৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

পঞ্চমবর্ষ—প্রথমখণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ

১৩২৪

সম্পাদক-শ্রীজলধর সেন

প্রকাশক-

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

পঞ্চমবর্ষ প্রথম খণ্ড আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩২৪

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্ত্তিক

অগ্রহায়ণ

ত্রিবর্ণ চিত্র

আষাঢ়, ১৩২৪

প্রথম খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [প্রথম সংখ্যা

জীবধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু, এম্-এ, বি-এল্]

"সম্বন্ধি ভেদাৎ সত্বৈব ভিদ্যমানা গবাদিষু।
জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দাঃ ব্যবস্থিতাঃ॥"

—বাক্যপদীয়।

"প্রাদুর্ভাব বিনাশাভ্যাং সত্বস্য যুগপদ্গুণৈঃ।
অসর্ব্বলিঙ্গাং বহ্বর্থাং তাং জাতিং কবয়ো বিদুঃ॥"

—মহাভাষ্য।

বৈশেষিক দর্শন হইতে আমরা মানুষকে এবং সাধারণ জীবকে বুঝিতে চেষ্টা করিব। বৈশেষিক দর্শন অনুসারে পদার্থ ছয় প্রকার হইলেও—দ্রব্য মূল পদার্থ। গুণ ও কর্ম্ম—দ্রব্যেই সংশ্লিষ্ট, দ্রব্যের শক্তি হইতেই অভিব্যক্ত। সামান্য ও বিশেষ—দ্রব্যেরই বিভাগ। সমবায় ও সাধারণ দ্রব্যের কারণত্ব পরস্পর সংযোগশক্তি মাত্র। এই মূল দ্রব্য বৈশেষিক দর্শন অনুসারে নয় প্রকার।

"পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি।" ১।১।৫

পৃথিবী, জল, বায়ু ও তেজ—এই চারি ভূত; আকাশ, কাল, দিক এবং আত্মা ও মন—এই কয়টী দ্রব্য। মানুষ বা কোন জীব স্বতন্ত্র দ্রব্যরূপে গৃহীত হয় নাই। এই দর্শন হইতে জানা যায় যে, মানুষ প্রভৃতি জীব আত্মা স্বরূপে দ্রব্য। এইজন্য পরবর্ত্তী বৈশেষিক দার্শনিকগণ আত্মার পরিবর্ত্তে 'দেহী' পদ ব্যবহার করিয়াছেন। এই আত্মার সহিত মনের এবং পার্থিব প্রভৃতি ভৌতিক শরীর সংযোগ হেতু মানুষ ও অন্যান্য জীব হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে উক্ত হইয়াছে যে—

"তৎ পুনঃ পৃথিব্যাদি কার্য্য দ্রব্যং ত্রিবিধং
শরীরেন্দ্রিয় বিষয় সংজ্ঞকম্। ৪।২।১

পৃথিব্যাদি পরমাণু হইতে যে সকল পার্থিব পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ত্রিবিধ, যথা—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। শরীর দ্বিবিধ—যোনিজ ও অযোনিজ। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ দেহ অযোনিজ। শাস্ত্রান্তরে উর্দ্ধলোকে সিদ্ধ বা পুণ্যাত্মাগণ যে তৈজসাদি দেহ ধারণ করেন উক্ত হইয়াছে, তাহা অযোনিজ। বৈশেষিক দর্শনে এই অযোনিজ বিশেষ দেহের কথা আছে। ৪।২।৫-১১ সূত্র দ্রষ্টব্য। এই পৃথিবীতে সকলেরই দেহ পার্থিব বা পৃথিবী ধাতু প্রধান। সুতরাং

এই পার্থিব দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের সহিত আত্মার সংযোগ হেতু মানুষাদি সমস্ত জীব উৎপন্ন হইয়াছে। আর কেবল এই সংযোগ নহে—পার্থিব বিষয়ের সহিতও সংযোগ, সম্বন্ধ বা ঘাত প্রতিঘাত জন্য সেই জীবত্বের বিকাশ হয়।

অতএব বৈশেষিক দর্শন অনুসারে জীবের, বিশেষতঃ মানুষের ধর্ম্ম, উক্ত আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর সংযোগ হেতু জীবধর্ম্ম; এবং বিষয়ের সহিত সংযোগ হেতু সেই ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়। সে অভিব্যক্তি ব্যাপার গৌণ বলিয়া তাহা এ স্থলে আলোচনার প্রয়োজন নাই। সুতরাং মানুষের ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ ধর্ম্ম বুঝিতে হয়; কিন্তু মানুষে আত্মধর্ম্মেরই বিশেষ বিকাশ হয়। আমরা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব যে, মানুষ এই আত্মার স্বরূপ। অবিদ্যা বা কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে এই আত্মার সহিত মন-ইন্দ্রিয়-সংযোগ হয়। তাহা হইতে শরীর-গ্রহণ হয়। মানুষ শরীরী হয়। সকল জীব সম্বন্ধে এই কথা। তবে মানুষে আত্মধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত অধিক বিকাশিত বলিয়া মানুষের মনুষ্যত্ব; এবং ইতর পশুত্ব হইতে তাহার এত প্রভেদ।

কিন্তু এই আত্মধর্ম্ম কি, আত্মার স্বরূপ কি, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। এজন্য এ সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। সাধারণতঃ আত্মজ্ঞান হইতেই আমাদের আত্মার ধারণা হয়। প্রত্যেক জ্ঞান ক্রিয়ার সঙ্গে যেমন জ্ঞেয় বিষয়ের ধারণা হয়, তেমনই জ্ঞাতা আত্মার ধারণা হয়। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ায়—আমি ইহা জানিতেছি—এইরূপ জ্ঞান হয়। এই অহং-জ্ঞান আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মপ্রবৃত্তি কালে ও প্রত্যেক ভোগ কালেও উপলব্ধি হয়; 'আমি এই কর্ম্ম করিতেছি', বা 'আমি ইহা হইতে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিতেছি'—এইরূপ জ্ঞান হয়। এইরূপে অহং-প্রত্যয়ের সহিত আমাদের আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে। বৈশেষিক দর্শনে আছে—

'অহমিতিশব্দস্য ব্যতিরেকাৎ ন আগমিকম্।' ৩।২।৯

অন্যত্র আছে—

'অহমিতি প্রত্যগাত্মনি ভাবাৎ পরত্রাভাবাৎ অর্থান্তর প্রত্যক্ষঃ' ৩।২।১৪

'অহং' এই প্রত্যয় আমাদের প্রত্যেক আত্মাতে আছে, অন্যত্র নাই। 'অহমিতি মুখ্যযোগ্যাভ্যাং বিশেষসিদ্ধেঃ। ৩।২।১৮। 'অহং'—ইহাই আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধির মুখ্য ও যোগ্য কারণ। 'আমি মানুষ' এ কথায় সেই আত্মাকেই নির্দ্দেশ করে; কিন্তু সে আত্মা কি? দেহাত্মবাদীরা বলেন, আত্মা শরীরের ধর্ম্ম, ভূতের বিকার মাত্র। সুতরাং শরীরের ধর্ম্মও যাহা, আত্মধর্ম্মও তাহাই। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াত্মবাদী, তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মকেই আত্মাতে আরোপ করেন। যাঁহারা মনাত্মবাদী, তাঁহারা মনের ধর্ম্ম আত্মাতে অধ্যস্ত করেন। বৈশেষিক দর্শনে সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার দ্বারা আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের পার্থক্য বুঝান আছে। সাধারণতঃ আত্মা, মন, ইন্দ্রিয়, শরীরসংযোগে আমাদের সাধারণ অস্তিত্ব বোধ বা আত্মপ্রতীতি হয়। এই আত্মাকে জীবাত্মা বলে। আমরা এ স্থলে প্রায় সর্ব্বত্রই এই আত্মা শব্দ জীবাত্মা অর্থে ব্যবহার করিতেছি। এই অর্থেই বৈশেষিক দর্শনে আত্মার লিঙ্গ বা অনুমাপক—"প্রাণ,অপান, নিমেষ, উন্মেষ, জীবন, মনোগতি, ইন্দ্রিয়ান্তরবিকার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন" (৩।২।৪)—এই সকল বলা হইয়াছে। ন্যায়-দর্শন হইতেও পাওয়া যায় যে, "ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, ইহারা আত্মার লিঙ্গ।" (১।১।১০) কিন্তু, ইহাদের মধ্যে প্রাণ, অপান, নিমেষ, উন্মেষ, জীবন—ইহারা প্রাণের ধর্ম্ম। আর মনোগতি (ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বিষয়ে গমন ও গ্রহণ) ইন্দ্রিয়ান্তরবিকার, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ—ইহারা ইন্দ্রিয়যুক্ত মনের ধর্ম্ম। প্রযত্ন মনোযুক্ত আত্মার ধর্ম্ম। আত্মার প্রযত্ন ব্যতীত মন ইন্দ্রিয়াদির কোন ক্রিয়া সম্ভব হয় না। প্রাণ, অপান প্রভৃতি সমুদায়েরই আশ্রয় আত্মা। আত্মার আশ্রয় ব্যতীত প্রাণ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়; তাহারা স্বতঃ কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। আত্মা ব্যতীত জীবত্ব থাকে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—

সেয়ং দেবতা……অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপেণ ব্যাকরবান্ ইতি। ৬।৩।২। অর্থাৎ তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি এই তিন জীবরূপ হন, এবং সেই জীবরূপেতে প্রাণধারক আত্মা রূপে বা চৈতন্যস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হন।

অতএব আত্মা প্রাণশক্তি-বলে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও শরীর সংযোগে শরীরী হয়, জীব হয়। বৈশেষিক দর্শন এই প্রাণকে স্বতন্ত্র দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। উল্লিখিত সূত্র হইতে পাওয়া যায় যে, প্রাণ আত্মারই লিঙ্গ বা পরিমাপক।

সাংখ্যদর্শনে আছে—"সামান্য করণবৃত্তিপ্রাণাদ্যাপঞ্চ-বায়বঃ।" অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অন্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি; কিন্তু উপনিষদে ও বেদান্তে প্রাণ স্বতন্ত্ররূপে স্বীকৃত। প্রাণ সর্ব্বব্যাপক। প্রাণ ব্রহ্ম। প্রাণ ব্রহ্ম হইতে কম্পনযুক্ত হইয়া (এজন্তি) নিঃসৃত হ'ন। মৃত্যু-কালে শরীর ত্যাগ করিয়া প্রাণ উৎক্রমণ করে;—এই সকল বেদান্তের সিদ্ধান্ত। শ্রুতিতে আছে—

প্রাণং দেবা অনুপ্রাণন্তি মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে।
প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ তস্মাৎ সর্ব্বায়ুসমুচ্যতে।
সর্ব্বমেব ত আয়ুর্যন্তি যে প্রাণং ব্রহ্মোপাসতে॥

তৈত্তিরীয় উপঃ ২।৩।১

দেবতারা, মনুষ্যগণ এবং পশুরা প্রাণশক্তির দ্বারা প্রাণন্ কর্ম্ম করে। প্রাণই প্রাণীদের আয়ুঃ। যাঁহারা প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হ'ন। এই প্রাণের উপাসনাকে হিরণ্যগর্ভের উপাসনা কহে। অতএব প্রাণই এই জীবের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণের কারণ। এই প্রাণের যাহা লিঙ্গ, তাহা উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রাণ সংযোগেই আত্মা শরীরী হন। প্রাণ, মন ও বাক্ তখন আত্মার আহার বা গ্রহণীয় হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে,—পিতা (স্রষ্টা) আত্মার জন্য তিনটি অন্ন করিয়াছিলেন—মন, বাক্ ও প্রাণ। অন্যমনস্ক হইলে দেখা বা শোনা যায় না। মনের দ্বারাই দর্শন করা যায়, মনের দ্বারাই শ্রবণ করা যায়। এই মন কি?

"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিঃ অধৃতিঃ হ্রীঃ ধীঃ ভীঃ ইত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব।"

আর শব্দই বাক্। ইহা অভিধেয়ের প্রকাশক; কিন্তু তাহার প্রকাশ্য নহে। পঞ্চপ্রাণ এক প্রাণ হইতেই জাত—প্রাণেরই বৃত্তি। ইহার অন্ন বা দৈহিক চেষ্টার মূল। এই ত্রিবিধ অন্নযুক্ত হইয়াই আত্মা—বাঙ্ময়, মনোময়, প্রাণময়।"

বৃহদারণ্যক ১।৫।৩

ইহার মধ্যে বাক্—মানুষেই বিশেষরূপ অভিব্যক্ত। বাক্ হইতেই প্রকৃত জ্ঞানের সম্ভাবনা। ভাষা ব্যতীত, চিন্তা, জ্ঞান, কল্পনা প্রভৃতির বিশেষ সম্ভাবনা নাই। প্রথমে নাম, পরে রূপ; প্রথমে পদ, পরে তাহার সহিত অর্থ-সংযোগ। নাম বা সংজ্ঞা ব্যতীত আমাদের সামান্যের জ্ঞান বিকাশ হইতে পারে না। এই জন্য এই বাক্ হইতে জ্ঞান। উল্লিখিত মন আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা—এজন্য ইহাকে ষষ্ঠ বা একাদশ ইন্দ্রিয় বলে। আর প্রাণ হইতে শরীর। আত্মা এই বাক্, মন ও প্রাণ আহরণ করিয়া জীব হ'ন বলিয়া, ইহারা আত্মার আহার বা অন্ন।

সাধারণতঃ এই মনকে অন্তঃকরণ বলা হয়। বুদ্ধি, কর্ত্তৃত্বভাব প্রভৃতি মনের অন্তর্গত ধরা হয়। শ্রুতিতে আছে, "যদেতৎ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানম্, আজ্ঞানম্, বিজ্ঞানং, প্রজ্ঞানং মেধা, দৃষ্টিঃ, ধৃতিঃ, মতিঃ, মনীষা, জূতিঃ, (তৎপরতা) স্মৃতিঃ, সঙ্কল্পঃ, ক্রতুঃ (চেষ্টা) অসুঃ (প্রাণনাদি) কামঃ বশঃ (অভিলাষ) ইতি।"

ঐতরেয় উপনিষদ ৩।২

অতএব শাস্ত্র অনুসারে আত্ম-স্বরূপ আমরা—(কেবল আত্মস্বভাব যুক্ত আমরা এই বাক্ বুদ্ধি) মন, প্রাণ সংযুক্ত হইয়া জীব হই। প্রাক্তন বাসনা এই সংযোগের কারণ। প্রাক্তন সংস্কার এই বাসনার মূল। প্রলয়ে এই সংস্কার লীন থাকে, বাসনা সুপ্ত থাকে। জীবের বাসনা বিকাশোন্মুখ হইলে ভগবান আবার সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি জীববাসের উপযোগী হইলে জীব ভূলোকে শরীরী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। যাহার যেরূপ সংস্কার, তিনি সেইরূপ জন্ম বিধাতার বিধানে লাভ করেন। কাহারও সংস্কার ক্ষীণ হইলে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মা অল্প বিকাশিত হয় বলিয়া নিম্নশ্রেণীর জীব হ'ন। কাহারও পূর্ব্বসংস্কার বিশেষ উন্নত ও বিকাশিত থাকায়, এবং পূর্ব্বে মন, বুদ্ধি, প্রাণ অধিক পরিণত থাকায়, উচ্চ শ্রেণীর জীব হইয়া জন্মেন। কেহ এই সূক্ষ্ম শরীর আরও অধিক বিকাশিত বলিয়া মানুষ হ'ন। কেহ আরও উন্নত জীব বা দেব কি 'সিদ্ধ' হ'ন। সৃষ্টির প্রথমে এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষাদি জীবের প্রতি জন্মে সংস্কারের উন্নতি বা অবনতি হইতে থাকে। এইরূপে পুনঃ প্রলয় পর্য্যন্ত জন্ম-মৃত্যু-চক্রে জীব ভ্রমণ করিতে থাকে।

এই জন্য আমরা এ সৃষ্টিতে এত অসংখ্য রূপ জীব-জাতি দেখিতে পাই। নিম্ন জীবে প্রাণ-মন-বুদ্ধি বা সূক্ষ্ম শরীর অতি সামান্য মাত্র বিকাশিত। সে যে শরীর গ্রহণ করে, তাহাও আংশিক রূপে বিকাশিত। জীব প্রকৃতির আপূরণে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার শরীর ক্রম-বিকাশিত হইতে থাকে; এবং প্রকৃতির পরিণামে

শেষে উচ্চতর জাতিতে পরিণত হয়। যতই এই পরিণাম হইতে থাকে, ততই তাহার ধর্ম্মগত ভেদ হয়।* এই পরিণতির সহিত তাহার সূক্ষ্ম শরীরেরও ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। বৃক্ষের শরীর আছে—প্রাণ আছে;—কিন্তু মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিকাশ নাই। অন্তঃকরণ বিকাশিত না হওয়াতে সেখানে আত্মা সুপ্তাবস্থায় থাকেন, অথবা কেবল স্বপ্নাবস্থা মাত্র লাভ করেন। জড়ে প্রাণ ও শরীর নিতান্ত অপরিণত। সেখানে আত্মা পূর্ণ নিদ্রিত। ইতর জন্তুতে প্রাণময় বুদ্ধির বিকাশ হওয়ায়, ইন্দ্রিয়েরও বিকাশ হইতে আরম্ভ হওয়ায় আত্মা স্বপ্নাবস্থা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হইতে আরম্ভ হ'ন। মানুষের অবস্থায় না আসিলে,—মনুষ্য শরীর গ্রহণ করিতে না পারিলে বুদ্ধি, মন, প্রাণের এবং ইন্দ্রিয়ের বিশেষ বিকাশ সম্ভব হয় না। আত্মা বলিয়াছি ত জ্ঞান-স্বভাব। উদ্ভিদ অবস্থায় তাহার অন্তঃকরণ বা জ্ঞান-বিকাশের যন্ত্র প্রস্তুত না হওয়াতে, বা নিতান্ত অপরিণত থাকাতে, তখন জ্ঞান অন্তর্মুখী থাকে। এই জন্য তখন আত্মা সুপ্ত বা স্বপ্নযুক্ত। প্রাণী অবস্থায় অন্তঃকরণ বা জ্ঞান-বিকাশের যন্ত্র কতকটা প্রস্তুত হয়—ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়, এজন্য তখন আত্মা জাগরিত হইয়া বহির্মুখী হ'ন। তখন তিনি অন্তঃকরণ দিয়া—ইন্দ্রিয় দিয়া বিষয় গ্রহণ করিতে পারেন। তখন তিনি এই বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হ'ন; এবং এই বিষয়-গ্রহণ হইতেই জ্ঞান-বিকাশ হইতে থাকে—অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ বিশেষরূপে হইতে থাকে। আর সেই বিকাশের ফল সংস্কার রূপে আত্মাতে সংযুক্ত হইয়া জীব-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে।

অতএব আত্মা, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব রূপে বদ্ধ হ'ন সত্য; কিন্তু সেই আবরণ সহায়েই জীবাত্মার ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, এবং সেই আবরণের সহায়েই ক্রমে জীবধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে। সেই আবরণের সহায়েই মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, এবং ক্রমে তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। এইরূপে মনুষ্যত্ব-ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশের মূল আত্মপ্রযত্ন। সেই প্রযত্ন হইতে তিনি অন্যের সহায়তা লাভ করেন। প্রকৃতির সহায়ে আত্মপ্রযত্ন ফলেই জীব ক্রমে নিদ্রাবস্থা হইতে জাগরিত অবস্থায় আসিবার চেষ্টায় ক্রমোন্নত হয়। উদ্ভিদ হইতে নিম্ন জাতীয় জীবে, পরে উচ্চ জাতীয় জীবে, পরে মানুষে পরিণত হইতে পারে। জীব বহির্মুখী হইয়া বিষয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়া ও বিষয় গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হ'ন। সেই প্রযত্নের ফলে বাহ্য বিষয়ের সহিত তাঁহার শরীরের ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া ক্রমে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হইতে থাকে। বলিয়াছি ত, জীব-জাতি আরও উন্নত হইলে তাহার মনের, ও পরে বুদ্ধির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এইরূপে ক্রমে ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া যখন আত্মা বহির্মুখী হইতে চেষ্টা করিয়া, প্রবুদ্ধ হ'ন, তখন আত্মাতে অহং-জ্ঞানের বিকাশ হয়, বাহ্য বিষয়কে আত্মা-অতিরিক্ত অন্য কিছু বলিয়া বোধ হয়। তখন হইতে বৃত্তি-জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু মানুষ-অবস্থায়ই কেবল তাহার প্রকৃত জ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞান-বিকাশ হইতে পারে। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তখন জ্ঞানরূপী আত্মা তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া অধিষ্ঠান করেন।

আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মধ্যে পণ্ডিত ডারউইন্ এই জীবজাতির বিকাশ-তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝাইয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনেও আমরা ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাই। পাতঞ্জল দর্শনে প্রকৃতির আপূরণে জাত্যন্তর পরিণাম হয়—এই তত্ত্ব স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতে, কিরূপে আমাদের দেহে ইন্দ্রিয়গণ বিকাশিত হয়, তাহার উল্লেখ নাই। বৈশেষিক দর্শনে আছে—

"ভূয়স্ত্বাদ্ গন্ধবত্ত্বাচ্চ পৃথিবী গন্ধজ্ঞানে প্রকৃতিঃ ৯।১।৫

অর্থাৎ গন্ধজ্ঞানের বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বা কারণ পৃথিবী, কেন না তাহাতে গন্ধ এবং পার্থিব অংশের আধিক্য আছে। সেইরূপ—

"তথাপস্তেজো বায়ুশ্চ রসরূপ স্পর্শাবিশেষাৎ"। ৯।১।৬

জল তেজ বায়ু হইতে যথাক্রমে রস, রূপ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইয়াছে। এই রূপের পার্থিবাদি ভূত হইতে ইন্দ্রিয়গণের উৎপত্তি হইয়াছে।

ন্যায়দর্শনেরও সেই কথা—

ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র—এই সকল ইন্দ্রিয় ভূত সকল হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে।—

* পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে আছে—"অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্ব্বধর্ম্মনিবৃত্তৌ ধর্ম্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণাম ইতি।"

"ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্ শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ।"১।১।১২

আর সেই সকল ভূত—

"পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ু রাকাশমিতি ভূতানি।"১।১।১৩

সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন অনুসারেও মূল অহঙ্কার-তত্ত্বের রাজসিক অংশ হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অংশ হইতে ভূতগণের উৎপত্তি হয়। অতএব ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আত্মার সহিত জড় ভূতের সংযোগে প্রথমে জড় ভূত হইতে অপরিণত শরীরের উৎপত্তি হয়। এই শরীরের সহিত বাহ্য ভৌতিক বিষয়ের সংযোগে বা ঘাত-প্রতিঘাতে আত্ম প্রযত্নের ফলে সেই ভূত হইতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের গঠন হয়। তাহার পর আত্ম-মন সংযোগ হেতু আত্মা বহির্মুখী হ'ন, ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া বিষয় গ্রহণ করেন। বিষয়ের সহিত তখন আত্মার ঘাত-প্রতিঘাত, আদান-প্রদান চলিতে থাকে। তখন তিনি ক্রমাগত বিষয় আহার বা আহরণে প্রবৃত্ত হ'ন। ক্রমে তাহার ফলে শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মের বিকাশ ও পরিণতি হয়। এইরূপে আত্মা, মন ও ভূতগণের বিশেষতঃ পার্থিব ভূতের সংযোগে সকলেরই ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে।

ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের যে কথা, সাংখ্য বা পাতঞ্জল-দর্শনেরও সেই কথা। এই দর্শন মতে, পুরুষ প্রকৃতি সংযোগ হইতেই জীবাত্মার বিকাশ ও পরিণতি হয়, জীবধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হয়। আত্মার সান্নিধ্য জন্য এই প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি মন-অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া আত্মাকে বদ্ধ করে। সেই বন্ধন হইতে, প্রকৃতির তমোগুণ হইতে উৎপন্ন শরীর এবং রজঃ গুণ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রধানতঃ সাত্ত্বিক। তাহা হইতেই জীবাত্মার বিকাশ-চেষ্টা। ইন্দ্রিয় হইতে তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রবৃত্তি; আর শরীরের তামসিক ধর্ম্ম তাহার আবরণ-শক্তি। প্রকৃতির এই গুণ বিকার বা ধর্ম্মের দ্বারা আত্মা বদ্ধ হ'ন। প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে প্রকৃতি হইতে গৃহীত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের পূর্ণ বিকাশ হয়। বিশেষতঃ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-তত্ত্ব সাত্ত্বিক। তাহা ক্রমে স্বচ্ছ, নির্ম্মল হইতে থাকে। তখন আত্ম-ধর্ম্ম বিকাশিত ও পরিণত হইতে পারে। এই প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্তিই আমাদের মুক্তি বা আত্ম-ধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশাবস্থা।

বেদান্তদর্শনেরও এইরূপ সিদ্ধান্ত। আত্মা মায়া বা অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ হইয়া জীব হ'ন। মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণ-শক্তি হইতে, তাহার শরীর, প্রাণ, মন, বুদ্ধি দ্বারা আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান আবরিত হয়। তখন আত্মা অন্নময় কোষে, প্রাণময় কোষে, মনোময় কোষে, বিজ্ঞানময় কোষে, এবং আনন্দময় কোষে—এই পঞ্চ কোষে আবদ্ধ হ'ন। গুটিপোকা যেমন আপনার নালে আপনি আবদ্ধ হয়—সেইরূপ আবদ্ধ হ'ন। তাহার পর পরমা প্রকৃতি বা অন্তর্যামী ভগবানের সহায়ে সেই শরীরের মধ্য দিয়া জীবাত্মার ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। যখন তাঁহার আত্মধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ হয়, তখন গুটিপোকা হইতে প্রজাপতির বিকাশের ন্যায় আত্মা পূর্ণরূপে এই আবরণ-মুক্ত হইয়া স্বধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হ'ন।

গীতাতেও আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এবং বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় ও স্থূল শরীরকে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে। যথা—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে।
এতদ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম॥

* * *

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয় গোচরাঃ॥
ইচ্ছা দ্বেষ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদাহৃতম্॥

গীতা, ১৩।১-২ ; ৫-৬।

অতএব পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত (প্রকৃতি), মন সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গোচর (রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ), ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, স্থূল শরীর, চেতনা, ধৃতি—ইহাই বিকার সহিত ক্ষেত্র। অতএব আত্মার স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর অথবা পঞ্চ কোষ সমুদায়ই ক্ষেত্র—ইহাই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার শরীর। সংসারে স্থাবর জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু জড় আছে, তৎসমুদয় এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে উৎপন্ন।

"যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥"

গীতা, ১৩।২৬।

অতএব এমন কিছু সত্ত্বা জগতে নাই—যাহা এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞযোগে উৎপন্ন হয় নাই। আর ভগবান সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে অবস্থিত—সকল জীবের অন্তর্যামী। কারণ—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।"

গীতা, ১৩।২৭

এই ক্ষেত্র ভগবানের অপরা প্রকৃতি, আর ক্ষেত্রজ্ঞ জীব তাঁহার পরা-প্রকৃতি। (গীতা ৭ অধ্যায় ৪।৫ শ্লোক।)

অতএব আমাদের সকল শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জীব—প্রকৃতি-বদ্ধ বা মায়াবদ্ধ আত্মা; জীব-ভাব আত্মা, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও স্থূল শরীরের সমবায়ে উৎপন্ন। জীবাত্মা প্রথমে প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া অন্তর্মুখী বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। তখন তাঁহার সংযুক্ত প্রকৃতি জড় বা জড়ের ন্যায়। তাঁহার সে জড় শরীর—অতি অপরিণত ও ইন্দ্রিয়াদি বিহীন থাকে। ক্রমে আত্মা বহির্মুখী হইতে প্রবৃত্ত হ'ন বা প্রযত্ন করেন। তখন শরীর অপেক্ষাকৃত বিকাশিত হয়; ইন্দ্রিয়গণের বিকাশ হয়। শাস্ত্রে আছে, আমাদের ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা দেবগণ বা অধিদেবগণ সেই বিকাশের সাহায্য করেন।* ইন্দ্রিয় বিকাশ হইলে আত্মা বহির্মুখী হইয়া বিষয়-গ্রহণে প্রবৃত্ত হ'ন। ইহাতে ক্রমে তাঁহার স্বধর্ম যে জ্ঞান, তাহা ক্রম বিকাশিত হইতে থাকে। তিনি স্বপ্নাবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থায় আসেন; তখন তাঁহার জীবত্বের অনেকটা বিকাশ হয়। এই বিষয়-গ্রহণের পরিণামে অধিদেবগণের সহায়ে আমাদের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার (জীবভাব) বিশেষ বিকাশিত হয়, জীবধর্ম্মের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়। তখন আত্মধর্ম্ম বিকাশের আর বড় বাধা থাকে না। তখন মনুষ্যদেহ লাভ হয়। তখন উক্ত শরীরমধ্যে অধিষ্ঠিত দেবগণের বিশেষ সহায়ে আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, ধর্ম্মের বিশেষ বিকাশ হয়। তখন মানুষ ক্রমে বিশেষ বিকাশাবস্থা লাভ করে। সে মানুষ হয়।

* প্রত্যেক ব্যাপার অধ্যাত্ম অধিদৈব ও অধিভূত এই তিন প্রকারে বুঝিতে হয়। আমাদের এই ইন্দ্রিয়গণের বিকাশ ক্রিয়ায়ও আত্মার প্রযত্ন, তদধিষ্ঠিত দেবশক্তির সহায়তা ও তৎসমবায়ী কারণ ভূত-বিশেষের সেই নিমিত্ত-কারণ-সহায়ে সম্পন্ন হয়।

ক্রমে আরও আপূরণে তাহার বুদ্ধি-জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি হয়,—ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, পূর্ণ বিকাশিত ও স্ফূর্ত্ত হইয়া শান্ত হয়; আর বিষয়-গ্রহণের বড় প্রয়োজন হয় না। তখন জ্ঞান এক অর্থে সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিয়া আবার অন্তর্মুখী আপন স্বরূপ অবস্থা লাভ করিতে চেষ্টা করেন ও আত্মা অন্তর্মুখী হ'ন। তাহারই পরিণামে আত্মধর্ম্মের পূর্ণ বিকাশ হয়—নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। এইরূপে অতি সংক্ষেপে আমরা জীবোন্নতির এই ইতিহাস বুঝিতে পারি।

ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জীবত্ব-বিকাশের একরূপ অনন্ত স্তর আছে। জীবমাত্রেরই ধর্ম্ম কি, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সে ধর্ম্ম তাহার আত্মধর্ম্ম। যে কারণেই হউক, আত্মা প্রকৃতিবদ্ধ হইয়া জীব হ'ন। আত্মার জন্যই তাহার প্রকৃতি ক্রমপরিণত হয়। তাহা মন, ইন্দ্রিয় বা শরীর হইয়া আত্মধর্ম্ম বিকাশের সহায় হয়। আত্মা প্রকৃতিযুক্ত না হইলে নিদ্রিত ভাবে থাকে;—নিজের স্বরূপ বুঝে না। সেই জন্যই আত্মার সহিত প্রকৃতির সংযোগ হয়। আর সেই সংযোগ হইতে প্রথমতঃ শরীর, পরে ইন্দ্রিয়, পরে মন বুদ্ধি ও জ্ঞান বৃত্তির—ইহাদের ধর্ম্মের বিকাশ হইতে থাকে। শেষে যখন এই বিকাশে চিত্ত নির্ম্মল হয়, তখন তাহাতে আত্মদর্শন সম্ভব হয়। তখন হইতে আত্মজ্ঞান আরম্ভ হয়। তখন প্রকৃতি আত্ম-ধর্ম্ম বিকাশের পূর্ণ সহায় হয়; এবং তখন হইতে আত্মধর্ম্ম বিশেষ রূপে বিকাশিত ও পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় আসিতে অনেক জীব-জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমে অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। সে সকল কথা এস্থলে আলোচ্য নহে।

আমরা—বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে যে এই জীবধর্ম্ম বিভিন্ন রূপে বিকাশিত—তাহা বুঝিতে পারি। প্রত্যেক জাতীয় জীবে তাহার বিকাশ বিভিন্ন। তাহাদের মধ্যে শরীরের বিভিন্নরূপ বিকাশ, ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নরূপ বিকাশ, মনের বিভিন্নরূপ বিকাশ—আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। এই ধর্ম্মের বিকাশাবস্থার পার্থক্য হইতে আমরা প্রত্যেক জাতীয় জীবের ধর্ম্মগত পার্থক্য ধারণা করি। আবার প্রত্যেক জাতীয় জীব মধ্যেও, বিশেষতঃ অপেক্ষাকৃত উন্নত জীব মধ্যে, আমরা ব্যক্তিগত পার্থক্যও দেখিতে পাই; সুতরাং এস্থলে মূল ধর্ম্মের কোন প্রভেদ না থাকিলেও, তাহারই

বিকাশাবস্থার পার্থক্য আমরা বুঝিতে পারি। তাহা হইতেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিচার করিতে পারি। ইহাতে সমগ্র জীবমধ্যে এই সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্য বিচার করিয়া তাহাদের মধ্যে সামান্য ও বিশেষ বিভাগ করিতে পারি। এইরূপে আমরা ধর্ম্মের বিকাশের তারতম্য হইতে, ধর্ম্মগত ভেদ বা সমতা হইতে—পর-অপর জাতির ক্রম-বিভাগ বা ব্যক্তিগত পার্থক্য, ও অন্যের সহিত একজাতিত্ব ধারণা করি। এইরূপে আমরা ধর্ম্মগত প্রভেদ বুঝিতে পারি। অতএব মানুষের ধর্ম্ম আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে ইতর জীবের সহিত তাহার সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য বুঝিতে হইবে। তাহা ব্যতীত মানুষে-মানুষে ধর্ম্মগত প্রভেদ ও সেজন্য মানুষের মধ্যে জাতিগত বিভাগও বুঝিতে হইবে।

যাহা হউক, মানুষ ও ইতরজাতি মধ্যে এই ধর্ম্মগত পার্থক্য বুঝিবার পূর্ব্বে আপত্তি হইতে পারে যে, আমরা যে সকল তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছি, তাহা অমূলক। আমরা জন্মান্তরের কথা ইঙ্গিত করিয়াছি, জাত্যন্তরের কথাও বলিয়াছি। জন্মান্তর সর্ব্ববাদিসম্মত তত্ত্ব নহে। প্রমাণ দ্বারা ইহা নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধান্ত করা যায় না। জাত্যন্তর সম্বন্ধেও সেই কথা। একজাতি হইতে, কিরূপে অবস্থার পরিবর্ত্তনে, অন্য জাতির উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা সম্প্রতি ডারউইন সাহেবের অনুগ্রহে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন; কিন্তু সে জাতিগত পরিবর্ত্তন তত্ত্ব স্বীকার্য্য হইলেও, ব্যক্তিবিশেষের এই জাত্যন্তর-পরিণাম এখনও স্বীকৃত হয় নাই। প্রত্যেক জীবকে যে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং প্রতি জন্মে তাহার প্রকৃতির যে ক্রমবিকাশ হইতে থাকে এবং তাহার ফলে যে তাহার পুনঃপুনঃ জন্ম ও জাত্যন্তর পরিণাম হয়—তাহা এক হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। পুরাণে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। যাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রে বিশ্বাস না করেন, শাস্ত্র-প্রমাণ না মানেন, তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিবেন না।

তাহা না বুঝিলেও আমরা যে জীবধর্ম্ম আলোচনা করিতেছি, তাহা বুঝিবার বাধা হইবে না। প্রকৃত ধর্ম্ম সনাতন, সকলেরই ধর্ম্ম মূলতঃ এক। তবে ব্যবহারিক ভাবে, বিকাশের পার্থক্য হেতু বিভিন্ন হইয়াছে। সকল জীবে যে আত্মা-মন-(ও বুদ্ধি) ইন্দ্রিয়-শরীর ধর্ম্ম আছে, এ দার্শনিক তত্ত্ব বিচার করিয়া দেখিলে সকলেই স্বীকার করিতে পারেন। বিভিন্ন জাতীয় জীবমধ্যে যে এই সকলের ধর্ম্ম বিভিন্নরূপে বিকাশিত হয়—নিম্নজাতীয় জীবে তাহার অতি সামান্য বিকাশ হয়, এবং উচ্চজাতীয় জীবে যে তাহার অধিক বিকাশ হয়, তাহা একরূপ প্রত্যক্ষ ও সামান্য অনুমান সিদ্ধ। এ স্থলে দার্শনিক মতভেদে কিছু যায় আসে না। আমরা শরীর হইতে আত্মা ও মনকে পৃথক বুঝি বা না বুঝি, আত্মা হইতে মন প্রভৃতি পৃথক ইহা স্বীকার করি বা না করি, জীব অবস্থায় যে প্রত্যেক জাতীয় জীবের পরস্পরের ধর্ম্ম পৃথক রূপে অনুমিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব কেবল মনুষ্যত্ব ধর্ম্মের এবং তাহার সহিত ইতরজাতীয় জীবের ধর্ম্মের বিকাশগত পার্থক্য বুঝিতে হইলে, এই দার্শনিক মতভেদের কোন বিচার বা মীমাংসার প্রয়োজন নাই।

আমরা জীবমধ্যে বৈশেষিক দর্শনানুসারে সামান্য ও বিশেষের বা ধর্ম্মের বিভাগ হইতে জাতিগত বিভাগের কথা বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই "জাতি" শব্দ বৈশেষিক দর্শনে নাই। তাহাতে 'সামান্য' ও 'বিশেষ' ইহারই উল্লেখ আছে মাত্র। এই 'সামান্য' অর্থে যে 'জাতি'—তাহা সকল টীকাকারই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু সামান্য ও বিশেষ বিভাগ যেরূপে করা হইয়াছে, জাতিবিভাগ ঠিক সেরূপে করা যায় না। জাতি অর্থে আরও বিশেষত্ব আছে। জাতি-বিভাগের মূল স্বতন্ত্র। জাতির অর্থ কি? ন্যায়দর্শনে এই জাতির অর্থ বুঝান আছে। বাহ্য আকৃতি দেখিয়াই আমাদের পদার্থ-জ্ঞান হয়। শরীরের গঠন হইতেই আমরা শরীরীকে অনুমান করি। সকল জীবের শরীর বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন একরূপ নহে। প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু প্রভেদ আছে। এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রভেদ—কতকগুলি সামান্য, কতকগুলি বিশেষ। এই প্রভেদ হইতেই আমরা জীবের জাতিত্ব ও ব্যক্তিত্ব সাধারণতঃ ধারণা করি।

ন্যায় দর্শনে আছে—

"ব্যক্ত্যাকৃতি জাতয়স্তু পদার্থঃ।" ২।২।৬৮

ইহার বাৎস্যায়ন ভাষ্য এইরূপ—

প্রধান-অঙ্গ ভাবস্য অনিয়মেন পদার্থত্বম্।...যদা হি বিবক্ষা বিশেষ গতিশ্চ তদা ব্যক্তিঃ। প্রধানমঙ্গন্তু

ক্তাত্যাকৃতী। যদা তু ভেদ বিবক্ষিতঃ সামান্য গতি স্তদা জাতিঃ।"......

অতএব প্রধান অঙ্গ-বিভাগ হইতে জাতি; আর বিশেষ অঙ্গ-পার্থক্য হইতে ব্যক্তি। নানা ব্যক্তিতে জাতি। "নানাব্যক্ত্যাকৃতি জাতয়ঃ।"

আরও উক্ত হইয়াছে যে,

"আকৃতি জাতি লিঙ্গাখ্যাঃ।" ২।২।৭০

অতএব আকৃতিই জাতির লিঙ্গ বা পরিমাপক। এই আকৃতি (Form বা রূপ) কেবল আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিষয়। বহু আকৃতি মধ্যে যে স্থলে আমাদের সমান-বুদ্ধি প্রসূত হয়, সে স্থলে জাতিজ্ঞান হয়।

"সমান প্রসবাত্মিকা জাতিঃ।" ২।২।৭১

ইহার বাৎস্যায়ন-ভাষ্য বড় সুন্দর। তাহা উদ্ধৃত হইল।

"যা সমানাং বুদ্ধিং প্রসূতে ভিন্নেষু অধিকরণেষু, যথা বহূনি ইতরেতরতো ন ব্যবর্ত্তন্তে যোঽর্থোঽনেকত্র প্রত্যয়ানুবৃত্তি নিমিত্তং তৎ সামান্যং। যচ্চ কেষাঞ্চিৎ ভেদং কুতশ্চিৎ ভেদং করোতি তৎ সামান্য বিশেষো জাতিরিতি।"

এইরূপে বাহ্য শরীর বা আকৃতি হইতে আমরা সাধারণতঃ জাতি ও ব্যক্তির ধারণা করি। এই ধারণা আংশিক। ব্যক্তিগত বিশেষ ধর্ম্ম ও জাতিগত সামান্য ধর্ম্ম—এই সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য হইতে প্রধানতঃ আমরা জাতির ধারণা করি। দেশ কাল প্রভৃতির পার্থক্য জন্যও ব্যক্তিজ্ঞান লাভ হয়। ইহাই সাধারণ ব্যক্তি বা বিশেষ জ্ঞান। তাহার পর যে সকল সূক্ষ্ম ধর্ম্মগত ভেদ আমাদের এই জ্ঞানে প্রত্যক্ষ নয়, যোগজ প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয়—ইহা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং স্থূল-সূক্ষ্ম প্রভৃতি বস্তুর বিশেষ ধর্ম্মজ্ঞান,—কতক প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কতক অনুমানজাত, আর কতক যোগজ প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ। তাহাদের সেই বিশেষ ধর্ম্ম হইতেই ব্যক্তি-জ্ঞান—পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হয়। পাতঞ্জল-দর্শনে আছে—

"জাতি লক্ষণ দেশৈরন্যতা নবচ্ছেদাৎ
তুল্যয়োস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ।" ৩।৫৩

ইহার অর্থ, "গোত্বাদি জাতি বস্তুর অসাধারণ ধর্ম্ম ও দেশভেদ (আধার স্থানভেদ) দ্বারাই বস্তুর ব্যক্তিগত ভেদ প্রতীতি হয়। যেখানে জাতি বিশেষ ধর্ম্ম ও দেশভেদ প্রতীতি হয় না, সেখানে যোগফল বিবেকজ জ্ঞান হইতে সে ভেদ প্রতীতি হয়।

যাউক, এস্থলে ব্যক্তি-ভেদের কথা বুঝিবার আবশ্যক নাই। আমরা জাতিভেদ কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক জাতীয় ব্যক্তির মধ্যে যে একত্ব ধারণা করি, তাহাই জাতি। জাতি নিত্য দেশ কাল বিভক্ত সমগ্র ব্যক্তির একীভূত সম্মিলিত রূপ। সেই জাতির অন্তর্গত সর্ব্ব কালের সর্ব্ব দেশের ব্যক্তি-সমষ্টির একীভূত ধারণা। ইহাই হিরণ্যগর্ভের মূল কল্পনা। এই জাতির মূলে আর এক গূঢ় অর্থ নিহিত আছে। জন ধাতু হইতে জাতি। জন্ম-প্রবাহকে জাতি বলে। কি স্বেদজ, কি অণ্ডজ, কি উদ্ভিজ্জ, কি জরায়ুজ,—সকল জীবই বীজ-প্ররোহ-ক্রমে পরম্পরা রূপে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এক অর্থে শরীরী জীবমাত্রেই পিতৃমাতৃজ; কিন্তু জরায়ুজ জীবকে বিশেষ-ভাবে পিতৃমাতৃজ বলা যায়। মূল এক পিতামাতা হইতে যে জীব-প্রবাহ বরাবর চলিতে থাকে, তাহাই প্রকৃত পক্ষে এক জাতির অন্তর্গত। এইরূপে উন্নত জীব পিতার রেতঃ ও মাতার শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া মাতৃগর্ভে প্রথম পরিপুষ্ট হইয়া, মাতাপিতার অনুরূপ শরীর গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে পিতামাতা হইতে জীব-জাতি-প্রবাহ চলিতে থাকে। অতএব জাতির মূলে জন্ম। হিরণ্যগর্ভের মধ্যে যে বহু হইবার মূল কল্পনা প্রথম উদ্ভূত হয়, তাহাই এইরূপে পরম্পরাক্রমে সকল জাতিকে রক্ষা করে—ধারণ করে। এইরূপে এক জাতি মধ্যে পিতামাতার সংস্কার-সহায়ে একরূপ ধর্ম্মের বিকাশ হইতে পারে।

এস্থলে কোন্ জাতির প্রথম পিতামাতা কোথা হইতে আসিল, কোথা হইতে তাহার বীজ উৎপন্ন হইল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা ও নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক পণ্ডিত-গণ এ পর্য্যন্ত তাহার কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। পণ্ডিতবর ডারউইন্ ইহার একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বটে; কিন্তু ভগবানের মূল জাতি-কল্পনায় কিরূপে এ পৃথিবীতে আনুসঙ্গিক কারণের সহায়ে প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে ক্রম-বিকাশিত হয়, তাহা তিনি বুঝান নাই। কেবল প্রকৃতির

আপূরণে বা স্বাভাবিক উন্নত হইবার চেষ্টার পরিণামে ও পরিপাকে যে জাত্যন্তর পরিণাম হয়, ইহাই তিনি বুঝাইয়াছেন; কিন্তু সেই সকল জাতির মূলে যে ভগবানের কল্পনা ও তাহা সৎরূপে পরিণত করিবার "কামনা" ও "তপস্যা" আছে, তাহার তিনি ধারণাও করেন নাই। ইহা পরে উল্লিখিত হইবে।

যাহা হউক, এই কারণে যে জাতিগত ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এইজন্য এক জাতি হইতে আর এক জাতির ভেদ স্পষ্ট হয়। এক জাতির মধ্যে অনেক শাখা-প্রশাখা, অনেক অন্তর্জাতীয় ভেদ থাকে সত্য; কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভেদ যেরূপ পরিষ্কার সীমা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট, এই অন্তর্জাতীয় ভেদ সেরূপ নহে। মানুষে ও অপর কোন জাতীয় পশুতে ভেদ যেরূপ স্পষ্ট পরিস্ফুট, এক জাতীয় মানুষের সহিত আর এক জাতীয় মানুষে তত ভেদ হয় না। এক মানুষের সহিত আর এক মানুষের স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভেদ থাকিলেও তাহা অপেক্ষাও অপর পশু হইতে তাহার ভেদ আরও অনেক অধিক পরিস্ফুট। অতএব মনুষ্যত্ব-ধর্ম্ম অপর জীবধর্ম্ম হইতে, অথবা সাধারণতঃ পশুধর্ম্ম হইতে বিশেষ বিভিন্ন। এই ধর্ম্মগত ভেদ হইতেই জাতি-বিভাগের সার্থকতা। সাধারণ জীব-ধর্ম্ম ক্রমে বিকাশিত হইয়া নানা রূপে নানা ভাবে পরিণত হইয়াছে। এই বিভিন্ন রূপ-পরিণতি হইতে বিভিন্ন জাতি-বিভাগ; তাহা হইতেই বিভিন্ন জাতি-ধর্ম্ম। বংশপরম্পরাগত হয় বলিয়া এই জাতি-ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকে, জাতিভেদ রক্ষিত হয়, জাতিগত আকৃতিভেদ, প্রকৃতিভেদ, গুণভেদ ও কার্য্যভেদ সমুদায়ই রক্ষিত হয়। একএক জাতিতে ধর্ম্মের একএক রূপ বিকাশ হয়।

বলিয়াছি ত, জাতির মূল ভগবানের কল্পনা। তাঁহার ছয় প্রকার স্থাবর সৃষ্টি-কল্পনার পরস্পর ভেদ আছে। তাহা হইতে আবার আটাইশ প্রকার তির্য্যক-যোনি সৃষ্টি-কল্পনার ভেদ আছে। এই আটাইশ প্রকার তীর্য্যক-যোনি মধ্যেও পরস্পর ভেদ আছে; এবং তাহাদের হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব-কল্পনার ভেদ আছে।* ধর্ম্মগত ভেদ দ্বারা এই ভেদ কল্পিত ও রক্ষিত হয়। অতএব কোন্ জাতীয় জীবে জীবধর্ম্মের কতদূর বিকাশ হইবে, তাহা নিত্যসিদ্ধ। এই জন্য সৃষ্টিতে জাতিকে নিত্য বলে। স্বয়ং ভগবতী বা পরমা-প্রকৃতিই জাতিরূপে সর্ব্বজীব মধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ।"

* শ্রীমদ্‌ভাগবত, তৃতীয় স্কন্ধ ১০।১৭—৩০ দ্রষ্টব্য।

দেশে জ্ঞান-প্রচার

[রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি, এম্-এ]

আমরা দেশের কাজ খুব সস্তায় সারিতে চাই; আগা কোথায় গোড়া কোথায় না ভাবিয়া মাঝখানে ধরিতে যাই।

অনেক কাল হইল, বিশ বাইশ বছরের কম হইবে না, কলেজের দীর্ঘ অবকাশের দিন চারি পূর্বে উচ্চ শ্রেণীর এক ছাত্র, মদন এবং আর দুই জন, আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। এ-কথা সে-কথার পর মদন বলিল, "ছুটির সময় গ্রামে যাইতেছি, সেখানে কিছু করিতে চাই। কি করিতে উপদেশ করেন?"

আমি॥ পড়া-শুনা করিবে, আর কি করিবে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক শিয়রে বসিয়া আছেন, ইহা মনে রাখিয়া পড়া-শুনা করিবে।

মদন॥ আমরা সে কথা বলিতেছি না। পরীক্ষা ত আছেই। পড়া-শুনা করিয়াও সময় থাকিবে। তখন দেশের কিছু করিতে চাই।

আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "তোমরা কি কাজের যোগ্য হইয়াছ? বিদ্যাভ্যাস ছাড়া আর কি কাজ পার?"

মদন॥ আমরা কিছুই করিতে পারি না? এই আসছে পরীক্ষার পরেই ত চাকরি করিব, ঠিক আছে।

আমি বুঝিলাম, মদন খিন্ন বোধ করিতেছে, আমি যেন তাহার ক্ষমতায় প্রত্যয় করি না। কি চায়, বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু দাস্য-ভাব কি এত সোজা যে বিনা সাধনায় আসে, কিংবা থাকে? সেবা-ধর্ম কি যে-সে পালন করিতে পারে?

তথাপি নিরুৎসাহ করিতে ইচ্ছা হইল না। বলিলাম, "দেখ, মদন একটা কথা মনে হইতেছে। কিন্তু পারিবে কি? গ্রামে গিয়া স্বাস্থ্য-রক্ষার মূল গোটা কয়েক কথা, যেমন গৃহ, দেহ, জল, বায়ু, খাদ্যে শুচি, লোককে বুঝাইয়া দিতে পারিবে?"

মদন চিন্তা না করিয়াই বলিয়া উঠিল, "এ ত সোজা কাজ। এই রকম কিছু করিব মনে করিতেছিলাম।"

আমি॥ এই সোজা কাজটাই কর। পরে অন্য কাজ মনে হইবে।

তাহারা চলিয়া গেল। অবকাশ শেষ হইলে গ্রাম হইতে আসিল। কিছু করিতে পারিয়াছিল কি না, জানিতে আমারও আগ্রহ ছিল; কিন্তু মদন কিছু বলে না। এক দিন জিজ্ঞাসিলাম,

"কি, মদন, গ্রামে কি করিয়াছিলে?"

মদন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, কিছুই পারে নাই।

"কেন, কি ঘটিয়াছিল?"

মদন॥ আমরা বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু কেহ শুনিল না।

"বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইয়াছিলে না কি? কেহ শুনিল না, কি?"

মদন॥ প্রথমে দেখি, কি বলিব, কেমন করিয়া বলিব, খুঁজিয়া পাই না। ভাষা যদি জুটিল, কেমন করিয়া লোককে মানাইব, ভাবিয়া পাইলাম না।

আমি॥ শ্রোতা পাইয়াছিলে? কোথায় পাইয়াছিলে?

মদন॥ ভাগবত-ঘরে।

(বঙ্গীয় পাঠক ভাগবত-ঘর বুঝিতে পারিবেন না। ওড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে একটা করিয়া ভাগবত-ঘর আছে। সন্ধ্যার পর এই ঘরে ওড়িয়া ভাগবত প্রত্যহ পাঠ হয়, লোকে শোনে, বহু পদ আপামর সাধারণের কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত ওড়িয়া ছন্দে অনুবাদ করিয়া জগন্নাথ-দাস এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ভাগবত-ঘর সাধারণের। এখানে ভাগবত-পাঠ ব্যতীত অপর কাজও হয়। গ্রাম্য কলহের বিচার হয়, কোন পণ্ডিত শাস্ত্রচর্চা করিতে আসিলে ভাগবত-ঘরে স্থান হয়, বি-গ্রামী অভ্যাগত বাসা পান। পশ্চিমবঙ্গে অনেক গ্রামে এইরূপ সাধারণের শিব তলা আছে।)

আমি॥ কেন শুনিল না, বলিতে পার? পাদ্রী সাজ নাই ত?

মদন একটু হাসিয়া বলিল, "লোকে আমাদিগকে প্রায় তাহাই মনে করিয়াছিল।"

অথচ মদন তাহাদের গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। এক সাধনার অভাবে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

আর একবার কয়েক যুবা গ্রামে "নৈশ-বিদ্যালয়" বসাইতে গিয়াছিল। কিন্তু বুঝিয়াছিলাম, "পাঠ পড়ানা"ও তাহাদের কর্ম নয়।

চিন্তামণি॥ গ্রামে অনেক দুঃখী দরিদ্র আছে। তাহারা সবাই মূর্খ। ইহাদের জন্য একটা night school করিতে চাই।

আমি॥ বেশ ত; কিন্তু ইহারা পাঠশালা চায় কি?

চিন্তামণি॥ দু-এক জনের সঙ্গে কথা কহিয়া বুঝিয়াছি, লেখা-পড়া জানে না বলিয়া দুঃখ করে।

আমি॥ দুঃখ করুক; শিখিতে চায় কি? তাহারা কি কাজ করিয়া খায়?

চিন্তামণি॥ নানা কাজ করে। অধিকাংশ চাষ-বাস করে। ইহারা schoolএ না আসুক, ইহাদের ছেলেরা আসিবে। দিনের বেলা পারিবে না, সন্ধ্যার পর আসিতে পারিবে।

আমি॥ আমার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। কি শিখাইবে, কে শিখাইবে?

চিন্তামণি॥ পাঠশালায় যাহা শেখানা হয়। প্রথম প্রথম আমরাই শিখাইব।

বলা বাহুল্য, night school বা "নৈশ-বিদ্যালয়" নামের কিছু মহিমা নাই। ইংরেজী তর্জমায় যাহার উৎপত্তি, তাহার পরিণতিও তর্জমায়। গ্রামে পাঠশালা চলিতে পারে, চলিতেছে। সেই পাঠশালাই "নৈশ-বিদ্যালয়" নামে চালাইতে গেলে নূতন কিছু চাই, যেটা "দৈন" পাঠশালায় নাই। দিবা-রাত্রির প্রভেদে লেখা-পড়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মে না। কার্মিক (labourer) ও কারু (artisan)-দিগের নিমিত্ত "নৈশ" বিদ্যালয়ের উৎপত্তি। তাহারা দিন আনে, দিন খায়। আট-দশ বছরের ছেলেরাও দুই চারি পয়সার কাজ করে। দরিদ্রের পক্ষে এই পয়সা কম নয়। ইহারা ক খ লিখিতে ও পড়িতে শিখিলে কি উপকার পাইবে?

যাহার ফল সত্ব লব্ধ পাওয়া যায় না, পয়সায় পাওয়া যায় না, তাহা ইহাদের লোভনীয় হইতে পারে না।

আমাদের দেশে এখানে ওখানে অনেক কারু-শালা (Industrial school) আছে। বিশ বাইশ বৎসর হইবে, এই সব কারু-শালার গতিক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, কোনটা দ্বারা আশানুরূপ ফল হইতেছে না, শিক্ষার্থী জোটে না। কারুর ছেলে ঘরে যাহা দেখে, শেখে, তাহা শিখিবার তরে অন্য শালায় যাইবে কেন? ঘরে কেবল শেখে না, দুই চারি পয়সাও আনে। যাহা শেখে না, শিখিতে পায় না, অথচ শিখিতে পারিলে বেতন বাড়ে, এমন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া এখানে কটকের 'ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড'-কে একটা কারু-শালা বসাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহাঁরা মাসিক ৫০৲ টাকা ব্যয় করিতে স্বীকৃতও হইয়াছিলেন। কিন্তু কটকের মতন নগরে, যেখানে ৫০ হাজার লোকের বাস, এবং যেখানে নানাবিধ কারু-কর্ম দ্বারা লোকের জীবিকা সংগ্রহ হয়, সেখানে ৫০৲ টাকায় কুলাইত না। আমি মাসিক ১৫০৲ টাকা চাহিয়াছিলাম। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি, টাকা পাইলেও বেশী দিন চালাইতে পারা যাইত না। চিন্তার কথা এই, যে কারিকরের হাত ভাল, দক্ষতা আছে, সে শিখাইতে জানে না, যে তত্বটা জানে সে হাত করাইতে জানে না। যোগ্য যন্ত্রের অভাবে অনেক কাজ হয় না। যদি বা হয়, অনেক সময় ও অনেক ধৈর্য লাগে। কারু-শালায় শিক্ষার্থী যন্ত্র পাইত বটে, কিন্তু ঘরে গিয়া পাইত না, কিনিবার পয়সা নাই। কারুর বাড়ীর দূরে এই শিক্ষাশালা করিলেও চলিত না। দূরে আকর্ষণ কমে, যাইতে আসিতে সময় লাগে। তা ছাড়া, আরও একটা কঠিন সমস্যায় পড়িতে হইত। দুই চারি বৎসর অন্তর কলা পরিবর্তন করিতে হইত। দুই চারি বৎসর কামার, দুই চারি বৎসর কুমার, দুই চারি বৎসর ছুতার, দুই চারি বৎসর সেকরা, দুই চারি বৎসর তাঁতী ইত্যাদি নানা কারুর নিমিত্ত শিক্ষা-শালা করিতে হইত, প্রত্যেকের পাড়ায় গিয়া করিতে হইত। অথবা একই শিক্ষা-শালায় এইরূপ নানাবিধ কলা শিখাইতে হইত। এই শেষোক্ত রীতি স্থির করিয়াছিলাম, সকল কলার গোড়া কিছু কিছু শিখাইবার কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু বরাবর শিক্ষার্থী পাইতাম কি না, সন্দেহ। কেন আসিবে? যে দিন আনে দিন খায়, তাহার দিনের কাজ দুই ঘণ্টাও ছাড়িবার জো আছে কি? রাত্রে কলা শেখানা চলে না; গান-বাজনা যাহাতে কানে শেখা, তাহা অবশ্য চলে। "পাঠ-পড়ানা"ও ভাল চলে না, চোখের প্রতি নির্মম না হইলে চলে না।

এ বিষয়ের একটা কথা পাড়ি। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র বঙ্গদেশেও অপরিচিত ছিলেন না। ধীর স্বভাব ও ঔদার্য প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণহেতু তিনি প্রজা-রঞ্জক ছিলেন। তাহাঁর অকাল-মৃত্যুর (বোধ হয়) চারি-পাঁচ বৎসর পূর্বে তিনি নিজের রাজ্যের তাঁতীর ছেলেদের শিক্ষার নিমিত্ত একটি তাঁতীশালা করিয়াছিলেন। বাল্যে তিনি আমাদের কলেজের ছাত্র ছিলেন। কি কারণে জানি না, তাঁতী-শালা প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমার নিকট হইতে একটা শিক্ষা-পত্র (syllabus) লইবার অভিপ্রায়ে তাহাঁর তৎকালীন রহস্য-সচিবকে (Private Secretary) এখানে কটকে পাঠাইয়া দেন। এই সচিবও এক সময়ে আমার ছাত্র ছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের সহাধ্যায়ী ছিলেন। বলা বাহুল্য, মহারাজার অভিপ্রায় শুনিয়া,—শিক্ষা-পত্র আমার নিকট লইবার ইচ্ছা শুনিয়া—অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াছিলাম। কারণ তাঁতী-শালা কিংবা কাপড়-বোনা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান কিছুই ছিল না বলিলে হয়। আমি কি শিক্ষা চাই, তাহাও কখনও চিন্তা করি নাই। রহস্য-সচিবকে ফিরিয়া যাইতে বলিলাম। তাহাঁকে শ্রীরামপুরে কিংবা কলিকাতায় গিয়া দেখিয়া বুঝিয়া শিক্ষা-পত্র লিখিয়া আনিতে পুনঃ-পুনঃ বলিলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না, সপ্তাহ কাল প্রত্যহ আমার কাছে প্রায় 'ধরনা' দিয়া বসিতে লাগিলেন। আমি একটু বিপন্ন বোধ করিলাম। গত্যন্তর না দেখিয়া এক সারাদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া তিন বৎসরের শিক্ষা-পত্র লিখিয়া দিলাম। সচিব চলিয়া গেলেন।

আমার আপত্তির আরও কারণ ছিল। আমার বিশ্বাস শিক্ষা-পত্র দ্বারা বড় কিছু হয় না, যিনি কাজ করিবেন তিনিই, মানুষটিই, কাজের আদি-অন্ত-মধ্য, এবং যাবতীয় শিক্ষা-শালার প্রাণ। শিক্ষা-পত্র দ্বারা মাত্র যৎসামান্য দিগ্‌দর্শন হয়। যিনি কর্ম-নির্বাহক, তাহাঁর মনে শিক্ষার মন্দিরটি প্রতি-বিম্বিত না হইলে কর্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে

পারেন না। আমার আশঙ্কাও ছিল, আমার ব্যবস্থার দোষে মহারাজার প্রয়াস বিফল না হয়।

সচিব চলিয়া গেলেন। দুই এক দিন পরে কথাটা ভুলিয়া গেলাম। ইহার পাঁচ ছয় মাস পরে কি এক কারণে মহারাজা কটকে আসিয়াছিলেন। দেখা হইল। প্রথম আলাপেই বলিলেন, "আপনি তাঁতী-শালার (weaving school) শিক্ষা-পত্র দিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই আপনার সময়…।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "রাজা (তিনি 'মহারাজা' হইলেও তাঁহাকে 'রাজা' নামেই সম্বোধন করিতাম), আমার একটু সময় গেলে যদি আপনার উদ্দেশ্য সফল হয়, সে ত পরম ভাগ্য। তাঁতী-শালা কেমন চলিতেছে ?"

মহারাজা॥ আপনি তিন বছরের—

আমি॥ অন্যে নিশ্চয়ই তিন মাসের শিক্ষার কথা বলিয়া থাকিবে।

মহারাজা॥ তিন মাস নয়, ছয় মাস। আমি কলিকাতার weaving school হইতেও শিক্ষা-পত্র আনাইয়াছিলাম। তাহাতে ছয় মাসেই শেখা শেষ হয়।

আমি॥ এই কারণেই আমি শিক্ষা-পত্র লিখিতে চাই নাই। আপনার সচিবের মুখে শুনিয়া থাকিবেন।

মহারাজা॥ হাঁ। কিন্তু তাঁতীর ছেলেরা তিন বছর দিতে পারিত কি ?

আমি॥ রাজা, আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি আপনার তাঁতী-প্রজাকে মানুষ ও তাঁতী দুই-ই করিতে চাহিবেন। আপনিও কেবল তাঁতী করিতে চাহিলে ছয় মাস কেন তিন মাসেই করিতে পারেন। তাঁত-বোনাতে এমন কিছু নাই, যাহা শিখিতে তাঁতীর ছেলের তিন মাসের বেশী লাগে।

মহারাজা কথাটা বুঝিলেন, একটু লজ্জিত হইলেন। পরে কথাবার্তা হইবে বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। যেখানে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেখানে এসব কথার সুযোগ ছিল না। পরেও হয় নাই। কিন্তু শুনিয়াছিলাম দুই এক বৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার তাঁতী-শালা শূন্য পড়িয়াছিল। আমার অদ্যাপি বিশ্বাস, মানুষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁতী করিলে, বরং তাঁতী করিবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ করিলে, তাঁতী-শালা টিকিত।

কয়েক বৎসর হইল এখানে একটা সরকারী তাঁতী-শালা স্থাপিত হইয়াছে। ছেলে, যুবা, বুড়া, নূতন নূতন তাঁতে নূতন নূতন ধরণের কাপড় বোনা শিখিতেছে। প্রথমে দেখিয়া খুব আশ্চর্য হইয়াছিলাম। এমন কি মন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহার টানে দূর গ্রাম হইতে তাঁতীরা আসিয়া পড়িয়াছে ? পরে শুনিলাম, প্রত্যেকে মাসিক ৬৲ টাকা বৃত্তি পায়, ৬ মাস শিখিবার পর একটা করিয়া ঠক্-ঠকী তাঁত পুরস্কার পায়। এইরূপ উৎকোচের ব্যবস্থা শুনিয়াও সব রহস্য বুঝিতে পারিলাম না। ছয় মাসে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। শিক্ষকের মুখে শুনিলাম, একজন ৬ মাস শিক্ষা শেষ করিয়া আরও ৬ মাস থাকিতে চায়। শুনিয়া মনে হইল, সে হয় ত ৬ মাসে ভাল শিখিতে পারে নাই, কিংবা আরও কিছু অধিক শিখিয়া যাইতে চায়। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম। যাহা জানিলাম তাহাতে রহস্য-ভেদ হইল। মাসিক বৃত্তিই আকর্ষণ করিতেছিল। বাড়ী ফিরিলে ৬৲ টাকা পাইবে না!

সব স্থলে টাকার টান প্রবল নহে। মানের টানও কম প্রবল হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দি-ই। এই কটকে এক সেকরা আছে, সৎ, কর্ম্ম-ক্ষম, ধনাঢ্য। এত ধনাঢ্য যে দুই একজন উকীলকে কিনিতে পারে। কিন্তু কোথাও বসিতে আসন পায় না; কারণ ইংরেজী জানে না, জামা পরে না। বড় ছেলে ইংরেজী পড়িয়া এক সরকারী আপিশে কেরাণীগিরি করিত। মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে কিন্তু তাহার কুলাইত না। বাপকে খরচ যোগাইতে হইত। আমি শুনিয়া হাসিয়া বলিলাম, "তোমার বয়স হইয়াছে, ছেলেও মানুষ হইয়াছে। এখন তোমার ছেলে তোমাকে বসাইয়া খাওয়াইবে। তাহার বাবুগিরির টাকা তুমি যোগাইবে, এ কেমন কথা ?"

"তাহাকে যে দশজনের সঙ্গে মিশিতে হয়।" ভিতরের কথা, ছেলে বসিতে আসন পায়, লোকে তাহাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করে। সেই ইংরেজী-জানা ছেলে আপিশের কর্ম্মে মকদ্দমায় পড়িয়াছিল, বাপ আট-দশ হাজার খরচ করিয়া ছেলেকে উদ্ধার করিয়াছিল। বাৎসল্য অবশ্য ছিল; কিন্তু যে মান তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই, সে মান ছেলে পাইয়াছে। তাহার নাতিও ইংরেজী শিখিয়াছে।

ইহার অন্ন-চিন্তা ছিল না। সে চিন্তা প্রবল, অথচ লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, এমন ঘটনাও একেবারে বিরল নহে।

একটার উল্লেখ করি। এটি বঙ্গদেশে দেখিয়াছি। অরুণ ছেলে-বেলায় গ্রামের পাঠশালায় কিছু লেখা-পড়া শিখিয়াছিল। পরে গ্রামের এক কার্মিক ও কৃষক হয়। অভ্যাসের অভাবে লিখিতে কষ্ট বোধ করিত, অক্ষরগুলা 'কাগের ছা বগের ছা' হইত, কিন্তু পড়িতে ভোলে নাই। 'দাতা-কর্ণ' যে কতবার পড়িয়াছিল, সে ও তাহার 'দাতা-কর্ণ'ই জানে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাহার বয়স ৪০।৪২ বৎসর হইবে। হরি-ভক্ত, বৈষ্ণব। শুনিয়াছি, কখনও কোনও ভিক্ষুক বৈষ্ণব তাহার দ্বার হইতে বিমুখ হইয়া ফেরে নাই। (গ্রামে বৈষ্ণব ব্যতীত ভিক্ষা-জীবী নাই।) প্রথম প্রথম অরুণ সন্ধ্যার পর রামায়ণ পড়িত, এক এক দিন হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিত, পাড়ার যুবা ও বৃদ্ধেরা আসিয়া শুনিত। ইহারাও কৃষক। ক্রমে ক্রমে সেই সব যুবা—১৪।১৫ হইতে ২৩।২৪ বছরের—ক খ লিখিতে আরম্ভ করিল, অরুণের দলুজে একটি ছোট "নৈশ-পাঠশালা" বসাইল। অরুণকে জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়াছিলাম, লেখা-পড়া শিখিবার আকাঙ্ক্ষা প্রথমে কাহারও ছিল না, পরে জন্মিয়াছে। নিজে নিজে রামায়ণ পড়িতে পারিবে, দরকার হইলে নাম সহি করিতে পারিবে—এ সব কম গৌরব নয়। আকাঙ্ক্ষা জন্মাইতে পারিলে পরে কাজ সোজা। কিন্তু গোড়াই যে শক্ত। আইনের জোরে জেলখানার ভয় দেখাইয়া গোড়া-পত্তন হইতে পারে; কিন্তু ডাক্তারের ছুরীতে রোগীর আর্তনাদ না শুনিয়াও ফোড়া সারাইবার উপায় নাই কি? কোনও স্বাভাবিক উপায় নাই কি?

কথাটা অনেকদিন হইতে মনে জাগিতেছে। অল্পে অল্পে উঠিয়াছে, অল্পে অল্পে দাঁড়াইয়াছে। অনেক সময় কলেজের ছাত্রদের সহিত কথাবার্তা করিয়া থাকি। ইহাদের নবীন চিত্তে এমন নবীন নবীন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, যাহা প্রৌঢ়জনের পরিণত মনে স্থান পায় না। কয়েকটা একত্র করিতেছি। কথোপকথন-ক্রমেই বলি।

দশ-বার বৎসর, কি আরও অধিক হইবে, একদিন সন্ধ্যা-বেলা কটকের কাঠজুড়ী নদীর তীরে কলেজের কয়েকজন ছাত্র ঘোর তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল। আমি বেড়াইতে বেড়াইতে সেখানে গিয়া পড়িলাম, ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিলাম।

একজন বলিল, "আমরা একটা অসম্ভব কল্পনা করিতেছিলাম। কিন্তু এখন আর কল্পনা নহে, হাতা-হাতির উপক্রম হইয়াছে।"

আমি॥ কি সেটা?

প্রমথ॥ আমি বলিতেছিলাম, যদি কৈলাস হইতে কুবের নামিয়া আসিয়া বলেন, তোমাদের টাকার চিন্তা নাই, যত লাগে আমি দিব, কিন্তু টাকা পাইলে কি করিবে ঠিক কর। কথাটা গোড়ায় এই।

আমি॥ বেশ ত। তোমরা কি ঠিক করিয়াছ?

প্রমথ। বিপিন বলে, টাকা পাইলে আগে মেলেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি মোটা মোটা যমদূতকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিত। গোপাল বলে, টাকা পাইলে সে Technical school খুলিত। মহেশ্বর বলে, Technical school, সে ত খুব বড় কথা। দেশটা কৃষির; কৃষির উন্নতির জন্য টাকা পাইলে কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন করিত। সতীশ বলে, আগে গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা হউক, পেটে বিদ্যা পড়িলে আর সব আপনা-আপনি আসিবে।

আমি॥ সিদ্ধেশ্বর, তুমি কি করিতে? গণেশানন্দ, তোমার মত কি?

প্রমথ॥ সিদ্ধেশ্বরের টাকা-কড়ীর দরকার নাই। সে বলে অধার্মিক দেশে কিছুই হইবে না। বিদ্যা ঢুকিলে বরং হিতে বিপরীত হইবে। সে অবতারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে। গণেশানন্দ বলে, দেশের লোকের উদ্‌যোগ নাই, যোগ্যতা নাই। দুটা পাঠশালা করিলে বেশী কি হবে? কত বি-এ, এম-এ আছেন, কত রাজা মহারাজা আছেন; কই কোথায় কি করিয়াছেন?

আমি॥ ইহাতে তর্কের কি আছে। সবাই সব কাজ করিলেই ত গোল মিটিয়া যায়।

প্রমথ॥ কুবের যে একটী কাজের জন্য টাকা দিবেন! সব কাজের জন্য টাকা দিলে ত সবাই ইচ্ছামত খরচ করিতে পারিত।

আমি॥ এমন কথা? কুবেরের হাত ঝাড়িলে পর্বত; বর একটি কেন, অনেক চাও না। দেশের কিছু হউক না হউক, তোমাদের উপস্থিত বিবাদটা ভাঙ্গিয়া যায়। যখন একটী বই অধিক বর পাইবার আশা নাই, তখন তোমরা কে কি বর চাহিবে, এবং টাকা পাইলে কি রকমে খরচ করিবে, তাহা বেশ ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক কর। দুই তিন

দিন পরে শোনা যাইবে; ইতিমধ্যে ভাল করিয়া অভিপ্রায়টা আঁট।

ইহার দুই তিন দিন পরে সকলের সঙ্গে আবার দেখা হইল। এবার সহাস্যে তর্ক নহে, কথাটা পড়িবামাত্র সকলে একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল। বুঝিলাম, তাহারা প্রশ্নটার গুরুত্ব অনুভব করিয়াছে। বলিলাম, "যদি আমাকে বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকের সহিত বাদানুবাদ করিতে হইবে। প্রথমে, বিপিন, বল, তুমি টাকা পাইলে কেমন করিয়া মোটা মোটা যমদূতকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে। আরও বল, আর সব বর না চাহিয়া কেন এই বর চাহিবে।"

বিপিন॥ লোক লইয়াই ত দেশ; যদি রোগে লোক উৎসন্ন হইল, তাহা হইলে বিদ্যা শিখিবে কে, ধন মান উপার্জ্জন করিবে কে? মাটি যেমন, তেমন পড়িয়া থাকিবে। আগে লোকে বাঁচুক, তার পর অন্য চিন্তা। না বাঁচিলে, কার তরে চিন্তা?

আমি॥ কথাটা সত্য। গাছটা বাঁচিলে ফল ফুল ধরিবে। কিন্তু বাঁচাইবার উপায় কি?

বিপিন॥ গ্রামে গ্রামে, গ্রামে গ্রামে না হউক, প্রতি দশখানা গ্রামে কবিরাজ ও ডাক্তার নিযুক্ত করিব; ইহাঁরা বিনা বেতনে চিকিৎসা করিবেন, বিনা মূল্যে ঔষধ দিবেন। রোগ-গুলাকে একবার দেশ-ছাড়া করিতে পারিলে বীজ নষ্ট হইবে, পরে আর হইবে না।

সতীশ॥ তা হ'লে বল, আমরা অমর হইতে পারিব! সেকালে অমরত্ব বরের তরে এক একজন ব্রহ্মার কত তপস্যা করিয়াছিলেন। রোগে ধরিবে না, এই বর মাগিলেই অমর হইতে পারিতেন, ব্রহ্মাও সামান্য ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে বরটা দিয়া ফেলিতেন।

আমি॥ এটা ঠিক প্রতিবাদ হইল না। মৃত্যুর অনেক কারণ আছে। একটা কারণ রোগ। অপমৃত্যু ছাড়িয়া দিলে, জরাবশে যে মৃত্যু সেটাই স্বাভাবিক মৃত্যু। সে কথা থাক; কুবের কি চিরকাল ঔষধ ও চিকিৎসার তরে টাকা যোগাইবেন? মনে কর, দেশটা এক বছর কি দুই বছর মড়কশূন্য হইল। তার পর? এদেশে মেলেরিয়া কলেরা ছিল না। অন্ততঃ কলেরা ছিল না। কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়াছে, সে সংবাদ পাইলে উপকার হইত, আমরা কারণ-বিনাশে মনোযোগী হইতাম। কিন্তু কারণ যে অজ্ঞাত। পচা ডোবা-পুকুর, বন-জঙ্গল, জলনিকাশের নালা পরিষ্কার করিলে, বাহিরের কারণ দূর হইতে পারে। মেলেরিয়া-বাহন মশা ধ্বংস করিলেও সেই ফল। সেকালে ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ প্রভৃতি সজ্জিত শত্রু ছিল, লোকে যুদ্ধও করিত। কিন্তু বর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া করিত। মনে কর না, দেহ এমন হইল যে রোগ আক্রমণ করিতে পারিল না?

গোপাল॥ এই হেতু আমি Technical school খুলিতে বলি। লোকে ব্যবসা শিখুক, টাকা রোজগার করুক, ভাল খাইয়া পরিয়া, ভাল ঘর-বাড়ী করিয়া থাকুক। টাকা রোজগার করিতে শিখিলে সেই টাকায় আর সব হইতে পারিবে।

আমি॥ ইহাও ত মিথ্যা নয়। যার টাকা হউক, একবার পাইলে তাহা দিয়া আয়ের পথ খোলা যাইতে পারিত। কিন্তু বল ত, কি রকম ইস্কুল চাও; যে ইস্কুলে শিক্ষা পাইলে টাকা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়? টেক্‌নিকাল ইস্কুলে কি শেখানা হয়, কিংবা কি শিখাইতে চাও?

গোপাল॥ কল তৈয়ার করিবার ফিকির শিখিলে কল বসাইয়া নানা রকম জিনিষ করিয়া বেচিতে পারা যাইত। বাজারে যাই, বিলাতী জিনিষে ভরা, সব কলে তৈয়ারী। কাপড় মোজা গেঞ্জি হইতে জুতা ছাতা সাবান চিরনী, ছুঁচ সূতা দিয়াশলাই, ইস্তক যা কিছু দরকার, সব কলে হইতেছে। যদি এদেশে এসব তৈয়ার হইত, তাহা হইলে আমরাও বিদেশে চালান দিয়া টাকা আনিতে পারিতাম। বিদেশের টাকা আনিতে না পারিলেও দেশের টাকাতেই দেশ কাঁপিয়া উঠিত।

আমি॥ কিন্তু তুমি ত জান, যে ক্যারেকটার নাম করিলে সে সব বড় বড় ব্যবসায়। মনে কর, কল গড়িতে শিখিলে। তার পর? এখনও ত কল কিনিতে পাওয়া যায়। কই, তুমি যাহা চাও, তাহা হইতেছে কি? তোমার কুবের কল গড়িতে শেখার পর, কল বসাইয়া ব্যবসায় চালাইবারও কি টাকা দিবেন?

মহেশ্বর॥ শেষে হয় ত তাঁহাকে মজ্জ্য করিয়া দিতে হইবে! দেশে কি কাপড় বুনিবার তাঁতী নাই? এখন তাহারা তাঁত ছাড়িয়া হাল ধরিয়াছে। একটা কলের

তাঁত বসুক, অমনই এক-শ দু-শ তাঁতীর হাহাকার পড়িবে। কটক হইতে পুরী রেল বসিয়াছে; অন্ততঃ দু-শ গাড়োয়ানের অন্ন মারা গিয়াছে। কল কল করিও না; কলেই দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তেলের কল, ময়দার কল, যে কলই বসাও, একজন ধনী হইবে, অমনই আর শতজন 'কুলী' হইয়া পড়িবে। কুলি আর দাস এক নহে কি? গোপাল একটু "বাবু" কি না; তার চোখে জুতা ছাতা সাবান পড়িতেছে। এসব জিনিষ না হইলেও চলে। সেকালে এসব ছিল না। আমাদের যাহা যাহা আবশ্যক, সব দেশের লোকে করিত।

আমি ॥ তোমরা Technical school আর Industrial school এক মনে করিতেছ। গোপাল Technical school চায়। আচ্ছা, গোপাল, কত রকমের কয়টা ইস্কুল চাও? এই ধর, কাপড় বোনা। কলে সুতা কাটা, কাপড় বোনা ইত্যাদি শিখাইতে একটা ইস্কুল চাই। কাপড় ও সুতা রং করা শিখাইতে একটা চাই। পশমী সুতা কাটা, কাপড় বোনার একটা চাই। রেশমী সুতা ও কাপড়ের জন্য একটা চাই। এ সব ছাড়া ভেড়া ও গুটীপোকা ও তসর-পোকা পালিতে শিখাইবারও দুইটা চাই। আমাদের কাপড়ের তরেই পাঁচটা ইস্কুল ছাড়া অন্ততঃ পাঁচটা খুব বড় বড় কারখানাও চাই। এত বড় বড় যে, সেখানে যে যে কাজ হইবে তাহাতে কারখানার খরচ পোষাইয়া লাভ থাকিবে। অতএব এক এক কলা শিখাইবার এক এক কলালয় নহে, এক এক বৃহৎ ব্যবসায় থাকা চাই, নতুবা শেখা পূর্ণ হইবে না। এইরূপ, প্রত্যেক দ্রব্য করিতে চাই। ভাবিয়া দেখ, তুমি কতগুলা ইস্কুল ও কারখানা খুলিলে আমরা যত রকম জিনিষ কিনিয়া থাকি সব করিতে শিখিতে পারিব। ইস্কুল ছোট করিতে পার; কিন্তু প্রত্যেক কলা-সংক্রান্ত কারখানা বৃহৎ করিতেই হইবে, নচেৎ শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না, ব্যবসায়ে লাভালাভ বুঝিতে পারা যাইবে না। এত টাকা পাইবে ত?

গোপাল ॥ কুবেরের টাকার অভাব নাই। যত টাকা লাগুক, পাওয়া যাইবে।

আমি ॥ বারম্বার পাইবে কি? টাকা না কি একবার মাত্র পাইবে? ইস্কুল হইতে লভ্য পাইবে না; একবার সব জোগাড় যন্ত্র লইয়া ইস্কুল খুলিলেও মাসে মাসে প্রভূত ব্যয় হইবে। ছাত্রদের বেতন হইতে এই ব্যয় আদৌ কুলাইবে না। যদি বেতন ভরসা কর, তোমার দেশের ছাত্রেরা তত বেতন দিতে পারিবে না। ইস্কুল গেল। কারখানাগুলা ইস্কুলের সম্পত্তি করিবে, কি বাহিরের লোককে দিবে? ইস্কুলের করিলে ভাল হইবে না, দুই এক বছরের মধ্যেই সেগুলা সে-কেলে হইয়া পড়িবে। বাহিরের লোকের হাতে দিতেই হইবে। না দিলে কল-কারখানার উন্নতি হইবে না, লভ্য হইবে না।

গোপাল ॥ আমরা প্রথমে কুবেরের টাকায় কারখানাগুলা খুলিয়া পরে অন্য লোককে এই নিয়মে বিক্রি করিব যে আমাদের ইস্কুলের ছেলেরা সেখানে যখন ইচ্ছা তখন গিয়া দেখিতে শিখিতে পারিবে।

আমি ॥ ফিকিরটা মন্দ নয়। কিন্তু তোমার দেশের লোকের এত টাকা আছে কি যে সব কারখানা কিনিয়া লইতে পারিবে? মনে কর, এক 'তাতা'র লোহা করার কারখানা কিনিবার লোক পাইবে কি? অতএব নামমাত্র মূল্যে বেচিতে হইবে। বোধ হয় অধিকাংশই দান করিতে হইবে।

গোপাল ॥ আমাদের ইস্কুলের ছাত্রেরা তখন এক এক কারখানার কর্ত্তা হইতে পারিবে।

আমি ॥ কর্ত্তা হইতে পারিবে; কিন্তু কারখানার স্বামী করিতে হইলে মূল-ধনও দিতে হইবে।

মহেশ্বর ॥ এই জন্যই ত বলি, যাহার শেষ কুলাইতে পারিবে না, তাহাতে হাত দিও না।

গণেশানন্দ ॥ এই দেখ না, ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে কতজন কত কলা শিখিয়া আসিলেন; উদ্‌যোগ নাই, বিদ্যাটা মাথাতেই রহিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বর। যাহাই কর, ধর্ম্মজ্ঞান না জন্মিলে কারখানায় টাকার লুঠ হইবে। লুঠ না হইলেও কতকগুলা অযোগ্য জুটিয়া ব্যবসায়ের সর্ব্বস্বান্ত ঘটাইবে।

গোপাল ॥ অযোগ্য কোথায়? ইস্কুলে সকলকে যে যোগ্য করিয়া তুলিবে?. এখন ইস্কুল নাই বলিয়াই ত অযোগ্যকে কাজ করিতে হইতেছে।

সিদ্ধেশ্বর ॥ ইস্কুলের সে যোগ্যতা থাকিলে যে দেশে ইস্কুল আছে, সে দেশে অযোগ্য লোক থাকিত না। ইংলণ্ড ধর; জর্ম্মাণীর যোগ্যতার কাছে পরাজিত।

আমি॥ এত বাদানুবাদ এখন থাক। গোপাল যা চায়, তাহাতে বুঝিতেছি তাহার উদ্দেশ্য কল ও কারখানা নয়, উদ্দেশ্যটা টাকা উপার্জন। এখন, মহেশ্বর, বল, তুমি কৃষি-বিদ্যালয় কেন চাও। সে বিদ্যালয়ে কি শিখাইবে, কে শিখাইবে?

মহেশ্বর॥ আমি বলি দেশটা কৃষির। ভারতবর্ষে শত-জনের মধ্যে ৭১ জনের জীবিকা কৃষি হইতে। ১২ জন কলা দ্বারা, ৫ জন ব্যাপার দ্বারা, আর ২ জন বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করিতেছে। আগে ৭১ জনের হিত দেখা কর্ত্তব্য। অন্য দেশে কৃষিকর্ম দ্বারা জমিতে সোনা ফলাইতেছে, আর আমাদের হা-অন্ন ঘুচিতেছে না। বিঘায় ৯।১০ মণ ধানের বদলে ২০ মণ ৩০ মণ ধান জন্মাইতে পারিলে হাহাকার শুনিতে হইত না। পেটে ভাত নাই, কোমরে কাপড় নাই! আগে ভাত কাপড় দিয়া বাঁচাই, তার পর কল-কারখানায় জুতা ছাতা মোজার চিন্তা করা যাইবে। ভাল কাপাস জন্মাও, তাঁতীরা কাপড় বুনুক। ধনের আদি মাটি। মাটিকে সোনা করিতে জানিলে টাকার চিন্তা থাকিবে না।

আমি॥ তা ত থাকিবে না। কিন্তু কে জানিবে, কারা জানাইবে?

মহেশ্বর॥ আমরা কৃষককে শিখাইব। দেখাইব কেমন করিয়া বিলাতে ও আমেরিকায় বিঘায় কত টাকার ফশল হইতেছে। কৃষি-বিদ্যালয় খুলিব, কৃষি ক্ষেত্র করিব, দেশের কৃষক দেখিবে, শিখিবে।

গোপাল॥ সেটা আকাশকুসুম। কেবল কৃষির ভরসা করিয়াই ত দেশ নির্ধন হইতেছে। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। এমন বছর যায় না, যে বছর কোথাও না কোথাও অজন্মা হইতেছে না। তা ছাড়া, বিলাতের অনুকরণ কৃষিতে চলিবে না, বরং কল-কারখানায় চলিবে।

মহেশ্বর॥ দেশটাকে কি বিলাত করিতে চাও? ব্যবসায়ী হইয়া বিলাত সুখে আছে কি? গোপালের বাড়ী শহরে কি না; সে গ্রামের শান্তি ও স্বাস্থ্য কি বুঝিবে। চাষের ধান কলাই, ঘরের দুধ, পুকুরের মাছ, চেষ্টা করিলেই অপর্য্যাপ্ত পাইতে পারি; স্বাধীনভাবে সুস্থচিত্তে জীবন-যাপন না করিয়া কোথায় পরের চাকরি, কলের কুলী খালি খুঁজিতে যাইব কেন!

বিপিন॥ জানি না তোমাদের গ্রাম ম্যালেরিয়ার গ্রাসে পড়িয়াছে কি না। যদি আমাদের গ্রাম দেখিতে, তাহা হইলে গ্রাম ছাড়িয়া শহরে গিয়া পড়িতে। আগে প্রাণ, তার পর ধন। গ্রামে জমি আছে, এই মাত্র। তাও বন-জঙ্গলে ভরিয়া আছে। যে মানুষগুলা আছে, তারা বাঁচিয়া আছে কি না, সন্দেহ। ফলে, বঙ্গদেশে এমন জেলা আছে যেখানে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী। সব জেলা ধরিলেও মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম অল্প অধিক। অন্য দেশে হাজারে বার্ষিক বৃদ্ধি ১১।১২।১৩; অন্ততঃ ৭।৮। আমাদের বঙ্গদেশে ৩।৪ এর অধিক হইবে না। অন্যদেশে বিবাহ করে না বলিয়া লোক-বৃদ্ধি তেমন হয় না; আমাদের দেশে বিবাহ করিয়াও কম।

গোপাল॥ ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে। কারণ অন্যদেশের মতন বৃদ্ধি হইলে হাহাকারই বাড়িত। গ্রেট-ব্রিটেন অপেক্ষা বঙ্গদেশ কিছু ছোট, কিন্তু ১০লক্ষ লোক অধিক। বঙ্গদেশটি সবাই ভাগাভাগি করিয়া লইলে জন-প্রতি ৩ বিঘা মাটি পড়িত। কিন্তু দক্ষিণে সুন্দরবন, পশ্চিমে ও উত্তরে পাথর কাঁকর মাটি। জনপ্রতি চাষের জমি ২ বিঘা পড়ে কি না, সন্দেহ। মাটি যত উর্বরা হউক, ধান কত ফলিবে? ইয়ুরোপে প্রতি জনের ৮ বিঘা জমিতেও সংসারযাত্রা চলে না।

আমি॥ বোঝা গেল, কেবল চাষের ভরসা করিলে চলিবে না। সতীশ, তুমি এখন বল, গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠশালা করিয়া অন্নবস্ত্রের অভাব ও রোগের জ্বালা কমাইতে পারিবে কি না।

সতীশ॥ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পেটে বিদ্যা পড়িলে সব হইবে। কি দুঃখের কথা, বঙ্গদেশে প্রতি ১৩ জনে ১জন মাত্র লিখিতে ও পড়িতে জানে! অথচ ভারতবর্ষ মধ্যে বঙ্গদেশই লেখা-পড়ায় বড়। শত জনের মধ্যে ৯২।৯৩ জন লিখিতে পড়িতে জানে না! ইহা অপেক্ষা কষ্টের কথা কি আছে?

গোপাল॥ ব্রহ্মদেশে শতকরা ৩১ জন লিখিতে পড়িতে জানে। সে দেশ উন্নত বলিতে চাও কি? পাঠশালা কেন, গাঁয়ে গাঁয়ে ইস্কুল খোল, কলেজ খোল, চাকরি না পাইয়া লোকে চোর-ডাকাইত হইবে। পেট-চলা চাই ত? লিখিতে পড়িতে জানিলেই টাকা আসিবে না। দেশটা বিদ্বানে ভরিয়া গেলে এখন যাহা খাইতেছে পরিতেছে, তাহাও

জুটিবে না। টাকা নইলে রোগ-শোক কমিবে না, কৃষির উন্নতি হইবে না, বিদ্যা-দানও চলিবে না।

আমি॥ যদি তা না চলে, সিদ্ধেশ্বর বল, তুমি ধর্ম-জ্ঞানের দ্বারা কি করিয়া চলাইবে?

সিদ্ধেশ্বর॥ আমি টাকা কড়ী চাই না, কুবেরের কি কাহারও নিকট বর প্রার্থনা করি না। যদি দেশে ধর্ম থাকিত, তাহা হইলে সবই থাকিত।

গোপাল॥ এক কথায় উত্তর দিলে চলিবে না। তোমার ধর্ম কি লোকগুলার উদরজ্বালা নিবারণ করিবে?

বিপিন॥ রোগ তাড়াইয়া দিবে?

মহেশ্বর॥ চাষের উন্নতি করিবে?

সিদ্ধেশ্বর॥ নিশ্চয় করিবে। ধর্মের দুয়ার ধর; দেখিবে কোন কিছুর অভাব নাই। দেশে কি কবিরাজ-ডাক্তার নাই, কৃষক নাই, কারু ও শিল্পী নাই, শিক্ষক নাই? সবাই আছে, কিন্তু নামে মাত্র। ভগবানের কৃপা হইলেই এই কবিরাজ এই ডাক্তার যিনি এখন কেবল টাকা চিনেন, তিনিই বিনা বেতনে লোকের দ্বারে দ্বারে চিকিৎসা করিয়া কৃতার্থ বোধ করিবেন; উকীল-মোক্তার এখন কৃষকের রক্ত জমাইয়া অট্টালিকা গাঁথিতেছেন, তখন তাঁহারাই কৃষককে বুঝাইয়া আদালতে আসিতে নিরস্ত করিবেন; ডেপুটী মুনসেফ প্রভৃতি হাকিম, এমন কি পুলিশ-দারোগাও দেশের দাস মনে করিবেন; মহাজন ও খাতক বন্ধু হইবেন; শিক্ষক এখনকার মতন বৈরাগী হইবেন না। এখন ইনি উনি তিনি, সবাই 'নেতা'; তখন দেখিবে এই নাম শুনিলে ইহাঁদের বুক দুর-দুর করিতেছে; যিনি ধার্মিক তিনি দাসানুদাস নামের অধিক জানিবেন না। আমরাই দেশের কাজ করিতেছি, রাজ্য চালাইতেছি। আমরাই জমিদার, আমরাই প্রজা; আমরাই কারু, আমরাই শিল্পী; আমরাই কৃষক, আমরাই ব্যাপারী; আমরাই ব্যবসায়ী, আমরাই বণিক্। আমরাই যে দেশ। টাকা টাকা করিতেছ; মানুষ না হইলে টাকায় কি হইবে? আর, মানুষ হইলে, টাকা আপনি আসিয়া জুটিবে।

এতক্ষণ প্রমথ একটী কথাও বলে নাই। এখন সিদ্ধেশ্বরের কথায় তাহার যেন তন্দ্রা ভাঙ্গিল। বড় বড় চোখ মেলিয়া সিদ্ধেশ্বরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বুঝিলাম কথাগুলা প্রমথর মর্মে লাগিয়াছে।

আমি॥ প্রমথ, তুমি কি ভাবিতেছ? সিদ্ধেশ্বর সত্য বলে নাই কি?

প্রমথ॥ আপনি কর্ম চারি ভাগ করেন, কর্ম, অ-কর্ম, কু-কর্ম, সু-কর্ম। সিদ্ধেশ্বর সু-কর্ম দেখিতে চায়। কিন্তু—।

আমি॥ "কিন্তু" কি?

প্রমথ॥ কিন্তু সু-কর্ম কয় জন ভাবে, কয় জন করে? প্রমথর কথা শেষ হইতে না হইতে সকলে সিদ্ধেশ্বরের প্রতি কটাক্ষ করিতে লাগিল যেন সে একটা অ-পদার্থ জীব-বিশেষ। একজন বলিল, "ধর্ম ধর্ম করিয়াই দেশটা অধঃপাতে গিয়াছে। এখন ধর্ম-টর্ম কমাইয়া practical হওয়া চাই।"

সিদ্ধেশ্বর॥ ধর্ম-ধর্ম করিলে ধর্মের মুখ তাকাইলে গজনীর মামুদ সোমনাথের মন্দির লুঠ করিতে পারিত না, আলেকজাণ্ডার পঞ্জাবে ঢুকিতে পারিত না। ক'টা দৃষ্টান্ত দিব। যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন তাহাকে ধর্মই রক্ষা করেন। এই পুরানা কথা নূতন করিয়া শোনাইতে এক অবতার চাই। তখন দেখিবে—

বিপিন॥ সত্যযুগ ফিরিয়া আসিয়াছে। হাজার বছর পরমায়ু হইয়াছে।

গোপাল॥ লোকে সোনার থালে ভাত খাইতেছে।

সিদ্ধেশ্বর॥ নিশ্চয়ই। তোমরা মনে করিতেছ সোনার থালে খাইয়া রূপার ডাবরে মুখ ধুইলে আমাদের ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। আমি মনে করি, কলা-পাতায় মোটা ভাত খাইয়াও লোকে পরম ঐশ্বর্য্যবান্ বোধ করিবে।

আমি॥ তোমাদের কথা কাটা-কাটি থাক। এখন গণেশানন্দকে জিজ্ঞাসা করি। তুমিও কি টাকা চাও না?

গণেশানন্দ॥ না। দান লইয়া কি করিব? এই যে দান চাহিতে হইতেছে, তাহাতেই তোমাদের অযোগ্যতার প্রমাণ হইতেছে। পরের ধনে নামে রাজা হইতে পার, কাজে নয়।

আমি॥ তোমার কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। পরের দান কেন; মনে কর না তোমার পিতৃ-পুরুষের ধন, মাটিতে কোথাও পোতা ছিল, কুবের পাহারা দিতেছিলেন। সে টাকা লইবে না?

গণেশানন্দ। যদি মাটিতে পোতা ছিল, এখনও থাক্। যে দিন মানুষ হইব, বরং সে দিন সে টাকায় কি করিতে

পারিব দেখিব। এখন পাইলে পরস্পর ঝগড়া মারা-মারি লাগিবে, টাকাও শূন্যে উড়িয়া যাইবে। এখন দেখিতেছি, যেখানে পাঁচজনের টাকা এক হাতে আসিয়াছে সেখানেই বঞ্চনা ও গরিমা, লোভ ও মোহ, ভয়ানক ব্যাপার জুটিয়াছে।

আমি॥ তুমিও কি যোগ্যতার জন্য অবতারের প্রতীক্ষায় থাকিবে? জলে না নামিয়া সাঁতার শিখিবে?

গণেশানন্দ॥ না; আমি অবতার মানি না। আমরাই এক এক অবতার, কিন্তু অন্ধ। কিন্তু কেমন করিয়া কবে চোখ পাইব, জানি না।

আমি॥ অর্থাৎ কালই চক্ষু দান করিবে, যোগ্য হইবে।

গোপাল॥ তোমার কাল-কে একটু অনুরোধ কর না, গোরুর গাড়ীতে না আসিয়া রেলে চড়িয়া আসেন।

গণেশানন্দ॥ তুমি রেলের বেগ কি দেখাইতেছ? কালের বেগের কাছে রেলের বেগ, না তোমার তাড়িতের বেগ?

প্রমথ॥ দেখিতেছি, আমাদের কপালে টাকাটা নাই। আমাদের সাত জনের সাত মত। তার মধ্যে দুজন উদাসীন।

আমি॥ প্রমথ, তোমার মত কি? টাকা পাইলে তুমি কি করিতে?

প্রমথ॥ কথাটা আমিই তুলিয়াছিলাম। কিন্তু জানি না, সত্য সত্য পাইলে কি করিতাম। আমাদের যে নানা অভাব; কোন্‌টা ছাড়ি, কোন্‌টা ধরি, বুঝিতে পারিতেছি না। তবে দেখিতেছি, দেশটি পৃথিবীর সঙ্গে জলে স্থলে জোড়া। পৃথিবীর লোক ছুটিতেছে, আমরা বেশ শুইয়া ছিলাম, আমাদিগকে ধীরে ধীরে না জাগাইয়া, ধীরে সুস্থে না হাঁটাইয়া, হড়্‌-হড়্‌ করিয়া টানিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া লইতে বসিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা।

গোপাল॥ তুমি হা-হা করিতে থাক। সেই প্রাচীনের রম্য উপবন যেখানে কাম-ধেনুতে দুধ দেয়, পাকা মিষ্ট ফল মুখে আসিয়া পড়ে, গাছের ছাল লজ্জা নিবারণ করে, সেই উপবনের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কাঁদিতে থাক।

গণেশানন্দ॥ সে সবই আছে, কেহই চুরি করে নাই।

সিদ্ধেশ্বর॥ নাই উপবনে ঋষি।

গণেশানন্দ॥ আমরাই ত ঋষি!

সিদ্ধেশ্বর॥ মন্ত্র ভুলিয়া গিয়াছ।

আমি॥ দেখ, তোমরা অন্য কথায় গিয়া পড়িতেছ। কিন্তু উত্তরটাও পাইয়াছ। কুবেরের দান লইয়া কথাটা উঠিয়াছে। কিন্তু কুবের যদি দান না করেন?

গণেশানন্দ॥ যাহারা দানের আশায় বসিয়া আছে, তাহারাই দুঃখিত হইবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এখন সভা-ভঙ্গ কর, রাত্রি হইয়াছে, পাঠ মুখস্থ করিবার সময় যাইতেছে। সাতকাণ্ড রামায়ণ একদিনে শেষ হইবে না।"

ধূলিমুষ্টিতে স্বর্ণমুষ্টি

[অধ্যাপক শ্রীজগদানন্দ রায়]

দেশে লোকসংখ্যা বাড়িলে নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। প্রথম সমস্যা খাদ্য লইয়া। দেশের জমিতে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা দেশের লোককে খাওয়াইতে পারে কি না, হিসাবী লোকেরা তাহা তখন খতাইয়া দেখিতে আরম্ভ করেন। যদি দেখা যায়, দেশের জমিতে উৎপন্ন শস্যে দেশের লোকদিগকে খাওয়ানো কঠিন, তখন অনুর্ব্বর পতিত জমিগুলিকে আবাদী জমিতে পরিণত করিবার চেষ্টা চলে। পতিত জমি না থাকিলে, বিদেশ হইতে খাদ্য আনিয়া স্বদেশের লোককে খাওয়াইতে হয়। ইহাতেও যদি অসুবিধা ঘটে, তখন বিদেশের কোন ভাল জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনের ধুম পড়িয়া যায়।

অন্নের সংস্থান হইলে মানুষ আরামের দিকে দৃষ্টি দেয়। এই প্রকারে সভ্যতার বিস্তারের সহিত আরাম-ভোগের ইচ্ছাটাও ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতির ন্যায় প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে, ক্ষুধার অন্ন ও আরামের উপকরণ পাশাপাশি সাজাইয়া না রাখিলে আধুনিক সভ্য মানুষ আনন্দ পায় না। কিন্তু ক্ষুধার অন্ন ও তৃষ্ণার জল যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে অনায়াসে পাওয়া যায়,

আরামের উপকরণ তেমন সহজে লাভ করা যায় না। মানুষ যে সকল কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলির পূরণের জন্য তাহাদিগকেই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। এই অভাব পূরণের জন্য প্রকৃতির নিকটে হাত পাতিলে, শূন্য হাতে ফিরিয়া আসিতে হয়। এই কারণে য়ুরোপ ও আমেরিকার বড়-বড় সহরের লক্ষ-লক্ষ লোকের বিলাস ও আরামের উপকরণ জোগাইবার জন্য আজ শত-শত কল-কারখানায় দিবারাত্রি কাজ চলিতেছে; এবং পৃথিবীর সর্ব্বাংশের বৈজ্ঞানিকগণ অল্প ব্যয়ে ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন।

বৈজ্ঞানিকদিগের এই চেষ্টা মানবজাতিকে কোন্ পথে চালাইবে, তাহা জানি না; কিন্তু ইহাতে জড়-বিজ্ঞানের যে একটা নূতন দিক খুলিয়া গিয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। যে সকল জিনিসকে পূর্ব্বে আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল বলিয়া লোকে দূরে ফেলিয়া দিত, তাহা দিয়া এখন একদল বৈজ্ঞানিক প্রতিদিনের ব্যবহার্য্য নানা সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। বিজ্ঞানের কৌশলে ভস্মমুষ্টি এখন স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত হইতেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে যে এমন একটা অসাধ্য-সাধন সম্ভব হইবে, তাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কেহ কল্পনা করিতে পারেন নাই।

বিস্কুট, সিগারেটের তামাক বা বিলাতী দুধ প্রভৃতি দ্রব্য যে সকল টিনে বোঝাই থাকে, খালি হইলেই সেগুলিকে আমরা হয় ত বাড়ীর ছেলেদের হাতে সমর্পণ করি। তাহাদের খেলার সুখ মিটিয়া গেলে, সেগুলি যেখানে-সেখানে পড়িয়া মাটি হয়। কিন্তু য়ুরোপের কোন গৃহস্থ অব্যবহার্য্য টিনের পাত্রকে এই প্রকারে নষ্ট হইতে দেয় না। ব্যবসায়ীরা সংগ্রহ করিয়া তাহা গালাইয়া নানাপ্রকার খেল্‌না প্রস্তুত করে। বিলাত হইতে যে সকল টিনের খেল্‌না এবং বোতাম আমাদের দেশে আম্‌দানি হয়, তাহার অধিকাংশই ভাঙা টিনে প্রস্তুত। জুতা ছিঁড়িলেই আমরা তাহা ফেলিয়া দিই; তাহার কতক অংশ উয়ে কাটিয়া শেষ করে, কতক হয় ত মাটি-চাপা পড়িয়া পচিয়া যায়। কিন্তু য়ুরোপ বা আমেরিকার কোন স্থানে এক টুক্‌রা চামড়াও এই প্রকারে নষ্ট হইতে পায় না। শিল্পীদের হাতে পড়িয়া ছেঁড়া চটির চামড়া নানা সৌখীন দ্রব্যে পরিণত হইয়া আমাদের বিলাসের উপকরণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। শিশি বা বোতল ভাঙিলে কাচের টুক্‌রাগুলিকে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া আমরা এ প্রকার ভাবে সমাহিত করি যে, কোন কালে সেগুলিকে ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু অপর দেশের গৃহস্থেরা কাচের টুক্‌রা ফেলিয়া দেয় না। সেখানকার একদল লোক দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া ভাঙা কাচ কিনিয়া লয়; এবং সেগুলিকে এক প্রকার মাটি ও বালির সহিত গালাইয়া সুন্দর কৃত্রিম পাথর প্রস্তুত করে। এই পাথরের টালি আজকাল অনেক স্থানে গৃহনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

বড়-বড় সহরে প্রতিদিনই অনেক কুকুর ভেড়া গোরু ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু মারা যায়। পোষা প্রাণীর মৃত্যু হইলে আমরা যেমন তাহাদের দেহ ভাগাড়ে ফেলিয়া দিই বা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলি, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপ ও আমেরিকায় এই প্রকারেই প্রাণীর মৃতদেহ নষ্ট করা হইত। কিন্তু এখন আর কেহ তাহা সে প্রকারে নষ্ট করে না। মৃত প্রাণীর হাড়, চামড়া, নাড়ী-ভুঁড়ি—সকলি নানা কাজে লাগিতেছে। যে সকল মসলা দিয়া দেশলাই প্রস্তুত করা হয়, ফস্‌ফরস্ তাহার প্রধান উপাদান। ইহা প্রাণীর হাড় হইতে বাহির করা হইতেছে। সহরের রাস্তায় যে সকল ছোট ইস্ক্রুপ্ বা পেরেক পড়িয়া থাকে এবং ঘোড়ার নালবাঁধা খুর হইতে কখন-কখনো যে একটু-আধটু লোহার টুক্‌রা খসিয়া পড়ে, সেগুলিও ফেলা যায় না। রাস্তা ঝাঁট দিবার সময়ে লোকে তাহা সংগ্রহ করে এবং পরে তাহারি সহিত কতকগুলি পদার্থ মিশাইয়া নানা প্রকার রঙ প্রস্তুত করে।

উননের কয়লা বা কাঠ সম্পূর্ণ পুড়িতে না পাইলে, ধোঁয়ার উৎপত্তি করে। কলের চুলোতে এই প্রকারে অবিরাম ধোঁয়া জন্মে। কয়লার এই অপব্যয় নিবারণ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, কিন্তু চুলোর আগুনকে একবারে নির্ধূম করিতে পারা যায় নাই। কাজেই যেখানে কল-কারখানা অধিক, সেখানে ধোঁয়া অধিক। লণ্ডন ও বার্মিংহাম্ প্রভৃতি সহরে কলের ধোঁয়া আকাশকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যে, সেখানে কখনো-কখনো

দিনে আলো না জ্বালিলে লেখাপড়ার কাজ চলে না। বৃথা ধোঁয়া উৎপন্ন করিয়া কয়লার যে অংশটা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা কাজে লাগাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করিতেছেন। কয়লার ধোঁয়া ধরিবার জন্য অল্প দিন হইল আমেরিকায় একপ্রকার যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে যে সকল কাজ হইতেছে, তাহা বড় অদ্ভুত। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক শত গাড়ী কাঠ হইতে যে ধোঁয়া বাহির হয়, তাহা ঐ যন্ত্রে পূরিলে সহজে দেড় শত মণ লাইম এসিটেট্ (Acetate of Lime) এবং প্রায় পনেরো সের আল্‌কাত্‌রা পাওয়া যায়। যে সকল উপাদানে সুরা (Alcohol) প্রস্তুত হয়, তাহার সকলগুলিই ধোঁয়াতে থাকে। পূর্ব্বোক্ত ধোঁয়া হইতে যদি সুরা প্রস্তুত করা যায়, তবে অন্ততঃ দুই শত গ্যালন্ স্পিরিট্ অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। তাপ ও আলোর জন্য এবং মোটরের জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই আজকাল স্পিরিটের প্রয়োজন। ধোঁয়া হইতে স্পিরিট-প্রস্তুতের উপায়টি কত লাভজনক হইবে, পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন।

আতর, গোলাপজল, ল্যাভেণ্ডার প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ফুল হইতেই সংগ্রহ করা হইতেছিল। ন্যাস্‌পাতি, আপেল এবং আঙ্গুর প্রভৃতি ফলের বেশ সুগন্ধ আছে; কিন্তু সেগুলি যখন পচিয়া যায়, তখন তাহা দুর্গন্ধময় হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় তাহা মানুষ বা পশু কাহারো ব্যবহারে লাগে না। য়ুরোপ ও আমেরিকার বড়-বড় দোকানের পচা ফল ময়লাফেলা গাড়ী বোঝাই করিয়া পূর্ব্বে সহরের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আজকাল এই সকল দুর্গন্ধ আবর্জ্জনা হইতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহাদের সুগন্ধ তাজা গোলাপের গন্ধকেও পরাজিত করে। বিলাতী এসেন্স এবং সাবান প্রভৃতি জিনিস প্রস্তুত করিতে ঐ গন্ধদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কয়লার গ্যাস প্রস্তুত করিতে গেলে গ্যাসের সঙ্গে-সঙ্গে অনেকটা আল্‌কাত্‌রা উৎপন্ন হইয়া পড়ে। এই আল্‌কাত্‌রা লইয়া কি কাজ করা যাইতে পারে, তাহা গ্যাস-ওয়ালারা ভাবিয়া পাইত না। আজকাল ঐ বিকট গন্ধযুক্ত পদার্থ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সুগন্ধি তৈল বাহির করা হইতেছে। এখন এক বিন্দু আল্‌কাত্‌রাও নষ্ট হইতে পারিতেছে না।

যে আকরিক দ্রব্য হইতে লৌহ প্রস্তুত হয়, তাহা প্রায় সকল দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। যে সকল দেশে ঐ পদার্থটি অধিক পরিমাণে আছে, সেখানে অনেক লৌহ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। খনিজ লৌহ খাঁটি লৌহ নয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় গালাইয়া লোহাকে খাঁটি করিয়া লইতে হয়। আকরিক পদার্থ হইতে বিশুদ্ধ লৌহ বাহির করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এ পর্য্যন্ত কারখানার আবর্জ্জনা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছিল। ইহা প্রত্যেক কারখানার নিকটে পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ হইয়া জমা থাকিত, এবং পরে, বহু ব্যয়ে সেগুলিকে স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আজকাল কারখানার এই আবর্জ্জনাটি পরম আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দিয়া উৎকৃষ্ট কাচ এবং সুন্দর টালি প্রস্তুত করা হইতেছে। তা' ছাড়া এই আবর্জ্জনার সঙ্গে শতকরা ছয় ভাগ চুণ মিশাইয়া একপ্রকার সিমেণ্টও পাওয়া যাইতেছে।

গালাইবার সময়ে আকরিক লৌহ হইতে নানা জাতীয় দাহ্য বাষ্প আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে ইহা কোন কাজে লাগিত না। এখন সুকৌশলে বাষ্প গুলিকে ধরিয়া কলের চুলোর তলায় ছাড়িয়া দিয়া পোড়ানো হইতেছে। এই ব্যবস্থায় কারখানার কয়লার খরচ কমিয়া প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া আসিয়াছে। মোটর গাড়ী বা মোটর জাতীয় কল ষ্টীমের জোরে চলে না। পেট্রোলের বাষ্প দিয়া ইহাদিগকে চালাইতে হয়। যে সকল দেশে লৌহ-প্রস্তুতের কারখানা আছে, সেখানে আজকাল সেই অব্যবহার্য্য বাষ্প দিয়া মোটরও চালানো হইতেছে।

কাঠের কারখানা পৃথিবীর সকল সহরেই আছে। এই সকল কারখানায় যে কত করাতের গুঁড়া ও কাঠের টুক্‌রা সঞ্চিত হয়, তাহার ইয়ত্তা হয় না। যেখানে কলের করাতে কাঠ চেরা হয়, সেখানে স্তূপাকার কাঠের গুঁড়া জড় হয়। টুক্‌রা কাঠ ইন্ধনরূপে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু কাঠের গুঁড়াকে সে প্রকারে ব্যবহার করা কঠিন। পূর্ব্বে কাষ্ঠ-ব্যবসায়ীরা অব্যবহার্য্য কাঠের গুঁড়া লইয়া বিব্রত হইয়া

পড়িতেন। কিন্তু এখন তাহার এক কণাও নষ্ট হইতে পায় না। বৈজ্ঞানিকগণ কাঠের গুঁড়া হইতে অল্প ব্যয়ে স্পিরিট্ প্রস্তুত করিবার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আমেরিকা ও য়ুরোপে এই প্রকারে প্রচুর স্পিরিট্ প্রস্তুত হইতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আড়াই মণ কাঠের গুঁড়া হইতে প্রায় দুই গ্যালন স্পিরিট্ সংগ্রহ করা যায়। আমরা বাজারে যে স্পিরিট কিনিতে পাই, তাহার প্রায় সকলি কাঠের গুঁড়া হইতে প্রস্তুত। আমাদের দেশেও এই প্রথায় স্পিরিট প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছিল জানি, কিন্তু চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে সে সংবাদ পাই নাই। বার্চ প্রভৃতি কয়েকজাতীয় কাঠের গুঁড়া হইতে চিনিও প্রস্তুত হইতেছে। যাহাকে পূর্ব্বে আবর্জ্জনা বলিয়া মনে করা হইত, আজকাল তাহারি এত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে, এক নিউ-ইয়র্ক সহরেই পাঁচটা বড় কোম্পানি কেবল কাঠের গুঁড়ার ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। বৎসরে ইহারা প্রায় এক কোটী টাকার গুঁড়া বিক্রয় করে।

পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেরই লোক মাংসভোজী। য়ুরোপ ও আমেরিকার বড়-বড় সহরে কেবল মানুষের খাদ্য জোগাইবার জন্য প্রতিদিন যে কত পশুপক্ষী বধ করা হয়, তাহার হিসাব হয় না। কিন্তু প্রাণিদেহের সকল অংশই মানুষ আহার্য্যরূপে ব্যবহার করে না। যে অংশ অব্যবহার্য্য ও অখাদ্য, তাহা আবর্জ্জনা বলিয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু এখন কসাইখানার এক টুক্‌রা জিনিসও নষ্ট হইতে পায় না। পশুর অস্থি, মজ্জা, রক্ত, শিঙ্, খুর, লোম—সকলি বিশেষ-বিশেষ কাজের জন্য পৃথক্-পৃথক্ কারখানায় চালান দেওয়া হয়; এবং সেখানে বৈজ্ঞানিকদিগের হাতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া সেগুলি নানা প্রকার ঔষধ ও সৌখীন জিনিসের আকারে বাজারে দেখা দেয়। পেপ্‌সিন্, থাইমস্, গ্লিসারিন্, প্যানক্রিয়াটিন্, প্যারোডিট, জেলাটিন্ এবং শিরিশ প্রভৃতি সুপরিচিত অনেক দ্রব্যই কসাইখানার কাঁচা মাল হইতে প্রস্তুত হইতেছে। আল্‌বুমেন নামক পদার্থটি পশুর রক্ত হইতেই প্রস্তুত হয়। তা'ছাড়া, চাম্‌ড়া প্রস্তুত করিতে কাপড়ের ছিট্ রঙ করায় এবং চিনি সাফ্ করাতে রক্তের ব্যবহার আছে। মাংস সিদ্ধ করিয়া গৃহস্থ যে হাড়গুলি ফেলিয়া দেয়, তাহাও নষ্ট হয় না। কারখানায় লইয়া সেগুলিকে জলে ফুটানো হয়, ইহাতে কিছু চর্ব্বি ও জেলাটিন বাহির হইয়া পড়ে। এই চর্ব্বিই সাবানের প্রধান উপাদান। মোটা হাড় পাইলে সেগুলিকে আর এ প্রকারে ব্যবহার করা হয় না। তাহা দিয়া সাধারণতঃ দাঁত-মাজার ব্রস্, চুল আঁচড়াইবার সৌখীন ব্রস্, ছুরীর দামাট এবং দাবা-খেলার সরঞ্জাম প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

মৃত পশুর খুর বড় আদরের সামগ্রী। ইহা দিয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে। সাদা খুরগুলি সাধারণতঃ জাপানে চালান দেওয়া হয়। জাপানী কারিগরদের হাতে পড়িয়া তাহা নানা সৌখীন জিনিসের মূর্ত্তি গ্রহণ করে। সাদা-কালো রঙের খুরে সুন্দর বোতাম হয়। খাঁটি কালো খুর দিয়া পোটাসিয়ম্ সাইনাইড নামক একটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। বটারিন্ এবং ওলিয়োমার্গারিন্ নামে দুইটি জিনিস বিদেশের অনেক স্থানে মাখনের পরিবর্ত্তে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পশুর চর্ব্বি দিয়া এগুলিকে প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

সূতা ও পশমের কলের আবর্জ্জনাগুলিকে আজকাল যে প্রকার কাজে লাগানো হইতেছে, তাহার বিবরণ আরো আশ্চর্য্যজনক। ভেড়া প্রভৃতি লোমশ প্রাণীর দেহ হইতে স্বভাবতঃই এক প্রকার তৈল নির্গত হয়। ইহা লোমে আট্‌কাইয়া থাকিয়া সেগুলিকে কোমল ও চিক্কণ রাখে। এই তৈলের কোন ব্যবহার পূর্ব্বে জানা ছিল না। কাজেই তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য কেহই চেষ্টা করিত না। এখন সুকৌশলে এই তৈল সংগ্রহ করা হইতেছে, এবং যে সকল সৌখীন লোকের মাথার চুল বা গোঁফ-দাড়ি কর্কশ, তাঁহারা এই তৈলকে প্রসাধনের উপকরণ করিয়া লইতেছেন। ইহার প্রয়োগে কর্কশ চুল কোমল হইয়া পড়িতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, কেবল আমেরিকাতে এক কোটী টাকার ভেড়ার তৈল সংগৃহীত হইতেছে। প্রসাধনের কাজ ছাড়া, জুতার চামড়া নরম করা, পশমী জিনিসকে চক্‌চকে করা প্রভৃতি অনেক কাজে ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

সূতা প্রস্তুতের কারখানার কোন জিনিসই অব্যবহার্য্য বলিয়া ত্যাগ করা হয় না। তুলার বীজের তৈল যে আমাদের কোন কাজে লাগিতে পারে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও লোকে তাহা জানিত না। কাজেই কলে তুলা পিঁজিয়া যে স্তূপাকার বীজ পাওয়া যাইত, তাহা আবর্জ্জনার

মত মাঠের জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হইত ; ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা ছাড়া, ইহা দিয়া অন্য কোন কাজ হইত না। এখন সেই বীজেরই তৈল বিক্রয় করিয়া লক্ষ-লক্ষ টাকা লাভ হইতেছে। হিসাব করিলে দেখা যায়, তুলা বিক্রয় করিলে যে অর্থ লাভ হয়, বীজের তৈল বিক্রয় করিয়া তাহার প্রায় সিকি লাভ করা যায়। রন্ধন-কার্য্যে আমরা ঘৃত ও তৈল ব্যবহার করি। কিন্তু বিদেশের লোকে প্রায়ই তৈল বা ঘৃত খাদ্যরূপে ব্যবহার করে না ; চর্ব্বিই তাহাদের খাদ্য। আজকাল চর্ব্বির সহিত তুলার বীজের তৈল মিশাইয়া অনেক খাদ্য প্রস্তুত করা হইতেছে। কটোলিন্ (Cottolene) নামে যে খাদ্য দ্রব্যটি আজকাল ভদ্রসমাজে বিশেষ আদর পাইতেছে, তুলার তৈলই তাহার প্রধান উপাদান। ইহা ছাড়া সাবান প্রস্তুতের মসলারূপেও জিনিসটির খুব আদর আছে।

ব্যাগ, জুতা ও বইয়ের মলাট প্রভৃতির জন্য যখন চামড়া প্রস্তুত করিতে হয়, তখন গোটা চামড়ার চুল, মাংস ইত্যাদি চাঁচিয়া, ছুলিয়া বর্জ্জন করিতে হয়। পূর্ব্বে এই টুক্‌রা জিনিসগুলিকে কোন কাজে লাগানো যাইত না। এখন সেগুলিকে কলে পিষিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমাট চামড়ায় পরিণত করা হইতেছে। এই কৃত্রিম চামড়া আজকাল জুতার তলায় এবং জুতার গোড়ালিতে লাগানো হইতেছে।

সকল কথা বলা হইল না। অব্যবহার্য্য আবর্জ্জনা হইতে বিদেশের লোকেরা কি প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, এখানে কেবল তাহার আভাসমাত্র দিলাম। কিন্তু ঠিক্ কি প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এই কার্য্যগুলি সুসাধ্য হইয়াছে, তাহার পরিচয় দেওয়া হইল না। মন্ত্র-গুপ্তির কলঙ্ক এ পর্য্যন্ত কেবল ভারতবাসীই ভোগ করিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু এখন তাহাই পৃথিবীর অপর সুসভ্য জাতিকেও স্পর্শ করিতে চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীরা এখন অতি গোপনে তাঁহাদের কারখানাগুলির কাজ পরিচালনা করেন ; এবং যে উপায়ে তাঁহারা ভস্মমুষ্টিকে স্বর্ণ মুষ্টিতে পরিণত করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া রাখেন। কাজেই সেই সকল উপায়ের সামান্য পরিচয় প্রদানও এখন অসাধ্য।

বেগম সমরু

(ঐতিহাসিক চিত্র)

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পূর্ব্বাভাষ ; সমরুর ভারতে আগমন ; বেগম সমরু।

মানব-জীবনে সময়ে-সময়ে কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তনই না সাধিত হয়! মরুভূমির সন্তান মেহের-উন্নিসা সামান্য অবস্থা হইতে শেষে সম্রাজ্ঞী নূরজহান্ হইয়াছিলেন— এ কথা ইতিহাস-পাঠকের অপরিজ্ঞাত নহে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যাঁহার কথা লিপিবদ্ধ করিব, তিনিও নূর-জহানের ন্যায় অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, এবং জীবনের সায়াহ্নে দানাদি পুণ্যকার্য্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ভারতে মোগল-শক্তি ক্ষীণপ্রভ। আর্য্যাবর্ত্তে তখন উত্থান-পতনের অভিনয় চলিতেছিল ; প্রকৃতপক্ষে তখন ইংরেজের অভ্যুদয়-কাল। এই সময়ে ইউরোপের নানাস্থান হইতে বহুলোক ঐশ্বর্য্য-লাভাকাঙ্ক্ষায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজগণের সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ডি বইন্, জর্জ্জ টমাস, পেরন্ প্রভৃতি সমরকুশল ব্যক্তিগণ ভারতে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেশীয় সমর-বিভাগে প্রতীচ্য প্রথা প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করিতেছিলেন।

এই ভাগ্য-পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে ওয়াল্‌টার রীন্‌হার্ড, ওরফে সমরু, অন্যতম। এই অজ্ঞাতকুলশীল জর্ম্মান-যুবক ধনলাভাকাঙ্ক্ষায় একখানি ফরাসী জাহাজে সামান্য কার্য্য গ্রহণ করিয়া ভারতে আগমন করে। ভারতে উপস্থিত হইয়া সে কখনও বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, কখন বা চন্দন-নগরে কার্য্য করিয়া, অবশেষে মীরকাসিমের সেনাদলে

প্রবিষ্ট হয়। অল্পদিনের মধ্যেই সে রণচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া মীরকাসিমের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিমের পরাজয় ঘটিলে, সমরু ও তাহার সৈন্যদল কখন বা অযোধ্যার নবাব, কখন বা জাঠরাজের নিকট কার্য্য করিয়া অবশেষে ৬৫ হাজার টাকা বেতনে দিল্লীশ্বর শাহ্ আলমের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মন্ত্রী নাজফ্ কুলী খাঁর অধীনে কর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের নিকট হইতে স্বীয় সৈন্যদলের ভরণপোষণের জন্য সমরু ছয় লক্ষ টাকা আয়ের, মীরাটের সন্নিকটস্থ সার্দ্ধানা পরগণা ও তৎসংলগ্ন ভূমি জাগীর লাভ করে।

মীরাটের ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কোটানা গ্রামে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বেগম সমরুর জন্ম হয়; তাঁহার ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা লতিফ আলির মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর বেগম সমরু ও তাঁহার মাতা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, দিল্লীতে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হ'ন।

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের জাঠরাজার অধীনে, সমরু যখন দিল্লী অবরোধ করিতেছিল, সেই সময়ে বেগমের সহিত তাহার পরিচয় হয়। সমরু, তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মুসলমান প্রথানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করে। বিবাহের পর হইতে তিনি 'বেগম সমরু' আখ্যা প্রাপ্ত হ'ন।

বলা বাহুল্য, সমরু এদেশে আসিয়া জাতীয় আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, মোগলের বেশ অবলম্বন করিয়াছিল। বেগম সমরুকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই তাহার উন্মাদ-রোগগ্রস্তা অপর এক মুসলমান পত্নী ও তাহার গর্ভজাত এক পুত্র বর্ত্তমান।

বেগমের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা; জর্জ্জ টমাস;
লেভাসুল্তের সহিত
গুপ্তবিবাহ।

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সমরুর মৃত্যু হইলে, তাহার দেশীয় সৈনিক-কর্ম্মচারীরা একবাক্যে বেগমকেই তাহাদের মৃত প্রভুর পদে বরণ করিবার জন্য সম্রাট্ শাহ্ আলমের নিকট আবেদন করিল। সম্রাটের সম্মতিক্রমে বেগমের অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বেগম সপত্নী-পুত্রসহ আগ্রায় রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন।

সমরুর মৃত্যুর পর যাঁহারা বেগমের সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হ'ন, তন্মধ্যে দুইজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একজন বিখ্যাত জর্জ্জ টমাস—ইনি জাতিতে আইরিশ; অপর ব্যক্তি লেভাসুল্ত্—জাতিতে ফরাসী, সুশিক্ষিত ও সুপুরুষ। দুই-জনেই প্রতিভাশালী। অল্পদিন মধ্যেই টমাস ও লেভাসুল্ত্ বেগমের অধিক অনুগ্রহলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। বেগম দিন-দিন লেভাসুল্তের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইতে লাগিলেন। টমাস ও লেভাসুল্তের মধ্যে শত্রুতা ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল; ফলে টমাস প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অকৃতকার্য্য হইয়া বেগমের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গেলেন।

লেভাসুল্তের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বেগম তাঁহার প্রণয়প্রার্থিনী। বেগম প্রণয়ের মধুর দৃষ্টিতে লেভাসুল্তের কার্য্যসকল সুন্দর দেখিতেন। কৌশলী ফরাসী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বেগম আর স্ববশে নাই; তাই একদিন তিনি তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন। বেগমের প্রাণ যাহা চাহিতেছিল, আভিজাত্য ও সম্মান যাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছিল না—সেই অভিলষিত প্রস্তাব লেভাসুল্তের মুখ হইতে বহির্গত হইবামাত্র, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাইলেন। ধর্ম্মযাজক গ্রেগোরিও কর্তৃক তাঁহারা রোমান্ ক্যাথলিক্ মতে গোপনে বিবাহিত হইলেন (১৭৯৩ খ্রীঃ); কিন্তু সাধারণে এই গুপ্ত বিবাহের বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না।

লেভাসুল্ত্ নানা সদ্‌গুণের অধিকারী হইলেও উদ্ধত-প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এক্ষণে আদেশ করিলেন, ইউরোপীয় সেনানায়কেরা আর পূর্ব্ববৎ বেগমের সহিত একত্র আহার করিতে পারিবে না। বেগম লেভাসুল্ত্কে এরূপ আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন; বুঝাইলেন, এই সকল দুর্দ্ধর্ষ অশিক্ষিত সৈনিকগণের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করা কোন মতেই উচিত নয়; লেভাসুল্ত্ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

বেগম যে ভবিষ্যৎ অনর্থের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই হইল। লেভাসুল্তের এই আচরণে ইউরোপীয় সেনানায়কেরা অপমান বোধ করিল। তাহার উপর, বেগমের সহিত লেভাসুল্তের বিবাহের কথা অবগত না থাকায়, তাহারা নূতন সেনাপতিকে বেগমের অবৈধ প্রণয়ী ভাবিয়া আরও বিরক্ত হইল। সৈন্যবর্গ বিদ্রোহের সুযোগ

অন্বেষণ করিতে লাগিল—চারিদিকে গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র চলিতে লাগিল।

সৈন্যগণের বিদ্রোহ; লেভাসুল‍্তের আত্মহত্যা; বেগম সমরুর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

সৈন্যগণের আচরণ ক্রমেই বশ্যতার সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল; তাহাদের ঔদ্ধত্য বেগমের পক্ষে অসহনীয় হইয়া পড়িল। তিনি নিজের ধন মান, সম্পদ্‌, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। শেষে বেগম ও লেভাসুল‍্ত্‌ উভয়ে গোপনে সার্দ্ধানা ত্যাগ করিয়া ইংরেজ-সীমানায় আশ্রয় লইতে সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু সার্দ্ধানা ত্যাগ করিতে তাঁহাদের একটু বিলম্ব হইয়াছিল; কারণ মাধোজী সিন্ধিয়া তখন দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি—আর্য্যাবর্ত্তের ভাগ্যবিধাতা; বেগম দিল্লীশ্বরের সৈন্যসাহায্যার্থ প্রদত্ত জাগীর ভোগ করিতেছিলেন; সুতরাং স্থানত্যাগের জন্য বেগমকে সিন্ধিয়ার অনুমতি লইতে হইয়াছিল।

এদিকে বেগমের যে সৈন্যদল দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা কোন সূত্রে এই গুপ্ত সংবাদ অবগত হইল। তাহারা সমরুর পুত্র জাফর ইয়ারকে মসনদে বসাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। বেগম ও তাঁহার স্বামীকে ধরিবার জন্য বিদ্রোহী সৈন্যদল অবিলম্বে দিল্লী ত্যাগ করিয়া সার্দ্ধানা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

লেভাসুল‍্ত্‌ বিদ্রোহীদের অভিযানের কথা পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কালক্ষেপ না করিয়া, একদিন মধ্যরাত্রে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে পত্নীকে লইয়া অনুপশহর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্বারোহী স্বামীর হস্তে পিস্তল এবং পার্শ্বে শাণিত কৃপাণ ঝুলিতেছে; বেগমের হস্তে শাণিত ছোরা। পথিমধ্যে স্থির হইল, দুর্ব্বৃত্তদের হস্তে পতিত হইয়া অত্যাচার ও অপমান ভোগ করা অপেক্ষা ধৃত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা আত্মহত্যা করিবেন। সার্দ্ধানা হইতে তিন মাইল দূরে কাত্রি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবার পর তাঁহারা বিদ্রোহীদের অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইলেন। লেভাসুল‍্ত্‌ বেগমকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, এখনও তাঁহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প স্থির আছে কি না। বেগম দক্ষিণ হস্তে ধৃত ছুরিকা দেখাইয়া বলিলেন, তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন। লেভাসুল‍্ত্‌ বিনা বাক্যব্যয়ে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া, পালকীর বেহারাদিগকে দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে বলিলেন।

বিদ্রোহীর দল প্রবল বাত্যার ন্যায় তাঁহাদের অতি নিকটেই আসিয়া পড়িল। এই সময়ে বেগমের পরিচারিকাগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। লেভাসুল‍্ত্‌ দেখিলেন, বেগম আত্মহত্যা করিয়াছেন—তাঁহার বক্ষের বসন রক্তাক্ত। পত্নী আত্মহত্যা করিয়াছে দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় লেভাসুল‍্ত্‌ সবলে মুখের মধ্যে পিস্তল ছুঁড়িলেন—গুলি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া গেল; তাঁহার দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইল।

বেগম আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ছুরিকা তাঁহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ হয় নাই—একখানি অস্থিতে প্রতিহত হইয়াছিল; ইহাতে তিনি সংজ্ঞাশূন্যা হইয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁহাকে সাত দিন অনশনে-অর্দ্ধাশনে একটা কামানের তলদেশে বদ্ধ করিয়া রাখিল। তাঁহার কোন বিশ্বস্ত পরিচারিকা গোপনে মধ্যে-মধ্যে কিছু আহার্য্য না দিলে বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল। নিদারুণ অপমানের ভয়ে তিনি জীবন বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছিলেন—স্বহস্তে নিজবক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন,—কিন্তু এত নির্য্যাতনেও সে প্রাণবায়ু অনন্তে মিশাইল না। তিনি কোথায় এত শক্তি লাভ করিলেন? বেগমের ভবিষ্যত জীবনের ইতিহাসই এ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবে। ভগবান্‌ তাঁহাকে দরিদ্রের দুঃখমোচনের জন্য, অসহায়ের আশ্রয়দানের জন্য এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন; ভারতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন; এই মহৎ কার্য্যের উপযুক্ত করিবার অভিপ্রায়েই তাঁহার ন্যায় মহিয়সী মহিলা, তাঁহার ন্যায় ধনজন-ঐশ্বর্য্য-বেষ্টিতা রমণীকে এমন দুর্দ্দশায় ফেলিয়াছিলেন। প্রতিদিন যাঁহার দ্বারে শত-শত নিরন্ন ব্যক্তি অন্নপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সেই মহিলা অনশনে-অর্দ্ধাশনে সপ্তাহাধিক কাল ক্ষেপণ করিলেন। অদৃষ্টের কি ভীষণ পরিহাস! ধনজন-সম্পদের অকিঞ্চিৎকরত্বের কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ!

এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় কয়েকদিন অতিবাহিত করিবার পর, বেগম গোপনে জর্জ্জ টমাসকে সংবাদ পাঠাইবার সুযোগ পাইলেন; এই দুর্দ্দিনে টমাসের সাহায্য-ভিক্ষা করিয়া বহু অনুনয়-বিনয় করিলেন। উদার হৃদয়-টমাস বেগমের প্রতি

তাহার পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া সসৈন্যে আসিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে মুক্ত করিলেন।

বেগম সমরুর ঘোর নির্য্যাতন শেষ হইল তাঁহার দুঃখের অমানিশা কাটিয়া গেল—বিদ্রোহী সৈন্যদল তাঁহার

নবাব মীর কাশিম

শাহ আলম্

বশ্যতা স্বীকার করিল—তিনি পুনরায় সার্দ্ধানার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন

ইংরেজের সহিত সন্ধি ; ভরতপুরের যুদ্ধে বেগম সমরু।

প্রণয়-দেবতার চরণে দ্বিতীয়বার আত্মসমর্পণ করিয়া—লেভাসুল্‌ত্‌কে গোপনে বিবাহ করিয়া—বেগম সমরু মনের যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল তিনি ভোগ করিয়াছিলেন—জীবনের একটি ভুলের জন্য

বেগম সমরু

তাঁহাকে হৃতসর্ব্বস্ব, অবমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তিনি যে সে ভ্রম সংশোধনের মহতী চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মরণ পর্য্যন্ত প্রথম স্বামী সমরুর নামানুসারী আপনাকে অভিহিত করা হইতেই স্পষ্ট বুঝা

শাহ আলম্-মহিষী—জিন্নৎ মহল

যায়। বেগমের সহিত লেভাসুল্‌তের প্রকৃত সম্বন্ধ জানিত না বলিয়া তাঁহার সৈন্যবর্গ, উভয়ের অবাধ-মিলনকে অবৈধ প্রণয় স্থির করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছিল,—ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, পাছে

তাহাদের পূর্ব্ব অধিনায়ক সমরুর গৌরব অক্ষুণ্ণ না থাকে। সমরুর নাম যদি লোপ পায়—যদি সমরুর পুণ্যনামের পরিবর্ত্তে লেভাসুলতের নাম অধিকার করিয়া বসে—যদি মহিমা বিজড়িত গৌরবশ্রী মণ্ডিত সমরুর বিধবা লেভাসুলতের কামানলে ইন্ধন যোগাইয়া দেয়, তাহা হইলে কি ভীষণ পরিণাম হইবে, তাহাই ভাবিয়া সৈন্যগণ অব্যবস্থিতচিত্ত লেভাসুলতের বিরোধী হইয়াছিল। বুদ্ধিমতী বেগম সমরু সৈন্যগণের নিকট প্রকৃত কথা গুপ্ত রাখিয়াছিলেন; কারণ উত্তরাধিকারী মিঃ ডাইস্‌কে "সোম্বার" নাম গ্রহণ করিতে হইবে।

যাহাতে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, সুশৃঙ্খলায় ও শান্তিতে প্রজাশাসন ও রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, তাহাই এক্ষণে বেগমের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল, এবং সেই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লেক আর্য্যাবর্ত্তে এবং ওয়েলেস্‌লি

জর্জ্জ টমাস।

নাজফ কুলী খাঁ।

তিনি জানিতেন, এ কথা শুনিলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার অধীনতা অস্বীকার করিবে—রাজ্যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিবে—নিরীহ প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ রক্ষা করা দুর্ঘট হইবে। আমাদের মনে হয়, লেভাসুলতের প্রণয়িনী হইয়া বেগম যে সাময়িক দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহা বিস্মৃতির গর্ভে ডুবাইবার জন্যই হউক, অথবা সমরুর পুণ্যস্মৃতিকে উজ্জ্বল করিবার জন্যই হউক, তিনি উত্তরকালে উইলে লিখিয়া যান যে, তাঁহার

দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র-শক্তি নির্ম্মূল করিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই ভারতবর্ষ ইংরেজাধীন হয়; ভারতের ইহা একটি স্মরণীয় দিন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী বেগম সমরু বেশ বুঝিতে পারিলেন, ভারতে আর কোন শক্তিই কার্য্যকরী হইবে না—প্রবল ইংরেজরাজই ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবেন। এ অবস্থায় ইংরেজরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহাদের বন্ধুত্ব লাভপূর্ব্বক নিজের রাজ্য ও ক্ষমতা সুদৃঢ় করাই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া

জেনারেল কাউণ্ট ডি বইনি

কর্ণেল জেমস স্কিনার

ভরতপুরের যুদ্ধ

বুঝিতে পারিলেন; তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লেকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন।

বেগমের সহিত ইংরেজের সন্ধি হইয়া গেল (১৮০৪ খ্রীঃ)। ইংরেজেরা স্থির করিয়া দিলেন, বেগম যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে; তাঁহার মৃত্যুর পর জাগীর ইংরেজ অধিকারভুক্ত হইবে। বেগমও এই অনুগ্রহের বিনিময়ে আমরণ ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

মাধোজী সিন্ধিয়া

বলা বাহুল্য, বেগম সমরু যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন এই সন্ধি কখনও ভঙ্গ করেন নাই। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভরতপুরের রাজার সহিত লর্ড কোম্বারমিয়ারের তত্ত্বাবধানে ইংরেজের যে যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে বেগম সসৈন্যে ইংরেজপক্ষের সহায়তা করিয়াছিলেন।

সৎকর্ম্ম : মৃত্যু।

এক্ষণে বেগম সমরু বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত হইয়াছেন ; ভাবিলেন, শেষের সে দিনের জন্য কি করিতেছেন ; এই প্রভুত্ব—এই অর্থ—এই নাম জীবনের সঙ্গে-সঙ্গেই ত অন্তর্হিত হইবে। এই সুদীর্ঘ জীবনকালে এমন কি কাজ করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে? তাই তিনি অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে মনোনিবেশ করিলেন—জীবনকে নূতন করিয়া গঠিত করিতে চেষ্টা করিলেন ; বুঝিলেন, নরের উপকার না করিলে ষড়ৈশ্বর্য্যময় ভগবানের করুণালাভ করা যায় না ; ধনশালী ব্যক্তি ভগবানের প্রতিভূস্বরূপ—তাঁহার মঙ্গলকার্য্যে সেই অর্থ নিয়োজিত না হইলে অর্থের সদ্ব্যবহার করা হয় না ; এক্ষণে বেগমের যত্নে ও অর্থে ক্যাথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিস্তার ও পরিপুষ্টি হইতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে কর্ত্তব্যের অনুরোধে নানাস্থানে সৈন্যচালনা করিয়া বেড়াইতে হইত বলিয়া, তাঁহার উপাসনার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। এক্ষণে বেগম চারি লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ভজনালয় নির্ম্মাণ করাইলেন। অদ্যাপি ইহা সার্দ্ধানায় Cathedral Church of St. Mary নামে প্রসিদ্ধ। গীর্জাটি

সেণ্ট মেরী গীর্জ্জা—সার্দ্ধানা
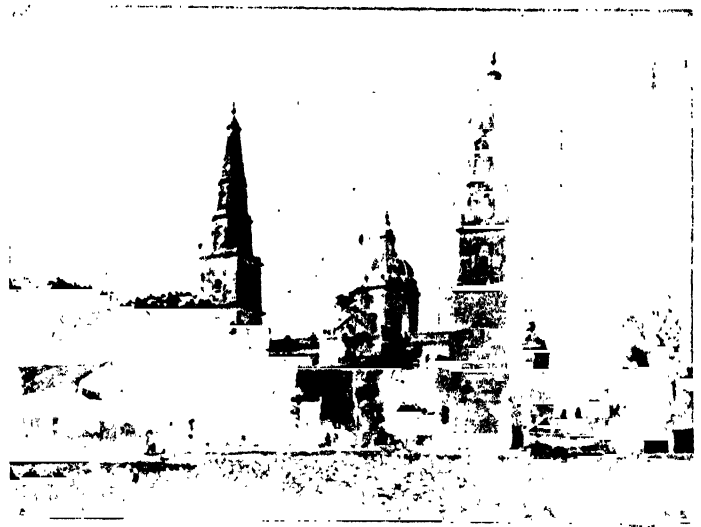
ক্যাথলিক্ সৈন্যদিগের যে সুন্দর ধর্ম্মমন্দির আছে, তাহাও বেগম সমরুর কীর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত বেগম নানাস্থানে সেতু ও পথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন।

বেগম সমরুর সুদীর্ঘ জীবনে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। কয়েকদিনের জরে তিনি শয্যাশায়িনী হইলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী প্রাতঃকালে তিনি ভগবানের নাম

বৃদ্ধবয়সে বেগম সমরু

স্মরণ করিতে করিতে ইহধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। মৃত্যুর পর তাঁহারই নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

অবলা রমণী হইয়া রাজনৈতিক গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় আভা বিকীরণ করিয়া—মুসলমান, মহারাষ্ট্র ও ইংরেজ জাতির সহিত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া—দুর্দ্ধর্ষ বিজাতীয় সেনাপতিগণের চক্রান্ত সকল ভেদ করিয়া যে মহীয়সী মহিলা ভারতবর্ষের ঘোর দুর্দ্দিনেও শান্তি সংস্থাপিত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন, তিনি সামান্য স্ত্রীলোক ছিলেন না। নারীজনসুলভ চপলতা তাঁহাতে ছিল না;—ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ম্মপটু, সরল প্রাণ—ছিল আপনার প্রতি অটল বিশ্বাস—ছিল ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ—সর্ব্বোপরি ছিল প্রজার মনোরঞ্জন করিবার ইচ্ছা, এবং কিসে তাহাদের উন্নতি হয়, তাহার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা। এ হেন ভারতীয় রমণীর সুখদুঃখময় জীবন-নাট্যের ঘটনাবলী যে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে তিনি যে পৃথিবীর ইতিহাসে বরণীয় আসন গ্রহণ করিতে পারিতেন, এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

দানব্রত; বিষয় সম্পত্তি।

প্রবলশক্তি ইংরেজের বন্ধুত্বলাভ ও দেশে শান্তি সংস্থাপনের ফলে একদিকে যেমন বেগম সমরুর আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, অপর দিকে তেমনই প্রায় ৩০ বৎসরকাল তাঁহার আর সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। এই আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় লাঘবে তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দেব সেবা ও মানব সেবার জন্য বেগম যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া গিয়াছিলেন। নিম্নে আমরা তাঁহার কয়েকটি দানের তালিকা দিলাম:

১। সাদ্ধানায় তিনি যে গীর্জ্জার প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার সংস্কার ও অন্যান্য আবশ্যক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য এক লক্ষ টাকা।

২। রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের শিক্ষার্থ সাদ্ধানায় একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা।

৩। স্থানীয় দরিদ্রদিগের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় ৫০ হাজার টাকা।

৪। কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ক্যাথলিক্ প্রচারমণ্ডলীর জন্য এক লক্ষ টাকা।

৫। আগ্রায় রোমান্ ক্যাথলিক্ প্রচারমণ্ডলীর জন্য ৩০ হাজার টাকা।

৬। রোমান্ ক্যাথলিক্গণের জন্য বেগম মীরাটে যে

বেগম সমরুর প্রাসাদ—সার্দ্ধানা

সার্দ্ধানার স্মৃতিস্তম্ভ

গীর্জ্জা সংস্থাপন করেন, তাহার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য— ১২ হাজার টাকা।

৭। কলিকাতার দরিদ্র প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট বালকদিগের শিক্ষার জন্য কলিকাতার বিশপ্‌কে— ৫০ হাজার টাকা।

অধিকন্তু বেগম রোমের পোপকে তাঁহার ইচ্ছামত সৎকর্ম্মে ব্যয় করিবার জন্য এক লক্ষ ৫০ হাজার ও ক্যান্‌টারবেরীর আর্চ্চ-বিশপকে ৫০ হাজার টাকা প্রেরণ করেন; কলিকাতার দুঃস্থ ঋণীদিগের সাহায্যকল্পে বেগম ৫০ হাজার ও কলিকাতার দরিদ্র Protestant বালকদিগের

শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য কলিকাতার বিশপকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহা ব্যতীত আরও নানা সৎকার্য্যে বেগম অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি নগদ প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান; ইঁহার অধিকাংশই তাঁহার সপত্নী পুত্রের দৌহিত্র ডাইস্ সোম্বার পাইয়াছিলেন।

পরিশেষে, বেগম সমরুর উন্নত চরিত্র, বদান্যতা ও পরোপকারবৃত্তির জাজ্জ্বল্য প্রমাণ স্বরূপ, আমরা তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের একখানি পত্র এইস্থলে উদ্ধৃত করিব। কার্য্যত্যাগ করিয়া বিলাত গমনকালে বেণ্টিঙ্ক বেগমকে লিখিয়াছিলেন :—

To

Her Highness, the Begum Sombre.

My esteemed Friend,—

I cannot leave India without expressing the sincere esteem I entertain for your Highness's character. The benevolence of disposition and extensive charity which have endeared you to thousands, have excited in my mind sentiments of the warmest admiration; and I trust that you may yet be preserved for many years, the solace of the orphan and widow, and the sure resource of your numerous dependants. To-morrow morning I embark for England; and my prayers and best wishes attend you, and all others who, like you, exert themselves for the benefit of the people of India.

I remain,

With much consideration,

Your sincere friend,

Sd. M. W. Bentinck

CALCUTTA,
March 17, 1835

উপরিউক্ত পত্রখানি সরকারী আদব কায়দা-দোরস্ত বাঁধি গতের সমষ্টি নহে, অথবা বহু উপাসনায় প্রাপ্ত প্রশংসা পত্রও নহে; —উহা বন্ধুর নিকট লিখিত বন্ধুর পত্র—উহা গুণমুগ্ধ বান্ধবের হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুরাগের নিদর্শন উহা প্রকৃত প্রশংসাভাজনের গুণকীর্ত্তন! আর সে গুণকীর্ত্তনও যে সে ব্যক্তি করিতেছেন না; তিনি ভারতের শাসনকর্ত্তা তিনি সদাশয়, ভারত-হিতৈষী, প্রকৃত গুণজ্ঞ গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক!

এখনও সাদ্ধানা আছে,—এখনও বেগমের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাসাদ আছে—এখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভবন তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে—এখনও কত স্থানে তাঁহার কীর্ত্তি রহিয়াছে;—কিন্তু যিনি একদিন এই সাদ্ধানায় অমিততেজে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন—যাঁহার আশ্রয়ে কত দীন-দুঃখী প্রতিপালিত হইয়াছে—যাঁহার করুণায় কত ব্যথিতের বেদনা দূর হইয়াছে,—সেই **বেগম সমরু** নাই—সে সাদ্ধানার বিস্তীর্ণ জমিদারী এখন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সব গিয়াছে—আছে শুধু কীর্ত্তি। তাই আমাদের নীতিবিদেরা বলিয়া থাকেন :—

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"

চন্দননগরের বাঙ্গালী সৈনিক

গোলন্দাজ শ্রীসন্তোষকুমার সরকার

গোলন্দাজ শ্রীপরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আলো

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম-এ]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণীর জাতীয় প্রতিভার মূর্ত্ত অবতার (Goethe) গেটের চর্ম্মচক্ষে যখন জগতের আলো নিবিয়া আসিয়াছিল, তখন তিনি শেষ নিশ্বাসের সহিত ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"আলো, আলো, আরও আলো!" ('Light, light, more light!') আর আজ বিংশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণীর জাতীয় প্রতিভার মূর্ত্ত অবতার কাইজার (Kaiser) বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন,—"আঁধার, আঁধার, আরও আঁধার! গথিক (Gothic) বর্ব্বরতার, অমানুষ নিষ্ঠুরতার, পৈশাচিক জিগীষা ও জিঘাংসার নারকীয় অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী ডুবাইয়া দেও!"

বাইবেলে বর্ণিত (Genesis) সৃষ্টিপ্রকরণে দেখা যায়, পরমেশ্বরের আদেশে অন্ধকার হইতে আলোকের উদ্ভবেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার আরম্ভ—'Let there be light and there was light'; আমাদের শাস্ত্রেও আছে, 'আসীদিদং তমো

ভূতম্। ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥' (মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় ৫।৬ শ্লোক)। তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে ইতি শ্রুতিঃ।

গেটের মৃত্যুকালীন উক্তির ও বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইয়াছে; এই ব্যাখ্যায় আলোক জ্ঞান-রূপে ও অন্ধকার অজ্ঞান-রূপে গৃহীত হইয়াছে; অর্থাৎ অজ্ঞান জ্ঞানের আলোকে তিরোহিত হয়—'তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা'। এই ব্যাখ্যানুসারে, 'অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন', সেই জগদ্গুরু শ্রীভগবান্ আসন্নমরণ জ্ঞানভিক্ষু জার্ম্মাণ কবি গেটের রসনায় আবির্ভূত হইয়া বৈদিক ঋষির উদাত্ত প্রার্থনা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির করাইয়াছেন,—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়।' এই আধ্যাত্মিক অর্থেই আমাদের কবি গাহিয়াছেন, 'তুমি অন্ধ জনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ।' এই ভাবের ভাবুক হইয়াই শাস্ত্রবিশ্বাসী হিন্দু বলেন,

> অনেক-সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শনম্।
> সর্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

বিশেষ করিয়া যে শাস্ত্র এই সত্যজ্ঞানের আলোক প্রদান করে, তাহাকেই আমাদের দেবভাষায় দর্শন-শাস্ত্র বলে, কেন না প্রকৃত-দর্শন ও সত্যজ্ঞান অভিন্ন।

যাহা হউক, আমরা এই গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়িয়া সহজ স্বাভাবিক অর্থেই 'আলো' শব্দটা গ্রহণ করিব; শিক্ষা-ব্যবসায়ী হইয়াও ইহা দ্বারা শিক্ষার আলোক না বুঝিয়া শিখার আলোকই বুঝিব।

আকাশে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র ধূমকেতু উল্কা বিদ্যুৎ, ভূপৃষ্ঠে খদ্যোত প্রভৃতি পতঙ্গ ও তৃণজ্যোতিঃ প্রভৃতি উদ্ভিদ্, স্বাভাবিক উপায়ে আলোক বিকীর্ণ করে। সাগর-জলেও এইরূপ (phosphorescent) জ্যোতিষ্মান্ কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হইয়াছে। নির্জ্জন প্রান্তরে আলেয়ার আলো পথিককে বিভ্রান্ত, বিড়ম্বিত করে। বনের দাবানল ও সমুদ্রের বাড়বানল আকস্মিক আলোক উৎপাদন করে। উল্কার আলোকে শেক্‌স্‌পীয়ারের ব্রুটস্ পত্র পড়িতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, কিন্তু জগতের অন্য কেহ কোন উপকার পাইয়াছে বলিয়া জানি না। বরং উল্কাপাতে মানব-মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করে, ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ছায়াপাত করে। আমার মনে হয়, এগুলি বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতের ধ্বংসাবশেষ, বিশ্বামিত্রের উচ্চ আশার মতই থাকিয়া-থাকিয়া খসিয়া পড়ে। ক্ষণ-প্রভার ক্ষণিক আলোকে প্রেমিকা বসন্তসেনা বা প্রেমপ্রবণ জগৎসিংহ 'বিদ্যুদ্দীপ্তি-প্রদর্শিত পথে কোনমতে চলিতে' পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে আলোকের উপর তত ভরসা হয় না; তাই অভিসারিকা বসন্তসেনা আক্ষেপ করিয়াছেন,—'অয়ি বিদ্যুৎ ত্বমপি প্রমদানাং দুঃখং ন জানাসি।" বস্তুতঃ মেঘমালার বিদ্যুৎ-ঝলকে আলোকের মনোহারিত্ব অপেক্ষা বজ্রপতনের ভয়ঙ্কর-ত্বই অধিক প্রকট। ধূমকেতুর আবির্ভাব কালে ভদ্রে ঘটে এবং ইহা মানবের কোন উপকারে আসে না। বরং ইহার আকস্মিক আবির্ভাব মানবমনে নানারূপ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে, ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় মানবমনকে দুশ্চিন্তায় অভিভূত করিয়াছে। ফলতঃ ভূপৃষ্ঠের আলেয়া এবং আকাশের বিদ্যুৎ, উল্কা ও ধূমকেতু, দাবানল বাড়বা-নল, জলজ ও স্থলজ (phosphorescent) জ্যোতিষ্মান্ কীটপতঙ্গ উদ্ভিদ, আলোক বিতরণ করিয়া মানবের জীবন পথ সুগম করিয়াছে, বলা চলে না।

পক্ষান্তরে, সূর্য্য চন্দ্র ও নক্ষত্রমালা সৃষ্টির আদিমকাল হইতে আলোক প্রদান করিয়া মানবের উপকার সাধন করিতেছে। বাইবেলের সৃষ্টিপ্রকরণে স্পষ্টবাক্যে লিখিত আছে, 'সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ' মানুষকে আলো দিবার জন্যই জীহোভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত,—'The greater light to rule the day and the lesser light to rule the night,' অর্থাৎ দিনের ভার বড় আলো সূর্য্যের উপর, আর রাতের ভার ছোট আলো চন্দ্রের উপর। তবে জীহোভার নির্দ্দিষ্ট এই শ্রমবিভাগে (division of labour) একটু ত্রুটি আছে; আমরা যখন জীহোভা-ভক্ত য়িহুদী নহি, তখন অকুতোভয়েই কথাটা বলিতে পারি।

সূয্যি মামার লোহার শরীর (iron constitution), অটুট স্বাস্থ্য, অসীম শক্তি, অসামান্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি। তিনি রোজ সকালে ঠিক ঘড়ী ধরিয়া আফিস করিতে বাহির হন, কখন লেট্ বা গরহাজির হন না। মেঘলা-কুয়াশা-বর্ষা-বাদলার দিনে তিনি একটু লুকোচুরি খেলেন বটে, কিন্তু রীতিমত আলো সরবরাহ করিতে ক্ষান্ত থাকেন না। তবে

যখন দুরন্ত রাহুর কবলে সর্ব্বগ্রাস ঘটে, তখন ইচ্ছাসত্ত্বেও আলো দিতে পারেন না। সে ত বিধাতার ফের! তাহার উপর আর তাঁহার হাত কি?

চাঁদা মামার কায কিন্তু এমন নিখুঁত নহে। তিনি ক্ষয়রোগী, তাঁহার ভঙ্গুর স্বাস্থ্য (delicate health), কর্ত্তব্যজ্ঞানও তেমন সজাগ নহে। জীতোভার বন্দোবস্ত মত, সূর্য্যাস্তে দাদার হাত হইতে চার্জ্জ বুঝিয়া লইয়া, দাদাকে relieve করিয়া, আবার সূর্য্যোদয়ে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার ঘরে যাওয়া উচিত। কিন্তু পাহারাওয়ালার মত এরূপ কাটায় কাঁটায় কায তিনি মাসের মধ্যে দুই দিনও করেন কি না সন্দেহ। ফাঁকীবাজ কেরাণীর মত, দেরী করিয়া কাযে আসা বা টাইম্ না হইতে আফিস পালান তাঁহার বিষম রোগ। তবে গুণের মধ্যে এইটুকু যে, তিনি দুই দিক্ রক্ষা করিতে না পারিলেও এক দিক্ রক্ষা করেন, যেদিন দেরীতে আসেন সেদিন শেষ পর্য্যন্ত থাকেন, আবার যেদিন শেষদিকে গা ঢাকা দেন, সেদিন খুব সকাল সকাল কাযে লাগেন, কেরাণীর শিরোমণি চার্লস্ ল্যাম্বের* মত বা শাঁখের করাতের মত 'যেতেও কাটা আসতেও কাটা' অভ্যাস নাই। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহার এই বদখেয়ালের নিদান নির্ণয় করিয়াছেন; কিন্তু আমরা অতশত বুঝি না; আমাদের স্বল্প বুদ্ধিতে ইহাই লয় যে, কুলীন ব্রাহ্মণের মত বহুপত্নীক বলিয়া তিনি চাকুরীর কাযে তাল ঠিক রাখিতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রৈণ শ্রীশচন্দ্র যে একটি লইয়াই সব সময়ে সাম্লাইতে পারেন নাই! ইহার উপর আবার যদি মেঘলা-বাদলা হয়, তবে ত কথাই নাই; এমন অবস্থায় বরং সূর্য্য মামার একটু আবছায়া দেখা যায়, চাঁদা মামা একেবারেই ডুব দেন। গ্রহণের সর্ব্বগ্রাসে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়। ফল কথা, ইনি জীতোভার বন্দোবস্ত ঠিকমত পালন করেন না। ইহাতে শয়তানের কারসাজী আছে কি না, বাইবেলজ্ঞই বলিতে পারেন। যাহা হউক, সাতাইশ তারার পতি হওয়াতে তাঁহার এইটুকু সুবিধা হইয়াছে যে, তিনি যখন Sick report করিয়া গরহাজির হন, তখন তাঁহার পত্নীগণ বা তাহাদের সখীরা তাঁহার একটিনী করে। (যেমন বর্ত্তমান যুদ্ধে পুরুষেরা লড়াই করিতে যাওয়াতে স্ত্রীলোকে দেশে বসিয়া পুরুষদের কায চালাইতেছে।) তবে এই ক্ষীণাঙ্গীদিগের সাধ্য কি যে তাঁহার স্থান পূরণ করে? তাই চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন,—

একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি॥

আর প্রাচীন বাঙ্গালী কবি 'অস্থার্থ' করিয়াছেন—

এক চন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে।
লক্ষ লক্ষ তারাগণে কি করিতে পারে॥

আরও এক কথা। সূর্য্যের আলো 'প্রদীপ্ত, প্রভাময়, যাহাতে পড়ে, তাহাই হাসিতে থাকে।'* সুতরাং দিনের বেলা অন্ধকারের ভয় নিতান্ত গুলিখোর ভিন্ন কেহ করিবে না। কিন্তু রাতের বেলা চন্দ্র-তারার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা যায় না। একে ত তাহাদের আবির্ভাব-তিরোভাবে নানান্ ছল; তাহাতে তাহাদের জ্যোতিঃ বড়ই ক্ষীণ; সস্তা জাম্মাণ মালের মত তাহাদের কেযো গুণ অপেক্ষা বাহার-চটকই বেশী। সেই আলোকে পুলকিত হইয়া কবিতা লেখা চলে, কিন্তু তাহাতে সংসারের প্রয়োজন সাধিত হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে, সে আলোক 'সুবিমল, সুমধুর, সুশীতল; কিন্তু তাহাতে গৃহকার্য্য হয় না; তত প্রখর নয় এবং দূরনিঃসৃত।'* তাই মানুষ সভ্যতার প্রথম ধাপে উঠিয়াই, রাত্রিকালের জন্য কৃত্রিম উপায়ে আলোক উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছে। সেই চেষ্টার ইতিহাস সঙ্কলনের সূচনা-স্বরূপ এই দীর্ঘ গৌর-চন্দ্রিকা। কিন্তু এই ইতিহাস-অবতারণার পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে আর একটু বক্তব্য আছে।

যখন মানববুদ্ধি ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিল, যখন মানব নিজের অভাব অনুভব করিতে এবং অভাব দূর করার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে শিখিল, যখন প্রয়োজন উদ্ভাবনের জনন করিতে প্রবৃত্ত হইল, সেই অবস্থায় মানব আলোক অপেক্ষা তাপের প্রয়োজনীয়তাই অধিকতর তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিল। কেন না অন্ধকারে মানুষ বাঁচিতে পারে, কিন্তু শীত-নিবারণ ব্যতিরেকে প্রাণধারণ দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ, জগতের আদিম অবস্থায় (glacial

* 'You are late Mr. Lamb'. 'Yes, but I always make it up by going away early!' বলা বাহুল্য এটা বৈঠকী কথা। প্রকৃতপক্ষে ল্যাম্ব আফিসের কাজে অবহেলা করিতেন না।

* দুর্গেশনন্দিনী—'আয়েষা' শীর্ষক পরিচ্ছেদ

period) শীতটাও ছিল নিদারুণ। লোমশ পশুচর্ম্মধারণ ও বসাভোজনে সে শীত প্রশমিত হইত না। আবার, আম মাংস ও কন্দমূলফল ভোজনে ক্রমে অরুচি জন্মিলে, মানুষ খাদ্যপাকের জন্যও অগ্নির প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়াছিল। হয় ত আকস্মিক দাবানলে অর্দ্ধদগ্ধ পশুপক্ষীর মাংস খাইয়া মানুষ আমমাংস অপেক্ষা ইহার স্বাদুতা বুঝিয়াছিল এবং সুস্বাদু খাদ্যপাকের লোভে ইচ্ছাক্রমে অগ্নি উৎপাদনে কৃতাভিনিবেশ হইয়াছিল। অন্ততঃ দাবানল দেখিয়া অগ্নির দাহিকা শক্তি ও তাপ-বিকিরণ সম্বন্ধে মানবের প্রথম জ্ঞান জন্মিয়াছিল, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়। কিন্তু দাবানল দৈব ঘটনা, মানুষের ইচ্ছাধীন নহে; সুতরাং অগ্নিপ্রজ্বলনের কৃত্রিম উপায় তখনও পর্য্যন্ত মানবের করায়ত্ত হয় নাই। কি কৃত্রিম উপায়ে দাবানলের ন্যায় অগ্নি উৎপাদন করা যায়, মানব তদ্বিষয়ে মস্তিষ্ক-চালনা করিতে লাগিল। হয় ত দৈবাৎ প্রজ্বলিত দাবানলকে নিবিতে না দিয়া, তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া সেই আগুন (চাষাদের তামাকু-সেবনের জন্য বোদলার আগুনের মত) বাচাইয়া রাখিবার চেষ্টাই সর্ব্বপ্রথম।

তাহার পর কোন একজন অসাধারণ-প্রতিভাশালী মানব পুনঃ পুনঃ দাবানল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির করিলেন যে, কাষ্ঠে-কাষ্ঠে ঘর্ষণে দাবানল উৎপন্ন হয়। যিনি প্রথমে এই পথ ধরিয়া কাষ্ঠে-কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া স্বহস্তে কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি উৎপাদনে কৃতকার্য্য হইলেন, তিনি ঋষিপদবাচ্য। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, নচিকেতা যমরাজের নিকট অগ্নিচয়ন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রোমিথিউস্ (Prometheus) স্বর্গ হইতে অগ্নি অপহরণ করিয়া মানুষকে ইহার ব্যবহার শিখান। কিন্তু ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণ বুঝাইয়াছেন যে, এই কাহিনী রূপক। অরণিদ্বয়-সঙ্ঘর্ষণে অগ্নির আবির্ভাব রহস্য এই কাহিনীর মূর্ত্তি লইয়াছে। Prometheus = প্রমন্থ — কাষ্ঠে-কাষ্ঠে ঘর্ষণে অগ্নিমন্থন। ইহা এখনও বৈদিক যজ্ঞের অপরিহার্য্য অঙ্গ। উক্ত প্রক্রিয়া না কি অনেক বর্ব্বর জাতির মধ্যেও সুপরিজ্ঞাত। সাগ্নিক বা আহিতাগ্নিক গৃহিগণ যে বহু যত্নে অগ্নিরক্ষা করিতেন, তাহার মূলেও হয় ত এই তথ্য রহিয়াছে যে, তখন অগ্নি-উৎপাদন আয়াস-সাধ্য ব্যাপার ছিল। এই উপায় উদ্ভাবন করার পরই নিশ্চিত শবদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করার পরিবর্ত্তে মুখ অগ্নি ও অগ্নি-সংস্কার প্রথার প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।

এইরূপে মানব যখন স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচালনায় কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি-উৎপাদনে সফলকাম হইল, তখন সে অগ্নির দাহিকা ও প্রকাশিকা শক্তি, অর্থাৎ, তাপ ও আলোক উভয়ের উপকারিতাই বুঝিল; এবং উভয় প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করিতে লাগিল।

এই ঘর্ষণ-ব্যাপারের ক্রমিক উন্নতিতে চকমকি পাথর ও লোহায় ঠোকাঠুকি করিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উৎপাদন করিয়া তাহা দ্বারা শোলা ধরাইয়া সহজদাহ্য শুষ্কপত্র-কাষ্ঠাদিতে অগ্নি-সংযোগ করা হইত। আজ ইহারই চরম উন্নতি— অগ্নিগর্ভদীপশলাকা সকলের গৃহে-গৃহে (গৃহিণীর বালিশের নীচে ও কর্ত্তার শার্টের পকেটে) বিরাজ করিতেছে। হায়! এই চরম উদ্ভাবনের দিনে সে কাহিনীসৃষ্টির শ্যামল (mytho-poeic age), হিন্দু ও গ্রীক প্রভৃতি আর্য্যজাতির সে সুন্দর কল্পনা প্রবণতার কাল কাটিয়া গিয়াছে, তাই আধুনিক কবি 'নমামি বিলাতী অগ্নি দেশলাইরূপী' বলিয়া 'নমোনমঃ' করিয়া সারিয়াছেন, দিয়াশলাই এর উদ্ভাবককে নচিকেতাঃ বা প্রোমিথিউসের ন্যায় উচ্চ আসন দেন নাই।

কথায় কথায় অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। পূর্ব্বে বলিতেছিলাম যে ঘর্ষণজনিত অগ্নিতে শুষ্কপত্র শুষ্ককাষ্ঠ প্রভৃতি সহজদাহ্য ইন্ধন যোগাইয়া মানুষ উত্তাপ ও আলোক উভয়ই উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন পরে কেবল আলোর জন্য প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করা একটু যেন (clumsy) বহ্বাড়ম্বর বলিয়া বিবেচিত হইতে আরম্ভ হইল। এ যেন বিশল্যকরণীর জন্য সমগ্র গন্ধমাদন উৎপাটন! ক্রমে কন্‌গ্রেসবাদীদিগের প্রস্তাবিত বিচারকার্য্য ও শাসন-কার্য্যের পৃথক্‌করণের ন্যায় (separation of judicial and executive functions) আলো জ্বালা ও তাপ দেওয়ার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল। আলোর জন্য প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালার পরিবর্ত্তে ভেরাণ্ডার বীজ মালা করিয়া কাঠীতে গাঁথিয়া তাহাতেই অগ্নিসংযোগ করা অথবা তৈল-দায়ক পদার্থে প্রস্তুত মশাল জ্বালার ব্যবস্থা হইল। তাহার পর, মানুষ যখন তৈলদায়ক বীজ হইতে তৈল বাহির করিতে শিখিল, তখন ত ব্যাপার অতি সহজ অতি সরল,

অতি সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কবিরাজী গাছগাছড়া এবং ডাক্তারী (extract) নির্য্যাসের মধ্যে যে প্রভেদ, আলো জ্বালার পূর্ব্বের বহ্বাড়ম্বর প্রণালী ও পরের সংক্ষিপ্ত প্রণালীর মধ্যেও সেই প্রভেদ।

সরিষা, মসিনা, রেড়ী, মহুয়া, নারিকেল প্রভৃতি হইতে তৈল বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে মানববুদ্ধি পলিতা বা সলিতা পাকান ও দীপনির্ম্মাণ প্রভৃতিও উদ্ভাবন করিল। তখন ঘরে ঘরে সন্ধ্যা জ্বালা গৃহস্থের 'লক্ষণ' হইল, দেবোদ্দেশে দীপদান অর্থাৎ আকাশ-প্রদীপ, চৌদ্দ-প্রদীপ প্রভৃতি সজ্জিত হইল; দেবার্চ্চনে, আরতি ও বরণে, তৈলের পরিবর্ত্তে পবিত্র ঘৃতের প্রদীপের প্রতিষ্ঠা হইল, বিবাহে শুভদৃষ্টির প্রবর্ত্তন হইল, বাসর-ঘরে সুন্দরীর হাট বসিল, সুখযামিনীতে নিরালায় বসিয়া দীপালোকে প্রেমিক প্রেমিকার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিল।

অবশ্য ততদিনে মানুষ তরুতল বা গিরিগুহা ছাড়িয়া কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে শিখিয়াছিল। রাত্রিকালে গৃহে আলো জ্বালিতে পারাতে মানুষের অনেক সুখ সুবিধা ঘটিল; এঘর ওঘর করিতে আর হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইতে হয় না, দরকারী জিনিশ খুঁজিতে আর হাতড়াইতে হয় না, আহার্য্য দ্রব্যের সহিত খড়কুটা পোকা-মাকড় চিবাইতে হয় না, বিছানায় শুইতে গিয়া সাপ-বিছার দ্বারা নিগৃহীত হইতে হয় না।* এ সব ত গেল মোটা কথা। সমস্তদিনের নানা শ্রমজনক কার্য্যের পর স্ত্রী-পুরুষ বিশ্রামক্ষণে পরস্পরের ও সন্তান-সন্ততির মুখ দেখিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিল; কত আমোদ-আহ্লাদে, কত হাসি-গল্পে সময় কাটিতে লাগিল। বাস্তবিক, যেমন গুড়ুকখোরের তামাকুর ধোঁয়া না দেখিতে পাইলে, গুড়ুক টানার আয়েসটুক্ সব মাটি হয়, তেমনি পরস্পরের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখিতে না পাইলে হাসিঠাট্টাও মাঠে মারা যায়। তাই রসিকরাজ চার্লস্ ল্যাম্ব্ বলিয়াছেন—Jests came with candles; আলোক-উৎপাদনের উপায়-উদ্ভাবনের পূর্ব্বে মানুষ সন্ধ্যাকালে খাইত আর শুইত, হাসিগল্প গীতবাদ্য আমোদ আহ্লাদ কিছুই জমিত না।

এ ত গেল গৃহে আলো জ্বালার সুখ-সুবিধার কথা। কিন্তু মানুষের আরও অসুবিধা আছে। অন্ধকার রাত্রে প্রয়োজন-বশে প্রতিবেশীর গৃহে বা গ্রামান্তরে যাইতে হইলে কি উপায়? জোছনা-রাতে না হয় সরকারী আলোয় চলিতে পারে, কিন্তু নিশায়াং নষ্টচন্দ্রায়াং দুর্ল্লভো মার্গদর্শকঃ। তখন দূর কুটীরের ক্ষীণ প্রদীপের আলোকেই ধ্রুবতারার মত লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইত। আলেয়া জ্বলিলে ত বিপদ ঘনীভূত হইত। ঘরের দীপ হাতে করিয়া গেলে, দু'পা না যাইতেই, মুক্ত বায়ুতে সেটি নিবিয়া যাইত। ধুচুনী আড়াল দিয়া প্রদীপ রক্ষা করিয়া এঘর-ওঘর করা চলিলেও, এবাড়ী-ওবাড়ী এগ্রাম-ওগ্রাম যাওয়া চলে না। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কাচ বা অন্য কোন মসৃণ পদার্থে প্রস্তুত আলোকাবরণ অর্থাৎ হাত লণ্ঠন উদ্ভাবিত হইল। আমাদের বাল্যকালে যেমন গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে হইলে সঙ্গে জলপাত্র লইয়া যাইতে হইত, তেমনি রাত্রে গৃহ হইতে গৃহান্তরে বা গ্রামান্তরে যাইতে হইলে হাত-লণ্ঠন সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা। আজও পল্লীগ্রামে এই প্রথা প্রচলিত। যেমন পকেট ঘড়ী সঙ্গে থাকিলে সময় দেখা চলে, তেমনি হাত-লণ্ঠন হাতে থাকিলে পথ দেখা চলে। বীর-হনুমান্ আসল সূর্য্যকে বগলদাবা করিয়াছিলেন; ডারউইনের মতে যাঁহারা উক্ত মহাত্মার উত্তরপুরুষ, তাঁহারা নকল সূর্য্যকে হাতে ঝুলাইলেন। সত্য সত্যই এই সচল আলো—'migratory lanthorn', 'vagabond pharos'*—সূর্য্য-চন্দ্র-তারার গার্হস্থ্য সংস্করণ নহে কি?

ইহার পর, সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে নগরনির্ম্মাণ এবং আরও উন্নতির অবস্থায় রাস্তায় আলোকস্তম্ভ-নির্ম্মাণ। আফিস করিয়া, প্রাইভেট পড়াইয়া, বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইয়া, থিয়েটার দেখিয়া, সাহিত্য-সঙ্গত করিয়া, আড্ডা দিয়া, যত রাতেই ফের, লণ্ঠন-হাতে বিব্রত হইবার দরকার নাই; অথচ নাক ভাঙ্গিবার, পা মচ্কাইবার, পরের ঘাড়ে পড়িবার, পথ হারাইবার ভয় নাই। এক সময়ে আমাদের প্রাচীন কবি (মৃচ্ছকটিক-কার) চন্দ্রকে 'রাজমার্গপ্রদীপ' বলিয়া ছোট করিয়াছিলেন। আর আজ আধুনিক ইংরেজ লেখক (Stevenson) রাস্তার সারি-সারি সাজান আলোকে

* এই প্রবন্ধের কোন-কোন স্থলে ভাব ও ভাষার ভঙ্গী Stevenson's A Plea for gas-lamps নামক উপাদেয় প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। দুই-চারিটি কথা 'কাশীর কিঞ্চিৎ' এর লেখক মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

'Urban Stars', 'biddable domesticated stars'—'সহুরে তারা', 'আজ্ঞাকারী পোষমানা তারা' বলিয়া বড় করিয়াছেন। সময়ের কি পরিবর্ত্তন!

কথা-প্রসঙ্গে সভ্যতার অনেকগুলি ধাপ এক লম্ফে অতিক্রম করিয়া গিয়াছি। এক্ষণে আবার সেই আদিম (কিন্তু কৃত্রিম) প্রদীপ বা চেরাগের কথা তুলিব। সভ্যতার ক্রমিক বিকাশে এই নূতন আলোর নানা দোষ ধরা পড়িতে লাগিল। তেল-সলিতার প্রদীপ নোংরা ও জবরজঙ্গ, সলিতা-পাকান অফুরন্ত পরিশ্রমের কায, ফর্শা নেকড়ার সলিতা না হইলে আলো মিটমিট করে, তৈলও সাফ না হইলে আলো ঘোলাটে হয়; মিনিটে মিনিটে সলিতা উস্কান, কোয়ার্টারে-কোয়ার্টারে নূতন সলিতার যোগান দেওয়া, ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রদীপে তেল ঢালা—সবই ক্লেশকর; পরন্তু তেল ঢালা ও প্রদীপ উস্কান বড় নোংরা কায; আবার প্রদীপের দিকে সর্ব্বদা নজর রাখিতে হয়,—কখন্ তেল দিতে, সলিতা উস্কাইতে বা নূতন সলিতা যোগাইতে হইবে; সুতরাং কাযে মনঃসংযোগ হয় না। যতক্ষণ জ্বলিবে, ততক্ষণ জ্বালাইবে। ইহা ছাড়া বর্ষা হইলে পোকা পড়ার ভয়, বাতাস হইলে নিবিবার ভয়। আবার অনাবৃত প্রদীপের শিখায় অসাবধানে কাপড়-চোপড় ধরিয়া গিয়া গৃহদাহ ঘটাও বিচিত্র নহে। গেলাসে জল ও তেল ঢালিয়া পতিঙ্গেয় পলিতা পরাইয়া আলোর ব্যবস্থা ইহার অপেক্ষাকৃত উন্নত সংস্করণ।

এই সব দোষ পরিহার করিবার চেষ্টায় মানুষ ইহা অপেক্ষা ছিম্‌ছাম আলোর উদ্ভাবন করিল—মোমবাতি ও চর্ব্বির বাতি। কঠিন পদার্থকে দ্রব করিয়া আবার পিণ্ডাকারে কঠিন করা হইল, দ্রব অবস্থায় কৌশলে তাহার মধ্যে পলিতা প্রবেশ করান হইল, প্রজ্বলিত পলিতার উত্তাপে ক্রমে-ক্রমে আবার সেই কঠিন পদার্থ দ্রব হইয়া ইন্ধন যোগাইতে থাকিল; পুনঃপুনঃ তেল-সলিতা যোগান, সলিতা উস্কান, কিছুরই প্রয়োজন হইল না। এই আলোক বড় স্নিগ্ধ, বড় মিঠে, সুন্দর ও শোভন। কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য, বাবুগিরির, বড়মানুষির, বিলাসের জিনিস। হয় ত অধিক বিলাস-ব্যসনে শেষে 'লালবাতি' জ্বালিতে হয়! রাজনন্দিনী প্যারী শ্যাম-কালাচাঁদের আশায় 'জ্বালায়ে মোমের বাতি, সারারাতি' জাগিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু দরিদ্রের সেই চেরাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

যাহা হউক, বাতিতে চেরাগের অন্যান্য দোষ নিরাকৃত হইলেও পোকা-পড়ার ও বাতাসে নিবিয়া যাওয়ার এবং অকস্মাৎ ব্রহ্মার কোপের ভয় গেল না। এই ত্রিদোষের প্রতিবিধানের জন্য আলোকের আবরণ লণ্ঠন ফানুশের প্রচলন হইল। দরিদ্রের চেরাগ অবশ্য বাড়তী খরচের ভয়ে এইরূপ আবরণের আশ্রয় পায় না। কিন্তু মহাজনের গদির গেলাসে-জ্বালা রেড়ীর বা নারিকেল তৈলের আলো এবং সৌখীন লোকের বাতির আলো লণ্ঠন ফানুশের স্বচ্ছ কাচের ভিতর হইতে খোলে ভাল। হাজার-ডেলে ঝাড়ের ভিতর যখন এই বাতির বাহার সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

এই দুই রকম আলো—গরিবের সম্বল চেরাগ, আর বড়লোকের বাতি—জগতে বহু শত, বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল; আসিতেছিল কেন, আজও বহু স্থলে চলিতেছে। কিন্তু হালে মানুষের অনুসন্ধিৎসা মাটীর ভিতর হইতে মেটে তৈল (rock oil) বাহির করিয়া আলোক-জগতে একটা বিপ্লব বাধাইয়াছে। সস্তার কল্যাণে ইহার অবাধ প্রসার হইয়াছে। আজ এই কেরসিনের দাপটে সরিষা, মসিনা, রেড়ী, মহুয়া প্রভৃতির তৈলের রেওয়াজ উঠিয়া যাইতেছে। দুর্গন্ধে ও ধূমোদ্গারে নাক জ্বলিয়া যাইতেছে, আলোকের তীব্রতায় মাথা ধরিয়া উঠিতেছে, চক্ষুঃ ঝলসিয়া যাইতেছে, এমন কি অকালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, বিষাক্ত সূক্ষ্ম অঙ্গারকণা খাদ্য-পেয়ে ছড়াইয়া পড়িয়া স্বাস্থ্যহানি করিতেছে, হঠাৎ আগুন ধরিয়া উঠিয়া (explosion) কত ঘরবাড়ী পাটতুলা জ্বলিয়া যাইতেছে, কত মানুষ পুড়িয়া মরিতেছে, জলবত্তরলং তীব্রবিষ ছেলেবুদ্ধিতে পান করিয়া কত শিশু মৃত্যুমুখে পড়িতেছে, শুধু মর্ম্মান্তিক বেদনায় কেন, সামান্য অভিমানে কত নারী পরিধেয় বস্ত্রে এই অত্যন্ত-সহজদাহ্য পদার্থ নিষিক্ত করিয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া জীবনবলি দিতেছে,—আর অর্থনীতিবিশারদ আমরা 'সস্তার তিন অবস্থা'র হিড়িকে অটল-অচল-ভাবে বীরাসনে বসিয়া—এই লেলিহান অগ্নিশিখার স্তবপাঠ করিতেছি,—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী ঘরদ্বারেষু সস্তা-রূপেণ সংস্থিতা॥

যাক্, আর এত ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতার প্রয়োজন

নাই ; অন্য কথা বলি। মানব-বুদ্ধির অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তির, আবিষ্ক্রিয়া-ক্ষমতার, উদ্ভাবনী-শক্তির সীমা নাই। মানবের সূক্ষ্মবুদ্ধি কঠিন পদার্থ কাঠখড়-পাতায় অগ্নিসংযোগ করিয়া আলোক নিষ্কাষণ করিল, তাহার পর কঠিন বীজ সরিষা মসিনা প্রভৃতি হইতে তরল তৈল বাহির করিয়া, কৌশলে ঘৃত ও বসা প্রস্তুত করিয়া, মধু-মক্ষিকার শ্রমজাত মোম লইয়া, সুরাসার (spirit) চোঁয়াইয়া, আলোকের ইন্ধন-স্বরূপ ব্যবহার করিল ; কিন্তু কঠিন ও তরল পদার্থেও সন্তুষ্ট না হইয়া বায়বীয় পদার্থকেও আলোকের ইন্ধন রূপে নিয়োজিত করিতে প্রবৃত্ত হইল ; অধ্যবসায়ের ফলে গ্যাসের আলো জ্বলিল। ইহাকে সামলাইতে পারিলে ইহা নিরাপদ, কিন্তু leak করিলে দুর্গন্ধের অসুবিধা ত আছেই, প্রাণের আশঙ্কাও আছে। একদম জ্বলিয়া উঠিলেও সমূহ বিপদ্। যাহা হউক, ইহার আলো কেরসিনের আলো অপেক্ষা মৃদু ও স্নিগ্ধ, অথচ অন্য তৈলের আলো অপেক্ষা প্রখর। সেইজন্য golden mean ('মধ্যমা প্রতিপৎ' !) বলিয়া ইহার প্রশংসা করিতে হয়। সভ্যতার কেন্দ্র সহর জায়গায় ইহার যথেষ্ট প্রসার হইয়াছে। শুধু গৃহে-গৃহে কেন, রাজমার্গেও সেকেলে রেড়ী বা নারিকেল তৈলের ও একেলে কেরসিনের লণ্ঠনের বদলে এখন সারি-সারি গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, সন্ধ্যাতারার সঙ্গে সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটির মশালচীরা মই এ চড়িয়া এক অভিনব স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিতেছে—'খোল খোল দ্বার, খোল শীঘ্রগতি, হিরণ্ময় দ্যুতি যা'র !'

তাহার পর একদিন মার্কিন মুল্লুকে (এ রাজ্যে সকলই অদ্ভুত) মেঘলার দিনে বুড়ো খোকা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের হাতে কোন কায ছিল না ; কমলবিলাসী বাঙ্গালীর মত এমন দিনে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' বা 'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর', 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' বা 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' আবৃত্তি করিবারও প্রবৃত্তি ছিল না ; তাই তিনি মনের খেয়ালে ঘুড়ী উড়াইতেছিলেন, আর মেয়েলি ছড়ার খোকাবাবু যেমন সাগর-জলে ছিপ ফেলিয়া রাঘব বোয়াল ধরিয়াছিলেন, অথবা সমুদ্র-মন্থনে দেবাসুরগণ যেমন লক্ষ্মীকে সমুদ্র হইতে টানিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনি তিনি আকাশ-সমুদ্র হইতে, ব্যোমবপুঃ পয়োধি হইতে, সৌদামিনী-সুন্দরীকে বন্দী করিলেন। (রাবণের অত্যাচার ইহার তুলনায় ছেলেখেলা !) বাঙ্গালী কবি অমনি গায়িয়া উঠিলেন, 'বজ্রশিখা ধরে' স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও !' সেই অবধি চঞ্চলা চপলা মানবের 'হস্তদাসী' (handmaid)! পাখাটানা* হইতে আলো জ্বালা পর্য্যন্ত সকল কায এই হাত-নুরকুতের জিম্মায়। দাসীকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে হয় না, গায়ে জল ঢালিয়া দিয়া জাগাইতে হয় না, মৃদুহস্তে বোতাম টেপ, আর দাসী হুজুরে হাজির—সারা ঘর, সারা বাড়ী, সারা রাস্তা, সারা সহর, আলোয় আলো ! তারা ফুটছে লাখে-লাখে, ঝাঁকে-ঝাঁকে, কি অদ্ভুত কারখানা ! 'চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, কোথায় উজল এমন ধারা !'

আমরা কিন্তু তড়িৎ-সুন্দরীর তত পক্ষপাতী নহি। ইহাতে 'উজ্জ্বলে-মধুরে' মিশে না। এই বিজলী-বাতি চোখ-ঝলসান, গ্যাসের আলোর মত মধুর-স্নিগ্ধ নহে। গ্যাস leak করার মত তীব্র দুর্গন্ধ বাহির না হইলেও, ইহারও fuse পুড়িলে একটা দুর্গন্ধ বাহির হয় ; আর আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা গ্যাস বা কেরসিনের চেয়ে ইহাতে কোনও অংশেই ন্যূন নহে। আবার কল বিগড়াইলে ইহার আলো একদম নিবিয়া যায় ; তখন ইন্দ্রভুবন চৌরঙ্গীতেও চর্ব্বির বাতি বা চেরাগ জ্বালিয়া 'পুনর্মূষিক' হইতে হয়। ইহার সরঞ্জামীখরচা চড়া হইলেও, মোটের উপর ইহার সরবরাহ সস্তা পড়ে। সুতরাং এই অর্থনীতির আমলে, পরন্তু, এই বিলাসিতার মরসুমে, ইহার অবাধ বাণিজ্য অপ্রতিবিধেয়। তথাপি আবার বলি, এই চোখ-ঝলসান, চমক-লাগান, আলো চমৎকার হইলেও, আমাদের তত মনঃপূত নহে। যদি এই ঘোর কলিকালে, তথাকথিত সভ্যতার কেন্দ্রে-কেন্দ্রে, সহরে সহরে, বিলাস-লালসার, বড়মানুষী ব্যসনের, অনাচারের, পাপাচারের নারকীয় দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিতে চাও, পাপপুরীর, মানবসৃষ্ট নরকের, সভ্যসমাজের, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন নিভৃত কোণ-কাণাচ পর্য্যন্ত search-light দ্বারা expose করিতে চাও, তবে এই তীব্র আলোক জ্বাল। আর যদি বিলাস-সাগরে গা ঢালিয়া না দিয়া, শান্ত শুদ্ধ সংযত চিত্তে সুখময় গৃহ-নীড়ে স্বাভাবিক-ভাবে জীবন-

* আমার কিন্তু মনে হয়, সৌদামিনী-সুন্দরীকে দিয়া পাখা টানান, আর বৃষোৎসর্গের ষাঁড়কে দিয়া ময়লা-ফেলা গাড়ী টানান সমান (sacrillege) অধর্ম্ম ! তবে আসল কথা, মানবের কাযে লাগাইতে প্রকৃতপক্ষে মেঘের কোলের সৌদামিনীকে টানিয়া আনা হয় না, উহার একটা ঘরোয়া হাতগড়া সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়।

যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া বিমল সুখ ও শান্তি পাইতে চাও, তবে আবার সেই পিতৃ-পৈতামহিক প্রদীপের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা কর।

যেনাস্য পিতরো যাতাঃ যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন যাস্যন্ন দুষ্যসে॥

পরন্তু ইহাতে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না, গ্যাস বা বিজলী-বাতির বিরাট্ কারখানার উপর নির্ভর করিতে হইবে না, সামান্য সরঞ্জাম নিজেরই আয়ত্ত। শাস্ত্রেও বলে, 'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্।'

কিন্তু সতত চঞ্চল মানব-মন কি এইখানেই ক্ষান্ত থাকিবে? 'So far shalt thou go and no farther' এই বিধিনিষেধ সে কি মানিবে? গেটের সেই মৃত্যু-কালীন উক্তি—'Light, light, more light'—সভ্য মানবের ইষ্টমন্ত্র হইয়াছে; তাই ভয় হয়, তাহার আবিষ্কার প্রবৃত্তি, উদ্ভাবনী-শক্তি, অনুসন্ধিৎসা, ভোগ-বাসনা, এইখানেই উপশান্ত হইবে না; বিংশ শতাব্দী শেষ না হইতেই সে আবার উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, চালশে-ধরা চোখের চশমার নম্বর চড়ানর ন্যায়, ব্রহ্মত্রার বছর-বছর বেড়া বদ্‌লানর ন্যায়, বিজলী বাতির উপর টেক্কা দিয়া, (radium) রেডিয়ামের আলোকে নরদেহের প্রত্যেক শিরা-উপশিরা পর্য্যন্ত সকলের গোচর করিয়া দিয়াই নিবৃত্ত হইবে না, এই তীব্রতম আলোক-সম্পাতে সমস্ত জগৎ ভাসাইয়া দিবে। তখন কেরসিন, কার্ব্বাইড, গ্যাস, স্পিরিট, বিজলী বাতি—সকল আলোই এই রেডিয়ামের কাছে ম্লান হইবে।

সংস্কৃত-সাহিত্যে কবিত্বের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে উদ্ভট শ্লোক আছে—

তাবদ্ভা ভারবে ভাতি যাবন্ মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ॥

আলোকের ক্রমবিকাশ-সম্বন্ধেও উদ্ভটসাগর মহাশয় এইরূপ একটি শ্লোক সংগ্রহ করিবেন না কি?*

* দেড়বৎসর পূর্ব্বে ৺কাশীধামে Stevensonএর প্রবন্ধ-পাঠে যসড়া লিখিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে দেড়বৎসর পরে ৺কাশীধামেই সংশোধিত আকারে পুনর্লিখিত হইল।

হারু

[শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

তখন দক্ষিণেশ্বর গ্রামের অবস্থা খুবই ভাল; অনেকেই রেড়ির তেলের কারখানা খুলিয়া, রেড়ির তেল ও রেড়ির খো'লের কারবারে বেশ দুটাকা রোজগার করিতেছেন। কলিকাতার সাহেব সওদাগরেরা তাঁহাদের নিকট তেল খরিদ্ করিয়া দেশান্তরে চালান্ দিতেছেন; এবং হুগলী, বর্দ্ধমান, জাহানাবাদ প্রভৃতি জেলার মহাজনেরা খো'ল্ খরিদ্ করিয়া চাষিদের নিকট বিক্রয় করিতেছেন। তাহাতে দক্ষিণেশ্বরের অনেকেই সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিতেছেন। ঐ সকল কারখানায় কাজ করিবার জন্য—মুটে, মজুর, প্রেস্‌ম্যান্ প্রভৃতি শ্রমজীবীরা হুগলী ও বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছে এবং কেহ কেহ স্থায়ী রকমে বাসও করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গার ঘাটগুলি—তেল বোঝাই বোট্, বড় বড় রেড়ির কিস্তি ও কয়লা বোঝাই ডিঙ্গিতে পূর্ণ, এবং মাঝি, মাল্লা ও মুটে মজুরের কোলাহলে মুখর। শ্রমক্লান্ত মাঝিমাল্লারা যখন নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিরহ গান আরম্ভ করিত, এবং তরঙ্গগুলি যখন ছুটিয়া আসিয়া দাতারাম মণ্ডলের ঘাটের প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটির তলায় জটলা করিত ও তাহাদের সুরে সুর মিলাইয়া নৃত্য করিত এবং হাসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত,—তখন মনে হইত দক্ষিণেশ্বর গ্রামটির দিনগুলি—কি প্রাণময়!

কল কারখানা যতই বাড়িতে লাগিল, বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমজীবীরা ততই আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে জাহানাবাদ অঞ্চলের হারাণ বাগ্‌দীও এক জন। সে,—দক্ষিণেশ্বরে, হারু মুটে বলিয়াই পরিচিত। হারু—দিননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বহির্ব্বাটিতেই আশ্রয় লইয়াছিল এবং হরনাথ রায়ের রেড়ির কলে মুটের কাজ করিত। হারুর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; সে বেশ বলিষ্ঠ-কায় ও কর্ম্মিষ্ঠ। তাহার মুখে সর্ব্বদাই একটা

আনন্দভাব দৃষ্ট হইত, এবং তাহার ব্যবহার সকলের নিকটেই মধুর ও প্রিয় ছিল। সে মাসে ৩০।৩৫ টাকা উপার্জ্জন করিত, এবং প্রতি বৎসর চাষবাসের সময় দুই মাসের জন্য বাড়ী যাইত।

(২)

হরনাথ রায় মহাশয়ের রেড়ির কলে রামহরি ভট্টাচার্য্য সরকারের কাজ করিতেন। নিজের আবশ্যক মত চার পাঁচ টাকা বাদে, উপার্জ্জনের বাকি টাকাটা, হারু, সরকার মহাশয়ের কাছে জমা রাখিত, এবং বাড়ী যাইবার সময় বীজ খরিদ ও চাষবাসের জন্য তাহা লইয়া যাইত।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন বুঝিলেন, হারু নিতান্ত ভালমানুষ; তাহার চক্ষুলজ্জা খুবই বেশী, এবং হাতে টাকা থাকিতেও 'নাই' বলিয়া কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করিবার শক্তি তাহার নাই,—তখন তাহার নিকট আবশ্যক মত দশ বিশ টাকা কর্জ্জ লইতে তাঁহার আর সঙ্কোচ রহিল না। হারু বলিত—"এত আপনাদেরই টাকা, আমাকে কেবল বাড়ী যাবার সময় সাহায্য করলেই হবে।" সেই অবধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় মধ্যে মধ্যে কর্জ্জ লইতেন এবং তদুপযুক্ত আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিতেন না; তাহার প্রধান কারণ সুদ লওয়ার প্রতি হারুর একটা আন্তরিক ঘৃণা ছিল। এই ভাবে ৬।৭ বৎসর গত হইবার পর রামহরি ভট্টাচার্য্যের কন্যার বিবাহ উপস্থিত হইল। হরনাথ রায় মহাশয়ের নিকট তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা আজিও পরিশোধ করেন নাই, সুতরাং তাঁহার নিকট পুনর্ব্বার ঋণের প্রস্তাব কি করিয়াই বা করেন! পুত্রের বিবাহে বৈবাহিকের নিকট যে নগদ চারি শত টাকা গোপনে আদায় করিয়াছিলেন,—ঋণ পরিশোধ না করিয়া তাহা চোটা-সুদে ধার দিয়া থাকেন। সেরূপ লক্ষ্মীমন্ত টাকায় হাত দেওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং হারুর জমা-খরচের হিসাব দেখিবার জন্য খাতার উপর একবার লোলুপ দৃষ্টি করিলেন,—দেখিলেন হারুর নামে ৩৬০৲ টাকা জমা রহিয়াছে। কিন্তু এত টাকা সে ধার দিতে রাজী হইবে কি?

সাত পাঁচ ভাবিয়া পরদিন তিনি দীর্ঘ কোঁটা কাটিয়া, নামাবলী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া কর্ম্মস্থানে আসিলেন; টিকিতে এমন একটি বড় গোছের বিল্বপত্র সংলগ্ন করিলেন, যেন তাহা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

হারু নিত্য সন্ধ্যার সময় তাহার দৈনিক পারিশ্রমিক লইতে সরকার মহাশয়ের নিকট আসিত;—সে দিনও আসিল। প্রণামান্তে সে বলিল—"সরকার মশাই, আজ আপনাকে এমন আনমনা দেখচি কেন?" রামহরি ভট্টাচার্য্য এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন;—তাঁহার অভিনয় নিষ্ফল হয় নাই! তিনি বলিলেন—"কি আর বোল্‌বো হারু, বড়ই বিপদে পড়েচি বাবা;—মেয়েটির বে না দিলে জাত যায়। অনেক চেষ্টায় ভগবান্ একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আজ দশ দিন হ'ল, হাতে যা ছিল জমানং দিয়ে ছেলেটার একটা চাকরী ক'রে দিয়েছি,—দেখলুম্ কাজটায় বেশ দুটাকা রোজগার আছে;—হাত একেবারেই খালি ক'রে ব'সেছি হারু! কি করেই বা জান্‌বো বল, যে দশ দিন পরেই মেয়েটার ভাগ্যে এমন সুপাত্র এসে জুটবে! এখন কি করি, কোথায় যাই, কার কাছে যাই, ভেবে কূল কিনারা পাচ্চি না। কন্যাদায়ের চেয়ে আর দায় নেই বাবা,—এ বিপদে কে আমাকে উদ্ধার ক'রে আমার জাত রক্ষা করবে,—সেই চিন্তাতে আজ আর অন্ন পেটে দিতে পারিনি, হারু।"

পরদুঃখে হারুর প্রাণ স্বভাবতই কাঁদিত,—পরোপকারে চেষ্টা বা যত্নের কোন দিনই তাহার ত্রুটী ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ বলিল—"আপনি ভাব্‌বেন না,—যে টাকাটা আমার নামে জমা আছে, তাই নিয়ে এখন মেয়ের বিয়েটা শিগ্‌গির-শিগ্‌গির দিয়ে ফেলুন। অমন সুপাত্তোর ছাড়বেন না। অনেকদিন হ'ল আমার বাবা একজনের জামীন্ হয়েছিলেন, কিন্তু সে লোকটা ফেরার হওয়ায় আমাদের জমীজমা বসতবাটী সবই বন্দক প'ড়ে আছে—সে প্রায় সুদে-আসলে চারশো টাকায় দাঁড়ালো; সেইটে শোধ ক'রে ভিটেটা খালাস্ কোরবো বোলে ঐ টাকাটা রাখ্‌চি। আমার তাড়া নেই, এখনও এক বছর সময় আছে,—তারির মধ্যে আমাকে কৃপা ক'রলেই হবে।—যান্, এখন আগে আহার করুন গে।"

রামহরি ভট্টাচার্য্য মহাশয়—একেবারে সটান্ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হারুকে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং পৈতাশুদ্ধ হাত তাহার মস্তকে রাখিয়া বলিলেন,—"বাবা,তুমি আমার ছেলের চেয়েও আপনার। এ উপকার আমার বংশের কেউ কখনও ভুল্‌বে না। তুমি আমাদের জাত রাখলে, তুমি আমাকে

বাঁচালে। তোমার কল্যাণে এখন আর আমি ঋণ পরিশোধের জন্যে ভাবি না;—দেবেন আমার মাসে কম্‌সে-কম্ ৬০।৭০ টাকা উপরী রোজগার করবেই করবে,—মায় সুদ্ তিনশো ষাট্ টাকা শোধ দিতে ছ'মাসও লাগবে না। আমি আর তোমাকে কি আশীর্ব্বাদ ক'রবো—তুমি লক্ষপতি হও।" এই বলিয়া টিকি-সংলগ্ন বিল্বপত্রটি যত্নে খুলিয়া তাহার হস্তে দিলেন। হারু প্রণাম করিয়া বলিল—"সুদের কথা তুল্‌বেন না,—টাকাটার বিশেষ দরকার, তাই সময়ের কথাটা জানিয়ে রাখ্‌তে হোলো।"

আজ তিন বৎসর হইল রামহরি ভট্টাচার্য্যের কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্বশুরের চেষ্টায়—শ্বশুরের আপিসে সত্য-সত্যই দেবেন কুড়িটাকা বেতনে একটি কেরাণীগিরি কাজ পাইয়াছিল, কিন্তু সে টাকা তাহার পোষাক-পরিচ্ছদেই ব্যয় হইত। হারুর টাকার জন্য কাহারও কোনদিন কিছুমাত্র চেষ্টা বা চিন্তার ভাব দেখা যায় নাই। দেবেন কেবল একদিন বাপ্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"কোন লেখা-পড়া নেই ত'?"

(৩)

হারু যে বাসায় থাকিত, তাহার পার্শ্বেই দেবকালী ঘোষালের বাড়ী। দেবকালী বাবু একটু মোটা মাইনের চাকুরী করেন,—সুতরাং মেজাজটা একটু নিম্‌-সাহেবী গোছের। বেতনের ওজনে, তিনি তাঁহার লেখাপড়া ও জ্ঞানবুদ্ধির ওজনও একটু ভারি করিয়াই ভাবেন, এবং গ্রামের কেহ কখনও তাঁহাকে অমিশ্র বাংলা কথা কহিতে শুনে নাই—এমন্ কি, স্ত্রীলোকেরাও নহে। তাঁহার অবস্থাহীনা বিধবা পিসীর একটি পুত্র—লেখাপড়ার জন্য আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেছিল। তাহার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ হইবে,—নাম বিনোদ। লেখাপড়া ছাড়া বাজার-হাট করাও বিনোদের একটি নিয়মিত কর্ম্ম ছিল।

উপর্য্যুপরি দুই বৎসরই বিনোদ পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রাইজ পাওয়ায়, এবং দেবকালী বাবুর পুত্র বিজয়ের পরাজয়ের সংবাদ প্রচার হওয়ায়, ও গ্রাম মধ্যে তাহা লইয়া একটা অনুচ্চারিত বিদ্রূপের ভাব বিজয়ের মাতা যেন সুস্পষ্ট অনুভব করায়, বিনোদ সকলেরই চক্ষুঃশূল হইয়া পড়িয়াছিল। একদিন হঠাৎ তাহার কলেরার লক্ষণ দেখা দেওয়ায়, দেবকালী বাবু রোগটিকে খুবই bad typeএর ও real Asiatic স্থির করিয়া সেইদিনই স্ত্রী-পুত্রাদিকে নিজের শ্বশুরালয়ে স্থানান্তরিত করিলেন এবং স্বয়ং একজন জ্ঞাতির বাড়ীতে আহারের ব্যবস্থা করিলেন;—বিনোদকে দেখা-শুনার ভার ঝির উপরেই ন্যস্ত হইল।

দেবকালী বাবু আপিস্ যাইবার সময় ভরাপেটে রুবিণীর ক্যাম্ফর-সিক্ত রুমালখানা নাকে চাপিয়া ধরিয়া একবার বহির্ব্বাটী হইতে বিনোদের সংবাদ লইয়া গেলেন। ঝি নাকমুখ ঝাঁকাইয়া আপনা-আপনি বলিল—"ছিঃ ছিঃ—ভদ্দর লোক যেন দুনিয়ায় কেউ না হয়!"

ঝির কাচ্চাবাচ্চা আছে,—সন্ধ্যার পরই সে বাড়ী চলিয়া যাইবে,—এদিকে রোগের প্রকোপ ও বিনোদের যাতনা খুবই বাড়িতে লাগিল। বিনোদ অধীর হইয়া ঝিকে বলিল,—"দিদি, আমি বোধ হয় আর বাঁচবো না,—মাথা জ্বলে যাচ্চে। মা কাছে থাক্‌লে"—বলিতেই দুই চক্ষে জল গড়াইয়া পড়িল। একটু সামলাইয়া বিনোদ বলিল, "দিদি, মাকে আমার প্রণাম জানিও, আর আজ আমাকে রাত্তিরে একলা ফেলে যেও না। না হয়, হারুদাদাকে ডেকে দিও, আমার ত' জল গড়িয়ে খাবার আর বল নেই।" ঝি চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ভয় কি দাদা, তুমি সেরে উঠবে। এই আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চি। হারুকে না ডেকে দিয়ে কি আমি যাব?"

(৪)

হারু আজ তিন দিন, তিন রাত বিনোদের মাতার স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার শয্যা ত্যাগ করে নাই। কেবল ডাক্তার ডাকা ও ঔষধ আনার সময় মাত্র সে বহির্বায়ুর সংস্পর্শে আসিত। চতুর্থ দিনে ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"আর কোন ভয় নাই।" তখন ঝির হাতে দুটি টাকা ও পথ্যের ভার দিয়া হারু বাসায় আসিল।

আজ তিন দিন পরে ভাত রাঁধিয়া দু' চার গ্রাস খাইবার পর হারুর বমন ও ভেদ আরম্ভ হইল। দ্রুত বলহীন হইয়া পড়ায় সে বুঝিল, এ যাত্রা আর তাহার রক্ষা নাই। ভাবিল—এ সংক্রামক রোগ লইয়া আশ্রয়দাতাকে বিপন্ন করিব না,—এখনও শক্তি আছে—মা গঙ্গার কোলেই স্থান লইগে। পরে,—বহু কষ্টে ধীরে-ধীরে দাতারাম মণ্ডলের ঘাটে আসিয়া শয়ন করিল, এবং একজন সহ-কর্ম্মীকে দেখিতে পাইয়া

বলিল,—"ভাই, দয়া করে দাদাঠাকুরকে কি রায় মশাইকে যদি একবার ডেকে দিস্।"

দেখিতে-দেখিতে ভদ্র ও ইতর স্ত্রী পুরুষে দাতারাম মণ্ডলের ঘাট ভরিয়া গেল, গ্রামের মধ্যে অকস্মাৎ যেন একটা বিষাদের ছায়া দেখা দিল। হারুর গুণে ও ব্যবহারে সকলেই তাহাকে আপনার জন বলিয়া ভাবিত ও ভালবাসিত। তাই সকলেই যেন আজ একটা আসন্ন ক্ষতির আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত। তারাচরণ বাবু ডাক্তারের জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন, কেবল রামহরি ভট্টাচার্য্য ওরফে সরকার মহাশয়, সংবাদ পাইয়াই, একটা জরুরী কাজের ভাণ করিয়া বরাহনগরের পথ দিয়া কলিকাতা রওনা হইয়া পড়িলেন,—ঘাটের সোজা পথটা আজ আর মাড়াইলেন না।

দিনবাবু, রায় মহাশয়, কানাইবাবু প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা সকলেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। তারাচরণ বাবু উৎকণ্ঠার সহিত ডাক্তারের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মুহূর্ত্তগুলা যেন যুগ বলিয়া তাঁহার বোধ হইতেছিল। হারু জোড়হাত করিয়া বলিল, "আমার আর বেশী দেরি নেই; ডাক্তারের তরে চেষ্টা পাবেন না। আমার দু'একটা কথা বলবার আছে, এখনও বোধ হয় বল্‌তে পারব।"

কানাইবাবু বলিলেন, "বল, আমরা শুন্‌চি।"

হারু। আমার গেঁজেতে ক'য়টি টাকা আছে। শ্যাম দোকানী চালের দরুণ ৪॥০ টাকা পাবে; সর্ব্বানন্দ কাপড়ের দাম ৩।০ পায়; কেষ্টপালের কাছে একনাগ্‌রী গুড় নিয়েছি, সে ॥৵০ পায়; হরিহর বাবুর কাজ করেছিলুম, ।৶১০ পাওনা হয়েছিল, তিনি ১৲ টাকা দিয়েছিলেন, বাকীটা ফেরৎ দেওয়া হয়নি। কত হ'ল দাদামশাই?"

কানাই। আট টাকা সাড়ে পনর আনা।

হারু। তা হ'লে ১২৲ টাকার মধ্যে কি রইল?

কানাই। তিন টাকা দু' পয়সা।

হারু অতি কাতর ভাবে বলিল "তাতে ত' ঘাট-খরচ হয় না। আমার আর ত' কিছু নেই, একটা ঘটি আর একখানা পেতলের থালা আছে কেবল। যা' কিছু কম পড়ে, আপনারা কেউ দয়া করে আমাকে ভিক্ষে দেবেন; আপনাদের গ্রামে ছেলের মত ছিলুম"—হারুর স্বরভঙ্গ হইয়া আসিল।

রায় মহাশয় বলিলেন, "সে কি হারু? আমরা জানি, তুমি রামহরি ভট্টাচার্য্যের কাছে সাড়ে তিন শত টাকার উপর পাও। আরও কয়েক জনের কাছে কিছু-কিছু পাও। তা ছাড়া এ মাসে যা কাজ করেছ, আমার কাছেই তার জন্যে তোমার অন্ততঃ পঁচিশ টাকা পাওনা হবে।' সব আদায় হলে পাঁচশো টাকার কম হবে না। তোমার ছেলে আছে শুনেছি। তুমি কেবল দেনার কথাই কইলে,—সে ত' কিছুই নয়। এখন একবার সকলের সামনে তোমার পাওনার কথাটা খুলে বল।"

হারুর বক্তব্য শেষ হইয়াছিল। কিন্তু সকলে বার-বার অনুরোধ করায় সে অবশিষ্ট বলটুকু সংগ্রহ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "এতদিন যে গ্রামের অন্নজল খেলুম, যাবার সময় সে গ্রামের লোককে টাকার জন্যে বিপদে ফেলে যাব? হাতে থাক্‌লে কি কেউ দিতেন না? ছেলেটা এসে নানা রকম পীড়ন ক'রতে পারে। সে সব আমার পাওয়া হয়েছে। সে ছোটলোকের ঘরের ছেলে,—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন খেটে খেতে পারে।"

কানাইবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এরাই ছোটলোক বটে!"

তারাচরণ বাবু সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিলেন, "হারু, ভগবানের দূতের মত তুমি একদিন নিজে এসে স্ব-ইচ্ছায় আমার বিপদের সময় ৪০৲ টাকা সাহায্য না করলে, রমেশকে আমি মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাতে পারতুম না; কিন্তু এখনও যে বাবা আমি সেই মোহরগুলির অর্দ্ধেকও শোধ করতে পারিনি।"

হারু বিদায় মুহূর্ত্তের সমগ্র শক্তিতে বলিয়া উঠিল, "সে টাকা আমি রমেশ দাদাকে দিয়েচি।" পরেই ক্ষীণ স্বরে বলিল "একটু গঙ্গাজল আর পায়ের ধূলো দিন।"

জল খাইয়া হারু অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল, "দেহটা শ্যাল-কুকুরে"—আর তাহার কথা সরিল না, দুই চক্ষে জল গড়াইয়া পড়িল।

তারাচরণ বাবু বেদনা-বিহ্বল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "আমার পুত্র-বিয়োগ হচ্চে—সে ভার আমার।"

হারু কষ্টে হাত তুলিয়া প্রণাম করিবার চেষ্টা করিল; হাত দুটী অবশ হইয়া দুই পার্শ্বে পড়িয়া গেল। তারাচরণ বাবু বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই গম্ভীর

বেদনাতপ্ত শ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুছিলেন। জোয়ারের জল "সর সর" বলিতে-বলিতে দাতারাম মণ্ডলের ঘাটের সর্ব্বোচ্চ সোপানটি উত্তীর্ণ হইয়া হারুকে অঙ্কে লইতে ছুটিল।

সশব্দে ডাক্তার বাবুর গাড়ী ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বাবু তাড়াতাড়ি নামিলেন। তারাচরণ বাবু তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে দারুণ ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "হারু মরে গেলে, তার পর এলেন ডাক্তার বাবু! গরীবকে বাঁচাতে একটু চেষ্টাও করলেন না।"

ডাক্তার বাবু হারুকে খুবই জানিতেন। তিনি বড়ই দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"দশটার আগে রামহরি ভট্টাচার্যির ছেলে দেবেন, আমায় জেদাজিদী ক'রে, তার পিসীকে দেখতে কেদিটিতে নিয়ে গিছলো; সেইখানেই খাওয়ার হাঙ্গাম ক'রে মিছিমিছি ৪।৫ ঘণ্টা দেরি করালে। এইমাত্র বাড়ীতে পা দিয়েই খবর পেলুম,—গাড়ি না ছেড়ে তাইতেই চ'লে এসেছি।" একটু বিমর্ষ থাকিয়া পুনরায় বলিলেন "বিশেষ কিছুই না। গিয়ে শুনলুম, পুরোনো কলিক্ ব্যথা। হায় হায়! তার তরে হারুর জন্যে একবার চেষ্টা করেও দেখা হ'ল না!" এই বলিয়া ব্যথিত অন্তরে মাথা হেঁট করিলেন।

কানাইবাবু, রায় মহাশয় প্রভৃতি সকলেই মুখ-চাওয়া-চাওই করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কেবল রামহরি ভট্টাচার্য্য রজনীর অন্ধকারে দুর্গা নাম জপ করিতে-করিতে কলিকাতা হইতে গ্রামে ফিরিলেন, এবং হারু ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

সভ্যতার দার্শনিক ব্যাখ্যা

[রায় বাহাদুর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, বি-এ]

যাহাতে সকলেরই আনন্দ হয়, যাহা সকলেরই অনুমোদনীয়, যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য্যবিধান করে, যে আবরণের মধ্য দিয়া জ্ঞান ও ভক্তির বিকাশ হয়, যাহা দেখিয়া 'সত্য কি' তাহা নিরূপণ করা যায়—তাহার নাম সভ্যতা।

সমাজ মাত্রেই মহাসভা। আমরা তাহার সভ্য।

আচার, ব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম্ম, কথোপকথন, সকলেরই মধ্যে সভ্যতার বিকাশ হয়। ক্রমবিকাশের অর্থই সভ্যতার ক্রমবিকাশ। যাহাতে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না, যাহা আদর্শের দিকে পৌঁছায় না, তাহা অসভ্যতা।

সভ্যতা সমষ্টি লইয়া। সকলেই এক সময়ে চরম সীমায় উপস্থিত হইতে পারে না,—কিন্তু সভ্যতা কি, তাহা দেখাইতে পারে। সমাজ সভ্যতার নাট্যশালা। সভ্য সমাজের মধ্যে প্রত্যেকেই যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। কেহই সম্পূর্ণ নহে। অধিকাংশই অসম্পূর্ণ। কিন্তু সভ্যতার আবরণে সকলে বেষ্টিত হইলে যে দৃশ্য নয়ন-পথে আবির্ভূত হয়, তাহা আপামর সাধারণের পক্ষে শ্রেয়ঃ ও প্রেয় বলিয়া বোধ হয়।

অনেকে মনে করে যে, ব্যক্তিগত উৎকর্ষ না হইলে সভ্যতা একটা আড়ম্বর মাত্র। অলীক, কিংবা 'ভণ্ডামি'। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে নাট্যশালার নট কেহই রামচন্দ্র কিংবা বুদ্ধদেব নহে, অথচ রামচন্দ্র কিংবা বুদ্ধদেবের ভাব নানাবিধ ভাবভঙ্গী দ্বারা বিকাশ করিলে সকলে আনন্দিত হয়, জ্ঞানলাভ করে।

সভ্যতা প্রকাশ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় ভাষা। কিন্তু ভাষার সহিত শারীরিক ভাবভঙ্গীর সম্বন্ধ আছে। অনেকে সেই ভাবভঙ্গী দ্বারাই ভাষার অভাব বিদূরিত করে।

আমরা মনে করি যে, সৃষ্টির মধ্যে ইতর জীবজন্তু অসভ্য, এবং আমরাই সভ্য। বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। অতি আদিম কাল হইতেই জীবজন্তু সভ্যতার অনুশীলন করে। জড়পদার্থের মধ্যেও তাহার বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সৌর জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন। সূর্য্যদেব

খুব সভ্যতার পক্ষপাতী। তিনি গোলাকার। তাঁহার মণ্ডলও গ্রহগুলি লইয়া গোলাকার। ত্রিকোণ কিংবা চতুষ্কোণ হইলে আমরা বিরক্ত হইতাম। সৌরমণ্ডলের গতি অতিশয় সভ্য রকমের। ধূমকেতুবর্গ সভ্যতা সহকারে গ্রহগণের কক্ষা রক্ষা করিয়া বিচরণশীল। সকলেরই গতির মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য আছে, ছন্দ আছে, সঙ্গীত আছে।

পৃথিবীর দিকে তাকাইয়া দেখুন,—নদ-নদী, গিরিশৃঙ্গ, বন, উপবন, এমন কি ভূগর্ভের অগ্ন্যুৎপাত পর্য্যন্ত সকলেই সভ্যতার বশবর্ত্তী। বৃক্ষ খুব সাবধানে বর্দ্ধিত হয়। বীরদর্প ও অহঙ্কার লুকাইয়া রাখে। ফলভারে অবনত হইয়া লজ্জা-শীলতা প্রকাশ করে, পত্রপুষ্প দ্বারা অঙ্গের সৌন্দর্য্য-বিধান করে। গিরিশৈল স্তরে-স্তরে বর্দ্ধিত হয়, হৃদয়ের দারুণ দুঃখ রুদ্ধ করিয়া জগতের জন্য আত্মোৎসর্গ করে।

একটা আদিম কীট লইয়া দেখুন। সে যথাসাধ্য সভ্যতার অনুরোধে একটা কেন্দ্র লইয়া ঘূরিতে থাকে, এবং সংসার-নাট্যশালায় সঙ্গীতের ভাব দেখাইয়া গুঞ্জন করিতে থাকে। পশুপক্ষী, সরীসৃপ, মধুমক্ষিকা, পতঙ্গ, মর্কট এবং বানর প্রভৃতি যথাসম্ভব সভ্য।

যাহা হউক, মানব লইয়া আমাদিগের প্রবন্ধ; সুতরাং ইতর জীবজন্তুর সভ্যতা লইয়া বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি, ভাবভঙ্গী ও কথোপকথনে যত-দূর সম্পূর্ণতা প্রকাশ করা যাইতে পারে, তাহার নাম সভ্যতা। অতএব কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার উদাহরণ স্বরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিচার করিবার পূর্ব্বে, বিজ্ঞান ও দর্শনানুমোদিত গোটাকতক সূত্র মনে রাখা উচিত। নচেৎ আধুনিক সভ্যতাতত্ত্বে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে।

১। যাহা সত্য এবং সুন্দর, তাহা একই। সুতরাং আমিত্ব ভাব লইয়া গর্ব্বে স্ফীত হইলে, নিতান্ত অসভ্য রকম হইয়া পড়ে। 'আমি' কথাটাই অসভ্যতার চরম। 'আমরা' এই কথাটা সভ্যতার অন্তর্গত।

২। 'আমি'র পরিবর্ত্তে যদি কোন ঈশ্বরবাচক শব্দ প্রয়োগ করা যায়, তাহাও অসভ্যতা। যেমন 'আমি ক্ষুধায় কাতর',—ইহার পরিবর্ত্তে, 'ভগবান ক্ষুধায় কাতর'—এ রকম একটা কথা বলা ঘোর অসভ্যতা।

৩। নিজের কোন রকম সুখ-দুঃখ প্রকাশ করাই অসভ্যতা। অন্যের সুখ-দুঃখ প্রকাশ করাই শ্রেয়ঃ। ইহাতে সকলেরই আনন্দ হয়। তবে অন্যের মৃত্যু দেখিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা ঘোর অসভ্যতা।

৪। সকলেরই ভাবভঙ্গী অনুমোদন করা, এবং তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করা ভক্তির লক্ষণ। দুঃখ ছাড়া অন্য যত রকম ভঙ্গী আছে, তাহা 'ভাব'। দুঃখ অভাব। সুতরাং দুঃখে আনন্দ প্রকাশ করা অসভ্যতা। সকলের আনন্দে দুঃখ প্রকাশ করাও অসভ্যতা।

৫। ইচ্ছা-শক্তি বলিয়া কিছুই মানবের নাই। সুতরাং হঠাৎ কিছু হইয়া পড়িলে, তাহার কারণ 'অজ্ঞেয়'—ইহাই বলা সভ্যতা। 'ভগবানের ইচ্ছা' বলা অসভ্যতা; কেন না, ঈশ্বরের সহিত মানবের আলাপ-পরিচয় এত কম যে, তাঁহার ইচ্ছাসম্বন্ধে আমাদিগের কোন মতপ্রকাশ করা উচিত নহে।

৬। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির অনুভূতিতে সর্ব্বদাই আনন্দপ্রকাশ করা উচিত। যদি কোনক্রমে তাহারা আনন্দ-বিধান করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে 'বাস্তবের' মধ্যে সুন্দর ভাবে বিন্যাস করিয়া রসগ্রহণ করা সভ্যতা।

৭। অনুভূতিবাচক যত শব্দ (ভাষা) 'তন্মাত্র'-জাত। মাত্রাস্পর্শে সুখ-দুঃখ হয়। নিজের দুঃখের কথা সভায় প্রচার করা অসভ্যতা, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কেবল ইহাই মনে রাখা উচিত যে, লয় ও মাত্রা ঠিক রাখিয়া প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি যত উচ্চ অঙ্গের ভাব আছে, তাহার কথা কহা উচিত। উঃ, আঃ, সাবাস্! প্রভৃতি মাত্রাহীন কথা অসভ্য।

৮। রিপুপরায়ণতা মাত্রাহীন কর্ম্ম। সংযত ভাবে মাত্রা রক্ষা করিয়া জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যবর্ত্তী পথে উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া রিপুচালনা করা সভ্যতা। (অনেকে এটাকে 'কর্ম্মযোগ' বলে, কিন্তু আমাদিগের প্রবন্ধে তাহার বাহ্য ছটাটুকু কি করিয়া ভাষায় রক্ষা করিতে হইবে, তাহাই প্রদর্শিত হইবে)।

৯। দেশ, কাল, বাস্তব, ও কারণবাচক শব্দ (Categories) ভাষায় কি করিয়া প্রয়োগ করিলে জ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, সভ্যতা তাহা দেখাইয়া দেয়।

১০। অঙ্গভঙ্গী দ্বারা কি করিয়া অদ্বৈত ও দ্বৈতভাব,

কিংবা জ্ঞান ও ভক্তি দেখান যাইতে পারে, তাহার চর্চ্চা করা সভ্যতা। ইহার একটা বিশেষ বিধান (Law) আছে, যাহার রেখা ধরিয়া ক্রমবিকাশ হয়। ক্রমে অঙ্গ-ভঙ্গী এমন সুন্দর হয় যে, সকলে পরস্পরকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হয় এবং ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি-সম্বন্ধ অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারে।

উপরোক্ত সূত্রগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, ইহাদের মধ্যে যে দর্শনশাস্ত্রের সার প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, এই প্রবন্ধ দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের 'বাদ'-বিসংবাদের উপর সংস্থাপিত। ইহাতে কেবল সভ্যতার বিকাশ কিরূপে হইতেছে, এবং প্রাদেশিক ও সামাজিক সভ্যতা কোথায় কিরূপ আকার অবলম্বন করিয়া নানাবিধ 'বাদে'র সামঞ্জস্য করিতেছে, তাহারই আভাস অতিশয় সংক্ষিপ্তভাবে গোটাকতক দৃষ্টান্ত লইয়া প্রদর্শিত হইবে। ইহাও যেন কেহ মনে না করেন যে, কেবল ভাবভঙ্গী দ্বারাই জগৎ ব্যক্ত করা যাইতে পারে, কিংবা কেবল ভাষা দ্বারাই পরম সত্য প্রচারিত হয়। সভ্যতা উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন, অর্থাৎ বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে কি করিয়া যত্নবান হয়, তাহারই দিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে কতিপয় প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক।

১। সম্ভাষণ। সভ্যসমাজে কোন ভদ্রলোকের অন্যের সহিত দেখা হইলে, তাহারা অভিবাদন ও সম্ভাষণের দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করে। (আমরা গুরু-শিষ্য কিংবা রাজা-প্রজার সম্ভাষণ সম্বন্ধে কিছু বলিব না)।

১। নমস্কার (মহম্মদীয় ধর্ম্মে 'সেলাম')।

২। করমর্দ্দন (সেক্-হ্যাণ্ড)।

নমস্কারে বক্ররেখা এবং যুক্তকর লক্ষিত হয় ('সেলামে' একটা হাতও ব্যবহার করা যাইতে পারে)। সেক্-হ্যাণ্ডে দুইটি সরল রেখা পরস্পরের সহিত বদ্ধ হয়। নমস্কারের সহিত সাধারণতঃ কোন ভাষা ব্যবহৃত হয় না। সেক্-হ্যাণ্ড করিলে 'কেমন আছেন' (How do) এই রকম একটা প্রশ্ন করিতে হয়। নমস্কারের মধ্যে মুখভঙ্গী খুব গম্ভীর। সেক্-হ্যাণ্ডে দন্তবিকাশ না করিলে সভ্যতা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।

নমস্কারের মধ্যে idealistic এবং monistic ভাব আছে। বোধ হয় ইহা দ্বৈত ও অদ্বৈতভাবের সামঞ্জস্য। 'তোমার' এবং 'আমার' সম্বন্ধ কোন কেন্দ্রবিশেষ লইয়া। আমরা যুক্ত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছি। সেই পরিধির খানিকটা অংশ 'নমস্কার' দ্বারা ব্যক্ত হয়। সূর্য্যকে কেন্দ্রভাবে বেষ্টন করিয়া গ্রহগণ নিজ-নিজ কক্ষায় ঘুরিতেছে। পৃথিবী ও চন্দ্র করবদ্ধ হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। তুমি, আমি এবং সকলেই সেই পরিধির মধ্যে। মস্তিষ্ক সেই গোলকের সঙ্কেত (Symbol)। ইহার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ভাব আছে। যুক্ত-কর আকৃষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে যায়, এবং মস্তক অবনত হইয়া নিম্নগামী হয়।

সেক্-হ্যাণ্ড তত দূর যায় না। 'তোমার' ও 'আমার' আকর্ষণ সরল রেখা লইয়া। 'তুমি' ও 'আমি' কর দ্বারা যুক্ত হইতে চাহি, কিন্তু আমরা উভয়েই স্বতন্ত্র পদার্থ। আমরা কোনও কেন্দ্রবিশেষ অবলম্বন করিয়া পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করিতেছি—তাহা সেক্-হ্যাণ্ডে বুঝায় না। 'আমার' মধ্যে 'তুমি' এবং 'তোমার' মধ্যে 'আমি' যে মিশিয়া যাইব, তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। তবে আমাদের মধ্যে একটা বাস্তব-আকর্ষণ আছে (molecular attraction)। তাহা দ্বারা যুক্ত হইয়া আমাদের 'সমাজ'। আমরা পরস্পরের হিতকামনা করি (utilitarian), এবং সকলে মিলিয়া একটা মহাবৃক্ষ (Social Organism)। কিন্তু ইহার কেন্দ্র কিরূপ তাহা অজ্ঞেয় (agnosticism)। ইহার বিচার করিতে গেলে, দন্ত-বিকাশ সম্ভব। কিংবা আমরা বিচার করিতে অক্ষম বলিয়া আনন্দিত হই।

জৈবিক স্তরের দিকে লক্ষ্য করিলে, বানর প্রভৃতি উন্নত পশুদিগের মধ্যেও দন্তবিকাশ করিবার প্রথা আছে বলিয়া বোধ হয়। যে সকল পশুর ঘ্রাণশক্তি প্রবল, তাহারা আগন্তুককে দেখিলেই নাসিকা দ্বারা সম্ভাষণ করে। ইহারা রসগ্রহণশীল (রসিক পুরুষ)। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস (গাত্রলেহন প্রভৃতি), গন্ধ প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া বস্তু-বিচার করা, এবং নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বস্তুর পরীক্ষা করা দর্শনশাস্ত্রের একটা অঙ্গ। ইহা প্রাকৃতিক (Em-

piric কিংবা Experiential School of Philosophy)। বিজ্ঞান এই শ্রেণীভুক্ত। আমি তোমার রূপ দেখি, তোমাকে স্পর্শ করি, তোমার কথার ও গানের মধুরত্ব পরীক্ষা করি, তোমার কথার রসাস্বাদন করি, তোমার মস্তকের আঘ্রাণ লই,—কেন? ভাবিয়া দেখুন। ইহাতে আনন্দ হইলে দন্তবিকাশ করা সভ্যতা; কিন্তু আনন্দ না হইলে, পশুপ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দংশন-ব্যাপার অসভ্যতা। দংশন দ্বারা রূপের ধ্বংস করিলে, বাস্তবের প্রতি অনাদর প্রকাশ করা হয়। কেহ নিকটে আসে না, জ্ঞানের পথ রুদ্ধ হয়, ভক্তির বিকাশ হয় না।

How do? 'কেমন আছেন?' ইহা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তরে কেবল How do? 'কেমন আছেন' বলাই সভ্যতা। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয় ভাল আছেন ত?' তাহার উত্তরে 'হাঁ', কি 'না', কিংবা 'একরকম আছি', কিংবা 'ভগবানের কৃপায় এক রকম মঙ্গল' এ সব কথা বলা সভ্যতাবিরুদ্ধ। আমার মঙ্গল ও অমঙ্গল, ভাল ও মন্দ সম্বন্ধে বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সকলকে জড়াইয়া জগতের মঙ্গল, সুখ ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিবারই আমার অধিকার। একটা সুন্দর চিত্রপটে, কিংবা কোন সুশ্রাব্য সঙ্গীতে 'অমুক রংটা ভাল', কিংবা 'অমুক সুরটা (গ, ম, প্রভৃতি) মন্দ' তাহা বলা যায় না। ছোট, বড়, অন্ধ, খঞ্জ, ধূলিকণা ও নির্ঝরিণীর জল, ঢাকের বাদ্য ও কুহুরব, শ্মশান ও পুষ্পোদ্যান, সকলকে একত্রে লইয়া স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য। কেবল একই প্রকারের পদার্থ, দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, বর্ণে, স্বরে যদি জগতে সারি-সারি হইয়া চতুর্দ্দিক ভরিয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা তাহাদের মধ্যে কোনই সৌন্দর্য্য দেখিতাম না। বহু পদার্থের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পরস্পরের অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি লইয়া যে ভাব হয়, তাহাই মঙ্গলবাণী। 'আসুন', 'বসুন' একজন বলিলে, তৎক্ষণাৎ অন্য ব্যক্তির 'আসুন' ও 'বসুনে'র প্রতিধ্বনি সভ্যতা। একজন বসিলে অন্য বসিবে, একজন দাঁড়াইলে অন্য দাঁড়াইবে, একজন হাসিলে অন্য হাসিবে, এইরূপ একটা চুক্তি মানব-সমাজের মধ্যে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। করে কর যোগ করিয়া সেই আদিম সামাজিক চুক্তি (Social Contract) রক্ষা করা সভ্যতা।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ করমর্দ্দনের সহিত মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে যে অনাদি সম্বন্ধ আছে, তাহা মুক্ত হইলেও যায় না। ঈশ্বরের রূপ কি? দৈবী প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতির বিকাশ কোন যুগেই এমন সম্পূর্ণ ভাবে হওয়া অসম্ভব, যাহাকে আমরা আদর্শ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার অংশ কিংবা প্রতিবিম্ব স্বরূপ 'জীবেরও' সম্পূর্ণ বিকাশ আমরা কল্পনা করিতে পারি না। সুতরাং করমর্দ্দন দ্বারা জীবের সম্পূর্ণ ঐক্য সাধিত হইলেও, আমরা আদর্শের দিকে লক্ষ্য করিয়া মস্তক নত করিতে বাধ্য। এই যে ইঙ্গিতটুকু এবং তদ্‌জ্ঞানজনিত আনন্দের ঈষৎ হাস্য, উভয়ই সভ্যতার লক্ষণ।

অসভ্য কে? কোন লোক আসিলে তাহার দিকে মুখব্যাদান করিয়া যে কর্কশভাবে চাহিয়া থাকে। 'মহাশয় কোথায় থাকেন, কি উদ্দেশ্যে আসা, কি কাজকর্ম্ম করা হয়' ইত্যাদি প্রশ্নের ভাব নিতান্ত অসভ্য। চোরই আসুক, শঠই আসুক, অনাথ, আতুর, ভিখারীই আসুক, সভ্যতার মন্দিরে সে সৌন্দর্য্য বিধান করিবে নিশ্চয়। আপনাকে ভুলিয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিলেই সৌন্দর্য্য বাহির হইয়া পড়ে।

২। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অভিবাদন ও সম্ভাষণ প্রথা কি প্রকার?

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে একটা চিরন্তন সম্বন্ধ আছে, তাহা লইয়া পুরাকালের সমাজ কতিপয় ব্যবহারিক সূত্র রচনা করিয়াছিল। এখন তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। স্ত্রীজাতি দৈবীপ্রকৃতির স্বরূপ বলিয়াই বিখ্যাত। ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে পুরুষ ও স্ত্রী—উভয়েরই ক্রমবিকাশ হয়। কিন্তু কাহার স্থান কিরূপ তৎসম্বন্ধে এখনও মতভেদ আছে।

দর্শনশাস্ত্রের মতে ইহাকে Parallelistic theory বলা যাইতে পারে; অর্থাৎ, স্ত্রীর ভাব হইতে পুরুষের ভাব জন্মিতে পারে না, এবং পুরুষের ভাব হইতে স্ত্রীভাব জন্মে না। উভয়ে স্বতন্ত্র পদার্থ। উভয়ই অনাদি। অথচ স্ত্রী না থাকিলে সন্তানরূপে পুরুষ আসে না, এবং স্বামী না থাকিলে কন্যারূপে স্ত্রী আসে না। উভয়ই দর্পণবিশেষ। একের প্রতিবিম্ব অন্যে গিয়া পড়ে, অথচ প্রতিবিম্বদ্বয় এক নহে, কোন একেরই দুই রূপ।

পুরাতন সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান উচ্চ ছিল না বলিয়া শুনা যায়; কিন্তু তাহার মধ্যে মাতৃভাব ও কন্যাভাব এতদূর ফুটিয়াছিল যে, 'উচ্চস্থান' আর কি হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। তখনকার স্ত্রীর স্থান অতিশয় অন্তরে, হৃদয়ের একটা অংশে, 'পর্দ্দানশীন্' ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ক্রমে তাহারা ক্রমবিকাশের সঙ্গে অন্তর হইতে বাহির হইয়া মস্তক অধিকার করিয়াছে।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতি 'নর্ত্তকীবৎ'; অর্থাৎ সে ভাব-ভঙ্গীতে, মনোময় পুরুষ কি. তাহা বুঝাইয়া দেয়। পুরুষ তাহা দেখিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া যায়। বাস্তবের পরিণাম না দেখিলে জ্ঞান সম্ভবে না। রঙ্গালয়ে মূর্ত্ত আনন্দ না দেখিলে আনন্দের আভাস পাওয়া যায় না। অঙ্ক হাতে-কলমে না কসিলে সংখ্যা সম্বন্ধে কোন মূল তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ প্রভৃতির তন্মাত্রা, এবং তজ্জাত ছন্দ, কলা, নৃত্য, গীত প্রভৃতি প্রথমে স্ত্রী-প্রকৃতির মধ্যে বাস্তবরূপে বিকাশ পায়। তখনকার অবস্থা (বিজ্ঞানের মতে) যেন একটা open circuit.

+ ———————

ক্রমে পরস্পরের আকর্ষণে পুরুষের ভাব স্ত্রীর মধ্যে যায় এবং স্ত্রীর ভাব পুরুষের মধ্যে আসে। ক্রমে অবস্থা closed circuitএ দাঁড়ায়। এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মান, অভিমান প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। পুরুষ স্ত্রীকে, এবং স্ত্রী পুরুষকে বিশ্লেষণ করিয়া উভয়ই জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। কারণ, উভয়েই আত্মা, এবং উভয়েরই মুক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অধিকার। পুরুষের মধ্যে স্ত্রীভাব থাকিলেও স্ত্রীর মধ্যে পুরুষের ভাব আছে। উভয়ই অনাদি এবং স্বতন্ত্র। বহুকাল ধরিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম স্ত্রীভাবের মধ্যে মাতৃভাব ও কন্যাভাব ছাড়া অন্য কোন ভাবের প্রশ্রয় দিতে চাহে নাই। এই জন্য স্ত্রীজাতির সাধারণ সমাজে নমস্কারের দাবীদাওয়া ছিল না। আর একটা কথা, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে 'সম্ভোগের' ভাব লইয়া সভ্যতার কোন সূত্র তখন রচিত হয় নাই। নিবৃত্তির পথেই তখন জ্ঞানের আদর ছিল। ভক্তিও রসগ্রাহিতা সম্বন্ধে প্রবৃত্তিপথের অপলাপ করে নাই। এ সম্বন্ধে গ্রীস ও ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র একমত। আনন্দের মূলে জ্ঞান না থাকিলে তাহা অসম্পূর্ণ। জ্ঞান, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সমীকরণ করিয়া আনন্দের পথ দেখাইয়া দেয়।

কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে ভাগবত-কথার আভাস পাইয়া সকলে স্ত্রীত্ব এবং পুরুষত্বকে Parallelism রূপে দাঁড় করাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্বের আদান-প্রতিদানে এবং তাহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে সংসার সম্পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহা একেশ্বরবাদিগণও স্বীকার করিলেন। প্রেম বলিয়া একটা কোন ভাববিশেষ পূর্ব্বে ছিল না। ভক্তিকেই সনাতনধর্ম্ম প্রেম বলিয়া বুঝিত। কিন্তু পরবর্ত্তী দর্শনে এবং বৈষ্ণবীতন্ত্রে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে একটা অপূর্ব্ব প্রেমের সঞ্চার হইতে পারে, এবং তাহার মধ্যে যে যৌন-প্রবৃত্তির কলুষিত ভাব থাকিতে পারে না, এই কথা প্রচারিত হইল। এই যে প্রেম, ইহাকে 'দাম্পত্যপ্রেম' বলিলে অবমাননা করা হয়। কারণ, 'দাম্পত্য' বলিলে স্বামী বড় এবং স্ত্রী তাহার অধীন, এই রকম একটা ব্যক্তিগত ভাব আসে, কিংবা কেবল স্বামীর অধিকারের ভাব আসে; এবং তাহার সহিত স্বামীর ইন্দ্রিয়-সুখ সাধনের জন্যই স্ত্রী, এইপ্রকার একটা ভাব আসে। না আসিলেও, নারী ও পুরুষতত্ত্বের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর পরিচ্ছিন্ন ভাব নাই।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-কথার মধ্যে এই ভাব ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল। ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্ম সংস্থাপিত হইলে, এই ভাবের সামান্য আভাসমাত্র একদল লোক জগতকে দেখাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ ভাবের বিকাশ দেখিবার অনেক দিন বাকী আছে। য়ুরোপে 'কমিউনিস্‌মের' মধ্যে এই ভাবের খানিকটা প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া বোধ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সমগ্র জগতের সভ্যতা এই ভাবকে গড়িয়া তুলিতেছে। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণ এই ভাব দ্বারা অলক্ষ্যে চালিত হইয়া নূতন ভাষায় নূতন কথা কহিতেছেন। বৈষ্ণব কবিগণ এই কথা কহিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে, সমাজের দিকে, স্পষ্ট, মূর্ত্ত, বাস্তব পদার্থের দিকে, এবং রাজ্যশাসন তন্ত্রের দিকে তাকাইয়া বলেন নাই। অতএব আমরা স্মিতমুখে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে ইহার ঈষৎ আভাস পাইয়া কৃতার্থ হইতেছি।

এই সভ্যতাতত্ত্বের মধ্যে রাজা আছে, কিন্তু রাণী নাই। রাণী (স্ত্রী) রাজা হইতে পারে। রাখাল রাজা হইতে পারে। রাই রাজা হইতে পারে। কিন্তু রাজার 'রাণী'

কেহই নাই। রাণীকে স্ত্রীরূপে ভাবিলেই অধীনতার ভাব আসিবে। সকলে মিলিয়া, ভাব ও বাস্তব জড়াইয়া রাজার ভাবে লীন হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে রাণীর ভাব আসিতে পারে না। সকলে সখী ও সখা। কুমার ও কুমারী। সন্তানসন্ততি, জনকজননী, সম্পত্তি-বিভাগ, labor theory, wages, ঘট এবং পট, probate এবং letters of administration, দালালী ও দস্তরী, রাষ্ট্রতন্ত্র এবং রাজনীতি, উত্তরাধিকারিত্ব, সোণার গহনা ও হরিনামের মালা প্রভৃতি যত ব্যবহারিক মায়া, যাহা লইয়া সমাজতন্ত্র, সকলই ইহার মধ্যে। চিদাভাস মূর্ত্ত রূপে দ্বিধা হইয়া এই অপূর্ব্ব বৈষ্ণবীতন্ত্রে ব্যক্ত।

যাঁহারা তন্ত্রের অর্থ বাহির করিতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে জ্ঞান-সঙ্কলনী-তন্ত্রের সহিত বৈষ্ণবী-তন্ত্রের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। মূলাধারে স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ আমরা "**কাম**" বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি। হৃদয়ে (অনাহত পদ্মে) 'প্রেম' রূপে দেখি। দ্বিদলপদ্মে আসিয়াই যত গোলমাল হয়। সুষুম্নার (spinal chord) উপর সহস্রার (Cerebrum) সংস্থাপিত। সুষুম্নার দক্ষিণে ও বামে ঈড়া ও পিঙ্গলা (Sympathetic ganglia) পুরুষ ও স্ত্রীরূপে ব্যক্ত। ক্রমে উভয়ে দ্বিদল (medulla) ভেদ করিয়া (decussation) বামভাগ দক্ষিণে ও দক্ষিণভাগ বাম দিকে উঠিয়া সহস্রারের (brain) সহিত মিশিয়াছে। আমাদিগের "জ্ঞান" (perception and apperception) মস্তিষ্ক লইয়া। মস্তিষ্কে স্ত্রী-পুরুষের দুই ভাগ। (double hemispheres) যুগ্ম কর্ণ, যুগ্ম নাসিকারন্ধ্র। দ্বিদলপদ্ম। মন দ্বিধা। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মস্তিষ্কের দ্বাদশ যুগ্ম-স্নায়ু।

তবে স্ত্রী-পুরুষের ভাব যুক্ত কোন্‌খানে? তন্ত্র বলেন সুষুম্নায়। মন (brain mind) সুষুম্নায় কোন উপায়-বিশেষ অবলম্বন না করিলে আসিতে পারে না। মস্তিষ্কের যুগ্মপদ্মের মধ্যে যে স্থলে শিবশক্তির বিহার স্থল, স্ত্রী ও পুরুষ একাধারে, যেখানে তৃতীয় নেত্র অবস্থিত, যে স্থল বেষ্টন করিয়া মস্তিষ্কের গ্রহ-উপগ্রহ, কুমার ও কুমারীগণ বিচরণ করে, তাহা আমাদিগের দ্বিধা মনশ্চক্ষের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই সঙ্গম-স্থলের সংস্পর্শে মন একটা আভাস পায়। বহিঃ প্রকৃতি (ক্ষুদ্রের সমষ্টি) একাগ্রচিত্ত হইয়া মূল বিষয়ের চিন্তারত হয়।

এইটুকু লইয়া দর্শনশাস্ত্র। তাহার চরম বেদান্ত এবং পাশ্চাত্য জগতে তাহার কিয়দংশ Transcendental rationalism of Kant.

জ্ঞানতত্ত্ব (rationalism) আনন্দতত্ত্বটুকু (Hedonism) ধ্বংস করে। মায়া ভাব (idea) বলিয়া উড়াইয়া দেয়। জ্ঞানতন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছাশক্তি (will) কেবল বাস্তব-ধ্বংসপরায়ণ। জ্ঞানশক্তি প্রবল বহ্নিরূপে আনন্দ ভস্ম করে। ক্রিয়াশক্তি (motion) তাহারই সহায়ক।

ভাবিয়া দেখুন, তাহাতে জগৎ থাকে কোথায়? কিন্তু বোধ হয় যে, আনন্দেরও একটা তন্ত্র আছে। জ্ঞান বাস্তবকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেও, আনন্দ সেই ভস্ম লইয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করে। ইচ্ছাশক্তি সেই সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আবার কামরূপে দেখা দেয়। যে ষট্‌চক্র ধ্বংস করিয়া জ্ঞান মুক্তিলাভ করিতে চাহে, আনন্দময় পুরুষ সেই চক্র রক্ষা করিয়া বৈষ্ণবীতন্ত্র প্রকাশ করেন। প্রত্যেক চক্রই স্ত্রী ও পুরুষের বিহারস্থল। প্রত্যেক তন্মাত্রার মধ্যেই আনন্দ। আনন্দের মধ্যে অনুভূতি। অনুভূতি হইতে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা হইতে মূলের প্রতি ভক্তি। পাশ্চাত্য দর্শন ইহার উপর Ethics of sensibility প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে বিজ্ঞান ও Experiential schoolএর কোন বিবাদ নাই। বিবাদ কেবল দার্শনিক-মণ্ডলীর দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া।

তন্ত্রের কথা উত্থাপিত করিবার একটা কারণ এই যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সমাজ-বুদ্ধি (social instinct), সমাজ-বোধ (social consciousness) প্রভৃতি নানা রকম কথার সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজ-তন্ত্র একটা জটিল কথা। আধুনিক সমাজ শাক্ত কিংবা বৈষ্ণবী-তন্ত্রের পথে যাইতেছে; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে সভ্য সমাজের ভাষা ও ভাবভঙ্গীর দার্শনিক ব্যাখ্যা দুরূহ হইয়া পড়িবে। দর্শনশাস্ত্রের মূলে, প্রথমতঃ একটা তন্ত্র (Psychology) দাঁড় না করাইলে বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করা হয় না।

পাছে তাঁহার কাব্যের ঠিক অর্থ কেহ বুঝিতে না পারে, এইজন্য বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বলিয়া গিয়াছেন—

(১) "মূলচক্রে হয় হংস যোগের আধার
অষ্টদল চক্র হয় লীলার সঞ্চার।"

(২) "মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়
মস্তক উপরে সহস্রদল পদ্ম কয়।"
কিন্তু (২)
"সাধন তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়
বোধিযোগ এই তত্ত্বে হয় ত নিশ্চয়"
এবং
"এ দেহ সে দেহ একই রূপ
তবে সে জানিবে রসেরি কূপ।
এ বীজে সে বীজে একতা হবে
তবে সে প্রেমের সন্ধান পাবে।"

এই কথাগুলি সহজ ভাষায় বলিলে, Brain mind দ্বারা সাধনা হয় না। সৃষ্টির মধ্যে (চক্রে) যাহারা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অর্থাৎ ক্রিয়াক্ষেত্রে কর্ম্মের দ্বারা সখার লীলায় মগ্ন হয়, তাহারাই সেই রসের অধিকারী।

এখন রস বলিলেই আমাদের শাক্ততন্ত্রের ভাব জ্বলিয়া উঠে। সংসারের পাপের মূলে ইন্দ্রিয়বর্গ; তাহাদিগকে নষ্ট করিব, না বৈষ্ণবী প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সৌন্দর্য্যের পশ্চাতে দৌড়িব?

বৈষ্ণবীতন্ত্র বলে যে, বৈষ্ণবীর জন্য বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবের জন্য বৈষ্ণবী ইন্দ্রিয়-লালসার জন্য পাগল নহে। সৃষ্টিতত্ত্বে দুঃখ ও সুখ উভয়েরই সমান। রোগ, শোক, পীড়া, জরা, মরণ, হিংসা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা ও দস্যুতা প্রভৃতি যত দুঃখ ও পাপ আছে, তাহার মূলে ঈশ্বর বিরহতা। কাম চরিতার্থ হইলে তাহাও দুঃখ, এবং তাহাতেও ধর্ম্ম ও ঈশ্বরত্বের অভাব। যেখানে তাঁহার অভাব, তাহা নরক। অভাবকে ধ্বংস করা যায় না। অভাবের মধ্যে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া জগতের আনন্দ-বিধানই বৈষ্ণবী ধর্ম্ম। যেখানে তাঁহার অভাব, সেখানেই আমি দুঃখে ও বিরহে উন্মাদিনী হইয়া ছুটিয়া যাই। তাঁহার প্রেম সেইখানে ফুটিয়া উঠে। ভাব আসিয়া অভাব পূর্ণ করে।

চক্র কি? এই সংসারে ভাইভগ্নী, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, দেশ, সকলেই চক্রের অন্তর্গত। অসংখ্য বীজ এই চক্রের মধ্যে। অষ্টদলচক্র "সখার লীলা" কি? সখা পুরুষরূপে স্ত্রীত্বের দুঃখ গ্রহণ করেন এবং আনন্দ দিয়া স্ত্রীকে বরণ করেন। দুঃখের অভাবে স্ত্রী রাজা। সুখের অভাবে স্ত্রী কাঙ্গালিনী। প্রজা রাজার স্ত্রী। প্রজার দুঃখ রাজা মোচন করিলে প্রজাই রাজা হয়। রাজা দুঃখ ও গরল হৃদয়ে ও কণ্ঠে ধারণ করিয়া প্রজার দুঃখ মোচন করেন। প্রজা সিংহাসনে বসে, রাজা নিজেরই প্রেমময় মুখ প্রজার মুখে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি প্রজা স্ত্রী (প্রকৃতি) এবং রাজা পুরুষ।

প্রজা বলে 'আমিই এখন রাজ্যভার লইব।'
রাজা বলেন, 'আজ আমার রাজত্ব সার্থক'।

'সভ্যতার' প্রবন্ধে স্ত্রী-সমাজ লক্ষ্য করিয়া আরও অনেক কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ক্রমবিকাশ কি?

ক্রমবিকাশ কি ব্যক্তিগত? পাশ্চাত্য জগতে সেই কথা উঠিয়াছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিবিশেষ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া নিজের মনোমত সৃষ্টি করিতে পারে কি না? রূপ কি ভাব গড়িতে পারে? ভাব, রূপ গড়িতে পারে? ভাব কি রূপে মিশিয়া যায়? রূপ কি ভাবে মিশিয়া যায়? যদি তাহা হয়, তবে পুনর্জন্ম কি সত্য? অথবা, ক্রমবিকাশ বিশ্ব জড়াইয়া একটা রূপান্তরের সহিত ভাবান্তর? সেই জন্য কি ভাবের সহিত রূপের খেলা?

তন্ত্র বলে মস্তিষ্ক ব্যক্তিগত। মেরুদণ্ড ও তাহার স্নায়ু-মণ্ডলী বিশ্বপ্রকৃতি। তাহার উপর ব্যক্তির অধিকার নাই। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ চক্রগুলি ভাণ্ডার-গৃহ। তাহার মধ্যে কুল ও বংশের খবর লুক্কায়িত। সেটা গৃহিণীর (প্রকৃতি) খাস-কামরা। চাবি বন্ধ। বাহির হইতে যত অনুভূতির (sensation) উত্তেজক মাত্রাগুলি আসে, সেগুলি ব্যক্তির মস্তিষ্কে পৌছায়। তাহার মধ্যে যেগুলি বিশ্বের ক্রম-বিকাশের জন্য দরকার, গৃহিণী সেগুলি বাছিয়া ভাণ্ডারে রাখে এবং বংশপরম্পরা বীজরূপে বিস্তার করে। এ সম্বন্ধে সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত সৃষ্টিকর্ত্রীর সম্বন্ধ কি, তাহার কোন তথ্য এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে এইটুকু জানা গিয়াছে যে, স্ত্রী Protectionist, পুরুষ Free Tradeএর পক্ষপাতী। এটা বীজের সম্বন্ধে। স্ত্রীত্বের Free Trade আর্য্য-সভ্যতার বিরুদ্ধ। বর্ণসঙ্করত্ব দোষ একটা মহাপাপ।

কিন্তু যদি কালা আসিয়া কুল ভাঙ্গিয়া দেয়?

বৈষ্ণবী-তন্ত্র বলে যে, সেটুকু মস্তকে ভাঙ্গা হয়। মেরুদণ্ডের মধ্যে নাম কলঙ্কের ডালি মস্তকেই থাকে; কিন্তু

হৃদয়ে কলঙ্ক পৌঁছিতে পারে না। Intentionএর মধ্যেই পাপ, motiveএর মধ্যে না।

বীজবিস্তার-তত্ত্বে (Biology) নির্ব্বাচনের মূলে (Natural Selection) কাহার হাত, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। বাইসম্যানের Idantsএর সংখ্যা ও যোগ বিয়োগের ভার কাহার হাতে, তাহা আমরা জানি না। আমরা একগাছি তৃণের মধ্যেও জীবন সঞ্চার করিয়া, তাহার ক্রমবিকাশের পথ সরল করিয়া দিতে পারি না।

বৈষ্ণবতত্ত্বে Free Trade একটা মাথার ব্যাপার। ইহাতে সতীত্বের কোন অপলাপের সম্ভাবনা নাই। এবং ইহাতে বর্ণসঙ্করত্বও আসিতে পারে না। 'বর্ণ' যদি Natural Selectionএর Category হয়, এবং বর্ণাশ্রম যদি একটা Archetype হয়, তবে ক্রমবিকাশ-তরঙ্গের মধ্যেও তাহারা চিরকাল থাকিয়া যাইবে। যেমন, গানের মধ্যে সাতটা স্বর, বর্ণের মধ্যে সাতটা রং।

চক্রের মধ্যে কি আছে? রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এবং মূল তত্ত্বগুলি। সৃষ্টিমধ্যে যাহা আমরা দেখি, তাহা কেবল তত্ত্বের সমষ্টি। কিন্তু আমরা তত্ত্বের দিকে ত চাহিয়া দেখি না; বাস্তবের দিকে, মূর্ত্তের দিকে চাহিয়া দেখি। সুতরাং চক্রের কথা তুলিলে বিরক্তি বোধ হয়। সখা, পতি, বৎস, স্ত্রী, পুত্র, এগুলির conceptএর মধ্যে কেবল শক্তি, মাত্রা ও তত্ত্বের সমষ্টি বৈ আর কি আছে? কিন্তু তত্ত্বের কথা তুলিলে, এবং "হ্লাদিনী" শক্তি বুঝাইতে গেলে, কয়জন আনন্দিত হয়? অতি দূর হইতে বংশীরব হয় ত একজন কবিকেই মাতাইয়া তুলে; কিন্তু সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নিকটে একজন সভারকমের কীর্ত্তনওয়ালীর দরকার। সেই রকম দুঃখের একটা মূর্ত্তি সম্মুখে না আসিলে দুঃখ উছলিয়া উঠে না। বৎস সম্মুখে না দেখিলে, দুগ্ধবতী গাভী স্তনে দুগ্ধ ধরিয়াও দুঃখিতা।

মেরুদণ্ডের মধ্যে যেটুকু পুরুষ প্রকৃতির রঙ্গস্থল, তাহা সংসারে এত অধিক বিস্তৃত যে, তাহার তত্ত্ব বাহির করিতে বহুযুগ কাটিয়া যায়। এই দুঃখময় কর্ম্মক্ষেত্রে উদরের জ্বালায় ও পারিবারিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্বে, রোগে এবং শোকে সকলে এত জর্জ্জরিত-দেহ ও ক্ষিপ্ত যে, যাহারা বাস্তবিক জ্ঞানী, তাঁহারাও চটিয়া বলে, 'ওহে! তত্ত্বের কথা রাখিয়া দেও। Practical কিছু কর। ভারতবর্ষ চিরকালই কর্ম্মবিমুখ বৃদ্ধ জরদ্গব, কেবল তত্ত্ব ও দর্শন লইয়াই ব্যস্ত। পূর্ব্বে আহারের সংস্থান ছিল, তাই চলিয়া গিয়াছে। এখন সংসার জুড়িয়া ঘোর দ্বন্দ্ব। কর্ম্ম কর! কর্ম্ম কর! বকামি রাখিয়া দেও!'

বৈষ্ণবী-তন্ত্র বলে, 'ভায়া! চটিও না। কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় কিসে? 'কর্ত্তব্য' বলিয়া যে rationalistic ভাব, তাহারই তাড়নে কি কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়? কোন্ দেশে তুমি তাহা দেখিয়াছ? সম্মুখে 'মেম সাহেবের' রূপ, রঙ্গীন পরিচ্ছদ, মখমলের কোট, হুইস্কি ও সেরি, মোটর-কার, সুগন্ধি, সুন্দর সঙ্গীত, উদ্যান ও পার্ক, এবং দেশবিদেশে ভ্রমণ। এসব না থাকিলে কর্ম্মে প্রবৃত্তি কোথায়? কাহার জন্য বাণিজ্য ব্যবসা, মারামারি ও খুনোখুনি, এবং Rationalismএর খাতিরে একটা দাতব্য হাসপাতাল ও অনাথাশ্রম, এবং 'দশজনের সুখেই আমার সুখ' এই রকম একটা Utilitarian বক্তৃতা? হে কর্ম্মী! এই জগতে কি কালোকে, দাসকে, দুঃখী ও নিপীড়িত প্রজাকে, ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত মুমূর্ষু নরনারীকে ভালবাসিবার কেহ নাই? সে ভালবাসা কি কেবল খাল কাটিলে ও চাঁদা তুলিলেই আসিবে? পৃথিবীর এই বার্দ্ধক্য ও জরার সময় কি International Conference এবং Industrialismএর বিকাশ করিলেই প্রেমের চূড়ান্ত হইবে? ভায়া! তোমার মাথার মধ্যে কর্ম্মটা এত বড় হইয়া গিয়াছে যে, শক্তি কোথা হইতে আসিবে, তাহা দেখ না। মাতাইয়া না তুলিলে কি মানব কর্ম্মী হয়? কিসে মাতিবে? আমি না হয় কুটীরের মধ্যে জীর্ণাশীর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা, প্লীহাগ্রস্তা, একখানি 'অবনী ঠাকুরের চিত্রকলার' মত কচি মুখ লইয়া, রাসলীলার পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া মাতিতেছি। কিন্তু তাহারই মধ্যে দুঃখী প্রজাদের এমন একটা একতার আদর্শ এখনও আছে যে, যদি ম্যালেরিয়াটা ছাড়ে, তবে বুঝিতে পারিবে। তুমি যে সব দেশের সঙ্গে তুলনা করিতেছ, তাহাদের ভরা যৌবন, বাঘের মত বুকের পাটা। এই ত, বনে বাঘও থাকে, হরিণও থাকে। বাঘের কর্ম্ম খুব বিস্তৃত, হুঙ্কারটা বেশী। কিন্তু বাঘ যখন বৃদ্ধ হয়, তখন সে বৃদ্ধ হরিণের চেয়েও অকর্ম্মা হয়। হয় ত একটা কাব্যর্ষি, কি রাজর্ষি, কি দর্শনবেত্তা মহর্ষি হইয়া পড়ে। আর একটা কথা যেন মনে থাকে। সকলের সমষ্টি বল দিয়া পৃথিবীকে দোহন করিলেও, এ যুগে

পৃথিবী যত অন্ন দিতে সমর্থ, তাহার অধিক কখনই হইবে না। তাহা যদি বাঁটিয়া লওয়া যায়, তবে যে Normal Standardটুকু পাইবে, তাহাতে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর মত লোকেরই চলিতে পারে। তুমি খুনোখুনি করিয়া যে অবস্থায় উপনীত হইতে চাহ, সেই শান্তিময় অবস্থায় আমি এখন হইতেই বসিয়া আছি। আমরা একটা বৃদ্ধ অধ্যাপকের দল; কিন্তু আমাদের মধ্যে যে চিরকুমারত্বটুকু আছে, তাহা তোমরা এখনও পাও নাই। পৃথিবী জুড়িয়া আমাদেরই তত্ত্বের বিস্তৃতি হইতেছে। সবল মাংসপেশীগুলির ধ্বংস হইলে তাহা বুঝিতে পারিবে। যদি শক্তির উচ্ছ্বাস থাকে, একবার তাল ঠুকিয়া দেখিতে পার। ক্রমে তোমার মাংসপেশী, কি আমার প্রেম ও সৌন্দর্য্যতত্ত্বই আদর্শ—তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

কর্ম্মী বলিবে, 'আমাদের এখনও জানিবার আছে, বুঝিবার আছে, দেখিবার আছে। কর্ম্ম দ্বারা পৃথিবীকে যথাসম্ভব বিকাশ না করিলে জ্ঞান হইতে পারে না, এবং জ্ঞান না হইলে তোমার প্রেমের মূল্য কেহ বুঝিবে না। তুমি যাহাকে সুন্দর বল, তাহা জ্ঞানই সাব্যস্ত করিবে, এবং কর্ম্মই তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিবে।'

সেকালের ব্রাহ্মণ হয় ত ধীরভাবে বলিবেন, 'তোমরা উভয়েই এক-এক দিকে দেখিতেছ। বৈষ্ণব প্রেমের বশে যেটুকু করিবে, তুমি হয় ত কর্ত্তব্যতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহা করিতে চাহ। কিন্তু বৈষ্ণবের প্রেমের অপলাপ করা যুক্তির সম্ভব, তোমার কর্ম্মের পক্ষেও তাহাই। বৈষ্ণব বলিবে ভক্তের সখা ভক্তকে যথার্থ জ্ঞানও দিয়া থাকেন। কর্ম্মী বলিবে যে, ক্রমে কর্ম্মক্ষেত্র বাড়াইলে জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব আপনি উদয় হইবে। হয় ত উভয়েরই কোন ফলাভিলাষ নাই। কিন্তু তোমরা উভয়েই এত অকর্ম্মের উৎপত্তি করিতে প্রস্তুত, যাহার সামঞ্জস্য করিয়া সৌন্দর্য্য-বিধান করিতে হইলে, একটা আইন-কানুনের দরকার। তোমাদের এত ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে যে, কর্ম্মীর জ্ঞান লাভ ও ভক্তের আনন্দলাভ দুষ্কর হইয়া পড়িবে। যে দিকেই যাও, গানের 'স রে গ ম'র মত সাধনার একটা সংযত পথ আছে। শ্রুতি এবং স্মৃতি সেই পথ দেখাইয়া দেয়। ব্রাহ্মণ তাহার অধ্যাপনা করুন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধই জ্ঞানের ক্ষেত্র। ভক্তের জীবন অন্য রকম। ব্যবসা-বাণিজ্যও জ্ঞানলাভের একটা অঙ্গ। কিন্তু যুদ্ধ-ব্যবসায়ী এবং Political Economy'র Expert একজনের হওয়া অসম্ভব। আবার, সেবার জন্য একদল লোক চাই। তোমরা যদি মনে কর যে, সকলে যত গুণ একাধারে লইয়া প্রত্যেকে সম্পূর্ণ জীব হইয়া পড়িবে, তাহা হইলে বিলক্ষণ ভ্রমে পড়িয়াছ। যদি কখনও এই ধারণা দৃঢ় হইয়া পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে যে তাহা খণ্ড-প্রলয়ের লক্ষণ। তাহার খানিকটা কারণ বুঝাইয়া দিই। ধারণা স্ত্রীত্বের লক্ষণ। ধ্যান পুরুষের লক্ষণ। বহির্জ্জগৎ হইতে রূপের যে সকল মাত্রা আসে, সেগুলি মস্তিষ্কের একভাগের সাহায্যে আমরা ধারণা করিয়া, অন্য ভাগ দিয়া তাহা ধ্যান করি। যদি সেই রূপের প্রতি কামনা জন্মে, তবে বীজরূপে সংসার বন্ধে (বামভাগের স্নায়ু বাহিয়া) সেই ধ্যান ও ধারণা মূর্ত্তভাবে প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি সেই মাত্রাগুলির মধ্যে সকল গুণই সমভাবে থাকে, কিম্বা তাহাকে ধ্যান দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া রূপকে নির্গুণ ভাবে দেখি, তাহা হইলে কামনা; অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। পূর্ণ সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব উভয়েরই ফল,—'শূন্য'।

আবার ভাবিয়া দেখুন, যদি বহু পুরুষের রূপ ও গুণ একজন স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কে ধ্যান ও ধারণার সামগ্রী হয়, তবে তাহার ফল বর্ণসঙ্করত্ব। সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা কেবল সংযমপরায়ণা সতীর পক্ষে হইতে পারে। প্রবৃত্তির পথে দুঃখ পাইয়া যে জ্ঞানসঞ্চার হয়, তাহা কেবল অব্যক্তের পথে যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহারই দিকে ঝুঁকিয়াছে। রমণী-হৃদয়ের প্রেমের প্রতিদানে যদি কোন পুরুষ তাহার পবিত্রতা নষ্ট করিয়া ধর্ম্ম পথ রুদ্ধ করে, তবে সে সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা সমাজ ধ্বংসের কারণ হইয়া উঠে। এ স্থলে Protectionই ব্যবস্থা; স্ত্রী-পুরুষ সংযত হইয়া যত দিন আদর্শের আভাস প্রাপ্ত না হয়, তত দিন Free Trade সভ্যতা-বিরুদ্ধ।

এখন দেখিতে হইবে যে, সভ্য-জগৎ রঙ্গস্থলে কোন্ তত্ত্বের সমর্থন করিতেছেন। পাশ্চাত্য-সভ্যতার যে তরঙ্গ আসিয়া ভারতবর্ষকে অভিঘাত করিতেছে, আমরা তাহাই প্রথমে দেখিব।

'স্ত্রীলোকের রূপ দেখান' সভ্যতা। 'পুরুষ সেই রূপ এখন ব্রাহ্মণ্য যুগের ন্যায় মাতৃভাবে দেখে না। স্ত্রীলোক

মাত্রেই এখন সখী। যাত্রার দলের সখীর মত তাহাদের সুন্দর সাজ। যাত্রার দলের 'সখী' পুরুষবিশেষ (প্রাকৃতিক অভিধান)। মাথায় পরচুলা, দন্ত বাঁধানো, গালে রং। সখীর বয়স কত তাহা জিজ্ঞাসা করা অসভ্যতা। কারণ, সখী একটা Social organism (সমাজ-বৃক্ষ)। বয়সের গাছ পাথর নাই। দাঁত নড়িলে বয়স নিরূপিত হয় না। সখীর নিজের কোন রূপ নাই। সমাজ অর্থাৎ সমগ্র সমাজ এবং রাষ্ট্র লইয়া তাহার রূপ। সেই জন্য সখী মধ্যে-মধ্যে রূপের গরবে মূর্চ্ছাগ্রস্ত। 'মূর্চ্ছা যাওয়া সভ্যতা'।

সখা পুরুষ। সখার সমাজ-বোধ ও রাষ্ট্র-চৈতন্য। সখারও ব্যক্তিগত ভাব (individuality) নাই। সখার সঙ্গে সখীর সম্বন্ধ কি? সখা ভাবময়, সখী রূপময়। সখা সখীর রূপ ধ্যান করে। সখী সেই ধ্যান দেখিয়া ক্রমবিকাশের সার্থকতা উপলব্ধি করে। মূল শব্দ 'সখি'। রূপান্তরে প্রথমার একবচনে 'সখা'।

সখা যদি সখিকে দেখিয়া প্রেমময় হয়, তখন সখি খুব হাসে। 'O, dear—dear!' অর্থাৎ তোমার প্রেম অতি সুন্দর। Mill-এর Utilitarianism এবং Sidgwick-এর Social organism এবং Spencer-এর Evolutionism জড়াইয়া। সখা! তুমি সমাজের সমষ্টি-সৌন্দর্য্য অর্থাৎ সমষ্টি সুন্দরীকুলকে ভালবাস। আমি সমাজের সমষ্টি ভাব অর্থাৎ সমষ্টি-সুন্দর পুরুষবর্গকে ভালবাসি। আমাদের দুজনেরই আদর্শ ক্রমে পরিশুদ্ধ ও বিস্তৃত হইতেছে।

সখা। ইহার একটা হিসাব কসিয়া দেও ত সখি!

সখি। এই দেখ—ছয়জনকে একত্র করিয়া—(আমি ও তুমি সপ্ত)

মিথ্যা—১ + ½ + ১½ + ৩½ + ২ + ২½ = ১১

সত্য—১ + ২ + ৩ + ৪ + ১½ + ½ = ১২

দুঃখ—½ + ½ + ২½ + ৩½ + ½ + ৪½ = ১২

সুখ—১ + ২ + ৪ + ৫ + ০ + ১ = ১৩

সুখ ও সত্য প্রত্যেকেই এক কাঠি করিয়া এই ছয় জনের মধ্যে বাড়িয়াছে,—আমার রূপ এখন একমাত্রা আগেকার চেয়ে বেশী, তোমার ভাবও একমাত্রা বাড়িয়াছে। সখা! আমরা সমান—সমান—O dear আমি তোমাকে ভালবাসি, মনে আছে ত?

সখা। (ইতস্ততঃ তাকাইয়া)—আছে।

সখি। Flatterer! আমার তা বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয়, তোমার নজর ঐ সত্যের ৪ ও সুখের ৫-এর দিকে।

সখা। আর তোমার নজর মিথ্যার ৩½ এবং দুঃখের ৪½-এর দিকে।

সখি। কি অসভ্য! (রাগ ও মূর্চ্ছা)

সখিকে চটানো অসভ্যতা। সখির দুঃখ সখার। সখির সুখ সখার। সখি সুখ-দুঃখ বিবর্জ্জিত। তাহা হইলে সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না।

সখির সঙ্গে সখার দেখা হইলে, প্রথমে শীত, গ্রীষ্ম, (weather) আকাশ, ফুল, গাছ, খেলা, ধূলা, এই সব কথার উত্থাপন করাই সভ্যতা। এটার কারণ কি, ওটা কতদূর, ওটা কোন্ সময়ে ঘটে, এটা পদার্থ কি অপদার্থ, এই রকম Categories of Substance, cause, distance, time প্রভৃতির আলোচনা করিয়া প্রথমে পরস্পরের জ্ঞান লাভ করা সভ্যতা। সখা Transcendental Rationalism-এর দিকে যাইবে, সখি সখার গুণের দিকে (Secondary qualities) দৃষ্টিপাত করিবে। যেমন—weight, power, divisibility, elasticity, প্রভৃতি।

Fashion-এ বদ্ধ হওয়া সভ্যতা। কারণ Fashion সামাজিক রূপ। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও চরিত্র যেমনই হউক না, সামাজিক ক্রমবিকাশ কতদূর হইয়াছে তাহা দেখানই Fashion। দোকানের মধ্যে কত রকম Heterogeneous বস্তুর স্তূপাকার; তাহা দেখিলেই Spencer-এর Evolutionism বুঝা যায়।

সখিকে লইয়া সখার দোকানে যাওয়া সভ্যতা। পছন্দটা সখির (Natural Selection)। দরদস্তুর সখার (Value)। সখি যেটা পছন্দ করিবেন, সখার পক্ষে তাহাই বহুমূল্য। Law of supply & demand তাহাই লইয়া। Tariff Reform সখা করিবেন। সখি কোন্‌টার Protection করিতে হইবে, তাহা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিবেন। Political Economy তাহা লইয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর। সখি রথের উপর বসিয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা ও অবসাদগ্রস্ত। সখা বলেন, 'ভয় নাই, আমি পশ্চাতে আছি। কুরুক্ষেত্রের ভার আমার উপর।'

কিন্তু সখির Parliamentএ 'ভোট' নাই! সখি বলেন; 'কেন?' সখা বলেন, 'চাষ না করিলে আর অন্ন জুটিবে না।' সখি বলেন 'Fie! Industrialism আমার জন্য, না তোমার উদরান্নের জন্য?' সখা (স্বগত) এখানে 'আমার' ও 'তোমার' ভাবের সামঞ্জস্য নাই, অতএব সভ্যতাবিরুদ্ধ। রাষ্ট্রতন্ত্রের happiness ও স্ত্রীলোকের খেয়াল বিবাদমূলক।

সখা বলে 'খঞ্জনী বাজাইয়া নাচ।' সখি বলে, 'কখনই না। ভারতবর্ষের দিকে তাকাইয়া দেখ। যাহারা খঞ্জনী বাজাইত, তাহারাও Ball-dressএর জন্য পাগল। আমাদের ধর্ম্ম, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া জগতকে দেখাইবে। তোমাদের ইচ্ছা, আমরা পুরুষের দাসী হইয়া থাকিব? তবে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্র বাড়িবে কোন দিক্ দিয়া?'

সখা (চটিয়া)। 'তোমরা জাহান্নমে গেলেও আমাদের কর্ম্ম বাড়িবে, স্বর্গে গেলেও বাড়িবে। তোমরা মাথায় উঠিলে আমাদের জাহান্নম, আমরা মাথায় উঠিলে তোমাদের জাহান্নম।'

সখি। O dear—dear। তবে কোন্‌টা ভাল? আমাদের রূপ তোমাদের মাথায় না উঠিলে আমরা আত্মহত্যা করিব। তোমাদের 'আদর্শ' ধর্ম্মের তল্পীদারী করিতে পারিব না।

সখা। ছি! আত্মহত্যা মহাপাপ।

সখি। কি অসভ্যতা! আমি কি যথার্থ ই দেখিতে ভাল?

সখা। সমাজের সঙ্গে তোমার সাদৃশ্য আছে।

সখি। তোমারও আছে। তুমি দশটা মিথ্যা কথা কও, পাঁচটা সত্য। একবার তোমার করুণা জাগিয়া উঠে, দশবার নৃশংসতা। পাঁচদিন তুমি একটা রূপ পছন্দ কর, দশদিন আর একটা। তোমার চরিত্র নাই। আছে কেবল বাহুবল। কিন্তু বোধ হয় Coxএর বাহুবল তোমার চেয়ে বেশী।

সখা। আচ্ছা তাহাকে একবার দেখিয়া লইব।

সখি। (সত্রাসে) কখনই না। সমাজের মহা হানি হইবে (ক্রন্দন)।

সখা। আচ্ছা! তুমি তাহারই স্ত্রী হইও।

সখি। তুমি চিরদিনই সখা থাকিবে, বন্ধু থাকিবে, ভাই থাকিবে, কিন্তু--

সখা। (সানন্দে) এই সত্য কথা যদি পূর্ব্বে বলিতে!

সখি। দেখ সখা! আমাদের প্রেম বিশ্বব্যাপ্ত। বোধ হয়, এক সময় বিবাহ-প্রথাটাই উঠিয়া যাইবে।

সখা। তাহা হইলেই মঙ্গল। জগতে আমরাই শেষ কর্ম্মবীর হইয়া পড়িব। সন্তানসন্ততির দরকার নাই। আমার বোধ হয়, আমাদের ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

সখা। সখি! আজ Captain Coxএর সঙ্গে সকালে Lake দেখিতে গিয়াছিলে বোধ হয়। খুব Charming না?

সখি। খুব (হাস্য)।

সখা। (স্বগত) Captain Cox, না Lake—কোন্‌টা?

সখি। তোমার দৃষ্টিতে অসভ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে।

সখা। (দীর্ঘনিশ্বাস)।

সখি। Captain Cox সমাজের আদর্শ।

সখা। তুমিও বোধ হয়?

সখি। (হাস্য) ঠিক বলিতে পারি না।

সখা। বিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

ভারতবর্ষে

সখি। সখা! আজ তুমি কেবল বাড়ীতে চুপ ক'রে ব'সে আছ যে?

সখা। কাল দুটো অন্নের সংস্থান কি ক'রে হবে তাই ভাবছি।

সখি। ভগবান্ জুটিয়ে দেবেন।

সখা। কি অসভ্য! ভগবান কি অন্ন জুটিয়ে দেন, না মানুষে চেষ্টা ও পরিশ্রম ক'রে অন্ন সংগ্রহ করে?

সখি। মানুষেরও চেষ্টা চাই, ভগবানেরও অনুগ্রহ চাই। অনাবৃষ্টি হ'লে লাঙ্গল কাঁধে ক'রে লাভ কি? দেখ, ও বাড়ীর মেয়েটার বারদিন ধ'রে জ্বর হয়েছিল, অত ডাক্তার এসে কি হ'ল?

সখা। কি ঘোর অদৃষ্টবাদী ও Pantheistic তুমি!

সখি। যারা অদৃষ্টবাদী নয়, তারা অন্নের উপায় কি ক'রে করে?

সখা। সভা ক'রে। আন্দোলন ক'রে। সভা ক'রে বৃষ্টি হয়, শস্য হয়, অনেক জীবজন্তু বাড়ে, তাদের 'কারি' ও 'কট্‌লেট্' হয়, ডিমের কালিয়া হয়। তাতেও যদি না হয়, তবে সমাজ লাঠি ধ'রে দাঁড়ায়। মাঝে এক জায়গায় যুদ্ধ বেধে চাউলের রপ্তানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু একটা সভা করবামাত্র একদিনে তিনলক্ষ ডিম এসে উপস্থিত।

সখি। আকাশ থেকে?

সখা। (হাসিয়া) না। ধার ক'রে। Credit—National Credit International Co-operation। যাঁদের কাছে ডিম ছিল, তাঁরা পকেট থেকে তৎক্ষণাৎ বের ক'রে দিলেন। তাঁদের সঙ্গে যাঁদের Credit ছিল, তাঁরা খাতায় লিখে নিলেন। এমনি ক'রে Arctic Ocean থেকে সাদা ভালুকের ছানা একদিনে চ'লে আসে। (ইহা বলিয়া সখা একবার চক্রাকারে হাত ঘুরাইয়া দিলেন)। সমাজ নিয়ে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র নিয়ে দেশ, দেশ নিয়ে মহাপ্রদেশের আত্মবোধ। সকলেরই প্রাণ এক।

সখি। সখা! আমি সেই সভার সভ্য হব!

সখা। আমারও তাই ইচ্ছা—কিন্তু এখনও তোমাদের সাজগোজ, ভাব ভঙ্গী সে রকম দাঁড়ায় নাই! তোমরা ব্যক্তিবিশেষের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাক! 'আমরা' বলিতে 'আমি' বলিয়া ফেল। 'তোমরা' বলিতে 'ভগবান' বলিয়া ফেল। তোমাদের কথাবার্ত্তা কিছু প্রবীণ রকম হওয়া চাই। অঙ্গভঙ্গী আরও dramatic হওয়া চাই। থিয়েটরে যেমন অঙ্গভঙ্গী দেখে সমাজ ও রাষ্ট্রকে মনে পড়ে, তোমাদের দেখে সকলের সেই রকম হওয়া চাই। তা'হলে সেটা রাষ্ট্র-হিতের অনুবর্ত্তী হবে। এক সমাজের সঙ্গে অন্য সমাজ মিশে যাবে।

সখি। কিন্তু আমি হোটেলে বসে খেতে পারব না।

সখা। খেতে না পার, প্রথমে কাছে বসে থাক্‌বে। কাঁটা-চাম্‌চিগুলো মধুর ভাবে ঠুং ঠাং ক'রে সকলের প্লেটে ভাগ করে দেবে।

সখি। যদি কেউ মদ খেয়ে আমার দিকে তাকায়?

সখা। তুমি বল্‌বে O dear—dear—আর সকলে মিলে তাকে ঠুকে দেবে। সামাজিক আত্মবোধ না হলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে না। আমরা নিঃসহায় হয়ে পড়েছি দেখ্‌ছ না? তুমি যেমন সুন্দরী, তোমার জন্য একলক্ষ "thank you very much" ত রাস্তায় পড়ে আছে। তুমি ঘরের বাহিরে গিয়ে কুড়িয়ে নিতে পারছ না। এ কি সামান্য ক্ষোভ! (রুমাল দিয়া নয়নাবরণ)

সখি। সখা, দুঃখ কর' না। সমাজের মধ্যে মিশে গেলে, তোমাকে পাব কি না, তাই ভয় হয়। আমরা স্বামীকেই বুঝি, ভাইকে বুঝি, পিতামাতাকে বুঝি, জোর নিজের পাড়াটা বুঝি। তুমি যে ইতিহাস দিয়েছিলে, সেগুলো পড়ে' দেখ্‌লেম যে, মানুষেরই কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যায়, সমাজের কোন কঙ্কাল ভূগর্ভে পাওয়া যায় না। অথচ কত সমাজ ও জাতির ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সমাজের রূপ আমি ধ্যান করতে পারিনে। সমাজ ও দেশের লোকে মিলে একটা কাব্য লিখ্‌তে পারে না। একজন কবিই কাব্য লেখে। একজনের মধ্যেই ঈশ্বরের অবতার হয়। বিশ্বের বিরাট মূর্ত্তি দেখে অর্জ্জুন না কি ডরিয়ে উঠেছিল। সমাজ একত্র হয়ে মহাসঙ্কীর্ত্তন করলেও, সেটা বিকট গোলমালের মত বোধ হয়। আমার দশজনকে ভালবাসবার ক্ষমতা নাই। তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ। আমার সাধের ফুলগাছের মূলেই আমার আনন্দ ও বিষাদের অশ্রু, তারই ফুলগুলি আমার সন্তান। আমি তোমাকে সমাজে বিলিয়ে দিতে পারব না। সখা, আমার মত তোমাকে কেউ আদর করবে না, ভালবাস্‌বে না।

সখা। কি horrible pantheism! blind hedonism! দেখ সখি! স্পষ্ট কথা বলি। দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে আস্‌ছে। যত দিন বিনা পরিশ্রমে দেশে অপর্য্যাপ্ত ধান জন্মাত, তত দিন আমাদের খাতির ছিল। এখন আর বিলাইবার অন্ন নাই। বাকি আছে হৃদয়ের প্রেম ও দেহের পরিশ্রম। এ দুটো একত্র না হলে আমাদের এই শতাব্দীর মধ্যে প্রাণ রক্ষা করা সুকঠিন।

সখি। জননীকে বিলাইয়া, তাঁর স্তন্যদুগ্ধ জগতকে দিয়া, যখন এক কড়া ঘরে আনিতে পার নাই, তখন স্ত্রীকে বিলাইয়া ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছু পাবে, তা বোধ হয় না। সমাজ, রাষ্ট্র ও মহাপ্রদেশের মধ্যে আমার আদর্শ কই? যে ধর্ম্ম যুগে-যুগে আমাদের কুটীরে শান্তি রেখেছে, সে ধর্ম্ম ত অন্য কোন্ সমাজে দেখ্‌তে পাই নে? আমাদের পরিশ্রমের

ফল কোন্ দেশে রপ্তানি হয়ে যাবে? তার বদলে কোন্ দেশ হ'তে আমরা অধর্ম্ম নিয়ে আস্‌ব?

সখা। ধর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, এসব বিলাইলে পুণ্যই হয়।

সখি। তবে তার বদলে কিছু নিও না। ঘরে চুপ করে বসে থাক। যার গরজ সে নিতে আসুক। আমরা সহস্র বৎসর এই জরাজীর্ণ শরীরে ভাঙ্গা ঘরে প্রদীপ জ্বেলে, আমাদের যেটুকু ছিল বিলিয়ে দিয়েছি। কৃষকেরা আহ্লাদে খেয়েছে, বহু জাতি এসে প্রাঙ্গণে বসে অঞ্চল ভরে নিয়ে গিয়েছে। আমরা তার জন্য দুঃখ করি নাই। নিজের দুঃখ ভুলে গিয়েছি। আমরা ব্রাহ্মণ। ঈশ্বর আমাদের দ্বারস্থ হয়ে কর্ম্ম ও ভক্তি শিখ্‌বেন। আমরা প্রাণের ভয় করিনে। দেখ সখা—বোধ হয় তুমি ভুলে গেছ আমরা ঈশ্বরের জননী—আমরা আদ্যাশক্তি ভগবতীর অংশ। যার স্তন্যদুগ্ধ পেয়ে ঈশ্বর মূর্ত্তিরূপে জগৎবিস্তার করেন, সেই দেবের কন্যা আমরা। আমরা সমাজের অন্তরে থাকব। সমাজ, বাহিরের রূপের মধ্যে আমাদের অন্বেষণ করবে। আমরা সতী। আমরা না থাকলে জ্ঞান ভক্তি থাকবে না, কর্ম্মও প্রলয়ে অবসান হবে। যখন ভগবানকে ডাকি, তখন আমরা আমাদের সন্তানকে ডাকি। সে কোথায় প্রেমে মত্ত হয়ে 'সমাজ' 'সমাজ' করে বেড়াচ্ছে, কেবল যুদ্ধ বাধাবার জন্য। বরাবর সে আমাদের কষ্ট দেয়। তার কথায় মেতে মহম্মদ কাটাকাটি করেছিল, বুদ্ধ মরমে কষ্ট পেয়েছিল, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল। সে একবার বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে গিয়ে সকলকে যদুবংশের সঙ্গে ধ্বংস করেছিল। নিতাই তার জন্য সন্ন্যাসী। সে জগতকে শৃঙ্খলার মধ্যে রাখ্‌তে পারে না, মাঝে মাঝে একটা মতলব ক'রে নিয়ম ভেঙ্গে ফেল্‌তে চায়। একবার ঘরে ফির্‌লে হয়, তা হলে দুটো ভর্ৎসনা করে আবার শ্রুতি স্মৃতির মধ্যে তাকে বদ্ধ করে ফেল্‌ব। তখন তার বৈষ্ণবগিরি বেরিয়ে যাবে।

সখা। (স্বগত) বামুনের মেয়ের সঙ্গে কথায় পারা ভার। এইটুকুই ভারতবর্ষের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণগুলো দর্শনশাস্ত্রের বাইরে। ভক্তি ও জ্ঞান কর্ম্মের উপর সংস্থাপিত, কিন্তু কর্ম্মের মারপ্যাচটুকু এদেরই পেটের মধ্যে। এদের সভ্যতা বেতর রকমের। কেবল will এর উপর।

(প্রকাশ্যে) Hopeless Case। আচ্ছা, আপাততঃ তুমি হাঁড়ি থেকে কিছু চা'ল বের করে খিচুড়ি রেঁধে দেও। আমায় ১১টার সময় বক্তৃতা করতে হবে।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্নসূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে। কিন্তু ডাক যখন সত্যই পড়িল, তখন বুঝিলাম, বিস্ময় এবং সঙ্কোচ আমার যত বড়ই হোক্, এ আহ্বান শিরোধার্য্য করিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করা চলিবে না।

তাই, আজ আবার এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার শতছিন্ন গ্রন্থিগুলা আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে, বাড়ী ফিরিয়া আসার পরে, আমার এই সুখে-দুঃখে মেশানো জীবনটাকে কে যেন হঠাৎ কাটিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল, আমার এ জীবনের দুঃখের বোঝা আর আমার নিজের নয়। এ বোঝা বহিয়া বেড়াক সে, যাহার নিতান্ত গরজ। অর্থাৎ আমি যে দয়া করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, এই ত রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য। চোখে আকাশের রঙ বদ্‌লাইয়া গেল, বাতাসের স্পর্শ আর একরকম করিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল,—কোথাও যেন আর ঘর-বার, আপনার-পর রহিল না। এম্‌নি একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় উল্লাসে অন্তর বাহির একাকার হইয়া উঠিল যে, রোগকে "রোগ" বলিয়া,

বিপদকে বিপদ বলিয়া, অভাবকে অভাব বলিয়া আর মনেই হইল না। সংসারে কোথাও যাইতে, কোনও কিছু করিতে দ্বিধা-বাধার যেন আর লেশমাত্র সংস্রব রহিল না।

এ সব অনেক দিনের কথা। সে আনন্দ আর আমার নাই; কিন্তু, সেদিনের এই একান্ত বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্বাদ একটা দিনের জন্যও যে জীবনে উপভোগ করিতে পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ। অথচ, হারাইয়াছি বলিয়াও কোন দিন ক্ষোভ করি না। শুধু এই কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়, যে শক্তি সেদিন এই হৃদয়টার ভিতর হইতেই জাগ্রত হইয়া, এত সত্বর সংসারের সমস্ত নিরানন্দকে হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে কি বিরাট শক্তি! আর মনে হয়, সে দিন আমারই মত আর দুটি অক্ষম, দুর্ব্বল হাতের উপর এতবড় গুরু ভারটা চাপাইয়া না দিয়া, যদি সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের ভারবাহী সেই দুটি হাতের উপরেই আমার সেদিনের সেই অখণ্ড বিশ্বাসের সমস্ত নির্ভরতা সঁপিয়া দিতে শিখিতাম, তবে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল? কিন্তু, যাক্ সে কথা।

রাজলক্ষ্মীকে পৌঁছান সংবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম, সে চিঠির জবাব আসিল, অনেক দিন পরে। আমার অসুস্থ দেহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া, অতঃপর সংসারী হইবার জন্য সে আমাকে কয়েকটা মোটা রকমের উপদেশ দিয়াছে। এবং সংক্ষিপ্ত পত্র শেষ করিয়াছে এই বলিয়া যে, সে কাজের ঝঞ্ঝাটে সময় মত পত্রাদি লিখিতে না পারিলেও, আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই, এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি!

তথাস্তু! এত দিন পরে সেই রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি! আকাশ-কুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল। এবং যে দুই-একটা শুক্‌না পাপ্‌ড়ি বাতাসে ঝরিয়া পড়িল, তাহাদের কুড়াইয়া ঘরে তুলিবার জন্যও মাটি-হাতড়াইয়া ফিরিলাম না। চোখ দিয়া যদি-বা দু'এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে ত হয় ত পড়িয়াছে, কিন্তু সে কথা আমার মনে নাই। তবে, এ কথা মনে আছে যে, দিনগুলা আর স্বপ্ন দিয়া কাটিতে চাহিল না। তবুও এম্‌নি ভাবে আরও ৫।৬ মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি, হঠাৎ একখানা অদ্ভুত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরে মেয়েলি কাঁচা অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা। খুলিতেই পত্রের ভিতর হইতে একখানি ছোট পত্র ঠুক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া তাহার অক্ষর এবং নাম-সহির পানে চাহিয়া সহসা নিজের চোখ দুটাকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার যে মা দশ বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই শ্রীহস্তের লেখা। নাম সহি তাঁরই। পড়িয়া দেখিলাম, মা তাঁর 'গঙ্গাজল'কে যেমন করিয়া অভয় দিতে হয় তা' দিয়াছেন। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এই, যে, বছর বারো-তেরো পূর্ব্বে এই 'গঙ্গাজলে'র যখন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ, দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে আমার স্বর্গবাসিনী জননী এই গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হইয়া মা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে, তাঁর নিজের ছেলে ত আছে! তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদি বা একান্ত অভাব হয়, তখন আমি ত আছি! সমস্ত লেখাটা আগাগোড়া বার-দুই পড়িয়া দেখিলাম, মুন্সিয়ানা আছে বটে! মার উকিল হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যতপ্রকারে কল্পনা করা যাইতে পারে, তিনি নিজেকে, মায় তাঁর বংশধরটিকেও দায়িত্বে বাঁধিয়া গিয়াছেন। দলিলের কোথাও এতটুকু ফাঁক, এতটুকু ত্রুটি রাখিয়া যান নাই।

সে যাই হোক্, 'গঙ্গাজল' যে এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসর কাল এই পাকা দলিলটির উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নীরবে বসিয়া ছিলেন, তাহা মনে হইল না। বরঞ্চ মনে হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ ও লোকাভাবে কুপাত্র যখন তাঁহার পক্ষে একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনূঢ়া কন্যার শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকে বুকের রক্ত মগজে চড়িবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই, এই হতভাগ্য সুপাত্রের উপর তাঁহার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এই চিঠির জন্য আজ তাঁর মাথা খাইয়া ফেলিতাম; কিন্তু, এখন যে উঁচুতে বসিয়া তিনি হাসিতেছেন। সেখানে লাফ দিয়াও যে তাঁর পায়ের তলায়

সজোরে একটা ঢুঁ মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইব, সে পথও আমার বন্ধ হইয়া গেছে।

সুতরাং মায়ের কিছু না করিতে পারিয়া, তাঁর গঙ্গা-জলের কি করিতে পারি না পারি, পরখ করিবার জন্য, একদিন রাত্রে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সারা-রাত্রি ট্রেনে কাটাইয়া পরদিন তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা অপরাহ্ণ। গঙ্গাজল-মা প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন না। শেষে পরিচয় পাইয়া এই তেরো বৎসর পরে এমন কান্নাই কাঁদিলেন, যে, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁর কোন আপনার লোক চোখের উপর তাঁকে মরিতে দেখিয়াও এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বলিলেন, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তিনিই এখন আমার মাতৃ-স্থানীয়া, এবং করুণায় বিগলিত-চিত্ত হইয়া আমার সাংসারিক অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবা কত রাখিয়া গিয়াছেন, মায়ের কি-কি গহনা আছে, এবং তাহা কাহার কাছে আছে, আমি চাকরি করি না কেন, এবং করিলে কত টাকা আন্দাজ মাহিনা পাইতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, এই আলোচনার ফল তাঁহার কাছে তেমন সন্তোষজনক বোধ হয় নাই। বলিলেন, তাঁর কোন এক আত্মীয় বর্ম্মা মুল্লুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ, অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে—শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষা মাত্র! সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে-না-নামিতে বাঙালীদের সাহেবেরা কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকরি দেয়—এইরূপ অনেক কাহিনী। পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত-বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে, এমন অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহায়সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে, এবং মোহভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। গঙ্গাজল-মায়ের বর্ম্মা-মুল্লুকের বিবরণ আমাকে তীরের মত বিঁধিল। 'লাল' হইবার আশায় নহে,—আমার মধ্যে যে 'ভবঘুরেটা' কিছুদিন হইতে ঝিমাইতেছিল, সে তাহার শ্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এক মুহূর্ত্তেই খাড়া হইয়া উঠিল। যে সমুদ্রকে ইতিপূর্ব্বে শুধু দূর হইতে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, সেই অনন্ত, অশ্রান্ত জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে পাইব, এই চিন্তাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোনমতে একবার ছাড়া পাইলে হয়।

মানুষকে মানুষ যত প্রকারে জেরা করিতে পারে, তাহার কোনটাই গঙ্গাজল-মা আমাকে বাদ দেন নাই। সুতরাং, নিজের মেয়ের পাত্র হিসাবে আমাকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু, রাত্রে খাবার সময় তাঁহার ভূমিকার ধরণ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাকে হাত-ছাড়া করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি এই বলিয়া সুরু করিলেন যে, মেয়ের বরাতে সুখ না থাকিলে, যেমন কেন না টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি, বিদ্যাসাধ্যি দেখিয়া দাও, সমস্তই নিষ্ফল। এবং এ সম্বন্ধে নামধাম, বিবরণাদি সহযোগে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য নজির তুলিয়া বিফলতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়। অন্য পক্ষে এমনও কতকগুলি লোকের নাম উল্লেখ করিলেন, যাহারা আকাট মূর্খ হইয়াও, শুদ্ধমাত্র স্ত্রীর আয়-পয়ের জোরেই সম্প্রতি টাকার উপরে দিবারাত্রি উপবেশন করিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, টাকা জিনিসটার প্রতি আমার আসক্তি থাকিলেও, চব্বিশ ঘণ্টা তাহার উপরেই উপবেশন করিয়া থাকাটা আমি প্রীতিকর বিবেচনা করি না। এবং এ জন্য স্ত্রীর আয়-পয় যাচাই করিয়া দেখিবার কৌতূহলও আমার নাই। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না। কারণ, যিনি সুদীর্ঘ তেরো বৎসর পরেও এমন একটা পত্রকে দলিল-রূপে দাখিল করিতে পারেন, তাঁহাকে এত সহজে ভুলানো যায় না। তিনি বার-বার বলিতে লাগিলেন, ইহাকে মায়ের ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত। এবং যে সন্তান সমর্থ হইয়াও মাতৃঋণ পরিশোধ করে না, সে ইত্যাদি ইত্যাদি—

যখন নিরতিশয় শঙ্কিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি, তখন কথায়-কথায় অবগত হইলাম, নিকটবর্ত্তী গ্রামে একটি সুপাত্র আছে বটে, কিন্তু পাঁচশত টাকার কম তাহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি চোখে পড়িল। মাসখানেক পরে যা-হোক একটা উপায় করিব—কথা দিয়া, পরদিন

সকালেই প্রস্থান করিলাম। কিন্তু উপায় কি করিয়া করিব—কোন দিকে চাহিয়া তাহার কোন কিনারা দেখিতে পাইলাম না।

আমার উপর আরোপিত এই বাঁধনটা যে আমার পক্ষে সত্যকার বস্তু হইতেই পারে না, তাহা অনেক করিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু তথাপি মাকে তাঁহার এই প্রতিশ্রুতির ফাঁস হইতে অব্যাহতি না দিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার কথাও কোন মতে ভাবিতে পারিলাম না।

বোধ করি এক উপায় ছিল, পিয়ারীকে বলা; কিন্তু কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে মনস্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন হইল তাহার সংবাদও জানিতাম না। সেই পৌছান খবর ছাড়া আমিও আর চিঠি লিখি নাই, সেও তাহার জবাব দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পত্র লেখে নাই। বোধ করি চিঠিপত্রের ভিতর দিয়াও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, এ তার অভিপ্রায় ছিল না। অন্ততঃ, তাহার এই একটা চিঠি হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। তবুও আশ্চর্য্য এই যে, পরের মেয়ের জন্য ভিক্ষার ছলে একদিন যথার্থই পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া নীচের বসিবার ঘরের বারান্দায় দেখিলাম দু'জন উর্দ্দীপরা দরওয়ান বসিয়া আছে। তাহারা হঠাৎ একটা শ্রীহীন অপরিচিত আগন্তুক দেখিয়া এমন করিয়া চাহিয়া রহিল যে, আমার সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। ইহাদের পূর্ব্বে দেখি নাই। পিয়ারীর সাবেক বুড়া দরওয়ানজীর পরিবর্ত্তে কেন যে তাহার এমন দু'জন বাহারে দরওয়ানের আবশ্যক হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাই হোক, ইহাদের অগ্রাহ্য করিয়া উপরে উঠিয়া যাইব, কিংবা সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিব, স্থির করিতে-না-করিতে দেখি, রতন ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া সে প্রথমে অবাক্ হইয়া গেল, পরে পায়ের কাছে টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "কখন্ এলেন? এখানে দাঁড়িয়ে যে?"

"এই মাত্র আস্‌চি রতন। খবর সব ভাল?"

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "সব ভাল বাবু। ওপরে যান—আমি বরফ কিনে নিয়ে এখুনি আস্‌চি" বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

"তোমার মনিব ঠাকরুণ ওপরেই আছেন?"

"আছেন" বলিয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চ হাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কাণে গেল। একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাপ্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিস একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপর শুভ্র জাজিম ধপ্‌ধপ্ করিতেছে। তাকিয়াগুলায় অড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরণে বাঙালীর মত ধুতি-পিরান থাকিলেও, মাথার উপর কাজ-করা মস্‌লিনের টুপিতে বেহারী বলিয়াই মনে হইল। একজোড়া বাঁয়া-তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবল্‌চি এবং তাহারই অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। একপাশে একটা ছোট হারমোনিয়াম্। পিয়ারীর গায়ে মুজ্‌রার পোষাক ছিল না বটে, কিন্তু সাজ-সজ্জারও অভাব ছিল না। বুঝিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক—ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র।

আমাকে দেখিয়া পিয়ারীর মুখের সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। তার পরে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "এ কি! শ্রীকান্ত বাবু যে! কবে এলেন?"

"আজই।"

"আজই? কখন? কোথা উঠ্‌লেন?"

ক্ষণকালের জন্য হয় ত বা একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকিব, না হইলে জবাব দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু, আপনাকে সামলাইয়া লইতেও বিলম্ব হইল না। বলিলাম, "এখানকার সমস্ত লোককেই ত তুমি চেন না, নাম শুনলে চিন্‌তে পারবে না।"

যে ভদ্রলোকটি সব চেয়ে জম্‌কাইয়া বসিয়াছিলেন, বোধ করি এ বৈঠকের যজমান তিনিই। বলিলেন,—"আইয়ে বাবুজী

বেঠিয়ে—" বলিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভাবে বুঝাইলেন যে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা তিনি ঠিক আঁচ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে একটা সসম্মান অভিবাদন করিয়া জুতার ফিতা খুলিবার ছলে মুখ নীচু করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া লইতে চাহিলাম। বিচারের সময় বেশি ছিল না বটে, কিন্তু এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে এটা স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, ভিতরে আমার যাই থাক্, বাহিরের ব্যবহারে তাহা কোন মতেই প্রকাশ পাইলে চলিবে না। আমার মুখের কথায়, আমার চোখের চাহনিতে, আমার সমস্ত আচরণের কোন ফাঁক দিয়া যেন অন্তরের ক্ষোভ বা অভিমানের একটি বিন্দুও বাহিরে আসিয়া না পড়িতে পারে। ক্ষণকাল পরে ভিতরে সকলের মধ্যে আসিয়া যখন উপবেশন করিলাম, তখন নিজের মুখের চেহারাটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু অন্তরে অনুভব করিলাম যে, তাহাতে অপ্রসন্নতার চিহ্ন লেশমাত্রও আর নাই। রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলাম, "বাইজী বিবি, আজ শুকদেব ঠাকুরের ঠিকানা পেলে তাকে তোমার সামনে বসিয়ে একবার মনের জোরটা তাঁর যাচাই করে নিতুম। বল্মি, করেচ কি? এ যে রূপের সমুদ্র বইয়ে দিয়েচ!"

প্রশংসা শুনিয়া কর্ম্মকর্ত্তা বাবুটি আহ্লাদে গলিয়া বারংবার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিয়া জেলার লোক; দেখিলাম, তিনি বাঙলা বলিতে না পারিলেও, বেশ বুঝেন। কিন্তু পিয়ারীর কাণ পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা যে লজ্জায় নয়—রাগে, তাহাও বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলাম না, বাবুটিকে উদ্দেশ করিয়া তেম্‌নি হাসি-মুখে বাঙলা করিয়া কহিলাম, "আমার আসার জন্যে আপনাদের আমোদ-আহ্লাদের যদি এতটুকু বিঘ্ন হয় ত অত্যন্ত দুঃখিত হব। গান-বাজনা চলুক।"

বাবুটি এত খুসি হইয়া উঠিলেন, যে, আবেগে আমার পিঠের উপর একটা চাপড় মারিয়া বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা বাবু। পিয়ারী বিবি, একঠো ভালা সংগীত হোক্।"

"সন্ধ্যার পরে হবে,—আর এখন নয়" বলিয়া পিয়ারী হারমোনিয়ামটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া সহসা উঠিয়া গেল।

এইবার বাবুটি আমার পরিচয় গ্রহণের উপলক্ষে নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁর নাম রামচন্দ্র সিংহ। তিনি পূর্ণিয়া জেলার একজন জমিদার, দরভাঙ্গার মহারাজা তাঁর কুটুম্ব, পিয়ারী বিবিকে তিনি ৭।৮ বৎসর হইতে জানেন। সে তাঁর পূর্ণিয়ার বাড়ীতে ৩।৪ বার মুজ্‌রা করিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও অনেকবার এখানে গান শুনিতে আসেন; কখন-কখন ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত থাকেন—মাস তিনেক পূর্ব্বেও একবার আসিয়া এক সপ্তাহ বাস করিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কেন আসিয়াছি—এইবার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পিয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, "বাইজীকেই জিজ্ঞেসা করুন না, কেন আসিয়াছি।" পিয়ারী আমার মুখের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিল, কিন্তু জবাব দিল সহজ, শান্ত স্বরে; কহিল,—"উনি আমার দেশের লোক।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "বাবুজী, মধু থাকিলেই মৌমাছি আসিয়া জোটে—তারা দেশ-বিদেশের বিচার করে না।" কিন্তু বলিয়াই দেখিলাম, রহস্যটা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পূর্ণিয়া জেলার জমিদার মুখখানা গম্ভীর করিলেন। এবং, তাঁর চাকর আসিয়া যাই জানাইল সন্ধ্যা-আহ্নিকের যায়গা করা হইয়াছে, তিনি তখনি প্রস্থান করিলেন। তবলচী এবং আর দুইজন ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। তাঁর মনের ভাবটা অকস্মাৎ কেন এমন বিকল হইয়া গেল, তাহার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিলাম না।

রতন আসিয়া কহিল, "মা, বাবুর বিছানা করি কোথায়?"

পিয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আর কি ঘর নেই রতন? আমাকে জিজ্ঞেসা না কোরে কি এতটুকু বুদ্ধি খাটাতে পারিস্ নে? যা এখান থেকে।" বলিয়া রতনের সঙ্গে-সঙ্গে নিজেও বাহির হইয়া গেল। বেশ দেখিতে পাইলাম, আমার আকস্মিক শুভাগমনে এ বাড়ীর ভারকেন্দ্রটা সাংঘাতিক রকম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এমন হঠাৎ আসা হ'ল যে?" বলিলাম, "দেশের লোক, অনেক দিন না দেখে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম, বাইজী!"

পিয়ারীর মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল। আমার

পরিহাসে সে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া বলিল, "আজ রাত্রে এখানেই থাক্‌বে ত ?"

"থাক্‌তে বল, থাক্‌ব।"

"আমার আর বলাবলি কি ! তবে, তোমার হয় ত অসুবিধে হবে। যে ঘরটায় তুমি শুতে, সেটাতে—"

"বাবু শুচ্চেন ? বেশ ! আমি নীচে শোব, তোমার নীচের ঘরগুলোও ত চমৎকার।"

"নীচে শোবে ? বল কি ! মনের মধ্যে এতটুকু বিকার নেই—দু-দিনেই এত বড় পরমহংস হয়ে উঠ্‌লে কি করে ?"

মনে-মনে বলিলাম, 'পিয়ারী, আমাকে তুমি এখনও চেনোনি।' মুখে বলিলাম, "আমার তাতে মান-অভিমান এক বিন্দু নেই। আর কষ্টের কথা যদি মনে কর ত সেটা একেবারে নিরর্থক। আমি বাড়ী থেকে বেরোবার সময় খাবার-শোবার ভাবনাগুলোও ফেলে রেখে আসি। সে ত তুমি নিজেও জানো। বেশি বিছানা থাকে ত একটা পেতে দিতে বোলো, না থাকে দরকার নেই—আমার কম্বল সম্বল আছে।"

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা আছে জানি। কিন্তু এতে তোমার মনে কোন রকম দুঃখ হবে না ত ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না। কারণ, ষ্টেসনে পড়ে থাকার চেয়ে এটা ঢের ভাল।

পিয়ারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আমি হলে বরঞ্চ গাছতলায় পড়ে থাকতুম, কিন্তু এ অপমান সইতুম না।"

তাহার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া আমি না হাসিয়া থাকিলাম না। সে যে কি কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে চায়, তাহা আমি অনেকক্ষণ টের পাইয়াছিলাম। কিন্তু শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলাম, "আমি এত নির্ব্বোধ নই যে, মনে করব, তুমি ইচ্ছে করে আমাকে নীচে শুতে বলে অপমান করচ। তোমার সাধ্য থাক্‌লে তুমি সেবারের মতই আমার শোবার ব্যবস্থা করতে। সে যাক্‌, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথা-কাটাকাটি করবার দরকার নেই—তুমি রতনকে পাঠিয়ে দাওগে, আমাকে নীচের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসুক, আমি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

পিয়ারী কহিল, "তুমি জ্ঞানী লোক, তুমি আমার ঠিক অবস্থা বুঝ্‌বে না, ত বুঝ্‌বে কে ? যাক্‌ বাঁচলুম !" বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ আসার সত্যি কারণটা শুন্‌তে পাইনে কি ?"

বলিলাম, "প্রথম কারণটা শুন্‌তে পাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা পাবে।"

"প্রথমটা পাব না কেন ?" "অনাবশ্যক বলে।" "আচ্ছা, দ্বিতীয়টাই শুনি।" "আমি বর্ম্মায় যাচ্চি। হয় ত আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ, অনেক দিন যে দেখা হবে না, সে নিশ্চয়। যাবার আগে একবার দেখ্‌তে এলুম।"

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বাবু, আপনার বিছানা তৈরি হয়েছে, আসুন।" খুসি হইয়া কহিলাম, "চল।" পিয়ারীকে বলিলাম, "আমার ভারি ঘুম পাচ্চে। ঘণ্টাখানেক পরে যদি সময় পাও, ত একবার নীচে এসো—আমার আরও কথা আছে" বলিয়া রতনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম।

পিয়ারীর নিজের শোবার ঘরে আনিয়া রতন যখন আমাকে শয্যা দেখাইয়া দিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বলিলাম, "আমার বিছানা নীচের ঘরে না ক'রে এ ঘরে করা হ'ল কেন ?" রতন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "নীচের ঘরে ?" আমি বলিলাম, "হাঁ, সেই রকমই ত কথা ছিল।"

সে অবাক্‌ হইয়া ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "আপনার বিছানা হবে নীচের ঘরে ? আপনি কি যে তামাসা করেন বাবু !" বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল,—আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মনিব শোবেন কোথায় ?"

রতন কহিল, "বঙ্কুবাবুর ঘরে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়েচি।" কাছে আসিয়া দেখিলাম, এ সেই রাজলক্ষ্মীর দেড়হাত চওড়া তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা হয় নাই। একটা মস্ত খাটের উপর মস্ত পুরু গদি পাতিয়া রাজ-শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর সেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। একধারে কয়েকখানি বাঙলা বই, অন্যধারে একটা বাটির মধ্যে কতকগুলি বেল-ফুল। চোখ চাহিবামাত্র টের পাইলাম, এর কোনটাই ভৃত্যের হাতে তৈরী হয় নাই—যে বড় ভালবাসে, এ সব

তাহারই স্বহস্ত-প্রস্তুত। উপরের চাদরখানি পর্য্যন্ত যে রাজলক্ষ্মী নিজের হাতে পাতিয়া রাখিয়া গেছে, এ যেন নিজের অন্তরের ভিতর হইতে অনুভব করিলাম।

আজ ওই লোকটার সম্মুখে আমার অচিন্ত্যপূর্ব্ব অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী হতবুদ্ধি হইয়া প্রথমে যে ব্যবহারই করুক, আমার নির্বিকার ঔদাসীন্যে মনে-মনে সে যে কতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না। এবং কেন যে আমার মধ্যে একটা ঈর্ষার প্রকাশ দেখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া এত প্রকারে আমাকে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল, তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও যে নিজের নিষ্ঠুর রূঢ়তাকেই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া তাহার অভিমানের কোন মান্য রাখি নাই, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র আঘাতটিকেই শতগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি, এই অন্যায় আমার মনের মধ্যে এখন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। নিশ্চয় জানিতাম, একবার সে আসিবেই। এখন সেই সময়টুকুর জন্যই উৎগ্রীব হইয়া পড়িয়া রহিলাম।

শ্রান্তিবশতঃ হয় ত একটুখানি ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। সহসা চোখ মেলিয়া দেখিলাম, পিয়ারী আমার পায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া বসিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, "বর্ম্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না,—সে খবর জানো?" "না, তা জানিনে।" "তবে?" "ফিরতেই হবে এমন ত কারো মাথার দিব্যি নেই।"

"নেই? তুমি কি পৃথিবীর সকলের মনের কথাই জানো না কি?" কথাটা অতি সামান্য! কিন্তু সংসারে এই একটা ভারি আশ্চর্য্য যে, মানুষের দুর্ব্বলতা কখন্ কোন্ ফাঁক দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে কত অসংখ্য গুরুতর কারণ ঘটিয়া গিয়াছে, আমি কোন দিন আপনাকে ধরা দিই নাই; কিন্তু, আজ তাহার মুখের এই অত্যন্ত সোজা কথাটা সহ্য করিতে পারিলাম না। মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল,—"সকলের মনের কথা ত জানিনে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু, একজনের জানি। যদি কোন দিন ফিরে আসি, ত শুধু তোমার জন্যেই আস্‌ব। তোমার মাথার দিব্যি আমি অবহেলা করব না।"

পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাঙিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না। কিন্তু মিনিট দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না; তখন তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু, তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বলিলাম, "উঠে বোস; এ অবস্থায় কেউ দেখ্‌লে সে ভারি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে।" কিন্তু পিয়ারী একটা জবাব পর্য্যন্ত যখন দিল না, তখন জোর করিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার নীরব অশ্রুতে সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া গেছে। টানাটানি করিতে, সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, "আগে আমার দু'তিনটে কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠ্‌ব।" "কি কথা, বল?" "আগে বল, ও লোকটা এখানে থাকাতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে করনি?" "না।" পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু, আমি যে ভাল নই, সে তো তুমি জানো? তবে কেন সন্দেহ হবে না?" প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন। সে যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ, এও ভাবিতে পারি না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া, ধড়্‌মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আচ্ছা, জিজ্ঞেসা করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক্, ভাল হতে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে পোড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না?" আমি বলিলাম, "আমরা কোন দিন মানা করিনে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ কারো আট্‌কে রাখতে পারে না।"

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে ধীরে-ধীরে বলিল "বেশ। তা'হলে তুমিও আট্‌কাতে পারবে না।" আমি জবাব দিবার পূর্ব্বেই রতনের কাসির শব্দ দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, "কি রে রতন?"

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, "মা, রাত্রি ত অনেক হ'ল,—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না? বামুনঠাকুর ঢুলে-ঢুলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েচে।"

"তাই ত, তোদের কারুর যে এখনো খাওয়া হয়নি" বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমার খাবারটা সে বরাবর নিজের হাতেই লইয়া আসিত; আজও আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, "তোমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েচি—আজ তোমাকেও জাগিয়ে রাখ্‌ব।" বলিয়া, সম্মতির জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া, আমার পায়ের বালিশটা টানিয়া লইয়া বাঁ হাতটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়া বলিল, "আমি অনেক ভেবে দেখ্‌লুম, তোমার অত দূরদেশে যাওয়া কিছুতে হতে পারে না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হতে পারে, তা'হলে? এম্‌নি কোরে ঘুরে-ঘুরে বেড়ানো?" পিয়ারী তাহার জবাব না দিয়া বলিল, "তা' ছাড়া, কিসের জন্যে বর্ম্মায় যেতে চাচ্চ শুনি?" "চাক্‌রি করতে, ঘুরে বেড়াতে নয়।" আমার কথা শুনিয়া পিয়ারী উত্তেজনায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "দেখ, অপরকে যা' বল, তা' বল; কিন্তু আমাকে ঠকিয়ো না। আমাকে ঠকালে তোমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই—তা জানো?" "সেটা বিলক্ষণ জানি; এবং কি করতে বল তুমি?" আমার স্বীকারোক্তিতে পিয়ারী খুসি হইল; হাসিমুখে বলিল, "মেয়েমানুষে চিরকাল যা' বলে থাকে, আমিও তাই বলি। একটি বিয়ে করে সংসারী হও—সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন কর।"

প্রশ্ন করিলাম, "সত্যি খুসি হবে তাতে?"

সে মাথা নাড়িয়া, কাণের দুল দুলাইয়া সোৎসাহে কহিল, "নিশ্চয়! একশ'বার। এতে আমি সুখী হব না, ত সংসারে হবে কে শুনি?" বলিলাম, "তা' জানিনে; কিন্তু এ আমার একটা দুর্ভাবনা গেল। বাস্তবিক, এই সংবাদ দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম যে, বিয়ে না করে আমার আর উপায় নেই।"

পিয়ারী আর একবার তাহার কাণের স্বর্ণাভরণ দুলাইয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল—"আমি ত তা' হলে কালীঘাটে গিয়ে পূজো দিয়ে আসব। কিন্তু, মেয়ে আমি দেখে পছন্দ কোরব, তা বলে দিচ্চি।" আমি বলিলাম, "তার আর সময় নেই—পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।" আমার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বোধ করি পিয়ারী লক্ষ্য করিল। সহসা তাহার হাসিমুখে একটা ম্লান ছায়া পড়িল; কহিল, "বেশ ত, ভালই ত! স্থির হয়ে গেলে ত পরম সুখের কথা।"

বলিলাম, "সুখ, দুঃখ জানিনে রাজলক্ষ্মী; যা' স্থির হয়ে গেছে, তাই তোমাকে জানাচ্চি।" পিয়ারী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "যাও—চালাকি করতে হবে না,—সব মিছে কথা।" "একটা কথাও মিথ্যে নয়। চিঠি দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে।" বলিয়া জামার পকেট হইতে দুখানা পত্রই বাহির করিলাম। "কৈ দেখি চিঠি" বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ারী চিঠি দুখানা হাতে লইতেই, তাহার সমস্ত মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। হাতের মধ্যে পত্র দুখানা ধরিয়া রাখিয়াই বলিল, "পরের চিঠি পড়বার আমার দরকারই বা কি! তা কোথায় স্থির হ'ল?" "পড়ে দেখ।" "আমি পরের চিঠি পড়িনে।"

"তা'হলে পরের খবর তোমার জেনেও কাজ নেই।"

"আমি জানতেও চাইনে" বলিয়া সে ঝুপ্‌ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চিঠি দুটা কিন্তু তাহার মুঠার মধ্যেই রহিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোন কথা কহিল না। তার পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া, দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, মেজের উপর সেই দুখানা পত্র লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। লেখাগুলা বোধ করি সে দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিল। তার পরে উঠিয়া আসিয়া আবার তেম্‌নি করিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ঘুমুলে?" "না।" "এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভাল নয়, তাকে আমি ছেলেবেলা দেখেচি।" "মার চিঠি পড়লে?" "হাঁ; কিন্তু, খুড়িমার চিঠিতে এমন কিছু লেখা নেই যে, তোমাকেই তাকে ঘাড়ে করতে হবে। আর, থাক্‌ ভাল, না থাক্‌ ভাল, এ মেয়ে আমি কোন মতেই ঘরে আন্‌ব না।" "কি রকম মেয়ে ঘরে আন্‌তে চাও, শুন্তে পাই কি?"

"সে আমি এখুনি কি করে বল্‌ব? বিবেচনা কোরে দেখ্‌তে হবে ত!" একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলাম, "তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর করে থাকতে হলে, আমাকে আইবুড় নাম খণ্ডাতে আর-এক জন্ম এগিয়ে যেতে হবে—এতে কুলোবে না। যাক্‌, যথাসময়ে তাই না হয় যাবো, আমার তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু এই মেয়েটিকে তুমি উদ্ধার করে দিয়ো।

পাঁচেক টাকা হলেই তা হবে, আমি তাঁর মুখেই শুনে এসেছিলুম।” পিয়ারী উৎসাহে আর একবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, “কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, খুড়িমার কথা মিথ্যে হতে দেব না।” একটুখানি থামিয়া কহিল, “সত্যি বল্‌চি তোমাকে, এ মেয়ে ভাল নয় বলেই আমার আপত্তি, নইলে”—“নইলে কি?” “নইলে আবার কি! তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি খুঁজে বার কোরে তবে এ কথার উত্তর দেব—এখন নয়।”

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, “তুমি মিথ্যে চেষ্টা কোরো না, রাজলক্ষ্মী, আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি কোন দিন খুঁজে বার করতে পারবে না।” সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “আচ্ছা, সে না হয় নাই পারব; কিন্তু তুমি বর্ম্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেবে?” তাহার প্রস্তাব শুনিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম। কহিলাম, “আমার সঙ্গে যেতে তোমার সাহস হবে?”

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল—“সাহস! এ কি একটা শক্ত কথা ব'লে তুমি মনে কর?” “আমি যাই করি, কিন্তু, তোমার এই সমস্ত বাড়ীঘর, জিনিসপত্র, বিষয়-আশয়—তার কি হবে?”

পিয়ারী কহিল, “যা' ইচ্ছে তা হোক্‌। তোমাকে চাকরি করবার জন্যে যখন এত দূরে যেতে হ'ল, এত থাকতেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বন্ধুকে দিয়ে যাবো।”

এ কথার জবাব দিতে পারিলাম না। খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। সে পুনরায় কহিল, “অত দূরে না গেলেই কি নয়? এ সব তোমার কি কোন দিন কোন কাজেই লাগ্‌তে পারে না?”

বলিলাম, “না, কোন দিন নয়।”

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “সে আমি জানি। কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে?” বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে-ধীরে আবার তাহার হাতখানা রাখিল। একদিন এই পিয়ারীই আমাকে যখন তাহার বাড়ী হইতে একরকম জোর করিয়াই বিদায় করিয়াছিল, সে দিন তাহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও মনের জোর দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গিয়াছিলাম। আজ তাহারই আবার এত বড় দুর্ব্বলতা, এই করুণ কণ্ঠের সকাতর মিনতি, সমস্ত একসঙ্গে মনে করিয়া আমার বুক ফাটিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, “তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিনে বটে, কিন্তু যখনি ডাকবে, তখনি ফিরে আস্‌ব। যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাক্‌ব, রাজলক্ষ্মী।”

“এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাক্‌বে?” “হাঁ, চিরদিন থাক্‌ব।” “তা' হলে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল?”

“না। তার কারণ, তোমার অমতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে আমার কোন দিন প্রবৃত্তি হবে না।”

পিয়ারী অপলক-চক্ষে কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পরে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া, বড়-বড় ফোঁটা গাল বহিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, “এই হত-ভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাক্‌বে?”

বলিলাম, “তা' আমি থাক্‌ব। তোমার কাছে যে জিনিস আমি পেয়েছি, তার বদলে সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা আমার লোকসান নয়;—যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোন দিন অবিশ্বাস কোরো না।” পলকের জন্য দুজনের চোখেচাখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া-কাঁপিয়া, ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া চহিলাম। সমস্ত বাড়ীটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের নিত্য-সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুক-ফাটা অভিনয় যেন আজ নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে!

(ক্রমশঃ)

বিষ্ণুপুর-বিবরণ

[শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় বিত্থানন্দ বি-এ]

সেই বন বিষ্ণুপুরের কথা বলিতেছি। বন বিষ্ণুপুরের বর্ত্তমান নাম শুধু বিষ্ণুপুর; কিন্তু ইহার প্রাকৃতিক বন্য-ভাব এখনও বিদূরিত হয় নাই। বঙ্গদেশ হইতে নির্গত হইয়া যে প্রাচীন বন্য-বর্ত্ম ছোটনাগপুরের জঙ্গল অতিক্রম পূর্ব্বক সুদূর দণ্ডকারণ্যে রামসীতার কুটীর অন্বেষণে ধাবিত হইয়াছে, সেই বিষ্ণুপুরী রাস্তার উভয় পার্শ্বে শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন বনের কর্ত্তিতাবশেষ অদ্যাপি রক্তবীজের ন্যায় মাথা উত্তোলন করিয়া পথিকদের ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। হুগলীর পর বাকুড়া জেলার কোতুলপুর পর্য্যন্ত সম্প্রতি লোকালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও, তার পর জয়পুর থানা হইতে পশ্চিমদিকে হাঁটা-পথে, এবং শালবনি, গড়বেতা প্রভৃতি ষ্টেসন হইতে উত্তরদিকে রেলপথে, যতই বিষ্ণুপুরের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই শালবন ও গড়জঙ্গলের নিবিড়তায় প্রচণ্ড বন্যমূর্ত্তি প্রকটিত।

এই আরণ্য-প্রদেশের প্রাচীন নাম মল্ল-ভূমি। এককালে মল্লভূমি উত্তরে সাঁওতাল-পরগণা, দক্ষিণে মেদিনীপুর ও পশ্চিমে ধলভূম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মল্লবিদ্যাপরায়ণ এক ক্ষত্রিয় বীরবংশ সিংহ পরাক্রমে এই ভূখণ্ড প্রায় সহস্র বৎসর স্বাধীনভাবে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই 'মল্ল' এবং কেহ কেহ" বীর" উপাধি-ধারী ছিলেন। মুসলমান-প্রভাব-সময়ে স্বাধীনতার অবসানে করদ রাজগণ সিংহ উপাধি ধারণ করেন। মল্লরাজগণের উপাধি হইতে মল্লভূম নামের উৎপত্তি। বীরভূম সম্বন্ধেও সেইরূপ অনুমান হয়। মল্লভূম বা মালভূমের পশ্চিমাংশ এখন মানভূমে পরিণত। এদেশে 'ল' এবং 'ন'এর উচ্চারণ-বিপর্য্যয় সর্ব্বজন-বিদিত।

মল্লবংশের প্রথম রাজা আদিমল্ল। অনুমান ৬৯৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তখন মুসলমানদের নামগন্ধ এদেশে প্রবেশ করে নাই। আদিমল্লের জন্ম ও রাজত্বের উপাখ্যান পরে বলিতেছি। তাঁহার প্রায় পঞ্চাশ-পুরুষ অধস্তন রাজা সুপ্রসিদ্ধ বীর হাম্বিরের রাজত্বকালে, ইং ১৫৭২ অব্দে, বিষ্ণুপুরের অরণ্যে এক সাহিত্যিক দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। রক্ষক-পরিবৃত শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে গৌড়বাসীদের জন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলীর এক সুধাভাণ্ড লইয়া এই পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। মল্লরাজের নিযুক্ত দৈত্যোপম দস্যুদল হঠাৎ সেই সুধাভাণ্ড বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল! শ্রীবৃন্দাবন হইতে বহু নদ-নদী, গিরিবন নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রমের পর, অবশেষে স্বদেশের দ্বারে পঁহুছিলে অমূল্য গ্রন্থরত্নরাজি অপহৃত হইল! আচার্য্য প্রভুর হাহাকার ও অশ্রুজল এবং বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস কবিরাজের অনাহারমৃত্যু সমগ্র মল্লভূমির উপর কলঙ্ক লেপন করিয়া দিল। তদবধি বিষ্ণুপুরের অসভ্য "বুনো" নাম এবং মল্লরাজবংশ জাতিতে মাল বা বাগ্দি ও উহাদের ব্যবসায় তস্করবৃত্তি, এই অখ্যাতি মুখে-মুখে রটিত ও সমর্থিত হইয়া গেল। মহারাজ বীর হাম্বির অগৌণে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ ও অপহৃত গ্রন্থাবলী প্রত্যর্পণ করিয়া কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছিলেন। এতকাল পরে সম্প্রতি বোধ হয় সেই আরব্ধ প্রায়শ্চিত্ত উদ্‌যাপিত হইয়া গেল। কারণ তাঁহার প্রিয় মল্লভূমি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের হস্তে ইদানীং যত রাশি-রাশি প্রাচীন বাঙ্গলা লুপ্ত পুঁথি অর্পণ করিয়াছে ও করিতেছে, বঙ্গের অন্যান্য জেলাসমূহ একত্র তাহার অর্দ্ধাংশও প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। এ কথার প্রমাণ-স্বরূপ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দীনেশ বাবুর সংগ্রহ, বিশ্বকোষের নগেন্দ্র বাবুর পুস্তকালয় এবং সাহিত্যামোদী অর্থদক্ষ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের পুরাতন পুঁথির গুদাম পরীক্ষা করিলেই যাথার্থ্য নির্ণীত হইতে পারিবে।*

আর এক হিসাবেও সাহিত্যক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের স্থান অদ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রামের রামাই পণ্ডিত প্রণীত ধর্ম্মপূজা বা শূন্যপুরাণ অপেক্ষা প্রাচীনতর প্রকৃত (প্রাকৃত নহে) বাঙ্গালা গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। উহা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লিখিত। বিষ্ণুপুরের অন্যতম গৌরব এই যে দেশ-বিশ্রুত গণিতাচার্য্য শুভঙ্কর মল্লরাজের রাজস্ব-সচীব ছিলেন; যাঁহার আর্য্যার ইঙ্গিতে অদ্যাপি সারা বঙ্গের গ্রাম্য বাজার-হিসাব নিমিষে নিয়মিত হইতেছে।

আদিমল্ল

আদিমল্লের প্রকৃত নাম গোপাল। কোতুলপুর থানার আড়াই ক্রোশ পূর্ব্বে লাউগ্রাম। লাউগ্রামে পঞ্চানন (কেহ বলেন রামরুদ্র) ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বাস করিতেন। রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরনিবাসী চৌহানবংশীয় ক্ষত্রিয়কুমার রঘুবর সিংহ সস্ত্রীক নানা তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। দ্বারকেশ্বর নদ উত্তীর্ণ হইয়া তিনি লাউগ্রামের পথে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছিলেন। আসন্নপ্রসবা পত্নীর প্রসববেদনা উপস্থিত হওয়াতে রঘুবর উক্ত পঞ্চাননের আলয়ে অতিথি হইলেন। ভট্টাচার্য্য-ভবনের গোশালায় তাঁহার পুত্র গোপালের জন্ম

---

* এই সেইদিনও রাজকার্য্যে আসিয়া কয়েক সপ্তাহের ভিতর শ্রীমান্ সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় এম্-এ, সবডেপুটী কালেক্টার লেখকের সন্ধানক্রমে দুই তিন গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

বিষ্ণুপুর টাউন

হয়। সূতিকাগারেই প্রসূতির মৃত্যু হইল। পত্নীশোকে মুহ্যমান রঘুবরও ক্ষিপ্তের ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। ধর্ম্মপত্নী সঙ্গে করিয়া শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম দর্শন অশেষ পুণ্যজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু তীর্থযাত্রায় বহির্গমনের পর সহধর্ম্মিণীর গর্ভসঞ্চার বোধ হয় শুভসূচক নহে। সেই কারণেই শ্রীক্ষেত্রের আদি মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচলে নীলমণির দর্শন সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ইহা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

নবজাত ক্ষত্রিয়কুমার বাগ্দিজাতীয়া ধাত্রীর স্তন্যদুগ্ধে ভট্টাচার্য্যালয়ে

যুদ্ধে প্রদ্যুম্নরাজ সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া এক জলাশয়ের জলে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। এই সরোবরের আধুনিক নাম কানাই সায়ের। পরবর্ত্তী কালে এই স্থানে এক দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। সেই জীর্ণমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ভিতর বহু অতীত স্মৃতি সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

সাঁওতালি 'ছাতা পরব'।

যুদ্ধজয়ের পর গোপাল মল্ল মৃত রাজার অনূঢ়া কন্যা প্রভাবতী দেবীর

জোড় বাঙ্গালা

পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক মহাসমারোহে ইন্দ্রপূজা সম্পন্ন করিয়া প্রদ্যুম্নপুরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। সেইদিন ভাদ্রমাসের শ্রবণা নক্ষত্র-যুক্তা শুক্লা দ্বাদশী ও শক্রোত্থান পর্ব্ব ছিল। তদবধি এখনও বিষ্ণুপুরে প্রতি বৎসর উক্ত তিথিতে রাজ্যাভিষেকসূচক ইন্দ্রপূজার বিশেষ অনুষ্ঠান হইতেছে। পূজার প্রাঙ্গণে এক অত্যুচ্চ বংশদণ্ড প্রোথিত হয়। উহার অগ্রচূড়ায় আবদ্ধ, আকাশমার্গে বিস্তৃত এক অপূর্ব্ব তালপত্রের রাজছত্র উর্দ্ধমুখ দর্শকবৃন্দের কৌতূহল উদ্দীপন করিয়া থাকে। সাঁওতাল সৈন্যের সাহায্যে রাজত্ব লাভ হইয়াছিল, এইজন্য এই বার্ষিক উৎসবের দিবস বহু-দূরাগত সহস্রাধিক মদমত্ত সাঁওতাল নরনারীর নৃত্যগীত ও দামামা ধ্বনিতে বিষ্ণুপুরের দিগন্ত কম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। ইহাই সাঁওতাল জাতির ছাতা পরবের (ছত্র-পর্ব্ব) ইতিহাস। বর্ত্তমান আবকারী আইনের কঠোর নির্দ্দেশে সাঁওতালগণও শুঁড়ির দোকান হইতে পাঁচুই মদ কিনিয়া খাইতে বাধ্য, ঘরে প্রস্তুত করিতে পারে না। কিন্তু ছাতা-পরবের সময় সর্ব্বত্রই এই নিষেধবিধি কিছুদিনের জন্য তুলিয়া রাখিতে হয়।

জয়পুর ও বিষ্ণুপুর।

প্রদ্যুম্নপুর বা পদুমপুরের দক্ষিণাংশের নাম জয়পুর। জয়পুরে এখন পুলিস ষ্টেসন বসিয়াছে। গোপাল মল্ল তাঁহার পিতা রঘুবরের অন্বেষণে রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যে লোক পাঠাইয়াছিলেন। সংবাদ পাইয়া রঘুবরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও আত্মীয় স্বজন প্রদ্যুম্নপুরে আগমন করেন। তাঁহাদের আবাসস্থল জয়পুর নামে অভিহিত হয়। রাজধানীর পূর্ব্বদিকসংলগ্ন জনপদের বর্ত্তমান নাম রাজসোল। "সোল" শব্দ এ অঞ্চলে বহু বিশিষ্ট গ্রামের নামের সহিত যুক্ত আছে। দামোদরের উত্তরেও সোলের ছড়াছড়ি। আসানসোল, সিহাড়সোল ইত্যাদি।

প্রদ্যুম্নপুরের চারি ক্রোশ পশ্চিমে বীরনদীর তীরে বিষ্ণুপুর। বীরনদীর আধুনিক নাম বিড়াই, ইহা দ্বারকেশ্বরেরই শাখা। গোপাল মল্ল বীরনদীতীরবর্ত্তী মুনিমনোরম অরণ্যে প্রায়ই মৃগয়া করিতে আসিতেন। কিন্তু এ স্থানের সামান্য বন্য বরাহের সন্ধানেও তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইত। একদা তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, এক বৃহৎ শ্যেনপক্ষী বৃক্ষশাখায় উপাসীন এক ক্ষুদ্র বকের চঞ্চু আস্ফালনেই ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তখন রাজার জ্ঞান হইল, শঙ্করের কণ্ঠস্থিত সর্প ও গরুড়ের প্রতি গর্জ্জন করিয়াছিল। তিনি এই স্থানের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া প্রদ্যুম্নপুর হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। স্বীয় প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের নামানুসারে নূতন রাজধানীর বিষ্ণুপুর নামকরণ হইল। কিল্লার জঙ্গলের ভিতর সেই বকবৃক্ষটির প্রতি এখনও অনেকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিস্ময়ের কথা কি? কারণ, শ্রীক্ষেত্রে শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে প্রলয় কালের সেই অক্ষয় বট এখনও বিদ্যমান, মার্কণ্ডেয় মুনি ভাসিতে-ভাসিতে যাহার অগ্রশাখা ধরিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকেলিকদম্ব বৃক্ষটিও হ্রাস-বৃদ্ধিহীন, অজর, অমর।

বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপনের বৎসর হইতে মল্লরাজ্যে এক স্বতন্ত্র সনের গণনা আরম্ভ হয়। তাহার নাম মল্লাব্দ। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১৩২৮ সনে মল্লাব্দ ১২২৩ সন। দুই সনে প্রভেদ ১০১ বৎসর। ইং ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে গোপাল মল্ল বিষ্ণুপুরে আগমন করেন।

রাজা গোপালমল্ল পরবর্ত্তীকালে আদিমল্ল নামে পরিচিত হন। তিনি বৃত্তিদানের সনন্দপত্রে দেবনাগর অক্ষরে "গোপাল দেবস্য"

এইরূপ স্বাক্ষর করিতেন। আদিপুরুষের অনুসরণ ক্রমে পরবর্ত্তী মল্লরাজগণও তাঁহাদের বৃত্তি-প্রদান-পত্রের শিরোদেশে "গোপাল দেবস্য" কথাটি অঙ্কিত করিতেন।

আদিমল্ল ধরাপাট, মালিয়াড়া ও সাঞ্চার জোড়ার রাজাদিগকে পরাজিত করেন। গড়বেতার রাজা বাহাদুর সিংহ বিনা যুদ্ধেই বশ্যতা স্বীকার করেন। দক্ষিণ দেশে আদিমল্ল তাঁহার পিতৃব্য পুত্র মেদিনামল্লকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন যে, মেদিনীমল্লের নাম হইতে মেদিনীপুর নামের উৎপত্তি। কিন্তু এ বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা সেদিন মেদিনীপুরে বলিয়াছেন, বা পরে বলিবেন, তাহার উপর আর আমাদের কথা নাই।

সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্ষীরোদ বাবু রঞ্জাবতী নাটকে অনায়াসে পালিত প্রথম মল্লরাজের নাম বীরমল্ল রাখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, নাটোল্লিখিত বিবরণ সকলই কল্পনামিশ্রিত। শ্রীশ্রীমদনমোহনের 'দলমাদল' কামানে তোপ দাগা বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী ঘটনা।

আদিমল্লের পর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ৪৮ জন মল্ল নরপতি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাজত্ব করেন। ইঁহারা অনেকেই চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী ভৌমিকদের সহিত সতত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। চতুষ্পাঠী স্থাপন ও লোকহিতকর কার্য্যেরও অভাব ছিল না। রেণু, বেণু, কানু, কনক, কন্দর্প, কুমুদ, কৃষ্ণ প্রভৃতি মিষ্টি নামধারী নৃমণিগণ যেমন ধনু-শরে প্রীতিপরায়ণ থাকিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় তনুত্যাগ করেন, তেমনই কমঠ-কঠোর কাউ, ঝাউ, খড়্গ, ঝাঁপ, খট্টার, ধাড়ি প্রভৃতি ভুজঙ্গ নামধারী মল্লাধিপেরা মন্দির ও জলাশয় প্রতিষ্ঠারূপ বহু কীর্ত্তি ভূতলে ফেলিয়া রাখিয়া ঊর্দ্ধলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। সকলের নামাবলী কীর্ত্তন করিবার অবসর নাই। খড়্গপুর রেলষ্টেশন রাজা খড়্গমল্লের (ইং ৮৪১-৮৬৯) নাম ধারণ করিতেছে। ইং ১০০৬ সনে মহারাজ জগৎমল্ল মল্লেশ্বর শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। তখন মল্লরাজগণ শক্তির উপাসক ও শৈব ছিলেন। সহরের ভট্টাচার্য্য পল্লীতে এই মন্দির অবস্থিত। ইহা বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম মন্দির। বীর হাম্বিরের পুত্র ধাড়ি হাম্বির ইং ১৬৬২ সনে মন্দিরের বিশেষ সংস্কার করেন। তার পর আধুনিক সংস্কারকগণ নির্ব্বুদ্ধিক্রমে ইহার উপর বালির আস্তর দিয়া মৌলিক সৌন্দর্য্য আবৃত করিয়া ফেলিয়াছেন।

বিষ্ণুপুর পোকা বাঁধ

মল্লেশ্বর শিবমন্দির।

সারেশ্বর শিবমন্দির ৬৪১ মল্লাব্দ বা ১৩৩৫ ইং সনে নির্ম্মিত হয়। ইহা বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী। প্রতি বৎসর বারুণীস্নান উপলক্ষে চৈত্রমাসে এখানে সপ্তদিবসব্যাপী মেলার অধিবেশন হয়। বাঁকুড়া কালেক্টরীর কোনও পুরাতন দপ্তরে প্রকাশ যে, পূর্ব্বোক্ত মহারাজ জগৎমল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুর স্বর্গের ইন্দ্রভবন অপেক্ষাও অধিকতর সৌন্দর্য্যময় ছিল। কবি তাঁহার বর্ণনায় কোন কথা বলিতে বাকী রাখেন নাই। প্রস্তরগ্রথিত সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী, বিদ্যাভবন, পান্থশালা, অতিথিনিকেতন, প্রেক্ষাগৃহ, সজ্জালয়, ধনাগার, অস্ত্রশালা, সেনানিবাস, শস্যভাণ্ডার, প্রশস্ত বর্ত্ম, সুসজ্জিত বিপণি, রাজপ্রাসাদ, দেবমন্দির,

স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা, উদ্যানবাটিকা, বিরামকুঞ্জ প্রভৃতি স্বর্গে যাইয়া কবি যাহা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাও বিষ্ণুপুরে বেশী দেখিয়াছিলেন।

রাজা গোপমল্ল (ইং ১১০০ সন) বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি বল্লালসেন কৃত দানসাগর গ্রন্থের অনুবাদ করেন—এরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অনুবাদগ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। রাজা শিবমল্ল (ইং ১৩৭২-১৩৯৭) সঙ্গীত বিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। তাহার সময় হইতেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যার পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পশ্চিম দেশীয় বহু কালোয়াত, গায়ক ও বাদক ইহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন। আধুনিক বহু সঙ্গীতাচার্য্যের আদি নিবাস বিষ্ণুপুর। বৃদ্ধেরা বলেন শিবমল্ল বা শিবসিংহের রচিত অনেক পদাবলী আছে।

মহারাজ চন্দ্রমল্ল ৪৬ সংখ্যক নরপতি। ইহার রাজত্বকাল ইং ১৪৬০-১৫০১। কচিয়াকোলের নিকটবর্ত্তী গোকুলনগরের গোবিন্দচন্দ্র জীউর প্রস্তরময় ঠাকুরবাটী ইহার নির্ম্মিত। চন্দ্রমল্ল জয়রামপুরের গহন বন কর্ত্তন করিয়া বহু জনপদ স্থাপন করেন। চন্দ্রপুর গ্রাম তাহার মধ্যে অন্যতম। ঐ স্থানে তাহার বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দমনমল্ল পাত্রসায়ের অঞ্চলে গমন করিয়া চন্দ্রপুরে এক কিল্লা নির্ম্মাণ করেন। চন্দ্রপুরে দমনিগড় ও দমন দীঘি এখনও দমনমল্লের নাম জাগরূক রাখিয়াছে।
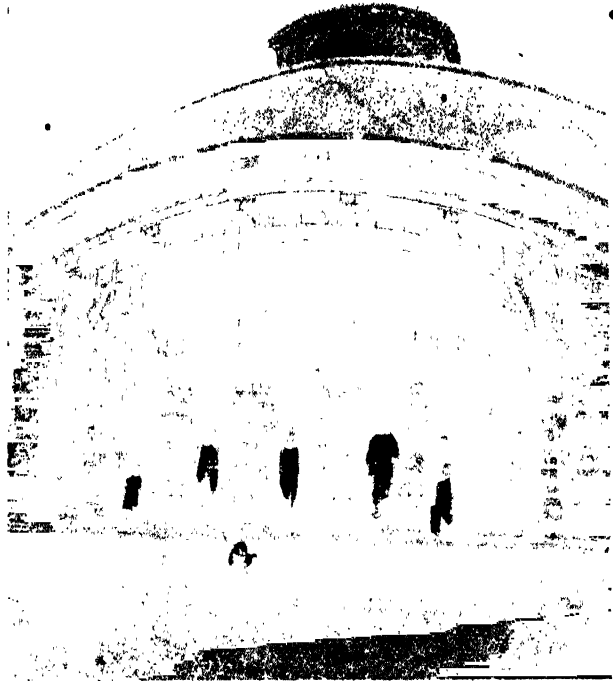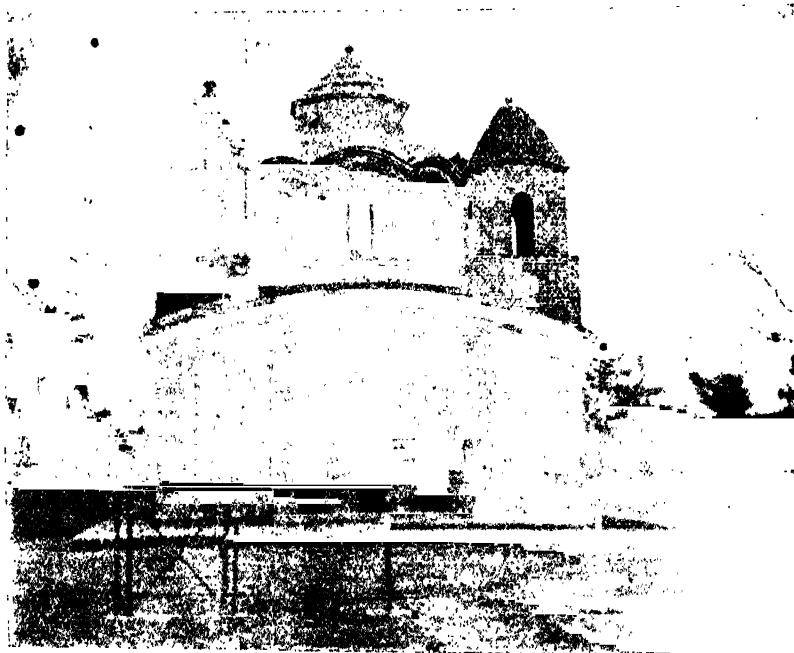
জোড় বাঙ্গালার সম্মুখভাগ

শ্যামরায় মন্দির

বীর হাম্বিরের "মুণ্ডমালা।"

আমরা এখন চন্দ্রমল্লের প্রপৌত্র প্রথিতনামা বীর হাম্বিরের রাজত্ব-কালে (ইং ১৫৩৬-১৬২১) প্রবেশ করিতেছি। বৈষ্ণব-সাহিত্যের আলোকবর্ত্তিকা ইহার রাজত্বের দ্বিতীয়ার্দ্ধে আমাদের পথপ্রদর্শক। যে বৎসর মহাপ্রভুর তিরোধান হয়, সেই ইং ১৫৩৩ সনে হাম্বিরমল্লের জন্ম হয়। ইনি মোগলসম্রাট আকবরের সম-সাময়িক। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে তিনি অতি পরাক্রান্ত বীরাচারী বীর ছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি পিতৃব্যপুত্র বার হাজার পরগণার কৃষ্ণমল্লকে বিশেষরূপে দমন করেন। কৃষ্ণমল্ল পিতৃশ্রাদ্ধের অবসরে স্বয়ং রাজা খেতাবের সহিমোহরযুক্ত নিমন্ত্রণপত্র প্রচারিত করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। অতঃপর যে পাঠানরাজের সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যার দেবমন্দির ধ্বংস করে, সেই গৌড়বঙ্গাধিপতি সোলেমানের দুর্দ্ধর্ষ পুত্র দাউদ খাঁ মল্লগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে, সসৈন্যে বহু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকের পথ দিয়া অতর্কিতভাবে বিষ্ণুপুরের দ্বারে উপনীত হন। পাঠানেরা প্রথমতঃ রাজধানীর ৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে রাণীসাগর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। হাম্বিরমল্ল দক্ষিণে যমুনা ও কালিন্দী বাঁধের পশ্চিমদিকে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহারই কৌশলক্রমে পাঠান সৈন্য ক্রমশঃ উত্তর হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া চাকদহের মাঠে উপস্থিত হয়। তখন রাজধানীর উত্তর দুর্গ প্রাকাররক্ষিত অসংখ্য মল্লসৈন্যের তীর ও গোলা বর্ষণে পাঠান সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু উত্তর দ্বারকেশ্বর নদ পলায়নের পথ রোধ করিল। অসংখ্য পাঠান সৈন্য মল্ল অশ্বারোহীদের ভল্ল ও অসির আঘাতে ছিন্নমুণ্ড হইয়া ধরাশায়ী হইল। পাঠানদের ছিন্নমুণ্ডে চাকদহের রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইয়াছিল। মল্লরাজ রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত মৃন্ময়ী দেবীকে মুণ্ডমালা উপহার দেন। এখনও চাকদহ গ্রাম "মুণ্ডমালা" নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া হাম্বিরমল্ল বীর উপাধি অর্জ্জন করিলেন।

সাঁওতাল বাগ্দী গয়লা, কৈবর্ত্ত, সদগোপ প্রভৃতি বহু জাতি মল্ল সৈন্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। বনবিষ্ণুপুরে গয়লা প্রভৃতি জাতির উপাধির মধ্যে আজিও বন্যভাব বর্ত্তমান। যথা কাবর, কাপুড়ি, কিং, কোলে, ঘাঘরা, গুহ, পুসু, ঘর, মাকড়, মাছুর, মালস, পালুই, পৈ, পৌলিক ধ, দিয়াসি, বাগ, বাগালে, বিট, বুট, আদব, আগু, লাড়ু, কাঁটাল, চড়চড়ি, দণ্ডপাট, শ্যাম, সু ইত্যাদি।

রাজধানীর ভিতর কিল্লার সুবৃহৎ প্রস্তরময় উত্তরদ্বার বীর হাম্বিরের নির্ম্মিত। ইহার উপর হইতে অসংখ্য তীর ও গোলা বর্ষণের স্থান আছে। এখন এই দুর্গ তোরণ পাথর দরজা নামে খ্যাত।

বৈষ্ণব ধর্ম্মে বীর্য্যনাশ।

বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষালাভের পর পাঠানবিজয়ী বীর হাম্বির যখন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পানে বিভোর হইয়া বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় একান্ত নিবিষ্ট, সেই সময় নূতন বাদশাহ জিগীষু জাহাঙ্গির সহসা বিষ্ণুপুরের প্রতি নেত্রপাত করিলেন। বৃদ্ধ ভক্ত কবি হাম্বির বিনাযুদ্ধেই সম্রাট সদনে বার্ষিক একলক্ষ সাত হাজার মুদ্রা কর প্রদানে সম্মত হইলেন। তদবধি বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা লুপ্ত হইল; মল্লভূমি করদরাজ্য ও পরে পরগণায় পরিগণিত হইল। আচার্য্য প্রভুর কৃপায় এই সময় বিষ্ণুপুরের বিপিনে শ্যামের বাঁশরী বাজিয়া উঠিয়াছিল। আচার্য্য প্রভুর আহ্বানে রাজকুমার নরোত্তম, কবিরাজ রামচন্দ্র বিষ্ণুপুরে আগমন করিয়া নৃত্য কীর্ত্তন সমারোহে খেতরীর মহোৎসবের পুনরভিনয় করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের নরনারী অবিরল প্রেমাশ্রু-সলিলে বিগলিত, রাজা প্রজা বিষয় ও রক্তের প্রতি 'পরম বিরক্ত'। সুতরাং যুদ্ধের প্রসঙ্গও হইল না। মোগল সৈন্য অর্দ্ধপথ হইতে বিপুল সেলাম লইয়া ফিরিয়া গেল। এতাবৎ কাল বিশাল দ্বারকেশ্বর, গহন অরণ্য ও সর্ব্বোপরি মল্লবীরদের বাহুবল একত্র মিলিয়া বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা গৌরব রক্ষা করিয়াছিল।

মণিমঞ্জুষা হরণ।

রাজা ও দস্যুতে প্রভেদ নাই, এই কথা একজন দস্যু দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের মুখের উপর শুনাইয়া দিয়াছিল। প্রথম বয়সে হাম্বির
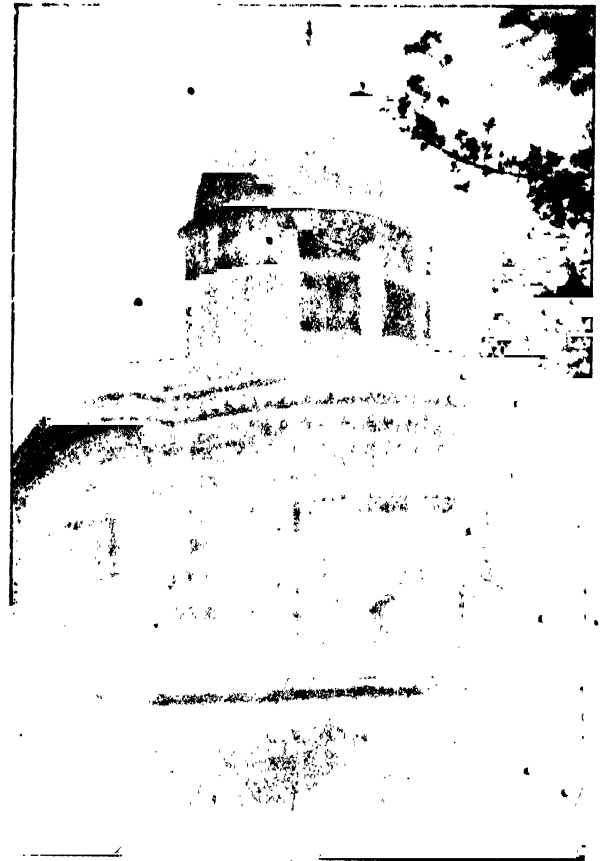
লালজীর মন্দির

যেন তেন প্রকারেণ রাজকোষ পূর্ণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বৈষ্ণব সংস্পর্শে আসিয়া এই দুর্দ্দান্ত ও কঠোর পুরুষের জীবনস্রোত সহসা সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়া যায়।

সিন্দূরলিপ্ত সিন্দুক, তোরঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা গো শকট বোঝাই করিয়া শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ বনপথে গৌড়ে আসিতেছেন। সঙ্গে অনেক ব্রজবাসী লাঠিয়াল। পথিকেরা সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছে—"মহাশয়, গাড়ীতে কি আছে, এবং আপনারা কোথায় যাইবেন।" অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে ভক্তি বিহ্বল

দলমাদল কামান

বাগবাজার—মদনমোহনের মন্দির

শ্রীনিবাস গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতেছেন, "ভাই সব, গাড়ী অমূল্য রত্নে পূর্ণ, এ সব রত্নের তুলনা নাই ; কোথায় যাইব বলিতে পারি না, প্রভুর ইচ্ছা।" সুতরাং,

"সর্ব্বত্র হইল ধ্বনি এক মহাজন।
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহু ধন॥"

তখনকার দিনে পশ্চিম দেশ হইতে অনেক ছদ্মবেশী রাজা-মহারাজা মণিমাণিক্য জহরত সঙ্গে লইয়া আসিয়া, তাহা প্রভু জগন্নাথের শ্রীচরণে ঢালিয়া দিয়া রাজ-জন্ম সার্থক করিবার আশায় পদব্রজে শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিতেন। হাম্বিরের নিযুক্ত দস্যুগণ মালিয়াড়া পরগণার জঙ্গলে প্রথমে তামড় গ্রামে, তার পর রঘুনাথপুরে গাড়ী লুণ্ঠন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অবশেষে তাহারা গোপালপুর গ্রামের এক চটিতে রাত্রিযোগে শকটস্থিত মণি মঞ্জুষা অপহরণ করিয়া অন্তর্হিত হইল। এই গ্রামগুলি সোণামুখী হইতে উত্তরপশ্চিমে এবং দামোদরের দক্ষিণে অবস্থিত। নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে বিদায় দিয়া গ্রন্থশোকে উন্মত্তপ্রায় শ্রীনিবাস কিছুদিন পরে বিষ্ণুপুরে রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে আসিলেন। তিনি জানিতেন না, রক্ষকই ভক্ষক।

রায়কেশরের দক্ষিণ তীরে দেউলি গ্রাম—এখন মধ্যে খালমহাল। এই গ্রামনিবাসী কৃষ্ণবল্লভ নামক এক ব্রাহ্মণ-তনয় আচার্য্য প্রভুকে বিষ্ণুপুর রাজসভায় লইয়া গেলেন। গ্রন্থলাভ এবং রাজা ও রাজমন্ত্রীদের যুগল-মন্ত্র দান প্রভৃতি বিষয় নরোত্তম বিলাস ও বিশেষতঃ ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে * সবিস্তার বর্ণিত আছে। দলে দলে বিষ্ণুপুরবাসীদের দীক্ষাগ্রহণ ও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ধুম লাগিয়া গেল। সভাপণ্ডিত ব্যাস চক্রবর্ত্তীর তত্ত্বাবধানে বহু সংস্কৃতবিৎ লেখক দ্বারা সমগ্র গ্রন্থাবলীর বহুসংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়া নানাস্থানে প্রচারিত হইল। গুরু-দক্ষিণাস্বরূপ গুরুভার দ্রব্যসম্ভার ও বস্ত্রালঙ্কার সঙ্গে লইয়া আচার্য্য-প্রভু যাজিগ্রামে যাত্রা করিলেন।

আচার্য্য-প্রভুকে অনেকবার যাজিগ্রাম হইতে বিষ্ণুপুরে শিষ্য-গৃহে যাতায়াত করিতে হইয়াছিল। একবার গুরুর সহিত ভক্ত হাম্বির বৃন্দাবনে গমন করেন। প্রত্যাগমনের পর শ্রীবৃন্দাবনের অনুকরণে তিনি রাজধানীতে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, তাল তমাল ও ভাণ্ডীর বন স্থাপন করিলেন। বিখ্যাত যমুনা ও কালিন্দী বাঁধ তাঁহারই খাত। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী মথুরা, দ্বারকা, গোকুলনগর প্রভৃতি জনপদগুলি তাঁহারই কল্পিত। তিনি বিষ্ণুপুরকে "গুপ্তবৃন্দাবন" নামে অভিহিত করেন। গিরি গোবর্দ্ধনের অনুকরণে তিনি এক মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। ইহা এখন রাসমঞ্চ নামে পরিচিত।

শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ।

বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম দিনে গত পহেলা বৈশাখে কলিকাতাবাসিগণ এই ভীষণ সমরে সম্রাটের বিজয়-কামনায়,—উত্তরে বাগবাজারের মদন-মোহন মন্দিরে এবং দক্ষিণে কালীঘাটের কালীমাতার প্রাঙ্গণে কাতর প্রার্থনা করিয়া বিরাট সঙ্কীর্ত্তনসহ বীডন উদ্যানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের মল্লকুলদেবতা শ্রীশ্রীমদনমোহন ঘটনাচক্রে কলিকাতায় বিরাজ করিতেছেন। মদনমোহন-বিগ্রহ রাজা বীর হাম্বিরের প্রতিষ্ঠিত। দিগ্বিজয়ী দস্যু হাম্বির গ্রন্থরত্ন অপহরণ করিয়াছিলেন। আবার এই মদনমোহনের ইতিহাসেও ভক্ত হাম্বিরের হরণ-কলঙ্ক বিদ্যমান। এবার অপহরণের মূলে ভক্তি; সুতরাং স্বপ্নাদেশের শুভ্র আবরণ দ্বারা কলঙ্ক-গোপনের চেষ্টা হইয়াছে। শ্রীনিবাস প্রভুর মাতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পাইয়া মল্লরাজা যাজিগ্রামে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে একদিবস তাঁহাকে বীরভুম পরগণার বৃষভানুপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়া রাত্রিযাপন করিতে হইল। ব্রাহ্মণের আলয়ে শ্রীশ্রীজিউ ও রাধারাণীর আরতি দর্শনের অবসরে তিনি বিগ্রহ-যুগলের রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। রাত্রে শ্রীমদনমোহন রাজার প্রতি স্বপ্নে আদেশ করিলেন, তুমি যাজিগ্রাম হইতে প্রত্যাগমনের পথে আমাকে গোপনে বিষ্ণুপুরে লইয়া যাইবে। আমি তোমার সঙ্গে একাকী যাইব, শ্রীমতী কিশোরী এই গৃহেই থাকিবেন। যেমন আদেশ, তেমন কাজ। বিগ্রহ-হরণের পরদিন গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় বিষ্ণুপুরে ছুটিয়া গেলেন। মল্লরাজ মদনমোহনের অবিকল অন্য এক মূর্ত্তি গঠন করাইয়া ব্রাহ্মণকে ভুলাইতে বৃথা চেষ্টা করিলেন। সকল মূর্ত্তিতে সেরূপ স্বর্গীয় অঙ্গ-সৌরভ হইবে কেন? অগত্যা মদনমোহন ব্রাহ্মণের প্রতিও স্বপ্নাদেশ করিলেন, আমি দিবসে বিষ্ণুপুর রাজভবনে যতকাল ইচ্ছা থাকিব; কিন্তু প্রতিদিন তোমার আলয়ে গিয়া শ্রীকিশোরীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করিব। আর উপায় নাই, ব্রাহ্মণ গৃহে আসিয়া কিশোরী ঠাকুরাণীর সেবা-পূজায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন।

দেড়শত বৎসর মল্লরাজভবনে অবস্থিতি করিয়া মল্লরাজ-বংশের পতন সময়ে মদনমোহন জীউ বিষ্ণুপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গোকুল মিত্রের গৃহে আগমন করেন। সে দুঃখের কাহিনী শেষ রাজা চৈতন্যসিংহের উপন্যাসে লিখিত হইবে। গোকুলভবন হইতে তিনি কি হাম্বিরের গুপ্ত-বৃন্দাবন বিষ্ণুপুরের বনে আর ফিরিবেন?

শ্রীগুরু বন্ধন

গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামের বাটীতে স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বিষ্ণুপুরে গতিবিধির হ্রাস হইয়াছে। এখন তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। অনেক অনুনয় করিলেও গুরুদেব বিষ্ণুপুরে পদার্পণ করেন না। মল্লরাজ চিন্তিত হইলেন, বিষ্ণুপুরের প্রতি গুরুদেবের অনুরাগ কামনা করিয়া, তিনি নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে বৃদ্ধ আচার্য্য প্রভুকে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিষ্ণুপুরে আনয়ন করিলেন। পশ্চিম-গোপালপুরনিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে গোপনে পরামর্শ চলিতে লাগিল। রঘুনাথের দ্বাদশবর্ষীয়া পরমাসুন্দরী কন্যা স্ফুরৎ-যৌবনা পদ্মাবতী দেবী পূর্ব্ব-শিক্ষামতে সহসা বৃদ্ধের গলে বরমাল্য প্রদান করিয়া ফেলিলেন! আর উদ্ধার নাই, পরদিবসই সুতহিবুক যোগে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। এই গুরু-বন্ধনে পড়িয়া শ্রীগুরুকে বিষ্ণুপুরে ঘন-ঘন যাতায়াত করিতে হইত।

আচার্য্য প্রভুর ৭২ বৎসর বয়সে এই দ্বিতীয়া পত্নী পদ্মাবতীর গর্ভে গতিগোবিন্দ নামক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁহার কন্যা হেমলতা দেবীকে মুনিপুরনিবাসী রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভ চট্টরাজ বিবাহ করেন। হেমলতা দেবী অর্দ্ধকালী রূপে বিখ্যাতা। দুই হস্তে অন্ন-ব্যঞ্জনের থালা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজনে পরিবেশনকালে হঠাৎ তাঁহার মাথার বস্ত্রাবরণ স্থানচ্যুত হয়। দেবী তৎক্ষণাৎ স্কন্ধদেশ হইতে অপর দুই হস্ত উদগত করিয়া বস্ত্র বিন্যস্ত করেন। এইরূপ অর্দ্ধকালী জনপ্রবাদ বঙ্গের অন্য স্থানেও বিরল নহে।

ভেঙ্গো রামকৃষ্ণ

বিষ্ণুপুরের চারি ক্রোশ ব্যবধানে দক্ষিণ সাবড়াকোন গ্রামের অরণ্য

* এই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য। খেতুরীর নরোত্তম ঠাকুর-বংশের শিষ্য পরম বৈষ্ণব স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির সাহায্যে বহরমপুরের স্বর্গীয় পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন এই বৃহৎ গ্রন্থ ৪০২ চৈতন্যাব্দে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সমাজ নূতন সংস্করণ প্রকাশ করুন।

মধ্যে এক প্রসিদ্ধ দেবমন্দির বর্ত্তমান। বিগ্রহের নাম রামকৃষ্ণ জীউ। মদনমোহনের ন্যায় ইঁহার বামেও শ্রীরাধা নাই, এজন্য ইঁহার লৌকিক নাম ডেঙ্গো রামকৃষ্ণ। ইনিও অতি জাগ্রত দেবতা, শত-শত লোক ইঁহার প্রসাদে রোগমুক্ত হইতেছে। পশু-পক্ষীরাও ইঁহাকে সম্মান করে। এ পর্য্যন্ত কোন বন্য পাখীকে শ্রীমন্দিরের মাথা অতিক্রম করিয়া উড়িয়া যাইতে দেখা যায় নাই। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বীর হাম্বীরের প্রতিষ্ঠিত। এই বিগ্রহ আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে, তাহা ভক্তদের পরম উপাদেয় হইলেও লিপিতে বিরত হইলাম।

"দিনমণি চন্দ্রোদয়"-প্রণেতা সুকবি মনোহর দাস রাজা বীর হাম্বিরের সভাসদ ছিলেন। সোণামুখীতে তাঁহার 'পাট' আছে। তাঁহার স্মরণ উপলক্ষে রামনবমী তিথিতে তথায় মেলা হইয়া থাকে। হুগলীর বদনগঞ্জে তাঁহার সমাধি রহিয়াছে। বীর হাম্বীরের সমসাময়িক বিষ্ণুপুরনিবাসী গোকুলদাস মোহান্তের নামও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

"সিংহ" রঘুনাথ

বীর হাম্বিরের বৃদ্ধবয়সে বৃন্দাবন-প্রাপ্তি হয়। তাঁহার ছয় রাণী ও ছয় পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র বাঁকু রায়ের নামানুসারে বাঁকুড়া (অনেকে বলেন বাকুণ্ডা) নামের উৎপত্তি,—বিষ্ণুপুরবাসিগণ এইরূপ বিশ্বাস করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ধাড়ি হাম্বির (১৬২১-২৭) রাজ্যলাভ করেন। অপুত্রক ধাড়ি হাম্বিরের সহসা মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় সহোদর স্বনামধন্য রঘুনাথ মল্ল রাজা হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ইং ৬২৭-৫৭। তিনি শাহ্‌জাহান বাদশাহের সমসাময়িক।

রঘুনাথ দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শেষপক্ষের পুত্র বিষ্ণুপুরনিবাসী গতিগোবিন্দ ঠাকুর তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ। এজন্য তিনি আচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ তনয় যাজিগ্রামের বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুরের নিকট দীক্ষাদানের নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করিলেন। বৃন্দাবন আচার্য্য গুরুদক্ষিণার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া বিষ্ণুপুরে গমন করিতে অসম্মত হইলেন। অগত্যা রঘুনাথকেই যাজিগ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। পথিমধ্যে বর্দ্ধমানের নিকটে এক বিভ্রাট সঙ্ঘটিত হইল। মল্লরাজের অধীন চেতুয়া বরদার জমিদার গোবিন্দ সিংহ রাজস্ব বন্ধ করায় সম্রাটের প্রাপ্য করও বাকী পড়িয়াছিল। তখন সম্রাট-পুত্র সুজা বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রঘুনাথের গমন-বার্ত্তা পাইয়া বর্দ্ধমানের কাজি তাঁহাকে রাজমহলে প্রেরণ জন্য অসহায় অবস্থায় বন্দী করিলেন। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং মল্লরাজের করে দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া তাঁহার জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ ঘটনা অনর্গল পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে যুগপৎ বিস্ময় ও আশায় অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। ফলতঃ সম্রাট-তনয় তাঁহাকে অতিশয় সম্মানসহকারে গ্রহণ করিলেন। তিনি একমাস পরমানন্দে রাজমহলের রাজভবনে অবস্থিতি করিলেন। রঘুনাথ দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার বাহুবলেরও বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বাদশাহ্‌জাদার এক দুর্দমনীয় অতিকায় অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক রঘুনাথ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গুণগ্রাহী সুজা বাহাদুরের চিত্ত মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি মল্লরাজের মর্য্যাদাস্বরূপ দুইটী বহুমূল্য অশ্ব ও বিবিধ উপঢৌকন দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। উপঢৌকন-পত্রে বোধ হয় ভ্রমক্রমে তাঁহার নাম রঘুনাথ "সিংহ" লিখিত হয়। রঘুনাথ এই ভুল সংশোধন আবশ্যক মনে করেন নাই। তদবধি মল্লরাজগণ সিংহ পদবী আগ্রহের সহিত স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

আমাদের "রাজপুত্র"গণ—যাঁহাদের সিংহাসনে বসিবার অভ্যাস ছিল বা আছে, তাঁহারা সিংহ উপাধির উপর মমতাগ্রস্ত। ইস্তক রণজিৎ সিংহ, নাগাইদ কত্তে সিংহ—ব্যাঘ্র-দমন করিয়া কেহ-কেহ "সের" হইয়াছেন, সিংহ হইতে পারেন নাই। এদেশে গঙ্গের উপরই সিংহের বিজয়ী-মূর্ত্তি দৃষ্ট হইলেও, দুর্দ্দান্ত অশ্বে চড়িয়া "সিংহ" হওয়া কম পরাক্রমের কথা কি? যুদ্ধজয়ের সওলা-পরামর্শ জন্য বিকানীর হইতে গঙ্গা সিংহ, বঙ্গ হইতে এস্‌পি সিংহ বৃটীশ সিংহের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। সিংহের জয় অনিবার্য্য!

রাজা রঘুনাথ আর যাজিগ্রামের গুরুগৃহে গমন করেন নাই, পূর্ব্বোক্ত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই সময় জোড় বাঙ্গালা, শ্যাম রায়, কালাচাঁদ প্রভৃতি অসামান্য কারুকার্য্যসম্পন্ন দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। মন্দির-গাত্রের ইটগুলি পৌরাণিক চিত্রাবলীতে শোভিত। সহরের রঘুনাথ-সায়ের, রঘুনাথগঞ্জ ইঁহারই স্মৃতি বহন করিতেছে।

বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা

রঘুনাথ সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র বীরসিংহ ইং ১৬৫৭ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পর বৎসর আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মল্লরাজ বীরসিংহ প্রজাপীড়ক ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি জ্ঞাতিবর্গের বহু নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া তাহাদের অনেককে মল্লভূম হইতে বিতাড়িত করিলেন, এবং কেহ-কেহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহাদের বাসস্থানের নূতন নামকরণ হইল। এইরূপে প্রসিদ্ধ বীরসিংহ গ্রামের সৃষ্টি। সহোদর ভ্রাতা মাধবসিংহ তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন। অন্য সহোদর কত্তে সিংহ ধলভূমের রায়পুরে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও গড় রায়পুরের রাজা বলিয়া পরিচিত।

বীরসিংহের প্রথমা মহিষী তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক-গমন করেন। তাঁহাদের নাম শূরসিংহ, দুর্জ্জনসিংহ ও কৃষ্ণসিংহ। তার পর তিনি বরাহভূমের রাজকুমারী পরমা রূপবতী স্বর্ণময়ীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহারই করগত রহিলেন। এই ছোটরাণীর গর্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম বলদেব। স্বর্ণময়ীর কৌশলে শূরসিংহ ও কৃষ্ণসিংহ বিষপ্রয়োগে নিহত হইলেন। প্রজা ও [illegible] মাহাত্ম্যে দ্বিতীয়

রাজকুমার দুর্জ্জনসিংহের প্রাণ রক্ষা হইল। তিনি ইন্দাসের সন্নিহিত অরণ্যে অজ্ঞাতবাসে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, এই অলীক সংবাদ প্রচার দ্বারা নূতন রাণীকে নিরস্ত ও নিশ্চিন্ত করা হইল। তাঁহার একান্ত কামনা, তাঁহার গর্ভজ পুত্র বলদেব নিষ্কণ্টক হইয়া যথাসময়ে রাজ্যলাভ করে। কিন্তু বিধাতা তাঁহার এই আশা চূর্ণ করিলেন। বলদেবের বাল্যেই মৃত্যু হইল। বৃদ্ধ রাজার আর পুত্র হইল না। তিনি জ্ঞাতি-ভ্রাতা ও পুত্র-শোকবহ্নি ও অনুতাপের তুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন দ্বিতীয় পুত্র দুর্জ্জন সিংহ অজ্ঞাতবাস হইতে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মুমূর্ষু রাজার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। রাজা বীরসিংহের সময় লালজীর মন্দির নির্ম্মিত হয়।

লালজীর মন্দির।

দুর্জ্জন সিংহ ইং ১৬৮৩ সনে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার সময় সমগ্র মল্লভূমিতে প্রতি টাকায় পাকী ওজনের ৪মণ চাউল বিক্রীত হইত। প্রায় এই সময়েই ঢাকায় বাঙ্গালার সুবাদার, আওরঙ্গজেবের মাতুল সায়েস্তা খাঁর রাজধানী ছিল। কথিত আছে, তখন ঢাকা সহরে এক টাকায় ৮মণ চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। দুর্জ্জন সিংহের রাজত্বকালে মদনমোহন মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পূর্ণ হয়।

লালজী বাইজী।

অতঃপর দুর্জ্জন সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ (প্রথম রঘুনাথ সিংহের প্রপৌত্র) ইং ১৭০৩ সনে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট বৃদ্ধ আওরঙ্গজেব তখনও দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন; মোগল সাম্রাজ্যের পূর্ণ গৌরব। মুসলমানী প্রভাবে এই সময় হিন্দুগণ আহারে না হোক বিহারে, অশনে না হোক বসনে, এবং আদব-কায়দায় প্রায় সকলেই ক্রমশঃ মুসলমানী রীতিনীতির পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় একজন পরম রূপবতী মুসলমান নর্ত্তকীর মোহে পড়িয়া দ্বিতীয় রঘুনাথ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। মল্লরাজ্যে হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল।

রঘুনাথ চেতুয়া বরদার পরাক্রান্ত জমিদার শোভাসিংহের কন্যা চন্দ্রকুমারীর পাণিগ্রহণ মানসে নারিকেল প্রেরণ করিয়াছিলেন। শোভাসিংহ উদ্ধতভাবে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। বর্দ্ধমানের রাজকুমারী সত্যবতীর ছুরিকাঘাতে পরে এই শোভাসিংহের মৃত্যু হয়। বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা জগৎরাম রায়ের সাহায্যে রঘুনাথ সিংহ সসৈন্যে চেতুয়া আক্রমণ করেন। শোভাসিংহের কনিষ্ঠ হিম্মত সিংহকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তিনি চেতুয়া-অন্তঃপুর হইতে চন্দ্রকুমারীকে বিষ্ণুপুরে লইয়া গিয়া বিবাহ করিলেন। সেই সঙ্গে অন্তঃপুর-দাসীদের সঙ্গে ঘটনাক্রমে রঘুনাথের কালস্বরূপিণী পূর্ণযৌবনা পরমারূপসী লালজী বাইজী মুসলমানী আগমন করেন। তাঁহার হাস্যমধুর নৃত্যগীত ও বিলাস-চটুল অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে বিভ্রান্ত হইয়া মল্লরাজ অহর্নিশ তাঁহার সংসর্গে থাকিতেন। বাইজীর জন্য পুষ্পোদ্যান ও সরোবর-সংলগ্ন এক সুন্দর বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হইল। ঐ ভবন এখন লাল-মহল ও সরোবর লাল-সায়ের নামে পরিচিত। লাল বাইজী একদিন রাজার আহ্বানে রাজ-অন্তঃপুরে গিয়া জ্যেষ্ঠা মহারাণী পট্টমহাদেবী কর্ত্তৃক বিষম অপমানিতা হইয়াছিলেন। ক্ষোভে, রোষে তিনি বিষ্ণুপুর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। সুতরাং রঘুনাথ চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন; এবং পদপল্লব ধারণ করিয়া তাঁহার মানভঞ্জন করিলেন। মায়াবিনী মনোরঞ্জন ধ্বনি করিয়া উত্তর করিলেন, "ছিঃ, মহারাজ, ক্ষান্ত হও। এ দাসীর প্রতি তোমার মেহেরবানি আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। আল্লা জানেন, তুমি আমার দিলের ভিতর কিরূপ বিরাজ করিতেছ। নহিলে, বর্দ্ধমান হইতে আমি কবে দিল্লীতে আমার মা-বাপের কাছে চলিয়া যাইতাম; আজিম শা, রহিম খাঁ আমাকে এখনও কত চিঠি লিখিতেছে। কিন্তু তোমার এই হিন্দু রাজ্যে আমার থাকা হইবে না। কেবল তোমার সোহাগিনী বড় রাণী কেন, তোমার কাক্কের প্রজাদের বিল্লীটা পর্য্যন্ত মুসলমান বলিয়া আমাকে হামেসা ঘৃণা করিয়া থাকে। তুমি আমার সঙ্গে একত্র খানা-পিনা করিতেছ; তাহাতে কেহ কিছু বলে না। এখন আমার আরজ এই, তুমি তোমার বড় রাণীকে সঙ্গে লইয়া একত্র মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হও। তাহা হইলে তাঁবেদার আমি তোমার শ্রীচরণের আশ্রয়ে থাকিতে পারি। নহে তো আলবৎ জানিবে, আমি তোমারই সম্মুখে আত্মঘাতী হইয়া জান দিব, কিম্বা বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া যাহাকে যাহা বলিতে হয়, কি নালিশ করিতে হয়, যাহা জানি করিব। তাহাতে তোমার ভাল হইবে না।" বাইজী ক্ষণকাল থামিয়া পরে বলিলেন, "দেখ, মহম্মদীয় ধর্ম্মই আমীর-ওমরাহের ধর্ম্ম। তুমি তোমার বৈরাগী ধর্ম্মটা নোংরা কাপড়ের ন্যায় এখনই ত্যাগ কর, ওটা আমি সইতে পারিব না।" এই বলিয়া বাইজী কুঞ্চিত নাসিকায় রুমাল তুলিয়া সহসা দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

মহারাজের মগজ রূপজ মোহে বিগড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি অতঃপর রাজসভায় বসিয়া প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন, "ইসলাম ধর্ম্মই রাজধর্ম্ম, শীঘ্রই আমি সপরিবারে রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। কিন্তু উপায় কি? অবিলম্বে মহারাজ মজকুরের মরজিমতে মকসুদাবাদ মুলুক হইতে আগমন করিয়া আকল-মন্দ মোল্লা মৌলভী মাতব্বর মহাশয়গণ মল্লভূম মোকামে মজলিস করিতে লাগিলেন। আর সময় নাই, মহারাজ "মমিন মল্ল" নাম ধারণ করিয়া কল্যই কলমা পাঠ করিবেন।

সেইদিন নিশীথে হিতৈষী পাত্রমিত্র, অমাত্যবর্গ রাজার কনিষ্ঠ সহোদর গোপালসিংহের সঙ্গে নিভৃত মন্ত্রণাগারে সম্মিলিত হইলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই রজনীতেই গোপালসিংহ অসিহস্তে রাজার শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া পট্টমহিষীর মৌন সম্মতি লইয়া রঘুনাথের প্রাণসংহার করিলেন। আবালবৃদ্ধ-বনিতার হরিবোল-ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল। এইরূপে মল্লরাজবংশের ধর্ম্ম ও গৌরব রক্ষিত

হইল। কিল্লার উত্তর-পূর্ব্বদিকে লালমহালের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়।

গোপালসিংহের বেগার

প্রজার উল্লাস-ধ্বনির ভিতর ইং ১৭১২ সালের চৈত্রমাসে মহারাজ গোপালসিংহের রাজ্যাভিষেক হইয়া গেল। তিনি অতি শীঘ্রই ভ্রাতৃ-হত্যা পাপের জন্য বিরাট আয়োজন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত ও দানসাগর সম্পন্ন করিলেন। রঘুনাথ কর্ত্তৃক অপহৃত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রত্যর্পিত হইল। কিন্তু প্রায়শ্চিত্তই করুন আর যাই করুন, ভ্রাতৃহত্যা-পাপ তাঁহার মনের শান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। এইজন্য গোপালসিংহ সর্ব্বদা দান, ধ্যান ও হরিনাম-কীর্ত্তনে জীবন অতিবাহিত করেন। প্রজার পুণ্যে রাজারও অংশ আছে মনে করিয়া, তিনি মল্লভূমির সর্ব্বত্র এক অদ্ভুত আদেশ প্রচার করিলেন যে, ১৮ বৎসর বয়সের উর্দ্ধ স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই সকাল-সন্ধ্যায় দুইবেলা হরিনাম জপ করিতে হইবে। আদেশ পালন হয় কি না জানিবার জন্য গুপ্তচরও নিযুক্ত হইল। স্বয়ং মহারাজও ছদ্মবেশে বাড়ী-বাড়ী সন্ধান লইতেন।

একদিন বিষ্ণুপুরের দরিদ্র পল্লীর বৈদ্যনাথ সূত্রধর দিবসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় শয্যায় আশ্রয় লইল। এক প্রহর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে হরিনাম জপের কথা স্মরণ হইল। অমনি শশব্যস্তে বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে জাগাইয়া বলিল, "শীঘ্র হরিনামের মালাটা দাও, গোপালসিংহের বেগারটা খাটিয়া দি। আজ বেগার-খাটা হয় নাই, এ কথা যেন রাজার কাণে না যায়।" অক্ষরে-অক্ষরেই এ কথা পরদিন প্রাতে রাজার কাণে উঠিল। তখনি রাজ-দরবারে বেচারী বৈদ্যনাথের তলব হইল। সকলেই ভাবিল আজ সূত্রধর-নন্দনের রক্ষা নাই। কম্পিত-কলেবর, গললগ্নীকৃতবাস কৃতাঞ্জলি-পুট দীনহীন বৈদ্যনাথ রাজসভায় নীত হইল। সজলনয়নে কাঁদিতে-কাঁদিতে সে নিবেদন করিল, "মহারাজ, আমি নেহাৎ গরীব, দিনে আমার ৵০ আনাও রোজগার হয় না; এজন্য সন্ধ্যার পরও বেশী মেহনত করিতে হয়। ঘরে অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা। ভগবানই আমাকে তাঁর নাম করিবার অবসর দেন না; এইজন্য আপনার হুকুম পালন করাকে আমি অন্যায় করিয়া বেগার-খাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমার অপরাধ হইয়াছে।" এই বলিয়া সূত্রধর দুই হাতে নিজের কর্ণ দুইটি নিজেই বেশ আচ্ছা করিয়া মলিয়া দিয়া সভাস্থ সকলকে নিশ্চয়রূপে জানাইয়া দিল যে, সে এমন কর্ম্ম আর কখনও করিবে না। সূত্রধর কাঁদিতে লাগিল। রাজা তাহার দৈন্যে ব্যথিত হইলেন। এবং তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, "তুমি যে আমার বেগার খাট, এইরূপ বেগার প্রত্যহ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে তোমাকে খাটিতে হইবে। এইজন্য তোমাকে বার্ষিক ১০০৲ টাকা আয়ের জমি লিখিয়া দিলাম।" সূত্রধরবংশ এখনও সেই বেগার-খাটা জমি ভোগ করিতেছে।

কথিত আছে, রাজা গোপালসিংহ অহোরাত্র তিন লক্ষবার হরিনাম করিতেন। তাঁহারই দৃষ্টান্তক্রমে বোধ হয়, বিষ্ণুপুরে হরিনামের একটা উৎকট প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে। কারণ যখন-তখন "চব্বিশ প্রহর" তারকব্রহ্মনামের বাধ্যতামূলক তিনদিবসব্যাপী আবৃত্তি (কিবা দিন কিবা রাত্রি) এক বিষ্ণুপুরেই সম্ভবে। ভক্ত কবি বলিয়াছেন "এক-বার রাম নামে যত পাপ হরে, মহাপাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে।"

"দলমাদল" কামান

ইং ১৭৪০ অব্দে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ দিল্লীর অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা হইলেন। এই সময় হইতে মল্লরাজ্যের পতনের অবস্থা। নানা কারণে নবাব-সরকারে বিষ্ণুপুরের দেয় কর ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাকী পড়িতেছিল। নবাবের সম্মতিক্রমে বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্র সসৈন্যে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। মল্ল সৈন্যগণ ইন্দাসের নিকট তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিয়া কিছুকাল সফল হইয়াছিল। অবশেষে কীর্ত্তিচন্দ্র ক্রমেই পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এদিকে অন্য বিপদ উপস্থিত। এই সময় সংবাদ আসিল, অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী-সৈন্য ঝড়ের বেগে পশ্চিম-বঙ্গ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শিখরভূমাধিপতি গরুড়-নারায়ণ সপরিবারে তাঁহার রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। সামন্তভূম ও ধলভূম হইতেও দুঃসংবাদ আসিতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে মারহাট্টা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত ঝাড়খণ্ড পার হইয়া, মল্লভূমে প্রবেশ করিলেন। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মেদিনীপুর শিবিরে ছিলেন। তিনি ত্বরান্বিত হইয়া বর্দ্ধমানের পথে কাটোয়ায় চলিয়া গেলেন। বর্দ্ধমান-রাজ কীর্ত্তিচন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিষ্ণুপুরের অদূরে নিবৃত্ত রহিলেন। সহসা মহারাট্টারা অগ্রসর হইতে লাগিল। বিষ্ণুপুরে আতঙ্কের অবধি রহিল না। প্রজাকুল আকুলভাবে "রক্ষা কর মদনমোহন" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। বর্গী-সৈন্যের একদল প্রথমে বিষ্ণুপুর সহরের দক্ষিণে শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছিল। ঐ স্থান এখনও মহারাট্টা ছাউনি নামে খ্যাত। পশ্চাতে গহন বন বলিয়াই বোধ হয় উহারা পশ্চিমদিক হইতে উত্তরে ধাবিত হইল। মল্ল-সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিড়াইতীরে যুদ্ধের ঘাটিতে (বর্ত্তমান নাম যুজুঘাটি) শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দুর্গপ্রাকারের উচ্চ ভূমিতে কয়েকটি কামান স্থাপিত হইল। দুই দিন বর্গী-সৈন্য নিশ্চেষ্ট ছিল। উহাদের মতি-গতি ও গন্তব্য স্থির ছিল না। তার পর সহসা বিষ্ণুপুরে প্রচারিত হইল, কল্য প্রাতে বর্গীরা রাজধানী আক্রমণ করিবে। সারারাত্রি মল্লরাজ গোপালসিংহ শ্রীশ্রীমদনমোহন জিউর শ্রীমন্দিরের দ্বারে দণ্ডবৎ পতিত রহিলেন। রজনী প্রভাত হইল। কি আশ্চর্য্য! বর্গীরা ভাস্কর পণ্ডিতের আদেশে বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া ঝড়ের বেগে অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছে। এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ আশ্চর্য্য পলায়ন কেহ কখনও চোখে দেখে নাই। তাহারা প্রজাদের শস্যভাণ্ডার লুণ্ঠন ব্যতীত আর কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। শেষ রাত্রে কয়েকবার ভীষণ তোপধ্বনি হইয়াছিল। মল্লপক্ষ প্রথমতঃ মনে করিয়াছিল, উহা শত্রুপক্ষেরই কামান-

"The Taming of the Shrew" বা "কাপিকার বশীকরণ"

Emerald Ptg. Works

গর্জ্জন। পরে নিজেদের দুর্গপ্রাকারের উপরিস্থিত কামান পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ইহা স্বপক্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী দলমর্দ্দনেরই কর্ম্ম! কিন্তু কে সেই বীর পুরুষ, যিনি এত বিক্রম সহকারে দলমর্দ্দনে অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন? মহাদণ্ড উপাধিধারী সেনাপতিদের মধ্যে কেহই বৈষ্ণবোচিত বিনয়গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া এই বিক্রম স্বীকার করিতে অগ্রসর হইল না। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, রাজা যখন শ্রীমন্দিরের দ্বারে শয়ান ছিলেন, তখন তিনি স্বচক্ষে মদনমোহন জিউকে দ্বাদশবর্ষীয় বালকের বেশে রাত্রিশেষে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। স্বয়ং রাজা এই চাক্ষুষ প্রমাণের কথা স্বীকার করিলেন। আরও প্রমাণ পাওয়া গেল, ঐরূপ একজন বংশীধারী বালক তোপধ্বনির কিছু পূর্ব্বে দলমর্দ্দন কামানের অনতিদূরে অন্ধকারের আচ্ছাদনে বিরাজ করিয়াছিলেন। সকলে মদনমোহনের জয়ধ্বনি করিয়া Te Deum গানে উন্মত্ত হইল। বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র এই জয়ধ্বনি শ্রবণের সঙ্গে-সঙ্গে মহারাষ্ট্রীদের পূর্ব্বদিকে ধাবন সংবাদ পাইয়া ত্রাসান্বিতচিত্তে বর্দ্ধমানে ছুটিয়া আসিলেন।

মদনমোহনের মন্দিরে মদনমোহন একাকী থাকিতেন; মন্দিরে তাঁহার লক্ষ্মীজিউ ছিলেন না; তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। লক্ষ্মীর আলয় এখন কলিকাতা, এজন্য মদনমোহন কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় দলমর্দ্দনের বিপুল দেহ বিষ্ণুপুরে লালবাঁধের পশ্চিমতীরে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ ফিট ৫ ইঞ্চি; বিবরের ব্যাস ১১½ ইঞ্চ। দলমর্দ্দন পরে দলমর্দ্দল এবং এখন দলমাদল নাম ধারণ করিয়াছে। ইহাঁর মুখের কাছে ফারসী অক্ষরে "তিন লাখ" কথাক্য অস্পষ্টভাবে লেখা আছে। গোপালসিংহ প্রত্যহ তিন লক্ষবার হরিনাম গ্রহণ করিতেন; তাহাতে প্রীত হইয়া মদনমোহন যুদ্ধ জয় করিয়া দিয়াছিলেন। "তিন লাখ" কি সেই প্রীতিচিহ্ন? গত বৎসর আগষ্ট মাসে মাননীয় মিঃ বিট্‌সন বেল বিষ্ণুপুরের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিতে আসিয়া এই কামান বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি "তিন লাখ" কথার পর আরও অস্পষ্ট লেখা দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই।

আরও কয়েকটি ছোট কামান পাথরদরজার উত্তরবর্ত্তী পরিখার উপর স্থাপিত ছিল। বৃষ্টিপতনে মৃত্তিকা-ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি গড়াইয়া পড়িয়া নিম্ন ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়াছে। এখনও একটি উপরে আছে। প্রতিবৎসর দুর্গাপূজার অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে উহাতে বারুদ ও অগ্নি সংযোগ করা হয়। উহাতেই এখন বৎসরের মধ্যে একদিন বিষ্ণুপুর রাজবাটীর অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষিত হইয়া থাকে।

রুক্মিণী হরণ

মহারাজ গোপালসিংহের দুই পুত্র, কৃষ্ণসিংহ ও গোবিন্দসিংহ। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণসিংহ তাঁহার একই শিশুপুত্র চৈতন্যসিংহকে রাখিয়া যৌবনে পরলোক গমন করেন। বৃদ্ধ মহারাজ দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দসিংহকে জামকুণ্ডি (অন্য নাম ভেলিসারের) পরগণা বৃত্তি প্রদান করিয়া ইং ১৭৪৮ সনে পৌত্র চৈতন্যসিংহকে সিংহাসনে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং অবসর গ্রহণ করেন। চারি বৎসর অনবরত হরিনাম জপ করিতে-করিতে ১৭৫২ সনে বৃদ্ধ মহারাজ দিব্যধামে গমন করেন। গোপালসিংহ তুঙ্গভূমের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পৌত্র চৈতন্যসিংহ ময়ূরভঞ্জের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সে বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

যুবক চৈতন্যসিংহ পিতামহের অনুমতি লইয়া শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তম দর্শনে গিয়াছিলেন। সঙ্গে একদল সৈন্যসামন্ত ছিল। প্রত্যাগমন কালে ময়ূরভঞ্জরাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার রাজধানীতে তিনি অতিথি হন। এই অবসরে ভঞ্জরাজের লীলাবতী নাম্নী অষ্টাদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কুমারী মনে-মনে কুমার চৈতন্যকে পতিত্বে বরণ করেন। ভঞ্জ-মহিষী কন্যার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ভঞ্জরাজ কুপিত হইয়া মহিষীকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন। রাজকুমারী লীলাবতী মনের দুঃখে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ভঞ্জমহিষী চৈতন্যের শিবিরে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন যে, কন্যা হরণ ব্যতীত আর উপায় নাই। কুমারী-হরণ শাস্ত্র সম্মত বটে, আর তিনিও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মল্লকুমার ভঞ্জ-অন্তঃপুরের বড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিয়া একদিন সহসা গভীর রাত্রিকালে লীলাবতীর কর ধারণ করিয়া সসৈন্যে গৃহযাত্রা করিলেন। প্রভাতে সংবাদ রাষ্ট্র হইল। ভঞ্জরাজ উন্মত্তবৎ অসংখ্য সৈন্য সহ মল্লকুমারের গতিরোধ করিলেন। লীলাবতী পিতার সমক্ষে নীত হইয়া অশ্রুজলে তাঁহার চরণ সিক্ত করিয়া দিল। চৈতন্যসিংহও মাথা নত করিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান রহিলেন। আর উপায় কি! ভঞ্জরাজ ক্ষমা করিলেন এবং কন্যা ও জামাতা বাবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বহু যৌতুকাদি সহ মল্লভূমে প্রেরণ করিলেন।

গৃহ-বিবাদ

চৈতন্যসিংহ মল্লবংশের শেষ রাজা। ইহাঁর রাজত্বের প্রথম দুই-বৎসরের মধ্যেই বিষ্ণুপুরে পুনরায় বর্গির হাঙ্গামা হইয়াছিল। অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধ মহারাজ গোপালসিংহ পৌত্র চৈতন্যকে বলিলেন, "ভয় কি? মদনমোহনের রাজ্য মদনমোহনই রক্ষা করিবেন।" মহারাষ্ট্রীয় অধিনায়ক রঘুজী ভোঁসলা দেশের শস্য লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেলেন। বিষ্ণুপুরে প্রতি টাকায় ৩৷৫ সের চাউলের দর হইয়াছিল। চৈতন্যসিংহ অকাতরে রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া প্রজার প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন। বহুকালের সঞ্চিত অর্থ অজস্র ব্যয় হইতে লাগিল।

কিন্তু বহিঃশত্রু অপেক্ষা গৃহ-শত্রুই ভয়ঙ্কর। চৈতন্যসিংহের পিতৃব্য জামকুণ্ডি-স্থিত গোবিন্দ সিংহের নাম পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তখন সারা বঙ্গে বড়যন্ত্র চলিতেছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার আসনে বসিয়া মীরজাফর অহিফেন সেবন পূর্ব্বক তন্দ্রামগ্ন আছেন। সময় বুঝিয়া গোবিন্দসিংহের পুত্র দামোদর সিংহ বিষ্ণুপুরের অর্দ্ধেক রাজ্য দাবী করিয়া বসিলেন, এবং বড়যন্ত্রে বশীভূত কর্ম্মচারীদের সাহায্যে ইং ১৭৫৯ সনের একদিন সুপ্রভাতে সহসা বিষ্ণুপুরের রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা চৈতন্যসিংহ অনুপস্থিত ছিলেন। একমাত্র শ্যাম বিশ্বাস নামক বিশ্বস্ত দ্বারবান ব্যতীত আর কেহই বাধা প্রদান করিল না।

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মদনমোহন রাণীদের লইয়া কুচিয়াকোলের বাটীতে চলিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্য চৈতন্যসিংহ কয়েক বৎসর আপন শ্যালক লছমিনারায়ণ দেওর আশ্রয়ে থাকিয়া অবশেষে মুরশিদাবাদে আসিলেন। ইং ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করিলেন। তিনিই দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। বিষ্ণুপুরে স্মরণাতীত কাল হইতে জ্যেষ্ঠপুত্রাদি ক্রমে রাজ্যাধিকার হইতেছে, কনিষ্ঠ পুত্র বা সহোদরগণ জীবিকা-বৃত্তির অধিকারী,' এই অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ক্লাইভ বাহাদুর চৈতন্যসিংহকে ডিক্রি প্রদান করিলেন। কাপ্তান লগিন সাহেব বিষ্ণুপুরে আসিয়া রাজা চৈতন্য সিংহকে দখল দিয়া গেলেন। দামোদর চলিয়া গেলেন। বিশ্বস্ত শ্যাম বিশ্বাস "নরোত্তম" উপাধি পাইলেন।

রাজলক্ষ্মী ও মদনমোহনের অন্তর্দ্ধান

নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে বিষ্ণুপুর রাজ্য এখন হইতে জমিদারী মাত্র। দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার প্রাণরক্ষার জন্য চৈতন্যসিংহ পূর্ব্বেই কোষাগার অকাতরে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। তার পর দামোদর সিংহ রাজকোষ শূন্য করিয়া চলিয়া যান। সুতরাং রাজস্বের দায়ে ১৭৬৬ অব্দে জমিদারী কোম্পানি-বাহাদুরের খাস-দখলে আসিল। চৈতন্য সিংহের ভরণপোষণ ও দেবসেবার জন্য মাসিক ৫৫২॥/৮ মালিকানা 'বরাদ্দ হইল। বহু নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত হইল।' পরে বন্দোবস্ত কর্ম্মচারী মিঃ ডসন অনেক বাজেয়াপ্তি জমি ছাড়িয়া দেন। এই জমি গুলি "ডাসনি ছাড়ি" বলিয়া খ্যাত।

পরে ৩,৭৫,০০০৲ টাকা রাজস্ব স্বীকার করিয়া চৈতন্যসিংহ পুনরায় জমিদারী গ্রহণ করেন। কিন্তু তখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর; জমিদারী রক্ষা করা সুকঠিন। নবাব ও ইংরেজের সরকারে এই সময় শাসন ও বিচার-কার্য্যের বড় বিশৃঙ্খলা ছিল। সুতরাং দামোদরসিংহ হঠাৎ অর্দ্ধেক জমিদারীর ডিক্রি-পরোয়ানা লইয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে সদর দেওয়ানী আপীল-আদালতে চৈতন্যসিংহ জয়ী হইলেন।

গভর্ণর হেষ্টিংস চৈতন্যের পক্ষপাতী ছিলেন। কাশীর রাজা চৈৎসিংহের প্রতি হেষ্টিংসের দৃষ্টি পতিত হইল; এজন্য তিনি বেনারসে চলিয়া গেলেন। এই সুযোগে দামোদরের জয়, পরে আবার হার হইল। ঋণে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইলেও চৈতন্য সিংহ চারিলক্ষ টাকা রাজস্বে দশশালা বন্দোবস্ত গ্রহণ করিলেন। জমিদারী রহিল না। খণ্ড-খণ্ড হইয়া নীলামে উঠিতে লাগিল। অনেকাংশ বর্দ্ধমান-রাজের জমিদারী-ভুক্ত হইল।

তার উপর সর্ব্বনাশ! রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র মদনমোহন সিংহ, যিনি সর্ব্ববিষয়ে বৃদ্ধরাজার দক্ষিণহস্ত ছিলেন, তিনি অকালে ৪১ বৎসর বয়সে হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন! চৈতন্যের হৃদয়ের আর চৈতন্য রহিল না।

৺মদনমোহন জিউর সেবা পূজা না করিয়া রাজা চৈতন্য সিংহ জল-গ্রহণ করিতেন না। এজন্য মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে কলিকাতা আগমন সময়ে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া মদনমোহন জিউকে সঙ্গে আনিতে হইত। মোকদ্দমার তদ্বির কার্য্যে বিষ্ণুপুর হইতে আনীত অর্থ খরচ হইয়া গেলে, বাগবাজারের গোকুল মিত্রের নিকট গৃহদেবতা মদন-মোহন জিউকে পণে বন্ধ রাখিয়া চৈতন্যসিংহ লক্ষাধিক টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকল টাকা পরিশোধ করা হয় নাই। গোকুল মিত্র ইং ১৭৯৫ সনের ২৬৯৬ নং মোকদ্দমায় ৭৩,৩৭ ৸/৬ দাবীতে নালিস করিলেন। পুত্রশোকে জর্জ্জরিত ও উন্মত্ত চৈতন্যসিংহ আর কি করিবেন। পুত্র মদনমোহন তাঁহাকে ত্যাগ করিল, মদনমোহনেরও অনুগ্রহ হইল না। মদনমোহন পণে আবদ্ধ হইয়া কলিকাতার গোকুল ভবনেই রহিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইল!

প্রভু মদনমোহনের বিস্তৃত দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। চৈতন্যসিংহ ঐ সকল সম্পত্তির সনন্দ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত পূজারি ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যাদিকে কলিকাতায় মিত্রভবনে প্রেরণ করিলেন। বিষ্ণুপুরী ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যদের বংশধরগণ এখনও ৺মদনমোহনের সেবা-পূজায় নিযুক্ত আছে। মদন-মোহনের ভোগ রন্ধন করে বলিয়া কলিকাতার বিষ্ণুপুরী পাচকের বিশেষ খ্যাতি। বাগবাজারের রসগোল্লা বিষ্ণুপুরের মন্দির হইতেই সুনাম লইয়া আসিয়াছে। গোকুল মিত্র লবণের ব্যবসায় করিয়া প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। তিনি চিৎপুর রোডের ধারে মদনমোহনের বৃহৎ মন্দির ও রাসমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শেষ কথা

তার পর? সে কথা না বলিলেও চলে। ইং ১৮০৩ সনে চৈতন্য-সিংহ বৈকুণ্ঠে আশ্রয় পাইলেন। এক বৎসর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র মাধব সিংহকে নিজহস্তে রাজটিকা দিয়া শূন্য গদিতে বসাইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র সুপণ্ডিত বাবু নিমাই সিংহ অন্য সহোদরদের লইয়া কুচিয়া কোলের বাটীতে চলিয়া গেলেন। বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ মাধব নূতন প্রতিষ্ঠিত বাঁকুড়া বা বাকুণ্ডা জেলার ইংরেজ কাছারী আক্রমণ করিলেন এবং কলিকাতায় বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপুত্র গোপাল সিংহের বয়স তখন ৭ বৎসর। কোম্পানি বাহাদুর কৃপা করিয়া তাঁহার জন্য মাসিক ৪০০৲ টাকা রাজনৈতিক পেন্সনের ব্যবস্থা করিলেন। ১৮৭৬ সনে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ রামকৃষ্ণ সিংহ ও কনিষ্ঠ রামকিশোর সিংহ, প্রত্যেকে ২০০৲ পেন্সন উত্তরাধিকার করেন। রামকৃষ্ণের দ্বিতীয়া পত্নী রাণী প্রসন্নময়ী ৫০৲ বৃত্তি পাইতেছেন; মৃত-জ্যেষ্ঠা পত্নীর পোষ্যপুত্র ৺নীলমণি সিংহের বিধবা ভার্য্যা রাণী চূড়ামণি ৫০৲ এবং তাঁহার নাবালক পুত্র শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রসিংহ মল্লদেও বিদ্যাশিক্ষার জন্য সরকার হইতে ২৫৲ বৃত্তি পাইতেছেন।

বিষ্ণুপুরে এখন আর কিছুই নাই! আছে কেবল বিষ্ণুপুরী তামাক, আর বোধ হয় গেলের পাচন, আর কয়েক ঘর রেশমী তাঁতি।

হায়, আর কি মদনমোহন বিষ্ণুপুরে ফিরিয়া আসিবেন!

তাল ফেরতা

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ]

আমি হাসি-মুখ দেখিতে বড় ভালবাসি। তাই আমার ক্ষীণ-প্রচেষ্টা লইয়া সময়ে-সময়ে আপনাদের দ্বারে সন্ধ্যা-প্রভাতে উপস্থিত হই। কিন্তু আমি জানি হাস্যরসের কড়ি-মধ্যম আদায় করা আমার ক্ষুদ্র শক্তির পক্ষে কত কঠিন। আরও কঠিন এই জন্য যে, হাসিতে বলিলে লোকে হাসে না। এমনি সময়ে-অসময়ে, কারণে-অকারণে আপনারা কত হাসেন, কিন্তু যেমনই কেহ হাসাইবার জন্য একান্ত যত্ন দেখাইল, অমনই আপনারা গম্ভীর হইয়া বসিলেন—যেন শ্রীমদ্ভাগবতের কথা শুনিতে বসিয়াছেন! লোকে হাসিতে কেন যে নারাজ, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। সে-কালে ঠাকুরমা'রা নাকে কত কি গহনা পরিতেন, যাহার ঝুলুনিতে হাসির চকিত চমকটুকু অলক্ষিতে ঢাকিয়া যাইত। হাসিলে যে ধরা পড়িতে হয় তাহাই শুধু তাঁহারা জানিতেন; হাসির ফাঁদে যে সকলেই ধরা পড়ে, সেটুকু সে সতী-লক্ষ্মীরা বুঝি জানিতেন না। একালে অনেক শ্রোতা দেখিতে পাই, হাসির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই চুরুট-বিরাজিত মুখে চট্ করিয়া আগুন লাগাইয়া বসেন। ঠাকুরমাদের গহনার মত, চুরুটের ধূমের পশ্চাতে তাঁহাদের অ-সামাল হাসিটি যাহাতে লুকাইয়া যায়, তাহারই জন্য আয়োজন। এমন কড়া-পাহারা-দেওয়া গৃহস্থের হাসির ভাণ্ডারে সিঁদ দিতে গিয়া যদি কখনও আমাকে শুধু উপহাসের ধূলি-পাংশু অঞ্চলে বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, তবে যেন কেহ হাসিবেন না।

হাসি আমাদের সম্পদ্। জন্তুর মধ্যে শুধু মানুষই হাস্য-প্রবণ। অন্য কোনও জন্তু ইচ্ছা করিয়াই হাসে না, বা হাসিতে পারে না, তাহা আমি বলিতে পারি না। মানুষ হাসে। হাসিয়াই সে শ্রেষ্ঠ। আমরা অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বীকে শুধু হাসিয়াই উড়াইয়া দি'। তর্কে যেখানে শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা কঠিন, সে স্থলে কখন-কখনও হাসিয়াই জিতিয়া যাওয়া যায়। আমরা ইতর জন্তুকে শুধু হাসিয়াই পশ্চাতে ফেলিয়াছি। ভাগ্যে বিধাতা হাসি দিয়াছিলেন! আমরা এ যাত্রা হাসিয়াই জিতিয়া গিয়াছি। প্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ হাসিয়া; আমার মনে হয়, মানুষের মধ্যেও মানুষ শ্রেষ্ঠ হাসিয়া। হাস্য-রস সকল রসের সেরা। শিল্পকলার স্বাধীন বিকাশ হাসিতে।

হাসি জীবনের আলো। হাসি ও অশ্রু জীবনের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ। চন্দ্রেরই কলার মত হাসি ক্ষয়শীল। ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া হাসির জ্যোতিঃ যখন অশ্রুতে মিলাইয়া যায়, তখন জীবনে কোনও আলোই আর থাকে না। অশ্রু ও হাসি উভয়ে মিলিয়া সংসার-পটের এক অপূর্ব্ব প্রচ্ছন্ন ভূমি (Back-ground) প্রস্তুত করিয়াছে, আর তাহারই উপরে জীবনের তুলি বুলাইয়া আমরা নানা রঙ্গে করুণ-মধুর কত ছবি আঁকিয়া তুলিতেছি।

হাসি বড় চপল; ছোট ছেলের মত উদ্দাম; প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিয়া-ছুটিয়া বেড়াইতে সে ভালবাসে। হাসির বড় দিদি—কান্না—কিছু উদাস, গম্ভীর, স্থির, মন্থর। হাসিকে তাই সে মাঝে-মাঝে চোখ রাঙাইয়া শাসন করে। হাসিও তেমনই পাশ কাটাইয়া বাহিরে-বাহিরে ফেরে। চোখের জলের অন্তরালে কখন কখনও রামধনু আঁকিয়া একটু-আধটু মজা করিতেও সে ছাড়ে না।

হাসির শত্রু অনেক; সেইজন্য হাসিকে বড় সাবধানে চলিতে হয়। যেখানে-সেখানে হাসা চলে না। কেহ কাজের কথা পাড়িয়াছে, কাহারও টাকার জন্য মাথায়-মাথায় ভাবনা পড়িয়াছে, কেহ অসুখের যন্ত্রণায় অধীর হইয়াছে, সেখানে যেন ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিও না। হাসির পরম শত্রু বেদনা (Emotion)। বেদনা শুধু দুঃখ নহে। ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতিকে যদি সাধারণতঃ 'বেদনা' বলা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার বেদনাই হাসির শত্রু। মন যখন বেদনার মেঘাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, তখন কিছুতেই হাসির অরুণভাতি খেলে না।

হাসি বড় সুন্দর। সকল সৌন্দর্য্য হাসিতে খুলে। "ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিল্লোলে, মদন মুরছা পায়।" রূপের মর্ম্মরে হাসি মরকতের মীনা। উষার সীমন্তে বালার্কের মত, তরুণীর ললাটে টিপের মত, পাতার ঝাড়ে ফুলের মত সুন্দর মুখে হাসি বড় মানায়। হাসি সৌন্দর্য্যে

মাধুর্য্য সঞ্চার করে, স্বর্বর্ণের অলঙ্কারে হীরকছ্যতি ফুটায়। তাই প্রেমের পূর্ব্বরাগ হাসিতেই বিকশিত হয়। মর্ম্মের কথা হাসিতে যেমন প্রকাশ করা যায়, এমন আর কিছুতে নহে। বসন্তের পিক-কাকলির ন্যায় হাসি সু-সময়ের সূচনা করে। হাসির ভাষা আছে। চোখে-মুখে, কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনায়, অঙ্গের বিলাস-ভঙ্গীতে হাসি অবলীলায় তাহার মনের কথা বলিয়া ফেলে। "মুখের হাসি চাপ্‌লে কি হয়, প্রাণের হাসি চোখে খেলে।"

হাসি সরল প্রাণের স্বচ্ছ মুকুর। হাসি এক নিমেষে মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত উন্মুক্ত করিয়া ফেলে। সংসারের নানা কর্ত্তব্য-কণ্টকিত কঠোরতার হস্ত হইতে একটু অবসর পাইলেই মানুষ মনের মানুষের আশ্রয় লয়,—যেখানে একটু হাল্‌কা হাসি হাসিয়া হৃদয়কে একেবারে খুলিয়া, মেলিয়া, বিলাইয়া দেওয়া চলে। হাসির স্ফূর্ত্তি স্বাধীনতায়। স্বাধীনভাবে যেখানে মিশিতে পারা যায় না, সেখানে হাসি ফোটে না। বড়ই সখের জিনিষ হাসি। সখের বা স্বাধীনতার একটুও অভাব ঘটিলে হাসির চাঁদিনী জোছনার অবাধ স্রোত বহে না। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে হাসিকে দন্তে-দন্তে পিষিয়া শাসন করিতে হয়। কিন্তু একটু মুক্তি পাইলেই, সে হাসির ছলক পলকে সকল বাধা টুটাইয়া গিরিনির্ঝরের মত বহিয়া যায়।

মানুষের জীবনে দেবতার দান হাসি। জ্যোতিঃ-প্রপাতের ন্যায় হাসির রজতধারাটি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে। সুরসরিতের মতই তাহা রোগ, শোক, ব্যথা-কলুষিত মানবজীবনকে শান্ত, তরল প্রবাহে পুত করিয়া মুক্তিপ্রদান করে। আপনাদের হাসি জ্ঞানে ও অজ্ঞানে, সদরে ও অন্দরে, আধেয় ও আধারে অক্ষয় হউক।

হাসির বিমল প্রবাহটি বড় যত্নে রক্ষা করিতে হয়। অশ্রুজলের জমাট বাঁধা হিমনিকর উভয় কূল হইতে যে হাসির প্রবাহটিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর করিয়া আনিতেছে, তাহার হাত এড়াইব কিরূপে? তাই মনে হয়, হাসির সা-রি-গ-ম প্রভৃতি যে কয়েকটি পর্দ্দা আছে, সবগুলিতে ঝঙ্কার দিয়া জীবনে একবার হাসির ঢেউ বহিয়া যাক্‌।

দেবদাস

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

সেপ্টেম্বর—১৯০০

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আজ দুই বৎসর হইতে অশথঝুরি গ্রামে চন্দ্রমুখী ঘর বাঁধিয়াছে। ছোট্ট নদীর তীরে, একটা উঁচু যায়গায় তাহার ঝর-ঝরে দুখানি মাটীর ঘর; পাশে একটা চালা, তাহাতে কাল রংয়ের একটা পরিপুষ্ট গাভী বাঁধা থাকে। ঘর দুইটার একটিতে রান্না, ভাঁড়ার; অপরটিতে সে শোয়। উঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, রমা বাগ্দীর মেয়ে রোজ নিকাইয়া দিয়া যায়। চতুর্দ্দিকে ভেরাণ্ডার বেড়া, মাঝখানে একটা কুলগাছ, আর একপাশে তুলসীর ঝাড়। সম্মুখে নদীর ঘাট—লোক লাগাইয়া, খেজুর গাছ কাটিয়া সিঁড়ি তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সে ভিন্ন এ ঘাট আর কেহ ব্যবহার করে না। বর্ষার সময় দুকূল পূরিয়া চন্দ্রমুখীর বাটীর নীচে পর্য্যন্ত জল আসে। গ্রামের লোক ব্যগ্র হইয়া কোদাল লইয়া ছুটিয়া আসে, বেড়ার নীচে মাটি ফেলিয়া উঁচু করিয়া দিয়া যায়। এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই। চাষা, গোয়ালা, বাগ্দী, দু'ঘর কলু, আর গ্রামের শেষে ঘর-দুই মুচীর বাস। চন্দ্রমুখী এ গ্রামে আসিয়া দেবদাসকে সংবাদ দেয়; উত্তরে সে আরও কিছু টাকা পাঠাইয়া দেয়। এই টাকা চন্দ্রমুখী গ্রামের লোককে ধার দেয়। আপদ-বিপদে সবাই তাহার কাছে ছুটিয়া আসে—টাকা লইয়া বাড়ী যায়। চন্দ্রমুখী সুদ লয় না—তাহার পরিবর্ত্তে কলাটা, মূলাটা, খেতের শাক সব্জী আহ্লাদ ইচ্ছা করিয়া দিয়া যায়। আসলের জন্যও কখনো পীড়া-পীড়ি করে না।

যে দিতে পারে না, সে দেয় না। চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলে, "আর তোকে কখনো দেব না।" সে নম্রভাবে বলে, "মা ঠাকুরুণ, আশীর্ব্বাদ কর, এবার যেন ভাল ফসল হয়।" চন্দ্রমুখী আশীর্ব্বাদ করে। আবার হয় ত ভাল ফসল হয় না, খাজনার তাগাদা পড়ে—আবার আসিয়া কাঁদিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়—চন্দ্রমুখী আবার দেয়। মনে-মনে হাসিয়া বলে, "তিনি বাঁচিয়া থাকুন, আমার টাকার ভাবনা কি?"

কিন্তু তিনি কোথায়? প্রায় ছয়মাস হইল, সে কোন সংবাদ পায় নাই। চিঠি লিখিলে জবাব আসে না, রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলে ফিরিয়া আসে। একঘর গয়লাকে চন্দ্রমুখী নিজে বাটীর কাছে বসাইয়াছে; তাহার পুত্রের বিবাহে সাড়ে দশগণ্ডা টাকা পণ দিয়াছে; একজোড়া লাঙ্গল কিনিয়া দিয়াছে। তাহারা সপরিবারে চন্দ্রমুখীর আশ্রিত এবং নিতান্ত অনুগত। একদিন সকালবেলা চন্দ্রমুখী ভৈরব গয়লাকে ডাকিয়া কহিল, "ভৈরব, তালাসোনাপুর এখান থেকে কতদূর জানো?" ভৈরব চিন্তা করিয়া বলিল, "দুটো মাঠ পার হলেই কাছারি।" চন্দ্রমুখী প্রশ্ন করিল, "সেখানে বুঝি জমীদার থাকেন?" ভৈরব কহিল, "হাঁ, তিনি মুলুকের জমীদার। এ গাঁও তাঁর। আজ তিনবছর হ'ল তিনি স্বর্গে গিয়েছেন;—যত প্রজা এক মাস ধ'রে সেখানে লুচিমণ্ডা খেয়েছিল। এখন তাঁর দুই ছেলে আছে; —মস্ত বড়লোক,—রাজা!" চন্দ্রমুখী কহিল, "ভৈরব, আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো?" ভৈরব বলিল, "কেন পারব না মা, যেদিন ইচ্ছে চল।" চন্দ্রমুখী উৎসুক হইয়া বলিল, "তবে চল না কেন ভৈরব, আমরা আজই যাই।" ভৈরব বিস্মিত হইয়া কহিল, "আজই?" তার পরে চন্দ্রমুখীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তা' হলে মা, তুমি শীগ্‌গীর রান্না করে নাও, আমিও দুটো মুড়ি বেঁধে নিই।" চন্দ্রমুখী বলিল, "আমি আর রান্না করব না ভৈরব, তুমি মুড়ি বেঁধে নাও।" ভৈরব বাড়ী গিয়া কিছু মুড়ি ও গুড় চাদরে বাঁধিয়া কাঁধে ফেলিল। একগাছা লাঠি হাতে লইয়া ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তবে চল; কিন্তু তুমি কিছু খাবে না মা?" চন্দ্রমুখী বলিল, "না, ভৈরব, আমার এখনো পুজো-আহ্নিক হয় নি; যদি সময় পাই ত সেখানে গিয়ে ওসব কোরব।" ভৈরব আগে-আগে পথ দেখাইয়া চলিল। পিছনে চন্দ্রমুখী বহু কষ্টে আলের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। অনভ্যস্ত কোমল পা-দুটী ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইল, রৌদ্রে সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। স্নানাহার কিছুই হয় নাই, তবু চন্দ্রমুখী মাঠের পর মাঠ পার হইয়া চলিতে লাগিল। মাঠের কৃষকেরা আশ্চর্য্য হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রমুখীর পরিধানে একখানা লালপেড়ে কাপড়, হাতে দু'গাছা বালা, মাথায় কপালের উপর পর্য্যন্ত আধ-ঘোমটা; সমস্ত দেহ একখানা মোটা বিছানার চাদরে আবৃত। সূর্য্যদেবের অস্ত যাইতে যখন আর অধিক বিলম্ব নাই, সেই সময়ে দুই-জনে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রমুখী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "ভৈরব, তোমার দুটো মাঠ এতক্ষণে কি শেষ হ'ল?" ভৈরব পরিহাসটা বুঝিতে না পারিয়া সরল ভাবে বলিল, "হাঁ, মা ঠাকরুণ, এইবার এসেচি; কিন্তু তোমাদের এই সুখী শরীরে আজ কি আর ফিরে যেতে পারবে?" চন্দ্রমুখী মনে-মনে বলিল, "আজ কেন, কালও বোধ করি এ পথ হাঁটিতে পারিব না।" প্রকাশ্যে কহিল, "ভৈরব, গাড়ী পাওয়া যায় না?" ভৈরব বলিল, "যায় বৈ কি মা, গরুর গাড়ী ঠিক কোরব?" গাড়ী ঠিক করিতে আদেশ করিয়া চন্দ্রমুখী জমীদার-বাটী প্রবেশ করিল। ভৈরব গাড়ীর বন্দো-বস্তে অন্য দিকে গেল। অন্দরে, উপরের বারান্দায় বড়-বৌ (আজকাল জমিদার-গৃহিণী) বসিয়া ছিলেন। একজন দাসী সেইখানে চন্দ্রমুখীকে লইয়া উপস্থিত করিল। উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিল। চন্দ্রমুখী নমস্কার করিল। বড় বধূর দেহে অলঙ্কার ধরে না, চোখের কোণ দিয়া অহঙ্কার ফাটিয়া পড়িতেছে। ঠোঁট-দুটা ও দাঁতগুলা পান ও মিশিতে প্রায় কালো হইয়া গিয়াছে। একদিকের গাল উঁচু, বোধ হয় দোক্তা আর পানে ভরা আছে। এমন টান করিয়া চুল বাঁধা যে, খোঁপাটা মাথার ডগায় উঠিয়াছে। দু'কাণে ছোটবড় বিশ-ত্রিশটা মাকড়ি। নাকের এক দিকে নাকছাবি, অপর দিকে মস্ত ফুটা—বোধ হয় শাশুড়ীর আমলে তাহাতে নথ পরা হইত। চন্দ্রমুখী দেখিল, বড়-বৌয়ের বেশ মোটা-সোটা, মাজা-ঘসা দেহ, বর্ণ শ্যাম; বেশ ভাসা-ভাসা চোখ, গোল ধরণের মুখ,—পরনে কালা-পেড়ে সাড়ী, গায়ে একটা দামী জামা—সেইটা দেখিয়া চন্দ্রমুখীর ঘৃণা বোধ হইল। আর বড়বৌ দেখিলেন, চন্দ্রমুখীর বয়স হইলেও, শরীরে রূপ ধরে না। দুজনেই বোধ করি

সমবয়সী, কিন্তু বড়বৌ মনে-মনে তাহা স্বীকার করিলেন না। এ গ্রামে পার্ব্বতী ভিন্ন অতখানি রূপ তিনি আর দেখেন নাই। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?" চন্দ্রমুখী কহিল, "আমি আপনারই একজন প্রজা; কিছু খাজনা বাকী পড়িয়াছে, তাই দিতে আসিয়াছি।" বড়বৌ মনে-মনে খুসি হইয়া বলিলেন, "তা' এখানে কেন? কাছারী বাড়ী যাও না!" চন্দ্রমুখী মৃদু হাসিয়া কহিল, "মা, আমরা দুঃখী মানুষ, সব খাজনা ত দিতে পারিনে। শুনেচি, আপনার বড় দয়া; তাই আপনার কাছেই এসেচি, যদি দয়া করে কিছু মাপ করে দেন।" এরূপ কথা বড়বৌ জীবনে এই প্রথম শুনিলেন। তাঁর দয়া আছে, খাজনা মাপ করিতে পারেন—কাজেই চন্দ্রমুখী একেবারে প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়িল। বড়বৌ কহিলেন, "তা' বাছা, দিনের মধ্যে এমন কত টাকা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়, কত লোক আমাকে এসে ধরে; আমি না বল্‌তে পারি না, এজন্য কর্ত্তা আমার উপর কত রাগ করেন।—তা' তোমার কত টাকা বাকী পড়েচে?" "বেশী নয় মা, মোটে ৬টাকা; কিন্তু আমাদের কাছে তাই যেন পাহাড়; সমস্ত দিন আজ পথ চলে এসেচি।" বড় বৌ কহিলেন, "আহা, তা' তোমরা দুঃখী লোক, আমাদের দয়া করাই উচিত। ও বিন্দু, একে বাইরে নিয়ে যা; দাওয়ান মশাইকে আমার নাম করে বলে দে, যেন দু'টাকা মাপ করা হয়। তা' বাছা, তোমার বাড়ী কোথায়?" চন্দ্রমুখী বলিল, "আপনারই রাজত্বে—ওই অশথঝুরি গাঁয়ে। আচ্ছা মা, কর্ত্তারা এখন দু'সরিক না?" বড়বৌ বলিলেন, "পোড়া কপাল! ছোট সরিক আর কি আছে? দু'দিন পরে আমারই ত সব হবে।" চন্দ্রমুখী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা? ছোট বাবুর বুঝি খুব ধার-কর্জ্জ?" বড়বৌ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমার কাছে সব বাঁধা। ঠাকুরপো একেবারে ব'য়ে গেছে। কলকাতায় মদ—বেশ্যা, এই নিয়েই আছে। কত টাকা উড়িয়ে দিলে তা'র কি আদি অন্ত আছে?" চন্দ্রমুখীর মুখ শুকাইল; একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ মা, ছোট বাবু কি তা'হলে বাড়ীও আসেন না?" বড়বৌ বলিলেন, "আস্‌বে না কেন! যখন টাকার দরকার হয়, আসে। ধার করে, বিষয় বাঁধা দেয়—চলে যায়। এই মাস দুই হ'ল, এসে বার হাজার টাকা নিয়ে গেছে। বাঁচবার আকারও নেই, গা-ময় কুচ্ছিত রোগ জন্মেচে—ছিঃ—ছিঃ—" চন্দ্রমুখী শিহরিয়া উঠিল—মলিন মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি কলকাতায় কোথায় থাকেন?" বড়বৌ কপালে একটা করাঘাত করিয়া হাসিমুখে কহিলেন, "পোড়া দশা! তা' কি কেউ জানে? কোথায় কোন্ হোটেলে খায়—যা'র-তা'র বাড়ীতে পড়ে থাকে—সেই জানে, আর তার যম জানে।" চন্দ্রমুখী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি যাই—" বড়বৌ একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "যাবে? ওরে ও বিন্দু—" চন্দ্রমুখী বাধা দিয়া বলিল, "থাক্ মা, আমি আপনিই কাছারীতে যেতে পারব" বলিয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল। বাটীর বাহির হইয়া দেখিল, ভৈরব অপেক্ষা করিয়া আছে,—গো-শকট প্রস্তুত। সেই রাত্রে চন্দ্রমুখী বাটী ফিরিয়া আসিল। সকাল বেলা ভৈরবকে আবার ডাকিয়া কহিল, "ভৈরব, আমি আজ কলকাতা যাব। তুমি ত যেতে পারবে না, তাই তোমার ছেলেকে সঙ্গে নেব, কি বল?" ভৈরব—"তোমার ইচ্ছে। কিন্তু কলিকাতায় কেন মা, বিশেষ কোন কাজ আছে কি?" চন্দ্রমুখী—"হাঁ ভৈরব, বিশেষ কাজ আছে।" ভৈরব—"আবার আস্‌বে কবে মা?" চন্দ্রমুখী—"সে কথা বল্‌তে পারিনে ভৈরব। হয় ত শীঘ্র ফিরে আস্‌ব, হয় ত বা দেরি হবে। আর যদি না আসি, এসব ঘরবাড়ী তোমার রইল।" প্রথমে ভৈরব অবাক হইয়া গেল। তাহার পর তাহার দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল; কহিল, "ও কি কথা মা? তুমি না এলে এ গাঁয়ের লোক যে কেউ বাঁচবে না!" চন্দ্রমুখী সজল চক্ষে মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে কি ভৈরব, আমি দু'বছর হ'ল এখানে এসেছি। তার পূর্ব্বে তোমরা কি বেঁচে ছিলে না?" ইহার উত্তর মূর্খ ভৈরব দিতে পারিল না; কিন্তু চন্দ্রমুখী অন্তরে সমস্তই বুঝিল। ভৈরবের ছেলে কেবলা শুধু সঙ্গে যাইবে। গাড়ীতে আবশ্যক দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া উঠিবার সময়, পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই দেখিতে আসিল, দেখিয়া কাঁদিতে আসিল। চন্দ্রমুখীর নিজের চোখেও জল ধরে না। ছাই কলিকাতা! দেবদাসের জন্য না হইলে, কলিকাতার রাণীগিরি পাইবার জন্যও চন্দ্রমুখী এত ভালবাসা তুচ্ছ করিয়া যাইতে পারিত না।

পর দিন সে ক্ষেত্রমণির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পূর্ব্বের বাসাতে এখন অন্য লোক আসিয়াছে।

ক্ষেত্রমণি অবাক হইয়া গেল,—"দিদি যে! কোথায় ছিলে এত দিন?" চন্দ্রমুখী সত্য কথা গোপন করিয়া বলিল, "এলাহাবাদে ছিলাম।" ক্ষেত্রমণি ভাল করিয়া নজর দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "তোমার গহনাগাটি কি হ'ল দিদি?"

চন্দ্রমুখী হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল—"সব আছে।" সেই দিন মুদীর সহিত দেখা করিয়া কহিল, "দয়াল, কতটাকা আমি পাব?" দয়াল বিপদে পড়িল—"তা' বাছা, প্রায় ৬০।৭০ টাকা। আজ না হোক দু'দিন পরে দিব।" "তোমাকে কিছুই দিতে হবে না যদি আমার কিছু কাজ কোরে দাও।" "কি কাজ?" "দুদিন খাটতে হবে এই মাত্র! আমাদের পাড়ায় একটা বাড়ী ভাড়া করিবে—বুঝলে?" দয়াল হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি বাছা।" "ভাল বাড়ী। বেশ ভাল বিছানা, বালিশ, চাদর, আলো, ছবি, দুটো চেয়ার, একটা টেবিল— বুঝলে?" দয়াল মাথা নাড়িল। "আর্শি, চিরুণী, রং-করা দু'জোড়া কাপড়, গায়ের জামা—আর, ভাল গিল্টির গয়না কোথায় পাওয়া যায় জান?" দয়ালমুদী ঠিকানা বলিয়া দিল। চন্দ্রমুখী কহিল, "তবে তাও এক্‌শেট ভাল দেখে কিনতে হবে—আমি সঙ্গে গিয়ে পছন্দ কোরে দেব।" তার পর হাসিয়া কহিল, "আমাদের যা' চাই, জানো ত সব,—একজন ঝিও ঠিক করতে হবে।" দয়াল কহিল, "কবে চাই বাছা?" "যত শীঘ্র হয়। দুই তিন দিনের মধ্যে হ'লেই ভাল হয়।" বলিয়া চন্দ্রমুখী তাহার হাতে একশত টাকার নোট দিয়া কহিল,—"ভাল জিনিস নিয়ো, শস্তা কোরো না।"

তৃতীয় দিবসে সে নূতন বাটীতে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলরামকে লইয়া মনের মত করিয়া ঘর সাজাইল, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে আপনি সাজিতে বসিল। সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া তাহাতে পাউডার দিল, আলতা গুলিয়া পায়ে দিল, পান খাইয়া ওষ্ঠ রঞ্জিত করিল। তাহার পর সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিয়া, জামা আঁটিয়া, রং-করা কাপড় পরিল; বহু দিন পরে চুল বাঁধিয়া আবার কপালে টিপ্ পরিল। আয়নায় মুখ দেখিয়া মনে-মনে হাসিয়া বলিল, "পোড়া অদৃষ্টে আরও কি আছে!" পাড়াগাঁয়ের ছেলে কেবলরাম সহসা এই অভিনব সাজসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ভীত হইয়া কহিল, "দিদি, এ কি!" চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলিল, "কেবল, আজ আমার বর আস্‌বে।" কেবলরাম বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যার পর ক্ষেত্রমণি বেড়াইতে আসিল —"দিদি, এ আবার কি!" চন্দ্রমুখী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "এ সব চাই ত আবার।" ক্ষেত্রমণি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "দিদির যত বয়স বাড়চে, রূপও তত বাড়চে।"

সে চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী বহু দিন পূর্ব্বের মত আবার জানালার পার্শ্বে উপবেশন করিল। নির্নিমেষ চক্ষে রাস্তার পানে চাহিয়া রহিল। এই তাহার কাজ; এই করিতে সে আসিয়াছে—যতদিন এখানে থাকিবে, ততদিন ইহাই করিবে। নূতন লোক কেহ হয় ত আসিতে চায়; দ্বার ঠেলাঠেলি করে; কেবলরাম মুখস্থর মত ভিতর হইতে কহে—"এখানে নয়।" পুরাতন পরিচিত কেহ বা আসিয়া উপস্থিত হয়। চন্দ্রমুখী বসাইয়া হাসিয়া কথা কহে; কথায় কথায় দেবদাসের কথা জিজ্ঞাসা করে; তাহারা বলিতে পারে না,—অমনি বিদায় করিয়া দেয়। রাত্রি অধিক হইলে নিজে বাহির হইয়া পড়ে। পাড়ায়-পাড়ায় দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। অলক্ষ্যে দ্বারে-দ্বারে কাণ পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে চায়—নানা লোকে নানা কথা বলে; যাহা শুনিতে চায়, তাহা কিন্তু শোনা যায় না।—কেহ বা মুখ ঢাকিয়া হঠাৎ মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়—স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়ায়—শশব্যস্তে চন্দ্রমুখী সরিয়া যায়। দুপুরবেলা পুরাতন পরিচিত সঙ্গিনীদের বাড়ী বেড়াইতে যায়। কথায়-কথায় প্রশ্ন করে,—"কেহ দেবদাসকে জান?" তাহারা জিজ্ঞাসা করে "কে দেবদাস?" চন্দ্রমুখী উৎসুক হইয়া পরিচয় দিতে থাকে—গৌরবর্ণ, মাথায় কোঁকড়া চুল, কপালের বাঁ' দিকে একটা কাটা দাগ, বড়লোক—অজস্র টাকা খরচ করে, কেউ চেন কি?" কেহই সন্ধান দিতে পারে না। হতাশ, বিষন্নমুখে চন্দ্রমুখী বাড়ী ফিরিয়া যায়। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া রাস্তার পানে চাহিয়া থাকে।—ঘুম পাইলে বিরক্ত হয়; মনে-মনে কহে, "এ কি তোমার ঘুমাইবার সময়?" ক্রমে একমাস অতীত হইল,—কেবলরামও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। চন্দ্রমুখীর নিজেরও সন্দেহ হইতে লাগিল, বুঝি সে এখানে নাই। তবুও আশার ভর করিয়া, দেবতার চরণে কায়মনে প্রার্থনা করিয়া, দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

কলিকাতা আসিবার পর দেড়মাস গত হইয়াছে। আজ রাত্রে তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। রাত্রি তখন এগারটা—হতাশ মনে বাড়ী ফিরিতেছিল; দেখিতে পাইল পথের ধারে একটা দ্বারের সম্মুখে একজন আপনার মনে কি বলিতেছে। চন্দ্রমুখীর বুকের মধ্যে ধড়াস্ করিয়া উঠিল। এ কণ্ঠস্বর *যে বড় পরিচিত! কোটী-কোটী লোকের মধ্যেও চন্দ্রমুখী সে স্বর বুঝিতে পারিত।* স্থানটা একটু অন্ধকার, তাহাতে আবার লোকটা অত্যন্ত মাতাল হইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। চন্দ্রমুখী নিকটে গিয়া গায়ে হাত দিল—"তুমি কে গা, এমন ক'রে পড়ে আছ?" লোকটা সুর করিয়া বলিল, —"শুন সই, মনের মানস কই; যদি পাই কানু হেন স্বামী—" চন্দ্রমুখীর আর সন্দেহ নাই, ডাকিল,—"দেবদাস?" দেবদাস সেই ভাবে বলিল,—"উঁ।" "এখানে পড়ে কেন, ঘরে যাবে?" "না। বেশ আছি—" "একটু মদ খাবে?" "খাব" বলিয়া সে একেবারে চন্দ্রমুখীর গলা জড়াইয়া ধরিল,—কহিল, "এমন বন্ধু কে বাবা তুমি?" চন্দ্রমুখীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন বহু পরিশ্রমে টলিয়া-টলিয়া, তাহার গলা ধরিয়া কোনক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ মুখপানে চাহিয়া বলিল, "বাঃ, এ যে খাসা জিনিস!" চন্দ্রমুখীর কান্নায় হাসি মিশিল; কহিল, "হাঁ, বেশ জিনিস; এখন, আপাতক আমার কাঁদে ভর দিয়ে একটু এগিয়ে চল, একটা গাড়ী চাই ত।" "তা' চাই বই কি!" পথে আসিতে-আসিতে দেবদাস জড়িত কণ্ঠে কহিল, "সুন্দরি, আমাকে তুমি চেন?" চন্দ্রমুখী কহিল, "চিনি।" দেবদাস হাসিয়া উঠিল—"অন্য লোকে ভুরা দেয়, ভাগ্যে আমি চিনি—।" তাহার পর গাড়ীতে বসিয়া, চন্দ্রমুখীর কাঁদে ভর দিয়া বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া পকেটে হাত দিয়া কহিল, "সুন্দরি, কুড়িয়ে ত আন্‌লে, কিন্তু পকেটে যে কিছু নেই—" চন্দ্রমুখী নীরবে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একেবারে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া কহিল—"ঘুমোও।" দেবদাস তেম্‌নি জড়িত কণ্ঠে কহিল, "কিছু মৎলব আছে না কি? এই যে বল্‌লাম পকেট খালি, —কিচ্ছু আশা নেই! বুঝ্‌লে রূপসী!" রূপসী তাহা বুঝিয়াছিল; কহিল, "কাল দিয়ো।" দেবদাস বলিল, "এতটা বিশ্বাস ত ভাল নয়—কি চাও খুলে বল দেখি?" চন্দ্রমুখী কহিল, "কাল শুনো"—বলিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

দেবদাসের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছিল। ঘরে কেহ ছিল না। চন্দ্রমুখী স্নান করিয়া নীচে রান্নার উদ্যোগে গিয়াছে। দেবদাস চাহিয়া দেখিল, এ ঘরে কখন সে আসে নাই, একটি জিনিসও চিনিতে পারিল না। তাহার গত রাত্রের কোন কথাই মনে পড়িল না; শুধু স্মরণ হইল *কাহার একটা আন্তরিক সেবা। কে যেন বড় স্নেহ করিয়া টানিয়া আনিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছিল।* এই সময় চন্দ্রমুখী ঘরে প্রবেশ করিল। রাত্রের সাজসজ্জার সে অনেকখানি পরিবর্ত্তন করিয়াছিল। গায়ে গহনাগুলি ছিল বটে, কিন্তু পরনে রঙীন কাপড়, কপালে টিপ, মুখে পানের দাগ—এ সকল ছিল না। নিতান্তই একখানি সাদাসিধা কাপড় পরিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেবদাস মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল; "কোথা থেকে কাল আমাকে ডাকাতি ক'রে আন্‌লে?" চন্দ্রমুখী বলিল, "ডাকাতি করিনি—পথে থেকে শুধু কুড়িয়ে এনেছিলাম।" দেবদাস হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা' যেন হ'ল; কিন্তু তোমার আবার এ সব কি? কবে এলে? গায়ে যে গয়না ধরে না—দিলে কে?" চন্দ্রমুখী দেবদাসের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আবার!" দেবদাস হাসিয়া কহিল, "না, না—তা' নয়; একটা তামাসা করতেও কি দোষ? এলে কবে?" চন্দ্রমুখী বলিল, "দেড়মাস হ'ল।" দেবদাস মনে-মনে যেন কি হিসাব করিল। পরে কহিল, "আমাদের বাড়ী যখন গিয়াছিলে, তা'র পরেই এসেছ?" চন্দ্রমুখী বিস্মিত হইয়া কহিল, "তোমাদের বাড়ী গিয়েছিলাম—কি কোরে জান্‌লে?" দেবদাস কহিল, "তুমি যাবার পরেই আমি বাড়ী গিয়েছিলাম। একজন দাসী—যে তোমাকে বউ-ঠাকরুণের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তার কাছেই শুন্‌তে পাই,—কাল অশথঝুরি গাঁ থেকে একজন স্ত্রীলোক এসেছিল, সে ভারি সুন্দরী। আর কি বুঝতে বাকী থাকে? কিন্তু এত গয়না আবার গড়ালে কেন?" চন্দ্রমুখী বলিল, "গড়াইনি, এ সব গিল্টির গয়না, কলকাতায় এসে কিনেচি। তবুও দেখ দেখি, তোমার জন্যে আবার কত বাজে খরচ করতে হ'ল! অথচ কাল আমাকে তুমি চিনতেও পারলে না।" দেবদাস হাসিয়া উঠিল; বলিল, "একেবারে চিন্‌তে পারিনি, কিন্তু যত্নটি চিনেছিলাম। অনেকবার মনে হয়েছিল, আমার চন্দ্রমুখী ছাড়া এত যত্ন কা'র? আনন্দে

চন্দ্রমুখীর কাঁদিতে সাধ হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দেবদাস, আমাকে আর তত ঘৃণা কর না—না?" দেবদাস জবাব দিল, "না। বরং ভালবাসি।"

দুপুরবেলা স্নান করিবার সময় চন্দ্রমুখী দেখিল, দেবদাসের পেটে একখণ্ড ফ্লানেল বাঁধা আছে। ভয় পাইয়া বলিল, "ও কি, ফ্লানেল বেঁধেচ কেন?" দেবদাস বলিল, "পেটে একটু ব্যথা বোধ করি, তুমি অমন করচ কেন?" চন্দ্রমুখী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ করনি ত? লিভারে ব্যথা হয় নি ত?" দেবদাস হাসিয়া কহিল, "চন্দ্রমুখি, বোধ হয় তাই হয়েছে।" সেই দিন ডাক্তার আসিয়া বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ঠিক এই আশঙ্কাই করিয়া গেলেন। ঔষধ দিলেন, এবং জানাইলেন যে, যথেষ্ট সাবধানে না থাকিলে, বিষম অনিষ্ট ঘটিতে পারে। অর্থ উভয়েই বুঝিল। বাসায় সংবাদ দিয়া ধর্ম্মদাসকে আনা হইল; চিকিৎসার জন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনা হইল। দু'দিন অমনি গেল, কিন্তু তৃতীয় দিনে তাহার জ্বর দেখা দিল। দেবদাস চন্দ্রমুখীকে ডাকিয়া কহিল, "খুব সময়ে এসেছিলে, না হলে হয় ত আর দেখ্‌তেই পেতে না।" চোখ মুছিয়া চন্দ্রমুখী প্রাণপণে সেবা করিতে বসিল। যুক্ত-করে প্রার্থনা করিল, "ভগবান, অসময়ে এতখানি কাজে লাগিব, এ আশা স্বপ্নেও করি নাই। কিন্তু দেবদাসকে ভালো করিয়া দাও।" প্রায় মাসাধিককাল দেবদাস শয্যায় পড়িয়া রহিল; তাহার পর ধীরে-ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিল;—অসুখ তেমন গুরুতর হইতে পারিল না।

এই সময় একদিন দেবদাস কহিল, "চন্দ্রমুখি, তোমার নামটা মস্ত বড়। সর্ব্বদা ডাকতে অসুবিধা হয়,—একটু ছোট করে নিতে চাই।"

চন্দ্রমুখী বলিল, "বেশ ত।" দেবদাস কহিল, "তবে, আজ থেকে তোমাকে বৌ বলে ডাক্‌ব।" চন্দ্রমুখী হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তা' যেন ডাক্‌লে, কিন্তু একটা মানে থাকা ত চাই।" "সব কথার কি মানে থাকে? আমার সাধ।" "যদি সাধ হয়ে থাকে, তাই ডেকো; কিন্তু, এ সাধ কেন, তাও বল্‌বে না?" "না; কখনো কারণ জিজ্ঞেসা করতেও পাবে না।" চন্দ্রমুখী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বেশ, তাই হবে।" দেবদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, হঠাৎ গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "আচ্ছা বৌ, তুমি আমার কে, যে, এত প্রাণপণে আমার সেবা কোরচ?" চন্দ্রমুখী লজ্জানত বধূও নহে, অ-বাক্‌পটু বালিকাও নহে; মুখপানে স্থির, শান্ত দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহ-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব—তা কি আজও বুঝ্‌তে পারোনি?" দেবদাস দেয়ালের দিকে চাহিয়া ছিল; সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে-ধীরে বলিতে লাগিল, "তা পেরেছি; কিন্তু তেমন আনন্দ পাইনে। পার্ব্বতীকে কত ভালবাসি, সে আমাকে কত ভালবাসে; কিন্তু তবু কি কষ্ট! অনেক দুঃখ পেয়ে ভেবেছিলাম, আর কখনো এ সব ফাঁদে পা দেব না; ইচ্ছে কোরে দিইওনি। কিন্তু, তুমি এমন কেন কোরলে? জোর কোরে আমাকে কেন বাঁধ্‌লে?" বলিয়া আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, "বৌ, তুমিও হয় ত পার্ব্বতীর মতই কষ্ট পাবে।" চন্দ্রমুখী মুখে অঞ্চল দিয়া শয্যার একপ্রান্তে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তোমাদের দু'জনের কত অমিল, আবার কত মিল। একজন অভিমানী, উদ্ধত,—আর একজন কত শান্ত, কত সংযত! সে কিছুই সইতে পারে না, আর তোমার কত সহ্য! তার কত যশ, কত সুনাম, আর তোমার কত কলঙ্ক! সবাই তাঁকে ভালবাসে, আর কেউ তোমাকে ভালবাসে না। তবে আমি ভালবাসি, বাসি বৈ কি!" বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিল, "পাপ-পুণ্যের বিচারকর্ত্তা তোমার কি বিচার করবেন, জানিনে; কিন্তু, মৃত্যুর পরে যদি আবার মিলন হয়, আমি কখনো তোমা হতে দূরে থাক্‌তে পারব না।"

চন্দ্রমুখী নীরবে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল; মনে-মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল,—"ভগবান কোন কালে, কোন জন্মে যদি এ পাপিষ্ঠার প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমাকে যেন এই পুরস্কার দিয়ো।"

* * * *

মাস-দুই অতিবাহিত হইয়াছে। দেবদাস আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু শরীর সারে নাই। বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কাল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে, সঙ্গে শুধু ধর্ম্মদাস যাইবে। চন্দ্রমুখী ধরিয়া বসিয়াছিল, "তোমার একজন দাসীরও ত প্রয়োজন, আমাকে সঙ্গে যেতে দাও।"

দেবদাস বলিল, "ছিঃ, তা' হয় না। আর যাই করি, এত বড় নির্লজ্জ হতে পারব না। চন্দ্রমুখী একেবারে মৌন হইয়া গেল। সে অবুঝ নয়, তাই সহজেই বুঝিল। আর যাহাই হৌক, এ জগতে তাহার সম্মান নাই। তাহার সংস্পর্শে দেবদাস সুখ পাইবে, সেবা পাইবে, কিন্তু, কখনো সম্মান পাইবে না। চোখ মুছিয়া কহিল, "আবার কবে দেখা পাব?" দেবদাস কহিল, "বল্‌তে পারিনে; তবে, বেঁচে থাক্‌তে তোমাকে কোন দিন ভুলব না, তোমাকে দেখবার তৃষ্ণা আমার কখনো মিটবে না।"

প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী সরিয়া দাঁড়াইল। চুপি চুপি বলিল, "এই আমার যথেষ্ট! এর বেশী আশা করিনে।" যাবার সময় দেবদাস আরও দু'হাজার টাকা চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়া কহিল, "রেখে দাও। মানুষের শরীরে ত বিশ্বাস নেই; শেষে, তুমি কি অকূলে ভাস্‌বে।" চন্দ্রমুখী ইহাও বুঝিল, তাই, হাত পাতিয়া অর্থ গ্রহণ করিল। চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি একটা কথা আমাকে বলে যাও"—দেবদাস মুখপানে চাহিয়া বলিল, "কি?" চন্দ্রমুখী কহিল, "বড়বৌ ঠাকরুণ বলেছিলেন, তোমার শরীরে খারাপ রোগ জন্মেছে—এ কি সত্যি?" প্রশ্ন শুনিয়া দেবদাস দুঃখিত হইল; কহিল, "বড় বৌ সব পারেন; কিন্তু তা' হলে তুমি কি জান্‌তে না? আমার কোন্ কথা তোমার জানা নেই? এক বিষয়ে তুমি যে পার্ব্বতীরও বেশী!" চন্দ্রমুখী আর একবার চোখ মুছিয়া কহিল, "বাঁচ্‌লুম। কিন্তু তবুও, খুব সাবধানে থেকো। তোমার শরীর একে মন্দ, তার ওপর দেখো, কোন দিন যেন ভুল করে বোসো না।" প্রত্যুত্তরে দেবদাস শুধু হাসিল, কথা কহিল না। চন্দ্রমুখী কহিল, "আর একটা ভিক্ষে—দেহ এতটুকু খারাপ হলেই, আমাকে খবর দেবে বল?"

দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"দেব বৈ কি বৌ।" আর একবার প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী কাঁদিয়া কক্ষান্তরে পলাইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন যখন দেবদাস এলাহাবাদে বাস করিয়াছিল, তখন, হঠাৎ একদিন সে চন্দ্রমুখীকে চিঠি লিখিয়াছিল, "বৌ, মনে করেছিলাম, আর কখনো ভালবাসব না। একে ত, ভালবেসে শুধু হাতে ফিরে আসাটাই বড় যাতনা; তার পরে আবার কোরে ভালবাস্‌তে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে আর নেই।"

প্রত্যুত্তরে চন্দ্রমুখী কি লিখিয়াছিল, তাহাতে আবশ্যক নাই; কিন্তু, এই সময়টায় দেবদাসের কেবলই মনে হইত, সে একবার এলে হয় না?

পরক্ষণে সভয়ে ভাবিত,—না, না, কাজ নেই,—কোন দিন পার্ব্বতী যদি জান্‌তে পারে! এম্‌নি করিয়া একবার পার্ব্বতী, একবার চন্দ্রমুখী তাহার হৃদয়-রাজ্যে বাস করিতেছিল। কখনও বা দু'জনের মুখই পাশাপাশি তাহার হৃদয় পটে ভাসিয়া উঠিত—যেন উভয়ের কত ভাব!

মনের মাঝে দু'জনেই পাশাপাশি বিরাজ করিত। কোন দিন বা অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইত, তাহারা দু'জনেই যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই সময়টায় মনটা তাহার এমনি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িত, যে, শুধু একটা নির্জ্জীব অতৃপ্তিই তাহার মনের মধ্যে মিথ্যা প্রতিধ্বনির মত ঘুরিয়া বেড়াইত। তার পরে দেবদাস লাহোরে চলিয়া গেল। এখানে চুনিলাল কাজ করিতেছিল, সন্ধান পাইয়া দেখা করিতে আসিল। বহুদিন পরে দুই বন্ধু উভয়ে উভয়কে দেখিয়া লজ্জিত হইল, সুখী হইল। আবার দেবদাস সুরা স্পর্শ করিল। চন্দ্রমুখীকে মনে পড়ে, সে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল! মনে হয়, তার কত বুদ্ধি! সে কত শান্ত, ধীর; আর তার কত স্নেহ! পার্ব্বতী এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শুধু নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার মত কখনো-কখনো জ্বলিয়া-জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাহার সহিল না। মাঝে-মাঝে অসুখ হয়, পেটের কাছে আবার যেন ব্যথা বোধ হয়। ধর্ম্মদাস একদিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "দেবতা, তোমার শরীর আবার খারাপ হচ্চে—আর কোথাও চল।" দেবদাস অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, "চল, যাই।" দেবদাস প্রায় বাসাতে মদ খায় না। চুনিলাল আসিলে কোন দিন খায়, কোন দিন বাহির হইয়া চলিয়া যায়। রাত্রি শেষে বাটী ফিরিয়া আসে, কোন রাত্রি বা একেবারেই আসে না। আজ দুইদিন হইতে হঠাৎ তাহার দেখা নাই। কাঁদিয়া ধর্ম্মদাস অন্নজল স্পর্শ করিল না। তৃতীয় দিনে জ্বর লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। শয্যা লইল আর উঠিতে পারিল না। তিন-চারিজন ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস কহিল, "দেবতা, কাশীতে মাকে খবর দিই"—দেবদাস

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল, "ছিঃ ছিঃ—মা'কে কি এ মুখ দেখাতে পারি?" ধর্ম্মদাস প্রতিবাদ করিল, "রোগ-শোক সকলেরই আছে; কিন্তু তাই বলে কি এতবড় বিপদের দিনে মাকে লুকোনো যায়? তোমার কোন লজ্জা নাই, দেবতা, কাশীতে চল্।" দেবদাস মুখ ফিরাইয়া কহিল, "না, ধর্ম্মদাস, এ সময়ে তাঁর কাছে যেতে পারব না। ভাল হই, তার পরে।" ধর্ম্মদাস একবার মনে করিল, চন্দ্রমুখীর উল্লেখ করে; কিন্তু নিজে তাহাকে এত ঘৃণা করিত যে, তাহার মুখ মনে পড়িবামাত্রই চুপ করিয়া রহিল। দেবদাসের নিজেরও অনেকবার এ কথা মনে হইত; কিন্তু কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিত না। সুতরাং কেহই আসিল না। তার পরে অনেক দিনে সে ধীরে-ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিল। একদিন সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, "চল, ধর্ম্মদাস, এইবার আর কোথাও যাই।" "আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই, ভাই,—হয় বাড়ী চল, না হয়, মায়ের কাছে চল।" জিনিসপত্র বাঁধিয়া, চুনিলালের নিকট বিদায় লইয়া, দেবদাস আবার এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল,—শরীর অনেকটা ভাল। কিছুদিন থাকিবার পর একদিন ধর্ম্মদাসকে কহিল, "ধর্ম্ম, কোন নূতন বায়গায় গেলে হয় না? কখনো বোম্বাই দেখিনি, যাবে?" আগ্রহ দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ম্মদাস মত দিল। সময়টা জ্যৈষ্ঠ মাস। বোম্বাই সহর তেমন গরম নয়। এখানে আসিয়া দেবদাস অনেকটা সারিয়া উঠিল। ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করিল, "এখন বাড়ী গেলে হয় না?" দেবদাস কহিল, "না, বেশ আছি। আমি এখানেই আর কিছুদিন থাক্‌ব।"

* * * * *

এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভাদ্রমাসের সকালবেলা একদিন দেবদাস ধর্ম্মদাসের কাঁধে ভর দিয়া বোম্বাই হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিল। ধর্ম্মদাস কহিল, "দেবতা, আমি বলি, মায়ের কাছে যাওয়া ভাল।" দেবদাসের দু'চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—আজ কয়দিন হইতে মাকে তাহার কেবল মনে পড়িতেছিল। হাঁসপাতালে পড়িয়া যখন-তখন এই কথাই ভাবিয়াছে,—এ সংসারে তাহার সবই আছে, অথচ কেহই নাই। তাহার মা আছেন, বড় ভাই আছেন. ভগিনীর অধিক পার্ব্বতী আছে,—চন্দ্রমুখীও আছে। তাহার সবাই আছে, কিন্তু, সে আর কাহারও নাই। ধর্ম্মদাসও কাঁদিতেছিল; কহিল, "তাহ'লে দাদা, মায়ের কাছে যাওয়াই স্থির?" দেবদাস মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিল; বলিল, "না ধর্ম্মদাস, মাকে মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না—আমার এখনো বোধ করি, সে সময় আসেনি।" বৃদ্ধ ধর্ম্মদাস হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিল, "দাদা, এখনো যে মা বেঁচে আছেন!" কথাটায় কতখানি যে প্রকাশ করিল, তাহা অন্তরে উভয়েই অনুভব করিল। দেবদাসের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে। সমস্ত পেট প্লীহা-লিভারে পরিপূর্ণ; তাহার উপর জ্বর, কাশী। রঙ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, দেহ অস্থি-চর্ম্মসার। চোখ একেবারে ঢুকিয়া গিয়াছে, শুধু একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় চক্-চক্ করিতেছে। মাথার চুল রুক্ষ ও ঋজু—চেষ্টা করিলে বোধ হয় গণিতে পারা যায়। হাতের আঙ্গুলগুলার পানে চাহিলে ঘৃণা বোধ হয়—একে শীর্ণ, তাহাতে আবার কুৎসিত ব্যাধির দাগে দুষ্ট। ষ্টেসনে আসিয়া ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার টিকিট কিনব, দেবতা?" দেবদাস ভাবিয়া-চিন্তিয়া কহিল, "চল, বাড়ী যাই—তার পর সব হবে।" গাড়ীর সময় হইলে, তাহারা হুগলীর টিকিট কিনিয়া চাপিয়া বসিল। ধর্ম্মদাস দেবদাসের নিকটেই রহিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেবদাসের চোখ জ্বালা করিয়া আবার জ্বর আসিল। ধর্ম্মদাসকে ডাকিয়া কহিল, "ধর্ম্মদাস, আজ মনে হচ্ছে, বাড়ী পৌঁছানোও হয় ত কঠিন হবে। "ধর্ম্মদাস সভয়ে কহিল, "কেন দাদা?" দেবদাস হাসিবার চেষ্টা করিয়া শুধু বলিল, "আবার যে জ্বর হল ধর্ম্মদাস।" কাশীর পথ যখন পার হইয়া গেল, দেবদাস তখন জ্বরে অচেতন। পাটনার কাছাকাছি আসিয়া তাহার হুঁস হইল; কহিল, "তাই ত ধর্ম্মদাস, মায়ের কাছে যাওয়া সত্যিই আর ঘট্‌ল না।" ধর্ম্মদাস কহিল, "চল দাদা, আমরা পাটনায় নেবে গিয়ে ডাক্তার দেখাই—" উত্তরে দেবদাস শুধু বলিল, "না থাক্, আমরা বাড়ী যাই চল।" গাড়ী যখন পাণ্ডুয়া ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভোর হইতেছে। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়াছিল, এখন থামিয়াছে। দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। নীচে ধর্ম্মদাস নিদ্রিত। ধীরে-ধীরে একবার তাহার ললাট স্পর্শ করিল,

লজ্জায় তাহাকে জাগাইতে পারিল না। তার পর দ্বার খুলিয়া আস্তে-আস্তে বাহির হইয়া পড়িল। গাড়ী সুপ্ত ধর্ম্মদাসকে লইয়া চলিয়া গেল। কাঁপিতে-কাঁপিতে দেবদাস ষ্টেসনের বাহিরে আসিল। একজন ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল, "বাপু, হাতিপোতায় নিয়ে যেতে পারবে?" সে একবার মুখপানে চাহিল, একবার এদিক-ওদিক চাহিল; তাহার পর কহিল, "না বাবু, রাস্তা ভাল নয়—ঘোড়ার গাড়ী এ বর্ষায় ওখানে যেতে পারবে না।" দেবদাস উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, "পাল্কী পাওয়া যায়?" গাড়োয়ান বলিল, "না।" আশঙ্কায় দেবদাস বসিয়া পড়িল,—তবে কি যাওয়া হবে না? তাহার মুখের উপরেই তাহার অন্তিম অবস্থা গাঢ় মুদ্রিত ছিল, অন্ধেও তাহা পড়িতে পারিত। গাড়োয়ান আর্দ্র হইয়া কহিল, "বাবু, একটা গরুগাড়ী ঠিক করে দেব?" দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণে পৌঁছিবে?" গাড়োয়ান বলিল, "পথ ভাল নয় বাবু, বোধ হয় দিন দুই লেগে যাবে। দেবদাস মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল,—দু'দিন বাঁচব ত? কিন্তু পার্ব্বতীর কাছে যাইতেই হইবে। তাহার অনেক দিনের অনেক মিথ্যা কথা, অনেক মিথ্যা আচরণ স্মরণ হইল। কিন্তু শেষ দিনের এ প্রতিশ্রুতি সত্য করিতেই হইবে। যেমন করিয়া হোক, একবার তাহাকে শেষ দেখা দিতেই হইবে। কিন্তু এ জীবনের মেয়াদ যে আর বেশী বাকী নাই! সেই যে বড় ভয়ের কথা!

দেবদাস গরুর গাড়ীতে যখন উঠিয়া বসিল, তখন জননীর কথা মনে করিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। আর একখানি স্নেহকোমল মুখ আজ জীবনের শেষ ক্ষণে নিরতিশয় পবিত্র হইয়া দেখা দিল,—সে মুখ চন্দ্রমুখীর! যাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া সে চিরদিন ঘৃণা করিয়াছে, আজ তাহাকেই জননীর পাশে সগৌরবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া, তাহার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ জীবনে আর দেখা হইবে না, হয় ত বহুদিন পর্য্যন্ত সে খবরটাও পাইবে না। তবুও পার্ব্বতীর কাছেই যাইতে হইবে! দেবদাস শপথ করিয়াছিল, আর একবার সে দেখা দিবেই! আজ এ প্রতিজ্ঞা তাহাকে পূর্ণ করিতেই হইবে! পথ ভাল নয়। বর্ষার জল কোথাও পথের মাঝে জমিয়া আছে, কোথাও বা পথ ভাঙিয়া গেছে। কাদায় সমস্ত রাস্তা পরিপূর্ণ। গরুর গাড়ী হটর-হটর করিয়া চলিল। কোথাও নামিয়া চাকা ঠেলিতে হইল, কোথাও গরু দুটাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে হইল—যেমন করিয়াই হউক, এ ষোল ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতেই হইবে! হু-হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আজও তাহার সন্ধ্যার পর প্রবল জ্বর দেখা দিল। সে সভয়ে প্রশ্ন করিল, "গাড়োয়ান, আর কত পথ?" গাড়োয়ান জবাব দিল, "এখনো আট-দশ কোশ আছে বাবু।" "শীগ্‌গীর নিয়ে চল বাপু, তোকে অনেক টাকা বক্‌শিষ দেব।" পকেটে একখানা একশ' টাকার নোট ছিল, তাই দেখাইয়া কহিল, "একশ' টাকা দেব—নিয়ে চল।"

তাহার পর কেমন করিয়া, কোথা দিয়া যে সমস্ত রাত্রি গেল, দেবদাস জানিতেও পারিল না। অসাড় অচেতন;—সকালে সজ্ঞান হইয়া কহিল, "ওরে, আর কত পথ? এ কি ফুরোবে না?" গাড়োয়ান কহিল, "আরও ছয় ক্রোশ।" দেবদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "একটু শীগ্‌গীর চল বাপু, আর যে সময় নেই।" গাড়োয়ান বুঝিতে পারিল না, কিন্তু নূতন উৎসাহে গরু ঠেঙ্গাইয়া, গালি-গালাজ করিয়া চলিল। প্রাণপণে গাড়ী চলিতেছে, ভিতরে দেবদাস ছট্‌ফট্ করিতেছে; কেবল মনে হইতেছে, "দেখা হবে ত? পৌঁছব ত?" দুপুর বেলা গাড়ী থামাইয়া, গাড়োয়ান গরুকে খাবার দিয়া, নিজে আহার করিয়া আবার উঠিয়া বসিল। কহিল, "বাবু, তুমি খাবে না কিছু?" "না বাপু; তবে, বড় তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দিতে পার?" সে পথিপার্শ্বস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিল। আজ সন্ধ্যার পর জ্বরের সঙ্গে দেবদাসের নাকের ভিতর সড়-সড় করিয়া ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়িতে লাগিল। সে প্রাণপণে নাক চাপিয়া ধরিল। তার পর বোধ হইল, দাঁতের পাশ দিয়াও রক্ত বাহির হইতেছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও যেন টান ধরিয়াছে। হাঁপাইতে-হাঁপাইতে কহিল, "আর কত?" গাড়োয়ান কহিল, "আর কোশ দুই; রাত্রি দশটা নাগাদ পৌঁছব।" দেবদাস বহুকষ্টে মুখ তুলিয়া পথের পানে চাহিয়া কহিল—"ভগবান!" গাড়োয়ান প্রশ্ন করিল, "বাবু, অমন করচেন কেন?" দেবদাস এ কথার জবাব দিতেও পারিল না। গাড়ী চলিতে লাগিল, কিন্তু দশটার সময় না পৌঁছিয়া প্রায় রাত্রি বারটায় গাড়ী হাতিপোতার

জমিদার বাবুর বাটীর সম্মুখে বাঁধান অশ্বত্থতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। গাড়োয়ান ডাকিয়া কহিল, "বাবু, নেমে এসো।" কোন উত্তর নাই। আবার ডাকিল, তবু উত্তর নাই। তখন সে ভয় পাইয়া প্রদীপ মুখের কাছে আনিল; "বাবু, ঘুমুলে কি?" দেবদাস চাহিয়া আছে; ঠোঁট নাড়িয়া কি বলিল, কিন্তু শব্দ হইল না। গাড়োয়ান আবার ডাকিল, "ও বাবু!" দেবদাস হাত তুলিতে চাহিল, কিন্তু হাত উঠিল না; শুধু তাহার চোখের কোণ বহিয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। গাড়োয়ান তখন বুদ্ধি খাটাইয়া অশ্বত্থতলার বাঁধান বেদিটার উপর খড় পাতিয়া একটা শয্যা রচনা করিল; তাহার পর বহু কষ্টে দেবদাসকে তুলিয়া আনিয়া তাহার উপর শয়ন করাইয়া দিল। বাহিরে আর কেহ নাই,—জমিদার বাটী নিস্তব্ধ, নিদ্রিত। দেবদাস বহু ক্লেশে পকেট হইতে একশ' টাকার নোটটা বাহির করিয়া দিল। লণ্ঠনের আলোকে গাড়োয়ান দেখিল, বাবু তাহার পানে চাহিয়া আছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। সে অবস্থাটা অনুমান করিয়া নোট লইয়া চাদরে বাঁধিয়া রাখিল। শাল দিয়া দেবদাসের মুখ পর্য্যন্ত আবৃত; সম্মুখে লণ্ঠন জ্বলিতেছে, নূতন বন্ধু পায়ের কাছে বসিয়া ভাবিতেছে।

ভোর হইল। সকালবেলা জমীদার-বাটী হইতে লোক বাহির হইল,—এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! গাছতলায় একজন লোক মরিতেছে। ভদ্রলোক! গায়ে শাল, পায়ে চক্‌চকে জুতা, হাতে আংটী। একে-একে অনেকে জমা হইল। ক্রমে, ভুবনবাবুর কাণে এ কথা গেল, তিনি ডাক্তার আনিতে বলিয়া নিজে উপস্থিত হইলেন। দেবদাস সকলের পানে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল—একটা কথাও বলিতে পারিল না, শুধু চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়োয়ান যতদূর জানে বলিল, কিন্তু তাহাতে সুবিধা কিছুই হইল না। ডাক্তার আসিয়া কহিল, "শ্বাস উঠিয়াছে, এখনি মরিবে।" সকলেই কহিল—"আহা!" উপরে বসিয়া, পার্ব্বতীও এ কাহিনী শুনিয়া বলিল, "আহা!" কে একজন দয়া করিয়া মুখে এক ফোঁটা জল দিয়া গেল। দেবদাস তাহার পানে করুণদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর চক্ষু মুদিল। আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়া ছিল, তাহার পরে সব ফুরাইল। এখন কে দাহ করিবে, কে ছুঁইবে, কি জাত, ইত্যাদি লইয়া তর্ক উঠিল। ভুবনবাবু নিকটস্থ পুলিশ-ষ্টেসনে সংবাদ দিলেন। ইনস্পেক্টর আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। প্লীহা-লিভারে মৃত্যু; নাকে-মুখে রক্তের দাগ। পকেট হইতে দুইখানা পত্র বাহির হইল। একখানা তালসোনাপুরের দ্বিজদাস মুখুয্যে বোম্বায়ের দেবদাসকে লিখিতেছে,—"টাকা পাঠান এখন সম্ভব নয়।" আর একটা কাশীর হরিমতী দেবী উক্ত দেবদাস মুখুয্যেকে লিখিতেছে—"কেমন আছ?" বাঁ-হাতে উল্কি দিয়া ইংরাজি অক্ষরে নামের আদ্যক্ষর লেখা আছে। ইন্‌স্পেক্টর বাবু তদন্ত করিয়া কহিলেন, "হাঁ, লোকটা দেবদাস বটে!" হাতে নীল-পাথর-দেওয়া একটা আংটী—দাম আন্দাজ দেড়শ', গায়ে একজোড়া শাল, দাম আন্দাজ দুইশ', জামা, কাপড় ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্তই লিখিয়া লইলেন। চৌধুরী মহাশয় ও মহেন্দ্রনাথ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তালসোনাপুর নাম শুনিয়া মহেন্দ্র কহিল, "ছোট্‌-মার বাপের বাড়ীর লোক, তিনি দেখলে—" চৌধুরি মহাশয় তাড়া দিলেন,—"সে কি এখানে মড়া সনাক্ত করতে আসবে না কি?" দারোগা বাবু সহাস্যে কহিলেন, "পাগল আর কি!" ব্রাহ্মণের মৃতদেহ হইলেও, পাড়াগাঁয়ে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিল না; কাজেই, চণ্ডাল আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। তার পর কোন্ শুষ্ক পুষ্করিণীর তটে, অর্দ্ধ-দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল,—কাক-শকুন উপরে আসিয়া বসিল, শৃগাল-কুকুর শবদেহ লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তবুও যে কেহ শুনিল, সেই কহিল—আহা! দাসী-চাকরও বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা, ভদ্দর লোক, বড়লোক! দুশ' টাকা দামের শাল, দেড়শ' টাকা দামের আংটী! সে সব এখন দারোগার জিম্মায় আছে; পত্র দু'খানাও তিনি রাখিয়াছেন।"

খবরটা সকালেই পার্ব্বতীর কাণে গিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন বিষয়েই আজকাল সে মনোনিবেশ করিতে পারিত না বলিয়া, ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু, সকলের মুখেই যখন ঐ কথা, তখন পার্ব্বতীও বিশেষ করিয়া শুনিতে পাইয়া, সন্ধ্যার পূর্ব্বে একজন দাসীকে ডাকিয়া কহিল,—"কি হয়েচে লা? কে মরেচে?" দাসী কহিল, "আহা, কেউ তা জানে না, মা। পূর্ব্বজন্মের মাটী কেনা ছিল, তাই শুধু মরতে এসেছিল। শীতে, হিমে সেই রাত্রি থেকে পড়েছিল,

আজ বেলা ন'টার সময় মরেচে।" পার্ব্বতী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আহা, কে তা কিছু জানা গেল না?" দাসী বলিল, "মহেন বাবু সব জানেন, আমি অত জানিনে মা।" মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনা হইলে সে কহিল, "তোমাদের দেশের দেবদাস মুখুয্যে!" পার্ব্বতী মহেনের অত্যন্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া, তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে, দেবদাদা? কেমন কোরে জানলে?" "পকেটে দুখানা চিঠি ছিল; একখানা দ্বিজদাস মুখুয্যে লিখেছেন—" পার্ব্বতী বাধা দিয়া কহিল, "হাঁ, তার বড়দাদা।" "আর একখানা কাশীর হরিমতী দেবী লিখেচেন।" "হাঁ, তিনি মা।" "হাতের উপর উল্কি দিয়ে নাম লেখা ছিল—" পার্ব্বতী কহিল, "হাঁ, কলিকাতায় প্রথম গিয়ে লিখেছিলেন বটে।" "একটা নীল রংয়ের আংটী—" "পৈতার সময় জেঠা মশাই দিয়েছিলেন। আমি যাই—" বলিতে-বলিতে পার্ব্বতী ছুটিয়া নামিয়া পড়িল। মহেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, "ওমা, কোথা যাও?" "দেবদাদার কাছে।" "সে ত আর নেই—ডোমে নিয়ে গেছে।" "ওগো, মা গো!" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পার্ব্বতী ছুটিল। মহেন্দ্র ছুটিয়া সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "তুমি কি পাগল হলে মা? কোথা যাবে?" পার্ব্বতী মহেন্দ্রর পানে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া কহিল, "মহেন, আমাকে কি সত্যি পাগল পেলে? পথ ছাড়।" তাহার চক্ষের পানে চাহিয়া, মহেন্দ্র পথ ছাড়িয়া নিঃশব্দে পিছনে-পিছনে চলিল। পার্ব্বতী বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখনও নায়েব-গমস্তা কাজ করিতেছিল; তাহারা চাহিয়া দেখিল। চৌধুরি মহাশয় চশমার উপর দিয়া চাহিয়া কহিলেন, "যায় কে?" মহেন্দ্র কহিল, "ছোট মা।" "সে কি? কোথায় যায়?" মহেন্দ্র বলিল, "দেবদাসকে দেখতে।" ভুবন চৌধুরি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তোরা কি সব ক্ষেপে গেলি! ধর—ধর—ধরে আনো ওকে। পাগল হয়েচে! ও মহেন, ও কনেবৌ!" তাহার পর দাসী-চাকর মিলিয়া ধরাধরি করিয়া, পার্ব্বতীর মূর্চ্ছিত দেহ টানিয়া আনিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। পরদিন তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না; একজন দাসীকে ডাকিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্রিতে এসেছিলেন না? সমস্ত রাত্রি!" তাহার পর পার্ব্বতী চুপ করিয়া রহিল।

এখন এতদিনে পার্ব্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে, জানি না; সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়! তোমরা যে কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয় ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু, যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিয়ো। প্রার্থনা করিয়ো, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারো মৃত্যু না ঘটে! মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহ-করস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে,—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে-দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে!

সমাপ্ত।

সাময়িকী

আজ 'ভারতবর্ষ' পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। যে সর্ব্ব-মঙ্গলময় বিধাতার কৃপায় 'ভারতবর্ষ' বিগত চারি বৎসর বঙ্গ-বাণীর সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছে, আজ সর্ব্বপ্রথমে আমরা তাঁহার চরণে প্রণাম করি।

চারি বৎসর পূর্ব্বে যে সাহিত্য-রথী 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, শেষ জীবনে এই 'ভারতবর্ষে'র সেবাকেই যিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল, বাঙ্গালীর দ্বিজেন্দ্রলাল—এই পত্রের প্রথম সংখ্যার প্রকাশ পর্য্যন্তও দেখিয়া যাইতে পারিলেন না,—এ দুঃখ রাখিবার স্থান আমাদের নাই। আমরা এই চারি বৎসর কালের মধ্যে যখনই 'ভারতবর্ষে'র কার্য্য করিতে বসিয়াছি, তখনই দ্বিজেন্দ্রলালের কথা আমাদের মনে হইয়াছে। তাঁহার বড় সাধের 'ভারতবর্ষে'র অস্তিত্ব যে আমরা চারি বৎসর

রক্ষা করিয়া আজ পঞ্চম বর্ষে প্রবেশ করিতেছি, ইহার মধ্যে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেরণাই অনুভব করিতেছি।

আমাদের ক্রটী-বিচ্যুতির কথা আর বলিব না। 'ভারতবর্ষে'র প্রথম সংখ্যার সূচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাণী উচ্চারণ করিয়া নীরব হইয়াছিলেন, আমরা সেই আশায় উৎফুল্ল হইয়াই 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন,—"অগ্নি জ্বলিয়াছে। আর ভয় নাই। আমরা আজ কল্পনায় বঙ্গসাহিত্যের সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেছি। যে দিন এই উপেক্ষিত বঙ্গভাষা পৃথিবীর সমক্ষে সগর্ব্বে নিজের আসন গ্রহণ করিবে—যে দিন এই সাহিত্যের ঝঙ্কার সমস্ত ভারতবর্ষ উৎকর্ণ হইয়া শুনিবে, আর এই মাসিক পত্রের নামকরণ সার্থক হইবে—যে দিন এই ভাষায় নূতন বাল্মীকি গান ধরিবে, নূতন ভাস্করাচার্য্য জ্যোতিষ লিখিবে, নূতন গৌতম বিচার করিতে বসিবে, নূতন শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মপ্রচার করিতে ছুটিবে—যে দিন এই অবজ্ঞাত জাতির সাহিত্য পাঠ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বিস্মিত জগৎ জয়গান করিবে—সে দিন আসিবে। আর যদি ইংরেজ-শাসনের শান্তি এ সাহিত্যকে ঘিরিয়া রক্ষা করে, ত, সে দিন বহু দূরে নয়।"

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে যাঁহারা পরিষদের সেবক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ব্যক্তি। যাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, প্রাণপণ অধ্যবসায়ের ফলে, এই সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই এবার পরিষদের সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন,—ইহা পরিষদের সৌভাগ্যের কথা। আমরা সাহিত্য-পরিষদের উন্নতি-প্রয়াসী; তাই এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনপ্রকার অমঙ্গলের সূচনা দেখিলে আমরা শুধু ব্যথিত নহি, ভীত হই। আমাদের মনে হয়, বুঝি অন্যান্য অনেক কার্য্যের মত, আমাদের এই সাহিত্য-পরিষদের মধ্যেও ঈর্ষা-বিদ্বেষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া ইহার অস্তিত্ব, লোপ করিয়া দেয়। সেইজন্যই, নিতান্ত অপ্রীতিকর হইলেও, মধ্যে-মধ্যে আমরা সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-প্রণালীর ক্রটীর উল্লেখ করিয়া থাকি, এবং তৎপ্রতীকারের জন্য যাহাতে সেবকগণ অবহিত হন, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকি। বিশেষতঃ, যাঁহারা আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয়, যাঁহারা আমাদের গৌরবের স্থল, তাঁহাদের সহিত যে পরিষদের সম্বন্ধ, সে পরিষদের কার্য্য-প্রণালী সর্ব্বাংশে দোষশূন্য হইবে, ইহা সকলেরই বাসনা। বর্ত্তমান বৎসরের সেবকগণের দ্বারা আমাদের সে বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে; এবং অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে কোন অপ্রীতিকর কথা আমরা শুনিতে পাইব না।

সাহিত্য-পরিষদের কথা বলিবার সময় আর একটি কথা আমাদের মনে হইল। তাহা রমেশ-ভবন। কিছু-দিন পূর্ব্বে মহাসমারোহে রমেশ-ভবনের শিলা-বিন্যাস কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে; আমাদের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় গবর্ণর শ্রীযুক্ত কারমাইকেল মহোদয় স্বহস্তে শিলা-বিন্যাস করিয়াছিলেন। তাহার পর এই কয় মাস চলিয়া গেল। ইহার মধ্যে রমেশ-ভবন-নির্ম্মাণ-কমিটি কতদূর কি করিলেন, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। অবশ্য এখন বড়ই দুঃসময় উপস্থিত; এখন সমর-ঋণের দিকেই আমাদের দেশের সকলের চেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে; সুতরাং এ সময়ে রমেশ-ভবনের জন্য চাঁদা-সংগ্রহের তেমন সুবিধা হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া, কথাটা একেবারে ভুলিয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না; মধ্যে-মধ্যে রমেশ-ভবনের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষতঃ, যাঁহারা এই ব্যাপারের প্রধান উদ্যোগী, তাঁহারাই যে এই ভবন-নির্ম্মাণের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, রমেশ-ভবনের জন্য অর্থের অভাব হইবে না; এবং যাঁহাদের নাম মনে করিয়া আমরা এই আশা করিতেছি, তাঁহারা এখনও যথোপযুক্ত অর্থ-সাহায্য করিতে পারেন; তাঁহাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কোন দিনই শূন্য হইবে না। কর্ম্মীর অভাবে যেন এই রমেশ-ভবন-নির্ম্মাণের কথাটা চাপা পড়িয়া না যায়, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-ভাষার প্রচলন যে

করিয়াছেন, এ কৃতিত্বের গৌরব কাহার প্রাপ্য, এই কথা লইয়া মাসিকপত্রে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলন প্রথম আরম্ভ করেন—গৌহাটী কটন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, এম-এ মহোদয়। বাঁকিপুর *সাহিত্য-সম্মেলনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পণ্ডিত পদ্মনাথ* মহোদয় 'নব্যভারত' পত্রে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। *তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-ভাষার প্রচলন করিবার গৌরব মাননীয়* বিচারপতি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয়ের প্রাপ্য নহে; এ গৌরব শ্রীযুক্ত সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রাপ্য। তবে সার আশুতোষের ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলরীর আমলেই ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজপত্র হইতে ইহার প্রমাণও প্রদর্শন করেন। 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার পত্রের 'কষ্টিপাথর' শীর্ষক সঙ্কলনে 'নব্যভারতের' ঐ অংশ উদ্ধৃত করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া একখানি সুদীর্ঘ পত্র মাসিক ও সাপ্তাহিকপত্রের সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট প্রেরণ করেন। আমরা বৈশাখ মাসের 'ভারতবর্ষে'র সাময়িকীতে শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বক্তব্যের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। অন্যান্য কয়েকখানি সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পত্রখানি অবিকল মুদ্রিত হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতিবাদের একটি সুদীর্ঘ প্রতিবাদ অন্যান্য পত্রে প্রেরণ করেন। আমাদের পত্রে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বক্তব্যের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, পণ্ডিত পদ্মনাথ তাহারও একটা সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই অপর দুই-একখানি পত্রে তাঁহার প্রেরিত সম্পূর্ণ প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ প্রকাশের বিশেষ কোন আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি না।

এই বাদ-প্রতিবাদের যে কি সার্থকতা আছে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। সার গুরুদাস ও সার আশুতোষ *এ ব্যাপারে বাদী-প্রতিবাদী নহেন; তাঁহারা এ গৌরব* লাভের জন্যও লালায়িত নহেন; অথচ সর্ব্বজনমান্য এই দুইটি ভদ্রলোককে উপলক্ষ্য করিয়া এই বাদ-প্রতিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা উভয়েই যে লজ্জিত এবং ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেহ যদি সার গুরুদাসের প্রাপ্য গৌরব সার আশুতোষকে প্রদান করেন, তাহাতে সার গুরুদাসের যে গৌরবরাশি আছে,—তাহার বিশেষ কিছু কমিবে না, ভগবান তাঁহাকে এ সকলের অনেক উর্দ্ধে বসাইয়া রাখিয়াছেন। আবার সার আশুতোষকে কেহ যদি এ সম্মান হইতে বঞ্চিত করেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায় মহাসাগরের একঘটি জল কম হওয়াতে তিনিও ক্ষুব্ধ হইবেন না; এই মহাসাগর যেমন আছে, তেমনই থাকিবে, লাভের মধ্যে আমাদের বচসা। তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া এই অপ্রীতিকর আলোচনা উপস্থিত করিয়া পণ্ডিতদ্বয়ের কেহই ভাল কাজ করেন নাই।

পণ্ডিতদ্বয় এবং অপর কেহ-কেহ হয় ত বলিবেন যে, এ ভাবে অসত্য প্রচারের প্রশ্রয় প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা তদুত্তরে বলিতে চাই যে, যাহা সত্য তাহা কেহই গোপন রাখিতে পারিবেন না; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের নিকট প্রমাণের অভাব হইবে না; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য-বিবরণও লুপ্ত হইয়া যাইবে না। এ সত্য নির্দ্ধারণের জন্য এত তাড়াতাড়ি করিয়া, এমন একটা অপ্রীতিকর আলোচনা এখন না করিলে যে পৃথিবী আজই অচল হইত, তাহাও নহে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বাঁকিপুর সম্মেলনের বিবরণ লিখিতে যাইয়া এ কথার উল্লেখ না করিলেই পারিতেন; তাহাতে সম্মেলনের বিবরণের অঙ্গহানি হইত না; এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও এই অপ্রীতিকর আলোচনায় ইন্ধন-সংযোগ করিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। ইহাতে আর যাহা হয়

হউক, আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের কথা ভাবিয়াই এই আলোচনা বন্ধ করিয়া দিবার পক্ষপাতী। ভরসা করি, পণ্ডিতে-পণ্ডিতে এই দ্বন্দ্বের অভিনয় আর অধিকদূর অগ্রসর হইবে না; ইহাতে মনোমালিন্য ব্যতীত আর কোন লাভই নাই।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা-ভাষার পরীক্ষার প্রচলন হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-নির্ব্বাচন-কমিটি পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন করেন এবং যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করেন। ছাত্রগণকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার কোন প্রকার ব্যবস্থাই অনেক স্কুল-কলেজে নাই; ছাত্রেরাও বাঙ্গলা পড়ে না; না পড়িয়াই পরীক্ষা দেয়। মফস্বলের কোন-কোন বিদ্যালয়ে সপ্তাহে এক ঘণ্টা বাঙ্গালা পড়াইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে; কোন একজন শিক্ষকের উপর পড়াইবার ভার প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তিনি যে কি পড়াইয়া থাকেন, এবং ছাত্রেরা যে সপ্তাহে সেই এক ঘণ্টায় কি শিখিয়া থাকে, তাহা, এ বিষয়ে অভিজ্ঞগণ অবগত আছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ্য নির্ব্বাচিত হয়, তাহা হইতে কোন প্রশ্ন করা হয় না; বিশ্ব-বিদ্যালয় বলিয়া দিয়াছেন যে, ঐ পুস্তকগুলি লিখন-প্রণালী (Style) শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

লিখন-প্রণালী (Style) শিখিবার জন্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে; কিন্তু ছাত্রগণ সেই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া কেমন করিয়া যে Style শিক্ষা করিবে বা করিয়া থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষার কোন নির্দ্দিষ্ট Style নাই; পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ও স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের এক রকমের ভাষা, বঙ্কিমচন্দ্রের এক রকম ভাষা, সার রবীন্দ্রনাথের এক রকম ভাষা। আমাদের দেশের ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা বাঙ্গালা-ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকে, তাহারা নিজের-নিজের রুচি অনুসারে লিখিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া থাকে। এদিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ও যে সকল পুস্তক Style শিক্ষার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায় না যে, তাঁহারা কোন্ Styleএর পক্ষপাতী। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসও পাঠ্য হয়, আবার চলিত ভাষায় লিখিত পুস্তকও পাঠ্য হয়। ছাত্রেরা ইহার মধ্যে কোন্ Style অবলম্বন করিবে, এবং সপ্তাহে একঘণ্টার শিক্ষক মহাশয়ই বা কোন্ Style ছাত্রগণকে শিখাইবেন? এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষার প্রচলন হয় নাই, বাঙ্গালা পরীক্ষারই প্রচলন হইয়াছে। শিক্ষা নাই, অথচ পরীক্ষা আছে,—এ রহস্য মন্দ নহে।

তাহার পর আর এক কথা। বিশ্ব-বিদ্যালয় যে সকল পুস্তক পরীক্ষার জন্য নির্ব্বাচন করেন, অধিকাংশ ছাত্রই সে সকল পুস্তক পড়ে না, পড়িবার প্রয়োজনও অনুভব করে না। বি-এ পরীক্ষায় যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে, তাহা হইতে প্রশ্ন প্রদত্ত হয় বলিয়া ছাত্রেরা কেহ বা কিনিয়া কেহ বা চাহিয়া-চিন্তিয়া পুস্তকগুলির উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া লয়; অধ্যাপক মহাশয়েরাও মধ্যে-মধ্যে পুরোহিতের মন্ত্র পড়ার মত দুই-একটা লেক্‌চার দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন; অনেক কলেজে তাহাও যথারীতি হয় না। ছাত্রেরা পুস্তক কিনিবে কেন? পড়িবে কেন? না পড়িয়াই যদি পরীক্ষা দেওয়া যায়, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হওয়া যায়, তাহা হইলে পুস্তক কিনিবার ও পড়িবার ত কোনই প্রয়োজন নাই! আমরা জানি, একবার আমাদের কোন বন্ধুর একখানি পুস্তক ইন্‌টারমিডিয়েটের পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। বন্ধুবরের প্রথম সংস্করণের প্রায় তিনশত পুস্তক তখনও প্রকাশকের নিকট ছিল। তিনি মনে করিলেন, পুস্তকখানি যখন পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তখন যেমন করিয়া হউক দুই হাজার পুস্তক ত নিশ্চয়ই কাটিবে। তিনি এই আশায় তাড়াতাড়ি পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ করিলেন, এবং প্রকাশকগণের পরামর্শে দুই হাজার পুস্তক না ছাপাইয়া এক হাজার পুস্তক ছাপাইলেন। বৎসরের শেষে প্রকাশকগণ বন্ধুবরকে যে হিসাব দিলেন, তাহাতে দেখা গেল যে, মোট সাতাইশখানি পুস্তক বিক্রীত হইয়াছে। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যবস্থিত বাঙ্গালা-ভাষার কেমন পঠন-পাঠনা হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমাদেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে; সে সকল কথা এখন আর বলিবার

প্রয়োজন নাই। আমাদের বক্তব্য এই যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঙ্গালা-ভাষাকে আদৃত করিয়া বেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থাও তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। আর, তাঁহারা বাঙ্গালা-ভাষার Style বলিতে কি বুঝেন, তাহাও যেন বলিয়া দেন।

সেদিন কলিকাতা ফিনিক্স ইউনিয়ান লাইব্রেরীর আহ্বানে রামমোহন লাইব্রেরী-ভবনে পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে যথেষ্ট লোক-সমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী প্রভৃতি অনেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের গুণগান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্য সম্বন্ধেও কয়েকটা সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, পাশ্চাত্যের অনুকরণে বা অনুসরণে আমাদের সাহিত্যের মধ্যে কিছু আবর্জ্জনা প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে। তিনি বলেন, এই আবর্জ্জনাগুলিকে বাহিরে রাখিয়া দিলে, অন্যান্য আবর্জ্জনার সহিত সেগুলিও ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে; তাহাদিগকে ঘরে স্থান দিয়া জঞ্জাল-বৃদ্ধি করিয়া কোনই লাভ নাই। আমরা বলি, লাভ ত নাই-ই, বরঞ্চ ক্ষতিই অধিক; সেই সকল আবর্জ্জনায় আমাদের ঘরের বায়ু দূষিত হইয়া গৃহস্থালীর মধ্যে সংক্রামকতার সৃষ্টি করিবে। আর্টের নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই সঙ্গত নহে। আমাদের সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ-কেহ সে কথা মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, আর্টের দিক দিয়াই লেখার বিচার করিতে হইবে, নীতির দিক দিয়া নহে। নীতিপরায়ণগণ নীতির মাহাত্ম্য প্রচার করুন, আর্টবাদীরা তাহাতে কিছুতেই আপত্তি করিবেন না। কিন্তু তাঁহারা আর্টের অঙ্গহানি দেখিতে পারিবেন না। এ কথার অর্থ যে কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা ইহাই বুঝি, যাহা নীতির পরিপন্থী, তাহাই আবর্জ্জনা। তাহাকে নির্ম্মম ভাবে পরিহার করিতে হইবে; তাহাতে আর্ট বা কলার অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই হইবে।

এবারকার সাময়িকীর শেষ বা প্রধান কথা সমর-ঋণ ও বাঙ্গালী পল্টন সংগ্রহ। বাঙ্গালী পল্টন সংগ্রহের কার্য্য বাঙ্গালা দেশে আশানুরূপ হইতেছে না জন্য, ভারত-গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন; এবং এ সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজী সংবাদপত্র সম্পাদকগণও এই কথা লইয়া আমাদিগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে বিদ্রূপ করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে আমাদের ভগ্নোৎসাহ হইবার কারণ নাই। যে প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশে পল্টন সংগৃহীত হইতেছে, তাহা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা আমাদিগকে কিছুতেই বিদ্রূপ করিবেন না। বিশেষতঃ, অল্প কিছুদিন হইতে যে ভাবে পল্টন সংগৃহীত হইতেছে, তাহাতে অতি শীঘ্রই আমরা দেখাইতে পারিব যে, রাজভক্তিতে আমরা কম নহি। আমাদের দেশের যে সকল যুবক পল্টনে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের অবস্থা ভাল নহে; তাঁহাদের উপার্জ্জনের উপর অনেক সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করিয়া থাকে। সে কথাটাও ত ভাবিতে হয়। এ দেশে ধনীর সংখ্যা অধিক নহে; এবং ধনী-সন্তানেরা এ প্রকার শ্রম ও কষ্টসাধ্য কার্য্যে অভ্যস্ত নহেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্য হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া ত তাঁহারাও নিশ্চিন্ত নহেন। ঢাকার নবাব বাহাদুর সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব এবং ধনী। তিনি এই পল্টনে যোগদান করিয়াছেন। সেদিন ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদবিহারী দত্ত (মিঃ কে, বি, দত্ত) মহাশয়ের পুত্র পল্টনে গিয়াছেন। মেদিনীপুরের ডেপুটী কলেক্টর আমাদের সোদরোপম স্নেহভাজন শ্রীমান সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ হাকিমী চাকুরীর মায়া ছেদন করিয়া, পুত্রকন্যাগণের স্নেহের বাঁধন কাটিয়া এই পল্টনে যোগদান করিয়াছেন। আরও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরা পল্টনে যাইতেছেন। ইহা কি আশার কথা নহে? আবার বলিতেছি, বাঙ্গালী পল্টনে লোকের অভাব হইবে না। শুনিলাম, যাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে, তাঁহাদের দুস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে একটী ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইতেছে। এই ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফল ফলিবে। বাঙ্গালীর ভীরু

কলঙ্ক ঘুচিবে; আমাদের রাজার জন্ত জীবন পণ করিয়া বাঙ্গালী জাতি ধন্ত হইবে।

— —

সমর-ঋণে যথেষ্ট টাকা উঠিতেছে না, ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ঋণ-সংগ্রহের চেষ্টা যে ভাবে হইতেছে, তাহা ঠিক নহে। অনেক স্থলে জোর-জুলুম হইতেছে বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশ। জোর-জুলুমের অনুমাত্রও প্রয়োজন আমরা দেখি না। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে বলিতে পারি, এই ঋণের কথাটা জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার তেমন ব্যবস্থা মফস্বলে হয় নাই। যাঁহারা টাকা দিবেন,— সমর-ঋণে টাকা দিলে তাঁহাদের যে লাভ আছে,—এ কথাটা তাঁহাদিগকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। সরকারী কর্ম্মচারীরা চাঁদা আদায়ই করিয়া থাকেন; তাঁহারা যে ঋণ করিবেন, এবং সুদ সহ সে ঋণ শোধ করিবেন, এ কথা মফস্বলের লোকে বুঝিতেই পারে নাই। তাহারা মনে করিয়াছে, ইহাও একটা চাঁদা। বে-সরকারী লোকের দ্বারা এই কথাটা সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। শতকরা বার্ষিক পাঁচটাকা হারে সুদ পাওয়া যাইবে, নির্দ্দিষ্ট সময় পরে আসল টাকা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে, এ কথা বুঝিতে পারিলে, যাহার ঘরে টাকা আছে, সে এমন সুবিধার টাকা খাটাইতে কিছুতেই আপত্তি করিবে না। অবশ্য মহাজনেরা অতিরিক্ত সুদে টাকা ধার দিয়া থাকেন; কিন্তু সেই টাকা আদায়ের জন্য অনেক সময় কত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়; কখনও বা সুদে-মূলেই যায়। এ ক্ষেত্রে তাহার সম্ভাবনা মোটেই নাই। আসল টাকা ঘরে আসিবে, ছয়মাস পরে-পরে সুদ পাওয়া যাইবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে রাজাকেও সাহায্য করা হইবে,—ইহা অপেক্ষা সুবিধার কথা আর কি আছে? তবে এ কথাও বলি,—আমাদের দেশের যাঁহারা ধনী, যাঁহারা শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁহাদিগকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে। মহাধনী বলিয়া যাঁহাদের খ্যাতি আছে, যাঁহাদের লাখ-লাখ টাকা আছে বলিয়া সাধারণের ধারণা, তাঁহারা যদি এই সমর-ঋণে অল্প টাকা দেন, তাহা হইলে সাধারণের মধ্যে সে দৃষ্টান্ত সুফল প্রসব করিবে না। ধনশালী মহাশয়গণকে মুক্তহস্ত হইতে হইবে; যাঁহারা যথেষ্ট উপার্জ্জন করেন, যাঁহাদের কোম্পানীর কাগজ বাক্সে ধরে না বলিয়া দেশরাষ্ট্র, তাঁহারা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করুন, দেখিবেন, অল্পদিনের মধ্যেই টাকা সংগৃহীত হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

উলূলু *

[শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী বি-এল]

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার অব্যবহিত পরে এই আনন্দধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তৎপরে অন্নাশন, উপনয়ন, বিবাহ, পূজা ও অন্যান্য মাঙ্গলিক ব্যাপারে ও উৎসবে যোষিৎগণের এই উল্লাসধ্বনি আমাদের হর্ষ বর্দ্ধন করে। ফলতঃ, আনন্দ ও উৎসবে এই ধ্বনি আমাদের জন্ম হইতে সহচর।

শুনিয়াছি, কোন-কোন বঙ্গ-বিদুষী এই ধ্বনি করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। তাঁহারা এখন যে সমাজকে আদর্শ মনে করেন, সে সমাজে উক্তরূপ ধ্বনি নাই, এবং গৌড়দেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্ত কোন প্রদেশে অপ্রচলিত বলিয়া ইহাকে কেহ-কেহ অনার্য্য বা অসভ্য ধ্বনি মনে করেন।

এই ধ্বনি অনার্য্য মনে করিবার কোন কারণ নাই। বৈদিক সময় হইতে ইহা প্রচলিত ছিল; এবং এক সময়ে অতি সুসভ্য আর্য্য-জাতির উল্লাস-ধ্বনি বলিয়া পরিগণিত ছিল। কালক্রমে অন্য দেশে উহা অপ্রচলিত হইয়া বিশেষরূপে বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছে; এবং সম্ভবতঃ বাঙ্গালীদের অনুকরণে কটক ও বালেশ্বরে উহা প্রচলিত আছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ধ্বনির উল্লেখ দেখিতে পাই। উক্ত উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ের ঊনবিংশ খণ্ডে ১ম শ্রুতিতে অণ্ডের উৎপত্তি ও তৃতীয় শ্রুতিতে আদিত্যের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

"অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যঃ তং জায়মানং ঘোষা উলূলবোঽনূদতিষ্ঠন্ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাস্তস্মাত্তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলূলবোঽনু তিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাঃ॥" ৩৷১৯৷৩

* পাবনা সাহিত্য-পরিষদে ১৩২৩ সনের ৮ই মাঘ তারিখে পঠিত।

এই শ্রুতিতে "উলুলব" শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ইহার নিম্নলিখিত ভাষ্য করিয়াছেন :—

"অথ যৎ তদজায়ত গর্ভরূপং তস্মিন্নণ্ডে, সোঽসাবাদিত্যঃ, তমাদিত্যং জায়মানং ঘোষাঃ শব্দা উলুলব উরুরবো বিস্তীর্ণরবা উদতিষ্ঠন্ উত্থিতবন্তঃ, ঈশ্বরস্যেবেহ প্রথম পুত্র জন্মনি, সর্ব্বাণি চ স্থাবরজঙ্গমানি ভূতানি সর্ব্বে চ তেষাং ভূতানাং কামাঃ কাম্যন্ত ইতি বিষয়াঃ স্ত্রীবস্ত্রান্নাদয়ঃ ; যস্মাদাদিত্যজন্মনিমিত্তা ভূতকামোৎপত্তিঃ তস্মাদদ্যত্বেঽপি তস্যাদিত্যস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রত্যস্তগমনং চ প্রতি, অথবা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগমনং প্রত্যায়নং, তৎ প্রতি তন্নিমিত্তীকৃত্যেত্যর্থঃ ; সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামা ঘোষা উলুলবশ্চানুতিষ্ঠন্তি।' প্রসিদ্ধং হি এতদুদয়াদৌ সবিতুঃ॥

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ উহার নিম্নলিখিত বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন :—

"অনন্তর সেই অণ্ড মধ্যে সন্তানরূপে যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাই এই দৃশ্যমান আদিত্য ; সেই জায়মান আদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া জগতে ধনিগণের পুত্র জন্মিলে যেরূপ হয়, তদ্রূপ বিবিধ শব্দ, উচ্চ রব, স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভূত, এবং সেই ভূতবর্গের সমস্ত কাম, অর্থাৎ কাম্য বিষয়—স্ত্রী, বস্ত্র ও অন্ন উৎপন্ন হইল। যেহেতু আদিত্যের জন্মই কাম্য বিষয়োৎপত্তির নিমিত্তীভূত, সেই হেতু আজও সেই আদিত্যের উদয়কে লক্ষ্য করিয়া এবং অস্তগমনকে লক্ষ্য করিয়া—অথবা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাগমন—ফিরিয়া আইসার নাম প্রত্যায়ন, তাহাকে নিমিত্ত করিয়া সমস্ত ভূত ও সমস্ত কাম্য বিষয়, বিবিধ শব্দ ও নানারব উচ্চ রব উত্থিত হইয়া থাকে॥" ৩৯৮ ও ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের প্রসিদ্ধ শিষ্য আনন্দগিরি শঙ্কর ভাষ্যের টীকায় লিখিয়াছেন, "উলুলব ইত্যুৎসবকালীনাঃ শব্দবিশেষা দেশবিশেষে প্রসিদ্ধাঃ।" তিনি "উলুলব" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "ইহা দেশ বিশেষে প্রসিদ্ধ উৎসবকালীন শব্দবিশেষ।" সুতরাং "উলুলু" অনার্য্য শব্দ নহে এবং বঙ্গদেশীয় এই উল্লাসধ্বনি সুমহৎ প্রাচীন কালের প্রথার অনুসরণ মাত্র ; এবং কালক্রমে ইহা অধুনা এ দেশে যোষিৎগণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। উহা অনার্য্যোচিত বা অসভ্যোচিত বিবেচনা করিবার, অথবা উহার উচ্চারণে কোন কুণ্ঠার কারণ দেখি না।

কালিদাসের ভুল

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী এম্-এ]

কথিত আছে, একজন প্রাচীন নৈয়ায়িকের বৃদ্ধবয়সে, বোধ হয় বয়সের দোষে, কাব্যরস আস্বাদন করিবার বাসনা জন্মে। কালিদাস কবিকুলগুরু, তৎপ্রণীত মেঘদূত কাব্যরসের অমৃতোদধি। সুতরাং পণ্ডিত মহাশয় রসসাগরে ডুবসাঁতার কাটিবার বাসনায় প্রথমেই মেঘদূত পড়া আরম্ভ করিলেন।

নৈয়ায়িক ঠাকুর প্রথম শ্লোকটি পড়িলেন ; পড়িয়া, ব্যাখ্যায় মন দিলেন ; কিন্তু প্রথম পদেই গুরুতর বাধা, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। "কশ্চিৎ কান্তা—"এমন ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ কালিদাস মহাকবি হইয়া কেমন করিয়া করিলেন? যাহার এতটুকু হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নাই, কান্তার সমস্ত কমনীয়তা—সম্মুখে এতবড় একটা পুংলিঙ্গ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া,—যে নিঃসঙ্কোচে নাশ করিতে পারে, সে আবার কবি! সে কবি নামের কলঙ্ক!!

বলা বাহুল্য, নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহাশয় সেই মুহূর্ত্তেই কাব্যচর্চ্চা 'জন্মের মত' পরিত্যাগ করিলেন! তদবধি তিনি ন্যায়শাস্ত্র আলোচনা করিয়াই কাল কাটাইতেন ; এবং কালিদাসের ন্যায় মহামূর্খের, 'অদ্বিতীয় মহাকবি' বলিয়া খ্যাতি যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিরুদ্ধ তাহা সর্ব্বদাই দৃষ্টান্তের সহিত তর্ক-যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন।

উল্লিখিত অংশটি গল্প মাত্র। উহাতে সত্যতা কিছুমাত্র নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মহাকবির সমস্ত কাব্যের মধ্যে কোথাও কোনরূপ অপপ্রয়োগ নাই, তাহা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। সুতরাং তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে, লেখককে "কশ্চিৎকান্তার" নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়-কুটুম্ব বলিয়া বোধ হয় কেহ ভাবিবেন না। ঈদৃশ আলোচনায় মহাকবির গৌরবহানির লেশমাত্র আশঙ্কা নাই। চন্দ্রকিরণের মধ্যে কলঙ্ক কোথায় লুকাইয়া থাকে, কে তাহাকে দেখিতে পায়? দেখিতে পাইলেও ত কেহ চন্দ্রের নিন্দা করে না। কবির নিকট ঐ মৃগাঙ্ক অলঙ্কারে পরিণত হইয়াছে।

সংস্কৃত নাটকসমূহের মধ্যে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট—সর্ব্বপ্রথম। উহারই প্রথম শ্লোকে প্রথম চরণেই প্রথম ভুলটি দেখা যাইতেছে। কালিদাস লিখিয়াছেন—"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবি র্যা চ হোত্রী"—এখন এই চরণের প্রথমাংশে ঐ 'আদ্যা' শব্দ প্রয়োগের প্রতিই আমাদিগের আদ্যা আপত্তি। এখানে যে জলরূপা সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি জল-সৃষ্টিকে ভ্রমক্রমে আদ্যা মনে করিয়াই 'আদ্যা' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, এবং শ্লোকের আদিতেই তাহার উল্লেখ করিয়া, আদ্য বস্তুর আদ্যত্ব রক্ষায় প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ঐ 'আদ্য' শব্দ শ্রুতি-স্মৃতিতে অনভিজ্ঞ কাব্য-পাঠকের চিত্তে জলের আদ্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে মিথ্যা ভ্রম জন্মাইয়া এতকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রের আদ্যকৃত্য করিয়া আসিতেছে। বিশ্বাস না হয়, টোলের কাব্যতীর্থ শ্রেণীর বা কাব্যতীর্থ পরীক্ষায় পাশ যে-কোনও ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করুন—ঈশ্বর কোন্ বস্তুকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তৎক্ষণাৎ উত্তর পাইবেন—"কেন, জলকে? এ ত কালিদাসই বলিয়াছেন—"যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা ইত্যাদি।" এস্থলে "কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্" কথায়-কথায় ফলিয়াছে। আবার রহস্য দেখুন,—ভারতীয় শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রথম শ্লোকে, প্রথম চরণে প্রথম পদেই এই শাস্ত্রলঙ্ঘন!

আমরা জিজ্ঞাসা করি, জলের সৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে কিরূপে হইল?

বেদান্ত-মতে "আত্মনঃ আকাশঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী"—তৈত্তিরীয়োপনিষৎ। সাংখ্য-মতেও সৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, স্থূল হইতে স্থূলতম, ক্রমে তদ্রূপ। মনুও স্বীয় সংহিতায় প্রথমাধ্যায়ে ৭৫—৭৮ শ্লোকে সেই কথাই বলিয়াছেন। সকলেই বলিতেছেন, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছিল। তবে জল-সৃষ্টির আদ্যত্ব নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক?

যদি বল, মনু বলিয়াছেন,—"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু-র্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥" অতএব জলকে আদিতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? এমন জাজ্বল্যমান 'আদৌ' পদটি কিরূপে অগ্রাহ্য করিবে? তদুত্তরে এই বলা যায় যে, ঐ 'আদৌ' পদের আদিত্ব-বোধকত্ব আদৌ নাই। কারণ, তাহা হইলে শ্রুতির সহিত, অন্য স্মৃতির সহিত এবং নিজ উক্তির সহিত বিরোধ হয়। এইজন্য কুল্লূক 'আদৌ' পদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আদৌ শব্দের অর্থ—সর্ব্বাদৌ অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর পূর্ব্বে, এরূপ বুঝিলে চলিবে না। এমন কি, মহাভূতগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে,—এরূপ অর্থও করিলে চলিবে না। সুতরাং যে ঘটনার বিবৃতি পরেই করা হইবে, তাহারই পূর্ব্বে,—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি-বর্ণনোদ্যত মনু, ষষ্ঠ শ্লোকে "ইদং মহাভূতাদি ব্যঞ্জয়ন্" বলিয়া, অর্থাৎ আকাশাদি মহাভূতগণ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মহদাদিকে প্রকটিত করিয়া, পরে ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পূর্ব্বেই, জলের সৃষ্টি বুঝাইবার জন্য, ৮ম শ্লোকে "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" বলিয়াছেন। সুতরাং এই 'আদৌ' পদকে সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে। কুল্লূকের উক্তি দেখুন—"আদৌ স্বকার্য্য ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টেঃ প্রাক্। অপাং সৃষ্টিশ্চ ইয়ং মহদহঙ্কার তন্মাত্রক্রমেণ বোদ্ধব্যা। মহাভূতাদি ব্যঞ্জয়ন্ ইতি পূর্ব্বাভিধানাৎ অনন্তরমপি মহদাদি সৃষ্টেঃ বক্ষ্যমাণত্বাৎ"—অর্থাৎ যদিও মনুর বাক্যে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয়, আদিতে জলসৃষ্টির কথা রহিয়াছে, তথাপি জল "সর্ব্বাদৌ" সৃষ্ট হয় নাই বলিয়াই, আদৌ অর্থে "সর্ব্বাদৌ" বুঝিলে চলিবে না। যে সকল বস্তুর সৃষ্টির পরে জল সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া শ্রুতিতে এবং স্মৃতিতে কথিত রহিয়াছে, এক অর্থহীন "আদৌ" পদ প্রয়োগের বলে, তাহাদের সকলের পূর্ব্বে জল-সৃষ্টি হইয়াছিল, এ কথা বলা যায় না। ফলতঃ, যাহার পূর্ব্বে জল-সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং যাহা জলের পরে সৃষ্ট হইয়াছিল, 'আদৌ' শব্দ দ্বারা এখানে তাহারই আদিতে বা পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে।

মহাকবি কালিদাস মনুর এই 'আদৌ' পদ দ্বারা প্রতারিত হইলেন কিরূপে? তিনি ত বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। অথবা, কবি তিনি—দীর্ঘকাল কাব্যালোচনায় সম্ভবতঃ দর্শন ও স্মৃতি অনেকাংশে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ জল-সৃষ্টি আদিতে হউক, মধ্যেই হউক, আর অন্তেই হউক—তাহাতে এখানকার কাব্যের কিছু বিপর্য্যয় হইতেছে না। তবে আমাদের ইহাই আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, অদ্যাবধি শকুন্তলার যে হাজারখানা টীকা বাজারে বাহির হইয়াছে, সেগুলিতে কবিকৃত 'আদ্যা' বিশেষণ প্রয়োগের সমর্থনের জন্য মনুর ঐ "অপ এব সসর্জ্জাদৌ" তুলিতে কেহই বিস্মৃত হন নাই! বড়-বড় টীকাকারগণ হাজারে-হাজারে যখন কেহই মনুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই, তখন মহাকবি কালিদাসও যদি সে ভুলটুকু করেন, তবে আর তাঁর বেশী দোষ কি? এখানে পাঠক লক্ষ্য করুন, ধর্ম্মপ্রবক্তা মনুর স্মৃতি সর্ব্বস্মৃতি মধ্যে প্রধান এবং সকলের অবশ্য পাঠ্য ও জ্ঞাতব্য হইলেও, সেই মনু-স্মৃতি ভারতে কত অল্প পঠিত! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি?

কেহ-কেহ হয় ত বলিবেন, মনুর শ্লোকে যে হিসাবে জলের আদিত্ব, শকুন্তলা নাটকেও সেই হিসাবেই আদ্যত্ব সিদ্ধ হউক। তাহার উত্তরে আমরা এইমাত্র বলি যে, মনু তাঁহার সংহিতায় সৃষ্টি-বিষয়ের আমূল বর্ণনা করিতেছেন, তিনি ঘটনার পর ঘটনার উল্লেখ করিয়া যাইতেছেন। সুতরাং একশ্রেণীর ঘটনাবলীর পূর্ব্বে কি হইয়াছিল, এবং পরেই বা কি হইয়াছিল তাহা বলিয়া, অপর শ্রেণীর ঘটনাবলীর আদিতে কি হইয়াছিল এবং পরেই বা কি হইয়াছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি যে নূতন করিয়া 'আদৌ' শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু কালিদাসের গ্রন্থপ্রারম্ভে জলের সেরূপ আদিত্ব নির্দ্দেশ করিবার কি প্রয়োজন আছে? বিশেষতঃ পরেই অপর যে চারি ভূতের উল্লেখ করিতেছেন, সেই চারি ভূতের মধ্যে তিন ভূত জলের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল। তাহাদের নাম আকাশ, বায়ু ও অগ্নি। এক্ষণে জলকে প্রথমে 'পাকড়াও' করিয়া "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" বলিলে চলিবে কেন? পাঠক দেখুন, অন্য ভূতগুলির নির্দ্দেশ কবি কিরূপে করিয়াছেন—"বহতি বিধিহুতং যা হবিঃ", "শ্রুতি বিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্", "যামাহুঃ সর্ব্ববীজ প্রকৃতিরিতি" "যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ"—ইহাদের কোনটিই বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু জলের বেলাই "যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা" বলিয়া কবি আমাদিগকে এবং সমস্ত শাস্ত্রগুলিকে একেবারে জলে ফেলিয়াছেন। হঠাৎ শুনিলে মনে হইবে, 'আকাশ' সৃষ্টির কথা বলা হইতেছে। "কাব্যে ভব্যতমেঽপি বিজ্ঞনিবহৈরাস্বাদ্যমানে মুহুর্দোষান্বেষণমেব মৎসরজুষাং নৈসর্গিকো দুর্গ্রহঃ। কাসারেঽপি বিকাসি পঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃ শম্বুকমন্বিষ্যতি।" আজ এই একটি শম্বুক সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম।*

---

* শঙ্কর-কৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, দ্বিতীয় পাদ, তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম কতিপয় সূত্র দ্রষ্টব্য। বৃহদারণ্যকের 'তস্যার্চ্চত আপোঽজায়ন্ত' শঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তস্য অর্চ্চতঃ আপঃ রসাত্মিকাঃ অজায়ন্ত। তত্র আকাশ প্রভৃতীনাম্ ত্রয়াণাম্ উৎপত্ত্যনন্তরম্ ইতি বক্তব্যম্। শ্রুত্যন্তর সামর্থ্যাৎ বিকল্পাসম্ভবাৎ চ সৃষ্টিক্রমস্য"।

সাক্ষী ও সাক্ষ্য

[শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত বি-এ]

মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ বিচারালয়ে সাক্ষী ও সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মাধিকরণ-সমক্ষে শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান যে মহাপাপ, তাহা বহু পুরাণেই বর্ণিত আছে। রোম, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশমাত্রেই এইরূপ সাক্ষ্যগ্রহণ-বিধি বিভিন্ন রীতিতে প্রচলিত ছিল।

সকল বিষয়েরই প্রত্যক্ষ-জ্ঞান কথনও সম্ভবপর নয়। দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, অনেক বিষয়েই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে অপরের উক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। এই পরস্পর-নির্ভরতার আবশ্যকতা আছে বলিয়াই, সভ্য-সমাজে সত্য-প্রিয়তা এত উচ্চাসন প্রাপ্ত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে 'আপ্তবাক্য' জ্ঞান লাভের অন্যতম পন্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিচারালয়ে যে সমস্ত বিষয় বিচারার্থ সমুপস্থিত হয়, বিচারকের পক্ষে সে সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা একেবারেই সম্ভবপর নয়; এমন কি, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগও অনেক ক্ষেত্রেই ঘটিয়া উঠে না। কাজেই, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া সাক্ষী ও প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সেই সমস্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, বিচার-শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করাই বিচারকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

বিচার-গৃহে উপস্থিত হইয়া বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে যিনি কিছু উক্তি করেন, তিনিই সাক্ষী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি যাহা প্রকাশ করেন তাহাই সাক্ষ্য, এবং বিচার ক্ষেত্রে ইহাই প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে। ব্যবহার-শাস্ত্রমতে, কথিত, লিখিত বা অলিখিত বহুবিধ বিষয়ই প্রমাণ রূপে ব্যবহৃত হয়। বেন্থামের মতে, 'যে কোন প্রকার ঘটনা অপর কোন ঘটনার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিষয়ে বিশ্বাস জন্মায়, বা বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহাই প্রমাণ স্বরূপ গণ্য'। কিন্তু, সে সমস্ত আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। আমরা এখানে মানুষ সাক্ষী ও তাহার উক্তির বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

অর্থী, প্রত্যর্থী উভয়েই যদি সত্যপরায়ণ হইত, তবে বোধ হয় সভ্যসমাজে ব্যবহার-শাস্ত্রের জটিল জাল বিস্তার করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না। স্বার্থপরতা মানুষের ধর্ম্ম। মানুষ যতই সত্যের তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া নিজের বিষয় অপরের নিকট ব্যক্ত করুক না কেন, সে উক্তি একটু স্বার্থ-রাগ-রঞ্জিত হইবেই। বিশেষতঃ, যখন প্রকৃত পক্ষেই তাহার স্বার্থে আঘাত লাগে, আর সেই আঘাতের প্রতীকার-কল্পে সে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়, তখন যে তাহার উক্তি স্বার্থ-সংরক্ষণের উপযোগী হইবে, ইহা ত একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। আবার, অপর পক্ষ তাহার কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ৎ দিবার সময়, এই স্বার্থ-সংরক্ষণ-নীতি যে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিবে, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। এই অনুকূল-প্রতিকূল তরঙ্গ-বিক্ষোভের ভিতর ন্যায়ের তরী সুদক্ষ ভাবে পরিচালিত করিবার জন্যই বিচারক কর্ণধার রূপে বিচারাসনে উপবিষ্ট। তাঁহাকে ঘটনা সমবাতের ভিতর হইতে সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইবে, ওতঃপ্রোত আন্দোলনের ভিতর শান্তি-সংস্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন? তিনি ত প্রত্যক্ষদর্শী নহেন। যদি কেহ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা থাকেন, এমন কোন নিরপেক্ষ লোককে সহকারী রূপে পাইলে, তাঁহার কর্ত্তব্য অনেক সহজ-সাধ্য হইতে পারে। এই জন্যই বিচার গৃহে সাক্ষীর এত প্রয়োজন।

কিন্তু, সাক্ষীর উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা কি সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ? অর্থী, প্রত্যর্থীর যে দোষে দোষী হওয়া সম্ভবপর, সাক্ষীর পক্ষেও ত সেরূপ হওয়া বিচিত্র নহে! আলোচ্য বিষয়ের সহিত যাহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার বর্ণনা যেমন স্বার্থপরতা দুষ্ট হওয়া সম্ভব, নিঃস্বার্থ উদাসীন ব্যক্তির উক্তিও সেইরূপ স্বকপোল-কল্পনা প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে।

অপরের বর্ণিত বিষয় সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি মানবমাত্রের মনে বর্ত্তমান আছে। প্রত্যহ মানব-জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফলেই এই বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। আমরা যেরূপ কথাবার্ত্তা সর্ব্বদা শুনিতে পাই, তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহার মধ্যে সত্যের ভাগ মিথ্যা অপেক্ষা কত গুণ অধিক। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ এই বিশ্বাস জন্মিবার বহুবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, মানব-মনে স্বভাবজ যে নৈতিক বিচার-বুদ্ধি আছে, তাহাই মানবকে অপরের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে প্ররোচিত করে। যাহা জ্ঞানের সীমা-বহির্ভূত, এবং বিচারশক্তি যেখানে দুর্ব্বল, সেইখানেই লোক অপরের উক্তিতে নির্ভর করিতে সহজেই স্বীকৃত হয়। নিজের জ্ঞানের শক্তি যেখানে প্রতিহত, অপরের শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা সেখানে স্বাভাবিক। মানুষ স্বাধীন ভাবে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জ্জন করে, বস্তুতঃই তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। অপরের অর্জ্জিত জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া, তাহা নিজের আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে বলিয়াই, মানব জ্ঞান-রাজ্যের প্রকৃত রাজা। সরল ভাবে বিশ্বাস স্থাপনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বালকের মনে অত্যন্ত প্রবল। যাহা তাহারা শুনে, তাহাই তাহাদের কাছে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাহারা ক্রমশঃ মিথ্যার সংস্পর্শে আসিতে থাকে; এবং সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ ব্যাপার বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করে বলিয়াই, ঐ প্রবৃত্তি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আইসে।

স্বভাবতঃ লোকে সত্যকে যেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করে, মিথ্যার প্রতি সেইরূপ একটা বিরক্তির ভাবও স্বতঃই হৃদয়ে পোষণ করে। মানবের মনে একের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ ও অপরের প্রতি স্বাভাবিক বিরক্তি জন্মিবার হেতু অনুসন্ধান করিতে গিয়া, পাশ্চাত্য নীতিবিদ পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত কয়েকটা মূল কারণ অনুমান করেন:—

(১) সত্যকথনে স্বাভাবিক স্পৃহা।

পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনের প্রবৃত্তি মানুষের মনে অত্যন্ত প্রবল। এ বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। তাহা হইলে, সমাজ অচল হয়, সংসারের গতি প্রতিহত হয়। সাধারণ মানব সত্যপরায়ণ না হইলে, এরূপ নির্ভরতা কখনও চলিতে পারে না। কাজেই বোধ হয়, বিশ্ব-নিয়ন্তা মানব-মনে সত্যকে সুদৃঢ় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—সত্য-কথনের একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষের মনে প্রদান করিয়াছেন। বেন্থামের মতে, এই সত্যকথন-প্রবৃত্তি মানব-মনে স্বাভাবিক ভাবে বর্ত্তমান আছে মনে হইলেও, কয়েকটী বাহ্য কারণের সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

মানুষ স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়; মনের ভার লাঘব করিবার জন্য সে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। মানুষের স্মৃতিশক্তির কার্য্য উদ্ভাবনী-শক্তির ক্রিয়া অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর। স্মৃতির কার্য্য, অতীত কালে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার বিবরণ সযত্নে হৃদয়ে রক্ষা করা, এবং সময়মত অবিকল ব্যক্ত করা; আর উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দেশ্য, যাহা ঘটে নাই তাহার নূতন সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করা, অথবা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বিকৃত অবস্থায় ব্যক্ত করা। সাধারণভাবে, উভয়ের ক্রিয়ার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ বড় সহজ ব্যাপার নহে।

স্মৃতিশক্তির কার্য্য যেমন সহজসাধ্য, উদ্ভাবনী-শক্তির ব্যবহার তদ্রূপ কষ্টসাধ্য। স্বাভাবিক পদার্থকে তাহার স্বরূপ অবয়বে দেখাইতে কোনরূপ চেষ্টা আবশ্যক হয় না। কিন্তু, কোন কৃত্রিম পদার্থকে স্বাভাবিক আকারে প্রদর্শন করিতে হইলে, তত সহজে তাহা সম্পন্ন হয় না; পরন্তু, তাহাতে বিশেষ চেষ্টা ও নিপুণতা আবশ্যক; নচেৎ, তাহার কৃত্রিমতার প্রকাশ পদে-পদে সম্ভব। স্মৃতি যাহা প্রকাশ করে, তাহা সে নিজেই অতি সহজে, সরল ভাবে,—যেমনটী সে বহির্জ্জগৎ হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, ঠিক তেমনই ভাবে ব্যক্ত করে। মন সেখানে নিরুদ্বেগে পরম শান্তি উপভোগ করে। কল্পনার সাহায্য ব্যতীত উদ্ভাবন-ক্রিয়া কখনও সম্ভবপর হয় না। মন সেখানে নিশ্চেষ্ট ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহাকে স্মৃতি ও কল্পনার সাহায্যে নূতন কিছু গড়িয়া তুলিতে হয়। যখন অতীত কোন বিষয় প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হয়, স্মৃতি তখন তাহার বোঝা লাঘব করিয়া নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিবার জন্য সজোরে মনের দ্বারে অনবরত ধাক্কা মারিতে থাকে। মন যখন স্মৃতিকে অবহেলা করিয়া কল্পনার সাহায্যে নূতন কিছু গড়িতে থাকে, তখন স্মৃতি ও কল্পনার এই ধাকাধাক্কির ব্যাপারে তাহাকে বাস্তবিক বড় বিব্রত হইতে হয়। মিথ্যার সৃষ্টি করা বাস্তবিকই বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। উদ্ভাবন করিতে গিয়া মনকে আর একটা বিষয়ে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়—সেটা নির্ব্বাচন। কল্পনার সাহায্যে মিথ্যা গড়িতে গিয়া অনেক সময়েই একটার স্থলে অনেকগুলি মিথ্যার সৃষ্টি হইয়া যায়। তখন মনে হয়, কোন্‌টিকে ছাড়ি, কোন্‌টিকে গ্রহণ করি। এ নির্ব্বাচন-ব্যাপার বড় সহজসাধ্য নহে। অনেকে মিথ্যাকথনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া, কার্য্য-কালে হয় ত যাহা বলিবার আবশ্যকতা নাই, অথবা বলিলে কোন ক্ষতির কারণ ঘটিতে পারে, এমন কিছু বলিয়া বসেন। অনেক স্থলে এমনও দেখা যায় যে, অবিকল সত্য বলিলে যে ফল হইত, মিথ্যা বলিতে গিয়া তাহার বিপরীত ফল ফলিয়া বসে। এমন কি, কোন-কোন স্থলে উক্তি-গুলি এমন অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, বক্তাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। লোকের সত্যকথনের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের ইহা অন্যতম কারণ। এইরূপ যুক্তির আশ্রয় লইলে আমরা বলিতে পারি যে, অপরের নিকট হইতে সত্য কথার প্রত্যাশা করা অসঙ্গত নহে, বরং ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বেন্থাম্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের এই মত যতই সমীচীন হউক না কেন, ফরাসী নীতিবিৎ বনিয়ার (Bonnier) প্রভৃতি তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাক্ষীর নিকট হইতে আমরা সত্য কথার আশা করিতে পারি; কেন না, সত্যকথন-স্পৃহা মানব-মনের একটি বিশেষ ধর্ম্ম;—তাহাই মনকে সত্য কথা বলিতে বাধ্য করে। মিথ্যা কথা বলিতে গেলে, মনের সেই ধর্ম্মের সহিত ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে হয়। দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের কাঁটা যেমন সর্ব্বদাই উত্তরাভিমুখে অবস্থিত থাকে, কলুষশূন্য নির্ম্মল মনের স্বাভাবিক গতিও সেইরূপ সত্যের অভিমুখে। মিথ্যার দিকে তাহাকে টানিয়া আনিতে যাওয়া, সেই স্বাভাবিক গতির প্রতিকূলাচরণ করা মাত্র। লর্ড বেকনও এই মতের অনেকাংশে পোষকতা করেন। বেন্থাম্ তাঁহার সাক্ষ্য-বিষয়ক গ্রন্থে (Judicial Evidence) আর একটী কারণেরও উল্লেখ করিয়া-ছেন। উহা তাঁহার পূর্ব্বকথিত মতের আনুসঙ্গিক মাত্র। তিনি বলেন, মানুষ যে মিথ্যা কথা বলিতে সর্ব্বদা অনিচ্ছুক, তাহার আর একটী কারণ—মানুষের 'সহানুভূতি-প্রিয়তা'। মিথ্যা কথা বলিলে অপরের অনিষ্ট হইতে পারে, এই সহানুভূতিসূচক চিন্তা অনেক সময় মানুষকে মিথ্যাকথন হইতে বিরত করে।

(২) সন্নীতিপরায়ণতা।

অনেকের মতে, মানুষকে সত্যকথনে উৎসাহিত করিবার ইহাও একটি মূল কারণ। সত্যকথনের সুবিধা এবং মিথ্যা-ভাষণের অসুবিধার বিষয়, মানব পরস্পরের সহিত ব্যবহার করিতে গিয়াই, বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। সত্যের মহিমা প্রকৃত রূপে হৃদয়ঙ্গম হয় বলিয়া, সত্য বাক্যের প্রতি একটা পবিত্র শ্রদ্ধার ভাব স্বতঃই হৃদয়ে সমুদিত হয়। সত্যের অপলাপ করিলে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কার্য্য করা হয়, সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের আদেশও লঙ্ঘন করা হয়। সকল সুসভ্য দেশেই 'মিথ্যাবাদী' একটা ভয়ানক অসম্মানসূচক আখ্যা। মানুষ সর্ব্বদাই সুবিচারের প্রয়াসী। পাপের উপযুক্ত শাস্তিবিধান এবং পুণ্যবানকে পুরস্কার প্রদান সভ্যসমাজ মাত্রেরই উদ্দেশ্য। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গেলেই, বাধ্য হইয়া সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অসত্যকে অবলম্বন করিয়া ন্যায়পরতন্ত্রতা চলিতে পারে না। এই ধারণা অনেক সময় নীতিবান মানবকে মিথ্যাভাষণে বিরত করে।

(৩) ধর্ম্মভয়।

অনেকের মতে, ধর্ম্মভয় সত্যকথনে প্রবৃত্তি জন্মাইবার একটি প্রধান কারণ। ধর্ম্মভীরুতা অনেক সময়েই বক্তাকে মিথ্যাকথনে বিরত করে। সত্যের যশ এবং মিথ্যার কলঙ্ক হিন্দুশাস্ত্রকারগণ যেরূপ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা কে না অবগত আছেন? মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সভ্যজাতির ধর্ম্মগ্রন্থেই সত্যের মহিমা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। সত্য যে শুধু ইহকালে যশস্কর, তাহা নহে। যাঁহারা পরকাল স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ইহা পরকালেও সুবর্ণফল প্রদান করে। সত্য-কথন বিশ্বনিয়ন্তার আদেশ এবং সত্য বিশ্বেরই বিধান। কাজেই, ইহার অপব্যবহার করিলে সর্ব্বসাক্ষী ভগবানের সমক্ষে মহা অপরাধী হইতে হয়। ইহকালেই হউক, আর পরকালেই হউক, মিথ্যা রূপ মহাপাপের ফল ভোগ করিতেই হইবে। এইরূপ ধারণা এ দেশবাসীর মনে বদ্ধমূল বলিয়াই, অনেক স্থলে এতদ্দেশীয় অনেক সাক্ষীর নিকট হইতে সত্য কথার প্রত্যাশা করিতে পারা যায়। বৃদ্ধ বয়সে, জীবনের শেষ প্রান্তের নিকটবর্ত্তী হইলেই, লোকের মনে ধর্ম্মভয় একটু বিশেষ রূপে জাগিয়া উঠে। এই ধর্ম্ম-ভীরুতার ফলেই বৃদ্ধ সাক্ষীর মুখ হইতে অনেক সময়েই সত্য কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিচারালয়ে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক সাক্ষ্য প্রদানের রীতি আছে। যে কোন প্রকারের মিথ্যা-কথনই মহাপাপ,—সেই মিথ্যা শপথ পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে, পাপের মাত্রা বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্মগ্রন্থ স্পর্শ করিয়া সাক্ষ্য প্রদানের রীতি যেখানে আছে, সেখানেও এই কথা বিশেষরূপে খাটে। হিন্দুরা অনেক সময় প্রতিপক্ষকে ব্রাহ্মণের পদ, শালগ্রাম শিলা, তামা-তুলসী-গঙ্গাজল প্রভৃতি স্পর্শানন্তর শপথ করিয়া বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিতে অনুরোধ করে। মুসলমানদের ভিতরেও সেইরূপ কোরাণ স্পর্শ করিয়া, অথবা মসজিদে গিয়া শপথ করিবার রীতি প্রচলিত আছে। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজমুখে সমস্ত পাপ ব্যক্ত করিয়া থাকেন। এই সমস্তের মূল কারণ ধর্ম্মভয়। এই মত স্বীকার করিলে বলিতে হয়, যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মভাব যত প্রবল, তাহাদের নিকট হইতে সত্যকথন তত অধিক মাত্রায় প্রত্যাশা করা যায়। মিথ্যাবাদী ইহ-কালে হাতে-হাতে তাহার পাপের ফল না পাইলেও, পরকালে তাহার নিস্তার নাই। এই চিন্তা অনেক সময়েই সত্যপরায়ণ ধর্ম্মভীরুকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারে।

উপরোক্ত কারণত্রয় যতই সঙ্গত হউক না কেন, পৃথক-পৃথক রূপে গ্রহণ করিলে, তাহারা যে অসম্পূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। স্বতন্ত্র ভাবে বিচার না করিয়া ঐগুলি একত্রে গ্রহণ করিলে, আমরা একটা স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, সাক্ষীর নিকট হইতে সত্য বাক্যের প্রত্যাশা করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান আছে। মিথ্যা কথা বলিতে গেলে যে স্বভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়, এ কথা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। মানুষ সত্য কথা বলিবে—এইটিই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, মিথ্যা কথা সেই নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র।

বেষ্ট্ তাঁহার সাক্ষ্যবিষয়ক বিখ্যাত পুস্তকে (W. M. Best on Evidence) মানবের মনের সত্যানুরক্তি-বিষয়ক উক্ত কারণ-ত্রয়ের বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, সংসারে অতি অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা সত্যপথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না। অধিকাংশের পক্ষেই সত্যকথন প্রত্যেক ক্ষেত্রের বিশেষ অবস্থা, বিশেষ ঘটনা বা যথেচ্ছাচারিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমনও এক শ্রেণীর লোক আছে, মিথ্যাভাষণ যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ। মনে হয়, যেন তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াই মিথ্যা কথা বলিয়া আসিতেছে। এইরূপ পাকা মিথ্যা-বাদী সচরাচর দেখা না গেলেও, এই বিশাল সংসারে তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্পও নহে। কিন্তু, সংসারে যত প্রকারেই সত্যের অসদ্ব্যবহার হউক না কেন, যত ভাবেই মিথ্যার প্রচার হউক না কেন, মোটের উপর সত্যের শ্রীবৃদ্ধি স্বীকার করিতেই হইবে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের হিসাব করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, সংখ্যা-হিসাবে সত্য বহুগুণে মিথ্যাকে অতিক্রম করে। বেন্থাম এক স্থানে বলিয়াছেন, "অতিশয় মিথ্যাবাদী বলিয়া যে সর্ব্বত্র পরিচিত,—গণনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়,—তাহারও মুখ দিয়া যত কথা বাহির হয়, তন্মধ্যে সত্যের ভাগ মিথ্যা অপেক্ষা অন্যূন এক শত গুণ অধিক।" তিনি আরও বলেন, "কোন পুস্তকে আমরা এক দেশের গল্প পড়িয়াছি; ঐ দেশবাসিগণকে তাহাদের দেশের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা কখনও সত্য কথা বলিবে না,—মতলব করিয়া ক্রমাগত মিথ্যার পর মিথ্যা বলিয়া যাইবে। তথাপি, একজন পর্য্যটক নানারূপ আনুসঙ্গিক প্রশ্ন করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ঐ দেশ বিষয়ক সত্য সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহাদের রাশিরাশি মিথ্যার ভিতর হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে সমস্ত সত্য কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই তাঁহার জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। [Judicial Evidence, ৮২ পৃঃ]

মানবের মনে সত্যানুরাগ জন্মিবার যে সমস্ত মূল কারণের উল্লেখ করা হইয়াছে, বিরুদ্ধবাদিগণ সে যুক্তিতে ততটা আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, আরাম-প্রিয়তাই যদি মানুষের স্বাভাবিক সত্যানুরক্তির মূল কারণ হয়, এবং কষ্ট-কল্পনা-সম্ভূত মিথ্যা-ভাষণ যদি সেই আরামের ব্যাঘাতকর বলিয়াই পরিত্যাজ্য হয়, তবে সত্যের অনুরোধে স্মৃতিশক্তিকে কষ্ট দিয়া, পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয় স্মরণপূর্ব্বক যথাযথ ভাবে বর্ণন করিতে গেলেও ত মনকে বিশেষরূপে উদ্বিগ্ন হইতে হয়; সেজন্য সত্যও ত পরিত্যাজ্য হইতে পারে। সন্নীতিপরায়ণতা ও ন্যায়-পরতন্ত্রতার জন্যই যে মানব সত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়,—তাঁহাদের মতে, এ কথা বলাও ঠিক নহে। বিচারক্ষেত্রে হয় ত সাক্ষী মনে করিতে পারে, —প্রকৃত পক্ষে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, আমি যদি এই কথাটী যথাযথ ভাবে ব্যক্ত না করিয়া এইরূপ বিকৃত ভাবে প্রকাশ করি, অথবা সম্পূর্ণ রূপে গোপন করি, কিংবা আংশিকরূপে বিবৃত করি, তাহা হইলে আমার মতে সুবিচার হইতে পারে। এরূপ ঘটনা অসম্ভব নহে। মনে করুন, একজন সাক্ষীর উক্তির উপর একজন অপরাধীর প্রাণদণ্ড নির্ভর করিতেছে। সাক্ষী মনে করিতে পারে, এই লোকটীর জীবন-নাশের

সাহায্য করিয়া ফল কি? এ যাত্রায় অব্যাহতি পাইলে হয় ত সে পাপপন্থ পরিত্যাগ করিবে, হয় ত সে একদিন সৎ লোক বলিয়া পরিচিত হইয়া দেশের গৌরব-বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে। এই মনে করিয়া হয় ত সে মিথ্যা কথা বলিয়া উক্ত অপরাধীর প্রাণ রক্ষা করিল। এ ক্ষেত্রে উক্ত সাক্ষী সন্নীতি দ্বারা পরিচালিত হয় নাই—এ কথা বলিতে পারি না। ফলে কিন্তু সে সত্য কথা বলিল না। এই শ্রেণীর দার্শনিক-দিগের মতে, সন্নীতিকে কখনও সত্যকথন-প্রবৃত্তি জন্মাইবার মূল কারণ বলা যাইতে পারে না। সমাজের এক শ্রেণীর লোক যেরূপ কার্য্যের অনুমোদন করে, অপর শ্রেণী হয় ত তাহা বিগর্হিত মনে করিতে পারে। এক শ্রেণীর মতানুসারে কাজ করিতে গিয়া অনেক সময় অপর শ্রেণীর বিষদৃষ্টিতে পতিত হইতে হয়। কাজেই, কোন সাক্ষী যদি কোন সম্প্রদায়বিশেষের লোক হয়, তাহা হইলে, অনেক সময়ে তাহার উক্তি সেই সম্প্রদায়ে প্রচলিত মতবিশেষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মভয় যে সর্ব্বদাই মানুষকে সত্যকথনে প্ররোচিত করে, ইঁহাদের মতে, এ কথাও ততটা ঠিক নহে। ধর্ম্মভাব-প্রণোদিত হইয়া অনেকে অনেক সময় জ্ঞানকৃত মিথ্যা কথা বলিতেও প্রস্তুত হয়। কোন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে এরূপ মনে করা অসম্ভব নহে যে, আমার কথা দ্বারা যদি একজন ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষা হয়, তবে একটা মিথ্যা কথা বলিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালীরা তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া,—নিজ মুখে ব্যক্ত করিলে পুণ্যফল নষ্ট হইয়া যাইবে—এই ভয়ে তীর্থভ্রমণকাহিনী সর্ব্বদাই গোপনে রাখিতে প্রয়াস পান। নিজের ধন-সম্পদের বিষয় নিজ মুখে ব্যক্ত করিলে অহঙ্কার প্রকাশ পাইবে—এই পাপভয়ে অনেককে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও দেখা যায়। অনেক সম্প্রদায় আছে, তাহার দলভুক্ত লোকেরা অপরের নিকট নিজ ধর্ম্মের গূঢ় রহস্য প্রাণান্তেও ব্যক্ত করিবে না। ধর্ম্মশাস্ত্রও কখন-কখন মিথ্যাকে সমর্থন করিয়া থাকে। যে হিন্দুশাস্ত্রমতে মিথ্যার ন্যায় মহাপাপ আর নাই, তাহাতেই স্পষ্ট ভাষায় উক্ত আছে যে, সময়বিশেষে ও অবস্থা-বিশেষে মিথ্যা কথা বলায় কোন পাপই হয় না। এ শ্লোকটা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়:—

> "ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি
> ন স্ত্রীষু রাজন্! ন বিবাহকালে।
> প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে
> পঞ্চানৃতান্যপাতকানি॥

রহস্যযুক্ত বাক্য মিথ্যাশ্রেণীভুক্ত নহে। স্ত্রীর নিকট, বিবাহকালে, প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে এমন সময়ে এবং সর্ব্বধন অপহৃত হইতে যাইতেছে এরূপ সময়ে মিথ্যা কথা বলায় কোনই পাপ নাই।

এই ঋষি-বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ধর্ম্মের মান বাঁচাইয়া অনেক মিথ্যারই কৈফিয়ৎ দিতে পারা যায়।

এ সমস্ত বিরুদ্ধ তর্কমাত্র। আলোচনা করিলে উভয় পক্ষেই আরও যুক্তি দেখান যাইতে পারে। বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পাশ্চাত্য-দর্শনোক্ত পূর্ব্বকথিত সত্যানুরক্তির মূল কারণগুলি যে অনেকাংশে সমীচীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিরূপ সাক্ষী সত্যবর্ণনা প্রদানের যোগ্য পাত্র, এবং কিরূপ উক্তি সত্য বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য, এই বিষয়ে স্টেট্ তাঁহার সাক্ষ্যবিষয়ক পুস্তকে যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

সুস্পষ্ট ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা যাহার নাই, তাহার কথা হইতে সত্যাসত্য নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এ যোগ্যতা সাক্ষীর আছে স্বীকার করিয়া লইলেও, তাহার উক্তির সত্যাসত্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, দুইটী বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য করা আবশ্যক:—

(১) বর্ণিত বিষয়ে তাহার জ্ঞান কিরূপ?

(২) যথাযথ বর্ণনা করিতে তাহার আন্তরিক ইচ্ছা আছে কি না?

ইহার মধ্যে প্রথমটীর বিচার অনেকটা সহজসাধ্য। দ্বিতীয় দফার বিচার করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা আবশ্যক;—

(ক) বর্ণিত বিষয়ে তাহার এমন কোন স্বার্থ, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের মধ্যে একতরের পক্ষ সমর্থন করিবার পক্ষে এমন কোন কারণ বর্ত্তমান আছে কি না, যাহা তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে প্ররোচিত করিতে পারে?

(খ) পূর্ব্বে তাহার সত্যবাদিতার কিরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে?

(গ) সাক্ষ্যপ্রদানের সময় সে কিরূপ আচরণ করিতেছে?

প্রথম দুইটী আনুসঙ্গিক সাক্ষ্য-প্রমাণাদি হইতে অনেকটা বিচার করা যায়। তৃতীয়টা হইতে সাক্ষীর সত্যপরায়ণতার বিষয় বিচার করিতে হইলে, একটু চরিত্রানুমান-বিদ্যার প্রয়োগ করা আবশ্যক। ষ্টার্ক তাঁহার সাক্ষ্যবিষয়ক গ্রন্থে (Stark on Evidence) সাক্ষীর সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতার নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন।

যে পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সে উপস্থিত হইয়াছে,—যে কথা সেই পক্ষের উপকারে আসিতে পারে,—তাহা বলিবার জন্য সাক্ষীর একান্ত আগ্রহ ও অস্বাভাবিক ব্যস্ততা; ঘটনাগুলি অতিরঞ্জিতরূপে বর্ণনা করা; যে কথা তাহার পক্ষের বিরুদ্ধে যাইবার সম্ভাবনা, এমন কিছু প্রকাশ করিতে একান্ত অনিচ্ছা; অথবা সেই প্রশ্ন পরিহার করিবার বাসনায় চতুরতাপূর্ণ উত্তর প্রদান; প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অযথা বিলম্ব করা; প্রশ্নের কোন্ উত্তর প্রদানে কিরূপ ফল হইতে পারে, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়া লইবার জন্য সময় পাইবে বলিয়া, শুনিতে পাই নাই, অথবা প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারি নাই—এইরূপ ভাণ করা; প্রশ্নের সমস্তটা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়াই অথবা প্রশ্নের ভাব বুঝিবার চেষ্টা না করিয়াই অতি শীঘ্র উত্তর প্রদান; পাছে মিথ্যা কথা ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে কোন ঘটনার বিশেষ বিবরণ প্রদানে অস্বীকার, অথবা যেখানে বুঝিতে পারে যে ধরা পড়িবার কোনই সম্ভাবনা নাই, সেখানে অযথা ভাবে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা; বিচার্য্য বিষয়ে যেন সম্পূর্ণ

উদাসীন, এইরূপ কৃত্রিম ভাব প্রদর্শন—এই সমস্ত লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে সাক্ষীর সত্যপরায়ণতার বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে।

ফলাফল কিরূপ হইবে সে বিষয় বিচারশূন্ত হইয়া সরলভাবে সত্বর প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান; যদি তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে বিপরীত ফল ফলিতে পারে—ইহা বুঝিয়াও অসঙ্কোচে সমস্ত ঘটনা সহজ ভাবে ব্যক্ত করা—ইত্যাদি লক্ষণগুলি সাক্ষীর সত্যভাষণের যথেষ্ট নিদর্শন।

কেহ কেহ বলেন, সাক্ষী জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সত্য উত্তর প্রদান করিতেছে কি না, তাহা বিচারের জন্ত শুধু ভাবভঙ্গীর উপর লক্ষ্য করা সঙ্গত নহে। কোন সাক্ষী হয় ত বাস্তবিক সত্যবাদী; কিন্তু তাহার বাহ্য লক্ষণগুলি হয় ত এরূপ অস্বাভাবিক ও বিরক্তিকর যে, পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণগুলির সহিত মিলাইয়া দেখিলে, তাহার উক্তির সত্যতায় সন্দেহ জন্মিতে পারে। হয় ত মিথ্যার প্রতি তাহার বিজাতীয় ঘৃণা আছে; হয় ত সত্য কথা বলিতে সে যথার্থই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; কিন্তু তাহার ব্যবহার দৃশ্যতঃ বাস্তবিকই নিন্দার্হ। হয় ত শুধু অমার্জ্জিত রীতিনীতি ও অসংস্কৃত ভাবে জীবন যাপন করিবার ফলেই তাহার চালচলন ঐরূপ বিরক্তিকর হইয়াছে। অশিক্ষিত পার্ব্বত্য জাতির সত্যপরায়ণতা সর্ব্বজনবিদিত; অথচ তাহাদের ভাবভঙ্গী হইতে উহা বিচার করিবার কোনই উপায় নাই। কাজেই, বিশৃঙ্খল ভাবে বা ব্যাকুলতার সহিত উত্তর প্রদান, উত্তর দিতে সঙ্কুচিত হওয়া বা ইতস্ততঃ করা, মস্তক বা গাত্র-কণ্ডূয়ন, অথবা ঐরূপ কোন সামান্ত কার্য্যে মনঃসংযোগ, পরস্পর বিপরীত ভাববোধক উত্তর প্রদান,—প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়াই সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা ঠিক নহে। অনেক স্থলে হয় ত ঐরূপ অস্বাভাবিক ভাবভঙ্গী লজ্জা বা স্বাভাবিক ধীরতা-প্রযুক্ত হইতেও পারে। ধর্ম্মাধিকরণ-সমক্ষে সুদক্ষ ব্যবহারাজীবীর কূট প্রশ্নের জালে পড়িয়া অনেক মেধাবী সাক্ষীকেও মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হয়। কারণ, সাক্ষীকে বিপর্য্যস্ত করা, সাক্ষীর নিজের উক্তি হইতেই উহার এক অংশের সহিত অপর অংশের বৈপরীত্য প্রমাণ করা, যাহা তাহার নিজের পক্ষের বিরুদ্ধে যাইতে পারে এমন কথা সাক্ষীর মুখ দিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা প্রভৃতি ব্যাপার সুদক্ষ ব্যবহারাজীবীর কৌশলে সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সময় সাক্ষীর, বিচারগৃহের ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ, হয় ত যথেষ্ট সন্দেহজনক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু, কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিচারালয়ের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃশ্যের সম্মুখে ঐরূপ ব্যবহার করা কোন ক্রমেই অস্বাভাবিক নহে। এইরূপ স্থলে, প্রশ্নের উত্তর দিবার সময়ে মনকে সংযত করিয়া আনিতে হয় বলিয়া, তাহাকে স্বভাবতঃ ব্যস্ততাসহকারে, বিবেচনা করিয়া উত্তর করিতেই হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্ম্মাধিকরণকে অসম্মান করা, অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা কখনও তাহার উদ্দেশ্য নহে; এমন কি, অনেক সাক্ষী অপেক্ষা হয় ত সে সত্যপরায়ণ। সচরাচর দেখা যায়, সাধারণ কথোপকথনের সময় অনেকে অন্তমনস্ক হইয়া, এক কথা বলিতে আর এক কথা বলিয়া ফেলেন, পরে সংশোধন করিয়া লয়েন; কাজেই, এইরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষীকে দোষী মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

কোন ব্যক্তির, ঘটনাবিশেষের যথাযথ বিবরণ প্রদান করিবার ক্ষমতা আছে কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে, কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক:—

(১) সাক্ষীর পক্ষে বিচার্য্য বিষয়টীর পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ, (২) পর্য্যবেক্ষণ করিবার যোগ্যতা, (৩) বিচার্য্য ঘটনার এমন কোন বিশেষত্ব আছে কি না, যাহা বক্তার অবধান আকর্ষণ করিবার উপযুক্ত, (৪) বক্তার স্মরণশক্তি। আর স্থূলতঃ, দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে, বর্ণনার সত্যাসত্যের বিচার অনেকটা সম্ভবপর হইতে পারে,—(১) বর্ণনার পৃথক্ পৃথক্ অংশের মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য আছে কি না? (২) বিচার্য্য ঘটনা কথিত ক্ষেত্রে সম্ভবপর কি না? বিচার-ক্ষেত্রে যত মিথ্যা কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নূতন সৃষ্ট কাল্পনিক মিথ্যার সংখ্যা অতি কম। রূপান্তরিত, অসম্পূর্ণ বা অতিরঞ্জিত সত্যের সংখ্যাই অধিক।

অর্থী প্রত্যর্থীর মধ্যে বিবাদ হইলে, সমস্ত সভ্যদেশেই সাক্ষীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়। এই সাক্ষ্য-গ্রহণ-প্রথা কত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। সত্য নির্ণয় করিবার জন্তই সাক্ষীকে আহ্বান করা হয়; কিন্তু, সাক্ষীই যদি সত্যের অবমাননা করে, তাহা হইলে বিচারককে মহা সমস্যায় পড়িতে হয়। বিচারক সাক্ষী দ্বারা প্রতারিত না হন, এবং বিচার-সমস্যা জটিলতর হইয়া না পড়ে—এই উদ্দেশ্যেই সাক্ষ্যবিষয়ক রাজ-বিধানের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। সাক্ষীকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া মিথ্যার জাল ছিন্ন করিবার চেষ্টা করা হয় বলিয়া, বিচারকালে অনেক সত্য আবিষ্কৃত হয়—এ কথা যথার্থ। কিন্তু, অনেক সময় আবার এই ব্যাপারে অনেক সহজ, সরল সত্য সত্যের সম্মান প্রাপ্ত হয় না। ধর্ম্মাধিকরণ হইতে দেশের লোক-চরিত্রের একটা প্রতিচ্ছবি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। মিথ্যা সাক্ষ্যের যেখানে যত আধিক্য, দেশবাসীর চরিত্রও সেখানে ততটা হীন। সাক্ষীর জন্তই অনেক স্থলে বিবাদের সৃষ্টি হয়, আর, এ দেশবাসী নিরক্ষরেরও পর্য্যন্ত ধারণা আছে যে, সাক্ষীর উপরই বিচারের ফলাফল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, ব্যবহার-শাস্ত্র ত অবলম্বন মাত্র।

গৃহ-দাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাসখানেক গত হইয়াছে। কেদারবাবু রাজী হইয়াছেন—মহিমের সহিত অচলার বিবাহ আগামী রবিবারে স্থির হইয়া গেছে। সেদিন যে কাণ্ড করিয়া সুরেশ গিয়াছিল, তাহা সত্যই কেদারবাবুর বুকে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু, সেই অপমানের গুরুত্ব ওজন করিয়াই যে তিনি মহিমের প্রতি অবশেষে প্রসন্ন হইয়া সম্মতি দিয়াছেন, তাহা নয়। সুরেশ নিজেই যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়াছে,—এত দিনের মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সেই রাত্রেই সে না কি পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গেছে,—কবে ফিরিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। সেদিন কান্না চাপিতে অচলা ঘর ছাড়িয়া যখন চলিয়া গেল, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনজনেই মুখ কালী করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু, কথা কহিল প্রথমে সুরেশ নিজে। সে কেদারবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, "যদি আপত্তি না থাকে, আমি আপনার সাক্ষাতেই আপনার কন্যাকে গোটাকয়েক কথা বল্‌তে চাই।" কেদার ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! তুমি কথা বল্‌বে তার আবার আপত্তি কি সুরেশ? যত সব ছেলেমানুষের—" "তা'হলে একবার ডেকে পাঠান—আমার বেশী সময় নেই।" তাহার মুখের ও কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য লক্ষ্য করিয়া কেদার মনে-মনে শঙ্কা অনুভব করিলেন। কিন্তু জোর করিয়া একটু হাস্য করিয়া, আবার সেই ধুয়া তুলিয়াই বলিতে লাগিলেন, "যত সব ছেলেমানুষের কাণ্ড! কিন্তু একটুখানি সাম্‌লাতে না দিলে—বুঝ্‌লে না সুরেশ, ও সব প্লেগ-ফ্লেগের যায়গার নাম করলেই—মেয়েমানুষের মন কি না! একবার শুন্‌লেই ভয়ে অজ্ঞান—বুঝ্‌লে না বাবা—" কোন প্রকার কৈফিয়তের প্রতি মনোযোগ দিবার মত সুরেশের মনের অবস্থা নয়,—সে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাস্তবিক কেদারবাবু, আমার অপেক্ষা করবার সময় নেই।" "তা' ত বটেই! তা' ত বটেই! কে আছিস্ রে ওখানে?" বলিয়া ডাক দিয়া কেদারবাবু মহিমের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিলেন। মহিম উঠিয়া দাঁড়াইয়া, একটা নমস্কার করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল। কেদারবাবু নিজে গিয়া অচলাকে যখন ডাকিয়া আনিলেন, তখন অপরাহ্ন-সূর্য্যের রক্তিম-রশ্মি পশ্চিমের জানালা-দরজা দিয়া ঘরময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই আলোকে উদ্ভাসিত এই তরুণীর ঈষদ্দীর্ঘ কৃশ দেহের পানে চাহিয়া, পলকের জন্য সুরেশের বিক্ষুব্ধ মনের উপর একটা মোহ ও পুলকের স্পর্শ জাগিয়া উঠিল, কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিল না। তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রেই সে ভাব তাহার চক্ষের নিমেষে উবিয়া গেল। তবুও সে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না, নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অচলার মুখের উপর আকাশের আলো পড়ে নাই বটে, কিন্তু সুমুখের দেয়াল হইতে প্রতিফলিত আরক্ত আভায় সমস্ত মুখখানা সুরেশের চোখে কঠিন ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্ত্তির মত বোধ হইল। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি যেন একটা নিবিড় বিতৃষ্ণায় এই নারীর সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত কোমলতা, নিঃশেষে শুষিয়া ফেলিয়া, মুখের প্রত্যেক রেখাটিকে পর্য্যন্ত অবিচলিত দৃঢ়তায় একেবারে ধাতুর মত শক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। সহসা কেদারবাবুর প্রবল নিঃশ্বাসের চোটে সুরেশের চমক্ ভাঙিয়া গেল। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

কেদারবাবু আর একবার তাঁহার পুরাতন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "যত সব পাগলামি কাণ্ড,—কাকে যে কি বলি, আমি ভেবে পাইনে"—সুরেশ অচলাকে উদ্দেশ করিয়া নিরতিশয় শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আপনি যা' বলে গেলেন, তাই ঠিক?" অচলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ।" "এর আর কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়?" অচলা তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না।" রক্তের উচ্ছ্বাস এক ঝলক আগুনের মত সুরেশের চোক-মুখ প্রদীপ্ত করিয়া দিল;

কিন্তু সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়াই কহিল, "আমার প্রাণটার পর্য্যন্ত যখন কোন দাম নেই, তখনি আমি জানতুম!" তাহার বুকের ভিতরটা তখন পুড়িয়া যাইতেছিল; একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, জিজ্ঞেসা করি, আমিই কি আপনাদের প্রথম শিকার, না, এমন আরও অনেকে এই ফাঁদে প্পোড়ে নিজেদের মাথা মুড়িয়ে গেছে?" অসহ্য বিস্ময়ে অচলা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল। সুরেশ কেদার-বাবুর প্রতি চাহিয়া কহিল, "বাপে-মেয়েতে ষড়যন্ত্র কোরে শিকার-ধরার ব্যবসা বিলাতে নতুন নয় শুনতে পাই; কিন্তু, এ-ও বল্‌চি আপনাকে, কেদারবাবু, একদিন আপনাদের জেলে যেতে হবে।" কেদারবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এ সব তুমি কি বল্‌চ সুরেশ?" সুরেশ অবিচলিত স্বরে জবাব দিল, "চুপ করুন, কেদারবাবু; এই থিয়েটারের অভিনয় অনেক দিন ধরে চল্‌চে। পুরানো হয়ে গেছে—আর এতে আমি ভুল্‌ব না। টাকা আমার যা' গেছে, তা যাক্—তার বদলে শিক্ষাও কম পেলুম না; কিন্তু এই যেন শেষ হয়!" অচলা কাঁদিয়া উঠিল—"তুমি কেন এঁর টাকা নিলে বাবা?" কেদারবাবু পাগলের মত একখণ্ড শাদা কাগজের সন্ধানে এদিকে-ওদিকে হাত বাড়াইয়া, শেষে একখানা পুরাতন খবরের কাগজ সবেগে টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, "আমি এখ্‌খুনি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি—" সুরেশ বলিল, "থাক্—থাক্, লেখালিখিতে আর কাজ নেই। আপনি ফিরিয়ে যা দেবেন, সে আমি জানি। কিন্তু আমিও ঐ ক'টা টাকার জন্যে নালিশ করে আপনার সঙ্গে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে পারব না।" জবাব দিবার জন্য কেদারবাবুর দুই ঠোঁট ঘন-ঘন নড়িতে লাগিল, কিন্তু গলা দিয়া একটাও কথা ফুটিল না। সুরেশ অচলার প্রতি ফিরিয়া চাহিল। তাহার একান্ত পাংশু মুখ ও সজল চক্ষের পানে চাহিয়া তাহার একবিন্দু দয়া হইল না, বরঞ্চ ভিতরের জ্বালা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সহিত বলিয়া উঠিল—"কি তোমার গর্ব্ব করবার আছে, অচলা? ঐ ত মুখের শ্রী, ঐ ত কাঠের মত দেহ, ঐ ত গায়ের রঙ!—তবু যে আমি ভুলেছিলাম—সে কি তোমার রূপে? মনেও কোরো না!" পিতার সমক্ষে এই নির্লজ্জ অপমানে অচলা দুঃখে, ঘৃণায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কোচের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ব্রাহ্মদের আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে। যাদের ছায়া মাড়াতেও আমার ঘৃণা বোধ হোতো, তাদের বাড়ীতে ঢোকবামাত্রই যখন আমার আজন্মের সংস্কার—চিরদিনের বিদ্বেষ এক মুহূর্ত্তে ধুয়ে-মুছে গেল, তখনি, আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল—এ যাদুবিদ্যা! আমার যা হয়েছে, তা হোক্; কিন্তু যাবার সময় আপনাদের আমি সহস্র-কোটী ধন্যবাদ না দিয়ে যেতে পারচিনে। ধন্যবাদ অচলা!" চপলা মুখ না তুলিয়াই, অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা, ওঁকে তুমি চুপ কর্‌তে বল। আমরা গাছতলায় থাকি সেও ঢের ভাল,—কিন্তু ওঁর যা নিয়েচ, তুমি ফিরিয়ে দাও"—সুরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "গাছতলায়? একদিন তাও তোমাদের জুটবে না, তা' বলে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সে দিন আমাকে স্মরণ কোরো" বলিয়া প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল। কেদারবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "উঃ, কি ভয়ানক লোক! এমন জান্‌লে আমি কি ওকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিতুম!" পিতার কথা অচলার কাণে গেল, কিন্তু সে কিছুই বলিল না; উপুড় হইয়া পড়িয়া যেমন করিয়া কাঁদিতেছিল, তেমনি একভাবে পড়িয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিল। অদূরে চৌকির উপর বসিয়া কেদারবাবু সমস্তই দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু, সান্ত্বনার একটা কথা উচ্চারণ করিতেও আর তাঁহার সাহস হইল না। সন্ধ্যা হইয়া গেল। বেহারা আসিয়া গ্যাস জ্বালাইবার উপক্রম করিতেই, অচলা নিঃশব্দে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কিন্তু, মহিম ইহার কিছুই জানিল না। শুধু যেদিন কেদারবাবু অত্যন্ত অবলীলাক্রমে কন্যার সহিত তাহার বিবাহে সম্মতি দিলেন, সেই দিনটায় সে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বলের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেক প্রকারের অনেক কথা, অনেক সংশয় তাহার মনে উদয় হইল বটে, কিন্তু, তাহার এই সৌভাগ্যের সুরেশ নিজেই যে মূল কারণ, ইহা তাহার সুদূর কল্পনায়ও উদয় হইল না। অচলার প্রতি স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু চিরদিনই সে নিঃশব্দ প্রকৃতির লোক; আবেগ-উচ্ছ্বাস কোন দিনই প্রকাশ করিতে পারিত না, পারিলেও হয় ত তাহার মুখে

নিতান্তই তাহা একটা অপ্রত্যাশিত, অসংলগ্ন আচরণ বলিয়া লোকের চোখে ঠেকিত। বরঞ্চ, আজ সন্ধ্যার সময় যখন সে একাকী কেদারবাবুর সহিত দুই-চারিটা কথাবার্ত্তার পর বাসায় ফিরিয়া গেল, তখন, অন্যান্য দিনের মত অচলার সহিত দেখা করিয়া, তাহাকে একটা ছোট্ট নমস্কার পর্য্যন্ত করিয়া যাইতে পারিল না। কথাটা কেদারবাবু নিজেই পাড়িয়াছিলেন। প্রসঙ্গ উত্থাপন হইতে সুরু করিয়া, সম্মতি দেওয়া - মায় দিন স্থির পর্য্যন্ত, একাই সব করিলেন। কিন্তু সমস্তটাই যেন অনন্যোপায় হইয়াই করিলেন; মুখে তাঁহার স্ফূর্ত্তি বা উৎসাহের লেশমাত্র চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। তথাপি দিন কাটিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসিল।

পরশু বিবাহ। কিন্তু মেয়ের বিবাহে তিনি কোনরূপ ধুমধাম, হৈচৈ করিবেন না—স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, আগামী শুভ কর্ম্মের আয়োজন যতটা নিঃশব্দে হইতে পারে, তাহার ত্রুটি করেন নাই।

আজও বিকালবেলা তিনি যথানিয়মে চা খাইতে বসিয়াছিলেন। একটা সেলাই লইয়া অচলা অনতিদূরে কোচের উপর বসিয়া ছিল। অনেক দিন অনেক দুঃখের মধ্যে দিন যাপন করিয়া, আজ কয়েক দিন হইতে তাহার মনের উপর যে শান্তিটুকু স্থিতিলাভ করিয়াছিল, তাহারই ঈষৎ আভাসে তাহার পাণ্ডুর মুখখানি ম্লান জ্যোৎস্নার মতই স্নিগ্ধ বোধ হইতেছিল। চা খাইতে-খাইতে মাঝে-মাঝে কেদারবাবু ইহাই লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন। কলহ করিয়া সুরেশ চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত, এতদিন তিনি মন-মরা ভাবেই দিন যাপন করিতেছিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে, না করিবে—এই এক দুশ্চিন্তা; তা ছাড়া, তাঁহার নিজের কর্ত্তব্যই বা এ সম্বন্ধে কি,—হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দেওয়া, বা, টাকাটা পরিশোধ করিতে আর কোথাও ঋণের চেষ্টা করা, কিম্বা মহিমের উপর দায়িত্ব তুলিয়া দেওয়া—কি যে করা যায়, তাহা ভাবিয়া-ভাবিয়া, কোন কূল-কিনারাই দেখিতেছিলেন না। অথচ, একটা কিছু করা যে নিতান্তই আবশ্যক সুরেশের নিরুদ্দেশ অবস্থার উপর বরাত দিয়া যে চিরদিন চলিবে না, অথবা মেয়ের মত নিজের খেয়ালে মগ্ন হইয়া, চোখ বুজিয়া থাকিলেই যে বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে না, তাহাও হাড়ে-হাড়ে বুঝিতেছিলেন। হতাশ-প্রেমিক একদিন যে চাঙ্গা হইয়া উঠিবে, এবং সেদিন ফিরিয়া আসিয়া কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া মস্ত হাঙ্গামা বাধাইয়া দিবে, এবং যে টাকাটা সে চেকের দ্বারা তাঁহাকে দিয়াছে—তাহা আর কোন লেখা-পড়া না থাকা সত্ত্বেও যে আদালতে উড়াইতে পারা যাইবে না, ভাবিয়া-ভাবিয়া এ বিষয়ে এক প্রকার তিনি নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু, মেয়ের সহিত এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করিবার পর্য্যন্ত যো ছিল না। সুরেশের নামোল্লেখ করিতেও তাঁহার ভয় করিত। এখন, অচলার ওই শান্ত-স্থির মুখচ্ছবির প্রতি চাহিয়া-চাহিয়া তাঁহার ভারি একটা চিত্তজ্বালার সহিত কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই মেয়েটাই তাঁহার সকল দুঃখের মূল। অথচ, কি সুবিধাই না হইয়াছিল; এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও কি না হইতে পারিত!

যে নিষ্ঠুর কন্যা বৃদ্ধ পিতার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও, তাঁহার সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করিল না, সমস্ত পণ্ড করিয়া দিল,—সেই স্বার্থপর সন্তানের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচ্ছন্ন ক্রোধ অভিশাপের মত যখন-তখন প্রায় এই কামনাই করিত,—সে যেন ইহার ফলভোগ করে; একদিন যেন তাহাকে কাঁদিয়া বলিতে হয়,—'বাবা, তোমার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি আমি পাইতেছি।' পাত্র-হিসাবে সুরেশ যে মহিমের অপেক্ষা অসংখ্য গুণে অধিক বাঞ্ছনীয়, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার সম্পর্ক হইতে বিচ্যুত হওয়াটাকে তিনি গভীর ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতেছিলেন। মনে-মনে তাহার উপর তাঁহার ক্রোধ ছিল না। এত কাণ্ডের পরেও যদি আজ আবার তাহাকে ফিরিয়া পাইবার পথ থাকিত, উপস্থিত বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে বোধ করি তিনি লেশমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু, কোন উপায় নাই,—কোন উপায় নাই! অচলার কাছে তাহার আভাসমাত্র উত্থাপন করাও অসাধ্য! সেলাই করিতে-করিতে অচলা সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, "বাবা, সুরেশবাবুর ব্যাপারটা পড়লে?" অচলার মুখে সুরেশের নাম! কেদারবাবু চমকিয়া চাহিলেন। নিজের কাণকে তাঁর বিশ্বাস হইল না। সকালের খবরের কাগজটা টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল; অচলা সেটা তুলিয়া লইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কাগজখানার স্থানে-স্থানে তিনি সকালবেলায় চোখ বুলাইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু, অপরের সংবাদ খুঁটিয়া

জানিবার মত আগ্রহাতিশয্য তাঁহার মনের মধ্যে এখন আর ছিল না। কহিলেন, "কোন্ সুরেশ?" অচলা সংবাদপত্রের সেই স্থানটা খুঁজিতে-খুঁজিতে বলিল, "বোধ করি, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।" কেদারবাবু বিস্ময়ে দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের সুরেশবাবু? কি করেছেন তিনি? কোথায় তিনি?" অচলা উঠিয়া আসিয়া সংবাদপত্রের সেই স্থানটা পিতার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ না, বাবা।" কেদারবাবু চসমার জন্য পকেট হাতড়াইয়া বলিলেন, "চস্মাটা হয় ত আমার ঘরেই ফেলে এসেচি। তুমিই পড় না মা, ব্যাপারটা কি শুনি?" অচলা পড়িয়া শুনাইল,—ফয়জাবাদ সহরের জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিতেছেন, সেদিন সহরের দরিদ্র-পল্লীতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড হইয়া গেছে। একে প্লেগ, তাহাতে এই দুর্ঘটনায় দুঃখী লোকের দুঃখের আর পরিসীমা নাই। কিছুদিন হইতে সুরেশ নামে একটি ভদ্র যুবক এখানে আসিয়া অর্থ দিয়া, ঔষধ-পথ্য দিয়া, নিজের দেহ দিয়া রোগীর সেবা করিতে-ছিলেন। বিপদের সময় তিনি উপস্থিত হইয়া শুনিতে পান, রোগশয্যায় পড়িয়া কোন স্ত্রীলোক একটি প্রজ্বলিত গৃহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে—তাহাকে উদ্ধার করিবার কেহ নাই। সংবাদদাতা অতঃপর লিখিয়াছেন, ইহার প্রাণরক্ষা করিতে, কি করিয়া এই অসমসাহসী বাঙালী যুবক নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি—" পড়া শেষ হইয়া গেল। কেদারবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু, এ কি আমাদের সুরেশ বলেই তোমার মনে হয়?" অচলা দৃঢ় স্বরে বলিল, "হাঁ বাবা, ইনি আমাদেরই সুরেশবাবু।" কেদারবাবু আর একবার চমকিয়া উঠিলেন। বোধ করি, নিজের অজ্ঞাতসারেই অচলার মুখ দিয়া এই 'আমাদেরই' কথাটার উপর এবার একটা অতিরিক্ত জোর প্রকাশ পাইয়াছিল। হয় ত সে শুধু একটা নিশ্চিত বিশ্বাস জানাইবার জন্যই। কিন্তু কেদারবাবুর বুকের মধ্যে তাহা আর এক ভাবে বাজিয়া উঠিল। এবং মজ্জমান ব্যক্তি যে ভাবে তৃণ অবলম্বন করিতে দুই বাহু বাড়াইয়া দেয়, ঠিক তেমনি করিয়া বৃদ্ধ পিতা কন্যার মুখের এই একটিমাত্র কথাকেই নিবিড় আগ্রহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। এই একটা কথাই তাঁহার কানে-কানে, চক্ষের নিমেষে কত কি যে অসম্ভব সম্ভাবনার দ্বারোদ্ঘাটনের সংবাদ শুনাইয়া গেল, তাহার সীমা রহিল না। তাঁহার মুখখানা আজ এতদিন পরে অকস্মাৎ আশার আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "আচ্ছা, মা, তোমার কি মনে হয় না যে—" পিতাকে সহসা থামিতে দেখিয়া অচলা মুখপানে চাহিয়া কহিল, "কি মনে হয় না বাবা?" কেদারবাবু সাবধানে অগ্রসর হইবার জন্য মুখের কথাটা চাপিয়া গিয়া বলিলেন, "তোমার কি মনে হয় না, যে, সুরেশ যে ব্যবহার আমাদের সঙ্গে করে গেল, তার জন্যে সে বিশেষ অনুতপ্ত?" অচলা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, "আমার তা' নিশ্চয় মনে হয়, বাবা!" কেদারবাবু প্রবল-বেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! একশ'-বার। তা' না হলে, সে এ ভাবে পালাত না—কোথাকার একটা তুচ্ছ স্ত্রীলোককে বাঁচাতে আগুনের মধ্যে ঢুকত না! আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, সে শুধু অনুতাপে দগ্ধ হয়েই নিজের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে গিয়েছিল! সত্য কি না বল দেখি মা?" অচলা পিতার ঠিক জবাবটা এড়াইয়া গিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "পরকে বাঁচাতে এই রকম আরও দু'-একবার তিনি নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করেছিলেন।" কথাটা কেদারবাবুর তেমন ভাল লাগিল না। বলিলেন, "সে আলাদা কথা, অচলা। কিন্তু, এ যে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া! এ যে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা! ছুটোর প্রভেদ দেখতে পাচ্ছ না?" অচলা আর প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "তা বটে। কিন্তু, যাঁরা মহৎ-প্রাণ, তাঁদের যে-কোন অবস্থাতেই, পরের বিপদে নিজের বিপদ মনে পড়ে না—" কেদারবাবু উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলেন। দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক তাই ত বল্‌চি তোকে, অচলা—সে একটা মহৎ প্রাণ! একেবারে মহৎ-প্রাণ! তার সঙ্গে কি আর কারো তুলনা চলে! এত লোক ত আছে; কিন্তু কে কাকে পাঁচ-পাঁচহাজার টাকা একটা কথায় ফেলে দিতে পারে, বল্ দেখি! সে যাই কেন না ক'রে থাক, বড় দুঃখেই ক'রে ফেলেচে—এ আমি তোমাকে শপথ করে বল্‌তে পারি!" কিন্তু শপথের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এ সত্য অচলা নিজে যত জানিত, তিনি তাহার শতাংশের একাংশও জানিতেন না। কিন্তু জবাব দিতে পারিল না—নিমেষের লজ্জা পাছে তাহার মুখে ধরা পড়ে,

এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘাড় হেঁট করিয়া মৌন হইয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধের সতৃষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাহা ফাঁকি পড়িল না। তিনি পুলকিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, "মানুষ ত দেবতা নয়,—সে যে মানুষ! তার দেহ দোষে-গুণে জড়ানো; কিন্তু তাই বলে ত তার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের উত্তেজনাকে তার স্বভাব বলে নেওয়া চলে না! বাইরের লোক যে যা' ইচ্ছে বলুক, অচলা, কিন্তু আমরাও যদি এইটেকেই তার দোষ বলে বিচার করি, তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ থাকে কোন্‌খানে বল্ দেখি? বড়লোক ত আরও ঢের আছে, কিন্তু, এমন কোরে দিতে জানে কে? কি লিখেচে ওইখানটায় আর একবার পড় দেখি মা! আগুনের ভেতর থেকে তাকে নিরাপদে বার করে নিয়ে এল? উঃ, কি মহৎ প্রাণ! দেবতা আর বলে কাকে!" বলিয়া তিনি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস মোচন করিলেন। অচলা তেম্‌নি নিরুত্তর অধোমুখে বসিয়া রহিল! কেদারবাবু ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, আমাদের একখানা টেলিগ্রাফ কোরে কি তার খবর নেওয়া উচিত নয়? তার এ বিপদের দিনেও কি আমাদের অভিমান করা সাজে?" এবার অচলা মুখ তুলিয়া কহিল, "কিন্তু আমরা ত তাঁর ঠিকানা জানিনে বাবা।" কেদার-বাবু বলিলেন, "ঠিকানা! ফয়জাবাদ সহরে এমন কেউ কি আছে, যে, আমাদের সুরেশকে আজ চেনে না? তার ওপর আমার রাগ খুবই হয়েছিল, কিন্তু এখন আর আমার কিচ্ছু মনে নেই। একখানা টেলিগ্রাম লিখে এখ্‌খুনি পাঠিয়ে দাও মা; আমি তার সংবাদ জানবার জন্যে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেচি।" 'এখুনি দিচ্চি বাবা' বলিয়া, সে একখানা টেলিগ্রাফের কাগজ আনিতে ঘরের বাহির হইয়া, একেবারে সুরেশের সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। অন্তরে গভীর দুঃখ বহন করার ক্লান্তি এত শীঘ্র মানুষের মুখকে যে এমন শুষ্ক, এমন শ্রীহীন করিয়া দিতে পারে, জীবনে আজ অচলা এই প্রথম দেখিতে পাইয়া চম্‌কাইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তার পরে সে-ই কথা কহিল। বলিল, "বাবা বসে আছেন; আসুন, ঘরে আসুন। ফয়জাবাদ থেকে কবে এলেন? ভাল আছেন আপনি?" অজ্ঞাতসারে তাহার কণ্ঠস্বরে যে কতখানি স্নেহের বেদনা প্রকাশ পাইল, তাহা সে নিজে টের পাইল না; কিন্তু, সুরেশ একেবারে ভাঙিয়া পড়িবার মত হইল। কিন্তু, তবুও আজ সে তাহার বিগত দিনের কঠোর শিক্ষাকে নিষ্ফল হইতে দিল না। সেই দুটি আরক্ত পদতলে তৎক্ষণাৎ জানু পাতিয়া বসিয়া পড়িয়া, তাহার অগাধ দুষ্কৃতির সমস্তটুকু নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিবার দুর্জ্জয় স্পৃহাকে আজ সে প্রাণপণ বলে নিবারণ করিয়া লইয়া, সসম্ভ্রমে কহিল, "আমার ফয়জাবাদে থাক্‌বার কথা আপনি কি কোরে জান্‌লেন?" অচলা তেম্‌নি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল, "খবরের কাগজে এইমাত্র দেখে বাবা আমাকে টেলিগ্রাফ করতে বল্‌ছিলেন। আপনার জন্যে তিনি বড় উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন—আসুন, একবার তাঁকে দেখা দেবেন," বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করিতেই, সুরেশ বলিয়া উঠিল, "তিনি হয় ত পারেন; কিন্তু তুমি আমাকে কি কোরে মাপ করলে অচলা?" অচলার ওষ্ঠাধরে একটুখানি হাসির আভা দেখা দিল। কহিল, "সে প্রয়োজনই আমার হয়নি। আমি একটি দিনের জন্যেও আপনার ওপর রাগ করিনি—আসুন, ঘরে আসুন।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সুরেশ যখন জানাইল, সে মহিমের পত্রে বিবাহের সংবাদ পাইয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছে, তখন কেদারবাবু লজ্জায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু, অচলার মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পাইল না। সুরেশ বলিল, "মহিমের বিবাহে আমি না এলেই ত নয়, নইলে আরও কিছু দিন হাঁসপাতালে থেকে গেলেই ভাল হ'ত।" কেদারবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁসপাতালে কেন সুরেশ, সে রকম ত' কিছু—"

সুরেশ বলিল, "আজ্ঞে না, সে রকম কিছুই নয়—তবে, দেহটা ভাল ছিল না।" কেদারবাবু সুস্থির হইয়া বলিলেন, "ভগবানকে সে জন্যে শতকোটী প্রণাম করি। তখন অচলা যখন খবরের কাগজ থেকে তোমার অলৌকিক কাহিনী শোনালে সুরেশ, তোমাকে বলব কি—আনন্দে, গর্ব্বে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল। মনে-মনে বল্‌লুম, 'ঈশ্বর! আমি ধন্য যে—আমি এমন লোকেরও বন্ধু!'" বলিয়া দু'হাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "কিন্তু, তাও বলি, বাবা, নিজের প্রাণ বারংবার

এমন বিপদাপন্ন করাই কি উচিত? একটা সামান্ত প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এতবড় একটা মহৎ প্রাণ-ই যদি চলে যেত, তাতে কি সংসারের ঢের বেশী ক্ষতি হত না?” “ক্ষতি আর কি হ’ত!” বলিয়া সুরেশ সলজ্জ হাস্তে মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল, অচলা নির্নিমেষ চক্ষে এতক্ষণ তাহারই মুখের পানে চাহিয়া ছিল—এখন দৃষ্টি আনত করিল। কেদারবাবু বারংবার বলিতে লাগিলেন, “এমন কথা মুখে আনাও উচিত নয়; কারণ, আপনার লোকদের ইহাতে যে কতবড় ব্যথা বুকে বাজে তাহার সীমা নাই।” সুরেশ হাসিতে লাগিল; কহিল, “আপনার লোক আমার ত কেউ নেই, কেদারবাবু? থাক্‌বার মধ্যে আছেন শুধু পিসিমা, —আমি গেলে সংসারে তাঁরই যা কিছু কষ্ট হবে।” তাহার মুখের হাসি সত্বেও তাহার কেহ নাই শুনিয়া কেদারবাবুর শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। বলিলেন, “শুধু কি পিসিমাই দুঃখ পাবেন সুরেশ? তা নয় বাবা, এ বুড়োও বড় কম শোক পাবে না। তা’ সে যা’ক্, অন্ততঃ আমি যে ক’টা দিন বেঁচে আছি, সে ক’টা দিন নিজের শরীরে একটু যত্ন রেখো সুরেশ, এই আমার একান্ত অনুরোধ।” ঘড়িতে রাত্রি দশটা বাজিল। বাড়ী ফিরিবার উদ্যোগ করিয়া সুরেশ হঠাৎ হাত জোড় করিয়া বলিল, “আমার একটা প্রার্থনা আছে কেদারবাবু; মহিমের বিয়ে ত আমার ওখান থেকেই হবে, স্থির হয়েচে; কিন্তু সে ত পরশু। কাল রাত্রেও এই অধমের বাড়ীতেই একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে—নইলে বিশ্বাস হবে না যে, আমি ক্ষমা পেয়েচি। বলুন এ ভিক্ষে দেবেন?” বলিয়া সে অকস্মাৎ নীচু হইয়া কেদারবাবুর পায়ের ধূলা লইতে গেল। কেদারবাবু শশব্যস্ত হইয়া বোধ করি বা তাহাকে জোর করিয়াই নিরস্ত করিতে গিয়াছিলেন,—অকস্মাৎ তাহার অস্ফুট কাতরোক্তিতে লাফাইয়া উঠিলেন। পিঠের খানিকটা দগ্ধ হওয়ায় ব্যাণ্ডেজ করা ছিল, একটা শাল গায়ে দিয়া এতক্ষণ সুরেশ ইহা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। না জানিয়া টানাটানি করিতে গিয়া, তিনি ব্যাণ্ডেজটাই সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন অনাবৃত ক্ষতের পানে চাহিয়া বৃদ্ধ সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত উঠিয়া আসিয়া অচলা ব্যাণ্ডেজ্ ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, “ভয় কি, আমি ঠিক করে বেঁধে দিচ্চি” বলিয়া তাহাকে ও-ধারের সোফার উপর বসাইয়া দিয়া, সযত্নে সাবধানে ব্যাণ্ডেজটা যথাস্থানে বাঁধিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। কেদারবাবু তাঁহার চৌকির উপর ধপ্ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িলেন—বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আর তাঁহার কোনরূপ সাড়া-শব্দ রহিল না। কোচের পিঠের উপর দুই কনুয়ের ভর দিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া অচলা নিঃশব্দে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিতেছিল। দেখিতে-দেখিতে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং অনতিকাল পরেই মুক্তার আকারে একটির পর একটি নীরবে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুরেশ ইহার কিছুই দেখিতে পাইল না; এদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। সে শুধু নিমীলিত চক্ষে স্থির হইয়া বসিয়া, তাহার অসীম প্রেমাস্পদের কোমল হাত দু’খানির করুণ স্পর্শ বুকের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল। কোনমতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া অচলা এক সময়ে চুপি-চুপি বলিল, “আজ আমার কাছে আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।” সুরেশ ধ্যান ভাঙিয়া চকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সেও তেম্‌নি মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, “কি প্রতিজ্ঞা?” “এমন কোরে নিজের প্রাণ আর আপনি নষ্ট করতে পার্‌বেন না।” “কিন্তু প্রাণ ত আমি ইচ্ছে কোরে নষ্ট করতে চাইনে! শুধু পরের বিপদে আমার কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না—এ যে আমার ছেলেবেলার স্বভাব, অচলা!” অচলা তাহার প্রতিবাদ করিল না; কিন্তু, সঙ্গে-সঙ্গে সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল, সুরেশ তাহা টের পাইল। বাঁধা শেষ হইয়া গেলে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে-ধীরে বলিল, “কাল কিন্তু এ দীনের বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলো দিতে হবে—” তাহার দু’চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিল; কিন্তু, কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইল না। অচলা অধোমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “আচ্ছা।” সুরেশ কেদারবাবুকে নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, “দেখ্‌বেন, আমাকে নিরাশ কর্‌বেন না যেন!” বলিয়া অচলার মুখের পানে চাহিয়া, আর একবার তাহার আবেদন নিঃশব্দে জানাইয়া ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন যথা সময়ে সুরেশের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। কেদারবাবু প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন, কন্যাকে লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাত্রা করিলেন।

সুরেশের বাটীর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেদার-

বাবু অবাক্ হইয়া গেলেন। সে বড় লোক ইহা ত জানা কথা; কিন্তু তাহা যে কতখানি—শুধু আন্দাজের দ্বারা নিশ্চয় করা এতদিন কঠিন হইতেছিল; আজ একেবারে সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া বাঁচিলেন। সুরেশ আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উভয়কে গ্রহণ করিল। হাসিয়া বলিল, "মহিমের গোঁ আজও ভাঙ্‌তে পারা গেল না, কেদার বাবু। কাল দুপুরের আগে এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে সে কিছুতেই রাজী হ'ল না।" কেদারবাবু সে কথার কোন জবাবও দিলেন না। তিনজনে বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেই, একজন প্রৌঢ়া রমণী দ্বারের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া অচলার হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিজের ঘরের মেঝের উপর একখানি কার্পেট বিছানো ছিল, তাহারই উপর অচলাকে সযত্নে বসাইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। বলিলেন, "আমি সম্পর্কে তোমার শাশুড়ী হই, বউমা। আমি মহিমেরও পিসি।" অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, "আপনি এখানে কবে এলেন?" মহিমের যে পিসি ছিলেন, তাহা সে জানিত না। প্রৌঢ়া তাহার বিস্ময়ের কারণ অনুমান করিয়া, হাসিয়া কহিলেন, "আমি এখানেই থাকি মা, আমি সুরেশের পিসি; কিন্তু মহিমও ত পর নয়, তাই তারও আমি পিসি হই মা।"

তাঁহার স্বভাব-কোমল কণ্ঠস্বরে এমনই একটা স্নেহ ও আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল যে, এক মুহূর্ত্তেই অচলার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। তাহার মা নাই, —সে অভাব এতটুকু পূর্ণ করে বাড়ীতে এমন কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক কোন দিন নাই। তাহার জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত এতদিন সে পিতার স্নেহেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সে স্নেহ যে তাহার হৃদয়ের কতখানি খালি ফেলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল—আজ পরের বাড়ীর পরের পিসিমা যখন 'বউমা' বলিয়া ডাকিয়া, তাহাকে আদর করিয়া কাছে বসাইলেন। প্রথমটা সে এই অভিনব সম্বোধনে একটুখানি লজ্জিত হইয়া পড়িল; কিন্তু ইহার মাধুর্য্য, ইহার গৌরব তাহার নারী-হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল। দেখিতে-দেখিতে দুজনের কথা জমিয়া উঠিল। অচলা লজ্জিত মুখে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, পিসিমা, আমাকে যে আপনি কাছে বসালেন, কৈ ব্রাহ্ম-মেয়ে বলে ত ঘৃণা করলেন না?"

পিসিমা তাড়াতাড়ি আপনার অঙ্গুলির প্রান্ত দ্বারা তাহার চুম্বন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "তোমাকে ঘৃণা কর্‌ব কেন মা?" একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমরা হিন্দুর ঘরের মেয়ে বলে কি এমন নির্ব্বোধ, এত হীন, বউমা, যে শুধু ধর্ম্মমত আলাদা ব'লে, তোমার মত মেয়েকেও কাছে বসাতে সঙ্কোচ বোধ করব? ঘৃণা করা ত অনেক দূরের কথা মা!"

অচলা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া বলিল, "আমাকে মাপ করুন পিসিমা, আমি জানতুম না। আমাদের সমাজের বাইরে কোন মেয়েমানুষের সঙ্গেই কোনদিন আমি মিশ্‌তে পাইনি; শুধু শুনেছিলুম, যে তাঁরা আমাদের বড় ঘৃণা করেন; এমন কি একসঙ্গে বস্‌লে দাঁড়ালেও তাঁদের স্নান করতে হয়।" পিসিমা বলিলেন, "সেটা ঘৃণা নয় মা, সে একটা আচার। আমাদের বাইরের আচরণ দেখে হয় ত তোমাদের অনেক সময় এই কথাই মনে হবে; কিন্তু, সত্যি বল্‌চি, মা, সত্যিকারের ঘৃণা আমরা কাউকে করিনে। আমাদের দেশের বাড়ীতে আজও আমার বাগ্দী জ্যাঠাইমা বেঁচে আছে—তাকে কত যে ভালবাসি, তা বলতে পারিনে।" একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেসা করি মা, তোমাকে,—এ কি সুরেশের মুখ থেকে শুনে আজ তোমার আমাকে দেখে এ কথা মনে পড়ল?" সুরেশের উল্লেখে অচলা মনে-মনে লজ্জা পাইয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "অনেকদিন আগে একবার তিনিও বলেছিলেন বটে।" পিসিমা বলিলেন, "ঐ ওর স্বভাব। একটা কথা মনে হলে আর রক্ষে নেই—ও তাই চারিদিকে বলে বেড়াবে। কোন দিন ব্রাহ্মদের সঙ্গে না মিশেই ও ভেবে নিলে, তাদের ও ভারি ঘৃণা করে। এই নিয়ে মহিমের সঙ্গেও ওর কত দিন ঝগড়া হবার উপক্রম হয়ে গেছে। কিন্তু আমি ত তাকে একরকম মানুষ করেছি, আমি জানি সে কাউকে ঘৃণা করে না—ঘৃণা কর্‌বার সাধ্যই ওর নেই। এই দেখ না মা, যেদিন থেকে সে তোমাদের দেখ্‌লে, সেদিন থেকে—" কিন্তু কথাটা শেষ করিতে পারিলেন না। অঁচলার মুখের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় হঠাৎ মাঝখানেই থামিয়া গেলেন। তিনি তাহাদের সম্বন্ধে কতদূর জানিয়াছেন, তাহা বুঝিতে

না পারিলেও, অচলার সন্দেহ হইল, যে, অন্ততঃ কতকটা পিসিমার অবিদিত নাই। ক্ষণকালের জন্য উভয়েই মৌন হইয়া রহিল; অচলা নিজের লজ্জাটাকে কোনমতে দমন করিয়া অন্য কথা পাড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, "পিসিমা, আপনিই কি তবে সুরেশবাবুকে মানুষ করে ছিলেন?" পিসিমা আবেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিলেন, "হাঁ, মা, আমিই তাকে মানুষ করেচি। ছ'বছর বয়সে ও মা-বাপ হারিয়েছিল। আজও আমার সে কাজ সারা হয়নি—আজও সে বোঝা মাথা থেকে নাবেনি। কারুর দুঃখ-কষ্ট, কারুর আপদ-বিপদ ও সহ্য কর্‌তে পারে না, প্রাণের আশা-ভরসা ত্যাগ করে, তার বিপদের মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কত ভয়ে-ভয়ে যে দিনরাত থাকি বউমা, সে তোমাকে আর বল্‌তে পারিনে।" অচলা আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ফয়জাবাদের ঘটনাটা শুনেছেন?" পিসিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "শুনেচি বই কি মা। ভগবানকে তাই সদাই বলি 'ঠাকুর, আমি বেঁচে থাক্‌তে যেন আমাকে আর সে দেখা দেখিয়ো না—মাথায় পা দিয়ে একেবারে আমাকে রসাতলে ডুবিয়ে দিয়ো না। এ আমি কোনমতে সহ্য কর্‌তে পারব না।'" বলিতে-বলিতেই তাঁহার গলা ধরিয়া গেল। তাঁহার সেই মাতৃস্নেহ-মণ্ডিত মুখের সকাতর প্রার্থনা শুনিয়া অচলার নিজের চোখ দু'টিও সজল হইয়া উঠিল। করুণকণ্ঠে কহিল, "আপনি নিষেধ ক'রে দেন না কেন পিসিমা?" পিসিমা চোখের জলের ভিতর দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "নিষেধ! আমার নিষেধে কি হবে মা? যার নিষেধে সত্যি-সত্যি কাজ হবে, আমি তাকেই ত আজ কত বচ্ছর থেকে খুঁজে বেড়াচ্চি। কিন্তু সে ত যে সে মেয়ের কাজ নয়! ওকে বাঁধ্‌তে পারে, তেমন মেয়ে ভগবান্ না দিলে, আমি কোথায় পাব মা?" অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার মনের মত মেয়ে কি কোথাও পাওয়া যাচ্চে না?" পিসিমা কহিলেন, "ঐ যে তোমাকে বললুম, মা, ভগবান্ না দিলে কোনদিন কেউ পায় না। যে সুরেশ কথ্‌খনো এ কথায় কান দেয় না, সে নিজে এসে যেদিন বল্‌লে 'পিসিমা, এইবার তোমার একটি দাসী এনে হাজির করে দেব' সেদিন আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা মুখে বলে জানানো যায় না। মনে-মনে আশীর্ব্বাদ করে বল্‌লুম, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক বাবা! সেদিন আমায় কবে হবে যে, বউ-ব্যাটা বরণ করে ঘরে তুল্‌ব। কত বল্‌লুম, সুরেশ আমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে আয়, কিন্তু কিছুতেই রাজী হল না, হেসে বল্‌লে 'পিসিমা, আশীর্ব্বাদের দিন একেবারে গিয়ে দিন স্থির করে এসো।' তার পর হঠাৎ একদিন শুধু এসে বল্‌লে, 'সুবিধে হল না পিসি মা, আমি রাত্রির গাড়ীতে পশ্চিমে চল্‌লুম।' কত জিজ্ঞেসা কর্‌লুম, কিসের অসুবিধে আমাকে খুলে বল্, কিন্তু কোন কথাই বললে না সেই রাত্রেই চলে গেল। মনে মনে ভাবলাম, শুধু আমার ছেলের ইচ্ছেতেই ত আর হতে পারে না—সে মেয়েরও ত জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা থাকা চাই! কি বল মা?" অচলা নীরবে ঘাড় নাড়িল। এতক্ষণে সে টের পাইল—মেয়েটি যে কে, পিসিমা তাহা জানেন না। তাহার একবার মনে হইল বটে—তাহার বুকের উপর হইতে একটা পাথর নামিয়া গেল—কিন্তু, পাথরখানা যে সহজে যায় নাই, বুকের অনেকখানি স্থান ছিঁড়িয়া পিষিয়া দিয়া গেছে, তাহা পরক্ষণেই আবার যেন স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। আহারের আয়োজন হইলে পিসিমা অচলাকে আলাদা বসাইয়া খাওয়াইলেন এবং সঙ্গে করিয়া বাড়ীর প্রত্যেক কক্ষ প্রতি জিনিষ পত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখাইয়া আনিয়া, সহসা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মা, ভগবানের আশীর্ব্বাদে অভাব কিছুর নেই—কিন্তু এ যেন যেই লক্ষ্মীহীন বৈকুণ্ঠ! মাঝে-মাঝে চোখে যেন জল রাখতে পারিনে বৌমা!" চাকর আসিয়া খবর দিয়া গেল বাহিরে কেদারবাবু যাবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। অচলা প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইতেই পিসিমা তাহার একটা হাত ধরিয়া একবার একটু দ্বিধা করিয়া চুপি-চুপি বলিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞেসা করি যদি কিছু না মনে কর মা।" অচলা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল। পিসিমা বলিলেন, "সুরেশের কাছে তোমার আর মহিমের সমস্ত কথা আমি শুন্‌তে পেয়েচি মা। তার মুখেই শুন্‌তে পেলুম, সে গরীব বলে না কি তোমার বাবার ইচ্ছে ছিল না? শুধু তোমার জন্যেই—"

অচলা ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "সত্যি পিসিমা।" পিসিমা অকস্মাৎ যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে অচলার হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "এই ত চাই

মা। যাঁকে ভালবেসেচ, তাঁর কাছে টাকাকড়ি, ধনদৌলত কতটুকু! মনে কোন ক্ষোভ রেখো না, মা। আমি মহিমকে খুব জানি, সে এমনি ছেলে,—যত কেন না দুঃখ তার জন্যে পাও—একদিন ভগবানের আশীর্ব্বাদে সমস্ত সার্থক হবে। তিনি এত বড় ভালবাসার কিছুতে অমর্য্যাদা কর্‌তে পার্‌বেন না, এ আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌চি।” অচলা আর একবার হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। তিনি তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, “আহা, এম্‌নি একটি বৌ নিয়ে যদি আমি ঘর কর্‌তে পেতুম!”

সুরেশ আসিয়া উভয়কে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ফিরিয়া গেল। যাবার সময় লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য তাহার মুখের উপর অচলার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে-মুখে যে কি ছিল তাহা জগদীশ্বর জানেন, কিন্তু অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। জুড়ি গাড়ী দ্রুতবেগে পথে আসিয়া পড়িল। রাস্তার জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া তাহার হঠাৎ মনে হইল, এতক্ষণ সে যেন একটা মস্ত স্বপ্ন দেখিতেছিল। তাহা সুখের, কিংবা দুঃখের তাহা বলা শক্ত। কেদারবাবু এতক্ষণ মৌন হইয়াই ছিলেন—বোধ করি, সুরেশের ঐশ্বর্য্যের চেহারাটা তাঁহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছিল; সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “হাঁ, বড়লোক বটে!” মেয়ের তরফ হইতে কিন্তু এতটুকু সাড়া পাওয়া গেল না। উৎসাহের অভাবে বাকী পথটা তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন। গাড়ী আসিয়া যখন তাঁহার দ্বারে লাগিল, এবং সহিস কপাট খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, তখন আর একবার যেন তাঁহার চমক ভাঙিয়া গেল। আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে-মনেই বলিলেন—সুরেশকে আমরা কেউ চিন্‌তে পারিনি! একটা দেবতা!

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ]

হিন্দী

১। **নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা,** মার্চ্চ, এপ্রিল ১৯১৭।

“হিন্দী অওর বাংলা সাহিত্য।”—লেখক, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বসাক, বি-এ। অনেকের ধারণা যে, মধ্যভারতবর্ষ হইতেই এ দেশের সব ভাষার উদ্ভব হইয়াছে; এবং হিন্দীভাষা প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার মূল ভাষা। হিন্দীভাষীর সংখ্যাও ভারতবর্ষে অন্যভাষাভাষী অপেক্ষা অনেক অধিক। হিন্দী হইতে বাংলাভাষার সৃষ্টি হইলেও, বাঙলা—হিন্দী এবং অন্যান্য প্রান্তীয় ভাষা হইতে অনেক শ্রীসম্পন্ন। বাংলার লেখকদিগের শক্তি ও অধ্যবসায়ের গুণেই এইরূপ হইয়াছে—ভাষার আদি রূপের কারণ বশতঃ নহে। কারণ হিন্দী ও অন্যান্য ভাষাগুলি সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ ও সংস্কৃতদ্বারা পুষ্ট। কিন্তু হিন্দী ভাষার উপর মোগল সম্রাটগণের প্রভাব অত্যন্ত বেশী কাজ করিয়াছে। আধুনিক হিন্দী উর্দ্দু শব্দে পূর্ণ।

হিন্দী ও বাঙ্গলার পার্থক্য ভাষার বিভিন্নতাজনিত নহে। এই দুইটি ভাষা একই ভাষার বিভিন্ন রূপ ছাড়া আর কিছু নহে। ইহাদের পার্থক্য শুধু স্থানীয় পার্থক্য—যেমন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভাষা, কিম্বা হিন্দীতে ব্রজভাষা ও খড়ী বোলী। কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষার মধ্যে সকল স্থানেই পার্থক্য থাকে। কিন্তু এই পার্থক্যের একটি সীমা আছে, এবং সেই সীমা অতিক্রান্ত হইলেই লিখিত ভাষা মৃতভাষা হইয়া পড়ে। তখন কথিত ভাষাই বিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত হইয়া লিখিত ভাষায় পরিণত হয়; এবং লিখিত ভাষা শুধু শিক্ষিত সমাজেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ কথিত ভাষায় শব্দের শ্রীবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হয় এবং লিখিত ভাষা জনসাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। তখন ভাষা-বিপ্লব উপস্থিত হয়। এইরূপে সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে মাগধী ও তাহার পর হিন্দী, বাংলা, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে।

হিন্দীতে পদ্যের পিঙ্গলশাস্ত্র সম্প্রতি ভানুকবি রচনা করিয়াছেন। তাহাতে অনেক প্রকার ছন্দের পরিচয় দেওয়া আছে। কয়েক প্রকার ছন্দ নিম্নে দেওয়া গেল—

১। চৌপাই—

রাম রমাপতি তুম্ মম দেব।
নহিঁ প্রভু হোত তুম্হারী সেব।

২। সার—

উর অভিরাম রাম অরু লছমন মধুর মনোহর জোরী।
বারোঁ সকল বিশ্ব কি শোভা, যো কছু কহোঁ সো থোরী॥

৩। মরহঠা—

ইকদিন রঘুনায়ক, সীয় সহায়ক, রতিনায়ক অনুহারী।
শুভ গোদাবরী-তট, বিমল পঞ্চবট, বৈঠে হোত সুখারী॥

৪। মবৈয়া—

আননমেঁ মুসক্যানি সুহাবনি, বঙ্কুরতা আঁখিয়ানি ছই হৈ।
বৈন খুলে মুকলে উর জাত জকী বিথকী গতি ঠৌনি ঠই হৈ।

৫। দোহা—

শ্রীরঘুবর রাজিবনয়ন, রমারমণ ভগবান।
ধনুষজনধারণ কিয়ে, বসহু সু মম উর আন।

৬। মস্তগযন্দ—

ভাসত গঙ্গ্ ন তো সম আন, কহু জগ মেঁ পাপ হরৈয়া।
বৈঠি রহে মনুদেব সবৈ তজি, তোপর তারন ভারন মৈয়া।।

ইত্যাদি।

বাংলা ও হিন্দীর কাব্যরচনা প্রায় একই সময়ে আরম্ভ হয়। আজ পর্য্যন্ত ইহাদের বিকাশকাল এইরূপে ভাগ করা যায়—পূর্ব্ব প্রারম্ভিক, উত্তর প্রারম্ভিক, পূর্ব্ব মাধ্যমিক, উত্তর মাধ্যমিক—পূর্ব্বালঙ্কৃত, উত্তরালঙ্কৃত, পরিবর্ত্তন ও আধুনিক।

পূর্ব্বপ্রারম্ভিক—৬৫০—১২৮৬ খৃষ্টাব্দ।

ভাটগণই হিন্দীসাহিত্যের জন্মদাতা। ইঁহারা আপন-আপন নৃপতিগণের গুণকীর্ত্তন করিয়া গান রচনা করিতেন। ৭৭০ সংবতে কবিতায় একটি অলঙ্কার-গ্রন্থ বিরচিত হয়। ৮৯০ অব্দে জনৈক ভাট 'খুমান সিং রাসৌ' রচনা করেন। ১২২৫—৪৯ অব্দের মধ্যে চাঁদবরদাই তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থ বিখ্যাত "পৃথ্বীরাজ রাসৌ" রচনা করেন। বাংলাভাষায় এই সময় জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দের বহু অনুকরণ রচিত হইতেছিল। মনসার গান, খনার বচন, দক্ষিণা-রায়ের স্তোত্র প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এই দুই ভাষার সাহিত্যেই একটুও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

উত্তর প্রারম্ভিক—১২৮৬—১৫০৩ খৃষ্টাব্দ।

বাংলা ভাষায় এইটি গৌড়ীয় যুগ। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম এই সময় নিজ-নিজ কীর্ত্তিধ্বজা উত্তোলিত করেন। বিদ্যাপতি, বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র—তাহার পর সঞ্জয়, শ্রীকরনন্দী প্রভৃতি লেখক-গণও এই যুগের। এই সময় পদাবলী সহিত্য সৃষ্ট হয়।

সুরদাস ও চণ্ডীদাসের কবিতায় যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। ইহাদের ভাব ও রচনা প্রায় একই প্রকার। যথা—

বঁধু তুমি হে আমার প্রাণ
দেহ মন আদি, তোঁহারে সঁপেছি, কুলশীল অভিমান।—চণ্ডীদাস

সুরদাস—

অঁখিয়া হরিদর্শন কে প্যাসী।
চিন দেখো বহ সুরতি সাঁবরী, মনমে রহতী উদাসী।

কবীর—

জগমেঁ রামভজা সো জীতা
কবু শুমরী ভাগীকি ধাই, কব পঢ়ি আই গীতা? ইত্যাদি।—

২। মর্য্যাদা, বৈশাখ।

"সভ্যতা কী কাটছাট"—লেখক শ্রীযুক্ত গুলাব রায়জী এম-এ।

আধুনিক সভ্যতার লক্ষণ হইতেছে কাটিয়া ছাঁটিয়া সঙ্কুচিত করা। সভ্যতার কাঁচি চারিদিকেই দেখিতে পাই। উন্নত সমাজের কর্ত্তব্য-শাস্ত্রের প্রথম সূত্র হইতেছে—"অলমতি বিস্তরেণ" বা, "সব রকম বৃদ্ধিই কম কর।" সঙ্কীর্ণতাই এখন যুগধর্ম্ম।

বস্ত্র ও বেশ দেখ। উঠিতে-বসিতে কষ্ট হউক না, কিন্তু ঢিলা পায়জামা কিংবা ধুতি অসভ্যের পোষাক। কিছুদিন পরে হয় ত কোট ও ওয়েষ্টকোটে বড় পার্থক্য থাকিবে না। বিলাতে মেয়েরা পেটিকোটের ঘের এত কমাইয়া ফেলিয়াছে যে, চলিতে কষ্ট হয়। শুধু উকীল ও ব্যারিষ্টারগণই পূর্ব্বেকার ঢিলা পোষাক রাখিয়াছেন। আজকালকার সমতাপ্রিয় সভ্যতা পুরুষের সৌন্দর্য্য গুম্ফ রাখা অন্যায় মনে করে ও স্ত্রী-পুরুষের এই অনাবশ্যক ভেদ উড়াইয়া দিয়াছে।

কথাবার্ত্তায়, লেখাপড়ায় যতটা পার সংক্ষিপ্ত হইবে। ইংরাজ পুরুষগণ বেশী কথা বলেন না, বলিতেও দেন না। লেখা সম্বন্ধেও তাই। বিস্তৃত কিছুই ভালবাসেন না—সেইজন্য ছেলেদের পরীক্ষাতে Substance writing একটি প্রধান জিনিস। রীতি-নীতি সম্বন্ধেও তাই। পূর্ব্বে লোকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিত। ক্রমে দুই হাতে, তাহার পর এক হাতে—এখন অনেক বিলাতী পুঙ্গবগণ অভিবাদনের উত্তর শুধু একটি অঙ্গুলী উত্তোলন দ্বারাই সারিয়া ফেলেন।

এ ত গেল বাহিরের কথা। অন্তরের ভাবগুলির বুকে সভ্যতার ছুরি কেমন বিদ্ধ হইয়াছে দেখুন। সৌহার্দ্য ও উদারতা আজকাল কমিয়া যাইতেছে। আজকাল সবাই practical। যারা সত্যবাদী, ভাবুক, সরল—তারা তো ইডিয়ট! মিত্রতা কোথায়—বিবাদ এখন আইনের অঙ্গ। হোটেলের প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে আতিথ্য জিনিসটা ক্রমে পৌরাণিক হইয়া পড়িয়াছে। আপন পরের বিচার আজকাল একটু বেশী। এবং এই ব্যক্তিত্বের যুগে যুক্তপরিবার জিনিসটি শীঘ্রই বোধ হয় ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িবে!

দার্শনিক বিচারেও এই সঙ্কোচন দেখা যায়। দেশ ও কাল পরিমিত। pragmatism অনুসারে ঈশ্বরও পরিমিত। আত্মার বিস্তারের সীমা নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা কেবলই প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে ও আপনার কথা, কাজ, ভাব ও ভঙ্গীর চারিপাশে দাগ টানিয়া আপনিই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে।

৩। চিত্রময় জগৎ, মার্চ্চ, ১৯১৭

"ইসবার কা সপ্তগ্রহণযোগ।

জ্যোতিষশাস্ত্রের চোখে এ বৎসর অত্যন্ত স্মরণীয়। কারণ এবার সাতটি গ্রহণ হইবে। সব কয়টা গ্রহণই যে ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হইবে তাহা নহে—পৃথিবীর কোনও না কোনও স্থানে দেখা যাইবেই।

এই সাতটির মধ্যে চারটি সূর্য্যগ্রহণ ও তিনটি চন্দ্রগ্রহণ। একই বৎসরে পাঁচটি গ্রহণ বিরল নহে—কখন-কখন ছয়টিও দেখা যায়; কিন্তু সাতবার গ্রহণ হওয়া একটি দুর্লভ যোগ। ১১২ বৎসর পূর্ব্বে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে একবার এইরূপ সাতটি গ্রহণ একই সময়ে দেখা গিয়াছিল। এবং এইবারের পরে দেড়শত বৎসরের মধ্যে মাত্র দুইবার হইবে।

"ঔদ্যোগিক প্রদর্শনী, বড়োদা"

আপনার রাজ্যে শিল্প ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য বড়োদাধিপতি শ্রীযুক্ত সয়াজীরাও মহারাজ অনেকরূপে প্রযত্ন করিতেছেন। বিগত জানুয়ারী মাসে তিনি বড়োদা নগরে এই উদ্দেশ্যে একটি শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়াছেন। ১০ই জানুয়ারী সন্ধ্যার সময়ে রাজকুমার জয়সিংহরাওএর সভাপতিত্বে এই প্রদর্শনীর পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। প্রদর্শনীতে প্রায় ত্রিংশ সহস্র বস্তু প্রদর্শনার্থ আনীত হইয়াছিল। এবার ৮০টি স্বর্ণপদক, ৭৬টি রৌপ্যপদক, ৩৬টি রঞ্জপদক এবং ১০৩ সার্টিফিকেট এবং ৩০৩ অন্যান্য পারিতোষিক পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।

বড়োদারাজ্যের উন্নতির আদর্শ লইয়া যদি অন্যান্য রাজগণ কার্য্য আরম্ভ করেন, তবে দেশী করদরাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইতে পারে।

৪। সরস্বতী—এপ্রিল ১৯১৭

"স্বর্গীয় গণপতিরাও দেশাই"

কোনও লোক মারা গেলে, তাঁহার মধ্যে প্রায়ই এমন কোন না কোনও গুণ পাওয়া যায়, যে জন্য তাঁহার জীবনচরিত লেখা উচিত মনে হয়। যদি ধনী ব্যক্তি মারা যায়, লোকে বলে অমুক আর কিছু করুন আর নাই করুন, পরহিতে এত টাকা দান করিয়াছেন; যদি কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর দেহান্তর হয়, লোকে বলে অমুক সরকারী কাজ করিয়াও প্রজাহিতে তৎপর ছিলেন। কিন্তু বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ধনী যদি তাঁহার অতুল সম্পদের কিছু অংশ খয়রাৎ করিয়াই থাকেন, তবে তিনি এমন কিছু একটা বড় কাজ করেন নাই। যদি শাসন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রজাগণের উপর অত্যাচার না করিয়া তাঁহাদের হিতাহিত বিবেচনা করিয়া কাজ করিয়া থাকেন, তিনি তাঁহার ধর্ম্মই করিয়াছেন—যদি না করিতেন, তবে তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য অবহেলা করিতেন এবং তাঁহার পদের অনুপযুক্তই বিবেচিত হইতেন।

কিন্তু যাঁহার জীবনের সামান্য পরিচয় আজ আমরা পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি, তিনি সামান্য মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া কবিরাজী করিয়া সামান্য জীবিকা অর্জ্জন করিতেন। কিন্তু তাঁহার সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি লইয়াই তিনি জনসাধারণরূপ বিরাট ভগবানের পূজা করিয়াছিলেন। ৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের সাগর নগরে এই মহাত্মার জন্ম হয়। গত ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দুরন্ত প্লেগরোগে ইনি ইহলীলা সংবরণ করেন। ছয় বৎসর বয়সেই ইনি বিদ্যারম্ভ করেন। সামান্য ইংরাজী শিখিয়া আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইহার পিতা পণ্ডিত শ্রীধর রাও দেশাইয়ের একটি ঔষধালয় ছিল। এখানে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরিত হইত।

গণপতিরাও দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করিতেন ও ঔষধ দিতেন। ইনি অত্যন্ত সুচিকিৎসক ছিলেন, এবং ইঁহার দেশে খুব কম লোকই ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করিত। ইনি অনেক কঠিন-কঠিন পীড়া চমৎকাররূপে চিকিৎসা করিতেন।

ইনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্য-সেবী এবং স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। বিদেশী জিনিস একান্ত প্রয়োজন না হইলে ব্যবহার করিতেন না। মারাঠী ও হিন্দী ভাষাদ্বয় বিশেষরূপেই আলোচনা করিয়াছিলেন এবং হিন্দীতে অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

বাঙ্গালী সৈনিক

গোলন্দাজ—শ্রীনন্দলাল শেঠ

রোহিতাশ্ব পুষ্প চয়ন করিতেছে। বৃক্ষশাখাস্থিত একটা সর্প তাহার মস্তকে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে
অপর দুইটা বালক নিকটেই খেলা করিতেছে।

অন্ধকার পথ দিয়া শৈব্যা মৃত পুত্র কোলে করিয়া শ্মশানে যাইতেছেন ।
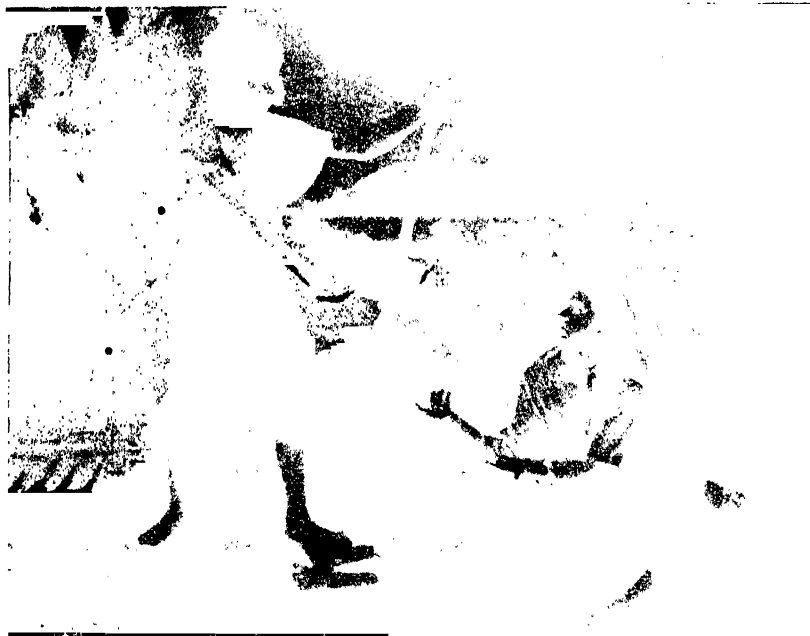
রোরুদ্যমানা শৈব্যার নিকট হইতে চণ্ডাল-বেশী হরিশ্চন্দ্র রোহিতাশ্বের সৎকারের ঘাট-খরচার দাবী করিতেছেন।

রোহিতাশ্বের পুনরায় জীবন লাভ।

বুকিং ক্লার্ক

বুকিং ক্লার্ক

সজোরে বাজিল ঘণ্টা। হুড়াহুড়ি পড়ে চারিদিকে।
বাহিরে লোকের ভিড়ে ক্ষীণ প্রাণ বুঝি নাহি টিঁকে।
বিষম নির্ম্মম চাপে, পিষে যায় ইস্ত্রী-করা প্লেট,
ছেলে, বুড়া, দাড়ি, গোঁফ, ভরা হুঁকা, পাগড়ী, পকেট,
এসেন্সের শিশি, রসা ইলিসা মাছ, সন্দেশের ঝুড়ি।
তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ে ছোট-বড় হস্ত গোটা কুড়ি
Counterএ, বাসুকীর শিরসম, আস্ফালিয়া রোষে,
—রজত-গরল মুখে। এঞ্জিনের বাঁশীর নির্ঘোষে
শ্রবণপটহ ফাটে। জেগে উঠে অট্ট অট্ট রোল,
বিকট চীৎকার—উড়ে, উর্দ্দু, চীনা, পেশোয়ারী বোল।
আর্বী, পার্শী, ভাঙ্গা হিন্দী, জোড়া বাঙ্গালা, ছেঁড়া ইংরাজিতে
অনুরোধ, উপরোধ, ডাক্ হাঁক। দেখিতে-দেখিতে
সুরু হয় গালাগালি, ঠেলাঠেলি—Babel Tower!

এত তাড়া কেন বাপু? ট্রেণ ছাড়ে? উপায় কি তার?
আমি দেখ এততেও নির্ব্বিকল্প, অচল, গম্ভীর,
পুরীর রথের মত। টিকিট্‌টা দিতে হবে স্থির?
তবে উঠি—টুল ছেড়ে! ভাড়া দাও, বাজাই;
এবার টিকিট খুঁজি, উর্দ্ধে, নীচে, আসে পাশে চাই;
খুঁজিয়া পাই না যে গো! লিষ্ট দেখি, খাতা দেখি দিকি,
Blank Cardএ ধীরে ধীরে ইংরাজীতে নাম, দাম লিখি!
খাতা খুলি ফের; Blot করি, Punch করি সকাতরে,
তার পরে তার দিকে চেয়ে থাকি দু'মিনিট ধরে
পুষ্কনেত্রে; অবশেষে দিয়ে ফেলি, Change দিতে ভুলি,
ফিরে আসি, দিই Change, ঘসা টাকা মেকি সিকিগুলি,
ঘুরাইয়া দিই পরে, হাঁফ ছেড়ে চাহি পুনরায়,
চসমার উপর দিয়া, Counterএ, "আর কোই হ্যায়?"

"বাঙ্গালার ইতিহাস"

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগ, পাঠ করিয়া বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত কারমাইকেল মহোদয় স্বহস্তে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, তাহার আলোকচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতঃপূর্ব্বে কোন গবর্ণর বা ছোটলাটের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর দেখিবার সুযোগ কাহারও হয় নাই। গবর্ণর মহোদয়ের হস্তাক্ষর যেমন গোটা গোটা, পরিষ্কার ও সুন্দর, তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার গঠনও তদ্রূপ মনোহর। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, লর্ড কারমাইকেল অতি যত্ন সহকারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন।

লর্ড কারমাইকেল।

GOVERNMENT HOUSE
DARJEELING.

বাঙ্গালার ইতিহাস-শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় প্রনীত। ইতিহাসখানি নব্য বঙ্গের নূতন সামগ্রী। আশা করি ইহা ইতিহাসবেত্তামাত্রেরই আদরনীয় হইবে।

১৫ই আষাঢ় ১৩২৩। Carmichael কারমাইকেল

লর্ড কারমাইকেলের স্বহস্ত-লিখিত প্রশংসাপত্রের প্রতিলিপি।

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

প্রথম পরিচ্ছেদ

কামাখ্যানাথ বাবু বৈঠকখানায় গিয়া বসিতেই, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—জ্যোতিরত্ন মহাশয় আসিতেছেন। তাঁহার আর বসা হইল না, আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শুভ্র বস্ত্র-পরিহিত, শুভ্র উত্তরীয়ে আবৃত-দেহ, কাষ্ঠপাদুকাধারী একটী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, যখন কেবল দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উর্দ্ধে তুলিয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন সেই অনতিক্রান্ত-যৌবন; উন্নত-মহিমকান্তি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদার কামাখ্যানাথ বাবু যেন আনন্দে শিশুর মত বিগলিত হইয়া তাঁহার পদধূলি মস্তকে তুলিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণের শরীরে পাণ্ডিত্য-গৌরব-প্রকাশক তেমন কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছিল না। নস্তের কৌটা, দীর্ঘ ফোঁটা কিম্বা শিখাবাহুল্য—সেকালের পাণ্ডিত্য-সূচক এই তিন লক্ষণের একটীও তাঁহাতে নাই; তবুও সেই সুগৌর, দীর্ঘচ্ছন্দ দেহ, উন্নত নাস, আর সুপ্রশস্ত ললাট ব্রাহ্মণের যেটুকু পরিচয় দিতেছিল, তাহাতে, যে তাঁহাকে দেখিবে—তাহাকেই সেই ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে অগ্রসর হইতে হইবে। উভয়ে উপবেশন করিলে, কামাখ্যাবাবু জিজ্ঞাসু-নেত্রে ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিলেন। ব্রাহ্মণের হস্তে যে দুইটী হরিদ্রাবর্ণের কাগজের গোল মোড়ক ছিল, বসিবার সময় সে দুটী বিস্তৃত আসনের একপার্শ্বে রাখিয়াছিলেন; এইবার জমিদারের নীরব প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে সেই দুটীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "যা অনুমান করেছিলাম, দেখ্‌লাম, ঠিক তাহাই ঘটেছে। লগ্ন স্থির করার ভ্রমে সমস্ত কোষ্ঠীখানিই মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। লগ্নেই যখন গোল, তখন এ কোষ্ঠীর জন্মকুণ্ডলী, ভাবকুণ্ডলী বা গ্রহ-নক্ষত্রের ফলের হিসাব দেখবার পণ্ডশ্রম আর আমার কর্‌তেই ইচ্ছা হ'ল না। তবে একেবারে চুপ করেও থাক্‌তে পারিনি। নিরঞ্জনের জন্মস্থানের, আর তার জন্ম-সময়ের কাল নির্দ্ধারণ করে, তার নতুন একখানি কোষ্ঠী তৈরী করেছি। এই কোষ্ঠীর সঙ্গেই আপনার ছেলের আকার-প্রকার, আর স্বভাবেরও অনেক মিল পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সে কথা থাক। তার রিষ্টের ভয় আপনি ত্যাগ করুন। দীর্ঘায়ুপ্রদ লগ্ন ও চন্দ্রেই নিরঞ্জনের জন্ম হয়েছে। এ কোষ্ঠীর সঙ্গে এর রিষ্টও যে একেবারে মিথ্যা, এ আপনাকে আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি।" জমিদার স্তব্ধ-নেত্রে ব্রাহ্মণের পানে চাহিয়া রহিলেন। যাঁহার মুখ দিয়া এ কথা উচ্চারিত হইতেছে, তাঁহার প্রতি একান্ত, অখণ্ড বিশ্বাস। এই কথা-গুলিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও, তাঁহার মন যেন চিরদিনের বদ্ধ-সংস্কারকে একেবারে ত্যাগ করিতেও পারিতেছিল না। তাই এমন একটা সংবাদেও কামাখ্যা-বাবু বিচলিত না হইয়া, স্থিরভাবে বক্তার পানে চাহিয়াই রহিলেন। এ অভাবনীয় সুসংবাদটিকে যেন তাঁহার চির দুর্ভাবনা-গ্রস্ত নিরাশ মস্তিষ্ক এক কথায় ধারণা করিয়া লইতে পারিল না। জ্যোতিরত্ন কামাখ্যাবাবুর বিমূঢ় ভাবের অর্থ অনুমান করিয়া, তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার ছেলের জন্মস্থানের নামও এ কোষ্ঠীর প্রথম দিকে সন তারিখের কাছে লেখা নেই দেখ্‌লাম। কোষ্ঠীকারক কি জান্‌তেন না, কিম্বা তাঁকে কি বলা হয়নি যে, জাতকের জন্ম বাংলা দেশের উত্তর-সীমান্ত কুচবেহার-রাজ্যে হয়েছিল?" কামাখ্যানাথ ধীরে-ধীরে উত্তর দিলেন, "বল্‌তে পারি না। কারণ, তখন নিরঞ্জনের মাতামহ বর্ত্তমান ছিলেন। তিনিই নিরঞ্জনের জন্মের দু'তিন বৎসর পরে একজন জ্যোতিষীর দ্বারা এই কোষ্ঠী তৈরী করান্।" "নিরঞ্জনের মাতামহের নিবাস?" "নিকটেই একটী গ্রামে; কিন্তু পূর্ব্বে তিনি কুচবেহারে বাস কর্‌তেন। নিরঞ্জনের জন্মের পরেই তিনি প্রবাস ত্যাগ করে পরিবারদের নিয়ে স্বদেশে বাস কর্‌তে আসেন্। সেই থেকেই তিনি আর প্রবাসে যান্ নি।"

"তা'হলে, খুব সম্ভব, তিনি এই দেশের পণ্ডিত দিয়েই কোষ্ঠী তৈরী করান। তিনি বোধ হয় ভুলক্রমে জাতকের জন্মস্থানের কথা সে জ্যোতিষীকে জানান্‌নি; কিম্বা এ কথা

জানানোর যে বিশেষ দরকার আছে, তা' বোধ হয় তিনি জানতেন না।" "হতে পারে। আমার তখন অল্প বয়স; গুরুজনের কাজের কোন সন্ধান রাখতাম না। তবুও যেন এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্চে, তিনি একটা কাগজে নিরঞ্জনের জন্মের সন, তারিখ, আর সময়টা লিখে রেখেছিলেন। জ্যোতিষী তাই দেখেই কোষ্ঠী তৈরী করেন।" জ্যোতিরত্ন এইবার গম্ভীর মুখে বলিলেন, "কিন্তু জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতমাত্রেই জানেন যে, এই দক্ষিণ-বাংলা দেশেরই কোন-কোন জায়গায় এক-একটা রাশির লগ্নমানের দু-তিন পল কম-বেশী আছে। যাঁদের লগ্ন পর্য্যন্ত স্থির করে নিয়ে কোষ্ঠী তৈরী করতে হয়, তাঁদের জাতকের জন্ম স্থানের নামটা সর্ব্বাগ্রে জানা দরকার। কোষ্ঠী-কারকের এত বড় ভুল খুবই মারাত্মক! অবশ্য দু'পক্ষ থেকেই এ ভুল হয়েছে। যাক্, আমার অনুমানের এখন দৃঢ়ভিত্তিও পেলাম। জন্ম সময় দৃষ্টে কোষ্ঠী-কারক দক্ষিণ-বঙ্গের লগ্নমান অনুযায়ী মেষরাশিতে লগ্ন স্থির করেছিলেন; কিন্তু জাতকের জন্মস্থান সুদূর উত্তর বঙ্গদেশে। সেখানকার লগ্নমানের সঙ্গে এ দেশের লগ্নমানের পার্থক্যে—তখন সেখানে তার চার-পাঁচ পল পূর্ব্বে বৃষরাশির উদয় হয়েছিল। এই রকমে লগ্ন রাশ্যান্তরিত হওয়ায়, সমস্ত কোষ্ঠীখানিই বৃথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।" কামাখ্যাবাবু এতক্ষণে যেন কথাটা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। নবীন ধারণার সঙ্গে-সঙ্গে মনে যেন নব আশার উদয় হইল; ঈষৎ ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "আপনি এই নূতন লগ্ন নিরূপণ করে এর ঠিকুজীও তৈরী করেছেন বল্লেন না?" "শুধু ঠিকুজী করে ত আনতে পারিনি। শুভগ্রহের দণ্ডে অপাপবিদ্ধ স্থানে এই লগ্নের স্থিতি দেখে, আর ভাবস্ফুট-গণনায় ভাবকুণ্ডলীতে বলবান্ চন্দ্রকে তুঙ্গীরূপে লগ্নস্থ হ'তে দেখে, নিরঞ্জনের একখানা গোটা কোষ্ঠী তৈরী করে তবে সুস্থির হ'তে পেরেছি। লগ্নই কোষ্ঠীর মাথা। সেই লগ্নে অশুভ-দর্শনের বদলে এমন অচিন্তনীয় শুভসংযোগ দেখলে, সমস্ত জীবনের ফলাফল জানতে জ্যোতিষীমাত্রেরই মন আপনিই ব্যগ্র হয়ে উঠে।" "শুধু তাই নয়! নিরঞ্জনের মারাত্মক রিষ্টের কথা শুনে পর্য্যন্ত আপনাকে যে রকম দুঃখিত বুঝেছিলাম, তাতে আপনি যে কেবলমাত্র কৌতূহলেই তা দেখতে গিয়েছিলেন, তা নয়।" জ্যোতিরত্ন সহাস্য মুখে বলিলেন, "তা ঠিক্। আর নিরঞ্জনের চেহারায়ও তাকে অল্পায়ু বলে আমার বিশ্বাস হয়নি। চিরকালের জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনা অনুমান-শাস্ত্রে আমার এতটুকু অধিকারও দিয়েছে কি না, এটুকু জানতেও একটা তীব্র কৌতূহল এসেছিল। সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করলে, কোন-না-কোন শুভযোগের আভাষ পেয়ে, যদি আপনাকে একটু আশ্বাস দিতে পারি, এই ইচ্ছাই প্রথমে নিরঞ্জনের কোষ্ঠী দেখতে আমার আগ্রহ বাড়িয়েছিল। এখন আমার বক্তব্য এই যে, কোন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীকে দিয়ে আমার তৈরী কোষ্ঠীখানা একবার দেখিয়ে নেন্,—যদি আমিও কোন ভুল করে থাকি।"

কামাখ্যানাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "এ আদেশ আর করবেন না। নিরঞ্জনের কোষ্ঠী তৈরীর পর প্রায় সতের বৎসর ধরে ঐ কোষ্ঠী অনেক বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দেখানো হয়েছে। সকলেই কোষ্ঠী দেখে ঐ কথায়ই সায় দিয়েছেন; আর ঐ রিষ্ট খণ্ডনের জন্য এ পর্য্যন্ত অনেক হোম, জপ, স্বস্ত্যয়ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেহই আপনার মত সন্দিহান হয়ে লগ্ন স্থির সম্বন্ধে এ কথা ভাবেননি, বা জন্মস্থানের নামেরও উল্লেখ করেননি। গতানুগতিক ভাবে তাঁরা কোষ্ঠীর লিখিত লগ্নই মেনে নিয়েছেন। আজ আপনি যখন দ্বিতীয় বিধাতা-পুরুষের মত নিরঞ্জনের জীবন সম্বন্ধে নূতন সাঙ্কেতিক আলো দেখালেন, তখন আমি আবার একটা সংশয় এনে এ আলোকে নিবাতে চাই না। আমি যে অন্ধ ভাবেই জ্যোতিষকে মেনে থাকি, তাও নয়। আমি জানি যে, মানুষের সকল রকম জ্ঞান আর বুদ্ধি-কৌশলের উপর একজন মহা-নিয়ন্তার অঙ্গুলী-চালনাই সর্ব্বদা জয়লাভ করছে। সম্পূর্ণ নিরাশার মধ্যেও যেমন এতদিন তাঁর সেই নিয়ন্ত্রী-শক্তির উপরই নির্ভর করে আমি যথাকর্ত্তব্য করে যাচ্ছিলাম, এখন আপনার কথায় আশান্বিত হয়েও সেই বিধির বিধানের উপরেই আত্ম-সমর্পণ করছি, জানবেন। এই জন্যই নিরঞ্জনকে অল্পায়ু বলে বিশ্বাস থাকলেও, তার প্রবল জ্ঞান-তৃষ্ণা দেখে, তার বিদ্যাশিক্ষায় তিলমাত্রও বাধা দিইনি। আপনি ত দেখতেই পাচ্চেন, লেখাপড়ার জন্য সে প্রায় সহরেই থাকে। যতদিন সে আছে—রিষ্টের ভয়ে তার উচ্চশিক্ষায় বাধা দিয়ে, তাকে কাছে-কাছে রাখার ইচ্ছাও আমার একেবারেই হয়নি।"

জ্যোতিরত্ন একটা মোড়ক হস্তে তুলিয়া লইয়া ধীর-স্বরে বলিলেন—"চতুর্থ ভাবে কেন্দ্রগত বলবান বুধ জাতকের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য প্রচুর ভাবেই নির্দ্দেশ করছে। দশমস্থ তুঙ্গী গ্রহেও তার বহু সৌভাগ্যের আভাষ দিচ্চে। দীর্ঘায়ু-প্রদ লগ্ন ও চন্দ্রেই বালকের জন্ম। তনু ভাবস্থ বৃহস্পতি, কেন্দ্রবর্ত্তী তুঙ্গী আত্মকারক, আর শুভ ভাবস্থ রবি এই দীর্ঘায়ুঃ যোগকে সাহায্য করেছে। এ বালক অল্পায়ু হতেই পারে না।" কামাখ্যানাথ নত হইয়া জ্যোতিরত্নের পদধূলি গ্রহণ করিলেন—"তাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার এ শুভ ইচ্ছা সফল হোক্। এর বেশী আর আমার জান্‌বারও দরকার নেই। অতি ছোটবেলাতেই তাদের মাতৃবিয়োগ হয়; সেই থেকে—" জ্যোতিরত্ন বাধা দিয়া বলিলেন, "তার কোষ্ঠীতেও এইটুকু মাত্র মন্দ আছে—চতুর্থদর্শী মঙ্গলের দশান্তর্দ্দশা কালে মাতার মৃত্যু। তা' ত ফলেই গিয়েছে।" সামান্য পীড়াদি ভিন্ন আর কোন অমঙ্গল-চিহ্ন এ কোষ্ঠীতে দেখলাম না।" "হতে পারে। এ সব বিষয়ে আমার যা ধারণা, তা আপনাকে বলেছি। আমার নিজের কোষ্ঠীতে আমার শেষ অবস্থায় ভগ্নহৃদয়ে নষ্টসংজ্ঞ হয়ে থাকতে হবে—এই রকম উল্লেখ চিরদিন দেখে আস্‌ছি; তাই নিরঞ্জনের অমঙ্গলই এর কারণ-সূত্র বলে ধরে রেখেছিলাম। এ ধারণা আজ যদি ত্যাগ করতে হয়, সে কেবল আপনারই অনুগ্রহে।"

জ্যোতিরত্ন স্তব্ধ ভাবে কিছুক্ষণ কামাখ্যানাথের প্রশান্ত, গম্ভীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনার শেষ অবস্থা এই রকম? আশ্চর্য্য! কই, নিরঞ্জনের পিতৃস্থানে ত এমন কোন দুর্ঘটনার যোগ দেখিনি—তবে কোন সন্দেহ ছিল না বলে, তেমন সূক্ষ্মভাবে খুঁজিনিও বটে—" বলিতে-বলিতে জ্যোতিরত্ন মোড়কটির সুদীর্ঘ পত্রময় দেহ প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র, কামাখ্যানাথ বাধা দিলেন—"এজন্য আর বৃথা কষ্ট করবেন না। এ বিষয়ে আমার মন একেবারেই কৌতূহলশূন্য। সংসারে একটী ছেলে আর একটী মেয়েমাত্র আমার অবলম্বন। বারো বৎসর বয়সেই মেয়েটির ভাগ্যফল ভগবান আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। বাকী নিরঞ্জনের এই রিষ্টের কথা মনে করে, সর্ব্বক্ষণই আমাকে বল্‌তে হয়েছে, "যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপং"। যার সন্তানদের সম্বন্ধেই এত ভাব্‌বার থাকে, তার নিজের বিষয়ে আর বেশী চিন্তা করা যে অসম্ভব, তা বুঝ্‌তেই পারছেন। কিন্তু "আশা" জিনিষটার এই একটি মস্ত দোষ দেখুন। আজ আপনি যে রকম দক্ষতার সঙ্গে নিরঞ্জনের কোষ্ঠীফল পরিবর্ত্তন করে দিলেন, তাতে মনে অলক্ষ্যে এমনি আশার সঞ্চার হয়েছে যে, এখনি ভাব্‌ছি, রমার বিবাহের সময় যদি আপনি এ গ্রামে আস্‌তেন, তা'হ'লে হয় ত সে অল্পায়ু পাত্রে তাকে সম্প্রদান কর্‌তাম না। আমার মেয়ে রমার কথা কি আপনি জানেন?" জ্যোতিরত্ন বলিলেন, "কাত্যায়নীর কাছে সর্ব্বদাই যে তার নাম শুনি। এ গ্রামে আপনার ছেলে-মেয়েকে জান্‌বে না, এমন কি কেউ হতে পারে! বিশেষ, দীন-দরিদ্রেরা! না হবেই বা কেন! "আত্ম বৈ জায়তে পুত্রঃ"—তারা যে কামাখ্যানাথের পুত্র-কন্যা! পনের-ষোল বছরের মেয়ের এমন দয়ামায়া আর দেবভক্তি—এ পুরাণ-আদিতেই পড়েছি।"

কামাখ্যানাথ সনিশ্বাসে বলিলেন "স্নেহান্ধ মানুষ এমন কত অসার জল্পনাই করে। যা শুভ, যা শ্রেয়ঃ, তাহাই যে নিয়ন্তার হাত হতে জগতে নেমে আসছে, এ কথা সে কোন-মতে মনে রাখতে চায় না। তাই আমার সেই ভগবানের-চরণে-উৎসর্গ-করা ফুলটীকেও—নষ্ট হল বলে ভ্রান্তি জন্মায়। জ্যোতিরত্ন মহাশয়, আমার এই মেয়েটীর কথা আপনাকে আর কি বল্‌ব—" বলিতে-বলিতে কামাখ্যানাথের চক্ষু স্নেহে সজল হইয়া আসিল। জ্যোতিরত্ন সহানুভূতি-পূর্ণ মুখে উত্তর দিলেন, "কামাখ্যানাথ! আমার কাত্যায়নীর মুখে সবই আমি শুনতে পাই। মহেন্দ্রের কাছে নিরঞ্জনের নামও শুনে থাকি। তারা তোমার ছেলে-মেয়ের গুণে অত্যন্ত বশীভূত।" কামাখ্যানাথ সসম্মানে বলিলেন, "আমার উপর আপনার এই অহেতুকী অগাধ স্নেহই এর একমাত্র কারণ। অতি অল্প দিন আপনি এই গ্রামে এসেছেন; কিন্তু এই অল্প দিনের পরিচয়েই আমার মনে হয়, যেন আমার স্বর্গগত পিতৃদেবকে ফিরে পেয়েছি। আমার প্রত্যেক চিন্তা আর মনঃকষ্টের অংশ নিতেও আপনি সর্ব্বদা যেমন ব্যগ্র, আবার তার প্রতিকারের জন্যও তেমনি ব্যস্ত থাকছেন। আপনার পরিবারের সঙ্গে আমার ছেলে-মেয়ের এ স্নেহ-বন্ধন তাদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। এই ক'-মাসের মধ্যে আপনার পরিবারেরা এ গ্রামের এমনি শ্রদ্ধা-আকর্ষণ

করেছেন। কিন্তু সে যাই হোক্, আমাকে আপনি সর্ব্বদা এই রকম স্নেহ আর অভয় দান করেও যে ধর্ম্মের কাছে অত্যন্ত পতিত করে রাখছেন, এই কথাটি আমি আপনাকে এক-একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।"

"সে কি কামাখ্যানাথ! আপনার মত স্বভাব-ধার্ম্মিককে আমি অধর্ম্ম করাচ্ছি?" বিনীত কণ্ঠে কামাখ্যাবাবু বলিলেন, "আমাকে 'তুমি' বলে কথা বলুন।" হাসিয়া জ্যোতিরত্ন বলিলেন, "আচ্ছা তাই হোক্। কিন্তু তোমার ও কথার অর্থ কি?" "কতদিন আপনাকে বল্‌ব মনে করি, কিন্তু সাহস পাই না! ক্রমশঃ আপনার স্নেহের পরিচয় পেয়ে আজ বল্‌তে সাহসী হচ্ছি। আপনি আমাকে পুত্রতুল্য স্নেহ করেন। আমি আপনার স্বজাতি, স্বশ্রেণী, তবুও—আপনি আমাকে আপনার গঙ্গাতীরবাসের খাজনা নিতে বাধ্য করেছেন। যে জায়গার কর নেওয়া শাস্ত্রের নিষেধ, সেই দেবমন্দিরের কাছের, আর গঙ্গাতীরের দেবভূমির খাজনাও নির্ব্বাক হয়ে আমায় নিতে হয়, আপত্তি জানাতেও সাহস হয় না।" জ্যোতিরত্ন সস্নেহে, সহাস্যমুখে বলিলেন, "তুমি ত শাস্ত্র জান, কামাখ্যানাথ। আমায় তুমি পিতৃতুল্য সম্মান কর, তাই আমিও সেই অধিকারে তোমার উপর যথেষ্ট দৌরাত্ম্য করি!" "কিন্তু এ কথা ছেড়ে দিলেও, আমি এ পর্য্যন্ত এমন একটা সুযোগ পাইনি, যাতে আপনার উপর আমার এই ভক্তিশ্রদ্ধার এতটুকুও জানাতে পেরে কৃতার্থ হই।" "তোমার এই শ্রদ্ধার মত মূল্যবান জিনিষ আমার পক্ষে আর কিছু আছে কি? তাইই যখন আমায় অহরহঃ তুমি দিচ্ছ,—এর চেয়ে আর বেশী কি জানাবে? অনাথ-দরিদ্রদের কথা ছেড়ে দিলেও, তুমি সর্ব্বদা যত সাহায্যপ্রার্থী আর অর্থকামনাহীন ব্রাহ্মণদেরও অজস্র দান করছ, তাদের মধ্যে আমার মত খ্যাতি-প্রতিপত্তিশূন্য ব্যক্তি তোমার কাছে যা পেয়েছে, এমন আর কেউ কিছু পেয়েছে কি? তাই বল্‌ছি, একটা মিথ্যা ক্ষোভে মনকে অনর্থক ক্লিষ্ট ক'র না!"

কামাখ্যানাথ ক্ষুণ্ণভাবে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিলেন। সহসা কি যেন তাঁহার মনে পড়ায় ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আপনার ভাবী জামাতা মহেন্দ্রের লেখাপড়ার বিষয়ে কিন্তু আপনি—" জ্যোতিরত্ন অসহিষ্ণু ভাবে মাথা নাড়িয়া, ঈষৎ উত্তেজনার সহিত কামাখ্যানাথের বাক্য সমাপ্ত হইতে দিলেন না।—বাধা দিয়া বলিলেন, "ভাবী জামাতা নয়—মহেন্দ্র আমার পুত্র, আমার পালিত পুত্র; এ কি তুমি শোননি কামাখ্যানাথ?" কামাখ্যানাথ অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দিলেন, "হাঁ তা জানি; কিন্তু লোকে এ কথাও আন্দাজ করে শুন্‌তে পাই, যে, ঘরে জামাতা স্থির করা আছে বলেই, আপনি, আপনার কন্যার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হ'লেও, বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন না।" "না কামাখ্যানাথ, মহেন্দ্রকে অনাথ বলেই চিরদিন প্রতিপালন করে আস্‌ছি। গৃহিণীর অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তান না হওয়ায় মহেন্দ্রকে তিনি সন্তানের মতই পালন করেন। কাত্যায়নী আমাদের শেষ-বয়সের সন্তান। ব্রাহ্মণী স্ত্রীলোক; বিশেষ, মহেন্দ্রের প্রতি তাঁর অপত্যের অধিক স্নেহ; তাই তাঁর মুখে শুনিয়া লোকে এ রকম অনুমান করে।" "তাঁর এ ইচ্ছা ত যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। মহেন্দ্রকে আমি দেখেছি, কি সুন্দর ইন্দ্রের মত কান্তি তার। তা'ছাড়া স্বভাব, বিদ্যাবুদ্ধির বিষয়েও যে রকম শুনেছি—" "কামাখ্যানাথ! রূপে-গুণে মহেন্দ্র সর্ব্বাংশেই কাত্যায়নীর উপযুক্ত পাত্র, কিন্তু তবুও এ বিবাহ হবার নয়। তা' যদি সম্ভব হ'ত, তা'হলে কি আজ সতেরো বৎসর পর্য্যন্ত কাত্যায়নী অবিবাহিতা থাকৃত? কোনমতেই তা হবার নয়—" বলিতে-বলিতে জ্যোতিরত্ন সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কামাখ্যানাথ যে কথা বলিতে যাইতেছিলেন, প্রসঙ্গান্তর আসিয়া পড়ায় সে কথাটির সূত্র হারাইয়া গেল দেখিয়া তিনি একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং পুনর্ব্বার তাহার সূত্রোদ্ধারের চেষ্টায় কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"এ বিষয়ে কিসে বাধা পাইলেন, জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি? আমায় পুত্রের মত দেখেন, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস কর্‌ছি—" "কুণ্ঠিত হবার প্রয়োজন নেই। শোন, আমার কন্যার গণ, রাশি, বর্ণ অত্যন্ত উঁচু। তার পাত্রের জন্য আজ ছয়-সাত বৎসর ধরে অনেক কোষ্ঠীই আমি ঘাঁটছি; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেলাম না। সাধারণ মানুষের কোষ্ঠীর সঙ্গে আমার মার কোষ্ঠীর মিল্ যে কিছুতেই হবার নয়। অতি উপযুক্ত ব্যক্তি স্বামী না হলে, তার শুভলগ্নস্থ বৃহস্পতির সপ্তমে পূর্ণদৃষ্টির ফলই যে বৃথা হ'য়ে যায়। এই সকলা জ্যোতিষশাস্ত্র- চন্দ্রার্ক যাঁর সাক্ষীভূত, তা কি মিথ্যা হ'তে পারে?"

কামাখ্যানাথ একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "সত্যই এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। এ পর্য্যন্ত যত পাত্রের কোষ্ঠী

ভারতবর্ষ
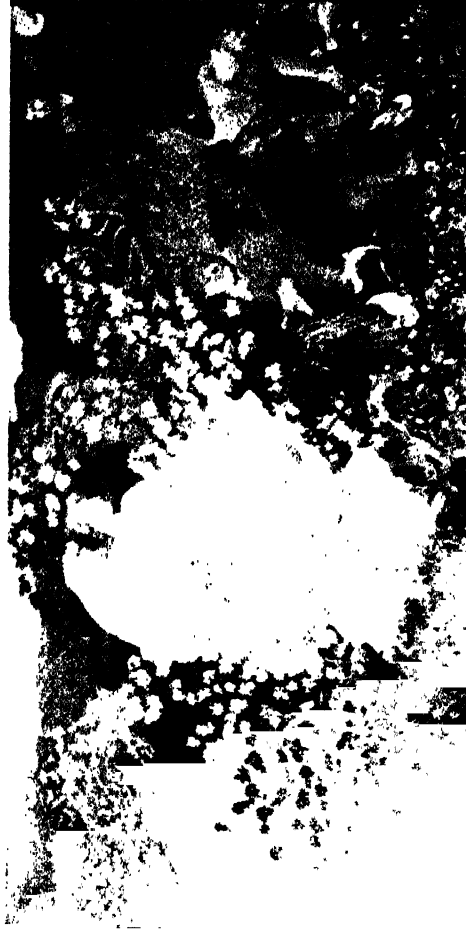
Emerald Ptg. Works

দেখেছেন, তার মধ্যে একজনকেও কি আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র বলে বোধ করেন নি?" "প্রায়ই তাই। যে কটি সুপাত্র পেয়েছিলাম, তারা কেউ বা হীন বর্ণ, হীন গণ-রাশি,—কোথাও বা চন্দ্র-নক্ষত্র-গ্রহ-তারা প্রতিকূল; আবার কার-কারও সঙ্গে অরিষড়ষ্টক, বিষম সপ্তক, অরিদ্বিদ্বাদশ —এই সমস্ত দোষ দাঁড়ায়। এগুলি একেবারে ত্যাজ্য। এ সমস্ত বাদ দিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রমতে যার সঙ্গে বিবাহ কিছু সম্ভব বলে বোধ হ'য়েছে, সে কটিই কুপাত্র। কুপাত্রে কন্যা-দান করার চেয়ে কন্যা অবিবাহিতা রাখা শতগুণে শ্রেয়ঃ।"

"এ আপনার মত বাপের উপযুক্ত কথা বটে; কিন্তু আপনি সমাজের কথাটাও ভেবে দেখ্‌বেন।" "আমার সে ভয়ও নেই। আমরা মুখ্য কুলীন। স্ব-ঘরের অভাবে আমার এক পিসী আজীবন কুমারী ছিলেন। সমাজ আমার জাতিনাশ কর্‌বার ক্ষমতা রাখে না।"

"তা'হলে কি কন্যার বিবাহ না দেওয়াই আপনার ইচ্ছা?" "এ কি সম্ভব কামাখ্যানাথ? আমার গৌরীসমান কন্যার উপযুক্ত শিবতুল্য স্বামীকে কি আমি নিত্য প্রার্থনা করি না? বিধাতার নিকটে আমি তাঁকে প্রত্যহ যাচ্ঞা করি না? বৃথা বহু কোষ্ঠী দেখতে-দেখতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হ'য়ে, আমি নিজের মন হ'তে একটা কল্পিত কোষ্ঠীই এই জন্য তৈরী করে রেখেছি,—যেন সে পাত্রের কোষ্ঠীর জন্ম-কুণ্ডলীর লগ্ন ও গ্রহ-সংস্থান দেখবামাত্র আমি তাঁর আগমন জান্‌তে পারি। কাত্যায়নীর সঙ্গে বিবাহের অনুকূল গণ, রাশি, বর্ণ, নক্ষত্র ও চন্দ্রতারা হিসাব করে আমার মনঃকল্পিত কোষ্ঠীখানি তৈরী করে পর্য্যন্ত আমি আর বৃথা শ্রম করি না। নূতন কোষ্ঠী হাতে আসবামাত্র, অল্পক্ষণ দেখেই বুঝ্‌তে পারি যে, তার সঙ্গে বিবাহ হবার নয়। আমার সে কল্পিত কোষ্ঠীখানি আমার চোখের সম্মুখে সর্ব্বদা এমনি জল্‌জল্ করছে।"

কামাখ্যানাথ একটুখানি নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আপনাকে কিছু বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র, তবু স্নেহের অধিকার নিয়ে বলতে চাচ্ছি! অহরহঃ যাঁর অচিন্ত্য রহস্য জগতে নিত্য সপ্রমাণ হলেও, যাঁর কারণ-সূত্র আজ পর্য্যন্ত কোন শাস্ত্র নিশ্চিত ভাবে সন্ধান পায়নি, সেই অদৃষ্ট বা বিধির বিধান নামধারী বিশ্ব-নিয়ন্তাকে কি ক্ষুদ্র মানুষের ক্ষমতায় পরিষ্কার ভাবে বুঝে নেবার সাধ্য আছে? তিনি কোথায় মানুষকে কি দেখান, কি বোঝান, এবং তার ফল শেষকালে কি অপূর্ব্ব রূপে তাঁর বিধানের মধ্যেই গিয়ে মিশে—এ মানুষের ধারণাতেই আসে না। যদি অপরাধ না নেন্ তো বলি, যদি এত কাণ্ড না করে যথাসাধ্য সুপাত্রে কন্যা-দান করে ফেল্‌তেন, তা'হলে বিধির বিধানও সর্ব্বত্র সমভাবেই পালিত হ'ত,—আর আপনার এই যে মানসিক অশান্তি ও উদ্বিগ্ন ভাব- এই কষ্টটি আপনাকে ভোগ কর্‌তে হ'ত না।"

জ্যোতিরত্ন সনিশ্বাসে বলিলেন "তুমি যা বল্‌ছ, তা হয় ত ঠিক, কামাখ্যানাথ; কিন্তু চিরদিনের সংস্কার আর আমার ফের্‌বার পথ রাখেনি। আমায় এই পথেই চিরদিন চল্‌তে হবে। আমার এই কল্পিত কোষ্ঠী প্রস্তুতের কথা শুনে তুমি আমায় হয় ত উদ্ভ্রান্ত-মস্তিষ্ক বলে মনে করছ,—সত্যই আমি তার বিবাহ-বিষয় ও পাত্রের কোষ্ঠী দেখে হতাশ হ'য়ে যেন বিভ্রান্তই হ'য়ে পড়েছি। হয় ত শুক্রের বক্রতায় কাত্যায়নীর বিবাহই হবে না; কিন্তু বৃহস্পতির সুসংযোগের আশাও যে আমি কোন মতেই ছাড়তে পার্‌ব না। সেই রকম পাত্র না পেলে যদি তার বিবাহ না হয়, তাতেও আমি ক্ষুণ্ণ নই। আমার এই সর্ব্বশুদ্ধা গৌরীতুল্যা কন্যার এই উচ্চাঙ্গের কোষ্ঠীর জন্য আমায় বিপদ্‌গ্রস্তও মনে কোরো না কামাখ্যানাথ! এজন্য আমি বিশেষ গর্ব্বিত বলেই জেনো। বহু পুণ্যে আমি এমন কন্যা লাভ করেছি—এই আমার বিশ্বাস।"

কামাখ্যানাথ অস্পষ্ট স্বরে একবারমাত্র বলিলেন, "ভগবানের খেলা।" তাহার পরে পূর্ব্বকথার অনুবৃত্তি করিয়া বলিলেন "কিন্তু মহেন্দ্রের কথা ত কিছু বল্‌লেন না, তার—"

"মহেন্দ্র—মহেন্দ্রের কথা বোলো না, ওঃ—তার কোষ্ঠীর কথা আমার যে ভুল্‌বার উপায় নেই।"

"বিবাহের কথা বল্‌ছি না; তাকে এ বয়সে ঘরে বসিয়ে কেন রেখেছেন, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।" জ্যোতিরত্ন এইবার মন ও মস্তিষ্ককে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পাইলেন। কন্যার বিবাহ বিষয়ের আলোচনা করিতে-করিতে তিনি যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইবার মনকে প্রসঙ্গান্তরে আনিয়া সুস্থির করিবার চেষ্টা করিতে-করিতে বলিলেন "ও—হাঁ,—মহেন্দ্রকে—; এই গ্রামে আসার পর

তার পড়াশোনার ব্যবস্থা এখনো ক'রে উঠতে পারিনি।"

"নিরঞ্জনের কাছে তার বুদ্ধি ও বিদ্যা সম্বন্ধে যে রকম কথা শুনি, তাতে মনে হয়, বিদ্যাশিক্ষার জন্য তাকে সহরে রাখ্‌লে সে খুব উন্নতি করতে পারত।"

"কয়েক বৎসর তাও রেখেছিলাম; কিন্তু গৃহিণী তাতে বড় কাতরা হন। তাঁর ইচ্ছা, মহেন্দ্র আমার কাছে যা শিখেছে, সেই বিদ্যায় ভবিষ্যতে সে আমার মত একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই হ'য়ে সংসার করে। তাই অগত্যা আজ এক বৎসর হল, সহর হ'তে তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে, আবার নিজেই পাঠ দিচ্চি।"

"আপনি আমার চেয়ে এ কথা ভাল রকমই জানেন যে, দেশকালের উপযোগী বিদ্যা না আয়ত্ত থাক্‌লে, মানুষের পূর্ণ উন্নতি হয় না। মাতা ঠাকুরাণী স্ত্রীলোক; বিশেষ তিনি মা; মা-মাত্রেই এ রকম কাতরা হন। কিন্তু সন্তানের ক্ষতির কথা তাঁদের বুঝিয়ে দিলে, তখন ত তাঁরা এ কষ্ট স্বেচ্ছায়ই সহ্য করে থাকেন।"

"তা বটে; কিন্তু এর মধ্যে আরও একটু কথা আছে। সে কথা যাক্—আমি ত তার সম্পূর্ণই বিরোধী। আমিও চাই যে, মহেন্দ্র দূরেই থাকে; কিন্তু এ গ্রামে এসে এখনো তাকে স্থানান্তরে পাঠাবার সুবিধা করতে পারিনি।"

কামাখ্যানাথ উভয় হস্ত একত্র সম্বদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আমার একটি ভিক্ষা! এ প্রার্থনাটিও যদি না রাখেন,—বুঝ্‌ব, আমায় আপনি নিতান্তই অকৃপা করেন।"

জ্যোতিরত্ন কামাখ্যানাথের পানে ক্ষণেক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার ইচ্ছা যে না বুঝ্‌ছি, তা নয়; কিন্তু, শোন কামাখ্যানাথ,—যদিও সে নিরঞ্জনের অপেক্ষা তিন-চার বৎসরের বড়, কিন্তু বিদ্যায় ত সে তার সঙ্গী হবার উপযুক্ত হয়নি। আমি তাকে ছোট হ'তে বাংলা আর ভালরূপে সংস্কৃতই শিখিয়ে এসেছি, ফার্সীও সে ভাল রকমই জানে। কিন্তু রাজভাষার অন্তর্গত বিদ্যায় সে নিরঞ্জনের সমান নয় ত।"

"আপনি বলেন কি! তার সংস্কৃত ও ফার্সী জ্ঞানে যে সে নিরঞ্জনের অনেক উঁচুতে। তাকে সঙ্গীরূপে পেলে নিরঞ্জন ধন্য হবে। তার যে রকম প্রতিভাযুক্ত মুখশ্রী দেখি আর বুদ্ধির কথা শুনি, রাজভাষায়ও নিরঞ্জনের সমান হতে তাকে বেশী চেষ্টা পেতে হবে না। এখন আপনি দয়া ক'রে সম্মতি দিলেই কৃতার্থ হই।"

জ্যোতিরত্ন কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া সনিশ্বাসে যেন নিজ মনে বলিলেন—"পুরুষকারকে কেন আবার বিস্মৃত হয়েছি জানি না,—কেন এত নিরাশ হ'য়ে পড়্‌ছি দিন-দিন! না, কামাখ্যানাথ, এমন সুযোগ আমি ত্যাগ কর্‌ব না—তোমাদের মত দেব-সহবাসেই তাকে রাখ্‌ব। শুনেছি ভাগ্যদেবী পুরুষকারের হাতে কখনো-কখনো পরাস্ত হন্। কিন্তু শোন কামাখ্যানাথ, তোমায়ও আমার একটি অনুরোধ রাখ্‌তে হবে। তোমার কাছে আমি যে জমী বন্দোবস্ত করে নিয়েছি, তার অর্দ্ধেক উপস্বত্বও তোমায় মহেন্দ্রের জন্য নিতে হবে। তুমি যদি আমার এই দৌরাত্ম্য সহ্য করে তার মঙ্গল ও উন্নতিকামী হয়ে তাকে তোমাদের কাছে রাখ, তবেই এ সম্ভব হতে পারে।"

কামাখ্যানাথ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ভাবে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জ্যোতিরত্ন পুনর্ব্বার কোমল স্বরে বলিলেন—"আমার উপর তোমার যে রকম শ্রদ্ধা, তারই জোরে আমি তোমায় এ অনুরোধ করতে পারছি। পিতৃতুল্য সম্মান না পেলে, তোমায় এ কথা বলা কি কারও সাধ্য হ'ত? তুমি ত জান, ঈশ্বরেচ্ছায় আমার অভাব অত্যন্ত অল্প। আমার জন্য যে বৃথা ব্যয় তোমায় করাব, সে ব্যয়ে হয় ত একটি যথার্থ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির যথেষ্টই উপকার হবে। এ রকম কাজ তোমার দ্বারা এই একটি মাত্র নয়। এমন কত লোকের অভাব-মোচন তুমি ত সর্ব্বদাই কচ্চ। আমার এ অসম্মতির কারণ আর কিছুই নয়—মহেন্দ্রের মাতা তার গর্ভধারিণী না হলেও তার উপর অত্যন্ত স্নেহবতী। একে তাঁর ইচ্ছানুসারে মহেন্দ্রের সঙ্গে কাত্যায়নীর বিবাহ দিচ্চি না—তাতে যদি মহেন্দ্রকে আমি অন্যের সাহায্যপ্রার্থী করি, তা'হলে তিনি অত্যন্ত মনঃপীড়া পাবেন। মহেন্দ্রও কষ্টবোধ করবে, আর তা ছাড়া আমারও এ সর্ব্বপ্রকারেই অকর্ত্তব্য। সে-ই আমার পুত্রস্থানীয়। এই সমস্ত বুঝে তুমি যদি তাকে তোমার পুত্রের সহবাসে রাখ্‌তে সম্মত হও, বুঝ্‌ব—তুমি তার শুভান্বেষী, দৈব-নিয়োজিত মহাপুরুষ! এ স্বীকার করতে পার্‌বে তুমি?"

কামাখ্যানাথের প্রতিবাদের আর উপায় ছিল না; অসম্মতি জানাইবারও সাধ্য নাই। মস্তক অবনত করিয়া

কেবলমাত্র বলিলেন, "আপনার ইচ্ছাই আমার পক্ষে সকলের বড়। যা আদেশ করলেন, তাই হবে। কিন্তু আমায় আপনি যে এতখানি পর ভাবেন, এ কষ্ট আমার—" জ্যোতিরত্ন বাধা দিয়া সাদরে বলিলেন, "অভিমান করো না। তোমার কতখানি সাহায্য যে আমি আজ নিচ্ছি, তা যদি তুমি জানতে কামাখ্যানাথ! তুচ্ছ অর্থের সাহায্যই কি জগতে সকলের বড়? তোমার আশ্রয়ে আমার পুত্রাধিক মহেন্দ্রকে রেখে, তার সম্বন্ধে যে কতখানি আশান্বিত হচ্ছি, তা যদি তুমি বুঝতে!"

"আপনি এ কথা কেন বলছেন? তার কোষ্ঠী সম্বন্ধেও কি আপনার মনে কোন অশান্তি আছে? এ ভিন্ন মহেন্দ্র সম্বন্ধে আপনার এ চিন্তার অর্থ ত খুঁজে পাই না।" জ্যোতিরত্ন বলিলেন, "যা অনুমান করেছ, তাই। কিন্তু এ সব কথা আর না। কেবল একবার তোমার কোষ্ঠী-খানি দেখতে ইচ্ছা করি। তোমায় শেষবয়সে ভগ্নহৃদয় হ'তে হবে—এর কারণটি না দেখে আমি স্থির হ'তে পারব না ত।" কামাখ্যানাথ এইবার একটু দুঃখিত ভাবে ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ক্ষমা করুন—একটু অন্য দিকে মন দিন,—যার নাম অদৃষ্ট, তাকে দেখবার জন্য সর্ব্বদা এত উতলা হবেন না। একটা কথা আপনারা কেবলই ভুলে যান —'নিয়তি কেন বাধ্যতে'।"

"অন্য দিকে মন দেবার আর পথ নেই, কামাখ্যানাথ। এই জ্যোতিষ আমায় যেন ভূতের মতই পেয়ে বসেছে। সত্যই, তুমি যেন আজ অন্তর্যামীর মত আমার মর্ম্মগত এই কথার পুনরুক্তি করলে! এই অত্যধিক জ্যোতিষালোচনা আমায় শেষে উদ্ভ্রান্ত না করে ফেলে! শুধু এই মাত্র নয়—কন্যার বিবাহ নিয়েও, এই রকম অত্যন্ত কোষ্ঠী-বিচারে সন্দিগ্ধ হ'য়ে কেউ-কেউ হয় ত সন্দেহ করে যে, কন্যাই অলক্ষণা, কিংবা তার অখণ্ড বৈধব্য-যোগ আছে। তাই সহজে কোন পাত্রও আর তার জন্য উপস্থিত হয় না। এই জ্যোতি-বিচারের অবথাধিক্যেই বুঝি আমি আমার চারিদিকে অশান্তির চির-অগ্নি জ্বেলে তুললাম। কিন্তু যাই হোক্, তবু আর আমার ফেরবার উপায় নেই,—এ ভূতের এমনি প্রভাব। তাই তোমারও কোষ্ঠীখানা দেখতে চাই।"

"দেখুন তবে। কিন্তু এজন্য আর কোন পরিশ্রম করবেন না, এর সত্য-মিথ্যার তথ্য নিরাকরণে ব্যস্ত হবেন না—স্বীকার করুন।"

"আচ্ছা, তাই হবে কামাখ্যানাথ! কিন্তু এ যে আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। তোমার মত লোকের যদি এই রকম পরিণাম হয়, তা'হলে—"

"আবার আপনি বিদ্রোহসূচক কথা কইলেন!" কামাখ্যানাথ আসন হইতে উঠিয়া নিকটস্থ আলমারী খুলিলেন, এবং আর একটী হরিদ্রাবর্ণ কাগজের পূর্ব্বোক্তরূপ মোড়ক তন্মধ্য হইতে বাহির করিয়া জ্যোতিরত্নের হস্তে দিয়া সহাস্য মুখে বলিলেন, "মানুষের সকল চেষ্টা, সকল বিদ্যার উপরে 'তাঁর ইচ্ছা' এই কথাটি খুদে রাখতে পারলে, তার আর এই রকম বিদ্রোহী হবার আশঙ্কা থাকে না। তাই তার জীবনে দুঃখ এলেও, দুঃখের চেয়েও যা দুঃখপ্রদ,—সেই অশান্তি প্রবেশ করতে পায় না।"

জ্যোতিরত্ন সে কথার দিকে লক্ষ্য না করিয়া, ব্যগ্র ভাবে মোড়কের জড়িত পত্রময় দেহ আসনের উপর ঈষৎ প্রসারিত করিয়া তাহার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। কামাখ্যানাথ নিস্তব্ধ ভাবে যেন অন্তর্নিবিষ্টমনা হইয়া নত নেত্রে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, পরে জ্যোতিরত্নের পানে চাহিবামাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। জ্যোতিরত্ন যেন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন—তাঁহার মুখে ক্রমেই রক্তাধিক্য দৃষ্ট হইতেছে, কপালের শিরাগুলি ক্রমশঃ যেন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে; চক্ষু ও নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, দৃষ্টিও ক্রমশঃ স্থির, নিশ্বাস বিলম্বে দীর্ঘতর ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কামাখ্যানাথ বিস্ময়াধিক্যে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে জ্যোতিরত্নের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, শেষে মৃদু শান্তস্বরে বলিলেন,"আজ রেখে দিলে ভাল হত না? বেলা অনেক হয়েছে, আপনার স্নানাহ্নিকের সময়—"জ্যোতিরত্ন যেন সে কথা শুনিতেই পাইলেন না। একবারমাত্র উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত ভাবে তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি তুলিয়া পুনর্ব্বার কোষ্ঠীতে মনঃসংযোগ করিলেন; কিন্তু সেখানেও তাঁহার দৃষ্টি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। আবার তিনি কামাখ্যানাথের মুখের পানে উদাস নেত্রে চাহিলেন। কামাখ্যানাথ পুনরায় বিনীত স্বরে বলিলেন, "বেলা অনেক হয়েছে, আপনার স্নানাহ্নিকের—" "হ্যাঁ এই যে—কিন্তু এ কি কামাখ্যানাথ, এ কি?—এ কি দেখলাম?—এ কি আমার ভ্রান্তি? কিম্বা আমার মাথাই অপ্রকৃতিস্থ হয়েছে? কি

তাই বা কই? এই ত—এই ত আমার—এই ত তেমনি লগ্ন, কুণ্ডলী, সব,—বুঝি সব —"!

"আজ থাক এ সব কথা। যা বল্‌তে চান ও-বেলায় বল্‌বেন। আপনাকে আজ অসুস্থ দেখছি।"

"অসুস্থ? হাঁ, আমি অসুস্থ! বিধাতা আমায় এ কি দেখাচ্চেন, কামাখ্যানাথ?"

"মনকে সংযত করুন, দৃঢ় করুন, স্থির হতে চেষ্টা করুন। নিজের উপরও এত বেশী নির্ভর করবেন না। ক্ষণেকের দৃষ্টিমাত্রে যতখানি আশঙ্কা কর্‌ছেন, অতখানি মন্দ না-ও হতে পারে। আর হলেও তাতে ভয়ের কি আছে? যে সমস্ত দুরবস্থা মানুষের কল্পনারও অতীত, তাও ত মানুষের অদৃষ্টে সর্ব্বদাই ঘট্‌ছে। তাতেই বা এত ভয় কেন পেতে হবে! ভগবানের নাম স্মরণে থাক্‌লে কোন অবস্থাই মানুষকে নষ্ট কর্‌তে পারে না।"

"তা নয়, কামাখ্যানাথ! এই কোষ্ঠী—এ যে অচিন্ত্য-পূর্ব্ব!"

"না, আমি ত আপনাকে বলেছি, আমার শেষাবস্থার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সেই অজ্ঞাততত্ত্ব সম্বন্ধে কি একটু ইঙ্গিত পেয়েছে বলেই আভাষ দিয়েছে শুনেছি। কিন্তু তা' সত্য হোক, মিথ্যা হোক—" "মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয় কামাখ্যানাথ! সে কোষ্ঠী—আমার সে মনঃ-কল্পিত কোষ্ঠী যে আমার চোখের উপর, মনের উপর সর্ব্বদা জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌ছে। এই ত সেই লগ্ন, সেই চন্দ্র—ঠিক্ যেন সেই কুণ্ডলীর আভাষ-যা আমি কাত্যায়নীর যোগ্য পাত্রের উপর মনে-মনে আরোপ করে রেখেছি। এতে কি আমার ভুল হতে পারে? আমি এখনো তোমার শেষাবস্থা বা কোন কিছুই আর দেখিনি! কেবল মাত্র কুণ্ডলীর কতকটা আভাষ--" "জ্যোতিরত্ন মহাশয়! আপনি কি অপ্রকৃতিস্থ বোধ করছেন? উঠ্‌বেন না, বসুন; আমি কারুকে ডাকি! আপনাকে এমন ভাবে যেতে দিতে পারি না। আপনি অসুস্থ!"

দুই হাতে কামাখ্যানাথকে নিবারণ করিয়া জ্যোতিরত্ন সহসা দৃঢ় ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; আদেশসূচক স্বরে বলিলেন, "কামাখ্যানাথ! তুমিও স্থির হও। আমার জন্য কিছুমাত্র ভয় পেয়ো না। আমি প্রকৃতিস্থ হয়েছি।" বলিতে-বলিতে জ্যোতিরত্ন সেই প্রসারিত-দেহ কাগজের মোড়কটা তুলিয়া লইয়া, তাহার শ্লথ অংশ জড়িত করিয়া কামাখ্যা-নাথের হস্তে দিলেন; বলিলেন, "আমার দ্বারা আর এ কোষ্ঠী দেখার ভরসা আমি রাখি না। এর কিছুই আমি দেখিনি—কেবলমাত্র জন্ম কুণ্ডলী। সেইটুকুই আমার—থাক্—জয়তু।" ব্রাহ্মণ আবার যেন ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ ভাবে সবেগে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কামাখ্যানাথ নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রাণের কাহিনী

(গত বর্ষের শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'প্রাণময় জগৎ' শীর্ষক প্রবন্ধের পরে পঠিতব্য)

[আচার্য্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ]

প্রাণের সহিত জড়ের বিরোধের কথা বলিতেছিলাম। এই বিরোধে নিজের প্রাণ এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, বহুদিন আপনাদের সম্মুখে আসিতে সাহস করি নাই। আমার কথাগুলি সব আপনাদের স্মরণে আছে কি না জানি না। প্রাণ জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণি-পদার্থে পরিণত করিতে চাহিতেছে। অন্যদিকে জড় প্রাণের বিশিষ্টতা লুপ্ত করিয়া উহাকে জড়ত্বে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রাণি-পদার্থে ও জড়পদার্থে এই নিত্য বিরোধ। নানা প্রাণী,—নানা জন্তু ও নানা উদ্ভিদ,—জড়-পদার্থকে গ্রাস করিয়া, সেই জড়ে প্রাণের বিশিষ্ট ধর্ম্ম অর্পণ করিয়া আপনাদের দেহ নির্ম্মাণ করিতেছে; জড় কিন্তু প্রাণি-পদার্থের বিশিষ্টতা নষ্ট করিয়া পুনরায় জড়ত্বে নামাইতে সর্ব্বদা নিযুক্ত আছে। এই হইল নিত্য বিরোধ। এই বিরোধের কাহিনী লইয়া জীবনযাত্রা; এই বিরোধের যে দিন সমাপ্তি হয়, সেই দিন মৃত্যু। প্রাণীর পক্ষে এই মৃত্যু প্রায় অবশ্যম্ভাবী, জড়ের নিকট পরাজয়টাই অবশ্যম্ভাবী। অথচ প্রাণ এই

অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে এড়াইতে গিয়াই, নিত্য নূতন বিচিত্র আকৃতিতে, বিচিত্র মূর্ত্তিতে আপনাকে স্ফূর্ত্ত করিয়া, জড়ের সহিত বিরোধ চালাইয়া আসিতেছে।

'মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং'—ইহা আপনারা জানেন; অথচ আশ্চর্য্য এই যে, প্রাণী মরিয়া যায়, কিন্তু প্রাণ লুপ্ত হয় না। এক দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রান্ত হইয়া জড়ের সহিত যুদ্ধ চালায়। অন্ততঃ, আমাদের এই পৃথিবীতে যে দিন হইতে প্রাণের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই ধারা চলিতেছে। প্রাণী কেবল মরিতেছে, কিন্তু প্রাণ এ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই। কোটি দেহাশ্রয়ে কোটি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জড়ের সহিত লড়াই চালাইতেছে। ইংরাজিতে যাহাকে protoplasm বলে, আমি তাহাকে প্রাণি-পদার্থ বলিয়া আসিতেছি। এই protoplasm-এর কণিকা যে দিন ভিতরে একটি সূক্ষ্ম দানা বা nucleus বাঁধিয়া তাহার ক্ষুদ্র দেহ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছে—অন্ততঃ সেই দিন হইতে প্রাণের এইরূপ আচরণ চলিয়া আসিতেছে। এই দানাওয়ালা প্রাণি-পদার্থ অর্থাৎ nucleus-বিশিষ্ট protoplasm-এর কণিকাকে ইংরাজিতে cell বলা হয়, বাঙ্গালায় উহাকে কোষ বলা হইয়া থাকে। এই কোষ নামটা আমি আদৌ পছন্দ করি না; কিন্তু অন্য নামের অভাবে অগত্যা ঐ নামই আমাকে ব্যবহার করিতে হইবে। এই কোষই এক হিসাবে ক্ষুদ্রতম প্রাণী; অথবা ঐ কোষটাই সেই ক্ষুদ্রতম প্রাণীর দেহ। উহার কাজই হইতেছে আশে-পাশে জড়-পদার্থের সন্ধানে থাকা, এবং গ্রহণযোগ্য পদার্থের সন্ধান পাইলেই, তাহাকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিয়া আপনার দেহের পুষ্টি-সাধন করা। এই অতিক্ষুদ্র প্রাণীটি কেবলই আহারের সন্ধানে আছে, কেবলই খাইতেছে আর বাড়িতেছে। ইহার প্রবৃত্তিটাই হইতেছে আত্মপোষণের অভিমুখে। ইহার বাড়িবার প্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু কি জানি কেন, ইহা আপনাকে বড় করিয়া বিশ্বব্যাপী দেহ গ্রহণ করিতে পারে না। একটু বাড়িয়াই ইহা দুই টুক্‌রা হইয়া যায়; একটা কোষ ভাঙ্গিয়া দুইটা কোষ হইয়া যায়। উহার দেহের ভিতর যে ক্ষুদ্র nucleus বা দানাটুকু থাকে, সেই দানাটাই প্রথমে ছিন্ন হইয়া দুই খণ্ড হয় এবং protoplasmটুকু ভাগ করিয়া লইয়া দুইটা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন কোষের উৎপাদন করে। ছিন্ন দানাওয়ালা একটা কোষ—একটি প্রাণী; খণ্ডিত হইয়া উৎপাদন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দানাওয়ালা দুইটি কোষ, বা দুইটি প্রাণী। এই দুইটি প্রাণীর প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়; স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে বলিলেই হয়। আবার একটু বড় হইয়াই প্রত্যেকটা আবার দুই টুক্‌রা হইয়া যায়। একটি প্রাণী ভাঙ্গিয়া দুইটি হইয়াছিল, দুইটি ভাঙ্গিয়া চারিটি—এইরূপে চারিটি হইতে আটটি, আটটি হইতে ষোলটি—এইরূপে ক্রমে বহুকোটি প্রাণীতে পরিণত হইয়া পড়ে। প্রত্যেকটাই স্বাধীন প্রাণী, কেহ কাহারও তোয়াক্কা রাখে না, স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিয়া আহারের অন্বেষণে বেড়ায়। পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হইতে আজ পর্য্যন্ত এই ব্যাপার আপনাদের চোখের উপর চলিয়া আসিতেছে, আপনারা তাহা দেখিয়াও দেখেন না, জানিয়াও জানেন না। আপনাদের হাঁচিতে, কাশিতে, দাঁতের বেদনায় ও পেট ফাঁপায়, আপনাদের প্রাত্যহিক জীবন-ধারণ ব্যাপারে ইহাদের কতটা হাত আছে, তাহা আপনারা জানেন না। যখন কলেরার বা প্লেগের আক্রমণে ও-পারের ডাক পড়ে, তখন এই ক্ষুদ্র প্রাণিগুলার কৃতিত্ব জাহির হয়। এক প্রাণীর বহু হইবার এই প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল এবং কেন আসিল—প্রাণ-বিদ্যার পক্ষে এ একটা সমস্যা বটে। প্রাণিপদার্থ একটা একাকার বিশাল বিশ্বব্যাপী দেহ ধারণে প্রবৃত্তি না রাখিয়া, এইরূপ অগণ্য কোটি-কোটি-কোটি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া পৃথিবী ব্যাপিতে চাহে কেন, ইহা একটা সমস্যা বটে। বন্ধুবর অধ্যাপক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের কলেজের পত্রিকায় আমার পঠিত এই প্রবন্ধগুলির আলোচনা এবং সঙ্গে-সঙ্গে সমালোচনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিতেছেন। এই হেঁয়ালিটা তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। একের এই বহু হইবার প্রবৃত্তি যে কেবল প্রাণি-পদার্থেই দেখা যায়, এমন নহে; খাঁটি জড়-পদার্থেও এই প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। জড় পদার্থও একাকার অবস্থায় বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থানে সমর্থ হয় নাই; আপনাকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র টুক্‌রায়, কোটি-কোটি-কোটি খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু এবং electron, atom, molecule ইত্যাদি নানা মূর্ত্তিতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রমথবাবু প্রশ্ন তুলিয়াছেন,—জড়েরই বা এরূপ খণ্ডিত হইবার প্রবৃত্তি কেন, প্রাণি-পদার্থেরই বা এরূপ খণ্ডিত হইবার প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তি কেন? একাকারে বৃহৎ ভাবে না থাকিয়া অগণ্য ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইবার প্রবৃত্তি কেন? এই প্রশ্নটি জগৎ-তত্ত্বের একটা গোড়ার প্রশ্ন; ইহার উত্তর দিতে পারি, সে সাহস আমার নাই। তবে আমি এই পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি, রাজপথে যেমন mile-stone,—electron, atom, moleculeগুলি, অথবা তারকা, গ্রহ, উপগ্রহগুলি সেইরূপ আকাশ মধ্যে mile-stoneএর কাজ করে। মাইলষ্টোন বা তদ্বিধ খণ্ডচিহ্ন না থাকিলে, সরল রাজপথে পথিক যেমন তাহার পর্য্যটন-কাহিনীর হিসাব দিতে পারিত না, জড়-পদার্থও খণ্ডাকারে আকাশে ছড়াইয়া না থাকিলে, আমরা আমাদের ব্যাবহারিক বাহ্য জগতের কোনরূপ হিসাব দিতে পারিতাম না। সম্ভবতঃ জীবন-যাত্রাই আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইত। অন্ততঃ যে প্রণালী মতে আমাদের জীবনযাত্রা চলিতেছে, সেই প্রণালী মতে জীবনযাত্রা অসাধ্য হইত। প্রমথনাথের প্রশ্নের উত্তরে, জড়-পদার্থের খণ্ড-ভাব সম্বন্ধে ইহার অধিক আমি কিছু বলিতে পারিব না। প্রাণি-পদার্থের খণ্ড-ভাব সম্বন্ধেও আমি ঐরূপ একটা উত্তর কল্পনা করিয়া পরিত্রাণ পাইতে চাই। জীবনের ইতিহাসটাকে আমি একটা বিরোধের ইতিহাসমাত্র বলিতে চাহি। এই বিরোধ না থাকিলে জীবন থাকিত না; এই বিরোধই জীবন এবং জীবনই এই বিরোধ। প্রাণি-পদার্থ যদি আপনাকে এইরূপ কোটি খণ্ডে ভাগ করিয়া না লইত, তাহা হইলে এই বিরোধই বা চলিত কিরূপে, জীবনের অর্থ এবং তাৎপর্য্যই বা কি হইত—তাহা আমি মনে করিতে পারি না। জীবনের অস্তিত্বটা যদি মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে জীবনের সহিত অভিন্ন এই বিরোধ-টাকেও মানিয়া লইতে হইবে; এবং বিরোধকে মানিতে হইলে, পরস্পর বিরুধ্যমান বা বিরোধে লিপ্ত একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীও মানিতে হইবে। যে সর্ব্বতোভাবে এক, অদ্বয় এবং অখণ্ড, সে আপনার সহিত আপনি বিরোধ করিতে পারে না। বিরোধ কল্পনা করিতে হইলে অন্ততঃ দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী আবশ্যক হয়। দুইয়ের অধিক প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলে বিরোধটা আরও জম্‌কাইয়া উঠে। জীবনের কাহিনী বিরোধেরই কাহিনী—খুব জম্‌কাল কাহিনী। প্রাণী যদি বহু না হইয়া এক হইত, তাহা হইলে জীবনের কাহিনী ত থাকিতই না, জীবন বলিয়াই কিছু থাকিত কি না, সে বিষয়েই আমার সংশয় জন্মিতেছে। আপনারা হয় ত ঘাড় নাড়িবেন বা হাসিবেন, কিন্তু আমার মনে হয়, যেন আমাদের মত চেতন জীবের জীবনযাত্রার খাতিরেই, আদান-প্রদানের খাতিরেই, জড়-জগৎ এবং প্রাণময় জগৎ—উভয় জগৎই আপনাকে খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন, discontinuous করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিতে চাহি। Continuity শব্দের বাঙ্গলায় সন্ততি শব্দ ব্যবহার করিতে পারি। যাহার খণ্ড নাই, কোথাও কোন বিচ্ছেদ নাই, ফাঁক নাই, যাহা বিচ্ছেদহীন একটানা, তাহাকেই সন্তত বলা যায়। পুত্র-কন্যা জন্ম লইয়া পিতৃ-পিতামহের জীবনের ধারা রক্ষা করে, বা অবিচ্ছিন্ন রাখে; সেই জন্য পুত্রকন্যাকে সন্তান-সন্ততি বলা হয়। এই continuity বা সন্ততির তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আপনাদের একটা মোটা ধারণা আছে। মোটা ধারণা বলিলাম এই জন্য, যে, একটু চাপিয়া ধরিলে ইহার তাৎপর্য্য লইয়া নানা গণ্ডগোল উঠে। গণিতজ্ঞ পণ্ডিতেরা,—সূক্ষ্ম তর্ক উত্থাপনে যাঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই,—তাঁহারা এই সন্ততি ব্যাপারের তাৎপর্য্যের অন্ত পান নাই; অন্ততঃ যে দিন হইতে তাঁহারা differential calculus নামক অস্ত্রের উদ্ভাবনা করিয়াছেন, তদবধি তাঁহারা এই হেঁয়ালিকে আরও ঘনাইয়া তুলিয়াছেন। মনে করুন জ্যামিতি-বিদ্যা—জ্যামিতি-বিদ্যার কারবার বিচ্ছেদহীন সন্তত পদার্থ লইয়া। কিন্তু যখন জ্যামিতিবিৎ পণ্ডিতেরা একটা গোলাকার বাঁটুলের volume বা ঘনফল বাহির করিতে যান, তখনই বাঁটুলটাকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলেন, এবং প্রত্যেক টুক্‌রার ঘনফল পৃথক্ ভাবে বাহির করিয়া, তাহাদিগকে সঙ্কলন করিয়া, গোটা বাঁটুলের ঘনফল বাহির করিতে বাধ্য হন। বাঁটুল দ্রব্যটা বিচ্ছেদহীন সন্তত দ্রব্য, কিন্তু কারবারের বেলায় একটানে উহার ঘনফল বাহির হয় না, উহাকে শতকোটি খণ্ডে কাটিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডের ঘনফল বাহির করিতে হয়। ব্যাপারটা কৌতুককর—যেন বালির পাহাড়ে কত বালি আছে, তাহার পরিমাণ করিতে গিয়া বালির কণিকাগুলি গণিতে হইতেছে;—সমুদ্রের জলের পরিমাণ করিতে গিয়া, কত জলবিন্দু আছে, তাহা গণিতে হইতেছে। মনে রাখিবেন; ইহা কারবারের ব্যাপার—হিসাবের ব্যাপার। যেখানে

হিসাব করিয়া কারবার চালাইতে হয়, সেইখানেই একটানা জিনিষে কাজ চলে না ; টুক্‌রা লইয়া কাজ চালাইতে হয়। মানুষের প্রাণ-যাত্রাটাই একটা প্রকাণ্ড কারবার, – একটানা, বিরামহীন, বিচ্ছেদহীন সন্ততিতে প্রাণ পরিত্রাহি রবে কাঁদিতে থাকে। প্রাণ একটা ছন্দোময় পদার্থ ; উহার মাঝে-মাঝে যতি ও বিরাম আবশ্যক ;– গানের মত পদার্থ ; মাঝে-মাঝে তাল দিয়া, ফাঁক বসাইয়া, উহার সুর রক্ষা করিতে হয়। অন্যের সহিত কারবারে আমরা কথা কহি– বাক্যের পর বাক্য বসাই– মাঝে ফাঁক থাকে ; পদের পর পদ বসাইয়া বাক্য গড়িয়া লই ; syllableএর পর syllable, অক্ষরের পর অক্ষর, উচ্চারণ করিয়া, পদ নির্ম্মাণ করি। লিখিবার সময় লিপিমধ্যে হরপের পর হরপ বসাই ;—টেলিগ্রাফের সিগ্নালে একটানা রেখার পরিবর্ত্তে সারি বাঁধিয়া dotএর পর dash দিতে হয়। মানুষের প্রজ্ঞা —Reason —যেন এইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে যে, একটানা সন্তত পদার্থকে উহা আয়ত্ত করিতে পারে না, আয়ত্ত করিতে গেলে মাঝে-মাঝে হাঁফ ছাড়িতে হয় ; হাঁফের সঙ্গেই বিরামের দরকার হয়। যেখানে বুদ্ধিবৃত্তির খেলা, সেইখানেই এইরূপ দেখিতে পাইবেন। মনে করুন—ইটের প্রাচীর, আর কাদার দেওয়াল। ইটের উপর ইট সাজাইয়া, সহস্রখণ্ড ইটের সমষ্টিতে ইটের প্রাচীর গাঁথা হয় ; দুইখানা ইটের মাঝে ফাঁক থাকিবেই। আপাততঃ মনে হয়, কাদার দেওয়াল যেন অন্যরূপ ; কাদার পরিমাণ যেন ক্রমশঃ অবিরামে, অবিচ্ছেদে বাড়াইয়া কাদার দেওয়াল গড়া হইয়াছে ; মাঝে ফাঁক বা বিচ্ছেদ রাখিবার প্রয়োজন হয় নাই। ইটগুলা যদি পাথরের ইট হয়, ভাঙ্গা না চলে, তাহা হইলে প্রাচীর হইতে একখানা ইট খুলিয়া লওয়া চলে ; ইটের ভগ্নাংশ, আধখানা বা সিকিখানা খোলা চলে না। কিন্তু মাটির দেওয়াল হইতে যতটুকু ইচ্ছা মাটি খুঁটিয়া লইতে পারি ; আপনি যত অল্প কাদা বাহির করুন, আমি তার চেয়েও অল্প পরিমাণ খুঁটিয়া বাহির করিতে পারি। অতএব আপাততঃ মনে হইতে পারে, ইটের প্রাচীর নির্ম্মাণ বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরম্পরা, আর কাদার দেওয়াল গাঁথা একটানা বিচ্ছেদহীন ঘটনা। কিন্তু কার্য্যতও কি তাই ? যে মজুর কাদার দেওয়াল গাঁথিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিবেন, যে, সে তিল-তিল করিয়া ত কাদা তোলে নাই, তাল-তাল করিয়া কাদা তুলিয়া, তালের উপর তাল চাপাইয়া, দেওয়াল গড়িয়াছে ; দুই তালের মাঝে তাঁহাকে হাঁফ লইতে হইয়াছে। পদার্থবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা যখন তাঁহাদের বাঙ্ময় কাদার মসলা দিয়া জড়জগৎ নির্ম্মাণে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনই তাঁহাদিগকে সেই মজুরের মত হাঁফ ছাড়িতে হইয়াছে ; ইটের উপর ইট চাপাইয়া তাঁহাদের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। বালুকণার উপর বালুকণা চাপাইয়া তাঁহারা বালির পাহাড় গড়িয়াছেন, জলবিন্দুর উপর জলবিন্দু চাপাইয়া তাঁহারা মহাসাগরের সৃষ্টি করিয়াছেন ; moleculeএর পাছে molecule বসাইয়া জলবিন্দু গড়িয়াছেন, atomএর পাছে atom বসাইয়া জলের molecule গড়িয়াছেন, electronএর পাশে electron বসাইয়া atom গড়িবার চেষ্টায় আছেন। এমন কি, যে সকল পণ্ডিত আকাশব্যাপী সন্তত - বিচ্ছেদহীন ঈথারের কল্পনা করিয়া, তদ্দ্বারা আকাশের ফাঁক পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও অবশেষে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। যখনই তাঁহারা আকাশব্যাপী ঈথারের সহিত কারবার করিতে গিয়া তাহার dynamical theory দিতে গিয়াছেন, তখনই সেই ঈথারেরও কণিকা, বা molecule বা particle কল্পনা করিতে হইয়াছে ; সেই ঈথারকে কোটিখণ্ডে খণ্ডিত করিতে হইয়াছে ; একটা ঈথার-কণিকার পাছে আর একটা কণিকা বসাইয়া উভয়ের মধ্যে ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার হিসাব দিতে হইয়াছে।

প্রমথনাথ যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, আমি এই জন্যই সেই প্রশ্নটিকে জগত্তত্ত্বের একটা গোড়ার প্রশ্ন বলিয়াছি। Continuity লইয়া আমাদের কারবার চলে না, discontinuity লইয়াই আমাদিগকে কারবার করিতে হয়। ইহা হয় ত মূলে আমাদের প্রজ্ঞাবৃত্তির—আমাদের Reasonএর একটা দুর্ব্বলতার বা সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেয়। জীবন-যুদ্ধে আমাদের প্রজ্ঞাবৃত্তি এরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, যে, আমাদিগকে ঐরূপেই জীবনের কারবার চালাইতে হয়। ঐরূপেই জগতের অভিমুখে আমাদিগকে তাকাইতে হয় ;— দেবতার মত নির্নিমেষ-নেত্রে আমরা তাকাইতে পারি না, মাঝে-মাঝে নিমেষ ফেলিয়া আমরা তাকাইতে বাধ্য হই। জাগতিক রহস্যের উপর তলায় উঠিতে হইলে, আমরা গড়াইয়া গড়াইয়া উঠিতে পারি না—ধাপে-ধাপে পা ফেলিয়া

সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিয়া থাকি। মানুষের মত চেতন জীবের পক্ষে বাহ্য জগতের সহিত কারবারে এই প্রজ্ঞা-বৃত্তিকেই মন্ত্রাস্ত্র বা ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইতর অস্ত্রও আমরা যেরূপে প্রয়োগ করি, এই ব্রহ্মাস্ত্রকেও সেই রীতিতে প্রয়োগ করিতে বাধ্য আছি। আমরা যেন ঘায়ের পর ঘা দিয়া মুদ্গর প্রহার করি, চোটের পর চোট দিয়া তলোয়ার চালাই, খোঁচার পর খোঁচা দিয়া বল্লম প্রয়োগ করি, তীরের পর তীর, গুলির পর গুলি, ছুড়িয়া জীবনের লড়াই চালাইতে বাধ্য হই। একটানে, অবিচ্ছেদে, সন্তত ভাবে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিকেও প্রয়োগ করিতে পারি না। বিজ্ঞান-বিদ্যা যেখানে ব্যাবহারিক বিদ্যা—practical applied science,—সেখানে তাহার সমুদয় হাতিয়ারই ঐরূপ—সর্ব্বত্রই এইরূপ discontinuity, বিরাম, বিচ্ছেদ। Atom, molecule, particle,—এ সমস্তই বিজ্ঞান-বিদ্যার উদ্ভাবিত হাতিয়ার—এ সবগুলিই যেন তূণীর মধ্যে অবস্থিত বাণ,—গোটা-গোটা বাণ, চোখা-চোখা বাণ; গোটা-গোটা বলিয়াই আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহাদের প্রয়োগে পটু এবং প্রয়োগ দ্বারা জগজ্জয়ী।

এই জন্যই বিজ্ঞান-বিদ্যায় atomistic theory'র—কণিকা-বাদের জয়জয়কার। ব্যাবহারিক জগৎকে আয়ত্ত করিতে হইলেই, তাহাকে কাটিয়া টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া, খণ্ডে-খণ্ডে ছিঁড়িয়া লইতে হয়—ইহাই হইল atomistic theory. জড়জগতের পক্ষে যাহা atom—পরমাণু—প্রাণি-জগতে তাহা কোষ –cell ; এক-একটা cellএর একটা খণ্ড গোটা জিনিষ; এক-একটা individual; উহার ভগ্নাংশ নাই। আধখানা, সিকিখানা পরমাণু যেমন অর্থশূন্য, আধখানা, সিকিখানা কোষ সেইরূপ অর্থশূন্য। একটি-একটি করিয়া কোষের সংখ্যা গণিতে হয়। বড়-বড় প্রাণীর দেহ এইরূপ বহু কোষে নির্ম্মিত—উহা বহু কোষের সমূহ—বহু ইষ্টকে নির্ম্মিত এক-একখানা বাড়ী। এক-একখানা বাড়ী এক-একটা গোটা জিনিষ—একখানা বাড়ীর পাশে আর একখানা থাকে—গ্রামের মধ্যে বাড়ীর সংখ্যা পঞ্চাশখানা বা একান্নখানা হয়, সাড়ে-পঞ্চাশখানা হয় না। বহু কোষে নির্ম্মিত বড়-বড় প্রাণীও গোটা-গোটা প্রাণী, তাহাদেরও ভগ্নাংশ হয় না। পঞ্চাশটা হাতী বা একান্নটা হাতী হয়, সাড়েপঞ্চাশটা হাতী হয় না। একটা গোটা হাতী আর একটা গোটা হাতীর সহিত কারবার করে—আদান-প্রদান করে। এই আদান-প্রদানই হাতীর প্রাণযাত্রা—ইহা মূলে বিরোধাত্মক। আদান-প্রদানের নামই প্রতিদ্বন্দ্বিতা—দ্বন্দ্ব না থাকিলে, অর্থাৎ অন্ততঃ দুইটা না থাকিলে, একা-একা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে না। অতএব প্রাণযাত্রা চালাইতে হইলে একের দ্বারা চলে না, বহুর প্রয়োজন হয়। প্রাণিপদার্থ একাকারে জগদ্ব্যাপী হইলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই বিরোধ, এই প্রাণ-যাত্রা অসম্ভব হইত; অতএব প্রাণযাত্রা যেখানে আছে, সেখানে এই বহুত্বের আবশ্যকতাও আছে। বহুর মধ্যেই বিরোধ—বহু লইয়াই প্রাণযাত্রা—নতুবা প্রাণময় জগতের প্রাণের স্ফূর্ত্তি, প্রাণের প্রকাশ কিরূপে হইত, তাহা আমাদের বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির গোচর হইত না। এই জন্য আমি এই প্রশ্নকে জগৎতত্ত্বের একটা গোড়ার কথা বলিয়া প্রমথনাথের প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। আপনারা হয় ত ভাবিবেন, আমি চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা করিলাম। আমি তাহা মনে করি না,—অন্ততঃ ঐ প্রশ্নের ঐ উত্তর ভিন্ন আমার নিকট এখন অন্য উত্তর নাই।

প্রসঙ্গক্রমে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; সেই বিরোধের কথাতেই আবার ফিরিয়া আসা যাক্। প্রাণের সহিত জড়ের চিরন্তন বিরোধের কথাটাই পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি; কিন্তু তদপেক্ষা তীব্রতর ভীষণতর বিরোধের এ পর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই। এই বিরোধ প্রাণীর সহিত প্রাণীর বিরোধ। গোড়াতেই বলিয়া রাখিয়াছি, প্রাণের মত স্বার্থপর আর দ্বিতীয় নাই। একটা প্রাণি-কোষ যখনই খণ্ডিত হইয়া দুইটা কোষে বিভক্ত হয়, তখনই ঐ দুইটা কোষ সম্পূর্ণ স্ব-তন্ত্র হইয়া আহার অন্বেষণে নিযুক্ত হয়, কিন্তু একটা অন্যটার কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে না। উভয়েই যে এক সময়ে একই মাতৃকোষের মধ্যে প্রায় অভিন্ন দেহে বিদ্যমান ছিল, তাহার কোন পরিচয়ই এখন পাওয়া যায় না। প্রত্যেকে আপন জীবনযাত্রা লইয়া এতটা ব্যস্ত থাকে যে, অন্যটার প্রতি চাহিবার কোন অবকাশ থাকে না। এই শ্রেণীর একটি মাত্র কোষে নির্ম্মিত প্রাণীকে ইংরাজিতে unicellular organism বলে। প্রাণময় জগতে ইহারা যে কত কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে—পঞ্চাশ বৎসর

আগে, এমন কি, দশ-বিশ বৎসর আগেও আমরা তাহার কিছুই জানিতাম না। সম্প্রতি ইহাদের আলোচনার জন্য Bacteriology নামে একটা বিপুলকায় বিজ্ঞান-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। যে সকল প্রাণী সর্ব্বদা আমাদের নজরে পড়ে, তাহাদের দেহ unicellular নহে, multicellular; একটামাত্র কোষে নির্ম্মিত নহে, বহু কোষে নির্ম্মিত। ইহাদের দেহ বহু প্রাণীর দেহের সমবায়ে বা সমষ্টিতে নির্ম্মিত মনে করা চলিতে পারে। কীট-পতঙ্গ হইতে হাতী, ঘোড়া, মানুষ পর্য্যন্ত সকল প্রাণীর দেহ বহু কোষের সমষ্টি। অনেকগুলি মানুষে একটা দলভুক্ত হইয়া যেমন একটা সমাজ বাঁধে, কতকটা সেইরূপ। প্রত্যেক জন্তু এক-একটা প্রাণী নহে, এক-একটা প্রাণি-সমাজ। এই সমষ্টিবদ্ধ কোষগুলির মধ্যে আবার কাজের বাটোয়ারা হইয়া পড়িয়াছে। এক-এক দল কোষের উপর এক-একটা কাজের ভার পড়িয়াছে। হাড়, মাস, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ ধাতু এবং নাক, চোখ, কাণ প্রভৃতি অবয়বই তাহার পরিচয়। এখানে সমাজ-রক্ষার বা সমষ্টি-রক্ষার অনুরোধে সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যষ্টি কোষকে তাহার স্বাতন্ত্র্য, তাহার স্বার্থপরতা একেবারে ত্যাগ করিয়া সমষ্টির স্বার্থের জন্য বিনিয়োগ করিতে হইয়াছে। এমন কি, প্রত্যেক অঙ্গকে ও অবয়বকে আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া অন্যান্য অঙ্গের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে। পেট বসিয়া-বসিয়া খায়, কোন মেহনত করে না,—পেটের বিরুদ্ধে হাত-পায়ের অভিযোগের প্রাচীন উপাখ্যান স্মরণ করিবেন। এখানে দেহের অন্তর্গত প্রত্যেক কোষকে আমরা প্রাণী বলি না,—কোষের সমষ্টিতে নির্ম্মিত নানা অবয়ববিশিষ্ট যে বৃহৎ দেহ, সেই দেহটাকেই প্রাণী বলি। জড়জগতে অণু-পরমাণুগুলি যেমন জমাট বাঁধিয়া গ্রহ-উপগ্রহ—চন্দ্র-সূর্য্যাদির মত বৃহৎ জড়খণ্ডের উৎপাদন করিয়াছে, ইহাও যেন কতকটা সেইরূপ। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যগত অণু-পরমাণুর প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, গোটা-গোটা গ্রহ-উপগ্রহের হিসাব রাখেন; প্রত্যেক গ্রহে, প্রত্যেক উপগ্রহে, একটা individuality দেন। প্রাণি-বিদ্যাও সেইরূপ দেহের অন্তর্গত কোষগুলির পৃথক খবর না লইয়া, কোষের সমষ্টি যে দেহ, তাহাকেই একটা স্বতন্ত্র প্রাণী বলিয়া গণ্য করেন, এবং তাহাকেই একটা individuality দেন। এই হিসাবে আমি, আপনি, তিনি, রাম, হরি, শ্যাম প্রত্যেকে একটি প্রাণী, একটি individual, একটি ব্যক্তি। প্রমথনাথের প্রশ্ন এখানেও অন্য আকারে উঠিতে পারে। ছোট-ছোট কোষগুলি কেন এরূপে জমাট বাঁধিয়া মোটা-মোটা, বড়-বড় কোষসমষ্টিতে অর্থাৎ multicellular প্রাণিদেহে পরিণত হইল? ইহার পাল্টায় আমি প্রশ্ন করিব, atom, moleculeগুলিই বা কোন্ গরজে জমাট বাঁধিয়া মোটা-মোটা গ্রহ-উপগ্রহের, চন্দ্র-সূর্য্য-তারকার, উৎপাদন করিল? দার্শনিক তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে যেরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি আগেই দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আপনারা বলিবেন, উহা চোখে ধূলা দিবার চেষ্টা; দার্শনিক ফাঁকিতে তুষ্ট হইব না। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা দার্শনিক তত্ত্বের বড়-একটা ধার ধারিতে চাহেন না, দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি বরং একটু বক্রদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি সাবধান করিয়া গিয়াছেন, "Physics, Beware of Metaphysics!" বেশ কথা, আমি বৈজ্ঞানিকের সাজে উপস্থিত হইতে ইচ্ছুক আছি। কাজেই, দার্শনিকের হেঁয়ালি ত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিকোচিত ভাষায় আমি বলিব, স্বতন্ত্র কোষগুলি জমাট বাঁধিয়া বড়-বড় প্রাণি-দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছে,—তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য জীবন-সংগ্রামের সুবিধা। এই জীবন-সংগ্রামের কথাটা আজ-কালিকার বৈজ্ঞানিক-মহলে খুব একটা বড় কথা। প্রাণময় জগতে কোন ঘটনা ঘটিতেছে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায়, এই ঘটনায় জীবন-সংগ্রামের সুবিধা হয়, অতএব এই ঘটনা ঘটিতেছে—অমনই বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী নিস্তব্ধ হইয়া, মাথা হেঁট করিয়া উত্তরটা মানিয়া লন। আমি যদি বলি, কোষগুলি দলবদ্ধ হইয়া এইরূপে জমাট বাঁধিয়া বড়-বড় প্রাণিদেহ নির্ম্মাণ করিলে তাহাদের জীবন-যুদ্ধে, জীবনযাত্রায়, সুবিধা হয়, জড়কে আত্মসাৎ করিবার সুবিধা হয়, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক ধাতের লোকে মাথা হেঁট করিয়া বলিবেন, তাই ত, উত্তরটা সঙ্গত হইতেও পারে। আপনারা জানেন, প্রাণময় জগতে এই জীবন-সংগ্রামের আবিষ্কর্ত্তা Charles Darwin. বাঘে ছাগল খায়, ছাগলে গাছ খায়, এমন কি গাছের পাতাতেও পোকা ধরিয়া খায়, Darwinএর আগেও ইহা সকলে জানিত। এই ঘটনাটাই জীবন-সংগ্রাম। কিন্তু এই জীবন-সংগ্রামটা যে কিরূপ

ভীষণ, এবং ইহার ফলাফল কিরূপ সূক্ষ্ম এবং কিরূপ দূরব্যাপী, Darwinএর আগে কেহ তাহা স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পান নাই। জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে—সর্ব্বত্র কিরূপ ভীষণ কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার অহর্নিশি চলিতেছে, তাহা Darwinএর পর হইতে আমাদের চোখে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখা দিয়াছে। প্রাণের সহিত জড়ের নিত্য বিরোধের কথা আগেই বলিয়াছি। সে বিরোধ ত ভয়ানক বটেই, কিন্তু প্রাণীর সহিত প্রাণীর এই যে বিরোধ, ডারুইন যাহা পট তুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাহার উগ্র ভীষণতার বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম। ব্যাসের বা হোমারের কলমে বর্ণনা কুলায় কি না সন্দেহ। আপনাদের যদি সখ থাকে, ডারুইন-তন্ত্রীদের পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিবেন। কিন্তু ইহার ভিতরে একটা মস্ত কৌতুকের কথা আছে। প্রাণ-পদার্থ জড়-পদার্থকে আত্মসাৎ করিতে চায়, protoplasm তাহার ভিতরে দানা বাঁধিয়া প্রাণিকোষে পরিণত হইয়া জড়জগৎ হইতে খাদ্য অন্বেষণ করে। বিশাল জড়-জগৎটাকে সহজে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া আপনাকে ছিন্ন করিয়া, খণ্ডিত করিয়া—শতখণ্ডে, কোটিখণ্ডে বিচ্ছিন্ন করিয়া জড়-জগৎ মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার উদ্দেশ্য, বোধ করি, আহার অন্বেষণের সুবিধা। একাকী একত্র স্থির না থাকিয়া শতখণ্ডে ছুটিয়া বেড়াইলে, জড়কে আত্মসাৎ করিবার, জড়ের সহিত বিরোধ চালাইবার হয় ত সুবিধা ঘটে। আবার unicellular কোষগুলি জমাট বাঁধিয়া multi-cellular প্রাণীতে পরিণত হইলেও, বোধ করি, জড়-জগৎ হইতে আত্মরক্ষার এবং জড়কে আত্মসাৎ করিবার সুবিধা ঘটে। উভয় স্থলেই মূল বিরোধ প্রাণের সহিত জড়ের। কিন্তু প্রাণী যখন প্রাণীর সহিত বিরোধ করিতে আরম্ভ করে, তখন যেন সেই গোড়ার বিরোধটা ভুলিয়া যায়। সাধারণ শত্রু যে জড়, তাহার সহিত বিরোধটা যেন ভুলিয়া গিয়া পরস্পর ঘরোয়া বিরোধে লিপ্ত হইয়া পড়ে। ফলে, সমস্ত প্রাণী যেন দুইটা স্কন্ধাবার আশ্রয় করিয়া পরস্পর যুধ্যমান দুইটা দলের উৎপত্তি করিয়া ফেলিয়াছে। একটা দলের নাম উদ্ভিদ্; আর একটা দলের নাম জন্তু। জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণ-পদার্থে পরিণত করিবার ভারটা মুখ্যতঃ উদ্ভিদের উপরে পড়িয়াছে। আমাদের এই ভূ-পৃষ্ঠে প্রত্যেক উদ্ভিদ্ স্বস্থানে গঁট্ হইয়া বসিয়া অর্ব্বুদ মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য্যের দিকে পত্রপল্লবরূপী হাজার পেট পাতিয়া দিয়া সূর্য্যের আলো এবং উত্তাপ হইতে বল সংগ্রহ করিয়া, বায়ুরাশি হইতে কয়লা আত্মসাৎ করিতেছে এবং ভূমির মধ্যে শিকড়রূপী সরু মুখ চালাইয়া দিয়া মৃত্তিকা হইতে লোনা জল সংগ্রহ করিতেছে; এবং সেই কয়লা ও লোনা জলের সহিত এটা-ওটা-সেটা মিশাইয়া প্রাণি-পদার্থ অর্থাৎ protoplasm তৈয়ার করি-তেছে। এইরূপে জড়কে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণি-পদার্থে পরিণত করিবার ভার লইয়াছে উদ্ভিদ্। আর একটা দল জন্তু। ইহারা জড় পদার্থকে আত্মসাৎ করিতে পারে না। কিন্তু উদ্ভিদ্‌কে আত্মসাৎ করিয়া উদ্ভিদের প্রস্তুত প্রাণি-পদার্থকে হজম করিয়া আপনাদের দেহের পুষ্টি করিয়া থাকে। মনে রাখিবেন, উদ্ভিদ্ ও জন্তু উভয়কেই আমি প্রাণীর মধ্যে ফেলিয়াছি। উদ্ভিদেরা ধীর, স্থির, গম্ভীর, সঞ্চয়ী; আর জন্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে ডাকাত। উদ্ভিদেরা আপনার নৈপুণ্যের বলে এবং মিতব্যয়িতার বলে সারাজীবন ধরিয়া যাহা সঞ্চয় করে, জন্তুগুলি অবলীলাক্রমে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা অপহরণ করিয়া আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। প্রাণিপদার্থ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা জন্তুর নাই,—সে পটুতা আছে উদ্ভিদের। জন্তুরা জোর করিয়া পরের দ্রব্য লইয়া স্ফূর্ত্তি করিতেই মজবুত। এই যে স্ফূর্ত্তি, ইহা প্রাণেরই স্ফূর্ত্তি; উদ্ভিদের তুলনায় জন্তুর মধ্যে এই প্রাণের স্ফূর্ত্তি উৎকট ভাবে দেখা দেয়। উদ্ভিদেরা স্বস্থানে বসিয়া সঞ্চয় করিয়া যায়, আর স্ফূর্ত্তিমান জন্তুরা ছুটাছুটি করিয়া, যেখানে উদ্ভিদের সন্ধান পায়, সেইখানে উপস্থিত হইয়া সেই সঞ্চিত ধন হরণ করিয়া থাকে। হরণ করিয়াও রাখিতে পারে না; অমিতব্যয়ীর মত খরচ করিয়া ফেলে, এবং আবার ডাকাতি করিতে বাহির হয়। এইরূপে একটা চিরন্তন বিরোধ, জন্তুর সহিত উদ্ভিদের বিরোধ। জন্তুদের মধ্যে সকলের আবার উদ্ভিদ্-ভোজনেও প্রবৃত্তি নাই। ছাগল ঘাস খায় বটে, কিন্তু বাঘ ঘাস হজমের পরিশ্রমটুকু স্বীকারে নারাজ। সে আস্ত ছাগলকেই আত্মস্থ করিয়া স্ফূর্ত্তির সহিত বিচরণ করে। এখানে জন্তুর সহিত বিরোধ জন্তুর। দেখিতে পাইতেছেন, সমস্ত জগৎটাই একটা বিরোধের ক্ষেত্র। গোড়ায় বিরোধ, প্রাণের সহিত জড়ের; তাহার উপরে বিরোধ প্রাণীর সহিত প্রাণীর; তাহার মধ্যে বিরোধ উদ্ভিদের সহিত জন্তুর

এবং জন্তুর সহিত জন্তুর। এই যে সকল বিরোধ, ইহাও আবার মোটা বিরোধ, ইহার চেয়েও সূক্ষ্মতর বিরোধ আর একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। বাঘের সহিত ছাগলের বিরোধ আছে বলিয়া মনে করিবেন না যে, বাঘেদের মধ্যে পরস্পর পরম সম্প্রীতি রহিয়াছে। পৃথিবীতে ছাগলের সংখ্যা এত অধিক নহে, যাহাতে পৃথিবীর যাবতীয় বাঘ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে। সকল বাঘের উচিতমত আহার যোগাইতে হইলে পৃথিবীর ছাগলে কুলায় না, ছাগলের উপর গরু-ভেড়া প্রভৃতি যোগ করিলেও কুলায় না। ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। এই কথাটার উপরে ডারুইন বিশেষভাবে জোর দিয়াছিলেন। কুলায় না বলিয়াই বাঘের সহিত বাঘের বিরোধ। ছলে-বলে-কৌশলে যে বাঘ আহার সংগ্রহ করিতে পারে, সে-ই টিকিয়া যায়, জিতিয়া যায় এবং তাহারই বংশ থাকে। অন্যে অকালে মরিয়া যায় এবং বংশ রাখিতে পারে না। প্রত্যেক বাঘ এইরূপে আপন জীবন রক্ষার জন্য অন্য সমুদয় বাঘের সহিত অবিরাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছে। এই যুদ্ধ সকল সময়ে মারামারি, কামড়াকামড়ি, রক্তারক্তিতে পরিণত না হইতে পারে। রক্তারক্তির সহিত যে লড়াই, তাহা মোটা লড়াই, তাহা সহজেই চোখের উপর ধরা পড়ে; কিন্তু ছল-বল-কৌশল প্রভৃতি যাবতীয় নীতি প্রয়োগ করিয়া এই যে অবিরাম গুপ্ত লড়াই, ইহা তাহার চেয়েও ভীষণ; ইহার ফলাফল তাহার চেয়েও সূক্ষ্ম এবং দূরগামী। বিংশ শতাব্দীর সভ্যসমাজের সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সহকৃত যে রক্তারক্তি, তাহার ভীষণতার নিকট আটিলার বা জঙ্গিস খাঁয়ের খাঁটি রক্তারক্তি হারি মানে। Darwinএর পর হইতে যোগ্যের জয়, অযোগ্যের পরাজয় প্রভৃতি নানা কথা আপনারা শুনিয়া আসিতেছেন—তাহা এই জীবনযুদ্ধেরই ফল। বস্তুতঃ এই বিরোধের ফল অতি সূক্ষ্ম এবং অতি দূরগামী। নির্ম্মমতায়, নিষ্ঠুরতায় কোন বিরোধের সহিত ইহার তুলনা হয় না। এখানে কেহ কাহারও আত্মীয় নাই, কোনরূপ আত্মীয়-পর বিচার নাই, স্বজাতি-পরজাতি বলিয়া কোন পক্ষপাত নাই। এমন কি, পিতা-পুত্রের মধ্যেও এখানে কোনরূপ মমত্ব-বোধ নাই। পিতা যখনই অন্নের গ্রাস নিজের মুখে তুলিতেছেন, তখনই তিনি আপন পুত্রকে বঞ্চিত করিতেছেন। তাহা ত হইবেই। ইহা নিতান্ত সত্য কথা যে, পৃথিবীতে অন্নের মাত্রা পরিমিত। উদ্ভিদ্ জড়দ্রব্য আত্মসাৎ করে; কিন্তু পৃথিবীর জড়দ্রব্যের কিঞ্চিৎমাত্র গ্রহণযোগ্য; অধিকাংশই বর্জ্জনীয়। জন্তু উদ্ভিদ্‌কে আত্মসাৎ করে, কিন্তু যত জন্তু, তত উদ্ভিদ্ নাই। নতুবা এক জন্তু অন্য জন্তুকে আত্মসাৎ করিতে যাইবে কেন? অন্নের মাত্রা যখন নিতান্তই পরিমিত, তখন পিতা যখনই অন্নের গ্রাস নিজ মুখে অর্পণ করিলেন, পুত্রকে তখনই সেই গ্রাস হইতে বঞ্চিত করিলেন। আজি না হউক, ভবিষ্যতে কোন একদিন পুত্রকে সেই বঞ্চনার ফল ভোগ করিতে হইবেই। প্রাণীমাত্রেই এই হিসাবে ঘোর স্বার্থপর, এবং প্রাণের মত স্বার্থপর পদার্থ আর কিছুই নাই। গতবারে প্রাণের এই স্বার্থপরতার কথা আমি খুব ঘনাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; আপনারা হয় ত সে কথাটা তখন সম্পূর্ণ স্বীকার করেন নাই; কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ কালের প্রাণবিদ্যার পক্ষে এ কথাটাই সব চেয়ে বড় কথা এবং এই কথাটার সত্যতা অতি স্পষ্ট ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন বলিয়া ডারুইনের এত মাহাত্ম্য।

প্রাণিগণের পরস্পরের মধ্যে এই যে বিরোধ, অন্নের জন্য যে বিরোধ, যে বিরোধের কথা ডারুইনই স্পষ্টভাবে উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিরোধটা মোটা-মোটা বহু কোষে নির্ম্মিত multicellular প্রাণীর মধ্যেই প্রবলভাবে এবং তীব্রভাবে দেখা যায়। এক কোষে নির্ম্মিত unicellular প্রাণীরা—যাহারা আমাদের চোখের আড়ালে থাকে—তাহাদের মধ্যে তত স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। ডারুইনও সেই মোটা-মোটা প্রাণীর পরস্পর বিরোধই সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। ডারুইনের সময়ে Bacteriology-বিদ্যার উৎপত্তি হয় নাই বলিলেই হয়। এই বিরোধের আলোচনা করিতে গেলেই, মৃত্যু তাহার সমস্ত বিভীষিকা লইয়া চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। একটা প্রাণী অতি তুচ্ছ কারণে অপর প্রাণীকে মারিয়া ফেলে,—হয় তাহার দেহটাকেই আত্মস্থ করে, নয় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার মুখের অন্ন কাড়িয়া লয়। পরস্পরকে মারিবার জন্য প্রাণি-জগতে যে নিরন্তর চেষ্টা, তাহাই জীবন-সংগ্রাম। এই জীবন-সংগ্রামে কে কোন্ সুবিধায় জিতিয়া যায়, তাহা বলা কঠিন। কেহ ছলে, কেহ বলে, কেহ কৌশলে জিতিয়া যায়। অন্যে অতি সামান্য ত্রুটিতে পরাজিত হয়। সংগ্রামটা

এত ভীষণ যে, কোন স্থানে, কোন মতে, কোন একটুকু ত্রুটি হইলেই পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, ফল অকালমৃত্যু। প্রাণী কেবলই মরিতেছে, অজস্রভাবে মরিতেছে—এত অজস্রভাবে মরিতেছে যে, একটুকু হিসাব করিয়া দেখিতে গেলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। মনে করুন দেখি, একটা মাছে কত ডিম পাড়ে। প্রত্যেক ডিম যদি বাঁচিয়া থাকিয়া পূর্ণাঙ্গ মাছে পরিণত হইত, এবং সেই প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ মাছ আবার পূর্ব্বের মত ডিম পাড়িবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে মৎস্যবংশের স্থান হইতই বা কোথায়? আহার জুটিতই বা কিরূপে? লাখটা মাছের মধ্যে একটা মাছও হয় ত পূর্ণাঙ্গ হইবার অবকাশ পায় না—তৎপূর্ব্বে অন্য জন্তুর উদরসাৎ হয়, অথবা জড়-জগতের দৌরাত্ম্যে প্রাণ পরিত্যাগ করে। ভাগ্যে মৃত্যু ছিল, তাই পৃথিবীতে অন্য জন্তুর স্থান হইয়াছে; নতুবা মৎস্যপূর্ণ বসুন্ধরায় অন্য জন্তুর উপস্থিতির কোন সুযোগই ঘটিত না। মৎস্য বংশ ধ্বংস করিবার জন্যই মৃত্যুর সহস্র পথ খুলিতে হইয়াছে, সহস্র শত্রুর উপস্থিতি আবশ্যক হইয়াছে। ফলে মাছের শত্রুসংখ্যা এখন এত বেশী এবং মাছের মৃত্যুর পথ সংখ্যায় এত অধিক যে, এখন মৎস্যবংশ রক্ষা করাই সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। এখন মৎস্যবংশ রক্ষা করিবার জন্যই যেন মাছের মাকে লক্ষ ডিম্ব প্রসব করিতে হইতেছে। এ বড় কৌতুকের কথা। মৎস্যবংশ ধ্বংস করিবার জন্যই মাছের বহু শত্রুর আবশ্যক; নতুবা পৃথিবী মাছেই ভরিয়া উঠে। আবার সেই শত্রু হইতে মৎস্যবংশ রক্ষা করিবার জন্য মাছের জননীকে বহু সন্তানের প্রসবিনী হওয়া দরকার; নতুবা মৎস্যবংশ পৃথিবীতে লুপ্ত হয়। এ অত্যন্ত কৌতুকের ব্যবস্থা নয় কি? একদিকে বংশবৃদ্ধি নিবারণের জন্য মৃত্যুর আবশ্যকতা; অন্যদিকে মৃত্যু হইতে বংশ রক্ষার জন্য অতিরিক্ত বংশবৃদ্ধির প্রয়োজন। ইহাও ত একটা প্রকাণ্ড বিরোধ। বংশনাশের ব্যবস্থার সহিত বংশরক্ষার ব্যবস্থার বিরোধ—যেন জীবনের সহিত মৃত্যুরই বিরোধ। ব্যাপারটা যেন রক্তবীজের লড়াই। রক্তবীজকে যতই ধ্বংসের চেষ্টা হইতেছে, রক্তবীজ ততই বাড়িয়া যাইতেছে; প্রত্যেক ফোঁটা রক্ত হইতে কোটি রক্তবীজ জন্মিতেছে। প্রকৃতিদেবী নিষ্ঠুরা—নির্ম্মম খড়্গাঘাতে আপন সন্তানদিগকে বধ করিতেছেন; কিন্তু বধে কুলাইতেছে না; একের স্থানে কোটি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রকৃতি দেবীর যে মূর্ত্তি ডারুইন খুলিয়া দেখাইয়াছেন, তাহা নিতান্তই উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি; তাহা সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্তধারা-বিস্ফুরিতাননা মূর্ত্তি।

মৃত্যু বলিতেছে, আমি জীবনকে নষ্ট করিব; জীবন বলিতেছে, আমি মৃত্যুকে ফাঁকি দিব। এই ফাঁকি দিবার জন্য জীবন যে কত কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতি সামান্য ত্রুটিতে যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন কোন-না-কোন রূপে সেই ত্রুটি সাম্‌লান দরকার। যে অযোগ্যতায় পরাজয়ের আশঙ্কা, সেই অযোগ্যতা কোন-না-কোন রূপে পরিহার করিতেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, যোগ্যেরই জয়—অযোগ্যেরই পরাজয়। যেখানে যেটুকু অযোগ্যতা আছে, সেটুকু দূর করিতে হইবে। মেরুদণ্ড শক্ত করিতে হইবে, দাঁত ধারাল করিতে হইবে, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিতে হইবে, মাথার মধ্যে মগজ জমাইতে হইবে, দুই পায়ে ভর দিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, জলে সাঁতরাইতে অথবা হাওয়ায় উড়িতে হইবে, আঁধারে লুকাইতে হইবে অথবা রঙ বদ্‌লাইয়া অদৃশ্য হইতে হইবে, দল বাঁধিয়া পরস্পরের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, অথবা বুদ্ধি খেলাইয়া জড়দ্রব্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া সেই বুদ্ধিকে আত্মরক্ষার অস্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। ঘটিয়াছেও তাহাই—কোনও প্রাণী পাখী হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে, কেহ মাছ হইয়া জলে সাঁতার দিতেছে, কেহ সাপ হইয়া বিষ উদ্গিরণে শত্রু নাশ করিতেছে, কেহ ছুঁচা হইয়া গর্ত্তের ভিতর লুকাইয়া আছে, কেহ পোকা হইয়া গায়ের গন্ধে শত্রুরও অগ্রাহ্য হইতেছে, কেহ বাঘ হইয়া ঘাসের বনে আত্মগোপন করিয়া অসতর্ক শিকারের অপেক্ষায় ধারাল নখ এবং দাঁত লইয়া বসিয়া আছে। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন প্রাণীই ত ভিন্ন-ভিন্ন জাতি বা Species। এই নানাজাতি প্রাণীর উৎপত্তি কেবলই ত আত্মরক্ষার জন্য এবং শত্রুবিনাশের জন্য। মানুষও যে তাহার খুলির ভিতরে একরাশি মগজ এবং সেই মগজের অনুযায়ী বুদ্ধিশক্তি সত্ত্বেও দল বাঁধিয়া, সমাজ বাঁধিয়া পরস্পরের বাধ্যবাধকতা স্বীকার করিয়াছে, তাহারও মূল কারণ ত সেইখানে। তাহার যখন বাঘের মত দাঁত নাই, নখ নাই, বা জলে ডুবিবার বা হাওয়ায় উড়িবার ক্ষমতা নাই, বহুরূপীর মত রঙ বদলাইয়া শত্রুর দৃষ্টি এড়াইবার শক্তি নাই, সে যখন সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল—তখন এইরূপে

সমাজ না বাঁধিলে, পৃথিবীতে তাহার স্থান হইত কোথায়? সে আত্মরক্ষা করিত কিরূপে? মনে করিবেন না যে, পরের প্রতি প্রেমের বশীভূত হইয়া মানুষ সমাজ বাঁধিয়াছে; মানুষ দল বাঁধিয়াছে স্বার্থ রক্ষার জন্য; আপনাকে বাঁচাইবার জন্য; পরকে নাশিবার জন্য। প্রাণবিদ্যা প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করে না; প্রাণবিদ্যার এই নিগূঢ় তথ্য খুলিয়া বলিয়াছেন, জর্মনি দেশের Nietzche; তাই জর্মনি আজ সমস্ত পৃথিবীর সহিত লড়াইয়ে মাতিয়াছে; প্রেমের কথা তাহাকে শুনাইতে যাইবেন কি? ফলে, যে যেমনে পারে, সে সেইরূপে আত্মরক্ষার এবং শত্রুনাশের উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছে; এবং তাহারই ফলে এই প্রাণময় জগতে বিবিধ বিচিত্র প্রাণিজাতিসমূহের উদ্ভব ঘটিয়া গিয়াছে—ইহাই হইল ডারুইনের Origin of Species।

প্রাণী জানিতেছে, মৃত্যু ত আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, একটু ত্রুটি পাইলেই আমাকে গ্রাস করিবে; কিন্তু মৃত্যুকে ত আমার ফাঁকি দেওয়া চাই। মৃত্যুকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সে একটা অপূর্ব্ব কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহার দেহের কিয়দংশ,—খানিকটা প্রাণি-পদার্থ—দেহের মধ্যে অতি সন্তর্পণে গুপ্ত করিয়া রাখে। নিজের একটু বয়স হইলেই সেই যত্নরক্ষিত প্রাণিপদার্থকে দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া ছাড়িয়া দেয়। এই ব্যাপারের নাম অপত্যোৎপাদন। অপত্যরূপী প্রাণপদার্থ এইরূপে জন্মলাভ করিয়া আপনার দেহ আপনি বানাইয়া লয় এবং সেই দেহের মধ্যে আপনাকে গোপনে লুকাইয়া রাখে। এইরূপে একটা নূতন প্রাণীর উৎপত্তি হয়। সময় উপস্থিত হইলে এই নূতন প্রাণী আপনাকে স্ব-দেহ হইতে বিচ্যুত করিয়া অপত্যের জন্ম দেয়। সেও আবার নূতন করিয়া আপনার দেহ গড়িয়া লইয়া তৃতীয় প্রাণীর সৃষ্টি করে। এইরূপে অপত্য-পরম্পরায় প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়। প্রত্যেক প্রাণী মরিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার অপত্য তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রাণের ধারা রক্ষা করে। অপত্য উৎপাদনের জন্য দেহ মধ্যে যে প্রাণিপদার্থটুকু গুপ্ত থাকে, সেইটুকু বীজ; এবং যে দেহের মধ্যে উহা সযতনে রক্ষিত থাকে, সেইটুকু যেন সেই বীজের খোসা বা আবরণ। সেই বীজকে বাহিরের শত্রুর আক্রমণ হইতে, বাহিরের যাবতীয় আপদ হইতে রক্ষা করাই সেই দেহের, সেই আবরণভাগের, একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রাণীর যে দেহ আমাদের চোখে পড়ে, সেটা কেবল খোসামাত্র; এবং সেই দেহের অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র কণিকাটুকু লুকান থাকে, সেই বীজটুকুই আসল প্রাণী। দেহরূপ কৌটার ভিতরে যেন এই অমূল্য রত্নকণা সংগোপনে রক্ষিত থাকে। সেই লুকান রত্নটির, সেই বীজটির, যেন নাশ নাই। সে কেবল এক দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেহান্তরে আশ্রয় লয়; এবং এইরূপে গুপ্ত থাকিয়া বাহিরের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। এই আসল প্রাণীটুকু বস্তুতঃ অমর, ইহার ধ্বংস নাই। কিছু দিনের জন্য যে দেহের মধ্যে থাকিয়া সে আত্মরক্ষা করে, সেই দেহটাই ধ্বংসশীল। বাহ্যজগতের আক্রমণ এই দেহের উপর দিয়াই যায়; এবং সেই দেহটাই কিছুকাল ধরিয়া বাহ্যজগতের সঙ্গে লড়াই চালাইয়া অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দেহের এই ধ্বংসকেই আমরা বলি মৃত্যু। আসল যে মাণিকটি তাহার ধ্বংস হয় না; মাণিকের কৌটাটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কৌটাটি মাঝে-মাঝে বদলাইতে হয়। যখনই তাহার জীর্ণ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা জন্মে, তাহার পূর্ব্বেই তাহা পুরাণ কৌটা ত্যাগ করিয়া নূতন কৌটা আশ্রয় করে। নূতন কৌটা আশ্রয় করে বলিলে চলিবে না—আপনার কৌটা আপনি গড়িয়া লয় বলিতে হইবে। ইহাই ত প্রাণের কারিকরি। জড়দ্রব্য কোনরূপে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না; কিন্তু জড়দ্রব্যে প্রাণের সঞ্চার হইবামাত্র উহা প্রাণিপদার্থে পরিণত হয়, এবং সেই প্রাণিপদার্থ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবার শক্তি রাখে। প্রাণের ইহাই বিশিষ্ট ধর্ম্ম। প্রাণ আপনাকে যেরূপেই হউক রক্ষা করিবেই। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহাই খুব খোলসা করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আসল প্রাণীটার এই নূতন-নূতন দেহ-পরিগ্রহ—এই খোলস-ছাড়ার ব্যাপার—ইহারই নাম বংশানুক্রম; এবং এই বংশানুক্রমের কৌশল উদ্ভাবন করিয়া বহুকোষে নির্ম্মিত multicellular প্রাণিগণ মৃত্যুকে এড়াইবার কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, প্রাণী নিয়তই মরিতেছে; কিন্তু প্রাণের ধারা লুপ্ত হইতেছে না—এক দেহ হইতে অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণ আপনাকে জীবন-সংগ্রামে আজি পর্য্যন্ত অপরাজিত রাখিয়াছে। Darwinএর পরবর্ত্তী Weismannএর নিকট আমরা এই তথ্যটির সন্ধান পাইয়াছি।

ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। আমরা দেহটাকেই প্রাণীর সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। অস্থি-মজ্জা-শোণিত-মাংস ইত্যাদি নানা ধাতুতে এই দেহ নির্ম্মিত। হাত, পা, মাথা, বুক, পেট, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি নানা অবয়ব, নাক-মুখ-চোখ ইত্যাদি নানা ইন্দ্রিয়, এই দেহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। এই দেহটাকেই আমরা চোখের সাম্নে দেখিতে পাই, এবং ইহাকেই প্রাণীর সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করি। এই প্রকাণ্ড দেহের কোন্ অভ্যন্তরে আসল প্রাণীটি সংগোপনে চোখের আড়ালে রক্ষিত আছে, তাহার বড়-একটা খোঁজই রাখি না। অথচ এই দেহটা কেবল একটা আবরণমাত্র, একটা আচ্ছাদনমাত্র, একটা কৌটামাত্র, একটা ঢাক্‌নামাত্র, একটা খোলসমাত্র। প্রাণীকে রক্ষা করা এই খোলসের একমাত্র উদ্দেশ্য; কাজেই জীবন-সংগ্রামে লড়াইয়ের ভারটা এই দেহের উপরেই পড়ে—বাহ্যজগতের সমস্ত আক্রমণটাই এই দেহের উপর দিয়াই যায়। বাহিরের সমস্ত উপদ্রব, সমস্ত অত্যাচার, এই দেহকেই সহিতে হয়; এবং এই সমস্ত উপদ্রব-অত্যাচার সহিয়া জরাজীর্ণ অবস্থায় এই দেহকেই ধ্বংস পাইতে হয়। ইহার অভ্যন্তরস্থ আসল প্রাণীটি অবিনাশী থাকে, অবিকৃত থাকে, বাহিরের কোন উপদ্রব তাহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। যত কিছু বিকার, বৈকল্য—তাহা সেই দেহের উপর দিয়া যায়। এই দেহ যেন দুর্গবিশেষ—শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলা-গুলি সেই দুর্গটিকেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করে। দুর্গের যে মালিক, সে নিশ্চিন্ত হইয়া দুর্গমধ্যে আপনার কুঠরিতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া অবিকারে নিদ্রা যায়। নিতান্তই যখন দুর্গটি আর টেকে না, তাহার পূর্ব্বেই দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নূতন দুর্গ গড়িয়া লইয়া তাহার ভিতরে আবার সুখসুপ্ত হয়। ফলে, যাহাকে মৃত্যু বলা যায়, তাহা মৃত্যু নহে, তাহা খোলস-ছাড়া ব্যাপার। জীবনযুদ্ধে সামর্থ্য পাইবার জন্য জীর্ণ খোলস ত্যাগ করার ব্যাপার—ইহা প্রাণ-রক্ষারই কৌশল। বস্তুতঃ প্রাণী মরে না। মৃত্যু প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণি-কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত কৌশলমাত্র।

দেখা যায়, পুত্রের দেহ প্রায় সর্ব্বাংশেই পিতৃদেহের সদৃশ। পুত্রের আকৃতি-প্রকৃতি প্রায় সর্ব্বাংশেই পিতারই অনুরূপ হয়; অর্থাৎ নূতন খোলসটি প্রায় সর্ব্বাংশেই পুরাতন খোলসটির অনুরূপ হয়। মানুষের বাচ্চা মানুষই হয়, কুকুরের বাচ্চা কুকুরই হয়, আমের বীজে কাঁঠাল-গাছ জন্মে না, ইহাই নিয়ম। ইংরাজিতে ইহাকে বলে heredity। বাঙ্গলায় বলিব পিতৃক্রম। ইহাতে তত বিস্ময়ের কারণ নাই। একই প্রাণী যখন অবিকৃত থাকিয়া জন্ম-পরম্পরায় ভিন্ন-ভিন্ন দেহ গড়িয়া লয়, তখন সেই পূর্ব্বজন্মের দেহ আর পরজন্মের দেহ সর্ব্বাংশে সদৃশ হইবে ইহাতে বিস্ময় কি? যে বীজ পিতার দেহ গড়িয়াছিল, সেই বীজই যখন পিতৃদেহ হইতে চ্যুত হইয়া আসিয়া এবং বাহিরের আক্রমণ-সত্ত্বেও অবিকৃত থাকিয়া পুত্রের দেহ নির্ম্মাণ করে, তখন পুত্র সর্ব্বাংশে পিতার অনুরূপ হইবে, ইহাতে বিস্ময় কি? সর্ব্বাংশে অনুরূপ না হইলেই বরং বিস্ময়ের কথা হইত। আপনারা প্রণিধান করিবেন, আমি একটুকু সাবধানে কথা কহিয়াছি। পুত্র সর্ব্বাংশে পিতার অনুরূপ হয়, ইহা আমি বলি নাই—একটা "প্রায়" শব্দ বাক্যমধ্যে বসাইয়াছি; বলিয়াছি, "প্রায় সর্ব্বাংশে অনুরূপ হয়"। পুত্র পিতার মত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে পিতার মত হয় না; একটু-না-একটু পার্থক্য থাকেই। এমন কি, এক পিতার বহু পুত্র থাকিলে, সেই পুত্রগণের মধ্যেও পরস্পর কিছু-না-কিছু ভিন্নতা থাকে। এই ভিন্নতাটুকুকে ইংরাজিতে বলে variation—বিকার, ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম। Heredityতে বিস্ময়ের কথা নাই; কিন্তু এই variationটাই বিস্ময়কর। বাহ্যজগতের সমস্ত উপদ্রবই দেহের উপর দিয়া যায়। ভিতরের বীজ যদি সর্ব্বতোভাবে অবিকৃতই থাকে, তাহা হইলে সেই অবিকৃত বীজ হইতে উৎপন্ন নূতন দেহের এই ভিন্নতা আসে কিরূপে? এ বড় কঠিন সমস্যা। এ কালের অনেক পণ্ডিত জোর করিয়া বলিতে চাহেন, বাহিরের আক্রমণে দেহেরই বিকার ঘটে; কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে বীজকে সে আক্রমণ একেবারে স্পর্শ করে না, বীজ অবিকৃতই থাকিয়া যায়। তাহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সেই অবিকৃত বীজ হইতে যে নূতন দেহ অপত্যরূপে নূতন জন্ম গ্রহণ করে, এই নূতন দেহে ভিন্নতা বা বিকার আসে কোথা হইতে? অথচ এ ব্যত্যয় অস্বীকারের উপায় নাই। বেটা বাপের সকল গুণ পায় না; দুই ভাই, এমন কি দুই যমজ ভাই, সর্ব্বাংশে একরূপ হয় না, ইহা ত সত্য কথা। আবার এই ব্যত্যয় না থাকিলে ধরাপৃষ্ঠে এত বৈচিত্র্য ঘটিত না, নূতন জাতি, নূতন species আবির্ভূত হইত না। Darwin গোড়ায় এই varia-

tion মানিয়া লইয়াছেন—বলিয়াছেন, একই পিতার বহু পুত্রের মধ্যে সকলে জীবন-সংগ্রামে সমান যোগ্য হয় না। যাহার যোগ্যতা কোন-না-কোন কারণে একটু অধিক, তাহারই অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনাও অধিক; তাহারই অপত্য রাখিয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। আর যাহার যোগ্যতা অল্প, তাহারই অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক, তাহার অপত্য রাখিবার অবসর না ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক। কাজেই, যে যোগ্য তাহারই বংশ টিকিয়া যায়; আর যে অযোগ্য তাহার বংশ থাকে না। কিন্তু সকল অপত্যই যদি সর্ব্বাংশে পিতার সদৃশ হইত, তাহা হইলে সকলেরই যোগ্যতা সমান হইত; যোগ্যতার তারতম্য থাকিত না; জীবনযুদ্ধে যোগ্যতমকে বাছিয়া লইয়া, ক্রমশঃ যোগ্যতা-বৃদ্ধি ঘটাইয়া, নূতন জাতির - নূতন speciesএর—উদ্ভাবনা সম্ভব হইত না। ফলে, এই যে নানা speciesএর উদ্ভব, তাহা সেই variationএর ফলেই। খাঁটি heredity থাকিলে বাঘ বা হরিণ, সাপ বা ব্যাঙ—এইরূপ জাতিভেদ থাকিত না—প্রাণিমাত্রই এক জাতি হইয়া পড়িত।

প্রাণীর দেহকে প্রাণরক্ষা-ব্যাপারে কবচ-স্বরূপ মনে করা গিয়াছে। ভিতরে গোপনে রক্ষিত প্রাণীটি এই কবচ পরিয়া বাহুজগতের আক্রমণ প্রতিষেধ করে। কবচটি সেই আক্রমণ প্রতিষেধের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। তলওয়ারের আক্রমণ ঢালে ব্যর্থ হইতে পারে, বল্লমের খোঁচার পক্ষে ইস্পাতের সাঁজোয়া প্রশস্ত; কিন্তু গোলাগুলির আবির্ভাবের সঙ্গে ঢালও গিয়াছে, সাঁজোয়াও গিয়াছে। ধরাপৃষ্ঠ যুগে-যুগে ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। প্রাণীর প্রতি বাহুজগতের আক্রমণও যুগে-যুগে ভিন্ন রূপ লইতেছে। এখন আমরা য়ুরোপকে শীত-প্রধান দেশ বলি। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন, দেড় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপ গ্রীষ্মপ্রধান ছিল; তখন য়ুরোপের মহারণ্যে অতিকায় হাতী, গণ্ডার ও সিংহ, শার্দ্দূল বিচরণ করিত। তার পর য়ুরোপে হিমের যুগ আসে; সমস্ত মহাদেশ বরফে ঢাকিয়া গিয়া প্রকাণ্ড বরফের ক্ষেত্রে পরিণত হয়; ইংরেজিতে সে যুগকে বলে glacial age—হিমানীযুগ। তখন গণ্ডারের বংশ, সিংহের বংশ য়ুরোপ ছাড়িয়া দক্ষিণে পলাইয়া আসিল; অতিকায় হাতীর বংশ, ম্যামথের বংশ হিমের আক্রমণ সহিতে না পারিয়া লুপ্ত হইল। এখন আবার য়ুরোপ গরম হইতেছে; বরফের ক্ষেত্র গলিয়া গিয়াছে; বরফ কেবল উত্তর মেরুর চারিদিকে খানিকটা দেশে বর্ত্তমান আছে, এবং Alps পর্ব্বতের মাথার উপরে আশ্রয় লইয়াছে। ফলে, এই যুগ-বিপ্লবের সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণীকেও আপনার দেহ বদলাইয়া লইতে হইয়াছে। যে দেহ উৎকট গ্রীষ্মের উপযোগী, তাহা উৎকট হিমের উপযোগী নহে। Environmentএর সঙ্গে,—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে—সামঞ্জস্য না থাকিলে, কোন দেহই টিকিতে পারে না। এই সামঞ্জস্য-লাভের যোগ্যতা না থাকিলে, জীবনযুদ্ধে পরাজয় ঘটে। খাঁটি heredity বা পিতৃক্রম স্থিতিশীল; উহাতে চলে না। Variation অর্থাৎ পিতৃক্রম হইতে ব্যত্যয় আবশ্যক হয়। প্রাণীর বীজ যদি বাহিরের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত থাকে, সেই আক্রমণ যদি তাহাকে একবারে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে তাহার এই ব্যত্যয় লাভের, এই variationএর সম্ভাবনা আসে কোথা হইতে? এই প্রশ্নের আজিও মীমাংসা হয় নাই। পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, জীবনযাত্রায় পিতার স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম পুত্রে সংক্রান্ত হয় না; acquired characters are not inherited. অথচ দেখা যায়, যখন সেই পুরাতন পৈতৃক বীজ হইতে অপত্যের দেহ গড়িয়া উঠে, তখন সেই অপত্যের দেহ সর্ব্বাংশে পিতৃদেহের সদৃশ হয় না; কিছু-না-কিছু ব্যত্যয়, বিকার বা ব্যতিক্রম ঘটেই। ঘটে বলিয়াই, অপত্যগণের মধ্যে যোগ্যতা বিষয়ে তারতম্য ঘটে। যে যোগ্যতর, সেই টিকিয়া যায়, তাহারই বংশ থাকে; যে যোগ্যতায় হীন সে টেকে না; তাহার বংশ থাকে না। এককালে পাঁচ আঙুলওয়ালা, চারি আঙুলওয়ালা, ঘোড়া বিদ্যমান ছিল। যুগ বিপ্লবে তাহাদের বংশ টিকে নাই, বংশপরম্পরায় যে ঘোড়া চারিটা আঙুল লুপ্ত করিয়া বাকি একটা আঙুলকে মোটা ও শক্ত করিয়া খুরে পরিণত করিয়াছে, বর্ত্তমান যুগে তাহারই প্রাদুর্ভাব। বিশ্বাস না হয়, আমেরিকায় গিয়া যাদুঘরে প্রমাণ সাজান আছে, দেখিয়া আসুন। যে কারণেই হউক, বীজ অবিকৃত থাকে না। অবিকৃত থাকিলে, ধরাপৃষ্ঠে এত নূতন ধরণের উদ্ভিদ, এত নূতন ধরণের জন্তুর আবির্ভাব হইত না। যুগ-বিপ্লবে যে সব জন্তু আপনাকে বিকৃত করিয়া, নূতন পারিপার্শ্বিক

অবস্থার সহিত আপনার দেহের সামঞ্জস্য করিয়া লইতে পারে নাই,—তাহারা ভূপঞ্জরের পাষাণস্তরে অস্থি-কঙ্কালের নিদর্শন রাখিয়া লোপ পাইয়াছে। অতএব প্রাণি-পদার্থের এই বিকার-প্রবৃত্তি, এই যোগ্যতার্জ্জন-প্রবৃত্তি মানিতেই হইবে। প্রাণিপদার্থ এবং প্রাণিপদার্থে নির্ম্মিত প্রাণিদেহ ক্রমশঃ বিকৃত হয়। সেই বিকৃতি ধীরে-ধীরে, অল্পে-অল্পে বৃদ্ধি পায়, অথবা ধাপের পর ধাপ লাফ দিয়া বাড়ে,—তিলে-তিলে বাড়ে, অথবা তাল-তাল করিয়া বাড়ে,—তাহা লইয়া ডারউইনের শিষ্যেরা এবং De Vries-এর শিষ্যেরা বিতণ্ডা করুন। সে বিতণ্ডায় প্রবেশে আমার এখন দরকার নাই। কিন্তু এই বিকৃতি হিসাবের অঙ্কে ধরা যায় কি না, formulaয় বাঁধা যায় কি না, ইহা calculable বটে কি না, সে বিতণ্ডা আরও বড় বিতণ্ডা। তৎসম্বন্ধে দুটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

গোড়ার একটি কথা আপনাদের স্মরণে আছে কি না, জানি না। পদার্থবিদ্যা বা physical science যাহাকে জড়পদার্থ বলে, তাহার সমস্ত আচরণ formulaয় বাঁধা চলিতে পারে। দিলীপ রাজার প্রজা মনু-নির্দ্দিষ্ট বর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতেও পারিত; কিন্তু যাহা খাঁটী জড়পদার্থ, তাহা বৈজ্ঞানিকের সূত্র-নির্দ্দিষ্ট formula-বাঁধা পথ হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট হইতে পারে না; তাহার সমস্ত আচরণ একেবারে ধরাবাঁধা - determinate; কোন স্থানে কোনরূপ বিচ্যুতির বা freedomএর অবসরমাত্র নাই। খাঁটী জড়পদার্থে যে যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, সেই যন্ত্রের প্রত্যেক আচরণ সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুনির্দ্দেশ্য; হউক তাহা নীরবে গগনচারী বিশাল সৌরজগৎ, অথবা কাণের কাছে টিক্‌টিক্‌কারী ক্ষুদ্র ঘটিকাযন্ত্র। হ্যালির ধূমকেতু কবে উঠিবে, তাহা সৌরজগতের গতি-বিধি-ঘটিত formula-মধ্যে বাঁধা আছে, এবং ঘড়ির কাঁটা কখন্ কোথায় থাকিবে, তাহাও ঘড়ির গতিবিধিঘটিত formulaমধ্যে নিবদ্ধ আছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে—প্রাণিদেহ ঘড়ির মত একটা যন্ত্রমাত্র, অথবা যন্ত্রের অতিরিক্ত আর কিছু প্রাণিদেহে বিদ্যমান আছে? ঘড়ির অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রচুর জটিলতা আছে;—উহার কাঠের খোল ও কাঁচের ঢাকনার ভিতর ছোট-বড় দাঁতাল চাকা, স্প্রিং আর পেনডুলম, ঘণ্টা-মিনিটের কাঁটা, বাজিবার ঘণ্টা আর প্রাতঃসময়ে ঘুম ভাঙ্গাইবার আল্লারম,—এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উহার জটিলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু প্রাণিদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জটিলতার তুলনায় ঘটিকাযন্ত্রের জটিলতা ছেলেখেলা মাত্র। এখন প্রশ্ন এই যে, প্রাণিদেহে জটিলতার চূড়ান্ত থাকিলেও, উহা যন্ত্রমাত্র কি না? একজন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের ভাষা একটু বদলাইয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি;—"The living organism is a machine, but it is a self-stoking, self-repairing, self-preservative, self-adjusting, self-increasing, self-reproducing machine"। হাঁ, প্রাণি-দেহ একটা যন্ত্র বটে; ঘড়ির মতই যন্ত্র বটে। তবে এই ঘড়ি নিজের দম নিজে দেয়, নিজের মরিচা-ধরা চাকায় নিজে তেল দেয়, নিজের স্প্রিং ছিঁড়িলে নিজেই বদলাইয়া লয়, নিজের পেণ্ডুলাম তুলিয়া নামাইয়া আপনাকে রেগুলেট করিয়া লয়, অপিচ, ইহার নিজের কলেবর নিজে বাড়াইয়া ছোট্ট ওয়াচটি বড় ক্লক-ঘড়ির আকৃতি পায়; এবং পঞ্চাশ বৎসর চলিয়া ইহার কাঠামটা যখন নিতান্ত জীর্ণ হয়, তখন আর একটি ছোট্ট বাচ্চা ঘড়ীকে জন্ম দিয়া আপনার যন্ত্রলীলা অবসান করে। ইহার উপরেও বলা যাইতে পারে যে, এই অদ্ভুত নবজাত বাচ্চা ঘড়িটি সর্ব্বাংশে পুরান ঘড়িটার মত হয় না। পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে গৃহস্থের যে রুচির বদল হইয়াছে, তদনুসারে নূতন ফ্যাসানের অনুবর্ত্তী হইবার জন্য, আপনার কাঠামটা একটু নূতন রকমের করিয়া লয়। গত তিনশত বৎসরে ঘড়ির কাঠামতে অনেক উন্নতি হইয়াছে। আগামী তিনশত বৎসরের মধ্যে আরও উন্নতি ঘটিয়া এই রকমের অদ্ভুত ঘটিকা-যন্ত্র দোকানে কিনিতে পাওয়া যাইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে মানিয়া লইতে হইবে, প্রাণীর দেহ-যন্ত্র ঐরূপ যন্ত্রমাত্র; যন্ত্রের অতিরিক্ত আর কিছু উহাতে বিদ্যমান নাই। প্রাণিদেহের নির্ম্মাণে যে বহু উন্নতি ঘটিয়াছে, ভূপঞ্জরের স্তর ঘাঁটিলেই তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং এই উন্নতি, এই variation, যে প্রাণের ধর্ম্মে নিষ্পাদিত হইয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। ঘড়িযন্ত্রের সমস্ত আচরণ mechanical formulaয় বাঁধা যায়, ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই প্রাণের আচরণ formulaয় বাঁধিতে পারা যায় কি না? তাহাই হইল মূলগত সমস্যা।

Heredity বা পিতৃক্রম ব্যাপারটা ধরা-বাঁধার ব্যাপার।

পিতা যেমন ছিল, পুত্র ঠিক্ তেমনি হইবে, কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটিবে না, ইহাই হইল খাঁটি heredity। ইহা এক রকম ছাঁচে ঢালা ব্যাপার, অথবা মুদ্রাঙ্কণের ব্যাপার। এক ছাঁচের পুতুলগুলি ঠিক এক রকমেরই হয়, টাকশালায় একই ছাঁদে এক রকমের মুদ্রা প্রস্তুত হয়; ছাপাখানায় একই ছাপে সকল কেতাবই একই ভাবে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়; heredityর ব্যাপারটা কতকটা সেই রকমের। ইহাকে formulaয় ফেলা সহজ বটে, formulaয় ফেলিবার চেষ্টাও হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে ডারুইনের gemmule theory এবং Weismannএর determinant theoryর উল্লেখ করিতে পারি। এই দুই theory কতকটা atomistic theoryর মত। আজিকার প্রবন্ধের আরম্ভেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, ব্যাবহারিক জগতের কোনরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হইলেই আমাদিগকে কোন-না-কোনরূপ atomistic theoryর আশ্রয় লইতে হয়। পিতামাতার দেহধর্ম্ম কতকগুলা গোটা-গোটা definite characterএর সমষ্টি-মাত্র। এক-একটা character বা গুণ, একটা একটা গোটা জিনিষ; একটা characterএর যেন কোন ভগ্নাংশ নাই। পিতার দেহের মধ্যে যে বীজকোষটি অপত্যরূপে জন্ম গ্রহণের জন্য গোপনে সুরক্ষিত থাকে, সেই বীজকোষের মধ্যে অথবা তাহার অন্তর্গত nucleus বা দানার মধ্যে কতকগুলি গোটা-গোটা কণিকা বিদ্যমান আছে, ইহা সচ্ছন্দে কল্পনা করা যাইতে পারে। ঐ কণিকার gemmule বা ঐরূপ একটা কিছু নাম দেওয়া যাইতে পারে। এক-একটি কণিকার সঙ্গে পিতার এক-একটা characterএর সম্পর্ক কল্পনা করা যাইতে পারে। পিতৃদেহে যতগুলি character, সেই দেহস্থিত বীজকোষের মধ্যে ততগুলি কণিকা; এক-এক কণিকা এক-এক characterএর প্রতিনিধি স্বরূপ। যেমন এক-একটা হরপ এক-একটা ধ্বনির প্রতিনিধি, সেইরূপ। বীজকোষটি যখন দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরে আসে, তখন তাহার সমস্ত কণিকা লইয়াই বাহিরে আসে এবং অপত্য যখন সেই কোষ হইতে নূতন দেহ গড়িয়া তোলে, তখন প্রত্যেক কণিকা আপনার নির্দ্দিষ্ট character সেই দেহ মধ্যে সংক্রান্ত করে। এইরূপে অপত্যের দেহ সর্ব্বাংশে পিতৃদেহের অনুরূপ হয়। এইরূপ একটা theory খাড়া করিয়া heredityর ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ডারুইন এবং ওয়াইজম্যান প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পিতৃক্রম বুঝাইতে যে সকল থিয়োরি খাড়া করিয়াছেন, সে সকলই এই রকমের মোটা থিয়োরি। কিন্তু variationএর ঐরূপ ব্যাখ্যা বড় কঠিন সমস্যা। চেষ্টা যে না হইয়াছে তাহা নয়। যাঁহারা গ্যালটন এবং মেন্‌ডেল্—এই দুইটা নাম শুনিয়াছেন, তাঁহারা এই Variation-তত্ত্ব কিছু শুনিয়া থাকিবেন। বড়-বড় প্রাণীর অপত্য উৎপাদনে দুইটি কোষে সম্মিলনের প্রয়োজন হয়। একটি পিতৃকোষ বা পুংকোষ ও আর একটি মাতৃকোষ বা স্ত্রীকোষ। পিতৃকোষের অন্তর্গত কণিকাগুলি পিতার character বহন করে, এবং মাতৃকোষের কণিকাগুলি মাতার character বহন করে। উভয় কোষের সম্মিলনে যে অপত্য জন্মে, সে পিতা ও মাতা —উভয়েরই character পাইয়া থাকে। এই সম্মিলনের কতিপয় নিয়ম মেণ্ডেলের formulaয় বাঁধা পড়িয়াছে। পিতৃকোষ এবং মাতৃকোষের অন্তর্গত কণিকাগুলির নানাবিধ permutation এবং combinationএ অপত্য-দেহে কতকটা নূতনত্ব আসিবে, তাহা বুঝিতে পারা যায় বটে। এইখানে রসায়ন-বিদ্যা হইতে তুলনা আনিয়া ব্যাখ্যার সুযোগ ঘটিতে পারে। হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত অক্সিজেন পরমাণুর যোগ হইয়া যে জলের অণু উৎপন্ন হয়, তাহাতে হাইড্রোজেনের ধর্ম্মও থাকে না, অক্সিজেনের ধর্ম্মও থাকে না; নূতন ধর্ম্ম – জলের ধর্ম্ম তাহাতে আবির্ভূত হয়। Marsh gasএর অন্তর্গত হাইড্রোজেন পরমাণু সরাইয়া তাহার স্থানে ক্লোরিণ পরমাণু বসাইলে, উহা আর marsh gas থাকে না; উহা একটা নূতন gas হয়। রসায়নবিৎরা যাবতীয় যৌগিক পদার্থকে এইরূপে formulaয় বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। গোটা কতক মূল পদার্থের কণিকা বা পরমাণু আশ্রয় করিয়া অসংখ্য যৌগিক পদার্থের গঠন-প্রণালীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। সেইরূপ কতকগুলা মূল characterএর কণিকা অবলম্বন করিয়া প্রাণিদেহের অসংখ্য বিকৃতির অসংখ্য প্রকার-ভেদের ব্যাখ্যা চলিতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাণিকোষ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার অন্তর্ভুক্ত nucleus বা দানাটিও দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়। দানাটি প্রথমে একগাছি সূতার মত হয়

সূতাগাছটি ছিঁড়িয়া কয়েকটি টুকরা হয়; টুকরার অর্দ্ধেক-গুলি এক পাশে, অর্দ্ধেকগুলি অন্য পাশে, লগ্ন হইয়া দুই-গাছি নূতন সূতা উৎপন্ন হয়; দুই নূতন সূতায় দুইটি নূতন দানা বাঁধে—এক-এক দানাকে কেন্দ্রে লইয়া কোষটি দ্বিখণ্ডিত হয়।

অপত্যোৎপাদন ব্যাপারে পুংবীজের কোষের সহিত স্ত্রীবীজের কোষ মিলিত হয়; তৎপূর্ব্বে উভয় কোষেই এইরূপ ঘটনা ঘটে। দানার সূতাগাছটি ছিঁড়িয়া কতকগুলি টুকরা হয়। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। টুকরাগুলির অর্দ্ধেকমাত্র যুক্ত হইয়া নূতন দানা বাঁধে; অপর অর্দ্ধ সরিয়া পড়ে—দানা বাঁধে না। ফলে পুংকোষের পুরাতন দানার অর্দ্ধাংশমাত্র থাকে, অপরার্দ্ধ নষ্ট হয়। স্ত্রীকোষেরও পুরাতন দানার অর্দ্ধাংশ থাকে, অপরার্দ্ধ নষ্ট হয়। পুংকোষের এই অর্দ্ধের সহিত স্ত্রীকোষের এই অর্দ্ধের মিলন ঘটিয়া পূর্ণ অপত্য-কোষ উৎপন্ন হয়। পুরাতন দানাটি কেনই বা ছিঁড়িয়া খণ্ড-খণ্ড হয়, আর কেনই বা সে খণ্ডগুলির অর্দ্ধেক লুপ্ত হয়, তাহার তাৎপর্য্য এখনও বুঝা যায় না। হয় ত ইহা হইতে একটা পূর্ণাঙ্গ atomistic theory ভবিষ্যতে খাড়া করা চলিবে। কিন্তু তাহা ভবিষ্যতের সমস্যা।

কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান সাধ্য হইবে কি? ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করুন। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মে। সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের যাবতীয় ধর্ম্ম সেই বীজের মধ্যে নিহিত আছে; উহার প্রত্যেক ধর্ম্ম, প্রত্যেক character, এক-একটি কণিকা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। যেন ভবিষ্যতের অশ্বত্থগাছ-টারই অতি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি সেই বীজের মধ্যে আবদ্ধ আছে। বীজ যখন বড় হইয়া গাছে পরিণত হয়, তখন নূতন ধর্ম্ম কিছুই আসে না। যাহা ক্ষুদ্র বীজের অন্তরালে গুপ্ত ভাবে ছিল, প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাই ব্যক্ত হইয়া, বড় হইয়া প্রকাশ পায় মাত্র। অতএব বীজ হইতে গাছের উৎপত্তি, ইহাতে নূতনের সৃষ্টি নাই, ইহাতে পুরাতনেরই আবিষ্কার আছে। শুধু তাহাই কেন। সেই অশ্বত্থ বৃক্ষ হইতে ভবিষ্যতে যত অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে, সে সকলেরই সমস্ত ধর্ম্ম সেই আদি বীজ মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে। সেই প্রথম বীজে যে কয়টি কণিকা ছিল, সেই কয়টিকেই সাজাইয়া, গোছাইয়া, নানারূপে সন্নিবিষ্ট করিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের বংশ-পরম্পরার উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহাকে atomic theory of life বলা যাইতে পারে। রসায়ন শাস্ত্রের পরমাণুবাদ আপনারা জানেন। ধরিয়া লওয়া হয়, আদি কালে বিশ্বব্যাপিয়া কতকগুলা পরমাণু ছিল; অদ্যাপি সেই পরমাণুগুলি বর্ত্তমান আছে; একটিও নষ্ট হয় নাই, অথবা একটিও নূতন আবির্ভূত হয় নাই। প্রাচীন কালের সেই পরমাণুগুলাই নানারূপে দল বাঁধিয়া জমাট বাঁধিয়া যাবতীয় যৌগিক দ্রব্যের উৎপাদন করিয়াছে। সেইরূপ আদিকালে কতকগুলি প্রাণ-কণিকা ছিল। সেই প্রাণ-কণিকাগুলি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, একটিও নষ্ট হয় নাই, একটিরও নূতন সৃষ্টি হয় নাই। সেই পুরাতন প্রাণ-কণিকাগুলি নানারূপে সংহত হইয়া জমাট বাঁধিয়া বর্ত্তমান প্রাণিগণের নানা মূর্ত্তি উৎপাদন করিয়াছে। সমস্ত প্রাণ-ময় জগতে যদি একটা আদি পিতা অথবা আদি মাতা কল্পনা করা যায়, বর্ত্তমান কালের যাবতীয় বংশধর সেই আদি পিতার বা আদি মাতার মধ্যেই যাহা ছিল, গুপ্ত ছিল। কোন characterএর নূতন সৃষ্টি হয় নাই; যাহা ছিল গুপ্ত বা অব্যক্ত, এখন হইয়াছে তাহা ব্যক্ত। এই ব্যাপারকে অভিব্যক্তি বা Evolution বলা যাইতে পারে। একালের পণ্ডিতেরা এই অভিব্যক্তিবাদের জয়ডঙ্কা বাজাইতেছেন। আদিতে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। নূতন কিছুই হয় নাই। যাহা পুরাতন তাহাই নূতন-নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া আপনাকে প্রকাশ বা আবিষ্কৃত করিতেছে মাত্র। এই আবিষ্কার-ঘটনার বা নূতন মূর্ত্তি-গ্রহণ-ঘটনার formula-নির্দ্ধারণ বিজ্ঞান-বিদ্যার কার্য্য। formula বাহির করিয়া ফেলিতে পারিলে, প্রাণময় জগতের যাবতীয় ভবিষ্যৎ ঘটনা বৈজ্ঞানিকের গণনার আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। আচার্য্য হক্সলী এই কথাটা অতি স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তিটা আপনাদিগকে শুনাইতে চাহি।

"If the fundamental proposition of evolution is true, namely, that the entire world, animate and inanimate, is the result of the mutual interaction according to definite laws of forces possessed by the molecules which made up the primitive nebulosity of

the universe, then it is no less certain that the present actual world reposed potentially in the cosmic vapour, and that an intelligence, if great enough, could from his knowledge of the properties of the molecules of that vapour have predicted the state of the fauna in Great Britain in 1888 with as much certitude as we say what will happen to the vapour of our breath on a cold day in winter." একটু ঘুরাইয়া এই উক্তির বাঙ্গালা তর্জ্জমা করিয়া বলা যাইতে পারে—আদিকালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরমাণুগুলি ছড়াইয়া ছিল। সেই পরমাণুগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিত। এখনও কোন বৈজ্ঞানিক সেই সমুদয় আকর্ষণ-বিকর্ষণকে সূত্রবদ্ধ করিতে পারেন নাই; আশা করি, এক দিন পারিবেন। যখন পারিবেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডের ভবিষ্যৎ তাঁহার করতলস্থিত আমলকী ফলের মত আয়ত্ত হইবে। সেই আদিকালে কোন্ পরমাণু কোথায় ছিল এবং কি বেগে ছুটিতেছিল, তাহা বলিলেই তিনিও গণিয়া বলিবেন, কোন্ বর্ষের কোন্ মাসের কোন্ তারিখে ভারতবর্ষ পত্রে আমার এই ভীষণ প্রবন্ধ বাহির হইবে। আচার্য্য টিণ্ডালও অতি সংক্ষেপে ও অতি স্পষ্ট ভাষায় পরমাণুর জয়গান করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, I see in the atom the promise and potency of all terrestrial life.

বিজ্ঞান-বিদ্যার তরফে ইহার অপেক্ষা স্পষ্টতর উক্তি আর হইতে পারে না। প্রাণময় জগতের সমস্ত ব্যাপার যদি গণনাসাধ্য হয়, তাহা হইলে প্রাণের আর বিশিষ্টতা কিছুই থাকে না। সমস্ত প্রাণময় জগৎটা জড়-জগতেরই মূর্ত্তি-ভেদ হইয়া পড়ে, এবং প্রাণি-দেহমাত্রই জড়যন্ত্রে পরিণত হয়। বিজ্ঞানবিৎদের এই দর্পের উক্তি নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করা যাইবে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছি এবং আমার বক্তব্য প্রায় শেষ করিয়াছি। একটা কথা তখন আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলিয়াছিলাম, আপনাদের মনে থাকিতে পারে। যাহা খাঁটি জড়, তাঁহার কোন history বা কাহিনী নাই। জড়ের গায়ে অতীতের কোন দাগ বসে না। অতীত তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়, কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না। একটি হাইড্রোজেনের পরমাণু আদি কালে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে এবং দূর ভবিষ্যতেও সেইরূপ থাকিবে। যে অঙ্গার-কণিকা আজি গাঁজার কলিকায় পোড়াইতেছি, তাহা শঙ্করাচার্য্যের মগজের ভিতর একদিন কিলবিল করিত কি না, তাহার কোন চিহ্ন নাই। একটি মিছরি-দানার গুণাগুণ সম্বন্ধে আজিকার রসায়নের কেতাবে যে কথা লেখা থাকিবে, হাজার বৎসর পরের কেতাবেও ঠিক সেই কথাই থাকিবে। জড় দ্রব্য চির-পুরাতন। সৌর-জগতের গ্রহ-উপগ্রহ আজি কোথায় কি ভাবে আছে, বলিয়া দাও,—কলির শেষে কোথায় কি ভাবে থাকিবে, গণিয়া বলিব; অতীত ইতিহাস জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইবে না। অথবা সত্যযুগের আরম্ভে কে কোথায় কি ভাবে ছিল, তাহা বলিয়া দিলে যুগান্তে বা কল্পান্তে কোথায় কি ভাবে থাকিবে, তাহা হিসাব করিয়া বলা যাইবে; মাঝের অবস্থা জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইবে না। কেন না, প্রত্যেক গ্রহের, প্রত্যেক উপগ্রহের পথ সুনির্দ্দিষ্ট formulaবদ্ধ; সেই পথ হইতে তাহার ভ্রষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। জ্যামিতি-শাস্ত্রোক্ত সরল রেখার দুইটি মাত্র বিন্দু কোথায় আছে বলিয়া দিলে, সমস্ত সরল রেখাটাই বাঁধা পড়িয়া যায়। বৃত্ত-রেখার তিনটি মাত্র বিন্দুর অবস্থান বলিয়া দিলে, সমস্ত বৃত্ত-রেখাটাই বাঁধা পড়িয়া যায়। এও কতকটা সেইরূপ। জড়-দ্রব্য যে পথে চলে, সেই পথের কিয়দংশ বিজ্ঞানবিৎকে ধরিয়া ফেলিতে দাও, তাহার সমস্ত পথটাই বিজ্ঞান-বিদের আয়ত্ত হইয়া পড়িবে। সেই পথ ছাড়িয়া বিপথে যাইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। ইহার মানেই হইল এই যে খাঁটি জড়-দ্রব্যের history নাই। যে দ্রব্যের বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারিলেই তাহার সমস্ত অতীত এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ চোখের উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার history, তাহার পুরাতত্ত্ব, খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন থাকে না। তাহার ভবিষ্যতের কাহিনী জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। কেন না, বর্ত্তমানের মধ্যেই তাহার সমস্ত অতীত এবং সমস্ত ভবিষ্যৎ নিয়মিত রহিয়াছে। এই জন্যই আমি historyর কথা তুলিয়া-

ছিলাম। যাহা চির-পুরাতন, তাহার ইতিহাস নাই। অচিন্তিতপূর্ব্ব নূতনের আবির্ভাবেই পুরাতনত্বের ব্যত্যয় ঘটায়। জড়-জগৎ চির-পুরাতন; উহাতে নূতনের আবির্ভাব সম্ভাব্য নহে। বিজ্ঞান-বিদ্যা একবার উহার গতিবিধি সূত্রবদ্ধ করিয়া ফেলিলে, আর নূতন observationএর, নূতন পর্য্যবেক্ষণের আবশ্যকতা থাকে না। কোনরূপ নূতন experiment বা নূতন পরীক্ষার দরকার হয় না। নিউটন যে দিন Law of Gravitation দ্বারা সৌর-জগতের গতিবিধি বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, তদবধি আর নূতন পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন থাকে নাই। এখনও যদি জ্যোতিষীরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে চাহেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, নিউটনের নিয়মসূত্রে তাঁহাদের সন্দেহ আছে;—কি জানি যদি উহার কোথাও সংশোধন দরকার হয়। নেপচুন গ্রহকে আবিষ্কারের জন্য দূরবীণ লাগাইবার দরকার হয় নাই; কাগজে-কলমে অঙ্ক কষিয়া উহাকে ধরা গিয়াছিল। জড়-জগতের কোন ঘটনা যদি এখনও গণনা-সাধ্য হইয়া না থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহা বিজ্ঞান-বিদ্যার দোষ নহে, উহা বৈজ্ঞানিকের দোষ—বৈজ্ঞানিক এখনও সূত্রবদ্ধ করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই গণনা চলিতেছে না; সেই জন্য এখনও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে; কেবল কাগজে-কলমের হিসাবে কুলাইতেছে না।

আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একটা কথা শুনিয়া থাকিবেন—reversibility। পদার্থবিদ্যা যে সকল ক্রিয়াকর্ম্মের আলোচনা করে, তাহার কতকগুলা reversible, আর কতকগুলা reversible নয়,—irreversible। ইংরাজী reversion শব্দের অর্থ উল্টান বা পাল্টান, সাধু ভাষায় বিপর্য্যাস। যাহাকে উল্টান যায়, বিপর্য্যস্ত করা চলে, তাহা reversible, অন্যে irreversible। যে পথে আসিয়াছে, ঠিক্ সেই পথে যাহাকে ফেরান যায়, তাহাই reversible; যাহা ফিরিবার সময় অন্য পথ ধরে, তাহা reversible নয়। এক স্থান হইতে চলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্ব স্থানে উপস্থিত হইলে, যদি পথ-অতিবাহনের কোন চিহ্ন না থাকে, তাহা হইলে বলা যায় যে ঘটনাটা reversible; কেন না চলার উল্টা ফেরা; যেমন লাভের উলটা লোকসান। চলিতে যেটুকু লাভ হয়, ফিরিতে সেইটুকু লোকসান ঘটে; স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলে লাভে-লোকসানে কাটাকাটি হইয়া পূর্ব্বাবস্থার প্রাপ্তি ঘটে; পথ চলায় কোন নিদর্শনই থাকে না। আর যদি প্রত্যাবর্ত্তনের পর কিছু লাভের অঙ্ক অথবা ক্ষতির অঙ্ক স্থায়ী ভাবে দাঁড়াইয়া যায়, সেই লাভের অঙ্ক বা ক্ষতির অঙ্ককে আমরা পথ-চলার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করিতে পারি; তখন ঘটনাটা হয় irreversible; এই irreversible ঘটনা পথের চিহ্ন বহন করে, যে পথে চলিয়াছে সেই পথের দাগ তাহার গায়ে কাটিয়া বসে; কোন্ পথে চলিয়াছে তাহার তথ্য না জানিলে সেই দাগ কিরূপে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এইস্থলেই পথ-চলার ইতিহাস জানা আবশ্যক হয়। যে ঘটনা reversible, তাহাতে পথ-চিহ্ন কিছুই থাকে না; কাজেই পথ চলার ইতিহাস তাহার পক্ষে অনাবশ্যক। পদার্থ বিশ্ব-মধ্যে এইরূপ reversible এবং irreversible—বিপর্য্যাস-যোগ্য এবং বিপর্য্যাসের অযোগ্য—বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। আপনাদের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য গোটা-কতক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মনে করুন, ঘড়ির পেণ্ডুলম। উহা ক্রমাগত দোল খাইতেছে এবং প্রত্যেক দোলে ওলট-পালট হইতেছে। যেমন ওলট, তেমনি পালট। ঘড়িতে দম দেওয়ার পর উহা চলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত কত দোল খাইয়াছে—উহার গায়ে তাহার কোন চিহ্নমাত্র নাই। আমাদের পৃথিবীটা একটা বৃহৎ পেণ্ডুলম। উহা সূর্য্যের চারিদিকে কেবলই পাক খাইতেছে। এক-এক বৎসরে এক-এক পাক। বৎসরান্তে যথাস্থানে ফিরিয়া আসে; পূর্ব্ব-বৎসরের কোন চিহ্নমাত্র রাখে না। চিহ্ন রাখিলে এত সহজে উহার গতিবিধির বিনির্ণয় জ্যোতির্ব্বিদের পক্ষে সাধ্য হইত না। এইখানে হয় ত আপনারা আমার ভুল ধরিবেন;—ধূমকেতুগুলা পৃথিবীর মত একই নিয়মে সূর্য্যের চারিদিকে পাক খাইয়া ঘুরিয়া আসে, কিন্তু দেখা গিয়াছে, কোন-কোন ধূমকেতু একটু-না-একটু মূর্ত্তি বদলাইয়া ঘুরিয়া আসে; যে পথ অতিক্রম করিয়াছে, সেই পথের চিহ্ন লইয়া ফিরিয়া আসে। Encke সাহেবের ধূমকেতুর যে সময়ে ঘুরিয়া আসা উচিত, তার আড়াই ঘণ্টা আগে সে ফিরিয়া আসে? পথিমধ্যে কিসে তাহাকে ঠেলিয়া দেয়, কে জানে!

Halleর ধূমকেতু [illegible] পৃথিবীর [illegible] ধরিয়া [illegible] আসিয়াছিল; অনেক-যুগ ঘুরিয়া উহা দীর্ঘ [illegible] লইয়া ফিরিয়া আসিল। — এ উত্তরে আমি বলিব, ধূমকেতুটার গতিবিধি ঠিক reversible ছিল না; যে পথে চলিয়াছে, সে পথে এমন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে, —কোন জ্যোতিষী যাহার হিসাব লইতে পারেন নাই— নিউটনের formulaর মধ্যে তাহার হিসাব ছিল না। হয় ত পথে সে কোন রকম বিঘ্ন পাইয়াছিল। যে পথে চলিয়াছিল, সেই পথের সমস্ত ইতিহাসটা জানিলে, আমরা সেই বিঘ্ন-বিপত্তির তথ্য নির্ণয় করিতে পারিতাম। পৃথিবীর মত, চাঁদের মত, বড়-বড় জ্যোতিষ্কের চলাফেরায় সেইরূপ বাধার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, কাজেই তাহাদের গতিবিধি গণনায় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ মজবুত। কিন্তু ধূমকেতুর গণনায় জ্যোতির্ব্বিদ্যাকে হারি মানিতে হয়—তাহার formulaয় কুলায় না। দূরবীণ হাতে করিয়া সমস্ত পথটার পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। পৃথিবীর গতিবিধিতেও যে ঐরূপ বাধাবিপত্তি একেবারে নাই, তাহা কিরূপে বলিব? পৃথিবী এঞ্জিনের চাকার মত ঘুরিতে-ঘুরিতে, আবর্ত্তন করিতে-করিতে চলিতেছে বটে, কিন্তু আড়াই লক্ষ মাইল দূর হইতে চাঁদ সেই পৃথিবী রূপ চাকার পিঠে ব্রেক কষিয়া বসিয়া আছে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলবিনের পূর্ব্বে কেহ তাহার তথ্য জানিত না। মহাসাগরের জলরাশি সেই ব্রেক। চাঁদ সেই জলরাশিকে আপনার দিকে খেঁচিয়া ধরিয়া জোয়ারের উৎপাদন করিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তনকে থামাইবার চেষ্টা করিতেছে; এ তথ্য লর্ড কেলবিনের আগে কেহ জানিত না। চাঁদ সর্ব্বদাই এই লাগাম ধরিয়া বসিয়া আছে। ছয় মাস ধরিয়া পৃথিবী আগে চলিতেছে, তখনও সেই লাগাম; আর, পরবর্ত্তী ছয় মাসে পৃথিবী ঘুরিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে, তখনও সেই লাগাম। এই লাগামের টানে পৃথিবীর আবর্ত্তনের ব্যাঘাত বা ক্ষতি ঘটিতেছে; চলিতেও ক্ষতি; ফিরিতেও ক্ষতি; মোটের উপর খানিকটা ক্ষতি লইয়া পৃথিবী স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। এই ক্ষতিটাই তাহার [illegible] চিহ্ন। এই ক্ষতির পরিমাণ যৎসামান্য; কিন্তু [illegible] বৎসর এই ক্ষতির পরিমাণ [illegible] [illegible]। [illegible] এই ক্ষতি [illegible] [illegible] [illegible] হয় ত সমান থাকিবে না। পৃথিবী এখন যে বেগে আবর্ত্তন করিতেছে, সেই বেগ ক্রমশঃ মন্দ হইবে। কোটি বৎসর পরে দিন রাত্রির পরিমাণ এখনকার ঘণ্টার চব্বিশ ঘণ্টা ছাড়াইয়া উঠিবে। কাজেই পৃথিবীর গতিবিধিকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যাসযোগ্য বলিতে পারি না। উহার মধ্যে একটু একটু ব্যতিক্রম আছে, নিউটনের formulaয় যাহা ধরা পড়িবে না; যাহার জন্য নূতন formula বাঁধিতে হইবে; যত দিন বাঁধিতে না পার, তত দিন ঘড়ি ধরিয়া আবর্ত্তনকাল মাপিয়া যাও। আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। খানিকটা বাতাসে চাপ দিলে উহা সঙ্কুচিত হয়; চাপ তুলিয়া লইলে উহা পূর্ব্ববৎ প্রসার লাভ করে। বরফকে যতটা উত্তাপ দিলে গলিয়া জল হয়, সেই জল হইতে ততটা উত্তাপ বাহির করিলে সেই বরফ ফিরিয়া পাওয়া যায়। চা-খড়িকে গরম করিলে খানিকটা কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বাহির হইয়া যায়; পড়িয়া থাকে খানিকটা চুণ; আবার ঠাণ্ডা করিলে সেই কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস চুণের সহিত মিলিত হইয়া চা-খড়ির উৎপাদন করে।—এই সমস্ত ঘটনা বিপর্য্যাসযোগ্য—reversible। বরফে কোন চিহ্ন থাকে না, যাহাতে বুঝা যায় যে উহা জলের অবস্থায় ছিল। চা-খড়িতে কোন চিহ্ন থাকে না, যে, এককালে উহা চুণের অবস্থায় ছিল। উহাদের অতীত কাহিনী, উহাদের পথের খবর, জানিবার কোন প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু অন্য দৃষ্টান্ত লউন। ইস্পাতের তলোয়ারে মোচড় দেওয়ার পর ছাড়িয়া দিলে, উহা পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে; উহার স্থিতিস্থাপকতা reversible; কিন্তু লোহার কড়ে মোচড় দিলে উহা বাঁকিয়া যায়, পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে না। ইস্পাতকে চুম্বকে ঘষিয়া সহজে উহাকে চুম্বকে পরিণত করা চলে, কিন্তু একবার চুম্বকতা পাইলে আর সহজে সেই চুম্বকতা নষ্ট করা যায় না। গরম দ্রব্যের উত্তাপ সহজেই বাহির হইয়া ঠাণ্ডা দ্রব্যে সঞ্চালিত হয়; কিন্তু ঠাণ্ডা দ্রব্য হইতে সেই উত্তাপ ফিরিয়া গরম দ্রব্যে আসিতে চায় না; তাহা সম্ভব হইলে বরফের উত্তাপে আমরা ভাত রাঁধিতে পারিতাম। এইসকল ঘটনা [illegible] চলে না; ইহারা reversible নহে। একখানা তলোয়ারের আচরণ অন্য তলোয়ারের সমান নহে; একখানা চুম্বক সর্ব্বাংশে অন্য চুম্বকের মত নহে; তাহার ভিতরে উত্তাপের [illegible]

তামার ভিতরে উত্তাপের চলাচলের সদৃশ নহে; এমন কি, দুইখানা তাম্রখণ্ডে উত্তাপ এক নিয়মে চলে না। একটা সাধারণ সূত্রে এক শ্রেণীর যাবতীয় দ্রব্যকে বাঁধা চলে না। প্রত্যেক দ্রব্যের আচরণ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করিয়া, সেই দ্রব্যের জন্য একটি মোটা formulaয় সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; একটা দ্রব্যের আচরণে যে formula খাটে, তদ্রূপ অন্য দ্রব্যের আচরণে সে formula খাটে না। ভিন্ন-ভিন্ন দ্রব্যের আচরণের ভিন্ন-ভিন্ন পথ। প্রত্যেক দ্রব্যেরই যেন একটা গোঁ থাকে; একটা মেজাজ থাকে; সেই গোঁ অনুসারে বা মেজাজ অনুসারে সেই দ্রব্য চলিয়া থাকে; সেই গোঁ বা মেজাজ আমাদিগকে মানিয়া চলিতে হয়। কোন্ দ্রব্যের গোঁ কিরূপ, তাহা পর্যাবেক্ষণে দেখিতে হয়; প্রত্যেকের আচরণের পৃথক্ ইতিহাস পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করিতে হয়। বিশুদ্ধ গণিতবিদ্যায় বা খাঁটি mechanicsএ ইহা কুলায় না; ইহার জন্য physicsএর দরকার হয়। Observation বা পর্যাবেক্ষণ এবং experiment বা পরীক্ষা আবশ্যক হয়। ইহারা যে পথে চলে, সে সমস্ত পথটা দেখিতে হয়; পথের একাংশ দেখিয়া অন্য অংশের নিরূপণ চলে না; এক অংশের বক্রতা দেখিয়া অন্য অংশের বক্রতা নির্দ্ধারণ চলে না।

এই সমুদায় দৃষ্টান্ত জড়জগৎ হইতে লইয়াছি। যে সকল জাগতিক ঘটনা পাল্টান চলে, পাল্টাইলে ঠিক পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে, পথের কোন চিহ্ন রাখে না, সেই ঘটনাগুলাই গণিত-বিদ্যার অধীন থাকে; একবার formulaয় ফেলিতে পারিলে আর ভাবিতে হয় না; কাগজে-কলমে আঁক কষিয়া তাহার গতিবিধি, চালচলন নিরূপিত হয়। কিন্তু যেসকল ঘটনা পাল্টান চলে না, যাহা পূর্ব্বাবস্থায় কিছুতেই ফেরে না, যে পথে চলে সে পথের চিহ্ন গায়ে লইয়া ফেরে, তাহাদের গতিবিধি গণনাযোগ্য হয় না, তাহাদের পথের কাহিনী মন দিয়া আদ্যন্ত শুনিতে হয়, পদে-পদে তাহার দশার বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিতে হয়। জড়জগতের বহু ঘটনা এখনও এই অবস্থায় রহিয়াছে; এখনও বিজ্ঞানবিদের সম্পূর্ণ বশ হয় নাই; জড়জগতের mechanical description এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। এমন কি লর্ড কেলবিনই একদিন বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারই মোটের উপর irreversible; উহা একটা নির্দ্দিষ্ট পরিণতির অভিমুখে একটানে চলিতেছে; সে মুখ হইতে ফিরিয়া আসার কোন সম্ভাবনাই নাই; সেই চরম পরিণতিকে নিবৃত্তি বলা যাইতে পারে; বিশ্বজগতের বৃহৎ যন্ত্রটা চলিতেছে; বহুকাল হইতে চলিতেছে এবং এখনও বহুকাল ধরিয়া চলিবে; কিন্তু একদিন না একদিন এই যন্ত্রকে থামিতে হইবে; নিবৃত্তিতে ইহার সমাপ্তি হইবে; একবার থামিয়া গেলে আর ইহা চলিবে না, আর পাল্টাইবে না। কেলবিনের এইরূপ সিদ্ধান্তের একটি হেতু ছিল। জাগতিক ব্যাপারের সর্ব্বত্রই শক্তির অপচয় হইতেছে; dissipation হইতেছে। জগতের যাবতীয় শক্তি ক্রমশঃ উত্তাপে পরিণত হইতেছে; সমস্ত শক্তি একদিন উত্তাপে পরিণত হইবে। সেই উত্তাপ জগতের সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। আপনাদিগকে বলিয়াছি, উত্তাপ গরম হইতে ঠাণ্ডায় যায়; ঠাণ্ডা হইতে গরমে যায় না; প্রদীপের উত্তাপে বরফ গলে; কিন্তু বরফের উত্তাপে প্রদীপ জ্বলে না। ষ্টীম এঞ্জিনের একটি স্থানে গরম জল সঞ্চিত থাকে, আর এক স্থানে থাকে ঠাণ্ডা জল; ঐ গরম জলের উত্তাপ ঠাণ্ডা জলে সংক্রান্ত হইবার সময় এঞ্জিন চলে; সেই উত্তাপের কিয়দংশ কাজে লাগে; দুই জল সমান গরম হইলে অথবা সমান ঠাণ্ডা হইলে এঞ্জিন চলিত না। জড়জগৎটাও একটা বৃহৎ এঞ্জিন; উহার কোথাও গরম, কোথাও বা ঠাণ্ডা; উত্তাপ কোথাও ঘনীভূত হইয়া গরম হইয়া আছে; কোথাও ছড়াইয়া পড়িয়া ঠাণ্ডা হইয়া আছে। জগতের সমস্ত উত্তাপ যদি সর্ব্বত্র সমানভাবে ছড়াইয়া পড়ে, কোথাও গরম কোথাও ঠাণ্ডা না থাকে, তাহা হইলে জগৎযন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে। জগৎযন্ত্র তখন আর চলিবে না; পরম নিবৃত্তিতে সমাপ্তি পাইবে। সেই চরমদশা হইতে ফিরিবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। কেলবিন বিশ্বজগতের শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর, এই কথা শুনাইয়া বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীকে চমকাইয়া দিয়াছিলেন। এই ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হইলে জগৎযন্ত্র যখন নিরস্ত হইবে, বৈজ্ঞানিকের কোন formulaই তখন আর খাটিবে না। পরম নিবৃত্তির আবার formula কি? উহা ত একাকার নির্ব্বিকার অবস্থা। কেলবিন কর্তৃক এই সিদ্ধান্তের প্রচার হইতে বৈজ্ঞানিকেরা কতকটা মূঢ়ের মত

বসিয়া আছেন; কোন সঙ্গত উত্তর অদ্যাপি দিতে পারেন নাই; তবে তাঁহারা আশা করেন যে, কেলবিনের সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন একটা প্রমাদ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন যে, জড়জগতের কোন ঘটনাই বস্তুতঃ irreversible নহে; এখন যে পাল্‌টাইতে পারি না, সে কেবল আমাদের অক্ষমতা মাত্র। আমাদের হাত-পা প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলা মোটা; চোখ-কাণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় মোটা; আমাদের অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রতন্ত্র সমস্তই স্থূল। জড়পদার্থের সূক্ষ্ম রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি না। সেইজন্যই আমরা ঐসকল ঘটনাকে পাল্‌টাইতে পারিতেছি না। আমরা স্থূল দ্রব্য লইয়াই কারবার করি। এমন কি অণুপরমাণুগুলারও গতিবিধি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না। তাহাদিগকে ধরিয়া-ছুঁইয়া তাহাদের সহিত কারবার করা ত দূরের কথা। সে ক্ষমতা থাকিলে, আমরা সমুদায় জাগতিক ঘটনাগুলাকেই পাল্‌টাইতে পারিতাম। অণুপরমাণু বাছিয়া লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে খাটাইতে পারিতাম। অণুপরমাণুগুলিকে চাপিয়া ধরিতে পারিলে, যদৃচ্ছাক্রমে উলটা পথে প্রেরণ করিতে পারিতাম। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহা পারি না। কাজেই কতকগুলা ঘটনাকে আমরা irreversible—বিশ্বাসের অযোগ্য—মনে করিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া আছি; কিন্তু বস্তুগত্যা আমাদের পক্ষে যাহা অসাধ্য, অন্য জীবের পক্ষে তাহা সাধ্য হইতে পারে; অন্ততঃ ক্লার্ক ম্যাক্‌সওয়েলের মানসপুত্র demonগুলির পক্ষে তাহা অত্যন্ত সুসাধ্য। এই demon গুলির কথা আমি স্থানান্তরে বলিয়াছি; আপনাদের যদি কৌতূহল থাকে, আমার প্রকৃতি নামক পুস্তকের পাতা উলটাইলে তাহাদের পরিচয় পাইবেন। ফলতঃ, জড়জগতে আপাততঃ যে irreversibility দেখিতে পাই, তাহা জড়পদার্থের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী বা essential নহে। কোন জাগতিক ঘটনাকে একেবারে পালটানর অযোগ্য মনে করিবার সম্যক্ হেতু নাই। বিশ্বজগতের কোথাও না কোথাও ক্লার্ক ম্যাক্‌সওয়েলের demonগুলি গুপ্তভাবে বসিয়া আছে, তাহারা সমুদায় ঘটনাকে পালটাইয়া দিতেছে অথবা পালটাইয়া দিবে। তাহারা যে বিজ্ঞানবিদ্যা রচনা করিবে, তাহার কোথাও কোন irreversible ঘটনার উল্লেখ থাকিবে না। কেলবিনের বাণী শুনিয়া বিজ্ঞানবিদ্যার একেবারে হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। বিশ্বজগতের শক্তিরাশির এক দিকে যেমন অপচয় হইতেছে, অন্যত্র সেই অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে বিশ্বজগতের পরিণাম ভাবিয়া শঙ্কিত হইবার হেতু নাই। জগৎযন্ত্র এখনও যেমন চলিতেছে, চিরকালই তেমনি চলিবে; জগৎ-প্রবাহ কস্মিনকালে একেবারে বন্ধ হইবে না। ম্যাকস্‌ওয়েলের demon-গুলাই এমন formula বাঁধিয়া দিবে, চিরকালের জন্য সেই সূত্র দ্বারা নির্দ্ধারিত পথে জগৎপ্রবাহকে চলিতেই হইবে; কখন কোথাও বিচ্যুতির সম্ভাবনা থাকিবে না; কখন থামিয়া হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। লর্ড কেলবিন বর্ত্তমান অবস্থায় জাগতিক শক্তির অপচয় দেখিয়া জগৎ-প্রবাহের অন্ত কল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যা আশা করেন যে, কোন-না-কোন স্থানে এই অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা আছে; তাহা একদিন আবিষ্কৃত হইবেই। জগৎপ্রবাহের অন্ত কল্পনা করিয়া আতঙ্কিত হইতে হইবে না।

বিজ্ঞানবিদ্যার পক্ষে ইহা এখন আশার বাণী। এই আশা কখন পূর্ণ হইবে কি না জানি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, এই irreversibility জড়পদার্থের পক্ষে একেবারে essential নহে। জড়জগতের অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এখনও আবদ্ধ আছে; জড়জগৎ আবহমানকাল ধরিয়া যে পথে চলিতেছে, তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশ বৈজ্ঞানিকের গোচর হইয়াছে। সেই পথ সরল পথ নহে; পক্ষান্তরে উহা বক্র পথ, কুটিল পথ। সরল রেখায় না চলিয়া উহা হিজিবিজি রেখা ক্রমে চলিতেছে। সেই রেখার অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র দেখিয়া অপর অংশের নির্দ্ধারণ বর্ত্তমান বিজ্ঞানবিদ্যার পক্ষে অসাধ্য। কলিকাতা হইতে নৌকাপথে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত চলিয়া দিল্লীর পথের নির্দ্ধারণ কখন সাধ্য হয় না; এও কতকটা সেইরূপ ব্যাপার। জগতের পথ কুটিল পথ বটে; কিন্তু সেই কুটিলতা periodic হইতে পারে; ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার নিরূপণ হইবে কিরূপে? অতএব আমরা কতকটা সাহসের সহিত বলিতে পারি, জড়ধর্ম্মে এমন কিছু নাই যাহা essentially irreversible; যাহা গণনাযোগ্য নহে বা কস্মিনকালে গণনাযোগ্য হইবে না। মানুষের মত ক্ষুদ্রবুদ্ধি জীবের পক্ষে তাহা গণনা-

লক্ষ্য নাই। কেলবিনের সিদ্ধান্ত সত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন, কোনরূপ চরম লক্ষ্যের অভিমুখে চলা জড়ের পক্ষে একান্ত আবশ্যক—essential—নহে। জড় ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে; বাঁধা পথে চলিতেছে, কোন চিহ্ন রাখিয়া বা কোন চিহ্ন লইয়া চলিতেছে না। তাহার সমস্ত অতীতটাকে ধুইয়া-মুছিয়া, বিস্মৃত হইয়া চলিতেছে। কিন্তু প্রাণ যখন জড়দেহ আশ্রয় করিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলে, কিন্তু কোন্ পথে চলে, তাহা আগে হইতে বলিবার কোন উপায় নাই। এখানে তাহার স্বাধীনতা বা freedom রহিয়াছে। তাহার লক্ষ্য স্থির আছে বটে, কিন্তু পথের স্থিরতা নাই। পথের নিরূপণে সে একবারে স্বাধীন। বিজ্ঞানবিদ্যা সেই পথের অনুসরণ করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে; সেই পথে কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিতে পারে, কিন্তু পথ দেখাইতে পারে না। গঙ্গা যখন ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন, সাগর তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল; সমস্ত বাধা কাটাইয়া আপনার পথ তিনি আপনি বাছিয়া লইয়াছিলেন; ভগীরথ বোধ করি তাঁহাকে পথ দেখাইতে পারেন নাই; তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। সেইরূপ, কোন বৈজ্ঞানিক প্রাণের প্রবাহকে কোন নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে পারিবেন কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। প্রাণের প্রবাহের জন্য বৈজ্ঞানিক যে খাতই নির্দ্দিষ্ট করুন, প্রাণের ধারা সেই খাত ছাড়িয়া কখন অন্য খাত আপনি কাটিয়া লইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। এইরূপে প্রাণ স্বাধীনভাবে আপন পথে চলে, এবং চলিবার সময় অতিক্রান্ত পথের সমস্ত নিদর্শন বহন করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত কাদামাটি অঙ্গে মাখিয়া চলিতে থাকে। অতএব প্রাণের একটা কাহিনী আছে। সেই কাহিনী গণনা দ্বারা আবিষ্কারের বিষয় নহে। কেন না, প্রাণ আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লয়, অপরের নির্দ্দেশের অপেক্ষা করে না। প্রাণের কাহিনী যদি জানিতে চান, তাহা হইলে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, পর্ব্বের পর পর্ব্ব পড়িয়া যান। প্রাণ নিজের ইতিহাস নিজেই লিখিয়া যাইতেছে। কোন অধ্যায়, কোন পর্ব্ব হারায় নাই; যদি চোখ থাকে, তাহা হইলে প্রাণীর গায়ে তাহা লিখিত দেখিবেন। ইতিহাস সেখানে লিখিত আছে; hieroglyphic স্বরূপে খোদাই করা আছে। একালের প্রাণিবিদ্যা ভূপঞ্জরের স্তরাবলী ঘাঁটিয়া, মাতৃকুক্ষি ভ্রূণের দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, দেহস্থিত প্রত্যেক কো[ষে] অণুবীক্ষণ লাগাইয়া, সেই অতীত ইতিহাস পড়িবার চে[ষ্টা] করিতেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহা[রা] সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এখানে কোন জ্যোতিষের বচন ভবিষ্[যৎ] গণনায় সফল হইবে না; প্রাণপ্রবাহ কোন্ পথে চলি[বে] ভবিষ্যতে প্রাণ কোন্ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করি[বে] তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে; এ[খন] তাহার কোন হিসাব দেওয়া চলিবে না।

প্রাণের কাহিনী আছে এবং সেই কাহিনী বিরোধে[র] কাহিনী,—নিরন্তর, অবিরাম, অবিশ্রাম বিরোধের কাহিনী এই বিরোধেরই নাম জীবনযুদ্ধ। এই জীবনযুদ্ধের একা[টা] লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এই যুদ্ধ চলিতে[ছে] সেই লক্ষ্যের নাম প্রাণরক্ষা—প্রাণের বর্দ্ধন। প্রা[ণ] আপনাকে রাখিবার জন্য, আপনাকে বাড়াইবার জন্য, এ[ই] যুদ্ধে লিপ্ত আছে। সেই উদ্দেশ্যেই এই জীবনযুদ্ধ চালাই[-] তেছে। সেই যুদ্ধ চালাইবার জন্যই প্রাণ মৃত্যুর উদ্ভাবন করিয়াছে। অতি নিম্নশ্রেণীর এক কোষে নির্ম্মিত unice[l-] lular প্রাণী মৃত্যু জানিত না, কিন্তু বহু কোষে নির্ম্মি[ত] multicellular প্রাণী মৃত্যুর উদ্ভাবনা করিয়াছে এবং সে[ই] মৃত্যুকে এড়াইবার জন্য অপত্যোৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রাণ আপনাকে রাখিতে চাহে, এব[ং] রাখিবার জন্যই আপনাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া থাকে এইরূপে প্রাণ যুদ্ধ চালাইতেছে; সেই যুদ্ধে প্রাণ কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছে, কেবলই মৃত্যু স্বীকার করিতেছে কিন্তু রক্তবীজের মত মরিয়াও মরিতেছে না; সহস্র নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া খড়্গহস্তে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেছে প্রাণ আপনাকে অজস্রভাবে নষ্ট করিতেছে, অজস্রভাবে অপচয় করিতেছে। এই অপচয় দেখিলে অবাক্ হইতে হয় পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী যেন বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মত বিনা কারণে, বিনা বিচারে কেবলই মরিতেছে। মরণ ভিন্ন যেন তাহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই। ইংরাজি ১৮৯১ সালে গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম এক দিন অপরাহ্নে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে সাঁ-সাঁ, সোঁ-সোঁ শব্দ শুনিলাম। "প্রতাপোঽগ্রে ততঃ

শব্দঃ”—এখানে কিন্তু আগে শব্দ তার পর প্রতাপ। আকাশের কোণে যেন একখানা মেঘ দেখা দিল; মেঘখানা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আকাশ ছাইল; সূর্য্য ঢাকিয়া গেল, দিনের আলো মন্দ হইল। মেঘখানা নামিয়া ভূমি স্পর্শ করিল। দেখিলাম পঙ্গপাল—ফড়িঙএর পাল। অবিলম্বেই এই ফড়িঙে ছাইল সকল ঘাট-বাট। গাছের মাথা, ঘরের চাল, দেওয়াল, উঠান, ময়দান, সমস্ত পঙ্গপালে ঢাকিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল। সেই পঙ্গসেনা রাত্রির মত গ্রামেই বিশ্রাম লইল। ভূমিতে নামিয়া গাছপালা, ক্ষেত আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আবার ঝাঁক বাঁধিয়া উত্তরমুখে চলিয়া গেল। দেখা গেল, বড়-বড় গাছগুলা পত্রপল্লবশূন্য হইয়া কঙ্কালসার হইয়াছে; নারিকেল গাছগুলা ন্যাড়া হইয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মত দাঁড়াইয়া আছে। এই পঙ্গপাল উত্তরমুখে চলিল? কোন্ দেশে চলিল? শুনিয়াছি, ক্রমাগত তাহারা উত্তরমুখে চলিয়া হিমাচলের তুষারক্ষেত্রে ঠেকিয়া গিয়াছিল। এবং সেইখানে প্রাণযাত্রা শেষ করিয়াছিল। এক-একটা ঝাঁকে কত ফড়িঙ ছিল কে গণিবে? কত কোটী ফড়িঙ একটা ঝাঁকের মধ্যে ছিল কে তাহার তালিকা দিবে? এই কোটি কোটি প্রাণী উত্তরমুখে চলিয়া হিমাচলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহাকে প্রাণের অপচয় ভিন্ন আর কি বলিব? জড়জগতে আপনারা শক্তির অপচয়ের কথা লর্ড কেলবিনের নিকট শুনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণের এই যে অপচয় ইহা সর্ব্বদা চোখের উপরে ঘটিতেছে।

জীবনযুদ্ধে প্রাণের এই অপচয় দেখিয়া বিস্মিত—ভীত হইতে হয়; কিন্তু এই অপচয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে। আজি আপনাদিগকে জীবনযুদ্ধের যে কাহিনী শুনাইলাম, তাহার মর্ম্ম যদি আপনারা বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে জানিতেছেন যে, এই অপচয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে। প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণের এই অপচয়। এ বড় কৌতুকের কথা। যাহা রক্ষণীয়, তাহায় অপচয় কখনও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। সঞ্চয় আর অপচয় পরস্পর বিরুদ্ধ।

অপচয়ের দ্বারা সঞ্চয়, ইহা বোধ করি উন্মত্ত প্রলাপ। অথচ প্রাণময় জগতে ইহাই অহরহঃ চলিতেছে। প্রাণ যাহা সঞ্চয় করিতে চাহে, কল্পতরুর মত তাহা দুই হাতে বিলাইতেছে, স্থান অস্থান, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবলই নষ্ট করিতেছে, যেন একটা উৎকট নেশার ঝোঁকে উন্মত্তের মত আপনাকে রিক্ত করিতেছে। এ বড় আশ্চর্য্য কথা। প্রাণ চাহে অমরতা, সেই অমরতা লাভের জন্যই প্রাণ কেবলই মরণকে আলিঙ্গন করিতেছে। প্রকৃতি দেবী প্রকৃতই শিবদূতী; তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন; সেই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি শ্মশানচারিণী সাজিয়াছেন; শ্মশানভূমিতে উন্মাদিনীর মত নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন। এ অতি আশ্চর্য্য নয় কি?

আজিকার মত এইখানেই আপনাদিগকে বিরাম দিলাম। ইহার পরে আর এক ধাপ উঠিতে চাহি। প্রাণময় জগতের কহিনী শুনাইলাম; এইবার মনোময় জগতে যাইতে চাহি। আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

সভাপতির অভিভাষণ।—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন দেখি না। কারণ, তাহার প্রশংসায় বঙ্গদেশ মুখরিত। তাহার কথা লইয়া কাগজে-কাগজে লোফালুফি চলিতেছে। এমন কি, ইংরাজের কাগজ 'ষ্টেটস্‌ম্যান' 'ক্যাপিটাল'ও দশমুখে তাহার সুখ্যাতি করিয়াছে।—এত বেশী প্রশংসা লাভ আর কখনও কোনও 'অভিভাষণে'র অদৃষ্টে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ!

আবার নিন্দাও যে এ লেখাটির একেবারে না হইয়াছে, এমন বলি না। বাঙ্গালার তিনখানি কাগজ, যথা—'প্রবাসী', 'ভারতী' ও 'সঞ্জীবনী' প্রাণ খুলিয়াই উহার কুৎসা কীর্ত্তন করিয়াছেন! সে কুৎসার তেমন অর্থ থাকুক, আর নাই থাকুক—ঘোর কুৎসা বটে! 'অভিভাষণে'র অঙ্গে তাঁহারা অপহরণের অপবাদ লাগিয়া দিয়াছেন।

লক্ষ্য নাই। কেলবিনের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন, কোনরূপ চরম লক্ষ্যের অভিমুখে চলা জড়ের পক্ষে একান্ত আবশ্যক—essential—নহে। জড় ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিতেছে; বাঁধা পথে চলিতেছে, কোন চিহ্ন রাখিয়া বা কোন চিহ্ন লইয়া চলিতেছে না। তাহার সমস্ত অতীতটাকে ধুইয়া-মুছিয়া, বিস্মৃত হইয়া চলিতেছে। কিন্তু প্রাণ যখন জড়দেহ আশ্রয় করিয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলে. কিন্তু কোন্ পথে চলে, তাহা আগে হইতে বলিবার কোন উপায় নাই। এখানে তাহার স্বাধীনতা বা freedom রহিয়াছে। তাহার লক্ষ্য স্থির আছে বটে, কিন্তু পথের স্থিরতা নাই। পথের নিরূপণে সে একবারে স্বাধীন। বিজ্ঞানবিদ্যা সেই পথের অনুসরণ করিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে; সেই পথে কিছু দূর পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিতে পারে, কিন্তু পথ দেখাইতে পারে না। গঙ্গা যখন ভূতলে অবতরণ করিয়াছিলেন, সাগর তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল; সমস্ত বাধা কাটাইয়া আপনার পথ তিনি আপনি বাছিয়া লইয়াছিলেন; ভগীরথ বোধ করি তাঁহাকে পথ দেখাইতে পারেন নাই; তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। সেইরূপ, কোন বৈজ্ঞানিক প্রাণের প্রবাহকে কোন নির্দ্দিষ্ট পথে চালাইতে পারিবেন কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। প্রাণের প্রবাহের জন্য বৈজ্ঞানিক যে খাতই নির্দ্দিষ্ট করুন, প্রাণের ধারা সেই খাত ছাড়িয়া কখন অন্য খাত আপনি কাটিয়া লইবে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। এইরূপে প্রাণ স্বাধীনভাবে আপন পথে চলে, এবং চলিবার সময় অতিক্রান্ত পথের সমস্ত নিদর্শন বহন করিয়া লইয়া যায়। সমস্ত কাদামাটি অঙ্গে মাখিয়া চলিতে থাকে। অতএব প্রাণের একটা কাহিনী আছে। সেই কাহিনী গণনা দ্বারা আবিষ্কারের বিষয় নহে। কেন না, প্রাণ আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লয়, অপরের নির্দ্দেশের অপেক্ষা করে না। প্রাণের কাহিনী যদি জানিতে চান, তাহা হইলে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, পর্ব্বের পর পর্ব্ব পড়িয়া যান। প্রাণ নিজের ইতিহাস নিজেই লিখিয়া যাইতেছে। কোন অধ্যায়, কোন পর্ব্ব হারায় নাই; যদি চোখ থাকে, তাহা হইলে প্রাণীর গায়ে তাহা লিখিত দেখিবেন। ইতিহাস সেখানে লিখিত আছে; hieroglyphic হরূপে খোদাই করা আছে। একালের প্রাণিবিদ্যা ভূপঞ্জরের স্তরাবলী ঘাঁটিয়া, মাতৃকুক্ষিস্থ ভ্রূণের দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, দেহস্থিত প্রত্যেক কোষে অণুবীক্ষণ লাগাইয়া, সেই অতীত ইতিহাস পড়িবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কাহিনী সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এখানে কোন জ্যোতিষের বচন ভবিষ্যৎ গণনায় সফল হইবে না; প্রাণপ্রবাহ কোন্ পথে চলিবে, ভবিষ্যতে প্রাণ কোন্ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে; এখন তাহার কোন হিসাব দেওয়া চলিবে না।

প্রাণের কাহিনী আছে এবং সেই কাহিনী বিরোধের কাহিনী,—নিরন্তর, অবিরাম, অবিশ্রাম বিরোধের কাহিনী। এই বিরোধেরই নাম জীবনযুদ্ধ। এই জীবনযুদ্ধের একটা লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া এই যুদ্ধ চলিতেছে, সেই লক্ষ্যের নাম প্রাণরক্ষা—প্রাণের বর্দ্ধন। প্রাণ আপনাকে রাখিবার জন্য, আপনাকে বাড়াইবার জন্য, এই যুদ্ধে লিপ্ত আছে। সেই উদ্দেশ্যেই এই জীবনযুদ্ধ চালাইতেছে। সেই যুদ্ধ চালাইবার জন্যই প্রাণ মৃত্যুর উদ্ভাবনা করিয়াছে। অতি নিম্নশ্রেণীর এক কোষে নির্ম্মিত unicellular প্রাণী মৃত্যু জানিত না, কিন্তু বহু কোষে নির্ম্মিত multicellular প্রাণী মৃত্যুর উদ্ভাবনা করিয়াছে এবং সেই মৃত্যুকে এড়াইবার জন্য অপত্যোৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবনা করিয়াছে। প্রাণ আপনাকে রাখিতে চাহে, এবং রাখিবার জন্যই আপনাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া থাকে। এইরূপে প্রাণ যুদ্ধ চালাইতেছে; সেই যুদ্ধে প্রাণ কেবলই আপনাকে নষ্ট করিতেছে, কেবলই মৃত্যু স্বীকার করিতেছে; কিন্তু রক্তবীজের মত মরিয়াও মরিতেছে না; সহস্র নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া খড়্গহস্তে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইতেছে। প্রাণ আপনাকে অজস্রভাবে নষ্ট করিতেছে, অজস্রভাবে অপচয় করিতেছে। এই অপচয় দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী যেন বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের মত বিনা কারণে, বিনা বিচারে কেবলই মরিতেছে। মরণ ভিন্ন যেন তাহাদের অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই। ইংরাজি ১৮৯১ সালে গ্রীষ্মকালে বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে পঙ্গপাল দেখা দিয়াছিল। আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম। এক দিন অপরাহ্নে আকাশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ হইতে সাঁ-সাঁ, সোঁ-সোঁ শব্দ শুনিলাম। "প্রতাপোহগ্রে ততঃ

শব্দঃ"—এখানে কিন্তু আগে শব্দ তার পর প্রতাপ। আকাশের কোণে যেন একখানা মেঘ দেখা দিল; মেঘখানা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আকাশ ছাইল; সূর্য্য ঢাকিয়া গেল, দিনের আলো মন্দ হইল। মেঘখানা নামিয়া ভূমি স্পর্শ করিল। দেখিলাম পঙ্গপাল—ফড়িঙএর পাল। অবিলম্বেই এই ফড়িঙে ছাইল সকল ঘাট-বাট। গাছের মাথা, ঘরের চাল, দেওয়াল, উঠান, ময়দান, সমস্ত পঙ্গপালে ঢাকিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল। সেই পঙ্গসেনা রাত্রির মত গ্রামেই বিশ্রাম লইল। ভূমিতে নামিয়া গাছপালা, ক্ষেত আচ্ছাদন করিয়া বসিয়া রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আবার ঝাঁক বাঁধিয়া উত্তরমুখে চলিয়া গেল। দেখা গেল, বড়-বড় গাছগুলা পত্রপল্লবশূন্য হইয়া কঙ্কালসার হইয়াছে; নারিকেল গাছগুলা ন্যাড়া হইয়া বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মত দাঁড়াইয়া আছে। এই পঙ্গপাল উত্তরমুখে চলিল? কোন্ দেশে চলিল? শুনিয়াছি, ক্রমাগত তাহারা উত্তরমুখে চলিয়া হিমাচলের তুষারক্ষেত্রে ঠেকিয়া গিয়াছিল। এবং সেইখানে প্রাণযাত্রা শেষ করিয়াছিল। এক-একটা ঝাঁকে কত ফড়িঙ ছিল কে গণিবে? কত কোটী ফড়িঙ একটা ঝাঁকের মধ্যে ছিল কে তাহার তালিকা দিবে? এই কোটি কোটি প্রাণী উত্তরমুখে চলিয়া হিমাচলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল, ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহাকে প্রাণের অপচয় ভিন্ন আর কি বলিব? জড়জগতে আপনারা শক্তির অপচয়ের কথা লর্ড কেলবিনের নিকট শুনিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণের এই যে অপচয় ইহা সর্ব্বদা চোখের উপরে ঘটিতেছে।

জীবনযুদ্ধে প্রাণের এই অপচয় দেখিয়া বিস্মিত—ভীত হইতে হয়; কিন্তু এই অপচয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি আপনাদিগকে জীবনযুদ্ধের যে কাহিনী শুনাইলাম, তাহার মর্ম্ম যদি আপনারা বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে জানিতেছেন যে, এই অপচয়ের একটা উদ্দেশ্য আছে। প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণের এই অপচয়। এ বড় কৌতুকের কথা। যাহা রক্ষণীয়, তাহার অপচয় কখনও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। সঞ্চয় আর অপচয় পরস্পর বিরুদ্ধ।

অপচয়ের দ্বারা সঞ্চয়, ইহা বোধ করি উন্মত্ত প্রলাপ। অথচ প্রাণময় জগতে ইহাই অহরহঃ চলিতেছে। প্রাণ যাহা সঞ্চয় করিতে চাহে, কল্পতরুর মত তাহা দুই হাতে বিলাইতেছে, স্থান অস্থান, পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবলই নষ্ট করিতেছে, যেন একটা উৎকট নেশার ঝোঁকে উন্মত্তের মত আপনাকে রিক্ত করিতেছে। এ বড় আশ্চর্য্য কথা। প্রাণ চাহে অমরতা, সেই অমরতা লাভের জন্যই প্রাণ কেবলই মরণকে আলিঙ্গন করিতেছে। প্রকৃতি দেবী প্রকৃতই শিবদূতী; তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন; সেই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি রণরঙ্গিণী সাজিয়াছেন; শ্মশানভূমিতে উন্মাদিনীর মত নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছেন। এ অতি আশ্চর্য্য নয় কি?

আজিকার মত এইখানেই আপনাদিগকে বিরাম দিলাম। ইহার পরে আর এক ধাপ উঠিতে চাহি। প্রাণময় জগতের কহিনী শুনাইলাম; এইবার মনোময় জগতে যাইতে চাহি। আপনারা প্রস্তুত থাকুন।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

সভাপতির অভিভাষণ।—

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন দেখি না। কারণ, তাহার প্রশংসায় বঙ্গদেশ মুখরিত। তাহার কথা লইয়া কাগজে কাগজে লোফালুফি চলিতেছে। এমন কি, ইংরাজের কাগজ 'ষ্টেটস্‌ম্যান' 'ক্যাপিটাল'ও দশমুখে তাহার সুখ্যাতি করিয়াছে।—এত বেশী প্রশংসা লাভ আর কখনও কোনও 'অভিভাষণে'র অদৃষ্টে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ!

আবার নিন্দাও যে এ লেখাটির একেবারে না হইয়াছে, এমন বলি না। বাঙ্গালার তিনখানি কাগজ, যথা—'প্রবাসী', 'ভারতী' ও 'সঞ্জীবনী' প্রাণ খুলিয়াই উহার কুৎসা কীর্ত্তন করিয়াছেন! সে কুৎসার তেমন অর্থ থাকুক, আর নাই থাকুক—ঘোর কুৎসা বটে। 'অভিভাষণে'র অঙ্গে তাঁহারা অপহরণের অপবাদ দাগিয়া দিয়াছেন।

কেবল তাহাই নহে। চিত্তরঞ্জন যাহা বলেন নাই,—গালি দিবার সুবিধা হইবে বলিয়া—তাহাও তাঁহার মুখের কথা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে!

অতি-প্রশংসিতের নিন্দা করাটাই যে অন্যায়, এমন বলিতেছি—কেহ তাহা মনে করিবেন না। নিন্দা সুখ্যাতি সকল জিনিষেরই হইয়া থাকে। অমন যে সেক্সপীয়র, তিনিও একদল লেখক কর্ত্তৃক নিন্দিত। জগতে যতদিন মতভেদ ও রুচিভেদ থাকিবে, ততদিন নিন্দার হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। অতএব, আমরা এমন কথা কখনও বলি নাই, এবং বলিবও না যে, যাহা প্রায় সর্ব্বজন কর্ত্তৃক প্রশংসিত, তাহার প্রশংসা অন্ধভাবেই সকলকে করিতে হইবে।

তবে কথা এই যে, সাহিত্যের উদার ক্ষেত্রে অযথা নিন্দার—যুক্তিহীন তর্কের স্থান নাই। দেশের বা সাহিত্যের ক্ষতি বোধে যদি কেহ কিছুর নিন্দা করেন, তবে তাহা দোষের নহে। কিন্তু ব্যক্তিগত বিরোধ বিদ্বেষ, উপরোধ অনুরোধের দ্বারা যদি সাহিত্যালোচনা শাসিত হয়, তবে তাহা অমার্জ্জনীয়। সাহিত্যের চরিত্র তাহাতে নষ্ট হইয়া যায়। সাহিত্য সেবা ক্রমশঃ দোকানদারীতে পরিণত হয়। তাহার দমন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বলিতে দুঃখ হয়, এবং লজ্জাও হয় যে, 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' দেশের বা সাহিত্যের মুখ তাকাইয়া এই অভিভাষণটির বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই। শুধু নিন্দা করিব বলিয়াই তাহার নিন্দা করিয়াছেন। আটপেজী ডবলক্রাউন আকারের ৫২ পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তক হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া তাঁহারা প্রায় এক পৃষ্ঠার কয় লাইন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উক্ত অভিভাষণের 'সকল আইডিয়াই' রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী হইতে সংগৃহীত। অথচ উহার মধ্যে 'এনার্কিজম', 'সমর-ঋণ' ও দেশের শিক্ষা-দীক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তাপূর্ণ, স্বাধীন ও নির্ভীক আলোচনা আছে, 'প্রবাসী' তাহার নামগন্ধও করেন নাই!—সমদর্শিতার ইহা এক চূড়ান্ত নিদর্শন বটে!

'ভারতী' বলিতেছেন,—"তাঁর সমস্ত লেখার সব আইডিয়াগুলার জন্য তিনি যে রবি বাবুর কাছে কি পরিমাণে ঋণী, তাহা তিনি স্বীকার না করিলেও, বঙ্গীয় পাঠকবর্গের তাহা জানা উচিত। সেই জন্য তাঁহার কথার সঙ্গে-সঙ্গে রবি বাবুর কথা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি।"—এই বলিয়া 'ভারতী' যে ভাবে চিত্তরঞ্জনের ঋণ-গ্রহণের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা অনেক স্থলেই হাস্যরসের উদ্দীপক হইয়াছে। আমরা তাহার একটা নমুনা দিতেছি। 'ভারতী'র লেখক 'অভিভাষণে'র এই লাইনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন।"—তার পর এই লাইনের সহিত রবি বাবুর লেখার মিল দেখাইবার জন্য তিনি এই কবিতাটি তুলিয়া দিয়াছেন,—

> "ও আমার দেশের মাটি,
> তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা;
> তোমাতে বিশ্ব-ময়ীর বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

—সাদৃশ্যের এই নমুনা দেখিয়া হাসি আসে না কি? এ ভাবের সাদৃশ্য দেখাইতে গেলে, শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, বিদ্যাসাগরের 'প্রথম ভাগ' হইতে আরম্ভ করিয়া উপনিষদ্ পর্য্যন্ত সকলের নিকটই চিত্তরঞ্জনের ঋণ গ্রহণ প্রমাণ করা যাইতে পারে!

আর যদিই বা তাঁহার ভাবের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের কোথাও মিল ঘটিয়া থাকে, তাহাতে নিন্দার কি আছে, বুঝিতে পারি না। যিনি যত মৌলিকতারই ভাণ করুন,—এই কথাই কিন্তু সত্য যে,—"There is nothing new under the Sun." একই ভাব, একই 'আইডিয়া' শত-শত আকারে সাহিত্য সংসারে প্রচারিত হইয়া থাকে। 'ভারতী'র লেখক লিখিয়াছেন বটে যে,—"কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্সের রাজনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন বাবু যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র নূতন নয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে এ সকল কথার যথেষ্ট আবৃত্তি হইয়া গেছে, কন্‌গ্রেসের নীতিকে তখন ভিক্ষুকের নীতি বলিয়া একদল স্বাদেশিক প্রচুর অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনেরও বিশ বছর পূর্ব্বে রবিবাবু তাঁর লেখায় ও গানে এই কথাই বলিয়াছিলেন:—

> "মিছে,
> কথার বাঁধুনি, কাঁদুনির পালা,
> চোখে নাই কারো নীর;
> আবেদন আর নিবেদনের থালা
> ব'হে ব'হে নত শির।
> কাঁদিয়ে সোহাগ, ছি ছি এ কি লাজ—
> জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ;
> আপনি করিনে আপনার কাজ—
> পরের পরে অভিমান।"

—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ আইডিয়া কি রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কৃত? কমলাকান্তের দপ্তরের 'পলিটিকস্' শীর্ষক অধ্যায়টি কি তাঁহার ঐ গানের পর লিখিত হইয়াছে? বঙ্কিমচন্দ্র যে বহুকাল হইল স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো! ইহাই তাহাদিগের পলিটিকস্।" তাঁহারা কি বলিতে চান যে, ইহা রবীন্দ্রনাথেরই ধার-করা কথা?

এই সব দেখিয়া-শুনিয়া স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বাবুর কথাই আজ মনে পড়িতেছে যে, "বেদব্যাস হইতে বঙ্কিমবাবু পর্য্যন্ত কে কোন্ ভাবের আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা নির্ণয় করা কঠিন;—পরন্তু প্রত্যেক পদে আবিষ্কর্ত্তার নাম নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; কেবল অসম্ভব নয়,—হাস্যোদ্দীপক ও পাণ্ডিত্য পাগলামির পরিচায়ক।" বাস্তবিক, 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' এই অভিভাষণের যে সকল আইডিয়াকে রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহার একটিও প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া নহে। খুঁজিয়া-পাতিয়া দেখিলে সে সমস্ত ভাবই ভূদেব, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দাদির রচনা-মধ্যে পাওয়া যায়। এ কথার প্রমাণস্বরূপ এখানে তাহার আরও কিছু নমুনা দিতেছি।—

(১)

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের ও ইংরাজের মিলনের মর্ম্ম যদি এই হয় যে, আমরা ইংরাজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিব,… তাহা হইলে আমি বলি, এ মিলন একেবারে অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন যে, এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরাজের যাহা কিছু ভাল আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল তাহা ইংরাজ লইবে…। খাঁটা ভালটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কি করিয়া? কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ—"সকল জাতির স্বভাবগত আদর্শ এক নয়, তাহা লইয়া ক্ষোভ করিবার প্রয়োজন দেখি না। বাহির হইতে আঘাত পাইতে পারি, বল পাইতে পারি না; নিজের বল ছাড়া বল নাই।"—"স্বদেশ"।

ভূদেব—"একজাতীয় লোক কিছুতেই অপর জাতীয় হইতে পারে না। ভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ থাকিয়া জাত্যন্তর হইতে পারে না। আমরা জানি যে, মনুষ্যের দোষ-গুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে আর্জ্জিত। সুতরাং আমরা যে বংশজাত অপর বংশীয় কোন ব্যক্তি কখনই ঠিক তেমন হইতে পারেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র—"বাঙ্গালী কখন ইংরেজ হইতে পারিবে না। যদি এই তিনকোটী বাঙ্গালী হঠাৎ তিনকোটী ইংরেজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই।"

বিবেকানন্দ—"আমাদিগকে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। বৈদেশিক সমাজ সকল আমাদিগকে জোর করিয়া যে প্রণালীতে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুযায়ী কার্য করিতে চেষ্টা করা বৃথা। উহা অসম্ভব। আমাদিগকে যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অপর জাতির ন্যায় গড়িতে পারা অসম্ভব, তজ্জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি অপর জাতির সামাজিক প্রথার নিন্দা করিতেছি না। তাহাদের পক্ষে উহা ভাল হইলেও আমাদের পক্ষে নহে। তাঁহাদের পক্ষে যাহা অমৃত, আমাদের পক্ষে তাহা বিষবৎ হইতে পারে।"

(২)

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের এখন বিলাতি আদর্শজনিত যে বিলাসের ভোগ তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ সরল করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ—"প্রত্যেক জীবনযাত্রাকে সরল করুন। দেশের ভোগ বিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে—সহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে—কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই।"

ভূদেব—"দরিদ্রের পক্ষে বিলাসিতা বড় সাংঘাতিক রোগ। আমরা এক্ষণে দরিদ্রজাতি। আমাদের সুখোপভোগ চেষ্টা ভাল নয়। যিনি আমাদিগের মধ্যে ধনবান, তাঁহারও কর্ত্তব্য, ছেলেকে বাবুয়ানা হইতে নিবারণ করিয়া রাখেন।"

(৩)

চিত্তরঞ্জন—"আমাদের দেশে রাজার কর্ম্মক্ষেত্র অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা কর লইতেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কাজ আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবন যাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।"

রবীন্দ্রনাথ—"আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন—প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্যদ্বারা আবদ্ধ। জন সাধারণ নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না—সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকেরই উপর আশ্চর্য্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।"

ভূদেব—"হিন্দুসমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।…আর্য্যেতর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলেও তাঁহারা সমাজপতি হইতে পারিলেন না।… পুরাণ সংহিতাদিতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে যে, "সমাজ রক্ষার্থ "মহাত্মগণ" বা "মনীষিগণ" এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন।… ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজে আত্মশাসন কেমন সুবিস্তৃত এবং কেমন দৃঢ়মূল।"

যাউক, আর উদাহরণ উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অনর্থক স্ফীত করিয়া তুলিবার প্রয়োজন দেখি না। ইচ্ছা করিলে কেবল বঙ্কিম ভূদেব নহে;—রমেশচন্দ্র-অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ-চন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত-রাজনারায়ণ প্রভৃতি বহু মনীষিরই লেখা হইতে এখনও অজস্র পরিমাণে ঐ একই ধরণের কথা বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা করিয়া পাঠকের সময় ও কাগজের স্থান নষ্ট করিতে প্রবৃত্তি নাই। রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছেন—"বস্তুত সাহিত্যের বারো আনা কথাই নিতান্ত জানা কথাকেই নিজের মধ্যে নূতন করিয়া জানিয়া নিজের মত নূতন করিয়া বলা"।—এটুকু পড়া থাকিলে 'ভারতী' ও 'প্রবাসী' সম্ভবতঃ অতটা ছেলেমানুষী করিতে অগ্রসর হইতেন না।

তার পর 'প্রবাসীর' বিরুদ্ধে আরও একটি বিশেষ গুরুতর অভিযোগ আছে। 'প্রবাসী' লিখিয়াছেন, বক্তা রবিবাবুর একটি কথাও উদ্ধৃত করেন নাই, কিন্তু নানা রকমের ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথা—(১) রবিবাবু নকল পণ্ডিত, ইউরোপের মত ধার করিয়া নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন; (২) রবিবাবু বালি।" ইত্যাদি।—কিন্তু এ কথা কি সত্য? চিত্তরঞ্জন বাবুর 'অভিভাষণে' আছে,—"সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে, তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ—এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি না কি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন।"—ইহাতে কি বুঝায় রবীন্দ্রনাথকে 'নকল পণ্ডিত' ও 'বালির তাপ' বলা হইয়াছে? ঐ লেপাটুকুর মধ্যে ঐ "এমন কি" কথাটার কি তবে কোনও অর্থ নাই? জানি, সত্য দোষারোপে তালমত উত্তর জোগায় না বলিয়া রাগ বেশী হয়। কিন্তু সে রাগের বশে

শিক্ষিত লোক যে এতটা আত্মহারা হইতে পারেন, তাহা জানিতাম না।

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—

অমুক মহারাজ-পুত্রের বিবাহ—সুতরাং সংবাদ পত্রের স্তম্ভ পূর্ণ হইয়া সে সংবাদ প্রচারিত হইল! অমুক স্বর্ণ-গর্দ্দভ পীড়িত, কাজেই তাহার জন্য কাগজে-কাগজে হা-হুতাশ পড়িয়া গেল! অথচ জ্ঞানেন্দ্র-লালের ন্যায় সাহিত্যের একজন একনিষ্ঠ সাধক ইহ সংসার হইতে অন্তর্হিত হইলেন,—তাঁহার কথা প্রায় কোন কাগজেই এক প্যারার অধিক স্থান অধিকার করিল না! এমন কি, অনেক কাগজই তাঁহার নাম-গন্ধও করিল না!—এমনই আমরা গুণগ্রাহী!—কর্ত্তব্য-জ্ঞান আমাদের এতই বেশী!

জ্ঞানেন্দ্রলাল দ্বিজেন্দ্রলালের সহোদর। জ্ঞানেন্দ্রলাল অগ্রজ। দ্বিজেন্দ্রলাল কনিষ্ঠ। দুই ভ্রাতাই অনেকটা এক ভাবের ভাবুক—এক ভাবের প্রচারক ছিলেন। দুই জনই দেশবাসীকে মনুষ্যত্বে উদ্দীপিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেন,—"জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে।"—এই ভাব তাঁহার প্রায় সমগ্র রচনার সহিত জড়ান-মাখানো আছে। জ্ঞানেন্দ্রলালও এই ভাব তাঁহার রচনা-মধ্যে বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। নিরক্ষর কৃষক হইতে দরিদ্র ভদ্রগৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলের জন্যই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। সাহিত্য বলিতে সাধারণে যাহা বুঝে, তিনি তাহা বলিতেন না। তাঁহার মতে,—"সাহিত্য একপ্রকার সংগ্রাম। উত্তমের সহিত অধমের সংগ্রাম, রাক্ষসের হস্ত হইতে দেবীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, অমঙ্গলের করাল কবল হইতে মঙ্গলকে রক্ষা করিবার প্রয়াস। সংক্ষেপে, সাহিত্য মানবজাতির মঙ্গল-গীতি,—অনন্ত ভগবদ্গীতা। এই ভগবদ্গীতা স্বয়ং ভগবান মনুষ্যের হৃদয়ে অনবরত লিখিতেছেন। যাহাতে মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়, যাহাতে মহতী চিন্তাতে ও উদারভাবে মনুষ্য উন্নত হয়, সংশোধিত হয়, সুমার্জ্জিত হয়, যাহাতে মনুষ্য মনুষ্যের প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, ধরাধামে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য,—তাহাই সাহিত্যের প্রাণ,—তাহাই সাহিত্য-রূপী ভগবদ্গীতার উপদেশ ও শিক্ষা।"—সাহিত্যের এই ধর্ম্ম জ্ঞানেন্দ্র-লাল অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম পালনের জন্য তিনি যৌবনে 'পতাকা' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন। তার পর ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'নবপ্রভা' নাম দিয়া এক-খানি মাসিক পত্রিকাও বাহির করেন। 'নবপ্রভায়' স্পষ্ট করিয়াই তিনি বলিয়াছিলেন,—"প্রীতি লইয়া 'নবপ্রভা'র জন্ম; 'নবপ্রভা' জানে যে চিত্তশুদ্ধি, চরিত্র পবিত্র, চিন্তা মহতী না হইলে দেশ জাগিবে না।"

সাহিত্যে তিনি বঙ্কিমের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। বঙ্কিম বলিতেন,—"যে কণ্ঠ হইতে কাতরের জন্য কাতরোক্তি নিঃসৃত না হইল, সে কণ্ঠ রুদ্ধ হউক, যে লেখনী আর্ত্তের উপকারার্থে না লিখিল, সে লেখনী নিষ্ফল হউক।"—এই কথা জ্ঞানেন্দ্রলালের লেখনী হইতেও বহুবার নিঃসৃত হইয়াছে। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার শুনিলে তিনি নীরব থাকিতে পারিতেন না। প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে বঙ্কিম যেমন সতেজে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনই গুরুর পদাঙ্কানু-সরণ করিয়াছিলেন। ধনবান জমিদারের অসন্তোষের ভয়ে তিনি সত্য কথা চাপিয়া রাখিতে জানিতেন না।

সুলেখকের অনেক গুণই তাঁহাতে ছিল। পরের উচ্ছিষ্ট অজীর্ণ অবস্থায় উদ্গার করিতে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। বাক্যের অঙ্গে আপনার চিন্তাটুকুকে তিনি বাঁধিয়া দিতে পারিতেন। আসল কথা, তিনি প্রাণের টানে সাহিত্যিক হইয়াছিলেন,—নামের মোহে নহে। মাতৃভূমিকে তিনি যেমন প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতেন, মাতৃভাষাকেও তেমনিই ভালবাসিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 'জননী বঙ্গভাষা'র স্তব পদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন; আর জ্ঞানেন্দ্রলাল মাতৃভাষার স্তব গদ্যে করিয়াছেন,—"যার কোলে বসিয়া যার মাইয়ের দুধ খাইতে খাইতে যে ভাষায় মার মধু-মাখা কথা শুনিয়াছেন, জনকের মাঙ্গল্য গম্ভীর উপদেশ যে ভাষায় শুনিয়াছেন, ভগ্নী কোমল-কমনীয় স্মিত সম্ভাষণে যে ভাষায় হৃদয়ে আলোক ছড়াইয়াছিল, প্রিয়ার প্রাণারাম প্রণয় পুষ্পাঞ্জলি যে ভাষায় দয়িত চরণে নিবেদিত, যন্ত্রণায় প্রাণ ছটফট্ করিলে যে ভাষায় ভগবানকে ডাকি, ভবলীলার অবসানে গঙ্গা-সৈকতশায়ী হইলে যে ভাষায় পতিতপাবনের নাম হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়,—জীবনে মরণে, বাল্যে-বার্দ্ধক্যে, প্রণয়ে-শোকে, উৎসবে-বিপদে যে ভাষা প্রাণে প্রাণে মিশ্রিত—সেই মাতৃভাষা; সেই চিরপ্রিয়া, সেই চিরপূতা, সেই চির-পূজনীয়া, সেই নিরুপমা মাতৃভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাষা আর কি হইতে পারে?"—মাতৃভাষার এমন স্তব মাতৃভাষায় বড় বেশী শুনি নাই।—কথাগুলির ছত্রে-ছত্রে আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এ আন্তরিকতার মর্ম্ম কি বাঙ্গালী বুঝিবে না? তাঁহার বরেণ্য ভাবের আধার হইতে কি আমরা পারিব না? "পরিষদ" তাঁহার কথা কহিল না, সাহিত্যিকেরাও তাঁহার নাম করিল না সত্য, কিন্তু স্বামীজি বলিতেন,—"যদি কোনও ব্যক্তি গুহায় বসিয়া উহার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া যথার্থ একটি মাত্রও মহৎ চিন্তা করিয়া মরিতে পারে, সেই চিন্তা সেই গুহার প্রাচীর ভেদ করিয়া সমস্ত আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে ঐ ভাব সংক্রামিত হইবে।"—এ বাণী কি জ্ঞানেন্দ্রলালের মহতী চিন্তা সম্বন্ধে অব্যর্থ হইবে না?

প্রতিধ্বনি

পল্লী-কাহিনী

সহর বা নগর লইয়া দেশ নহে—দেশ পল্লী লইয়া। সেই পল্লীর দুরবস্থার কথাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। পল্লী রক্ষা পাইলে, কৃষক বাঁচিলে তবে সহর বাঁচিবে, নগর গড়িবে। পল্লীবাসী রোগে কাতর, অভাবে পীড়িত হইলে, অন্নাভাবে হাহাকার করিলে, জাতির শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। সুতরাং পল্লীর অভাবের কথা, সুখ-দুঃখের কথা ব্যতীত প্রধান কথা আর নাই। তাই আমরা পল্লী-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতি ব্যারিষ্টারপ্রবর শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির কথা বলিতে গিয়া, গ্রাম ও পল্লী সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও কৃষি-কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে আমাদের—

(১) ইতিহাসের বাণীকে মনে রাখিতে হইবে।

(২) ইউরোপীয় Industrialismকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) বড়-বড় সহরগুলা যে অজগর সর্পের মত পল্লীগ্রাম হইতে লোক টানিয়া আনিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) তাহা বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় পল্লীগ্রামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

(৫) পল্লীগ্রামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে তাহার অস্বাস্থ্যতা দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ শরীরে বারমাস পরিশ্রম করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।

(৬) কৃষক তাহার কৃষিকার্য্য ছাড়া যাহাতে তাহার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৭) তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকেরা ঘরে-ঘরে কি-কি শিল্প-পণ্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাও দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৮) আমাদের দেশে যে সব শিল্প-পণ্য প্রস্তুত হইত, তাহার অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৯) এই সব শিল্প-পণ্য লইয়া ছোট-ছোট অনেকগুলি কারবার দেশের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

(১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহা রাখিয়া, য়ুরোপ, আমেরিকা, জাপানের অন্য সমুদয় পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

(১১) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রস্তুত হয়, সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে।

(১২) এই সব ছোট-ছোট ব্যবসাগুলিকে ফলপ্রদ করিতে হইলে, তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেইজন্য জেলায়-জেলায় জেলাবাসীদের সাহায্য ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।"

পল্লী-স্বাস্থ্য

ম্যালেরিয়ার জ্বালায় আমাদের গ্রাম-পল্লী একেবারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। যে গ্রামে যাইবে, সেখানেই রোগকাতর কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইবে; যে বাড়ীতে যাইবে, সেখানেই শুনিবে চার-পাঁচটী রোগী আছে। ইহার প্রতীকারের উপায় না করিতে পারিলে, আর কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের গ্রাম পল্লী একেবারে শ্মশান হইয়া যাইবে। পল্লী-স্বাস্থ্যের কথার উল্লেখ করিয়া 'নায়ক' লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষে, অন্ন, জল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা,—ইহাই চতুর্বর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই চতুর্ব্বর্গ লাভের ব্যবস্থা না করিলে আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। অন্ন-জলের অভাবে ভারতবাসীর জীবনী-শক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে। তাহার উপর অস্বাস্থ্য। সমগ্র ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যহীন ও সংক্রামক রোগের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল দেশ স্বাস্থ্যনিবাস বলিয়া পরিগণিত হইত, এখন ম্যালেরিয়া প্রভৃতির প্রকোপে সে সকল স্থান শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এইজন্য ভারতবাসী স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বহুদিন হইতে আর্ত্তনাদ করিতেছে। সকল আর্ত্তনাদের ফল যেমন হয়, এই হাহাকারেও আমরা সেই ফল লাভ করিয়াছি। রাজদপ্তরে স্বাস্থ্যবিধানের পরামর্শ পুঞ্জীভূত হইতেছে, অস্বাস্থ্যের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, সংক্রামক রোগ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিতেছে। অনেক বৈজ্ঞানিক প্রতীকারের পথও দেখাইয়া দিয়াছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে!—কিন্তু কে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই!—এই ত অবস্থা! আমাদের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মুরুব্বীরা বলেন, নেটিভরা স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে জানে না। মশারী টাঙ্গাইলে ম্যালেরিয়া হয় না, কুইনাইনের তাল খাইলে ম্যালেরিয়ার বিষ উপিয়া যায়, পাস্তুরের ফিল্টারে জল পরিশ্রুত করিয়া রাখিলে সংক্রামক রোগ ধরিতে পারে না,—দেশের লোককে এই সকল তত্ত্ব শিখাইয়া দাও; দেশের স্বাস্থ্য উন্নত হইয়া উঠিবে। এ পরামর্শে সত্য নাই, এমন নহে। কিন্তু ইহা মুষ্টিযোগ; ব্যাপ্য রোগ ইহাতে নির্ম্মূল হইতে পারে না। সমস্ত দেশটা প্রাকৃতিক কারণ, নদ-নদী-খালের প্রবাহ-পরিবর্ত্তনের ও রেলপথের বাঁধের নাগপাশ-বন্ধনের ফলে রোগের আকর হইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোক স্বাস্থ্য-পাঠের অনুসরণ করিলে সে উৎপাতের অবসান হইবে

কারণ, বোয়াল কিম্বা অন্য মৎস্যভুক্ মাছ কিম্বা পুঁটি খরসুলা প্রভৃতি ক্ষুদ্রায়তন মাছে পুষ্করিণী ভরিয়া যতই যায়, শেষে পুষ্করিণীতে বড় মাছ জন্মিবার আশা ততটা কমিয়া যায়। এই কারণে অপেক্ষাকৃত বড়মাছের বাচ্চা (যাহার জাতি চেনা যায়) ৭৲ টাকা করিয়া হাজার কেনাও অধিকাংশ সময়ে পরিশেষে অধিকতর লাভজনক দাঁড়ায়।

বঙ্গীয় মৎস্য-বিভাগ কিন্তু ১৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা হাজারে ভাল জাতীয় মাছের চারা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। যদিও সমস্ত চারা কেবলমাত্র রুই কিম্বা কেবলমাত্র কাতলা, কিম্বা মিরগেলের, হইবে এইরূপ গ্যারাণ্টি দেওয়া অসম্ভব; তথাপি বঙ্গীয় মৎস্য বিভাগ অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এই সকল চারা সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইহাদের ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। এই সকল চারার জন্য যে মাসের মধ্যে ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ ফিসারির নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং তিনি কোন্ দিন, কোন্ সময়ে, কোথায় বিলি হইবে তাহা লিখিবেন। তিনি মাছের ছোট চারা সরবরাহ করা ছাড়া সৎ-ব্যবসায়ীদের নামও সুপারিশ করিতে প্রস্তুত আছেন।

পুকুরের ঠিকাদারেরা প্রায়ই ঠিকা ফুরাইবার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত মাছ তুলিয়া ফেলে বলিয়া ২।১ বৎসরের ঠিকায় মাছ পূর্ণায়তন হইবার সুযোগ পায় না। এই কারণে মৎস্য-বিভাগ ৫ বৎসরের কম সময়ের জন্য ঠিকা দেওয়া অনুমোদন করেন না। পুকুরে অল্প পরিমাণ পানা কিম্বা দল মৎস্য বৃদ্ধির সহায়তা করে; কিন্তু অধিক পরিমাণ দল, ঝোপ ইত্যাদি মাছের পক্ষে অনিষ্টকর এবং মে মাসই এই সকল দল পরিষ্কার করিবার প্রশস্ত সময়।

৬ই জুন ১৯১৬ সালের এক সারকুলার দ্বারা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কালেক্টর কমিশনরগণকে আসল মৎস্য ব্যবসায়ীগণের সহিতই সরকারী নদী, পুষ্করিণী, বিল প্রভৃতির মৎস্য ধরিবার স্বত্বের সাময়িক ইজারা দিবার অনুজ্ঞা করিয়াছেন। ইহাও বলিয়াছেন যে নিলাম করিয়া সর্ব্বোচ্চ দরে দালাল ব্যবসায়ীদিগের বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন না।"

পুস্তক-পরিচয়

সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব

শ্রীঅভয়কুমার গুহ এম-এ, বি-এল প্রণীত

মূল্য ২৲ দুই টাকা

গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে আমরা দেখিতে পাই, পণ্ডিতপ্রবর মনীষী ম্যাক্সমুলার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বোধ হিন্দুগণের কখনও ছিল না। তাঁহারা ভাস্কর্য্যে অথবা চিত্রে কখনও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। * * আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে হিন্দুজাতি সূক্ষ্মতম গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-বিষয়ক মত সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়া যান নাই।' এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া অধ্যাপক নাইট লিখিলেন, 'সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান প্রাচীন ভারতে উন্মেষিত না হওয়া বিস্ময়াবহ ব্যাপার। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বহুদেবতাবাদ, প্রকৃতির উপাসনাবাদ প্রভৃতি অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য দার্শনিক মত প্রাচীন ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মণ্য কি বৌদ্ধ গ্রন্থে সৌন্দর্য্য-স্পৃহার চিহ্নমাত্র পাওয়া যায় না।' এই অলীক-ভাষণ-সঞ্জাত বেদনা বোধ হয় সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব আলোচনায় লেখক মহাশয়কে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—অনুশীলনে প্রেরণা আনিয়াছে, প্রমাণ-সংগ্রহে অদম্য উৎসাহে দিয়াছে। ফলে, আমরা তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল, সুধী পণ্ডিতের নিকট হইতে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বিষয়ক একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সুচিন্তিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সমালোচক গ্রন্থ পাইয়াছি। এ পুস্তকে যে শুধু নীরস দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা হইয়াছে, প্রতীচ্য মতের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইয়াছে ও সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যগণের সৌন্দর্য্য-বোধ যে জাগ্রত ছিল তাহা দেখান হইয়াছে, তাহা নহে। ইহাতে আছে মধুর রসের কথা—যাহা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়া প্রেমানন্দ লাভ করা যায়; ইহাতে আছে সাধনার ধন অপ্রাকৃত তত্ত্ব—যে তত্ত্বের মধুর রসাস্বাদ পাইয়া কবি সত্যই বলিয়াছিলেন,—

> "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
> নয়ন না তিরপিত ভেল।"

সেই বৈষ্ণবদিগের রসতত্ত্বের আলোচনা এ পুস্তকে আছে।

পুস্তকের ভূমিকায় লেখক মহাশয় প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদ প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় পূর্ণ। বৈদিক আর্য্যগণ ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, পরমদেবতা বিষ্ণু মধুর উৎস। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের খনি—কবিতা ও গীতির উৎকর্ষ-সাধন করিয়াছিলেন, বিবিধ ছন্দের বিষয় অবগত ছিলেন, রসাত্মক বাক্যই যে কাব্য তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-বোধ শুধু কাব্য ও সঙ্গীতের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা নহে। স্থাপত্য এবং অন্যান্য কলার আকারেও প্রকাশ পাইয়াছে। সহস্রস্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদ, 'শত পাষাণ নির্ম্মিত পুরী', 'মহতী লৌহ নির্ম্মিত পুরী', 'শীতাতপবর্ষানিবারক, সমৃদ্ধ ও আচ্ছাদনযুক্ত সহস্রদ্বার গৃহে'র পরিকল্পনাও তাঁহারাই করিয়াছিলেন। সুচক্র রথও তাঁহারা প্রস্তুত করিতে জানিতেন। আর এ কথা এখন একরূপ

সর্ব্ববাদিসম্মত যে, সৌন্দর্য্যের অনুভূতি ও অনুরাগ হইতেই কলার উৎপত্তি। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণ সকল দৃষ্টে আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে, অন্যূন পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে, বৈদিক যুগে আর্য্যগণের সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাস আলোচনা করিয়া ইহাও আমরা বলিতে পারি যে, আর্য্যগণই সর্ব্বপ্রথমে সৌন্দর্য্যের মূল তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কারণ পাশ্চাত্য গ্রীক্ সভ্যতা খৃঃ পূর্ব্ব নবম কি দশম শতাব্দী অপেক্ষা প্রাচীন নহে? ভারতীয় ঋষিরাই প্রথমে জগতকে এই সত্য দান করিয়াছেন যে, যিনি সুকৃত তিনিই রসস্বরূপ। রসস্বরূপের রস প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দিত হয়। জগতের সকল বস্তুই তাঁহার আনন্দ-রূপ, অমৃত-রূপ। তিনি সচ্চিদানন্দময়—তাঁহারই প্রকাশে সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত। ভারতীয় ঋষিরাই সর্ব্বাগ্রে প্রমাণ করিয়াছেন, রসই সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব—সৌন্দর্য্য শুধু আমাদের মানসিক অবস্থা নহে—উহার বস্তুগত বাহ্য অস্তিত্ব আছে।

পুস্তকখানিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—(১ম) প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ণয়—কলার বিবৃতি ভিন্ন যে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সম্ভবপর নয়, এ মত অলীক। সুন্দর বস্তুতে এমন কিছু আছে, যাহা তাহাকে সুন্দর করিয়াছে। বিশ্লেষণ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। (২য়) সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব বিষয়ে গ্রীক দার্শনিকদিগের, (৩) জার্ম্মাণ দার্শনিকদিগের, (৪) ফরাসি দার্শনিকদিগের, (৫) ইটালীয় ও ওলন্দাজদিগের এবং (৬) ইংরাজ দার্শনিকদিগের মতবাদ সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদের মত একদেশদর্শী; কেহ ভাবের দিক, কেহ রসের দিক দেখিয়াছেন মাত্র। এই সকল মতবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা দেখিয়া আমরা লেখক মহাশয়ের বিচার-শক্তির ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার গবেষণা, তাঁহার চিন্তাশীলতা ও মার্জ্জিত বুদ্ধির পরিচয় পদে-পদেই প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতবাদের কেবল মাত্র অনুবাদ করেন নাই। এ পুস্তকখানি অনুবাদ গ্রন্থ নহে—সুচিন্তিত মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ। পাশ্চাত্য মতগুলিকে তিনি সম্ভ্রমের সহিত আলোচনা করিয়াছেন; মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন—তাহাদের মধ্যে কতটা সত্য নিহিত রহিয়াছে। সত্যানুসন্ধিৎসু লেখক মহাশয় মতগুলিকে নিজস্ব করিয়া আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। নীরস দার্শনিক মতবাদগুলিকে সরস করিয়া বলিবার অসীম ক্ষমতা তাঁহার আছে। তৎপরে তিনি (৭) ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতের আলোচনা করিয়া (৮) সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে (৯) সৌন্দর্য্য-স্বরূপ অধ্যায়ে নিজ বক্তব্য স্ফুটতররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ভাবুক লেখক মহাশয় দেখাইয়াছেন, ভগবানের বিগ্রহ-মূর্ত্তিতেই আমাদের সৌন্দর্য্য-স্পৃহার পরিসমাপ্তি—ইহা সৌন্দর্য্যের পর-প্রকাশ। এই রসামৃত মূর্ত্তি অপেক্ষা সুন্দর কিছুই নাই। এই মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে, সে চিরকালের জন্য মজিয়াছে, আপনাকে বিকাইয়াছে। প্রেমিক চণ্ডীদাসের ন্যায় তাহাকেও বলিতে হইবে—

"ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে,
আর কেহ নাহি মোর।
তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি,
তবে যে মরি আমি।
চণ্ডীদাস ভণে, অনুগত জনে
দয়া না ছাড়িও তুমি॥"

পুস্তকে দুইটী পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমটীতে লেখক কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিতের সৌন্দর্য্যবিষয়ক মতের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন ও অপরটীতে ললিতকলার স্বরূপ সম্বন্ধে কতিপয় প্রবীণ লেখকের মত উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানিতে একটী প্রমাণ-পঞ্জীও (Bibliography) আছে।

এই সুচিন্তিত ও সুলিখিত পুস্তক গুহ মহাশয়ের গভীর জ্ঞানের, চিন্তাশীলতার ও ভাবপ্রবণতার পরিচায়ক। তাঁহার পরিশ্রম যে সফল হইয়াছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আমরা এ পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাই পুস্তকখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের পাঠ্য পুস্তক হইতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব।

ধূপদান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন প্রণীত

মূল্য একটাকা।

এই ধূপদানে কয়েকটী দেবী চরিত্রের সমাবেশ দেখিলাম। ইহাতে যশোদা দেবী, বীরমতি, ইচ্ছাকুমারী, রাণীক দেবী, বিমলা দেবী, গৌরীবাঈ, সুন্দরকুমারী, কর্ম্মদেবী, মীরাবাঈ, ও রাবেয়া এই দশটী মহিমময়ী মহিলার জীবন-কাহিনী যে সৌগন্ধ বিতরণ করিয়াছে, তাহা পরম পবিত্র। যে কয়েকটী মহিলার কথা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে শেষোক্ত তিনটী মহিলার জীবন কথা বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা অল্পবিস্তর জানেন, অপর সাতটীর কথা আমাদের বাঙ্গালা দেশে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত; অথচ তাঁহারা আমাদের এই ভারতবর্ষেই হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পবিত্র জীবন-কথা বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া সুলেখক রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন; বস্তুতঃ এমন ভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশের দেবীচরিত্রের সহিত পরিচিত হওয়া যে আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়, সে কথা আর বলিতে হইবে না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু সুলেখক এবং হৃদয়বান লেখক; জীবন-কথা লিখিতে যে প্রকার শ্রদ্ধা-ভক্তিসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, রবীন্দ্রবাবুতে তাহার অভাব নাই। এই পুস্তকখানি আমাদের দেশের প্রত্যেক অন্তঃপুরে স্থানলাভ করিলে প্রকৃত পক্ষেই নারী-সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

আপেল

শ্রীপাঁচুলাল ঘোষ প্রণীত

মূল্য একটাকা।

শ্রীমান পাঁচুলাল ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাগণের পাতে 'আঙ্গুর' পরিবেশন করিয়াছিলেন; এখন আবার আপেল দিতেছেন। শ্রীমানের আম, জাম, কাঁঠালের উপর বিতৃষ্ণা কেন? তা হউক; 'আপেল'ও মন্দ ফল নহে। এই ছোট গল্প-সংগ্রহ পুস্তকে বারটা গল্প আছে; তাহার মধ্যে কয়েকটী 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। ছোট গল্প লেখায় শ্রীমান পাঁচুলালের হাত আছে; যেটা যেমন করিয়া বলিলে শোভন হয়, তাহা তিনি বেশ জানেন। গল্প কয়টীই সুন্দর, সুলিখিত। আমরা শ্রীমান পাঁচুলালের গল্পের পক্ষপাতী। এই 'আপেল' পাঠ করিলে পাঠকগণ শ্রীমানের গল্প লিখিবার শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাইবেন। আমরা এই সংগ্রহের মধ্যে 'হাঁচ্যাতত্ব' 'সাটার' 'বৌদিদি'—এই গল্প তিনটীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান

ডাক্তার শ্রীজগচ্চন্দ্র রায় এল-এম-এস প্রণীত

মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় একজন বহুদর্শী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসক। তিনি যখন পাবনায় ছিলেন, তখন হইতেই আমরা তাহার সুযশ শুনিয়া আসিতেছি; কলিকাতায় আসিয়াও তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আমরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কিছুই জানি না; তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, এমন বহুদর্শী চিকিৎসকের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল যে পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা চিকিৎসা ব্যবসায়ীর নিকট আদৃত হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

আট আনা সংস্করণের পঞ্চদশ গ্রন্থ শ্রীমতী হেমনলিনী দেবীর "লাইকা" বাহির হইয়াছে। ষোড়শ গ্রন্থ শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর "আলেয়া" যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষাল এম্ এ, বি-এল্, সরস্বতী প্রণীত "যৌতুক" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲। এই বিবাহের বাজারে অপরিহার্য্য।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "জালমোহন্তে"র আত্মলীলা প্রকাশিত হইল। মূল্য বার আনা।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সঙ্গীতচন্দ্রিকা, ২য় ভাগ, প্রকাশিত হইয়াছে। দক্ষিণা ছয় মুদ্রা।

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পুণ্যের সংসার" বাহির হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

সৌরভ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার প্রণীত "সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাস" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য আড়াই টাকা।

"মণি-মন্দির"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত ধর্ম্মমূলক উপন্যাস "প্রীতি ও ভক্তি" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত "রাতকাণা" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ছয় আনা। প্রহসনখানির নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়—থিয়েটারে গিয়া ইহার অভিনয় দর্শন করিলে 'রাতকাণা' রোগ জন্মিবে, না সারিবে?

অধ্যাপক সমাদ্দারের 'সমসাময়িক ভারত' গ্রন্থাবলীর একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হইল। মূল্য তিন টাকা। গ্রন্থাবলীর মোট সাতখানি বাহির হইল। অধ্যাপক সমাদ্দারের 'ইংরাজের কথা'র ইংরাজী ও হিন্দী উভয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম্-এ "শিল্পের বিকাশ" (Evolution of Industry) নামক প্রবন্ধ লিখিয়া চৈতন্য লাইব্রেরী হইতে (একশত টাকা মূল্যের) বিশ্বম্ভর সেন পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

ভবানীপুর সাহিত্যসমিতি হইতে চারিটি পদক পুরস্কার ঘোষিত হয়। তন্মধ্যে 'নীতীশ' ও 'স্নেহলতা' পদক শ্রীমান্ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী রত্নমালা বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'দ্বিজেন্দ্র' পদক ও 'গোপাল' পদকের জন্য আশানুরূপ প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়ায় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত রচনা গৃহীত হইবে। 'দ্বিজেন্দ্র' পদকের বিষয়—দ্বিজেন্দ্রলালের গান। 'গোপাল' পদকের বিষয়—(১) গৃহ-শিল্প বা (২) ভারতে গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ। ৭৫ নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির কার্য্যালয়ে রচনা পাঠাইতে হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Choudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

শোকে সান্ত্বনা

শিল্পী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রাবণ, ১৩২৪

প্রথম খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [দ্বিতীয় সংখ্যা

বেদে কালের বিভাগ

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম্-এ]

শতপথ ব্রাহ্মণ—ত্রয়োদশ মাস

ঋগ্বেদে ও অথর্ব বেদে ১২, মাসে বৎসর বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক মাস ৩০ দিনে গণিত হইত। সেই জন্য সেকালের বৎসর ৩৬০ দিনব্যাপী ছিল (১)। কৌটিল্যের অর্থনীতিতে ৩০ দিনের মাসকে প্রকর্ম্ম মাস আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে (২)। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে ৩০ দিনের প্রত্যেককে সাবন দিন বলা হইত। ১২ মাস ছাড়া আর একটি মাসের উল্লেখ উপরোক্ত দুই বেদেই বর্ত্তমান। ঋগ্বেদে ঐ মাসকে ৭ম মাস এবং উহা একাকী জন্মায়, বলা হইয়াছে। অপরগুলি যুগ্ম মাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৩)। অথর্ব বেদে এই মাসকে ত্রয়োদশ এবং ৩০ দিন ও রাত্রিযুক্ত বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ত্রয়োদশ

(১) দ্বাদশারং নহি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরিদ্যামৃতস্য।
আপুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্তশতানি বিংশতিশ্চতস্থুঃ॥

ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।১১

১২টী অর- (অর্থাৎ radius) যুক্ত ঋতের (অর্থাৎ বৎসরের) চক্র দ্যুলোকের চারিদিকে ঘুরিতেছে; তাহারা জরাগ্রস্ত হয় না। অগ্নির ৭২০ মিথুন পুত্র (অর্থাৎ দিবা ও রাত্রি) ইহাতে আছে।

যস্মান্ মাসা নির্মিতা স্ত্রিংশদরাঃ সংবৎসরো'যস্মিন্ নির্মিতো দ্বাদশারঃ।

অথর্ববেদ, ৪।৩৫।৪

যাহা হইতে ৩০টী অরযুক্ত মাস সকল নির্ম্মিত, যাহা হইতে ১২টী অর-যুক্ত সংবৎসর নির্ম্মিত।

সপ্ত চ বৈ শতানি বিংশতিশ্চ সংবৎসরস্যাহোরাত্রা,স্তাবান্ সংবৎসর·

ঐঃ ব্রাঃ

(২) ত্রিংশদহোরাত্রঃ প্রকর্ম্ম মাসঃ। ২য় অধিকরণ, ৩৮ প্রকরণ। Thirty days and nights together make one work-a-month (*Prakarma-māsah*). p. 134 (Translation by R. Shama Sastry)

(৩) সাকং জানাং সপ্তথ মাহু রেকজং ষড়িদ্যমা ঋষয়ো দেবজা ইতি।

ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।১৫

একত্র উৎপন্নদিগের ৭ম একাকী জন্মিয়াছে বলিয়া। ছয় জন যমজ, ঋষি ও দেবজাত।

মাসের উল্লেখ আছে (৪)। শতপথ ব্রাহ্মণেও আমরা ১৩ মাস ও ৭টী ঋতুর উল্লেখ দেখিতে পাই (৫)। শতপথ ব্রাহ্মণের মূল না পাওয়ায়, The Sacred Books of the East Series-এর অন্তর্গত জুলিয়াস্ এজ্জেলিং কৃত ইংরাজী অনুবাদ-গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ত্রয়োদশ মাস বা সপ্তম ঋতুর সহিত বৎসরের অপরাপর মাসের কি সম্বন্ধ? ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকদিগের নিকটে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। ঋগ্বেদের কাল হইতেই পাঁচ প্রকার বৎসরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। শতপথ ব্রাহ্মণে ঐ ৫ প্রকার বৎসরের সকল নামই প্রাপ্ত হই (৬)। কিন্তু ঋগ্বেদ ও অথর্ব বেদে কতকগুলির মাত্র নাম পাওয়া যায় (৭)। বৎসরগুলির নাম —সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, ইদ্বৎসর ও বৎসর। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সেকালে ঋতুক্রমে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যদি ৩৬০ দিনে বৎসর গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র ঋতু-বিপর্য্যয় হইয়া পড়ে। ইহা নিবারণের জন্যই সেকালে এই পাঁচ বৎসরের যুগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক বৎসরে প্রায় ৬ দিন কম থাকায়, প্রত্যেক ৫ বৎসরে এক মাস কম হইয়া পড়িবে। এই নিমিত্ত বৈদিক কালের ঋষিরা যুগের শেষ বৎসরে ১৩ মাস কল্পনা করিতেন। যদি বৎসরের বার মাসের নাম বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে পঞ্চম বৎসরের চৈত্র মাসের শেষে যে অধিক মাস ধরা হইত, তাহা ত্রয়োদশ বলিয়া উল্লিখিত হইত।

যদি মনে করা যায় যে, সেকালে পূর্ণিমা দ্বারা মাস গণনা করা হইত, তাহা হইলে ৫ প্রকর্ম্ম ও চান্দ্র বৎসরেও এক মাস অন্তর হইবে। ইহাকেই কি ত্রয়োদশ মাস বলা হইত? আমাদের মনে হয় যে, ইহাকে ত্রয়োদশ মাস বলা হইত না। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, সূর্য্য ও চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা স্থির করা হইত। শতপথ ব্রাহ্মণের এক স্থলে লিখিত আছে যে, বৈশাখ মাসে যে, অমাবস্যা হয় তাহা রোহিণী নক্ষত্রে হইয়া থাকে (৮)। এই ত্রয়োদশ মাস ঋতু সম্বন্ধীয় (অর্থাৎ সৌর) বৎসর এবং প্রকর্ম্ম বৎসরের মধ্যে বিরোধ ভঞ্জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কারণ, সাংবৎসরিক যজ্ঞ বসন্ত ঋতু, কি গ্রীষ্ম ঋতুতে আরম্ভ হইবে, তাহার বিচার হইয়াছে।

সাংবৎসরিক যজ্ঞ (শতপথ ব্রাহ্মণ)

শতপথ ব্রাহ্মণে সাংবৎসরিক যজ্ঞ কিরূপে সাধিত হইত, আমরা এক্ষণে তাহার বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। বৈদিক যুগে অগ্নিই সংবৎসর ও প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়াছে (৯)। সাংবৎসরিক যজ্ঞ করিতে হইলে, ইষ্টক দ্বারা

(৪) অহোরাত্রৈ র্বি মিতং ত্রিংশদঙ্গং ত্রয়োদশং মাসং যো
নির্মিমীতে তস্য। অথর্ববেদ, ১৩।৩।৮

৩০টী অঙ্গযুক্ত ত্রয়োদশ মাস অহোরাত্র সকল দ্বারা পরিমিত; (তাহাকে) যিনি নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাঁহার ......।

এতং (সোমং) ত্রয়োদশান্ মাসাৎ অক্রীণং তস্মাৎ ত্রয়োদশো
মাসো নানু বিদ্যতে .....ঐঃ ব্রাঃ।

(৫) There are 26 half-months, 13 months, 7 seasons. শতপথ ব্রাহ্মণ, ৮।৪।১।২৫

The year, as an embryo, in the shape of the 13th month, enters the seasons. শতপথ ব্রাহ্মণ, ৮।৪।১।১৯

(৬) Thou art Samvatsara,—thou art Parivatsara,—thou art Idâvatsara,—thou art Idvatsara,—thou art Vatsara,—May thy dawns prosper.

শতপথ ব্রাহ্মণ, ৮।১।৪।৮

(৭) সংবৎসরস্য তদহঃ পরিষ্ঠয়ন্ মণ্ডূকাঃ প্রাবৃষীণং বভূব।

ঋগ্বেদ, ৭।১০৩।৭

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচমক্রত ব্রহ্মকৃণ্বন্ত পরিবৎসরীণম্।

ঐ ৭।১০৩।৮

হে মণ্ডূকগণ! সংবৎসরের সেই দিন আসিয়াছে যে (দিনে) প্রাবৃট্ হইয়াছিল। সোমযজ্ঞকারী ব্রাহ্মণগণ পরিবৎসরকালীন বাক্য, স্তোত্র করিয়া উচ্চারণ করিতেছেন।

ইদাবৎসরায় পরিবৎসরায় সংবৎসরায় কৃণুতা বৃহৎ নমঃ।

অথর্ববেদ, ৬।৫৫।৩

(৮) He may lay down the fires on the new moon which falls in the (month) Vaisākha, for that coincides with the Rohini (asterism). XI, 1, 1, 7.

(৯) With seven (formulas) he draws them across,—the altar consists of seven layers, and seven seasons are a year, and Agni is the year. IX, 1, 2, 31.

These are 13 oblations,—for there are 13 months in the year, and the year is Pragāpati, and Pragāpati is sacrifice. XIV, 3, 2, 16.

অগ্নি-বেদি রচনা করিতে হইত। বৎসরে যত দিন ও রাত্রি আছে, বেদি রচনার ইষ্টকের সংখ্যাও তত হওয়া চাই। দ্বাদশ মাস ব্যতীত, ত্রয়োদশ মাসের কল্পনা দ্বারা সৌর ও সাবন বৎসরের মিলন করা হইত। এই ত্রয়োদশ মাসের জন্যও ইষ্টক লওয়া হইত (১০)। এক মতে বৎসরে ছয় ঋতু ধরা হইত। যে বৎসরে ত্রয়োদশ মাস হইত, সে বৎসরে ৭টি ঋতু ধরা হইত। ছয়টি ঋতু প্রত্যেকে দুই মাস করিয়া; কিন্তু ত্রয়োদশ মাসকে ৭ম ঋতু বলা হইত (১১)। কোন মতে ৫টি ঋতু ধরা হইত (১২)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এই দুই মত ছিল। আবার কোন মতে ঋতু তিনটি (১৩)। বলা হইয়াছে, চরকাধ্বর্যুগণ অগ্নিবেদি রচনায় পাঁচটি স্তর না করিয়া ছয়টি স্তর প্রদান করিতেন। সেকালে মনে করা হইত, অগ্নিবেদির ধাপে-ধাপে দেবগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসেন এবং পুনরায় উঠিয়া যান, সেইজন্য এইরূপ রচনা হইত (১৪)। ঋতু ক্রমে ইষ্টক রচনার ক্রম এইরূপ। ভূমিই প্রথম স্তর, এবং তাহার উপরের ইষ্টক-স্তর লইয়া বসন্ত-ঋতু। ইহা দ্বারা বৎসরের পদদ্বয় গঠিত হইয়াছে (১৫)। বসন্ত-ঋতুর মাসদ্বয়ের নাম মধু, মাধব। গ্রীষ্মঋতুর মাসদ্বয় শুক্র, শুচি; ইহারা প্রজাপতির উরুদ্বয় গঠন করে (১৬)। বর্ষাঋতুর মাসদ্বয় নভ ও নভস্য; শরৎ ঋতুর মাসদ্বয়ের নাম ছিল ইষ ও ঊর্জ। বর্ষা ও শরৎ প্রজাপতির মধ্যদেশ গঠন করে (১৭)। হেমন্তঋতুর মাসদ্বয়কে সহ ও সহস্য বলা

Twelve heifers with first calf are the sacrificial fee for this (sacrifice) ; for twelve months there are in the year, and the year is Pragāpati, and Pragāpati is the sacrifice. V, 4, 5, 20.

(১০) As many there are days and nights in the year, so many are the bricks of that fire-altar. Thereto (comes) a thirteenth month, for there is that thirteenth month. VI, 2, 2, 29.

Now, what 720 bricks there are of these, they are the 360 enclosing stones and 360 yagus-shmati bricks; and what 36 there are in addition, they are the 13th (intercalory) month, the body (of the altar). X, 5, 4, 5.

(১১) There are six cups (of milk and liquor), for there are six seasons ; it is the seasons he thereby secures,—to wit, the spring and summer by the two Asvina (cups), the rainy season and autumn by the two Sārasvata ones, and the winter and dewy season by the two Aindra ones. XII, 8, 2, 34.

(১২) Two spring months, two summer months, two months of rainy season, two autumn months and two winter months. VIII, 5, 2, 14.

ষড়্ঋতুনেতি যজন্তি···।৯।৫।২৯ 'সপ্তদশবৈ প্রজাপতির্দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্তবো······১।১।১

(১৩) There are three sacrificial cakes, for there are three seasons ; it is the seasons he thereby secures,—to wit, the summer by that of Indra, the rainy season by that of Savitri, and the winter by that of Varuna. XII, 8, 2, 33.

(১৪) Tapa and Tapasya, the two dewy seasons ......Tapa (the burner), doubtless is yonder Sun. VIII, 7, 1, 5.

The fifth layer of this (altar) is the sky, and the dewy season of this (year) is the sky. VIII, 7, 1, 7.

The fifth layer of his (Agni's) head, and the dewy season is its (the year's) head. VIII, 7, 1, 8.

Now these same (bricks) are indeed stepping-stones, for by means of the seasonal (bricks the gods then stepped over these worlds, both from hence upwards and from above downwards. VIII, 7, 1, 13.

Now, the Charakādhvaryus lay down here yet other stepping stones. VIII, 7, 1, 14.

(১৫) This Agni (fire-altar) is the year, and the year is these worlds ; the first layer is this (terrestrial) world thereof ; and when he now lays down those two (bricks), he thereby puts back into him (Agni-Pragāpati) what those two (the first layer and the spring) are to that body of his ; this why he now lays down those two bricks. VII, 4, 2, 30.

(১৬) 'Madhu and Mādhava the two spring seasons'—these are the names of those two ; it is thus by their names that he lays them down. VII, 4, 2, 29.

Sukra and Suchi, the two summer seasons. VIII, 2, 1, 16.

(১৭) 'Nabha and Nabhasya, the two rainy sea-

হইত। ইহারা চতুর্থ স্তর এবং প্রজাপতির বক্ষস্থল গঠন করে। হিমঋতুর মাসদ্বয়কে তপ ও তপস্য বলা হইত এবং ইহারা ছিল বৎসরের মস্তক। কোন সম্প্রদায় পাঁচ স্তরে, অপর এক সম্প্রদায় ছয় স্তরে অগ্নিবেদি রচনা করিতেন, বলা হইয়াছে। তবে উভয়েই বসন্ত ঋতু হইতে বৎসর আরম্ভ করিতেন (১৮)। সেই জন্য বর্ষা ও শরৎ বৎসরের মধ্যস্থলে পড়িত। যাঁহারা পাঁচ ঋতু বলিতেন, তাঁহাদের মতে বর্ষা ও শরৎ মিলিয়া এক ঋতু।

যেমন ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সাংবৎসরিক যজ্ঞে অতিরাত্র, চতুর্বিংশ, মহাব্রত, বিষুবান্ প্রভৃতি দিনের প্রধান-প্রধান যজ্ঞের উল্লেখ আছে, শতপথ ব্রাহ্মণেও ঐ সকল নাম প্রাপ্ত হই (১৯)। এই ব্রাহ্মণেও সংবৎসর যজ্ঞকে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সহিত তুলনা করা হইয়াছে (২০)। বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাঋতু দেবতাদিগের এবং শরৎ, হেমন্ত ও শিশিরঋতু পিতৃদিগের ছিল, বলা হইয়াছে (২১)। সূর্য্যের উত্তরায়নকে

---

sons'—these are the names of those two (bricks). VIII, 3, 2, 5.

Then the two upper ones, with (Vâg, S, XIV, 16 ,) 'Isha and Urga, the two autumnal seasons.'…VIII, 3, 2, 6.

'Saha and Sahasya, the two winter seasons.'…VIII, 4, 2, 14.

Now that (part) of him which is above the feet and below the waist is this second layer (*i.e.*, Sukra and Suchi). VIII, 2, 1, 18.

Now the middlemost layer is the middle of this (altar) and the rainy season and the autumn are the middle of that (year). VIII, 3, 2, 8.

The rainy season and the autumn are the middle of that (year). VIII, 3, 2, 8.

What part thereof is above the air and below the sky, that is this 4th layer, and that is the winter season thereof. VIII, 4, 2, 15.

What (part) of him there is above the waist and below the head, that is this 4th layer, and that is the winter season of him (or of it, the year). VIII, 4, 2, 16.

(১৮) One month (the building of) the first layer (of bricks) takes and one month the layer of earth, —so long desire (lasts) in the spring season …X, 2, 5, 9.

One month the second (layer of bricks)…in the summer season. *Do*, 10.

One month the third (… *do*)…in the rainy season. *Do*, 11.

One month the fourth (… *do*)…in the autumn season. *Do*, 12.

And of the fifth layer (of bricks)…in the winter season. *Do*, 13.

One month the sixth (layer of bricks takes) … in the dewy season ; … the 12 months and the 6 seasons. X, 2, 5, 14.

(১৯) The same year contains 3 great rites (Mahabrata) :— the great rite on the চতুর্বিংশ day , the great rite on the Vishuvat day and the great rite on the Mahabrata day itself XII, 2, 3, 23.

(২০) Verily, those who become initiated for (a scarificial session of) a year cross an ocean : the প্রায়ণীয় অতিরাত্র is a flight of steps , for it is by means of a flight of steps that one enters (the water). XII, 2, 1, 1.

The অভিপ্লব is (a spot) suitable for swimming ; and so is the পৃষ্ঠ্য suitable for swimming. XII, 2, 1, 2.

The অভিজিৎ is a foothold, a shallow place.

The first স্বরসামন্ is thigh deep.

The বিষুবৎ is a foothold (in the form of) an island.

The বিশ্বজিৎ is a foothold, a shallow place.

The মহাব্রত is a foothold.

The উদয়নীয় (concluding) অতিরাত্র is a flight of steps, for, it is by a flight of steps that people step out of (the water).

How many অতিরাত্রs are there in the year, how many অগ্নিষ্টোমাঃ ; how many উক্থ্যাঃ ; how many ষোড়শিন্ ; how many ষড়হাঃ। XII, 2, 1, 2 to 6.

(২১) But let him rather begin it in Spring ; for Spring is the Brahmana's season, and truly whosoever sacrifices, sacrifices after becoming, as it were, a Brahmana ; let him therefore by all means begin it in Spring. XIII, 4, 1, 3.

দেবযান ও দক্ষিণায়নকে পিতৃযান বলা হইত (২২)। শতপথ ব্রাহ্মণে কৃত্তিকা-নক্ষত্র সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ অগ্নির। এই নক্ষত্রপুঞ্জে, সকল নক্ষত্র-পুঞ্জ হইতে অধিক নক্ষত্র বর্ত্তমান। ইহা পূর্ব্ব দিক হইতে বিচলিত হয় না, কিন্তু অপর নক্ষত্রগণ পূর্ব্বদিক হইতে দূরে গমন করে। প্রাচীন কালে কৃত্তিকাগণ সপ্তর্ষিদিগের স্ত্রী ছিল। তাহারা ঋষিদিগের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বামী-সহবাসে বঞ্চিত হইয়াছে। কারণ, সপ্তর্ষিগণ উত্তরে উদিত হন এবং কৃত্তিকাগণ পূর্ব্বে। বর্ত্তমান কালে অগ্নি তাহাদের স্বামী হইয়াছেন, এবং তাহারা অগ্নির সহবাস প্রাপ্ত হইতেছে (২৩)। এই সকল বর্ণনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইতেছে যে, সূর্য্য কৃত্তিকায় আসিলে গ্রীষ্ম কাল হইত, ও দিন-রাত্রি সমান হইত। কারণ, কৃত্তিকা পূর্ব্বদিক হইতে বিচলিত হয় না। শতপথ ব্রাহ্মণের সময়ে এইরূপ হইলে তাহার কাল তবে কি ছিল? এই বিষয়ের পরে বিচার করা যাইতেছে।

বিষুবান্

এক্ষণে আমরা, বিষুবান্ শব্দ দ্বারা শতপথ ব্রাহ্মণে কি বুঝাইত, তাহার বিচার করিব। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা দেখিয়াছি, বিষুবান্ দ্বারা Winter-Solstice বুঝাইত—এবং অতিরাত্র দ্বারা Summer-Solstice বুঝাইত। শতপথ ব্রাহ্মণে সংবৎসর সত্রকে একস্থলে সমুদ্র পার হইবার সহিত তুলনা করা হইয়াছে; কোন স্থলে সংবৎসরকে মনুষ্যের সহিত, আবার এক স্থলে পক্ষীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে প্রধান-প্রধান দিবসের যজ্ঞ হয়, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অগ্নি, জল, সূর্য্য, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও বিশ্বদেবগণ হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে (২৪)। ইহাদের মধ্যে বিষুবৎ দিন সূর্য্য হইতে উৎপন্ন এবং মধ্যস্থলে বর্ত্তমান। যখন বৎসরকে মনুষ্যের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, প্রায়ণীয় অতিরাত্র উহার পদতলদ্বয়, চতুর্বিংশ উরুদ্বয়, অভিপ্লব বক্ষ ও পৃষ্ঠ্য পৃষ্ঠদেশ বলা হইয়াছে। (২৫) অভিজিৎ দক্ষিণ হস্ত, বিষুবৎ মস্তক, বিশ্বজিৎ বাম হস্ত,

(২২) The spring, the summer and the rains,—these seasons (represent) the gods; the autumn, the winter, and the dewy season represent the fathers. II, 1, 3, 4.

Now when he (the Sun) moves northwards, then he is among the gods, then he guards the gods; and when he moves southwards, then he is among the fathers, then he guards the fathers. II, 1, 3, 3.

(২৩) The Krittikas, are doubtless Agni's asterism; ......II, 1, 2, 1. Moreover, the other lunar asterisms (consist of) one, two, three, or four (stars), so that the Krittikas are the most numerous (of asterisms); II, 1, 2, 2.

And again, they do not move away from the eastern quarter, whilst the other asterisms do move from the eastern quarter. II, 1, 2, 3.

Originally, namely, the latter were the wives of the Bears (riksha); for the seven Rishis were in former times called the Rikshas (bears). They were, however, precluded from intercourse (with their husbands), for, the latter, the seven Rishis, rise in the north, and they (the Krittikas) in the east. II, 1, 2, 4.

Agni doubtless is their mate, and it is with Agni that they have intercourse. II, 1, 2, 5.

(২৪) From out of the year (they fashioned) the chaturvimsa day from out of the priesthood the Abhiplava (Shadaha), from out of the nobility the Prishthya (Shadaha), from out of Agni the Abhigit, from out of the waters the Svarasaman days, from out of the Sun the Vishuvat,—......from out of Indra the Visvagit,—...... from out of Mitra and Varuna the Go and Ayus, from out of the Visve Devāh the Dasaratra, from out of the regions the Prishthya shadaha of the Dasaratra, from out of these worlds the Chhandoma days. XII, 1, 2, 2.

From out of the year (they fashioned) the tenth day, from out of Pragapati the Mahabrata and from out of the world of heaven the Udayaniya Atiratra:—such was the birth of the year. XII, 1, 2, 3.

(২৫) The year, indeed, is Man:—the opening (prayaniya) Atiratra is his feet, for, by means of their feet, (men) go forward (prayanti).........The Chaturvimsa day is the thighs, the Abhiplava the breast, and the Prishthya the back. XII, 1, 4, 1.

দশরাত্র অঙ্গ সকল, মহাব্রত মুখ, উদনীয় অতিরাত্র উৰ্দ্ধ হস্তদ্বয়—এইরূপে তুলিত হইয়াছে। যখন সমুদ্র পার হওয়ার সহিত সাংবৎসরিক যজ্ঞের তুলনা করা হইয়াছে, (২৬) তখন প্রায়ণীয় অতিরাত্র জলে নামিবার সোপানশ্রেণী, চতুর্বিংশ চওড়া ধাপ, অভিপ্লব-স্থান সন্তরণযোগ্য, পৃষ্ঠ্যও সন্তরণ-যোগ্য দেশ, অভিজিৎ অল্পজল স্থান, স্বরসামনে উরু মগ্ন হয়, বিষুবৎ দ্বীপসদৃশ দাঁড়াইবার স্থান, ইত্যাদি। আদিত্য ও অঙ্গিরাদিগের ভিতর কাহারা অগ্রে স্বর্গে যাইবে এই লইয়া প্রতিযোগিতা হয়। আদিত্যগণ অভিপ্লব দ্বারা অগ্রে, এবং অঙ্গিরাগণ পৃষ্ঠ্য দ্বারা পশ্চাৎ স্বর্গে গমন করেন (২৭)। বৎসর যখন পক্ষীর সহিত তুলিত হইয়াছে, (২৮) বিষুবৎ দিনকে বৎসরের মধ্যদিন ও পক্ষীর দেহের সহিত তুলিত দেখি। প্রায়ণীয় অতিরাত্রের দ্বারা উদয়নীয় অতিরাত্রে উঠিতে হয় (২৯)।

The Abhigit is the right arm, the Svarasāman days these three (openings of the) vital airs on the right side, the Vishuvat the head, and the (second period of) Svarasāman days these three vital airs on the left side. XII, 1, 4, 2.

The Visvagit is this left arm—......the Go and Ayus those downward vital airs; the Dasaratra the limbs, the Mahabrata the mouth; and the concluding (Udayaniya) Atiratra is the hands. XII, 1, 4, 3.

(২৬) Verily, those who become initiated for (a sacrificial session of) a year cross an ocean :—the Prāyaniya Atiratra is a flight of steps, for it is by means of a flight of steps that one enters (the water).

The Chaturvimsa day is......a foothold, a shallow place. The Abhiplava is (a spot) suitable for swimming ; and so is the Prishthya suitable for swimming.

The Abhigit is a foothold, a shallow place......the first Svarasāman is thigh-deep, the second knee-deep, the third knuckle-deep. The Vishuvat is a foothold ......an island. The first (Svarasāman) with reversed Sāmans is knuckle-deep, the second kneedeep and the third thigh-deep. The Visvagit is a foothold. The Prishthya is suitable for swimming and so is Abhiplava and so are the Go and Ayus and so is the Dasaratra.

The Mahabrata is a foothold......The Udayaniya (concluding) Atirātra is a flight of steps. XII, 2, 1, 1 to 5.

(২৭) Now, the Adityas and the Angiras, both of them spring from Pragāpati, were contending together, saying, 'We shall be the first to reach heaven,—we shall be the first !' XII, 2, 2, 9.

By means of four stomas, four Prishthas and light (simple) hymn-tunes, the Adityas sailed across to the heavenly world ; and inasmuch as they sailed (abhiplu) to it, they (these six-days' periods) are called Abhiplava. XII, 2, 2, 10.

By means of all the stomas, all the Prishthas, and heavy (complicated) hymn-tunes, the Angiras, coming after (the gods), as it were, touched (reached) the heavenly world ; and inasmuch as they touched (spris) it, it (this six-days' period) is called Prishthya. XII, 2, 2, 11.

(২৮) But, indeed, that year is a great eagle : the six months which they perform prior to the Vishuvat are the one wing, and those which they perform subsequent thereto are the other ; and the Vishuvat is the body. XII, 2, 3, 7.

'Seeing that for six months prior to the Vishuvat they perform stomas tending upwards, and for six (months) reversed (stomas), how are these latter performed so as to tend upwards ? XII, 2, 3, 8.

(২৯) By means of the opening Atiratra they ascend the concluding Atiratra, by means of the Chaturvimsa the Mahābrata, by means of an Abhiplava a subsequent Abhiplava, by means of a Prishthya a subsequent Prishthya, by means of the Abhigit the Visvagit, by means of the Svarasāmans the subsequent Svarasāmans—but that one day is not ascended, to wit, the Vishuvat ; XII, 2, 3, 10.

And in this way, indeed, there is a descent of days :—the Prāyaniyá Atiratra descends to the Chaturvimsa day, the Chaturvimsa day to the Abhiplava, the Abhiplava to the Prishthya, the Prishthya

উঠিবার প্রণালী এইরূপ :—প্রায়ণীয় অতিরাত্র চতুর্বিংশে নামে, চতুর্বিংশ অভিপ্লবে নামে, অভিপ্লব পৃষ্ঠ্যে, পৃষ্ঠ্য অভিজিতে, অভিজিৎ স্বরসামনে, স্বরসামন বিষুবতে, বিষুবৎ-স্বরসামনে, স্বরসামন বিশ্বজিতে, বিশ্বজিৎ পৃষ্ঠ্যে, পৃষ্ঠ্য অভিপ্লবে, অভিপ্লব গো ও আয়ুসে, গো ও আয়ুস দশরাত্রে, দশরাত্র মহাব্রতে, মহাব্রত উদয়ণীয় অতিরাত্রে। এক স্থলে মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও বাক্যের সহিতও তুলনা করিতে দেখি (৩০)।

একবিংশ ও দ্বাদশাহ সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, বৎসরের উদর একবিংশ এবং সংবৎসর সত্রের পরিবর্ত্তে দ্বাদশাহ সত্রও করা যাইতে পারে। অতএব মনে হয়, দ্বাদশাহের যজ্ঞ বিস্তৃত হইয়াই সম্বৎসর যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে(৩১)। নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না, যে, বিষুবৎ দিন বৎসর সত্রের মধ্য দিন ছিল (৩২)। কারণ, প্রথম অতিরাত্র ১ দিন, ৫৩ অগ্নিষ্টোম, ১২০ উক্‌থ, বিষুবৎ, ১২০ উক্‌থ, ৫৩ অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র ১ দিন। দেখান গিয়াছে, বৎসর বসন্ত ঋতু হইতে আরম্ভ হইত এবং প্রায়ণীয় অতিরাত্র তাহার পদদ্বয়, বিষুবৎ দিন বৎসরের উদর এবং মধ্যে অবস্থিত ; অতএব উহা শরৎকালের আদিতে পড়ে। ইহা Summer-Solstice হইতে পারে না। কিন্তু জুলিয়াস এজ্জেলিং নিম্নোদ্ধৃত পাদটীকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, বিষুবৎ দিন সকলের অপেক্ষা বড় দিন (৩৩)। ইহার অর্থ ত বুঝিলাম না। তাঁহার ভ্রম হইয়াছে আমার বিশ্বাস। বিষুবানের সূর্য্যকে কেন একবিংশ বলা হইত, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে দেখান গিয়াছে। বৎসরকে যজ্ঞের সহিতও তুলনা করা হইয়াছে (৩৪)। এই বর্ণনায়ও বসন্তঋতুকেই

---

to the Abhigit, the Abhigit to the Svarasāmans, the Svarasāmans, to the Vishuvat, the Vishuvat to the Svarasāmans, the Svarasamans to the Visvagit, the Visvagit to the Prishthya, the Prishthya to the Abhiplava, the Abhiplava to the Go and Ayus, the Go and Ayus to the Dasaratra, the Dasaratra to the Mahavrata, the Mahavrata to the Udayanīya Atiratra, the Udayanīya Atiratra to the world of heaven, to the resting place, to plenty. XII, 2, 3, 11.

(৩০) The year, indeed, is Man :—the Prayanīya Atiratra is his breath,...and the Arambhaniya (opening) day is speech. XII, 2, 4, 1.

The Abhiplava-Shadaha is this right hand.

XII, 3, 4, 2.

(৩১) The Ekavimsa (twenty-one-versed hymn-form) is the belly, for, inside the belly there are 20 Kuntāpa and the belly is the twenty-first. XII, 2, 4, 12.

They (the gods) saw the Prishthya—Shadaha to be an accelerated soma-feast in lieu of the Dvādasāha, for there are those (some) Stomas, those Prishthas and those metres. They (the gods) saw the Dvādasāha to be an accelerated Soma-feast in lieu of (a session of) a year, for there are those (same) stomas, those Prishthas and those metres. XII, 3, 3, 7 and 8.

(৩২) One Atiratra they perform before, and one after, the Vishuvat ; fiftythree Agnishtomas they perform before and fiftythree after, the Vishuvat ; one hundred and twenty Ukthya days they perform before, and one hundred and twenty after, the Vishuvat,—thus at least in the case of those who perform the Svarasāmans as Ukthyas.

And in the case of those who (perform them) as Agnishtomas, they perform fifty-six Agnishtomas before, and fifty-six after, the Vishuvat ; One hundred and seventeen Ukthya days they perform before, and one hundred and seventeen after, the Vishuvat; six Shodasins they perform before, and six after, the Vishuvat ; thirty Shadahas they perform before and thirty after, the Vishuvat. XII, 3, 5, 12 and 13.

(৩৩) The reason why the Sun is so often referred to as the twenty-first or twenty-one-fold, is not easy to discover. Possibly it may be from the fact that the Vishuvat day, or central day of the great session and the longest day of the year, is identified with the Sun, and that this day is flanked on both sides by ten special days which together with the central day, form a special group of twenty-one days. But, on the other hand, it may be exactly the other way, viz., that this central group was made one of twenty-one days because of the already recognised epithet of Aditya as

প্রথম বলা হইয়াছে। শরৎঋতুকে ব্রহ্মণ্ বলা হইয়াছে; অতএব শরৎঋতুতে বিষুবান্ থাকিত। কারণ, ঋষিদিগের নিকট ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ। দেখা গিয়াছে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে বৈশাখ মাস ও গ্রীষ্ম ঋতু হইত। বর্ত্তমান কালে আমরা বলি, সূর্য্য বিষুব বৃত্তে অবস্থান করিলে গ্রীষ্ম ঋতু ও সমান দিন-রাত্রি হয়। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের কালে বিষুবান্ শব্দ দ্বারা তাহা বুঝাইত না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতেও দেখান গিয়াছে যে, বিষুবান্ শব্দের অর্থ বর্ত্তমান কালের বিষুববৃত্ত বা বিষুবান্ দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। অথচ, সায়ন-প্রমুখ নব্য বেদ ব্যাখ্যাকারগণ এই আধুনিক অর্থ গ্রহণ করিয়া বেদ ও ব্রাহ্মণের মধ্যে অসংলগ্ন, বিপরীত ও ভ্রান্ত মত স্থাপন করিয়াছেন। তিলক মহোদয়ও এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। আচার্য্য যোগেশচন্দ্রের গ্রন্থ—'আমাদের জ্যোতিষী' হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি।

"ইতঃপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, ঋগ্বেদের সময়ে মৃগশিরা নক্ষত্রে, (এবং তিলক মহাশয়ের প্রমাণানুসারে প্রথমে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে রোহিণীতে কিংবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কৃত্তিকায়, এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণের সময়ে স্পষ্টতঃ কৃত্তিকায় বাসন্ত বিষুবদ্ দিন হইত।" পৃঃ ২৫

"কিন্তু কোন অয়নান্ত দিন হইতে বৎসর গণিত হইলে, বিষুবন্ বৎসরের মধ্য দিন হয় না। এরূপ হইলে বিষুবনের একদিকে ৩ মাস, অন্যদিকে ৯ মাস থাকে। এজন্য তিলক মহাশয় বলেন, প্রাচীন বৈদিক সময়ে বিষুবন্ হইতেই বৎসর গণিত হইত।" পৃঃ ৩৯

"বর্ষারম্ভ-কাল বিচার করিয়া অধ্যাপক বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় বৈদিক কাল নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছেন। মৃগশিরা নক্ষত্রে বিষুবন্ থাকিত, ইহা বহুবিধ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া, ঋগ্বেদের কোন-কোন সূক্তের কাল শক-পূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর পাইয়াছেন। ··· ··· তিলক মহাশয় এই-খানেই ক্ষান্ত হন নাই; পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বিষুবন্ থাকিবার উল্লেখ তিনি বেদ হইতেই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মৃগশিরার তুল্য এই সকল প্রমাণ দৃঢ় না হইলেও, কাল্পনিকও নহে। শকপূর্ব্ব প্রায় ৬০০০ বর্ষে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বিষুবন্ থাকিত।" পৃঃ ১৬২

the 'Ekavimsa'. 3rd Foot note, Satapatha-Brāhmana, part V., p. 150-151.

শতপথ ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয়

শতপথ ব্রাহ্মণে আমরা তিনটী নাক্ষত্রিক মাসের নাম প্রাপ্ত হই। যথা,—মাঘ, ফাল্গুন ও বৈশাখ। ফাল্গুন মাস বসন্তঋতু ছিল (৩৫)। দেখা গিয়াছে রোহিণী নক্ষত্রে অমাবস্যা হইলে, উহা বৈশাখের মধ্যে পড়িত। তাহা হইলে গণনা দ্বারা জানা যায়, কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে, চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে থাকিয়া পূর্ণিমা হইত। সেই দিন বা পর দিন হইতে বৈশাখ মাস গণনা করা হইত। পূর্ব্বভাদ্রপদে সূর্য্য থাকিলে, চন্দ্র ফল্গুনী নক্ষত্রে থাকিয়া পূর্ণিমা হইত এবং এই দিন হইতে ফাল্গুন মাস গণনা করা হইত।

যদি শতপথ ব্রাহ্মণের যুগে সূর্য্যের অবস্থান দ্বারা ঋতু নির্ণয় করা হইত, মনে করা যায়—এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণও উপরে দেখান গিয়াছে,—তবে বৈশাখ মাস ও গ্রীষ্মঋতু তখনই আরম্ভ হইত, যখন সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে প্রবেশ করিত। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সূর্য্য যখন

(৩৪) The sacrifice is the year. XI, 2, 7, 1.

The officiating priests are the seasons, XI, 2, 7, 2.

The sacrificer is the year; and the seasons officiate for him. The Agnidhra is the spring, whence forest-fires take place in spring, for that is a form of Agni. The Adhvaryu is the Summer, for Summer is, as it were, scorched; and the Adhvaryu comes forth (from the sacrificial ground) like something scorched. The Udgatri is the Rainy season; whence, when it rains hard, a sound as that of a chant, is produced. The Brahman is the Autumn; whence, when the corn ripens, they say, 'The creatures are rich in growth (Brahmanvat).' The Hotri is the Winter, whence in winter cattle waste away, having the Vashat uttered over them. XI, 2, 7, 32.

Whatever good deed man does, that is inside the Vedi; and whatever evil deed he does, that is outside the Vedi. Let him therefore, sit down, touching the right edge of the Vedi; for indeed, they place him on the balance in yonder world.

উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের দ্বিতীয় পাদের শেষে আসে, তখন গ্রীষ্মঋতু আরম্ভ হয়। কারণ, যে দিন, দিন-রাত্রি সমান হয়, প্রকৃত পক্ষে সেই দিনই গ্রীষ্মঋতু আরম্ভ হয়। সেকালে, কৃত্তিকা নক্ষত্র বলিতে কি বর্ত্তমানকালের কৃত্তিকা নক্ষত্র বুঝাইত? আমরা দেখিয়াছি, শতপথ ব্রাহ্মণের কালে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ পূর্ব্বদিক হইতে বিচলিত হয় না। তাহা হইলে, সেকালে সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে আসিলেই দিন রাত্রি সমান ও গ্রীষ্মকাল হইত, বুঝিতে হয়। অতএব, সেকালে ঋষিগণ নক্ষত্র বুঝিতে ঐ সকল নক্ষত্রপুঞ্জই বুঝিতেন। যদিও নক্ষত্র চক্র ২৭ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল, (৩৬) কিন্তু তাহার দ্বারা এরূপ বুঝায় না যে, ঐ ২৭ ভাগেরও আরো সূক্ষ্ম ভাগ করা হইত। ঋষিগণ এরূপ ভাবে নক্ষত্রচক্র বিভাগ করিয়াছিলেন, যাহাতে ২৭টী নক্ষত্রপুঞ্জ অনেকটা সমদূরবর্ত্তী হয়। আবার, কৃত্তিকা-পুঞ্জ হইতে রোহিণী নক্ষত্রপুঞ্জের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৃত্তিকা নক্ষত্র হইত।

বর্ত্তমানকালের নক্ষত্রচক্রে কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ ঐ নক্ষত্রের শেষ ভাগে অবস্থিত, দেখিতে পাই। তাহা হইলে, উত্তর-ভাদ্রপদের মধ্যে অয়ন সরিয়া আসিতে প্রায় ৪৷৷০ নক্ষত্র চলিতে হইয়াছে। প্রত্যেক নক্ষত্র চলিতে প্রায় ৯৫০ বৎসর ধরিলে, শতপথ ব্রাহ্মণের কাল ৪২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে দাঁড়ায়। অতএব, খৃষ্টাব্দ হিসাবে, উহা ২৩৫৮ বৎসর পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত হই।

পাঠকের অবগতির জন্য আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের 'আমাদের জ্যোতিষী' গ্রন্থ হইতে এই বিষয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধার করিয়া দিলাম।

"শ্রীযুক্ত শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত শতপথ ব্রাহ্মণ (২।১।২) হইতে এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। এখানে তাহার অর্থ উদ্ধৃত হইল। 'অন্য নক্ষত্র এক, দুই, তিন, চারি আছে, কিন্তু কৃত্তিকা ভূয়িষ্ঠ। কৃত্তিকায় অগ্নির আধান করিবে। কেবল এইটী পূর্ব্বদিক হইতে চলিয়া যায় না, অন্য সকল নক্ষত্র পূর্ব্বদিক হইতে চ্যুত হয়। অতএব কৃত্তিকায় অগ্নির আধান করিবে।'

এখানে ব্রাহ্মণকার বলিতেছেন, কৃত্তিকা পূর্ব্বদিক্ হইতে চলে না; অর্থাৎ কৃত্তিকা ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। এক্ষণে কৃত্তিকা ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত না হইয়া ২৩।২৪ অংশ উত্তর দিকে উদিত হয়। অয়ন-চলন এই প্রভেদের কারণ। উপরের উক্তি ভূত-কালেরও নহে; "কৃত্তিকাই পূর্ব্বদিকে উদিত হয়,"—এইরূপ বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে, শতপথ ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্র বিষুববৃত্তে অবস্থিত ছিল। অর্থাৎ ঐ নক্ষত্রে যে বিষুবান থাকিত, তাহা নিঃসংশয়ে সিদ্ধ হইতেছে। আরও সিদ্ধ হইতেছে যে, কৃত্তিকা শব্দে কৃত্তিকা নামক কল্পিত বিভাগ নহে, কৃত্তিকা তারাপুঞ্জ বুঝিতে হইবে; যে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতেন যে, আমাদের পুরাতন ঋষিগণ নক্ষত্র-চক্র উদ্ভাবন করেন নাই, বিদেশীয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কল্পনার মূল নাই।

'কোন্ সময়ে কৃত্তিকা বিষুববৃত্তে ছিল, অর্থাৎ কোন্ সময়ে কৃত্তিকা ক্রান্তিশূন্য ছিল?' ··· — দীক্ষিত মহাশয় শকপূর্ব্ব প্রায় ৩০০০ বর্ষ স্থির করিয়াছেন। ······কি ক্রমে তিনি এই গণনা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট লেখেন নাই। ১৮১৬ শকাব্দে কৃত্তিকার মধ্যস্থিত তারার (7 Tawri) সায়ন ভোগ ৫৮।৩১ অংশাদি ছিল। স্থূলতঃ ৫৯ অংশ, এবং ৭২ বৎসরে অয়ন গতি ১ অংশ ধরিলে ৪২৪৮

(৩৫) But let him rather begin it in Spring; for, Spring is the Brahman's season, and truly whosoever sacrifices after becoming, as it were, a Brahmana; let him therefore by all means begin it in Spring. XIII, 4, 1, 3.

A six days or seven days, before that full moon of Phâlguna, the officiating priests meet together. XIII, 4, 1, 4.

He may lay down the fires on the new moon which falls in (the month of) Magha, thinking Lest (mā) sin (agha) be in us.' XIII, 8, 1, 4.

He may lay down the fires on the new moon which falls in the (month) Vaisākha, for that coincides with the Rohini (asterism). XI, 1, 1, 7.

(৩৬) For there are 27 of these Nakshatras and 27 secondary stars accompanying each Nakshatra; this makes 720 and 36 in addition thereto. X, 5, 4, 5.

বৎসর আসে। তাহা হইতে ১৮১৬ হীন করিলে শকপূর্ব্ব ২৪৩২ হয়। (২৪৩২-৭৯—২৩৫৩ খৃঃ পূঃ)

অতএব দেখা যাইতেছে, খৃঃ পূঃ ২৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে নক্ষত্র গণনা প্রচলিত ছিল। আরো দেখা যাইতেছে যে, শতপথ ব্রাহ্মণের অন্ততঃ এই ভাগ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণও প্রায় এই সময়ের বলিতে পারা যায়।" পৃঃ ১৫১—১৫৩।

মন্তব্য :—শুধু কৃত্তিকার অবস্থান দ্বারা শতপথ ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয় দীক্ষিত মহাশয় করিয়াছিলেন; আমরা এখানে বৈশাখ মাসের কাল দ্বারাও একই কাল প্রাপ্ত হইয়াছি। তিলক মহোদয় যে বিষুবান শব্দের অর্থ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। বোধ হয় ইহাতে কাহারো দ্বিমত হইবে না। এজ্জেলিং সাহেব অনেকটা কাছাকাছি গিয়াছিলেন দেখা যায়।

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ]

স্বার্থ

স্বার্থ-বিজড়িত উদ্বোধক চিত্ত-সংযোগের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কোন বস্তু বা বিষয় হইতে উৎপন্ন সুখ বা দুঃখের অনুভূতিকেই স্বার্থ বলা যায়। যে জিনিস হইতে সুখের আশা বা দুঃখের আশঙ্কা করি না, সে জিনিসে আমরা স্বভাবতঃই নির্লিপ্ত—আমাদের নিকট সে জিনিসের অস্তিত্ব নাই বলিলেও বিশেষ কোন ত্রুটি হয় না।

সাদৃশ্য, সুখ বা দুঃখের সংস্রব, এবং ঔৎসুক্য—এই তিনটি স্বার্থের হেতু। যে জিনিসটি একবারে নূতন, যাহা একবারে অননুভূতপূর্ব্ব, সে জিনিসে স্বার্থ থাকিতে পারে না—সে জিনিস হইতে সুখের আশা বা দুঃখের আশঙ্কার উদ্রেক হইতে পারে না। বর্ত্তমান বিষয়ের সহিত যদি অতীত কোন জ্ঞাত বিষয়ের কোন প্রকার সাদৃশ্য না থাকে, তবে সে বিষয় হইতে স্বার্থের উৎপত্তি হয় না, সে বিষয় মনকে আকর্ষণ করে না।

"সে মায়া-মূরতি কি কহিছে বাণী!
কোথাকার ভাব কোথা নিলে টানি!
আমি চেয়ে আছি বিস্ময় মানি, রহস্যে নিমগন।"

আমি যাহা একেবারেই বুঝি না বা জানি না, যাহা কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই, তুমি যদি আমার সহিত সেই বিষয়ের আলাপ কর, তোমার কথায় আমার মন দেওয়া অসম্ভব।

হায়! একবিন্দু বারি দেখিল না যেই জন,
সে কেমনে বুঝিবেক মহাপারাবার?

যে শিক্ষক তাঁহার শিষ্যকে কোন একটি সম্পূর্ণ নূতন তথ্য একবারেই শিখাইবার প্রয়াস পান, তাঁহার চেষ্টা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হয়; কারণ তিনি শিষ্যের মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে অক্ষম হন। শিক্ষকের কথিত বিষয়ের সহিত শিষ্য তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত বিষয়ের কোনরূপ সাদৃশ্য দেখিতে পায় না; সুতরাং সে বিষয়ে কোন স্বার্থ উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া, চিত্ত-সন্নিবেশ করিতেও অক্ষম হয়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, সাদৃশ্য স্বার্থের হেতু হইলেও, সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আবার ইহার সংহারক। যে কথা আমরা বারংবার শুনি, সে কথা আমাদিগের আর ভাল লাগে না—সে দিকে মনও যায় না। যে জিনিস আমরা পুনঃ-পুনঃ দেখি, তাহার আর মোহিনী শক্তি থাকে না। যে গীত আমরা বারংবার শুনি, তাহা আর ভাল লাগে না।

"পারি না শুনিতে আর, একই গান, একই গান।
কখন থামবি তুই, বল মোরে—বল প্রাণ।"

"মাতা" ——— এবং ——— "ঘাকা"
এই দুইটি শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, তোমার মন প্রথমটির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইতেছে। প্রথম কথাটি হইতে তোমার মাতার আকৃতি-প্রকৃতি মনে হইতেছে, এবং তৎসঙ্গে কত সুখ-দুঃখের কথা মনে আসিতেছে। কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি হইতে তোমার কিছুই মনে আসিতেছে না—কোন ভাবেরই সঞ্চার হইতেছে না—উহাতে কেবল দুইটি অক্ষরের একত্র সমাবেশ হইতেছে মাত্র। প্রথম শব্দটির সহিত তোমার অতীত জীবনের কাহিনী যেন সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত; কিন্তু দ্বিতীয়টির সহিত এরূপ কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথমটিতে সুখ-দুঃখের সংস্রব আছে, দ্বিতীয়টি যেন সকল সংস্রব-বর্জ্জিত। স্বার্থের মাত্রা সুখ-দুঃখের মাত্রার উপর নির্ভর করে। যে জিনিসটির সহিত সুখ বা দুঃখ অধিক মাত্রায় বিজড়িত, সেই জিনিসটিতে স্বার্থও অধিক। ছাত্রগণ শিক্ষকের সাহচর্য্য অপেক্ষা ছাত্র-বন্ধুগণের সাহচর্য্য অধিক পছন্দ করে।

"তোর কাছে আসি যদি বিজিবিজি কি বকিস্,
শুনি মম হাড় জ্ব'লে যায়।"

ঔৎসুক্য স্বার্থের আর একটি হেতু। কোন অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাকে ঔৎসুক্য বলে। আকাঙ্ক্ষা মনের পিপাসামাত্র—ব্যাকুলতামাত্র।

"চারিদিকে কি মহা বিস্ময়
প্রগাঢ় রহস্যে ঢাকা! যত ভাবি, এ ক্ষুদ্র হৃদয়
ততই ব্যাকুল ভাবে গুমরিয়া কেঁদে হয় সারা।"

এই পিপাসা হইতে স্বার্থের সৃষ্টি হয়। গণিতশাস্ত্র কি—আমি জানি না; সুতরাং এ শাস্ত্রে আমার কোন স্বার্থও দেখি না। পরে, এই শাস্ত্রের বিষয় অবগত হইবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হইল; আকাঙ্ক্ষা হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রমশঃ স্বার্থের সৃষ্টি হইল;—তখন ঐ শাস্ত্রের আলোচনায় আমি আনন্দ পাইতে লাগিলাম। ছাত্রদিগের মধ্যে ঔৎসুক্যের বীজ বপন করা শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য। একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে কোন কথা না বলিয়া একটি জলপূর্ণ গেলাস লইলেন; গেলাসের মুখটি এক টুকরা কাগজ দিয়া বেশ করিয়া আচ্ছাদিত করিলেন। ছাত্রেরা জানে না—শিক্ষকের উদ্দেশ্য কি। সকলই নিবিষ্ট-চিত্তে, উৎসুক চিত্তে শিক্ষকের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। তৎপরে শিক্ষক গেলাসটি উল্টাইয়া ধরিলেন। কাগজ খসিয়া গেল না; বিন্দুমাত্র জল পড়িল না। ছাত্রেরা স্তম্ভিত হইয়া গেল। ঔৎসুক্যের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইল। এখন—

"আকুলতা এসে ধরেছে আঁকড়ি',
করিয়াছে মাতোয়ারা।"

"কেন এমন হইল" জানিবার জন্য সকলেই বিশেষ উৎসুক হইল। অপর একটি শিক্ষক প্রথমেই বলিয়া বসিলেন যে, বায়ুর গতি ঊর্দ্ধদিকে; তৎপরে তিনি যথাশক্তি তাহার ব্যাখ্যা করিলেন; এবং কি উপায়ে তাহা প্রমাণ করিবেন সেটুকু বলিবারও লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি উক্ত উপায়ে তাঁহার কথিত বিষয় প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহার কার্য্যে ছাত্রদের তত কৌতূহল জন্মিল না; তাহারা বিশেষ স্বার্থও দেখিতে পাইল না; সুতরাং তাহাদের সম্যক প্রকার মনঃসংযোগও হইল না। কৌতূহল হইতে স্বার্থ এবং স্বার্থ হইতে অবধান প্রকাশ হইতেছে। কৌতূহলী বৃত্তির উচ্ছেদ কর, অপর দুইটি ক্রমশঃ ক্ষীনপ্রভ হইবে।

স্বার্থ দুই প্রকার—সহজলব্ধ এবং শিক্ষালব্ধ। ছোট-ছোট ছেলেরা 'টুকটুকে' রং দেখিতে ভালবাসে। এখানে স্বার্থ সহজলব্ধ—স্বাভাবিক।

"ইঙ্গিতে সৈনিক এক লয়ে এল রাজ-সভামাঝে
লজ্জিতা যুবতী;
নিমেষে নিস্তব্ধ সভা, বিস্মিত বিমুগ্ধ নেত্র যত
হেরি সে মূরতি।
যেন এ সৌন্দর্য্য স্বপ্ন—বিধাতার মানবী কল্পনা
চিত্রপটে আঁকা!
শিবাজি কহিলা ধীরে—ক্ষণকাল দেখি সেই রূপ
পতিব্রতা মাখা;—
"মাতঃ, তোর গর্ভে যদি জন্মিতাম, আমরাও বুঝি
হতেম সুন্দর!"

এখানে শিবাজির স্বার্থ সহজ স্বার্থ। দার্শনিক তর্কবিজ্ঞান-আলোচনায় আনন্দ উপভোগ করেন। হিন্দু বিধবা সর্ব্ব আশা, সর্ব্ব ইচ্ছা, সর্ব্ব মান-অভিমান একবারে ত্যাগ করিয়া, আত্মহারা হইয়া, অনন্ত ধৈর্য্যের ভরে পরহিত-ব্রতে মন-প্রাণ সমর্পণ করেন। এখানে স্বার্থ শিক্ষালব্ধ।

"অন্তহীন ক্ষমাভরে তুচ্ছ করি' সে সকলি
—হে মোর জননি,
করুণা করিয়া সবে অসীম স্নেহেতে শুধু
সেবিতেছ সুখে।
এত যে দুঃসহ, ঘোর বিচার; তবু, মাগো,
কথা নাহি মুখে!
আপনারে বিস্মরিয়া—রাখি' কোন্ অন্তরালে;
পর-হিত-তরে।
মৌন কর্ম্মে রত সদা,—পালিছ নিষ্কাম ধর্ম্ম
অনন্য অন্তরে।"

মিষ্ট দ্রব্য সকলেরই ভাল লাগে—ইহা দ্রব্যের গুণ। আবার কাহারও নিকট তিক্ত দ্রব্যও মধুর বোধ হয়—ইহা দ্রব্যের গুণ নহে—অভ্যাসের ফল। সুতরাং একটির স্বার্থ স্বভাবজ এবং অপরটির স্বার্থ অভ্যাসজ। প্রথম অবস্থার স্বার্থ স্বোপার্জ্জিত নহে। এই অবস্থায় মানুষ নিজের স্বার্থ নিজে সৃজন করে না—বাহিরের বস্তুই স্বার্থের উদ্রেক করিয়া দেয়। শৈশব অবস্থার স্বার্থ স্বভাবজ। বালক-বালিকাদের মনে যে জিনিসে সহজেই স্বার্থের উদ্রেক হয়, যাহাতে সহজেই প্রীতির সঞ্চার হয়, ঐরূপ বস্তু তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া উচিত। স্বার্থ হইতে অবধানের উন্মেষ হয়। স্বার্থের মাত্রা বৃদ্ধি হইলে অবধানশক্তিও প্রবল হয়। অবধানের মাত্রা অধিক হইলে স্বার্থের মাত্রা অধিক হইবে—মনে করিও না। একটি বালককে তৈলপূর্ণ ভাণ্ডটি আনিতে আদেশ করিয়াছ। যাহাতে বিন্দুমাত্র তৈল নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছ। ভাণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে পরিপূর্ণ। সামান্য অমনোযোগী হইলেই তৈল পড়িয়া যাইবে। বালকটি অতি সাবধানে ভাণ্ডটি আনয়ন করিতেছে—তাহার সমস্ত অবধান-শক্তি তৈলপূর্ণ ভাণ্ডে প্রয়োগ করিয়াছে। এখানে তাহার অবধানের মাত্রা অধিক, কিন্তু বালকটি কি বিন্দুমাত্রও স্বার্থ অনুভব করিতেছে? সকল মনুষ্যেরই স্বার্থ একপ্রকার নহে—সকলেই এক স্বার্থে অনুপ্রাণিত নহে। মনের প্রকৃতির উপর স্বার্থের প্রকৃতি নির্ভর করে। একই বস্তুতে কাহারও বা অনুরাগের সৃষ্টি হয়, আবার কাহারও বা বিরাগের সৃষ্টি হয়।

"সুন্দরতর বদন তব
করিয়া নিতে আপনা;
সুন্দরতর প্রকৃতি মম
নিয়ত করি কামনা।"

অতএব নিজের প্রকৃতিই নিজের স্বার্থ সৃষ্টি করে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, সুতরাং স্বার্থও বিভিন্ন।

"স্তন্য সুধাপায়ী শিশু হাসে 'মা মা' ব'লে;
চুমিছে সে মুখ মাতা ভাসি আঁখি-জলে।
দার্শনিক হেরি' তাহে কহে—"এ যে ভুল!"
মুগ্ধ কবি কাঁদি কহে—"অতুল, অতুল'!"

এখানে মাতা, দার্শনিক এবং কবির স্বার্থ পৃথক। আবার দেখ—

"কবি আপনার গানে যত কথা কহে,
নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি।"

যদি বালক-বালিকাগণের অবধান-ক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন করিতে চাও, যদি উহাদের অবধান-শক্তিকে সংযত করিতে চাও, তবে যে জিনিসে সহজেই তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই জিনিস তাহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দাও। এইরূপে যখন উহাদের অবধান-শক্তি কিঞ্চিৎ দৃঢ় ও সংযত হইবে, তখন অপেক্ষাকৃত জটিল এবং দুরূহ ব্যাপারে তাহাদের অবধান আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করা উচিত। যে বিষয় স্বভাবতঃ বিরক্তিকর, যাহাতে প্রথমে কোন স্বার্থচিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না, সে বিষয়ে চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইলে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। বালকগণ 'নামতা' অভ্যাস করিতে কখনই আমোদ পায় না—এরূপ স্থলে পুরস্কারের লোভ দেখাইতে হয়; আবার কখন-কখন শাস্তির ভয় দেখাইতে হয়। যে বিষয় স্বার্থোৎপাদনশক্তি বিরহিত, সে বিষয়ে চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইলে অন্য স্বার্থের আশ্রয় লইতে হয়। যে কাজে আমি স্বভাবতঃই বীতশ্রদ্ধ, সে কাজ সম্পন্ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমি যদি বুঝি যে, ঐ কাজে পারদর্শিতা লাভ করিলে আমার সুখ-সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে, তখন সে কার্য্যের কঠোরতা, সে কার্য্যে আমার স্বভাবসুলভ বিরাগ আমার চেষ্টার বিশেষ অন্তরায় হইবে না। কথিত কার্য্যে আমার স্ফূর্ত্তির অভাব থাকিলেও, অন্য চিন্তা হইতে আমার স্ফূর্ত্তির উদয় হইবে, এবং সেই

স্ফূর্তির বলে, যাহা এখন অসাধ্য মনে হইতেছে, তাহা অচিরে সুসাধ্য হইবে।

বুঝিলাম এতক্ষণে—
অবস্থায় মতিগতি বিবর্ত্তিত হয়,
অবস্থায় সর্ব্বমূল।
নহে কালিকার চিত্তভার মোর
আজি কেন বিপরীত ?
কালি আমি কি বলিনু
সর্দ্দারগণেরে ?—
মহারাণা বিক্রমজিতেরে
সিংহাসনচ্যুত করা সমুচিত নহে,
বিক্রমের সিংহাসন কৈলে অধিকার
মহাপাপ হইবে আমার।
কি আশ্চর্য্য !
আজি সেই মহাপাপে করি আলিঙ্গন,
বিক্রমজিতের কথা একবারো নাহি
ভাবি মনে।
কি মোহিনী শক্তি ধরে রাজার ক্ষমতা !
কি কুহক রাজসিংহাসন !

আত্মচিন্তা সকল স্বার্থের মূল। যখনই কোন বিষয় নিজের সুখের সহায় বলিয়া মনে হইল, তখনই সেই বিষয় অবধানের বিষয়ীভূত হইল। স্বার্থচিন্তা বিরাগে অনুরাগের সৃষ্টি করে, দুঃখের দৈন্য এবং কষ্টের কঠোরতা দূর করে। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর বস্তুতে আমি স্বার্থ অনুভব করিতাম—যাহা দেখিতে ভাল লাগিত তাহাই দেখিতাম, যাহা শুনিতে ভাল লাগিত তাহাই শুনিতাম। তখন বাহ্যবস্তু আমার চিত্ত আকর্ষণ করিত। আমাকে কোন বেগ পাইতে হইত না। পরে যখন বড় হইলাম, তখন পুরস্কারের আশাতেই হউক, বা শাস্তির আশঙ্কাতেই হউক, অনেক অপ্রিয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইলাম। অভ্যাসের বলে অপ্রিয় বস্তু প্রিয় বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে-ক্রমে যতই জ্ঞানের উন্মেষ এবং অভিজ্ঞতার বিকাশ হইতে লাগিল, ততই আমার নিজের স্বার্থ নিজেই বুঝিতে লাগিলাম। কোন্‌টি আমার স্বার্থের সহায় এবং কোন্‌টি অন্তরায় বুঝিতে সমর্থ হইলাম।

"ভোগ তৃষ্ণা স্বার্থ বলিদান দেহ মতিমান,
জনগণ-মঙ্গল-কামনা
একমাত্র স্বার্থ রাখ হৃদে।
জনসেবা মহাব্রতে অভিমান যাবে,
জ্ঞানরত্ন করগত হবে,
জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মসাৎ করি সংস্কার
পাপের বন্ধন হ'তে লভহ উদ্ধার।

দুই

[অধ্যাপক শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি-আর-এস]

ধারাপাতে লিখিতেছে—দুইএ পক্ষ। দুইএ পক্ষ ছাড়া, ধারাপাতকার যে অন্য প্রকার উদাহরণ দুইএর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দিতে পারিতেন, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

তাহার পূর্ব্বে পক্ষের বিচারটা সারিয়া ফেলা যাউক। সকলেই জানেন, পক্ষ নানান অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তিথি হিসাবে পক্ষ দুই প্রকার—শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ। বিবাহ হিসাবে মানুষ এক পক্ষ ত করিয়া থাকেনই, প্রয়োজন হইলে দুই বা ততোধিক পক্ষও করিতে পারেন। তাহা ভিন্ন, পক্ষীর উড়িবার যন্ত্রদ্বয়ও পক্ষ। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের প্রভেদ সকলেই অবগত আছেন। শুক্ল পক্ষে হিমাংশুদেব প্রথমতঃ অতি ক্ষীণ কলেবর লইয়া আকাশ-পথে উদিত হইয়া, প্রতিদিন ক্রমশঃ বর্দ্ধিতকায় হইয়া, পূর্ণিমা-রজনীতে পূর্ণ কলেবর ধারণ করতঃ, জগতবাসীর আনন্দ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন; আবার কৃষ্ণপক্ষে তিনি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতে-হইতে অমাবস্যার রাত্রিতে

একেবারেই তিরোহিত হইয়া থাকেন। এই প্রাকৃতিক ঘটনা—চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধির কারণ-নির্ণয় উপলক্ষে একটা মস্ত আজগুবি কারণ আমাদের পুরাণ-প্রণেতারা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, চন্দ্র একজন বহুপত্নীক দেবতা—একটা স্ত্রীলোকঘটিত কাণ্ডের ফলে অভিশপ্ত হইয়াই এইরূপ ক্ষয় ও বৃদ্ধিরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। এই কারণ-নির্ণয়ের চেষ্টাতে পুরাণকারগণের কল্পনাশক্তির প্রাখর্য্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা কি দেবতাদিগকে অন্ততঃ চরিত্রবান্ ভদ্রলোক করিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন না? পুরাণের অনেক দেবতাই দেখি চরিত্রহীন—ঈর্ষা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ তাঁহাদের অজানিত নহে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার কত চরিত্রহীনতার কথা—লীলাক্রমে কত পুরাণে সালঙ্কারে বর্ণিত হইয়াছে। কে বলিবে, এই সকল চিত্র হিন্দুর চিন্তাশক্তির অধঃ-পতনের সময় কল্পিত হয় নাই? আমার হৃদয়দেবতা কি মেনকা-রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি নর্ত্তকী-সেবিত, পারিজাত-সৌরভ-মুগ্ধ, সোমপানে পুষ্টদেহ একজন ভোগী ব্যক্তি হইতে পারেন? স্বীকার করি, পুরাণ সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম্মবিস্তারের জন্য রচিত হইয়াছিল; তাহাই যদি হয়, তাহা হইলেও—এবং দেবতাদিগকে মানবেরই উন্নত সংস্করণ করিয়া কল্পনা করিবার অভিপ্রায় থাকিলেও—অন্ততঃ তাহাদিগকে চরিত্রবান্ আদর্শ মানব করিয়া সৃষ্টি করিতে কি বাধা ছিল, বুঝিতে পারি না।

তার পর, বিবাহের দুই বা ততোধিক পক্ষ সম্বন্ধে নিজের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকাতে, এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে লেখক সম্পূর্ণ অনধিকারী। যাঁহারা দ্বিতীয়, তৃতীয় বা ততোধিক পক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বলিয়া মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ। তবে এটা দেখিতে পাই যে, যিনি দুই বা ততোধিকবার দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন, তিনি সঠিক কারণটা কখন ভুলিয়াও খুলিয়া বলেন না। অধিকাংশ স্থলেই, বৃদ্ধা মাতা, অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে দূর-সম্পর্কীয়া খুড়ী, পিসি, মাসি, প্রভৃতি কাহারও-না-কাহারও সবিশেষ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে পঞ্চাশৎ বর্ষে বয়সেও নবমবর্ষীয়া একটি অনূঢ়ার পাণিপীড়ন করিয়া থাকেন। সন্তান না থাকিলে বংশরক্ষার্থ, অথবা এক পাল সন্তান-সন্ততি থাকিলে, তাহাদের কনিষ্ঠ বা কনিষ্ঠাদিগকে মানুষ করিবার চিন্তাও পক্ষান্তর-গ্রহণের একটা মস্ত কারণ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এ ত গেল প্রথম-পক্ষের অবর্ত্তমানের কালের কথা। এক পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে, দ্বিতীয় বা ততোধিক পক্ষ করার প্রথা হিন্দু ও মুসলমান-সমাজে প্রচলিত আছে,—খৃষ্টীয় সমাজে উহা আইনবিরুদ্ধ। খৃষ্টীয় সমাজে যিনি ঐরূপ কার্য্য করিবেন, তাঁহার পক্ষে শ্রীঘরবাসের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কে বলিবে—এ ব্যবস্থা ধর্ম্ম ও বিবেকবুদ্ধি-সঙ্গত নহে? পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাই যে, কৌলিন্যপ্রথার সমধিক প্রচলনের সময়, তথাকথিত কুলীন মহাশয় ত্রিশ-চল্লিশ, এমন কি, সত্তর-আশী পক্ষও করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। কুলীনপ্রবর স্বামী শ্বশুরবাড়ীসমূহে বৎসর-বৎসর 'টুর' করিয়া ফিরিতেন। এইরূপে চল্লিশটি শ্বশুরবাড়ী থাকিলে, এক-এক স্থানে গড়ে নয় দিবস অতিবাহিত করিতে পারিলেই আর রোজগার করিয়া আহারাদির যোগাড় করিতে হইত না। উপরন্তু, ডাক্তারদের মত ভিজিটও যথেষ্ট মিলিত। হতভাগিনী কন্যার পিতামাতা জামাতাকে গৃহে আনয়নের জন্য—শুইবার, খাইবার, বসিবার জন্য, দর্শনীর ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইতেন। বিবাহটা এই শ্রেণীর জীবের একটা মস্ত পেশা ছিল। অথচ ইঁহারা পবিত্র বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করিবার সময়, পত্নীকে অগ্নি-সাক্ষী করিয়া বলিয়াছেন, "যদস্তু হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।" ভরসার বিষয় এই ছিল যে, ইঁহাদের হৃদয় পাষাণময় হইলেও, ইঁহাদের হতভাগিনী পত্নীগণের হৃদয় রমণী-হৃদয় বলিয়া, কঠিন ছিল না। এইসকল হতভাগিনী বঙ্গ-রমণীর দুর্দ্দশায় কাতর-হৃদয়, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর একদিন যে আন্দোলন বঙ্গদেশে উত্থাপন করিলেন, তাহার স্রোতে, এবং আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে, এই কাপুরুষোচিত প্রথা সমাজ হইতে বহুপরিমাণে তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু বহু-পক্ষ করণেচ্ছু কুলীন বা অকুলীনের পক্ষে শ্রীঘরবাসের ব্যবস্থা না করিলে, এই প্রথা যে একেবারে সমাজ কলঙ্কিত করিতে বিরত হইবে, এরূপ ত মনে হয় না।

দুইএ পক্ষের বিচার ছাড়িয়া দিয়া, এখন দুইএর

অপরাপর উদাহরণের বিচার করা যাউক। প্রথমেই দেখুন, বৈয়াকরণিকের মতে বর্ণ দুই প্রকার—স্বর ও ব্যঞ্জন। বৈয়াকরণিকের মতে ব্যঞ্জনের সংজ্ঞা এই যে, যে বর্ণ অপরের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হয় না, তাহাই ব্যঞ্জন। কিন্তু পাচক-ব্রাহ্মণের মতে ব্যঞ্জনের সংজ্ঞা অন্যবিধ। পাচক-ঠাকুরের মতে—যে দ্রব্যের সাহায্য ব্যতীত ভাত উদরস্থ হয় না, তাহাই ব্যঞ্জন; এবং তাহার বর্ণ হরিদ্রা-সংযোগে সাধরণতঃ পীত হইয়া থাকে;—কেবল বাঙ্গাল দেশে "অষ্টগুণ্ডা গাছ-মরিচ"-সংযোগে উহা উৎকৃষ্ট লোহিত বর্ণেরও হইয়া থাকে। সেইরূপ, স্বরের সংজ্ঞাতেও বৈয়াকরণিক ও পাচক-ঠাকুরের মতের মধ্যে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বৈয়াকরণিক বলিতেছেন যে, যাহা স্বতঃই উচ্চারিত হয়, তাহাই স্বরবর্ণ। পাচক-ঠাকুর বলিতেছেন যে, "সর" স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু উহা দুগ্ধের উপর পাতলা স্তরের আকারে। উহার বর্ণ সাধারণতঃ শ্বেত, কিন্তু কৃষ্ণনগরে উহা ভাজা বা পুরিয়ার আকার প্রাপ্ত হইলে, অতি মনোরম ঈষৎ পীতাভ বর্ণ লাভ করে; এবং তখন ব্যঞ্জনের অপেক্ষা শতগুণ উপাদেয় হইয়া থাকে।

বৈয়াকরণিকের মতে বর্ণের ন্যায় সন্ধিও দুই প্রকার—স্বর-সন্ধি ও ব্যঞ্জন-সন্ধি। ব্যঞ্জনের সহিত ব্যঞ্জনের যে সন্ধি, তাহার নাম ব্যঞ্জন-সন্ধি। কিন্তু এই সন্ধির নিয়মাবলী বৈয়াকরণিকের অপেক্ষা গৃহিণীরাই ভাল বুঝেন। গৃহিণীদের হাতে পড়িয়া ব্যঞ্জনের সহিত ব্যঞ্জনের সন্ধি বা মিলনে ডাল্না, শুক্তা, দম, কালিয়া, চাট্নি প্রভৃতি বিবিধ মুখরোচক পদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। আধুনিক কালের চপ, কাটলেট, পুডিংও এই ব্যঞ্জন-সন্ধিরই নব্যধরণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এই সন্ধি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে এখনকার গৃহিণীরা পুরাকালের দ্রৌপদীর ন্যায় আর 'এক্স্পার্ট' থাকিতে পারিতেছেন না। নানা কারণে রন্ধনশালার ভার এখন উৎকল বা বাঁকুড়ানিবাসী দ্বিজসত্তমকুলের উপর ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহারা নভেল-পড়ায় মন দিতেছেন। "রন্ধনে দ্রৌপদী" প্রবচনটা এখন আর ভদ্রসমাজে প্রশংসার কথা নহে। তাহার ফলে এই হইতেছে যে, ব্যঞ্জন-সন্ধির নিয়মাবলী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ উৎকল ব্রাহ্মণের হাতের রান্না খাইয়া, কর্ত্তাদের অজীর্ণ ও অম্লের পীড়া ক্রমশঃ জীবনসঙ্গী হইয়া পড়িতেছে। আশা করি, এখন হইতে পুনর্ব্বার গৃহস্থের বৌ-ঝিদের মধ্যে এই ব্যঞ্জন-সন্ধির জ্ঞান পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

তাহার পর দেখুন,—মানুষের হস্ত, পদ, চক্ষু ও কর্ণ দুইটা করিয়া; এবং নাসিকা একটা হইলেও উহাতে দুইটি ছিদ্র থাকাতে, নাসিকা-নির্ম্মাণেও 'দুই'এর প্রভাব বিদ্যমান। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি একটা না করিয়া, বিধাতা সব জোড়া-জোড়া কেন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহাদের কার্য্যকারিতা ছাড়া আরও একটা কারণ বিদ্যমান আছে। তাহা হইতেছে—দেহের সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি-করণ। আমরা বিজ্ঞানের অধ্যাপক—ছাত্রেরা কোনও যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলে, আমরা তাহাদিগকে সর্ব্বদাই উপদেশ দিয়া থাকি—'তোমার যন্ত্রপাতি কেবল কার্য্যোপযোগী হইলেই চলিবে না, উহা সুন্দর হওয়াও চাই' ("your apparatus should not only be useful, but also beautiful")। এই সৌন্দর্য্যের মন্ত্র মানব-দেহ-নির্ম্মাণেও সুস্পষ্ট। নরনারীর দেহে যদি একটা হাত একদিকে লট্পট করিত, বা একটা কাণ একধারে খাড়া হইয়া থাকিত, তাহা হইলে দেহের সৌষ্ঠব (symmetry), এবং সেই হেতু সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতই। বাস্তবিক, এই দুই দিকের গঠনের সামঞ্জস্য হেতু মানবের দৈহিক সৌন্দর্য্য কি অসামান্য হইয়াছে! মানবদেহের এই সৌন্দর্য্য সম্যকরূপে পরিস্ফুট করিবার জন্য, কত চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে কত আলেখ্য আঁকিয়াছেন; কত কবি ছন্দোবদ্ধ বাক্য-বিন্যাসে কত কবিতা রচনা করিয়াছেন; কত ভাস্কর মর্ম্মর-পাষাণে কত যত্নে মূর্ত্তি গড়িয়াছেন (অধিকাংশ চিত্রকর, ভাস্কর ও কবি পুরুষ বলিয়া রমণীর মূর্ত্তিই তাঁহাদের নিকট সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অর্ঘ্য পাইয়াছে; কিন্তু ইঁহারা রমণী হইলে পুরুষের সৌন্দর্য্য যে এত অবহেলার পাত্র হইত না, এটা হলপ করিয়া বলিতে পারি)। বাস্তবিক, বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-চাতুর্য্যের মধ্যে যেমন একটা কার্য্যোপযোগিতা স্পষ্ট বিদ্যমান, সেইরূপ অপর দিকে একটা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সর্ব্বত্র পরিস্ফুট, দেখিতে পাওয়া যায়। কিবা নদ-নদী ও পর্ব্বত-সরিৎ, কিবা পত্র-পুষ্প-বৃক্ষ-বল্লরী, কিবা পশু-পক্ষী-কৃমি-পতঙ্গ অথবা নর-নারী-মূর্ত্তি—সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্যের একটা পূর্ণ বিকাশ দেখিয়া

আনন্দে অন্তর-বাহির ভরিয়া যায়। নর-নারী-মূর্ত্তির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-কল্পে দুইএর প্রভাব যে কম নহে, তাহা একটু অনুধাবন করিলেই প্রতীতি জন্মিবে।

দুইএর আরও অনেক উদাহরণ মিলে। কয়েকটিমাত্র এখানে প্রদত্ত হইবে। জগতের যাবতীয় পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত—সচেতন ও অচেতন। সাধারণতঃ, মানুষ ও পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সচেতন এবং বৃক্ষ-লতা-ইষ্টক-প্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ অচেতন বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু সচেতন ও অচেতন রাজ্যের মধ্যে এই কল্পিত পার্থক্য ক্রমশঃ শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। প্রথমেই দেখুন, বৃক্ষ-লতার যে চেতনা আছে, তাহার প্রমাণ সহজেই মিলে। সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত কুসুমে কি মধুর হাস্যের ছটা দেখিতে পান না? সহকারবেষ্টিত মাধবীলতার নিবিড় আলিঙ্গন কি নর-নারীর মিলন হইতে কম ঘনিষ্ট? মানব-হস্ত-স্পর্শে লজ্জাবতী লতার একান্ত সঙ্কোচ পরপুরুষ-স্পর্শে ব্রীড়ান্বিতা রমণীর সঙ্কোচ হইতে কি কম সুস্পষ্ট? পরন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে যে, বৃক্ষলতা আঘাত পাইলে আমাদের মতই কষ্ট অনুভব করে, পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়, বিশ্রামে সুস্থ হয়, মদিরায় মাতাল হয়, এবং ঔষধে সঞ্জীবিত হয়। সেও সুখ-দুঃখের অতীত নহে। তাহার পর জড়-পদার্থের কথা। বৃদ্ধি ও গতি (growth and movement) চেতনার প্রধান লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। এ হিসাবে জড় পদার্থ আর কাহাকে বলিব? বিজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমরা যাহাকে জড়-পদার্থ বলি, তাহার প্রতি পরমাণুর ভিতর অসংখ্য বিদ্যুতাণু (electron) রহিয়াছে, তাহারা অবিরত ভ্রাম্যমান। তাহাদের সংযোগ ও বিয়োগে বিভিন্ন প্রকারের পরমাণু গঠিত, এবং তাহা হইতেই জড়ের উৎপত্তি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র জগতের ভিতর একটা চেতনার অস্তিত্ব রহিয়াছে। সচেতন ও অচেতন বলিয়া দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক-পৃথক রাজ্য বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্ব-সৃষ্টির বহির্ভূত—আধুনিক বিজ্ঞান এই কথাই সপ্রমাণ করিতে চলিয়াছে।

দুইএর আর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—প্রেমের দুই অবস্থা,—বিরহ ও মিলন। বাস্তবিক, প্রেমের এই দুই অবস্থা না থাকিলে, এত রাশি-রাশি নভেল, নাটক, কবিতা, ছোট-গল্প কিছুই ভাষার সম্পদ-বৃদ্ধি করিত না। বিরহ ও মিলন না থাকিলে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, ভারত-চন্দ্রের কবিতা থাকিত না, কালিদাসের শকুন্তলা রচিত হইত না, সেক্সপিয়ারও রোমিও-জুলিয়েট" প্রভৃতি নাটক লিখিবার উপকরণ খুঁজিয়া পাইতেন না। বাস্তবিক, এই প্রেম ও তাহার দুই অবস্থা—বিরহ ও মিলন (পূর্ব্বরাগ গণনা করিলে তিন অবস্থা হয়) লইয়াই জগতের সমস্ত ভাষার তাবৎ সাহিত্যই গঠিত। এই একই বিষয় লইয়া কত কবি, কত নাট্যকার ও নভেল-লেখক কত শত বা সহস্র প্রকারের গল্পের প্লট রচনা করিয়া, তাঁহাদের কল্পনা-শক্তির প্রাখর্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, যাইতেছেন ও যাইবেন—তাহা একবার চিন্তা করিলে, বাস্তবিক শিহরিতে হয়। ইংরাজি ভাষায় প্রতি বৎসর কয়েক শত নভেল, নাটক, কাব্য বা গল্প পুস্তক বাহির হয়। বাঙ্গালা ভাষাতেও, কয়েক শত না হইলেও, কয়েক ডজন এইরূপ পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেইরূপ পৃথিবীর তাবৎ ভাষা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এই সকল ভাষায় সহস্র-সহস্র নাটক, নভেল প্রভৃতি পুস্তক প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাদের শতকরা নিরানব্বইখানির প্রতিপাদ্য বা বর্ণনীয় বিষয়—নরনারীর মধ্যে বৈধ বা অবৈধ প্রেম-সঞ্চার-জনিত বিরহ ও মিলন। নর-নারীর মধ্যে মানসিক ও দৈহিক মিলনের আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষার নাম প্রেম। স্বীকার করি যে, এই প্রেমের বন্ধনের জন্য সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছে, এবং সংসার চলিতেছে। কিন্তু এই প্রেমের সহস্র রকমফের এবং নানা বৈধ ও অবৈধ অবস্থার বর্ণনা করিয়া জগতের এত পাঠক-পাঠিকার সময় নষ্ট করান বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হয়।

বাস্তবিক, এই সব লেখক প্রেমের এত রকমফের বর্ণনা করিলেও, তাঁহাদের অনেকে প্রেমের আস্বাদ নিজেরা যে পান নাই, তাহা তাঁহাদের রচনা হইতেই বুঝা যায়। সত্যই বিরহ ও মিলন লইয়া ইঁহারা যে কত আজগুবি কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে করিলে হাসিও ধরে, কান্নাও পায়। একজন লিখিয়াছেন—

"বিরহ বরং ভাল একরকমে কেটে যায়।
প্রেমতরঙ্গে নানা রঙ্গে একবার হাসায় একবার কাঁদায়।"

ইনি নিশ্চয়ই পরের মুখে ঝাল খাইয়া, এই মনগড়া কথা

শিখিয়াছেন। বিরহ যে কিরূপ একরকমে কাটিয়া যায়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। সুখের বিষয় এই যে, গৃহিণী রাগ করিয়া পিত্রালয়ে না যাইলে, বা কর্ত্তা মফস্বলে 'টুরে' বাহির না হইলে, বিবাহের পর হইতে শ্মশান-ঘাট পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জীবনে বড় একটা বিরহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। সে সময়ে কর্ত্তার সময় যে কেমন "এক রকমে কেটে যায়" তাহা বুঝাইতে বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। গিয়া দেখিবেন, কর্ত্তার বালিসে ওয়াড় নাই, জামার বোতাম ছেঁড়া, পানে চুণের ভাগ প্রয়োজনের যথেষ্ট অতিরিক্ত, রাঁধুনী-বামুনের হাতের রান্না খাইয়া কর্ত্তার পেটই ভরিতেছে না। আফিস হইতে আসিয়া কর্ত্তা সাহেবের তাড়নার ঝাল কাহার উপর ঝাড়িবেন, লোক খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ঝি চাকরে ভাণ্ডারের চাল-ডাল লুটিতেছে এবং রাঁধুনী-ঠাকুরও বিড়ালের নাম করিয়া মাছের মুড়া ও দুধের কড়া সাবাড় করিতেছে। বিরহের এই বাস্তব চিত্র দেখিয়া, এখন কবির "এক রকমে কেটে যায়" কথায় বিশ্বাস করিবেন কি? তার পর মিলনের কথা। কবি বলিতেছেন, মিলনের সময় "প্রেমতরঙ্গে, নানারঙ্গে কখনও হাসায়, কখনও কাঁদায়।" সব ভুল, মশাই, সবই মিথ্যা। বহু দিন হইল, কোন এক সন্ধ্যায় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের আনন্দ-কোলাহলের (ও নিজের দিবসব্যাপী উপবাসের) মধ্যে এক অজ্ঞাত বঙ্গনারীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি। তার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু হলপ করিয়া বলিতে পারি যে, কোনও দিন কোনও প্রকার তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাই নাই। অবশ্য ঝগড়া ঝাঁটি হইলে একটু আধটু কান্না, বা স্যাক্‌রা-বাটী হইতে নূতন গহনা প্রস্তুত হইয়া আসিলে বিলক্ষণ হাসি যে না দেখিয়াছি, তাহা নহে। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবন-প্রবাহ একটানাই চলিয়াছে—তাহাতে তরঙ্গ নাই, বিক্ষেপ নাই। এক নিবিড় মিলনের শান্তিতে, পত্নীর নিঃস্বার্থ সেবা ও যত্নের মধ্যে বেশ নিশ্চিন্ত আছি—পাশ্চাত্য-সমাজের নরনারীর মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতজনিত নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল প্রেমতরঙ্গে পড়িয়া এই নির্ম্মল পারিবারিক শান্তি ও গভীর তৃপ্তি হারাইতে বড়-একটা রাজি নহি।

প্রেমের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ সংস্কারের কথা পাড়া যাউক। বাস্তবিক, দুইটি জিনিস লইয়াই সংসার চলিতেছে—সুখ ও দুঃখ। শাস্ত্রকার বলিতেছেন, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ"—সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় পর্য্যায়ক্রমে মানবের সম্মুখীন হইয়া থাকে। মানব নিরবচ্ছিন্ন সুখের জন্য লালাইত, সে দুঃখকে বাঘের অপেক্ষা অধিক ভয় করে; কিন্তু বিধাতা সুখ ও দুঃখকে এমনই ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহারা চক্রের অধঃ ও উর্দ্ধদেশের ন্যায়, পর্য্যায়ক্রমে এবং অনিবার্য্যরূপে মানবের অদৃষ্ট-দেবতার কার্য্য করে। যদি বিধাতার নিয়মই এই, তবে দুঃখকে ভয় করিয়া বিশেষ লাভ কি? আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—এই দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইবার কি কোন পন্থা নাই? সে দিন পড়িতেছিলাম, রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"আমি কি দুখেরে ডরাই,
তবে দাও দুখ মা আর যত চাই।"

তবে ত দেখিতেছি যে, জগতে এমন মানুষও আছেন, যিনি দুঃখকে ভয় ত করেনই না, বরং সাহস করিয়া বলিতেছেন, "দাও দুখ মা আর যত চাই।" কি হইলে, বা কি করিলে, এ অবস্থা লাভ করা যায়? আমাতে ও রামপ্রসাদে পার্থক্য দেখিতেছি এই যে, আমার সকল কর্ম্মই সকাম, আর সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার সকল কামনা, সমস্ত বাসনা তাঁহার জগজ্জননী মাকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে নাম গান করিতেছেন। তবেই দেখিতেছি, এই সকাম কর্ম্মই দুঃখের প্রেরক—আর নিষ্কাম কর্ম্মই দুঃখের জেতা। ভগবান গীতায় অর্জ্জুনকে এই শিক্ষাই দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, কেবলমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারাই "সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ" এই ভাবে ভাবিতে হওয়া যায়। নিষ্কাম কর্ম্ম যে কি, তাহাও গীতাকার বলিয়া দিয়াছেন—কর্ম্মের সমস্ত ফলাফল ভগবানকে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করার নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। বাস্তবিক, সহজ কথায় এটা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে, ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইলে, আশানুরূপ ফলের অপ্রাপ্তিতে দুঃখ আসিতে পারে না। বুঝি ত সবই; কিন্তু জ্ঞানকে কার্য্যে পরিণত করিবার সে শক্তি বা শিক্ষা কই? কে এ শিক্ষা আমাকে দিবে? সেই গুরুর আশায় পথপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। তিনি যদি কোনও দিন দয়া করিয়া আসেন, তবেই দুঃখ জয় করিতে সমর্থ হইব; নহিলে, যেমন সুখ-দুঃখের ক্রীতদাস এখনও আছি, বরাবরই তাহাই থাকিয়া যাইব।

ঈশ্বরের রূপেও দুইএর প্রভাব দেখা যায়। কাহারও মতে ঈশ্বর সাকার, কাহারও মতে নিরাকার। ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার—এ তর্ক বহু শতাব্দী ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে—ইহার মীমাংসা অদ্যাবধি হইল না, কখনও যে হইবে এমন মনে হয় না। এই তর্ক কেবল বাকযুদ্ধে সীমাবদ্ধ নহে, অসির অগ্রভাগ দিয়াও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই সাকার-নিরাকার-সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে—কিন্তু মীমাংসা ত হইল না! এই ভারতবর্ষেই এই অসি-তর্ক বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হইয়া গিয়াছে, কত দেবমন্দির বিচূর্ণীকৃত হইয়াছে, কত দেব ও দেবী-প্রতিমা ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাকার পূজা কতকটা প্রচলিত ছিল, কিন্তু মার্টিন লুথার প্রভৃতি প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকেরা যখন এই সাকার পূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন এই দুই খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া কত নরহত্যা, কত নারীহত্যা, কত দেবালয়ের ধ্বংস সাধিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাস্তবিক, এই সাকার-নিরাকার তর্কের মীমাংসার অজুহাতে যত ধর্ম্মপ্রাণ মানবের জীবনান্ত হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক দুরপনেয় কলঙ্কের কাহিনীরূপে চিরদিনই লিপিবদ্ধ থাকিবে।

এই সাকার-নিরাকার তর্ক লইয়া এত কাটাকাটি, মারামারি,—এত বাক্, মসি ও অসিযুদ্ধ যে কেন হইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝা কিছু কঠিন। সকল ধর্ম্মের মতে ঈশ্বর অনন্ত; সেইজন্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া অনন্ত সাধন-সাপেক্ষ। সেই কারণে, ঈশ্বরকে কেহ যে চাক্ষুষ দেখেন নাই, সেটাও সুনিশ্চিত। এ স্থলে তাঁহার কোনও আকার বা রূপ আছে, কি নাই,—থাকিলেই বা তিনি নরাকার কি পশ্বাকার, দ্বিহস্ত বা চতুর্হস্ত, একমুণ্ড কি দশমুণ্ড—তাহা হলপ করিয়া বলিবার অধিকার যিনি রাখেন বলিয়া মনে করেন, তিনি হয় ভণ্ড, না হয় ভ্রান্ত। যাঁহারা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, যাঁহারা ঈশ্বর-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সাধনার দ্বারা, অনুভূতির দ্বারা তাঁহার মহিমা পূর্ণরূপে অনুভব করিয়াছেন—ভগবান সাকার, কি নিরাকার তাহা তাঁহারা বহিশ্চক্ষুর দ্বারা কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। বস্তুতঃ ঈশ্বর সাকার, কি নিরাকার—এ দুইই কল্পনার বিষয়ীভূত ও যুক্তিমূলক। কিন্তু কল্পনা ও যুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক। আপনি কল্পনা ও যুক্তির সাহায্যে স্থির করিলেন যে, ঈশ্বর সাকার; আমি স্থির করিলাম, নিরাকার। আপনি আপনার সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী সাধনা করুন, আমি আমার সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী সাধনা করিতে থাকি। আসল কথা, ঈশ্বরের সাধনা—সে সাধনা সাকারই হউক বা নিরাকারই হউক—তাহাতে যে কি আসিয়া যায়, তাহা আমি বাস্তবিকই বুঝিতে অক্ষম। অন্ততঃ, অসির তীক্ষ্ণ ধারের দ্বারা সাকার-উপাসক—আমাকে নিরাকার-উপাসক করিবার উগ্র চেষ্টার কোনও সার্থকতা উপলব্ধি করিতে আদৌ সমর্থ নহি। আমি যদি একটি দারু, প্রস্তর বা মৃত্তিকা-মূর্ত্তি গড়িয়া, তাহাতেই ঈশ্বরের অনন্ত গুণরাশি কল্পনার সাহায্যে আরোপ করিয়া, ঈশ্বরের সাধনা করি, তাহা হইলে আমার সাধনা সফল হইবে না,—আর আপনি চক্ষু বুজিয়া নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করিলেই, আপনার সিদ্ধি মিলিবে—এরূপ অদ্ভুত কথার কোনও অর্থ ত আমি খুঁজিয়া পাই না। তবে সাকার পূজার একটি বড় বিপদ এই যে, মানস-প্রসূত প্রতিমাটি ভগবানের প্রতিনিধিমাত্র, আসল নহেন—এটি অনেকে অনেক সময়ে ভুলিয়া যান। সেইরূপ, নিরাকার ভগবানের উপাসনাতেও যে বিপদ নাই, তাহা নহে—অনেকে ভগবানের কোনরূপ কল্পনা না করিলে, চক্ষু বুজিয়া কেবল অন্ধকারই দেখিয়া থাকেন। তাঁহার পক্ষে ভগবানে মন স্থির করা অনেক সময়ে কষ্টকরই হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে, এই সাকার-নিরাকার মীমাংসার বৃথা চেষ্টা বর্জ্জন করিয়া, যাহাতে ভগবৎ-সাধনা নিজের জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিলে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিপূর্ণ সখ্যতা স্থাপিত হইবে; এবং একটি মহা অশান্তির কারণ জগত হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

সর্ব্বশেষে দেখুন, কর্ম্মের বিভাগও দুই প্রকার,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। এখন কলিকাল; শুধু কলি কেন, এখন ঘোর কলি—পুরাণের মতে এখন ধর্ম্ম প্রায় অন্তর্হিত, অধর্ম্মই প্রায় সব। ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুপাত-অনুযায়ী, পুরাণ জগতের সৃষ্টি হইতে চারিটি কালভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্যযুগে ধর্ম্ম ষোলআনা ছিল; ত্রেতায় ধর্ম্ম ত্রিপাদ এবং অধর্ম্ম একপাদমাত্র; এবং দ্বাপরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমান

ছিল। কিন্তু হায়, হায়! আমরা যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে যুগে অধর্ম্ম বারোআনা, আর ধর্ম্ম মাত্র চারিআনা। সত্যই কি তাই? সত্যই কি আমরা অধর্ম্মের অনুচর? সত্যই কি ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে? তবে কি এই আধুনিক সভ্যতার কোনও অর্থ নাই? ইহাতে কি কোন ধর্ম্ম নাই? কে বলিবে, পুরাণকার সত্য বলিয়াছে কি না?

পুরাণকারের এ কথা, মনে হয়, অবিশ্বাসীর কথা, 'পেসিমিষ্টে'র কথা। আমি বৈজ্ঞানিক—আমি ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাস করি। বস্তুতঃ, ক্রমবিলোপ জড়-জগতের ধর্ম্ম নহে। অবশ্য, জড়-জগতে যাহা সত্য, ধর্ম্ম-জগতেও তাহা যে অনিবার্য্য সত্য হইবে, এমন কোনও কথা না থাকিলেও, এটা দেখিতে পাইতেছি যে, মানব-সভ্যতার ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতে ক্রমশঃ আমরা বহু জ্ঞানলাভের, বহু পুণ্য কার্য্য করিবার, এবং সৎদৃষ্টান্তের অনুকরণের সুবিধা লাভ করিয়াছি। আমরা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পেলিওলিথিক ও নিয়োলিথিক বন্য মানবসম্প্রদায় হইতে বহু ভাগ্যবান, তাহার প্রধান প্রমাণ এই যে, ইহারা বুদ্ধ, মহম্মদ, যীশু, কনফিউসস, লুথার, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মনীষিবৃন্দের সাধনার ফল লাভ করিয়া নিজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন পূর্ণতর করিবার সুবিধা আদৌ পায় নাই। অপর দিকে, এই সকল যুগ ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মনীষিগণের ধর্ম্মসাধনার প্রেরণা আমাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে নিয়তই ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে প্রবুদ্ধ করিতেছে। সত্য বটে, এই সকল মহাপুরুষের প্রদর্শিত পন্থা হইতে আমরা নিয়ত স্খলিত হইয়া থাকি; কিন্তু তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদে আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়াছি, কামকে চিনিয়াছি, ও পাপকে দূরে রাখিবার জন্য সতত সচেষ্ট হইয়া থাকি। বাস্তবিক, মানুষ কিবা কর্ম্মজগতে, কিবা নৈতিক বা ধর্ম্মজগতে স্তরে-স্তরে উন্নতির সোপানেই উঠিতেছে, নামিতেছে না। অধর্ম্ম ক্রমশঃ বাড়িতেছে না—পলাইতেছে, সত্যযুগ আগতপ্রায়। ক্রমশঃ ধর্ম্ম পূর্ণতর হইতেছে, যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন, হত্যা যাহাতে জাতিবর্গের ইতিহাস আর কলঙ্কিত না করে, তাহার জন্য জাতিগণ সত্যবদ্ধ ও মিলিত হইতেছে। এই আগতপ্রায় সত্যযুগের জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা অধর্ম্মের নিত্য অনুচর—এই ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া, যদি আমরা—অচিরেই সত্যযুগকে আনয়ন করিব—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, জনে-জনে স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে থাকি, তাহা হইলে সত্যযুগ থাকিতে পারিবেন না, আপনিই আসিবেন। তখন ধর্ম্ম ষোলআনা হইবে, অধর্ম্ম পলাইবে; নরনারীর বৈষম্য বিদূরিত হইবে; সকল দেশে গভীর শান্তি বিরাজ করিবে; হত্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি নির্ব্বাসিত হইবে; জ্ঞানালোকে আবালবৃদ্ধবনিতার মন আলোকিত হইবে; সঙ্গে সঙ্গে পুরাণকারের কথা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

পৌরাণিক সাদৃশ্য*

[অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ]

আমাদের দেশের পৌরাণিক বিবরণ অনুসারে মনুষ্যমাত্রেই একই পিতার সন্তান। কিন্তু আমরা এখন ইংরাজী পড়িয়া শিখিয়াছি যে, পৃথিবীতে আর্য্য, সেমিটিক্, পোলিনেসিয়ান্ প্রভৃতি অনেক জাতীয় মনুষ্য আছে; আর্য্যদিগের সঙ্গে অনেকেরই কোন সম্পর্ক নাই; আর্য্যগণ কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে সভ্য-জগতের বিভিন্ন দেশে বাস স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সহিত অন্য দেশের পুরাণঘটিত ইতিবৃত্তের এতই সাদৃশ্য আছে যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সাদৃশ্যের বিভিন্ন কারণ প্রদর্শন করেন। কাহারও মতে, মানব-সভ্যতার প্রথম বিকাশ-কালে মনুষ্য-মাত্রেরই হৃদয়ে এক রূপ চিন্তার উন্মেষ হইয়া থাকে,—

* ৺রজনীকান্ত গুপ্ত স্মৃতি-পুস্তকাগারের সাহিত্য শাখার অধিবেশনে পঠিত।

এ সাদৃশ্য তাহারই ফল। আবার অনেকে বলেন, দুই জাতির পরস্পর পরিচয়-কালে নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্টতর জাতির নিকট হইতে তাহাদের ভাবগুলি প্রাপ্ত হয়; তাহার পর ঐ গুলিকে নিজেদের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মত করিয়া লয়। অনেকে বলেন, উপরি উক্ত দুই কারণের সংমিশ্রণে বিভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপ পৌরাণিক বৃত্তান্তের সৃষ্টি হইয়াছে। আমেরিকার, ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের, আদিম অধিবাসীদিগের সহিত পাশ্চাত্য সভ্য জাতিদিগের সম্বন্ধ অল্পদিন হইল স্থাপিত হইয়াছে, এবং পাশ্চাত্যগণ প্রাচ্য জাতিদিগের বহু কাল পরে সভ্যতার আলোক পাইয়াছেন—এ কথা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং ভারতবর্ষের পৌরাণিক বৃত্তান্তের সহিত অন্য দেশের পুরাবৃত্তের সাদৃশ্য থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, যদি ভাবের আদান-প্রদানে ঐরূপ সাদৃশ্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষই তাহার মূল। ভারতবাসিগণ যে পুরাকালে সমুদ্র-যাত্রায় অনভ্যস্ত ছিলেন না, এবং তাঁহারা যে এককালে আমেরিকাতেও যাতায়াত করিতেন, অধুনা তাহা এক প্রকার নিঃসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, মানবের আদি জন্মভূমি যদি ভারতবর্ষ হয়, তাহা হইলে অবশ্য সব গোলই মিটিয়া যায়। পুরাবৃত্তের ইয়ত্তা নাই, এবং তাহার শতাংশের একাংশও আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা করা যায় না। সুতরাং আমি ভারতবর্ষে প্রচলিত অতি সাধারণ দুই-চারিটি বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া, পাঠকবর্গের উপর আমার মতের যথার্থতা নির্দ্ধারণের ভার দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

(১) মনু

আমরা বৈবস্বত মনুর (স্মৃতিকার মনু নহেন) সন্তান বলিয়া মানব। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই আদিপুরুষ মনু। এখন দেখুন, ভারতবর্ষ ব্যতীত আরও কত দেশের পুরাবৃত্তে মনু মানবের আদিপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত রহিয়াছে। তবে বিভিন্ন দেশের ভাষা অনুসারে মনু নামের ঈষৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। মিশরের আদি-মানব মিনিস্ (Menes) নামে পরিচিত। ফ্রিজিয়ায় তিনি ম্যানিস্ (Manis) নাম ধারণ করিয়াছেন। লিডিয়ায় তিনি মেনস্ (Manes), গ্রীসে তিনি মাইনস্ (Minos), এবং জার্ম্মাণিতে তিনি ম্যান্নাস্ (Mannus) নামে পরিচিত হইয়াছেন। তাহা হইতে ইংরাজী Man হইয়াছে।

(২) আকাশ ও পৃথিবী

ধরিত্রী আমাদের মাতা ও আকাশ আমাদিগের পিতা। ঋগ্বেদে আকাশ ও পৃথিবীকে দ্যৌস্—পিতর্ ও পৃথ্বী—মাতর্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পোলিনেসিয়ার মাওয়ারি জাতি স্বর্গকে পিতা ও পৃথিবীকে মাতা বলিয়া থাকে। তাহাদের পৌরাণিক বৃত্তান্তটি বড় সুন্দর। তাহাদের বৃত্তান্তে আছে, স্বর্গ ও মর্ত্ত পূর্ব্বে একত্র ছিল। পৃথিবীস্থ মনুষ্য, পর্ব্বত, অরণ্য, নদী, ঝটিকা প্রভৃতি সকলই তাহাদের সন্তান। এই সন্তানগণ অন্ধকারে অত্যন্ত কষ্টভোগ করিয়া অবশেষে স্থির করিল যে, যে কোন উপায়ে হউক, তাহাদের পিতা-মাতা—স্বর্গ-মর্ত্তকে পৃথক্ করিতেই হইবে। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই সংগ্রামের বর্ণনা লিখিবার স্থানাভাব। অবশেষে তাহারা স্বর্গকে তাহাদের মস্তকের উপর ও পৃথিবীকে তাহাদের পদতলে স্থাপন করিল। স্বর্গ ও পৃথিবী এই বিরহ বেদনা এখনও ভোগ করিতেছে। বিরহ-বেদনা-কাতর স্বর্গের অশ্রুধারা নীহার-বিন্দুরূপে সারা রাত্রি ধরা-বক্ষে পতিত হইতেছে; এবং ধরণীর দীর্ঘশ্বাস কুজ্ঝটিকারূপে আকাশের দিকে উত্থিত হইতেছে। চীন দেশেও, ভারতবর্ষের ন্যায়, আকাশ পিতা ও পৃথিবী মাতা। গ্রীক্‌দিগের জিয়ুস্ ও ডিমিটার স্বামী ও স্ত্রী,—জিয়ুস্ স্বর্গ-পিতা, ও ডিমিটার পৃথ্বী-মাতা। প্লেটোর মতে, ধরিত্রী মানবের জননী ও স্বর্গস্থিত দেব তাহার জনক। অন্যান্য অনেক দেশে আবার আকাশ—পিতা, এরূপ কোন সংস্কার না থাকিলেও, ধরণী যে মানব-জননী এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। যথা, উত্তর-আমেরিকার আদিম অধিবাসী ও দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুভিয়ান্ প্রভৃতি জাতিদিগের জননী বসুধা। য়ুরোপে ফিন্‌স্, ল্যাপ্‌স্ ও এস্থ জাতিদিগেরও (Finns, Lapps, and Esths) ধরণী পরমারাধ্যা মানব-জননী। আদি ইংরাজদিগেরও (Anglo-Saxon) পৃথিবীই মাতা।

(৩) পৃথিবী-সৃষ্টি

হরিবংশে আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্য মধুকৈটভকে বধ করিলে, তাহাদের দেহ হইতে এত মেদ নিঃসৃত হইয়া-

ছিল যে, তদ্দ্বারা ভগবান্ নারায়ণ এই পৃথিবী নির্ম্মাণ করেন। সেই জন্য পৃথিবীর অপর নাম মেদিনী। ব্যাবিলোনিয়ায় পৃথিবী-সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেকটা এইরূপ পুরাবৃত্ত আছে। কথিত আছে, ব্যাবিলোনিয়ার দেবতা মারডুক (Marduk) জলদৈত্য টায়ামাটকে বিধ্বস্ত করিয়া জলের উপর পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

(৪) কূর্ম্ম-পুরাণ

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই, যাহাদিগের পুরাবৃত্তে পৃথিবীর মহাপ্লাবনের উল্লেখ না আছে। সকলের একই মত যে, পৃথিবী একবার প্রলয়-পয়োধির অতল জলে নিমগ্ন হইয়াছিল। আমাদের হিন্দু পুরাণের মতে মহাপ্লাবনের পর হইতে কূর্ম্মরাজ ধরণীকে পৃষ্ঠোপরি বহন করিতেছেন। অন্য আর একটি মত আছে যে, কূর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠে ঐরাবত অথবা সর্পরাজ বাসুকীকে ধারণ করিয়া আছেন এবং ঐরাবত পৃথিবীকে পৃষ্ঠে বা বাসুকী ধরণীকে মস্তকে ধারণ করিতেছেন। পারস্য দেশেরও প্রাচীন পুরাণের মতে জল-প্লাবনের পর কূর্ম্ম ধরিত্রীকে পৃষ্ঠে ধারণ করিতেছেন। ইহুদি, ও মধ্যযুগের য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে রসাতল হইতে কূর্ম্ম কর্ত্তৃক পৃথিবীর উত্তোলন ও তাহাকে পৃষ্ঠে ধারণের বৃত্তান্ত প্রচ্ছন্নভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্রিকার জুলু প্রভৃতি জাতিদিগের পুরাবৃত্ত অনুসারে, একটি ভীষণ কূর্ম্ম বসুধাকে পৃষ্ঠে বহন করিতেছে। উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এই কূর্ম্মঘটিত বৃত্তান্ত ভারতবর্ষের কূর্ম্ম সংক্রান্ত বৃত্তান্তের এতই অনুরূপ যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

(৫) ভূমিকম্প

আমাদের দেশের অশিক্ষিত সাধারণ লোকের সংস্কার এই যে, সর্পরাজ বাসুকী মাথা নাড়িলে ভূমিকম্প হয়। অন্য এক মতে, ঐরাবতের অঙ্গ-সঞ্চালনের ফলে ভূকম্পন হইয়া থাকে। মুসলমানদিগের পুরাণ মতে বসুধা-বাহন বৃষ অঙ্গ-সঞ্চালন করিলে ভূমিকম্প হয়। মঙ্গোলীয় লামাদিগের মতে পৃথিবীর বাহন ভেক দেহ দোলাইয়া ভূমিকম্প উপস্থিত করে। সেলিবিস্ দ্বীপে ধরণীধারক বরাহ সময়ে-সময়ে বৃক্ষের সহিত অঙ্গ-ঘর্ষণ করিয়া কণ্ডূয়ন-ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করে, ও তাহারই ফলে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। উত্তর-আমেরিকার আদিম-জাতিদিগের পৃথিবী-বাহন কূর্ম্ম অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া ভূমি কম্পন করিয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় অনেক দেশেরই ধারণা যে, পৃথিবীকে কোন জন্তু ধারণ করিয়া আছে, ও তাহার অঙ্গসঞ্চালনে ভূমিকম্প হয়।

(৬) হিন্দু দেবতা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে, পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম মিশর, ক্যালডিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যগণ যাহাই বলুন না কেন, আমাদের ভারতবর্ষ ঐ সকল দেশ সভ্য হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই সভ্যতার আলয় ছিল। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ার অনেক জাতি ভারতবর্ষ হইতে অনেক দেবতা গ্রহণ করিয়াছিল। যথা, প্রাচীন ব্যাবি-লোনিয়ার ক্যাসাইট্ জাতির প্রধান দেবতার নাম সূর্য্যস্,—আমাদের সূর্য্যদেব। আবার উহার মিটানি জাতির দেবতা 'ইন্দ্র', 'বরুণ', ও 'অশ্বিনীকুমারদ্বয়' ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত।

(৭) বৈতরণী

হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুর পর পরলোকে যাইতে হইবে। বৈতরণী পার হইয়া তবে তথায় যাইতে হয়। রাম-লক্ষ্মণ সরযূ নদীতে নিমগ্ন হইয়া স্বর্গে প্রয়াণ করেন। প্রাচীন মিশরে, ও ফ্রান্সের ব্রিটানি প্রদেশে আধুনিক যুগেও লোকের ধারণা এইরূপ যে, মৃত ব্যক্তি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া নদী পার হইয়া বহু দূরস্থিত নিজ চির-আবাস-ভূমিতে গমন করিয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীসে মৃত ব্যক্তিদিগের আত্মাকে কেরণ (Charan) পাটনী ষ্টিক্স্ নদী পার করিয়া লইয়া যাইত। পোলিনেসিয়ার পুরাবৃত্তে লিখিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা শরীর-ত্যাগের পর হয় সন্তরণ দ্বারা, অথবা ক্ষুদ্র নৌকাযোগে সমুদ্র পার হইয়া, পরপারে গমন করে। উড়িষ্যার খন্দজাতি, বোর্নিওর ড্যায়াক জাতি, গিনির নিগ্রো জাতি ও রুষিয়ার ফিন্ জাতি-দিগের মধ্যেও—মৃত্যুর পর আত্মাকে নদী পার হইয়া যাইতে হয়,—এইরূপ পুরাবৃত্ত প্রচলিত আছে। উত্তর-আমেরিকার অধিবাসীদিগেরও বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর আত্মাসকলকে উজ্জ্বল হীরক-নির্ম্মিত নৌকাযোগে পর-

পারে যাইতে হয়। এই জলরাশি পার হইবার সময় প্রবল বাত্যা উত্থিত হইয়া নৌকা জলমগ্ন হয়, এবং দুরাত্মগণ ডুবিয়া যায়; এবং পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ অনন্ত ধামে উপস্থিত হন। আমেরিকার ওজিবোয়াস্ জাতির ধারণা, মৃত্যুর পর আত্মা খরস্রোতা নদী পার হইয়া চিরানন্দভূমে গমন করে। মাণ্ডান জাতির ধারণা, মৃত্যুর পর আত্মা একটি হ্রদের তীরে গমন করে ও সেখানে নৌকা আরোহণ করে। হ্রদে নৌকা নিমজ্জিত হইয়া পাপাত্মগণ ডুবিয়া যায় ও পুণ্যাত্মগণ নিজ চির-আবাসভূমে উপস্থিত হন। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে জলরাশি পার হইয়া পরপারে যাইতে হইবে– এই ধারণায়, নরওয়ে ও সুইডেনে অর্ণবযানে অগ্নিসংযোগ করিয়া, মৃত যোদ্ধাগণকে তাহাতে শায়িত করিয়া, সমুদ্রবক্ষে তাহাদের ভাসাইয়া দেওয়া হইত; অথবা তাঁহাদিগকে নৌকায় স্থাপন করিয়া নৌকাশুদ্ধ তাহাদিগকে সমুদ্রতটে প্রোথিত করা হইত। দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়া ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মৃতব্যক্তিদিগকে আদিম অধিবাসিগণ তাহাদের দেশে ব্যবহৃত নৌকায় স্থাপন করিয়া নৌকা শুদ্ধ সমাধিস্থ করে।

(৮) চন্দ্র-সূর্য্য

আমাদের দেশে চন্দ্র-সূর্য্য দুই ভ্রাতা। আমাদের দেশের এই ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ অন্য দেশে একটু রূপান্তর ধারণ করিয়াছে মাত্র। যথা, গ্রীসে এপলো ভ্রাতা ও ডায়ানা ভগিনী। মিশরে সূর্য্যদেব ও সাইরিস্ ভ্রাতা ও চন্দ্রমা—আইসিস্ ভগিনী। আমেরিকার পেরুপ্রদেশে সূর্য্য ভ্রাতা, চন্দ্র ভগিনী; আলগনকুইন জাতিদিগেরও সূর্য্য ও চন্দ্র ভ্রাতা ও ভগিনী। মেরুপ্রদেশে এসকুইমো প্রভৃতি জাতিদিগের চন্দ্রই ভ্রাতা, সূর্য্য ভগিনী। পুরাকালে মিশর প্রভৃতি দেশে ভ্রাতা-ভগিনীর পরিণয়ই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত; সুতরাং সূর্য্য ও চন্দ্র ঐ দেশে ভ্রাতা ও ভগিনী এবং স্বামী ও স্ত্রী।

(৯) চন্দ্রের কলঙ্ক

আমাদের ভাষায় চন্দ্রের অপর নাম শশাঙ্ক। কথিত আছে, চন্দ্রের কাশরোগ হওয়ায়, বৈদ্যের আদেশ অনুসারে ঐ রোগ-আরোগ্যকল্পে চন্দ্র একটি শশক বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। এই কারণে চন্দ্রের নাম 'শশাঙ্ক' এবং শশকটী তাঁহার বক্ষস্থিত দৃশ্যমান্ কলঙ্ক। সিংহলের পৌরাণিক বৃত্তান্তে লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব অরণ্যে তপস্যাকালে ক্ষুধায় পীড়িত হইলে, একটি শশক বুদ্ধদেবের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আত্মদান করিয়াছিল। এই পুণ্যে সে চন্দ্রবক্ষে স্থান পাইয়াছে,—চন্দ্রে যে কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, তাহা ঐ শশক। দক্ষিণ-আফ্রিকার নামাকোয়া জাতির পুরাবৃত্তে বিবৃত আছে যে, চন্দ্র একদা একটি শশককে কোন বিশেষ সংবাদ দিবার জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। শশক কিন্তু একটি ভুল সংবাদ দিয়া আসে। এই কারণে চন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শশককে প্রহার করেন। শশক প্রাণভয়ে পলায়ন করে। চন্দ্রে যে কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, উহা তাহাদের মতে, ঐ পলায়মান শশক। আবার অন্য এক মতে, চন্দ্র শশককে প্রহার করিলে, শশক ক্রুদ্ধ হইয়া নখরাঘাতে চন্দ্রানন ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। চন্দ্রের বদনে ঐ ক্ষতস্থানগুলি কলঙ্ক স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারত বিখ্যাত ফিজি দ্বীপপুঞ্জে চন্দ্র ও শশক বিষয়ে এইরূপ বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে। এক্ষণে দেখুন, পৃথিবীতে এত জীবজন্তু থাকিতে অন্যান্য সুদূর দেশেও চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অনুরূপ চন্দ্রের শশক-সম্পর্ক কিরূপ বিস্ময়জনক।

চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের দেশে আর একটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে; উহা অবশ্য চন্দ্রের কাশ রোগের সহিত সংশ্লিষ্ট। কথিত আছে, চন্দ্র বৃহস্পতি দেবের নিকটে অধ্যয়নকালে গুরুপত্নী হরণ করেন। এই ব্যাপার হইতে চন্দ্রের কলঙ্কের উৎপত্তি। আসামের খাসিয়াদিগের মধ্যে একটি পৌরাণিক গল্প প্রচলিত আছে যে, চন্দ্রদেব একদা তাঁহার শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণীর প্রতি অবৈধ আসক্তি প্রদর্শন করায়, তিনি কুপিতা হইয়া চন্দ্রের আননে অঙ্গার নিক্ষেপ করেন। সেই অঙ্গার অদ্যাপি চন্দ্রের বদনে কলঙ্ক রূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। য়ুরোপের শ্লাভ জাতিদিগের পৌরাণিক বৃত্তান্তে আছে, চন্দ্রদেব গোপনে শুকতারার সহিত প্রণয় করায়, তাঁহার স্ত্রী তাঁহার মুখ নখরাঘাতে ক্ষত করিয়া দেন। চন্দ্রে দৃষ্ট কলঙ্ক চন্দ্রবদনের ঐ ক্ষত স্থান।

চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে আমাদের দেশে আর একটি

ধারণা আছে যে, 'চাঁদের মা বুড়ী চাঁদে বসিয়া কাট্‌না কাটিতেছে।' চন্দ্রে দৃষ্ট কলঙ্ক ঐ বৃদ্ধা। সুতরাং এক-মতে চন্দ্রস্থিত মনুষ্য চন্দ্রে কলঙ্ক স্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সানোয়ান্ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণের বিশ্বাস, সিনা নাম্নী একটি বৃদ্ধা চন্দ্রে বাস করে। চন্দ্রের কলঙ্ক ঐ বৃদ্ধা। য়ুরোপে নর্স জাতিদিগের (Norsemen) বৃত্তান্তে, চন্দ্রের মধ্যস্থিত দুইটি শিশু পৃথিবী হইতে চন্দ্রের কলঙ্ক রূপে দৃষ্ট হয়। য়ুরোপের অন্যত্র চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে ভিন্ন-ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কোথাও বা আইযাক্ (Isaac) আত্মোৎসর্গের জন্য কাষ্ঠ লইয়া যাইতেছেন; কোথাও বা কেন্ (Cain) ভগবান্ জিহোভার নিকট উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত নিজ ক্ষেত্র হইতে এক বোঝা কণ্টক লইয়া আসিতেছেন। আর ইংলণ্ডের আখ্যায়িকা এই যে, একটি লোক বিশ্রামের দিন—রবিবারে কাষ্ঠ আহরণ করার শাস্তি স্বরূপ চন্দ্রে অবরুদ্ধ আছে। ঐ লোকটিকে পৃথিবী হইতে লোকে চন্দ্রের কলঙ্ক স্বরূপ দেখিতে পায়।

(১০) গ্রহণ।

সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পৌরাণিক বৃত্তান্ত এইরূপ যে, অসুর রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে। সূর্য্য ও চন্দ্রকে রাহুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদি বাজান হইয়া থাকে ও লোকে সংকীর্ত্তন, চীৎকার প্রভৃতি নানারূপ শব্দ করিয়া রাহু বা কেতুকে ভয় প্রদর্শন করে। চীন ও শ্যাম দেশে রাহু-কেতুর অনুরূপ অসুর আছে, তাহারা চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করে। চীনেও লোকে গ্রহণ-কালে আমাদের দেশের ন্যায় কোলাহল করিয়া থাকে। মঙ্গোলিয়া প্রদেশেও চন্দ্রের, সূর্য্যের রাহু-গ্রাস হয়, তাহাদের রাহুর নাম আরাচো। আমেরিকার আদিম অধিবাসিদিগের মধ্যে ঠিক আমাদের দেশের অনুরূপ রাহু-গ্রাসে গ্রহণ হইয়া থাকে ও লোকে ঐ সময় কোলাহল করে। তবে আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে ঐ রাহু একটু বিভিন্ন প্রকারের; যথা,—ক্যারীবদিগের অসুরের নাম মাবোয়া; পেরুভিয়ানদিগের অসুর ভীষণ পশু-আকৃতি, ইত্যাদি। পোলিনেসিয়ার দ্বীপ-পুঞ্জে চন্দ্র ও সূর্য্যকে ক্রুদ্ধ [উপ] দেবতা গ্রাস করিয়া গ্রহণ উপস্থিত করে। সেখানেও চন্দ্র ও সূর্য্যকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কোলাহল করা হইয়া থাকে। য়ুরোপে চন্দ্র ও সূর্য্য অসুর-কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়েন না, তাঁহারা অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং যুদ্ধে হতজ্ঞান হইয়া ঐরূপ দশা প্রাপ্ত হন। গ্রহণ-কালে য়ুরোপেও চন্দ্র-সূর্য্যের রক্ষার জন্য কোলাহল করা হইত।

(১১) রামধনু

বৃষ্টির পর রৌদ্র হইলে অনেক সময় আকাশে ধনুর আকারে যে একটা দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে আমাদের দেশে কেহ বা রামধনু, কেহ বা ইন্দ্রধনু বলে। ইস্‌রেলাইট্‌গণ ইহাকে জিহোভার ধনু আখ্যা দিয়াছিলেন। য়ুরোপের ফিন্‌জাতি ইহাকে তাঁহাদের বজ্রপাণি টায়ারের ধনু বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের ধারণা এই যে, এই ধনুর দ্বারা টায়ার দেব মনুষ্যজাতির অনিষ্টকারী যাদুকরদিগকে সংহার করেন। সাহেবগণ ইহাকে সোজাসুজি বৃষ্টি-ধনু বলিয়া থাকেন।

(১২) ছায়াপথ।

রাত্রিতে আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নক্ষত্ররাজির সমাবেশ-হেতু যে একটা নাতিসূক্ষ্ম শুভ্র রেখা দৃষ্ট হয়, তাহাকে আমরা ছায়াপথ বলিয়া থাকি। আফ্রিকার বাসুতো জাতি ইহাকে দেবতাদিগের পথ, ওজি জাতি ইহাকে প্রেতাত্মার পথ, উত্তর আমেরিকার জাতিগণ ইহাকে জীবিতেশ্বরের পথ, প্রেতাত্মার পথ ও আত্মার পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শ্যামদেশবাসিগণ ইহাকে শ্বেত-হস্তী বা ঐরাবতের পথ এবং সিরিয়ান্, সারসিয়ান্ ও তুর্কগণ ইহাকে তৃণবর্ত্ম আখ্যা দিয়া থাকেন। য়ুরোপের লিথুয়ানিয়ানগণ ইহাকে পক্ষিবর্ত্ম (আত্মারূপ পক্ষী), স্প্যানিয়ার্ডগণ ইহাকে সেন্টিয়াগোর পথ, এবং য়ুরোপের তুর্কগণ ইহাকে তীর্থযাত্রীর পথ বলেন। ইংরাজী দুগ্ধপথ (Milky Way) নামের নিদান প্রাচীন গ্রীক্ পুরাণে পাওয়া যায়। হার্কিউলিসের ধাত্রীর স্তনদুগ্ধ আকাশে ছড়াইয়া পড়িয়া ইহার উৎপত্তি হয়। আবার গ্রীক্ পুরাণে ইহা দেবরাজ জুপিটারের রাজপ্রাসাদে গমনের পথ বলিয়াও পরিচিত। রোমানরা ইংলণ্ড অধিকার-কালে বহু রাজপথ নির্ম্মাণ করেন, ওয়াটলিং ষ্ট্রীট্ তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইংরাজগণ ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছায়াপথকে ওয়াটলিং ষ্ট্রীট বলিতেন।

এমন কি, কবি চসারও (Chaucer) ইহাকে Watling Street বলিয়াছেন!

(১৩) অসামান্য পুরুষদিগের জন্তু-স্তন্য পান।

আমাদের দেশে একটা ধারণা আছে যে, বাঘের দুধ খাইলে শরীরে শক্তি ও মনে সাহস হয়। ছোট-ছোট ছেলেরা এখনও বলিয়া থাকে, 'আমার সঙ্গে যাবি, বাঘের দুধ খাবি, ভয় করবি না।' ছেলেমানুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রায় সকল দেশের পুরাবৃত্তেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসাধারণ মনুষ্যগণ মাতৃ স্তন্য-পানে অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, বিশিষ্ট বলশালী জন্তুর দুগ্ধ পান করিয়া তবে ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের শাতবাহন সিংহী এবং সিং বাবা ব্যাঘ্রী কর্তৃক লালিত হইয়াছিলেন। পারস্যের প্রথম রাজা সাইরাস্ (Cyrus) কুক্কুরীর স্তন্য পান করিয়া লালিত হইয়া ছিলেন। প্রাচীন রোমের নির্ম্মাতা রোমিউলাস্ ও তাঁহার ভ্রাতা রেমাস্‌কে তাঁহাদিগের মাতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈশব অবস্থায় বধ করিবার নিমিত্ত টাইবার নদের জলে ভাসাইয়া দেয়। ভাসিতে-ভাসিতে তাঁহারা একটী বৃক্ষ-মূলে আসিয়া আটকাইয়া যান। সেখান হইতে একটী ব্যাঘ্রী তাঁহাদিগকে তুলিয়া লইয়া গিয়া স্তন্য দানে তাঁহাদের জীবন রক্ষা করে। শ্লাভ্‌দিগের বৃত্তান্তে আছে, তাহাদের দেশের বীরপুরুষ ওয়ালিগোরা ব্যাঘ্রীর স্তন্য পান করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার এমন শক্তি ছিল যে, তিনি পর্ব্বত লইয়া ভাঁটা খেলা করিতেন। তাহাদের উইরুইড্যাব্ ভল্লুকী-স্তন্য-পানে লালিত হওয়ায় এরূপ শক্তিশালী ছিলেন যে, তিনি একটানে বৃহৎ-বৃহৎ ওক্ বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিতেন। নেকড়ে বাঘ জাম্মাণ পৌরাণিক বীর ডায়েটারিচের পালকমাতা ছিল বলিয়া, তাঁহার নাম হইয়াছিল Wolfdieterich। তুর্কদিগের পৌরাণিক বৃত্তান্তে আছে, তুর্কি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বুর্ত্তা চিনো (Burta-Chino) শৈশব কালে রোমিউলাসের ন্যায় একটী হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন ও একটী ব্যাঘ্রী তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া স্তন্য দানে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। ব্রেজিলদেশের ইয়ুরাকেরিস্ জাতিদিগের পৌরাণিক কথা এই যে, তাহাদের বীরপুরুষ তিরি ব্যাঘ্রী-স্তন্য-পানে পরিপুষ্ট হইয়াছিলেন।

(১৪) মনুষ্যের ব্যাঘ্ররূপধারণ।

আমাদের দেশে লোকের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল এবং পল্লীগ্রামে ইতরলোকদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের এখনও বিশ্বাস আছে যে, অনেক লোক স্বেচ্ছায় ক্ষণকালের নিমিত্ত,—বা কেহ যাদুকর কর্তৃক চিরকালের মত ব্যাঘ্রে পরিণত হয়। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমার মাতুলালয়ে একবার ব্যাঘ্রের উৎপাত হয়। আমি মাতুলালয়ে মাতামহীর নিকট যাইবার পরই, তিনি আমাকে ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যের কথা শুনাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, এই বাঘ আসল বাঘ নহে, নিকটবর্ত্তী নগরের একটী লোক কোন্ দেশে গিয়াছিল, সেখানকার যোগিনীগণ তাহাকে বাঘ করিয়া দিয়াছে। লোকটীর মাতা এই সংবাদ পাইয়া, একঘটী মন্ত্রপূত জল লইয়া, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া, ব্যাঘ্রটীকে দেখাইয়া দিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিতেছে,—দেখিতে পাইলেই ঐ জল ব্যাঘ্রের গাত্রে সেচন করিলে, ব্যাঘ্র আবার মানুষ হইবে। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহার সম্মুখেই উচ্চ হাস্য করিয়াছিলাম। আমার হাসি শুনিয়া তিনি আমার প্রতি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন, তাহাতে,—মানুষ যে বাঘ হয়—এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না, এবং তখন আমি টেনিসনের A tiger-cat in act to spring উক্তির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। আসামের গারোদিগের ধারণা যে, তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ ব্যাঘ্র-রূপ ধারণ করে। উড়িষ্যার খন্দদিগের ধারণা যে, যে বাঘ মানুষ খায়, সেগুলি হয় ক্রুদ্ধা ধরিত্রী দেবী, আর না হয়, ব্যাঘ্র-রূপধারী মনুষ্য, নিজ শত্রুর বিনাশের নিমিত্ত ব্যাঘ্র-রূপ ধারণ করিয়াছে। সিংভূমের কোলদিগেরও ঠিক এইরূপ ধারণা আছে। একবার চাঁইবাসার কোর্টে একটী খুনের মোকদ্দমা হয়। ব্যাপার এইরূপ—একটি ব্যাঘ্র মোরা নামক একটি লোকের স্ত্রীকে লইয়া পুসা নামক একটি লোকের বাড়ীর মধ্য দিয়া কোথায় চলিয়া যায়। মোরা পুসার প্রতিবাসীদিগকে পুসার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলে পুসার বাঘ হইবার ক্ষমতা আছে। ইহা শুনিয়া মোরা পুসাকে খুন করিয়া ফেলিল। কোর্টে বিচারকালে সাক্ষীরা বলিল, পুসা ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিয়া একবার একটা আস্ত ছাগল খাইয়াছিল, এবং সে একবার একটা বলদ দেখিয়া বলে যে, তাহার ঐ বলদটাকে

খাইবার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। সেই রাত্রেই বলদটাকে বাঘে লইয়া যায়। সুতরাং পুসার বাঘ হইবার ক্ষমতা নিশ্চয়ই ছিল। বাঘ মারিলে কোন দোষ নাই! সিঙ্গাপুর অঞ্চলে লোকের ধারণা আছে যে, তাহাদের দেশের যাদুকরগণ—তাহাদের শত্রুর উপর প্রতিশোধ লইতে হইলে, ব্যাঘ্র হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে। আফ্রিকার অধিবাসীদিগের মধ্যে মনুষ্যের সিংহ, ব্যাঘ্র ও হায়ানা রূপ ধারণ করার পৌরাণিক বৃত্তান্ত অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রচলিত। আবিসিনিয়ার বুডা জাতির ধারণা যে, তাহাদের দেশের লোহকার ও কুম্ভকারগণ হায়ানা-রূপ ধারণ করিতে সিদ্ধহস্ত। দক্ষিণ আমেরিকার যাদুকরগণ শত্রুকে দমন করিবার নিমিত্ত নিজেকে ব্যাঘ্রে পরিণত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। রোমের কবি ভার্জিল নর ব্যাঘ্রের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। য়ুরোপে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ প্রভৃতি কোন দেশেই নর ব্যাঘ্রের অভাব ছিল না। অদ্যাপি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীস্, জার্ম্মাণি প্রভৃতি দেশে মনুষ্য ব্যাঘ্রের বৃত্তান্তের অভাব নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগেও ফ্রান্সের কোন-কোন প্রদেশে আইন দ্বারা মনুষ্য ব্যাঘ্র বিতাড়িত করিতে হইয়াছিল। এমন কি, মনুষ্য-ব্যাঘ্রগণ নিজেরাই বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া নিজেদের ব্যাঘ্রস্বভাব সুলভ কার্য্যের সাক্ষ্য দিত। ফ্রান্সে এখনও অনেক স্থানে সন্ধ্যার পর কেহ মনুষ্য ব্যাঘ্রের ভয়ে একা বাটী হইতে দূরে যাইতে চাহে না। প্রবাদ আছে, সপ্তদশ শতাব্দীতে সুইডেন ও রুষের মধ্যে অনেক সুইডিস্ বন্দী ব্যাঘ্র হইয়াছিল। ডেনমার্কে এখনও মনুষ্য ব্যাঘ্র দেখা গিয়া থাকে। ইংলণ্ডে Wer-wolf কথা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

(১৫) পৌরাণিক পুরুষদিগের মৎস্যোদরে অবস্থিতি।

আমাদের পুরাণে আছে, মদনভস্মের পর মদন শ্রীকৃষ্ণ তনয় প্রদ্যুম্ন হইয়া জন্মান। শিশু প্রদ্যুম্ন শম্বরাসুর কর্ত্তৃক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, মৎস্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন; ও পরে মৎস্যের উদর হইতে তাঁহাকে বাহির করা হয়। কথা-সরিৎ-সাগরে একটি গল্প আছে যে, এক রাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পুরুষ স্বর্ণপুরী দর্শন করিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। শক্তিদেব ঐ স্বর্ণপুরী উদ্দেশে সমুদ্র যাত্রা করিলে, দৈবক্রমে সমুদ্র-জলমগ্ন ও মৎস্য কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন। সেই মৎস্য ধৃত হইয়া স্বর্ণপুরীর রাজার নিকট নীত হয় ও তাহা ছেদন করিলে শক্তিদেব বাহির হইয়া পড়েন। তাহার পর বহু বাধা-বিপত্তি ভোগ করিয়া অবশেষে তিনি ঐ রাজকুমারীর পাণিপীড়ন করেন। পোলিনেসিয়ার দেবতা ময়াই সম্বন্ধেও অনেকটা এইরূপ পৌরাণিক বার্ত্তা আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপসমূহেও এইরূপ বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর-আমেরিকার চিপেওয়া উপন্যাসেও (Chippewa tale) মোনেডো নামক একটি ক্ষুদ্র মনুষ্য সম্বন্ধেও এইরূপ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। বাইবেলে যোনা (Jonah) সম্বন্ধেও এইরূপ পুরাবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

(১৬) সহমরণ

আমাদের দেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে মৃত স্বামীর সহগামিনী হইবার নিমিত্ত পত্নী স্বামীর চিতায় নিজেকে ভস্মীভূত করিতেন। ইহার নাম সহমরণ। ইহা ভারতবর্ষের একটি অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া ভুবন বিখ্যাত হইয়া আছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অনুরূপ মৃত স্বামীর সহগামিনী হইবার প্রথা পৃথিবীর আরও অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল। আফ্রিকার গিনি নিগ্রোদিগের কোন বড়লোকের মৃত্যু হইলে, মৃত স্বামীর সহগামিনী হইবার নিমিত্ত, তাহার সৎকারের সময় তাহার অনেকগুলি পত্নীকে বধ করা হইত। নিউজিল্যাণ্ডে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, বাটীর অন্য লোকেরা তাহার প্রধানা স্ত্রীকে এক গাছি রজ্জু দিত; ও ঐ রজ্জু দ্বারা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া সে তাহার মৃত স্বামীর সহগামিনী হইত। হেরডোটাসের ইতিহাসে আছে যে, প্রাচীন শকদ্বীপে কোনও লোকের মৃত্যু হইলে, তাহার পত্নীগুলিকে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া বধ করিয়া, তাহাদিগকে মৃত ব্যক্তির সহিত একত্র সমাধিস্থ করা হইত। তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু হইলে, তাহার সহগামিনী হইবার জন্যও বোধ হয় অনেকগুলি যুবতীকে বধ করা হইয়াছিল। পেরুদেশের আদিম অধিবাসীদিগের কোন রাজার মৃত্যু হইলে, তাঁহার মহিষীগণ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া মৃত স্বামীর সহগমন করিতেন। পুরাকালে গ্রীকদিগের সৎকারের সময় সম্ভবতঃ

এই উদ্দেশ্যেই মৃত ব্যক্তির যুবতী দাসীগুলিকে বধ করা হইত। *

* এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য লওয়া হইয়াছে :-

(1) Rawlinson - Story of the Nations Egypt.
(2) Tylor—Primitive Culture. Vol I.
" -- Early History of Mankind.
" — Anthropology.
(3) Hall—The Ancient History of the Near East.
(4) Max Muller - Comparative Mythology.
(5) Vignoli—Myth & Science.

চিত্রে বিষাদ

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

কবি যাহা লেখনীর সাহায্যে ভাষায় প্রকাশ করেন, চিত্রকর তুলিকার সাহায্যে তাহা বর্ণে প্রতিফলিত করেন। চিত্রকর ও কবি—উভয়েরই ভাবই প্রধান সম্পদ। কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ শব্দের সমষ্টি যেমন কবিতা নহে, তদ্রূপ 'ক্যানভাসে' প্রতিফলিত কতকগুলি বর্ণের সমষ্টিও চিত্র নহে। ভাবসম্পদবিহীন কবিতা যেরূপ নির্জীব, চিত্রেও সেইরূপ ভাবের অভাব হইলে তাহা চিত্র না হইয়া বিচিত্র হইয়া দাঁড়ায়। সুকবি যেমন ভাষার ভাণ্ডার হইতে শব্দ চয়ন করিয়া, ছন্দে গাথিয়া, কবিতা রচনা করিয়া, পাঠকের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সুনিপুণ শিল্পী সুলিখিত চিত্রফলকে নানা ভাবের সমাবেশ করিয়া সেইরূপ দর্শকের হৃদয়ে বিচিত্র লীলাতরঙ্গের সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ, কবি ও চিত্রকরের মধ্যে অতি চমৎকার সাদৃশ্য বর্তমান।

হাসি-কান্না লইয়া এই জগৎ সংসার বিরচিত। কিন্তু বিধাতার অখণ্ডনীয় বিধানে এ সংসারে হাসির অপেক্ষা অশ্রুর প্রবাহই অধিক। বৈয়াকরণিকেরা কাব্যের যে সকল সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি সংজ্ঞা এই—রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। কাব্যে রস সাধারণতঃ নয় প্রকার; কিন্তু কাব্যে করুণরসেরই প্রাধান্য দেখা যায়। কারণ পৃথিবীতে দুঃখের ভাগই অধিক। চিত্রেও এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকরগণ করুণ-রসাত্মক চিত্র অঙ্কন করিতেই অধিক পরিমাণে ভালবাসেন। বিয়োগান্ত দৃশ্যের চিত্রই তাঁহাদের সমধিক প্রিয়। কিছু দিন পূর্ব্বে "ভারতবর্ষে" হাস্যরসাত্মক চিত্রের সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। আজ এই লেখকের উপর বিষাদমূলক চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ভার পড়িয়াছে।

অশ্রু অপ্রিয়দর্শন নহে। মহাকবি সেক্সপীয়ার এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন,—"A beauty's tears are lovelier than her smile." কবির এই উক্তি কল্পনা মাত্র নহে। স্থলবিশেষে হাসির অপেক্ষা অশ্রু বাস্তবিকই অধিকতর সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিয়া থাকে।

কিন্তু অশ্রুই যে শোকের, বিষাদের, দুঃখের একমাত্র লক্ষণ, তাহাও নহে। সাধারণ চিত্রকর বিষাদের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া প্রায়শঃ অশ্রুর সহায়তা গ্রহণ করেন। কোন চিত্রে নয়ন দু'টা অশ্রুভরা, সে অশ্রু এখনও পড়ে নাই, তবে পতনোন্মুখ বটে;—যেন পড়ে, পড়ে, তবু পড়ে না। কোন চিত্রে অশ্রু পতনশীল,—ফোঁটার আকারে, বা, গণ্ড বাহিয়া। কিন্তু সকল শোকেই অশ্রু পতিত হয় না। এমন অনেক গভীর দুঃখ আছে যে, বুক ফাটিয়া যাইতেছে, অথচ, নয়নে একবিন্দু অশ্রু নাই। সেই জন্য বহুদর্শী চিত্রকরেরা শোকের চিত্র অঙ্কন করিবার সময় একমাত্র অশ্রুর উপরই নির্ভর করেন না; অশ্রু পাতিত না করিয়াও তাঁহারা চিত্রিত ব্যক্তির বদনমণ্ডলে গভীর শোকের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারেন।

হাস্য-রসাত্মক চিত্রের অপেক্ষা করুণরসাত্মক চিত্র যে অধিক পরিমাণে অঙ্কিত হয়, তাহার আরও একটি স্বাভাবিক কারণ আছে। মানবের বদনে হাস্যের ক্রিয়া

ক্ষণিক ; কিন্তু দুঃখের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অধিক কাল স্থায়ী। উচ্চ হাস্য বা মৃদু হাস্য—যেরূপ ভাবেই হাসুক না কেন, লোকে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিতে পারে না। আনন্দের তীব্রতা হ্রাসের সঙ্গে-সঙ্গে হাস্য বা আনন্দের অপর লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হয় ; কিন্তু শোকের তীব্রতা হ্রাস হইলেও, শোকার্ত্তের বদনে শোকের চিহ্নগুলি দেদীপ্যমান থাকে। চিত্রে হাস্য বা শোকের ভাব আরোপিত করিতে হইলে, হাসির সময় বা শোকের সময় মানুষের মুখের ভাব যেরূপ হয়, চিত্রকরকে তাহা হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া, পরে তাহা তুলিকা ও বর্ণের ভিতর দিয়া চিত্রে প্রতিফলিত করিতে হয়। চিত্রকর আনন্দের ভাব হৃদয়রূপ ফটোগ্রাফে ধরিয়া লইবার যতটুকু সময় পান, দুঃখের ভাব গ্রহণ করিতে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী সময় পাইয়া থাকেন। সুতরাং চিত্রে শোকের ভাবই যে বেশী পরিমাণে ফুটিয়া উঠিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। তাহা ছাড়া, সহানুভূতি মানব হৃদয়ের একটি সাধারণ ধর্ম্ম। কাহাকেও শোক প্রকাশ করিতে দেখিলে, আপামর সাধারণ সকলেরই হৃদয়ে একটি 'আহা!'-র ভাব স্বতঃই সৃষ্ট হয়। অন্যান্য লোকে দুই-চারিটি সান্ত্বনা-বাক্য প্রয়োগ করিয়া শোকাপনোদনের চেষ্টা করে ; কিন্তু চিত্রকর চিত্রপটে শোকেরমূর্ত্তি অঙ্কন করিয়া তাঁহার হৃদয়গত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং শোকের চিত্র অঙ্কন করিবার লোভ সংবরণ করা শতকরা একজন চিত্রকরের পক্ষেও কঠিন।

উইলিসিসের মৃত্যুতে এণ্ড্রোমেচার শোক-প্রকাশ

সাধারণ চিত্রকরেরা অশ্রুকে বাদ দিয়া শোকের চিত্রাঙ্কনের কল্পনাও করিতে পারেন না। তাঁহাদের শোক-চিত্রের নায়ক-নায়িকার চক্ষু দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া অজস্র ধারে অশ্রুবিন্দু গণ্ড বাহিয়া পড়িবেই। কিন্তু চিত্রে শোকার্ত্ত ব্যক্তির চক্ষে অশ্রু স্থাপন করা যে কতখানি কঠিন, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। ফলতঃ, তাঁহাদের অঙ্কিত শোকচিত্র দর্শকের হৃদয়ে

নীরব শোক

সহানুভূতি বা সমবেদনার উদ্রেক না করিয়া, বরং বিদ্রূপাত্মক হাস্য-রসের সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু সুনিপুণ শিল্পী (master painters) শোক-চিত্রাঙ্কন কালে সযত্নে অশ্রু পরিহার করিয়া মুখে শোকের ভাবমাত্র ফুটাইয়া তুলিবার

চেষ্টা করেন, এবং দর্শকের হৃদয়ে প্রকৃত সমবেদনার উদ্রেক করিতে কৃতকার্য্য হন। যেখানে অশ্রুর সৃষ্টি একান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, সেখানেও তাঁহারা পতনশীল অশ্রু চিত্রিত না করিয়া, চক্ষু দুইটি জলে পূর্ণ করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহারা অবশ্য সকল স্থলে কৃতকার্য্য হন না। কিন্তু যেখানে হ'ন, সেখানে তাঁহাদের অঙ্কিত

সাশ্রুনয়না

মূর্ত্তির চক্ষুদ্বয়ে টলটল অশ্রু, গোলাপ বা কমল-দলোপরি বসন্তের শিশির-বিন্দুর ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে।

এইরূপ একখানি চিত্রের প্রতিলিপি এখানে প্রকাশিত হইল। ইহা হোগার্থ (Hogarth) রচিত; ইহার নাম Sigismunda Weeping over the Heart of Guiscardo। চিত্রখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সিজিসমণ্ডের অশ্রুসজল আঁখি দুইটি দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। ইহা এক্ষণে বিলাতের ন্যাশনাল গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। এই চিত্রাঙ্কনের একটু বিচিত্র ইতিহাস আছে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহা অঙ্কিত হয়। করেজিও (Coreggio) নামক একজন চিত্রকর এই শ্রেণীর একখানি বিষাদ চিত্র অঙ্কিত করিয়া ৪০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিলেন (অনেকে বিবেচনা করেন, চিত্রকর করেজিও নহেন; প্রকৃত পক্ষে ফ্রান্সেস্কো ফারিনি এই চিত্র অঙ্কন করেন)। হোগার্থ

ক্যানেরীর শোকে

তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর চিত্র অঙ্কিত করিয়া ঐ মূল্যে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়া, সিজিসমণ্ডের চিত্র অঙ্কন করেন। সার রিচার্ড গ্রোসভেনর নামক একজন ভদ্রলোক, চিত্রখানি সম্পূর্ণ হইলে উহা ৪০০ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্কন সম্পূর্ণ হইলে, তিনি বলেন, এরূপ চিত্র সর্ব্বদা চোখের সম্মুখে থাকিলে, তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষণ্ণ হইয়া থাকিবে; তাহাতে বিবিধ কুফল ফলিতে পারে। অতএব তিনি

হোটেল-রক্ষকের মৃতা কন্যা ও তাহার প্রণয়ী

শোকে সমতা

উহা গ্রহণ করিবেন না। হোগার্থ ইহাতে বিরক্ত হইয়া সার রিচার্ডের উদ্দেশে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণ্যে এই চিত্র তাদৃশ প্রশংসিত না হইলেও, হোগার্থ স্বয়ং ইহাকে অতি উচ্চ শ্রেণীর চিত্র মনে করিতেন; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার এই বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তাঁহার পরিত্যক্ত অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে-সঙ্গে এই চিত্রখানিরও অধিকারিণী হইয়াছিলেন। হোগার্থ পত্নীকে আদেশ করিয়া যান যে, ঐ চিত্র তিনি যেন ৪০০ পাউণ্ডের কম মূল্যে কদাচ বিক্রয় না করেন। হোগার্থের পত্নীর মৃত্যুর পর উহা ৫৬ গিনি মূল্যে বিক্রীত হয়। পরে মিঃ জেমস হিউজেস এণ্ডাসন উহা ক্রয় করিয়া ন্যাশনাল গ্যালারীতে দান করেন।

ভ্যান ডার উইডেন রোরুদ্যমানা স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া, পতনশীল অশ্রু পরিহার করিবার জন্য, রমণীর চক্ষে রুমাল বসাইয়া দিয়াছেন। এই কৌশল অবলম্বন করায় তাঁহাকে অশ্রুর চিত্র অঙ্কিত করিতে হইল না, অথচ রুমালের অন্তরালে অশ্রুর সুস্পষ্ট কল্পনা দর্শকের চিত্তে প্রতিফলিত হইল। মিঃ ফ্রেডারিক গুডঅল ও Patient in Tribulation নামে রোরুদ্যমানা রমণীর একখানি চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। কিন্তু দুইখানি চিত্রের তুলনা করিলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রহিয়াছে। দ্বিতীয়খানিতে দুঃখের অপেক্ষা অনুতাপেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে।

দুঃখেরও তারতম্য আছে। প্রিয়জন বিয়োগ জনিত মর্ম্মান্তিক দুঃখের ন্যায় গৃহ-পালিত পশু-পক্ষী-বিয়োগ-জনিত সামান্য দুঃখও চিত্রকরের তুলিকার অযোগ্য নহে। The Dead Canary'র চিত্রে পাঠক দেখুন, ঐ মেয়েটির প্রিয় পোষা ক্যানেরী পাখীটার মৃত্যু হওয়াতে, উহার কি পরিমাণ দুঃখই না হইয়াছে! চিত্রকর Greuze এই

অকস্মাৎ শোক-সংবাদ প্রাপ্তি

ধরণের চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। জন রীড অঙ্কিত The Sale of Old Dobbin নামক চিত্রও এই শ্রেণীর। ডবিন ঐ গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক দিনের পালিত অশ্ব বলিয়া পরিবারের সকলেরই উহার উপর মায়া জন্মিয়াছে। এখন অবস্থার গতিকে বিক্রয় করিতে হইতেছে। নিলাম হইতেছে। এদিকে গৃহস্বামী বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। প্রিয় কুকুরটী প্রভুর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য তাঁহার উরুর উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে। তাঁহার স্ত্রী-কন্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিলাম দেখিতেছেন, এবং এখনই ক্রেতা ডবিনকে লইয়া যাইবে ভাবিয়া, মনে-মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন। ঘোড়াটিও যেন নিজের অবস্থা বুঝিতে

পরিত্যক্ত শিশু

পারিতেছে; এতদিনের আবাস, প্রভুর এত কালের আদর যত্ন—সমস্তই এখনই ফুরাইবে মনে করিয়া, সেও যেন যথেষ্ট ভাবিত হইয়াছে।

মিঃ ব্রিটন রিভিয়ার (Mr. Briton Riviere) অঙ্কিত Regrets আর এক শ্রেণীর দুঃখের চিত্র। চেয়ারে আসীনা মহিলাটির স্বামী, ভ্রাতা বা অপর কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত ব্যক্তি ঐ কুকুরটির প্রভু ছিলেন। সুতরাং উভয়েরই অবস্থা সমান। তাই কুকুরটি রমণীর কোলের উপর মুখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দুজনেই পরস্পরের ব্যথার ব্যথী। এখানে ভাষার আড়ম্বর নাই, কিন্তু শোকের গভীরতার অভাব নাই।

The Inn-keeper's Daughter চিত্রখানি একটি জার্ম্মাণ গাথা অবলম্বনে বিরচিত। একটি যুবক প্রবাস হইতে নিজগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, তত্রত্য 'আশ্রমে'র অধিকারীর কন্যা—ঐ যুবকের প্রণয়িনী অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই মৃত্যু-মুখে পতিতা হইয়াছে!

সুপ্রসিদ্ধ পেরুজিনো The Deposition নামে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তাহাতে যে সকল মানবমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটিতে দেখা যায়, চিত্রকর মূর্ত্তির গণ্ডদেশে স্পষ্টভাবে অশ্রুর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু বিখ্যাত শিল্পীদিগের চিত্রে এরূপ দৃশ্য কদাচিৎ দেখা যায়।

বৈদেশিক চিত্রকরগণের কথা ছাড়িয়া এইবার আমরা আমাদের ঘরের কথা কহিব। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'ভারতবর্ষে'র পাঠক পাঠিকাগণের নিকট অপরিচিত নহেন। তাঁহার অনেকগুলি সুরঞ্জিত চিত্র 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার আর একখানি বহুবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হইল। এই চিত্রে অঙ্কিত দুইজনেরই শোকের কারণ এক; সেইজন্য উভয়েই পরস্পরের নিকট সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। গভীর দুঃখ,—ভাষায় প্রকাশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে; উভয়ে নীরবে পরস্পরের ব্যথা অনুভব করিতেছেন;—ইহাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান সান্ত্বনা। উভয়েরই মনের ভাব এইরূপ—I feel better than I can express.

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। পশ্চিমের আরক্ত কোমল রাগ, বিস্তৃত নীল আকাশের কোলে আনন্দের অপরূপ আভাসের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাহার ললাটমণ্ডলে রত্নখণ্ডের ন্যায় আরক্ত আভায় রোহিণী-বধূ ধীরে-ধীরে পূর্ব্বগগনে ফুটিয়া উঠিল। ধরণী মুগ্ধা, বিবশা,—রোমাঞ্চিত দেহে পদতলে পড়িয়া স্থিরনেত্রে কেবল চাহিয়া আছে।

ভাগীরথীতীরে জ্যোতিরত্নের ক্ষুদ্র গৃহখানির অঙ্গনে, তুলসীমঞ্চের নিকটে বসিয়া, একটী বর্ষীয়সী সধবা কোশাকুশী সম্মুখে লইয়া জপ করিতেছিলেন। মৃদুহস্তে দ্বার ঠেলিয়া একটী যুবক সেই অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "মা!" "কে রে মহীন? এতক্ষণে বুঝি মা বলে মনে পড়্‌ল! আজ দুদিন সহর থেকে নিরঞ্জনের সঙ্গে জমিদার-বাড়ী এসেছ শুনেছি, কিন্তু, এতদিন মা বলে বুঝি মনে ছিল না?" বর্ষিয়সী হস্তের জপ বন্ধ করিয়া, পরম স্নেহে যুবকের পানে চাহিয়া, অভিমানক্ষুব্ধ বাক্যে তাহাকে সম্বোধন করিতেছিলেন; কিন্তু যুবকের মুখের পানে দৃষ্টি পড়িতেই, ধীরে-ধীরে তাঁহার বাক্যস্রোত যেন আপনিই রুদ্ধ হইয়া গেল। শঙ্কিত মুখে যুবকের পানে দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিলেন, "মহীন্, ভাল ছিলি ত? তোকে এমন দেখাচ্চে কেন? আয়, কাছে আয়।" যুবক নত নেত্র তুলিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "আহ্নিক করছ যে মা! ছোঁবে?"

বর্ষিয়সী সেকথা কাণে না করিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তখন তাঁহার পদপ্রান্তে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মস্তক ও মুখের উপর শঙ্কিত, স্নেহকম্পিত হস্ত বুলাইতে-বুলাইতে বর্ষিয়সী পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "এমন কেন তোকে দেখাচ্চে মহীন্? সেখানে কি তোর কোন অসুখ করেছিল?" "না, বেশ ভালই ছিলাম মা!" "তবে কেন তোকে এমন দেখাচ্চে? এখানে এসেও তবে এ দুদিন কেন বাড়ী আসিস্‌নি?" "এম্‌নি। নিরঞ্জনের সঙ্গে কাল একজায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। আর—" বলিতে-বলিতে মহেন্দ্র ঈষৎ উজ্জ্বল চক্ষে তাঁহার পানে চাহিল; কণ্ঠের স্বর সহসা যেন থামিয়া গেল—মাতাকে প্রত্যাশিত নেত্রে তাহার পানে তখনো চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া গাঢ় স্বরে বলিল, "নাই বা এলাম মা? তাতে এমন ক্ষতি কি? আমার ত এখন সেইখানেই থাক্‌বার কথা।" বর্ষিয়সী ক্ষুব্ধ নেত্রে মহেন্দ্রের প্রতি চাহিলেন। একটু থামিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন—"যে ক'দিন আমি থাকি মহীন্, সেই ক'দিন যখন এখানে আস্‌বি, আমায় এসে দেখা দিস্। বেশী দিন হয় ত তোকে এ কষ্টও সইতে হবে না। মাত্র সেই ক'টা দিন আমার জন্য এইটুকু কর্‌তে পার্‌বি না কি?" বলিতে-বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মাতাকে কাঁদিতে দেখিলে শিশু যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে, মহেন্দ্র তেমনি ভাবে আকুল কণ্ঠে 'মা মা' বলিতে-বলিতে বর্ষিয়সীর ক্রোড়ে মুখ লুকাইল, এবং একখানি হস্ত তাঁহার পায়ের উপর রাখিল। মাতা হস্তখানিও ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মহেন্দ্রের মাথার উপরে ওষ্ঠাধর নমিত করিলেন, এবং তেমনি ভাবে বলিতে লাগিলেন, "কাত্যায়নীর আগে যে তুই আমায় মা বলেছিস্। সে যখন পেটে, তখন মনে হত এ বয়সে আবার নতুন করে এ কেন। আমি ত মহেন্দ্রকে পেয়েছি, আর আমার ছেলের দরকার কি! যেদিন মেয়ে জন্মাল, সেদিন মনে আর এক নতুন আশা এল যে, মহীন্‌কে আর কেউ আমার পর বল্‌তে পার্‌বে না। গর্ভে না ধর্‌লে সবাই তাকে ছেলে বলে মান্‌তে চায় না—সেই বড় দুঃখ ছিল। কাত্যায়নীকে দিয়ে সেই দুঃখ মেটাব, এই বড় সাধ করেছিলাম। ভগবান আমার সেই সাধে এমন বাদ্ সাধ্‌লেন যে, সেই জন্যই তুই-ও আমার পর হ'য়ে গেলি মহীন্!" "মা, মা, মাপ করো আমায়,—মা,

চুপ্ করো,—তোমার পায়ে পড়ি।" "আমি কি জানি না মহীন্, কেন তোকে কর্ত্তা এমন ক'রে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। জ্যোতিষেই তাঁকে এমন নিষ্ঠুর করে তুলেছে। আমি তাঁকে বল্‌ব, তাঁর মেয়ে নিয়ে তিনি যা ইচ্ছা করুন, যার সঙ্গে খুসী বিয়ে দেন্—চাই না দেন্। তাই বলে তিনি তোকে এমন করে দিনে-দিনে পরের মত দূরে রাখার চেষ্টা যেন আর না করেন। এ আমি আর সহ্য করতে পার্‌ছি না।" বলিতে-বলিতে ব্রাহ্মণী মহেন্দ্রের মুখের পানে অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মহেন্দ্রের মুখ আবার একান্ত মলিন হইয়া গিয়াছে। সে যেন প্রাণপণ চেষ্টায় কি একটা বেদনাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে চাহে; কিন্তু সে ব্যথা তাহার অপরাজেয় শক্তিতে মহেন্দ্রের মুখ কালিবর্ণ করিয়া দিতেছে। বুঝিয়া মাতা একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার ক্রোড়ের উপর মস্তক রাখিয়া ক্রমে-ক্রমে শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় পতিত দেখিয়া মাতা ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "মাটীতে শুয়েছিস্ মহীন্? কাত্যায়নি, একটা কম্বল নিয়ে আয় ত।" মহেন্দ্র তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া বলিল "না মা, আমায় এমনিভাবে একটু থাক্‌তে দাও।"

মাতা পুত্র—উভয়েই কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে রহিলেন। মনের বেগটা খানিক প্রকাশ করিতে পাইয়া মাতা যেন ক্রমে একটু সবলা হইয়া উঠিলেন। হতাশাচ্ছন্ন, ম্রিয়মান মহেন্দ্রের পানে চাহিয়া, তাহাকেও একটু আশা দিবার জন্য তাহার ললাটে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "মহীন্! তোকে আমার একটি অনুরোধ আছে।" "অনুরোধ মা? কি বলবে বল, অনুরোধ ব'ল না।" "শোন্, এমন ক'রে তুই হাল্ ছাড়িস্ নে—দূরে সরে যাস্ নে, মহীন্। এই জ্যোতিষ শাস্ত্রের দায়ে সহজে উনি যে কোন পাত্র পছন্দ কর্‌তে পার্‌বেন, এমন বোধ হচ্চে না। কাত্যায়নী এম্‌নি ক'রে সতেরো বছরের হল দেখ্‌ছিস তো। হয় তো শেষে ওঁকে রাজী হতে হবে। ততদিন মহীন্ তুই অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌বি না কি? ত্যাখ্, বিধাতা শেষ পর্য্যন্ত কি করেন।" "আমি—আমি—কোথায় গিয়েছি মা? কেন তুমি ও-রকম ভাব্‌ছ? একটু দুঃখ হ'য়েছিল—তোমাদের কাছ থেকে তো দূরে বেশী দিন থাকিনি,—তাই ও-কথা বলেছি। তোমার কোল্ ভিন্ন আর আমার জায়গা কোথায়?" বলিতে-বলিতে রুদ্ধকণ্ঠে মহেন্দ্র আবার তাঁহার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। মাতা সস্নেহ বেদনায় তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "তা কি আমি জানি না বাবা? রাতদিন যে তোকে আমিই আমার এ সাধের কথা কতবার বলে রেখেছি। মেয়েরই দুর্ভাগ্য—নইলে এমন কাঁর ভাগ্যে জোটে! সবাই যে আমার জোড়াগাঁথা চাঁদ দেখে কত হিংসে করেছে। এমনি হতভাগী আমি—আমার আজন্মের সাধে এমন বাদ্ পড়্‌ল। কি যে ছাই জ্যোতিষ কি অলক্ষণেই আমার সংসারে ঢুকেছিল,—সে যে আমার এমন শত্রু হবে, এ স্বপ্নেও জানি না। এতে আমার একরত্তিও বিশ্বাস নেই। ছাই হয় ও জ্যোতিষ-বিচারে। কর্ত্তাকে ঐ ছাইতেই মাথা খারাপ করে দিলে। তুই জ্যোতিষের হিজিবিজির কথা কাণে নিস্ না। জ্যোতিষ বলে, কাত্যায়নীর সঙ্গে তোর মিল হবে না; আর আমি যে তার জন্ম থেকে তোর সঙ্গে মনে-মনে তাকে মিলিয়ে রেখেছি—এর চেয়ে কি জ্যোতিষের মিল বড়?" মহেন্দ্র স্তব্ধনেত্রে মাতার মুখের পানে চাহিয়া যেন অপর কোন এক রাজ্যে বিচরণ করিতেছিল; অপলকনেত্রে সহসা দীপালোকচ্ছটা পতিত হওয়ায় সচকিতে উঠিয়া বসিল। মাতাও সেই আলোকের অনুসরণে গৃহপানে চাহিয়া বলিলেন, "কাত্যায়নি, তুলসী তলায় সন্ধ্যা দাও মা! প্রদীপ হাতে ক্বন্ধে দাঁড়িয়ে আছ যে? মহেন্দ্রকে কি চিন্‌তে পারনি?"

মুক্ত দ্বারপথে প্রদীপ-হস্তে জ্যোতির্ম্ময়স্থা দেবীর মত সেই প্রতিমাখানি অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; মাতার পুনরাহ্বানেও অঙ্গনে নামিল না।

মহেন্দ্র স্তব্ধভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত সেই দিকে চাহিয়া সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। ত্রস্ত স্বরে "আমি আস্‌ছি মা একটু পরে" বলিয়া ব্রাহ্মণীকে নিষেধের অবকাশমাত্র না দিয়া অঙ্গন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণী বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

কাত্যায়নী তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিল। তাহার পরে মাতার পানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, "মা!" কন্যার ঈষৎ তীব্র আহ্বানে চকিতা হইয়া মাতা উত্তর

দিলেন, "কেন মা কাত্যায়নি!" "এ সব কি মা?" "কিসের কথা বল্‌ছ কাত্যায়নি? কোন্ সব কি?" "তুমি এ সব কথা কেন মহেন্দ্রের কাছে বল? বাবা না তোমায় কতদিন বারণ করেছেন? তাঁর যাতে এমন অনিচ্ছা, সে আশা কেন তুমি এখনো কর, আর মহেন্দ্রকেই বা এমন অন্যায় আশা করতে কেন তুমি শেখাও?" মাতা ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন; শেষে মনস্তাপ-জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন, "এ আশা কি আজ আমরা নতুন করে করছি, কাত্যায়নি? তোদের জ্যোতিষ-শাস্ত্র এ সংসারে ঢুক্‌বার ঢের আগে আমাদের এ স্থির-করা কথা, জানিস্?"

"যখন জাননি তখন করেছ। এখন বাবার নিষেধ জেনেও কি বলে, তোমরা এই সব কথা বল?" "মানুষের মন কি তোদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের আঁক্, যে না মিল্‌ল তো অমনি মুছে নতুন করে মিলুতে বসে যাবে? মহেন্দ্রের মন থেকে কি সহজে এ কথা মুছে যেতে পারে?" "সে তোমারি দোষে। তুমিই তাকে মুছতে দাও না! আর তুমি এ রকম করতে পাবে না।" কন্যার অচঞ্চলা মূর্ত্তি ও দৃঢ়তাসূচক বাক্যে মাতা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণা হইয়া যেন নিজ মনেই বলিলেন, "এ যে আমার কতদিনের সাধ, তা' তুই কি করে জান্‌বি! আমি যে তোকে এইজন্যই তাকে দাদা বল্‌তেও শেখাইনি। তুই জানিস্ না, কিন্তু সে অনেকদিন আগে তা জেনেছিল।"

"জানুক। তুমি আর এ রকম কথা মুখে আন্‌তে পাবে না। আমি তাকে আজ থেকে দাদা বল্‌ব দেখো। বাবার অমতে, তাঁকে অসন্তুষ্ট করে, তোমাদের এ রকম ইচ্ছা করাই অন্যায়।" "কি মা কাত্যায়নি? কার অন্যায় মা! কাকে বকছ?" বলিতে-বলিতে জ্যোতিরত্ন মহাশয় অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে দেখিবামাত্র অসম্বৃতপদে প্রায় ছুটিয়া গিয়া কাত্যায়নী তাঁহার দুই হস্ত ধারণ করিয়া 'বাবা' বলিয়া আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল; কিন্তু তখনি আবার সে চাপল্য সংবরণ করিয়া যেন একটু লজ্জিতমুখে বলিল, "সন্ধ্যে উতরে গেছে যে বাবা—গঙ্গাতীরে কখন যাবেন?" বলিতে-বলিতে ধীরে কাত্যায়নী পিতার হস্তদ্বইখানি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার পানে চাহিল। "গঙ্গাতীরেই যে বসেছিলাম মা এতক্ষণ, কিন্তু সন্ধ্যাহ্নিক করা হয়নি।" "গঙ্গাতীরেই ছিলেন? জমীদার বাবুর কাছে যান্‌নি?" "না মা।" অস্ফুট ভাষায় জ্যোতিরত্ন নিজ মনে বলিলেন, "তুমিই আমায় সে স্থান ত্যাগ করালে।" "তবে হাত-মুখ ধুয়ে নিন্। আমি কাপড় উত্তরীয় আন্‌ছি।" কাত্যায়নী গৃহমধ্যে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণী স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "আজ এত অন্যমনা কেন? মুখ এত শুক্‌নো কেন?"

"তুমি কি তা জান না?" "কি করে জান্‌ব? কখনো কোন চিন্তার অংশ দাও ও না, নাও ও না।" "আজ তোমার চিন্তারই অংশ নিয়েছি। কাত্যায়নীর বিয়ের কথা ভাব্‌ছি।" "তোমার পক্ষে নতুন চিন্তা বটে। সমাজেরও তোমার ভয় নেই। এমনি কুল তোমাদের যে, সে কুলের মেয়ের বিয়ে হওয়াই দায়। যদি বা কুল মিল্‌বে তো জ্যোতিষশাস্ত্র তার সব পথ বন্ধ করেছে। এই মণি-কাঞ্চন-যোগে মেয়েটার ভাগ্যে যে শেষে কি দাঁড়াবে, তা বুঝতেই পার্‌ছি। হয় ত এজন্মে বিয়েই হবে না, নয় ত কোন্ একটা হতভাগার হাতে পড়্‌তে হবে।" জ্যোতিরত্ন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হতভাগা,—কাত্যায়নীর সঙ্গে যার বিবাহ হবে, সে হতভাগা হলে, বুঝবে যে জ্যোতিষ শাস্ত্রই মিথ্যা! তা যে হতেই পারে না। কিন্তু কাত্যায়নীর বিবাহ হবে না—চিরকুমারী থাক্‌বে সে, এ বরং সম্ভব। বোধ হচ্চে শেষে এই ঘটবে।" "কিন্তু তুমি বই তার যে দ্বিতীয় অভিভাবক কেউ নেই, তা কি একবার ভাব না?" "আজ তাই ই ভাবছি ব্রাহ্মণি! অনিত্য শরীর, তোমাদের তখন কি হবে?"

"আমারই কি খুব বেশী দিন আছে বলে মনে কর? ভাবনা মেয়েরই জন্য।" "সেই ভাবনাতেই আজ মাথা ঘুরছে" বলিতে-বলিতে জ্যোতিরত্ন সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী ব্যাকুল ভাবে নিকটে আসিয়া স্বামীর ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "এমন হতাশ তো তোমায় কোন দিন দেখি নাই। আজ এত কি ভাবছ বল ত?" ব্রাহ্মণ স্থিরনেত্রে আকাশ-পানে চাহিয়া রহিলেন। গৃহিণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "মহেন্দ্র আজ বাড়ী এসেছে। আজ তার মন হতে অভিমানটা গিয়েছে দেখলাম।" "এসেছে? বেঁচে থেকে নিষ্কলঙ্ক, চরিত্রবান্

হোক্! হায়, মহেন্দ্রকে যদি দিতে পার্‌তাম।" "তাই কেন দাও না? নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের কথা বল্‌ছ? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, তবু আমার মহেন্দ্রে নেই! তাকে কি তুমি ছোট থেকে পালন করনি? তাকে কি জান না?"

"আমি কি বল্‌ছি তুমি জান না! শুধু কাত্যায়নীর সঙ্গে রাশি-নক্ষত্রের বিষ-দোষের কথা বল্‌ছি না; তার পঞ্চম, নবম, তৃতীয়, একাদশ রাশিতে পাপগ্রহ কৃত যোগের কথা যে আমি কিছুতেই ভুল্‌তে পারি না। তাই ত তাকে উচ্চ সংসর্গে রাখ্‌তে চাই, যদিই তাতে দুর্ভাগ্য-যোগটা সংযত চরিত্রের পুরুষকারের নিকটে পরাজিত হয়।" "কি বক্‌ছ অত? আমি তোমার ও জ্যোতিষ-শাস্ত্র মানিনে। সবাই কি অত দেখে বিয়ে দেয়?" "না দেখে সাপের বিষও তো লোকে খায় এবং শুনেছি তা না কি ক্বচিৎ খণ্ডিতও হয়ে থাকে; কিন্তু জেনে-শুনে তা ত পারা যায় না। তুমি মহেন্দ্রকে পুত্রের অধিক স্নেহে পালন করেছ—তোমায়ও হয় ত তার জন্য বহু কষ্ট পেতে হবে।"

ব্রাহ্মণী ভীতভাবে বলিলেন "বালাই! অমন কথা বলো না। সে অমনি আমার ভাল থাকুক—বেঁচে থাকুক—তোমার মেয়েয় তার কাজ নেই।" "তাই ত সে আশা বহুদিন ছেড়েছি। ঈশ্বর আবার আমায় এ দেখালেন কেন?" "কি দেখালেন? আমায় একটু ভেঙে বল সব,—সবই নিজের মনে-মনে রেখে অত সন্তাপ পেয়ো না।" "কামাখ্যানাথের কোষ্ঠী দেখার কথা সে দিন কি তোমায় একটুও বলিনি?" "ওঃ সেই কথা? তোমার যত অনাছিষ্টি মত, আর আশ্চর্য্য কথা। অনেক দিনই তো তোমার কাছে এই জ্যোতিষের আলোচনা শুনে আস্‌ছি,—এমন কথা ত তোমার মুখে কখনো শুনিনি যে, কারও কোষ্ঠীতে তার কার সঙ্গে বিয়ে হতে পারে তাও লেখা থাকে।" "তা নয়। আমার সেই মনঃকল্পিত কোষ্ঠীতে যে রকম লগ্ন, চন্দ্র, গ্রহ-সংস্থান করে রেখেছি, সে রকম কোষ্ঠী যে আজ পর্য্যন্ত একটাও আমার চোখে পড়েনি; কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র দেখেও কামাখ্যা-নাথের কোষ্ঠী কেন আমার সেই কাল্পনিক আদর্শের সঙ্গে এতটা মিল্‌ল? আমি যে এমনি একখানা কোষ্ঠীরই প্রতীক্ষা করে আছি।" "কি যে বল! তাও তো বলেছিলে যে, ভয়ে ভাল করে সব দ্যাখনি। দু-এক নজর দেখে এমন বিশ্বাস এক তোমার মত জ্যোতিষ-পাগলেই সম্ভব্‌। যদি খুঁটিয়ে মাথা ঠিক করে দেখ্‌তে, তা'হলে হয় ত তোমার এ ভ্রম ভেঙেও যেতে পার্‌ত। হয় ত খানিকটা মিল হলেও বাকী সব অমিল্ হত।" "তা' যে আর ভরসা করে দেখতে পার্‌লাম না। যদি তাতে দেখি যে, আমার গৌরীর জন্য যার প্রত্যাশায় আমি বসে আছি, প্রত্যেক দিন পূজার শেষে ইষ্টদেবতার কাছে নিত্য যাঁকে আমি কামনা করি, আমার সেই প্রার্থিত বস্তুই নিকটে এসেছে, এ যদি আমি একবারে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারি; তা'হলে—তা'হলে আমি কি করব ব্রাহ্মণী?"

"কি আবার কর্‌বে! না হয় তোমার মনের মতন, ইচ্ছার মতন একখানা কোষ্ঠীই দেখতে পেয়েছ,—তাই বলে তার সঙ্গেই যে বিয়ে দিতে হবে, সেই যে কাত্যায়নীর স্বামী, তাকে ছাড়া আর কাকেও যে মেয়ে দেওয়া চলবে না, এও কি একটা কথা! আর কোন পাত্রের কোষ্ঠীর সঙ্গেই যে তোমার মেয়ের কোষ্ঠীর মিল্ হতে পারবে না, এমন কথা জ্যোতিষের বাবাও বল্‌তে পার্‌বে না। ভাল কোষ্ঠী দেখেছ তাঁর, বেশ। কিন্তু তাই বলে এমন ধারণা কেন কর্‌বে যে, সেই তোমার মেয়ের স্বামী। সে ছাড়া আর কারও সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারবে না? ও চিন্তা মন থেকে ছেড়ে দাও; দিয়ে, যেমন এতদিন পাত্র দেখছ, তেমনি তোমার জ্যোতিষের সঙ্গেই মিলিয়ে পাত্র খোঁজ।" জ্যোতিরত্ন নিজ মনেই যেন বলিতে লাগিলেন "এ পর্য্যন্ত এত কোষ্ঠী দেখেছি, কিন্তু কই, এমন তো একখানাও দেখিনি। কাত্যায়নীর জন্ম-লগ্নস্থ বৃহস্পতি সপ্তম স্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তার এমনি মহাপুরুষ স্বামী-সম্ভাবনাই যে নির্দ্দেশ কর্‌ছে। কামাখ্যানাথকে আমি যত জানি, এমন বোধ হয় আর কেউ জানে না। কাত্যায়নীর যে এমনি স্বামীই হবার কথা।"

"তুমি বারে-বারে ও কথা বলো না! অমন দোজবরে বুড়ো বর কাত্যায়নীর অদৃষ্টে আছে—এত দেখে-দেখে মেয়ের এমনি ভাগ্য তুমি আবিষ্কার কর্‌লে? ধন্য যা' হোক্ তোমার ধারণা!" "শিবও তো দোজবরে, আর তাঁকে সবাই বুড়োও বলেছিল ব্রাহ্মণি,—কিন্তু গৌরীর মা-বাপ কি তেমন জামাই পেয়ে কৃতার্থ হয়ে যান্‌নি?

Emerald Printing Works

আর তুমি কামাখ্যানাথকে বুড়ো কি বলে বলছ? বিবাহের বয়স না থাকলেও, তার বয়স চল্লিশ বৎসরের ওপরে দু'তিন বৎসর যদি বেশী হয়।" "তুমি বল কি গো? না হয় ততখানি বুড়ো নাই হল, তাই বলে কি এই এত বচ্ছর পরে সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে আসবে? তার উপযুক্ত ছেলে! ঐ মেয়ে! রমা যখন খুবই ছোট তখন তাদের মা মরে। স্ত্রী মরে গেলে বিয়ের বয়স থাকতেও যিনি বিয়ে করেননি, তিনি এই এতকাল বিপত্নীক থাকার পরে এই বয়সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে আসবেন? তাতে বুকের ওপর পনর বছরের বিধবা মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি ছেলে!" "তাও আমি জানি ব্রাহ্মণি; কামাখ্যানাথ কখনই বিবাহ করবে না, আর আমিও তাকে এমন ধর্ম্ম বিগর্হিত অনুরোধও করব না, এও নিশ্চিত জেনো।"

"তবে? তবে কেন এ নিয়ে এত ভাবছ?" "ভাবছি এই যে, তোমার কাত্যায়নীর বিবাহ দেওয়ার ইচ্ছা বুঝি আমায় ত্যাগ করতেই হ'ল। বিধির রহস্য ছ্যাখ, যাঁকে তিনি আমার মনের সঙ্গে যোগ্য পাত্র বলে বুঝতে দিলেন, তাঁকে এমনি অবস্থায় আমায় দেখালেন যে, তাঁকে আমার কামনা করাও অন্যায়। সে দেবতা, আমাদের মনের দ্বারাও অস্পৃশ্য! তাই বলছি ব্রাহ্মণি, তোমার কাত্যায়নীর আর বিয়ে দেওয়া আমাদের সাধ্যে হল না। তাকে চির-কুমারীই রাখতে হ'ল দেখছি।"

ব্রাহ্মণী এইবার প্রায় রোদনোন্মুখী হইয়া বলিলেন, "এই জন্যই জ্যোতিষ শিখেছিলে! শেষে এই করলে!" জ্যোতিরত্ন উপায়ান্তরহীন ভাবে শুধু মস্তক নাড়িলেন। ব্রাহ্মণী কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন "সত্যই জমীদারের এত প্রশংসা কখনো শুনিনি। কেবল তুমি নও, ছোট-বড়, সবাই এই কথা বলে যে, বাবু দেবতা! ছেলেমেয়ে দুটিও তেমনি। এক—একটু বয়স হয়েছে, কিন্তু মেয়ের এ গতির চেয়ে তাও ভাল। তা'হলে কি একবার জানাবে তাঁকে?" ব্রাহ্মণ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ও কথা বলো না—ও কথা না। আমি এই প্রলোভনের হাত এড়াবার জন্য আর তাঁর নিকটে সহজে যাই না। এমন অনুপযুক্ত চেষ্টা বা অনুরোধ আমার দ্বারা হবে না। ভাগ্যের সঙ্গে আর লড়তে পারি না। মেয়ে কুমারীই থাক্। কই মা, কাত্যায়নি কাপড় দাও।" কাত্যায়নী নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি এখনো ত মুখ হাত ধোন্নি?" "ওঃ—তাই ত!" ব্রাহ্মণ অঙ্গনের এক পার্শ্বে একটি অনতিক্ষুদ্র কূপের নিকটে গিয়া তাহার একদিকে পাতিয়া-রাখা একখানি ক্ষুদ্র জল-চৌকীর উপর বসিলেন। কন্যা নিকটে আসিয়া পিতার জন্য বহুপূর্ব্ব হইতে সযত্ন-রক্ষিত পাত্রস্থ জল ঘটীতে তুলিয়া তাঁহার করপুটে ও প্রসারিত পদযুগলের উপর ঢালিয়া দিতে লাগিল। হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া তিনি বস্ত্রাদি ত্যাগের জন্য গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণী এতক্ষণ স্তব্ধভাবে তুলসীতলায় বসিয়াই ছিলেন; ক্রমশঃ ক্ষীণজ্যোতিঃ প্রদীপটিকে এইবার একেবারে নির্ব্বাণোন্মুখ দেখিয়া "ঠাকুর তোমারই ইচ্ছা" বলিয়া সনিশ্বাসে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আসন ও কোশাকুশী তুলিয়া লইয়া গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই প্রায়ান্ধকার অঙ্গনে দাঁড়াইয়া কাত্যায়নী আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল—সেই ঊর্দ্ধদেশস্থ বিস্তৃত অঙ্গনখানিও অন্ধকার বটে, কিন্তু শতসহস্র জ্যোতিষ্কমালা রেখাকারে, স্তূপাকারে এবং যথেচ্ছ বিশৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, তাহাকে এক মৃদুল স্নিগ্ধ আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। সে যেন একটা প্রহেলিকা-ঘেরা অপরূপ জগৎ। সে জগতে কত অজানা রহস্যই ঐ তরল আলোকে তাহাদের অস্ফুট আভাষ দিবার জন্য সচেষ্ট। ঐ দীপ্ত তারকাগুলিই যেন সে রহস্যের উজ্জ্বল চক্ষু! কাত্যায়নী ভাবিল, "ওরাই কি তারা—যারা মানুষের জীবনকে নানা পথে কত আশ্চর্য্য ভাবেই সর্ব্বদা চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে? ওরাই কি মানুষের ভাগ্যের নিয়ামক?" সে গ্রহ বা নক্ষত্র কোন্‌টি—যেটির বশে তাহার জীবনও দিন-দিন এমন রহস্যময় পথে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে? কোন্‌টি সে? তাহার আলোকে আরও কোন অজানা রহস্যের ইঙ্গিত যদি সে বুঝিয়া লইতে পারে, সেই আশায় কাত্যায়নী আকাশের এদিকে-ওদিকে পুনঃপুনঃ দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিল। পিতাকে পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়াও তাহাদের কতকগুলির নামধাম ভিন্ন কাত্যায়নী সে বিষয়ে আর বেশী কিছু এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই। যে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তিনি নিজের জীবনকে ইদানীং অভিশাপগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতেন, সে শাস্ত্র আর কন্যাকে কিছু শিখাইতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই।

তাই কাত্যায়নী গোটাকতক গ্রহ-নক্ষত্রের নাম ও তাহাদের কিছু পরিচয় ছাড়া আর বেশী কিছু জানিত না। বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া কেবল সে ভাবিতেছিল, এই সুন্দর-সুন্দর আলোর অপরূপ ফুলগুলি—যেগুলিকে দেখিলে মনে হয়, ভগবান ফুলকে যে উদ্দেশ্যে গড়িয়াছেন, এদেরও বুঝি সেই উদ্দেশ্যে আকাশে ফুটাইয়াছেন—কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের নামে তাদের উপর মানুষ কত বড় ভারই চাপিয়ে দিয়েছে। ওদের মধ্যে এক-একটা জগৎ লুকান থাকে থাক—ওরা পৃথিবীর চেয়ে সহস্রগুণে বড় হয় হোক, সে কথা মানুষকে বিস্ময়ের আনন্দ ছাড়া অন্য কিছুই ত দেয় না! আর এই যে মানুষের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, যার বশে মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রগুলিকে জীবনের মঙ্গলামঙ্গলের হেতুভূত ক'রে এদের নামে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করছে, এ কি ঠিক! না,—না, ঠিক নিশ্চয়ই। নইলে পিতা কি এরই আলোচনায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিতেন? তাই এই আকাশের ফুলগুলির ক্ষমতা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, অবাক্ হইতে হয়।

জ্যোতিরত্ন অঙ্গনে নামিয়া কন্যার নিকটে আসিলেন। তাহাকে তারকানিবদ্ধ দৃষ্টি দেখিয়া সস্নেহে তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া ডাকিলেন "মা কাত্যায়নি!"

কন্যা সচকিত দৃষ্টি ফিরাইয়া সলজ্জ মুখে উত্তর দিল, 'বাবা!"

"এমন করে এখানে দাঁড়িয়ে কেন, চল ঘাটে যাই। কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেল যে মা।" কাত্যায়নী ভাবিয়া বলিল, "রমা এতক্ষণ আরতি দেখে বাড়ী চলে গেছে, আপনি ঠাণ্ডায় ঘাটেও আমায় বস্‌তে দেবেন না। তা'হলে এতরাত্রে আর যাব না বাবা।"

"সেই ভাল—উঠানেও থেক না, ঘরে যাও! সন্ধ্যার সময় তো উত্তীর্ণই হয়ে গেছে, যাই তবু গঙ্গাস্পর্শ করে আসি।"

"ঘরে এসে কি জপ কর্‌বেন? শীগ্‌গীর ফির্‌বেন কি? তা'হলে একটু দাঁড়িয়ে থাকি বাবা।"

"না মা, দেরী হবে আমার। দাঁড়িয়ে থেক না; তার চেয়ে তোমার পুঁথীপত্র নিয়ে বস গে। আমি জপ সেরেই আস্‌ব।"

"আপনি জপ সেরে আসুন, আমায় আজ শ্রীমদ্ভাগবত পড়াতে হবে আপনাকে।" "শ্রীমদ্ভাগবত! আজ যে নতুন ফরমাস পাগলি? মহাভারত ছাড়া যে তোর আর কিছু পছন্দই হ'ত না। ভীষ্ম-কর্ণের কাহিনীর কাছে রামায়ণও যে ভাল লাগে না বলিস্! আজ—" কন্যা সলজ্জ হাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমার জন্য তো নয় বাবা; রমা ভাগবত শুন্‌তে চায়, রামায়ণও শুন্‌তে ভালবাসে; কিন্তু ও-দুখানার কোন শ্লোকই আমার মুখস্থ নেই, জানাও নেই। তাই আপনার কাছে আজ বুঝে-বুঝে শুনব। তার পরে যেখানটা ভাল লাগ্‌বে, সেখানটা—" "শুন্‌তে-শুন্‌তেই অর্দ্ধেক মুখস্থ করে, বাবার পড়ানোর অর্দ্ধেক কষ্ট কমিয়ে দিয়ে, তখন দিন-রাত কেবল সেই কথা, আর সেই শ্লোক, আর তার ভাষ্য এনে তার প্রত্যেক শব্দের গূঢ় অর্থ আবিষ্কারের জন্য বাপের মাথা ঘুলিয়ে দিবি, কেমন?" হাসি মুখ নীচু করিয়া কাত্যায়নী বলিল, "না বাবা, কেবল রমাকে শোনাব—আর কিছু না।" "দেখিস্, মনে রাখিস্। শেষে যেন দুপুর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে শ্লোকের অর্থ করে দিতে হুকুম করিস্ না।" কন্যার মস্তকে সস্নেহে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করাইয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন।

কাত্যায়নী ক্ষুণ্ণভাবে একবার মনে করিল, 'রমার সঙ্গে আজ দেখা হল না,—সেই কাল সন্ধ্যা নইলে আর দেখা হবে না।' জমীদারের প্রাসাদ যদিও নিকটেই, তথাপি কাত্যায়নীদের সে বাটীতে তেমন গতিবিধি ছিল না; এবং রমাও ঠাকুরবাড়ী ভিন্ন অন্য কোথাও আসে না। সন্ধ্যারতি দেখিতে পিতা, ভ্রাতা বা কোন আত্মীয়ের সঙ্গে সে গঙ্গাতীরস্থ দেবালয়ে নিত্য আসিয়া থাকে। কাত্যায়নীও পিতার সহিত প্রত্যহ সন্ধ্যায় ঘাটে যায়। জমিদারের দেবালয় এবং তৎসংশ্লিষ্ট ঘাটও তাহাদের বাটীর অতি নিকটে। এই খানেই রমার সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে। জ্যোতিরত্ন ঘাটে বসিয়া বহুক্ষণ সন্ধ্যাহ্নিক, জপ করেন এবং কাত্যায়নী রমার আহ্বানে তাহার নিকটে যায়, মন্দিরসংলগ্ন কক্ষে অথবা ঠাকুরঘরে বসিয়া তাহার সহিত গল্প করে। গঙ্গাতীরে-বাস করিবার অভিপ্রায়ে জ্যোতিরত্ন অল্পদিন মাত্র এই গ্রামের অধিবাসী হইয়াছেন; কাজেই কাত্যায়নীর বাল্যসঙ্গিনী সে গ্রামে কেহই ছিল না। যাহাদের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, তাহারাও কাত্যায়নীর বয়সের অনুপযোগী গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বভাবে তাহার নিকটে ঘেঁসিত না; এবং কাত্যায়নীরও সেদিকে কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। একমাত্র পিতার সাহচর্য্যেই তাহার জীবন সপ্তদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া

চলিয়াছে। খেলাধূলার সময়ও সে পিতার গ্রন্থরাশির পাশে বসিয়া সেইগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়াই খেলা করিয়াছে। আর এখন ধীরে-ধীরে পিতার সাহায্যে তাহাদের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত হইয়া তাহাদেরই জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট বাঞ্ছিত সঙ্গী বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। গ্রামের তরুণী সধবা অথবা বালিকা কুমারীর দল কেহই কাত্যায়নীর সেই সপ্তদশ বর্ষীয় কুমারীত্বের বর্ম্মের নিকটে ঘেঁসিতে সাহসও পাইত না। তাহাকে দেখিলেই তাহারা বিস্ময়স্তব্ধ ভাবে চাহিয়া থাকিত, সে যেন তাহাদের নিকটে অন্যলোকের প্রাণী! কেবল বালিকা বা তরুণী সধবাদের দৃষ্টিতেই যে কাত্যায়নী অদৃষ্ট-পূর্ব্বা ছিল তাহা নয়, গ্রামের রমণীমাত্রেরই নিকটে তাহার স্থান একটু অনন্যসাধারণ হিসাবে গণ্য হইত। কেহ বা ভাবিত, দুষ্ট গ্রহ-নক্ষত্রের কোপদৃষ্টিতে এই অপূর্ব্বদর্শনা কন্যার অখণ্ড-বৈধব্য-যোগ বুঝিতে পারিয়াই পণ্ডিত পিতা ইহাকে পুরাণ-বর্ণিতা ঋষিকন্যাদের মত কুমারী সন্ন্যাসিনী করিবার জন্য নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। কেহ বা ভাবিত, কন্যাটির দেব-অংশে জন্ম, মানুষের সঙ্গে বিবাহ সহিবে না বলিয়াই, তাহার অভিজ্ঞ পিতা সে চেষ্টায় বিরত আছেন। নহিলে অমন ভগবতীর মত মেয়ের আবার পাত্র জুটে না।" জ্যোতিরত্ন মহাশয় সে গ্রামের নব অধিবাসী হইলেও, তাঁহার পরিবারবর্গের স্বভাব-গুণে তাঁহারা যে সকলের অনেকখানি শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা এমন কি জমীদার শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথের কর্ণে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। তাই কাত্যায়নীর কৌমার্য্য তাহাদের বিস্ময়ের বিষয় হইলেও, সেই কুমারীর পানে কেহ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিতে সাহস পাইত না।

কিন্তু গ্রামের এ বিস্ময়-শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টির প্রতি কাত্যায়নীর কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। আজন্ম বিদ্বান্ পিতার সাহচর্য্য-বর্দ্ধিতা বালিকার জীবনে এ পর্য্যন্ত অন্য কোন অভাবই অনুভূত হয় নাই। সম্প্রতি তাহাদের সংসারে একটা কি যেন অশান্তি উপস্থিত হওয়ায় মাঝে-মাঝে সে এক-একবার চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল মাত্র। তাহাদের শান্তিস্নিগ্ধ পরিজনের মধ্যে এ মনোবাদ, এ শান্তিভঙ্গের সূচনা কেন? পিতার, মাতার এবং ভ্রাতৃস্থলাভিষিক্ত আত্মীয়ের মধ্যে এমন মনোমালিন্যের সূত্রপাত কেন হইতেছে? আর পিতাও তাহার জন্য কেন এমন দিন-দিন ভাবিয়া সারা হইতেছেন? এই সব ভাবনার আঘাতে কাত্যায়নী মাঝে-মাঝে বিচলিতা হইয়া উঠিতেছিল, একটু অন্যমনা হইবার জন্য যেন কাহাকেও সঙ্গী খুঁজিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে রমার সহিত তাহার আলাপ। তাহার মধ্যে কাত্যায়নী এমন একটু কিছু পাইয়াছিল, যাহাতে তাহার সঙ্গীবিমুখ স্বভাব নিঃশব্দে সেখানে দিনে-দিনে নিজের আবরণ ত্যাগ করিতেছিল। সেই বিধবা কিশোরী এই তদপেক্ষা ঈষৎ বয়োজ্যেষ্ঠা কুমারীর অসাধারণ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী হইয়া উঠিয়াছিল কেন, কে জানে?

জ্যোতিরত্ন মহাশয় গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিয়া গেলে কাত্যায়নী রমার সঙ্গে সে দিন দেখা না হওয়ার কথা ক্ষণেক ভাবিয়া, শেষে বহির্দ্বারের নিকট গিয়া, মুক্ত দ্বারপথে অদূরে প্রবাহিনীর উদ্দেশে যোড়হস্তে প্রণাম করিল। হেমন্তের নদী তখন সঙ্কুচিত-শরীরা, ঘাটের নিকটে না গেলে তাহার শীর্ণদেহে দৃষ্টি পড়ে না। প্রণাম করিয়া ফিরিতেই গম্ভীর ঘণ্টানাদে সহসা শিহরিয়া কাত্যায়নী দক্ষিণ দিকে চাহিল। গোবিন্দদেব এবং শিব-মন্দিরের যুগ্ম-চূড়া নৈশ গগনে যেন কাহার নীরব অঙ্গুলি-সঙ্কেতের ন্যায় উত্থিত হইয়া কাহাকে কি যেন সঙ্কেত করিতেছে। স্তব্ধ, ভয়-কণ্টকিত ভাবে কাত্যায়নী বিমূঢ় দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

বাদ্য থামিয়া গেল। কাত্যায়নী বুঝিল, বিগ্রহের শয়ন-আরতি হইতেছে। দেবতার উদ্দেশে ক্ষণেক মস্তক নত করিয়া কাত্যায়নী আবার আকাশপানে চাহিল। সেই নীল অভ্রংলিহ যুগল অঙ্গুলীর উপর একটা দীপ্ত তারকা-পুঞ্জ, আশে-পাশে আরও কত উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল রহস্যপূর্ণ জ্যোতিসমষ্টি! কাত্যায়নী আবার মস্তক নত করিল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

হাসির বিজ্ঞান

[শ্রীচুণীলাল মিত্র]

গত বৎসর শ্রাবণ মাসে 'হাসির মাদকতা' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা বিলাতী কোন পত্রিকাস্থিত প্রবন্ধের ছায়াবলম্বনে লিখিত। ঐ প্রবন্ধে নানাপ্রকার হাসির মুখ-ভঙ্গীর প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিষয় পরিহার পূর্ব্বক স্বতন্ত্র বিষয়ের অবতারণা করা হইল।

দার্শনিকগণ বলেন, "Man is an animal which laughs"। এক-কথায় বোধ হয়, প্রত্যেক মানুষই হাসিয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ (Zoologists) ঘোড়ার, বানরের এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণীর হাসির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কত নূতন-নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতেছেন। আমাদের দেশে একটা চলিত প্রবাদ আছে যে, স্থূলকায় ব্যক্তি কখনও কৃশের ন্যায় কূটবুদ্ধিসম্পন্ন হয় না এবং কৃশকায় গম্ভীর প্রকৃতির লোক কখনও স্থূলকায় হাস্যকৌতুকপ্রিয় মানবের ন্যায় সরল প্রকৃতির হয় না। এ কথার প্রমাণ আমাদের নিজের হাতেই আছে। একটু আলোচনা করিলেই, অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক তথ্য জ্ঞাত হইতে পারা যায়। এই জন্যই কবিবর সেক্ষপীয়র বলিয়াছেন—

> "Would he were fatter :
> But I fear him not
> * * * *
> * * * *
> Seldom he smiles, and,
> Smiles in such a sort,
> As if he mocked himself
> And scorned his spirit
> That could be moved
> to smile at anything.
>
> (Julias Cæsar, Act I, Sc. II.)

দার্শনিকগণ জগৎকে শিখাইয়াছেন যে, "হাস, হাস ; বেদম হাস ; যদি দীর্ঘ জীবন কামনা কর, তাহা হইলে সমস্ত কাজকর্ম্মের মধ্যে একটু হাসির অবসর লও।' দার্শনিক Kant তাঁহার Critique of Judgmentএ হাসির লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "an affection arising from the sudden transformation of a strained expectation into nothing" ; অর্থাৎ, 'কোন রুদ্ধ আশার হঠাৎ শূন্যে পরিণতি হইতে উদ্ভূত মনোভাব।' এইরূপ ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি শেষে বলিয়াছেন যে, হাসির কারণ সুখ নহে ; তবে সুখ হইতে হাসির সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন যে, আমাদের ফুস্‌ফুস্ তাড়াতাড়ি এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তন্মধ্যস্থ বাতাস নির্গত করিয়া আমাদের শরীরকে সুস্থ করে। এই প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আমাদের হৃদয়ে আনন্দ আনয়ন করে। (১)

চাপা হাসি হউক, উচ্চ হাসি হউক,—তাহা একই কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। মানবমাত্রেই এই স্বাভাবিক দৈহিক প্রক্রিয়ার অধীন। কে না জানে যে, হাসির স্বাভাবিক বিকাশের পর একটা শান্তি আসে ? সকল দেশেই কবিগণ 'হাসি' লইয়া কত সুন্দর-সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত কবি Goldsmith (গোল্ডস্মিথ) লিখিয়াছেন, "The loud laugh that spoke the vacant mind"। তাঁহার মতে উচ্চহাস্য হৃদয়ের সরলতা প্রকাশ করে। দার্শনিক বার্গসন বলেন, "হাসি মানবজীবনের একটা অত্যাবশ্যক উপাদান—ইহার একটা সামাজিক আবশ্যকতা আছে"। (২)

ভগবান যদি আমাদিগকে হাসিবার শক্তি না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই না হইত ! আমাদের এই অভাব, অশান্তি, দারিদ্র্যময় জীবনে যদি মাঝে-মাঝে হাসির সুখটুকু না পাই, তাহা হইলে কোনও মতেই আমরা বাঁচিতে পারি না। আমরা জীবনের প্রভাত হইতেই হাস্য-পরিহাসের জন্য উৎসুক হইয়া পড়ি। যখন আমাদের জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হয়, তখন পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন আমাদের সেই অর্দ্ধোচ্চারিত কথাগুলি শুনিয়া হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ক্রমে আমরা যত বড় হইতে থাকি, ততই কত হাসির গল্প বলিয়া, কত হাসির ছড়া শুনিয়া, আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করি। আমরা যতই জীবনের কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে থাকি, নানা কারণে ততই কঠোর হইতে থাকি ; ততই হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি হইতে হাস্যের রস পরিশুষ্ক হইতে থাকে। এক সময়ে যাহাকে আনন্দময় ও হাস্যময় বলিয়া জানিতাম, তাহাকে এখন শুষ্ক, কঠোর ও নিরানন্দময় দেখি।

---

(১) "The lungs expel the air at rapidly succeeding intervals, and thus bring about a movement b.nificial to health, which alone, and not what preceeds it in the mind, is the proper cause of gratification in thought that represents nothing."

(২) "Laughter must answer to certain requirements of life in common. It must have a social signification."

এই জন্যই কি কবি, কি দার্শনিক—সকলেই বলেন যে, যদি প্রকৃত পক্ষে বাঁচিতে চাও, তবে হাস্।

রাজারাজড়ার পক্ষে হাসিটা আরও দরকার। জনসাধারণের অপেক্ষা তাঁহাদের জীবন অধিকতর চিন্তা ও দায়িত্বে পরিপূর্ণ। এই-জন্য সেকালের রাজসভায় বিদূষক ও ভাঁড়ের প্রতিপত্তি। কেবল ভারতবর্ষে কেন সর্ব্বদেশেই এই প্রথার প্রাদুর্ভাব ছিল, এবং এখনও অনেক জায়গায় আছে। ইহাদের কার্য্য—রাজা ও রাজপারিষদগণকে রাজকার্য্যের কঠোর তাড়নার মধ্য হইতে মাঝে-মাঝে নিষ্কৃতি দেওয়া। বিষম চিন্তার অবসাদ দূর করিয়া মনকে সতেজ ও কার্য্যক্ষম করিতে হাসিই অদ্বিতীয় ও একমাত্র ঔষধ। বিদূষকগণ এই গুণপনার জন্য রাজসভায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন। আমাদের বাঙ্গালীর গোপাল ভাঁড় বোধ হয় অমর হইয়া থাকিবেন—বাঙ্গালী তাঁহার নাম সহজে ভুলিবে না। বর্ত্তমান সময়ে চিত্তরঞ্জনের ও Mr. Funnimanএর নাম বঙ্গ ও বঙ্গ সমাজে বিশেষ পরিচিত। তাঁহারা অনেকের চির-অন্ধকারময় জীবনে ক্ষণিক আনন্দের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হাস্যকে একটা রস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ আটটী রস আছে যথা :—

"শৃঙ্গার বীর করুণাদ্ভুত হাস্য ভয়ানকাঃ।
বীভৎস্য রৌদ্রাঃ ইত্যেতে রসাষ্টা প্রকীর্ত্তিতা॥"

শৃঙ্গার রস, বীর রস, করুণ রস অদ্ভুত রস, হাস্য রস, ভয়ানক রস, বীভৎস রস, রৌদ্র রস এই আটটী। তন্মধ্যে হাস্য রসের লক্ষণ —

"কপোলাবি তোল্লাসো ভিন্নোষ্টঃ স মহাত্মনাম্।
বিদীর্ণাস্যশ্চ মধ্যামানামনামাং সশব্দকঃ"

কপোল ও চক্ষুর উল্লাস করিয়া ওষ্ঠ প্রসারিত করিয়া যে হাস্য হয়, সেই হাস্য মহাত্মাদিগের। মধ্যম ব্যক্তিদিগের মুখ ফাঁক করিয়া যে হাস্য তাহাই মধ্যম। আর সশব্দ যে হাস্য, তাহা অধমলোকের হাস্য, তাহা অধম।

হাসির উদ্দেশ্য ও তাহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় (psychological) ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অন্তর্বাহী শিরা (Sensory nerves) যেমন কোন আনুভূতিক কার্য্যের দ্বারা প্রকটিত হয়, সেইরূপ কোনও বহির্বৃত্তি আমাদের অন্তরে আঘাত করিয়া উহাকে হাস্যে পরিণত করে। কিন্তু হাসি যদি বহির্জগতের কোনও অবলম্বন হইতে উৎপন্ন হয়, তবে সদ্যোজাত শিশু কিম্বা বাতুল কি ভাবিয়া হাসিয়া আকুল হয়? সেখানে হাসির উৎপত্তির কারণ কাল্পনিক চিন্তা। তাহাদের ব্যাপার সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত।

হাসি আনন্দদায়ক ও অবজ্ঞাসূচক। আপনার কোনও কার্য্য সফল হইয়াছে; আপনাকে আমার হৃদয়ের প্রীতি জ্ঞাপন করিবার জন্য আমি হাসি। আপনার বিপদ; আমি আপনার শত্রু; আপনার পরিণাম দেখিয়া আমি আহ্লাদিত, তাই আমি হাসি। কিন্তু প্রথমোক্ত হাসির সঙ্গে এই শেষোক্ত হাসির অনেক প্রভেদ। আপনার সুখে হাসি, আমার দুঃখেও হাসি। উভয় অবস্থায় আমার মনের তৃপ্তিলাভ হইতেছে। তাই বলিয়া কি দুই প্রকারের হাসিই এক অবস্থা হইতে উৎপন্ন? তা' নয়,—একটী আনন্দসূচক, অপরটী অবজ্ঞাসূচক। নানা কারণে হাসির উৎপত্তি হইতে পারে। হর্ষ, শোক, ক্রোধ, ভয়, অবজ্ঞা প্রভৃতি গুণগুলি হাসির প্রধান কারণ। আবার দুঃখ হইতে যেরূপ ক্রন্দন, সেইরূপ আনন্দ হইতে হাসির সৃষ্টি হয়। শীত-গ্রীষ্ম, আলোক-অন্ধকার, হাসি-কান্না,—এক-একটী বিরুদ্ধভাবাপন্ন অবস্থা। একটীর উদরে অপরটীর ভাব জাগিয়া উঠে।

কবিবর হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন,—

ভ্রমে রতিপতি সাজাইয়া বাণ ;
কুসুম-ধনুতে সুঈষৎ টান—
মুচকি মুচকি মুচকি হাসি—বৃত্রসংহার—২য় সর্গ
যখনি ভ্রুকুটী করি চাহিবে দানব,
অথবা অঙ্গুলি তুলি ব্যঙ্গ-উপহাসে
দেখাইবে—এই দেব স্বর্গ অধিপতি,—
শত নরকের জ্বালা অন্তরে জ্বলিবে। বৃত্রসংহার—১ম সর্গ
বলিয়া নেহালে পতির চরণ
আধ ছল ছল ছল দু'নয়ন
অভিমানে হাসি জড়ায়ে রয়। — ঐ

হেমচন্দ্র এক-একটী স্থানে এক-এক রকম ভাবে হাসির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে প্রত্যেক কবি নানাভাবে হাসির বর্ণনা করিয়া থাকেন।

হাসিকে কবিগণ শুভ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; অন্তরের নির্ম্মলতার বিকাশ। নির্ম্মল দ্রব্য কখনও কলুষিত ভাবে প্রকাশমান হয় না। তাই কবিরা উহাকে কাশপুষ্প-সদৃশ কিংবা তুষার-শুভ্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্বভাবের সৌন্দর্য্যকে প্রকৃতির হাসি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

"But through the valleys of the hay
The brown brook laughed and went its way.

অমর কবি জয়দেব গীতগোবিন্দম্ কাব্যে প্রকৃতির হাসি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন

"বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকন তরুণকরুণকৃতহাসে
বিরহিনি কৃন্তন কুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাসে। ৫।
গীতম ৩।

অয়ি! বসন্তের প্রভাবে সকলেরই লজ্জা একবারে বিগলিত হইয়াছে; তরুণ-করুণ-পাদপগুলি তাহা দেখিয়াই যেন আজ পুষ্পচ্ছলে হাস্য করিতেছে। দেখ কত কেতকী ফুল বিরহীহৃদয়ভেদী বর্ষার ফলার ন্যায় চারিদিকে ফুটিয়া রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন দিক-সকল দন্তবিকাশ করিতেছে।

কবি সার রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন

"হাসি হয়ে ভাসিব অধরে;
সুখস্বপ্ন হয়ে পশিব নয়ন পল্লবে।"

বাস্তবিক, সময়ে-সময়ে অধরের এই হাসিটুকুর জন্ত আমরা কত লালায়িত। আমরা হাসির কাঙ্গালী। একটু হাসির কণা পাইলেই আমরা মহা সন্তুষ্ট; মনে হয় আমাদের জীবন যেন সফল ও সার্থক হইল। আমরা এই হাসির প্রভাবে অসাধ্য-সাধন করিতে সমর্থ। পৃথিবীতে যত মহামহা সমর ঘটিয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, হাসিই তাহার মূল। প্রাচীন ট্রোজান্ যুদ্ধ হেলেনের হাসি-কান্নার উপর নির্ভর করিয়াছিল। ভারতের কুরুক্ষেত্রের মূল সেই কুরুরাজসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা এবং কৌরবগণের হাস্য। এই হাসির ফলে একদিন ভারতের অস্তিত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছিল।

এই ত গেল সাধারণ হাসির কথা। কিন্তু হাসির একটা ভিতর-মূর্ত্তি আছে। এই হাসির স্বরূপ অবধারণ করিলে, আমাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠে। একদিন মহাকাল পৃথিবী গ্রাস করিবার নিমিত্ত তাণ্ডব নৃত্য করিতে-করিতে অট্টহাস্য করিয়াছিলেন। সে হাসির বিকাশে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল; সে হাসির রোল বিশ্ব ব্যাপিয়া উঠিয়া জীবমাত্রকেই মোহাবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

হাসি অনেক সময়ে সংক্রামক বলিয়া বোধ হয়। আপনি হাসিতেছেন,—আমি যদি সেখানে থাকি, তাহা হইলে আমিও আপনার দেখাদেখি হাসিয়া উঠি। আবার আমার হাসি দেখিয়া আমার সন্নিহিত ব্যক্তি হাসেন। এইরূপে হয় ত একস্থানে সমবেত সকলেই হাস্য-সুখ অনুভব করেন। তবে প্রভেদ এই—কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে আপনার অন্তরের হাসি ফুটাইয়া তোলেন।

আচ্ছা হাসি এরূপ সংক্রামক কেন? ইহার অর্থ—আমাদের সকলের অন্তর এক সুরে বাঁধা। আপনার মনে যে ভাব উঠিয়াছে, তাহাতে আপনি হাসিতেছেন; সেই ভাবটী সেই সময়ে সেই অবস্থায় আমার মনে উত্থিত হওয়াতে আমিও হাসি। ইহার প্রমাণ আমাদের জীবনে প্রতিদিন দেখিতে পাই। অধিক কি, গ্রামোফোঁর রেকর্ডের হাসি শুনিলে আমরাও হাসিয়া ফেলি। অনেক সময়ে মনে করি বটে হাসিব না, কিন্তু নিবারণের চেষ্টা সত্ত্বেও সে হাসি পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যাত্রা-থিয়েটারে যত বেশী দর্শকের জনতা হয়, হাসির মাত্রা তত অসংযত হইয়া থাকে। আরও দেখা যায় যে, মিলনান্ত নাটকের এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহার হাস্যরসটুকু প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রধান কারণ—এক সম্প্রদায়ের আচার ও রীতি অন্য সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের।

বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক Henry Bergson তাঁহার প্রণীত Laughter নামক পুস্তিকার তিনটী অধ্যায়ে ইহার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

Chap. (i) The Comic in general;

The comic element in forms and movements Expansive force of comic.

Chap. (ii) The comic element in situations and the comic element in words.

Chap. (iii) The comic in character.

সাধারণ পাঠক হাস্যোদ্দীপক সাহিত্য ভালবাসেন। ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতি লেখকের হাস্য-কৌতুক পরিপূর্ণ পুস্তক পড়িলে, আমাদের প্রাণে একটা আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয়।

প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে একটা স্বতন্ত্র হাস্যরসপূর্ণ ভাব আছে। সেটা তাহার মানসিক বৃত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই জন্য কাহাকেও জোর করিয়া হাসান কঠিন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যে বিষয়টি আমার নিকট হাস্যজনক, সেটি অন্যের নিকট হাস্যজনক না হইতে পারে। কাজেই কাহাকেও অরসিক বলিয়া পরিহাস করা অনেক সময় ভ্রমসঙ্কুল হইয়া থাকে। অপরকে আমাদের নিজেদের মাপকাটী দিয়া মাপা উচিৎ নয়। আমাদের হৃদয়স্থিত বিবেকের সাহায্যে আমাদের অনেক ভুল ধারণা আমরা সংশোধন করিয়া লইতে পারি। হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিলে আমরা আমাদের প্রতিবেশিগণকে ভাল-বাসিয়া আমাদের জীবনটাকে আনন্দপূর্ণ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

আমরা প্রকৃতির ছবি দেখিয়া কখন হাসি না। কলনাদিনী স্রোত-স্বিনীর গর্ভে বন্যার জলরাশির উচ্ছলিত সৌন্দর্য্য, সমুদ্রের দিগন্তব্যাপী গুরুগম্ভীর মূর্ত্তি, হিমাচলের বিশাল ও সমুন্নত বপু, নীলাকাশের অনন্ত সৌম্য মূর্ত্তি, অন্ধকারময় নৈশ গগনের উগ্রভাব,—এই সকল দেখিয়া কেহ কখন হাসে না। তবে তাহাদের মধ্যে যদি কোন মানব-প্রকৃতির ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিয়া আমরা হাসি। মানুষের আকৃতির কোন বৈষম্য দেখিলে, কিম্বা তাহার কার্য্যের কোনও দোষ পাইলে, আমরা হাসিয়া থাকি; অথবা কোন অসাধারণ অবস্থাবিশেষ দেখিলেও আমরা হাসি। যথা (১) খোঁড়া, বামন, পাগল ইত্যাদি ও (২) গুলিখোর, মাতাল, শুচিবায়ুগ্রস্ত ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় হাস্যোদ্দীপক সাহিত্য বড় বেশী নাই। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে টেকচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল, দীনবন্ধুর জামাই বারিক, বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তর, অমৃতলাল বসুর বিবাহ বিভ্রাট ইত্যাদি এবং সর্ব্বোপরি ডি, এল, রায়ের হাস্যোদ্দীপক কবিতাগুলি পাঠ করিলে আমাদের হৃদয়ে হাস্য-ধারা প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে একটা অপূর্ব্ব আনন্দে পরিপ্লুত করিয়া দেয়।

হাসি রজোগুণাত্মক; অর্থাৎ রজোগুণ হইতে ইহার বিকাশ নির্ণয় করা হয়। রজোগুণের লক্ষণ—

> রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবম্।
> তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্ম-সঙ্গেন দেহিনাম্॥ গীতা ৭, ১৪

হে কুন্তিনন্দন! রজোগুণকে অনুরাগ রূপে জানিবে; উহা হইতে অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং উহা দেহী জীবকে স্বর্গাদি ফল-জনক কর্ম্মে আবদ্ধ করে।

এই রজোগুণ হইতে আমাদের একটা আসক্তি জন্মায়; এবং সেই আসক্তির ফলে আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এখানে সেই কার্য্যই আমাদিগকে হাস্য-পরিহাসে লিপ্ত করে। এই হাসি আমাদের শরীরের সমস্ত জড়-ভাব নষ্ট করিয়া একটা স্ফূর্ত্তি আনয়ন করে এবং তাহা হইতে আমরা পুনরায় কর্ম্মঠ হই। হাসি আমাদের সর্ব্বশরীরকে পরিচালিত করিয়া একটা নূতন উদ্যমের প্রতিষ্ঠা করে। সেই প্রতিষ্ঠা-বলে আমরা সজীব ও সজাগ হইয়া উঠি। যোগিগণের সংসারে বা বিষয়ে আসক্তি নাই; সেই জন্য তাঁহারা কখন হাসেন না। আসক্তির পরিতৃপ্তিতেই হাসি। তাঁহারা সত্ত্বভাবাপন্ন পুরুষ। তাঁহাদের হৃদয়ে রজোভাব ও তমোভাব পরিলক্ষিত হয় না।

হাসির সঙ্গে সত্ত্বগুণের সম্বন্ধ আছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।

সুখ সঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন বানঘ॥ গীতা ৬; ১৪শ

হে নিষ্পাপ! উক্ত গুণ ক্ষেত্রের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব প্রযুক্ত স্ফটিক মণির প্রকাশক ও শান্তভাবাপন্ন। এই হেতু সেই সত্ত্বগুণ তাহার স্বকার্য্য সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গে জীবকে আবদ্ধ করে; অর্থাৎ সত্ত্বগুণ হইতে দেহাভিমানী জীব "আমি সুখী, আমি জ্ঞানী" এইরূপ মনোধর্ম্মে সংযুক্ত হয়।

আমরা সত্ত্বগুণ-প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের দ্বারা অন্তরের ভাব উপলব্ধি করি। এই জ্ঞান কোন বহিরিন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়ার দ্বারা পরিদৃষ্ট হয় না। কারণ, দেখা যায় যে, হৃদয়ে হাস্যরস উপস্থিত ও উপলব্ধ হইলে, কার্য্য দ্বারা তাহার কারণের অনুমান করা যায়, কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না। যে সকল বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে বিকৃতাকার দর্শন ও কুহকাদির পরিশীলন, মুখ-বিকাশ, চক্ষুরুল্লাস ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির স্পন্দন দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একপ্রকার বিকাশ ভাব আবির্ভূত হয়, তাহাকে হাস্য কহে। যখন এই প্রকার হাস্যের উদ্গাম হয়, তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, হয় কোন একটা স্বাভাবিক অবস্থার কল্পিত বিকার দেখিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, অথবা কোনও প্রকার বাক্‌চাতুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছি। তদ্দ্বারা প্রকৃতিগত স্থিরতাকে উচ্ছলিত করিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বাহী এক প্রকার উল্লাস ভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই জন্য, হাসি যে মানসিক ক্রিয়ার বিকাশমাত্র ও সত্ত্বগুণের কার্য্যানুকার্য্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তমোগুণের কার্য্য অন্যরূপ। তমোগুণের লক্ষণ—"তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধিমোহনং সর্ব্বদেহিনম্। প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্ত নিবধ্নাতি ভারত॥ —হে ভারত! তমোগুণকে আবরণ শক্তিবিশিষ্ট প্রকৃতির অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে। সুতরাং উহা জীবমাত্রেরই ভ্রান্তিজনক হইয়া থাকে। অতএব উহা অনবধান, অনম্য, এবং নিদ্রাতে জীবকে আবদ্ধ করে।

হাস্যরসের উদ্দীপনাকারী সত্ত্বগুণের প্রাধান্য-ভাবকে নষ্ট করিয়া যখন তমোগুণের উদ্ভব হয়, তখন তাহার কার্য্যকালে আমরা হাস্যশূন্য হইয়া পড়ি। আমরা যদি হৃদয়ে একটা দারুণ ও দুর্ব্বহ শোক অনুভব করি, সে সময়ে কোনও হাসির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা কি করি? তখন হাসির জ্যোতিঃপূর্ণ ভাব পরিহার করিয়া তমোগুণে আচ্ছাদিত হইয়া ম্রিয়মান হইয়া পড়ি। এখানে তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনার প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ হাস্যরসকে বীভৎস রস দ্বারা নষ্ট করা হয়। এই অবস্থাকে বিরোধী ভাব বলে। শৃঙ্গার ও হাস্যরসকে অবশিষ্ট ছয়টী রসের দ্বারা পরাভূত করা যায়।

Professer Bergson বলেন—

"Laughter is, above all, a corrective. Being intended to humiliate, it must make a painful impression on the person against whom it is directed. By laughter society avenges itself for the liberties taken with it. It would fail in its object if it bore the stamp of sympathy or kindness."

হাসির বিশিষ্ট একটী গুণ—ইহা সংশোধক। যাহার প্রতি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে অপ্রস্তুত বা অবমানিত করিবার জন্যই ইহা ব্যবহৃত হয়। হাসির দ্বারা সমাজ তাহার অবমাননাকারীকে শাস্তি দেয়। হাসি যেখানে এই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, সেখানে যদি ইহাতে সহানুভূতি বা দয়ার উন্মেষ থাকে, তাহা হইলে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

তিনি আরও বলেন * * * "It is a froth with saline base. Like froth it sparkles. It is gaiety itself. But the philosopher who gathers a handful to taste, may find that the substance is scanty and the after-taste bitter."

অর্থাৎ—ইহা লবণাক্ত ফেনপুঞ্জের ন্যায় উজ্জ্বল। ইহা মূর্ত্ত আনন্দ। দার্শনিকগণ ইহার বিশ্লেষণ করিলে বুঝিবেন, ইহাতে সার পদার্থ অতি অল্প এবং ইহার আস্বাদন কটু।

সেকালের আজগুবি শাস্তি

[শ্রীনরেশচন্দ্র রায় বি-এসসি]

অনেকেই বোধ হয় ভবচন্দ্র রাজা ও তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রীর কথা শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহারা পুকুর-চুরির-প্রয়াসী পথিকদ্বয়ের চৌর্য্যাপরাধের জন্য যে শাস্তির আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাও বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

এই ভবচন্দ্র রাজা ও তাঁহার গবচন্দ্র মন্ত্রীর আখ্যায়িকার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, আমি সে বিষয়ে কোন আলোচনা করিব না। তবে তাঁহারা যে শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অধুনা নিতান্ত আজগুবি বলিয়া বোধ হইলেও, এবম্বিধ শাস্তি সেকালে আজগুবি বলিয়া খ্যাত ছিল না। কারণ সেকালের প্রাচীন পুঁথি খুলিলে, এবং সেকালের গল্প পড়িলেই, জানিতে পারা যায় যে, কেহ কোন গুরু অপরাধ করিলেই, তাহাকে শূলারোহণে অথবা অন্য প্রকারে প্রাণ-

ত্যাগ করিতে হইত। অপরাধের মাত্রা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইলে, হয় ত কোন-কোন স্থলে অপরাধীর হস্তচ্ছেদন, পদচ্ছেদন ইত্যাদি শাস্তি বিহিত হইত।

পরীক্ষা অথবা প্রমাণ স্থলেও অনেক সময় অপরাধীর প্রতি অনেক প্রকার আজগুবি শাস্তির বিধান হইত। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য এই সমস্ত ordeal-এর ভিতর দিয়া আসিতে হইত। তখনকার লোকের এই বিশ্বাস ছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি বাস্তবিকই নিরপরাধ হয়, তবে সে নিশ্চয়ই অবাধে ordeal উত্তীর্ণ হইবে; স্বয়ং দেবগণই তাহাকে এই পরীক্ষায় সাহায্য করিবেন। এই প্রকার পরীক্ষা ও বিশ্বাসের মূলে কোন সত্য নিহিত ছিল কি না, সে বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইবেন; এবং কেহ-কেহ হয় ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু সীতাদেবীর 'অগ্নি-পরীক্ষার' কথা বলিলে, নিষ্ঠাবান হিন্দু ইহাকে আজগুবি বা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন না।

এ ত' গেল দেবতাদের কথা। তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, সেকালে অনেক সময় অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া রাজদ্বারে তাহাদের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি পরীক্ষা দিতে হইত। যথা:—

(১) উত্তপ্ত তৈল-কটাহে হস্ত প্রদান

(২) স্ফুটনোন্মুখ গলিত ধাতু মধ্যে হস্ত প্রবেশ

(৩) উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের উপর দিয়া গমন; ইত্যাদি।

এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেক হতভাগাকেই যে আর তাহাদের নির্দ্দোষিতার পরিচয় দিতে হইত না, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তথাপি প্রাচীন পুঁথি অন্বেষণ করিলে এরূপও দেখা যায় যে, কেহ-কেহ ঈদৃশী পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনেক (Monastery) মঠের পুরাতন কাগজ-পত্রে না কি এরূপ ব্যক্তিদের নাম-ধাম, ঘটনার তারিখ ইত্যাদিও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এগুলিকে একেবারে মিথ্যা বা কল্পনা বলা যাইতে পারে না। তবে এই অলীক ও অসম্ভব ঘটনার সম্ভবপরতার কারণ কি?—এই প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে, আমি একটী বৈজ্ঞানিক (Experiment) পরীক্ষার বর্ণনা করিয়া, বিষয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমরা সকলেই জানি যে, ১০০ ডিগ্রী উত্তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়। একখণ্ড উত্তপ্ত লৌহে জলের ছিটা দিলে, ঐ জল তৎক্ষণাৎ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একখানি লোহার চাকতি (disc) তেপায়ার (tripot) উপরে রাখিয়া ১০০ ডিগ্রী অপেক্ষা অনেক বেশী (২০০ বা ৩০০ ডিগ্রী) উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপরে একটু জল ফেলিলে জলটা তৎক্ষণাৎ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় না; বরং একটী * গোলকের আকার ধারণ করিয়া, পারদের ন্যায় চঞ্চল অবস্থায় চাকতির উপর ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে। এই গোলকাবস্থায় জলটুকু অনেকক্ষণ থাকে। অবশ্য, উহা আকারে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে-হইতে অবশেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। জলের এই গোলকাবস্থাতেই যদি লোহার চাকতির নিম্ন হইতে অগ্নিশিখা সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কিছুক্ষণ পরে জলটুকু হঠাৎ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। এখন এই বিষয়টীর কারণ বুঝিতে পারিলেই, আমরা প্রাগুক্ত শাস্তি-নিষ্কৃতির একটী বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিব। তবেই বুঝিতে পারিব যে, যে শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি-লাভ আমরা কোন দেবতার বা অশরীরী কোন মায়াবীর মধ্যস্থতায় অথবা কৃপায় সংঘটিত বলিয়া মনে করি, তাহা কেবল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মবশেই হইয়া থাকে।

এখন লোহার চাকতির এক পার্শ্বে একটী বাতি রাখিয়া যদি জলের গোলকটাকে দেখা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, জল-গোলক লোহার চাকতিটাকে ঠিক স্পর্শ করে না—তাহা হইতে একটু উঁচুতে অবস্থান করে। ইহার কারণ এই যে, জলটুকু উত্তপ্ত লোহার চাকতির সংস্পর্শে আসিবামাত্রই উহার কিয়দংশ বাষ্প হইয়া তদুপরিস্থ জলটাকে ঠেলিয়া তোলে; এবং বাষ্পমাত্রেই অল্প তাপ-পরিচালক বলিয়া, জলের তাপ ১০০ ডিগ্রীতে উঠিতে পারে না; কারণ চাকতি হইতে তাপ বাষ্পের ভিতর দিয়া ভাল রকম পরিচালিত হইতে পারে না। কাজে-কাজেই উপরকার জলটা আর শীঘ্র বাষ্পে পরিণত হইতে পারে না। জলটা যেন ঠিক বাষ্পের কোমল শয্যার উপর অবস্থান করিতে থাকে; কিন্তু এই অবস্থায় জলটা স্থির থাকিতে পারে না (a state of unstable equilibrium)—গড়াইয়া যায়; এবং পূর্ব্বের বাষ্পটুকু উড়িয়া গিয়া জল-গোলকের জন্য আবার এক নূতন বাষ্প-শয্যার উদ্ভব হয়। এই প্রকারে জল-গোলকের আকার ক্রমশঃ কমিয়া-কমিয়া অবশেষে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা চাকতির নীচে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জলটা গোলকাবস্থাতেই থাকে; কিন্তু অগ্নি-শিখা সরাইয়া লইবার কিয়ৎকাল পরেই, সমস্ত জল 'ছাঁৎ' শব্দ করিয়া বাষ্পীভূত হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে যতক্ষণ অগ্নিশিখা থাকে, ততক্ষণ জলটা বাষ্প শয্যায় অবস্থান করে; কিন্তু অগ্নিশিখা সরাইয়া লইলেই, ঐ বাষ্প শীতল হইয়া ঘনীভূত হয়; ঘনীভূত হইয়া জলের আকার ধারণ করিবামাত্র, সমস্ত জলটা এককালে চাকতির উপর পতিত হইয়া চাকতির সংস্পর্শে বাষ্প হইয়া যায়। চাকতিটি খুব উত্তপ্ত থাকিতে, সমুদয় জলটা উহার সংস্পর্শে আসিবার অবকাশ পায় না;

---

* Spheroida—অর্থ ঠিক গোলক নহে। গোলকাভাস বলা যাইতে পারে। 'গোলকাভাস' কথাটী বিদ্ঘুটে শুনিতে লাগে। তাই গোলক কথাটাই ব্যবহার করিয়াছি। যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তবে গোলক স্থলে 'গোলকাভাস' পড়িতে পারেন; অথবা যদি ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন সুখ-শ্রাব্য শব্দ পান, তবে আমাকে জানাইলে বাধিত হইব।—লেখক

সুতরাং সামান্য অংশমাত্র বাষ্প হয়। কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সমস্ত জলটা চাক্‌তির সংস্পর্শে আসিতে পারে; এই জন্যই বাষ্পে পরিণত হয়।

এই Experimentটী অতি সহজ এবং অধিকন্তু ব্যয়সাধ্যও নহে; সুতরাং কৌতূহল হইলে প্রত্যেকেই ঘরে বসিয়া করিয়া দেখিতে পারেন।

এই Experimentটীর সহিত 'আজগুবি শাস্তি'র তুলনা করিয়া দেখিলে, বিষয়টা বেশ পরিষ্কার হইবে। কটাহস্থিত তৈলের উত্তাপ হয় ত ২০০ ডিগ্রী কি ৩০০ ডিগ্রী হইবে। তৈলে হস্ত প্রবিষ্ট করাইবার সময় হয় ত অপরাধী হাতটা জলে বেশ করিয়া ধুইয়া লয়। সুতরাং হস্তস্থিত জলকণা অত্যন্ত উত্তপ্ত তৈল-সংস্পর্শে আসিয়া গোলকাবস্থা (Spheroidal state) প্রাপ্ত হয়। জলকণা ও তৈলের মধ্যে বাষ্পের ব্যবধান থাকায়, জলের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রীও হইতে পারে না; কাজেই কটাহস্থিত তৈলের প্রকৃত উত্তাপ হস্তকে অনুভব করিতে হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি অপরাধী তৈলে হস্ত প্রয়োগ করাইবার পূর্ব্বে জলে

গোলকাবস্থা প্রাপ্ত জলবিন্দু।
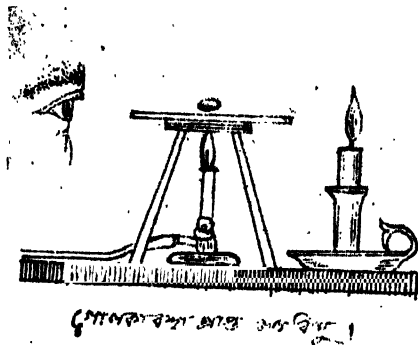
হস্ত প্রক্ষালন না করে, তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ জলকণা বর্ত্তমান থাকে, তাহার দ্বারাই তাহার হস্ত সর্ব্বদাই সিক্ত থাকে। এই জলকণাই গোলকাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অপরাধীর হস্তকে ভীষণ উত্তাপ হইতে রক্ষা করে। অথবা যদি বায়ুমণ্ডলে জলকণার নিতান্ত অভাব হয়, তবে এরূপ অবস্থায় অপরাধী হয় ত Ordealএ (পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হইতে পারে না; অর্থাৎ তাহাকে অবশ্যই মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়। গলিত ধাতুতে হস্ত প্রয়োগ কিম্বা উত্তপ্ত (red-hot) লৌহোপরি গমনও এই একই কারণে সম্ভবপর হইয়া থাকে।

অবশ্য এস্থলে এটুকুও বলিয়া রাখা দরকার যে, যদিও অপরাধী ব্যক্তি তপ্ত তৈলে হস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কখন-কখনও নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকে, তথাপি তাহাকে যে একেবারেই কোন কষ্ট পাইতে হয় না, এরূপ নহে। তবে অপেক্ষাকৃত কম। হয় ত যে স্থলে প্রাণ-সংশয়, সে স্থলে হাতটা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইল—এইমাত্র প্রভেদ।

এখন হয় ত কেহ-কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "এ সব ত বেশ বুঝা গেল; কিন্তু সীতাদেবীর অগ্নি-পরীক্ষার ব্যাখ্যাটা কি?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি।

খেলা

[শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক এম-এ, বি-এল]

আমরা সকলেই খেলা কথাটার একটা মোটামুটি অর্থ বুঝি, কিন্তু খেলার প্রকৃত সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি না। খেলা কাকে বলে? ছোট ছেলেরা ধূলো খেলে, মার্‌বেল খেলে, ডাণ্ডা-গুলি খেলে; যুবকেরা ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল খেলে; মেয়েরা দশ-পঁচিশ ও বিন্তী খেলে, বৃদ্ধেরা দাবা-সতরঞ্চ খেলেন। কিন্তু এ জিনিসটার সঙ্গে অন্য জিনিসের প্রকৃত ভেদ-সূত্রটা কি? অনেকে হয় ত মনে ভাবেন, খেলা জিনিসটা লেখাপড়ার ঠিক উল্টো। তা না হলে বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখ্‌তেন না, "রাখাল বড় মন্দ বালক—সে সর্ব্বদা খেলিয়া বেড়ায়, সে মোটেই পড়াশুনা করে না।" লেখার উল্টো খেলা,—এটা অক্ষর হিসাবে খুব সত্য হলেও, বাস্তবিক নয়। তা হলে দোকান করা, চাষবাস করা, কলকারখানা করা, এ সকলকেও লেখাপড়ার উল্টো বল্লে দোষ কি? এ সব কাজে যতটুকু লেখাপড়ার দরকার, ততটুকু লেখাপড়া না জানলে অনেক খেলাও চলে না। খেলার উপরও মস্ত-মস্ত বই আছে, খেলাতেও পণ্ডিত-মূর্খ আছে, খেলার উপরও তর্ক-বিতর্ক চলে। আর কলকারখানা করা বা চাষবাস করা যদি লেখাপড়ার উল্টো হয়, তা হলে খেলাটা লেখাপড়ার উল্টো—এ কথা বল্লে চল্‌বে কেন? তা হলে ব্যবসা, কৃষি, বাণিজ্যগুলাও কি খেলার মধ্যে?

অনেকে খেলা বল্লে বোঝেন বাজে কাজ,—অর্থাৎ যার কোন মূল্য নেই, প্রয়োজনীয়তা নেই,—যা কেবল কোনরকমে সময় অতি-বাহিত করবার উপায়। খেলা যদি বাজে কাজ হয়, তবে কাজের কাজ কি—তা দেখা দরকার। যা কিছু করা যায় তাই কাজ; কিন্তু 'কাজের' ও 'বাজে' এই দুটো বিশেষণ নিয়েই গোলমাল। যদি 'কাজের' বল্লে বুঝি—যাতে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি বা পরের উপকার হয়, আর 'বাজে' বল্লে বুঝি,—যাতে কারো কোন উপকার হয় না, বরং অপকার হয়,—তা হলে খেলা করা ত কোন সময়েই উচিত নয়। তবে "খেলার সময় খেলা করিবে" এ কথা হল কেন? তবে সব খেলাই জুয়াখেলার মত আইনে নিষিদ্ধ হল না কেন? খেলে কোনই উপকার হয় না, এ কথাই বা কে বল্লে? আমি ত জানি, খেলা মাথা-ধরার একটা খুব ভাল অষুধ; আর খেলার মাটীতে বন্ধুত্বের বীজ যত শীঘ্র গজায়, এত আর কিছুতেই নয়।

তবে এ কথা উঠতে পারে,—খেলাতে সমাজের কি উপকার হয়, দশের কি উপকার হয়? আমি বলি, দুজনে খেল্লে দশের উপকার হবে কেন? যদি দশেও খেলা করে, তা হলে দশের উপকার হবে। সমাজ ত

দশ জন মিয়ে। ইংরাজ জাতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে—তাদের মাঠে-ঘাটে খেলার জন্যে,—ঘরে বসে বই-পড়ার জন্যে নয়। খেল্‌তে-খেল্‌তে জেমস্ ওয়াটের মাথায় ষ্টীম এঞ্জিন এসেছিল; খেল্‌তে-খেল্‌তে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মাথায় বিদ্যুতের তার চমকেছিল। কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তেও অনেক সময় সাপ বের হয়।

অনেকে ভাবেন, খেলা করাটা বাজে কাজ, অর্থে কুড়ের কাজ। হাতে অন্য কাজ না থাকলে লোকে খেলে। কিন্তু যে সব খেলায় গায়ের ঘাম বেরিয়ে যায়, সেও কি কুড়ের কাজ? আমরা ঘরের দরজা দিয়ে পাঁচজনে মিলে গল্প করাকে একটা কাজের মত কাজ মনে করি; কিন্তু যাতে একটু অঙ্গ-সঞ্চালন হয়, তাকে কুড়ের কাজ বলে নাক সিঁট্‌কে থাকি। গল্প করার পক্ষে এই বল্‌বার আছে যে, তাতে আলাপের ক্ষমতা বাড়ে, জ্ঞানেরও কিছু আদান-প্রদান হয়; কিন্তু এই খেলাটার পক্ষে বল্‌বার কি কিছুই নেই?

অনেকে বলেন, খেলাটা জীবনের গভীর উদ্দেশ্যের অঙ্গীভূত নয়—উহা অবাস্তব ও কৃত্রিম। আমাদের জীবন উদ্দেশ্যমূলক বাস্তব কাজের দ্বারা গঠিত, খেলার দ্বারা উহার সামান্য অংশও গঠিত হয় নাই। স্বীকার করি, অনেক খেলাই জীবনের প্রকৃত ঘটনার কৃত্রিম অভিনয়—যেমন পুতুল খেলা, চোর-পাহারাওলা খেলা, কিন্তু উহা স্বপ্নের মত অলীক নয়, এবং উহারও একটা ক্ষণিক উদ্দেশ্য আছে। জীবনের গভীর উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে কি আমরা সব কাজ করে থাকি? তা' হলে জীবনের বাড়ীর গাঁথনি একটানা হত, কাঁচায়-পাকায় মেশান হত না; তা' হলে উহার ইঁট, পাথর, খড়, খোলা, বাঁশ, খুঁটা, কড়ি, বরগা সব থাক্‌তো না। জীবনের বাড়ী মিউনিসিপালিটির নক্‌সা অনুসারে গড়া হয় না—গড়া হয় মিস্ত্রীর মতলব অনুসারে। মিস্ত্রীর আগাগোড়া এক মতলব থাকে না—হাজার-হাজার দিনের হাজার-হাজার মতলবে হাজার-হাজার অংশ গঠিত হয়। খেলাও সেই হাজার-হাজার মতলবের একটা মতলব।

খুব খাটো করে বল্লে খেলাকে এই রকম বল্‌তে হয়। কিন্তু আমি আরো বেশী বলি। আমার মতে, খেলাটা serious lifeএর বহির্ভূত নয়। জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যের সঙ্গে উহার সঙ্গতি আছে। জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় ত জীবনের মধ্য দিয়েই। কিন্তু সেই জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দেয় খেলাতে। serious কাজ ও serious চিন্তার আলো যখন জীবন-প্রদীপে মিট্‌-মিট্‌ করে জ্বলতে থাকে, তখন খেলার কাটী দিয়ে তার সল্‌তে একটু উস্কে দিতে হয়। জ্বলাটা যদি প্রদীপের উদ্দেশ্য হয়, তবে কাটীটা তার এক কোণে রাখাটাও নিতান্ত নিরুদ্দেশ্য হয় না।

তবে খেলাটা কি? কেউ বলেন, যা' খুব সহজ, যা' সকলেই পারে,—যার জন্যে বেশী কষ্ট স্বীকার করতে হয় না, মাথা ঘামাতে হয় না, তাই খেলা। যে সব ছেলে লেখাপড়া করতে কষ্ট বোধ করে, তারা খেল্‌তে আনন্দই বোধ করে। কিন্তু খেলাটা কি বাস্তবিকই এত সহজ? খেলাতে কি মোটেই বুদ্ধির দরকার হয় না? যদি খেলাতে বেশী বুদ্ধির দরকার না হতো, তা হলে মানুষের চেয়ে বাঘ-ভালুকেই বেশী খেলা কর্‌তো। কিন্তু তারা খায় দায় ঘুমোয়, খেলার বড় ধার ধারে না। খেলাটা যদি খুব সহজসাধ্য, ক্লেশশূন্য, প্রীতিপ্রদ ব্যাপারই হয়, যদি তাতে বুদ্ধিবৃত্তি চালনার মোটেই দরকার না হয়, তবে এক কাজ করা যাক্। আজ থেকে খেলাকে লেখাপড়ার স্থানে এবং লেখাপড়াকে খেলার স্থানে বসিয়ে দেওয়া যাক্। যে ভাল খেল্‌তে না পারবে, তার ভাগ্যে নিন্দা, গুরুজনের ভৎর্সনা বা গুরুমহাশয়ের কাণমলার ব্যবস্থা করা যাক্। দেখা যাক্, খেলাকে ছেলেপিলেরা ভয় করে কি না। দেখা যাক্, খেলার নাম শুনে অনেক ছেলেই আঁৎকে উঠে কি না। তা' হলে অনেক ছেলেই বোধ হয় লুকিয়ে-লুকিয়ে History, Geometry পড়তে আরম্ভ করবে। আমার বোধ হয়, পড়াশুনার উপরকার চাপ্‌টা একটু কমিয়ে সেই চাপ্‌টা খেলার উপর দিলে, পড়াশুনারও বেশী উন্নতি হয়।

অনেকে বলেন, খেলার সঙ্গে অন্য কাজের তফাৎ এই যে, অন্য কাজ বেশী করলেও দোষ নেই, কিন্তু বেশী খেল্লেই সর্ব্বনাশ। "তাস, দাবা, পাশা, তিন কর্ম্মনাশা।" বেশী খেলেছ—কি, আখেরে পস্তাতে হবে। সেইজন্য খেলা জিনিসটাই খারাপ; ওটা যত না করা যায়, ততই ভাল। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি—কোন্ কাজ বেশী করলে আখেরে পস্তাতে হয় না? কোন্ কাজের বাড়াবাড়ি ভাল? সব কাজের সামঞ্জস্য রেখে কাজ করাই ভাল; সামঞ্জস্য না রেখে ধর্ম্ম-চেষ্টাও ভাল নয়, কিন্তু সামঞ্জস্য রেখে খেলাও ভাল।

খেলাটা কেন যে নিন্দের, কেন যে দোষের—তা আমি বুঝতে পারি না। উহা কি শীল-গর্হিত (immoral)? কখনই না। মক্কেলের ঘাড় ভাঙ্গার চেয়ে উহা অনেক ভাল। উহার আনন্দ কি নির্দ্দোষ বিমল আনন্দ নয়? দু' টাকার জিনিস চার টাকায় বিক্রী করে যে আনন্দ হয়, সে আনন্দের চেয়ে উহা অনেক নির্দ্দোষ। তবে খেলাতে আর অন্য কাজে তফাৎ কি?

যদি বল খেলাটা মানুষের স্বাভাবিক চেষ্টা, উহা আপনা-আপনি আসে, উহা শিখিবার জন্য মাষ্টারের দরকার হয় না,—তা' হলে বলি, আহার-নিদ্রাও কি খেলা? আর খেলা শিখিবার জন্যও যে মাষ্টারের দরকার হয়, তা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রত্যেক খেলারই ঘাঁৎঘোঁৎ, কৌশল আছে—যা অধিকারী ভিন্ন অপরে আয়ত্ত করতে পারে না এবং অধিকারী হতে হলে গুরুকরণ আবশ্যক।

আমরা মানুষকে মানুষ বলে চিনি কেবল দেখে, সংজ্ঞা খাটিয়ে নয়। খেলাকেও ঠিক সেই রকম ভাবে চিনি; কিন্তু তা বলে খেলার সংজ্ঞা (definition) ত একটা না থেকে পারে না। কোন্ মাপকাটিতে মেপে, কোন্ নিক্তিতে ওজন করে আমরা খেলাকে খেলা বলে নির্দ্দেশ করি, সেটা মনের ভিতর উহ্য থাকলেও তাকে তর্ক করে ত টেনে বার করতে হবে। নৈলে খেলার একটা স্পষ্ট স্বতন্ত্র জ্ঞান হবে কেন? তা হলে হয় ত একদিন এমন একটা নূতন খেলা বের হবে, যা দেখে আমরা ধাঁ করে বল্‌তে পারবো না, সেটা খেলা কি কাজ;—তখন কিন্তু সংজ্ঞার খোঁজ পড়বে।

আমি আশ্চর্য্য হই—কেন আমরা কুস্তী-করা, কোদাল-কোপানকে খেলা বলি না, অথচ হাডুডুডু কিম্বা রাগ্‌বি খেলাকে খেলা বলি। আমার মতে খেলার বিশেষত্ব এই যে, আমোদ ভিন্ন উহার মুখ্য বা নিকট উদ্দেশ্য আর কিছুই থাকে না; তবে গৌণ বা দূরতর উদ্দেশ্য যথেষ্ট থাকে। কুস্তী করার মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য, লেখাপড়ার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান, কৃষি বাণিজ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থ, দান-ধ্যানের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, এবং দেশের Leader হইবার মুখ্য উদ্দেশ্য সম্মান। যদি স্বাস্থ্যাদি জীবনের serious উদ্দেশ্য হয়, তবে আমোদই বা হইবে না কেন?

অতএব যাহার উদ্দেশ্য প্রধানতঃ আমোদ এবং যাহার ফল প্রধানতঃ শক্তি-সঞ্চয়, তাহাই খেলা। আমরা খেলায় প্রবৃত্ত হই প্রধানতঃ খেলার উত্তেজনার জন্য, স্ফূর্ত্তির জন্য—সুখের জন্য নয়, জয়লাভের জন্য নয়। খেলার ভিতর অর্থের লালসা থাকিলেই তাহা জুয়াখেলা হইয়া দাঁড়াইল। Game of loveই প্রকৃত খেলা। অন্য খেলা আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। যুধিষ্ঠির দ্যূত-ক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ঐরূপ খেলাকে পাপের মধ্যেই গণি। হারি কি জিতি, হারি কি জিতি করিয়া যদি বুক দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিতেই লাগিল, তাহলে খেলিয়া আমোদই বা কোথায়? সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে কিন্তু অন্য নিয়ম দেখিতে পাই। তাহাদের মধ্যে দুই ভাইতেও যদি খেলে, তাহলে অন্ততঃ একটা আধলা বাজী রেখে খেলবে, নতুবা খেলাটা না কি জমে না। যাদের মাথায় লাভ লোক্‌সানের চর্কী দিন-রাত ঘুরছে, যারা লাভ লোকসানের রাই না মাখিয়ে কোন জিনিস উদরসাৎ করতে পারে না, তাদের রাজসিক ভাবের খেলাটা আমাদের সাত্ত্বিক দেশে যত কম আসে ততই ভাল। তাদের খেলার দেহটা আসুক, তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু আত্মাটা যেন না আসে।

যে সকল ভিন্ন-ভিন্ন মুখ্য উদ্দেশ্যে আমরা যে সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, খেলার উদ্দেশ্য তাহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। খেলা কেবল লেখাপড়ার বিরুদ্ধে নয়, অন্য সকল কাজেরই বিরুদ্ধে। খেলা সব কাজেরই Supplement,—পরিপূরক। উহাও একপ্রকার কাজ, কিন্তু অন্য সব কাজের যে দাঁড়া, উহার দাঁড়া তা নয়। সকলে দাঁড়ায় কুঞ্চিত ললাটে, খেলা দাঁড়ায় প্রফুল্ল-মুখে।

খেলার প্রবর্ত্তন কেবল কর্ম্ম-ক্লান্ত চিত্তকে প্রফুল্ল ও সতেজ করবার জন্য। মনের কেন্দ্রের পক্ষে উদ্দেশ্যের লক্ষ্যগুলি চিন্তার রজ্জু দ্বারা সংলগ্ন। সে চিন্তা-রজ্জুগুলির উপর নিরন্তর টান পড়্‌ছে। আর সে যে-সে টান নয়, সে পাল্লার পাকের টান। মনের স্তম্ভ সেই টানের চোটে এক-এক সময় থরথর করে কাঁপে;—যেন ভেঙ্গে পড়ে আর কি। কিন্তু খেলা engineএর মত এসে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তার রজ্জুগুলিকে একটু শিথিল করে দেয়। সেই অবসরে স্তম্ভ আবার জোর করে মাটিতে বসে যায়; কারণ এ ঠিক পাথরের স্তম্ভ নয়, ইহার গাছের মত শিকড় আছে।

এ সংসার-রঙ্গভূমে আমরা সকলেই না কি খেলতে এসেছি। আমরা সকলেই পুতুল-নাচের পুতুলের মত fret and stout our hour on the stage। যিনি খেলাচ্ছেন, তাঁকে আমরাও দেখতে পাই না; কারণ, পুত্তলিকার চক্ষু আছে অথচ সে দেখিতে পায় না, এবং বাহিরের লোকও দেখতে পায় না, কারণ তাহারাও পুতুল। যখন এক পুতুলের নাচ হচ্ছে, তখন আর এক পুতুল দর্শক; কিন্তু দর্শক ও নট উভয়েরই অবস্থা তুল্য, উভয়েরই দেহ সহস্র তারে বাঁধা। তারটা বিশ্বের আইন—যেমন মাধ্যাকর্ষণ। কর্ম্মের আইনও বিশ্বের আইনের মধ্যে। হাতের উপর রেখে সব পুতুল এক সঙ্গে নাচাতে পারতেন কি না, একথা অনেকে জিজ্ঞাসা করেন; কিন্তু তাঁর হাতের এক, একটি স্নায়ুই ত বাইরে এসে এক একটি তার হয়েছে।

আচ্ছা, এই খেলাটার ভিতর আমাদের নিজের খেলা কি কিছুই নেই? আমরা কি ঠিক সব কলের পুতুল? তিনি না হয় আমাদের গ'ড়ে আমাদের খেলাতে সুরু করে দিয়েছেন, কিন্তু তার পর আমরা নিজেদের মধ্যে যে খুঁটিনাটি খেলা করি, সে সব ধুলাখেলার ভিতরও কি তাঁর হাত আছে? তবে এ খেলার শেষ কি তাঁর ইচ্ছের উপর নির্ভর করে, না,—আমরাও তার ছিঁড়ে খেলা ফেলে পরদার আড়ালে তাঁর কাছে ছুটে যেতে পারি?

এ বড় শক্ত কথা। মনে ত হয় আমরাই খেলছি। আমাদেরই তারগুলো পর্য্যন্ত আমরা দেখতে পাই; কিন্তু তারগুলো উঁচুতে দিয়ে কোথায় মিশেছে, ততদূর আর আমাদের নজর চলে না। আমরা ত এই মনে করেই খেলে যাই যে, খেলা শেষ করা আমাদের হাত; তার পর যদি কোন দিন খেলা শেষ করে উঠতে পারি, তখন বুঝতে পারবো—খেলা শেষ হলো কার ইচ্ছায়।

সংসারের সাজানো ঘরে বসে ঘরকাটা সময়ের ছক পেতে আমরা সকলেই রং খেল্‌ছি। আমাদের খেলোয়াড় হচ্ছেন পাপচন্দ্র আর মন্দলাল। তাদের ঘুঁটী হচ্ছে কাল আর লাল। আর আমাদের ঘুঁটী হচ্ছে সাদা ও সবুজ—আমাদের মন প্রথম থাকে সাদা আর সংস্কার থাকে সবুজ অর্থাৎ কাঁচা। লাল ঘুঁটির একটা টান আছে। লাল রংটা কেমন চোখে ধরে। মারতে মন সরে না। কাল ঘুঁটি কেবল লালের আড়ালে থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে চলে। এই জন্যে প্রায়ই সাদা আর সবুজ ঘুঁটি কাঁচাই থেকে যায়, পেকে ঘরে উঠতে পায় না, কিন্তু কাল আর লাল ঘুঁটি জুড়ি মিশে সটান্ পেকে ঘরে ওঠে। এই রকমে আমরা বাজীর পর বাজী হারছি। এক-এক বাজী শেষ হচ্ছে—না, এক-একবার ভবের খেলা সাঙ্গ হচ্ছে। কিন্তু তবু আমরা খেল্‌তে ছাড়ছি না; কারণ খেলোয়াড় ছাড়ে না। এক বাজী না জিতলে নিস্তার নেই, আর নেশাও ছাড়ে না। আর যে বাজী রেখে খেলছি, সেটার মায়াও ছাড়্‌তে পারি না। আত্মাটাকে খোয়াই কেমন করে? একবার জিতে শেষ রক্ষে করতেই হবে। কিন্তু জেতায় দরকার কি? খেলা ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়লে হয় না? সেই ত খেলা শেষ করবার সহজ উপায়। হাঁ, তা বটে; খেলাটা যে সব মিথ্যে এটা বোধ না হলে তা হবে কেন? খেলা মিথ্যে, হারজিত মিথ্যে, খেলোয়াড় মিথ্যে, বাজী মিথ্যে, এ জ্ঞানটা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা কোন্ প্রাণে

খেলা ছাড়ি, কোন্ বলে নেশা চটাই ; কিন্তু সে জ্ঞানটা কেবল শুষ্ক জ্ঞান নয়—প্রাণের ভিতরকার অনুভবের সঙ্গে, বিশ্বাসের সঙ্গে, জীবনের কাজের সঙ্গে সে জ্ঞানটা ফুটে বের হওয়া চাই। তা যেদিন হবে সে দিন দেখবো আমি স্বাধীন জীবও নই, কলের পুতুলও নই—আমি হচ্ছি এক ক্রিয়াশূন্য কর্ত্তা। তা' হলে বুঝবে, আমি চিদানন্দ দূরে থাক, সৎও নই, আমি চিৎ ও অচিৎ। আনন্দ ও নিরানন্দ, সৎ ও অসতের এক অচিন্তনীয় সংমিশ্রণ—অথবা সমস্ত গুণ উপাধির অতীত এমন একটা কিছু—যা হতে মানুষের মন ঠিকরে পড়ে, যাহার নিকট মানুষের ভাষা নির্ব্বাক হয় ; "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

চুম্বক-তত্ত্ব (Magnetism)

[অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি এস্‌সি]

আসল ও নকল চুম্বক।—আমাদের দেশে "চুম্বক" ও "অয়স্কান্তমণি" এই দুটী কথার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাক্য দুটি কত দিন হইতে বঙ্গভাষায় স্থানলাভ করিয়াছে, আমাদের দেশেই চুম্বকের আদি আবিষ্কার কি না, কে বলিবে ? এই কথা দুটী উপলক্ষ করিয়া বেশ একটা বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক research চলিতে পারে।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রালোচনায় জানিতে পারা যায় যে, এসিয়া মাইনরে ম্যাগনেসিয়া নামে কোন স্থান আছে। সেই স্থানে এক রকম পাথর পাওয়া যায়। সেই পাথরকে যদি লোহাচুরের মধ্যে ডুবাইয়া ধীরে-ধীরে তোলা হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাথরের দুই স্থানে লোহাচুরগুলি গুচ্ছে-গুচ্ছে লাগিয়া আছে। উক্ত পাথরকে পাকহীন সূতাদ্বারা প্রলম্বিত করিলে, ঐ দুই নির্দ্দিষ্ট অংশ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়া স্থির হয়। উহাকে নাড়িয়া দিলেও কয়েকবার ইতস্ততঃ করার পর উত্তর দক্ষিণে আসিয়া স্থির হয়। এইরূপ পাথরকে "আসল" চুম্বক (Loadstone) কহে।

আজকাল বিজ্ঞানাগারে চুম্বকধর্ম্ম প্রতিপাদনের জন্য নকল চুম্বকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহার কারণ (১) আসল চুম্বক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। (২) আসল চুম্বকের আকৃতি পরীক্ষা কার্য্যের (Experiment) উপযুক্ত নহে। (৩) তাহার মেরুবল বড় কম। (৪) নকল চুম্বক সহজে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিতে পারা যায়। (৫) নকল চুম্বকের আকৃতি ইচ্ছামত আয়তনবিশিষ্ট করিতে পারা যায় ; কিন্তু আসল চুম্বককে ইচ্ছামত আকৃতিতে পরিণত করিতে পারা যায় না।

চুম্বক ধর্ম্ম।—একটী চুম্বক দণ্ডের (bar magnet) মাঝখানে পাকহীন সূতায় বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেটী কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া পরে স্থির হয়। যখন স্থির হয়, তখন সে উত্তর-দক্ষিণ দিকে মুখ রাখিয়া দাঁড়ায়। তাহাকে নাড়িয়া দিলে আবার কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ আন্দোলনের পর উত্তর-দক্ষিণে মুখ রাখিয়া দাঁড়ায়। যে দিকটা উত্তর দিকে মুখ রাখিয়া স্থির হইয়াছে, সেই দিকের প্রান্তভাগে একটা খড়ির দাগ দিয়া দাও, আবার নাড়িয়া দাও, কি আশ্চর্য্য ! তবু দেখ, খড়ি-চিহ্নিত দিকটা আবার উত্তর দিকে আসিয়া স্থির হইয়াছে। ইহাকে যতবার ইচ্ছা স্থানভ্রষ্ট কর, তবু ইহা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে ও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট দিকে মুখ রাখিয়া স্থির হইবে। চুম্বকের ইহা একটা ধর্ম্ম। যে দুই দিকে দুটি মুখ রাখিয়া ইহা স্থির হইয়াছে, যদি একটি সরল রেখা দ্বারা সেই দুটি দিক যোগ করিয়া উভয়দিকে অসীমরূপে বর্দ্ধিত করা যায়, তবে সেই রেখাদর্শিত দিকটার নাম হয় "চৌম্বক দিক" (magnetic meridian)। কি করিয়া অভ্রান্তরূপে এই চৌম্বক দিক স্থির করিতে হয়, তাহা পরে বিশদরূপে বলিব। এখন দ্বিতীয় চুম্বকদণ্ড পূর্ব্বোক্তরূপে ঝুলাইয়া দাও। ইহার যে দিকটা উত্তর দিকে আসিয়া স্থির হইবে, সেই দিকে একটা খড়ির দাগ দাও। এখন দ্বিতীয় চুম্বকদণ্ডটী পূর্ব্বকথিত স্থির প্রলম্বিত প্রথম চুম্বকদণ্ডের নিকট ধীরে-ধীরে লইয়া এস। দ্বিতীয় চুম্বকের খড়ি-চিহ্নিত দিকটা প্রলম্বিত চুম্বকের খড়িচিহ্নিত দিকটার নিকটে লইয়া যাও। দেখিবে প্রলম্বিত চুম্বকের খড়ি চিহ্নিত দিকটা তোমার হস্তস্থিত চুম্বকের চিহ্নিত দিক হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। ইহাতে জানা গেল যে, প্রলম্বিত অবস্থায় উভয় চুম্বকের উত্তর মুখ বা দক্ষিণ মুখ সমধর্ম্মবিশিষ্ট ; এবং সমধর্ম্মবিশিষ্ট চুম্বক মুখের মধ্যে বিকর্ষণ-শক্তি বর্ত্তমান। এখন হস্তস্থিত চুম্বকের অচিহ্নিত দিকটা প্রলম্বিত চুম্বকের চিহ্নিত দিকটার নিকটে লইয়া যাও। দেখিবে প্রলম্বিত চুম্বকের চিহ্নিত দিকটা হস্তস্থিত চুম্বকের অচিহ্নিত দিক দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। ইহাতে জানা গেল যে, হস্তস্থিত চুম্বকের দুটি মুখ দুই রকম বা বিপরীত ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। একটা চিহ্নিত মুখ অপর চিহ্নিত মুখকে বিকর্ষণ করিতেছে। আর অচিহ্নিত মুখ চিহ্নিত মুখকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রত্যেক চুম্বকের দুইটি করিয়া মুখ আছে। প্রলম্বিত চুম্বকের যে মুখটি উত্তর দিকে আসিয়া স্থির হইয়াছে, তাহার নাম "সুমেরু" বা উত্তর মেরু (" North Pole ")। আর যে মুখটি দক্ষিণ দিকে চাহিয়া আছে, তাহার নাম "কুমেরু" বা "দক্ষিণ মেরু" (South Pole)। সুমেরু সুমেরুকে ও কুমেরু কুমেরুকে বিকর্ষণ করে। সুমেরু কুমেরুকে ও কুমেরু সুমেরুকে আকর্ষণ করে। আর এই আকর্ষণী বা বিকর্ষণী শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি মেরুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের উপর নির্ভর করে। দূরত্ব যদি বেশী হয়, শক্তি কমিয়া যায় ; আর, দূরত্ব হ্রাস করিলে শক্তি বৃদ্ধি পায়। কি হারে কমে বাড়ে—নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা দেখাইতে পারা যায়। প্রত্যেক চুম্বকের উভয় মেরুর বল সমান ও বিপরীত। কিন্তু সকল চুম্বকের মেরুবল সমান নহে। কাহারও কম, কাহারও বেশী। যদি মেরুদ্বয়ের মধ্যে বিকর্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং মেরুদ্বয়ের ব্যবধান যদি 'দ' সেঃ মিঃ (centimetre) হয় এবং বায়ু যদি মধ্যস্থ (medium) হয়—আর প্রথম ও দ্বিতীয় চুম্বকের মেরু-বল যদি 'চ' ও সেঃ গ্রাঃ সেঃ পদ্ধতি অনুসারে মাপ হয় (C. G. S.

system) আর বিকর্ষণ শক্তির মাপ যদি সঃ সেঃ গ্রাঃ সেঃ পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায়, তবে তাহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ নিম্নলিখিত অঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে, যথা—

$$শ = \frac{চ \times চ'}{দ^2}$$

ইহা দ্বারা আমরা চুম্বক শাস্ত্রের তিনটি নিয়ম (বা ধর্ম্ম) পাইলাম।

১। সমধর্ম্মী চুম্বক-মেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

২। বিপরীতধর্ম্মী চুম্বক-মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

৩। এই আকর্ষণী বা বিকর্ষণী শক্তি মেরুবলদ্বয়ের গুণফলের উপর ও বিপরীতক্রমে দূরত্বের বর্গের উপর (inversely proportional to the square of the distance) নির্ভর করে।

গিন্নী-মা

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী]

"গিন্নী মা, চারু বাবু ক'দিন হ'ল আমার কাছ থেকে পাচটা টাকা ধার ব'লে নিয়েচে ; আজ চাইতে, ব'ললে— ঠাকুমাকে আমার নাম ক'রে বল'গে যাও, এখন আমার হাতে কিছু নেই। তাই তোমার কাছে এলুম—" এই বলিয়া নন্দর মা সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কল্যাণী আহ্নিক করিতে যাইতেছিলেন। ঝিয়ের এই কথায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বিষ ছড়াইয়া দিল ; বলিলেন, "তুই সব জেনে-শুনে আবার তা'কে টাকা দিলি কি ব'লে? আজ দশ দিন হয়নি, এই টাকা দেওয়ার জন্যে কত কাণ্ড হ'য়ে গেল ; আবার তা'কে টাকা দিয়ে আমার কাছে কোন্ লজ্জায় চাইতে এসেছিস্?—বেরো আমার সুমুখ থেকে।" কল্যাণী যে আজ তাহাকে এরূপ দু'একটা কড়া কথা বলিবেন, এ কল্পনা ঝি পূর্ব্ব হইতেই করিয়াছিল, তাই সে প্রথমটা কোন মন্দ কথা না বলিয়া শান্তভাবে আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইয়া বলিল, "আগে আমার সব কথা শোন, তা'র পরে যা' হয় বলো। আমারও কি ইচ্ছে মা, যে চারু দিন-দিন—ও মা! তুমি চল্‌লে যে! তা' সব শোন আর না শোন, কিন্তু আমার টাকা দাও—গোঁসাই ঠাকুর কাল রাত চারটের গাড়ীতে বাড়ী যাবেন, আজ তাঁকে না দিলেই নয়।" "হাঁ, দোব বই কি—তোমার টাকা দোব না! আজ কর্ত্তা আসুন— একবারে সুদ শুদ্ধু দোব এখন।"

সন্ধ্যার পর ঝি আবার উপরে আসিয়া, কল্যাণীর সম্মুখে যাইয়া, গলায় কাপড় দিয়া, যোড় হাত করিয়া বলিল, "গিন্নী মা গো, এই যোড় হাত ক'রে ব'লচি—দয়া ক'রে আমার কথাটাই একবার শোন না।" কল্যাণীর পূজা-আহ্নিকের পর তিনি কাহারও প্রতি রুষ্ট হইতেন না—এ কথা নন্দর মা বেশ জানিত। কল্যাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কি ব'ল্‌বি—তা'র জন্যে আর এত কেন—বল্ না।" "তা' বই কি! তখন ত এই জন্যেই কত মুখনাড়া শুনতে হ'ল।" কল্যাণী স্নেহ-তিরস্কার-সহকারে বলিলেন "মর মাগী, তুই কি আজ্‌কের লোক না, তাই কিছু জানিস্‌নে? আহ্নিক কর্‌বার আগে যদি আমার বাবাও এসে বাধা দেন, তা'তেও আমি বিরক্ত হই, তা' তুই জানিস্ না? আর, তুই বা আমায় না জানিয়ে তা'কে টাকা দিলি কি ব'লে? তোর কি এই বয়সেই ভীমরতী হ'য়েচে?" "তা যাক্, কথায় কথা বাড়ে—এখন শোন, কেন আমি টাকা দিয়েচি। ইচ্ছে ক'রে হাতে গুঁজেও দিতে যাইনি, আর সুদ খাবার জন্যেও যে দিয়েচি, তাও নয়। সে দিন দুপুর বেলা চারু আমার কাছে গিয়ে ব'ল্‌লে—'নন্দর মা, আমায় পাঁচটা টাকা দাও, বড় দরকার ; কাল তোমায় দিয়ে দোব।' আমি 'নেই' বল্‌তে ব'ল্‌লে,—'যদি না দাও ত আমার আংটিটা বাঁধা পড়ে—তুমি মিথ্যে কথা বল্‌চ—দাও।' কাজেই, কি করি মা, আমি না দিলেই যে ও টাকা পাবে না তাও ত নয়,—এখুনি আংটি বাঁধা দিয়ে কুড়ি-পচিশ টাকা পাবে এখন—এই ভেবে দিলুম। তা'র পর আজ চাইতে ঐ কথা বল্‌লে-

নাতি যে এতদ্দূর উচ্ছন্ন গিয়াছে, কল্যাণী তাহা জানি-

তেন না। রাগে তাঁহার আপাদমস্তক ঝিন্-ঝিন্ করিতে লাগিল। তাঁহার একটি কু-অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি রাগের সময় যাহাকে সুমুখে পাইতেন, তাহাকেই বিনা দোষে বকিয়া-ঝকিয়া আপনার রাগ মিটাইতেন; এজন্য তাঁহার স্বামী বৃদ্ধ উকিল হরিচরণ বাবুকেও অনেক সময় কত কথা সহ্য করিতে হইত। আজ সেই রাগ প'ড়িল বেচারা নন্দর মার ঘাড়ে!—"তুই কেন টাকা দিয়ে আত্তি কর্‌তে গেলি? আংটি বাঁধা দিত, দিতই!—তা'র জিনিস সে বাঁধা দিক,—বেচুক, তা'র যা খুসী তা'ই করুক, তোর তা'তে কি?—তা'তে তোর এত দরদ কিসের? ও ত আমার আগে এমন ছিল না,—তুই ত তা'কে লুকিয়ে-লুকিয়ে টাকা দিয়ে-দিয়ে মাটী করলি। এখন আমার কাছে এসেচেন 'টাকা দাও'! যা'—যা'কে দিয়েচিস্, তা'র কাছে মরগে যা। দূর হ' আমার সুমুখ থেকে—বাড়ী থেকে বেরো।" বিনাদোষে ইহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক তিরস্কারেও এই পুরাতন ঝির মনে ব্যথা লাগিত না; কেন না, বিনাদোষের তিরস্কার তাহার গা-সহা ছিল। তা' ছাড়া, সে তিরস্কারে সে অপমান বোধ করিত না। কিন্তু আজ বাস্তবিকই সে দোষী—তাই কল্যাণীর শেষ কথায় অভিমানে তাহার রক্তহীন ঠোঁট দু'টী ফুলিয়া উঠিল। অর্দ্ধ-ক্রন্দন-মিশ্রিত স্বরে বলিল, "হা, তোমার বাড়ী থেকে বেরুব বই কি মা? বেশ, যাব,—তা'র আর কি? আমার সব মাইনে চুকিয়ে দাও—কালই গোঁসাইয়ের সঙ্গে বাড়ী যাই। আর আমার কাজ করবারই কি বয়েস আছে,—তবে না কি আজ এত দিন তোমার বাড়ীতে রয়েচি, তাই যা' মায়া,—নৈলে আর কি? আচ্ছা মা, তোমার এ বাড়ী থেকে কালই বেরুব।" এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কল্যাণী কি ভাবিয়া নরম হইয়া তাহার হাত দু'টী ধরিতে গেলেন। নন্দর মার অভিমান দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। সে জোর করিয়া হাত টানিতেই, হাত কল্যাণীর বুকে লাগায়, তাঁহার বড়ই আঘাত লাগিল। সে কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিল, "আবার ধর কেন? না, আমি কালই এখান থেকে চলে যাব।"

কল্যাণী রাগে অন্ধ হইয়া বলিলেন "দূর—হ। উঃ—লাগ্‌ল দেখ,—দাঁড়া, তোকে দূর ক'রে তবে আমি জল স্পর্শ করব।" এই বলিয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন। নন্দর মাও রাগে কাঁপিতে-কাঁপিতে চলিয়া গেল।

২

অন্যান্য দিন কর্ত্তা মহাশয় বাড়ী আসিয়া অন্ততঃ আধ-ঘণ্টা বিশ্রাম করিলে পর, কল্যাণী, যাহা কিছু বলিবার থাকিত, বলিতেন। আজ কিন্তু তিনি ঘরে পা দিবামাত্রই বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, তোমার জন্যই আমার সোণার সংসার ছারখার হবে। আমি একা মানুষ—আর কত দিক দেখ্‌ব? এদানি তুমি যেন কি হ'য়ে পড়েচ—কেন বল ত? এমন যদি কর ত বল, তোমার সংসার তোমার থাক্‌—আমি এ সংসার থেকে বেরিয়ে যাই—দরকার নেই এ সংসারে।" কর্ত্তার মেজাজটাও বড় ভাল ছিল না। তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "তুমি যে কখন কি ভাবে থাক, তা' বোঝা ভার। কি হ'য়েচে তা'র নেই ঠিক—কেবল বাজে কথা ব'কচ—" কল্যাণী সুর চড়াইয়া বলিলেন, "কি হ'য়েচে, জান না? সব দাস-দাসীর মাসের-মাস মাইনে ফেলে দাও, কিন্তু নন্দর মা'র কেন বাকী রাখ?—আজই তা'র সব চুকিয়ে দাও। সে আর এ বাড়ী থাক্‌বে না।" "বাঃ—সে বুঝি আমার দোষ? তুমিই ত ফেলে রাখ্‌তে বল, তা'ই রাখি; যাক্‌, কিন্তু কি হ'ল আবার?" "আমি ওকে তাড়িয়ে তবে জল খাব। গেলবারে ওকে ডেকে আনা হ'য়েছিল ব'লে, ওর বড় তেজ হ'য়েচে।" এই বলিয়া নন্দর মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দাঁড়া মাগী, এবার তোর তেজ ভাঙ্‌চি!" "ওঃ—এই কথা। তাই বল্‌তে হয়!" বলিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া আবার বলিলেন, "আচ্ছা, তা'র জন্যে আর এত তাড়া কেন?—হ'বে এখন।" কল্যাণী পূর্ব্বের মত ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "হ'বে এখন! এখুনি নন্দর মাকে ডেকে তার পাওনা পাই-পয়সা ফেলে দাও। নৈলে জলস্পর্শ করব না। ওকে দূর ক'রে তবে আমার অন্য কাজ!" এই বলিয়া চুপ করিলেন। হরি-চরণ বাবু কি চিন্তা করিয়া বলিলেন "না, তা ত আমি পারব না—পাওনা না হয় ফেলে দিচ্চি, কিন্তু বাড়ী ছাড়া করি কেমন ক'রে? তা' আমি পারব না।" "কেন পারবে না?" "পারব না তার কারণ আছে। আজ তাড়াব, আবার কাল ডেকে আনাতে বাধ্য করবে—এই ত তোমার তাড়ান। সে আমি পারব না। আরবারে

ত তাড়িয়েছিলে, আবার তবে আনালে কেন? যাক্, কিন্তু কি হ'য়েচে, তার ত কিছুই এখনও শুন্‌তে পেলুম না?" "কি হ'য়েচে, শোন। তোমার চারু হ'তেই বংশের মুখে চুণকালি পড়বে। এই দেখ না, কোন্ দিন বল্‌তে কোন্ দিন কা'র কি চুরি করবে, তার পর জেলে যাবে। তা'তে তোমার খুব মুখোজ্জ্বল হ'বে।" কর্ত্তা কিছু বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "বেশ, ত, তার জন্যে ওকে কেন তাড়াতে চাও?"

কল্যাণী, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সে সমস্তই সংক্ষেপে জানাইয়া বলিলেন, "এবার তোমার পায়ে হাত দিয়ে ব'ল্‌চি, এবার ও যদি মরেও যায় ত আর আমি ডাক্‌ব না। তুমি ওকে দূর কর।" এই বলিয়া তিনি স্বামীর পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন "আর আমি ওকে ডাক্‌ব না,—ডাক্‌ব না—ডাক্‌ব না।" কর্ত্তা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "যাক্, এবার তা'কে ক্ষমা কর, আর সে কর্‌বে না।" কল্যাণী সহজভাবে বলিলেন "এ ত তোমার বল্‌বার কথা নয়!" কর্ত্তা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমিই না হয় তার হ'য়ে তোমার কাছে মাপ চাইচি।" এমন সময় বাহির হইতে নন্দর মা বলিয়া উঠিল, "না জ্যেঠা ম'শাই, আমি আর কাজ করতে পারব না—বুড়ী হলুম, আর কেন।" কর্ত্তা চুপ করিয়া রহিলেন।

কর্ত্তা তাহারি জন্য যাহা বলিতেছিলেন, নন্দর মাও তাঁহার কথায় কথা না দিয়া এইরূপ বিপরীত উত্তর করায়, কল্যাণী হাড়ে-হাড়ে জ্বলিয়া গিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "কাজ ত কচ্ছিলেন কত! ঝি-চাকরগুলো কে কি কচ্ছে, না কচ্ছে, দেখা—ঠাকুরকে দিয়ে সকলের ভাত পাঠান—সময় সময় ভাঁড়ার-ঘর আগ্‌লান—আর ইচ্ছেমত ছেলেপুলেদের নিয়ে আদর-আহ্লাদ করা। তা' না পারিস্, তা'র কি হ'বে? তোর জন্যে আমার কাজ কি আট্‌কে থাক্‌বে মনে করিস্ না কি?" নন্দর মা কপাটের পাশ হইতে বলিল, "তা' কেন মনে করব—কা'র জন্যে কা'র আট্‌কায় মা? আমার জন্যেও তোমার আট্‌কাবে না—আর তোমার জন্যেও যে আর কা'রুর আট্‌কাবে, তাও নয়। যেখানে গতর খাটাব, সেইখানেই মাইনে পাব,—তা'র জন্যে আর এত কথা কেন শুনতে যাব মা? আর আমি ত তোমায় বলিনি—তুমি কেন অমন ক'রে বল্‌চ মা?"

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল। কল্যাণী জ্বলিয়া উঠিয়া কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "সরে যা আমার সুমুখ থেকে—নজর-ছাড়া হ।" এইবার কর্ত্তা বলিলেন, "আচ্ছা, আমি ওর সব চুকিয়ে দিচ্চি—ও চারুকে যা দিয়েচে, তাও না হয় দিচ্চি; আর নন্দর মা-ও চ'লে যাবে,—কিন্তু দেখ, আর যেন কখন ওকে ডাক্‌তে ব'ল না। এখনও উপায় আছে, ভাল ক'রে বুঝে দেখ।" কল্যাণী গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বুঝ্‌ব ছাই—ওকে ডাকবার জন্যে আমার দায় পোড়েচে। পাপ গেলেই বাঁচি। ওর এতবড় আস্পদ্দা যে, বলে কি না—হাত ধর কেন, ডেকে এনেছিলে কেন?" বলিয়া নন্দর মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ওরে পোড়ারমুখী! ডেকেছিলুম কেন, তা তুই কি বুঝ্‌বি?" নন্দর মা কোন কথা না বলিয়া আস্তে-আস্তে চলিয়া গেল। আধঘণ্টা পরে কর্ত্তা ঝিকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য চুকাইয়া দিলেন।

৩

পরদিন প্রাতঃকালে সম্মুখে মেজ-বৌকে দেখিয়া কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরা কখন গেল জান? রাত-থাক্‌তে যায়নি ত?" মেজ-বৌ শ্বাশুড়ীর এখনকার মনো-ভাব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "না, না, ভোরবেলা তা'রা যখন যায়, আমি যে সেখানে দাঁড়িয়েছিলুম—কিছু নিয়ে-টিয়ে যেতে পারেনি।" কল্যাণীর চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠিল। কাতর বিস্ময়ে বলিলেন "ওমা, ও কি কথা বৌমা! সে কিছু চুরি ক'রে নিয়ে গেছে কি না, জানবার জন্যই কি আমি তোমায় জিজ্ঞেস্ ক'চ্চি? আমি ওকে যত বিশ্বাস করি, বোধ হয় তোমাদের তত করি না, তা তুমি জান।" মেজ-বৌ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না, না, আমি সে কথা ব'ল্‌ব কেন মা? আমি কি জানিনে যে, আমি এখানে আসার আগে থেকে ও এ বাড়ী কাজ ক'রচে। তবে সে যখন তা'র গোঁসাইয়ের সঙ্গে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, তখন আমি তা'কে,—সে নিজে যে গেলাসে জল-টল খেত,—সেগুলি নিতে বল্লুম, তবু সে নিলে না কি না—তাই—" মেজ-বৌয়ের শেষ কথা তাঁহার কাণে গেল না। তিনি মনে-মনে বলিলেন "শুধু কি তোমার এ বাড়ী আসার আগে থেকে? যখন এই তিন মহল তেতলা বাড়ী শুধু একতলা ছিল, নন্দর মা আমার তত-দিনকার লোক।" পরে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি ত সে সময় ছিলে, যাবার সময় আমাকে কিছু ব'লতে ব'লে গেল না?"

মেজ-বৌ অবজ্ঞা ভরে বলিল, "কিছু না! সে কি তেমন লোক মা?" মেজ-বৌয়ের মুখে বারবার তাহার নিন্দা শুনিয়া কল্যাণী তাহার কুটিলতাপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে ভাল লোক কি মন্দ লোক, সে বিচার ত তোমায় কর্‌তে বলিনি বৌ। যাও—তুমি নিজের কাজ কর'গে। আজ আর আমি রান্না-ঘরে যেতে পার্‌ব না, শরীরটা কেমন ম্যাজ-ম্যাজ কর্‌চে—তোমরাই সব দেখো, শুনো।"

মেজ-বৌ চলিয়া যাইবার পর কল্যাণী ধীরে-ধীরে নীচে নামিয়া, বরাবর নন্দর মা যে ঘরে থাকিত, সেই দিকে আসিলেন। সেখানে পূর্ব্ব পরিচিত ঝি খেঁদী, আর একটী চাকর, উভয়ে হাত মুখ নাড়িয়া পরস্পরকে কি বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল। সহসা কল্যাণীকে আসিতে দেখিয়া, সে কথা ছাড়িয়া দিয়া, দর্শন খেঁদীকে বলিল, "চলে গেচে তার আর দেখ্‌চিস্ কি—নিজের কাজ ক'র্‌গে যা।" কল্যাণী তাহাদের সম্মুখে আসিয়া একবার নন্দর মার ঘরের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বেশ হ'য়েচে—আপদ গেছে।" পরে খেঁদীর পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিলেন, "তোর পায়ে কি হ'য়েচে রে খেঁদী?" খেঁদী সুযোগ পাইয়া মিথ্যা করিয়া নাকি সুরে বলিল, "কাল তোমার চাবিটা লেগে কালসিটে পড়ে গেছে।"

খেঁদীর কথায় তাঁহার মনে দয়া হইল। বলিলেন, "আহা—তাইতে এমন হ'য়ে গেছে? আর মা, রাগের সময় করে' ফেলিচি, মনে কিছু করিস্‌নে মা। এই নে, চারটে পয়সা নিয়ে জল খেগে যা।" এই বলিয়া তিনি কাপড়ের খুট হইতে চারিটি পয়সা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

দর্শন খেঁদীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, "সত্যি চাবি লেগে এমন হ'য়েচে না কি?" খেঁদী মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "না রে, না। গিন্নীর কাছে পয়সা আদায় করবার কায়দা জানিস? না জানিস্ ত আমার কাছে শেখ্।" দর্শন বলিল, "দেখ্ খেঁদী, তুই আমায় তুই-তো-কারি করিস্‌নে বল্‌চি।" "কি করবি তুই" বলিয়া সে হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল। কল্যাণী উপরে আসিয়া আজ অনেক দিনের পর ফণী বাবু ও বড় বৌয়ের উদ্দেশে কাঁদিতে লাগিলেন।

৪

সকালে ওপাড়ার কনে-গিন্নী আসিয়া সদর দরজায় ডাকিল, "ও নন্দর মা, বলি কেমন আছ গো? কল্‌কাত্ থেকে আমাদের জন্যে কি আন্‌লে—" গত বৎসর কল্যাণী নন্দর মাকে একটি বক্‌না দিয়াছিলেন। আজ সে গোয়াল ঘর পরিষ্কার করিতেছিল। এখন ডাক পড়ায় শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া বলিল, "এস দিদি এস, বস।" কনে'-গিন্নী সুর টানিয়া "না ভাই, আর বস্‌বে না" বলিতে-বলিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। নন্দর মা তাহাকে আবার "বস বস" বলিয়া ভাজকে বলিল "ও বৌ, তোর কনে' দিদি এসেচে, বস্‌তে দে।" ননদের কথা-মত সে তৎক্ষণাৎ একটি পিঁড়া আনিয়া দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া বলিল, "বস দিদি।" "না ভাই, এখন সময় নেই" বলিয়া তাহার উপর বসিল; বলিল, "কবে এলি হেমা? কদ্দিনকার ছুটি নিয়ে এসিচিস্?"

এই সময় হেমার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখা যাইত যে, এই কথায় তাহার মুখখানি মুহূর্ত্তের জন্য শুকাইয়া গেল। আন-মনে বলিয়া ফেলিল, "না দিদি, ছুটী নিয়ে আসিনি। গিন্নী-মা আমায় তাড়িয়ে দিয়েচে।" বলিতে-বলিতে তাহার চক্ষে জল আসিল। কনে'-গিন্নী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "সে কি—তুই কি ক'রেছিলি? হঠাৎ তাড়িয়ে দিলে কেন?"

"সে অনেক কথা দিদি। শুনে কাজ নেই।" কনে-গিন্নী বলিল, "আমার ত বিশ্বাস হয় না যে, গিন্নী তোকে তাড়িয়ে দিয়েচে—কেন না—" হেমা বাধা দিয়া "হ্যাঁ দিদি, আমি কি তোমায় মিথ্যে ব'ল্‌চি" বলিয়া, একটি-একটি করিয়া, যাহা-যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই বলিল। শুনিয়া কনে-গিন্নী বলিল "তা তুই যা'ই বল্ হেমা, তোরই কিন্তু দোষ! তুই আসবার সময় গিন্নীকে কিছু ব'লে এলিনি কেন? এটা কি তোর ভাল করা হ'য়েচে?" "তা যেন হয় নি দিদি! কিন্তু গিন্নী-মাও ত আর একবারও আমায় থাক্‌তে ব'ল্‌লে না। কর্ত্তা যখন আমার ছ'মাসের মাইনে ফেলে দিলেন, তখনও ত আমায় ব'কে-ঝ'কে বুঝিয়ে ব'ল্‌লে পারত? তা'ও ত করলে না!" ক'নে-গিন্নী অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "তা বটে, কিন্তু আর বোধ হয় তোকে ডাক্‌বে না—না?"

এই কথায় হেমার মুখে ক্ষণিক মৃদু হাসি দেখা দিল। বলিল—"না দিদি; গিন্নী-মা ত আগে অমন ছিল না। বড় ব্যাটা, বড়-বৌ মারা যাবার পর থেকে একটু খিট্‌খিটে হ'য়েছিল; তার পর বড় নাতি চারু আজকাল বদ্ হওয়ায় আরও বেশী হ'য়েচে। সে যা হোক, কিন্তু আজ একমাস আমার সঙ্গে কথা না ব'লে সে যে কেমন ক'রে আছে, আমি তাই ভাবছি। এই দেখ না, কোন্ দিন বল্‌তে কোন্ দিন গাড়ী ভাড়ার টাকা আসে! লোকের নামে মিথ্যে কথা বল্‌তে নেই দিদি—গিন্নী-মা আমায় বড্ড ভালবাসে; এক দণ্ড না দেখ্‌তে পেলে, নন্দর মা, নন্দর মা ক'রে বুড়ীর যেন দম বেরিয়ে যায়।" "বলিস্ কি—তোকে এত ভালবাসে কেন বল্ ত?" "তবে বলি শোন" বলিয়া নন্দর-মা বলিতে আরম্ভ করিল, "আমি কি ওদের বাড়ীর আজকের লোক দিদি? তুমি আর এ দেশে কদ্দিন এসেচ, তা' সব জানবে বল! জানে ওই ওপাড়ার বামুন দিদি। আমি যখন ওদের বাড়ী ঢুকি, তখন কি ওদের ঐ অত বড় তেতলা বাড়ী ছিল। ছোট্ট একতালা বাড়ী, আর রান্না ঘরটা খোলার! তখন কর্ত্তার ছেলেগুলো সবে এতটুকুটুকু;—কেউ একটা পাশ ক'রেচে, কেউ ক'রবে এমন ধারা। কর্ত্তা তখন সবে আইন পাশ ক'রে বছর আট নয় আদালতে বেরুচ্চেন। তার পর দেখ্‌তে-দেখ্‌তে ছেলেরা বড় হ'ল—উপায় ক'ত্তে শিখ্‌লে। কেউ ডাক্তার হ'ল, কেউ উকিল হ'ল, কেউ বা ডেপুটী হ'ল। বড় ছেলের বিয়ে হ'ল, তা'তে কত টাকা পেলে। তার পর পিঠে-পিঠে সব ছেলেদের বিয়ে হ'য়ে গেল। এই একতালার ওপর দু'তালা, দু'তালার ওপর তেতালা; গাড়ী, ঘোড়া; দাস-দাসী ধাঁ-ধাঁ ক'রে সব হ'ল। ঐ গিন্নীই ত ওদের লক্ষ্মী কি না!—হাঁ, গিন্নী যদি ব'ল্‌তে হয় ত ঐ গিন্নীকে। আর কর্ত্তার চেয়ে গিন্নীর মন ভাল, গরিবের ওপর দয়া-মায়া খুব। এত বয়স হ'ল, এক বড় ছেলে আর বড় বৌয়ের শোক ছাড়া অন্য কোন শোক-তাপ পায়নি।"

এতক্ষণ কনে-গিন্নী চুপ করিয়া শুনিতেছিল। তাহার কথা শেষ হইলে বলিল, "হ্যাঁ, ভাল কথা,—তুই এলি, নন্দ এল না? সে আজকাল কি ক'চ্চে?"

"সে আসবে কি দিদি,—আস্‌বার আগে তা'কে কি জানাতে পাল্লুম? সে যে কল্‌কাতায় বোর্ডিং ইস্কুলে পড়্‌চে। আর দু'বছর গেলে তবে এন্‌টেন্‌স্ পাশ ক'রবে।" "আর পড়া কেন? এবার একটা কাজ কর্ম্মে ঢুকিয়ে দাও না!" "বাবারে! এখন ওকে পড়া ছাড়ালে কি আমার বাবার মাথা বাঁচবে? গিন্নী তা হ'লে আমায় আস্ত খেয়ে ফেল্‌বে। ওই ত খরচা দিয়ে তা'কে বোর্ডিং ইস্কুলে ঢুকিয়েচে।"

"ওমা, এমন ধারা, তা ভাল" বলিয়া আরও অনেক বিষয়ের কথা কহিবার পর কনে গিন্নী বলিল "যাই, দেরী হ'য়ে গেল—আর ব'স্‌ব না।" নন্দর মা শশব্যস্তে ভাজকে ডাকিয়া বলিল, "ও বৌ, তোর কনে' দিদিকে পান দে—এইবার যে বাড়ী যাবে।" বৌ তৎক্ষণাৎ দু'টি পান ছেঁচিয়া আনিয়া তাহার সুমুখে ধরিল। কনে-গিন্নী পান মুখে ফেলিয়া বৌয়ের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "বেশ বৌ, এমন না হ'লে বৌ গা!" বৌ লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া ঘরে চলিয়া গেল। হেমা বলিল "দেখ দিদি, তোমাদের পাঁচ-জনের আশীর্ব্বাদে ভগবান্ ওর কোলে যা হয় একটা দিন, তবু দেখে সুখে মরতে পাই।" কনে গিন্নী খন্‌খন্ করিয়া বলিল, "ওমা, সে কি কথা! হ'বে বৈ কি। ওর ভাল মন, ভগবান্ ওর মনে কি কষ্ট দেবে? আর ভাল ত হ'বেই —ননদ যেমন ভাজও ত তেম্‌নি হ'বে।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

৫

জামাই-বাড়ী তত্ত্ব পাঠাইবার জন্য কল্যাণী আজ সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিলেন। কোন্ চাকর কোন্ জিনিসটী নিয়ে যাবে, কোন্ জিনিসটী ভাল হ'ল, কোন্‌টা বা মন্দ হ'ল, কাপড়খানি তত ভাল হয় নি ভেবে কুটুম-বাড়ীর পাঁচজনে পাঁচকথা ব'ল্‌বে কি না—ইত্যাদি নানা ভাবনায় আজ তাঁহার মেজাজের বড় ঠিক ছিল না। আবার শুধু ইহাই নহে। আজ সকাল থেকে সেজ-বৌ আর তাহার খোকার অসুখ করিয়াছে। সে আবার আর এক ভাবনা। এই সকল নানা ভাবনায় বিরক্ত হইয়া আজ তিনি ঘণ্টায় পাঁচবার বলিয়াছেন, "এ সব কি আমার একলার দেখবার কথা!" আবার নিজেও আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, "তা, যে দেখ্‌বে, সে যে যমের বাড়ী গেচে, কাজেই আমায় একলাই সব দেখ্‌তে হ'চ্চে।

এত ঝি চাকর, বৌ-ঝি র'য়েচে,—কিন্তু সে মাগী ছাড়া এ সব দেখ্‌বার আর কার যোগ্যতা আছে বল? নাঃ—আমি আর এমন করে পারি নে!"

সন্ধ্যার সময় আহ্নিক করিতে গিয়া দেখিলেন, আহ্নিকের কিছুই আয়োজন নাই—মেজ-বৌ কিন্তু হাত-পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। দেখিয়া তাঁহার গা জ্বলিয়া গেল; চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ পা ছড়িয়ে বসে বসে কার ছেরাদ্দ ক'চ্ছিলে বৌ, তাই এখনও আমার আহ্নিকের আয়োজন হয় নি!" মেজ বৌ মনে মনে "তোমার" বলিয়া প্রকাশ্যে কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল, "আমি আর কার ছেরাদ্দ করব মা? বাপ, মা, দু'জনাকেই ত খেয়েচি!" পরে "মা গো, তুমি কোথা গো—আমায় সঙ্গে করে নাও গো" ইত্যাদি বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল।

কল্যাণী তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া নিজেই কোশাকুশী ধুইয়া, আসন পাতিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিলেন। মেজ-বৌ অল্পক্ষণ পরে সেখান হইতে উঠিয়া আপনার ঘরে গেল। মিছামিছি অসুখের ভাণ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া ঘামিতে লাগিল।

খেঁদী কোথায় ছিল। মেজ বৌয়ের ক্রন্দন শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। এঘর-ওঘর করিয়া মেজ-বৌয়ের ঘরে গিয়া দেখিল, মেজ-বৌ লেপের ভিতর হইতে, খুব জ্বর হইলে লোকে যেমন গোঁ-গোঁ করে, তেমনি করিতেছে। ঘরে কোন আলো জ্বলিতেছিল না, কেবল বাতায়ন-পথে চন্দ্রমার স্নিগ্ধ রশ্মি প্রবেশ করিয়া গৃহতল উজ্জ্বল করিয়াছিল। খেঁদী ঘরে ঢুকিয়াই সুইজ টিপিল—ধপ করিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে চন্দ্ররশ্মির মনোরম উজ্জ্বলতা মলিন ভাব ধারণ করিল। খেঁদী তাহার লেপ তুলিয়া বলিল, "কি হয়েচে বৌ-দি?" কল্যাণী বিনাদোষে তাহাকে যাহা-যাহা বলিয়াছিলেন, বৌদি' সংক্ষিপ্ত অলঙ্কার-যোগে সমস্তই বলিয়া জানাইল যে, সেই জন্যই তাহার জ্বর হইয়াছে। খেঁদী তাড়াতাড়ি আপনার হাতটা তাহার কপালে ছোঁয়াইয়া বলিল "তাই ত, গা যে পুড়ে যাচ্ছে! না,—গিন্নী থাকতে তোমারও এ বাড়ী থাকা পোষাবে না। আর আমারও পোষাবে না;—তুমি বৌদি' এর যা হয় একটা বিহিত কর; যাই—আবার এখুনি হাঁক পড়বে।" এই বলিয়া আলোটা নিভাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, "তাই ত, এখনও জান্‌লা কেন খোলা র'য়েচে?" এই এই বলিয়া সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

কল্যাণী ঘরে ঢুকিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হ'য়েচে মা—এমন সময় শুতে এলে কেন? আমার কথায় রাগ ক'রেচ? আর মা, তোরা যদি বুড়ীর কথায় রাগ করবি, ত পরে কেন সইবে বল্? ওঠ', মা আমার ওঠ।" এই বলিয়া তিনি মেজ-বৌয়ের হাত ধরিতেই সে বলিল,—"না, এখন আমি উঠ্‌ব না। আমার অসুখ ক'রেচে। আর তোমার কথায় রাগ ক'রব কেন মা—আমার বরাতের দোষ।" কল্যাণী তাহার শেষ কথাটা শুনিতে পাইলেন না। তাহার কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "জ্বর হ'য়েচে! কৈ মা, তোমার গা ত তত গরম হয় নি—" মেজ-বৌ বাধা দিয়া বলিল,"মিথ্যে ক'রে জ্বর হ'য়েচে বল্‌চি।" কল্যাণী সে কথায় কাণ না দিয়া বলিলেন, "জ্বর, আর জ্বর! জ্বরের যেন কি হয়েচে;—তোমার জ্বর, সেজ বৌমার জ্বর, তার ছেলের জ্বর—আর পারিনে মা, এমন ক'রে। আর সুরেশই বা গেল কোথা? সেই বেলা দশটার সময় বেরিয়েচে, এখনও বাড়ী আসার নাম নেই। ভাল, বাড়ীতে অসুখ, তুই কোন্ অন্য কোথাও না গিয়ে আজ বাড়ীর সকলকেই দেখ্‌লি-শুন্‌লি। কাকে কি ব'লব মা! যাই, দেখি, আজ আবার নূতন ঝিও বল্‌ছিল 'অসুখ-অসুক ক'র্‌চে'।" বলিতে-বলিতে চলিয়া গেলেন।

* * * * *

সেজ-বৌ শুইয়া ছিল। তখনও তাহার জ্বর ছাড়ে নাই। কল্যাণী ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কি মা, কেমন আছ?" শাশুড়ীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিতে গেল। কল্যাণী বলিলেন "থাক্, থাক্, বস্‌লে কষ্ট হবে।" সেজ-বৌ আবার শুইয়া পড়িল। কল্যাণী বলিলেন, "তাই ত মা, এখনও মেজবাবু বাড়ী এল না। এখন থাক্‌লে একবার দেখ্‌তে পার্‌ত কে কেমন আছ। আবার মেজ-বৌয়েরও জ্বর হয়েচে না কি।" এই বলিয়া তিনি খোকার গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, বেশ ঠাণ্ডা। পরে অমলার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "উঃ! তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে মা। তোমার খুব কষ্ট হচ্চে, না?" এই কথায় অমলা পাশ ফিরিতে-ফিরিতে আপনার রক্তহীন ঠোঁট দু'টী নাড়িয়া বলিল, "না মা, তবে শরীরটা কেমন ম্যাজ-ম্যাজ

কর্‌চে।” কল্যাণী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কি কর্‌ব মা, যদি হাত দিয়ে ভাল করবার হ’ত ত এখুনি কুরতুম। দেখি, মেজবাবু এল কি না—” বলিতে-বলিতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইবামাত্র অমলা বলিল, “হাঁ মা, মেজদির কখন অসুক কর্‌ল?” “কি জানি মা—মেজ-বৌয়ের অসুখ—মেজ-বৌই জানে” এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

৬

রাত দশটার সময় মেজবাবু বিষণ্ণ মনে আপনার ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, স্ত্রী বিছানায় শুইয়া “উঁ, আঁ” শব্দ করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “কি হ’য়েছে!” স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, “হবে আবার কি? আমি আর এখানে থাক্‌ব না—আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।” “বেশ, তার জন্যে আর কি—কালই পাঠিয়ে দেব।” এই বলিয়া সুরেশ বাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। স্বামী তাহার কথা শুনিয়া কোন কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ ভাবে উত্তর করায় রাগে, অভিমানে মেজবৌয়ের সর্ব্বাঙ্গ যেন পুড়িয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গে-সঙ্গে আর এক নূতন চিন্তা—স্বামী যদি কাল সত্য-সত্যই তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে সে কি করিবে?

এদিকে সুরেশ বাবু বরাবর কল্যাণীর নিকট যাইয়া বলিলেন, “কি হ’য়েছে মা?”

“কিসের বাবা?” “ওই যে, ও ব’ল্‌ছে—আর এখানে থাক্‌ব না—বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।”

এই কথায় কল্যাণী চম্‌কাইয়া বলিলেন, “সর্ব্বনাশ, এ কথা ও ব’লেচে? কি জানি বাবা, ও কেমন ঘরের মেয়ে। কি হয়েচে তবে বলি শোন—” কল্যাণী, মেজ-বৌয়ের রাগের কারণ পুত্রকে এক-একটি করিয়া সমস্তই বলিলেন। পরে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিতে লাগিলেন, “আমিই যেন এ বাড়ীর আপদ হয়েচি। বাড়ীর সব কাজই হ’চ্চে—কেবল আমার কাজটাই পড়ে থাকে। মর-মর, এতদিন তোদের কি আমার কোন কাজ ক’র্‌তে হ’ত? সেই পোড়ারমুখী গিয়ে পর্য্যন্তই ত আমার এই দশা হ’য়েচে! যার যা’ ইচ্ছে ক’রে নে—আমি আর ক’দিন। আমি আর কাউকে কিছু বল্‌ব না। বল্‌লেই ত সেও যেমন কড়্‌কে চলে গেল, তোরাও ত তেম্‌নি যাবি। কিন্তু তোরা যে বুড়োবয়সে আমার মনে কষ্ট দিয়ে সুখী হবি, তা’ মনের কোণেও ঠাঁই দিস্‌নে।” বলিতে-বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে ঝর্‌-ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সুরেশ আস্তে-আস্তে চলিয়া গেলেন।

* * * *

পর দিন সকালে মাতার নিকট যাইয়া সুরেশ বাবু বলিলেন “মা, এস একবার—সেজ-বৌমা কেমন আছে, দেখে আসি। আমায় আবার এখুনি বেরুতে হ’বে।” “আজ আবার কোথায় বেরুবি বাবা! বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ ক’রেচে—আজকের দিনটা থাকই না বাড়ীতে।” “না—আজ আর অন্য কোথাও যাব না। ওকে রেখে আস্‌ব।” “কাকে, কোথা রেখে আস্‌বি? মেজ বৌমাকে বুঝি বাপের বাড়ী পাঠাবি?” সুরেশ বাবু মাথা হেঁট করিয়া উত্তর দিলেন, “হাঁ।” কল্যাণী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “সে কি! তোরা পাঁচজনে মিলে আমাকে বুড়োবয়সে কি পাগল করবি রে? কি হল, না হ’ল, তার জন্যে রাগ ক’রে পাঠাবার কি দরকার? বড়-বৌ ত অনেক দিন হ’ল, জগৎ ছেড়ে চ’লে গেছেই,—তার পর নন্দর মা ছিল, সেও গেল। এখন আবার মেজ-বৌও চল্লো—আমি কা’কে নিয়ে থাক্‌ব তবে?” বলিতে-বলিতে দু’ফোঁটা অশ্রু তাঁহার কোঠরগত চক্ষু হইতে গণ্ড বহিয়া পড়িয়া গেল।

সুরেশের মনে ব্যথা লাগিল। আত্মহারা হইয়া মাতার পদস্পর্শ করিয়া বলিলেন, “তোমার পা ছুঁয়ে ব’ল্‌ছি মা, ওর এ বাড়ী ছাড়াই মঙ্গল। কাল রাত্রে ওর সঙ্গে আমার অনেক তর্ক হয়ে গেছে। ওর মুখে তোমার নিন্দে আর আমি সহ্য করতে পারি নে। আমি হতভাগা, তাই তোমার ঘরে এমন বৌ। ওর কথা আর আমায় ব’ল না মা—আজ আমি ওকে পাঠাবই পাঠাব।” উপযুক্ত পুত্র শিশুর ন্যায় তাঁহার পায়ে হাত দিতেই কল্যাণী আপনার হাত পুত্রের গালে ঠেকাইয়া হাত মুখে তুলিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন, “ও আমার নিন্দে করেচে—তাই তোমার এত রাগ! তা’ ক’ল্লেই বা, করুক। তবু ত আমার ছেলের বৌ। আর পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান হয় বাবা! ওকে পাঠিয়ে কেন আর আমায় বুড়োবয়েসে কষ্ট দিবি?” এইবার সুরেশ বাবু সহজভাবে বলিলেন “আচ্ছা, সে যা’ হয় হবে এখন। চল, দেখে আসি বৌমা কেমন আছে।” কল্যাণী আর

কোন কথা না বলিয়া তাঁহাকে লইয়া সেজ-বৌয়ের ঘরে গেলেন।

সুরেশ বাবু, অমলা ও তাহার খোকার দেহ পরীক্ষা করিবার পর, কোন কথা না বলিয়া বিষণ্ণ মনে ঘর হইতে বাহিরে আসিতে উদ্যত হইবামাত্র কল্যাণী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, কেমন দেখ্‌লে ?" তিনি আসল কথা গোপন করিয়া উত্তর দিলেন, "এক রকম ভাল আছে -বটে, কিন্তু বৌমাকে বোধ হয় আরও দিন দশ ভোগাবে। যাই, এখুনি ওষুধ আনাতে হ'বে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী বৌমার বিছানায় বসিলেন। অমলা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "আপনার কি হ'য়েচে মা ?" "কৈ কি হ'য়েচে মা, কিছু ত হয়নি।" অমলা পাশ ফিরিয়া বলিল, "আপনার মুখ বড় শুকিয়ে গেচে।" "হাঁ মা, বড় ভাবনায় প'ড়িচি। তোমার অসুখ, তার পর মেজ-বৌও হয় ত বাপের-বাড়ী যাবে। সেই চিন্তায় আমায় কাতর ক'রে তুলেচে। বুড়ো বয়সে, এ সব আর সয় না মা।" অমলা ব্যগ্রভাবে বলিল "কেন! এখন বাপের বাড়ী শুধু শুধু কি ক'ত্তে যাবে ?" "শুধু শুধু নয় মা—তবে বলি শোন।" এই বলিয়া কল্যাণী সমস্তই বলিলেন। শুনিয়া অমলা বলিল, "মা, বড়ঠাকুরকে ব'ল্‌বেন, দিদি এখন বাপের বাড়ী গেলে, আমি বোধ হয় সহজে সেরে উঠ্‌তে পারব না।" এই বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। প্রথমতঃ কাশি আসিয়া তাহার কথা বন্ধ করিল; দ্বিতীয়তঃ কাশি বন্ধ হইতে-না-হইতেই মেজবাবু ঔষধ লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। সুতরাং তাহার মুখ একেবারে বন্ধ হইল।

মেজবাবু ঘরে ঢুকিতেই কল্যাণী বলিলেন, "সেজ-বৌ-মা কি বল্‌চে শুনেচ ?" প্রলাপে কোন কথা বলিয়া থাকিবে ভাবিয়া সুরেশের মুখখানি চুপ্‌ করিয়া শুকাইয়া গেল। ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ব'লেচে ?" "তুমি মেজ-বৌমাকে বাপের বাড়ী পাঠাবে শুনে ব'ল্লে—'তা' হ'লে আমি সহজে ভাল হ'তে পার্‌ব না বোধ হয়।" "বাঃ—তুমি বুঝি ব'সে ব'সে কেবল ওকে বকাচ্চ ? ওকে এখন এ কথা বলবার কি দরকার ছিল ?" এই কথা বলিয়া অমলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "না বৌ-মা, সে জন্যে তুমি ভেবো না। যাবে আবার কোথা ?" কল্যাণী পুত্রের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "বাবা, ও কথা শুনিয়েচি বলে ওর জ্বর আরও বাড়্‌বে না ত ?" "না, তবে দরকার কি-ছিল বলবার ?"

৭

প্রায় দিন-বারো অত্যন্ত কষ্ট পাইবার পর, সুরেশ বাবু ও অন্য দুই জন যোগ্যতর ডাক্তারের আন্তরিক চেষ্টায় অমলা আজ পাঁচ দিন হইল পথ্য পাইয়াছে।

আজ দুপুর বেলা কল্যাণী আপনার ঘরে বাক্স খুলিয়া কি খুজিতেছিলেন, এমন সময় বাহির হইতে চারু ডাকিল, "মা!" কল্যাণী মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিলেন "কে বাবা চারু, আয়; কখন এলি ?"

বাল্যকাল হইতে চারু কল্যাণীকে "মা" বলিয়া ডাকিত। এখন বড় হইয়াও সে দোষ সংশোধন করিতে পারে নাই; তবে, অপর কাহারও কাছে ঠাকুরমার কোন কথা বলিতে হইলে, তাঁহাকে "ঠাকুর-মা" বলিত। কল্যাণীও তাহার বাল্যকাল হইতে তাহাকে "বাবা" বলিয়া আদর করিতেন। তিনিও আজ অবধি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

কয়দিন চারু বাড়ী ছিল না। সে তাহার মামার সঙ্গে কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল। কল্যাণীর উপরিউক্ত প্রশ্নে চারু বলিল "অনেকক্ষণ এসিচি।" এই বলিয়া দালানে বেঞ্চির উপর বসিল। কল্যাণী বলিলেন, "ভাত খেয়েচিস্‌ ?" চারু "হাঁ খেয়েচি" বলিয়া আবার নরম সুরে ডাকিল, "মা—"

এইবার কল্যাণী বেশ বুঝিলেন, গুণধর নাতির নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে। একটু বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন, "কেন রে, কেন ?" "আজ আমায় পাঁচটা টাকা দাও—অর্‌ফ্যান্‌ ফণ্ডের চাঁদা দিতে হবে।" "হাঁ, দোব বৈ কি—টাকা আমার কাছে কাঁদ্‌চে।" চারু ছেলেমানুষের মত আবদার করিয়া বলিল, "না—না, দাও। না দিলে ফ্রেণ্ডদের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ব না।" কল্যাণী বিরক্তভাবে বলিলেন, "টাকা কোথা পাব রে ? আর টাকা নিয়ে কর্‌বি কি ?" "ওগো, আমরা পাঁচজনে মিলে একটা অর্‌ফ্যান্‌-ফণ্ড খুলিচি—তারই চাঁদা দিতে হবে।" "কি খুলিচিস্‌ ?" "সে তুমি বুঝবে না। তবে বাঙ্গালা করে' বলি শোন। এই বাপ-মা-মরা, অসহায় ছেলেদের সাহায্য করবার জন্য একটা 'ফণ্ড' করিচি। ফণ্ড মানে বোঝ ত—টাকা জমা

বার বাক্স।" "তোমার মুণ্ডু। ছেলে আমার কি একবারে বি-এ, এম্-এ পাশ ক'রেচেন—তাই কথায়-কথায় ইংরিজি ব'ল্চেন। সেই কথায় বলে না,—পচা আদার ঝাল বেশী—তাই হ'য়েচে তোর। তিনবার ফেল হ'য়েও একটা পাশ করতে পারলেন না—উনি আবার মেয়েমানুষের কাছে ইংরিজির মানে ব'ল্চেন। যা না তোর কাকাদের কাছে—কাণ ধরে ইংরিজি শিখিয়ে দেবে এখন।"

আপনার নিন্দা শুনিয়া চারু হাড়ে-হাড়ে জ্বলিয়া গেল। ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "টাকা দেবে কি না বল?" "আমি টাকা কোথা পাব' রে। যা কর্ত্তার কাছে বল্'গে যা।" চারু আরও রাগিয়া বলিল, "তুমি দেবে না ত পাঁচটা টাকা?" কল্যাণী বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "পাঁচ্টা টাকা! বলে একটা পয়সা নেই আমার হাতে!" চারু আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেশ, দিও না; কিন্তু আজ থেকে আর, আমি বাড়ী আস্‌ব না। যদি আসি ত আমায় "কুকুর" বলে ডেকো।" এই বলিয়া গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেল। কল্যাণী শশব্যস্তে বলিলেন "ওরে শোন্, শোন্।" চারু সেইভাবে ঘুরিয়া আসিয়া রাগভরে বলিল, "কি?" কল্যাণী সহজভাবে বলিলেন, "কি করবি টাকা নিয়ে"? "বল্লুম ত, অরফান্-ফণ্ডের চাঁদা দিতে হবে।" "আচ্ছা বাবা, এই নে, আমার কাছে দু'টি টাকা আছে।" এই বলিয়া তিনি আঁচল হইতে দুটী টাকা খুলিয়া দিতে গেলেন। চারু মাথা নাড়িয়া বলিল "না—দু'টাকা নিয়ে কি হ'বে,—রেখে দাও তোমার টাকা।" এই বলিয়া আবার চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। কল্যাণী কাতরভাবে বলিলেন, "নে বাবা, এই-ই নিয়ে যা।" "না—দু'টাকা আমি নোবো না।" এইবার কল্যাণী বাস্তবিক রাগিয়া বলিলেন, "না নিবি ত মরগে যা।" চারু খানিক গিয়া রাগে গোঁ-গোঁ করিতে-করিতে আবার ফিরিয়া আসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "দাও।" কল্যাণী টাকা দু'টী ফেলিয়া দিলেন। চারু কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। এই সময়, কি জানি কেন, কল্যাণীর চক্ষুর্দ্বয় ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিল।

পূজার আর অধিক দিন বিলম্ব নাই। সওদাগরী আফিসের কেরাণীদের মনে কষ্ট দিয়া আজ হাইকোর্ট বন্ধ হইয়াছে।

জলযোগের পর হরিচরণ বাবু হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী আসিলেন। কল্যাণী বলিলেন "হ্যাঁ গা, ক'দিন ধ'রে তোমায় জিজ্ঞেস্ করচি, এবার কোথা যাওয়া হ'বে,—কৈ এখনও ত তা'র একটা ঠিক্ উত্তর দিলে না?" কর্ত্তা গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তুমিই বল না, কোথা গেলে ভাল হয়!" "আমি বলি, এবার মধুপুরে না গিয়ে কাশী যাই চল। চারুকে নিয়ে যাব। বাবা বিশ্বেশ্বর করুন, তা'র যেন সুমতি, সুবুদ্ধি হয়।" "বেশ, তাই চল। আর এবার কাশী যাওয়াই ভাল। কেন না সেখানে বাড়ী কেনার পরে তিন বছর হ'ল, সেই মোটে একবার যাওয়া হ'য়েছিল।" এই বলিয়া অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "বেশ কথা, তবে আর দেরী করার আবশ্যক কি? পরশু দিনই যাওয়া যাবে—কি বল?" স্বামীর উত্তরে কল্যাণী দ্বিগুণ উৎসাহে বলিলেন, "হ্যাঁ, বাড়ীখানি প'ড়ে আছে; তা' ছাড়া, চারুকে নিয়ে গেলে, বাবার কৃপায় তার যদি সুবুদ্ধি হয়!" "তা' ত বটেই" বলিয়া কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কে যাবে তবে?" "কেন, সেজ-বৌমা যাবে, মণি (অমলার স্বামী) যাবে। তার পর চারু আছে, আমি আছি, তুমি আছ। আর দু'জন চাকর, আর দুটো ঝিকেও ত সঙ্গে নিতে হবে! আবার কি?" "ওঃ—তা হলেই যথেষ্ট! তা' হলে, কি নিতে হবে না হবে, কাল তুমি সব গুছিয়ে নিও।" কল্যাণী বলিলেন, "তা ত নিতেই হ'বে।"

আজ এ বিষয়ে আর কোন কথা হইল না। পরদিন দুপুর বেলা সকলের আহারাদির পর ছোট-বৌ কল্যাণীকে বলিল, "আমি যাব মা।" কল্যাণী সহানুভূতি দেখাইয়া কাতরভাবে বলিলেন, "তুমি ভরা-পোয়াতী, কোথা যাবে মা? আশীর্ব্বাদ করি, বাপের বাড়ী থেকে ভালয়-ভালয় পয়সো হ'য়ে এস।" ছোট-বৌ এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে না পারিয়া, আবদার করিয়া বলিল, "তবে আমি আস্‌চে বছর যাব।" কল্যাণী একমুখ হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মা, আস্‌চে বছর ছেলে নিয়ে বাবার পূজা দিয়ে আস্‌বে।" ছোট বৌ চুপ করিল।

কল্যাণী মেজ-বৌকে ডাকিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "তবে মা, কাল থেকে তুমি এ সংসার দেখো-শুনো। আশীর্ব্বাদ করি, এসে যেন দেখি, সকলে ভাল আছে।" তিনি তাহার হাতে বাক্সর চাবিটী দিয়া বলিলেন, "যদি বেঁচে থাকি,

তবেই ফিরে এসে আবার তোমার কাছ থেকে চাবি হাতে করে, তোমার বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলতে পারব; আর যদি মরে যাই, ত আজ থেকেই তোমার মাথায় ভার চাপল।"

৯

প্রায় দশ দিন হইল হরিচরণ বাবু সপরিবারে কাশী আসিয়াছেন। কাশীতে আসিয়া অবধি চারু প্রত্যহ গঙ্গাস্নান না করিয়া জলস্পর্শ করে না। ইহাতে কল্যাণী মনে করেন যে, বাবা বিশ্বেশ্বর তাঁহার প্রার্থনা কাণ পাতিয়া শুনিয়াছেন—তাই গঙ্গাস্নানে চারুর এত ভক্তি!

আজ কল্যাণী গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দেখিলেন, কিছু দূরে চারু একটি পরমা সুন্দরী বালিকার দিকে এক-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। তাহার চোখ দু'টি দেখিলেই, তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। চারুর গঙ্গা-ভক্তির যথার্থ কারণ এখন তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। হাসিয়া সেজবৌয়ের দিকে ফিরিয়া কল্যাণী বলিলেন, "দেখ বৌমা, দেখ, ঠিক্ যেন ননীর পুঁতুল।" সেজ-বৌ প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারিল না। শেষে বালিকার দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিয়া উঠিল, "হাঁা মা, ঠিক্ যেন ছবিটি! কিন্তু খুব গরীবের মেয়ে, নয় মা?" "হোক গরীবের মেয়ে, কিন্তু ওকে দেখে আমার মনে হচ্চে যে, আমার ঘর আলো করবার জন্যেই ও লক্ষ্মীর জন্ম হয়েচে। দাঁড়াও আমি এক-বার ওকে ডাকি!" এই বলিয়া তিনি বালিকার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া সস্নেহে ডাকিলেন, "ও মেয়ে, শোন ত একবার—এদিকে এস ত মা!"

বালিকার মুখখানি আরক্তিম হইল। ধীরে-ধীরে কল্যাণীর সুমুখে আসিয়া কোন কথা না বলিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। তাহার জাতির পরিচয় না পাইলেও, এই সময় কল্যাণীর তাহাকে কোলে করিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু এত লোকের সুমুখে একজন অপরিচিতা বালিকাকে কোলে করিতে তাঁহার লজ্জা হইল। কাজেই তিনি সে আশা ভবিষ্যতে পূর্ণ করিবার আশায় মনকে দমন করিলেন। তিনি তাহার দাড়িটী ধরিয়া মুখখানি উঁচু করিয়া সেজবৌকে বলিলেন, "যেমন মুখের শ্রী, তেমনি টকটক্ কচ্চে রং। এমন না হলে মেয়ে!"

এই বলিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি গা?" বালিকা মুখ তুলিয়া বলিতে গেল, পারিল না; লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। কল্যাণী বলিলেন, "বল মা, বল—লজ্জা কি! তোমার নাম কি মা?" বালিকা নীচু দিকে মুখ করিয়া কোকিল কণ্ঠে উত্তর দিল, "আমাকে 'মানী' বলে ডাকে। আমার নাম মালতী।" "তোমার বাপের নাম কি?" বালিকা পূর্ব্বের মত মাথা হেঁট করিয়াই ধীরে-ধীরে উত্তর করিল "বাবার নাম, মতিলাল বোস্।"

এই উত্তরে কল্যাণী যে কি বলিয়া বাবা বিশ্বেশ্বরকে ধন্যবাদ দিবেন, তাহা ঠিক্ করিতে পারিলেন না। করুণ-দৃষ্টিতে বালিকার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আহা!—তোমার বাপ নেই?" বালিকার গণ্ড বহিয়া টিপ্‌টিপ্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। কল্যাণী প্রথমটা দেখিতে পাইলেন না। অমলা তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া শাশুড়ীকে বলিল, "ওমা, ও কাঁদচে যে!" কল্যাণী "ওমা, তাই ত" বলিয়া তাহার মাথাটী আপনার কোলের মধ্যে টানিয়া বলিলেন, "কাঁদিস্ নে মা, চুপ কর্। আহা, ছেলেমানুষ!"

পিতার মৃত্যুর পর, এক পিসী ভিন্ন, ইহাকে আজ ছয় মাসের ভিতর কেহ কখনও এমন মিষ্টি কথা বলে নাই; তাই আজ কল্যাণীর কোলে মুখ লুকাইয়া বালিকা ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় একটি বুড়ী ছেঁড়া গামছায় গা মুছিতে-মুছিতে এদিকে আসিয়া মানীকে কল্যাণীর কোলের মধ্যে কাঁদিতে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েচে মা—ও কাঁদছে কেন?" গলার সুরে পিসী আসিয়াছে বুঝিয়া, বালিকা লজ্জায় কল্যাণীর কোল হইতে মুখ তুলিয়া লইয়া, আপনার ছেঁড়া আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিল।

কল্যাণী বুঝিলেন, বুড়ী বালিকার আপনার কেহ হইবে। কিন্তু সে ভাবে কোন কথা না বলিয়া, সহজ ভাবে বলিলেন, "মেয়েটির বাপ নেই, তাই বাপের কথা জিজ্ঞেস্ ক'রিচি ব'লে, বাপের দুঃখে কাঁদচে।" "হাঁা মা, মেয়ে আমার বাপ ছাড়া কাউকে জানত না। মা-মরা ধন, বাপের কাছেই সব ভুলে ছিল।" বলিতে-বলিতে বুড়ীর চোখেও জল আসিল। চোখ মুছিয়া বালিকাকে বলিল, "আয় মা, বাড়ী যাই।"

বালিকা যাইতে উদ্যত হইল। কল্যাণী তাহার হাত

ধরিয়া একটি টাকা তাহার হাতে দিতে গেলেন। সে হাত চাপিয়া রহিল। তখন তাহার পিসী বলিল, "ছি মা—উনি তোমায় দিচ্চেন, নাও। না নিলে পাপ হয়।" বালিকা টাকাটি ধরিল। কল্যাণী তাহার পিসীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মেয়েটি তোমার কে হয়?" "আমার ভাই-ঝি হয় মা।" "তোমরা কোথা থাক—তোমাদের আর কে আছে?" "কে আবার থাক্‌বে মা। আমি ছাড়া ওর মুখপানে চাইবার আর কেউ নেই মা।"

এই সময় আরও কয়জন বৃদ্ধা সেখানে আসিয়া জমা হইল। সকলেই অবাক্ হইয়া কল্যাণীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। কল্যাণী বৃদ্ধাকে বলিলেন "তোমরা থাক কোথা?" "আর মা! তোমাদের বাড়ীর উত্তর দিকে পাঁচখানা বাড়ীর পর যে বাড়ী সেই বাড়ীতে থাকি। সেই বাড়ীর কর্ত্তা দয়া ক'রে আমাদের একখানা ঘর ছেড়ে দিয়েচেন।" "তোমাদের চলে কি ক'রে? সেই বাড়ীর কর্ত্তাই কি খেতে দেন?" "না মা, ঘর দিয়েচে সেই আমার বাবার ভাগ্যি। চলে? ভাই দু'দশ টাকা রেখে গেছে, তাই ভাঙ্গিয়ে-ভাঙ্গিয়ে মেয়েটাকে মানুষ কচ্চি। তার পর আরও কিছুদিন পরে ভিক্ষে-সিক্ষে করব।" "মেয়ের বিয়ে দেবে না?"

বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "কোত্থেকে দোব মা? আমি গরীব ব'ল্‌লে, পোড়া সমাজ ত আর শুন্‌বে না। কায়েতের মেয়ে, বিয়ে দিতে গেলেই খুব কম ক'রে তিন শ' টাকার কম ত নয়-ই। কোথায় পাব মা তিন শ' টাকা। তবে যদি বাবা বিশ্বেশ্বর করেন, ত দয়া ক'রে কেউ যদি শুধু মেয়ে নিয়ে যায়, তবেই হ'বে। এই মনে ক'রে বসে আছি।"

এতক্ষণে কল্যাণী "যাই, বেলা হ'ল" বলিয়া বৃদ্ধার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আজ একবার মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের বাড়ী যেও না;—বেশ মেয়ে!"

"যাব বৈ কি মা—যাব" বলিয়া বৃদ্ধা মানীকে বলিল, "গিন্নী-মাকে গড় কর ত মা।" পিসীর কথায় মানী আস্তে-আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিতে গেল। কল্যাণী তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "হ'য়েচে মা, থাক্। বেঁচে থাক, সুখে থাক। রাজ-পুত্তুর বর হোক্।" ইত্যাদি আশীর্ব্বাদ করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গেলেন।

১০

বেলা বারটার পর মানীকে সঙ্গে লইয়া তাহার পিসী হরিচরণ বাবুর বাড়ী আসিল। তখন কল্যাণী উপরে বারাণ্ডায় বসিয়া চারুর সঙ্গে কৌশলে মানীর কথাই কহিতেছিলেন। অনেক হাসি-তামাসা, তর্ক-বিতর্কের পর তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সেই গঙ্গার ঘাটের পুতুলের মত মেয়েটার বদলে স্বর্গের অপ্সরী পাইলেও সে বোধ হয় তত সুখী হইতে পারিবে না।

মানীর পিসী বাড়ী ঢুকিয়াই ডাকিল, "মা কোথা গো—আমরা এসিচি।" কল্যাণী একটি ঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ওদের এখানে নিয়ে আয় ত।" ঝি চলিয়া গেল। চারু বলিল "কে ডাক্‌চে মা?" কল্যাণী নাতির মুখপানে চাহিয়া বলিলেন "মালতীর পিসী।" মালতীর নামে চারুর মন এক অজানা আনন্দ-দোলায় স্পন্দিত হইল। ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, "মালতী কে?" কল্যাণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ব'ল্‌ব কেন? আর ব'ল্‌লেই বা ক্ষেতি কি? আজ সকাল গঙ্গা নাইতে গিয়ে একটা টুক্‌টুকে মেয়ে দেখে এসিচি। তা'রই নাম মালতী।"

চারু তাঁহার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া অস্পষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি ওদের আস্‌তে বলেছিলে?" কল্যাণী অল্প উঁচু গলায় বলিলেন, "তোর সে খপরে কাজ কি? যা' মনে কচ্চ, তা' হবে না!" "আঃ—কি মনে কচ্ছি আমি?" "মনে কচ্ছ—আমি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করব। তা' হ'চ্ছে না বাবা!" চারু মৃদু হাসিয়া বলিল "যাওঃ—যাওঃ, আমার ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই! এই আমি চল্লুম—" বলিতে-বলিতে, সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া একটা ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল।

ঝি সেই বৃদ্ধা আর মানীকে সঙ্গে লইয়া কল্যাণীর নিকট হাজির হইল। বৃদ্ধাকে দেখিয়া কল্যাণী শশব্যস্তে বলিলেন, "এস, এস—বস।" তাহারা উভয়ে বসিল। বালিকার সুদীর্ঘ কেশগুলি সানে লুটাইতেছে দেখিয়া কল্যাণী সেজবৌকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা, কর্ত্তাবাবু ঘুম থেকে ওঠ্‌বার আগে, তুমি বেশ করে এর চুলটা বেঁধে দাও ত।" সেজ-বৌ তৎক্ষণাৎ সুবাসিত তৈলদ্বারা তাহার মাথা বাঁধিতে বসিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সেজবৌয়ের

নৈপুণ্য দেখিয়া কল্যাণী তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কল্যাণী বৃদ্ধাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধা—পূর্ব্বে এই কাশীতে তাহার পিতা কিরূপ গণ্য মান্য ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পর কি করিয়া তাহার ভাই মতিবাবু আর একখানি বাড়ী কিনিয়াছিল; পরে হরি মুখুয্যের সঙ্গে মকদ্দমায় কি করিয়া একে-একে সমস্ত বিষয়াদি ছারখার হইয়া যায়; তার পর তাহার ভাজ চার বছরের কন্যা রাখিয়া মরিয়া গেলে, কিছু দিন মতিবাবু কিরূপ পাগলের মত হইয়াছিল; কত কষ্টে মেয়েটিকে মানুষ করা হয়; শেষে ছয় মাস হইল তাহার হাতে মানীকে সঁপিয়া দিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া মতিবাবু মারা গেল;—ইত্যাদি সমস্তই বলিল। শুনিয়া কল্যাণী বলিলেন, "ওঃ,—তা, হ'লে আজই তোমাদের এই অবস্থা! ভগবান কাঁকে কখন কি করেন, তা' কে বল্‌তে পারে মা?" আরও দু'একটি কথা কহিয়া তিনি "তোমরা ব'স, আমি আস্‌চি" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

হরিচরণ বাবু সবেমাত্র উঠিয়া দুই হাতে চোখ ঘসিতেছিলেন, এমন সময় কল্যাণী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "কেমন একটা জিনিস এনিচি দেখ্‌বে?" কর্ত্তা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি জিনিস?" কল্যাণী স্বামীর মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখালে আমায় কি দেবে বল?"

আজ অনেক দিনের পর স্ত্রীর মুখে এরূপ আবদারের কথা শুনিয়া কর্ত্তা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আর কি নেবে বল?" "আচ্ছা, আগে জিনিস দেখাই—তার পর দাম বল্‌ব।" এই বলিয়া কল্যাণী বাহিরে আসিলেন।

দু'এক মিনিট পরে মালতীকে কোলে করিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "ঘটক-বিদায়—পঞ্চাশ টাকা!" কর্ত্তা মহাশয় একবার বালিকার আপাদমস্তক বেশ করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মেয়েটী বেশ। কা'দের মেয়ে?" কল্যাণী সংক্ষেপে বালিকার পরিচয় দিয়া বলিলেন, এইটীকে নাত্‌বৌ ক'র্‌বে?" "না—না, তা'কি হয়? ছেলেকে যত্ন করবার কেউ নেই; তা' ছাড়া, আমিও একটি মেয়ে দেখেছি; মেয়েও বেশ সুন্দরী,—গয়না-নগদে প্রায় ছ'সাত হাজার টাকাও দেবে বলেচে। বনিদি ঘর—সব দিকেই ভাল—"

কল্যাণী স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "দেখো, টাকাটাই কি বড় হ'ল? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তোমার ত কোন অভাব নেই! আর যত্ন করার কথা বলছ—তা' আমরা ত আর মেয়ে দিচ্ছি না—"

কর্ত্তা চুপ করিয়া রহিলেন। কল্যাণী বলিতে লাগিলেন, "বিয়ে দেওয়া মানে কি?—ছেলেকে সুখী করা; আচ্ছা হাজার-দশহাজার নিলেই কি ছেলেকে সুখী করা হয়? তা' ছাড়া, আজকাল ছেলেদের অমতে বিয়ে দেওয়াও উচিত নয়। এতে ভাল হওয়া চুলোয় যাক্‌, আরও খারাপ হ'য়ে দাঁড়ায়!"

কর্ত্তা ব্যঙ্গ-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন, "তবে চারুরও এতে মত আছে না কি?" কল্যাণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! তোমার গুণধর নাতি সে দিন গঙ্গার ঘাটে যে করে এর দিকে চেয়ে ছিল, তাতেই বেশ বোঝা যায়, এর দিকে তা'র কত টান্‌! আর তা'র সঙ্গে কথাবার্ত্তায়ও বুঝ্‌তে পেরেচি, একে পেলে সে সুখী হয়। চারুর গঙ্গা নাইবার অত ধুম কেন জান?"—কর্ত্তা সহজ ভাবে বলিলেন, "ও-এর মধ্যে যে এত, তা আমি কেমন ক'রে জান্‌ব বল।"

১১

পাঁচদিন হইল কল্যাণী, মালতী আর তাহার পিসীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। উপস্থিত ইহাদের দুইজনকে সেজবৌমার বাপের বাড়ী রাখা হইয়াছে; অল্প দিনের মধ্যেই চারুর কল্পনা সত্যে পরিণত হইয়া কল্যাণীর আশা পূর্ণ করিবে।

আজ দুপুর বেলা একটি বৃদ্ধ চাকর আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল "মা, আপনারা সব ভাল আছেন?" কল্যাণী সস্নেহে "এস বাবা" বলিয়া তাহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি হ'য়েছে—এত রোগা হ'য়ে গেছ কেন?" "একমাস ভোগার পর আজ দু'দিন হ'ল ভাত খেয়েচি মা।" "তা এত শীগ্‌গীর এলে কেন—আরও দু'দশ দিন থেকে ভাল ক'রে সেরে এলেই পাত্তে।" "না মা, আমি ত ছুটী পাইনি। মেজ-বৌদি' আমায় তাড়িয়ে দিয়েচেন। তাই আপনি এসেচেন শুনে, আবার কাজ কত্তে এলুম।" এই বলিয়া সে সংক্ষেপে জানাইল যে,

খেঁদীর সহিত ঝগড়া হওয়ায় মেজ-বৌ তাহাকেই বিনা দোষে জবাব দিয়াছে।

কল্যাণী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তা' তোমার চেহারা যা' হ'য়ে গেছে, এতে তুমি কাজ ক'র্‌বে কি ক'রে?—এ দেহ নিয়ে খাট্‌লেই যে মারা পড়্‌বে!" "কি করব মা, কাজ না ক'ল্লেও যে না খেতে পেয়ে মরব মা!" বলিতে-বলিতে তাহার চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তাহা দেখিয়া কল্যাণীর দয়া হইল। বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি দেশে গিয়ে থাকগে—পেটের জন্যে তোমায় ভাব্‌তে হ'বে না—মাসে মাসে ছেলেকে পাঠিয়ে দিও—আমি কিছু-কিছু করে দেব।" চাকরের চক্ষুর্দ্বয় আবার আনন্দাশ্রুপূর্ণ হইল। সে "আচ্ছা মা, আপনার জয় হোক্‌" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শত ধন্যবাদ দিতে-দিতে চলিয়া গেল।

কল্যাণীর তাহার প্রতি এই ব্যবহারে হিংসায় খেঁদীর বুক চড়্‌চড়্‌ করিতে লাগিল।

দেখিতে-দেখিতে আরও তিন দিন কাটিয়া গেল। বিবাহের আর কুড়ি দিন মাত্র দেরী আছে। এই বিবাহ উপলক্ষে হরিচরণ বাবু অনেক টাকার গহনা গড়াইতে দিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া এ বাড়ীর সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল।

বিবাহের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, কল্যাণী ততই যেন বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। এ সময়ে চারুর বাপ মায়ের জন্য তিনি যে পৃথিবী অন্ধকার দেখিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া কর্ত্তা ডাকিলেন, "ওগো, কোথা গো?" কল্যাণী নীচে কি করিতেছিলেন। সেখান হইতে "কেন, যাই" বলিয়া উপরে আসিলেন। দু'একটি বাজে কথা কহিবার পর কর্ত্তা কহিলেন, "আজ ক'দিন থেকে তোমার কি হ'য়েচে বল ত?" "কৈ, কিছু ত হয় নি?" "দেখ, তুমি কি মনে কর যে, তুমিই খুব সেয়ানা, আমার মনের কথা বুঝ্‌তে পার; আর আমি এতই বোকা যে কিছুই বুঝিনে?" "যদি বুঝে থাক, তবে আবার জিজ্ঞেস্‌ করা হ'চ্ছে কেন?" এতক্ষণ সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি হইতেছিল। এখন কর্ত্তা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "তবে কালই ওকে আস্‌বার জন্যে চিঠি লিখি?" "কা'কে চিঠি লিখ্‌বে?" "কা'কে, বল্‌ব? এই যার জন্যে আজ ছ'মাস হ'ল, অন্য কোন ঝি-চাকরের কোন কাজই তোমার ভাল লাগে না। বুঝেচ?"

কর্ত্তার কথায় কল্যাণীর চোখে দু'ফোঁটা আনন্দাশ্রু টল্‌টল্‌ করিতে লাগিল। কর্ত্তা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

* * * *

ছয় মাস পরে পাঁচটী টাকা সমেত পত্র পাইয়া নন্দর মা এক দিনও দেরী না করিয়া কলিকাতায় আসিল। বেলা দশটার সময় বাড়ী পৌছিয়া বরাবর কল্যাণীর কাছে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে ঠক্‌ করিয়া মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করিল।

কল্যাণী শশব্যস্তে "এস মা, এস; বাড়ীর সব ভাল আছে?" বলিতে-বলিতে হঠাৎ নন্দর মার হাতে হাত দিয়া "ওরে তুই ত এলি—আমার তারা ত এখনও এল না রে—" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

দেশে জ্ঞান-প্রচার

[রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্‌-এ]

দেশ-সম্বন্ধে কয়েকটা কথা কয়েক বৎসর সর্ব্বদা শোনা যাইতেছে। কেহ বলিতেছেন, আমরা রোগে জর্জরিত হইতেছি; কেহ বলিতেছেন, দারিদ্র্যে নিষ্পীড়িত হইতেছি; এবং কদাচিৎ কেহ বা ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া সন্তপ্ত হইতেছি। কথাগুলা আদি কালের; কেবল এদেশে নয়, সব দেশের সবাই দীর্ঘায়ু হইতে চায়, ধনশালী হইতে চায়, এবং কখন-কখনও বস্তুতঃ ধার্মিকও হইতে চায়। ধন নইলে জীবনরক্ষা হয় না, জীবন নইলে ধর্ম্মও থাকে না। অতএব আদি যে ধন, তাহার উপায়-চিন্তা চলিতেছে। এদেশের এক নীতি-কার ধনার্জ্জনের চারি উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—বাণিজ্য, কৃষি, রাজসেবা ও ভিক্ষা। তিনি কলাকে বাণিজ্যের অন্তর্গত করিয়াছেন। ভিক্ষা

অনিশ্চিত ও নিন্দিত, রাজ-সেবা বা চাকরি দুর্লভ; অতএব ধনের পথ তিনটি, কৃষি, কলা ও বাণিজ্য। ধন, প্রাণ, ধর্ম, এই তিন লাভের এক উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সে উপায় শিক্ষা। অতএব গোড়ায় শিক্ষা আসিয়া পড়িতেছে। এই সকল কথা সে দিন পূর্বাঙ্কের 'ভারতবর্ষে' কলেজের তর্ক-সভার বিচারের মতন করিয়া বলা গিয়াছে। চিত্ত জাগাইবার উদ্দেশ্যে তেমন করিয়া প্রত্যেক মতের যৎসামান্য সমালোচনাও করা গিয়াছে।

সমালোচনার প্রয়োজন আছে; কিন্তু দোষ দেখাইলেই শ্রেয় পথ আবিষ্কৃত হয় না। এটা না, সেটা না; এটায় এই দোষ, সেটায় সেই দোষ; ইত্যাদি বলিয়া দিলে উপকার হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আদেশ না করিয়া কেবল নিষেধ করিলে উপদেশ-পালন দুষ্কর হয়, পা বাড়াইতে শঙ্কা হয়।

রাজা উদাসীন থাকিতে পারেন না। তিনি নানা উপায় দেখিতেছেন। স্বাস্থ্য-বিভাগ, কৃষি-বিভাগ, কলা-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ প্রভৃতি নানা বিভাগে নানা লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। অধ্যক্ষেরা পাঠশালায় গোড়াপত্তন করিতে বলিতেছেন। স্বাস্থ্যাধ্যক্ষ পাঠশালায় স্বাস্থ্যরক্ষার স্বই ধরাইতেছেন, কৃষি-অধ্যক্ষ কৃষিতত্ত্ব শিখাইতে বলিতেছেন, শিক্ষাধ্যক্ষ nature study, moral training, manual training দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তথাপি আমরা রোগা ছেলের মতন খুঁৎ-খুঁৎ করিতেছি; বলিতেছি, এ কি শিক্ষা, কতজনের বা শিক্ষা হইতেছে।

কিন্তু কি শিক্ষা চাই, এবং কেমন করিয়া সে শিক্ষা হইতে পারে, হইলে কি লাভ হইবে, তাহা বলিতে পারি কি না, সন্দেহ। সমাজ ছাড়িয়া ত শিক্ষা নয়; সমাজের হিতার্থেই শিক্ষা। সে সমাজ ইয়ুরোপের আদর্শে গড়িতে হইলে শিক্ষার যে পথ ধরিতে হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি। ভারতের আদর্শে গড়িতে হইলে পথ দেখিতে পাই না। সে আদর্শ ভাঙ্গনের মুখে পড়িয়াছে; কোথায় কি আকারে কতখানি থাকিবে, তাহা ভাবিয়া পাই না। আমরা ভারতের খানিকটা চাই, ইয়ুরোপেরও খানিকটা চাই। এই দুই জুড়িয়া এক করিতে পারা, এক চতুরস্র-শোভী সৌধ গড়িতে পারা, এক বিশ্বকর্মা ছাড়া কাহারও কর্ম নয়।

তথাপি একটা মোটা আদরা আঁকায় দোষ নাই। শিক্ষা দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়; জ্ঞানই কাম্য, শিক্ষা উপায়। সে জ্ঞান, দেখিয়া, শুনিয়া, বই পড়িয়া, জন্মিতে পারে। আমরা বই পড়িয়া জ্ঞান-লাভের দিকে অধিক হেলিয়া পড়িয়াছি। 'শিক্ষা' আর 'শেখা' একই কথা। কিন্তু 'শিক্ষা' বলিলে ক-খ কিংবা 'এ বি' লিখিতে ও পড়িতে শেখা মনে করি কেন? Education = শিক্ষা, ঠিক। কিন্তু education = পাণ্ডিত্য মনে করি কেন? আমরা যাঁহাকে educated বলি, তিনি বিদ্বান্, ইংরেজী লেখা-পড়া কর্মে শিক্ষিত (trained)। কিন্তু হাজার হাজার নর-নারী আছে, যাহারা 'এ বি' দূরে থাক, ক-খ-ও লিখিতে ও পড়িতে পারে না। তাহারা সবাই অ-শিক্ষিত (uneducated) বলিতে পারা যায় কি? শিক্ষা উত্তম না হউক, আমাদের মনের মতন না হউক, কিছু শিক্ষা পাইয়াছে, প্রায়ই প্রত্যক্ষ করিয়া পাইয়াছে, এবং পাইয়াছে বলিয়াই সংসার চলিতেছে। দেশের শতকে ৯২ জন লিখিতে ও পড়িতে জানে না। কিন্তু ইহাও সত্য, লেখা-পড়া-জানা ৮ জন দ্বারা দেশ চলিতেছে না। সে ৯২ জন আরও শিক্ষিত হইলে দেশ ভাল চলিত। অতএব তাহারা যে শিক্ষা পাইয়াছে, কিংবা পাইয়া থাকে, তাহার উপরে ভিত্তি তুলিতে হইবে। গোড়ার এই কথা, শিক্ষা শব্দের অর্থ গোলে হরিবোল দিয়া ঢাকিয়া না ফেলিয়া, দেশকে ধরিয়া, জ্ঞান-প্রচার করিতে হইবে।

যে কাজ যে করিতে চায়, তাহাকে সে কাজের যোগ্য করা শিক্ষা-দান বা শেখাবার উদ্দেশ্য। পাঠশালায়, কিংবা বঙ্গ-বিদ্যালয়ে, কিংবা ইংরেজী ইস্কুলে, ছেলেরা যে শিক্ষা পাইতেছে, তাহাতে লেখা-পড়ার চাকরি করিবার যোগ্যতা হইতেছে। এই চাকরিতে মান আছে, টাকা আছে, অথচ আয়ের ক্ষতিবৃদ্ধির আশঙ্কা নাই। কতক লোককে চাকরি করিতে হইবেই। তাহারা করিতে ইচ্ছুক না থাকিলে ভুলাইয়া, করাইতে হইবে। অতএব দুইটা বল আমাদিগকে চাকরির দিকে টানিতেছে। একটা টান, অপরটা ঠেল।*

* ইংলণ্ডেও নাকি এই অবস্থা। সে দেশেও পণ্ডিত ও কেরাণী করিবার যোগ্য শিক্ষা প্রচলিত ছিল। ইয়ুরোপের বর্তমান যুদ্ধের পর 'গোড়া দেখ' ডাক পড়িয়াছে, যুদ্ধে প্রত্যহ ৯ কোটি টাকা খরচের দিনেও শিক্ষার নিমিত্ত অতিরিক্ত ৬ কোটি বরাদ্দ হইয়াছে। ছিল ৩০ কোটি, এখন হইয়াছে ৩৬ কোটি। শিক্ষার গতিক ভাল নয়, একথা যুদ্ধের পূর্বেও শোনা যাইতেছিল। এ বিষয়ে কয়েকটা মত A Policy

এমন দুই বল ঠেলিয়া দিয়া অন্য পথে চলা, কে একজন পারে কিনা সন্দেহ। কে পারে? যাহার আত্মপ্রত্যয় কিংবা ধর্মে মতি হইয়াছে, সে পারে।

এখানে এ বিষয় সম্যক্ আলোচনার স্থান হইবে না। তবে দেখা যায়, পাঠশালা হইতে কলেজ পর্য্যন্ত যে শিক্ষা হয়, তাহা প্রায়ই দেশ-ছাড়া শিক্ষা; যেন আমরা বিদেশী, দিন কয়েকের তরে প্রবাসে আসিয়াছি। ঘরে কি আছে, কি হইতেছে; বাড়ীর পাশে কি আছে, কি হইতেছে; এই জ্ঞান জন্মিলে আত্মপ্রত্যয় জন্মিতে পারিত। পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে এক ভূগোল আছে, যাহা হইতে দেশ-জ্ঞান কিছু জন্মিতে পারিত। কিন্তু 'ভূগোল'-সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণ করা হইয়াছে, পঠনও অনাদৃত রহিয়াছে। ইস্কুলে অনাদৃত, কলেজেও অনাদৃত। কলেজে কলেজে বিজ্ঞান শিখাইবার আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু অমূর্ত বিজ্ঞান,—যাহার সহিত দেশ-কাল-পাত্রের সম্বন্ধ নাই, যাহা এদেশে না শিখাইয়া অন্য দ্বীপে শিখাইলেও চলিত। নানাকারণে রাজা ধর্ম-শিক্ষার ভার লইতে পারেন না। সে ভার, আমাদের উপরেই আছে। কিন্তু আমরা উদাসীন। রাজার উপর সব ভার দিয়া এমন জড়ভরত হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের নিজের কর্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি আমাদের সমাজ-বিধিতেও হাত দিতে পারেন না, অথচ সমাজই প্রধান শিক্ষা-ক্ষেত্র। বুদ্ধি মার্জিত হইলে কি হইবে; সমাজ যে বুদ্ধি-প্রয়োগের ক্ষেত্র। অতএব বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ জ্ঞান দ্বারা পাণ্ডিত্য জন্মিতেছে, নাস্তিক্য প্রসারিত হইতেছে, সন্তোষ অদৃশ্য হইতেছে, সুখে শান্তিতে সংসারযাত্রা-নির্বাহের সামর্থ্য আসিতেছে না। জনসাধারণের অর্থ চাই, বলাই বাহুল্য। কিন্তু ধর্মও চাই। ইহাই আমাদের শিক্ষার নীতি। ধর্ম, অর্থ, কাম,—এই তিনের লাভ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, আমাদের পুরুষার্থ। কিন্তু ত্রিবর্গের প্রথমে ধর্ম। কারণ ধর্মব্যতিরিক্ত অর্থ, অকল্যাণের হেতু; ধর্ম ব্যতিরিক্ত কাম, স্বেচ্ছাচারী করে; আর, ধর্ম ব্যতিরিক্ত শিক্ষা দ্বারা পাঁজীর ব্যতিপাত যোগের সম্ভাবনা। যোগের অশুভ ফল ঘটিতেও আরম্ভ হইয়াছে। এখন সাবধান না হইলে, গন্তব্য উত্তমরূপে স্থির না করিলে, ধর্মকে কর্ণধার না করিলে, কখন্ কোন্ আবর্ত্ত-কূপের টানে পড়িয়া অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইব, কে জানে। কাল-স্রোত-রোধের সাধ্য নাই; কিন্তু স্রোত ধরিয়া গন্তব্যেও উপস্থিত হইতে পারি।

এই ভূমিকার পর শিক্ষার কয়েকটা সূত্র অন্বেষণ করি। কথোপকথনক্রমে বলিলে, বোধ হয়, কথাটা স্পষ্ট হইবে। অতএব গণেশ ও প্রমথ, দুই জন কি বলে, শুনি।

প্রমথ॥ দেশে যে নানা অভাব। প্রথমে কোন্ অভাব দূর করা উচিত।

গণেশ॥ এই যে অভাব-বোধ, এই বোধ জন্মানো প্রথম কর্তব্য। তুমি আমি কাগজে কলমে বোধ করিলেই, অভাব দূর করিতে পারিবে না। যাহারা দেশ, তাঁহারা অভাব বোধ করে কি?

প্রমথ॥ অভাব বোধ করে না? এই গ্রীষ্মকাল পড়িয়াছে, অমনই খাবার জলের অভাবে লোকে কি করিবে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

গণেশ॥ কষ্টবোধ-টা বাস্তবিক কি? বাস্তবিক হইলে কষ্ট দূর করিতে পারিত না কি? কষ্টে পড়িলে লোকে মন্ত্রণা করে, মন্ত্রণা হইতে কর্ম আসে। কিসে কি হয়, লোকে জানে না। এই জ্ঞান দেওয়াই প্রথম কর্তব্য।

---

of Rural Education. By S. H. Fremantle, C. I. E. Printed at the Pioneer Press, Allahabad, 1915 এই পুস্তিকা হইতে উদ্ধার করিতেছি। Sir John Gorst said in 1911: "We are spending millions...on what is called education,...the greater part of this money is, under the present system, wasted and might as well, so far as education is concerned, be thrown into the sea." Mr. E. Holmes, the Chief Inspector of Elementary Schools, does not stop at declaring the education to be useless: he declares that it is positively harmful. Another witness, Alexander Paterson, says: "At our elementary schools we seem to aim at producing a nation of clerks, for it is only to a clerk that the perfection of writing and spelling attained is a necessary training." The Poor Law Commissioners say, "our expensive Elementary Education System (costing £20,000,000 annually) is having no effect on poverty; it is not developing self-reliance or fore-thought in the characters of the children and is in fact persuading them to be clerks rather than artisans."

প্রমথ॥ তাহা হইলে ত গ্রামে-গ্রামে পাঠশালা বসাইতে হয়।

গণেশ॥ পাঠশালায় পাঠ পড়াইয়া যে জ্ঞান জন্মাইবে, সেটা কেতাবী জ্ঞান। শোনাইয়া, দেখাইয়া জ্ঞান জন্মাও। সে জ্ঞান হইতে প্রয়োগ (application) আসিবে, এবং প্রয়োগ হইতে আত্মবত্তা (self-reliance) আসিবে।

প্রমথ॥ কিসের জ্ঞান ? কি জ্ঞান ?

গণেশ॥ নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান। নিজ-জ্ঞান দুই ভাগ করিতে পার; দেহ-জ্ঞান ও আত্ম-জ্ঞান। আমরা আছি,—এই কথা বলিলে বুঝি আমাদের দেহ আছে, আর সুখ-দুঃখ ভোক্তা আত্মা আছে। কি করিলে দেহের কি হয়, এক কথায় দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞান চাই। সঙ্গে সঙ্গে আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষার জ্ঞানও চাই। দেহ রক্ষিত, কিন্তু অসুখী, এমন লোক প্রত্যহ দেখিতেছ। আত্ম-জ্ঞান, একটা বৃহৎ কথা। সেটা না বলিয়া ধর্মজ্ঞান বলিতে পার। দেহজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান পৃথক করিতে পারা যায় না। একারণ আয়ুর্বেদে ও ধর্মশাস্ত্রে দুইই একত্র বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের ধর্ম শব্দে ইংরেজী religion বুঝিবে না। একবার, একবার কেন, ইংরেজী ১৯০১ সনের লোক সংখ্যান-সময়ে সংখ্যাকারী এক পাড়ায় গিয়া এক জনকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "তোমার ধর্ম কি ?" আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যাহাকে প্রশ্ন হইল, সে উত্তর করিতে পারিল না; এক বৃদ্ধকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, আমার ধর্ম কি ?" বৃদ্ধ মাথা চুলকাইয়া খানিক ভাবিয়া বলিল, "তোমার ধর্ম তোমার।" সংখ্যাকারী ফাঁপরে পড়িয়া গেল। কারণ, ফার্মের কাগজে ধর্ম শব্দের নীচে 'তোমার' লিখিবার আদেশ ছিল না। বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ধর্ম কি ?" "আমার ধর্ম আমার, একথা আবার কি জিজ্ঞাসিতেছ ?" তখন সংখ্যাকারীও অধীর হইয়া পড়িয়াছে; জিজ্ঞাসিল, "তুমি হিন্দু, না মুসলমান ?" বৃদ্ধও অধীর হইয়া বলিল, "তাই বল না! আর, আমি যে হিন্দু, তা আমার গলায় মালা দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছ না ?" উত্তর-প্রত্যুত্তর শুনিয়া আমি হাসিলাম বটে, কিন্তু বুঝিলাম, বৃদ্ধই ঠিক। যখন লোকে রাগিয়া বলে, 'তোমার ধর্মে যা আছে কর', তখন বলে না বেদে কোরাণে কি বাইবেলে যা আছে। নিজ-জ্ঞান দিতে গেলেই দেশ-জ্ঞান দিতে হইবে। আমি আছি, কোনও দেশে আছি, কোনও কালে আছি। সে দেশ কেমন, সে কাল কেমন, তাহা না জানিলে নিজকে রক্ষা করা অসম্ভব। দেশ বলিতে কেবল মাটি নহে; আমাকে বেড়িয়া যা কিছু আছে, সব। মাটি জল বায়ু অন্তরীক্ষ, গাছপালা জীবজন্তু, মানুষ প্রভৃতি যাহাদের মাঝে আছি, সেটা আমার 'দেশ'। ইংরেজীতে environment। কিন্তু আমার 'দেশ' দশ বছর আগে যেমন ছিল, আজি তেমন নাই; কালি যেমন ছিল, আজি তেমন নাই; আমি যেমন ছিলাম, এখন আমিও তেমন নাই। এই যে অবিরাম পরিবর্তন-স্রোত, সেটা 'কাল'। লোকে বলে, 'সে কাল আর নাই'। নাইই ত; যে ঘটনা-পরম্পরা ছিল, তাহা এখন নাই, থাকিতে পারে না। অতএব যদি আমাকে সুস্থদেহে সুস্থচিত্তে থাকিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে দেশ জানিতে হইবে, কালও জানিতে হইবে। আমি আছি; আমার থাকা যাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাকে 'দেশ' বলিতেছি। ইহার মধ্যে 'কাল'ও আনিতেছি। 'দেশ' আমার ধর্মের অনুকূল কি প্রতিকূল, দেশের 'ধর্ম' কি, এই জ্ঞান দেশ-জ্ঞান। ভূগোল ও ইতিহাস, এই জ্ঞান দিতে রচিত হয়। দেখিতে গেলে ভূগোলেই ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি, বাণিজ্য, ব্যবসায় (industry), বার্তা (occupation) প্রভৃতি আমার জীবন-ধারণের নিমিত্ত আবশ্যক দেশ-জ্ঞান, সব পাইবার কথা। অথচ পাঠশালা, কি উচ্চ বিদ্যালয়ে, এই দেশ জ্ঞান অনাদৃত রহিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ পাঠ, যাত্রাগান, ও নিত্য নৈমিত্তিক পূজা পার্বন দ্বারা ধর্মজ্ঞান কিছু জন্মিয়া থাকে; কিন্তু দেহ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান জন্মাইবার উপায় প্রচলিত নাই। যাঁহারা কবিরাজ কি ডাক্তার, কেবল তাঁহারাই দেহ-জ্ঞান লাভ করেন। অথচ সকলেরই কিছু-না-কিছু পাওয়া আবশ্যক। যাঁহারা "শিক্ষিত", তাঁহাদেরও সকলের দেশ-জ্ঞান নাই।

প্রমথ॥ তবেই ত পাঠশালা চাই।

গণেশ॥ পাঠশালা নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু পাঠশালা দ্বারা নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান দেশময় ব্যাপ্ত করিতে বহু কাল লাগিবে। এখন বঙ্গদেশে ৩৬ হাজার পাঠশালা আছে। ৪॥ কোটি লোকের ৵১০ আনা যদি পাঠশালা যাইবার বালক ও বালিকা ধরা যায়, এবং ৩০টির তরে একটা পাঠ-

শালা দরকার হয়, তাহা হইলে ২ লক্ষের উপর পাঠশালা চাই। কেবল বালকদিগের নিমিত্ত ১ লক্ষ পাঠশালা বসাইতেও ত বহুকাল যাইবে। তা ছাড়া, আর যে বার-তের আনা, যাহারা পাঠশালার মুখ দেখে নাই, তাহারা ত ছেলে সাজিয়া পাঠশালায় আসিতে পারিবে না।

প্রমথ॥ পাঠশালায় আসিতে পারিলেই বা কি ফল হইত?

গণেশ॥ বিশেষ কিছুই না। আসিতে পারিলে ক-খ লিখিতে ও পড়িতে পারিত। কিন্তু যে অন্ন চায়, তাহাকে 'অন্ন' বানান করিতে শিখাইয়া বিদায় করা, উপহাস করার তুল্য। তা ছাড়া, পাঠশালা ছাড়ার পর লেখা-পড়ার অভ্যাস রাখিতে না পারিলে পাঠশালায় আসাই অকারণ। ইহাদের বোধগম্য করিয়া বই লিখিতে হইবে, ইহাদের অর্থ-গম্য করিয়া বেচিতে হইবে। এমন একখানাও বই দেখি না, যাহা স্বল্পাক্ষর পড়িতে পারে, পড়িয়া নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যাহা আছে, তাহা আপনা-আপনি আছে, কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহাদের হিতার্থে ছাপায় নাই। দামও বেশী; এক আনা দুই আনায় পাওয়া যায় না।

প্রমথ॥ তাহা হইলে উপায়?

গণেশ॥ ছেলে হইতে বুড়া পর্য্যন্ত, সকলের শিক্ষার নিমিত্ত এক উপায় হইতে পারে না। আমরা এক উপায়, পাঠশালার দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছি। মনে কর, যেন দেশের সব ছেলে-মেয়েকে পাঠশালায় টানিয়া আনা গেল। ইহারা মানুষ হইতে অন্ততঃ দশ বার বৎসর লাগিবে। এই দশ-বার বৎসর কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত? "শিক্ষা-বিস্তার" বল, আর জ্ঞান-প্রচার বল, একটা স্রোত চালাইতে না পারিলে সে জল স্বাদু ও হিতকর হইবে না। নানা উপায়ে সে স্রোত রক্ষা করিতেই হইবে। ছেলে-মেয়েদের তরে পাঠশালা কর, স্বল্পাক্ষরের তরে নানাবিধ কাজের বই লেখ, নিরক্ষরের তরে কথকতা কর। সকলের তরেই কথকতা চাই, প্রদর্শন চাই। শোনাইয়া, দেখাইয়া জ্ঞান-প্রচার সহজে হয়, শীঘ্র হয়। একথা পরে হইবে। প্রথমে পাঠশালা ধর। পঞ্চম বর্ষে হাতে খড়ী দিতে পার; কিন্তু জানিবে দশম বর্ষে পাঠশালা ছাড়িলে লেখা-পড়া-শেখা বৃথা হইবে, শেখা পাকা হইবে না, থাকিবে না। ১১।১২ বৎসর বয়স হইতে ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহা শিখিবে, সেটা বরং থাকিবে। কিন্তু ১০।১২ বৎসর বয়স হইলেই পুত্র পিতার সঙ্গে কাজ করিতে শিখিতে আরম্ভ করে, কাজ করিবার কিছু জ্ঞানও জন্মে। এই বয়সে কন্যার বিবাহ আছে, ঘরকন্নার কাজ আছে। কন্যার শিক্ষা-সমস্যা ভারি কঠিন, বধূর শিক্ষা আরও কঠিন। সম্প্রতি ইহাদের ১০ বছর বয়সে পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত মনে করিতে হইবে। কিন্তু পাঠশালা ছাড়িয়া বধূ হইয়াও যাহাতে লেখাপড়ার অভ্যাস থাকে, তাহার উপায় করিতে হইবে। ইহার এক উপায়, বধূ ও গৃহিণীর যোগ্য জ্ঞান-পূর্ণ বই লেখা ও সস্তায় বেচা।

প্রমথ। যত রাজ্যের গল্পের বই বধূরা পড়ে। গল্পের মতন গল্প হইলে বরং কিছু উপকার হইত। এমন গল্প, যাহা পড়িলে সংসার-ধর্ম্মে অবসাদ, গৃহকর্ম্মে ক্লান্তি আসে, এবং পরীর রাজ্যে স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইবার বাসনা জন্মে।

গণেশ॥ কেবল বধূদের দোষ দেওয়া কেন, যুবারাও গল্পের কুহক এড়াইতে পারে না। তাহারাই কিনিয়া দেয়। কতকটা বয়সের ধর্ম; আর কতকটা দেশের অভাগ্য, ভাল বই নাই। আরও অভাগ্য, কেহ কেহ একটা ইংরেজী কথা, 'আর্ট' (art) নামের মহিমায় মুগ্ধ হইয়াছেন, 'আর্ট'-জন্য মানুষ, কি মানুষ-জন্য 'আর্ট,' বিচারে দিশা-হারা হইয়া পড়িতেছেন। উপরের জল নীচে গড়ায়, যাহা 'বড়'লোকে করে, তাহা 'ছোট'লোকও করিতে চায়। 'শিক্ষা, শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ করিয়া, সমাজের শিক্ষা চাপা দিয়া রাখিয়াছি। শিক্ষার ক্ষেত্র পাঠশালা নয়, সমাজ। বুড়া বয়সে বিবাহ করিয়া, বিবাহ করিতে বর কিনিয়া, সমাজ নিজের বধূকে যে শিক্ষা দিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ। পাঁচখানা বই পড়াইয়া দশটা কবিতা লেখাইয়া, প্রত্যক্ষ শিক্ষার দোষ কাটাইতে পারা যায় না। এই কারণে পূর্ব্বে বলিয়াছি, বধূ-শিক্ষা অতিশয় কঠিন।

প্রমথ॥ গ্রামের সব ছেলে পাঠশালায় আসিবে কি?

গণেশ॥ সব পাঠশালা এক রকম হইলে আসিবে না। ১০ বছর বয়স পর্য্যন্ত বালক-বালিকা, ধনী দরিদ্র, সকলের শিক্ষা সমান হইবে। ইহাদের নিমিত্ত কেবল সকালে পাঠশালা বসিলে ভাল। ইহাদিগকে দুইবেলা পাঠ

পড়ানার চেষ্টা না করাই ভাল। গ্রাম ছোট হইলে একটা; বড় হইলে পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা চাই, নতুবা সব ছেলে-মেয়ে পাইবে না, ১০।১২ জনের অধিক হইলে গুরুমশায়ও পড়াইতে পারিবেন না। এই সকালী পাঠশালার পড়া সাঙ্গ হইলে, কেহ বিকালী পাঠশালায় যাইবে, কেহ বা 'বঙ্গবিদ্যালয়ে' যাইবে। 'বঙ্গবিদ্যালয়ে' কিংবা ইংরেজী ইস্কুলে কি বিদ্যা শিখিবে, তাহা এখন ভাবিবার দরকার নাই। এখন জনশিক্ষার কথা হইতেছে। বিকালী পাঠশালা কেবল বিকালে বসিবে। এখানে ছেলেরা ১৫।১৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত আসিতে পারিবে। সকালে ইহারা পিতার কাজ, কি ঘরের কাজ করিবে, বার্ত্তা শিখিবে। বিকালী পাঠশালা দুই রকমের হইবে। যে গ্রামে সকালী পাঠশালায় ছেলেরা ১০।১১ বৎসর পর্য্যন্ত কিছু শিখিয়াছে, তাহাদের পক্ষে যে পাঠ; যাহারা পাঠশালা মাড়ায় নাই, তাহাদের পক্ষে সে পাঠ হইতে পারে না। দুইতিন গ্রামের মধ্যে একটা বিকালী পাঠশালা থাকিলেই চলিবে। বিকালী পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্য নয় ভাষা, শিখিবে, আবশ্যক অঙ্ক দেশীয় রীতিতে শিখিবে, অক্ষর-লেখা ও চিত্র-লেখা শিখিবে। বই একখানি পাইবে; তাহা হইতে ভাষা, এবং নিজ-জ্ঞান ও দেশ-জ্ঞানের আভাস পাইবে। তাহাতে সূচনা থাকিবে, গুরু-মশায় সেই সূচনা ধরিয়া মুখে-মুখে জ্ঞান জন্মাইতে চেষ্টা করিবেন। এক প্রহর সময়ের মধ্যে অধিক আশা করা যাইতে পারে না। মুখে-মুখে শিক্ষা না পাইলে সময়ে কুলাইবে না, জ্ঞানও পাকা হইবে না।

প্রমথ॥ এমন গুরু-মশায় কোথায়?

গণেশ॥ ইহাই দারুণ চিন্তা। কিন্তু দারুণ ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট হইলেও চলিবে না। গুরু-মশায় করিয়া লইতে হইবে। ইঁহাদের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় করিয়া সেখানে শিক্ষা দিয়া গ্রামে-গ্রামে পাঠশালা বসাইতে হইলে এক যুগ লাগিবে। যাঁহারা সেখানে শিক্ষিত হইবেন, তাঁহারা বরং পরিদর্শক হইতে পারিবেন। ইঁহারা, এবং এখন যাঁহারা পরিদর্শক আছেন তাঁহারা, গুরু-মশায়দিগকে গ্রামে গ্রামে শিখাইয়া বেড়াইতে পারিবেন। তাঁহারা চারি-পাঁচখানা গ্রামের গুরু-মশায়কে এক পাঠশালায় আনাইয়া নিজেরা দুই তিন দিন গুরু-মশায়ি করিয়া দেখাইবেন। যে দেশ-জ্ঞান প্রচারের কথা বলিতেছি, সে সবের কথক ও প্রদর্শকের নিকট হইতেও গুরু-মশায়েরা কিছু কিছু শিখিতে পারিবেন। পাঠশালার পরিবর্ত্তে 'বিদ্যালয়', এবং গুরু-মশায়ের পরিবর্ত্তে 'পণ্ডিত মহাশয়' বলিও না। 'গুরু'-এতবড় মানের কাছে, 'পণ্ডিত' নাম ছোট। কিন্তু সব ছেলেকে এক ছাঁচে ঢালা ঠিক হইবে না। বিকালী পাঠশালায় নানা ছাঁচ রাখিতে হইবে। কেবল বাটী, কেবল ঘটী দিয়া ছোট সংসারও চলে না।

প্রমথ॥ তাহা হইলে ত খরচের অন্ত থাকিবে না।

গণেশ॥ তবে আর খরচ কিসে? তুমি দেশটাকে শিক্ষিত করিতে চাও, বার্ত্তা ও কলায় ও ধর্ম্মে শিক্ষিত করিতে চাও। পাঠশালায় দুই তিন ঘণ্টায় কিসের কতটুকু শিখাইতে পারিবে? যদি নানা বিষয়ের ছোট ছোট কিন্তু সুন্দর সুন্দর বই ছাপাইয়া গ্রামে গ্রামে ৵০ দামে বেচিয়া বেড়াইতে পার, তাহা হইলেও সে সব বই পড়াইতে পারিবে না। পাঠশালা ছাড়িতে না ছাড়িতে দ্বিতীয় শিক্ষায় প্রবেশ করাইতে হইবে। এই শিক্ষা জ্ঞান-প্রচারের অন্তর্গত হইবে। জ্ঞান-লাভের নানা পথ আছে; একটা পথ বই পড়িয়া। কিন্তু এ পথ সকলের পক্ষে সোজা নয়: সে পথে চলা যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহারা দুই পা যাইতে না যাইতে হাঁপাইয়া পড়ে। যাহারা বিকালী পাঠশালায় পড়িয়াছে, এবং যাহারা না পড়িয়াছে, সকলকেই এই পথে আনিতে হইবে। পথটা সুন্দর সুগম করিতে হইবে। সাধারণ লোক সদ্য ফলই বোঝে; কারণ অজ্ঞানের তিমিরে দূরে ঝাপসা ঠেকে।

প্রমথ॥ সে কাজ সোজা হইবে না। সদ্য সদ্য কি ফল দেখাইতে পারা যাইবে?

গণেশ॥ সোজা ত নহেই। সকলকেই অর্থ-ফল দেখাইতে হইবে না। এখন সে আর কুআর বেং নয়; পাশে বিপুল পৃথিবী আছে, যেখানে ইচ্ছা করিলেই সে যাইতে পারে। এই যে আত্ম-শক্তি, সেই শক্তি জাগাইতে পার। ইহার আদি আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা আপনি জাগে, যদি উদাহরণ দেখাইতে পার। এ নিমিত্ত,

(১) গ্রাম তোমার নিকট আসিবে না; তোমাকে গ্রামে যাইতে হইবে।

(২) গ্রামে গ্রামে জ্ঞান বিতরণ কর। বিতরণ

নহে, দান ত নহেই, বিলাও। কোথাও কেহ শুনিবে মানিবে, কোথাও কেহ শুনিবে না, শুনিলেও মানিবে না। তুমি ধৈর্য্য ধরিয়া বিলাইতে থাক।

(৩) শুধু কান দিয়া শোনানা নহে, চোখে দেখাও। চোখ দিয়া দেখিলে, হাত দিয়া নাড়িলে যে জ্ঞান জন্মে, সেটাই পাকা।

প্রমথ॥ দেখাইব কি?

গণেশ॥ দেশের কোথায় কি আছে, কিসে কি হইতেছে, কিংবা হইতে পারে, তাহা কোনও দ্রব্য হইলে বহিয়া লইয়া গিয়া দেখাইবে; তাহা না হইলে, কর্ম কিংবা গুণ হইলে, ছায়াচিত্র (magic lantern slides) দ্বারা বুঝাইবে। চরন্ত চিত্র (kinematograph) হইলে উত্তম হইত; সম্প্রতি সে চিত্র ছাড়িয়া যাহা সাধ্য, তাহার সাহায্যে জ্ঞানটা স্পষ্ট করিবে। দেহ-জ্ঞান বিলাইলে লোকে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে জানিবে, আত্ম-জ্ঞান জন্মিলে মানুষ হইবে, আর দেশ-জ্ঞান পাইলে নির্বিঘ্নে জীবন ধারণ করিতে পারিবে। আমি যাহা তিনভাগে ভাগ করিয়াছি, প্রাচীনেরা তাহা চারিভাগ করিতেন। তাঁহারা বলিতেন, বিদ্যা, যাহা জানিতে হইবে, চারিটি,—আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা, ও দণ্ডনীতি। আন্বীক্ষিকী—অনু পশ্চাৎ ঈক্ষণ দর্শন, জগতের কার্যকারণ দর্শন অর্থাৎ দর্শন (metaphysics); ত্রয়ী—তিন বেদ যাহা হইতে ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি, বার্তা—জীবিকা, যাহা করিয়া বর্ত্তমান থাকিতে পারা যায়; দণ্ডনীতি-দেশের আইন। ইহার একটিও বাদ দিতে পারা যায় না। বিপদে ও অভ্যুদয়ে বুদ্ধিকে রাখিতে পারে, এক দর্শন। ধর্মশাস্ত্রে আচার ব্যবহার শেখায়। আচার দ্বারা দেহের ও মনের স্বাস্থ্য নিষ্পন্ন হয়; ব্যবহার দ্বারা সমাজে তিষ্ঠিতে পারা যায়। আমাদের সমাজে যে ব্যবহার আছে, অন্য সমাজে ঠিক সেরূপ নাই। যে ব্যবহার উত্তম বলিয়া সমাজে বিবেচিত হয়, তাহা ন্যায়। অতএব ধর্মশাস্ত্রে ধর্মাধর্ম, ন্যায়ান্যায় শেখায়। কেহ-কেহ আন্বীক্ষিকী ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করেন; অতএব তাঁহাদের মতে বিদ্যা তিন। কেহ বা বার্ত্তা ও দণ্ড-নীতি, দুই বিদ্যা গণিয়াছেন, কেহ বা এক বিদ্যা দণ্ডনীতি মাত্র ধরিয়াছেন। এক গণিবার কারণ এই যে, রাজা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। সুতরাং তিনিই শিষ্ট করেন, এবং শিষ্টের পালন করেন।

প্রমথ॥ দেহ-জ্ঞান কই? সাধারণ লোককে দর্শন শিখাইতে হইবে?

গণেশ॥ ধর্মশব্দে religion (a system of faith and worship) মনে করিতেছ কেন? ধর্মশাস্ত্রে শারীরধর্ম পালনের সূত্রও আছে। আয়ুর্বেদে দেহজ্ঞান ও আত্ম-জ্ঞান দুইই আছে। দর্শনের নামে চমকাইলে কেন? জন্মান্তর ও কর্মফলে বিশ্বাস কোন্ হিন্দুর না আছে? যদি কাহারও না থাকে, সে জানে না। পূর্বজন্মের ফলে এ জন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ করি, এবং এ জন্মের সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতেই হইবে। এই বিশ্বাসেই হিন্দু সমাজ টিকিয়া আছে। কর্মফলে বিশ্বাস করিতে গেলেই জন্মান্তরে বিশ্বাস করিতে হইবে। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ, দেশের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থে এই কথা পুনঃ পুনঃ পাইবে।

প্রমথ॥ সে সব ত আখ্যায়িকা, গল্প।

গণেশ॥ গল্প বলিও না; শাস্ত্র না বল, ইতিহাস বল। ইতিহাস হইতে যদি দুরূহ দর্শন পর্যন্ত শিখিতে পার, যে দর্শন তর্কাতর্কি নয়, তোমার চরিতের মন্ত্রী হইবে, সে ত উত্তম ইতিহাস। তুমি ইস্কুলে ইস্কুলে moral training দিতে চাও; কিন্তু কি করিয়া training দিবে, ভাবিয়া পাইতেছ না। ইহার একটা কারণ, এই সব গ্রন্থ গল্পের বই মনে করিয়াছ; আর একটা কারণ, moral trainingএর বাঙ্গালা "নীতিশিক্ষা" করিয়াছ। সেকালের লোকে এবং একালেরও শতকে অন্ততঃ ৯২ জন moral training বা "নীতিশিক্ষা" বুঝিবে না। তাহারা ইহাকে ধর্মের অন্তর্গত করে। ধর্ম=religion মনে করিয়া অনেক অনর্থ হইতেছে। ধর্ম ও কর্মে ভেদ করিতে গিয়া নীতির অবলম্বন হারাইয়া ফেলিতেছ। এক আখ্যায়িকা শোন। অনেককাল হইল বর্দ্ধমানের আদালতে এক বাঙ্গালা-শিক্ষিত ভদ্রলোক চাকরি করিতেন। বেতন অল্প। একদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার বাসায় আসিয়া কন্যাদায় জানাইলেন। শুনিবামাত্র তিনি দুইটি টাকা দান করিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "শুনিয়াছি আপনি আদালতে কাহাকে ৵০ আনা পয়সাও ছাড়িয়া দেন না। আর এই ভিক্ষুক, ব্রাহ্মণ কি না কে জানে, কন্যাদায় কি না কে জানে, ইহাকে বিনা বিচারে দুই টাকা দিলেন;

এ কি নীতি?" তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সেখানে চাকরি, এখানে ত চাকরি নয়। ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলিয়া থাকেন, তাঁহার পাপ; তা বলিয়া আমি কন্যাদায়ে যথাসাধ্য দান না করিয়া থাকিতে পারি কি?" আর একটি শোন। এক মালী বৃদ্ধ হইয়াছিল, কথায় কথায় স্মরণ করিত, তিন-কুড়ি সাত বৎসর পার হইয়াছে, এখন প্রভুর ইচ্ছা। কাজ আরম্ভে জগন্নাথ, মাঝে জগন্নাথ, শেষে জগন্নাথ, নাম উচ্চারণ করিত। পাড়ার শঠেরা তাহার ধর্মভাব দেখিয়া কখনও কলা, কখনও মূলা, কখনও শাগ, কখনও পাতা এমন লইত যে যাঁহার বাগান তাঁহার ভোগে আসিত না। মালী বলিত, লোকের দরকারে যদি কিছুই করিতে না পারি, তাহা হইলে তিন কুড়ি সাত বৎসর বাঁচিয়া ফল কি?

প্রমথ॥ এসব ভণ্ডামি, গোরু মেরে জুতা দান।

গণেশ॥ কিন্তু, বল ত, যাঁহাদিগের চরিত দেখিয়া গ্রাম্য জন নিজের চরিত সংশোধন করিবে, তাঁহারা গোরু মেরে জুতা দান করিলে কোন্ নীতির প্রচার হইবে? Duty, honorary বলিয়া অবহেলা করা কোন্ নীতি? যেখানে সাক্ষাৎ ধর্ম, যাহার নাম ধর্মাধিকরণ, সেখানে কি না হইতেছে? পুত্রকন্যাকে, জনসাধারণকে অসত্যের মাঝে বসাইয়া বলিতেছ, "সদা সত্য কথা কহিবে!" শিক্ষা-কল কত টিপিবে? রামায়ণ-মহাভারত কত ছাপাইবে? মানুষ ধর্মাধর্ম-সংযুক্ত; এক কাজে ধার্মিক, অন্য কাজে অধার্মিক; তথাপি বাল্যকাল হইতে ধর্মের দিকে, ধর্মকর্মের দিকে, মতি চালিত করিতে পারিলে ধর্মকর্মে অভ্যাস জন্মাইতে পারিলে, ব্যবহারের সময় বিচার করিতে হইবে না। ধর্ম উপদেশে যত না হউক, ধর্ম-আচরণে একটা সৎ অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। পুত্রকন্যা প্রাতে পিতামাতা, অপর গুরুজন ও ঠাকুর প্রণাম করিবে; তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিবেন। শুধু এইটুকুর অভ্যাস জন্মাইয়া দাও, দেখিবে ধর্মের পোত পড়িয়াছে।

প্রমথ॥ গুরুজনকে প্রণাম করিতে পারে, কারণ তাঁহারা লালন-পালন করেন। কিন্তু ঠাকুর পূজা করিবে?

গণেশ॥ এইখানে দেশী ও বিদেশী ধর্মের বিস্তীর্ণ প্রভেদ। পিতা-মাতা লালন-পালন করেন, কিংবা ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিবেন ভাবিয়া আমরা পিতামাতা ও ঠাকুর দেবতার পূজা করি না। আমাদের ধর্ম এই, আমরা পূজা করি। কেন এমন ধর্ম, সে অনেক কথা। সে কারণে আমরা গোকে ভগবতী জ্ঞান করি, ভূমিকে ধাত্রী মনে করি। সে কারণে কেহ সরস্বতী, কেহ লক্ষ্মী, কেহ দুর্গা, কেহ শিব, কেহ কৃষ্ণ, কেহ শালগ্রাম, কেহ বা বিশ্বকর্মার পূজা করি। মানুষের যে আশ্রয় ছিল, তাহা নষ্ট হইতেছে; হিংসা, অসত্য, অসূয়া, নৃশংসত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। যে নামই কর, একটা শরণ্য রাখ। এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতে না দিলে পরে সংশয়ে জীবন কাটাইতে হইবে। তবে, যিনি কাল, যিনি শিব, যিনি শঙ্কর, যিনি যোগ (combination of events) দ্বারা জগতের ক্ষেম (well-being) সিদ্ধ করিতেছেন, তিনি নিদ্রিত নাই। তাঁহার কর্ম তিনি করিতেছেন। আমরা কর্মের সহিত ধর্মের এবং ধর্মের সহিত কর্মের যোগ ঘটা-ইতে চেষ্টা করি। পারিব কি না, তিনিই জানেন। "কেন এই কর্ম করিতেছ?"—উত্তর হইবে, "কারণ ধর্মই বড়।" "কেন এই ধর্ম করিতেছ?" কারণ কর্মই বড়। এখনও এদেশ ধর্মহীন হয় নাই। দেখ, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় অন্য দেশে অধর্মের অত্যাচার যত হয়, এদেশে তত হয় না। বছরে বছরে যত বই ছাপা হয়, বোধ হয় তাহার চৌদ্দ আনা ধর্মগ্রন্থ। দেশ-কাল-পাত্র উপেক্ষা করিয়া যে শিক্ষাই দাও, সেটা কুশিক্ষা হইবে। আমাদের দেশের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা কোন্ দেশে আছে? কোন্ গুণে এত ধৈর্য?

প্রমথ॥ ধৈর্য একটু কম হইলে ভাল ছিল। অনা-বৃষ্টিতে মাঠের ধান শুখাইয়া যাইতেছে, পুকুরের জল খোলায় করিয়া সেচিতেছে! একটা কাঠ কুঁদিতে হইবে; এক জন টানিবে, আর এক জন থামিয়া থামিয়া কুঁদিবে! ধন্য ধৈর্য!

গণেশ॥ তুমি হইলে কি করিতে?

প্রমথ॥ কেন, 'পম্প' বসাইয়া হড়্-হড়্ করিয়া জল তুলিয়া পাঁচ দিনের কাজ একদিনে শেষ করিতাম। একটা 'লেদ' (lathe) দিয়া কাঠখানা একাই কুঁদিয়া ফেলিতাম। একটু উদ্যম (enterprise) থাকিলে কি না হইত।

গণেশ॥ তুমি 'পম্প' ও 'লেদ' দেখিয়াছ, তাহাদের নিন্দা করিতেছ। তাহারা কখনও দেখিয়াছে কি, কিংবা তাহাদের কিনিবার পয়সা আছে কি? দেখে নাই

বলিয়াই ত দেখাইতে বলিতেছি। তুমি বিদ্যা শিখিয়াছ, দেশের লোককে একটু দান করিতে বলিতেছি। কিন্তু খোলায় করিয়া জল তুলিতে দেখিয়াও কি বলিতে পার উদ্যম নাই? কোন্ উদ্যমে শুখনা মাটিতে ধার-করা ধান বুনিয়া দেয়, কোন্ উদ্যমে ক্ষেতে গিয়া রোদে বর্ষায় দিনের পর দিন খাটে? এত দেখিয়াও বল, উদ্যম নাই? তোমার উদ্যমে অনিশ্চয় অল্প; আট-ঘাট ভাবিয়া উদ্যম। আর ইহাদের উদ্যমে সবই অনিশ্চয়। বর্ষা, যথা সময়ে বর্ষা হইতে পারে, নাও হইতে পারে; ঝড় হইতে পারে, পোকা লাগিতে পারে। এত অনিশ্চয়ের মধ্যে যে বুক বাঁধিয়া কাজ করে, তাহাকে উদ্যম-হীন বলিতে পার কি?

প্রমথ। এমন উদ্যম আছে। কিন্তু পুরাতনকে এমন ধরিয়াছে যে, নূতনের নামে শিহরিয়া উঠে। নূতন কিছু করিতে বলা যাক, অমনই পিছাইয়া পড়িবে।

গণেশ॥ পুরাতন নিশ্চিত, নূতন যে সব অনিশ্চিত। নূতন লইয়া তুমি খেলা করিতে পার; তোমার কিছুই আসে যায় না। তাহারা খেলা করিতে পারে কি? যে ধানের আশায়, তাহার একার নহে, তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রাণ নির্ভর করিতেছে, সে ধান লইয়া সে খেলা করিতে পারে কি? তুমি বলিতেছ, জমিতে হাড়-গুঁড়া ছড়াও। তুমি তাহার ভালর তরে বলিতেছ। কিন্তু হাড়-গুঁড়ায় যদি ধান মরিয়া যায়, যত ফলিবার তত যদি না ফলে? তখন তুমি তাহার ক্ষতি-পূরণ করিবে কি? তাহার পাশের জমিতে হাড় ছড়াইয়া দুই-তিন বছর দেখাও, কেমন বেশী ধান হয়; তখন তাহাকে আর বলিতে হইবে না, তাহাকে পুরাতনের ভক্ত বলিয়া গালি দিতে হইবে না। তখন দেখিবে, সে তোমার উপরে উঠিয়াছে, তুমি যাহা পার নাই সে পারিয়াছে। কারণ, তোমার মাত্র সদিচ্ছা, আর তাহার মরণ-বাঁচনের কথা। তুমি এত জ্ঞান, এত লেখা-পড়া শিখিয়াছ, এই সামান্য কথাটায় অধৈর্য হইয়া পড়িতেছ! বলিতেছ এদেশের লোকগুলা এত নির্বোধ, নিজের স্বার্থও বুঝিতে পারে না! দেখ, সকল বিষয়েই তিন অবস্থা আছে, ক্ষয় (decline), স্থিতি (stationary condition) আর বৃদ্ধি (growth or rise)। আমাদের দেশের কৃষকেরা বৃদ্ধি করিতে না পারুক, ক্ষয় করিতেছে না। যে জ্ঞান ছিল, বরং তাহা বাড়াইয়াছে, কমায় নাই। সে সময় তুমি উপদেষ্টা ছিলে না। আমরা উদ্যমহীন আমরা পুরাতন-প্রিয়, এই দুই অপবাদে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে। কেবল কৃষিতে নহে, আমরা যখনই কিছু না করি, তখনই এই দুই অপবাদের বোঝা মাথায় চাপাইয়া ঢাক-ঢোল পেটা হয়।

প্রমথ॥ এ যেন গেল! চাষের সঙ্গে ধর্মের কি সম্বন্ধ? তাঁতী তাঁত বুনিতেছে, ছুতার কাঠ চিরিতেছে, কামার লোহা পিটিতেছে, ধর্ম কোথায়?

গণেশ॥ তাহারা কার কর্ম করিতেছে? "তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে আমি করি"—এই গান কেবল বঙ্গদেশের গ্রামে নয়, ভারতবর্ষের যেখানে যত গ্রাম আছে, সব গ্রামের লোক শুনিয়াছে। বেদে কোরাণে বাইবেলে সব শাস্ত্রেই লেখা আছে। ক্ষেতে কৃষক লাঙ্গল করিতেছে, কার তরে করিতেছে? নিজের তরে? সেই যে দেবী যিনি সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া, দয়া, তুষ্টি, বৃত্তি-মাতৃ, রূপে সংস্থিতা হইয়া জগৎ যন্ত্র ঘূর্ণিত করিতেছেন, তিনিই জানেন। এই উক্তি হিন্দু কি, মুসলমান কি, শোনে নাই?

প্রমথ॥ যদি শুনিয়া থাকে, তবে আবার শোনাইয়া ফল কি?

গণেশ॥ শোনে, কিন্তু ভুলিয়া যায়। সেই পুরানা গানই কর্মে প্রয়োগ করিতে বল, নিরানন্দ স্থানে আনন্দ আসিবে। এখন কর্মের প্রবর্ত্তক, আমি ও আমার; তখন মনে হইবে, আমি না করিলে কে করিবে? এখন পুরানা পুকুরের পাক উঠিতেছে না। তখন দেখিবে নূতন দীঘী কাটা হইতেছে। এই যে ভুবনেশ্বরের মনোহর মন্দির; কোন্ শিল্পী মন ঢালিয়া গড়িয়া গিয়াছে! সে কে, তাহার নামধাম সন তারিখ কোথাও ক্ষোদা আছে কি? সাধ্য কি, সে নিজের নাম ক্ষুদিবে। মনে কর কি, পয়সা দিয়া নির্মিত হইয়াছিল? প্রবল রাজার বেত্রাঘাতে পাথর উঠিয়াছিল? পুরীতে নাকি ৫২ মঠ (সে কালের residential college) আছে; কত দেশ-দেশান্তরের কে বিষয় সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে, তাহাদের নাম-ধাম কোথায়? যশের তাড়নায় মঠ স্থাপন করিলে পাথরে পাথরে নাম লেখা দেখিতে, পাথরে পাথরে প্রতিমূর্ত্তিও দেখিতে পাইতে।

প্রভৃতি 'নিস্বষ্টার্থের' (middle man) উদরে যাইতেছে, তাহারা পাইলে বাঁচিয়া যাইত।' কৃষক ক্ষেতে প্রচুর আলু জন্মাইয়াছে, যথা সময়ের পূর্বেই জন্মাইয়াছে; কিন্তু কাহাকে কোথায় বিক্রি করিবে? তাঁতী দিন রাত খাটিয়া প্রত্যহ একখানা ধুতি বুনিতেছে; কিন্তু কে তৎক্ষণাৎ কিনিয়া দাম দিবে? এখন 'মহাজন'কে বেচিতে হইতেছে। কিন্তু মহাজন আর একজনকে বেচে, সে আর একজনকে। এই রূপে তিন চারি হাত ঘুরিয়া গ্রাহকের হাতে যায়। ধুতির দাম অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠে। গ্রাহক দাম দেয়; কিন্তু সমুদয়, কারু যে তাঁতী, সে পায় না। অথচ সে পাইলে বাঁচিয়া যাইত।

প্রমথ॥ মহাজনই দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

গণেশ॥ এক নিশ্বাসে 'রায়' প্রকাশ করিও না। মহাজন ভাল আছে, মন্দ আছে; সুজন আছে, দুর্জন আছে। কিন্তু কোন্ ব্যবসায়ে দুর্জন নাই? বিদ্বান্, উত্তম শিক্ষিত-দিগের মধ্যে দুর্জন নাই?

প্রমথ॥ আমি শুদখোর মহাজনের কথা বলিতেছি। টাকায় এক আনা শুদ কষিয়া কষিয়া খাতকের রক্ত শুষিয়া খায়।

গণেশ॥ যদি টাকায় বছরে ৸০ আনা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে গ্রামের সবাই মহাজনি করে না কেন? এত লভ্য ত আর কিছুতে নাই। কিন্তু মহাজনের কত টাকা ডুবিয়া যায়, তাহার হিসাব দেখিয়াছ কি? খাতক টাকায় এক আনা সুদ দিতে স্বীকার, যখনই শুনিবে, তখনই জানিবে সে খাতককে তোমরা এক পয়সাও ধার দিতে না। কোনও 'বেঙ্ক' দিত না, নিশ্চয়। বোধ হয়, "সমবায়-উদ্ধার-সমিতিও" দিত না। এমন খাতকের বিপত্তির সময় যে মহাজন টাকা দেয়, সে মহৎ জনই বটে। শুদ কেন চড়া, তা না ভাবিয়া উপকারী মহাজনের দোষ দিলে অধর্ম হইবে। দোষটা দেশের; দেশটা এত দরিদ্র যে এক আনা শুদ দিতে হয়। মহাজন শব্দের প্রাচীন অর্থ কি, জান? বহুজন,—মহাজন, (a multitude of men)। এই বহুজনের মধ্যে যে প্রধান হইত, ব্যবসায়ে বড় হইত, সে ক্রমে মহাজন নাম পাইত। বোধ হয়, প্রথমে 'শ্রেণী' ছিল; সেই শ্রেণীর যে প্রধান, সে মহাজন। অতএব কৃষক-'শ্রেণী' ধর, কি কারু 'শ্রেণী' ধর, মহাজন তাহাদেরই একজন, এক প্রতিনিধি। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তাহাদেরই। ধর্মদাসের ঘরের চাল ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে; বর্ষাকালে বেচারীর দাঁড়াইবার স্থান নাই। অর্থ সঞ্চয় দূরে থাক, যাহা প্রত্যহ আনে, তাহাতে খাইতেও কুলায় না। মহাজনের দ্বার ভিন্ন তাহার কি গতি আছে? এমন লোককে মহাজন বাঁচাইতে পারে; কারণ টাকা তাহার একার। সমিতি পারে না, কারণ সমিতির টাকা দশজনের। শ্রেণীর মহাজন শ্রেণীর প্রত্যেককে বাঁচাইতে পারে। আমাদের দেশের জাতিবন্ধনের মূল এই শ্রেণী। পরস্পরের হিতসাধনই উদ্দেশ্য। জাতিবিভাগের অন্য কারণ যাহাই থাক, বন্ধনের কারণ সমবায়ে হিতেচ্ছা। এখন মূল উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়াছি। পুরাতন শ্রেণীর ভাব জাগাইতে পারিলে কৃষক ও কারুর অর্থাভাব কিছু কমিতে পারে। মনে করিও না, সমাজভেদ উঠাইয়া দিতে পারিবে। সেই ভেদ অন্য নামে —সমাজ, সভা, সমিতি প্রভৃতি নামে থাকিবেই থাকিবে। সমবায়ে বল-সংগ্রহ, সকলেরই উদ্দেশ্য।

প্রমথ॥ আমাদের দেশের লোকগুলাও নির্বোধ; আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করে, শেষে মহাজনের দ্বারস্থ হয়।

গণেশ॥ দেখ, আর যাহা বল, অতিব্যয়ী বলিও না। অকস্মাৎ বিপদ না ঘটিলে কেহ অন্যের নিকট ঋণী হয় না। অর্থ সঞ্চয় করিবার পর বিবাহ করা চলে; কিন্তু সে নীতি পিতৃ-দায়, মাতৃ-দায়, কন্যা-দায় মানে না। 'দায়' অর্থে দান (gift)—পিতামাতার শ্রাদ্ধে দান করিতেই হইবে। যাহার যেমন সমাজ, তাহাকে সে সমাজের তেমন মর্যাদা (propriety of conduct) রক্ষা করিতে হয়। গ্রামে দেখিবে, অবস্থা বিবেচনা করিয়া সমাজই মর্যাদা স্থির করিয়া দেয়। একজন শত্রু হইতে পারে, পাঁচজনই পারে না। পাঁচজনে বসিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেয়, যথা-সাধ্য সাহায্যও করে। আর, কন্যা-দায় যাহা বলিতেছ, তাহা কতকটা তোমাদের সৃষ্টি। তোমরা কত নূতন নূতন সৃষ্টি করিতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? সাধারণ লোকে তোমাদিগকে আদর্শ জ্ঞান করে; কারণ তোমরা বিদ্বান্, ও সমাজের হিতাহিত বিবেচক। কিন্তু তোমরা যাহা পার না, তাহারা পারে। একবার এক গ্রামের প্রায় পঞ্চাশঘর জোলিয়া একদিনে মদ্য ত্যাগ করিয়াছিল, অদ্যাবধি স্পর্শ করে নাই। কর্ম-সামর্থ্যই পুরুষ-সামর্থ্য। গর্হিত বুঝাইয়া

দিলে তাহারা মানে। তোমরা মান কি? তোমরা স্বাধীন-চিন্তা চাও; কিন্তু চিন্তাকে স্ব-এর অধীন রাখিয়াছ কি? লোক-শিক্ষা স্বাধীন-চিন্তায় চলিবে না। যাহা আছে, তাহার উপর ভিৎ তুলিতে হইবে। গড়িতে না পারিলে ভাঙ্গিবে না। দেশটি কি রকম হইলে সন্তুষ্ট হইতে পারিবে, তাহা মনে মনে, আদি-অন্ত, শাখা-প্রশাখা-সহিত, শিল্পীর ন্যায় রচনা করিবে। বৈষম্যে যতই কষ্ট বোধ কর, দূর করিতে পারিবে না; কারণ বৈষম্যেই সৃষ্টি। সাম্য একটা অসম্ভব কল্পনা। অতএব দেশের কর্মের অনুবন্ধ (motive) ধ্যান করিবে, বিরোধ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিবে, তার পর লোক শিখাইতে বাহির হইবে। কারণ শিক্ষা দ্বারা কেবল বুদ্ধির উৎকর্ষ নহে, প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হইবে। যিনি কর্ম ও জ্ঞান যোগ করিয়া শিখাইতে পারেন, তিনিই সাধক, তিনি ধন্য, তাঁহার ভক্তিও ধন্য। পুরাতন সবই পবিত্র নহে, নূতন সবই নিন্দিত নহে। যেমন শিখাইবে, সমাজ তেমন হইবে। শিক্ষার শিকড় সমাজের উপর হইতে নিম্নতলে গিয়া ঠেকে।

প্রমথ॥ এমনি সব দেখাইয়া দেখাইয়া বলিয়া বলিয়া বেড়াইলে দেশের শিক্ষা হইবে?

গণেশ॥ এমনি কি? শিখাইবার অন্ত আছে কি? মনে কর, এক গ্রামে গিয়া আমাদের তীর্থ-স্থান কহিতে গিয়াছ। গ্রামের লোক যত মূর্খ হউক, যে বার্তাই করুক, কতকগুলা নাম নিশ্চয় শুনিয়াছে। ছায়া-পটে ভারতবর্ষের মান-চিত্র দেখাও, কোথায় কি তীর্থ, সে তীর্থে কি ঠাকুর, কেমন মন্দির, সে দেশের লোক কেমন, তাহাদের কাপড়-চোপড় কেমন, ঘর-কন্না কেমন, সেখানে যাইবার পথ কি, ইত্যাদি ইত্যাদি ধরিয়া একটা নূতন পৃথিবী, তোমার শ্রোতার পৃথিবী অপেক্ষা হাজার কি লক্ষ গুণে বৃহৎ পৃথিবী, চোখের সামনে ধরিবে। তীর্থের কাহিনী কয়দিনে শেষ করিতে পারিবে? আর, কত বিষয় কত অল্প সময়ে জানাইতে পারিবে? দেশ-জ্ঞান জন্মাইবার এমন সহজ উপায় কোথায় পাইবে? রামায়ণী কথা ধর। এই এক কথা ধরিয়া দিনের পর দিন কত কথা বলিতে পারিবে; চিত্র দ্বারা বাস্তব করিবে; কোথায় অযোধ্যা, কোথায় সরযূ, কোথায় মিথিলা, কোথায় দণ্ডকারণ্য, কোথায় লঙ্কা, প্রভৃতি দেখাইতে দেখাইতে দশরথের সত্যপালন, রামের পিতৃভক্তি ভরত ও লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র্য, সীতার পাতিব্রত্য প্রভৃতি ধর্ম জীবন্ত হইয়া উঠিবে। একালের ডাক-ঘর ধর। কি বিশাল ব্যবস্থা, পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, এক করিয়া ফেলিয়াছে; দুইটি কি চারিটি পয়সার বদলে দূর দূরান্তরের বন্ধুর সংবাদ আনিয়া দিতেছে!

প্রমথ॥ এমন সব ধরিলে কথকতা অফুরন্ত বটে। একখানি কাপড় ধরিয়া আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত দিয়া গেলে, শত বিষয়ের জ্ঞানসঞ্চার করিতে পারা যায়। কিন্তু শুধু জ্ঞানে কি হইবে, কর্ম চাই। সম্প্রতি যে "গৃহশিল্প-সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অনেক কর্ম হইতে পারিবে।

গণেশ॥ কর্ম হউক না হউক, যেটা যা নয় সেটাকে তা বলিও না। কারণ আসলটা Home Industry। Home মানে স্বদেশ, এবং Industry মানে ব্যবসায় বুঝি। বহুলোক কোনও উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিলেই Industry। ইংরেজীতে কৃষিও একটা Industry। কৃষিকর্মকে "গৃহ-শিল্প", "কুটীর-শিল্প" বলিতে শুনিলে হা-হতোস্মি করিতে ইচ্ছা হয়। "গৃহ-শিল্প", "কুটীর-শিল্প" বলিলে বুঝি গৃহ-নির্মাণ-শিল্প (art of architecture)। ময়দানব শিল্পী ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভা নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিশ্বকর্মা দেবতাদিগের শিল্পী। এ কারণ দেশের কারু বিশ্ব-কর্মার পূজা করে; যেন তাহার কলায় নূতন নূতন 'অভি-প্রায়' (design) ব্যক্ত হয়। 'স্বচিত্ত-কারু',—যে কারু নিজের মন হইতে গড়ে, সে শিল্পী। সে নিজের মন হইতে গড়ে না, সে কারু (artisan)-মাত্র। শিল্পী, কারু-শ্রেষ্ঠ, (master artisan), বরং স্রষ্টা ((master artist) ।

প্রমথ॥ নামে কি আসে? কথাটা বুঝিলেই হইল।

গণেশ॥ নামে খুব আসে যায়। জোৎস্নায় গাছের ডালের ছায়া পড়িয়াছে। ভূত-প্রেত নাম শুনিলে ভয় জন্মিবে, ডালের ছায়া শুনিলে জন্মিবে না। একটা নামের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ইতিহাস মনে আসে। Technical education = কলা-শিক্ষা। কলা-শিক্ষা বল, দেশের হাজার হাজার কলার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। তখন মনে হইবে, অদ্ভুত কিছুর শিক্ষা নয়। যদি নূতন কিছু হয়, যেটা এদেশে নাই, তখন 'বিলাতী কলাশিক্ষা' বল, কলা স্পষ্ট হইয়া পড়িবে। পাঠ-শালা নাম ছাড়িয়া 'বিদ্যালয়' বল; মনে হইবে একটা কিছু নূতন। তখন দেশের সঙ্গে মিশিতে সময় লাগিবে। যাহা কিছু আমরা শ্রেয় বলিয়া বিদেশ

হইতে গ্রহণ করিব, সে সব যত দেশী করিয়া ফেলিবে, ততই সুবিধা। Cottage industry বলিতে ছোট ছোট কারু-কর্ম, দুই একজনের দ্বারা নিষ্পন্ন কর্ম বুঝি। Factory industy বলিতে বহুলোকের দ্বারা নিষ্পন্ন কর্ম বুঝি। Factory=কারুস্থান বা কারখানা। পূর্বকালে বলিত 'কর্মান্ত'। অতএব যদি নাম চাও, তাহা হইলে গ্রাম্যকলা, এবং কর্মান্ত-কলা কিংবা কারখানার কলা বলা চলে। 'কলা' মানে করা, গড়া। বঙ্গদেশের গত লোক-সংখ্যান (Statistics) হইতে জানা যায়, শতকে ৭৮ জন কৃষি-বার্তায়, ৭জন কলায়, ৫ জন বাণিজ্যে, ৩জন পণ্যবহনে, ৩ জন সেবায়, এবং ৫ জন ভিক্ষা প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা করিতেছে। ইহা মনে রাখিয়া, কোথায় কি জ্ঞান জন্মাইলে উপকার হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া, কর্মের সহিত ধর্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য রাখিয়া, জনশিক্ষায় প্রবৃত্ত হও।

প্রথম ॥ এখন প্রদর্শক কোথায় ?

গণেশ ॥ এখন নাই, কিন্তু সুশীল, সুভাষী, ধার্মিক, ও জ্ঞানী প্রদর্শক শিখাইয়া লইতে হইবে। বঙ্গদেশে প্রায় লক্ষ গ্রাম আছে। প্রতি ১০ খানা গ্রামে একটা হাট ধরিলে প্রদর্শকের ১০ হাজার 'স্থান' হইবে। বৎসরে চাতুর্মাস্য বাদ দিলে ৮ মাস থাকে। প্রত্যেক 'স্থানে' তিনদিন ধরিলে এক এক প্রদর্শক ৮০ স্থান বেড়াইতে পারিবে। অতএব এক বঙ্গদেশের তরেই ১০ জন প্রদর্শক আবশ্যক। পাঁচ জন পাইলে কাজ আরম্ভ করিতে পার। দুই জন কৃষি, দুই জন কলা, এক জন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবে। পাঁচ জনের নিমিত্ত বছরে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় ধরিতে পার। রেল-ভাড়া ষ্টীমার-ভাড়া প্রায় লাগিবে না। কারণ একে-বারে বহুদূরে যাইতে হইবে না। প্রবাসব্যয়ও প্রায় পড়িবে না। যে গ্রামে হাট বসে, সে গ্রামে কিংবা নিকট-বর্ত্তী গ্রামে এমন উদ্‌যোগী সৎকারশীল লোক পাইবে যাঁহার বাড়ীতে ভৃত্যসহ তিন দিন থাকিতে পারিবে। চেষ্টা সফল হইলে দেখিবে, গ্রামের লোকে প্রদর্শককে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছে। প্রথম প্রথম লোক পরস্পর জিজ্ঞাসা করিবে, তুমি কেন আসিয়াছ ? অর্থাৎ তোমার কি স্বার্থ আছে ? তোমার ব্যবহারে যদি উত্তর না পায়, তাহা হইলে তুমি অযোগ্য। হাত ধরিয়া তুলিবে, কিন্তু গলাধরা-ধরি করিবে না। চাতুর্মাস্য তোমাদের সাধনার সময় হইবে। সে সময় যথাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিবে, দেশ-জ্ঞান সঞ্চয় করিবে, প্রদর্শনের দ্রব্য, ছায়াচিত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে। কলি-কাতায় কিম্বা অন্য স্থানে দেশ-হিতৈষী সৎকর্মশীল বিজ্ঞ ৫ জনের 'দেশ-পঞ্চক' থাকিবে। ইহাঁরা 'অবৈতনিক'। ইহাঁদিগের উপর সমস্ত নীতি নির্ভর করিবে। ইহাঁরা অর্থ-সংগ্রহ করিবেন, কর্মের ব্যবস্থা ও আয়োজন করিবেন, ইহাঁরা এক পয়সা কি দুই পয়সা দামের এক এক কৃষির, এক এক কলার, এক এক বার্তার, স্বাস্থ্যরক্ষার ছোট ছোট পুস্তিকা লেখাইয়া প্রকাশ করিবেন। একপয়সা দামের সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিবেন। হাটে হাটে সাপ্তাহিক পত্র যাইবে; প্রদর্শক গ্রামে পুস্তিকা লইয়া যাইবে। পুস্তিকা কিংবা সাপ্তাহিক পত্রের সব দাম পাইবে না, বেচিয়া লাভও করিতে বসিবে না। এক একটা ছায়া-যন্ত্র কিনিতে ধর ১০০৲ টাকা, প্রতি কাচপট করিতে ৪৲ টাকা। প্রত্যেক প্রদর্শকের নিকটে অন্ততঃ ৫০ খানা। অতএব পাঁচটা সংযোগ (set) করিতে অন্ততঃ ১৫০০৲ টাকা পড়িবে। একজন প্রদর্শক ফটোগ্রাফ তুলিতে ও কাচপট করিতে জানিবে। যেখানে উত্তম কিছু দেখিবে, তাহা উদাহরণ হইতে পারিবে। বছর বছর নূতন নূতন জ্ঞান জন্মিবে, নূতন নূতন আয়োজনও করিতে হইবে। বোধ হয় পঞ্চকের হাতে বৎসরে ৫০০০৲ টাকা থাকা আবশ্যক হইবে। বৎসরে ১০,০০০৲ টাকা কত দিকে উড়িয়া যাইতেছে। সংকল্প সফল হইলে কর্ম বাড়াইতে পারিবে। তখন দেখিবে আমরা বুড়ারাও তোমাদের কথা শুনিবার নিমিত্তে লালায়িত হইতেছি। ধর্ম ও সমাজের যোগ না থাকিলে সরকার-বাহাদুরও কোনো কোনো জ্ঞানপ্রচারের নিমিত্ত কথক বা প্রদর্শক নিযুক্ত করিতে পারিতেন।

প্রজ্ঞার জয়

(আষাঢ়ে প্রকাশিত প্রাণের কাহিনী প্রবন্ধের পর পঠিতব্য)

[আচার্য্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ,]

প্রাণের কাহিনী কহিতেছিলাম,—সেই কাহিনী বিরোধের কাহিনী। আশা করি, সেই বিরোধের উৎকটতা আপনাদের কাছে অনেকটা স্পষ্ট হইয়াছে। প্রাণিমাত্রই এই বিরোধে লিপ্ত আছে ; অথবা, ঘুরাইয়া বলিতে পারি, একমাত্র প্রাণিপদার্থ আপনাকে কোটি-কোটি-কোটি খণ্ডে খণ্ডিত করিয়া এই বিরোধ চালাইতেছে। প্রত্যেক খণ্ড আপন সুবিধামত আপনার মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়াছে ; বিরোধ চালাইতে যোগ্যতা লাভের জন্য যে যেমন সুবিধা পাইয়াছে, সে সেইরূপ মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। বিরোধে সুবিধার জন্যই হয় ত প্রত্যেক প্রাণি-খণ্ড অন্যখণ্ড হইতে এইরূপে স্বাতন্ত্র্য লাভে বাধ্য হইয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্যলাভের ফল হইয়াছে যে জড় জগতের সহিত গোড়ার বিরোধ যেন ভুলিয়া গিয়া প্রাণিগণ পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে এবং পরস্পরকে ধ্বংস করিয়া আপনার স্ব-তন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন আমরা ঐ বিরোধকেই প্রাণের ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যেখানে এই বিরোধ নাই, সেখানে প্রাণেরও অস্তিত্ব নাই, এরূপও মনে করিতে পারি। যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নাই, আমার সংজ্ঞামতে তাহাই খাঁটি জড়। সেইরূপ প্রাণহীন খাঁটি জড়দ্রব্য পৃথিবীতে কোথাও আছে কি না আছে, সে তর্ক এখানে তুলিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। খাঁটি প্রাণহীন জড় থাকুক্ আর নাই থাকুক্, খাঁটি জড়ের এইরূপ conceptual সংজ্ঞা গ্রহণে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। ব্যাবহারিক জগতে ঐরূপ খাঁটি জড় না থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের বাঙ্ময় জগতে উহার কল্পনা করিতে কোন আপত্তি চলিবে না। এই খাঁটি জড় যেখানেই প্রাণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেইখানেই ঐ বিরোধ দেখিতে পাইব, ইহা আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে বিরোধ, ইহা প্রাণীদের জ্ঞাতসারে ঘটিতেছে কি না? জ্ঞান-পূর্ব্বক ঘটিতেছে কি না? প্রাণীরা সচেতন ভাবে,—knowingly, consciously,—এই বিরোধে লিপ্ত আছে, না কেবলমাত্র প্রাণধর্ম্মের বশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যন্ত্রবৎ এই বিরোধে লিপ্ত হইয়াছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন ; কেন না, এখানে চৈতন্যর কথা আসিয়া পড়ে। কোন দ্রব্য চেতন কি অচেতন, ইহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। কিন্তু অপরের চেতনা কস্মিন্‌কালে কোন উপায়ে প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। আমি স্বয়ং যে চেতন জীব, এ বিষয়ে আমার সংশয়মাত্রই নাই ; কিন্তু আমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও চেতনার অস্তিত্ব আছে কি না, ইহার প্রমাণ একেবারেই নাই। এমন কি, আপনি আমার প্রবন্ধের শ্রোতা, পাঠক, বন্ধু ও প্রতিবেশী,—আপনিও আমারই মত চেতন জীব, অথবা চেতনাহীন একটা কলের পুতুলমাত্র, তাহার কোন প্রমাণ আমার হাতে নাই। আপনার অঙ্গভঙ্গী ও চালচলন দেখিয়া এবং আমার অঙ্গভঙ্গী ও চালচলনের সহিত আপনার অঙ্গভঙ্গী ও চালচলনের সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণে উপলব্ধি করিয়া, আমি আপনাকেও আমারই মত চেতন জীব মনে করিয়া লই বা অনুমান করিয়া লই। ইহাকে অনুমানও বলা চলে না ;—ইহা একটা hypothesis বা কল্পনামাত্র। কেন না, অনুমান মাত্রই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একত্র যাহা প্রত্যক্ষ করি, অন্যত্র তুল্য স্থলে তাহা অনুমান করিয়া লই ; সেই অনুমান হয় ত কোন কালে প্রত্যক্ষ-প্রমাণে সমর্থিত হইতে পারে। কিন্তু আমা ভিন্ন অন্য কোন জীবে চেতনা আছে কি না, তাহা কোনকালে প্রত্যক্ষ হয় নাই ; হইবেও না। অতএব এখানে অনুমানেরও কোন ভিত্তি নাই। তবে যে অন্যকে চেতন জীব বলিয়া স্বীকার করি, অন্যে কল্পিত সেই চেতনা নিতান্তই একটা hypothesis, নিতান্তই একটা কল্পনা ; আমার জীবনযাত্রা চালাইবার

জন্ত এইরূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছি মাত্র। অতএব, আমার চেতনা, যাহা আত্ম-চেতনা, যাহাতে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই,—ও যাহা আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়, এবং অন্তে আরোপিত যে চেতনা,—যাহা নিতান্তই ব্যবহারার্থ কল্পিত, এই উভয় চেতনা কখনও এক পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। আমার চেতনাকে যদি চেতনা বলি, তাহা হইলে অপর জীবে আরোপিত চেতনাকে চেতনা নাম না দিয়া চেতনাভাস বলাই সঙ্গত। আমাকে যদি জীব বলি, অন্তকে জীব না বলিয়া জীবাভাস বলাই সঙ্গত। আমরা যখন প্রাণিবর্গকে চেতন ও অচেতন এই দুই শ্রেণিতে ফেলাই, তখন বস্তুতঃ চেতনার কথা বলি না, চেতনাভাসের কথাই বলিয়া থাকি। সেই চেতনাভাস আমি আপনাতে আরোপ করি, মনুষ্য-মাত্রেই আরোপ করি, এমন কি কুকুর বিড়াল কীট পতঙ্গাদিতেও আরোপ করিয়া থাকি। কেহ বা এই চেতনা-ভাস গাছপালাতেও আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কোন প্রাণীতে এই চেতনাভাস খুব স্পষ্ট, কোথাও বা অত্যন্ত অস্পষ্ট। জন্তুতে আরোপিত চেতনাভাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট, আর উদ্ভিদে আরোপিত চেতনাভাস অত্যন্ত অস্পষ্ট,—এত অস্পষ্ট যে গাছপালাকে একেবারে অচেতন মনে করিলেও ব্যবহারে কোথাও আট্‌কায় না। বস্তুতঃ জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যে কোনরূপ সীমারেখা টানা যায় কি না সন্দেহ। এমন কি, অতি নিম্নশ্রেণির প্রাণীতেও এই চেতনাভাস এত অস্পষ্ট যে, তাহাদিগকেও এই হিসাবে অচেতন বলিলে কার্য্যতঃ বিশেষ কোন হানি হয় না। কেঁচো এবং জোঁকের মত প্রাণীতেও এই চেতনা-ভাস আছে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দিবার ক্ষমতা,—respond করিবার ক্ষমতা—দেখিয়া আমরা স্থূলতঃ এই চেতনাভাসের মাত্রা স্থির করিয়া থাকি। একটা জোঁকের গায়ে খোঁচা দিলে সে আপনার দেহকে সঙ্কুচিত করিয়া লয়; আবার একটা লাজুকের গাছে খোঁচা দিলেও সে আপনার শাখা-পল্লবগুলি সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। বাহিরের উত্তেজনাতে উভয়েই সাড়া দেয়; অতএব, উভয়েই চেতন, কেহ কেহ এরূপ মনে করেন। ঘড়ির কাঁটা নাড়িয়া দিলে ঘড়িও টং টং করিয়া বাজিয়া উঠে, বাহিরের উত্তেজনায় সাড়া দেয়; কিন্তু তাই বলিয়া ঘড়ি যে আতনাদে সচেতনভাবে সাড়া দিতেছে, এরূপ ত মনে করা যায় না। ঘড়িকে ত কেহ চেতন মনে করে না। দিল্লীতে চুম্বক নাড়িয়া দিলে সহস্র মাইল দূরে হাবড়ায় লোহার কাঁটা সাড়া দেয়; সূর্য্য-বিম্বে কলঙ্ক দেখা দিলে অর্ব্বুদ মাইল দূরে পৃথিবীর মেরুদেশে অন্তরিক্ষ জ্যোতির্ম্ময় হয়। এই সকল দৃষ্টান্তেও কেহ মনে করে না, যে লোহার কাঁটা চেতন, বা পৃথিবী চেতন। তবে লাজুকের গাছকে বা জোঁককে চেতন মনে করিব কেন? কাজেই কেবল এই সাড়া দিবার ক্ষমতা দেখিয়া চেতনার—অর্থাৎ আমার ভাষায় চেতনা-ভাসের—কল্পনা সর্ব্বত্র নিরাপদ্ নহে। আপনি হয় ত বলিবেন, ঘড়িকে, লোহার কাঁটাকে বা পৃথিবীকে চেতন মনে করিতেই বা হানি কি? যে সাড়া দেয়, তাকেই আমি চেতন বলিব। কিন্তু এরূপ তর্ক কুতর্ক,—কেবল কথার মা'র-প্যাঁচ্ মাত্র। এরূপ তর্কে আপনি চেতনা শব্দটাকে খুব ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিতেছেন মাত্র; উত্তে-জনায় সাড়া দিবার ক্ষমতাকেই আপনি চেতনার লক্ষণ বলিতেছেন। চেতনার ঐ লক্ষণ ধরিলে মানুষ হইতে বালুকণা পর্য্যন্ত সমস্তই চেতন হইয়া পড়ে—অচেতন আর কিছু থাকে না। বরং মানুষের চেয়ে বালুকণাই অধিক সচেতন হয়; কেন না বালুকণা সকল উত্তেজনাতেই সাড়া দিতে বাধ্য; মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক বহু স্থলে সাড়া দেয় না, মানুষ সর্ব্বত্র সাড়া দিতে বাধ্য নহে। ঐ কুতর্ক তুলিবেন না।

আমি আমা-ভিন্ন আর কোথাও চেতনা স্বীকার করিতেই অসম্মত। ঘড়ির কাঁটা, লাজুক গাছ বা জোঁক ত দূরের কথা, অন্য মানুষেও আমি চেতনা স্বীকারে কুণ্ঠিত। অন্য মানুষে যাহা আরোপ করি, তাহা আমার নিকটে চেতনাই নহে, চেতনাভাস মাত্র। আমার নিকট চেতনা ও চেতনাভাস এই উভয়ের পার্থক্য খুব বড় কথা;—এত বড় কথা যে আমার বক্তব্য খুব স্পষ্ট করিয়া না বুঝাইতে পারিলে আমার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইবে। আমি জগত্তত্ত্বের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং পরে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে যদি মূল কোথাও পাওয়া যায়, তাহা হয় ত এইখানে। কাজেই আমি এ বিষয়টা অস্পষ্ট রাখিতে চাই না। মনে করিবেন না, আমি একটা হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়া আপনাদের ধাঁধা লাগাইবার চেষ্টা

"মুক্তির আদেশ"

শিল্পী আর জে, ই, মিত্র, ব্যারনেট

করিতেছি। আমি চেতনা শব্দে আমার চেতনাকেই বুঝিব; যে চেতনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নাই, যাহা আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়। চেতনাভাস শব্দের অর্থ অন্য জীবে আরোপিত চেতনা—যাহা আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় নহে, যাহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় কখনও হইবে না বা হইতে পারে না। ইহার মধ্যে কোন হেঁয়ালি—কোন mysticism নাই। সাদা কথায়, আমার মনের কথা আমি সমস্তই জানিতেছি; কিন্তু আপনার মনের কথা—আপনার মনের ভিতর কখন কি আসিতেছে যাইতেছে, তাহা কিছুতেই জানিতে পারি না, জানিবার উপায় নাই। আপনার অঙ্গভঙ্গী, ইঙ্গিত ইসারা, মুখ চোখের অবস্থা, প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহা হইতে আপনার মনের কথা কতকটা আন্দাজ করিয়া লই মাত্র; কিন্তু যাহা উপলব্ধির বিষয়, ও যাহা আন্দাজের বিষয়, তাহাতে আকাশ-পাতাল ভেদ; সেই দুই পদার্থকে এক পর্য্যায়ে ফেলা কখনই চলিতে পারে না। ফেলিতে গেলে সমস্ত বিচার-বিতর্কের অবসান হইয়া যাইবে। আপনি হয় ত thought-readerদের কথা আনিয়া ফেলিবেন; বলিবেন, কেন, একে অন্যের মনের কথা বলিতে পারে, ইহার ত প্রচুর প্রমাণ আছে। প্রমাণ থাকিতে পারে। কলিকাতায় চুম্বকের কাঁটা নাড়িলে যদি দিল্লীর চুম্বকের কাঁটা নড়িতে পারে, তবে আপনার মগজের ভিতর একটা কিলিবিলি আন্দোলন ঘটিলে আমার মগজের ভিতরেও তদনুরূপ একটা কিলিবিলি আন্দোলন না ঘটিবার কোন কারণ নাই। বিনা তারে টেলিগ্রাফির আবিষ্কারের পর ইহাকে অসম্ভব ঘটনা বলিতে কেহ সাহস করিবে না। বিশেষ আপনার মগজের ও আমার মগজের মাঝখানে যখন ঈথার রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? ঈথারের ভিতর দিয়া যখন এত আন্দোলন চলিতে পারে, তখন মগজের আন্দোলনই বা চলিবে না কেন? আর আপনার মগজ আর আমার মগজ যদি কোনরূপে এক সুরে বাঁধা থাকে, তখন আপনার মগজে গান ধরিলে আমার মগজ ঝঙ্কার দিয়া উঠিবেই। টেলিগ্রাফের কেরাণী যদি লোহার কাঁটার টকর-টক্ক শব্দ শুনিয়া অথবা dot ও dashএর সারি দেখিয়া দূরের তথ্য জানিতে পারে, তখন আমার মগজের টকর-টক্ক হইতে আপনার মগজের তথ্য জানিয়া লইব, তাহা বিচিত্র কি? এইরূপে আপনার মনের কথা আমি জানিয়া লইতে পারি; হয় ত এইরূপ thought-readingএর পক্ষে প্রচুর প্রমাণ আছে; তাহা মানিয়া লইতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতে আমার প্রশ্নের কোন সমাধান হইল না। লর্ড কিচেনারের মৃত্যু-সংবাদ টেলিগ্রাফের তার বাহিয়া সহস্র ক্রোশ দূরে উপনীত হইল। সহস্র ক্রোশ দূরে টেলিগ্রাফের কাঁটা টকর-টক্ক করিয়া উঠিল। কেরাণী সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন, সেই টকর-টক্ক মাত্র; কিচেনারের মৃত্যু ঘটনা তাঁহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইল না। সেই টকর-টক্ক সঙ্কেতের তিনি অর্থ গড়িয়া লইয়া পরে বলিলেন, কিচেনারের মৃত্যু ঘটিয়াছে। উপলব্ধির বিষয় হইল কতকগুলা সঙ্কেত; সেই সঙ্কেতের তাৎপর্য্যটা উপলব্ধির বিষয় হইল না, উহা গড়িয়া লইতে হইল। সেইরূপ আপনার মগজের চাঞ্চল্যে আমার মগজে যদি চাঞ্চল্য ঘটে, তাহা হইলে সেই চাঞ্চল্যের ফল আমার উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে; সেই চাঞ্চল্যের সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া আমি তাহার তাৎপর্য্য স্থির করিয়া বলিতে পারি, আপনার মনে দুঃখ হইয়াছে কি হর্ষ হইয়াছে, আপনার ক্ষুধা হইয়াছে কি পিপাসা হইয়াছে। সেই তাৎপর্য্য আমাকে বুদ্ধিপূর্ব্বক গড়িয়া লইতে হইবে। যিনি thought-reader, তিনি টেলিগ্রাফের সঙ্কেতজ্ঞ কেরাণী, তাঁহার সে অভ্যাস বা সামর্থ্য থাকিতে পারে, অন্যের তাহা না থাকিতে পারে। ফলে আমি যখন আপনার মুখ চোখ দেখিয়া আপনার মনের কথার আন্দাজ করি, তখনও আমি সেইরূপ সঙ্কেত লইয়াই আন্দাজ করি। মগজে মগজে সঙ্কেত চালাচালি হইলেও তাহার বড় বেশী কিছু হইত না। আপনার হর্ষ-ক্লেশ বা ক্ষুৎ-পিপাসা আন্দাজ করা যাইতে পারে। কিন্তু আপনার হর্ষক্লেশ বা আপনার ক্ষুৎপিপাসা কোন thought-readerএর প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় হইল, তাহা ত বলিতে পারিব না। মনে করুন, আমিই thought-reader; আপনার মনের কথা বলিবার জন্য আপনার সম্মুখে হাজির। আপনার ক্ষুৎপিপাসা হইবামাত্র যদি আমারও ঠিক্ তদনুরূপ ক্ষুৎপিপাসা জন্মে, তাহা হইলেও আমি বলিব, আমার যাহা প্রত্যক্ষ হইল, তাহা আমারই ক্ষুৎপিপাসা—তাহা আপনার ক্ষুৎপিপাসা নহে; যদিও আপনারই ক্ষুৎপিপাসা হইতে কোন উপায়ে আমারও তদ্রূপ ক্ষুৎপিপাসা প্রণোদিত হইয়াছে। কাজেই আপনার মনের অবস্থা—আপনার চিত্ত—কখনও আমার 'সাক্ষাৎভাবে

প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। কিন্তু আমার ক্ষুৎপিপাসা, আমার দুর্ঘক্লেশ, সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। অতএব আমি যে অর্থে আমাকে চেতন বলিয়া জানি, সে অর্থে আপনাকে চেতন বলিয়া জানিতে পারি না। উভয়ের চেতনাকে এক পর্য্যায়ে ফেলা অনুচিত। উভয়কে এক নাম দেওয়াও উচিত নহে। অতএব আমি বলিতে চাহি, আমার চেতনাই চেতনা; আপনার চেতনা চেতনাভাস মাত্র। একটা প্রত্যক্ষ, অন্যটা কল্পনা। একটা আসল, অন্যটা নকল।

মনে করিবেন না যে উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য আনিয়া আমি একটা আজগুবি তথ্যে উপনীত হইয়াছি। দুঃখের বিষয়, ইংরেজিতে উভয় চেতনাকেই consciousness বলা হয়—উভয়কে পৃথক্ নামে অভিহিত করা হইলে দার্শনিক বিচারে বোধ করি এতটা গোলযোগ হইত না। দার্শনিক সাহিত্যে আমার কিছুমাত্র বিদ্যা নাই; তবে যতটুকু আছে, তাহাতে আমার মনে সংশয় আছে, যে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য স্পষ্ট দেখা উচিত, পণ্ডিতেরাও ততটুকু পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া দেখান নাই। দেখাইলে হয় ত এতটা গণ্ডগোল হইত না। কেহই যে দেখান নাই, তাহা আমি বলিতে পারিব না। দুই একটা নাম করিয়া দৃষ্টান্ত দিতে পারি,—তাহা হইলে অন্ততঃ আমার বাঁচোয়া ঘটিতে পারে। বড় নামের আশ্রয় লইয়া নিজে তরিয়া যাইতে পারি। দার্শনিক পণ্ডিতের নাম না করিয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের নাম করিব; কেন না একালে তাঁদের নামেরই জোর বেশী। অধ্যাপক Karl Pearson-এর Grammar of Science নামে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। উহা হইতে আমি একটি বাক্য তুলিব, "We *recognise* consciousness in our individual selves; we *assume* it to exist in others" দেখুন, এক ক্ষেত্রে বলা হইতেছে we recognise,—আমরা উপলব্ধি করি, অন্য ক্ষেত্রে বলা হইতেছে, we assume—আমরা মানিয়া লই। আমিও ঠিক্ ঐ কথা বলিতেছি; তবে আমি এস্থলে বহুবচনান্ত We বা 'আমরা' না বলিয়া I বা 'আমি' এই একবচনান্ত শব্দ বসাইলাম। কেন না, আপনার ও অন্য লোকের চেতনা সম্বন্ধে যদি আমার এরূপ সংশয়েরই হেতু থাকে, তাহা হইলে এই "আমরা" থাকে কোথায়? আমার উপর আমার জোর আছে, কিন্তু আপনার উপরে সে জোর কোথায়? আপনারা আচার্য্য ক্লিফোর্ডের নাম নিশ্চয় শুনিয়াছেন—তিনি এই বিষয় লইয়া বিশেষভাবে বিচার বিতর্ক করিয়াছেন—তাঁহার ভাষাও খুব স্পষ্ট—"When I come to the conclusion that *you* are conscious, and that there are objects in your consciousness similar to those in mine, I am not inferring any *actual* or *possible* feelings of my own, but *your* feelings, which are not, and *cannot by any possibility become*, objects in my consciousness." কার্ল পিয়ারসনও আপনার উক্তিকে ফলাইয়া বলিয়াছেন—"Another man's consciousness however, can never, be directly perceived by sense-impression, I can only *infer* its existence from the apparent similarity of our nervous systems, from observing the same hesitation in his case, as in my own, between sense-impression and exertion, and from the similarity between his activities and my own." আমিও তাহাই বলিয়াছি, অন্যের ইঙ্গিত-ইসারা মুখ চোখ ভাব ভঙ্গী দেখিয়া আমি অন্যের চেতনা আন্দাজ করিয়া লই। কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ চেতনা ও অন্যের কল্পিত চেতনা উভয়কে এক নাম দেওয়া উচিত নহে। ক্লিফোর্ড এ কথাটার যাথার্থ্য খুবই বুঝিয়াছিলেন। আমার চেতনাকে—আত্মচৈতন্যকে—তিনি বলিয়াছেন object—প্রত্যক্ষ বিষয়; আর পরের চেতনাকে তিনি বলিয়াছেন eject—মৎকর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বা কল্পিত চেতনা। আমি একেকে বলিয়াছি চেতনা,—অন্যকে বলিয়াছি চেতনাভাস। আমা ভিন্ন অন্য কোন জীবকে আমি চেতন জীব বলিতে রাজি নহি,—বলিতে গেলেই আমার উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটিবে;—আমি অন্য জীবের পক্ষে চেতনাভাস-যুক্ত এই বিশেষণ দিতে চাহি। কিন্তু চেতনাভাস শব্দটার গায়ে পণ্ডিতী গন্ধ আছে—পুনঃ পুনঃ উহার প্রয়োগে বমনোদ্রেক

হইতে পারে। অতএব আমি চেতনাভাস শব্দটা প্রয়োগ না করিয়া তাহার স্থলে কেবল জ্ঞান শব্দ প্রয়োগ করিব। মানুষ পশু পক্ষী প্রভৃতি যে সকল জন্তুর চেতনাভাস স্পষ্ট, তাহারা জ্ঞান পূর্ব্বক, জ্ঞাতসারে, কাজ করে,—তাহারা জ্ঞানী অথবা জ্ঞানবান্ প্রাণী। আর যে সকল নিম্নশ্রেণির জন্তু বা যে সকল উদ্ভিদ্ জ্ঞান পূর্ব্বক কাজ করে না, তাহাদিগকে অজ্ঞানী বা জ্ঞানহীন প্রাণী বলিব। তাহা হইলে আমার বক্তব্য বুঝাইতে গণ্ডগোল হইবে না।

প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিয়া লই। কথায় কথায় আস্ফালন করিয়া বলা হয়, আমাদের ভারতবর্ষের শাস্ত্রে সমস্ত বাহ্য জগৎকে চৈতন্যময় বলা হইয়াছে। আমাতেও যে চেতনা আছে, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তৃণলতা এমন কি লোহ কাষ্ঠেও সেইরূপ চেতনা আছে, আমাদের শাস্ত্রে না কি তাহাই বলা হইয়াছে, এবং ইহাই নাকি ভারতবর্ষের শাস্ত্রের বিশিষ্টতা। আর আচার্য্য জগদীশচন্দ্রও নাকি বৈজ্ঞানিক প্রমাণবলে আমাদের শাস্ত্র-বাক্য সমর্থন করিয়াছেন; ইহাতেই আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের গৌরব। আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সেরূপ কিছুই বলেন নাই; এবং বলেন নাই তাহাতে তাঁহার গৌরবের এক কণিকারও হানি হইবে না। তিনি বিজ্ঞানবিদ্যাবিৎ;—সেই বিজ্ঞানবিদ্যা চৈতন্য সম্বন্ধে কোন কথা বলে না, বলিতে চাহে না, বলিতে পারে না। চৈতন্য দূরের কথা, তিনি জড়-জগতে প্রাণের আরোপও করেন নাই—বরং তিনি প্রাণি-দেহকে জড়-যন্ত্রের formula মধ্যে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়া জড়-জগতের ও প্রাণময় জগতের মধ্যে সীমারেখা লুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—এমন কি মৃত্যুকে পর্য্যন্ত জড়ের formulaয় বাঁধিবার চেষ্টায় আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছেন। তিনি জগতে যে একত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা mechanistic একত্ব,—অন্যরূপ একত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে গেলে তিনি বৈজ্ঞানিক হইতেন না। কোন বাহবার প্রত্যাশায় তিনি আপন পথ ছাড়িয়া বিপথে চলিয়াছেন, মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার হইবে—তাঁহার গৌরবের হানি হইবে। আমাদের শাস্ত্রেও যদি বাহ্যজগৎকে চৈতন্যময় বলিয়া থাকে, তাহারও তাৎপর্য্য আমি অন্যরূপ বুঝি। বাহ্যজগতে চেতনার স্বীকার দূরের কথা, আমাদের শাস্ত্র সম্পূর্ণ উল্টা পথে গিয়া বাহিরের সমুদয় চেতনাকে কল্পিত চেতনা বা চেতনাভাস বলিয়া জোরের সহিত ধরিয়াছে;—পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র যেখানে ভয়ে ভয়ে কথা কহিয়াছে, আমাদের দর্শনশাস্ত্র সেখানে নিঃসঙ্কোচে জোরের সহিত স্পষ্টরূপে সে কথা বলিয়াছে। অন্ততঃ আমার বিশ্বাস ইহাই। এক বই আর দ্বিতীয় চেতন জীব নাই এবং আমিই সেই চেতন জীব, আমাদের শাস্ত্রের একজীববাদের তাৎপর্য্য ইহাই, এ বিষয়ে আমার সংশয়মাত্র নাই। এক এব অদ্বিতীয়, এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্যই ইহাই, এ বিষয়ে, আমার সংশয় মাত্র নাই।

সে কথা আমাকে পরে বলিতে হইবে,—সে সব অত্যন্ত বড় কথা। এখন আমি ছোট কথাতেই ব্যাপৃত আছি। সেই ছোট কথাতেই আবার নামিয়া আসা যাক্। আমি এখন প্রাণিবিদ্যার তরফ হইতে প্রাণের তত্ত্ব আলোচনা করিতেছি। চেতনাই বলুন, আর চেতনাভাসই বলুন, আর কেবল জ্ঞানই বলুন, প্রাণিবিদ্যার রঙিন চশমা চোখে দিলে এই জ্ঞানের সার্থকতা কি দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিতে চাহি।

কবে কোথায় কিরূপে এই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, বিজ্ঞানবিদ্যা বা Physical Science তাহা বলিতে অক্ষম; প্রাণিবিদ্যা বা Biologyও তাহা বলিতে অক্ষম। প্রাণিবিদ্যার সে সমস্যার সমাধানে বোধ করি প্রয়োজনও নাই; অন্ততঃ ডারুইন-তন্ত্রীর এই বিষয়ে মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। ডারুইন-তন্ত্রী কেবল দেখিলেন, এই জ্ঞান-সঞ্চারে প্রাণীর জীবন-সংগ্রামে কোন লাভ আছে কি না। দূরে শত্রু আছে, অথবা দূরে আহার্য্য সামগ্রী আছে, ইহা কোনরূপে জানিতে পারিলে প্রাণীর লাভ আছে বৈ কি! ইহা তাহার পরম লাভ। জীবন-সংগ্রামে যাহাতে পরম লাভ, প্রাণী যদি তাহা অর্জ্জন করিয়া থাকে, ডারুইন-তন্ত্রী তাহাতে কিছুমাত্র বিস্মিত হইবেন না। ধরিয়া লও, এমন দিন ছিল, যখন কোন প্রাণীতে জ্ঞান ছিল না, অথবা অত্যন্ত অস্পষ্ট জ্ঞান ছিল। অকস্মাৎ কোন প্রাণীতে জ্ঞানের লক্ষণ স্পষ্ট ভাবে দেখা দিল। পিতৃপিতামহে যাহা ছিল না, অপত্যে তাহা অকস্মাৎ দেখা দিল। অপত্যের পক্ষে ইহা একটা ব্যতিক্রম, ব্যত্যয়, variation। কোন্ ব্যত্যয় কিরূপে ঘটিল, সে সমস্যার এখনও সমাধান হয় নাই; ডারুইন-তন্ত্রী

সমাধানের জন্য ব্যাকুলও নহেন। হঠাৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইল; অতি অল্পমাত্রায় হইল, কি একেবারে অনেকটা হইল, সে তর্কেও দরকার নাই। অল্পই হউক আর অধিকই হউক, জ্ঞানসঞ্চার ঘটিবামাত্র সেই প্রাণীর জীবন-সংগ্রামে মস্ত একটা সুবিধা হইল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহার বাহিরে খাদ্যসামগ্রী কোথায় কি আছে, শত্রু-মিত্র কোথায় কে আছে, এই জ্ঞান লাভের সঙ্গে-সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে তাহার যোগ্যতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেল, জীবনযুদ্ধে তাহার জয়লাভের সম্ভাবনা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল, আপনার মত সমর্থ অপত্য রাখিয়া বংশরক্ষার সুযোগ তাহার অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেল। জীবনযুদ্ধে যোগ্যের জয়, অযোগ্যের পরাজয়, ইহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। প্রকৃতি ঠাকুরাণী নিষ্করুণভাবে অযোগ্যকে সরাইয়া দেন, যোগ্যতরকে বাছিয়া লইয়া কোলে বসান। কাজেই ধরাধামে জ্ঞানবিশিষ্ট প্রাণীর আধিপত্য দেখিয়া ডারুইন-তন্ত্রী বিস্মিত হইবেন না। প্রাণিবিদ্যা এই জ্ঞানকে জীবনযুদ্ধে অস্ত্রস্বরূপ মনে করেন। উদ্ভিদেরা প্রাণী বটে, এমন কি জড়পদার্থকে আত্মসাৎ করিয়া প্রাণিপদার্থে পরিণত করিবার ভার উদ্ভিদেরাই লইয়াছে। উহারা যখন প্রাণী, তখন উহারাও আত্মরক্ষাপরায়ণ, প্রাণের প্রেরণায় উহারাও আত্মরক্ষার নানা ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। কোন গাছ ফুল ফুটাইয়া ফুলের গন্ধে, ফুলের রঙে, মধুর প্রলোভনে প্রজাপতিকে ডাকিয়া আনে; এবং সেই প্রজাপতির দ্বারা এক পুষ্পের পরাগরেণু পুষ্পান্তরে বহাইয়া লইয়া আপনার বংশ-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লয়। কোন গাছ সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা গজাইয়া রাখে; জন্তুতে খাইতে আসিলে সেই কাঁটা বিঁধিয়া দেয়। কেহ বা আপন দেহে মাদকদ্রব্য বা বিষ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যে জন্তু খাইতে আসে, সে নেশায় অথবা বিষে অভিভূত হইয়া পরাজয় স্বীকার করে। কিন্তু কোনও গাছ জানে না যে, সে এইরূপে বংশরক্ষা করিতেছে বা আত্মরক্ষা করিতেছে বা শত্রুজয় করিতেছে। গাছ যাহা করে, তাহা স্বভাবের প্রেরণায় করে, প্রাণধর্ম্মের বশে করে। জ্ঞাতসারে করে, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে। জ্ঞানাস্ত্র থাকিলে উদ্ভিদেরও হয় ত সুবিধা থাকিত; কিন্তু উদ্ভিদের পক্ষে তাহা তেমন আবশ্যক হয় নাই। উদ্ভিদের মুখ্য কাজ হইতেছে আহার-সঞ্চয়; হাওয়া হইতে ও ভূমি হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে প্রাণি-পদার্থের নির্ম্মাণ—প্রভূত পরিমাণে নির্ম্মাণ। এ জন্য তাহাকে এক স্থানে গট হইয়া বসিতে হয়; কাণ্ড হইতে সহস্র শাখা প্রসার করিয়া, প্রত্যেক শাখা হইতে সহস্র পত্র পল্লব বাহির করিয়া বায়ু হইতে অঙ্গারকণা সংগ্রহ করিতে হয়; ভূমির ভিতর সহস্র শাখাযুক্ত মূল চালাইয়া লোণা জল সংগ্রহ করিতে হয়। তাহার খাদ্যসামগ্রী তাহার পাশেই বিদ্যমান;—হাত বাড়াইলেই পাওয়া যায় ও মুখ বাড়াইলেই পাওয়া যায়;—তজ্জন্য দূর দূরান্তে দৌড়িতে হয় না;—এক স্থানে স্থির হইয়া হাজার হাত ও হাজার মুখ বাড়াইলেই কার্য্যসিদ্ধি ঘটে। কোন কোন গাছ এইজন্য প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করে, এবং সেই প্রকাণ্ড দেহের ভর সহিবার জন্য জমিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ঝঞ্ঝা-বায়ু তাহাকে উৎপাটন করিতে পারে না; বড় বড় জন্তু তাহাকে নিঃশেষ করিয়া নির্ম্মূল করিয়া ধ্বংস করিতে পারে না। আত্মরক্ষার জন্য কোন সূক্ষ্ম অস্ত্রের তাহার প্রয়োজন হয় না। বরং যে গাছগুলা আকারে ছোট, তাহাদেরই শত্রুভয় অধিক, তাহাদিগকেই আত্মরক্ষার্থে গায়ে কাঁটা গজাইয়া বা পাতায় বিষ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। শত্রু নিকটে আসিয়া আক্রমণ করিলে তাহার প্রতিবিধান করিতে হয়; দূরের শত্রু হইতে উদ্ভিদের তত ভয় নাই। কাজেই সূক্ষ্মতর জ্ঞানাস্ত্র উদ্ভাবনায় উদ্ভিদের প্রয়োজনই হয় নাই। জন্তুর পক্ষে কিন্তু ভিন্ন ব্যবস্থা। জন্তু নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করিতে পারে না। উদ্ভিদ্‌কে বা অন্য জন্তুকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে বাঁচিতে হয়; এক স্থানে স্থির থাকিলে তাহার চলে না; উদ্ভিদ্ বা অন্য জন্তুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। কাজেই জন্তুরা সাধারণতঃ অস্থির, চঞ্চল; দৌড়িয়া গিয়া অন্যকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে আহার সংগ্রহ করিতে হয়; আবার অন্য জন্তু দৌড়িয়া আক্রমণ করিতে আসিলে দৌড়িয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। দূরস্থিত আহার-সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া তাহার প্রয়োজন; দূরস্থিত শত্রুর সন্ধান পাওয়া তাহার প্রয়োজন। এই সন্ধান ব্যাপারে জ্ঞানাস্ত্রের তুল্য অস্ত্র নাই। অতি দূর দেশ হইতে অতি সূক্ষ্ম উত্তেজনা,—গন্ধের, শব্দের, বর্ণের উত্তেজনা—পৌঁছিবামাত্র তাহাতে সাড়া দিয়া তদনুসারে আত্মরক্ষা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া তাহার

প্রয়োজন। জ্ঞানাস্ত্রের কাজ ইহাই। প্রাণিবিদ্যা বলিবেন, জন্তুরা এই উদ্দেশ্যেই জ্ঞানাস্ত্র অর্জ্জন করিয়াছে বা উদ্ভাবনা করিয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে যাহার প্রয়োজন হয় নাই, জন্তুর পক্ষে তাহার প্রয়োজন হইয়াছে। কাজেই জন্তুমধ্যে—বিশেষতঃ উচ্চ শ্রেণির জন্তুমধ্যে আমরা স্পষ্টতঃ জ্ঞানের সঞ্চার দেখিতে পাই। কিন্তু এই জ্ঞানাস্ত্রেরও আবার প্রকার-ভেদ আছে, সামর্থ্য-ভেদ আছে। দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিব। প্রজাপতি বা মৌমাছি দূরে অবস্থিত ফুলে বর্ণের বা গন্ধের উত্তেজনা পাইবামাত্র সেই ফুলের অভিমুখে দৌড়িয়া যায়; সম্পূর্ণ জ্ঞানপূর্ব্বকই দৌড়িয়া যায়। মৌমাছি সেই ফুলের মধু আনিয়া চাকের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া, চাকের যিনি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, চাকের যিনি রাণী, তাঁহার বাচ্চাগুলির ভোজনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছিদের অধিকাংশই কেবল মজুরি করে; সহস্র কুঠরিতে বিভক্ত চাক গড়ে; সেই চাকের কারিকরি দেখিলে মানুষেরও তাক লাগিয়া যায়। সেই কুঠরিতে তাহারা মধু সঞ্চয় করে; আর চাকের রাণী কুঠরির মধ্যে ডিম পাড়েন। রাণী কেবলই বসিয়া বসিয়া ডিম পাড়িতেছেন, হাজার-হাজার ডিম পাড়িতেছেন; সেই ডিমগুলি ফুকাইয়া যখন বাচ্চা মাছি নির্গত হইতেছে, চাকের মজুর-মাছিরা তখন তাহাদিগকে সযত্নে লালন-পালন করিতেছে এবং সঞ্চিত মধু খাওয়াইয়া তাহাদিগকে পোষণ করিতেছে। যদি কোন শত্রু চাকের নিকটে আসে, অমনি তাহাদের গায়ে হুল্ ফুটাইয়া বিষ ঢালিয়া দেয়। মৌমাছির এই যে আত্মরক্ষাপর এবং বংশরক্ষাপর কর্ম্ম, ইহা জ্ঞান-পূর্ব্বক কর্ম্ম, ইহা স্বীকার না করিলে বুঝি চলে না। দূরাগত গন্ধের বা বর্ণের অতি সূক্ষ্ম উত্তেজনা পাইয়া জ্ঞান-পূর্ব্বক মৌমাছি ফুলের দিকে ছুটিতেছে, ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে, চাকের কুঠরির মধ্যে সঞ্চয় করিতেছে, নিজের চাক নিজেই গড়িতেছে, আবশ্যক-মত চাক মেরামত করিতেছে, রাণী-মাছির ডিমগুলিকে এবং বাচ্চাগুলিকে সযত্নে পালন করিতেছে, চাকের শত্রু দেখিবামাত্র তাহাকে আক্রমণ করিতেছে;—এত কাণ্ড সে জ্ঞানপূর্ব্বক করিতেছে ইহা মানিতে পারি। জ্ঞানপূর্ব্বক করিতেছে বলিয়াই মৌমাছি উদ্ভিদের তুলনায় উচ্চ প্রাণী। কিন্তু এখানেও উদ্ভিদের সহিত তাহার মিল আছে। মৌমাছি জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতেছে, ইহা মানি, কিন্তু কেন করিতেছে, কি উদ্দেশ্যে করিতেছে, তাহার কিছুই সে জানে না। করিতে হয় তাই সে করিয়া যাইতেছে। কি যেন ভিতর হইতে তাহাকে করাইতেছে; সে বাধ্য হইয়া করিতেছে; তাহার না করিলে নয়, তাই সে করিতেছে। এই কর্ম্ম বিষয়ে তাহার কোনরূপ ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই, কোনরূপ স্বাধীনতা নাই, কোনরূপ বিচার-বিতর্কের অবসর নাই, করিব না বলিবার কোন অধিকার নাই। সে বিষয়ে মৌমাছির অবস্থা বাবলা গাছেরই সমান। বাবলা-গাছ যথাকালে সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা বাহির করে; এই কাঁটা আত্মরক্ষার অস্ত্র বটে; কিন্তু বাবলা গাছ জানেও না, যে, সে আত্মরক্ষার জন্য এই অস্ত্র বাহির করিয়াছে; এমন কি, সে জানেও না যে, তাহার শত্রু আছে; এবং সেই শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্যই সে যথাকালে কণ্টকাস্ত্র প্রস্তুত রাখিয়াছে। সে যথাকালে কাঁটা বাহির করিতে বাধ্য আছে; এ বিষয়ে কোন স্বাধীনতা তাহার নাই। মৌমাছিও সেইরূপ জানে না, কেন কি উদ্দেশ্যে সে এইরূপে খাটিয়া মরিতেছে; নিজের জন্য যত না খাটুক, চাকের রাণীর জন্য এবং চাকের রাজপুত্র এবং রাজকন্যাদের জন্য খাটিয়া মরিতেছে। অথচ এ বিষয়ে মৌমাছিরও স্বাধীনতা নাই; ভিতরের প্রেরণায় তাহাকে বংশরক্ষার্থ ঐরূপ খাটিতে হয়, না খাটিলে তাহার চলে না; তাই বাধ্য হইয়া খাটে। এই বাধ্যতা বিষয়ে, এই স্বাধীনতার অভাবে, মৌমাছির বাবলা গাছের সহিত মিল। বাবলা গাছের সহিত তাহার প্রভেদ এই যে, বাবলা গাছ নিজের কাঁটার অস্তিত্বও জানে না, বাহিরের শত্রুর অস্তিত্বও জানে না, শত্রুর গায়ে যখন কাঁটা বিঁধে, তাহারও কোন খবর রাখে না। মৌমাছি বোধ হয় সেইটুকু জানে। বাহির হইতে শব্দের উত্তেজনা, বর্ণের উত্তেজনা, গন্ধের উত্তেজনা আসিবামাত্র সে জানিতে পারে এবং সেই উত্তেজনা আসিলে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। বাবলা গাছ জ্ঞানহীন, তাহার জ্ঞানই নাই; মৌমাছি জ্ঞানবান, তাহার কর্ম্ম জ্ঞান-পূর্ব্বক। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ। কিন্তু উভয়েই প্রাণ-ধর্ম্মের সর্ব্বতোভাবে অধীন; প্রায় যন্ত্রবৎ অধীন।

মৌমাছির পক্ষে এই প্রাণ-ধর্ম্মের প্রেরণার ইংরাজি নাম instinct; বাঙ্গালায় বলা যাইতে পারে, সহজাত বা সহজ

সংস্কার ;—সহজাত, কেন না, মৌমাছি জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সমুদয় ক্ষমতা ষোলআনাই পাইয়া থাকে ; দেখিয়া, শুনিয়া বা ঠেকিয়া শিখিতে হয় না। কোন্ অবস্থায়, কোন্ ক্ষেত্রে, কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে, তাহা তাহাকে শিখিয়া লইতে হয় নাই, কেহ তাহাকে শিখায় নাই। চাক নির্ম্মাণে, চাক রক্ষায়, মধু সঞ্চয়ে, অপত্য পালনে, তাহার পটুত্ব একবারে আশিক্ষিত-পটুত্ব। ইহা জন্মসহকারে লব্ধ, অতএব সহজাত বা সহজ। ঐ অশিক্ষিত-পটুত্ব,—ঐ সহজ সংস্কার, চাক-রক্ষার অনুকূল ; মৌমাছির জাতিরক্ষার ও বংশরক্ষার অনুকূল। অতএব এই সংস্কারটা জীবন-সংগ্রামে অনুকূল, এই সংস্কারটা তাহাকে জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতা দিয়াছে। অতএব মৌমাছি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে এই সংস্কার অর্জ্জন করিয়াছে। অতীত ইতিহাসে যে সকল মাছির এইরূপ বংশরক্ষার প্রবৃত্তি ছিল না, তাহাদের বংশ কোন্ দিন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; ঘটনাক্রমে যাহাদের ছিল, তাহাদের বংশ আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে। মৌমাছির চেয়ে উচ্চশ্রেণির প্রাণী—বিড়াল, কুকুর হইতে মানুষ পর্য্যন্ত যাবতীয় উচ্চশ্রেণির প্রাণী—তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পরিচালনায় নানাবিধ এইরূপ সহজ-সংস্কারের দাস। এরূপ ক্ষেত্রে এইরূপ দাসত্বই প্রাণরক্ষার অনুকূল ; স্বাধীনতাই বিপজ্জনক। আত্মরক্ষার জন্য সদাসর্ব্বদা যে সকল কর্ম্মের প্রয়োজন, যে সকল বিপদআপদ জীবন-যাত্রায় প্রতিনিয়ত আসিয়া থাকে, সেই সকল বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যে কর্ম্মের প্রয়োজন, তাহাতে সহজ-সংস্কারের দাসত্বই অনুকূল। সে সকল স্থলে বিচার-বিতর্ক দ্বিধা-সংশয় উপস্থিত হইলে জীবনরক্ষাই দুষ্কর হইত। প্রকৃতি ঠাকুরাণী এখানে বুদ্ধি-বিবেচনার উপর, সঙ্কল্প-বিকল্পের উপর নির্ভর করিতে সাহসী হন না ; অথবা যাহারা এ সকল বিষয়ে সহজ-সংস্কারের সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগকেই বাঁচাইয়া রাখেন, অপরকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়া জীবনের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চিরদিনের জন্য সরাইয়া দেন। ব্যাপারটা বুঝুন। প্রাণরক্ষার ব্যবস্থায় কেমনে ধাপে-ধাপে উঠিতে হয়, তাহা দেখুন। প্রথম ধাপে অজ্ঞানেই মঙ্গল ; তারপর সংস্কার, তারপর বুদ্ধি বিবেচনা আবশ্যক হয়। মানুষের অবস্থাই মনে করুন না। আমাদের হৃৎপিণ্ড অহর্নিশ স্পন্দিত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র নাড়ীযোগে রক্তের ধারা প্রবাহিত রাখিয়াছে ; আমাদের শ্বাসযন্ত্র সর্ব্বদা নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলাইতেছে, এ বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানেরই অবসর নাই। এখানে আমাদের অবস্থা প্রায় উদ্ভিদের মত। আমাদের দেহের মধ্যে এইরূপ কাণ্ড ঘটিতেছে ; তাহার আমরা কোন খোঁজই রাখি না। আমাদের অজ্ঞাতসারে, এমন কি ঘোর নিদ্রাবস্থাতেও, রক্তচালনা এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ঘটিয়া থাকে ; মুহূর্ত্তের জন্যও উহা রুদ্ধ হইলে প্রাণসঙ্কট হয়। কাজেই, এ সকল কর্ম্ম আমরা জ্ঞানপূর্ব্বক করি না, নিতান্ত জ্ঞানহীন যন্ত্রের মতই করিয়া থাকি। এখানে সহজ সংস্কারের প্রভুত্ব পর্য্যন্ত আবশ্যক হয় না। যাহা চব্বিশ ঘণ্টা ধরিয়া চলিবে, তাহাতে দূরাগত উত্তেজনার অপেক্ষা চলে না ; তাহা অজ্ঞানেই করিতে হইবে। এখানে আমরা মৌমাছি অপেক্ষাও হীন। এখানে আমরা গাছপালার সমধর্ম্মী। ইহার উপরে আর কতকগুলি কর্ম্ম আছে। সেগুলি প্রাণযাত্রার জন্য নিত্য আবশ্যক নহে ; তবে সময় মত আবশ্যক বটে। শত্রু আসিলে আমরা ক্রোধের বশে তাহাকে আক্রমণ করি, অথবা ভয় পাইয়া দূরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করি। যথাকালে অপত্য উৎপাদন করিয়া বংশরক্ষার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই আসে। এই কাজগুলি আমরা জ্ঞান-পূর্ব্বক করি, কিন্তু সহজসংস্কারের বশে করি। এখানে আমাদের অশিক্ষিত-পটুত্ব। এ সকল কাজ আমাদিগকে শিখিতে হয় নাই, পিতৃপরম্পরাক্রমে ইহা আমরা স্বভাবতঃ লাভ করিয়াছি। এই সকল কর্ম্মে সহজ-সংস্কার—instinct—প্রভু। এখানে আমরা সংস্কারের দাস ; এখানে আমাদের অবস্থা মৌমাছির মত ; তাহার অপেক্ষা অধিক উচ্চ নহে। এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা খাটাইতে গেলে দ্বিধা-সংশয় আসিত, তাহাতে প্রাণেরও সংশয় ঘটিত। কাজেই আমরা এখানে সংস্কারের দাসত্ব করিতেছি। ইহার উপরে উঠিলে তবে বুদ্ধি-বিবেচনায় —intelligenceএ—পৌছান যায়। এই intelligence বা বুদ্ধিবৃত্তি, instinct বা সহজ-সংস্কারের অনেক উপরে। সংস্কারের প্রদর্শিত পথ ধরা-বাঁধা, কাটা-ছাঁটা ; সেখানে একটু এদিক-ওদিক চলিবার উপায় নাই। বুদ্ধি-দর্শিত পথ একাধিক। যে সকল বিপদ-আপদ

সদাসর্ব্বদা আসে না, সহজ-সংস্কার সেখানে আত্মরক্ষার জন্য কোন পথই দেখাইতে পারে না। যে প্রাণী কেবল সহজ-সংস্কারের দাস, তাহাকে সেখানে পড়িয়া প্রহার খাইতে হয়। কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তি সে সকল স্থলেও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে। এখানে শিক্ষা আবশ্যক, experience আবশ্যক, মগজের জোর আবশ্যক। কুকুর, বিড়াল, বাঘ, ভালুকে বুদ্ধি-পূর্ব্বক কাজ করে। তাহাদের পক্ষে সংস্কারের প্রেরণা ত আছেই, তাহার উপরে বুদ্ধির প্রেরণাও আছে। কুকুর তাহার মনিবকে চিনিয়া লইতে শিখিয়াছে। কোথায় কখন গেলে দুধ মাছ পাওয়া যাইবে, বিড়াল সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। কখন কোথায় লুকাইয়া থাকিলে শিকার মিলিবে, বাঘ-ভালুক তাহা বহু চেষ্টার ফলে শিখিয়া লইয়াছে। বুদ্ধি আছে বলিয়াই বাঁদরে ও ভালুকে বেদিয়ার কাছে নাচ শেখে। সকল প্রাণীর উপরে এ বিষয়ে মানুষের স্থান। এমন কি, মানুষের বুদ্ধি এতটা প্রবল যে, সে বুদ্ধির বলে সংস্কারের প্রেরণাকেও দমনে রাখিতে পারে। সংস্কারের প্রেরণা যেখানে কোন পথ দেখায় না, অথবা যে পথ দেখায়, তাহা প্রাণরক্ষার পক্ষে বিপথ, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে পথ নির্দ্দেশ করে। সংস্কার যেখানে বলে -চল, বুদ্ধি সেখানে বলে—পলাও। সংস্কারের দাস পতঙ্গ নিঃসঙ্কোচে আগুনে ঝাঁপ দেয়। পশুপাখী একবার আগুনের ছেঁকা পাইয়া আর সেদিকে ঘেঁষে না। সংস্কারের প্রেরণা যেখানে প্রতিকূল, বুদ্ধির জোর সেখানে কাজ করে। এই বুদ্ধির প্রয়োগ কিন্তু অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ; কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপে বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, তাহা জীবন ব্যাপিয়া ঠেকিয়া শিখিতে হয়। এই অভিজ্ঞতা অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা। পশুপাখীর পক্ষে কিন্তু এই অতীত জীবনের অভিজ্ঞতা যৎসামান্য—অতি সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আপনার ক্ষুদ্র জীবনে পশুপাখী ঠেকিয়া শেখে; কিন্তু যাহা শেখে, তাহাও স্মরণশক্তির দুর্ব্বলতায় হউক বা অন্য কারণেই হউক, ধরিয়া রাখিতে পারে না। কাজেই তাহাদের বুদ্ধির দৌড় খুব অল্প। বুদ্ধির প্রেরণাও অতি দুর্ব্বল;—সংস্কারের প্রেরণার কাছে উহার বল অকিঞ্চিৎকর বলিলেই হয়। তা হইবেই ত? কুকুর তার মনিবের কাছে কখনও আদর পায়, কখনও বা তাড়না পায়। মনিবের ডাকে নিকটে আসিয়া কখনও বা রুটির টুকরা পায়, কখনও বা আবার চাবুকের ঘাও পায়। একই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপ; কাজেই উহার বুদ্ধিবৃত্তি কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে গিয়া ফাঁপরে পড়ে—দ্বিধা আসে, সংশয় আসে। সংস্কারের প্রেরণায় এরূপ দ্বিধা নাই, সংশয় নাই; উহা একবারে জোর হুকুম; তামিল না করিলে উপায় নাই। প্রাণযাত্রার দৈনন্দিন ব্যাপারে প্রকৃতি যেখানে সংস্কারের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেখানে সংস্কারের প্রেরণা অমোঘ ও অব্যর্থ। প্রাণযাত্রায় যে সকল বিপদ্-আপদ্ দৈনন্দিন ঘটনা নহে, নিতান্ত নৈমিত্তিক ঘটনা মাত্র; সেইখানেই সংস্কার কোন পথ দেখায় না; যদি বা দেখায়, তাহা পতঙ্গের বহ্নিপ্রবেশ প্রবৃত্তির মত হয় ত প্রাণযাত্রার প্রতিকূলই হয়। সেখানে অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিবৃত্তি আসিয়া সহায় হয়। সহায় হয় বটে; কিন্তু কেবলই দ্বিধা আনে, সংশয় আনে, জোরের সহিত পথ-নির্দ্দেশ করে না। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে পশুপক্ষীর জীবনযাত্রায় সহজ-সংস্কারেরই কর্ত্তৃত্ব প্রবল, বুদ্ধিবৃত্তির কর্ত্তৃত্ব দুর্ব্বল।

অতীতের অভিজ্ঞতার উপরে ভর দিয়া বুদ্ধিবৃত্তি উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে; কিন্তু ভবিতব্য হইতে রক্ষা করিতে পারে কি না, এই প্রশ্ন উঠিবে। ইতর জন্তু ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বোধ করি, সর্ব্বত্রই সংস্কারের প্রেরণায় করে। কীট-পতঙ্গের ত কথাই নাই, উচ্চতর শ্রেণির পশু-পক্ষীতেও বোধ করি, সংস্কারের প্রেরণায় করে, বুদ্ধিপূর্ব্বক করে না। ভবিষ্যতে সন্তান জন্মিবে, এখনই তাহার জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া রাখা আবশ্যক; শীতকালে আহার মিলিবে না, অতএব শীত পড়িবার পূর্ব্বেই আহার সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক,—এতটুকু বুদ্ধি যে পশুপক্ষীর আছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। অথচ তাহারা যে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে, সেখানে সংস্কারের প্রেরণাই হেতু। তাহারা স্বভাবতঃ ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে উহা শিখিতে হয় নাই। মানুষের পক্ষে কিন্তু অন্যরূপ। অতীতে এইরূপ ঘটনা-পরম্পরা ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপ ঘটনা-পরম্পরা আসিবে; অতএব এখনই তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, বুদ্ধিপূর্ব্বক প্রস্তুত হইতে

হইবে, এই বিচারের ক্ষমতা মানুষের আছে। একটা যে ভবিষ্যৎ আছে, সেই জ্ঞানটুকুই ইতর প্রাণীর মধ্যে কতটুকু স্পষ্ট, তাহা বলা কঠিন। এমন কি, ভবিষ্যতে মরণের জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহাদের আছে কি না, তাহাও বলা কঠিন। চোখের সামনে সকলেই মরিতেছে; অতএব, জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ; অতএব, আমাকেও একদিন মরিতে হইবে; অতএব, আমার মরণের পর আমার সন্তান-সন্ততির ব্যবস্থা এখনই করিয়া যাইতে হইবে, মানুষ এতটা ভাবিয়া জীবন যাত্রা চালায়। ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করা দূরের কথা, এক দিন মরিতে হইবে, ইতরপ্রাণীর সে জ্ঞানটুকু আছে কি না তাহাই বলা কঠিন। বলিদানের পাঁঠা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে; একটার পর একটা খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইতেছে; যাহার পালা পরক্ষণেই আসিবে, সে চোখের সামনে এই হত্যাকাণ্ড দেখিতেছে; অথচ নির্ব্বিকারে পাতা চিবাইতেছে; তাহার বুদ্ধির দৌড়ের পরিচয় এইখানে। অতীতের সম্বন্ধেও ইতর প্রাণীর জ্ঞান কতটুকু স্পষ্ট, তাহা বলা কঠিন। মানুষ তাহার স্মরণশক্তির সাহায্যে অতীত জীবনের ঘটনাগুলিকে মনের মধ্যে পর-পর সাজাইয়া গাঁথিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু পশুপাখী তাহাদের জীবনের ঘটনা-পরম্পরাকে ঐরূপ পর-পর সাজাইয়া একটা অতীত ইতিহাস মনের মধ্যে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছে কি? সে ক্ষমতা থাকিলে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসর গ্রীষ্মের পর শীত আসিয়াছিল, এবারও গ্রীষ্মের পর শীত আসিবে, এই বুদ্ধিটুকু থাকা সম্ভব হইত, এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক আগামী শীতের জন্য আয়োজন করাও সাধ্য হইতে পারিত! আবার স্মরণের অতীত যে একটা কাল ছিল, সে কালেও যে কত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন পশুপাখীর কোন ধারণা আছে কি? জন্মের পূর্ব্বেও যে একটা অতীত কাল গিয়াছে, আমি যখন ছিলাম না, তখন আর কিছু ছিল, মরণের পরেও যে একটা ভবিষ্যৎ কাল আসিবে, আমি যখন থাকিব না তখনও আর কিছু থাকিবে—এ ধারণাটুকু যে পশু-পক্ষীর নাই, তাহা বোধ হয় নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে। ফলে, যেটুকু প্রত্যক্ষ হইয়াছে বা হইতেছে, সেই প্রত্যক্ষের সীমা ছাড়াইয়া আর কিছু আছে কি না, সে সংশয়ও বোধ করি কোন পশুপক্ষীর মনে এ পর্য্যন্ত উদিত হয় নাই। অথচ মানুষের এইখানে বিশিষ্টতা। এই যে কথাটা তুলিলাম, ইহার গুরুত্ব আছে। আপনারা অবধান করুন। মানিয়া লইলাম, পশুপাখীর স্মরণশক্তি আছে; তদ্দ্বারা সে অতীত জীবনে নানা বিপদে আপদে পড়িয়া কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে; সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে উপস্থিত বিপদ্ হইতে সে বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। উপস্থিত বিপদের কথা বলিলাম; কোন ভবিতব্য বিপদ হইতে পশুপাখী বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে ইহা মানা কঠিন। ভবিতব্যের জন্য আয়োজনে পশুপাখীর পক্ষে সংস্কারই প্রভু। কিন্তু এই অতীতের অভিজ্ঞতাও পশুপাখীর পক্ষে কেবল নিজের প্রত্যক্ষ মধ্যে সীমাবদ্ধ। যে ঘটনা সে নিজে প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার সম্বন্ধে কোন সংশয়ই তাহার মনে থাকিতে পারে না। এক কালে মরণ হইবে, এ ধারণা তাহার ত নাই; এক কালে জন্ম হইয়াছিল, সে ধারণাও যে আছে, ইহা মনে করিতে পারি না। জন্মের পূর্ব্বেও যে একটা অতীতকাল ছিল, তখন সে ছিল না, কিন্তু অন্য পশুপাখী ছিল, তখনও একটা বাহ্যজগৎ ছিল, সে জগতে নানা ঘটনা ঘটিত, এ ধারণাটুকু পশুপাখীর থাকিতে পারে, ইহা মানিতে পারি না। কিন্তু মানুষের ইহাই বিশিষ্টতা। বয়ঃস্থ মানুষের স্পষ্ট বিশ্বাস আছে, যে এক সময়ে তাহার জন্ম হইয়াছে; তাহার জন্মের পূর্ব্বেও একটা অতীত কাল গিয়াছে; যে অতীত তাহার প্রত্যক্ষ হয় নাই; তথাপি তাহা ছিল। মানুষের স্পষ্ট ধারণা আছে, যে, তাহার একটা ভবিতব্য আছে—এবং সেই ভবিতব্য তাহার প্রত্যক্ষ হইবে। অতীতের ঘটনাপরম্পরা দেখিয়া সে ভবিতব্য ঘটনাপরম্পরা সম্বন্ধেও কতকটা অনুমান করিয়া লয়; এবং তাহার অনুমান বস্তুতই প্রত্যক্ষ প্রমাণে যথাকালে সমর্থিত হয়। একদিন মরণ আসিবে, সেই মরণের পরও একটা ভবিতব্য থাকিবে—উহা তাহার প্রত্যক্ষ না হইলেও নিশ্চয় আসিবে। এ বিশ্বাসও মানুষের আছে। সে বিশ্বাস এত দৃঢ় যে, মরণের পরবর্ত্তী সেই ভবিষ্যৎ কালের জন্যও সে আজি হইতে ব্যবস্থা করে—নিজের জন্য না করুক, আপনার পুত্রপৌত্রাদির জন্য করিয়া থাকে। এক কথায়—পশুপাখীর পক্ষে, কাল নামক অদ্ভুত পদার্থটা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; উহার নিজ জীবনের প্রত্যক্ষের দুই দিকের সীমানা মধ্যেই আবদ্ধ।

অতীতের একখানা ছোট অস্পষ্ট পট তাহার জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে থাকিতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যৎ তাহার নিকটে একেবারে আঁধার। কিন্তু মানুষের পক্ষে কাল এরূপ সীমাবদ্ধ নহে; প্রত্যক্ষের সীমানাকে দুই দিকে—অতীতের দিকে ও ভবিতব্যের দিকে—দুই দিকেই অতিক্রম করিয়া মানুষ কাল-পদার্থকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—এতটা করিয়া ফেলিয়াছে যে এখন সেই অতীত কালের আদি কোথায়, এবং ভবিষ্যৎ কালের অন্ত কোথায়, তাহার কল্পনা করিতেও মানুষ অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। পশুপক্ষীর সহিত মানুষের এই যে প্রভেদ, ইহা অতি প্রচণ্ড প্রভেদ। ইহাতে মানুষকে পশুপক্ষীর পর্য্যায় হইতে একদমে অতি উৰ্দ্ধে তুলিয়া দিয়াছে। ইহার মানে কি? ইহার গোড়ার কথা কি?

ইহার মানে এই। মানুষ আপনাকে বহুর মধ্যে এক বলিয়া মনে করে; অপি চ সেই বহুকে সর্ব্বাংশে আত্ম-তুল্য মনে করে। কুকুরও যে আপনাকে বহু কুকুরের মধ্যে এক বলিয়া না জানে, এমন নহে। তাহারও স্বজাতির প্রতি বিশিষ্ট ব্যবহার দেখা যায়। আপনার স্বজাতিভুক্ত অন্য কুকুরের ডাক শুনিলে সে যেমন দূরে থাকিয়াও ডাকিয়া উঠে, স্বজাতিভুক্ত অন্য কুকুরকে নিকটে দেখিলে সে যেমন দাঁত খেঁচিয়া উহার অভ্যর্থনা করে, পরজাতিভুক্ত বিড়াল বা গরু ভেড়ার প্রতি তাহার সেরূপ ব্যবহার দেখা যায় না। তাহার স্বজাতি-পরজাতি ভেদ করিবার জ্ঞান আছে বটে;—স্বজাতির প্রতি তাহার ব্যবহার এক রূপ, পরজাতির প্রতি ব্যবহার অন্য রূপ। অতএব মানিয়া লইলাম, সে আপনাকে এক বৃহৎ সারমেয়-সমাজের অন্যতম সভ্যমাত্র বলিয়াই জানে, এবং তৎসহিত অন্যান্য সভ্যেরও অস্তিত্ব মানিয়া লয়। খুব সম্ভব, স্বভাবধর্ম্মে অর্থাৎ সংস্কারের প্রেরণাতেই সে ঐরূপ করে। কিন্তু অন্য কুকুরও যে সর্ব্বাংশে তাহার মতই জ্ঞানবিশিষ্ট জীব; তাহার যেমন আত্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা আছে, অন্য কুকুরেরও সেইরূপ অভিজ্ঞতা আছে; অন্যের সেই অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে পারিলে নিজেরও প্রাণ-যাত্রার উপকার হইতে পারে; এতটুকু বিচার-ক্ষমতা তাহার আছে কি না, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারিব না। মানুষ যেমন অন্য মানুষকে সর্ব্বাংশে আত্ম-তুল্য মনে করে, কুকুরও সেইরূপ অন্য কুকুরকে সর্ব্বাংশে আত্মতুল্য মনে করে কি না, বলিতে পারিব না। যখন অন্য মানুষেরই মনের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি না, তখন কুকুরের মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া ঐ প্রশ্নের সমাধান করিতে আমি অশক্ত। কিন্তু মানুষ যেমন অন্য মানুষকে আত্মতুল্য মনে করিয়া সেই অন্য মানুষের অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে শিখিয়াছে, কুকুর যে তাহা পারে নাই, তাহা জোরের সহিত বলিতে পারি। মানুষ অন্য মানুষকে আত্মতুল্য অভিজ্ঞ জীব বলিয়া মানে এবং অন্যের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে পারে। পারে বলিয়াই জীবনযুদ্ধে তাহার সামর্থ্য অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। এজন্য মানুষ যে ক্ষমতা উপার্জ্জন করিয়াছে, জীবনযুদ্ধে তাহা মানুষের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র—উহার নাম প্রজ্ঞা বা Reason.

এই প্রজ্ঞার বিষয় আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখানে আবার পুনরুক্তি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পুনঃ পুনঃ একই কথা লইয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিতেছি, তজ্জন্য আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন। বহুদিনের কথা, খুব সম্ভব আপনাদের স্মরণ নাই, অথচ আমার বক্তব্য ফুটাইবার জন্য তাহা মনে না করিয়া দিলেও নয়। মানুষের এই প্রজ্ঞা বস্তুতই সৃষ্টিকর্ত্রী—ইহা রূপের জগৎ অবলম্বন করিয়া একটা নামের জগৎ রচনা করিয়া ফেলে। প্রত্যক্ষ percept অবলম্বন করিয়া ইহা সাঙ্কেতিক concept সৃষ্টি করে। এই conceptগুলা নিতান্তই কল্পিত পদার্থ,—প্রজ্ঞা কর্তৃক নির্ম্মিত পদার্থ। এক একটা কৃত্রিম সঙ্কেত আশ্রয় করিয়া এই conceptগুলা বাহিরে প্রকাশ পায়। এক একটা concept এর গায়ে এক একটা নামের টিকিট আঁটিয়া বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই concept গড়া এবং প্রত্যেক conceptএর গায়ে এক একটা নামের টিকিট বসান, ইহা একটা মস্ত কারিকরি; সহজ সংস্কার বা instinct এবং বুদ্ধিবৃত্তি বা intelligence, ইহাদের শক্তিতে এই কারিকরি কুলায় নাই। ইহার জন্য প্রজ্ঞার আবশ্যকতা হইয়াছে। প্রজ্ঞা স্বহস্ত-রচিত এই conceptগুলি বা নামগুলি লইয়া খেলায়; তাহাদের মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নানা formula বাঁধে, নানা সূত্রবদ্ধ নিয়মের ব্যবস্থা করে, এবং সেই সকল formula বা নিয়ম-সূত্রের সাহায্যে অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া ফেলে। এমন করিয়া বাঁধিয়া ফেলে, যে অতীত হইতে বর্ত্তমানকে টানিয়া বাহির

করা চলে, এবং অতীত ও বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎকে আকর্ষণ করিয়া গণিয়া বলা যায়। এইরূপ নিয়মসূত্রে আবদ্ধ যে নূতন জগৎ কল্পিত হয়, তাহাকেই আমি নামের জগৎ বা বাঙ্ময় জগৎ বলিয়াছি—উহা প্রত্যক্ষ রূপের জগতের একটা সাঙ্কেতিক প্রতিমামাত্র—প্রজ্ঞা এই বাঙ্ময় জগতের সাহায্য লইয়া,—প্রত্যক্ষ জগতে কিরূপে চলিলে ঠকিতে হইবে না, তাহা মানুষকে দেখাইয়া দেয়। এই বাঙ্ময় জগৎ নির্ম্মাণে মানুষকে অন্যের অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হয়—অন্যের প্রত্যক্ষের সহিত আপনার প্রত্যক্ষের কতটা মিল আছে, তাহা জানিয়া লইতে হয়। কেন না এই বাঙ্ময় জগৎ কোন মানুষেরই জগৎ নহে; ইহা সেই Mean Manএর জগৎ; কোটি কোটি মানুষের গড় করিয়া যে মাঝারি মানুষ কল্পিত হয়, সেই কৃত্রিম মাঝারি মানুষের জগৎ। বাঙ্ময় জগতের সাহায্যেই যখন পরস্পরের সহিত কারবার করিতে হইবে, তখন সকলের প্রত্যক্ষের সহিত সামঞ্জস্য না করিতে পারিলে চলিবে কেন? এইজন্য নিজের অভিজ্ঞতা অন্যকে জানাইতে হয় এবং অপরের অভিজ্ঞতা নিজে গ্রহণ করিতে হয়। তাহার ব্যবস্থাও প্রজ্ঞা করিয়া লইয়াছে;—প্রত্যেক conceptএর গায়ে নামের বা শব্দের টিকিট বসাইয়া ভাষা-নামক কৃত্রিম উপায়ের উদ্ভাবনা করিয়াছে এবং সেই ভাষার সাহায্যে একের অভিজ্ঞতা অন্যকে জানাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

মানুষের জীবনযাত্রায় প্রজ্ঞা এইরূপে এক প্রকাণ্ড খেলা খেলিতেছে; একের অভিজ্ঞতা অপরকে জানাইয়া, বহু কোটি মনুষ্যের অভিজ্ঞতা একত্র স্তূপীকৃত করিয়া ~~ভদনুসারে এক~~ প্রকাণ্ড বাঙ্ময় জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছে; সেই জগতে প্রতিষ্ঠাপিত নিয়মের সূত্র ধরিয়া ব্যাবহারিক জগতে কিরূপে চলিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। বর্ত্তমানে কিরূপে চলিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে কিরূপে চলিতে হইবে, তাহা দেখাইতেছে। কেননা, বাঙ্ময় জগতে বর্ত্তমান একদিকে অতীতের সহিত, অন্যদিকে ভবিষ্যতের সহিত, দৃঢ় নিয়মের সূত্রে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে—প্রজ্ঞাই সেই নিয়মের সূত্র গড়িয়াছেন, ও তদ্দ্বারা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিনকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। পশুপক্ষীর বুদ্ধির দৌড় দুদিকে সীমাবদ্ধ; অতীতে তাহার ক্ষুদ্র প্রত্যক্ষ মধ্যে সীমাবদ্ধ; ভবিষ্যৎ ত একবারে অন্ধকার। কিন্তু মানুষের প্রজ্ঞার দৌড় কোন সীমা মানে না; অতীত ও ভবিষ্যৎ দুই দিকে দৌড়ায়; কোনরূপ বাধা বিঘ্ন আটক না মানিয়া দৌড়ায়। প্রতেক মানুষের স্বকীয় প্রত্যক্ষ পশু-পক্ষীর প্রত্যক্ষের মতই সঙ্কীর্ণ ও সসীম;—অতীতের দিকে কিছু দূর গিয়াই অন্ধকার, ভবিষ্যৎও একবারে আঁধার। তথাপি মানুষের প্রজ্ঞা স্থির করিয়া আছে, যে অতীতেরও আদি নাই—ভবিষ্যতেরও অন্ত নাই। এমন কি আমি যখন ছিলাম না, তখনও বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরা লইয়া অতি বিস্তীর্ণ অতীত ছিল, এবং আমি যখন থাকিব না, তখনও বিচিত্রতর ঘটনা-পরম্পরা লইয়া ভবিতব্য আপনাকে ক্রমশঃ প্রকাশ করিবে। ইহা প্রজ্ঞারই খেলা। কিরূপে এরূপ হয়? আমি বলিতে চাহি, যে, প্রজ্ঞা কেবল আত্ম প্রত্যক্ষে নির্ভর না করিয়া অপরের প্রত্যক্ষ সংগ্রহ করে, সঞ্চয় করে ও স্তূপীকৃত করে; এবং মানবজাতির স্তূপীকৃত অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া তাহার সুনিয়ত সুশৃঙ্খল বাঙ্ময় জগৎকে অসীম দেশে ও অনাদি অনন্তকালে ছড়াইয়া দেয়। এই অসীম দেশের আলোচনা আমি পূর্ব্বে করিয়াছি; কিন্তু অনাদি অনন্ত কালের আলোচনা আমি পূর্ব্বে করি নাই। এখন সময় আসিয়াছে।

আমার প্রত্যক্ষলব্ধ দেশের মত আমার প্রত্যক্ষলব্ধ কালও আমার স্বোপার্জ্জিত, কিন্তু স্বোপার্জ্জিত বলিয়াই ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। সেই সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ কালে আমার স্বত্বাধিকার ত আছেই। তাহার উপর আমি আমার আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী প্রত্যেকের স্বোপার্জ্জিত কালের বোঝা চাপাইয়াছি। কেন চাপাইয়াছি? আমার জীবনযাত্রায় তাহাতে লাভ হইয়াছে বলিয়া চাপাইয়াছি। আমার আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী ইঙ্গিতে ইসারায় সঙ্কেতে ভাষায় তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আমাকে জানাইয়াছেন; তাহা আমি বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিয়াছি, এবং আমার ভাণ্ডারে তাহা সঞ্চয় করিয়া লইয়াছি। তদুপরি আমার পিতা পিতামহ প্রপিতামহ—পিতৃপরম্পরা—যাঁহারা এখন বর্ত্তমান নাই,—তাঁহারাও আপন-আপন অভিজ্ঞতার ফল ইঙ্গিতে ইসারায় সঙ্কেতে ভাষায় লিপিতে আমার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন; সে সকলও আমি আত্মসাৎ করিয়াছি—বিশ্বাসের উপর করিয়াছি—তাহাতে জীবনযাত্রায় ঠকিতে হয় নাই, মোটের উপর জিতিয়াই যাইতেছি। দেখিয়াছি

যে, এইরূপে আমার জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিসর ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে; আমার চিত্তক্ষেত্রের যে কুঠরিতে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা স্তূপীকৃত করিতেছি, সেই কুঠরির পরিসর ক্রমেই বাড়িতেছে। এমনভাবে বাড়িতেছে, যে কোথায় তাহার দেওয়াল গাঁথিব, তাহার ঠাহর না পাইয়া, শেষে হাল-ছাড়িয়া বসিয়া আছি; এবং মনকে বুঝাইতেছি, এখানে দেওয়াল তুলিয়া সীমা নির্দ্দেশের কোন উপায় নাই—অতএব কাজ নাই কোন সীমা নির্দ্দেশে। অতএব আমি একটা মনগড়া জগৎ গড়িয়া লইলাম – তাহার কিয়দংশমাত্র আমার প্রত্যক্ষ; অপর কিয়দংশ আমার প্রত্যক্ষ না হইলেও অন্যের প্রত্যক্ষ; এবং অবশিষ্ট অংশ সকলেরই প্রত্যক্ষের বাহিরে। এই শেষোক্ত অংশে কি আছে কি নাই, কি ঘটিতেছে কি ঘটিবে, তাহা জানি না; জানিতে হয় ত পারিবও না। জানি আর না জানি, সেই বৃহত্তর অংশ আছে, যেখানে যত ইচ্ছা ঘটনার স্থান মিলিবে। প্রজ্ঞা সেখানে নানাবিধ ঘটনা বসাইয়া দিবেন। এ যেন শাদা চেকে সহি করিয়া দেওয়া—অঙ্কের জায়গাটা খালি থাকিল—সেখানে যে কোন অঙ্ক লিখিয়া তাহার উপর যত ইচ্ছা শূন্য বসাইয়া লইতে পার। এই যে কাল, ইহা প্রত্যক্ষ বহির্ভূত, প্রত্যক্ষের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহা আমার কল্পনা, ইহা আমার রচনা। এই রচনাতে জীবন-সংগ্রামে আমার লাভ বই লোকসান হয় নাই। যে ক্ষমতার বলে এই রচনা, সেই ক্ষমতার নামই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা এইরূপে যেমন অসীম দেশের রচনা করিয়াছেন, সেইরূপ অসীম কালেরও রচনা করিয়াছেন। এই প্রজ্ঞা-নির্ম্মিত অসীম দেশমধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের প্রজ্ঞা-রচিত বাঙ্ময় জগৎকে ছড়াইয়া দিয়াছেন, এবং সেই জগতের ঘটনাপরম্পরাকে সেই প্রজ্ঞা-রচিত কালমধ্যে নিয়মের বাঁধনে বদ্ধ করিয়া বিছাইয়া দিয়া, সেই ঘটনা-পরম্পরার আদি কবে এবং অন্ত কবে, তাহার ঠাহর পাইতেছেন না। গ্যালিলিও, নিউটন হইতে আরম্ভ করিয়া ম্যাকস্‌ওয়েল এবং টমসন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপে যে বাঙ্ময় জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি আগে দিয়াছি। এই জগতে প্রতিষ্ঠিত নিয়মসূত্রগুলির প্রয়োগদ্বারা বিজ্ঞানবিদ্যা মনুষ্যজাতিকে জীবনযাত্রায় যে আশ্চর্য্য সফলতা দিয়াছে, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। বিজ্ঞানবিদ্যা যে বাঙ্ময় জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে, সাধারণ মানুষে যে তাহার বিশেষ খোঁজ খবর রাখে, তাহা আমি বলিতেছি না। আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যার সূত্রপ্রয়োগে সকলের ক্ষমতাও নাই, অধিকারও নাই। কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্যই ছোট খাট বৈজ্ঞানিক। সে আপনার প্রজ্ঞার বলে আপনার জন্য একটা কচিৎ ছিন্ন কচিৎ ভিন্ন বাঙ্ময় জগৎ গড়িয়া লইয়াছে এবং তন্মধ্যে যে কচিৎ ছিন্ন কচিৎ ভিন্ন নিয়মের সূত্র প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাই ধরিয়া আপনার প্রাণযাত্রা নিয়মিত করিতেছে। বলা বাহুল্য, তদ্দ্বারা সে জীবনযুদ্ধে প্রচুর সামর্থ্য লাভ করিয়াছে; কেবল সংস্কারের দাসত্ব এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগে এতটা সামর্থ্যলাভ কখনই ঘটিত না। মনুষ্য যে আজ প্রাণিসমাজের মধ্যে জীবনযুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ এবং অপরাজেয়, তাহার প্রধান কারণ মনুষ্যের এই প্রজ্ঞা বা Reason।

প্রাণিবিদ্যার রঙ্গিন চশমা এখনও আমার চোখে লাগান আছে। Instinct বা সহজাত সংস্কারের অশিক্ষিত পটুত্ব, intelligence বা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ ও শিক্ষালব্ধ বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ-কুশলতা, এবং Reason অর্থাৎ concept নির্ম্মাণ-পটু এবং নানাবিধ concept মধ্যে সম্পর্কস্থাপনপটু প্রজ্ঞা, এই তিনকেই আমি এখন জীবন-যুদ্ধে অস্ত্রমাত্র মনে করিতে চাহি। জ্ঞানবান্ জন্তু এই তিনকে অস্ত্রস্বরূপ করিয়া জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত আছে, এবং পরস্পরকে হটাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এই তিনেই যখন জীবনযুদ্ধে সামর্থ্য দেয়, তখন ইহারা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা নিরূপণের জন্য প্রাণি-বিদ্যা ব্যাকুল নহে। অন্য বিদ্যা ব্যাকুল থাকিতে পারে। সহজ-সংস্কার প্রাণযাত্রার নিত্য আপদ নিবারণের জন্য নিত্য প্রযুক্ত হয়। এক হিসাবে ইহার পরাক্রম অধিক; কেন না ইহার সন্ধান অমোঘ এবং অব্যর্থ। বুদ্ধিবৃত্তি এবং Intelligence যাহা পশুধর্ম্মমাত্র, তাহা উপস্থিত নৈমিত্তিক আপদ নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সংস্কার যেখানে আত্মরক্ষার পথ দেখায় না, অভিজ্ঞতার বলে শিক্ষার বলে বলবান্ বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে পথ দেখাইয়া দেয়। ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সংস্কারের প্রয়োগক্ষেত্র অপেক্ষা প্রশস্ত; কিন্তু ইহার সন্ধান সহজাত সংস্কারের সন্ধানের মত অমোঘ নহে। বুদ্ধিবলে কাজ ক'

গিয়া বহু স্থলে ঠেকিতে হয় এবং ঠেকিয়া আবার শিখিতে হয়। ইহাদের উপরে প্রজ্ঞা। এই অস্ত্র মানুষের নিজের অস্ত্র; ইতর প্রাণীর হাতে এই অস্ত্র নাই। ইহার প্রয়োগ অমোঘ ও অব্যর্থ না হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রয়োগক্ষেত্র এত প্রশস্ত, এবং যেখানে ইহা প্রযুক্ত হয় সেখানে এমন ভীম পরাক্রমে প্রযুক্ত হয়, যে, ইহার সহিত অন্য দুই অস্ত্রের তুলনাই হয় না। ইহার সাহায্যে মানুষ আবশ্যক মত সংস্কারের প্রেরণাকে দমন করিতে বাধ্য হয়; বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত ও সংস্কৃত করিয়া কর্ম্মসাধনে নিয়োগ করে। বলা বাহুল্য, আত্মরক্ষা এবং স্বার্থসাধন সেই কর্ম্ম। প্রাণ তাহার নিজের উদ্ভাবিত যাবতীয় অস্ত্র স্বার্থসাধনেই নিযুক্ত করিয়া থাকে। স্বার্থপরতাই প্রাণের স্বভাব; পরার্থপরতার এখানে কোন স্থান নাই; এ কথাটা আমি আপনাদিগকে কিছুতেই ভুলিতে দিব না।

এখন দেখুন, আমি কোথায় আসিলাম। মানুষ মুখ্যতঃ প্রজ্ঞাজীবী এবং প্রজ্ঞাজীবী বলিয়াই জীবন সংগ্রামে অপরাজেয়। এই প্রজ্ঞাবলেই মানুষ প্রত্যক্ষ অবলম্বন করিয়া concept সৃষ্টি করে এবং সেই conceptএর গায়ে এক-একটা সঙ্কেতের টিকিট বসায়; এক-একটা শব্দকে এক-একটা কৃত্রিম অর্থ দেয়। এইরূপে সে আপনার প্রত্যক্ষ অপরকে জানায় এবং অপরের প্রত্যক্ষ নিজে সংগ্রহ করে। এইরূপে প্রত্যক্ষকে স্তূপীকৃত করিয়া সেই স্তূপীকৃত প্রত্যক্ষ হইতে প্রকাণ্ড বাঙ্ময় জগতের সৃষ্টি করে, এবং বাঙ্ময় জগৎকে আঁটাসাটা নিয়মবদ্ধ করিয়া সেই নিয়মানুসারে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়। পরের অভিজ্ঞতা এরূপে গ্রহণ করিতে না পারিলে, প্রজ্ঞার পক্ষে এতটা সাধ্য হইত না। কথাটার মানে বুঝুন। আমি পরের প্রত্যক্ষে আস্থা করি, এমন কি নিজের প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও অনেক সময়ে অধিক আস্থা করি; আমার প্রত্যক্ষকে বহুস্থলে অবিশ্বাস করিয়া অপরের প্রত্যক্ষকে মানিয়া লই; দশের অভিজ্ঞতার নিকট আপনার অভিজ্ঞতাকে খাটো করিয়া দেখি। ইহাতে আমাদের ঠকিতে হয় না; প্রাণযাত্রায় বরং জিতিয়াই যাই। ইহার দৃষ্টান্ত পদে-পদে। পঞ্চতন্ত্রের সেই ব্রাহ্মণের গল্প আপনাদের মনে থাকিবে। ব্রাহ্মণ অমাবস্যায় পূজা দিবার জন্য পাঁঠা কাঁধে করিয়া যাইতেছেন; ধূর্ত্তেরা আসিয়া পর-পর বলিতে লাগিল, ঠাকুর তোমার কাঁধে কুকুর কেন? তখন সে নিজের প্রত্যক্ষে আস্থা হারাইয়া পাঁঠাটিকে ছাড়িয়া দিল। আমাদের প্রত্যেকের দশা ঐ ব্রাহ্মণের দশা। দশের কথায় আমরা হাঁ'কে না এবং না'কে হাঁ বলিতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মণ সে ক্ষেত্রে ঠকিয়াছিল; আমরাও যে একবারে না ঠকি, তাহা নহে। অনেকে অনেক মিরাকলের গল্প করিয়া আমাদিগকে ঠকাইয়াছে; তাহা ইতিহাসে লেখে। কিন্তু মোটের উপর ইহাতে আমরা জিতিয়া যাই। দশের প্রত্যক্ষ মানিব না, এ পণ ধরিয়া বসিলে মানুষের পক্ষে প্রাণযাত্রা অসাধ্য হইত। অতএব প্রাণের দায়ে আমরা অন্যের প্রত্যক্ষে আস্থা করি। বাহিরের দশজনের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া নিজের অভিজ্ঞতাকে সংশোধিত ও সংস্কৃত করিয়া লই। কেন লই? আমি মনে করি, অন্যেও ঠিক আমারই মত জীব। আমি যেমন চেতন জীব, অন্য মানুষও সর্ব্বাংশে মৎসদৃশ চেতন জীব। আমার যেমন একটা প্রত্যক্ষ জগৎ আছে, অন্য মানুষের ঠিক্ তেমনি একটা প্রত্যক্ষ জগৎ আছে। অন্যে তাহার প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধে যে বিবরণ দেয়, আমার প্রত্যক্ষ জগতের অন্ততঃ কিয়দংশের সহিত তাহার মিল দেখিতে পাই। বহু লোকে তাহাদের প্রত্যক্ষ জগতের যে বিবরণ দেয়, আমার প্রত্যক্ষ জগতের কিয়দংশের সহিত তাহার মিল দেখিতে পাই। যে অংশের সহিত মিল দেখিতে পাই, সেই অংশটুকুকেই আসল জগৎ, খাঁটি জগৎ, সত্য জগৎ, বলিয়া মনে করি এবং সেই জগৎটুকুতেই অন্যের সহিত আদান-প্রদান সম্ভব হয়। আমার প্রত্যক্ষ জগতের যে অংশের সহিত আর দশজনের প্রত্যক্ষ জগতের মিল না দেখি, জগতের সেই অংশটুকুতেই আস্থা স্থাপনে সাহস করি না। সেখানে অপরের সহিত আদান-প্রদান ব্যবহার চালাইতে পারি না। সে অংশটাকে আপনার নিজস্ব খেয়ালমাত্র সাব্যস্ত করিয়া প্রাতিভাসিকের কোঠায় ফেলিয়া দিই। ফলে এই যে ব্যাবহারিক জগৎটাকে খাঁটি বাহ্যজগৎ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, এবং যেখানে অন্যের সহিত কারবার চালাইতেছি, প্রাণযাত্রা চালাইতেছি, জীবন-যুদ্ধ চালাইতেছি, সেই ব্যাবহারিক জগৎ সর্ব্বতোভাবে অপরের অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত জগৎ। এই জগতেই আমার

অভূতপূর্ব্ব বন্যায় লোকের ধনপ্রাণসহ রাস্তাঘাট বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কিন্তু এত যে ক্ষতি হইয়াছে—সেই সংবাদ পূর্ব্বে পাইলে হয় ত এ যাত্রাও মণিপুরে যাওয়া ঘটিত না। রেলওয়ে লাইন খোলার সংবাদ পাইবামাত্রই রওনা হইয়া পড়িলাম। সেদিন সোমবার সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী,—সন্ধ্যায় ট্রেণ ধরিয়া পরদিন ১১টার সময়ে ডিমাপুর পৌঁছিলাম। ২৪শে আশ্বিন (১৩২৩)—এইদিন হইতেই প্রকৃতপক্ষে মণিপুর-যাত্রা আরব্ধ হইল।

ডিমাপুর ষ্টেসনকে মণিপুর রোড ষ্টেসন বলে। এখান হইতে একটি প্রশস্ত রাজপথ নাগা পাহাড়ের মধ্য দিয়া সেই জেলার হেড-কোয়ার্টার কোহিমা হইয়া মণিপুরের রাজধানী ইম্ফাল পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথটি ১৩৪ মাইল দীর্ঘ—বড়ই সুন্দর; গরুর গাড়ী ও মটর কার অনায়াসে চলে। ৫।৭ মাইল অন্তরেই চটি পাওয়া যায়, তথায় খাদ্যদ্রব্যাদিও কিনিতে পাওয়া যায়। গড়ে ১০ মাইল অন্তর ইন্‌স্পেক্‌সন্ বাংলো আছে, তৎসংসৃষ্ট সব্‌অর্ডিনেট্ কোয়ার্টারস্ মধ্যে ভদ্র, বিশিষ্ট পথিক স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারেন। যে সকল ওভারশিয়ার প্রভৃতি ঐ সকল স্থানে থাকেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই অতিথিসেবায় অপরাঙ্মুখ। তাঁহাদের অনুকম্পায় পথিকের অসুবিধা অনেকটা ঘুচিয়া যায়।

ডিমাপুরে ভোরে পৌঁছিবার কথা ছিল; কিন্তু পথিমধ্যে লাইন কিঞ্চিৎ খারাপ থাকাতে পৌঁছিতে ১১টা হইয়া গেল। আশা ছিল, ষ্টেসনে টম্‌টম্ ও লোক পাইব; কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তাহাতে বাধা পড়িয়া গেল। ডিমাপুর পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ আফিসে গেলে উহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে ভাবিয়া, ষ্টেসন হইতে একজন কুলি লইয়া বহু আয়াসে মাইল খানেক দূরবর্ত্তী ঐ আফিসে উপস্থিত হইলাম।

পথিমধ্যে ডিমাপুরের প্রাচীন কাঁছাড়ী রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতে লাগিল—প্রস্তরের দুই চারিটা স্তম্ভও দৃষ্টিগোচর হইল। তখন উহা পুনর্ব্বার (১) দেখিয়া যাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। রাস্তার ধারে কুলিকে বসাইয়া রাখিয়া শড়ক হইতে কিঞ্চিৎ নামিয়াই ডাইনদিকে রাজবাড়ীর 'গেট্' পাইলাম; ভিতরে ঢুকিয়া পাষাণস্তম্ভ-শ্রেণী দেখিলাম। ১৩১৪ সালে যখন প্রথম এইগুলি দেখিয়া যাই, তখনকার অপেক্ষা সম্প্রতি তোরণ-দ্বার এবং স্তম্ভগুলির অবস্থা যেন অধিকতর শোচনীয় বোধ হইল।

পাব্‌লিক্ ওয়ার্কস্ কম্পাউণ্ডে গিয়া ওভারসিয়ার বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া জানিতে পারিলাম, মণিপুর হইতে বন্ধুবর রোহীন্দ্রবাবুর প্রেরিত লোক আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। অচিরেই তাহার সন্ধান পাওয়া গেল। ভোজনান্তে প্রায় ৩টার সময়ে যাত্রা করিলাম। যাইবার পূর্ব্বে ডিমাপুর থানা হইতে একখানি 'পাস্' সংগ্রহ করিতে হইল—নচেৎ যাত্রায় বিঘ্ন ঘটিত। টম্‌টম্ তখনও ডিমাপুরে পৌঁছাইতে পারে নাই—পদব্রজেই পথ চলিবার সংকল্প করিতেছিলাম—এমন সময় দৈবাৎ একটি ঘোড়া পাওয়া গেল।

ডিমাপুর হইতে নীচুগার্ড ৮ মাইল। সন্ধ্যার সময় তথায় পৌঁছিয়া 'তেওয়ারী মহারাজের' ভবনে আতিথ্যগ্রহণ করিলাম। ঐখানে টম্‌টম্‌ও অপেক্ষা করিতেছিল। শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ তেওয়ারি এই মণিপুর রোডের একজন প্রসিদ্ধ কণ্ট্রাক্‌টর্। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত গুপ্তেশ্বর তেওয়ারি বাড়ী ছিলেন—তাঁহার আপ্যায়নে মুগ্ধ হইতে হয়। শুনিলাম, তেওয়ারি মহারাজের আতিথেয়তা অকৃত্রিম—ভদ্র, বিশিষ্ট পথিক-মাত্রেই তাঁহার গৃহে সতত সাদরে স্থান পাইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় দিন

২৫শে আশ্বিন (বুধবার)—প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে টম্‌টমে চড়িয়া যাত্রারম্ভ হইল। নীচুগার্ড পর্য্যন্ত রাস্তা সমতল। অতঃপর পর্ব্বতারোহণ। কিন্তু পথটি এমন সুন্দর যে, আরোহণ-অবরোহণে বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটে না। তবে আরোহণের সময়ে ঘোড়া একটু সত্বর ক্লান্ত হইয়া পড়ে। টম্‌টম্ টানিবার জন্য দুইটি ঘোড়া ছিল—একটিকে পূর্ব্বেই রওনা করাইয়া দেওয়াতে, পথিমধ্যে ঘোড়া বদল করিয়া চলা গিয়াছিল। প্রায় ১০টার সময়ে দ্বিতীয় আড্ডা

(১) প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে একবার ডিমাপুরে রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যাই। 'আসাম-ভ্রমণ' দ্বিতীয় প্রবন্ধে (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৮ সনের তৃতীয় সংখ্যায়) এস্থানের দর্শনীয় জিনিস-গুলির বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে।

সুর আরও এক পর্দ্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, "কিসের তামাসা! জাত তুলে আবার তামাসা কি! মোচনমানের রুটি দিয়ে মাল্‌সা-ভোগ হবে? তোর কৈবর্ত্তের মুখে আগুন—দরকার থাকে তুই তুলে রাখ্‌গে—বাপের পিণ্ডি দিস্!" জ্যা-মুক্ত ধনুর মত নন্দ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াই টগরের কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল,—"হারামজাদি, তুই বাপ্ তুলিস!" টগর কোমরে কাপড় জড়াইতে-জড়াইতে, হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল,"হারামজাদা, তুই জাত তুলিস্!" বলিয়াই আকর্ণ মুখব্যাদান করিয়া নন্দর বাহুর একাংশ দংশন করিয়া ধরিল। এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর মল্ল-যুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিতে-দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিয়া ঘেরিয়া ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্র পীড়া ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবিরা ছি ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চেঁচামেঁচি করিতে লাগিল—সবশুদ্ধ একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত মুখে বিবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত সামান্য কারণে এত বড় অনাবৃত নির্লজ্জতা যে সংসারে ঘটিতে পারে, ইহা ত আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। তাহাই আবার বাঙালী নর-নারীর দ্বারা এক-জাহাজ লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। কাছেই একজন জৌনপুরী দরওয়ান অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত তামাসা দেখিতেছিল; আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "বাবুজী, বাঙ্গালীন্ তো বহুত অচ্ছি লড়নেওয়ালী হ্যায়! হট্‌তি নহি!"

আমি তাহার পানে চাহিতেও পারিলাম না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া কোনমতে ভিড় ঠেলিয়া উপরে পলাইয়া গেলাম।

(ক্রমশঃ)

মণিপুর-পরিভ্রমণ

[অধ্যাপক শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্-এ]

[উপক্রমণিকা]

বিগত গ্রীষ্মাবকাশে একবার মণিপুরে যাইবার জন্য প্রয়াস করিয়াছিলাম। তদর্থে শিলচর পর্য্যন্ত গিয়া জানা গেল যে, ঐ দিকে যাওয়া বড় সুবিধাজনক নহে। শিলচর হইতে জিরিঘাট পর্য্যন্ত প্রায় সমতল ভূমি দিয়া ২০ মাইল আন্দাজ রাস্তা গিয়াছে—তাহাতে বিশেষ কোন কষ্ট নাই; এবং মণিপুর হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত ১৮ মাইল পথও সমতলই বটে। কিন্তু জিরিঘাট হইতে বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত পথটুকু বড়ই ভয়ানক। পাহাড়ের উপর দিয়া রাস্তা—গড়ে ১৫ মাইল অন্তর এক-একখানি চটি—প্রত্যহ এক চটি পর্য্যন্ত যাইতে হয়—ততোধিক যাওয়া যায় না। পথিমধ্যে কোনও জিনিস-পত্র খরিদ করিতেও পাওয়া যায় না; এমন কি লোকালয় পর্য্যন্ত দেখা যায় না। পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণে যাইতে হয়। তবে নর-যান একপ্রকার আছে—তাহা অনেকটা বদরিকাশ্রমের পথের ঝাপানের মত, কিন্তু নৌকার ছৈয়ের ন্যায় তাহার একটা আবরণ আছে। নিজে তদন্ত করিয়া প্রস্তুত করাইলে, শুইয়াও যাওয়া যায়। এই নর-যানে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেরাই বাহিত হইয়া থাকে। যাহারা পথ হাঁটিতে সমর্থ, তাহাদের পক্ষে হাঁটিয়া চলাই অধিকতর আরামজনক। এই সকল বর্ণনা শুনিয়া প্রখর রৌদ্র অথবা বৃষ্টির দিনে ঐ পথে যাইতে সাহস হইল না। অগত্যা শারদীয়া পূজার ছুটিতে ডিমাপুরের পথে যাওয়াই ধার্য্য করিলাম।

কিন্তু বিধি যাহার উপর বাম, তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সম্ভাবনা কোথায়? বিজয়া-দশমী দিবসে যাত্রা করিবার সংকল্প ছিল। তদনুসারে মণিপুর হইতে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রোহিণীন্দ্রনাথ বাগ্‌চি বি-ই (সুপারভাইসর পি, ডব্লিউ, ডি) ডিমাপুরে টম্‌টম্ প্রেরণ করাইয়া সংবাদ পাঠাইলেন। ঐ দিন ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হইতে লাগিল—যাত্রা করা হইল না। সেই বিষম বর্ষণে ডিমাপুর হইতে লামডিং ষ্টেসনের মধ্যে রেলওয়ে লাইন বন্ধ হইয়া গেল,—মণিপুর ও কাছাড়ে

উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল ; সুতরাং বমি-করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু, সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহাঁরা এখনও মহা-সঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাঁহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীরভাবে বসিয়া ছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্ব্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাত্রে কেমন ছিলে, মিস্ত্রী মশাই ?" নন্দ কহিল, "বেশ।" তাহার পরিবারটি তর্জ্জন করিয়া উঠিল, "বেশ, না ছাই ! মা গো মা, কি কাণ্ডই হয়ে গেল !" একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কাণ্ড ?" নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া, হাই তুলিয়া; গোটা-দুই তুড়ি দিয়া, অবশেষে কহিল, "কাণ্ড এমন কিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতায় গলির মোড়ে সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা বিক্রী করা দেখেছেন ? দেখে থাক্‌লে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙার নীচে গুটি-দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল ডাল-মটর কড়াই-ছোলা-বরবটি-মুশুরি-খ্যাঁসারি সব একাকার করে দেয়, দেবতার কৃপায় আমরা সবই ঠিক তেম্‌নি মিশিয়ে গিয়েছিলুম, - এই খানিক-ক্ষণ হল যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি।" তাহার টগরের পানে চাহিয়া কহিল, "মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার -" টগর ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত গর্জ্জিয়া উঠিল - "আবার ! ফের !"

"না, তবে থাক্" বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিল। মূর্ত্তিমান নোংরা এক-জোড়া কাবলি-আলা আপাদ-মস্তকে সমস্ত পৃথিবীর অপরিচ্ছন্নতা লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর অনিমেষ-দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্য-দিগের প্রতি তাহার অতবড় দুই চক্ষুর অগ্নি-বর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, "আজ তা'হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না বল্ ?" পরিবার কহিল —"মরণ আর কি ! হবে কি কোরে শুনি ?" ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, "এই ত মোটে সকাল, একটু বেলা হলে—" নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "কলকাতা থেকে দিব্যি এক হাঁড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল, মশায় ; জাহাজে উঠে পর্য্যন্ত বল্‌চি, আয় টগর কিছু খাই, আমাকে কষ্ট দিস্‌নে—নাঃ, রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে !" টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া, ক্ষুব্ধ অভিমানে একটিবারমাত্র আমার পানে চাহিয়াই, পুনরায় সেই দুই হতভাগ্য কাব্‌লিকে চোখের দৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে লাগিল। আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হ'ল রসগোল্লা ?" নন্দ, টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, "সেগুলোর কি হ'ল বল্‌তে পারিনে। ওই দেখুন ভাঙা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময় তার রস ; এর বেশি যদি কিছু জান্‌তে চান্ ত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন।" বলিয়া সে টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিলাম, "তা' যাক্, সঙ্গে চিঁড়ে আছে ত ?" নন্দ কহিল, "সে দিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর !" টগর একটা ছোট পুঁটুলি পা দিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল —"দেখাওগে তুমি —" নন্দ কহিল, "যাই বলুন বাবু, কাব্‌লি জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুল দেশের মোটা রুটিও অমনি বেঁধে দেয়। ফেলিস্‌নে টগর, তুলে রাখ্, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।" নন্দর এই পরিহাসে আমি ত হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম ; কিন্তু, পরক্ষণেই টগরের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ কালো করিয়া, মোটা গলায় বজ্র-কর্কশ শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে সচকিত করিয়া টগর চীৎকার করিয়া উঠিল —"জাত তুলে কথা কোয়ো না বল্‌চি, মিস্তিরি,—ভাল হবে না তা বল্‌চি—"চীৎকার শব্দে যাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভাল মতেই চিনিত, একটা বেফাঁস ঠাট্টার জন্য ক্রোধটা তাহার সে শান্ত করিতে পারিলেই বাঁচে। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, "মাথা খাস টগর, রাগ করিস্‌নে—আমি তামাসা করেচি বৈ ত নয়।"

টগর সে কথা কাণেও তুলিল না। চোখের তারা ভুরু একবার বামে ও একবার দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইয়া, গলার

ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে; কিন্তু, ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গো-শালার আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকে, ত সে আলাদা কথা; কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয়-চিত্তে সিঁড়ির দুই-এক ধাপ নামিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার national সঙ্গীত সুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্য্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্রহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্য-যন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে! এ মহা-সঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে; এবং সঙ্গীতই যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ললিত-কলা, তাহা সেইখানে দাঁড়াইয়াই সসম্ভ্রমে স্বীকার করিলাম। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় এই যে, এতগুলা সঙ্গীত-বিশারদ এক সঙ্গে জুটিল কিরূপে?

নীচে নামা উচিত কি না, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, ইংরাজের মহাকবি সেক্ষপীর না কি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে মুগ্ধ না হয়, সে খুন করিতে পারে, না, এমনি কি একটা কথা। কিন্তু, মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কি না জানি না; না হইলে, কাবুলিআলা গান গায়, এ কথা কে ভাবিতে পারে! একপ্রান্তে এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিতেছিল, হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি; হঠাৎ দেখি, এক ব্যক্তি তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। অনেক কষ্টে অনেক লোকের চোখ-রাঙানি মাথায় করিয়া এই লোকটার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল, এবং নিজেকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে একটি বিগতযৌবনা স্থূলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এত বড় দুটো ভাঁটার মত চোখ ও এত মোটা জোড়া ভুরু আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, "বাবু মহাশয়, ইটি আমার পরি—" কথাটা শেষ না হইতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল—"পরিবার! আমার সাত-পাকের সোয়ামী বল্‌চেন, পরিবার! খবরদার বল্‌চি মিস্তিরী, যার-তার কাছে মিছে কথা বলে আমার অপমান কোরো না বলে দিচ্চি।" আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, "আহা! রাগ করিস্ কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর—" টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, "হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল! জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর কর্‌চি বটে, কিন্তু, এক দিনের তরে হেঁসেলে ঢুক্‌তে দিয়েচি? সে কথা কারু বলবার যো নেই! টগর বোষ্টমী মরে যাবে, তবু জাত-জন্ম খোয়াবে না—তা জানো?" বলিয়া এই জাত-বোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্ব্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল। নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারম্বার বলিতে লাগিল, "দেখ্‌লেন মশায়, দেখলেন? এখনো এদের জাতের দেমাক! দেখ্‌লেন! আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হলে—" কথাটা সে তাহার বিশ বচ্ছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতেই পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাত-বোষ্টমীর কথাগুলা মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং সহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে! এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা শুদ্ধ-মাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়াই পরিত্রাণ পাইতেছে! তবে, এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই। আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প-অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পরে সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্ট শান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্র-পীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলেবেলায় নৌকার

দেখা দিলেন। সেই লাইনবর্ত্তী অবস্থায় বেশি ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না; তথাপি পুরোবর্ত্তী সঙ্গীদের প্রতি পরীক্ষা-পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ দৃষ্টি-গোচর হইল, তাহাতে ভাবনার সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরার্দ্ধ অনাবৃত করায় ভীত হইবে, অবশ্য, বাঙালী ছাড়া এরূপ কাপুরুষ সেখানে কেহ ছিল না; কিন্তু সম্মুখবর্ত্তী সেই সাহসী বীর পুরুষগণকেও পরীক্ষায় চম্‌কাইয়া-চম্‌কাইয়া উঠিতে দেখিয়া শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সকলেই অবগত আছেন, প্লেগ রোগে দেহের স্থানবিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তার সাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার-চিত্তে সেই সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা। কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন সভ্যতা আছে বলিয়াই তবু যা হোক একবার চমকাইয়াই স্থির হইতে পারিতেছিল; আর কোন জাত হইলে ডাক্তারের হাতটা সেদিন মুচড়াইয়া ভাঙিয়া না দিয়া আর নিরস্ত হইতে পারিত না। সে যাই হোক্, পাশ করা যখন অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন আর উপায় কি! যথাসময়ে চোখ বুজিয়া, সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ডাক্তারের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিলাম। এবং, পাশ হইয়াও গেলাম। অতঃপর জাহাজে উঠিবার পালা। কিন্তু ডেক-প্যাসেঞ্জারের এই অধিরোহণ-ক্রিয়া যে কি ভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ধারণা করা অসাধ্য। তবে, কল-কারখানায় দাঁতওয়ালা চাকার ক্রিয়া দেখা থাকিলে বুঝা কতকটা সম্ভব হইবে। সে যেমন সুমুখের টানে ও পিছনের ঠেলায় অগ্রসর হইয়া চলে, আমাদেরও এই কাবুলি-পঞ্জাবী-মাড়ওয়ারী-মাদ্রাজী-মারহাট্টী-বাঙ্গালী-চীনা-খোট্টা-উড়িয়া গঠিত সুবিপুল বাহিনী শুদ্ধ মাত্র পরস্পরের আকর্ষণ বিকর্ষণের বেগে ডাঙা হইতে জাহাজের ডেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া আসিল। এবং সেই গতি সেইখানেই প্রতিরুদ্ধ হইল না। সম্মুখেই দেখিলাম, একটা গর্ত্তের মুখে সিঁড়ি লাগানো আছে। জাহাজের খোলে নামিবার এই পথ। আবদ্ধ নালার মুখ খুলিয়া দিলে বৃষ্টির সঞ্চিত জল যেমন খরবেগে নীচে পড়ে, ঠিক তেম্‌নি করিয়া এই দল, স্থান অধিকার করিতে মরি-বাঁচি-জ্ঞান-শূন্য হইয়া অবরোহণ করিতে লাগিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নীচে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, পা দিয়া হাঁটিয়াও নামি নাই। ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম বলিলেও, বোধ করি শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সচেতন হইয়া দেখিলাম, খোলের মধ্যে অনেক দূরে এক কোণে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। পায়ের নীচে চাহিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ভোজবাজীর মত চক্ষের পলকে যে যাহার কম্বল বিছাইয়া বাক্‌স পেট্‌রার বেড়া দিয়া নিরাপদে বসিয়া প্রতিবেশীর পরিচয় গ্রহণ করিতেছে। এতক্ষণে আমার সেই নম্বর-আঁটা কুলি আসিয়া দেখা দিল; কহিল, "তোরঙ্গ ও বিছানা উপরে রাখিয়াছি; যদি বলেন, নীচে আনি।" বলিলাম, "না; বরঞ্চ, আমাকেও কোন মতে উদ্ধার করিয়া উপরে লইয়া চল।" কারণ, পরের বিছানা না মাড়াইয়া, তাহার সহিত হাতা-হাতির সম্ভাবনা না ঘটাইয়া, পা ফেলিতে পারি, এমন একটুখানি স্থানও চোখে পড়িল না। বর্ষার দিনে উপরে জলে ভিজি সেও ভালো, কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও না। কুলিটা অধিক পয়সার লোভে, অনেক চেষ্টায়, অনেক তর্কাতর্কি করিয়া, কম্বল ও সতরঞ্চির এক-আধটু ধার মুড়িয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল এবং আমার জিনিসপত্র দেখাইয়া দিয়া বক্‌সিস্ লইয়া প্রস্থান করিল। এখানেও সেই ব্যাপার,—বিছানা পাতিবার যায়গা নাই। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরেই নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে মা ভাগীরথীর উভয় কূলের মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইয়াছিল। এই দুই ঘণ্টা কাল যে কাণ্ড মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না—এমন কঠিন বুক সংসারে অল্পই আছে। কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল একটা গ্লাস, না ছিল একটা ঘটি। সহযাত্রীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙালী থাকে, ত, একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া, আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে নামিবার সেই গর্ত্তটার কাছা-কাছি হইবামাত্র এক প্রকার তুমুল শব্দ কাণে পৌঁছিল—যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন

চোখের জল আবার ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল; অস্ফুট অবরুদ্ধ স্বরে চুপিচুপি বলিল, "নাই গেলে অতদূরে? থাক্‌গে, যেও না!" নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল। চাবুক ও চারখানা চাকার সম্মিলিত সপাসপ্‌ ও ঘড়্‌ঘড় শব্দে অপরাহ্ণ বেলা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত চাপা দিয়া একটা ধরা-গলার চাপা কান্নাই শুধু আমার কাণে বাজিতে লাগিল; এবং আজও সে বাজ্‌না আমার কাণে থামে নাই।

* * * *

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন ভোরবেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাত্‌লা বিছানামাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লা-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ী হইতে নামিতে না নামিতে, এক খাকি-কুর্ত্তি-পরা কুলি আসিয়া এই দুটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া কোথায় যে চক্ষের পলকে অন্তর্ধান হইয়া গেল, খুঁজিতে-খুঁজিতে দুশ্চিন্তায় চোখ ফাটিয়া জল না আসা পর্য্যন্ত, আর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। গাড়ীতে আসিতে-আসিতেই দেখিয়াছিলাম, জেটি ও বড়রাস্তার অন্তবর্ত্তী সমস্ত ভূখণ্ডটাই নানা রঙের পদার্থে বোঝাই হইয়া আছে। লাল, কালো, পাশুটে, গেরুয়া - একটু কুয়াসা করিয়াও ছিল - মনে হইল, এক পাল বাছুর বোধ হয় বাঁধা আছে, চালান যাইবে। কাছে আসিয়া ঠাহর করিয়া দেখি, চালান যাইবে বটে, কিন্তু বাছুর নয়—মানুষ। মোটঘাট লইয়া, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া সারারাত্রি অম্‌নি করিয়া হিমে পড়িয়া আছে,—প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে জাহাজের একটু ভালো স্থান অধিকার করিয়া লইবে বলিয়া। অতএব কাহার সাধ্য পরে আসিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া জেটির দোরগোড়ায় যায়! অনতিকাল পরে এই দল যখন সজাগ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম, কাবুলের উত্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্য্যন্ত এই কয়লা-ঘাটে প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই। সব আছে। কালো-কালো এণ্ডি গায়ে এক দল চীনাও বাদ যায় নাই। আমিও না কি ডেকের যাত্রী (অর্থাৎ যার নীচে আর নাই), সুতরাং ইহাদিগকেই পরাস্ত করিয়া আমারও একটুখানি বসিবার যায়গা করিয়া লইবার কথা। কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া গেল। কিন্তু যখন যাইতেই হইবে, এবং জাহাজ ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানও জানা নাই, তখন যেমন করিয়া হৌক ইহাদের দৃষ্টান্তই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বলিয়া যতই নিজের মনকে সাহস দিতে লাগিলাম, ততই সে যেন হাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ যে কখন আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে;—সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোদ্দ-পোনরশ' লোক ইতিমধ্যে কখন্‌ ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু, বেশ ত সকলে বসিয়াছিলে,—হঠাৎ এমন কাতার দিয়া দাঁড়াইলে কেন?" সে কহিল, "ডগ্‌দরি হোগা।" "ডগ্‌দরি পদার্থটি কি বাপু?" লোকটা পিছনের একটা ঠেলা সাম্‌লাইয়া বিরক্ত মুখে কহিল, "আরে, পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি।"

জিনিসটা আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু বুঝি-না-বুঝি, এতগুলা লোকের যাহা আবশ্যক, আমারও ত তাহা চাই। কিন্তু কি কৌশলে যে নিজেকে ওই পালের মধ্যে গুঁজিয়া দিব, সে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কোথাও একটু ফাঁক আছে কি না খুঁজিতে-খুঁজিতে দেখি, অনেক দূরে কয়েকটি খিদিরপুরের মুসলমান সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এটা আমি স্বদেশে-বিদেশে সর্ব্বত্র দেখিয়াছি—যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে। ভারতের অপরাপর জাতির মত অসঙ্কোচে ঠেলা-ঠেলি, মারামারি করিতে পারে না। এমন করিয়া দাঁড়ানোটাই যে একটা হীনতা, এই লজ্জাতেই যেন সকলের অগোচরে মাথা হেঁট করিয়া থাকে। ইহারা রেঙ্গুনে দর্‌জির কাজ করে, অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। প্রশ্ন করিতে বুঝাইয়া দিল যে, বম্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরাজ-রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ। শুনিয়াছি কসাই-খানার যাত্রীদের পর্য্যন্ত জবাই হওয়ার অধিকারটুকুর জন্য এঁদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অবস্থা হিসাবে রেঙ্গুন-যাত্রীদের সহিত তাহাদের যে এত বড় মিল ছিল, এ কথা তখন কে ভাবিয়াছিল! ক্রমশঃ 'পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি' আসন্ন হইয়া উঠিল,—সাহেব ডাক্তার স-পেয়াদা

সংস্কার, অন্যহস্তে বুদ্ধি বৃত্তি, এই দুই অস্ত্র লইয়া ব্যাবহারিক জগতে প্রাণের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সংস্কারের প্রয়োগ অমোঘ ও অব্যর্থ; কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট, সেই নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাহিরে যাইবার উপায় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্র তেমন নির্দ্দিষ্ট নহে; কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকে অতীতের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়—অতীতের অভিজ্ঞতা যেখানে কেবল স্বকীয় অভিজ্ঞতামাত্র, সেখানে উহা সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; সেখানে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ ক্ষেত্রও অল্লায়তন। উপস্থিত আপদের নিবারণে সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি কতকটা সমর্থ হয় বটে; কিন্তু ভবিষ্যতের কোন সন্ধান করিতে পারে না। ভবিষ্যতে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের জন্য প্রজ্ঞাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ইতর জীবের হাতে এই প্রজ্ঞাস্ত্র নাই; মানুষ ইহার উদ্ভাবন করিয়াছে। তজ্জন্য সে আপনাকে ছোট করিয়া আপনার আততায়ীকেই বড় করিয়া মানিয়াছে এবং বহু আততায়ীর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া আপন অভিজ্ঞতাকে সংস্কৃত ও বৰ্দ্ধিত করিয়াছে। আপনার অভিজ্ঞতার সহিত অন্যের অভিজ্ঞতা সঙ্কলিত করিয়া সে অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে ও ভবিষ্যৎকে যোগসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া অসীম সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। এই প্রজ্ঞার অস্ত্র বিজ্ঞানময় অস্ত্র। বৈজ্ঞানিক এই বিজ্ঞানাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বাঙ্ময় জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং বাঙ্ময় জগতের অনুশাসনে প্রত্যক্ষ জগৎকেও আপনার বশীভূত করিয়াছেন। বিজ্ঞানবিদ্যার এইজন্য এত স্পর্দ্ধা। মানুষের কারবার প্রত্যক্ষ জগতে। প্রজ্ঞাবলে সেই প্রত্যক্ষ জগৎ মানুষের বশীভূত। প্রজ্ঞাবান মনুষ্য প্রত্যক্ষ জগতের প্রভু; অতএব প্রজ্ঞারই জয়;—প্রজ্ঞার জয় গাহিয়া আজিকার মত বিদায় লইতেছি।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

২

এক একটা কথা দেখিয়াছি সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে—তাহার শব্দগুলা পর্য্যন্ত যেন কাণের মধ্যে বাজিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলাও তেম্নি। আজও আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই। সে যে স্বভাবতঃই কত বড় সংযমী, সে পরিচয় ছেলেবেলাতেই সে বহুবার দিয়াছে। তাহার উপর এতদিনের এই এত বড় সাংসারিক শিক্ষা! গতবারে বিদায়ের ক্ষণটিতে কোন মতে পলাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এবার কিছুতেই আর আপনাকে সাম্লাইতে পারিল না, চাকর-বাকরদের সাম্নেই কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "দেখ, আমি অবোধ নই, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগ্‌তেই হবে জানি; কিন্তু, তবু বল্‌চি, আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দ্দয়! একেও এর শাস্তি একদিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!" সমাজের উপর কেন যে সে এতবড় অভিশাপ দিল, তাহা সেই জানে, আর তাহার অন্তর্যামী জানেন। আমিও যে না জানি তা' নয়, কিন্তু নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। বুড়া দরওয়ান গাড়ীর কবাট খুলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। পা বাড়াইবার উদ্‌যোগ করিতেছি, পিয়ারী চোখের জলের ভিতর দিয়া আমার মুখ পানে চাহিয়া একটু হাসিল; কহিল, "কোথায় যাচ্চ—আর হয় ত দেখা হবে না—একটা ভিক্ষে দেবে?" বলিলাম, "দেব।" পিয়ারী কহিল, "ভগবান না করুন, কিন্তু তোমার জীবন যাত্রার যে ধরণ তাতে—আচ্ছা, যেখানেই থাকো, সে সময়ে একটা খবর দেবে? লজ্জা কোরবে না?" "না, লজ্জা কোরব না,—খবর দেব" বলিয়া ধীরে-ধীরে গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। পিয়ারী পিছনে-পিছনে আসিয়া আজ তাহার অঞ্চল-প্রান্তে আমার পায়ের ধূলা লইল। "ওগো, শুনচ?" মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার ওষ্ঠাধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার

প্রাণযাত্রা চালাইতে হয়; অতএব আমি বলিতে পারি যে, প্রাণের দায়েই আমি ইহাতে আস্থা করি। অন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাতে আমি আস্থা করি। কৌতুক এই যে, প্রাণযাত্রা বিষয়ে আর সকলেই আমার শত্রু; সেই সকলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষাই প্রাণযাত্রা। অথচ সেই আত্মরক্ষার জন্যই আমি নিজের অভিজ্ঞতার অপেক্ষা সেই শত্রুমণ্ডলীর অভিজ্ঞতাতেই অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য হই; তাহারা যে সাক্ষ্য দেয় তাহাই মানিয়া লই; এমন কি, অনেক সময় নিজের প্রত্যক্ষকেও অবিশ্বাস করি। যাহারা আমার পরম শত্রু, তাহাদের সাক্ষ্যই আমার প্রাণরক্ষার বলবৎ উপায়। এ বড় কৌতুক বটে। এই বহু শত্রুকে আমি খুব বড় করিয়া দেখি; যেহেতু তাহারা বহু, সেইজন্যই বড় করিয়া দেখি। সেই হেতু তাহাদের অভিজ্ঞতা-সমষ্টির তুলনায় আমার স্বোপার্জ্জিত অভিজ্ঞতার মূল্য অল্প মনে করি; কেন না আমি ধরিয়া লইয়াছি, এই বহুর প্রত্যেকেই সর্ব্বাংশে আমার মত। আমিও যেমন চেতন জীব, তাহারাও সেইরূপ চেতন জীব; আমারও যেমন প্রত্যক্ষ জগৎ আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরও সেইরূপ প্রত্যক্ষ জগৎ আছে। তাহাদের চেতনা সর্ব্বাংশে মৎতুল্য চেতনা। আমার চেতনাই যে আসল, আর তাহাদের চেতনা যে নকল, সেই গোড়ার কথাটাই ভুলিয়া যাই।

মজাটা দেখুন। আমি প্রত্যক্ষবাদী; প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন আর কোন প্রমাণ আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। অন্য মানুষে যে চেতনার আরোপ করিয়াছি, তাহা কখনই আমার প্রত্যক্ষ বিষয় হইবার নহে, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। অপরের চেতনাকে আমি চেতনা নাম দিতেই সম্মত নহি। উহার নাম দিয়াছি চেতনাভাস। উহা চেতনাই নহে; উহা নকল চেতনা; চেতনার ছদ্মবেশ পরিয়া আমার নিকটে চেতনার মত দেখায় বটে। আমি যখন তত্ত্বান্বেষী, তখন আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই মতকে আঁকড়াইয়া থাকিব; কিছুতেই টলিব না; তখন আমার কাছে আমা ভিন্ন আর কোন চেতন জীব নাই, আমি এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু আমি আবার প্রাণী; যে কারণেই হউক, আমি প্রাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছি এবং সেই প্রাণরক্ষার চেষ্টায় বাধ্য আছি; আমার সমুদায় তত্ত্ব-পিপাসাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমার প্রাণের প্রেরণা আমাকে প্রাণযাত্রায় লিপ্ত রাখিয়াছে। এই প্রাণের দায়ে আমি বহু জীব স্বীকার করিতেছি। শুধু তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি তাহা নহে; তাহাদিগকে সর্ব্বাংশে আমারই মত চেতন জীব স্বীকার করিতেছি। সেই বহু চেতন জীবের নিকট আপনাকে অত্যন্ত খাটো করিতেছি। সেই বহু চেতন জীবের সাক্ষ্যের তুলনায় আমার প্রত্যক্ষকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করিয়া লইয়াছি। ক্ষুদ্র করিয়া লইয়াছি বলিয়াই অন্যের সাক্ষ্য অনুসারে নিয়মবদ্ধ বাহ্য জগৎ রচনা করিয়াছি এবং বাহ্য জগতের নিয়ম অনুসারে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করিয়া বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছি। ইহাই প্রজ্ঞার কাজ, এই প্রজ্ঞার বলেই আমি প্রাণযাত্রায় সমর্থ। এই প্রজ্ঞার বলেই মৎতুল্য বহু চেতন জীবের যুগপৎ আক্রমণ সত্ত্বেও আমি এ পর্য্যন্ত টিকিয়া আছি। আমি যখন তত্ত্বান্বেষী, তখন আমি একজীববাদী, আমিই তখন একমাত্র চেতন জীব। আমি যখন প্রাণী, তখন আমি বহুজীববাদী; তখন আমি মৎতুল্য বহু জীবের অস্তিত্ব নির্ব্বিবাদে মানিয়া লই; মানিয়া যে লই সে প্রাণের দায়ে, না মানিলে প্রাণ টেকে না। আমার সহজ সংস্কারে প্রেরণা দুর্ব্বল; আমার স্বোপার্জ্জিত অভিজ্ঞতা অতি সঙ্কীর্ণ; সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আমার বুদ্ধিবৃত্তিরূপ অস্ত্রের সন্ধান অধিকাংশ স্থলেই ব্যর্থ হয়। কিন্তু অপরের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমি যে বৃহত্তর জগতে আমরা প্রজ্ঞাস্ত্র প্রয়োগে সমর্থ হই, সেখানে আমার প্রজ্ঞাস্ত্র মহাপরাক্রমে বলীয়ান। আমার আততায়ী বহু চেতন জীবের অভিজ্ঞতার ফল আদায় করিয়া তৎ সাহায্যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া সেই ক্ষেত্র মধ্যে আমি আমার প্রজ্ঞাস্ত্রকে পরিচালিত করিতে পারি, নানারূপে তাহাকে খেলাইতে পারি। এখানে আমি প্রচণ্ড খেলোয়ার। সেই খেলোয়ার রূপে আমি জয়ী—জীবনযুদ্ধে আমার সমকক্ষ কেহ নাই।

প্রজ্ঞার বলে আমরা জয়ী; প্রজ্ঞার জয়গান করিয়া আজিকার মত বিদায় লইব। প্রাণ আপনাকে রক্ষা করিতে চাহে—প্রাণের ধর্ম্মে জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। কিরূপে হইয়াছে, জানি না; প্রাণের কাজকর্ম্মকে এখনও সূত্রবদ্ধ করিতে পারি নাই;—পারিব কি না, তাহাও জানি না। জ্ঞান জীবনযুদ্ধে প্রাণের পশ্চাতে বিদ্যমান। এক হস্তে

বাসপানি (৯ মাইল) পৌঁছি। কিন্তু ঐ স্থানে সব্‌অডিনেট্‌ কোয়াটার্‌স্‌ তখন বিধ্বস্তাবস্থায় ছিল বলিয়া আরও ৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাঘপানি গিয়া 'তেওয়ারি মহারাজের' দোকানে মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপন করিলাম। অপরাহ্ণে প্রায় ২ ঘটিকার সময়ে ৪ মাইল আন্দাজ চলিয়া পিফিমা পৌঁছিলাম। এই আড্ডায় একজন ডাক্তার এবং একজন ওভারসিয়ার বাস করেন। ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল রায় অতীব সজ্জন। তিনি তাঁহার আলয়ে রাত্রিযাপনের নিমিত্ত প্রভূত যত্ন করিলেন। কিন্তু বেলা তখনও খানিকটা আছে দেখিয়া, চলিয়া আসিয়া, ১০ মাইল দূরবর্ত্তী জুবুকা নামক স্থানে প্রায় ৭টায় পৌঁছিলাম। এখানে বেশ আরামে রাত্রি কাটাইলাম। কিন্তু পাকের অসুবিধাবশতঃ আহারাদি করা হইল না।

অর্দ্ধসভ্য পরিচ্ছদে ভদ্র নাগা

তৃতীয় দিন

১৬শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে চলিতে আরম্ভ করিবার খানিক পরেই কোহিমা সহর দৃষ্টিগোচর হইল। পথ খুব চড়াই—রাস্তা দুই এক স্থলে অচির ঘটিত বৃষ্টি-বন্যায় কিঞ্চিৎ বেমেরামত দেখা গেল। মধ্যপথে একটি সুন্দর জলপ্রপাত দেখিলাম। ১০ মাইল চলিয়া ১টার সময়ে কোহিমা সহরে পৌঁছিলাম। যাঁহারা শিলং প্রভৃতি পাহাড়ে সহর দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে কোহিমা তেমন চিত্তাকর্ষক হইবার কথা নহে। চলিতে-চলিতে মনে হইতে লাগিল, যেন শিলং সহরের একটা সড়ক দিয়া যাইতেছি—সেই পাহাড়ের

বাবু-পরিচ্ছদে নাগা

গা-কাটিয়া থাকে-থাকে বাড়ী, দোকান ইত্যাদি বেশ কৌতুকাবহ দৃশ্য। পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ খানিকটা সমতল—তাহাতে আফিস, সেনানিবাস, ডাকঘর, তারঘর ইত্যাদি রহিয়াছে।

মধ্যাহ্নে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন দত্ত সিভিল ওভারসিয়ার মহাশয়ের বাসভবনে আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রাম

করিতেছি, এমন সময়ে খবর জানা গেল, যিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার জন্যে টমটম্ পাঠাইয়াছিলেন, তিনিই টেলিগ্রাম করিয়াছেন, যাহাতে আমি মণিপুরের দিকে না যাই; কেন না পথঘাট প্রবল বন্যায় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ডিমাপুর হইতে মণিপুরের পথের ঠিক একতৃতীয়াংশে কোহিমা। এখানে আসিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে,—ইহা কোনক্রমেই চিত্তকে বুঝাইতে পারিলাম না। বরং উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। টমটম্ চলার রাস্তা বন্ধ হইয়াছে—পদব্রজে যাইব, তথাপি ফিরিয়া যাইব না। কোহিমার মেকেঞ্জ অফিসার মিঃ শ ঐ দিনই মণিপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তাঁহার কাছ হইতে খবর পাওয়া গেল যে, হাটিয়া পথ চলিতে পারিলে, কোনও প্রকারে

ভদ্র পরিচ্ছদে নাগা রমণী ও তাহার সন্তানগণ

যাওয়া যাইতে পারিবে। তথাস্তু বলিয়া টমটম্ নিয়াই চলিলাম। যতদূর পারা যায়, টমটমেই যাইব; তার পর যখন উহা চলিবে না—পদব্রজে যাইব, এই দৃঢ় সংকল্প করিয়াই রওনা হইলাম।

কোহিমা পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তিনটি জিনিস দেখিয়া গেলাম। (১) মেকেব ফোয়ারা; এইটি নাগা পাহাড়ের জনৈক ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিশনার মিঃ আর, বি, মেকেব সাহেবের নামে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থে নির্ম্মিত। (২) ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নাগা যুদ্ধে হত কয়েকজন বীরের স্মৃতিস্তম্ভ (ওবেলিস্ক); মেজর কক্, লেপ্টেনাণ্ট্ ফর্ব্বস্, মিঃ ডামাণ্ট্ ও সুবেদার মেজর নরবীরসিংহ এই চারি ব্যক্তির নাম ও পরিচয় ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। (৩) মণিপুরের রাজার বিজয়লিপি—এই লিপিযুক্ত প্রস্তর পদাঙ্কচিহ্নসহ নাকি জুবজার নিকটে পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে সূচিত হয় যে, জুবজা পর্য্যন্ত মণিপুরের অধিকার ছিল। পূর্ব্বেই
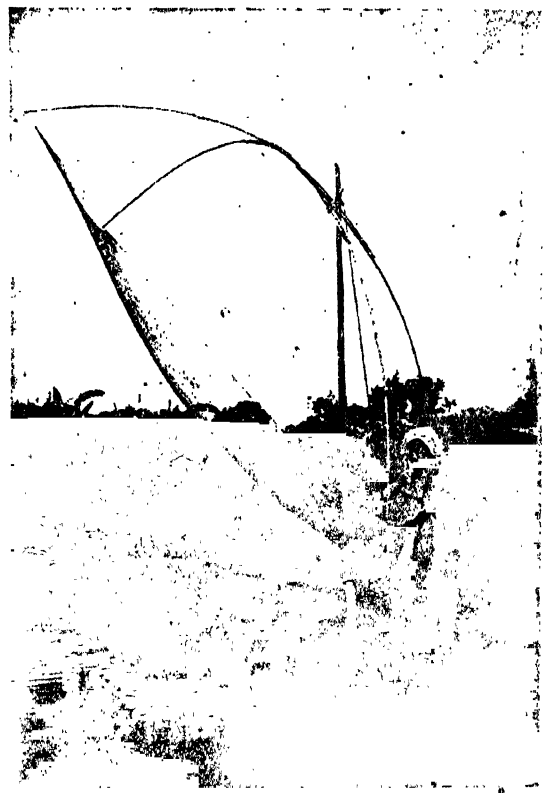
নাগা রমণীর মৎস্য-শিকার

বলিয়াছি, কোহিমায় আসিতে ১০ মাইল এদিকে জুবজা। ইহার লিপি বঙ্গাক্ষরে—কিন্তু ভাষা মণিপুরী। ইহাতে তারিখ আছে—শকাব্দা ১৭৫৪ ১০ই মাঘ (ইং ১৮৩৩ জানুয়ারি ২২শে কি ২৩শে)। রাজার নাম—"শ্রীগোবিন্দ মহারাজ কি মন্নাই শ্রীমৈতিঙ্ চিঙ্লেন নোংবে সোমর মহারাজা।" ইহার অর্থ, শ্রীগোবিন্দজীর দাস "শ্রীমৈতিঙ্ চিঙলেন নোংবে সোমরা মহারাজ"। ইহা মহারাজ গম্ভীর সিংহের মণিপুরী নাম বলিয়া বোধ হয়; কেন না, ঐ অব্দে

গম্ভীর সিংহই মণিপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীগোবিন্দ মণিপুরের রাজাধিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ দেববিগ্রহ।

প্রায় ৩টায় যাত্রারম্ভ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে জাকোমা (১০ মাইল) পৌঁছিয়া রাত্রিযাপন করিলাম। এই পথটুকু বেশ ভালই ছিল। রাস্তার পার্শ্ব দিকে, নিম্ন দিকে দৃষ্টি করিলে বড় মনোহর দৃশ্য লক্ষিত হইল—যেন পাহাড়ের পাদদেশে মাইলব্যাপী এক ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ বিছাইয়া রাখিয়াছে! নাগারা জুম করিয়াছে—থাক-থাক পাকা ফসলের আইল-গুলি হরিদ্রাবর্ণের—দুই আইলের মধ্যের ফাকটুকু কাল—ঠিক যেন বাঘের ছালের মতন দূর হইতে দেখা যাইতেছে। সড়কের পার্শ্বেই মকাই খেত—নাগারা বলে 'নৌ'। এই শস্য হইতেই তাহাদের মাদকদ্রব্য—নাম 'মধু'—প্রস্তুত হয়।

নাগাদের মধ্যে কিংবদন্তী এই যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ইঁহাদেরই রাজকন্যা উলুপীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোহিমা হইতে ১১ মাইল দূরবর্ত্তী 'কনমা' নামে একটা গ্রাম আছে—সেইটাই না কি উলুপীর পিত্রালয় ছিল। উলুপীর ছেলে ইরাবান্ না কি ভারতযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে স্থিত ইরাবতী নদী না কি ইহাঁরই নাম অনুসারে হইয়াছে। কিংবদন্তী সত্য কি না ভগবানই জানেন; কিন্তু কনমার নাগারা যে অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোহিমায় যাঁহাদের স্মৃতিস্তম্ভ বর্ত্তমান, ইঁহারা এই 'কনমা'তেই নাগাদের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। কোহিমা হইতে জাকোমার পথের দক্ষিণদিকে অনতিদূরেই নাগা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ 'জাপ্‌বো'—উহার উচ্চতা প্রায় ১০,০০০ ফিট।

চতুর্থ দিন

শুক্রবার, ২৭ আশ্বিন প্রাতঃকালে জাকোমা ছাড়িয়া কিয়দ্দূর যাইবার পরেই পথের দুরবস্থা দৃষ্ট হইতে লাগিল। যে যে জায়গায় পাকা পুল ছিল তাহা—বৃষ্টির জল প্রবলবেগে পাহাড়ের উপর হইতে নামিয়া আসায়—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিয়াছে। বন্যার অব্যবহিত পরে কিয়দ্দিন লোক-যাতায়াত একান্ত বন্ধ ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ আমি যে সময় গিয়াছিলাম, তখন ডাক-যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেক ভাঙ্গা জায়গায় নাগা কুলি মেরামত কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে। কণ্ট্রাক্টার বাবুদের অনুগ্রহে আমার ঘোড়া টমটম্ ইত্যাদি ঐ কুলিরা পার করিয়া দিয়াছে—কোনও অসুবিধা হয় নাই। পুরস্কার স্বরূপ নাগাদিগকে সিগারেট দিলে ভারি খুসি হইত। হিমালয়ে বদরিকার পথে যেমন 'ছুই সুতা' এখানে তেমনই 'সিগারেট'। আমি 'সিগারেট' ব্যবহার করি না—তন্মূল্য বলিয়া কিছু কিছু পয়সা দিতাম। নাগা, মণিপুরী প্রভৃতির মধ্যে সিগারেট অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে,—স্ত্রী পুরুষ, বালক সকলেই সিগারেট ভক্ত। এটা শুভ লক্ষণ নহে। বেলা প্রায় ১১টার সময়ে ১০ মাইল গিয়া মাউ থানায়

তাংখোল নাগা

পৌঁছিলাম—ইহা মণিপুরের মহারাজের এলাকাভুক্ত। এখানকার ডাক্তার বাবু গগনচন্দ্র দেবের আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক মধ্যাহ্ন কৃত্য সমাপন করিয়া প্রায় ২টার সময় মাউ ছাড়িলাম। এখানে ডিমাপুর হইতে গৃহীত 'পাস' দিয়া থানা হইতে নূতন 'পাস' গ্রহণ করিলাম। এই জায়গা মণিপুরের পথে সর্ব্বোচ্চ স্থান। আট মাইল আন্দাজ দূরবর্ত্তী এক পার্ব্বত্য প্রস্রবণ হইতে বরাক নদী—যাহা "বরবক্রো মহানদঃ পূর্ব্ব দেশেষু সংস্থিতঃ" বলিয়া পরিচিত—উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদীই মণিপুর, কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলার মধ্য দিয়া গিয়া, নানা নামে অভিহিত হইয়া, অবশেষে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের সন্নিকস্থ ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়া 'মেঘনা' নাম ধারণ করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

লোটনী-ভোয়ালী

[শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য]

মা ভৈঃ! পাঠকগণ আশ্বস্ত হউন,—ইহা ভ্রমণ কাহিনী নহে। ইহা কুমায়ুন পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত একটি স্বাস্থ্য নিকেতন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ। যে ভীষণ যক্ষা-রোগ ভারতবর্ষের গ্রামে-গ্রামে প্রবেশলাভ করিয়াছে—কিছুদিন পূর্ব্বে যে রোগের চিকিৎসা নাই বলিয়াই সকলে জানিতেন—এখন তাহার চিকিৎসা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অনেকটা সুসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই চিকিৎসায় অনেকে আরোগ্যলাভ করিতেছেন—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য ব্যাধিমুক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন। আমাদের বাংলা দেশে অনেক সময়ে যাহা
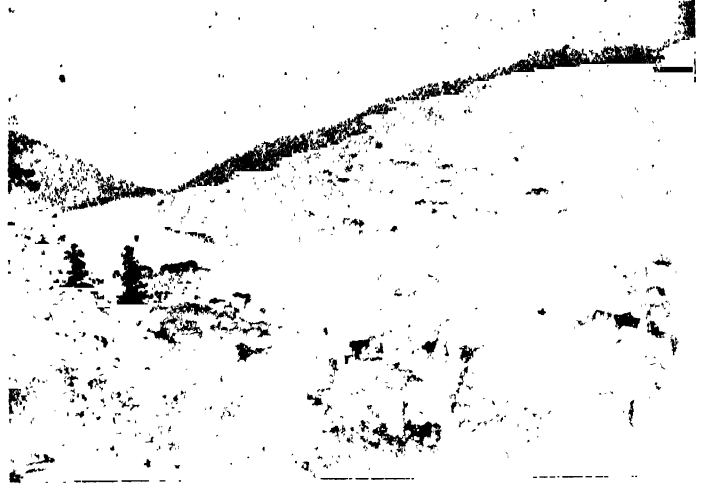
চীনা পাহাড় হইতে নৈনিতালের দৃশ্য

নৈনিতালের দৃশ্য

জীর্ণ-জ্বর বলিয়া অনেকে মনে করেন, তাহা সম্ভবতঃ এই যক্ষার রূপান্তর মাত্র। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় জানেন—ইহা কিরূপ সংক্রামক! যক্ষারোগীর শ্লেষ্মা শুকাইয়া চূর্ণাকারে বাতাসের সহিত মিশিয়া মনুষ্যের দেহ মধ্যে প্রবেশ করে, এবং দুর্ব্বল মনুষ্য দেহে সহজেই আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। ভারতবর্ষে যক্ষা-রোগের কারণ ও তাহার নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য ডাক্তার ল্যাঙ্কাষ্টার গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, নানা স্থান হইতে তিন বৎসর ধরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। শুনিলাম, এখনও তাঁহার যক্ষা-পরিদর্শন শেষ হয় নাই বলিয়া কোন রিপোর্ট সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তবে ভারতবর্ষে এখন এ রোগের এই প্রাদুর্ভাব যে, সমস্ত প্রদেশেই অতি শীঘ্র স্যানাটোরিয়া চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়—ইহাই বিশেষজ্ঞদিগের মত। এই ভোয়ালী স্বাস্থ্যনিবাসে যুক্তপ্রদেশের রোগীদের স্থান হইয়া যদি 'বেড' খালি থাকে, তাহা হইলেই বাঙ্গালীকে স্থান দেওয়া হয়। কাজেই অনেক বাঙ্গালী এখানে আবেদন করিয়াও স্থান পান না। সিমলার নিকটে ধর্ম্মপুরেও একটি স্বাস্থ্যনিবাস আছে; এখানেও বাঙ্গালীদের এই অবস্থা। এই সব স্বাস্থ্যনিবাসে বঙ্গ-দেশবাসীরা অতি সামান্যই সাহায্য করিয়াছেন; কাযেই এখানে এই ব্যবস্থা।
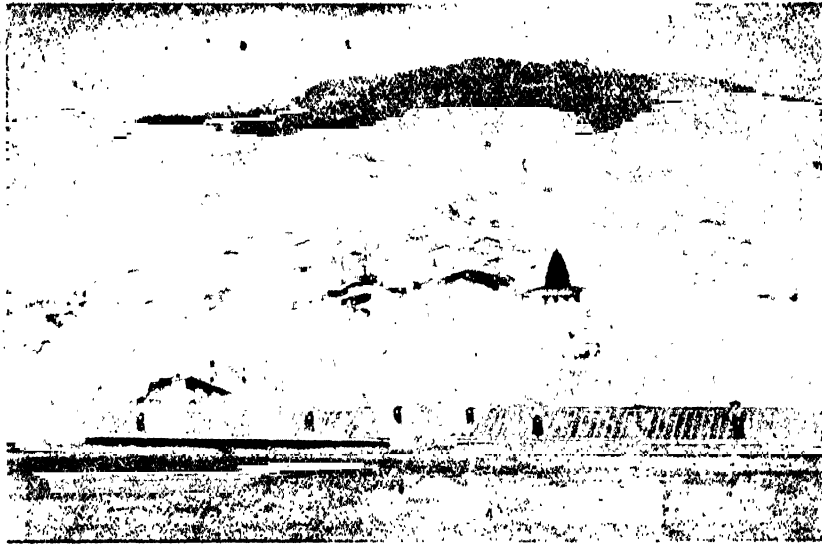
আলমোড়ার উত্তর দিকের দৃশ্য

নয়নাদেবীর মন্দির

লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল এ, সি, ককরেন এম বি, এফ আর সি-এস-ই

অথচ. বাঙ্গালাদেশে এই রোগের এত প্রাদুর্ভাব যে, উহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে অনেকেই ভীত হইবেন। যুক্তপ্রদেশ ও উত্তরপশ্চিম ভারতের যে-যে স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া আমাদের এতদিন বিশ্বাস ছিল, এখানে আসিয়া দেখিতেছি যে, সে সমস্ত স্থান হইতেও প্রতিবৎসর যক্ষ্মারোগী চিকিৎসার জন্য এখানে আইসে। এরূপ স্থলে বাঙ্গালাদেশের অবস্থার কথা বলা বাহুল্য। অথচ বাঙ্গালার এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দেশে এত দান-বীর থাকিতেও বাঙ্গালাদেশে একটীও স্বাস্থ্যনিবাস নাই। যে দেশে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ ও মহারাণী স্বর্ণময়ীর বংশধরের মত দান-বীরেরা বর্ত্তমান, সে দেশে যে একটা স্বাস্থ্য-নিবাস অক্লেশে স্থাপিত হইতে পারে না,—ইহা বিশ্বাস করা যায় না। যদি বাঙ্গালার জন্য আলাহিদা স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দাতৃগণ ভোয়ালী ও ধরমপুরের স্বাস্থ্য-নিবাসে বাঙ্গালীর জন্য এক-একটি কুটীর দান করিলেও অনেকের প্রাণরক্ষা হইতে পারে। অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, এরূপ এক একটি কুটীর নির্ম্মাণ ও পরিচালনের জন্য ১০,০০০্ টাকার প্রয়োজন। বিকানীর, বলরামপুর, প্রতাপগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজামহারাজ-

গণ এইরূপ এক-একটি কুটীর দান করিয়া দেশবাসীর কষ্টের লাঘব করিয়াছেন। আমাদের দেশের পরহিতব্রত দানবীরগণের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হউন।

এইবার আমি এই স্বাস্থ্যনিবাসের নিকটস্থ দু'একটি স্থান সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিব। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় ভোয়ালীর নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। এখানে আসিতে হইলে, রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন রেলের কাঠগুদাম ষ্টেশনে নামিতে হয়। কাঠগুদাম হইতে ভীমতাল হইয়া যে পথ আলমোড়ায় গিয়াছে, সেই পথ দিয়া ঘোড়া কিম্বা ডাণ্ডীতে এখানে আসা যায়—ইহা কিন্তু গাড়ীর পথ

তল্লিতাল বাজার

ডাণ্ডি

নহে। এই পথে ভোয়ালী প্রায় ১৩ মাইল ও গাড়ীর পথে ২২ মাইল। কাঠগুদাম হইতে ঘোড়ার ভাড়া ২॥০, ডাণ্ডীর ন্যূনাধিক ৫, টমটম ১১, ১৬, ও মোটারের ৩০, ৪০, লাগে। মুটে ভাড়া ১।০ মণ। কাঠগুদাম ষ্টেশনে কণ্ট্রাক্টররা ঘোড়া, মুটে প্রভৃতি সরবরাহ করে। মুটেরা বিশ্বাসী,—কণ্ট্রাক্টর মহাশয় সুবিধা পাইলে অধিক আদায় করিতে ছাড়েন না। মোটরে ৩।৪ জনের অধিক আরোহী এবং লোক-পিছু ১৫ সেরের অধিক মাল লওয়ার নিয়ম নাই। গাড়ীর রাস্তা—বিরভটি (Brewery) হইতে একটা নইনীতাল গিয়াছে, অপরটি এই ভোয়ালী অভিমুখে আসিয়াছে। ভোয়ালী হইতে স্বাস্থ্য-নিবাস এক মাইল দূরে অবস্থিত হইলেও, ভোয়ালী নামেই ইহা অধিক পরিচিত। আসল ভোয়ালী হইতে ভীমতাল ৪ মাইল, রামগড় ৬ মাইল, নইনীতাল ৭ মাইল ও আলমোড়া ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

ভোয়ালী বাজার মাঝারি গোছের, ও এখানে মোটামুটি নিত্যব্যবহার্য্য প্রায় সমস্তই পাওয়া যায়। এখানে পোষ্ট আপিসও আছে। পূর্ব্বে বদরীনারায়ণ বা বদরিকাশ্রম হইতে যাত্রীরা আলমোড়া হইয়া এই পথেই ফিরিতেন। যাত্রীদের মধ্যে কয়েকবার কলেরা হওয়ায় এখন এ পথ দিয়া আর যাত্রীদের আসিতে দেওয়া হয় না। ভীমতাল ভোয়ালী হইতে প্রায় ২০০০ ফুট নীচে ও কিছু অধিক গরম। ভীমতাল হ্রদের শোভা এই পর্ব্বতমালার মধ্যে অতি সুন্দর। এই হ্রদের তিন দিকে ইংরাজদের কুটীর ও হোটেল প্রভৃতি অবস্থিত। ভীমতাল মহাশের মৎস্য-শিকারের জন্যই প্রসিদ্ধ। মাছ ধরিতে একদিনের পাশ।০, ১৫ দিনের ১, লাগে। সাধারণতঃ আধ সের হইতে এক সেরের উপর মাছ বড় ধরা পড়ে না। এখানে এই মাছ ॥০ সের হিসাবে দেশী শিকারীরা বিক্রয় করে। পথে আসিতে-আসিতে পাহাড়ের গায়ে যেখানে একটু সমতল ভূমি, সেইখানেই কৃষিক্ষেত্র। ক্ষেত্রগুলি পাহাড়ের গায়ে যেন সিঁড়ির মত থাকে-থাকে সাজান—দেখিতে বড় সুন্দর। এই ভোয়ালীতে কিছু দিন পূর্ব্বে প্রোফেসর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (এক্ষণে সোহং স্বামী) বাস করিতেন। এখন ইনি এখান হইতে ৮ মাইল দূরে গেঠিয়া গ্রামে আছেন। তিনি এই অঞ্চলের রোগীদিগকে অবধৌতিক ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে অনেকেই স্বাস্থ্যলাভের জন্য আলমোড়ায় যাইতেন; কিন্তু

নৈনিতালের উত্তর-পশ্চিম দৃশ্য

তালই যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেন্টের গ্রীষ্মাবাস—সেইজন্য এপ্রিল মাস হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত এখানে খুব জমজমাট থাকে। এই সময়ে এখানে পোলো, হকি ও ফুটবল ম্যাচ হয় এবং মাঝে-মাঝে পাল-দেওয়া ছোট বোটের দৌড় হয়। হ্রদের চারিদিকে পাহাড় এবং এই পাহাড়ের গায়েই সরকারী আফিস, কাছারী ও বড়লোকের বাংলা। নইনীতে বাড়ীভাড়া বড় বেশী। সমস্ত মরসুমের জন্য বাড়ী ভাড়া করিতে হয়। অল্প দিনের জন্য কেহ ভাড়া দিতে চাহে না। হ্রদটী যেন পাহাড়ের মধ্যে ঘুমাইয়া আছে—এত শান্ত, এত স্থির। নইনিতালে প্রবেশের মুখেই যে বাজারটী পড়ে, তাহাকে তল্লিতাল বাজার বলে। এখানে সব দেশীয় লোকের
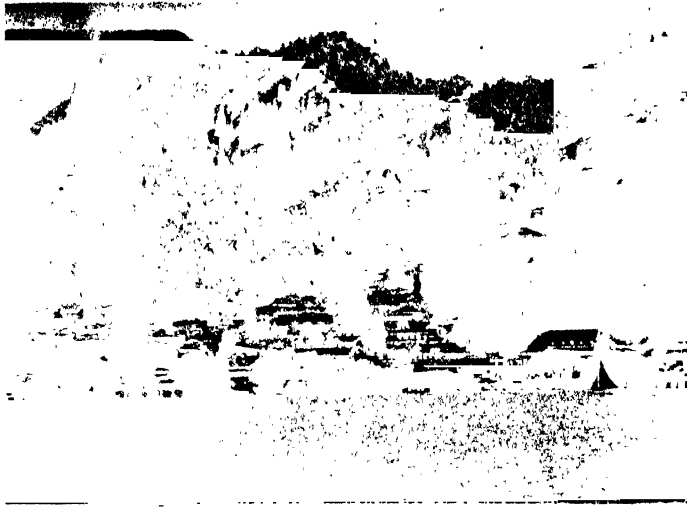
রেল ষ্টেশন হইতে অধিক দূর বলিয়া যাওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য। সাধারণতঃ ডাণ্ডীতে বা ঘোড়ায় দুই দিনের কম পৌঁছান যায় না। পথে থাকিবার মত চটী আছে। মোটরে গেলে কাঠগুদাম হইতে প্রায় ১০০্ ভাড়া পড়ে। আলমোড়া, শুনিতে পাই, ভোয়ালী বা নইনীতাল হইতে অধিক স্বাস্থ্যকর। ভোয়ালী বা নইনীতালে হারাহারি বারিপাত প্রায় ১০০ ইঞ্চি হয়, আলমোড়ায় ইহা হইতে অনেক কম। পাহাড়ের বৃষ্টি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বেশ রৌদ্র রহিয়াছে, কোথাও কিছু নাই, একখণ্ড মেঘ উঠিতে না উঠিতে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়। আবার কখন-কখন পাহাড়ের গা হইতে সাদা ধোঁয়ার মত মেঘ উঠিয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—মনে হয় যেন কুয়াশা হইয়াছে। বর্ষাকালে পাহাড়ে থাকা কষ্টকর হইয়া উঠে। বৃষ্টি-ঝড় প্রায় সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকে। আলমোড়ায় বাটীভাড়া ও খাদ্যদ্রব্য নইনীতাল অপেক্ষা অনেক সস্তা। আলমোড়ায় মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক একজন ৫০্ মাসিক ব্যয়ে বেশ থাকিতে পারেন। এইজন্য এখনও অনেকে, যাঁহারা যাতায়াতের অসুবিধা গ্রাহ্য করেন না তাঁহারা, ভোয়ালীতে স্থান না পাইলে, আলমোড়ায় চলিয়া যান। ভোয়ালীতে ভাড়াটে বাড়ী ৮।১০খানির অধিক নাই; কাযেই যাঁহারা ভোয়ালীতে বাংলো ভাড়া লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা শীতের শেষেই বাড়ীর জন্য চেষ্টা করেন।

এ প্রদেশের মধ্যে নইনীতালই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পার্ব্বত্য সহর। নইনী-

ঔষধালয় ও সাহেবদের কুটীর
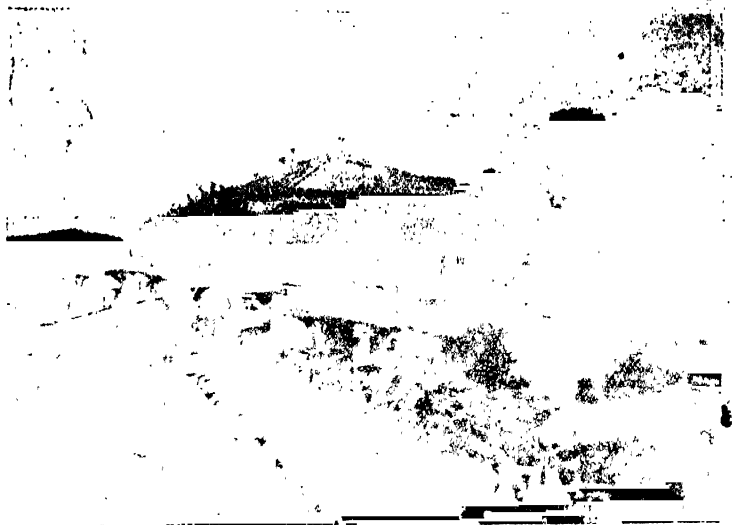
দোকান। তল্লিতালে একটি পোষ্ট আফিস আছে এবং তাহার তলদেশ দিয়া একটি গন্ধক-ঝরণা প্রবাহিত। এই পোষ্ট আপিস পর্য্যন্ত মোটর আসে, তাহার পর ঘোড়া বা ডাণ্ডী ছাড়া আর কোন যান ব্যবহৃত হওয়া নিষিদ্ধ। এখানকার ডাণ্ডীগুলি সুগঠিত এবং বড়লোক মাত্রেই নিজের ডাণ্ডী ও বাহক রাখেন। সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যবহারের জন্যও অনেকগুলি ডাণ্ডী আছে। এমন কি লাট সাহেব বা লাট পত্নীও এই যান ব্যবহার করেন। হ্রদের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ইংরাজদের দোকান অবস্থিত। এই স্থানের নাম মল্লীতাল। হ্রদের ধারে-ধারে কাঠের নৌকা-ঘরের মধ্যে বাচখেলার নৌকা রাখিবার জন্য কয়েকটি ঘর আছে। তাহার মধ্যে লাট-সাহেবের, রামপুরের নবাবের ও Y. M.
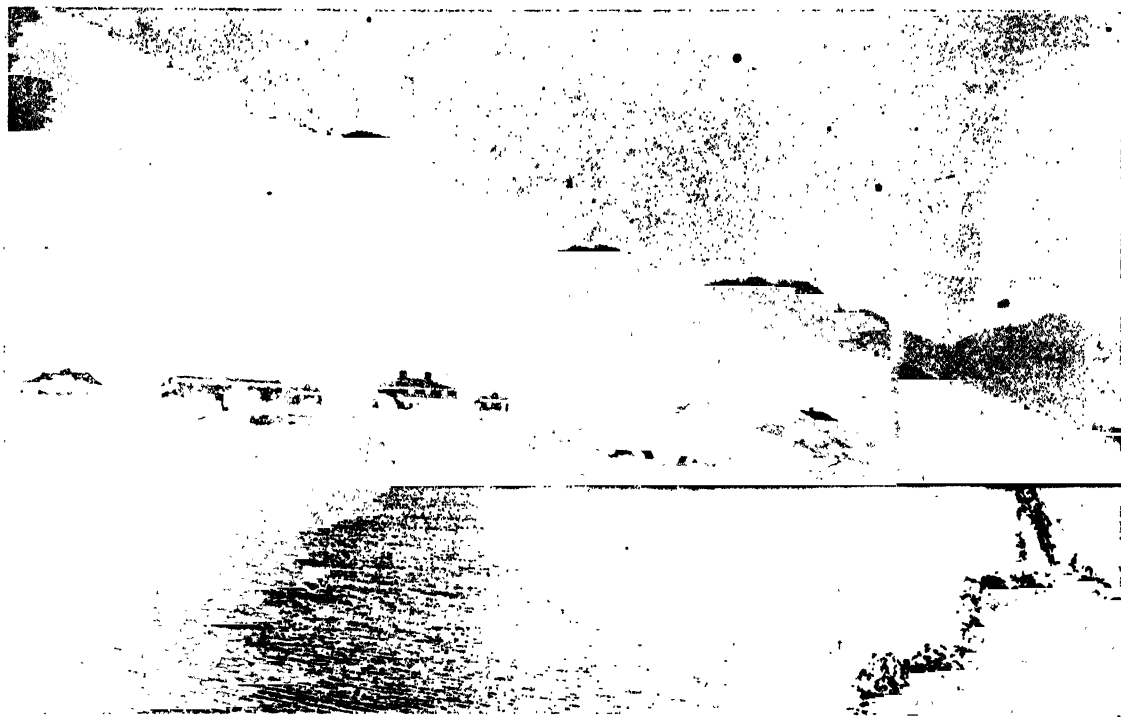
ভীমতাল হ্রদ

লেখক ও তাঁহার বন্ধুগণ

C. A.র বোট হাউসই উল্লেখযোগ্য। এই উত্তর-পশ্চিম প্রান্তেই হ্রদের ধারে খানিকটা স্থান সমতল করিয়া, পোলো প্রভৃতি খেলিবার ময়দান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, এবং ইহারই নিকট সাহেবদের ক্লাব-গৃহ। ইহার সন্নিকটেই নয়নাদেবীর মন্দির — একেবারে হ্রদের উপর; দেখিতে বড় সুন্দর। মন্দিরটি আধুনিক বলিয়া মনে হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা এখানে আসিয়া অনেক সময় আশ্রয় লইয়া থাকেন। ইহার নিকটে মুসলমানদিগের একটি সুন্দর মস্‌জিদ আছে। শুক্রবারে বহু মুসলমান এখানে উপাসনার জন্য সমবেত হ'ন। নইনীতালে সকল জিনিষই পাওয়া যায়।

প্রথম শ্রেণীর কুটীর (ক)

প্রথম শ্রেণীর কুটীর (খ)

মল্লিতালে শাক-সব্‌জী ও ফলমূল বিক্রয়ের জন্য মিউনিসিপালিটীর একটি বাজার আছে—ইহা ছাড়া তল্লিতালেও সমস্ত রকম শাক-সব্জী বিক্রীত হয়। তল্লিতাল হইতে মল্লিতাল পর্য্যন্ত হ্রদের ধারে-ধারে প্রশস্ত সমতল পথ এক মাইল দীর্ঘ—ইহাই এখানকার প্রধান ও পরিষ্কার পথ। গ্রীষ্মকালে এখানে নানা রকমের পার্ব্বত্য ফল, যাহা নীচে পাওয়া যায় না, বিক্রীত হয়। ইহার মধ্যে সুপক্ক চেরী, আলুবোখ্‌রা, খোভানী, আখ্‌রোট, হিমালু, কায়ফল ও আপেলই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নইনীতালে কয়েকটি ইংরাজী বিদ্যালয় ও বাণিজ্য-বিদ্যালয় আছে-ইহার মধ্যে মিশন হাইস্কুলটি হ্রদের তীরে অবস্থিত।

এখানে "চীনা" নামক একটী উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ আছে—চড়াই বড় কঠিন; কিন্তু কষ্ট স্বীকার করিয়া উপরে উঠিতে পারিলে, এখান হইতে চির-তুষার-ধবলিত হিমালয়ের নন্দাদেবী প্রভৃতি শৃঙ্গ দেখিয়া নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হয়, পথশ্রম সফল বলিয়া মনে হয়। চীনা হইতে সমগ্র নইনীতালের দৃশ্যও বড় সুন্দর।

লোহ্‌নী স্বাস্থ্যনিবাস

জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার গ্যালেনের সময় হইতে মুক্ত বায়ুর সাহায্যে যক্ষ্মা-চিকিৎসা য়ুরোপে প্রচলিত হইলেও, ইংলণ্ডের লোকেরা ইহাতে প্রথমে আস্থাবান্‌ হ'ন নাই। স্বর্গীয় সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড যখন প্রিন্স অফ্‌ ওয়েলস্‌—তখন তাঁহার চেষ্টায় যক্ষ্মা-রোগের তথ্য নিরূপণের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের অনুসন্ধানের ফলে—যক্ষ্মা যে কিরূপ সংক্রামক, এবং পীড়িতদের স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা না করিলে জনসমূহের কিরূপ বিপদের সম্ভাবনা, তাহা প্রকাশিত হয়; ইহারই ফলে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার জন্য মিডহার্সট সহরে ইংলণ্ডের প্রথম স্বাস্থ্য-নিবাস নির্ম্মিত হয়; পরে ইহারই আদর্শে ইংলণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশের জন্য বহু স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইংলণ্ডে ও য়ুরোপে স্যানাটোরিয়া চিকিৎসার সুফল প্রচারিত হইলে, বঙ্গের স্বর্গীয় মিঃ মালাবারী ও কলিকাতার মিঃ অ্যাটন, যাহাতে নিখিল ভারতবর্ষের জন্য হিমালয়ের কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে স্যানাটোরিয়ম্‌ নির্ম্মিত হয়, তজ্জন্য যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট সার্‌ জন্‌ হিউয়েটের নিকট ১৯০৮ খৃঃ অঃ আবেদন করেন। সঙ্গে-সঙ্গে কুমায়ুন পর্ব্বতমালায় সুবিধাজনক স্থানের অনুসন্ধান হইতে থাকে, এবং যুক্ত-

প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। অনেক লেখা লিখির পর এই পর্য্যন্ত স্থির হয় যে, যদি স্যানাটোরিয়াম্ সত্য-সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট একজন উপযুক্ত ডাক্তার ধার দিবেন। তাহার পর কিছুদিন ধরিয়া আলমোড়ার নিকটে কয়েকটি স্থান পরীক্ষা করা হয়; কিন্তু তৎসম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হইতে হইতেই কথাটা একরূপ চাপা পড়িয়া যায়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য আলোচনা প্রসঙ্গে যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন ইন্স্পেক্টর-জেনারেল কর্ণেল ম্যানিফোল্ড রামপুরের নবাবের
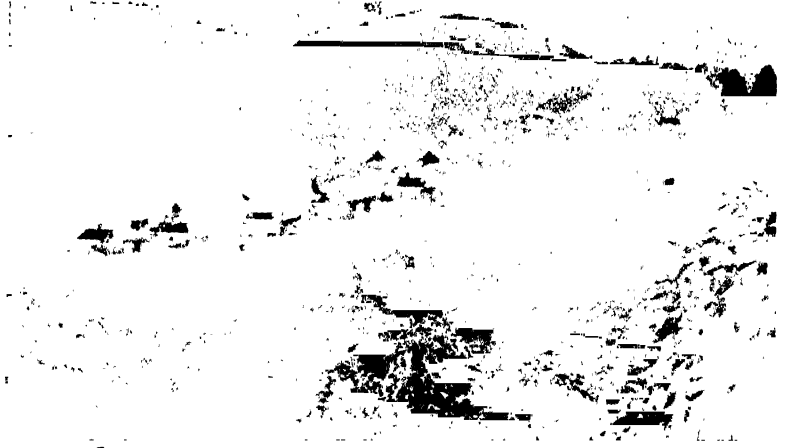
স্যানাটোরিয়ামের দৃশ্য

মিশন হাইস্কুল

নিকট স্যানাটোরিয়াম্ স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই সময় নবাব সাহেবের পরিবারবর্গের ভিতর এই ব্যাধি দেখা দিয়াছিল। রামপুরের নবাব সাহ্লাদে এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া স্বয়ং ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হ'ন, এবং যাহাতে স্বর্গীয় সম্রাটের স্মৃতি স্যানাটোরিয়ার আকার ধারণ করে, এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সহানুভূতির জন্য সংবাদপত্রে লেখালিখি করেন। তদানীন্তন লেফ্টেনেণ্ট গভর্ণর সার্ পোর্টারও এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন, এবং যুক্ত প্রদেশে স্বর্গীয় সম্রাটের স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে সভা হয়, তাহাতে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, কুমায়ুন পার্ব্বত্য প্রদেশে একটি স্যানাটোরিয়ামই সম্রাটের স্মৃতি মন্দির হউক। এই সভায় প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে বিচারপতি সার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। উপরি উক্ত বাঙ্গালীদ্বয় পরে কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটিতেও স্থান গ্রহণ করেন; এবং কমিটির যত্নে শীঘ্র পাঁচ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়।

তাহার পর স্যানাটোরিয়ামের জন্য স্থান নির্ব্বাচন। ইহা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত হইতে থাকে। পরিশেষে কমিটি সকল প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া স্থির করেন যে, স্যানাটোরিয়ামের স্থান-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের সুবিধা-অসুবিধা বিশেষ বিবেচ্য হওয়া উচিত। (১) অল্প ব্যয়ে প্রচুর ভাল জল। (২) গৃহাদি নির্ম্মাণোপযোগী প্রশস্ত স্থান,—যাহাতে ভবিষ্যতে স্যানাটোরিয়ামের আয়তন বৃদ্ধি হইতে পারে। (৩) গাড়ীর রাস্তার সান্নিধ্য (৪) ম্যালেরিয়া বর্জ্জিত স্থান (৫) মুক্ত বায়ু ইত্যাদি (৬) রোগীর বেড়াইবার জন্য ছায়াময় উপযুক্ত স্থান (৭) ধুলা, ঝড় প্রভৃতি হইতে দূরত্ব (৮) বারিপাত ইত্যাদি ইত্যাদি। মেজর ওয়াল্টন এইরূপ স্থান নির্ব্বাচনের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, হৃষীকেশ, রামনগর প্রভৃতি

স্থান পরিদর্শন করিয়া, সে গুলি, ম্যালেরিয়ার জন্য, অস্বাস্থ্যকর বিবেচনা করেন ও পরে মুহুরী ও লোহাঘাটের মধ্যে প্রায় ত্রিশটি স্থান পরিদর্শন করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার মনের মত স্থানগুলি পূর্ব্বেই কোথাও সৈনিক-বিভাগের দ্বারা, কোথাও চা-কর প্রভৃতির দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। কোথাও সর্ব্ববিষয়ে সুবিধামত স্থান নির্ব্বাচন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। কোন স্থান গাড়ীর পথ হইতে অতি দূরে, কোন স্থানে জল পাওয়া দুঃসাধ্য, কোথাও শীতাধিক্য, এইরূপ বহু বহু বাধা তাঁহার সম্মুখীন হয়। এমন অবস্থায় রামপুরের নবাব সাহেব ভোয়ালীর সন্নিকটে লোটনী শিখরে অবস্থিত তাঁহার দুইটি জমিদারী দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এখানে পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার সুবিধা বর্ত্তমান ছিল। তদুপরি তৎক্ষণাৎ কাযে আসার উপযুক্ত কয়েকটি ইমারতও পাওয়া গেল। ইহাতে কমিটির প্রায় ৬০ হাজার টাকার সুবিধা হইল। এখানকার একমাত্র অসুবিধা যে, এখানে অধিক বারিপাত হয়। যাহা হউক, কমিটিও এই প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। এই সময় মেজর কর্‌রেণ, যিনি বিলাতে স্যানাটোরিয়া-চিকিৎসা-প্রণালী শিক্ষার জন্য প্রেরিত হ'ন, ফিরিয়া আসিলেন ও ১৯১২ অব্দের এপ্রিল মাসে স্যানাটোরিয়ার প্রথম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার যত্নে মে মাসের মাঝামাঝি প্রথম রোগীকে এখানে স্থান দেওয়ার উপযুক্ত সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়া গেল।

লোটনী স্থানটি বেশ মনোরম। প্রথমে এইখানে একটি চা-বাগান ছিল; এখনও অনেক চা গাছ এখানে বর্ত্তমান আছে তাহাদের ডালে অনেক হিন্দু রোগী দাঁতন করেন। চা বাগানের উপযোগী করিয়া স্তরে-স্তরে পাহাড়ের গায়ে যে সকল জমি প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন সেখানে রোগীদের জন্য গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভোয়ালী এখান হইতে ২ মাইল ও নাইনীতাল হইতে ৮ মাইল; কাযেই প্রায় সমস্ত দ্রব্যই এখানে পাওয়া যায়। এখানে চীড় (পাইন), ও সুরুই (দেবদারু) গাছ যথেষ্ট। এই দুই বৃক্ষের হাওয়া না কি যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে বড় উপকারী। এখানে দরিদ্র রোগীদের জন্য একটি টিনের লম্বা একচালা আছে—ইহাতে ১১ জনের স্থান হয়। রোগীদিগের আহার দেওয়া হয়, এবং কেহ একেবারে নিঃস্ব হইলে এখান হইতে যাইবার সময় পাথেয় পর্য্যন্ত দেওয়া হয়।

এখানে চিকিৎসা সকলের পক্ষেই বিনামূল্যে হইলেও, যাঁহারা এখানে নিজ ব্যয়ে থাকেন, তাঁহাদের জন্য তিনটি পৃথক্ শ্রেণী আছে এবং অবস্থানুযায়ী তাঁহাদিগকে পৃথক্-পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। প্রথম শ্রেণীর রোগীদের নিকট হইতে অবস্থানুসারে অন্যূন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাড়া লওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর কুটীরগুলি পৃথক্-পৃথক্ ভাবে নির্ম্মিত। এক-এক কুটীরে দুইটী করিয়া ঘর, সম্মুখে ও পশ্চাতে বারান্দাবিশিষ্ট; রান্না ও শৌচের গৃহ পৃথক্। এ সমস্ত কুটীরে সপরিবারে থাকিতে পারা যায়। ঘরগুলি খুব পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও রং করা। এখানে গৃহের ছাদ পাকা হয় না, সকল গৃহের ছাদই কাঠের, করোগেটে মোড়া। মেঝে রেওয়াড়ী শ্লেটে আচ্ছাদিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গৃহটী দ্বিতল। ইহাতে ১২ জনের উপযোগী স্থান আছে। এক একটী রোগীর জন্য এক-একটী কক্ষ। আহারাদির বন্দোবস্ত রোগীকে নিজ ব্যয়ে করিতে হয়। খরচ দিলেও সরকার হইতে আহার্য্য দিবার এখানে কোন ব্যবস্থা নাই। তাই এখানে নিজের পাচক রাখার প্রয়োজন হয়। পাহাড়ী পাচক ব্রাহ্মণ মাসিক ৮৲৯ টাকায় পাওয়া যায়। ইহারাই অন্যান্য গৃহ-কর্ম্মাদিও করিয়া লয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার স্থান নাই। তাঁহাদের জন্য প্রথম শ্রেণীর মত আলাহিদা দুইটী কুটীর আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষের মাসিক ভাড়া কুড়ি টাকা। তৃতীয় শ্রেণীতেও ১২ জন রোগীর স্থান আছে—প্রত্যেক কক্ষে দু'জন রোগীকে রাখা হয়। এখানে ঘরের ভাড়া লাগে না, এবং অবস্থানুসারে আহার্য্যের আংশিক ব্যয়ের জন্য ১০ হইতে ১৫ টাকা মাত্র লওয়া হয়। প্রতি রোগীর আহার্য্যের জন্য কমিটির ২০৲ খরচ পড়ে। এখানে রজকের খরচও লাগে না; তবে রজক মহাশয় "উপরি" কিছু না পাইলে ভাল করিয়া কাপড় কাচেন না। আহার্য্যের মধ্যে প্রাতে সুজি, রাত্রি দিনে প্রায় দেড় সের দুধ, ও দ্বিপ্রহরে ভাত, রুটী, ডাল ও আলুর তরকারি, এবং রাত্রিতে রুটী ও মাংস দেওয়া হয়। যাঁহাদের এরূপ খোরাক পছন্দ নহে, তাঁহারা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে পারেন, এবং তাঁহাদের কোন খরচ স্যানাটোরিয়মকে দিতে হয় না।

স্যানাটোরিয়ার কুটীরগুলির মধ্যস্থলে ঔষধালয় ও ল্যাবরেটরী-গৃহ অবস্থিত। এই গৃহের মধ্যস্থলে সকলের পড়িবার উপযোগী পুস্তকাদি সজ্জিত একটী কক্ষ আছে। ইহারই চারিদিকে সাহেব-রোগীদের জন্য কয়েকটী কক্ষ আছে। সাহেবদের নিকট হইতে অবস্থানুসারে মাসিক ৫০ হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত লওয়া হয়। আহার্য্য প্রভৃতি স্যানাটোরিয়া হইতেই দেওয়া হয়। বিনামূল্যে কোন সাহেব রোগী এখানে স্থান পায় না।

বসরা হইতে প্রত্যাগত দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় ১০০ লোকের বাসের উপযুক্ত অস্থায়ী কাঠের চালা নির্ম্মিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাদের চিকিৎসার জন্য লোক পিছু ৩০৲ টাকা করিয়া কমিটিকে দিতেছেন। ইহাদের চিকিৎসার জন্য কয়েকজন ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্যানাটোরিয়ার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল এ, সি, কর্‌রেণ অতি সুবিজ্ঞ, ধীর, ভদ্র চিকিৎসক। ইঁহার সদয় ও মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। ইঁহার নিকট কোন ইতর-বিশেষ নাই—ইনি সকলের সহিত সমান ব্যবহার করেন। ইনি লণ্ডনের উচ্চবংশীয় ইংরাজ—এরূপ ভদ্র ইংরাজ ভারতবর্ষে কমই আছেন। অনেক সময় ইনি স্বয়ং রোগীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন ও রোগীদের আমোদের জন্য অনেক সময়ে নিজ ব্যয়ে ক্রীড়াদির ব্যবস্থা করেন।

চিকিৎসা-প্রণালী

এখানে তিন প্রকার চিকিৎসা প্রচলিত। প্রথম টিউবারকিউলীন,

দ্বিতীয় ক্লোরিণ গ্যাস, ও তৃতীয় নিউমোথোরাক্স। সাধারণতঃ যাঁহাদের ১০০ ডিগ্রির কম জ্বর হয়, তাঁহাদের টিউবারকিউলীন্ দেওয়া হয়। অতি কম শক্তির টিউবারকিউলীন্ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে-ক্রমে খাঁটী টিউবারকিউলীনের পিচকারী সপ্তাহে দুই দিন করিয়া দেওয়া হয়; সঙ্গে-সঙ্গে ব্যায়ামের জন্য কমোচ্চ পাহাড়ের পথে ভ্রমণ করান হয়। যাঁহাদের ১০০° অধিক জ্বর হয়, তাঁহাদের জন্যই ক্লোরিণ গ্যাসের ব্যবস্থা হয়। প্রথমে ২০ হইতে ত্রিশ গেণ পটাশ আয়োডাইড দেওয়া হয় এবং তাহার ২ ঘণ্টা পর হইতে মিশ্র ক্লোরিণ গ্যাস সেবন করান হয়। ইহাতেও অনেকের উপকার হয়। যাঁহাদের এ সকলে উপকার হয় না, তাঁহাদের জন্য নিউমোথোরাক্সের ব্যবস্থা। বৈকালে জ্বর না হওয়া বা বাড়া পর্য্যন্ত পরিমিত ব্যায়াম সকলের পক্ষেই বিধেয়। জ্বর হইলে একেবারে বিশ্রাম করা একান্ত কর্ত্তব্য। জ্বর হইলে বিছানা হইতে ওঠা একেবারে নিষিদ্ধ।

স্যানাটোরিয়াম যে প্রণালীতে চিকিৎসা হয়, যক্ষ্মার এরূপ চিকিৎসা অন্য কুত্রাপি হওয়া সম্ভবপর নহে। এখানকার চিকিৎসায় একেবারে আরোগ্য না হইলেও, অনেকে যে কার্য্যক্ষম হইয়া এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এরূপ রোগীর সংখ্যা কম নহে। তবে রোগের প্রারম্ভেই আসিলে উপকার হয়, নচেৎ সন্দেহস্থল হইয়া পড়ে।

বড়-বড় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকদের মতে যক্ষ্মারোগীর পক্ষে যে সকল বিধি-নিষেধ অবশ্য পালনীয়, তাহা নীচে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(১) যথাসম্ভব মুক্ত বায়ু সেবন করা উচিত; জ্বরের অবস্থায় অতিশয় শীতের সময়ও কদাচ মুখ ঢাকিয়া শুইতে নাই। পর্য্যাপ্ত পরিমাণ গরম কাপড়ে দেহ ঢাকিয়া, রাত্রিদিন গৃহের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া রাখা উচিত। বারান্দায়, বা আকাশের নীচে যথন সম্ভব শয়ন করা অধিক উপকারজনক। মুক্ত বায়ুতে যক্ষ্মারোগীর ঠাণ্ডা লাগে না।

(২) জ্বরের অবস্থায় একবারও বিছানা হইতে উঠা নিষেধ। জ্বরের সময় বেড়াইলে জ্বরের বৃদ্ধি ও শক্তির হ্রাস হয়।

(৩) শরীর ও মনের অধিক পরিশ্রম বর্জ্জনীয়।

(৪) আরোগ্যলাভের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে। এ রোগ অল্পে অল্পে সারে ও অল্পে-অল্পে বাড়ে।

(৫) প্রচুর বলকারী দ্রব্য আহার করা একান্ত প্রয়োজন—পেটের গোলমাল না থাকিলে কদাচ আহার ছাড়িবে না—জ্বরের অবস্থাতেও নহে।

(৬) সকালে ও বৈকালে থার্ম্মমিটার দিয়া জ্বর দেখা উচিত। ½ মিনিটের থার্ম্মমিটার হইলেও ৫ মিনিট ধরিয়া জিহ্বার নীচের উত্তাপ লওয়া উচিত। উত্তাপ লইবার অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মুখ খুলিতে, কথা কহিতে বা কিছু খাইতে নাই। ঘুম ভাঙ্গিবার পর (বিছানা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে) ৯৭.২ ডিগ্রি উত্তাপ হওয়া উচিত। স্ত্রীরোগীদের উত্তাপ পুরুষ রোগীদের অপেক্ষা .৪' অধিক হয়। যদি তখন ৯৮' হয়, বা সন্ধ্যাকালে ৯৯ হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত উত্তাপ না কমিয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই শয্যা ত্যাগ করা উচিত নহে—ইহা সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদের মত। বিশ্রামই জ্বরের একমাত্র ঔষধ। যখন জ্বর থাকিবে না, তখন ভ্রমণ শ্রেয়ঃ। জ্বরের সময় ব্যায়াম বিষবৎ অনিষ্টকর।

(৭) যক্ষ্মারোগীর পক্ষে ধীরে-ধীরে বেড়ানই একমাত্র হিতকর ব্যায়াম। ঘণ্টায় দুই মাইলের অধিক বেগে ভ্রমণ করা উচিত নহে। সন্ধ্যায় ও সকালে বেড়ান বিধেয়, দ্বিপ্রহরে নিষিদ্ধ।

(৮) দুগ্ধ (খাঁটি) যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতিশয় উপকারী—অন্ততঃ দেড় সের দুধ প্রত্যহ পান করা উচিত। ডিম ও মাংসও খুব উপযোগী।

(৯) ব্যায়ামের অব্যবহিত পরে আহার বা আহারের অব্যবহিত পরে ব্যায়াম করা উচিত নহে। আহারের পর অন্ততঃ একঘণ্টা বিশ্রাম করা উচিত।

(১০) কোন বলকারী খাদ্য নিষিদ্ধ নহে—তবে উহা সহজপাচ্য হওয়া উচিত। পেটের গোলমাল যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে খুব সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। যক্ষ্মারোগীর পক্ষে পেটের পীড়া বড় অনিষ্টকর।

(১১) ধূম বা মদ্যপান পরিত্যাজ্য।

(১২) ঔষধের উপর অতি বিশ্বাস রাখিও না। পেটেণ্ট ঔষধে অনর্থক অর্থ ব্যয় করা উচিত নহে। সহ্য হইলে কডলিভার অইল সেবন করিতে পার—ইহাতে বল ও মেদ বৃদ্ধি হয়।

(১৩) রাত্রি জাগরণ করা উচিত নহে। আহার নিদ্রা সমস্তই নিয়মিত সময়ে হওয়া উচিত।

(১৪) শ্লেষ্মা যেখানে-সেখানে ফেলা উচিত নহে। শ্লেষ্মাতে যক্ষ্মার বীজাণু থাকে, তাহাই অপরে সংক্রামিত হয়। শ্লেষ্মা পুড়াইয়া ফেলাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। একটী চওড়া মুখ শিশি সঙ্গে রাখিলে তাহাতে শ্লেষ্মা ত্যাগ করা চলে এবং পরে তাহা পুড়াইয়া ফেলিলেই বীজাণু সহজে নষ্ট করা যায়।

যক্ষ্মারোগীর পক্ষে এই সমস্ত বিধি-নিষেধ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে প্রকৃত উপকারের আশা করা যায়। স্যানাটোরিয়ামে আসিতে হইলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে নিয়মাবলী আনাইয়া তদনুযায়ী দরখাস্ত করিতে হয় এবং তদুত্তরে যদি তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে এখানে আসা উচিত; নচেৎ বড়ই কষ্টে পড়িতে হয়। এখানে থাকিবার অন্য কোন স্থান নাই। কয়েকটি ভদ্রলোক অনাহূত আসিয়া সপরিবারে যে কষ্টে পড়িয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। অথচ ইহার কোন প্রতিকারই সম্ভব নহে। কারণ, স্থান সময়-সময় খালি থাকিলেও তাহা অপরকে দেওয়া চলে না—উহা পূর্ব্ব হইতেই রিজার্ভ হইয়া থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসে জুলাই মাসে ও সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভে আবেদন করিলে স্থান পাওয়ার অধিক সম্ভাবনা। স্যানাটোরিয়াম ডিসেম্বরের শেষ হইতে প্রায় ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগ হইতে মার্চ্চের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এখানে খুব শীত থাকে। জুন, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসই এখানে অধিকতর স্বাস্থ্যকর।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

' Let the dead past bury its dead.'

Stock Exchange Advertisement.

Wanted.— A bride of handsome appearance and rosy complexion, age below nine, heiress preferred, for a living Bengalee Kulin. Portrait annexed. 70394 applications already received.

গুরুপুত্র

এসেছি শিষ্যালয়ে আহরিতে বার্ষিকী,
পিছনের ছাঁটা চুলে লুটায়ে নধর টিকি।
টেরি আজ হতাদর, জলভরা চোখ নাক,
সিদ্ধি চরস বিনা পেট ফুলে জয়ঢাক।
টেনেছি দাঁতের আগে সরা হাসি মিটি মিটি,
লুকাতে পারিনি শুধু সনাতন চাহনিটি।
তাতে কিবা আসে যায়? পড়ে যায় উৎসব,
চরণে লুটায়ে পড়ে ছোঁড়া বুড়া আদি সব।
বসে থাকে আশে পাশে, চেয়ে রয় উন্মুখ,
আমার আশীষ আশে নরনারী উৎসুক।
শুনিতে আমার বাণী হয়ে পড়ে যোগময়,
আমার প্রসাদ খেতে ভুলে যায় রোগ ভয়।
রাজভোগ ঘরে ঘরে, থরে থরে জলপান;
আমারে সেবিতে সঁপে অকাতরে ধনমান।
আমার অবাধ গতি অন্দর অন্তরে;
পর্দ্দা হটিয়া যায় বিমোহন মন্তরে।

ইন্দুমাধব মল্লিক

শোক-সংবাদ

আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, বি, এল, এম, ডি মহোদয় আর ইহজগতে নাই। ইন্দুমাধববাবুর মত এমন মেধাবী ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি কমই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত উপাধি-পরীক্ষা প্রদান করা যেন তাঁহার একটা খেয়াল ছিল। এম, এ পরীক্ষাই তিনি তিনবার তিন বিষয়ে দিয়া উত্তীর্ণ হন; তাহার পর বি, এল, পরীক্ষা দেন। তাহার পর তিনি মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করেন; উকিল না হইয়া ডাক্তারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন; তাঁহার চীন-ভ্রমণ পুস্তকখানি অতি সুন্দর। যে ইকমিক কুকার এখন অনেকের ঘরেই বিরাজ করিতেছে, ইন্দুমাধবই তাহা প্রস্তুত করেন। এমন ধীমানের অকাল মৃত্যু বড়ই শোচনীয়।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(১৯)

রেখাঃ কে. এম. ব্যানার্জ্জী

মধুসূদনের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর

মধুসূদন ও তাঁহার পত্নী উত্তরপাড়া হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে ইটিলীস্থ বেনিয়াপুকুরে প্রায় দুই-তিন সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসুখগ্রাসিনী ব্যাধি মধুসূদনকে পৃথিবী বক্ষ হইতে সত্বর অপসারিত করিবার নিমিত্ত ভীষণা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন – সমস্ত পার্থিব চেষ্টাই তাহার প্রচণ্ড প্রকোপের সম্মুখে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছিল। পতি পত্নী—উভয়েই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছেন; কে কাহার সেবা শুশ্রূষা করিবেন, কে কাহার মুখে জলগণ্ডূষ দিবেন, কে কাহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিবেন? দুইজনেরই চক্ষু মৃত্যু-আবেশে মুদিয়া আসিতেছে, কে কাহার দিকে চাহিয়া দেখিবেন? শেষাশ্রু-বিজড়িত চক্ষে পরস্পরের দিকে চাহিয়া শেষ বিদায় লইবার শক্তি আর কাহারও ছিল না। কে কাহাকে বিদায় দিবেন? বিধাতার শেষ আহ্বানের ঘণ্টাধ্বনি উভয়ের শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, —উভয়কে যে একসঙ্গেই যাইতে হইবে!

হেন্‌রিয়েটা যদি সুস্থ থাকিতেন, তাহা হইলে মধুসূদন পত্নীর সেবা শুশ্রূষা লাভ করিয়া, ইটিলীর বাটীতেই তনুত্যাগ করিতে পারিতেন! কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।
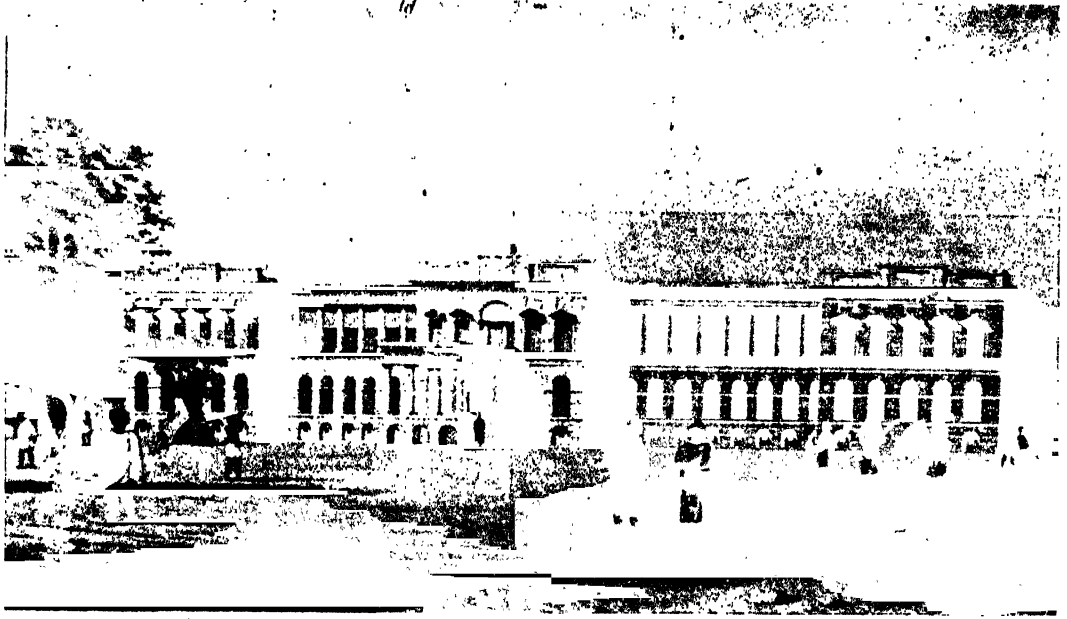
আলিপুর জেনারেল হাসপাতাল (৮৭৩)

বেণিয়াপুকুরের বাটীতে মধুসূদনের সুচিকিৎসা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, তাঁহার বন্ধুগণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। যাহাতে অন্তিমকালে মাইকেল মধুসূদনের চিকিৎসা ও সেবার ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, ও মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী পরামর্শ করিয়া,—সেই সময়ে আলিপুরে সিভিলিয়ান ইংরাজদিগের চিকিৎসার জন্য জেনারেল হাসপাতাল নামে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসালয় ছিল এবং এখনও আছে,—মধুসূদনকে সেইখানে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার বাসনা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও এক অন্তরায় ছিল। জেনারেল হাসপাতালে ইংরাজ ও য়ুরোপীয়েরাই চিকিৎসিত হইতেন। য়ুরেশীয়ান, য়িহুদী, পার্শী, এবং বিলাত-প্রত্যাগত দেশীয় খ্রীষ্টানদিগকে সেখানে লওয়ার রীতি ছিল না। "কিন্তু ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিভ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এবং অন্যান্য দুই একজন ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারীর বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে Presidency General Hospitalএ indoor patient করা হইয়া-

রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিল।* * কাযেই পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় বিদূরিত হইয়াছিল। সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ-ভিষক ডাক্তার পামার (W. J. Palmer M. D.) জেনারেল হাসপাতালের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে মধুসূদনের পরিবারে চিকিৎসা করিতেন বলিয়া, ইঁহার সহিত মধুসূদনের বিশেষ ঘনিষ্টতা ছিল। কাযেই মধুসূদনের পক্ষে যতদূর পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট চিকিৎসা সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার ত্রুটি হয় নাই। মধুসূদনের পত্নী হেনরিয়েটা ইটলীর বাটীতে তাঁহার জামাতা ফ্লয়েড সাহেবের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া চিকিৎসিত হইতে লাগিলেন। মধুসূদনকে সেবা করিবার কণামাত্রও শক্তি তাঁহার ছিল না।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের শেষভাগে মুমূর্ষু মধুসূদনকে তাঁহার কুটুম্ব ও বন্ধুগণ জেনারেল হাসপাতালে লইয়া গেলেন। চিররুগ্না, মৃত্যুশয্যাশায়িনী, অনাথা পত্নীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় মৃতকল্প মহাকবির মনের ভাব যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার শক্তি আমাদের নাই। মধুসূদনের হৃৎপিণ্ড,—বক্ষের অস্থি সমস্তই চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, শোণিত শুকাইয়া গিয়াছিল। নয়ন নিষ্প্রভ, অধর নির্ব্বাক্ ও হৃদয় নিস্পন্দ হইয়া জড়বৎ পাষাণ হইয়া গিয়াছিল! তিনি কেবল রুদ্ধবক্ষে সিক্তনেত্রে পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন! ইহাই তাঁহার অনন্তের পথে মহাযাত্রা!. এ পথেও তিনি কোন সহযাত্রীর আশা করেন নাই! কিন্তু তাঁহার মর্ত্ত্যবাসের জীবনসঙ্গিনীই তাঁহার পূর্ব্বগামিনী হইয়াছিলেন।

মধুসূদন চিকিৎসালয়ে আনীত হইলে, তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত চিকিৎসক ডাক্তার পামার তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। যাহাতে মধুসূদনের পরিচর্য্যার ব্যাঘাত না হয়, এই নিমিত্ত শুশ্রূষাকারিণীদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। মহানুভব মধুসূদন তাঁহাদের পরিচর্য্যায় এতদূর সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এক পূর্ব্বতন মুন্সী তাঁহাকে দেখিতে আসিলে, তাহাকে বলিয়াছিলেন,—"আহা, ইহাদের শুশ্রূষার অন্ত নাই। আমি যদি পূর্ব্বে এখানে আনীত হইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় এ যাত্রা বাঁচিতাম।"

* ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের ভ্রাতা পরলোকগত মুরলীমোহন ঘোষ মহাশয়ের লিখিত।

মধুসূদন যে কয়দিন হাসপাতালে জীবিত ছিলেন, সে কয়দিন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ, এবং অনেক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিতে যাইতেন। তিনি তাঁহাদের সহিত নিজের অতীত জীবনের আলোচনা করিতেন, এবং অনেককে সদুপদেশ দিতেন। যে সময়ে একটু ভাল থাকিতেন, তখন তাঁহার স্বভাবজাত সরস কথাবার্ত্তায় সকলকে বিমোহিত করিতেন। তাঁহার অবস্থানে সেই নিরানন্দ রোগী-নিবাস ক্ষণেকের তরে প্রফুল্ল-শ্রী ধারণ করিয়াছিল! কোন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি বলেন, "হাসপাতালের লোকেরা বলিয়াছিল—'এখানে যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের জন্য আমাদের দুঃখ হয় না; কিন্তু ইঁহার জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি; কারণ এখানে এই কয়দিন মাত্র থাকিয়া ইনি আমাদিগকে বড়ই আমোদে রাখিয়াছিলেন; ইনি মধ্যে-মধ্যে এরূপ চমৎকার কথোপকথন করিতেন, যাহাতে আমরা প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতাম। কারণ, সেই শোচনীয় শারীরিক অবস্থাতেও ওরূপ আনন্দে ও মধুর প্রকৃতিতে থাকা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই।' এ সম্বন্ধে জনৈক অশীতিপর ব্যবহারাজীব বলেন, 'He (Michael) had still light in his eyes and wit and humour on his tongue'.

হাসপাতালে আসিয়া মধুসূদন প্রথম দুই-চারি দিন একটু ভাল ছিলেন; প্রত্যেক দর্শনার্থীকেই তিনি ধীরে-ধীরে অতি মধুর বচনে আপ্যায়িত করিতেন। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার পরিচিত এক ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার কোন প্রিয়পাত্রের সহিত তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া অন্যত্র বাটী ভাড়া করিয়া Nurse ও ইংরাজ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিতে চাহিয়াছিলেন। মধুসূদন সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলেন, "এখানে আমার চিকিৎসার কোন অসুবিধাই হইতেছে না, তোমার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" মধুসূদন স্বীকার না করাতে ব্রাহ্মণ বড়ই গোলযোগ ও ক্রন্দন করিয়াছিলেন। মধুসূদন গম্ভীরভাবে তাঁহাকে বলেন, "তুমি এখানে ওরূপ বালকের ন্যায় ক্রন্দন ও গোলযোগ করিও না। এ সাহেবদিগের হাসপাতাল; তোমার গোলমালে তাঁহাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিলে

তাঁহারা বিরক্ত হইতে পারেন ? তুমি স্থির হও।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার বন্ধুকে ইঙ্গিত করিলেন।

চিকিৎসালয়ের শুশ্রূষাকারিণীরা মধুসূদনের মধুর কথায় ও মধুর ব্যবহারে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে অপরিসীম যত্ন করিতেন। তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে না পারিয়া, দানশৌণ্ড মধুসূদন এতই ব্যাকুল হন যে, তাঁহাদিগকে প্রত্যহ এক-একটি টাকা পুরস্কার দিতে মনোমোহন ঘোষকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মনোমোহন ঘোষও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

একদিন মনীরুদ্দীন নামে তাঁহার মুন্সী কয়েক প্রকার ফল ও পুষ্প লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিল। মধুসূদন যখন তাহার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন জনৈকা শুশ্রূষাকারিণী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মধুসূদন মুন্সীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট কিছু আছে কি ?" মুন্সীর নিকট মাত্র দেড় টাকা ছিল। সে পকেট হইতে তাহা বাহির করিলে, মধুসূদন উহা তাঁহার বৃদ্ধ ও মধ্যম অঙ্গুলীর অগ্রভাগে ধারণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ 'Here is something for you' বলিয়া সেই শুশ্রূষাকারিণীকে প্রদান করিলেন।

এদিকে ত মধুসূদনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। ওদিকে বেণিয়াপুকুরে তাঁহার পত্নীর রোগের অবস্থা চরম সীমায় উপনীত হইল। স্বামী-বিরহিতা অভাগিনী মৃত্যুশয্যায় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন বৃহস্পতিবার, স্বামীর মৃত্যুর দুইদিন পূর্ব্বেই মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া, এই অশান্ত সংসারের চির অশান্ত মধুসূদনের নিমিত্ত শান্তির নীড় রচনা করিবার জন্য, অধীরা হইয়া পলায়ন করিলেন। মধুসূদন পত্নীর সহিত পৃথিবীতে শেষ সাক্ষাৎ করিতে পান নাই। তাঁহার সতীলক্ষ্মী পত্নীর শবদেহ সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত জে, লিউইস্ এণ্ড কোম্পানী (J. Lewis and Co. Undertakers) তাঁহাদের শববাহী শকটে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। তাঁহার পুত্রকন্যা, জামাতা ও অন্যান্য আত্মীয় ও কুটুম্বগণ, মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ দেশীয় ও য়ুরোপীয় বন্ধুগণ ধীরে-ধীরে সাশ্রুনয়নে শবাধারবাহী শকটের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এবং সমাধির সময়ে মধুসূদনের চিরক্লেশভাগিনী সহিতার জন্য শেষাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেণ্ট জন গির্জ্জার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য রেভারেণ্ড ডব্লিউ, সি, ব্রমহেড্ (Rev. W. C. Bromehead, Senior Chaplain, St. John's Church) হেন্‌রিয়েটার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

পতিপরায়ণার আদর্শ, রমণীরত্ন এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়ার কথা আমরা পূর্ব্বে কয়েক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি। পুনরুল্লিখিত হইলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, এমন নিত্য অভাবপূর্ণ সংসারের গৃহিণী হইয়াও, তিনি পতিগতপ্রাণা হিন্দু রমণীর ন্যায় পতির সঙ্গে চিরদুঃখভাগিনী হইয়াছিলেন। অম্লান বদনে সংসারের সকল জ্বালাই সহ্য করিয়াছিলেন। একটি মুহূর্ত্তের নিমিত্ত কখনও ক্ষোভ বা বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই। মধুসূদনের দুরন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতায় তাঁহার যাবতীয় সৌখীন দ্রব্য, বহু মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কার সকলই অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। নিজে একটি দিনের জন্যও সুখের প্রয়াসী ছিলেন না। কি করিলে মধুসূদন শান্তচিত্তে জীবন-যাপন করিতে পারেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তার বিষয় ছিল। নিজের পীড়া, নিজের চিকিৎসা ও নিজের মৃত্যু গণনার মধ্যেই আনেন নাই ! নিজে মৃত্যুশয্যাশায়িনী হইয়াও স্বামীর জীবন যাহাতে রক্ষা পায়, সেই দুর্ভাবনায় তিনি অধীরা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন ! এ হেন সতীসাধ্বী ললনার স্বামী-বিরহ কে ঘটাইতে পারে ? স্বয়ং মহাকালও তাঁহার ভয়ে ভীত। মধুসূদনের নানা ক্লেশে তিনি ইহলোকে চিরজীবন উদ্বিগ্না ছিলেন। পাছে মধুসূদন পরলোকেও বিপন্ন হন, এই নিদারুণ উদ্বেগে চিরজীবী সতী স্বামীর মহাযাত্রার প্রাক্কালে ত্বরিত গতিতে অগ্রগামিনী হইয়া, 'সুবর্ণ লেক্টী' হস্তে স্বর্গের পথ আলো করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। আবার এ দিকে স্বয়ং বিধাতার বিধানে পৃথিবীতলে একই সমাধিগর্ভে তাঁহার শবদেহ পতিপার্শ্বশায়িনী হইয়া বহু যন্ত্রণার পর সুখ-বিশ্রামে চিরসমাহিত হইয়া রহিয়াছে। মধুসূদনের কথায় ;—

"Pent in each other's arms in balmy rest
In bliss without alloy—"

হেনরিয়েটার সমাধির পর সন্ধ্যার সময় আষাঢ়ের প্রাবৃট-

প্রকৃতি ঘনঘোর হইয়া উঠিল! আকাশ [illegible]! অবিরাম বৃষ্টির ধারা মেদিনী শীতল করিতে লাগিল! যেন মহা-জ্বালা-নির্ব্বাণের পর মহাশান্তি আসিয়া সতীকুলরাণীকে শান্ত তৃপ্তি দান করিল। সেই নিবিড় সান্ধ্য অন্ধকারে মধুসূদনের এক পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রবিষ্ট হইয়া, স্বীয় প্রভুকে তাঁহার পত্নীবিয়োগ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। মুমূর্ষু, আর্ত্ত মধুসূদন শুষ্ককণ্ঠে, রুদ্ধ-স্বরে কেবল বলিলেন, "জগদীশ! আমাদিগের দুইজনকেই একত্র সমাধিস্থ করিলেনা কেন? কিন্তু আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, আমি সত্বরই হেন্‌রিয়েটার অনুবর্ত্তী হইব।" এই শোক-সংঘাতেই মধুসূদনের জীর্ণ বক্ষ-পঞ্জর চূর্ণ হইয়া গেল! যিনি পৃথিবীতে সকল দুঃখেই হিমালয়ের ন্যায় অটল ছিলেন, পত্নীবিয়োগরূপ বজ্রাঘাতে তিনি একেবারে বালুকা-স্তূপের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন!

সেই নিশীথের ঘন অন্ধকারে, বিষাদক্লিষ্ট হৃদয়ে, ম্লান বদনে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, মধুসূদনের দুইজন বন্ধু ও শ্যামাধবকে সঙ্গে লইয়া আলিপুরের চিকিৎসালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্যামাধব বাবু বলিয়াছিলেন যে, "সেই রজনীর স্তব্ধ, গম্ভীর এবং শোকাবহ দৃশ্যাবলী তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন নাই। ঘোর অন্ধকারে ধরিত্রী সমাচ্ছন্না! চন্দ্রতারকাশূন্যা প্রকৃতির বিষাদ-বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি, ভয়ঙ্করী ভৈরবীর ন্যায় নিবিড় কুন্তল-জালে ব্রহ্মাণ্ড ছাইয়া ফেলিয়াছে। অন্ধকার দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া, চক্ষু ধাঁধিয়া বিদ্যুৎরশ্মি মুহুর্মুহু জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে—আবার ক্ষণে-ক্ষণে সুধীর ধারায় বারিবর্ষণ হইতেছে। মনোমোহন ঘোষ দেখিলেন—চারিদিক নীরব, গম্ভীর ও জনশূন্য; প্রখর বাতাসে চিকিৎসালয়ের কোন-কোন কক্ষের লণ্ঠনের ক্ষীণ বর্ত্তিকালোক নিবিয়া গিয়াছে; কোন-কোন কক্ষের ল্যাম্প স্তিমিত মৃদুরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। দুর্ব্বল আতুর এলায়িত দেহে সুপ্তির ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; কেহ বা শয্যোপরি শয়ন করিয়া আছেন; কাহাকেও মাতৃরূপিণী শুশ্রূষাকারিণী ঔষধ সেবন [illegible]ছেন; কাহাকেও বা ব্যজন করিতেছেন।—আবার কোন-কোন কক্ষে শোকাবহ মর্ম্মভেদী দৃশ্য! কেহ বা রোগ-যন্ত্রণায় থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছেন—কোন রোগীর অন্তিম অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আত্মজন নীরবে শোকাশ্রু মুছিতেছেন! কোন মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্মযাজক পাদরী তাঁহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইয়া স্বর্গের আশ্বাস দিতেছেন! মনোমোহন ঘোষ, দ্বিতলে উঠিয়া মধুসূদনের কক্ষাভিমুখে গমন করিতে-করিতে শ্যামাধবকে বলিলেন, "একজনকে ত সমাধিস্থ করিয়া আসিলাম; কে জানে আবার কখন আর একজনকে সমাধিভূমে লইয়া যাইতে হয়! কি ভয়ঙ্কর রাত্রি!"

তাঁহারা ধীরে-ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মধুসূদনের কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, মুমূর্ষু মধুসূদন মুদিত নেত্রে শয্যায় শায়িত হইয়া আছেন। জনৈক বালক-ভৃত্য তাঁহার শয্যাতলে বসিয়া ছিল! তাঁহাদের পদশব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মধুসূদন চক্ষু চাহিয়াই অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মনোমোহন, সকল ত ভদ্রোচিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে? কোনও ত্রুটি ত হয় নাই? কে কে, উপস্থিত ছিলেন? বিদ্যাসাগর, যতীন্দ্র, ও দিগম্বর উপস্থিত ছিলেন কি?" মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "সকলই নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে—কোন ত্রুটিই হয় নাই—বিদ্যাসাগর প্রভৃতিকে সংবাদ প্রেরণের সুযোগ হয় নাই।" এই কথা শুনিয়া মধুসূদন কিয়ৎকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন! পরে মনোমোহনকে বলিলেন, "তুমি ত সেক্সপিয়ার পড়িয়াছ,—সেই কয়টি পংক্তি কি তোমার স্মরণ হয়?" মনোমোহন ঘোষ বলিলেন, "কোন্ কয়টি পংক্তি?" মধুসূদন,—"লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যুতে ম্যাক্‌বেথ যাহা বলেন? আমার স্মৃতিলোপ হইয়া আসিতেছে, কোনও কথাই আর আমার স্মরণ হয় না।" এই বলিয়াই তিনি ম্যাক্‌বেথের নিয়োদ্ধৃত উক্তিগুলি সুস্পষ্টরূপে আবৃত্তি করিলেন;—

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time ;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out—brief
candle !
Life's but a walking shadow ; a poor player,
That struts and frets his hour upon the
stage,

And then is heard no more ; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."—

মৃতকল্প মধুসূদনের মুখে উক্ত প্রাণময় আবৃত্তি শুনিয়া মনোমোহন ঘোষ বিচলিত হইয়া বলিলেন, "এ সকল কথায় কাজ নাই, আপনি আরোগ্য লাভ করিবেন, চিন্তা নাই।" এই কথায় ঈষৎ হাসিয়া মধুসূদন বলিলেন, "ডাক্তার পামার অদ্য যখন আমার প্লীহা যকৃতের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে আসেন, তখন আমার নির্ব্বান্ধাতিশয্যে নিতান্ত অনিচ্ছায় জানাইয়াছেন যে, আর ২।৩ দিনের মধ্যেই আমাকে ইহজগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অতএব ভাবিয়া দেখ, আমার দিন, ঘণ্টা, মিনিট সীমাবদ্ধ। ("You see, Monu, my days are numbered, my hours are numbered, even my minutes are numbered.") এক্ষণে আমার এই শেষ অনুরোধ যে, তোমার অন্ন থাকিলে যেন আমার পুত্রদুটি তোমার পুত্রগণের সহিত অন্ন পায়। তুমি যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চিন্তমনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি।" ("If you have one bread, you must divide it between yourself and my children; if you say, you will, I depart with consolation.") প্রত্যুত্তরে মনোমোহন ঘোষ বলেন:—"Certainly,—I assure you, so long as my children have bread to eat, they shall divide it with yours."—অর্থাৎ 'আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আমার পুত্রগণ একমুষ্টি খাইতে পায়, তাহা হইলে তাহারা আপনার পুত্রদ্বয়কে না দিয়া কখনও খাইবে না।' এই কথায় পুলকপূর্ণ হইয়া, মনোমোহনের হস্ত ধারণ করিয়া মধুসূদন আবেগে বলিয়া উঠিলেন, "God bless you, my boy." তৎপরে তাঁহারা সাশ্রুনয়নে বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিলেন।

ক্রমেই মধুসূদনের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল। পত্নীবিয়োগের পর হইতেই তাঁহার পীড়াসমূহের আর উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। মধুসূদন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, এইবার পৃথিবীর সকল মোহবন্ধন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তমা দয়িতার অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহাকে আর এ পৃথিবীতে বাস করিতে হইবে না; তিনি এজন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে নীরবে শেষ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত মধুসূদনের বহুদিন হইতে বিশেষ বন্ধুতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। মধুসূদনের উত্তরপাড়ায় অবস্থিতিকালে চন্দ্রনাথ তাঁহাকে প্রায়ই দেখিতে যাইতেন। মধুসূদন যে কয়দিন জেনারেল হাসপাতালে ছিলেন, রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ প্রতিদিনই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। পূর্ব্বে মধুসূদনের সহিত চন্দ্রনাথের সাহিত্য ও নানা বিষয়ে আলাপ হইত; কিন্তু চিকিৎসালয়ে মধুসূদন তাঁহার সহিত কেবলই ধর্ম্মালাপ, ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত মহাকবির অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার চক্ষে স্বর্গের জ্যোতিঃ বিকশিত করিয়াছিল। সেই সময়ে তিনি আক্ষেপ করিয়া চন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, "চন্দ্রনাথ! জীবনে বহু সাধারণ-হিতকর সৎকার্য্য করিয়া যাইবার আমার অভিপ্রায় ছিল; সুযোগ-সুবিধা এবং শক্তি-সামর্থ্যও যথেষ্ট ছিল; কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বহু বিড়ম্বনার অধীন হইয়া আমার জীবনের বহু সঙ্কল্প অপূর্ণ রহিয়া গেল!" রেভারেণ্ড চন্দ্রনাথ মধুসূদনের অন্তিম সময়ে তাঁহাকে যথাসাধ্য শান্তি ও সান্ত্বনা দান করিয়াছিলেন।

এ স্থলে প্রসঙ্গতঃ মধুসূদনের ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহান্ বিশ্বের কবি হইয়া, বিশ্বকাব্য অধ্যয়নে ও আলোচনায় জীবন-যাপন করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন নানাদেশীয় ভাষা শিক্ষায় ও আইন অধ্যয়নে তাঁহার জীবনের বহুকাল ব্যয়িত হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত তিনি ইংরাজি, গ্রীক ও হিব্রুভাষায় বহু ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বাইবেল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। New Testament গ্রীক ভাষায় পাঠ করিয়াছিলেন! তিনি এত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। কোন খ্রীষ্টীয় লেখক লিখিয়াছেন, "মাইকেল মধুসূদনের আন্তরিক গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কি ছিল, তাঁহার আত্মিক উৎকণ্ঠা কি ছিল এবং কোথায় বা তাঁহার মন ও আত্মা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইয়াছিল, তাহা কেবল যিনি অন্তর্যামী, তিনিই জানিতেন, কোন মনুষ্য নহে।" বাস্তবিক মধুসূদনের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা,

বড়ই দুরূহ সমস্যা। তবে তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধিনী উক্তিসমূহ হইতে আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যতদূর বুঝিতে পারি, ধর্ম্মভাব অলক্ষ্যে তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের আকর্ষণ কবিতার দিকে এতই প্রবল ছিল যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অপর সমস্ত বিষয়ই তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কবিতাই সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ; তাঁহার এই বদ্ধমূল ধারণা কিছুতেই কম্পিত, বিচলিত বা দমিত হয় নাই। আদালতে মোকদ্দমা করিতে-করিতে তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বিচারকদিগের সম্মুখে সময়োপযোগী কবিতার আবৃত্তি করিতেন। এমন কি, একসময়ে কৃষ্ণনগরে গিয়া যখন কবিতা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ তত্রত্য গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি বিচলিত হইয়া বলেন, "ভগবৎ আরাধনার আহ্বান মহান্ বিশ্বে নিরন্তর হইতেছে—তাহার জন্য আবার ঘণ্টাধ্বনি কেন?" শতদলের নিম্নস্থ স্বচ্ছ বারির ন্যায়, মৃত্তিকা-প্রোথিত শুভ্র হীরকখণ্ডের ন্যায় যে ধর্ম্মরত্ন মধুসূদনের হৃদয়-গুহায় নিহিত ছিল, তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তাহা কি উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করিয়া স্বর্গের বার্ত্তা বহিয়া আনিয়াছিল!

মধুসূদনের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে মধুসূদনের হিন্দু ও ব্রাহ্ম চরিত-লেখকগণের প্রতিবাদ করিয়া সম্প্রতি "সম্মিলনী" নামক বঙ্গীয় খ্রীষ্টীয় সমাজ-সম্মিলনীর মাসিক পত্রিকায় "মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি খৃষ্টে অবিশ্বাসী ছিলেন?" নামক ধারাবাহিক বিপুল প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ নানা যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া মধুসূদনকে যথার্থ 'খ্রীষ্টবিশ্বাসী পুরুষ' প্রতিপন্ন করিয়াছেন! আমরাও মধুসূদনকে কখনও কোথাও অবিশ্বাসী বলি নাই; বরং খ্রীষ্টধর্ম্মে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল, এ কথা আমরা বলিয়াছি। শ্রদ্ধেয় ঘোষ মহাশয় বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া কবির ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ধারাবাহিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া মধুসূদনের হিন্দু ও ব্রাহ্ম চরিত-লেখকগণের বিপক্ষে নানা কথা বলিলেও, আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির নিমিত্ত উক্ত প্রবন্ধাবলী হইতে প্রসঙ্গতঃ কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম;—

"আমরা অনুসন্ধিৎসু হইয়া বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, তিনি (মাইকেল মধুসূদন) সর্ব্বদা গ্রীক্ ভাষায় New Testament পড়িতেন এবং গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, অনেক সময়ে নির্জ্জন স্থানে প্রবেশ করিয়া, পরামনে নিবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার উপাসনা কোন লোকের পরিলক্ষণের বিষয় ছিল না। তিনি মধ্যে মধ্যে সাধারণ খৃষ্টীয় ভজনালয়ে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান করিতেন।"

* * * *

"একদিকে তাঁহার আত্মীয় অনাত্মীয়দের আক্রোশ ও অত্যাচার এবং অপর দিকে তাঁহাদের প্রলোভক প্রসাদ বর্ষণের মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যটি হারান নাই। জগতে স্বজন-নিষ্কাসিত, বিতাড়িত ও নিঃসম্বলীকৃত হইয়াও, তিনি সেই পৌল-বর্ণিত আদর্শ বিশ্বাসীর ন্যায় খৃষ্টের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাসের এরূপ প্রগাঢ় ধৃতি দেখিয়া কে তাঁহাকে ন্যায্যতঃ খৃষ্টে অবিশ্বাসী বলিয়া অবগান করিতে পারে?"

* * * *

"যদি বা কখন খ্রীষ্টীয়ান মাইকেল মধুসূদনের ধর্ম্মজীবন * * অবিশ্বাসীর ন্যায় দেখাইয়াছিল, তাহা হইলে কি তাহা শেষ পর্য্যন্ত এরূপ ছিল? যখন আমরা জানি তাহা ছিল না, তখন তাহার দ্বারাই তাঁহায় ধর্ম্মজীবনের অনেকের অপেক্ষা আরও অনুসন্ধিৎসুতা, আরও জ্ঞানপিপাসুতা, আরও সজীবতা সপ্রমাণ করিয়াছিল। * * তিনি জীবনান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার বিশ্বাসী ছিলেন।"

* * * *

"মাইকেল মধুসূদনকে একটি সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও, অনেক বিপদ, অভাব ও কষ্টের মধ্য দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। এবং তিনি যে সেই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া আপনার অমূল্য ধর্ম্মকে হৃদয়ে অক্ষতভাবে ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা শ্লাঘ্য, এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি মনুষ্য স্বভাবজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদ্রেক না হইয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিক:—

"Earth cannot show so brave a sight,
As when a single soul doth fence
The batteries of alluring sense,
And heaven views it with delight."

"আমি এখানে মাইকেল মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্মে অটল বিশ্বাস সম্বন্ধে আর একটি নির্ব্যূঢ় প্রমাণ দিব। কয়েক দিবস হইল, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু ধরলাটের প্রবীন জমীদার বাবু কেদারনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। * * তিনি বলিলেন, 'অনেক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে মাইকেল মধুসূদনকে ভোজে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তিনি নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন; কিন্তু আহার করিবার পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় প্রথা অনুসারে প্রার্থনা করিয়া পরে ভোজনে প্রবৃত্ত হন। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, মাইকেল মধুসূদন যে, সম্পূর্ণ খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ছিলেন, ইহা আবার কে সন্দেহ করে? এ বিষয়ে ত তর্কের কিছুই নাই।'

"খৃষ্টিয়ানদের ভোজন করিবার পূর্ব্বে খাদ্যদাতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার বা grace উচ্চারণ করিবার প্রথা আছে, এবং সেই ধন্যবাদ খ্রীষ্টের নামে দেওয়া হয়। যিনি যাঁহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেন, তিনি তাঁহার প্রতি আপনার প্রসন্নতা দেখাইতে চান। তাই হিন্দু বাটীতে নিমন্ত্রকের প্রসন্নতার উপভোগী হইতে গিয়া, সেখানে খ্রীষ্টীয় প্রথা পালনে বা 'খৃষ্টিয়ানী' করায়, হিন্দু গৃহস্বামীর প্রীতিকর না হইবারই কথা। কিন্তু ইহা জানিয়াও যে, মাইকেল মধুসূদন grace পালনে বিরত হন নাই, তাহার দ্বারা তাঁহার পরীক্ষায় অবিচলিত খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যদি মনে অখৃষ্ট-বিশ্বাসী হইতেন, তাহা হইলে তিনি হিন্দু বাটীতে তাহা পালন না করিতেও পারিতেন। কিন্তু তিনি যখন সেখানে তাহার পালনে বিরত হন নাই, তখন তাঁহার আন্তরিক অদম্য খ্রীষ্টীয় ভাবতাই প্রকাশ পায়।

" * * পরন্তু যাহা জানা গিয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রকার ঘটনার সহিত বিচার করিলে, তাঁহাকে একটি খ্রীষ্টীয় বীরেরই ন্যায় অনুমিত হয়। তিনি যখন ভীষণ বিপদাপন্ন অবস্থার মধ্যেও তাঁহার ধন্য পরিত্রাতা খ্রীষ্টকে হারান নাই, তখন তাঁহাকে বরং অনেকের অপেক্ষা অধিক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী না ভাবিয়া, অন্য কি ভাবিতে পারি?

" * * আমি সত্যের মর্য্যাদার জন্য বলিতে চাহি যে, সমস্ত অনুধাবন পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার ন্যায় কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া কয়জন বিশ্বাসী অবশেষে বিজয়ী হইয়া নিক্রান্ত হইয়াছেন? তিনি তাঁহার প্রলোভন ও পরীক্ষা-ভূয়িষ্ঠ জীবনে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসী থাকিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি আমাদের প্রশংসার্হ ও তাঁহার জীবন আমাদের বিশ্বাস-প্রবর্দ্ধক। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ন্যায় weighed in the balance and not found wanting."

মধুসূদন জীবনে কখনও বাহ্যিক ধর্ম্মাড়ম্বর প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু তিনি যে একজন ধর্ম্মপ্রাণ পুরুষ ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। তাঁহার বিষাদান্ত জীবনের ধর্ম্মমহিমা-মণ্ডিত প্রোজ্জ্বল শেষ দৃশ্য ধর্ম্ম-জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। বীর কবির বীর হৃদয় মৃত্যুভয়ে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। যিনি যথার্থ জ্ঞানী ও ভক্ত - যিনি যথার্থ মনুষ্যত্বের সহিত জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি অন্তিমে তত্ত্বদর্শীর ন্যায় তনুত্যাগ করেন। কে বলে মধুসূদনের পরিণাম শোচনীয়? যে মহাপুরুষের নিকট পার্থিব ঐশ্বর্য্য পথের ধূলি অপেক্ষাও মূল্যবান্ ছিল না, সেই মধুসূদনের পরিণাম যেরূপ পুণ্যময়, তেজোময় ও গৌরবজনক হইতে পারে, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মধুসূদন যখন বুঝিলেন, তাঁহার আরোগ্যলাভের আশা জন্মের মত ফুরাইয়াছে, জীবন-সূর্য্য অস্তাচলে ঢলিয়া পড়িতে আর বিলম্ব নাই—সমগ্র জীবনব্যাপী দুঃখাভিনয়ের যবনিকা এইবার পড়িবে, তখন তিনি তাঁহার মহাপ্রস্থানের পথে নিত্যসম্বল লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে—আয়ুঃ-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্ব-ক্ষণে তিনি ধর্ম্ম-আরাধনার প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন এবং সত্বর ব্যবস্থা করিতে অণুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। হায়, এ রত্নখনিতে যে কত রত্নই নিহিত ছিল, কে তাহার নির্ণয়ে সমর্থ হইবে?

তাঁহার ভবযন্ত্রণা সমাপ্তির পূর্ব্বদিনে তিনি তাঁহার খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মপথের প্রথম বন্ধু—দীর্ঘ মান্দ্রাজ-প্রবাস সময়ে স্বদেশ প্রত্যাগমনের জন্য প্রথম সংবাদদাতা—প্রত্যাগতের বঙ্গদেশে প্রথম অভ্যর্থনাকারী রেভারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে

(Rev. Dr. K. M. Banerjea, C. I. E. LL. D.) তাঁহার নিকট আসিবার নিমিত্ত সংবাদ প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণমোহন তখন ১ নং বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে থাকিতেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্রেই তিনি জেনারেল হাসপাতালে উপস্থিত হইয়া মধুসূদনের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

মনুষ্য যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, সেই ধর্ম্মেই তাঁহার পরিত্রাণ ও মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। মধুসূদন যখন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় আচার-ব্যবহারে অনুরক্ত হইয়া জীবন-যাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার পক্ষে অন্তিমসময়ে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধান ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও প্রশস্ত। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া গভীর ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন; দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন, তিনি ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেন এবং তিনি নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিতেছেন।* মধুসূদন বলিয়াছিলেন, "আমি সেই দয়াময়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া মরিতেছি। তিনি যে পাপী-তাপীর উদ্ধারের জন্য, খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।"

'সম্মিলনী' নাম্নী খ্রীষ্টীয় মাসিক পত্রিকায় জ্ঞানেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—

"মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাইকেল মধুসূদনের খ্রীষ্ট প্রভুকে বিশ্বাস ও প্রত্যাশা কি দৃঢ় ও সুন্দর! তাহার দ্বারা যেন তাঁহার সমস্ত অন্তর্জীবনটি বহির্গত হইয়া তাহার স্বরূপ দেখাইয়াছিল। ঈদৃশ খ্রীষ্টপ্রাণ ভক্তকে কি অবিশ্বাসী আশীবিষে দংশন করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিতে পারে?" রেভারেণ্ড কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সময়োচিত প্রার্থনা করিলেন এবং ধর্ম্মযাজকের প্রাথানুযায়ী মধুসূদনকে ভগবানের আশীষ প্রদান করিলেন।

মধুসূদনের আর বাঁচিবার আশা নাই, এ কথা পূর্ব্ব হইতেই জনসমাজে প্রচারিত ও বিঘোষিত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার বিষয় লইয়া খ্রীষ্টীয় সমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বনের কিছুদিন পর হইতে তাঁহার সমগ্র জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তিনি 'চর্চ্চ অব ইংলণ্ডে'র অধীন ওল্ড মিশন চর্চ্চ ধর্ম্মমন্দিরে বাপ্তাইজ হন। এমন কি সে গির্জ্জারও সহিত তাঁহার কোন সংস্রব না থাকায়, অনেক খ্রীষ্টান ও পাদরী মহাশয়েরা তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক খ্রীষ্টান বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া মহা হুলুস্থুল বাধিয়াছিল, কয়েকটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজক—মধুসূদনের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিরূপে নিষ্পন্ন হইবে, ইহা ভাবিয়া ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের সহিত কথাপ্রসঙ্গে, এই সকল কথা উত্থাপিত হইলে, কৃষ্ণমোহন মধুসূদনকে বলিলেন, "তুমি জীবনে কোন গির্জ্জার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলে না। তোমার অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া যেরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তোমার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি তোমার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি লইয়া আসি।" ইহা শুনিয়া তেজস্বী মধুসূদন বলিলেন, "আমি মনুষ্য-নির্ম্মিত গির্জ্জার সংস্রব গ্রাহ্য করি না; আমার কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন নাই; আমি ঈশ্বরে বিশ্রাম করিতে যাইতেছি, তিনি আমাকে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগারে লুকাইয়া রাখিবেন! ('I am going to rest in my Lord! He will hide me in his best resting place!') আমাকে তোমরা যে কোন স্থানে প্রোথিত করিও—সে স্থান তোমার গৃহদ্বারের নিকটেই হউক, কিম্বা কোন তরুতলেই হউক। কেবল আমার এইমাত্র শেষ অনুরোধ রাখিবে, যেন আমার

* এ সম্বন্ধে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ৪ঠা তারিখের Bengal Christian Herald নামক খ্রীষ্টীয় পত্রিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম;—

"We have, above all, the consolation of being able to believe that his end was peace. During the last days of his illness, when all hope of recovery was past, he sent for a Christian friend (Rev. Dr. K. M. Banerjea.) to whom he had been affectionately attached, and we are thankful to learn, that in the course of the solemn conversation which ensued, he avowed with all the emphasis of a full assurance, "he believed in Christ" "he was going up to heaven."

Bengal Christian Herald,
Friday, 4th July, 1873.

দেহাস্থি বিড়ম্বিত না হয়! পৃথিবীতলে শ্যামশষ্পই যেন আমার সমাধি আচ্ছাদন করিয়া রাখে।"

যদিও এই প্রকার অচিন্তনীয় ও অশ্রুতপূর্ব্ব বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় বন্ধুগণের মধ্যস্থতায় তাৎকালিক লর্ড বিশপ রাইট রেভারেণ্ড রবার্ট মিলম্যান্, D. D. মহোদয় মধুস্থদনের প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্মানুমোদিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধির নিমিত্ত অনুমতি দিয়াছিলেন। এস্থলে প্রসঙ্গতঃ একটি কথার উল্লেখ করিতে হইল। যখন মধুস্থদনের সমাধির বিষয় লইয়া উপরিউক্ত আন্দোলন চলিতেছিল, তখন জনৈক ব্যাপটিষ্ট মিশনরী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি হওয়ায়, তাঁহাকে সে কার্য্য করিতে হয় নাই।

আমরা এ সম্বন্ধে ট্রিনিটি গির্জ্জার পাদরী মহাশয়ের লিখিত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

REMINISCENCES OF THE DEATH OF

MICHÆL MADHU SUDAN DATTA.

"Michæl Dutt's Christian friends differed from him because of his peculiar views of churchmanship. Michæl believed that there was no special spiritual benefit in joining any particular church: in his eyes all churches were the same and he thought he might attend divine worship wherever it pleased him. This alienation from the established practices of his mother-church was a cause of great embarrassment to his countrymen and Christian friends when he died. The Missionaries had, in consequence, no end of trouble in arranging for his last rites. While life was ebbing out of him, Michæl Dutt was informed by Revd. K. M. Banerjea and Revd. C. N. Banerjea of the difficulties that might arise in respect of his burial, to which Dutt replied by saying—"I care not for man-made churches nor for anybody's help. I am going to sleep in my Lord and He will hide me in His best resting place. Bury me wherever you like —at your door or under a tree; let none disturb my bones. Let green turf grow over my last resting place on earth." Permission, however, was easily accorded by the Right Revd. the Lord Bishop of Calcutta for a real Christian burial, through the intermediation of such estimable and pious gentlemen as Revd. K. M. Banerjea and others. And Michæl Dutt's bones did rest in its last resting place—finding an honoured corner in the Lower Circular Road Cemetery in the Church of England plot, followed thither by a concourse of gentlemen of different nationalities, of different faiths, and of different walks of life."

(Sd.) Revd. Joseph Prannath Biswas, B. A.,
Chaplain of Trinity Church, Calcutta.

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার, প্রাতঃকাল হইতেই তাঁহার জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। প্রাবৃটের নিবিড় মেঘচ্ছায়ার ন্যায় অকরুণ মৃত্যুর ভীষণ ছায়া ঘনাইয়া আসিল! মধুস্থদনের স্মৃতিশক্তি ও বাঙ্‌নিষ্পত্তির ক্ষমতা যখন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিতেছিল, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রৈলোক্যমোহন দত্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। মধুস্থদন ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলিলেন, "ত্রৈলোক্যমোহন! জীবনের কোন আশাই পূর্ণ হয় নাই, অনেক আক্ষেপ লইয়া মরিতেছি, এখন বলিবার শক্তি নাই। তুমি আর এক সময়ে আসিও, অনেক কথা বলিবার আছে, তোমায় বলিব।" কিন্তু আর বলিতে পারিলেন না; সেই কথাই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত শেষ কথা হইল। সেই দিনই—সেই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ জুন, রবিবার, বেলা দুইটার সময় জামাতা, পুত্র-কন্যা-শুশ্রূষাকারিণী-পরিবেষ্টিত শ্রীমধুস্থদনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল! তাঁহার অমর আত্মা জীর্ণ দেহাস্থিপঞ্জর পরিত্যাগ

পূর্ব্বক ঊর্দ্ধলোকে গমন করিল! মহানিদ্রায় অভিভূত হইয়া জ্বালাপীড়িত শ্রীমধুসূদন মর্ত্ত্যের মহাজ্বালা ভুলিয়া গেলেন! অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী দুঃখঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অলৌকিক জীবলীলার চিরাবসানে শ্রীমধুসূদন বিশ্রামদিবসে (রবিবারে) শান্তির সুগুপ্তনীড়ে চিরবিশ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তাবধি বাগ্‌দেবীর রক্তোৎপল চরণতলে মহাসাধনার অর্ঘ্যদান করিয়া ধরাধামে দীপ্ত যশের কল্পবৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক শ্রীমধুসূদন লোক্-লোচনের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

বঙ্গভাষার নির্জ্জীব জীর্ণকঙ্কালে ঐশী শক্তি সঞ্জীবিত করিতে এ প্রতিভা কোথা হইতে আসিয়াছিল? কোথা হইতে কোথায় আসিয়া বিদ্যুৎপ্রভা-ঝলসিত কুলিশ-নির্ঘোষের ন্যায় কোথায় মিশিয়া গেল! কাব্যগগনের প্রোজ্জ্বল বৃহস্পতি ছুটিতে-ছুটিতে, ঘুরিতে-ঘুরিতে, জ্বলিতে-জ্বলিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া কোন্ অলক্ষ্য দিগন্তকোণে ডুবিয়া গেল! যে জ্যোতিঃ নিবিল, তাহা আর জ্বলিল না। যে কবি—যে মনীষা—যে প্রতিভা চলিয়া গেলেন, তেমন আর কেহ আসিলেন না। সেই ব্যোমবিদারী ভেরীরব, সেই অপূর্ব্ব বীণাধ্বনি, সেই করুণ সঙ্গীত-ঝঙ্কার, সেই মধুর ব্রজগীতি, চিরনিস্তব্ধ হইয়া গেল! জ্ঞান ও বিদ্যার সহস্রমুখী তরঙ্গিনী দিগ্‌দেশপ্লাবিত করিয়া মৃত্যুনিদাঘের অগ্নিবর্ষণে শুকাইয়া গেল! আকাশের ন্যায় মহান্ হিয়া অসীম আকাশে ব্যাপ্ত ও বিলীন হইল! আর নিম্নে—বহুনিম্নে তাঁহার 'অনিন্দ্য-জ্যোতিঃ স্বর্ণতরু'বৎ শবদেহ মর্ত্ত্যধূলায় মিশাইয়া গেল! আর এদিকে কল্পান্ত-প্রসারিণী—মৃতসঞ্জীবনী মহাশক্তিময়ী কীর্ত্তি অলক্ষ্যে ভক্ত সন্তানকে অঙ্কে তুলিয়া অক্ষয়-স্মৃতি-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিল!

'বঙ্গের পঙ্কজরবি গেলা অস্তাচলে।'

"Bengala! thou proudest Lotus in the
Eastern main,
Thy Sun of glory has set, ne'er to rise
again!!!

কত দূর!

[শ্রীজলধর সেন]

(১)

আমাদের এম-এ পরীক্ষা যে দিন শেষ হইয়া গেল, তাহার পর দিনই বাড়ী গেলাম। আমাদের বাড়ী মেদিনীপুরে।

রাত্রি নয়টার সময় বাড়ীতে পৌঁছিয়াই প্রথমে বাবাকে দেখিলাম। তিনি বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—আমি যে তাঁহার এক মাত্র সন্তান! বাবাকে প্রণাম করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর ভাল আছে ত?" আমি বলিলাম, "ভালই আছি।"—মিথ্যা কথা! শরীর তখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন লিখ্‌লি?" আমি বলিলাম "ভালই লিখেছি!" "ফার্ষ্টক্লাস হবে ত!" "আমার ত খুব বিশ্বাস, হবে।" বাবা বড়ই আনন্দিত হইলেন; বলিলেন "যাও, বাড়ীর মধ্যে যাও।" নিকটেই দুই-চারিজন মক্কেল দাঁড়াইয়া ছিল; তাহারা বলিল "আপনারই ত ছেলে—পাশ আবার হবে না।" বাবা উকিল, এম-এ, বি এল; সুতরাং তাঁহার যখন ছেলে আমি, তখন, তাঁহার মক্কেলদিগের আইন অনুসারে আমি পৈত্রিক উপাধির উত্তরাধিকার পাইতে হক্‌দার! কেমন!

বাড়ীর মধ্যে যাইতেই মা, মাসীমা, রমা (মাসীমার বিধবা মেয়ে) প্রভৃতি আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। যাঁহারা প্রণাম পাইবার অধিকারী, তাঁহারা প্রণাম পাইলেন; আবার আমার ভাগ্যেও কয়েকটা প্রণাম জুটিল; কিন্তু সর্ব্বপ্রধান প্রণামটা তখনও মুলতবী রহিল। মা আমার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "আহা, বাছার আমার শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেছে—একেবারে চেনা যায় না গো!" মাসীমা বলিলেন, "ঐ ছাই পাশের জন্য কি এমন করে শরীর মাটী করতে হয়। আজও ত চারমাস হয় নি; তখন ত বেশ শরীর ছিল।

এই চার মাসে এমন হয়ে গেল!" রমা বলিল "এম-এ পরীক্ষা সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। বউদিদি সে দিন বল্‌ছিল, রাত-দিন না পড়লে কেউ ও-পরীক্ষায় পাশ দিতে পারে না। এত খাটুনীতে কি শরীর থাকে? পাশ—না—মানুষ-মারা কল!" আমি হাসিয়া বলিলাম, "রমা, ঠিক বলেছিস্—ও মানুষ-মারা কলই বটে। ও কলে পড়লে আর কিছুই থাকে না।" মাসীমা বলিলেন, "সে সব এখন থাক্, মহিন্দির! তুই কাপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে, ঠাণ্ডা হ; তার পর পাশ-ফাশের কথা হবে।" রমা বলিল "দাদা, তোমার ঘরে গিয়ে কাপড় পর গে।" আমি বলিলাম, "আমি আর সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে যেতে পারছিনে দিদি! তুই আমার এই কাপড়গুলো নে। দেখিস্, ঘড়িটা যেন পড়ে না যায়। মা, আমার এই ব্যাগটা ধর ত!" এই বলিয়া মায়ের হাতে আমার মনিব্যাগটা দিতেই, তিনি রমাকে বলিলেন, "রমা, এই ব্যাগটা নিয়ে বউমার কাছে দে গিয়ে। এতে বুঝি বেশী টাকাকড়ি আছে; ভাল ক'রে তুলে রাখ্‌তে বলিস্।" আমি বলিলাম "মা, এ ত আমার রোজগারের টাকা নয় যে, তার ব্যবস্থা করছো—এ যে বাবার দেওয়া টাকা। এতে তোমার আর আমার অধিকার!" মা হাসিয়া বলিলেন, "তোর সব তাতেই ঐ এক কথা। এখন থেকে সব জিনিস আগ্‌লে রাখতে না শেখালে কি হয়? আর তুই যে ছেলে!" আমি বলিলাম, "তোমার কোলেই ত এত বড় হয়েছি মা! বাকী কটা দিনও তুমিই আগ্‌লে রেখো।" "ষাট্, ষাট্, অমন কথা বলতে নেই মহিন্দির!" এই বলিয়া মা আমার গায়ে হাত দিয়াই বলিলেন, "তোর গা যে গরম বোধ হচ্চে রে! জ্বর হয়েছে না কি! দেখি, মাথাটা দেখি। দিদি! তুমি ত হাত দেখ্‌তে জান—ওর নাড়ীটা দেখ ত।" আমি বলিলাম "পাগল আর কি! জ্বর হতে যাবে কেন? গাড়ীতে এতটা পথ এসেছি, তাইতে হয় ত ও-রকম বোধ হচ্চে। তোমাদের আর ব্যস্ত হ'তে হবে না।" এই বলিয়া আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলাম; কারণ তখন যদি কেহ আমার শরীরের তাপ পরীক্ষা করিত, তা হইলে দেখিত যে, আমার তখন জ্বর ১০৩ ডিগ্রী।

আজ বলিয়া নহে—একমাস হইতেই আমার রোজ একটু-একটু জ্বর হইতেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ত আমার জ্বরের ধার ধারে না; পরীক্ষকেরাও আমার জ্বরের সংবাদ পাইলে দশ নম্বর বেশী দিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ম্মম চক্রের কঠিন পেষণে সব নিষ্পেষিত হইয়া যায়। আমার কি শুধু জ্বরই হয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্রের বিনিময়ে যাহা-যাহা দিতে হয়, সবই আমি ধীরে-ধীরে এই ছয় বৎসরে দিয়াছি; দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, হৃদ্‌স্পন্দন বাড়িয়াছে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইয়াছে, প্রতিদিন জ্বর হয়, দু'পা চলিতে হাঁফ ধরে। তবুও পরীক্ষা দিতেই হইবে—তবুও ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হইতেই হইবে! বাবার সাধ পূর্ণ করিতেই হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসরই এই প্রকারে অসংখ্য নিরীহ জীবের হত্যা-সাধন করিয়া থাকেন,—পশুক্লেশ-নিবারণী সভার সভ্যেরা এখানে দৃষ্টিহীন!

একটু পরেই বৃদ্ধ ভৃত্য নবীন-দা আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, বাড়ীর ভিতর যাও গো! মা ডাক্‌ছেন।" আমি বাড়ীর মধ্যে গেলে মা বলিলেন, "রাত্তিরে ত আর কিছু খেলিনে; এখন ওপরে যা'। একটু চা খেতে চেয়েছিলি, সে সব তোর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। যখন খেতে ইচ্ছে হবে, বৌমাকে বলিস্ তৈরী করে দেবে; আর না হয় আমাকে ডাকিস্। রাত হয়েছে, ঘরে যা।"

আমি উপরে আমার ঘরে গেলাম। একবার ইচ্ছা হইল, মোহিনীর না আসা পর্য্যন্ত একখানি চেয়ারে বসিয়া থাকি; কিন্তু শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছিল; বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। দশমিনিট পরেই মোহিনী ঘরে আসিল এবং তাড়াতাড়ি আমার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়াই বলিল, "তোমার পা যে বড় ঠাণ্ডা। দেখি।" বলিয়াই আমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "ওগো, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে! কখন জ্বর হয়েছে? খুব জ্বর যে! থারমমিটারটা আনি দেখি। মাকে ডাক্‌ব?"

আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? কিছু করতে হবে না। রেলে এসেছি জন্ত শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে; তাই অমন বোধ হচ্চে।" "না, না, সে কিছুতেই নয়। এ রেলে আসার গরম নয়। এ জ্বর! তুমি লুকোচ্চো কেন? রোজই বুঝি এমনি জ্বর হোতো? শরীর যে কি হয়ে গিয়েছে, দেখ দেখি! শরীর যখন খারাপ, বুঝলে, তখন এবার একজামিন না দিলেই পারতে; আস্‌ছে

বছরে মিলেই হোতো।” আমি বলিলাম “ও সব কিছু নয়। রোজ-রোজ সামান্য একটু জর হোতো। এখন বাড়ী এসেছি, সব সেরে যাবে।” মোহিনী আমার গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, “সেরে যাবে বই কি; তবে এতদিন যে কষ্ট পেলে। কা'ল থেকে নিয়মমত থাক, আর ওষুদ খাও। তা হলেই শরীর সুস্থ হবে। আমি বলি কি, দাদাকে চিঠি লিখে দিই। তিনি এসে ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবেন।” আমি বলিলাম, “কেন তাঁকে কষ্ট দেবে। এখানেও ত ভাল ডাক্তার আছে।” মোহিনী বলিল “না, না, তা হবে না। দাদার মত ডাক্তার ত আর এখানে নেই। তিনিই একবার এসে দেখে যান; তা' হলেই আমি নিশ্চিন্ত হব। তা' সে কথা যাক্। এসে অবধি ত জলটুকুও খাওনি; এখন একটু চা তৈরী ক'রে দিই। দুধ, চিনি, ষ্টোভ,—মা সব রেখে গেছেন; রুটী-মাখনও রেখে গেছেন। রুটী টোষ্ট করে দিই, আর একটু চা গরম করে তৈরী করে দিই। তাই খেয়ে ঘুমোও। রাত প্রায় দশটা বাজে।”

আমি বলিলাম, “ও সব কিছু কাজ নেই। শেষে হাত পুড়িয়ে ফেল, কি একটা অগ্নিকাণ্ড হোক্। তার চাইতে তুমি আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও, তা হলেই আমার শরীর জুড়িয়ে যাবে। টোষ্ট তুমি পেরে উঠ্‌বে না।”

মোহিনী বলিল, “সে কথা আর বল্‌তে হবে না। আমি বেশ রাঁধ্‌তে শিখেছি। আগে জান্‌তাম না তাই। শুন্‌বে তবে; সে দিন বাবা আটদশজন বাবুকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁরা ব'লে দিয়েছিলেন, বামুন-ঠাকুরের রান্না খাবেন না। মা রান্না করেছিলেন; আমি মাংস রেঁধেছিলাম —হ্যাঁ গো, আমি নিজে হাতে রেঁধেছিলাম। সবাই খেয়ে কি বলেছিলেন জান—এমন মাংস-রান্না তাঁরা কখন খাননি। বাবা বাড়ীর মধ্যে এসে মাকে বল্লেন 'ওগো, বৌমা রান্নায় এম-এ পাশ, এমন মাংস রান্না কেউ কখন খায়নি।' শুন্‌লে—একেবারে এম-এ পাশ—তোমার আগেই আমি পাশ হয়ে গেছি। কেমন মশাই, আর আমি কি না দুখানি টোষ্ট করতে হাত পুড়িয়ে ফেল্‌ব—লঙ্কাকাণ্ড করব।”

যাক্, এতক্ষণে মোহিনী স্ব-রূপে আসিয়াছে। সে দিন-রাত হাসি-তামাসা, আমোদ-আনন্দেই মত্ত। আজ প্রথম দর্শনে, আমার জ্বর দেখিয়াই সে যেন কেমন গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল; কেমন ধীরে ধীরে প্রবীণা গৃহিণীর মত কথা বলিতেছিল। এখন সে ভাব কাটিয়া গেল। আমি বলিলাম, “তা' হ'লে তোমার যা ইচ্ছা, তাই তৈরী কর।”

মোহিনী বলিল “পাঁচমিনিটের মধ্যে সব হয়ে যাবে। তার পর তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেব। কেমন? আর যদি ভয় হয়, তা হলে খানিকটা জল নিয়ে আমার কাছে বসে থাকবে এস, লঙ্কাকাণ্ডের মত দেখ্‌লেই অমনি জল ঢেলে দেবে।” বলিয়াই হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল—আমার যে জ্বর, তাহা ভুলিয়া গেল। আমার শরীরে কে যেন অমৃত ঢালিয়া দিল।

(২)

এতদিনের অত্যাচারে যে জ্বর হইয়াছে, তাহা কি শীঘ্র সারে? ডাক্তারের চেষ্টার ত্রুটী নাই। আমার কুটুম্বোত্তম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ঘোষ আসিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। কিন্তু শরীর আর সুস্থ হয় না। দুই দিন ভাল থাকি, আবার জ্বর আসে, আবার দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। বাবা, মা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ করিয়া কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কিছুতেই কিছু হয় না,—সেই একটু জ্বর আর ছাড়িতে চাহে না। তখন সকলেই বলিলেন, বায়ু-পরিবর্ত্তন ব্যতীত শরীর সুস্থ হইবে না—ঔষধে কোন কার্য্য করিবে না।

তখন নানা জনে নানা স্থানের কথা বলিলেন। কেহ বলিলেন দারজিলিং, কেহ বলিলেন মধুপুর, কেহ বলিলেন পুরী। এই ভাবে ভারতবর্ষে যেখানে যত স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, সকলগুলিরই নাম হইল। যিনি যেখানে যাইয়া ফল পাইয়াছেন, তিনি সেই স্থানেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এত পরামর্শের মধ্যে পড়িয়া বাবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এতদিনের মধ্যে কিন্তু কেহই আমার মত জিজ্ঞাসা করেন নাই—প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। রোগীর আবার মতামত কি? অবশেষে বাবা একদিন আমাকে বলিলেন, “আচ্ছা মহেন্দ্র, এক-এক জন ত এক-এক স্থানের কথা বলেন। তোমার কি ইচ্ছা বল ত।”

আমি বলিলাম, “কোন পাহাড় যায়গায় যেতে আমার ইচ্ছা করে।”

বাবা বলিলেন, "বেশ ত। তা' হলে দারজিলিং, কর্সিয়ং, শিলং—এই তিন যায়গার একস্থানে যাও না।"

আমি বলিলাম, "এ সব ত আমি পূর্ব্বেও দেখেছি। যদি যেতে হয়, তা হলে একটা নূতন স্থানে গেলে বেশ হয়।"

বাবা বলিলেন, "নূতন স্থান কোথায় বল ?"

আমি বলিলাম, "নাইনিতাল গেলে হয় না ?"

বাবা বলিলেন, "বেশ ত। নাইনিতালে আমার এক বন্ধু আছেন; তাঁকে চিঠি লিখে দিই। তিনি একটা বাসা ঠিক করে পত্র লিখ্‌লে সেখানেই যেয়ো। কিন্তু বড় দূর ব'লে হয় ত বাড়ীতে আপত্তি হতে পারে। তা, তোমার যখন নাইনিতালে যেতে ইচ্ছে হয়েছে, তখন সেখানে যাওয়াই ভাল। আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্চি।"

হঠাৎ নাইনিতালের কথা কেন বলিলাম, তাহা আমিই জানি না। বোধ হয় ঐ নামটা কেহই করেন নাই বলিয়াই আমার মনে আসিয়াছিল। সেই দিন রাত্রিতে মোহিনী ঘরে আসিয়া বলিল "তোমার না কি নাইনিতালে যাওয়া স্থির হোলো ;—কিন্তু সে যে অনেক দূর। সেখানে তোমার যাওয়া হবে না। একলা অত দূরে কি করে যাবে ?"

আমি বলিলাম, "একলা যাব কেন ? মা যাবেন, তুমি যাবে, আমি যাব।" মোহিনী বলিল, "সে হচ্চে না মশাই ! তোমাকে যে একলা যেতে হবে, সে কথা বুঝি শোননি ? দেখ, এই ডাক্তার-কব্‌রেজগুলোর কি বুদ্ধি ! আচ্ছা, তারা কি আমাদের জন্ম মনে করে ? শুনলাম, আমি তোমার সঙ্গে থাক্‌লে না কি তোমার অসুখ সারবে না। শুনেছ কথা ! সত্যি বল্‌ছি, কথাটা শুনে অবধি আমার এমন রাগ হয়েছে, যে, আমার ইচ্ছে করছে, সকলকে খুব দশ কথা শুনিয়ে দিই। আমার বুঝি কোন জ্ঞানই নেই। রাগও হয়, আবার এদের বুদ্ধির কথা ভেবে হাসিও পায়।" আমি বলিলাম "মোহিনী, রাগ কোরো না। দশজনের ব্যবহার দেখেই লোকে এ সব কথা বলে। সবাই কি আর তোমার মত।" মোহিনী বলিল, "বেশ কথা। তা হলে মাকে সেই কথা বুঝিয়ে বল্‌লেই ; তা' হলেই ত আমাদের তোমার সঙ্গে যাওয়া হয়। মা বল্‌ছিলেন যে, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তোমার সঙ্গে যাবেন।" আমি বলিলাম, "তাতে তোমার অমত নেই ত ?" মোহিনী বলিল, "সে কিছুতেই হবে না। তুমি রোগা শরীর নিয়ে কোন্ দূর-দেশে যাবে, আর আমি বাপের বাড়ী যাব। সে কখনো হবে না; সে কথা আমি বলে রাখছি। আমি তোমার সঙ্গে যাবই। মা বুড়ো মানুষ, তিনি কি তোমার সব কর্‌তে পার্‌বেন। তাঁকে মিছে কষ্ট দেওয়া হবে, অথচ তোমার কোন উপকারই হবে না।" আমি বলিলাম, "মাকে সব কথা বল না। তিনি শুনে যা হয় ঠিক করবেন।" মোহিনী বলিল, "ছি, আমি কি এ কথা মাকে বল্‌তে পারি ;—আমার যে লজ্জা করে,— তুমি মাকে বোলো।" "বাঃ, তোমার লজ্জা করে ; আর আমার লজ্জা করে না ! আমি কিছুতেই এ কথা মাকে বল্‌তে পারব না।" "তা, যাই বল ; আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি কিন্তু। আমাকে ফেলে যেতে পারবে না। কাছে হ'লেও বা কথা ছিল ; সে যে কত দূর।"

কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না ; আমার নাইনিতাল যাওয়ার সংবাদ পাইয়া আমার শ্বশুর মহাশয় মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার গমনের বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া বাবাকে বলিলেন, "যোগেন্দ্র বাবু, আপনি যা ব্যবস্থা করেছেন, তার চাইতে ভাল ব্যবস্থা মনে করে আমি এসেছি। নাইনিতাল অনেক দূরের পথ ; সেখানে আপনার স্ত্রীর না গেলেই ভাল হয়। অত দূরে স্ত্রীলোক সঙ্গে থাক্‌লে নানা অসুবিধা হ'তে পারে। পুরুষদের এক কথা,—আর স্ত্রীলোক সঙ্গে থাক্‌লে সর্ব্বদাই নানা চিন্তা, নানা ভাবনা। আমি বলি কি, মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনয় যাক্। তার প্র্যাক্‌টিসের ক্ষতি হবে বটে ; কিন্তু সে ডাক্তার ; সে যদি মহেন্দ্রের সঙ্গে থাকে, তা হ'লে আমরা নির্ভাবনায় থাক্‌ব। বিনয়ের এতে আপত্তি হবে না ; বিশেষ তার শরীরও আজকাল ভাল যাচ্ছে না। মাস দুই ঘুরে এলে তারও শরীর ভাল হবে। নাইনিতাল বেশ স্থান, খুব স্বাস্থ্যকর। আমি যখন কমিসেরিয়েটে ছিলাম, তখন দুই তিনবার নাইনিতালে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, আমি যা প্রস্তাব করছি, এতে আপনার স্ত্রীর অমত হবে না। তারপর মোহিনীর কথা। আস্‌বার সময় আমার স্ত্রী ব'লে দিয়েছিলেন যে, তাকে যদি আপনারা ছেড়ে দেন, তা হ'লে দিন কয়েকের জন্ম কলিকাতায় নিয়ে যাই। কিন্তু আমি ভেবে দেখ্‌লাম যে, মহেন্দ্র নাইনিতালে যাচ্ছে ; তারপর মোহিনীকেও যদি আমি কলিকাতায় নিয়ে যাই,

তা হ'লে মহেন্দ্রের মায়ের বড়ই মন খারাপ হবে। কাজ নেই মোহিনীর এখন কলিকাতায় গিয়ে। মহেন্দ্র সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক, তার পর মোহিনীকে আমি দিন-কয়েকের জন্য নিয়ে যাব। কি বলেন?"

আমার শ্বশুর মহাশয়ের কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন "এর চাইতে সুন্দর বন্দোবস্ত আর হ'তে পারে না। বিনয় যে তার কাজকর্ম্ম ফেলে যাবে, এ কথা আমি ভাবতেও পারি নি। তার কিন্তু ভারি ক্ষতি হবে।" আমার শ্বশুর বলিলেন "দেখুন যোগেন্দ্র বাবু, টাকা অনেক রোজগার করতে সে পারবে; কিন্তু স্বাস্থ্য-লাভ সকলের আগে। আর আপনি ত জানেন, মোহিনী আমার বড় আদরের মেয়ে— ঐ একটী বই ত নয়। বিনয় কি সতীশ ত মোহিনী বল্‌তে অজ্ঞান। তারপর আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পেয়েছি— মহেন্দ্রকে আমি বিনয় সতীশের চাইতে কম আপনার বলে ভাবিনে। আর এ প্রস্তাব কি আমি করেছি; বিনয়ই নিজে আমাকে বলেছে। দেখুন, দু' মাসে না হয় বিনয় দু'হাজার টাকাই ঘরে আন্‌ত; কিন্তু মহেন্দ্রের স্বাস্থ্য কি দুই হাজার টাকার চাইতে অনেক বেশী নয়? আর আপনার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে আমি যা দু' পয়সা করেছি, তাতে বিনয় সতীশের রোজগারের দিকে না চাইলেও চলে। যাক্ সে কথা। আপনার ত মত হোলো, এখন বেহান ঠাকরুণের মতটাও ত আমাকেই করতে হবে, না আপনিই পদপল্লবমুদারমের ভারটা নেবেন।" বাবা হাসিয়া বলিলেন "আপনার যখন ও-বিদ্যেটা অভ্যস্ত, তখন আমার গৃহিনীই বা সে গৌরবে বঞ্চিত হন কেন? আপনিই যান; তবে যদি শিরসি মণ্ডনের দরকার হয়, তা হলে আমাকে ডাক্‌বেন।" শ্বশুর মহাশয় বড় কম যান না। তিনি বলিলেন "মেদিনীপুরের উকিলদের কি ও-ব্যবসাটাও শিখে রাখ্‌তে হয়!"

একজন ব্যতীত আর কাহারও অমত হইল না; কিন্তু সে একজন ত মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না,— তাহার মতও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

সন্ধ্যার সময় মোহিনী আসিয়া আমার সম্মুখে একখানি চেয়ারে হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মুখে যেন কে কালী মাখাইয়া দিয়াছে। আমার ভয় হইল। আমি তাহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি হয়েছে মোহিনী! তোমার মুখ অমন মলিন কেন?" যে মোহিনী সর্ব্বদা হাসিয়া বেড়ায়, যার মুখ আমি কোন দিন বিষণ্ণ দেখি নাই, সেই মোহিনী আজ কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "আমাকে তোমরা নিয়ে যাবে না? আমাকে ফেলে তুমি চলে যাবে? জান, সে কত দূর! আমি তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই থাক্‌তে পারব না। এই ত তুমি এতদিন কলিকাতায় ছিলে, মধ্যে মধ্যে বাড়ী আস্‌তে; একজামিনের সময় পাঁচ-ছয় মাস ত মোটেই আস্‌তে না; তখন কি আমি তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যেতে চেয়েছি? কিন্তু এবার আমার মন কেমন করছে। শুধু মনে হচ্ছে আর হয় ত দেখা হবে না। এমন ত কখন হয় না! ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চল—নিয়ে চল।"

আমি বলিলাম "সে কি করে হবে মোহিনী। তুমি অত ভাবছ কেন? এই মাসখানেক পরেই আমি ফিরে আসব। আর আমার অসুখও এমন কঠিন নয় যে আমি—"

আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া মোহিনী বলিল "অমন কথা বোলো না! আমি কি তাই বল্‌ছি। তা তুমি যাই বল, আমি যাবই—তোমরা না নিয়ে গেলেও আমি যাব।" এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে কত বুঝাইলাম, কত উপদেশ দিলাম, কত আদর করিলাম; কিন্তু তাহার সেই এক কথা, "তোমরা আমাকে না নিয়ে গেলে,—কিন্তু আমি যাবই।" হায়, তখন কি সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলাম! যখন বুঝিলাম, তখন সে কত দূর!

(৩)

আমরা নাইনিতালে আসিয়াছি। সঙ্গে আসিয়াছেন আমার কুটুম্বোত্তম ডাক্তার বিনয় বাবু, আমাদের পুরাতন ভৃত্য নবীনদা, আর একটি রাঁধুনী ব্রাহ্মণ। এখানেও একজন চাকর নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমরা যে বাংলোয় আছি, তাহা সহরের বাহিরে, অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। বাংলোর সম্মুখে যে সামান্য জমিটুকু আছে, তাহাতে বাগান। সে বাগান একেবারে ফুলে ভরা। প্রকৃতির এমন শোভা, পর্ব্বতের এমন দৃশ্য আমি পূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই; কিন্তু কিছুতেই আমাকে যেন আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। আমার কিছুই ভাল লাগে না।—দিন-রাত শুধু

মোহিনীর মলিন মুখ মনে হয়;—সে যে কেমন করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে হতাশভাবে আমাকে বিদায় দিয়াছিল, তাহাই আমার মনে হইত। বিনয় বাবু বেশ আছেন। যতক্ষণ বাসায় থাকেন, শুধু আমার উপর বক্তৃতা, আর ঔষধ খাওয়ান, আহারের ব্যবস্থা করা, আমাকে চোখে-চোখে রাখা। আমি বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিলে একেবারে পর্ব্বতটা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করেন। তাঁহার জ্বালায় পড়াশুনা করিবার যো নাই, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবারও উপায় নাই। তিনি যখন বেড়াইতে যান, তখন আমাকে সঙ্গে নিতে চান না; কারণ, তিনি ত আর আধ মাইল বেড়াইবেন না—তিনি একটানে পাঁচ-সাত মাইল ঘুরিয়া তবে বাংলোয় ফিরেন। বাহির হইবার সময়ে, দশ মিনিট ধরিয়া, তাঁহার অনুপস্থিতির সময়ে আমাকে কি-কি করিতে হইবে, কোন্ জামাটা গায়ে দিতে হইবে, কোন্ মোজাটা পরিতে হইবে, কোন্ গাছটা পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাইতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যান; এবং নবীন-দাকে বলিয়া যান, "নবীন-দা, দেখো, আমি যা-যা বলে গেলাম, ও ষ্টুপিড যেন ঠিক তাই করে।" আমি হাসি, আর নীরবে এই স্নেহের অত্যাচার সহ্য করি। এতে যে আনন্দ বোধ হয়—এর মধ্যে যে কি মমতা মিশ্রিত, তা' আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। এত স্নেহ, এত আদর সহিবে কেন? বাড়ীর পত্র সপ্তাহে দুইখানি করিয়া ত আসেই, মাঝে-মাঝে তিনচারিখানিও আসে। কলিকাতা হইতেও সর্ব্বদা পত্র আসে। মোহিনী, বলিতে গেলে, প্রায় প্রত্যহই পত্র লেখে; আর সে সকল পত্রে শুধু ভগবানের কাছে আমার শীঘ্র বাড়ী ফিরিবার প্রার্থনা। এখানে আসিবার কথা কোন পত্রেই থাকে না। আমিও তাহার পত্র পাইলেই উত্তর দিই। এমনই ভাবে প্রায় কুড়ি দিন চলিয়া গেল। আমি এখন যে দুর্দ্দিনের কথা বলিব, সে দিন শনিবার। সন্ধ্যা হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বিনয় বাবু আর সে দিন বেড়াইতে যান নাই। আটটার মধ্যেই আহার শেষ করিয়া আমরা শয়নের আয়োজন করিলাম। বিনয় বাবুর কি সুন্দর নিদ্রা! বিছানায় পড়িবামাত্রই তিনি নিদ্রাগত হন; আর সে কি যেমন-তেমন নিদ্রা—ঘরের মধ্যে বজ্রপতনেও বোধ হয় তাঁহার গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গে না। ইহাতে আমার একটু সুবিধা হইয়াছিল। তিনি নিদ্রিত হইলে আমি ধীরে-ধীরে উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া এক-এক দিন পড়িতে বসিতাম। শনিবারেও তেমনি পড়িতে বসিয়াছি। ঘরের এক কোণে একখানি চারপাইর উপর লেপে আপাদমস্তক ঢাকিয়া বিনয় বাবু নিদ্রা দিতেছেন। সে দিন আর আমার পড়ায় মন লাগিতেছিল না। বাহিরে তখন ঝড় উঠিয়াছিল,—সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি। আমি একবার দুয়ার একটু খুলিয়া দেখিলাম, কি ভয়ানক অন্ধকার, আর কি বাতাসের গর্জ্জন! গাছ-পালা যেন মহাতাণ্ডবে অধীর! আমার কেমন ভয় করিতে লাগিল; দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলাম। শয়ন করিতেও ইচ্ছা হইল না, পড়িতেও মন লাগে না। কি করি, বসিয়া-বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, আর বাহিরের ক্রুদ্ধ বাতাসের 'হায় হায়' শব্দ শুনিতে লাগিলাম। টং-টং করিয়া দেওয়াল-সংলগ্ন ঘড়িতে এগারটা বাজিল। আমার মনে হইল, কে যেন দুয়ার ঠেলিতেছে। দুয়ার ত ভিতর হইতে বন্ধ। ভাবিলাম, বাতাসের বেগে দুয়ার কাঁপিতেছে। ঘরের মধ্যে আমার চেয়ারের পার্শ্বে টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলিতেছিল। সহসা কেমন করিয়া বলিতে পারি না, দুয়ার খুলিয়া গেল। এবং তাহার পর—তাহার পর যাহা দেখিলাম, তাহা কেমন করিয়া বলিব—কেমন করিয়া সে দৃশ্যের কথা লিখিব? দেখিলাম—দেখিলাম, একটা জ্যোতিঃ যেন দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত;—একটা জ্যোতিঃমাত্র। আমি সে দিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না; তাহার পর—ওগো তোমরা শোন—তাহার পর সেই জ্যোতিঃর মধ্য হইতে একটি মূর্ত্তি যেন অবয়ব গ্রহণ করিতে লাগিল। রমণী মূর্ত্তি—যুবতী মূর্ত্তি। হরি হরি—এ যে মোহিনী!—জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে মোহিনী—মোহিনী মূর্ত্তিতে নয়। মুখখানি বড়ই মলিন। আমার সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল,—তখনও দৃষ্টি সেই মূর্ত্তির দিকে নিবদ্ধ! সহসা সেই মুখে হাসি দেখা দিল! এ যে আমার সেই চিরপরিচিত হাসি! মোহিনী হাসিয়া বলিল, "আমি এসেছি—এই ত কত দূর!" আমি ঠিক শুনিতে পাইলাম,—সেই কণ্ঠস্বর! তাহার পরই জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইয়া গেল; আমার সংজ্ঞা বুঝি ফিরিয়া আসিল। আমি "মোহিনী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তার পর কি হইল—জানি না।

যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন বেলা দশটা; বিনয় বাবু ও একজন সাহেব আমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আমি চক্ষু চাহিতেই বিনয় বাবু বলিলেন, "মহেন্দ্র, ভাই আমার, এখন কেমন বোধ হচ্চে?" আমি অতি ধীর স্বরে বলিলাম, "ভাল।" সেইদিন অপরাহ্নকালে একটু সুস্থ হইয়া শুনিলাম, আমি না কি কি বলিয়া চীৎকার করিয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। বিনয় বাবু অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না। কি বলিব? সেই জ্যোতিঃ! সেই মূর্ত্তি! আরও দুই দিন গেল। আমি একটু সুস্থ হইলাম। কিন্তু সেই জ্যোতিঃ—সেই মূর্ত্তি! তৃতীয় দিনে বিনয় বাবুর একখানি পত্র আসিল; আমার কোন পত্র নাই। আমিই বিনয় বাবুকে তাঁহার পত্রখানি দিলাম। পত্রখানির দিকে একবার চাহিয়াই বিনয় বাবু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "কি বিনয় বাবু, কি হয়েছে?" বিনয় বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন "ওরে মহেন্দ্র, ওরে ভাই, মোহিনী আর নেই রে ভাই! শনিবার রাত্রি এগারটার সময় মোহিনী আমাদের ছেড়ে গেছে ভাই!" বিনয় বাবু আর বলিতে পারিলেন না। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কাঁদিব কেমন করিয়া—আমার যে গলা শুকাইয়া গেল! কথা বলিব কি? শনিবার রাত্রি এগারটা! তবে ত ঠিক তাই! মোহিনী তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে—সে ত আসিয়াছিল!—সে ত বলিয়াছিল, 'আমি এসেছি—এই ত কত দূর!' দূর ত বেশী ছিল না মোহিনী—কিন্তু আজ কত দূর!

বীণার তান

হিন্দী

১। **সরস্বতী**, মে ১৯১৭

"সাক্‌চী মেঁ লোহে কি কারখানা"—লেখক জোখু পাণ্ডের। ভারতীয় ধনিগণের দৃষ্টি আজকাল শিল্প ও কলাকৌশলের উপর পতিত হইতেছে—ইহা এ দেশের পক্ষে অত্যন্ত আশাপ্রদ লক্ষণ। ইঁহারা এখন বুঝিয়াছেন যে, বাড়ী বসিয়া থাকিয়া, টাকা ধার দিয়া সুদ আদায় করিলেই অর্থোপার্জ্জন হয় না, কিংবা জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। নিজের প্রয়োজনগুলি যতদিন ভারত নিজে সম্পূর্ণ করিতে না পারিবে, ততদিন এ দেশের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে না। দেশভক্ত শ্রীযুক্ত জে, এন, তাতা-স্থাপিত লৌহের কারখানা এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিতেছে।

সাক্‌চী অত্যন্ত নূতন স্থান। অল্প দিন হইল এখানে চাষ-আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে হিংস্রপশু-বহুল ঘন জঙ্গল ছিল।

জল ও কয়লা এখানে খুব সুবিধায় ও সহজে পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যান্তর্গত গুরুমাসানী হইতে লৌহ এস্থানে আনীত হয়। কারখানায় ১৪।১৫ হাজার লোক প্রতিদিন কাজ করে।

সাক্‌চীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিবার জিনিস। স্থানটি চারিদিকে পাহাড়ে বেষ্টিত। পশ্চিম দিকে খোলখাই নামক নদী—বর্ষাকালে ঘোর-গর্জনে প্রলয়কালের মত বহিয়া যায়; অন্য ঋতুতে শুধু বালুকা পড়িয়া থাকে।

নদীর পশ্চিম পাড়ে সুবৃহৎ শালবৃক্ষশ্রেণীপূর্ণ ঘন জঙ্গল। এখানে বাঘ, ভালুক, হরিণ ও নানাবিধ সর্প দেখা যায়। অস্ত্র-আইনের বাঁধাবাঁধির জন্য প্রতি বৎসর অনেক নিরীহ মনুষ্যকে হিংস্র জন্তুর হস্তে অকালে প্রাণ হারাইতে হয়। নদীর ধারে একটি Pump-house আছে—বিদ্যুৎ-শক্তি দ্বারা জল উত্তোলিত হইয়া লোহার নলের সাহায্যে কারখানায় আনীত হয়। সেখান হইতে জল ফিল্টার করিয়া সহরে সরবরাহ করা হয়।

কারখানার দক্ষিণে দেড় মাইল দূরে রেলের রাস্তা। রেলের লাইন পার হইয়া জুগসলাই নামক বাজার পাওয়া যায়। এখানে মাড়ওয়ারী ও অন্যান্য লোক বাটী নির্ম্মাণ করিতেছে।

অগ্নিকোণে কালীমাটী রেল-ষ্টেসন। সাক্‌চী যাইতে হইলে এইখানে নামিতে হয়। ষ্টেসন কারখানা হইতে প্রায় দুই মাইল। ষ্টেসনে টঙ্গা, ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। কোম্পানীর মোটর সার্ভিসও আছে।

এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত উত্তম। প্লেগ, কলেরা ও ম্যালেরিয়ার নামগন্ধও এখানে নাই। শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটিমাত্র ঋতুই এদেশে টের পাওয়া যায়। এই তিন ঋতুই বেশ প্রচণ্ড আকারে নিজ-নিজ অস্তিত্ব জানাইয়া দিয়া যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অত্যন্ত ঝড় হয়। বর্ষাকালে কখন-কখনও তুষার-বৃষ্টিও হয়।

এখানে স্বাস্থ্য-বিভাগের (Sanitary Departmentএর) উত্তম

বন্দোবস্ত আছে। এরূপ ব্যবস্থা বাংলা-বিহারের খুব কম স্থানেই আছে।

রাস্তাগুলির দুই পাশে সমান দূরে সারি-সারি আম, জাম, এবং নিমের গাছ। শৌচকার্য্যের স্থানগুলি প্রত্যহ দুইবার করিয়া পরিষ্কার করা হয় এবং ফিনাইল দিয়া দুর্গন্ধ নাশ করা হয়। স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী এবং চিফ মেডিকাল অফিসার হইতেছেন শ্রীযুক্ত শান্তিরাম চক্রবর্ত্তী। ইনি সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রায় সাহেব' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। স্থানীয় লোকগণ ইঁহার নামে একটি স্কলারশিপ ফণ্ড খুলিয়াছেন। এই ফণ্ড হইতে তিনটি ছাত্রকে এক বছর করিয়া বৃত্তি দেওয়া হয়। সহরে একটি সুবৃহৎ হাসপাতাল আছে। শীঘ্রই আর একটি নূতন হাসপাতাল খোলা হইবে।

লৌহ কোম্পানী নিজ কর্ম্মচারীদের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল খুলিয়াছেন। তাতা কোম্পানীর Consulting Engineer পেরিণ সাহেবের পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থ এই মধ্য-ইংরাজী স্কুলটী স্থাপিত হয়। ইহার নাম Mrs. Perin Memorial School। হিন্দী ও বাংলায় ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়ান হয়। আশা আছে, দু'এক বৎসরের মধ্যে স্কুলটী হাই স্কুলে পরিণত হইবে।

এই স্কুলের একটী শাখা নৈশ-বিদ্যালয় আছে। যে সকল বালক দিনের বেলা কারখানায় কাজ করে, তাহাদের শিক্ষার জন্য রাত্রিতে ক্লাস করা হয়। এই ক্লাসে শুধু ইংরাজী ও গণিত শেখান হয়।

একটী Mechanics Schoolও এখানে আছে। এখানে ঔদ্যোগিক শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা ইংরাজীতেই হয়—কারণ শিক্ষক মহাশয় দেশীয় ভাষা জানেন না।

আনন্দের বিষয় এই যে, এই স্কুলগুলিতে অস্পৃশ্য জাতির বালকগণও শিক্ষা লাভ করিতে পারে। শিক্ষকগণও কোনও আপত্তি করেন না। হেডমাষ্টার একজন বিহারী গ্রাজুয়েট।

শীঘ্রই এখানে একটী European School এবং বালিকা বিদ্যালয় (Girls School for Indians) খোলা হইবে।

সর্ব্বসাধারণের জন্য কয়েকটী ক্লাব এখানে আছে। সাকচী ড্রামাটিক ক্লাব, টীস্কো-শিবপুর কলেজ ইউনিয়ন, সরস্বতী সম্মিলনী ও মহারাষ্ট্র-মণ্ডল। প্রথম তিনটী বাঙ্গালীদের; তৈলঙ্গী ও মান্দ্রাজীগণেরও নিজ-নিজ সমিতি আছে। ড্রামাটিক ক্লাবের পাকাবাড়ী হইতেছে। বাঙ্গালীদের দুইটী দল আছে; একটী শান্তিপুরীদের এবং দ্বিতীয়টী অন্য জেলাবাসীদের।

কার্য্যালয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীযুক্ত টী, ডব্লিউ টট্‌হইলার। ভারতবাসীদের প্রতি ইঁহার উদারতার কথা সংবাদপত্র-পাঠকদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। Industrial Commissionএর সম্মুখে ইঁহার সাক্ষ্য ভারতবাসীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল।

এখানে একটী গবর্ণমেণ্টের প্রয়োগশালা বা Laboratory আছে। এই প্রয়োগশালায় কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যগুলি বাচাই করা হয়।

কার্য্যালয়ে রেল, বীম, ফিশ্‌প্লেট, স্লিপার, ব্যাজ্‌লবার, ইস্পাত, পিগ আয়রণ (Pig iron) coal-tar এবং Sulphate of Ammonia প্রস্তুত হয়। সাড়ে তিনকোটী টাকা মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। এখন মূলধন বৃদ্ধি করার কথা হইতেছে। প্রায় দেড় বর্গমাইল স্থানের উপর কারখানা-ঘর নির্ম্মিত। গত বৎসর কারখানার লাভ ছিল ৬৮ লক্ষ টাকা।

২। মর্য্যাদা, জুন ১৯১৭

"ব্রহ্মদেশ কী বৈবাহিক রীতি।"—লেখক শ্রীগোপালরামজী। পাশ্চাত্য দেশের মত ব্রহ্মদেশে বরকন্যা পরস্পর পরিচিত হইয়া উভয়ের ইচ্ছা অনুসারে বিবাহ করে। পিতামাতার নির্ব্বাচনের উপর বিবাহ নির্ভর করে না।

যুবক-যুবতীর পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইলে, উপহারের আদান-প্রদান আরম্ভ হয়। ইহাতে পিতামাতা বা অন্য কোনও আত্মীয় আপত্তি করিতে পারে না। যদি পিতামাতার অমত থাকে, তাহা হইলে কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া প্রণয়ীর সঙ্গে চলিয়া গিয়া কিছুদিন অন্যস্থানে যাপন করে। শেষে পিতামাতার ক্রোধের শান্তি হইলে, আবার বাড়ী ফিরিয়া আসে। এইরূপেই অধিক সংখ্যক বিবাহ এদেশে নির্ব্বাচিত হয়। তবে পিতামাতার নির্ব্বাচন যে কোথাও সম্মানিত হয় না, তাহাও নহে।

বিবাহের পর বর শ্বশুরবাড়ীতে ঐ পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করে। ঘরজামাই থাকাই এই দেশের প্রথা। যদি কোন মাতৃপিতৃভক্ত পুরুষ লুকাইয়া পিতামাতার খবর লয়, তবে সে কথা তাহার স্ত্রী বা শাশুড়ীর কর্ণগোচর হইলে, তাহাকে সেজন্য যথেষ্ট গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। বিবাহের পর মাতাপিতার সহিত পুত্রের সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়।

আমাদের দেশে পুত্রের কাজ ব্রহ্মদেশে কন্যা দ্বারা সম্পাদিত হয়। এইজন্য এদেশে লোকে কন্যার আকাঙ্ক্ষা করে। যাহার কন্যা যত বেশী, তাহার সুবিধা তত অধিক। যে ব্যক্তির কন্যা হয় না, সে বৃদ্ধাবস্থায় দুঃখ পাইবার বিভীষিকা দেখিয়া আধমরা হইয়া থাকে। বাহিরের কার্য্য এদেশে মেয়েরাই করে। ব্রহ্মদেশে পুরুষগণ অত্যন্ত আলস্যপরায়ণ হয়। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে তাহারা কাজ করিতে চায় না। বিবাহের সময় পুরুষ প্রথমে দেখিয়া লয়,—বিবাহ করিলে ঘরে বসিয়া থাকিলে চলিবে কি না। পরিশ্রমবিমুখ ও অলস কন্যার বিবাহ হওয়া কঠিন।

এদেশে বিবাহ-বন্ধন অস্থায়ী। যখন ইচ্ছা স্বামী-স্ত্রী আলাদা হইয়া যাইতে পারে। এখানকার সমাজ ও রাজনীতি অনুসারে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে স্বামী-স্ত্রী দুইজনেরই সমান অধিকার। সন্তানাদি হইলে, পুত্রগণের উপর পিতার এবং কন্যাগণের উপর মাতার দাবী জন্মিয়া থাকে। গ্রামের পঞ্চায়েৎ বা মণ্ডলের মত হইলেই বিবাহ-বিচ্ছেদ পাকা বলিয়া বিবেচিত হয়। উচিত বা সঙ্গত কারণ না দেখাইতে পারিলে, জরিমানা দিয়া পৃথক হইতে হয়।

৩। চিত্রময় জগৎ, এপ্রিল ১৯১৭।

"মাতৃভাষা দ্বারা মাধ্যমিক শিক্ষা দেনে কা আবশ্যকতা"—লেখক

শ্রীরামচন্দ্র রঘুনাথ সর্বটে। শিক্ষা-প্রণালী তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে,—উচ্চ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক। ইহার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাই শুধু দেশীয় ভাষায় দেওয়া হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ইংরাজীতে দেওয়া হয়।

এ প্রবন্ধে আমরা উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতেছি না, কারণ মাতৃভাষা দ্বারা উচ্চ শিক্ষা দেওয়া আমাদের দেশে একরূপ অসম্ভব। নানা কারণে দেশে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা ইংরাজী ভাষার দ্বারা দিলে কি দোষ, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

(১) বিদ্যার্থীর শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপব্যয় হয়। যে বিষয়টি বালক মাতৃভাষায় শিক্ষা করিলে অল্প সময়ে হইত ও অধিক শিখিতে পারিত, সেই বিষয়টী অল্পবয়স্ক ও ভাষানভিজ্ঞ বালককে শিখিতে হইলে সময় বেশী লাগে, ও তাহার মানসিক পরিশ্রম অধিক হয়; এবং মানসিক পরিশ্রম অধিক হওয়ায়, তাহার মন ও শরীর শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে যে সকল ছাত্র লেখাপড়ায় ভাল হয়, তাহারা ক্রীড়া ও ব্যায়ামে যোগ দেয় না। ইহা দেশের জলবায়ুর দোষ নহে—শিক্ষাপ্রণালীর দোষ। বালকগণের মস্তিষ্ক অধিক চালিত হওয়ায় তাহারা শ্রান্ত হইয়া পড়ে ও ক্রীড়া বা ব্যায়ামে যোগ দিবার তাহাদের উৎসাহ থাকে না। (২) সময়ের অপব্যয় হয়। (৩) কোনও বিষয়ের মর্ম্ম অবগত না হইয়া শুধু মুখস্থ করায় শাব্দিক জ্ঞানই হয়। (৪) কোনও বিষয়ে স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া ঐ বিষয় সম্বন্ধে নূতন কোনও আবিষ্কার অসম্ভব হইয়া পড়ে। (৫) মিশ্রভাষা বলিবার অভ্যাস হইয়া পড়ে। (৬) মাতৃভাষা অপেক্ষা ইংরাজী ভাষার শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে।

৪। **জৈনহিতৈষী**, মার্চ্চ ও এপ্রিল ১৯১৭। "বিবিধ-প্রসঙ্গ"—সম্পাদক।

(১) "বরদা রাজ্যকা সুধার সম্বন্ধী কানুন।"—শুধু শিক্ষাপ্রচারে নহে, সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধেও বরদা রাজ্য উন্নতি করিতেছে। এ বিষয়ে বরদা আদর্শ রাজ্য। সামাজিক বাধাগুলি মানুষের পথ হইতে অপসৃত না হইলে, শুধু শিক্ষা-প্রচার দ্বারা সমুচিত লাভ পাওয়া যায় না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এই আইন পাশ হয় যে, ১২ বৎসরের কম বয়সের কন্যার বিবাহ হইবে না। ফলে দু-একটী নীচ জাতি ব্যতীত কোনও জাতির মধ্যেই ১২ বৎসরের কম বয়সে মেয়ের বিবাহ হয় না। সম্প্রতি একটী নূতন সমাজ-সংশোধক আইনের পাণ্ডুলিপি রচিত হইয়াছে।

যে সমাজে বা জাতির মধ্যে বাস করিতে হয়, ঐ সমাজের উচিত এবং অনুচিত আজ্ঞা ও বিধি মানিয়া চলিতে হয়। যদি কোনও ব্যক্তি সমাজের অনুচিত বিধিগুলি অমান্য করিয়া নিজের সিদ্ধান্তমত কাজ করে, সে ব্যক্তি জাতিচ্যুত হয়। ফলে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদিগকেও সমাজের অন্যায় রীতিগুলির নিকট মস্তক হেঁট করিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু ইহাতে মনুষ্যত্বের স্বাধীন আত্মবিকাশ সম্ভবে না। বরদার নূতন আইন জাতি ও সমাজের এই দাবী উঠাইয়া দিবে। যদি কোনও ব্যক্তি কোনও সামাজিক বিধির সত্তা আমূলে উচ্ছেদ করিতে চাহে বা হ্রাস করিতে চাহে, তবে তাহাকে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে আবেদন করিতে হইবে যে, অমুক বিধি পালন আর আবশ্যক নয়, কিংবা ইহাতে অমুক-অমুক পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

যদি ব্যবস্থাপক সভা অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারেন যে, উক্ত প্রথা বা রীতি সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, অথবা জাতির অন্তর্গত বিবাহ বিষয়ে অনাবশ্যক বাধা প্রদান করে, অথবা ব্যয়সাধ্য, অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় অনাবশ্যকরূপে হস্তক্ষেপ করে, অথবা সমাজভুক্ত ব্যক্তির শারীরিক, আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির পক্ষে বাধাস্বরূপ, কিংবা সমাজের প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষগণের একচতুর্থাংশ কর্তৃক ঐ নিয়ম পালিত হয় না, তাহা হইলে ব্যবস্থাপক সভা ঐ নিয়ম পরিশোধন করিয়া দিবেন।

যদি মরণাশৌচের পর কেহ মস্তক, শ্মশ্রু এবং গুম্ফ মুণ্ডন না করে, তাহা হইলে দণ্ডস্বরূপ তাহাকে সমাজমণ্ডলে স্থান দেওয়া হয় না। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াতে এরূপ অনেক নিয়ম আছে, যেগুলি না মানিলেও চলে—সেগুলি না মানিলে এখন হয় জাতিচ্যুত হইতে হয় নতুবা একঘরে হইতে হয়। সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধেও এই নিয়ম আছে। নির্দ্দিষ্ট বয়স পার হইলে কন্যা যদি অবিবাহিত থাকে, তবে গঞ্জনা, অপবাদ ত পিতাকে সহ্য করিতেই হয়, আবার জাতিচ্যুতও হইতে হয়। বরদার নূতন আইনে সমাজের এই অন্যায় উৎপীড়নের হাত হইতে লোকে রক্ষা পাইবে।

(২) "দাহোদকী সংযুক্ত সভাকে প্রস্তাব"।—গত ফেব্রুয়ারী মাসে দাহোদে দিগম্বর জৈনদিগের প্রান্তিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভার কার্য্যাবলীতে এবার বিচার-বিমূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে। একটী প্রস্তাবে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ সপ্তাহে দুই দিন মাংস আহার ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া হর্ষপ্রকাশ পূর্ব্বক জানান হইয়াছে যে, সম্রাট্ ভবিষ্যতে প্রজাগণের সহিত মাংসাহার একেবারে ত্যাগ করুন! সভা ধরিয়া লইয়াছেন যে, সম্রাট ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া মাংসাহার ত্যাগ করিয়াছেন।

জৈনহিতৈষী, জাতিপ্রবোধক প্রভৃতি মাসিকপত্র জৈনসমাজে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে। এই সভা উক্ত পত্র-গুলিকে এইরূপ আলোচনা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

জৈনদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা অধিক ও স্ত্রীর সংখ্যা কম। এ অবস্থায় যদি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না করা যায়, তাহা হইলে সমাজে নানাবিধ দোষ প্রবেশ করিবে। আজকাল জৈনদের সংখ্যাও কমিয়া যাইতেছে। এই সকল কথা মনে রাখিয়া বিধবা-বিবাহের প্রশ্নটি সঙ্গতরূপে বিচার করা আবশ্যক। আর এ সকল প্রশ্ন আজকাল চাপিয়া রাখিলে চলিবে না।

পঞ্চম প্রস্তাবে বিধবার সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্য সভা চারিটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—বাল্যবিবাহ, কন্যাবিক্রয়, বৃদ্ধবিবাহ এবং বেশ্যানৃত্য না হইতে দেওয়া। কিন্তু এই উপায়গুলি নিতান্ত হাস্যাস্পদ

ও অকিঞ্চিৎকর। বিধবাদের সংখ্যা সামান্য কমিলেও অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যাধিক্যের প্রশ্নের সমাধান হয় কই ?

আসামী

১। আলোচনা, জ্যৈষ্ঠ—১৩১৭।

"বরাহরাজ্য আর বরাহমিহির।"—লেখক শ্রীআনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যে, চক্রবান নামক পর্ব্বতে বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুইজন দানবকে বধ করিয়া চক্র এবং শঙ্খ গ্রহণ করেন। তার পর অগাধ সমুদ্র হইতে উত্থিত চতুঃষষ্টি-যোজন-বিস্তৃত বরাহ নামে পর্ব্বতমালা দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে স্বর্ণময় নগর আছে। নরক নামে এক দুর্জ্জন দানব সেখানে বাস করে।

যোগিনীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ এবং ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরক বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, আসামী রামায়ণ-রচয়িতা কবি কন্দলিয়ে তাঁহার রচিত রামায়ণে আত্মপরিচয় দিয়া বলিয়াছেন,—

"কবিরাজ কন্দলিয়ে আমাকে যে বুলিয়ে
করিলাহোঁ সর্ব্বজন বোধে
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহা মাণিক যে
বরাহ রাজার অনুরোধে।"

স্বর্গীয় রায়বাহাদুর মাধবচন্দ্র বরদলৈ মহাশয় আসামী রামায়ণ সম্বন্ধে বলেন,—"দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত "বরাহীরজা"-অভিহিত জয়ন্তীপুরের রাজগণ নগাঁও জিলার উপর আধিপত্য করিতেন। নগাঁওর অন্তর্গত আলিপুখুরীতে জন্ম ও বাসস্থান হওয়ায় আসামের শ্রেষ্ঠ কবি মাধব কন্দলিও জয়ন্তীর প্রজা ছিলেন। সুতরাং তিনি যে দেশাধিপতির আদেশ অনুসারে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

জয়ন্তীপুরের ইতিহাসে "মাণিক" উপাধিধারী তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়, বিজয়মাণিক, ধনমাণিক, যশমাণিক। বরদলৈ মহাশয়ের মতে বিজয়মাণিকই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মহামাণিক রাজা ছিলেন।

পুরাতন আসামে যে বরাহনামে এক রাজ্য ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারের কামরূপ, নগাঁও, খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় একসময় এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

যে সময়ে রাজা বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই সময়ে নরকবংশীয় সুবাহু রাজা কামরূপে রাজ্য করিতেছিলেন। নরক-বংশীয় হওয়ার জন্য সুবাহুকে বরাহী রাজা বলা হইত।

পরম বিদ্যোৎসাহী রাজা বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বিদ্বান ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠগণকে আহ্বান করিয়া নিজ সভাপণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। জ্যোতিষী বরাহমিহির বোধ হয় বরাহ রাজ্যের মানুষ ছিলেন—জ্ঞানে এবং বিদ্যায় বরাহের মিহির সদৃশ ছিলেন (!!!) সেই জন্যই বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে 'বরাহমিহির' উপাধি দান করেন!

অথবা এরূপও হইতে পারে যে তাঁহার প্রকৃত নাম 'মিহির' ছিল, বরাহদেশ হইতে আগত বলিয়া 'বরাহমিহির' বলিয়া অভিহিত হইতেন!! সেই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যেরূপ জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা হইত ভারতবর্ষের অন্য কোথাও সেরূপ ছিল না।

উজ্জয়িনীতে বাসকালে বরাহমিহির কয়েকবার দেশে আইসেন—প্রমাণ পাওয়া যায়। ডাকের জন্মপুঁথিতে মিহির দুবার দেশে আসেন, উল্লেখ আছে। যথা—

"ডাক জন্মা শুনি মিহির মুনি
মোর পুত্র হৈছে বলি আসিলা আপুনি।
ডাকে বোলে পিতা ন কর চিন্তা
কুমায়ণী যাই তুমি হোবা পিতা।"

লেখক কামরূপ অনুসন্ধান সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন যে তাহারা অনুসন্ধান করুন, বরাহমিহিরের জন্ম গৌহাটীতে না কামরূপে!!

গৃহ-দাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আজ অচলার বিবাহ। বিবাহ-সভার পথে পলকের জন্য তাহার সুরেশের মুখের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহার পরে সে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, সারা রাত্রির মধ্যে কেদার বাবুর বাটীতে আর তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

বিবাহ হইয়া গেল। এই দুটা দিন অচলার মনের মধ্যে বিপ্লব বহিতেছিল। সেই নিমন্ত্রণের কথা, সুরেশের পিসিমার কথা সে কোন মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না; আজ তাহার নিবৃত্তি হইল।

মহিমের অটল গাম্ভীর্য্য আজিও অক্ষুণ্ণ রহিল। আনন্দ-

নিরানন্দের লেশমাত্র বাহ্য প্রকাশ তাহার মুখের উপর দেখা দিল না। তবুও শুভদৃষ্টির সময় এই মুখ দেখিয়াই অচলার সমস্ত বক্ষ আনন্দে, মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে স্বামীর পদতলে মাথা পাতিয়া মনে-মনে বলিল, প্রভু, আর আমি ভয় করিনে। তোমার সঙ্গে যেখানে যে অবস্থায় থাকিনে কেন, সেই আমার স্বর্গ; আজ থেকে চিরদিন তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ। শ্বশুরবাটী যাত্রার দিন কেদার বাবু জামার হাতায় চোখ মুছিয়া কহিলেন, "মা, আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীর সঙ্গে দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করে জীবনের পথে, কর্ত্তব্যের পথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।" বলিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিতে-চাপিতে পাশের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন!

তাহার পরে, শ্রাবণের এক স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রহরে, মাথার উপর ক্ষান্ত-বর্ষণ, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও নীচে সঙ্কীর্ণ, কর্দ্দমাচ্ছন্ন, পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ দিয়া পাল্কি চড়িয়া অচলা একদিন স্বামীগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই পথটুকুর মধ্যেই যেন তাহার নব বিবাহের অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়া গেল।

পল্লীগ্রামের সহিত তাহার ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়াই পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে, দুঃখ-দারিদ্র্যের সহস্র ইঙ্গিতের মধ্যেও ছত্রে-ছত্রে কবিতা ছিল, কল্পনার মাধুর্য্য ছিল। পাল্কি হইতে নামিয়া সে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কোথাও কোন দিক হইতে কবিত্বের এতটুকু সাড়া আসিয়া তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল না। তাহার কল্পনার পল্লীগ্রাম সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে যে এম্‌নি নিরানন্দ, নির্জ্জন,—মেটেবাড়ীর ঘরগুলা যে এরূপ স্যাঁত্‌-সেঁতে, অন্ধকার, জানালা দরজা যে এতই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র,—উপরে বাঁশের আড়া ও মাচা এত কদাকার—ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। এই কদর্য্য গৃহে জীবন যাপন করিতে হইবে—উপলব্ধি করিয়া, তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্বামি-সুখ, বিবাহের আনন্দ সমস্তই এক মুহূর্ত্তে মায়া-মরীচিকার মত তাহার হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া গেল। বাটীতে শ্বশুর-শাশুড়ী বা-ননদ কেহই ছিল না, দূর-সম্পর্কের এক ঠান্‌দিদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বর-বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য ও-পাড়া হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি বিবাহের আজন্ম-পরিচিত সাজ-সজ্জার একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়া অব্যক্ত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন;—অবশেষে বধূর হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। পাড়ার যাহারা বধূ দেখিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারা অচলার বয়স অনুমান করিয়া,—মুখ-চাওয়া-চাওয়ি, গা-টেপা-টিপি করিল, এবং প্রত্যাগমন কালে তাহাদের অস্ফুট কলরবের মধ্যে 'বেম্ম' 'মেলেচ্ছ' প্রভৃতি দুই একটা মিষ্ট কথা আসিয়াও অচলার কাণে পৌঁছিল। অনতিবিলম্বেই গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কথাটা সত্য যে, মহিম ম্লেচ্ছ-কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে। এই প্রকার একটা জনশ্রুতির বিবাহের পূর্ব্বেই কিছু-কিছু আন্দোলন, আলোচনা হইয়া গিয়াছিল; এখন বউ দেখিয়া কাহারও বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না যে, যাহা রটিয়াছিল, তাহা ষোলো আনাই খাঁটি! প্রতিবেশিনীরা প্রস্থান করিলে, ঠান্‌দিদি আসিয়া কহিলেন, "নাত-বৌ, আজ তা'হলে আসি দিদি। অনেকটা দূর যেতে হবে, আর ঘরে না গেলেও নয় কি না,—ছোট নাতীটি" ইত্যাদি বলিতে-বলিতে তিনি অনুরোধ-উপরোধের অবকাশমাত্র না দিয়াই চলিয়া গেলেন। তিনি যে এতক্ষণ শুধু একটা সম্বন্ধ স্মরণ করিয়াই যাইতে পারেন নাই, এবং সেজন্য মনে-মনে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন, অচলা তাহা বুঝিয়াছিল। বস্তুতঃ, ঠান্‌দিদির অপরাধ ছিল না। ব্যাপারটা যে যথার্থ ই এরূপ দাঁড়াইবে, তাহা জানিলে হয় ত তিনি এদিক্‌ মাড়াইতেন না। কারণ, পাড়াগাঁয়ে বাস করিয়া এ সকল জিনিসকে ভয় করে না, এত বড় বুকের পাটা পল্লী-ইতিহাসে সুদুর্ল্লভ।

ঠান্‌দিদি অন্তর্ধান করিলে, বাড়ীর যদু চাকর ও উড়ে বামুন এবং কলিকাতা হইতে সদ্য আগত অচলার বাপের বাড়ীর দাসী হরির মা ভিন্ন সমস্ত বিবাহ-বাড়ীটা শূন্য খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টির বিরাম হইয়াছিল, পুনরায় ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া পড়িতে সুরু করিল। হরির মা কাছে আসিয়া ধীরে-ধীরে কহিল, "এমন বাড়ী ত দেখিনি দিদি, কেউ যে কোথাও নেই—" অচলা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, অন্যমনস্কের মত শুধু কহিল, "হুঁ—" হরির মা পুনরপি কহিল, "জামাই-বাবুকেও ত দেখ্‌চিনে? সেই যে একটিবার দেখা দিয়ে

কোথায় গেলেন—” অচলা এ কথার জবাবও দিল না। এই বনজঙ্গলপরিবৃত শূন্য পুরীর মধ্যে হরির মার নিজের চিত্ত যত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াই উঠুক, অচলাকে সে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছে। তাহাকে একটুখানি সচেতন করিবার জন্য কহিল, “ভয় কি! সত্যই ত আর জলে এসে পড়িনি! জামাইবাবু এসে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ততক্ষণ এ সব ছেড়ে ফেল দিদি, আমি তোরঙ্গ খুলে কাপড়-জামা বার করে দি—” “এখন থাক্ হরির মা” বলিয়া অচলা তেমনি অধোমুখে কাঠের মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। জীবনের সমস্ত স্বাদ-গন্ধ তাহার যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। সেই বর্দ্ধিত-বেগ বারিধারার মধ্যে কখন যে দিন-শেষের অত্যল্প আলোক নিবিয়া গেল, কখন শ্রাবণের গাঢ় মেঘাস্তীর্ণ আকাশ ভেদ করিয়া মলিন পল্লী-গৃহে সন্ধ্যা নামিয়া আসিল, কিছুই ঠাহর হইল না। শুধু আনন্দলেশহীন আঁধার ঘরের কোণে-কোণে আর্দ্র অন্ধকার নিঃশব্দে গাঢ়তর হইয়া উঠিতে লাগিল। যদু চাকর আসিয়া হারিকেন লণ্ঠন ঘরের মাঝখানে রাখিয়া দিল। হরির মা প্রশ্ন করিল, “জামাই বাবু কোথায় গো?” “কি জানি” বলিয়া যদু ফিরিতে উদ্যত হইল। তাহার সংক্ষিপ্ত ও বিশ্রী উত্তরে হরির মা শঙ্কিত হইয়া কহিল, “কি জানি কি রকম? বাইরে তিনি নেই না কি?” “না” বলিয়া যদু প্রস্থান করিল। সে যে আগন্তুকদিগের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাহা বেশ বুঝা গেল। হরির মা অত্যন্ত ভীত হইয়া অচলার কাছে সরিয়া আসিয়া ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, “রকম-সকম আমার ত ভাল ঠেকচে না দিদি! দোরে খিল দিয়ে দেব?” অচলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, “খিল দিবি কেন?”

হরির মা ছেলেবেলায় দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, আর কখনও যায় নাই। পল্লীগ্রামের চোর, ডাকাত—ঠ্যাঙাড়ে প্রভৃতি গল্পের স্মৃতি ছাড়া আর সমস্তই তাহার কাছে ঝাপ্‌সা হইয়া গেছে। সে বাহিরের অন্ধকারে একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অচলার গা-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া চুপি-চুপি কহিল, “পাড়া-গাঁ—বলা যায় না দিদি!” বলিতে-বলিতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। ঠিক এমনি সময়ে প্রাঙ্গণের মাঝখান হইতে ডাক আসিল, “ঠান্‌দি কোথায় গো?” বলিতে-বলিতেই একটি কুড়ি-একুশ বৎসরের পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে মেয়ে জলে ভিজিতে-ভিজিতে দোরগোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল; কহিল, “আগে একটা নমস্কার করে নিই ঠান্‌দি, তার পরে কাপড় ছাড়ব ‘খন” বলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অচলার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। লণ্ঠনটা অচলার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া, ক্ষণকাল এক-দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া, চীৎকার করিয়া, ডাক দিল, “সেজ্‌দা, ও সেজ্‌দা—” মহিম বাটী পৌঁছিয়াই এই মেয়েটিকে নিজে আনিতে গিয়াছিল। ও-ঘর হইতে সাড়া দিল, “কি রে মৃণাল?” “এদিকে এসো না, বল্‌চি—” মহিম দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, “কি রে?” মৃণাল লণ্ঠনের আলোকে আর একবার ভাল করিয়া অচলার মুখখানি দেখিয়া লইয়া বলিল, “নাঃ—তুমিই জিতেচ সেজ্‌দা। আমাকে বিয়ে করলে ঠকে মরতে ভাই।”

মহিম বাহির হইতে তাড়া দিয়া কহিল, “কিছুতে আমার কথা শুন্‌বিনে, মৃণাল! আবার এই সব ঠাট্টা? তুই কিছুতে আমার কথা শুন্‌বিনে?” “বাঃ, ঠাট্টা বই কি!” অচলার মুখের প্রতি চাহিয়া মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, “ঠান্‌দি, মাইরি বল্‌চি, ভাই, তামাসা নয়। আচ্ছা, তোমার বরকেই জিজ্ঞেস কর,—আমাকে এক সময়ে উনি পছন্দ করেছিলেন কি না!” মহিম কহিল, “তবে তুই বকে মর্, আমি বাইরে চল্‌লুম।” মৃণাল কহিল, “তা যাও না, তোমাকে কি ধরে রাখচি?” অচলার চিবুকটা একবার পরম স্নেহে নাড়িয়া দিয়া কহিল, “আচ্ছা, ভাই ঠান্‌দি, হিংসে হয় না কি? এ সংসারের আমারই ত গিন্নী হবার কথা! কিন্তু আমার মা পোড়ারমুখী কি যে মন্তর সেজ্‌-দা’র কাণে ঢুকিয়ে দিলে,—আমি সেজ্‌-দা’র দু’চক্ষের বিষ হয়ে গেলুম। নইলে—ওরে যদু, ঘোষাল মশাই গেলেন কোথায়?” যদু কহিল, “পুকুরে হাত-পা ধুতে গেছেন।” “অ্যাঁ, এই অন্ধকারে পুকুরে?” মৃণালের হাসিমুখ এক মুহূর্ত্তে দুশ্চিন্তায় ম্লান হইয়া গেল। ব্যস্ত হইয়া কহিল, “যদু যা বাবা, আলো নিয়ে একবার পুকুরে। বুড়োমানুষ এখুনি কোথায় অন্ধকারে পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গবে।”

পরক্ষণেই অচলার মুখের পানে চাহিয়াও লজ্জিতভাবে হাসিয়া কহিল, “কি কপাল করেছিলুম ভাই ঠান্‌দি, কোথাকার একটা বাহাত্তুরে বুড়ো ধরে আমাকে দিলে,—

তার সেবা করতে-করতে আর তাকে সাম্‌লাতে-সাম্‌লাতেই প্রাণটা গেল! আচ্ছা ভাই, আগে ও-ঘর থেকে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আসি, তার পরে কথা হবে। কিন্তু সতীন বলে রাগ করতে পাবে না, তা' বলে দিচ্চি,—আর, বল ত', না হয় আমার বুড়োটাকেও তোমাকে ভাগ দেব—" বলিয়া, হাসির ছটায় সমস্ত ঘরটা যেন আলো করিয়া দিয়া, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এই শ্রেণীর ঠাট্টা-তামাসার সহিত অচলার কোন দিন পরিচয় ঘটে নাই। সমস্ত পরিহাসই তাহার কাছে এম্‌নি কুরুচিপূর্ণ ও বিশ্রী হইতেছিল যে, একান্ত লজ্জায় সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। এতবড় নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা যে কোন স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকিতে পারে, তাহা সে ভাবিতেও পারিত না। সুতরাং সমস্ত রসিকতাই তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কারের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু তবুও তাহার মনে হইতে লাগিল, ইহার আগমনে তাহার নির্ব্বাসনের অর্দ্ধেক বেদনা যেন তিরোহিত হইয়া গেল। এবং, এ কে, কোথা হইতে আসিল, তাহার সহিত কি সম্বন্ধ—সমস্ত জানিবার জন্য অচলা উৎসুক হইয়া উঠিল। হরির মা কহিল, "এ মেয়েটি কে দিদি? খুব আমুদে মানুষ।" অচলা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, "হাঁ।" ভিজা কাপড় ছাড়িয়া মৃণাল এ ঘরে আসিয়া কহিল, "কেবল ঠাট্টা-তামাসা করেই গেলুম, ঠান্‌দি, আমার আসল পরিচয়টা এখনো দেওয়া হয়নি। আর পরিচয় এমন কি-ই বা আছে? তোমার বর যিনি, তিনি হচ্চেন আমার মায়ের বাপ। আমি তাই ছেলেবেলা থেকেই 'সেজ্‌-দা' মশাই বলে ডাকি।" মৃণাল একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, "আমার বাবা আর তোমার শ্বশুর—দুজনে ভারি বন্ধু ছিলেন। হঠাৎ একদিন গাড়ী চাপা পড়ে, ডান হাতটা ভেঙে গিয়ে বাবার যখন চাকরি গেল, তখন তোমার শ্বশুর এই বাড়ীতে তাঁদের আশ্রয় দিলেন। তার অনেক পরে আমার জন্ম হয়। সেজ্‌-দা' তখন আট বছরের ছেলে। তাঁর মা ত তাঁকে জন্ম দিয়েই মারা যান; বড় দু' ছেলে আগেই ডিপথিরিয়া রোগে মারা গিয়েছিল। তাই, আমার মা আমা' পর্য্যন্তই হলেন এ বাড়ীর গিন্নী। তার পরে বাবা মারা গেলেন, আমরা এ বাড়ীতেই রইলুম। তার অনেক পরে তোমার শ্বশুর মারা গেলেন, আমরা কিন্তু রয়েই গেলুম। এই ত সবে পাঁচ বছর হল পলাশীর ঘোষাল-বাড়ীতে আমার বিয়ে দিয়ে সেজ্‌-দা আমাকে দূর করে দিয়েছেন! মা বেঁচে থাক্‌লেও বা যা'হোক্ একটু জোর থাক্‌ত!" "বড় বৌ এই ঘরে না কি?" বলিয়া একটি বৃদ্ধ গোছের বেঁটে, খাটো গৌরবর্ণ ভদ্রলোক দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মৃণাল কহিল, "এসো, এসো।" অচলার পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "এইটি আমার কর্ত্তা ঠান্‌দি। আচ্ছা, তুমিই বল ত ভাই, ওই বায়াত্তুরে বুড়োর সঙ্গে আমাকে মানায়? এ জন্মের রূপ-যৌবন কি সব মাটি হয়ে গেল না ভাই?" অচলা লজ্জায় মাথা হেঁট করিল। ভদ্রলোকটির নাম ভবানী ঘোষাল। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "বিশ্বাস করবেন না ঠান্‌দি,—সব মিছে কথা। ওর কেবল চেষ্টা—আমাকে খেলো করে দেয়। নইলে, বয়স ত আমার এই সবে বায়ান্ন কি তি—" মৃণাল কহিল, "চুপ করো, চুপ করো। এই সেজ্‌দা'টি যে আমার কি শত্রু, তা' ভগবানই জানেন। আমাকে সব দিকে মাটি করেছেন—আচ্ছা, এই বুড়োর হাতে দেওয়ার চেয়ে হাত-পা বেঁধে কি আমার জলে ফেলে দেওয়া ভাল হত না ঠান্‌দি? সত্যি বোলো ভাই?" অচলা তেম্‌নি আরক্ত মুখে নীরব হইয়াই রহিল। ঘোষাল ধীরে-ধীরে ঘরে ঢুকিয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া অচলার লজ্জানত মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সহসা একটা মস্ত আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাঁচালেম ঠান্‌দি, এ ছুঁড়ির অহঙ্কার এতদিনে ভাঙ্‌ল। রূপের দেমাকে এ চোখে-কাণে দেখ্‌তেই পেত না।" স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া করিয়া কহিলেন, "কেমন, এইবার হ'ল ত? বনদেশে এতদিন শিয়াল রাজা ছিলে, সহরের রূপ কারে বলে এইবার চেয়ে দেখো!" মৃণাল কহিল "তাই বই কি! আমার যেখানে অহঙ্কার, সেখানে ভাঙ্‌তে যায়—সাধ্যি কার?" বলিয়া স্বামীর প্রতি সে যে গোপন কটাক্ষ করিল, অচলার চোখে সহসা তাহা পড়িয়া গেল। ঘোষাল হাসিয়া বলিলেন, "শুন্‌লেন ত, ঠান্‌দি,—একটু সাবধানে থাক্‌বেন। দুজনের যে ভাব, যে আসা-যাওয়া, বলা যায় না—আর আমি ত বায়াত্তুরে বুড়ো, মাঝে থাক্‌লেই কি, আর, না থাক্‌লেই বা কি! নিজেরটি সাম্‌লে চল্‌বেন,—হিতৈষী বুড়োর এই অনুরোধ।" "মৃণাল, তোরা কি সারারাত্রি বই নিয়েই থাক্‌বি?" "কি

কোরব সেজ্-দা ?" "একবার রান্নাঘরের দিকেও কি যাবিনে ?" মৃণাল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "কি ভুল হয়েই গেছে সেজ্-দা। উড়ে বামুনটাকে আমার আগে দেখে আসা উচিত ছিল। আচ্ছা, তোমরা বাইরে যাও, আমরা যাচ্ছি।" মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কে ?" মৃণাল কহিল, "আমি আর ঠান্‌দি।" অচলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "আমি যখন এসেচি, তখন, এ সংসারের সমস্ত 'চার্জ্জ' তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যাবো সেজ্‌দি।" মহিম এবং ভবানী বাহিরে চলিয়া গেল। মৃণাল অচলাকে পুনরায় কহিল, "আমার দু'দিন আগে আসাই উচিত ছিল। কিন্তু, শাশুড়ীর হাঁপানির জ্বালায় কিছুতে বাড়ী ছেড়ে বেরুতে পারলুম না। আচ্ছা, তুমি কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হও সেজ্‌দি, আমি এখ্‌খুনি ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।" বলিয়া মৃণাল রান্নাঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল। তখন বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছিল এবং গাঢ় মেঘ কাটিয়া গিয়া নবমীর জ্যোৎস্নায় আকাশ অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছিল।

রান্নার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া মৃণাল অচলার কাছে আসিয়া বসিল। তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, "ঠান্‌দিদির চেয়ে সেজ্-দি ডাকটা ভালো, কি বল সেজ্‌দি ?" অচলা মৃদুস্বরে কহিল, "হাঁ।" মৃণাল কহিল, "সম্পর্কে তুমি বড় হলেও বয়সে আমি বড়। তাই ইচ্ছে হয় আমাকেও তুমি মৃণাল দিদি বলে ডেকো, কেমন ?" অচলা কহিল, "আচ্ছা।" মৃণাল কহিল, "আজ তোমাকে রান্নাঘর দেখিয়ে আন্‌লুম; কিন্তু কাল একেবারে ভাঁড়ারের চাবি আচলে বেঁধে দেব, কেমন ?" অচলা কহিল, "চাবিতে আমার কাজ নেই ভাই।" মৃণাল হাসিয়া কহিল, "কাজ নেই ? বাপ রে উ-কি কথা ! ভাঁড়ারটা কি তুচ্ছ জিনিস সেজ্‌দি, যে বলচ—তার চাবিতে কাজ নেই ? গিন্নীর রাজত্বের ওই ত হ'ল রাজধানী গো !" অচলা কহিল, "হোক্ রাজধানী, তাতে আমার লোভ নেই। কিন্তু তোমার ওপর আমার ভারি লোভ। শীগ্‌গীর ছেড়ে দিচ্চিনে মৃণাল দিদি।" মৃণাল দুই বাহু বাড়াইয়া অচলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "সতীনকে ঝাঁটা মেরে বিদায় না কোরে, ঘরে ধরে রাখতে চাও,—এ তোমার কি রকম বুদ্ধি সেজ্‌দি ?" অচলা আস্তে-আস্তে বলিল, "তোমার এই ঠাট্টাগুলো আমার ভাল লাগলো না ভাই। আচ্ছা, এ দেশে সবাই কি এই রকম করে তামাসা করে ?"

মৃণাল খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "না গো, ঠান্‌দি, সবাই করে না। এ শুধু আমিই করি। সবাই এ জিনিস পাবে কোথায়, যে কোরবে ?" অচলা কহিল, "পেলেও আমরা মুখে আন্‌তে পারিনে, ভাই। আমাদের কলকাতার সমাজে অনেকে হয় ত ভাব্‌তে পর্য্যন্ত পারে না যে, কোন ভদ্রমহিলা এ সব মুখে উচ্চারণ করতে পারে।" মৃণাল কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। বরঞ্চ জোর করিয়া অচলাকে আর একবার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তোমাদের সহরের ক'জন ভদ্রমহিলা আমার মত এমন কোরে জড়িয়ে ধরতে পারে, বল ত সেজ্-দি ? সবাই বুঝি সব কাজ পারে ? এই ত তোমাকে কতক্ষণই বা দেখেচি, এর মধ্যেই মনে হচ্চে, আমার বোন ছিল না, একটি ছোট বোন পেলুম। আর এ শুধু কথার কথা নয়, সারাজীবন ধরে আমাকে এর প্রমাণ যোগাতে হবে—তা মনে রেখো। এখানে আর ঠাট্টা-তামাসা চল্‌বে না।" অচলা শিক্ষিতা মেয়ে। এই পল্লীগ্রামের বিরুদ্ধ সমাজের মধ্যে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যে কি ভাবে কাটিবে, তাহা বাটীতে পা দিয়াই সে বুঝিয়া লইয়াছিল। এ সুযোগ সে সহজে ছাড়িয়া দিল না। পরিহাসকে গাম্ভীর্য্যে পরিণত করিয়া কহিল, "মৃণাল দিদি, সত্যিই কি এর প্রমাণ তুমি সারা জীবনভোর যোগাতে থাক্‌বে ?" মৃণাল বলিল, "আমরা ত সহরের মহিলা নই ভাই,—যোগাতে হবে বৈ কি ! যে সত্যি তোমাকে ছুঁয়ে ক'রে ফেললুম, সে ত মরে গেলেও আর উল্টোতে পারব না !" অচলা এ কথা আর অধিক নাড়াচাড়া না করিয়া অন্য কথা পাড়িল; হাসিয়া কহিল, "শীগ্‌গীর পালাবে না, তাও অমনি বল !" মৃণাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বোকা পেয়ে বুঝি ক্রমাগত ফাঁস জড়াতে চাও সেজ্-দি ? কিন্তু সে ত আগেই বলেচি ভাই, ভাল করে চার্জ্জ বুঝিয়ে না দিয়ে পালাব না।" অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, "চার্জ্জ বুঝে নেবার আমার এক তিল আগ্রহ নেই।" মৃণাল বলিল, "সেইটে আমি করে দিয়ে তবে যাবো। কিন্তু বেশি দিন আমার ত বাড়ী ছেড়ে থাক্‌বার জো নেই, ভাই। জান ত, কত বড় সংসারটি আমার মাথার ওপর।" অচলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, জানিনে।" মৃণাল আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা

করিল, "সেজ্-দা আমার কথা তোমাকে আগে বলেন নি ?" অচলা কহিল, "না, কোন দিন নয়। তাঁর বাড়ী-ঘর সম্বন্ধে, অবস্থার সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানিয়েছিলেন ;—কিন্তু যা' সকলের আগে জানানো উচিত ছিল, সেই তোমার কথাই কেন যে কখনো বলেননি, আমার ভারি আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে, মৃণাল দিদি।" মৃণাল অন্যমনস্কের মত বলিল, "তা' বটে।" অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু কণ্ঠে হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গেই বুঝি ওঁর প্রথমে বিয়ের কথা হয় ?" মৃণাল তখনও অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল,—কহিল, "হাঁ।" অচলা কহিল, "তবে হল না কেন ? হলেই ত বেশ হ'ত।" এতক্ষণে কথাটা মৃণালের কাণের ভিতরে গিয়া ঘা দিল। সে অচলার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, "সে হবার নয় বলেই হ'ল না।" অচলা তথাপি প্রশ্ন করিল, "হবার বাধা কি ছিল ? তুমি ত আর সত্যিই তাঁর কোন আত্মীয় নও ? তা'ছাড়া, ছেলেবেলা যে ভালবাসা জন্মায়, তাকে উপেক্ষা করাও ত ভালো কাজ নয় ?" তাহার প্রশ্নের ধরণে মৃণাল হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে অচলার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "এ সব তুমি কি খুঁজে বেড়াচ্চ সেজ্ দি ? তুমি কি মনে কর, ছেলেবেলার সব ভালবাসারই শেষ ফল এই ? না, মানুষে বিয়ে দেবার মালিক ? এ শুধু এ জন্মের সম্বন্ধ নয় সেজ্-দি, জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ। আমি যাঁর চিরকালের দাসী, তাঁর হাতেই তিনি আমাকে সঁপে দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কি যায়-আসে !" অচলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সে ঠিক কথা, মৃণাল দিদি—আমি তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম—" কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, সমস্ত মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। মৃণালের কাছে তাহা অগোচর রহিল না। সে অচলার হাতখানি সস্নেহে মুঠার মধ্যে লইয়া বলিল, "সেজ্-দি, তুমি শুধু সেদিন স্বামী পেয়েচ, কিন্তু আমি এই পাঁচবচ্ছর ধরে তাঁর সেবা করচি। আমার এই কথাটা শুনো, ভাই ; স্বামীর এই দিকটা কোন দিন নিজের বুদ্ধির জোরে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করো না। তাতে বরং ঠকাও ঢের ভাল, কিন্তু জিতে লাভ নেই।" যদু বাহির হইতে কহিল, "দিদি, বাবুদের খাবার যায়গা হয়েচে।" "আচ্ছা, চল আমি যাচ্চি" বলিয়া মৃণাল হঠাৎ দুই হাত বাড়াইয়া অচলার মুখখানা কাছে টানিয়া আনিয়া একটা চুমা খাইয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সাময়িকী

মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের স্বর্গারোহণ দিনের স্মৃতিরক্ষার জন্য বিগত ১৫ই আষাঢ় শুক্রবার কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও সাহিত্য-সেবক লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধি-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছিলেন। এই স্মৃতিসভার স্থায়ী সভাপতি মাইকেলের জীবনী-লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু কবিভূষণ ও সম্পাদক 'মধুস্মৃতি' লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়দ্বয় সাহিত্যিকগণকে এই স্মৃতি-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সমাধি-স্থানে প্রায় পাঁচশতাধিক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সম্বুদ্ধাগম-চক্রবর্ত্তী বিদ্যার্ণব মহোদয় সভাপতিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কবিবর যোগীন্দ্র বাবু সভার উদ্বোধন করিয়া শ্রীযুক্ত সার আশুতোষকে সভাপতি পদে বৃত হইতে অনুরোধ করেন। তাহার পর কয়েকটি সময়োচিত কবিতা পঠিত হয় এবং পূজনীয় শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় ওজস্বিনী ভাষায় মহাকবির গুণকীর্ত্তন করেন। অবশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণ ছাপাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন ; সভা শেষ হইলে সেই অভিভাষণ বিতরিত হয়।

শ্রীযুক্ত সার আশুতোষের এই অভিভাষণটি তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত ও হৃদয়বান্ বাঙ্গালীরই উপযুক্ত হইয়াছিল। বিগত দুই বৎসরে সার্ আশুতোষ তিনটি অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, তাহার পূর্ব্বে তিনি কখন বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন বলিয়া ত মনে হয় না। তাঁহার প্রথম অভিভাষণ উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের রঙ্গপুরের অধিবেশনে সভাপতিরূপে, দ্বিতীয় অভিভাষণ কৃত্তিবাস

স্মৃতি-সভায় ; তৃতীয় অভিভাষণ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বাঁকিপুর অধিবেশনে সভাপতি রূপে। এইটি তাঁহার চতুর্থ অভিভাষণ। তাঁহার এই অভিভাষণ পূর্ব্বের কয়েকটীর ন্যায়ই মনোহর হইয়াছিল ; সমবেত ভদ্রলোকগণও সকলেই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করিবেন। আমরা তাঁহার এই অভিভাষণ হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মহাকবি মাইকেলের কথা বলিতে গিয়া তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন—

"তাঁহার ন্যায় মহাকবির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ চিরদিনের মত পূজনীয় হইয়া রহিয়াছে। আর তাঁহার কবিতারূপিণী মন্দার-মালায় বঙ্গভাষা আচন্দ্র দিবাকর সুশোভিত হইয়া থাকিবে। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি মহাকবিগণের বহুযত্ন-কল্পিত কবিতা-কাননে মধুময় মধুসূদনের মধুমতী ভাব-মন্দাকিনী প্রবাহিত হইয়া, বঙ্গদেশকে যেন চিরদিনের মত সরস করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলের এমনই একটা মাহাত্ম্য, বাঙ্গালার শ্যামল শস্য-ক্ষেত্রের, সুনীল বনাবলীর এমনই একটা মাধুরী, এমনই একটা উন্মাদকতা, যে, অতিবড় নীরস পাষাণেও এখানে নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আমরা সত্যই,

"পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে উঠি পাখীর ডাকে জেগে।"

তীর্থস্থানে উপনীত হইলে যেমন হৃদয়ে কেমন একটা স্পৃহনীয় ভাবের উদয় হয়, অরুণোদয়ে নীলাম্বুরাশির বেলাভূমিতে উপবিষ্টের মনে যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবেশ হয়, সায়ংকালে পল্লী-প্রান্তরে সমাসীন ব্যক্তির পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দয়েল শ্যামার তানে নয়ন ও মনে যেমন একটা আনন্দময়ী জড়তার আবির্ভাব হয়,—এই বাঙ্গালার পল্লী-কুঞ্জে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতই ঐরূপ ভাবাবেশ জন্মিয়া থাকে। যাঁহারা আবার ভাগ্যবান, বিধাতার অনুগ্রহ যাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত, তাঁহারা ঐ ভাবাবেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্য হন, নর-জীবন সার্থক করেন। দিবাবসানে, যখন পল্লী-পাদ-বাহিনী তটিনী কুলকুল গীতিকায় পথিকের প্রাণে কেমন একটা উদাস ভাব জাগাইয়া বহিয়া যায়, তটবর্ত্তী বটবৃক্ষের মূলে সমাসীন পথিকের হৃদয় সান্ধ্য-সমীরণে যেন কেমন বিভোর হইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তখন, সেই আত্মবিস্মৃত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে হৃদয়ের সুপ্ত বীণা আপনিই অনুরণিত হইয়া উঠে। যদি তাহার চিত্তে প্রেম থাকে, যদি তাহার জন্মান্তরের পুণ্য থাকে, তবে তখন সে পাগলের মত গাহিতে থাকে ; তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী কল্পনাময়ী প্রতিমার চির-প্রসন্ন মুখের দিকে মুদিত-নেত্রে চাহিয়া বলে—

"মধুর-মূরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার !
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।"
(সারদামঙ্গল)

তখন সে যুক্তকরে তাহার আদরিণী প্রতিমাকে স্তব করিতে আরম্ভ করে, কখনো ধ্যান করে, কখনো আবার দুই হাত বাড়াইয়া সেই সস্মিতবদনা জ্যোতির্ম্ময়ীকে ধরিতে যায় ; সত্যই সেই করুণাময়ীর সকরুণ নয়নের দীপ্তিতে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া তখন ঐ ব্যক্তি কত কি বলিতে থাকে,—কখনো শোকাশ্রুতে ভাসাইয়া দেয়, আবার প্রেমাশ্রুতে কখনো বা মরুভূমি অমরধামে পরিণত করে।"

তাহার পর মাইকেলের মহাকাব্য সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ বলিতেছেন—

"মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তাঁহার কবিতায় সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত। তাহাতে বিদেশীয় মসলা নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-জগতের ভাল মন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্য প্রতিমা বসান নাই, জাতীয়তার বিসর্জ্জন দেন নাই। পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্যরাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতা-রাণীর ললাট মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ রাগে। তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব। উপবৃক্ষই কালে শুকাইয়া যায়, মূল বৃক্ষের কিছুই হয় না। সোজা কথায় ইউরোপের নানা কারুকার্য্যখচিত সুন্দর ফ্রেমে তিনি ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প-কলা দেশান্তর হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু জাতীয় কবিতাও যদি বিজাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে হয়, তবে আর রহিল কি? এরূপ দুষ্কার্য্যের ফল জাতীয়তার ক্রমিক ধ্বংস। মহাকবি মধুসূদন সে পথে যান নাই। তিনি ইউরোপের অমিত্রাক্ষরে এ দেশের কবিতাকে সাজাইয়াছেন। তিনি গৌড়কে প্রাণময় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্গের কবিতাকে মদালসার পরিবর্ত্তে বীরাঙ্গনার ভূষায় বিভূষিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাটক প্রহসনাদি সম্বন্ধে তাঁহার সাফল্য তর্কের বিষয় হইলেও অমিত্র-ছন্দের সম্পর্কে তিনি যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।"

মাইকেল যে কেমন স্বদেশ ও স্ব-ভাষার পক্ষপাতী

ছিলেন, সেই কথা বলিতে গিয়া শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ বলিতেছেন—

"তাঁহার কবিজীবনের দুইটি স্তর দেখিতে পাই; প্রথমটি কবির ইউরোপ গমনের পূর্ব্বকাল, দ্বিতীয়টি ইউরোপ-যাত্রা হইতে তাহার পরবর্ত্তী-কাল। তদীয় যে সমুদয় কাব্য-রত্নাবলীতে বঙ্গবাণী অলঙ্কৃত, সেগুলি ঐ পূর্ব্বকালে গ্রথিত; আর হেক্টর বধ, মায়াকানন এবং কবিতামালা তাঁহার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর লিখিত। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যে শক্তি থাকায় তিনি "পূর্ব্বে ভারত-সাগরে" ডুবিয়া রত্ন তুলিতে পারিয়াছিলেন, ভারতসাগর পারে যাইয়া তাঁহার সে শক্তির তিনি উপচয় করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত অপচয়ই ঘটিয়াছিল। যদিও চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রকাশ ফরাসীর ভারসেলস্ নগরে, কিন্তু তাহার জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। রাজনারায়ণ বাবুর নিকট কবি নিজেই সে কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন ইউরোপে গমন করেন, তখন তাঁহার ঐ প্রথম সনেট্টা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, নতুবা রাজনারায়ণ বাবুর নিকট লিখিত সেই সনেট আমরা বর্ত্তমান চতুর্দ্দশপদী কবিতা পুস্তকে ঐরূপ সংশোধিত আকারে দেখিতে পাইতাম না। তিনি ইউরোপে যাইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি গিয়াছেন, তাহার সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি আইন-কানুন যাহাই পড়ুন বা যাহাই করুন না কেন, প্রাণ কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদাই মাতৃভাষার জন্য কাঁদিত। তিনি নিজেই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন,—

পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি॥

বাস্তবঃ মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়া ছিল। কবে বাঙ্গালায় শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদার অর্চ্চনা, কবে বিজয়া-দশমী, কপোতাক্ষনদ কেমন কুল-কুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ ঘাটে ভাগ্যবান্ ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়াছিল,—সুদূর ফরাসীতে বসিয়া, বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিতপ্রায়,—সেই স্থানে বসিয়া তিনি বঙ্গের এই সমুদয় সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন, ও না জানি কত আনন্দই পাইতেন। বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভারসেলেসে বসিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেন। জন্মভূমি যশোর সাগরদাঁড়ীর অবিদূরে, নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্য্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। কলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল। "বাঙ্গালার ফুল, বাঙ্গালার ফলে, বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে" তাঁহার অন্তর-বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল।

আমরা আর একটি বক্তৃতার কথা এই স্থানে উল্লেখ করিব। গত ১৬ই আষাঢ় শনিবার কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে আমাদের মাননীয় গবর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড রোণাল্ডসে মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের শিক্ষা, আমোদ, আনন্দ ও অবসর-যাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এ কথা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং এই বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মহোদয় যে ছাত্রগণকে উদ্দেশ করিয়াই সমস্ত কথা বলিবেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। সে দিনের সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ছাত্রগণের প্রতি যে প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকল ছাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য; এবং তদনুসারে কাজ করিলে তাঁহাদের মঙ্গলই হইবে। শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুরের কথাগুলি যাহাতে সকল ছাত্রই অবগত হইতে পারেন, সেই জন্য আমরা সেই সুন্দর বক্তৃতার কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বক্তৃতার আরম্ভেই বলিয়াছেন—

As your Rector, I naturally take a very close official interest in your welfare; but I can assure you, that the interest which I take in you, is by no means due to the mere accident of my official connection with you. Official interest is sometimes said to be a poor soulless sort of thing, and so indeed it may be, unless beneath the official cloak there beats a heart which radiates forth personal interest and sympathy as well. I am young to rejoice with you in your youths to share with your hopes and your aspirations, and to enter into your feelings of joyful anticipation as you dream dreams, and conjure up visions of the greater life which lies before you. Gentlemen, it is a matter of profound regret to myself that these early days of my official connection with your University should have been darkened by unfortunate mishap in connection with your examinations, and I

venture to offer my heartfelt sympathy to all those who have been affected by the misfortune, to the authorities of the University who have been the victims of the baleful activities of some mischievous person or persons whose sinister object has been to cast discredit upon the University, and to the students and applicants for admission to the University, who have been put to much trouble and much inconvenience and possibly considerable expense in having to attend a whole series of examination.

যাঁহাদের উদ্দেশ করিয়া শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর এই কথা বলিয়াছেন, সেই ছাত্রগণ সকলেই ইংরাজী জানেন; তাঁহারা উদ্ধৃতাংশ বেশ বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে উপরি-উদ্ধৃত অংশের বক্তব্য অতি সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর বলিতেছেন যে, তিনি যে কথাগুলি বলিবেন, তাহা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ভাবে, সরকারী কর্ম্মচারী ভাবে বলিবেন, তাহা নহে; সরকারী মানুষের মধ্যেও যে গভীর সহানুভূতি, যে ব্যক্তিগত আত্মীয়তার ভাব আছে, সেই ভাব-প্রণোদিত হইয়াই তিনি কথা বলিবেন। তিনি এখনও যুবক শ্রেণীভুক্ত; সুতরাং যুবকগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, কল্পনা, চিন্তার সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক। তাহার পরই শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর প্রবেশিকা পরীক্ষার দুইবার বিফলতার কথা উল্লেখ করিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিলেন; ছাত্রগণ যে কত অসুবিধা, কত উদ্বেগ সহ্য করিল, তাহার জন্য সহানুভূতি দেখাইলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষও যে কত বিপন্ন হইয়াছেন, সে কথারও উল্লেখ করিলেন।

তাহার পর শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফল কুফলের কথা বলিয়াছেন। তিনি আমাদের দেশের কোন খ্যাতনামা বক্তার বক্তৃতার একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি যখন বক্তার নাম উল্লেখ করেন নাই, তখন আমরাও সে নাম উল্লেখ করিব না; উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই অনেক পাঠক, বক্তা যে কে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর বাঙ্গালী বক্তার বক্তৃতার যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

"Western education has given rise to a kind of soulless culture in our midst—a culture that is powerless for good but is ambitious of much. Mimic Anglicism has become an obsession with us; we find its black footprint in every walk and endeavour of our life.........We have become hybrid in dress, in thought, in sentiment and culture, and are making frantic attempt to become hybrid even in blood."

বাঙ্গালী বক্তার কথার সংক্ষিপ্তসার এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে একটা আত্মাহীন মানসিক উন্নতি আনিয়াছে; ইহার ভাল করিবার শক্তি নাই, অথচ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে। আমাদের জীবনের উপর এই শিক্ষার একটা ছাপ পড়িয়া গিয়াছে; আমরা পোষাকে পরিচ্ছদে, আচারে ব্যবহারে, চিন্তায় ভাবে, সব রকমে একটা বর্ণ-সঙ্কর হইয়া পড়িয়াছি; এমন কি আমরা আমাদের শোণিত-সম্পর্কেও বর্ণ-সঙ্কর হইবার জন্য একটা উদ্দাম আবেগে অধীর হইয়া পড়িয়াছি।

উপরিউক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন যে—

"I think that view is a very wrong view; but there is a moral to be drawn from it, which I would commend to your careful attention; and that is this; that you should bring to bear upon the Western teaching that you receive, a discerning and discriminating mind. You may benefit enormously by the arts and the science of the West, but believe me, it is not necessary in order that you should cut yourselves entirely adrift from your own past."

অর্থাৎ আমি এই মতটিকে ভ্রমপূর্ণ মনে করি; তবে এই মত হইতে একটা উপদেশ গ্রহণ করা যাইতে পারে; তাহা এই;—আপনারা পাশ্চাত্য শিক্ষাকে একেবারে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিবেন না। পাশ্চাত্য সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান হইতে আপনারা প্রভূত শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, তাহাতে আপনাদের যথেষ্ট উপকার হইবে; কিন্তু, আমার

কথা বিশ্বাস করুন, আপনারা এই শিক্ষালাভ করিয়া আপনাদের দেশের অতীত শিক্ষা হইতে দূরে যাইয়া পড়িবেন না।

এই কথাটা বলিয়াই মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর নিরস্ত হন নাই; তিনি তাঁহার কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়াছেন। সেগুলি এতই সুন্দর, এতই মর্ম্মস্পর্শী যে, সেই সুদীর্ঘ মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমাদের দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী ব্যক্তি মাত্রই এই সুন্দর মন্তব্য প্রণিধান করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর বলিতেছেন—

"Let me give you an example of what I mean. It is not necessary to adopt all the customs of Europe because you desire to benefit from the fruits of your European teaching. Let us take a quite simple example;—the drinking of wine or spirits is a common custom in European countries, and in the case of people who live in a temperate climate it is not injurious so long, of course, as moderation is observed. It does not follow, however, that the same custom is suitable to people brought up in a different way and living in a different climate. I have quoted that example because I was much interested in reading a short time ago extracts from the autobiography of a well-known Bengali gentleman of the last century, Babu Raj Narain Bose. In his autobiography I find these words :—"It was a common belief of the alumni of the college that drinking wine was one of the concommitants of civilisation.'......"At the beginning of 1884 I became dangerously ill and the cause of it was excessive drinking." Well, that is one small example to illustrate what I mean."

উপরি-উদ্ধৃত অংশের কথা এই যে, ইউরোপীয় আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুকরণ করা যে প্রার্থনীয় বা কর্ত্তব্য নহে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত তিনি দিতেছেন। ইউরোপ অঞ্চলে, শীতপ্রধান দেশে, অনেকেই পরিমিত মদ্যপান করিয়া থাকেন, এবং তাহাতে তাঁহাদের অপকারও হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক এবং যাহারা অন্য ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা সাহেবদের দেখাদেখি মদ্যপ হইবে? এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর পরলোকগত রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-জীবনচরিত হইতে একটা বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, রাজনারায়ণ বাবু বলিয়াছেন, তাঁহাদের আমলে কলেজের ছাত্রদিগের ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মদ খাওয়া বিলাতী সভ্যতার অঙ্গ। তাঁহারা তখন খুব মদ খাইতেন। শেষে যখন তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'ন, তখন মদ্যপান একেবারে ত্যাগ করেন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"Take another example. Sir Rabindranath Tagore has not disdained to come into contact with the culture of the peoples of Europe and America. Is it maintainable, therefore, that he does not in his writings give expression to the very spirit of Bengal? Does not Bankim Chandra Chatterjee portray the very soul of Bengal, burdened with fruits, green with its rice fields, cooled with the southern breezes! Or take another example—What about Sir Jagadish Chandra Bose? Is not Sir Jagadish Chandra Bose a great representative of Bengal? And is it not a fact that, because he has carried on his investigations on the lines of Western science, he has added immeasurably to the lustre of Bengal? Let me put it in another way. Would that great man Raja Ram Mohan Roy have ever been the great man that he was—the great Bengali that he was—if he had not drunk deep of the wells of Western thought?"

এই উক্তির মর্ম্ম এই যে, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সার জগদীশচন্দ্র বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি যদি পাশ্চাত্য জ্ঞান মণ্ডিত না হইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা এমন প্রথিতযশাঃ হইতে পারিতেন।

তাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া কি দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন নাই ?

অতএব—

"My advice to you, gentlemen, is this, that you should tread the golden path of the happy mean. Take a discriminating and intelligent interest in your Western studies, but do not cut yourselves adrift from the spiritual instinct which are your immortal birthright, and do not jump to the conclusion, as is so often done quite wrongly, that the culture and civilisation of the West is built up upon a purely materialistic basis. No, you may benefit by all the ins-truction on western art and western thought which you will get in this University ; and I would beg you each man according to his ability, to play his part in weaving the golden threads of Indian idealism into the more sombre warp of western empiricism, for in that way he will play his part, a worthy part in weaving under Providence that great cosmic pattern which embodies the strivings and achievements and which represents the evolution not of this people or of that country, not of this race or of that race, but of mankind."

অতএব, আপনাদিগকে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, আপনারা কোন কিছুতেই বাড়াবাড়ি করিবেন না; সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও প্রকৃষ্ট পথ যে মধ্যপথ, তাহাই অবলম্বন করিবেন। বেশ বুঝিয়া-সুঝিয়া, বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক পাশ্চাত্য জ্ঞানলাভের জন্য অভিনিবিষ্ট হইবেন; কিন্তু এ কথা কিছুতেই ভুলিবেন না যে, আপনারা এক আধ্যাত্মিক জাতির সন্তান; আপনারা সেই পবিত্র আধ্যাত্মিক পথ হইতে বিচ্যুত হইবেন না—আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই উত্তরাধিকার হইতে নিজেদিগকে বঞ্চিত করিবেন না; আবার সেই সঙ্গে-সঙ্গে তাড়াতাড়ি এ সিদ্ধান্তও করিয়া বসিবেন না যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান [illegible] জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি বলিতেছি, পাশ্চাত্য সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাহা আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হয়, তাহাতে আপনাদের যথেষ্ট উন্নতি হইবে; আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের স্বর্ণ-সূত্র আপনারা গলদেশে ধারণ করিবেন। এই দুইয়ের—পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জ্ঞানের সমভাবে আলোচনা করিয়া আপনারা যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিবেন, তাহাই উন্নত জ্ঞানের চরম আদর্শ হইবে,—তাহা কোন সম্প্রদায়, কোন জাতি-বিশেষের নহে,—তাহা সমগ্র মানব জাতির আদর্শ হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদাশয় ভাইস্-চেন্সেলর মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় একটি অতি সুন্দর ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। যে সমস্ত ছাত্র দুই দুইবার প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিতে আসিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে এবং কয়েকদিন পরে পুনরায় পরীক্ষা প্রদান করিতে আসিবে, তাহারা সকলেই সম্পন্ন পরিবারের ছেলে নহে; আমাদের বিশ্বাস তাহাদের অর্দ্ধাংশেরও উপর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ও দরিদ্রের সন্তান। তিন-তিনবার অর্থব্যয় করা অনেক পিতামাতা বা অভিভাবকের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য; এমনও অনেক ছাত্র আছে, যাহারা পরের সাহায্যে এই ভার বহন করিয়া থাকে। এই দরিদ্র ছাত্রদিগের পাথেয়ের সাহায্য করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয় চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন; তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে সকলের সম্মুখে উপস্থিত। কেন দুই দুইবার পরীক্ষা হইল না, কাহার দোষে এমন কাণ্ড হইল, ইহার জন্য দায়ী কে, এ সমস্ত কথার বিচার সকলে, যখন করিতে হয় করিবেন; কিন্তু এই দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যের জন্য সকলেরই মুক্তহস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি, সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের এ চেষ্টা সফল হইবে, এই সাহায্য-ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থ প্রদত্ত হইবে; দেশের ধনী ও পদস্থ মহোদয়গণ কেহই সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

তারা-তলা

[শ্রীবিধুভূষণ বসু]

একবার গঙ্গাস্নানের পরম পুণ্যময় অর্দ্ধোদয় যোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। পুণ্য-পিপাসু বহু নরনারী দুই মাস আগে থাকিতে সাজিতে লাগিলেন। তখনও বাষ্পীয়-যান এদেশে আসিয়া পৌছিতে পারে নাই। তখনকার তীর্থ-দর্শন এখনকার 'স্থের হাওয়া-পরিবর্ত্তন বা দেশ-ভ্রমণ নয়; তীর্থ-যাত্রার পূর্ব্বে সংসার-যাত্রা হইতে অবসর লইয়া যাইতে হইত। এবারকার অর্দ্ধোদয়ে বলবানেরা পাথেয়-সহ পুটলি বাঁধিয়া পদ-ব্রজে যাত্রা করিলেন; সঙ্গে দুই-একজন গত-যৌবনা রমণী ছিলেন। বিশ-ত্রিশ দিন পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ-দর্শন করিবার মতন সামর্থ্য তখনকার অনেক মহিলারও ছিল। যাঁহারা ধন-হীন অথচ দুর্ব্বল, তাঁহারা উদ্দেশে গঙ্গার পায়ে প্রণাম করিয়াই নিরস্ত হইলেন; ধনবানেরা নৌকা সাজাইলেন; সাধারণ লোকেরা দশ-জনে মিলিয়া "পলোয়ারি" নৌকা ভাড়া লইয়া, চাল, চিঁড়া, কাঠ, পাত গোছাইয়া 'গঙ্গাপ্রতি হরিধ্বনি বল' বলিয়া নৌকা খুলিলেন।

তারা বাল-বিধবা—ব্রাহ্মণ-কন্যা, যুবতী। শ্বশুরকুলে তেমন আত্মীয় কেহ নাই,—পিতা-মাতাও নাই; ভ্রাতার সংসারেই তারার দুটি হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা হয়। তারা—ভাইয়ের গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ করেন, বাগানে গিয়া কাঠ কুড়ান, গোশালায় গাভীদিগের তত্ত্ব লন, ভ্রাতৃ-বধূর পুত্র-কন্যাগুলিকে কোলে পিঠে করেন। ইহার মধ্যে অবসর করিয়া, রাত্রি জাগিয়া পৈতা তুলেন, কাঁথা সেলাই করেন,—ইহাতে কিছু-কিছু উপার্জ্জন হয়—তাহার কড়া-ক্রান্তি হিসাব করিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-বধূ বুঝিয়া লন। কিন্তু তবু ভাগ্যহীনা তারা ভ্রাতৃ-বধূর সুনয়নে থাকিতে পারেন নাই; সুতরাং ভ্রাতার কাছে আশানুরূপ প্রীতির সান্ত্বনা তাঁহার পক্ষে দুর্লভ। দগ্ধাদৃষ্টা ভগিনীর হবিষ্যা-ন্নের ভারটা ভ্রাতার কাছে নিতান্ত গুরু বলিয়াই বোধ হইত, এবং ইহা যে নিতান্ত অপব্যয়,—তিনি স্পষ্ট-বাদী বলিয়া প্রায়ই তাহা ব্যক্ত করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে প্রাণপণ সংযম-প্রতিরোধ সত্ত্বেও, নিরাশ্রয়া বিধবার চক্ষে যে দুই-একটী বারিবিন্দু ফুটিয়া উঠিত, তাহা দেখিতে পাইলে স্পষ্টবাদিনী ভ্রাতৃবধূ স্পষ্ট কথা বলিতেন, "এমন করিলে অন্যত্র স্থান দেখাই ভাল; গৃহস্থের সংসারে এমন রাত্রিদিন চোখের জল ফেল্‌লে, সে ঘরের কি আর ভাল আছে? ছুতায়-নতায় যদি চোখের জল গলে পড়ে, তবে নিজে একটি রাজত্ব নিয়ে বস্‌লেই হতো।" অভ্যাস করিলে লোকে বিষ খাইয়াও হজম করিতে পারে। ভ্রাতৃ-বধূর সাদর সম্ভাষণগুলি তারা বেমালুম পরিপাক করিতে অভ্যস্তা হইয়াছেন। তারা একটি সান্ত্বনা হৃদয়ে পুষিয়া রাখিয়াছেন,—আর কতদিনই বা?—আমি ত চিরকাল এ পৃথিবীতে থাকিতে আসি নাই? সকলে অনাদর করুক, মৃত্যু কাউকে অনাদরে ফেলে যায় না।

সংসারে তারার আশাও ছিল না, লোভও ছিল না। কিন্তু অর্দ্ধোদয়ের গঙ্গাস্নানের অক্ষয় পুণ্যের প্রলোভন সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে বড় কঠিন হইল। পাড়ার কয়েক-জন মিলিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিয়াছে; জন-প্রতি দুই টাকা খরচ; তারার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ তীর্থ-যাত্রা করিবেন; তারাকে বাড়ীতে থাকিয়া ছেলে-মেয়ে ও গাভীগুলিকে দেখিতে হইবে; এইরূপ বন্দোবস্তে সব স্থির হইয়াছে।

তারা এইবার ভ্রাতার আদেশ অমান্য করিয়া বসিলেন। তিনিও গঙ্গাস্নানে যাইবেন,—একান্ত নির্ব্বন্ধ। কিন্তু তাঁহার খরচ,—এই দু' টাকা নৌকা-ভাড়া, আর পথে খাবার খরচ, তীর্থের খরচ, এ সব কে কুলাইবে? ভ্রাতার অসাধ্য। তারা নেত্র-নীরে মাটি ভাসাইয়া জিদ করিয়া বলিলেন, "কে জানে? আমি যাইবই। আমি তোমাদের সবার কাছে ভিক্ষা চাই, আমার পথের খরচটি মাত্র চালিয়ে দাও, তীর্থে কোন খরচ আমার লাগিবে না।" দশজনের দয়া হইল, সকলে তারার ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন; বিনিময়ে তারাকে কেবল যাত্রীদিগের দু' সন্ধ্যা রান্না করিয়া দিতে হইবে। তারা সানন্দে রাজি হইলেন। বিশ বছর ভ্রাতার পরিচর্য্যা করিয়া কিছু মাত্র পারিশ্রমিক মিলিল না,

আর দশদিনের পরিচর্য্যায় যদি এমন বাঞ্ছিত মূল্য লাভ হয়, ইহার চেয়ে সুযোগ আর কি হইতে পারে?

তারার ভ্রাতা বড় মুস্কিলে ঠেকিলেন। তাঁহাদের তীর্থ-দর্শন যে পণ্ড হইতে যায়। ছেলে-মেয়ে, সংসার, গৃহস্থালী কাহার কাছে রাখিয়া যান? বধূ বলিলেন, "যাবে যাক্, এ পুরীতে আর আস্‌তে হবে না। ছিঃ! ভদ্রঘরের বিধবার এত সাহস?" তারা এ শাসনও মানিলেন না। বলিলেন, "আমি ফির্‌ব ব'লে যাচ্ছি না বউ! এই যাত্রা আমার শেষ যাত্রা।"

তীর্থের নাম করিয়া সাজ-সজ্জা গোছান হইয়াছে; অগত্যা ছেলে-মেয়েগুলিকে তাহাদের মাতুল-গৃহে, গরুক'টিকে একটা রাখালের হাতে ও বাড়ীর ভার পড়শীর উপর দিয়াই যাইতে হইল। কিন্তু ছেলে-মেয়ে মাতুলগৃহে রাখিতে গিয়া আর এক বিপদে ঠেকিতে হইল। ছেলের মাতামহী জামাতাকে বলিলেন, "বাবা, আমার ত আর সাথী-সঙ্গতি নাই, তোমরা যাচ্ছ, আমিও তোমাদের সাথে গিয়ে একটু গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে গর্ভপাতকটা দূর করে আসি।" মুস্কিল হইলেও এ অনুরোধ এড়ান যায় না। পত্নীর গর্ভধারিণীকে তীর্থে লইয়া যাইয়া, ব্যয়টা তাঁহার কাছে থেকে লওয়াটাই বা কেমন হয়? যত অনর্থের মূল তারা; পথে ওলাউঠা হয়ে মরলেই আপদ চুকে যায়।

যাত্রীরা মহানন্দে গঙ্গার জয়-ঘোষণা করিয়া নৌকা খুলিয়া দিলেন।

তারার স্নেহশীতল পরিচর্য্যায় গঙ্গা-যাত্রীদিগের নৌকা-বাস গৃহবাস অপেক্ষা আরামের বোধ হইল। বড় আনন্দে, বড় মনোযোগে তারা সকলের সেবা করিতেছেন। তারা একাকিনী জল তোলেন, বাসন মাজেন, রান্না করেন, মায়ের মতন হৃদয় লইয়া সকলকে ভোজন করান। এ সব কাজে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে কাতর হওয়া দূরের কথা, তারা বরং বড় আনন্দই পাইতেছেন। নৌকার মাঝি-মাল্লারাও তারার উপেক্ষার পাত্র নয়।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিতে এখনও তিন দিন বাকি। এক সপ্তাহ নৌকার থাকিয়া যাত্রীরা হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছে। কাহারও অসুখ করিয়াছে, কাহারও পীড়া হইয়াছে। দুই-এক নৌকায় ওলাউঠায় কাহারও তীর্থযাত্রা পথিমধ্যেই সাঙ্গ করিয়াছে, এমন খবরও পাওয়া যাইতেছে। কোনও নৌকায় চোর-ডাকাতেরও অত্যাচার হইয়াছে। তবু ধর্ম্মের উপর বিশ্বাস অটল রাখিয়া, ঘন-ঘন "গঙ্গাপ্রতি হরিধ্বনি বল" ধ্বনিতে দুই কূল প্রতিধ্বনিত করিয়া যাত্রিগণ উৎসাহ-ভরেই চলিতেছে। তীরে-তীরে পল্লীবাসীরা দাঁড়াইয়া দেখিতেছে; কেহ হাসিতেছে, কেহ নৌকা ও যাত্রীর সংখ্যা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছে, কেহ বা পুণ্যপিপাসু যাত্রীদিগের দর্শনও পুণ্য-বিধায়ক ভাবিয়া এ সময়-ক্ষেপের সার্থকতা বুঝিয়া লইতেছে।

এক বহরে শতাধিক যাত্রীর নৌকা চলিতেছিল। নদী-তীরের একস্থানে উন্মুক্ত বিস্তৃত প্রান্তর-প্রান্তবর্ত্তী একটি বিশাল বটবৃক্ষের পার্শ্বে নৌকাগুলি একে-একে ভিড়িল। পাক করিয়া খাইবার ও বিশ্রাম করিবার উৎকৃষ্ট স্থান। নৌকায়-নৌকায় বিভিন্ন পল্লীর যাত্রীদিগের সহিত পরস্পর সৌহৃদ্য জন্মিয়াছে। ইহার মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বয়সে ও বুদ্ধিতে প্রবীণ, তাঁহাদিগকে আর সকলে কর্ত্তা করিয়াও লইয়াছে। বাঙ্গালী সময়মত প্রবীণের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। কর্ত্তারা এই স্থানই মনোনীত করিলেন। নৌকা হইতে এক-এক জন "থন্তা" হাতে কূলে লাফাইয়া পড়িল। সারি-সারি উনুন খোঁড়া হইল। কেহ চাল আনিল, কেহ ডাল আনিল, কেহ কাঠ আনিল। একজন ভাত চড়াইল, আর পাঁচজন তদ্‌বির করিতে লাগিল।

জ্যোৎস্না রাত্রি,—একধারে জ্যোৎস্না-দীপ্ত তরঙ্গলীলায় নৃত্য করিতে-করিতে নদী কত সৌন্দর্য্য, কত ভাব, কত আরাম বিলাইয়াই চলিতেছে; আর এক ধারে দূর-বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তর,—চৈত্রের শেষে শন্-শন্ শব্দে বায়ু-তরঙ্গ জ্যোৎস্না-তরঙ্গকে যেন ঠেলিয়া চলিতেছে। ইহার মধ্যে যাত্রীদিগের সারি-সারি লণ্ঠনের আলো ও উনুনের রশ্মি যেন রাজপ্রাঙ্গণে উৎসবের রজনী সাজাইয়াছে! সকলের প্রাণেই উৎসাহ, আনন্দ!

সকল নৌকার এক ব্যবস্থা,—কিন্তু তারার নৌকার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। সকল নৌকার যাত্রীরা সবায় মিলিয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া, গোছাইয়া খায়; কিন্তু তারার নৌকায় তারা দাসী হইয়া আসিয়াছেন, তারায় একাকীই সব করিতে হয়। তারা জল তুলিলেন, উনুন জ্বালিলেন, রান্না চড়াইলেন, কিন্তু আজ যেন তিনি বড় দুর্ব্বল। হাত-পা যেন চলিতে চায় না। দুই-একবার বলিলেন, "আমার

আজ কেমন অসুখ করছে।” তাঁহার সুখ-অসুখের কথা শুনিবার জন্য কেহই উৎকর্ণ হইয়াছিল না। পরন্তু একজন বলিলেন, “কি গো, আজ আমাদের অন্নপূর্ণা ঠাকুরাণীর ডাল যে এখনও গলে নাই।” যাহা হউক তারা আজ বড় কষ্টে রান্না শেষ করিলেন। রান্না আজ ভাল হইল না; কেহ-কেহ ধমকাইয়া বলিল, “রাঁধুনীর আজ দশাটা হয়েছে কি? জিনিসগুলিই নষ্ট করে ফেলেছে।”

সকলের আহারাদি শেষ হয় নাই, এমন সময়ে তারা একবার বমি করিলেন; পরক্ষণেই দাস্ত। সকলেই বুঝিল তারার ওলাউঠা হইয়াছে! ভাই সঙ্গে ছিলেন, ভগিনীর অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “আমি ত সেই সময়ে বলেছিলাম, এসো না। এখন যত বিপদ আমার ঘাড়ে।”

তারা আর বসিতে পারিলেন না, সেই নদী-তীরে তৃণের উপর পড়িয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিলেন। যাত্রীরা সকলেই ভীত হইলেন। তাড়াতাড়ি সকলে আহারাদি সম্পন্ন করিলেন। কেহ বা আহারের লোভ এ রাত্রির মত সংযত করিলেন। সকলেই যত শীঘ্র সম্ভব একে-একে নৌকায় চড়িলেন। তারা তখন নদী-তীরে পড়িয়া রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন,—তীর হইতে নৌকায় যাইবার মত শক্তি আর তাঁহার নাই। নৌকায় গিয়া যাত্রীরা কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন। এইরূপ রোগীকে নৌকায় তোলা সকলের পক্ষেই বিপজ্জনক। তারা ত বাঁচিবেই না; সুতরাং বহু প্রাণ রক্ষার জন্য তারাকে এইস্থানে ত্যাগ করিয়া গেলে নিষ্ঠুরতা হইবে বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন যে উপায়ান্তর নাই। তারার ভাই আছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে সঙ্গে থাকিয়া তারার শুশ্রূষা, চিকিৎসা করিতে পারেন। ভাইএর এত সাহস বা ইচ্ছা হইল না। অনাথা, সংসার-পরিত্যক্তা তারার জন্য আত্মজীবন বিপদাপন্ন করিবে, এমন বুদ্ধিহীন সেখানে কেহ ছিল না।

একে-একে মাঝিরা নৌকায় “পাড়া” তুলিল। আর কতক্ষণ? দু'চারি দণ্ডের মধ্যেই তারার প্রাণ-বায়ু ছুটিয়া যাইবে! এতটুকু সময়ের জন্য একটু পিপাসার জল রাখিয়া যাইতেও তারার স্বজনেরা ভুলিয়া গেলেন। তারাকে যে জন্মের মত ত্যাগ করিয়া চলিল, তাহা কেহ তারাকে বলিয়াও গেল না। বোধ হয় লজ্জা বোধ হইতেছিল। সেই গভীর রাত্রিতে জনশূন্য নদী-সৈকতে মরণাপন্না তারা একাকিনী ভূলুণ্ঠিতা। দারুণ পিপাসা তাঁহার কণ্ঠ, তালু বক্ষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতেছিল; কিন্তু কে তাঁহাকে এক বিন্দু পিপাসার জল দিবে? মুমূর্ষু পীড়িতকে পথে কুড়াইয়া পাইয়া আপন শয্যায় আশ্রয় দেয়, সেও মানুষের লীলা,—আর মুমূর্ষুকে প্রাণভয়ে পথে ফেলিয়া যায়, এও মানুষের লীলা। এই মানুষ দেবতা,—এই মানুষ রাক্ষস!

তখনও আকাশে চন্দ্র হাসিতেছিল; এই নিদারুণ সময়েও অভাগিনী তারা দূরগগনগামী অস্তোন্মুখ চন্দ্রের প্রতি চাহিলেন! তাঁহার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে,—অত দূরে দৃষ্টি যেন আর চলে না। তবু বড় কষ্টে, বড় চেষ্টায় চন্দ্রের পানে চাহিলেন! আর ত কেহ নাই; যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ একজনের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া জীব যে থাকিতে পারে না! তারা চন্দ্রের প্রতি চাহিয়াই অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, “ঠাকুর, তুমি আকাশের দেবতা, আমি যে, গঙ্গা দর্শন করিতে, গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছিলাম তাহা ত তুমি জান দেবতা! আমার সে আশা কি পূর্ণ হইবে না? মা-গঙ্গা কি আমায় কৃপা করিবেন না? একটু গঙ্গাজল কি আমার মুখে পড়িবে না? আমার বুক যে তৃষ্ণায় ফাটিয়া যাইতেছে!”

তারার কাতর প্রার্থনায় বুঝি দেবতার হৃদয় গলিল—দেখিতে-দেখিতে গগন-প্রান্তর কম্পিত করিয়া ভীষণ নাদে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। বিশ্বপ্রলয় কামনা করিয়াই যেন বাতাস উন্মত্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। তীক্ষ্ণ শরাঘাতের ন্যায় বায়ু-তাড়িত বৃষ্টিধারা মুমূর্ষু তারার অঙ্গে পতিত হইতে লাগিল! এক, দুই, তিন--অনেক বিন্দু তারার শুষ্ক অধরে বর্ষিত হইল!

তারার পিপাসা শান্তি হইল; দুঃসহ ব্যাধি-যন্ত্রণাও যেন মৃদু হইয়া আসিল। শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া আসিল! কিন্তু দেহ যেন আরও অবসন্ন হইয়া পড়িল, জীবনী-শক্তি যেন ক্ষীণতর হইয়া আসিল। ঝড় বৃষ্টি থামিল, কিন্তু তারার যেন আর বিলম্ব নাই। তারা অনন্যমনা হইয়া ক্ষীণ শক্তি ইষ্ট-স্মরণে নিয়োজিত করিলেন।

তারার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল! সেই অবস্থায় তন্দ্রা-বশীভূত হইয়া তিনি স্বপ্ন দেখিলেন,—বড় সুন্দর, অলৌকিক অপার্থিব স্বপ্ন! মহাগিরির হৈমশিখর হইতে রজত-বরণ গঙ্গা-প্রবাহ মনোহর তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়া আসিতেছে! তাহা

হইতে স্নিগ্ধ মধুর সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া চারিদিক আলোকিত করিয়াছে। বিমল-পুলক-সঞ্চারী অপূর্ব্ব সুগন্ধ বিস্তারিত হইয়া চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল! অকস্মাৎ গঙ্গাতরঙ্গ অপসারিত করিয়া হৈমকিরীটিনী মহামহিমময়ী দেবী-মূর্ত্তি! কে ইনি? এই ত সেই মকর-বাহিনী ত্রিতাপতারিণী মা গঙ্গা! তারা ভক্তি-বিবশ-চিত্তে দেবীকে প্রণাম করিলেন। দেবী যেন তরঙ্গাসন ত্যাগ করিয়া স্নেহসরস মধুর ভঙ্গিমায় তারার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং করুণ-কোমল হাস্য বিকসিত করিয়া কহিলেন, "তারা, মা, আমি আসিয়াছি। তোমার পিপাসা দূর হইয়াছে ত? গঙ্গাস্নান ত হইয়া গেল তারা!"

তারা আবেগভরে দেবীর চরণ স্পর্শ করিতে যাইতে-ছিলেন। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তারা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে। রজনীর দুর্য্যোগান্তে প্রভাত-প্রভা বড় সুন্দর ফুটিয়াছে। তারার পুলক-কণ্টকিত দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হইল, কিন্তু উঠিবার-বসিবার মতন শক্তি তাঁহার নাই। রোগযন্ত্রণা নাই, কিন্তু অতি দুর্ব্বল, অধিকন্তু প্রবল ক্ষুধানল যেন তাঁহার পাকস্থলী দগ্ধ করিতেছিল। হিন্দু বিধবা তারা ক্ষুধা সহ্য করিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এ ক্ষুধা ত অসহ্য! এই নির্জ্জন নদী-তটে সকল-ছাড়া হইয়া, এত বড় রোগে যখন মরি নাই, তখন এখন কি মরিব? যিনি তৃষ্ণার জল দিয়াছেন,—রোগের ঔষধ দিয়াছেন,—এমন সুখের স্বপ্ন দিয়াছেন, তিনি কি আমার ক্ষুধার অন্ন দিবেন না?

একটু বেলা হইলে দুইটী কৃষক-বালক দুধের ভাঁড় লইয়া দুধ বেচিতে যাইতেছিল। তাহারা নদীতটে অবসন্না তারাকে দেখিয়া ভয়ে-ভয়ে কৌতূহল বশে আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল! আহা! এমন সুন্দর মেয়ে! এখানে কেন? ওর বুঝি ব্যায়রাম? "তুমি এখানে কেন গো?" বালকদের কণ্ঠস্বর দয়ামাখা! তারা অন্য পরিচয় না দিয়া বলিলেন, "আমার বড় ক্ষুধা,—আমায় কিছু দুধ দাও না! আমি অনাথা, আমার পয়সা নাই।" বালকদ্বয় ফাঁফরে পড়িল। তাহাদের মাপা দুধের যতটুকু ইহাকে দিয়া যাইবে, বাজারে গিয়া ততটুকু দাম কম পাইতে হইবে। বাড়ীতে গেলে পিতা রাগ করিবেন, হয় ত মারিতেও পারেন! কিন্তু এমন লোকে এমন করিয়া চাহিলে কি না দিয়া পারা যায়? বালকেরা ভাঁড় হইতে "চোঙ্গায়" ঢালিয়া কিছু দুধ তারাকে খাইতে দিল। তার পর তাহারা দুইজনে ধরিয়া পীড়িতাকে নিকটবর্ত্তী বটবৃক্ষের ছায়ায় রাখিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "আবার বাজার হইতে ফিরিবার সময়ে তোমাকে দেখিয়া যাইব।"

দুগ্ধপানে তারাদেবীর ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল, শরীরে বল আসিল। উঠিয়া সমীপবর্ত্তী বৃক্ষতল পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে পারিলেন। তারা বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিলেন, সংসার করুণাময়ের রাজ্য, চারিদিকেই করুণা; কাউকে নিরাশ্রয়ে মরিতে হয় না। দয়াময়! কত তোমার দয়া! তারা সংসারে কেবল করুণাই দেখিতে লাগিলেন। আকাশে করুণা, প্রান্তরে করুণা, নদীর তরল বক্ষে করুণা-তরঙ্গের লীলা, প্রভাত-সূর্য্যের স্বর্ণরশ্মি করুণারই জ্যোতিঃ বিলাইয়া যাইতেছে। পল্লী-প্রান্তে স্বর্ণরবিকরদীপ্ত তরুরাজি করুণার ছায়া পাতিয়া রাখিয়াছে; পক্ষিকুলের কলনাদে করুণারই গান গীত হইতেছে! এমন করুণার সংসারে মানুষের অভাব কি? সেই বৃক্ষতলে মৃত্তিকা-শয়ন তারাদেবীর কাছে বড় আরামের বোধ হইল।

বেলা দুই-প্রহর হইবার পূর্ব্বেই অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, যুবা দল বাঁধিয়া আসিয়া তারাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দুধ, চিনি, কলা, পেঁপে প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিল। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, "মা! তোমায় আমরা চিনিতে পারি নাই; তুমি কোন্ দেবতা, পরিচয় দাও; এই অজ্ঞান বালকদিগের অপরাধ ক্ষমা কর।" সেই দুইটী দুধওয়ালা বালক যোড়-করে তারাদেবীর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারাদেবী বিস্মিত হইলেন। তাঁহার জীবনদাতা সেই দুটী কৃষক-বালককে হস্ত ধরিয়া কাছে বসাইয়া, তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ক্রমে কথাবার্ত্তায় বুঝিলেন, তিনি যে দুটী বালকের দুধ চাহিয়া পান করিয়াছিলেন, বাজারে গেলে তাহাদের দুধ বিন্দুমাত্রও কম হয় নাই। প্রত্যহ বাজারে মাপিয়া যতটুকু হয়, আজও তাহাই হইয়াছে। তাহাতেই তাহারা তারাকে কোনও অমানুষিক শক্তি-সম্পন্না দেবী বলিয়া মনে করিয়াছে। এমন রূপবতী রমণীকে এইরূপ অসম্ভব অবস্থায়

এখানে দেখিয়া, তাহারা পূর্ব্বেই সন্দেহ করিয়াছিল,—ইহার মধ্যে না-জানি কি কাণ্ড আছে!

তারাদেবী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন,—কিন্তু অবিশ্বাস করিলেন না। এও করুণাময়ের করুণা! এই দুর্গমেও যিনি এমন সহজে আমার তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন, রোগের ঔষধ যোগাইয়া দিলেন, তিনি সরল-প্রাণ এই বালকদের করুণার পুরস্কার না করিবেন কেন? হে করুণাময়! তোমার করুণার ভার অপসারিত কর।—আমি যে আর ভার লইতে পারি না। তারার রোগশীর্ণ গণ্ড বহিয়া ধারার পর ধারা ঝরিতে লাগিল!

পল্লীবাসী কেহই বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, তারা সামান্যা মানবী। অনেকেই তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইতে অভিলাষ করিলেন; তারা সম্মত হইলেন না। লোকালয়ের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে যাইতে আর তাঁহার ইচ্ছা নাই। এই অনন্ত, উদার আকাশতলে মুক্ত প্রান্তর সীমায় তটিনী-তটবর্ত্তী এই বৃক্ষতলেই বিশ্বের করুণা অবাধে অবিরামে ঝরিতেছে! এই স্থানেই বসতি করিব; ইহা ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইব না! এই বৃক্ষতলে, ঐ মেঘ-খচিত নীলাকাশে চাহিয়া, ঐ কলনাদী তরঙ্গিনীর শিকর-সিক্ত সমীরণে মরিতেই বা কি সুখ! এইখানেই মরিব, কোথাও যাইব না।

সেই বৃক্ষতল তারার আশ্রম হইল। এখন আর তাহা জনশূন্য রহিল না। এক দল যায়, আর এক দল আইসে। ভাঁড়ে-ভাঁড়ে দধি, দুগ্ধ, চিনি, বাতাসা, নারিকেল, কদলী প্রভৃতির ভোগ আসিতে লাগিল। তারাদেবী কাহারও দান প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তিনি দেবী নন, মানবী—তাহাও কাহাকেও বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন না। এই সরল-প্রাণ কৃষক নরনারীর মনের বিশ্বাস টুটাইয়া লাভ কি? অথবা করুণাময় যদি মানবীকে দেবীত্ব দান করিতেই অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে তাহাই বা প্রত্যাখ্যান করিবেন কেন? তারা ভোগের দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সকলকে কাছে বসাইয়া, তাহা বাঁটিয়া দিলেন। সকলে প্রসাদ পাইয়া তুষ্ট হইল।

সেই বট-বৃক্ষতলে তারার কুটীর রচিত হইল। সকলে সুন্দর করিয়া পর্ণগৃহ প্রস্তুত করিয়া দিল। তারা গৃহমধ্যে বাস করিলেন না,—এমন অনন্ত মুক্ত করুণার জগৎ ছাড়িয়া তাঁহার কুটীরের সঙ্কীর্ণ ছায়ায় যাইতে ইচ্ছা হইল না। নদী-লহরী-চুম্বিত সেই বট-বৃক্ষমূল দেবীর পরম সুখ-নিবাস হইল। তারাদেবী জীবনের অবশিষ্ট কাল সেই নিঃসঙ্গ প্রান্তরেই যাপন করিবেন, স্থির সঙ্কল্প করিলেন। দলে-দলে লোকে আসিয়া তাঁহাকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে লাগিল। কত রুগ্ন তাঁহার আশীর্ব্বাদ চাহিল, কত দুঃস্থ ধনবর, কত বন্ধ্যা পুত্রবর, কত বিপন্ন বিজয়-বর চাহিল! তারাদেবী ইষ্টের নামে সকলকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। মানুষের পূজা-ভক্তিতে তারার মানবী হৃদয় ফুটিয়া উঠিল। তিনি আর অবলা, অবরোধবাসিনী, অনাথা, বঙ্গরমণী রহিলেন না,—অতি সবলা মহিমার মূর্ত্তি—দেবী-শক্তির অধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন। নিরক্ষর কৃষকদিগের গৃহে-গৃহে ঘুরিয়া তিনি স্নেহধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রীতি-প্রফুল্ল মুখ দর্শনে কত ব্যথিতের ব্যথা দূর হইল, তাঁহার পীযূষবর্ষী মধুর সান্ত্বনা-বাক্যে শত-শত শোকাতুরের শোকানল নিবিয়া গেল। তাঁহার জন্য আহরিত দ্রব্যসম্ভারে বহু ক্ষুধিতের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল। তারার বৃক্ষতল তীর্থে পরিণত হইল। তারা প্রাতঃ-সন্ধ্যায় আকাশপানে চাহিয়া যুক্তকরে কেবল এই কথাটাই বলিতেন, "হে অনাথের নাথ! আবার তুমি এ কি করিলে? আমি ত এত চাহি নাই।"

তারার বটতলায় সর্ব্বদাই আনন্দের মেলা। বালকেরা সেই স্থানেই খেলার মাঠ করিয়াছে। যুবকেরা সেইখানেই কীর্ত্তনের আথ্ড়া দেয়। মেয়েরা পাল-পার্ব্বণে সেইখানে আসিয়া ভোগ দেয়, গান করে। বৃদ্ধেরাও সেইখানে সমবেত হইয়া ধর্ম্মের কথা, পৌরাণিক উপাখ্যান, রামায়ণ মহাভারত ব্যাখ্যা করেন। প্রতি মাঘী-পূর্ণিমায়, পাঁচগ্রামের লোকে মিলিয়া তারা-তলায় মেলা বসায়। সাত দিন পর্য্যন্ত আনন্দ উল্লাসের অফুরন্ত তরঙ্গে পল্লীগুলি যেন নাচিয়া উঠে।

সে কতকালের কথা,—তারা রক্তমাংসের দেহধারিণী মানবীই ছিলেন,—জরা-মৃত্যুর অধীন। অনেক দিন হইল তিনি সংসার-লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দেবীত্বের লীলা সে তারা-তলা হইতে অপসারিত হয় নাই। সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী কত দেবমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে; ভক্তেরা এখনও সেই বৃক্ষমূলে দধি দুগ্ধ চিনি ঢালিয়া দেয়। এখনও মাঘী-পূর্ণিমায় তেমনি মেলা বসে এবং তেমনি ভাবে বহু নরনারী সেই পল্লী-প্রবাহিনীর জলে তীর্থ-স্নান করিয়া থাকে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

ভাষার কথা

সবুজ।—সাধু ভাষার পক্ষ নিয়ে যাঁরা লড়্‌ছেন, তাঁরা কেবল গোলোযোগে গলাযোগ কচ্ছেন মাত্র,—আমাদের কোনো কথারই সদুত্তর দিতে পার্‌ছেন না!

অসবুজ।—আপনাদের কোন্ কথাটার সদুত্তর দেওয়া হয় নাই, বলুন! আপনিও অপবাদ দিতেছেন আমরা 'গোলোযোগে গলাযোগ' করিতেছি, আবার রবীন্দ্রনাথও সেদিন 'সবুজ পত্রে' আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"তাঁহারা এতই বিচলিত যে, সাধু ভাষার পক্ষে তাঁহারা যে ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে বাংলা ভাষার আর যাই হোক, সাধুতার চর্চ্চা হইতেছে না।" কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কথ্য-ভাষা-লেখকদের লেখার মধ্যেই কি অকথ্য ভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত বড় বিরল? এই যে সেদিন 'ভারতী' আমাদের উদ্দেশে 'রাম ছুঁচো' 'বাছুড়' 'ভুঁইফোড় লেখক' 'ধুরন্ধর সমালোচক' প্রভৃতি কত কথা বলিলেন, সেগুলি কি তবে সাধু বাক্যের পুষ্পাঞ্জলি?

সবুজ।—যাই হোক, আমার নামে অভিযোগ এই যে আমি সাধু ভাষার উপর আক্রমণ করেছি। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নয়।

অসবুজ।—আজ্ঞে, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যাও নহে। আপনিই আপনার—'সবুজ পত্রে' বলিয়াছেন,—'দুটি ভাষার (সংস্কৃত ও ইংরাজী) মিলনে যে কিস্তৃত কিমাকার নব-ভাষার সৃষ্টি হচ্ছে তারি নাম সাধু ভাষা।'—ইহাকে 'আক্রমণ' বলিব না ত কি সাধু ভাষার গুণ কীর্ত্তন বলিব?

সবুজ।—যাই হোক, আপনারা যাকে 'প্রচলিত বিশুদ্ধ' ভাষা বলেন—তা অশুদ্ধ ও অপ্রচলিত—অর্থাৎ তা ungrammatical এবং unidiomatic.

অসবুজ।—কথাটা নূতন বটে; তবে একটু উদ্ভট রকমের! যে ভাষার সাহিত্য সমস্ত বঙ্গদেশে প্রচলিত, তাহা হইল অপ্রচলিত!—এ ভাষার কোন কোন প্রয়োগ পশ্চিম দক্ষিণ বঙ্গের মুখের (colloquial) কথায় না চলিতে পারে, কিন্তু বঙ্গের অন্য অংশে তাহা সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবে অথবা সামান্য রূপান্তরিত হইয়া এখনও চলিতেছে। এ ভাষা খুব Grammatical, তাহার প্রমাণ—এ ভাষায় উৎকৃষ্ট Grammar রচিত হইয়াছে। এ ভাষা Grammaticalও বটে, Idiomaticও বটে, তাহার প্রমাণ—পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা না করিলে এ ভাষায় ভাল লেখক হওয়া যায় না। কোন্ 'বাংলা idiom' ইহার ভিতর খাপ খাওয়ান যায় না? যদি এমন কিছু থাকে, নিশ্চয়ই তাহা idiom নহে,—slang; তাহা সাহিত্যে ব্যবহার না করাই ভাল, কারণ সাহিত্য সমগ্র বঙ্গ দেশের জন্য; প্রদেশে বিশেষের, বা সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নহে। প্রধান সাহিত্যিকগণ বলেন, সাহিত্য এমন ভাষায় রচিত হওয়া উচিত যে তাহা যথাসম্ভব সকলে বুঝিতে পারে; যাহা অনেকে বুঝিতে পারে না, তাহা উৎকৃষ্ট সংস্কৃতই হউক, আর প্রাদেশিক slangই হউক, সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

সবুজ।—যাক্—আমি আর কিছু বল্‌তে চাই নে।—সাধু ভাষার জন্মস্থান হচ্ছে ফোর্ট উইলিয়মে; সুতরাং তাকে আর আক্রমণ করা চলে না—সে যে কেল্লার ভেতরে বসে আছে!

অসবুজ।—আপনি চটিতেছেন কেন?—আপনাদের ঐ কথাও ত ঠিক নহে। রবীন্দ্রনাথও গত চৈত্রের 'সবুজ পত্রে' লিখিয়াছেন বটে,—"যাই হোক এ সম্বন্ধে আমার মনে যে তর্ক আছে সে এই—বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ তাঁরা এ ভাষার কখন মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত-ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্ব্বাসন দিয়া যজ্ঞকর্ত্তার ফরমাসে তাঁরা সোণার সীতা গড়িলেন।"—কিন্তু এ সকল কথা কি ঠিক? আপনারা যদি একবার দয়া করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান-পত্র, ভাষা পরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ ও "বৃন্দাবন লীলা" প্রভৃতি পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে আপনারা যাহা বলিতেছেন, তাহা একেবারেই ভুল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান-পত্রের ভাষা দেখুন,—"আমার বয়ঃক্রম যে হইয়াছে, তাহাকে সদর মফস্বল মলুকি কোন বিষয়ে মামলত যে আমি করি তাহার সময় নহে। পারলৌকিক যে যে ব্যাপার তাহাই আমার কর্ত্তব্য, একারণ আপনি স্বচ্ছন্দরূপে—তোমাকে সমস্ত লিখিয়া দিলাম শ্রীশ্রী৺দেব সেবা প্রভৃতি ও জমীদারী লওয়া জমা খরচ আখরা জাত ও নফা লোকসান সমস্ত তোমারই, তোমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সহিত এলাকা নাহি, প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দেবের পোষ্য অধিক এ কারণ আমার মোৎপাহেয়া সরকারে যে পাওনা আছে তাহার মধ্যে সালিয়ানা পনের হাজার তাঁহার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুৎ মহেশ দেবের দশ হাজার ও

প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুৎ ঈশানচন্দ্র দেবের দশ হাজার ও ভৈরবচন্দ্র দেবের পৌত্রপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুৎ মাধবচন্দ্রের আড়াই হাজার ও হরচন্দ্র দেবের পৌত্রপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত বজ্রচন্দ্র দেবের আড়াই হাজার একুনে এই চল্লিশ হাজার টাকা এহাদিগের খরচের নিমিত্ত মোকরার করিয়া দিলাম। এই নিয়ম যে করিলাম ইহার উল্লঙ্ঘন তাঁহারা এবং তুমি কখন-করিবে না। যদি কেহ কখন এ নিয়মের অন্যমত আচরণে উদ্যত হও, তবে লোকত ধর্ম্মত এবং হাকিমানে সে নামঞ্জুর। ইতি সন ১১৮৭ তারিখ ৯ই জ্যৈষ্ঠস্য।"—তারপর 'ভাষা পরিচ্ছেদের' ভাষার একটু নমুনা দেখুন,—"গৌতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয়। তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গৌতম উত্তর করিতেছেন পদার্থ সপ্ত প্রকার। দ্রব্যগুণ কর্ম্মে সামান্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে দ্রব্য নয় প্রকার।" তারপর "বৃন্দাবন লীলার" গদ্য-ভাষারও একটু নমুনা দেখুন,—"তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চারণ পাহাড়ি পর্ব্বতের উপরে কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ-চিহ্ন ধেনু-বৎসল এবং উঠের এবং ছেলির এবং মহিষের এবং আর আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন যে দিবস ধেনু লইয়া সেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উজান বহিয়াছিলেন এবং পাষাণ গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদচিহ্ন হইয়াছিলেন।"—বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা গদ্যের এই যে তিনটি নমুনা দেখাইলাম, ইহার প্রত্যেকটিই 'বিদেশীর ফরমাসের' পূর্ব্বে লিখিত। কিন্তু ঐ কয়টি লেখার মধ্যেই ভাষার যে ঠাট, কায়দা, ভঙ্গী ও রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 'বিদেশীর ফরমায়েসে' রচিত বঙ্গভাষার মধ্যেও আছে। পরে কেরী ও হ্যালহেড প্রভৃতি ইংরাজেরা যে বাঙ্গালা বহি লেখেন তাহাতেও ঐ ভাষা-ভঙ্গী পূর্ণ মাত্রায় প্রকট। এ ভাষার রচনা ভঙ্গী (style) হাতে হাতে পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য, এবং সে হওয়াটাও স্বাভাবিক; কিন্তু ভাষার যে একটা বাঁধা ঠাট আছে, তাহা বরাবরই একভাবে চলিয়া আসিতেছে। এই ভাষার প্রবাহে মাঝে মাঝে বন্যা আসিয়াছে, ঢল নামিয়াছে,—ফলে তাহাতে ভাষার পুষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ভাষার ঠাট-ভঙ্গীর বৈলক্ষণ্য হয় নাই।—প্রবাহ একটানা গন্তব্য পথে গিয়াছে; কিন্তু দক্ষিণ-বাহিনী উত্তর-বাহিনী হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ কেন যে এ জীবন্ত ভাষাকে 'গড়া-পেটা ভাষা' 'মেকীভাষা' প্রভৃতি বলিতেছেন, বুঝিতে পারি না। তবে এক মজার কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে প্রবন্ধে লিখনের ভাষাকে 'মেকী-ভাষা' বলিয়াছেন, সেই প্রবন্ধটিই তাঁহার কথিত 'মেকী-ভাষায়' লিখিত!

সবুজ।—আমি কিন্তু বহুকাল ধরে বাঙ্গালা কালিতেই লিখে আসছি। সে কালির ছাপ আমার লেখার গায়ে চিরদিনই রয়েছে।

অসবুজ।—এ কথাই বা কেমন করিয়া স্বীকার করি! যে বাঙ্গলা কালিতে আপনি পূর্ব্বে লিখিতেন, সেই 'কালির ছাপ' কি আপনার আধুনিক 'লেখার গায়ে' দেখিতে পাওয়া যায়? প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে, 'সাহিত্য' পত্রে আপনি 'ফুলদানী' নামে যে গল্প লিখিয়াছিলেন, সে গল্পের ভাষা-বিন্যাসের সহিত কি আপনার এখনকার ভাষা-বিন্যাসের কোনও মিল আছে? এমন কি, নয়-দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আপনি 'ভাণ্ডার' পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখনও আপনার 'লেখার গায়ে' কলিকাতার প্রাদেশিকতার চিহ্ন মাত্র দেখি নাই। তখনও আপনি 'হলুম' না লিখিয়া 'হইলাম', 'নতুন' না লিখিয়া 'নূতন', 'মন্তর' না লিখিয়া 'মন্ত্র' প্রভৃতি লিখিতেন।

সবুজ।—এতে ক্ষতি কি? আমার ভাষা আর পাঁচজনের ভাষা হ'তে ঈষৎ পৃথক। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য দোষ বলে গণ্য হ'তে পারে না।

অসবুষ। স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা দোষের নহে, স্বীকার করি। কিন্তু তা বলিয়া যথেচ্ছাচারকে 'স্বাতন্ত্র্য' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলে শুনিব কেন? রচনা-রীতির (styleএর) স্বাতন্ত্র্য বাঞ্ছনীয় এবং তাহা প্রশংসনীয়; কিন্তু তা' বলিয়া আপনারা ভাষার যে ওলট-পালট করিবেন, সেটা সহিতে পারিব না। বিদ্যাসাগরের রচনা-রীতি বঙ্কিমের রচনা-রীতি হইতে অনেক পৃথক। আবার রবীন্দ্রনাথের রচনা-রীতি (অবশ্য তাঁহার আগেকার লেখা) সম্পূর্ণ অন্যরূপ। কিন্তু এ তিনটা ভাষাই বাঙ্গালা ভাষা। এ ভাষা একেবারে প্রাদেশিকতা বর্জ্জিত। ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু আপনাদের ভাষা না বাঙ্গালার, না ঠিক কলিকাতার। সংস্কৃত পুষ্পিত, পল্লবিত শব্দের সহিত কলিকাতার 'গেছে' 'কল্লুম' প্রভৃতি মিশাইয়া এ আপনারা এক বিটকেল ভাষার সৃষ্টি করিতেছেন। 'স্বাতন্ত্র্যের' সার্টিফিকেট দিয়া ইহার সুখ্যাতি করিতে পারি না।

সবুজ।—আপনাদের নিন্দা সুখ্যাতিতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। এতে দোষ কি বলতে পারেন?

অসবুজ।—আপনাদের ভাষা আর একটু চলিলে 'মাথা' স্থলে 'মাতা' 'আছে' স্থলে 'আচে' 'পাখা' 'পাকা' ইত্যাদি পরিবর্ত্তন হইতে বেশী বিলম্ব হইবে না। 'ইচ্ছে' 'বিচ্ছে', পুণ্যি, 'ষজ্ঞি' ইত্যাদি ত আছেই। এইরূপ হইলে ভাষার ঠাট ভাঙ্গিবে। এক বাঙ্গালায় নানা ভাষার সৃষ্টি হইবে। অতীক্ষ্ণ প্রদেশের লোকে যদি বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাঁহাকে মাথায় হাত দিয়া বসিতে হইবে। যে সকল কথা বাঙ্গালার সকল অঞ্চলের লোকেই ব্যবহার করে, এবং বুঝিতে পারে, সেগুলি বাদ দিয়া নূতন কতকগুলি শব্দ, যাহা সব জায়গার লোকে ব্যবহার করে না এবং বুঝিতেও পারে না—তাহার প্রবর্ত্তন করায় লাভ কি বলিতে পারেন?

সবুজ।—তবে দেখতে পাচ্ছি যে চোখের সুমুখেই পূর্ব্ববঙ্গের ভদ্রসমাজের মুখের কথা বদলে যাচ্ছে।

অসবুজ।—চোখের সম্মুখে যাহা দেখিতেছেন, আড়ালে কিন্তু তাহা মোটেই ঘটিতেছে না। ভাষার উদ্দেশ্য লোকের নিকট

নিজের মনোগত ভাব প্রকাশ। যদি কথাচ্ছলে একজন পূর্ব্ববঙ্গবাসী তাঁহার ভাষা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিকট তাঁহার মনোগত ভাব বোধগম্য করিতে না পারেন, তবে তিনি তাঁহার ভাষা একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিকট বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু ঘরে তাঁহারা কলিকাতার ভাষার অনুকরণ করেন না। চট্টগ্রামবাসীর ঘরে চট্টগ্রামের ভাষা, ঢাকাবাসীর ঘরে ঢাকার কথাই শুনিতে পাওয়া যায়।

সবুজ।—আচ্ছা, রবীন্দ্র বাবু যে লিখেছেন,—"পুঁথির বাংলায় যে অংশটা লইয়া বিশেষভাবে তর্ক প্রবল, তাহা ক্রিয়ার রূপ। "হইবে"র জায়গায় "হবে", "হইতেছে"র জায়গায় "হচ্চে" ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনেরা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির খর্ব্বতাকে তারা মানের খর্ব্বতা বলিয়া মনে করিত। আজ যেই তাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তারা হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে আপদ গেছে। এক সময়ে ছাপার বহিতে "হয়েন" লেখা চলিত, এখন "হন" লিখিলে কেহ বিচলিত হন না। "হইবা" করিবা"র আকার গেল, "হইবেক" "করিবেক"-এর ক খসিল, "করহ" "চলহ"র হ কোথায়? এখন "নহে"র জায়গায় "নয়" লিখিলে বড় কেহ লক্ষ্যই করে না। এখন যেমন আমরা "কেহ" লিখি, তেমনি এক সময়ে ছাপার বইয়েও "তিনি"র বদলে "তেঁহ" লিখিত। এক সময়ে "আমারদিগের" শব্দটা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল, এখন "আমাদের" লিখিতে হাত কাঁপে না। আগে যেখানে লিখিতাম "সেহ" এখন সেখানে লিখি "সেও", অথচ পণ্ডিতের ভয়ে "কেহ"কে "কেও" অথবা "কেউ" লিখিতে পারি না। ভবিষ্যৎবাচক "করিহ" শব্দটাকে "করিয়া" লিখিতে সঙ্কোচ করি না, কিন্তু তার বেশী আর একটু অগ্রসর হইতে সাহস হয় না। এই ত আমরা পণ্ডিতের ভয়ে সতর্ক হইয়া চলি কিন্তু পণ্ডিত যখন পুঁথির বাংলা বানাইয়াছিলেন আমাদের কিছুমাত্র খাতির করেন নাই।"—এ কথার উত্তরে আপনারা কি বলতে চান?

অসবুজ।—রবীন্দ্র বাবু চীনেদের টিকি কাটার যে উপমাটি দিয়াছেন, তাহা সুন্দর হইয়াছে, অস্বীকার করি না। কিন্তু উপমা ত যুক্তি নহে। "হইবা" "করিবা"র আকার গেলে, 'হইবেক করিবেক' এর ক খসিলে পূর্ব্ববঙ্গবাসী বা পশ্চিমবঙ্গবাসী কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না; তাই স্বাভাবিক নিয়মে ঐ অনাবশ্যক অংশটা বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু 'করিলাম'কে 'কল্লুম' করিলে শুধু পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নহে—বর্দ্ধমানবাসীরও কর্ণে আঘাত লাগে। ক্রিয়াপদই ভাষার মেরুদণ্ড। ক্রিয়াপদকে লইয়া অতটা ভাঙ্গাভাঙ্গি করিতে নাই। লিখনের ভাষায় ঐ ক্রিয়াপদের রূপ আমরা বরাবরই একরকম দেখিয়া আসিতেছি। আগে ভাষার যে নমুনা দিয়াছি, তাহাতেও উহা প্রত্যক্ষ করিবেন। ইহার এ রূপ কে দিয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। যদি পণ্ডিতেরাই ক্রিয়াপদের ঐ আকার দিয়া থাকেন, তাহা হইলেও উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। কারণ, উহা সহজেই চলিতেছে।—"There is no appeal against the decree of usage."

সবুজ।—গিরিশ ঘোষের ও দীনবন্ধুর নাটকের অনেক স্থলে যে কলিকাতার ভাষা আছে, তা'র কি? সে বই কি বিকায় না?

অসবুজ।—কেন বিকাইবে না? নাটকের কথা স্বতন্ত্র। নাটকে শুধু কলিকাতার ভাষা কেন,—বাঁকুড়া জেলার ভাষা, উড়িয়া-ভাষা প্রভৃতি অনেক রকমের ভাষাই আছে। কিন্তু তাহা দীনবন্ধু বা গিরিশচন্দ্রের ভাষা নহে। তাঁহারা নিজের কথা যখন কিছু লিখিয়াছেন, তখন আপনাদের কথিত 'মেকীভাষাতে'ই লিখিয়াছেন।

সবুজ।—যাই হোক্, আমরা যে ভাষায় লিখ্‌ছি, সেই ভাষাতেই লিখবো।—দেখা যা'ক্, কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভেতর টেনে এনে ভাষার শক্তি ও সৌষ্ঠব বাড়ান যায় কি না?

অসবুজ।—এ experiment নূতন করিয়া করিবার প্রয়োজন দেখি না। আপনাদের অনেক পূর্ব্বে, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ খাঁটি কলিকাতার ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহার অনেকে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাষার অনুকরণ বড় একটা কেহ করেন নাই। এমন কি, স্বয়ং কালীপ্রসন্নও সে ভাষায় তার পরে আর কিছু লেখেন নাই। তা' ছাড়া, এই কথ্য ভাষার পক্ষ লইয়া আপনারাই যে আজ প্রথম তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন, এমন মনে করিবেন না। আপনারা যাহা আজ বলিতেছেন, তাহা বহুকাল হইল স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন। স্বামীজি লিখিয়াছিলেন,—"চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূত কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ব বিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। এ ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারি ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ ইস্পাৎ, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল—নকল ক'রে অস্বাভাবিক হ'য়ে যাচ্ছে। যদি বল এ কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করবো? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কল্‌কেতার ভাষা। পূর্ব্ব পশ্চিম, যে দিক হ'তেই আসুক না,

একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি, সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে।"—বলা বাহুল্য, এই সকল কথারই প্রতিধ্বনি আপনাদের লেখায় সর্ব্বদা শুনিতে পাই। কিন্তু উহার প্রায় সকল কথারই উত্তর আমরা দিয়াছি। উহার আর এক উৎকৃষ্ট উত্তর স্বয়ং বিবেকানন্দই দিয়া গিয়াছেন। সে উত্তর মুখে নহে—কার্য্যতঃ তিনি দিয়াছেন। যে ভাষাকে তিনি 'অস্বাভাবিক' বলিয়াছিলেন, সেই ভাষাতেই তাঁহার অধিকাংশ বাঙ্গালা পত্র লিখিত।—বাস্তবিক, উচ্ছ্বাস বা উদ্দীপনা প্রকাশের সময় এ 'অস্বাভাবিক' ভাষার সাহায্য না লইলে চলে না। স্বামীজি বলিয়াছেন বটে যে, "যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই,—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না।"—কিন্তু ক্রোধ বা দুঃখ কথায় জানাইবার সময় কথার সুর ও ভঙ্গী তাহার অর্দ্ধেক সহায়তা করে। কিন্তু লিখনের ভাষার প্রণালী অনেক সময় সে সুর ও ভঙ্গীর অভাব দূর করিয়া দেয়। চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতা পর্য্যন্ত অনেক লেখাতেই দেখাইতে পারা যায় যে, ঐ সুর বজায় রাখিবার জন্য 'করিব' 'বলিব' প্রভৃতি ক্রিয়াপদকে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিবেকানন্দের লেখা হইতে এ কথার ভূরি-ভূরি প্রমাণ দেখাইতে পারা যায়।

সবুজ।—তবে আপনাদের মত কি শুনি!

অসবুজ।—সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের যাহা মত, আমাদেরও সেই মত। তিনি সংযোগে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা ফেনাইয়া, ফাঁপাইয়া তাহাই বলিতেছি। তাঁহার ভাষাতেই আবার বলি যে আমাদের মত এই,—

"স্থূল কথা সাহিত্য কি জন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে বোধ হয়, এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের বোধগম্য অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য, তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে আমার গ্রন্থ দুই চারি জন শব্দ পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক আমরা কখনও যশ করিব না।

তাই বলিয়া আমরা এমন বলিতেছি না যে বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষা দান, চিত্ত সঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র—ইহাতে তত শব্দ ধন নাই।

টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। কিন্তু গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষা কুলায় না। কেন না এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্ব্বল এবং অপরিমার্জ্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্রই যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা।

বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে। যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে,—তজ্জন্য ইংরাজী, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষার প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে। অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি।"

সবুজ।—এ কথা আমি মানি নে।

অসবুজ। তবে আমরা নাচার। যিনি জাগিয়া ঘুমান, তাঁহার ঘুম কে ভাঙ্গাইবে? *

* এই রচনার মধ্যে 'সবুজে'র মুখ দিয়া যত কথা বলান হইয়াছে, তাহার প্রায় পোনের আনা কথা 'সবুজ পত্র' সম্পাদক মহাশয়ের লেখা হইতে গৃহীত। আর 'অসবুজে'র কথাগুলির কিছু-কিছু 'বঙ্গদর্শন' ও 'বিক্রমপুর' প্রভৃতি কাগজ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাদবাকী সমস্তই আমার।—লেখক।

গ্রাম্য সাহিত্যের স্বরূপ

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

'সাহিত্যে'র ধাতুগত অর্থ লইয়া মহারথীরা হাতাহাতি করুন। বড়-বড় সাহিত্যের মানোয়ারী জাহাজ ভাষার সমুদ্রে পাখা মেলিয়া ভাসিতে থাকুক; তাহার গৌরব-চ্ছটার নীচে, 'আমাদের গ্রাম্য-সাহিত্য' আমাদের পিতৃ-পিতামহ-পরিত্যক্ত বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন শান্তি-সুখ-পরিবৃত পল্লী-কুটীরের গোময়লিপ্ত আঙ্গিনাস্থিত মৃণ্ময় তুলসীমঞ্চে মৃৎ-প্রদীপের ম্লান রশ্মি বিকীর্ণ করিবে।

ঐ দূরে কি অতুল বিভবশালিনী জননী দণ্ডায়মানা

রহিয়াছেন, তাঁহার প্রসন্ন বদনে অমৃত ঝরিতেছে,—উভয় হস্তে মা বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন। মায়ের সেই জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া-দেখিয়া মুগ্ধ হই। আবার অন্য দিকে তাঁহার কি প্রচণ্ড রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি! চরণ-তলে শিব মুমূর্ষু, জগতের কল্যাণ তাঁহার পদতলে বিমর্দ্দিত, মায়ের নিবিড় বিমুক্ত কুন্তলপাশ ব্যোমপথে উড্ডীন হইয়া, নবীন মেঘের আকার ধারণ করিয়া, দিকে-দিকে, দেশে-দেশে কুলিশ বর্ষণ করিতেছে! শোণিতরাশি খর্পর পূর্ণ করিয়া ছাপাইয়া উঠিয়াছে;—মায়ের খড়্গ হইতে অবিরাম শোণিত ঝরিয়া পড়িতেছে; য়ুরোপের হৃদয়-শোণিত শোষণের জন্য যেন তাঁহার লেলিহান রসনা লক্-লক্ করিতেছে! মায়ের গলদেশে নরমুণ্ডমালা, কটিতে কর-মেখলা; তাঁহার এই দিগ্‌বসনা মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছি। য়ুরোপীয় সাহিত্যে মায়ের এই ভীষণা মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিতেছি, 'মা, এ মূর্ত্তি সংবরণ কর। বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, মিলটন্ তোমার এ মূর্ত্তি আঁকিতে পারিতেন; কিন্তু এ মূর্ত্তি থাক্। পল্লী-জননী মূর্ত্তিতে তুমি তোমার পল্লীর সন্তানগণের পূজা গ্রহণ কর। মা, আমরা তোমার পল্লীর সন্তান। পল্লীর মাতৃ-মূর্ত্তিতে একবার আমাদের মানস-নেত্রে আবির্ভূতা হও। জননীর সুপবিত্র শুভ্র বসনে, গৃহিণীর কল্কাপেড়ে দেশী সাড়ীতে, কন্যার নীলাম্বরীতে, আমাদের গৃহ-দেবতা গোপালের পীত-ধড়ায় তোমার পরিধেয় বস্ত্রের শুচিতা ও আড়ম্বরহীনতা সূচিত হউক। পল্লীবক্ষে যে স্নেহ-প্রেম-সরলতা—যে ভক্তি-প্রীতি-সেবা-ধর্ম্ম নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা যেন তোমার মধুর সত্বায় পূর্ণ হয়।'

গ্রাম্য সাহিত্য গ্রাম্য জীবনের মাধুরীতে পরিপূর্ণ। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকে যদি কেহ পলান্নের সহিত তুলনা করেন, তাহা হইলে আমরা আমাদের গ্রাম্য সাহিত্যকে 'তিল-জাউ' বলিব। এই 'তিল-জাউ' গ্রামে বসিয়া বন্ধু-বান্ধবগণকে সঙ্গে লইয়াই উপভোগ্য। অতএব কিঞ্চিৎ গ্রাম্য 'তিল-জাউর' আস্বাদনে প্রবৃত্ত হউন।

পল্লী-জীবনের সকল স্তরেই গ্রাম্য সাহিত্যের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। সাহিত্য আমাদের জীবনের পক্ষে নির্ম্মল বায়ু-হিল্লোলের ন্যায় হিতকর, অপরিহার্য্য।

আমার স্মরণ হয়, বহুপূর্ব্বে—বৈশাখের এক অপরাহ্নে কোনও গ্রাম প্রান্তবর্ত্তী 'খোঁয়াড়ের' নিকট দিয়া গ্রামান্তরে যাইতেছিলাম। নিকটেই পথের ধারে একটা জলসত্র। গ্রাম্য জমীদার কুণ্ডু মহাশয় পাঁচজনের পিপাসা নিবারণের জন্য এই 'জলসত্র' দান করিয়াছেন। হায় রে সে-কাল! এই 'জলসত্র' যে বটবৃক্ষমূলে সংস্থাপিত, তত বড় বিরাট বটগাছ আমি কুত্রাপি দেখি নাই। বৃক্ষশাখা হইতে অসংখ্য 'বয়া' নামিয়া গাছটিকে দৃঢ়মূল করিয়াছে। গাছটি দুই তিন বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত। কতকগুলি বয়া অত্যন্ত স্থূল,—যেন স্বতন্ত্র গাছের গুঁড়ি; কতকগুলি সরু,—তাহাদের অগ্রভাগ হাতীর লেজের মত;—মাটি হইতে তিন-চারি হাত উচ্চে তাহা ঝুলিতেছে। রাখাল বালক দূর মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া, বটবৃক্ষমূলে দেহ প্রসারিত করিয়াছে,—বংশদণ্ড তাহার উপাধান হইয়াছে। আর দুই জন রাখাল বটগাছের সরু বয়া ধরিয়া ঝুলিতেছে,—আবার তখনই ফস্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া, সহচরের সম্মুখে আসিয়া, হাত নাড়িয়া গাহিতেছে—

"সুমৃষ্ট ফল খাও রে কৃষ্ট আমি এনেছি!"

তখন গ্রাম্য সাহিত্য আমার নয়ন-সমক্ষে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিলেন।

যে লোকটীর উপর কুণ্ডুবাবুরা জলসত্র রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তাহার নাম ফটিক। এই নির্জ্জন স্থানে একাকী সময় ক্ষেপণ করা কঠিন ভাবিয়া ফটিক ঘোষ অধিকাংশ সময় নীলমণি দাসের 'পাউণ্ডে' আসিয়া বসিত। নীলমণি তখন গাছের ছায়ায় একখানি মাদুরে বসিয়া, মাথা নীচু করিয়া সর্ব্বশরীর দোলাইয়া তাহার পুরাতন, মলিন, ছিন্নপ্রায় পুঁথি—রামায়ণখানি গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছে; আর ফটিক ঘোষ দাবা-হুঁকাটা হাতে লইয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া রামায়ণ শুনিতেছে। রাবণ কর্ত্তৃক সীতা হরণে রামের খেদ যে অংশে আছে, তাহাই পড়া হইতেছে। নীলমণি একঘেয়ে সুরে প্রত্যেক অক্ষর বানান করিয়া, ছত্রের পর ছত্র পড়িয়া যাইতেছে। রাখাল-কৃষাণেরা দূর মাঠ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কালে এক ছিলিম তামাক খাইতে আসিয়া, এই অপূর্ব্ব পবিত্র গাথা শুনিতে-শুনিতে আর উঠিতে পারে নাই। পথিকেরা শতগ্রালিবিশিষ্ট ছিন্ন চটি-জোড়াটা সম্মুখে রাখিয়া, কোলের উপর ছাতাটা ফেলিয়া, এক পা ধূলি লইয়াই বসিয়া গিয়াছে, এবং একাগ্র-চিত্তে এই অমৃতময়ী কাহিনী শ্রবণ করিতেছে। কতবার

তাহারা এই অমর-গাথা শুনিয়াছে,— কিছুতেই ইহা তাহাদের নিকট পুরাতন হয় নাই। বিশেষতঃ, আজ নিদাঘের এই অপরাহ্নে, এই বিবিধ-বিহঙ্গ-কুজিত বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন প্রান্তরের প্রান্তবর্ত্তী প্রচ্ছন্ন কুটীরে, সভ্যতার নামগন্ধবিহীন এই শান্ত-স্নিগ্ধ পল্লী-জীবনের মাঝখানে,—নরদেব রামচন্দ্রের সেই বেদনাপ্লুত, করুণ কাহিনী,—অতি প্রাচীন যুগের একটি দিন, সেই শান্তি, সেই তৃপ্তি, সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিষম বিষাদ ও দুঃসহ বিরহের একটি মর্ম্মভেদী চিত্র তাহাদের সম্মুখে অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিল। তাহার পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল, রামচন্দ্র সীতাদেবীর অদর্শনে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন, কবি সেই কথা সুকোমল কবিতায় সরল ভাবে বলিতেছেন,—

"চাহিয়া বেড়ান রাম গোদাবরী তীরে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে॥
কাঁদিয়া বিকল রাম ফুলিল দুই আঁখি॥
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বনের যত পাখী॥
সীতা সীতা বলি রাম পড়ে ভূমিতলে।
ভাই ভাই বলিয়া লক্ষ্মণ করে কোলে॥
দুই হাত তুলিয়া রাম সীতা বলি ডাকি।
দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ সীতা চন্দ্রমুখী॥"

তখন সুমধুর, সকরুণ সমবেদনায় তাহাদের বক্ষঃপঞ্জর হইতে অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ও চক্ষু প্রান্তে বিন্দু-বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। যিনি ভগবানের অবতার, রঘুকুল-রবি, মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ, তাঁহার এত বিপদ, এমন কষ্ট,—ভাবিয়া তাহারা নিজের দুঃখ-দৈন্য ও দরিদ্র জীবনের শত-শত অভাবের অভিযোগ ভুলিয়া গেল। গ্রাম্য সাহিত্যের সুস্নিগ্ধ শান্তি-ধারা-স্পর্শে আমার তৃষিত, তাপিত বক্ষ শীতল হইল।

পল্লীগ্রামে বৈশাখ-সংক্রান্তিতে দলে-দলে সংকীর্ত্তন বাহির হইতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি,—গলে পুষ্পমালা, চন্দন-চর্চ্চিত দেহ, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং সর্ব্বাঙ্গ নামাবলীতে আবৃত, কীর্ত্তন-নিরত গায়ক সম্প্রদায় গ্রাম্য পথ মুখরিত করিয়া সমস্বরে গাহিতেছে,—

"শ্রীবাসের আঙ্গিনা মাঝে আমার গৌর নাচে,
আমার গৌর নাচে ভক্ত সঙ্গে, নিতাই নাচে প্রেম-তরঙ্গে
মুখে হরি বোল, হরি বোল বলে রে।"

এই গান গাহিতে-গাহিতে সকলে রাজপথে চলিতেছে। তাহারা বাজারে উপস্থিত হইলে, দোকানদারেরা তাহাদের মাথার উপর হাত ঘুরাইয়া,—'সকলে একবার কৃষ্ণানন্দে পূর্ণ করে' হরি হরি বলো'—বলিয়া হুঙ্কার দিতেছে।

জননী গ্রাম্য সাহিত্যের ইহা আর এক মূর্ত্তি। আবার দেখিয়াছি, জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নে পল্লী-রমণীগণ কেশ-সংস্কার পূর্ব্বক কলসী-কক্ষে দীঘির ঘাটে গা ধুইতে চলিয়াছে। ললাটে কাঁচপোকার একটি গোল টিপ, নাকে নোলক, অধরে তাম্বুল-রেখা, স্কন্ধে চারআনার সুরঞ্জিত পেড়ে গামছা, চরণে প্রসাধিকার সাবধানে অনুলিপ্ত অলক্ত-রাগ; পাছে আল্‌তা মুছিয়া যায় এই ভয়ে, তাহারা অতি ধীরে-ধীরে পা ফেলিয়া চলিতেছে। কোন-কোন গৃহস্থ-কন্যা কেশ-সংস্কার করে নাই,—আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশদাম পৃষ্ঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া চারিগাছি মলের আনন্দ-ঝঙ্কারে গ্রাম্য পথ প্রতিধ্বনিত করিয়া চলিয়াছে। অপরাহ্নে পুরুষ-সমাগম-শূন্য, বৃক্ষ-লতা-পরিবেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য পথে এই সকল যুবতীর সঙ্কোচ-সম্পর্ক-হীন, ব্রীড়াবিরহিত, কৌতুক-হাস্য-তরঙ্গিত প্রসন্ন মুখ দেখিলে দীনবন্ধুর ভাষায় মনে হয়,—

'এলো চুলে বেণে বৌ আল্‌তা দিয়ে পায়,
কলসী কাঁকে নলক নাকে জল আন্‌তে যায়।'

এই ছড়ায় আমরা গ্রাম্য সাহিত্যের যে মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহা র‍্যাফেলের পরিকল্পনার যোগ্য।

পথ হইতে পল্লী-গৃহস্থের গৃহমধ্যে আসিয়া দেখুন, কোন-কোন গৃহস্থ-বধূ নূতন শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে, এখনও সঙ্কোচ ত্যাগ করিতে পারে নাই। পিতৃগৃহের চির-আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সুখ ও অসঙ্কুচিত স্বাধীনতার কথা মনে পড়ায়, তাহাদের বক্ষে দীর্ঘ-নিশ্বাস পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। শাশুড়ীর আদেশ-পালনে ও অন্যান্য গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, পিতা-মাতার স্নেহসিক্ত উদার মুখ ও পিতৃগৃহের প্রতিদিনের সহস্র আনন্দ-কাহিনী দিবসের অন্য সময় এই সকল বালিকার অন্তরে গুপ্ত থাকে; কিন্তু এই শান্ত, শীতল, স্তব্ধ অপরাহ্নে, যখন সংসারের সকল কায শেষ হইয়া যায়—তখন সেই সুমধুর অবসরে—কোমল, বিরহ-কাতর হৃদয়ের সহিত সমুজ্জ্বল, অতীত স্মৃতির সন্ধি সংঘটিত হয়। তখন তাহাদের প্রাণ এই নবীন, কুণ্ঠিত স্নেহের অনভ্যস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রথম জীবনের সেই উদ্দাম হর্ষকল্লোল-মুখরিত পুরাতন

মেঘের মুক্ত তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যে দিন অধীর হয়, তাহা কবিতায় একদিন শুনিয়াছিলাম—

"বেলা যে পড়ে এলো জল্‌কে চল।"

ইহা গ্রাম্য সাহিত্যের বেদনাভরা করুণ মূর্ত্তি।

তাহার পর এক বর্ষার অপরাহ্নে আকাশে নবীন, নীল কাদম্বিনী ঘনাইয়া আসিয়াছে; নদীর অপর পারে বহু দূরবর্ত্তী ধূসর বনরাজির উপর বৃষ্টিধারাপাতে তাহা ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে। বলাকাশ্রেণী শুভ্র পক্ষ বিস্তার করিয়া কম্পিত বক্ষে কোন অনুদ্দিষ্ট জলাশয় লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। গৃহপ্রান্তে পীতাভ ঝিঁঙের ফুল ফুটিয়া প্রাচীরের চাল আলো করিয়া রাখিয়াছে; রাশি-রাশি হলুদে, সাদা ও লাল সন্ধ্যামণির ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া সন্ধ্যার আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছে; এবং আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনায় ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা নাচিয়া-নাচিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—

"কচুর পাতায় নল
জোরে মার ঢল।"

কেহ-কেহ সমোচ্চ কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে,—

"কচুর পাতায় করম্‌চা,
এই মেঘখান উড়ে' যা।"

পল্লীগ্রামের শিশু সাহিত্যের এই রূপ আমাদের নিকট সুপরিচিত। বালকণ্ঠোচ্চারিত এই সকল ছড়া যুগান্ত পূর্ব্ব হইতে শিশু কণ্ঠে অমরতা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে; এবং তাহা পল্লীর সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

এই সময় গ্রাম ছাড়িয়া একবার গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী নদীতীরে উপস্থিত হইলে দেখিবেন, শত-শত ধানের নৌকায় নদীকূল পরিপূর্ণ; বড়-বড় নৌকায় যে সকল পশ্চিমে দাঁড়ি গুন টানিবার জন্য নিযুক্ত আছে, তাহারা নৌকার সুবৃহৎ শত-ছিদ্র-বিশিষ্ট পালগুলি নদীতীরস্থ সবুজ ঘাসের উপর বিছাইয়া, গুণ-ছুঁচ দিয়া পালের ছিন্ন অংশ মেরামত করিতেছে। কৌপীনের উপর আজানুবিলম্বিত বহির্ব্বাস পরিহিত; নামাবলী-বেষ্টিত-মস্তক ভিখারীর দল কাঁধে ঝুলি লইয়া নৌকায়-নৌকায় ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে, এবং গ্রাম্য কারুকার্য্যখচিত 'সারিন্দে'র তারের উপর দ্রুত ছড় ঘুরাইয়া, তাহার চঞ্চল, কম্পিত তানের সহিত আপন স্থূল কণ্ঠস্বর মিলাইয়া, গলার শির ফুলাইয়া, মাথা দোলাইয়া গাহিতেছে,—

'ব্রজ হ'তে তোমায় ল'তে পাঠায়েছে রাই;
তুমি যাবে কি না যাবে হরি জান্‌তে এলাম তাই।'

তাহাদের কণ্ঠস্বর বিস্তীর্ণ নদীতীর ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। অদূরে আউসের ক্ষেতে বসিয়া কৃষাণেরা নিড়ানী দ্বারা বড়-বড় ঘাস ও কাঁটা নিড়াইতেছে। মধ্যে-মধ্যে বায়ু-প্রবাহে ধান্য-শীর্ষগুলি হিল্লোলিত হইতেছে। মুক্ত আকাশের নীচে, এই সুশীতল, নির্ম্মল, বায়ু-হিল্লোলে, কঠোর জীবনের দৈনিক কাজ করিতে-করিতেও, এই সকল গ্রাম্য কৃষকের মনে যে আনন্দধারা উথলিয়া উঠিতেছে, তাহা সঙ্গীতের ভাষায় পরিব্যক্ত হইতেছে। তাহারা শস্যক্ষেত্রে নিড়ানী চালাইতে-চালাইতে গাহিতেছে,—

"যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে ব'সে ধান কাটি,
তখন মনে জাগে তার নয়ান দুটি।"

নিরক্ষর কৃষকের হৃদয়ে তখন যে সাহিত্যরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাষায় তাহার স্থান না থাকিতে পারে,—কিন্তু তাহার মঙ্গল-মধুর মূর্ত্তি জীবনের শত অভাব ও দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাহাদের হৃদয়কে সবল রাখে, অন্ন-বস্ত্র-জলের ন্যায় তাহাদের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য।

আর একদিন বর্ষার অবসানে—প্রথম শরতের অপরাহ্নে, নদীপথে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলাম। বর্ষার জলে নদীর উভয় তীর বহুদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত হইয়াছে। ধান্যক্ষেত্রে ধানগাছগুলি ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল শীষগুলি জাগিতেছে; কৃষকেরা দলে-দলে আসিয়া কাস্তে দিয়া আউস্ ধান কাটিতেছে, এবং ছোট নৌকায় বোঝাই দিয়া পারে লইয়া যাইতেছে। রাশি-রাশি 'টোপাপানা' নদীজল বহুদূর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার উপর 'জল-পিপি'গুলা পুচ্ছ দোলাইয়া দ্রুত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটা 'পানকৌড়ী' একস্থানে ডুব দিয়া আর এক স্থানে গিয়া দীর্ঘ গলাটা জলের উপর হঠাৎ বাহির করিয়া দিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যাইতেছে। এবং জলমগ্ন কাশবনের পাশে বসিয়া একটা ডাহুক 'কুয়া' 'কুয়া' করিয়া একঘেয়ে সুরে চীৎকার করিতেছে। তাহার সেই বিদীর্ণ কণ্ঠস্বরের মধ্যে যে অব্যক্ত কাতরতা, ক্লান্ত হতাশ জীবনের যে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা শুনিয়া মনে

হইতেছিল—তাহা বর্ষাপ্লাবনপীড়িত খরপ্রবাহকম্পিত সিক্ত তটভূমির করুণ বিলাপোচ্ছ্বাস। সেই সময় দেখিলাম, একখানি ধান-বোঝাই নৌকায় একজন চাষা ধানের আঁটির উপর ঠেস্ দিয়া বসিয়া, পোয়ালের বুঁদির আগুনে কলিকার 'খর্সান' ধরাইতে-ধরাইতে গাহিয়া উঠিল,—

"তোর পীরিতে সব খোয়ালাম,
বাকি কেবল টুকনী হাতে।"

গ্রাম্য সাহিত্যের এই বিশেষত্ব উপভোগ করিবার উপযুক্ত স্থান ও কাল ইহাই, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

সেকালে ঝুমুর, পাঁচালী, তর্জ্জা, কবি প্রভৃতি গ্রাম্য সাহিত্যের অঙ্গ ছিল। তাহা যে সর্ব্বথা সুরুচি-সঙ্গত হইত, এরূপ নহে; কিন্তু সেই অমার্জ্জিত গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক বিষয় স্থান পাইত, যাহা পল্লী-জীবনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া পল্লীবাসিগণকে কেবল যে সুখ ও আনন্দ দান করিত, ইহাই নহে,—তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির পথও প্রদর্শন করিত। এখনও বহু পল্লীতে 'রাম রসায়ন' 'মনসার ভাসান্' প্রভৃতি গান কৃষকদিগের চিত্তে নির্ম্মল সাহিত্য-রস প্রবাহিত করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, পল্লী-কৃষকগণের হৃদয়ে আনন্দ-বিধানের জন্য 'মনসার ভাসান্' অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সঙ্গীত আর কি আছে? মনে পড়িতেছে,—শারদাগমে যখন পল্লীর প্রত্যেক তরুলতা উজ্জ্বল, শ্যামস্নিগ্ধ বেশ ধারণ করে, কৃষকের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কুটীরের চারিদিকে খানা-ডোবা জলে ভরিয়া থাকে, এবং তাহার উপর চাঁদের আলো পড়িয়া সাধারণের নয়ন-সমক্ষে পল্লীগ্রামের সহজপুষ্ট, বিশদ, শারদ সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলে, সমস্ত গ্রামখানি ছবির মত সুন্দর দেখায়,—প্রাঙ্গণে আউসের পোয়াল গাদা হইতে একটা সিক্ত সোঁদা গন্ধ উঠিতে থাকে, আর ঘরের পাশে কদম্ব গাছে কদম্ব ফুলের ও বেড়ার ধারে অযত্ন-রোপিত রজনী-গন্ধার ঝাড় হইতে প্রস্ফুটিত রজনী-গন্ধার স্নিগ্ধ গন্ধ বিকীর্ণ হইয়া তরল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিকে রূপ, রস ও গন্ধের মোহে ঢাকিয়া ফেলে, তখন সেই সকল নিরক্ষর পল্লীবাসীর সংসার-সংগ্রাম-ক্ষুব্ধ ক্লান্ত জীবনের নীরস মরুস্তর সিক্ত করিয়া সেখানে প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় অম্লান কবিত্বের স্নিগ্ধ মধুরতা বিকশিত হইয়া উঠে। তাহারা কি যে চায়, তাহা তাহারা জানে না,—তাহাদের হৃদয় যে কোন্ অপার্থিব, দুর্লভ রত্নের সন্ধান পাইয়া তাহা লাভ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে—তাহা এই সকল শিক্ষাহীন অবোধ কৃষক-সন্তান ও শ্রমজীবিগণ বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাহাদের এই ব্যাকুলতা হৃদয়ের গোপন অন্তরালে আবদ্ধ না থাকিয়া, বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কোমল-মধুর সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়া দেয়। তাই তাহাদের হৃদয় ও মন ঝঙ্কারিত করিয়া বহুপূর্ব্ব যুগের পল্লী-জীবনের সুখ, দুঃখ, আশা, ভয়, বেদনা ও মোহে বিজড়িত করুণ সঙ্গীতোচ্ছ্বাস তাহাদের মুক্তকণ্ঠে নব-জীবন লাভ করে। তাই বেহুলা ও নখিন্দরের পুণ্য-কাহিনী পল্লীগ্রামে পুরুষ-পরম্পরায় মুখে-মুখে চলিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর সাহিত্যে এমন কোনও কাহিনী নাই, যাহা আমাদের এই সকল 'তুচ্ছ' গ্রাম্য সাহিত্যের স্থান পূর্ণ করিতে পারে।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বার মাসই আমাদের স্নেহ-মধুরা বঙ্গ-পল্লী গ্রাম্য সাহিত্যের মধুর রসে ভরপুর থাকে। তাহার বৈচিত্র্যময়ী বিশেষত্ব ভিন্ন-ভিন্ন অংশে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার স্থান ও সময় নাই; অদ্য আর একটি-মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া আমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সে দিন শীতলা-ষষ্ঠী। নব-বসন্ত সমাগত-প্রায়। শীতের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং অস্তমান সান্ধ্য-তপনের পীত-রশ্মি-রাগ বাসন্তী লক্ষ্মীর হেমাভ লাবণ্যের ন্যায় শোভাময়। রবিশস্য-সমলঙ্কৃত প্রশস্ত প্রান্তর-বক্ষে তাহা বিচিত্র বর্ণচ্ছটার বিকাশ করিতেছে। এমন সময় সহসা নব-বসন্তের প্রথম প্রণয়ানুরাগ-স্ফুরিত আবেগ-চঞ্চল নিশ্বাসের মত ঈষদুষ্ণ বায়ু-প্রবাহ আম্র-মুকুলের সৌরভ ও তরুশাখাসীন বিহঙ্গমকুলের মধুর হর্ষ-কাকলি বহিয়া আনিয়া মূক ধরণীর সুপ্ত বক্ষে নবাগত যৌবনের সুখস্বপ্ন ঘোষণা করিয়া গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ, শান্ত, স্থির; ক্রমে তপনের কনক-কান্তি পশ্চিমাকাশে বিলীন হইল। আকাশের অতি উচ্চে দুই-একটি পক্ষী তখনও দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাসমান। অদূরবর্ত্তী শাল্মলীর পত্রহীন শাখায় সমাসীন বিকশিত সুলোহিত পুষ্পস্তবকের অন্তরাল হইতে একটা কোকিল সেই স্তব্ধ উদার ধূসর সন্ধ্যায় আপনার উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কুহু স্বরে ব্যক্ত করিয়া চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিয়া তুলিল। ক্রমে শুক্ল-ষষ্ঠীর ক্ষীণ চন্দ্রকলা ঊর্দ্ধাকাশ হইতে অনতিউজ্জ্বল রজত-রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া ধরাতল ধৌত করিতে লাগিল।

এমন সময় একজন পথিক মুক্ত প্রান্তর পথে চলিতে-চলিতে মোটা সুরে গাহিয়া উঠিল,—

"হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি !
ওহে ভক্তিপ্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধা সতী।
বাজায়ে কৃপা-বাঁশরী মন-ধেনুরে বশ করি,
তিষ্ঠ মন হৃদি-গোষ্ঠে, কৃষ্ট ! মম এই মিনতি।'

সেই পল্লী-যুবকের তান-লয়-বর্জ্জিত, অমার্জ্জিত, উচ্চ সুরে গীত, ভক্ত গায়ক দাশরথির এই সঙ্গীত-লহরী ম্লান চন্দ্রিকা পরিব্যাপ্ত শ্যামল রবিশস্য-শীর্ষ পরিপূরিত পাণ্ডুর প্রান্তর প্লাবিত করিয়া চলিল।

প্রান্তর হইতে গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল গোপ-পল্লীর গোয়াল ঘর হইতে 'সাঁজালের' প্রচুর ধূম উদ্গম হইতেছে ; শ্রমজীবিগণ অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে বসিয়া তামাকু সেবন ও গল্প করিতেছে ; গোপ-বধূরা কেহ 'সাঁজা' দিয়া দৈ 'পাতিবার' আয়োজন করিতেছে, কেহ বা ময়লা ছেঁড়া কাঁথায় শিশু পুত্রটিকে শয়ন করাইয়া, অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে তাহাকে স্তন্য পান করাইতে-করাইতে মৃদু স্বরে সুর করিয়া বলিতেছে,—

'খোকা ঘুমুলো, পাড়া জুড়ুলো
বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেব কিসে ?

এবং পথি-প্রান্তস্থ পল্লী-বিলাসিনীর পর্ণ-কুটীরের অভ্যন্তর হইতে কোনও হতভাগিনী তাহার তান-লয়হীন তীব্র কণ্ঠ স্বরে সেই সুপ্তপ্রায় শান্তিময়ী নৈশ-প্রকৃতির সুগভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গাহিতেছে,—

"তামাক খেয়ে গেলে না, বঁধু,
কত দুঃখ মনে যে রৈল,
ঐ যে চাঁদের পাশে তারা হাসে,
তেঁতুল-পাতা শুকালো !
মরা গাঙ্গে কুমীর ভাসে, শুকায় চ্যঁদীর ফুল,
এই ভরা বয়সে হলেম রাঁড়ী
বঁধু যৈবনে ফুটলো ফুল।
ও পরাণ বঁধু বঁধু হে !"

এই সঙ্গীত সমাজচ্যুতা, প্রবঞ্চিতা, পাপ-পঙ্কে আকণ্ঠ-নিমজ্জিতা, অভাগিনী পতিতার কণ্ঠোচ্চারিত হইলেও ইহা গ্রাম্য সঙ্গীত ; ইহার মাধুর্য্য অনুভব করিবার শক্তি বা অবসর সকলের নাই, তথাপি এইরূপ কত সঙ্গীত, ছড়া, গান, কবিতা আমাদের গ্রাম্য সাহিত্যের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র কুসুমাস্তৃত করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের পল্লীবাসিগণের মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেছে ; দুঃখে, বিপদে ক্ষুব্ধ, অশান্ত হৃদয়ে শান্তিসুধা বর্ষণ করিতেছে ; সভ্যতা-দৃপ্ত পাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিলাসী সুসভ্য সহরবাসিগণ তাহার রসাস্বাদনে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কিন্তু এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, বঙ্গ-সাহিত্যের যতই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হউক, বঙ্গ-সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ, বাঙ্গালীর পল্লী-জীবনের অবলম্বন এই গ্রাম্য সাহিত্য চিরদিন অম্লান গৌরবে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের উৎস সমুজ্জ্বল রাখিবে।

দাদাভাই নৌরজী

আমরা অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত চিত্তে পাঠক-পাঠিকাগণকে একটী শোকের সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতের Grand Old Man দাদাভাই নৌরজী বোম্বাই নগরের অদূরবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে তাঁহার পল্লীনিবাসে অবস্থিতি কালে সেদিন পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৯২ বৎসর বয়স হইয়াছিল। দাদাভাই নৌরজীর নাম অবগত নহেন, এমন শিক্ষিত ভারতবাসী নাই বলিলেই হয়। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ দেশ-সেবক,—ভারতমাতার সুসন্তানও আর নাই। ১৮৮৬ অব্দে কলিকাতায়, ১৮৯৩ অব্দে লাহোরে এবং ১৯০৬ অব্দে পুনরায় কলিকাতায়—প্রতিবার দশ বৎসর অন্তর—তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি পাঁচ বর্ষব্যাপী অবিশ্রান্ত চেষ্টায় বিলাতী পার্লামেন্টের সদস্য হইয়াছিলেন ; এ সৌভাগ্যলাভ আর কোন ভারতবাসীর হয় নাই। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে নিজ আবাসে স্বীয় আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া পরম শান্তিতে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু স্বদেশের মঙ্গল-চিন্তায় তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত বিরত ছিলেন না। ভারতে তাঁহার স্থানপূরণ করিবার মত লোক আর কেহ নাই। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।
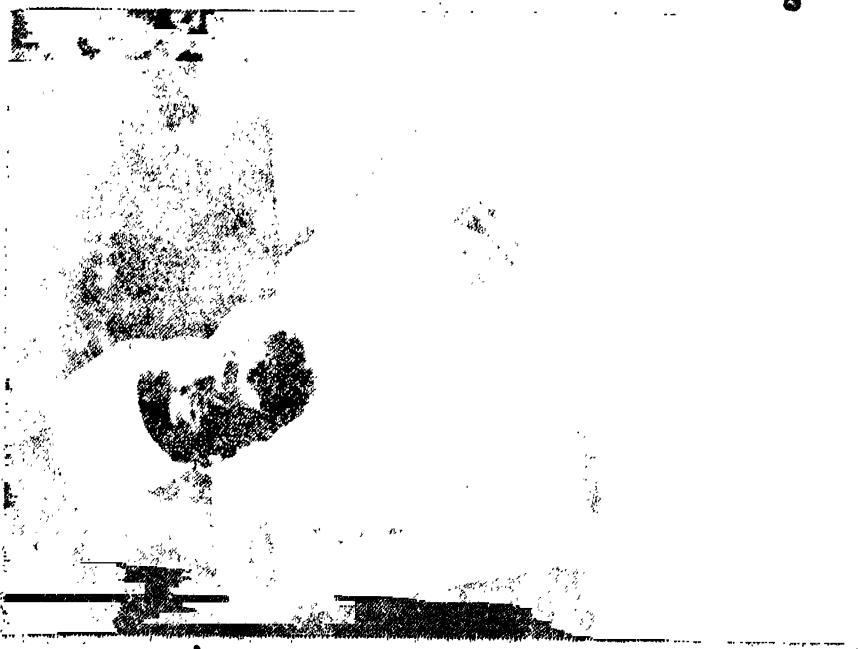
পরলোকগত দাদাভাই নৌরজী

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ চৌধুরী

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু (ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য)

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র এম-এ, বি-এল
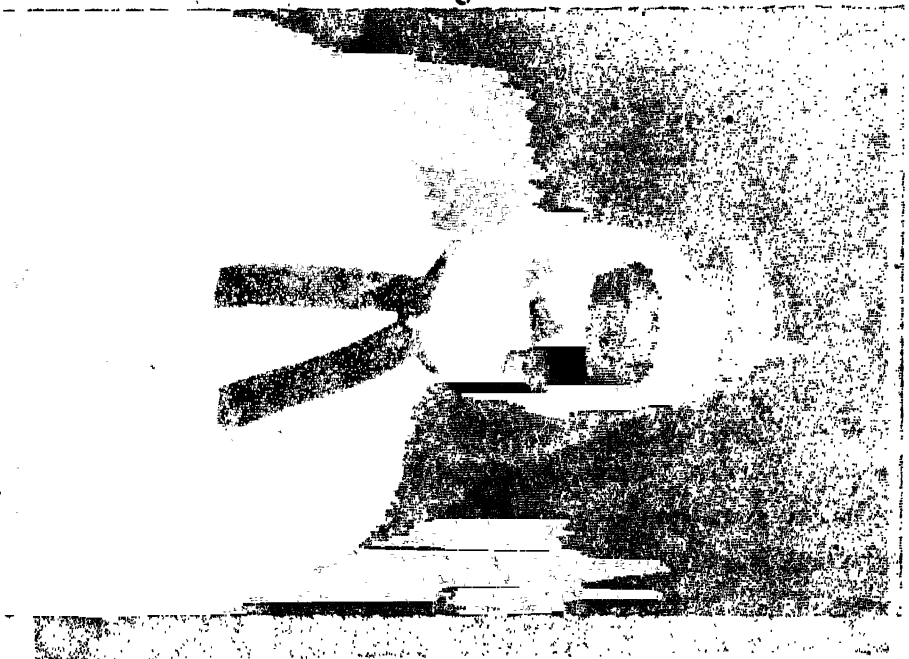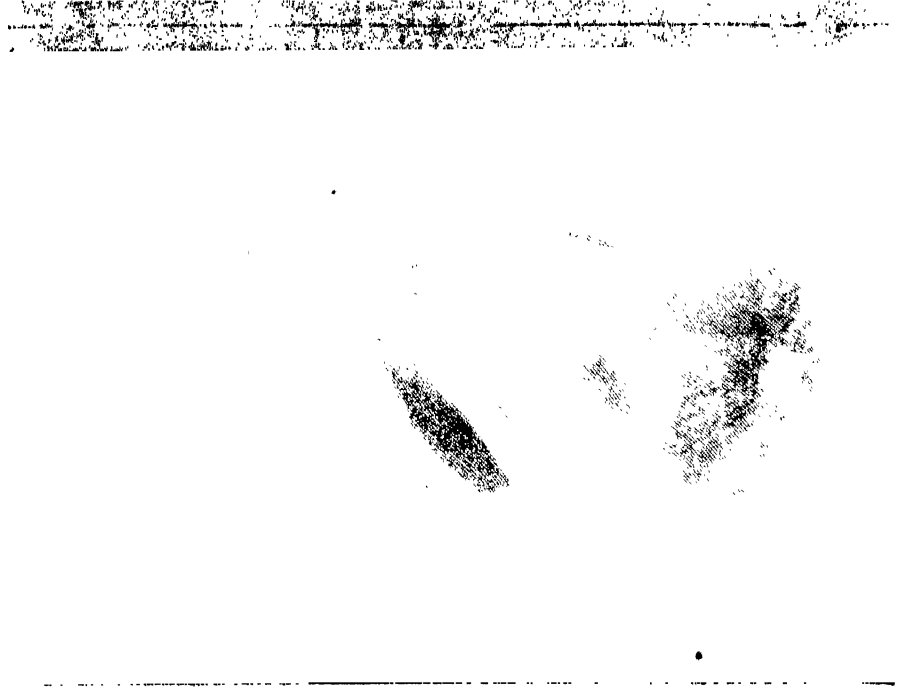
প্রতিধ্বনি

ছাত্রসমাজে দুর্নীতি

আজকাল বাঙ্গলার ছাত্রসমাজে কিছু-কিছু দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটির আশু দমন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। নচেৎ ছাত্রগণের আর রক্ষা নাই। ধূমপান মানবের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য এমন কথা কেহই বলিবেন না। পরন্তু, ইহা যে অতিশয় অনিষ্টকর কু-অভ্যাস তাহাও সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা ধূমপান করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধূমপানের অনিষ্টকারিতার কথা অবগত আছেন। কিন্তু অভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহারা তাহা ছাড়িতে পারেন না। কিন্তু অপরিণতবয়স্ক যুবকগণ, যাহারা ধূমপানের অনিষ্টকারিতার কথা সম্যকরূপে অবগত নহে, অথচ বিলাসী, বৃদ্ধ ও প্রবীণ ব্যক্তিগণের দেখাদেখি ধূমপান করিতে অভ্যাস করে, তাহাদের পক্ষে ধূমপান আরও যে অনিষ্টকর তাহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ, আজ-কাল চুরুট সিগারেট, বার্ডসাই, বিড়ি প্রভৃতির ধূম সেবনের প্রথা এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, পথে-ঘাটে যত্র-তত্র অতি অল্পবয়স্ক শিশুদের মুখে সিগারেট কিম্বা বিড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। কি বিসদৃশ দৃশ্য! অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকগণের ধূমপান রহিত করিবার জন্য সংবাদপত্রে আলোচনাও যথেষ্ট হইয়া থাকে। সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের শুভদৃষ্টি এ দিকে পতিত হইয়াছে। বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের সহকারী ডাইরেক্টার মহাশয় স্কুল কলেজের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সহযোগী "নোয়াখালি-সম্মিলনী" লিখিয়াছেন,—

"সম্প্রতি শিক্ষাবিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ মহোদয় ছাত্রগণের ধূমপান সম্বন্ধে এক নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশের স্কুলের ও কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে এই অনিষ্টকর কু-অভ্যাসের দাস না হয়, তৎপ্রতি তিনি বিভাগীয় ইন্স্পেক্টর, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ ও ডেপুটী ইন্স্পেক্টরগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের সীমানায় সিগারেট বিক্রয় বন্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন ও বালকগণ যাহাতে স্কুলে ও স্কুলের বাহিরেও ধূমপান না করে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে বলিয়াছেন। তরুণ বয়সে ধূমপান ও মাদক দ্রব্য সেবনের অপকারিতা ক্লাসে আলোচনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। পরিশেষে শিক্ষকগণকে অন্ততঃ ছাত্রগণের সাক্ষাতে ধূমপান হইতে বিরত থাকিয়া তাহাদিগকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে বলিয়াছেন। যে কোন বালক এই আদেশ অমান্য করিবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।" আমরা এই আদেশ প্রচারের জন্য ডিরেক্টর মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আজকাল ছাত্রসমাজে যেরূপ ধূমপানের প্রচলন দেখিতেছি, তাহাতে হৃদয়ে বেদনা উপস্থিত হয়। ৭।৮ বৎসরের ছেলের মুখেও সিগারেট দেখিয়াছি। কত শত বালকের শরীর এইভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক বাবুদের মধ্যেও এই ব্যাধিটি সংক্রামক বটে। শুনিতে পাই, আমাদের অন্দরমহলেও না কি ইহার প্রবেশাধিকার লাভ হইয়াছে। গত বৈশাখ মাসে এক বিবাহে গিয়াছিলাম, ৩।৪টী কলেজের ভদ্রলোকও গিয়াছিলেন। তাঁহারা ৪ জনে ৪ দিনে ৬৲ টাকার সিগারেট ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আমাদের মেসের একটী বাবু মাসে চা ও সিগারেটে ১৫৲ ব্যয় করিতেন। তাঁহার শ্বশুর পুলিস ইন্স্পেক্টর ছিলেন, বলা বাহুল্য তাঁহার প্রেরিত মাসিক ৫০৲ টাকার তিনি এরূপ সদ্ব্যবহার করিতেন। এই ভদ্রলোকটী প্রথম উকিল হইয়াছেন,—প্রথম মাসের আয় পনর টাকার নীচে ছিল, সে খবর রাখি। ইহাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমানে কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে ব্যয়-লাঘব করিতে শিক্ষা করাও দরকার। ধূমপান ও মাদকদ্রব্য সেবনে শরীর মনের ক্ষতি সাধিত হয়। আর্থিক ক্ষতি ত আছেই। বর্ত্তমানে, যে বাঙ্গালার যুবকগণের মধ্যে ভীষণ হৃদয়-ক্ষয়-রোগ দেখা দিয়াছে, ধূমপান ও মাদক দ্রব্য সেবনও তাহার অন্যতম কারণ কি না, বিশেষজ্ঞগণ তাহার বিচার করিবেন। আমরা ভরসা করি, শিক্ষকগণ যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত না হইয়া, কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বোধে প্রাণ ঢালিয়া ছাত্রগণের কল্যাণকর এবম্বিধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন।

* * * *

এ বিষয়ে অভিভাবকগণেরও বিশেষ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাঁহারা ছেলেকে স্কুলে পাঠাইয়া ও স্কুলের বেতন দিয়াই নিশ্চিন্ত। যদি কখনও কেহ খোঁজ নেন,—সেও ছেলের পরীক্ষার ফলটাই জানিতে চান; তাহার শারীরিক ও নৈতিক অবস্থার কোনই খবর রাখেন না। বাড়ীতে এ বিষয়ে দৃষ্টি না থাকিলে, শিক্ষকগণের পক্ষে অল্প সময়ে সকল দিক দেখা বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে সম্ভব নয়। অভিভাবক ও শিক্ষকের সহযোগিতা না হইলে কোন সুফলের আশা নাই। বছরে একদিন

নারী গৃহিণী ও জননী,—গৃহের মঙ্গল, সন্তানের মঙ্গল প্রধানতঃ নারীর উপরেই নির্ভর করে। যৌনসম্বন্ধে পবিত্রতার আদর্শ তাই বোধ হয় সমাজে নারীর পক্ষে এত উচ্চ - এত কঠোর করা হইয়াছে। হিন্দু-সমাজের এই পবিত্রতার আদর্শ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত এবং কঠোর-রূপ রীতিতে পালিত। সতীত্বের আদর্শ এ সমাজে এতই কঠোর যে পরপুরুষের সংস্পর্শও নারীর পক্ষে অশুচিকর এবং পাপজনক বলিয়া সকলে মনে করেন। পাশব বলে কোনও নারী ধর্ষিতা হইলেও, তাঁহার নিতান্ত আপনার জনও তাঁহাকে গ্রহণে প্রস্তুত হন না, অপবিত্রা বলিয়া আর তাহাকে ঘনিষ্ট সম্পর্কে পরিবারের মধ্যে রাখিতেও চান না। পরিবারে যাহার স্থান নাই, সমাজেই বা তাহার স্থান কোথায় হইবে? এই সংস্কার সকলের চিত্তে এমন দৃঢ় হইয়া বসিয়াছে যে এরূপ নারীকে আর তাঁহারা পবিত্রবোধে আপন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।

নারীর পবিত্রতার আদর্শ অতি উচ্চ হওয়াই বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। স্বেচ্ছায় ব্যভিচারিণী গৃহত্যাগিনী নারী পরিত্যাজ্যা হইতে পারে। বস্তুতঃ গৃহের অধিষ্ঠাত্রীরূপে, নির্ম্মল পুতস্বভাব শিশুদের স্নেহময়ী ধাত্রীরূপে কল্যাণময়ী গৃহলক্ষ্মীরূপে এরূপ নারীর গৃহে কোনও স্থান না হওয়াই ভাল। কিন্তু বলে যে ধর্ষিতা হয় তার অপরাধ কি? সে কেন পরিত্যজ্যা হইবে? সকলের পরিত্যক্তা হইয়া আপনার জনের সহায়তা ও আশ্রয়ে বঞ্চিত হইয়া কেন তাহাকে পাপে ও দুঃখে জীবন কাটাইতে হইবে? সমাজ যাহাকে দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না কোন্ অধিকারে সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে? এই দুর্ব্বৃত্তদের শাসন ও দমন না করিয়া কোন্ বিচারে সমাজ তাহাদেরই কর্ত্তৃক এইরূপ উৎপীড়িতা নারীকে আবার চরম সামাজিক শাস্তিতে লাঞ্ছিত করিয়া তার জীবন দারুণ দুঃখময় করিতে পারে?

যে নিষ্পাপ, পুণ্যের গৃহধর্ম্মে আনন্দে যে জীবন যাপন করিত,—পরের দোষে তাকে এমন ভাবে পার্থিব সকল মঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একা অসহায় তাকে অতি হেয়, অতি দুঃখময় পাপের পথে এমন করিয়া ঠেলিয়া দেওয়া—ইহা অপেক্ষা পাপের কথা কলঙ্কের কথা—নীচতার কথা, অবিচারের কথা—আর কি হইতে পারে, জানি না। যে সংস্কারবশতঃ পাশব বলে এরূপ ধর্ষিতা নারীকে অপবিত্রা অস্পৃশ্যা বলিয়া ধারণা হয়, সাদরে গ্রহণ করিয়া গৃহে স্থান দিতে প্রবৃত্তি লোকের হয় না,—শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে সেই সংস্কার যাহাতে দূর হয় সমাজনায়কগণকে এখন সেই চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই এই সম্পর্কে তাঁহাদের বড় একটি ধর্ম্ম।

প্রায় দুই বৎসর হইল ঢাকা জেলার কোনও গ্রাম হইতে ভদ্রবংশীয়া একটি যৌবনপ্রাপ্তা কুমারী দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা হন। ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া কুমারী কোনও উদারচরিত্র সাধুর গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। শুনিয়াছি, কুমারীর স্বজাতীয় একটি যুবক তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন। এই যুবকের মহানুভবতা আদর্শস্থানীয়। এই দম্পতিকে সমাজ যদি আদরে আপন বক্ষে স্থান দিয়া থাকেন, তবেই বলিতে পারা যায় সমাজ তাঁহার ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু নাম স্বাক্ষরকারীর সেই প্রশ্নের ইহাই উত্তর। পবিত্র বলিয়াই সেই নারীকে সমাজে ও গৃহে তার আপন স্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে। রাখিতেই তাকে হইবে,—নতুবা ন্যায়ধর্ম্মী দেবতার অভিশাপে সমাজ ছারখারে যাইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

"দারোগার দপ্তরে"র প্রতিষ্ঠাতা, প্রসিদ্ধ পুলিশ-ইনস্পেক্টর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তিনি যথার্থই popular writer ছিলেন। অতি সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত তাঁহার দারোগার দপ্তর ও অন্যান্য উপন্যাস আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছিল। তিনিই সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় ডিটেকটিভ উপন্যাসের প্রচার করেন।

আট আনা সংস্করণের ষোড়শ গ্রন্থ শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর "আলেয়া" এবং সপ্তদশ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বেগম সমরু" প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টাদশ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্তের "নকল পঞ্জাবী" যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দেবদাস" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বিন্দুর বিয়ে" প্রকাশিত হইয়াছে। দেড় টাকা দিয়া বৌয়ের মুখ দেখিতে হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Choudhari's 2nd Lane, CALCUTTA.

Emerald Printing Works

ভাদ্র, ১৩২৪

প্রথম খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [তৃতীয় সংখ্যা

বেদে কালের বিভাগ

বিষুবান

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ]

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

ঋগ্বেদ হইতে পাওয়া গিয়াছে যে, অঙ্গিরাগণ দশমাসব্যাপী যজ্ঞ করিতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, যে সকল গো দশমাসব্যাপী সত্র করিয়াছিল, তাহারা খুর ও শৃঙ্গ লাভ করিয়াছিল; কিন্তু যাহারা দ্বাদশমাসব্যাপী সত্র করিয়াছিল, তাহাদের খুর ও শৃঙ্গ হয় নাই; তবে তাহারা ঊর্জ (অর্থাৎ বল) লাভ করিয়াছিল (১)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আরো দেখিতে পাই যে, অঙ্গিরা ও আদিত্যগণের মধ্যে কে অগ্রে স্বর্গে যাইতে পারে, এই লইয়া প্রতিযোগিতা চলে। আদিত্যগণ দ্বাদশমাসব্যাপী যজ্ঞ করিয়া অগ্রেই স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অঙ্গিরাগণ যাট্

(১) গবাং অয়নেন যন্তি গাবো বা আদিত্যা আদিত্যানামেব অয়নেন যন্তি। ১৮।৩।১৭

– গোসকল গোসকলের অয়ন দ্বারা গমন করে। কিম্বা আদিত্যগণ আদিত্যদিগের অয়ন দ্বারা গমন করে।

গাবো বৈ সত্রং আসত শফান্ শৃঙ্গাণি সিষাসন্ত্য স্তাসাং দশমে মাসি শফাঃ শৃঙ্গানি অজায়ন্ত; তা অব্রুবন্ যস্মৈ কামায় অদীক্ষামহি অপাম তমুত্তিষ্ঠামেতি। তা যা উদতিষ্ঠং স্তা এতাঃ শৃঙ্গিণ্যঃ। ১৮।৩।১৭

গো সকল পায়ের খুর, শৃঙ্গ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া সত্র করিয়াছিল। তাহাদিগের খুর ও শৃঙ্গ দশমমাসে উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহারা বলিয়াছিল, যে কামনা করিয়া দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহারা সত্র হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিল। যাহারা উঠিয়াছিল, তাহারা শৃঙ্গী হইয়াছে।

অথ যাঃ সমাপয়িষ্যামঃ সংবৎসরং ইতি আসত তাসাং অশ্রদ্ধয়া শৃঙ্গাণি প্রাবর্তন্ত। তা এতাঃ তূপরা ঊর্জং ত্বসুবং শুস্মাৎ উ তাঃ সর্বান্ ঋতূন্ প্রাপ্ত্বোত্তরং উত্তিষ্ঠন্তি। ঊর্জং হি অসুন্বন্ সর্বস্য বৈ গাবঃ প্রেমাণং সর্বস্য চারুতাং গতাঃ। ১৮।৩।১৭

অনন্তর যাহারা সংবৎসর পূর্ণ করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিব মনে করিয়াছিল, তাহাদিগের অশ্রদ্ধা দ্বারা শৃঙ্গ সকল হয় নাই; তাহারা শৃঙ্গহীন; কিন্তু ঊর্জ (অর্থাৎ বল) প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেইজন্য তাহারা সকল ঋতু (অর্থাৎ ছয় ঋতুই) প্রাপ্ত হইয়া পরে উঠিয়াছিল। বল প্রাপ্ত হওয়ায় এই সকল গো সকলের প্রিয় হইয়াছিল (ও) সকলের মধ্যে সুন্দর হইয়াছিল।

হইয়াই পুরুষ, এবং পুরুষের শিরে এই সংযোগ-রেখা আছে। বিষুবান্ নামক বৎসররূপী পুরুষের শির-মধ্যেও সেলাই করা আছে। যে দিন আদিত্য এই স্থানে আগমন করেন, বৎসরের সেই দিনকেও বিষুবান্ বা একবিংশ বলা হয়। যখন আদিত্য বিষুবানে আগমন করেন, তখন দেবতাগণ আদিত্যের নিম্নে ও দূরে পড়িয়া যাইবার ভয় করিতেন। এই জন্য বিষুবান্ দিনের দুই দিকে দশ দিন, দশ দিন করিয়া প্রধান যজ্ঞ হইত। অতএব এই একুশ দিন বৈদিক যুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই একুশ দিনের দুই দিকে ছয় দিন করিয়া স্তোম পাঠ হইত। ইহাকে মনে করা হইত, আদিত্য নিম্ন ও ঊর্দ্ধ ৬ লোক দ্বারা ধৃত হইয়াছেন; অতএব তিনি নিম্নে বা দূরে পতন হইতে রক্ষিত হইলেন। একবিংশ বা বিষুবান্ দিন, তাহার পরের দশ দিন এবং তাহারও পরের ছয় দিন—ইহারা একুনে সতের দিন হয়। এইরূপে বিষুবান্ দিন, তৎপূর্ব্বের দশ দিন এবং তাহারও পূর্ব্বের ছয় দিন, একুনে সতের দিন হয়। ইহাদের প্রত্যেককে সেইজন্য সপ্তদশ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে পৃষ্ঠ সকল ও অভিজিৎ এক সপ্তদশের অগ্রে এবং পৃষ্ঠ সকল ও বিশ্বজিৎ অপর সপ্তদশের পরে স্থাপিত হইয়াছে।

এই বর্ণনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে আদিত্য যখন দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় আগমন করেন, তখন সেকালের ঋষিগণ ভীত হইতেন। কারণ, সূর্য্য নিম্নে বা দূরে পড়িয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা সেইজন্য সূর্য্যকে এইরূপ পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, নানাবিধ যাগ-যজ্ঞ করিতেন। এই সময়ের যজ্ঞই অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এই বর্ণনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, বিষুবান্ যজ্ঞ Winter Solsticeএ অনুষ্ঠিত হইত।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ঋগ্বেদের ঋষিদিগের মধ্যে কিম্বদন্তী রূপে প্রচলিত ছিল যে, নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণ ইন্দ্র ও বৃহস্পতি—দেবদ্বয়ের সাহায্যে পণিদিগের পর্ব্বত হইতে সূর্য্য, গো, অর্ক এবং উষাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের কালেও সূর্য্যকে পাছে হারাইয়া ফেলেন, সেই জন্য আর্য্যগণ সাংবৎসরিক সত্রের অনুষ্ঠান করিতেন। কিন্তু এ কালের ঋষিপদবাচ্য ব্যক্তির অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্যতা হেতু বোধ হয় নূতন সূক্ত রচিত হইত না। প্রাচীন ঋষিদিগের বিরচিত সূক্তসমূহ হইতে যজ্ঞোপযোগী সূক্ত বাছিয়া লওয়াই ব্রাহ্মণদিগের একালে কাজ ছিল। অঙ্গিরা ঋষিগণ,—সূর্য্য দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় গমন করিলে, পাছে পুনরায় পণিগণ হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখে,—এই জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করিতেন। পরে প্রাচীন ঋষিদিগের বংশধরগণ এ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিলে, সূর্য্য একেবারে অদৃশ্য হইতেন না। তখন তাঁহাদের ভয় হইত, পাছে সূর্য্য পড়িয়া যান। এই জন্য হিমঋতুতে তাঁহাদের যজ্ঞ অত্যন্ত ভয় ও ভক্তির উদ্রেক করিত। আমাদের মনে হয়, বৈদিক কালে হিম শব্দ দ্বারা বৎসর বুঝানর ইহাই কারণ। অতএব বৎসরের ইহাই প্রাচীনতম নাম। যে সময়ে এই যজ্ঞ হইত, তাহার নাম বিষুবান্ রাখা হইয়াছিল। বিশেষতঃ, যে দিনে সূর্য্য দক্ষিণের শেষ সীমায় আসিতেন, সেই দিনই বিশেষ ভয়ের ছিল; সেই দিনকেই বিষুবান্ বলা হইত। এই শব্দ দ্বারা আর্য্যগণ আরও বুঝাইতেন যে, দক্ষিণায়নের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সূর্য্য একই দিকে যাইতেছেন। এই সময়ে দিবস ছোট ও রাত্রি ক্রমশঃ বড় হইয়া থাকে। কিন্তু বিষুবানের পর হইতে ঠিক বিপরীত হইয়া যায়। সূর্য্যের গতি দক্ষিণ হইতে উত্তরে হইতে থাকে, এবং দিন বড় ও রাত্রি ছোট হইতে থাকে। বিষুবানের আর একটী নাম ছিল একবিংশ। দেখান গেল, বিষুবান্-দিবস বৎসর আরম্ভ হইবার ছয় মাস পরে হইত।

ঋগ্বেদে যে-যে স্থলে বিষুবান্ শব্দ প্রাপ্ত হই, এক্ষণে আমরা তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শকময়ং। ধূমম্। আরাৎ। অপশ্যং। বিষুবতা। পরঃ।

দেবতাগণ সেই আদিত্যের স্বর্গলোক হইতে নিম্ন পতনে ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নিম্নস্থ তিন স্বর্গলোক দ্বারা উত্তোলিত করিয়াছিলেন। তিন স্বর্গলোক স্তোম সকল; তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্থান হইতে দূর পতনে ভীত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ঊর্দ্ধস্থ তিন স্বর্গ লোক দ্বারা স্তম্ভন করিয়াছিলেন। স্তোম সকলই তিন স্বর্গলোক। তাহা হইলে তিন নিম্নে (ও) তিন উপরে সপ্তদশ হয়। মধ্যে এই একবিংশ। উভয় দিকে স্বর সাম সকলের দ্বারা ধৃত। ইহাই উভয় দিকে স্বর সাম সকলের দ্বারা ধৃত। সেইজন্ত ইহা অন্তরবর্ত্তী, যাহাতে এই সকল লোক বাধা না দেয়।

এনা। অবরেণ। উক্ষাণং। পৃশ্নিং। অপচন্ত। বীরাঃ। তানি। ধর্ম্মাণি। প্রথমানি। আসন্॥ ১।১৬৪।৪৩

এই ঋকের আমরা এইরূপ অর্থ করি :—

(আমি) নাতিদূরে শকময় ধূমকে দেখিয়াছি; (এই ধূম) বিষুবান্ দ্বারা যুক্ত (ও) এই অবর (অর্থাৎ নিম্নস্থ অগ্নি) দ্বারা শ্রেষ্ঠ। বীর সকল উক্ষ অর্থাৎ বৃষ (ও) পৃশ্নি অর্থাৎ গাভী পাক করিয়াছিলেন। সেই সকল ধর্ম্ম প্রথম ছিল।

মন্তব্য :—অগ্নিকে ধূমকেতু বলা হইত। যথা—

সঃ। নঃ। মহান্। অনিমানঃ ধূমকেতুঃ। পুরুচন্দ্রঃ। ধিয়ে। বাজায়। হিন্বতু॥ ১।২৭।১১

অর্থ :—সেই (অগ্নি) মহান্, অপরিচ্ছন্ন, ধূম চিহ্ন-বিশিষ্ট, বহুদীপ্ত—আমাদিগের ধী ও অন্নের লাভে প্রীত হউন।

অতএব ধূম অর্থে ধূমকেতু বা অগ্নি। অবরেণ অবর শব্দের তৃতীয়া। অবর অর্থে নিকৃষ্ট বা নিম্নস্থ (৮)। অতএব পৃথিবীর অগ্নি 'এনা অবরেণ' দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। শকময় অর্থে সায়ন শকৃৎময় বা শুষ্ক গোময়-সম্ভূত বলেন। ঋগ্বেদের অপর কোন স্থলে 'শকময়' শব্দ প্রাপ্ত হই না। আমাদের মনে হয় 'শকময়' অর্থে তেজোময়। কারণ, শক্ ধাতুর অর্থ শক্তিমান হওয়া বা সক্ষম হওয়া (৯)। এখানে ঋষি বিষুবানের সূর্য্যকে বর্ণনা করিতেছেন। যখন সূর্য্য বিষুবানে গমন করেন, তখন যে যজ্ঞ হইত ও যাহাতে বৃষ এবং গাভী পাক করা হইত, তাহাই প্রথম ধর্ম্মকার্য্য ছিল, বলা হইতেছে।

এই ঋকের সায়ন-সম্মত অর্থ :—নাতি দূরে শুষ্ক গোময়-সম্ভূত ধূম দেখিয়াছি; এই ব্যাপ্তিযুক্ত নিকৃষ্ট (ধূম) দ্বারা (অগ্নি) শ্রেষ্ঠ। (ফলদাতা) বৃষভকে, সোমকে অভিষব দ্বারা ঋত্বিক্‌গণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সকল কার্য্যই প্রকৃষ্ট ছিল।

রমেশবাবু কৃত অর্থ :—আমি নাতিদূরে শুষ্ক গোময়-সম্ভূত ধূম দেখিলাম। চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত নিকৃষ্ট ধূমের পর অগ্নিকে দেখিলাম। বীরগণ শুক্লবর্ণ বৃষকে পাক করিতেছেন। তাহাদের এই অনুষ্ঠানই প্রথম।

মন্তব্য :—এই ঋকের ব্যাখ্যা করিবার কালে সায়নাচার্য্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-সম্মত 'বিষুবান্' শব্দের বিশেষ অর্থের উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। তিনি এই শব্দের যজ্ঞ সম্বন্ধীয় বিশেষ অর্থ গ্রহণ না করিয়া 'ব্যাপ্তি মতা' অর্থ করিয়াছেন। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, ঋগ্বেদের ঋক্ সকলের রচনা যজ্ঞ-কার্য্য সম্পাদনের জন্য। আমরা দেখাইয়াছি, বিষুবানের যজ্ঞ অতি প্রাচীন কালে অঙ্গিরা ঋষিদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এ স্থলে দেখিতেছি যে, ঋগ্বেদের ঋষি বলিতেছেন যে, ইহাই প্রথম শকময় ধূমের যজ্ঞ এবং এই যজ্ঞে বৃষ ও গাভী উৎসর্গ করা হইত। পৃশ্নি অর্থে গাভী। মরুৎদিগকে পৃশ্নিমাতর বলা হইত। অথচ রমেশবাবু পৃশ্নি অর্থে শুক্ল করিলেন। ঋগ্বেদ পাঠে আমরা তিন প্রকার অগ্নির কথা বহু স্থলে প্রাপ্ত হই। এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এই তিন প্রকার অগ্নি চন্দ্র-সূর্য্য এবং বিদ্যুৎ বা উষা মধ্যে দেখিতে পাই। যাহা হউক, ঋগ্বেদের কোথাও ঘুঁটের আগুনের কথা নাই। মূলে রহিল 'শকময়'—সায়নাচার্য্য অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলিলেন যে, ইহা ঋষি শকৃৎময় লিখিতে গিয়া শকময় করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া যদি বেদের অর্থ করা যায়, তাহা হইলে বেদের সকল অর্থই করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি, যাঁহারা ঋক্-রচয়িতা ছিলেন, তাঁহারা অত্যন্ত জ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারা যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা বৃথা প্রয়োগ করেন নাই; এবং সেকালেও ব্যাকরণ ছিল, যাহার নিয়ম অনুসারে ঋষিগণ ঋক্ রচনা করিতেন। উক্ষ ও পৃশ্নি অর্থে যে বৃষ ও গাভী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন ঋভুগণ অঙ্গিরাদিগের গৃহে যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা গাভীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটিয়া যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এইরূপ বর্ণনা ঋগ্বেদেই বর্ত্তমান (১০)।

(৮) দধাতি। পুত্রঃ। অবরং। পরং। পিতুঃ। নাম। তৃতীয়ং। অধি রোচনে। দিবঃ॥ ১।১৫৫।৩

(৯) অজীজনঃ। হি। পবমান। সূর্য্যং। বিধারে। শকমনা। পয়ঃ। গোজীরয়া। রংহমাণঃ। পুরন্ধ্যা॥ ৯।১১০।৩

অর্থঃ—হে পবমান (সোম)! গোদুগ্ধ মিশ্রিত সোম দ্বারা, শ্রেষ্ঠ ধী-দ্বারা যুক্ত বেগবান্ (তুমি) উদকের আধারে (অর্থাৎ অন্তরিক্ষে) তেজ দ্বারা সূর্য্যকে জন্ম দিয়াছ।

এই ঋকে শকমন্ শব্দ বর্ত্তমান। সেকালে শকময় অর্থে তেজোময় ওয়াই সম্ভব মনে করি।

(১০) শ্রোণাং। একঃ। উদকং। গাং। অব। অজতি। মাংসং।

স্বাদোঃ। ইত্থা। বিষুবতঃ। মধ্বঃ। পিবন্তি। গৌর্যঃ।
যাঃ। ইন্দ্রেণ। সযাবরীঃ। বৃষ্ণা। মদন্তি। শোভসে।
বস্বীঃ।
অনু। স্বরাজ্যম্॥ ১।৮৪।১০

গৌরীগণ নিশ্চয় বিষুবানের মধু হইতে স্বাদু (সোম) পান করিতেছেন। যাঁহারা বর্ষক ইন্দ্রের সহিত গমনকারিণী (তাঁহারা) হৃষ্টা হইয়াছেন। স্বরাজ্যের অভিমুখে বস্বীগণকে (হে ইন্দ্র) শোভা প্রদান করিতেছ।

সায়ন 'বিষুবতঃ' অর্থে 'সর্বেষু যজ্ঞেষু ব্যাপ্তি যুক্তস্য' করিয়াছেন। যদি বৈদিক যুগেও ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণেই দেখিতে পাই, সাংবৎসরিক সত্রের মধ্যে একটী প্রধান দিনকে বিষুবান্ নাম দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই শব্দ ঋগ্বেদেও প্রাপ্ত হই, তখন উহার অর্থ 'সর্বেষু' যজ্ঞেষু ব্যাপ্তিযুক্তস্য' করা কতদূর সমীচীন, তাহা বিজ্ঞমাত্রেই বিবেচনা করিবেন। পূর্ব্বে আমরা ঋগ্বেদ হইতে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি যে, সংবৎসর সত্রের আরম্ভ যেরূপ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, সেই ভাবেই ঋগ্বেদেও রহিয়াছে। এই উদ্ধৃত ঋক্ "চাতুর্বিংশিকে হনি মাধ্যং দিনে সবনে" পড়িতে হয়। দেখা গিয়াছে, চতুর্বিংশ দিবসে বৎসর আরম্ভ হইত। অতএব ঋষি এই দিনের সোমরসকে বিষুবানের মধু অপেক্ষা স্বাদু বলিতেছেন বলিয়া অনুমান করি। ইহা আশ্চর্য্য কথা যে, সায়ন একবারও বিষুবানের এই বিশেষ অর্থের উল্লেখ পর্য্যন্তও করেন নাই।

উৎ। যৎ। ব্রধ্নস্য। বিষ্টপং। গৃহং। ইন্দ্রঃ। চ। গন্বহি।
মধ্বঃ। পীত্বা। সচেবহি। ত্রিঃ। সপ্ত। সখ্যুঃ।
পদে॥ ৮।৫৮।৭

অর্থ:—ইন্দ্র ও (আমি) আদিত্যের বিষ্টপ গৃহে যখন উঠিয়া যাইব, সখার একবিংশ পদে সোম পান করিয়া একত্র হইব।

সায়ন:—'ত্রিঃ সপ্তপদে' অর্থে আদিত্যস্য দেবলোকানাং উত্তমং একবিংশ স্থানং উচ্যতে, আদিত্যস্যৈক বিংশত্বাৎ। তথা চ ব্রাহ্মণং দ্বাদশ মাসাঃ পঞ্চর্তব স্ত্রয় ইমে লোকা অসাবাদিত্য একবিংশ ইতি।

অতএব সায়ন মতে সখার একবিংশ পদ অর্থে আদিত্য আপনি। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, বিষুবান্ দিনকেও একবিংশ বলা হইত। সেই দিনের যজ্ঞই সংবৎসর সত্রের অন্তর্গত সর্ব্বপ্রধান যজ্ঞ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, নানা প্রকার যজ্ঞ কিরূপে করিতে হয়, তাহার বর্ণনা দেখিতে পাই। একটী যজ্ঞের নাম ষোড়শীক্রতু। এই ক্রতু দ্বারা দেবগণ পূর্ব্বকালে প্রথম দিনে ইন্দ্রের বজ্র-নির্ম্মাণ, দ্বিতীয় দিনে উহার অভিষেক ও তৃতীয় দিনে ইন্দ্রকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র চতুর্থ দিনে তাহা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সাংবৎসরিক যজ্ঞের মধ্যে এই যজ্ঞ করিতে হয় (১১)। সাংবৎসরিক যজ্ঞের মধ্যে অতিরাত্র নামে এক যজ্ঞ আছে। ইহার বিষয় বিস্তৃত রূপে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ১৬।৫ খণ্ডে, অর্থাৎ ষোড়শী ক্রতুর বিবরণের পর, বর্ণিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত সাংবৎসরিক যজ্ঞের বর্ণনা (ঐঃ বাঃ ১৭ ও ১৮ অধ্যায়ে) করিবার পূর্ব্ব অংশেই অতিরাত্র যজ্ঞের বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, উদ্ধৃত (৮।৫৮।৭) ঋকের পূর্ব্বে "ষোড়শী শস্ত্রস্তোত্রৎ ব্রধ্নস্য ইতি এষাস্ত্যা স্তৃত্রিতঞ্চ" বলিয়া বেদে লেখা আছে। অতএব এই ঋক্ সাংবৎসরিক সত্রের মধ্যে পৃষ্ঠ্য ষড়হ দিনে ব্যবহৃত হইত। এই ঋকে বলা হইতেছে যে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও ইন্দ্র সখার (অর্থাৎ আদিত্যের) ত্রিসপ্ত অর্থাৎ একবিংশ পদে যখন যাইবেন, তখন সোম পান করিবেন। যে পৃষ্ঠ্য ষড়হে এই ষোড়শী শস্ত্র পঠিত হয়, তাহা দ্বারা ইন্দ্রকে বজ্র দেওয়া হয়, এবং উহা তিনি বর্ষাকালেই বৃত্রের প্রতি প্রয়োগ করেন। বিষুবান্ দিন উহা হইতে ছয়মাস পরে হয়। অতএব এই ঋকে সেই ভবিষ্যৎ দিনের কথাই বলা হইতেছে। যেমন পৃথিবীতে ঋষিগণ যজ্ঞ করিতেন,

একঃ। পিংশতি। সূনয়া। আভৃতম্ আ। নিম্রচঃ। শকৃৎ। একঃ।
অপ। অভরৎ। কিং। স্বিৎ। পুত্রেভ্যঃ। পিতরৌ। উপ। আবৃতঃ।
১।১৬১।১০

অর্থঃ—একজন পদহীন গাভীকে জলের নিকট লইয়া যাইতেছেন; একজন ছুরি দ্বারা কর্ত্তিত মাংসকে সাজাইতেছেন; একজন নির্মুক্ত (মাংস) হইতে মল দূর করিতেছেন; কোন পুত্রদিগের হইতে পিতামাতা একরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হন?

(১১) তথা চ শাখান্তরে পঠন্তি—'ন বৈ ষোড়শী নাম যজ্ঞোহস্তি; যদ্বাব ষোড়শং স্তোত্রং ষোড়শং শস্ত্রং তেন ষোড়শী ইতি। তথা সতি অস্থং সংস্থা বিশেষঃ পৃষ্ঠ্যষড়হ চতুর্থেহনি প্রযুজ্যতে।..... তস্মাৎ পৃষ্ঠ্যষড়হস্য চতুর্থাহঃ প্রযোগে ষোড়শিনং শস্ত্রং শংসেৎ।' ইতি সায়ন। ঐঃ ব্রাঃ ১৬।১।১।

আমরা দেখিতেছি পৃষ্ঠ্যষড়হং অঙ্গিরাদিগের সাংবৎসরিক যজ্ঞের অঙ্গ।

দিব্যলোকেও বরুণ ও আদিত্যগণ এই সাংবৎসরিক যজ্ঞ করিতেন। ঋষি বিষুবানের শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় যজ্ঞে গিয়া সোম পান করিয়া অমর হইবেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা গেল অতিরাত্র, প্রায়ণীয় ও চতুর্বিংশ যজ্ঞ, বৎসর আরম্ভ হইবার সময়ে অনুষ্ঠিত হইত। আর বিষুবান্ দিন ইহার ছয় মাস পরে ঠিক বৎসরের মধ্যে পড়িত। ঋগ্বেদের মধ্যে দ্বাদশ মাস যুক্ত বৎসর সত্রে গ্রীষ্মের পর বর্ষা ঋতুর আগমনে অতিরাত্র, প্রায়ণীয় প্রভৃতি যজ্ঞ হইবার প্রমাণ উদ্ধার করা গিয়াছে এবং ঐ সময়ে যে বৎসর আরম্ভ হইত, তাহারও স্পষ্ট উল্লেখ আছে, দেখান গিয়াছে। ঋগ্বেদের এক স্থলে এই সময়ে কূপ হইতে সূর্য্যের অবস্থান পরিদর্শন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত, বর্ণিত আছে (১২)। এতৎ ভিন্ন বৎসরের মধ্যে যে বিষুবান বা একবিংশ দিনের যজ্ঞ হইত, তাহাও উদ্ধার করিয়া দেখান হইয়াছে। অতএব ঋগ্বেদের সময়ে হিম ঋতুতে (অর্থাৎ Winter Solsticeএ) যে বিষুবানের যজ্ঞ হইত, তাহতে আর সন্দেহ থাকে না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আমরা জানিতেছি যে, পুরুষের মস্তকে যেমন জোড়ের চিহ্ন থাকে, সেইরূপ যে নক্ষত্রে সূর্য্য আসিলে বিষুবান্ হইত, তাহার শিরের মধ্যেও সেলাই করার চিহ্ন রহিয়াছে। আকাশে কোন্ নক্ষত্রে এইরূপ দেখা যায়? আমাদের মনে হয়, যে নক্ষত্রপুঞ্জকে Orion বলা হয়, সেই নক্ষত্রেই এইরূপ সেলাই করার চিহ্ন বর্ত্তমান। তিলক মহোদয়ও তাহাই মনে করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা মৃগ, মৃগব্যাধ, রোহিণী ও তিন কাণ্ডযুক্ত বাণের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সকল নক্ষত্র পুঞ্জ কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাহার বর্ণনায় দেখিতে পাই, প্রজাপতি মৃগ-রূপ ধারণ করিয়াছেন; তাঁহার কন্যা রোহিণী আকাশে রোহিণী নক্ষত্র হইয়াছেন। মৃগব্যাধ যিনি, তিনি পশুপতি দেবতা। প্রজাপতির পাপের জন্য, তিন কাণ্ডযুক্ত বাণ দ্বারা তিনি (পশুপতি) তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে মৃগ না বলিয়া মৃগশীর্ষ বলা হইয়াছে (১৩)।

এই গল্প দ্বারা আমাদের মনে হয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কালে বিষুবান রোহিণী নক্ষত্র ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কারণ কিম্বদন্তী রূপে প্রচলিত ছিল যে, মৃগ-নক্ষত্রে আদিত্য ও অঙ্গিরাগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। (১৪)

অঙ্গিরাদিগের বিষয় ঋগ্বেদে যেরূপ বর্ণিত দেখি, তাহাতে ইন্দ্রের কুক্কুরী সরমা, দক্ষিণ দিকস্থ পণিদিগের দ্বারা হৃত সূর্য্যকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছিল। সেই নিমিত্তই সরমা ও তাহার পুত্র যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হয় (১৫)। আমাদের মনে হয়, সরমাই Serius (বা α Canis Major) নামক নক্ষত্র ও তাহার পুত্র শ্বা (বা β Canis Major) নক্ষত্র। সরমা ও শ্বা পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অন্তর্গত। যখন

---

(১২) পরিশিষ্ট দেখুন।

(১৩) তং অভি আয়ত্য অবিধ্যৎ স বিদ্ধ ঊর্দ্ধ্ব উৎ অপ্রপতৎ। তং [illegible]ঃ মৃগ ইতি আচক্ষতে। য উ এব মৃগব্যাধঃ স উ এব স। যা [illegible]হিৎ সা রোহিণী। যো এব ইষুঃ ত্রিকাণ্ডা সো এব ইষুঃ ত্রিকাণ্ডা। ১৩।৯।১০

অর্থ:—তাঁহার দিকে (ধনু) টানিয়া বিদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই তাঁহাকে মৃগবৎ দেখা যাইতেছে। যিনি মৃগ ব্যাধ (ছিলেন), তিনি ও ঐ তিনি। যিনি লালবর্ণ তিনি রোহিণী। তিন কাণ্ড (যুক্ত) ইষু যাহা তাহা ও ঐ ত্রিকাণ্ড ইষু (বা বাণ) For Mrigasirsha, indeed, is the head of Prajapati..... শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।২।৮

(১৪) ঋগ্বেদের হইতেও প্রাচীনকাল হইতে চন্দ্রস্থিত সোমরসই সকল সৃষ্টির মূল বলিয়া বিশ্বাস আমাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। অতএব প্রজাপতি অর্থে সোমকেই বুঝাইত। সেইজন্য মৃগ বা মৃগশিরা নক্ষত্রের দেবতা সোম। আর সেইজন্য প্রজাপতির রেত হইতে আদিত্য ভৃগু, আদিত্যগণ, অঙ্গিরাগণ, বৃহস্পতি, মনুষ্য, পশু সকলের উৎপত্তি, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত হইয়াছে। ঐঃ ব্রাঃ ১৩।১০।৪

(১৫) অনূনোৎ। অত্র। হস্তযতঃ। অদ্রিঃ। অর্চন্। যেন। দশ। মাসঃ। নবগ্বাঃ ঋতং। যতী। সরমা। গাঃ। অবিন্দৎ। বিশ্বানি। সত্যা। অঙ্গিরাঃ। চকার॥ ৪।৪৫।৭

বিশ্বে। অস্যাঃ। বি উষি। মাহিনায়াঃ। সম্। যৎ। গোভিঃ।
অঙ্গিরসঃ। নবন্ত
উৎসঃ। আসাম্। পরমে। সধস্থে। ঋতস্য। পথা। সরমা
বিদৎ। গাঃ॥ ৪।৪৫।৮

অর্থ:—এই যজ্ঞে হস্তধৃত প্রস্তর শব্দ করিতেছে; যাহার দ্বারা নবগ্বগণ দশ মাস যজ্ঞ করিয়াছেন। ঋত (বা বৎসররূপী যজ্ঞ) গামিনী সরমা গোসকলের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিল, অঙ্গিরাগণ সকল সত্য করিয়াছিলেন।

ইহার (অর্থাৎ সরমার) মহিমায় সকল (গো) প্রকাশিত হইলে, অঙ্গিরাগণ তুখন (সেই) সকল গোদ্বারা যুক্ত হইয়াছিলেন; উৎকৃষ্ট স্থানে ইহাদিগের (অর্থাৎ গাভীদিগের) উৎস (বা উৎপত্তিস্থান) আছে। ঋতের (অর্থাৎ বৎসররূপী যজ্ঞের) পথ দ্বারা সরমা গোসকল জানিয়াছিল।

সূর্য্য সরমা নক্ষত্রে আসিতেন, তখন সূর্য্যের বিষুবান্ (বা Winter Solstice) হইত। এই ঘটনা অঙ্গিরা ঋষিদিগের কালে ঘটে। ঋগ্বেদে ঋভু, বিভ্ব ও বাজ নামক তিন ভ্রাতার গল্প আছে। তাঁহারা অগোহ্যের (অর্থাৎ অগ্নির) গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। দ্বাদশ দিন তথায় বেশ সুখে অবস্থান করেন। সেই দ্বাদশ দিনের শেষে সুনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া অগোহ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কে সংবৎসরের মধ্যে অন্ধকার দিনকে জানাইয়া দেন? তাহাতে বস্ত অগোহ্য (বা অগ্নি) উত্তর দিয়াছিলেন যে, শ্বাকে এই জ্ঞানদাতা বলিয়া জানিবে। (১৬) কোন্ ঋতুতে তখন সূর্য্য শ্বা নক্ষত্রে উদিত হইতেন? আমরা দেখিয়াছি,ঋভুগণ দ্বাদশাহের যজ্ঞে অঙ্গিরাদিগের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। দ্বাদশাহের যজ্ঞ কখন্ সম্পন্ন হইত জানিলেই, আমরা ঐ সময় নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইব। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানিতেছি যে, শিশির-ঋতুর শেষ ভাগে দ্বাদশাহের সত্র যজ্ঞ হইত। যিনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ তিনি এই যজ্ঞ করিতেন। পাপী পুরুষ যাজ্য নহে। যখন দেবগণ ইন্দ্রকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তখন তিনি বৃহস্পতিকে বলিয়াছিলেন "আমাকে দ্বাদশাহের দ্বারা যাজন কর।" এই যজ্ঞের পর ইন্দ্র দেবতাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন। শিশির মাসদ্বয়ের মধ্যে দ্বাদশাহের যজ্ঞ করিতে হইবে। বসন্ত ঋতু আসিলে যজ্ঞ শেষ করিতে হইত (১৭)। অতএব ঋভুদিগের কালে সূর্য্য শ্বা নক্ষত্রে

(১৬) সুষুপ্বাংসঃ। ঋভবঃ। তৎ। অপৃচ্ছত। অগোহ্য। কঃ ইদং। নিঃ। অবূবুধৎ
শ্বানং। বস্তঃ। বোধয়িতারং। অব্রবীৎ। সংবৎসরে।
ইদং। অদ্য। বি। অখ্যত ॥ ১।১৬১।১৩ ॥

অর্থঃ—হে সুন্দররূপে নিদ্রাগত ঋভুগণ! তৎপরে (অর্থাৎ নিদ্রা ভঙ্গে) তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, হে অগোহ্য! কে ইহাকে (ও) আমাদিগকে জানাইয়া দেন? বস্ত শ্বাকে উদ্বোধয়িতা বলিয়াছিলেন, অদ্য সংবৎসরে ইহাকে (অর্থাৎ জগৎকে) বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছে।

দ্বাদশ। দ্যূন্। যৎ। অগোহ্যস্য। আতিথ্যে। রণন্। ঋভবঃ। সসন্তঃ
সুক্ষেত্রা। কৃণ্বন্। অনয়ন্ত। সিন্ধূন্। ধন্ব। আ। অতিষ্ঠন্।
ওষধীঃ। নিম্নং। আপঃ ॥ ৪।৩৩।৭

অর্থ:—ঋভুগণ দ্বাদশ দিবস অগোহ্যের আতিথ্যে বাস করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। (তাঁহারা) জলশূন্য দেশে নদীসকল আনয়ন করিয়া ক্ষেত্রসকল সুন্দর করেন। উপরে ওষধী নিম্নে জল অবস্থান করে। অগ্নিকেই অগোহ্যং বলা হইত। দেবতাদিগের দ্বারা প্রজ্বলিত তিন অগ্নি নিম্ন ঋকে প্রকাশিত।

নরাশংসং। বা। পুষণং। অগোহ্যং। অগ্নিং। দেবেদ্ধং। অভি।
অর্চসে। গিরা। সূর্য্যামাসা। চন্দ্রমাসা। যমং। দিবি। ত্রিতং।
বাতং। উষসং। অক্তুং। অশ্বিনা ॥ ১০।৬৪।৩

নরাশসং, পোষক, অগোহ্য (অগ্নেগর্হনং অশক্যং ইতি সায়ন)

দেবতাদিগের দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নিকে বাক্যের দ্বারা অর্চনা কর। সূর্য্যমা, চন্দ্রমা দিবালোকে (এই দুইকে (ও) তৃতীয় অগ্নিদ্বয় দ্বারা প্রাপ্তা (ও) যুক্তা উষাকে (অর্চনা কর।)

ইন্দ্রস্য। অঙ্গিরসাং। চ। ইষ্টৌ। বিদৎ। সরমা। তনয়ায়। ধাসিং।
বৃহস্পতিঃ। ভিনৎ। অদ্রিং। বিদৎ। গাঃ। সং। উস্রিয়াভিঃ। বাবশন্ত।
নরঃ ॥ ১।৬২।৩

সঃ। সুষ্টুভা। সঃ। স্তুভা। সপ্ত। বিপ্রৈঃ। স্বরেণ। অদ্রিং। স্বর্যঃ।
নবগ্বৈঃ।
সরণ্যুভিঃ। ফলিগং। ইন্দ্র। শক্র। বলং। রবেণ। দরয়ঃ। দশগ্বৈঃ ॥ ৪
গৃণানঃ। অঙ্গিরঃ ভিঃ। দস্ম। বি। বঃ। উষসা। সূর্য্যেণ। গোভিঃ। অন্ধঃ
বি। ভূম্যাঃ। অপ্রথয়ঃ। ইন্দ্র। সানু। দিবঃ। রজঃ। উপরং।
অস্তভায়ঃ ॥ ৫

ইন্দ্র ও অঙ্গিরাদিগের যজ্ঞে সরমা তনয়ের নিমিত্ত অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৃহস্পতি অদ্রি ভঙ্গ করিয়া গো প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; নেতাগণ গোসকলের সহিত হর্ষসূচক শব্দ করিয়াছিলেন।

তিনি (অর্থাৎ বৃহস্পতি) সুন্দর মধ্যম স্বরের দ্বারা, স্তোত্র দ্বারা, স্বরের দ্বারা সাতজন নবগ্ব বিপ্রদিগের সহিত অদ্রিকে সুখে পাইয়া (বিদারণ করিয়াছিলেন)। হে শক্র ইন্দ্র! অনুসরণকারী দশগ্বদিগের সহিত ফলিগবলকে শব্দের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন।

হে দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি অঙ্গিরাদিগের দ্বারা স্তুয়মান হইয়া উষা, সূর্য্য, গোসকলের দ্বারা অন্ধকার দূর করিয়াছিলে। তুমি দ্বারা উচ্চ স্থানসকল সমতূল করিয়াছ; উপরে দিব্য ও রজলোক দৃঢ় করিয়াছ।

(১৭) জ্যেষ্ঠ যজ্ঞো বা এষ যৎ দ্বাদশাহঃ। স বৈ দেবানাং জ্যেষ্ঠো য এতেন অগ্রে অযজত। শ্রেষ্ঠ যজ্ঞো বা এষ যৎ দ্বাদশাহঃ স বৈ দেবানাং শ্রেষ্ঠো য এতেন অগ্রে অযজত। ঐঃ, ব্রাঃ ১৯।৩।২৫

যাহা এই দ্বাদশাহ (যজ্ঞ) তাহা জ্যেষ্ঠ যজ্ঞ। দেবতাদিগের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি ইহা দ্বারা প্রথম যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাহা এই দ্বাদশাহ তাহা শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। দেবতাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি ইহা দ্বারা অগ্রে যজ্ঞ করিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠো যজেত কল্যাণীহ সমা ভবতি। ন পাপঃ পুরুষো যাজ্যো দ্বাদশাহেন নেদয়ং ময়ি প্রতিতিষ্ঠাৎ ইতি। ঐঃ ব্রাঃ, ১৯।৩।২৫

জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ (যিনি) এই যজ্ঞ করিবেন। সমা (বা সংবৎসর)

আসিলে বসন্ত ঋতু আরম্ভ হইত। আমাদের ব্যাখ্যায় ভ্রম না থাকিলে, winter solstice বা বিষুবানের সময় ইহার ঠিক একমাস পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অন্তর্গত শ্বা নক্ষত্রের আরম্ভ হইলে মৃগশিরা নক্ষত্রপুঞ্জে নিশ্চয় বিষুবান হইত। কারণ মৃগশিরা হইতে আর্দ্রা এক নক্ষত্র, আর্দ্রা হইতে পুনর্ব্বসু এক নক্ষত্র এবং তাহা হইতে শ্বা এক নক্ষত্রের অংশ; মোট দুই নক্ষত্র ও কিছু অংশ; ইহা অতিক্রম করিতে সূর্য্যের এক মাস লাগে। বর্ত্তমান কালে মৃগশিরার পরনক্ষত্র আর্দ্রার প্রথম অংশে অতিরাত্র বা summer solstice হইতেছে। অতএব বৈদিক কাল হইতে অয়ন-চলন বশতঃ এই বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, অয়ন প্রায় ১৩ নক্ষত্র ঘুরিয়া আসিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে ১৩×৯৫০ বৎসর অর্থাৎ ১২৩৫০ বৎসর লাগিয়াছে। ঋভুদিগের কাল তাহা হইলে বর্ত্তমান সময় হইতে ১২৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল। নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাদিগের কালে বিষুবান্ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অন্তর্গত সরমা নক্ষত্রে ছিল। অতএব ঋভুদিগের কাল হইতে প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে নবগ্ব ও দশগ্বগণ বর্ত্তমান ছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কালে সম্ভবতঃ রোহিণী নক্ষত্র ছাড়াইয়া বিষুবান্ কৃত্তিকার দিকে গমন করিয়াছে, কিন্তু কৃত্তিকায় পৌঁছায় নাই। অথর্ব-বেদের যুগে বিষুবান্ কৃত্তিকায় পৌঁছিয়াছে এবং এই কালে সমস্ত নক্ষত্রদিগের নামকরণ হইয়াছে। কৃত্তিকায় বিষুবান্ হইলে বিশাখায় বৎসর শেষ ও আরম্ভ হয় অর্থাৎ বৎসরের দুই শাখার মিলন-স্থান বিশাখা নক্ষত্রে। তাহা হইলে যে কালে নক্ষত্রদিগের নামকরণ হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কাল হইতে (১১×৯৫০)=১০৬৫০ বৎসর পূর্ব্বে ছিল।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা ত্রয়োদশ মাসের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। ইষ, ঊর্জ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বোধ হয় তখনও মাসদিগকে বুঝাইত না। কারণ শতপথ ব্রাহ্মণে ইষ ও ঊর্জ শব্দদ্বয় দ্বারা শরৎ ঋতুর মাসদ্বয় বুঝাইত। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বসন্তকে ইষ ও ঊর্জ বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে গুটিকতক নক্ষত্রের নাম প্রাপ্ত হই। সকল নক্ষত্রের নাম এই ব্রাহ্মণে নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথর্ব্ববেদের নাম নাই। তবে অথর্ব্বঋষির নাম ঋগ্বেদে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে (১৮)। অতএব ইহা হইতে

কল্যাণী হয়। পাপী পুরুষ যাজ্য নহে; দ্বাদশ আহ দ্বারা ইনি। অর্থাৎ পাপী পুরুষ। আমাতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন না।

ইন্দ্রায় বৈ দেবা জৈষ্ঠ্যায় শ্রৈষ্ঠ্যায় নাতিষ্ঠন্ত। সোঽব্রবীৎ বৃহস্পতিং যাজয় মা দ্বাদশাহে নেতি। তং অযাজয়ৎ। ততো বৈ তস্মৈ দেবা জৈষ্ঠ্যায় শ্রৈষ্ঠ্যায় অতিষ্ঠন্ত। ঐঃ ব্রাঃ ১৯।৩।২৫

দেবগণ ইন্দ্রকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি বৃহস্পতিকে বলিয়াছিলেন, আমাকে দ্বাদশাহের দ্বারা যাজন কর। তাঁহাকে যাজন করিয়াছিলেন। তৎপরে দেবগণ তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

সত্রং উ চেৎ সংস্তৃপ্য অগ্নীন্ যজেরন্ সবে দীক্ষেরন্ সবে সুসুযুঃ বসন্তং অভিঃ উদবস্যন্তি। ঊর্জং বৈ বসন্তঃ। ইষং এব তৎ ঊর্জ অভি উদবস্যন্তি। ঐঃ ব্রাঃ ১৯।৪।২৬

(দ্বাদশাহকে) যদি সত্র (করা হয়) অগ্নিসকলকে একত্র করিয়া সকলে যাজন করিবে। সুন্দর নৌকায় যাইতে ইচ্ছুক সকলে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। বসন্ত ঋতু আসিলে যজ্ঞ শেষ করিবে। বসন্তই ঊর্জ স্বরূপ। ইষ (যাহা) তাহাই ঊর্জ; (তাহার) অভিমুখে যজ্ঞ শেষ করিবে। দীক্ষা বৈ দেবেভ্যো অপাক্রামৎ। তাং বাসন্তিকাভ্যাং মাসাভ্যাং অন্বযুঞ্জত। তাং বাসন্তিকাভ্যাং মাসাভ্যাং নোদাপ্নুবন্।······তাং শৈশিরাভ্যাং মাসাভ্যাং অন্বযুঞ্জত। তাং শৈশিরাভ্যাং মাসাভ্যাং আপ্নুবন্। ঐঃ ব্রাঃ ১৯।৪।২৬

দীক্ষা দেবতাদিগের হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বসন্ত মাসদ্বয়ের দ্বারা যুক্ত (মনে করা হইয়াছিল) তাঁহাকে বসন্ত মাসদ্বয়ের দ্বারা যুক্ত পান নাই।········তাঁহাকে শিশির মাসদ্বয়ের দ্বারা যুক্ত (মনে করা হইয়াছিল)। তাঁহাকে শিশির মাসদ্বয়ের দ্বারা যুক্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১৮) King Varuna Aditya—his people are the Gandharvas, the Atharvan are the Veda. Satapatha Brahman, Vol. V. p. 361, XIII, 4, 3.

অতৃপ্নুবন্তং। বিয়তং। অবুধ্যং। অবুধ্যমানং। সুসুপানং। ইন্দ্র সপ্ত। প্রতি। প্রবতঃ। আশয়ানং। অহিং। বজ্রেণ। বি। রিণা।

অপর্বন্॥—ঋগ্বেদ, ৪।১৯।৩

(ভোগে) অতৃপ্ত, শিথিলাঙ্গ, মন্দবুদ্ধি, অজ্ঞান, নিদ্রাতুর, সাতটী জলপ্রবাহের অভিমুখে শয়ান অহিকে বজ্রের দ্বারা বিশেষরূপে হনন করিয়াছ।

অক্ষুন্। অহিং। পরিশয়ানং। অর্ণঃ। প্র। বর্তনীঃ। অরদঃ। বিশ্বধেনাঃ॥

৪।১৯।২

তুমি জলাভিমুখে পরিশয়ান অহিকে বধ করিয়াছ, সকলের প্রীতি-দায়িকা নদীসকল খনন করিয়াছ।

অথর্ববেদের নাম শতপথ অনুমান হয়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অথর্ববেদ-সংহিতা সংগ্রহের পূর্ব্বে রচিত। অথর্ববেদে ২৮টী নক্ষত্রের নাম আছে। ইহাতেও আমাদের অনুমান সমর্থিত হইতেছে। কারণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সকল নক্ষত্রের নাম পাই না। শতপথ ব্রাহ্মণে ২৮ নক্ষত্রের স্থলে ২৭ নক্ষত্রে নক্ষত্রচক্র বিভক্ত। ইহাতেও ইহাকে অথর্ববেদের পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে মাঘ, ফাল্গুন ও বৈশাখ শব্দগুলি মাসের নাম রূপে প্রাপ্ত হই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় অথর্ববেদের বহু পরে এই সকল হইয়াছে।

বৈদিক কালে বৃত্র-বধ লইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব। সেকালে বৃত্রকে অহি বলা হইত। বৃত্র স্বর্গীয় নদী সকল ব্যাপিয়া শয়ান থাকে, বর্ণিত হইয়াছে। ইহাকে সংহার করিবার জন্য দেবগণ ইন্দ্রকে বজ্র প্রদান করিয়াছিলেন। অতিরাত্র (অর্থাৎ summar solstice) দিনে সেকালে বর্ষ আরম্ভ হইত এবং ইন্দ্রকে বৃত্রবধের জন্য যজ্ঞ করিয়া ঋষিগণ আহ্বান করিতেন। বৃত্রের হস্ত নাই, পদ নাই ; সে স্বর্গীয় জল রোধ করিয়া অবস্থান করে। ইন্দ্র তাহাকে সংহার করিলে তবে পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়। আমরা রাশিচক্রের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, বৃশ্চিক রাশির আকার হস্তপদহীন অহিসদৃশ। এই রাশি জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা ও বিশাখার চতুর্থাংশ লইয়া অবস্থিত। যদি রোহিণী নক্ষত্রে বিষুবান থাকে, তবে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে অতিবাদ হইবে। আমাদের মনে হয় ঋগ্বেদের কালে রোহিণী নক্ষত্রে বিষুবান গিয়াছিল। সেইজন্য ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে উষার শকট ভাঙ্গিয়া দেন, বর্ণিত হইয়াছে (১৯)। রোহিণী নক্ষত্র শকটাকার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহা দেখিতেছি ঋগ্বেদের যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইন্দ্র রোহিণী নক্ষত্রে গমন করিয়া উষাকে পরাজয় করিয়াছিলেন। সেই কালে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে স্থিত বৃত্রকে সংহার করিয়া ইন্দ্র স্বর্গীয় বারি আনয়ন করিয়াছিলেন ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে বৎসর আরম্ভ হইত বলিয়া অনুমান করি। এই নিমিত্ত ইন্দ্র, রোহিণী ও বৃত্র বৈদিক যুগে এত প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট

ঋগ্বেদ। ১।১০৫

(জলবিষুবক্রান্তি নির্ণয়।)

চন্দ্রমাঃ। অপসু। অন্তঃ। আ। সুপর্ণঃ। ধাবতে। দিবি। ন। বঃ। হিরণ্যনেময়ঃ। পদং। বিন্দন্তি। বিদ্যুতঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১

দিব্যলোকে সুপর্ণ চন্দ্রমা জলসকলের মধ্যে ধাবমান হইতেছেন। তোমাদিগের হিরণ্যনেমি (অর্থাৎ চক্র) সকল বিদ্যুতের স্থান প্রাপ্ত হন নাই। হে রোদসী! এই আমার (স্তোত্র) জান।

অর্থং। ইৎ। বৈ। উং। অর্থিনঃ। আঃ। জায়া। যুবতে। পতিম্। তুঞ্জাতে। বৃষ্ণ্যং। পয়ঃ। পরিদায়। রসং। দুহে।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ২

অর্থী সকল অর্থ (প্রার্থনা করে) ; জায়া, পতি (প্রার্থনা

অপাৎ। অহস্তঃ। অপৃতন্যৎ। ইন্দ্রং। আ। অস্য। বজ্রং। অধি। সানৌ। জঘান

বৃষ্ণঃ। বধ্রিঃ। প্রতিমানং। বুভূষন্। পুরুত্রা। বৃত্রঃ। অশয়ৎ। বি অস্তঃ॥ ১।৩২।৭

পদহীন, হস্তহীন (বৃত্র) ইন্দ্রের (উদ্দেশে) যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল ; তাহার উন্নত দেশে বজ্র আঘাত করিলেন ; পুরুষত্বহীন পুরুষত্বযুক্তের নিকট যেরূপ, বৃত্রও সেইরূপ বহু স্থানে আহত হইয়া শয়ন করিল।

(১৯) দিবঃ চিৎ। ঘ। দুহিতরং। মহান্। মহীয়মানাম্

উষসং। ইন্দ্র। সং। পিণক্॥ ৪।৩০।৯

হে ইন্দ্র! মহান্ (তুমি) দিব্যলোকের দুহিতা পূজ্যমানা উষাকে সম্যক্ প্রকারে পেষণ করিয়াছিলে।

অপ। উষাঃ। অনসঃ। সরৎ। সংপিষ্টাৎ। অহ। বিভ্যুষী

নি। যৎ। সীং। শিশ্নথৎ। বৃষা॥ ৪।৩০।১০

যখন বৃষ (ইন্দ্র) তাঁহাকে তাড়না করিয়াছিলেন, দিবাভীতা উষা চূর্ণ শকট হইতে পলায়ন করিলেন।

এতৎ। অস্যাঃ। অনঃ। শয়ে। সুসংপিষ্টং। বিপাশি। আ

সসার। সীং। পরাবতঃ॥ ৪।৩০।১১

এই তাহার শকট বিপাশাতীরে চূর্ণ হইয়া শয়ান রহিয়াছে ; (তিনি,) দূরদেশে চলিয়া গিয়াছেন।

ইয়ং। যা। নীচী। অর্কিণী। রূপা। রোহিণ্যা। কৃতা

চিত্রা ইব। প্রতি। অদর্শি। আয়তী। অন্তঃ। দশসু। বাহুষু॥ ৮।৯০।১৩

এই যাঁহাকে নিম্নমুখী অর্কিণীরূপা রোহিণী করা হইয়াছে, দশদিকের মধ্যে আগমনকারিণী চিত্রার মত দেখাইতেছে।

[উদ্ধৃত ঋকে উষার স্তুতি হইয়াছে।]

করে); (জায়াপতি) বীর্য্য (রূপ) পয় উৎপন্ন করে; গ্রহণ করিয়া রস দোহন করে; হে রোদসী! এই আমার (স্তোত্র) জান।

মো। সু। দেবাঃ। অদঃ। স্বঃ। অব। পাদি। দিব। পরি। মা। সোম্যস্য। শম্ভু বঃ। শূনে। ভূম। কদা। চ ন।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ৩

হে সুদেবগণ! ঐ স্ব দিব্যালোকে (বা দিব্যালোক হইতে) নামিতেছেন; হে সোমযাজীর কল্যাণকরগণ (অর্থাৎ দেবগণ)! (আমি যেন) কদাচ (যজ্ঞ) শূন্য না হই। হে রোদসী! এই আমার (স্তোত্র) জান।

যজ্ঞং। পৃচ্ছামি। অবমম্। সঃ। তৎ। দূতঃ। বি। বোচতি। ক্ব। ঋতং। পূর্ব্যং। গতং। কঃ। তৎ। বিভর্তি। নূতনঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ৪

অবম (অর্থাৎ অগ্নিকে) যজ্ঞ (সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করিতেছি; সেই দূত তাহা বলিতেছেন। পূর্ব্ব ঋত কোথায় গিয়াছে, কোন্ নূতন তাহা ধারণ করিতেছে?......

অমী। যে। দেবাঃ। স্থন। ত্রিষু। আ। রোচনে। দিবঃ। কৎ। বঃ। ঋতং। কৎ। অনৃতং। ক্ব। প্রত্না। বঃ। আহুতিঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥

ঐ যে সকল দেবগণ দিবালোকের তিন আরোচন স্থানে ছিলেন, (হে দেবগণ)! তোমাদিগের ঋত কোথায়, অনৃত কোথায়? তোমাদিগের প্রাচীন আহুতি কোথায়?

কৎ। বঃ। ঋতস্য। ধর্নসি। কৎ। বরুণস্য। চক্ষণং। কৎ। অর্যম্ণঃ। মহঃ। পথা। অতি। ক্রামেম। দুঃধ্যঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ৬

তোমাদিগের ঋতের ধারক কোথায়? বরুণের চক্ষু কোথায়? কোথায় অর্যমার মহৎ পথ—(যাহা) অতিক্রম করা দুঃসাধ্য?......

অহং। সঃ। অস্মি। যঃ। পুরা। সুতে। বদামি। কানি। চিৎ। তম্। মা। ব্যন্তি। আধ্যঃ। বৃকঃ। ন। তৃষ্ণজং। মৃগং।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ৭

আমি সেই (জন) হই, যে পূর্ব্বে সোমযজ্ঞে কতকগুলি (সূক্ত) বলি; সেইরূপ আমাকে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ জন্য মনোদুঃখ ব্যথা দিতেছে, যেমন তৃষ্ণার্ত্ত মৃগকে ব্যাঘ্র মনে কষ্ট দেয়।

সং। মা। তপন্তি। অভিতঃ। সপত্নীঃ ইব। পর্শবঃ। মূষঃ। নঃ। শিশ্না। বি। অদন্তি। মা। আধ্যঃ। স্তোতারং। তে। শতক্রতো।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ৮

(কূপের) পার্শ্বদেশ সকল সপত্নীর মত আমাকে চতুর্দ্দিকে সম্যক্‌প্রকারে ক্লেশ দিতেছে; হে শতক্রতো! তোমার স্তবকারী আমাকে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ জন্য মনোদুঃখ, ইন্দুর যেমন শিরা চর্ব্বণ করে, সেইরূপ কষ্ট দিতেছে।...

অমী। যে। সপ্ত। রশ্ময়ঃ। তত্র। মে। নাভিঃ। আততা। ত্রিতঃ। তৎ। বেদ। আপ্ত্যঃ। সঃ। জামিত্বায়। রেভতি।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী। ৯

ঐ যে সপ্তরশ্মি সকল (অর্থাৎ সূর্য্যাস্থিত), তাহাতে আমার নাভি সংবদ্ধ রহিয়াছে। আপ্ত্য (বংশীয়) ত্রিত তাহা জানে; সে (অর্থাৎ ত্রিত) জ্ঞাতিত্বের নিমিত্তই স্তব করিতেছে।

অমী। যে। পঞ্চ। উক্ষণঃ। মধ্যে। তস্থুঃ। মহঃ। দিবঃ। দেবত্রা। নু। প্রবাচ্যং। সধ্রীচীনাঃ নি। ববৃতুঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১০

ঐ যে পাঁচটী বৃষ মহৎ দিব্যালোকের মধ্যে ছিলেন, (তাঁহারা) দেবতাদিগের মধ্যে অগ্রে প্রশংসার যোগ্য; একত্র বা যুগপৎ (আমার অভিমুখে) আবর্ত্তন করুন।...

সুপর্ণাঃ। এতে। আসতে। মধ্যে। আরোধনে। দিবঃ। তে। সেধন্তি। পথঃ। বৃকং। তরন্তং। যহ্বতীঃ। আপঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১১

দিব্যালোকের আবরণের মধ্যে এই সকল সুপর্ণগণ ছিলেন; তাঁহারা মহতী আপ সকল উত্তরণকারী বৃককে (অর্থাৎ সূর্য্যকে) পথ হইতে (দূরে যাইতে) নিবারণ করেন।......

নব্যং। তৎ। উক্থ্যং। হিতং। দেবাসঃ। সুপ্রবাচনং। ঋতং। অর্ষন্তি। সিন্ধবঃ। সত্যং। তাতান। সূর্য্যঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১২

হে দেবগণ! স্তুতিযোগ্য, মঙ্গলকর, শোভন, প্রশংসাযোগ্য সেই নব্য ঋতকে সিন্ধু সকল প্রেরণ করিতেছেন; সূর্য্য সত্যকে বিস্তার করিতেছেন।......

অগ্নে। তব। তৎ। উক্থ্যং। দেবেষু। অস্তি। আপ্যং। সঃ। নঃ। সত্তঃ। মনুষ্বৎ। আ। দেবান্। যক্ষি। বিদুষ্টরঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১৩

হে অগ্নে! দেবতাদিগের মধ্যে তোমার সেই প্রসিদ্ধ স্তুতিযোগ্য বন্ধুত্ব আছে; জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ সেই (অগ্নি) মনুষ্যবৎ আমাদের (যজ্ঞে) আসীন হইয়া দেবতাদিগকে যাজন কর।……

সত্তঃ। হোতা। মনুষ্বৎ। আ। দেবান্। অচ্ছ। বিদুঃতরঃ। অগ্নিঃ। হব্যা। সুসূদতি। দেবঃ। দেবেষু। মেধিরঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১৪

জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, হোতা, দেবতাদিগের মধ্যে মেধাবী, দেব অগ্নি মনুষ্যের মত আসীন হইয়া দেবতাদিগের অভিমুখে হবিদ্বারা সুন্দর রূপে প্রেরণ করিতেছেন।

ব্রহ্ম। কৃণোতি। বরুণঃ। গাতুবিদং। তম্। ঈমহে। বি। উর্ণোতি। হৃদা। মতিং। নব্যঃ। জায়তাং। ঋতম্।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১৫

বরুণ ব্রহ্ম (অর্থাৎ স্তোত্র) করিতেছেন; সেই পথজ্ঞকে প্রার্থনা করি (বা যাচ্ঞা করি)। হৃদয়ে মতি (বা স্তুতি) প্রকাশ করিতেছেন। নূতন ঋত উৎপন্ন হউক।

অসৌ। যঃ। পন্থাঃ। আদিত্যঃ। দিবি। প্রবাচ্যং। কৃতঃ। ন। সঃ। দেবাঃ। অতিক্রমে। তং। মর্তাসঃ। ন। পশ্যথ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১৬

দিবালোকে ঐ যে পথ আদিত্য প্রসিদ্ধ করিয়াছেন (বা স্তুতিযোগ্য করিয়াছেন), হে দেবগণ! তিনি (অর্থাৎ আদিত্য) অতিক্রম করেন না; তাহাকে (পথ-সীমাকে) মর্ত্ত্যগণ দেখিতে পায় না।

ত্রিতঃ। কূপে। অবহিতঃ। দেবান্। হবতে। উতয়ে। তৎ। শুশ্রাব। বৃহস্পতিঃ। কৃণ্বন্! অংহুরণাৎ। উরু।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১৭

কূপে অবস্থিত ত্রিত রক্ষার জন্য দেবতাদিগকে ডাকিতেছে; বৃহস্পতি কূপ হইতে (উত্থিত) এই মহৎ কার্য্য (বা স্তোত্র) শ্রবণ করিয়াছিলেন।

অরুণঃ। মা। সকৃৎ। বৃকঃ। পথা। যন্তং। দদর্শ। হি। উৎ। জিহীতে। নিচায্য। তষ্টাইব। পৃষ্টি আময়ী।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী॥ ১৮

অরুণ বৃক (অর্থাৎ সূর্য্য) (২০) পথের দ্বারা গমনশীল আমাকে একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন; যেমন ছুতার (অনেকক্ষণ কাজ করিতে-করিতে) পৃষ্ঠে ক্লেশ বোধ করিলে সোজা হইয়া দাঁড়ায়, (সেইরূপ বৃক) দেখিয়া (সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন)।

এনা। আঙ্গুষেণ। বয়ম্। ইন্দ্রবন্তঃ। অভি। স্যাম। বৃজনে। সর্ববীরাঃ। তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ। পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ॥ ১৯

এই (স্তোত্র) ঘোষণার দ্বারা আমরা সংগ্রামে ইন্দ্রবন্ত, সকল বীরযুক্ত হইব। অতএব মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও দ্যৌ আমাদিগকে পালন করুন।

মন্তব্যঃ—এই সূক্তে নূতন বৎসর উৎপত্তির বর্ণনা হইতেছে। ঋষি সূর্য্যবংশীয়। ইহা যে সৌর বৎসর, তাহাতে সন্দেহ নাই। সূর্য্য যে পথে ভ্রমণ করে তাহাতে ঋষি চক্ষু দ্বারা গমন করিতেছেন, অর্থাৎ সেই পথে তাঁহার চক্ষু আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ঐ পথের বিশেষত্ব এই যে, সূর্য্য তাহার সীমাকে অতিক্রম করে না এবং উহার সীমাও কেহ দেখিতে পায় না। এখানে সূর্য্যের নিম্ন পতনের জন্য কোন ভয়ের কথা নাই। বরং ঋষি কূপ হইতে সূর্য্যের গতি পরিদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে, বৃক (অর্থাৎ সূর্য্য) একবার মাত্র সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে দেখিয়াছিল। অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সূর্য্য এক্ষণে মস্তকের নিকট আসিয়াছিল; অর্থাৎ ইহাই Summer Solstice ছিল। এই সময়ে স্বর্গীয় নদীসকল ঋতকে প্রেরণ করিতেছেন এবং সূর্য্য সত্য বিস্তার করিতেছেন। বৈদিক যুগে ধারণা ছিল এই যে, স্বর্গের এক দিকে জলের

(২০) আস্নঃ। বৃকস্য। বর্তিকাং। অভীকে। যুবম্। নরা। নাসত্যা। অমুমুক্তম্। ১।১১৬।১৪

যাস্ক আহ:—পুনঃ বর্ত্ততে প্রতিদিবস মাবর্ত্তত ইতি। বর্তিকা উষাঃ তাং বৃকেণাবরকেণ সর্বজগৎপ্রকাশে নাচ্ছাদয়িত্রা সূর্যেণ গ্রস্তাং।

অর্থ:—যুবা, নেতা, না সত্যদ্বয় বৃকের (অর্থাৎ সূর্য্যের) মুখ হইতে বর্তিকাকে (অর্থাৎ উষাকে) সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

মন্তব্য:—সূর্য্য উঠিলে উষা অদৃশ্য হন; ইহার কারণ ঋষিগণ মনে করিতেন, সূর্য্য তাহাকে গ্রাস করেন। কিন্তু প্রাতঃকালে অশ্বিদ্বয় উঠিয়া সূর্য্যের মুখ হইতে উষাকে মুক্ত করেন বলিয়া পুনরায় তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ুদ্র আছে। যখন সূর্য্য সেই দিকে আগমন করে, তখনই গীয় জল বৃষ্টি রূপে পড়িবার সম্ভাবনা হয়! তবে যদ্যপি ান দানব (যথা বৃত্র) ঐ জল রোধ করিয়া থাকে, তবে াকালেও অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা। সূর্য্য যে সময়ে উত্তর কে আগমন করে, এবং পথ-সীমা অতিক্রম করে না, ই সময়ে স্বর্গীয় সিন্ধুগণ জল প্রেরণ করে এবং সূর্য্য তাঁহা য়ে ছড়াইয়া দেয়। কারণ স্বর্গের এই দিকই সমুদ্রের ক্। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে এ বিষয়ে একটী বন্ধে মতামত প্রকাশ করা গিয়াছে। তবে এই সূক্ত অত্যন্ত আবশ্যক। সেই জন্য পুনরায় ইহার অর্থ প্রকাশ করা গেল। ইহা হইতে দেখিতেছি যে, ঋগ্বেদের কালে কোন্ সময়কে বর্ষাঋতু বলা হইত। গ্রীষ্মঋতুর পর বর্ষা-ঋতুর আগমনে নূতন বৎসর উৎপন্ন হইত—ঋগ্বেদ হইতে ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখান গিয়াছে। এখানে দেখান গেল যে, সূর্য্য যখন উত্তরায়নের শেষ সীমায় (অর্থাৎ Summer Solsticeএ) আগমন করিত, তখনই বর্ষাঋতু ও নূতন বৎসর উৎপন্ন হইত। এই সময়ে ঋগ্বেদের কালে সূর্য্যের অবস্থান পরিদর্শন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইত।

ব্রাউনিঙের গীতি-কবিতা

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ]

(ব্রাউনিঙের জন্ম—৭ মে, ১৮১২ ; মৃত্যু—১২ ডিসেম্বর, ১৮৮৯

াজ বিজ্ঞান, দর্শন ও প্রলয়কারী মহাযুদ্ধের যুগে বঙ্গ-হিত্যের গীতি-কবি-মণ্ডলে একটা ভীষণ অবসাদ আসিয়া ড়িয়াছে। মাসিকপত্রসমূহে ঋতু-বন্দনা, খণ্ড চতুর্দ্দশ-ী, খেদোক্তি ও নিরাশ-প্রেম-সূচক কবিতা অত্যন্ত াধান্য লাভ করিয়াছে। আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে এ ক্ষণ দেখা দেয় নাই; সে সময়ে "বঙ্গদর্শনের" কশাঘাত ন সাধারণ অত্যন্ত ভয়ের চক্ষে দেখিত। এখন আপকা-ান্তের যুগে সে ভয় কাটিয়া গিয়াছে। সেকালের ালোচনায় লোকে মরিয়া যাইত। বায়রণের সেই দ্রূপাত্মক শ্লোকটি মনে পড়ে—

'Who kill'd Johnny Keats?'

'I'—said the Quarterly!

ই অবসাদের যুগে ব্রাউনিঙের মত ভাবুক, সৌন্দর্য্যা-সক, সুখবাদী দার্শনিক কবির প্রয়োজন। ভারতবর্ষ পৌরুষেয় বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বড়াল-কবির খ' পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থে নিরাশার পূরবী-রাগিণী শুনিয়া-নিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয়, ই যুগগত অবসাদ ও দুঃখবাদের মধ্যে সুখবাদী উনিঙের কবিতা *aqua vitoe* বা সঞ্জীবনী-সুধার ন্যায় াজ করিবে।

আটাশ বৎসর হইল ইংলণ্ডের গীতি-কবি রবার্ট ব্রাউনিঙ দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, তিনিই ইংলণ্ডের শেষ গীতি-কবি। যে জীবনব্যাপী সাধনা, যে সৌভাগ্য, যে প্রতিবেশ-প্রভাবে তাঁহার প্রতিভা মুকুলিত ও পুষ্পিত হইয়াছিল, আজ-কালের যুগে তাহা সম্ভবপর নহে।

ব্রাউনিঙ্এর ব্যারেট্ ঘটিত প্রেম-কাহিনী ইংরাজী সাহিত্যজ্ঞগণের নিকট সুবিদিত। কেমন করিয়া একে অন্যের কবিতা পাঠ করিয়াই, চোখে না দেখিয়াই, পর-স্পরকে আত্ম-সমর্পণ করেন, তাহা বিদ্যাপতি-লছমীদেবী-ঘটিত কাহিনীর ন্যায় বিস্ময়কর। একজন রুগ্না, পাণ্ডুর-দেহা, তন্বঙ্গী নারী কোন্ গুণে ব্রাউনিঙ্এর মনোহরণ করে—তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়। পিতার অজ্ঞাতে শ্রীমতী ব্যারেট্ পিতৃ-গৃহের মায়া কাটাইয়া, বিপুল বিশ্বের প্রাণে আপনার প্রাণের কামনা মিশাইয়া দিবার জন্য রবার্টের সহিত ইটালী-যাত্রা করিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি চসারের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, উনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবি সুইন্‌বর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত খ্যাতনামা কবিই ইটালীর মোহন সৌন্দর্য্যে নিক-

নিজ কাব্য-জীবনের ভিত্তি ও আদর্শ গড়িয়া লইয়াছেন। আমরা বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

দীর্ঘ প্রবাসের ফলে ইটালীর সৌন্দর্য্য, ইটালীর ধ্যান-ধারণা, ইটালীর কাব্য ও ললিতকলা, ইটালীর ধর্ম্ম, সমাজ ও চরিত্রনীতি ব্রাউনিঙের কাব্য-জীবন পরিপূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গীন করিয়া দেয়। ব্রাউনিঙের নাটক, দীর্ঘ গাথা, ও গীতি-কবিতার উপর ইটালীর সুনীল আকাশের নিবিড় ছায়া প্রভাতের সুকুমার স্বপ্নের মত ঘিরিয়া আছে।

সাধারণ পাঠকের নিকট ব্রাউনিঙ সচরাচর দুর্ব্বোধ্য ও নীরস। ব্রাউনিঙ তাঁহার কাব্য-গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'আমার কাব্য আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া ধূমপান করিতে-করিতে পাঠ করিবার জন্য রচিত নহে।' ব্রাউ-নিঙের কাব্য সুষ্ঠুরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে, vertebrate বা মেরুদণ্ডশীল হইতে হইবে। তাঁহারা কবিতা দার্শনিকের ভাষায় *Sui generis*, অর্থাৎ অদ্বিতীয়। তাঁহার চিন্তার ধারা আকাশের মেঘ-প্রবাহের মত চঞ্চল-গতি—কখন্ কোন্ দিকে ছুটিতেছে, তাহা ধরিবার জন্য পাঠককে সর্ব্বদাই দুইটী চক্ষু সতর্ক রাখিয়া, একটি তৃতীয় জ্ঞান-চক্ষু লইয়া চলিতে হয়। তাঁহার কবিতার ভাষা সাধারণতঃ কথোপকথনের (১) ভাষা—পার্ব্বত্য পথের মত কটমট। ছন্দের মিলের জন্য কবি এমন অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেন যে, পাঠককে সহসা বিমূঢ় হইয়া পড়িতে হয়। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার "হাসির গানে" এই সকল শব্দের অনেক ব্যবহার করিয়াছেন। 'cock-crow' ও 'roch-row', 'gownd him' ও 'found him', 'far gain' ও 'bargain' honey-bee' ও money-bee' ইত্যাদি প্রয়োগে পাঠককে একটু বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। কবি বলিয়াছেন, ভাবই কবিতার অঙ্গ; ভাষা-সৌষ্ঠবে মনোযোগ দিতে হইলে ভাব পঙ্গু হইয়া পড়ে। মোলায়েম বাঙ্গালা গীতি-কবিতা-প্রিয় বঙ্গদেশের হঠাৎ-কবিগণ ভাষার এই যথেচ্ছ ব্যবহারে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, সন্দেহ নাই।

(১) ইহা ব্রাউনিঙের ইচ্ছাকৃত দোষ বলিয়া আমাদের সন্দেহ হয়। কারণ Her zve Riel, Rabbi Ben Ezra, One Word More, The Last Ride Together প্রভৃতি অনেকগুলি বিখ্যাত কবিতায় যে ছন্দোলালিত্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে তিনি শেলীর সহিত সমান আসনে বসিবার উপযুক্ত।

"প্রেম-পথে বহু বাধার" ন্যায় ব্রাউনিঙ পাঠে দ্বিতী বাধা—তাঁহার দার্শনিক চিন্তার ধারা। তিনি বলে 'অতীত চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানকে আঁকড়াইয়া ধর (২)

'Since life fleets, all is change, the Past
gone seize to-day' (Rabbi Ben Ezra).

'এ জীবনের বিফলতা—আগামী জীবনের সফলতার আ এক সোপান।' অন্যত্র তিনি বলেন—

'My own hope is……
That what began best, can't end worst,
Nor what God blessed once, prove accurst.

প্রেম এ জগতেই শেষ হয় না। এভেলিন্ হোপ্‌কে এ জন্মে পাইলাম না। আশায় চাহিয়া রহিব। হয় ত কত জন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে। 'But the time will come —at last it will'—'আসিবে সে দিন আসিবে।' কবি বলেন, সুকুমার কলার আলোচনায় তোমার প্রাণ লইয়া এসো, কল্পনার চিত্র জড় তুলিকায় ফুটাইবার চেষ্টা কর। নিখুঁত চিত্রকর (The Faultless Painter) Andrea তাহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্রে কি-যেন-কিছু খুঁজিয়া পায় নাই, তাই সে বলিয়া উঠিল—

"But all the play, the insight and the sketch
Out of me! Out of me!'

আত্মোন্নতি না করিতে পারিলে 'বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই?'—'Why stay we on earth unless to grow?'—(Cleon) সঙ্গীতের মোহ মানব বুদ্ধির অজ্ঞেয়। ব্যাধিগ্রস্ত সল (Saul) ডেভিডের (সুসমাচারের 'দায়ুদ') অপূর্ব্ব বীণাবাদনে নবজীবন ফিরাইয়া পায়। আবট্ ফল্গার (Abt Volger) তাঁহার নবাবিষ্কৃত বীণাযন্ত্রে বিশ্বের

(২) ওমর খৈয়ামের অমর শ্লোকটী মনে পড়ে—

'Ah, fill the cup—what boots to repeat
How time is slipping underneath our feet!
Unborn To-morrow and dead Yesterday
Why fret about them, if To-day be sweet!'

ব্রাউনিঙের প্রিয় ভক্ত বড়াল-কবি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

"সত্য শুধু বর্ত্তমান—অসত্য সকলি,
শুধু সুধা, শুধু গান—শুধু তুমি সৎ।'

(সাহিত্য—'পান্থ')

ব-ধ্বনি ফুটাইয়া তুলেন। স্থপতির ন্যায় গায়কও স্বর-
রীর অপূর্ব্ব প্রাসাদ গড়িয়া তুলিতে পারেন।

'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে যেন করিতে পারি জয়,—'

ই কবির দর্শনবাদের মূল-মন্ত্র। মৃত্যুর কয়েক মাস র্ব্ব রচিত তাঁহার শেষ কবিতায় (Epilogue to Asondo) তিনি বলেন, 'ফিরিয়োনা—আগে চল, আগে ভাই!' "ভয় পাইও না যে বজ্রপাত হইবে; উত্থানের ই যে আমাদের পতন, জয়ের জন্যই যে আমাদের াজয়,—জাগরণের জন্যই না আমাদের নিদ্রা?" ইটালীর সা গিডির (Casa Guidi) প্রাসাদে বসিয়া লিখিত বর এই শেষ বাণী বিংশ শতাব্দীর রক্তলোলুপ জড়োাক জগৎকে আজ নববলে প্রবুদ্ধ করিবে।

এই 'ফিলজফির' ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলে তবে ক কবির পার্ণাসস-কুঞ্জে (Parnassus) প্রবেশ করিতে রিবেন। তাঁহার কবিতা-পাঠের তৃতীয় বাধা এইখানে। ার গীতি-কবিতাগুলি নাটকীয় নিয়মে গঠিত। কে কার্য্য-পরম্পরার (action) পরিণতির ভিতর বক্তার চরিত্র (character) ও পারিপার্শ্বিক ('milieu') য়া উঠে। নাটকে কবির নিজ অন্তরের ভাব ফুটাইবার কাশ নাই। ব্রাউনিঙের সমুদায় কবিতা এই নাটকীয় পাক করা। অধুনা ডিস্‌পেপ্‌টিক্ ও বদহজমী কের সংখ্যা সুপ্রচুর বলিয়া ব্রাউনিঙের পাঠক-সংখ্যা চুর হইয়া পড়িতেছে। ইংরাজ-কবি হইলেও প্রথমে শে কবির সমাদর হয় নাই। উদার আমেরিকা নিঙ-প্রচারে প্রধান সহায়ক হইয়া কালিফোর্ণিয়া ওয়ের টাইম্-টেবলে কবির গীতি-কবিতা প্রকাশ । বঙ্গদেশে অবাধ-প্রকাশিত পঞ্জিকায় 'জোয়ার-ভাঁটা য়'র নিম্নেই রবীন্দ্রনাথের 'যামিনী না যেতে জাগালে না ', রামপ্রসাদের 'মন তুমি কৃষি কাজ জান না'— দির আবির্ভাব দেখিয়া মনে হয়, নোবেল্ প্রাইজের বটতলার নিকট কত ঋণী! কিন্তু হায় রামপ্রসাদ! ব্রাউনিঙের যে-কোন কবিতা পাঠ করিলে এই উক্তির র্থ্য সপ্রমাণ হইবে। তাঁহার মহাকাব্য 'The Ring the Book' হইতে ক্ষুদ্র গীতি-কবিতা পর্য্যন্ত সমস্ত র এই নাটকীয় ভাব পরিলক্ষিত হয়। ব্রাউনিঙ নিজে খুব 'মিশুক' ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁহার বন্ধু টেনিসনের ঠিক বিপরীত। তিনি একাধারে কবি, গায়ক, চিত্রকর ও মূর্ত্তি-শিল্পী ছিলেন। সুচারু পরিচ্ছদে শোভিত, প্রাংশুদেহ, উদার ললাট, শান্ত হাস্যরসোজ্জ্বল মুখশ্রী লইয়া তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদৃত হইতেন। দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর কালের মধ্যে এক দিবসের জন্যও কবি পত্নীর বিরহ-দুঃখ ভোগ করেন নাই। মানুষ-হিসাবে তিনি একজন দুর্জ্জেয় পুরুষ। তাঁহার দেহ ও মনের গঠন-প্রণালী দেখিয়া কত সমালোচক যে কত কি লিখিয়াছেন, তাহা সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক-সমালোচনা পাঠের ন্যায় চমকপ্রদ। তাঁহার বংশাবলীর আলোচনা করিতে বসিয়া এই সব মল্লিনাথ তাঁহার ইটালীয়ান, স্কচ, জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক্, এমন কি বর্ব্বর কেলটিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি! সমগ্র জনসনের অভিধানখানি না কি তাঁহার এক রূপ কণ্ঠস্থই ছিল! নূতন কোনও অভিধান প্রকাশিত হইলে তিনি মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিতে বসিতেন।

তাঁহার দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র গীতিকবিতা ও গাথায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের, এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের চিত্র ও চরিত্র এই নাটকীয় প্রথায় অপূর্ব্ব দক্ষতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন যে চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন, তখনই সেই সৃষ্ট চরিত্রের ধ্যান-ধারণা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। প্রত্যেক মনুষ্যই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের 'epitome' বা ক্ষুদ্র সংস্করণ; প্রত্যেকেই যেন এই বিশাল জগতের একমাত্র অধিবাসী—তাহার 'সমান-ধর্ম্মা' কেহ নাই। জীবনের সমস্ত সুখ, মোহ, বিলাস-ব্যসন তাহাকে দেওয়া হইল,—দেখা যাক্, সে আপনাকে কিরূপে পরিচালিত করে। তাহার কার্য্যের উদ্দেশ্য সৎ কি অসৎ—ইহা দেখিবার প্রয়োজন নাই; কেবল দেখিব—সে আপনার শক্তি, আপনার বুদ্ধিবৃত্তি, আপনার চিন্তা লইয়া আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে কি না—

To man propose this test—
Thy body at its best,
How far can that project thy soul on its
lone way'

(Rabbi Ben Ezra)

ইহাই তাঁহার চরিত্র-নির্ণয়ের নিকষ পাষাণ। এই জন্যই তাঁহার গীতিকবিতায় 'monologue' বা স্বগতোক্তির এত বাহুল্য। এইজন্যই তাঁহার কবিতায় এত রকমফের,—রাজা, প্রজা, সাধু, প্রেমিক, যোদ্ধা, কবি, চিত্রকর, গায়ক, পুরোহিত, ইহুদী, বেদিয়া, দরবেশ, রাজকুমারী, নর্ত্তক, পথের রূপসী বালিকা, পণ্ডিত, মূর্খ, গণৎকার, ইত্যাদি শত-শত চরিত্র যেন সজীব হইয়া তাঁহার কবিতার পটে বায়োস্কোপের ছায়াবাজি দেখাইতেছে। এ বিষয়ে সেক্‌স্‌পীয়র ব্যতিরেকে তিনি জগতের কবিগণের নিকট অদ্বিতীয়। 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' পর্য্যন্ত তিনি বিশ্বের মানব-চরিত্রের সহিত সুপরিচিত। কল্পনার লঘু ও দ্রুতসঞ্চালিত পক্ষ সহযোগে তিনি জগতের দিগ্‌দিগন্তে যাইতে পারেন। ইংলণ্ডের নগর ও পল্লী, গ্যাসের আলো ও আকাশের আলো, রোমান্ ক্যাম্পানা, ভিনিসের গণ্ডোলা, ফ্লোরেন্সের মায়াময় রাজপথ, পারী নগরীর বুলেভার (Boulevards), স্পেনের রাজধানী মাড্রিডের প্রাডো, রাশিয়ার তুষারময় অরণ্যানী, পারস্যের খর্জ্জুরবনভূমি, মিশরের মহামরু, নর্ম্মাণ্ডি ও ব্রিটানির লবণময় উপকূল, আরব, সিরিয়া, এমন কি তদানীন্তন কালে স্বল্প-পরিচিত বোষ্টন্ সহরের চিত্র পর্য্যন্ত এই যাদুকরের তুলিকায় প্রতিফলিত হইয়াছে।

২

এইবার আমরা কবির দুই একটী কবিতার আলোচনা করিব। আমরা যথাসম্ভব কবির ভাষাই অনূদিত করিয়া দিব। Paracelsus নামক নাটকে কবির একটী বিখ্যাত গান—

(ক) বৎসরের বসন্ত এসেছে,
দিবসের হয়েছে প্রভাত,
প্রভাতের এ দ্বিতীয় যাম,
নগদেশে শিশির-মুকুতা।
পাখী দূরে উড়িয়া চলেছে
কণ্টকেতে কীট-যাতায়াত,
ব্রহ্ম তাঁর নিজ স্বর্গধাম—
পৃথিবীর কুশল-বারতা।—
God's in his heaven—
All's right with the world!

জগতের দুঃখ আমাদের বিচলিত করিতে পারিবে না; কেন না উপরে অনন্তদেব স্নেহময় চক্ষে আমাদের পানে চাহিয়া আছেন—আমরা শুধু তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিব। ইহাই কবির সুখবাদের ভিত্তি।

(খ) *Muckle-mouth Meg* নামক গাথায় একটী ক্ষুদ্র ঘটনা বর্ণনাগুণে অপূর্ব্বতা লাভ করিয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের সীমান্ত-প্রদেশের জমীদার একটী ইংরাজ-যুবককে বন্দী করিলেন। তাহার দোষ—সীমান্ত-রাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ। জমীদার-পত্নী বলিলেন, "শুন্‌ছ, একে দেখ্‌তে-শুন্‌তে ত' মন্দ নয়, আমাদের মেগ্‌কে যদি এ বিয়ে করে, তবে—" কিন্তু সে যে সেই ব্যাবৃত-বদনা (muckle-mouth) মেয়েটীকে বিয়ে করিবে না! তাহা অপেক্ষা কারাগার ভাল।...কারাগারের আশে-পাশে চঞ্চল চরণে ও কে ছুটিয়া বেড়ায়? সে বলে—"হাঁ-করা'কে এখনও ঘৃণা? আচ্ছা, কয়েদে থাকো! কিন্তু এই কিছু এনেছি, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও!" পরে তাহার সহিত ইংরাজ-যুবকের চাক্ষুষ পরিচয়ে ভ্রম দূরীভূত হইল। যুবক দেখিল—এ কি, এ যে অপূর্ব্ব সুন্দরী! সুতরাং কারা-মোচন ও পাণিগ্রহণ!

(গ) *Summum Bonum* (শ্রেয়ঃ)—একটী মৌমাছির উদর-স্থলীতে সারা বৎসরের সুগন্ধ ও সুষমা লুক্কায়িত আছে;

"ক্ষুদ্র মণি-কণা-ছায়
খনির তমান্ধ ভায়,
ক্ষুদ্র মুকুতার কোলে সাগর-মাধুরী" (প্রদীপ)।

কিন্তু সত্য যে মুক্তার চেয়ে উজ্জ্বল, বিশ্বাস সে মণির চেয়ে পবিত্র;—উজ্জ্বল সত্য, ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বাস,—এ সবই একটী বালিকার চুম্বনে আবদ্ধ।

(ঘ) *The Statue and the Bust* নামক বিখ্যাত কবিতাটীতে ব্রাউনিঙের সৌন্দর্য্যানুভূতি, দর্শন-জ্ঞান, কাব্য-রসবোধ ও নাটকীয় প্রথায় চরিত্র-সৃষ্টি অপূর্ব্ব কৌশলে প্রতিভাত হইয়াছে। গল্পটী এই;—ফ্লোরেন্স দেশের রিকার্ডি-বংশের একজন ধনী বৃদ্ধবয়সে তরুণী ভার্য্যা ঘরে আনিলেন। অপূর্ব্ব রূপসী;—গুচ্ছে-গুচ্ছে কৃষ্ণ-কেশসম্ভার কপোলদেশে লুটাইয়া পড়িতেছে; ভ্রমরকৃষ্ণ চঞ্চল দুইটী নয়ন—এই দুইটী অস্পষ্ট আভাসেই কবি নববিবাহিতা

ধুর "সঙ্গারিবী পল্লবিনী-লতেব" রূপের পরিচয় দিয়াছেন। সকালে ফ্লোরেন্স শহরে বড় কড়া নিয়ম ছিল। বিবাহের র কন্যা স্বামী ব্যতীত আর কোনও পুরুষের সাহচর্য্যে াসিতে পাইত না। দ্বিতলের বাতায়নে দাঁড়াইয়া বধূ জ্ঞাসা করিলেন, 'ও কে ঘোড়ায় চড়িয়া যায় ?' সখীরা লিল, 'ওকে চেন না ? উনি যে ডিউক ফার্ডিনাণ্ড !' আর

"That self-same instant underneath
The Duke rode past in his idle way,
Empty and fine like a swordless sheath"—

দুইজনের দৃষ্টি-বিনিময় হইল—

"And lo, a blade for a knight's emprise
Filled the fine empty sheath of a man"—

তদিন সেই খাপে তরবারি ছিল না ;—আজ প্রেমের ণিত কৃপাণ তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

"He looked at her, as a lover can ;
She looked at him, as one who awakes ;
The past was a sleep and her life began"—

ইহার অনুবাদ চলে না—"the words of Mercury e harsh after the songs of Apollo." রিকার্ডির নন্দ-ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া ডিউক সে দেশের প্রথামত ায়ার কপোল চুম্বন করিল। বুঝি দুইজনের ভিতর কি-ন-একটা ফিস্‌ফাসও হইয়া গেল। শুধু বুড়া সে কথা নল। সেইদিন হইতে সে তরুণী ভার্য্যাকে সাম্‌লাইতে গিল। ফার্ডিনাণ্ড বলিল, 'ওহে রিকার্ডি, তোমার বালিকা-—চল না, পেট্রায়াতে আনন্দ-ভোজ করা যাক্। বেশ া আরামের যায়গা।' 'না ভাই—ধন্যবাদ! সেখানকার বায়ু হয় ত তা'র সইবে না।' 'হাঁ, তা' বটে, জায়গাটা টু ঠাণ্ডা।' ইত্যাদি। কিন্তু দুইজনের মনেই মিলিত বার প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠিল। বধূ ভাবিল—'কা'ল য যাওয়া হ'বে না—বাবা থাক্‌বেন।...চাকরের একটা া হ'লেই হবে। আর এই পোড়া চুলের রাশ বেঁধে ত হ'বে—'। ফার্ডিনাণ্ড ভাবিল, 'আজ আর হ'য়ে না—ফ্রান্সের দূত আসবে, অনেক কথা'— ইত্যাদি। রূপে সে দিন গেল—তার পরদিনও কাটিল। এ কি !—

'They found love not as it seemed before'

সারা জীবন এই প্রতীক্ষায়, এই বিফলতায় কাটিবে ? বধূ পথের পানে চাহিয়া থাকে—কিন্তু বাতায়ন হইতে বলিতে পারে না—

'নবীন পথিক, সে যে আমি—সেই আমি !'—'কল্পনা' তাই কবি বলিতেছেন,—

"So weeks grew months, years ; gleam
by gleam
The glory dropped from their youth
and love,
And both perceived they had dreamed
a dream."

দুইজনেরই মোহ কাটিল—ভাবিল, যেন গত রাত্রের একটা দুঃস্বপ্ন জীবনের উপর—"ঘনশ্রাবণ মেঘের মত, রসের ভারে নম্র নত" হইয়াছিল। আজ সে মেঘ কাটিল। বধূ আজ যেন প্রবীণা ; সে বলিল, "রবিয়া শিল্পীকে খবর দাও,— সে এই দ্বিতলের সার্শির উপর পথ-লগ্ন-চক্ষু আমার আবক্ষ মূর্ত্তি খোদিত করিয়া দিক্—আমার মরণের পরেও আমার প্রিয়তম যখন ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপথে যাইবেন, তখন তাহার পানে চাহিয়া রহিব।' ডিউকও নিজের স্মরণ-চিহ্ন রাখিতে প্রস্তুত হইলেন। ডু'য়ে'র বিখ্যাত শিল্পী জন্ তাহার বাতায়ন-সন্ধ-দৃষ্টি অশ্বারোহী-মূর্ত্তি পথিপার্শ্বে খোদিত করিয়া দিল। বধূ উপরের বাতায়ন হইতে "উপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্" সেই প্রস্তর-খোদিত প্রেমময় মূর্ত্তিটার পানে জন্ম-জন্ম ধরিয়া চাহিয়া আছে...... কবি বলেন, দুইজনেই একটা বিষম ভুল করিয়াছে। নিজের দোষেই তাহারা মিলিত হইতে পারে নাই। নীতির দিক হইতে তাহাদের কার্য্যের দোষ-গুণ নির্দ্ধারণের প্রয়োজন নাই, কেন না—

——"a crime will do
As well, I reply, to serve for a test"—

ইহাই আমাদের অবসন্ন জীবনের একমাত্র আশ্বাস-বাণী। সংকল্প ও কার্য্যসিদ্ধি—এই দুইটা আমাদের যাথার্থ্য, স্বরূপ ও গুণ নির্ণয় করিয়া দেয়। বাইবেলের ভাষায় কবি এই নিরাশ-প্রেমিক-যুগলের পাপের নামকরণ করিয়াছেন—

"And the sin I impute to each frustrate—
ghost
Is—the unlit lamp and the ungirt loin."

এই পাপেই তাহাদের সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল।

উপসংহার

ব্রাউনিঙের কবিতায় শক্তি, সাধনা ও প্রেমের প্রকাশ। তাঁহার ইন্দ্রিয়-নিচয় অত্যন্ত ভাবপ্রবণ; একটী সবুজ প্রিম্‌রোজ পুষ্পকে কেবল 'সবুজ' ও 'প্রিমরোজ' বলিয়া তিনি দেখেন না; তাহার অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করিয়া যেখান পরাগ, কেশর ও পুষ্পদলের অস্তিত্ব শেষ হইয়া অতীন্দ্রিয় প্রিম্‌রোজের বিকাশ,—কবি সেই ভাবুকতার রাজ্যে প্রবেশ করেন। ডেভিড গান করিতে করিতে সেই আদিম মনুষ্যের আদিম আনন্দকাহিনী রুগ্ন রাজাকে শুনাইয়া বলিয়াছিল—

"Oh the wild joys of living! the leaping
from rock up to rock,
The strong rending of boughs from the
fir-tree the cool silver shock
Of the plunge in a pool's living water."

স্বর্গীয় মনীষী চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'অনন্ত মুহূর্ত্ত' বঙ্কিমচন্দ্র উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া আজকাল শোনা যাইতেছে। কিন্তু ব্রাউনিঙ্ সান্ত ও অনন্তের সঙ্গম-স্থল এইরূপ এক-একটী মুহূর্ত্তের উপর আপনার কাব্য-চরিত্র স্থাপন করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা Pippa Passes নামক নাটকের উল্লেখ করিতেছি। রেশমের কারখানার বালিকা পিপ্পা একটী দিন ছুটী পাইয়া আনন্দে প্রভাত-সঙ্গীত গাহিয়া চলিয়াছে,—কয়েকটী প্রাণী তাহাদের জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্তে সেই গান শুনিল—

ব্রহ্ম তাঁর নিজ স্বর্গধাম —
পৃথিবীর কুশল—বারতা!—

আর তাহাদের জীবনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। কেবলমাত্র বিশ্বের অমোঘ নিয়ম ও নীতিপালনেই মনুষ্যের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে। আত্ম-দমনে মানুষ দেবত্ব পায় না। দেশ-কালের অতীত বস্তুকে পাইবার জন্য তোমার সর্ব্বস্ব নিয়োজিত কর, ইহাই তোমার দেবত্ব, ইহাই তোমার সাধনা, ইহাই তোমার মানবতা। জড়ের জীবন—'Finished and finite clods, untouched by a spark.'

মনুষ্য-জীবনের চরম সাফল্য কয়েকটী বিশেষ-বিষয়ে পরিস্ফুট হয়; যথা, প্রেম, ললিতকলা ইত্যাদি। তোমার ভালবাসার পাত্রকে হয় ত ধর্ম্ম ও সমাজনীতি অনুসারে তুমি নিজের করিয়া লইতে পার না; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? যদি ইহা যথার্থ ও প্রবল ভালবাসা হয়, তবে জন্ম-জন্মান্তরে তাহা সফল হইবে। চিত্রকর কল্পনার ছায়া জড় পটে ফুটাইতে পারে না—

'চিত্র অবশেষে সজল নয়নে
চিত্রকর শূন্যে চায়,
হৃদয়ের ছবি উঠিল না পটে
জীবন বৃথায় যায়!'—(প্রদীপ)।

কিন্তু এই চেষ্টার ভিতর দিয়া আমাদের ব্যর্থ জীবনকে চালাইয়া লইতে হইবে। প্রভাতের আলোক ও বাতাস যেমন বনের কুসুমকে ফুটাইয়া তোলে, আমাদিগকে সেইরূপ আত্মার বিকাশ-সাধন করিতে হইবে। এই নর মনুষ্যজন্ম ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। কর্ম্মপথ আমার পরমার্থ। গীতার উপদেশ জগতের ধর্ম্ম। আমি অনন্তের প্রতিচ্ছবি—"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ"—সমগ্র জগৎ আমার দিকে তাকাইয়া আছে। প্রভাতের তারা, তটিনীর কল্লোল, বালিকার হাসি, ফুলের বিকাশ, মেঘের প্রবাহ যুগে-যুগে আমার জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছে—

"Most potent to create and rule and call
Upon all things to minister to it;
And to a principle of restlessness
Which would be all, have, see, know,
taste, feel all—
This is myself"—

এ জন্মের পরাজয় জন্মান্তরে জয়ের মুকুট আনিয়া দিবে—কারণ 'কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী!'

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মস্ত রাত্রি গুমোট গ্রীষ্মের পর উষার শীতল বায়ু রুদ্ধ-নিশ্বাস গতের উষ্ণ বক্ষ যেন স্নিগ্ধ করিয়া দিল। কামাখ্যানাথ শয্যা াগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ছাতের উপর পাদ রণা করিতেছিলেন। পাণ্ডু গগনে ম্লান চন্দ্ররেখা, নক্ষত্র কল একে-একে নিস্প্রভ, কেবল শুক্রতারা দপ্-দপ্ করিয়া লিতেছে। পূর্ব্ব-আকাশে তখনো রবি-রশ্মির আরক্ত াভাষ জাগে নাই। উষার পিঙ্গল কান্তি কেবল কোমল ভ্রতায় ভরিয়া উঠিতেছে মাত্র। কামাখ্যানাথ ক্ষণেক াদচারণান্তে একবার পশ্চাৎ ফিরিবামাত্র দেখিলেন, সেই ান চন্দ্রসমা একটী বালিকা নীরবে তাঁহার পানেই চাহিয়া াড়াইয়া আছে। কামাখ্যানাথ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "কি রমা? এত ভোরে উঠেছ কেন মা?" বালিকা স্থির ষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি এখনো াহ্নিকে বসেননি যে বাবা? অসুখ করেনি ত?"

"না মা, রাত্রে বড় গরম গিয়েছে, তাই একটু বাতাসে বড়াচ্চি। তোমার মুখ অত শুখ্‌নো কেন রমা? কোন সুখ বোধ করছ কি?"

রমা মস্তক নাড়িয়া অস্বীকার করিল। পিতা পুনর্ব্বার শ্ন করিলেন, "তবে তোমার ছেলেমেয়েগুলি সব ভাল াছে ত? কারও কিছুর দরকার আছে কি? তোমার াবিন্দদেবের সেবার কোন নূতন ব্যবস্থার দরকার নি তো?"

রমা ম্লানমুখে, কম্পিতকণ্ঠে বলিল "না বাবা, আপনি শোনেন নি? কাত্যায়নীর বাবার যে বড় ব্যারাম!"

"কাত্যায়নীর বাবা—জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের? কই, ামি তো কিছু জানি না। তোমায় কে বল্লে?" কাত্যায়নী ক'দিনই আর ঠাকুরবাড়ী যায় না দেখে, কাল ন্ধ্যাবেলা আরতির সময় তাকে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। বলে'ছে 'বাবার বড় অসুখ, যেতে পারব না।'" "কি সুখ? কত দিনই বা হয়েছে? তাঁকে ইদানিং বড়-একটা দেখ্‌তে তো পাই না, তাই তাঁর তেমন সংবাদও জানি না" বলিতে-বলিতে কামাখ্যানাথ থামিয়া গিয়া মনে-মনে ভাবিলেন, "দেখা হ'লেও এখন আর তিনি তেমন ভাবে কথাবার্ত্তা কন্ না, তাঁর ব্যস্ত ভাব দেখে আমিও বিরক্ত করতে ইচ্ছুক হই না। কিন্তু অসুখ?" পুনর্ব্বার কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন "কই, তাঁর অসুখের কথা কারও মুখে শুনিনি তো।" "আপনি আজ যান বাবা, দেখুন, তাঁরা কি রকম অবস্থায় আছেন।" রমার চক্ষে জল দেখিয়া কামাখ্যানাথ ব্যস্তে অগ্রসর হইয়া, সাদরে কন্যার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "পাগলি! অসুখ শুনেই এত ভয়? আমি এখনি খবর নিচ্চি; যাচ্চি, ভয় কি!" "বাবা আমি একদিন কাত্যায়নীর কাছে যাব।" "আজই যেও। তার আগেই আমি তাঁকে দেখে এসে তোমায় খবর দিচ্চি।" তখন পূর্ব্বাকাশ লোহিত আলোকে ভরিয়া গিয়াছে, আর কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিলেই উদয়োন্মুখ জ্যোতি-র্গোলকের সিন্দুর-রক্ত-কান্তি জগতের তৃষিত চক্ষুকে তৃপ্ত করিবে। কিন্তু কন্যা তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল; এবং কন্যার মর্ম্মজ্ঞ পিতা আস্তে-ব্যস্তে সৌধশিখর ত্যাগ করিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ধাবিত হইলেন। "নিরঞ্জন,—নিরঞ্জন!" এমন প্রত্যুষে পিতার এ আকস্মিক আহ্বানে নিরঞ্জন ত্রস্তে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিতে-মুছিতে বিস্ময়-ব্যগ্র স্বরে উত্তর দিল, "বাবা? যাচ্চি! কি বল্‌ছেন?" কিন্তু তাহার আর পিতার নিকটে যাওয়ার অবকাশ ঘটিল না। তৎপূর্ব্বেই চক্ষু চাহিয়া পিতাকে গৃহমধ্যে উপস্থিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি পালঙ্ক হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। "নিরঞ্জন! মহেন্দ্রের কোন সংবাদ রাখ? তাদের বাড়ীর খবর কিছু জান?" "মহেন্দ্রের সংবাদ?" বিস্মিত ভাবে পিতার পানে চাহিয়া নিরঞ্জন উত্তর দিল "আপনি তো জানেন, তিনি আজ প্রায় তিন মাস হ'তে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন-ভাবে জীবিকা

উপার্জ্জনের জন্য”—বাধা দিয়া কামাখ্যানাথ বলিলেন, “সে তো আমিই তার ইচ্ছা বুঝে তাকে জমিদারী সম্বন্ধে কাজ শিখবার জন্য দেওয়ানের কাছে দিয়েছি। কিন্তু সে কি তোমার সঙ্গে মাঝে-মাঝেও দেখা করে না?” নিরঞ্জন ঈষৎ ভাবিয়া বলিল, “কই আর তা করেন। আমি তো প্রায় দু' মাস বাড়ী এসেছি, এর মধ্যে দু-এক দিন কি বড় জোর তিন দিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাও দৈবাৎ রাস্তায় বা সেরেস্তার ঘরে। তিনি শুনেছি বেশীর ভাগ মফঃস্বলে থেকেই কাজ শিখ্‌ছেন।” তাহার পরে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ স্বরে নিরঞ্জন বলিল, “তিনি আগের মত আমার সঙ্গে আর মেশেন না বল্‌লেও চলে। দেখা হ'লেও খুব দূরত্ব রেখে, সম্ভ্রম দেখিয়ে, আর মান্য করে কথা কন্‌। তাই, আমিও আর তত—” “হুঁ।” কামাখ্যানাথ সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটী অভিমুখে চলিলেন। পশ্চাৎ-অনুসরণকারী ভৃত্যকে দেওয়ানকে ডাকিবার জন্য আদেশ দিয়া তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সদরের গেট অতিক্রম করিয়া পথে পদার্পণ করিবামাত্র পশ্চাৎ হইতে দেওয়ান দ্রুতপদে সম্মুখে যাইয়া অভিবাদন করিলেন। প্রত্যভিবাদনের ভাবে হস্ত তুলিয়া কামাখ্যানাথ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, “মহেন্দ্র কোথায়?” “আজ্ঞে, সে আজ তিন-চার দিন হ'ল মফঃস্বল হ'তে বাড়ী এসেছে। কি অদ্ভুতকর্ম্মা এই ছেলেটী! এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর মাথা পরিষ্কার আমি তো এ পর্য্যন্ত কারও দেখিনি। মাত্র এই ক'মাসে—” কামাখ্যানাথ স্নিগ্ধকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিলেন, “তা আমি জানি। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, তিন-চার দিনের খবর কিছু জান কি না? সে এই ক'দিন তোমার সেরেস্তায় এসেছিল কি? আর এখনই বা সে কোথায়?” “আজ্ঞে সে এর মধ্যে আমার কাছে কই আসেনি। এখন বোধ হয় সে তার নিজেদের বাড়ীতেই আছে।” কামাখ্যানাথ যেন নিজ মনেই বলিলেন, “আমিও এই আন্দাজই কর্‌ছিলাম। তা হলে নিশ্চয়ই—হাঁ, তুমি এখন নিজের কাজে যেতে পার।” প্রভুর আদেশ বুঝিয়া দেওয়ান পশ্চাৎপদ হইলেন এবং প্রভু সম্মুখেই গতির বেগ বাড়াইয়া দিলেন।

জ্যোতিরত্নের বহির্দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গৃহদ্বার তখনো রুদ্ধ। ডাকিলেন, “মহেন্দ্র! মহেন্দ্র আছ কি?” অনতিবিলম্বে দ্বার মুক্ত হইল; বিস্মিত মহেন্দ্র বাহিরে আসিয়া বলিল, “এমন সময়ে আপনি?” “জ্যোতিরত্ন মহাশয় কেমন আছেন?” “ভাল নাই। ক'দিন হ'তে তাঁর ব্যারাম।” “চল, আমি তাঁকে দেখ্‌ব।” “আসুন” বলিয়া মহেন্দ্র অগ্রগামী হইল। তাহার পশ্চাতে কামাখ্যানাথ অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অঙ্গনখানি যেন শ্রীভ্রষ্ট, বিষাদাচ্ছন্ন; বোধ হয় কয়েক দিনের মার্জ্জনাভাবেই তাহার এরূপ দশা! তাঁহার মনে পড়িল, কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন, তখন জ্যোতিরত্ন মহাশয়ের সহিত তাঁহার অল্প দিনের পরিচয়,—জ্যোতিরত্নকে প্রণাম করিতে আসিয়া এই ক্ষুদ্র মৃৎগৃহের অঙ্গনের কি পবিত্র মার্জ্জিত শ্রী তিনি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই সামান্য লক্ষণেই তাঁহার মনে হইল গৃহস্বামীর পীড়া নিশ্চয় ইতিমধ্যে কঠিন আকার ধারণ করিয়াছে, নহিলে গৃহস্থরা এবিষয়ে এমন উদাসীন সহজে হয় না। কামাখ্যানাথের মুখ ক্রমশঃ গভীর চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র গৃহমধ্যস্থ ব্যক্তিগণকে কামাখ্যানাথের আগমন জানাইয়া গৃহের রুদ্ধ কপাট ও জানালা খুলিয়া দিল, এবং কক্ষ দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান কামাখ্যানাথকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিল। কক্ষের মেঝেয় শয্যা বিছানো; তাহাতে পীড়িত জ্যোতিরত্ন মহাশয় শুইয়া আছেন। পদতলে পত্নী এবং মুখের নিকটে কন্যা কাত্যায়নী বসিয়া আছে। কামাখ্যানাথ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, কাত্যায়নী উঠিয়া গিয়া পিতার অপর পার্শ্বে উপবেশন করিল। জ্যোতিরত্ন কামাখ্যানাথের পানে চাহিয়া ম্লান হাস্যে বলিলেন “বস বাবা!” বলার সঙ্গে-সঙ্গে মহেন্দ্রের প্রদত্ত আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কামাখ্যানাথ তাঁহার নির্দ্দেশমত বসিলে, পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন,—“এমন অসময়ে এভাবে কেন কামাখ্যানাথ?” ব্রাহ্মণের ঈষৎ বিস্ময়ান্বিত দৃষ্টিতে কামাখ্যানাথ নিজের বেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিলেন যে, তিনি ব্যস্ততার জন্য আহ্নিকের বস্ত্রাদি পরিয়াই চলিয়া আসিয়াছেন; সেই কৌষেয় বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বস্ত্র-নির্ম্মিত পাদুকা ত্যাগ করিতেও তাঁহার মনে হয় নাই। ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিলেন, “এইমাত্র রমার মুখে আপনার পীড়ার কথা শুন্‌লাম। এমন পীড়িত হয়েছেন, এর তো কিছুই আমি জানি না।” “বেশী দিনের কথা তো নয়, এর আর কি সংবাদ তোমায় দেব?” “মহেন্দ্রও কই

আমায় একবার খবর দাও নি? এ বড়ই দুঃখের বিষয়!" "মহেন্দ্রের অপরাধ নাই কামাখ্যানাথ! তোমায় বৃথা উদ্বিগ্ন করতে আমিই নিষেধ করেছিলাম।" কামাখ্যানাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া রোগীর অধিকতর নিকটস্থ হইলেন এবং সসম্ভ্রম সন্তর্পণের সহিত একবার তাঁহার ললাট স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তটি হস্তে তুলিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ নাড়ীর গতি লক্ষ্য করার পর বলিলেন, "জ্বর তো এখনো পূর্ণমাত্রায় রয়েছে দেখ্‌ছি। অন্যান্য উপসর্গ কি-কি আছে? কার চিকিৎসায় আছেন এখন? কে দেখ্‌ছে?" জ্যোতিরত্ন ঈষৎ ম্লান হাস্যের সহিত নিজ ললাটে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। মহেন্দ্র মৃদু স্বরে বলিল, "এ পর্য্যন্ত কোন ঔষধ খাওয়াতে পারা যায় নি। ডাক্তারি ঔষধ তো স্পর্শই করেন না।" "ডাক্তারি না খান্ কবিরাজী আছে। তোমার নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত হয় নি মহেন্দ্র।" "কি করব, ওঁর নিষেধ আমরা কি করে ঠেল্‌ব?" "বৃথা ব্যস্ত হয়ো না কামাখ্যানাথ! নিজের কথা আজ কেন ভুলে যাচ্ছ? নিয়তি কেন বাধাতে?" "আপনি এখনি এমন নিরাশ কেন হচ্চেন? এ ত সামান্য অসুখ!" "আশার সঙ্গে আমার যখন কোন পরিচয়ই নাই, তখন নিরাশ কি জন্য হব?" বাহির হইতে কে ডাকিল "মহেন্দ্রবাবু—বাবা এখানে কি?" "নিরঞ্জন এসেছে। মহেন্দ্র তুমি বাইরে গিয়ে তাকে বল চন্দ্রনাথ কবিরাজ মশায়কে শীঘ্র ডাকতে পাঠানো হোক্। তুমি যেও না, এখানে তোমার প্রয়োজন হতে পারে। নিরঞ্জনকে এখনি লোক পাঠাতে বলে এস।" মহেন্দ্র গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। সহসা জ্যোতিরত্ন তাঁহার মুদ্রিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন;—একটু হাসিয়া যেন অদৃশ্য কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "এতদিন আমি তাকে গ্রাহ্য করিনি, পুরুষকারকেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ ভেবে এসেছি। এখন সে ভ্রম আর নেই; এখন প্রত্যেক বিষয়েই তার খেলা লক্ষ্য করছি! ও কি! কে তুমি? কৌষেয় বস্ত্র পরা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তুমি কে? ওঃ! কি দুর্নিরীক্ষ্য তেজোময় মূর্ত্তি তোমার। তুমি কি [illegible] ভাগ্যবিধাতা?"

কামাখ্যানাথ স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার পানে বদ্ধদৃষ্টি, জ্যোতিরত্নের চক্ষের ভাব এবং অসংলগ্ন বাক্যে বুঝিতে পারিলেন, রোগীর মস্তিষ্ক বিকার স্পর্শ করিয়াছে। ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "কি বল্‌ছেন? আমি আপনার সন্তানতুল্য কামাখ্যানাথ। আমায় কি চিন্‌তে পারছেন না?" "চিন্‌তে পার্‌ছি না? কাকে? কাত্যায়নী, আমার কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে? আমি কি ভুল বক্‌ছি?" কাত্যায়নী পিতার মুখের নিকট সরিয়া আসিয়া তাঁহার মুখের নিকট মুখ নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "না বাবা।" "এই তো তোমায় চিন্‌তে পার্‌ছি, ঐ তোমার গর্ভধারিণী, তবে কে বল্‌লে আমার জ্ঞান নষ্ট হয়েছে?" "কেউ তো সে কথা বলে নি বাবা। আমি মাথায় হাত বুলুই, আপনি ঘুমুন।" কাত্যায়নী তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল এবং বাধ্য বালকের মতন জ্যোতিরত্ন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কামাখ্যানাথ নীরবে, নত মস্তকে বসিয়া ছিলেন; কোমল, মৃদুকণ্ঠে শব্দ হইল "কবিরাজ আস্‌তে কত দেরী?" সচকিতে মাথা তুলিয়া দেখিলেন, তাঁহারই পানে দুই বাষ্প-স্তম্ভিত চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া কাত্যায়নী প্রশ্ন করিতেছে। কামাখ্যানাথও তেমনি মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "একটু দেরী হবে, তাঁর বাড়ী খানিকটা দূরে। এ রকম অবস্থা কতক্ষণ হয়েছে?" "এই প্রথম দেখ্‌ছি। আজ পাঁচ দিন জ্বর হয়েছে বটে, কিন্তু কথার কোন বৈলক্ষণ্য হয় নি।" "কবিরাজ না দেখান অন্যায় হয়েছে। যদি এতদিন অন্ততঃ আমায়ও সংবাদ দিতেন।" কাত্যায়নী মৃদুস্বরে যেন নিজ মনেই বলিল, "ওঁর সাহসে আমরাও সাহস বেঁধেছিলাম। জ্বর হলেও উনি তো কখনো ওষুধ খান্ না, তাই দরকারও বুঝি নি। এবার যে এমন অসুখ হয়েছে, দু'দিন আগেও এ কথা বুঝ্‌তে পারিনি। সেই আপনাকেও শেষে ব্যস্ত হ'তে হ'ল, কেবল—" শঙ্কাকম্পিত, বেদনা-বিবর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে একবার চাহিয়া কাত্যায়নী মস্তক নত করিয়া নীরব হইল। কামাখ্যানাথ নিঃশব্দ, ব্যথিত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন; ভাবিলেন; রমাকে ডাকাইলে ভাল হইত। মহেন্দ্র মৃদু-পদ-সঞ্চারে গৃহমধ্যে আসিয়া কাত্যায়নীকে বলিল "তুমি একবার বাইরে যাও, মা বড় অধীর হয়েছেন।" কাত্যায়নী চাহিয়া দেখিল, স্বামীর জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া অধীরা সাধ্বী কখন গৃহের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। কাত্যায়নী উঠিবার চেষ্টা করিতেই জ্যোতিরত্ন ঈষৎ জাগরিত হইয়া ডাকিলেন, "মা কাত্যায়নি!" "বাবা!" বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া পিতার ললাটে

হাত বুলাইতে লাগিল; এবং ইঙ্গিতে মহেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল, তাহার উঠা অসম্ভব,—মহেন্দ্র মাতার নিকটে থাকুক। মহেন্দ্র আবার বাহিরে চলিয়া গেল। কামাখ্যানাথ স্তব্ধ ভাবে রোগীর মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। কবিরাজ আসিলে যুগপৎ বহু পদশব্দে রোগী জাগ্রত হইলেন। সকলের পানে বিস্মিত চক্ষে চাহিয়া বলিলেন "তোমরা কে? কামাখ্যানাথ না? ওরা সব কে মহেন্দ্র?" কামাখ্যানাথ উত্তর দিলেন, "এটি আমার ছেলে নিরঞ্জন। উনি কবিরাজ মহাশয়।" "কবিরাজ কেন? আমার শরীর এখন আমি নির্ব্যাধির মত বোধ কর্‌ছি। বড় সুস্থ হ'য়ে ঘুমিয়েছিলাম। কি চমৎকার যে এক স্বপ্ন দেখ্‌লাম! আঃ! ব্রাহ্মণী কই? সে এক দিব্যকান্তি, কোষেয় বস্ত্র-পরা দেবতা! তাঁর হাতে আমি কাত্যায়নীকে সমর্পণ কর্‌ছি।" কবিরাজ বহুক্ষণ ধরিয়া রোগীকে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, অনেক প্রশ্ন করিলেন। শেষে ব্যবস্থাপত্র এবং বটিকা গুঁড়া প্রভৃতি নানা প্রকারের ঔষধ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন "অন্য কোন রকম অবস্থান্তর হইবামাত্র যেন আমায় সংবাদ দেওয়া হয়। বৈকালে আমি নিজ হইতেই আসিব।" কবিরাজের সঙ্গে কামাখ্যানাথ, মহেন্দ্রাদিও বাহিরে আসিলেন। অঙ্গনের বাহিরে গিয়া কামাখ্যানাথ মৃদুস্বরে কবিরাজকে প্রশ্ন করিলেন, "কেমন দেখ্‌লেন?" "ভাল নয়। পূর্ণ বিকার। নাড়ীর অবস্থা বড়ই খারাপ। বিশেষ সতর্ক থাকার প্রয়োজন।" একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া কামাখ্যানাথ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "আরোগ্যের আশা রাখেন তো?" "ভগবানের হাত। মানুষের এখানে কোন কথাই বলা চলে না। তবে সাধ্যের ত্রুটি না হয় এই পর্য্যন্ত।" কবিরাজ চলিয়া গেলেন। কামাখ্যানাথ নিরঞ্জনকে বলিলেন "বাড়ী যাও, রমাকে সংবাদ দাওগে; এঁর অসুখ খুব গুরুতরই বটে। এর বেশী কিছু ব'লো না। যদি আস্‌তে চায়, সঙ্গে করে রেখে যেও।" নিরঞ্জন নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। বেলা অনেক হইয়াছে; পিতার স্নানাহ্নিক পর্য্যন্ত হয় নাই; তথাপি সে বিষয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করিতে তাহার সাহস হইল না, বা কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে হইল না। তাহার পিতা যে গ্রামের প্রত্যেকের বিপদেই প্রায় এমনি ভাবে উপস্থিত হ'ন। আশৈশবই তাহারা তাহাদের পিতার এইরূপ কার্য্য দেখিতে-দেখিতে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে; এবং নিজেরাও তদনুযায়ী শিক্ষা পাইয়া আসিতেছে। তবে রমা নিতান্ত কোমলহৃদয়া, এবং এরূপ স্থলে সে যে নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে—এ কথা জানা সত্ত্বেও, পিতা যে তাহাকে সংবাদ দিতে বলিলেন, ইহা জ্যোতিরত্ন পরিবারের বিপদ বলিয়াই সম্ভব হইল—নিরঞ্জন ইহাও বুঝিল। নহিলে রমাকে তিনি জগতের সর্ব্ব শোক-দুঃখ হইতে একটু দূরে রাখিতেই চাহেন। বাটীতে রমার আশ্রিত অনাথ-আর্ত্তের গতিবিধির শেষ নাই। তাহার সেই পুত্র-কন্যাগুলির সর্ব্ব অভাব মোচনের জন্য কামাখ্যানাথ সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত; কিন্তু তথাপি রমা তাঁহার স্নেহ-ক্রোড়ের সীমার মধ্যেই সর্ব্বদা বাস করে। ঠাকুরবাড়ী ভিন্ন সে অন্য কোন স্থানে যায় না। জ্যোতিরত্নের পীড়ায় পিতা অন্য যে কর্ত্তব্যজ্ঞানেই মাত্র যথাকর্ত্তব্য করিতেছেন তাহা তো নয়। অন্য দিনের অন্যত্রের এবম্বিধ কার্য্যের সঙ্গে ইহার যে একটুখানি প্রভেদও আছে। জ্যোতিরত্নকে তিনি যে দেবতার মত শ্রদ্ধা করেন, ভক্তি করেন। তিনি যে অন্তরে কতখানি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা নিরঞ্জনও বুঝিতে পারিতেছিল। আর রমা? কাত্যায়নীর এ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনায় সেও না জানি কতখানি ব্যথা পাইতেছে। নিরঞ্জন যথাসাধ্য দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্র শ্লথপদে কামাখ্যানাথের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল; এবং দাওয়ার উপর উঠিয়া একখানা চৌকীর উপরে অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল। কামাখ্যানাথ ক্ষণ পরে তাহার মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের মত অধীর হয়ো না"—বলিতে-বলিতে কাত্যায়নীর শঙ্কাকম্পিত, বেদনাবিদ্ধ অথচ দৃঢ় মূর্ত্তি মনে আসিয়া অর্দ্ধপথে তাঁহার বাক্য রুদ্ধ হইয়া গেল। রোগীকে ব্যবস্থামত ঔষধাদি প্রয়োগ করা হইল। ব্রাহ্মণী ঈষৎ আশান্বিত হইয়া তখন স্বামীর নিকটে বসিলেন। মহেন্দ্র রোগীর মস্তকে বাতাস করিতে লাগিল। কাত্যায়নী কবিরাজের নির্দ্দেশমত পথ্য প্রস্তুত করিতে উঠিয়া, কামাখ্যানাথের দিকে দুই একবার চাহিয়া, শেষে নত-মস্তকে মৃদু স্বরে বলিল, "বেলা হ'য়েছে। আপনি স্নানাহার করুন।" "হাঁ এই যাই। মহেন্দ্র! তোমারও আমার সঙ্গে গিয়ে দুটি খেয়ে আস্‌তে হবে।" মহেন্দ্র উঠিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, কাত্যায়নী বলিল; "কাল থেকে তোমার খাওয়া হয়নি। আপনি যান,

মহেন্দ্র একটু পরেই যাবে।" কামাখ্যানাথ ইতস্ততঃ ভাবে মহেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, "বোধ হয় এঁদেরও খাওয়া-দাওয়া হচ্চে না, রমা এখনি আসবে—৺ঠাকুরবাটীর প্রসাদ—" "আপনি ব্যস্ত হবেন না; কাছেই ত ঠাকুরবাড়ী, দরকার বুঝ্‌লেই প্রসাদ আনিয়ে নেব।" কামাখ্যানাথ কাত্যায়নীর পানে একবার চাহিলেন; দেখিলেন নির্ব্বাত স্থানের প্রদীপের মতই সে মূর্ত্তি নিস্পন্দ, স্থির; কিন্তু তাহার জ্বালাময় দাহিকা-শক্তি এখনি তাহার সমস্ত ধৈর্য্য ও সংযমকে ভস্মাবশেষে পরিণত করিয়া দিবার জন্যই যেন তেমন উজ্জ্বল, উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। পর্ব্বতের মতই সে ধৈর্য্য বাহিক দৃশ্যে তাহার অটলতা প্রকাশ করিতেছিল বটে, কিন্তু অভ্যন্তরের সমুদ্র-গর্জ্জনের ন্যায় উত্তাল কল্লোল আর প্রচণ্ড বেগশালী তরঙ্গে আহত সেই পাষাণের অধীর ক্রন্দন-শব্দ যেন বাহির হইতেও শুনা যাইতেছিল। সেই বালিকার মুখের পানে চাহিয়া প্রবীণ কামাখ্যানাথের চক্ষেও জল আসিল। তিনি মৃদুস্বরে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "বিপদে অধীর হয়ো না।" "না।" "মাকে প্রবোধ দিও, এখনো ভরসা আছে।" কাত্যায়নী মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়াই কামাখ্যানাথ বুঝিলেন, তাহাকে এ স্তোক দেওয়া নিরর্থক। ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন "ভগবানের ইচ্ছা।"

কাত্যায়নী নীরব রহিল। কামাখ্যানাথ তখন মহেন্দ্রকে বলিলেন, "আমি তবে চল্‌লাম,—আহ্নিক এখনো—স্নানাহার সেরে শীঘ্রই আবার আস্‌ছি। তুমিও দেরী কর না—কাজটা চুকিয়ে এসে ব'স।" কাত্যায়নীর পানে ফিরিয়া বলিলেন—"রমাকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" কাত্যায়নী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "রমা? তাকে পাঠাবার কোন দরকার তো নেই, অনর্থক কষ্ট দেওয়া কেবল। আপনারা রয়েছেন—" "সেই আমায় এ সংবাদ দিয়েছে। তার আগে তো কোন খবরই জান্‌তাম না। সে আস্‌বার জন্য ছটফট্ করছে, আমি যাইনি বলেই আস্‌তে পার্‌ছে না বুঝতে পার্‌ছি। যাক্—৺গোবিন্দদেবের প্রসাদ এলে মাকে জোর করেও দুটী প্রসাদ গ্রহণ করাবে। তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি যদি অধীরা হও, মা তা'হলে বেশী অস্থির হবেন। আহার না কর্‌লে রোগীর সেবার ত্রুটি হবে জান ত?" কাত্যায়নী নিঃশব্দে মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। "যদি এর মধ্যেই কোন দরকার বোধ কর, আমায় খবর দিতে কুণ্ঠিত হ'য়ো না।" "না।" "মহেন্দ্র, তুমিও তা' হলে আর বেশী দেরী ক'র না।"

কামাখ্যানাথ চলিয়া গেলেন। কাত্যায়নী রোগীকে পথ্য সেবন করাইয়া মহেন্দ্রকে বলিল, "এখন তো একটু সুস্থই আছেন বোধ হচ্চে। মহেন্দ্র, এই বেলা তুমি খেয়ে এস।" "তোমরাও তো কাল থেকে খাওনি কাত্যায়নি—আমি যাব না।" "যাও, শুন্‌লে তো, প্রসাদ আস্‌বে।" মাতা বলিলেন, "মহেন থাক—সেও সেই প্রসাদই খাবে। মহেন গেলে আমার ভয় করবে।" "তবে থাক।" নিরঞ্জনকে গৃহ-দ্বারের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কাত্যায়নী বুঝিল রমা আসিয়াছে। অগত্যা সে পিতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দ্বারের সম্মুখে গেল। নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি খানিকটা সরিয়া গেলে কাত্যায়নী দেখিল, রমা গৃহের দেওয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশিয়া মুখখানা একেবারে ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা সহানুভূতি-পূর্ণ কুণ্ঠা প্রকাশ পাইতেছিল। কাত্যায়নী অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিল—"তুমি এমন সময়ে আজ কেন এলে, রমা?" কাত্যায়নী তাহার হাত ধরিতেই, রমা অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া, তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, এবং কাত্যায়নীর বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইয়া উদ্গত ক্রন্দনকে যেন সেইখানে সজোরে চাপিয়া ধরিল। রমার এই ব্যবহারে কাত্যায়নীরও কুণ্ঠা এবং দূরত্ব ভাবটা সরিয়া গিয়া এতক্ষণে চক্ষে জল আসিল। রমার স্পর্শে তাহার প্রাণটাও যেন এতক্ষণে মুক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া অমনি কাহারো কণ্ঠলগ্ন হইতে চাহিল। অতি কষ্টে সে উচ্ছ্বাস দমন করিয়া কাত্যায়নী চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া ভগ্ন-কণ্ঠে বলিল, "তুমি এ আগুনের মধ্যে কেন এলে, রমা? তুমি যে এ সহ্য করতে পার না। দেখা তো হ'ল, এইবার ফিরে যাও।" রমা নিঃশব্দে তাহাকে কেবল দৃঢ় ভাবে জড়াইয়া ধরিল। বুঝিয়া অগত্যা কাত্যায়নী বলিল, "তবে ঘরে চল।" কাত্যায়নীর অঞ্চল ধরিয়া রমা তাহার সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জ্যোতিরত্নের শয্যার নিকটে কাত্যায়নীর অন্তরালে উপবেশন করিল। বয়সে সে কাত্যায়নীর অপেক্ষা একটু ছোট হইলেও, তাহার ব্যবহারে এবং স্বভাবে তাহাকে নিতান্ত বালিকার মতই বোধ

হইত। জ্যোতিরত্নের মুখের দিকে একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া আর সে সেদিকে চাহিতেও পারিতেছিল না; নিঃশব্দে কাত্যায়নীর পৃষ্ঠে মুখ লুকাইয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল। কাত্যায়নীর পুনর্ব্বার মনে হইল, রমাকে এমন সময়ে এরূপ স্থলে উঁহাদের পাঠানো উচিত হয় নাই। নিজের অসুবিধার কথা সে মনে আসিতে দিল না; কেবল ভাবিল, অনর্থক কেন তাহাদের এ কষ্ট ভোগ করানো। কিছুতেই তো বিধির বিধি লঙ্ঘন হইবে না, তবে তাহাদের জন্য উঁহারা কেন এত কষ্ট পান। যে রমা ইতিহাস-পুরাণাদি পুস্তকের করুণ কাহিনী শুনিতে গিয়া ধৈর্য্য রাখিতে পারে না, তাহাকে তাহার স্নেহভাজন ব্যক্তির এরূপ বিপদের ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হইলে, সে হয় ত সে দৃশ্য বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিবে না। যাহার অন্তঃকরণ এত কোমল, তাহাকে এ সব সময়ে দূরে রাখাই উচিত।

নিরঞ্জন পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া মহেন্দ্রকে ডাকিল, "মহেন্দ্রবাবু, আসুন; বাবা আপনার অপেক্ষা করছেন। ঠাকুরবাড়ীর প্রসাদ এনেছেন এঁরা।" কাত্যায়নী মহেন্দ্রের পানে চাহিলে মহেন্দ্র একভাবেই মস্তক নাড়িয়া অস্বীকার করিল। অগত্যা কাত্যায়নী আবার দ্বারের নিকটে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মহেন্দ্র থাকুক্, এই প্রসাদই সে খাবে। সে গেলে আমরা থাক্‌তে পারব না।" নিরঞ্জন সরল আগ্রহের সহিত বলিল, "একলা কেন থাক্‌বেন; উনি যতক্ষণ না ফিরে আসেন আমি থাক্‌ছি।" "আপনারা এত ব্যস্ত হবেন না। ব্যস্ত হয়ে তো কোন লাভ নেই। আপনি যান, রমাকেও নিয়ে যান। তিনি হয় ত আপনার প্রতীক্ষা করছেন।" নিরঞ্জন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। কাত্যায়নীর ধীর বিষাদাপ্লুত স্বরে সে ক্ষুণ্ণ হইতেও পারিল না, আবার কি করা কর্ত্তব্য তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অনুপায় ভাবে আর একবার ডাকিল, "মহেন্দ্র বাবু!" মহেন্দ্র সাড়া দিল না। নিরঞ্জনের সঙ্গে যে তাহার কখনো কোন পরিচয় আছে, এমন ভাবও একবারও প্রকাশ করিল না। কাত্যায়নীও মহেন্দ্রের এই বিমূঢ় ভাবে নিরঞ্জনের সম্মুখে ঈষৎ কুণ্ঠা বোধ করিয়া নিরুপায় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রমা বাহির হইয়া আসিয়া ভ্রাতাকে বলিল, "তুমি যাও, এঁদের কি এখন এখান হ'তে নড়া উচিত? তুমি আর দেরী ক'রো না।" নিরঞ্জন অগত্যা এইবার চলিয়া গেল। কাত্যায়নী রমার পানে ফিরিয়া বলিল, "তুমি গেলে না? তুমিও যাও রমা—!" রমা সে কথা কাণে না তুলিয়া, ৺ঠাকুরের প্রসাদ-বাহী ব্রাহ্মণ দুইজনের হস্ত হইতে প্রসাদের থালাগুলি একে একে লইয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাপিত-প্রায় দীপে অধিক তৈল দানেরও আর আবশ্যকতা হইল না। অতি শীঘ্রই জ্যোতিরত্নের অন্তিমকাল উপস্থিত হইল।

সেদিন দিন-রাত্রের মধ্যে তাঁহার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না, সকলের সঙ্গে সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিলেন। পত্নীকে বহু সান্ত্বনা দিলেন, মহেন্দ্রকে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন। কাত্যায়নীর বিবাহ সম্বন্ধে কামাখ্যানাথকে বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহের জন্য তুমি যেন ব্যস্ত হয়ো না। আমাদের মুখ্য-কুলীন-কুলে বহু কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় জীবন কাটিয়ে গেছে। আমার কৃত কার্য্যে তার ভাগ্য সম্বন্ধে লোকের হয় ত দ্বিধা জন্মে গেছে। তার পাত্রের জন্য তুমি যেন কারও কৃপা-প্রার্থী হয়ো না কামাখ্যানাথ! সে চিন্তাও এখনো আমি সহ্য করতে পারছি না, আমার গৌরীর মত মেয়েকে লোকে যাতে অলক্ষণা বলে প্রত্যাখ্যান করবে, সে রকম কাজ তোমরা কেউ কদাচ ক'র না—" কামাখ্যানাথ একবার মৃদুভাবে বলিতে চেষ্টা করিলেন, "আপনার কন্যার সম্বন্ধে ঐ রকম উচ্চ ধারণাও লোকের মুখে শোনা যায়; অতএব তাকে যে লোকে অলক্ষণা বলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করবে, আপনি এমন ভাববেন না। সেই জন্যই আমার নিবেদন, যথাসাধ্য উপযুক্ত পাত্রে আপনার কন্যা সম্প্রদানের চেষ্টা আমরা করতে ইচ্ছুক, আপনি অনুগ্রহ করে সেই আজ্ঞা আমাদের দেন—" কিন্তু জ্যোতিরত্ন কামাখ্যানাথকে এ কথা ভাল করিয়া বলিতেও দিলেন না। তাঁহার কথা কাণে না তুলিয়া নিজ মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "তাকে উপযুক্ত পাত্রে আমিই যখন সম্প্রদান ক'রে যেতে পারলাম না, তখন বুঝেছি, কুমারীত্বই তার বিধিলিপি। বিধিলিপি কার সাধ্য খণ্ডন করে—তাই

আমার একান্ত চেষ্টাও এমন করে ব্যর্থ হ'ল।" ব্রাহ্মণী রোদনরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, "ওগো, মহেন্দ্রকে কাত্যায়নী দান করতে অনুমতি দাও আমাকে।" "না—না—না!" অত্যন্ত আর্ত্ত ভাবে বিচলিত-কণ্ঠে ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এখনো অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝ্‌ছি; এই যুদ্ধ কর্‌তে-করতেই যাব; এ যুদ্ধ আর আমার শেষ হবে না। মহেন্দ্র, প্রাণাধিক পুত্র, এস আশীর্ব্বাদ দিই—এতেই তুমি সন্তুষ্ট থাক—" উত্থিত হস্ত ক্রমে নামিয়া গেল। মহেন্দ্র নিশ্চেষ্ট, স্তব্ধ ভাবে দূরেই বসিয়া রহিল। জ্যোতিরত্ন ক্ষণপরে নিজ মনে বলিলেন, "স্বকর্ম্ম ফলভূক্ পুমান্! ভুলে যাচ্ছি—সব ভুল হ'য়ে যাচ্ছে। নমস্তৎ কর্ম্মে ভ্যোঃ। তাই মহেন্দ্রকে বিদ্যার্জ্জন ছেড়ে বিষয়-কর্ম্ম শিক্ষায় মন দিতে দেখে ক্ষুণ্ণ বই তুষ্ট হ'তে পারিনি। এ যে কার কুটিল গতি তাকে এখনো চিন্‌লাম না। কে সে?—সে কে? ওঃ!" সহসা তিনি ক্রোড়ের নিকটে উপবিষ্টা কন্যাকে স্পর্শ করিয়া ডাকিলেন, "মা—কাত্যায়নি!" "বাবা!" কন্যা পিতার মস্তকের উপর মুখ নামাইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল—পিতা যদি তাহাকে কিছু বলেন; কিন্তু জ্যোতিরত্ন আর তাহার পানে চাহিলেন না—নিজ মনে আবার বলিতে লাগিলেন, "কামাখ্যানাথ—ওঃ! ঈশ্বর আমার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বল্‌ছেন্, আমি যেন প্রলোভন সম্বরণ কর্‌তে পারি। বিধির কি আশ্চর্য্য বিধান কামাখ্যানাথ! কাত্যায়নীর এই পূর্ণ সপ্তদশ বর্ষ বয়স, এই সময়েই একবার তার বিবাহের অনুকূল যোগ সংঘটিত হবে। কেবল শুক্রের ক্রূর দৃষ্টিপাতে যা আশঙ্কা ছিল। মহাপুরুষ স্বামী লাভ করেও তার ভোগরাহিত্য। হাঁ, তাই বটে; কিন্তু নিয়তির এ আবার কি বিচিত্র লীলা! কোথায় আজ তার বিবাহ,—না, সে আজ একেবারে আত্মীয়-স্বজনশূন্যা, সহায়-আশ্রয়হীনা হল!—ওঃ—আবার ভুলে যাচ্ছি! শনি এ তার পিতা-মাতার সম্বন্ধেও অরি হয়েছেন; কিন্তু তার ফল এত শীঘ্র—" কামাখ্যানাথ এইবার ঈষৎ দার্ঢ্যের সহিত বলিলেন, "যদি এ সময়েও আমায় কোন ভার না দেন, এ ক্ষোভ আমার মনে চিরজীবন জেগে থাক্‌বে। আমায় আপনার স্ত্রী-কন্যা-পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের কথা, বা কন্যার বিবাহ বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টার আজ্ঞা—এর কি কিছুই দেবেন না? আমায় এত স্নেহ করে এসেছেন, কিন্তু এমন সময়েও কি সামান্য একটু ভারও দিতে পারবেন না?" স্নিগ্ধ চক্ষে মৃত্যুশয্যাশায়ী ব্রাহ্মণ কামাখ্যানাথের পানে চাহিলেন, "কি ভার চাও, কামাখ্যানাথ? কন্যার বিবাহ? সে যদি হবার হ'ত, তা'হলে—যাক সে কথা, তার একমাত্রই উপায় আমার চখে পড়েছে—কিন্তু তা হবার নয়। তাই বল্‌ছি—আমার কন্যা চির-কুমারীই থাক্‌বে। আমার এ আদেশ মনে রেখো।"

"সেই একমাত্র উপায় কি তাই বলুন—আমি তাই-ই প্রাণপণে চেষ্টা করব। বলুন তা কি?" জ্যোতিরত্ন সজোরে মুখ বন্ধ করিলেন। কিছুক্ষণ আর কথা কহিলেন না—পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "এদের রক্ষণাবেক্ষণ? হাঁ, সে তুমি না করলে কে করবে? এদের ভরণ-পোষণের জন্য কোন চিন্তা নেই। অন্য সব ব্যবস্থা মহেন্দ্রই কর্‌বে, সে যে ওঁর পুত্রস্থানীয়! তবে সেও বালক! এ পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমাকেই আমি দিয়ে যাচ্ছি, কামাখ্যানাথ! তুমিই এদের শুভাশুভ দেখ্‌বে, সৎপরামর্শ দেবে। কামাখ্যানাথ, আবার বলি অদৃষ্টের কি রহস্য ছাখ! সেই তোমার উপরেই কাত্যায়নীর সর্ব্ব ভার আমায় প্রকারান্তরে রাখ্‌তে হ'ল। এ যে হবেই—তা সেদিন তোমার অযাচিত ভাবে ব্যগ্র হয়ে আস্‌তে দেখেই বুঝেছিলাম।" "কি এমন ভার আমায় দিলেন? আর এটুকু দিতেও কি ক্ষুণ্ণ হচ্চেন?" "না ক্ষুণ্ণ কেন হব? সে দিন তোমার কোষ্ঠী দেখেই যে এ আমি সন্দেহ করেছিলাম—বিধিলিপি যে এই! যাক্ সে কথা। মহেন্দ্র, মহেন্দ্র—আমার কাছে এস একবার।" মহেন্দ্র নিকটে আসিলে অতি কষ্টে তাহার একখানি হস্ত ধরিয়া জ্যোতিরত্ন কামাখ্যানাথের হস্তের উপর ধীরে-ধীরে রাখিলেন; মৃদুস্বরে অতি ধীরে বলিলেন, "আমার এই মহেন্দ্র—তাকেই তোমার হাতে দিয়া গেলাম, কামাখ্যানাথ! —একেই সর্ব্বসময়ে দেখো, সর্ব্ব অবস্থায় এর ওপর স্নেহ-দৃষ্টি দিয়ো, এর মঙ্গলামঙ্গলে লক্ষ্য রেখো—এইমাত্র আমার অনুরোধ। কাত্যায়নীর জন্য আমার এখন আর চিন্তা নেই; যত চিন্তা—" ক্রমশঃ রোগী নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিলেন, ক্রমশঃ নীরব হইয়া পড়িতে লাগিলেন। অস্পষ্ট ভাষায় মাঝে-মাঝে একবার কি যেন উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কামাখ্যানাথ একান্ত কর্ণে তাঁহার

দিকে মনঃসংযোগ করিয়াও তাহাতে নূতন কোন' ভাষা পাইলেন না। তাঁহার সেই একই কথা—তাহা কখনো ঈষৎ স্পষ্ট, কখনো একেবারে অস্পষ্ট আকারে ক্ষণে-ক্ষণে প্রকাশ পাইতেছিল। সেই মহেন্দ্র, কাত্যায়নী, কামাখ্যানাথ—অদৃষ্ট, নিয়তি, বিধিলিপি। মাঝে একবার বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! - সে কি এতই বলবান? কিছুতেই তা লঙ্ঘন হয় না?—হবে—হবে।" কামাখ্যানাথ বুঝিলেন, চিরজীবনের চিন্তা ও আলোচ্য বিষয় হইতে তিনি মৃত্যু-সময়েও বিরাম পাইতেছেন না। চিরজীবনের কৃতকর্ম্ম তাঁহার নিষ্প্রভ মস্তিষ্কে ছায়াবাজির মত কাজ করিয়া মৃত্যু-সময়েও তাঁহাকে শান্তি পাইতে দিতেছে না। মনস্তাপ বোধ করিয়া কামাখ্যানাথ নিঃশব্দে তাঁহার পানে শুধু চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাত্রি গভীরা, নিস্পন্দা পৃথিবী। অন্ধকারময় গৃহটির ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে কেবল একটী আলোক সে আঁধারে ক্ষুদ্র তারকার মত মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। রোগী শ্রান্তভাবে বহু ক্ষণ হইতে ঘুমাইতেছেন; কেবল অন্যান্য সকলে অতন্দ্র ভাবে সে গৃহে জাগিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় ঘন ঘন রোগীর নাড়ী দেখিতেছেন। মহেন্দ্র-নিরঞ্জন সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার মুখের পানে চাহিতেছে। ব্রাহ্মণী নিস্পন্দ ভাবে স্বামীর পায়ের কাছে পড়িয়া আছেন। নিকটে রমা—সেও ভীতি-বিহ্বল, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বাক পাষাণ প্রতিমারই মত। মুমূর্ষুর মুখের একদিকে কাত্যায়নী এবং অন্য ধারে একটু দূরে কামাখ্যানাথ নিস্পন্দ নয়নে কেবল তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন।

সহসা রোগীর অবস্থা চরম সীমায় দাঁড়াইল। কবিরাজ বলিলেন "আর কেন, অন্তকালের যা' বিধান, তা' এখন করানো হোক্।" কাহারো সম্বিতের কোন লক্ষণ না দেখিয়া, অগত্যা কামাখ্যানাথই উঠিলেন, এবং নিরঞ্জনের দ্বারা সমস্ত ব্যবস্থা করাইলেন। অতি সন্তর্পণে মুমূর্ষুকে গৃহের বাহিরে আনিয়া তুলসী-তলায় শোয়ানো হইল। কেহ অন্তর্জ্জলের কথা বলিলে, কামাখ্যানাথ বলিলেন, "সে যদি উনি জ্ঞানের সঙ্গে চাইতেন, তা'হলে দরকার ছিল বটে। অন্যথায় সে কেবল মুমূর্ষুকে কষ্ট দেওয়া মাত্র। এ জায়গাকে গঙ্গাতীরই বলা চলে।" কয়েক মুহূর্ত্ত পরে মুমূর্ষু সহসা যেন তাড়িতস্পর্শে সসংজ্ঞ হইয়া পরিস্কার কণ্ঠে ডাকিলেন, "কই মা কাত্যায়নী, কাছে এস।" স্বর শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া উঠিল। কাত্যায়নী নিকটেই ছিল, পিতার এই চরম আহ্বানে এইবারে ধৈর্য্যচ্যুত ভাবে একেবারে তাঁহার বক্ষের উপর পড়িয়া দুই হস্তে তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করিল "বাবা বাবা!" কামাখ্যানাথ আস্তে-ব্যস্তে তাহাকে ধরিলেন, "কি কর কাত্যায়নি, কি কর, আরও একটু—আরও একটু ধৈর্য্য ধর এই সময়টাতে কষ্ট দিও না!" "কে,—কামাখ্যানাথ?" "হাঁ, ঈশ্বরের নাম করুন—ভগবানকে ডাকুন; বলুন, 'নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ" "বলি। ওঃ! দেখেছ কি তীব্র জ্যোতিঃ! ঐ আমার কাত্যায়নীর ভাগ্য-নিয়ামক নক্ষত্র। প্রসন্ন হও—অন্ধ মূঢ় আমি—আর তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না। কামাখ্যানাথ, এই নাও—কাত্যায়নীকে তোমার হাতে আমি সমর্পণ করছি। এইবার বল কি বলবে—চল, গঙ্গাগর্ভে আমায় নামিয়ে নিয়ে চল। অন্তর্জ্জলী করাও—বল—'নারায়ণ পরাবেদা, নারায়ণ পরাক্ষরা, নারায়ণ পরামুক্তি, নারায়ণ পরাগতি ওঁ নারায়ণ—ওঁ!—" আত্মা দেহ-বন্ধনমুক্ত হইল।

* * * *

যথানির্দ্দিষ্ট কালে কাত্যায়নীর দ্বারা জ্যোতিরত্নের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল, মহেন্দ্র পালিতপুত্রমাত্র—শাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধাধিকারী নয়। ধীরে-ধীরে দিন যাইতে লাগিল। মহেন্দ্র প্রায় সর্ব্বসময়ই এখন বাটীতে থাকিত। ব্রাহ্মণীর নিকটে থাকিয়া সর্ব্বকার্য্যে কাত্যায়নীর সাহায্য করিত। কামাখ্যানাথ প্রত্যহই তাহাদের সংবাদ লইতেন। সন্ধ্যায় বিগ্রহের আরতি দর্শনের পর কন্যা সমভিব্যাহারে আসিয়া ব্রাহ্মণীকে প্রণাম করিয়া যাইতেন। রমা তাহার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও মহেন্দ্রের সর্ব্বদা উপস্থিতির জন্য অন্য সময়ে কাত্যায়নীর নিকটে আসিতে পাইত না; কেবল সেই সময়ে পিতার সঙ্গে আসিয়া কাত্যায়নীর নিকটে একটু সময় কাটাইয়া যাইত। কয়েক দিন পরে কামাখ্যানাথ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "যে নিজেই শোকক্লিষ্ট, শোকার্ত্তদের সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ থাকাটা তার উচিত নয়। তাতে তার দেহ-মন ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ওঁরা স্ত্রীলোক, শোক করুন,—নইলে শান্তি পাবেন না; কিন্তু তুমি পুরুষ, তোমার চিরজীবন কায করতে হবে, কাযই পুরুষের সর্ব্বসন্তাপ-নাশক। তোমার এ ভাবে আর ওদের কাছে বেশী দিন কাল কাটান উচিত

র। তুমি মাঝে-মাঝে বাইরে চল। তোমার শরীরও ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।" মহেন্দ্র কোন উত্তর ল না।

নিরঞ্জন দুই-তিন দিন ডাকাডাকি করিয়াও যখন হেন্দ্রকে সেই শোকাচ্ছন্ন গৃহের বাহিরে লইয়া যাইতে রিল না, তখন ব্রাহ্মণীও মহেন্দ্রকে বলিলেন, "মহেন, তুমি র এমন করে থেক না বাবা। এ রকম করলে তোমার রীর ক'দিন বইবে?" "য'দিন বয়। বেশী দিন ব'য়ে কি ব মা?" "ছি বাবা, তোমার মুখে এ কথা সাজে না হন। আমার আর কাত্যায়নীর যে এখন তুমিমাত্র ভরসা— কি জান না?" "না মা, ভগবান কাত্যায়নীকে— মাদের খুব উচ্চ সহায়ই দিয়েছেন, আমি তোমাদের কোন যেই লাগব না। আমার দ্বারা আর ত কিছু সম্ভব হবে —কেবল এইটুকুমাত্র,—এই সময়ে একটু তোমাদের ছে থাকা মাত্র। এ থেকেও তুমি আমায় বঞ্চিত ক'রে দূরে ড়িও না মা এখনি।" "ওরে, তুই এমন কথা বলিস্ মহেন, াকে আমি দূরে তাড়াব? তুই কি জানিস্ না—" লতে-বলিতে ব্রাহ্মণীর রুদ্ধ ক্রন্দন সবেগে মুক্ত হইয়া তাঁহার রোধ করিল। মহেন্দ্র বালকের ন্যায় তাঁহার পায়ের উপর ড়ে হইয়া গড়াইয়া পড়িল। "মা—মা, মাপ কর, আমায় কর; তোমার ওপরও আমার অবিশ্বাস আসে—আমি নি অভাগা।" কিছুক্ষণ কাঁদিয়া ব্রাহ্মণী আবার মহেন্দ্রের তরতা দেখিয়া আপনিই ধৈর্য্য ধরিলেন; বলিলেন— মন কথা আর বলিস্ না মহেন, অন্য কথা আর এখন মার মনে নেই—আমি সে আশা ভুলতেই চাই। তুই ন আমার সতেরো বছরের আগের সেই মহেন্—যাকে মি পেটের সন্তান বলেই পরিচয় দিতাম। তোর ছেও এখন আমি সেই রকম প্রত্যাশা করি। যা হল না, না—সে চিন্তা আর করব না। কিন্তু তোর বিয়ে দিয়ে য়ের মুখ দেখে, তোর সন্তান কোলে নিয়ে আমি এ দুঃখ তে চাই। কাত্যায়নীর যা ভাগ্যে আছে, হবে; কিন্তু সঙ্গে তোমার জীবনও আমি এমন করে তোমায় নষ্ট তে দেব না। ওঠো, যাও—তুমি কামাখ্যানাথের কাছে । যে কাজ নিয়েছ, সেই কাযে মন দাও—নিজের ত কর। বেটাছেলের এমন ভাবে থাকতে নেই। মার বিয়ে দিয়ে, তোমার সংসার নিয়ে আমি আবার স্থির হব। তোমার যথার্থ মা হয়ে আমি আজ কেবল তোমারই মঙ্গল চাইছি। ওঠো মহেন, আর না।"

মহেন্দ্র আর কোন প্রতিবাদ করিল না। নতমস্তকে জমীদার-বাড়ী চলিয়া গেল। কামাখ্যানাথ তাহাকে বিষয়ান্তরে মন দিবার জন্য ইচ্ছুক দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সে দিন দ্বিপ্রহরে রমা তাহাদের নিকটে আসিয়াছিল। কাত্যায়নী শায়িতা বিমলা মাতার চরণতলে বসিয়া বলিল, "শুধু মহেন্দ্রকে তো ওঠালে হবে না মা— তোমায়ও সেই সঙ্গে উঠতে হবে। তুমি জোর না ধরতে পারলে সেও পারবে না।" মাতা মৃদুস্বরে বলিলেন, "যা করতে বলছ, যা বোঝাচ্ছ, তাই ত বুঝছি মা, আর কি করব?" "মহেন্দ্র যদি এসে তোমার এমনি এক ভাবেই থাকতে দ্যাখে, ভাববে ওসব তোমার স্তোক। তার ওপর সত্যই যে তুমি নিজের শেষ জীবন নির্ভর করছ, এটুকু তোমায় তাকে নিজের কায দেখিয়ে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে মা।"

মাতা চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "এখনি তাকে ঠেলে কাজ কম্ম দেখতে পাঠালাম - এখনো তার মন সামলে উঠতে পারেনি কাত্যায়নি, তার আঘাত যে একরকমের নয়। তার যে—" বলিতে-বলিতে কন্যার মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, সনিশ্বাসে তিনি নীরব হইবার পূর্ব্বে অস্পষ্ট স্বরে একবার বলিলেন, "এই ঠেলে পাঠান'তে আমায়ই সে হয় ত নিঃস্নেহ ভাবলে। ভাবলে হয় ত, আমার নিজের মা হ'লে কি পারত? শরীরটা খারাপ হয়েছে—"।

কাত্যায়নী ঈষৎ অপ্রসন্ন ভাবে বলিল, "মিথ্যে অত ভাবছ মা, এই রকম থাকলেই তার শরীর আরও খারাপ হত। যা করেছ, তা ঠিক কাজই করা হয়েছে। জগতে নিজের দুঃখকে বড় করার চেয়ে অন্যায় আর কিছু নেই, বাবার মুখে শুনেছি। এই যে আমরা নিজেদের দুঃখে ওঁদের পর্য্যন্ত কতদিন থেকে ব্যস্ত করে রেখেছি। ওঁরা যার উপকার করতে যাবেন, তারা সবাই যদি আমাদের মত এমনি করে ওঁদের ব্যস্ত করে' তোলে, তা'হলে পরের উপকার আর জগতে কেউ করতে চাইবে না। তার চেয়ে নিজেদেরই কি একটু বলিষ্ঠ হওয়া উচিত নয়? শোক-দুঃখ কি বাইরে প্রকাশের জিনিস, না, বাইরের সান্ত্বনায় তার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে? তবে কেন সকলকে ব্যস্ত করা?"

ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন না; কিন্তু রমা এইবার কথা কহিল। রমা কাত্যায়নীকে তার বক্তব্য কথাগুলা বলিতে বাধা দেয় নাই; কিন্তু বলা শেষ হইলে, ধীর, শান্ত স্বরে প্রতিবাদ করিল—"শোক দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা জগতে একজনের মাত্র আছে। তিনি ছাড়া মানুষের তা' দেবার সাধ্য নেই। কিন্তু মানুষের মাত্র ঐ একটু কাযই তিনি দিয়েছেন কাত্যায়নি! মানুষের জন্য একটু ব্যস্ত হওয়া, এইটুকুমাত্র। শুধু মানুষ বলে নয়, বোধ হয় প্রাণীমাত্রেই সেটুকু করে থাকে। পাখীগুলিতে পর্য্যন্ত তা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। একটার বিপদ দেখ্‌লে বাকীগুলি অস্থির হ'য়ে ওঠে। পাখীগুলো কি তাদের উপকার অপকারের কথা কিছু ভেবে অমন চেঁচামেচি করে? প্রাণীর স্বভাবধর্ম্মেই তাদের সে অস্থিরতাটুকু প্রকাশ পায়। তবে কেন তুমি, কারা একটু ব্যস্ত হ'য়েছে ভেবে—দ্বিগুণ ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ছ? পরের উপকার করার কথাটাও তোমার ভুল কাত্যায়নি! যার সঙ্গে আমাদের একেবারে পরিচয় নেই, এমন লোকের বিপদের কথাও তো আমরা সর্ব্বদা শুনে থাকি; কই, ক'জন সেই সব পরের দরকারে ব্যস্ত হই? আত্মজন বলে বোধ না হলে কই আমরা ত তাদের জন্য আঙ্গুলটিও নাড়ি না!"

কাত্যায়নীর মাতা সজল চক্ষে রমার পানে চাহিয়া স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "মা তোমাদের দয়ার কথা এ গ্রামে যে সবাই জানে। আমরা না হয় নূতন লোক, বেশী কিছু জানি না; কিন্তু ছোট-বড়র মুখে তোমার বাবার গুণের কথা যে শুনে আস্‌ছি—"

"এ গ্রামের লোক কি বাবার পর? তারা সবাই যে আমাদের আপনার লোক! কিন্তু এদের ছাড়াও তো অনেক লোকের অনেক দরকার অনেক দুঃখ এ জগতে আছে, কে তাদের দেখ্‌ছে, কে তাদের শোকে-দুঃখে সান্ত্বনা দিচ্চে বলুন? বাবা বলেন বটে যে, তেমনি আবার অনেক ভাল-ভাল লোকও আছেন, যাঁরা তাদের সর্ব্বদা দেখেন। আমার কিন্তু এ কথায় তেমন মন পোরে না। মানুষের সাধ্য কি—তাদের কাউকে কেউ শান্তি দিতে পারে? তার সে ক্ষমতা কোথায়?" ব্রাহ্মণী শোকাচ্ছন্ন স্বরে বলিলেন, "জগতে শান্তি কি আছে রমা? কই এতদিনেও কোথাও কারও কাছে তো তাকে দেখ্‌তে পেলাম না। জগতেই নেই—তা' কে কাকে দিতে পারে?" রমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে মুখখানি আনত করিয়া বলিল, "এমন কথা বল্‌বেন না। তা'হলে শান্তি শব্দটাও জগতে থাকৃত না; কিন্তু সেটা মানুষের হাতের জিনিষ নয়, তাই তা' কেউ কাউকে দিতে পারে না। জগতে কেউ যার দেখবার নেই, যার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কোন দিকে কিছু নেই, তার দিকেও যিনি সমভাবে দৃষ্টি দিয়ে আছেন, তাকেও যিনি ও-জিনিষে বঞ্চিত করেন না, সেই তাঁরই হাত থেকে না পেলে শান্তি তো অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।" ব্রাহ্মণী স্নেহ-শ্রদ্ধা-মিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন, "তা জানি মা; আর এও জানি—তোমাদের পরিবারও তেমনি করে'—যার কেউ কোথাও নেই—তাকে দেখ্‌তে জানে বলে' শান্তিময়ের হাত থেকে সেই শান্তির অনেকখানিই দখল করেন।" রমার চক্ষু অশ্রুতে পূরিয়া উঠিল। সেই অশ্রু ব্যাকুল চক্ষুতে ব্রাহ্মণীর পানে চাহিয়া চাহিয়া বালিকা বলিল, "কই তা' হয়? কত অসংখ্য দুঃখই যে এ পৃথিবীতে আছে শুন্‌তে পাই; কিন্তু কটার কথা আমরা জান্‌তে পারি বলুন? বাবা যে এত খোঁজ রাখেন, তাই কি তার এক চুলেরও সন্ধান পান? আমাদের এ গ্রাম পৃথিবীর মধ্যে কতটুকু জায়গা? কটি লোক এর? কতটুকু এর অভাব-দুঃখ? আর তাও কি সব কেউ জান্‌তে পারে? বাবার মুখে আগে এ সব কথা যখন শুন্‌তাম, তখন ভাবতাম, তবে তাদের কে দ্যাখে? তাদের কি হয় তা'হলে? ভেবে ভেবে এখন এক-একবার মনে হয়, তাদেরও দেখ্‌বার এমন একজন আছেন, যিনি থাক্‌লে জগতে আর কারুরই থাক্‌বার দরকার থাকে না। তাঁর দৃষ্টিতে কারো দুঃখ বাদ্ প'ড়ে নেই।" "তা'হলেও তোমাদের মত লোককে জগতের অহরহই দরকার আছে মা। নইলে তোমার মত মেয়েকেও কে কবে পরের দুঃখ-কষ্টের ভাগী করতে পাঠায়?" রমা এইবার লজ্জিত মুখে বলিল, "আপনারা কেন এ কথা ভাব্‌ছেন? বাবা আমায় কোন দুঃখ-কষ্টের মধ্যেই যেতে দেন্ না। আপনাদের যে আমরা আপনার বলেই জানি। পরের জন্য বাবা ব্যস্ত হতে পারেন, কিন্তু আমি তো তা' হতে পাই না। বাড়ীতে যারা যায়, তাদের ছাড়া এ গ্রামেরও কাউকে যে আমি জানি না! কিন্তু আপনারা কেন আমাদের পর ভেবে

কষ্ট দিচ্ছেন।" ব্রাহ্মণী আর কিছু বলিলেন না—ঈষৎ লজ্জিত ও স্নেহপূর্ণ ভাবে বালিকার মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কাত্যায়নী এতক্ষণ নিঃশব্দেই বসিয়া ছিল; এইবার মৃদুকণ্ঠে বলিল, "রমার সঙ্গে বৈকালে ঠাকুরবাড়ী যাবে মা?" "ঠাকুরবাড়ী?" মাতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "না।" "যাও না কেন? রমার সঙ্গে একটু কথা কবে, আরতি দেখবে—একটু অন্যমনস্ক হবে।" রমা কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিল, "আর তুমি?" কাত্যায়নী ঘাড় নাড়িল। রমা আবার প্রশ্ন করিল, "কেন?" 'কাজ আছে।" রমা ব্রাহ্মণীর পানে চাহিতেই, তিনি রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "ও এখন তাঁর কাগজ পত্র, পুঁথী-পাজী সাজাবে, গুছুবে,—তাঁর সেই ঘর পরিষ্কার করবে, ধূপ-ধূনা দেবে" বলিতে-বলিতে শোকে ব্রাহ্মণীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, রমাও মস্তক নত করিল। ক্ষণপরে কাত্যায়নী বলিল, "মহেন্দ্র যে তোমার প্রসাদ নইলে খায় না, তার খাবার ঠিক করতে হবে যে এখন। তুমি একা এখানে প'ড়ে থাক্‌বে, তাই রমার সঙ্গে একটু ঠাকুরবাড়ী যেতে বল্‌ছিলাম।" "তা আমি বেশ থাক্‌ব, তুমি নিজের কাযে যাও।" গমনশীলা কন্যার পানে স্থির চক্ষে চাহিয়া-চাহিয়া মাতা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে অস্ফুট ভাষায় বলিলেন, "তাঁর সেবা এখন আর কর্‌তে পাস্‌নে, তাই মহেন্দ্র আর আমার জন্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত হয়ে রয়েছিস্‌। আমাদের ভাবনাতেই অস্থির হচ্চিস্‌; কিন্তু তোর ভাবনা কে ভাব্‌ছে? মাগো, কি পাষাণী মা আমি তোর! আমার দিন আর কতই বেশী হবে! মহেন্দ্রও পুরুষ মানুষ। কিন্তু তোর কি হবে? কি নিয়ে তুই জীবন কাটাবি? তোর দশা ভগবান কি কর্‌বেন, তা' একবারও আমি ভাবি না—"বলিতে-বলিতে মাতা রুদ্ধ-কণ্ঠে নেত্রজল সংবরণ করিতে লাগিলেন। রমাও তেমনি নত মুখে বসিয়া রহিল; কিন্তু সেই বয়িয়সীর অশ্রুপাতে তাহার চক্ষুও কিছু না বুঝিয়া সুঝিয়া, না ভাবিয়া-চিন্তিয়া অনাহুত ভাবে অনেকখানি জল আনিয়া উপস্থিত করিল।

সূর্য্যের কোষ্ঠী

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ]

কয়লার মন যে হঠাৎ টাকার উপর উঠিয়া গেল, এটা বেশী দিন থাকিতে পারে না; কারণ, পৃথিবীতে কয়লা এখনও ঢের আছে। কিন্তু কয়লা ত মনে করিলেই তৈয়ারি করা যায় না, ইহা আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি। অতএব জমার স্থানে যদি শূন্য পড়ে, ত খরচ যত কম ক'রে করা হউক না কেন, দেউলে একদিন হতেই হবে—তা' সে আজ না হয় দু'দিন পরে। বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও ফুরাইয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, আন্দাজ তিন হাজার বৎসর মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত কয়লা একেবারে উজাড় হইয়া যাইবে। অবশ্য বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধের ন্যায় মহাসমর যদি ২।৫টা তন্মধ্যে ঘটে, ত হীরার দামে কয়লা যে দিন বিক্রয় হইবে, সে দিন আরও নিকটে ঘনাইয়া আসিবে। যাহা হউক, সেই শেষের দিন, যে দিন রাণীগঞ্জ নিউকাসেল শ্মশানে পরিণত হইবে, সে দিন কয়লার অভাবে আমাদের ট্রেন বন্ধ হইবে, ষ্টীমার অচল হইবে, ফ্যাক্টরিতে তালা-চাবি পড়িবে। বিজ্ঞান কি সে দিনের জন্য একটা কিছু ঠিক করিয়া রাখেন নাই।

বিজ্ঞান বলেন, কয়লা না হয় গেল; কিন্তু কয়লা যাহার তেজ হইতে উদ্ভূত, সেই মার্ত্তণ্ডদেব ত সেইরূপ প্রচণ্ড ভাবেই তাঁহার কিরণ বিকীরণ করিতে থাকিবেন। অতএব কয়লার অভাবে সূর্য্যের তেজ-রশ্মি একত্র করিয়া আমাদের কাজে আনিবার চেষ্টা করিলেই চলিবে। শুধু বলিয়া নিশ্চিন্ত নয়, ইহা কার্য্যে পরিণত করা যে সম্ভব, বিজ্ঞান তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি আফ্রিকায় কাইরো নগরে একটী কল নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহাতে সূর্য্য-কিরণ জলকে বাষ্পে পরিণত করিয়া ইন্‌জিন্‌ চালাইতেছে, গম পিষিতেছে, বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাইতেছে। সুতরাং কয়লার অভাবের জন্য আমাদিগকে চিন্তিত হইতে হইবে না; কয়লা ফুরাইলে, সূর্য্যতেজকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাইয়া আমরা এক-রকম চালাইয়া লইতে পারিব। কিন্তু তাহার

পরের কথাটা যাহা মনে আসে, তাহা এই,—এই সূর্য্য কি অজর,অমর, অবিনাশী, না—এক দিন ইহারও শেষ আছে? এই ধরিত্রীতে মানবের আদি অভ্যুত্থান হইতে ভারতবর্ষ, আসিরিয়া, ব্যাবিলন, প্যালেষ্টাইন, চীন প্রভৃতি প্রাচীন দেশের সভ্য মানবের নিকট যিনি দেবতারূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন, ধ্বান্তারি, সর্ব্বপাপঘ্ন রূপে ত্রিসন্ধ্যায় যিনি পূজিত হইতেছেন, জগৎসবিতা শুচি, কর্ম্মদায়ি রূপে যিনি কীর্ত্তিত হইতেছেন, সেই বিবস্বানের একটা কোষ্ঠী বিজ্ঞান তৈয়ারি করিয়াছে। সূর্য্যোপাসক বিজ্ঞানের এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন।

সূর্য্যের এই তেজ কোথা হইতে আসিল? কিন্তু তৎপূর্ব্বে সৌরতেজের পরিমাণটা একবার কল্পনায় আনিবার চেষ্টা করা যাউক। জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলার বৃষ্টি যে কত মিষ্টি, শুধু সেই বুঝিতে পারে, যে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর বেলার রৌদ্রে অন্ততঃ দু'মিনিটের জন্যও দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই রৌদ্রের তেজ সমস্ত সৌর-তেজের কতটুকু অংশ! এই সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া যে পরিমাণ সৌরতেজ বিক্ষিপ্ত আছে, সমগ্র সৌরশক্তির তাহা ২২০ কোটী ভাগের এক ভাগ মাত্র। সংখ্যার পরিবর্ত্তে অন্য প্রকারে এই সৌরতেজের প্রচণ্ডতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা যাউক। রাবণের সিঁড়ি ঠিক কত মাইল লম্বা হইবার কথা ছিল, জানা নাই; কিন্তু কল্পনায় মনে করা যাউক যে, ধরা-পৃষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্য অবধি বিস্তৃত ৯২০ লক্ষ মাইল লম্বা এবং ২৪ মাইল চওড়া একটী বরফ-সেতু বিদ্যমান; এবং মনে করা যাউক, পুঞ্জীভূত সমস্ত সৌরতাপ এই বরফ-সেতুর উপর প্রসারিত। দিন, ঘণ্টা, মিনিটও অপেক্ষা করিতে হইবে না। একটী মাত্র সেকেণ্ড—ঘড়ির দোলকের একটী মাত্র 'টিক্' আর এই বিশাল সেতু একেবারে গলিয়া জল হইবে। পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ এই সৌরতেজের আরও কিছু-কিছু অংশ পায়। মোটের উপর বার কোটী ভাগের এক ভাগ মাত্র এই সৌরজগতে রক্ষিত। বাকী সমস্তটাকে সূর্য্য কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া, কাহার উদ্দেশে কাহার তরে বিলাইয়া দিতেছে, কবি তাহার হিসাব করুন বিজ্ঞান সে বিষয়ে নীরব। তাহার মতে এটা তাহার একটা একান্ত পণ্ডশ্রম, একটা বিরাট বিফলতা।

এতদূর অপব্যয়ী যে সূর্য্য, তাহার তহবিল পূরণ হইতেছে কিরূপে? এই বিশ্বের শক্তির নাশ নাই—শুধু রূপান্তর হয় মাত্র। গতিবান পদার্থ যখন আর একটা পদার্থের সহিত ধাক্কা খাইয়া অচল হইয়া যায়, তখন উহার কতকটা গতি-শক্তি তাপ-শক্তিতে পরিণত হয়। চকমকি ঘষিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্ভূত হয়। এক সময় মনে করা হইত, অগণিত উল্কাপিণ্ড নিরন্তর সূর্য্য-পৃষ্ঠে ধাক্কা খাইতেছে এবং সেই সঙ্ঘাতে যে তাপ উদ্ভূত হইতেছে, তাহাই সূর্য্যের পুঁজি; তাহাতেই উহার এই বিপুল দান-শক্তি বজায় রহিতেছে। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরা এই মতের অনেক গলদ্ বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে, এই উল্কাপিণ্ডের সংখ্যা এত অধিক হইতে পারে না যে, উহার সঙ্ঘাতজনিত তাপ এই ভীষণ অপব্যয়ের পূরণ করিতে পারে। তাহা হইলে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদিগের মত সূর্য্যের এই ভীষণ তেজ কোথা হইতে আসিতেছে? ইহা দেখা যায় যে, কোন বায়বীয় পদার্থের উপর যদি চাপ পড়ে, ত উহা ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়, এবং সেই সঙ্কোচনের ফলে উহাতে তাপ উদ্ভূত হয়। সূর্য্যে একটা প্রকাণ্ড বায়ুপিণ্ড বর্ত্তমান। বিজ্ঞানের মতে উহা ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতেছে, এবং এই সঙ্কোচনের ফলে যে তাপের উৎপত্তি হইতেছে, তাহাতেই সূর্য্যের এত বড়াই। এখন কথা উঠিতে পারে যে, বাস্তবিক যদি তাহাই হয়, তবে সূর্য্যকে ক্রমশঃই ছোট হইতে হয়। এখন মাপিয়া দেখা যাউক—সত্য সত্যই সূর্য্য ছোট হইয়া যাইতেছে কি না। তাহা হইলে এই তর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু বিজ্ঞান বলেন, এই সঙ্কোচন এত কম যে, ২০।২৫, ১০০।১৫০ বৎসরে উহা ধরা সুকঠিন হইবে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সূর্য্যের ব্যাস ২১ বৎসরে যদি এক মাইল মাত্র কমে, তাহা হইলে যে তাপ উদ্ভূত হইবে, তাহাতেই এই অমিতব্যয়ী সূর্য্যের বেশ চলিয়া যাইবে! সুতরাং সূর্য্য ছোট হইতেছে কি না, হঠাৎ ধরিবার কোন উপায় নাই।

এই মত যদি অভ্রান্ত হয়, তবে সূর্য্যের ভবিষ্যৎটা কিরূপ দাঁড়ায়? এই সঙ্কোচন অবশ্য অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে পারে না;—এমন একটী দিন আসিবে, যখন সূর্য্যের পুনঃ-সঙ্কোচন অসম্ভব হইবে; সুতরাং আর উহাতে তাপ উদ্ভূত হইবে না, এবং তখন উহা ঠাণ্ডা হইতে সুরু করিবে;—যতক্ষণ না একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, ততক্ষণ ক্রমশঃই ঠাণ্ডা

হইতে থাকিবে। গণিতের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়া বিজ্ঞান দেখাইয়াছেন যে, সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে সূর্য্যের ১৭০ লক্ষ বৎসর লাগিবে; এবং হিসাবে আরও দেখাইয়াছে যে, উহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইতে সূর্য্যের ১৭০ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে। তবে সূর্য্যে রেডিয়মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রেডিয়ম হইতে তাপ স্বতঃই উদ্ভূত হয়, সুতরাং হিসাবে সূর্য্যের বয়ঃক্রম আরও ১০।১৫ লক্ষ বৎসর বাড়িতে পারে, তাহার বেশী নয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সূর্য্য আমাদের একটী আধ-বয়সী যুবা; উহার বর্ত্তমান বয়স ২ কোটী বর্ষ এবং আর ২ কোটী বর্ষ উহার পরমায়ু আছে; এই ৪ কোটী বৎসরেই জীবলীলা সমাপ্ত। বিজ্ঞান আমাদের সূর্য্যের এই কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেই শেষের দিনে সমস্ত গ্রহ শান্ত হইয়া, এই মৃতপ্রায় সূর্য্যকে সজ্ঘাতবলে সঞ্জীবিত করিয়া পুনঃ কল্পারম্ভ করা সম্ভবপর হইবে কি না, বিজ্ঞান সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলিতে পারিতেছেন না।

কয়লার অভাবে সৌরতেজ দ্বারা আমাদের সভ্যতা বজায় রাখিবার যে সব বন্দোবস্ত বিজ্ঞান করিতেছেন, সে দিন বিজ্ঞানের সে সব জারিজুরি আর খাটিবে না। কিন্তু সূর্য্য কি কেবল আমাদের কয়লার অভাব পূরণ করিবার জন্যই আছে? সূর্য্যের নিকট আমাদের ঋণ কি শুধু এইটুকু? সূর্য্য এই সৌরজগতের প্রাণ। সূর্য্যের আলো ও সূর্য্যের তাপ আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহার কৃপাতেই আমরা খাই, এবং যাহা কিছু খাই, তাহা তাঁহার কৃপাতেই পাই। বসন্ত-সমাগমে ধরিত্রী যখন নব-ফলপল্লবে সজ্জিত হইয়া নব-জীবনের স্পন্দন অনুভব করে, তখন প্রকৃতির উপর মার্ত্তণ্ডের প্রভাব আমরা নিরীক্ষণ করি। যখন "ফিরে দিশি-দিশি মলয় মন্দ কুসুমগন্ধ বহিয়া" তখন জানি সেই গন্ধবহের মন্দগতি সৌরতেজেরই আংশিক প্রকাশ মাত্র। সৌরতাপ প্রভাবে বায়ু গতিশীল হইতেছে, সাগরাম্বুর আণবিক গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নিম্মল জলীয় বাষ্প উত্থিত হইতেছে; সূর্য্যের তাপে সেই বাষ্প ধরিত্রীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে পর্ব্বতস্কন্ধে নীত হইতেছে এবং সূর্য্যেরই তাপে সেই বাষ্প গিরিনদী ও ক্রমে স্রোতস্বিনীতে পরিণত হইতেছে। এই স্রোতের শক্তিতে শুধু নৌকা বেগবতী হয় না; বিজ্ঞান ইহাকে নানা রকমে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে। নায়াগ্রার জলপ্রপাতে চক্রযন্ত্র বসাইয়া প্রপাত-শক্তি হইতে তড়িৎ উৎপন্ন করা যাইতেছে এবং সেই তড়িদ্বল তার সাহায্যে বহু শত মাইল দূরে নীত হইয়া পিটস্‌বর্গ প্রভৃতি নগরে কোথাও ট্রাম চালাইতেছে, কোথাও বৈদ্যুতিক আলো ও পাখা ঘুরাইতেছে, অথবা পুনরায় তাপরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া লৌহ ঢালাই করিতেছে। আমাদের দেশে কাবেরী নদীতে বাধ দিয়া কৃত্রিম জলপ্রপাতের সৃষ্টি করা হইতেছে এবং তাহা হইতে তড়িৎ উৎপন্ন করিয়া কোলার স্বর্ণখনির যন্ত্রাদি চালিত হইতেছে; এবং আশা আছে, এক দিন দামোদরের প্রচণ্ড শক্তি বন্যারূপে লোকের অনিষ্টসাধন না করিয়া তাহাদের হিতসাধনেই নিয়োজিত হইবে।

সুতরাং এই দুই কোটী বৎসর পরে সূর্য্য যে দিন অপসৃত হইবেন, সে দিন সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত এই বিরাট সৌরজগতে প্রাণের স্পন্দন আর কোথাও অনুভূত হইবে না। নদী বহিবে না, বায়ু প্রবাহিত হইবে না; উপরে অনন্ত আকাশ—মেঘ নাই; নীচে অসীম সমুদ্র—ঢেউ নাই। বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম—নির্জীব; পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ—প্রাণহীন। সমস্ত নিস্পন্দ, সমস্ত অচল, সমস্ত অন্ধকার। আর মানব সভ্যতার এই শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিবার জন্য কোন জীবিত সাক্ষীও থাকিবে না।

কিন্তু মা ভৈঃ—সে দিনের এখনও ঢের দেরী আছে; এবং চাই কি, ততদিনে বিজ্ঞানের এ মতটাও বা উল্টাইয়া যাইতে পারে।

সাঁচি স্তূপ*

[শ্রীভবতোষ মজুমদার]

(১)

নীলসিন্ধুজল-বিধৌত-পাদ তুষারশুভ্রকিরীটি আমাদের এই ভারতবর্ষের উপর দিয়া বিভিন্ন সভ্যতার খরস্রোত বিভিন্ন সময়ে প্রবাহিত হইয়া তাহার স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। এই স্রোতের অন্যতম প্রবাহ বৌদ্ধ যুগ। এই যুগে ভারতবর্ষ জগতকে সাম্য ও মৈত্রী সর্ব্বপ্রথমে শিক্ষা প্রদান করে। যিনি এই অমর নীতিদ্বয় জগৎ-সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী লইয়া কত-শত শিল্পী নিজের প্রতিভা-বিকাশে অবসর পাইয়াছিল। আমরা সাঁচি শৈলে বিখ্যাত স্তূপ, তোরণ, মন্দির, মঠ ইত্যাদিতে তাহাদিগের অমর কীর্ত্তি দেখিতে পাই। এই যুগের চিত্রকরের অপূর্ব্ব তুলি চিত্রিত অজন্তা গুহার চিত্রাবলী। ইহার পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষের উপর এক অভিনব ভাবস্রোত প্রবাহিত হয়—উড়িষ্যার কনারকের সূর্য্য-মন্দির এই নব-যুগের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ আজও বিরাজমান। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে এলোরা পর্ব্বতে খোদিত শৈব কৈলাস মন্দির। কালপ্রবাহে ভারতবর্ষে মুসলমান সভ্যতার প্রাদুর্ভাব হয়। পাঠানেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পুরাতন আর্য্য সভ্যতার সহিত সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীভূত হইতে না পারায়, তাঁহাদের স্থাপত্য ও শিল্প আরবপ্রভাবযুক্তই থাকে; কিন্তু যে সময়ে মোগলগণ ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে আর্য্য ও মহম্মদীয় শিল্পকলার এক অপূর্ব্ব মিলন সংঘটিত হয়। এই মিলনের চিরস্থায়ী স্মৃতি ও ভারতের অতুলনীয় সম্পত্তি তাজমহল।

এই প্রবন্ধে বৌদ্ধযুগের শিল্পকলার আদর্শ ও মুখপাত্র স্বরূপ বিখ্যাত সাঁচি স্তূপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

(২)

যথায় বিন্ধ্যপর্ব্বতের খণ্ড-খণ্ড শৈলগুলি ক্রমে শস্য-শ্যামলা দশার্ণ জনপদের হরিতক্ষেত্রে বিশ্রাম করিতেছে, তথায় কবিকুলগুরু কালিদাসের বর্ণিত স্বচ্ছসলিলা বেত্রবতী ও বেশ নাম্নী ক্ষুদ্র তটিনী প্রবাহিতা। এই দুই নদী-সঙ্গমে স্বনামখ্যাত দশার্ণের ঋদ্ধিমতী রাজধানী বিদিশা। এই বিদিশার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাঁচি পর্ব্বত। অধুনা এই পর্ব্বতের সন্নিকটে G. I. P. Ry. লাইনের একটি ক্ষুদ্র ষ্টেসন আছে। বিদিশায় নিকট কেবল যে সাঁচি পর্ব্বতের উপর বৌদ্ধ-কীর্ত্তি পাওয়া যায় এরূপ নহে, সোনারি, শতধারা, পিপলিয়া এবং আন্ধের পর্ব্বতের উপরও বৌদ্ধ-স্থাপত্যের সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে, স্বতঃই এই প্রশ্ন মনোমধ্যে উদিত হয়,—"এতগুলি বৌদ্ধ-মন্দির এরূপ ভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া বিরাজ করিবার কারণ কি?" ইহার প্রধান কারণ এই যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে বিদিশা নগর বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল; এবং বৌদ্ধধর্ম্ম-বিকাশের সহিত এই সমৃদ্ধিশালী নগরের অনেকেই "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই বৌদ্ধনীতি গ্রহণ করেন। সাঁচি এবং অন্যান্য পর্ব্বতোপরি স্থিত স্তূপগুলি তাহাদেরই প্রবল ধর্ম্মপিপাসার ও নীতি-মার্গানুসারিতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিদিশা নগরের বৌদ্ধরা নিভৃত লোকবিরল সাঁচি পর্ব্বত ধর্ম্ম-সাধনের উপযুক্ত স্থান ভাবিয়া তথায় মঠাদি নির্ম্মাণ করে।

প্রায় দেখা যায়, বৌদ্ধদিগের অন্যান্য তীর্থগুলি ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। কপিলবস্তুর লুম্বিনী নামক উদ্যান সিদ্ধার্থের জন্মস্থান; গয়া জেলার উরুবিল্ব গ্রাম বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির পুণ্যভূমি; বারাণসী নগরের উপকণ্ঠে মৃগদাব প্রথম ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের লোকবিশ্রুত কেন্দ্র; আর হিমাচলের পাদমূলে মল্লদিগের রাজধানী কুশীনগর (বর্ত্তমান কাসিয়া) তদীয় নির্ব্বাণ-লাভের শোক-শ্মশান। এই নিমিত্ত উক্ত স্থানগুলি সুদূর অতীতের পুণ্য কাহিনী-স্মৃতি অতি যত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর ধরিয়া অকপট ভাবে হৃদয়ের পবিত্র পূজা প্রাপ্ত

(*) Sir John Marshallএর Monuments of Sanchi অবলম্বনে লিখিত এবং তাঁহার অনুমত্যনুসারে প্রকাশিত হইল।
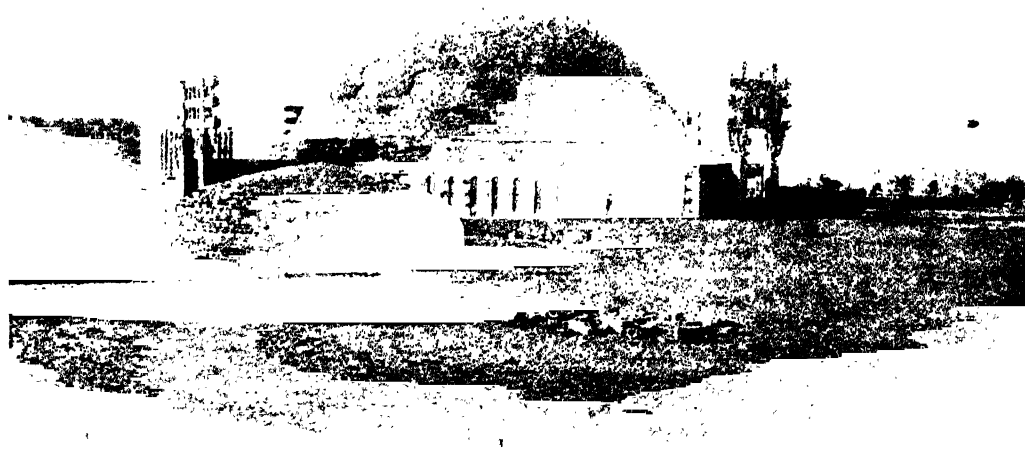
সাঁচি-পাহাড়োপরি বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ ও মন্দিরাদির নক্সা

বৃহত্তম স্তূপ
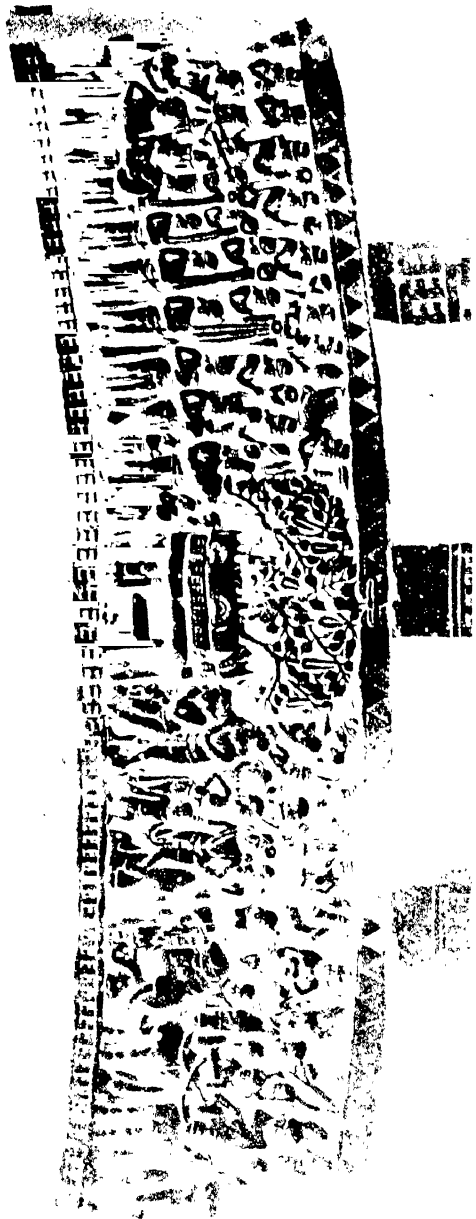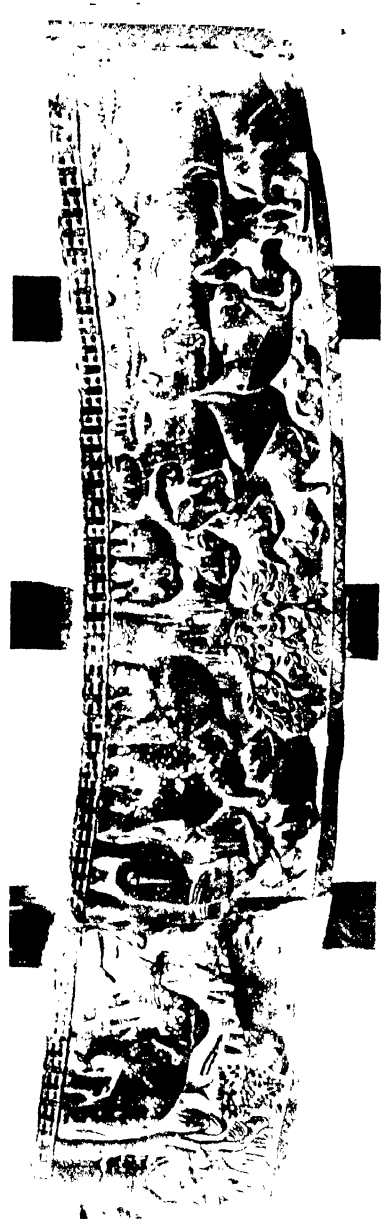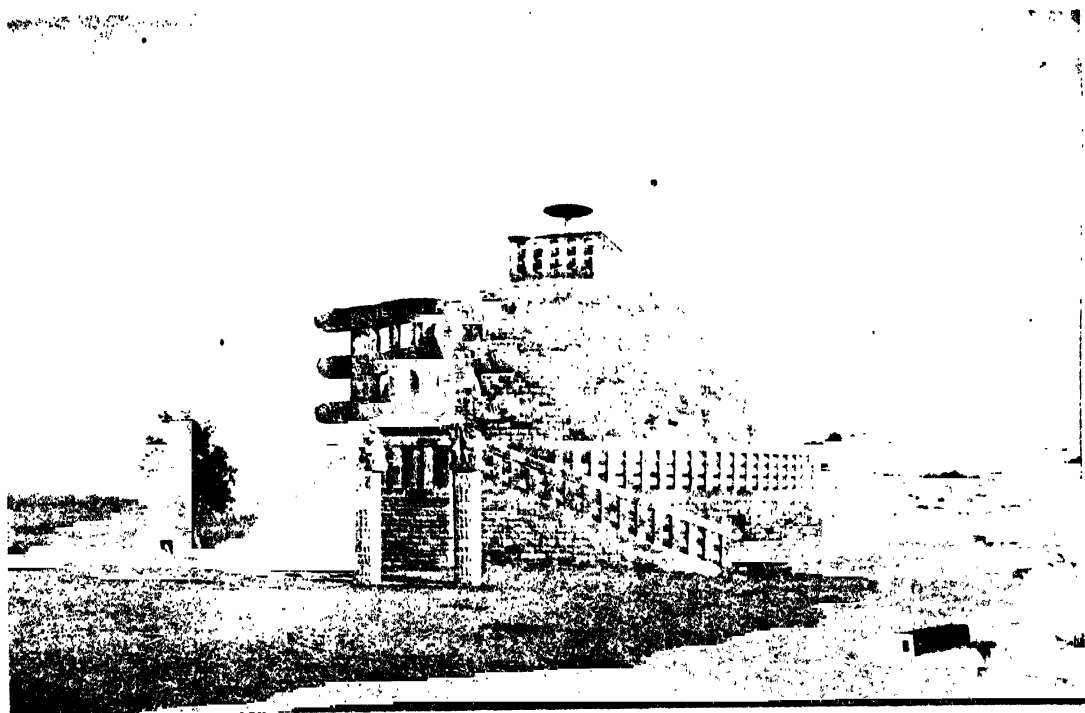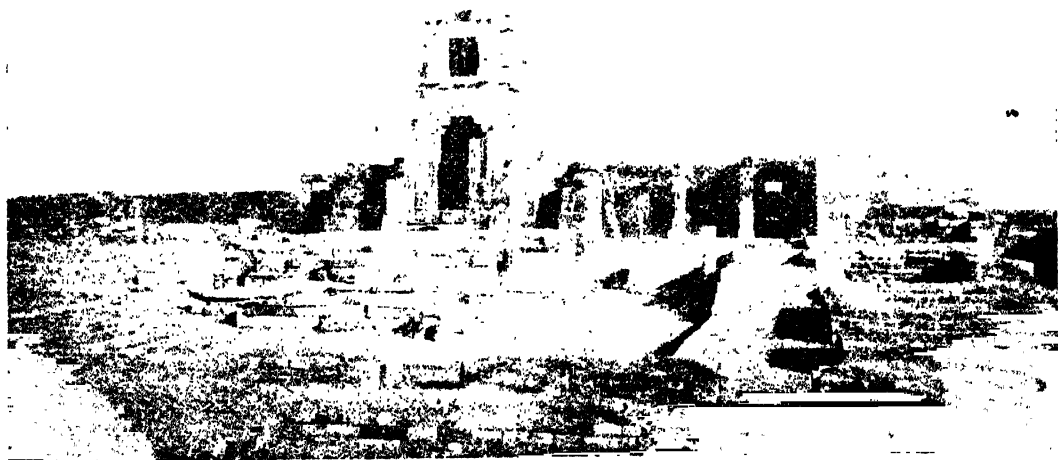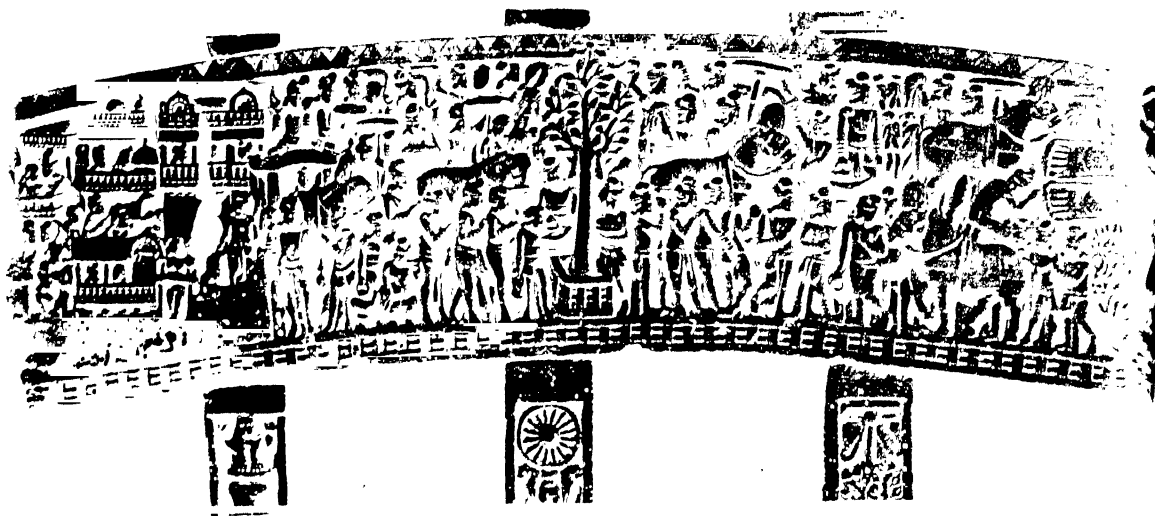
মহাকপি জাতক

বুদ্ধ ও জলপ্লাবন

স্তম্ভগাত্রে শিল্প-চাতুর্য্য
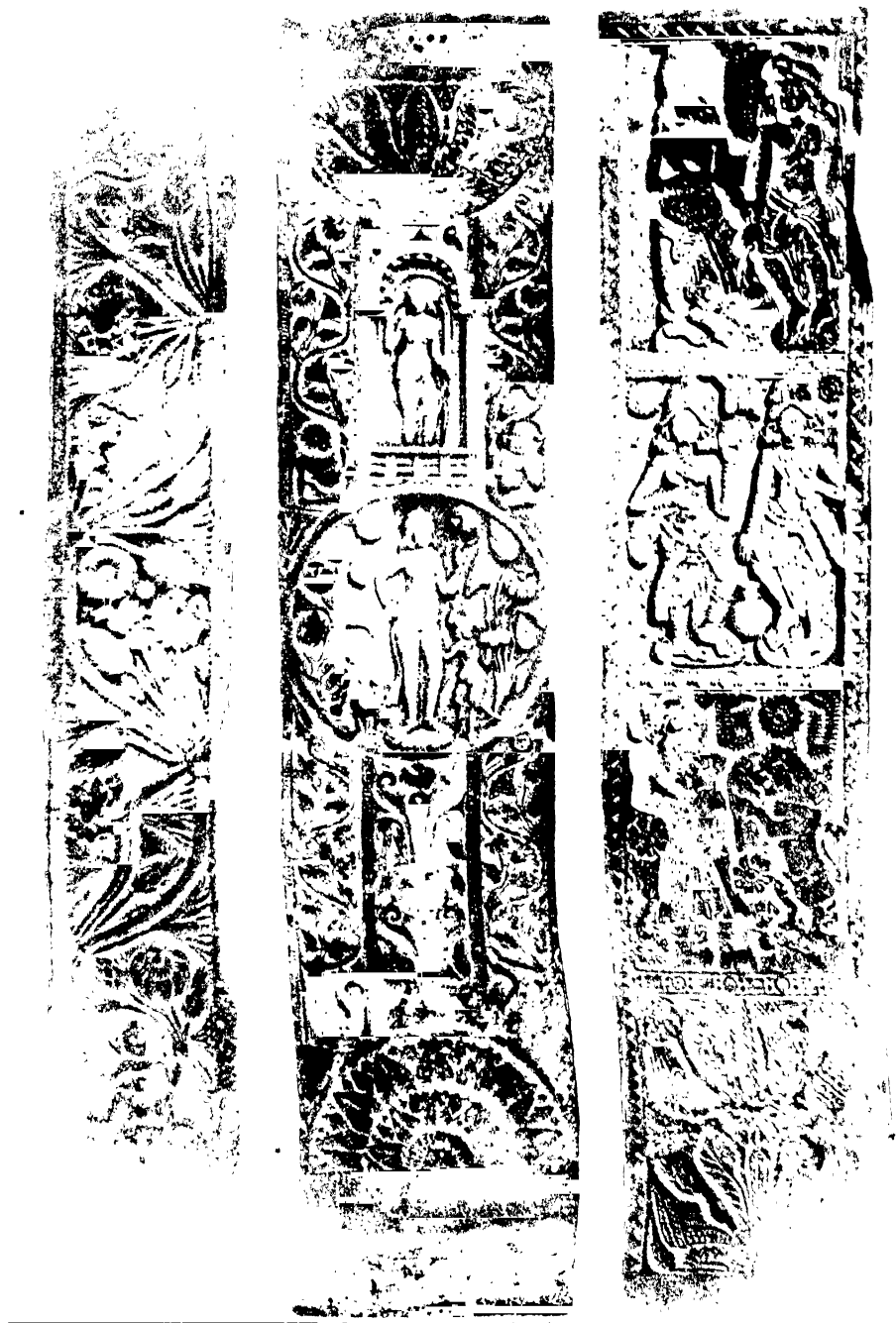
হইয়া আসিতেছে; এবং পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ-স্তূপ ও বৌদ্ধ মন্দিরাদির আবাসস্থল হইয়াছে। সাঁচিতে উক্ত কোন কারণ বিদ্যমান না থাকিলেও, অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহার সহিত বৌদ্ধ-সম্রাট্ অশোকের স্মৃতি বিজড়িত থাকায় উহা পরবর্ত্তী যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। অশোকাবদান পাঠে অবগত হওয়া যায়, উজ্জয়িনী নগরের

শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইবার কালীন অশোক বিদিশা নগরে দেবী নামে এক বৌদ্ধ বণিক্‌-কন্যার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করেন। এই পরিণয়ের ফল স্বরূপ দেবীর গর্ভে মহেন্দ্র নামক এক পুত্র এবং সঙ্ঘমিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। চৈনিক পরিব্রাজক Fa Hien এবং Hiuen Thsang এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে সাঁচির মন্দিরাদির কোন উল্লেখ না থাকিলেও, অনুমান হয় যে, বুদ্ধদেবের জাতকমালায় বর্ণিত কোন আখ্যানের সহিত সাঁচি পর্ব্বতের সম্বন্ধ ছিল। সে যাহাই হউক, মহারাজ অশোকের সময় হইতেই সাঁচির খ্যাতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অশোক এই পর্ব্বতের উপর একটি মঠ, একটি স্তূপ এবং একটি চতুঃসিংহ-চূড়া-শোভিত ধর্ম্মস্তম্ভ স্থাপন করেন। এই স্তম্ভ গাত্রে পুরাতন ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত ধর্ম্মলিপি বৌদ্ধ যুগের অমরকীর্ত্তি আজ পর্য্যন্ত ঘোষণা করিতেছে।

পশ্চিম তোরণ— কারুকার্য্য [illegible]

উত্তর তোরণ

গুপ্ত মন্দির

অশোক নির্ম্মিত স্তূপের চারিদিকে ক্রমে অসংখ্য বড় স্তূপ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩
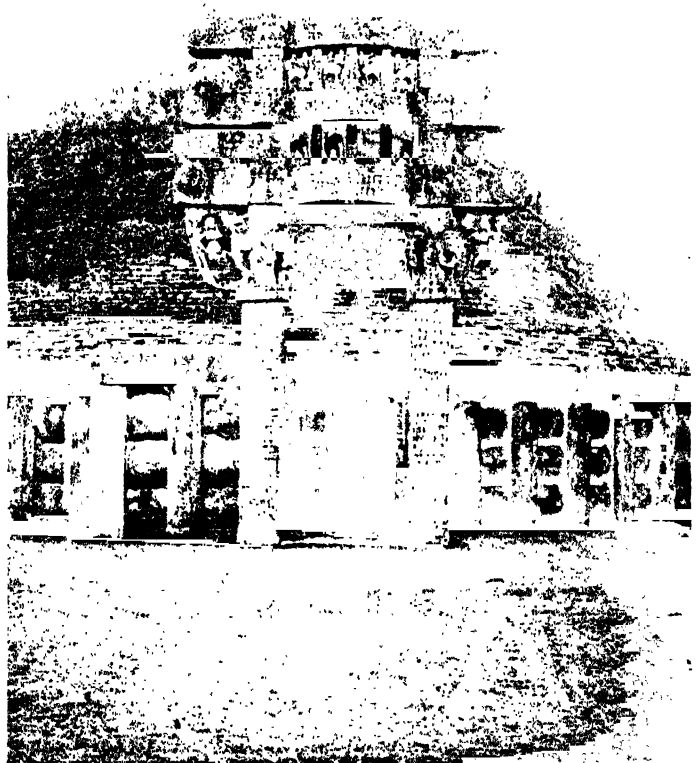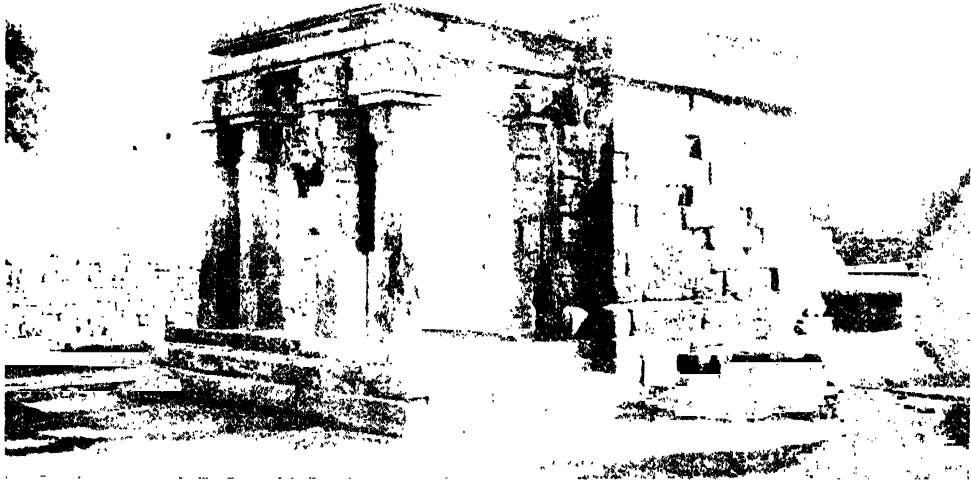
সাঁচি পর্ব্বতের বাহ্যিক আকারের কোনরূপ বিশেষত্ব নাই। ইহা অনুমান ৩০০ ফিট উচ্চ ও অর্দ্ধ বৃত্তাকার। এই বৃত্তের মধ্য স্থানটি ঘোড়ার জিনের মত নীচু। উক্ত নিম্নভূমিতে সাঁচি নামক ছোট গ্রাম; এবং গ্রামের নাম হইতেই বর্ত্তমান পর্ব্বতের নাম সাঁচি শৈল হইয়াছে। এই পর্ব্বত বালু প্রস্তরে গঠিত এবং ইহা স্তরমালাশোভিত। প্রাকার বৌদ্ধযুগের লোকেরা এই প্রস্তর হইতেই স্তূপ, মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। সাঁচির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই উপভোগ্য। ইহার বিবিধ বর্ণের প্রস্তর দৃশ্য যেরূপ নেত্র মনোহর, তদুপরি বিচিত্র আরণ্য বৃক্ষলতাকুঞ্জাদি তদপেক্ষা শোভাময়। স্থানে স্থানে খিরণী বৃক্ষের সবুজ পত্রের সহিত পলাশের নানাবর্ণের পুষ্পগুচ্ছের এক অপূর্ব্ব মিলন নয়ন মনের তৃপ্তিসাধন করে। পর্ব্বতের উপর দুই স্থানে বৌদ্ধদিগের মন্দিরাদি বিদ্যমান আছে। একটি উপরকার সমতল

প্রবন্ধ লেখক শ্রীযুক্ত ভবতোষ মজুমদার

ভূমিতে, আর একটা তাহার কিছু নিম্নে। উপরকার সমতল ভূমি বেষ্টন করিয়া প্রায় ১১ খৃষ্টাব্দে একটি নাতিউচ্চ প্রস্তর প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। এই প্রাচীরবেষ্টিত ভূমিতে চারিপ্রকার বৌদ্ধ মন্দিরাদি দেখা যায় (১) স্তূপ ও ধর্ম্ম স্তম্ভ, (২) চৈত্যমন্দির, (৩) বৌদ্ধমঠ এবং (৪) বৌদ্ধ মন্দির। উক্ত সমতল খণ্ডে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে প্রায় দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছোট বড় অসংখ্য স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম স্তূপ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এই বড় স্তূপটী অর্দ্ধগোলাকার। ইহার উপরিভাগ সমতল নিম্নদেশে বৌদ্ধ ভক্তদিগের প্রদক্ষিণ করিবার পথ বিদ্যমান। এই পথের নিম্নে সমতল ভূমিতে আর একটি প্রদক্ষিণ পথ আছে। উক্ত দুইটী পথই বেষ্টন করিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত বেষ্টনী (রেলিং)। স্তূপের শিরোদেশ চতুষ্কোণ। ইহার মধ্যস্থলে প্রস্তর পেটিকায় আবদ্ধ ভগবান বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ সযত্নে স্থাপিত হয়; উপরিভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত বেষ্টনী ও দণ্ডছত্র। প্রদক্ষিণ পথের এবং ছত্রবেষ্টনীর গাত্র নানাপ্রকার জন্তু ও পুষ্পের চিত্রাদিতে শোভিত; কিন্তু চতুর্দ্দিকের চারিটি তোরণের কারুকার্য্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। এই তোরণগুলিতেই বৌদ্ধ শিল্পী অতুলনীয় প্রতিভার বিকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রায় ২০০০ বৎসর হইতে চলিল, এই তোরণগুলি বৃষ্টিপাত ও ঝটিকাপ্রবাহ উপেক্ষা করিয়া এখনও পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চারিটী তোরণই প্রায় একই প্রণালীতে নির্ম্মিত। এই চারিটী তোরণের মধ্যে কেবল উত্তর তোরণটী সম্পূর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান। ইহার দুই পার্শ্বে চতুষ্কোণ স্তম্ভ। পারসিকদিগের অনুকরণে স্তম্ভগুলির চূড়া কোথাও হস্তী কিম্বা সিংহের পূর্ব্বভাগ, কোথাও বা খর্ব্বাকৃতি মনুষ্য-মূর্ত্তি, কোথাও বা ধর্ম্মধ্বজাধারী হস্তিপৃষ্ঠস্থিত মনুষ্য-মূর্ত্তি দ্বারা শোভিত। চূড়ার উপরে লম্বভাবে তিনটী প্রাচীরশীর্ষ (architrave) স্থাপিত এবং এই architrave এর শেষভাগ কিঞ্চিৎ গোলাকার (volute
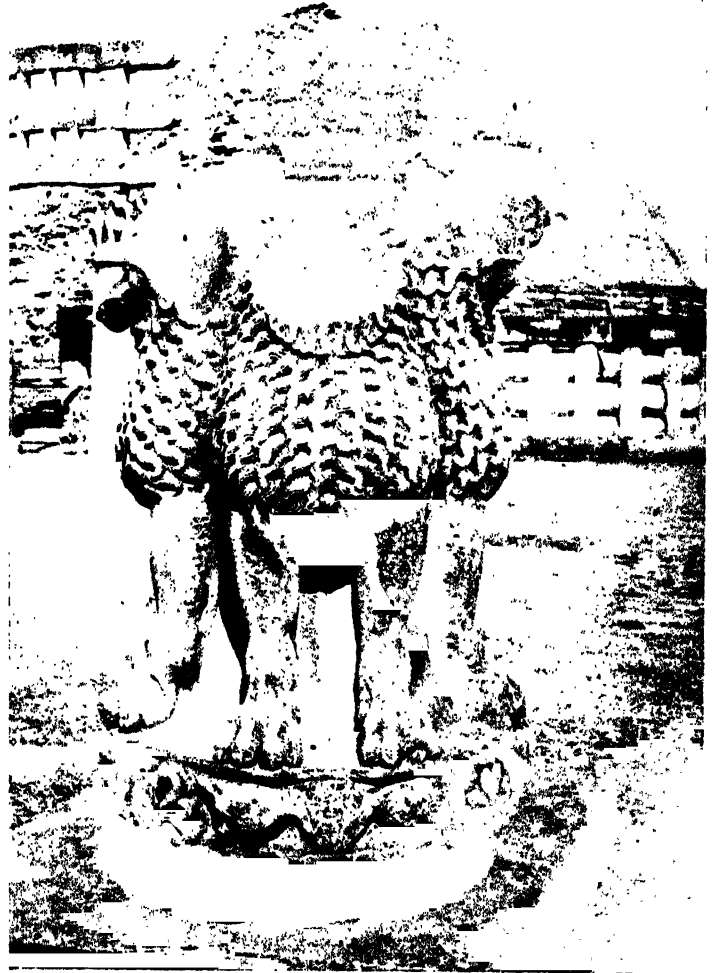
অশোক স্তম্ভ

ends)। সর্ব্বনিম্ন (architrave) প্রাচীরশীর্ষ এবং স্তম্ভচূড়ার সংযোগ স্থলে মনোহর স্ত্রীমূর্ত্তি দেওয়ালগিরি (Bracket) রূপে স্থাপিত। ইহা ব্যতীত (architrave) প্রাচীরশীর্ষগুলির মধ্যে নানাপ্রকার মনুষ্য, জন্তু ও পত্রপুষ্প-শোভিত প্রস্তরখণ্ড অতি সুন্দর ভাবে সংযুক্ত। তোরণের সর্ব্বোচ্চ architraveএর উপরে ধর্ম্মচক্র এবং ইহার দুই পার্শ্বে চামর হস্তে পার্শ্বচর দণ্ডায়মান ও ইহার বামপার্শ্বে

ত্রিরত্ন-চিহ্ন। তোরণে এবং স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব ও পরজন্মের ঘটনাবলী অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার দৃশ্য খোদিত আছে। তাহাদের মধ্যে দুইটি জাতক নিম্নে বর্ণিত হইল।

এই জাতকানুসারে, বুদ্ধদেব এক সময়ে ৮০০০ হস্তীর দলপতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, হিমালয়ের পাদমূলে ছদন্ত নামক হ্রদ-পার্শ্বে শাখাবহুল কোন এক বটবৃক্ষের তলদেশে বাস করিতেন। তাঁহার নাম তখন ছদন্ত ছিল। মহাসুভদ্রা এবং চুল্লসুভদ্রা নামে ইঁহার দুই স্ত্রী ছিল। ছদন্ত প্রথমা স্ত্রীকে অধিক ভালবাসিতেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী এই হেতু প্রথমা স্ত্রীর উপর ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল, যেন সে পরজন্মে কাশী-অধিপতির স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করে; উদ্দেশ্য এই যে, যেন সে স্বামীর উপর প্রতিশোধ লইতে সমর্থ হয়। উপযুক্ত সময়ে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হয়। চুল্লসুভদ্রা বারাণসীর রাণী হইয়া রাজ্যের সমস্ত শিকারীকে সমবেত করেন, এবং বারাণসীর কোন একজন ব্যাধকে ছদন্তের দন্ত আনিতে আদেশ করেন। পাঠক চিত্রে বটবৃক্ষের উভয় পার্শ্বে হস্তীযূথের মধ্যভাগে ছদন্তকে দুইবার দেখিতে পাইবেন। এই দুইবার প্রদর্শন করাইবার অর্থ, ব্যাধ যে স্থানে লুক্কায়িত আছে, ছদন্ত ক্রমে ক্রমে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই চিত্রের একপার্শ্বে ব্যাধ লুক্কায়িত থাকিয়া বিষাক্ত তীর নিক্ষেপের সুযোগ খুঁজিতেছে। ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, যখন ব্যাধ স্বীয় অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া রাণীর নিকট দন্ত লইয়া উপস্থিত হয়, তখন রাণী অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। এই ছদন্ত গল্পের দৃশ্যটি দক্ষিণ-তোরণের মধ্য architraveএর পশ্চাদ্ভাগ এবং পশ্চিম-তোরণের নিম্ন architraveএর সম্মুখভাগে খোদিত আছে। ইহার মধ্যে প্রথম খোদিত দৃশ্যের শিল্পী অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব একসময়ে বানরদিগের রাজা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং গঙ্গার সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতেন। সেখানে একটী বৃহৎ আম্রবৃক্ষ ছিল। ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া বানরগুলি জীবন-ধারণ করিত। কোন সময়ে বারাণসী-নৃপতি ব্রহ্মদত্ত মৃগয়া করিতে আসিয়া, সেই বৃক্ষটীর চতুর্দ্দিক স্বীয় সহচর দ্বারা বেষ্টন করাইয়া ফেলিলেন। কিন্তু বানরাধিপতি দেহের উপর এক সেতু নির্ম্মাণ করিলেন; তখন তাঁহার দলের অন্যান্য বানরগুলি এই সেতুর সাহায্যে নিরাপদে সেই স্থান হইতে পলাইতে সমর্থ হয়।

জাতক-বর্ণিত দৃশ্য ব্যতীত বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী অবলম্বনে অনেকগুলি দৃশ্য খোদিত আছে। তাহার মধ্য হইতে দুইটী দৃশ্যের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই দুইটী দৃশ্যই পূর্ব্বদিকের তোরণ হইতে লওয়া হইয়াছে। এখানে একটী কথা বলা উচিত যে, এই ছবিগুলিতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নাই। তাঁহার চিহ্ন স্বরূপ কোন স্থানে সিংহাসন, কোথাও বা আসন, পদচিহ্ন, ছত্র কিম্বা তাঁহার অশ্ব প্রদর্শিত আছে। ইহাই পুরাতন বৌদ্ধ শিল্পীর বিশেষত্ব।

বুদ্ধদেব কি প্রকারে অগ্নি-উপাসক কশ্যপ মুনিকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দৃশ্যের বর্ণিত স্থান উরুবিল্ব গ্রামের নিকট উনরঞ্জন নদীর তটদেশ। পাঠক দেখিতে পাইবেন, উনরঞ্জন নদীতে প্রবল বন্যা আসিয়াছে। বৃক্ষকাণ্ড জলে ডুবিয়া গিয়াছে, এবং বৃক্ষস্থ বানরগুলি ভয়ে বিশেষ আকুল হইয়াছে। বুদ্ধদেব জলে ডুবিয়া যাইবেন—এই আশঙ্কায়, কশ্যপ মুনি তাঁহার শিষ্য সমভিব্যাহারে একখানি নৌকা লইয়া সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছেন। ইতোমধ্যে বুদ্ধদেব তদীয় অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া শুষ্ক তটভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া কশ্যপ মুনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ ভক্তিভরে বুদ্ধদেবের পাদবন্দনা করিতেছেন। এই ছবিতে বুদ্ধদেবের পরিবর্ত্তে তাঁহার আসন প্রদর্শিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব গভীর রাত্রিতে স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, জগতের হিতার্থ তাঁহার জন্মস্থান কপিলাবস্তু নগর পরিত্যাগ করেন। ছবির বামপার্শ্বে নগর-প্রাচীর এবং পরিখা। তোরণ-দ্বারে বুদ্ধদেবের প্রিয় অশ্ব কন্থক। যাহাতে অশ্বের পদশব্দে কাহারও নিদ্রাভঙ্গ না হয় সেই হেতু, যক্ষগণ ও পৃথিবী-দেবী অশ্ব-খুর ধারণ করিয়া আছেন। দেবতাগণ ক্রমে অশ্বকে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। বুদ্ধদেবের

* ছদন্ত নামের দুইটি কারণ দু'রকমে বর্ণিত হইয়াছে; ১ম—তাঁহার দন্ত হইতে ছয় প্রকার রশ্মি নির্গত হইত; ২য়—তাঁহার ছয়টি দন্ত ছিল।—লেখক।

প্রির ভৃত্য ছন্দক রাজচিহ্নের নিদর্শন স্বরূপ ছত্র ধারণ করিয়া আছে। অশ্বটীকে এখানে চারিবার দেখাইবার উদ্দেশ্য যে, বুদ্ধদেব অগ্রসর হইতেছেন। সর্ব্বশেষে ছন্দক এবং তাহার সঙ্গিগণ অশ্ব লইয়া প্রত্যাগমন করিতেছে। ইহার পরে কেবলমাত্র বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার অর্থ, অশ্ব ছাড়িয়া বুদ্ধদেব পদব্রজে গমন করিতেছেন।

পরবর্ত্তী ছবির মধ্যভাগে বোধিবৃক্ষ, তাহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া অশোক-নির্ম্মিত প্রাচীর, এবং ইহার বামপার্শ্বে বাদক ও ভক্তবৃন্দের সমাবেশ প্রদর্শিত হইয়াছে। বৃক্ষের দক্ষিণ পার্শ্বে সম্রাট অশোক এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী তিষ্যরক্ষিতা হস্তী হইতে অবতরণ করিতেছেন, এবং তাঁহাদের বেষ্টন করিয়া রাজকীয় পার্শ্বচরগণ দণ্ডায়মান। এই আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য, বোধিবৃক্ষের পুনঃস্থাপন। কারণ, এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, তিষ্যরক্ষিতা অসূয়াপরবশ হইয়া বোধিবৃক্ষকে অভিসম্পাত করাতে বৃক্ষটী শুকাইয়া আছে;—এই দুঃখে সম্রাটও দিন-দিন শীর্ণ হ'ন। অবশেষে রাণী তাঁহার দোষ স্বীকার করায় উভয়েই বোধিবৃক্ষের নিকট পূজা প্রদানার্থ উপস্থিত হ'ন। এই ছবিতে অশোকের বোধিবৃক্ষ পূজা করণার্থ বোধগয়াতে আগমন দেখান হইয়াছে।

পাঠক এই কয়েকখানি চিত্র মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিলে, বৌদ্ধ শিল্পীদিগের কারুকার্য্যে মোহিত হইবেন। এই চিত্রগুলি যে অনেক বৎসরের পরিশ্রমের ফল, এবং বৌদ্ধ শিল্পের পরিণত অবস্থার নিদর্শন তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ইহাতে শিল্পী কি প্রকারে মূর্ত্তিগুলিতে স্বাধীন এবং সজীব ভাব ফুটাইয়া, উহাদের স্বাভাবিক অবস্থা দেখাইয়া, তাহার মধ্যে কেমন ভাবের গাম্ভীর্য্য এবং প্রত্যক্ষ জীবনের সুন্দর ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা প্রণিধান করিবার বিষয়। কিন্তু সাঁচির খোদিত দৃশ্যে বিদেশী প্রভাবও বিদ্যমান। অনেকের বিশ্বাস, উত্তর-তোরণে সাঙ্কেতিক চিহ্ন এবং নানাপ্রকার ফুলের মালা যে খোদিত আছে, তাহা এ্যাসিরিয়ান শিল্পকলার অনুকরণ। কাহার-কাহারও মতে পাখাযুক্ত সিংহমূর্ত্তি এবং অন্যান্য কাল্পনিক পশুমূর্ত্তির কল্পনাতে পশ্চিম এসিয়ার প্রভাব জাজ্বল্যমান। অনেকে দ্রাক্ষাগুচ্ছে বিদেশীয় প্রভাবের অস্তিত্ব অনুমান করেন। কিন্তু এইরূপ

তৃতীয় স্তূপ

অনুকরণও দূষণীয় নহে। কারণ এইগুলিকে সাঁচির শিল্পীরা জাতীয় শিল্পকলার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। ইহাতে জাতীয় শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে ও সুন্দর হইয়াছে। কারণ, এই সময়ে শিল্পকলায় জাতীয় ভাবের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক অনুকরণ নাই। ইহা বৌদ্ধদিগের হৃদয়ের কথা; এবং দৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাস সরল এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রস্ফুট হইয়াছে। এই গুণেই সাঁচির শিল্পকলার মূল্য এত অধিক।

(৪)

অনেকের বিশ্বাস, যখন অশোক দক্ষিণ-তোরণের সম্মুখে তাঁহার চতুঃসিংহ-শোভিত ধর্ম্মস্তম্ভ স্থাপিত করেন, সেই সময়ে বড় স্তূপ এবং তাহার বৃহৎ প্রস্তর-বেষ্টনী নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ অনুমান সত্য নহে। যখন অশোক ধর্ম্মস্তম্ভ স্থাপন করেন, তখন একটি ছোট ইষ্টক-নির্ম্মিত স্তূপ বর্ত্তমান ছিল, এবং ইহার চূড়ায় মসৃণ প্রস্তরের ছত্র ছিল। এই ছত্রের খণ্ড অংশ পাওয়া গিয়াছে। অশোকের কিছু পরে এই ইষ্টক-নির্ম্মিত স্তূপকে প্রস্তরাবরণে বেষ্টিত করা হয়, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রস্তরের বৃদ্ধাসন নির্ম্মিত হয়। তাহার উপরে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া খুব উচ্চ প্রস্তর-বেষ্টনী স্থাপিত হয়। এই প্রস্তর-বেষ্টনীর গাত্রে বৌদ্ধ ভক্তদিগের দানলিপি খোদিত আছে। প্রস্তর-বেষ্টনী নির্ম্মিত হইবার কিছুকাল পরে চারিদিকের তোরণগুলি নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যে দক্ষিণ-তোরণটী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন; তৎপরে ক্রমে উত্তর, পূর্ব্ব এবং পরিশেষে পশ্চিম-তোরণগুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে সাঁচির অশোকস্তম্ভ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও, তাহার যে অংশে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উক্ত স্তম্ভের এই একটী বিশেষত্ব যে, উহার উপরিভাগ মুকুরের ন্যায় মসৃণ। এই প্রকার পাথরের উপরে পালিস আর কোন সময়ে পাওয়া যায় না। ঐ স্তম্ভোপরি যে খোদিত শিলালিপি আছে, তাহার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল। "যে সকল ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী মঠের নিয়ম পালন না করিবে, তাহাদিগকে শুভ্রবসন পরিধান করিয়া অন্য স্থানে বাস করিতে হইবে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, যতদিন অশোকের পুত্র-প্রপৌত্র রাজত্ব করিবেন, ততদিন এই আদেশ কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।"

(৫)

প্রথম স্তূপের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে প্রায় ৫০ গজ দূরে আর একটী স্তূপ আছে। ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী বড় স্তূপের ন্যায়, কিন্তু ইহা আকারে ছোট। ইহার মধ্যে জেনারাল কানিংহাম সারিপুত্র এবং মহামগোলন নামক বুদ্ধদেবের দুই প্রধান শিষ্যের দেহাবশেষ, এবং তৎসঙ্গে (pearl) মুক্তা, (garnet) রক্তবর্ণ মণি, (lapislazuli) নীলকান্ত মণি, (crystal) স্ফটিক এবং (annethyst) ধূমল মণির গুটি (beads) দুইটী প্রস্তর-পেটিকামধ্যে প্রাপ্ত হন। এই স্তূপের ভূমিস্থিত প্রস্তর-বেষ্টনী অদৃশ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধানাধ্যক্ষ এই স্তূপটীর সংস্কার করিয়াছেন। এই স্তূপের উত্তর দিকে একটী তোরণ এখনও পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান আছে। এই সকল স্তূপ-গাত্রে চূণ এবং বালি দ্বারা পঙ্খের কাজ করা হইত।

এই দুইটী স্তূপ ভিন্ন আর একটী স্তূপ উল্লেখযোগ্য। এই স্তূপটী পাহাড়ের পশ্চিম-গাত্রে প্রায় অর্দ্ধপথে অবস্থিত। ১নং স্তূপের ন্যায় প্রস্তরের বেড়া ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, কিন্তু কোন তোরণ নাই। এই প্রস্তর-বেড়ার কারুকার্য্যের একটী বিশেষত্ব এই যে, শিল্পী ফল, ফুল ইত্যাদিতে যেরূপ শিল্পচাতুর্য্য দেখাইয়াছেন, সেরূপ মনুষ্যমূর্ত্তি চিত্রণে দেখান নাই। ইহার কারণ কি তাহা বলা কঠিন। কোন-কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে, যখন গ্রীসীয় প্রভাব ভারতবর্ষের উপর সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হয়, তখন ভারতবর্ষীয় ভাস্করগণ মনুষ্যমূর্ত্তি গঠনে পারদর্শিতা লাভ করেন।

(৬)

চৈত্যমন্দির

সাঁচির শিল্প ও ভাস্কর্য্য যে বিশেষ মনোমুগ্ধকর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহার সহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের বাসস্থান এবং তাহাদের উপাসনা-মন্দিরাদি থাকাতে, এই স্থানটী আরও অধিক রমনীয় ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। এখানে আমরা বৌদ্ধ-যুগের একটী সজীব প্রাত্যহিক জীবনের যথার্থ চিত্র দেখিতে পাই। প্রথম স্তূপের তোরণ-সম্মুখে যে চৈত্যমন্দির বর্ত্তমান আছে, সেটী অতি সুন্দর। দাক্ষিণাত্যে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত অনেকগুলি চৈত্যমন্দির পাওয়া যাইলেও, তাহাদিগের বাহ্যিক আকার যে কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় ইতঃপূর্ব্বে ছিল

না; কিন্তু সাঁচির চৈত্যমন্দির দেখিলে, আমরা তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কল্পনা করিতে পারি। চৈত্যমন্দিরগুলি সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; সম্মুখভাগে প্রায় একটী প্রস্তর-কক্ষ এবং তাহার দুইপার্শ্বে নাতিপ্রশস্ত পথ। পশ্চিমভাগে প্রায় একটী স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়; এবং পূর্ব্ববর্ণিত পথটী এই স্তূপটীকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া বিদ্যমান। অনেকের অনুমান, বর্ত্তমান খৃষ্টানদিগের গির্জ্জা, এই চৈত্য-মন্দিরের অনুকরণে নির্ম্মিত। সাঁচি মন্দিরে কেবল চতুষ্কোণ স্তম্ভগুলি বর্ত্তমান আছে। এই স্তম্ভগুলি দেখিতে

চৈত্য-মন্দির

অতি সুন্দর। এই চৈত্যমন্দিরের নিম্নে আরও কয়েকটী পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল বলিয়া, তাহা কালক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই চৈত্যমন্দিরের সম্মুখের কপাটে যে খোদিত প্রস্তর (Jamb) পাওয়া যায়, তাহা মধ্যযুগে নির্ম্মিত। ইহা ছাড়া আর একটী চৈত্যমন্দির সাঁচিতে পাওয়া গিয়াছে। উহা পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের দক্ষিণ কোণে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই চৈত্যমন্দিরটীর অতি সামান্য অংশই বিরাজমান। অতএব ইহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

(৭)

বৌদ্ধমঠ ও মন্দির

সাঁচিতে পাঁচটী বৌদ্ধ মঠের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই মঠগুলি প্রথম স্তূপের পূর্ব্বদিকে উচ্চ স্থানে স্থাপিত। পূর্ব্বকার মঠগুলি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত থাকাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল একটী মঠ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। উহা মধ্য-যুগে নির্ম্মিত। এই মঠগুলির মধ্যে একটী বৃহৎ অঙ্গন দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চারিদিকে দ্বিতল, ত্রিতল কক্ষশ্রেণী বিদ্যমান ছিল। এই মঠগুলি বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের বাসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সাঁচিতে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন মন্দির গুপ্ত-সম্রাটদিগের রাজত্ব কালে নির্ম্মিত। যদিও গুপ্ত-মন্দিরটী দেখিতে ছোট, তথাপি তাহার কারুকার্য্য বড়ই সুন্দর। এই সময়ে সাহিত্য-জগতে অমর কবি [illegible] কবিতায় যেরূপ এক নবভাবের আভাষ পাওয়া যায়, সেইরূপ শিল্পে, ভাস্কর্য্যে এবং স্থাপত্যেও এক নূতন মনোমুগ্ধকর ভাব-রাজ্যের বিকাশ প্রতীয়মান হয়। গুপ্ত-মন্দিরগুলির কয়েকটী বিশেষত্ব

রোহিণী ও রূপো

[কৃষ্ণকান্তের উইল, ১ম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা

আছে। গুপ্ত-মন্দিরের দেওয়ালের গাত্রে কোন শিল্প-আভরণ থাকিত না; কিন্তু প্রবেশ-দ্বারের চৌকাঠের চারি-দিকে সুন্দর লতাপাতার 'পাড়' থাকিত। ঠিক দরজার মাথার মধ্যভাগে বীণাবাদনরত কিন্নর-কিন্নরী দেখিতে পাওয়া যায়; এবং চৌকাটের উপরকার দুই কোণে মকরবাহিনী গঙ্গা-মূর্ত্তি এবং কচ্ছপবাহিনী যমুনা-মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। মন্দিরের সম্মুখে সুন্দর স্তম্ভ-শোভিত দালান অথবা নাটমন্দির আছে। এই স্তম্ভের মাথার উপর সুন্দর-সুন্দর মানুষ ও সিংহ-মূর্ত্তি পত্রপুষ্পে ভূষিত হইয়া মন্দিরের শোভা বর্দ্ধন করিত। পূর্ব্ববর্ণিত মঠের ঠিক পূর্ব্বভাগে মধ্যযুগে নির্ম্মিত একটী মন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরের উপকরণ অন্য এক মন্দির হইতে লওয়া হইয়াছে, এইরূপ বোধ হয়; এবং ইহার নিম্নে আর একটি মন্দিরের ভিত্তির অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরটীদেখিলে হঠাৎ হিন্দু-মন্দির বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু ইহা বাস্তবিক বৌদ্ধ-মন্দির; কারণ ইহার ভিতরে এখন পর্য্যন্ত গুপ্ত সময়ের প্রকাণ্ড ধ্যানী বৌদ্ধমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, এবং মন্দির-গাত্রের কুলুঙ্গিতে (niches) বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই মন্দিরের অলঙ্কারে হিন্দু-মন্দিরের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। সম্ভবতঃ এই সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভেদ অতি অল্পই ছিল। উভয় ধর্ম্মে মূর্ত্তি-পূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং উভয় ধর্ম্মে তান্ত্রিক দেব-দেবীর অস্তিত্বও অনুভূত হয়। এই মন্দির-গাত্রে খোদিত প্রেমিক-প্রেমিকার লালসাবর্দ্ধক দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ তান্ত্রিক প্রভাবযুক্ত।

উপসংহারে উপরিউক্ত স্তূপ, মঠ ও মন্দিরাদির বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় কিছু বলা কঠিন। প্রায় ৫ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানটী গহন অরণ্যে আবৃত ছিল। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্বের অধ্যক্ষের চেষ্টায় এই নিবিড় বৃক্ষলতাচ্ছন্ন স্থানটীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে Captain Taylor (?) সর্ব্বপ্রথম এই স্থানটীর উল্লেখ করেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ Asiatic Societyর Journalএ প্রকাশিত হয়। ভূপাল রাজ্যের Political Agent মেডক্ সাহেব কিম্বা তাঁহার সহকারী Captain Johnston রাজ-দরবারের অনুমতি লইয়া গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায় স্তূপগুলি খনন করেন। এই খনন-কার্য্যে স্তূপগুলির বিশেষ ক্ষতি হয়, এবং ১নং স্তূপের উত্তর ও দক্ষিণ তোরণদ্বয় ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার পর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে General Cunningham এবং Captain Maisey দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তূপ দুইটী খনন করেন, এবং তৃতীয় স্তূপের মধ্য হইতে পূর্ব্ব-বর্ণিত সারিপুত্র ও মহা মগলনের দেহাবশেষ (relics) প্রাপ্ত হন। ইহার আরও ৩০ বৎসর পরে এই অমূল্য বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্মৃতি-চিহ্নগুলির সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। Colonel Cole ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ ও পশ্চিম তোরণ দুইটী পুনঃসংস্থাপন করেন, এবং ১ম ও ২য় স্তূপ দুইটীর সংস্কার করেন। প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল, Sir John Marshall, Director-General of Archaeology in India, ৩য় স্তূপের অমূল্য সংস্কার সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক প্রকারে এই অতুলনীয় বৌদ্ধ-স্মৃতি-চিহ্নের উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করিতেছেন, এবং বিক্ষিপ্ত মূর্ত্তি ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটী সুন্দর Museum (যাদুঘর) পর্ব্বতোপরি নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাঁহার এই চেষ্টা ও যত্নের জন্য ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

রোগী ও চিকিৎসক

[শ্রীমনোজমোহন বসু বি-এল]

ডাক্তারের বাড়ী। বাহিরে প্রস্তর-ফলকে লেখা—ডাক্তার ডি, মল্লিক M. B., L. R. C. P.; স্নায়ুরোগে বিশেষ পারদর্শী (Specialist in Nervous Disorders)!

সময় সকাল ৮॥। নিম্নতলায় রোগীর দল বসিয়া আছে। দ্বিতলে ডাক্তার মহাশয়ের রোগী দেখিবার ঘর (Consultation Room)।

রোগী দেখিবার ঘরের মধ্যভাগে একজন সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ় ব্যক্তি পার্শ্বস্থ একটি টেবিলে ভর দিয়া দণ্ডায়মান। পরিধানে পার্শীকোট, পেণ্টুলেন; মাথায় ক্যাপ।

শশব্যস্তে দরজা ঠেলিয়া ব্যস্তবাগীশ বাবুর ভিতরে প্রবেশ।

"এই যে ডাক্তার বাবু, নমস্কার। বহুদূর থেকে মহাশয়ের নাম শুনে একবার আপনাকে দেখাতে এলাম। আজ এই সাত বৎসর মহাশয়, বলব কি, স্নায়ুরোগে ভুগছি—"

"আপনি একটু ভুল—"

"আজ্ঞে সে কথা আমি একশ' বার স্বীকার করছি। ভুল কেন বলছেন, বিশেষ অন্যায় করেছি। আমি আপনার নিয়ম নীচে থেকেই শুনেছি—এক-একজন রোগীকে, আগে খবর দিয়ে, তবে আপনার উপরের ঘরে এক-এক করে আস্তে হয়। কিন্তু কি করব মশায়, আমার ভয়া—নক তাড়াতাড়ি। ন'টা দশ মিনিটের ট্রেণে আমাকে দেশে যেতেই হবে। রাস্তায় taxi দাঁড় করিয়ে আপনার সঙ্গে একবার একটু পরামর্শ করবার জন্য এসেছি। ভারি তাড়াতাড়ি,—এক মিনিট দাঁড়াবার অবসর নাই। তাই আপনার নিয়মটা ভঙ্গ করে একেবারে ঘরে ঢুকে পড়েছি। অবশ্য আমি খুবই বুঝি যে, সব কাজেই মানুষের একটা নিয়ম থাকা চাই; তা' না হলে, সুশৃঙ্খলে সংসার চল্‌তেই পারে না। আমারও মশায়, ছেলেবেলা থেকে সব কাজেরই একটা ধরা-বাঁধা নিয়ম আছে। তার একচুল এদিক-ওদিক হবার যো নেই। যা' হোক, এখন ভারি তাড়াতাড়ি, না হলে আমার কাজকর্ম্মের ধরণ-ধারণগুলো আপনাকে বুঝিয়ে দিতুম। ইংরেজেরা বলে যে, বাঙ্গালীদের নৈতিক বলের ভারি অভাব; তাই তারা কোন বিষয়ে নিয়মের মর্য্যাদা রেখে চল্‌তে জানে না। কথাটা কতকটা ঠিক বটে। আমায় কিন্তু মশায়, সে' কথাটী বলবার জো নাই। একবার এক সাহেবের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে ভারি তর্ক হয়েছিল। আচ্ছা যাক, সে অনেক কথা। এখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। দু'-কথায় আমার অসুখটা আপনাকে বুঝিয়ে দিই—"

"দয়া করে আমার কথাটা শুনবেন?"

"সে কি কথা? আপনার কথা শুনব না কি রকম? আপনি হাসালেন দেখ্‌ছি। আপনার কথা শোনবার জন্যেই ত এখানে এলাম। তবে মশায়, (যোড় হস্তে) আমার কথাটা আগে দয়া করে শুনুন। না হলে রোগটা ধরবেন কি করে? এই দু'কথায় আমি আমার অবস্থাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। আর তাড়াতাড়িতে বেশী কথা বলবার সময়ও নেই। আমার রোগটা বড়ই peculiar রকম। আশ্চর্য্য এই যে, লক্ষণগুলা (Symptoms) রোজ বদলায়, আজ একরকম, কাল একরকম। কখনও মন খাঁ-খাঁ করে। প্রাণের ভিতর দিয়ে কেমন একটা দীর্ঘনিশ্বাস বয়ে যায়। কখনও মাথা চিন্-চিন্ করে, কখনও ঘাড় টন্‌টন্। কোন দিন হয় ত বেশ ক্ষুধা আছে, আবার কোন দিন আধসের মাংস মুখে দিতে না দিতেই পেট ভরে এল। স্নায়ুমণ্ডলীটা (Nervous System) একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। আমার কবিতা লেখাটা বরাবরই একটু আসে—এক রকম ভালই আসে। বোধ হয় "যোড়াসাঁকো দর্পণে' আমার পদ্য দু'একটা পড়েও থাকবেন। "দুগ্ধবতী গাভী" "বাবলা গাছে বুলবুলি," "প্রেমের ঢেউ"—মনে পড়'ছে না? তা' আপনাদের ব্যবসায়ে, কাজের ভিড়ে সাহিত্য-চর্চ্চার অবসরই পান না বোধ হয়। আচ্ছা যাক্, আমার ট্রেণের সময় হয়ে এল, বেশী কথা বলবার অবসর নাই। আমার রোগের

কথাটা দয়া করে একটু মন দিয়ে শুনুন। বলছিলেম কি, আজকাল কবিতা-টবিতা লিখতে গেলে, মাথার ভিতর ভাবগুলো কেমন ওলট-পালট খেয়ে যায়। আমার ডাক্তার পান্নালাল বলে, এ সবই স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যের ফল। এই জন্যই মহাশয়ের কাছে একবার দেখাতে আসা।"

"আপনার যে ম'শায় গোড়াতেই গলদ!"

"আহা-হা, ঠিক ধরেছেন। ওঃ, তাইতেই আপনার এত নাম, এত যশ। আমার পান্নালাল ডাক্তারও তিন বৎসর ধরে ঠিক এই কথাটিই বলে আসছে যে, গোবর্দ্ধন বাবু, আপনার গোড়াতেই গলদ। আসল কথা, যকৃতের কাজটা (Liver action) ভাল করে হয় না, তাইতেই যা' কিছু গোল। আহা-হা, আপনি দু'কথা শুনেই ঠিক ধরেছেন। যাক্, তা হলে আর বেশী কথা কয়ে আপনাকে বোঝাতে হবে না। আমি মশায়, বেশী কথা কওয়ার উপর ভারি চটা।"

"তা ত দেখাই যাচ্ছে।"

"আজ্ঞে হাঁ। তাই যাকে বেশী কথা বলে বোঝাতে হয়, তাকে আমি মোটেই পছন্দ করি না। মানুষের ক্ষুদ্র জীবন যদি কথা কইতেই কেটে গেল, তবে কাজ করবেন কখন? যা'হোক, এখন আর একটা কথামাত্র আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। কারণ আমার ট্রেণের দেরী হয়ে এল, আর মোটেই সময় নাই। আবার এই ট্রেণে দেশে যেতে না পারলে বড়ই অসুবিধা হবে। আমাদের দেশ হচ্ছে বালিডাঙ্গা। বালিডাঙ্গা জানেন বোধ হয়?"

"বালিচক একটা জায়গার নাম শুনেছি বটে।"

"ওঃ, তা হলে ত আপনি অনেকটাই জানেন। তবে বালিচক জায়গাটা মেদিনীপুর জেলায়,—বি,এন, আর, দিয়ে যেতে হয়। আমাদের বালিডাঙ্গা যেতে হলে ই, বি, আর, দিয়ে, ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী ষ্টেশনে নেমে, সেখান থেকে গরুর গাড়ীতে সাত ক্রোশ। এই অধীনই সেখানকার পাঁচআনী তরফের জমিদার। এখনকার কথা আর কি বলব? তবে যদি কখনও ওদিকে যান, ত, শুনতে পাবেন যে, একদিন এ গরিবদের দরজাতেও হাতী বাঁধা থাকৃত। সেকালে কমিশনার সাহেব শিকার করতে গেলে, আমার পিতামহের হাতীটিকে না পেলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হতেন না। আমরাও ছেলেবেলায় সে হাতীটা দেখিছি। সে ম'শায়, এক ঐরাবত; নাম ছিল 'রংবাহাদুর'। প্রকাণ্ড দুই রূপা-বাঁধান দাঁত; আর, শুঁড়েরই বা বাহার কি! সেই হাতীটি মারা যেতেই ত আমাদের লোকসান সুরু হল! যাক্ সে সব কথা—এখন ভারি তাড়াতাড়ির সময়। (ঘড়ি দেখিয়া) ওঃ, আমার ট্রেণের সময় যে হয়ে এল। আর দাঁড়াতে পারি না। যাক্, আমার ব্যবস্থার কথাটা এইবার বলুন। রোগনির্ণয় (Diagnose) ত ঠিকই করেছেন; এইবার শুধু একটা কথার জবাব দিন। আমার পান্নালাল ডাক্তার বলে যে, কোন ঔষধ না খেয়ে, আমার শুধু পথ্যের উপর নির্ভর করা উচিত। সে বলে, সকালে মাছের ঝোল ভাত, বিকালে আটার রুটি আর কচি মাংস, রাত্রে শুধু ফল-মূল, দুধ। শুদ্ধ এই খেয়ে থাকলে, আর সকাল-সকাল ঘুমলেই আমার সব অসুখ দু'দিনে সেরে যাবে। তা আপনারও কি এই মত, না কোন আপত্তি আছে?"

"আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই মশায়, তবে"—

"বাস্, বাস্,—শুদ্ধ ওই কথাটাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম। একজন বড় ডাক্তারের মত না পেলে মনটা সন্তুষ্ট হয় না। একমাস কি রকম থাকি দেখে, আবার দেখা করব। উঃ, ট্রেণের সময় যে হয়ে এল! চল্লেম ম'শায়, নমস্কার। আপনার ফী-টা"—

(ষোলটি টাকা টেবিলের উপর রাখিয়া ব্যস্তবাগীশ বাবুর শশব্যস্তে প্রস্থান)

"ও ম'শায়, ও ম'শায়, এ কচ্ছেন কি?"

(নেপথ্য হইতে) "আজ আর নয় ম'শায়, এক সেকেণ্ডও দাঁড়াবার সময় নেই। নমস্কার, নমস্কার।"

সৌম্যমূর্ত্তি ভদ্রলোক। "তা হলে কাজেই নমস্কার। সকালবেলা ডাক্তার বাবুর গ্যাস মেরামত করতে এসে লভ্যাটা হ'ল মন্দ নয়। যাহোক বাবা, বরাতে থাকলে প্রাত্যহিক কাজেও মজা পাওয়া যায়।"

কল্পতরু

ফিজি-কাহিনী

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

সাধারণ কথা

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ আজকাল সমস্ত ভারতবর্ষে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইংলণ্ডে, মহা আন্দোলনের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তোতারাম সনাঢ্য এই আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি ২১ বৎসর ফিজি দ্বীপে বাস করিয়া, এই দ্বীপ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার সেই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার লেখনী "ফিজি দ্বীপে ২১ বৎসর" শীর্ষক একখানি হিন্দী-ভাষায় রচিত পুস্তক প্রসব করিয়াছে। ফিজি দ্বীপ-ঘটিত বর্ত্তমান আন্দোলন রাজনীতিক ব্যাপার—আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। তবে যে ফিজি দ্বীপ লইয়া এত আন্দোলন, সেই দ্বীপের বিবরণ জানিতে অনেক পাঠক-পাঠিকার মনে কৌতূহল জন্মিতে পারে। আমরা পণ্ডিত তোতারাম প্রণীত "ফিজি দ্বীপে ২১ বৎসর" গ্রন্থ অবলম্বনে এবং অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলন পূর্ব্বক পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল কিছু পরিমাণে চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

দ্বীপপুঞ্জের বিবরণ

ফিজি দ্বীপের অপর নাম ভিটি। ইহা ইংরেজের একটা সামুদ্রিক উপনিবেশ,—প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে পোলিনেসিয়া দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপগুলি ১৫ হইতে ২২ দক্ষিণ অক্ষাংশ এবং ১৩৫ হইতে ১৮০ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। ফিজি দ্বীপপুঞ্জে সর্ব্বসমেত ২৫৫টী দ্বীপ আছে; তন্মধ্যে ৮০টীতে মনুষ্য বাস করে। ফিজি দ্বীপমালার ক্ষেত্রফল ৭৪৩৫ বর্গ মাইল। ১৯১১ অব্দের আদমসুমারির হিসাবে এখানকার লোকসংখ্যা ১৩৯৫৪১। এই দ্বীপগুলির মধ্যে দুইটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; অপর সকলগুলি ক্ষুদ্র। বৃহত্তম দ্বীপটির নাম ভিটি লেভু; ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৯৮ মাইল এবং প্রস্থে ৬৭ মাইল; ক্ষেত্রফল ৪১১২ বর্গ মাইল। ইহার ৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ভানুয়া লেভু; দৈর্ঘ্যে ১১৭ মাইল এবং প্রস্থে ৩০ মাইল; ক্ষেত্রফল ২৪৩২ বর্গ মাইল। কান্দাভু বা কাদাভু এবং টভিউনি নামে দুইটী নাতি-বৃহৎ দ্বীপও আছে।

গঠন

ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতে, এই দ্বীপমালার অন্তর্গত কতকগুলি দ্বীপ সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয়-গিরির অগ্নিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন; আর কতকগুলি প্রবাল-রচিত। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর। কোন-কোন স্থানের ভূমি উর্ব্বরা,—প্রচুর সতেজ শস্য ও বৃক্ষলতায় শোভিত; আবার স্থানে-স্থানে অসমতল, বন্ধুর, প্রস্তর-কঙ্করময় অনুর্ব্বর ভূমি। এখানকার পাহাড়গুলি ৩০০০ হইতে ৪০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। বড়-বড় দ্বীপগুলিতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুসংখ্যক নদী আছে। সেই সকল নদীতে জাহাজ এবং বড় নৌকা চলিতে পারে।

সর্ব্বপ্রধান দ্বীপ ভিটি লেভুর ভূমি অতি উর্ব্বরা। ইহার ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের ভূমি বিভিন্ন প্রকারের। সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ লোক এই দ্বীপটির অধিবাসী। ভিটি দ্বীপের প্রধান নগর সুভা একটা অতি সুন্দর স্রোতাশ্রয়। চুপড়ি আলু, শাঁক আলু ও কমলালেবু এখানকার স্বাভাবিক উৎপন্ন ফলমূল। তা' ছাড়া, এখানে প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ সমুদ্রতীরে জন্মিয়া থাকে। কিছুকাল হইতে এই সকল দ্বীপে কলা ও ইক্ষুর চাষ হইতেছে। ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য এখানে অনেকগুলি বড়-বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কলা ও চিনি বহু পরিমাণে অষ্ট্রেলিয়ায় রপ্তানী হইয়া থাকে।

ইতিহাস

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপগুলির অস্তিত্ব য়ুরোপবাসীর গোচর হয়, এবেল টাসমান নামক একজন সমুদ্র-ভ্রমণকারী ইহার উত্তর-পূর্ব্ব দিকের কতকগুলি দ্বীপ দেখিতে পান। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কুক নামক প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী নাবিক ফিজি দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তস্থিত টার্টল দ্বীপটির আবিষ্কার করেন। লেপ্টেনাণ্ট ব্লিঘ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে "বাউন্টি" নামক তরী-সংযুক্ত একখানি লাঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক এই দ্বীপপুঞ্জের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বীপবাসীরা তাঁহাকে শত্রুভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ডিউমণ্ট ডি'আর ভিলি আষ্ট্রোলেব নামক জাহাজে আসিয়া এই দ্বীপগুলি পর্য্যবেক্ষণ করেন। পরে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্য সরকারী ভাবে রীতিমত অভিযান পাঠাইয়া দ্বীপগুলির সম্পূর্ণ পর্য্যবেক্ষণ করাইয়াছিলেন। এ যাবৎ এই দ্বীপে দুই-চারিজনের অধিক য়ুরোপীয়ান পদার্পণ করেন নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ওয়েসলিয়ান মিশনারীরা টঙ্গা দ্বীপ হইতে আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ফিজি দ্বীপে তখন অনেক টঙ্গান আসিয়া বসবাস করিতেছিল। মিশনারীগণের যত্নে টঙ্গান ও ফিজিয়ানদিগের মধ্যে অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম আলিঙ্গন করে। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি অষ্ট্রেলিয়ান কয়েদী জেল ভাঙ্গিয়া এবং কতক নাবিক দল ছাড়িয়া

সর্দ্দারকে দমন করে। কিন্তু মিত্র অবশেষে শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, কিং জক্ত বন্ধুকে সাহায্য করার মূল্য স্বরূপ ১২০০০ পাউণ্ড দাবী করিয়া বসিল। এইরূপে নানাদিকে উত্যক্ত হইয়া থাকোম্বাউ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে রাজ্য ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করে। তদনুসারে কর্ণেল স্মাইথ এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য ফিজি দ্বীপে থাকোম্বাউর রাজ্যে প্রেরিত হন। কিন্তু তিনি রাজ্য গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করেন নাই।

ইতোমধ্যে ডাক্তার সীমান এই দ্বীপের সম্বন্ধে কিছু অনুকূল বিবরণ প্রকাশ করেন। তাহা পাঠ করিয়া অনেক লোক অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীলণ্ড হইতে আসিয়া ফিজি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাজা থাকোম্বাউর অধীনতায় কয়েকজন ইংরেজ একটী Constitutional Government স্থাপন করেন।

কলা বাগান

কিন্তু তাহা তিন বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অবশেষে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের হস্তে এই রাজ্য শাসনের ভার অর্পিত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রোটুমা দ্বীপ ফিজি রাজ্যের সহিত সম্মিলিত হয়। সর্ব্ব প্রথমে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ হইতে এখানে কুলীর আমদানি হয়। ১৯০০ অব্দে নিউজীলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ফিজি দ্বীপের শাসন ভার গ্রহণের প্রস্তাব করেন; কিন্তু ফিজির অধিবাসীদিগের আপত্তি থাকায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

জলবায়ু

এই দ্বীপগুলির অবস্থান এরূপ যে, ইহারা দাক্ষিণপূর্ব্ব বাণিজ্য বায়ুর গমন-পথের বহির্ভাগে পড়িয়া গিয়াছে, অথচ ইহারা উত্তর-পশ্চিম মৌসুম বায়ুর যাতায়াতের পথেও পড়ে না। এপ্রেল হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত এখান দিয়া নিয়মিত ভাবে শুষ্ক অথচ শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। বৎসরের অবশিষ্ট কয় মাস বায়ু প্রবাহ নিয়মিত থাকে না। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে প্রচণ্ড বেগে ঝড় বহিয়া থাকে। তাহাতে শস্যহানি ঘটিয়া সময়ে সময়ে দেশে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। ফিজির রাজধানী সুবা নগরে বৎসরে ১১০ ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়। মোটের উপর ফিজির আবহাওয়া মন্দ নহে। জ্বর রোগ এদেশে অজ্ঞাত। আমাশয় ছাড়া অন্য কোন রোগও এখানে দেখা যায় না। আমাশয় রোগও এ দেশে য়ুরোপীয়ানদের পদার্পণের পূর্ব্বে ছিল না বলিয়াই জানা যায়। তবে ফিজির একটা অসুবিধা এই যে, এখানে মশা ও মাছির উপদ্রব অত্যন্ত অধিক।
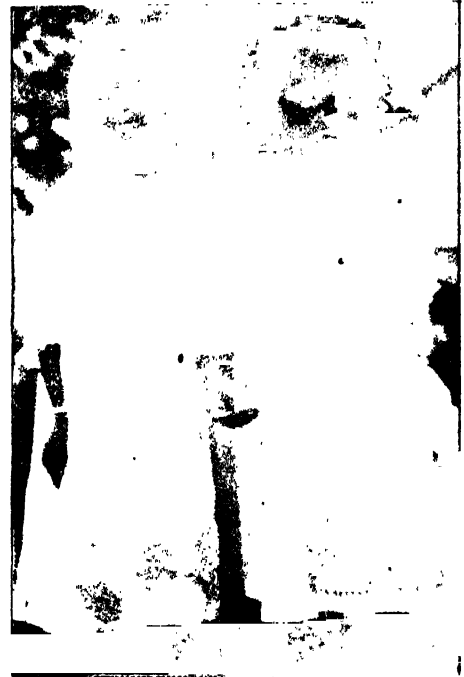
ফিজি দ্বীপের মিশনের আশ্রিতা অনাথা বালিকাদ্বয়

জীবজন্তু

ফিজি দ্বীপে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু নাই। কুকুর ও শূকর আছে বটে, তবে তাহারা ওখানকার আদিম অধিবাসী নহে; য়ুরোপীয়ানদিগের দ্বারা তথায় নীত হইয়াছে। গৃহপালিত কুক্কুটও তথায় উপনিবিষ্ট হইয়াছে। ফিজির আদিম নিবাসী জীবজন্তুর মধ্যে ইন্দুর ও বাদুড় উল্লেখযোগ্য। চাষের জন্য তথায় মৌমাছি লইয়া যাওয়া হইয়াছে। দুই-চারি রকমের শিকারী পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। তোতা পাখী এবং পারাবত যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে। খাদ্যোপযোগী বিবিধ জাতীয় মৎস্য এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এখানকার উদ্ভিদ প্রধানতঃ ইণ্ডো-মালয় দেশসুলভ—গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য

এখানকার জমিতে কলা ও ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ঝড়ে

নারিকেল বাগান

কুলী লাইনের বাজারের একটী কোণ

কুলী লাইনের বাজার

ফিজি দ্বীপের মিশনাশ্রিত ভারতবাসী অনাথ বালকদ্বয়

সুভা বন্দরে জাহাজে কলা বোঝাই হইতেছে, অন্যত্র চালান যাইবে

কোরাণ পাঠ-নিরত ভারতীয় মুসলমান ফকীর
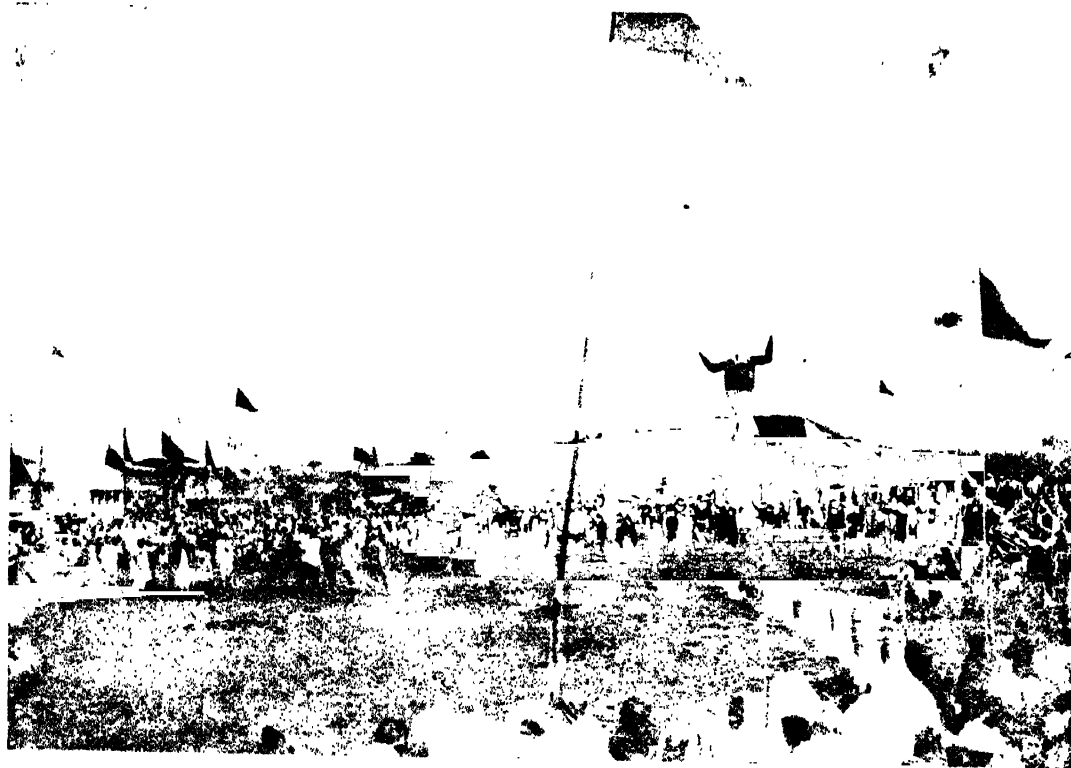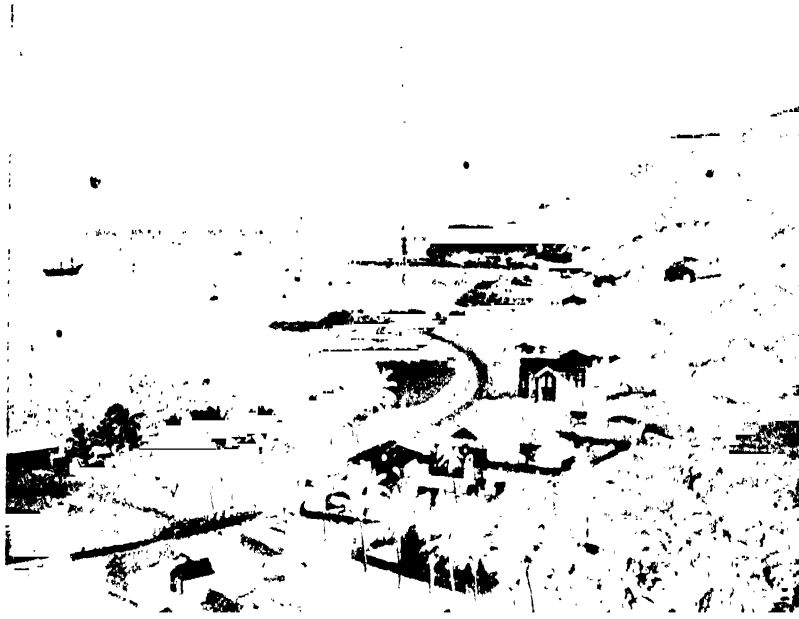
ফিজিদ্বীপের রামলীলা উৎসব

ফিজির পুরাতন রাজধানী লেভুকা নগর

ফিজি দ্বীপের রামলীলা উৎসব—রাবণ-বধ

এই উভয় বৃক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি হয় বটে, তথাপি, যাহা রক্ষা পায়, তাহাতেই প্রচুর লাভ হইয়া থাকে। কলা, আনারস ও ইক্ষুজাত চিনি বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। স্বভাবজাত নারিকেল হইতে তৈল নিষ্কাশন করিয়া তাহা হইতে সাবান প্রস্তুত করা হয়। চীনদেশ হইতে ক্ষুদ্র জাতীয় একপ্রকার কলাগাছ এখানে আনিয়া চাষ করা হইতেছে; ঝড়ে তাহার বেশী অনিষ্ট হয় না। কার্পাস, কাফি, চা, মক্কা, তামাক, ধান্য প্রভৃতিও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লোক-সংখ্যা

ফিজিতে এখন নানা জাতীয় লোক বাস করিতেছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ফিজির লোক সংখ্যা ১৯১১ অব্দের গণনানুসারে

মোট ১৩৯০৪১। উক্ত আদমসুমারির রিপোর্টে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের পরিমাণ এইরূপ :—

জাতির নাম	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
শ্বেতকায়	২৪০৩	১৩০৪	৩৭০৭
বর্ণসঙ্কর শ্বেতাঙ্গ	১২১৭	১১৮৪	২৪০১
ভারতবাসী	২৬০৭৩	১৪২১৩	৪০২৮৬
পোলনেসিয়ান	২৪২৯	৩২৯	২৭৫৮
চীনা	২৭৬	২৯	৩০৫
ফিজিয়ান	৪৬১১০	৪০৯৮৬	৮৭০৯৬
রোতুমান	১০৪৩	১১৩৩	২১৭৬
মিশ্রজাতি	৪৫৭	৩৫৫	৮১২
মোট	৮০০০৮	৫৯০৩৩	১৩৯০৪১

শাসন-প্রণালী

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ফিজিতে বর্ত্তমান শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ড হইতে ফিজির জন্য একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার একটা কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি আছে এবং তাহাতে চারিজন সচিব আছেন। ফিজির গবর্ণর, ১০ জন সরকারী সদস্য ছয়জন বেসরকারী সদস্য, এবং দুইজন দেশীয় সদস্য লইয়া ফিজির ব্যবস্থাপক সভা গঠিত। বৎসরে একবার করিয়া গবর্ণরের সভাপতিত্বে দেশীয় সর্দ্দারগণ, এবং প্রাদেশিক প্রতিনিধিগণ মিলিত হইয়া পরামর্শ করেন, এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হয়। সমগ্র ফিজি উপনিবেশ ১৭টি প্রদেশে বিভক্ত। ফিজির বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ১৪০০০০ পাউণ্ড; তন্মধ্যে রাজ্য শাসন কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ বৎসরে ১২৫০০০ পাউণ্ড ব্যয়িত হয়।

শিক্ষা-দীক্ষা

বলা বাহুল্য, ফিজিতে য়ুরোপীয়ানগণের পদার্পণের পূর্ব্বে তত্রত্য আদিম নিবাসিগণের মধ্যে শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরে মিশনারীগণের চেষ্টায় ফিজিয়ানদের দেশীয় ভাষায় বর্ণমালার সৃষ্টি হইয়াছে। রোমান অক্ষরে তাহাদের ভাষা লিখিত হয়। মিশনারীরা প্রায় প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ফিজিয়ানরা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রবাসী য়ুরোপীয়ান এবং বর্ণসঙ্করদিগের বালক-বালিকাগণের জন্য স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবাসী ভারতবাসীদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থার একান্ত অভাব লক্ষিত হয়। পণ্ডিত তোতারাম এই জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কোন হিন্দী ও ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি ফিজিতে গিয়া ভারতবাসী বালক বালিকাদিগের জন্য পাঠশালা স্থাপন করিলে ভাল হয়। এই প্রবন্ধের কয়েক খানি ছবি শ্রীযুক্ত তোতারাম মহোদয় আমাদিগকে ছাপিবার জন্য প্রদান করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

গল্প লেখার বিপদ

[শ্রীহেমচন্দ্র বকসী]

আমি অনেক দিন হইতেই মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিতাম। সেগুলি যে কেবলই 'কাগজের রঙিন ফানুস', তাহাও আমার জানিতে বাকী ছিল না। কিন্তু তবু লিখিতাম। প্রথম বয়সের লেখা,—বাস্তবতার দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না; ছিল শুধু উদ্দাম ভাবুকতা। তাহাতে প্রেমের মসলা খুব বেশীই পড়িত, কাজেই একটা তীব্র ঝাঁজও থাকিত। তাহা পড়িয়া বন্ধু বান্ধবেরা বাহবা দিত, আর গুরুজনেরা চিন্তিত হইতেন!

কিছুদিন আগে "প্রকৃতি"তে একটা গল্প লিখিয়াছিলাম। সংক্ষেপেতঃ তাহার ঘটনা এই—"কলিকাতায় বেচু চাটার্জ্জির লেনের ১৩ নম্বর বাড়ীতে শ্রীযুক্ত হরকুমার রায় বাস করিতেন। তিনি ওকালতি করিতেন। ছেলে সুকুমার ইস্কুলে পড়িত। তাঁহার মেয়ে কিরণবালার বয়স বছর ষোল হইয়াছে; শীঘ্রই বিবাহ দিবেন বলিয়া আর তিনি মেয়েকে ইস্কুলে পাঠান না। দুপুরবেলা বাবু আপিসে যাইতেন, আর ছেলে বই হাতে করিয়া ইস্কুলে যাইত। বাসায় থাকিতেন শুধু কিরণ আর তাহার মা। মা ঘুমাইতেন; কিরণ বসিয়া-বসিয়া বই পড়িত, অথবা সূচীকর্ম্ম করিত।

তিন বছর আগে কিরণ আর তাহার মা তাঁহাদের দেশের বাড়ীতে থাকিতেন, আর বাবু থাকিতেন কলিকাতায়। বাড়ী তাঁহাদের বর্দ্ধমান জেলায়, মোহিতপুর গ্রামে। সেখানে কিরণের এক বাল্য-সঙ্গী ছিল। সে তাহাদেরই দূর আত্মীয়—পরেশনাথ। সর্ব্বদাই সে তাঁহাদের বাড়ী আসিত—কিরণের সহিত খেলিত, হাসিত, গল্প করিত। একদিন কিরণের মা দুজনের সম্মুখেই বলিয়া দিলেন, "তোমাদের এখন বয়স হয়েছে, এ রকম হাসাহাসি আর ভাল দেখায় না।" সেইদিন হইতেই পরেশ আর বড় তাঁহাদের বাড়ী যাইত না। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহারা কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। আজ তিন বৎসর তাঁহারা কলিকাতায়।

কিরণদের কলিকাতার বাসার পাশের বাড়ীতে একটা মেস ছিল। তাহাদের সেই দিকের জানালাটা প্রায় সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত। দুপুরবেলা যখন মেসের সকলে আপন-আপন কাজে চলিয়া যাইত, বাড়ী যখন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িত, তখন কিরণ সে-দিকের জানালা খুলিয়া তাহার পাশে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিত।

সে এইরূপ একদিন বসিয়া আছে। বেলা তখন প্রায় দুইটা। নিবিষ্ট মনে সে একখানা বই পড়িতেছিল। এমন সময় সশব্দে মেসের সেইদিকের একটা জানালা খুলিয়া গেল। কিরণ মাথা তুলিয়া চাহিতেই চারি চক্ষুর মিলন। একজনে দেখিল, পরেশনাথ; অপরে দেখিল, কিরণবালা! উভয়েই বিস্মিত হইল।

প্রায় প্রতিদিনই এইরূপ হইত। তাহাদের বেশ কথা-বার্ত্তা চলিত। মা থাকিতেন নিদ্রায়, বাসায় দুপুরবেলা আর কেহই থাকিত না। কাজেই তাহাদের আলাপটা বেশ জমিয়াই উঠিত। পরেশনাথ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে এবং সেই মেসে থাকে। পরেশ প্রত্যেক দিন কলেজ হইতে 'ফরাসী বিদায়' লইয়া আসিয়া বালা সঙ্গিনীর সহিত গোপন আলাপ জুড়িয়া দিত।

কিছুদিন পরে এই গোপন আলাপে বড় বিষময় ফল ফলিল। প্রেমের বীজ তাহাদের অন্তরে বহু আগেই রোপিত হইয়াছিল। এখন সুযোগ পাইয়া পূর্ণতেজে গজাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাদের বিবাহ যে হইতে পারে না!—তাহাতে সামাজিক বাধা আছে।

আবেগ যখন কানায় কানায় পূর্ণ, তখন সমাজের বাধা সত্ত্বেও ভ্রান্ত যুবক তাহার অভিলাষ স্বীয় অভিভাবকের কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। ইহাতে সে যে ভর্ৎসনা লাভ করিল, তাহার পর আর লোকালয়ে মুখ দেখাইবার তাহার ইচ্ছা রহিল না। সে ভাবিল, এ জীবন ত বৃথাই গেল। তবে আর কেন? কাহার জন্য সংসারে থাকিব? হিমালয়ের গিরি কন্দরেই জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা কাটাইয়া দিব!

যাইবার পূর্ব্বে সে একবার কিরণের সঙ্গে দেখা করিল। এখানে সে ব্যর্থ প্রণয়ের এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়িল। তার পর যেমন হয়,—উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনে বিবাহ করিবে না। কারণ, প্রকৃত বিবাহ ত তাহাদের হইয়াই গিয়াছে!

পরেশনাথ কিরণের প্রতিজ্ঞায় ততটা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। সে বলিল, "কিন্তু তোমার মা বাপ যে তোমার বিয়ে দিবেন।" তাহাতে কিরণ উত্তর করিল, "মা বাপ বিয়ে দিবেন কা'র? আমার জীবন ত আমারই হাতে! ছুরি বা দড়ির তো আর অভাব নাই!"

কিরণের উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া পরেশনাথ বিদায় লইল। বুঝি বা, নায়কের প্রথা অনুসারে জীবনের সম্বল স্বরূপ একটি চুম্বন দিয়া যাইত; কিন্তু জানালাগুলিতে শিক দেওয়া; আর, দুই বাড়ীর জানালার দূরত্বটাও চুম্বন দিবার পক্ষে অনুকূল ছিল না!

সেই দিন হইতে পরেশনাথ নিরুদ্দেশ; আর, কিরণ গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসিনী!"

* * * * *

গল্প ত বাহির হইল; সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুমহলে সমালোচনাও আরম্ভ হইল; যাহারা নেহাৎ নাছোড়বান্দা রকমের 'এডমায়ারার', তাহারা বলিল, "বৈচ্যুতিক প্রভাসম্পন্ন এমন গল্প আর হয় না!" কেহ বলিলেন, "ছাই হয়েছে।" আর কেহ বা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "অরিজিনেলিটি নাই।" "জ্যোতিঃ" পত্রিকা "প্রকৃতি"র প্রতিদ্বন্দ্বী। তাহাতে এইরূপ সমালোচনা বাহির হইল:—"এ মাসে প্রকৃতিতে এক অদ্ভুত গল্প বাহির হইয়াছে। প্রকৃতি সম্পাদক যে কি করিয়া উহা ছাপিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। গল্পে যত প্রকার দোষ থাকা সম্ভব, লেখক যেন তাহার একটি নমুনা দিয়াছেন!" ইত্যাদি।

তার পর, গল্পটা রহিল প্রকৃতির পৃষ্ঠায়, আর আমি রহিলাম কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের একটি ত্রিতলের প্রকোষ্ঠে। উভয়ের মধ্যে আর কোন সংশ্রব ছিল না। কয়েক মাস কাটিয়া গেল। লিখিয়া-পড়িয়া দিনগুলি কাটাইয়া দিতেছিলাম। নীল আকাশে একখণ্ড শাদা মেঘের মত আমার উদ্দেশ্যবিহীন জীবনটা ভাসিয়া যাইতেছিল, কোথায় ইহার সমাপ্তি সে-দিকে কোন চিন্তাই ছিল না।

একদিন প্রভাতে অভ্যাসমত বসিয়া পড়িতেছি, এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিলেন। তাঁহার বয়স বছর চল্লিশ হইবে; মুখে বেশ একটা সরলতার ভাব। পূর্ব্বে তাঁহাকে কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "আপনার নামই কি সত্যব্রত গুহ?"

আমি বলিলাম, "হাঁ। আপনি বসুন।" এই বলিয়া পার্শ্বের একখানি চেয়ার তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিলাম। তিনি সেই চেয়ারে উপবেশন করিয়া বলিলেন—"আপনি প্রকৃতিতে গল্প লিখে থাকেন বুঝি?"

তাহারও উত্তর দিয়া উৎসুক নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তখন তিনি বলিলেন, "যদিও আপনার সঙ্গে আমি মোটেই পরিচিত নই, তবু খুব খোলামেলা ভাবেই আপনার সঙ্গে আমার একটু আলাপ করতে হবে। অনুগ্রহ করে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন। আপনি আমাকে পূর্ব্বে কখনো চিন্‌তেন কি?"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "না, চিন্‌তাম বলে ত মনে হয় না।"

তখন উপর্য্যুপরি ওকালতি ধরণের প্রশ্ন হইতে লাগিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের বাড়ীর কাউকে আপনি জানেন কি?"

আমি পূর্ব্বের মতই উত্তর দিলাম। আগন্তুক বলিলেন, "আমার নাম হরচন্দ্র রায়। বাড়ী বর্দ্ধমান, মোহিতপুর। এখন জিজ্ঞাস্য, কাহারো কাছে আপনি আমাদের সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন কি?"

এ সকল প্রশ্নে ক্রমেই আমার বিস্ময় বাড়িয়া যাইতেছিল। আমি বলিলাম, "না। আপনি এ সকল প্রশ্ন কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার কথাটা কি খুলেই বলুন দেখি?" "কথাটা কি, তা' আপনার নিজের লেখা পড়েই বুঝতে পারবেন।" এই বলিয়া এক সংখ্যা "প্রকৃতি" আমার সম্মুখে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "এই বর্দ্ধমানের মোহিতপুরের হরকুমার রায় আমি। আমিই ১৩নং বেচু চাটার্জ্জির লেনে থাকিয়া ওকালতি করি, আর আমারই মেয়ের নাম কিরণবালা। এখন জিজ্ঞাস্য, আমাদের পরিবারের নামে প্রকাশ্য কাগজে এই মিথ্যা কথাটা আপনি কেন লিখ্‌লেন? আর যদি বলেন, ইহা মিথ্যা ঘটনা, কেবলি গল্প, তবে ইহা আমার মেয়ের সম্বন্ধে লিখে আমাদের এ রকম অপমানিতই বা করলেন কেন, আর এত অসুবিধায়ই বা ফেল্লেন কেন? আমি ইহার সদুত্তর চাই।"

এতক্ষণে ভদ্রলোকের সব কথা আমি বুঝিতে পারিলাম। বুঝিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। অনেক গল্প লেখকের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, নিজেও অনেক গল্প লিখিয়াছি,—কিন্তু এরূপ কোন ঘটনা কখনো ঘটিতে পারে, তাহা জীবনে কাহারো কাছে শুনি নাই, এবং স্বপ্নেও কখনো ভাবি নাই। আমি ভাবিয়া কূল পাইলাম না। ভদ্রলোকটিকে কি করিয়া বুঝাইব যে, ইহা কেবলি গল্প, নেহাতই যৌবন-সুলভ অলস মস্তিষ্কের কল্পনা, দৈব বিড়ম্বনায় এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে!

যাহা হউক, তাহাকে যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, ঐ গল্পে বর্ণিত ব্যক্তিগণের নাম এবং স্থান শুধুই কল্পনা প্রসূত; জীবনে কখনো আমি মোহিতপুর দেখি নাই বা কাহারো কাছে শুনি নাই; এবং বেচু চাটার্জ্জির লেনের ১৩ নম্বর বাড়ী কোনটা তাহাও জানা নাই। মনে হইল যেন, ভদ্রলোক আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন। আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি। কিন্তু ঘটনা শুধু এখানেই শেষ হয়নি। অনেক কষ্টে কিরণের বিয়ের ঠিক করেছিলাম। ছেলে লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানে না; পাড়াগাঁয়ে বাপের কিছু সম্পত্তি আছে, তাই নেড়েচেড়ে সাধারণ ভাবে খেয়ে-পরে থাকে। এতেই তারা অনেক টাকা চেয়েছে। সে যা'হোক, এর চেয়ে ভাল ঘরে বিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আস্‌ছে মাসের বারই বিয়ে হবে, ঠিক ছিল। কিন্তু কাল ছেলের বাপ ভবতোষ বাবু এসে, রেগে, চটে বল্লেন যে, বিয়ে ভেঙে গেল,—এ মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের বিয়ে কক্ষনো দিতে পারেন না। তার পর আমার হাতে এই পত্রিকাখানা দিয়ে আরো যে সব কথা বল্লেন, তার আমি পুনরুক্তি করতে চাই না।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "ঘটনা এত দূরই গড়িয়েছে? তা' হলে ত দেখছি, আমার ঐ সামান্য একটা বাজে লেখার জন্য আপনাকে ভারি মুস্কিলেই পড়তে হয়েছে! আপনি যদি বলেন, তবে ভবতোষ বাবুকে আমি নিজে গিয়ে

সব বুঝিয়ে দিতে পারি। তা হলে বোধ হয় তাঁর আর কোন আপত্তি থাকবে না।"

তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তাই করবেন। কাল বিকালবেলা আমাদের বাসায় যাবেন, তাঁকে ডেকে আনব। কিন্তু তিনি যে ধরণের লোক, জানি না আপনার কথায় বিশ্বাস করবেন কি না।" তার পর একটু নীচু স্বরে বলিলেন, "কি আর বলব আপনাকে, হিন্দু ঘরের মেয়ে বড় হলে যে কি বিড়ম্বনা, তা' ত জানেন। কাল থেকে আমার মাথা ঘুরছে, আর মেয়ের মা ত কেঁদেই আকুল। যাহা হয় আপনি যদি তাঁকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তবেই রক্ষা পাই।"

তার পর ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। আমি বাস্তবিকই বড় ব্যথিত হইলাম। ঠিক করিলাম, অকাট্য যুক্তি দ্বারা কাল ভবতোষ বাবুকে সব বুঝাইয়া দিব। কিন্তু যদি তিনি বিশ্বাস না করেন! আর আমার পক্ষে যুক্তিও ত বিশেষ কিছু ছিল না। এমন অদ্ভুত ঘটনা ত কখনো শুনি নাই! কি দৈব বিড়ম্বনা! ভদ্রলোকের জন্য মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল।

পর দিন বিকালবেলা হরকুমার বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। হরকুমার বাবু ও ভবতোষ বাবু তখন বসিয়া ছিলেন,—বোধ হয় আমারই অপেক্ষায়। আমি বসিলে পর, হরকুমার বাবু আমাকে ভবতোষ বাবুর নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন।

তার পর প্রথমেই ভবতোষ বাবু আরম্ভ করিলেন, "আপনি 'প্রকৃতিতে' এই গল্পটা ছাপিয়ে ভদ্রলোককে এ রকম অপদস্থ করলেন কেন?"

আমি বলিলাম, "হরকুমার বাবুর কাছে থেকেই বোধ হয় শুনেছেন যে, কাউকে অপদস্থ করবার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। যা' ঘটেছে তা' কেবলি দৈবক্রমে। এমন আহাম্মক বোধ হয় কেউ নেই, যে নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব রেখে প্রকাশ্য কাগজে একজনের পরিবারের কথা এ রকম খোলাখেলা ভাবে সমস্ত পরিচয় দিয়ে লিখতে পারে।"

ভবতোষ বাবু বলিলেন, "এ রকম আহাম্মক কেউ আছে কি না, তা' নিয়ে তর্ক চলে না। আর আপনি দোহাই দিচ্ছেন দৈবের; এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না যে, এতগুলি কাল্পনিক বিষয় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলে যাবে।"

হরকুমার বাবু বলিলেন, "আপনি এত বেশী করে দেখছেন কেন? অনেকগুলি মিলেছে বটে, কিন্তু সবগুলি ত মিলে নাই। এই দেখুন, পরেশ ব'লে আমাদের কোন আত্মীয় নেই, আর আমাদের বাসার পাশে কোন মেস্ কখনো ছিল না।"

ভবতোষ বাবু রাগিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আপনি এই বুদ্ধি নিয়ে ওকালতি করেন? তাই আপনার পসার এমনি! ওটা ওর চালাকি যে! আপনি বুঝতে পারছেন না? মেয়ের যে কলঙ্ক হয়েছে,—সত্য হউক মিথ্যা হউক,—তা আর ঘোচ্‌বার নয়। আপনি এ অপমান কেন সহ্য করবেন— কুড়ি হাজার টাকার দাবীতে মানহানির মোকদ্দমা আনুন। সারাটা জীবন সুখে কেটে যাবে; মেয়ের বিয়ে দিতেও কোন কষ্ট হবে না।" হরকুমার বাবু বলিলেন, "না; ছোটলোকের মত কাজ আমি করতে পারি না। আমি আমার মেয়েকে খুব জানি। এমন কোন ঘটনা আমাদের পরিবারে ঘটতে পারে না। আর আমার বিশ্বাস, সত্যব্রত বাবু মিথ্যা কথা বলেন নাই।" ভবতোষ বাবু যেন বড় আশায় নিরাশ হইলেন। বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "তা' যাক্, আপনার যা খুসী তাই করুনগে'। সোজা কথা, আমার ছেলের সাথে এ মেয়ের বিয়ে হতে পারে না। ভাগ্যিস্ নরেন কাগজখানা পড়ে' আমার হাতে দিয়েছিল, না হলে কি কলঙ্কটাই হত!" তার পর আমাদের তিনজনের ভিতর এ সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। হরকুমার বাবু বাগ্দত্তা মেয়ের কিরূপে বিবাহ দিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। ভবতোষ বাবুর প্রত্যেক কথায়,—তিনি যে একটা অর্থগৃধ্নু নরপিশাচ, তাহাই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল। মুখের উপর আমায় যে ভাবে অপমান করিতে লাগিলেন, সে রকম অপমানিত আমি জীবনে কখনো হই নাই। ভবতোষ বাবুর সমস্ত কথার ভিতরকার ভাব এই যে, যদি আরো কিছু টাকা ধরিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বরং তিনি এখানে পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন। তাঁহার এতটা সদয় হওয়ার কারণ, শুধু হরকুমার বাবুর মান রক্ষার জন্য;—কি করা যায়, ভদ্রলোক যখন বিপদে পড়েছেন, তাঁহাকে রক্ষা ত করা চাই! এই তাঁহার ভাব! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ রকম ভাবে বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার ক্ষমতা

হরকুমার বাবুর আর তখন ছিল না। ইতঃপূর্ব্বে 'পাত্র-মর্য্যাদা' স্বরূপ তিনি যাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে নিজের মর্য্যাদাটুকু খোয়াইয়া বাড়ী-ঘর বন্ধক রাখিতে হইবে। ইহার উপরও আবার কিছু ধরিয়া দেওয়া, সে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তবুও তিনি বলিলেন, "যা' পূর্ব্বে দিব বলেছি, তাই যে কি ক'রে দিতে হবে, তা ত জানেন। আচ্ছা, দেখি ভেবে-চিন্তে। ঠেকেছি যখন, উদ্ধার তো পেতেই হবে।" "আমারও এই এক কথা। শেষকালে যে জাতও দিব, পেটও ভর্‌বে না, সে আমা দ্বারা হবে না।" নির্লজ্জের মত এই কথা বলিয়া ছাতাটা হাতে লইয়া তিনি পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমরা দু'জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। কাহারো মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। ভদ্রলোকের জন্য বড়ই ব্যথিত হইলাম। শুধু আমারই জন্য আজ তাঁহাকে এতটা নাকাল হইতে হইয়াছে, আর এত বিপদে পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার দুর্ভাবনা-ক্লিষ্ট মুখখানা মনে বড় বাজিল। আমি ভাবিলাম, এতটা ঘটিল শুধু আমারই জন্য। অপরাধ করিয়াছি আমিই, কাজেই ইহার প্রায়শ্চিত্তও আমাকেই করিতে হইবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। আমি বলিলাম, "দেখুন, এ সমস্ত ঘটেছে শুধু আমারই জন্য। আমি আপনাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর্‌ব। এর চেয়ে ভাল পাত্র দেখে আমি আপনার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেব। এ ভার আমি নিলাম, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। টাকাও আপনাকে কিছু খরচ কর্‌তে হবে না।" তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার কি এতই সৌভাগ্য হবে? আপনি কেন আমার জন্য খাট্‌বেন।" আমি বলিলাম, "আমিই এ জন্য দায়ী। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব আছে; এর জন্য আমাকে বেশি বেগ পাইতে হইবে না।" তখন তিনি আমাকে পাশের একটা ঘর দেখাইয়া বলিলেন, "আপনি ঐ ঘরে একটু বসুন, আমি এই খবরটা বাড়ীর ভিতর দিয়ে আসি। আপনাকে মেয়ে দেখে যেতে হবে, নতুবা আন্দাজে কি করে সম্বন্ধ কর্‌বেন।" এই বলিয়া তিনি ভিতরে গেলেন, আমিও উঠিয়া দরজা ঠেলিয়া পাশের ঘরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই আমাকে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল। দেখিলাম, একটি তরুণী নিবিষ্টমনে টেবিলে বসিয়া কি লিখিতেছে। আমাকে দেখিয়াই সে চঞ্চল হরিণ-শিশুর মত ছুটিয়া পলাইল। বুঝিলাম, হরকুমার বাবুর মেয়ে। তরুণী যে চেয়ারে বসিয়া ছিল, আমি আস্তে-আস্তে গিয়া তাহাতে বসিলাম। চেয়ার-খানায় তখনো একটা মৃদুমধুর উষ্ণতা বিরাজ করিতেছিল। টেবিলের উপর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, তরুণী যে কাগজ-খানায় লিখিতেছিল, তাহা তখনো সেখানে রহিয়াছে। অতি-ব্যস্ততায় সে তাহা লইয়া যাইতে অবসর পায় নাই। তরুণী কি লিখিতেছিল, তাহা জানিবার জন্য আমার ভারি একটা ঔৎসুক্য হইল। আমি কাগজখানা তুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু কয়েক ছত্র পড়িয়াই আমার চক্ষু স্থির! তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"বাবা, আজ কতদিন যাবত তোমার মুখে আর হাসি দেখি না, আমার সঙ্গে আর তেমনভাবে কথা বল না। আমি ইহার কারণ জানি। সংসারটাকে আমি ডুবাইতে বসিয়াছি। আজ ভবতোষবাবুর সহিত তোমার যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছে, আমি তাহা সব শুনিয়াছি। বুঝিয়াছি, আমার বিবাহ দিতে হইলে, তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। কিন্তু তাহা আমি হইতে দিব না। আমার জন্য সারা জীবন তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে, এ আমি কিছুতেই হইতে দিব না। জানি, আমি গেলে তোমাদের খুব কষ্ট—" আর লিখিবার অবসর সে পায় নাই। পড়িয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, পিতার কষ্ট হইবে বলিয়া যে মেয়ে তাহার তরুণ জীবনকে বলিদান দিতে প্রস্তুত হইয়াছে, সে মেয়ে দেবী। তাহাকে লাভ করা যে-কোন পুরুষের পক্ষে ভাগ্যের কথা। একটি সরস, কোমল, স্নেহপূর্ণ হৃদয়কে যদি সামাজিক অত্যাচারের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারি, সে কি কম কথা! এক মুহূর্ত্তে এই অপরিচিতা আমার হৃদয়ের পূর্ণ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া ফেলিল। মনে-মনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলাম, স্বর্গের এই পারি-জাত-কলিটির দুঃখ মোচন করিতেই হইবে। হঠাৎ আমার মনে হইল, আমার একক জীবনের সাথী যদি কাউকে করিতে হয়, তবে এই কি উপযুক্ত পাত্রী নয়—যে শুধু পরকেই চিনে, নিজের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করিবার যাহার অবসর নাই! এতদিন কল্পনায় এমনই একটি

মানসী দেবীর সহিত আমার ভবিষ্যৎ জীবনটা জড়াইয়া নানা বর্ণে একটি আদর্শ জীবন চিত্রিত করিয়াছি। কিন্তু আবার মনে-মনে এক-একবার বড় ভয় হইতে লাগিল। এতকাল ধরিয়া আমার জীবন-সঙ্গিনীর যে মানসী মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া আসিয়াছি, যদি সে তাহার ঠিক অনুরূপ না হয়! কল্পনায় আমার ভবিষ্যৎ জীবনের যে চিত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, যদি তাহা সকল দিক দিয়া সফলতা লাভ না করে! তবে? তবে ত জীবনটা বিফল হইয়া যাইবে! এমন সময় হরকুমারবাবু আসিয়া আমাকে অন্য এক ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে মিষ্ট দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করার পর মেয়ে দেখান হইল। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। বর্ষার বন্যার মত তাহার চরিত্র ও রূপের মাধুর্য্য নিমেষে আমার হৃদয় প্লাবিত করিয়া ফেলিল। মনে-মনে ভারি একটা সুখের আবেশ ও স্বস্তি বোধ করিলাম।

*   *   *   *

বিবাহের পর আমি ও কিরণ একদিন বসিয়া গল্প করিতেছি। আমি বলিলাম, "আচ্ছা, সেদিন আমার সাথে তোমার বিয়ের কথা ঠিক না হলে, সত্যই তুমি আত্মহত্যা করতে না কি?" কিরণ হাসিয়া বলিল, "সে কথা আবার এখন কেন?" "বল না শুনি?" "না, যাও বল্‌ব না।" তার পর কি ভাবিয়া বলিল, "সে যা' হোক, কিন্তু তুমি আমার নামে ও-রকম মিথ্যা গল্প লিখ্‌লে কেন? একটা গল্প লিখে তুমি বাবাকে কি বিপদেই ফেলেছিলে?" আমি বলিলাম, "সেটা ভগবানের হাত। তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে, সেই জন্যেই বুঝি। না হলে এ রকম অঘটন কি কেউ ঘটতে দেখেছে?" "আমি অনেকদিন থেকে তোমার গল্প পড়ে আস্‌ছি। 'প্রকৃতিতে' যে গল্পটা বেরিয়েছিল, তাও আমি পড়েছি। পড়ে তো আমি অবাক্! কিছুতেই আমি এর আর অর্থ করতে পারছিলাম না; অথচ কাউকে বলতেও কেমন লজ্জা বোধ হচ্ছিল। ও-রকম ভাবে গল্প আর তুমি লিখতে পারবে না; কে জানে, আমার মত কত জনের কত প্রকার বিপদ হতে পারে।" আমি বলিলাম, "না, সেই ঘটনা হতে প্রতিজ্ঞা করেছি, ও-রকম নামধামের অত তথ্য দিয়ে আর গল্প লিখব না। তোমরা যদি মানহানির মোকদ্দমা আন্‌তে,—বাপ রে, তবেই সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি! আমার পক্ষে বলবার যে কিছুই ছিল না!"

বিবিধ প্রসঙ্গ

কালিদাসের নারী-চিত্র

[অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম্-এ]

জগতের সাহিত্যে যে সমস্ত রমণী-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কালিদাসের নারী-চিত্রগুলি শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই নিপুণ চিত্রকরের স্বপ্নময়ী তুলিকার স্পর্শে যে কয়খানি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, চিরদিন তাহা জগতের আদর্শ স্বরূপ হইয়া থাকিবে, কখনও তাহাদিগের প্রভা মলিন হইবে না। অনন্ত কাল ধরিয়া তাহারা আনন্দের অনাবিল ধারায় মানবজাতির মনঃ-প্রাণ আপ্লুত করিবে। এই মলিনতা, সঙ্কীর্ণতা ও তামসিকতায় পরিপূর্ণ পৃথিবী যখনই আমাদিগের নিকট বিরক্তিকর মনে হইবে, তখনই একবার এই সকল চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমাদিগের নয়ন শীতল হইয়া যাইবে, মনে শান্তি ফিরিয়া আসিবে এবং আমরা এমন এক অভিনব রাজ্যের সন্ধান পাইব, যেখানে সকল বস্তুই সুন্দর, সকল বস্তুই মনোহর, সকল বস্তুই উদার।

এই সকল রমণী-চিত্রের প্রত্যেকটাতেই এমন কোনও বিশেষত্ব আছে, যাহাতে আমাদিগকে কখনও বৈচিত্র্যের অভাব অনুভব করিতে হয় না। আমরা এক-একটি করিয়া এই চিত্রগুলি, পাঠকের নয়ন-সমক্ষে স্থাপন করিব। প্রথমেই ত্রিলোক-পূজ্যা সীতাদেবীর চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন—

সীতা।

চতুর্দ্দশ-বর্ষব্যাপী দীর্ঘ বিরহের পর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা জানকী আজি পতির সহিত অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন; বিরহের সকল ক্লেশ, সকল যন্ত্রণা আজি তিরোহিত। সে দিনের কথা আজি স্বপ্নের মত মনে হয়। এই আনন্দের দিনে, এই মিলনের দিনে বিরহের সে সকল কাহিনী মনে পড়িলে, মন আর বিষণ্ণ হয় না; বরং একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

ক্রমে সীতার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল ; রামের আনন্দের আর সীমা নাই। নির্জ্জনে অন্তঃস্থা প্রিয়তমাকে রাম তাঁহার মনের নিগূঢ় অভিলাষের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এরূপ স্থলে অন্য কোনও রমণী কি প্রার্থনা করিতেন, বলিতে পারি না ; কিন্তু, ধর্ম্মপ্রাণা সীতার মনে কোনও বিলাস-বাসনা স্থান পায় নাই। জগতে এমন কোনও পদার্থ ছিল না, যাহা প্রার্থনামাত্র রাম তাঁহাকে আনিয়া দিতে না পারিতেন। কিন্তু পার্থিব ভোগ্য বস্তুর প্রতি সীতার মন ধাবিত হইল না।

"সা দষ্ট নীবারবলীনি হিংস্রৈঃ
সংবদ্ধ বৈখান সকন্যকানি।
ইয়েষ ভূয়ঃ কুশবন্তি গন্তুম্,
ভাগীরথীতীরতপোবনানি ॥" রঘু ২।২৮

তিনি চাহিলেন, ভাগীরথীতীরস্থিত কুশগুচ্ছসমাবৃত সেই সকল তপোবনে পুনরায় গমন করিতে, যেখানে বন্য পশুগণও নীবার-ধান্যে ক্ষুধার নিবৃত্তি করে এবং যেখানে মুনিকন্যাগণ সীতার সহিত সখিত্বসূত্রে আবদ্ধা। বলা বাহুল্য, রাম প্রিয়তমার এই অভিলাষ পূর্ণ করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবতা এই সময়ে একবার অলক্ষ্যে হাস্য করিয়াছিলেন। এই রাজ-দম্পতির অদৃষ্ট-গগনে পুনরায় মেঘের সঞ্চার হইল,—কিন্তু এত শীঘ্র হইবে, তাহা কে মনে করিয়াছিল ? কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, সীতার এই তপোবন-দর্শনেচ্ছাই তাঁহার নির্ব্বাসনের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিবে ?

ভদ্র আসিয়া রামকে জানাইল যে, পুরবাসিগণ তাঁহার সকল কার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু রক্ষোগৃহবাসিনী সীতার গ্রহণ তাহারা অনুমোদন করে না। এই সংবাদে সেই বৈদেহি-বন্ধুর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু যে সূর্য্যবংশে কখনও কলঙ্ক স্পর্শে নাই,—কেমন করিয়া তিনি দাঁড়াইয়া দেখিবেন যে, তাহা হইতেই সেই শুদ্ধ বংশের প্রভা মলিন হইয়া যায় ? তাই আজি করুণার সাগর নির্ম্মম হইলেন, নিজের হৃৎপিণ্ড নিজহস্তে ছিন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মণকে বলিলেন,

"প্রজাবতী দোহদশংসিনী তে
তপোবনেষু স্পৃহয়ালুরেব।
স ত্বং রথী তদ্ব্যপদেশনেয়াং
প্রাপষ্য বাল্মীকিপদং ত্যজৈনাম্ ॥" রঘু ১৪।৪৫

"তোমার ভ্রাতৃজায়া আমাকে তাহার অভিলাষ জানাইয়াছে। তপোবন-দর্শনে তাহার অত্যন্ত স্পৃহা। সেই ছলে তুমি তাহাকে রথে করিয়া লইয়া গিয়া বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আইস।" কি কঠোর এই আদেশ! কিন্তু এ যে নিজ মুখে নিজ মৃত্যুদণ্ডের উচ্চারণ!

পথে গমনকালে সীতার দক্ষিণ নয়ন স্ফুরিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করা সত্ত্বেও সীতার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, একটা ভীষণ অনর্থপাত তাঁহার সম্মুখে রহিয়াছে। আশঙ্কায় তাঁহার মুখারবিন্দ ম্লান হইয়া গেল। তথাপি এই পতি-প্রাণা রমণীর নিজের কথা একবারও মনে হইল না। তিনি হৃদয়ের অন্তরতম দেশে এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"আমি ত দূরে চলিলাম, হে ঠাকুর, দেখিও, আমার স্বামীর এবং দেবরগণের যেন কোনও অমঙ্গল না হয়।" পতিকুলের মঙ্গলের মধ্যে এই মহীয়সী রমণী আপনাকে এতটাই হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তার পরে যখন লক্ষ্মণ অতি কষ্টে রাজার কঠোর আদেশ তাঁহাকে শুনাইলেন, তখন তিনি পবনোন্মূলিতা লতার মত ধরণীতলে পতিতা হইলেন। কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! স্বামীর অসীম প্রণয়ের ভাজন হইয়া আজ তিনি বনে তৃণের মত পরিত্যক্তা হইলেন! তিনি যে মূর্চ্ছিতা হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তার পরে যখন সৌমিত্রির যত্নে তাঁহার লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখনও সেই রমণীকুলললামভূতা জানকী স্বামীর দোষ দেখিতে পাইলেন না, কেবল আপনারই দুঃখভাজন আত্মাকে পুনঃ-পুনঃ নিন্দা করিতে লাগিলেন। কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আত্ম-বিস্মৃতা হইয়াছিলেন ; একবারমাত্র তিনি লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

"বাচ্য ত্বয়া মদ্বচনাৎ স রাজা
বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ
শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য ?" রঘু ১৪।৬১।

"আমার কথায় তুমি সেই রাজাকে গিয়া বলিবে যে, যদিও আমি তাঁহারই সমক্ষে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিলাম, তথাপি যে তিনি আমাকে লোকের অপবাদ শুনিয়া ত্যাগ করিলেন, এ কার্য্যটা কি তাঁহার বংশের যোগ্য ? না, তাঁহার উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত ?" এইটুকু যদি তিনি না বলিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার রমণীত্ব অব্যাহত থাকিত না। এরূপ যথেচ্ছাচারে কাহার হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া না উঠে ? সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই যে, এই পতিদেবতা রমণী পতির কার্য্যের প্রতিবাদ করিবেন ; বরং ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তিনি একবারমাত্র প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন—দ্বিতীয়বার করেন নাই। পরক্ষণেই তিনি আপনাকে সংযত করিয়া বলিলেন—

"কল্যাণ বুদ্ধেরথবা তবায়ং
ন কামচারো ময়ি শঙ্কনীয়ঃ।
মমৈব জন্মান্তর পাতকানাং
বিপাকবিস্ফূর্জথুরপ্রসহ্যঃ ॥" রঘু ১৪।৬২

"অথবা তোমার বুদ্ধি জগতের মঙ্গলকারিণী। আমার প্রতি তুমি যে যথেচ্ছাচার করিয়াছ, সে আশঙ্কা করা উচিত নহে। ইহা আমারই পূর্ব্বজন্মের পাতকের পরিণাকরূপ অসহনীয় অশনি-নির্ঘোষ।" এক-বার তাঁহার ইচ্ছা হইল, তমসার জলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া সকল জ্বালার নিবৃত্তি করেন ; কিন্তু হায়, তাহারও কি উপায় আছে ? জগদীশ্বর যে তাঁহার স্কন্ধে এক গুরু কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন! তাঁহাকে যে তাঁহার গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে! যখন এ কর্ত্তব্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই, তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, প্রসবের পর হইতে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া

তিনি তপস্যা করিতে চেষ্টা করিবেন, যাহাতে পরজন্মে রামই তাঁহার স্বামী হন, কিন্তু আর যেন বিরহ না হয়! বিরহের যাতনা, মা, তুমি যত বুঝিয়াছিলে, এত আর কেহ বুঝে নাই। বিবাহের পর কয়টা দিনই বা তোমার সুখে কাটিয়াছিল? তোমার জীবন-প্রভাতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত রাবণের উদয় হইল। দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষের পর যদি মিলন হইল, আবার বিরহ! এ বিয়োগের যে আর অন্ত নাই! আর ত মিলনের আশা নাই! একান্ত ভাবে পাথেয়শূন্য হইয়া, মা গো, তুমি কেমন করিয়া এই দীর্ঘ জীবন-পথ অতিক্রম করিবে?

বাস্তবিক, এ কি কম দুঃখের কথা? একদিন যখন রাক্ষসের অত্যাচারে তপস্বিগণ ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন রামেরই অনুগ্রহে সীতা মুনিপত্নীগণের আশ্রয়স্বরূপ হইয়াছিলেন। এখন সেই রাম জাজ্বল্যমান থাকিতে, সেই তপস্বিনীগণের নিকটেই সেই সীতা কোন্ মুখে ভিক্ষার্থিনী হইয়া দাঁড়াইবেন? এ চিন্তাও যে অসহ্য! সীতা কিছুতেই ভাবিতে পারিলেন না যে, রাম তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাই তিনি বলিলেন—

"নৃপস্য বর্ণাশ্রম পালনং যৎ,
স এব ধর্ম্মো মনুনা প্রণীতঃ।
নির্ব্বাসিতাপ্যেব মতস্ত্বয়াহং
তপস্বিসামান্যমবেক্ষণীয়া" ॥১৪।৬৭

"মনু নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রমের পালনই রাজার ধর্ম্ম। অতএব, এইরূপে যদিও আমি নির্ব্বাসিতা, তথাপি একজন সাধারণ তপস্বিনীর মতও ত আপনার পর্য্যবেক্ষণের আশা করিতে পারি।"

লক্ষ্মণ যখন চলিয়া গেলেন, তখন সীতা তাঁহার অবস্থার অসহায়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কুররীর মত রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই রোদনে ময়ূরগণ নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইল, তরুগণ অশ্রুচ্ছলে কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল, হরিণীগণের মুখের গ্রাস মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইল। সীতার দুঃখে দুঃখিত সেই বনেও যেন একটা ক্রন্দনের সাড়া পড়িয়া গেল। তাঁহার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া করুণ-হৃদয় বাল্মীকি তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এত যে বিপদ, তবুও সীতার কর্ত্তব্যজ্ঞান লুপ্ত হয় নাই। নেত্রের আবরণ-স্বরূপ অশ্রুজল মুছিয়া ফেলিয়া এবং রোদন হইতে বিরতা হইয়া সীতা সেই জগদ্বন্দ্য ঋষির পাদবন্দনা করিলেন। বাল্মীকি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—

"জানে বিসৃষ্টাং প্রণিধানতস্ত্বাং
মিথ্যাপবাদক্ষুভিতেন ভর্ত্রা।
তন্মা ব্যথিষ্ঠা বিষয়ান্তরস্থং
প্রাপ্তাসি বৈদেহি পিতুর্নিকেতম্" ॥ রঘু ১৪।৭২

"মা গো, তোমার আর কিছু পরিচয় দিতে হইবে না। ধ্যানে আমি জানিতে পারিয়াছি, মিথ্যা অপবাদে ক্ষুভিত হইয়া তোমার স্বামী তোমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। সেজন্য কেন মা, এত দুঃখিত হইতেছ? মনে করিও, তুমি দেশান্তরস্থিত পিতৃগৃহেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ।"

তবোরুকীর্ত্তিঃ শ্বশুরঃ সখা মে।
সতাং ভবোচ্ছেদকরঃ পিতা তে।
ধুরি স্থিতা ত্বং পতিদেবতানাম্।
কিং তন্ন যেনাসি মমানুকম্পা?" রঘু।১৪।৭৪

"তোমার বিপুলকীর্ত্তি শ্বশুর আমার সখা। তোমার পিতা সাধুগণকে মোক্ষ বিতরণ করিয়া থাকেন। তুমি নিজে পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। এমন কি থাকিতে পারে, যাহার জন্য তুমি আমার অনুকম্পার ভাজন হইবে না?"

এইরূপে সীতার বনবাস আরম্ভ হইল। কিন্তু দুঃখের এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও একটী আলোক-রশ্মি তাঁহার নয়ন-গোচর হইয়াছিল। যখন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়া রাম আর দ্বিতীয়-বার বিবাহ করেন নাই, তখন তাঁহার বিরহ-দুঃখও যেন কতকটা প্রশমিত হইয়াছিল। যদিও সীতা রামের হৃদয়ের সহিত সম্পূর্ণরূপেই পরিচিতা ছিলেন, তথাপি তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে রামকে হয় ত আবার বিবাহ করিতে হইবে। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, যজ্ঞে তাঁহারই স্বর্ণপ্রতিমা রামের সহধর্ম্মচারিণী হইয়াছে, তখন তাঁহার সে আশঙ্কা অপনোদিত হইল এবং পতির হৃদয়ের প্রণয়ের গভীরত্ব অনুভব করিয়া দুর্ব্বার নির্ব্বাসন-দুঃখও কোনরূপে তিনি সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন।

যজ্ঞস্থলে লব ও কুশের রামায়ণ গান শ্রবণ করিয়া, রাম বাল্মীকির নিকট তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রামায়ণের কবি তাহাদিগের পরিচয় দিয়া রামকে সীতার সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রামের মনে সীতার শুদ্ধি সম্বন্ধে ত কখনও সন্দেহ ছিল না। লোকাপবাদের জন্যই তিনি তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং লোকহৃদয়ের সন্দেহ বিদূরিত না করিয়া কেমন করিয়া তিনি সীতাকে গ্রহণ করেন? তাই তিনি বলিলেন—

"তাত শুদ্ধা সমক্ষং নঃ স্নুষা তে জাতবেদসি।
দৌরাত্ম্যাদ্ রক্ষসস্তাং তু নাত্রত্যাঃ শ্রদ্দধুঃ প্রজাঃ॥ রঘু ১৫।৭২

"হে পিতঃ, আপনার পুত্রবধূ আমার সমক্ষে ত অগ্নিতে পরিশুদ্ধা হইয়াছিল, কিন্তু রাবণের দুষ্ট চরিত্রের জন্য এখানে কেহ সীতাকে শুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করে না।'

"তাং স্বচারিত্রমুদ্দিশ্য প্রত্যায়য়তু মৈথিলী
ততঃ পুত্রবতীমেনাং প্রতিপৎস্যে ত্বদাজ্ঞয়া॥" রঘু।১৫।৭৩

"নিজের বিশুদ্ধ চরিত্র সম্বন্ধে সীতা যদি ইহাদিগের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি পুত্রের সহিত ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারি।"

আবার পরীক্ষা! যদি সাধু ব্যক্তিকে তাঁহার সাধুত্বের প্রমাণ দিতে বলা হয়, তাহা হইলে তাঁহার কি অবমাননা করা হয় না? তথাপি একবার সীতা অগ্নি-পরীক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সময়েই তাঁহার মনের

ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। এরূপ পরীক্ষা পুনরায় দিবার প্রবৃত্তি কাহারও হয় কি? তথাপি যে সীতাকে পরীক্ষা দিতেই হইবে! না দিলে যে অনন্ত কালের মত তাঁহার পবিত্র নামে একটা কলঙ্ক-রেখা লাগিয়া থাকিবে! না দিলে যে তাঁহার স্নেহের পুত্তলীদ্বয় চিরতরে পিতার আদরে বঞ্চিত থাকিবে! তাই পুত্র-বৎসলা পুনরায় পরীক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কাষায় বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, এবং নিজের পাদমূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ধীরে-ধীরে তিনি সভাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর হইতে যেন একটা শান্তিধারা উচ্ছলিত হইয়া পড়িতেছিল। ইহা সত্বেও তাঁহার পবিত্রতা সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহ থাকিতে পারে কি? তাঁহার দর্শনপথ হইতে প্রজাগণ নয়ন ফিরাইয়া লইয়া শস্যভারাবনত শালিগুচ্ছের মত নতমুখে অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাদিগের সাধ্য কি যে, সেই পতিব্রতার দিকে চাহিতে পারে? কুশাসনে অধিষ্ঠিত মুনি তাঁহাকে বলিলেন "বৎসে, এই তোমার স্বামী তোমার অগ্রবর্ত্তী। ইঁহারই সমক্ষে প্রজাগণের মনে আপনার শুদ্ধি সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন কর।" হায়, মূর্খ প্রজাগণ, তোমরা কি কেহ অনুমান করিতে পারিয়াছিলে যে, সেই তেজস্বিনী, উপেক্ষিতা রমণী কি ভাবে তোমাদের উপর প্রতিশোধ লইয়া চলিয়া যাইবেন? কোন্ অশুভক্ষণে তোমরা তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে দোষারোপ করিয়া পাপবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলে? চিরতরে তোমাদিগকে সে নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইয়াছে, চিরদিনের জন্য তোমাদিগকে কাঁদিতে হইয়াছে। এখনও জগৎ সে দুঃখ ভুলিতে পারে নাই, এখনও তাহার হৃদয়ের ক্ষত শুষ্ক হয় নাই, এখনও তাই থাকিয়া-থাকিয়া সে কাঁদিয়া উঠে।

সংসারের সুখের উপর জানকীর বিতৃষ্ণা হইয়াছে; আর তিনি সুখের প্রত্যাশা রাখেন না। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য এখন নিজ চরিত্রে প্রজাগণ যে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়া দিয়াছে, সেই কালিমা ক্ষালন করা, আর তাঁহার পুত্রদ্বয়কে পতির অঙ্কে সমর্পণ করা। এই দুইটী কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিলেই, সংসারের সহিত তাঁহার হিসাব-নিকাশ হইয়া যায়। বাল্মীকিশিষ্যোপনীত পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া তিনি এই সত্য বাণী উচ্চারণ করিলেন—

"বাঙ্মনঃ কর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথানমৌ।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি মামন্তর্ধাতুমর্হসি॥ রঘু। ১৫।৮১।

"কায়মনোবাক্যে যদি আমি স্বামীর প্রতি কখনও ব্যভিচার না করিয়া থাকি, তাহা হইলে—হে বিশ্বধাত্রি ধরণি, তুমি আমাকে গর্ভে স্থান দাও।"

সতীর বাক্য কি কখনও মিথ্যা হইতে পারে? তখনই কঠিন পৃথিবী-বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া গেল। সেই রন্ধ্র-পথ দিয়া বিদ্যুতের জ্যোতিঃর মত প্রভামণ্ডল বিনির্গত হইল। শতসহস্র নাগের ফণার উপর প্রতিষ্ঠিত দিব্য সিংহাসনে উপবিষ্টা সমুদ্ররশনা বসুন্ধরা প্রাদুর্ভূতা হইলেন। তিনি সেই বিষাদিনী জানকীকে নিজ অঙ্কে ধারণ করিয়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। সতীত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগজ্জনের নয়ন সমক্ষে স্থাপিত করিয়া চিরদুঃখিনী জানকী রামকে শেষ দেখা দেখিতে-দেখিতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই সীতা-চরিত্র অঙ্কন বিষয়ে মহাকবি কালিদাস কবিগুরু বাল্মীকির নিকট অত্যন্ত ঋণী, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা আমার বলিবার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কালিদাসের মায়াময়ী লেখনীর নিম্নে সীতাচিত্র কিরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কুমার-সম্ভবে উমার চিত্রাঙ্কনে কালিদাস কত দূর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিব।

লবণ

[শ্রীবিপিনবিহারী বিদ্যাভূষণ, বি-এল]

মানব-সভ্যতার আদি যুগে যখন মানব কাঁচা মাংস ভক্ষণ ছাড়িয়া রন্ধন করিতে শিখিয়াছিল, যখন বনে-বনে পশু-হনন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা ছাড়িয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিয়া ফল-শস্য উৎপাদন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা জীবনধারণ করিতে শিখিয়াছিল, তখন হইতেই মানব-সমাজে লবণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, যাহারা কেবল দুগ্ধ, কাঁচা মাংস অথবা দুগ্ধ-মাংস আহার করিয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের পক্ষে খাদ্য দ্রব্যের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করা আবশ্যক হয় না। কিন্তু উদ্ভিজ্জ-ভোজীগণের পক্ষে উহা একান্ত আবশ্যক, নতুবা, তাহাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে না। শুদ্ধাচার-সম্পন্ন হিন্দুগণ কখনই দুগ্ধের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া আহার করেন না। মাংস সিদ্ধ করিলে উহার লবণময় অংশ গলিয়া বাহির হইয়া যায়, তখন উহার সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে। সভ্যতার আদি যুগে ভারতীয় আর্য্যগণ যে সময়ে অন্ন-ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা লবণের ব্যবহারও শিখিয়াছিলেন; কারণ, লবণ ব্যতীত কেবল অন্নের দ্বারা শরীর পোষণ অসম্ভব। মানব-দেহের আভ্যন্তরিণ ক্রিয়াসমূহের জন্য রক্তের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ থাকে; কিন্তু ঘর্ম্ম, মূত্রাদির সহিত উহা বহু পরিমাণে বাহির হইয়া যায় বলিয়া, সেই ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত খাদ্যদ্রব্যের সহিত লবণ ব্যবহার করা আবশ্যক। উহার অভাবে শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া স্কার্ভি নামক রোগ উৎপন্ন করে। (এই রোগে মুখের মধ্যে ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং শরীরের রক্ত কম ও দূষিত হইয়া পড়ে।) প্রত্যেক লোকের প্রত্যহ অন্ততঃ এক তোলা লবণ খাওয়া উচিত। লবণ ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের সহায়তা করে, ইহা কলেরা প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক ও কুষ্ঠ-নিবারক। এই সমুদায় কারণে অতি প্রাচীন কাল হইতে লবণ একটি অতি পবিত্র পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। মহাকবি হোমর লবণকে স্বর্গীয় পদার্থ (Salt divine) বলিয়াছেন। প্লেটো ইহাকে দেবতাদিগের প্রিয় পদার্থ "a substance dear to the gods" বলিয়াছেন। পারস্য-ভাষার নিমকহারাম শব্দের অর্থ বিশ্বাসঘাতক। হতাদর কথায় প্রতি-

শব্দ "আগুনি আদর"। লবণ অতিশয় পচন-নিবারক ও কীটাণু-নাশক ; এই নিমিত্ত মৎস্য, মাংস প্রভৃতি লবণের মধ্যে রাখিলে, উহা বহু দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। প্রাচীন হিন্দুগণ খাদ্যদ্রব্যের সহিত লবণ ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; উহার বিবিধ গুণ পরীক্ষা করিয়া উহা ঔষধরূপেও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অসামান্য রাজনৈতিক পণ্ডিত কৌটিল্যের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, লবণে ভেজাল দিলে অপরাধীকে গুরু দণ্ড ভোগ করিতে হইত। ঐ সময়ে আর্য্যগণ রন্ধনাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ ব্যবহার করিতেন। একজন আর্য্যের রন্ধনের জন্য একপ্রস্থ তণ্ডুল, তণ্ডুলের চতুর্থাংশ ডাইল, ডাইলের ষোড়শাংশ লবণ ও চতুর্থাংশ ঘৃত অথবা তৈল আবশ্যক হইত (১)। ২০ পল মাংস রন্ধন করিতে হইলে এক পল লবণ আবশ্যক হইত। সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্, সৌবর্চ্চল, ও উদ্ভিদ্জ এই পঞ্চবিধ লবণ ব্যবহৃত হইত। ভূমিতে লবণ রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

আমরা আহার্য্য দ্রব্যের সহিত যে লবণ ব্যবহার করি, তাহা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; সমুদ্রজ লবণ, খনিজ লবণ ও উদ্ভিজ্জ বা গুটিকা লবণ। ইহার মধ্যে খনিজ লবণ সামুদ্রিক লবণেরই পরিণতি ; যে সমুদায় স্থানে লবণের খনি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এক কালে কোন-না কোন লবণাম্বু হ্রদ অথবা সমুদ্রের অংশবিশেষ ছিল। বাজারে সাধারণতঃ দুই প্রকারের সামুদ্রিক লবণ পাওয়া যায় ; পাঙ্গা অর্থাৎ কলে চূর্ণ করা এবং করকচ অর্থাৎ দানাদার সামুদ্রিক লবণ। খনিজ লবণও দুই প্রকারের পাওয়া যায় ; গুঁড়া সৈন্ধব ও শিলা সৈন্ধব। সমুদ্রতীরে অথবা লবণাম্বুবিশিষ্ট নদী, হ্রদ প্রভৃতির তীরে জাত "গো'া" প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদ পোড়াইয়া তাহার পাংশু হইতে উদ্ভিজ্জ লবণ প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে খুলনা ও চব্বিশ পরগণার দক্ষিণভাগস্থ সুন্দরবন প্রদেশে এই লবণ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইত। করকচ লবণ যন্ত্র দ্বারা চূর্ণ করিয়া পাঙ্গা লবণ প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে যে লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৬১·৮ ভাগ সামুদ্রিক বা সমুদ্রজলজাত লবণ, ২৭·০ ভাগ—হ্রদ-জল হইতে জাত লবণ, এবং ১১·২ ভাগমাত্র সৈন্ধব বা খনিজ লবণ। আমাদের পৃথিবীতে সামুদ্রিক লবণের একান্ত অভাব হইবার শীঘ্র কোনই আশঙ্কা নাই ; কারণ পৃথিবীস্থ সমগ্র সাগরের জলে যে লবণ আছে, তাহার পরিমাণ ৪৪১৯৭৬০ ঘন মাইল।

প্রাচীন কালে উত্তর-ভারত হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্ধব লবণ বিদেশে রপ্তানি হইত এবং উহা লবণ-বাণিজ্যের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। ষ্ট্রাবো বলেন আলেক্জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের বহু পূর্ব্ব হইতে উত্তর-ভারতের লবণের খনিগুলি হইতে লবণ উত্তোলিত হইয়া আসিতেছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রবল পরাক্রান্ত মৌর্য্যদিগের রাজত্বকালে লবণ-কর একটি প্রধান রাজস্ব মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং লবণাধ্যক্ষ নামে একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু অধুনা বহু পরিমাণে লবণ বিদেশ হইতে আমদানি হইতেছে। বঙ্গদেশে ত বিদেশীয় লবণেরই একাধিপত্য। বিগত ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার বাজারে মজুদ লবণের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, আমরা আজকাল কোন্ লবণ কি পরিমাণে ব্যবহার করিতেছি।

বর্ত্তমান বর্ষের ১লা জানুয়ারীর লবণের বাজারের অবস্থা।

লবণের নাম	মজুদ লবণের পরিমাণ		মণ শতকরা দর
লিভারপুলি	২০০০০০ (দুইলক্ষ) মণ		২২৫
হাম্বার্গ গুড়া	"		"
ঐ করকচ	"		"
স্পেনিস্ গুড়া	৪০০০০০ (চারিলক্ষ) মণ		১৯০
ঐ করকচ	৯০০০ (নয়হাজার) মণ		"
সৈয়দ বন্দরের লবণ গুঁড়া / ঐ করকচ নামমাত্র	২০০,০০০ (দুইলক্ষ) মণ		১৯০
মাস্ওয়ার লবণ—	১০০,০০০ (এক লক্ষ) মণ		
এডেনের লবণ গুঁড়া—	৩২৫০০০ (সওয়া তিনলক্ষ) মণ		১৮৩—১৯০
ঐ করকচ	১০,০০০ (দশহাজার) মণ		১৭৫
শালিফ গুঁড়া—	০		—
ঐ করকচ—	০		—
ঐ সৈন্ধব—	০		—
বোম্বাই করকচ (কাল রং)	৫০০০	মণ	১০৯
মান্দ্রাজের করকচ কাল	৫০,০০০	মণ	১০১
ঐ পরিষ্কার			১২৭

অল্পদিন মধ্যে লিভারপুলি লবণের দর ১৩৬ হইতে ২২৫ হইয়াছে। আরও যে উঠিবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? ইহার উপর প্রতি শত মণে ২।৶ টোল ও ১২৫ টাকা লবণ-কর দিতে হয়। যুদ্ধের জন্য হাম্বার্গ ও শালিফ লবণের আমদানি বন্ধ আছে।

কলিকাতার বাজারে আমরা যে সমুদায় মোটা দানাবিশিষ্ট পরিষ্কার করকচ দেখিতে পাই, উহার অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানি। অল্প পরিমাণে সম্বর লবণ ও মান্দ্রাজের লবণ ইতঃপূর্ব্বে পাওয়া যাইত বটে, কিন্তু উহার কাট্‌তি নিতান্ত কম ; কারণ, সম্বর লবণের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক এবং মান্দ্রাজের লবণ অতিশয় অপরিষ্কার ও বালুকাপূর্ণ। কিন্তু উড়িষ্যার বাজার হইতে এখনও পর্য্যন্ত মান্দ্রাজী লবণের আধিপত্য যায় নাই। বঙ্গদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে আজকাল সমগ্র ভারতে যে পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ পরিমাণ লবণ কেবল বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশেই প্রস্তুত হয়। বোম্বাই লবণের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ সমুদ্র-জল হইতে প্রস্তুত ; অবশিষ্ট অংশ কচ্ছ উপসাগরের

(১) "অখণ্ড পরিশুদ্ধানাং বা তণ্ডুলানাং প্রস্থঃ চতুর্ভাগঃ সূপঃ সূপ ষোড়শো লবণাংশঃ সূপশ্চতুর্ভাগম্ সর্পিষঃ তৈলস্য বা একমার্য্য ভক্তম্॥" কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ৯৬ পৃঃ (শ্যাম শাস্ত্রী সঙ্কলিত)।

তীরবর্তী স্থানসমূহের ভূমিরস লবণাম্বু হইতে প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রস্তুত লবণের সমুদায়ই সামুদ্রিক।

বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সমুদায় লবণ ব্যবহৃত হইত, তাহার একটি বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সামুদ্রিক লবণ

১। এডেনের করকচ; সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্র-জল শুকাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

২। এডেনের পাঙ্গা বা গুঁড়া লবণ।

৩। রেওয়া করকচ; লোহিত সাগরের পার্শ্ববর্ত্তী আফরিকাখণ্ড হইতে আনীত হয়।

৪। রেওয়া পাঙ্গা।

৫। শালিফ্ করকচ; আফ্রিকা মহাদেশের শালিফ বন্দর হইতে ইহার আমদানি হয়।

৬। শালিফ্ পাঙ্গা।

৭। বোম্বাই করকচ।

৮। স্পেনের করকচ; সূর্য্যোত্তাপে সমুদ্র-জল শুকাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

৯। সৈয়দ বন্দরের করকচ।

১০। মান্দ্রাজের করকচ, কোকনদ, বিশাখাপত্তম এবং টিউটিকোরিণ প্রভৃতি স্থান হইতে কলিকাতা, কটক প্রভৃতি স্থানে আমদানি হয়। এই লবণ-প্রস্তুতকারিগণের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট প্রতি মণ ৵১০ ছয় পয়সা হিসাবে খরিদ করিয়া লইয়া সাধারণের নিকট বাজার দরে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ অপরিষ্কার ও বালুকা-মিশ্রিত বলিয়া কলিকাতায় বাজারে ইহার কাট্‌তি অতিশয় কম।

১১। সম্বর লবণ

রাজপুতানার অন্তর্গত সম্বর হ্রদের জল হইতে এই লবণ প্রস্তুত হয়। এই লবণ-হ্রদ রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৫০ বর্গ মাইল। ইহার দৈর্ঘ্য ১০ মাইল ও বিস্তৃতি ২ হইতে ৭ মাইল। ইহার চারিদিকেই বালুকাময় অনুর্ব্বর প্রদেশ এবং পশ্চিম দিকে রাজপুতানার বিখ্যাত মরুভূমি। যে বৎসর সুবৃষ্টি হয়, সে বৎসর ইহার জল সমুদ্র-জলের তুল্য লবণাক্ত; কিন্তু অনাবৃষ্টির বৎসর উহা সমুদ্র-জল অপেক্ষা তিনগুণ, সাড়ে তিনগুণ অধিক লবণাক্ত হইয়া থাকে। এই হ্রদের কর্দ্দমে শতকরা ৩ হইতে ১২ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ এবং অল্প পরিমাণে সোডিয়ম্ সল্‌ফেট, সোডিয়ম্ কার্ব্বনেট ও পটাসিয়ম্ সল্‌ফেট বর্ত্তমান। বর্ষাকালে নদীসমূহের জল এই হ্রদে আসিয়া পড়ায়, ঐ লবণ দ্রব হইয়া দুই-তিন ফিট গভীর, ৭০ বর্গ মাইল বিস্তৃত তীব্র লবণাম্বুরাশিতে পরিণত হয়। তখন এই লবণ-জল "কেয়ারী"তে আবদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইতে দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর এই হ্রদের জল হইতে সত্তর-বাহাত্তর লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই হ্রদ ভারত-গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে।

খনিজ লবণ

দেশীয় সৈন্ধব; তিনটি প্রধান কেন্দ্র হইতে এই লবণের আমদানি হয়—

(১) পঞ্জাবের লবণ শৈলমালা বা সৈন্ধব শৈলমালা।

(২) কোহাট পাহাড়।

(৩) কাংড়া জিলার মণ্ডিরাজ্য।

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত সৈন্ধব শৈলমালাই প্রধান; এবং উহা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লবণ রপ্তানি হয়। ইহার মধ্যে আবার খেওরার মেও খনি সর্ব্বপ্রধান। উহার গভীরতা ৫৫০ ফিট। তন্মধ্যে ২৭৫ ফিট বিশুদ্ধ লবণ, অবশিষ্ট কিছু অপরিষ্কার। খেওরার "মেও" খনি হইতে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্ব্ব (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী) হইতে লবণ উত্তোলিত হইয়া আসিতেছে। ভারত সম্রাট আকবরের সময়ে ইহার কার্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত ছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খনি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে; ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই খনির প্রাচীন কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে খনির কার্য্য চলিতেছে, উহা ভারত গবর্ণমেণ্টের ভূতত্ত্ব বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার ওয়াথের উদ্ভাবিত। এই খনির লবণে শতকরা ৯৮·৯০ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ (সোডিয়াম্ ক্লোরাইড) ও ০·৫৭ ভাগ সোডিয়াম্ সাল্‌ফাইড্ বিদ্যমান আছে। সাহাপুর জেলার "ওয়াচা" খনি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্ধব লবণ পাওয়া যায়। এই খনির লবণ-স্তরের গভীরতা ২০ হইতে ৩০ ফিট পর্য্যন্ত। সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী কলাবাগ হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত "সৈন্ধব গড়" পাহাড়ের পূর্ব্ব পার্শ্ব হইতে লবণের পাহাড় কাটিয়াই লবণ সংগ্রহ করা হয়। এই সমুদায় লবণ বিশুদ্ধ শুভ্র হইতে রক্তাভ পর্য্যন্ত নানা বর্ণবিশিষ্ট। কিন্তু অধুনা এই লবণ পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের লোকদিগকে যোগাইতেই প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়; সুতরাং বঙ্গদেশে অতি সামান্য পরিমাণেই আসিয়া থাকে।

মোগল বাদশাহগণের রাজত্বকালে পঞ্জাববাসিগণ লবণ-শৈল হইতে লবণের বড়-বড় সৈন্ধব-শিলা ভাঙ্গিয়া সিন্ধুতীরে লইয়া যাইত; এবং সেখানে উহা লবণ-ব্যবসায়ীগণের নিকট বিক্রয় করিয়া বিক্রয়-লব্ধ অর্থ লবণ-বাহকদিগের সহিত বণ্টন করিয়া লইত। উহার বার-আনা অংশ খনকগণ লইত, এবং অবশিষ্ট চারিআনা বাহকগণ প্রাপ্ত হইত। লবণ-ব্যবসায়ীগণ একটাকা মূল্যে ২০ হইতে ৮০ মণ পর্য্যন্ত লবণ ক্রয় করিত। ইহার উপর তাহাদিগকে প্রতি ১৭ মণ লবণে একটাকা করিয়া লবণ-কর দিতে হইত। শিল্পীগণ সৈন্ধব-শিলা হইতে নানাপ্রকার কারু-কার্য্য-শোভিত আস্‌বাব-পত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত। মীর আবুল কাসেম সম্রাট আকবরকে এইরূপ একখানি সৈন্ধবের রেকাব ও একটা বাটি দিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে তিনি নিমকিন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও সৈন্ধব-লবণের নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপ অনেকগুলি কুঁজো, গেলাস, বাটি, রেকাব প্রভৃতি দ্রব্য কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির মিউজিয়মে আছে।

কোহাটে পাহাড় কাটিয়াই লবণ সংগ্রহ করা হয়, সুতরাং ভূপৃষ্ঠ খনন করা আদৌ আবশ্যক হয় না। এই লবণ পাংশুবর্ণ। এই "অদ্ভুত" লবণ-শৈলের উপরিভাগ নিঃশেষ করিতেই বহু শতাব্দী অতীত হইবে।

মণ্ডির লবণ অতিশয় অপরিষ্কার। এই স্থানেও কোহাটের ন্যায় উপর হইতে পাহাড় কাটিয়া লবণ সংগ্রহ করা হয়, খনন করা আবশ্যক হয় না।

ব্রহ্মদেশে মন্দালয় নগরের নিকটে ইরাবতী নদীর তীরবর্ত্তী সীনপঞ্জা নামক স্থলে এক বৃহৎ লবণের খনি আছে; কিন্তু সুলভ বিলাতী লবণের কৃপায় উহা বাজার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।

দেশীয় অন্যান্য খনিজ লবণ

ইহা ব্যতীত পাঁচভদ্রা ও দিদ্বানা নামক স্থানে তরল লবণের খনি আছে। পাঁচভদ্রা যোধপুর রাজ্যের রাজধানী, যোধপুর নগর হইতে ৪০ মাইল দূরে লূণী নদীর তীরে অবস্থিত। এইস্থানে প্রায় তিন ক্রোশ দীর্ঘ এবং এক ক্রোশ প্রশস্ত স্থানের সর্ব্বত্রই তরল লবণের উৎস দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় আট লক্ষ চল্লিশ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৫০ হাত দীর্ঘ ও ৪০ হাত প্রশস্ত একটি গর্ত্ত প্রস্তুত করা হয়; তরল লবণ বা তীব্র লবণাম্বু এই গর্ত্তের মধ্যে প্রায় দুই হাত গভীর হইয়া জমিয়া থাকে। এই জল সমুদ্র-জল অপেক্ষা সাত-আট গুণ অধিক লবণাক্ত। একপ্রকার গাছের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শাখা এই সকল গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে, উহার উপর লবণ জমিতে থাকে। এইরূপে এখানে লবণ সংগ্রহ করা হয়। বিগত ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারত-গবর্ণমেণ্ট এই স্থান ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

সম্ভর হ্রদ হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে যোধপুর রাজ্যমধ্যে দিদ্বানা লবণ-খনি অবস্থিত। এই খনিতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ-দ্রব পাওয়া যায়। উহা অনবরত তুলিতে থাকিলেও ফুরায় না। বৎসরের মধ্যে প্রায় নয় মাস কাল লবণ প্রস্তুতের কার্য্য চলিয়া থাকে, এবং প্রতি বৎসর প্রায় তিন লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয়। প্রতি মণে প্রায় দেড় পয়সা খরচ পড়ে এবং উহা একটাকা চারিআনা মণ দরে বিক্রীত হয়। কিন্তু এখান হইতে লবণ চালান দিতে অত্যধিক খরচ পড়ে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই খনিও ভারত-গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে।

বিদেশীয় খনিজ লবণ

বঙ্গদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানের লোকেই দেশীয় লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গদেশে বিদেশীয় লবণেরই একাধিপত্য। বঙ্গদেশে যে পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধাংশ "লিভারপুলি" বা বিলাতী লবণ; অবশিষ্ট জার্ম্মাণি, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, এডেন, জিড্ডা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের আমদানি লবণ। অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণি হইতে যে সমুদায় খনিজ লবণ আমদানি হয় তাহার সমুদায়ই বাজারে "হ্যাম্বার্গ লবণ" নামে পরিচিত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে এই সমুদায় বিদেশীয় লবণ বঙ্গদেশে ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া, ১৮৭৪ অব্দের মধ্যে দেশীয় লবণকে বাজার হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছে।

১। বিলাতী পাঙ্গা লবণ।

সাধারণতঃ ইহা লিভারপুলি লবণ বলিয়াই বাজারে পরিচিত। ইহা লিভারপুল, হার্টেলপুল, বৃষ্টল প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হয়। ইহার অধিকাংশই চেসায়ার ও উরচেষ্টার সায়ারের খনি হইতে উৎপন্ন। চেসায়ারের লবণের খনিতে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০ হাত নিম্নে ১৫০ হইতে ২০০ হাত গভীর লবণের স্তর আছে। এই লবণ-স্তরের উপরিভাগ শতকরা ২৫ ভাগ দ্রবীভূত লবণবিশিষ্ট জল দ্বারা আচ্ছাদিত। এই তরল লবণ যন্ত্র-(pump) সাহায্যে উত্তোলিত হইয়া লবণের কারখানায় নীত হয়। উহা হইতে ঐ সমুদায় কারখানাতে দুই প্রকার লবণ প্রস্তুত হয়। একপ্রকার, অতিশয় "সরু দানা"বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট লবণ; অপর, "মোটা দানা"বিশিষ্ট নিকৃষ্ট লবণ। উভয় প্রকার লবণ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিভিন্ন। মোটা দানাবিশিষ্ট লবণ মৃদু জ্বালে প্রস্তুত হয়; কিন্তু সরুদানার উৎকৃষ্ট লবণ ফুটন্ত লবণ-জল হইতে প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ খনি হইতে উত্তোলিত লবণ-জল কটাহে ছাড়িয়া দিয়া তাহার সহিত অল্প পরিমাণে শিরিষ অথবা পশুরক্ত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত জল ফুটিয়া না উঠে, ততক্ষণ ক্রমশঃ জ্বাল বাড়াইতে হয়। এইরূপে জ্বাল দিতে-দিতে উপরে চিনির রসের গাদের ন্যায় এক প্রকার গাদ উঠে। উহা উপর হইতে কাটিয়া ফেলা হয়। এই গাদ উঠাইয়া ফেলিলে, ঘোলা লবণ-জল স্বচ্ছ লবণ-জলে পরিণত হয়, এবং কটাহের তলায় লবণের দানা বাঁধিতে থাকে। ঐ লবণ হাতা দিয়া তুলিয়া কটাহের উপর স্থাপিত তক্তার উপর শুকাইতে দেওয়া হয় এবং উহা হইতে জল ঝরিয়া গেলে, "ষ্টোভ" ঘরে লইয়া গিয়া উহা উত্তমরূপে শুষ্ক করা হয়। এই প্রকারে একমণ উৎকৃষ্ট বিলাতি লবণ প্রস্তুত করিতে প্রায় ছাব্বিশ সের গুঁড়া কয়লা খরচ হয়; কিন্তু এক মণ মোটাদানার লবণ প্রস্তুত করিতে আঠার সেরের অধিক কয়লা খরচ হয় না। এই সকল স্থানে কয়লা অতিশয় সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় বলিয়া, ব্যবসায়ীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আজকাল machine pan নামক একপ্রকার কটাহের সাহায্যে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইতেছে। উহা অতিশয় সূক্ষ্ম দানাবিশিষ্ট। চেসায়ারের সরু-দানাবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট লবণের মধ্যে শতকরা

৯৮.৩৫০ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড

০.০৭৫ ভাগ ম্যাগনিসিয়াম্ ক্লোরাইড্

০.০২৫ ভাগ ক্যালসিয়াম্ ক্লোরাইড

এবং ১.৫৫০ ভাগ ক্যালসিয়াম্ সলফেট

পাওয়া যায়; কিন্তু বড় দানার নিকৃষ্ট লবণের মধ্যে শতকরা

৯৮.০০ ভাগ বিশুদ্ধ লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড্

০.৯০ ভাগ ম্যাগ্নেসিয়াম্ ক্লোরাইড্

১.০০ ভাগ ক্যাল্সিয়াম্ সলফেট্

৩ . ১০ ভাগ জলে অদ্রবনীয় ময়লা পাওয়া যায়।

ইংলণ্ড হইতে যে সমুদায় বাণিজ্য-জাহাজ কলিকাতা, রেঙ্গুণ ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আসিয়া থাকে, তাহাতে এই সমুদায় লবণ ব্যালাষ্টস্বরূপ বোঝাই হইয়া এদেশে আসিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমরা উহা অল্প মূল্যে পাইয়া থাকি।

২। "হ্যাম্বার্গ লবণ"।

ইহা আমাদের দেশের সৈন্ধব-জাতীয় খনিজ লবণ। লবণ-শিলা সকল কলে পেষণ করিয়া উহা প্রস্তুত হয়। বঙ্গদেশে লিভারপুলি ব্যতীত যে সমুদয় বিদেশীয় লবণ আমদানি হয়, তাহার মধ্যে হাম্বার্গ লবণই প্রধান ছিল। কিন্তু আজকাল যুদ্ধের গোলযোগে এই লবণের আমদানি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণিতে অনেক লবণ-শৈল আছে। উহার দুই-এক স্থলে প্রায় দেড়হাজার গজ পর্য্যন্ত গভীর লবণের স্তর পাওয়া যায়। কার্পেথিয়ান শৈলমালার মধ্যে অনেক লবণের খনি আছে। অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের গ্যালিসিয়া প্রদেশস্থ ক্রাকো নগর হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে উইলিকজার প্রসিদ্ধ লবণের খনি। এই খনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া এই খনি হইতে লবণ উত্তোলিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপে ভূগর্ভে একটি ইন্দ্রালয়-তুল্য অনুপম সৌন্দর্য্য-শোভিত সপ্ততল নগরের সৃষ্টি হইয়াছে। এই নগরে প্রশস্ত রাজপথ ও রেলগাড়ি প্রভৃতি ত আছেই; পরন্তু, তাড়িতালোকে আলোকিত বিচিত্র-কারুকার্য্যশোভিত রেলষ্টেশন, হোটেল, নাচঘর, ভজনালয় (সেণ্ট এণ্টনির গির্জ্জা) ঝাড়-লণ্ঠন ইত্যাদি শোভিত বৃহৎ হলঘর, বিশ্রাম-স্থান, আস্তাবল প্রভৃতিরও অভাব নাই। সমুদায়ই লবণে নির্ম্মিত ও বিবিধ বর্ণে শোভিত। এই নগরের মধ্যে ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় আড়াইশত গজ নিম্নে একটি হ্রদ আছে। এই হ্রদ ঘন কৃষ্ণবর্ণ লবণাম্বুতে পরিপূর্ণ। উহার উপর দর্শক-গণের জল-ভ্রমণের নিমিত্ত একখানি নৌকাও আছে।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশেও যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। হিজলির নিকটে মোগল বাদশাহদিগের সময়ে একটি বৃহৎ সরকারি লবণের কার-খানা ছিল। কিন্তু নিম্নবঙ্গের জলবায়ুর আর্দ্রতাবশতঃ এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বিপুল মধুর জলরাশি অনবরত বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে বলিয়া, এখানে লবণ প্রস্তুত করা লাভজনক নহে। এই সমুদায় কারণে এবং অন্য দিকে বিলাতি লবণ অতিশয় সস্তা দরে বাজারে বিক্রীত হওয়ায় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গদেশে লবণ-প্রস্তুত-কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উড়িষ্যার উপকূল প্রদেশে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুতের কার্য্য চলিতেছিল; ঐ সময় হইতে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

লবণ-কর

জীবনধারণের জন্য লবণের আবশ্যকতা অত্যন্ত অধিক। কেবল মানুষের জন্য নহে, গবাদি গৃহপালিত পশু এবং কৃষিকার্য্যের নিমিত্তও লবণের প্রয়োজনীয়তা অতিশয় অধিক। এই নিমিত্ত ইহার উপর কর আদায় করা অতিশয় সুবিধাজনক। ভারতের প্রজাগণ বহুকাল হইতে এই লবণ-কর প্রদান করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন হিন্দু-রাজাদিগের সময়ে কখন-কখনও রাজকর্ম্মচারিগণের দ্বারা লবণ প্রস্তুত-কার্য্য পরিচালিত হইত; আবার কখনও বা রাজা লবণ-প্রস্তুত-কারি-গণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই লবণের আমদানি ও রপ্তানির উপর শুল্ক দিতে হইত। খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য্য রাজগণের রাজত্ব সময়ে লবণাধ্যক্ষ নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী লবণ-বিভাগের কার্য্য পরিচালনা করিতেন। সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্, সৌবর্চ্চল, উদ্ভিজ্জ এবং যবক্ষার এই ছয়প্রকার লবণের উপর কর গ্রহণ করা হইত। রাজার ইচ্ছানুসারে সময়-সময় এই স্বত্ব ইজারা দেওয়া হইত। উৎপন্ন লবণের পঞ্চ-বিংশতি ভাগ হইতে বিংশতি ভাগ পর্য্যন্ত কর স্বরূপ গ্রহণ করা হইত। "ধান্য, স্নেহ, ক্ষার, লবণ, মধ্য, পকান্নাদীনাংচ বিংশতিভাগ পঞ্চবিংশতি ভাগো বা" (১)। কিন্তু বিদেশীয় লবণের ষষ্ঠাংশ কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইত; "আগন্তু লবণং ষড়্‌ভাগং দদ্যাৎ" (২)। বস্তুতঃ আমদানি লবণের উপর চারিগুণ কর আদায় করিয়া এই সময়ে দেশীয় লবণ-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা হইতেছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী, শ্রোত্রিয়, উপাধ্যায় এবং শ্রমজীবীদিগকে খাদ্য লবণের নিমিত্ত আদৌ কোন কর প্রদান করিতে হইত না। লবণাধ্যক্ষ এইরূপে করস্বরূপ যে লবণ আদায় করিতেন, তাহা ব্যবসায়ীদিগের নিকট উচিত মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়-লব্ধ অর্থ রাজকোষে জমা দিতেন। মুসলমান-দিগের রাজত্বকালেও আমদানি ও রপ্তানি উভয়বিধ লবণ-কর প্রচলিত ছিল। তাঁহারা সন্ন্যাসী, শ্রমজীবী প্রভৃতি কাহাকেও এই কর হইতে অব্যাহতি দিতেন না; সর্ব্বত্রই সমভাবে উক্ত কর আদায় করিতেন, "মু-শীর-ই রহিমি" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মোগল বাদশাহদিগের সময় প্রতি ১৭ মণ লবণে এক টাকা রাজস্ব দিতে হইত; অর্থাৎ এখনকার হিসাবে মণকরা এক আনা হিসাবে লবণ-কর দিতে হইত। মোগল-সাম্রাজ্যের অবসান সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, লবণ প্রস্তুত, বিক্রয় এবং আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য নিজের আয়ত্তাধীনে লইয়া লবণের ব্যবসায় "একচেটিয়া" করিয়া লইয়া-ছিলেন। ক্লাইব এই কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ করেন। এই প্রথাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তদনন্তর বর্ত্তমান প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লবণের শুল্ক মণকরা আড়াই টাকা ছিল। উহা ক্রমশঃ কমাইয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মণকরা দুইটাকা, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মণকরা দেড়টাকা এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মণকরা একটাকা করা হইয়াছিল। ১৯০৭ হইতে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লবণকর মণকরা ঐ এক টাকাই ছিল। কিন্তু বিগত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে উহা অস্থায়ী ভাবে বাড়াইয়া মণকরা একটাকা চারি আনা করা হইয়াছে। ভারতের ত্রিশ কোটি প্রজা বৎসরে প্রায়

(১) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (শ্যাম শাস্ত্রী সঙ্কলিত), ১১৩ পৃঃ।

(২) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (শ্যাম শাস্ত্রী সঙ্কলিত), ৮৩ পৃঃ।

পাঁচ কোটি মণ লবণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। মৎস্যাদি রক্ষা করিবার নিমিত্ত যে লবণ ব্যবহৃত হয়, তাহার উপর কোন কর দিতে হয় না। বরোদা রাজ্যে লবণ কর আদৌ নাই। ঐ রাজ্যের অন্তর্গত কাথিয়াবাড় প্রদেশের অধিবাসিগণ আপনারাই তাহাদের ব্যবহার্য্য লবণ প্রস্তুত করিয়া লইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে টাকায় প্রায় সাড়ে তিন মণ করিয়া লবণ পাওয়া যায়। বিগত ১৯১৫—১৬ইং সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ১০৫ লক্ষ ৫০ হাজার মণ লবণের কারবার হইয়াছিল। উহা হইতে গবর্ণমেণ্ট ১১৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা লাভ করিয়াছেন। লবণ-কর কমাইয়া দিলে রাজসরকারের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম; কারণ, অল্প মূল্যে ক্রয় করিতে পারিলে, লোকে গৃহপালিত পশু প্রভৃতি এবং নিজেদের জন্যও অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহার করিত। এইরূপে এবং উহার অপচয় অধিক হওয়ায়, কাটতিও বাড়িয়া যাইত এবং তদ্দারা রাজসরকারের ক্ষতির পূরণ হইত।

উল ও উলীবস্ত্র

[শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী]

কার্পেট ব্যবসায়ের সাধারণ বিবরণ

কার্পেট ব্যবসাটা প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। পারস্যদেশই বল, আর তুর্কিস্থানই বল—সর্ব্বত্রই এক। বয়ন-যন্ত্রের মালিক দোকানদারদিগের নিকট হইতে আগাম টাকা লয় এবং আপনাদিগের লোক নিযুক্ত করে। তাঁতিরা দোকানদারদিগের সহিত স্বাধীনভাবে কোন সম্বন্ধ রাখে না। তাঁতিদিগকে আগাম টাকা দেওয়ার প্রথাটা সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

সাধারণতঃ একজন লোক কয়েকটা মাত্র বয়ন-যন্ত্র রাখে। বাটীর সকলেই কার্য্যে নিযুক্ত হয়। রমণীগণ এবং বালকেরা লাচ্ছা খোলা এবং তানা-বয়ন ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কেবল আগ্রার Messrs. Ott. Weyladt & Co. এবং কানপুরের য়ুরোপীয় কার্পেটের দোকান কার্পেটের কারখানা রাখিয়া থাকে।

তাঁতিমাত্রেই সহরে বাস করে; কিন্তু মির্জাপুরে ঠিক তাহার বিপরীত। মির্জাপুরে অধিকাংশ উলী কার্পেট তৈয়ার হয়। কিন্তু সুতি কার্পেট বা দরি অন্যান্য সহরে তৈয়ার হয়। সহরের তাঁতিদিগের জীবিকা বয়ন-কার্য্য; কিন্তু পল্লীতে তাঁত-বয়ন ত আছেই তদুপরি কৃষিও আছে।

মির্জাপুরে Ott. Weylardt & Coর কার্পেটের কারখানা ব্যতীত সাধারণতঃ তাঁতিরা জাতিতে মুসলমান। তাহারা সেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, জুলাহা, তেলি, নাই (নাপিত), সুরবাফ ইত্যাদি। মির্জাপুর, কানপুর এবং বাজিতে কার্পেট বয়নের জন্য এক জাতি সৃষ্টি হইয়াছে; তাহারা "কালিনবাফ" নামে খ্যাত। তাহারা বস্তুতঃ পাঁতিতে মণিহার (অর্থাৎ চুড়ি প্রস্তুতকারক)।

কার্পেট বিক্রয়ের সুবিধা যেমন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তেমনই কার্পেটের জাতীয় ব্যবসা লোপ পাইতেছে। মুসলমানের প্রায় সকল সম্প্রদায়কেই কার্পেট বয়ন করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলে ইহাই হইয়াছে যে পুরাতন পঞ্চায়তি পদ্ধতি—যদ্দারা তাঁতিদিগের মজুরি নির্দ্দিষ্ট থাকিত—লোপ পাইয়াছে; এবং একপ্রকার সস্তার কার্পেট প্রস্তুতির প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতেই তাঁতিদিগের তাঁতিকুল ও বৈষ্ণব কুল উভয়ই গিয়াছে। পঞ্চায়তগণ তাঁতিদিগের বেতন নির্দ্ধারণ, কার্পেটের উত্তমতা বা অপকর্ষতার বিচার এবং ব্যবসায় বিবাদ ভঞ্জন করিত। এখন খুসিয়ামদিগের সব খুসির জন্য পঞ্চায়তির বিলোপে প্রথমতঃ অন্যান্য জাতীয় কার্পেটে হস্তক্ষেপ সংঘটিত হইয়াছে—সুতরাং তাঁতিদিগের তাঁতিকুল আর নাই; এবং প্রতিযোগিতার ফলে তাঁতিদিগের বেতনের হ্রাস নিবন্ধন উত্তম কার্পেট প্রস্তুতি আর হয় না:—কেবল মাত্র কার্পেটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে মাত্র; তাহাতে তাঁতিদিগের বৈষ্ণবকুলও গিয়াছে। আর কি পূর্ব্বকার দিন ফিরিয়া আসিবে? বোধ হয় না। "তে হি নো দিবসা গতা।"

এ দেশে প্রায় ৫।৬ হাজার তাঁতি উলী কার্পেট বয়ন করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে। তন্মধ্যে ৪ হইতে ৫ হাজার মির্জাপুরে, ৬০০ আগ্রায় এবং অবশিষ্টাংশ অন্যান্য সহরে দেখা যায়।

বৎসরে প্রায় সাত লক্ষ টাকা মূল্যের উলী দরি যুক্তপ্রদেশ হইতে রপ্তানি হইয়া থাকে; তন্মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার দরি মির্জাপুর হইতে বহির্দ্দেশে যায়। শতকরা ৯০টা বা ততোধিক দরি য়ুরোপ ক্রয় করে। ইহার অধিকাংশ কলিকাতা এবং অল্পাংশ বম্বে এবং করাচির বন্দর হইতে প্রেরিত হয়।

তাঁতির দৈনিক পারিশ্রমিক গড়ে দুই হইতে তিন আনা। গত দশ বৎসরের মধ্যে বেতন কোনরূপ বৃদ্ধি হয় নাই; বরং ধরিতে গেলে উপার্জ্জন কমিয়া গিয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—বেতন কমিল না অথচ উপার্জ্জনের হ্রাস কিরূপে হইল? তাহার উত্তর এই যে, বেতনের হ্রাস না হইলেও, আহার্য্য-বস্তুর মূল্য-বৃদ্ধি নিবন্ধন, তাঁতিদিগের আয় কমিয়া গিয়াছে। ছেলের কি করিবে, প্লীহাই মারিয়া রাখিয়াছে। ক্ষুদ্র বয়ন-যন্ত্রের মালিকগণ সাধারণ কার্পেটে প্রত্যেক বর্গ গজে ২ পয়সা হইতে ১ আনা এবং বড়-বড় ঠিকাদার ৪ হইতে ৮ আনা লাভ করিয়া থাকে। উত্তম কার্পেটে লাভ অত্যন্ত অধিক হয় বটে, কিন্তু কার্পেট উত্তমই হউক আর অধমই হউক, তাঁতিদিগের বেতনের কোন পার্থক্য নাই।

কোন-কোন স্থানের কার্পেট অতি উত্তম হয়। বুলন্দসহর জেলায় জেওয়ার নামক স্থানে উত্তম কার্পেট পাওয়া যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সকল স্থানের কার্পেট সমান না হইয়া, কোন স্থানবিশেষের কার্পেট উত্তম হয় কেন? তাহার উত্তর এই যে, যেখানে জাতীয় ব্যবসা আছে, সে স্থানে কার্পেট উত্তম হইয়া থাকে। যাহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ কখনও কার্পেট বয়ন করে নাই, ক্ষুধার তাড়নায় যাহারা এই ব্যবসায়ে নূতন হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহারা উত্তম কার্পেট বয়ন করিতে কিরূপে সমর্থ

হইবে? যুগযুগবাহী যে বিদ্যা পিতা হইতে পুত্রে অর্শিয়াছে, তাহার প্রভাব চিরবলবান থাকিবেই থাকিবে।

অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর ফ্যাসানও পাশ্চাত্য হইয়াছে। কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটী গেলে দেখিতে পাইবে যে, তাহার গৃহের দেওয়াল চাকচিক্যশালী জর্ম্মন চিত্রের দ্বারা মণ্ডিত, গৃহে টেবিল, চেয়ারের অভাব নাই—অভাব কেবল উত্তম কার্পেটের। বাবু দেশীয় বস্ত্র ক্রয় করেন না, কারণ তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাসক। তাঁহার আছে সব—নাই কেবল ইহকাল এবং পরকাল। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে ও দেশীয় লোকদিগের অনবধানতা নিবন্ধন তাঁতিগণ য়ুরোপের শরণাপন্ন হইয়াছে। য়ুরোপের চিত্র কখনও স্থির থাকে না—পরিবর্ত্তন নিত্যই লাগিয়া আছে। সুতরাং তাহাদিগের চিত্ত-বিনোদন করিতে গিয়া ভারত আজ কার্পেটের উত্তম নমুনা হারাইয়াছে। য়ুরোপের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই বিষয়টা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কেবল পাশ্চাত্য সভ্যতাসেবী দেশীয় বাবুগণ ইহা স্বীকার করেন না।

বহির্দ্দেশের কার্পেটের আবশ্যকতা এবং বেতন

যুক্তপ্রদেশের মধ্যে মির্জাপুরেই উলী "দরি" বহু পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই স্থানের তন্তুবায়দিগের বেতন অত্যন্ত কম। হয় ত তুমি জিজ্ঞাসা করিবে যে, যখন পরিশ্রমের আবশ্যকতা কমে নাই, তখন বেতনের ন্যূনতার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, মির্জাপুরে কিরূপ হারে বেতন দেওয়া হয়, তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। "ঢেরি" হিসাবে বেতন নিরূপিত হইয়া থাকে। "ঢেরি" তন্তুবায়দিগের হস্ত প্রদত্ত গাঁটের সংখ্যা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এক ঢেরিতে ছয় সহস্র গাঁট থাকে। ৮ হইতে ৯ ঢেরির পারিশ্রমিক এক টাকা। আগ্রা, ঝান্সি এবং কানপুরে ছয় হইতে সাত ঢেরিতে এক টাকা দেওয়া হয়। এক্ষণে মির্জাপুরে অল্প বেতনের কারণ কি, তাহা বলিতেছি।

(১) যখন কোন ব্যবসায়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন বেতন-বৃদ্ধির কথা উঠিতেই পারে না। কাপড়-বয়নকারী জুলাহা (জোলা)-দিগের বস্ত্র-বয়ন-জীবিকা লোপ পাইবামাত্র তাহারা কার্পেট-প্রস্তুতির দিকে দলে-দলে ঝুঁকিল। তখন তাহারা বেতন-বৃদ্ধির কথা কি উত্থাপন করিতে পারে?

(২) পূর্ব্বে ব্যবসা জাতীয় ছিল; কিন্তু অধুনা বহু জাতির সংমিশ্রণে কোন একটা বিশেষ জাতির সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া, কেহই আপনার জিদ বজায় রাখিতে সমর্থ নহে। সুতরাং জাতীয় পঞ্চায়তী বিভিন্ন জাতিদিগের ব্যবহারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম।

(৩) যখন ব্যবসাটা শিখিতে পারিলেই উপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত হয়, তখন শিক্ষানবীশ দলের অভাব হয় না।

(৪) নবীনের দল অধিক হইলে প্রধানেরা কষ্ট পায় না। বালকেরা অল্প বেতনে কার্য্য করিতে সদাই প্রস্তুত। তাহারা অবগত আছে যে, অন্য ব্যবসায়ে তাহারা এত বেতন পাইবে না; সুতরাং তাহাদিগের বেতন স্বরূপ যাহা দিবে, তাহাতে তাহাদিগের কোনরূপ আপত্তি নাই। যখন অল্প বেতনে বালক পাওয়া যাইতে পারে, তখন প্রবীণদিগকে অধিক বেতন দিয়া রাখিবার আবশ্যকতা না হইতে পারে—এই আশঙ্কায় প্রবীণেরা অল্প বেতনে কর্ম্ম করিতে বাধ্য।

উল্লিখিত কারণগুলি অল্পবেতনের মূল বলিতে হইবে। কিন্তু অনেক স্থলে দাদন দেওয়াই অল্প বেতনের কারণ। দাদনের প্রথা ভারতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল দোকান কার্পেটের ব্যবসা করিয়া থাকে, তাহারা ওস্তাদকে আগাম টাকা দেয় এবং ওস্তাদ তন্তুবায় দিগকে অগ্রিম টাকা দিয়া থাকে। দাদন দিবার আবশ্যকতা কি? তাহার কারণ এই যে, তন্তুবায়মাত্রেই গরীব। টাকার খাঁক্তি তাহাদিগের সর্ব্বদাই। সুতরাং টাকাটা হস্তে পাইলে তাহারা সুযোগটা ছাড়িবে কেন। একবার টাকা লইলে তাহাদিগের আর পরিত্রাণ নাই। তাহারা চিরদিনের জন্য ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে। তন্তুবায়দিগকে ঋণজালে আবদ্ধ করাই দাদনের উদ্দেশ্য।

সকল বস্তুই গুণ ও দোষে সমাচ্ছন্ন—দাদনও এ নিয়ম হইতে পরিমুক্ত নহে। গুণ এই যে, মনিব ও ভৃত্যের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। গরীব বেচারাগণ বিপদে পতিত হইলে অথবা কোন কারখানা খুলিলে মনিবের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ পাইতে পারে। দোষ এই যে একবার টাকা লইলে গ্রাহকের আর পরিত্রাণ নাই। টাকাটি না দিতে পারিলে, তাহার মুক্তি অসম্ভব। সুতরাং সে স্বীয় পারিশ্রমিকও ভালরূপ প্রাপ্ত হয় না। অনেক দোকান দাদনের টাকার কোন সুদ লয় না বটে, কিন্তু অন্য দিকে অর্থাৎ গ্রাহককে অল্প বেতন দিয়া আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়া লয়। ইহা ব্যতীত আরও একটু রহস্য আছে। তাহা এই যে, কারিকরদিগকে দাদন দিয়া শীঘ্র কার্পেট প্রস্তুতির জন্য হুকুম বা তৎপ্রস্তুতির উপকরণাদি দেওয়া হয় না। ফলে কারিকরদিগকে অধিক সময় নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিতে হয়। আগাম টাকা লইয়াছে বলিয়া মনিবকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, অথচ যে সময় নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকে তাহার জন্য বেতন পায় না। ইহার উপর, কার্য্য খারাপ হইলে বেতন কাটিয়া লওয়া আছে। সুতরাং গরীব বেচারাদিগকে আপনার ক্ষতি করিয়াও কাজ করিতে হয়। ইহাও অল্প বেতনের এক কারণ।

কার্পেট-বয়নকর্ত্তা এবং ক্রেতাদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি থাকে, তাহারাও তাঁতিদিগের অল্প বেতনের এক কারণ বলিতে হইবে। প্রথমতঃ বিলাতের থোক ক্রেতাগণ ও তৎপরে তাহাদের প্রতিনিধিগণ। শেষোক্তটী মির্জাপুরে থাকিয়া কার্পেট প্রস্তুতির হুকুম লয়েন ও ওস্তাদদিগকে দাদন দেন। ওস্তাদ উল ক্রয় এবং বয়নকারীগণকে নিযুক্ত করেন। সুতরাং মির্জাপুরে বয়নকর্ত্তা ও বিলাতের ক্রেতাগণের মধ্যে (১) ওস্তাদ (২) প্রতিনিধি (৩) কলিকাতার জাহাজের এজেণ্ট (৪) লণ্ডনের থোক ক্রেতাগণ (৫) খুচরা ব্যবসায়ীগণ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি থাকেন, তাঁহারাই লভ্যাংশের প্রায় সমস্তটাই আপনাদিগের

উদর নামক বৃহৎ গর্ত্তে দিয়া থাকেন ; বয়নকারিগণ তেমন কিছুই পায় না। দুই এক বৎসর ধরিয়া যখন বিলাতে প্রতিযোগিতা চলে, তখন অনেক বয়নকারী কার্য্যচ্যুত হইয়া থাকে ; বেচারাগণ তখন যৎকিঞ্চিৎ বেতনে আপনাদিগের উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে। ইহাও অল্প বেতনের এক কারণ বলিতে হইবে।

উল সম্বন্ধে দেশাচার

উলীবস্ত্র কত পুরাতন তাহা বলা দুঃসাধ্য। মানব যখন বর্ব্বর অবস্থায় ছিল, তখন ছাল চামড়া পরিধান করিয়াই দিন অতিবাহিত করিত। ক্রমে যতই সভ্য হইতে লাগিল, ততই তাহারা বস্ত্রাদির ব্যবহার শিখিতে লাগিল। পরিধানের জন্য তখন চর্ম্মাদির ব্যবহার আর রহিল না, তৎপরিবর্ত্তে উলীবস্ত্র ব্যবহারে আসিল।

হিন্দুগণ উলীবস্ত্রকে পবিত্র বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। বৈষ্ণব-শাস্ত্র "পারায়ণ-সার-সংগ্রহ" বলেন যে, শ্রাদ্ধকালে উলীবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রাদ্ধ করাই বিধি। গয়ায় শ্রাদ্ধ করিলে যে ফল হইয়া থাকে, উলীবস্ত্র পরিধান করিয়া শ্রাদ্ধ করিলে সেই ফল হইয়া থাকে।

হারীত স্মৃতি বলেন যে, অগ্নি, উলীবস্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং কুশ ঘাস, —এই পদার্থচতুষ্টয়কে ব্রহ্মা পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

উলীবস্ত্র পরিধান করিয়া আহারাদি করিতে হিন্দুদিগের কোন বাধা নাই। আসনও উলী হইলে হিন্দুদিগের নিকট পবিত্র। শ্রাদ্ধ-কালীন পিণ্ডে উল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির শরীর দৃষ্টিগোচর না হওয়াতে যেসকল উপকরণে শরীর প্রস্তুত করা হয় তন্মধ্যে উল একটি। ইহাকেই "পুরুষল" ক্রিয়া কহে। উলের মালা তৈয়ার করিয়া জপ করিবার বিধিও হিন্দুদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রের আদেশ এই :—বৈশ্য ব্রহ্মচারিগণ কেবলমাত্র উলীবস্ত্র এমন কি উলনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত পরিধান করিবে। বিপদ সমাগত হইলে হিন্দুগণ তাহা হইতে পরিমুক্ত হইবার জন্য দানকি নামক ক্রিয়া করিয়া থাকেন ; তাহাতে কম্বল দান একটি বিশেষ বিধি।

উলীবস্ত্র হিন্দুর নিকট যেরূপ পবিত্র, মুসলমানদিগের পক্ষে সেরূপ নহে। তবে মুসলমান ফকিরদিগের উলীবস্ত্র পরিধান করিবার বিধি আর্ব্বি এবং পার্শি পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। মহম্মদও কম্বল ধারণ করিতেন। "আলি আবা" শব্দে কম্বলের সন্তানকে বুঝায়। আলি, ফতিমা, হসেন, হুসেনকেই "আলি আবা" শব্দ প্রয়োজ্য হইয়া থাকে।

সুলতানপুরে গাড়ারিয়া (গোয়ালা) জাতির মধ্যে প্রথা এই যে, উল পড়িয়া থাকিতে দেখিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে উঠাইয়া লইয়া মস্তকোপরি স্থাপন করতঃ বাটী লইয়া আইসে। বেরিলীতে যদি কেহ উলী ও সূতি একত্র মিশ্রিত করে, তবে সে জাতিচ্যুত হয়।

য়ুরোপে রমণীগণ উল লইয়া তুক করিয়া থাকে। ভারতবর্ষেও যে এ প্রথা নাই তাহা বলিতে পারা যায় না। আলিগড় জেলার লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, জ্বলিয়া যাইলে—হস্তে বা পদে উলের টুকরা ধারণ করিলে, ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য প্রাপ্ত হয়।

গৃহে নূতন কপাট লাগাইলে উলী সূতা তাহাতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এরূপ করিলে ভূত-প্রেতাদির উপদ্রব হয় না। ঘোড়ার গলায় উলী সূতা বাঁধিয়া দিলে, দৃষ্টি লাগিবার আশঙ্কা নাই। পাছে দৃষ্টি লাগে এই জন্য "বানজারা" জাতীয়া রমণীগণ উলী অলঙ্কার পরিধান করে। অনেকের বিশ্বাস এই যে, কুকুর-দষ্ট হইলে লাল উলী সূতা কলার ভিতর করিয়া খাওয়াইলে, ও সপ্ত কূপ দর্শন বা তাহার বারিপানে দষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য হয়।

মির্জ্জাপুরে মুসলমান তাঁতিগণ বৃহস্পতিবারে কার্পেট বয়ন আরম্ভ করে না। যদি বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বৃহস্পতিবারে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, তবে তাহারা "লুকমল হাকিমের" আত্মার উদ্দেশে মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করে। মুসলমানদিগের মতে "লুকমল হাকিম" কার্পেটের আবিষ্কর্ত্তা। লুকমল একজন কৃতদাস—নিবাস নিউবিয়ায় ; তিনি ভারতবর্ষের লোক নহেন।

ইটাওয়া, বেরিলী এবং বুলন্দসহর জেলাস্থ ঔরঙ্গাবাদে কার্পেট-বয়নকারীদিগের দেবতা "বড় পীর সাহেব।"

উপসংহার।

উলী কার্পেটমাত্রেই রপ্তানির জন্য হইয়া থাকে ; শতকরা দুইখানা কার্পেট যুক্তপ্রদেশে বিক্রয় হয় কি না সন্দেহ। বাকী য়ুরোপে যাইয়া থাকে।

তাঁত ও যন্ত্রাদি বাবা আদমের সময়ের। রংকরা ও নমুনাদিতে পাশ্চাত্য প্রভাব দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কার্পেটের দুইটা সমস্যা আছে—একটি ব্যবসাগত এবং অপরটা শিল্পগত। প্রথমটা উপকরণাদির মহার্ঘতা নিবন্ধন বিশেষ ভয়ের কারণ হইয়াছে।

দেশীয় ব্যক্তিরা যদি জর্ম্মাণ কাগজাদি দ্বারা গৃহ মণ্ডিত না করিয়া কার্পেট দ্বারা গৃহ সজ্জা করে, তবেই কার্পেট ব্যবসার উন্নতি হইতে পারে, নতুবা নহে।

কালিদাসের ভুল নয়, বুঝিবার ভুল

[অধ্যাপক শ্রীহরিপদ শাস্ত্রী, এম্-এ]

আষাঢ় মাসের ভারতবর্ষে 'কালিদাসের ভুল' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়া-ছিলাম যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল-নাটকের টীকাকারেরা 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা' এইটুকুর এতকাল পর্য্যন্ত যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন, তাহা ভ্রান্ত। সেরূপ ব্যাখ্যা মহাকবির অভিপ্রেত হইলে, সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে তাঁহারও ধারণা যে বিকৃত ছিল, এবং তিনিও যে সম্ভবতঃ মনুবাক্যের আপাত-অর্থে ঠকিয়া টীকাকারদিগেরই ন্যায় ভুল করিয়া-ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হয়। কবিবরের এ বিষয়ে সত্য-সত্য ভুল হইলেও, তাঁহার বা তদীয় কাব্যের 'গৌরবহানির লেশমাত্র আশঙ্কা নাই', ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম। কিন্তু টীকাকারদিগের উপায় কি ?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখাইব যে, কবির ঐ বাক্যাংশের অর্থ অন্যরূপে করিতে হইবে, টীকাকারদিগের টীকার সাহায্যে হইবে না। এই অভিনব অর্থে সমগ্র ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরব অক্ষুন্ন থাকে, এবং কবিরও যশোহানি হয় না। এ বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বহু অধ্যাপক এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আমাদিগের বিচার হইয়াছিল। তাঁহারা পরিশেষে আমাদিগের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত আমাদিগের যে বিচার হয়, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম—

(শ্রীযুক্ত তিলকের পত্র)

"আপনি তৈত্তিরীয়োপনিষদের 'এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।' এই প্রমাণের বলে কালিদাস 'অপ্'কে সৃষ্টির আদ্য বস্তু বলিয়া ভুল করিয়াছেন, বলিতেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বেদেই কোন-কোন স্থলে আকাশাদিকে আদি সৃষ্ট বস্তু না বলিয়া, অপ্‌কেই প্রথম সৃষ্ট বস্তু বলা হইয়াছে। সুতরাং বেদের মধ্যেই যখন এমন মতদ্বৈধ রহিয়াছে, তখন আমরা বেদানুসারেই অপ্‌কেও আদ্য বস্তু বলিতে পারি। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ; ১।১।৩ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৭।১।১০ (?) এই দুই বাক্যের অনুসরণ করিয়া, হয় ত মনুও ঐরূপ (১।৮) লিখিয়া থাকিবেন। সুতরাং কালিদাস যে ভুল বা কোনরূপ অন্যায় করেন নাই, তাহা দেখা যাইতেছে। বেদে সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে স্পষ্ট মতভেদ আছে ; তবে কালিদাসের দোষ কি? আসল কথা এই যে, বেদের উক্তিগুলি প্রথমে ঐরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধই ছিল ; পরে উপনিষদে কতকটা যুক্তিসঙ্গত সৃষ্টিপ্রণালী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উহাদিগকে একরূপ সাজাইয়া দাঁড় করান হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও মনুসংহিতায় অপ্‌কেই প্রথম সৃষ্ট বস্তু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।"

আমরা তিলক মহোদয়ের পত্রের উত্তরে যাহা লিখি, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—"আমরা, হিন্দুরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না যে, সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে বেদে কোথাও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ—ইহাদের মধ্যে সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে পরস্পরের বিরুদ্ধ বাক্য সকল গ্রথিত আছে, সংহিতা বা ব্রাহ্মণে যুক্তি ও শৃঙ্খলার অভাব, উপনিষদে বর্ণিত সৃষ্টিক্রম কতকটা যুক্তিযুক্ত, ইত্যাদি কথা আর যাঁহারা বলেন বলুন, বৈদিক ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ আস্তিক হিন্দুরা এ কথা কখনও বলিতে বা বিশ্বাস করিতে পারেন না। সমগ্র শ্রুতিকে এক অভ্রান্ত, প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ, অখণ্ড সত্যরূপে গ্রহণ করাই যাঁহাদিগের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য, তাঁহারা বেদের কোনও বাক্য অযুক্ত, অপ্রামাণ্য বা অন্য বেদবাক্যের বিরোধী, ইহা কেমন করিয়া বলিবেন? আমাদিগের চিরকালের নীতি,—'সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে।' বিশেষতঃ, ধর্ম্মবিষয়ে একবাক্যতা না করিলে রক্ষা নাই। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতির আপাত-বিরোধ দূর করিবার জন্য বিচারকালে আমরা এই ন্যায় যতদূর সম্ভব অনুসরণ করি। যে-যে স্থলে প্রকৃত বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেই-সেই স্থলে প্রমাণের গুরু-লঘুত্ব বিচার করিবার উপায় সকলেই অবগত আছেন। শ্রুতির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ উপস্থিত হইলে, উভয় শ্রুতিই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। এইরূপে তিন বা ততোধিক বিরুদ্ধ শ্রুতিবাক্যও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এই শ্রুতিদ্বন্দ্ব কেবল কর্ত্তৃব্যাপারাত্মক বিধিবাক্যেই সম্ভব। এইজন্য 'উদিতে জুহুয়াৎ', 'অনুদিতে জুহুয়াৎ' ইত্যাদি বিধিবাক্যে বিকল্পবশে যে কোন বিধিই ইচ্ছানুসারে মানিয়া চলা যায়। কিন্তু যে বিষয় বস্তুতন্ত্র, তাহার বিকল্প-কল্পনা অসম্ভব। পরমাত্মা, ঈশ্বর, মোক্ষ, জীব ইহাদিগের সম্বন্ধে কি বেদে মতদ্বৈধ আছে? সেইরূপ সৃষ্টি সম্বন্ধেও বিকল্প হইতে পারে না, কারণ সৃষ্টিক্রম বস্তুতন্ত্র হওয়ায় চিরকালই একপ্রকার। (শাঙ্কর শারীরক ভাষ্য, অধ্যায় ১। পাদ ১। সূত্র ২)।

"তৈত্তিরীয়োপনিষদে স্পষ্ট উক্ত আছে—'পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্, অপ্ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছিল।' এই ক্রমের অন্যথাকরণ কিরূপে হইতে পারে? অপরাপর সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-বাক্যই কি এই বাক্যের অনুসরণ করিতে বাধ্য নহে? এই ক্রম উড়াইয়া দিয়া আবার অন্যরূপ সৃষ্টিক্রম কোনও বেদবাক্য বর্ণনা করিয়াছেন কি? বেদে মতভেদের দোষারোপ অন্যে করে করুক, আমরা হিন্দুরা তাহা কিছুতেই পারি না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কি এই কারণেই 'তস্য অর্চ্চত আপোঽজায়ন্ত' এই বৃহদারণ্যকবাক্যে কেবল 'অপে'র উল্লেখ আছে দেখিয়া বিদ্যার্থীমাত্রকেই শঙ্খনাদপূর্ব্বক সাবধান করিয়া দেন নাই? তিনি বলিয়াছেন—'অত্র আকাশ প্রভৃতীনাং ত্রয়াণাম্ উৎপত্ত্যনন্তরম্ ইতি বক্তব্যম্ শ্রুত্যন্তরসামর্থ্যাৎ বিকল্পাসম্ভবাৎ চ সৃষ্টিক্রমস্য।'—অর্থাৎ আকাশাদির উৎপত্তির পরে 'অপ্' উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে ; আকাশ-বায়ু-অগ্নিকে ভুলিলে চলিবে না ; আপাত অর্থে ঠকিয়া, সর্ব্বাগ্রে 'অপ্' উৎপন্ন হইয়াছিল, এরূপ ভ্রান্ত ধারণা যেন কেহ না করেন ; কারণ, তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-বাক্যকে ঠেলা অসম্ভব, এবং সৃষ্টিক্রমও চিরকাল অব্যাহত একরূপ—উহা দুই বা ততোধিক প্রকারের হইতে পারে না, উহার বিকল্প নাই। এক্ষণে বলুন, বেদে কোন্-কোন্ স্থলে 'অপ্'কে আদি সৃষ্ট বস্তু বলা হইয়াছে ; এবং কালিদাস তদনুসারে শাস্ত্রানুযায়ী কথাই বলিয়াছেন, ইহা কিরূপে বলা চলে? বস্তুতঃ, সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে আপাততঃ বিরুদ্ধ বেদ-বাক্যগুলির শঙ্করাচার্য্যের উপদেশানুসারে সামঞ্জস্য করিয়া ব্যাখ্যা করাই কি প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের কর্ত্তব্য নহে? তবে তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও মনু 'অপে'র আদ্যত্ব কোথায় বলিলেন? মনু-বাক্যের কুল্লূকভট্ট টীকা এবং স্বয়ং মনুর উক্তি (১।৭৫-৭৮) হইতেই বুঝা যায় যে, মনু মহাভূতগণের মধ্যে 'অপে'র আদ্যত্বের পরিবর্ত্তে চতুর্থত্বের কথাই বলিয়াছেন। বেদবাক্যগুলির মধ্যেও

ঐরূপ একবাক্যতা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, 'অপে'র আত্তব কোথাও বলা হয় নাই।

সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে, 'তৎ তেজোঽসৃজত'—ছান্দোগ্য, 'তস্য অর্চ্চত আপোঽজায়ন্ত'—বৃহদারণ্যক, 'ততঃ সমুদ্রঃ অর্ণবঃ'—ঋক্, 'স ইমান্ লোকান্ অসৃজত'—ঐতরেয়, 'আপো :বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ'—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।১।৩, 'আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ'—তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৭।১।৫ ইত্যাদি আপাততঃ-বিরুদ্ধ শ্রুতি-বাক্যগুলি দেখিয়া পাছে পাঠক ঠকেন, এই আশঙ্কা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ—'তৎ তেজঃ অসৃজত" কিম্বা 'তস্য অর্চ্চত আপঃ অজায়ন্ত' বাক্য হইতে 'তেজঃ' বা 'অপ' সকলের পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা কোথায় পাওয়া যায়? 'আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ', কিম্বা 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ'—এই সকল উক্তিতে 'অগ্রে' বা 'আদৌ' অর্থে 'সর্ব্বাগ্রে' বুঝিতে হইবে, ইহা কে বলিল? আকাশাদি ভূতত্রয়ের সৃষ্টির পরে, এবং ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পূর্ব্বেই 'অপে'র আবির্ভাব; সুতরাং 'আদৌ' বা 'অগ্রে' অর্থে 'ঐ ব্রহ্মাণ্ডের আদিতে', ইহা কেন না বুঝিব? যে পাচক অন্ন, পায়স, শাক, সূপ প্রভৃতি যথাক্রমে পাক করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে যদি কেহ, 'সে শাক রাঁধিয়াছে' বা 'সে সূপ রাঁধিয়াছে' এইরূপ বলে, তাহা হইলে সে অন্যান্য দ্রব্য পাক করে নাই, বুঝাইবে কিরূপে? ঐরূপ 'সে অগ্রে শাক পাক করিয়াছিল' বলিলে 'সূপের অগ্রে' না, 'অন্নেরও অগ্রে' বুঝিব?—(শঙ্কর শারীরক ভাষ্য, ২য়, অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, ঐতরেয় ভাষ্য ও বৃহদারণ্যক ভাষ্য।)

"অতএব আমরা দেখিতেছি যে, শ্রুতি বা শ্রুতি-স্মৃতির মধ্যে সৃষ্টিক্রম সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ না থাকায়, উহার কল্পিত আশ্রয়ে কবির পক্ষ-সমর্থন আদৌ চলিতে পারে না। শ্রুতিতে বা স্মৃতিতে যে কথার অস্তিত্ব কোথাও নাই, টীকাকারগণ শ্রুতি ও স্মৃতির গলা টিপিয়া তাহাই বাহির করিবার জন্য এতকাল চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, এবং তাহারই দোহাই দিয়া কবির মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন! ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

"সংক্ষেপে আমাদিগের যুক্তি এইরূপ—

(১) মনু কোথাও বলেন নাই যে, 'অপ্' সকল ভূতের আদিতে সৃষ্ট হইয়াছিল (কুল্লূক টীকা, ১।৮ এবং মনু ১।৭৫-৭৮)।

(২) বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদির কুত্রাপি এরূপ দৃষ্ট হয় না যে, 'অপ্' আকাশ-বায়ু-অগ্নির পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল।

(৩) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-বাক্যে এবং বেদানুবাদী মনু-বাক্যে (১।৭৫-৭৮) অব্যাহত শ্রৌত সৃষ্টিক্রম উক্ত হইয়াছে। সৃষ্টি দুই প্রকার হইতে পারে না। বেদ-বেদান্তাদির মধ্যে আপাত-বিরোধ দূর করিয়া সামঞ্জস্য করিতে আমরা হিন্দুরা বাধ্য। সৃষ্টিক্রমে বিকল্প ব্যবস্থা নাই; কারণ, উহা কর্ত্তৃব্যাপারতন্ত্র নহে, উহা বস্তুতন্ত্র। এরূপ অবস্থায় তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়াই অপর সমস্ত শ্রুতি-বাক্যের অর্থ প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) নাস্তিক তর্কের খাতিরে যদি বেদবাক্যে বিরোধের অস্তিত্ব স্বীকার করি, তাহা হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেরূপ সিদ্ধান্তের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী। হিন্দু সমাজ শাস্ত্রসিদ্ধান্তে আমাদিগের মত গ্রহণ করে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হিন্দুর শাস্ত্র অবলম্বনে যাহা লিখিত, তাহার ব্যাখ্যা হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারেই করিতে হইবে।

(৫) সৃষ্টি সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ক্রমে—অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে গুণোপচয়বশতঃ আকাশ হইতে বায়ু বা বাষ্প, বাষ্প হইতে অগ্নি বা তেজ, অগ্নিময় বাষ্প হইতে তরল জলীয় অবস্থায় অপ্, এবং অপ্ হইতে কঠিন ক্ষিতির উৎপত্তি হইয়াছিল। সুতরাং 'অপ্' মহাভূতমধ্যে চতুর্থ হইতেছে।

(৬) নাটকে আলোচ্য স্থানে সমস্ত মহাভূতগুলির একত্র পাশাপাশি উল্লেখ আছে। এ ক্ষেত্রে অন্য ভূতগুলি পড়িয়া রহিল, আর, 'অপ্' আদ্য সৃষ্টি বলিয়া ঘোষিত হইল, ইহা হইতেই পারে না। 'অপে'র এরূপ অন্যায় খাতিরে অগ্নি, বায়ু ও আকাশের আপত্তি আছে।

(৭) আকাশ ও বায়ুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর তিনটি ভূতকে লইয়া ত্রিবৃৎকরণের চেষ্টায় 'তেজস্'কে—"অগ্নেঃ পার্থিবং বা আপ্যং বা ধাতুম্ অনাশ্রিত্য ইতর ভূতবৎ স্বাতন্ত্র্যেণ আত্মলাভো নাস্তি'—এই ছলে বিদায় দিয়া 'অপ্'ই দৃশ্য ভূতত্রয়ের মধ্যে প্রথম হইতেছে, ইহা বলা শোভা পায় না। কারণ, চতুর্থ আপত্তি এ স্থলেও বলবৎ থাকিতেছে।

(৮) মহাভূতগণের মধ্যে আদ্যত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'আদ্যা' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে, অন্যান্য স্থলেও যাহা স্রষ্টার দ্বিতীয় সৃষ্টি, যাহা তৃতীয়, যাহা চতুর্থ এবং যাহা পঞ্চম, এইরূপ বলিলেই যেন শোভন হইত। আবার ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, আদ্য মহাভূতকেও "আদ্যা সৃষ্টি" বলা যায় না। কারণ, সৃষ্টিক্রম পর্য্যালোচনা করিলে 'মহৎ' তত্ত্বই "আদ্যাসৃষ্টি" বলিয়া বর্ণনীয় হইবার যোগ্য হয়। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আলোচ্য অংশের অর্থ—'যাহা স্রষ্টার আদি সৃষ্টি' এরূপ হইতেই পারে না।

"এইবারে আমাদের কৃত অর্থ প্রদান করিব। বস্তুতঃ, 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা' এই বাক্যটিকে সমস্ত শাস্ত্রের সহিত অবিসংবাদে এবং সঙ্গতিপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতে হইলে, উহাকে 'সৃষ্টিকর্ত্তার যাহা আদ্যা বা প্রথমা সৃষ্টি, অর্থাৎ অপ্' এই ভাবে ব্যাখ্যা না করিয়া 'যে সৃষ্ট বস্তু স্রষ্টারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, যাহা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল" এইরূপ অর্থে লইতে হইবে। 'যা অরূপা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা স্রষ্টুরাদৌ ভবা, ব্রহ্মণোঽপি প্রাক্ বর্ত্তমানা আসীৎ অস্যা এব ব্রহ্মাণ্ডস্য ব্রাহ্মণশ্চ জাতত্বাৎ' অর্থাৎ 'অপ্' হইতেই ব্রহ্মাকে গর্ভে লইয়া ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল, (মনু ১।৮-১২) বলিয়া 'অপ্'ই স্রষ্টার অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। এখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার। স্রষ্টার পূর্ব্বে সৃষ্ট বস্তুর থাকা অসম্ভব বটে, কিন্তু 'অপ্' সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সৃষ্ট নহে, উহা পরমাত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছিল, সুতরাং বস্তুতঃ কোনও বিরোধ নাই। 'স্রষ্টৃ' শব্দের প্রচলিত অর্থ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা—যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। আমাদিগের কৃত ব্যাখ্যায় 'স্রষ্টৃ' শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করা হইয়াছে। টীকাকার-

বিচার কৃত অর্থে 'গ্রহ' শব্দ ব্যবহারেও দোষ স্পর্শে। আমাদের কৃত অর্থানুসারে শ্রুতি-স্মৃতি-নির্দিষ্ট সৃষ্টিক্রম এবং কবির যশঃ উভয়ই অক্ষুন্ন থাকে, টীকাকারদিগের অর্থে দুই পক্ষেই অনিষ্ট। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে সামাজিকগণের নিকট এই অভিনব অর্থটি নিবেদন করিলাম। আশা করি, তাঁহারা ইহা বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।"

শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক যেরূপ তর্ক উত্থাপিত করিয়াছিলেন, অন্যান্য অনেক স্থলেও আমরা প্রথমে সেইরূপ তর্কের পূর্ব্বোক্ত উত্তর প্রদান করিয়া সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ বা উপনিষৎ ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হইলেও, প্রত্যেক সম্প্রদায়ই ঐ সকল গ্রন্থের আপাতজ্ঞঃ-বিরুদ্ধ বাক্যগুলিকে আপনাদের সাম্প্রদায়িক মতানুসারে সামঞ্জস্য পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং বেদ সকল সম্প্রদায়ের মতেই অভ্রান্ত ও সত্য, এবং উহার কোথাও অসামঞ্জস্য নাই। অতএব একই বস্তু সম্বন্ধে বেদের বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন মত প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহা কোন মতাবলম্বীই বলিতে পারেন না। সুতরাং তৈত্তিরীয়োপনিষদের স্পষ্ট উক্তির সহিত সকল সম্প্রদায়কেই সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে হয়। এইরূপে 'অপ্' সর্ব্বত্রই চতুর্থ মহাভূত বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। অতএব কালিদাস স্বসম্প্রদায়ের মতানুসারে 'অপ্'কে "আদ্যা সৃষ্টি" বলিয়াছেন, এ কথা কেহ এক মুহূর্ত্তও ভাবিতে পারিবেন না।

কুমারের দ্বিতীয় সর্গে পঞ্চম শ্লোকে 'অপ্' হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। এখানেও আকাশাদির উল্লেখের কোনও প্রয়োজন না থাকায়, তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই।

কাশ্মীরের স্বভাবজ সম্পদ

[শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত এম-আর-এ-এস]

অতি পুরাকাল হইতেই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি বিশ্ব-বিখ্যাত। দেশীয় ও বিদেশীয় কতই কবি, ঐতিহাসিক ও পর্য্যটকের লেখনীতে হিমালয়-ক্রোড়স্থিত এই ক্ষুদ্র উপত্যকার মাধুরী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু কাশ্মীর যে শুধুই রূপ, গন্ধ ও বর্ণের অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র নহে, ইহার জলে ও স্থলে যে অগাধ সম্পদ লুক্কায়িত রহিয়াছে, এবং বর্ত্তমান যুগোচিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ে তৎ সমুদয় ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্যে পরিণত হইতে পারে, তাহা সকল লেখক সম্যকরূপে বিবেচনা করেন নাই। আমরা সেইজন্য কাশ্মীর সম্বন্ধীয় অন্যূন পঞ্চাশখানি আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে কেবল দুই-চারিখানিতেই কাশ্মীরের খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থ সমূহের উল্লেখ দেখিতে পাই। আবার এবম্বিধ পুস্তক সমূহের মধ্যে লরেন্স সাহেবের "ভ্যালি অব্ কাশ্মীর" নামক গ্রন্থই এখনও প্রামাণ্য হইয়া রহিয়াছে।

কাশ্মীরের কৃষি ও শিল্পজাত অথবা স্বভাবজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধে সাধারণের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি এতটা কম হওয়ার অন্যতম কারণ এই যে, কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাশ্মীর বড় সহজগম্য স্থান ছিল না। পুরাকালে কাশ্মীর যাইবার ৪।৫টি রাস্তা ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু ঐ সমুদয় কখনই ব্যবসায়ের পক্ষে তাদৃশ উপযোগী ছিল না। বহুমূল্য পশমী ও রেশমী বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা বাদলার কাজ—যে সমুদয় দ্রব্য সমধিক ব্যয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দূর দেশে লইয়া গিয়া বিক্রয়ে লাভ থাকে—সেই প্রকার দ্রব্যই সচরাচর বিদেশে বিক্রয়ের জন্য যাইত। অপরাপর অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া বণিকগণের তেমন লাভ হইত না বলিয়া ঐ সমুদয় বহির্ব্বাণিজ্যে স্থান পাইত না।

বস্তুতঃ ১৮৯০ সাল হইতেই কাশ্মীরের সহিত বহির্জগতের অবাধ সংযোগ স্থাপিত হয়। এই বৎসরেই প্রথমে রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত শকট-পথ খোলা হয়। এই পথের কোহালা হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত অংশ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত। ইহা নির্ম্মাণের ব্যয় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাতেও বাণিজ্যের সুবিধা হইতেছে না দেখিয়া, রাজ্যের কর্ত্তৃপক্ষ আবটাবাদ হইতে বরাহমূলা পর্য্যন্ত একটি অন্তরীক্ষ-রেলপথ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। উহা রাজধানী শ্রীনগরের সহিত বৈদ্যুতিক ট্রাম গাড়ী দ্বারা সংযোজিত হইবে। এই পথ প্রস্তুত করিবার আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা। আপাততঃ রাওলপিণ্ডির পথে বরাহমূলার দূরত্ব প্রায় ১৫০ মাইল। ডাক টোঙ্গা যাইতে প্রায় তিন দিন এবং কেরাচি অথবা মালগাড়ী যাইতে অন্যূন ১৫ দিন লাগে। সেই স্থলে আকাশ-রেল-পথের দূরত্ব প্রায় ৭৫ মাইল ভ্রমণের সময় প্রায় ১৫ ঘণ্টা লাগিবে। যাত্রীগণের ইহাতে বিশেষ সুবিধা না হইলেও ব্যবসায়ীগণের যথেষ্ট উপকার হইবে।

কাশ্মীর-গমনের বর্ত্তমান পথের অবস্থা এইরূপ। এক্ষণে প্রকৃত দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে কাশ্মীর—কাশ্মীর ও জম্মুর মহারাজার রাজ্যের এক অংশ মাত্র। সম্পূর্ণ রাজ্য জম্মু, কাশ্মীর, গিলগিট্, লাডক, তাণ্ডারা জায়গীর, পুঞ্চ এবং সীমান্ত প্রদেশস্থ এপামা লইয়া গঠিত। ইহাদের মোট আয়তন ৮৪,৪৩২ বর্গ মাইল। তাহার মধ্যে প্রকৃত কাশ্মীর প্রায় ৭০০০ বর্গ মাইল। কাশ্মীরকে সাধারণতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—উত্তর কাশ্মীর অথবা কামরাজ, দক্ষিণ কাশ্মীর এবং মজঃফরাবাদ। অনেক কাশ্মীর-পর্য্যটকই অবগত আছেন যে, উক্ত দেশের অধিকাংশ স্থানই গিরি-সঙ্কুল ও বন্ধুর। অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গসমূহ মনুষ্যাবাস-বিরল এবং তদ্রূপ স্থান চাষ-আবাদের পক্ষেও অপ্রশস্ত। বস্তুতঃ কাশ্মীরের যে অংশটুকুতে বিতস্তা অথবা তাহার শাখানদীসমূহ প্রবাহিত, সেই অংশই কাশ্মীরের লোকালয় এবং তাহাকেই কাশ্মীর-উপত্যকা বলা হয়। এই স্থানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০ মাইল এবং প্রস্থে ২৫ মাইল। আয়তন প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল।

ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের ন্যায় কাশ্মীরও কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষিই অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা। ভারতগভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক

প্রকাশিত Agricultural Statistics of India, Vol II. 1912-13 নামক কৃষি-বিবরণে দেখা যায় যে, কাশ্মীর দেশে উৎপাদিত ফসল-সমূহের মধ্যে ধান্য, গোধূম, যব, বজরা, মণ্ডুয়া, ভুট্টা, তিসি, তিল সরিশা, কার্পাস, তামাক, সিদ্ধি, ফল এবং সব্জী প্রভৃতিই অন্যতম। ইহার মধ্যে, কেবল চারিটি ফসল বড় বলিয়া গণনা করিতে পারা যায়—ধান্য, গোধূম, ভুট্টা ও তিসি। ইহাদের চাষ লক্ষাধিক বিঘাতে হইয়া থাকে। ধান্যই সর্ব্বপ্রধান ফসল। মোট ৭৮৯,৮৯৯ একর কর্ষিত জমির মধ্যে ২৯৮,৬৫১ একরে ধান্য উৎপাদিত হয়। সুতরাং আবাদী জমির শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ ধান্যই অধিকার করে। পূর্ব্বোক্ত চারিটি প্রধান ফসলের পর যব ও সরিশার উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইহাদের প্রত্যেকের চাষের জমি ৩০,০০০ বিঘার উপর। অন্য সমুদয় ফসলের উৎপাদনের মাত্রা, সামান্য। ইহা হইতে সহজে অনুমান করিতে পারা যায় যে, কাশ্মীরের, প্রায় তিন লক্ষ লোকের আহার্য্যের সংস্থান করিয়া উক্ত দেশ হইতে কোন কৃষিজাত দ্রব্য আপাততঃ রপ্তানি হইতে পারে না। আবার ফসল-সমূহের এমন কোন বিশেষ গুণ কিম্বা উৎকর্ষতা নাই যে, বিদেশে নীত হইলেও তৎসমুদয় প্রতিযোগিতায় বাজারে স্থান পাইতে পারে। পক্ষান্তরে এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধুনা কর্ষিত জমি ভিন্ন কাশ্মীরে প্রায় ২৫৫০৭১ একর কর্ষণযোগ্য এবং ৩৮,৩৭৪ একর পতিত জমি আছে। রপ্তানির খরচ সুলভ হইলে, এই সমুদয় জমির আবাদ হইতে পারে; কিন্তু কোন সাধারণ কৃষিজাত ফসল দ্বারা বহির্ব্বাণিজ্যে কাশ্মীর যে কোন সময়ে লাভবান হইতে পারিবে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্র ও উদ্যানজাত ফসলের পক্ষে কাশ্মীরের বিশেষ-বিশেষ স্থানের মৃত্তিকা ও জলবায়ু অত্যন্ত উপযোগী; যদি সেইরূপ ফসল নির্ব্বাচিত হইয়া উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে অবশ্য লাভের সম্ভাবনা আছে।

এবম্বিধ বিশেষ উদ্ভিদের কথা বলিতে গেলে, প্রথমেই ফল চাষের বিষয় বলিতে হয়। শৃঙ্গ-রেলপথে ফল-ব্যবসায়ের যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্যবসায়ের মূলীভূত ফল প্রথমে উৎপাদিত হওয়া আবশ্যক। আপাততঃ কাশ্মীর হইতে কতক পরিমাণ ফল রপ্তানি হয়; কিন্তু সেগুলি অযত্ন-সম্ভূত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বতন কাল অপেক্ষা বাগানের সংখ্যা এখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই, এবং পূর্ব্বে যে প্রথায় চাষ হইত, এখনও তাহাই চলিয়া আসিতেছে। বরং ২।৪টি ভাল-ভাল বাগান অবহেলায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার কালিফর্ণিয়ার, ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের স্থানে-স্থানে, ইতালী ও দক্ষিণ-ফ্রান্সে বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদয় বিশাল ফলক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যেরূপ উন্নত প্রণালীতে চাষ ও ব্যবসায় চলিতেছে, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় সেইরূপ কতিপয় প্রথা কাশ্মীরে অবলম্বিত না হওয়া পর্য্যন্ত, বৃহত্তর ফল-ব্যবসায়ের কোন আশা নাই। কাশ্মীরের অনেক স্থানে আদর্শ ফলক্ষেত্র হইতে পারে। ফলের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কাশ্মীর এখনও অগ্রগণ্য। সেও, নাসপাতি, বিহিদানা, আড়ু, খোবাণি, বাদাম, দাড়িম্ব, তুঁত, আখরোট, খরমুজা, কুটি, আঙুর এবং ইংরাজ-প্রিয়, Plum, Hazelnut, Strawberry, Raspberry, Currant, Cherry, Gooseberry, প্রভৃতি ফলের কর্ষণজাত ও অর্দ্ধবন্য বৃক্ষ কাশ্মীরের অনেক স্থানেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ফল-চাষে যে নির্ব্বাচন ও সুপ্রজনন অত্যন্ত আবশ্যক, এবং তদ্ভিন্ন বিভিন্ন জাতির অবাধ সঙ্কর উৎপাদনে যে ফসলমাত্রেই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, তাহা অনেকেই বুঝেন না। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে শিক্ষিত কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে এখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাশ্মীর-দরবার ফল-চাষের উন্নতির জন্য সামান্যই চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় যে ভবিষ্যতে অর্থ-বৃদ্ধির অন্যতম উপায়, তাহা সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন।

আর এক শ্রেণীর উদ্ভিদের চাষ কাশ্মীরবাসীর পক্ষে লাভজনক হওয়া সম্ভব। অনেকেই অবগত আছেন যে, আমরা আজকাল যে সমুদয় অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করি, তাহার অধিকাংশই বিদেশে বিদেশীয় উপাদানে প্রস্তুত। কিন্তু সেই সমুদয় উদ্ভিজ্জ উপাদান অথবা তাহাদের সহিত ঘনিষ্ট-সম্পর্কিত সমগুণ-বিশিষ্ট উদ্ভিদ কাশ্মীর উপত্যকায় এবং চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে জন্মিয়া থাকে। যে সকল ঔষধার্থ ব্যবহৃত উদ্ভিদ্ এখন জন্মায় না, তৎসমুদায়ও কাশ্মীরের ন্যায় জল-বায়ু ও প্রাকৃতিক গুণবিশিষ্ট দেশে সহজে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় Materia Medica Farmiug অর্থাৎ ভেষজ উদ্ভিদের চাষ কাশ্মীরবাসীর পক্ষে লাভজনক ব্যবসায়। স্বকীয় অনুসন্ধানের ফলে আমরা অবগত আছি যে, আপাততঃ কাশ্মীরে মিঠা তেলিয়া (Aconite), রেষাতমি (Althae), বেলাডোনা (Belladona), সুরিঞ্জন (Colchinium) পঞ্জাবী ধুতুরা (Datura Stramonium), খোরাসানি আজোয়ান (Hyoseyamus), সালেপ মিছরি (Salep) পোডোফাইলাম (Podophyllum) রেউচিনি (Rhuburb) মুস্কবালা (Valerian), প্রভৃতি অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের অত্যাবশ্যক উপাদান এক্ষণে বন্য অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ এইগুলি লইয়াই ব্যবসায় আরম্ভ হইতে পারে। পরে চাষ দ্বারা উক্ত উদ্ভিদ্-সমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করাইয়া এবং ডিজিট্যালিস (Digitalis), ইপিকাস (Ipecacuahua) জ্যালাপ (Jalup) প্রভৃতির প্রবর্ত্তন করিয়া ভেষজ উদ্ভিদ্-ব্যবসায় দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা যাইতে পারে। কেশর, রুট, বিহিদানা, সা-জিরা, ধূপ প্রভৃতি দ্রব্য ঠিক ভেষজ উদ্ভিদ্ না হইলেও, এইগুলি এবং কতকগুলি মশলা ও গন্ধ-দ্রব্য এই ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়। তাহাতে ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। এতদ্দেশে এখনও ঔষধার্থ লতা-গুল্মাদির চাষ হয় নাই। এক সময় বন্য বৃক্ষাদিই প্রচুর ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই; এবং ক্রমশঃ বিবেচনাহীন সংগ্রহের দোষে থাকিবে না। এরূপ স্থলে ভেষজ উদ্ভিদের চাষ অপরাপর ফসল চাষের ন্যায় লাভজনক হইবে সন্দেহ নাই।

কাশ্মীরে যথেষ্ট পরিমাণে Willow (স্থানীয় নাম বেত) জন্মিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে পশুর খাদ্য, গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণ এবং ঝুড়ি-

চারি প্রকার গৃহ-সজ্জার দ্রব্যের জন্ম ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু জাপানে এইরূপ বৃক্ষ হইতে উৎপাদিত নানাবিধ ব্যবহার্য্য সাজ, সজ্জা, পেটরা, ঝুড়ি, মাদুর, খেলনা, প্রভৃতির বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, কাশ্মীরে বেত ও সমধর্ম্মবিশিষ্ট অন্যান্য উদ্ভিদের সাহায্যে একটি বড় সাজ-সজ্জার কারখানা খোলা যাইতে পারে, এবং তাহাতে লোকসান হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই।

কাশ্মীর রাজ্যের বন-বিভাগ দুই-একটী ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তন্মধ্যে তার্পিন উৎপাদন অন্যতম। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা অবগত হইয়াছিলাম যে, কাশ্মীরে পাইন (চির) ও কার-অধিকৃত স্থানের আয়তন, ১০০০ বর্গ মাইলের কম হইবে না। সুতরাং তার্পিন প্রস্তুতের উপাদানের অভাব নাই। প্রতিবন্ধক কেবল গন্ধ-বিরোজা সংগ্রহের অসুবিধা এবং উৎপন্ন তার্পিন ও রজন সমতল দেশে চালান দেওয়ার ব্যয়-বাহুল্য। রামপুর ও মোহরার নিকটবর্ত্তী স্থানে কারখানা খোলা হইলে বৈদ্যুতিক শক্তি সহজে পাওয়া যাইতে পারে। ভারতেও নৈনিতালের সন্নিহিত যে সরকারী তার্পিনের কারখানা বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে, তাহাও নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেসন হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে গিরিশিখরে অবস্থিত।

অধুনা কাগজের যে কত অভাব, তাহা সকলেই জানেন। যে মসলা হইতে কাগজ উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ Wood-pulp (কাষ্ঠপিণ্ড) তাহা হইতেই আবার নানা রকম দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। কাশ্মীরের পর্ব্বতাদির বৃক্ষাবলী কাটিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া নিম্নদেশে আনিতে অনেক খরচ হয় ও লোকসানও হইয়া থাকে। তৎপরিবর্ত্তে দেশ-মধ্যে কোন উপযুক্ত স্থানে যদি কাষ্ঠপিণ্ড প্রস্তুত করিবার কল স্থাপিত হয়, এবং তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে কাষ্ঠপিণ্ড প্রস্তুতই কাশ্মীরের অল্প মূল্যের কাষ্ঠের সদ্ব্যবহারের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণনা করিতে হইবে। আর ইহাও সম্ভব যে, অচিরে ভারতে কাষ্ঠপিণ্ড হইতে কাগজাদি প্রস্তুতের জন্ম কল স্থাপিত হইবে।

উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদির যেরূপ সদ্ব্যবহার হইতে পারে, তাহার দুই-একটী উদাহরণ আমরা এ স্থলে দিলাম। প্রাণীজ দ্রব্যাদি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা যায়। চর্ম্ম, রেশম, পশম ও তজ্জাত দ্রব্যাদি এখন কাশ্মীরে অল্প-বিস্তর পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। রেশম চাষের ব্যবস্থা কাশ্মীর দরবার কতক পরিমাণে করিয়াছেন; এবং যে রেশমসূত্র প্রস্তুতের কারখানা অগ্নিতে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তাহা জগতের মধ্যে অন্যতম প্রধান কারখানা ছিল। তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু কাশ্মীরের যে পশম বিশ্ববিখ্যাত, তাহার উৎপাদন বৃদ্ধি অথবা উৎকর্ষ সাধনের জন্ম এ পর্য্যন্ত সেরূপ চেষ্টা হয় নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এইরূপ চেষ্টা করিতে হইলে, প্রথমেই মেষ-জননের উপর মনঃসংযোগ করা আবশ্যক। আপাততঃ ছাগ, মেষ ও গবাদি পশুর জনন ও ব্যবসায় অর্দ্ধসভ্য গুজরগণের হস্তে ন্যস্ত। কাশ্মীর উপত্যকায় এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতরাজির ক্রোড়ে এমন অনেক স্থান আছে, যাহা পশু-প্রজনন ও পালনের আদর্শ ক্ষেত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেরূপ প্রথায় বিশেষ-বিশেষ পণ্য উৎপাদনের জন্ম বিশেষ জাতীয় পশু পালিত হইয়া থাকে, এতদ্দেশেও সেইরূপ প্রথা অবলম্বিত হওয়া উচিত—অর্থাৎ পশম, দুগ্ধ মাংস ও ভারবহনের জন্ম বিভিন্ন জাতীয় পশু। তাহাদের কৌলিন্য পরিরক্ষিত হওয়াও বিশেষভাবে আবশ্যক। এখনকার যথেচ্ছ প্রতি-পালন-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া বর্ণ, ধর্ম্ম, ও গঠন নির্ব্বাচনে বিশেষ-বিশেষ কার্য্যের জন্ম বিভিন্ন শ্রেণীর পশুপাল প্রজনন করিলে, ভবিষ্যতে একটি সুমহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

কাশ্মীরের হ্রদ ও ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদীসমূহ মৎস্য-জনন ও পালনের যেরূপ বিস্তৃত ক্ষেত্র, সেরূপ ভারতের আর কুত্রাপি আছে কি না সন্দেহ। দুই-এক শ্রেণীর বিলাতী মৎস্য উৎপাদনের চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও, অদ্যাবধি নানা জাতীয় দেশীয় মৎস্যকুলের বংশ বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এইরূপ মৎস্য-জনন ও নানা প্রকারে সংরক্ষিত মৎস্যের কারবার ভবিষ্যতে অর্থাগমের একটি প্রকৃত উপায়। কি পশু-জনন, কি মৎস্য-জনন—উভয়েরই আনুসঙ্গিক ব্যবসায়াদির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, সংরক্ষিত মাংস, পশম, ক্ষুর, শিং, চামড়া ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, গ্লিসারিন, সংরক্ষিত মৎস্য, মৎস্যের তৈল, জিলাটিন, শিরিস এবং পশুজ ও মৎস্যজ সার—এ সমস্তই পশু ও মৎস্য-জননকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইতে পারে।

কাশ্মীরে খনিজ দ্রব্যাদির অপ্রতুল নাই। তবে দুর্গম রাস্তা, দক্ষ ও যথেষ্ট মজুরের অভাব, এবং স্বল্প উদ্যম ও অধ্যবসায়—এই সমুদায়ই ব্যবসায়ের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। পাদুর নামক স্থানে মূল্যবান নীলকান্তমণি, কুটিহার ও জম্মুর পর্ব্বতশৃঙ্গে তাম্র, পীরপঞ্জাল, মেরুবদ্ধন ও জম্মুর কতিপয় স্থানে সীসক, গুলমার্গের নিকটবর্ত্তী সিন্ধো ও ঝিলম নদীর গর্ভে স্বর্ণরেণু, এবং দেশের নানা স্থানে নিকৃষ্ট জাতীয় পাথুরে কয়লা ও লৌহ—এই সমুদয় খনিজ পদার্থের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। এতদ্ভিন্ন আরও নানা রকম ব্যাবহারিক খনিজ পদার্থ এতদ্দেশে পাওয়া যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে কাশ্মীর মিনারল্ কোম্পানি নামে একটি বিলাতী কারবার বনিয়ার, রামনদী ও পাদুর কেন্দ্রে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ-দরবারের সহিত কোন কারণে গোলযোগ হইয়া কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমরা আশা করি যে, অচিরে দেশীয় জনগণই দেশের খনিজ সম্পত্তি উদ্ধারের জন্ম বদ্ধপরিকর হইবেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত যতদূর আলোচনা করিলাম, তাহাতে পাঠকবর্গ সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, কাশ্মীরে স্বভাবজ দ্রব্যের অভাব নাই। কিন্তু স্বভাবজ দ্রব্য থাকা এক কথা, আর তাহা বাণিজ্যোপযুক্ত পণ্যে পরিণত হওয়া আর এক কথা। আরও একটী বিষয় স্মরণ রাখা উচিত যে, অধিক ধনাগম করিতে হইলে, দেশে এমন শ্রেণীর শিল্প উৎপাদিত হওয়া উচিত, যাহা জনসাধারণের ব্যবহার্য্য, যাহা সখের জিনিস নয়, নিত্য আবশ্যক। আপাততঃ কাশ্মীরে যে দুই-চারিটী সুপরিচিত শিল্প আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর। তৎসমুদায়ের উন্নতি সাধিত

হওয়া বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পের প্রতিষ্ঠা হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইলে, ইহাও ভাবিতে হইবে যে, কাশ্মীরে গমনাগমনের পথ এ সময়ে সুগম হইতেছে, এবং আকাশ-রেল হইলে আরও সুগম হইবে। যে দেশের অধিকাংশ ধন-সম্পত্তি কেবল স্বভাবজ দ্রব্য এবং শিল্পাদি সামান্য, সেরূপ দেশে বিদেশীয় বণিকের পথ অবাধ হইলে দেশ যে ক্রমশঃ পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে এবং জীবন-ধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইয়া উঠিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া এবং কৃত্রিম উপায়ে অভাব-সমূহের সৃষ্টি করিয়া, ভারতের অনেক স্থল, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ যে কিরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে, তাহা কাশ্মীরবাসীর প্রণিধান-যোগ্য। দেশীয়গণ স্বগৃহে বিদেশী ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় শিল্পাদি উৎপাদনে অক্ষম ; কিন্তু বিদেশী সওদাগরগণ চাকচিক্যশালী পণ্যভার লইয়া প্রতিক্ষণ দ্বারে করাঘাত করিতেছে—এরূপ অবস্থায় চাষ আবাদ অথবা স্বভাবজ দ্রব্য বিক্রয়ে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইতেছে, তাহার প্রায় সমস্তই ভিন্ন দেশীয় কারখানাওয়ালাদের উদর পূরণার্থ দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে।

সেইজন্য আমরা বলি যে, যদি বর্ত্তমান যুগে বাণিজ্য-ক্ষেত্র গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে গণ্ডী খুলিয়া দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আত্ম-সংরক্ষণের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের পক্ষে এই বিষয়ে জাপানের মহত্তম দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। দূরদর্শী, তীক্ষবুদ্ধি জাপানীগণ বিদেশীয়কে দেশমধ্যে অবাধ-প্রবেশাধিকার প্রদানের সমকালেই শুধুই যে তৎকালীয় দেশজাত শিল্পাদির সংস্কার করিয়া দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে ; সেই সময় হইতেই তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন যে, বিদেশীয় বণিকেরা যে সমস্ত দ্রব্য আনিয়া দেশে বিক্রয় করিবে, তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় সেই সকল দ্রব্য স্বদেশেই প্রস্তুত করিবেন। ফলে, বর্ত্তমান সময়ে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, জাপান বিদেশীয় বণিকের লীলাক্ষেত্র হওয়া দূরে থাকুক, জাপানী বণিকই ক্রমশঃ তাঁহার বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লইতেছেন। কিন্তু ইহা করিতে হইলে, জাপানী শ্রম-সহিষ্ণুতা, একাগ্রতা ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। কাশ্মীরে তীক্ষবুদ্ধি জননায়কের অভাব নাই। তাঁহারা এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইলে, কাশ্মীরের বাণিজ্যশ্রী প্রতিষ্ঠিত হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। ভারতের শিল্পদেশে যে নব উদ্দীপনা প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহা কাশ্মীরে যাইতে বিলম্ব হইবে না ; এবং আমরা আশা করি যে, বৃহত্তর ভারত অগ্রসর হইলে কাশ্মীরও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

বিলম্বিতা

[শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ]

রজনীকান্ত দোকানের তাগাদা শেষ করিয়া রাত্রি ১০টার পর বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, মোহিনী শয্যায় নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে। "আজ আবার অসুখ বেড়েছে? রান্না-বান্না তা'হ'লে কিছুই হয়নি বোধ হয়?" বলিয়া সে গায়ের মলিন উড়ানিখানি খুলিয়া একটা টিনের তোরঙ্গের উপর রাখিয়া, নিতান্ত অপ্রসন্নমুখে শয্যার অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বহু কষ্টে উঠিয়া বসিয়া মোহিনী বলিল—"আজ আর কিছুতে পারলাম না। ঘরে চাট্টি চিঁড়ে ছিল, তাই ভিজিয়ে রেখেছি। তেঁতুল, গুড় আর চিঁড়ে এই ঘরেই ঢাকা আছে।"—সারাদিন পরিশ্রমের পর প্রচুর ক্ষুধা লইয়াই রজনী গৃহে ফিরিয়াছিল। তাহার উপর আহারের এরূপ অবস্থা দেখিয়া তাহার বিলক্ষণ ক্রোধ ও বিরক্তির উদয় হইল ; কঠোর স্বরে বলিল—"না, আর ত চলে না। উপোস করে ত আর পারি না।" মোহিনী কাতর স্বরে বলিল,—"আমার কি সাধ, যে, এই খাটুনির পর তোমাকে উপোস করিয়ে রাখি! কি করব, আজ যে কিছুতে উঠ্‌তে পারলাম না।" জানিয়া-শুনিয়াও রাগের মাথায় রজনী হঠাৎ একটা নির্ম্মম কথা কহিল,—"শুয়ে থাক্‌লে যদি চলে, তা'হ'লে কি কেউ খাট্‌তে চায়?" ইতঃপূর্ব্বে কখন সে এমন কঠোর কথা বলে নাই। মোহিনী নীরবে চক্ষু মুছিল।

একটু বিশ্রামের পর একপাত্র চিপিটক উদরস্থ করিয়াই রজনীর মেজাজ কোমল হইয়া আসিল। মোহিনী অতি কষ্টে উঠিয়া কলিকাটি সাজিয়া স্বামীর হাতে দিল। স্ত্রীর পানে চাহিতেই তাহার দৃষ্টি হইতে সমস্ত কাঠিন্য মুছিয়া গেল। সে ব্যথিত হইয়া বলিল—"আহা, আজ যে হাত, পা, মুখ সব ফুলে গিয়েছে দেখ্‌ছি!"—মোহিনী ঈষৎ অভিমানের সহিত বলিল—"তা নইলে কি আমি শুধু-শুধু বিছানায় পড়ে থাকি!"

অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া স্ত্রীর পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে ও উত্তপ্ত ললাটে হাত বুলাইতে-বুলাইতে রজনী বলিল—"দিনকের দিন আমি যেন একটা জানোয়ার হয়ে যাচ্ছি। কিসে

লাগলে আমার আর জ্ঞান থাকে না।"—অভিমানের মেঘ মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। মোহিনী গাঢ় অনুরাগভরে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"আহা, খিদে আর পাবে না! সেই ছপুরবেলা এক-তরকারী ভাত খেয়ে গিয়েছ, আর এখন এসে চাট্টি চিঁড়ে খেলে—পুরুষ মানুষের কি এত কষ্ট সহ্য হয়!"

আপনাদিগকে অপরাধী ভাবিতে-ভাবিতে দু'জনেই ধীরে-ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল। পর্ণকুটীরের শত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও এই ছটী হৃদয়ের প্রেমের স্নিগ্ধ দীপ-শিখাটী যে অম্লান, শান্ত জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছিল, তাহা অশেষ-বিধ বিলাস-বাহুল্য-মণ্ডিত সুরম্য অট্টালিকাতেও দুর্লভ।

(২)

রজনীকান্ত কায়স্থের ছেলে। কিন্তু লেখাপড়া শিখিতে পারে নাই বলিয়া অন্য চাকুরী তাহার অদৃষ্টে জুটে নাই; মাসিক ১২৲ টাকা মাহিনায় এক দোকানদারের ঘরে তাহাকে গোমস্তাগিরি করিতে হইতেছে। এ দেশে নিরক্ষর শ্রমজীবীর অন্নকষ্ট নাই; কিন্তু অনেক নিরক্ষর ভদ্রসন্তানকে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হয়। তাহারা যদি ছুতার ও রাজমিস্ত্রী ইত্যাদির কাজ শিখা অপমানজনক মনে না করিত, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অনায়াসেই তাহাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইত। হীন শ্রমজীবীর কার্য্য করিলে যে তোমার নিন্দা করিবে, সে ত একদিনের জন্যও তোমার ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া, তোমার ক্ষুধার গ্রাস যোগাইবে না!

ছয় বৎসর বয়সে রজনীর পিতৃ-বিয়োগ হয়। বিধবা মাতা অনেক কষ্টে—লোকের নিকট চাহিয়া-চিন্তিয়া, এবং আপদে-বিপদে প্রতিবেশীদিগকে যে কায়িক সাহায্য করিতেন তাহার বিনিময়ে নানাবিধ সাহায্য পাইয়া রজনীকে "মানুষ" করিয়াছিলেন। রজনীর দশ বৎসর বয়স হইতেই সে এক দোকানদারের ঘরে কাজ শিখিতে লাগিল। সেই রজনী যখন অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক হইয়া, গোমস্তার কাজ করিয়া, মাসে-মাসে মায়ের হাতে দশটী করিয়া টাকা আনিয়া দিতে লাগিল, তখন একটী পুত্রবধূ আনিয়া পুত্রটীকে 'স্থিতু' করিয়া দিবার বাসনা তাঁহার বড়ই বলবতী হইল। এক বৎসর ধরিয়া বহু চেষ্টা করিয়া, ও নিজের শেষ সম্বল দু'খানি জীর্ণ স্বর্ণালঙ্কার বিক্রয় করিয়া, তিনি পুত্রবধূ ঘরে আনিয়াছিলেন। তার পর এক বৎসরের মধ্যেই পৌত্রমুখ সন্দর্শন করিবার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি অন্তর-নিবদ্ধ রাখিয়াই তিনি পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। সে আজ প্রায় সাত বৎসরের কথা।—তাহার পর সুখে-দুঃখে দরিদ্র দম্পতির জীবন কাটিয়াছে। তিন মাস পূর্ব্বে মোহিনী একটি মৃত সন্তান প্রসব করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। রোগ ক্রমশঃ সূতিকায় দাঁড়াইয়াছে। ঘরের অর্দ্ধেক পিতল-কাঁসার বাসন বিক্রয় করিয়া দুই-চারি দিন ডাক্তার দেখান হইল। বাসন বিক্রয়ের পয়সাও ফুরাইয়া আসিল, ডাক্তার দেখানও বন্ধ হইল। রোগিনীর অবস্থা বলিয়া রজনী গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে ঔষধ আনিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। ইহার উপর সংসারের কাজকর্ম্মও চলিতে লাগিল, নহিলে গরীবের সংসার চলিবে কি করিয়া!—শেষে মোহিনীর সর্ব্বশরীর ফুলিয়া পড়িল।

(৩)

প্রতিবেশী হরিদাস ঠাকুরই রজনীর দুর্দ্দিনের বন্ধু। ঘরে চাউল না থাকিলে তিনিই তাহার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; মাঝে-মাঝে টাকাটা-সিকাটা তিনিই ধার দেন এবং প্রত্যেক বারেই তাহার তাগাদা করিতে ভুলিয়া যান। রজনী ঋণ স্বীকার করিয়া কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে গেলেই, হরিদাস বলিতেন—"তোমরা বাপু কি করে দেনা-পাওনার হিসাব মনে করে রাখ, আমি তাই ভাবি। দিন-পনর আগে আমি নিজে যে তোমার কাছ থেকে টাকা দুটো চেয়ে নিয়ে গেলাম।" অশিক্ষিত হইলেও রজনী এ মহত্ত্বের মর্য্যাদা বুঝিত। উপরের দিকে চাহিয়া, যাঁহার উপর পৃথিবীর সকল ভারই ন্যস্ত, তাঁহারি উপর ইহার প্রত্যুপকারের ভার দিয়া সে নিশ্চিন্ত হইত।

সকালে উঠিয়াই রজনী হরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিয়া মোহিনীর অবস্থা দেখাইল। হরিদাস ঠাকুর রজনীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—"বৌমার অবস্থা বড় ভয়ানক হয়েছে। এখন কোম্পানীর ডাক্তারের ঔষধ খাইয়ে এ রকম করে ফেলে রাখ্‌লে এঁকে আর বাঁচান যাবে না।"—রজনীর মুখ শুকাইয়া গেল; বলিল—"কি করব খুড়ো মশায়, এখন তাই বলুন। ঘরে যে ক'খান বাসন-কোসন আছে, তাই বিক্রী করে আবার ডাক্তার নিয়ে আসবো?" হরিদাস।—"তা যেন এবার আন্‌লে; কিন্তু এ রকম করে ক'দিন চল্‌বে?"

রজনী—"তা হ'লে কি হবে?"—হরিদাস।—"দেখ বাবা, আমি যা বলি তাই কর। কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বৌমাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেখে দিয়ে আসি, সেখানকার চিকিৎসা ও সুব্যবস্থার গুণে দু'এক মাসের মধ্যেই নির্দোষ হয়ে সেরে উঠবেন, একটী পয়সাও তোমার খরচ হবে না।"

হাসপাতালের নাম শুনিয়াই রজনী চমকিয়া উঠিল। মেয়েমানুষ—ঘরের বউ—হাসপাতালে যাইবে কি করিয়া? হরিদাস ঠাকুর অনেক করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহাতে কোন দোষ নাই, বড়লোকের ছেলেমেয়েরাও সেখানে যায়। সেখানে কত বড়-বড় ডাক্তার, মেমেরা সব সেবা করে—সে রকম চিকিৎসা বড়-বড় জমিদারেরাও করাতে পারেন না—ইত্যাদি সব বিশদরূপে বলিলেন।

উপায়ান্তর না দেখিয়া রজনী অগত্যা সম্মত হইল। কলিকাতা যাইতে হইবে শুনিয়া মোহিনী রজনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি আমার সঙ্গে যাবে ত?" রজনী বলিল—"আমি কেমন করে যাব? আমাকে ত সেখানে থাকৃতে দেবে না।"

মোহিনী তখন বলিল—"তা'হ'লে আমিও যাব না। হাসপাতালে আমি বুঝি একলাটী থাকৃব—বেশ ত!"

'পাখীপড়ান' করিয়া বুঝাইয়া তবে মোহিনীকে রাজী করিতে হইল। হরিদাস ঠাকুর গোপনে মোহিনীকে বুঝাইয়াছিলেন যে, এখানে থাকিলে অর্থাভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইবে না, এবং তাহাকে বিনা চিকিৎসায় রাখিলে রজনীর মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না। তাহার উপর রজনী যদি দোকান কামাই করিয়া ঘরে বসিয়া স্ত্রীর সেবা করে, হয় ত চাকরিটী পর্য্যন্ত খোয়া যাইবে—ভাবিয়া-ভাবিয়া রজনী শেষটা হয় ত পাগল হইয়া যাইবে।

পরদিন ভোরের ট্রেণে হরিদাস ঠাকুর মোহিনীকে লইয়া কলিকাতা যাইবেন, কথা রহিল। আসন্ন বিচ্ছেদ সম্মুখে করিয়া উভয়েরি চক্ষে কিয়ৎক্ষণের জন্যও নিদ্রা আসিল না।

দোকান হইতে অনেক বলিয়া-কহিয়া রজনী পাঁচটা টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। গাড়ীভাড়ার জন্য তাহা হরিদাস ঠাকুরকে দিতে গেলে, তিনি নিরতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"সে যে সরকারের কত বড় হাসপাতাল তা'ত জান না! আমি এখন ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি,—যাওয়ামাত্র তা'রা কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব ক'রে সব মিটিয়ে দেবে—তোমায় দিতে হবে না।" গাড়ী চলিয়া গেল। রজনী চোখ মুছিতে-মুছিতে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

(৪)

ক্রমশঃ রজনীর নিঃসঙ্গ জীবনের দিনগুলি দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রতি দিন সকালে উঠিয়াই সে দোকানে ছুটিত; দ্বিপ্রহরে গৃহে ফিরিয়া স্বপক অন্নে কোনপ্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াই পুনরায় দোকানে উপস্থিত হইত। রাত্রি দশটার সময় শ্রান্ত,অবসন্ন দেহে যখন শূন্য গৃহে ফিরিত, তখন তাহার অন্তরতম প্রদেশের তীব্র হাহাকারে সেই পর্ণকুটীরের প্রতি তৃণটী মুখরিত হইয়া উঠিত। মোহিনী কত দিনে ফিরিবে, আর ফিরিবে কি না, রজনী এ চিন্তার আর কুল-কিনারা পাইত না। দুপুরের রাঁধা ভাত পাত্রেই থাকিত, কত দিন তাহা খাইতে ভুলিয়া যাইত। বাহিরের অন্ধকারে বসিয়া-বসিয়া নিদ্রাহীন নেত্রে সে কলেজ হাসপাতালের মোটা-মুটি একটা কল্পনা করিতে বিফল প্রয়াস পাইত। কোন্ দিন কোন্ সামান্য ক্রটীতে সে মোহিনীকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল, তাহার চক্ষে অশ্রু বহাইয়াছিল,- সে সব স্মৃতি পাষাণস্তূপের মত তাহার বক্ষঃ চাপিয়া ধরিত। আর যদি সে ফিরিয়া না আসে—সে মিষ্ট কথার কাঙাল—আর যদি তাহাকে একটী মিষ্ট কথাও বলিবার অবসর না পায়—এই সব ভাবিতে-ভাবিতে তাহার চক্ষু দুটী বার-বার সজল হইয়া উঠিত। নিশ্বাস ফেলিয়া সে গৃহমধ্যে আসিয়া আপনার অবসন্ন দেহ অযত্ন-প্রসারিত মলিন শয্যায় ঢালিয়া দিত। তাহার সব-চেয়ে দুঃখ বাজিয়াছিল—সে দরিদ্র বলিয়া স্ত্রীকে হাসপাতালে রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। উদ্বেগ, চিন্তা ও অর্দ্ধাশনে রজনীর শরীর ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মোহিনী যাইবার একমাস পরেই সে কঠিনরূপে পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। হরিদাস ঠাকুর যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিলেন। পথ্যাদির ব্যবস্থা তিনিই করিয়া দিতেন; কিন্তু পরিচর্য্যার সম্যক্ ভার তিনি লইতে পারিতেন না। ক্রমে রজনী এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে, শয্যা ত্যাগ করিবার ক্ষমতাও তাহার লোপ পাইল।

অবস্থা দেখিয়া হরিদাস ঠাকুর রজনীকেও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লইয়া আসিলেন। এবার রজনী একটুও আপত্তি করে নাই। কেবল হাসপাতালে আসিয়া

আপনার নির্দ্দিষ্ট শয্যা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে একবার মোহিনীর সহিত দেখা করিতে চাহিল। সেখানকার হাউস-সার্জ্জন তাহাদের দেশের একটী ব্রাহ্মণ-যুবক। হরিদাস ঠাকুর তাঁহার অনুমতি লইয়া রজনীকে কয়েক মিনিটের জন্য মোহিনীর সহিত দেখা করিতে লইয়া গেলেন। হরিদাস মাঝে-মাঝে কলিকাতায় আসিয়া মোহিনীকে দেখিয়া যাইতেন। রজনীর হাসপাতালে আসিবার কথা মোহিনী পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। আপনার স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে কয়েক-মিনিটমাত্র দাঁড়াইবার অধিকার পাইয়া রজনী মৃদুস্বরে একবার জিজ্ঞাসা করিল—"একটু সেরেছ ?" কত কথাই তাহার বলিবার ছিল, তবু একটী কথাও ত মুখে আসিল না! অনেকগুলি কুতূহলী দৃষ্টির মাঝখানে লজ্জা ত্যাগ করিয়া মোহিনী একটী ছোট "হাঁ"ও দিতে পারিল না; শুধু একটীবার ঘাড় নাড়িয়া সুস্থতা জানাইল। তখনি রজনীকে চলিয়া আসিতে হইল। আসিবার সময় রজনী দেখিল, অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মোহিনীর ম্লান চক্ষু দুটী সজল হইয়া উঠিয়াছে।

(৫)

রজনী আসিবার এক মাস পরে মোহিনী আরোগ্য-লাভ করিল। সংবাদ পাইয়া হরিদাস ঠাকুর মোহিনীকে লইতে আসিলেন। এবার তিনি আপনিই ডাক্তারের অনুমতি লইয়া মোহিনীকে রজনীর সহিত দেখা করাইতে লইয়া গেলেন। রজনীর শীর্ণ দেহ শয্যার সহিত মিশিয়া গিয়াছে দেখিয়া মোহিনীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী হরিদাসের নিকট শুনিয়াছিল, আজ মোহিনী বাড়ী ফিরিবে। মোহিনী শয্যার এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। রজনী জিজ্ঞাসা করিল—"বেশ সেরেছ তো ?" তার পর আপনিই ধীরে-ধীরে বলিয়া গেল—"তুমি ভেব না, বাড়ী যাও। আমিও শীগ্‌গির সেরে উঠে বাড়ী যাব।" সে স্থানটীতে লুটাইয়া পড়িয়া মোহিনীর বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল—"ওগো, তোমাকে এখানে এমন দেখে কি করে আমি ঘরে ফির্‌ব"—সেখানে একটীমাত্র কথা বলিয়াই গোপনে চোখের জল মুছিতে-মুছিতে বাহিরে আসিতে হইল। গাড়ীতে বসিয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—"কি হবে খুড়ো মশায় ?"

(৬)

যত দিন মোহিনী হাসপাতালে ছিল, রজনী ততদিন কোনপ্রকারে আপনাকে স্থির রাখিয়াছিল। মোহিনী চলিয়া যাইতেই তাহার সমস্ত প্রাণ উন্মুখ হইয়া গৃহপানে ছুটিতে চাহিল। সেখানে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকুক,—মোহিনীর সেবা, মোহিনীর দুর্লভ সঙ্গ ত সেখানে আছে। অসংখ্য রোগীর মাঝখানে রোগী হইয়া থাকিবার কষ্ট তাহার আর সহ্য হইতেছিল না। কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া কি খাইবে, মোহিনীকেই বা কি খাওয়াইবে, এই সব ভাবিয়া বাড়ী ফিরিবার কল্পনাকে সে মনে স্থান দিতে পারিল না। রোগ তাহার কঠিনই হইয়াছিল। ক্রমশঃ তাহার জীবনের আশাও ফুরাইয়া আসিল। তাহাদের গ্রামের সেই যুবক ডাক্তারটী রজনীর অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। অসহায়া পত্নীকে একা ফেলিয়া অসময়ে অভাগা কোথায় চলিল! এক দিন প্রভাতে তিনি যখন রোগী দেখিতে আসিলেন, রজনী তাঁহাকে বলিল—"ডাক্তার বাবু, আপনি আমায় অনেক দয়া করেছেন। কিন্তু আমি আর বাঁচবো না। আমার একটা অনুরোধ যদি দয়া করে রাখেন।" যুবক বড়ই সহৃদয়। আশ্বাস দিয়া রোগীকে বলিলেন,—"তোমার কোন ভয় নেই; শিগ্‌গির সেরে উঠ্‌বে। কিন্তু তোমার কি কথা বল ?" রজনী হতাশভাবে বলিল—"না ডাক্তার বাবু, আমার সব শেষ হয়ে এসেছে। মরবার আগে আপনি একবার আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন। আর যাতে তার সঙ্গে দুটো কথা বলে মর্‌তে পারি, তার একটা উপায় করে দিন। তিন মাসের মধ্যে নিকটে থেকেও একটা কথা তার সঙ্গে কইতে পারিনি।" রজনীর চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—আজই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে। তবু রজনীকে সাহস দিয়া বলিলেন—"কোন ভয় নেই। তবে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আস্‌বার জন্য আমি আজই টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি।" বাহিরে আসিয়া হরিদাস ঠাকুরকে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন—"রোগীর জীবনের আশা নেই। তাহার স্ত্রীকে লইয়া অবিলম্বে এস।" এই অসহায় রোগীর জন্য ডাক্তারের প্রাণে সতত একটী মমতা জাগিত। স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসিয়া,—স্ত্রী আরোগ্য লাভ করিয়া ফিরিল, কিন্তু স্বামী গৃহে

ফিরিবার সমস্ত আগ্রহ বক্ষে লইয়া পরজগতে চলিল—কথাটা তাঁহার ভাবপ্রবণ হৃদয়ে একটী করুণ সঙ্গীতের মত ঝঙ্কৃত হইত।

সেই ওয়ার্ডের একটু দূরে একটী কেবিন খালি ছিল। ডাক্তার নিজের ব্যয়ে সেটী রজনীর জন্য ভাড়া লইলেন এবং তাহাকে সেখানে উঠাইয়া আনিলেন। একটু নির্জ্জন স্থান ভিন্ন মুমূর্ষু রোগীর বাসনা তো মিটিবে না! বেলা ১২টার পর হইতে রজনীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া আসিল। তাহার শীর্ণ মুখমণ্ডলের চারি পাশে মৃত্যুর ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিল। তাহার সেই মরণাহত নয়নের ক্ষীণ দৃষ্টি কাহার প্রত্যাশায় ক্ষুদ্র কক্ষটীর কঠিন দুয়ারে বারবার আঘাত পাইয়া ফিরিতেছিল। সেই সুদূর অজ্ঞাত পথের যাত্রীর কম্পিত ওষ্ঠে শেষ বাক্য ফুটিয়া উঠিল—"মোহিনী!" ডাক্তার বাবু সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া নানাবিধ উপায়ে রোগীকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা সত্বেও দয়িতার সহিত শেষ সাক্ষাতের প্রবল বাসনা অপূর্ণ রাখিয়াই অপরাহ্নে রজনী চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিল। মৃত্যু-তমসাচ্ছন্ন নিষ্প্রভ নয়নের সম্মুখে বাঞ্ছিতার মূর্ত্তিখানি না দেখিয়া, শীতল ললাটের উপর কাহারো কোমল স্নেহস্পর্শ অনুভব না করিয়াই রজনীকে মহাপ্রস্থান করিতে হইল।

এত করিয়াও মুমূর্ষুর শেষ বাসনা অপূর্ণ রহিয়া গেল! ডাক্তারবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত রজনীর শয্যাপার্শ্বেই মুহ্যমান হইয়া রহিলেন। এমন সময় বাহির হইতে পরিচিত কণ্ঠে কে ডাকিল—"ডাক্তারবাবু এ ঘরে আছেন?"—সঙ্গে-সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর মোহিনীকে পশ্চাতে লইয়া কেবিনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। হায়! হতভাগিনি নারী, আর এক মুহূর্ত্ত আগে আসিতে পারিলে না! আজ মোহিনীর ভিতর বিন্দুমাত্র লজ্জাজনিত জড়তা ছিল না। যিনি তাহার জন্য এই কঠিন দুঃখ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আজিকার এই সঙ্কোচহীন দৃঢ়তা বুঝি তাঁহারি দেওয়া। সে জানিয়া আসিয়াছিল—স্বামী তাহাকে দেখিবার জন্য অধীর হইয়াছেন। রজনীকে নিদ্রিতের মত দেখাইতেছিল। মোহিনী ধীরপদে অগ্রসর হইয়া রজনীর শয্যার এক প্রান্তে বসিল; অপর প্রান্তে বামহস্তখানি রাখিয়া, পরম প্রীতিভরে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া আপনার দক্ষিণ হস্তখানি তাহার মৃত্যুশীতল ললাটে রাখিতে গেল! পরমুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর সত্য সেই ক্ষণমাত্রবিলম্বিতা, ভাগ্যহীনা, সর্ব্বরিক্তা নারীর ক্ষুদ্র হৃদয় কি প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিবে—কল্পনায় সে করুণ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া, ডাক্তারবাবু দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

জীবনের খাতা

[শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি-এল]

সাগর-লহরী-সমান অনন্ত লহরীময় এই কালস্রোত। সম্বৎসর পূর্ব্বে এইখানে দাঁড়াইয়া আমরা যে বৎসরের আগমনী-বন্দনা করিয়াছিলাম, সেই বৎসর একটী সিন্ধু-তরঙ্গের মত চলিয়া গিয়াছে,—তাহার বিজয়া-সঙ্গীত এখনও শ্রুতিগোচর হইতেছে। আর একটি তরঙ্গে নব বৎসর আবার আমাদের সম্মুখে সমাগত; আমরা তাহাকে বন্দনা করিয়া ডাকিয়া লইতেছি। কাল-স্রোত এমনই চলিয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতেছে ও যাইতেছে; বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতেছে। এক বৎসর যায় আর এক বৎসর আইসে; সেই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া সাধ যায়—একবার জীবনের খাতা খুলিয়া দেখি, ব্যবসায় কিরূপ চলিতেছে—লাভ-লোকসান কিরূপ হইতেছে—আমাদের ভবিষ্যৎ কিরূপ অনুমিত হইতে পারে; নিরাশার করাল অন্ধকার আমাদের সম্মুখে, না আশার মধুর, উজ্জ্বল আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ পথ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে? জীবনের খাতা খুলিয়া দেখি, আমাদের সম্পূর্ণ পৃথক না হইলেও, দুইটী ব্যবসায় বটে। একটি বিশেষ ভাবে ও পৃথক ভাবে আমরা বাঙ্গালী বলিয়া—এই বঙ্গদেশের সন্তান বলিয়া; আর একটি সাধারণ-

ভাবে আমরা মানব বলিয়া—পৃথিবীর যাবতীয় নরনারীর সুখ-দুঃখের ভাগী বলিয়া। আমরা বাঙ্গালী বলিয়া আমাদের যে খাতা, তাহারই দুই-এক পৃষ্ঠা অতি অল্প সময়ের জন্য প্রথমে দেখিয়া লই। আমি বাঙ্গালী, তোমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালাদেশে যাহারা জন্মিয়াছে, সকলেই বাঙ্গালী। আমার সহিত, তোমাদের সহিত, বাঙ্গালাদেশবাসী সকলের সহিত কাহারও কোনও সম্বন্ধ আছে কি? কেবল এই দেশে জন্ম বলিয়া সকল বাঙ্গালীর মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ, প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাব জাগিয়া আছে কি? বাঙ্গালীরা কি তাহাদের জননী জন্মভূমির সম্মুখে নতজানু হইয়া কর-যোড়ে বলিতে পারে—"বন্দে মাতরম্"! মুখে বলিলে কি হইবে? মুখে না বলিলেও ক্ষতি নাই; অন্তরের অন্তরে সত্য-সত্য বলিতে পারে কি—"বন্দে মাতরম্"? যে দিন জানিব, বুঝিব ও মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিব যে, দেশ আমাদের মা, দেশের লোক আমাদের ভাই, সেদিন এই বাঙ্গালীর হিসাবের খাতায় আমাদের ব্যবসায়ের রেখোন্নতি লাভ করিব। অন্য দেশীয়ের এই ব্যবসায়ের খাতার সহিত আমাদের তুলনা করিলে, আমাদের মুখ ম্লান হইয়া যায়। তাহাদের ব্যবসায়ের মূলধন, বিষয় ও প্রণালী আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়। যুরোপের যে মহা-সমর-নির্ঘোষ আমরা এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি, সেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে—সেই পরম পবিত্র মহাশ্মশানের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলে, এই ব্যবসায়ের মূলধন কিরূপ, প্রণালী কিরূপ তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। ইংরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। ইংলণ্ডেই থাকুক, ভারতবর্ষেই থাকুক, আফ্রিয়ায় থাকুক বা অন্য কোন উপনিবেশে থাকুক, ইংরাজ ইংলণ্ডের সন্তান। পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে কোন একজন ইংরাজের সুখ-দুঃখ হইলে, তাহাতে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে যে-কোন ইংরাজ থাকিবে, তাহার টনক নড়িয়া উঠিবে—তাহার হৃদয়ে সেই সুখ-দুঃখের অনুভূতি শিহরিয়া উঠিবে। তাই ইংরাজ বলিতে পারে, আমি ইংলণ্ডের সন্তান; তাই ইংরাজ ইংলণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে "বন্দে মাতরম্"! তাই ইংরাজ ঐ মন্ত্রের অধিকারী; তাই ইংরাজ বড়-গলা করিয়া বলিতে পারে—"Who dies if England lives, and who lives if England dies?" এই মন্ত্রের অধিকারী বলিয়া আজ ইংরাজ স্বদেশে-বিদেশে যেখানে আছে, সেইখান হইতে দল বাঁধিয়া আসিয়া মৃত্যু-সাগরে ঝাঁপ দিতেছে। যুদ্ধে যাইবার সময় তাহারা কি জানে না যে, পৃথিবীর সকল স্নেহ, সকল প্রেম, সকল সুখ, সকল ভোগ জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছে? তাহারা কি জানে না যে, তাহারা পৃথিবীর ভীষণতম কষ্ট, যন্ত্রণা ও জ্বালাময় মৃত্যু বরণ করিয়া লইতেছে? কিসের জন্য? নিশ্চয়ই তাহাদের নিজের কোনও সুখ তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। নিজের সকল সুখ-দুঃখ পাশরিয়া, নিজের সাধ-আশা তুচ্ছ করিয়া এক অদৃশ্য স্বদেশপ্রেমের জন্য প্রাণাহুতি, জননী জন্মভূমির উদ্দেশ্যে প্রাণমেধ-যজ্ঞ। যে যুরোপ ইহকালের সুখের জন্য পাগল, সেই যুরোপ ইহকালের সর্ব্বস্বকে ছিন্নবস্ত্রের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কল্পনাতীত:ভীষণ কষ্টকে আলিঙ্গন করিতেছে—অতি ভীষণ লোমহর্ষণ মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছে। এ অতি অদ্ভুত দৃশ্য! যুরোপেও এই আধ্যাত্মিক ভাব বড়ই অচিন্তনীয়! যুরোপের এই চিত্রের পার্শ্বে আমাদের চিত্র রাখিলে লজ্জায় মরিয়া যাইতে হয়। দেশ ও দেশবাসীর প্রতি আমাদের কিরূপ অনুরাগ, তাহা চিন্তা করিলে ক্ষোভের অবধি থাকে না। দেশের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? দেশের লোকের প্রাণ যায় বা থাকে, তাহার সহিত আমার কি সম্বন্ধ? সহস্র বাঙ্গালী না খাইয়া মরিল, শত সহস্র বাঙ্গালী সাহেবিয়ানাকেই জীবনের সার ব্রত বলিয়া অবলম্বন করিল,—লক্ষ বাঙ্গালীর কোন ধর্ম্মজীবন নাই, সমস্ত বাঙ্গালী রোগে, শোকে জীবন্মৃত,—তাহাতে আমার কি? আমি ছাড়া আর সকল বাঙ্গালী যদি অধঃপাতে যায়, তাহাতে আমার কি? এই নীচ, কদর্য্য, কুৎসিৎ ভাবের ছায়া দেশের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; মনে ভয় হয়, বুঝি-বা ব্যবসায় মাটি হইল—লাভে-মূলে সব হারাইলাম! যখন দেখি, যাঁহাকে বরেণ্য মনে করিয়া আরাধনা করিয়া আসিতেছি, তিনি সামান্য স্বার্থের মোহ কাটাইতে পারিলেন না,—যখন দেখি, বক্তৃতায় যে সুর উঠে, তাহার অস্তিত্ব কেবল বক্তৃতাতেই থাকে,—যখন দেখি, দেশের আপামর-সাধারণের সহিত দেশের যাঁহারা নায়ক হইবার অধিকারী, তাঁহাদের কোনও জীবন্ত সম্বন্ধ নাই,—যখন দেখি—দেশ-প্রেম অর্থ ও নাম-সংগ্রহের একটি উপায় মাত্র,—যখন দেখি, বিদ্বেষ-হিংসা আমাদের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অস্থি-মজ্জা নষ্ট করিতেছে,—তখন

আশা ম্রিয়মাণা হইয়া পড়ে; মনে হয়, বুঝি-বা সবই গেল! দেখিতে সাধ যায়,—বক্তৃতায় নয়, কার্য্যে—যাঁহারা দেশের অগ্রণী, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ, বিদ্বেষ, হিংসা বিস্মৃত হইয়া দেশের অপর সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন—দেখিবেন, কোথায় তাহাদের অভাব, কোথায় তাহাদের রোগ। আমরা সহরে সভা সাজাইয়া বক্তৃতা করি, আর দেশের যাহা সর্ব্বস্ব, দেশের যাহা প্রাণ—সেই সমগ্র বঙ্গদেশের পল্লী-সমাজের নরনারী ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, রোগে, শোকে, কলহে অহরহঃ জরজর হইতেছে। দেখিতে সাধ যায়,—যাঁহারা বিদ্যায়, অর্থে, শক্তিতে বড়—তাঁহারা পল্লীগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই দাবানলদগ্ধ, অর্দ্ধমৃত, রোগে, শোকে, অনাহারে প্রপীড়িত বাঙ্গালীগণকে ডাকিয়া বলিবেন, "ভয় কি ভাই—আমরা যে তোমাদের বড় ভাই; আমরা থাকিতে তোমরা কি এমনি করিয়া পুড়িয়া মরিবে?" প্রকৃত এই ভাবটুকু, এই সহৃদয়তাটুকু যেদিন বাঙ্গলাদেশে জন্মিবে, সেইদিন, সেই মুহূর্ত্তে বাঙ্গলাদেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইবে, প্লেগ চলিয়া যাইবে, দুর্ভিক্ষ তিরোহিত হইবে। দেখিতে সাধ যায়,—দেশের যাঁহারা বড়লোক, তাঁহারা গরীবদিগকে ঘৃণা করিবেন না; আর যাহারা গরীব, তাহারা বড়লোকদিগকে সাহেব বলিয়া ভয় করিবে না—বড় ভাই মনে করিয়া ভক্তি করিবে। আহা! সেই শুভ দিন আসিলে আবার বাঙ্গলার পল্লী-হৃদয় হইতে হাসির কলরোল শোনা যাইবে, কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে, প্রতি দিনের নব-নব উৎসবের আনন্দ-উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে—তখন আবার বাঙ্গলার গৃহে-গৃহে দেবীপূজা হইবে, বাঙ্গলার প্রান্তরে-প্রান্তরে সবুজ সমুদ্র তরঙ্গিত হইয়া উঠিবে। বাঙ্গলার তটিনীর কলধ্বনিতে সঙ্গীত আসিবে, বাঙ্গলার চাঁদের হাসিতে কবিতা ভাসিবে। এই যে সাধ ইহা, কি পূরিবে না!—অবশ্যই পূরিবে। কিন্তু একজন বাঙ্গালী নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হইলে, শুধু সেই সময় চৌদ্দকোটী হাত আকাশের চাঁদের দিকে উঠাইলে চলিবে না; একজন বাঙ্গালী চিকাগো ধর্ম্ম-সভা-মণ্ডলীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিলে, আমরা সকল বাঙ্গালীই পরম ধার্ম্মিক বলিয়া গর্ব্ব করিলে চলিবে না।

সুদূরপ্রান্তে ভগ্ন পর্ণ-কুটীরের মধ্যে অন্ন, বস্ত্র, স্বাস্থ্য বা জ্ঞানের যে অভাব আছে, তাহা বাঙ্গলার গৃহে-গৃহে প্রবেশ করিয়া হাহাকার করিয়া সকলের সুষুপ্তি ভাঙ্গিয়া দিতেছে—ইহাই ভাবিতে হইবে। শুধু এই ভাবটুকু, এই ভাবনাটুকু দেশের মধ্যে জাগিলেই হইল। তাহা কি হইবে না?—তাহা হইবে। সব হইবে, সব আশা পূরিবে। পূরিবে কেন বলি শুনিবে? হিসাবের খাতায় দেখিতেছি, যে সকল জিনিসের আমদানী হইয়াছে, এখন তাহার কাটতি নাই বটে—কিন্তু কালে তাহা বহুমূল্য হইবে। অনেক জিনিস সংগৃহীত হইয়াছে, যাহা ঝুটা নহে, প্রকৃত সাঁচ্চা মাল। যে দেশে মানুষ জন্মে, সেই দেশ বিধাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হয় না—সেই দেশ বিধাতার বিশেষ স্নেহাশ্রিত। যে দেশে এখনও রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় তেজস্বী, ধর্ম্মপরায়ণ লোক জন্মগ্রহণ করেন, পরমহংস রামকৃষ্ণের ন্যায় দেবাত্মার আবির্ভাব হয়, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত সাধুর শুভাগমন হয়, সে দেশ কি বিধাতার বিশেষ আদরের স্থান নহে? যে দেশের স্তম্ভে জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়, ব্রজেন্দ্র শীল প্রতিপালিত হইয়া নিশিদিন মাতৃনাম জপিতেছেন, সে দেশ কি কম ভাগ্যবান! আর, বিধাতার বরে বাঙ্গলাদেশে যে সাহিত্য-কুসুম বিকশিত হইয়াছে, তাহা নন্দনের পারিজাতের ন্যায় বিমল, বিশুদ্ধ ও পুণ্য-সুরভিময়। এই সাহিত্য পৃথিবীর মধ্যে এক অদ্ভুত জিনিস। যেমন মনুষ্যদেহে রক্ত, এই সাহিত্যে তেমনি স্বদেশ-প্রেম—ঠিক রক্তের মত সাহিত্যের শিরায়-উপশিরায় এই স্বদেশ-প্রেম গিয়া সমগ্র সাহিত্যকে সুস্থ ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। নিধুর টপ্পায় "স্বদেশীয় ভাষা ভিন্ন তৃষ্ণা মিটে না", শুনিতে পাই; ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় "বিদেশীয় ঠাকুর ফেলিয়া দেশের কুকুর পূজার" আহ্বান শুনিতে পাই; মাইকেল "কুললক্ষ্মীর" পূজায় ব্যাপৃত, দেখিতে পাই। তার পর—তার পরের কথা আর বলিব না। বঙ্কিম, হেম, নবীন, রঙ্গলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবি ইহাদের কেবল নাম স্মরণ করিব। যে উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক 'সেই মুখখানির' কথা স্মরণ করিয়া প্রলাপ বকিতেছে, সেও দেশের কথা ভুলিতে পারিতেছে না। এ কি সব বৃথা? বিধাতার বরপুত্রগণের আকুল রোদন কি বৃথা হইতে পারে? আমি জানি, সত্য ইতিহাস-রচয়িতার নিকট থাকেন না; তিনি থাকেন কবির হৃদয়-মন্দিরে। কাব্যই সত্যের একমাত্র ভাষা। কবির স্বপ্ন বিধাতার ইঙ্গিতমাত্র। আজ যাহা কবির স্বপ্ন, কাল তাহাই বাস্তবে পরিণত হয়।

আমাদের এই পৃথিবী কত কাল পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষ কত দিন পূর্ব্বে জন্মিয়াছে, আমি তাহা জানি না। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "আমাদের জন্মভূমি এই পৃথিবীর বয়স ন্যূনকল্পে ৬ কোটী বৎসর হইবে। মানব এই বৃদ্ধা বসুন্ধরার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান। সর্ব্ববিধ জীবজন্তুর জন্মের পর মনুষ্যের জন্ম। মানব-শিশু যে দিন সর্ব্বপ্রথম ধরিত্রী-জননীর ক্রোড় আশ্রয় করিয়াছিল, সে দিনের গণনা লইয়া এখনও সূক্ষ্ম বিচার চলিতেছে; সম্ভবতঃ ইহা ১৫ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যে এই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিল, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" যাহা হউক, মানুষের বয়স নিতান্ত কম নহে—সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এই মানুষ পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে বাসা বাঁধিয়া বাস করিতেছে। ভিন্ন-ভিন্ন স্থানের মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য উপলব্ধি হয়। সভ্যতার সোপানে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এ দেশের লোকের বর্ণ অপর দেশের লোকের বর্ণ হইতে বিভিন্ন। ভিন্ন-ভিন্ন দেশের নরনারী ভিন্ন-ভিন্ন বেশ-ভূষায় ও অঙ্গরাগে লজ্জা নিবারণ ও অঙ্গশোভা সম্পন্ন করে। এক জাতির জীবন-প্রবাহ অন্য জাতির জীবন-প্রবাহ হইতে ভিন্ন। আহারে, বিহারে, আনন্দে, উৎসবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আচারে, ব্যবহারে, চিন্তায়, ভাষায় মানবের মধ্যে পার্থক্যের অবধি নাই। এই এক ভারতবর্ষে যে সকল খণ্ড জাতির নিবাস, তাহাদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে পার্থক্য আছে, তাহার একটি তালিকা করিতে গেলে, তাহার শেষ হইবে কি না, সন্দেহ। সমগ্র মনুষ্য-জাতির পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা ত নিতান্তই অসীম। মনুষ্যের বিভিন্নতার কথা আর কি বলিব। প্রত্যেক মনুষ্য একটী পৃথক বস্তু। কোনও মনুষ্য শরীরে ও মনে অপর কোনও মনুষ্যের সহিত তুলনায় ঠিক একরূপ নহে এবং এই কথা সকল দেশ ও সকল কাল লইয়াও সত্য। একজন মানুষের যেরূপ মুখচ্ছবি দেখা গেল, ঠিক সেইরূপ মুখ আর কোনও মানুষের নাই, কোনও দেশে কখনও ছিল না, কোনও দেশে কখনও হইবে না। দেশে-দেশে প্রভেদ, জাতিতে-জাতিতে প্রভেদ, মানুষে-মানুষে প্রভেদ;—এত যে প্রভেদ, তবু আবার ভিতরে—অন্তরের অন্তরে এক। সকল মানুষেরই অন্তরের ইতিহাস এক—মনুষ্য-হৃদয়ের একই মহাকাব্য। একদিন জন্ম, একদিন মৃত্যু—মাঝের সময়টা সুখ-দুঃখ বিজড়িত। আবার এই জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখ সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে অদ্যাবধি রহস্যের কুয়াসায় আবৃত রহিয়াছে। "কোথা হইতে আসিয়াছি আবার কোথায় যাইব",- সকল দেশের সকল ভাষায় এই প্রশ্ন উচ্চারিত হইতেছে; কিন্তু কোনও ভাষায় তাহার মীমাংসা হইল না। মৃত্যু,—মানব চিরকাল মরিয়া আসিতেছে—অহরহঃই মরিতেছে; অথচ মৃত্যু আজিও আমাদের অভ্যস্ত হইল না, আজিও আমরা মৃত্যুর কিছুই বুঝিলাম না। মৃত্যুর নামে কেবল একটী আতঙ্ক আমাদের মনের মধ্যে সর্ব্বদা সজাগ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে – যাহা দেখিয়া ধার্ম্মিক চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন—"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।" সেই আশ্চর্য্য সকল দেশে চিরকালই সমান আশ্চর্য্য রহিয়া গেল। মৃত্যুর পূর্ব্বে পৃথিবী ব্যাপিয়া সেই ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সেই জীবস্রোত প্রবল রাখিবার জন্য প্রকৃতির দুর্দ্দম তাড়না। জীবন লইয়া আরও কত খেলা কত আলো, কত ছায়া, কত পুণ্য, কত পাপ, কত প্রেম, কত হিংসা, কত প্রাণের জন্য আবেগ, কত রূপের জন্য তীব্র পিপাসা। আবার খেলায় কত চাতুরী, পাপের পথ কিরূপ কুসুমাস্তীর্ণ, পাপের হাসিতে কি মোহিনী শক্তি; পাপের কটাক্ষে কি মাদকতা। কিন্তু কে যেন সকল সময় বলিতে থাকে—এ পথে আসিয়ো না; এ হাসিতে, এ কটাক্ষে ভুলিয়ো না। মানুষ নিষেধ শুনিয়াও শুনে না। চিরকাল ধরিয়া তাহার আত্মবিলাপ হইতেছে—

"পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি অবোধ হায়
না দেখিলি, না শুনিলি—এবে রে পরাণ কাঁদে।"

জাতীয় জীবনের খাতায় এই মহাসমরে আত্মোৎসর্গ দেখিয়াছিলাম; কিন্তু বিশ্বের জীবনের খাতায় এই পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কি দেখিতে পাই? ইহা সহজেই প্রত্যক্ষ হয় যে, মানবের যাহা প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি, তাহা সৃষ্টির আদিতে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানে, বিদ্যায়, অর্থে, সভ্যতায় সকল শক্তিতে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, মুখোস পরিয়া সংগ্রাম করার অসুবিধা হইতেছে বলিয়া তাঁহারা একবার মুখোসগুলি নামাইয়া রাখিয়াছেন—আমরা দরিদ্র, হতভাগ্য, শক্তিহীন—একবার তাঁহাদের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া লইতেছি। সে মূর্ত্তি দেখিলে ক্রোড়ে,

লজ্জায়, ঘৃণায় মরমে মরিয়া যাইতে হয়। এই কি লক্ষ-লক্ষ বৎসরের সাধনার ফল? কোথাও তাই দেখিলে এই বাহু পশারিয়া স্নেহের কোলে ডাকিয়া লইবে; ভগ্নি দেখিলে সংযত সম্ভ্রমে তাঁহাকে সমাদর করিবে; প্রাণান্তেও সত্যের পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবে না। পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রেম, সত্য ও ধর্ম্ম দেখিব,—না, তাহার পরিবর্ত্তে কি দৃশ্য নয়নগোচর হইতেছে! ভ্রাতার রক্ত লইবার জন্য ভ্রাতার হৃদয় হইতে রক্তপিপাসা কুৎসিত মূর্ত্তিতে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে রাক্ষসীর ন্যায় বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। মাসের পর মাস যাইতেছে, বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে। অহরহঃ সেই রক্ত-পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে—দেশ হইতে দেশান্তর তাহার করায়ত্ত হইতেছে। সেই রক্ত-পিপাসা মিটাইবার জন্য মানুষের যাহা কিছু অকরণীয় বলিয়া লক্ষ-লক্ষ বৎসর মানুষ উপদেশ পাইয়া আসিতেছে, তাহাই কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে। ধর্ম্ম-মন্দির আজ ইষ্টক-স্তূপমাত্র—নারী-সম্মান আজ কথার কথামাত্র—সত্য আজ পথের ধূলির মত নিষ্ঠুর ভাবে পদ-দলিত হইতেছে—সভ্যতা আজ মিথ্যাকে মণিমাণিক্যে বিভূষিত করিয়া মাথার মুকুটের মধ্যমণি করিয়া রাখিয়াছে। রক্ত-সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় পৃথিবী আজ ভীত, সন্ত্রস্ত। পৃথিবী কি সত্য-সত্যই তাহার কর্ত্তব্য বুঝে না? অথবা এমনই সৃষ্টি-কৌশল যে, বুঝিয়াও তাহা বুঝিবার তাহার সাধ্য নাই? সেই এক ইতিহাস সর্ব্বত্র—আগে পাপ, পরে আত্ম-বিলাপ—

> "পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায় ধাইলি অবোধ হায়
> না দেখিলি, না শুনিলি এবে রে পরাণ কাঁদে।"

এই আত্ম-বিলাপই কি মনুষ্য জীবনের সার? মানুষ কি জন্মিয়াছে শুধুই পাপে, মোহে, অন্ধকারে তাহার সর্ব্বস্ব হারাইবার জন্য ও কাঁদিবার জন্য? মানুষের জীবনের খাতা খুলিলে সকল দেশে ও সকল সময়ে তাহার একই ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ইতিহাস এই—জাতিতে-জাতিতে সংগ্রাম, মানুষে-মানুষে সংগ্রাম, মানুষের নিজের হৃদয়ের মধ্যে সুমতি-কুমতিতে সংগ্রাম; সেই সংগ্রামের ফল—সুখের জন্য ব্যাকুলতা, দুঃখের ভারে কাতরতা। কচিৎ দুই-একজন সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া শান্তির বিমল ছায়ায় ধ্যানরত। আমরা সুখের জন্য পাগল, কিন্তু পাপ-তাপ-শোক-দুঃখের দহনে অস্থির। এত দুঃখ কেন? মানুষ অহরহঃ আপনাকে এই প্রশ্ন করিতেছে; কিন্তু আজিও ত ইহার মীমাংসা হইল না! সকল দেশের দর্শন-শাস্ত্র এই প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যস্ত। কিন্তু বোধ হয়, হিন্দুর দর্শন-শাস্ত্র এই প্রশ্নের মীমাংসায় যে অসাধারণ মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা পৃথিবীর অপর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য, কপিলদেব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্য্যন্ত এই সুখ-দুঃখের মূল কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত; এবং কিরূপে সুখের পরিবর্ত্তে মানব দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহার পথ দেখাইবার জন্য চিন্তাকুল। সকল দেশের পণ্ডিতগণই এই বিষয়ে চিন্তাশীল। কিন্তু এই সকল চিন্তার কি ফল হইয়াছে? দার্শনিক ও ধর্ম্মোপদেষ্টার উপদেশে পৃথিবীর যে কিছু রূপান্তর হইয়াছে, এমন কি ইহার বোধোদয় পর্য্যন্ত হইয়াছে—তাহাও মনে করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কাব্যই সত্যের একমাত্র ভাষা; এবং কাব্যের মধ্যেই পৃথিবীর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সত্য চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কবি বৃন্দাবনের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমি সেই চিত্রেই মানবের সম্পূর্ণ ইতিহাস দেখিতে পাই। একবার মানস-চক্ষে সেই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। বৃন্দাবনে অসংখ্য নরনারী সকলেই আপন-আপন কার্য্যে অনুরক্ত—যেমন পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব আপন কার্য্য লইয়া ব্যস্ত। কেহ গো-দোহন করিতেছে, কেহ দধি-মন্থন করিতেছে কেহ শিশুকে স্তন্যদান করিতেছে, কেহ প্রতিবেশীর ঐশ্বর্য্যে অসূয়াপরবশ হইতেছে। অন্যত্র যেমন, সেখানেও তেমনি কাম-ক্রোধাদি রিপুর তাড়না আছে। অন্যত্র যেমন, সেখানেও তেমনি সাধন-ভজন আছে। সেই সকল নরনারী পাপে-ধর্ম্মে, সুখে-দুঃখে বিজড়িত। হঠাৎ কোথা হইতে বংশীধ্বনি ভাসিয়া আসিল। এমন মধুর মুরলী-ধ্বনি কখনও শ্রুতিগোচর হয় নাই। কিন্তু সকলে এ বাঁশীধ্বনি শুনিতে পাইল না। যাহারা শুনিতে পাইল, তাহারা পাগল হইল—তাহাদিগকে লোকলজ্জা বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। সংসারের সোণার শিকলি আপনা হইতে খুলিয়া পড়িল—কোথায় রহিল তাহাদের শিশু, কোথায় রহিল তাহাদের স্বামী, কোথায় রহিল তাহাদের পাপ-তাপ, সুখ-দুঃখ,—সকল ফেলিয়া, সকল

ভুলিয়া উন্মত্তের ন্যায়—প্রলয়ের বন্যার ন্যায় তাহারা যমুনা-কূলে উপনীত। তখন তাহারা সেই বংশীবাদকের আত্মজন—তাঁহার অঙ্গীভূত। ইহাই মানবের ইতিহাস বলিয়া আমি বুঝিতেছি। এই পৃথিবী যতদিন থাকিবে, ইহার এমনই সৃষ্টি-কৌশল যে, মানব চিরদিনই এমনই সুখে-দুঃখে, পাপে-ধর্ম্মে বিজড়িত রহিবে। স্বর্গের আমরা যাহা কল্পনা করি, তাহা এ পৃথিবীতে দেখিতে পাইব না; তবে পরম করুণাময় শ্রীভগবান সকলকেই নিজ করুণাবশে বাঁশী বাজাইয়া আপনার নিকট লইয়া আসিবেন—আপনার সহিত মিশাইয়া লইবেন; তখন কোনও জাতি-বিচার, গুণ-বিচার—কোনও বিচারই থাকিবে না—থাকিতে পারে না। আমি এই কথাই অতি অল্পদিন পূর্ব্বে কোন বিশেষ শোক প্রাপ্ত হইয়া নিজ রোজ-নামচায় লিখিয়াছিলাম; তাহার মর্ম্ম এই—

"কেন এত শোক? কেন এত দুঃখ? শোক কিছু নয়, দুঃখ কিছু নয়—এ কথা শাস্ত্রকারের মুখে শুনিতে পাই বটে, কিন্তু যখন মাথার উপর বজ্রাঘাত হয়, তখন সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। আজ যে বজ্রাঘাত হইল, কোন্ প্রাণে বলিব যে, ইহা কিছু নয়? সামান্য মশক-দংশনে ব্যথা অনুভব করি, আর প্রাণাধিক প্রিয়জনের বিয়োগ-যন্ত্রণা কিছু নয়? দেহের সমস্ত শিরা, সমস্ত মাংস, সমস্ত অস্থি পুঞ্জীকৃত করিয়া কে যেন রাবণের চিতা সাজাইয়া দিল।

"কেন এত শোক, কেন এত দুঃখ দয়াময়? যদি বল, এ কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তাহা হইলে ত কিছুই বুঝিলাম না। আবার জিজ্ঞাসিব, কেন এত পাপ? এ ধরা ত তোমার। তোমার সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, কোনও সম্পর্ক নাই—আমরা এমন নহি ত! তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব; আবার তুমি সর্ব্বশক্তিমান। কেন আমরা এমন পথে যাই, যে পথে অন্ধকার বিভীষিকা? কেন আমরা এমন কর্ম্ম করিবই করিব, যাহার ফলে একদিন মর্ম্মের গ্রন্থি শিথিল হইয়া যাইবে—আপনার হাহাকারে আপনি পাগল হইয়া উঠিব? যদি বল, 'আমি দুইটী পথ প্রস্তুত করিয়া সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আছি। যে আসিতেছে তাহাকে দেখাইয়া দিতেছি—এইটী পাপের পথ, পরিণাম—দুঃখ; এইটী পুণ্যপথ, পরিণাম—সুখ; যাহার যে পথে ইচ্ছা যাও।' আমি বলিব, 'ও তোমার ছেলে-ভুলান কথা। 'যাহার যে পথে ইচ্ছা যাও', এটা কি একটা কাজের কথা? ইচ্ছা আবার কাহার? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই কি হইতে পারে? আমি যাহা করি, সে ত তোমারই ইচ্ছায়। আর যদি আমার একটা স্বতন্ত্র, স্বাধীন ইচ্ছা থাকে, সে ইচ্ছা সৃজিল কে? সে ইচ্ছা পাপ-মুখী হইয়া আমাকে অনন্ত জ্বালার মধ্যে লইয়া যায় কেন? সে ইচ্ছা পুণ্যপথে যায় না কেন? তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে বলিব ঠাকুর! পাপের পথে কেন নয়ন-রমণ কুসুমরাশি দিয়াছ, পাপের মুখে কেন মোহিনী হাসি দিয়াছ, পাপের আকর্ষণ কেন এত প্রবল করিয়াছ? কি তোমার অভিসন্ধি—চিরকাল গোপন রাখিয়া কি সুখ পাও, জানি না।'

কি তোমার অভিসন্ধি লীলাময়! একি শুধুই তোমার লীলা? এত যে দুঃখ-শোক, এত যে জ্বালা-যন্ত্রণা, এত যে পাপ-তাপ তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আসিয়া আমাদিগকে প্রপীড়িত করিতেছে, আমরা কি—সকলই ত তুমিই সহিতেছ! আমরা কি ছাই—তোমারই ছায়ামাত্র—এত জ্বালা কি তোমার? তুমি যে এত দুঃখ পাও, তাহাও ত অসহ্য; একটু যদি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও ত বুঝিয়া চলি। আমাদের কর্ম্মফলে যদি তোমার সোণার অঙ্গে ক্ষত হয়, তাহা হইলে আর একটু সাবধান হই। আবার ভাবি, তোমার আবার সুখ-দুঃখ? তখন আবার মনে হয়, একটা কিছু রহস্য আছে, একটা কিছু খেলা আছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে দুঃখ না থাকিলে সুখ থাকে না, অভিমান না থাকিলে ভালবাসা থাকে না, পাপ না থাকিলে পুণ্যও থাকে না। তাই কি লীলাময়! আপন লীলারসে বিভোর হইয়া, পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ দিয়া লীলার পুতলী গড়াইয়া আপনি হাসিতেছ, আপনি কাঁদিতেছ! পৃথিবী যেমন আছে, তাহার কোন রূপ পরিবর্ত্তন হইলে, আর তোমার লীলারসের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। পৃথিবী কেবলই পুণ্যময়, পৃথিবী কেবলই সুখময়। সে পৃথিবী নির্জ্জীব। সে একটা রসের সাজান পুতুলের ঘর, সে পৃথিবীতে কোনও রসাস্বাদ হয় না। রসসাগর! লীলানিধি! মহাকবি! তাই কি তোমার এই অদ্ভুত সৃষ্টি—আলো-ছায়ায়, সুখে-দুঃখে, পাপে-পুণ্যে এমন বিজড়িত, এমন ওতঃপ্রোত? নাটের অধিকারী! এক-একবার নেপথ্যের ভিতরে দেখিবার অধিকার দিয়ো; যেন স্বচক্ষে দেখিতে পাই, এই রঙ্গমঞ্চে যাহারা যে সাজে অভিনয়

স্নেহের জয়

শিল্পী—শ্রীবিপিনচন্দ্র দে

করিতেছে, তুমি নিজ হস্তে তাহাদিগকে সেই সাজ পরাইয়া দিয়াছ; পুত্র-শোককাতরা মাতা, পতি-শোক-ম্লানা নব-বিধবা তোমারই হাতের সাজান বেশ। রাজা রাজাসনে বসিয়া আছেন, ভিক্ষুক ভিক্ষাপাত্র-হস্তে বেড়াইতেছে, সাধু হিমারণ্যে মুদিত নয়নে সমাধিস্থ, আর মাতাল পথে টলমল করিয়া চলিতেছে; সতী পতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছে, আর পাপীয়সী দূরে কটাক্ষপাত করিতেছে,—সকলেই তোমার নিজ-হস্তে সজ্জিত অভিনেতা ও অভিনেত্রী। তোমার অভিনয়ের জন্য পুণ্যাত্মার যেরূপ প্রয়োজন, পাপাত্মারও ঠিক সেইরূপ প্রয়োজন। পুণ্যাত্মাও তুমি, পাপাত্মাও তুমি; কেবল অভিনয়-বিকাশের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছ। তাই বুঝি দেবদেব! তোমার এই ধরায় এত পাপ, এত দুঃখ, এত শোক!

কিন্তু ঠাকুর! যেদিন অভিনয় শেষ হইবে—একদিন ত হইবেই;—একজন্মে না হউক, শতজন্মে হউক—সেদিন কি আনন্দের দিন— যেদিন তোমার বাঁশরী শুনিতে পাইব। সেদিনের কথা ভাবিলে সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয়। যেমন জল-বুদ্বুদ জলে মিশায়, তেমনি আমি তোমাতে মিশিয়া যাইব, আমি আর তুমি এক হইয়া যাইব! অপার প্রেম-পারাবার তুমি—আমি তাহারই এক কণিকা; নিবিড় ঘন ভূমানন্দ তুমি—আমি তোমারই মধ্যে! কি আনন্দ!

এই আশার আলোকপূর্ণ ভবিষ্যৎ আমার, এই ভবিষ্যৎ তোমার, এই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর। আজ কাল-বৈশাখীর অন্ধকারে সান্ধ্য গগন আবরিত হইয়াছে, বিদ্যুৎ চমকিতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু যে মাঝি হাল ধরিয়া আছেন, তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা; তরী তীরে লাগিবেই লাগিবে,—কোনও ভয় নাই, কোনও ভয় নাই; সকল মেঘগর্জ্জনকে মন্দীভূত করিয়া অন্তঃকরণের অন্তর হইতে ধ্বনি হইতেছে—"মা ভৈঃ, মা ভৈঃ।" *

* ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতির ১৩২৪ সালের নববার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

৩

সেদিন এমন প্রবৃত্তি আর হইল না যে নীচে যাই। সুতরাং নন্দ-টগরের যুদ্ধের অবসান কি ভাবে হইল, সন্ধি-পত্রে কোন্-কোন্ সর্ত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল, কিছুই জানি না। তবে, পরে দেখিয়াছি, সর্ত্ত যাই হোক, বিপদের দিনে এই স্ক্র্যাপ্-অফ-পেপারটা কোন কাজেই লাগে না। যাহার যখন আবশ্যক হয়, অবলীলাক্রমে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অপরের বূহ ভেদ করে। বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়াছে; এবং আরও বিশ বৎসর যে করিবে না, এমন শপথ বোধ করি স্বয়ং বিধাতা-পুরুষও করিতে পারেন না।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম হইল না; এখন অপরাহ্নের কাছাকাছি একটা গাঢ়, কালো মেঘ দিক্-চক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে-ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলা-ফেরার মধ্যেও এক প্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ যাহা ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ গোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?" বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, "কোর্ত্তা, নীচে যাও; কাপ্তান কইচে, ছাই-ক্লোন হোতি পারে।"

মিনিট-পোনর পরেই দেখিলাম, কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া, খালাসীরা হোলডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দুই-চারিজন আপত্তি করায়, সেকেণ্ড-অফিসার নিজে আসিয়া

ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানা-পত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে হতভাগোরা দশটাকার বেশী ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া, গর্ত্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্ব্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন, ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে-মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে, না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না,—তা' অদৃষ্টে যা' ঘটে তা' ঘটুক। আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারাই যায়, ত, অমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া-ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন, যতক্ষণ পারি, হাত-পা নাড়িয়া, ঢেউয়ের উপরে নাগরদোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক সময়ে টুপ্ করিয়া ডুব দিয়া, পাতালের রাজবাড়ীতে গিয়া অতিথি হইলেই চলিবে। কিন্তু রাজার জাহাজ যে আগে-পিছে লক্ষকোটী হাঙ্গর-অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া ফেলিতেও যে তাঁহাদের মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না—এ সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতেই গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির বেগ উভয়ই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে. পলাইয়া বেড়াইবার আর যো রহিল না, যেখানে হোক সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়া কাপ্তেন দূরবীণ-হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্ত্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের যায়গা অন্বেষণ করিতে-করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলা ভেড়া, মুরগী ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ যায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু, তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সবকটিই ধীরে-ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই "ছাই-ক্লোন"; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই,—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে। পরক্ষণেই এমন একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কাণে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন অভিজ্ঞতা আমার নাই। ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ—সোণার ভোম্‌রা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে-করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী নাড়াইয়া-গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেম্‌নি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে। তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়, শতকোটী;—উন্মত্ত কোলাহলে এই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়,—ঝড়। তবে, এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল। এই দুর্জ্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া শুদ্ধমাত্র এম্‌নি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলাম। অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল, এ বুঝি পাহাড়; কিন্তু, পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল, তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, "ভগবান! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে! এতদিন ধরিয়া ত সংসারের সর্ব্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই! যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজত-শুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু, এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না!

তা' ছাড়া, চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে-মনে বলিলাম, হে ঢেউ! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ মিনিট কাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার কলেবরখানি দেখিয়া লই।

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ, তা' হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু, এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে, সেই অপরিমেয় শক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্র-জলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া-জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বালা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথায় উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীর, কৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয় ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরই, এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থর-থর করিয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল; এবং ভয়ার্ত্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছাইয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন— সেই ঢেউরাজ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড-গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি; সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশে-পাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল! জাহাজ শুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিট-খানেক পরে দেখা গেল, না - ডুবি নাই, জাহাজ-শুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর, তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম, কেন কাপ্তান সাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্ত্তে পূরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে-মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচের হাঁস ও মুরগীগুলা বারকতক পট্-পট্ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েক বার ম্যা-ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর এক প্রকারের বিপদ ঘটিল। শুধু যে জলের ছাট্ ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল তাই নয়, সমস্ত জামা কাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এম্নি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্-ঠক্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল, জলে ডোবার হাত হইতে যদি-বা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হোক, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বল্লমের ফলার মত গায়ে বেঁধে না। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে

কিরূপ হয় ? কিন্তু তাই বা কতটুকু নিরাপদ ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত, নিতান্তই যদি না ম্যা-ম্যা করি, মা-মা করিয়া অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে। শুধু এক উপায় আছে,- জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, তবে বাঁচিতেও পারি। যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদি বা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কবাট হাজার ঠেল-ঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেম্নি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফাষ্ট ক্লাসের দোর-গোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্য-দেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া, কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্য্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিসপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, বিশেষ করিয়া মিস্ত্রী মশায় সস্ত্রীক কি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, জানিবার জন্য সকালবেলা নীচে নামিয়া গেলাম। কাল নন্দ মিস্ত্রী একটু রসিকতা করিয়াই বলিয়াছিল, "মশায়, সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত আমরা মিশিয়ে গিয়েছিলুম; এইমাত্র যে যার কোটে ফিরিয়া আসিয়াছি।" আজিকার মিশামিশি সাড়ে বত্রিশ ভাজায় চলে কি না জানি না; কিন্তু, এখন পর্য্যন্ত কেহই যে কাহারও নিজের কোটে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তাহা নিশ্চয়।

তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন চারিশ' যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকা ত অনেক দূরের কথা, বোধ করি অক্ষত কেহই ছিল না।

মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন চারশ' লোক দিয়া ঠিক তেম্নি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিসপত্র, বাক্স-পেঁট্রা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে! বমি এবং অনুরূপ আর দু'টা প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে, দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার। এখন ডাক্তার বাবু জাহাজের মেথর ও খালাসীদের লইয়া ইহাদের পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডাক্তার বাবু আমার আপাদমস্তক বারবার নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করি আমাকে সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী ঠিক করিয়াছিলেন; তথাপি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "মশাইকে ত খুব তাজা দেখাচ্চে; বোধ করি একটা হ্যামক্ পেয়েছিলেন, না?" বলিলাম, "হ্যামক্ কোথায় পাব মশাই, পেয়েছিলাম একটা ভ্যাড়ার খাঁচা। তাই তাজা দেখাচ্চে।"

ডাক্তার বাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম, "ডাক্তার বাবু, অধমও নরক-কুণ্ডেরই যাত্রী। কিন্তু দুর্ব্বল বলিয়া এখানে ঢুকিতে পারি নাই; সুরু হইতে ডেকের উপরেই ছিলাম। কাল সাইক্লোনের খবর পাইয়া খানিকটা সময় ভ্যাড়ার খাঁচার উপরে বসিয়া, আর বাকী রাত্রিটা ফার্ষ্ট ক্লাসের একটা ঘরের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছি। কি বলেন, অন্যায় করিয়াছি কি?"

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ডাক্তার বাবু এম্নি খুসী হইয়া গেলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে বাকী দুটো দিন কাটাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই; শুধু ডেক চেয়ারটা তাঁহার লইয়াছিলাম।

দুপুরবেলা ক্ষুধার তাড়নে নির্জ্জীবের মত এই কেদারা-টার উপরে পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের খাদ্য-বস্তুর চিন্তা করিতেছি,—কোথায় গিয়া কি ফন্দি করিলে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য মিলিবে, সেই দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময়ে খিদিরপুরের সেই মুসলমান দর্জ্জিদের একজন আসিয়া কহিল, "বাবু মশায়, একটি বাঙালী 'মেয়েলোক' আপনাকে ডাক্‌তেচে।"

'মেয়েলোক ?' বুঝিলাম ইনি টগর। কেন যে ডাকিতেছেন, তাহাও অনুমান করা কঠিন হইল না। নিশ্চয়ই মিস্ত্রীর সঙ্গে স্বামি-স্ত্রীর স্বত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপারে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু, আমাকে কেন? 'Trial by ordeal' ছাড়া বাহিরের লোক আসিয়া কোন দিন যে ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, তাহা মনে করাও ত শক্ত।

বলিলাম, "ঘণ্টা খানেক পরে যাবো, বলগে।"

লোকটি কুণ্ঠিতভাবে কহিল, "না, বাবু মশায়, বড় কাতর

হয়ে ডাক্‌তেছে—" কাতর? কিন্তু টগর ত আমার কাতর হবার মানুষ নয়? জিজ্ঞাসা করিলাম, "পুরুষ মানুষটি কি করচে?"

লোকটি কহিল, "তেনার বেমারির জন্তেই ত ডাক্‌তেছে।" বেমারি হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়;—তবুও উঠিয়া পড়িলাম। লোকটি সঙ্গে করিয়া আমাকে নীচে লইয়া গেল। অনেকদূরে এক কোণে কতকগুলা কাছি বিঁড়ার মত করিয়া রাখা ছিল; তাহারই আড়ালে একটী ২৫।২৬ বছরের বাঙালী মেয়ে যে বসিয়া ছিল, তাহা একদিনও আমার চোখে পড়ে নাই। কাছেই একখানি ময়লা সতরঞ্চির উপর এই বয়সেরই একটি অত্যন্ত ক্ষীণকায় যুবক মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—অসুখ ইহারই।

আমি নিকটে আসিতে মেয়েটি আস্তে-আস্তে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল; কিন্তু আমি তাহার মুখ দেখিতে পাইয়াছিলাম।

সে মুখ সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ, বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি; কিন্তু, এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপ মারা দেখিতে পাইলাম, যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি। আমার অন্নদা দিদির কপালও বড় ছিল,—অনেকটা যেন তাঁর মতই। সিঁথায় সিঁদুর ডগ্‌ডগ্ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা ছাড়া আর কোন অলঙ্কার নাই, পরণে একখানি নিতান্ত শাদাসিধা রাঙা-পেড়ে কাপড়।

পরিচয় নাই, অথচ এমন সহজ ভাবে কথা কহিলেন যে, বিস্মিত হইয়া গেলাম। কহিলেন, "আপনার সঙ্গে ডাক্তার বাবুর ত আলাপ আছে, একবার ডেকে আন্‌তে পারেন?"

বলিলাম, "আলাপ আজই হয়েছে। তবে, মনে হয় ডাক্তার বাবু লোক ভাল,—কিন্তু, কি প্রয়োজন?"

তিনি বলিলেন, "ডাক্‌লে যদি ভিজিট দিতে হয় ত কাজ নেই, ইনি না হয় কষ্ট কোরে ওপরেই যাবেন।" বলিয়া সেই রুগ্ন লোকটিকে দেখাইয়া দিলেন। আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, "জাহাজের ডাক্তারকে ডাক্‌লে বোধ করি কিছু দিতে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক্, এঁর হয়েছে কি?"

আমি মনে করিয়াছিলাম লোকটি এঁর স্বামী। কিন্তু, স্ত্রীলোকটির কথায় যেন সন্দেহ হইল। লোকটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ী থেকেই তোমার পেটের অসুখ ছিল, না?" লোকটি মাথা নাড়িলে, তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, "হাঁ, এঁর পেটের অসুখ দেশেতেই হয়েছিল, কাল থেকে জ্বর হয়েচে। এখন দেখ্‌চি জ্বর খুব বেশী, একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।"

আমি নিজেও হাত দিয়া লোকটির গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু নীচে আসিয়া, রোগ পরীক্ষা করিয়া, ঔষধ-পত্র দিয়া কহিলেন, "চলুন শ্রীকান্ত বাবু, ঘরে গিয়ে দুটো গল্পগাছা করা যাক্।"

ডাক্তারবাবু লোকটি চমৎকার। তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, "চা খান ত?" বলিলাম, "হাঁ।" "বিস্কুট্?" "তাও খাই।" "আচ্ছা।"

খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর দুজনে মুখোমুখী দুখানা চেয়ারে বসিলে, ডাক্তার বাবু কহিলেন, "আপ্‌নি জুট্‌লেন কি কোরে?" বলিলাম, "স্ত্রীলোকটি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "পাঠাবারই কথা। বিয়ে-টিয়ে কোরেছেন?" বলিলাম, "না।"

ডাক্তারবাবু কহিলেন, "তা'হলে জুটে পড়ুন, নেহাৎ মন্দ হবে না। লোকটার ঐ ত চেহারা; তা'তে টাইফয়েডের লক্ষণ বলেই মনে হচ্চে। যা হোক্, বেশী দিন টিক্‌বে না, তা' ঠিক। ইতিমধ্যে একটু নজর রাখ্‌বেন, আর কোন ব্যাটা না ভিড়ে যায়।" অবাক্ হইয়া বলিলাম, "আপনি এ সব কি বল্‌চেন ডাক্তারবাবু?" ডাক্তারবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, "আচ্ছা, ছোঁড়াটা বার করে আন্‌চে, না, ওকেই বার করে এনেচে, কি মনে হয় বলুন ত শ্রীকান্ত বাবু? খুব forward, না? দিব্যি কথাবার্ত্তা কয়!" বলিলাম, "এ রকম ধারণা আপনার মনে কি কোরে এল?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "প্রতি ট্রিপেই দেখি কি না, একটা-না-একটা আছেই। গত বারেই ত বেলঘোরের একজোড়া ছিল। একবার বর্ম্মায় গিয়ে পা দিন, তখন দেখ্‌বেন, আমার কথাটা ঠিক কি না।"

বর্ম্মার কথাটা যে তাঁর অনেকটাই সত্য, তাহা পরে

দেখিয়াছিলাম বটে ; কিন্তু আপাততঃ সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় যেন তিক্ত হইয়া উঠিল। ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একবার নন্দ মিস্ত্রীর খবর লইতে নীচে গেলাম। 'সপরিবার' মিস্ত্রী মশায় তখন ফলাহারের আয়োজন করিতেছিল ; একটা নমস্কার করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, "ঐ মেয়ে-মানুষটি কে মশাই ?"

টগর শিরঃপীড়া বাবদে মাথায় একটা পাগ্‌ড়ী বাঁধিতে-ছিল ;—ফোঁস করিয়া গর্জ্জাইয়া উঠিল, "তোমার সে খবরে কাজ কি শুনি ?" মিস্ত্রী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, "দেখ্‌লেন মশায়, মাগীর ছোট মন ? কে বাঙ্গালীর মেয়েটা রঙিনে যাচ্চে—খবরটা নিতেও দোষ ?" টগর শিরঃপীড়া ভুলিয়া, পাগড়ীটা ফেলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। সেই দুটি গো-চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "মশাই, টগর বোষ্টমীর হাত দিয়ে ওর মত কত গণ্ডা মিস্ত্রী মানুষ হয়ে গেল, —এখন ও আমাকে চোখে ধূলো দেবে ? আরে, তুই ডাক্তার, না বদ্যি যে, যাই একটু জল আন্‌তে গেছি, অম্‌নি ছুটে দেখ্‌তে গেছিস্ ? কেন, কে ও ? ভাল হবে না বলে দিচ্চি, মিস্তিরী ! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি ত, তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন !"

নন্দ মিস্ত্রীও গরম হইয়া কহিল, "তোর কি আমি পোষা বাঁদর, যে যে-দিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি, সেইদিকে যাবো ? আমার ইচ্ছে হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আস্‌ব,—তুই যা পারিস্, তা করিস্।" বলিয়া ফলারে মন দিল। টগরও শুধু একটা "আচ্ছা—"বলিয়া তাহার পাগ্‌ড়ী বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও প্রস্থান করিলাম। ভাবিতে-ভাবিতে গেলাম, এম্‌নি করিয়া ইহারা বিশ বৎসর কাটাইয়াছে। অনেক পোড় খাইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্য-কার বন্ধন নাই, সেখানে এতটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠকিতেই হইবে ; হয়, অহর্নিশি সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখিতে হইবে, না হয়, যৌবনের মত নন্দ মিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া টগরের এই বিদ্বেষ, ডাক্তার বাবুর এমন কুৎসিত, তীব্র কটাক্ষ,—সে কে, এবং কি ? টগর কহিল, এই কাজ করিয়া সে নিজে চুল পাকাইয়াছে,—তাহার চক্ষে ধূলি দিবে, এমন মেয়েমানুষ আছে কোথায় ? ডাক্তারবাবু বলিলেন, এই কাণ্ড নিত্য দেখিয়া তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টি আসিয়াছে ;—আজ ভুল করিলে এমন চোখ তিনি উপড়াইয়া ফেলিতে রাজী আছেন। এম্‌নিই বটে। অপরকে বিচার করিতে বসিয়া কোন মানুষকেই কখনো বলিতে শুনি নাই, সে অন্তর্যামী নয়, কিম্বা তাহার কখনো ভ্রম-প্রমাদ হয়। সবাই কহে, মানুষ চিনিতে তাহার জোড়া নাই, এবং এ বিষয়ে সে একটি পাকা জহুরি। অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে, তাহাই ত জানি না। তবে, আমার মত যে-কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্নদা-দিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া জয়ী হওয়ার চেয়ে, ভালো ভাবিয়া নির্ব্বোধ হওয়াতেও যে মোটের উপর জয়ের দামটা বেশিই পাওয়া যায়, সে কথা তাহাকে মনে-মনে স্বীকার করিতেই হয়। তাই এই দুটি পরম বিজ্ঞ নর-নারীর উপদেশ অভ্রান্ত বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলিয়া-ছিলেন, অত্যন্ত forward ; তা বটে। এই কথাটাই শুধু আমাকে থাকিয়া-থাকিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে আবার ডাক পড়িল। এইবার এই স্ত্রীলোকটির পরি-চয় পাইলাম। নাম শুনিলাম, অভয়া। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, বাড়ী বালুচরের কাছে। যে ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সে গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হয়। নাম রোহিণী সিংহ। অভয়া এতদিনে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে কি না জানি না ; কিন্তু, রোহিণীর এই যাত্রাই যে অগস্ত্য-যাত্রা, তাহা একদিন ভাল করিয়াই জানিতে পারিয়াছিলাম। সে বেচারার মনের মধ্যে যদি কোথাও পাপ স্পর্শ করিয়া থাকে, ত, প্রায়শ্চিত্তের কড়িও যাহা দিয়াছে, তাহা কিছুতেই অকিঞ্চিৎকর নয়। কিন্তু সে কথা আর একদিন বলিব,—আজ থাক্।

ঔষধে রোহিণী বাবুর যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া অভয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। অথচ, স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার মনের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কঠোর সমালোচনার ভাবই বরাবর জাগ্রত ছিল। তথাপি এই স্ত্রীলোকটির সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি বা অশোভন প্রগল্‌ভতা ধরিতে পারিলাম না। অভয়ার মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য্য শক্তি। ইহারই মধ্যে শুধু যে সে আমার নাম-ধাম জানিয়া লইল তাহা নয়, তাহার নিরুদ্দিষ্ট

স্বামীকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব, তাহাও আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইল। তাহার স্বামী আট বৎসর পূর্ব্বে বর্ম্মায় চাকরি করিতে আসিয়াছিল। বছর-দুই তাহার চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই ছয় বৎসর আর কোন উদ্দেশ নাই। দেশে আত্মীয়-স্বজন আর কেহ নাই। মা ছিলেন, তিনিও মাসখানেক পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করায়, অভিভাবক-হীন হইয়া বাপের বাড়ীতে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ায়, রোহিণী-দাদাকে রাজী করিয়া বর্ম্মায় চলিয়াছে। একটুখানি চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা, এতটুকু চেষ্টা না করে কোনরকমে দেশের বাড়ীতে পড়ে থাক্‌লেই কি আমার ভাল কাজ হ'ত? তা ছাড়া, এ বয়সে দুর্নাম কিন্‌তেই বা কতক্ষণ?" জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন তিনি এতকাল আপনার খোঁজ নেন না, কিছু জানেন?" "না, কিছু জানিনে।"

"তার পূর্ব্বে কোথায় ছিলেন, তা' জানেন?" "জানি। রেঙ্গুনেই ছিলেন, বর্ম্মা রেলওয়েতে কাজ করছিলেন; কিন্তু, কত চিঠি দিয়েছি, কখনো জবাব পাইনি। একটা চিঠিও কোন দিন কিন্তু ফিরে আসেনি।" প্রতি পত্রই যে অভয়ার স্বামী পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু কেন যে জবাব দেয় নাই, তাহার সম্ভবতঃ হেতু এইমাত্র ডাক্তারবাবুর কাছেই শুনিয়াছিলাম। অনেক বাঙালীই সেখানে গিয়া, কোন সুন্দরী ব্রহ্ম-রমণী লইয়া আবার নূতন করিয়া ঘর-সংসার পাতে। এমনও অনেক আছে, যাহারা সারাজীবনে আর কখনো দেশে ফিরিয়াও যায় না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অভয়া প্রশ্ন করিল, "তিনি বেঁচে নেই, তাই কি আপনার মনে হয়?" ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, "বরং ঠিক তার উল্টো। তিনি যে বেঁচে আছেন, এ কথা আমি শপথ করে বল্‌তে পারি।" খপ্ করিয়া অভয়া আমার পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, "আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক শ্রীকান্ত বাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাক্‌লেই হ'ল।" আমি পুনরায় মৌন হইয়া রহিলাম। অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "আপনি কি ভাব্‌ছেন আমি জানি।" "জানেন?" "জানিনে? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ভাব্‌তে পারলেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয়নি? তা' হোক, আমি ভয় করিনে,—আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর কর্‌তে পারব।" তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমার মনের কথা অনুমান করিতে এই বুদ্ধিমতী নারীর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। কহিল, "আপনি ভাব্‌চেন, আমি ঘর কর্‌তে রাজী হলেই ত হ'ল না; আমার সতীন রাজী হবে কি না, এই ত?" বলিলাম, "বেশ, তাই যদি হয়, ত কি কর্‌বেন?" এইবার অভয়ার চোখ-দুটি ছল্-ছল্ করিয়া উঠিল। আমার মুখের প্রতি সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "সে বিপদে আপনি একটু আমাকে সাহায্য কর্‌বেন শ্রীকান্ত বাবু। আমার রোহিণী-দাদা বড্ড সাদাসিধে ভালমানুষ, তাঁর দ্বারা তখন ত কোন উপকারই হবে না।" সম্মত হইয়া বলিলাম, "সাধ্য থাক্‌লে নিশ্চয়ই কর্‌ব; কিন্তু, এ সব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ ত প্রায় হয়ই না, বরং অকাজই বেড়ে যায়।" "সে কথা সত্যি" বলিয়া অভয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন বেলা ১১।১২টার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখে-চোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতেই একটা অস্ফুট শব্দ কাণে আসিতে লাগিল, "কেরেণ্টিন্—কেরেণ্টিন্!" খবর লইয়া জানিলাম কথাটা Quarantine; তখন প্লেগের ভয়ে বর্ম্মা গভরণ্‌মেণ্ট অত্যন্ত সাবধান। সহর হইতে ৮।১০ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটা-তারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর তৈরি করা হইয়াছে—ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্ব্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হইবে। দশ দিন বাস করার পর তবে ইহারা সহরে প্রবেশ করিতে পাইবে। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় সহরে থাকে, এবং সে Port Health Officerএর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র জোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা। ডাক্তার বাবু আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "শ্রীকান্ত বাবু, একখানা চিঠি জোগাড় না করে আপনার আসা উচিত ছিল না। Quarantineএ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে, কসাইখানার গরু-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে, ছোটলোকেরা কোন রকমে সইতে পারে; শুধু ভদ্রলোকদেরই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। একে ত মুটে নেই, নিজের সমস্ত জিনিস নিজে কাঁধে ক'রে

একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে ওঠাতে হবে,—ততদূর বয়ে নিয়ে যেতে হবে; তার পরে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে খুলে ছড়িয়ে ষ্টিমে ফুটিয়ে লণ্ড-ভণ্ড করে ফেল্‌বে—মশাই, এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবধি থাক্‌বে না।" অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলাম,"এর কি কোন প্রতিকার নেই ডাক্তারবাবু?" তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "না। তবে ডাক্তার সাহেব জাহাজে উঠ্‌লে একবার আপনার জন্যে বলে দেখ্‌ব, তাঁর কেরাণী বাবুটি যদি আপনার ভার নিতে রাজী—" কিন্তু কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। একটা গোলমাল শুনিয়া দুজনেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার ৬।৭ জন খালাসীকে 'এলো'-পাথাড়ি' লাথি মারিতেছে; এবং বুটের চোটে যে যেখানে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে। এই ইংরাজ যুবকটি অত্যন্ত উদ্ধত বলিয়া বোধ করি ডাক্তারবাবুর সহিত ইতিপূর্ব্বে কোন দিন বচসা হইয়া গিয়াছিল, আজও কলহ হইয়া গেল। ডাক্তারবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,"তোমার এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত—এক দিন তোমাকে এ জন্য দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি।" লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কেন?" ডাক্তারবাবু বলিলেন, "এ ভাবে লাথি মারা ভারি অন্যায়।" লোকটা জবাব দিল, "মার ছাড়া ক্যাট্‌ল সিধা হয়?" ডাক্তারবাবু একটু 'স্বদেশী'। তাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এরা জানোয়ার নয়, গরীব মানুষ। আমাদের দেশী লোকেরা নম্র এবং শান্ত বলিয়াই কাপ্তেন সাহেবের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করে না, এবং তুমিও অত্যাচার করিতে সাহস কর।" হঠাৎ সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাক্তারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, "Look, Doctor, there's your countrymen; you ought to be proud of them!" চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উঁচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই লোকগুলা দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে এবং গায়ের ধুলা ঝাড়িতেছে। সাহেব একগাল হাসিয়া, ডাক্তারবাবুর মুখের উপর দু'হাতের বুড়া আঙ্গুল দুটা নাড়িয়া দিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া শিষ দিতে-দিতে প্রস্থান করিল। জয়ের গর্ব্ব তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তারবাবুর মুখখানা লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে কালো হইয়া গেল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বেহায়া ব্যাটারা, দাঁত বার করে হাসচিস্ যে!" এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আত্মসম্মান-বোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একযোগে হাসি বন্ধ করিয়া চড়া কণ্ঠে জবাব দিল, "তুমি, ডাক্তারবাবু, ব্যাটা বল্‌বার কে? কারো কর্জ্জ করে খায়ে হাস্‌তেচি মোরা?" আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁর ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। চৌকির উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, "উঃ—!" আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না।

বেলা এগারোটার সময় Quarantineএর কাছাকাছি একটা ছোট ষ্টীমার আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। এইখানি করিয়াই না কি সমস্ত ডেকের যাত্রীদের সেই ভয়ানক স্থানে লইয়া যাইবে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে।—আমার তাড়া ছিল না, কারণ, ডাক্তারবাবুর লোক এইমাত্র জানাইয়া গেছে যে, আমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রী ও খালাসীদের চেঁচাচেঁচি দৌড়ধাপ কতক্‌টা অন্যমনস্কের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, অভয়া দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, "আপনি এখানে যে?" অভয়া কহিল, "কৈ, আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন না?" বলিলাম, "না,—আমার এখনো একটু দেরি আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে না, একেবারে সহরে গিয়েই নাব্‌ব।" অভয়া কহিল, "না—না, শীগ্‌গীর গুছিয়ে নিন্।" বলিলাম, "আমার এখনও ঢের সময় আছে।" অভয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, সে হবে না। আমাকে ছেড়ে আপনি কিছুতে যেতে পারবেন না।" অবাক্ হইয়া বলিলাম, "সে কি কথা! আমার ত ওখানে যাওয়া হতে পারে না।" অভয়া বলিল, "তা' হলে আমারও না। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তবু কিছুতেই এমন নিরাশ্রয় হয়ে ও-যায়গায় যাব না। ওখানকার সব কথা শুনেছি।" বলিতে-বলিতেই তাহার চোখ-দুটি জলে টল্-টল্ করিয়া উঠিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কে যে, এমন জোর করিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে আমাকে ধীরে-ধীরে জড়াইয়া তুলিতেছে!

সে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, "আমাকে একলা ফেলে

চলে যাবেন,—এত নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন, আমি ভাবতেও পারিনি। উঠুন, নীচে চলুন। আপনি কাছে না থাকলে, ওই রোগা মানুষটিকে নিয়ে আমি কি কোর্‌ব বলুন ত?"

নিজের জিনিসপত্র লইয়া যখন ছোট ষ্টীমারে উঠিলাম, তখন ডাক্তার বাবু উপরের ডেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "না—না, আপনাকে যেতে হবে না,—ফিরুন, ফিরুন—আপনার হুকুম হয়েচে—আপনি—" আমিও হাত নাড়িয়া চেঁচাইয়া বলিলাম, "অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু, আর একটা হুকুমে আমাকে যেতেই হচ্চে।" সহসা বোধ করি তাঁহার দৃষ্টি অভয়া ও রোহিণীর উপর পড়িল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তবে মিছে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন!" "তার জন্যে ক্ষমা চাচ্চি।" "না—না, তার দরকার নেই—আমি জান্‌তাম। Good bye! চল্‌লুম।" বলিয়া ডাক্তার বাবু হাসিমুখে সরিয়া গেলেন।

চঞ্চল জগৎ

[আচার্য্য শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্‌-এ]

(গত শ্রাবণে প্রকাশিত 'প্রজ্ঞার জয়' শীর্ষক প্রবন্ধের পরে পঠিতব্য।)

জগৎ-প্রবাহের উৎস-সন্ধানে চলিয়াছি। দেখুন, কত দূরে আসা গেল।

প্রথমে বাহ্যজগতের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। দেখিয়াছি, বিজ্ঞানবিদ্যার বাহ্যজগৎ, আর আমাদের প্রত্যক্ষ বাহ্যজগৎ,—এই দুই বাহ্যজগৎ এক নহে। বিজ্ঞানবিদ্যার বাহ্যজগৎকে নামের জগৎ বলিয়াছি; আর প্রত্যক্ষ বাহ্য-জগৎকে রূপের জগৎ বলিয়াছি। যেটা নামের জগৎ, তাহা কখনও কাহারও প্রত্যক্ষ হয় নাই বা হইবে না; এই হিসাবে উহা অসত্য জগৎ। বিজ্ঞানবিদ্যা উহাকে রচনা করিয়া লইয়াছে; যদি উহার কোথাও অস্তিত্ব থাকে, বৈজ্ঞানিকদের মাথার ভিতরে সেই অস্তিত্ব আছে। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্যা,—গ্যালিলিও নিউটন যাহার জন্মদাতা, সেই বিজ্ঞানবিদ্যা,—এই বাহ্যজগৎকে কেমন করিয়া গড়িয়াছেন, তাহা আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি, আমার সেই প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। বিজ্ঞানবিদ্যা একটা একাকার সমাকার সীমাহীন আকাশ কল্পনা করিয়া সেই আকাশে এই জগৎকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং একটা আদিহীন ও অন্তহীন সন্তত ও বিচ্ছেদহীন কালের কল্পনা করিয়া, সেই কালের মধ্যে সেই জগতের ঘটনাপরম্পরাকে সাজাইয়া ফেলিয়াছেন। সেই ঘটনাপরম্পরাকে এমন নিয়মসূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে অতীত হইতে বর্ত্তমানকে আবিষ্কার করা চলে, বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎকে আকর্ষণ করিয়া বাহির করা চলে। এই আবিষ্কার ও আকর্ষণ কর্ম্মের নাম গণনা; যে-কোন সময়ে সেই বাহ্যজগতের অবস্থা কিরূপ, তাহা বলিয়া দিলে, অন্য যে-কোন সময়ে তাহার অবস্থা নির্দ্ধারণের নামই গণনা। এই নিয়মসূত্রে বন্ধনের নামই কার্য্যকারণের শিকলে বন্ধন—causalityর শিকলে বন্ধন—এই কারণের পর এই কার্য্য আসিবে, অন্য কার্য্য আসিবে না, এই নিয়তির বন্ধন। জ্যামিতি-শাস্ত্রের সরল রেখা নিয়মবদ্ধ রেখা; উহার কিয়দংশ মাত্র নির্দ্দেশ করিলে অবশিষ্ট সমস্ত অংশ বাঁধা পড়িয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়; এপাশে ওপাশে দুই পাশে বাঁধা পড়িয়া যায়; এও সেইরূপ। বর্ত্তমানকে নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অতীতটা বাঁধা পড়ে ও সমস্ত ভবিষ্যৎটা বাঁধা পড়ে। যে শিকলে ঐ তিন কাল বাঁধা পড়িয়াছে, সেই শিকলের একাংশ টানিলে সমস্ত শিকলটাই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসে। একবার ঐ নিয়মের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে আর বিচ্যুতির বা ব্যত্যয়ের বা ব্যতিক্রমের কোন সম্ভাবনা থাকে না; কোনরূপ স্বাধীনতার, কোনরূপ নূতনতার, সম্ভাবনা থাকে না। এই নিয়মবদ্ধ জগৎ চিরপুরাতন জগৎ; ইহার কোথাও কোন নূতনতার আবির্ভাবের সম্ভাবনামাত্র নাই; ইহার

কোথাও কোন freedom নাই; সমস্তটাই determinate। মনে করিবেন না যে, এ কালের বিজ্ঞানবিদ্যা বস্তুতই তাহার স্বরচিত বাহ্যজগৎকে এইরূপে নিগড়বদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্যা এখনও একগাছি শিকলে সমস্ত ঘটনা-পরম্পরাকে বাঁধিতে পারে নাই; কয়েকগাছি শিকল গড়িয়াছে মাত্র; উহার মধ্যেও আবার দুইচারিগাছি মাত্র শক্ত; অন্য কয়গাছা শিথিল ও দুর্ব্বল। এখনও শিকলে-শিকলে জোড় লাগে নাই; ভাল করিয়া জোড় মিলে নাই; বহু স্থলে ঘটনাস্তূপ শিকলের বাহিরে ইতস্ততঃ অবিন্যস্তভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তা হউক, বিজ্ঞানবিদ্যা চাহেন, শেষ পর্য্যন্ত একগাছি শিকল গড়িতে; সে শিকল এমন হইবে, যে, তাহার দৃঢ় বন্ধনে তাঁহার রচিত জগতের সমস্তটা বাঁধা পড়িবে, কোথাও কোন শৈথিল্য থাকিবে না; কোথাও কিছু এড়াইয়া যাইবে না। বিজ্ঞানবিদ্যা সেই আশাতেই বসিয়া আছেন; সেই আশাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া আছেন; এরূপে আঁকড়াইয়া না থাকিলে তাঁহার ব্যবসায় মাটি হইবে। বিজ্ঞানবিদ্যা সমস্ত জগৎকে এইরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে গিয়া, জগতের যাবতীয় ঘটনাকে দেশের মধ্যে ও কালের মধ্যে সাজাইয়া ফেলিয়াছেন; এটার পাশে ওটা, ওটার পাশে সেটা, এইরূপে দেশে সাজাইয়াছেন। অতীতে এটার পর ওটা, ওটার পর সেটা আসিয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে এটার পর ওটা, ওটার পর সেটা আসিবে, এইরূপে কালে সাজাইয়াছেন। দেশে সাজাইয়া দিয়াছেন সাহচর্য্য এবং কালে সাজাইয়া দিয়াছেন পৌর্ব্বাপর্য্য। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্যা যে আকাশের কল্পনা করিয়াছেন, তাহা একাকার ও সমাকার আকাশ; উহার কোথাও কোন বৈষম্য নাই। যে কালের কল্পনা করিয়াছেন, তাহাও সন্তত-ভাবে একটানে একমুখে চলিয়াছে, একটা সরল রেখার মত একমুখে চলিয়াছে, কোনরূপে হেলিয়া দুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া চলে নাই। আপনারা কবির বচন শুনিয়া থাকিবেন, নদী আর কালগতি উভয়ে সমান;—নদী যেমন একটানে উঁচু জমি হইতে নীচু জমির দিকেই চলে, মুখ ফিরায় না, কালও সেইরূপ একটানে ভবিষ্যতের মুখেই চলে, মুখ ফিরায় না। এই হিসাবে বিজ্ঞানবিদ্যার আকাশও যেমন সমাকার, বিজ্ঞানবিদ্যার কালও সেইরূপ সমাকার; কোথাও কোন কুটিলতা নাই; একাকার তন্তুমধ্যে যেন কোথাও কোন গ্রন্থি পড়ে নাই। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যাকে সেই সমাকার দেশ ও সমাকার কাল ব্যাপিয়া যে জগৎকে বসাইতে হইয়াছে, তাহা ত সেরূপ সমাকার জগৎ নহে; তাহার সর্ব্বত্রই বৈষম্য, এবং সর্ব্বদাই বৈচিত্র্য। যাহা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা সমাকার, তাহা ত মহাশূন্য, তাহাকে আবার রচনা করিবেই বা কি, আর নিয়মের শিকলে বাঁধিবেই বা কি? বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁহার বাঙ্ময় জগৎকে রচনা করিতেছেন, রচনা করিয়া নিয়মে বাঁধিতেছেন; উহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমাকার হইলে বিজ্ঞানবিদ্যার কোন কার্য্যই থাকিত না। আমি দেখাইয়াছি যে, সমাকার আকাশে এই বিষমাকার জগৎকে স্থাপন করিতে গিয়া একালের বিজ্ঞানবিদ্যা একটা কৃত্রিম পদার্থের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উহার নাম দিয়াছেন জড়পদার্থ। ইহা বিজ্ঞানবিদ্যার জড়পদার্থ; প্রত্যক্ষ জগতের জড়পদার্থ ইহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানবিদ্যার এই জড়-পদার্থ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এ সমুদয়ে বর্জ্জিত জড়পদার্থ; উহা কোনরূপ অনুভূতির বা উপলব্ধির সামগ্রী নহে; এমন কি ইহার কোনরূপ resistance—বিরোধানুভূতি—জন্মাইবারও ক্ষমতা ইহার নাই। কিরূপে থাকিবে? অনুভূতি-মাত্রই ত প্রত্যক্ষ বিষয়; আর এই যে বিজ্ঞানবিদ্যার রচিত জগৎ ইহার কোন অংশ ত কোনরূপে কাহারও প্রত্যক্ষ বিষয় হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ হইবেই বা কাহার? চেতন জীবই ত প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান বিদ্যার রচিত এই যে জগৎ, ইহা ত চেতন জীবের কোন অপেক্ষাই রাখে না। বিজ্ঞানবিদ্যা বলেন, জগতে চেতন জীব যখন ছিল না, তখনও এই জগৎ বিদ্যমান ছিল; চেতন জীব কেহ না থাকিলেও ইহা বিদ্যমান থাকিবে; অতএব বিজ্ঞানবিদ্যার রচিত এই কৃত্রিম জগৎ চেতন জীবের অস্তিত্ব-নিরপেক্ষ জগৎ। বড় মজার জগৎ—সর্ব্বরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অতীত জগৎ, অথচ সাকার জগৎ—বিষমাকার জগৎ। এই জগৎকে বিষমাকৃতি দিতে গিয়া একালের বিজ্ঞানবিদ্যা তাঁহার সমাকার আকাশকে জড়পদার্থে পূর্ণ করিয়াছেন;—সমস্ত আকাশটা ঈথারে পূর্ণ করিয়াছেন, এবং ঈথারের মাঝে মাঝে ইলেক্ট্রনের কণিকা ছড়াইতেছেন, ছোট ছোট বড় বড় দল-বাঁধা ইলেক্ট্রন-কণিকাগুলিকে ছড়াইতেছেন। ইলেক্ট্রনের

এক একটা ঝাঁকের নাম দিয়াছেন পরমাণু বা atom; পরমাণুর সমষ্টিকে,নাম দিয়াছেন অণু বা molecule; অণুর সমষ্টিকে নাম দিয়াছেন কণা বা particle; আর কণা-সমষ্টির নাম দিয়াছেন বালুকাখণ্ড, শিলাখণ্ড, উল্কাখণ্ড, উপগ্রহ, গ্রহ, তারকা ইত্যাদি। ঈথার আর ইলেক্ট্রন, এই দুই কল্পিত মশলাতে আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্যা তাঁহার জড়-জগৎকে রচনা করিতে চাহিতেছেন। এই ঈথারটা কি, এই প্রশ্ন তুলিলে বিজ্ঞানবিদ্যা থতমত হইয়া বলেন, তাই ত, তাই ত, ইহার রূপ-রস-গন্ধাদি ত কিছুই নাই—ইহা ত প্রত্যক্ষ নহে—তবে কিরূপে উত্তর দিব? আচ্ছা, ইহা এমন একটা কিছু, যাহা সমাকার আকাশ ব্যাপিয়া আছে। ইহা অচল কি চঞ্চল, তাহা প্রশ্ন করিলে বিজ্ঞানবিদ্যা বলেন, তাই ত, ঈথার সচল মনে করিবার কোন হেতু নাই; ধর, ইহা আকাশে স্থির হইয়াই আছে, তবে একটু চাঞ্চল্য আছে বৈ কি; ইহা স্বস্থানে স্থির থাকিয়াই চাঞ্চল্য দেখায়;—ইহা সচল নহে, কিন্তু চঞ্চল, ইহা চলে না, কিন্তু ইহা কাঁপে। বুড়া রাজমন্ত্রী লর্ড সালিসবরিকে একবার ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের সভাপতিত্ব গ্রহণের জন্য বৈজ্ঞানিকেরা ডাকিয়াছিলেন;—লর্ড সালিসবরি বৈজ্ঞানিক না হউন, তিনি চিন্তাশীল ও ভাবুক লোক ছিলেন, এবং একালের বিজ্ঞানবিদ্যার খবর রাখিতেন। লর্ড সালিসবরি সভাপতির সম্বোধনে এই প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্যার নিকটে, ঈথার কি, এই প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া আমি সার বুঝিয়াছি যে, এই ঈথার কাঁপাক্রিয়ার কর্ত্তা। কথাটা নিতান্ত ব্যঙ্গ নহে। ঈথার এমন কিছু, যাহা চলে না, কেবলই কাঁপে। আর ইলেক্ট্রন কি, জিজ্ঞাসা করিলে বিজ্ঞানবিদ্যা বলিবেন যে, ইলেক্ট্রন চলন-ক্রিয়ার কর্ত্তা; ইলেকট্রন ঈথার ঠেলিয়া চলে; অতি দ্রুত বেগেই চলে; এমন কি, সেকেণ্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল পর্য্যন্ত বেগেও চলিতে পারে। ভাল, ঈথার কেবলই স্বস্থানে আসিয়াই কাঁপে, আর ইলেক্ট্রন ঈথার-মধ্য দিয়া বেগে চলে, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু ঈথারের সহিত ইলেক্ট্রনের সম্পর্ক কিরূপ? ইহার উত্তরে বলা হয়, তাই ত, তাই ত; ঈথারই হয় ত স্থানে-স্থানে জমাট বাঁধিয়া ইলেক্ট্রন, জন্মিয়াছে—উহা ঈথারেরই এক-একটা জমাট দানা। অথবা উহা এক-একটা ঘূর্ণী, ঈথারের স্থির সমুদ্রে এক-একটা ছোট ঘূর্ণী বা ভ্রমি। অথবা ইলেক্ট্রন এক-একটা ফাঁক—ঈথার-সমুদ্রে হয় ত এক-একটা বুদ্বুদ। এই অথবা-পরম্পরার প্রাচুর্য্য দেখিয়া অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিতে বাধ্য হন, নমস্কার মহাশয়, আর 'অথবা'র দরকার নাই; বেশ বুঝিয়াছি—তৃপ্তোঽস্মি।

বেশ, বিজ্ঞানবিদ্যার সমাকার আকাশে বিষমাকৃতি দেওয়া প্রয়োজন; সেই জন্য উহা ঈথারে পূর্ণ করিয়া সেই ঈথারে ইলেক্ট্রন ছড়াইতে হইয়াছে। এই ঈথার এবং ইলেক্ট্রন লইয়া বিজ্ঞানবিদ্যা তাঁহার যাবতীয় জড়দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতেছেন।

প্রশ্ন কর যে এই ঈথার কি? বিজ্ঞানবিদ্যা বলিবেন, যাহা চলে না, কেবলই কাঁপে, তাহাই ঈথার। প্রশ্ন কর, এই ইলেক্ট্রন কি? বিজ্ঞানবিদ্যা বলিবেন, ইলেক্ট্রন ঈথার মধ্যে চলে, খুব বেগে চলে। এখন এই কাঁপার ও চলার তাৎপর্য্যটা বুঝিবার চেষ্টা করুন। হাতী চলে, ঘোড়া চলে, ইট-পাটকেল বালুকণা ধূলিকণা, সবই চলে। আবার হাত কাঁপে, পা কাঁপে, বুক কাঁপে, ঝড়ের সময় ডালপালাসমেত গাছ কাঁপে, সেতারের তার কাঁপে, মেদিনীও থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপেন! এ সবই ত বস্তু; বস্তুমাত্রই চলে ও কাঁপে। কোন অবস্তু কাঁপিতে বা চলিতে পারে কি? যিনি পদার্থবিদ্যায় পণ্ডিত, তিনি এখনি নানা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া বলিবেন, হাঁ, পারে বই কি? যথা, উত্তাপ, উষ্ণতা, ঢেউ; পদার্থবিদ্যা মতে এই সকল পদার্থ অবস্তু; অথচ এই সকল অবস্তু এখান হইতে ওখানে চলে। আপনি জ্যামিতি-বিদ্যায় সুপণ্ডিত; আপনি দম্ভ করিয়া বলিবেন, রহ, ও সকল দৃষ্টান্তে কাজ কি? এমন সব অবস্তু লইয়া আমার জ্যামিতিবিদ্যা আলোচনা করে, যাহাতে প্রত্যক্ষের কোন বালাই নাই। যথা জ্যামিতি-শাস্ত্রের বিন্দু,—ইউক্লিডের point; উহা ত একেবারে প্রত্যক্ষের অতীত নামলোকের পদার্থ, উহাকেও ত আমরা ইচ্ছামত চালাইতেছি। বিন্দুকে ইচ্ছা-মাত্র এখান হইতে ওখানে চালাইতেছি; কখনও ধীরে, কখনও দ্রুত চালাইতেছি; এক বিন্দুকে অন্য বিন্দুর উপরে চাপাইয়া মিলাইয়া দিতেছি; কেহ কোন আপত্তি করে না। আর ঐ রেখা,—যাহা বিন্দুর পথ মাত্র,—উহাও প্রত্যক্ষের অতীত নামলোকের পদার্থ; উহাকেও ইচ্ছামত চালাইতেছি,

এক রেখাকে তুলিয়া অন্য রেখার উপরে চাপাইতেছি—superpose করিতেছি ;—যে ইউক্লিড পড়িয়াছে, সেই ত তা জানে। অতএব বিজ্ঞানবিদ্যার আকাশকে যদি বিষমাকার দিতে হয়, তবে ইট-পাটকেল, ধূলিকণা, বালুকণা ইলেক্ট্রন প্রভৃতির দরকার কি ? কতকগুলা বিন্দু বা কতকগুলা রেখা কল্পনা করিয়া আকাশকে বিষমাকৃতি দিলেই ত চলিতে পারে। বস্কোবিচ তাহাই করিয়াছিলেন। মাইকেল ফ্যারাডের অনুবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকেরাও তাহাই করিতেছেন। বিজ্ঞানবিদ্যা যে আকাশকে ঈথারে পূর্ণ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা সেই আকাশের মধ্যে কতকগুলা রেখা—lines of force—বসাইয়াছেন এবং সেই রেখাগুলাকে এ-দেশ হইতে ও-দেশে চালাইতেছেন। সমস্ত আকাশটাই এই সকল রেখায় পরিপূর্ণ রেখাগুলা আকাশে ছড়াইয়া আছে—সোজা, বাঁকা, কুঁজো, অসংখ্যেয় রেখা—কোথাও ঘন সন্নিবিষ্ট, ঘেঁসাঘেষি ; কোথাও বা বিরল, ছাড়াছাড়ি,—এইরূপ অসংখ্যেয় রেখা। এই রেখাগুলা চলন্ত রেখা ; ইহা চলিতেছে, ছুটিতেছে, ঘুরিতেছে, কাঁপিতেছে—যে প্রদেশে তাহারা বিছাইয়া আছে, সেই প্রদেশটাই ঈথার ; আর ঈথারের মাঝে-মাঝে যেখানে রেখাগুলা converge করিয়া মিলিবার, পরস্পর কাটাকাটি করিবার, চেষ্টা করিতেছে, সেই স্থান গুলাই ইলেক্ট্রন। এইরূপ বস্তুহীন ঈথার এবং এইরূপ বস্তুহীন ইলেক্ট্রন দিয়া সমাকার আকাশকে বিষমাকার করা যাইতে পারে। এবং এইরূপ রেখার চলাচল কল্পনা করিয়া বিজ্ঞানবিদ্যার জড়-জগতের সমুদয় কাণ্ড-কারখানার বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে।

আপনারা আমার উপর খুব চটিবেন। এ সব কথা ত আগেই বলিয়াছি—পুনরুক্তি কেন ? আমার একমাত্র কৈফিয়ত এই যে, কথাগুলা নিতান্ত সহজ নহে। যাঁহারা একালের বিজ্ঞানবিদ্যা নিবিষ্ট হইয়া আলোচনা করেন নাই, তাঁহাদের কাছে কথাগুলা নূতন ;—তাঁহাদের মাথায় ঢোকান কঠিন। পুনঃ-পুনঃ হাতুড়ির ঘায়ে মাথায় ঢোকাইতে হইবে, সেই জন্য আমাকে পুনঃ-পুনঃ হাতুড়ির ঘা দিতে হইতেছে। যদি প্রবেশ করাইতে না পারি, আমার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। বিজ্ঞানবিদ্যার জড়-জগৎ যে ইউক্লিডের আলোচিত জগতের মতই একবারে প্রত্যক্ষাতীত কৃত্রিম, জগৎ, তাহাই দেখান আমার উদ্দেশ্য। ইহা রূপের জগৎ নহে, কেবল নামের জগৎ। জ্যামিতি শাস্ত্রের জগৎও ঐরূপ নামের জগৎ। জ্যামিতি শাস্ত্রের রেখা, ভূমি, তল, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বর্ত্তুল, সমস্তই নামলোকে বিদ্যমান। কোন জীয়ন্ত মানুষ এ পর্য্যন্ত একটা সরল রেখা; একটা ত্রিভুজ বা বৃত্ত বা বর্ত্তুল, লইয়া কারবার করে নাই ; মাষ্টার মহাশয় ছেলেদিগের সম্মুখে খড়ি দিয়া যে সরল রেখা বা বৃত্ত আঁকেন, তাহা সরল রেখাও নহে, বৃত্তও নহে। এ সকল পদার্থ আঁকিয়া দেখাইবার যো নাই ; উহারা একবারে প্রত্যক্ষাতীত কৃত্রিম সামগ্রী। সেইরূপ বিজ্ঞান-বিদ্যার ইলেক্ট্রন, পরমাণু, অণু এ সকলও ধরিয়া দেখাইবার যো নাই ; সমস্তই প্রত্যক্ষাতীত কৃত্রিম পদার্থ। ইউক্লিড এক রকমের জ্যামিতি গড়িয়া গিয়াছেন ; আমাদের ইস্কুল কালেজে তাহাই পড়ান হইতেছে। কিন্তু একালের নব্য ইউক্লিডেরা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, জ্যামিতি বিদ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে গড়া যাইতে পারিত ; ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলিকে একবারে অসিদ্ধ করিয়া এবং স্বীকার্য্য কয়টিকে একবারে অস্বীকার করিয়া, অন্য স্বতঃসিদ্ধ ও অন্য স্বীকার্য্য লইয়া, নূতন জ্যামিতি গড়া যাইতে পারিত। বহুকালের প্রাচীন ইউক্লিড একটা বিদ্যা গড়িয়া দিয়া গিয়াছেন—তাহাতেই বেশ কাজ চলিতেছে ; তাই সেটাকে ভাঙ্গিয়া নূতন জ্যামিতি গড়িবার প্রয়াস কেহ করিতে চায় না ; ইস্কুল কালেজের কেতাবে করিতে চায় না। সেইরূপ গ্যালিলিও নিউটন একটা ভিত্তির উপর বিজ্ঞানবিদ্যাকে গড়িয়া গিয়াছেন, অন্য ভিত্তির উপরে অন্যরূপে গাঁথাও চলিত ; কোন ক্ষতিই হইত না। তবে এত বড় পুরাতন মন্দিরটা ভাঙিয়া আবার নূতন মন্দিরের নির্ম্মাণ কষ্টসাধ্য। বিজ্ঞানবিদ্যার জড়-জগতের এখন যে প্রতিমা গড়া হইয়াছে, তাহাকেই একমাত্র প্রতিমা মনে করিবার হেতু নাই। অন্য আকারে প্রতিমা গড়িলেও চলিত।

আপনারা বিজ্ঞানবিদ্যাকে অত্যন্ত সত্যবাদী বলিয়া জানেন। বিশুদ্ধ সত্য লইয়া ইহার কারবার। বিজ্ঞান-বিদ্যার সত্যের মূল্য এখন বুঝিলেন। বিজ্ঞানবিদ্যা বলেন জড়-জগৎ আকাশ ব্যাপিয়া আছে—সেই আকাশ সীমাহীন ; তবে, আকাশকে সীমাবদ্ধ মনে করিলেও হানি হইত

না; সেই আকাশ সমাকার; তবে আকাশকে স্বভাবতঃ বিষমাকার গণ্য করিলেও ক্ষতি হইত না। আকাশ ঈথারে পূর্ণ এবং সেই ঈথার মধ্যে অণু পরমাণু ইলেক্ট্রন ছড়াইয়া আছে। না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না। অন্যরূপ কল্পনাতেও বিজ্ঞানবিদ্যার কাজ চলিতে পারিত। ইহাই বিজ্ঞানবিদ্যার সত্য। এই সত্যকে প্রণাম করিয়া আপনারা তৃপ্ত থাকুন। ফলে, গ্যালিলিও ও নিউটনের সময়ে, ইউক্লিডের আকাশ ভিন্ন অন্যরূপ আকাশ যে হইতে পারে, ইহা কাহারও কল্পনাতেও আসে নাই। যদি লবাচুস্কি ও রীমানের পরে গ্যালিলিও নিউটন জন্মিতেন, তাহা হইলে হয় ত তাঁহারা অন্যরূপ আকাশে—সীমাবদ্ধ, বিষমাকার, চতুর্দ্ধা বা বহুধা বিস্তৃত, আকাশেই—জড়জগৎকে স্থাপনা করিতেন। তাহা হইলে সেই জড়জগৎকে নিয়মবদ্ধ করিবার জন্য অন্যরূপ সূত্রের উদ্ভাবনার প্রয়োজন হইত। নিউটনের law of gravitation—মাধ্যাকর্ষণ সূত্র—তাহা হইলে হয় ত অন্য রূপ গ্রহণ করিত; conservation of matter—জড়ের নিত্যতা—স্বীকৃত হইত কি না সন্দেহ; conservation of energy—শক্তির নিত্যতা—স্বীকারেও হয় ত একান্ত প্রয়োজন হইত না।

আমি আগেই বলিয়াছি যে বৈজ্ঞানিকের জড়জগতের বিবরণ দিতে গেলে আকাশকে নানা চিহ্নে চিহ্নিত করিতে হয়। এই চিহ্নগুলাই বৈজ্ঞানিকের জড়দ্রব্য—প্রত্যক্ষাতীত কল্পিত জড়দ্রব্য। একটা চিহ্ন নয়—বহু চিহ্নে আকাশকে চিহ্নিত করিতে হইয়াছে। বহু চিহ্নে আকাশকে বিচ্ছিন্ন করিতে হইয়াছে, অবিচ্ছেদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনিতে হইয়াছে। বহুত্ব কেন? প্রমথ বাবুর প্রশ্নের প্রসঙ্গে ইহার আলোচনা করিয়াছি। সন্ততিতে—অবিচ্ছেদে—আমাদের কাজ চলে না; বহুত্বই আবশ্যক; বিচ্ছেদই আবশ্যক। এই বহুত্বের কল্পনার সহিত দেশের কল্পনাকে ভিন্ন করিবার উপায় নাই; উভয় কল্পনা পরস্পরকে জড়াইয়া আছে। যখনই বলি, একের অধিক বা বহু, তখনি দেশের কল্পনা আসিয়া পড়ে; একটার পাশে আর একটা। সাধে কি বার্গসোঁ বলিয়াছেন, বহুত্ব আর দেশ একই জিনিষ—যেখানে বহুত্ব-বুদ্ধি, সেইখানেই দেশ-বুদ্ধি। কেবল এককে বসাইবার জন্য দেশের দরকার নাই। খাঁটি এককের সহিত দেশের সম্পর্ক থাকিতে পারে না। একমাত্র অখণ্ড অংশহীন পদার্থকে বসাইতে হইলে দেশের প্রয়োজন হয় না; সমস্ত দেশ যেন শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া সেই খাঁটি একের ভিতরে লীন হইয়া পড়ে। যেখানে দেশ, সেইখানেই বহুতা; সেইখানেই ক্ষুদ্রতা ও বৃহত্তা;—বহু ক্ষুদ্রকে পাশাপাশি বসাইলে যাহা হয়, তাহাই বৃহৎ। কাজেই যেখানে দেশ, সেইখানেই বহুতা; সেই খানেই সংখ্যা গণনা ও পরিমাণ কর্ম্ম পরস্পরকে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান-বিদ্যা বহু চিহ্নে আকাশকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং দুইটা চিহ্নের মাঝে আর কয়টা চিহ্ন পাশাপাশি বসান যাইতে পারে, তাহা দেখিয়া দূরত্বের পরিমাণ করিতেছেন। পরিমাণ কর্ম্মে এইরূপ বহুখণ্ডে খণ্ডনের দরকার হয়। বিজ্ঞানবিদ্যার রচিত জগৎকে এইরূপ খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন না করিলে সে জগতে পরিমাণ কর্ম্ম চলিত না; তাহার কোনরূপ হিসাব রাখা চলিত না।

আপনারা প্রশ্ন তুলিবেন, বিজ্ঞান-বিদ্যার এত পরিশ্রমের সার্থকতা কি? বিজ্ঞানবিদ্যা যে কৃত্রিম জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষের বহির্ভূত জগৎ, তাহা মানিয়া লইলাম। কিন্তু আমাদের কারবার ত প্রত্যক্ষ জগতে। আমাদের প্রত্যক্ষ জগতের কারবারে ঐ কৃত্রিম জগতের হিসাব লওয়ার সার্থকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাকে বেগ পাইতে হইবে না। আপনারা সকলেই ত ইউক্লিডের প্রসাদে ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বৃত্ত এইরূপ কতরকমের ক্ষেত্রের নিয়মসূত্র লইয়া পরিমাণ কর্ম্ম করিতেছেন। এই বৃত্ত-ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ সমস্তই ত প্রত্যক্ষের অতীত; অথচ যাহারই দশকাঠা জমি আছে, সেই জমির কালি কষিতে গেলেই তাহাকেই ইউক্লিডের শরণ লইতে হয়। ইউক্লিড তাঁহার কল্পিত বায়বীয় জগৎকে যে সকল নিয়মসূত্রে বাঁধিয়াছেন, আপনাদের প্রাণযাত্রার জন্য প্রত্যক্ষ জগতে কারবার করিতে গিয়া সেই সকল নিয়মসূত্রের প্রয়োগ করিতে হয়। সূত্র অনুসারে কালি কষিয়া যে ফল পান, তাহা বিশুদ্ধ হয় না; কিছু না কিছু ভুল থাকিয়া যায়; তবে মোটের উপর জীবনযাত্রার কাজ চলিয়া যায়। বিজ্ঞান-বিদ্যার পক্ষেও সেইরূপ। জ্যোতির্ব্বিদ্যা তাহার কাল্পনিক জগতে মাধ্যাকর্ষণের সূত্র প্রয়োগ করিয়া যে কাল্পনিক গ্রহের

আবিষ্কার করিয়াছিল, প্রত্যক্ষ জগতে দূরবীন লাগাইয়া নেপ্‌চুন্ গ্রহের আবিষ্কার হইলে, দেখা গেল যে জ্যোতির্বিদ্যার গণনার ফলের সহিত ঠিক মিলিল না বটে, কিন্তু কাজ-চলা-গোছের মিল হইল। বিজ্ঞান-বিদ্যার গণনা যে প্রত্যক্ষ জগতে কাজে লাগে, তাহার দৃষ্টান্ত রাশি-রাশি রহিয়াছে। তা হবেই ত। গোড়াতেই বলিয়া রাখিয়াছি, বিজ্ঞান-বিদ্যার আলোচিত কৃত্রিম জগতের রচনাকর্ত্রীর নাম প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা বহু চেতন জীবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া দেখিতে পায়, একজনের অভিজ্ঞতা সর্ব্বতোভাবে অন্যের অভিজ্ঞতার সহিত মিলে না; কেবল কিয়দংশ মিলে। এইজন্য সকলের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে অংশ মিলে না, তাহা ছাঁটিয়া ফেলিয়া, যে অংশ মিলে, সেই অংশের গড় কষিয়া একটা কাল্পনিক অভিজ্ঞতা খাড়া করে; একটা কাল্পনিক মাঝারি মানুষ খাড়া করিয়া তাহারই কাল্পনিক অভিজ্ঞতা অবলম্বনে একটা কাল্পনিক জগৎ রচনা করিয়া লয়। সেই কাল্পনিক জগতের গতিবিধি গণনা করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, কোন জীয়ন্ত মানুষের প্রত্যক্ষের সহিত তাহার ষোলআনা মিলে না; কোথাও পৌনে ষোল আনা, কোথাও বা পোনের আনা, মিলিলেই তাহার জীবনের কাজ মোটামুটি চলিয়া যায়। আর যদি কোন হতভাগা থাকে, যাহার প্রত্যক্ষের সহিত পৌনে ষোল আনা অমিল হয়, তাহার জীবনযাত্রায় সেই গণনা কোনই কাজে লাগে না; সেই হতভাগাকে বাতুল নাম দিয়া পাগলা গারদে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতে হয়। সৌভাগ্য যে অধিকাংশ মানবই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ। অতএব এই অধিকাংশ মানবই বিজ্ঞান-বিদ্যার গণনাকে জীবনযাত্রায় প্রয়োগ করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ। এইরূপ প্রয়োগে সমর্থ বলিয়াই মানুষ প্রজ্ঞাবলে জগজ্জয়ী। বিজ্ঞান-বিদ্যার এই যে জয়, ইহা প্রজ্ঞারই জয়।

মানুষের অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন। মোটা চোখে দেখিলে মানুষের মত অসমর্থ প্রাণী খুব বেশি নাই। গাছপালার মত জ্ঞানহীন প্রাণী আত্মরক্ষার জন্য কত উপায় স্বভাবতঃ করিয়া রাখিয়াছে; বাবলা গাছ তাহার গায়ে কাঁটা গজাইয়া রাখিয়াছে; কুঁচিলা গাছ আহার দেহে বিষ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। যে শত্রু তাহাদিগকে আক্রমণ করে, সে আপনা হইতেই পরাজিত হয়। বাবলাগাছ বা কুঁচিলাগাছ জানিতেও পারে না যে তাহার শত্রু এইরূপে পরাভূত হইয়া গেল। মানুষের দেহ শিরীষ-সুকোমল; মানুষ ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়; মানুষ আত্মরক্ষার জন্য স্বভাবদত্ত কোন অস্ত্র পায় নাই। মানুষের পিঠ কাছিমের পিঠের মত শক্ত নয়, দাঁত বাঘের মত ধারাল নয়, দৃষ্টি শকুনির মত তীক্ষ্ণ নয়, ঘ্রাণ কুকুরের মত তীব্র নয়, পাখীর মত উড়িয়া বা মাছের মত সাঁতরাইয়া বা ছুঁচার মত গর্ত্তে লুকাইয়া মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এমন কি তাহার পূর্ব্ব-পিতামহ বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষায় যে সামর্থ্য পাইত, মানুষ সে সামর্থ্যও হারাইয়াছে। হরিণ বা শশকের মত শত্রু হইতে দূরে পলাইবার ক্ষমতা থাকিলেও কতকটা রক্ষা হইত। এই অতি দুর্ব্বল মনুষ্যকে অন্য উপায়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। যে সকল আপদ নিত্য উপস্থিত হয়, তাহা হইতে রক্ষার ব্যবস্থা মোটের উপর স্বভাবতঃ রহিয়াছে। কিন্তু নৈমিত্তিক আপদ, বিশেষতঃ ভবিষ্যতের আপদ হইতে, আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আবশ্যক। আগে আপনাদিগকে বলিয়াছি, মৌমাছির মত ক্ষুদ্র জন্তু ভবিষ্যৎ আপদের জন্য আত্মরক্ষার এবং বংশরক্ষার কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মৌমাছির কোন জ্ঞানই নাই; ভবিষ্যতে কি আপদ আসিতে পারে, সে তাহা কিছুই জানে না; সে বিষয়ে তাহার আশঙ্কা মাত্রই নাই; অথচ সে কিরূপ অদ্ভুত কৌশলে, অদ্ভুত চাক বানাইয়া, সেই চাকের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য আহার-সামগ্রী সঞ্চয় করিয়া, আত্মরক্ষার এবং বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছে। কেন করিতেছে, কিছুই জানে না,—কেবল সংস্কারের প্রেরণায় করিতেছে। অনেক পশুপাখীও সংস্কারের প্রেরণায় ভবিষ্যতের জন্য কিরূপে প্রস্তুত থাকে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আপনারা শুনিয়াছেন। কোন পাখীই ভূগোল-বিবরণ পড়ে নাই, অথবা কোন্ দেশে কখন আহার-সামগ্রী পাওয়া যাইতে পারে, তাহা কাহারও নিকট শুনে নাই। সে দেশে যাইবার পথ পর্য্যন্ত চিনে না; অথচ ঋতুপরিবর্ত্তনের সহিত যথাকালে ঝাঁক বাঁধিয়া সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী দেশে গিয়া উপস্থিত হয়,—কোনরূপ শিক্ষার অপেক্ষা করে না। এক জাতি কাদামাছ আছে,—মাঝ-আটলান্টিকের

গভীর জলে তাহারা কোটি-কোটি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি হইতে অতি ক্ষুদ্র বাচ্ছা মাছ বাহির হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তাহার পর তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া পূর্ব্ব মুখে যাত্রা করে। কেন যাইতেছে এবং কোথায় যাইতেছে, তাহা জানে না; অথচ তিন চারি হাজার মাইল ঘুরান পথ অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে বাল্‌টিক্ সমুদ্রে উপস্থিত হয়। আসিতে-আসিতে তাহারা যে বয়স পায়, সে বয়সে সমুদ্রের লোণা জল সহিতে পারে না; তখন উত্তর সাগরে আর বাল্‌টিক্ সাগরে ইউরোপের যত নদী আসিয়া পড়িতেছে, সেই সকল নদীর মুখে প্রবেশ করে এবং উজানে চলিয়া নদী ছাইয়া ফেলে। কিন্তু নদীর প্রসন্ন জল ডিম পাড়িবার উপযোগী নহে; ডিম পাড়িবার পূর্ব্বে যথাকালে আবার সেই পূর্ব্ব পথ অতিক্রম করিয়া আটলাণ্টিকের সেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই ব্যাপারে তাহাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন হয় না; খাঁটি সংস্কারের তাড়নায় তাহারা দূর ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার এবং বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য বাধ্য রহিয়াছে। মানুষের পক্ষে সংস্কারের প্রেরণা অত্যন্তই দুর্ব্বল। মৌমাছি বা কাদামাছের ত কথাই নাই,—পশু পক্ষীর তুলনায়ও তাহার সংস্কার অতিশয় দুর্ব্বল। অথচ সেই মনুষ্য আজ প্রাণীর মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ ও শ্রেষ্ঠ;—সে কিসের বলে? উত্তরে বলিব, প্রজ্ঞার বলে। দুর্ব্বল মানুষ আত্মরক্ষার জন্য দল বাঁধিতে বাধ্য হইয়াছে; এবং দলের মধ্যে থাকিয়া, দলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, আপাততঃ আপনার স্বাভাবিক স্বার্থপরতাটাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এই যে সংযম, ইহারও মূলে স্বার্থপরতা। বস্তুতঃ কোন প্রাণী পরার্থ চায় না, স্বার্থই তাহার সর্ব্বস্ব। অপরের আনুগত্য স্বীকার না করিলে আত্মরক্ষা হয় না বলিয়াই, সে দলের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য। দলস্থিত বহুর নিকট সে আপনাকে ছোট করিয়া, খাট করিয়া, লইয়াছে। বহুর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া আপনার অভিজ্ঞতাকে সংশোধিত ও বৰ্দ্ধিত করিয়া লইয়াছে। অতীত পিতৃ-পরম্পরার সঞ্চিত স্তূপীকৃত অভিজ্ঞতা তাহার উপর চাপাইয়া, তন্মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া, গড় করিয়া, প্রত্যক্ষের অতীত একটা কাল্পনিক জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং সেই জগতের অতীত অবলম্বনে ভবিষ্যৎ ঘটনা-পরম্পরার সূত্রবদ্ধ ধারা নির্ণয় করিতেছে। সেই সূত্র আপনার জীবন-যাত্রায় প্রয়োগ করিয়া ভবিষ্যতের ঘটনা-পরম্পরার জন্য, ভবিষ্যতের আপদ নিবারণের জন্য, প্রস্তুত হইতেছে। আমি বলিতে চাহি না যে, আধুনিক বিজ্ঞান-বিদ্যা যে সুনিয়ত সুশৃঙ্খল অথচ কৃত্রিম জড়জগতের রচনা করিয়াছেন, সাধারণ মানুষে তাহার খোঁজ রাখে। আমি এইমাত্র বলিতে চাহি যে, সুস্থ প্রকৃতিস্থ মনুষ্যমাত্রই—যাহার কিছু প্রজ্ঞাবল আছে সেইরূপ মনুষ্যমাত্রই—একজন ছোটখাট বৈজ্ঞানিক। সে আপন প্রজ্ঞাবলে তাহার নিজের জন্য একটি কৃত্রিম জগৎ রচনা করিয়া লইয়াছে। সেই জগতের যেমন অতীত আছে, ভবিষ্যৎও তেমনি একটা আছে। সেই ভবিষ্যতের ঘটনা-পরম্পরা তাহার প্রজ্ঞা-চক্ষুর সম্মুখে কোথাও স্পষ্ট ভাবে, কোথাও অস্পষ্ট ভাবে, বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং সেই ভবিষ্যতের প্রতি চাহিয়া সে বর্ত্তমানে প্রাণযাত্রার কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। সংস্কার-প্রেরিত ইতর জীব ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে বটে, কিন্তু সেই ভবিষ্যতের কিছুই সে জানে না। তাহার জ্ঞানের সম্মুখে ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু বিদ্যমান নাই। কিন্তু প্রজ্ঞাজীবী মনুষ্যের জ্ঞানের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ভবিষ্যৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান। সে ভবিষ্যৎ তাহার প্রজ্ঞা-রচিত; প্রজ্ঞাবলে সে সেই ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়াছে। উহা যেন একখানা চিত্রপট; ক্বচিৎ ছিন্ন ক্বচিৎ ভিন্ন চিত্রপট; কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট ভাবে তাহা প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত। প্রজ্ঞা-চক্ষু মনুষ্য এইরূপে ভবিষ্যদ্দর্শী এবং এইরূপ ভবিষ্যদ্দর্শী বলিয়াই সে আত্মরক্ষায় সুপটু এবং জীবনযুদ্ধে জগজ্জয়ী।

বাহ্য-জগতের কথা বলিতেছিলাম। প্রজ্ঞা-রচিত বাহ্য-জগৎ আর প্রত্যক্ষ বাহ্য-জগৎ সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন। ইহা পুনঃ-পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। একটা কাল্পনিক এবং সেই হিসাবে অসত্য। অন্যটা প্রত্যক্ষ এবং সেই হিসাবে সত্য। এই প্রভেদটা আমার সাধ্যমত স্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছি। স্পষ্ট করা দরকার, নতুবা আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আমার বিশ্বাস যে, এই প্রভেদটা স্পষ্ট করিয়া না দেখাতে অনেক বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ করায় বড়-বড় পণ্ডিতেও অনেক অনুচিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রজ্ঞারচিত বাহ্য জগতের কথা বলিলাম। এখন প্রত্যক্ষ

জগতের কথা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে। প্রত্যক্ষ জগৎ এক-এক জনের পক্ষে এক-এক রূপ;—কাহার পক্ষে কিরূপ, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে অপরের চালচলন, ভাবভঙ্গী, ইঙ্গিত-ইসারা, কথাবার্ত্তা প্রভৃতির সঙ্কেতের আশ্রয়ে আমি অন্যের প্রত্যক্ষ জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লই বটে। টেলিগ্রাফের কেরাণী যেমন কাঁটানড়া দেখিয়া দূরের বার্ত্তা জানিতে পারে, কতকটা সেই রূপ। এইরূপে দেখিতে পাই যে, অন্যের প্রত্যক্ষ জগতের সহিত আমার প্রত্যক্ষ জগৎ সর্ব্বতোভাবে মিলে না; হয় ত অধিকাংশই মিলে না। কিয়দংশে বা অতি অল্পাংশে মিলে। যে কিয়দংশে আমার প্রত্যক্ষ জগৎকে বহুলোকের প্রত্যক্ষ জগতের সহিত সমান দেখি, সেইটুকু সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ জগৎ মনে করিয়া লই। ঐটুকুকে নিজস্ব জগৎ মনে করিতে পারি না। উহা সাধারণের জগৎ বলিয়াই মানিয়া লই। উহা কাহারও যখন নিজস্ব নহে, তখন উহা কাহারও অন্তরে নাই, সকলেরই বাহিরে আছে, এইরূপ মনে করি। উহা যখন কাহারও নিজস্ব নহে,—আমি না থাকিলে উহা রামের পক্ষে থাকিবে, রাম না থাকিলেও শ্যামের পক্ষে থাকিবে,—তখন উহা আমার এবং রাম শ্যাম কাহারও অপেক্ষা করিতে পারে না। উহার অস্তিত্ব সকলেরই নিরপেক্ষ অস্তিত্ব এবং স্বাধীন অস্তিত্ব—এইরূপ মনে না করিলে চলে না। এই স্বাধীন অস্তিত্বই বাহ্যতা। এইরূপ স্বাধীন ভাবে থাকার নামই বাহিরে থাকা;—বাহ্যতার অন্য কোন মানে নাই। অতএব আমার প্রত্যক্ষ জগতের কিয়দংশকে—অতি অল্প অংশকে—এইরূপে আমার বাহিরে দেখিতেছি এবং সেই অংশকে বাহ্যজগৎ নাম দিতেছি। এই যে প্রত্যক্ষ বাহ্যজগৎ,—ইহা বিজ্ঞান-বিদ্যার বাহ্যজগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার এই প্রত্যক্ষ বাহ্যজগৎও দেশে বিস্তীর্ণ আছে এবং কাল ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে; কিন্তু এই যে দেশ, ইহা আমার প্রত্যক্ষ দেশ, এবং এই যে কাল, ইহা আমার প্রত্যক্ষ কাল। বিজ্ঞানবিদ্যার জগৎও দেশকালব্যাপী। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্যার দেশ কাল্পনিক দেশ, অসত্য দেশ; কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ জগতের দেশ প্রত্যক্ষ, অতএব সেই হিসাবে সত্য দেশ। সেইরূপ বিজ্ঞানবিদ্যার কালও কাল্পনিক কাল, অসত্য কাল; আমার বাহ্যজগতের কাল প্রত্যক্ষ, অতএব সেই হিসাবে সত্য কাল।

আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্যা তাহার স্বরচিত বাহ্যজগৎকে সীমাহীন ও সমাকার দেশে বসাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ বাহ্যজগৎ যে দেশে বর্ত্তমান, তাহা বস্তুতই সীমাবদ্ধ ও বিষমাকার, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ দেশ বস্তুতই সীমাবদ্ধ এবং বিষমাকার, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমি চক্ষুষ্মান্ মানুষ, আমার প্রত্যক্ষদেশ বরং খুব বৃহৎ; কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহার প্রত্যক্ষদেশ তুলনায় অতি ক্ষুদ্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ বিজ্ঞানবিদ্যার স্বরচিত জগৎ যে কাল ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, সেই কল্পিত কাল আদিহীন অন্তহীন এবং সর্ব্বতোভাবে সন্তত পদার্থ, উহার কোথাও কোন বিচ্ছেদ নাই। কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ কাল অতি ক্ষুদ্র; উহার আদিও আছে, অন্তও আছে। আমার স্মরণশক্তি উহার আদি নির্ণয় করিয়া দিতেছে। তৎপূর্ব্বে আমার পক্ষে কোন কালই ছিল না। বর্ত্তমান ক্ষণে উহার অন্ত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইহার পরে উহা থাকিবে কি না, তাহা আমি জানি না। এখনই আমার জীবনান্ত ঘটিলে আমার প্রত্যক্ষ কালের শেষ হইবে। এই আদি এবং অন্তের মধ্যেও আমার প্রত্যক্ষ কাল একটানে অবিচ্ছেদে চলে নাই; যেখানেই আমার স্মরণশক্তি দুর্ব্বল হইয়াছে, সেখানেই সেই কালের প্রবাহে ছাঁট পড়িয়াছে। সুষুপ্তি বা নিদ্রা আসিয়া আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিবামাত্র সেই কালের প্রবাহে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের একটানা জ্ঞানের তুলনায় আমার প্রত্যক্ষ কাল কখনও দ্রুত চলিতেছে, কখনও ধীরে চলিতেছে। বিরহের কাল ও মিলনের কাল তুলনা করিয়া প্রত্যেক প্রেমিক তাহার সাক্ষ্য দিবে। অতএব বিজ্ঞানবিদ্যার দেশ ও কাল আমার প্রত্যক্ষ দেশ ও কাল হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন। এই দেশ এবং কালের তত্ত্ব লইয়া পণ্ডিতে-পণ্ডিতে অনেক বিচার-বিতর্ক হইয়াছে; কিন্তু এই পার্থক্যটা স্পষ্ট করিয়া না দেখায় অবিচারেরও অন্ত হয় নাই।

এখন এই প্রত্যক্ষ বাহ্য-জগতের কথা কহিতে চাহি। আপনাদিগকে পুনরায় মিনতি করিয়া মনে রাখিতে বলিতেছি যে, এই প্রত্যক্ষ বাহ্য-জগৎই আমার পক্ষে

সত্য জগৎ; ইহাতেই আমি ব্যবহার চালাই, প্রাণযাত্রা চালাই; যে অপ্রত্যক্ষ জগতের বিবরণ বৈজ্ঞানিকেরা দিয়া থাকেন, সে জগতে আমাদের প্রাণযাত্রা চলে না। তবে অতীতের সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে বাঁধিয়া ফেলিয়া আমাদের প্রাণযাত্রা-কর্ম্মে সাহায্যের জন্য আমাদের প্রজ্ঞা ঐ বিজ্ঞান-সম্মত জগতে গণনা কর্ম্ম করিতেছে। প্রত্যক্ষ জগতে প্রজ্ঞার সেরূপ গণনা কর্ম্মে ক্ষমতা নাই; কেন না, প্রত্যক্ষ জগৎ এক-এক জনের পক্ষে এক-এক রূপ; উহা অনিয়ত ও অনির্দ্দেশ্য; উহা কোন কঠিন নিয়মের বন্ধনে বাঁধা পড়িতে চাহে না। প্রত্যক্ষ জগৎ এই হিসাবে প্রজ্ঞার এলাকার বাহিরে; সেখানে ঘটনা-পরম্পরা আপনা হইতে আসে, আপনা হইতে যায়,—কোন নিয়মের বন্ধনে বদ্ধ থাকিতে চায় না; কোনরূপ causality বা কার্য্য-কারণ-সূত্রের বশ হইতে চায় না। তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, একটা কাল্পনিক জগতে প্রতিষ্ঠাপিত নিয়মের সূত্র প্রত্যক্ষ জগতে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহে সাহায্য করে কিরূপে, ইহার উত্তর আমি আগেই দিয়া রাখিয়াছি। ইউক্লিডের রেখাগণিত ও ক্ষেত্রগণিত কাল্পনিক জগতের জন্যই প্রণীত হইলেও প্রত্যক্ষ জগতের কারবারে স্থূল ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। কেন করে? উত্তরে বলিব যে, ঘটনাচক্রে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে পৃথিবীর অধিকাংশ সুস্থ মানুষের প্রত্যক্ষ জগৎ সর্ব্বাংশে এক-রূপ না হইলেও, স্থূলতঃ সদৃশ-রূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কাজেই কাল্পনিক Mean Manএর বা মাঝারি সুস্থ মানুষের জন্য বিজ্ঞানবিদ্যা যে কাল্পনিক জগতের রচনা করিয়াছে, তাহার সূত্রগুলির প্রয়োগ প্রত্যক্ষ জগতেও স্থূল ভাবে খাটিয়া যাইতেছে। এইরূপ খাটিতে পারে বলিয়াই সেই কাল্পনিক জগতের রচনা হইয়াছে। যেরূপে রচনা করিলে খাটিতে পারিবে, সেই রূপেই উহার রচনা হইয়াছে; নতুবা, এত পরিশ্রমে একটা কৃত্রিম জগৎ গড়িয়া তুলিবার কোন প্রয়োজনই থাকিত না। ধানের জমি জরিপ করিতে গিয়া যদি জ্যামিতি-শাস্ত্রের সূত্রগুলির স্থূল ভাবেও প্রয়োগ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে এতবড় জ্যামিতি-শাস্ত্র গড়িয়া তোলার কোন দরকারই হইত না। অথচ জ্যামিতি-শাস্ত্র নিতান্ত কাল্পনিক জগতের শাস্ত্র; প্রত্যক্ষ জগতে কোথাও কোন সরল রেখা, কোন ত্রিভুজ চতুর্ভুজ, কোন বৃত্তক্ষেত্রের অস্তিত্বমাত্র নাই। আমি মিনতি করিতেছি, আমার এই কথাটি যেন কিছুতেই ভুলিবেন না।

এখন সেই প্রত্যক্ষ জগতের কথা কহিব। এই প্রত্যক্ষ জগৎ কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত; কিন্তু সেই কালের আদি আছে এবং অন্ত আছে; আদি ও অন্ত উভয় সীমার মধ্যে সেই কাল খণ্ডিত ও সহস্রধা ছিন্ন। এই প্রত্যক্ষ জগৎ দেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত; কিন্তু সেই দেশও সীমাবদ্ধ; চোখের সামনে দূরবীন লাগাইয়াও একটা-না-একটা সীমায় ঠেকিয়া দৃষ্টিশক্তিকে পরাহত ও নিরস্ত হইতে হয়। প্রত্যক্ষ কাল ও প্রত্যক্ষ দেশ এই উভয়ই এইরূপে ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে কাল-পদার্থটা একটানা—উহার গতি একমুখে; উহার পূর্ব্ব আছে আর পর আছে, অথবা পশ্চাৎ আছে আর সম্মুখ আছে, কিন্তু আশ-পাশ নাই। কিন্তু দেশ-পদার্থ ঘটনাক্রমে ত্রিধা বিস্তৃত হইয়াছে; উহার সম্মুখ ও পশ্চাৎ আছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাইন ও বাম আছে, অপিচ ঊর্দ্ধ ও অধঃ রহিয়াছে। ইংরেজিতে বলা হয়, কালের dimension একটা মাত্র, দেশের dimension কিন্তু তিনটা। আপনারা জানেন যে, জ্যামিতি-শাস্ত্রের আলোচ্য দেশের dimension একটা, দুইটা, তিনটা হইতে পারে। এমন কি, চারিটা, পাঁচটা বা ততোধিকও যে হইতে পারে, তাহা আধুনিক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেশের dimension ঠিক্ তিনটা, তিনটার কমও নহে, বেশীও নহে। এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। প্রত্যক্ষ জগতে অর্থাৎ কারবারের জগতে আমরা সকল দ্রব্যকেই ত্রিধা বা তিন দিকে বিস্তীর্ণ করিয়া দেখিতে বাধ্য আছি—বাধ্যবাধকতার ফলে এই অভ্যাস আমাদের ধাতুগত হইয়া পড়িয়াছে।

মনে রাখিবেন, এই বাধ্যবাধকতা কেবল কারবারের জগতে; প্রজ্ঞারচিত কৃত্রিম জগতে এই বাধ্যবাধকতা নাই। জ্যামিতি-শাস্ত্র যে-কোন dimensionএর জগৎ কল্পনা করিবার শক্তি রাখে এবং সেই জগতে নিয়মসূত্রের অবধারণ করিতে পারে। ইউক্লিড যে ত্রিধা-বিস্তৃত জগতের জ্যামিতি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সে কাজটা ভাল হয় নাই। অকারণে তিনি আপনাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। একালের পণ্ডিতেরা আক্ষেপ করিতেছেন,

যে ইউক্লিডের প্রণীত জ্যামিতি-শাস্ত্র অতি সঙ্কীর্ণ শাস্ত্র ; উহা যথোচিত generalised শাস্ত্র নহে। ইউক্লিডকে দোষ দিব কি, ইউক্লিডের বহু শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াও গ্যালিলিও ও নিউটন বিজ্ঞানবিদ্যার জন্য যে কৃত্রিম জগৎ নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন, তাহাকেও সেই সঙ্কীর্ণ ত্রিধা-বিস্তৃত দেশে স্থান দিয়া ফেলিলেন। ইউক্লিডের অনুবর্ত্তী হইয়া বিজ্ঞানবিদ্যার আকাশকেও তাঁহারা ত্রিধা-বিস্তৃতরূপে মানিয়া লইলেন ; যে বিষ্ণুপদ হইতে তাঁহাদের আকাশ-গঙ্গাকে নামাইয়া আনিলেন, সেই বিষ্ণুপদকেই তাঁহারা তিনদিকে আটকাইয়া ফেলিলেন। এই সঙ্কীর্ণতার কোন প্রয়োজনই ছিল না। একালের বিজ্ঞানবিদ্যার গতি যাঁহারা অবহিতভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা ইহা জানেন ; অন্যকে ইহা বুঝান কঠিন। ইউক্লিডের এবং নিউটন-গ্যালিলিওর এই সঙ্কীর্ণতার ফল আজ পর্য্যন্ত আমরা ভোগ করিতেছি। প্রত্যক্ষ জগৎ ত্রিধা-বিস্তৃত বটে ; উহাকে ত্রিধা-বিস্তৃত মনে করিতে আমরা বাধ্য আছি ; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের জগৎকেও ত্রিধা-বিস্তৃত মনে করার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে ; এখন আক্ষেপ নিষ্ফল। আমাদের সঙ্কীর্ণ প্রত্যক্ষ জগৎ যে ত্রিধা-বিস্তীর্ণ জগৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই ; উহা মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য। এই বাধ্যবাধকতা কিরূপে আসিল, তাহা লইয়া পণ্ডিতেরা ঝগড়া করুন। কেহ বলিবেন, এই ত্রিধা বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা intuition-লব্ধ বা স্বভাবদত্ত; ঐরূপ মনে না করিলে আমাদের উপায় নাই। কেহ বলিবেন, উহা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে লব্ধ ; কোটি পুরুষের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা হইতে উহা প্রাপ্ত ; পৈত্রিক উত্তরাধিকার স্বত্বে প্রত্যেক মানুষ জন্মমাত্র উহা লাভ করিয়াছে। আমি সে বিতর্কে প্রবেশ করিব না ; সে পথেও চলিব না। আমি এখনও প্রাণিবিদ্যার সীমা ছাড়ি নাই ; প্রাণিবিদ্যার পক্ষ হইতে এই প্রশ্নটি কিরূপে দেখা যাইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিব। আমাকে এখানে কোন নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতে হইবে না ; পাশ্চাত্য গুরুঠাকুরেরাই জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়া, অর্থাৎ চোখে আঙুল দিয়া, এখানে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ জগৎ ত্রিধা-বিস্তীর্ণ। সাদা কথায় ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমার সম্মুখে অবস্থিত প্রত্যক্ষ দেশের এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে হইলে তিন মুখে চলিলেই পর্য্যাপ্ত হয়। পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে, বাম হইতে দক্ষিণে, এবং অধঃ হইতে উর্দ্ধে, কিছুদূর গেলেই প্রত্যক্ষ দেশের যে-কোন স্থান হইতে অন্য যে-কোন স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহাকেই আমি বলিতেছি, তিন মুখে চলা বা তিন মুখে পদক্ষেপ। ত্রিবিক্রম বামনদেবের মত আমরা তিন দিকে পদক্ষেপ করিয়া প্রত্যক্ষ জগৎকে আক্রমণ করিয়া থাকি। এই তিন মুখে চলা তিন স্বতন্ত্র মুখে চলা ;—এই তিন মুখ তিন রকমের মুখ। আপনারা প্রত্যক্ষ জানেন, যে এই তিন মুখ একরকমের নহে, তিন রকমের। কলিকাতা সহরে যিনি বাস করেন, তাঁহাকে সিঁড়ি ভাঙিয়া তেতলা চৌতলায় উঠিয়া যখন হাঁপাইতে হয়, তখন তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জোরের সহিত বলে, যে, নীচে হইতে উপরে চলা, অতি উৎকট চলা—প্রাণান্তক চলা। বিশেষতঃ যাঁহাদের দেহের ভার আড়াই মণকে অতিক্রম করিয়াছে, তাঁহারা এখনই এই উৎকটতার সাক্ষ্য দিবেন। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এই উৎকটতার হেতু। সমতল পথে বা সমতল ময়দানে চলিতে হইলে এত ক্লেশ হয় না, কেন না সেস্থলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের উপদ্রব ঘটে না। কিন্তু সেখানেও সম্মুখে চলা ও পাশ-কাটিয়া চলার পার্থক্য সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষতঃ যদি সেই সময়ে একটা ঝড় বহে, এবং হাতে খোলা ছাতা থাকে, তাহা হইলে ঝড়ের প্রতিকূলে সম্মুখে চলায়, আর পাশকাটিয়া আড়াআড়ি তির্য্যক্‌ভাবে চলায়, যে পার্থক্য, তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আপনাদের সকলেরই আছে। তা হবেই ত! আপনার দেহের গড়নেই এই সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। সম্মুখ হইতে দেখিলে আপনার দেহের উর্দ্ধভাগে একটা মাথা, নীচে দুইখানা লম্বা পা, আর বুকের ছাতির দুইদিকে দুইখানা আজানু-লম্বিত বাহু, দেখিতে পাই। আর পাশে দাঁড়াইলে কেবল একখানা পা, একদিকের পাঁজর, আর মাথার একটা পাশ মাত্র দেখিতে পাই। সম্মুখে চলিতে বুকের উপরে হাওয়ার ধাক্কা লাগে একরূপ ; তির্য্যক্‌ভাবে আড়াআড়ি চলিতে পাঁজরে ধাক্কা লাগে অন্যরূপ। সম্মুখে চলিতে প্রয়াস বা প্রযত্ন একরূপ, তির্য্যক্ চলিতে প্রয়াস বা প্রযত্ন অন্যরূপ ;

নীচে হইতে উর্দ্ধে গমনের প্রযত্ন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। আপনার দেহের কাঠামটার গড়নের ভেদে প্রযত্নেরও এই ভিন্নতা। আপনার দেহের কাঠামটা যদি বাঁটুলের মত হইত, অর্থাৎ ভীমের হাতে পড়িয়া কীচকের দেহের যে পরিণতি হইয়াছিল, কতকটা সেইরূপ হইত, তাহা হইলে, এই সম্মুখে চলার আর পাশ-কাটিয়া চলার প্রভেদ আপনি হয় ত বুঝিতে পারিতেন না। অর্থাৎ আপনার দেহের গড়নটা যদি সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তুলাকৃতি হইত —কেবল বাহিরের আকৃতিতে নহে, অভ্যন্তরে হৃৎপিণ্ডাদি অঙ্গের সন্নিবেশও যদি symmetrical হইত,—তাহা হইলে সম্মুখ ও পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম চিনিবার কোন উপায় থাকিত না; তখন সম্মুখে চলা এবং তির্য্যক্ চলা, এ দুয়ে কোন ইতরবিশেষ থাকিত না। তবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এড়াইবার উপায় নাই; কাজেই নীচে হইতে উপরে উঠার ক্লেশ উৎকটই থাকিয়া যাইত। যদি ঐরূপ আকারের কোন জ্ঞানবান্ জীব বস্তুতই পৃথিবীতে থাকে, তাহা হইলে সে উঠা-নামা বুঝিতে পারিবে, কিন্তু সমতল ভূপৃষ্ঠে যে মুখেই চলুক, কোনরূপ ভেদ বুঝিতে পারিবে না।

প্রাণি-বিস্তার আশ্রয় লইয়া এখন আপনারা বুঝিতে পারিলেন, আমাদের প্রত্যক্ষ দেশ কিরূপে ত্রিধা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। চলিতে ফিরিতে আমরা প্রযত্ন অনুভব করি। সম্মুখে চলিতে যে রকমের প্রযত্ন হয়, তির্য্যক্ চলিতে সে রকমের হয় না;—দেহের ভার লইয়া উর্দ্ধমুখে উঠিতে গেলে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ প্রযত্ন অনুভূত হয়। আমাদের দেহের গঠনটা সর্ব্বতোমুখে symmetrical হইলে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে, প্রযত্নের এই ভেদ থাকিত না। তিন রকমের প্রযত্ন, কাজেই তিন রকমের অনুভূতি এবং এই তিন রকমের অনুভূতি হইতেই প্রত্যক্ষ দেশের বিস্তার তিন মুখে। আপনারা চক্ষুষ্মান্ মানুষ; আপনারা মুখ্যতঃ দৃষ্টি-শক্তির সাহায্যে যাতায়াতের পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন। আমার বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে আপনাদের একটু কষ্ট হইবে; কিন্তু জন্মান্ধের অবস্থাটা মনে করিয়া দেখিতে পারেন। পথ-নিরূপণে সে চোখের সাহায্য একবারেই পায় না। পথ চলিবার সময় তাহার যে প্রযত্ন হয়, যে ক্লেশ হয়, যে পরিশ্রম হয়, তৎসম্পৃক্ত অনুভূতির সাহায্যে সে কোথা হইতে কোথায় যাইতেছে তাহা নিরূপণ করিয়া লইতে বাধ্য আছে। ত্রিবিধ প্রযত্ন-বুদ্ধির সাহায্য লইয়াই সে ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করে। সেই ত্রিবিধ প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতেই সে বুঝিতে পারে, যে সে উর্দ্ধে উঠিতেছে, কি সম্মুখে চলিতেছে, কি আড়াআড়ি পাশ কাটিয়া চলিতেছে। সে জানে যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পৌঁছিতে এই ত্রিবিধ প্রযত্নের অতিরিক্ত কোন চতুর্থ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। জন্মান্ধ ব্যক্তিও স্থির করিয়া লইয়াছে যে, যে দেশের মধ্যে তাহাকে বিচরণ করিতে হইতেছে, সে দেশটা তিন-মুখো দেশ,—তাহার এক মুখ অন্য মুখের সদৃশ নহে; সেই দেশ বস্তুতঃ তাহার পক্ষেও বিষমাকার দেশ।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে মনোবিজ্ঞান-ঘটিত বিচার আসিয়া পড়ে। রূপ-রস-শব্দাদি বোধের জন্য আমাদের পাঁচ-পাঁচটা ইন্দ্রিয় রহিয়াছে; কেবল খাঁটি দেশ-বুদ্ধির জন্য কোন বিশিষ্ট ইন্দ্রিয় আছে কি না, ঠিক জানি না। শুনিতে পাই যে আমাদের কাণের ভিতরে একটা কি যন্ত্র আছে, তাহাতে আমাদের দেশ-বুদ্ধির সাহায্য করে; অন্ততঃ যখন আমরা ঘুরিয়া বেড়াই, তখন আমাদের দিক্ নির্ণয়ের বোধ জন্মায়। সে কথা এখন থাক। আপনাদের হয় ত ধারণা আছে যে, দৃষ্টি-শক্তি এবং স্পর্শ-শক্তি এই দুইটাই বুঝি আমাদের দেশ-বুদ্ধির প্রধান সহায়; কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক্ নহে। ঐ দুই শক্তি গৌণ-ভাবে দেশ-বুদ্ধিতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু মুখ্যভাবে করে না। আমাদের অঙ্গ-চালনায় সমস্ত স্নায়ু-যন্ত্রটা বিচলিত হয়; সমস্ত মাংস-পেশীগুলা সেই সঙ্গে খেঁচিয়া উঠে। এই মাংসপেশীগুলার কুঞ্চন ও প্রসারণের সহিত একটা বিশিষ্ট রকমের বেদনা-বুদ্ধি জন্মে। অন্য নামের অভাবে তাহাকে muscular feeling নাম দেওয়া হইয়াছে। বাঙ্গলায় উহাকে প্রযত্ন বুদ্ধি বলা যাইতে পারে। শরীরের সমস্ত পেশী-যন্ত্রটা এই বুদ্ধির পক্ষে ইন্দ্রিয়স্বরূপ। পেশীগুলা খেঁচিয়া ধরিলেই একটা প্রয়াস বা প্রযত্ন বা চেষ্টা বা ক্লেশ অনুভূত হয়,—সেই অনুভূতিটাই এই muscular feeling। অঙ্গ-সঞ্চালনের সঙ্গে-সঙ্গেই এই muscular feeling আসিয়া পড়ে। মুখ্যতঃ আমরা এই অনুভূতির সাহায্যেই দেশ-বুদ্ধি পাইয়া থাকি। ইংরেজিতে এই প্রযত্নকে effort, exertion, innervation ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়। এই বিশিষ্ট প্রযত্ন-বুদ্ধি যে মুখ্যতঃ দেশ-বুদ্ধি আনয়ন করে, তাহা

আপনারা অল্পেই বুঝিতে পারিবেন। আবার সেই জন্মান্ধের কথা স্মরণ করুন। অঙ্গ-চালনা সহকৃত muscular feelingএ সে বঞ্চিত নহে। অঙ্গচালন সহকারে muscular feelingএর সাহায্যে তাহার দেশ-জ্ঞান জন্মিবে। বস্তুতই দেশ-বোধের জন্য কোন-না-কোন অঙ্গের সঞ্চালন আবশ্যক। দৃষ্টি-শক্তির কথাই ধরুন না। দৃষ্টি-শক্তি মুখ্যতঃ নীল-পীতাদি বর্ণ-জ্ঞান জন্মায়, এবং সেই-সেই বর্ণের উজ্জ্বলতার জ্ঞাপন করে, কিন্তু খাঁটি দেশ-বুদ্ধি দেয় না। বহির্জগতে দৃষ্টি ফেলিয়া চোখের সামনে আমরা একখানা বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্রপট দেখিতে পাই মাত্র; কিন্তু সেই পটের কোন্ অংশ নিকটে, কোন্ অংশ দূরে, দৃষ্টি-শক্তি তাহা জ্ঞাপন করিতে অক্ষম। তারকা-খচিত আকাশের দিকে চাহিলে মনে হয়, সমুদয় তারকাই আমাদের নিকট হইতে সমদূরে একখানি পটের গায়ে আঁকা রহিয়াছে; অথচ আপনারা শুনিয়াছেন যে সকল তারকার দূরত্ব সমান নয়—কোনটার আলো আসিতে চারি বৎসর, কোনটার আলো আসিতে চল্লিশ বৎসর, দরকার হয়। বৈজ্ঞানিকেরা জানেন, দূরস্থিত কোন দ্রব্যের দূরত্ব নিরূপণ করিতে হইলে কেবল চোখে দেখায় কুলায় না, সেই দ্রব্যের parallax পাইতে হয়। এই parallax পাইবার জন্য কিছু-না-কিছু ভ্রমণের প্রয়োজন, কিছু-না-কিছু অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রয়োজন। দূরে একটা গাছ থাকিলে, প্রথমে এক স্থানে দাঁড়াইয়া তাকাইতে হয়, পরে ডাইনে বা বামে কয়েক গজ সরিয়া গিয়া আবার তাকাইতে হয়; তবে তাহার parallax পাওয়া যায়; তবে তাহার দূরত্ব নিরূপিত হয়। গাছটা যত দূরে থাকে, তত অধিক দূরে সরিলে parallax পাওয়া যায়। খুব নিকটে থাকিলে সরিয়া যাওয়ারও দরকার হয় না, একটু ঘাড় নাড়িয়া তাকাইলেই চলিতে পারে। খুব নিকটের দ্রব্যের দূরত্ব-নির্ণয়ে ঘাড় নাড়ারও দরকার হয় না; নাকের দুই দিকে দুটা চোখ আছে; সেই চোখ-দুটাকে স্থির করিয়া সেই দ্রব্যের প্রতি তাকাইতে গেলেই মোটামুটি তাহার parallex পাওয়া যায়। চোখের কোটরের ভিতরেই চোখটাও ঘুরিয়া-ফিরিয়া সঞ্চরণ করিতে পারে; তাহাতেও দূরত্ব নিরূপণের সাহায্য করে। ফলে ভ্রমণ বা অঙ্গ-সঞ্চালন ব্যতীত দূরত্ব নিরূপণ চলে না। আকাশের তারাই বল, আর চন্দ্র-সূর্য্যই বল, আর দূরের বা নিকটের গাছপালাই বল, ঘুরিয়া ফিরিয়া ভিন্ন-ভিন্ন স্থান হইতে দেখিবার সুযোগ না থাকিলে, কোন দ্রব্যেরই দূরত্ব নির্ণীত হয় না। এই ভ্রমণ, এই অঙ্গ-সঞ্চালন, প্রযত্ন সাপেক্ষ। প্রযত্নের সহকারে প্রযত্ন-বুদ্ধি আইসে। এই প্রযত্ন-বুদ্ধিই দূরত্ব নিরূপণের মুখ্য অবলম্বন।

উইলিয়ম জেমস বলিতে চাহেন যে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ ইত্যাদি যাবতীয় অনুভূতির সহিত দেশ-বুদ্ধিটাও জড়াইয়া থাকে। আমাদের যাবতীয় অনুভূতির সহিত, এমন কি, দন্তশূল ও পেটের বেদনার মত শারীরিক অনুভূতির সহিতও, একটা বাহ্যতা-বুদ্ধি, একটা বৃহত্তা বা ক্ষুদ্রতা-বুদ্ধি, জড়াইয়া থাকে। শব্দবুদ্ধিই ধরুন না। কোন কোন ধ্বনি যেন ঘর-ভরা ধ্বনি—যেন বৃহৎ দেশ পূর্ণ করিয়া উহা বিদ্যমান—যেমন শঙ্খ-ধ্বনি। আবার কোন-কোন ধ্বনি যেন অতি সঙ্কীর্ণ ধ্বনি,—যেন অতি সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে উহা আটকান ছিল—কষ্টে বাহিরে আসিতেছে, এইরূপ ধ্বনি। যেমন ট্রামগাড়ীর বাঁশীর কাণ-ছেঁড়া ধ্বনি। জেমসের কথা অমান্য করিতে পারি না; কেহই করেন না। কিন্তু এই দেশ-বুদ্ধির মধ্যেও কতটা প্রযত্ন-বুদ্ধি law of association দ্বারা প্রচ্ছন্ন আছে, বলা কঠিন। শাঁখ বাজাইবার সময় গাল-ভরা বাতাস জোরের সহিত বাহির করিতে হয়; আর বাঁশীতে ফুৎকার দিবার কালে মুখের বিবর সঙ্কুচিত করিয়া সঙ্কীর্ণ বায়ু-প্রবাহ দুই ঠোঁটের মাঝ দিয়া বাহির করিতে হয়। এই উভয়বিধ প্রযত্নের সহিত উভয়বিধ ধ্বনির নিত্য সম্পর্ক অজ্ঞাতসারে চিত্তের মধ্যে কাজ করে কি না, বলা কঠিন। ফল কথা, অঙ্গ-সঞ্চালন-জাত প্রযত্ন-বুদ্ধি আমাদের দেশবুদ্ধির মুখ্য সহায়, ইহা জোর করিয়া বলিতে পারি।

নিত্য প্রাণযাত্রায় আমরা এই অঙ্গ-সঞ্চালনে বাধ্য আছি। ধরাপৃষ্ঠে চরিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া না বেড়াইলে আমাদের প্রাণযাত্রা নিষ্পন্ন হয় না। গাছপালার মত অথবা প্রবাল কীটের মত একস্থানে আবদ্ধ থাকিলে উচ্চ শ্রেণির জন্তুর আহার জুটে না। দৌড়িয়া পলাইতে না পারিলে শত্রুর আক্রমণ এড়াইতে পারা যায় না। কাজেই দূরে আহারের সন্ধান পাইলেই, অথবা দূরে আহার থাকিতে পারে, এই আশা লইয়াই, আমরা ধরাপৃষ্ঠে ভ্রমণ করিতেছি; দূরে শত্রুর আশঙ্কা হইলেই পলায়নপর হইতেছি। জন্মান্তর

পড়া গিয়াছিল, কোন জন্তু আহারের চেষ্টায় দৌড়ায়; কেহ বা প্রাণের ভয়ে দৌড়ায়। যে কারণেই হউক, আমরা দৌড়িতে বাধ্য আছি।

এই দৌড়াদৌড়িই আমাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম। কিছুতেই আমরা স্থির থাকিতে পারি না। আসনে বসিয়া, আমরা চঞ্চল;—কেবলই দুলিতেছি, কাঁপিতেছি, নাক চোখ ঘুরাইতেছি। কাণের কাছে মশা ডাকিলেই আমরা ঘাড় ঘুরাই; উচ্চ শব্দ শুনিবামাত্র আঁতকাইয়া উঠি। হঠাৎ ভয় পাইলেই আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠে। প্রতিক্ষণেই আমাদের অঙ্গ-সঞ্চালন এবং প্রত্যেক অঙ্গের সঞ্চালনে স্নায়ুযন্ত্রের আক্ষেপ আর মাংসপেশীর আলোড়ন। প্রত্যেক অঙ্গ-সঞ্চালনে প্রযত্ন-বুদ্ধি। নিম্নশ্রেণির প্রাণীর পক্ষে এই প্রযত্ন-বুদ্ধি আছে কি না আছে, তাহা জানি না, কিন্তু উচ্চতর জ্ঞানবান্ জন্তুর এই প্রযত্ন-বুদ্ধি আছে, ইহা মানিতে হয়। এই অঙ্গ-সঞ্চালন দায়েও পড়িয়া; হয় আহারের চেষ্টায়, নয় প্রাণের ভয়ে। জ্ঞানহীন প্রাণীর অঙ্গ-সঞ্চালন জ্ঞানপূর্ব্বক সম্পাদিত হয় না; উহাদের কোনরূপ প্রযত্ন-বুদ্ধিও থাকিতে পারে না। উহাদের দেশবুদ্ধিও নাই। বৃক্ষ লতা আহার অন্বেষণে ভূমির দিকে মূল চালায়; আলোক অন্বেষণে আকাশের দিকে শাখা পল্লব বাড়াইয়া দেয়; স্থিরত্ব প্রাপ্তির জন্য অন্য অবলম্বকে আকর্ষী দিয়া আঁকড়াইয়া ধরে; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক কোন কাজ করে না। গাছপালার দেশবুদ্ধি আছে, এ কথা কেহ বলিবেন না। নিম্নশ্রেণির জন্তুর মধ্যে যাহারা জ্ঞানহীন, তাহাদেরও এই দশা। এই সকল জ্ঞানহীন প্রাণীর পক্ষে বাহ্য-জগৎ অবিদ্যমান। বাহ্য-জগৎ কেবল জ্ঞানবান্ জীবের পক্ষেই বিদ্যমান, এ কথাটা যেন ভুলিবেন না। মৌমাছির মত যে সকল জন্তু আহারের অন্বেষণে সংস্কারের প্রেরণায় অতি দূর-দূরান্তে বেড়ায়, তাহাদের অঙ্গ-সঞ্চালনের অবধি নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষেও দেশবুদ্ধি কতটা স্পষ্ট, বলা কঠিন। জ্ঞান থাকিলেই যে দেশজ্ঞান থাকিবে, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। সংস্কারের প্রেরণায় যে সকল জন্তু দেশ-দেশান্তে ভ্রমণ করে, তাহাদেরও বাহ্য-দেশ সম্পর্কে জ্ঞান কত স্পষ্ট, তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে। ঋতুপরিবর্ত্তনে পাখীর ঝাঁক দেশান্তরে চলিয়া যায়, কিন্তু সেই দেশান্তরের কোন জ্ঞান তাহাদের আছে কি? আটলাণ্টিকের যে কাদামাছ বহু সহস্র মাইল অতিক্রম করিয়া যথাকালে বাল্‌টিক সাগরে উপস্থিত হয়, তাহাদেরও সেই দেশান্তর সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান আছে কি? স্বস্থান ছাড়িয়া অন্য দেশে চলিতেছি, এই জ্ঞানটুকুও তাহাদের আছে কি? কেতাবে পড়িয়াছি, পাটাগোনিয়াতে পিউমা নামে হিংস্র জন্তু আছে; উহা সে দেশের পশুরাজ। মৃত্যু আসন্ন হইবার কিছু পূর্ব্বে সে সকল কাজ ফেলিয়া নিতান্ত বানপ্রস্থ বৈরাগীর মত স্বস্থান হইতে বাহির হয়, এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব বরফে-ঢাকা এক প্রান্তরে ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া সেইখানে দেহ ত্যাগ করে। সেই তুষার-ক্ষেত্র পিউমা জাতির সর্ব্বসাধারণের সমাধিক্ষেত্র। কেহ তাহাদিগকে সে দেশের কথা শেখায় নাই, কেহ পথ চিনাইয়াও দেয় নাই। এই অপূর্ব্ব সংস্কারের ফলে প্রত্যেক পিউমা মৃত্যুর পূর্ব্বেই সেই অজ্ঞাত দেশের পথ আপনা হইতে চিনিয়া লয়। সেই অজ্ঞাত দেশে যে তাহাদের সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুত আছে, এই বুদ্ধি তাহাদের আদৌ আছে কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। বাহ্যতা জ্ঞানটাই কোন্ জন্তুর কতটুকু আছে না আছে, তাহা আন্দাজ করাই কঠিন। সেই দুরূহ প্রশ্নের আলোচনায় আমার এখন অবকাশ নাই।

সে যাই হউক, জ্ঞানবান্ মানুষের এই দেশ-বুদ্ধি আছে। সেই দেশমধ্যে মানুষ জ্ঞানপূর্ব্বক, বিচরণ করে। সেই দেশ তাহার প্রত্যক্ষ দেশ; প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতে লব্ধ দেশ। এই প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতেই মানুষ তাহার প্রত্যক্ষ জগতের এখান-ওখান-সেখান, দূর-নিকট, নিরূপণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা কিরূপে সূক্ষ্মভাবে দূরত্বের পরিমাণ করেন, তাহা ঘাঁটিয়া কাজ নাই। আমাদের মত সাধারণ মানুষে দৈনিক জীবন-যাত্রায় কিরূপে দূরত্বের পরিমাণ করি, তাহাই দেখুন। দেখিবেন, ইহার মূলে প্রযত্ন-বুদ্ধি। হাবড়া হইতে শ্রীরামপুর পর্য্যন্ত ভ্রমণে কিছু প্রযত্ন আবশ্যক, কিছু ক্লেশ ঘটে; শ্রীরামপুর হইতে হুগলি পর্য্যন্ত ভ্রমণে যদি সেই প্রযত্ন সেই ক্লেশ ঘটে, তাহা হইলে বলা হয়, হাবড়া হইতে শ্রীরামপুর যত দূর, শ্রীরামপুর হইতে হুগলি তত দূর। প্রযত্নের বা ক্লেশের সমানতা আশ্রয় করিয়া আমরা দূরত্বের সমানতা নির্দ্দেশ করি। সর্ব্বত্রই ঐরূপ। যদু আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান; আমি হাত বাড়াইয়া তাহার গালে চড় দিলাম; চপেটা-

ঘাতের প্রযত্ন আমি ধরিতেছি না; হাত বাড়াইবার প্রযত্নটাই ধরিব। কালান্তরে মধু আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। হাত বাড়াইয়া মধুর গালে চড় দিলাম; এবারও হাত বাড়াইতে ঠিক পূর্ব্ববৎ প্রযত্ন অনুভব করিলাম। স্থির করিলাম, যদু আমার যত দূরে ছিলেন, মধুও তত দূরে আছেন।

বস্তুতই আমাদের প্রাণযাত্রা পরস্পর চপেটাঘাতের ব্যাপার; পরস্পর কিলাকিলি ঠোকাঠুকি ঘুষোঘুষির ব্যাপার। এ বিষয়ে বহু আলোচনা করিয়াছি। জীবনযুদ্ধ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রযত্ন-সাপেক্ষ। প্রযত্নের সহিত প্রযত্ন-বোধ, এবং প্রযত্ন-বোধ হইতেই দূরত্ব-বোধ। কেবল দূরত্ব-বোধ কেন, ইহা হইতেই ভ্রমণ-বোধ, অঙ্গ-সঞ্চালন-বোধ,—এক কথায় গতি-ক্রিয়ার বোধ। গতিক্রিয়ার ইংরেজি নাম movement; ঐ প্রযত্ন বুদ্ধিই movementএর বা গতিক্রিয়ার বুদ্ধি। যেখানে সেই প্রযত্ন বুদ্ধি নাই, সেখানে movement-বুদ্ধি নাই। বৈজ্ঞানিকেরা প্রজ্ঞা-বলে সেখানেও গতির কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে সেখানে গতিবুদ্ধি নাই। নৌকার উপর সুখে শয়ান ব্যক্তি নৌকার গতি বুঝিতে পারে না। পৃথিবী একখানা প্রকাণ্ড নৌকা। যে ব্যক্তি পৃথিবীর উপর স্থিরাসনে আসীন তাহার অঙ্গমাত্র দোলে না। বৈজ্ঞানিকেরা মাথা খুঁড়িয়াও যদি বুঝাইতে চাহেন, পৃথিবী চলিতেছে, প্রত্যক্ষবাদী প্রত্যক্ষ প্রমাণের বলে বলিবে, না, তাহা মানিব না, পৃথিবী স্থির। পাঠশালার পণ্ডিত ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে স্পষ্ট বলিয়াছিল, আট টাকা মাহিনাতে পৃথিবীকে ঘুরাইতে পারিব না। ইন্‌স্পেক্টার বাবু ছাপার পুঁথির বাক্যকে বেদবাক্য মনে করিতেন; পণ্ডিত তাহাতে সায় দেয় নাই। কোপার্নিকস পৃথিবীকে ঘুরাইয়াছিলেন; প্রত্যক্ষ বলে নয়,—প্রজ্ঞার বলে। প্রজ্ঞাচক্ষু গ্যালিলিও পৃথিবীকে ঘুরিতে দেখিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষবাদীরা তাঁহাকে নির্য্যাতন করিয়াছিল।

ফলে যেখানে এই প্রযত্ন অনুভূত হয়, সেইখানেই আমরা এই movement বুঝিয়া লই। বুঝিয়া লই, আমরা সশরীরে চলিতেছি, অথবা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইতেছে। এই অনুভূতিটাই প্রত্যক্ষ, এই প্রযত্ন-বুদ্ধিটাই প্রত্যক্ষ; আর গতি-ক্রিয়াটা প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে। এই প্রত্যক্ষ প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতে বাহ্যজগতে আমাদের চলাফেরা হেলাদোলা সমস্তই বুঝিয়া লই। যেখানে ঐ অনুভূতির অভাব, সেখানে আমরা স্থির; যেখানে ঐ অনুভূতি বর্ত্তমান, সেইখানেই আমরা চঞ্চল বা গতিশীল।

ফলে ঐ প্রযত্ন-বুদ্ধি আমার বুদ্ধি; প্রযত্ন-বুদ্ধি অনুসারে আমি আমাকে চঞ্চল মনে করি। এই চাঞ্চল্য আমার চাঞ্চল্য। কেননা প্রযত্ন-বুদ্ধি আমারই নিজস্ব বুদ্ধি। যেখানে ঐ বুদ্ধি নাই, সেখানে চাঞ্চল্য নাই; সেখানে আমি স্থির। যেখানে ঐ বুদ্ধি আছে, সেখানে আমি চঞ্চল, অস্থির। এই অস্থিরতা আমারই অস্থিরতা। বাহ্য-জগতে নানা দ্রব্যের অস্থিরতা দেখি; সেই অস্থিরতার মানে কি? এক একটা জড় দ্রব্য এক একটা চিহ্ন মাত্র, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-ময় চিহ্নমাত্র; এই চিহ্নগুলা আমার বহির্দ্দেশে ছড়াইয়া আছে; কোনটা নিকটে কোনটা দূরে, কোনটা ডাইনে কোনটা বামে, কোনটা উপরে কোনটা নীচে, ছড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ চিহ্নকেই অস্থির ও চঞ্চল দেখিতে পাই। এখন এখানে যাহা দেখিতেছি, পরক্ষণেই তাহা সরিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। এখনই কাছে, পরক্ষণেই দূরে; এখনই বামে, পরক্ষণেই ডাইনে। নিজের অস্থিরতা আমি আমার প্রযত্ন-বুদ্ধি হইতে বুঝিতে পারি। কিন্তু আমার বাহ্যজগতে এই অস্থিরতা বুঝি কিরূপে?

উত্তরে বলিব যে বাহ্য-দ্রব্যের যে অস্থিরতা, উহা আমারই অস্থিরতা। আমার স্বকীয় দেহের অস্থিরতা আমি বাহ্য-দ্রব্যে আরোপ করিতেছি মাত্র। আমারই অস্থিরতা বাহিরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া বাহ্য-দ্রব্য হইতে প্রতিফলিত হইয়া, বাহ্য-দ্রব্যে অস্থিরতা দিতেছে। উত্তরটা বুঝিবার চেষ্টা করুন। আপনি আমার ঠিক্ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি অন্ধ; আপনাকে দেখিতে পাই না; হাত বাড়াইয়া আপনাকে স্পর্শ করিলাম; এবং হাত বাড়াইবার প্রযত্ন হইতে বুঝিলাম, আপনি আমার দুই হাত দূরে রহিয়াছেন। পরক্ষণেই হাত বাড়াইয়া দেখি যে আপনি সেখানে নাই। আমি ডানি দিকে কিছুদূর চলিলাম এবং চলিবার প্রযত্ন হইতে বুঝিলাম যে আমি পাঁচ হাত চলিয়া আসিয়াছি। পূর্ব্ববৎ হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, আপনি পূর্ব্ববৎ আমার সম্মুখে দুই হাত দূরে বিদ্যমান। পূর্ব্বে আমার সম্পর্কে আপনি যত দূরে ছিলেন, এখনও আমার সম্পর্কে তত দূরেই রহিয়াছেন। কিন্তু এই অবসরে

আমাকে পাঁচ হাত চলিয়া আসিতে হইয়াছে—প্রমাণ আমার প্রযত্ন-বৃদ্ধি। আমি আমার অস্থিরতা আপনাতে আরোপ করিলাম। বলিলাম, আপনিও ডানি দিকে পাঁচ হাত সরিয়া আসিয়াছেন। ফলে, আপনি পাঁচ হাত চলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য যে আমি পাঁচ হাত চলিলে পুনর্ব্বার আপনার নাগাল পাইব। আমারই গতি-বৃদ্ধি আপনাতে প্রতিফলিত হইয়া আপনার গতি-রূপে আমার প্রতীয়মান হইতেছে।

মনে করুন, অকূল পাথারে দুইখানি নৌকা, একখানায় আমি দাঁড় বাহিতেছি, অন্যখানা সম্মুখে কিছু দূরে আছে। পরক্ষণে দেখি, দ্বিতীয় নৌকা সেখানে নাই, অন্যত্র। কোন্ খানা চলিয়াছে? বিজ্ঞানবিদ্যা বলিবে, কোন্‌খানা চলিতেছে, তাহা জানার প্রয়োজন নাই। যেখানাকে ইচ্ছা সেইখানাকে স্থির মনে করিতে পার; তাহার অপেক্ষায় অন্য খানা চলিতেছে। গতিক্রিয়ামাত্রই আপেক্ষিক। আমি প্রত্যক্ষ-দর্শী—আমাকে দাঁড় বাহিয়া চলিতে হইতেছে; দাঁড় বহার পরিশ্রমে আমি ভুক্তভোগী। আমি বলিলাম দ্বিতীয় নৌকাই চলিতেছে, আমার নৌকা স্থির আছে; প্রমাণ আমার প্রযত্ন-বৃদ্ধি হয় নাই, দাঁড় বহার পরিশ্রম আমার হয় নাই। অতএব আমি স্বস্থানে স্থির আছি, ঐ দ্বিতীয় নৌকাখানাই চলিতেছে।

ফলে আমার প্রত্যক্ষ বাহ্যজগতে আমার গতিক্রিয়া আমার প্রত্যক্ষ বিষয়। অন্যের গতিক্রিয়া অন্যে আরোপিত গতিক্রিয়া মাত্র। অন্য দ্রব্য কোন্ দিকে কতদূর চলিয়াছে, ইহার তাৎপর্য্যই এই যে আমি কোন্‌দিকে কতদূর চলিলে উহার নাগাল পাইব।

এখন আসুন। আমি আমার বাহিরে বিস্তীর্ণ একটা জগতের অস্তিত্ব মানিয়া লই,—উহা আমার প্রত্যক্ষ প্রমাণে লব্ধ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই কয়টা সেই প্রমাণ। মনে করি, এই রূপ, রস, শব্দাদি আমার বাহির হইতে আসিতেছে। কেন মনে করি? আবার কি উত্তর দিতে হইবে? আমার রূপরসাদি অনুভবের সমকালে যদি আপনারাও তুল্যরূপ রূপ-রসাদি অনুভবের সাক্ষ্য দেন, তখন আমাকে বাধ্য হইয়া মনে করিতে হয়, এই রূপরসাদি আমার নিজস্ব নহে, উহা আপনাদেরও বটে,—উহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি—উহা আমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লইয়া আমার বাহিরে আছে। এই স্বাতন্ত্র্যেরই নাম বাহ্যতা। এই রূপরসাদির অনুভবে যখন বহু জনে এক সঙ্গে দাবি করিতেছে, তখন উহা সকলেরই বাহ্য। এইজন্য আমাদিগকে রূপরসাদির বাহ্যতা স্বীকার করিতে হয় এবং সেই বাহ্য রূপরসাদি লইয়া অন্যের সহিত আদান-প্রদান করিতে হয়। এই আদান-প্রদানের জন্য একটা স্বতন্ত্র ক্ষেত্র মানিয়া লই, সেই স্বাধীন ক্ষেত্রই বহির্দ্দেশ। রূপ-রসাদির নানা মূর্ত্তি—রূপ নানা, রস নানা, শব্দ নানা। নানা রূপে, নানা রসে, নানা শব্দে, সেই বহির্দ্দেশ বৈচিত্র্য-মণ্ডিত। এই নানাত্বের নাম বহুত্ব;—এই বহুত্বকে একসঙ্গে উপলব্ধি করিতে হইলেই উহাকে সেই দেশের মধ্যে ছড়াইতে হয়। নানাত্বের সহিত ও বহুত্বের সহিত বাহ্যতা-বুদ্ধি জড়িত রহিয়াছে; যেখানে যুগপৎ বহুতা, সেখানেই বাহ্যতা। এই নানা রূপ নানা রস বাহিরের দেশে ছড়াইয়া পড়িয়া নানা চিহ্নে ঐ দেশকে চিহ্নিত করিয়াছে; ঐ এক-একটা চিহ্নের নাম জড়দ্রব্য। এই জড়দ্রব্য বিজ্ঞানবিদ্যার জড়দ্রব্য নহে; উহা আমার প্রত্যক্ষ জড়দ্রব্য। বৈজ্ঞানিকের জড়দ্রব্য রূপাদি-বর্জ্জিত জড়দ্রব্য। কিন্তু প্রত্যক্ষ জড়দ্রব্য রূপরসাদিময় জড়দ্রব্য;—এই রূপ-রসাদিই প্রত্যক্ষ সামগ্রী। উভয় জগৎকে এক নাম না দিলেই ভাল হইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে দুই জগতেরই এক নাম দেওয়া হইয়াছে। তাহাতেই এত অনর্থ-পাত। বৈজ্ঞানিকের কৃত্রিম দেশে বৈজ্ঞানিকের কৃত্রিম জড়-জগৎ বিদ্যমান; আর আমাদের প্রত্যক্ষ দেশে আমাদের প্রত্যক্ষ জড়-জগৎ বিদ্যমান। বৈজ্ঞানিকের কৃত্রিম জড়দ্রব্য বৈজ্ঞানিকের দেশকে চিহ্নিত করে। আমাদের প্রত্যক্ষ জড়দ্রব্যই আমাদের প্রত্যক্ষ-জগৎকে চিহ্নিত করে। উভয় জড়দ্রব্য চিহ্ন মাত্র। বৈজ্ঞানিক যে চিহ্ন দ্বারা তাঁহার দেশকে চিহ্নিত করেন, সে চিহ্ন রূপ-রসাদি-বর্জ্জিত চিহ্ন; সে চিহ্নের একমাত্র লক্ষণ inertia; ঐ inertia একটা অঙ্ক মাত্র। বৈজ্ঞানিকের প্রজ্ঞা সেই অঙ্ক দ্বারা তাঁহার জড়-দ্রব্যকে চিহ্নিত করিয়াছেন। আর আমরা যে চিহ্নে প্রত্যক্ষ-জগৎকে চিহ্নিত করিতেছি, তাহা প্রত্যক্ষ চিহ্ন; রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই পাঁচ পাঁচটা প্রত্যক্ষ-বুদ্ধি সেই চিহ্নের লক্ষণ। এই পাঁচটার অতিরিক্ত আর একটা ষষ্ঠ লক্ষণ বিদ্যমান আছে। সেটা

বিরোধের অনুভূতি—resistanceএর অনুভূতি। রূপ রসাদি পাঁচটা লক্ষণ না থাকিলেও চলিতে পারিত, কিন্তু এই বিরোধাত্মক লক্ষণটা না থাকিলে বুঝি চলিত না। আমার পাঁচটা ইন্দ্রিয় একবারে শক্তিশূন্য হইলেও আমি ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি ধাক্কাধাক্কি এই সকল ব্যাপার-ঘটিত resistance বুদ্ধি দ্বারাই বাহ্য-জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশ চিহ্নিত করিয়া লইতে পারিতাম। রূপাদি পঞ্চ লক্ষণে বাহ্য-জগৎকে চিহ্নিত করিবার খুবই সুবিধা হইয়াছে; কিন্তু ঐ পাঁচটা না থাকিলেও চলিত। আবার সেই জন্মান্ধের কথা স্মরণ করুন। জন্মান্ধের রূপ-জ্ঞান নাই, কিন্তু সে বহির্জগতে চলিবার সময় পদে-পদে ধাক্কা খাইয়া সেই আঘাত-বুদ্ধিতেই তাহার বাহ্য-জগৎকে চিহ্নিত করিয়া লয়। জন্মান্ধ এই আঘাত খাইয়া-খাইয়া তাহার বাহ্য-জগতের একটা আঘাতাত্মক মূর্ত্তি চিত্তপটে আঁকিয়া লয়। ফলে প্রত্যক্ষ জড়দ্রব্যের নির্দ্দেশ ব্যাপারে এই রূপাদি পঞ্চ লক্ষণ গৌণ লক্ষণের কার্য্য করে;—এই পাঁচটা বুদ্ধি নিতান্তই উপরি লাভ। প্রত্যক্ষ জড়জগতের মুখ্য লক্ষণ resistance; সেই বিরোধের বুদ্ধি না থাকিলে বহির্জগতে কোন জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব থাকিত কি না সন্দেহ। ভূপৃষ্ঠে চলিবার সময় যদি পদে পদে প্রতিহত হইতে না হইত, জলে সাঁতার দিবার সময় যদি জলের ধাক্কা না বুঝিতাম, দৌড়িয়া চলিবার সময় যদি হাওয়ার ধাক্কা না বুঝিতাম, ইট পাথর তুলিবার সময় যদি গুরুত্ব-বোধ না থাকিত, সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠিবার সময় যদি দেহের ভারে কাতর না করিত, তাহা হইলে বাহ্য-জগতে জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন উপায়ই থাকিত না। জড়জগৎ তাহা হইলে তাহার মুখ্য লক্ষণেই বঞ্চিত হইত। এই ঘাত-প্রতিঘাতের বোধ দিয়াই বাহ্য-জগৎকে আমরা বিশেষ ভাবে চিনিয়া লই।

ফলে বৈজ্ঞানিকের জড়জগতে রূপরসাদির অস্তিত্ব নাই, কোন ঘাত-প্রতিঘাত-বুদ্ধিরও অস্তিত্ব নাই; উহাতে আছে কেবল extension আর inertia। প্রত্যক্ষ জড়জগতে রূপরসাদির অস্তিত্ব আছে; তদতিরিক্ত ঘাত-প্রতিঘাত-বুদ্ধি আছে। রূপরসাদি না থাকিলেও চলিতে পারিত; কিন্তু এই ঘাত-প্রতিঘাত না থাকিলে একবারেই চলিত না। এই ঘাত প্রতিঘাতের বোধ হইতেই আমরা প্রত্যক্ষ বাহ্যজগৎকে চিনিয়া লইতে পারি, এবং যেখানে এই ঘাত-প্রতিঘাতের অস্তিত্ব বুঝি—সেই খানেই একটা না একটা জড়-দ্রব্য বসাই। এই ঘাত-প্রতিঘাত বাহির হইতে আসিতেছে, এইরূপই মনে করি; কেন না অন্যান্য লোকেও এই ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে এক রকমেই সাক্ষ্য দেয়। আমিও যেখানে মাথা ঠুকিয়া বলি যে কঠিন আঘাত পাইলাম, অন্যেও সেখানে মাথা ঠুকিয়া বলে যে কঠিন আঘাত পাইলাম। অতএব এই কঠিন আঘাত বাহির হইতে আসিয়াছে, মনে করি। অন্যের সাক্ষ্য লইয়া বলি, বহির্দ্দেশের এইখানে কাঠিন্য, এইখানে তারল্য, এইখানে গুরুত্ব, এইখানে লঘুতা, এইখানে কঠোরতা, এইখানে কোমলতা। অপরের সাক্ষ্য লইয়া যেখানে যেরূপ বেদনা পাই, সেখানে সেইরূপ জড়দ্রব্য বসাইয়া তদনুরূপ লক্ষণে চিহ্নিত করি। দেখিতে পাই, এই চিহ্নগুলি চঞ্চল, অস্থির; এখন যে চিহ্ন এখানে, পরক্ষণে সে চিহ্ন ওখানে। এই জড়দ্রব্য অবলম্বন করিয়াই অন্যের সহিত কারবার করিতে হয়। মনে রাখিবেন, অন্যের সহিত কারবারের জন্যই যে এই বাহ্য-জগতের স্বীকার আবশ্যক হইয়াছে, এবং এই বাহ্য-জগৎকে ঐরূপে চিহ্নিত করা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু অন্যের সহিত এই কারবার বিরোধাত্মক। এ কথা আমি শতবার, সহস্রবার, বলিয়া আসিতেছি। এই বিরোধই প্রাণযাত্রা এবং প্রাণযাত্রা সর্ব্বদা বিরোধাত্মক। উহা ঠেলাঠেলি, কাড়াকাড়ি, ঘুষোঘুষি, কিলাকিলি, দন্তাদন্তি, রক্তারক্তির ব্যাপার এবং প্রত্যেক ব্যাপারই বিরোধের ব্যাপার। প্রাণভয়ে ও আহারের চেষ্টায় প্রাণযাত্রা কেবলই দৌড়াদৌড়ির ব্যাপার;—এই দৌড়াদৌড়িও বিরোধের ব্যাপার। বিরোধের ব্যাপার বলিয়াই উহার নাম জীবন-যুদ্ধ। প্রাণরক্ষার জন্যই এই জীবন-যুদ্ধই,—এই বিরোধ। প্রাণকে ক্ষয় করিয়া প্রাণকে অজস্রভাবে অপচয় করিয়া প্রাণের এই বর্দ্ধনই জীবন-যুদ্ধ। উহার ফলে, যত কিছু আধিভৌতিক ক্লেশ আছে তাহার নিদান এইখানে। অন্যের সহিত কারবারের জন্য আমার জগৎকে বহির্দ্দেশে স্থাপনা করিলাম; সেই কারবারটাকে, কি জানি কোন্ কারণে, বিরোধাত্মক করিয়া লইলাম। এই বিরোধে প্রাণের ক্ষয়; ক্ষয় হইতে রক্ষার জন্য বিরোধের নানা মূর্ত্তি। নানা-মূর্ত্তি দেখিয়া বহির্দ্দেশকে নানা চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া ফেলিলাম। এক একটা চিহ্ন এক-একটা জড়দ্রব্য। জীবন-যুদ্ধে

এই জড় দ্রব্যগুলাই অস্ত্র। এই জড় দ্রব্যগুলি পরস্পরকে ছুড়িয়া মারি, ইহারই আঘাতে অন্যকে নাশের পথে প্রেরণ করিতে চাহি। স্বয়ং চেষ্টাপূর্ব্বক এইগুলিকে আহরণ করিতে হয়। আহরণ কর্ম্মেই দৌড়াদৌড়ি, অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, ভ্রমণ, পর্য্যটন। চিহ্ন-গুলাকে আহরণ করিতে হয় - বহির্দ্দেশে খুঁজিয়া লইতে হয়। তাহাতে প্রযত্ন-বুদ্ধি হয়। প্রযত্ন-বুদ্ধির মাত্রানুসারে কোনটাকে দূরে, কোনটাকে নিকটে ফেলি। এখন যাহা নিকটে, পরে তাহা দূরে। প্রযত্ন-বুদ্ধিই ক্লেশ—কেন না ইহা বিরোধের সহকারী, এই বিরোধে প্রাণের ক্ষয় হয়। প্রযত্ন-বুদ্ধি অনুসারে আমি আমার চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা নিরূপণ করি। অথচ আমার চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা বাহিরে আরোপ করিয়া বাহ্য জগৎকে চঞ্চল ও অস্থির দেখি। এইরূপে আমার এই বাহ্য-জগৎ চঞ্চল জগৎ। আমার চাঞ্চল্য আমার বুদ্ধির চাঞ্চল্য; বাহ্য-জগতের চাঞ্চল্য উহার প্রতিবিম্ব। আমার দেহটাও জড়দ্রব্য; উহা আমার সব চেয়ে নিকটের অস্ত্র। ওটাকে যখন ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি—যেন উহা আমার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না—সর্ব্বদা আমার গায়ে লাগিয়া আছে। এই দেহাস্ত্র আশ্রয় করিয়াই আমি অন্যকে আক্রমণ করি। কিন্তু এই দেহাস্ত্রও আমার পক্ষে ভার স্বরূপ—আধিব্যাধি পীড়া যাতনা জরা মৃত্যু প্রভৃতিতেই তার পরিচয়। যে বহির্দ্দেশে আমি প্রাণযাত্রা চালাইতেছি, সেই বহির্দ্দেশ এইরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরোধে আস্তীর্ণ—এখানে ওখানে সেখানে সর্ব্বত্রই বিরোধ। বিরোধই যেন জমাট বাঁধিয়া-এক-একটা স্থানে দানা বাঁধিয়াছে; বিরোধের সেই দানা-গুলাই জড় দ্রব্য। আমার দেহটাও ঐরূপ একটা বিরোধের দানা, আমি সর্ব্বদা উহার ভার বহিতেছি। ভার বহিতেছি, কিন্তু ত্যাগ করিতে পারিতেছি না; কেন না, উহাই এক-দিকে আমার প্রধান অস্ত্র, অন্যদিকে উহাই আমার রক্ষাকবচ।

আজিকার মত এইখানেই দাঁড়ি টানিতে চাহি। বাহ্য-জগতের বিষয় বলিতেছিলাম। বাহ্যদেশে যে জগৎকে বিছাইয়া দিই, তাহাকেই জড়-জগৎ বলি। এই জড়জগৎ দ্বিবিধ; একটা বৈজ্ঞানিকের বাহ্যজগৎ, অন্যটা আমাদের প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ বাহ্য-জগৎ। বৈজ্ঞানিকের বাহ্য-জগৎ কাহারও প্রত্যক্ষ নহে, প্রত্যক্ষ হইবে না; পাঁচ জন সুধী ব্যক্তি মিলিয়া-মিশিয়া এই বাহ্যজগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইহার সৃষ্টির জন্য অন্য কোনও সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা আবশ্যক নহে। সুধী বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে একটা বিশিষ্ট মূর্ত্তি দিয়া ফেলিয়াছেন; অসীম ত্রিধাবিস্তৃত আকাশকে ঈথারে পূর্ণ করিয়া সেই ঈথার মধ্যে অণু পরমাণু ইলেক্ট্রন ছড়াইয়া দিয়া সেই অণু-পরমাণু ইলেক্ট্রনের সমন্বয়ে নানা জড়-দ্রব্যের, গ্রহ উপগ্রহ উল্কাপিণ্ড চন্দ্র সূর্য্য তারকার, মূর্ত্তি গড়িতেছেন। কিন্তু তাঁহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি দিতে পারিতেন। অসীমের বদলে সসীম, ত্রিধা-বিস্তৃতের স্থানে চতুর্ধা বা পঞ্চধা বিস্তৃত, আকাশ কল্পনা করিয়া বিনা ঈথারে বিনা ইলেক্ট্রনে তাঁহাদের জড়জগৎ নির্ম্মিত করিতে পারিতেন। এখনও যে করিবেন না, তাহা বলা যায় না। সেই জগৎকে তাঁহারা দৃঢ় নিয়মে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টায় আছেন; ক্রমশঃ সফল হইতেছেন। ধরিয়া লইয়াছেন, এই যে জগৎ গড়িব, ইহার কোথাও নিয়মের বন্ধন আল্‌গা থাকিবে না; একগাছি শিকল দিয়া ইহাকে বাঁধিয়া রাখিব, কোথাও ইহার স্বাধীনতা থাকিবে না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য, সুস্থ মাঝারি মানুষ এই জগতের বাসেন্দা হইবে এবং এই জগতের নিয়মসূত্র আশ্রয় করিয়া প্রজ্ঞাবলে আপনার প্রাণ-যাত্রা সম্পন্ন করিবে। এই জগতে কোথাও রূপ নাই, রস নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, এমন কি ইহা কাহাকেও কোন আঘাত দিয়া কাতর করিতেও পারে না। ইহার কোথাও কোন বিরোধ মাত্র নাই। বৈজ্ঞানিক ইহার নক্সা করিয়াছেন, এবং বৈজ্ঞানিক সেই নক্সা অনুসারে ইহাকে অশরীরী বাঙ্ময় মশলা দিয়া গড়িয়াছেন। এই জগৎ সর্ব্বতোভাবে প্রজ্ঞা নির্ম্মিত—প্রজ্ঞা কর্ত্তৃক পরিচালিত—সর্ব্বতোভাবে প্রজ্ঞার অধীন।

কিন্তু প্রত্যেক জীয়ন্ত মানুষের প্রত্যক্ষ জগৎ এরূপ কৃত্রিম পদার্থ নহে। প্রত্যেক জীয়ন্ত মানুষকে এই প্রত্যক্ষ জগতে প্রাণের খেলা খেলিতে হয়। প্রজ্ঞা-বল তাহাকে বল দেয় বটে; কিন্তু এই প্রত্যক্ষ জগৎ প্রকৃত পক্ষে প্রজ্ঞার এলাকার বাহিরে। এখানে জীয়ন্ত মানুষে জীবনের খেলা খেলে; বহু বহু খেলার সাথী পাইয়া হাডুডুডু দাণ্ডাগুলি কপাটি কপাটি প্রভৃতি নানা খেলা খেলে। নানাবিধ প্রযত্ন-বুদ্ধি সেই খেলায় দাণ্ডা ও গুলির ব্যাট ও বলের কাজ করে। এই প্রযত্ন-বুদ্ধি

হইতেছে বিরোধের অনুভূতি—প্রাণযাত্রায় পদে-পদে বিরোধের অনুভূতি। খেলাটাই যখন হইতেছে বিরোধের খেলা, তখন বিরোধ-বুদ্ধি না থাকিলে সেই খেলা চলিবে কিরূপে? আমার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়ারের অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিয়া লই,—তাহার আক্রমণ পাই বলিয়া, তাহার আক্রমণ এড়াইতে হয় বলিয়া। তাহার আক্রমণ এড়াইবার জন্য সদা জাগ্রত, সদা তৎপর, সদা সচেষ্ট, থাকিতে হয় বলিয়াই এই প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্তিত্ব মানিয়া লই। রূপ রস গন্ধাদি এই বিরোধে সহায় হয় বটে, কিন্তু এগুলা নিতান্তই উপরি লাভ। ও-গুলা আছে, ভালই ; না থাকিলে যে চলিত না, এমন নহে। কিন্তু এই প্রযত্ন-বুদ্ধিটা—এই ক্লেশটা—এই দুঃখটা—এই বেদনাটা, না থাকিলে চলিত না ; কেন না, এই যে খেলা ইহা বিরোধেরই। কাণার নিকট বাহ্যজগতে রূপ নাই, কালার নিকটে বাহ্য-জগতে শব্দ নাই ; কিন্তু এই বিরোধের বেদনা সকলেরই আছে। যাহারা দল বাঁধিয়া ক্রীড়া-ক্ষেত্রে উপস্থিত, তাহাদের সকলেরই আছে। আমি একমাত্র খেলোয়ার হইলে আমার নিকট এই বাহ্য-জগৎ থাকিত না। কাহার সহিত আমি খেলিতাম? ক্রীড়াক্ষেত্রেরই বা তখন কি প্রয়োজন থাকিত? বহু খেলোয়ারের সহিত খেলিবার জন্যই এই বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব, এই বাহ্য-জগতের উৎপত্তি, এই বাহ্য-জগতের বাহ্যতা এবং এই বাহ্য-জগতের সর্ব্বত্র বিরোধের অনুভব। বাহ্য-জগৎকে কাজেই বাধ্য হইয়া বিরোধময় জগৎ, বিরোধাত্মক জগৎ মনে করিয়া লইয়াছি। ইহার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরোধ—বিরোধই যেন দানা বাধিয়া এই বাহ্য-জগৎকে পূর্ণ রাখিয়াছে, বিরোধই যেন নানা ভাবে ঘনীভূত হইয়া এই বাহ্য-জগতে পরিণত হইয়াছে। একটা বিচিত্র বেদনা এই বাহ্য-জগৎকে পূর্ণ করিয়া ইহার স্থানে-স্থানে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে,—ইহার নানা স্থানকে নানা ভাবে চিহ্নিত করিতেছে। সেই বিরোধের বেদনাই যেন এই বাহ্য-জগতে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। মনে রাখিবেন, মূলে আমিই চঞ্চল ; আমার বেদনাটাই চঞ্চল ; আমার প্রাণযাত্রা যে বিরোধের বেদনায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমার এই বেদনার চাঞ্চল্য আমি আমার বাহ্য-জগতে ছড়াইয়া দিই, এবং সেই চাঞ্চল্যে বাহ্য-জগৎকে পূর্ণ করি। এই হেতু বাহ্য-জগৎ সঞ্চরণশীল, গতিশীল, অস্থির, চঞ্চল। এই বিচিত্র চঞ্চল বেদনা-বুদ্ধিকেই আমরা নাম দিয়াছি জড়পদার্থ—ইহা বৈজ্ঞানিকের কল্পিত জড়পদার্থ নহে—ইহার কোথাও অণুপরমাণু ইলেক্ট্রন নাই—ইহা আস্ত সত্য প্রত্যক্ষ পদার্থ—রূপ-রস-গন্ধাদি ইহার গৌণ লক্ষণ, ঐ বিরোধাত্মকতাই ইহার মুখ্য লক্ষণ। বাহ্য-জগতে যে জড়ের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছি, সে এই বিরোধেরই অস্তিত্ব, এই বেদনারই অস্তিত্ব, জ্ঞানবান্ প্রাণীর বেদনারই অস্তিত্ব। এই প্রত্যক্ষ জড়-জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা কে,—যদি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলিব, আমিই ইহার সৃষ্টি করিয়াছি ; অন্য সৃষ্টি-কর্ত্তা আমি মানি না। যদি জিজ্ঞাসা করেন,—কি উদ্দেশ্য লইয়া আমি ইহার সৃষ্টি করিয়াছি ; তদুত্তরে আমি বলিব, আমার প্রাণের খেলা খেলিবার জন্য— বহু প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত খেলিবার জন্য—এই ক্রীড়াক্ষেত্র আমার বাহিরে স্থাপন করিয়া তাহাতে খেলা করিতে নিযুক্ত আছি। যখনই এই বহু প্রতিদ্বন্দ্বী মানিয়া লইয়াছি, তখনই এই বাহিরের ক্রীড়াক্ষেত্র মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি ; এই বহুতার সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যতা আনিয়াছি। এই ক্রীড়াক্ষেত্রই প্রত্যক্ষ বাহ্য-জগৎ, ব্যাবহারিক বাহ্য-জগৎ ; কেন না এইখানে সমস্ত ব্যবহার। ইহাই প্রত্যক্ষ জড়-জগৎ, কেন না যেখানে এই বেদনানুভূতি, সেইখানেই জড়। আমার এই বেদনার চাঞ্চল্যই জড়-জগতের চাঞ্চল্য—জড়-জগতের সমস্ত অস্থির চঞ্চলতা। এই বেদনাই জড়তা ; এই বেদনাই মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়া বহির্দ্দেশে জড়দ্রব্যরূপে ছড়াইয়া আছে।

আপনারা দেখিতেছেন, সম্প্রতি আমি প্রাণকেই প্রথম স্বীকার্য্য postulate করিয়া জগত্তত্ত্বের আলোচনায় উপস্থিত হইয়াছি। জড়বাদীরা জড়কে প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লন—জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি বুঝাইবার চেষ্টা করেন। আমি প্রাণকে প্রথম স্বীকার্য্য ধরিয়া লইয়াছি। প্রাণ হইতে জড়ের উৎপত্তি, বা প্রাণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি বুঝাইতে আমি পারিব না ; তবে প্রাণের সম্পর্কে জড়ের তাৎপর্য্য, প্রাণের সম্পর্কে জ্ঞানের তৎপরতা, আমি বুঝাইতে চাহি। প্রাণি-বিদ্যার চশমা চোখে দিয়া আমি জগৎ-ব্যাপারের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছি। এ একটা আমার বিশিষ্ট attitude মাত্র, ইহার

ভিতরে কোন বুজরুকি নাই। জড়-বিদ্যার attitude স্বতন্ত্র। আমি প্রাণকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। প্রাণ আছে। সেই প্রাণের লক্ষণ—আপনাকে বর্দ্ধন। প্রাণ আপনাকে রাখিতে চায়, আপনাকে বাড়াইতে চায়, আপনাকে বিচিত্র করিতে চায়। কেন চায়, তাহা জানি না। ইহাই প্রাণের কামনা, এই কামনাই প্রাণের স্বরূপ লক্ষণ। প্রাণ সর্ব্বতোভাবে স্বার্থপর। প্রাণ এ বিষয়ে স্বাধীন। প্রাণীর স্বাধীনতা রোধে কাহারও ক্ষমতা নাই, কোন অধিকার নাই। কিরূপে আপনাকে রাখিতে হইবে, কিরূপে বাড়াইতে হইবে, প্রাণই তাহা বুঝে, অন্যের উপদেশ সে চাহে-না। কাহার উপদেশই বা চাহিবে? এই প্রাণ এক হইয়াও আপনাকে বহুখণ্ডে খণ্ডিত করিয়া বহু করিয়া লইয়াছে; এবং পরস্পর দ্বন্দ্বাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বাভিনয়টাই প্রাণযাত্রা। এই দ্বন্দ্বাভিনয় বড় বিচিত্র ব্যাপার। ইহা রক্তবীজের লড়াই। প্রাণ আপনাকে অজস্র ভাবে বাড়াইতেছে, আর অজস্র ভাবে অপচয় করিতেছে। এই অজস্রতার ইয়ত্তা নাই,—ইহা অতি বিপুল ব্যাপার। এই অজস্র উপচয় ও এই অজস্র অপচয়,—ইহা অতি বিপুল ব্যাপার—ইহা নিতান্ত নিষ্কারণ, অহেতুক, উদ্দেশ্যহীন বিপুল ব্যাপার মাত্র। ইহাকে খেলামাত্র বলিতে পারি। আর কোন নাম দেওয়া চলে না। এই খেলা খেলিবার জন্য প্রাণী জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছে। কিরূপে করিল, জানি না—জ্ঞান প্রাণের ঊর্দ্ধ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। জ্ঞানবান্ প্রাণীর সম্মুখেই বাহ্য-জগৎ প্রসারিত—জ্ঞানহীন প্রাণীর নিকটে কোনরূপ বাহ্য-জগতের অস্তিত্ব নাই, বাহ্য-জগতের কোন অর্থই নাই। এই জ্ঞান রূপাদি পঞ্চকের জ্ঞান এবং তাহারও উপরে বিরোধের জ্ঞান। বিরোধের জ্ঞানই বেদনার জ্ঞান। রূপাদি-পঞ্চক নহিলেও জ্ঞানবান্ প্রাণীর প্রাণযাত্রা চলিতে পারে, কিন্তু এই বেদনা-জ্ঞান না থাকিলে চলিতে পারে না।

আমার মূল কথা যদি আপনারা ধরিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্থির বুঝিবেন যে, একমাত্র অদ্বিতীয় চেতন জীবের পক্ষে কোন ব্যবহার নাই, কোন ক্রীড়া নাই, কোন ক্রীড়াক্ষেত্র আবশ্যক নহে, কোন বাহ্য-জগৎ থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমি যদি একমাত্র চেতন জীব হই, তাহা হইলে আমার নিকট বাহ্য-জগৎ অস্তিত্বহীন। আমার অন্তর্জগৎ আছে—সে জগৎ সর্ব্বতোভাবে প্রাতিভাসিক। কিন্তু যে কারণেই হউক আমি প্রাণীরূপে আত্মতুল্য বহু চেতন জীবের কল্পনা করিয়া লইয়াছি এবং তাহাদের সহিত এই প্রাণের ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যখনই তাহাদিগকে আত্মতুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তখনই আমাকে বাধ্য হইয়া এই বাহ্য-জগৎ স্বীকার করিয়া ফেলিতে হইয়াছে, এবং সেই অন্য জীবের সহিত খেলায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। এই খেলাকে কেন বেদনার খেলা করিয়া লইলাম, তাহা জানি না। উহাকে যে বেদনার খেলায় পরিণত করিয়া লইয়াছি, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। বাহ্য-জগতে আমার এই অস্থির চঞ্চল বেদনাকে প্রেরণ করিয়া বাহ্য-জগৎকে, ব্যবহারের জগৎকে, প্রাণযাত্রার জগৎকে, বেদনাময়, দুঃখময় জগতে পরিণত করিয়াছি। যদি জিজ্ঞাসা করেন, কে ইহার নির্ম্মাতা,—আমি বলিব, আমিই ইহার নির্ম্মাতা। যখনই আমি আমার মত বহুজন মানিয়াছি, তখনই ইহার নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিয়াছি। বহুজন যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে বাহ্য-জগৎও থাকে না, বাহ্য-জগতের নির্ম্মাণও দরকার হয় না। তখন বাহ্য-জগৎ কে গড়িল, এই প্রশ্নই অর্থশূন্য হইয়া পড়িবে। প্রাণের এই বিচিত্র বেদনা-রাশিকেই আমি বাহ্য-জগৎ বলিতে চাহি। বেদনা-খণ্ডই জড় দ্রব্য। যখনই আমি বহুজীববাদী হইয়াছি, তখনই আমি বেদনায় আপনাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি। আপনার হাতে নিগড় নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। জড়জগতের ক্রীড়াক্ষেত্রকে হয় ত এরূপ বেদনাপূর্ণ না করিলেও চলিত—প্রতিদ্বন্দ্বী জীবের সহিত বিরোধের খেলা না খেলিয়া উল্লাসের খেলা খেলিলেও হয় ত চলিত। প্রাণ কেন সেরূপ খেলা খেলিল না, তাহা আমি বলিতে পারিব না। স্বাধীনতাই যখন প্রাণের স্বরূপ লক্ষণ ধরিয়া লইয়াছি, তখন প্রাণের উপর ঐরূপ জবরদস্তি হুকুম চালাইবার অধিকার আমার নাই। আমি প্রাণের এই বেদনারাশিকেই প্রাণের কাম্য পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। প্রাণ এই বেদনা-রাশির মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দিয়া আপনার কামনা চরিতার্থ করিতেছে, ইহাই আমি ধরিয়া লইলাম।

প্রাণিবিদ্যার আলোচনায় পরিশেষে আমি এই তত্ত্বে উপনীত হইলাম। আপনারা নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া আমাকে বলিবেন, বেশ করিলে; যে ভাবে বসিয়া আছ,

সেই ডালের মূলে কুঠার-প্রয়োগ করিলে; এ যে আত্মদ্রোহীর কার্য্য হইল! এই দুঃখবাদেই যদি জগত্তত্ত্বের নিষ্পত্তি হয়, তাহা হইলে সেই নিষ্পত্তির দরকার নাই। প্রাণের স্বরূপ লক্ষণ হইল, আপনাকে বর্দ্ধন; আর সেই বর্দ্ধনের উপায় হইল বিশুদ্ধ বেদনা। বেদনা মারাত্মক পদার্থ। প্রাণ তবে শেষ পর্য্যন্ত আত্মঘাতী আত্মদ্রোহী পদার্থে দাঁড়াইল। এই স্ববিরোধী আত্মঘাতী তত্ত্বে প্রাণময় জগৎ প্রতিষ্ঠিত, ইহা কিরূপে মানিতে পারি?

উত্তরে আমি সবিনয়ে বলিব,—রহো—তিষ্ঠ। আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। আমাকে অভয় দেন, আমি আবার অন্য কথা লইয়া আপনাদের সম্মুখে আসিব।

সাময়িকী

আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর মাননীয় শ্রীযুক্ত লর্ড রোনাল্ড্‌সে মহোদয়ের কার্য্যকুশলতার পরিচয় এই অতি অল্পদিনেই সকলে পাইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালী ছাত্রগণকে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণের গোচর করিয়াছি। এবার তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কথা বলিব। বাঙ্গালা দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি কি করিতেছেন, না করিতেছেন, তাহার আলোচনা আমরা করিব না, তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধি-ব্যবস্থার সম্বন্ধেও কোন কথা আমরা বলিব না; তাহা আমাদের 'সাময়িকী'র বিষয়ীভূত নহে। তিনি যে কি ভাবে এ দেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন, কেমন করিয়া আমাদের দেশের দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, কৃষকের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের সহিত অসঙ্কোচে মিশিয়া, নানা তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন, নিজের চক্ষে দরিদ্রের অবস্থা দেখিতেছেন, তাহাদের গৃহস্থালীর সন্ধান লইতেছেন, তাহাদের অভাব অভিযোগ শুনিতেছেন, তাহাদের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অতি সামান্য কলা মূলা তরমুজ বেগুন সহাস্যবদনে গ্রহণ করিতেছেন, তাহারই সামান্য একটু পরিচয় প্রদান করিব।

ইতঃপূর্ব্বেও আমাদের দেশের লাট-বেলাটেরা মফস্বল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারা যখন যেখানে যাইতেন, তিনমাস পূর্ব্ব হইতেই সে সংবাদ ঘোষিত হইত, এবং স্থানীয় লোকেরা লাট-সাহেবের সংবর্দ্ধনার জন্য বিপুল আয়োজন করিতেন;—করিতেন কেন, এখনও করিয়া থাকেন। লাট-সাহেব সহরের মধ্য দিয়া কোন্ পথে কোথায় যাইবেন, তাহা পূর্ব্বেই স্থির করা হইত; সে সকল পথের সংস্কার সাধন হইত; সে সকল পথিপার্শ্বস্থ গৃহাদির শ্রী ফিরাইয়া দেওয়া হইত, পুষ্পপত্র পতাকা তোরণদ্বার প্রভৃতির দ্বারা দারিদ্র্যের সামান্য চিহ্ন পর্য্যন্ত সযত্নে মুছিয়া ফেলা হইত; লাট বাহাদুরেরা দেখিতে পাইতেন, সব সুখ শান্তি, আমোদ উল্লাসে পূর্ণ: দেশের মধ্যে যেন আনন্দের, সমৃদ্ধির হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। তাহার পর হয় ত দরবার হইত। সেখানে গণ্যমান্য লোকেরা সমবেত হইতেন; রাজপুরুষেরা তাঁহাদের মুখেই সমস্ত কথা শুনিতেন, তাঁহাদের মারফতেই দেশের অবস্থা অবগত হইতেন। কিন্তু যে দরিদ্র কৃষকেরা দেশের মেরুদণ্ড, তাহারা সে দরবারের ত্রিসীমাতেও প্রবেশ করিতে পাইত না; অনেকের ভাগ্যে রাজ-দর্শনও হইত না। ইহাই ছিল এবং এখনও আছে মফস্বল-ভ্রমণের সনাতন প্রথা। আমাদের সদাশয় গবর্ণর শ্রীযুক্ত লর্ড রোনাল্ড্‌সে সে প্রথা অনেকটা উল্টাইয়া দিয়াছেন। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া-কহিয়া, হঠাৎ কোন গ্রামে গমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেখানে যাইয়া, বাবুর বৈঠকখানা দূরে রাখিয়া একেবারে কলিমদ্দি সেখের পর্ণকুটীরের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইতেছেন, তাহার ঘরকরণা দেখিতেছেন, তাহার সুখ-দুঃখের কথা শুনিতেছেন, তাহার অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহাকে সদুপদেশ দিতেছেন, আর তাহার প্রদত্ত দুইটী বেগুন কি একছড়া কলা উপহার পাইয়া পরম আনন্দ, বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন।

সংবাদপত্র পাঠে অবগত হইলাম যে, কিছুদিন পূর্ব্বে

মাননীয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্থানীয় কৃষকগণের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে-বলিতে এক বৃদ্ধ কৃষক বলিল যে, সরকার হইতে তাহাকে কিছু পাটের বীজ দেওয়া হইয়াছিল। সেই বীজ বপন করিয়া তাহার ক্ষেত্রে অতি উৎকৃষ্ট পাটের গাছ জন্মিয়াছে; কিন্তু সরকারের লোকেরা তাহাকে সে পাট কাটিতে দিতেছে না। সেই পাট কাটিবার হুকুম সে লাট বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করে, কারণ শীঘ্র না কাটিলে গাছের আঁশ শক্ত হইয়া যাইবে। লাট বাহাদুর বৃদ্ধকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার পক্ষে ঐ পাট না কাটাই কর্ত্তব্য। কারণ সে যে পাট জন্মাইয়াছে, তাহা বিক্রয় না করিয়া যদি তাহার বীজ সে সংগ্রহ করিয়া রাখে, তাহা হইলে পর বৎসর অনেক জমিতে ঐ বীজ বপন করিয়া বেশী লাভ করিতে পারিবে এবং তাহার প্রতিবেশী কৃষকেরাও তাহার নিকট হইতে সেই বীজ লইয়া চাষ করিলে অধিক লাভবান হইবে। বৃদ্ধ কৃষক লাট বাহাদুরের পরামর্শের সারবত্তা বুঝিয়া নিরস্ত হইল। এই ভাবে কৃষকদিগকে সদুপদেশ প্রদান করায় যে কত সুফল হয়, তাহা বলিবার নহে। আমাদের মাননীয় লাট বাহাদুর এই প্রকার গ্রামে-গ্রামে ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন, তাহাতে আমরা আশা করিতেছি যে, ভবিষ্যতে তিনি দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন। তবে এই সঙ্গে আরও একটী কথা বলিবার প্রলোভন আমরা সংবরণ করিতে পারিলাম না। শ্রীযুক্ত লাট বাহাদুর যথেষ্ট কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার করিয়া গ্রামে-গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; আমরা বলি কি, মধ্যে মধ্যে সহরের অবস্থাও যেন তিনি স্বচক্ষে দর্শন করেন। এই কলিকাতা মহানগরীর কথাই ধরি না। একদিন বৃষ্টি-পতনের অব্যবহিত পরেই যদি তিনি এই কলিকাতা নগরীর উত্তরাংশের কোন গলিতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই নগরী সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন, তাহা সহজে ভুলিতে পারিবেন না।

মাননীয় শ্রীযুক্ত লাট বাহাদুর সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিবার আছে। সেদিন ঢাকায় উপাধি-বিতরণের দরবারে তিনি একটী অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। আমরা নিম্নে সেই কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত লাট বাহাদুর বলিয়াছেন—

I have recently had an opportunity of speaking at length upon the questions which are of particular interest to the people of Eastern Bengal and I have little to add to what I said in reply to the addresses of welcome which I received on my arrival. I am given to understand that some disappointment has been expressed at some of the replies which I gave to the many requests which were then made to me. Well, gentlemen, honeyed words are pleasant to listen to and still pleasanter to utt r. Nothing would have been pleasanter and easier for me than to have been profuse in the making of promises. But before a man makes promises it behoves him carefully to consider whether when the time for fulfilling them is at hand, he is likely to be in a position to make them good. It is true that in the case of many of the requests made to me to which I was not in a position to accede, it would have been possible for me to keep silence, and by so doing I might have avoided the odium which inevitably attaches to anyone who is in the unhappy po ition of having to disappoint fondly cherished hopes. That however is not my conception of the duty of the head of the Government.•

এই উক্তির সারমর্ম্ম এই—আমি ঢাকায় আসিবার পর যে সকল অভিনন্দনপত্র আমাকে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার যে উত্তর আমি দিয়াছি, তাহাতে অনেকে নিরাশ হইয়াছেন। মহাশয়গণ, মধুমাখা কথা শুনিতেও মিষ্ট লাগে, বলিতেও মিষ্ট লাগে; আশা দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু তার পর যখন কাজ করিবার সময় উপস্থিত হয়, তখন যে নিরাশ হইতে হয়! আমার মত এই যে, বৃথা আশা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; যেটুকু যিনি করিতে পারিবেন, তাহাই তাঁহার বলা উচিত। লম্বা-লম্বা কথা বলিয়া আশা দিয়া পরে নিরাশ করা অপেক্ষা গোড়া হইতে সকল কথা খুলিয়া বলা আমার মতে কর্ত্তব্য। আমি তাহাই চাই। মাননীয় শ্রীযুক্ত লাট বাহাদুরের এই কথাগুলিতে আমাদের দেশের নেতৃবৃন্দের চক্ষু ফুটিলেই হয়।

কান্ত কবি রজনীকান্ত সেনের নাম কি আমরা সত্য-সত্যই ভুলিতে চলিলাম? কবিবরের মৃত্যুর পর দুইচারিটি সভা করিয়াই কি আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে? তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার আয়োজন কি বক্তৃতাতেই পর্য্যবসিত হইল? আমাদের বেশ মনে আছে, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের পাবনার অধিবেশনে আমরাই রজনীকান্তের স্মৃতি-রক্ষার প্রস্তাব উপস্থাপিত করি এবং সকলেই সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। তাহার পর ত আর কোন কথা শুনিতে পাই না। পাবনার সেই সম্মিলনে নাটোরের মহারাজ পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় মহোদয় সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। আমাদের পূজনীয় কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথও সেই সম্মিলনস্থলে উপস্থিত ছিলেন; বাঙ্গালার সাহিত্যিক-মণ্ডলীর অনেকেই সেই সভায় রজনীকান্তের স্মৃতি-রক্ষার উদ্যোগী হইয়াছিলেন; সামান্য কিছু চাঁদাও সংগৃহীত হইয়াছিল। উত্তর বঙ্গের কবি, বাণীর বরপুত্র রজনীকান্তের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা বাঙ্গালীমাত্রেরই কর্ত্তব্য; উত্তর-বঙ্গের সাহিত্য-সেবকগণের ত বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু কেহই ত কিছু করিতেছেন না! মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকগণের পরম হিতৈষী ব্যক্তি, তিনি নিজে একজন শ্রেষ্ঠ কবি; আর শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ আমাদের সকলের অগ্রণী, বর্ত্তমান কবিকুলের মুকুটমণি। ইঁহারা দুইজন কান্ত কবির স্মৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টা করিলে কি কাজ অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে? কবির স্মৃতি-রক্ষার জন্য কবি-সম্রাটকেই আমরা অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। তিনি এই কার্য্যের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিলে এবং নাটোরের মহারাজা ও সার আশুতোষ তাঁহার সহায় হইলে দেখিতে-দেখিতে কান্ত-কবির স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে। অনেকদিন চলিয়া গেল, এখনও যদি কিছু না করা যায়, তাহা হইলে বুঝিব আমরা শুধুই বাক্‌সর্ব্বস্ব। রজনীকান্তের জীবনী লিখিবার আয়োজনের কথাও আমরা শুনিয়াছিলাম। তাহারই বা কি হইল?

—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থাপক সভায় শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত বৃষ-রক্ষার জন্য একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিবেন; এই সংবাদে আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহে এ সম্বন্ধে সর্ব্বদা আলোচনা হইয়া থাকে, কিন্তু এতদিনের মধ্যে বৃষ-রক্ষার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয় এই কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়া হিন্দুমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বৃষ-রক্ষা সম্বন্ধে খুলনা হইতে প্রকাশিত 'খুলনা' পত্রে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। 'খুলনা' বলিতেছেন:—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের ১৯০৭—৮ সালের গো-বিভাগের আদমসুমারীর রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহোদয় লিখিয়াছিলেন:—

"Brahmini bulls continued to be taken away by butchers and others from Eastern Bengal, Assam, and lower Districts of the Province. The evil assumed such a proportion that it had serious effect on cattle-breeding

অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম এবং বঙ্গদেশস্থ নিম্ন প্রদেশের উৎসর্গীকৃত বৃষগুলিকে কসাইগণ লইয়া যাইত। এই কুপ্রথা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, ইহার জন্য গো-জাতির বংশবৃদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৯১১—১৬ রিপোর্টে লেখা ছিল:—

"Another evil which is assuming an alarming aspect is that Brahmini bulls are taken away by butchers and Mahomedans for meat purposes.

আর একটী অমঙ্গল বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে যে, উৎসর্গীকৃত বৃষগুলি কসাই ও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে এই বিলটী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপাপিত করিবার জন্য কামিনীকুমার চন্দ মহোদয় হিন্দু-সমাজের প্রত্যেকেরই সহানুভূতি পাইবেন। দেশহিতৈষী প্রত্যেকেই দেশের উন্নতির হিসাবেও ইহার সমর্থন করিবেন। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড গোজাতির বংশ-বৃদ্ধির জন্য সবল বৃষ ক্রয় করিয়া থাকেন, কিন্তু এই সকল উৎসর্গীকৃত বৃষকে রক্ষা করিবার জন্য আইন প্রণীত হইলে বৃষকুল রক্ষিত হইবে এবং একারণে গভর্ণমেণ্টের আর অর্থব্যয় করিতে হইবে না। এ সম্বন্ধে গুরুদাস বাবু বলেন:—প্রস্তাবিত বিলটী দ্বারা যদি ডিঃ বোর্ডের হস্তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি বৃষরক্ষার ভার অর্পণ করা হয়, তাহা হইলে বৃষদিগের রক্ষার সুব্যবস্থা হওয়াতে উৎসর্গকারিগণ বলিষ্ঠ বৃষ দেখিয়া উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত হইবেন। আমরা বলি এই আইনে গ্রাম্য ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েতদিগের হস্তে যদি বৃষকুল রক্ষার ভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে পল্লীগ্রামস্থ গাভীদিগের পাল দিবার

ব্যবস্থা হইবে এবং গোজাতির উন্নতি ও বংশবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা হইবে। তবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ উৎসর্গ করা চাই। উপরোক্ত কারণ ব্যতীত গোজাতির অবনতির আরও অনেকগুলি কারণ বর্ত্তমান আছে। প্রথম গোচারণ-ভূমির অভাব এবং দ্বিতীয়, আমাদের গো-পরিচর্য্যার ত্রুটী। আমাদের দেশে মান্ধাতার আমলে গো-পরিচর্য্যার যে ব্যবস্থা ছিল, এখন পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিতেছে। কোন পরিবর্ত্তন নাই, কোন উন্নতি নাই। পূর্ব্বকালে রাজগণ ও ভূম্যধিকারিগণ গোচারণের জন্য বিস্তৃত মাঠ ছাড়িয়া দিতেন সুতরাং গোজাতির স্বেচ্ছা-বিচরণের কোনই অসুবিধা হইত না। বর্ত্তমানে আসাম গবর্ণমেণ্টও গোচারণের জন্য বিহিত বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশের লক্ষপতি ভূম্যধিকারিগণ একটু মনোযোগী হইলে গোজাতির অবনতির কোনই কারণ থাকে না।"

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা এবার নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গিয়াছে। এবার আর প্রশ্নপত্র চুরি যায় নাই। তবে নানাস্থানে নানা জনরব প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গেল সে সকল জনরব ভিত্তিহীন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এই পরীক্ষা-উপলক্ষে এবার যে প্রকার চেষ্টা, যত্ন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। পূর্ব্বে দুইবার পরীক্ষার গোলযোগ হওয়ায় কতজন দেবপ্রসাদ বাবুকে কত কথা বলিয়াছিলেন; তিনি নীরবে সকলই সহ্য করিয়াছিলেন। এখন বোধ হয় সকলেই তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিবেন। এবারের প্রশ্নপত্রও বেশ হইয়াছে। পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ এই সুদীর্ঘকাল যে কি ভাবে কাটাইয়াছে, তাহা বলা যায় না; তাহারাও নিশ্চিন্ত হইল। দরিদ্র পরীক্ষার্থীদিগের সাহায্যের জন্য মাননীয় দেবপ্রসাদ বাবু যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও সফল হইয়াছে; মফস্বলের অনেক স্থানের কলেজের অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, শিক্ষক ও স্থানীয় মহানুভব ব্যক্তিগণ পরিক্ষার্থীদিগের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, অনেক দরিদ্র ছাত্র পাথেয় পর্য্যন্তও পাইয়াছে। ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত সর্ব্বাধিকারী মহাশয়-প্রমুখ যে সকল সহৃদয় ভদ্রলোক দরিদ্র পরীক্ষার্থীদিগের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

কলিকাতার অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ কলেজটি ১ম বর্ষ অতিক্রম করিয়া ২য় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুদ্ধার কল্পে এই আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ প্রতিষ্ঠিত। শল্য, শালাক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমার ভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র—এই অষ্টঅঙ্গ লইয়া আয়ুর্ব্বেদ রচিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই আটটি অঙ্গের সাতটি অঙ্গ লুপ্ত হইয়া একমাত্র কায়-চিকিৎসা - তাহাও আবার সম্পূর্ণ নহে,—কতকাংশ লইয়া এখনকার কবিরাজ মহাশয়েরা আয়ুর্ব্বেদের দোহাই দিয়া থাকেন। এই অভাব দূরীভূত করিয়া, পুনরায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাকে স্বপথে আনয়ন করিতে হইলে, পাশ্চাত্য চিকিৎসার সাহায্য গ্রহণানন্তর আয়ুর্ব্বেদের লুপ্ত অঙ্গগুলি সম্পূর্ণ করিতে হইবে। প্রতিভাশালী লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ন এম-এ, এম-বি মহাশয় এই মহৎ উদ্দেশ্যেই স্বয়ং পাশ্চাত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এবং তাহার পর যথারীতি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-বৃত্তি অবলম্বন করেন,—অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় বা আয়ুর্ব্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠা তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। অঙ্গ-বিনিশ্চয় বিদ্যা বা এনাটমি, দ্রব্যগুণ, রোগ বিনিশ্চয় (প্যাথলজি) এবং শল্যতন্ত্র (সার্জ্জারি) উপদেশ ও কর্ম্মাভ্যাসের জন্য বিবিধ দ্রব্যসম্ভার (মিউজিয়ম) সহ এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়-সংসৃষ্ট দাতব্য ঔষধালয়ে বার্ষিক ত্রিসহস্রাধিক রোগী চিকিৎসার্থ সমাগত হইয়া থাকে,—এ জন্য এই কলেজের ছাত্রগণের রোগী-পরিদর্শনেরও বিশেষ সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। চিকিৎসা-বৃত্তি দ্বারা যে শুধু উদর পূর্ত্তিরই সংস্থান হইয়া থাকে, তাহা নহে,—দেশের—দশের—সমাজের উপকার করিবার এরূপ সহজ এবং সুগম পন্থা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। যাঁহারা ধর্ম্মমূলক স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহের পন্থা পরিষ্কৃত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই আয়ুর্ব্বেদ কলেজে অধ্যয়ন অতি শুভজনক বলিয়া আমরা মনে করি। কলিকাতা ২৯ নং কড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীটে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত।

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"ওলো সেজ্দি ?" অচলা পাশের ঘর হইতে ব্যস্ত হইয়া এ ঘরে আসিয়া পড়িল। মৃণালের কোমরে আঁচল জড়ানো,—সে একটা ছোট দেরাজ একলাই টানা-টানি করিয়া সোজা করিয়া রাখিতেছিল। অচলা ঘরে ঢুকিলেই, সে মহা রাগত ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, "ওরে মুখ-পোড়া মেয়ে, তুমি নবাবের মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাক্‌বে, আর আমি তোমার শোবার ঘর গুছিয়ে দেব ? নাও বল্‌চি ওই ঝাঁটাটা তুলে,—ঐ কোণ্‌টা পরিষ্কার করে ফেল।" বলিয়া হাসি আর চাপিতে না পারিয়া খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। চেঁচা-চেঁচি শুনিয়া হরির-মাও পিছনে-পিছনে আসিয়াছিল; সে কহিল, "তোমার এক কথা, দিদি। বাড়ীতে কতগণ্ডা দাস-দাসী,—দিদিমণির কি কোন দিন ঝাঁটা হাতে করা অভ্যাস আছে না কি, যে আজ পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের মত ঘর ঝাঁট দিতে যাবে ? আমি দিচ্চি," বলিয়া সে ঝাঁটাটা তুলিতে যাইতেছিল,—মৃণাল কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে তাহাকে একটা ধমক্ দিয়া কহিল, "তুই থাম্ মাগী। দিদিমণিকে আমার চেয়ে তুই বেশি চিনিস্ না কি, যে, সালিশি করতে এসেছিস ?" বলিয়া অচলার হাতের মধ্যে ঝাঁটাটা গুঁজিয়া দিয়া হরির-মাকে হাসিয়া বলিল, "ওরে, তোর দিদিমণি ইচ্ছে করলে যে কাজ করতে পারে, তা' তোর সাতগণ্ডা পাড়াগাঁয়ের মেয়েতে পারে না।" অচলাকে কহিল, "নাও ত সেজ্দি, ঐ কোণ্‌টা চট্ করে ঝেড়ে ফেল ত।" অচলা ঝাঁট দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিল, "মৃণাল-দিদি, তুমি যাদু-বিদ্যে জানো, না ?" মৃণাল কহিল, "কেন বল দেখি ?" অচলা বলিল, "তা, নইলে এই বাড়ী পরিষ্কার করবার জন্যে ঝাঁটা হাতে নিয়েচি, এ ভোজবিদ্যে নয় ত কি ?" মৃণাল কহিল, "তুমি নেবে না ত, কে নেবে গা ? তোমার বাড়ী ঝাঁট-পাট দেবার জন্যে কি ও-পাড়া থেকে পদির মাসী আস্‌বে না কি ? নাও, কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে হবে না, সন্ধ্যা হয়।" অচলা কাজ করিতে-করিতে হাসিয়া কহিল, "নিজেও একদণ্ড বস্‌বে না, আমাকেও খাটিয়ে-খাটিয়ে মারলে। সত্যি বল্‌চি, মৃণাল-দিদি, এই পাঁচ-ছ'দিন যে খাটান্ আমাকে খাটিয়েচ, চা-বাগানের কর্ত্তারাও বোধ করি তাদের কুলিদের এত করে খাটায় না।" মৃণাল কাছে আসিয়া তাহার চিবুকের উপর আঙ্গুলের একটা ঘা দিয়া বলিল, "তাই ত ঘর-দোর দেখে মনে হচ্চে, বাড়ীতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েচে। খাটুনি বল্‌চিস্, ভাই সেজ্দি, —যেদিন স্বামি-পুত্র, ঘর-কন্না নিয়ে নাবার-খাবার সময় পাবে না, শুধু তখনি ত এই মেয়েমানুষ জন্মটা সার্থক হবে। ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমার সে দিন আসে,—এখুনি খাটুনির হয়েচে কি গিন্নী!" বলিয়া হাসিতে গেল বটে, কিন্তু তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া গেল। হরির-মা হঠাৎ ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, "সেই আশীর্ব্বাদ কর দিদি, শুধু সেই আশীর্ব্বাদই কর।" তাহার অচলার মাকে মনে পড়িয়া গিয়াছিল।—সেই সাধ্বী অত্যন্ত অসময়ে যখন স্বর্গারোহণ করেন, তখন, একরত্তি মেয়েকে হরির মায়ের হাতেই সঁপিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেই মেয়ে এখন এত বড় হইয়া স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে। মৃণাল তাহাকে ধমক্ দিয়া বলিল, "আ'মর্! ছিঁচ্‌-কাঁদুনি মাগী, কাঁদিস্ কেন ?" হরির-মা চোখ মুছিতে-মুছিতে বলিল, "কাঁদি কি সাধে দিদি? তোমার কথা শুনে কান্না যে কিছুতে ধরে রাখ্‌তে পারিনে। মাইরি বল্‌চি, তুমি না এসে পড়লে এ বাড়ীতে একটা রাতও যে আমাদের কি কোরে কাট্‌ত, তাই আমি ভেবে পাইনে।"

আজ ছয় দিন হইল মৃণাল এ বাটীতে আসিয়াছে। আসিয়া পর্য্যন্ত বাড়ী-ঘর-দ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষগুলার পর্য্যন্ত চেহারা বদলাইয়া দিবার কার্য্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার সব কাজ-কর্ম্ম, হাসি-ঠাট্টার মধ্যে হইতে একটা যাই-যাই ভাব অচলাকে পীড়া দিতেছিল। কারণ, মৃণালের কাজে-কথায়, আচারে-

ব্যবহারে এত বড় একটা সহজ বিস্মৃতি ছিল, যাহার আড়ালে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া অচলা উঁকি মারিয়া তাহার নূতন জীবনের অচেনা ঘর-কন্নাকে চিনিয়া লইবার সময় পাইতেছিল; এবং ইহার চেয়েও একটা বড় জিনিসকে তাহার ভাল করিয়া এবং বিশেষ করিয়া চিনিবার কৌতূহল হইয়াছিল, সে স্বয়ং মৃণালকে। তাহার সাংসারিক অবস্থা যে স্বচ্ছল নহে, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জ্জিত হাত দুখানির পানে চাহিলেই টের পাওয়া যায়। তাহাতে ভগ্ন-স্বাস্থ্য বৃদ্ধ স্বামী,—কোন দিক দিয়াই যাহাকে তাহার উপযুক্ত বলিয়া অচলার মনে হয় না; তাহার উপর বাড়ীতে পরিশ্রমের অন্ত নাই,—জরাজীর্ণ শাশুড়ী মর-মর অবস্থায় অহর্নিশি গলায় ঝুলিতেছে। কারণে, অকারণে তাহার বকুনি-ঝকুনির বিরাম নাই—এ কথা সে মৃণালের নিজের মুখেই শুনিয়াছে,—অথচ, কোন প্রতিকূলতাই যেন দুঃখ দিয়া এই মেয়েটিকে তাহার জীবনযাত্রার পথে অবসন্ন করিয়া বসাইয়া দিতে পারে না। হৃদয়ের আনন্দ-নিরানন্দ ছাড়া বাহিরের কোন কিছুর যেন অস্তিত্বই নাই,—এম্‌নি এই মূর্খ পাড়া-গেঁয়ে মেয়েটার ভাব। অনুক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে বেশ বুঝিতেছিল, পদ্ম যেমন পাঁকের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াও সমস্ত মলিনতার অতীত, ঠিক তেম্‌নি যেন এই লেখা-পড়া-না-জানা দরিদ্র পল্লী লক্ষ্মীটিও সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের ক্রোড়ে অহোরাত্র বাস করিয়াও সমস্ত বেদনা-যন্ত্রণার উপরে অবলীলাক্রমে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। না আছে তাহার দেহের ক্লান্তি, না আছে তাহার মুখের শ্রান্তি। সুতরাং অচলাকেও সে যে-সকল অনভ্যস্ত কাজের মধ্যে অবিশ্রাম টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল, যদিচ, তাহার কোনটার সহিত তাহার শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কারের সামঞ্জস্য ছিল না, তথাপি, না বলিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ানোটা যেন অতি-বড় লজ্জার কথা, এম্‌নি অচলার মনে হইতেছিল। নিজের ভাগ্যটাকেও যে একবার ধিক্কার দিবার জন্য সে একমুহূর্ত্ত বসিয়া শোক করিবে, এই ছয়টা দিনের মধ্যে সে ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত তাহার মিলে নাই,—সমস্ত সময়টা সে কাজ দিয়া, হাসি-গল্প দিয়া এম্‌নি ভরাট্ করিয়া গাঁথিয়া আনিতেছিল। তাই তাহার শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া যাইবার ইঙ্গিতমাত্রেই অচলার মনে হইতেছিল, সঙ্গে-সঙ্গেই এই সমস্ত মেটে বাড়ীটা তাহার দরজা-জানালা-দেয়াল সমেত যেন তাসের ঘরের মত চক্ষের নিমিষে উপুড় হইয়া পড়িয়া যাইবে। মৃণাল-দিদি চলিয়া গেলে এখানে সে এক দণ্ডও তিষ্ঠিবে কি করিয়া?

সন্ধ্যার পর এক সময়ে অচলা কহিল, "কেবল যে পালাই-পালাই করচ মৃণালদিদি, বাপের বাড়ী এসে কে এত শীঘ্র ফিরে যায় বল ত? তা হবে না,—আমি যতদিন না কলকাতায় ফিরে যাই, ততদিন তোমাকে থাক্‌তেই হবে।" মৃণাল কহিল, "কি কোরব ভাই সেজদি, শাশুড়ী-বুড়ী না নিজে মরবে, না আমাকে একদণ্ড ছেড়ে দেবে। আমি বলি, বুড়ী তুই মর্। তোর ছেলের বয়স ষাট হতে চল্ল, শেষে কি তাকে খেয়ে তবে যাবি? তা এত যে দিবারাত্রি কাশে, দম্‌টা ত একবারও আট্‌কে যায় না!" অচলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তোমাকে বুঝি তিনি দেখ্‌তে পারেন না?" মৃণাল মাথা নাড়িয়া কহিল, "দুটী চক্ষে না।" অচলা কহিল, "আর তুমি?" মৃণাল বলিল, "আমিও না। বুড়ীকে গঙ্গা-যাত্রা করিয়ে আমি পাঁচ সিকের হরির-লুট দেব মানত করে রেখেচি যে।" অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, "বিশ্বাস হয় না, মৃণালদিদি। তুমি সংসারে কাকে যে দেখ্‌তে পারো, আর কাকে পারো না, তা তোমার মুখের কথা শুনে কিছুতে বল্‌বার যো নেই। হয় ত এই বুড়ীকেই তুমি সব চেয়ে বেশি ভালবাসো।" মৃণাল হাসিমুখে কহিল, "সবচেয়ে বেশী ভালবাসি? তা' হবে।" বলিয়া অচলার গাল টিপিয়া দিয়া কাজে চলিয়া গেল।

'যাই যাই' করিয়া মৃণালের আবার কিছুদিন গড়াইয়া গেল। একদিন হঠাৎ অচলার চোখে পড়িল, যাবার দিকে তাহার মুখে যত তাড়া, কাজের দিকে তত নয়। সত্যই চলিয়া যাইতে সে যেন ঠিক এত উৎসুক নয়। এতদিন তাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে সে যে-ভাবে চিনিয়া লইতেছিল, এখন তাহার আবরণের বাহিরে আসিয়া, পৃথিবীর সে চেহারা তাহার চোখে যেন আর রহিল না। এ বাটীতে পা দিয়া পর্য্যন্তই যখনই তাহাকে স্বামীর সঙ্গে কোন একটা হাসি-তামাসা করিতে দেখিয়াছে, তখনই তাহার বুকের মধ্যে ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এখন মাঝে-মাঝে যেন সূচ ফুটিতেই লাগিল। এ সব কিছুই নয়, ইহার মধ্যে যথার্থ পরিহাস ভিন্ন আর কিছুই নাই—মন খারাপ করিবার কোন হেতু

নাই,—তাহার মন বড় অশুচি,—এম্‌নি করিয়া আপনাকে সে যতই শাসন করিবার চেষ্টা করে, ততই, কোথা হইতে সংশয়ের বিপরীত তর্ক তাহার হৃদয়ের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারম্বার মুখ তুলিয়া তাহাকে ভ্যাঙ্‌চাইতে থাকে। মহিমের স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য এইখানে যেন অতিশয় বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হয়। সে এই বলিয়া বিতর্ক করিতে থাকে, ভিতরে যদি কিছুই নাই, তবে পরিহাসের জবাব পরিহাস দিয়া করিতেই বা দোষ কি! যে তামাসা করিয়া উত্তর দিতে পারে না, সে ত অন্ততঃ হাসিমুখে সেটা উপভোগ করিতেও পারে! অথচ, সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়, মৃণালের রহস্যালাপের সূত্রপাতেই মহিম লজ্জিত-মুখে কোনমতে তাড়াতাড়ি অন্যত্র পলাইয়া বাঁচে। তাই, কোথায় কি-একটা-যেন প্রচ্ছন্ন অন্যায় রহিয়াছে, আজ-কাল এ চিন্তা কোনমতেই সে মন হইতে সম্পূর্ণ তাড়াইতে পারে না। মৃণালের সঙ্গে একত্র কাজ-কর্ম্ম করিতে-করিতেও তাহার একশ'বার মনে হয়, সে নিজে মেয়েমানুষ হইয়াও যখন বুকের মধ্যে একটা গোপন ঈর্ষার বেদনা লইয়াও ইহাকে কোনমতে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছে না, একত্র এত-কাল ঘর করিয়াও কি কোন পুরুষমানুষে এ মেয়েকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?

মৃণাল আসিলেই যে উড়ে-বামুন তাহার রান্নাঘরের দায় হইতে মুক্তি পাইয়া বাঁচিত, এ কথা অচলা জানিত না। এবারেও সে ছুটি পাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু অচলা কেবলই লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল, মৃণাল নিজের হাতে রাঁধিয়া মহিমকে খাওয়াইতে যেন প্রাণ দিয়া ভালবাসে। আজ সকালে সে হঠাৎ বলিয়া বসিল, "মৃণালদিদি, আজ তোমার ছুটি।" মৃণাল বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "কিসের ভাই, সেজদি?" অচলা কহিল, "রান্নার। আজ আমিই রাঁধব।" মৃণাল অবাক্ হইয়া বলিল, "পোড়া কপাল! তুমি আবার রাঁধবে কি!" অচলা মাথা নাড়িয়া কহিল, "বাঃ, আমি বুঝি জানিনে? বাড়ীতে আমি ত কতদিন রেঁধেচি। সে হবে না মৃণালদিদি, আজ আমি রাঁধবই।" তাহার আগ্রহ দেখিয়া মৃণাল হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল; কহিল, "সে কি হয়, আমি থাকতে তুমি কি দুঃখে রান্নাঘরের ধুঁয়োর মধ্যে কষ্ট পেতে যাবে ভাই?" তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া অচলা জিদ্ করিয়া বলিল, "তা'হলে বামুন থাকতে তুমিই বা কেন কষ্ট কর? এ-বেলা আমি নিশ্চয় রাঁধব।" কেন যে তাহার এই আগ্রহ, মৃণাল তাহার কিছুই বুঝিল না। সে হাসি চাপিয়া কৃত্রিম অভিমানের সুরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বা রে মেয়ে! একে-একে বুঝি তুমি আমার সব কেড়ে-কুড়ে নিতে চাও? সবই ত নিয়েচ, দুটো দিন রেঁধে খাইয়ে যাবো, তাও বুঝি সইচে না? এখন থেকে সতীনের হিংসে সুরু হ'ল বুঝি?" অচলার বুকের ভিতরটায় আবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। মৃণালের শেষ কথাটা গিয়া তাহার ঈর্ষার ব্যথায় সজোরে ঘা দিল। সে এক মুহূর্ত্তেই গম্ভীর হইয়া শুধু সংক্ষেপে কহিল, "না, আজ আমিই রাঁধব।" এতক্ষণে মৃণাল দেখিতে পাইল, অচলা রাগ করিয়াছে। তাই, আর তর্কাতর্কি না করিয়া বিষণ্ণ-মুখে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বেশ, তা'হলে তুমিই রাঁধোগে। আচ্ছা, চল, কোথায় কি আছে দেখিয়ে দিয়ে আসি।" মহিম যে এতক্ষণ ঘরেই ছিল, তাহা দুজনের কেহই জানিত না। সহসা তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া উভয়েই অপ্রতিভ হইয়া গেল। মহিম, অচলাকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "মৃণাল যে ক'দিন আছে, ওই রাঁধুক না।" কেন যে সে এত আপত্তি করিতেছিল, মহিম তাহা মনে-মনে বুঝিয়াছিল। কিন্তু সে তো খুলিয়া বলা চলে না। অচলা আরও জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু রাগ চাপিয়া শুধু কহিল, "না, আমিই যাচ্ছি," বলিয়াই বাদানুবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

অচলা জোর করিয়া রাঁধিতে গেল। রান্নার কাজে সে কাহারও চেয়েই খাটো ছিল না; কিন্তু এ দিকে সে মন দিতেই পারিল না। বিগত দিনের সমস্ত কাহিনী নড়িতে-চড়িতে কেবলই খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, হয় ত মহিম কোন দিনই তাহাকে তেমন করিয়া ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার বিবাহের অনতিকাল পূর্ব্বে সুরেশকে লইয়া যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সকল কথা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া মনে করিয়া আজ সহসা সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, মহিম তাহার প্রতি চিরদিনই উদাসীন; এমন কি পিতার অনভিমতে পূর্ব্ব সম্বন্ধ

যখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, তখনও মহিম যে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই, ইহাতে তাহার যেন আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না।

এখানে আসা অবধি মৃণাল ও অচলা এক সঙ্গে আহারে বসিত। দুপুর বেলা হরির-মাকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া অচলা মৃণালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মৃণাল দিদির জরের মত হয়েচে, তিনি খাবেন না।" অচলা কোন কথা না কহিয়া মৃণালের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মৃণাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া ছিল; অচলা কহিল, "খাবে চল মৃণাল দিদি!" মৃণাল চাহিয়া দেখিয়া, একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তুমি খাওগে, ভাই, সেজদি, আমার শরীর ভাল নেই।" অচলা শুষ্কস্বরে প্রশ্ন করিল, "কি হয়েচে? জর?" মৃণাল কহিল, "তাই মনে হচ্চে। আজ উপ্‌স করলেই সেরে যাবে।" অচলা হেঁট হইয়া হাত দিয়া মৃণালের কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, "আমি অত বোকা নই মৃণালদিদি, খাবে চল।" মৃণাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "মাইরি বল্‌চি সেজদি, আমার খাবার জো নেই। কেন তুমি আবার কষ্ট করে ডাক্‌তে এলে ভাই? বরং চল, আমি না হয় গিয়ে তোমার সুমুখে বস্‌চি।" অচলা কঠিন হইয়া কহিল, "একজন অভুক্ত বন্ধুকে মুখের সাম্‌নে বসিয়ে রেখে খাবার শিক্ষা আমরা পাইনি মৃণালদিদি।" মৃণাল তথাপি হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল "আর বন্ধুর যদি ভোজনের উপায় না থাকে, তা'হলে? অচলা তেম্‌নি ভাবে জবাব দিল, "নেই কেন, আগে শুনি? তোমার জর হয়নি, হয়েচে রাগ। নিজে না খেয়ে আমাকেও শুকোবে, এই যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে, ত, স্পষ্ট করে বল, আমি আর তোমাকে বিরক্ত কোরবো না।" মৃণাল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, "স্বামীর দিব্যি করে বল্‌চি, সেজদি, আমি এতটুকু রাগ করিনি। কিন্তু, আমার খাবার জো নেই। চল দিদি, আমি তোমাকে কোলে কোরে বসে খাওয়াইগে।" অচলা কহিল, "তা'হলে জর-টর নয়? ওটা শুধু ছল?" মৃণাল চুপ করিয়া রহিল। অচলা নিজেও কিছুক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে-আস্তে বলিল, "এতক্ষণে বুঝলুম। কিন্তু, গোড়াতেই যদি মুখ-ফুটে বলে দিতে, মৃণালদিদি, আমার ছোঁয়া তুমি ঘৃণায় মুখে দিতে পারবে না, তা হলে এই অন্যায় জিদ্ ক'রে তোমাকেও কষ্ট দিতুম না, নিজেও দাসী-চাকরের সাম্‌নে লজ্জায় পড়তুম না। তা' সে যাক্—আমাকে মাপ কোরো ভাই,—কিন্তু দুধ ত ছোঁয়া যায় না শুনেচি, তাই এক বাটি এনে দিই,—আর যদু গিয়ে দোকান থেকে কিছু সন্দেশ কিনে আনুক। কি বল?" প্রথমটা মৃণাল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল; খানিক পরে সে ভাব কাটিয়া গেলেও সে কথা কহিল না, অধোমুখে নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। অচলা পুনরায় খোঁচা দিয়া কহিল, "কি বল?" মৃণাল আঁচলে চোখ মুছিয়া মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিল, "এখন থাক্।" অচলা আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল। মৃণাল মুখও তুলিল না, আর একটা কথাও কহিল না। বুড়া শাশুড়ীকে তাহার রাঁধিয়া দিতে হয়; তিনি অতিশয় শুচিবাই প্রকৃতির লোক; এ কথা শুনিলে কোন কালে যে তাহার জলস্পর্শ করিবেন না, নিদারুণ অভিমানে এ কথা সে আভাসেও অচলার কাছে প্রকাশ করিল না। অচলা রান্না-ঘরে গিয়া সেখানকার কাজ-কর্ম্ম সারিয়া হাত ধুইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু আর যে কোন কারণেই হোক, মৃণাল ঘৃণায় যে তাহার প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জন স্পর্শ করে নাই,—এ কথা সে একান্ত মিথ্যা বলিয়াই মনে-মনে জানিত বলিয়া, অমন করিয়া আঘাত করিতে পারিয়াছিল। সত্য বলিয়া বুঝিলে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেও পারিত না। অথচ, যে প্রভাত আজ কলহের দ্বারাই আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার মধ্যাহ্নে ভগবান কাহারও অদৃষ্টেই যে প্রস্তুত অন্ন মাপান নাই, তাহা উভয়েই মনে-মনে বুঝিল।

অপরাহ্ণ বেলায় গরুর গাড়ী আসিয়া সদরে উপস্থিত হইল। মৃণাল অচলার ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "নমস্কার করতে এসেচি,—সেজদি, বাড়ী চল্লুম। যদি কখনো ইচ্ছে হয়, একটা ডাক্ দিয়ো, আবার এসে হাজির হ'ব।" একটুখানি থামিয়া কহিল, "কিন্তু যাবার সময় একটা কথাও কবে না ভাই?" বলিয়া ক্ষণকাল উৎসুক চক্ষে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অচলা একটা কথাও কহিল না, যেমন বসিয়া ছিল, তেমনি মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়াই মৃণাল দেখিতে পাইল,

মহিম বাড়ী ঢুকিতেছে। "একটু দাঁড়াও সেজদা, তোমাকেও নমস্কার করি।" মহিম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু না খেয়েই বাড়ী চল্‌লি মৃণাল? না হয়, রাত্রিটা থেকে কাল সকালেই যাস্‌নে?" মৃণাল শুধু একটুখানি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না সেজদা, যদু গাড়ী ডেকে এনেচে, আজ যাই,—কিন্তু আর একদিন নিয়ে এসো।" বলিয়া গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা লইল। হাসিয়া বলিল, "মাথা খাও সেজদাদা মশাই, আর একদিন আন্‌তে যেন ভুলো না ভাই।" আজ মহিমও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "পোড়ারমুখী, তোর স্বভাব কি কোন দিন যাবে না রে?" "মরলে যাবে, তার আগে নয়।" বলিয়া আর একবার হাসিয়া মৃণাল গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

আজই, এত অকস্মাৎ মৃণাল যে চলিয়া যাইতে পারে, অচলা তাহা কল্পনাও করে নাই। সে নিজে খায় নাই, তাহাকে খাইতে দেয় নাই, এই অপরাধের সব চেয়ে বড় দণ্ড সে যে কি করিয়া দিবে, একলা ঘরে বসিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে এই চিন্তাই করিতেছিল। যে ভালবাসে, তাহাকে ঘৃণা করার অপবাদ দেওয়ার মত গুরুতর শাস্তি আর নাই, তাহা ভালবাসাই বলিয়া দেয়। এই গুরুদণ্ডই মৃণালের প্রতি মনে-মনে বিধান করিয়া অচলা বসিয়া ছিল। মৃণাল দিদি যে তাহাকে অন্তরের মধ্যে ঘৃণা করে, উঠিতে-বসিতে এই খোঁচা দিয়া সে আজকের শোধ লইবে স্থির করিয়াছিল;—কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল।

অভুক্ত মৃণাল বিদায় লইয়া যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহারও চোখের জলে দুই চক্ষু পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু, মৃণালের মুখের সেই এক-ফোঁটা হাসির শব্দ তপ্ত মরুর মত চক্ষের পলকে তাহার উদ্গত অশ্রু শুষ্ক করিয়া ফেলিল। এবং, দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া সে কাণ ভরিয়া উভয়ের বিদায়ের পালা শোষণ করিয়া বজ্রাহত তরুর মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল। একে সে সারাদিন উপবাসী, তাহার উপর এই আঘাত। অনতিকাল পরে মহিম আসিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার স্বাভাবিক ধৈর্য্য প্রায় সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাহার আজন্ম শিক্ষা-সংস্কার তাহাকে ইতরতায় হাত হইতে রক্ষা করিল। সে প্রাণপণ বলে আত্ম-সম্বরণ করিয়া, কঠোর হাসি হাসিয়া কহিল, "বাস্তবিক, সহরের লোক পাড়াগাঁয়ে এসে বাস করার মত বিড়ম্বনা বোধ করি সংসারে অল্পই আছে, না?" মহিম স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তোমার নিজের কথা বল্‌চ ত? বুঝ্‌তে পারি, প্রথমটা তোমার নানাপ্রকার কষ্ট হবে; কিন্তু —মৃণালের সঙ্গে যে তোমার বনিবনাও হবে না, এ আমি কিছুতে ভাবিনি। কেন না, তার সঙ্গে কোন দিন কারও ঝগড়া হয়নি।" অচলা কহিল, "আমার সঙ্গেই যে পাড়াশুদ্ধ লোকের চিরকাল ঝগড়া হয়, এ খবরই বা তুমি কোথায় শুনলে?" মহিম ধীরে-ধীরে বলিল, "তোমার সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি—থাক্ এ সব কথায় এখন কাজ নেই।" অচলা মনে-মনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "মৃণাল দিদিও ত সমস্ত দিন না খেয়েই বাড়ী গেলেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে হেসে কথা কইতে ত তোমার আপত্তি হয়নি!" মহিম আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ সব তুমি কি বল্‌চ অচলা?" অচলা কহিল, "আমি এই বল্‌চি যে, কি এমন গুরুতর অপরাধ তোমার কাছে করেচি, যাতে এই অপমানটা আমাকে না করলে তোমার চল্‌ছিল না?" মহিম হতবুদ্ধি হইয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল। কহিল, "কি বল্‌চ? এ সব কথার মানে কি?" অচলা অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মানে এই যে, কি অপরাধে আমাকে এই অপমান করলে তুমি? তোমার কি করেচি আমি?"

মহিম অধিকতর হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, "আমি তোমাকে অপমান করেচি?" অচলা বলিল, "হাঁ, তুমি।" মহিম সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "মিছে কথা।" অচলা মুহূর্ত্ত কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তার পরে কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, "আমি কোনদিন মিছে কথা বলিনে। কিন্তু সে কথা যাক্। কিন্তু তোমার নিজের যদি সত্যবাদী বলে অভিমান থাকে, সত্য জবাব দেবে?" মহিম উৎসুক দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিল। অচলা প্রশ্ন করিল, "মৃণালদিদি যা কোরে আজ চলে গেলেন, তাকে কি তোমাদের পাড়াগাঁয়ের সমাজে অপমান করা বলে না?" মহিম বলিল, "কিন্তু তাতে আমাকে জড়াতে চাও কেন?" অচলা কহিল, "বল্‌চি। আগে বল তাকে কি বলা হয় এখানে?" মহিম কহিল,

"বেশ, তাই যদি হয়—"অচলা বাধা দিয়া কহিল, "হয় নয়, ঠিক জবাব দাও।" মহিম কহিল, "হাঁ, পাড়াগাঁয়েও অপমান বলেই লোকে মনে করে।" অচলা কহিল, "করে ত? তবে, তুমি সমস্ত জেনে-শুনে এই অপমান করিয়েচ। তুমি নিশ্চয় জান্‌তে তিনি আমার ছোঁয়া রান্না খাবেন না। ঠিক কি না?" বলিয়া সে নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া মহিমের বুকের ভিতর পর্য্যন্ত যেন তাহার জলন্ত দৃষ্টি প্রেরণ করিতে লাগিল। মহিম বিহ্বলের মত শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। অচলা কহিল, "বল!"

ঠিক এমনি সময়ে বাহির হইতে সুরেশের চীৎকার আসিয়া পৌঁছিল—"মহিম? কোথা হে?"

প্রতিধ্বনি

গো-রক্ষা

কৃষি-কার্য্যের সাহায্যের জন্য এবং গো-বংশের উন্নতি-সাধনের জন্য এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সমারোহের শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে উৎকৃষ্ট জাতীয় সুলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট বৃষ উৎসর্গ করিতেন। এই সকল বৃষ অবাধে স্বেচ্ছায় যত্র তত্র বিচরণ করিয়া বিলক্ষণ তেজস্বী ও বলবান হইয়া উঠিত। এই উপায়ে সমাজ রক্ষার একটি সনাতন চিরস্থায়ী উপায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। মানবের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় পশু গো-জাতির উন্নতি ও রক্ষার জন্য মানুষকে কোনরূপ চেষ্টা যত্ন করিতে বা আয়াস স্বীকার করিতে হইত না। কিন্তু খাদ্য লোভে এক শ্রেণীর লোকে এইরূপ উৎসৃষ্ট ষণ্ড বধ করিতে থাকায় এবং মিউনিসিপ্যালিটী ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইহাদিগকে ধরিয়া গাড়ীতে জুতিয়া দেওয়ায় অথবা অপরাপর কার্য্যে নিযুক্ত করায়, পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সাধনে বিলক্ষণ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ একবার কতকগুলি লোক উৎসৃষ্ট বৃষ খাদ্যলোভে বধ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছিল। মামলা হাই-কোর্টে আসিলে মাননীয় বিচারপতিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, এইরূপ বৃষের যখন কোন অধিকারী নাই, তখন উহা-দিগকে হত্যা করিলে কোন অপরাধ হইতে পারে না। হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের পর হইতে শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করিবার প্রথা কমিয়া যাইতেছে। তজ্জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় উৎসৃষ্ট বৃষ রক্ষার ভার গ্রহণ এবং এ সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। আমরা 'সাময়িকী'তে এ কথার উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু বিষয়টী গুরুতর জন্য 'প্রতিধ্বনি'তেও তাহার আলো-চনা করিলাম। এই প্রসঙ্গে সহযোগী চারুমিহির বলেন,—

"শ্রীযুক্ত কামিনী বাবুর প্রস্তাবটী সম্বন্ধে আমাদের একটী কথা বলিবার আছে। এই ষাঁড়গুলিকে যাহাতে গবর্ণমেণ্ট প্রতিপালন করেন, মাত্র তদ্রূপ ভাবে আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্যই তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ষাঁড়গুলিকে যাহারা হত্যা করে, তাহারা যাহাতে এ কার্য্য না করে, সেসম্বন্ধে আইন প্রবর্ত্তন করিবার কোনও প্রস্তাব তিনি করেন নাই। কেন করেন নাই; তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় ঐরূপ ভাবে আইন প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ কোনও জিনিষ উৎসর্গ করিলে তাহা নষ্ট করিবার জন্য কাহারও অধিকার জন্মিতে পারে না। রাস্তা, ঘাট, পুকুর, কূপ, ইন্দারা ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ এ দেশে ও অন্যান্য দেশে বরাবরই উৎসর্গীকৃত হইয়া আসিতেছে। তজ্জন্য ঐ সকল জিনিষ নষ্ট করিবার কাহারও অধিকার জন্মিতে পারে না।

প্রাচীন রোমক আইনের যে সূত্র অবলম্বন করিয়া বিচারকগণ এই ষাঁড়-হত্যা ব্যাপারে সকলকে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই স্থলে প্রযোজ্য নহে। যে জিনিষের কোনও মালীক বা অধিকারী নাই, যে জিনিষকে কেহই তাহার নিজের জিনিষ বলিয়া দাবি করে না, সে জিনিষ যে কেহ গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু যে জিনিষ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারার্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যে কোনও এক ব্যক্তি গ্রহণ করিতে পারে বা নষ্ট করিতে পারে, ইহা কখনও আইনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। উহা সকলেই ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু কেহই নষ্ট করিবার অধিকারী নহে। আইনের এইরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত নহে এবং তদ্রূপ ভাবে আইন পরিবর্ত্তন করাও অন্যায় বা সাধ্যাতীত নহে। আমরা আশা করি, শ্রদ্ধেয় কামিনী বাবু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আইন সংশোধনের চেষ্টাও পরিত্যাগ করিবেন না।"

উৎসৃষ্ট বৃষ কোন ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি না হইতে

পারে ; কিন্তু কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাঁহার মৃত্যুর পর স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট যেমন তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন, উৎসৃষ্ট, না-ওয়ারিস্ বৃষও কেন সেইরূপ গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে না, এমন যুক্তিও অনেকে প্রদর্শন করিতেছেন। হিন্দু-শাস্ত্রে ইহার নজীরও আছে। কলিকাতার ব্রাহ্মণ-সভা বলিতেছেন,—

"উৎসৃষ্ট বৃষে কাহারও স্বত্ব না থাকিলেও সর্ব্বরক্ষক রাজার ঐ বৃষরক্ষার স্বামিত্ব আছে। "রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ। (মনু ৭মঃ ৩)। যাহার কেহ রক্ষক নাই, রাজাই তাহার রক্ষক। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"কুলানি জাতীঃ শ্রেণীশ্চ গণান্ জনপদাংস্তথা। স্বধর্ম্ম চলিতান্ রাজা বিনীয় স্থাপয়েৎ পথি॥" ১মঃ ৩৬১। উৎসৃষ্ট বৃষের প্রতি যে সকল আচরণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তাহা যে ব্যক্তি করিবে, তাহারই অধর্ম্ম ; দণ্ড প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেখিলে সেই অধর্ম্ম নির্ণয় করা যায়। মুষ্কমোচন ও হত্যা নিষেধ ; যথা—দণ্ডবিধি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"লিঙ্গস্য চ্ছেদনে মৃত্যৌ মধ্যমো মূল্যমেব চ। মহাপশূনামেতেষু স্থানেষু দ্বিগুণোদমঃ॥" ২য়ঃ ২২৯। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত স্মৃতিসাগরে গোভিলঃ—"বৃষভন্তু সমুৎসৃষ্টং কপিলাং বাপি কামতঃ। যোজয়িত্বা হলে কুর্য্যাদ্‌ব্রতং চান্দ্রায়ণ দ্বয়ম্॥" উৎসৃষ্ট বৃষকে হলে যোজিত করিলে দুই চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। হলযোজন শব্দ দ্বারা শকট যোজনও বুঝিতে হইবে। বৃষোৎসর্গস্থলে 'ন বাহ্য' বাহন অর্থাৎ হল বা শকটে যোজনা নিষেধ,—শুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উদ্ধৃত কল্পতরুধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচনে ইহা স্পষ্ট আছে। অতএব এ সকল অধর্ম্ম নিবারণ রাজার কর্ত্তব্য। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রক্ষাধিকারের ন্যায় অস্বামিক বৃষের রক্ষাধিকার রাজার আছে। "রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।" (মনু ৭মঃ ৩)।"

ব্রাহ্মণ-সভা আরও বলেন,—

"হাইকোর্টের নজির যে শাস্ত্র ও যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহাও এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

স্বত্বাধিকারীর ইচ্ছায় তাঁহার নিজ স্বত্ব নাশ ও অন্যের স্বত্ব উৎপত্তি হইতে পারে। এই ইচ্ছা দান বিক্রয়ের আকারে অভিব্যক্ত হয়। উপেক্ষা-স্বরূপ ইচ্ছায় স্বত্বাধিকারীর স্বত্ব নাশ হয় এবং উপেক্ষিত বস্তুতে অন্যের ঔপাদানিক স্বত্ব হইতে পারে। বৃষোৎসর্গ স্থলে উৎসর্গকারী যে ইচ্ছা করিয়া বৃষের প্রতি নিজ স্বামিত্ব বিসর্জ্জন দিতেছেন, সে ইচ্ছা দান, বিক্রয় বা উপেক্ষার আকারের নহে, তাহার মধ্যে একটু চুক্তি আছে। সেই চুক্তি এই যে, এই বৃষের উপর আমার যে স্বত্ব ছিল, তাহা ত্যাগ করিতেছি বটে, কিন্তু অপরে যেন ইহা গ্রহণ না করেন, তাঁহাদের ঔপাদানিক স্বত্ব হওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। সেই বৃষ অন্যে হল শকটাদিতে যোজিত করিতে পারিবে না, সেই বৃষ-সঙ্গিনী উৎসৃষ্ট বৎসতরীর দুগ্ধও পেয় নহে। দাঁড়াইল এই যে, আমার এ বৃষ উৎসৃষ্ট হইলেও অন্যে ইহার অধিকার করিলে আমার আপত্তি থাকিল, সেই আপত্তি করিবার ক্ষমতা স্বত্বের যে টুকু সম্বন্ধ থাকিলে হয়, মাত্র তত্টুকু সম্বন্ধ আমার থাকিবে, তাহার অতিরিক্ত কোন স্বত্ব সম্বন্ধ এ বৃষে বা বৎসতরীতে নাই। ব্রাহ্মণগণ আপনারা এ বিষয়ে সাক্ষী। এই ভাব নিম্নলিখিত বচনে স্পষ্টীকৃত আছে ;—"অথ বৃত্তে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ। ব্রাহ্মণানাহ যৎ কিঞ্চিন্ময়োৎসৃষ্টস্য নির্জ্জনে॥ তৎ কশ্চিদস্মো ন নয়েন্ন বিভাজ্যং যথাক্রমম্। ন বাহ্যং ন চ তৎ ক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ ক্বচিৎ॥" (কল্পতরুধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচন)।

এই বচন শুদ্ধিতত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'বক্রোক্তিভিঃ' এই অংশ দ্বারা স্পষ্টই বুঝান হইয়াছে যে, এই উৎসর্গের মধ্যে দাতার অভিসন্ধি আছে। সে অভিসন্ধিও স্পষ্ট উল্লিখিত। এই কারণে উৎসৃষ্ট বৃষ কাহারও ক্ষেত্রে শস্য নাশ করিলেও ক্ষেত্রস্বামী তাহাকে ধরিয়া রাখিলে রাজদণ্ড পাইত। কেননা রাজবিধি ছিল ;—

"মহোক্ষোৎসৃষ্ট পশবঃ সূতিকাগন্তুকাদয়ঃ।
পালো যেষান্তু তে মোচ্যা দৈবরাজপরিপ্লুতাঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ২য় খঃ ১৬৬)"

হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত যে অভ্রান্ত নহে, উৎসৃষ্ট বৃষ যে অস্বামিক নহে, এডুকেশন গেজেটে একজন পত্রলেখক তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"পুষ্করিণী উৎসর্গ করায় সমগ্র সমাজকে দেওয়া হয় ; সকলের পানীয় জলের জন্য। উহাতে সমাজের স্বত্ব হয়। সেইরূপ বৃষ উৎসর্গ করায় সমগ্র সমাজের স্বত্ব হইত। ব্যক্তি গত স্বত্ব লোপ পাইত। "না ওয়ারিস" বা অস্বামিক দ্রব্য সমাজের পরিচালক রাজার অর্থে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের থাকে না। সকল ব্যক্তিরই উহা ব্যবহারে লাগিবার এবং উপকারে আসিবার কথা। উহা কাহারও নয়, উহা বন্য ভাব পাইয়াছে ; উহা বন্য পশুর ন্যায় যে কেহ ধরিতে এবং স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত ব্যবহারে লইতে পারে, এরূপ অর্থ হিন্দুর প্রতি একান্তই সহানুভূতিহীন ভাবে করা হইয়াছে। ইংরাজ ক্রমেই উদারভাব এবং পরচিত্তজ্ঞ হইতেছেন। এই গূঢ় ক্ষোভের অপনয়ন জন্য কোন উদারহৃদয় ইংরাজ রাজপুরুষ উঠিয়া-পড়িয়া অবশ্যই লাগিবেন।

এমন কোন হিন্দু নাই যে, এবিষয়ে উচিত ব্যবস্থা হইলে চিরকৃতজ্ঞ না হইবে। এই সকল ষাঁড় নষ্ট হওয়ায় বা অন্যায্য ভাবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ গবর্ণমেণ্টের ক্যাটল সেন্সস রিপোর্টেও আছে।

এ সম্বন্ধে একটী আইন পাস করিয়া বৃষোৎসর্গের বৃষগুলি কৃষি বিভাগের দ্বারা পালনীয় এইরূপ মত স্থির করিয়া ফেলা হউক। কৃষি-বিভাগ ইউনিয়ন কমিটি ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের এবং পিঁজরাপোল গুলির সহিত এরূপ একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে পারিবেন—

যাহাতে সরকারী খরচা খুব কমই হয় অথচ ষাঁড় রক্ষা হইতে পারে। ষাঁড়গুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে পিঞ্জরাপোলের সহায়তা হইবে। ইহাতে সর্ব্বশ্রেণীরই সুখ হইবে। ষাঁড় মুসলমান কৃষকদিগেরও প্রয়োজনীয়। উহারাও তুষ্ট হইবে। সাধারণ মুসলমান চাষী কসাই-দিগের সহিত ভাল ষাঁড় নষ্ট করায় একমত নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এ বিষয়ে ধীরভাবে আলোচনা হউক। সুফলই প্রসূত হইবে।"

এদেশে গো-হত্যার ব্যাপার লইয়া হিন্দু-মুসলমানে একটা বিরোধের ভাব অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছে। যাঁহারা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গো-হত্যা নিবারণে প্রয়াস করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখন বুঝিতেছেন যে, ওদিক দিয়া চলিলে কোন ফল ফলিবে না, গো-হত্যা নিবারিত হইবে না। তাই তাঁহারা ভিন্ন পথ অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গোপালদাস ডিঙ্গোমল ইজিপ্টের কায়রো সহর হইতে ভারতের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের নিকট একটী আবেদন করিয়াছেন। তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলিয়াছেন,—

Apart from th's religious aspect there are two other highly important points involved in the case— the humanitration and the economical. The humanitration point does not require ary arguments from me, as it has since ages been well-established by great gemuses of every nation. But here I want to submit the economical point to the judgment of the Government and People of India. It has been observed almost in all Moslem countries that this periodical wholesale slaughter has resulted in scarcity of these useful household animals and consequent famine in rural and agricultural produce. This scarcity has specially been felt at the present time, when every country has abnormal conditions brought about by this world-wide war. For example I cite instance of Egypt; owing to the present economic conditions the Government of Egypt has been obliged to stop this wholesale slaughter of cattle by the following decree :—

"The Government has published a legal "Fatwa", by the heads of the "four Moslem sects recommending Moslems not to kill more than one sheep "on the occasion of the 'Gourban Bairam' (*i.e* Bakri Id) feast, which "falls on the 8th instant."—Egyptian Mail, Cairo, 3rd October 1910.

This order has been issued by the Government of His Highness the Sultan, by and with the consent of the heads of the Moslem religion. I have been informed that such restrictions have also been imposed by H. H. the Grand Sherifi of Mecca now H. M. the King of Arabs. In view of these facts my Moslem brothers in India have no longer the religious plea for the wholesale slaughter of cows and other cattle, as this practice has been disallowed by the lights of their own religion. The humanitrat on view is unconsciously admitted by the Moslems also, as the Moslem cultivators and livestock owner take as much care of their cattle as the Hindus and sometimes even more. I am pleased to make this statement definitely in the case of Sindhi Moslems, most of whom are agriculturists, and take the utmost care af their cattle and do not slaughter them for their dinner as they entirely live on the produc s of their soil and of the milk.

কেবল গো-হত্যাই যে গো-জাতির অবনতির একমাত্র কারণ, তাহা নহে। সময়ে সময়ে স্থান বিশেষে এক এক প্রকারের সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইয়া গো-জাতির ধ্বংস-সাধন করিয়া থাকে। সহযোগী মেদিনীবান্ধব লিখিয়াছেন,—

গো চিকিৎসা :—

কাঁথির 'নীহারে' প্রকাশ যে ঐ অঞ্চলের স্থানে স্থানে 'গলাফুলা' নামক এক অতি মারাত্মক গো-পীড়া হইয়া অনেক গরু মারা যাইতেছিল। এই জন্য স্থানীয় ভেটারীনারী সার্জ্জন মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ভেটারীনারী সার্জ্জন অনিল বাবু এখন রোগাক্রান্ত গ্রাম সমূহে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ঐ সংক্রামক পীড়ার প্রতিকার সম্বন্ধে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন যে, গরুর ঐ গলাফুলা পীড়া অতি সাংঘাতিক, এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে প্রায় একটীও গরু রক্ষা পায় না। সুতরাং কোন স্থানে পীড়া দেখা দেওয়া মাত্রেই অন্যান্য সুস্থ সবল গরুসকলকে টীকা দিয়া উহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে হয়। নচেৎ উহার আর কোন উপায় নাই। এই উপায়ে অনিলবাবু ইতিপূর্ব্বে ভগবানপুর, বনমালীচট্টা, প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক গরুকে পীড়ার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এখন দুরমুঠ বহিত্র-কুণ্ডা বেতিনিয়া প্রভৃতি যে সকল গ্রামে উক্ত মারাত্মক পীড়া দেখা

দিয়াছে, তিনি সেই সমস্ত স্থানে সুস্থ গরু সকলকে টীকা দিয়া ঐ রোগের সংক্রামতা নিবারণ জন্য কলিকাতা হইতে টীকার বীজ আনাইয়াছেন। বেতিলিয়া গ্রামে ইতিমধ্যে অনেকগুলি গরুকে টীকা দিয়াছেন। যে যে স্থানে ঐ রোগ দেখা দিয়াছে, সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণের এখন আপনাপন সুস্থ গরুগুলিকে সর্ব্বাগ্রে টীকা দিয়া লওয়া একান্তই উচিত। অনিলবাবুর এই চেষ্টায় সুফল ফলিলে সাধারণের বিশেষ উপকার হইবে। অনিলবাবু এজন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। জেলার অন্য কোন স্থানে ও এইরূপ গলা-ফোলা ব্যাধি দেখা দিলে সেখানেও এই উপায় যাহাতে অবলম্বিত হয় তাহার বিধান করা উচিত।"

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ]

(হিন্দী)

১। **সরস্বতী**, জুন, ১৯১৭

"**স্ত্রীশিক্ষা কী আবশ্যকতা**"—লেখক শ্রীশালগ্রাম গুপ্ত। দেশে শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। মূর্খ, একগুঁয়ে, নিরক্ষর অথচ শাস্ত্রাভিমানী ছাড়া অন্য কেহ আজকাল স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আর কোন মতদ্বৈত নাই।

এখন মতভেদ—কেবল স্ত্রীশিক্ষার পদ্ধতি বা প্রকৃতি লইয়া। কিরূপ শিক্ষা মেয়েদের দেওয়া উচিত? এক দলের মতে—মেয়েদের আদর্শ বধূ, আদর্শ পত্নী ও আদর্শ মাতা হইবার মত শিক্ষা দিতে হইবে। অন্য দলের মতে—মেয়েদের সম্পূর্ণরূপে পুরুষের মতই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি এবং বৃদ্ধি স্ত্রীজাতির উপর নির্ভর করিতেছে। রমণী যদি গর্ভধারণ এবং সন্তান-পালন না করেন, তাহা হইলে সৃষ্টির বিরাট যন্ত্রটি বিকল হইয়া যাইবে। ক্ষেত্রে বীজবপন করা চাষীর কাজ সন্দেহ নাই; কিন্তু ধরিত্রী যদি ধারণ শক্তি ত্যাগ করেন, তবে বীজবপন বৃথা হইয়া যায়। এই জন্যই মেয়েদের শক্তিরূপা বলা হইয়াছে। মনু বলেন, রমণী সন্তান গর্ভে ধারণ করেন; সেইজন্য তিনি বিশিষ্ট যত্ন এবং আদর পাইবার অধিকারিণী। গর্ভিণী রমণীর যত্ন এবং রক্ষা কিরূপ সাবধানতার সহিত করা উচিত, তাহার আহার-বিহারের ব্যবস্থা, এবং প্রসবের পরও কিছুদিন যে সব নিয়ম পালন করা উচিত—ইহা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র হইতে জানা যায়। এরূপ অবস্থায় ইহা কি সম্ভব যে, মেয়েরা পুরুষের মত ধনোপার্জ্জনের কষ্ট সহ্য করিবেন অথবা করিতে পারিবেন? যদি তাঁহারা এরূপ করেন, তবে উহা সন্তানোৎপত্তি এবং সন্তানপালনের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইবে। এই কারণেই ধনোপার্জ্জনের ভার মেয়েদের উপর না দিয়া পুরুষদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় মেয়েদের ধনোপার্জ্জন-সম্বন্ধীয় কোনও প্রকার শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি এরূপ শিক্ষা মেয়েদের প্রকৃতি-দত্ত স্বাভাবিক ধর্ম্মে বাধা প্রদান না করিত, তবে সকল পুরুষই তাহার অনুমোদন করিতেন; কারণ আর্থিক উন্নতির ইচ্ছা সকল পুরুষের মধ্যেই স্বভাবসিদ্ধ।*

সন্তান-পালনই রমণীর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। ইহা যে কত-বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তাহা বলা যায় না। ধন্য সেই রমণীবৃন্দ, যাঁহারা মাতৃরূপে রাজা

* [মাতৃত্ব অর্থাৎ সন্তান-ধারণই যে স্ত্রী-জীবনের চরম আদর্শ, এ কথা আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের সকলে স্বীকার করিতে চান না। সকল দেশেই চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এ পর্য্যন্ত বলিয়া আসিয়াছেন যে, রমণী-হৃদয়ের গভীরতম বৃত্তি হইতেছে প্রেম ও মাতৃত্ব, এবং বিবাহ, গর্ভধারণ ও সন্তান-পালনই রমণী-জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য সমাজের রমণীরা এই নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লেখক ইবসেন প্রতিপাদন করিতে চান যে, মাতৃত্ব রমণীর পবিত্রতম কর্ত্তব্য হইলেও, তাহার জীবনের চরম লক্ষ্য নহে। Anette Meakinও রমণীর মাতৃত্ববাদের অত্যন্ত তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রকৃতি রমণীকে জননী হইবার জন্য গড়িয়াছে সত্য, কিন্তু সকল রমণীকেই যে মাতা হইতে হইবে, এবং সন্তান গর্ভে ধারণ না করিলেই যে তাহার রমণী-জীবন বৃথা, এ কথা বলা অন্যায়। 'বংশানুক্রম' সম্বন্ধে যে সকল আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা ভাল করিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পুরুষকেই সন্তান উৎপন্ন করিতে দেওয়া, এবং প্রত্যেক রমণীকেই সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে দেওয়া সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। দুশ্চরিত্র পিতা-মাতার পক্ষে সন্তানের প্রজনন আইনের চোখে দোষাই এবং নীতির চোখে পাপ। পিতামাতার মনের বৃত্তিগুলি প্রায়ই সন্তানে অর্শে। সমাজে যাহাতে সুগঠিত-দেহ ও সুস্থচিত্ত ব্যক্তির জন্ম অধিক হয়, তাহাই দেখা উচিত। অন্যথা মাতৃত্ব দোষাবহ। সেইজন্য—To hold unqualified motherhood before every girl's eyes as her highest ideal, is to play the traitor to our race and humanity."—'Woman in Transition.']

সামসন

শিল্পী — এস, জে, সলোমন

Emerald Printing Works
CALCUTTA.

রামমোহন, বিবেকানন্দ, রাসবিহারী, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, গোখলে, মালবীয় প্রভৃতি নরশ্রেষ্ঠদের কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। যাঁহারা পৃথিবীর যশের পথে গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা সকলেই বোধ হয় একবাক্যে স্বীকার করিবেন, শৈশবে মাতৃ-দত্ত শিক্ষার প্রভাবেই তাঁহাদের প্রকৃতি ও চরিত্র গঠিত হইয়াছিল।

নর-নারী সমাজের ধারা রক্ষার জন্যই সন্তান উৎপাদন করেন। তাঁহাদের সেই সন্তানকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে সে সন্তান মানসিক ও শারীরিক শক্তি দ্বারা সমাজের ও নিজের উন্নতি করিতে পারে। এই শিক্ষা সে শৈশবে মাতার নিকট প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু মাতা নিজে সুশিক্ষিতা না হইলে, কি করিয়া তিনি সন্তানকে সুশিক্ষা দিবেন? অতএব যে নারী ভবিষ্যতে জননী হইবেন,—সন্তানের জননী হইয়া সেই সন্তানের লালন-পালন ও সৎশিক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে তিনি করিতে পারেন, সেরূপ শিক্ষা তাঁহাকে দিতেই হইবে।

"কালিদাস কী নীতিশিক্ষা"—লেখক শ্রীজনার্দ্দন ভট্ট। সমাজ কোন্ পথে যাইতেছে শুধু তাহারই বর্ণনা করা কবির কাজ নহে, সমাজের কোন্ পথে চলা উচিত, কবি তাহাও দেখাইবেন। সমাজের সাময়িক চিত্র অঙ্কিত করিয়াই কবির ক্ষান্ত থাকা উচিত নহে; কবির এমন একটা সাহিত্য প্রস্তুত করা উচিত, যাহার মধ্যে পাঠক তাহার ব্যক্তিগত জীবনের একটা আদর্শ পাইতে পারে।

কবি কালিদাস এ বিষয়ে ছোট ছিলেন না। তিনি অতি সুন্দর ভাবে তাঁহার কাব্যের মধ্যে দিয়া কর্ত্তব্য ও নীতিশিক্ষার প্রচার করেন। কয়েকটি উদাহরণ দিব।—

(১) ব্যক্তিগত নীতি :—

শরীর-রক্ষা—শরীর পালনের উপর কালিদাস অত্যন্ত জোর দিয়াছেন। দিলীপ সম্বন্ধে বলেন—"জুগোপাত্মানমত্রস্তঃ"—অর্থাৎ অন্য কিছুর ভয় তাহার ছিল না—কিন্তু সে আপনাকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা তৎপর ছিল। কুমারসম্ভবে ব্রহ্মচারীর বেশে শিব উমাকে বলিতেছেন —"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।" রঘুবংশে নন্দিনী-বধাকাঙ্ক্ষী সিংহ দিলীপকে উপদেশ দিতেছে—

"তদ্রক্ষ কল্যাণপরম্পরাণাং, ভোক্তারমূর্জ্জস্বলমাত্মদেহম্।" 'হে রাজন্! তুমি আপনার সুন্দর বলবান দেহ রক্ষা কর, যাহা দ্বারা তুমি অনেক সুখ ভোগ করিতে পারিবে।"

ইন্দ্রিয়-দমন—কালিদাসের মতে, মানুষের ইন্দ্রিয়-দমন ও চরিত্রের পরখ হয় সেই সময়, যখন বিকার-সৃষ্টি করিবার কারণগুলি বর্ত্তমান থাকা সত্বেও সে আপনার চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখে। এই কথাই সপ্রমাণ করিবার জন্য কুমারসম্ভবে তপস্যারত শিব এবং তাঁহার সেবারত পার্ব্বতীর একত্রবাসের ঔচিত্য দেখাইয়া কবি বলিতেছেন—

প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ শুশ্রূষমাণাং গিরিশোঽনুমেনে।
বিকারহেতৌ সতিবিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি স এব ধীরাঃ॥

স্ত্রীদের সামীপ্য তপস্যার পক্ষে বিঘ্নকর। তবু মহাদেব পার্ব্বতীকে আপনার সেবা করিতে নিষেধ করিলেন না। কারণ স্ত্রী প্রভৃতি বিকার-উপস্থিতকারী কারণ সত্বেও যাহার চিত্তে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ধীর ও দৃঢ়-চরিত্র। কালিদাসের মতে কাম-পিপাসার শান্তি বিবাহের উদ্দেশ্য নহে; সন্তানোৎপাদনই বিবাহের উদ্দেশ্য।—'প্রজায়ৈ গৃহ-মেধিনাম"। দিলীপ "পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে"—সন্তানের জন্য বিবাহ করেন।

(২) পারিবারিক নীতি :—

দাম্পত্য-প্রেম—দাম্পত্য প্রেমের উদাহরণে ত কালিদাসের কাব্য পূর্ণ। দিলীপ এবং সুদক্ষিণার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, উর্ব্বশীর বিয়োগে পুরুরবার উন্মত্তাবস্থা, মেঘদ্বারা বিরহী যক্ষের সন্দেশ প্রেরণ, ইন্দুমতীর জন্য অজের বিলাপ এবং কামের জন্য রতির করুণ রোদন দাম্পত্য প্রেমের সুন্দর উদাহরণ। দিলীপ মহিষী সুদক্ষিণাকে এতটা আদর করিতেন যে

যন্তারমাদিশ্য ধুর্য্যান্বিশ্রাময়েতি সঃ
তামবারোহয়ৎপত্নীং রথাদবততার চ।

দিলীপ সারথীকে ঘোড়া থামাইতে বলিলেন। পরে অগ্রে মহিষীকে নামাইয়া নিজে পশ্চাৎ অবতরণ করিলেন।

বিলাপরতা রতি বলিতেছে—

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয় মিদং ব্যবস্থিতং রমণ ত্বামনুয়ামি যদ্যপি॥

কাম বিনা রতি যে ক্ষণমাত্রও জীবিতা ছিল, এ নিন্দা ত আমার চিরদিনের মত রহিয়া গেল। এখন যদিও আমি তোমার অনুগমন করি, তথাপি আমার সে কলঙ্ক আর ঘুচিবে না।

একপত্নী-ব্রত। বিবাহিতা সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমানে "কায়েন মনসা বাচা' পরস্ত্রীর কামনা না করাই একপত্নীত্ব। এই ব্রত পালন করা অত্যন্ত কঠিন। কালিদাস ইহার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে প্রধান পাত্রগণ সকলেই একপত্নীপরায়ণ। যদিই বা কাহারও একাধিক পত্নী থাকে—সে কথা কালিদাস উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। বিবাহের পর উমা যখন বয়োজ্যেষ্ঠাগণকে প্রণাম করিলেন, তখন তাঁহারা উমাকে অন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন না—তাঁহারা কেবল বলিলেন, "অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্যুঃ"—তুমি পতির অখণ্ডিত প্রেম লাভ কর।—গঙ্গা পার্ব্বতীর সপত্নী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও কুমার-সম্ভবের সাতটি সর্গের কোনও স্থানেই কালিদাস সে কথার উল্লেখ করেন নাই। ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর অজ পুনরায় বিবাহ করেন নাই। রামচন্দ্রের একপত্নী-ব্রত ত প্রসিদ্ধ। অশ্বমেধ যজ্ঞে যখন অর্দ্ধাঙ্গিনীর প্রয়োজন হয়, রামচন্দ্র পুনরায় বিবাহ না করিয়া সীতার স্বর্ণ-মূর্ত্তি পার্শ্বে স্থাপন করেন। কবি বলিতেছেন—

"সীতাং হিত্বা দশমুখরিপুর্নোপয়েমে যদন্যাং
তস্যা এব প্রতিকৃতিসখো যৎক্রতূনাজহার।
বৃত্তান্তেন শ্রবণ বিষয়প্রাপিণা তেন ভর্তুঃ
সা দুর্বারং কথমপি পরিত্যাগদুঃখং বিষেহে॥"

"রাম সীতা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিলেন না, উপরন্তু তাঁহারই স্বর্ণমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া যজ্ঞপূর্ণ করিলেন—এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সীতা দুঃসহ পরিত্যাগ-দুঃখ কোনও প্রকারে সহ্য করিয়া রহিলেন।"

কুশও পিতার অনুসরণ করিয়া একপত্নীক ছিলেন। যখন অর্দ্ধ-রাত্রে স্ত্রীবেশে রাজলক্ষ্মী কুশের শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন কুশ জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কা ত্বং শুভে! কস্য পরিগ্রহো বা কিংবা মদভ্যাগম কারণং তে।
আচক্ষ মত্বা বশিনাং রঘূনাং মনঃ পরস্ত্রীবিমুখ প্রবৃত্তি॥"

"হে সুন্দরি! তুমি কে? কাহার স্ত্রী? আমার নিকট আসার কারণ কি? রঘুবংশীয়দের মন পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয় না—এই কথা মনে রাখিয়া উত্তর দাও।"

২। প্রতিভা, জুলাই,—১৯১৭

"জাতীয় আদর্শ"—লেখক বদরীদত্ত জোশী।

সময় পরিবর্ত্তনশীল। আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই। সংসারে সেই জাতি এবং সেই সমাজই টি'কিয়া থাকিতে পারে, যে জাতি ও যে সমাজ সময়ের গতির সঙ্গে আপনাকে খাপ্ খাওয়াইয়া লয়। ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য যেমন সাময়িক পরিস্থিতির অনুকূল হইয়া চলিতে হয়, তেমনি জাতির উন্নতিও দেশ, কাল ও শক্তির অনুকূলতার উপর নির্ভর করে।

সংসারে সকল জাতি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে পাল্লা দিয়া দৌড় আরম্ভ করিয়াছে, তখন যদি আমরা পিছু হটিতে চাই, অথবা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকি, তাহা হইলে অন্য জাতিরা নিশ্চয় আমাদের প্রতীক্ষা করিবে না। পরন্তু, যদি আমরা তাহাদের পথ আটকাইতে চাই, তাহা হইলে তাহারা ত আমাদের পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইবেই। আমাদের আর্য্য পিতামহগণ যদি এ দেশের আধুনিক প্রাচীনোপাসকগণের মত সঙ্কীর্ণচেতা হইতেন, তাহা হইলে হিন্দুরা আজ গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি উপযোগী বিষয়ের অহঙ্কার করিতে পাইতেন না। যখন ভারতবর্ষ অন্যান্য প্রতেবেশী জাতি হইতে সভ্যতায় অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিদেশীয়দের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইবার কোনও আশঙ্কাই যখন ছিল না, তখনও আর্য্যগণ, তাঁরা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ—অগ্রগামী প্রবৃত্তি ত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদেরই বংশ-ধর আমরা, আজ ময়দানে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, নানাজাতি নব উৎসাহে নব জীবনের নবীন প্রেরণায় আশার মশাল জ্বালিয়া ধাবিত হইতেছে; অথচ আমরা পা বাড়াইয়া হাঁটিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি—পাছে আমাদের অর্থহীন আভিজাত্যের মূল্যহীন খোলস খসিয়া গিয়া আমাদের দৈন্য প্রকাশ করিয়া দেয়!

আমরা একলা চলিতে ভয় পাই, সঙ্গী খুঁজি। কিন্তু সঙ্গী দ্বারা কোনও জাতি বড় হইতে পারে না, ইচ্ছা ও উন্নত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা দরকার। জাপান যখন ইচ্ছা করিল যে, সে বড় হইবে, তখন তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইতে বিশ বৎসরও লাগিল না—তাই আজ সে পৃথিবীর রাষ্ট্র-সমিতির সভ্য। তাহাকে কেহ হাতে করিয়া মানুষ করে নাই। অথচ আমরা জ্ঞানে, সভ্যতায়, মর্য্যাদায় পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ একটি জাতির সঙ্গে এতদিন থাকিয়াও পূর্ব্বে যাহা ছিলাম এখনও তাহাই আছি। আসল কথা এই যে, কোনও জাতির বাহ্য অনুকরণ করিলেই তার সমকক্ষ হওয়া যায় না, তার ভিতরকার গুণগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হয়।

আমাদের সামাজিক ও ধর্ম্মের বাঁধনই উন্নতির মার্গ হইতে আমাদিগকে ফিরাইয়া রাখিয়াছে। দেশের দু'একজন লোক ব্যক্তি-গত উন্নতি করিলেই দেশের উন্নতি হইতে পারে না। যে সকল দুর্নীতির বীজাণু সমাজ-শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রতিনিয়ত উহাকে জীর্ণ করিতেছে, সেইগুলিকে ধ্বংস করিতে না পারিলে আমাদের উন্নতি বহু-দূরপরাহত। যে জাতির মধ্যে সামাজিক শক্তি নাই, সে ত মৃত জাতি।

পাশ্চাত্য জাতিগণ বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যে জাতি সময়ের গতির সঙ্গে-সঙ্গে নিজের সামাজিক পদ্ধতির উচিত ও আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে, সে জাতির উন্নতি কেহই রোধ করিতে পারে না। অন্যদিকে, যে জাতি সাময়িক পরিবর্ত্তন হইতে কিছু শিক্ষা করিতে পারে না বা চায় না, শুধু নিজের মূর্খতা ও অহঙ্কারের বর্ম্ম পরিয়া বসিয়া থাকে, সে জাতি অচিরে নির্ম্মূল হইবেই।

যে সকল নিয়মকে অন্যান্য জাতি সামাজিক উন্নতির পক্ষে দরকারী মনে করেন, এবং এ যুগও যে সকল নিয়মের অনুকূল, সেই নিয়মগুলির অনুশীলন করিবার যোগ্যতা ও সাহস হিন্দুসমাজে এখনও হয় নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনের দরুণ আজ হিন্দুসমাজ তাহার যে সকল প্রাচীন নিয়ম পালন করিবার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, সে গুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিবার সাহস তাহার নাই। অথচ এ সমাজ তাহার ব্যক্তিগণকে যুগলক্ষণ দেখিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুমতি দিতেও ভয় পায়। ব্যক্তিগত যোগ্যতা দ্বারা কোনও ব্যক্তি যতই উন্নতি করুন অথবা উচ্চপদ লাভ করুন, জাতীয় ও সামাজিক বাঁধনের নিয়মগুলি তাঁহার সমাজে প্রবেশ করিবার পথ সবলে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দুসমাজ আজ ব্যক্তিকে খাটো করিতেছে, তাই লক্ষ-লক্ষ হিন্দুসন্তান জননীর ক্রোড় ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; কারণ, সেখানে তাদের ভিতরকার দীপ্যমান পুরুষটি ব্যক্তিগত উন্নতির স্বাভাবিক ইচ্ছায় বাধা পায় না, বরং উৎসাহ পায়।

কোনও ব্যক্তি যতই উন্নতি করুক অথবা উচ্চপদ লাভ করুক, জাতীয় ও সামাজিক বাঁধনের নিয়মগুলি তাহার সমাজে প্রবেশ করিবার সকল দুয়ার সবলে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হিন্দুসমাজ আজ ব্যক্তিকে খাটো করিতেছে, তাই লক্ষ-লক্ষ হিন্দুসন্তানগণ জননীর ক্রোড় ত্যাগ করিয়া অন্য সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, কারণ সেখানে তাদের ভিতরকার দীপ্যমান পুরুষটি ব্যক্তিগত উন্নতির স্বাভাবিক ইচ্ছায় বাধা পায় না, বরং উৎসাহ পায়।

সামাজিক এবং ব্যক্তিগত আচারগুলিকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা ধর্ম্মের নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিলেন; এই জন্য যে লোকে সে গুলিকে

কর্ত্তব্য বলিয়া পালন করিবে। সে সকল আচার বিশেষ দেশ, কাল ও অবস্থাতে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ হিন্দু-সমাজ সেগুলি নিতান্তই আমাদের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া লইতেছে।

এখন এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যখন হিন্দু-সমাজের নেতাগণের উচিত,—তাঁহারা বিবাদ-বিসম্বাদ ছাড়িয়া দিয়া, এমন একটি জাতীয় আদর্শের সৃষ্টি করুন, যাহার ছায়াতলে ভারতের সকল সম্প্রদায়ই নিজ-নিজ ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক একসঙ্গে একযোগে দেশের কাজ করিতে পারেন।

সামাজিক যোগ্যতা ব্যতীত আমরা অপ্রাপ্ত যাহা তাহা পাইবার আশা ত করিতেই পারি না, এ পর্য্যন্ত যাহা পাইয়াছি তাহাও রক্ষা করিতে পারিব না।

আসামী

১। আলোচনী, আষাঢ় ১৯১৭

"বহাগর বিহুর উৎপত্তি"—সম্পাদক। সংস্কৃত 'বিষুব' হইতে অসমীয়া 'বিহু'র উৎপত্তি। দিন রাত সমান হওয়া অর্থে 'বিষুব' প্রযুক্ত হয়। পৃথিবীর মধ্য দিয়া উভয় মেরুর সমদূরবর্ত্তী যে কাল্পনিক রেখা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে বিষুব-রেখা বলে। চৈত্র, আশ্বিন ও পৌষের শেষ দিনে আসামে 'বিহু' উৎসব হয়। বৈশাখের বিহুই মহাবিহু। পঞ্জিকা মতে চৈত্রের সংক্রান্তিকে 'মহাবিষুব সংক্রান্তি' বলা হয়। উত্তরায়ন সংক্রান্তিতে মাসের বিহু হয়। আষাঢ়ের শেষ দিনে বিহু বলিয়া কোনও উৎসব হয় না।

অতীত কালে আর্য্যগণ উত্তর-মেরুতে বাস করিতেন। দক্ষিণায়নের সময় সেখানে কেহ ছয় মাস সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইত না। উত্তর-মেরুতে বাসকালে আর্য্যগণ ছয় মাস পরে উত্তরায়নের সময় যে দিন প্রথম সূর্য্যের মুখ দেখিতেন, সে দিন তাঁহারা আনন্দে অধীর হইতে; সে দিন তাঁহারা "হেলি" "হেলি বিষুব" বলিয়া জয়ধ্বনিপূর্ব্বক স্ন করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া নৃত্যগীতাদি মহোৎসবে মত্ত হইতে; প্রতি বৎসর মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে তাঁহারা এই "হেলি বিষুব" উৎস করিতেন। এটা ছিল তাঁদের বসন্তোৎসব। পরে আর্য্যগণ কতক পশ্চি স্কন্দনবিয়ায় (Scandinavia) গেলেন, কতক শক দেশে বাস করিলে এবং অনেকে শকদেশ অতিক্রমপূর্ব্বক ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন ভারতে আগত আর্য্যগণের কিয়দংশ পশ্চিম-ভারতে রহিলেন; এ বাকী পূর্ব্ব-ভারতে বসতি আরম্ভ করিলেন। পশ্চিম-ভারতে এ উৎসবের নাম হইল "হেলি"; পূর্ব্ব ভারতে হইল "বিষুব" বা "বিহু" 'হেলি' উৎসব পশ্চিমে "হোলি"তে পরিণত হইল।

কর্ণেল টড্ সাহেবের মতে বৈবস্বত মনুর যে সকল সন্তা উত্তর-কুরুর পর ভারতে আসেন, তাঁহারা প্রতি বৎসর বসন্তকালে অশ্বোৎসর্গ বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন, তাহাই অতীত কালের "হেলী উৎসব। এই উৎসব সূর্য্যের উদ্দেশে বসন্ত কালে করা হইত। পণ্ডিতঃ বলেন, "হেলি" শব্দ সূর্য্যবাচক। সংস্কৃত নাটকাদিতে প্রাচীন ভারতে বসন্তোৎসবের কথা পাওয়া যায়। "হেলি" বা "বিহু" বসন্তকালের উৎসব।

পরে যখন ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ "ফল্গুৎসব" বা "দোলযাত্রা"র অনুষ্ঠান করেন, সেই সময় 'হোলি' এই উৎসবের সামিল হইয়া যায় "ফল্গু" শব্দের অর্থ রেণু এবং বসন্তকাল। "ফল্গুৎসব" আরম্ভ হওয়ার পর হইতে পশ্চিম-ভারতের লোকেরা বসন্তোৎসবকে ফল্গুৎসবে পরিণত করে। কিন্তু আসামীগণ ফল্গুৎসবও করে, "বিহু"ও বৈশাখ মাসে করে। বৈশাখের 'বিহু'তে আসামের লোকের আনন্দ বেশী। আসামে যে আর্য্যগণের বাস ছিল, তাহা এই বৈশাখ মাসের "বিহু" হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মণিপুর

[অধ্যাপক শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম-এ]

সপ্তম দিন—(সোমবার ৩০শে আশ্বিন)। অদ্য প্রাতঃকালে বন্ধুদিগের নিকটে মণিপুরে আসিবার কারণ বিবৃত করিতে হইল—সংক্ষেপে তাহা এ স্থলে বলিতেছি। সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক য়ুয়ান্ চোয়াং (হুয়েন্থসাং) ভারতে আসিয়া, বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া, তাহাদের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। সমতট (ঢাকা অঞ্চল) পরিদর্শনানন্তর আরও ওদিকে (পূর্ব্বদিকে) যান নাই—ছয়টি রাজ্যের নাম শুনিয়াছিলেন; তন্মধ্যে "ইশাংনোপুলো" একটি। আমার দৃঢ় ধারণা, এই ঈশাংনোপুলো 'বিষ্ণুপুর' হইবে—ইহা মণিপুরের প্রাচীন রাজধানী। এই বিষ্ণুপুর দেখাই আমার উদ্দেশ্য—কেন না, কোনও জায়গা সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, তৎস্থানে গিয়া দেখিয়া-শুনিয়াই একটা অবধারণ করা উচিত। শ্রীহট্ট-কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে আমি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ কথা-বার্ত্তা শ্রবণানন্তর উপস্থিত ভদ্রলোকেরা প্রস্তাব করিলেন—তাঁহাদের যে ক্লাব-ঘর আছে, তাহাতে সেই দিবস রজনীতেই

একটি সভা হইবে ; সেখানে উপস্থিত হইয়া আমাকে মান-চিত্রাদি সহযোগে মদীয় বক্তব্য বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহাতে তথাকার বাঙ্গালীদের প্রধান-প্রধান ব্যক্তি-বর্গের সহিত অনায়াসে আলাপ-পরিচয় হইবে ভাবিয়া, আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

মধ্যাহ্নে বড়-সাহেবের সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গেলাম। বহু সাহেবের অধীন থাকিয়া নানা কাজ করিয়াছি—এ যাবৎ কোনও মেম-সাহেবের দরবার করি নাই। তাই একটু ভয়ে-ভয়েই গেলাম। কিন্তু বড়-সাহেব যেরূপ সদাশয়,- মেম-সাহেবও তাদৃশ অথবা ততোধিক অমায়িক ; আমাকে যথেষ্ট সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার সংগৃহীত মণিপুরের ইতিহাস সম্বন্ধীয় পুঁথিপত্র দেখাইলেন। মণিপুরী ভাষায় "চৈতরণ-কুম্বাবা" নামে মণিপুরের বিবরণ-বিষয়ক হস্তলিখিত পুঁথি আছে ; মেম-সাহেব তাহা তরজমা করাইয়া তৎ-সাহায্যে একেবারে আদিম পৌরাণিক যুগ হইতে বর্ত্তমান মহারাজ পর্য্যন্ত একটি বংশাবলী সঙ্কলিত করিয়াছেন—তাহা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার একটি কথা এ স্থলে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিতেছি। এই পুঁথির মতে পাকাংবা রাজার ৪৫ বর্ষব্যাপী রাজত্বের পরে ভারতবর্ষে শকাব্দা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—তদবধি মণিপুরেও ঐ অব্দ প্রচলিত। আমার গবেষণা-সম্পর্কিত কয়েকটি কথাও মেম-সাহেবের নিকট হইতে নোট্ করিয়া নিলাম। এই-রূপে প্রায় ঘণ্টা-দুই অতিবাহিত হইবার পরে, কার্য্যান্তরানু-রোধে আমাকে বিদায় দিয়া, পরদিন পুনরপি যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া দিলেন—আমার অনুসন্ধেয় বিষয়েও প্রত্ন-তত্ত্বানুরাগিনী এই বিদুষী মহিলা বিস্তারিত ভাবে জানিতে চাহিলেন।

অপরাহ্নে বিশেষ কাজ কিছুই হইল না—তবে মণিপুর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দেব মহাশয় একখানি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত মণিপুরী উপন্যাস আনিয়া দিলেন—তাহা পড়িলাম। খাম্বা-থৈবীর গল্প—তা' বেশ কৌতুক-জনক। ভগবতীর অংশে জাতা রাজকুমারী থৈবী ও ভদ্র-বংশীয় মহাদেবের অংশজাত খাম্বা পরস্পর দর্শনমাত্রে প্রণয়পাশে বদ্ধ হইলেন—কিন্তু পরিণয়-মিলনে বহু বাধা-বিপত্তি—তা' যতই কঠিন হউক না কেন—খাম্বা সমস্ত অতিক্রম করিয়া নানাবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রতিদ্বন্দ্বীর দর্পচূর্ণ করিয়া অবশেষে প্রণয়িনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যার পরে ভিক্টোরিয়া ক্লাবে গেলাম—এইটি মণিপুরস্থ বাঙ্গালীগণের অন্যতম কীর্ত্তি ; সঙ্গে একটি লাইব্রেরী আছে—পার্শ্বে থিয়েটার হল্ এবং নিকটেই বালক-দের স্কুল ও বালিকা-বিদ্যালয়। বাঙ্গালী মণিপুর-প্রবাসী প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাদের অমায়িক আদর-আপ্যায়নে কৃতার্থ হইলাম। যথামতি আমার আগমন-প্রয়োজন বিবৃত করিলাম—সকলেই শুভেচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক এই অকৃতীর কৃতকার্য্যতা কামনা করিলেন। এখানে বাঙ্গালীদের ভিতরে বেশ একতা দেখিলাম—শ্রীহট্টবাসী, ঢাকাবাসী, কলিকাতাবাসী সকলেই পরস্পর সৌহার্দ্দ-পাশে বদ্ধ - বড়ই প্রীতির কথা।

অষ্টম দিন (মঙ্গলবার ১লা কার্ত্তিক [১])। পরদিন বুধবার মণিপুর ছাড়িয়া যাইব – বিষ্ণুপুর হইয়া শিলচরের পথে ফিরিব, এই প্রোগ্রাম ছিল ; তদনুযায়ী এই দিবস পূর্ব্বাহ্নে বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। সপ্তাহের খাদ্য, চলিবার দোলা, তদ্বাহক কুলী ইত্যাদি যোগাড় করিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। মণিপুর ষ্টেট কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট সিভিলিয়ান্ হিগিনস্ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম—তিনি খুব সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে উৎসাহিত করিলেন, এবং আমার প্রত্যা-বর্ত্তনের যাহাতে সুবিধা হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করিবার জন্য যথোচিত আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু বন্যায় বিষ্ণুপুর হইতে শিলচরের রাস্তার ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছে—ঐদিকে যাওয়া অসাধ্য হইতে পারে, এই কথাও বলিয়া দিলেন। বন্ধুবর্গও ঐদিকের পথ ভয়ঙ্কর অসুবিধার হইবে বলিয়া, আমাকে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা ঠিক্ হইল, বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত গিয়া পুনশ্চ ইম্ফাল হইয়া আগমনের পথেই প্রত্যা-বর্ত্তন করা যাইবে।

মধ্যাহ্নে পুনশ্চ রেসিডেন্সিতে মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম—প্রায় দেড় ঘণ্টা তথায় তথ্যালোচনা করিয়া প্রাঙ্গণে বটবৃক্ষের নীচে পরিরক্ষিত কতকগুলি প্রস্তর-মূর্ত্তি পরিদর্শন করিলাম। মূর্ত্তিগুলি অল্প-বিস্তর ভগ্ন—

(১) এই দিন গুপ্তপ্রেস প্রভৃতি সচরাচর-প্রচলিত পঞ্জিকার মতে ৩১শে আশ্বিন। কিন্তু আমি "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার মত" অনুবর্ত্তন করি—তদনুযায়ী তারিখই ইহাতে প্রদত্ত হইল।

দুইটি হনুমানের, দুইটি গরুড়ের, এবং একটি বৃষোপরি আসীন মহাদেবের মূর্ত্তি। এই সকল মূর্ত্তি স্থানান্তর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে—পশ্চাৎ অনুসন্ধানে জানিলাম, বিষ্ণুপুরে এই সকল প্রস্তর-মূর্ত্তি তৈয়ার হইত।

রণবেশে নাগা বীরগণ

অতঃপর ইম্ফাল শহরটা বেড়াইয়া দেখিবার জন্য বহির্গত হইলাম। মণিপুর গিয়া মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা একটা অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া পৌঁছিয়াই সে বিষয়ে আলাপ করিয়াছিলাম। বিষম বন্যায় মহারাজের প্যালেস্ অর্দ্ধমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তখন রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী শ্রীগোবিন্দজীউ প্রভৃতি বিগ্রহ সহ মহারাজ আপন শ্বশুরবাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। তাহাও শহরের মধ্যেই; তবে সেই জায়গাটা অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়ায় জলমগ্ন হয় নাই। সেখানে সামান্য পর্ণকুটীর বাঁধিয়া মহারাজ বড়ই অসুবিধায় আছেন - তাই আমাকে দর্শন দিতে সঙ্কোচ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু বন্ধুবর্গের কেহ-কেহ চক্ষু টিপিয়া নানাবিধ অন্য কারণও বলিলেন। যাহা হউক, ঐ সকল কারণ অনিবার্য্য মনে করিলাম না; বিশেষতঃ শ্রীগোবিন্দজী প্রভৃতি দেব বিগ্রহ দর্শনের নিমিত্ত কৌতূহল হইল। তাই আজ পরিভ্রমণে বাহির হইয়া সর্ব্বপ্রথম ঐদিকেই বেড়াইতে গেলাম। বেলা তখন প্রায় তিনটা। শুনিলাম, মহারাজ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন—দেবতারও গৃহের দ্বার অবরুদ্ধ; সন্ধ্যারতির সময়ে পুনর্ব্বার আসিলে দর্শন হইবে, শুনিলাম। সেই স্থান হইতে রাজবাড়ী প্যালেস্ ইত্যাদি দেখিবার জন্য চলিয়া পথে একটি ক্ষুদ্র মন্দির পাইলাম। তাহাতে এক বিশাল হনুমান মূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। বানরের জন্য সেখানে আহার্য্য প্রদত্ত হয়। শুনিলাম, পূর্ব্বে বহু খাদ্য বরাদ্দ ছিল, এখন সামান্যমাত্র আছে। বেগতিক বুঝিয়া নাকি বানরগুলিরও অনেকে পাহাড় পর্ব্বতে চলিয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর গিয়া লোহসেতুতে ইম্ফাল নদী পার হইয়া রাজবাড়ীতে গেলাম। সেখানে এখন কেহই নাই। বন্যায় ভিত্তির উপরে

সাধারণ পরিচ্ছদে মণিপুরী রমণী ও কুমারীগণ

জল হইয়াছিল—এখন জল নাই, কিন্তু তৃণলতাদি পচিয়া এমন একটা দুর্গন্ধ হইয়াছে যে, তিষ্ঠান কঠিন। যাহা হউক, সত্বরই সমস্ত পরিষ্কৃত হইবে। শুনিলাম, মহারাজ এখানে প্যালেস্ রাখিতে বড়ই অনিচ্ছুক। কিন্তু লক্ষাবধি টাকা

ব্যয় করিয়া যে সকল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াও তো কঠিন। পূর্ব্বে ইম্ফাল নদীর পশ্চিম পারে। অর্থাৎ যেদিকে আফিস আদালত ইত্যাদি। রাজবাড়ী ছিল—তবে তাহা অনেকটা উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। সেই স্থানে সম্প্রতি সৈন্যাবাস হইয়াছে। আমরা নূতন রাজবাড়ী হইতে প্রাচীন স্থানে গিয়া মহারাজ কুলচন্দ্র ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের আবাস নিকেতন দেখিলাম; সমস্তই শ্রীভ্রষ্ট সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। তথা হইতে বাজারে যাইবার পথে অধুনা ইতিহাস প্রসিদ্ধ

নৃত্য-পরিচ্ছদে মণিপুরী রমণী ও কুমারীগণ

নানাস্থান দেখিলাম—যেখানে চিফ্ কমিশনারকে নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল—যেখানে যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ, টোঙ্গল জেনারল প্রভৃতি ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান হইয়া বৃটিশ রাজকর্ম্মচারী-হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল—এবম্বিধ জায়গা বেড়াইয়া দেখিলাম। বাজারটি দেখিবার জিনিস। রোজই হাট জমে। বিক্রেতা পুরুষ অতি কম,—স্ত্রীলোকেরাই এখানে সমস্ত কাজ করে—একমাত্র হলচালন পুরুষদের কার্য্য। স্ত্রীলোকেরা বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন—বুকের নীচে কাপড় বাঁধে—সে কাপড় নানা রঙ্গের। মাথায় সিঁথি নাই—চুলগুলি ফিরাইয়া খোপা বাঁধে; বেশ দেখায়। সধবা বিধবা চিনিবার জো নাই—হাতে অলঙ্কার বা সীমন্তে সিন্দূর দিবার হিন্দুচিত পদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই—বৈষ্ণব বলিয়া সকলেরই ললাটে রেখা ও ছাপ আছে। কুমারীদের সম্মুখভাগের চুল কিয়দ্ভাগ কাটা। এখানে বিধবা বিবাহ চলিত আছে—এবং যদিও স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক, তথাপি, পুরুষেরা একাধিক বিবাহ করিতে পারে বলিয়া, কোনও অসুবিধা নাই। মণিপুরে পূর্ব্বে এই প্রথা ছিল যে, পুরুষমানুষ কেহ হাটে ক্রেতারূপেও যাইবে

পোলো খেলায় গমনোদ্যত মণিপুরীগণ

না। শুনিয়াছি যে, রাণীরাও নাকি ঐ হাটে যাইতেন। এখনও মণিপুরের ভদ্র, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হাটে যান না।

বাজারের একপার্শ্বে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত জয়স্তম্ভ আছে। তাহাতে ৬টি মকর-মূর্ত্তি রহিয়াছে; তবে উহা সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। কোন রূপ খোদিত লিপিও ইহাতে নাই।

তথা হইতে রেসিডেন্সির পার্শ্বে সাহেবদের কবর খানায় গিয়া মণিপুরে হত চিফ কমিশনর কুইণ্টন সাহেব প্রভৃতির স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। শিলংয়েও একটি আছে—তবে তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া মহারাজের আবাস স্থানে

শ্রীগোবিন্দজী প্রভৃতির আরতি দেখিতে গেলাম। যে গোবিন্দজীর মন্দির রাজ-ভবনের অপেক্ষাও সুদৃশ্য, তিনি আজ এক সামান্য দু'চালা খড়ের ঘরে অবস্থান করিতেছেন। ঐ ঘরের তিনটি কোঠা—মধ্যের কোঠায় শ্রীগোবিন্দজীর যুগলমূর্ত্তি নানা অলঙ্কার সুসজ্জিত। ডাইনের প্রকোষ্ঠে গৌর-নিতাই এবং বামের প্রকোষ্ঠে জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম আছেন। আরতির সাজসজ্জা রাজোচিত- সম্মুখের প্রাঙ্গনে খোল করতাল লইয়া মণিপুরীরা কীর্ত্তন করে। নাকি সুরে গলা কাঁপাইয়া গান করাতে তাহাদের গান কিছুই বোঝা যায় না—অথচ গানের ভাষা বাঙ্গালা। বলা বাহুল্য যে, যেস্থানে

রাসনৃত্য পরিচ্ছদে মণিপুরী যুবতীগণ

শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচলিত, যেস্থানে সংকীর্ত্তন বৈষ্ণবপদাবলী সহ প্রবেশলাভ করিয়াছে—সেই স্থানে বাঙ্গালাভাষার প্রবর্ত্তন স্বাভাবিক। পূর্ব্বতন মহারাজগণ বাঙ্গালাভাষার সমাদর খুবই করিতেন—বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা চলিত; রাজকীয় কাগজপত্রেও বাঙ্গালাই প্রচলিত ছিল—এখনও আছে। কিন্তু এই আমলে মণিপুরী-ভাষার চর্চ্চাই হইতেছে—এমন কি, বাঙ্গালা গান ও বাঙ্গালা নাটক সম্প্রতি অনুবাদিত হইয়া মণিপুরী ভাষায় প্রচারিত হইতেছে। ইহা শুভ কি অশুভ জানি না; তবে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য একটা স্বতন্ত্র ভাষা নিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া ত' মনে করিতে পারি না। যদ্বিশেষমসম্ভিতম্ (২)।

মহারাজ বাড়ীর ভিতরে ছিলেন—দেখা হইল না (৩)। সাধারণের প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইলাম, তাহাতে আর দেখা করিবার জন্য অধ্যবসায়ের প্রবৃত্তিও হইল না। পূর্ব্বে মহারাজ স্বয়ং ষ্টেট কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সিভিলিয়ান সাহেব ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এখন ঐ ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন, মহারাজের মাত্র একটা "ভিটো" দিবার ক্ষমতা আছে। তজ্জন্য যে মণিপুরী লোক সাধারণ অসন্তুষ্ট, তাহা ত বোধ হইল না; বরং উহারা বড় সাহেবের প্রতি যাদৃশ ভক্তির ভাব পোষণ করে, মহারাজের প্রতি তেমন করে বলিয়া বোধ হয় না। এই বিষম অবস্থায় বড় সাহেব [illegible] করিয়া লোকের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন ও করিতেছেন, মহারাজ

এই ব্যাপার হইতেই ভক্তি শ্রদ্ধার তারতম্যের কারণ বুঝা যাইবে। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুবর্গের, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে মণিপুর সম্বন্ধে নানা আলোচনা হইল। মণিপুরের প্রাচীন কিংবদন্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহা যে বভ্রুবাহনের মণিপুর, ইহাতে যে পাণ্ডবগণের অশ্বমেধীয় ঘোটক আসিয়া-

(২) মণিপুরী ভাষা নাগা ভাষার ন্যায় অনার্য্য। কিন্তু আজ কাল ইহাতে বাঙ্গালা ও ইংরেজী শব্দ প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে। জনেক বন্ধু সম্প্রতি পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন, "সেদিন পূজা উপলক্ষে আমি কোনও মণিপুরী ভদ্রলোকের নিকট হইতে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে শতকরা ৮৩টা শব্দ বাঙ্গালা, ১৩টা ইংরেজী এবং অবশিষ্ট [illegible]টি মাত্র মণিপুরী ছিল। শুনিতে পাইলাম, মণিপুরীদের মধ্যে কথিত ভাষায় যে যত অধিক বাঙ্গালা শব্দ প্রয়োগ করিতে পারে, তার কথা তত বেশী 'সাধুভাষা' বলিয়া সমাদর লাভ করে।"

(৩) মণিপুরে গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা না হওয়া, পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই. কিন্তু ভগবদিচ্ছায় অতর্কিত ভাবে তাহা হইয়া

ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুইটি স্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মণিপুর হইতে ১৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে 'সাগলমান' নামক এক জায়গা আছে,—সেখানে না কি পাণ্ডবদের ঘোড়া (সাগল) হারাইয়া গিয়াছিল। 'সাগলবন্ধ' নামক ইম্ফালের প্রায় ভিতরেই একটি স্থান আছে, সেখানে না কি বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক ঘোড়া ধৃত হইয়াছিল। সাগলমান পাহাড় বেষ্টিত স্থান, কিন্তু 'সাগলবন্ধ' সমতল ভূমি। ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান জলমগ্ন থাকিবার কথা (৪)। এই মণিপুর মহাভারতের মণিপুর কি না, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা অনাবশ্যক। তবে মণিপুর গন্ধর্ব্বের দেশ—নাগরাজ্যের সমীপ বর্ত্তী। বর্ত্তমান নাগাপাহাড় যদি নাগরাজ্য হয়, তবে এই মণিপুরও মহাভারতের মণিপুর হইতে পারে। বিশেষতঃ গন্ধর্ব্ব সুলভ গীত বাদ্য নৃত্য প্রিয়তা মণিপুরীদের খুবই আছে। এটাও দ্রষ্টব্য যে, এই দেশের উপর দিয়া বহু বিপ্লব বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে দেশটা একেবারে ওলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। তাই আজ কোনও কথা নিশ্চিতভাবে বলা বড়ই সুকঠিন।

মণিপুরে দেবতাস্থান কি কি আছে, তদ্বিষয়েও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, মণিপুরের অধিবাসিগণ বৈষ্ণব হইলেও, এই রাজ্যে শক্তিপীঠ এবং মহাদেবের স্থান আছে। ইম্ফাল হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ইয়াং থাং নামক গ্রামে ৺কামাখ্যা পীঠ বর্ত্তমান। রবিবার এবং অমাবস্যাতে মাত্র ঐ দেবালয়ের দ্বার খোলে। মণিপুরী ব্রাহ্মণ পূজাদি করিয়া থাকেন। বাঙ্গালীরা না কি ভিতরে ঢুকিয়া পীঠ দেখিতে পারে না। রাজ সরকার হইতে সেবা-পূজাদির ব্যবস্থা আছে; তজ্জন্য কিছু নিষ্কর জমিও প্রদত্ত হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন স্বয়ং মহারাজ সেই স্থানে গিয়া থাকেন। 'নুংমাইজিং' নামক পাহাড় ইম্ফাল হইতে পূর্ব্বদিকে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত, সেখানে এক শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। বারুণী অর্থাৎ মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে মেলা হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, এস্থান হইতে সুড়ঙ্গ দিয়া কাছাড়ের পূর্ব্ব প্রান্তস্থ ভুবনেশ্বরের স্থানে না কি যাওয়া যায় (৫)। ইম্ফাল হইতে দুই মাইল উত্তরে চিং মাইরং নামক পাহাড়ের উপরে একটি শিলাতেও মহাদেবের পূজা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তিতে সেখানে মেলা হইয়া থাকে। শ্রীগোবিন্দজীউ সম্বন্ধেও জানিলাম যে, ঠাকুর কাইনৌ বস্তিতে এক কাঁঠালগাছে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ কাঁঠালগাছের কাষ্ঠ দ্বারা শ্রীগোবিন্দজীর মনোহর মূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

নৌবিহারে গমনোন্মুখ ছত্রধারী রাজ-পারিষদগণ

গিয়াছে। বৃন্দাবনের পথে আমিনপত্তি ষ্টেশনে যখন মহারাজ ছিলেন, সেবার আমি তখন কলিকাতায় যাইতেছিলাম। তখন দর্শন, স্পর্শন (সেক্ হ্যাণ্ড) ও আলাপ সমস্তই যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(৪) আমার ইহাই ধারণা। প্রবন্ধের অপরত্রও এই রূপই বলিয়াছি। কিন্তু মণিপুরস্থ জনসাধারণের বিশ্বাস যে, বভ্রুবাহনের সময়েও মণিপুরের রাজধানী বর্ত্তমান ইম্ফালেই ছিল। প্রমাণ স্বরূপ আর একটি প্রবাদের কথা জানিতে পারিলাম; অর্জ্জুন বভ্রুবাহনের শরে নিহত হইলে যে সুড়ঙ্গ দিয়া মৃতসঞ্জীবক মণি আনীত হইয়াছিল, তাহা না কি ব্রিটিশ অভিযানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইস্থানে লক্ষিত ও সযত্নে রক্ষিত হইত।

(৫) ভুবনেশ্বরের পাহাড়ে আমি গিয়াছিলাম; তথায়ও সুড়ঙ্গ আছে। একটা সুড়ঙ্গ দিয়া ৺কামাখ্যা যাওয়া যায় বলিয়া সেখানে প্রবাদ শুনিয়াছি।

নবম দিন (২রা কার্ত্তিক বুধবার)। পূর্ব্বাহ্ণে সত্বর আহারাদি করিয়া দোলায় চড়িয়া ১১ টার সময়ে বিষ্ণুপুর অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। ৬ জন নাগা প্রত্যেকে প্রতি আড্ডায় চারি আনা করিয়া লইবে, ইহাই সরকারি বন্দোবস্ত; ইম্ফাল হইতে বিষ্ণুপুর ১৮ মাইল, দুইটি আড্ডা; ইম্ফাল হইতে বুড়াবাজার ৯ মাইল, তথা হইতে আর ৯ মাইল বিষ্ণুপুর। নাগারা বুড়াবাজারে প্রায় ১।০ ঘণ্টা কাল ধরিয়া বিশ্রাম ও মদ্যপান করিল। ঐখানে একটা হাট জমিয়াছিল--তাহাও দেখিলাম। রাস্তা বন্যায় অনেকটা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। একস্থানে প্রায় পোয়া মাইল জায়গা সড়ক একেবারে জলের নীচে। ঘোড়া বাঁধা ডোঙ্গায় পার হইলাম। রাত্রি প্রায় ৭ টার সময়ে বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইলাম। ডিস্পেন্সারিতে একজন মণিপুরী ডাক্তার আছেন--তাঁহার যত্নে রাত্রি ঔষধালয়ে অতিবাহিত করিলাম। বিষ্ণুপুরের শেষ কয়েক মাইল পথ মণিপুরের বিখ্যাত লোগ্‌তাক হ্রদের উত্তর প্রান্ত দিয়া গিয়াছে। মণিপুর রাজ্যের সমতলাংশের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তস্থ প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্থান ব্যাপিয়া এই হ্রদ অবস্থিত। শ্রীহট্ট অঞ্চলে এতাদৃশ জলভাগকে 'বিল' বা 'হাওর' বলে; তবে শ্রীহট্টে ঐগুলি প্রায়ই হেমন্তে শুকাইয়া যায়। মণিপুরের এইটি শীতকালে সামান্য সঙ্কোচিত হয় মাত্র। এই হ্রদের মধ্যে মধ্যে পাহাড় আছে--তন্মধ্যে বৃহত্তম পাহাড় টাঙ্গা মণিপুরের আণ্ডামান। নির্ব্বাসন দণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীরা এখানে প্রেরিত হইয়া থাকে। হ্রদের মধ্যে দলদাম জমাট বাঁধিয়া 'ভেরা'র ন্যায় ভাসিয়া বেড়ায় মৎস্যজীবিরা তাহাতে কুটীর বাঁধিয়া বাস করে।

ক্রমশঃ

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম-বি]

কেরাণী

চাকরী গেল, চাকরী গেল, চাকরী রাখা বিষম দায়!
ঐ রে বুঝি বাজ্‌ছে ন'টা, ঐ গো বুঝি চাকরী যায়!
বিজ্‌লী বাতির ফানুস হেন, ঠুন্‌কো মোদের চাকরী ভাই,
ফট্ করে সে ফাটে, কিন্তু ফাটার শব্দে চমকে যাই।
তাই ত তাড়া সকাল থেকে, নাইতে ভুলি তেল মেখে,
ভাত ত'মুঠো পুরেই পেটে ছুট্‌তে থাকি পান মুখে।
ভরাট পেটে ছুট্‌তে মানা? চিবিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যকর?
চাকরী আগে বাঁচাই দাদা; প্রাণ বাঁচান?—সে তারপর!

কেরাণী

মেয়ে দেখা

বাঙ্গলার বেগম *

[অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম-এ, পি-আর এস্]

"বাঙ্গলার বেগমে"র সেই নামই রহিল, কিন্তু পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। এবার গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে। প্রথম সংস্করণ বাহির হইবার পর, লেখক ইতিহাস রচনার ঠিক প্রণালীর অনুসরণ করিয়া, গ্রন্থের বিষয়টি আবার অনুশীলন করিয়াছেন,—প্রত্যেক ঘটনা ও মত সম্বন্ধে বিদ্যমান প্রমাণগুলি পরীক্ষা করিয়া সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া, পুস্তকখানি আগাগোড়া নূতন করিয়া লিখিয়াছেন; সমস্ত পূর্ব্বতন পরিশ্রমের ফল অম্লানবদনে ত্যাগ করিয়াছেন;—ইহা কম সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। পাদটীকায় বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে প্রমাণ পঞ্জী দেওয়াতে পাঠকের পক্ষে গ্রন্থকারের উক্তির ভিত্তি পরীক্ষা করা সহজ হইবে। বেগমদের সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ লোকমুখে চলিয়া আসিয়াছে; সেগুলি রাখিতে পারিলে বইখানি অধিক মনোরম হইত; কিন্তু যে প্রবাদের ভিত্তি নাই বা যাহা ধীর বিচারে সম্ভবপর বোধ হয় না, লেখক এবার তাহা বাদ দিয়াছেন। ইহা তাঁহার ঐতিহাসিক সাধুতার ফল।

যে সব ইংরাজী মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে বেগমদিগের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে ব্রজেন্দ্র বাবু তাহার প্রায় সমস্তই ব্যবহার করিয়াছেন। ঠিক এই যুগের ফার্সী বিবরণ কম ছিল; যাহা ছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দু'খানি,—মুতাখ্‌খরীন্‌ ও রিয়াজ্‌, ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়াছে। অপ্রকাশিত ইংরাজী সরকারী কাগজপত্রে

---

* বাঙ্গলার বেগম—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; দ্বিতীয় সংস্করণ।

(State Records) ইঁহাদের জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য নিহিত থাকা খুব সম্ভব; এবং বিলাতে ঐতিহাসিক জীবনী এইরূপ অপ্রকাশিত সরকারী বা সম্ভ্রান্তবংশীয় দপ্তরে রক্ষিত চিঠি, ডায়েরী, রিপোর্ট, দরখাস্ত প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া লেখা হয়। লণ্ডনের Foreign Office এবং India Officeএ একশত বৎসরের অধিক পুরাতন (অর্থাৎ নেপোলিয়নের পতন-কাল পর্য্যন্ত) সরকারী কাগজ সাধারণকে দেখিতে দেওয়া হয়; এবং তথায় অনুসন্ধিৎসুদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত অনেক প্রকার সুবিধা, আয়োজন এবং সেবক কর্ম্মচারী সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। ভারতের Imperial Record Office আমাদের নিকট রুদ্ধদ্বার। সুতরাং বর্ত্তমান কালের একজন ভারতীয় লেখকের পক্ষে যাহা করা সম্ভব, ব্রজেন্দ্রবাবু তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন। বাঙ্‌লার নবাবী যুগে অসংখ্য ফার্সী চিঠিপত্র লেখা হয়, তাহা লোপ পাইয়াছে, অথবা মুর্শিদাবাদের নিজামৎ পুস্তকালয়ে অজ্ঞাত, বিশৃঙ্খল ও অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। এ গুলি পাওয়া গেলে "বাঙ্‌লার বেগমে"র তৃতীয় সংস্করণ লেখা আবশ্যক হইবে; কিন্তু তাহা বোধ হয় স্বপ্নাতীত আশা মাত্র।

বর্ণিত বেগমদিগের সকলেরই চরিত্র যে মহৎ ছিল, অথবা শাসনকর্ত্তাদের উপর তাঁহাদের প্রভাব যে মঙ্গলময় হইয়াছিল, তাহা নহে। বরং ইঁহাদের অনেকের জীবনী আমাদের উজ্জ্বল অক্ষরে দেখাইয়া দেয়,—মুসলমান-রাজত্ব কেন লোপ পাইল, কোন্ সামাজিক দশার ফলে পলাশীতে ভারতীয় অক্ষৌহিণী মুষ্টিমেয় বিদেশীর নিকট পরাস্ত হইল। এই হিসাবে গ্রন্থখানির মূল্য আছে। বাঙ্‌লার মত আহ্‌মদনগর এবং গুলকুণ্ডা রাজ্যেও পতনের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের আধিপত্য হইয়াছিল। পুরুষগুলি অকর্ম্মণ্য হইলে হারেমের বেগমগণ প্রভুত্ব করিতেন এবং দাসীদিগকে অস্ত্রে সাজাইয়া পর্দ্দার ভিতর হইতে সৈন্যচালনা এবং রাজাদের সিংহাসনে উঠান-বসান করিতেন। জাতীয় নৈতিক অবনতির যে দৃশ্য মুর্শিদাবাদে অভিনীত হইল, তাহা ইতিহাসের নাট্যশালায় অতি পুরাতন।

"বাঙ্গলার বেগম" বইখানি ছোট, ইহার বিষয়টিও মহাকাব্যের মত গুরুত্ব বা মহিমায় মণ্ডিত নহে; কিন্তু এই গ্রন্থ-রচনায় তরুণবয়স্ক গ্রন্থকার বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক পদ্ধতি শিখিয়াছেন; শত বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি যে সত্য-লিপ্সার ক্রমোন্নতি-স্পৃহার এবং নির্ব্বাক্ শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান্; তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্রদ। তাই আমি মধ্যস্থ হইয়া ইহাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সম্মত হইয়াছি।

চুম্বক তত্ত্ব

[অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এস্‌সি]

চুম্বক প্রস্তুত প্রণালী

[২]

১। একচুম্বক-স্পর্শ-প্রণালী—(Single touch)। একটি ইস্পাত-দণ্ডকে চ চঁ 'চৌম্বক দিকে' (in the magnetic meridian) রাখিয়া (১ম চিত্র) একটি চুম্বকের* ক কঁ—কোন নির্দ্দিষ্ট মেরু দ্বারা, ইস্পাত-দণ্ডের উপরিতল এক (ক) প্রান্ত হইতে অপর (কঁ) প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘষিয়া টানিয়া লইয়া যাও। পরে চুম্বকের যে মেরু দ্বারা ঘষিতেছ, সেই মেরু উঁচু করিয়া তুলিয়া আবার ইস্পাতের প্রথম প্রান্তে রাখ। এইরূপে ১০।১২ বার ঘষা হইলে ইস্পাত-দণ্ড ঘুরাইয়া যে দিকটা পাশে ছিল, সেটা উপরে করিয়া দাও। মনে থাকে যেন ঘুরাইতে গিয়া 'চৌম্বক দিক' (magnetic meridian)
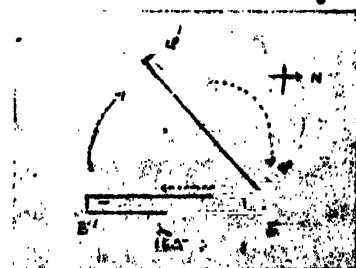
চিত্র—১

হইতে ভ্রষ্ট না হয়। আবার উপরোক্তরূপে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট মেরু দ্বারা পূর্ব্বকথিত রূপে উপরিতলটি ১০।১২ বার ঘষিয়া দাও। এইরূপে ইস্পাত-দণ্ডের চারিধার ঘষা হইলে, পরীক্ষা করিয়া দেখ, ইহা একটি চুম্বকে পরিণত হইয়াছে। মনে কর, যে মেরু দিয়া ঘষিয়াছ, সেটা সুমেরু (north pole)। তাহা হইলে ইস্পাত-দণ্ডের যে প্রান্তে ঘষা শেষ হইয়াছে, সেই দিকে সুমেরুর বিপরীত কুমেরুর (south pole) সৃষ্টি হইবে। সুতরাং অপর প্রান্তটি সুমেরু হইবে। এইরূপ সহজে নকল চুম্বক (artificial magnet) প্রস্তুত করিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য জগতে প্রস্তুত চুম্বকের উত্তর মেরুতে 'N' বা '+' চিহ্ন দেওয়া থাকে। এবং দক্ষিণ মেরুতে '—' চিহ্ন দেওয়া থাকে, অথবা কোন চিহ্নই দেওয়া থাকে না। আমাদের বাংলা দেশে B. C. P. W. Ld. নকল চুম্বক প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি উত্তর মেরুতে 'N' এর পরিবর্ত্তে 'সু' বা 'উ' খোদাই করেন, তাহা হইলে চুম্বক-দর্শকমাত্রেরই (শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই) আনন্দ বর্দ্ধিত হইবে। দয়া করিয়া তাঁহারা কি এ যুক্তি গ্রহণ করিবেন?

২। দ্বিচুম্বক স্পর্শ প্রণালী। সমকোণী চুম্বক-দণ্ডদ্বয়, খর্খ, ছর্ছ (চিত্র ২) এরূপ ভাবে রাখ
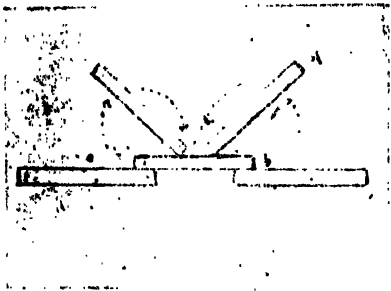
চিত্র—২

যে, একের উত্তর-মেরু অপরের দক্ষিণ মেরুর দিকে চাহিয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান ইস্পাত-দণ্ডের, চর্চ, দৈর্ঘ্যাপেক্ষা ঈষৎ ন্যূন হওয়া আবশ্যক। মনে কর, চর্চ সমকোণী ইস্পাত-দণ্ড। ইহাকে চুম্বকে পরিণত করিতে হইবে। চর্চকে উভয় চুম্বকের উপর এরূপ ভাবে রাখ যে, ইস্পাত-দণ্ডের এক প্রান্ত (চ) খ খর্এর '+' চিহ্নিত উত্তর মেরুর উপর ও অপর প্রান্ত (চ) ছর্ছ এর '—' চিহ্নিত দক্ষিণ মেরুর উপর থাকে। এক খণ্ড কাক (cork), ক, চর্চ, এর ঠিক মধ্যস্থলে রাখ। এখন আর দুটি চুম্বক, পর্প, টর্ট, কাকের (ক) উভয় পার্শে এরূপ বক্রভাবে ধর যে পর্প, এর '+' উত্তর মেরু ও টর্ট এর '—' দক্ষিণ মেরু ইস্পাত-দণ্ড স্পর্শ করিয়া থাকে। পর্প, কে কর্চএর দিকে ও টর্টকে কচএর দিকে একই সময়ে ইস্পাত-দণ্ডকে ঘষিতে-ঘষিতে যথাক্রমে টানিয়া লইয়া যাও। তার পর পর্প ও টর্টকে উঁচু করিয়া আনিয়া আবার পূর্ব্ব-স্থানে ঠিক পূর্ব্বমত বক্রভাবে রাখিয়া আবার পূর্ব্বমত টানিয়া লইয়া যাও। এইরূপে ১০।১২ বার টানা হইলে ইস্পাত-দণ্ডটি ঘুরাইয়া পার্শ্ব দিকটি উপরে করিয়া দাও। এবং কর্ক খণ্ডটি ইস্পাত-দণ্ডের উপরিতলের ঠিক মধ্যস্থলে আবার রাখ। এবং পূর্ব্ববৎ চুম্বক-দণ্ডদ্বয় দ্বারা ১০।১২ বার ইস্পাত-দণ্ডকে ঘষিয়া দাও। এইরূপে ইস্পাত-দণ্ডের চারিদিক ঘষা হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, ইহা চুম্বকের সকল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। চর্চএর 'চ' দিকটিতে '+' উত্তর মেরু ও চএর, দিকে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হইয়াছে।

৩। তড়িৎ-প্রবাহ-প্রণালী একটি সূত্রাচ্ছাদিত তাম্র। তার, তর্ত, সর্প-কুণ্ডলীর মত একটি সমকোণী ইস্পাত-দণ্ডের (চর্চ) চারিদিকে জড়াও। (চিত্র ৩) এখন প্রবল তড়িৎ-প্রবাহ তারের মধ্যে চালাইয়া দাও। ১০।১৫
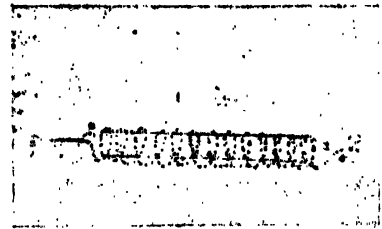
চিত্র—৩

মিনিট তড়িত-প্রবাহ চলিতে দাও। মধ্যে-মধ্যে ইস্পাত-দণ্ডে ধীরে-ধীরে টোকা দিতে থাক। পরে প্রবাহ বন্ধ করিয়া দণ্ডটি কুণ্ডলী হইতে বাহির কর। এখন পরীক্ষায় জানিতে পারিবে যে, ইস্পাত-দণ্ডটি চুম্বক-দণ্ডে পরিণত হইয়াছে। ইস্পাত-দণ্ডের যে দিকটিতে তড়িৎ-প্রবাহ বামাবর্ত্তে (anti-clockwise) যাইতেছিল, ইস্পাত-দণ্ডের

সেই দিকটিতে উত্তর মেরুর সৃষ্টি হইয়াছে। এবং তাহার যে দিকে তড়িত-প্রবাহ দক্ষিণাবর্ত্তে (clockwise) যাইতেছিল, ইস্পাত-দণ্ডের সেই দিক্‌টিতে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হইয়াছে।
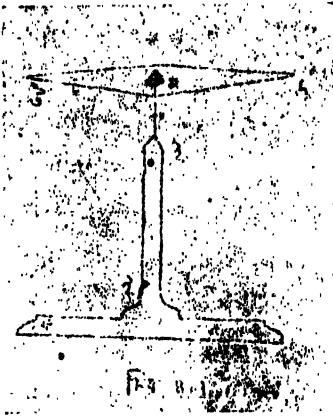
চিত্র—৪

চুম্বক-শলাকা।—একটি সমচতুর্ভুজ ইস্পাত-ফলককে, উদ, (চিত্র ৪) পূর্ব্বকথিত কোন প্রণালী দ্বারা চুম্বকে পরিণত কর। চুম্বকে পরিণত করিবার পূর্ব্বে উহার মধ্যস্থলে ভ্রমর দ্বারা একটি ছোট ছিদ্র, ম, করিয়া একটি ক্ষুদ্র গর্ত্তযুক্ত এ্যাগেট খণ্ড (কাচের ন্যায় স্বচ্ছ এক রকম শক্ত পাথর) বেশ মানানসই করিয়া ঐ ছিদ্রে লাগাইয়া দাও। ইই, সরু ছোট কাষ্ঠ দণ্ড একটি গোল কাষ্ঠ-ফলকের (কক) মাঝখানে পরিপাটীরূপে সংযোগ কর। ঐ কাষ্ঠ-খণ্ডের উপরি ভাগে একটি আলপিন বসাইয়া দাও। আলপিনের সরু আগাটি যেন উপরের দিকে থাকে। ঐ আলপিনের অগ্রভাগের উপর সমচতুর্ভুজ চুম্বক-খণ্ডের এ্যাগেটের গর্ত্তটি বসাইয়া দাও। এখন এই চুম্বক ফলকটি আলপিনের চারিদিকে অবাধে ঘুরিতে পারিবে। এইরূপ চুম্বক-খণ্ডকে চুম্বক-শলাকা (magnetic needle) বলে।

আক্‌বর বাদশাহ্ কি নিরক্ষর ছিলেন না ?

(প্রতিবাদ)

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

গত বর্ষের ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে (পৃঃ ৩৬৯-৭২) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা, এম-এ, পি-আর-এস্, মহাশয় সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, আক্‌বর নিরক্ষর ছিলেন না; কিন্তু এই মতের সমর্থনকল্পে তিনি যে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা আমার মনে হয় বলবৎ নহে।

মোগল-সম্রাট্ আক্‌বর যে নিরক্ষর ছিলেন, এ কথা অনেকে বিশ্বাস না করিতে পারেন; কিন্তু প্রাচ্যের ইতিহাসে এমন অনেক বড়-বড় শাসনকার্য্য-পরিচালকের নামোল্লেখ আছে, যাঁহারা সুশৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, অথচ, তাঁহারা লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না। উদাহরণস্বরূপ আলাউদ্দীন্ খিল্‌জী, হায়দর আলী, মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন কি হজরত মুহম্মদও নিরক্ষর ছিলেন।

আক্‌বরের পিতা, পিতামহ—সকলেই বিদ্বান্ ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন; সম্রাট্ হুমায়ুনও পুত্র আক্‌বরের উপযুক্ত শিক্ষাবিধানের জন্য যথাক্রমে অন্যূন চারিজন কৃতবিদ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, হুমায়ুনের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই; আক্‌বর লেখাপড়ার দিকে মনঃসংযোগ করা ত দূরের কথা, সর্ব্বদা পায়রা-উড়ান ও নানা অলস ক্রীড়া লইয়া সময়ক্ষেপ করিতেন (See *Akbarnama*, i, 519, 588-9, Eng. Trans. Bib. Ind.)।

আক্‌বর যে নিরক্ষর ছিলেন, তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ তাঁহার পুত্র জহাঙ্গীর; জহাঙ্গীর আত্ম-কাহিনী "তুজুক্-ই-জহাঙ্গীরী"তে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা 'আম্মি বুদ্ অর্দ' অর্থাৎ নিরক্ষর (ignorant or illiterate) ছিলেন। নরেন্দ্রবাবু "মুহীতুল্-মুহীৎ" (i, 40) নামক অভিধান অবলম্বনে বলিতে চাহেন যে, এই "আম্মি" শব্দের অর্থ—অল্পভাষী (taciturn)। আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত নহি; নানা বিশ্বাসযোগ্য অভিধান দেখিয়াও আমরা "অল্পভাষী" অর্থ বাহির করিতে পারি নাই। দুঃখের

বিষয়, আবুলফজল্ কর্তৃক সংগৃহীত আক্‌বরের বচনাবলীর মধ্যে একস্থলে এই "আম্মি" শব্দের প্রয়োগ আছে; আক্‌বর বলিতেছেন,—'The Prophets were all illiterate (ummi)'—See *Ain-i-Akbari*, Jarrett, ii, 385.। সুতরাং ইহার পর বোধহয় নরেন্দ্রবাবুর অর্থ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

নরেন্দ্রবাবু আমাদের জানাইয়াছেন যে, 'আক্‌বর হাফিজ্ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিতেন, এবং পদ্য-রচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল; তিনি মনীষিগণের সহিত দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে তর্কালাপ করিতেন।' এ সম্বন্ধে আমার একটু নিবেদন আছে। কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত 'আক্‌বরনামা'র যে অংশে (i, 520, Eng. Trans. *Bib. Indica Edition*) উল্লিখিত আছে যে,—ফার্সী ও হিন্দী কবিতা-রচনায় আক্‌বরের অধিকার ছিল, তিনি জলালুদ্দীন রূমীর মস্‌নবী ও হাফেজের দিউয়ান্ হইতে কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং কাব্য-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেন—সেই অংশটী বর্ত্তমানে প্রক্ষিপ্ত (spurious) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 'আক্‌বর-নামা'র লক্ষ্ণৌ সংস্করণ ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপিতে উপরিউক্ত কথাগুলি, অথবা ঐ স্থলে আক্‌বরের রচিত যে কবিতাটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নাই। ফেরেশ্‌তা (ii, 280) লিখিয়াছেন বটে যে, আক্‌বর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার কথা গ্রহণ করা যাইতে পারে না; কারণ তিনি প্রধানতঃ আবুল ফজলের 'আক্‌বরনামা' অবলম্বন করিয়াই আক্‌বরের রাজত্বকালের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; আর 'আক্‌বরনামার' উল্লিখিত আক্‌বরের কবিতা-রচনার কথা যখন প্রক্ষিপ্ত, তখন ফেরেশ্‌তার কথায় উপরও আস্থা স্থাপন করা বিধেয় নহে।

বদায়ুনী লিখিয়াছেন বটে, (ii, 24) আক্‌বর, ৯৬৩ হিজ্‌রায় ভারতে আগত, মীর আব্‌দুল লতীফের নিকট হাফেজের দিউয়ান্ হইতে পাঠ লইতেন; তথাপি ইহাতে আমাদের সংশয় মুক্ত হইতেছে না; কারণ ব্লকমান্ সাহেব 'আইন-ই আক্‌বরী'তে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে আব্‌দুল লতীফ্ যখন সম্রাট্ আক্‌বরের শিক্ষক নিযুক্ত হ'ন, তখন আক্‌বর লিখন-পঠনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; কিন্তু ইহার অত্যল্পকাল পরে তিনি হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিতেন (See Blochmann's Trans. of *Ain-i-Akbari*, p. 448)।

অন্যত্র বদায়ুনী স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন (ii, 263) যে, আক্‌বর গভীর অজ্ঞতাপ্রযুক্ত মুহম্মদীয় বিধির (Muhammadan Law) জটিলত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না।

নরেন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—"আবুল-ফজল্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ—সুতরাং প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইবার উপযুক্ত। * * তাঁহার আইন-ই-আক্‌বরীতে তিনি বলেন যে, আক্‌বর প্রত্যহ বেতনভোগী পাঠক কর্তৃক গ্রন্থের পাঠ শ্রবণ করিতেন ও পাঠককে পঠিত পৃষ্ঠার সংখ্যা হিসাবে পারিশ্রমিক দিতেন; এবং যতগুলি পৃষ্ঠা পঠিত হইল, তাহা আক্‌বর **স্বহস্তে স্বকলমে** শেষ পৃষ্ঠার উপর **সংখ্যা-লিপি-যোগে** লিখিয়া দিতেন—"*hindisah baqalam gauharbar naqsh kunand*" (See *Ain-i-Akbari*, Bib. Ind. Pers. Text. Bk. I. Ain 34, p.115, lines, 11,12)।" ব্লক্‌মান্ সাহেব এই স্থলটীর এইরূপ ভাবে অনুবাদ করিয়াছেন:—"His Majesty makes with his own pen a SIGN according to the number of the pages etc."

(Blochmann's Trans. of *Ain-i-Akbari*, *i*, 103.)

নরেন্দ্রবাবু বলিতে চাহেন, 'হিন্দিসাহ্' শব্দের অর্থ **সংখ্যালিপি**; এই কারণে তিনি লিখিয়াছেন:—"ব্লকমান্ তাঁহার 'হিন্দিসাহ্' (অর্থাৎ সংখ্যালিপি) শব্দটীর অর্থ পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই।" আমাদের মনে হইতেছে, নরেন্দ্রবাবু ভ্রমক্রমে 'হিন্দিসাহ্' শব্দের অর্থ 'সংখ্যালিপি' করিয়াছেন; ব্লকমান্ অনুবাদে যে Sign বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিয়াছেন, তাহাই ঠিক।

Steingass সাহেব কর্তৃক সঙ্কলিত *Arabic English Dictionary* একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিধান, এবং ইহার উপর যে নিঃসংশয়ে বিশ্বাসস্থাপন করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই; ইহাতে প্রদত্ত 'হিন্দিসাহ' শব্দের অর্থ জ্যামিতিক চিত্র (Geometrical diagram)—সংখ্যা-লিপি (numerical figure) নহে। অর্থাৎ, যেখানে পাঠক শেষ করিত, তথার পঠিত পৃষ্ঠার

সংখ্যা অনুযায়ী আক্‌বর নিজ কলমের সাহায্যে একটি জ্যামিতিক চিত্র আঁকিতেন (*naqsh kunand*=ছবি আঁকিতেন); আমরা বাঙ্গালায় যাহাকে ঢেরা বলি, যেমন ×, △, ×× প্রভৃতি চিহ্ন—অক্ষর নহে।

পক্ষান্তরে আক্‌বরের নিরক্ষরতা বিষয়ে ক্যাথলিক্ মিসনারী জেরোম জেভিয়ার (Jerome Xavier) লিখিয়াছেন—*Legere et scribere nescit*; এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

আক্‌বরের নিরক্ষরতা বিষয়ে এত প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতেও নরেন্দ্রবাবু বৃথা লিখিয়াছেন যে:—'আক্‌বর বাদশাহ যে সংখ্যা ও বর্ণমালায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহা য়ুরোপে বিনা তর্কে গৃহীত হইয়াছে।' বহু দিনের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফলে বিলাতের বেভারিজ (H. Beveridge I. C. S.) প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এ বিষয়ে নূতন কিছু বলবৎ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা এই মত গ্রহণ করিতে বাধ্য; তাহা না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। সত্যই ইতিহাসের প্রাণ; সেই সরল সত্য প্রচার করিতে আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

শোক-সংবাদ

পঞ্জাব চীফকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি·আই·ই মহোদয় মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বৃহত্তর বঙ্গে প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে যাঁহারা নিজগুণে বাঙ্গালীজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, সার প্রতুলচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ, বি·এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণ যৌবনে পূর্ণোদ্যমে প্রতুলচন্দ্র পঞ্জাব চীফ কোর্টে ওকালতী করিবার জন্য গমন করেন; এবং পরে দীর্ঘকাল সেই বিচারালয়ের প্রাড়্‌বিবাকের পদ অলঙ্কৃত করিয়া ১৯০৮ অব্দের অক্টোবর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। বিচারপতির কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর পাঁচবৎসর তাঁহাকে নাভা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে কার্য্য করিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর, সি-আই-ই এবং নাইট উপাধি দিয়া তাঁহার গুণের সমাদর করেন। ১৮৮৭ অব্দে যখন পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন প্রতুলচন্দ্র তাহার উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন; এবং তিনি দুইবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের কার্য্য করিয়াছিলেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অনারারী এল্‌এল্-ডি উপাধি প্রদান করেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি-আই-ই

স্বর-লিপি

আশাবরী—তেতালা

তব-চরণ-কমলে কবে চির শরণ পা'ব বল দীন-জননি !
ভব-সাগর পার হ'তে কেবল আছে গো তব পদ-তরণী।
নিত্য ভবে মজে ভুলিয়াছি তোমার নির্ম্মল গুণ-কাহিনী।
জ্ঞানহীন দীন গোপেশ্বর প্রতি চাও গো মহেশ ভামিনী ॥

স্বর-লিপি—
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গীত-রচয়িতা—
সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ১ ২´ ৩ ০
মা মা II মা পা পা র্সা | ণা দা পা পা I মা মা পা দা | মপা মজ্ঞা-া জ্ঞা | মা ঋা-া সা |
ত ব চ র ণ ক ম লে ক বে চি র শ র ণ পা০ ০ ব ব ০ ০ ল

১ ২´ ৩
ঋা মা পা র্সা I ণদা-া পা-া | দদা পমা মা মা II
দী ০ ন জ ন০ ০ নি০ ০ ০ ০ ০ "ত ব"

০ ১ ২´ ৩ ০
II মা মা ণদা-া | দা দা র্সা-া I র্সা র্সা র্সা-া | র্সা জ্ঞর্ঋা-া র্সা | মা-া মা মা |
ভ ব সা০ ০ গ র পা০ র হ তে০ কে ব ০ ০ ল আ০ ছে গো

১ ২´ ৩
পা মা পা র্সা I ণা দা পা-া | দদা-পমা মা মা II
ত ব প দ ত র ণি০ ০ ০ ০ ০ "ত ব"

০ ১ ২´ ৩ ০
II মা-া মা মা | পা-া পা পা I মা মা ণা দা | র্সা-া র্সা র্সা | মা-া মা মা |
নি০ ত্য ভ বে০ ম জে ভু লি য়া ছি তো০ মা র নি০ র্ম্ম ল

১ ২´ ৩
পা-া পা র্সা I ণদা-া পা-া | -া -া -া -া II
গু০ ণ কা হি০ ০ নী০ ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
II মা -া পা ণদা | -া ণা র্সা র্সা I র্সা -া র্ঋা ণা | র্সা র্সা র্সা র্সা | মা -া মা মা |
জ্ঞা০ ন হী০ ০ ন দী ন গো০ পে০ শ্ব র প্র তি চা০ ও গো

১ ২´ ৩
পা মা পা র্সা I ণদা-া পা-া | দদা পমা মা মা II
ম হে শ ভা মি০ ০ নি০ ০ ০ ০ ০ "ভ ব"

———

ইরাণ দেশের কাজী

তাল—একতালা।

স্বর-লিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়   গীত-রচয়িতা—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

০ ১ + ৩

॥ সা রা গা । গা -া গা । গা মা রগা । মা মা -া ।
আম্ রা ই রা ন্ দে শে র্ কা - - জী -

০ ১ + ৩ ০ ১ +

মা মা ধা । ধা ধা ধা-া । ধা পা পা-া । র্সা -া -া । মা মা-া মা-া । পা মা গা রা-া ॥ ॥
আম্ রা এ সে ছি এ ক্ টা নূ ত ন্ আ ই ন্ প্র চা র ক - র্ত্তে আ - জি -

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

রা পা পা । পা পা পা-া । পা পা-া পা-া-া । র্সা-া না র্রা-া । র্রা পা-া-া । পা-া-া ।
যে যা ব - লি বে স ব্ ই মা ম্ কু - ল্ হ উ ক মি - থ্যা হ উ ক্ ভু - ল্
পা - র্শী ঠে কি লে ই মা ম্ পা য়্ তার্ মা থা টি বাঁ চা নো হ ই বে দা - য়্
পা - র্শী র তং বে হ ই ল ব - দ্ ব্য তী ত কু লি ও কে রা ণী প দ্
তবে যে বে টা ব লি বে হাঁ হাঁ তা হো - ক্ মে বে টা ক ত ক্ ভ - দ্র লো - ক্

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

র্গা র্গা র্রা-া । র্রা র্রা র্সা । র্সা সা পা । পা-া পা ধা । পা পা ধা । পা র্সা-া । র্সা-া ॥
তো মা দে র্ হ বে ব লি তে তা তে ই বা হ বা বা হ বা বা - জা -
পা - র্শী র্ শি র্ কা টি য়া ল ই লে হ ই তে হ ই বে রা - জী -
হা কি ম্ হু কি ম্ হ ই বে স বা ই হো সে ন হা স ন হা - জী -
যে বে টা ব লি বে তা না না না না না সে বে টা বে জা য়্ পা - জী -

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

সা সা-া । গা গা-া । পা-া পা-া । ধা পা মা-া । মা মা-া । মা পা-া । গা-া-া-া ।
ই মা ম্ স বা ই স - ত্য - প্রি য় পা - র্শী মি - থ্যা বা - দী - - -
আ ম রা স বা ই দে খে ছি ই মা ম্ বি চা র্ ক রি য়া সূ - ক্ষ্ম - - - -
দা দা ভা ই হো ক্ জি জি ভা ই হো ক্ কা র্ সে ট্ জি কি মে - টা - - -

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ধা-া ধা ধা । ধা ধা র্সা । র্সা-া পা । ধা পা মা-া । মা-া মা মা । পা-া গা-া-া-া ।
পা - র্শী ই মা মে বি বা দ্ বা ধি লে পা - র্শী ই অ প রা - ধী - - -

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩

ধা ধা-া ধা । ধা-া র্সা-া । পা পা-া পা । মা-া মা মা । মা-া পা-া । গা-া-া-া ।
ই মা ম্ স রা ই বু - দ্ধি মা ন্ আর্ পা - র্শী স বা ই মূ - র্খ - - -
আ জ্ বে কে ত বে ঠি ক্ হ য়ে গে ল স স বা স া ম ন্ বে - টা - - -

ছোট কথা *

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ]

আবদুলপুরের নিতাই বৈরাগী ও মিঠু সেখ পরস্পর প্রতিবেশী। গ্রামের এক প্রান্তে তাহাদের বাস। তিন-পুরুষ ধরিয়া তাহারা এই গ্রামে বাস করিতেছে—উভয় পরিবারের মধ্যে বড় সদ্ভাব। নিতাই ও মিঠুর পিতামহেরা একই গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া যখন আবদুলপুরে ঘর বাঁধে, তখন নিতাইয়ের পিতা মধু বৈরাগী ও মিঠুর বাবা মধু সেখ দু'জনের বয়স সমান ও নাম এক হওয়ায়, দু'জনে 'মিতা' পাতাইয়াছিল। এখন মিঠু সেখের পিতা জীবিত নাই; এবং নিতাইয়ের বাবা বৃদ্ধ হইয়া চাষ-বাসের কাজকর্ম্ম ছেলের হাতে দিয়া, আপনার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানে, আর সন্ধ্যার সময় আপন মনে কীর্ত্তন গাহে।

উভয়েরই অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। নিতাইয়ের চারখান লাঙ্গলের চাষ এবং এক গোয়াল গরু। তার তিন ছেলেই উপযুক্ত হইয়াছে,—দু'টির বিবাহ হইয়া তাহাদেরও ছেলেপুলে হইয়াছে।

মিঠু সেখের চল্লিশ বিঘা জমী, এবং গরু বাছুরও অনেকগুলি। এক ছেলে,—তার বিবাহ দিয়াছে; আর এক মেয়ে,—তারও বিবাহ হইয়াছে;—জামাই মিঠুর কাছেই থাকে ও চাষবাসে সাহায্য করে।

(২)

এত আত্মীয়তা সত্ত্বেও, কেবল একটা বিষয় লইয়া দুই পরিবারে মধ্যে-মধ্যে একটু আধটু মনান্তর উপস্থিত হইত—সে কারণটা কিন্তু অত্যন্ত সামান্য। মাঝে-মাঝে মিঠু সেখের মুরগী গিয়া নিতাই বৈরাগীর খামার-বাড়ীতে ঢুকিত; এবং তার জন্য নিতাইয়ের মা'কে "ছোঁয়াচ পড়িয়া" অসময়ে স্নান করিতে হইত। কিন্তু যেমন দেহের সামান্য এক স্থান অশুচি পাইয়া নলরাজার শরীরে কলি প্রবেশ করিয়াছিল,—তেমনি এই ছোট কথা লইয়া এই দুই পরিবারে বিবাদ আরম্ভ হইল।

সে দিন রবিবার—পুরুষেরা সব হাটে গিয়াছে। মিঠু সেখের কন্যা ফতেমা খামার পরিষ্কার করিতে-করিতে একটা মুরগীকে তাড়া দিবামাত্র, সেটা উড়িয়া গিয়া নিতাইয়ের খামারে বসিল। সেই সময়ে নিতাইয়ের বড় পুত্রবধূ সেখানে কাজ করিতেছিল;—মুরগী দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল,—"দেখ দিকি মোছনমান মাগীর আক্কেল, ইচ্ছে করে মুরগীটে আমাদের খামারে তাড়িয়ে দিলে গা!" ফতেমা এ কথায় একবারে জ্বলিয়া উঠিল, এবং বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিল। ক্রমে তাহাদের চীৎকারে দুই বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া জুটিল এবং ঝগড়াটা বেশ পাকিয়া উঠিল। তাদের কাংসনিন্দিত কণ্ঠস্বরে পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ মধু বৈরাগী আপনার দাওয়া হইতে দু'একবার বিবাদ থামাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কোন পক্ষেরই কাণে প্রবেশ করিল না। ফলে, যখন দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে হাট হইতে গৃহে ফিরিল, তখন স্ত্রীলোকদের কণ্ঠ সপ্তমে চড়িয়া, উভয় পক্ষের পিতৃপুরুষের এবং নিজেদের চরিত্রের অকথ্য সমালোচনা চলিতেছিল। সে দিন মিঠুর ছেলে হাটে একজনের নিকট অপমানিত হইয়া আসিয়াছিল—তার উপর রৌদ্রে তাতিয়া-পুড়িয়া আসিয়া তার মেজাজটা বেশ ভাল ছিল না। সে হঠাৎ নিতাইয়ের পুত্রবধূকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া বসিল; ফলে, নিতাইয়ের ছেলের সহিত তাহার হাতাহাতি সুরু হইয়া গেল। সে দিন মিঠু ও নিতাই মাঝে পড়িয়া ছাড়াইয়া না দিলে, একটা বিষম কাণ্ড হইয়া যাইত।

নিতাই ছেলেদের থামাইল বটে, কিন্তু নিজে রাগ সামলাইতে পারিল না। সে তৎক্ষণাৎ জমীদারের কাছারীতে গিয়া মিঠুর ছেলের নামে নালিশ করিল।

জমীদারের গোমস্তা হলধর মণ্ডলের অনেক দিন হইতে 'উপরি পাওনা' বন্ধ থাকায় খরচপত্রের কিছু অনাটন চলিতেছিল। এমন সুযোগ সে অনেক দিন পায় নাই—তাই সে গম্ভীরভাবে বিচার করিতে বসিয়া গেল। ফলে,

* কাউন্ট টলস্টয়ের অনুসরণে।

মিঠু সেখের ছেলের পাঁচটাকা জরিমানা উশুল হইয়া তার বাক্সে উঠিল। আগুন লাগিল।

(৩)

ইহার পর সামান্য-সামান্য কারণে বিবাদ বাধিতে আরম্ভ হইল। আজ একজনের গরু অপরের খামারে ঢুকিয়া খড় খাইল, কাল আর একজনের ছাগল আসিয়া কুমড়ার ডাঁটা মুড়াইয়া খাইয়া গেল। আজ মিঠুর পুত্রবধূ নিতাইয়ের বৌকে গালি দিল—কাল সে তাহার শোধ লইল;—এমনি করিয়া ছোট-ছোট কথায় উভয় পরিবারের মধ্যে অসদ্ভাব বাড়িয়াই চলিল। ইহার উপর গোমস্তা হলধরের দণ্ড-জরিমানা এ আগুনে ফুৎকার দিতেছিল।

ক্রমে দূরদর্শী হলধর দেখিল,—ইহার অপেক্ষা আরো সুযোগের পথ আছে; তাই সে একটা এজমালী জমীর ধানকাটার উপলক্ষ পাইয়া নিতাইকে মহকুমায় "এক নম্বর" ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিতে পরামর্শ দিল। কেন না, উভয় পক্ষ একবার মোকর্দ্দমার স্বাদ পাইলে, তার নানা প্রকারে বেশ দু'পয়সা রোজগার হওয়ার সম্ভাবনা। পরামর্শটা গোপনে হইলেও, কথাটা বৃদ্ধ মধু বৈরাগীর কাণে উঠিতে দেরী হইল না। সে নিতাইকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইল। তিন পুরুষ ধরিয়া এই দুই পরিবারে যে সদ্ভাব ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ ছিল। দুই "মিতায়" কেমন করিয়া নানা কষ্ট-দুঃখের মধ্যে নিজেদের চেষ্টায় সাংসারিক অবস্থার উন্নতি করিয়াছিল, কেমন করিয়া মধু সেখ নিজের হালের গরু বেচিয়া মধু বৈরাগীর জমীদারের খাজনা দিয়াছিল, দুই বন্ধু যৌবনে কেমন করিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া জমীদারের জন্য লড়িয়াছিল, এবং মধু সেখ আহত হইলে, মধু বৈরাগী মিতাকে পিঠে করিয়া অত লাঠিয়ালের মধ্য হইতে বাড়ী আনিয়াছিল—সে সব কথা বলিতে-বলিতে বৃদ্ধের অশ্রু সংবরণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল। শেষে সে বলিল, "বাবা, তোরা দু'জনে দুই ভাইয়ের মত মানুষ হয়েছিস্; মিঠু আমাকে চাচা বলে; তুই আর মিঠু কি আমার কাছে পৃথক? সে ছোট, তুই বড়,—তুই গিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বল্লেই সব চুকে যাবে। মেয়েগুলোর কথায় নাচিস্‌নে; ওরা ত সব সে দিনের—তুই না জানিস্ কি? হলা মোড়লের কথায় এত দিনের আত্মীয়তা নষ্ট করিসনে। বুড়োর কথা রাখ্!"—বলিয়া অশ্রু মুছিয়া সে হরিনামের মালা লইয়া বসিল। সে দিন আর তাহার আহার হইল না। কিন্তু বৃদ্ধের কথায় কোন ফল হইল না—গোমস্তা হলধর মণ্ডলের সৎপরামর্শ ই জয়লাভ করিল। পরদিন প্রাতে নিতাই মহকুমায় গিয়া মিঠু সেখ, তার ছেলে ও জামাইয়ের নামে মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া আসিল। বৃদ্ধ মধু বৈরাগী সব শুনিয়া অশ্রুপাত করিল।

এ দিকে মিঠু সেখও নিশ্চিন্ত ছিল না; এবং তাহারও পরামর্শদাতার অভাব ঘটিল না। সেও সঙ্গে-সঙ্গে থানায় গিয়া নিতাইয়ের নামে ধান চুরির অভিযোগ রুজু করিয়া এজাহার দিয়া আসিল। ব্যাপারটা বেশ জমিয়া উঠিল। এ-দিকে আদালত হইতে মিঠু সেখের নামে "শমন" বাহির হইল; ও-দিকে থানার দারোগাবাবু "দ্বিতীয় কৃতান্তসমিব" তাঁহার অনুচরবর্গসহ "সরেজমীনে তৈকিকাত" করিবার জন্য গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লাল পাগড়ী ও তাহাদের বিচিত্র ভাষা লইয়া কনেষ্টবলগণ নিরীহ গ্রামবাসীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। গোয়ালাদের দুধ-বেচা বন্ধ হইয়া গেল—ছাগবংশ ধ্বংস হইবার উপক্রম হইল। শান্ত গ্রামখানি একবারে অতিরিক্ত সচেতন হইয়া উঠিল। "তৈকি-কাতের" ফল কি হইল জানি না—কিন্তু মধু বৈরাগীর একটা সবৎসা গাভী ও মিঠু সেখের একজোড়া হালের বলদ হস্তান্তরিত হইয়া গেল—সে কথাটা গোপন রহিল না। দুই দিন চর্ব্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় আহার করিয়া যে দিন প্রাতে দারোগাবাবু সদলে গ্রাম ত্যাগ করিলেন—সে দিন গ্রামবাসীর সুপ্রভাত হইল।

ইহার দুই সপ্তাহ পরে, দুই পক্ষ নিজেদের সাক্ষী-সাবুদ লইয়া, দুই নৌকায় মহকুমায় যাত্রা করিল। সাক্ষীদের আহার, উকিল-মোক্তারের ফিস্, মোহরের ও আদালতের নিম্ন-কর্ম্মচারীদের "মেহনতয়ানা" দিতে উভয়ের গোয়ালের প্রায় অর্দ্ধেক খালি হইয়া গেল। যথাসময়ে মোকর্দ্দমা উঠিলে, হাকিম উভয় পক্ষের উকিল-মোক্তারের সুদীর্ঘ বক্তৃতা সত্ত্বেও হুকুম দিলেন যে, এ মোকর্দ্দমা ফৌজদারী আদালতের বিচার্য্য নহে—দেওয়ানী আদালতে স্বত্ব-সাব্যস্তের নালিশ করা উচিত ছিল। হুকুম শুনিয়া নিতাই বিমর্ষ হইয়া পড়িল—কেন না, হলধর তাহাকে আশা দিয়াছিল যে, জেল না হইলেও, অপর পক্ষের জরিমানা নিশ্চয়ই হইবে। মিঠু সেখের দলের আনন্দের অবধি রহিল

না—যদিও খরচের কথা ভাবিয়া স্বয়ং মিঠু সেখের মনে মোকর্দ্দমা করার উৎসাহ অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল।

(৪)

এই মোকর্দ্দমার পর কিছুকাল মামলা-মোকর্দ্দমা বন্ধ রহিল বটে, কিন্তু ঝগড়া বন্ধ রহিল না—বিশেষ স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে। মিঠু সেখের কন্যা ফতেমা বড় মুখরা—তার খরধার রসনাকে সকলেই যথেষ্ট ভয় করিত। সে গাঁয়ের মেয়ে, কাজেই লজ্জা সরমের বড় ধার ধারিত না। এখন তার মেজাজ যেন আরো বেশী কড়া হইয়া উঠিয়াছিল—কেন না, আজকাল মিঠু সেখের সাংসারিক কিছু অস্বচ্ছলতা হওয়ায়, তার ছেলে ও জামাতার মধ্যে প্রায়ই কথান্তর হইত; এবং জামাতা, শ্যালকের উপর বিরাগ স্ত্রীর উপর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করায়—ফতেমা আবার সে ঝাল নিতাইয়ের বৌ'দের উপর ঝাড়িত। পথে-ঘাটে দেখা হইলে, সে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিত।

এমনি করিয়া অন্যেরা একটু শান্ত হইলেও, কলহ-প্রিয়া ফতেমা ও নিতাইয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ—দু'জনে মিলিয়া এ বিবাদাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দিল না।

একদিন পুকুরঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়া ফতেমা নিতাইয়ের পুত্রবধূকে ছুঁইয়া দিল। ঝগড়া-গালাগালি ঘাট হইতে আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু বাড়ী আসিয়াও তাহার জের চলিতে লাগিল; এবং দেখিতে-দেখিতে উভয় পরিবারের স্ত্রীলোকেরা রণভূমিতে অবতীর্ণ হইল। ফলে, বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গেলেও বিবাদ থামিল না; এবং তখনও পর্য্যন্ত কাহারো বাড়ীতে হাঁড়ি চড়িল না। এমন সময়ে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে লাঙ্গল-কাঁধে মিঠু সেখ মাঠ হইতে ফিরিল। ঠিক সেই সময়ে নিতাইয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ফতেমার চরিত্রে কুৎসিত দোষারোপ করিয়া গালি দিতেছিল। কথাটা মিঠু সেখের বড় অসহ হইল—সে হাতের "পাঁচনবাড়ী" দিয়া তাহাকে বেশ দু'চার ঘা' দিয়া দিল। পুত্র-সম্ভাবিতা এই আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল—দেখিতে-দেখিতে চারিদিকে লোক জমিয়া গেল। সেদিন গ্রামের প্রধানেরা থামাইয়া না দিলে একটা খুন-খারাপি হওয়া বিচিত্র ছিল না।

নিতাই তখন বাড়ী ছিল না। সে বাড়ী ফিরিয়া যখন সকল কথা শুনিল—তখন রাগের সঙ্গে তার মনে একটা আনন্দও হইল—বৈর-নির্য্যাতনের এমন সুযোগ আর হইবে না। বৌ'টা যদি মরিয়া যায়, তবে ত' মিঠু সেখের যদিই ফাঁসি না হয়, দ্বীপান্তর ত নিশ্চয়ই হইবে। আর যদি বাঁচে, তাহা হইলেও জেল নিশ্চয়। শত্রু-বিনাশের এমন সুযোগ কি আর হয়! সে দেরী মাত্র না করিয়া পুত্রবধূকে লইয়া একবারে মহকুমায় গিয়া মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া দিল। তার অদৃষ্টের দোষে কিন্তু বৌ'টা দু'দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল—কেবল তার গায়ে পাঁচনের দু'চারিটা দাগ রহিল মাত্র।

যথাসময়ে মোকর্দ্দমার দিন পড়িল। উভয় পক্ষের তরফ হইতেই বেশ ভাল-ভাল উকিল-মোক্তার নিযুক্ত হইল, এবং সাক্ষী-ভাঙ্গানের চেষ্টা প্রভৃতি নানাবিধ তদ্বিরেরও কোন ত্রুটি হইল না। নিতাইয়ের পক্ষে তদ্বিরকারক, হলধর মোড়ল। দুষ্ট লোকে বলে, সে না কি গোপনে মিঠু সেখকেও পরামর্শ দিতে বিরত ছিল না। এই মোকর্দ্দমার জন্য হালের গরু বিক্রয়, জমী বন্ধক এবং উকিল-মোক্তার নিয়োগ প্রভৃতিতেও হলধর বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া লইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের বিবাদের কথা সবই জানিতেন। এ মোকর্দ্দমার সমস্ত হাল শুনিয়া, উভয়ের উকিলদের ডাকিয়া, এ মামলা আপোষে মিটাইয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —"দেখ, তোমাদের দুই পরিবারে পূর্ব্বে বিশেষ সদ্ভাব ছিল; সামান্য কারণে তোমাদের মধ্যে এই যে বিবাদ বাধিয়াছে, ইহাতে উভয় পক্ষই সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম করিতেছ। এ মোকর্দ্দমায় মিঠু সেখের শাস্তি হইলেও, তোমার কি লাভ হইবে? আর তাহাতেই কি এ বিবাদ বন্ধ হইবে? আমার ইচ্ছা, তুমি এ মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লও—মিঠুকে ক্ষমা কর—বিবাদের শান্তি হউক।" নিতাইয়ের কিন্তু সহৃদয় বিচারকের এ পরামর্শ মনে ধরিল না। তার পুত্রবধূর অপমান করিয়াছে—ইহার প্রতিশোধ সে লইবেই। যাক্ প্রাণ, থাক্ মান। উপরন্তু, সে মনে-মনে বিচারকের পক্ষপাতের জন্য বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হইল। তার ভয় হইল, হয় ত তিনি মিঠুকে সামান্য শাস্তি দিয়া তার প্রতিহিংসার এমন সুযোগটা মাটি করিয়া দিবেন। হলধর আশ্বাস দিল, এর উপর আপীল ত আছে; দেখা যা'ক্

কি হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট মোকর্দ্দমা আপোষে মিটাইবার জন্য সাত দিন সময় দিলেন।

এদিকে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বৃদ্ধ মধু বৈরাগীও নিতাইকে অনেক বুঝাইল; এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের সৎ-পরামর্শ মত মোকর্দ্দমা মিটাইবার জন্য অনুরোধ করিল। কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" এই সময় নিতাইয়ের বংশ-গৌরব বড়ই বাড়িয়া উঠিল। তার পুত্রবধূকে একজন মুসলমান মারিল, আর সে কি না তাই সহিয়া থাকিবে! ধিক্ তার জীবনে! মিঠু যে তার বাল্যকালের খেলার সাথী, যৌবনের বন্ধু, প্রতিবেশী,—সে সব কথা সে ভুলিয়া গেল।

ম্যাজিষ্ট্রেট যখন দেখিলেন যে এ মোকর্দ্দমা মিটিবার নহে, তখন তিনি উভয় পক্ষের সাক্ষী-সাবুদ লইলেন। মিঠুর অপরাধ সপ্রমাণ হইয়া গেল। বিচারক কিন্তু সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিয়া, মিঠুকে অন্য শাস্তি না দিয়া, কুড়ি ঘা' বেতের হুকুম দিলেন। হুকুম শুনিয়া মিঠু বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিল; ওদিকে হলধর প্রভৃতি নিতাইয়ের দল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিতাইয়ের কিন্তু মনে কোনও সুখ হইল না। মিঠু সেখের সেই কাতর দৃষ্টি, তার বালকের ন্যায় রোদন, তার পর তার মুখে আহত হিংস্র পশুর মত একটা প্রতিহিংসার ভাব—সব কথা মনে করিয়া সে ভীত হইয়া পড়িল। না জানি মিঠু এ অপমানের কি প্রতিশোধ লয়! সে প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বিপদের কল্পনা করিতে লাগিল। কেন সে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধ, তার পিতার অনুনয় অগ্রাহ্য করিল? কেন সে তার বাল্যবন্ধুকে ক্ষমা করিয়া এ মোকর্দ্দমা মিটাইয়া ফেলিল না? অর্থনাশ ত তার যথেষ্ট হইয়াছে—এখন বেত্রাহত, অপমানিত মিঠু না জানি কি প্রতিশোধ লইবে! সে ছেলেপুলে লইয়া ঘর করে—কি সর্ব্বনাশ না জানি তার কপালে আছে! যদি—যদি মিঠু তার বাড়ীতে আগুনই লাগাইয়া দেয়! কথাটা ভাবিতেও সে কাঁপিয়া উঠিল। আগুন লাগাইবার কথা একবার মনে উঠিতেই, সে কল্পনাটা তাহাকে একবারে পাইয়া বসিল। এটা কিছুতেই সে মন হইতে সরাইতে পারিতেছিল না। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে সে তার দলবল লইয়া গ্রামে ফিরিল। পথে হলধরের রসিকতা সে দিন আর কোনও রকমেই তার মনের অন্ধকার দূর করিতে পারিল না।

(৫)

মিঠু সেখ যখন তাহার বেত্রাঘাতের হুকুম শুনিল, তখন সে প্রথমে ভয়ে, অপমানে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তার পর সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই তার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বলবতী হইতে লাগিল। সামান্য কারণে এ কি দারুণ অপমান! সে যে চিরদিনের জন্য দাগী হইয়া থাকিবে! কেমন করিয়া সে এ বৃদ্ধ বয়সে দশের সাম্‌নে মাথা উঁচু করিয়া চলিবে! এই নিতাই না তার বাল্যবন্ধু—যার সঙ্গে সে একসঙ্গে খেলা করিয়াছে—বড় হইয়াছে! মিঠু না হয় রাগের মাথায় একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছিল—তার কি আর ক্ষমা ছিল না! বেশ! ইহার প্রতিশোধ সে লইবেই!

তার পর যখন বেত্রাঘাতের পর চার-পাঁচ দিন হাসপাতালে থাকিয়া সে নিষ্কৃতি পাইল, তখন প্রতিহিংসা-রাক্ষসী তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। দারুণ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় তার মস্তি ভীষণ হইয়াছিল। সে নানা পথ ঘুরিয়া গ্রামে ফিরিল; কিন্তু লজ্জায় দিনের বেলায় গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিল না।

সে দিন অমাবস্যা;—সন্ধ্যা হইতে আকাশে ঘোর মেঘ দেখা দিল ও জোরে বাতাস বহিতে লাগিল। গ্রাম-প্রান্তে একটা গাছের নীচে বসিয়া মিঠু সেখ ভাবিতে লাগিল। ক্রমে প্রতিশোধ লইবার একটা প্ল্যান তাহার মাথায় আসিল—আজ সে যেমন করিয়া পারে নিতাইকে গৃহ-হীন করিবে। এমন সুযোগ আর হইবে না। ঘোর অন্ধকার রাত্রি—তার উপর, সে যে গ্রামে ফিরিয়াছে, কে তাহা জানিবে? সে ত অনায়াসে গভীর রাত্রে লুকাইয়া গিয়া নিতাইয়ের খামারে খড়ের গাদায় আগুন লাগাইয়া দিতে পারে। তার পর,—তার পর এক ঘণ্টার মধ্যে নিতাইয়ের আর দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না।

(৬)

মহকুমা হইতে ফিরিয়া নিতাইয়ের মনে শান্তি ছিল না। না জানি মিঠু কবে ফিরিবে—কোন্ সুযোগে সে তার অপমানের শোধ লইবে! ভাবনায় নিতাইয়ের আহার-নিদ্রা ত্যাগ হইয়াছিল। আজ সন্ধ্যা হইতে মেঘ করিতে দেখিয়া তার ভাবনা আরো বাড়িয়া উঠিল। রাত্রিতে আহারাদির পর সে অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল,

কিন্তু নিদ্রা আসিল না। সে অস্থির হইয়া পড়িল—শেষে অনেক ভাবিয়া বাড়ীর চারিদিকে পাহারা দিবার সঙ্কল্প করিয়া বাহির হইল। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া সে থামারের দিকে চলিল। ও কি! অন্ধকারে লুকাইয়া কে-একজন তাহার থামারে ঢুকিতেছে না? একবার মনে হইল, সে চীৎকার করিয়া লোক জড় করে। তার পর একটা দুর্ব্বুদ্ধি তার মাথায় আসিল,—এ যদি মিঠু সেখই হয়, তবে ত নিশ্চয়ই সে তার বাড়ীতে আগুন লাগাইতে আসিয়াছে! তাকে হাতে-হাতে ধরিতে পারিলে, এ অপরাধের জন্য তার নিশ্চয়ই জেল হইবে। তাকে ধরিতেই হইবে! এই ভাবিয়া সে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল।

এদিকে মিঠু সেখ সভয়ে, সন্তর্পণে থামারে ঢুকিয়া খড়ের গাদার কাছে দাঁড়াইল। এই ত সুযোগ! একটা দেশলাইয়ের কাটি লাগাইবার দেরী মাত্র! তার পর, নিতাই! হয় ত সে সপরিবারে পুড়িয়া মরিবে,—তা' যাক্ না আপদ চুকিয়া। প্রতিহিংসার আনন্দে সে হিতাহিত জ্ঞান হারাইল,—আর বেশী দেরী না করিয়া সে দেশলাই-কাটিটি জ্বালাইয়া খড়ে লাগাইয়া দিল! সেই মুহূর্ত্তে নিতাই বাঘের মত তার ঘাড়ে পড়িল। কিন্তু মিঠু সেখ তার অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ, সে অনায়াসেই তাহাকে ছাড়াইয়া পলায়ন করিল। নিতাই প্রতিহিংসার তাড়নায়, আগুন নিভাইবার কথা ভুলিয়া গিয়া, তার পিছনে-পিছনে ছুটিল। এদিকে অনুকূল বাতাস পাইয়া অগ্নিদেব প্রলয় মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; দেখিতে-দেখিতে নিতাইয়ের বড় ঘরে আগুন লাগিল!

নিতাই তখন উন্মত্তের মত মিঠু সেখের সন্ধানে ফিরিতেছিল—বাড়ীর কথা তার মনে ছিল না। প্রতিবেশীদের কোলাহলে তার চৈতন্য হইল। সে যখন ছুটিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল, তখন চারিদিকে আগুন—তার ছেলেপুলে সব পথে দাঁড়াইয়া! কিন্তু তার বাপ্!—সে দৌড়িয়া তার বৃদ্ধ পিতার ঘরে ঢুকিল এবং অতি কষ্টে তাকে পিঠে করিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। কিন্তু তখন বৃদ্ধের দেহের অনেক অংশ জ্বলিয়া গিয়াছে। দেখিতে-দেখিতে অগ্নি নিতাইয়ের বাড়ী পোড়াইয়া মিঠু সেখের বাড়ীও কবলিত করিয়া ফেলিল!

গ্রামের লোকের চেষ্টায় দুই পরিবারের লোকদের প্রাণ বাঁচিল মাত্র, দ্রব্যাদি কিছুই রক্ষা পাইল না। ক্রমে এ কাল রাত্রি প্রভাত হইল।

(৭)

বেলা হইলে মুমূর্ষু মধু বৈরাগী নিতাইকে কাছে ডাকিল, এবং অন্য সকলকে সরাইয়া দিয়া বলিল,—"বাবা, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, মিঠুর এ কাজ; আর তুইও তাকে দেখিয়াছিস্! সে সময় তাকে ধরিতে না গিয়া যদি আগুনটা নিবাইয়া দিতিস্, তবে সকলে আজ পথে দাঁড়াইতিস্ না। যাক্, যা' হবার:তা' হয়েছে; এখন আমার পা ছুঁয়ে দিব্বি কর যে, এ কথা কাউকে বল্‌বি নে—আর এ নিয়ে মোকদ্দমা করবি নে। মিঠুকে ক্ষমা কর্। আমার গুরু মাঝে-মাঝে বলতেন যে, বৈষ্ণবের মনে রাখা উচিত—ক্ষমার চেয়ে ধর্ম্ম নেই। 'ফেলে মারলি কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।'—এই ত আমাদের ভগবানের শিক্ষা! আমার ত শেষ হয়ে এসেছে; এখন তোর মুখে এ কথাটা শুন্‌লে আমি শান্তিতে মরতে পারি।"

ধীরে ধীরে নিতাই বৃদ্ধের পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—সে মিঠুকে ক্ষমা করিবে। বৃদ্ধেরও জীবলীলা সাঙ্গ হইল।

* * * *

মধু বৈরাগীর মৃত্যুর সাত দিন পরে একদিন সন্ধ্যার পর নিতাই তার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ছিল। সে অতি কষ্টে একখানি ঘরের চা'ল ছাওয়াইয়া লইয়াছিল। সে দিনও হলা মণ্ডল মিঠু সেখের নামে ঘরে আগুন দেওয়ার সন্দেহ করিয়া নালিশ করিতে পরামর্শ দিতেছিল। হলা চলিয়া গেলে, নিতাই বসিয়া-বসিয়া মৃত পিতার কথা ভাবিতেছিল—"ফেলে মারলি কলসির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না।" বারবার এই কথাটা তার মনে আসিতেছিল, ক্ষমা করাটা কি এত শক্ত! আজ যদি মিঠু আসে, সে তাকে ক্ষমা করিতে পারে।

এমন সময় কে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল! নিতাইও আর থাকিতে পারিল না। বড় দুঃখ পাইয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সে জীবনে যে শিক্ষা পাইয়াছিল,

তার ফলে সে বাল্যবন্ধু মিঠু সেখকে আলিঙ্গন করিয়া গাঢ় স্বরে বলিল,—"ভাই, তোকে ক্ষমা করলাম। আজ থেকে আয় আবার আগেকার মত দুজনে শান্তিতে থাকি!"

পরদিন গ্রামের লোক দেখিল, মিঠু সেথ ফিরিয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে দুই পরিবারের পুরুষেরা মিলিয়া আবার সমস্ত বাড়ী মেরামত করিল। ইহাতে তাহাদের কিছু জমী-জমা বাঁধা পড়িল বটে—কিন্তু মিঠু ও নিতাইয়ের মনে আর কোন কালিমা রহিল না।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

ভারতী—শ্রাবণ, ১৩২৪

মাসকাবারী—উত্তর-প্রত্যুত্তর।

গত আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে'র সাহিত্য-প্রসঙ্গের উত্তরে—শ্রাবণের 'ভারতী'র 'মাসকাবারী'তে আমাদের নামে অনেক মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হইয়াছে, দেখিলাম। 'মাসকাবারী'র লেখক আমাদের লেখা হইতে "বাতুলতার" ও "কোটেশন-চাতুরীর" পরিচয় দিবার জন্য যথাসাধ্যই চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা তাঁহাদের সফল হইয়াছে কি না, তাহা পরে বলিতেছি। কিন্তু এখানে একটা হাসির কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে কথা এই যে, যিনি গত মাসের 'মাসকাবারী'তে "সাহিত্যে ভদ্রতার আদর্শ" সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহারই কলমের মুখ হইতে এ মাসে ঐ অযথা কুৎসার উৎস উৎসারিত হইয়াছে!—কথায় ও কার্য্যে ইহা এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের চমৎকার নিদর্শন বটে!

যাহা হউক, চাতুরীটা যে কে করিয়াছে, পাঠক এইবার তাহার বিচার করুন! 'ভারতী'র লেখক তাহার 'মাসকাবারী'র "উত্তর-প্রত্যুত্তর" প্রবন্ধে আমাদের কোটেশনের খুঁত দেখাইতে গিয়া লিখিয়াছেন,—"ভূদেব লিখিয়াছেন,—'হিন্দু-সমাজের অনেকটা অন্তঃশাসন জাতি বা সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।... আযোত্তর লোকেরা দেশের অধিপতি হইলেও তাঁহারা সমাজপতি হইতে পারিলেন না।' ইত্যাদি। ভূদেবের এই কথার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বা চিত্তরঞ্জনের কথার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, কেন না হিন্দু-সমাজের 'অন্তঃশাসন' বলিতে ভূদেব পল্লীবাসীর স্বায়ত্ত-শাসন আদৌ বুঝেন নাই।"—এ তত্ত্ব 'ভারতী'র লেখক কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, জানি না। কিন্তু ভূদেব তাঁহার "বিবিধ-প্রবন্ধ" পুস্তকের "বঙ্গসমাজে অন্তঃশাসন" শীর্ষক রচনার আরম্ভেই লিখিয়াছেন,—"হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্ব্বত্রই অন্তঃশাসনের উপায় আছে। অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে ঐ সকল উপায় ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি এখনও এখানে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা নিতান্ত কম নয়। ইংরাজ এ দেশের রাজা হইয়া এবং সর্ব্বত্র আপনার দত্ত ক্ষমতার বিস্তার করিয়া এদেশের সমাজ-শাসন প্রণালী বদ্ধপ্রায় করিয়াছেন। তথাপি কোথাও-কোথাও তাহার কিছু কিছু অবশেষ আছে। সেই অবশিষ্ট ভাগ আমি কিরূপ দেখিয়াছি, তাহা বলিব। কোন সময়ে বৰ্দ্ধমান জেলার একটি গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। গ্রামটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়—উহাতে প্রায় পাঁচ শত ঘর আগুরি জাতীয় লোকের বাস এবং গ্রামের মণ্ডল সংখ্যা পাঁচ জন। ঐ গ্রামের মধ্যস্থলে একটি শিবালয় এবং শিবালয়ের চতুঃপার্শ্বে অতি সুপরিষ্কৃত ভূমি। ঐ দিন অপরাহ্নে গ্রামের পাঁচজন মণ্ডল এবং গ্রামের অপরাপর অনেক লোক চতুঃপার্শ্বে সমবেত হইয়া একটি অপরাধীর বিচার করিলেন। অপরাধ ধান-চুরি। চুরির মাল ধরা হইল, চুরির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, চোরকে আত্মদোষ ক্ষালনার্থ অবসর দেওয়া হইল। চোর অধোবদনে দোষ স্বীকার করিল এবং বলিল যে নিতান্ত দারিদ্র্য নিবন্ধনই সে ঐ কাজ করিয়াছিল। চোর যে পাড়ায় বাস করে সেই পাড়ার মোড়ল তাহার দারিদ্র্যের প্রমাণ দিলেন। তখন পাঁচজন মোড়লে বিচার করিতে লাগিলেন চোরের প্রতি কিরূপ দণ্ড হইবে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহার চৌর্য্যবৃত্তি না বাড়ে তাহার কি উপায় করা যাইবে। শিবালয়ের পুরোহিত ঠাকুর এবং উপস্থিত আরও চারি-পাঁচ জন ঐ বিচারে যোগ দিলেন। পরিশেষে অবধারিত হইল যে, দুইজন লোক চোরের কাণে ধরিয়া পাঁচবার শিবালয় প্রদক্ষিণ করাইবে, আর চোর আপনার পাড়ার মোড়লকে জানাইলে তিনি তাহার মজুরি জুটাইয়া দিবেন অথবা তাহাকে চাউল ধার দিবেন—ধার লইলে তাহাকে খাটিয়া শোধ দিতে হইবে। যাহার ধান চুরি গিয়াছিল, সে ধান লইয়া যাইবার সময় চোরকেই বলিয়া গেল,—"যদি কালিকার কাজ আর কোথাও না জুটিয়া থাকে, তবে আমারই ক্ষেতে যাইও।"—এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমার বোধ হইল যে রাজার শাসন অপেক্ষা গ্রামের শাসন শত সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট। আমি ঐ গ্রাম্য মণ্ডলদিগের মধ্যে একজনকে নিভৃতে বলিলাম "তোমরা চোরের দণ্ড যেরূপ করিলে তাহা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। কিন্তু চোর যদি থানায় গিয়া নালিস করে যে তাহার শারীর দণ্ড করা হইয়াছে, তাহা হইলে কি হইবে? * * * "সে থানায় যাইবে না। আর মনে করুন যদিই যায় তাহা হইলে সে ত গ্রামে আর কাহার স্থানে মজুরি পাইবে না। তাহাকে এ গ্রামের বাস উঠাইতে হইবে।" * * * "ভাল, ঐ ব্যক্তি যদি গ্রামান্তরের

লোক হইত, তাহা হইলে কি করিতে?" * * * "যদি গ্রামের ভিতরেই ধরিতে পারিতাম, ভাল করিয়াই উত্তম-মধ্যম দিতাম, দিয়া ছাড়িয়া দিতাম। * * * "সে নালিশ করিলে কি হইত?" * * * "কিছুই প্রমাণ হইত না।"—কথায়-কথায় জানিতে পারিলাম যে ঐ গ্রামের কোন লোক গ্রামান্তরবাসী কাহার স্থানে টাকা কর্জ্জ করে না। কর্জ্জ করিবার প্রয়োজন হইলে মণ্ডলদিগকে জানায় এবং মণ্ডলেরা গ্রাম হইতেই ঐ টাকা কর্জ্জ দেওয়ায়। ঐ গ্রামের জমিদার যখন আইসেন, তাঁহার যথেষ্ট সম্মান সমাদর করে, তাঁহাকে চাঁদা তুলিয়া দর্শনী দেয়; কিন্তু গ্রামের ভিতরে ঢুকিতে নিষেধ করে। যে জমীদারের অধিকারে ঐ গ্রাম তিনি প্রজাদিগের মন রাখিয়াই চলিতেন দেখিয়াছি। এবং শুনিয়াছি তিনি স্বচ্ছন্দে আপনার ঘরে বসিয়াই যথাকালে খাজনা এবং যাহা আবোয়াব ধার্য্য ছিল, তাহা নির্বিঘ্নে পাইতেন। কিন্তু ওরূপ স্বাধীন-তন্ত্র গ্রাম আর অধিক নাই।" ইত্যাদি।—'ভারতী'র লেখকের কথা পড়িয়া পাছে পাঠকেরা প্রতারিত হন, এই ভয়ে ভূদেবের লেখা একটু বেশী করিয়াই উদ্ধৃত করিলাম। 'অনুশাসন' বলিতে ভূদেব যে 'পল্লীবাসীর স্বায়ত্ত-শাসনই' বুঝিতেন, এ কথা নিতান্ত পাগল ছাড়া আর কেহ বোধ করি এখন অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

'ভারতী'র লেখক আমাদের 'কোটেশনের চাতুরী' ধরাইয়া দিবার জন্য আর এক স্থলে লিখিতেছেন,—"এই জাতিত্বের প্রসঙ্গেই তিনি যে অংশে ভূদেবের লেখা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সেখানে ভূদেব জাতি বলিতে বংশই বুঝিয়াছেন এবং স্পষ্টই বংশের কথা লিখিয়াছেন।"—বটে! কিন্তু ভূদেব তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধে' কি বলিয়া গিয়াছেন, পাঠক তাহা এইখানে একবার দেখুন:—"ইংরাজের ভাব—'তুমি ইংরাজ নহ। তুমি আমার ধর্ম্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।' আমরা হিন্দুজাতীয়। আমরাও জানি যে, এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপর জাতীয় হইতে পারে না—ভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ থাকিয়া জাত্যন্তর হইতে পারে না। আমরা জানি যে, মনুষ্যের দোষ-গুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত।" ইত্যাদি।—এ ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, ভূদেব ও বিবেকানন্দের জাতিত্বের আইডিয়ার সহিত চিত্তরঞ্জনের জাতিত্বের আইডিয়ার যত মিল আছে, রবীন্দ্রনাথের সহিত তত নাই। তবু 'ভারতী'র লেখক চিত্তরঞ্জনের অপহরণ সপ্রমাণ করিবার মতলবে জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে জোর-জবরদস্তি করিয়া, টানিয়া বুনিয়া সে সাদৃশ্য দেখাইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গত আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে' তাঁহার সে চেষ্টা ফাঁসিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি এবার সোজাপথ ছাড়িয়া বাঁকাপথে পদার্পণ করিয়াছেন। অর্থাৎ, বিবেকানন্দের কথাটা বেমালুম চাপা দিয়া ভূদেবকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভূদেব কিন্তু স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছেন,—"আমরা হিন্দুজাতীয়। আমরা জানি যে, এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপর জাতীয় হইতে পারে না ইত্যাদি।"—জাতি সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট কথার মধ্যে যিনি 'বংশের কথা' দেখিতে পান, তাঁহার অসাধ্য কাজ নাই!

'ভারতী'র লেখক লিখিয়াছেন,—"রবিবাবুর প্রস্তাব ছিল এই যে, আমাদের 'আত্ম-শক্তি'র উপর দাঁড়াইতে হইবে, দেশের কল্যাণ কর্ম্ম দেশের লোকেরাই সরকারের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াই করিবার চেষ্টা করিবে। এরূপ প্রস্তাব বঙ্কিম, ভূদেব বা বিবেকানন্দের লেখায় কুত্রাপি নাই।"—তা' বলিবেন বৈ কি? যাঁহাদের আত্ম-শক্তির মন্ত্রের প্রভাবে বাঙ্গালী আজ একটু নড়িতে-চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাঁহাদের লেখার মধ্যে আত্মশক্তির মন্ত্রের অভাব না দেখিলে যে চিত্তরঞ্জনকে গালি দিবার অসুবিধা হয়! কাজেই 'ভারতী'র লেখক একসঙ্গে চারিজনকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন!—সাহিত্যে সাধুতার আদর্শের ইহাও বোধ করি এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত!

ভূদেব, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের লেখায় যদি 'আত্ম-শক্তি'র বোধন না থাকে, তাহা হইলে আর কোথায় যে আছে, তাহা তো জানি না! আনন্দমঠ, কমলাকান্তের দপ্তর, সামাজিক প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, বর্ত্তমান ভারত ও ভাববার কথা প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থই আত্মশক্তির মন্ত্রে পরিপূর্ণ। 'ভারতী'র লেখক বলিতেছেন, যে, 'দেশের কল্যাণ কর্ম্ম দেশের লোকেরাই করিবে, এরূপ প্রস্তাব বঙ্কিম, ভূদেব বা বিবেকানন্দের লেখায় কুত্রাপি নাই।'—কিন্তু আমরা এই তিন মহাত্মার লেখা হইতেই এক-একটি করিয়া উদাহরণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক তাহা পড়িয়া দেখুন, তাহাতে "আমাদের আত্মশক্তির উপর 'দাঁড়াইবার' কথা আছে কি না! ভূদেব তাঁহার "সামাজিক প্রবন্ধে" বলিতেছেন,—"আপনাদিগকে ইংরাজ সমাজের অন্তর্ভূত মনে করিয়া তাঁহাদের দলাদলিতে মিলিতে হইবে না এবং তাঁহাদের মুখাপেক্ষিতা যতদূর সম্ভব পরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অবধারণ করিতে হইবে।" তার পর বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' বলিতেছেন,—"মাতাকে পূজা করিতে শেখ, এক মায়ের সন্তান বলিয়া স্বদেশীগণকে ভাই মনে করিয়া ভালবাসিতে শেখ। ধনের গর্ব্ব, বিদ্যার গর্ব্ব, বর্ণভেদের গর্ব্ব ছাড়িয়া সকলে এক হও, এক হ'য়ে মাকে পূজা কর। আত্মোৎসর্গ শিক্ষা কর, কিন্তু যতদিন সাহেবদিগের সমকক্ষ না হও, সাহেবদিগের সহিত বিবাদ করিও না। যখন ইংরেজের সমকক্ষ হইবে, তখনকার আনন্দমঠ তখনকার গ্রন্থকার রচনা করিবেন। * * * এক্ষণে বিবাদের সময় নহে, এক্ষণ শিক্ষার সময়, এক্ষণ তপস্যার সময়, এখন বর প্রার্থনার সময় নহে। ব্রত অবলম্বন কর, সন্ন্যাসী হও, শক্তিশালী হও।" তার পর বিবেকানন্দ তাঁহার "বর্ত্তমান ভারতে" কি বলিতেছেন, শুনুন,—"সর্ব্ববিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা শক্তির স্ফূর্ত্তি কখনও হয় না। সর্ব্বদাই শিশুর ন্যায় পালিত হইলে অতি বলিষ্ঠ যুবাও দীর্ঘকায় শিশু হইয়া যায়। দেবতুল্য রাজা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পালিত প্রজাও কখনও স্বায়ত্ত-শাসন শিখে না; রাজমুখাপেক্ষী হইয়া ক্রমে নির্ব্বীর্য্য ও নিঃশক্তি হইয়া যায়। ঐ 'পালিত'

'রক্তি'ই দীর্ঘস্থায়ী হইলে সর্ব্বনাশের মূল।"……"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাস-সুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, * * * ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"—আত্মশক্তির উপর দাঁড়াইবার এমন সব কথা বাঙ্গালার আর কোনও লেখকের লেখায় পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনি 'বিশ্ব-সাহিত্য' লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন, তিনি বাঙ্গালী হইয়াও বঙ্গ-সাহিত্যের কোনই খবর রাখেন না! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এবং হাসির বিষয় এই যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের কোনও খবর না রাখিয়াই তিনি তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন!

যাউক, আর আবর্জ্জনা ঘাঁটিব না। এখন আমাদের শেষ কথা এবং প্রধান কথা এই যে, 'ভারতী'র লেখক, কবিবর রবীন্দ্রনাথের যে সকল উক্তিকে ওরিজিনাল আইডিয়া বলিয়া মনে করেন, তাহার উণ্টা মতও যে রবীন্দ্রবাবুর লেখার মধ্যে পাওয়া যায়;—তাহার কি! 'ভারতী'র লেখক বলিতেছেন,—'রবীন্দ্রনাথ পরাধীন জাতির পরাধীনত্ব সম্পূর্ণ মানিয়াই কতটা আত্মশক্তির অধিকার ও চর্চ্চা সেই পরাধীনতার অবস্থার মধ্যেও পূর্ব্বকালে বজায় ছিল এবং এখনও থাকিতে পারে, তাহাই আলোচনা করিয়াছেন," ইত্যাদি। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আবার একদিন রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিরোধ দেখিয়া পুন তাহার সমর্থনও করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ব্রতধারণ' নামক প্রবন্ধের একস্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই সুস্পষ্ট রূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে? রাজাও পারিলেন না; আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে, যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না।"—'ভারতীর' লেখক আমাদের এই শেষের উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া কি বলিবেন!

মানসী—আষাঢ়, ১৩২৪

আলোচনা—বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলন।—

ব্যাপারটা বেশী বিস্ময়কর কি বেশী বিদ্রূপকর পাঠকবর্গ তাহার বিচার করুন:—

ব্যাপার এই যে, নিমন্ত্রণকারী নিমন্ত্রিত জনগণের প্রাণ খুলিয়া কুৎসা-কীর্ত্তন করিয়াছেন! নিমন্ত্রণ আবার যে-সে স্থানে নহে—সাহিত্য-সম্মিলনে। গতবারের সাহিত্য-সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইয়া বাঁকীপুরে যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে—নিমন্ত্রণকারীদেরই একজন—অর্থাৎ, অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার এই 'আলোচনা'য় বেশ একটু উত্তম-মধ্যম দিয়াছেন! ইহার পূর্ব্বে, যশোহরে যখন সাহিত্য সম্মিলন হয়, তখন সেখানকার একখানি সাপ্তাহিক পত্র নিমন্ত্রিতগণকে 'কাবুলী দাওয়াএর' ভয় দেখাইয়াছিলেন! এখন দেখিতেছি বাঁকীপুর সাহিত্য-সম্মিলন সেই কথাটাকে কার্য্যে পরিণত করিলেন!

কি সামাজিক কি সাহিত্যিক সকল নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যেই দেখা যায়, নিমন্ত্রিতেরা নিমন্ত্রণকারীর আয়োজন, অভ্যর্থনা ও অতিথি-সৎকারের নানা খুঁত ও ছল ধরিয়া নানা নিন্দা ও কুৎসা রটনা করিয়া থাকেন; বিবাহের বরযাত্র হইতে সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিনিধি পর্য্যন্ত কেহই এই সনাতন নীতির অনুসরণ করিতে লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম দেখিয়াছি, বাঁকীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে। প্রত্যেক বৃহৎ কার্য্যেই ত্রুটী হয়, বাঁকীপুর-সাহিত্য-সম্মিলনেরও যে কোন ত্রুটী হয় নাই বা হইতে পারে নাই, তাহা নহে। এবং নিমন্ত্রিত বাঙ্গালীও যে ছলধরা স্বভাব ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহাও নহে। শুধু বঙ্গের বাহিরের প্রবাসী বাঙ্গালীর সাদর নিমন্ত্রণ বলিয়া বঙ্গবাসী এবার কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু জাতীয় রীতি বজায় রাখিবার জন্য নিমন্ত্রণকারী বাঁকীপুর-সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় 'মানসী' পত্রিকায় আজ ছয় মাস পরে শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ ও শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ নিমন্ত্রিতগণের দোষ এবং অপরাধ-কাহিনীর তালিকা দিয়াছেন! সমাদ্দার মহাশয় লিখিতেছেন "প্রথম গোলমাল আরম্ভ হইয়াছিল নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া। অভ্যর্থনা সমিতি মনে করিয়াছিলেন যে, মাতৃ-পূজায় ব্যক্তিগত আহ্বানের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এ বিষয়ে পরিষদের সহিত তাঁহারা পারিয়া উঠিলেন না; পরিষদ না-ছোড়বান্দা হইয়া লিখিলেন পরিষদের প্রত্যেক সদস্যকে নিমন্ত্রণ করিতেই হইবে।" পূর্ব্বাপর প্রচলিত প্রথা এই যে, সাহিত্য-সম্মিলন হইতে পরিষদের সকল সদস্যকেই নিমন্ত্রণ করিতে হয়; হঠাৎ কিন্তু দশম সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিলেন যে ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণের দরকার নাই। সেই আব্দার বজায় রাখিবার জন্য জগদীশ বাবু, রামেন্দ্র বাবু ও যতীন্দ্র বাবু প্রভৃতি প্রত্যেককে পত্র লিখিয়া তাঁহারা জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলকে নিমন্ত্রণ না করিলে তাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, এ কথা কর্ত্তব্যের অনুরোধ পরিষৎ জানাইতে বাধ্য হইলেন। যোগীন্দ্র বাবু উহাই পরিষদের জিদের নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহাতে দশম বার্ষিক সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃ-

পক্ষের অদ্ভুত জিদের নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। পরিষদের সকল সভ্যকে নিমন্ত্রণ করার আপত্তির আর একটা কারণ সমাদ্দার মহাশয় লিখিয়াছেন,—"যেবার কলিকাতায় সাহিত্য-সম্মিলন হয় সেবার পরিষদ, সাহিত্য সভা ও সাহিত্য-সম্মিলনের কর্তৃপক্ষগণ সমবেত হইয়া উদ্যোগাদি করিয়াছিলেন, সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণকে নিমন্ত্রণ করিলে সাহিত্য সভা ও সাহিত্য-সম্মিলনের সদস্যগণকেও ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ করিতে হয়।" আমাদের মনে হয় যখন কলিকাতার সম্মিলনের পর আর দুইটী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, তখন সে কথা বাঁকীপুর-সম্মিলনের ভাবিবার দরকার ছিল না; বর্দ্ধমান ও যশোহরে যে ভাবে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল সেই ভাবে নিমন্ত্রণ করিতেই তাঁহারা বাধ্য।—সাহিত্য সভা বা সাহিত্য-সম্মিলনের ছুতা তাঁহাদের তুলিবার হেতু ছিল না।

সমাদ্দার মহাশয় জানাইতেছেন, "পরিষদের জিদ বজায় রহিল, ৩৫০০ নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইল; পরিষদ জানাইলেন ৫০০ প্রতিনিধি উপস্থিত হইবেন; অন্যান্য সভা সমিতি হইতেও ঐরূপ তালিকা আসিতে লাগিল। পরে দেখা গেল মাত্র দুইশত প্রতিনিধি উপস্থিত।"

ইহাতেও যে সমাদ্দার মহাশয় ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলেন না, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। যেখানে ৪০০০ ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়া, ১০০০ জনের উপস্থিতির প্রতিশ্রুতি-পত্র পাইয়াও পরে মাত্র দুইশত জন প্রতিনিধি উপস্থিত দেখিলেন, সেখানে ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ না করিয়া Come one and all লিখিয়া খবরের কাগজে ছাপিয়া দিলে কয়জন উপস্থিত হইতেন, তাহা অনুমান করা কি এতই কঠিন?

পরে সমাদ্দার মহাশয় প্রতিনিধিদের দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—(১) নবমবর্ষীয় একটা স্বেচ্ছা-সেবককে একজন প্রতিনিধি তামাকু প্রস্তুতের আদেশ দেন; পরে প্রস্তুত তামাকু মনোনীত না হওয়ায় "তামাক সাজিতে জান না, ভলণ্টিয়ার হইতে আসিয়াছ কেন?" বলিয়া তিরস্কার করেন। (২) একজন প্রতিনিধি একজন ভলাণ্টিয়ারকে জুতা রৌদ্রে দিতে বলেন। (৩) হাইকোর্ট দেখিতে যাইবার গাড়ী দিতে দেরী হওয়ায় দুইজন প্রতিনিধি তাঁহাদের "জুয়াচোর" "মিথ্যাবাদী" সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভদ্র-সন্তানেরাই স্বেচ্ছা-সেবক রূপে কার্য্য করেন এবং ভদ্র-সন্তানগণই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া সম্মিলনে যান। এই উভয় দলের কাহারও নিকটই কেহ কোন প্রকার অভদ্রতা আশা করেন না। তবে দুইশত জন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মধ্যে দু-চার জন অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি থাকাও অসম্ভব নহে। আর এক কথা; নিমন্ত্রণকারী সকল সময়েই একব্যক্তি বা ব্যক্তির সমষ্টি; তাঁহাদের নিযুক্ত সামান্য একজন ভৃত্যের কৃত অশিষ্টতার জন্যও তিনি বা তাঁহারা দায়ী; কিন্তু নিমন্ত্রিতগণ সকলেই পৃথক, তাঁহাদের একের কার্য্যের জন্য অপরে দায়ী হইতে পারেন না। সমাদ্দার মহাশয় যদি ঐ অমার্জ্জনীয় অভদ্রতা উপেক্ষা করিতে না পারিলেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ সকল ব্যক্তির নাম-ধাম সহ ঘটনার উল্লেখ করা উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। তাহা হইলে হয় তো অভিযুক্ত প্রতিনিধিদেরও বক্তব্য শুনিতে পাইতাম। তাঁহারা প্রকৃত অপরাধী কি না, তখন তাহার বিচার চলিত।

সমাদ্দার মহাশয়ের শেষ অভিযোগ, প্রতিনিধির দেয় ফি অনেক প্রতিনিধি দেন নাই; তাঁহারা বলেন যে তাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন, প্রতিনিধিত্বের ধার ধারেন না, বিষয় নির্ব্বাচন সমিতিতেও তাঁহারা ভোট দিবার প্রয়াসী নহেন। আমরা জানিতে চাহি যে, প্রত্যেক প্রতিনিধির অবশ্য দেয় বলিয়া কিছু বাস্তবিক স্থির হইয়াছিল কি না? যদি হইয়া থাকে তবে উহা নিমন্ত্রণ-পত্রে ছাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল কি না? যদি সকলের অবশ্য দেয় না হয়, যাঁহারা বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতিতে ভোট দিতে চান, তাঁহাদেরই অবশ্য দেয় হয়, তাহা হইলে সমাদ্দার মহাশয়ের অত রাগ প্রকাশ করাটা কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? সমাদ্দার মহাশয়, অনেক প্রতিনিধি দেয় ২্ টাকা দেন নাই বলিয়া, দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু একজন প্রতিনিধিই যে ১০০০্ দিয়াছেন শুনিয়াছিলাম, সেটি কি তবে ভুল?

সমাদ্দার বলিতেছেন,—"যাঁহারা নিমন্ত্রণ-পত্র পান নাই, তাহাদের একজন এ সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে আন্দোলন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে সত্যের অপলাপ করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে প্রমাণিত হইয়াছে। তাহার পুনরুক্তি করিয়া পুনরায় তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিব না।"—লেখকের ক্ষমা অসীম বলিতে হইবে! যাহা হোক, আমাদের নিজের কথা বলিতে চাহি না; কিন্তু 'নব্যভারতের' সম্পাদক, 'সবুজপত্রের' সম্পাদক, ও 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির মত সাহিত্যিকগণকে নিমন্ত্রণ করিতে যাঁহারা ভুলিয়া যান, তাঁহাদের ক্রটিকে সামান্য বলিয়া ত বোধ করি না। —যাহা কখনও কোন সম্মিলনে ঘটে নাই, তাহাই এ সম্মিলনে হইয়াছে!

এই 'আলোচনা'র মধ্যে একটি সত্য কথা আছে; তাহা এই,—"বঙ্গের বাহিরে এই প্রথম সম্মিলনকে সকলেই কৃপার চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমাদিগকে অনেক অসুবিধার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইয়াছিল।"—তাই বোধ করি লেখক 'সকলে'র উপর ঝাল ঝাড়িয়া ইহার প্রতিশোধ লইলেন! প্রতিনিধিরা এ লেখা পড়িয়া অনায়াসে বলিতে পারেন—"যে তোমাকে প্রেম শিখালে, তাকে তুমি খুব শিখালে।" শ্রদ্ধেয় পূর্ণেন্দুনারায়ণ ও অধ্যাপক যদুনাথ যে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্য, সেই সমিতি হইতে এইরূপ 'আলোচনা' বাহির হইতে দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছি!

পুস্তক-পরিচয়

PROMOTION of LEARNING IN INDIA DURING MUHAMMADAN RULE (By Muhammadans), By Narendranath Law, M. A. (P. R. S.), Longmans, Green & Co. 15s.

ইহা আশার কথা বলিতে হইবে যে, ভারতেতিহাস সম্প্রতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; তাঁহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দিন-দিন অতীতের অন্ধতম প্রদেশ হইতে নানা উপাদান সংগৃহীত হইতেছে। নরেন্দ্রবাবু ইঁহাদের অন্যতম; তিনি বহু পরিশ্রমে মুসলমান যুগে ভারতে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে এরূপ বিস্তৃতভাবে পূর্ব্বে আর কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস, নরেন্দ্রবাবুর উদ্যম সফল হইয়াছে। বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে তাঁহার পুস্তকের সমাদর দেখিলে আমরা সুখী হইব। গ্রন্থকার নানাস্থান হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র সংগ্রহ করিয়া পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; ইহাতে গ্রন্থের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

দু'একটা ভ্রম-সংশোধন আবশ্যক। ৯৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার ফেরেশ্‌তা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন:—"প্রথম ইব্রাহিম আদিল শাহের রাজত্ব কালে রাজস্ববিভাগের হিসাব ফার্সীর পরিবর্ত্তে হিন্দী ভাষায় রক্ষিত হইত।" ফেরেশ্‌তা 'Hindi' লেখেন নাই—'Hindvy' (বা হিন্দু-ঈ) লিখিয়াছেন। ইহার অর্থ 'ভারতীয়'—হিন্দী ভাষা নহে। ১৯ পৃষ্ঠা:— বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী কুতবুদ্দীনের Lieutenant ছিলেন না। এ কথা প্রামাণিক গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরী' স্বীকার করে না। মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ (১৭০৪-২৫ খ্রীঃ) আলিবর্দ্দী খাঁ, মীর কাশিম প্রভৃতির কথা, Pre-Mughal Periodএ সন্নিবিষ্ট না হইয়া Mughal Period অধ্যায়ে দেওয়া উচিত ছিল।

লাইকা

শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী প্রণীত; মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্-প্রকাশিত আট আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার পঞ্চদশ গ্রন্থ। এই গল্পটী যখন পত্রান্তরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়, তখন আমরা পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। শ্রীমতী হেমনলিনী আমাদের 'ভারতবর্ষে' ও অন্যান্য মাসিকপত্রে মধ্যে-মধ্যে ছোট গল্প লিখিয়া যে যশঃ লাভ করিয়াছেন, এই 'লাইকা'তে সে যশঃ অক্ষুণ্ণ আছে। 'লাইকা'র উপাখ্যান-ভাগ অতি মনোরম; শ্রদ্ধেয়া লেখিকার বর্ণনা-কৌশলের পরিচয়ও নূতন করিয়া দিতে হইবে না। পাঠক-পাঠিকাগণ এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন।

আলেয়া

শ্রীনিরুপমা দেবী প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানিও আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অন্যতম গ্রন্থ। আজকাল গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া যে সকল মহিলা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন, শ্রীমতী নিরুপমা তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার লেখায় এমনই একটা আন্তরিকতা থাকে এবং তিনি এমন সুন্দর করিয়া কথা বলেন যে, তাঁহার লেখা পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। এই 'আলেয়া'তে পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। ইহা উপন্যাস নহে, কয়েকটী ছোট গল্পের সমষ্টি; যথা— আলেয়া, প্রত্যাখ্যান, নূতন পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, সুখী। গল্প কয়টাই সুন্দর; তথাপি তাহার মধ্য হইতে আলেয়া ও প্রায়শ্চিত্ত এই গল্প দুইটীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নকল পাঞ্জাবী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত; মূল্য আট আনা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত আট আনা গ্রন্থমালার অষ্টাদশ গ্রন্থ। ইহাতে তিনটী প্রস্তাব আছে; শেষ প্রস্তাব 'নকল পাঞ্জাবী' নামে কিছু দিন পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সকলেই গল্পটীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে লেখক শ্রীমান উপেন্দ্রনাথ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব নূতন লিখিয়া এই পুস্তকখানি আট আনা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। লেখকের লিখন-ভঙ্গী অতি সুন্দর, বলিবার রকম দেখিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভূত হয়; ব্যঙ্গবিদ্রূপ এমন সরল ও সহজ ভাবে করা হইয়াছে, যে তরতর করিয়া পড়িয়া যাওয়া যায়, এবং পড়িলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এমন ভাবে গল্প বলিয়া যাওয়া পাকা ওস্তাদের কাজ। প্রস্তাব তিনটীর আখ্যানভাগও বেশ হাস্যরসাত্মক। এ পুস্তকখানির যথেষ্ট আদর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ভাষা ও সুর

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ প্রণীত; মূল্য এক টাকা।

এখানি কবিতা-পুস্তক। কবিতা-পুস্তকের নাম শুনিলেই আমরা এখন ভীত হইয়া থাকি;—না জানি তাহার মধ্যে কত কি আছে! কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, এই কবিতা-পুস্তকের মধ্যে তেমন কত-কি নাই; তাই আমরা এই পুস্তকখানির পরিচয় দিতেছি। কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাল, তেমন টানিয়া-বুনিয়া মিল দেওয়া নয়। তাহার পর কবিতাগুলি আমরা বুঝিতে পারিলাম। লেখক মহাশয়ের চেষ্টাও নিষ্ফল হয় নাই, ইহা বলিতে পারি। কবিতাগুলি সমস্তই উপভোগ্য।

জলপ্লাবন

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত; মূল্য একটাকা।

এখানি ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ একখানি উপন্যাস। দামোদরের প্রবল বন্যার সময় বর্দ্ধমানের এক সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর একটা ঘটনা অবলম্বন করিয়া সুলেখক শ্রীমান মুনীন্দ্রপ্রসাদ এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। অর্থলোভে ভদ্রলোকের ছেলে কেমন হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে, কেমন পিশাচ হইতে পারে, অহিভূষণের চরিত্রে তাহা সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছে; আবার নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে পড়িয়া নানা নির্যাতন সহ্য করিয়াও মানুষ কেমন স্থিরচিত্ত, কেমন ক্ষমাশীল, কেমন দেবচরিত্র হইতে পারে, রমেন্দ্রকিশোর তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। জলপ্লাবন গল্পে এই দুইটী চরিত্রেরই সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। গল্পটীর আখ্যানভাগও সুন্দর ভাবে কল্পিত; এবং সুলেখকের হাতে পড়িয়া তাহা সুপাঠ্য হইয়াছে।

লিখন

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত; মূল্য আট আনা।

'লিখন' ছোট গল্পের সংগ্রহ; ইহাতে নয়টী ছোট গল্প আছে। প্রথম গল্প 'লিখনে'র নামানুসারেই পুস্তকখানির নামকরণ হইয়াছে। 'লিখন' গল্পটী পাঠ করিলেই লেখকের লিপি চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। যে বংশে বন্ধুবর পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীমান সুবোধচন্দ্র যে গল্প লেখার আর্টে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবেন, তাহা আর আশ্চর্য্য কি! সত্য সত্যই, এই লিখনের প্রত্যেক গল্প পড়িয়াই বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্র ও শৈলেশচন্দ্রের কথা মনে পড়িয়াছে; তাঁহাদের মত মুন্সীয়ানা সুবোধচন্দ্রের প্রত্যেক গল্পে দেখিতে পাওয়া যায়। গল্প-সাহিত্যে 'লিখন' উচ্চস্থান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ দাবী রাখে।

অশ্রুকণা

৺ধরেন্দ্রবালা সিংহ প্রণীত; মূল্য এক টাকা।

এই 'অশ্রুকণা'র পরিচয় দিতে বসিয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না। লেখিকা আর ইহজগতে নাই, বিধবা সকল সন্তাপ হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া স্বামীর চরণতলে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন; তাঁহার অশ্রুপাত সার্থক হইয়াছে; তাঁহার সাশ্রু-নিবেদন সর্ব্ব-সন্তাপহারীর চরণে পৌঁছিয়াছে,—অশ্রুকণা সার্থক হইয়াছে। এই 'অশ্রুকণা' পড়িতে-পড়িতে, শ্রদ্ধেয়া কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা'র কথা মনে পড়ে,—সেই এক সুর, সেই এক হৃদয়ভেদী ক্রন্দন। পাঠক-পাঠিকাগণ শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রু-কণা'র 'উৎসর্গ' মনে করুন; ঠিক সেই সুরে সুরে বাঁধিয়া ধরেন্দ্রবালা বলিতেছেন—

"কণা কণা ক'রে যত অশ্রু আমি
ঢেলেছি তোমার লাগি'
লও লও তাই হে জীবন-স্বামী!
হে মোর দুখের ভাগী;
দিয়েছিলে যাহা তা' ছাড়া আমার
কি আর দিবার আছে?
সুখী হও যদি আসিয়া আবার
দাঁড়াব তোমার কাছে।"

অষ্টক

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা।

আটটী ছোট গল্পে বইখানি সমাপ্ত, তাই ইহার নাম 'অষ্টক।' ভ্রাতা ও ভগিনী দুইজনে এই আটটী গল্প লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে পক্ষীরাজ, বোবার ডায়ারী, স্নেহের সাজ্জারী, এই গল্প তিনটী বিভূতি বাবুর লেখা; আর ব্রতভঙ্গ, চাঁদের আলোর প্রাণী, প্রত্যর্পণ, অপমান না অভিমান, এই চারিটী শ্রীমতী নিরুপমার লেখা; অবশিষ্ট একটী—"অগ্নিশুদ্ধি"—কাহার লেখা, তাহার উল্লেখ নাই। ভ্রাতা ও ভগিনী দুইজনেরই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা আছে, দুইজনেরই লেখা সকলে আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। 'অষ্টকে' সে প্রতিষ্ঠার হ্রাস হয় নাই; তবে এই অষ্টকের মধ্যে বিভূতি বাবুর অপেক্ষা শ্রীমতী নিরুপমার গল্পের সৌন্দর্য্যই বেশী ফুটিয়াছে; প্রমাণ—ব্রতভঙ্গ, প্রত্যর্পণ; অগ্নিশুদ্ধির প্রশংসা কাহার প্রাপ্য জানি না। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ও 'দিদি'র লেখিকার নিকট হইতে আমরা যে কত বেশী আশা করি, তাহা বলিতে পারি না।

পুণ্যের সংসার

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা।

'পুণ্যের সংসার' উপন্যাস। লেখক শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে 'দেবী ও দানবী' লিখিয়া ছিলেন, এবার 'পুণ্যের সংসারের' পবিত্র চিত্র দেখাইতেছেন। গল্পটীর আখ্যানভাগ সুন্দর, লেখকের লিপি-কুশলতাও প্রশংসনীয়। অনেকেই এখন গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখিয়া থাকেন; তাহার মধ্যে অনেকগুলিই যেন মনগড়া বলিয়া মনে হয়, গৃহস্থের ঘরে তেমন চিত্র বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; বৃন্দাবন বাবুর চিত্রের বিরুদ্ধে সে কথা বলা যায় না। চিত্র বেশ হইয়াছে। গল্পের পরিচয় দিবার স্থান আমাদের নাই, চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে গেলেও পরিচয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে। নবীন লেখকের আমরা প্রশংসা করিতেছি।

যৌতুক

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষাল, এম্-এ, বি-এল্, সরস্বতী, কাব্যতীর্থ, বিদ্যাভূষণ, ভারতী প্রণীত, মূল্য একটাকা।

শ্রীযুক্ত ঘোষাল মহাশয় অদ্ভুত লেখক। তাঁহার লেখনী হইতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, সমস্তই বাহির হইতে থাকে; এবং সে সকল বিষয়েই তাঁহার গভীর গবেষণার, উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা কম শক্তির পরিচয় নহে। প্রমাণস্বরূপ এই 'যৌতুক' বইখানাই লওয়া যাইতে পারে। ইহাতে সাতটি ছোট গল্প আছে; 'ভারতবর্ষ' ও অন্যান্য মাসিকপত্রে এই গল্পগুলি যখন প্রকাশিত হয়, তখন সকলেই এগুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন এই গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমরাও সেই প্রশংসার প্রতিধ্বনি করিতেছি। শ্রীযুক্ত শরৎবাবু যখন যাহা লেখেন, তাহাই আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করি; আমাদের পাঠকগণ এই 'যৌতুক' লাভ করিয়া যে আনন্দিত হইবেন, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিয়া দিতেছি।

শুভক্ষণ

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল]

১

আমার স্বামী যখন দ্বিতীয় পক্ষে আমাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলেন, তখন আমার বয়স ষোল, আর তাঁর চল্লিশের কাছাকাছি। কবিদের হিসাবে না কি এই ষোল বছর বয়সটা অতি ভীষণ—এই দুরন্ত সন্ধিক্ষণে জগতে যে কত কাণ্ড ঘটে গেছে, তার ঠিকানা নেই। হতে পারে সত্যি, কিন্তু সে তখন বুঝিনি, যখন বধূবেশে, আমার স্বামীর পেছনে-পেছনে মঙ্গল-শঙ্খের আওয়াজের সঙ্গে এই ঘরে ঢুকেছিলাম। আমার স্বামীও নিশ্চয় বোঝেন নি—কেন না তিনি কোনও রকম ক'রে বিবাহ-কার্য্যটা সেরেই আপনার একরাশ বইএ মনোনিবেশ করলেন! শুক্‌নো বইএর পাতাগুলোর ভেতর তাঁর জন্যে যে কি রস সঞ্চিত ছিল, তা তিনিই জানতেন; কিন্তু তাদের ভেতর নিশ্চয়ই এ কথা ছিল না যে ষোল বছরের স্ত্রীর বয়স ষোল—চল্লিশ নয়! বলেছি ত', সে সত্যের অনুভব আমারও গোড়াটায় হয় নি! আমার কাজ কতকটা কৈলাসে নন্দীর কাজের মত দাঁড়িয়েছিল,—দিবারাত্র আমি স্বামীর সারস্বত-কুঞ্জের পাহারায় নিযুক্ত থাকৃতাম। যথাসময়ে খাইয়ে-দাইয়ে তাঁকে সেই বইএর স্তূপের মাঝখানে পৌঁছিয়ে দিয়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে প্রতীক্ষা করতাম, কখন আবার তাঁর মৃদু কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে পাই,—'সরোজ ও ঘর থেকে লাল রংয়ের মোটা সংস্কৃত বইখানা নিয়ে এসো' 'পেন্সিলটা হারিয়ে গেছে খুঁজে দেও' ইত্যাদি! আমি ভাবতাম স্বামী-স্ত্রীর এই বুঝি সম্বন্ধ! কিন্তু গোল হ'য়েছিল এইখানেই! বাইরের আক্রমণ থেকে সেই হরিণেরই বিপদের সম্ভাবনা কম, যে জানে আক্রমণ জিনিষটা কি; কিন্তু যে বেচারা মোটেই সে কথা জানে না, আক্রমণের সময় তার বাঁচবার উপায়ই থাকে না! এই কথাটা যদি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিত যে, ষোল বছরের মানব-হরিণীকে আক্রমণ করবার জন্যে বাছা বাছা শাণিত অস্ত্র নিয়ে নর-ব্যাধরা দিবারাত্র চারিদিকে কেবলই সন্ধান খুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

২

বেশ মনে পড়ে সেই দিনকার কথা। সে এক বর্ষার সন্ধ্যাবেলা, ঝর-ঝর ক'রে অবিরাম জল পড়ছে, আকাশে কালো মেঘের ঘন-স্তূপ, মাঝে-মাঝে মেঘের ডাকে মনে হ'চ্ছিল যে পৃথিবী যেন কাঁদছে! তখন ঠিক বুঝতে পারিনি, কিন্তু আমার মনের মধ্যেও একটা কান্নার সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল! কিছু ভাল লাগ্‌ছিল না—মেঘের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসেছিলাম, চোখও কি জানি কেন জলে ভরে' এসেছিল। স্বামী তখন কাগজ পেন্সিল নিয়ে ঘর কেটে কি একটা শক্ত অঙ্ক ক'স্‌ছিলেন! এমন সময় সিঁড়িতে আওয়াজ হোলো, আর তার পর-মুহূর্ত্তেই একটি সুন্দর ছিপ্‌ছিপে যুবক "সতীশ-দা" বলে ঘরে ঢুক্‌তে-ঢুক্‌তে আমাকে দেখে দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে গেল! আমার স্বামী বল্‌লেন "এই যে বিপিন এসো!" বিপিন কহিলেন, "যা বৃষ্টি, ভিজে গিয়েছি, রক্ষে পাবার জন্যে অবশেষে তোমার এখানে ঢুক্‌লাম।" স্বামী কহিলেন, "বেশ ক'রেছো।" তার পর লজ্জিতা আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন,

"ওকে লজ্জা কি,—ও যে আমাদের বিপিন্।" ব'লে তাঁর দুরূহ অঙ্ক-সাগরে নিমজ্জিত হ'লেন। বিপিন আমার পানে চাহিয়া কহিল, "বৌঠা'ন, তুমি আমাকে লজ্জা ক'রে আমার এ আশ্রয়টিকে ভেঙ্গে দিও না! ছোট-বেলা থেকে সতীশ-দার কাছে এইখানে অঙ্ক ক'সে-ক'সে এতবড়টী হয়েছি—দোহাই তোমার!" কথাটা শুনে আমার চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে হাসি এলো। কি সহজ-সুন্দর কথা! ছুরির মতন বেঁধে! এমন কথা বিয়ে হয়ে অবধি একটি-বারও শুনিনি! মোটা সংস্কৃত বইএও নেই, অঙ্কশাস্ত্রেও নেই! উত্তরে আমি শুধু হাস্‌লাম! বিপিন আস্তে কহিল, "তবু ভাল, আমার ভাগ্যে ওই হীরের মত পরিষ্কার হাসিটিও পেয়েছি!" কথাটা আমার ভাল লাগ্‌ল বটে, কিন্তু স্বস্তি দিল না। আমি আমার স্বামীর দিকে ফিরে চাইলাম, দেখ্‌লাম তিনি তখন বহুদূরে! বিপিন আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে দেখে ভারি লজ্জা কর্‌ছিল! ঠিক এই সময় স্বামী মুখ তুলে বল্‌লেন "সরোজ, ওকে আজ খাইয়ে দাও না।" বিপিন মহা আগ্রহে কহিলেন "কোন আপত্তি নেই!" আপত্তি যদি কারো থাকা উচিত ছিল ত' সে আমার! কিন্তু আমারো যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিল! এই খানিক আগে যে মনের মধ্যে কাহার সাড়া প'ড়েছিল, সেখানে কিসের একটা নতুন আনন্দ পেতে লাগ্‌লাম! তারি ঝোঁকে অল্প সময়ের মধ্যে রেঁধে-বেড়ে এমন খাওয়া খাইয়ে দিলাম যে, বিপিনের দশমুখে তার সুখ্যাত ধরে না! আমার স্বামীর সাম্‌নে বল্‌লে "এমন সুন্দর রান্না কখ্‌খনো খাইনি!" শুনে আমার স্বামী বল্‌লেন "হাঁ সরোজ রাঁধে ভাল!" স্বামীর কথা শুনে আমার একটু রাগও হোল! এই কথাটা কই তিনি এর আগে ত একবারও বল্‌তে পারেন নি! ভাল রাঁধার জন্যে যে একটা লোক প্রশংসা পেতে পারে, সে কথাটা তাঁর একেবারেই মনে হয়নি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আর একজন তার শত-মুখের সুখ্যাত তাঁকে মনে করিয়ে দিলে! খেয়ে-দেয়ে আমার হাত-থেকে জোর ক'রে ছুটোর জায়গায় চারটে পান কেড়ে-কুড়ে নিয়ে বিপিন যখন ফিরে গেল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদ উঠেছিল। আমার মনটা কেমন যেন পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল, তাই আজ প্রথম স্বামীর স্বারস্বত-কুঞ্জের পাহারা ছেড়ে ছাতের উপর গিয়ে বস্‌লাম।

৩

সেই রাত্রি থেকেই অপ্রত্যাশিত হরিণীকে লক্ষ্য ক'রে ব্যাধের শীকার সুরু হ'য়ে গিয়েছিল! সে আমি এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি। তখন জান্‌তাম না! তখন মনে হ'ত এই একটা জগৎ, যেখানে পাহারার পীড়া নেই, কিন্তু আনন্দ যথেষ্ট আছে! স্বামী কলেজে পড়াতেন। তিনি যখন বেরিয়ে যেতেন, তখন আমার মনটা ছট্‌ফট্ করতে থাক্‌তো, কখন বিপিন আস্‌বে! আমি জান্‌তাম যে, আমি বাড়ীতে একা থাক্‌তে সে আস্‌বে না, কিন্তু মন সেই অসময় থেকেই তার প্রতীক্ষা কর্‌ত! সে আমাকে ইংরাজি-বাংলা-সংস্কৃত পড়াত, এবং তারই মধ্যে বেছে-বেছে শ্লোক মুখস্থ করাত। সেই সব শ্লোকের মধ্যে যে উন্মাদনা ছিল, তা'তে আমার শিরা-উপশিরা রি-রি কর্‌তে থাক্‌তো! বিপিন বড়লোকের ছেলে ছিল; সে তা'দের দেশের, সমৃদ্ধির কথা ব'লে আমাকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল! সেখানে নাকি বড়-বড় বাগান আছে,—সেখানে স্ত্রীলোকদের স্বচ্ছন্দ-গতি,—সেখানে কত ফুল, কত ফল, কত আমোদ! কলকাতার ছোট অন্ধকার ঘরের ভেতর বন্ধ থেকে আমার মন যে মাঝে-মাঝে সেই অবাধ-স্বচ্ছন্দতার জন্যে তৃষিত হ'য়ে উঠ্‌ত না, এমন কথা বল্‌তে পারিনে। বিপিন আমাকে দামী দামী গহনা উপহার দিয়েছিল, ব'লেছিল যে আমার গুণের শতাংশেরও সমান তা'দের দাম নয়। অর্থাৎ একটি পরম অভগু-ক্ষণের অভিমুখে আমরা দু'জনে উল্কাবেগে ছুটে চলেছিলাম। আমার স্বামী এর কিছু জান্‌তেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁ'র প্রশান্ত অঙ্কসাগর কোনও দিন বিচলিত হয় নি! আজকাল তাঁ'র পাহারার কাজ থেকে আমি ছুটি নিয়েছিলাম, তিনিও নিঃশব্দেই আমাকে ছুটি দিয়েছিলেন! তা'র জন্যে তাঁ'র মাঝে-মাঝে পড়ার ব্যাঘাত হোতো, এবং দু'চারটে বেশী পেন্সিলও কিনে রাখ্‌তে হোতো; কিন্তু কোনও কথাই বল্‌তেন না!

৪

জীবনের সেই সময়কার কথাগুলো এখন তন্ন-তন্ন ক'রে মনে করতে লজ্জা করে। সংক্ষেপেই বলি। ব্যাধের শীকার পরিণতির কাছাকাছি এসেছিল। শেষকালে সেই ভয়াবহ মুহূর্ত্ত এলো। ঠিক হ'য়েছিল, রাত্রির একটার

সময় তিনি গাড়ী নিয়ে আস্‌বেন, আমি তোয়ের থাক্‌বো। স্বামী খেয়ে-দেয়ে যথাসময়ে ঘুমোলেন—আমি তারপর থেকে বিপিনের দেওয়া গহনাগুলো পর্‌তে লাগলাম। হীরেতে আলো লেগে ঠিক্‌রে উঠে আমার মনের মত চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিতে লাগলো। সেজেগুজে যখন বসলাম, তখন আর একটা বাজতে দেরী নেই,—কিন্তু তখন বুকের ভেতর কেমন কর্‌তে লাগলো। কোথায় যাচ্ছি, কবে ফির্‌ব! আমার তরফ থেকে এইটুকু কৈফিয়ৎ ছিল, যে আমি তখনও সব ব্যাপারটা—তার বীভৎসতা খুব ভাল ক'রে বুঝিনি! কিন্তু এগিয়ে পড়েছি, ভারি এগিয়ে পড়েছি! এই হীরের গহনাগুলো তাদের ভয়ঙ্কর আলো দিয়ে আমার প্রলয়ের রাস্তা আলো ক'রে তুলেছিল! কিন্তু আর সময় নেই। ওই গাড়ী এসে দাঁড়াল। ওই বিপিনের সঙ্কেত। কি করি—কি করি! একবার তাঁকে ডাক্‌ব? না, আর হয় না! আগে যদি বল্‌তুম! কেমন ক'রে গিয়ে যে গাড়ীতে বস্‌লাম তা জানিনে—তখন আমার জ্ঞান ছিল না। যখন চমক্‌ ভাঙ্গলো বিপিন তখন গাড়োয়ানকে বল্‌ছে, 'চালাও'—আর গাড়োয়ান ঘোড়ার রাস টেনে চাবুক তুলেছে। আমার বুকের ভেতর দম আট্‌কে আস্‌বার মত হ'লো, একবার বল্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম "না," কিন্তু পার্‌লাম না!

৫

তার পর-মুহূর্ত্তেই গাড়ীর দরজা খুলে রাস্তার একরাশ আলোর সঙ্গে আমার স্বামী গাড়ীতে ঢুক্‌লেন। এত আলো জীবনে কখনো দেখিনি। স্বামী বল্‌লেন, "সরোজ! আমি ভাবলাম সবটা না বুঝেই হয়ত তুমি ভুলের পথে যাচ্ছ, তাই ভুল ভাঙ্গবার একটা সুযোগ দেবার জন্যে এলাম। আমি এখনি ফিরে যাব।" বেঁচে গেলাম, বেঁচে গেলাম! আর এক দণ্ড দেরী হ'লে কি হ'তো। আমি একেবারে আমার সমস্ত পাপের ভার নিয়ে তাঁর পায়ের তলায় গিয়ে পড়লাম। তিনি একটুখানি চুপ্‌ ক'রে থেকে বল্লেন, "ফির্‌বে?" আমি তাঁর পা-দুটো তখন তেমনি শক্ত ক'রে ধরেছি, যেমন ক'রে ডুবে যেতে-যেতে লোকে শেষ আশ্রয়টুকু প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। স্বামী বলিলেন, "চলো।" আমি তাঁর দুই পায়ে মাথা রেখে তখন সেই হীরে-মুক্তোর গহনাগুলো ছিঁড়ে-ভেঙ্গে কোনও রকম ক'রে ফেলে দিয়ে, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সেই চির-আলোকের অন্ধকার ঘরে ফিরে এলাম! পাঁচটা মিনিট আমাকে একশো বছরের আলো দিয়ে গেল! সকালবেলা স্বামী আমাকে আদর ক'রে তুলে বল্‌লেন, "সরোজ, সমস্ত রাত মেজেয় প'ড়ে ছিলে?" আমি মনে-মনে ভাবলাম, তোমার পায়ের ধুলো ঐখানেই বেশী, তাই! দু'চোখ দিয়ে ঝর-ঝর ক'রে জল পড়তে লাগলো! স্বামী চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে, একটুখানি হেসে আমার কপালে চুম্‌ খেলেন!

বাঘ্‌নাপাড়ার ইতিকথা

[শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা]

বাঘ্‌নাপাড়া বৈষ্ণবদিগের শ্রী-পাট। বর্দ্ধমান জেলায় ইহা অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পল্লী। শ্রীশ্রী৺বলদেব কৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া, এবং তৎসম্বন্ধীয় নানা উৎসব, মেলা, পার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার প্রসিদ্ধি। গ্রামের আদি নাম ব্যাঘ্রনাদাশ্রম। ইহা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হুগলি-কাটোয়া শাখার কাল্‌না ষ্টেসন হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

মহাপ্রভুর পার্ষদের শ্রীশ্রীবংশীবদনানন্দ গোস্বামীর প্রপৌত্র শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী যৌবনেই সন্ন্যাস লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করেন। তথায় কিছু দিন সাধন-ভজন করণানন্তর রামকৃষ্ণ বিগ্রহ লইয়া বাংলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সুদীর্ঘ পথে তাঁহাকে নানাস্থানে বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল; কিন্তু যখন বাঘ্‌নাপাড়ায় বিশ্রামের জন্য অবস্থান করিলেন, তখন তিনি জানিতেন না,—এইখানেই তাঁহাকে চিরজীবন থাকিতে হইবে। তখন বাঘ্‌নাপাড়া এরূপ জনবহুল গ্রাম ছিল না; ছিল ভীষণ হিংস্র ব্যাঘ্র-শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্যানী;

আর পার্শ্ব দিয়া খরস্রোতা "ভল্লুকা" নদী তরঙ্গ-ভঙ্গে নৃত্য করিতে-করিতে ছুটিয়া যাইত। রামচন্দ্র প্রভু যখন বিশ্রামের জন্য তথায় উপবিষ্ট, তখন মধ্যাহ্নকাল; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কৃষকেরা বনমধ্যে গাভী অন্বেষণে আসিয়া সেই সন্ন্যাসী ও দেববিগ্রহ দেখিয়া নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হইল। পরে তাঁহাকে তাহাদের সহিত গ্রামের মধ্যে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। গ্রামবাসীদের আগ্রহ ও ভক্তি দেখিয়া সন্ন্যাসী যাইতে সম্মত হইলেন এবং দেবমূর্ত্তি লইয়া উঠিতে গেলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দেব বিগ্রহ উত্তোলন করিতে পারিলেন না। তিনি সেই অদ্ভুত কথা গ্রামবাসীদের বলিলে, তাহারা তাঁহাকে মহাপুরুষ জানিয়া, সেইখানেই মহোৎসাহে পূজার ব্যবস্থা করিল, এবং কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সাধু ও দেবতার অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিল। সেই রাত্রে রামচন্দ্র প্রভু তথায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন। ক্রমশঃ সেই মহাপুরুষ ও দেবতার অলৌকিক কথা চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল; দলে-দলে লোক ভক্তি-উপহার লইয়া তথায় সমবেত হইতে লাগিল; এবং সন্ন্যাসীর ভক্তি-নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে গ্রাম প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হইল। বনে ব্যাঘ্রের বড় উপদ্রব ছিল বলিয়া গ্রামের নাম হইল ব্যাঘ্রনাদাশ্রম; তাহার অপভ্রংশ বাঘ্‌নাপাড়া।

রামচন্দ্র প্রভু ঠাকুর রামাই নামে খ্যাত। তিনি চির-কুমার, এবং প্রকৃত সাধক ও ভক্ত ছিলেন। বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। প্রথমতঃ সামান্য কুটীরেই দেবতা ও রামাই ঠাকুর একত্র বাস করিতেন। পরে এক-জন ভক্ত যাত্রী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আর তাঁর পূর্ব্বপরিচিত গ্রামবাসীরা দেব-পূজার জন্য "যমুনা" নাম্নী বৃহৎ পুষ্করিণী কাটাইয়া দেয়। রামচন্দ্র প্রভু আর একটী দেব-বিগ্রহ স্থাপন করেন। একদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, গোপেশ্বর (শিব) আসিয়া বলিতেছেন যে, "আমায় প্রতিষ্ঠিত কর।" তদনুসারে তিনি শিব-প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে, যে বৃক্ষে চড়িয়া মহাদেব আসেন—প্রাতঃকাল উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া তাহা আর ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। সেটী "গাবগাছ" এখনও বর্ত্তমান আছে। গাছটী অতি প্রকাণ্ড। রামাই ঠাকুর সম্বন্ধে আর একটী প্রবাদ আছে;—একবার খড়দহের বীরচন্দ্র গোস্বামী পরীক্ষার জন্য রামাই ঠাকুরের কাছে রাত্রিতে ১২ শত নেড়া পাঠান। তাহারা সেই রাত্রে ইলিস মাছ ও আমের ঝোল খাইতে চায়। রামাই প্রভু "যমুনার" কাছে ইলিস মৎস্য ও অসময়ে আমগাছ হইতে আম পাইয়াছিলেন, এবং সেই রাত্রিতে তৃপ্তি পূর্ব্বক ১২ শত নেড়াকে ভোজন করাইয়া-ছিলেন। কত সালে তাঁর জন্ম বা মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা শ্রীশচীনন্দন নবদ্বীপ হইতে আসিয়া দেবসেবার ভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সেবাইতগণ তাঁরই বংশধর। রামাই ঠাকুরের সময়ে বলদেবের মন্দির ভিন্ন অন্য মন্দির ও দেববিগ্রহাদি ছিল না। পরে গোস্বামীদের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে পূজা-পার্ব্বণ ও মন্দির, দেব-বিগ্রহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমগ্র দেবস্থানকে ঠাকুরবাড়ী বলা হয়। ঠাকুর-বাড়ী প্রাসাদের মত বিস্তৃত; প্রকাণ্ড সিংহদ্বার, দ্বিতল অট্টালিকা, নাটমন্দির, অতিথিশালা, রন্ধনশালা, চতুষ্পাঠী প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত। আদি-মন্দির,—বলদেব কৃষ্ণের অতি প্রকাণ্ড মন্দির—প্রায় ৯০—১০০ ফুট উচ্চ এবং নানা কারুকার্য্যে পরিশোভিত। মন্দির গাত্রে নানারূপ চিত্রাদি অঙ্কিত। মন্দির-গাত্রে এই শ্লোকটী খোদিত আছে,—কিন্তু শেষ কয় চরণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে;—

"শাকে নাগাগ্নি কামেষু বিধৌ
শ্রীরামচন্দ্রতঃ আবীরাসী দ্বিচে"।

আরও দুইটী মন্দির আছে; একটী প্রকাণ্ডকার, একটী ক্ষুদ্র। বড়টী আধুনিক, প্রায় এক শত বৎসরের।

বলদেব কৃষ্ণ ব্যতীত জগন্নাথ, রাধিকা, রেবতী, গোপেশ্বর প্রভৃতি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং প্রত্যহ ভোগ-রাগাদি হইয়া থাকে। বাঘ্‌নাপাড়ার মহোৎসবে একটী প্রসিদ্ধ মেলা প্রতি বৎসর মাঘী কৃষ্ণা-তৃতীয়া হইতে আরম্ভ হইয়া প্রায় ১৫।২০ দিন পর্য্যন্ত থাকে। নানা দেশ হইতে দোকান ও লোকজনের সমাগম হয়। মহোৎসব রামাই ঠাকুরের শ্রাদ্ধোৎসব। প্রত্যহ ২০।২৫ মণ চাউল রন্ধন করিয়া বাজারের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত করা হয় এবং সেই সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন সাধু-সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ও দীন-দরিদ্রের মধ্যে বিতরিত হয়। এই অন্নক্ষেত্র আর সেই আহার-নিরত বিরাট জনসংঘের কলরোল-হরিধ্বনি—সে

এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। এই কয়দিন গ্রামে আনন্দের স্রোত বহিতে থাকে। বাঘ্‌নাপাড়ার মহোৎসব দর্শনীয় বিষয়। আরও ছুইটী পার্ব্বণ বিশেষ প্রসিদ্ধ; চৈত্র মাসে গাজন ও বৈশাখী পুর্ণিমায় পুষ্পদোল। এ সময়েও অনেক লোক-সমাগম হয়। অন্যগুলি তত উল্লেখযোগ্য নয়।

বাঘ্‌নাপাড়ার গোপেশ্বর জাগ্রত ঠাকুর বলিয়া খ্যাত। বহুদুর হইতে আরোগ্য-লাভের কামনায় প্রতিদিনই লোক আসিয়া থাকে, এবং আরোগ্য হইলে পূজা দিয়া যায়।

বাঘ্‌নাপাড়ার জন্ম লাভের পূর্ব্বে যে খরস্রোতা ভল্লুকা কল-গানে বহিয়া যাইত, আজ তাহা শীর্ণা; স্থানে-স্থানে নদীর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু শোনা যায় যে, ভল্লুকা এত প্রকাণ্ড নদী ছিল যে, সমস্ত দিনে একবার মাত্র খেয়া চলিত। বাঘ্‌নাপাড়ায় আর একটী প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে; তাহার নাম "দীঘি"।

এখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্মৃতি কালগর্ভে বিলীন। তবে দু-একজনের নামমাত্র জানা যায়। একজন প্রসিদ্ধ কথক ছিলেন, নাম ৺শ্রীজীবন গোস্বামী; ইনি কথকতা করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আর এক জনের নাম বিনোদ গোস্বামী; ইঁহার সম্পাদিত একখানি পুস্তক আছে—নাম মুরলীবিলাস। শ্রীজীবন গোস্বামী ১২৯১ সালে মানবলীলা সংবরণ করেন।

একজন সাধুর ভক্তি-সাধনায় বন গ্রামে পরিণত হইয়াছিল এবং নানা সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আর বুঝি সে পূর্ব্বগৌরব থাকে না। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বাংলার পল্লী উৎসন্ন গেল, গ্রামের শিক্ষিত লোক কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন। গ্রাম আবার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, আবার বনে পরিণত হইতেছে। যদি কোন উপায় না হয়, তবে বাংলার পল্লী ধ্বংস হইয়া নগরের শিক্ষিতগণের প্রত্নতত্ত্বের উপাদান বৃদ্ধি করিবে।

মিঃ এ, রসুল পরলোকে

মিঃ এ, রসুল

আমরা এবার একটী গভীর শোকের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেছি। কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ আবদর রসুল সাহেব গত ৩০শে জুলাই সোমবার রাত্রিতে নিতান্ত অকস্মাৎ লোকান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। ইহা মৃত্যুর বয়স নহে। সোমবার মধ্যাহ্নে তিনি হাইকোর্টে বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী ও বিচারপতি মিঃ গ্রীভসের এজলাসে যথারীতি একটী মোকদ্দমায় এক পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তাঁহার ১৪ নং রয়েড ষ্ট্রীটের আবাসে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার একমাত্র সন্তান উনবিংশবর্ষীয়া কন্যা শ্রীমতী নেজমাই সাহেবার বিবাহ সংক্রান্ত আয়োজনে ব্যস্ত হ'ন এবং রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত এই কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া শয়ন করিতে যান (৩রা আগষ্ট শুক্রবার এই কন্যার বিবাহের

দিন স্থির হইয়াছিল)। [illegible] [illegible] [illegible] উক্তিতে [illegible], [illegible] [illegible] হওয়ার তাঁহার পত্নী (মিঃ রসুল [illegible] [illegible] মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন) তাঁহাকে ডাকিতে গিয়া দেখেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার আনানো হয়। ডাক্তার আসিয়াই বলেন, জীবন-দীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত।

গত আগষ্ট শুক্রবার রসুল সাহেবের কন্যার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। ক্রমে সেই শুক্রবার সমাগত হইল। মিঃ রসুলের নির্ব্বাচিত ভাবী জামাতা কয়েক দিন হইতে তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] এই অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক মৃত্যুতে সকলেই মনে করিয়াছিলেন, শুভকর্ম্ম এখন স্থগিত রহিল,—পরে উপযুক্ত সময়ে অন্য কোন শুভ লগ্নে বিবাহ হইবে। কিন্তু রসুল সাহেবের পতিগত-প্রাণা পত্নী স্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে পতিকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত দিনে তাঁহারই নির্ব্বাচিত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করেন। তবে মিঃ রসুল বর্ত্তমান থাকিলে এই বিবাহে যেরূপ সমারোহ এবং ধূমধাম হইত, তাহা অবশ্য হয় নাই; বিনা আড়ম্বরে কেবল শুভকর্ম্ম সম্পাদিত হইয়াছে।

সাম্‌সন্

(চিত্র-পরিচয়)

সাম্‌সনের গায়ের জোর এত বেশী কিসে, এই তত্ত্বটি জানিবার জন্য তাঁহার প্রণয়িনী ডেলিলা তিনবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্না হয়। কিন্তু চতুর্থবার সাম্‌সন্ আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না—প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার দীর্ঘ বাব্‌রীকাটা কেশগুচ্ছই তাঁহার শক্তির মূল। ডেলিলা এই তত্ত্বটুকু সাম্‌সনের মুখে শুনিবামাত্র বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ফিলিষ্টাইনদিগকে ডাকিয়া তাহাদের কাছে এ কথা প্রকাশ করিয়া দিল। তাহারা নিদ্রাবস্থায় তাঁহার কেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিয়া ফেলিল। সাম্‌সন্ আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি এখন শক্তিহীন,—কাযেই নিরুপায় হইয়া তিনি বিশ্বাস-হন্ত্রী ডেলিলার দিকে রক্তনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু ডেলিলা তাঁহার নিষ্ফল ক্রোধে এখন আর ভীতা নহে; সে বরং তাঁহার চক্ষের সমক্ষে তাঁহার কর্ত্তিত কেশরাশি দোলাইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

সাহিত্য সংবাদ

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত সচিত্র "রামপ্রসাদ" (তান্ত্রিক সাধক কবি রামপ্রসাদের জীবনী) প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দুই টাকা। উক্ত গ্রন্থকারের "সত্যকাহিনী" স্ত্রীপাঠ্য সুন্দর গল্পের বই প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য এক টাকা।

কল্লোকুঞ্জ উপন্যাসমালার প্রথম উপন্যাস শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত চক্রীর চক্র প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দশ আনা।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ কাব্যবিনোদ প্রণীত "ঘরের লক্ষ্মী" প্রকাশিত হইয়াছে। আট আনা দক্ষিণা দিয়া পাঠকেরা লক্ষ্মীকে ঘরে তুলুন।

আট আনা সংস্করণ গ্রন্থাবলীর ঊনবিংশ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'বিম্বদল' প্রকাশিত হইয়াছে। বিংশ গ্রন্থ শ্রীযুক্ত মুন্সীপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী-প্রণীত 'হালদারবাড়ী' যন্ত্রস্থ।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 'মণির বয়' খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। দর্শনী ১॥০।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত '[illegible]' যন্ত্রস্থ, ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত [illegible] মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের [illegible] 'পত্রপুষ্প' যন্ত্রস্থ, ভাদ্র মাসের প্রারম্ভেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত [illegible] চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "কাদম্বিনী" যন্ত্রস্থ, ভাদ্রের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে। মূল্য ১।০

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Choudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

"শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা"

৺ দ্বিজেন্দ্রলাল

শিল্পী শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা

আশ্বিন, ১৩২৪

প্রথম খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [চতুর্থ সংখ্যা

ক্রমবিকাশে সহজ-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা

[অধ্যাপক শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ]

ইতর জীবের সন্তান ও মানবজাতির সন্তানের মধ্যে প্রথম শৈশবাবস্থার তুলনা করিলে, ইতর জীবের সন্তানেই বরঞ্চ মানব-সন্তান অপেক্ষা অধিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় মানব কি প্রকারে "সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব" হইয়াছে, ইহা একটী দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়াই আপাত-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। মানব-শিশু যখন মাতৃ-কোলে কেবল হাত-পা নাড়িতে পারে—কিন্তু নিজ-জ্ঞানে খাওয়া-দাওয়া, এমন কি ভালরূপে দর্শন-স্পর্শন পর্য্যন্ত করিতে পারে না—জীবশিশু সেই সময়ে কেবল যে চলা-ফিরা করিতে পারে, তাহা নহে; পরন্তু নিজ-জ্ঞানে খাওয়া-দাওয়া করিতে পারে,—এমন কি ভালরূপে দর্শন-স্পর্শনও করিতে পারে। জীব-শিশু যে জ্ঞানে নিজ হইতে এই প্রকারে জীবন-ব্যাপারের সাধারণ কার্য্য করিতে পারে, তাহাই তাহার সহজ-জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়।

জীব-শিশুকে মানব-শিশু অপেক্ষা এইরূপে অধিক পরিণত দেখিয়া, মানব-শিশু যে জীব-শিশুকে বিকাশ-ক্রমে অতিক্রম করিতে পারিবে, তাহা সহজে মনে আসে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানব-শিশুর এই অপরিণত শৈশবের মধ্যেই তাহার উচ্চবিকাশ-লাভের প্রকৃত রহস্য নিগূঢ়িত রহিয়াছে। মানব-শিশুতে আমরা সহজ-জ্ঞানের স্ফুরণের পরিবর্ত্তে অর্জ্জিত-জ্ঞানেরই সঞ্চয় দেখিতে পাই। এই জ্ঞানের সঞ্চয় যতই বাড়িতে থাকে, মানব-শিশুর উন্নতিও ততই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে। এই অর্জ্জিত-জ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়াই মানব-শিশু জীব-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ পদের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এই অর্জ্জিত-জ্ঞানের অপর নামই "অভিজ্ঞতা"। জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের মনের যে শক্তি দ্বারা পূর্ণ হয়, উহার নাম স্মরণ-শক্তি। এই স্মরণ-শক্তি মনুষ্যে যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, অপর কোন জীবেই সেইরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। স্মৃতির দ্বারা জ্ঞান যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিরও প্রখরতা সাধিত হয়। এই প্রকারে স্মরণ-শক্তি-মূলে মনুষ্যে বুদ্ধি-বৃত্তির বিশেষ বিকাশ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। স্মৃতি-শক্তির বিকাশের দ্বারা আমরা যেমন আমাদিগের নিজের অর্জ্জিত-জ্ঞান সঞ্চিত করিয়া রাখিতে পারি—

তেমনই আমাদিগের পিতামাতা ও পূর্ব্ব-পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানও আয়ত্ত করিতে পারি।

পূর্ব্বোক্তরূপে জ্ঞানের পরিসর-বৃদ্ধির সহিত মনুষ্যের মধ্যে একটী নূতন বিকাশের সূচনা হইয়াছে। জীব-সাধারণ-সুলভ সহজ জ্ঞান লোপ প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্যে অভিজ্ঞতা তৎস্থল গ্রহণ করিয়াছে। ক্রম-বিকাশের মূল প্রক্রিয়াই এই—যাহা আবশ্যক তাহাই রক্ষিত হয়,—আর যাহা অনাবশ্যক তাহাই লোপ পায়। অর্জ্জিত-জ্ঞান যতই আমাদের অধিক আবশ্যক হইয়াছে, সহজ-জ্ঞান ততই অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়া, অবশেষে একরূপ অন্তর্দ্ধানই করিয়াছে। অর্জ্জিত-জ্ঞানের দ্বারা যেমন একদিকে আমাদের অধিক উপকার হইয়াছে, তেমনই অন্যদিকে অপকার হইয়াছে। একদিকে আমরা বুদ্ধি-বৃত্তির উৎকর্ষতা দ্বারা যেমন অধিক শক্তিশালী হইয়াছি—তেমনই অন্যদিকে আত্ম-নির্ভরতা হারাইয়া অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। অভিজ্ঞতা বা অর্জ্জিত-জ্ঞান আমাদিগকে শেষে সমধিক সহায়সম্পন্ন করিলেও, শৈশবে সমধিক নিঃসহায় করে। এই নিঃসহায় ভাব হইতেই মনুষ্যের শৈশবকাল অপর সমস্ত প্রাণীর শৈশবকাল অপেক্ষা দীর্ঘকাল-স্থায়ী হইয়াছে। দীর্ঘ-শৈশবে পিতামাতা ও অন্যান্য সামাজিক লোকদিগের নিকট হইতে যে শিক্ষালাভ হয়—তাহাতেই অভিজ্ঞতার প্রথম ভিত্তি গঠিত হয়।

শিক্ষাই যে উন্নতির সোপান, তাহা সকলেরই সুবিদিত সত্য। এই শিক্ষার শক্তি দ্বারাই বিকাশের ক্রম নির্ণীত হইতে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে—"Animals low in the scale of life, for example, most insects—appear incapable of learning." Harmsworth's History of the World, Vol. I, p. 109. অর্থাৎ, "নিম্নস্তরের জীব-সকলে শিক্ষা-বিষয়ে অসামর্থ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।"

পিপীলিকা সামান্য প্রাণী হইলেও, শিক্ষাগুণে যে কতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহা বিজ্ঞানের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই প্রতীয়মান হইবে :—

"It is a fair inference that many of 'the so-called instincts of ants are really acquired habits, bits of knowledge and ways of thinking and acting, which are handed down from one generation to the next, not by actual inheritance, but traditionally and educationally, just as children receive from us language, or religion, or trade. Indeed, there is reason to believe, that the power of making mental acquirements has evolved to a greater degree in the favourable environment of the ant-nest than among any other species except man." Ibid. এখানে আমরা জানিতে পারিতেছি,—"পিপীলিকা-জাতির যাহা আমরা সহজ-জ্ঞান বলিয়া মনে করি, তাহা প্রকৃত পক্ষে অর্জ্জিত অভ্যাস—পুরুষানুক্রমে লব্ধ জ্ঞান-পরম্পরা এবং চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালীর পরম্পরা। ইহা প্রকৃত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নহে ;—পরন্তু, শিশুগণ যেমন আমাদিগের নিকট হইতে ভাষা, ধর্ম্ম বা ব্যবসায় গ্রহণ করে, তদ্রূপই কিম্বদন্তী ও শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত। প্রকৃত পক্ষে মানসিক গুণার্জ্জনের শক্তি পিপীলিকার বাসার অনুকূল পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যেরূপ বিকাশ লাভ করিয়াছে, মনুষ্য ব্যতীত অপর কোন জাতিতে তদ্রূপ বিকাশ লাভ করে নাই।"

পিপীলিকা-শিশুর শিক্ষা যে মানব-শিশুরই ন্যায় সযত্নে প্রদত্ত হইয়া থাকে—বিজ্ঞান তৎসম্বন্ধে অতি বিশদ বিবরণই প্রদান করিয়াছে :—

"When animals are social, and so have the opportunity of learning, not only from their parents, but from other members of the species, the power of making useful mental acquirements is correspondingly great. It reaches a remarkable degree of development even amongst insects, some species of which live together in great communities. Young ants, for example, are tended with anxious care. It is said, they are led about the nest and instructed by older individuals. They are reported to be playful. Most significant of

all is the fact that some species have the habit of capturing slaves belonging to other species which they take as pups, never as adult ants, and to whom, as they develop, they teach their duties." Ibid, p. 110. "পিপীলিকারা সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে বলিয়া, ইহাদের শিশু সকল কেবল পিতামাতা হইতেই যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে; পরন্তু, সমাজের অন্যান্য পিপীলিকা হইতেও শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র পিপীলিকা-শিশু সকল অতীব যত্ন-সহকারে লালিত-পালিত হয়। ইহারা বাসার চতুর্দ্দিকে নীত হইয়া বৃদ্ধ পিপীলিকা সকলের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করে। ইহারা ক্রীড়াপরায়ণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, ইহারা অন্য জাতীয় শিশু-পিপীলিকাদিগকে ধৃত করিয়া দাসরূপে কার্য্য করিবার জন্য ইহাদিগকে দাসের কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয়। এই প্রকারে তাঁহাদের বিশেষ মানসিক ঔৎকর্ষ্য সাধিত হয়।"

এইরূপে অর্জ্জিত-জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই মানসিক ঔৎ-কর্ষ্যের কারণ ও মানদণ্ড হইয়াছে। ইতর জীবের বিকাশ এই মানদণ্ড দ্বারাই পরিমিত হইয়া থাকে। এই মানদণ্ডের পরিমাপ দ্বারা কিরূপে জীবের বিকাশ-ক্রম নির্দ্ধারিত হইতে পারে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে:— "We always measure the intelligence of an animal by its power of profiting by experience. Thus, a cat is more intelligent than a rabbit; because it can learn more. A dog for the same reason, is still more intelligent." Ibid, p. 108. "কোন জন্তুর বুদ্ধি-বৃত্তি, আমরা ইহার অভিজ্ঞতা হইতে উপকার-লাভের শক্তি দ্বারাই পরিমাপ করি। এই প্রকারেই বিড়াল খরগোস্ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিজীবী হইয়াছে; কারণ, বিড়ালের অধিক শিক্ষালাভ করিবার শক্তি আছে। কুকুর এই কারণেই বিড়াল অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিজীবী।"

মনুষ্য শৈশবে যেমন সর্ব্বজীব অপেক্ষা নিঃসহায়, তেমনি তাহার শিক্ষার সুযোগও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সুযোগের দ্বারাই মনুষ্য শৈশবের অসহায় অবস্থা হইতে উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে:—"Of living beings man is by far the most helpless at birth. He cannot even seek the breast. In him instinct is at its minimum. For him more than any other animal, prolonged and elaborate tuition is necessary, and so great is his power of utilising its stored experience, that in later life he is beyond comparison the most capable of the inhabitants of the earth." Ibid, p. 109. "জীবদিগের মধ্যে মনুষ্যই জন্মের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিঃসহায় থাকে। তাহাতে সহজ-জ্ঞান স্বল্পতম মাত্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। তাহার জন্য অপর প্রাণী অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ও বিস্তারিত শিক্ষার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহার স্মৃতি এইরূপ বিশাল এবং ইহাতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার কার্য্যতঃ ব্যবহারে তাঁহার শক্তি এত অধিক যে, জীবনের শেষভাগে পার্থিব কোন জীবই ক্ষমতায় তাহার সহিত তুল্য হইতে পারে না।"

মনুষ্যে অভিজ্ঞতার মাত্রাধিক্যের সহিত সহজ-জ্ঞানের মাত্রাল্পতার যে অনুপাত আমরা দেখিতে পাইলাম, তাহা হইতে আমরা বিকাশ-ক্রম সম্বন্ধে এই তত্ত্বটী লাভ করিতে সমর্থ হই যে, অভিজ্ঞতা ও সহজ-জ্ঞান বিকাশের ক্রম-নির্দ্দেশ বিষয়ে পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন; অর্থাৎ বিকাশের যতই উচ্চতা, অভিজ্ঞতার ততই মাত্রাবৃদ্ধি,—কিন্তু সহজ-জ্ঞানের ততই মাত্রাহ্রাস; আবার বিকাশের যতই নিম্নতা, সহজ-জ্ঞানের মাত্রা ততই বেশী,– কিন্তু অভিজ্ঞতার মাত্রা ততই কম। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে আমরা প্রাগুক্ত তত্ত্বের পরিষ্কার বিবৃতিই প্রাপ্ত হই:—"With the opportunity to profit by experience comes the ability to profit by it, and with the latter a gradual decay of instinct. Intelligence in substituted, more or less, for unthinking impulse. All the instinct are not lost, but in the higher animals we find no such elaborate innate impulses as in the lower." Ibid, p. 109. "অভিজ্ঞতার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগের সহিতই ইহার দ্বারা উপকৃত

হওয়ার শক্তি জন্মে, এবং এই শক্তির সহিত ক্রমে সহজ-জ্ঞানের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়। চিন্তাবিহীন আবেগের স্থলে বুদ্ধি-বৃত্তির আবির্ভাব হয়। সমস্ত সহজ-জ্ঞান লোপ প্রাপ্ত হয় না বটে, কিন্তু নিম্ন-জীবে আমরা যেরূপ বিপুল স্বাভাবিক সংস্কার সকল বিদ্যমান দেখিতে পাই, উচ্চ-জীবে তদ্রূপ দেখিতে পাই না।"

স্মৃতির সহায়তায় আমরা কিরূপে প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য-বিধানরূপ উচ্চ বিকাশের উপযোগিতা প্রাপ্ত হই এবং তদভাবে আমাদের বিকাশ নিম্নস্তরে কিরূপে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতেই বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইবে:—"Low animals in proportion as they lack memory, move in a narrow, instinctive groove. Their mental traits are all inherited and each individual follows exactly in the foot-steps of its predecessor. Since they cannot learn, they cannot adapt themselves to circumstances. Removed from the ancestral environment they perish. Ibid, p. 112. "নিম্নশ্রেণীর জীব যে অনুপাতে স্মৃতিবিষয়ে হীন হয়, সেই অনুপাতেই অধিকতর সঙ্কীর্ণ সহজ-জ্ঞানের পথে আবর্ত্তন করে। তাহাদের মনোবৃত্তি সমস্তই উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বলিয়া, প্রত্যেকেই সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বপুরুষেরই পদানুসরণ করে। ইহাদের শিক্ষা করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া, ইহারা সকল অবস্থার সহিত আপনাদের সামঞ্জস্য-বিধানও করিতে সমর্থ হয় না। ইহারা পূর্ব্বপুরুষের বেষ্টনী হইতে স্থানান্তরিত হইলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

অভিজ্ঞতালাভের সহিত স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তির যতই উৎকর্ষ হইতে থাকে, ততই ইহাদের আধার স্বরূপ মস্তিষ্ক-যন্ত্রের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যে এই স্মৃতি-শক্তি ও বুদ্ধি-বৃত্তির যেমন অধিকতর বৈশিষ্ট্য হইয়াছে, তেমনি ইহাদের যন্ত্ররূপ মস্তিষ্কেরও অধিক বৈশিষ্ট্য হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এতৎসম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য দেখিতে পাওয়া যায়:—"The principal distinguishing physical peculiarity of man is the enormous relative size in him of that upper part of the vertebrate brain which is termed the cerebrum and, we have every reason to believe, constitutes the organ of memory and thought." Ibid, p. 111.

"মনুষ্যের শারীরিক প্রধান পরিচায়ক বিশেষত্ব তাহার মেরুদণ্ডের ঊর্দ্ধভাগস্থ মস্তিষ্কের অপরিমিত আপেক্ষিক বৃহদাকার। এই মস্তিষ্ক অগ্রমস্তিষ্ক নামে অভিহিত হয়। ইহা যে স্মৃতি ও চিন্তারই ইন্দ্রিয়, তাহা মনে করিবার আমাদের যথেষ্ট কারণই রহিয়াছে।" স্মৃতি ও বুদ্ধির আধাররূপে যেরূপ মনুষ্যে মস্তিষ্ক-যন্ত্রের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে, ইহাদের বাহ্যপ্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্র ও কার্য্যযন্ত্রেরও তদ্রূপ বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। বাগ্‌যন্ত্র দ্বারা স্মৃতি ও বুদ্ধি ভাষাতে অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয়, কার্য্যযন্ত্র দ্বারা ইহারা কর্ম্মরূপে পরিণত হয়। হস্তই আমাদের প্রধান কার্য্য-যন্ত্র। হস্তের দ্বারা কার্য্য করিতে হয় বলিয়াই ইহার এক নাম 'কর' হইয়াছে। 'কার্য্য' ও 'কর' উভয় শব্দই একই "কৃ"-ধাতুমূলক।

বাগ্‌যন্ত্র ও কার্য্যযন্ত্রের বিকাশ মস্তিষ্কের বিকাশের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ। মস্তিষ্কের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হস্তের দ্বারা কার্য্যে পরিণত হয় এবং ইহা বাক্যের দ্বারা অন্যের নিকট ব্যক্ত হয়। এই প্রকারে অভিজ্ঞতা-মূলেই বাগ্‌যন্ত্র ও কার্য্যযন্ত্রের বিশেষ উপযোগিতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই উপযোগিতা একদিনে উৎপন্ন হয় নাই। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়া যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নিয়মেই এই উপযোগিতা সাধিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এই বিকাশের এইরূপ বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়:—"Associated in a special way with his great brain are his organs of speech and manipulation. These three structures, the brain, the vocal apparatus, and the hand, undoubtedly underwent concurrent evolution by the constant survival, during a period of intense competition, of these individuals who were naturally the best capable of receiving and storing experience, of using it for the intelligent manipulation of objects, and of communicating it to their fellows and descendants through the medium of speech." Ibid, p. 111.

"বাগ্‌যন্ত্র ও কার্য্যযন্ত্র মনুষ্যের বৃহৎ মস্তিষ্কের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। মস্তিষ্ক, বাগ্‌যন্ত্র ও হস্ত—এই তিনটী অঙ্গ—যে সমস্ত ব্যক্তি অভিজ্ঞতা গ্রহণ ও সঞ্চয়ে, বুদ্ধিপূর্ব্বক বস্তু সকলের হস্তদ্বারা ধৃত করণ বিষয়ে ইহার প্রয়োগে এবং সহযোগিদিগের ও সন্তান-সন্ততিদিগের নিকট ভাষাযোগে ইহার জ্ঞাপনে পটুতম, তাহাদিগের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগে যে নিয়ত উদ্বর্ত্তনের দ্বারা যুগপৎ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

মনুষ্য মস্তিষ্ক ও ভাষার সহায়তায় সাক্ষাৎ ও পরম্পরা-ভাবে সর্ব্ববিধ বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যেমন বিজ্ঞ হয়, তেমনি হস্ত সহায়তায় সমস্ত জ্ঞানকে কার্য্যের আকার প্রদান করিয়া বিচক্ষণতা বা দক্ষতা প্রাপ্ত হয়। এই কার্য্য-দক্ষতাই মনুষ্যকে দ্বিপদ ও দণ্ডায়মান জীবে পরিণত করতঃ সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতমরূপে জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী করিয়াছে। "Without speech, or some such method of communicating abstruse information, his great brain would be useless. But knowledge and powers of thought are of no avail unless they can be translated into action; and for this the hands are necessary. To set free the fore-limbs which had hitherto been organs of locomotion, for their new function of manipulation, man became a biped, and assumed the erect posture—by no conscious effort, however, but solely by the survival of the fittest in each generation." Ibid, p. 111. "ভাষা ব্যতীত অথবা দুর্ব্বোধ্য বিষয় জ্ঞাপনের এতদ্রূপ কোন উপায় ব্যতীত মনুষ্যের মস্তিষ্ক অকর্ম্মণ্য থাকিত। কিন্তু জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি যদি কার্য্যে পরিণত করা না যাইতে পারে, তবে ইহারা নিরর্থক হইয়া পড়ে। এতদর্থেই হস্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। যে অগ্রাঙ্গ এতাবৎকাল কেবল গতিরই যন্ত্র ছিল, উহাদিগকে নূতন ধারণ-কার্য্যের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াই মনুষ্য "দ্বিপদে" পরিণত হইয়াছে; এবং কোনও জ্ঞানকৃত চেষ্টা দ্বারা না হইলেও, প্রতি পুরুষে একমাত্র যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন দ্বারাই দণ্ডায়মান দেহভঙ্গী প্রাপ্ত হইয়াছে।"

ভাষার লিখিত ও মুদ্রিত আকার প্রাপ্তিতে, মনুষ্যের জ্ঞান সংরক্ষণ, অর্জ্জন ও প্রচারে অভাবিতপূর্ব্ব সুগমতা উপস্থিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রভূত শিল্পকলা সাধনে ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির উদ্ভাবনে অসম্ভাবিতরূপে মনুষ্যের কার্য্য-দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষা ও কার্য্যদক্ষতা দ্বারা মনুষ্য যেমন ইতর প্রাণী হইতে অনন্যসাধারণ বৈলক্ষণ্য লাভ করিয়াছে, তেমনি ভাষার লিখিত ও মুদ্রিত রূপ এবং শিল্প-বিজ্ঞানে কার্য্যদক্ষতার উন্নত প্রয়োগ দ্বারা সভ্য মনুষ্য অসভ্য মনুষ্য হইতে অনন্যসাধারণ বৈলক্ষণ্য লাভ করিয়াছে। এই প্রকারে ভাষা ও কার্য্যদক্ষতা সভ্যতার এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে মানব-বিকাশের বিশেষ পরিমাপক হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মনুষ্যের এই নববিকাশ প্রক্রিয়ার এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছে:—"Savage man then differs from the lower animals in that he has a larger brain, a more capacious memory, and greater powers of utilising and communicating its contents. Modern man differs from ancient man, because he is the heir of longer experience. Civilised man differs from the savage chiefly in that he has invented and more or less perfected certain artificial aids to speech—written symbols—by means of which he is able to store in an available form knowledge immensely more abstruse and voluminous than would otherwise be possible. His books are artificial memories and vehicles of communication of unlimited capacity and unerring accuracy. Moreover, by means of these symbols he is able, as in the mathematics, to perform feats of thinking, quite beyond the powers of his unaided mind; just as by means of machinery and other mechanical contrivance he is able to perform physical feats beyond the unaided power of his body." Ibid, p. 111. "ইতর প্রাণী হইতে অসভ্য লোকের এই পার্থক্য যে, তাহার বৃহত্তর মস্তিষ্ক ও অধিক

ধারণাশক্তিযুক্ত স্মৃতি আছে; এবং ইহার আধেয় সকলের সমুচিত ব্যবহার ও তৎসমস্তকে অন্যের গোচর করিবার অধিক ক্ষমতা আছে। প্রাচীন মনুষ্য হইতে বর্ত্তমান মনুষ্যের এই বিষয়ে বিশিষ্টতা যে, সে অধিক ব্যাপক অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী। অসভ্য মনুষ্য হইতে সভ্য মনুষ্যের প্রধানতঃ এই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি ভাষার সহায়ক-রূপে কতকগুলি কৃত্রিম চিহ্ন উদ্ভাবিত করিয়া ন্যূনাধিক-রূপে এইগুলির ঔৎকর্ষ্য সাধন করিয়াছেন। এইগুলি লিখিত সঙ্কেত। ইহাদের সহায়তায় তিনি অতিরিক্তরূপে দুর্ব্বোধ্য ও বিপুল জ্ঞান সুবিধামত ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা অন্য কোনও রূপে সম্ভবপর হইত না। তদীয় মুদ্রিত পুস্তক সকলকে কৃত্রিম স্মৃতি ও অন্যের নিকট ভাব-বিজ্ঞাপনের অসীম শক্তি ও অভ্রান্ত শুদ্ধতার যন্ত্র বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ, এই সমস্ত সঙ্কেত দ্বারা তিনি গণিতাদি বিষয়ে এরূপ চিন্তা-ব্যাপার সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, যাহা তাঁহার অশিক্ষিত মনের পক্ষে সম্পাদন করা সম্পূর্ণই সাধ্যাতীত। এইরূপে যন্ত্রাদি দ্বারা এবং অন্যান্য যন্ত্র সম্বন্ধীয় উদ্ভাবনের দ্বারা তিনি এমত শরীর-ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ হন, যাহা তদীয় শিক্ষা-নিরপেক্ষ শরীরের পক্ষে সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই প্রকারেই মনুষ্য, প্রাণিসাধারণসুলভ সহজ-জ্ঞানের সীমাবদ্ধ উন্নতি হইতে অভিজ্ঞতার অশেষ উন্নতির অধিকারী হইয়া যথার্থই "সৃষ্টির প্রভু" ("Lord of Creation") পদে বরিত হইয়াছে।

উরু-ভঙ্গ

[শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল, সরস্বতী, এম-এ, বি-এল]

(সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র বিয়োগান্ত নাটক)

সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নাই,—এ কথা অনেক দিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ সংস্কৃত নাটকের এই দিকটা লইয়া বহু বিদ্রূপও করিয়াছেন। ম্যাকডোনেল্ তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে "বিয়োগান্ত নাটকের অভাব সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের একটি বিশেষত্ব" বলিয়া লিখিয়াছেন (১)। Encyclopædia Britannicaতে শুধু এ কথা বলা হয় নাই, ইহার একটা হেতুও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে হেতু এই—ভারতবাসিগণ বালক-স্বভাব, তাহারা শেষে দুঃখ সহ্য করিতে পারে না (২)।

কি কারণে সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটকের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় না, তাহার আলোচনার স্থল ইহা নহে। কিন্তু অন্ততঃ একখানি সংস্কৃত নাটক যে বিয়োগান্ত ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ভাস কবির সম্প্রতি-আবিষ্কৃত "উরু-ভঙ্গ" নামক নাটকখানি বিয়োগান্ত। এই বিশেষত্বপূর্ণ নাটকখানির অনুবাদ আমরা আজ প্রকাশ করিতেছি।

যে দেশের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত বিয়োগান্ত, যে দেশের "উত্তরচরিত" প্রভৃতি নাটকে করুণ-রসের পূর্ণ অধিকার, সে দেশের কাব্যরসগ্রাহীকে একেবারে বালকোচিত স্বভাববিশিষ্ট বলিতে আমরা সাহস করি না। তবে আলঙ্কারিকগণ কাব্যের একটা উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন বটে যে, কাব্যপাঠে লোকে রামাদির ন্যায় মহচ্চরিত্রের অনুসরণ করিবে, রাবণাদির ন্যায় নিকৃষ্ট-চরিত্র হইবে না। এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিতে হইলে, ধার্ম্মিক চরিত্রগুলির শেষে সুখ ও অধার্ম্মিকের শেষে দুঃখ দেখাইতে হয়। কিন্তু এই Poetic Justice সব সময়ে অনুসরণ করা যায় না। জগতে আমরা ধার্ম্মিকমাত্রেরই শুভ পরিণাম দেখি না। তাই বলিয়া ধর্ম্মকে কেহ অবহেলা করে না। যাহাদের মনোবৃত্তি মার্জ্জিত নহে, তাহাদিগকেই পরিণাম দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত বা অধর্ম্মে অপ্রবৃত্ত করিতে হয়। স্বর্গ-নরক-কল্পনাও এই শ্রেণীর লোকের জন্য। এইরূপ ক্ষুদ্র আদর্শ-প্রণোদিত হইয়া জনসন্ সেক্ষপীয়রের King Lear

(১) A History of Sanskrit Literature By A. A. Macdonell. P. 348.

(২) Drama (Encyclopædia Britannica.)

নাটকের শেষাংশ পড়িতে পারেন নাই, এবং এই আদর্শেই Tate সেক্ষপীয়রের উপর কলম চালাইয়া King Lear নাটককে মিলনান্ত করিয়া Edgar ও Cordeliaর বিবাহ সঙ্ঘটন করেন। কিন্তু সেক্ষপীয়রের আদর্শ-জগৎ এত সঙ্কীর্ণ নয়। "Shakespeare introduces into the world no little ethical code. Such a little ethical code would flutter away in tatters across the tempest and the night of Lear's agony. But Shakespeare discovers the supreme fact, that the moral world stands in sovereign independence of the world of senses." (৩) এ আদর্শ ভারতবর্ষেও ছিল; নহিলে বাল্মীকি রাম-সীতার মিলন ঘটাইয়াই রামায়ণ শেষ করিতেন (৪)। তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, 'আমরা অধর্ম্মের এরূপ জয় দেখি কেন?' তাহার উত্তর মহাকবিরা দিবেন না। ডাউডেন বলেন—

"Little solutions of your larger difficulties can readily be obtained from priest or *philosophe*. Shakespeare prefers to let you remain in the solemn presence of a mystery. He does not invite you into his little church or his little library brilliantly illuminated by philosophical or theological rush-lights. You remain in the darkness. But you remain in the vital air. And the great night is overhead." (৫)

এ কথা আমরা স্বীকার করি যে হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি-নিচয়ের সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত-সমন্বিত চরিত্র সংস্কৃত নাটকে অল্পই আছে। এবং এ কথাও একেবারে মিথ্যা নয় যে, ভারতীয় সাহিত্যে শেষটা মিলনান্ত করিবার প্রয়াস খুব বেশী। রামায়ণ পরিবর্ত্তিত করিয়া ভবভূতি 'উত্তরচরিত' মিলনান্ত করিয়াছেন। লৌকিক উপায়ে মিলন সঙ্ঘটন করা অসম্ভব হইলে অলৌকিক উপায়ের অবলম্বনও কোন-কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়। অন্ততঃ স্বর্গেও মিলন দেখান হয়। তাই এই স্রোতের বিপরীতগামী প্রাচীন নাট্যকার ভাসের তুলিকায় একখানি বিয়োগান্ত নাটক কেমন অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য "উরু-ভঙ্গে"র বঙ্গানুবাদ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম।

উরু-ভঙ্গ

[নান্দীর পর সূত্রধার প্রবেশ করিল]

ভীষ্ম দ্রোণ দুই তট; জয়দ্রথ জল যায়;
আবর্ত্ত সে গান্ধারের পতি;
অশ্বত্থামা, কর্ণ, কৃপ, নক্র, ঊর্ম্মি ও মকর;
দুর্য্যোধন যার স্রোতোগতি।
সিকতা শরের রাশি, শত্রুরূপ হেন নদী
যেই ভেলা ধরি' পার্থ তরিল হেলায়,
সে কেশব ভগবান করুন সবারে ত্রাণ
শত্রুনদী পার হ'তে তরণীর প্রায়॥

মহাশয়গণকে এইরূপ জানাইতেছি। আরে, আমি ব্যগ্র হয়ে জানাতে যাচ্ছি, এমন সময় কি শব্দ শোনা যাচ্ছে? দাঁড়াও, দেখি।

[নেপথ্যে]

এই যে আমরা। ওহে—এই যে আমরা।

সূ। ও, বুঝিয়াছি।

[পারিপার্শ্বিক প্রবেশ করিল]

পা। ভাব! কোথা হ'তে এ সকল—
স্বর্গ লভিবার তরে আজি রণানলে
মত্ত গজদন্তে ছিন্ন
নারাচ-তোমরে ভিন্ন
নিজ দেহ সমর্পিতে আহুতির ছলে।
নিজেদের বীর্য্য যেন
পরীক্ষার তরে হেন
রণাঙ্গনে বীরগণ ভ্রমিছে সদলে॥

সূ। মারিষ! বুঝতে পাচ্ছ না? শত-পুত্র-বধে শূন্য-কুল ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষে কেবল দুর্য্যোধনমাত্র অবশিষ্ট, আর যুধিষ্ঠির-পক্ষে কেবল পাণ্ডবগণ ও জনার্দ্দন। নৃপগণের

---

(৩) Shakespeare—His Mind and Art, P. 227.

(৪) আমরা উত্তরাকাণ্ডকেও রামায়ণের অন্তর্গত ধরিলাম। লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্তই রামায়ণ, এ মত আজকাল প্রচারিত হইতেছে।

(৫) Shakespeare—His Mind and Art, P. 226.

শরীর-সমাকীর্ণ সমস্ত-পঞ্চকক্ষেত্রে,

অশ্ব, গজ, নৃপ, যোধ হত এই রণে,
চিত্রপটে আঁকিবার নাহি যেন স্থান।
যুদ্ধ বাধিয়াছে দেখি ভীম-দুর্য্যোধনে,
যোদ্ধা যত গৃহে ঢুকে— যাবে নৃপ প্রাণ॥

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল]

স্থাপনা।

[তাহার পর তিনজন ভট প্রবেশ করিল]

সকলে। এই যে আমরা। ওহে—এই যে আমরা।

প্রথম।

বীরত্বের শ্লাঘা নাহি, বলের পরীক্ষা যাহে
প্রতিষ্ঠিত হয় বীর্য্য মান,
হেন যুদ্ধ-স্বয়ম্বর- সভা-মাঝে নৃপগণে
অপ্সরায় করে মাল্য দান।
বীর-শয্যা লভে' শেষে প্রাণাহুতি হোমানলে
স্বর্গযাত্রা যার শেষ ফল,
আসিয়াছি এবে মোরা সেইখানে, এই যে সে
আশ্রম-সদৃশ রণস্থল॥

দ্বিতীয়। আপনি ঠিক্ বলেছেন—

উপল-বিষম উচ্চ পর্ব্বতের প্রায়,
নিহত মাতঙ্গ-দেহ হেথা শোভা পায়।
দিকে-দিকে নিপতিত রথিহীন রথ যত
গৃধ্রের আবাস এবে, নৃপ যত হায়
যথোচিত আচরণ করিয়াছে বহুক্ষণ;
হতাহত হয়ে শেষে সম্মুখ সমরে,
ক্রিয়াশেষে স্বর্গবাস লভিয়াছে পরে॥

তৃতীয়। তাই বটে—

গজশুণ্ড যূপ সম, শর কুশ যার,
মন্থন করিয়া হত-গজ-দেহভার
প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে বৈর-হুতাশন;
ধ্বজগুলি চন্দ্রাতপ গগনে শোভন।
সিংহনাদ উচ্চমন্ত্র, বলিপাত নর,
যজ্ঞরূপ আজি এই শোভিছে সমর॥

প্রথম। আবার আপনারা দেখুন—

পরস্পর শরে বিগত-জীবন
রণাঙ্গন মাঝে পতিত কায়,
যে রাজগণের তাহা হতে আজি
বিহগে মাংস ছিঁড়িয়া খায়,
যতেক ভূষণ করিয়া শিথিল
অঙ্গ হইতে ফেলে ধরায়॥

দ্বিতীয়।

নিক্ষিপ্ত নারাচ- আঘাতে পতিত
সমরে উদ্যত, গজ সে দীন।
শ্লথ বর্ম্মভার ধনুঃশর আর,
নৃপ অস্ত্রাগার সম শ্রীহীন॥

তৃতীয়। আপনারা আর একটা দেখুন—

ধ্বজাগ্র হইতে ভ্রষ্ট মাল্যে শোভিতেছে শির যার,
রক্ত ও শায়কধারী বিপন্ন সে রথিবরে আর,
হৃষ্ট শিবাকুল এবে রথ হ'তে করে আকর্ষণ,
বর যেন নামাইছে যান হ'তে বন্ধু নারীগণ॥

সকলে। ওঃ—সমন্ত-পঞ্চক কি ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। অশ্ব, গজ, নর নিহত হইয়া পতিত; তাহাদের রক্তে ভূমিতল কর্দ্দমাক্ত। চারিদিক বর্ম্ম, চর্ম্ম, ছত্র, চামর, তোমর, শর, শকুন্ত, কবচ, কবন্ধ প্রভৃতিতে পূর্ণ; ও শক্তি, ত্রাস, হাটক, ভিণ্ডিপাল, শূল, মুসল, মুদ্গর, বরাহ, কর্ণ, কণয়, কর্পণ, শঙ্কু, ত্রাসি, গদা প্রভৃতি অস্ত্রে আচ্ছন্ন।

প্রথম। এখানে—

বহিতেছে রক্তনদী ভেদিয়া যে হত গজকায়,
নৃপ-নাশে ত্রস্ত সূত, অশ্বে রথ টানি লয়ে যায়;
গতশির—পূর্ব্বাভ্যাসে কবন্ধ সে করে বিচরণ
আরোহী-রহিত মত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমে গজগণ॥

দ্বিতীয়। আপনারা আর একটা দেখুন, ঐ যে—

দৈত্য-পতি-গজ নত আঘাতে যাহার,
এ হেন অঙ্কুশ প্রায়, তীক্ষ্ণ তুণ্ড যার ভায়
মধুকমুকুল সম পিঙ্গল আকার
উন্নত দুইটি আঁখি, শোভে গগনেতে থাকি
বিশাল লম্বিত পক্ষ করিয়া বিস্তার
মাংসরাশি ধরি মুখে গৃধ্রগণ ভ্রমে সুখে
প্রবালমণ্ডিত বহু তালবৃন্তাকার॥

তৃতীয়।

নিহত অশ্ব, গজ ও যোদ্ধা
নৃপগণ চারিধারে।

নারাচ, কুণ্ড, তীর ও তোমর

খড়্গ সে ভায়ে-ভায়ে

রয়েছে পতিত, দিনকর-করে

এবে সব দেখা যায়,

গগন হইতে পড়িয়াছে যেন

তারারাশি এ ধরায় ॥

প্রথম। এইরূপ অবস্থাতেও ক্ষত্রিয়গণের শোভা পূর্ব্ববৎই আছে। এখানে—

ভ্রমরের শ্রেণী সম চঞ্চল নয়ন,

পদ্মপত্র সম শোভে রক্তিম অধর,

কেশরের সম ভায় ভ্রূভঙ্গী মোহন,

মুকুট সে নবপত্র শোভে শিরোপর;

বীর্য্যরূপ সূর্য্য উদি' করেছে বিকাশ

নারাচস্বরূপ নালে উচ্চে যার স্থিতি

কম্পহীন স্থলপদ্ম সদৃশ প্রকাশ

ভয়হীন নৃপমুখ শোভিতেছে অতি ॥

দ্বিতীয়। এরূপ ক্ষত্রিয়দের উপরও মৃত্যুর প্রভাব? শত্রুপক্ষীয় পুরুষগণ আমাদের রাজার সৈন্যক্ষয় কর্‌তে পার্‌বে না।

তৃতীয়। তুমি কি বল? ক্ষত্রিয়দের উপর কি মৃত্যুর প্রভাব?

প্রথম। তাহাতে আর সন্দেহ কি?

তৃতীয়। না, না—এরূপ ব'ল না।

খাণ্ডবদাহন-ধূমে সুরঞ্জিত যার ছিলা

সংশপ্তক হত তেজে যার,

স্বর্গের ক্রন্দনহারী নিবাত কবচে মারি'

সেই ধনু ধরি পার্থ, আর

মহেশ্বর সহ রণে অবশিষ্ট শরগণে

নিক্ষেপি' সমরে গর্ব্বী যত নৃপগণে

প্রেরিয়াছে অকাতরে শমন-সদনে ॥

সকলে। ও:—কি শব্দ?

বজ্রে কি ভাঙ্গিছে গিরি? জলদ কি করিছে গর্জ্জন?

ভীমরব সে আঘাতে ধরণীর এ কি বিদারণ?

পবনে চঞ্চল ক্ষুব্ধ পূর্ণ করি' মন্দর কন্দর,

উর্ম্মিমালা উচ্ছ্বসিয়া নিনাদ কি তুলিছে সাগর?

চল, দেখা যাক্।

[সকলে পরিক্রমণ করিতে লাগিল]

প্রথম। আরে, ব্যাস, বলদেব, কৃষ্ণ, বিদুর প্রভৃ[illegible] কুরু ও যদুকুল-প্রধানগণের সমক্ষে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষ[illegible] ক্রুদ্ধ ভীমের সহিত ভ্রাতৃশতবধে ক্রুদ্ধ মহারাজ দুর্য্যোধনে[illegible] গদাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

দ্বিতীয়।

তপ্ত কাঞ্চনের আভা শিলা-সুকঠিন সেই

ভীম বুকে; ঐরাবত-শুণ্ড-সুকঠিন

দুর্য্যোধন-অংস'পরে পরস্পর সংপ্রহারে

দুই হাতে তুলি' গদা, হ'য়ে রণলীন,

গদাঘাত শব্দ এবে উঠিছে প্রবীণ ॥

তৃতীয়। এই যে মহারাজ দুর্য্যোধন—

কম্পনে শিরেতে যার চঞ্চল মুকুট,

ক্রোধে আরক্তিম যার নয়নযুগল,

বিভিন্ন প্রদেশে যেই আক্রমণ তরে

করিতেছে বক্রীকৃত শরীর কেবল।

রক্তে আর্দ্র গদা শোভে উত্তোলিত করে,

মহেন্দ্রের বজ্র যথা কৈলাস শিখরে।

প্রথম। আঘাতজনিত রুধিরে সিক্ত-দেহ পাণ্ডবে[illegible] দেখ।

দীর্ণ ললাট হইতে ঝরিছে

রুধির, ভেঙ্গেছে বাহুযুগল,

আঘাতে গলিত ঘন রুধিরেতে

ভিজিয়াছে বুক; মেরু অচল

ধাতু-রসধারা গলিত হইলে

শোভে যথা, ভীম তেমতি ভায়

গদার আঘাতে রুধির-ক্লিন্ন

ব্রণে ভরা আজি সকল কায় ॥

দ্বিতীয়।

নিক্ষেপিছে ভীম গদা, ভ্রমিতেছে করিয়া গর্জ্জন,

শীঘ্র বাহু আকর্ষিছে আঘাতেরে করিছে বারণ

গুপ্ত গতি অবলম্বি' পুনঃ-পুনঃ করিছে প্রহার

সুশিক্ষিত দুর্য্যোধন, বল কিন্তু ভীমেরই প্রচার ॥

তৃতীয়। এই বৃকোদর—

দারুণ আঘাত শিরে রক্তে সিক্ত সকল সে কায়,

রণে অনুপম বীর পর্ব্বতের সম শোভা পায়;

পড়ে' এবে ধরাতলে বজ্রাঘাতে হেমকূট-সম,

গৈরিক ধাতুর রস উছলিয়া পড়ে মনোরম ॥

ভীষণ প্রহারে শিথিল-অঙ্গ পতিত ভীমসেনকে দেখিয়া

বিস্মিত ব্যাস উত্তোলি মুখ

একটি আঙুলে রাখে।

দ্বিতীয়।

যুধিষ্ঠিরের দৈন্য ; অশ্রু

বিদুরের আঁখি ঢাকে।

তৃতীয়।

গাণ্ডীব ধ'রে অর্জ্জুন ; হরি

গগনের দিকে চায়,

সকলে।

শিষ্যের প্রীতি- বশ বলদেব

নিজ হল সে ঘুরায় ॥

প্রথম। এই যে মহারাজ—

বিবিধ রত্নে খচিত কিরীট বীর্য্যের সে আলয়

শোভমান সদা সাহস, কান্তি, অভিমান ও বিনয় ;

করি উপহাস, "নাহি ভয় ভীম" কহে সে দুর্য্যোধন,

"দীন যারা, রণে বীর তাহাদের

করে না কভু নিধন ॥"

দ্বিতীয়। এই যে ভীমসেনকে উপহসিত দেখিয়া জনার্দ্দন নিজ উরুতে আঘাত করিয়া কি এক ইঙ্গিত করিলেন।

তৃতীয়। এই ইঙ্গিতে আশ্বাস পাইয়া ভীমসেন—

ভ্রূকুটি করিয়া দূর, মুছি নিজ করে

ললাট হইতে স্বেদ, পুনঃ এবে ধ'রে

দুই হাতে গদা তার

চিত্রাঙ্গদ নাম যার

বায়ু যেন দিল বল সুতে দীন হেরে।

ভীম মুখ, আঁখি সিংহ বৃষের মতন,

ভূমি হ'তে উঠে পুনঃ করিয়া গর্জ্জন ॥

প্রথম। অহো, আবার গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ভূমিতে যুগল পাণি করিয়া ঘর্ষণ

বলে বাহুযুগ দ্রুত করিয়া মার্জ্জন

অধর দংশন করি' গর্জ্জিয়া বিক্রমে ঘোর

ত্যজি ধর্ম্ম, ঘৃণা ; নীতি করিয়া লঙ্ঘন

কৃষ্ণের ইঙ্গিত লভি' ভীম তুলি নিজ গদা

দুর্য্যোধন উরুপরে করিল পাতন ॥

সকলে। হায়—হায়—মহারাজ পতিত হইলেন।

তৃতীয়। রুধির-স্রাবে লিপ্ত-অঙ্গ পতিত কুরুরাজকে দেখিয়া ভগবান ব্যাস আকাশে উঠিয়া গেলেন।

হেলায় মুদিল আঁখি বলদেব, দেখিয়া তাহায়

দুর্য্যোধন তরে ক্রুদ্ধ মনে বুঝি, ব্যাসের আজ্ঞায়,

উদ্বিগ্ন পাণ্ডবগণ বাহুমাঝে অন্তরাল করি

লয়ে যায় ভীমে এবে ; কৃষ্ণ যায় তার কর ধরি' ॥

প্রথম। আরে, ভীমসেনের অপসরণ দেখিতে-দেখিতে ক্রোধোদ্দীপ্ত-নয়ন ভগবান হলায়ুধ এই দিকেই আসিতেছেন। যাঁর—

গমনের বেগে অলক শিথিল

ক্রোধে আরক্ত আয়ত আঁখি

ভ্রমর-দষ্ট পুষ্পের মালা

ঈষৎ টানিয়া, বাহুটি রাখি

শ্যাম দেহ হ'তে স্খলিত বসন

ধরিবার তরে- হেরিয়া তায়

মনে হয় যেন মণ্ডল-সহ

নামিয়াছে শশী আজি ধরায় ॥

দ্বিতীয়। তবে এস, আমরাও মহারাজের নিকট যাই।

প্রথম ও তৃতীয়। আচ্ছা। বেশ কথা।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

(বিষ্কম্ভক সমাপ্ত)

[তাহার পর বলদেব প্রবেশ করিলেন]

ব। ওহে নৃপগণ! ইহা উচিত নয়।

শত্রুদের যমসম হল মোর উপেক্ষিয়া,

সমর-নিয়ম দর্পে করিয়া লঙ্ঘন

আমারেও তুচ্ছ করি' দুর্য্যোধন উরুপরে

রণমাঝে গদা তার করিয়া পাতন,

ঐশ্বর্য্য, বিনয়, বংশ সহ দুর্য্যোধন

একত্রে আজিকে ভীম করিল নিধন ॥

দুর্য্যোধন, মুহূর্ত্তকাল প্রাণ ধরে রাখ'।

যেই হলমুখ মোর করিয়াছে আস্বাদন

সৌভেরে, অসুরপুর-প্রাকারে আবার

কালিন্দীর জলভেদী, রিপুপ্রাণহারী সেই
লাঙ্গল তুলিয়া আজি করিব প্রহার
ভীমের বিশাল তপ্ত রক্তস্বেদে আর্দ্র বুকে
ক্ষেত্রে যথা কৃষী করে হল ব্যবহার ॥

[নেপথ্যে

ভগবান্ হলায়ুধ, প্রসন্ন হউন— প্রসন্ন হউন।]

ব। এরূপ অবস্থাপন্ন হয়েও দীন দুর্য্যোধন আমার অনুগমন করছে।

রণ-চন্দন- রুধিরে লিপ্ত
আর্দ্র সকল কায়,
ভূমি-ঘর্ষণে ধূলিতে পাটল
বাহুযুগ শোভা পায় ;
বালকের মত হাতে-পায়ে ভর ;
মিলি যবে সুরাসুরে
সুধা-মন্থন সাঙ্গ হইলে
ত্যাগ করে বাসুকীরে,
মন্দর হ'তে মুক্ত বাসুকি
শ্রান্ত শিথিল কায়,
অর্ণব জলে টানে নিজ ফণা,
তেমনি মূরতি ভায় ॥

[তাহার পর ভগ্ন উরুযুগলবিশিষ্ট দুর্য্যোধন প্রবেশ করিলেন]

দু। এই যে আমি—

লঙ্ঘিয়া সমররীতি ভীমের সে গদাঘাতে
বিক্ষত, জর্জ্জর, উরু আমার এখন।
ভূমিতে বাহুর ভরে, অৰ্দ্ধমৃত দেহ মোর
কষ্টে অতি করিতেছি এবে আকর্ষণ ॥

ভগবান্ হলায়ুধ! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন হউন।

ভূমিতলে নিপতিত আমার এ শির আজি
বিলুণ্ঠিত যথা দেব তোমার চরণ
তাজ রোষ আগে দেব! কুরুকুল-তর্পণের
সলিল-পূরিত মেঘ যাহারা এখন
বাঁচুক তাহারা প্রাণে, শত্রুতা ও যুদ্ধকথা
অবসান, আমারও ত ফুরাল জীবন।

ব। দুর্য্যোধন, মুহূর্ত্তের জন্ম প্রাণ ধরে' রাখ।

দু। কেন? আপনি কি করবেন?

ব। শোন—

লাঙ্গলের ফালে করি ছিন্নভিন্ন কায়,
স্কন্ধ বক্ষ চূর্ণ করি মুষলের ঘায়,
রথ, অশ্ব, গজ সহ পাণ্ডুসুতগণ
স্বর্গে অনুচর তব করিব প্রেরণ ॥

দু। না—না—আপনি এ রকম করবেন না।

শত ভাই মৃত ; ভীম
প্রতিজ্ঞা ত করেছে পালন,
আমার এ দশা ; রাম!
যুদ্ধে আর কি কাজ এখন?

ব। আমার সামনে তোমায় ছলনা করলে, তাই আমার রাগ হয়েছে।

দু। আমায় কি প্রবঞ্চিত বলে মনে করেন?

ব। তার আর সন্দেহ কি?

দু। আমার প্রাণের উপযুক্ত মূল্য আদায় হয়েছে। কেন না—

প্রজ্বলিত অগ্নি-ঘেরা দারুণ সে জতুগৃহ
বুদ্ধিবলে তাহা হ'তে হয়েছে উদ্ধার।
কুবের আলয়ে রণে, ভূধরের শিলাঘাত
উপেক্ষিয়া প্রকটিত বীর্য্যবল যার ॥
হিড়িম্ব রাক্ষসরাজ, তার বধ যার কাজ
সেই ভীম লয় যদি ছলের আশ্রয়
তারই পরাজয় ইহা, মোর কভু নয় ॥

ব। তোমায় যুদ্ধে বঞ্চনা ক'রে ভীম কি এখন জীবিত থাকবে?

দু। আমি কি ভীমের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছি?

ব। তবে কে তোমায় এ রকম করলে?

রাজা (দুর্য্যোধন)। শুনুন—

বাসবের মান সহ যেই পারিজাত-তরু
একদিন করেছে হরণ।
সহস্র বৎসর ধরি' অর্ণব-সলিল মাঝে
হেলায় যে করেছে শয়ন,
ভীমের সে সুভীষণ গদামাঝে প্রবেশিয়া
যুদ্ধে আমি নিরত যখন,

সহসা মরণ আনি দিল মোরে সেই জানি
জগতের প্রিয় নারায়ণ ॥

[নেপথ্যে

সরে যান, মহাশয়েরা, সরে যান।]

ব। (দেখিয়া) ও, এই যে গান্ধারী ও দুর্জ্জয়ের দ্বারা পথ-প্রদর্শিত হয়ে, ও অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের দ্বারা অনুসৃত হয়ে শোকাভিভূত হৃদয়ে পূজনীয় ধৃতরাষ্ট্র এই দিকেই আসছেন।

বীর্য্যের আকর নৃপমণি সুত-শতে দেছেন নয়ন,
স্বর্ণযূপসম লম্ববাহু দর্পী এঁরে হেন লয় মন ;
ত্রিদিব রক্ষার তরে যেন ভীত হয়ে যত দেবগণ,
তিমিররাশিতে নেত্রযুগ অন্ধ করি, করেছে সৃজন ॥

[তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, রাজমহিষী
ও দুর্জ্জয় প্রবেশ করিল]

ধৃতরাষ্ট্র। পুত্র! কোথায় তুমি ?

গান্ধারী। বাছা, কোথায় তুই ?

দেবীদ্বয়। মহারাজ! কোথা তুমি ?

ধৃ। উঃ—কি কষ্ট!

ছলে হত পুত্র মোর আজি রণে করিয়া শ্রবণ।
অশ্রুপূর্ণ আঁখিযুগ, আরও অন্ধ হয়েছি এখন ॥

গান্ধারি! বেঁচে আছ কি ?

গা। হতভাগিনী এখনও বেঁচে আছি।

দে। মহারাজ! মহারাজ!

রাজা। উঃ—কি কষ্ট! আমার স্ত্রীদের কাঁদ্‌তে হচ্ছে।

গদার আঘাত জাত ছিল না বেদনা।
রণক্ষেত্রে হেরি আজি উন্মুক্ত কেশের রাজি
রমণীগণেরে, এবে জাগিল যন্ত্রণা ॥

ধৃ। বংশের মধ্যে মহামানী দুর্য্যোধনকে কি দেখ্‌তে পাচ্ছ গান্ধারি ?

গা। মহারাজ! দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

ধৃ। কি বল্লে ? দেখ্‌তে পাচ্ছ না ? আমায় যখন পুত্র খোঁজ করবে, সেই সময় উপস্থিত। আর আজ আমি কি না পুত্রকে দেখতে পাচ্ছি না। হা রে হত কৃতান্ত!

সমরে অরাতি-জয়ী, মান, বীর্য্যে প্রজ্বলিত,
ধীর, বীর শত পুত্রে করি উৎপাদন।
মানী ধৃতরাষ্ট্র এই পিবে না কি একবারও
ধরণীতলেতে ত্যক্ত সলিল—যখন
করিবে তনয় তার সাদরে তর্পণ ॥

গা। বাছা, সুযোধন! আমায় সাড়া দাও। শত পুত্র বিনাশে কাতর মন্দভাগ্য তোমার পিতাকে উত্তর দাও।

বলদেব। ও, এই যে সেই সম্মানার্হা গান্ধারী।

নাহি ছিল কৌতূহল নেহারিতে পুত্রপৌত্রমুখ,
দুর্য্যোধন-মরণেতে উপজিছে যেই ঘোর দুখ,
তাহাতে বিগত ধৈর্য্য.অজস্র সে নয়নের জল,
ভিজাইছে বস্ত্রখণ্ডে পতিব্রতা-চিহ্ন সমুজ্জ্বল
আবরিয়া রাখিয়াছে সদা যাহা নয়ন-যুগল ॥

ধৃ। পুত্র! দুর্য্যোধন! অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর রাজা! কোথায় তুমি ?

রা। আজও মহারাজ আছি।

ধৃ। শত পুত্রের জ্যেষ্ঠ! আমায় উত্তর দাও।

রা। অন্য কথা বলি। এ কথা বল্‌তে লজ্জা হচ্ছে।

ধৃ। এস পুত্র। আমায় অভিবাদন কর।

রা। এই যাই। [উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন] হা ধিক্, এ আমার দ্বিতীয় প্রহার! উঃ—কি কষ্ট!।

কেশে ধরি গদাঘাতে হরিয়াছে ভীম আজি
ঊরুদ্বয় সহিতে আমার
শক্তি গুরু-পাদ-বন্দনার ॥

গা। এদিকে এস ত মা!

দে। আর্য্যে! এই যে আমরা।

গা। স্বামীকে খোঁজ।

দে। হতভাগিনী আমরা—যাচ্ছি।

ধৃ। কে রে আমার কাপড় ধ'রে টেনে পথ দেখাচ্ছে ?

দুর্জ্জয়। তাত! আমি দুর্জ্জয়।

ধৃ। পৌত্র! দুর্জ্জয়! তোমার পিতাকে খোঁজ।

দু। আমি হাঁট্‌তে পারছি না। পরিশ্রান্ত হয়েছি।

ধৃ। চল, বাবার কোলে বসে' বিশ্রাম করবে।

দু। তাত! যাচ্ছি। (অগ্রসর হইয়া) বাবা! কোথায় তুমি ?

রা। আরে, এ-ও এসেছে। যে পুত্রস্নেহ সকল অবস্থাতেই হৃদয়ে জাগরুক, আজ সেই স্নেহ আমায় দগ্ধ কচ্ছে। কেন না, ভয় হচ্ছে—

দুঃখে অনভিজ্ঞ যেই, ক্রোড়ে যার উচিত আসন।
নির্জ্জিত নেহারি মোরে না জানি কি করে সম্ভাষণ!

দু। এই যে মহারাজ মাটীতে বসে রয়েছেন।

রা। বাছা! তুই কি জন্য এখানে এসেছিস্?

দু। তুমি দেরী কর্‌ছ বলে’।

রা। উঃ, এই অবস্থায় পুত্রস্নেহ আমার হৃদয় দগ্ধ কচ্ছে।

দু। আমি তোমার কোলে বস্‌ব।

(ক্রোড়ে আরোহণ করিতে গেল)

রা। (নিবারণ করিয়া) দুর্জ্জয়—দুর্জ্জয়। উঃ—কি কষ্ট!

হৃদয়ে প্রীতির হেতু নয়নের আনন্দবর্দ্ধন।
কালবশে সেই চন্দ্র হইয়াছে আজি হুতাশন॥

দু। কেন তুমি আমায় কোলে বসতে দিচ্ছ না?

রা। ত্যজি পরিচিত অঙ্ক যেথা সেথা ব’সগে এখন।
আজ হ’তে নাহি বাছা পূর্ব্বভুক্ত তব সে আসন।

দু। তুমি কোথায় যাবে?

রা। আমার শত ভ্রাতার অনুসরণ করব।

দু। আমাকেও সেখানে নিয়ে চল।

রা। ভীমকে গিয়ে এ কথা বল’গে বাছা!

দু। এস মহারাজ! তোমায় খুঁজছে।

রা। কে?

দু। আর্য্য, আর্য্যা ও অন্তঃপুরের সকলে।

রা। পুত্র! তুমি যাও। আমি যেতে পাচ্ছি না।

দু। আমি তোমায় নিয়ে যাব।

রা। বাছা! তুমি ছেলেমানুষ।

দু। (পরিক্রমণ করিয়া) আর্য্যেরা, এই যে মহারাজ।

দে। হা—হা—মহারাজ।

ধৃ। কোথায় সে মহারাজ?

গা। কোথায় আমার বাছা?

দু। এই যে মহারাজ মাটীতে বসে আছেন।

ধৃ। হায়! এই কি মহারাজ?

সুবর্ণের স্তম্ভ সম ছিল যেই একাকী ভুবনে
যতেক রাজার রাজা, আজ তারে ধরণী-শয়নে
শায়িত করেছে অরি,
দীনবেশ আজি হেরি
অর্গলের অর্দ্ধভাগ শোভা পায় যথা দ্বার-সনে॥

গা। বাছা সুযোধন! পরিশ্রান্ত হয়েছ।

রা। আমি তোমারই পুত্র ত মা।

ধৃ। এ কে?

গা। মহারাজ! নির্ভীক পুত্র-প্রসবিনী আমি।

রা। আজই যেন আমার জন্ম হয়েছে ব’লে মনে হচ্ছে।
পিতঃ! কেন এত কাতর হচ্ছেন?

ধৃ। পুত্র! কাতর হ’ব কেন?

বীর্য্যবলদৃপ্ত তব রণযজ্ঞে দীক্ষিত জীবন
শত ভাই কালগত, ছিলে একা, হ’লে হত
তব সনে আমারও যে হয়েছে মরণ॥

[ভূমিতে পতিত হইলেন]

রা। আহা—পতিত হইলেন? বাবা! মাকে সান্ত্বনা দিন।

ধৃ। পুত্র! কি ব’লে সান্ত্বনা দিব?

রা। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হই নাই, সম্মুখযুদ্ধে হত হয়েছি—এই ব’লে পিতঃ! শোক দমন ক’রে আমায় অনুগৃহীত করুন।

নিত্য দীপ্ত অগ্নিদেবে ত্যজি উপেক্ষায়
তোমার চরণে শুধু করিয়াছি শির নত
যে মানের সহ মোর জনম ধরায়।
সেই মান সহ আজি যাই অমরায়॥

ধৃ। জন্মান্ধ বৃদ্ধ যে আমি, লুপ্ত-ধৈর্য্য, না চাহি জীবন।
তীব্র পুত্রশোক মোর হৃদি এবে করে আক্রমণ॥

বলদেব। উঃ—কি কষ্ট!

দুর্য্যোধন জীবনের কোন আশা নাহিক এখন।
কেমনে জন্মান্ধ নৃপে করি এবে আত্ম-নিবেদন॥

রা। মা—তোমায় বল্‌ছি।

গা। বল বাবা।

রা। প্রণিপাত করি কহি যদি পুণ্য থাকে কিছু আর।
জন্মান্তরে হ’য়ো মাতঃ, তুমিই সে জননী আমার॥

গা। আমার মনের কথাই তুমি বললে।

রা। মালবি! তুমিও শোন—

সমরে উত্থিত গদা-পতনে ভ্রূকুটি
বিকসিত, বক্ষে মোর রুধিরের ধারে

বিরচিত হার, শোভা উঠিয়াছে ফুটি'
সুবর্ণ-কবচে যেন ব্রণাঙ্কিত করে।
অয়ি ক্ষত্রিয়ের জায়া, কাঁদ কেন আর ?
সমরে অপরাঙ্মুখ দয়িত তোমার॥

দে। আমি বালিকা, তোমার সহধর্ম্মচারিণী। কাঁদ্‌ছি।

রা। পৌরবি! তুমিও শোন—

বেদে সুবিহিত যাগ অভিমত
সাধিয়াছি বহু বার ;
যত বন্ধুজন, করেছি রক্ষণ ;
স্থান ছিল সে আমার
রিপুর উপরে ; আশ্রিত নরে
প্রিয় শত দিছি দান ;
আঠার বাহিনী- ভরা নৃপমণি
করেছি তাপিত-প্রাণ ;
মানিনী আমার! এরূপ প্রকার
নেহার আমার মান ;
কাঁদে না কখন, পতি যার হেন
রমণী আকুল-প্রাণ॥

পৌ। একত্রে অনলে প্রবেশ করব, এই স্থির করেছি। তাই আর কাঁদ্‌ছি না।

রা। দুর্জ্জয়! তুমিও শোন।

ধৃ। গান্ধারি! না জানি কি বল্‌বে।

গা। আমিও তাই ভাব্‌ছি।

রা। যেমন আমার করতে, তেমনি পাণ্ডবদের সেবা ক'রো। পূজনীয়া মাতা কুন্তীর আজ্ঞানুযায়ী হ'য়ে থেক। অভিমন্যুর মাতা ও দ্রৌপদীকে জননীর মত পূজা ক'রো। দেখ বৎস—

অভিমান-পূর্ণ চিত পিতা মোর দুর্য্যোধন
শ্লাঘনীয় লক্ষ্মী ছিল যাঁর,
সমকক্ষ বীর সহ সম্মুখ-সংগ্রামে হত
এই শোক কর পরিহার।
যুধিষ্ঠিরের ক্ষৌম দক্ষিণ সে ভুজ
স্পর্শ করি, পাণ্ডু-সুতগণ
সাথী হ'য়ে, যবে মোর নামমাত্র রবে শুধু
দিও জল—করিও তর্পণ॥

বলদেব। অহো বৈরভাব! অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। আরে, কি শব্দ নয় ?

নীরব হয়েছে রণ-দুন্দুভি-নিনাদ
বিক্ষিপ্ত কবচ, বাণ, ছত্র ও চামর
সারথি ও রথী মৃত, ধনুর টঙ্কার,
বিত্রাসি' বায়সকুল—শোনা যায় কার ?

[নেপথ্যে—

যেই যুদ্ধযজ্ঞ মাঝে প্রবেশ করিয়াছিনু
আকৃষ্ট ধনুরে ধরি, সাথে দুর্য্যোধন
আবার প্রবেশি' তথা, অশ্বমেধ যাগ যথা,
সমাপ্ত হ'লেও থাকে অধ্বর্য্যু তখন॥]

বলদেব। ও—এ যে গুরুপুত্র অশ্বত্থামা এই দিকেই আস্‌ছে। এর—

শোভিতেছে নয়ন-যুগল,
স্পষ্ট সুবিশাল যেন পদ্মপত্র, ফুটিলে কমল
মনোরম কনক-গঠিত
যূপসম ভুজযুগ স্থূল, দীর্ঘ, কার্ম্মুক-শোভিত।
ধরে উগ্রধনু ভীমবলে
ইন্দ্রধনুলগ্ন যথা মেরুশৃঙ্গ শোভে দাবানলে।

[তাহার পর অশ্বত্থামা প্রবেশ করিলেন।]

অশ্ব। ["যেই যুদ্ধমাঝে" ইত্যাদি পুনর্ব্বার বলিয়া]।

যুদ্ধের উদ্যোগে উভয় পক্ষের সৈন্যরূপ সমুদ্রের সঙ্ঘর্ষে শস্ত্ররূপ যে নক্র উত্থিত হইয়াছিল, তাহাদের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত-শরীর, অল্পাবশিষ্ট, নিঃশ্বাসমাত্রে যাহাদের দীন প্রাণ পর্য্যবসিত, এইরূপ সমরে শ্লাঘাকারী নৃপতিগণ শুনুন—শুনুন।

নহি আমি কুরুরাজ ছলে ভগ্ন ঊরুযুগ,
নহি কর্ণ, শস্ত্র যার শিথিল, বিকল।
উদ্যত আয়ুধ করে, রণভূমি দেখিবারে
দ্রোণ-সুত দাঁড়ায়েছি একা অবিকল॥

আমার এ যুদ্ধের বৃথা বিজয়-শ্লাঘা করিয়া লাভ কি ? (পরিক্রমণ করিয়া) থাক্‌। আমি পিতার তর্পণে ব্যস্ত থাকায় কুরুকুলতিলক দুর্য্যোধন প্রতারিত হইয়াছেন। এ কথা কে বিশ্বাস করিবে ? কেন না—

এক হাতে ধরি ধনু, মিলায়ে অপর হাতে
উত্তোলি' অঞ্জলি শিরে করিয়া বন্দন।

উন্মুখ আজ্ঞার তরে   রথ ও গজের পরে
একাদশ বাহিনীর ছিল নৃপগণ।
পরশুরামের শরে   বিক্ষত কবচ যার
হেন ভীষ্ম আর মোর পিতা যোদ্ধা রণে
কাল আজি হারায়েছে সেই দুর্য্যোধনে॥

তা, গান্ধারীপুত্র এখন কোথায় গেল। (পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) ও—নিহত গজ, তুরগ ও নর এবং রথের প্রাকার মধ্যে সমর-সাগর-পারগামী এই যে কুরুরাজ। যার—

ভ্রষ্ট কিরীট   চঞ্চল কেশ
কিরণের রাশি তা' হ'তে ধায়।
গদার আঘাতে   ক্ষত দেহ হ'তে
ঝরিছে শোণিত - আর্দ্র কায়॥
অস্তগিরির   মস্তক'পরে
শিলাতলে নিজ ঢালিয়া কায়।
সন্ধ্যায় রাঙা   অস্তোন্মুখ
রবি-সম এঁর মূরতি ভায়॥

(অগ্রসর হইয়া)

কুরুরাজ! এ কি?

রা। গুরুপুত্র! এ অসন্তোষের ফল।

অ। কুরুরাজ। আমি মূল সংকারের বিধান করব্।

রা। কি করবেন?

অ। শোন—

গরুড়ের পৃষ্ঠাসীন   চতুর্ভুজ কেশবেরে
উত্তোলিত শার্ঙ্গধনু আর চক্র করে
পাণ্ডুতনয়ের সহ   চিত্রপূর্ণ পটসম
নিক্ষেপিব কহি আমি নিশ্চয় সমরে
প্রহারিয়া সকলেরে শস্ত্রের নিকরে॥

রা। না—না—এরূপ করবেন না।

ধরণীর নৃপ যত   আজি ধাত্রীক্রোড়গত
কর্ণ মৃত, গততনু শান্তনু-তনয়
রণমুখে ভ্রাতৃশত   সকলে হয়েছে হত
আমি এ দশায়, ওগো গুরুর নন্দন,
ধনু ত্যাগ কর, শুন আমার বচন॥

অ। কুরুরাজ!

কেশে ধরি গদাঘাতে   আজি যুদ্ধে ভীম হাতে
তব দুই ঊরু চূর্ণ হয়েছে যেমন।
দর্পও তাহার সাথে ভেঙেছে তেমন॥

রা। ন,—না। রাজাদের মানই শরীর। মানের জন্যই আমি এ নিগ্রহ স্বীকার করেছি। গুরুপুত্র! দেখুন—

দ্রৌপদী আকৃষ্টা কেশে, রণে পুত্র উহাদের
বালক সে অভিমন্যু হয়েছে সংহার
দ্যূত-ছলে পরাজিত   হ'য়ে বনমৃগ সহ
অরণ্যে করেছে বাস কপটে আমার।
যে দর্প-হরণে দীক্ষা করিয়াছি দান।
অল্পই দিয়াছে তারা তার প্রতিদান॥

অ। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

যত বীরগণ আর তোমার আমার
নামে এ শপথ করি,   নাশিব পাণ্ডব অরি
নিশায় করিয়া ঘোর সমর-সঞ্চার॥

ব। গুরুপুত্র ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন।

অ। এই যে পূজনীয় বলদেব।

গ। হায়! এ বঞ্চনার সাক্ষী রহিয়াছে।

অ। দুর্জ্জয়! এইদিকে এস—

পিতার বিক্রমগুণে   উত্তরাধিকারী তুমি
বিনা অভিষেকে রাজ্যে (লব্ধ ভুজবলে)
হও রাজা ব্রাহ্মণের বচনের ফলে॥

রা। হায়, আমার মন যা করতে বলেছে তা করেছি। আমার প্রাণ এখন দেহ পরিত্যাগ করছে। এই যে শান্তনু প্রভৃতি আমার পূজনীয় পিতৃ-পিতামহগণ, এই যে কর্ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আমার শত ভাই উত্থিত হইয়াছে, এই যে ইন্দ্রের হাত ধরিয়া ঐরাবত-শিরোপবিষ্ট কাকপক্ষধর ক্রুদ্ধ অভিমন্যু আমায় সম্বোধন করিতেছে, এই যে উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরা আমার নিকট আসিয়াছে, এই যে মূর্ত্তিমান মহাসমুদ্রসকল—এই যে গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী-সমূহ, এই যে আমায় লইয়া যাইবার জন্য কাল-প্রেরিত বীরগণের বাহন সহস্র-হংসযুক্ত বিমান! এই যে আমি যাই।

[স্বর্গগত হইলেন]

[যবনিকা আচ্ছাদন করিল]

ধৃ। পুত্র মৃত; রাজ্যে মোর ধিক্ আজি;—যাই বনে—
সজ্জনগণের যাহা চিরনিকেতন।

অ। সৌপ্তিকবধের তরে   যাই ধরি ধনুঃশর

[ভরতবাক্য]

রিপুহীন নৃপ ধরা করুন পালন॥

[সকলে নিষ্ক্রান্ত হইলেন]

ঊরুভঙ্গ সমাপ্ত।

মনোবিজ্ঞান

[অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম-এ,]

মন ও শরীর।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। মানুষ বলিতে আমরা মানুষের শরীর বুঝি না, মনও বুঝি না—কিন্তু উভয়ই বুঝি। উভয়েই নিরবচ্ছিন্ন। মনই আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধির নিয়ন্তা।

"নিগূঢ় গোপন আত্মা তুমি হে,
হস্ত-চরণ আমরা সবে;
তুমি চালাইলে তবে চলি মোরা,
তুমি বলাইলে বলি সে তবে।"

মনের উপর বাহ্যজগতের ক্রিয়া শরীরের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে; আবার মনও শরীর দিয়াই বাহ্যজগতের উপর প্রতিক্রিয়া করিয়া থাকে। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক,—ইহারা শরীরের অংশ। চক্ষুর সাহায্যে বর্ণ, কর্ণের সাহায্যে শব্দ, জিহ্বার সাহায্যে রস, নাসিকার সাহায্যে গন্ধ এবং ত্বকের সাহায্যে স্পর্শ প্রভৃতির জ্ঞান হইয়া থাকে। যে আজন্ম অন্ধ, তাহার বর্ণের জ্ঞান নাই; যে আজন্ম বধির, তাহার শব্দ-জ্ঞান নাই। আবার মন ব্যতীত চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির। অতএব শরীরের ভিতর দিয়াই বাহ্যজগতের বিষয় আমরা অবগত হই। শরীরে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে, তাহা অচিরে মনোজগতে আনীত হয়; আবার মনোজগতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাহাও শরীরে প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। শারীর-লক্ষণমাত্র দেখিয়া আমরা মনের ভাব অনেক সময়েই অনুমান করিয়া থাকি। অতএব শরীর এবং মনে বড়ই মাখামাখি ভাব।

মনের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ এবং নিকট। মস্তিষ্কের সহিত সমস্ত শরীর-যন্ত্রটি অসংখ্য ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্নায়ু-সূত্রের দ্বারা সংলগ্ন। যদি কোন একটি বিশেষ অঙ্গের সহিত মস্তিষ্কের এই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হয়, অর্থাৎ ঐ অঙ্গের সহিত মস্তিষ্কসংলগ্ন স্নায়ুসূত্রগুলি কাটিয়া দেওয়া হয়, তবে সেই অঙ্গ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই থাকিবে না। কারণ, উক্ত বিচ্ছিন্ন অঙ্গের উপর কোন ক্রিয়া সংঘটিত হইলে, সেই ক্রিয়াভাব মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌছিতেছে না; সুতরাং তজ্জনিত কোন জ্ঞানও হইতেছে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মনের সহিত মস্তিষ্কের সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয়। আরও পরীক্ষার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, যখনই আমি তোমার কোন অঙ্গ স্পর্শ করিলাম, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই তোমার স্পর্শজনিত জ্ঞান হইবে না। স্পর্শ করিবার কিঞ্চিৎ পরে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার অঙ্গ স্পৃষ্ট হইতেছে। তোমার শরীর-স্পর্শ এবং তজ্জনিত জ্ঞান—এই দুইএর মধ্যে সময়গত ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যবধান হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, অঙ্গবিশেষ স্পর্শজনিত বা অন্য কোন কারণবশতঃ পরিবর্ত্তন-বার্ত্তা মস্তিষ্কে আনীত হইতে কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বার্ত্তা মস্তিষ্কে আনীত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধে জ্ঞানও হয় না। শরীরে যখন যে ক্রিয়া ঘটিতেছে, তখনই তাহার বার্ত্তা অন্তর্বাহী স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে আনীত হইতেছে। বাহ্যপরিবর্ত্তন যতক্ষণ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কে ধাক্কা না দেয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার জ্ঞান হয় না। আরও দেখিয়াছি যে, যখন মন অবসন্ন হয়, তখন মস্তিষ্কও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, মস্তিষ্কের বিকার উপস্থিত হয়। অকস্মাৎ সজোরে মস্তিষ্কে আঘাত লাগিলে, চিন্তাশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়, সংজ্ঞাহীন হইতে হয়। যেখানে মানসিক বিকার, সেইখানেই মস্তিষ্কের কোন না কোন অংশের হানি পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে, মস্তিষ্কের রক্ত-চলাচল দ্রুত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মস্তিষ্কেরও তারতম্য লক্ষিত হয়। পাগলের মস্তিষ্কের ওজন ৩২ আউন্স, সাধারণ মনুষ্যের ৪৮ আউন্স এবং ধীমান ব্যক্তির ৬৪ আউন্স পর্য্যন্ত দেখা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, মস্তিষ্ক এবং মনের সম্বন্ধ অতি নিকট; সুতরাং মানসিক ব্যাপারের সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে, শরীর

-যন্ত্র সম্বন্ধে—বিশেষতঃ স্নায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

মানব-শরীরের প্রধান অবলম্বন অস্থি-কঙ্কাল। এই অস্থি-কঙ্কালের এক অংশ আমাদের মলদ্বারের কিঞ্চিৎ উপর হইতে আরম্ভ হইয়া মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহাকে মেরুদণ্ড বলে। আমাদের মস্তক মেরুদণ্ডের উপরিভাগে স্থাপিত। মেরুদণ্ড ও মস্তক নর-কঙ্কালের এক-খণ্ড বলা যাইতে পারে। এই মেরুদণ্ডের বলে আমাদের শরীর সবল ও উন্নত হইয়া থাকে, এবং ইহাই আমাদের মস্তককে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ মেরুদণ্ড একটি অস্থি নহে; ইহা কতকগুলি অস্থিখণ্ডের আশ্চর্য্য সমন্বয়। এক এক জায়গায় এক-একটি গ্রন্থি হস্ত দ্বারাও অনুভব করা যায়। প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থি দুইটী অস্থি খণ্ডের উপর্য্যুপরি অবস্থানের দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রকারে সমগ্র মেরুদণ্ডটি সপ্তবিংশ অস্থিখণ্ডে প্রস্তুত। এতগুলি বিভিন্ন অস্থিখণ্ড সংযুক্ত আছে বলিয়াই, আমরা পৃষ্ঠদেশকে ইচ্ছামত কতক পরিমাণে নোয়াইতে ও সোজা করিতে পারি। এই মেরুদণ্ডের উপরে অতি কঠিন ও গুরুভারসহ শিরঃকঙ্কাল স্থাপিত রহিয়াছে। মেরুদণ্ডের উপাদান অস্থিগ্রন্থিসমূহের মধ্যস্থ সচ্ছিদ্র গ্রন্থিগুলির একটি অপরটির উপর রক্ষিত; সুতরাং নিম্নতর প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের অধোভাগ পর্য্যন্ত একটি নিরবচ্ছিন্ন ছিদ্র রহিয়াছে। শিরঃকঙ্কালের অভ্যন্তরও শূন্য। সুতরাং মস্তকের ঊর্দ্ধভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া শরীরকাণ্ডের অধস্তনভাগ পর্য্যন্ত নর-কঙ্কালের অভ্যন্তর শূন্য। এই শূন্য অংশ একপ্রকার কোমল পদার্থে পরিপূর্ণ। বস্তুতঃ এই পদার্থের মধ্যে দুই পদার্থের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি শ্বেত ও অপরটি ধূসর বর্ণের। এই পদার্থটিকে স্নায়ু-পদার্থ বলে। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে শ্বেত পদার্থকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া ধূসর পদার্থটি ও মস্তকের অভ্যন্তরে শ্বেত পদার্থটিকে পরিবেষ্টন করিয়া ধূসর পদার্থটি অবস্থান করিতেছে। মেরুদণ্ডের দুই-দুই অস্থিগ্রন্থির মধ্যে অতি সামান্য অবকাশ রহিয়াছে। এই অবকাশ দিয়া দুইটি সূত্রাকার স্নায়ুমূল—একটি শরীরের পুরোভাগ ও অপরটি পশ্চাৎভাগ হইতে নির্গত হইয়াছে। দুইটির মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, পশ্চাৎভাগ হইতে যে মূল নির্গত হইয়াছে, মেরুদণ্ড হইতে অল্পমাত্র দূরে উহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এবং পুনরায় পূর্ব্বাকৃতি ধারণ করতঃ কিঞ্চিদগ্রে অপর মূলের সহিত মিলিত হইয়া একটি স্নায়ুবৎ হইয়া গিয়াছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দুইটি মূল পুনরায় বিভিন্ন হইয়া শরীরের অপরাপর অংশে প্রবেশ করিয়াছে। ঊর্দ্ধ দিকে যে স্নায়ু-পদার্থ মস্তকের অভ্যন্তরে রহিয়াছে, উহা হইতে অসংখ্য স্নায়ুরাশি মস্তক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদিতে বিস্তৃত হইয়া আছে। মেরুদণ্ড মধ্যস্থিত স্নায়ুপদার্থকে মজ্জা ও মস্তকের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুপদার্থকে মস্তিষ্ক বলে। মেরুদণ্ড ও মস্তকের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ু-পদার্থকে স্নায়ুমণ্ডলের কেন্দ্র বলা হইয়া থাকে; যেহেতু, মানব শরীরের স্নায়ুমাত্রই হয় মস্তিষ্ক নয় মজ্জা হইতে নির্গত হইয়া শরীরের সকল অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। শরীরের দূরতম প্রদেশের অতি ক্ষুদ্র স্নায়ুসকলও পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, শেষে মস্তকে ও মেরুদণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। শরীরের এমন কোন অংশ নাই, যাহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুদ্বারা আচ্ছন্ন নহে। এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম-স্নায়ু পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র শরীর আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। একটি আলপিন বসিতে পারে এরূপ স্থান নাই, যাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র স্নায়ুর সন্নিবেশ না আছে। শরীরের বহির্ভাগে যেরূপ, অভ্যন্তরেও তদ্রূপ। স্নায়ুসকলের সংখ্যা করা অসম্ভব; কিন্তু শারীরতত্ত্ববিদেরা কতকগুলিকে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় মনে করিয়া, অপরগুলি হইতে পৃথক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা দর্শন-নাড়ী, শ্রবণ নাড়ী ইত্যাদি। এগুলি বরাবর মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া কথিত ইন্দ্রিয়াবয়ব সকল পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। মস্তকের অধোভাগে যে সকল স্নায়ু পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মজ্জা হইতে নির্গত হইলেও, পরোক্ষভাবে মস্তিষ্ক হইতেই নির্গত হইয়াছে। মস্তিষ্ক ও মজ্জা মিলিত হইয়া এক অবয়ব হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং অধোভাগের নাড়ীগুলি মস্তিষ্কের সহিত ও ঊর্দ্ধভাগের নাড়ীগুলি মজ্জার সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্নায়ু ও স্নায়ুকেন্দ্র লইয়াই আমাদের স্নায়ুমণ্ডল। একটি স্নায়ুকে যন্ত্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহা কতকগুলি স্নায়ুসূত্রের সমষ্টি মাত্র। অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় নাড়ীগুলির অভ্যন্তরে একটি সূত্র ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুইটি আবরণ বা পর্দ্দা রহিয়াছে। আভ্যন্তরীণ সূত্রটিকে অক্ষনল ও উহার আবরণ দুইটিকে স্নায়ুরক্ষক আবরণ বলা হয়। কতকগুলি স্নায়ুতে গ্রন্থি

আছে ও অপরগুলিতে উহা নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্নায়ুসকল পরস্পরকে কোন নগরের পথের ন্যায় কাটাকাটি করিয়া চারিদিকে চলিয়া গিয়াছে। স্নায়ুর উপাদান পূর্ব্বকথিত শ্বেত পদার্থ। মজ্জা বা মস্তিষ্কে যে শ্বেত পদার্থ আছে, স্নায়ুসকল সেই শ্বেত পদার্থের উপাদানে গঠিত। এই শ্বেত পদার্থ আবার অসংখ্য স্নায়ুসূত্রময়।

আমাদের মস্তিষ্ক একটি বৃহৎ পুষ্পাকৃতি। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ মজ্জাদণ্ডের উপর এই বৃহৎ পুষ্প সন্নিবিষ্ট। মস্তিষ্কের এক অংশ ক্ষুদ্র হইয়া মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া শরীর-কাণ্ডের অধস্তন ভাগ পর্য্যন্ত প্রসারিত, অথবা মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ মজ্জাদণ্ড মস্তকে প্রবেশ করিয়া এক বৃহৎ পুষ্পাকারে পরিণত হইয়াছে। যে স্থলে মেরুদণ্ড মস্তকে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থলে মজ্জাদণ্ড বিশেষ প্রশস্ত ও স্থূল ;—এই অংশকে আয়তমজ্জা বলে। ইহাকে আচ্ছাদন করিয়া আর একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক স্থাপিত। মজ্জা ও মস্তিষ্কের সন্ধিস্থল হইতে এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের উপরিভাগ পর্য্যন্ত যে অবয়ব তাহার দুই পার্শ্বে আরও দুইটি পৃথক অবয়ব রহিয়াছে। সর্ব্বোপরি মস্তিষ্কের গোলাকৃতি ঊর্দ্ধতন অংশ এক গভীর প্রণালী দ্বারা দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে—যেন বৃন্তের উপর সপল্লব পুষ্প প্রস্ফুটিত। এই দুই অংশকে দক্ষিণ ও বাম "গোলকার্দ্ধ" বলে। এই গোলকার্দ্ধের উপরিভাগ সমতল নহে। ইহাও অগভীর প্রণালী দ্বারা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া বন্ধুর হইয়া রহিয়াছে। গোলকার্দ্ধদ্বয় ভিতরের দিকে শ্বেতসূত্রগুচ্ছ দ্বারা সম্মিলিত। কিছুদূর নিম্নে দুই গোলকার্দ্ধ হইতে মিশ্রিত স্নায়ুসকল পরস্পরের ভিতর দিয়া বিভিন্নমুখে শরীরের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে—অর্থাৎ বাম গোলকার্দ্ধ হইতে নির্গত স্নায়ু সকল শরীরের দক্ষিণাংশে ও দক্ষিণ গোলকার্দ্ধ হইতে নির্গত স্নায়ু সকল শরীরের বামভাগে চলিয়া গিয়াছে।

এই বিশাল জগৎকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—অন্তর্জগৎ এবং বহির্জগৎ। অন্তর্জগতের ক্রিয়াবলি বহির্জগতে প্রকটিত হইতেছে; আবার বহির্জগতের ক্রিয়াবলি অন্তর্জগতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমাদের স্নায়ুমণ্ডল এই দুই জগৎকে সংযুক্ত রাখিয়াছে। অন্তর্বাহী স্নায়ুকর্তৃক বহির্জগতের ক্রিয়াবলি অন্তর্জগতে আনীত হইতেছে, আর বহির্বাহী স্নায়ুকর্তৃক অন্তর্জগতের ক্রিয়াবলি বহির্জগতে নীত হইতেছে। অন্তর্বাহী স্নায়ুকর্তৃক সংবিত্তির এবং বহির্বাহী স্নায়ুকর্তৃক গতির বা গতিক্রিয়ার উৎপত্তি হইতেছে। স্নায়ুসমূহ সাধারণতঃ বার্ত্তাবাহক। প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে বার্ত্তা বহন করিতে হইলে, বাহকের ক্লান্তি জন্মিতে পারে; সুতরাং স্থানে-স্থানে শক্তির পুনরুদ্দীপন আবশ্যক। সংবাদ বহনকালে যাহাতে স্নায়ুশক্তির হ্রাস না হয়, অথবা যাহাতে লুপ্তশক্তি পুনরুদ্দীপ্ত হয়, সেই জন্য স্নায়ুসূত্রের স্থানে-স্থানে শক্তি-উদ্দীপনী বিশ্রামাগার আছে। এই বিশ্রামস্থানগুলি কতকগুলি স্নায়ুকোষের সমষ্টিমাত্র। এই প্রকার এক একটি সমষ্টিকে কোষগুচ্ছ বলা হয়। এক-একটি কোষ এক-একটি শক্তি-ভাণ্ডার। স্নায়ুপ্রবাহ কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শক্তিসঞ্চয়পূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইয়া থাকে। স্নায়ুপ্রবাহের গন্তব্যস্থানও এই কোষ দ্বারাই নির্ণীত হয়। কোষমধ্যেই অসংখ্য স্নায়ু সংলগ্ন; সুতরাং কোন একটি স্নায়ুপ্রবাহ কোষে প্রবিষ্ট হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিলেও, কোন নির্দ্দিষ্ট স্নায়ু অবলম্বন না করিয়া নানা স্নায়ুতে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। অতএব স্নায়ুপ্রবাহকে সংযত এবং নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালন করা আবশ্যক। স্নায়ুকোষই স্নায়ুপ্রবাহের গতির নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া মোটামুটি এইরূপ—
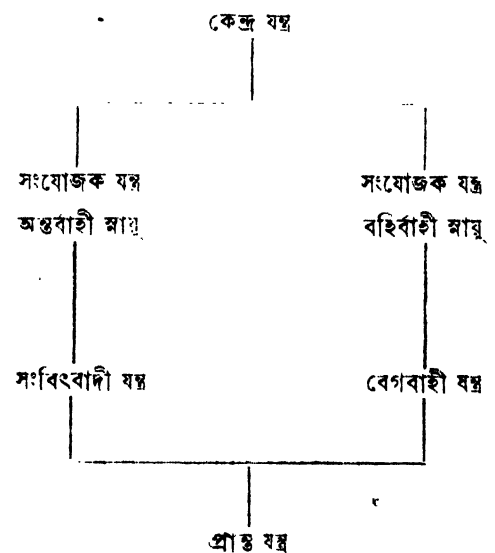
মজ্জাদণ্ড মস্তিষ্ক এবং শরীরকাণ্ডের সংযোজক। এই মজ্জাদণ্ড হইতে একত্রিশটি যুগ্ম স্নায়ু নির্গত হইতেছে। এই স্নায়ুগুলিকে মজ্জাস্নায়ু বলা হয়। প্রত্যেক স্নায়ুর দুইটি করিয়া মূল আছে; একটি পূর্ব্ববর্ত্তী, অপরটি পশ্চাৎবর্ত্তী। অন্তর্বাহী স্নায়ুর মূল পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বহির্বাহী স্নায়ুর মূল পশ্চাৎবর্ত্তী; হস্ত-সংলগ্ন মজ্জাস্নায়ুর পশ্চাৎবর্ত্তী মূলগুলির উচ্ছেদ কর, হস্তটি ইচ্ছামত ফিরাইতে-ঘুরাইতে পারিবে; কিন্তু ঐ হস্তে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিলেও কোন যন্ত্রণার অনুভূতি হইবে না। আবার অন্য মূলটির উচ্ছেদ কর, তোমার যন্ত্রণার অনুভূতি থাকিলেও, সঞ্চালন-শক্তি লোপ পাইবে। আবার যদি কোন কারণে মজ্জাদণ্ডের কোন অংশের অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তবে দেখিতে যে, সেই অংশের নিম্নদেশ হইতে স্নায়ু নির্গত হইয়া যে-যে অংশে প্রবাহিত হইয়াছে, সেই-সেই অংশ একবারে অবশ হইয়া যাইবে; এবং তাহাদের কোন প্রকার উত্তেজনা হইতে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হইবে না। মজ্জাদণ্ডের আর একটি শক্তি আছে। ইহা অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহের গতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। নিদ্রিত ব্যক্তির পদতলে আস্তে-আস্তে হাত বুলাইতে থাক, দেখিবে সে লোকটি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার পা-খানি সরাইয়া লইতেছে। উহার পদতলে হস্তস্পর্শ করিতেছ। স্পর্শজনিত ক্রিয়াহেতু অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হইতেছে; কিন্তু এই প্রবাহ মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত না যাইয়া মজ্জাদণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে—অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহ বহির্বাহী স্নায়ুপ্রবাহে পরিণত হইতেছে। এই প্রকারে নিদ্রিত ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেও তাহার পদ-সঞ্চালন হইতেছে। এখানে সংবিদ্বাহী স্নায়ুপ্রবাহ মজ্জাদণ্ড ভেদ করিয়া মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে না। মজ্জাদণ্ড হইতে গতি-প্রতিরোধ করিতেছে এবং অন্তর্বাহী স্নায়ুপ্রবাহকে বহির্বাহী স্নায়ুপ্রবাহে পরিণত করিতেছে।

মজ্জা বা মস্তিষ্ক হইতে নির্গত স্নায়ুমাত্রেই আয়তমজ্জাকে অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করে। আয়তমজ্জা মজ্জাদণ্ড ও মস্তিষ্কের বার্ত্তাবাহক। হৃদয়ের স্পন্দন, রক্তের প্রবাহ, পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি আয়তমজ্জার কার্য্য। এই সকল অত্যাবশ্যক জীবন-ধারণোপযোগী কর্ম্মগুলি যদি সতত চিন্তার আয়ত্তাধীন থাকিত, তাহা হইলে আমাদের জীবন রক্ষা একবারে অসম্ভব হইত—চিন্তামগ্ন হইলে, হয় ত শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে ভুলিয়া যাইতাম; অথবা কর্ম্মরত হইলে হয় ত ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিতে বিস্মৃত হইতাম। এই সকল কার্য্যের ভার আয়তমজ্জার উপর ন্যস্ত। মন এই সকল কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত। নিদ্রাকালে আমাদের হৃদয়-স্পন্দন প্রভৃতি ক্রিয়া সহসা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে—এরূপ চিন্তা কখনই আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করে না। অবশ্য ইচ্ছা করিলে আয়তমজ্জার কার্য্যাবলির নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারি; শ্বাস-প্রশ্বাস সংযত করিতে পারি; পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে পারি।

বৃহৎ মস্তিষ্ক ভাব, ভাবনা, ইচ্ছা প্রভৃতির আশ্রয়স্থল। এই মানসিক ক্রিয়াগুলি মস্তিষ্কের ধূসর বর্ণের পদার্থের সহিত অতি ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ। এই মস্তিষ্কের আকার ও বিকাশের সহিত মানসিক শক্তিসমূহের নিতান্ত নিকট সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। পশু অপেক্ষা মনুষ্য মস্তিষ্কের আয়তন অধিক এবং পশু অপেক্ষা মনুষ্যের বুদ্ধিও অধিক। মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে মস্তিষ্কের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন ব্যাধি বা ব্যাঘাত হেতু বৃহৎ মস্তিষ্কের কোন অংশের অনিষ্ট ঘটিলে, মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলির ক্রিয়া আংশিক বা সম্যক ভাবে লোপ পাইয়া থাকে। ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের দ্বারা আমাদের গতিশক্তি সঞ্চালিত এবং গতিক্রিয়া সংযত হইয়া থাকে। গতিশক্তির উৎপত্তিস্থল বৃহৎমস্তিষ্ক হইলেও ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক এই শক্তিকে সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত করিয়া থাকে। ব্যাধিপ্রযুক্ত ক্ষুদ্রমস্তিষ্কের অনিষ্ট সংসাধিত হইলে, পেশীসমূহের ক্রিয়া শিথিল হইয়া পড়ে এবং ইচ্ছানুযায়ী এই ক্রিয়ার সদ্ব্যবহার করা অসম্ভব হয়। আয়তমজ্জা শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালনাদি ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল। মজ্জা বা মস্তিষ্ক হইতে নির্গত স্নায়ুমাত্রেই আয়ত মজ্জাকে অতিক্রম করিয়া গমনাগমন করে। আয়তমজ্জার অনিষ্টের সঙ্গে-সঙ্গে জীবননাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমরা আমাদের বর্ণিত বিষয় আরও স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য অপর পৃষ্ঠায় একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলাম; ইহা হইতে পাঠকগণ অল্পায়াসেই বক্তব্য বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

		যন্ত্র	স্থান	স্নায়ু পদার্থের বিভাগ		ক্রিয়া
				ধূসর	শ্বেত	
স্নায়ুমণ্ডল	মস্তিষ্ক	বৃহৎ মস্তিষ্ক	মস্তকের উর্দ্ধভাগ	বাহির	ভিতর	অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছার আশ্রয়স্থল
		ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক	মস্তকের নিম্ন এবং পশ্চাৎভাগ	বাহির	ভিতর	গতিক্রিয়ার শৃঙ্খলানয়ন
		আয়তমজ্জা	মস্তকের সর্ব্ব নিম্ন ভাগ	ভিতর	বাহির	(ক) শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষেত্র (খ) সংবাহক
		মজ্জাদণ্ড	মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর	ভিতর	বাহির	(ক) সংবাহক (খ) প্রত্যাবর্ত্তন ক্রিয়ার আশ্রয়স্থল

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিচিত্রা প্রকৃতির সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি এই মানুষ। যে নিয়মের ধারায় অণপরমাণু হইতে গ্রহ-নক্ষত্র পর্য্যন্ত সকলেই একটানা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই প্রচণ্ড শক্তির স্রোত যেন এই মানুষের তটে আসিয়াই আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশ্বের নিয়ন্ত্রিত সব নিয়মই তাহার কাছে বে-নিয়ম। সে যে নিয়মে চলিবে, তাহা সে নিজে প্রস্তুত না করিলে, তাহা তাহার মনঃপূত হইবে না। সে নিয়ম নিজের পায়ের শৃঙ্খলই হউক, অথবা একেবারে ধূপের মত উড়িয়া যাইবার সর্ব্ব-বাধা-বন্ধ-হারা গতির ক্রম-সঞ্চরমান শক্তিই হউক,—নিজের মরণ-বাঁচন গতি-অগতির পথটি তথাপি মানুষের নিজেরই রচিত হওয়া চাই। ইহা, যতক্ষণ সে না বুঝিবে, ততক্ষণ সে থামিবেই না। হয় ত শিব গড়িতে বানর হইতেছে, হয় ত প্রাণকে আনিতে মরণকেই বরণ করা হইতেছে,—তবু মানুষের মধ্যে 'আমি' বলিয়া যে জিনিসটা বসিয়া আছে, সে তাহার কলার ভেলাতেই এই বিশ্ব-শক্তির উত্তাল সাগর পার হইতে চাহে। প্রতিপদে প্রতিকূল তরঙ্গ, বিপরীত-মুখ প্রচণ্ড পবন; তবু তাহার চিত্তের পাল, বুদ্ধির হাল, ইচ্ছার দাঁড়ের বলে সে বিশ্বের এই প্রচণ্ড প্রতিকূলতাকে অনুক্ষণই অনুকূল করিতে সচেষ্ট। যেন এ সাগর তাহাকে ডুবাইতেই পারিবে না, তাহার এ বিদ্রোহিনী ক্ষুদ্র শক্তির পরাজয় যেন একেবারেই সম্ভব নয়। মহাশক্তিময়ী বিশ্বপ্রকৃতি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বটেন, কিন্তু মানুষের কাছে এইখানে তিনিও যেন সময়ে-সময়ে নিজ শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিতেছেন। তিনিও যেন এই অবোধ শিশুকে লইয়া কি করিবেন ভাবিয়া পান না। তাই তাহাকে শান্ত রাখিবার জন্য নানা প্রকারে নিজেকে অক্ষমা প্রতিপন্ন করিয়া, তাঁহার এই ক্ষুদ্র শিশুকে ভুলাইয়াই রাখিতে চান। পুরুষকার নামে মানুষের শক্তির, মানুষের চেষ্টার এমন একটা অহঙ্কারকে তিনি তাহাদের চোখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়াছেন যে, মানুষ তাহার বলে তাঁহার সহিতও যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হইতে চায় না। শিশু যেমন মাতাকে জোরে হারাইয়া দিয়া নিজেকে জয়ী জ্ঞানে গর্ব্ব অনুভব করে, মানুষের এই যুদ্ধ—এই জয় যেন তাহারই অভিনয় মাত্র। এ যুদ্ধ কাহার সহিত—তাহা যে দুর্ব্বল মানব একেবারেই জানে না, তাহা নয়;

কিন্তু জানিয়া, মানিয়া, বুঝিয়াও স্বাধীন শক্তির মোহে সে সময়ে-সময়ে এমনি অন্ধ বনিয়া যায়। এইখানেই মানুষের বিচিত্রতা।

কামাখ্যানাথ ভাবিয়া-ভাবিয়া স্থির করিলেন, কাত্যায়নীর বিবাহ দেওয়াই কর্ত্তব্য। জগতে তাহার এমন কোন আত্মীয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া সে তাহার স্বল্পকাল-অতিবাহিত জীবনের বাকী বেশী দিনগুলি নিরুদ্বেগে কাটাইতে পারিবে। মহেন্দ্র তাহার ভ্রাতৃস্থানীয় বটে, কিন্তু পৃথিবীর ব্যাপারও কামাখ্যানাথের অনেকখানিই জানা আছে। নিজ পরিবার ও সন্তানাদি লইয়া এই মহেন্দ্রই যে এক সময়ে কাত্যায়নীকে জঞ্জাল স্বরূপ জ্ঞান করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এক বৃদ্ধা মাতা ছাড়া কাত্যায়নীর আত্মীয় বলিতে এখন আর কেহই নাই। তিনি ইহলোক হইতে অপসৃতা হইলে, অনূঢ়া ব্রাহ্মণ কন্যার কি অবস্থা হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই ভাবিয়া দেখা উচিত। যাহার সহিত একদিন বিবাহ-বন্ধনের স্থিরতা ছিল, সেরূপ অবিবাহিতা সুন্দরী যুবতী কন্যার ভার মহেন্দ্রের ন্যায় তরুণ-বয়স্ক ব্যক্তির উপর রাখাও যুক্তিসঙ্গত নয়। এরূপ স্থলে বিবাহ দেওয়া ভিন্ন অন্য কোনরূপেই মহেন্দ্রের নিকটে তাহাকে রাখা চলিতে পারে না; অথচ তাহার পিতা অন্তিম সময়েও এ বিষয়ে পুনঃপুনঃ এমন ভাবে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা ঠেলিতেও কাহারো সাহস হয় না। কে বলিতে পারে, ভবিষ্যতে তাহাতে কি ফল ফলিবে? মহেন্দ্র, ব্রাহ্মণী বা কাত্যায়নী—সম্ভবতঃ কেহই আর এ বিবাহে সম্মতি দিবেন না; অথচ এই বিবাহটি দিতে পারিলেই সর্ব্ব বিষয়ের যেন সুসামঞ্জস্য হইত। ইহাও যদি নিতান্ত না ঘটে, তাহা হইলে কাত্যায়নীর কোষ্ঠীপত্র দেখিয়া ভাল জ্যোতির্ব্বিদের দ্বারা অনুরূপ সুপাত্রের সঙ্গে শুভ সামঞ্জস্য করিয়া তাহার বিবাহ দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। জ্যোতিরত্নও একবার বলিয়াছিলেন যে, কাত্যায়নীর বিবাহের একমাত্র উপায় আছে! এই একমাত্র উপায় বোধ হয় যোগ্য পাত্রেরই ইঙ্গিত! জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মতে সুপাত্রে কন্যাদানে তাঁহার ত অনিচ্ছা ছিল না; সেরূপ পাত্র তিনি পান নাই বলিয়াই কন্যার এ.পর্য্যন্ত বিবাহ দেন নাই। এক্ষণে, পরের উপর অধিক ভার; অধিক দায়িত্ব স্থাপনে অনিচ্ছুক হইয়াই সম্ভবতঃ তিনি কন্যার বিবাহে অত অসম্মতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; নহিলে, কন্যার বিবাহ দেওয়া কখনই তাঁর অনভিপ্রেত ছিল না। অবশ্য, সেই স্বর্গগত ব্যক্তির মনোমত পাত্র সহজে পাওয়া যাইবে না; কিন্তু একেবারেই যে পাওয়া যাইবে না, এমনও ত হইতে পারে না। কামাখ্যানাথ সেজন্য চেষ্টা, অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম সমস্ত বিষয়েরই জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেমন করিয়াই হোক্, কাত্যায়নীর পাত্র খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। তাহাকে এমন সহায়হীনা ভাবে রাখা কোন ক্রমেই শাস্ত্র বা যুক্তি-সঙ্গত নয়।

কামাখ্যানাথ মহেন্দ্রকে একে একে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন এবং শেষে বলিলেন, "তোমারও এতে এক মহা-ভার নিরাকৃত হবে। নইলে চিরজীবন তোমায়ই তো এই চিন্তার অশান্তি সহ্য করতে হবে। তার চেয়ে এই পথই কি ঠিক নয়? ভাল করে ভেবে ভাখো।" মহেন্দ্র দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল, "আমার অশান্তি বা চিন্তার জন্য ভাব্‌বেন না। যাদের আমার ভার স্বরূপ জ্ঞান হবে বলে আশঙ্কা করছেন, তাঁদের মধ্যে একজন আমার গর্ভধারিণীর চেয়েও বড়, আর তাঁর কন্যা কাত্যায়নী! জীবনে কখনো এঁদের আমার ভার স্বরূপ বোধ হবে—এ ভয় আপনার একেবারেই করতে হবে না, এইটুকুমাত্র আপনি স্থির জান্‌বেন।" "এও সম্ভব স্বীকার করি- কিন্তু অন্যান্য কথাগুলোও মনে করে ভাখো।" "মা যদি বেশী দিন না বাঁচেন? আমি যদি তাঁদের কন্ঠার রক্ষণাবেক্ষণের উপলক্ষ না হই,—আপনাকেই তার পিতা বিশেষ ভাবে তার ভার অর্পণ করে গেছেন। আপনিই তাকে দেখ্‌বেন।" "মহেন্দ্র, ভুলে যাচ্ছ যে, আমি একজন পর বই আত্মীয় নই। এ দেখায় কি চিরদিন তাঁরা নির্ভর রাখ্‌তে পারবেন? তাও যদি সম্ভব হয়, তবুও আমার এ কর্ত্তব্য নয়; কেন না জীবনের কথা কেউ-ই বলতে পারে না। আমার বয়সের কথাও তোমাদের ভেবে দেখা উচিত; অথচ বালিকাটির জীবনের এখনো বহুকাল বাকী। আমি কতকালই বা তার তত্ত্বাবধান করতে পারব? বিশেষ, তার জীবনের সর্ব্ব ভার যখন তার পিতা আমাদের উপরই দিয়ে গেছেন—তার শুভাশুভের জন্য ধর্ম্মের কাছে যখন আমাদেরই দায়ী করে গেছেন,—তখন তার জীবনটা যাতে নিষ্ফলে না যায়, সে বিষয়েও আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমিই তার একমাত্র আত্মীয় বা অভিভাবক—সবই।

আমার কথাগুলি তুমি ভাল করে ভেবে দেখে যথা-কর্ত্তব্য স্থির কর।" "কাত্যায়নীর বাবা যে অসাধারণ জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, তা বোধ হয় আপনিও জানেন। তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে এত নিষেধ যখন করে গেছেন, তখন মনে হয় না কি, যে, অন্য কারও আর এ চেষ্টা না করাই উচিত? হয় ত তিনি এমন কোন অভ্রান্ত-দৃষ্টি পেয়েছিলেন, যাতে তাঁর মেয়ের বিয়ে না দেওয়াই কর্ত্তব্য বলে বুঝেছিলেন।" "তা যদি বল মহেন্দ্র, এমন অভ্রান্ত দৃষ্টি এক বিধাতা ছাড়া মানুষে সম্ভব বলে মনে হয় না। কে বলতে পারে তিনি এইখানেই বিশেষ ভাবে ভ্রান্ত হন নি? নিজ কন্যার সামান্য দুষ্টগ্রহকে বৃহৎ করে তোলেন নি, বা সেই ভ্রমটুকুতেই তার সমস্ত জীবনটা ঢেকে দেননি? মানুষ এইখানেই সব চেয়ে ভ্রান্ত হয়। যিনি যতবড় বিদ্বান, জ্ঞানী বা অভ্রান্তদর্শী হোন না কেন, সন্তানের জন্য প্রকৃতি-দত্ত স্নেহাশঙ্কা তাঁকে অতি সহজেই বিচলিত করে ফেলতে পারে। আত্মীয়ের চিকিৎসা এইজন্যই চিকিৎসা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। আজ তোমার হাতে কাত্যায়নীকে সমর্পণ করতে পারলেই সব দিকে সুশৃঙ্খলা হ'ত; কিন্তু এই যে আমরা তা সাহস করছি না, এই যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধায় তিনি সকলকে বেঁধে গেছেন, কে বলতে পারে এও একটা ভ্রমের উপরই দাঁড়িয়ে নেই।" মহেন্দ্র নত-মস্তকে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া একবার মাথা তুলিল—কামাখ্যানাথকে যেন কিছু বলিবে; আবার কি ভাবিয়া তখনি মস্তক নত করিল। কামাখ্যানাথ বলিলেন "কি বলতে চাও বল,—তুমিই তাদের একমাত্র আত্মীয়।" "না—অন্য কিছু না। আপনি তাঁদেরও এ কথাগুলা বলবেন কি?" "যদি তুমি ইচ্ছা কর, তো বলতে পারি বই কি। মার আদেশ ছাড়া কোন কাজই তো হবে না।"

পরদিন প্রভাতে কামাখ্যানাথ কাত্যায়নীর মাতার নিকট গিয়া এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন, "কাল মহেন্দ্রের মুখে কিছু-কিছু শুনেছি বাবা। আমি সামান্য মেয়েমানুষ, বুদ্ধি-জ্ঞান নেই,—কি করা উচিত, তা এখনো মাথা স্থির করে ভাবতে পারছি না। তোমার উপরেই তিনি কাত্যায়নীর সর্ব্ব ভার দিয়ে গেছেন।, তুমি ধার্ম্মিক, জ্ঞানী;—তুমি যা উচিত বলে বিবেচনা করবে, তাই কর। তোমার উপর তাঁরও যে দেবতার মতন বিশ্বাস ছিল। তোমার কাজে তিনি স্বর্গ থেকেও অসন্তুষ্ট হতে পারবেন না। বাবা, মহেন্দ্র ও কাত্যায়নীর কোষ্ঠী দুটো কোন ভাল জ্যোতিষীকে দিয়ে আর একবার দেখিয়ে যদি এই যোগাযোগটি ঘটিয়ে দিতে পার, তা হলে জানব—জীবনে এখনো আমার শান্তির আশা আছে।" কামাখ্যানাথ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "তাই যদি আপনার ইচ্ছা, তা'হলে প্রথমে সেই চেষ্টাই করা যাক্। এটি হলে সব দিকে ভাল হয়। কেবল তিনি যে বিশেষ করেই নিষেধ করে গেছেন, এইটা একটু আশঙ্কা বোধ হচ্ছে।" "সে কথা যে আমিও না ভাবছি, তা নয়। যদি নিতান্তই জ্যোতিষ-শাস্ত্রে না মেলে, তা'হলে কাজ নেই। আমার মহেনের আমি অন্যত্র বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনব। কাত্যায়নীর জন্য যদি তার এক বিন্দুও অনিষ্ট ঘটে, তা'হলে এ বিয়েয় কাজ নেই। তাঁর কাছে শুনেছি, তাঁর মেয়ের রাশ গণ খুব উঁচু।" "যা হোক, দেখা যাক্। আপনি আপনার মেয়ের আর মহেন্দ্রের কোষ্ঠী দুখানা আমায় এখনি দেন, দেরী করবার দরকার দেখি না।"

"কাত্যায়নি!" কাত্যায়নী গৃহান্তরে ছিল—মাতার আহ্বানে অঙ্গনে নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মাতা বলিলেন, "তোমার আর মহেন্দ্রের কোষ্ঠী দুখানা দাও তো মা।"

কন্যা নড়িল না। নত নেত্রে কেবল বলিল "কোষ্ঠী দেখার কোন দরকার নেই।"

"দরকার আছে বই কি। তুমি দাও।"

"মহেন্দ্রের কোষ্ঠী ঐ ঘরেই বাবার কাগজপত্রের মধ্যে আছে।"

"শুধু সেখানায় তো হবে না—তোমার খানাও চাই।"

সকলের প্রতি সুচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া কাত্যায়নী উত্তর দিল—"তাতে দেখবার যা ছিল, বাবা দেখে গেছেন; আর তা দেখার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

কন্যার স্বর শুনিয়া ও মুখের পানে চাহিয়া মাতা নীরব হইলেন। মহেন্দ্র অপলক স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কামাখ্যানাথও বিস্মিত ভাবে ক্ষণেক কাত্যায়নীর পানে চাহিলেন; পরে বলিলেন, "তুমি বালিকা, তোমার মঙ্গলামঙ্গলের ভার তোমার বাবা আমাদের উপর দিয়ে গেছেন। আমরা যাহা কর্ত্তব্য বুঝছি, তাই করতে চেষ্টা করছি। তুমি ছেলেমানুষী বুদ্ধিতে বাধা দিও না।" "আপনারা সব শুনেও যদি তাঁর ইচ্ছাকে মনে না রাখেন,

তা' হলে আমি তা' আপনাদের মনে করিয়ে দিতে পারি। আমি ছেলেমানুষ হলেও তাঁর মেয়ে।"

"তিনি যোগ্য পাত্র পাননি বলেই তোমার বিবাহ দিতে পারেন নি। আমরা তাঁর ইচ্ছামত জ্যোতিষশাস্ত্র মিলিয়েই সব কাজ করতে চেষ্টা করব।" ব্রাহ্মণী মৃদুস্বরে বলিলেন, "যদি মহেন্দ্রের নাম করাতেই তোমার অমত হয়, তা'হলে তাতে কাজ নেই। আমি জানি মহেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহে তাঁর অমত বুঝে পর্য্যন্ত তুমি এ সম্বন্ধে মহেন্দ্রের নাম কল্লেও রেগে ওঠো। তোমার সে পিতৃ-ইচ্ছা লঙ্ঘন করতে হবে না। সেকথা থাক। উনি যদি অন্য চেষ্টা করতে পারেন, দেখ্‌বেন। তোমার কোষ্ঠীখানা দাও।" "আমার কোষ্ঠী পাবেন না। এ সম্বন্ধে যে কোন চেষ্টাই পাপ—তাতে তাঁর ইচ্ছা ও আজ্ঞার উল্টো কাজ করা হবে। আমার তা অমান্য করার ক্ষমতা নেই। তিনি আমার বাবা।"

ছয়টি অপলক দৃষ্টিপাতের সম্মুখে কাত্যায়নী তেমনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কণ্ঠস্বর একটু বিচলিত হইল না, কাহারো পানে একবারও দৃষ্টি উঠাইল না—তেমনি নতনেত্রে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, কোমল অথচ স্পষ্ট ভাষায় প্রতি উত্তর দিয়া সকলকে নির্ব্বাক করিয়া দিল। মাতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমি জানি, এ চেষ্টা নিরর্থক। তিনি যখন বলেছেন কাত্যায়নীর বিবাহ হবে না, তা' কি কখনো মিথ্যা হ'তে পারে। থাক্—বিধবা মেয়ের মতনই তবে থাক্! বাপ হয়ে এই যে তিনি ব্যবস্থা করে গেলেন। মহেন, তুই তা' বলে নিজের জীবন নষ্ট করতে পাবি না। বাবা, এই দুর্ভাগাদের জন্য তুমি অনেক করছ; আরও একটু কষ্ট করে মহেন্দ্রের জন্য একটী সৎপাত্রী দেখে দাও—এই মাত্র আমার শেষ অনুরোধ।" কাত্যায়নীর ব্যবহারে কামাখ্যানাথের তখনো পর্য্যন্ত বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। ক্ষণেক নীরবে থাকিয়া গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"এ বিষয়ে আমার আর বেশী বলার অধিকার নেই। আপনার মেয়েকে ভবিষ্যতের কথা একটু ভাল করে বুঝোবেন।" "তার জন্মদাতা তাকে যে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে; তার উপরে আর কারও সাধ্য নেই যে, ওকে অন্য কিছু একটু বোঝায়। বাবা, তুমি আর এ জন্য অনর্থক কষ্ট পেও না। যা ওর ভাগ্যে আছে, তাই হবে।" কামাখ্যানাথ বিমনাভাবে চলিয়া গেলেন।

* * * * * *

কাত্যায়নী লক্ষ্য করিল, মহেন্দ্র কয়দিন হইতে তাহাকে যেন কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহস পাইতেছে না, ফিরিয়া যাইতেছে—অথচ অন্যদিকেও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিতেছে না। অন্যমনাভাবে অথচ অনন্যকর্ম্মা হইয়া মহেন্দ্রের চক্ষু কেবলই তাহার অনুসরণ করিতেছে। কাত্যায়নী বুঝিল, মহেন্দ্র তাহার কিছুকালের সঞ্চিত ইচ্ছার হস্ত হইতে এখনো নিষ্কৃতি পাইতেছে না। কিন্তু এ নিষ্কৃতি যে তাহাকে পাইতেই হইবে,—এই ইচ্ছার নাশ যে মহেন্দ্রকে করিতেই হইবে। এমন ইচ্ছা মনে পুষিয়া যদি সে এমন করিয়া কাত্যায়নীর পাশে-পাশে বেড়ায়, তাহা হইলে সে যে আর ভ্রাতার ন্যায় অসঙ্কোচে তাহাকে সেখানে রাখিতে পারিবে না। মাতার মুখে এই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত হওয়া পর্য্যন্ত মহেন্দ্র প্রায় বাহিরেই কাটাইয়াছে,—শৈশবের একত্র-বাস তাহাদের কিছুকাল হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে পিতার এই অনুষ্ঠানে সেই দূরের ব্যবধানটি সরিয়া গিয়াছিল। সেই শোকাকুল পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একজনের মত মহেন্দ্র তাহাদের মধ্যে চিরদিনের অধিকারেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। মায়ের সঙ্কোচকর কথাটা এতদিন যেন কাহারই মনে ছিল না। এখন আবার এই ব্যাপারে সেই সঙ্কোচ নূতন করিয়া এ সংসারে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। মহেন্দ্র কিছু বলিতেও সাহস করে না, অথচ তাহার মনে অহরহঃ সেই কথাটাই যে জাগিতেছে—ইহা বুঝিতে পারিয়া, কাত্যায়নীর ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বুঝিল, তাহার আর এরূপে চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। স্পষ্টাস্পষ্টিই মহেন্দ্রকে কিছু বলিতে হইবে; নহিলে মহেন্দ্র বোঝে কই! তাই সহসা একদিন কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া, কাত্যায়নী মহেন্দ্রকে বলিল, "মহেন্দ্র, তুমি কি আমায় কিছু বলতে চাও? যদি তোমার বল্‌বার কিছু থাকে, বল।" মহেন্দ্র কাত্যায়নীর এই প্রশ্নে বিব্রত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে কিছু বলিতে চায় বটে, কিন্তু এমন করিয়া প্রশ্ন করিলে তাহার সন্ধান মেলা যে কঠিন! তাহার যাহা বলিবার আছে, সে কথা তো এমন পরিষ্কার আদেশজ্ঞাপক স্বরের কাছে বলিয়া উঠা যায় না,—এমন স্পষ্ট দৃষ্টির সম্মুখেও নয়। কেবল বদ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "আমি? কই—এমন কিছু না।" "যেমনই হোক্, তাই শুনব। আমি বুঝ্‌তে পারছি, তুমি

ক'দিনই আমায় কি বলতে চেষ্টা করছ। চাওনি কি? ভুল বুঝেছি কি আমি? বল?"

মহেন্দ্র মস্তক নত করিল;—হাঁ, কি না,—কিছুই তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। "তোমার সঙ্কোচ দেখে অবাক্ হচ্চি। তুমি কি ভুলে যাচ্চ যে, তুমিই এখন আমাদের একমাত্র আশ্রয়—একমাত্র আত্মীয়! তুমি যে আমার ভাই।"

মহেন্দ্র মাথা তুলিয়া ক্ষণেক কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া রহিল। সেই রূপজ্যোতিঃ-উদ্ভাসিতা, অচঞ্চলা, বিদ্যুৎ বরণীর পানে চাহিতে-চাহিতে তাহার নয়নদ্বয় ঈষৎ অশ্রু-আবিল হইয়া আসিল। তাহার অন্তরাত্মা বুঝি বলিতে চাহিতেছিল, "শুধুই বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের রেখা! তা'ছাড়া একফোঁটা মেঘ, একবিন্দু জলের আভাষও বুঝি এখানে কোথাও নাই।" শুষ্ক কণ্ঠে ধীরে-ধীরে মহেন্দ্র উচ্চারণ করিল, "আমি কখনো তোমাকে কিছু বলিনি,—আজও বুঝি —বুঝি, সমস্ত জীবনেও সে সাহস কখনো পাব না। কেবল একটী অতি সামান্য কথা, একটী অতি সামান্য অনুরোধ তোমায় আমার করবার আছে।" "বল, সাধ্যের মধ্যে হলে নিশ্চয়ই রাখ্‌ব।"

"তোমার এই স্বীকারটুকুই আমার যথেষ্ট। মা আমায় কেবলই কি অনুরোধ করচেন, তা' তুমিও শুনেছ। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, মাকে তুমি এ ইচ্ছা ত্যাগ করতে পরামর্শ দেবে। আমার তাঁকে বা তোমাকে—কারুকেই বেশী কথা কিছু বলার সাধ্য নেই; কেবল তোমায় তাঁকে এই কথা বলতে বলি যে, যেমন বিধবা কন্যা মনে ভেবে তিনি তোমার বিয়ের বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাক্‌বেন, তেমনি আমায়ও তাঁর রোগগ্রস্ত সন্তান ভেবে বিয়ে দেওয়ার অনুপযুক্ত ছেলে বলেই তিনি যেন মনে করেন।"

কাত্যায়নী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মৃদুতর স্বরে বলিল, "আচ্ছা, আমি মাকে এ কথা না হয় বললাম; কিন্তু তিনি যদি তাতে না বোঝেন!" "তুমি যদি আন্তরিক চেষ্টার সঙ্গে তাঁকে বুঝাও, তিনি নিশ্চয়ই বুঝ্‌বেন—এ আমি ঠিক জানি।" "কাজটা কি ভাল হবে মহেন্দ্র? তাঁর মনে এ আঘাত দেওয়া তোমারও উচিত কি?" "অনুপায়। আমি তাঁর অকৃতজ্ঞ সন্তান।" "ভাল, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, কিন্তু আমারও তোমার কাছে কিছু চাইবার আছে।"

"আমার কাছে? বল, যদি আমার প্রাণ দিয়েও—। আমার কাছে তোমার চাইবার কি থাক্‌তে পারে, কাত্যায়নি? যাই হোক, বল—আমিও স্বীকার করছি, রাখ্‌ব।" "আর কিছু নয়—তুমি এর আগে যেমন কাজ-কর্ম্মে মন দিয়েছিলে, তেমনি আবার দেবে। নিজের উন্নতির চেষ্টা দেখ্‌বে—এমন করে বাড়ী বসে আর থাক্‌বে না।"

মহেন্দ্র থামিয়া-থামিয়া ধীর কণ্ঠে বলিল, "এই তোমার চাইবার বিষয়, কাত্যায়নি? বেশ, তুমিও যেমন আমার কথা রাখ্‌তে স্বীকার করেছ, আমিও তোমার কাছে স্বীকার করছি, আর তোমার কাছে এমন করে থাকব না—এখানে আর থাক্‌ব না—আমি শীগ্‌গিরই আবার চলে যাব। কাত্যায়নি,কিন্তু একটা কথা; মা,—মা কি এতে দুঃখিত হবেন না?" "হবেন—কিন্তু তিনি এটুকুও নিশ্চয় বুঝ্‌বেন যে, এমন করে থাক্‌লে তুমি কখনই ভাল থাক্‌বে না। তোমার স্বাস্থ্য ভাল নেই, তাও তিনি দেখ্‌ছেন তো। অন্যমনা না হলে, কাজে-কর্ম্মে মন না দিলে তুমি যে প্রকৃতিস্থ হবে না—এ তিনও বুঝ্‌তে বাধ্য হবেন।" "তোমরা মাত্র দুটী স্ত্রীলোক,—দেখা শোনারও কি দরকার হবে না।" "কেন হবে না? তুমি যখন এখানে আস্‌বে—দেখ্‌বে-শুন্‌বে। আর অন্য সময়ের জন্য সে রকম বন্দোবস্তও করতে হবে। কাছেই ত ওঁদের বাড়ী; রমার যত্নে, আর তার খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য আমাদের কোন অসুবিধাতেই পড়্‌তে হবে না—তা তো দেখতেই পাচ্চ। সদাসর্ব্বদা দরকারের জন্য একটা ব্যবস্থা করে রেখে গেলেই আমাদের যথেষ্ট হবে। বিশেষ, জমিদার স্বয়ংই যখন আমাদের অভিভাবকস্বরূপ, তখন সব বিষয়েই তুমি তাঁর উপরে নির্ভর রাখ্‌তে পারবে।" "তা সত্য। এও বুঝ্‌লাম কাত্যায়নি, যে, তুমি আমার এই এখানে থাকাটুকুও আরও সহ্য করতে পারছ না। অনেক দিন হতেই এ আমি লক্ষ্য করেছি। আমি একেবারে তোমার দৃষ্টির বাইরে না গেলে যদি তোমার অশান্তি বোধ হয়, তা'হলে তাও আমি যাব। ক্ষমা করো,—একটী কথা বলি;—যার জন্য তোমার আমার উপর এই বিরাগের সৃষ্টি—তার আশা বা সে প্রস্তাবের সাহস আমি নিজ হতে একদিনও মনে স্থান দিইনি। তোমার মা-ই তাকে সম্ভব বলে আমার সাম্‌নে ধরেছিলেন।"

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম্-বি]

বর-পণ

কর্ত্তা।—"সঙ্গে চাও যদি তবে এখানে মরতে এসেছ কেন"

কর্ত্তা।—"আমি মেয়ে বেচি না ;—গিন্নীর কাছে ও সব নিয়ে যাও।"

I slept and dreamt

I woke and found

এঞ্জিনীয়ার

কুলির হৃদয়ে শঙ্কা জাগায়ে
মাথায় তুলিনু সোলার hat ;
সামনেটা তার যদিও তোবড়া
সেলামে সেলামে—what of that ?
আমরা মস্ত ! আছে মুখস্থ
এঞ্জিনীয়ারি বোলচাল ;
খিলানের পরে সহর বানান,
একটা pillar এ গোল গোল,
নির্ঝর গতি রোধ করে' দেওয়া,
ঝরণার জলে বাঁধ বাঁধা,
সবই জানা আছে, করতেও পারি,
করি না,—কারণ, ঢের বাধা
শুধু খাতা নিয়ে, survey করিয়া,
উজাড় করিয়া বন-পাহাড়,
খালি ঘুরে মরি খানা ও খন্দে,—
ড্রেনের গন্ধে নির্বিকার !

মণিপুর-ভ্রমণ

[অধ্যাপক শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ]

দশম দিন ৩রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—ভোরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য নিমিত্ত ডিস্পেন্সারির নিকটস্থ একটি ডোবার ন্যায় পুষ্করিণীতে গেলাম। তাহার তীরে একটি প্রস্তরফলকে বাঙ্গলা অক্ষরে কি লেখা আছে দেখিয়া পড়িতে গেলাম। ভাষা মণিপুরী, এবং লেখাতে বর্ণাশুদ্ধি প্রচুর। যাহা হউক, এতটা বুঝিতে পারিলাম,—১৮২৬ শকে এই "অদ্বৈত সরোবর" বর্ত্তমান মহারাজ চূড়াচাঁদ সিংহ বাহাদুরের অনুজ্ঞায় খনিত হইয়াছে। কার্ত্তিক মাস বলিয়াই হউক, বা সর্ব্বদাই এইরূপ হইয়া থাকে বলিয়াই হউক, নিকটেই খোল করতালের বাদ্যসহ ক্রন্দন শব্দের ন্যায় কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। পরে জানিলাম, সন্নিকটে অদ্বৈত প্রভুর 'আখড়া' আছে। কাছাড়ের

এখান হইতে সমগ্র মণিপুর উপত্যকা লোক্‌তাক হ্রদ সহ বেশ দেখায়। একটু উপরে পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিলে তো কথাই নাই; তথা হইতে রাজ্যটি যেন একখানি সুদৃশ্য চিত্রপটের ন্যায় পরিলক্ষিত হয়। নিকটে একটি স্বচ্ছ সলিলা নদীও আছে। অথচ এ স্থান পাহাড়ের পাদদেশে হওয়াতে বন্যা বিপ্লবের কোনও ভয় নাই। এই যে এবার অভূতপূর্ব জলপ্লাবন হইয়া গেল, ইহা—এই স্থানের মাইলখানিক নীচিতে যে সকল ক্ষেত্র আছে, তাহারও কোনও অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

সঙ্গে মিলে। বর্তমানে মণিপুরীরা বিষ্ণুপুরীয়াদিগকে 'মায়াং' বলে; ইহার আধুনিক অর্থ—বিদেশী; কিন্তু মৌলিক অর্থ—"লোকাকীর্ণ স্থানবাসী" (মি-ইয়াম্—অনেক লোক)। ইহাতেও, বিষ্ণুপুর যে একটা বহুলোকবসতি-পরিপূর্ণ প্রাচীন জনপদ ছিল, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরীয়া মণিপুরীগণ এখন বিষ্ণুপুরে খুব কমই আছে। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে তাহারা নানাস্থানে বাস করিতেছে। বিষ্ণুপুর হইতে চারি মাইল দক্ষিণে নিংথৌ-খং নামক এক গ্রামে এখন বিষ্ণুপুরীয়াদের এক রাজা

শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দির

অতি প্রাচীনকালেও এখানেই রাজ্যের রাজপাট থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই যে লোক্‌তাক হ্রদ সম্ভবতঃ ইহা সমগ্র মণিপুর উপত্যকাব্যাপী ছিল, ক্রমশঃ পাহাড়ী নদী সমাহৃত পলি পড়িয়া ইহা ভরিয়া যাইতেছে। বর্তমান ইম্ফাল তো তখন জলগর্ভেই ছিল। এইখানেই সুতরাং প্রাচীনকালে লোকবসতি থাকিবার কথা। সমগ্র রাজ্যে এক মণিপুর নামটি ভিন্ন তাহাও না কি খুব আধুনিক সংস্কৃত নাম এক বিষ্ণুপুরেরই দেখা যায়। (১) এখানে যে সকল মণিপুরী "বিষ্ণুপুরীয়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাদের ভাষা অনেকটা আসামী—বাঙ্গালার থাকেন; তিনি মণিপুর রাজের সামন্ত। বলা আবশ্যক যে, ইম্ফালের মণিপুরীরা 'মিতেই' শ্রেণীর। বিষ্ণুপুরীয়াগণ যদিও মূলে অধিকতর আর্য্য, তথাপি ইহারা পরাজিত বলিয়া অনেকে 'মিতেই' বলিয়া অভিহিত হইতে বা তন্মধ্যে ভুক্ত হইতে বড়ই শ্লাঘা জ্ঞান করে। এরূপ উদাহরণ শত শত আছে, বলা বাহুল্য মাত্র।

অদ্বৈত সরোবরে স্নানাদি করিয়া প্রায় ৯টার সময়

(১) গ্রীয়ারসন সাহেব সংকলিত লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া দ্রষ্টব্য। Linguistic Survey of India, Vol. V, Part I P. 410.

হইতে বিদায়-গ্রহণপূর্ব্বক রাজধানী পরিত্যাগ করিলাম। এবারও টমটমে চলিলাম; কিন্তু তাহা ঘোটক-বাহিত নহে, নাগা দ্বারা চালিত। চারিজন নাগা—সম্মুখে দুইজন, পশ্চাতে দুইজন; টানিয়া ও ঠেলিয়া গাড়ী চালাইতেছিল। প্রতি আড্ডায় প্রত্যেকের ।৵০ করিয়া মজুরী। পথি-মধ্যে ষ্টেট কাউন্‌সিলের প্রেসিডেণ্ট হিগিন্‌স্ সাহেব স্বীয় বাহন থামাইয়া বিষ্ণুপুরের তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নিজেও তথায় সত্বর যাইবেন বলিলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দেবও সাহেবের সঙ্গে শকটে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সাহায্য যাহাতে আমার সময়ে পাই, তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া আসিলাম। রাত্রি ৪ দণ্ডের সময়ে প্রথম আড্ডা কাংলা-তম্বি পৌঁছিয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিলাম।

দ্বাদশ দিন (শনিবার ৫ই কার্ত্তিক)। কাংলাতম্বি হইতে প্রত্যূষে চলিয়া ১০টায় কোন্‌পক্‌পি পৌঁছিলাম। পথেই বড় সাহেব কোল বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হইল; তিনি সহরে ফিরিতেছেন। বিষ্ণুপুর ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গেও অনেক কথা হইল—একবার সেদিকে যাইবেন, এ কথাও বলিলেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রোহীন্দ্রনাথ বাগচির সহিতও দেখা হইল। তিনি স্বয়ং মণিপুরের নানা জায়গায় আমাকে লইয়া ভ্রমণ করিবেন, এই আশা ছিল; তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া বড়ই অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। কোন্‌পক্‌পিতে সদাশয় ওভারশিয়ার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় একটু সুলভতর রেটে কুলির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; এবং যাহাতে পথিমধ্যেও ঐরূপ স্বল্পতর ব্যয়ে নাগা পাওয়া যায়, তাহার নিমিত্ত চিঠিপত্র দিয়া আমার প্রভূত উপকার করিয়া দিলেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞ আছি। কোন্‌পক্‌পি হইতে কারিং সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে পৌঁছিলেও পূর্ব্বোক্ত উদারাশয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর বন্দোবস্তে মারান পৌঁছাইয়া দিবার কুলি পাইলাম। তথায় পৌঁছিতে রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর অতীত হইল।

ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষে যে কিরূপ শান্তি বিরাজমান, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আজ পাইলাম। এই নাগা জাতির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ পাহাড়ী জাতি কুত্রাপি ছিল না। মানুষ মারিয়া তাহাদের মুণ্ড যে যতগুলি সংগ্রহ করিতে পারিত, সে ততই গৌরবের ভাজন হইত। আমি একাকী একজন নিরস্ত্র ব্যক্তি, রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত ইহাদের দেশে নির্জ্জন পাহাড়ে ইহাদের দ্বারা অগ্র-পশ্চাতে পরি-বেষ্টিত হইয়া চলিয়াছি,—ইহাদিগের চলনে শৈথিল্য দেখিলে মধ্যে-মধ্যে দু-একটা ধমক্‌ও দিয়াছি; কিন্তু এই প্রকাণ্ডকায় বলিষ্ঠ নাগা কুলিরা মেষের ন্যায় ভীত ভাবে আমার আজ্ঞাবহ হইয়া চলিয়াছে। সঙ্গে তাহাদের দা, জাঠি প্রভৃতিও ছিল,—অনায়াসে আমার প্রাণ সংহার-পূর্ব্বক জিনিসপত্র, টাকাকড়ি লুঠপাট করিয়া নিতে পারিত; তা' করা দূরে থাকুক, কিসে আমার বিরক্তি না জন্মে, তজ্জন্যই যেন প্রাণপণ করিয়াছে।

নাগাদের সম্বন্ধে এস্থলে মোটামুটি দু একটা কথা বলা অন্যায় হইবে না। ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত,—প্রত্যেকের ভাষাও স্বতন্ত্র। চুল কাটিবার নমুনা দেখিয়া অনেক স্থলে কে কোন্ শ্রেণীর নাগা, তাহা বোঝা যায়। যেমন মণিপুরের "তাংখোল" শ্রেণীর নাগারা মাথার মাঝখানে চুল রাখিয়া পাশের দিকে অর্থাৎ দুই কাণের উপরে ছাঁটাইয়া ফেলে। কিন্তু সকলেরই শিখা আছে এবং কাণ সছিদ্র। এই কর্ণবেধ ও শিখাবন্ধন-রীতি দেখিয়া মনে হয়, নাগারা কোন কালে আর্য্যাচারপরায়ণ ছিল; 'শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাৎ' এবং 'ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ' ইহারা এই রূপ সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া বর্ব্বর জাতিতে পরিণত হইয়াছে (৫)। ইহাদের উদ্ধারের একমাত্র পথ ধর্ম্মপ্রচার। আসামের মহাপুরুষ শঙ্করদেবের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রভাবে কাছাড়ী প্রভৃতি অনেক জাতি সভ্য হইয়াছে। মিশনারী-দের কৃপায় খাসিয়ারাও অনেকটা উন্নত হইয়াছে বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম দ্বারা ঈপ্সিত উন্নতি হইবে না,—বিশাল হিন্দু-সমাজের অন্তর্বর্ত্তী না হইতে পারিলে তাহা হইবে না। মোসলমান হইলেও কতকটা হয়; কিন্তু কদাচার ঘুচে না, ধর্ম্মের রসও ইহারা পায় না। বৈষ্ণবের কীর্ত্তন, সেই খোল-করতালের সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-ঘোষণা ব্যতিরেকে ইহাদের বহুকাল-সঞ্চিত তমোরাশি দূর হইবে না। মণিপুরের অবস্থা দেখিলে নাগাদের উন্নতি সাধনের উপায় স্পষ্ট প্রতীত হইবে। অতি পূর্ব্বে যাহাই থাকুক না কেন, শ্রীমহাপ্রভুর

(৫) কেবল নাগা নহে, আসামের অন্যান্য বর্ব্বর জাতিরও সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযোজ্য।

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মণিপুরীরা নাগাদের হইতে সবিশেষ সমুন্নত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। (৬)

এখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সভ্যতাভব্যত ইত্যাদিতে মণিপুরীগণ বিশেষ প্রতিভা প্রদর্শন করিতেছে। আর তাহাদিগকে দেখিলে, বিশেষতঃ তাহাদের আবাস-বাটিকায় গেলে, বীভৎস রসের সঞ্চার হয় না। মণিপুরের মহারাজ ইচ্ছা করিলে নাগাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার, তথা সভ্যতা বিস্তারের অনেকটা উপায় করিতে পারেন। মণিপুরে যখন নানাবিধ ধর্ম্মোৎসব হয়, যথা, রথযাত্রা, রাস, দোল ইত্যাদি, তখন বিভিন্ন শ্রেণীর নাগাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া এই সকল উৎসবে আনা উচিত,—যেন দেখিয়া-শুনিয়া উহাদের মনে এই সকলের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। একজন শিক্ষিত মণিপুরীর সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল; তাঁহাকে এ কথা বলিয়াছি; এবং শুনিয়া সুখী হইলাম যে, নাগাদের কেহ কেহ নাকি শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মণিপুরীদের ন্যায় মালাতিলক ধারণ করিয়াছে।

ত্রয়োদশ দিন (রবিবার ৬ই কার্ত্তিক) মাবামের ওভারসিয়ার বাবু অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে না পাইলেও কুলির বন্দোবস্ত হইতে কোনও অসুবিধা হইল না। বলা আবশ্যক যে, প্রতি আড্ডায় নূতন লোক সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। এক আড্ডার কুলী অন্য আড্ডা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া আর সেদিকে যাইতে চায় না; কেন না, প্রতি ১০।১৫ মাইল অন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর নাগা পাওয়া যায়। একশ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর সংসর্গে এই "প্যাক্স্ ব্রিটেনিকার" যুগেও যাইতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে। মারামে একজন সহযাত্রী পাইলাম—সেই কোন্‌পক্‌পির সাব্‌এসিষ্টেণ্ট-সার্জ্জন—যিনি যাইবার সময়ে আমার ভগ্ন জানুতে ঔষধ প্রয়োগপূর্ব্বক যথেষ্ট করুণা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দুইজন টম্‌টমে চড়িলেও, এবং পথ অনেকটা চড়াই হইলেও, নাগারা বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত টানিতে লাগিল। এইদিনে দু-একটি সৌখীন নাগা-যুবক দেখিলাম। পরিধানে কৌপীন হইলেও, সর্ব্বাঙ্গে নানারূপ ভূষা দেখিলাম। শিখাতে পাখীর পালক; কাণে উল সূতা, ফুল ও গিল্টির মালার ইয়ারিং নানা ছিদ্রে গুঁজিয়া দেওয়া; গলায় পুতি-কাঠি ও ক্ষুদ্র হাড়ের টুক্‌রা; কনুইএর উপরে পিতলের বলয়; পায়ে হাঁটুর নীচে লতার 'গার্টার'। মুখে চুরুট টানিতে-টানিতে, অশ্বের অনুকরণে পা ফেলিয়া, বেশ গাড়ী টানিতে লাগিল। কিন্তু পথিমধ্যে রৌদ্রাতপে ক্লান্ত হওয়াতে, আর একদল লোক দিয়া এই দল বিদায় গ্রহণ করিল। ইহারা একই জাতীয় বোধ হইল—ইহাদেরও বেশ ভূষা একই রকম দেখিলাম।

মধ্যাহ্নে মাউ থানায়, পৌছিয়া মণিপুর হইতে আনীত "পাস্‌" (কেন না ফিরিবার সময়েও পাস্ লাগে) থানায় দাখিল করিলাম। এখান হইতে আর পাস্ লাগিল না। এখন কুলির নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইল। লোক-প্রতি এক এক আড্ডায় আটআনা দিতে হইল—এবং এই দল একেবারে দুই আড্ডায় গিয়া রাত্রিতে কোহিমা পৌছাইবে, এইরূপ সর্ত্ত হওয়াতে অতিরিক্ত কিছু দিতে হইল। ইহারা স্পষ্টতঃ ভিন্নশ্রেণীর নাগা,—চালপোষাকেই পরিচয় পাইলাম। মণিপুরের নাগাদের সকল শ্রেণীর লোকেই মণিপুরী ভাষা বুঝে; এই সকল নাগাপাহাড়ের নাগারা হিন্দুস্থানী অল্প-অল্প জানে—অনেকে আসামী ভাষাও জানে। মাউ থানা এ পথের "চেরাপুঞ্জী"—বৃষ্টি খুব অধিক হয়। তাই আজ কুলিরা পত্রনির্ম্মিত গাত্রাভরণ—ওভারকোট্ বলিলেও চলে—লইয়া চলিল। রাত্রি আটটার সময়ে কোহিমায় পুনশ্চ শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন দত্ত মহাশয়ের অতিথি হইয়া আরামে নিদ্রাসুখ অনুভব করিলাম।

চতুর্দ্দশ দিন (সোমবার ৭ই কার্ত্তিক)। প্রভাতেই প্রস্থান করিবার প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বদিবস একাদশী গিয়াছে—অন্নপারণা না করাইয়া যামিনী বাবু ছাড়িলেন না। বেলা প্রায় ১০ টার সময়ে রওয়ানা হইলাম। অদ্য চারিজন কুলির মধ্যে তিন জনই গুরখানি

(৬) এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। মণিপুরে প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দু-ধর্ম্ম ও সভ্যতার একটা অন্তঃস্রোত বহমান ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতের মণিপুর যে ইহাই, একথা আমি ইতঃপূর্ব্বে প্রবন্ধ-বিশেষে বলিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতেও মণিপুরে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অস্তিত্ব সংবাদ পাওয়া যায়। সাধক-প্রবর পূর্ণানন্দ গিরির জীবন-আখ্যায়িকায় শুনা যায়, তাঁহার গুরু ব্রহ্মানন্দ মণিপুরে এক চণ্ডাল রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। পূর্ণানন্দ তথা হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন—এটা ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা! ব্রহ্মদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ঐ দেশে ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয়গণ মণিপুর হইয়াই অতি প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। (ফেয়ার কৃত "হিস্‌টরি অব্ বর্ম্মা" ৪—৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ছিল। তবে ইহারা নাগাদের ন্যায় কর্ম্মঠ বোধ হইল না। পথ বেশ ছিল—প্রায়ই উৎরাই; তিন জন হইলেই প্রচুর হইত। চারিজনেও দ্রুত চালাইতে পারে নাই। প্রায় ৪ টার সময় দুই আড্ডার পথ অতিক্রম করিয়া পিফিমা পৌঁছিলে উহারা বিদায় গ্রহণ করিল। আমার আর এক আড্ডা যাইবার প্রবল বাসনা ছিল,—তাই কোনক্রমে তিন জন কুলি সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধপথ বাঘপানি, তার পর আর তিনজন দ্বারা অপরার্দ্ধ গিয়া ঘাসপানিতে রাত্রি-যাপন করিলাম। পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি বাঘপানি ও ঘাস পানিতে যাহাতে কুলি পাই, তদনুরোধক চিঠিপত্র দিয়াছিলেন। বাঘপানিতে অবস্থানের কোনও রূপ অসুবিধা হয় নাই—সব্‌ওর্ডিনেট্ কোয়ার্টারস্ না থাকিলেও ইন্‌স্পেকশন বাংলার এক প্রান্তে স্থানলাভ করিয়া আরামে থাকিলাম। অসুবিধার মধ্যে জল বড় দূরে—নচেৎ স্থানটি বেশ।

পঞ্চদশ (শেষ) দিন (মঙ্গলবার ৮ই কার্ত্তিক)। আজ পার্ব্বত্য পথের শেষ দিন। কুলিরা না খাইয়া চলে না। তাই প্রায় ৫ দণ্ডের সময় চলিলাম। গত দিবসের সায়ন্তন কুলি এবং অদ্যকার কুলি কেহই নাগা নহে, সকলেই বিদেশীয়। নাগারা সমতল স্থানের দিকে বড় আসিতেও চায় না। কোহিমার এদিকে পথিমধ্যেও নাগা কুলি খুব কম দেখা যায়। প্রায় ১১টার সময় অবারিত-দ্বার "তেওয়ারি মহারাজের" বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এবার শ্রীযুক্ত গুপ্তেশ্বর তেওয়ারিও বাড়ী ছিলেন না। তাহাতেও আতিথেয়তার কোনও ব্যাঘাত ঘটিল না। অতীব সমাদর সহকারে তদীয় কর্ম্মচারিগণ অন্নাদির ব্যবস্থা করিয়া এই স্বয়মামন্ত্রিত অভ্যাগতের তৃপ্তিবিধান করিলেন। কুলিরা পৌঁছাইয়া দিয়াই বিদায় গ্রহণ করিল। তেওয়ারি মহারাজের কর্ম্মচারীরা গো-শকটের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ঘোড়া, গাড়ী, দোলা, মানুষটানা যান, সমস্তই পর্য্যায়ক্রমে উপভোগ করিয়াছি; বাকী ছিল এইটা—তাহাও হইল। সন্ধ্যার সময় ডিমাপুরে পৌঁছিলাম। প্রায় দেড় মাইল বাকী থাকিতে, শড়ক ছাড়িয়া কিছু ডানদিকে গিয়া কাছাড়ী রাজগণের আমলের একটি পুকুর দেখিয়া আসিলাম। প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন দেখি, তখন ইহার তীরভাগ পরিষ্কৃত ছিল; এখন ঘোর জঙ্গলাকীর্ণ, যাইতে ভয় হয়। পূর্ব্বে ইহার তীরে একটি ডাক-বাঙ্গলা ছিল, এখন কিছুই নাই। অথচ এমন সুন্দর জল,—ডিমাপুরে তেমন নির্ম্মল জল কোথায়?

রেলওয়ে-ষ্টেসনের পথে পাব্লিক্ ওয়াকস্ কম্পাউণ্ড হইয়া গেলাম। ওভারশিয়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার সেন সঙ্গে-সঙ্গে অনেকদূর—রাজবাড়ীর কাছে পর্য্যন্ত গেলেন। তখন সান্ধ্য অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল—তাই প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও পুনরপি রাজবাড়ীর ভিতরকার স্তম্ভগুলি দেখিয়া যাইতে পারা গেল না—বাঘের ভয় আছে। বসন্ত বাবুর নিকটে এই স্তম্ভগুলির সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য জানা গেল। তিনি বলেন যে, স্তম্ভগুলি এখন যেমন সারি সারি সজ্জিত একত্র দেখা যায়, পূর্ব্বে তাদৃশ ছিল না। নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়া এখানে ইদানীং সংস্থাপিত করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, আনিবার কালে অনেক স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; সিমেণ্ট দিয়া সেই সকল জোড়া দেওয়া হইয়াছে। এগুলি যে সমাধিস্তম্ভ, তদ্বিষয়ে না কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বড় স্তম্ভ একটির ১৬ ফিট পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া তলদেশে একখানা পিতলের রেকাব পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে কয়েকটি দন্তও ছিল। আরো ৫।৬টি স্তম্ভও না কি খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে যে, নীচে দাঁত, হাড় ইত্যাদি পাওয়া যায়। তিনি আরো বলেন যে, স্তম্ভগুলির পাথর অনতিদূরবর্ত্তি রাঙ্গা পাহাড় হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

স্তম্ভগুলি যে সমাধিস্তম্ভ, তদ্বিষয়ে অধিকাংশ গবেষণা-কারীরই ঐকমত্য। স্তম্ভগুলির ঈদৃশ সুশৃঙ্খল অবস্থান যদি আধুনিক হইয়া থাকে, তবে আমার নিজের মতও এতদনুসারী করিতে প্রস্তুত, যদিও এ বিষয়ে পূর্ব্বে আমি কোনও সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। ফলতঃ গারো, খাসিয়া, নাগা—সমস্ত পাহাড়েই যখন এতাদৃশ সমাধিস্তম্ভ দেখা যায়, তখন এগুলিও তজ্জাতীয় হইবারই কথা। স্তম্ভগুলির নীচে দন্ত, অস্থি প্রভৃতি যদি পাওয়া গিয়া থাকে, তবে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, সন্দেহ নাই।

রাত্রিতে ট্রেন ধরিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে গৌহাটি পৌঁছিয়া দ্বিসপ্তাহাধিক কালের পর্য্যটন ক্লেশ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম।

বর্ত্তমান সাহিত্যের গতি

[শ্রী——

আমাদের সমস্ত বাংলাদেশটার মাতৃভাষা যেমন এক বাংলা, সমাজও যদি তেমনি এক হইত, তাহা হইলে বড়-বড় লোকের অনেক কথা খুব সোজা হইয়া যাইত; একজন বিখ্যাত লোক যখন একটা নূতন ও শক্ত কথা শুনাইতেন, আমাদের তখন সেটা বুঝিতে এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে বেশী সময় লাগিত না। ভগবান,—যিনি বলেন সমস্ত জগতের নীতিশাস্ত্র এক,—তাঁহাকেও সমাজের এই বিভিন্নতার জন্য বহুরূপী হইতে বাধ্য করা হইয়াছে! এর চেয়ে অদ্ভুত কথা আর কি হইতে পারে? ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রেই যখন এমন ব্যবস্থা, তখন অন্যান্য শাস্ত্রে যে এই একই বর্ত্তমান বাঙ্গালীদের মধ্যে মতদ্বৈধ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের দেশ অবগুণ্ঠনের দেশ ছিল;—ছিল কি, এখনও আছে। সমস্ত বাংলার মধ্যে খুব বেশী হয় ত চারি আনা লোকের অবগুণ্ঠন নাই। অবগুণ্ঠনের শাসন বাংলা দেশেই যে সব চেয়ে কড়া, সে কথা অবশ্য সত্য নয়। বাংলার পথে-ঘাটে পরপুরুষে অবগুণ্ঠনের ফাঁক হইতে পর স্ত্রীর মুখ দেখিয়া ফেলে, তাহাদের চোখোচোখিও হইয়া যায়। কিন্তু ভারতে এমন প্রদেশ আছে, যেখানে পর স্ত্রীর মুখ দেখা জন্মের মধ্যে একবারও ঘটিয়া উঠে না। তবে বঙ্গবধূ পর-পুরুষের সমক্ষে, ও স্বামী উপস্থিত থাকিলে শ্বশ্রূ-ননদের সমক্ষে অবগুণ্ঠন টানিয়া দেয়। পুত্রবধূ শ্বশুরের কন্যাস্থানীয়া হইলেও, অবগুণ্ঠন টানিয়াই, কোন কথা না কহিয়া, কেবল শিরঃসঞ্চালন করিয়া হাঁ-না সম্বন্ধীয় বহু প্রশ্নের উত্তর দেয়; এবং ভাশুরের সম্মুখে যতদূর পারে জড়ের মত হইয়া যায়;—ইহা সমস্ত বাংলার সাধারণ নিয়ম। এক রসিক বন্ধু একবার বলিয়াছিল,—একজনদের এক বধূ ছিল; সে প্রাণ গেলেও একটি বিশেষ ঘরে বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিত না; সে ঘরে তাহার ভাশুরের একটি ফটোগ্রাফ ঝুলান ছিল। জানি না কথাটা মিথ্যা কি না। যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে কথাটিকে সরল পরিহাস বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সত্য হইলে, ব্যাপারটি বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হয় না কি?

এই সব নানা কারণে সাহিত্যেও একটা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। উপন্যাস-নাটকে স্ত্রী-মনস্তত্ত্ব ফুটাইতে গেলে, সকল সময়ে না হোক, প্রায়ই স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে হয় পুরাতন পরিচয় রাখিতে হয়, না হয় পুস্তককে রোমান্সের আখ্যা দিতে হয়, না হয় সাধারণ বাংলা সমাজ হইতে বিদায় লইতে হয়। সাধারণ বাংলা সমাজের বাহিরে অথচ বাংলার ভিতরে এমন সমাজ—পাশ্চাত্যভাবাপন্ন সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজ। এই দুই সমাজের সহায় হইয়া যে মনস্তত্ত্ব ফুটাইয়া তোলা হয়, তাহা নূতন ধরণের, যদিও অস্বাভাবিক নয়। তাহা ঠিক আমাদের হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছায় না; যদিও বা কয়েকজনের পৌঁছায়, জনসাধারণের নয়। একখানা বিলাতী উপন্যাস পাঠ করিয়া তাহার যেমন প্রশংসা করি, ইহারও তেমনি করিব। নিজের মাতৃভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট পুস্তকের এইরূপ প্রশংসাই যথেষ্ট নয়; কিন্তু অনুভূতির দিকে অনুরূপ হইবার উপায় নাই। আসলে সমাজটা হচ্ছে রহস্যময়, সুতরাং ইহার ঘাত-প্রতিঘাতে সাহিত্যের ভাবও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের সমাজের এই সমস্যার সময়ে সাহিত্যের ধারায় যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং যে সব নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা শ্লাঘনীয়। ইংরাজীতে যাহাকে ideal realism বলে, তাহা আমাদের সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ লেখা idealismএ পূর্ণ। এই দুই ভাবের মধ্যে যে বৈষম্য আছে, তাহা আমরা সময়ে-সময়ে দেখিতে পাই না। আমরা ভাবি, দুই ভাবই এক—idealism। Supernaturalism এবং idealism—এই দুইটি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিস, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। গোল ঠিক এখানে বাধে না;—বাধে ideal realism আর idealismএর জায়গায়। আর যাহা খাঁটি realism, তাহারও কাহারও সঙ্গে গোল বাধে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে—রবীন্দ্রনাথের

সুবাদার কুমার অধিক্রম মজুমদার

অধিকাংশ লেখা ideal realismএ পূর্ণ। খাঁটি realismএর জন্য অনেকে হাঁক-ডাক করেন, এমন কি, অনেকে তাহার উদ্বোধনের জন্য যত্নবান হয়েছিলেন; কিন্তু তাহা এমন বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহা জ্ঞানী সমালোচকদের হৃদয়ে কোনরূপ ভাব জাগাইয়া তুলিবার পূর্ব্বে তাঁহারা artless art বলে পুস্তক বন্ধ করে ফেলেন।

কিন্তু এখনকার যে সমস্যা, তাহা অনেকের হৃদয়ে আঘাত দিয়েছে; এবং সেজন্য যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে (রস না থাকিলেও) আর্ট আছে। আমাদের উদীয়মান সমাজ ও সাধারণ সমাজের মধ্যে যেমন একটা বিভিন্নতা আছে, নূতন সাহিত্যের ধারা এবং পুরাতন ধারাতেও তেমনি বিভিন্নতা আছে। এই মনে করুন ব্রাহ্মসমাজ। আমাদের দেশ কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়াই হউক বা ভারতীয় সভ্যতা ভিন্ন প্রকারের বলিয়াই হউক, বা অন্য কোন কারণেই হউক এই সংস্কারে দেশের প্রাণে একটি প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে (আঘাতে সুফল ফলিবে কি কুফল ফলিবে, সে কথা এখানে আলোচ্য নয়)। ইহার সঙ্গে-সঙ্গে সাহিত্যেরও গতির পরিবর্ত্তন হইল। সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের চ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যে এরূপ হইল, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের সর্ব্বসমক্ষে মিলন আমাদের দেশে ছিল না বলিয়া, স্ত্রী-মনস্তত্ত্ব ফুটাইবার পথ রুদ্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ একে মনের কথা লিখিতে সিদ্ধহস্ত, তাহার উপর বাংলার এই বিচিত্র সময়ের সহায়তা পাইলেন; তজ্জন্য তাঁহার অনেক লেখাতে কবিত্ব, দর্শন ও সামাজিকতার অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। তা' বলিয়া ব্যালজাকের থিওরী আমাদের সাহিত্যে আহ্বান করা চলে না; ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, বার্ণাড শ প্রভৃতির মত বিগ্রহপন্থী নাটকও লেখা চলে না। সে সব রোমান্সের মত ঠেকিবে। না, তা নয়;—তাহা আইডিয়ালিজমের উপরে যা'হোক একটা হইবে।

"নৌকাডুবির" অন্নদাবাবুকে ব্রাহ্ম না করিলে, বা "চোখের বালি"র বিধবা বিনোদিনীকে সর্ব্বসমক্ষে অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিয়া না দাঁড় করাইলে, রবীন্দ্রনাথ যে উপন্যাস দুই-খানি লিখিতেই পারিতেন না, তাহা বলা বাহুল্য। তাহার জন্য "নৌকাডুবি"কে না মনে করিলেও "চোখের বালি"কে অনেকে রোমান্স মনে করিয়া পড়ে! কয়েক বৎসর পূর্ব্বের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার উল্লেখ করা দূষণীয় হইলেও, লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

আমাদের এক বুড়ো ও গোঁড়া পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু অন্যান্য অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁহার প্রধান প্রভেদ ছিল—তিনি ইংরাজী জানিতেন। তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করা গেল,—"চোখের বালি" কেমন উপন্যাস? উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন, তার সব কথা পড়িতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ত হইবেই, উপরন্তু যে পণ্ডিতকে আমরা ভক্তি করি, তাঁহার উপর অভক্তি জন্মিতে পারে। অনেক দোষ থাকিলেও, তাঁহাকে এখনও আমরা ভক্তি করিয়া থাকি। তাঁ'র সার কথা এই;—হিন্দুর ঘরে এ সব কেন বাপু! যা সম্ভব নয়, সেটাকে সত্যই রবিবাবু স্বাভাবিক করে তুলেছেন। মনের সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছেন, বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে স্ত্রী-পুরুষের মনের যে সব বিকার হয়েছে,—সে সব একেবারে স্বাভাবিক। হবে না-ই বা কেন? রবীন্দ্রনাথ যে মনস্তত্ত্ব লিখিতে সিদ্ধহস্ত! কিন্তু তিনি কি দেশটাকে বুঝেন না? বিপদটা কি—তিনি কি তা' বুঝতে পারেন নাই? ভারতবর্ষে ইন্দ্রিয় লালসার এ সব নগ্নমূর্ত্তি কেন বাপু! তিনি দেশের অকল্যাণই করিতেছেন। তাঁর মনস্তত্ত্বে ভুল নাই বলিয়াই ত আরও বিপদ! এ সব বিলাতী উপন্যাস আমাদের দেশে কেন? ইত্যাদি আরও কত কথা বলে গেলেন। আমরা সব চুপ করিয়া রহিলাম। আমার কিন্তু বইখানির গোড়া হইতে শেষ অবধি এমন ভাল লাগিয়াছিল যে, এ কথায় দুঃখ হইল, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার মত কোন কথাই খুঁজিয়া পাইলাম না। পণ্ডিত মহাশয় আমাকে খুব ভালবাসিতেন। দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর কথা আমার ভাল লাগিয়াছে কি না। আমি বলিয়া উঠিলাম, "আপনি যা বললেন, তা' বর্ণে-বর্ণে সত্য, কিন্তু আমার উপন্যাসখানি পড়তে খুব ভাল লেগেছিল। তিনি ত কোন কুশিক্ষা দেন নাই! রবীন্দ্রনাথ নীতিজ্ঞ নহেন যে, উপন্যাসে শিক্ষা দিতে যাবেন।"

কুইনাইন মিক্শ্চার সেবন করিলে এক-একজন যেমন 'প্রোজেক্টিক' মুখভঙ্গিমা করেন, তিনি ঠিক তেমনি করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর মহাশয় নীতিজ্ঞ ন'ন,

তা' আমি জানি; কিন্তু তিনি যে আশ্চর্য্য রকমের সূক্ষ্ম ও স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব লিখিতে পারেন, তাহা যে তাঁহার নীতি-কথার চেয়ে মানুষের হৃদয় গভীর ভাবে ছুঁয়ে যায়। উপন্যাসে নীতিকথা কাহারই বা ভাল লাগে? খাঁটি theory ও অনেক সময় ভাল লাগে না। কিন্তু তাঁর এই ভয়ানক optimism তোমার ভাল লাগিয়াছে! তাঁর দর্শনকে তুমি এক আদর্শ দর্শন মনে করেছ। শুধু তুমি একা নও, তোমার মত অনেক যুবক আছে। ভারতবর্ষে এ সব দর্শনের স্থান হবে না। এ সব optimism এ ভারতে কুফলই ফলিবে। যৌবনের উষ্ণ শোণিতের আধিক্যে এই সব দর্শনের জন্ম হয়,—জ্ঞানের পরিচয় এখানে কমই পাওয়া যায়। সেই লেখা ভাল, যাহাতে জ্ঞানের কথা আছে, স্থবিরতার বুদ্ধি আছে। আর্টের দিক হতে বল, আর সাহিত্যের দিক হতে বল,—সমালোচকেরা লেখায় sublimity পেলেই সন্তুষ্ট, সেখানে স্তুতিবাদ তাঁরা করবেনই। সেই জন্য "চোখের বালি"র চেয়ে "গোরা" "নৌকাডুবি" ঢের ভাল উপন্যাস; "নৌকাডুবি"র মধ্যে হিন্দু দর্শনই এক পবিত্র কবিত্বের আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে; "গোরার" মধ্যে ভারতের ধর্ম্মের ও জাতির দর্শন গ্রন্থকারের সৌম্য, শান্ত ও স্থবির বুদ্ধির সহায় হইয়া নিষ্কম্প প্রদীপ শিখার মত উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে।

এই কথা তিনি খুব জোর করিয়া বলিয়া আর কাহারও কথা যেন শুনিবেন না, ঠিক এমন ভাবেই বসিয়া পড়িলেন। এই পণ্ডিতমশায় আমাদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করিতেন, আমাদের দর্শন বুঝাইতেন, কবিতার সৌন্দর্য্য দেখাইতেন, আবার অলঙ্কার-শাস্ত্র ও ব্যাকরণও পড়াইতেন। যাহাই হোক্, তাঁহার ভাব দেখিয়া আমরা সকলে চুপ করিয়া গেলাম। আমি ত কি উত্তর দিব বা কি তর্ক তুলিব, খুঁজিয়া পাইলাম না। আমাদের সঙ্গে র- নামে একজন যুবক পড়িত। সে (পাছে কিছু মনে করে, তাই তাহার পূরা নাম দিলাম না) নিজেকে ভাবিত মস্ত বড় এক তার্কিক। নিজে কোন প্রবন্ধ লিখিলে - তা সে ছাইই হোক, আর পাঁশ হোক্—তাহার এক পড়বার গুণে প্রবন্ধের আদর বাড়িয়া যাইত। তাহার হিউমার ছিল; কথা বল্‌বার ভঙ্গী ছিল সব dramatic। সে সামান্য প্রবন্ধ পাঠ করবার সময় বা বক্তৃতা দিবার সময় এমন হাত নাড়িত, ঘাড় বাঁকাইত, যেন সে মস্তবড় এক বাগ্মী। যাহাই হোক, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি যে ছিল না বা কম ছিল, তাহা বলিলে ভুল করা হইবে। মোট কথা এই যে, তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন, আকুঞ্চন প্রসারণ তাহার গুণের অনুপাতে ঢের বেশী ছিল। একদিন একজন ছাত্র তাহাকে বলিয়াছিল;—"তুমি কি যে হাত পা নাড়! বয়স্থ লোকের কাছে অমন করতে লজ্জা হয় না - অত এঁচড়ে পাকামী ভাল নয় বলছি!" সে পরিমাণ মত হাসিয়া মৃদুভাবে মাথা বাঁকাইয়া কহিল,—"Thank God, I am not theatrical"। অনেকে তাহাকে এ সব সাহেবী অনুকরণ হইতেছে বলিয়া শাসাইত, কিন্তু সে তাহাদের কথা কখনও seriously ভাবিত না। কোন কথার প্রতিবাদ জন্য সে যখন উঠিয়া দাঁড়াইত, অনেকের দৃষ্টি বিনিময়ে একটা চাপা বিদ্রূপ ঘরময় ছড়াইয়া যাইত—এমন কি অধ্যাপকদের কাছেও সে ব্যাপার অবিদিত থাকিত না;- তাঁহাদের মধ্যেও দু-একজন মুখ টিপিয়া মুখের হাসি মুখের মধ্যে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতেন। সে সব বুঝিতে পারিত, সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিত, থামিয়া থামিয়া কথা কহিত; কিন্তু কোন দিনও বক্তব্য শেষ না করিয়া বসিয়া পড়িত না। এই সব দোষগুণ থাকিলেও তাহার একটা সুন্দর গুণ ছিল; (বহুদিনের আলাপ না থাকিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না)—সে ছিল সরল ও নিরহঙ্কারী। তাই সে আমাদের ভালবাসার পাত্র ছিল।

সেদিন যখন সে পণ্ডিত মশায়ের "কথার উপর কথা" কহিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, দু-একজন আশ্চর্যান্বিত হইল, কয়েক জন হাসিল, এবং তাহার ঠিক পিছনে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি তাহার পিরাণ ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। সে কিন্তু পাশের দিকে ঈষৎ সরিয়া গিয়া পণ্ডিত মশায়কে বলিতে লাগিল,—"আপনি 'নৌকাডুবির' সম্বন্ধে যা বল্লেন, তা আমি মানতে রাজি নই। আপনি কি করে 'নৌকাডুবির' মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মের দর্শনের আভাস দেখ্‌তে পেলেন? আমি ত বিশেষ করে হিন্দু ধর্ম্মের কিছু দেখ্‌তে পাই নাই। এখানে আছে মনুষ্যজাতির বিশ্বাস ও প্রেমের ছবি। সমস্ত বইখানার মধ্যে optimism অপূর্ব্ব ভাবে, নূতনরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে এমন

কবিত্ব আছে, যাহা শুধু হিন্দুকে কেন, মনুষ্য জাতিকে কাদাইয়া দিবে। ইহার মধ্যে যে সত্যের প্রকাশ হইয়াছে, তাহা মানুষ সারা বিশ্ব খুঁজিয়া লাভ করিতে চাইবে, কিন্তু খুঁজিয়া পাইবে না—কেবলই পথ হারাইবে, কেবলই বেদনা পাইবে। ইহার মধ্যে আশার বাণী আছে। মানুষ জানে সে আশা পূর্ণ হইবে না—তবু আশা করিতে ছাড়িবে না, তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে। বৃদ্ধের মনে হবে, মানুষ এত বড়। এ পৃথিবী তার আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছা হবে। 'নৌকাডুবির' কবিত্ব হিন্দুর একলার নয়, বিশ্বের। আর 'চোখের বালি'? সে ত বাংলার সামাজিক উপন্যাস। এখন মান্‌তে চাইছেন না, পচিশ বছর পরে সকলেই বল্‌বে চমৎকার সামাজিক উপন্যাস!"

পণ্ডিতমশায় একটু সমস্যায় পড়লেন,—কি উত্তর দেন! আমরা তাঁর মুখের ভাব দেখেই ব্যাপার বুঝ্‌তে পারলাম। র—এর পিছনে যিনি বসিয়া ছিলেন, তিনি মৃদুভাবে তাহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

পণ্ডিতমশায় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি যা বল্লে তা অনেকটা ঠিক বটে, কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি, কোন ইউরোপীয়ান বা আমেরিকানের সাধ্য নয় অমন পবিত্র উপন্যাস লেখে। শুধু ভারতবাসীই অমন কাব্য (!) লিখতে পারে। দেখাও পৃথিবীতে কে এমন বিশ্বাসের ছবি আঁকিয়াছে; কোন্ দেশের কোন্ কবি তার নায়ককে দিয়া তাহার স্ত্রীর বিশুদ্ধতার প্রমাণ না চাহিয়া বলাইয়াছে—'আমি জানি তুমি আমার স্ত্রী।' মনে রেখ 'নৌকাডুবির' এই যে কবিত্ব, হিন্দু ভিন্ন কোন জাতির মধ্যে তাহা ফুটিয়া উঠা সম্ভব নয়। হেমনলিনীকে রমেশ কিসের জন্য শীঘ্র বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার কারণ বলিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তরে হেম যে মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাহার শুনিবার কোনও ইচ্ছা নাই, সে চিত্র হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতির লেখক দ্বারা অঙ্কিত হওয়া শক্ত। রমেশের সঙ্গে জলপথে ভ্রমণকালে কমলা অন্য কামরায় বাস করিতেছে দেখিয়া চক্রবর্ত্তী খুড়োর যে বিষম বিস্ময় লাগিল, তাঁহার প্রাণটা যে বিষাইয়া উঠিল, সে দৃশ্যে আমাদের মনুষ্যত্বের বেদনাকে এক মুহূর্ত্তেই জাগাইয়া তুলিতে পারা এক হিন্দু ভিন্ন কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কমলা ও রমেশের ছলনা-খেলনা দ্বারা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে বিষাইয়া তুলিতে পারা কি ইংরাজের পক্ষে সম্ভব? সব কথা জানাজানির পর কমলা রমেশকে একটা নমস্কার করিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা বেশ গুরুত্ব ও লঘুত্বে আসিয়া পড়িল—এ সব দৃশ্য হিন্দু কবির দ্বারা অঙ্কিত হওয়াই সম্ভব। তোমাদের মধ্যে অনেকে বোধ হয় আমার এই হিন্দু-হিন্দু কথার পুনঃ-পুনঃ উল্লেখে বিরক্ত হইতেছ; কিন্তু কথাটা ঠিক—ভাল করে বুঝে দেখ। তোমরা হয় ত বলবে, ফরাসীদেশের ভিক্টর হুগোও এমন লিখতে পারত। কিন্তু আমি বলি, কিছুতেই নয়। বিদেশীরা রমেশের মত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে, নলিনাক্ষের মতও পারে, কিন্তু এমন সমাজ কোথায় পাইবে যে, তাহাদের ঘটনাস্রোত ঠিক এমনভাবে ফিরিবে? কোথায় তারা কমলার মত, একটা বালিকা পাইবে? গোড়াতে কমলা একটা characterই ছিল না—শেষেও না। চরিত্র নিয়ে যদি কথা হত, তাহলে অন্যের পক্ষে তাহার চিত্র আঁকা সম্ভব হতে পারত, কিন্তু তা নয়। সমস্ত বইখানার মধ্যে কমলা যেন ঘটনার মুখে ভেসেই চলেছে;—সে সব ঘটনার বিদেশী বইএ স্থান হতে পারে না। তাদের দেশের বালিকা কি শেষে কমলার মত রমেশের ন্যায় একজনকে প্রণাম করিয়া মাথায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে? বলে দিলাম, সমস্ত বইখানার মধ্যে বাংলার জল-হাওয়া লেগে আছে। এ দর্শনের জন্ম ভারতেই হইতে পারে, তবে এ কথা ঠিক যে, বিশ্বমানবের প্রাণে সে দর্শন আঘাত দিতে পারে।"

র—কি একটা বলিবার জন্য উসখুস্ করিতে লাগিল, কিন্তু ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সেইদিন হইতে জানিলাম "চোখের বালি" পণ্ডিতমশায়ের চোখের বালি, আর "নৌকাডুবি"কে তিনি ভক্তের মত ভালবাসেন। আর একদিন তিনি অতি শান্ত ভাবে বলেছিলেন,—"মহাভারত রামায়ণে যে হিন্দুদর্শন ও কবিত্ব বিদ্যমান, "নৌকাডুবি"র মধ্যে সেই দর্শন ও কবিত্ব আছে। সে পবিত্রতা এখানে পাবে—পাবে না কেবল সেই সরলতা। তারও একটা কারণ আছে। যুগের পর যুগ কাটিয়া গেছে, মানুষও তার সরলতা হারিয়ে ফেলেছে। কমলা ও হেমনলিনীর মধ্যে সতী সীতার অনেক গুণ পাবে—পাবে না কেবল সেই সরলতা। এখানে যে সরলতা পাবে, তাকে ফরাসী ভাষায় বলে সিম্‌প্লেসি। সেই সরলতার অভ্যুত্থান করা এখন মানুষের

সাধ্যাতীত। আর করতে গেলে ভাল কাজ করা হবে না। রামায়ণের সরলতাটি আমাদের সময়-সময় এত বাজে যে, আমরা সেখানে বলে উঠি—মোটেই artful নয়। নৌকাডুবির সিম্‌প্লেসি আমাদের বড় ভাল লাগে। এতবড় প্রশংসা তোমাদের নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না—কিন্তু আমার মন সর্ব্বদাই এই কথা বলে।"

তাঁর কথাগুলি বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। তাঁহার হিন্দু দর্শন ও কবিত্বের কথাগুলি ঠিক মানিয়া লইতে না শিখিলেও পুস্তকের গুণের পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি 'চোখের বালির' যেরূপ নির্দ্দয়রূপে নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার আজও দুঃখ হয়। "চোখের বালি" সম্বন্ধে রএ—র কথা অনেকটা ঠিক বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিত মশায় কবির লেখা বলেও ক্ষমা করতে পারতেন না। আর কিছু হোক্ না হোক্, তাঁহার "নৌকাডুবির কবির" আনন্দের জন্য তিনি পথ ছাড়িতে নারাজ ছিলেন। এসব তাঁর গোঁড়ামি ছাড়া আর কি বলি।

তারপর রবীন্দ্রনাথ নূতন-নূতন কবিতা লিখেছেন, নাটক লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন। ভাবেরও তাঁর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। পণ্ডিতমশায়ের কথাগুলো মনে পড়ে, তবুও "চোখের বালি"খানা পড়ি, পড়তে ভালও বাসি। একবার মনকে বুঝাইয়াছিলাম এইরূপে;—সৃষ্টিতে যদি আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ কখনই বইখানা লিখিতেন না। তিনি হচ্চেন কবি, তাঁর যদি এই ভাব ভাল বোধ হয়, তাহাতে কাহার কি? তিনি সব ঘটনা, দৃশ্য হৃদয়ের আবেগ দিয়ে অনুপ্রাণিত করে তুললেন, আর আর একটা কাব্যের মত শেষ করে ফেললেন। কবির এই যে impulse, তাহাকে আদরই করতে হয়। সেখানে সমালোচনার মাপ-কাঠি বা দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিকতা আনিয়া বুঝাপড়া করিবার কি প্রয়োজন? পণ্ডিতমশায়ের অন্ততঃ কবি বলিয়া রবীন্দ্রনাথকে ক্ষমা করা উচিত ছিল।

সাহিত্যের আদর্শ হচ্চে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও প্রকাশ করা। বেশ কথা। সেই হিসাবে "চোখের বালি" উপন্যাসকে মন্দ বলিবার ত কোন কারণ দেখি না। অনেকে বলেন, কুরুচি ও বীভৎস ভাবে পূর্ণ এই উপন্যাস। শুধু ইন্দ্রিয়-লালসার চিত্র থাকিতে পারে - বীভৎসতা কোথায়? এক বাঙ্গালী-ঘরের বিধবা কেমন করিয়া চুম্বনের জন্য দেবতার অর্ঘ্যের মত উন্মুখ হইয়া রহিল, তাহার আলোচনা করিবার কি এমন প্রয়োজন? রবীন্দ্রনাথকে এখানে idealist মনে করাই কতকটা ঠিক; কিন্তু তাহা ত কেহ মনে করেই না, উপরন্তু মাভৈঃ মাভৈঃ রবে সাহিত্যের আকাশ বিদীর্ণ করিতে চায়। বাস্তববাদী জ্ঞানী যাঁরা, তাঁরাও আর্ত্তনাদ করিতে ছাড়েন না - তবে তাঁরা কেবল idealist অভিযোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন। যাহা খাঁটি realism, তাহা যে কোন কালে খুব উচ্চে স্থান পাইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। ইউরোপে যারা realism এর জন্য খুব নাম কিনেছেন, তাঁদের সাহিত্য—সকলের না হোক্ কয়েক জনের—ঠিক মদের ফেণার মত। সমালোচকদের তাই খুব হিসাবী হয়ে চল্‌তে হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সুলেখক। এমন কি একটু idealism এর সংযোগ হলে অনেকের লেখা sublime হইয়া উঠিতে পারে। যাক্ সে কথা—সাহিত্যে idealismই চাই, বা realism এর প্রয়োজন নাই, এমন কথা বলিতে চাই না। একজন হিন্দু ঘরের বিধবা বাল্যেই স্বামীসম্পর্করহিতা হইয়া যৌবনে তাহার আচার-বিচার পূজা-পদ্ধতি দূরে রাখিয়া সহজে একজন গুণবান বুদ্ধিমান পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হইতে পারে, তাহাকে সত্যই প্রেম দিতে পারে তাহা যে একটা মস্ত পাপও নয়, এই হচ্চে রবীন্দ্রনাথের symbol।

Symbolism এর আমদানী হইল প্রধানতঃ পশ্চিম হইতে—আমাদের সমাজেই; আমাদের জাতীয়তার মধ্যেই তিনি যখন এ symbol পাইলেন, তখন ইহাকে কি করিয়া বিদেশী বলি। যে ঘটনা, যে দৃশ্য এখানে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা পশ্চিম দেশে symbol হইতে পারিত না। এমন স্থলে "চোখের বালি"কে আদর না করাই অন্যায়। খাঁটি মনস্তত্ত্বের উপন্যাস বাংলায় তিনিই প্রথমে লিখেছেন। বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত তাঁহার লেখার তুলনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে, এই ধরণের উপন্যাস লেখার হিসাবে তাঁহার স্থান কত উচ্চে। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাঁহার নায়ক নায়িকা প্রভৃতির মনোভাব কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার পরিচয় দিতে গিয়া তিনি হটিয়া যান না, অস্বাভাবিক একটা কিছু করিয়া বসেন না - পাঠকেরই মাঝে-মাঝে হিসাব রাখিতে হয়! এমনি সূক্ষ্ম পরিচয় তাঁর স্বভাবের সঙ্গে। "চোখের বালি"কে প্রশংসা করা হয় না দেখে

শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি

নব্য ফিজিয়ান যুবক

নরমাংসভোজী ফিজিয়ান

ফিজিয়ান ফলবিক্রেতা

বিধিনিষেধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাহারা অনেক প্রকার শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে পারে। তন্মধ্যে নৌকা, সালতি, মাদুর, চুপড়ি, ঝুড়ি, জাল, প্রভৃতি দেখিতে বা ব্যবহারে নিতান্ত মন্দ হয় না।

ফিজিয়ানরা পূর্ব্বে নরমাংসভুক রাক্ষস ছিল। পরে তথায় য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নরমাংস ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছে। তবে এই প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও তথায় দুই একটি নরমাংসভোজী ফিজিয়ান দেখা যায়। পণ্ডিত তোতারাম লিখিয়াছেন, ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও তথায় নরমাংস ভোজন প্রথা সাধারণ ভাবে প্রচলিত ছিল। সে সময়ে কেহ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে, যুবকেরা তাহার নিকট গিয়া বলিত, এই সংসার ছাড়িয়া যাইতে তোমার কি বড় মায়া হইতেছে? এই বলিয়া তাহারা ঐ বৃদ্ধকে হত্যা করিয়া পোড়াইয়া খাইয়া ফেলিত। বস্তুতঃ, নরমাংস তাহাদের অতি উপাদেয় রসনা তৃপ্তিকর খাদ্য ছিল। যুদ্ধে পরাজিত শত্রুপক্ষীয় বন্দীগণকে জিয়াইয়া রাখা হইত এবং মধ্যে মধ্যে এক একজনকে বধ করিয়া ভক্ষণ করা হইত। শত্রুপক্ষীয় বন্দীর অভাব হইলে, তাহারা নিজেদের বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া ভোজন করিতে ইতস্ততঃ করিত না।

ডাক্তার মণিলাল ও তাহার পত্নী

ফিজিয়ানরা কেবল যে মাংস-ভোজনের জন্যই নরহত্যা করিত তাহা নহে; তাহাদের কোন সর্দ্দারের মৃত্যু হইলে, তাহার সঙ্গে তাহার সকল স্ত্রী এবং দাসগণকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করা হইত। স্ত্রীগণ বা দাসগণ ইহাতে ভীত হইত না, বা আপত্তি করিত না। তাহাদিগকে যে এইরূপ ভাবেই মরিতে হইবে, ইহা যেন তাহাদের জন্মগত সংস্কার ছিল। কোন সর্দ্দারের গৃহ নির্ম্মাণকালে গৃহের ভিত্তি গহবরে একজন করিয়া দাসকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করা হইত। যুদ্ধের সালতী সমুদ্রে বা নদীতে ভাসাইবার সময় দুইটি কলাগাছের গুঁড়ির মাঝখানে একজন দাসকে হস্তপদবদ্ধাবস্থায় স্থাপন করিয়া তাহাকে ঐ গুঁড়িদ্বয়ের সঙ্গে বাঁধা হইত এবং তাহার উপর দিয়া নৌকাখানিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। ইহাতেও দাসেরা আপত্তি করিত না, এইভাবে জীবনাহুতি দেওয়া তাহাদের নিত্য-নিয়মিত কর্ত্তব্য বলিয়া ধারণা ছিল।

ফিজিয়ানরা সাধারণতঃ ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা, (১) ছোট বড় সর্দ্দার, (২) পুরোহিত, (৩) কর্ম্মচারী, দূত বা পরামর্শদাতা মন্ত্রী; (৪) নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধা, (৫) জনসাধারণ; (৬) দাস।

সর্দ্দারগণের সহিত জনসাধারণের সকল বিষয়েই পার্থক্য অত্যন্ত অধিক। দেহের দৈর্ঘ্য, গঠন, শ্রী, বল, সৌন্দর্য্য, বুদ্ধিকৌশল প্রভৃতি সকল প্রকার কলাকৌশলে সর্দ্দারগণ জনসাধারণ হইতে শ্রেষ্ঠতর। প্রজারা সর্দ্দারগণকে ভয় ও শ্রদ্ধা ভক্তি করে। তাহাদের যাহা কিছু—এমন কি দেহ মন পর্য্যন্ত সর্দ্দারের অধিকারভুক্ত। পক্ষান্তরে সর্দ্দারের সম্পত্তিতেও প্রজাদের অধিকার আছে। প্রয়োজন হইলে সর্দ্দার দুর্ভিক্ষাদি দুঃখের সময়ে নিজ সম্পত্তিতে প্রজাগণকে অবাধ অধিকার দিয়া থাকে। যুদ্ধের সময় সর্দ্দার প্রজার জীবন ও ধনসম্পত্তির উপর অসীম, অব্যাহত ক্ষমতা লাভ করে। কোন ফিজিয়ান সর্দ্দারের পুত্র তাহার মাতুল পরিবারের সকল ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি অবাধে ব্যবহার বা গ্রহণ করিতে পারে।

ফিজিনিয়ানগণ প্রথমে পূর্ব্বপুরুষের পূজা করিত। পরে তাহারা দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে। তাহাদের দেবগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর দেবতারা অমর। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতারা জরা-মরণশীল এবং রিপুগণের অধীন; তবে মানুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সর্দ্দারগণ, বীরপুরুষগণ এবং পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে ইহাদের সৃষ্টি। দেবতা ও মানুষের মধ্যস্থতা করিবার জন্য পুরোহিতও অবশ্য আছে। পৌরোহিত্যে বংশানুক্রমের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান।

ফিজিয়ানরা কাব্যচর্চ্চা করে, সঙ্গীত রচনা করে; নানাপ্রকার উপাখ্যান ও গল্প তাহাদের সাহিত্যে প্রচলিত আছে। কবিতায় ছন্দ বা যতির অভাব নাই। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইলে, ফিজিয়ানরা

কালাশৌচ গ্রহণ করে, ব্রত-উপবাস করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে মস্তক মুণ্ডন ও শ্মশ্রু ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হয়।

পূর্ব্বে ফিজিয়ানদিগের মধ্যে রাক্ষস-বিবাহ-বিধি প্রচলিত ছিল; অর্থাৎ বিবাহার্থী যুবক তাহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা স্বগ্রামবাসীদের সহিত ভিন্ন গ্রামে গিয়া সেই গ্রামের কোন কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনিত। তখন উভয় গ্রামবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ হইত। বরপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, বরের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হইত; আর কন্যাপক্ষ জয়লাভ করিলে, তাহারা কন্যাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইত, এবং অন্যত্র তাহার বিবাহ হইত। এখন অবশ্য তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায়, ঐ বর্ব্বরপ্রথা বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন বরকন্যা উভয়ে নিজ নিজ পত্নী বা পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া থাকে। ১৬ বৎসরের কম বয়সে কন্যা এবং ২১ বৎসরের কম বয়সে পুরুষ এখন আর বিবাহ করিতে পারে না।

স্বামীর মৃত্যু হইলে পত্নীকে সহমরণে যাইতে হইত, অর্থাৎ স্বামীর কবরে স্ত্রীকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করা হইত। পরমাত্মীয়ের মৃত্যু হইলে অনেকে স্বয়ং কনিষ্ঠাঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া মৃতের প্রতি সম্মান, প্রীতি বা স্নেহ প্রকাশ করিত। কর্ত্তিত অঙ্গুলি শবদেহের সহিত সমাহিত হইত।

ফিজিয়ানরা প্রাচীনকালে চূণের দ্বারা কেশের প্রসাধন করিত; এখনও এই প্রথা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তবে মধ্যে-মধ্যে লাল রং ও ভুষা মাখিয়া ইহারা বেশের পারিপাট্য ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

ফিজিয়ান রমণী মৃত-সন্তান প্রসব করিলে, তাহার আত্মীয় স্বজনেরা শিশুর নিদ্রা-ভঙ্গের নিমিত্ত কতকগুলি শঙ্খ অলাবু পরস্পর ঠোকাঠুকি করিয়া শব্দোৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু মৃত শিশুকে কোন রূপে জাগ্রত করিতে না পারিয়া ক্ষান্ত হয়। সুস্থ ও সবল শিশু নিরাপদে প্রসূত হইলে তাহাকে স্নান করাইয়া বমন করাইবার জন্য এক প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস তাহাকে পান করানো হয়। পরে নারিকেল বা কলা ভাজিয়া চর্ব্বণপূর্ব্বক তাহা শিশুর মুখে অর্পণ করা হয়।

বালিকাগণ বিবাহযোগ্যা হইলে তাহার কোন কোন অঙ্গে উল্কী পরাইয়া দেওয়া হয়।

ফিজিয়ানরা আমোদ প্রমোদ খুব ভালবাসে। নৃত্য তাহাদের উৎসবের অঙ্গবিশেষ। বসিয়া বা দাঁড়াইয়া নানাপ্রকারের নৃত্য তাহাদের সমাজে প্রচলিত আছে। অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নকল যুদ্ধ শিক্ষা করিতে-করিতে তাহারা এক প্রকারের নৃত্য করিয়া থাকে। এই নৃত্য তাহাদের বহুকালের সাধনা, অভ্যাস ও শিক্ষার ফল। ২০০ লোক ১০ জন করিয়া এক একটি সারি বাঁধিয়া ২০ সারে একসঙ্গে নৃত্য করে এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে আক্রমণ করিবার ভঙ্গীতে বর্শা চালনা করে। দলের নেতার ইঙ্গিতে দলের প্রত্যেকের এক একটি অঙ্গ এমনভাবে একসঙ্গে সঞ্চালিত হয় যে, মনে হয়, ইহারা সজীব পুতুল। একজন লোক একটিমাত্র তারের সাহায্যে তাহাদিগকে নাচাইতেছে।

ফিজিয়ানদের সমাজের নিয়মানুসারে ফিজিয়ান যুবকের উপযুক্ত পত্নী তাহার মাতুল বা পিতৃষ্বসার কন্যা। ইহা যেন তাহাদের জন্মগত অধিকার। এমন কি, এইরূপ পাত্র-পাত্রীর অন্যত্র বিবাহ হইলে তাহাদের পুত্র-কন্যার মধ্যে সম্বন্ধ যেন সহোদরার মত—এই দুইজনের মধ্যে কোন রূপে বিবাহ হইতে পারে না। আবার পক্ষান্তরে, কোন

ফিজিয়ান "বিবাহ সংস্কার"

ফিজিয়ানদিগের "অগ্নি পরীক্ষা"

ফিজিয়ান যুবক কোনক্রমেই তাহার মাসীর অথবা খুড়ার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। তবে মাতুল বা পিতৃস্বসার একাধিক কন্যা থাকিলে তাহাদের সকলকেই বিবাহ করিতে হয়, একজনকে মাত্র গ্রহণ করিলে চলে না। এরূপ স্থলে স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা বিধবা ভ্রাতৃজায়াগণকে বিবাহ করিয়া থাকে। এখন ফিজিয়ানরা সাধারণ-ভাবে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তাহারা আর মামাতো-পিসতুতো ভগিনী-গণকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয় না বটে, তথাপি চিরাচরিত সংস্কার বশতঃ তাহারা এখনও এইরূপ ভাবে বিবাহ করিয়া থাকে।

কোন সর্দ্দারের পুত্র-কন্যার বিবাহে মহা সমারোহ হইয়া থাকে, এবং অনেকপ্রকার অনুষ্ঠান পালন করিতে হয়। যিনি যত বড় সর্দ্দার, তাঁহার বা তাঁহার পুত্র-কন্যার বিবাহে সমারোহও তত বেশী হয়। এতদুপলক্ষে বহুদিন ধরিয়া পান ভোজন ও নৃত্যগীত চলিয়া থাকে

পোষাকী-পরিচ্ছদে ফিজিয়ান

বর্শা-হস্তে নৃত্য

সর্দ্দার-পরিবারে বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রজারা বিবিধ উপঢৌকন প্রদান করে। সর্দ্দার এই সমস্ত উপঢৌকন এবং তাহার উপর তাঁহার পদমর্য্যাদানুসারে আরও কিছু অধিক দ্রব্য প্রজাদের প্রত্যর্পণ করেন। বিবাহের তিন দিন পরে বরকন্যাকে পবিত্র করিবার জন্য একটা অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বিবাহ করিলে বরকন্যা কিরূপে অপবিত্র হয় তাহা বলিতে পারি না; তবে পবিত্র করিবার প্রথা এইরূপ,—একটা নূতন সাল্‌তি নির্ম্মাণ করিয়া বহুলোকে তাহা স্কন্ধে করিয়া বরের বাটীতে লইয়া যায়। সেখানে কন্যা তাহার সখিজনপরিবৃত হইয়া ঐ সালতিতে উপবেশন করে। পরে কন্যা সহ সাল্‌তী স্কন্ধে করিয়া সকলে নদীতে গমন করে। পরে কিছুক্ষণ নদীতে সাল্‌তি

ফিজিয়ান বিবাহোৎসব
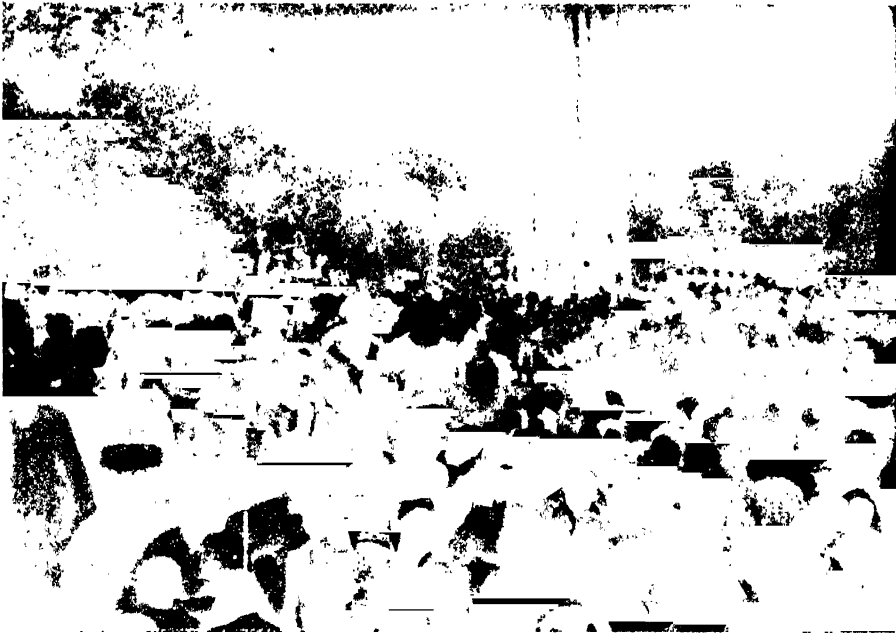
ফিজিয়ান নৃত্যোৎসব

চালনা করা হয় এবং বহু লোক নদীতীরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া থাকে। অতঃপর কন্যা সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে মৎস্যশিকার করিলে তাহার গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ সম্পূর্ণ হয়।

ফিজিয়ানরা পরলোকে বিশ্বাস করে। একটা সুউচ্চ পর্ব্বতের পর পারে তাহাদের স্বর্গ আছে। রোগে বা স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু হইলে কেহ স্বর্গ লাভের অধিকারী হয় না। কিন্তু সম্মুখ-যুদ্ধে বা অপঘাতে মৃত্যু

[illegible] পারে না। ফিজিয়ান-দের আবার একলা স্বর্গে যাইতে নাই। সঙ্গিনী না পেলে তাহারা স্বর্গে প্রবেশের অধিকার পায় না। ফিজিয়ানগণের সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের কোন স্ত্রীই আর স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার স্বর্গ-যাত্রার সাথী হইবার জন্ত নিহত হইতে অস্বীকার করে না। যদি কেহ করে, তবে তাহার স্বামী বেচারীকে স্ত্রীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পর্ব্বতের এপারে অপেক্ষা করিতে হয়। দম্পতির পরিচর্য্যার জন্ত তাহাদের দাসদাসীগণেরও স্বর্গে যাওয়া আবশ্যক। এইজন্ত প্রভুর শবদেহ সমাহিত করিবার সময় তৎসহ স্ত্রী-গণ ও দাসদাসীগণকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করা হয়।

ফিজি দ্বীপাবলীর অন্তর্গত বেকা দ্বীপে একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রথায় কতকগুলি লোককে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড সকলের উপর ভ্রমণ করিতে হয়। ৩০ ফিট দীর্ঘ ৩০ ফিট প্রশস্ত একখণ্ড ভূমি অগভীর ভাবে খনন করিয়া ক্রমান্বয়ে কাষ্ঠ ও প্রস্তর দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। পরে ঐ কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করা হয়। দ্বাদশ ঘণ্টা অগ্নি জ্বলিবার পর কাষ্ঠগুলিকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং দীর্ঘ কাষ্ঠ-দণ্ডের সাহায্যে লোহিতোত্তপ্ত প্রস্তর-খণ্ডগুলিকে সম স্তরে বিছাইয়া দিতে হয়। অনন্তর ১২।১৪ জন লোক প্রথমে ঐ অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে; তৎপরে কুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর ভ্রমণ করে। এই সময়ে তাহারা ধীরে-ধীরে পদবিক্ষেপ করে এবং পূর্ণ এক মিনিট কাল কুণ্ডের মধ্যে থাকে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে একজন পদস্থ ইংরেজ ভদ্রলোক এই অনুষ্ঠান দর্শন করিয়াছিলেন। ঐ তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর একখানি রুমাল নিক্ষেপ করায় উহা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। সেই উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডগুলির উপর লোকে ভ্রমণ করিয়াছিল। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ও পরে তাহাদের পদ এবং পদতল পরীক্ষা করা হইয়াছিল। তাহাতে স্থির হয় যে, অগ্নিতাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত তাহারা পায়ে কোন জিনিস লেপন বা মর্দ্দন করে নাই। অথচ এরূপ প্রচণ্ড উত্তাপ সত্ত্বেও তাহাদের পায়ের একগাছি লোমও দগ্ধ হয় নাই। যে-সে অবশ্য এরূপ অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যাহারা পারে, তাহারা ফিজিয়ানদিগের ধর্ম্মানুসারে কোন বিশিষ্ট অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে, ইহারই অঙ্গ স্বরূপ ঐ তপ্ত প্রস্তর-খণ্ডের উপর শাক, পাতা এবং তরী-তরকারী নিক্ষেপ করিয়া তাহা পাক করিয়া সকলে মিলিয়া ভোজন করে।

কুলীপ্রথা

ভারতবর্ষের সহিত কুলীপ্রথা লইয়াই ফিজি দ্বীপের যাহা কিছু সম্বন্ধ। সেই কুলীপ্রথার সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা বলিলেই আমাদের বক্তব্য শেষ হয়।

কুলী সংগ্রহ করিবার জন্ত দেশের প্রায় সর্ব্বত্র আড়কাটি আছে। ইহারা মানবচরিত্র সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞ। মানুষের মুখ দেখিলেই ইহারা বুঝিতে পারে যে, সে ব্যক্তি তাহাদের ফাঁদে পড়িয়া তাহাদের শিকার হইবে কি না। পাঁচ বৎসরের জন্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া অদূর [illegible] সম্মত হইতে পারে না। এই জন্ত আড়কাটিদিগকে কুলী-সংগ্রহার্থ অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, অনেক মিথ্যা ও চাতুরীর প্রয়োগ করিতে হয়, অনেক অসম্ভব প্রলোভন দেখাইতে হয়। এক কথায়, লোকের মুখ দেখিয়া, কুলী হইবার উপযুক্ত বুঝিলেই, ইহারা হয় আকাশের চাঁদ না হয় স্বর্গ, অন্ততঃ অর্দ্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা ভাবী কুলীর হাতে তুলিয়া দিয়া থাকে। একবার চুক্তিতে আবদ্ধ করাইতে পারিলে এবং প্রাপ্য টাকা আদায় হইলেই আড়কাটির কাষ শেষ হয়। কুলী তখন এমিগ্রেসন ডিপার্টমেণ্টের অধীন হয় এবং আড়কাটি নূতন শিকারের সন্ধানে বাহির হয়। ফিজি দ্বীপে কুলী পাঠাইবার এবং তথা হইতে কুলীদিগের ফিরিয়া আসিবার স্বতন্ত্র জাহাজ আছে। এই জাহাজে তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে কুলীদিগের কাহারও কোন রোগ আছে কি না, ডাক্তার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। জাহাজে কুলীদিগের মধ্যে কতক লোককে রন্ধন, কতক লোককে পাহারা দেওয়া—এইরূপ নানা কাজ করিতে দেওয়া হয়। কলিকাতার বন্দর হইতে সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও প্রভৃতি স্থান হইয়া তিন মাস বার দিনে জাহাজ ফিজি দ্বীপে পৌছিয়া থাকে।

জাহাজ হইতে কুলীরা অবতরণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগের আবার ডাক্তারী পরীক্ষা হয়। পরে তাহাদিগকে ভিন্ন-ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন কুঠীতে চালান দেওয়া হইয়া থাকে। কুঠীর অধ্যক্ষগণ প্রত্যেক কুলীর ব্যয় স্বরূপ ২১০ টাকা এমিগ্রেসন আপিসে জমা দিয়া থাকেন। কুলীরা প্রত্যেকে প্রত্যহ পুরা রোজ কায করিতে পারিলে বার আনা মজুরী পাইয়া থাকে। ইহাতেই তাহাদিগকে খোরাকী ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। যে সকল কুলীর সঙ্গে নিজ নিজ পত্নী থাকে, তাহারা স্বতন্ত্র কক্ষ পাইয়া থাকে; নচেৎ প্রত্যেক কক্ষে তিনজন পুরুষ অথবা তিনজন স্ত্রী-কুলীকে বাস করিতে হয়। * পাঁচ বৎসর কার্য্য করিবার পর চুক্তির মেয়াদ অন্তে কুলীরা দেশে ফিরিয়া আসিতে পারে, অথবা তথায় থাকিয়া স্বাধীনভাবে বাস করিতে পারে। অনেকে তথায় থাকিয়া বায় এবং ইক্ষু ও কলার চাষ-আবাদ করে। ইক্ষু চিনির কুঠীর অধ্যক্ষগণ কিনিয়া লন এবং কলা অষ্ট্রেলিয়ায় চালান যায়। অনেকে মজার চাষও করে।

ফিজিতে ৪০ হাজারের অধিক ভারতবাসী বাস করে; তন্মধ্যে শতকরা ৩৫ জন স্ত্রীলোক। ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকগণকে পর্য্যন্ত যে মজুরী করিবার জন্ত সুদূর সাগরপারে গমন করিতে হয়, ইহা

---

* বিবাহিত কুলীগণকে (অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কুলী হইয়া ফিজিতে গমন করিলে, অথবা কেহ ফিজিতেই বিবাহ করিলে) ফিজির আইন অনুসারে তত্রত্য Marriage Courtএ গিয়া বিবাহ রেজিষ্ট্রি করাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে Marriage Certificate লইতে হয়; নচেৎ দম্পতির মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ গ্রাহ্য হয় না। ইহাতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে।

ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্তই লজ্জার কথা। ভারতীয় স্ত্রী-কুলীগণকে কি কারণে ফিজিতে গমন করিতে হয়, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া পণ্ডিত তোতারাম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং আত্মীয়-স্বজনের অত্যাচার বা ঔদাসীন্যই এরূপ ঘটিবার কারণ। ফিজীতে ভারতবাসিনী স্ত্রীলোকগণকে পুরুষদিগের সমান পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া ফিজির আদিমনিবাসী অসভ্যগণও পণ্ডিত তোতারামের সম্মুখে ভারতবাসীর প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছে এবং তাহাদের উদ্দেশে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছে। কি লজ্জার কথা! অসভ্য ফিজিয়ানগণ তাহাদের স্বজাতীয়া স্ত্রীগণকে এরূপ কুলীর কায করিতে দেয় না। তাহারা অসভ্য, অথচ তাহাদের মধ্যে যে আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান আছে, যে ভারতবাসী আপনাদিগকে সুসভ্য বলিয়া গর্ব্ব করেন, সেই ভারতবাসীর সেটুকু আত্মসম্মান জ্ঞান নাই! এবং সে কথা অসভ্য ফিজিয়ানদিগের মুখে সুসভ্য ভারতবাসীর পক্ষে যে শ্লাঘার কথা নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

যাহারা আড়কাটির কুহকে মজিয়া ফিজিতে কুলীগিরি করিতে যায়, তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া সমাজে স্থান পায় না—ইহাও ভাবনার কথা, সামাজিকগণের বিবেচ্য। নচেৎ সমাজ দিন-দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। পণ্ডিত তোতারাম লিখিয়াছেন, ফিজি-প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ স্ব-সমাজে স্থান না পাইয়া ফিজিতে ফিরিয়া গিয়া তথায় স্থায়ী ভাবে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং অনেকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে সমাজের বল ক্ষুণ্ণ হইতেছে কি না, তাহা সমাজপতিগণ চিন্তা করিয়া দেখুন।

শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতি

খৃষ্টীয়ান মিশনারীগণ ফিজিতে গ্রামে-গ্রামে পাঠশালা স্থাপন করিয়া ফিজিয়ানদিগকে একদিকে যেমন শিক্ষা দান করিতেছেন, অপর দিকে তাহাদিগকে সেইরূপ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতও করিতেছেন। কিন্তু ফিজি-প্রবাসী ভারতবাসীদিগের শিক্ষার কোনরূপ সুব্যবস্থা আছে বলিয়া মনে হয় না। ফলে, তথায় ভারতবাসীদিগের মধ্যে দুর্নীতির প্রসার বৃদ্ধির সম্ভাবনা; এবং যদি সংবাদপত্রে প্রকাশিত রিপোর্টে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, ফিজি-প্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে দুর্নীতি অতি প্রবল ভাবে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। এরূপ অবস্থা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। খৃষ্টীয় মিশনারীগণ "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া নানা দূর দেশে গিয়া শিক্ষা-বিস্তার ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার যদিও তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তথাপি এই সূত্রে দুর্নীতিপরায়ণ সমাজে নীতি-শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া সেই সমাজের কল্যাণও সাধিত হইয়া থাকে। অতএব খৃষ্টীয় মিশনারীগণের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তাঁহাদের উদ্যম প্রশংসনীয়, সন্দেহ নাই। হিন্দু-মুসলমান-সমাজে এরূপ কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। কিন্তু ব্যবস্থা না হইবারও কোন কারণ নাই। অনেকে বলিতে পারেন, খৃষ্টীয় মিশনারীগণ অর্থ-বলে বলীয়ান, তাঁহাদিগকে অন্ন-চিন্তায় কাতর হইতে হয় না; তাই তাঁহারা ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে পারেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারার্থ বা শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে দেশ-বিদেশে মিশন পাঠাইবার মত অর্থ-সঙ্গতি কোথায়? আমরা বলি, অর্থের অসদ্ভাব নাই; অভাব আমাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টির, আমাদের বিবেচনা-শক্তির এবং power of organisationএর। খৃষ্টান মিশনারীগণ ধর্ম্ম-প্রচারক; এবং শিক্ষা-বিস্তারও তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারের অন্যতম অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। আমাদের হিন্দু-সমাজেও শিক্ষা-বিস্তার ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। মুসলমান সমাজের ব্যবস্থাও অনুরূপ। আমাদের বোধ হয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের তাবৎ সমাজেই শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। খৃষ্টীয়ান জাতিসমূহ যেমন ধর্ম্মোদ্দেশে অন্নবিত্তর দান করিয়া থাকেন, আমাদের হিন্দু-সমাজেও সেইরূপ আপামর-সাধারণ ধর্ম্মোদ্দেশে অন্নবিত্তর দান করিয়া থাকেন। কিন্তু খৃষ্টান সমাজে এই দানের যথার্থ সদ্ব্যয় হয়,—খৃষ্টান মিশনারীরা ঐ অর্থের সাহায্যে দূরদেশে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ গমন করিয়া থাকেন; আর আমাদের সমাজে ধর্ম্মোদ্দেশে প্রদত্ত অর্থ অধিকাংশ স্থলেই ব্যক্তিবিশেষের বা পরিবারবিশেষের বিলাসিতার উপকরণ-সংগ্রহে, পাপের স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামে ও নগরে অসংখ্য তীর্থ, মন্দির, মঠ, প্রভৃতি বিরাজমান। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জনসাধারণ তীর্থ-দর্শন-পুণ্য-লাভাকাঙ্ক্ষায় এই সকল স্থলে যথাসাধ্য অর্থদানে কৃপণতা করেন না। স্থলবিশেষে জোর-জবরদস্তি করিয়াও তীর্থযাত্রিগণের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা হইয়া থাকে। এক-একটী তীর্থ ক্ষেত্রের বা মন্দির-মঠের আয় এক-একটী জমিদারীর সদৃশ। এই অর্থ কি হয়? ইহা কি কেবল মোহান্ত মহারাজগণের বিলাসিতা-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য—তাঁহার ভোগতৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য—তাঁহার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত? না—ইহার দ্বারা সাধারণের মধ্যে শিক্ষা, ধর্ম্ম, নীতির বিস্তার হওয়া উচিত? আমাদের মনে হয়, যে সকল ভারতবাসী বিদেশে গিয়া বিবিধ কর্ম্মোপলক্ষে অথবা কুলীরূপে বসবাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার, সন্নীতি রক্ষা এবং ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনার জন্য এই দেব-সম্পত্তির অর্থ বিনিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহার যথার্থ সদ্ব্যয় হয়, দাতার প্রকৃত পুণ্য হয়। দেখিয়া সুখী হইলাম, কোন ভদ্রলোক সংবাদপত্রে পত্র প্রকাশ করিয়া এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছেন। তবে একখানি পত্রেই যেন এই আন্দোলনের পরিসমাপ্তি না হয়—যত দিন না দেব-সম্পত্তির আয়ের প্রকৃত সদ্ব্যয় হয়, ততদিন যেন এই আন্দোলন চলে—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তোতারাম ফিজি-প্রবাসী ভারতবাসীদিগের শিক্ষা-বিধানের জন্য, তাহাদের হৃদয়ে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগ্রত রাখিবার জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং অভিজ্ঞ মৌলবীগণকে ফিজিতে প্রেরণের জন্য ভারতবাসিগণকে অনুরোধ করিয়াছেন। এ অনুরোধ অতি ন্যায়সঙ্গত এবং রক্ষিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

কিছুকাল পূর্ব্বে ফিজিতে ভারতীয় কুলীদের উপর অত্যাচার হয়

বলিয়া সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধি, শ্রীযুক্ত মণিলালজী এম-এ, এলএল-বি, বাবু রাজমনোহরানন্দ প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ কুলীদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সবিশেষ যত্ন করেন। আন্দোলনের ফলে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কুলীদিগের অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত হয়। যে যাহা হউক, আমরা আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, বর্ত্তমান বর্ষে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ফিজিতে Indentured Labour অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ কুলী প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ত্রিপুরা-রাজ্যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব*

(প্রাচীন-যুগ)

(শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত, বিদ্যাভূষণ)

দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা একটি প্রাচীন রাজ্য। সম্রাট যযাতির অভিশাপগ্রস্ত পুত্র মহারাজ দ্রুহ্য ত্রিবেগ নগরীতে যাইয়া যে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই কালক্রমে ত্রিপুর-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিপুর-ভূপতির উপস্থিতি, এই রাজ্যের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ। গুপ্ত-সম্রাটগণের শিলালিপি পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে, মিবার অপেক্ষা ত্রিপুর-রাজ্যের প্রাচীনত্ব অনেক বেশী।†

এই রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশ কুকী, হালাম, ত্রিপুরা, খাসিয়া, রিয়াং, মগ ও চাখ্‌মা প্রভৃতি নানাবিধ অনার্য্য জাতির আবাসভূমি। যাঁহারা ত্রিপুরার প্রকৃত তথ্য অবগত নহেন, তাঁহারা 'কুকির মুলুক' বলিয়া রাজ্যটাকে 'কিস্তূত কিমাকার' মনে করিয়া থাকেন। একটী কথার দ্বারা আমাদের এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিব।

একবার আগরতলার কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি কলিকাতায় একটী প্রসিদ্ধ দোকানে বন্দুক ক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় আলাপ করিতে দেখিয়া মুর্শিদাবাদ-নিবাসী একটী ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, "আপনি দেখিতেছি উত্তম বাঙ্গালা বলিতে পারেন।" তিনি উত্তর করিলেন, "বাঙ্গালা আমাদের মাতৃভাষা, তাহা বলিতে না পারিব কেন?"—ভদ্রলোকটি বলিলেন, "মহাশয়, আজ আমার একটা বিষম ভ্রম দূর হইল; আমি মনে করিতাম, আপনাদের রাজ্যে অন্য কোন রকমের একটা ভাষা প্রচলিত আছে।" ত্রিপুর-রাজ্য সম্বন্ধে দূর হইতে অনেকেই এবম্বিধ অনেক আজগুবি ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন।

রাজ্যমধ্যে কুকি, ত্রিপুরা, মণিপুরী ও মগ প্রভৃতি জাতির বহুবিধ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত আছে,—এ কথা সত্য। কিন্তু তাহা থাকিলেও সাধারণতঃ তথাকার প্রচলিত ভাষা,—বিশেষতঃ রাজভাষা,—বাঙ্গালা। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা' গ্রন্থের সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন, "ত্রিপুরার রাজভাষা বাঙ্গালা; ইহার অধিকাংশ তাম্রশাসন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত। এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা' প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের রত্নমালা স্বরূপ। সুতরাং ত্রিপুরার গৌরবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত।"

আমরাও কৈলাস বাবুর ভাষায় বলিতেছি, "ত্রিপুরার গৌরবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত!" ত্রিপুরায় বাঙ্গালা ভাষা কেমন যত্নের সহিত পোষিত হইতেছে,—দীনা ক্ষীণা বাঙ্গালা ভাষার শিরে রাজমুকুট পরাইয়া তাহাকে কি ভাবে রাজকার্য্যে নিয়োগ করা হইয়াছে,—রাজা হইতে কুটীরবাসী দরিদ্র পর্য্যন্ত, সুশিক্ষিত পণ্ডিত হইতে অবজ্ঞ কুকি পর্য্যন্ত, সকলে সমপ্রাণে কেমন আগ্রহের সহিত বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে সকলকেই এক-বাক্যে বলিতে হইবে,—"ত্রিপুরার গৌরবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা ভাষা গৌরবান্বিত।" তথায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিবিধ উপচারে পূজা পাইয়া আসিতেছে; (১) রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রাধান্য, (২) ইতিহাসে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ, (৩) বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা ও প্রচার,—এই তিনটী বিষয়ই প্রধান এবং বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। রাজকার্য্যে নিয়োজিতা বাঙ্গালা ভাষা কি পরিমাণে উন্নতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

ত্রিপুরা-রাজ্যের আফিস ও আদালতসমূহে স্মরণাতীত কাল

---

* দক্ষিণ-বিক্রমপুর সাহিত্য-সম্মিলনীর ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত।

† সমুদ্রগুপ্ত শকাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ভূপতি ছিলেন। তাঁহার লাট-প্রস্তর-লিপিতে ত্রিপুরা-রাজ্যের নামোল্লেখ হইয়াছে। সুতরাং এই রাজ্য সমুদ্রগুপ্তের শাসন কালের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে।

হইতে বাঙ্গালা-ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী বিচারকগণ বাঙ্গালা-ভাষায় সাক্ষীর জবানবন্দী ও রায় ইত্যাদি লিখিয়া থাকেন। এ রাজ্যের আইন, নিয়মাবলী ইত্যাদি বাঙ্গালা-ভাষায় লিখিত; সরকারী চিঠিপত্র, হিসাব এবং সর্ব্ববিধ খাতাপত্রে বাঙ্গালা-ভাষা ব্যবহৃত হয়; সরকারী গেজেটের ভাষা বাঙ্গালা। এক কথায় বলিতে গেলে, সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যেই বাঙ্গালা-ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

ত্রিপুরা রাজ্যের রাজচিহ্নগুলিতেও বাঙ্গালা ভাষার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এই রাজ্যের ষ্ট্যাম্পের ছাপে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে। মুদ্রায় (জরক) বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষর উৎকীর্ণ হইয়া থাকে। মহারাজ ছত্রমাণিক্যের শাসনকালের (আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন) মুদ্রার এক পৃষ্ঠে "শ্রীহরগৌরী পাদপদ্ম-মধুপ শ্রীশ্রীযুত ছত্রমাণিক্য দেবস্য" এই কয়টী কথা এবং অপর পৃষ্ঠে একটী সিংহের আকৃতি ও তাহার নিম্নভাগে "শকাব্দা ১৫৮২" বঙ্গাক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে। সাতষট্টি বৎসরের পুরাতন, মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালের মুদ্রার এক পৃষ্ঠে "রাধাকৃষ্ণ পদে শ্রীশ্রীযুত ঈশানচন্দ্র মাণিক্য দেব—শ্রীশ্রীমতী রাজলক্ষ্মী মহাদেব্যো" এই কয়টি শব্দ এবং অপর পৃষ্ঠে সিংহমূর্ত্তির পদতলে "শকাব্দ ১৭৭১" অঙ্কিত আছে। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই নিয়মেই মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। মুদ্রায় রাজা ও রাণী উভয়ের নামাঙ্কিত হওয়াই নিয়ম; মহারাজ ছত্রমাণিক্য অবিবাহিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মুদ্রায় রাণীর নাম মুদ্রিত হয় নাই।

এ স্থলে ত্রিপুর-রাজ্যের মুদ্রা সম্বন্ধীয় একটি পুরাতন কাহিনীর উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে, কর্ণেল শ্রীযুত মহিমচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় কলিকাতায় অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি একদিন পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে যান। বড় লোকের নিকট যাইতেছেন, সুতরাং পরিচ্ছদাদির কিছু পারিপাট্য ঘটিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না,—এ কথা সকলেই অবগত আছেন। তিনি অধ্যয়নরত বালকের ঘড়ি, টেড়ি, ছড়ি ইত্যাদির জাঁক-জমক দেখিয়া রুষ্ট হইলেন। কর্ণেল সাহেবের মোটা সোণার চেইনে একখানি গোলাকার লকেট ঝুলিতেছিল, বৃদ্ধের সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। তিনি যেন কখনও লকেট দেখেন নাই, এরূপ ভাব দেখাইয়া একটু ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওটা চক্-চক্ করিতেছে কি?" তাঁহার হাবভাব দেখিয়া এবং স্বর শুনিয়া কর্ণেল বুঝিলেন, বৃদ্ধ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি সঙ্কুচিত ভাবে উত্তর করিলেন, "ইহা আমাদের রাজ্যের মুদ্রা—একখানি মোহর।" ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু আগ্রহের সহিত তাহা ধরিয়া দেখিলেন, এবং মুদ্রায় বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালা অক্ষরে রাজা, রাণীর নাম ইত্যাদি মুদ্রিত দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন; তখন সকলকে ডাকিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তোমরা আসিয়া দেখ—আমার বাঙ্গালা-ভাষা রাজভাষা!" তাঁহার প্রাণের প্রাণ বাঙ্গালা-ভাষা একটা রাজ্যে রাজভাষার সম্মানিত আসন অধিকার করিয়াছে, রাজার মুদ্রায় স্থান পাইয়াছে, এই সুখ এই আনন্দ তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন না; তাই এত উদ্বেলিত হইয়াছিলেন। কর্ণেল সাহেবের মুখে ত্রিপুর-রাজ্যে বাঙ্গালা-ভাষার সমৃদ্ধির কথা শুনিয়া তিনি অধিকতর আনন্দিত হইয়াছিলেন; এতদুপলক্ষে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর-সদনে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বঙ্গভাষা-সম্বর্দ্ধনী সভার পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা-ভাষা রাজভাষা রূপে ব্যবহৃত হওয়া বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা-ভাষার পক্ষে সামান্য গৌরব বা অল্প আনন্দের বিষয় নহে।

ত্রিপুর-ভূপতিগণের মোহরে (ছাপে) বাঙ্গালা-ভাষা ব্যবহৃত হয়। রাজগণের ত্রিবিধ মোহর প্রচলিত আছে,—পদ্ম মোহর, আজ্ঞা মোহর ও খাস মোহর। রাজার খাস দরবার হইতে প্রদত্ত সনন্দ ইত্যাদিতে পদ্মমোহর ব্যবহৃত হয়। ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস রাজমালা গ্রন্থে লিখিত আছে;—

> "রাজ সনদের মোহর পদ্মের আকৃতি,
> নিজ নাম মধ্যে লেখে পদ্মনাম খ্যাতি।
> চতুর্ভিতে পঞ্চনাম আপন পূর্ব্বের,
> বেষ্টিত লিখিত নাম থাকে যে রাজার॥"

একটা পঞ্চদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে বাঙ্গালা অক্ষরে, যে রাজার সময়ের মোহর তাঁহার নাম এবং পাঁচটি দলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচজন রাজার নাম পর্য্যায়ক্রমে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

আজ্ঞা-মোহরেও বাঙ্গালা-ভাষা উৎকীর্ণ হইয়া থাকে। কোনও দেবতার নামের সহিত "আজ্ঞা" শব্দ যুক্ত করা হয় বলিয়া ইহাকে "আজ্ঞা-মোহর" বলে। রাজার অভিপ্রায় অনুসারে আপন-আপন মোহরে "শ্রীরাম আজ্ঞা", "শ্রীগুরু আজ্ঞা", "শ্রীগোবিন্দ আজ্ঞা" "শ্রীহরি আজ্ঞা" ও শ্রীবিষ্ণু আজ্ঞা" ইত্যাদি শব্দ উৎকীর্ণ হয়। বর্ত্তমান মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের আজ্ঞা-মোহরে শেষোক্ত শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ স্থায়ী জমায় ভূমি-বন্দোবস্তের পাট্টা ও তালুকদার প্রভৃতির নামে চিঠিতে এই মোহরের ছাপ দেওয়া হয়। খাস মোহরে পারস্য ভাষায় রাজার পূর্ণ নাম খোদিত হইয়া থাকে। ইহা ব্রিটিশ রাজ্যের নিমিত্ত সম্পাদিত আমমোক্তারনামা ও খাসমোক্তারনামা ইত্যাদি দলিলে ব্যবহৃত হয়।

নৃপতিবৃন্দের প্রদত্ত অধিকাংশ তাম্র-শাসনে বাঙ্গালাভাষা উৎকীর্ণ হইয়াছে। সংস্কৃত-ভাষায় সম্পাদিত শাসনগুলিতেও বাঙ্গালা অক্ষরের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কোন শাসনে দেবনাগর অক্ষর উৎকীর্ণ হইয়াছিল, অদ্যাপি এমন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। যে সকল তাম্র-শাসনে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা খাঁটি বাঙ্গালা নহে, বাঙ্গালার সহিত পারস্য ও সংস্কৃত শব্দের সংমিশ্রণে এক অভিনব ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। বঙ্গদেশের সকল অঞ্চলেই দলিলের ভাষা এইরূপ

অবস্থাপন্ন। "লিখিতং" "পত্রমিদং" "কার্য্যঞ্চাগে" "মাহাবমাহা" "দরবস্ত রকবা" "বহাল তবিয়তে" "ওয়াদ্দা" ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় সম্পাদিত দলিলে সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন দরবারী ভাষার নমুনাস্বরূপ আড়াই শত বৎসরের উর্দ্ধতন কালের পুরাতন একখানি তাম্র-শাসনের আদর্শ নিম্নে প্রদান করা গেল।

"বিষ্ণু"

৭ স্বস্তি শ্রীশ্রীযুত কল্যাণমাণিক্য দেব বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয়ী রাজনামা দেশোয়ং কারকণবর্গে বিরাজতে৽ণা পরং। রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর, পরগণা সুরনগর মৌজে বাউরপার অজঙ্গলাতে শত দ্রোণ ভূমি ৺প্রীতে শ্রীমুকুন্দ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যকে দিলাম। ইহা আবাদ করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে রহুক। এহি ভূমির মাল খাজানা গয়রহ সমস্ত নিশেধ। ইতি শকাব্দা ১৫৭৩ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ।"

আদর্শে লিখিত "বিষম-সমর-বিজয়ী" বিশেষণ ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয়জ্ঞাপক। "মহামহোদয়ী" "মহামহোদয়" শব্দের অপভ্রংশ। "প্রচীকারকণবর্গে বিরাজতে" ইহার অর্থ "মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত।" রাজধানী হস্তিনাপুর এই শব্দ চন্দ্রবংশের পরিচায়ক। উদয়পুরে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল, এজন্য "সরকার উদয়পুর" লিখিত হইয়াছে।

এই তাম্রফলক ১৫৭৩ শকে প্রদান করা হইয়াছে, এখন ১৮৩৮ শক চলিতেছে, সুতরাং ইহা ২৬৫ বৎসরের প্রাচীন দলিল। মনোযোগ সহকারে ইহার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুর-রাজ্যে গদ্য ভাষার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ইহার ঠিক সমসাময়িক অন্য প্রদেশের গদ্য ভাষার নমুনা না পাওয়ায় তুলনা করিয়া দেখাইবার সুবিধা ঘটিল না। ইহার প্রায় এক শতাব্দী পরবর্ত্তী কালের (১১৩৭ সালে) গৌড় দেশে সম্পাদিত একখানা দলিলের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা আলোচনা করিলে উভয় প্রদেশের প্রাচীন বঙ্গভাষার তুলনা করিবার সুবিধা ঘটিবে। দলিলখানি এই :—

"স্বধর্ম্মান্বিত শ্রীল শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীজগদানন্দ দেব শর্ম্মণঃ সাং সুপুর তস্যপর শ্রীমুরলীধর দেব শর্ম্মণঃ সাং শ্রীপাট খড়দহ, তস্যপর শ্রীবল্লভীকান্ত দেব শর্ম্মণঃ সাং বীরচন্দ্রপুর তস্যপর শ্রীসাহেব পঞ্চানন্দ দেব শর্ম্মণঃ সাং গএষপুর তস্যপর শ্রীহৃদয়ানন্দ দেব শর্ম্মণ সাং কানাইডাঙ্গা। প্রভু-সন্ততিবর্গেষু—

ইস্তকা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার সহিত শ্রীশ্রী৺স্বকীয় ধর্ম্মের পর আপেক্ষ করিয়া ৺বৃন্দাবন হইতে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে গৌড়মণ্ডলে জয়নগর হইতে শ্রীযুত সেওয়ার জয়সিংহ মহারাজার নিকট হইতে দিগ্বিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীযুত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্য ও পাতশাহী মনসবদার সমেত গৌড়মণ্ডলে আসিয়াছিলেন এবং আমরা সর্ব্বে থাকিয়া স্বধর্ম্ম উপরি বহাল করিতে পারিলাম নাই সিদ্ধান্ত বিচার করিলাম এবং দিগ্বিজয় বিচার করিলেন এবং শ্রীনবদ্বীপের সভাপণ্ডিত এবং কাশীর সভাপণ্ডিত এবং সোণারগ্রাম বিক্রমপুরের সভাপণ্ডিত এবং উৎকলের সভাপণ্ডিত এবং ধর্ম্মঅধিকারী ও বৈরাগী ও বৈষ্ণব ষোলআনা একত্র হইয়া শ্রীমৎভগবৎশাস্ত্র এবং শ্রীমৎ মহাপ্রভুর মত এবং শ্রীমৎ মধ্যম গোস্বামীদিগের ভক্তি-শাস্ত্র লইয়া শ্রীধর স্বামীর টীকা ও তোষণী লইয়া শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মজকুরের সহিত এবং আমরা থাকিয়া ছয় মাসাবধি বিচার হইল তাহাতে ভট্টাচার্য্য বিচারে পরাভূত হইয়া স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে পারিলেন নাই।" ইত্যাদি

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে (১৫৭ বৎসর পূর্ব্বে) মহারাজ নন্দকুমার তদীয় কনিষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ রায়ের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা মিঃ বেভারিজ সাহেব ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের 'ক্যালকাটা মেগাজিন' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তুলনার নিমিত্ত উক্ত পত্রের কিয়দংশ এস্থলে দেওয়া যাইতেছে :—

"অতএব এসময়ে তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহা মকররর মকররর জানিবা। নাগাদি ৩রা তারিখ তথাকার রোয়দাদ সমেত, মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌঁছে তাহা করিবা এ বিষয়ে এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা।"

ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী আদর্শের এক শতাব্দী পরের ভাষা। এই আদর্শের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইতে পারে, সে কালে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ত্রিপুর-রাজ্য ভাষা-সম্পদে উন্নত ব্যতীত কোন অংশে হীন ছিল না।

পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসন আলোচনা করিলে তদানীন্তন রাজা ও প্রজার মধ্যে কেমন সরলভাব বিরাজমান ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে ; ভূমির চতুঃসীমা লিখিত না হইলে ভবিষ্যতে গোলমাল ঘটিতে পারে, এ কথা কোন পক্ষের মনেই স্থান পায় নাই। ইহা সামান্য সরলতার পরিচায়ক নহে।

তাম্রশাসনের ন্যায় ত্রিপুর-ভূপতিগণের প্রদত্ত সনন্দেও আবহমান-কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার ভাষায়ও সংস্কৃত এবং পারসী শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে একখানি সনন্দের আদর্শ প্রদান করা গেল :—

"শ্রীহরি

স্বস্তি বিষম সমর বিজয়ি মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজ রাধাকিশোর দেব বর্ম্মণ মাণিক্য বাহাদুর নরপতেরাদেশোঽয়ং কারকণবর্গেষু প্রচরতু, পরমস্ত বিরাজতে রাজধানী হস্তিনাপুরী। সরকার আগরতলা স্বাধীন ত্রিপুরা। কৈলা সহর বিভাগের অন্তর্গত মৃতলালজাচৈয়া রাজা বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুক্ত লালচুক পামাকে "রাজা" হুদ্দা প্রদান করা গেল। আমানত দেওয়ানত বহাল রাখিয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত উক্ত খেদমত করিতে থাকুক, ইতি। সন ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ তারিখ ১৩ই ফাল্গুন।"

বর্ত্তমান সময়ে ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে। এই সনন্দ ১৩ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল। ত্রিপুর-রাজ্যে বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষার অশেষ উন্নতি সাধিত হইয়া থাকিলেও দরবারী ভাষার উপর বড় একটা হস্তক্ষেপ হয় নাই। আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন পূর্ব্বোক্ত আদর্শের সহিত এই আদর্শের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, উভয় আদর্শের ভাষায় বিশেষ কোনও প্রভেদ ঘটে নাই। বোধ হয় দরবারী ভাষার অবস্থা চিরদিন একরকমই থাকিবে।

ত্রিপুর-রাজ্যে আর এক নূতন রকমের সনন্দ বা শাসন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা গভীর রাজনীতিমূলক। এই শ্রেণীর দুইটি লিপির বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

জয়ন্তীয়া রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী হালাম সম্প্রদায়ের কুকীগণ ত্রিপুর-রাজ্যের প্রজা হইলেও নিকটবর্ত্তী জয়ন্তীয়াপতি কর্ত্তৃক নানারকমে প্রলুব্ধ হইয়া মধ্যে-মধ্যে ত্রিপুরার বশ্যতা অস্বীকার করিত। তৎকালে হালাম-সম্প্রদায় নিতান্ত উদ্ধত ও দুর্দ্দম্য ছিল; ইহাদের বাহুবলে ত্রিপুর-ভূপতিগণের রাজসম্মান ও প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাদিগকে হস্তগত করিবার নিমিত্ত কুশলবুদ্ধি বিজয় মাণিক্য যত্নবান হইলেন; অপরিসীম বুদ্ধিবলে তিনি অল্পকালের মধ্যেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং 'থাঙ্গাচেপ্' ও 'সাকাচেপ্' সম্প্রদায়ের কুকীদিগকে চিরবশ্যতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করাইয়া সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ ও চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে ধাতু-নির্ম্মিত বিতস্তি পরিমিত একটী হস্তী ও একটী ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে বাঙ্গালা অক্ষরে নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত বাক্যাবলী খোদিত আছে;—

"পূর্ব্বাপোর্য্য ক্রমান্তবস্তু আত্মীয়া,
ইদানীং যদি বৈপরীত্য মাচরন্তি,
তদোপরি ধর্ম্মঃ শস্ত নাশোভবি-
ষ্যতি পশ্চাদ্গজ শার্দ্দূলৌ ॥"

পাঠের প্রথমাবধি "শস্ত নাশোভবি" শব্দ পর্য্যন্ত হস্তিপৃষ্ঠে এবং অবশিষ্টাংশ ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে উৎকীর্ণ হইয়াছে।

এই পাঠের ভাষা অসম্পূর্ণ, এবং না বাঙ্গালা—না সংস্কৃত। এতদ্দ্বারা ইঙ্গিতে ভাব প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। ইহার স্থূল মর্ম্ম এই;—পূর্ব্বাপর তোমাদের সহিত আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে; ইদানীং যদি তাহার বিপরীত আচরণ কর, তবে ভবিষ্যতে তোমাদের ধর্ম্ম ও শস্য নষ্ট হইবে, এবং পশ্চাৎ গজ ও শার্দ্দূল কর্ত্তৃক তোমরা নিহত হইবে।

পার্ব্বত্য জাতি অসভ্য হইলেও তাহারা সাধারণতঃ সরল এবং ধর্ম্মপ্রিয়; তাহাদের বহুস্তোৎপাদিত শস্যই জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র অবলম্বন। সর্ব্বদা অরণ্যে বাস করিতে হয়, সুতরাং বনচর হস্তী ও ব্যাঘ্রকে তাহারা প্রবল শত্রু বলিয়া ভয় করে, এবং রাজাকে দেবতা বলিয়া জানে। প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠে ধর্ম্ম ও শস্য বিনষ্ট এবং গজ শার্দ্দূল কর্ত্তৃক অপকার হইবার ভীতিসূচক অনুজ্ঞা থাকায়, তাহারা বংশপরম্পরা অতি সতর্কতার সহিত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং উক্ত মূর্ত্তিদ্বয় তাহাদের দেবতার আসন অধিকার করিয়াছে,—মূর্ত্তি দুইটীকে তাহারা প্রতিদিন ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকে। ওঝাই (কুকির পুরোহিত) ব্যতীত অন্য কাহারও তাহা স্পর্শ করিবার অধিকার নাই। বিজয় মাণিক্য ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে সিংহাসনারূঢ় হইয়া ৪৮ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় প্রদান করা হইয়াছে; সুতরাং তাহা সার্দ্ধ তিনশত বৎসরের প্রাচীন কীর্ত্তি।

এতদ্ব্যতীত লঙ্গাই সম্প্রদায়ের হালামদিগকে ঐরূপ ধাতু-নির্ম্মিত সুসজ্জিত যোদ্ধা আরোহীসহ একটী অশ্বের প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করা হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির পৃষ্ঠেও বাঙ্গালা অক্ষরে অনেক কথা খোদিত আছে। ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া লিপি অস্পষ্ট হওয়ায় তাহার পাঠ উদ্ধার করা অসাধ্য হইয়াছে; সুতরাং ইহা কি উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছিল, বুঝিবার সুবিধা নাই। অশ্বের পুচ্ছদেশে অঙ্কিত "শকাব্দা ১৫৮৩" এই কয়টী অক্ষর অতি কষ্টে পড়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে, ছত্র মাণিক্যের শাসন সময়ে ইহা প্রদান করা হইয়াছিল; সুতরাং তাহাও প্রায় আড়াই শত বৎসরের পুরাতন জিনিস। লিপি উদ্ধার করা যাইতে না পারিলেও ইহাও যে রাজনৈতিক কৌশলের একটা জ্বলন্ত নিদর্শন, এ কথা নিশ্চিতরূপে বুঝা যাইতে পারে।

প্রতিমূর্ত্তি তিনটীর গঠন দ্বারা ত্রিপুর-রাজ্যের প্রাচীন কালের শিল্প-নৈপুণ্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে। ইহা ঢালাই জিনিস নহে, সুতরাং ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। দীর্ঘকাল অপরিষ্কৃত অবস্থায় থাকায় তাহা কোন্ জাতীয় ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

নানাস্থানে মঠ ও মন্দিরের গাত্রে সংলগ্ন শিলালিপির কথাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুর-ভূপতিগণের এই শ্রেণীর কীর্ত্তির অভাব নাই। অধিকাংশ শিলালিপিতে সংস্কৃত-ভাষা উৎকীর্ণ হইয়া থাকিলেও তাহার অক্ষর বাঙ্গালা। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা-ভাষায় খোদিত প্রস্তর-ফলকও পাওয়া যায়। মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য বাহাদুর রাজ্যভার প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, পুরুষোত্তম ধামে শ্রীমন্দিরের সীমার ভিতরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই মন্দিরের শিলালিপিতে বাঙ্গালা-ভাষা উৎকীর্ণ হইয়াছে। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরস্থিত পীঠ দেবী ৺ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরের গাত্রস্থ শিলালিপিসমূহের মধ্যে একখানি লিপিতে যে ভাষা খোদিত হইয়াছে, তাহাকে সংস্কৃত না বলিয়া বাঙ্গালা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। উক্ত লিপির আদর্শ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে;—

"শ্রীধন্যমাণিক্য ক্ষিতে কৃতি ॥ শকাব্দা ১৪২৩ ॥
তত অভ্যান্তরে শ্রীরণাগণ রামমাণিক্য ধর্ম্মরাজ পতি ॥
শকাব্দা ১৬০৩"

ইহা মন্দিরের শিলালিপি কি সাপের মন্ত্র,—বিধি লিখিয়াছিলেন,

তিনিই জানেন। এই লিপি পাঠে অনুমিত হয়, ১৪২৩ শকাব্দে ধন্য মাণিক্য কর্ত্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এবং রাম মাণিক্যের শাসন কাল ১৬০৩ শকের পূর্ব্বে রণাগণ কর্ত্তৃক এই মন্দিরের সংস্কার হইয়াছিল। রণাগণ ধন্য মাণিক্যের পরবর্ত্তী এবং রাম মাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক। ইনি উদয় মাণিক্যের ভগিনীপতি ও সেনাপতি ছিলেন।

এই দেবালয়ের নাটমন্দিরে বৃহদাকারের একটী ঘণ্টা ঝুলান আছে। সেই ঘণ্টার গাত্রে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি খোদিত রহিয়াছে :—

"শ্রীশ্রীযুত কাশিচন্দ্র মাণিক্য দেবের কৃত ঘণ্টা, নির্ম্মান শ্রী কেবল রাম দেব শন ১২৩৯ ত্রিপুরা বত্তারিক ১১ পৈশ।"

যে সকল বিষয় আলোচিত হইল, তদ্দ্বারা ত্রিপুর-রাজ্যে কত রকমে রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধ হইবে। রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার পক্ষে রাজগণের সুদৃষ্টি এবং দৃঢ়সঙ্কল্প থাকিবার নিমিত্ত ভাষা এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইয়াছে। এই সঙ্কল্প বজায় রাখিবার নিমিত্ত সময়-সময় দরবার হইতে লিখিত আদেশ বাহির হইতেও দেখা গিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর আদালত ইত্যাদিতে বঙ্গভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে "নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন" শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি প্রবল আছে এবং স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে রাজমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, মহোদয় সময়-সময় ইংরাজী ভাষায় আদেশ লিপিবদ্ধ করিতেন শুনিয়া মহারাজ রমণীবাবুকে বলিয়াছিলেন :—"আবহমানকাল এখানকার রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় হিন্দু রাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা বলিয়া আমি মনে করি। বিশেষতঃ আমি বাঙ্গালা ভাষাকে প্রাণের সমান ভালবাসি, এবং রাজকার্য্যের ভাষা দিন-দিন যাহাতে উন্নত হইতে পারে, তদ্রূপ যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করি। আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত কর্ম্মচারিগণের দ্বারা আমার এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়, সে বিষয়ে আপনি দৃষ্টি রাখিবেন।" মহারাজার এই ইঙ্গিত-বাক্যে মন্ত্রী মহোদয়ের মত এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, পররাষ্ট্র-বিভাগের কাগজপত্র ভিন্ন অন্য কাগজে কখনও ইংরাজী ভাষা প্রয়োগ করিতেন না। তিনি নিজেও বাঙ্গালা ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন; অভ্যাসপ্রযুক্ত ইংরাজী ভাষায় কাজ করিতে অধিকতর সুবিধা পাইতেন বলিয়াই মধ্যে-মধ্যে সেই ভাষা ব্যবহার করিতেছিলেন।

বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীশ্রীযুত বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরও পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের সঙ্কল্প অক্ষুণ্ণ রাখিবার বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে রাজমন্ত্রী শ্রীল শ্রীযুত মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর ১৩২৪ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই বৈশাখ তারিখে যে সারকুলার প্রচার করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

এ রাজ্যের আফিস ও আদালতসমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে আবহমানকাল বাঙ্গালা-ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল ; এই অভিপ্রায় সংসাধনোদ্দেশ্যে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১২৮৪ ত্রিপুরাব্দে "নিষ্পত্তি-পত্রাদি লিখিবার আইন" শীর্ষক এক বিধি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। পরম পূজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর-লিখিত এবং বাচনিকরূপে এ বিষয়ে স্বীয় অভিমত বারংবার কর্ম্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহদভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকর্ম্মচারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য ; কিন্তু অধুনা কোন-কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যাইতেছে।

"সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষে ভাষার উৎকর্ষতা-বিধান করা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল্ বিভাগ সংসৃষ্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ভিন্ন আদালত ও আফিসসমূহের কাগজপত্রে বাঙ্গালা ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।

"কোন বিচারক বা অন্য শ্রেণীর কার্য্যকারকের বাঙ্গালা ভাষা জানা না থাকিবার দরুণ, অথবা উক্ত ভাষায় স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ডায়েরি ইত্যাদি অন্য ভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংসৃষ্ট কাগজের সঙ্গে রাখা এবং উক্ত কাগজ কোথাও প্রেরিত হইলে বঙ্গানুবাদ সহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে।

রাজকার্য্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব বিষয়ে অনেক কথা বলিতে বাকী থাকিলেও প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হওয়ায় তদ্বিষয়ে নিরস্ত থাকিতে হইল।

নিরক্ষর পল্লীকবি কৃষ্ণদাস

[শ্রীরমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, কাব্যবিনোদ]

এই পৃথিবীতে বাণীর সেবক কত নিরক্ষর, নীরব পল্লীকবি কত অজানা, অচেনা সুদূর পল্লীতে নীরবে বাস করিতেছেন, তাহা জানা কঠিন। পল্লীর নীরবতার মধ্যে তাঁহাদের কবিত্ব, এবং বর্ণনা বেশ ফুটিয়া উঠে। এই শ্রেণীর কবিগণ স্ব-স্ব ইচ্ছানুসারে চালিত হইয়া থাকেন। পৃথিবীর কোন একটি নিভৃত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সাধারণের নিকট অপরিচিত অবস্থায় নীরবে কালযাপনই বোধ হয় তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এইরূপে অনেক কবি সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত হইতে পারেন নাই। অকালে প্রাণ-বিয়োগ হেতু অনেক কবির কীর্ত্তি-সমূহ তাঁহার সেই নিভৃত পল্লী-কুটীরেই ধ্বংসীভূত এবং লুপ্ত হইয়াছে।

অধুনা, অনেক মহাপ্রাণ ব্যক্তি, যাহাতে এই শ্রেণীর কবিদিগের কীর্ত্তি সকল লুপ্ত না হয়, সেজন্য যত্নবান্ হইয়াছেন। এক্ষণে এই প্রবন্ধের মূল অবতারণা করিতেছি। ১২৭৫ সালে বাণীর সেবক নিরক্ষর কবি কৃষ্ণদাস রাজবংশী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কালনা মহকুমার অধীন "মেড়তলা" গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার

পিতার নাম শ্রীধর রাজবংশী। ইঁহারা জাতিতে ধীবর। সাধারণতঃ মৎস্যাদি বিক্রয় এবং নৌকার ব্যবসায় করিয়া ইঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণদাসের বর্ত্তমান বয়ঃক্রম ৪৯ বৎসর। ইঁহাদের আদি বাসস্থান পূর্ব্বে অন্যত্র ছিল। তৎকালে এই স্থানের ধার্ম্মিক জমিদার ৺কালীকুমার বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রায় ২৫।৩০টী ধীবর-পরিবারকে স্বগ্রামে আনয়ন করিয়া, প্রত্যেকের বাসভবন নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তথায় স্থাপন করেন। সেই সময় হইতেই ইঁহারা স্বজাতীয় ধীবরদিগের সহিত একত্র বাস করিতেছেন। কৃষ্ণদাস মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। ইনি শৈশবকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কোন শিক্ষা বা আক্ষরিক বিদ্যা লাভ করেন নাই। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার হৃদয়ে কবিতা বা সঙ্গীত রচনা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার রচিত কতকগুলি সঙ্গীতের মধ্যে কয়েকটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই গীতগুলি সাধারণের নিকট প্রীতিপ্রদ হইবে, এরূপ আশা করা যায়। ইহার রচনা সজীব, সরস এবং ভাবময়। নিরক্ষর ব্যক্তির রচিত এইরূপ সঙ্গীত শুনিলে সত্য-সত্যই চমৎকৃত হইতে হয়।

এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে "কবি কৃত্তিবাসে"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনিও বিশেষ কিছু লেখাপড়া শিখেন নাই, কিন্তু বঙ্গভাষায় "রামায়ণ"খানি রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ভাবুকজনের হৃদয় হইতে আপনিই কবিত্ব বাহির হইয়া পড়ে। কৃষ্ণদাস নিজে লিখিতে জানেন না, সুতরাং সঙ্গীত রচনা করিয়া কোন শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা তাহা নিজ খাতার মধ্যে লিখাইয়া লন। ইহার নাম "কৃষ্ণপদাবলী"। এক্ষণে ঐ "কৃষ্ণপদাবলী" হইতে কয়েকটী গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কৃষ্ণদাস ভাবুক ব্যক্তি, হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া গাহিয়াছেন,—

মন তোমার কেন এত ভাবনা।
ও মন গুরু বলে' কাঁদ, হরি বলে' ডাক,
ঘুচে যাবে তোমার মন বেদনা॥
হরি হরি তুমি বল নিরবধি,
নামের গুণে পার হবি ভবনদী,
চলে যাবি পারে, না আসিবি ফিরে
ভবযন্ত্রণা আর পাবে না॥
হরি নামের তুল্য আর কিবা আছে,
হরিনামের গুণে শিলা জলে ভাসে,
হরিগুণ গান কর পথে পথে,
হরি নাম তুমি যেন ভুল না।
হরি নামে তুমি অলস হয়ো না।
হরি নাম ভুললে নৌকাতে লবে না।
ক্ষ্যাপা কৃষ্ণ কয়, ডাক দয়াময়
নামের গুণে পারের ভয় থাকবে না॥

এই গীতগুলিতে রচনার এবং ছন্দের অনেক ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটিই ভাবময়। আশা করি, ইহা পাঠে পাঠকদিগের বিরক্তি জন্মিবে না।

পুনরায় অন্যস্থলে লিখিয়াছেন,—

হরি যাকে যে ভাবে রাখ।
তুমি কাউকে কর গরীব, কাউকে কর মহৎ
সকল কাজে তুমি থাক॥
সুখ দাও যারে,—সুখের উপর সুখ,
দুঃখ দাও যারে,—দুঃখের উপর দুঃখ;
পায় না পেটে খেতে, না পায় নিদ্রা যেতে—
বলে মন হরি, কোথায় ডাক॥
ভবে এসে যে জন পরম সুখী হয়, গুরুর কার্য্য সে সকল ভুলে যায়,
না থাকে তার ধর্ম্ম, না থাকে তার কর্ম্ম,
ভুলেও বলে না মন হরিকে ডাক॥
ক্ষ্যাপা কৃষ্ণ বলে, আমি অতি গরীব, বিপদে পড়েছি,
দাও চরণতরী, ঐ চরণে ধরি, বল হরি তুমি কোথায় থাক॥

আবার আর একখানি গান কি সুন্দর ভাবপূর্ণ!

"আগে পরহিংসা ছাড়রে আমার মন, হিংসা, নিন্দা, তম থাকতে—
হবে না ভজন-সাধন॥
ছজন চোরকে করগা শাসন, তবে হবে ভজন-সাধন;
মন প্রাণে হওরে এক মিলন, তবে পুঁজলে পাবে তুমি সেই পরম রতন॥
নাইতে হবে নদীর ঘাটে, ভজন সাধন আছে তাতে,
সে নদীর চতুষ্পাশে বন,
ও তোর বন দেখে মন ভুলে যাবে, হবি পাগলের মতন,—
ধরগা গিয়ে গুরুর চরণ,—বন দেখে ভয় হবে না মন,
ক্ষ্যাপা কৃষ্ণ বলে এখন, ডুব দিলে পাবে রতন॥

ক্ষ্যাপা কৃষ্ণদাস আবার "শ্যামাসঙ্গীত"ও কয়েকখানি রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে একখানি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

শ্যামা এত কষ্ট পাই, আমি সদাই ভাবি তাই।
কর মা আমার গতি—দাও মা তোমার চরণে মতি,
যদি মুখে বলি কালী, ঘুচিবে মনের কালি,
কালী বলে চলে যাই॥
বলেছিলাম আমি, এবার ভবে গিয়ে,—
যেমন যাব, আবার তেমনি আসিব ফিরে,
পড়ে ভূমিতলে, ক্ষুধায় অঙ্গ জ্বলে, মায়ের স্তন পানে ভুলে যাই॥
ভবে এসে আমি মায়ায় বদ্ধ হই, সকলই তোমার কার্য্য ওগো ব্রহ্মময়ী।
ক্ষ্যাপা কৃষ্ণের ধর্ম্ম রাখ অন্নপূর্ণা, জয় "বাচুয়া" বলে প্রসাদ খাই॥

আবার অন্য স্থানে কৃষ্ণদাস, অনাদি অনন্ত জগদীশ্বরের সৃষ্টিরহস্য এবং তাঁহার মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। ইহাও অপূর্ব্ব।

"ধন্য কারিকর, কিবা বুদ্ধি তার, চৌদ্দপোয়া জমি বানিয়েছে এই ঘর।
সে ঘরের নাই পতন, জনমের মতন, এক ছাউনিতে ঘরের মাটি হবে খড়॥
দুই খুঁটিতে ঘর করেছে খাড়া, কোথায় ঘরের পাড় কোথায় দিলে আড়া,

কোথায় তার বনুনি, কোথায় তার ছাটুনি, কিসের সঙ্গে বাঁধন

দিলে কারিকর।

কোন্ হিসাবে কত ঘরে দিলে আড়, কোন্ হিসাবে কোথায় বসে বাঁধে

চাল, কোথায় নড়ে চড়ে, কোথায় সে চাল করে, তৈয়ার হলে পরে

কাকে বলে ঘর্।

ক্ষ্যাপা কৃষ্ণ বলে, বৃথা এলাম ভবে, দেহের খবর আর

আমি জান্‌বো কবে,

ডাকি গুরু বলে, যদি অধম বলে, দয়া করে দেখা দেন সুরেশ্বর ॥

ইহা ভিন্ন এইরূপ আরও অনেকগুলি সঙ্গীত কৃষ্ণদাসের আছে; কিন্তু একবারে তাহার সমস্ত প্রকাশ করা অসম্ভব। সরস্বতীর আশীর্ব্বাদে, এই পৃথিবীতে কত নীরব পল্লীকবি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। জগদীশ্বরের মহিমা অনন্ত। তিনি নিরক্ষর ব্যক্তির হৃদয়ে এমন শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা সময়ে আপনিই প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িতেছে। তাই কোন অজ্ঞাতনামা কবি তাঁহার দেশের হিন্দী) ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন, :—

কঁঙ্করিয়া সব্‌কো কল্‌মা পড়াওয়ে,

মোম বানাওয়ে পাথ্‌থর্‌ কো।

ইহা সত্য। তাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইয়া যায়।

উলূলু

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

বিগত আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' বিবিধপ্রসঙ্গের প্রারম্ভেই 'উলূলু' নামে একটী অতি হ্রস্ব সন্দর্ভ মুদ্রিত দেখিতে পাইলাম। সন্দর্ভখানি পাঠ করিয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। লেখক যখন একটা সাধারণ সূত্র ধরিয়া ভাষ্য করিতেই বসিয়াছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিলেই বোধ হয় ভাষ্যটাকে আরও বিস্তৃত করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ, ইহা ১৩২৩ সনের ৮ই মাঘ তারিখে পাবনা সাহিত্য-পরিষদে পঠিত হইয়াছিল। যাঁহারা সাহিত্য-সভায় পাঠকালে ইহা শুনিয়াছেন, তাঁহাদেরও বোধ হয় স্বল্পকালস্থায়ী 'উলূলু' ধ্বনিতে শ্রবণ-পিপাসা মিটে নাই। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ কোনও উৎসবকালে যে উলূলু ধ্বনি করেন, তাহাও সাধারণতঃ ২।৩ মিনিট সময়ব্যাপী হইয়া থাকে; বিশেষতঃ, বাড়ীতে কাহারও পুত্র জন্মিলে, মহিলাগণ পাঁচ ঝাড় অথবা সাত ঝাড় উলূলু ধ্বনি করিয়া থাকেন; মেয়ে জন্মিলে চারি ঝাড়। এই ঝাড় শব্দ দ্বারা উলূলু-ধ্বনির এক একটা বার বুঝায়,—অর্থাৎ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিয়া একশ্বাসে তাঁহারা যতক্ষণ থাকিতে পারেন, ততক্ষণে এক ঝাড় হয়। সাধারণতঃ তিন ঝাড় ধ্বনিই প্রায় হইয়া থাকে; উৎসব-বিশেষে কখনও পাঁচ ঝাড়, কখনও সাত ঝাড়, এমন কি বিবাহাদি ব্যাপারে সাত ঝাড়ের অধিক্ উলূলু-ধ্বনি হয়।

এই উলূলু শব্দ হইতেই অপভ্রংশরূপে 'হুলু' শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ স্থলেই এই হুলুধ্বনি প্রচলিত আছে। বঙ্গের বাহিরে, এমন কি সুদূর য়ুরোপেও যে একদিন এই প্রকার আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইত, ক্রমে-ক্রমে তাহার প্রমাণ দিতেছি। লেখক মহাশয় বেদের ভাষা উদ্ধৃত করিয়া, বৈদিক যুগেও যে 'হুলু'-ধ্বনির সত্তা ছিল, তাহা সকলকে জানাইয়াছেন; কিন্তু তিনি যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া য়ুরোপীয়ানদের লিখিত কোনও ইংরেজী পুস্তক হইতে হুলুধ্বনি-সূচক কোনও হর্ষ-ধ্বনির অবতারণা করিতে পারিতেন, তবেই আমাদের দেশের নবাশিক্ষিত মহিলাগণের চক্ষু ফুটিত, এবং কথাটাও অতি সহজে কাণে প্রবেশ করিত। শ্রুতি ও স্মৃতির কথা যে আজকাল তাঁহাদের নিকট বিস্মৃতির বাথা! দুই-একখানা ইংরেজী পুস্তকের ইংরেজের লেখা না হইলে তাঁহাদের নিকট কিছুই 'প্রামাণ্য' বলিয়া স্বীকৃত বা গৃহীত হয় না। তর্ক-শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ—এই চারিটীকে 'প্রমাণ' বলা হইয়াছে। শাব্দ প্রমাণের অর্থই শ্রুতি-প্রমাণ; অর্থাৎ বেদে যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থাসূচক নির্দেশ রহিয়াছে, তাহা আস্তিকদের নিকট প্রামাণ্য। যাহারা আস্তিক নহে (অথচ নাস্তিকও নহে), তাহাদের নিকট বোধ হয় ইংরেজের বুলিই প্রামাণ্য। শ্রুতি-স্মৃতির কথা তাহাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না। শুধু এই হুলুধ্বনি বলিয়া নয়—হিন্দুদের প্রত্যেক কার্য্যেই আজকাল অনেকে অনেক বিষয়ে উপহাস করিয়া থাকেন। সন্দর্ভ লেখক নিজেও লিখিয়াছেন, "কোন কোন বিদুষী এই ধ্বনি (উলূলু) করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। . .. .. ইহাকে কেহ-কেহ অনার্য্য বা অসভ্য ধ্বনি মনে করেন।"

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যে সকল বিদুষী এই হুলুধ্বনিকে অসভ্যের ধ্বনি মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর বিদুষী? পুথি পুস্তক পড়িয়া বিদুষী হইয়া থাকিলেও গার্গী, মৈত্রেয়ী, অরুন্ধতী, লীলাবতী প্রভৃতিকে বোধ হয় তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। নিজের জাতি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, "জান্‌বার জিনিসকে আমরা জেনেছি" (বেদিতব্যমহং বেদ) মনে করিয়া যাঁহারা বিদুষী (বিদ্ + কসু) তাঁহারাও বোধ হয় প্রাচীন কালের পাশ্চাত্য রমণীদের মুখে হুলুধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজেদের বিদুষীম্মন্যতা পরিত্যাগ করিবেন।

বস্তুতঃ, আনন্দ প্রকাশ করা, বা হর্ষ ও আহ্লাদ প্রকাশ করাতে অসভ্যতার লক্ষণ কি থাকিতে পারে? বিদ্বান, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, বাঙ্গালী, ইংরেজ,—সকলেই, ভিতরে হর্ষের উদ্রেক হইলে, তাহা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। স্বভাবতঃই ঐ আনন্দের চিহ্ন বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। হর্ষ, আনন্দ ও আহ্লাদ স্বাভাবিক জিনিস। ইচ্ছা না করিলেও, সময় উপস্থিত হইলে, ঐ সমস্ত প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। এতাদৃশ স্বাভাবিকতাকে, বা প্রকৃতির গতিকে, যাঁহারা ইচ্ছা করিয়া অবরুদ্ধ করিতে যান, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর বিদুষী ও কোন্ দেশের সভ্য?

হর্ষ হুলুধ্বনিতে প্রকটিত না হইলেও অন্যান্য অবয়বে তাহা স্বভাবতঃই ফুটিয়া উঠে। ভিতরের হর্ষোচ্ছ্বাস কেহ কৃত্রিমতার ভাণ করিয়া চাপিয়া রাখিতে পারেন না; কারণ, তাহা আপনা-আপনিই

মুখে-চোখে ছাপিয়া উঠে। সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া, সুন্দর বেশ-ভূষণে লক্ষ-লোচনসমীপে বহির্গত হইয়া যাঁহারা বিনা কারণে প্রকাশ্য দরবারে নিজেদের কোমল কণ্ঠের পরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাঁহারাই আবার উৎসব-বিশেষে স্বভাবোত্থিত হর্ষ-ধ্বনিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সংযত করিয়া, আপনাদের সভ্যতার পরিচয় প্রদান করেন।

হুলুধ্বনিকে অনেক স্থানে 'জোকার' ধ্বনি বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

"জয়ে জোকারে হরিশঙ্কর ঠাকুরকে ঘরে আনিলেন।"

হরিশঙ্কর ব্রত-কথা।

এই জোকার শব্দ 'জয়কার' শব্দের অপভ্রংশ। জয় ও জয়কার সমশ্রেণীর শব্দ। জয়ধ্বনি ও জয়কার (জোকার) উভয়ই হুলুধ্বনির সমার্থক। কিন্তু ইংরেজী ভিক্টরী (Victory) শব্দ দ্বারা যে জয় অর্থ বুঝায়, এই জয়ধ্বনি দ্বারা তাহা অনুমান করা সমীচীন হইবে না; বরং 'হুররা' (Hurrah) শব্দের সঙ্গে 'হুলু' শব্দের অনেক সামঞ্জস্য আছে। 'হিপ্, হিপ্, হুর্‌রা' (Hip, Hip, Hurrah) ধ্বনি তিনবার উচ্চারিত হইয়া থাকে,—হুলুধ্বনিও তিনবার উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই জয়ধ্বনি বা হুলুধ্বনি শুধু যোষিদ্‌বৃন্দের মুখ দিয়াই বহির্গত হয় না,—পুরুষেরাও জয়ধ্বনি করিয়া থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুরুষেরা কোনও পদবিশেষ উচ্চারণ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া থাকে, আর স্ত্রীলোকেরা জিহ্বা ও ওষ্ঠের সাহায্যে এক শ্রুতি-মধুর মাঙ্গলিক শব্দ করিয়া 'জয়কার' করে। এই জয়কারকেই 'জোকার' বলা হয়। কখন-কখন গান গাহিয়াও জয় বা উল্লাস প্রকাশ করা হইয়া থাকে। দুর্গাপূজার প্রারম্ভে মণ্ডপগৃহে যখন নবপত্রিকা প্রবেশ করান হয়, তখনও শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে জয়ধ্বনি করিবার নিয়ম আছে। "গীতবাদ্য-জয়ধ্বনি পুরঃসরং নবপত্রিকাং প্রতিমাসকাশমানীয় মন্ত্রং পঠেৎ" এই প্রকারে কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা এবং হিন্দুদের সমস্ত ব্রত ও পর্ব্বদিনে জয়ধ্বনির প্রচলন প্রায় সর্ব্বত্রই আছে।

"দেগো তোরা পুরবাসী জয়ধ্বনি সবে।"

এই গানের অংশে পুংলিঙ্গ পুরবাসী শব্দ দ্বারা পুরুষকে লক্ষ্য করা হয় নাই; প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকদিগকে বলা হইতেছে যে, তোমরা সকলে জয়ধ্বনি কর অর্থাৎ 'জোকার' দেও।

"যত সব নারীগণ হুলুধ্বনি অগণন,
থেকে-থেকে করিতেছে হইয়ে ব্যাকুল;
বাজিছে দুন্দুভি-ঢোল গুম্ গুম্ রবে
সারঙ্গ-নিনাদ প্রাণ করিছে আকুল।"

এই সকল কবিতা দ্বারা বাদ্য, হুলুধ্বনি ও সঙ্গীত প্রভৃতি যে সমস্বরে উত্থিত হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভিতরও হুলু ধ্বনি ও জোকার-ধ্বনির অভাব নাই। তখনকার রমণীগণ আর্য্য ছিল, কি অনার্য্য ছিল,—সভ্য ছিল, কি অসভ্য ছিল—, তাহা অধুনাতন বঙ্গরমণীগণ বলিয়া দিবেন কি?

পূর্ব্ববঙ্গের কোন-কোন স্থানে মুসলমানের ছেলে-মেয়েরা হিন্দুদিগের পূজা-অর্চ্চনার সময় উপহাসচ্ছলে একটা ছড়া আবৃত্তি করিয়া থাকে:—

"হিন্দুনীরা জোকার দেয়, তুলসী-পাতা পূজাত্ দেয়।"

অর্থাৎ হিন্দুরমণীরা পূজার সময় জোকারধ্বনি ও তুলসী-পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে। এই মাঙ্গলিক জোকার-ধ্বনি দ্বারা যে পরিবারের মধ্যে মঙ্গল-সূচনা হয় এবং তুলসী-পাতার দ্বারাও যে মানবমাত্রেরই অনেক উপকার সাধিত হয়, তাহা যাহারা অনুধাবন করিতে না পারে, তাদৃশ ছেলেমেয়েরাই ঈদৃশ উপহাস করিয়া থাকে। আমাদের হিন্দুসমাজের আদর্শীভূতা রমণীরাও যে অবোধ ছেলেমেয়েদের মত ঐ সকল পবিত্র পদার্থকে উপহাস ও অবহেলা করিয়া অপবিত্র করিতে চেষ্টা করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

সম্প্রতি H. L. Havell লিখিত Stories from the Odyssey নামক পুস্তক হইতে একটি বলিদানের ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া, উহাতে যে হুলুধ্বনি বর্ণিত আছে, তাহা দেখাইতেছি—

Presently the heifer was driven lowing (পাঁঠার মত ভ্যা ভ্যা শব্দ করিতে-করিতে) into the courtyard, and the goldsmith followed with the instruments of his art. Nestor gave him gold, and the smith beat it into thin leaf with his hammer, and laid it skilfully over the horns of the heifer (হিন্দুদের দানীয় পশু স্বর্ণশৃঙ্গ ও রৌপ্যক্ষুরে অলঙ্কৃত হয় এবং ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতির শৃঙ্গ সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত করা হয়). A handmaid brought pure water and barly-meal in a basket, (হিন্দুরমণীগণ কুলাতে (শূর্পে) করিয়া যব, শ্বেত সর্ষপ, মাসকলাই প্রভৃতি আনিয়া থাকেন) while one of Nestor's sons stood ready with an axe (হিন্দুদের-খড়্গ) and another beld a bowl to catch the blood (হিন্দুদের ছাগরক্ত অস্ত্রপাত্রে অথবা কলার খোলে গৃহীত হয়). Then Nestor dipped his hands in the water (হিন্দু পুরোহিতগণ হাত-পা ধুইয়া জল দ্বারা আচমন করিয়া থাকেন, "প্রক্ষাল্য পানী পাদৌচ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্"), took barley-meal from the basket, and sprinkled them on the head of the beast. (ব্রাহ্মণ পুরোহিত সেই কুলা হইতে যব ও শ্বেত সর্ষপ প্রভৃতি লইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পশুর চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করেন। "ততঃ শ্বেতসর্ষপান্ গৃহীত্বা 'বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ—। ইত্যাদি মন্ত্রেণ বিকিরেৎ।" যব বা শ্বেত সর্ষপের আঘাতে উপদ্রবকারী বায়বীয় সূক্ষ্মশরীর সমূহ দূরীভূত হয়). The prayer was spoken (দেবী স্তুতি—যথা

বলিরেষ ময়া দত্তঃ পশুনাঞ্চ পশূত্তমঃ।
গৃহ্ন গৃহ্ন মহাদেবি রক্ষ মাং দুরিতার্ণবাৎ। ইত্যাদি)

and all due rites being ended, he who held the axe smote the heifer on the head just behind the horns.

(হিন্দুদের বলিও গলদেশেই ছেদিত হইয়া থাকে। the women the raised sacrificial cry as the heifer dropped to the ground. (হিন্দুরমণীরাও বলি শেষ হওয়া মাত্রই sacrificial cry অর্থাৎ মাঙ্গল্য হুলুধ্বনি করিয়া থাকে, উলুলু শব্দের অর্থই বৃদ্ধিসূচক মাঙ্গল্য স্ত্রী-ধ্বনি বিশেষ).

এই উপাখ্যানের অবশিষ্ট ভাগটুকুও পাঠকদের কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। Next they, whose office it was, lifted up the victim's head and Pisistratus cut the throut (কুঠারাঘাতের পর দ্বিতীয়বারে শরীর হইতে মস্তক বিভক্ত করাই বোধ হয় তাহাদের রীতি। আমাদের মুসলমানগণও এই ভাবেই 'জবাই' করিয়া থাকে। হিন্দুদের মহিষ-বলির বেলায়ও একের অধিক আঘাতে যে কোন দোষ হয় না তাহার উল্লেখ আছে—"দ্বিঘাতেন ত্রিঘাতেন বা মহেশ্বরি!—"). When the last quiver of life was o'r they flayed the carcass (হিন্দুদের ছালছোলা), cut strips of flesh from the thigh (পুরোহিতগণ ছাগের গলদেশ হইতে একটুকরা মাংস কাটিয়া দেবতার সমীপে নিবেদন করেন).

এখন দেখা যাইতেছে যে সেই দেশীয় রমণীগণ পশু কাটা হইবামাত্রই sacrificial cry উত্থাপন করিতেন, যাহা হিন্দু যোষিদ্‌গণও করিয়া থাকেন। ওডেসিয়াস্ (Odysseus) বা ইউলেসিস্ (Ulysses) প্রভৃতির অনুবাদকারগণের মধ্যেও কেহ কেহ এই sacrificial cry'কে হুলুধ্বনি ও জয়ধ্বনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে সুগৃহীতনামা কবি শ্রীহর্ষের রচিত নৈষধ-চরিতেও একদিন উলুলু শব্দ শুনিয়াছিলাম ও পড়িয়াছিলাম মনে পড়ে।

'উচ্চৈরুলুধ্বনি রুচ্চচার।'

তৎকালের স্ত্রীলোকগণ বোধ হয় বর্ত্তমান কালের পশ্চিমে হাওয়ায় গড়া ছিলেন না। প্রয়োজন বোধে পুনরায় ছান্দোগ্য উপনিষদের অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপেই সন্দর্ভের শেষ করিতেছি।

"অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যঃ তং জায়মানং ঘোষা উলুলবোঽনুদতিষ্ঠন্ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাস্তস্মাত্তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি ঘোষা উলুলবোঽনুতিষ্ঠন্তি সর্ব্বাণি চ ভূতানি সর্ব্বে চ কামাঃ।"

সঙ্গীত-বিজ্ঞান

দেশী ও বিলাতী

[শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি-এস্ সি]

সাধারণতঃ সঙ্গীত দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে,—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য। কিন্তু সার্ব্বজনীন সঙ্গীতের এই দেশী ও বিলাতী বিভাগ একটা বিশেষ ভ্রম। সঙ্গীত একই;—কিন্তু যেরূপ কোনও পত্রের কেবল এক পৃষ্ঠা থাকিতে পারে না, সেইরূপ সঙ্গীতের দুইটী দিক আছে। একই ভারতভূমিতে জন্মলাভ করিয়া, সঙ্গীতের একাংশ মাতৃক্রোড়ে মাতৃস্নেহে লালিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব কলাবিদ্যায় পরিণত হইয়া, ত্রিংশৎ শতাব্দীরও উর্দ্ধকাল মানবের এ মহনীয় লীলাভূমি মোহিত করিয়া রাখিয়াছে;—আজিও এ বহু সংঘর্ষময় যুগে, বহু পরিমাণে হতশ্রী হইয়াও স্বীয় অমৃতধারায় প্রকৃত গুণগ্রাহিগণের হৃদয় বহুবিধ রসে সিক্ত রাখিতেছে; আর অপরাংশ শৈশবে আরব-হস্তে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইয়া, বহু মরু-সাগর-পারে—প্রথমে স্পেনদেশে, পরে য়ুরোপের অপরাপর দেশে ভ্রমণ করিয়া স্বাবলম্বনে, প্রকৃতির মহনীয় ঝঙ্কার ধরিয়া রাখিয়া, মানব-শ্রবণের চিরসার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতে প্রভেদ ইহাই। একটী একহারা সুরের গতির অনুসরণ করে, একটী ধ্বনির (note) পর অপর একটী ধ্বনির উপযুক্ত সংযোগ করিয়া মানব-চিত্তে বিভিন্ন ভাবের উন্মেষ করে: আর অপরটী এককালীন একাধিক সুর-সম্মিলনে পল্লব-মর্ম্মর, জল-কলনাদ, কোকিল-কূজনময়ী প্রকৃতির স্বভাব-সঙ্গীতের আবির্ভাব-কল্পনায় নিরত।

য়ুরোপীয়গণ বহুকাল যাবৎ একাধিক সুর-সংযোগে সঙ্গীত-বাদ্যাদি করিয়া থাকেন। তাঁহারা একটী মূল সুরকে প্রাধান্য দিয়া তাহার সহিত দুই-তিনটী পর্য্যন্ত বিভিন্ন সুর-বিন্যাস করিয়া থাকেন। তাহার ফলে তাঁহাদের প্রধান সুর অপেক্ষাকৃত সহজ ও হাল্কা হইয়া পড়ে; কিন্তু এই 'হারমণি' বা সুরবিন্যাস-সংযোগে অপেক্ষাকৃত সহজ সুরও নিরতিশয় শব্দ-গাম্ভীর্য্য ও সুর-বৈচিত্র্য লাভ করিয়া থাকে। এই সুরবিন্যাস এঞ্জিনিয়ারিং-এর ন্যায় একটী গঠন-বিজ্ঞান; ইহা Acoustics বা নাদশাস্ত্রের নিয়মাধীন; এবং তৎফলে লব্ধ মিষ্টতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে।

দুইটী প্রায় সমান পর্দ্দার সুর একই রূপ জোরে একত্র বাজাইলে, দুইয়ের সংযোগে যে শব্দ উদ্ভূত হয়, তাহার একটী বিশেষত্ব আছে। সেটী সমস্ত ক্ষণ সমান জোরে বাজে না; একবার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে শব্দ-গাম্ভীর্য্যের হ্রাস পায়, প্রায় নিস্তব্ধই হইয়া যায়; এবং তৎপরে নাদ বর্দ্ধিত হইয়া অতি উচ্চে বাদিত হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধিটী পর্দ্দা-দুইটীর দূরত্বের উপর নির্ভর করে। যদি একটী ধ্বনি সেকেণ্ডে ২৫৬ কম্পনে * ও অপরটী ২৬১ কম্পনে সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই দুইটী সুরে, অর্থাৎ আমাদের হার্ম্মোনিয়ামের মুদারায় ষড়জ ও তাহার ঈষৎ বিকৃতি ঘটিলে যে সুর হয়,—এই উভয় এককালে বাদিত হইলে, আমরা সেকেণ্ডে পাঁচবার এই

---

* সঙ্গীতের ধ্বনিমাত্রেই সমকালান্তরিত কম্পনে সৃষ্ট। সেকেণ্ডে সাতাশের নিম্নে বা চল্লিশ হাজার বারের উর্দ্ধে কম্পন হইলে কোন ধ্বনি শোনা যায় না; সাধারণতঃ বিশ হাজার বারের অপেক্ষা দ্রুত কম্পন হইলেই শব্দোৎপত্তি ঘটে না। অতিশয় সুতীক্ষ্ণ শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই সেকেণ্ডে চল্লিশ হাজার কম্পনের শব্দ শ্রবণে সমর্থ হয়েন।

হ্রাসবৃদ্ধি অনুভব করিব। ফলতঃ, পর্দ্দা-দুইটীর কম্পনের সংখ্যায় যে পরিমাণে বিভিন্নতা থাকে, সেকেণ্ডে ততগুলি হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এটা অনেকটা আলোক-স্পন্দনের ন্যায়। চক্ষের সম্মুখে একটি আলোক যদি ক্রমান্বয়ে ঠিক সমকাল অন্তরে নিভিয়া যায় ও জ্বলিয়া উঠে, তাহা হইলে চক্ষের যেরূপ অবস্থা ঘটে, এই সুরের হ্রাসবৃদ্ধিতে কর্ণেরও সেই দশা হয়। যদি আলোক-স্পন্দনটা অতি ধীরে হয়, সেকেণ্ডে একবার কি দুইবার ঘটে, তাহা হইলে চক্ষের বিশেষ কষ্ট হয় না। কিন্তু যদি আলোকটা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে স্পন্দিত হইতে থাকে, তাহা হইলে চক্ষুতে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হয়। যাঁহারা সাধারণ খারাপ যন্ত্রে বায়স্কোপ দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য। কিন্তু আলোকটী অতিশয় দ্রুত-গতিতে স্পন্দিত হইলে আর কোনরূপ কষ্ট হয় না। হার্ম্মণির মিষ্টতাও এই কারণ-সম্ভূত। হার্ম্মোনিয়াম ও তজ্জাতীয় বাদ্যযন্ত্রে শ্রুতি-মাধুর্য্য সম্পাদনের জন্য ইচ্ছা করিয়াই Voix Celeste stopএতে সেকেণ্ডে দুইটী এইরূপ নাদ-স্পন্দনের (Beats) ব্যবস্থা করা থাকে। সেকেণ্ডে বত্রিশ বা তেত্রিশটা স্পন্দনে, সুরবিন্যাসোদ্ভূত সুর অতিশয় শ্রুতি-কঠোর হইয়া থাকে। কিন্তু সেকেণ্ডে আশীবারের অধিক স্পন্দন হইলে আর কষ্ট বোধ হয় না; পরন্তু, শ্রুতি-মাধুর্য্য ঘটে। কারণ, জওয়ারীহীন বিশুদ্ধ ধ্বনিতে প্রাণ নাই; তাহার মিষ্টতাও অধিক থাকে না, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতাও নাই। একটা টানা বেহালার তারকে যদি আঘাত করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে সমগ্রটীর কম্পনে একটা ধ্বনি উত্থিত হয়; এবং প্রায় তৎসমকালে অর্দ্ধাংশ, তৃতীয়াংশ, চতুর্থাংশ, পঞ্চমাংশ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে দ্রুত প্রকম্পিত হইয়া স্বতন্ত্র ধ্বনি উৎপন্ন করে। ইহারই ফলে এস্রাজ, তানপুরা, বেহালা প্রভৃতি তার ও তন্ত্রযন্ত্রের জওয়ারী নামক ধ্বনির উৎপত্তি, এবং ভাব-প্রকাশে ও শব্দ মাধুর্য্যে পরিপুষ্টি। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে এই হার্ম্মণির দ্বারা সুরের মিষ্টতা-সাধনের উদ্যমই প্রধান। তাহারই ফলে য়ুরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রধান সাতটী সুর একটা নিয়মিত সম্পর্কে গঠিত। পর্দ্দাগুলির কম্পন-সংখ্যামধ্যে একটা সহজ সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেকেণ্ডে সাধারণতঃ আশী বারের অধিক স্পন্দন ঘটিলে, সুর শ্রুতিকটু হয় না। যদি পর্দ্দা-দুইটার একটার প্রত্যেক চতুর্থ কম্পনে একটী হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তাহা হইলেও সমানই ফললাভ হয়। সাধারণতঃ সঙ্গীত যে কয় পর্দ্দার মধ্যে গীত ও বাদিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে কোনও দুইটার কম্পন-সংখ্যায় যদি একটী সহজ সম্পর্ক (Ratio) থাকে, তাহা হইলে দুই বা অধিক সুর (একত্র বাদিত হইলে) স্পন্দন-হেতু শ্রুতি-কটুতা ঘটে। পর্দ্দা দুইটার সম্পর্ক যদি ১ : ২ হয়, অর্থাৎ একটী উদারার ষড়জ ও অপরটী মুদারার ষড়জ হয়, তাহা হইলে কোনও উপায়ে (যদি সুরগুলি অতি নিম্ন না হয়) শ্রুতি-কটুতা ঘটে না। সর্ব্বদাই সুরসঙ্গত ঘটে। ১ : ২ পরেই ২ : ৩ সম্পর্ক, ও তাহার পর ৩ : ৪। এইরূপ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটী ধ্বনির সমাবেশ একটী বিশুদ্ধ সুর-বিন্যাস। ধ্বনিগুলি অতিশয় নিম্ন না হইলে, শ্রুতি-কটুতা কোনরূপে ঘটে না। সাধারণতঃ সঙ্গীতে সেরূপ নিম্ন-সুর পাওয়া যায় না। শেষোক্ত দুইটী সম্পর্কের প্রথম সুরটীকে ইংরাজীতে fifth ও দ্বিতীয়টীকে fourth বলে। ইহার পরেই অপেক্ষাকৃত জটিল, তথাপি সরল সম্বন্ধ ৪ : ৫ ও ৫ : ৬। এই দুইটীকে Major ও Minor Thirds বলে। তীব্র সুরে এই ধ্বনিদ্বয় দ্বারা স্বর-সঙ্গত সম্পন্ন হয়; কিন্তু নিম্ন-সুরে শ্রুতি-বিরাগই ঘটে। এই কয়েকটীকে একত্র করিলে আমরা চারিটী ধ্বনি পাই। ভগ্নাংশ করিলে সম্পর্কটা দাঁড়ায়—

৪ : ৫ : ৬ : ৮

ছয় সংখ্যাটীকে অপর একটী সুর বিন্যাসের ভিত্তি ধরিয়া আর একটী সুরসঙ্গত গঠিত করিতে হইলে আমরা—

৬ : ৭½ : ৯

এবং নয় সংখ্যাকে তাহার পরের স্বরসঙ্গতের ভিত্তি করিয়া—

৯ : ১১¼ : ১৩½

পাই। এই সুরগুলির ভগ্নাংশ বাদ দিলে সাতটী সম্পর্ক পাওয়া যায়; যথা :—

১৬ : ২০ : ২৪ : ৩০ : ৩৬ : ৪৫ : ৫৪

সুরগুলির কোনটী দ্বিগুণ বা দ্বিভাগ করিলে স্বর বিন্যাসের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। ১৬, ২০ ও ৫৪ সংখ্যাত্রয়কে এইরূপ গুণ ও ভাগ করিয়া পর্য্যায়ানুসারে সাজাইলে, আমরা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের Major Diatonic Scale প্রাপ্ত হই :—

২৪ : ২৭ : ৩০ : ৩২ : ৩৬ : ৪০ : ৪৫

ইহাই য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মূল সুর। সাধারণতঃ হার্ম্মোনিয়াম প্রভৃতি যন্ত্রে যে দ্বাদশটী করিয়া পর্দ্দা থাকে, তাহার সবগুলিই ঈষৎ বিকৃত। তবে উল্লিখিত হার্ম্মণি বা সুর-সঙ্গত যথাসম্ভব বজায় রাখা হইয়া থাকে।

আমাদের দেশেও যে একেবারে বিভিন্ন সুরের একত্র সংযোগ নাই, এ কথা বলা যায় না। আমাদের সঙ্গীতমাত্রেই যে তানপুরার সহিত গীত হয়, তাহার পঞ্চম ও ষড়জ মিলিয়া গানের স্বরের সহিত সর্ব্বদাই সুর-সঙ্গত করিয়া থাকে। বাদনকালে সেতারে যে চিকারি দেওয়া হয়, তাহাও ইহারই অন্যতম উদাহরণ।

কিন্তু আমাদের সঙ্গীত স্বরসন্ধি-প্রধান নহে; বহু শব্দের সম্মিলনে এক শ্রুতি-মধুর ঝঙ্কারের সৃষ্টি আমাদের সঙ্গীত-কবিগণের কামনা ছিল না। তাঁহারা ভাবের খেলা লইয়াই মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। বহির্ম্মুখী য়ুরোপ বাহিরের ঝঙ্কার লইয়া ব্যস্ত হইল; আর আমাদের ভাবুক দেশে সেই সঙ্গীতই তান-লয়-সংযোগে মানব-হৃদয়ের নিত্য-নূতন ভাবোন্মেষের ব্যাখ্যা করিয়া এক পরম মধুর রসধারার সৃষ্টি করিল। অবশ্য বহির্ম্মুখী বা অন্তর্ম্মুখী—উভয়বিধ সঙ্গীত বা অপর যে-কোন বিদ্যা, সকলই অনুভূতি-রাজ্যের। তবে প্রভেদ এই, একটীর ক্ষণাদ্ভূত অনুভূতির (Immediate sense impression) ফলে মস্তিষ্ক-পদার্থে যে পরিবর্ত্তন ঘটে ও চিহ্ন অঙ্কিত হয়, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ

বহির্ম্মুখী জগতের অন্তর্গত মনে করি; আর সেই অনুভূতির ফলে, আমরা পূর্ব্বানুভূতির সাহায্যে বিবেচনা করিলে, মস্তিষ্ক-পদার্থে যে বিভিন্নতা ঘটে, তাহার ফলকে চিন্তা, জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি অন্তর্ভূত জগতের অংশ বলিয়া থাকি। প্রথমোক্ত শ্রেণীর অনুভূতি পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের সাহায্যে শ্রেণীবিভক্ত হয়। য়ুরোপীয় সঙ্গীত, য়ুরোপীয় সভ্যতার স্যায় মূলতঃ এইরূপ বিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুভূতিগুলি মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও তত্তুল্য অপরাপর বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ হইতেছে। ভারতীয় ভাবময় সঙ্গীত এই স্বল্প-প্রস্ফুটিত মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের কোনও এক অজ্ঞাত নিয়মে গঠিত; এবং এই হিসাবে ভারতীয় সভ্যতার ন্যায় অনেক পরিমাণে অন্তর্ম্মুখী। আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে গায়ক বা বাদক তাহার প্রাণভরা ভাবের খেলা সম্পূর্ণ খেলিতে দেয়, শ্রুতি-মাধুর্য্যের জন্য স্বর-বিন্যাসের কোনও নিয়ম মানিয়া ভাবকে বাঁধিয়া রাখে না। কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীত-রচয়িতাগণের ভাবের খেলা কখনও বিশৃঙ্খল ভাবে ছুটে না। সেই ভাব-তরঙ্গের ফলে যে সঙ্গীত রচিত হয়, তাহা শ্রোতার হৃদয়ে,—রচনার অপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে রচয়িতার মানসে যে ভাব উদ্দীপিত হয়,—তাহাই উদ্দাম বেগে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে।

আমাদের সঙ্গীতে তাল বলিয়া যে একটা নিরতিশয় প্রধান অঙ্গ আছে, তাহাতে এই ভাবোৎপাদিকা-শক্তির বিকাশের সহায়তা ঘটে। রাগের আলাপ-কালে শ্রোতার হৃদয়ে যে ভাবের খেলা ঘটিতে থাকে, তাহা কেবল ধ্বনি-পরম্পরাতে (Melody) সম্ভবে না। তালই ইহার প্রধান ও পরম উপায়। ধ্বনি-পরম্পরায় কোন-কোনও ধ্বনির উপর জোর দেওয়াতে অনুভূতির প্রাখর্য্যে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, ও তৎসমকালে ধ্বনির মাত্রায় ও পর্দ্দায় যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহারই ফলে শ্রোতার হৃদয়ে বিভিন্ন ভাবের উন্মেষ, ক্রমবিকাশ, আতিশয্য, হ্রাস ও নিলয় হইয়া থাকে। এই প্রাখর্য্যের পরিবর্ত্তনে ভাব-পরিবর্ত্তন মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের একটা সিদ্ধান্ত। মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের মহারথিগণের পুস্তক পাঠ করিলেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিশেষে আমাদের দেশে অধুনা যে একটা মত উঠিয়াছে,—ভাষা-হীন (বা কথাহীন) সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ,—তাহাতে "বিশুদ্ধ আনন্দ" উপলব্ধি ঘটে, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিতে চাহি। বিশুদ্ধ আনন্দ শব্দে কেহ-কেহ একটা কিছু বিশেষ-ভাবহীন আনন্দ, এই অর্থ করিয়া থাকেন বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বেদান্ত-শাস্ত্র-বর্ণিত

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনোযদ্
বাচোহবাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ॥

পরব্রহ্মের পূর্ণ না হউক আংশিক উপলব্ধি লাভেই, এই প্রকার অজ্ঞাত, অবোধ্য আনন্দলাভ ঘটে বলিয়াই কিম্বদন্তী আছে। অনুভূতি-প্রাণ ইন্দ্রিয়-শক্তির অধীন সঙ্গীতে তাহা সম্ভবপর কি না, এ বিচার বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক, সে কথা ছাড়িয়া, আমার বোধ হয় ভাষা-হীন সঙ্গীত অর্থাৎ "তেলেনা" প্রভৃতিরই একমাত্র চর্চ্চা করিলে, ভারতীয় সঙ্গীত অপেক্ষাকৃত ভাবহীন হইয়া পড়িবে। অবশ্য শুদ্ধ ধ্বনি-পরম্পরা-সংযোগে যে মনঃ-কেন্দ্রে নাদের ঘাত-প্রতিঘাতে বিভিন্ন ভাবোন্মেষ ঘটে, সে কথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। কিন্তু সুরের সহিত ভাষা-যোজনা করিলেই যে সুরটীর ভাব-বিকাশের ব্যাঘাত ঘটে, এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। অবশ্য অনুপযুক্ত ভাষা যোজনা করিলে যে সুরের ভাবোৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস হয় ও ভারগ্রস্ত গো-যানের ন্যায় সুরটী কাঁদিয়া-কাঁদিয়া চলিতে থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ হিসাবে অবশ্য বলিতে পারা যায় যে, অনুপযুক্ত ভাষা-যোজনা অপেক্ষা কথাহীন, সুরময় গানই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা বলিয়া, কথা যে একেবারেই গান হইতে বর্জ্জনীয়, ইহা কখনই স্বীকার্য্য বা প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। র‍্যাফেলের ম্যাডোনা বর্ণ-বিকাশ-বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল সাদা ও কালো রেখার সমন্বয়ে অঙ্কিত হইলে, সে চিত্রের ভাববিকাশ বৰ্দ্ধিত হইত—এই কথায় যতদূর বাতুলতা প্রতিপন্ন হয়, উপযুক্ত ভাষা-যোজনা করিলেও যে সঙ্গীতের সুরের ভাবোন্মেষ-ক্ষমতার ক্ষতি হইবে, এই সিদ্ধান্তও তদ্রূপ অযৌক্তিকতার পরিচয় প্রদান করে। যেরূপ একই সুরে বাঁধা দুইটি তারের একটী বাজাইলে অপরটী বাজিয়া উঠে, এবং পরস্পরের শব্দোৎপাদিকা-শক্তির সাহায্য করে, সেরূপ উৎকৃষ্ট বেহালার শব্দ-গহ্বরে (Sound Box) তাহার তন্ত্র হইতে উৎপন্ন ধ্বনির সাহায্য করে,—সেইরূপ উপযুক্ত ভাষা-সংযোগে সুরের ভাবোন্মেষিকা শক্তি শতগুণে বৰ্দ্ধিতই হইবে, হ্রাস পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। একপ সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ, প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতাচার্য্যের দ্বারাই রচিত হওয়া সম্ভবপর। যাঁহারা সুর ও গান একসঙ্গেই বাঁধিয়া থাকেন, তাঁহারাই এই সমন্বয়-সাধনে সমর্থ হয়েন।

আমার সঙ্গীত-জ্ঞান অল্প, সেজন্য এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ দিতে পারিলাম না। কিন্তু আমার বোধ হয় স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "মহাসিন্ধুর ও-পার হতে" প্রভৃতি সঙ্গীত সুগায়কের নিকট শ্রবণ করিলে এ কথার সত্যতা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি হইবে।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে মহাপ্রলয়

[শ্রীআদীশ্বর ঘটক]

"ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং
পরোধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।"

মহিম্নস্তোত্র।

সাংখ্য এবং পাতঞ্জল মতানুসারে সমস্ত জগৎ সৎ অর্থাৎ জন্ম-নিধন-রহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনিত্য বস্তু হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না, এবং যাহা নিত্য, তাহারও বিনাশ হইতে পারে না। যাহাকে আমরা উৎপত্তি এবং বিনাশ বলিয়া থাকি, মহর্ষি কপিল এবং পতঞ্জলি তাহাকে আবির্ভাব এবং তিরোভাব মাত্র বলিয়াছেন। সেই উদাহরণানুসারে উৎপত্তি-বিনাশ-বিবর্জ্জিত বলিয়া পরমেশ্বরও নিত্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। ইহাই বর্ত্তমান কালে আস্তিক্যবাদ নামে কথিত হয়।

অপর পক্ষে সুগত মতানুসারে অর্থাৎ বৌদ্ধমতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ক্ষণিক, অর্থাৎ কিছুকালস্থায়ী। বেদান্ত যে আত্মাকে সৎ, অর্থাৎ সদাস্থায়ী বলেন, বৌদ্ধমতাবলম্বী জনগণ তাঁহাকেও বিনাশশীল বলেন। স্থায় মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন, আকাশাদি পঞ্চভূত নিত্য, কিন্তু ঘটাদি অর্থাৎ উক্ত মহাভূতগণের যাহা বিকৃতি, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি অথবা মনুষ্যাদির উৎপত্তি-বিনাশ আছে। কিন্তু আকাশাদি মহাভূত সকলের অথবা উহাদের অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরের উৎপত্তি অথবা বিনাশ নাই। এই প্রকারে সাংখ্য-পাতঞ্জল-স্থায়ে, আস্তিক্যবাদ, এবং সৌগত ও চার্ব্বাকাদি দর্শনে নাস্তিক্যবাদ কথিত হইয়াছে। পুরাণাদি শাস্ত্রে মহাপ্রলয় বর্ণিত হইয়াছে।

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে চারিসহস্র তিনশত বিংশতি কোটী বৎসর এই জগতের পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের এই সৌর-জগৎ সৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার লয় প্রাপ্ত হয়। প্রথমতঃ সূর্য্যের উৎপত্তি হয়, এবং সূর্য্য হইতেই সকল ভুবনের (গ্রহাদির ?) উৎপত্তি হইয়াছে। এ কথা আমাদের বেদশাস্ত্রের মর্ম্ম, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। সূর্য্য এবং অন্যান্য ভুবনের উৎপত্তি হইবার অনেক পরে পৃথিবী সূর্য্য হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়াছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, সপ্তদশ কোটী চতুঃষষ্টি সহস্র বৎসর পরে ভূ-সৃষ্টি হইয়াছে। শ্বেত-বরাহ কল্পাব্দের অতীতাব্দের সংখ্যা ১৯৭২,৯৪৯,০১২ অর্থাৎ উনবিংশ সহস্র সপ্তশত উনত্রিংশ লক্ষ উনপঞ্চাৎ সহস্র দ্বাদশ বর্ষ। উহার মধ্যে কতবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এবং কলি এই যুগ চারিটি ঘুরিয়া খণ্ড প্রলয় হইয়া গিয়াছে। সত্যযুগ-পরিমাণ ১৭২৮০০০ বৎসর। ত্রেতাযুগ ১২,৯৬০০০ বৎসর। দ্বাপরযুগ ৮,৬৪০০০ বৎসর। কলিযুগ পরিমাণ ৪,৩২০০০ বৎসর। চারিযুগের সংখ্যা একত্র ৪৩,২০,০০০ তেতাল্লিশ-কোটি বিংশতি সহস্র বৎসর।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারিযুগ বারম্বার ঘুরিয়া এক সহস্র আবর্ত্তন হইলে, একবার মহাপ্রলয় হয়। পূর্ব্বোক্ত তালিকা-নুসারে ৪৫৯ চারিশত উনষষ্টি বার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি যুগের আবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এখনও ঐ চারিযুগের ৫৪১ পঞ্চশত একচত্বারিংশৎবার আবর্ত্তন বাকী আছে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, শ্বেত-বরাহ-কল্পাব্দের এখনও অর্দ্ধেকও অতিবাহিত হয় নাই। হিন্দু জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে ঐ সকল অঙ্ক দ্বারা কি অসীম কাল বুঝায় না ? মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা কি ঐ পরিমাণ কালের কিছু ইয়ত্তা হয় ?

বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিকেরা একপ্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতেছেন যে, সূর্য্য হইতেই ক্রমশঃ গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছে। লাপ্লাস্ নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক প্রথমে য়ুরোপে এই কথা প্রকাশ করেন; পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরাও অনেকেই ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জগতে উহা "নিহারিকাবাদ" (Nebular theory) নামে বিখ্যাত।

মানুষের মনের স্বভাব এই যে, যে সকল বিষয় অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য, যাহা বুঝিবার জন্য অনেকটা যুক্তি এবং অনুমানের উপরই নির্ভর করিতে হয়, মানুষে একেবারে নাছোড় হইয়া তাহাই বুঝিবার জন্ত বিব্রত হয়। যাহা ভাবিতে-ভাবিতে মাথা ধরিয়া উঠে, যাহার কিছুই কুল-কিনারা পাইবার যো নাই, মানুষের মনের কেমন একটা স্বভাব যে, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য সে ব্যতিব্যস্ত হয়। এই বিশ্ব কি প্রকারে উৎপন্ন হইল শরীরের সহিত বহির্জগতের কি সম্বন্ধ, বিশ্বোৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে, কেবল ঈশ্বরেচ্ছায় ক্ষণমাত্রে হইয়াছে, অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ বহুকাল ব্যাপিয়া ক্রমশঃ মহাভূত সকল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইতেছে,—মানুষের মনে এই সকল প্রশ্ন চিরকাল আপনা হইতেই উদিত হইয়াছে।

মহাভারতীয় বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয়-সমস্যা পর্ব্বে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :—

"প্রলয়ে চাপি নির্বৃত্তে প্রবুদ্ধে চ পিতামহে।
ত্বমেক সৃজ্যমানানি ভূতানীহ প্রপশ্যসি॥
চতুর্ব্বিধানি বিপ্রর্ষে যথাবৎ পরমেষ্ঠিনা।
বায়ুভূতা দিশঃ কৃত্বা বিক্ষিপ্যাপস্ততস্ততঃ॥
* * * *
সদাদৈব রবির্ণাগ্নির্ণবায়ুশ্চ চন্দ্রমাঃ।
নৈবান্তরীক্ষং নৈর্বোব্বী শেষং ভবতি কিঞ্চনঃ॥"

বনপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায়।

"প্রলয় নিবৃত্ত হইলে, যৎকালে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া দিক্ সমুদায় বায়ুভূত করতঃ সেই-সেই উপায় দ্বারা জল বিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ ভূতের সৃষ্টি করেন, তখন সেই ভূতনির্ম্মাণ আপনিই (মার্কণ্ডেয়) স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সেই কালে, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমা, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, প্রভৃতি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।"

পুনশ্চ :—

"তস্মিন্ যুগসহস্রান্তে সম্প্রাপ্তে চায়ুষঃ ক্ষয়ে।
অনাবৃষ্টির্মহারাজ জায়তে বহুবার্ষিকী॥
ততস্তাল্পসারাণি সত্ত্বানি ক্ষুধিতানিবৈ।
প্রলয়ং যান্তি ভূয়িষ্ঠং পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে॥
ততো দিনকরৈর্দীপ্তৈঃ সপ্তভির্মনুজাধিপ।
পীয়তে সলিলং সর্ব্বং সমুদ্রেষু সরিৎসু চ॥
যচ্চ কাষ্ঠং তৃণঞ্চাপি শুষ্কং চার্দ্রঞ্চভারত।
সর্ব্বং তস্তস্মসাদ্ভূতং দৃশ্যতে ভরতর্ষভ॥
ততঃ সম্বর্ত্তকো বহ্নির্বায়ুনা সহ ভারত।
লোকমাবিশতে পূর্ব্বমাদিত্যৈরুপ শোষিতম্॥
ততঃ স পৃথিবীং ভিত্বা প্রবিশ্য চ রসাতলম্।
দেব দানব যক্ষাণাং ভয়ং জনয়তে মহৎ॥
ততো যোজন বিংশানাং সহস্রানি শতানি চ।
নির্দহত্যাশিবো বায়ুঃ সচ সম্বর্ত্তকোঽনলঃ॥
স দেবাসুর গন্ধর্ব্বং স যক্ষোরগ রাক্ষসম্।
ততো দহতি দীপ্তঃ স সর্ব্বমেব জগদ্বিভুঃ॥"

চারিযুগের এক সহস্র আবর্ত্তন হইলে, অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের সময় সমুদয় প্রাণিগণের আয়ুক্ষয় হইলে, বহুবার্ষিক অনাবৃষ্টি হইবে। তন্নিবন্ধন অনেকানেক ক্ষুধিত অল্পসার প্রাণী শমন-সদনে গমন করিবে। তৎপরে এককালে সপ্তসূর্য্য সমুদিত হইয়া, সমুদ্র ও নদী সকলের জল শোষণ করিবে। শুষ্কই হউক, বা আর্দ্রই হউক, যে কিছু তৃণকাষ্ঠ পৃথিবীতে থাকিবে, তৎসমুদায় ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অনন্তর সংবর্ত্তক নামে বহ্নি বায়ু-সহায় হইয়া, আদি-ত্যাপশোষিত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিবে, এবং পৃথিবী ভেদ করতঃ পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক দেব, দানব ও যক্ষগণের ভয়োৎপাদন করিবে। বিংশলক্ষ যোজন বিস্তার হইয়া, সেই সম্বর্ত্তক অগ্নি এবং অমঙ্গলজনক বায়ু দেব, অসুর, গন্ধ, য়ক্ষ, উরগ এবং রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ সমুদয় জগৎ এককালে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

মহাভারত গ্রন্থে সৃষ্টি এবং মহাপ্রলয় যে ভাবে বর্ণিত আছে, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম। বহুকাল পূর্ব্বে ঐ সকল কথা রচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

প্রথমতঃ ঐ সকল পুরাতন কথার উল্লেখ করিয়া আমরা এইটুকু বলিতে চাই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের একদিন নাশ হইবে, একথা আমাদের ঋষিগণ সকলেই বলিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, একেবারেই নাশ হইবে, কেহ বলিয়াছেন, না, একেবারে নাশ নয়, তিরোভাব হইবে। কিন্তু উভয় পক্ষই বলিয়াছেন, এখন যেমন পৃথিবীতে মনুষ্যাদির সমাবেশ দেখা যাইতেছে, এ প্রকারটি থাকিবে না। প্রলয় কালে পৃথিবী একেবারে জীবশূন্য হইবে। ব্রহ্মাণ্ডের যখন নাশ হইবে, সেই সময়ে সূর্য্যের তেজঃ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। "সপ্তভির্দ্দিনকরৈর্দীপ্তৈঃ"—সপ্ত সূর্য্য প্রদীপ্ত হইবে, এই প্রকার অনুবাদ আমরা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনূদিত বাঙ্গলা মহাভারতে পাইয়াছি। কিন্তু নীলকণ্ঠ-কৃত টীকায় "দিনকরৈঃ-দ্বাদশাদিত্যৈঃ সপ্তভির্দীপ্তৈঃ সপ্তজ্বালাভিঃ" এই প্রকার পাইয়াছি। পূর্ব্বোক্ত মতে সপ্ত সূর্য্যের উদয়, এবং শেষোক্ত মতে সূর্য্যের তেজঃ দ্বাদশ মাসেই সপ্তগুণ বৃদ্ধি, এই প্রকার অর্থ নিষ্পন্ন হয়। বিশেষ কারণ বশতঃ আমরা নীলকণ্ঠ-কৃত ব্যাখ্যা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। সপ্তসূর্য্যের একত্র উদয় প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাহা হইতেই পারে না।

আধুনিক কালে আমরা বেশ কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতে পারিতেছি যে, আকাশমণ্ডলে যত তারা দেখা যায়, সে সকলি সূর্য্য। আমাদের এই সূর্য্যও একটি তারা। যদিও আমরা আকাশমণ্ডলে তারকাগুলি দেখিয়া মনে করিতে পারি যে, উহারা খুব সন্নিকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহাদের দূরত্ব অসীম। আমাদের সবিতৃদেব আকাশ-পথে পরিবার-সমন্বিত * হইয়া প্রচণ্ড বেগে হারকিউলিস্ নামক তারার দিকে ছুটিতেছেন, কিন্তু উক্ত নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী হইতে এখনো কোটী-কোটী যুগ অতিবাহিত হইবে। মনে করা যাউক, কোটী-কোটী যুগ পরে না হয় আমাদের এই সূর্য্য হারকিউলিস্ নামক ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থিত একটি সূর্য্যের সন্নিহিত হইবে। এই প্রকারে না হয় দুইটি সূর্য্য কোটী-কোটী যুগাবসানে একত্র হইতে পারে, এ কথা স্বীকার করা গেল; কিন্তু, ঠিক সেই সময়ে আবার পাঁচটা সূর্য্য আসিবে কোথা হইতে? আমাদের সূর্য্য হইতে হারকিউলিস্ নামক আকাশমণ্ডলের একটি সূর্য্যের যত দূরত্ব, হারকিউলিস্ ব্রহ্মাণ্ডের একটি সূর্য্য হইতে অপর একটি সূর্য্যেরও সেইপ্রকার বা ততোধিক দূরত্ব রহিয়াছে। সুতরাং সপ্তসূর্য্য একত্র হইয়া উদিত হইবে, এ কথা একেবারেই পরিহার্য্য।

সূর্য্যের তেজোরাশির সপ্তগুণ বৃদ্ধি হইবে,—এ কথা সম্ভব কি না, এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য। আমরা এই কলিকালে সূর্য্যদেবের যে প্রকার তেজঃ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, বহুকাল ধরিয়া, অন্ততঃ কোটী-কোটী বৎসর কাল ব্যাপিয়া উনি যে ঐ একই প্রকার উত্তাপ বিকীর্ণ করিতেছেন, তাহার প্রমাণ আছে। বহু পুরাতন জীবদেহ সকলের প্রস্তরভাবাপন্ন অস্থিসমূহ দৃষ্টে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, কোটী বৎসর পূর্ব্বেও সূর্য্য এখনকার মতই উত্তাপ দিয়াছেন। অকস্মাৎ কোনও সময়ে যে অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড পুড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহারও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। যদি কেবল জীব-কঙ্কাল বিচার দ্বারা এ সকল কথার নির্ণয় করা আবশ্যক বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলেও বৃষ্টি ও তুষার পাত, বায়ু ও তুফান, রাসায়নিক ক্রিয়া, বৃক্ষাদির উৎপত্তি ও ধ্বংস, এবং অন্যান্য কারণে পৃথিবীর যে প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা বেশ সহজেই তাহার কালানুমান করিতে পারি। নদী সকলের প্রবাহ হেতু সমুদ্রমধ্যে পলি পড়িয়া ভরাট হইতেছে; কয়েক শত বৎসর হইতে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা তাহা মাপিয়া দেখিতেছেন; তাঁহারা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, বহু কোটী বৎসর হইতে ঐ ক্রিয়া এক রকমই হইতেছে। সমুদ্রের মধ্যে ঝিনুকের খোলা কতকাল থাকিয়া পরে পলিমাটী মধ্যে প্রোথিত হইয়াছে, ঐ প্রকার ঝিনুকের খোলায় প্রবালকীট সকল স্তুপ্ত হইয়াছে। এই সকল ব্যাপার হইতে ইহা নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, সমুদ্রমধ্যে বহু পূর্ব্বকালেও যে প্রকার পলি পড়িয়াছে, এখনও সেই প্রকার ঘটিতেছে। এই জন্য এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, বৃষ্টি বর্ষা বহু পূর্ব্বকালে যেমন হইত, এখনও সেই প্রকার হইতেছে। সূর্য্যের উত্তাপের সহিত বৃষ্টি বর্ষার নিকট সম্বন্ধ; অতএব, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই সূর্য্যদেব একই প্রকার জ্যোতিঃ দিগ্দিগন্তরে ছড়াইয়া জগতের পরিপালন করিতেছেন, এই সিদ্ধান্তেই ঘুরিয়া-ফিরিয়া উপনীত হইতে হয়। অতএব পার্থিব কোনও প্রমাণ দ্বারা আমরা সূর্য্যের আকস্মিক তেজোবৃদ্ধির কোনও প্রমাণ পাই না।

আমাদের এই সূর্য্যের সমান গুণবিশিষ্ট কোটী-কোটী সূর্য্য আকাশ-মণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থিত অন্যান্য সূর্য্য কোনও সময়ে ঐ প্রকার তেজোবৃদ্ধির পরিচয় দিয়াছে কি না; এবং ঐ প্রকার হইলে তত্তৎ ব্রহ্মাণ্ডে কি ভয়াবহ ব্যাপার ঘটিতে পারে, তাহাও আমাদের বিবেচ্য।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে সুসভ্য মনুষ্যেরা আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া

* গ্রহ, উপগ্রহ (চন্দ্রাদি), এবং ধূমকেতু ইত্যাদি।

আসিতেছেন। এসিরিয়া-ব্যাবিলন, ইজিপ্ট, ভারত, চীন—এ সকল পুরাতন সভ্য দেশের লোকেরা জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে আমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি মাত্র; পরন্তু বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান-শাস্ত্র অনেক নূতন বিষয়ের আবিষ্কার দ্বারা কৃতিমান্ হইয়াছে।

আকাশ-মণ্ডলের স্থানে-স্থানে অকস্মাৎ নূতন তারার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যাহাকে সাধারণ লোক নক্ষত্রপাত, অথবা শিক্ষিত জনে উল্কা বলিয়া থাকেন, তাহাকে নূতন তারা বলে না। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ প্রকার একটি নূতন তারা কাশ্যপীয় (Cassiopia) নামক নক্ষত্র-মধ্যে দেখা গিয়াছিল। ডেনমার্ক-নিবাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ টাইকো ব্রাহী (Tycho Brahe) উহার বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন। স্যার উইলিয়ম্ হার্সেল্ তাঁহার গ্রন্থে এই নূতন তারার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ১৫৭২ অব্দের ১১ই নভেম্বর সন্ধ্যার পরে টাইকো ব্রাহী আপন কর্ম্মস্থল হইতে গৃহে আসিতেছিলেন,—পথিমধ্যে তিনি দেখিলেন যে, কতকগুলি গ্রাম্য লোকে বিস্ময়াপন্ন হইয়া আকাশস্থ একটি তারা দেখিতেছে। টাইকো ব্রাহী তাহা দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাহা একটি নূতন তারা। তিনি এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আকাশের ঐ স্থানটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তখন তিনি উহা দেখিতে পান নাই। তাঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ তারা এক বৎসর চারিমাস কাল একই প্রকার উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট ছিল। প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্রসকল যে প্রকার নানাবর্ণের আলোক প্রকাশ করে, এ নূতন তারাটিতেও সেই প্রকার দেখা যাইত, এবং লুব্ধক নামক (The Dog Star) উজ্জ্বল তারার মতই আলোক তাহাতে দেখা গিয়াছিল। লুব্ধক অপেক্ষাও তাহাকে বড় দেখাইত। শুক্র গ্রহ (শুকতারা) আকাশে যে প্রকার উজ্জ্বল দেখায়, নূতন তারাটি ষোল মাস কাল সেইরূপ খুবই উজ্জ্বল থাকে, তন্মধ্যে তিন সপ্তাহ উহাকে দিনের বেলায়ও দেখা গিয়াছে। উহা যে ক্রমশঃ দীপ্তিমান্ হইয়াছিল, এমত নহে; কথিত সময়ে উহা যেন মুহূর্ত্তমাত্রে প্রস্তুত হইয়াছিল। পরে উহার প্রভা ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, এবং ১৫৭৪ অব্দের মার্চ্চ মাসে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। উহার প্রভা ক্ষীণ হইবার সময় বর্ণেরও পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। প্রথমে উহার বর্ণ বিশুদ্ধ শ্বেত ছিল; প্রভার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে উহার বর্ণ পীতাভ, পরে মঙ্গল গ্রহের ন্যায় অরেঞ্জ বর্ণ, এবং শেষে উহা শনি গ্রহের ন্যায় ঈষৎ নীলাভ বর্ণের হইয়া নিব্বাপিত হয়। টাইকো ব্রাহী যে সময়ে এই কাশ্যপীয় নক্ষত্রপুঞ্জের নূতন তারাটির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন দূরবীক্ষণ অথবা বর্ণবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই।

টাইকো ব্রাহী উপরি উক্ত যে তারাটির কথা লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরও অনেকগুলি নূতন তারার বৃত্তান্ত বৈজ্ঞানিক মহোদয়গণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশে হিপ্পারকস্ (Hipparchus) নামে এক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ আস্থ্রিক দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বহুকাল ইউফ্রেটিস্ নদীতীরে বাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, গ্রীস দেশবাসীদিগকে তিনি প্রথমে অয়নাংশ * বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই জ্যোতির্ব্বিদ্ একটি নূতন তারার কথা লিখিয়াছেন। ঐ নূতন তারাটি বৃশ্চিক-রাশিমধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। উহা এত উজ্জ্বল হইয়াছিল যে, দিনের বেলাও উহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। এই নূতন তারার প্রকাশ হওয়াতে, হিপ্পারকস্ আকাশস্থ সমস্ত তারার একটি মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন তারা তিমি নামক নক্ষত্রপুঞ্জে দেখা গিয়াছিল। ১২৬৪ এবং ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্যপীয় এবং তিমি নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে নূতন তারা দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রিসিয়স্ নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ তিমি নামক নক্ষত্রে এক নূতন তারা দেখেন, তাহাও কিছুকাল পরে অদৃশ্য হয়। ১৬৩৭ অব্দে হোসিলাইডিস্ পুনর্ব্বার ঐ তারাটির আবির্ভাব দেখেন। কিছুকাল ঐ তারাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ৩৩১ দিন ৮ ঘণ্টা অন্তর ঐ তারাটি এক-একবার জ্বলিয়া উঠে; এবং প্রজ্বলিত হইবার পর উহা ক্রমশঃ নিভিয়া যায়। অদ্যাবধি ঐ তারাটির প্রতি জ্যোতির্ব্বিদগণ দৃষ্টি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। জ্যোতিষীগণ ঐ তারাটির নাম রাখিয়াছেন 'মিরা' (Mira)।

১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ কেপলার একটি নূতন তারার কথা লিখিয়াছেন। উহা Ophiuchus নামক নক্ষত্রপুঞ্জে প্রকাশিত হইয়াছিল। কেপলার লিখিয়াছেন যে, ঐ তারাটিকে ধূমকেতু বলিতে পারা যায় না, কারণ উহার পুচ্ছাদি দেখা যায় নাই। বিশেষতঃ উহা যতদিন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, ততদিন ঠিক অচল নক্ষত্রের মতই দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৬০৬ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত উহা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতেও নানাবিধ বর্ণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজহংস (Cygnus) নামক তারা সমষ্টি মধ্যে এক নূতন তারার আবির্ভাব হয়। ১৮৪৮ সালে Ophiuchus নক্ষত্রে একটি নূতন তারা দেখা যায়। ইহার পরেও মধ্যে-মধ্যে আকাশমণ্ডলের স্থানে-স্থানে ঐ প্রকার নূতন তারার আবির্ভাব এবং তিরোভাব হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ ঐ প্রকার তারা দেখিতে পাইলে, তাহাকে 'নোভা' (Nova) অর্থাৎ নূতন আখ্যা দিয়া থাকেন। এই প্রবন্ধে আধুনিক সকল তারার বিবরণ লিখিবার স্থানাভাব। এক্ষণে দেখা যাউক, মধ্যে-মধ্যে ঐ প্রকার নূতন তারার আবির্ভাব দেখিয়া আমরা কি বুঝিতে পারি?

আকাশের প্রায় সকল তারাই এক-একটী সূর্য্য, এ কথা আমরা বলিয়াছি। আমাদের এই তেজোময় সূর্য্য অপেক্ষা বৃহত্তর এবং শত-গুণ অথবা সহস্রগুণ তেজঃসম্পন্ন অনেক সূর্য্য আমরা দেখিতে

* যে সময়ে দিবারাত্রিমান একপ্রকার হয়, তাহাকে 'বিষুবন' কহে। বর্ত্তমান কালে উহা ৯ই চৈত্র এবং ৯ই আশ্বিন হইতেছে। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় উহা ১লা বৈশাখ এবং ১লা কার্ত্তিক হইত। এক্ষণে অয়নাংশ প্রায় ২২ অংশ হইয়াছে।

পাইতেছি ; বহুদূরে এমন অনেক (কোটী-কোটী) সূর্য্য আছে, যাহা আমরা বিজ্ঞানের বলতঃ দেখিতে পাই না। যেমন আমাদের এই সূর্য্যকে পরিভ্রমণ করিতে-করিতে নেপ্‌চুন, হার্শেল, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, পৃথিবী, শুক্র, এবং বুধ গ্রহ রহিয়াছে,—সেইরূপ বহুদূরবর্ত্তী ঐ সকল তারকা অথবা সূর্য্যের ও তদনুরূপ গ্রহ এবং উপগ্রহাদির অস্তিত্ব আছে। আধুনিক কালে তাহার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। এক-একটি তারা যে এক-একটি সৌর-জগতের কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্য, তাহাতে একণে আর কোন সন্দেহ নাই।

কোনও সূর্য্য যদ্যপি অকস্মাৎ কোনও কারণবশতঃ প্রচণ্ড তেজঃ-সম্পন্ন হইয়া উঠে, অর্থাৎ কোনও সূর্য্য যদ্যপি শতগুণ প্রভাসম্পন্ন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ বিস্তার করিতে থাকে, তবেই বহুদূর পর্য্যন্ত তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বহুদূরস্থ যে সৌরজগৎ হইতে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত না, উহার ঐ প্রকার উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে, তৎদূরবর্ত্তী ব্রহ্মাণ্ড হইতে তাহা নূতন তারার মতই দেখা যাইবে। কিন্তু যে সূর্য্যটি ঐ প্রকারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, তাহার আকর্ষণে স্থিত গ্রহ এবং উপগ্রহ, অথবা সেই সকল গ্রহ অথবা উপগ্রহে যে সকল প্রাণী থাকিবে, সেই হতভাগ্যদের কি দশা হইবে ?

এই প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা মহাভারতোক্ত মহাপ্রলয় কাণ্ডের বর্ণনা করিয়াছি। যদি আমাদের এই সূর্য্য কোনও সময়ে ঐ প্রকার শতগুণ বা ততোধিক তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠেন, তাহা হইলে ক্ষণকাল-মধ্যে সমস্ত গ্রহ অগ্নিময় হইয়া যাইবে। সকল ভুবনের জীব-নিবহ মুহূর্ত্তমধ্যে পুড়িয়া মরিবে। স্বর্ণ প্রভৃতি ধাতু সকল দ্রবীভূত অথবা বাষ্পাকার ধারণ করিবে। সমুদ্রের জল পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশে অদৃশ্য বাষ্পাকারে অবস্থিত হইবে। সূর্য্যের ঐ প্রকার উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে, সমস্ত পৃথিবীর অঙ্গারবৎ লোহিত বর্ণ হইবে। সুতরাং মহাভারতকার ঋষি দিব্যদৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বোধ হয় পৌরাণিক সময়ে ঐ প্রকার নূতন তারার আবির্ভাব দেখিয়া কুশাগ্রবুদ্ধি মুনিগণ বুঝিয়াছিলেন যে, কোনও সুদূর ভবিষ্যৎকালে আমাদের এই সবিতৃদেবও সংহার-মূর্ত্তি ধরিতে পারেন ; এবং সেই চিন্তাবলেই জগতের মহাপ্রলয়কাণ্ড তাঁহার এমনি পরিস্ফুট করিয়া লিখিতে পারিয়াছেন।

এক্ষণে এ সম্বন্ধে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। সূর্য্যদেব বহুকাল ধরিয়া দিদিগন্তরে তাঁহার এই বিপুল তেজোরাশি বিকীর্ণ করিতেছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার এই বিপুল তেজোরাশি ক্রমশঃ কমিয়া যাইবারই কথা। এই পৃথিবী একদিন তেজোময়ী ছিলেন ; এক্ষণে ইহা শীতল হইয়া জীবনিবহের বাসোপযোগী হইয়াছে—এ কথা বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য বহুকাল ধরিয়া উত্তাপ বিকীর্ণ করিয়াও উত্তাপ হারাইতেছে না, ইহা নিতান্তই প্রাকৃতিক নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার। এই কারণে বোধ হয়, সূর্য্যের এই তেজোবিষয়ে নিশ্চয়ই কোনও গভীর রহস্য আছে। এই গভীর রহস্য ভেদ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল যুক্তি এবং অনুমানের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা এইবার বলিব।

লাপ্‌লাস্‌ বলিয়াছেন, সূর্য্য নিশ্চয়ই আকৃতিতে ক্রমশঃ ছোট হইতেছে, উহার মধ্যস্থিত প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলেই সূর্য্যের যতই সঙ্কুচিত হইতেছে, উহার উত্তাপ ততই নির্গত হইতেছে। যতকাল সূর্য্য উত্তাপ দিয়াছেন, ততকালই এই ভাবেই কাটিয়াছে। আর যত-কাল সূর্য্য এইভাবে আপন অঙ্গ সঙ্কুচিত করিতে পারিবে, ততকাল নিঃসন্দেহে উহা হইতে এই প্রকার আলোক এবং তেজঃ নির্গত হইতে থাকিবে।

সূর্য্য এই প্রকার অগ্নিময় এবং তেজোময় রহিয়াছে, তাহার আরও একটা কারণ অনুমিত হয়। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ বলেন, সূর্য্য-মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন উল্কাপিণ্ড সকল পতিত হইতেছে, এই কারণে উহার অগ্নি কমিতেছে না। আধুনিক কালের বড়-বড় বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও বলেন যে, সূর্য্যমণ্ডলে উপরোক্ত দুই কারণই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অর্থাৎ, উহা মাধ্যাকর্ষণ-বলে ছোটও হইতেছে, এবং উহার উপরে উল্কাপাত হইয়াও উহার তেজঃ বৃদ্ধি হইতেছে। সূর্য্যের উত্তাপ সম্বন্ধে এই তিনটি theory লইয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করিয়া অবশেষে মাধ্যাকর্ষণ মতটি প্রবল রাখিয়াছেন। সূর্য্য বহুকাল ধরিয়া সঙ্কুচিত হইতেছেন, এবং সেই জন্য উহা হইতে তেজঃ নির্গত হইতেছে। নেবুলার থিওরি মতে সূর্য্যের আকৃতি অনেক দূরে বিস্তৃত ছিল। নেপ্‌চুন গ্রহের যে কক্ষা বর্ত্তমান কালে স্থির করা হইয়াছে, সূর্য্যের আকৃতি উহার উৎপত্তিকালে নিশ্চয়ই সেই পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ক্রমশঃ ছোট হইতে গিয়াই গ্রহসকলের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব সূর্য্য যে ক্রমশঃ আকৃতিতে ছোট হইতেছে, এ কথায় আপত্তি করিবার কোনও হেতু নাই।

মাধ্যাকর্ষণ মতটি যদি ধরা হয়, তাহাতে একটা আপত্তি উপস্থিত হয়। গণিতবিৎ পণ্ডিতেরা অঙ্কশাস্ত্র মতে স্থির করিয়াছেন যে, নেপ্‌-চুন গ্রহের কক্ষা হইতে ক্রমশঃ গ্রহপিণ্ড সকল প্রসব করিতে-করিতে সূর্য্যের বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইতে বিংশ কোটী বৎসর লাগিয়াছে ; কিন্তু ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা স্থির করিতে হয় যে, আমাদের এই পৃথিবী এই ভাবে ৯০ কোটী বৎসর নিশ্চয়ই রহিয়াছে। অতএব বেশ বুঝা যায়, কেবল যে মাধ্যাকর্ষণ-বলে সঙ্কুচিত হইয়াই সূর্য্য উত্তাপ বিতরণ করিতেছে, তাহা নহে। ভূতত্ত্ববাদী বৈজ্ঞানিকদিগের পার্থিব বয়ঃক্রম নিরূপণে যদি ভ্রম হইয়া থাকে, এজন্য আমরা উপস্থিত না হয় ধরিয়াই লইলাম যে, ২০ কোটী বৎসর ধরিয়া সূর্য্যের অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে আরও একটা কথা ভাবিতে হয়। সূর্য্য ক্রমশঃ আকৃতিতে ছোট হইতেছে, এবং উত্তাপ বিতরণ করিতেছে—কিন্তু তাহা হইলে, বহুকাল পরে—কতকাল তাহা বলা যায় না,—এই তেজোময় ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণস্বরূপ সূর্য্যপিণ্ড অবশ্যই নির্ব্বাপিত হইবে। সূর্য্য নির্ব্বাপিত হইবার বহুপূর্ব্বে পৃথিবী শীতল হইয়া প্রাণিবিহীন হইবে। বৃহস্পতি, শনি, হার্শেল, নেপচুন প্রভৃতি বড় আকারের গ্রহপিণ্ড-

গুলি শীতল হইবার অনেক কোটি বৎসর পরে সূর্য্যের নিভিয়া যাইবার কথা। মনুষ্য জাতির সে বিষয়ে উদ্বিগ্ন হইবার কোনও কারণ নাই। আমরা (অর্থাৎ মনুষ্যজাতি) তখন কখনই থাকিব না।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যদিও আমরা সূর্য্যকে নির্ব্বাপিত হইতে দেখিব না সত্য, তথাপি আমাদের অনুসন্ধান করা হউক, আকাশ-মণ্ডলের অসংখ্য তারকার (যাহা সূর্য্য ব্যতিরেকে আর কিছু নহে) মধ্যে এমন সূর্য্যও কতকগুলি থাকিতে পারে, যেগুলি কালপ্রভাবে নিভিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদগণ আকাশমণ্ডলের স্থানে-স্থানে নানা বর্ণের তারকা দেখিতে পাইতেছেন। বর্ণবিচার দ্বারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ঐ সকল সূর্য্যের অবস্থা অনুমান করিতে পারিতেছেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে উহারা লোহিত, পীত, হরিৎ, নীল, অথবা বেগুনিয়া বর্ণের হইতে পারে। দীপনির্ব্বাণ কালে নীল এবং বেগুনিয়া বর্ণের আলোক নির্গত হয়। এই জন্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, যে সকল সূর্য্য নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তাহারা হরিৎ, নীল, অথবা ভায়োলেট্ বর্ণের আলোক প্রদান করিতেছে। আকাশ-মণ্ডলের দক্ষিণ ভাগে নানাবর্ণের সূর্য্য সকল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। স্যার জন্ হার্শেল তাহা দেখিয়া বলিয়াছেন, ঠিক যেন কালো বর্ণের মিণার কার্য্যে পদ্মরাগ, মরকত, অথবা নীলমণি সকল ঝিক্‌মিক্ করিতেছে!

তবেই, ইহা একপ্রকার নিশ্চিত দেখা যাইতেছে যে, বহুকাল পরে সূর্য্য নির্ব্বাপিত হইবে—এ কথা সকল পক্ষই এক্ষণে স্বীকার করিতেছেন।

সূর্য্য নিভিয়া যায় যাউক, তাহাতে উপস্থিত আমাদের কিছু যায়-আসে না; কারণ আমরা তখন থাকিব না। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাউক, সূর্য্যের এই তেজোরাশির উৎপত্তি কি প্রকারে হইল?

ক্রল নামক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে, যখন এ কথা স্বীকার করিবে যে, সূর্য্য একদিন নির্ব্বাপিত হইবে, সেই সঙ্গে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আকাশমণ্ডলে বর্ত্তমান কালে ঐ প্রকার নির্ব্বাপিত সূর্য্য অথবা সৌরজগৎও অনেক বিচরণ করিতেছে। তাহাদের জ্যোতিঃ নাই, এই জন্য সেই সকল নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত সৌরব্রহ্মাণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় না। যুক্তি এবং অনুমান ঐ প্রকার নির্ব্বাপিত অদৃশ্য জ্যোতিঃহীন ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করণ পক্ষে অনুকূল। ঐ প্রকার নির্ব্বাপিত সৌর-জগৎ দুইটা প্রকাণ্ড বেগে আকাশ পথে ধাবিত হইবার সময় যদি ধাক্কা লাগে, তাহা হইলে, ঐ প্রকার দুই ব্রহ্মাণ্ডের ভয়ঙ্কর গতি প্রতিহত হইয়া দুইটি ব্রহ্মাণ্ড একত্র হইয়া নূতন এক প্রজ্বলিত সূর্য্য-পিণ্ডের উৎপত্তি হইবে। ইহাই সূর্য্যের জন্ম। এই প্রকারে দুইটা ব্রহ্মাণ্ডের সংঘর্ষণ হইয়া সূর্য্য আপন তেজঃ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে সংঘর্ষ হইলে, বহু কাল পর্য্যন্ত ঐ উৎপন্ন তেজোরাশি দুইটা ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থসমষ্টি বাষ্পাকারে রাখিয়া দিবে। এই অবস্থাকেই নীহারিকা (Nebula) বলে। এই প্রকার নীহারিকা আকাশমণ্ডলের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

সূর্য্যের তেজঃ কি করিয়া উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা এক প্রকার যেন অনুমান করা হইল, কিন্তু এ বিষয়টিও আপত্তি-বিবর্জ্জিত নহে। আমাদের সূর্য্যের মত বিশাল আকারের দুইটা জগৎ এক সেকেণ্ডে ৫০০ মাইল ছুটিতে-ছুটিতে যদি ধাক্কা লাগে, তাহাতে যে প্রচণ্ড অগ্নির উৎপত্তি হইবে, তাহা ৫০ কোটী বৎসরকাল থাকিতে পারে। ক্রল্ নামক বৈজ্ঞানিক এ কথা প্রকাশ করিবার পরে প্রায় দ্বাদশ বৎসরকাল এই সকল কথা লইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতদিগের মধ্যে একটা তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে।

বৈজ্ঞানিকদিগের নিয়ম এই যে, কেহ কোনও নূতন কথা বলিলে, তাহা শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত বিশ্বাস না করিয়া, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হয়। যতক্ষণ তাহার বিশেষ প্রমাণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ উহা থিওরি মাত্র। কিন্তু অনুসন্ধানফলে যদি সম্যক্ প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন সেই থিওরি বিশ্বাসযোগ্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ক্রল্ সাহেবের থিওরির বিরুদ্ধেও অনেক প্রকার আপত্তি হইয়াছিল। আমরা তিনটি আপত্তির উল্লেখ করিলাম ;—

(১) দুইটা অন্ধকার সৌরজগতে ধাক্কা লাগিয়া সূর্য্যোৎপত্তি হইবে, কিন্তু এই প্রকার গতি দুইটা সূর্য্যের হইল কি প্রকারে?

(২) ঐ প্রকারে নির্ব্বাপিত দুইটা সূর্য্য আসিল কোথা হইতে?

(৩) আমরা যদি মনে করিতে পারি যে, দুইটা প্রকাণ্ড আকারের নির্ব্বাপিত সূর্য্য অথবা সৌরজগতে ধাক্কা লাগিয়া সূর্য্যোৎপত্তি হইয়াছে, আমরা ইহাও মনে করিতে পারি যে, সূর্য্য যে সময়ে বাষ্পাকার ছিল, সেই সময়ে উহাতে অগ্নিও পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। সুতরাং একটা ধাক্কাধুক্কীর অনুমান করিয়া থিওরি ও-প্রকার জটিল করিবার প্রয়োজন কি?

এইপ্রকার আপত্তি এবং প্রশ্ন অনেক হইয়াছিল, এবং তাহা লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা হইতে লাগিল। কেহ-কেহ থিওরির অনুকূলেও মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, লক্ষ-লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড আকাশমণ্ডলের চারিদিকে ভয়ঙ্কর গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সন্দেহ নাই। অপর পক্ষে, একটা গরম জিনিস চিরকাল গরম থাকিতে পারে না; যতকালেই হউক, অবশ্য একদিন উহা জুড়াইয়া শীতল হইবেই। লক্ষ-লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অন্ততঃ দুই-এক সহস্র জগৎ নির্ব্বাপিত এবং শীতল হইয়া ঘুরিতেছে; এ কথায় আপত্তি হইতে পারে না। এই প্রকার যুক্তিবলে ইহাও সম্ভব যে, দুইটা নির্ব্বাপিত ব্রহ্মাণ্ড পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে, উহাদের সেই ভয়ঙ্কর গতির বলে ব্রহ্মাণ্ড দুইটী যে নূতন দুইটা সূর্য্যের ন্যায় অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

আকাশমণ্ডলে দীপ্তিমান্ নক্ষত্রসকল যে ভাবে সজ্জিত দেখা যায়, ঐ প্রকার কোটী-কোটী ব্রহ্মাণ্ড নির্ব্বাপিত হইয়া ঘুরিতেছে, এ কথা স্বীকার করিবার বাধা কি? কিন্তু ঐ প্রকারে দুই ব্রহ্মাণ্ডের সংঘর্ষ হইলে প্রতিবারই যে দুইটা নির্ব্বাপিত ব্রহ্মাণ্ডেই উহা সংঘটিত হইবে, তাহা বলা যায় না; ও-প্রকার সংঘর্ষে নিম্নলিখিত ভিন্ন অবস্থা

হইতে পারে। (১) কোনও একটা নির্ব্বাপিত তারকার সহিত অপর একটা নির্ব্বাপিত তারকার সংঘর্ষ হইতে পারে। (২) কোনও সময় দুইটা দীপ্তিমান সূর্য্যেও ধাক্কা লাগিতে পারে। (৩) একটা অন্ধকারময় শীতল ব্রহ্মাণ্ডের সহিত অপর একটা দীপ্তিমান্ তারকার সংঘর্ষ হইতে পারে। দুইটা শীতল নির্ব্বাপিত জগতের সংঘর্ষে নূতন এক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু দুইটা দীপ্তিমান্ সূর্য্যে প্রতিঘাত হইলে তাহাকে যুগপৎ মহাপ্রলয় কাণ্ড হইয়া থাকে। তৃতীয় অবস্থা ঘটিলেও তাহাতেও মহাপ্রলয় কাণ্ড হইবে।

কোথায় কোন্ সময়ে ঐপ্রকার মহাপ্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইয়া সূর্য্য জ্বলিয়া উঠিবে, তাহার কিছু স্থিরতা নাই; কিন্তু একবার মনে করা যাউক, আমাদের এই দীপ্তিমান্ সূর্য্যের উপর একটা নির্ব্বাপিত অথবা একটা দীপ্তিমান্ সূর্য্য অথবা গ্রহপিণ্ড আসিয়া পড়িল। এ প্রকার হইলে, তৎক্ষণাৎ সূর্য্যের উপস্থিত উত্তাপ হয় ত লক্ষ গুণ বৃদ্ধি পাইবে, এবং সূর্য্যের আনুসঙ্গী গ্রহ এবং উপগ্রহসকলও সূর্য্যের মতই উত্তপ্ত এবং সম্ভবতঃ বাষ্পাকার হইয়া যাইবে। মনুষ্য অথবা জীবজন্তু তখন কোথায় থাকিবে?

আকাশমণ্ডলে এইপ্রকার ভীষণ কাণ্ড কখনও ঘটিয়াছে কি না, অথবা ঐপ্রকার নির্ব্বাপিত অথবা দীপ্তিমান্ অথবা দুইপ্রকার তারকার সংঘর্ষ হইয়া নূতন সূর্য্য অথবা তারকার উৎপত্তি হইয়াছে কি না, অবশেষে ইহারই অনুসন্ধান হইতে লাগিল।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সূর্য্যোৎপত্তি লইয়া প্রায় দ্বাদশ বৎসরকাল উপরোক্তভাবে বাদবিতণ্ডা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইটি নূতন নক্ষত্র অথবা সূর্য্য আকাশমণ্ডলে দৃষ্ট হইয়াছে। একটি দশম শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্র অকস্মাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর তারকার মত প্রজ্জ্বলিত হইয়া, অবশেষে কয়েক মাসের মধ্যে তাহার জ্যোতিঃ কমিয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর একটি নূতন নক্ষত্র যাহা রাজহংস (Cygnus) নামক নক্ষত্রপুঞ্জে দেখা যাইতেছে, তাহার অস্তিত্ব পূর্ব্বে ছিল না। ক্রল সাহেবের থিওরিমতে তাহাতে একটা সম্পূর্ণ নূতন সূর্য্যের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সূর্য্যটি সম্ভবতঃ দুইটা নির্ব্বাপিত সৌর-পিণ্ডের প্রতিঘাত বশতঃ আবির্ভূত হইয়াছে। উহা কিছুকাল অন্যান্য তারকার মত উজ্জ্বল থাকিয়া অবশেষে উহা নিহারিকার আকার ধারণ করিয়া অদ্যাবধি দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে। এই নূতন ব্যাপার আকাশমণ্ডলে উপস্থিত হওয়ায়, সাধারণ পণ্ডিতসমাজ ক্রল্ সাহেবের থিওরির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন। দুইটা নির্ব্বাপিত সূর্য্যপিণ্ডে ধাক্কা লাগিয়া নূতন সূর্য্য অথবা জগতের উৎপত্তি হয়, উপস্থিত এই থিওরি পণ্ডিত-সমাজ গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক্ষণে আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে, মহাভারত মধ্যে যে মহাপ্রলয় কাণ্ডের বর্ণনা আছে, বিজ্ঞান দ্বারা তাহা একপ্রকার সপ্রমাণ হইতেছে। আকাশের তারকাশ্রেণী মধ্যে ঐপ্রকার মহাপ্রলয়ের নিদর্শন মধ্যে-মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। সেইজন্যই ঋষিগণ সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয়াত্মক তিনটি পৃথক দেবতার কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

নিমাই

[শ্রী————]

(১)

সংক্ষেপে বলিব।

ইংরাজি শিক্ষা, না কৃপণতা, আমাকে এমন করিয়া ভিখারীর প্রতি বিমুখ করিয়াছিল, তাহা আমি আজ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ করিয়া দেখি নাই। পথের মধ্যে প্রায়ই সে 'একটি পয়সা' হাঁকিয়া হাত পাতিয়া সাশ্রু-নেত্রে বলিত, 'বড় ক্ষিদে পেয়েছে'; এবং আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া যে কতদূর দেশ-অহিতকর কার্য্য—এই চিন্তা আসিয়া আমার অন্তঃকরণকে তখন জন্মভূমি-প্রেমে এতদূর ক্রোধ-চঞ্চল করিয়া তুলিত যে, আমি অনেক সময়ে তাহাকে মারিতে ছড়ি উঠাইতাম; কিন্তু তাহার মুখখানি কি-যেন-কি-একপ্রকার কমনীয় ছিল,—শেষে আমাকেই পরাস্ত হইতে হইত; কিছু-না-কিছু না দিয়া আর থাকিতে পারিতাম না। বলিতাম,—"যা, আর কখনও দিক্ করিস্‌নে।"

দশবছরের তাহার ক্ষুদ্র বুকখানি। পেশাদার ভিখারীর অভ্যস্ত বুলি সে যখন মুখ দিয়া অকস্মাৎ জড়িতস্বরে বাহির করিয়া ফেলিত, তখন আমি স্মিতদৃষ্টিতে দেখিয়াছি,—তাহার রৌদ্রতপ্ত গাল-দুটি আরও যেন রক্তে ভরিয়া উঠিত; এবং আমার চোখে হাসি লক্ষ্য করিয়া সে কত সময় যে কম্পিত অধরে কান্না চাপিয়াছে, তাহার ইতিহাস কেহ আর লেখে নাই। মোটের উপর, বালকটির গতিবিধির প্রতি আমার যেন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ গঠিত হইয়া উঠিতেছিল, এবং আমার বেশ ধারণা হয়, মাতৃ-স্তন-দুগ্ধের মত

তাহার চক্ষে গভীর বেদনা দিয়াও আমি তাহার অমৃতটুকু লাভ করিয়াছিলাম। তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন আমার প্রতি একটা অব্যক্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠুর প্রেম উছলিয়া উঠিত।

একটি চাতুর্য্য তাহার মধ্যে আমি অনুমোদন করিতে একদিনও দ্বিরুক্তি করিতাম না,—তাহা তাহার অন্তর-জ্ঞান। দুঃখ, বোধ হয়, মানুষের ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বত্র সজাগ করিয়া তুলে। শিক্ষা ও প্রবৃত্তি আমাকে কখন লোক-চক্ষুর হাটের মাঝখানে দান বা ভাবের হাট খুলিতে দেয় নাই; সুতরাং 'নিমু'কে যখন পয়সা দিতাম, তখন তাহাকে একটা নির্জ্জন গলিতে লইয়া গিয়া, একবার চারিদিকের সহাস্য পথগুলা সতর্ক-দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া, নিগূঢ় লজ্জায় চট্ করিয়া কাজটা সারিয়া লইতাম। সেও বুঝিত। আমি আর তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকাইতাম না; কিন্তু মানস-নেত্রে স্পষ্ট দেখিতাম, তাহার তৃষিত মরু বিন্দু-পরিমাণ জল পাইয়া, যেন আরও গভীর অতৃপ্তি বুকে পুরিয়া হা-হা করিয়া উঠিত!

ভুলিয়া গিয়াছি, তাহার নাম "নিমাই"। স্ত্রী বলিত, "খোকার জন্য খেলনা আনতে যতবার তোমাকে পয়সা দিয়েছি, তুমি কি কর বল ত?" আমি হাসিয়া উত্তর দিতাম, "খোকা যাকে বড় হয়ে' তৃপ্তি দিয়ে, নিজের বুকে অনন্ত তৃপ্তি পাবে, তাকেই দিয়ে আসি!"

স্ত্রী। তোমার হেঁয়ালি রাখ। এমন করে পয়সা নষ্ট করলে, তোমার খরচ হাতে রাখতে আমি চাই না। কি ক'রে যে খরচ চালাই, তা' তো আর ভাবতে হয় না—একটা-আধটা পয়সা বা দু'টি চাল দিলে ত' তোমার দাতাগিরি হয় না,—সবই বাড়াবাড়ি, সবই কবিত্ব!

ছেলের খেলানার 'সিকি'-গুলা যে অনাহারীর আহারে লাগে, তাহাতে যে আমার প্রচণ্ড কবিত্ব প্রকাশ পায়, খরচের টানাটানি না ঘটাইয়া এক-আধ পয়সায় যে গরীবের পেট ভরা উচিত—এ সব সংক্ষিপ্ত সুন্দর সমালোচনা ইতি-পূর্ব্বে কর্ণগোচর করি নাই। সুতরাং কিছু বলিতাম না, খানিকটা হাসিতাম মাত্র!

স্ত্রী। দেখ, একটা কথা শুধু বলে রাখি,—সংসারের কোন ঘটনাই ভগবানের অসাক্ষাতে বা অমতে নয়। তিনিই যখন গরীবকে গরীব করেছেন, তখন তাহার যে সেটা ন্যায্য পাওনা ছিল, এটুকু সত্য জেনো। ভগবানের উপর বিচার করবার অধিকার তোমার নেই!

আমি অন্তরের মধ্যে একটা ভীষণ বিদ্রোহ পোষণ করিয়া কোনপ্রকারে ওষ্ঠে আলো আনিয়া বলিতাম, "কিন্তু কি করব বল; সেই গরীব ছেলেটাকে দেখ্‌লেই আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে, দেনা-পাওনার প্রশ্নটাই যে উঠ্‌তে পায় না!" সেই মহাপ্রেমিকের কথা স্মরণ করিয়া সে বলিত, "শিশির ঘোষের নিমাই-চরিত একদিন তোমার গঙ্গাজলে দিতে হবে দেখ্‌ছি—খুব হেঁয়ালি আর কথা শিখেছিলে!"

(২)

কয়েকদিন পরে নিমাই যেমন "বাবু!" বলিয়া ডাকিয়াছে,—আমি তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "নিমু, তুমি কখনও ইস্কুলে পড়্‌তে না?" দীর্ঘশ্বাসে নিমাই কহিল, "পড়্‌তুম।" স্নিগ্ধ স্বরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ ইস্কুলে,—কি পড়্‌তে বল ত'? ছাড়্‌লে কেন?" নিমাই আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, বলিল, "এংলো-সংস্কৃত ইস্কুলে, সেবেন্ত ক্লাসে পড়্‌তুম।" তা'র পর অশ্রু-সজল চক্ষে শেষ করিল, "ছেড়ে দিলুম।—" "কেন ভাই?" "টাকা ছিল না।" বাধা দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন, ও স্কুলে কি ফ্রি পড়ায় না?" সে কহিল, "হাঁ, আমি 'ফ্রি'তেই পড়্‌তুম; তবে—" আর বলিতে পারিল না। আমি তাহার রুক্ষ কেশে হাত বুলাইয়া কহিলাম, "তবে?" সে একনিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "ছেলেরা আমাকে মার্‌ত, মিছামিছি বদ্‌নাম দিত, সিগরেট খাই বল্‌ত, চুরি করি বলে' গালাগাল দিত—শেষে মাষ্টার ম'শায়কে লাগিয়ে মার খাওয়ালে, কেউ পড়াও বলে' দিত না। বাবা কেঁদে ছাড়িয়ে দিলেন; বল্লেন, 'গরীবলোকের লেখাপড়ার দরকার নেই'।" আমি কথা বদ্‌লাইলাম; কহিলাম, "হাঁ ভাই, তোমার বাপ-মা কি করেন?" নিমাই সংক্ষেপে বলিল, "বাবা আমার বুড়ো হয়েছেন, অসুখে উঠ্‌তে পারেন না, আমিই তাঁকে ভিক্ষে করে খাওয়াই; আর, মা—আমার—নেই!" একটা ছাগশিশু সেইখান দিয়া যাইতেছিল,—নিমাই ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল,—গাঢ় আলিঙ্গনে তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। অদূরে তাহার মা ভীতনেত্রে চীৎকার করিতেছিল। আমি কি যেন হারাইতেছিলাম, ঈষৎ অসন্তুষ্ট স্বরে কহিলাম, "ছেড়ে দাও,

ওর মা কাঁদ্‌চে, ও রকম ক'রে ধর্‌তে নেই—" নিমাই কিছু বলিল না, একবার শুধু আমার কথাগুলির অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য আমার মুখের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিল—তা'র পর, কি ভাবিয়া, ছাগশিশুটির শুভ্র গণ্ডে উপর্য্যুপরি গভীর চুম্বন-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া কহিল, "যা !—" সাশ্রুনেত্রে আমাকে বলিল, "কই দিন্‌।" আমি একটা দু'আনি ফেলিয়া দিলাম—আর দাঁড়াইলাম না, একটা শিশুর সম্মুখে শেষে কি চিত্ত-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিয়া অপ্রস্তুত হইব? সেইদিনই স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। এ-কথা-সে-কথার পর তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, "আপনি সঠিক কিছুই জানেন না; ওর বাপ ব্রাহ্মণ, আর ওর মা কায়স্থ,—ও দো-আঁসলা; সুতরাং ও'র আদৌ ভাল হবার কথা নয়। দেখুন, বিদ্যা জিনিসটাকেও উপযুক্ত মৃত্তিকায় রোপণ কর্‌তে হয়; নতুবা পণ্ডশ্রম ও অপব্যবহার হয়। ও'কে freeshipএই নিতে বলুন, বা আপনি খরচ দিয়েই পড়ান্‌—আপনি বন্ধুজন, আপনাকে কিছু বল্‌ব না,—ও'কে স্কুলে নিয়ে শেষে কি আমি দো-আঁসলার Secretary নাম লইব? ও'কে স্কুলে ঢোকালেও ও'র সঙ্গদোষে পচা আমের মত সব ভাল আমও যে পচিয়ে তুল্‌বে!"

কিছু বলিবার ছিল না। সত্যই কি উহার মূল এত কলুষিত? আর, যদি তাহাই হয়, সত্যই কি উহার মধ্যে রক্তমাংসের কোনও লক্ষণ নাই?—যাক্‌! আমার মনও কিন্তু কেমন যেন কলুষিত হইয়া উঠিতেছিল।

(৩)

"বাবু!—" আমি সজোরে ছড়ি তুলিয়া বলিলাম, "চুপ রও!—যাও এখান থেকে, ফের যদি পয়সার জন্য 'বাবু-বাবু' কর্‌বি, মেরে ফেল্‌বো তোকে, পিঠের ছালচামড়া তুল্‌বো—জুতোপেটা কর্‌বো, পাজি, শূয়ার, গাধা, বজ্জাত!"— বেশ লক্ষ্য করিলাম, মুখখানা তাহার শুকাইয়া গেল। আমি আরও কি বলিতে যাইতেছিলাম,—কিন্তু হঠাৎ তাহার মুখখানা মৃতবৎ বিকৃত দেখিয়া আমি বাধা পাইলাম। বালকটি পড়িয়া গেল!

আমি তাহাকে কোলে তুলিয়া মাথা নাড়িয়া অস্থির কণ্ঠে ডাকিলাম,—"নিমু!"—অনেকক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া সে কহিল, "বাবু!"—এবার তাহার মুখের শিরায় রক্ত ফিরিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন আছ নিমু? এ'রকম কেন হ'ল ভাই!" অশ্রু-প্লাবিত-গণ্ডে সে চক্ষু বুজিয়া কহিল, "কেমন যেন মাথা ঘুরে গেল,—চ'খে ঝাপ্‌সা বোধ হচ্ছিল।" "নিমু, তুমি কি কিছু খাওনি?" "না, আজ যে চাল পেয়েছিলুম, তা'তে কুলিয়ে গেল বলে, আর আপনার জন্য দাঁড়ালুম না, বাবাকে খাইয়ে এখানে এসেছিলুম!" ওঃ—এই সন্ধ্যের সময় এত বেলায় একেবারে সমস্ত দিনের খাওয়া তুমি খাও? তা' তুমি খেয়ে এলে' না কেন ভাই?"—নিমাই একবার আমার দিকে চাহিল; তার পর মৃদুস্বরে, বীণা-নিক্কণের মত কহিল, "আপনাকে একবার দেখ্‌ব বলে এসেছিলুম।"—আর থাকিতে পারিল না, অজস্র-ধারায় ফুঁপিয়া-ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল!—আমার মাথা ঘুরিতেছিল; কহিলাম, "নিমু, তুমি যেতে পার্‌বে? চল, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।" নিমু এবার উঠিয়া বসিল; কহিল, "না, আপনি আর কষ্ট কর্‌বেন না, আমি যেতে পার্‌বো—দু'টি খেলেই সেরে যাবে।" কিন্তু সে চলিতে পারিতেছিল না,—পদে-পদে টলিতেছিল। আমি তাহার হাত ধরিয়া কহিলাম, "নিমু, হাত চেপে ধর—না, চল, পৌঁছে দিয়ে আসি।" বাটীতে পৌঁছাইয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিতে গেলাম সে ঝনাৎ করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া ভিতর হইতে কহিল, "বাবু, আজ ত' আর দরকার নেই!"—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ঘরে ফিরিয়া ভাবিলাম,—হায়, মানুষ মানুষকে কতটা ভুল বুঝে!—স্থির করিলাম, যে যাহাই বলুক, নিমুকে আমি বেদনা দিব না!

(৪)

কয়দিন ধরিয়া নিমাইকে আর দেখিতে পাইলাম না। ঘোলাটে আকাশের মত মনটাও বড় উতলা হইয়া উঠিয়াছিল,—সূর্য্যাস্তের পরে তাহার বাটীর দিকে অগ্রসর না হইয়া আর থাকিতে পারিলাম না। কয়দিন ধরিয়া কলেরার অত্যাচারেও পাড়াময় একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল! স্ত্রী কহিল, "চুপি-চুপি বেরুচ্চ যে! সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমার গতিবিধি বুঝ্‌তে পারি না। আমাকে লুকিয়ে চোরের মতন যাবার কি দরকার ছিল?—যাক্‌, ও'টা আজকাল পুরুষদের সাধুত্বের হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ভিক্ষের চাল পরীক্ষা করে' ত' কোন লাভ নেই—বাপ যে আমার গলবস্ত্র হয়ে' দোরে-দোরে

ভিক্ষে করে তোমাকে পেয়েছিল!—তা' বল দেখি, বই কিন্‌বে বলে' টাকাটা নিয়ে' কি কর্‌লে?"—জীবনে এই প্রথম টাকাটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আমি কহিলাম, "তোমার টাকা আমি স্পর্শও করি না!"—কিন্তু আঁচলে বাঁধিতে-বাঁধিতে সে কহিল, "যাক্, আমার এখন বাজার-খরচ চল্‌বে। তা', এই চারিদিকে কলেরার সময় কোথায় বেরুচ্চ?"—"যমরাজের রাজত্বটা একবার দেখে আস্‌তে!" "মুখে তোমার কেবল উযুক্তি-কুযুক্তি—বালাই!" অ-বিলম্বে স্খলিত-পদে আমি বাহির হইয়া গেলাম। মোড় ফিরিতেই একটা মারপিটের গোলমাল বোধ হইল। ফিরিলাম। দেখি, ও'পাড়ার যামিনী মুখুয্যে, মণি কাব্যতীর্থ ও কালী ডাক্তার নিমাইকে নিষ্ঠুররূপে চড়চাপড়, কিল, জুতা মারিয়া আধমারা করিয়া ফেলিতেছে। আমি ছুটিয়া তাহাদের নিকট গেলাম। কালী ডাক্তার বলিয়া উঠিল, "ম'শায়, কি ভয়ানক চোর আমরা জান্‌তুম না—বলে, চার্ দিন ভিক্ষে পাইনি, কেউ দেয় না, খেতে পাইনি,—আজ ও'র চোদ্দ-পুরুষের কোন্ বাপ আছে, তা'র ভেদ বমি হয়েছে, কি বাতাত্তুরে ধরেছে, আফিং কিন্‌তে হবে, দু'টি পয়সা দাও! যামিনী ব্যস্ত লোক,—খরিদ্দারদের জিনিসপত্র দিতে-দিতে অবসরমত দু'তিনবার ধমক দিলে, সর্‌ল না; যামিনীও আর লক্ষ্য কর্‌লে না,—ভাব্‌লে চলে গেল! আমি কিন্তু আমার ঐ রক্‌টা থেকে বরাবরই লক্ষ্য কর্‌ছি। ব্যাটা,—যাই খরিদ্দারগুলো চলে' গিয়ে জায়গা ফাঁকা হ'ল, আর যামিনীও কি কর্‌তে ঘরে ঢুক্‌লো—ব্যাটা কি না চারিদিক চেয়ে' পয়সাগুলোর কাছে এগুচ্ছিল! মার্, মার্, মেরে ফেল্ ব্যাটাকে!—ব্যাটা বেজন্মা!—" প্রচণ্ড কোপ বুকে চাপিয়া রক্ত-মুখে কহিলাম, "আপনাদের ঐশ্বরিক বিচারে যথেষ্ট দেহের শক্তি দেখাইয়াছেন; কিন্তু ও' যে অচেতন হয়েছে,—এইবার মর্‌বে। পৃথিবীতে might is right ত' ও'র জানা ছিল না! আপনারা যখন এক পয়সার ওষুধটা চার আনায় চালান্, আর এক পয়সার জিনিসটা এক টাকায় বিক্রী করেন, তখন ত' দেহের বল পরীক্ষা কর্‌বার বিচারক কেউ থাকে না!—তখন নির্ভাবনায় আপনারা রোগীদের বড়-বড় সবজান্তার মত জীবন-অর্থে বৈতরণী পার কর্‌তে কোন ত্রুটি রাখেন না! উঃ—" নিমাইকে বুকে তুলিয়া আমি অনাথাশ্রমে দিয়া আসিলাম। সম্পাদক শরৎবাবুকে বার-বার বলিয়া আসিলাম, "দেখ্‌বেন, যেন সেবার কোনরূপ ত্রুটি হয় না। বলেন ত', কাল থেকে' আমিও আস্‌তে পারি!" এখন মনে হয়, শরৎবাবু আমার ভাব দেখিয়া কেমন একটা চাপা-হাসি হাসিয়াছিলেন। তখন আমার মাথা ঠিক ছিল না বলিয়া ততটা লক্ষ্য করি নাই!

আর বলিবার ক্ষমতা নাই। সংক্ষেপে শেষ করিয়া দিই। নিমাই না কি ভেদবমির মাঝখানে সমস্ত রাত্রি শুধু দু'টি কথা বলিয়াছে, "বাবু—কোথায়?" তাহার বাপ আর ইহজগতে নাই। আমি প্রফেসার—ছাত্র মহলে, বৃদ্ধ-মহলে, নারীর মজলিসে, সমস্ত কাশীময় আমার নামে টী-টী পড়িয়া গিয়াছে,—নিমাই-এর বড় বোন্ বাজারের বেশ্যা, তাহার জন্যই আমি এত করিতাম! স্থির করিয়াছি, দুঃখীর জন্য আর কখনও কাঁদিব না—স্ত্রীর কথামত, ভগবানের উপর বিচার করিতে আর অধিকার দেখাইব না, হেঁয়ালি ছাড়িব।

কোনারকের পথে

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম এ]

বন্ধুবর ——যখন জানাইলেন যে তাঁহার বিশাল অক্ষৌহিণী লইয়া তিনি পুরী হইয়া কোনারক যাত্রা করিবেন, তখনই তাঁহার সঙ্গ লইবার যে কিঞ্চিৎ ইচ্ছা না হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। তাহার পর উপহাস-উপরোধের ভিতর দিয়া সহৃদয় বন্ধুবর্গ যখন মহাজনের সঙ্গী হইলে হাতে-হাতে ফল-লাভের সম্ভাবনা বুঝাইয়া দিলেন, তখন কর্ম্মক্লান্ত জীবনে একটু বিচিত্রতার ভরসায় এই সুযোগে বাহির হইয়া পড়াই স্থির করিলাম। ভাবিলাম, পুরী যাওয়ার সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু এরূপ সৎসঙ্গে কোনারক-গমন আর কখনও ঘটিয়া উঠিবে না।

কলিকাতার সরকারী-বেসরকারী প্রায় সকল আপিসই শনিবারে দুইটার সময় বন্ধ হয়। আর মাদ্রাজ-মেল

ছাড়িবার সময় অপরাহ্ন বেলা ছয় ঘটিকা। সুতরাং এই সময়টুকুর মধ্যে আপনাপন প্রয়োজন বা সখ অনুযায়ী লোটা-কম্বল, সুটকেশ, valise প্রভৃতি সর্ব্ববিধ লাটবহর্ লইয়াই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া যাইতে পারে। আমাদের দলের তিন-চার জন পূর্ব্বেই Passenger trainএ রওনা হইয়াছিলেন। দলপতি Second Class রিজার্ভ করিয়াছেন। আমরা মধ্যশ্রেণীর যাত্রী। বিদেশ-ভ্রমণের সময় র— পুরাদস্তর সাহেব। সরকারী কাগজাদিতেও তাঁহাকে Mr. লিখিয়া থাকে; সুতরাং আমাদিগের ন্যায় plain Baboo না হইলেও "ব্যক্তিগত চরিত্র" ও "জাতিগত বিশিষ্টতার গুণে" বন্ধুবরকে গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বে অন্ততঃ তিন কোয়াটার কাল হাওড়া ষ্টেসনে পাদচারণা করিতে হইল, অথচ তাঁহাকেই আবার "বাস্তবাগীশ" বলিয়া অপর লোককে বিদ্রুপ করিতে শুনিয়াছি। ব্যয়-সংক্ষেপের জন্য রেল কোম্পানী প্লাটফরমের বৈদ্যুতিক পাখাগুলি বন্ধ রাখিয়াছেন। ষ্টেসনে হাত-পাখা বিক্রীত হইতেছিল; গ্রীষ্মাতিশয্যে তাপমান-যন্ত্রের পারদের ন্যায় তাহার মূল্য শনৈঃ-শনৈঃ উর্দ্ধে উঠিয়া গেল। অবশেষে র— ভায়া নিজের অবস্থা দৃষ্টে সঙ্গীগণের অভাব-অভিযোগ বুঝিয়া লইয়া কয়েক গ্লাস বরফ-লাইমেডের ব্যবস্থা করিলেন। প্রিয় সুহৃৎ হ—বোধ হয় আমাদের 'বিদায় অভিশাপ' দিবার জন্যই আসিয়াছিলেন; কিন্তু অবস্থা দেখিয়া স্বহস্তে লাইমেড্ পৌছাইয়া দিয়া অনেক মুখরোচক "শুভ ইচ্ছা" অর্জ্জন করিলেন। অবশেষে গাড়ী ছাড়িল।

আমাদের কক্ষে একজন সাহিত্যামোদী যুবক বসিয়া ছিলেন। তিনি মেদিনীপুরের যাত্রী। তাঁহার সহিত দীনেন্দ্রবাবুর "মেদিনীপুরে তিন-রাত্রি" "সাহিত্য-সম্মিলনী" এবং সার্ রবীন্দ্রনাথ ও বন্ধুবর "র"—এর উপন্যাসাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া খড়্গপুর পর্য্যন্ত বেশ কাটিয়া গেল। সাহিত্যিক সহযাত্রীটি খড়্গপুরে নামিয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে আসিলেন, একজন পাগ্ড়ীধারী পাঞ্জাবী।

গাড়ীতে সর্ব্বসমেত চারিজন যাত্রী। অন্য কোনও রেলপথে এরূপ ক্ষেত্রে বিশ্রামের বড় সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু B. N. R.,এর বন্দোবস্ত ভাল। দেখিলাম, পিঠের দিকের গদিটি টানিয়া লইয়া বেশ একটি bunk বা ঝোলান শয্যায় পরিণত করা যায়। ঘুম হউক বা না হউক, অন্ততঃ গা ছড়াইয়া লম্বা হওয়া চলে। সঙ্গে একখানি Pushkin-এর উপন্যাস ছিল; কিন্তু তখন আর পড়িতে ভাল লাগিল না। বন্ধুবর অধ্যাপক ক—একখানি টাট্কা Empire কাগজ কিনিয়াছিলেন, সেখানিও একপাশে উপেক্ষিত ভাবে অযত্নে পড়িয়া রহিল। নিশাশেষে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম গাড়ীখানি সশব্দে কোনও নদীর উপরিস্থ লৌহ-সেতু অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। আলো ও আঁধারের ভিতর দিয়া চারিদিকের দৃশ্যগুলি বড় মন্দ দেখাইতেছিল না। প্রভাত হইলে দূরস্থিত ধূমাভ পাহাড়-শ্রেণী ক্রমশঃ নয়নপথে পতিত হইল। আমরা খুর্দ্দায় আসিয়া পৌছিলাম। মুখ ধুইবার জন্য জলের চেষ্টা করিতে হইবে ভাবিতেছিলাম। কিন্তু দেখিলাম আমাদের মধ্য-শ্রেণীর বাথরুমেও Wash-hand-stand প্রভৃতি মুখ ধুইবার সরঞ্জাম রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বগামী বন্ধুগণ এখানে আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সদা প্রসন্ন—মিত্র মহাশয়কে দেখিয়া বড়ই স্বস্তি বোধ করিলাম।

উৎকল হইতেই মদ্রদেশের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। ষ্টেসনে ইংরাজী-ভাষী মাদ্রাজী রেলওয়ে কর্ম্মচারী দেখিয়া ইহাই মনে হইতে লাগিল। শ্রীমান ভূ— দেখিলাম দিব্য মাদ্রাজী সাজিয়াছেন,—গলায় টাই বাধা, গায়ে গলা-খোলা সাহেবী কোট, পরিধানে মাদ্রাজী ফ্যাসানে কচ্ছ-বিবর্জ্জিত ধুতি। ষ্টেসনে ফল-মূল বিক্রীত হইতেছিল; সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে মুন্সী সাহেবের প্রতিই তাহা সংগ্রহের ভার অর্পিত হইল। ফল সংগৃহীত হইল বটে, কিন্তু তাহা পুরী পর্য্যন্ত পৌছিল না। গাড়ী খুর্দ্দা ছাড়িতে না-ছাড়িতেই সকলগুলির সদ্ব্যবহার হইয়া গেল। আমরা যখন পুরী পঁহুছিলাম, বেলা তখন সবে সাড়ে সাতটা।

দূরে শ্রীমন্দির দৃষ্টিগোচর হইতেই, মন যেন স্বভাবতঃই বিচলিত হইয়া উঠিল। প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বেও দূরাগত পথক্লিষ্ট মুমূর্ষু-প্রায় যাত্রীগণ মন্দিরের চূড়ামাত্র দর্শনে হৃদয়ে নববলের সঞ্চার অনুভব করিত; তাহাদের সহিত আধুনিক রেল-আরোহী এই সকল সৌখীন তীর্থ-দর্শকগণের কোনক্রমেই তুলনা হইতে পারে না। সে ঐকান্তিকী ভক্তির কণামাত্র পাইলেও আজি-কালিকার অনেক শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিও আপনাকে যথার্থই ধন্য জ্ঞান করিতে পারে। কয়েক-

খানি গরুর-গাড়ী ও ঘোড়ার-গাড়ীতে মালপত্রাদি বোঝাই করিয়া আমরা গন্তব্য স্থানাভিমুখে রওনা হইলাম। রথ-যাত্রার আর অধিক বিলম্ব নাই। দেখিলাম, ষ্টেসন-সান্নিধ্যে কাঠের বেড়া দিয়া খোঁয়াড়ের ন্যায় কতকগুলি স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। রেলগাড়ীতে আরোহণ অবরোহণের সময় ভিড়নিবারণার্থ এইখানেই তৃতীয় শ্রেণীর অভাগা যাত্রি-দলকে আটক করিয়া রাখা হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও এরূপ বন্দোবস্তের প্রয়োজন হয় বলিয়া শুনি নাই।

আমাদের যে গৃহে আশ্রয় লইবার কথা ছিল, দেখিলাম —আমরা আসিবার পূর্ব্বেই কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তি তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছেন। বন্ধুবর র—সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তবে এ ক্ষেত্রে তাঁহার বলিবার বড় কিছু ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের হরিনাথ যখন পূর্ব্বে পত্র দ্বারা সংবাদ জ্ঞাপন না করিয়া আপন শ্বশুরালয়ে গিয়াও যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিল, তখন বন্ধুবর বিনা-সংবাদে প্রবাসে আসিয়া যে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! যাহা হউক, অল্প চেষ্টাতেই অন্যত্র বাসা স্থির হইল। চাকর-বাকরেরা জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিল; আমরা বাসা-বাটীর সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া সমুদ্রের লহরী-লীলা দর্শন করিতে লাগিলাম। সঙ্গীগণের মধ্যে একজন তরুণ বয়সে কিঞ্চিৎ ইংরাজী-সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়াছিলেন—এখন আর বড় সে দিকে ঝোঁক নাই। তিনি হঠাৎ "sea, the sea, the ever free" ...বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ঐতিহাসিক নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি Xenophonএর Retreat of the ten thousand পড়িয়াছিস্!" অপর একজনের মনে "কাব্যি" ও স্বদেশ-প্রীতি যুগপৎ জাগিয়া উঠিল; তিনি

"সিন্ধু যাঁহার চরণ ধূলায়
নিত্য আসি ললাট বুলায়"

এবং "সাগর যাহার বন্দনা-রচে শত তরঙ্গ-ভঙ্গে" প্রভৃতি কয়েকটি অমৃতময়ী পদ আমাদিগের অমর কবিগণের কবিতা হইতে অনর্গল আওড়াইতে লাগিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পুরীতে সমুদ্র দর্শন করিয়া ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার কাব্যামৃত আস্বাদে অভ্যস্ত 'গৌড়-জন'ও তাহা সহজে ভুলিতে পারিবে না। বঙ্গের সুকবি ও ভাবুক-গণ সিন্ধুতটে আসিয়া বঙ্গবাণীকে 'সাগর-সঙ্গীত' 'সিন্ধু-গাথা' প্রভৃতি রত্নাভরণে ভূষিত করিয়াছেন। মনে পড়িল ভিক্‌তর হুগো'র (Victor Hugo) একখানি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম Caeser crosses the Rubicon Mandrin leaps the gutter" এক্ষেত্রে যে অভাজনের উল্লেখ করিতেছি, তাঁহার 'পগার পার' হইবারও ক্ষমতা নাই। মস্তকে লগুড়াঘাত করিলেও দুলাইন মিল করিয়া দেওয়া যাহার পক্ষে সম্ভব নহে, ভাবাবেগে উৎকৃষ্ট কবিতা অশুদ্ধ ভাবে আবৃত্তি করা ছাড়া তাহার আর উপায় কি?

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বৃষ্টি নামিল। বায়ুবেগ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছাসও সঙ্গে-সঙ্গেই প্রবলতর হইয়া উঠিল। আমরা বাসায় আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সমুদ্র-স্নানার্থীর পাণ্ডা স্বরূপ দুই-একজন নুলিয়া আসিয়া দেখা দিলেন। মাথায় বাঁশের টুপি। কাহার-কাহারও হাতে উল্কি তুলিয়া ইংরাজী-ভাষায় নাম লেখা। শুনিতে পাই, উল্কি (tattoo-mark) না কি নৃতত্ত্ব আলোচনার একটি প্রধান উপকরণ। এই উল্কিগুলি ঠিক্ স্বদেশী নহে এবং আমাদের সঙ্গেও নৃতত্ত্ববিদ্ কেহ ছিলেন না, তাই রক্ষা; নতুবা স্নান-উপলক্ষে এই নুলিয়া কয়টির মাথার বেড় ও উল্কির বহর মাপিয়া শনৈঃ-শনৈঃ কোনও অভিনব তথ্যের উদ্ভব হইত। র—নুলিয়াদিগের নিকট হইতে একটি টুপি তাঁহার কোনও ইউরোপীয় বন্ধুর জন্য souvenir বা স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহারাও লোক বুঝিয়া দাম হাঁকিয়া বসিল। সুতরাং "নুলিয়া বেসাতি" আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। জল ছাড়িয়া গেলে আমরা সদল-বলে সমুদ্র-স্নানে আগুয়ান হইলাম। পুণ্যকামীগণ জগন্নাথ দর্শনের অঙ্গ-স্বরূপ 'ঢেউ খাইয়া' থাকেন। সৌখীন বাবুরাও ঢেউয়ে নাকানি-চোবানি খান; তবে পাছে কার্য্যটি ভুলক্রমে পুণ্যের খাতায় জমা পড়ে, সেই ভয়ে স্পষ্ট করিয়া উহাকে বিদেশী ভাষায় Sea-bath বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। দলপতির সাহসে অনেকেই বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিবার সময় কাহাকেও বা ছিন্ন-বস্ত্র, কাহাকেও বা ভগ্ন-পদ লইয়া ফিরিতে হইল। Moral—নূতন স্নানার্থীগণের নুলিয়াদিগের সাহায্য লওয়াই প্রশস্ত—বিশেষতঃ যদি

সমুদ্রের কিঞ্চিৎ অশান্ত ভাব দেখা যায়। বাসায় আসিয়াও কাহারও উৎসাহের অভাব দেখা গেল না। স্বয়ং casualty (আহত) তালিকাভুক্ত মহাশয়ও পায়ে পটি বাঁধিয়া ভূরি-ভোজনে লাগিয়া গেলেন। মিত্র মহাশয় "সংরক্ষিত" সামুদ্রিক মৎস্যে বিগত-স্পৃহ। তাঁহার জন্য "ভুড় ও টামাকে"র ব্যবস্থা হইল।

তাহার পর শ্রীমন্দির দর্শনের পালা। তখনও টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল—তাই পুনরায় ঠিকা গাড়ীর আশ্রয় লইতে হইল। মন্দির-পথে দেখিলাম, উৎকলবাসিগণ কিছু fresco-painting বা দেওয়াল-চিত্রের পক্ষপাতী। তাহাদের মাটীর ঘরের দেওয়ালগুলি প্রায়ই নানারূপ চিত্র-বিচিত্র করা। অধ্যাপক ক - মহাশয় ললিত-কলার সন্ধান রাখেন,—এই প্রসঙ্গে খুঁটি গাড়িয়া কোথায় একটি নাতিহ্রস্ব বক্তৃতায় ভারতীয় আর্টের "প্রাণ" এবং তাহার সহিত অজন্তা গুহাবলীর চিত্রাদির সম্পর্ক প্রভৃতি বুঝাইয়া দিবেন,—তা নয়, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া ওড়্-সভ্যতার অধোগতির কারণ খুঁজিতে ব্যস্ত হইলেন। মন্দিরের প্রবেশ-পথেই কোনারক হইতে আনীত কৃষ্ণবর্ণ Basalt প্রস্তরের বিখ্যাত অরুণ-স্তম্ভ। এই বহু-কোণবিশিষ্ট (polygonal) স্তম্ভটি একখানি অখণ্ড প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত (monolith); উচ্চে ২৫ ফিট ২ ইঞ্চি এবং বেড় ৬ ফুট ৩॥০ ইঞ্চি। স্তম্ভের পাদভূমি বা পাদমূল সমচতুষ্কোণ। এক-একটি পার্শ্ব-দেশ মাপে ৭ ফিট ৯ ইঞ্চি এবং উচ্চে ৯ ফুট হইবে। সম্মুখে (Vide M. Ganguly's Orissa) ক্ষুদ্র-বৃহৎ স্থায়ী-অস্থায়ী বিপণিশ্রেণী। মিত্র মহাশয়কে সূর্য্য বেদীর মাপ লইয়া নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ফুট-রুলের সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। মন্দিরের ভিতর চর্ম্মাবৃত টেপ লইয়া যাইবার উপায় ছিল না। এখন "নব-কলেবর" হইতেছে বলিয়া ঠাকুরের "অনবসর"; দীনবন্ধুর দর্শন এ অভাগাদের অদৃষ্টে ঘটিল না। আমরা তৎ-পরিবর্ত্তে অন্যান্য মন্দিরাদি দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সূর্য্য-মন্দির খোলা পাওয়া গেল না; তাই মিত্র মহাশয়ও আমাদিগের সহিত প্রাচীন স্থপতি ও তক্ষণ শিল্পিগণের কারুকার্য্যের আলোচনায় যোগ দিতে অবকাশ পাইলেন। র—গাইড্ স্বরূপ আমাদিগকে মন্দিরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ ও ভিত্তি প্রভৃতি দেখাইয়া কারুকার্য্যাদি বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। মন্দির-গাত্রস্থ আলম্বনে হংসশ্রেণী (goose frieze) হস্তীশ্রেণী (elephant frieze) বিচিত্র ভঙ্গীতে অঙ্কিত নাগকন্যাদির মূর্ত্তি প্রভৃতির বিশেষত্ব পর্য্যায়ক্রমে বর্ণনা করিয়া তিনি অন্যান্য খোদিত ছবিগুলির পরিকল্পনা ও সম্পাদন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, এই সকল sculpture বা খোদিত চিত্রের মধ্যে অধ্যাপক ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নৌবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে বর্ণিত প্রমোদ-তরণীটির চিত্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। দেখিলেই মনে হয়, ক্ষেপণীর সবেগ তাড়নায় জল যেন উছলিয়া পড়িতেছে। দোলনার ন্যায় আসনটিকে সাগরোর্ম্মির আন্দোলনজনিত কষ্ট-নিবারণক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইলেও কোন-কোনও পণ্ডিতের মতে এরূপ জলযান কেবল নদীবিহারেরই উপযোগী। কৃষ্ণলীলা ও গোষ্ঠ-বিহার প্রভৃতির চিত্রগুলিও বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। খোদিত রমণী-মূর্ত্তি-গুলির অঙ্গ-সৌষ্ঠব সুন্দর হইলেও নাসারন্ধ্র বিস্তৃত ও অধরোষ্ঠ কিঞ্চিৎ স্থূল। পুরুষ-মূর্ত্তিগুলির মুখের যেন কেমন থল্‌থলে ভাব। Chlorite (মুগ্‌নি) প্রস্তরে অঙ্কিত চিত্রগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অভিজ্ঞগণের মতে এগুলিও কতকাংশে কোনারক হইতে সংগৃহীত। অরুণ-স্তম্ভটি মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের ব্রহ্মচারী গুরুর আদেশক্রমে রাজা দ্বিতীয় দিব্যসিংহের রাজত্ব-কালে সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৭৭৯-৮০ হইতে ১৭৯৭-৯৮ অব্দের মধ্যে কোনারক হইতে আনীত হইয়াছিল। দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় যে খাঁজ-বিশিষ্ট প্রাচীর (battlement) জগন্নাথ দেবের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে সেগুলির মালমসলাও খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনারক হইতে গৃহীত হয়। আমাদিগকে মূর্ত্তি প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে দেখিয়া কয়েকটি ছোট-বড় পাণ্ডা-শ্রেণীর লোক পিছনে লাগিয়া গেল। যাহার যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইতে লাগিল,—দেবী-মূর্ত্তিকে দেব-মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত করিতেও দ্বিধা নাই। তাহাদিগের অনর্গল বাক্য-স্রোত থামাইবার জন্য বিশালকায় প্রত্নতাত্ত্বিকের সুবিশাল তর্জ্জনের প্রয়োজন হইল। মন্দিরা-ভ্যন্তরে পাণ্ডাগণের অবাধ অধিকার। সেখানে আধুনিক fresco ছবিগুলি সহজেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

দেখিলাম, এই সকল আধুনিক শিল্পিগণের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বড়ই প্রবল। তাহারা খোদিত চিত্রাদির সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্ম দুই এক পোঁচ চুণ লাগাইয়া দিতেও ছাড়ে নাই। ভোগ-মন্দিরের গাত্রে যে সকল কারু-কলার চিত্র রহিয়াছে, তাহার ভিতরও আধুনিক stuccc-work বা (পন্থের) পঙ্কের কায রহিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। এ শ্রেণীর প্রাচীন প্রস্তর-খোদিত চিত্রাবলী নানা কারণে শিল্পী ও ঐতিহাসিকের নিকট আদরণীয়,—কিন্তু নূতন করিয়া এরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

এবার জিনিস কেনার পালা। মন্দিরের বাহিরে মাল্য, 'ফুলি', পট প্রভৃতি বিক্রীত হইতেছে। নিকটে টাকা-পয়সা ভাঙ্গাইবার স্থানও আছে ; তবে ঈশা-বিতাড়িত বাইবেলের money-changer বা পোদ্দারগণের স্থায় ইহারা মন্দিরাভ্যন্তরে স্থান পায় নাই। পুরী তীর্থের প্রভাব সমগ্র ভারতে বিস্তৃত। দেখিলাম সুদূর পুরুষপুর (পেশোয়ার) হইতে কয়েকজন পাঠান-বেশী "বেণিয়া" জগন্নাথ-দর্শন করিতে আসিয়াছে। আমরা কয়েকটি মালা, সোপষ্টোনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাধাকৃষ্ণ ও মহাবীর মূর্ত্তি এবং প্রস্তরবৎ-মৃত্তিকা-নির্ম্মিত জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলদেবের মূর্ত্তি-সম্বলিত কয়েকটি votive tabletএর স্থায় খেলানা খরিদ করিলাম। দেখিলাম, এই মৃৎপীঠিকাগুলির উপরিভাগে এক-একটি মন্দিরও অঙ্কিত রহিয়াছে ; তবে শ্রীমন্দিরের সহিত উহার বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে বাঁকিপুরের নিকট কুমড়া-হারে প্রাচীন বোধগয়ার মন্দিরের চিত্রসংযুক্ত একখানি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্লাক্ (plaque) Dr. Spooner (ডাঃ স্পুনার) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার প্রতিকৃতি Journal of the Behar and Orissa Research Society (বিহার ও উড়িষ্যা অনুসন্ধান সমিতির) পত্রিকার প্রচ্ছদপটে দেখা যায়। সেকালেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ এইরূপ মন্দির দর্শন করিতে আসিয়া দেবতা ও মন্দিরের প্রতিকৃতিযুক্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মৃণ্ময়ী স্মরণ-চিহ্ন কিনিয়া লইয়া যাইতেন। কোন সুদূর ভবিষ্যতে হয় ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পুরুষোত্তম-তীর্থের এই সকল মৃণ্ময়ী পীঠিকা-নিহিত মন্দির-চিত্র দেখিয়া জগবন্ধুর মন্দিরের কল্পনা করিতে চেষ্টা করিবেন। পুরী বা জগন্নাথক্ষেত্র যে বৌদ্ধ তীর্থ, তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত আচার-অনুষ্ঠানাদি উল্লিখিত ও উদাহৃত হইয়া থাকে। (১) পুরীতে অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে কোনও জাতিভেদ নাই। (২) দেহাবশেষ অস্থি প্রভৃতির স্থায় কোনও বীজ পদার্থ 'নবকলেবর' সময়ে দেবমূর্ত্তি মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে। (৩) অন্যত্র ভ্রাতা ভগিনী লইয়া ত্রিমূর্ত্তির পূজা কোথাও অনুষ্ঠিত হয় না।

সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় মাগুনিয়া দাস নামক একজন উড়িয়া কবির কবিতা হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বৌদ্ধোপাসনার জনশ্রুতি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পদটি এই—

> দেখিলে সিংহাসনোপরে
> বিজয়ে বউদ্ধরূপরে
> পদ অঙ্গুলী নাহি হাত
> শ্রীদারুব্রহ্ম জগন্নাথ।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বিশ্বকর্ম্মার নিষেধ সত্ত্বেও অসময়ে রুদ্ধ মন্দির-দ্বার খুলিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, ইহা তাহারই বর্ণনা। মাগুনিয়া দাস সেরূপ প্রাচীন কবি নহেন। হিন্দুধর্ম্মের গ্রহণশীলতা-গুণে বুদ্ধদেব অবতারগণের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন ; এবং কোন-কোনও চিত্রে জগন্নাথদেব তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া আছেন, এরূপও দেখা যায়। যে কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে লীন হইয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বর্ত্তমান যুগের শেষ অবতার রূপে গৃহীত বুদ্ধদেবের সহিত জগন্নাথের সমন্বয়-চেষ্টা আশ্চর্য্য নহে। অন্য যে তিনটি হেতুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও মনে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস উৎপাদন করে না। (১) পুরীতে অন্নগ্রহণ প্রথা সম্বন্ধে যে উদারতা আছে, তাহা কেবল মন্দিরের রন্ধনশালায় প্রস্তুত অন্নভোগের বেলায়ই প্রযোজ্য। ঠাকুরের প্রসাদ খাইয়া পবিত্র জ্ঞানে আমরা এখনও মাথায় হাত মুছিয়া থাকি। দেব-নিবেদিত অন্ন একত্রে স্পর্শদোষ-নির্ব্বিশেষে আহার যে বৌদ্ধ-তীর্থেরই বিশেষত্ব ছিল, তাহা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ।

(২) বৌদ্ধগণ মহাপুরুষগণের অস্থি (relics) স্তূপাদিতে রক্ষা করিতেন বটে, কিন্তু উহা দেবমূর্ত্তির মধ্যে স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন বলিয়া শুনা যায় না। জগন্নাথের 'বীজপদার্থ' যে অস্থি বা তৎসদৃশ দেহাবশেষ, তাহা এ যাবৎ কোনও নিরপেক্ষ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই।

(৩) ভ্রাতা-ভগ্নীর পূজা অপেক্ষা দেবতা ও তাঁহার

"শক্তি"র একত্রোপাসনা হিন্দু-ধর্ম্মে অধিক প্রচলিত বটে, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অস্তমান চন্দ্র সূর্য্যের ভগিনীরূপে পূজিত হইতেন, এরূপ কথাও শুনা যায়। মূর্ত্তি তিনটি যদি শবরগণের গ্রাম্য-দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া ঠিক হয়, তাহা হইলে হিন্দু-ধর্ম্ম এই বিচিত্রতার জন্য দায়ী হইতে পারে না। দাক্ষিণাত্যের দেবমূর্ত্তি-বিবরণ-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় কুম্ভকোণামে প্রাপ্ত যে সকল দেবমূর্ত্তির চিত্র দিয়াছেন, তাহার মধ্যে rudimentary (প্রাথমিক) ধরণের বিকটাকার মূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। জগন্নাথ, সুভদ্রা বা বলরাম এরূপ কোনও প্রাচীন গ্রাম্য দেবদেবীর অনুকৃত মূর্ত্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। কোনারকে "রামেশ্বর" প্রতিষ্ঠার যে চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জগন্নাথ, শিব ও মহিষমর্দ্দিনী একত্র সন্নিবেশিত দেখা যায়। ডাঃ ব্লক বলিয়াছেন, পূর্ব্বে বোধ হয় শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সহিত শিব ও শক্তির এইরূপ একত্র পূজার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; সম্ভবতঃ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তির পরে উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এ কথাটিও সুধিগণের বিবেচনা-সাপেক্ষ। এ-সব ছাড়িয়া দিয়া কেবল হিন্দুমতেও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পূর্ণাবতারের সহিত তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীর একত্র পূজায় যে বিশেষ কোনও রূপ বিসদৃশ অসামঞ্জস্য আছে, তাহা তো বোধ হয় না।

পুরীর বিমানটি ফার্গুসন সাহেবের মতে শোভা ও কাঠিন্য-বিবর্জ্জিত—(devoid of solidity and grace)। তাঁহার মতে, একে সৌন্দর্য্যবিহীন আকৃতি—তাহাতে আবার চূণ ও রং লেপনের জন্য আরও কুশ্রী দেখায় বলিয়া বোধ হয়। Solidity যদি দৃঢ়তা বা সংঘাত-সহন-সামর্থ্য বুঝায়, তাহা হইলে আমাদিগের ন্যায় সাধারণ দর্শকের নিকট এরূপ নিন্দার কোনও কারণ দেখা যায় না। বিমানের অবয়বটি অবশ্য লিঙ্গরাজ-মন্দিরের তুলনায় কারুকার্য্যে নিতান্ত নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু দূর হইতে সেরূপ কদর্য্য বলিয়া মনে হয় না। যে কয়টি প্রস্তর-নির্ম্মিত, সুবৃহৎ, উদগত সিংহ-মূর্ত্তি বিমান-গাত্রে গাঁথা রহিয়াছে, বিশেষ নির্ম্মাণ-কৌশল না থাকিলে, সেগুলি কোন্ দিন ভূমিসাৎ হইত!

প্রাচীনকালে বর্ণলেপনের ব্যবস্থা ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন সৌধে আধুনিক চূণের পলস্তারা ও রঙের পোঁচ মোটেই শোভা পায় না। কিন্তু আবশ্যকতার নিকট অনেক সময়েই আর্ট বা সৌন্দর্য্য-জ্ঞানকে হার মানিতে হয়। মন্দির-সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও ত অগ্রাহ্য করিবার নহে। স্থাপত্য বিদ্যায় "solids" শব্দ "voids" শব্দের বিশেষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। solids-এ বুঝায় ভিত্তি, দেওয়াল, ও গাঁথনির অবলম্ব প্রভৃতি এবং voids-এ বুঝায় দুয়ার, জানালা, খিলান, তোরণ প্রভৃতি। এই voids ও solids অর্থাৎ ফাঁক ও পাকা গাঁথনির সামঞ্জস্যের উপর সৌধাদির সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। ফার্গুসন্ সাহেব solidity শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহার করিলেও, পুরীমন্দিরের প্রতি ন্যায় বিচার হইয়াছে বলা যায় না।

সে কথা এখন থাকুক। মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া কোনারক যাত্রার আয়োজনের জন্য তাড়া পড়িয়া গেল। কোনারক পুরীধামের উত্তর-পূর্ব্বে প্রায় ১৯ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা বিছানাপত্র বাঁধা-বাঁধি করিতেছি, ইতোমধ্যে কোথা হইতে মহিষ-শৃঙ্গের খেলানা, কলম-দান, প্রভৃতি লইয়া একজন ফিরিওয়ালা আসিয়া উপস্থিত। সে শিশুদের খেলা-ঘরের উপযোগী খুব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চেয়ার টেবিল প্রভৃতির সেট দেখাইতে লাগিল। কয়েকটি লেখনী রাখিবার আধার (pen-rack) আমাদিগের নিকট বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু মূল্য শুনিয়া আর কিনিবার প্রবৃত্তি রহিল না। দু-একটি খেলানা কিনিয়া লোকটিকে বিদায় দিয়া আমরা গো-শকটের জন্য উদগ্রীব হইয়া রহিলাম। ইতোমধ্যে বন্ধুবর র—এর সরকারী জিনিস-পত্র লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করার জন্য তুন্দিল-তনু নাজির মহাশয়ের আবির্ভাব হইল। ভদ্রলোকটি উৎকলবাসী, বন্ধুবরকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া পেয়াদা মোতায়েন করিলেন। এই মুসলমান পেয়াদাটির সহিত প্রাণ খুলিয়া হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া র—যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অনেক ধস্তাধস্তি, বকাবকি, হাঙ্গামের পর পাঁচখানি শকট আসিয়া উপস্থিত হইল। শীর্ণ বলীবর্দ্দগুলির অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের প্রাণে বড় আশার সঞ্চার হইল না। কিন্তু উপায় নাই। সম্মুখে রাত্রি, আকাশে তখনও ঘোর ঘনঘটা; সেই জীর্ণ খর্জ্জুরপত্রাচ্ছাদিত গাড়ীতেই রওয়ানা হইতে হইল। উড়িষ্যার গরুর গাড়ীগুলির বড়

বিশেষত্ব নাই। বঙ্গদেশের গাড়োয়ানদিগের স্তায় উড়িয়ারা এখনও ছই বাঁধিতে শিখে নাই। চাকাগুলি অপেক্ষাকৃত হাল্কা হইলেও পরিধিতে বড় এবং নেমীও (rim) সেরূপ স্থূল নহে; সুতরাং বালির উপর দিয়া চলিয়া যাইতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। আমরা পথে মিত্র মহাশয় প্রদত্ত প্রসাদী মিষ্টান্নের সহিত কিঞ্চিৎ গরম মুড়ি ও কদলী ভক্ষণ করিয়া বৈকালিক জলযোগ নিষ্পন্ন করিলাম। কলাবিৎ শ্রীমান ভূ—কদলী ক্রয় কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিলেন। বিক্রেতার বৈবাহিক প্রভৃতি আত্মীয়গণ পুত্র সহ উপস্থিত হইলে কিরূপ অভ্যর্থনা পাইয়া থাকে, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াও ভূ-চন্দ্র কোনও সদুত্তর পাইলেন না। ইহা যে উড়িয়া ভাষারই দুর্ব্বোধ্যতা দোষে ঘটিল, সে কথা বলা বাহুল্য। প্রায় ৬।৭ টার সময় আমরা বালুঘাট নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। দোকানে চেষ্টা করিয়া খাদ্য-দ্রব্যাদি বড় পাওয়া গেল না। ভূ—নোট ভাঙ্গাইবার প্রসঙ্গে যে কোথায় সরিয়া পড়িলেন, তাহা কেহই ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে প্রায় ১ ঘণ্টা বিলম্বের পর তিনি হাস্যমুখে আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম, স্থানীয় একজন প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া তবে একখানি দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইতে সমর্থ হইয়াছেন। সহযাত্রীগিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, উড়িষ্যা যে ধনীর দেশ নহে, তাহা এই সামান্য দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তবে নোট ভাঙ্গাইতে অনেক সময় বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামেও বড় কম ভোগ ভুগিতে হয় না। রাত্রি প্রায় ২টার সময় গাড়ীগুলি বাই বাঙ্গালায় পৌছিল। গাড়োয়ানেরা পণ করিয়া বসিল, এখানে গরুগুলিকে না খাওয়াইয়া এবং নিজেরা দুটি দানা মুখে না দিয়া,—এক পদও অগ্রসর হইতে পারিবে না। অগত্যা সেখানে ঘণ্টা-দুই অপেক্ষা করিতে হইল। অধ্যাপক ক—গাড়ীর ভিতর আর বিশ্রামের সম্ভাবনা না দেখিয়া ডাক-বাঙ্গালার বারান্দায় আসিয়া একটু গা-হাত ছড়াইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু "খাটমলের" কৃপায় আরাম-কেদারাও অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে তাড়া দিয়া পুনরায় গাড়ীগুলি রওনা করা গেল; কিন্তু অন্ধকারে পথ চিনিতে না পারায় গাড়োয়ানগণ বিপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা জন দুই পদব্রজে যাইতেছিলাম। ২।৩ রশি যাইতেই উহাদের ভ্যাবাচাকা ভাব দেখিয়া মনে সন্দেহ হইল। অবশেষে ডাকবাঙ্গালার মালীর সাহায্যে জেলবোর্ডের রাস্তা চিনিয়া লইয়া আবার সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গাড়ী কয়খানি শম্বুক অপেক্ষাও মৃদু-গতিতে গমন করিতেছে দেখিয়া ক—বাবু ও আমি সারা পথ হাঁটিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। গাড়ী বহুদূরে পড়িয়া রহিল। লণ্ঠনের মৃদু আলোও আর দেখা যাইতেছিল না। পথের দুই পাশে ঝাউ আর কেয়া গাছের সারি, ও কচিৎ-কদাচিৎ এক-একটি তালবৃক্ষ। চারিদিকে মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে; কোথাও জন-মানব নাই। অন্ধকারের ভিতর দিয়া দূরবর্ত্তী বালিয়ারির রেখা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। সমুদ্রের কলকল্লোল ব্যতীত আর কোনও শব্দই শ্রুত হইতেছে না। ক—বাবুর হাতে একটি লোহা-বাঁধান পাহাড়িয়া লাঠি। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। হঠাৎ ক-বাবু বলিলেন, "দেখিয়াছেন মহাশয়, কি যেন একটা ছুটিয়া আসিতেছে?" জন্তুটি রাস্তা পার হইয়া বেগে চলিয়া গেল। দেখিয়া নেকড়ে জাতীয় শ্বাপদ বলিয়া বোধ হইল। পরে Puri Gazetteer গ্রন্থে দেখিয়াছি, এ অঞ্চলে 'হায়েনা' (Hyaena) বা তরক্ষু জাতীয় শ্বাপদাদিরও অসদ্ভাব নাই। আমরা পথে কতকগুলি জন্তুর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এগুলি গো, মেষ কি বন্য-বরাহের পদচিহ্ন, তাহাই লইয়া তর্ক উপস্থিত হইল। আমরা এরূপ ভাবে আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। ক্রমে উষার বিকাশ পূর্ব্বাকাশে সূচিত হইল। ক—বাবু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, নিশ্চয়ই নিকটে লোকালয় আছে; অদূরে কয়েকটি কুকুর রহিয়াছে, দেখিতেছি। পরে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওগুলি হরিণ—এইমাত্র পলাইয়া গেল।" পলাইবার ভঙ্গী ও পেটের তলায় সাদা রং দেখিয়া সেগুলি যে হরিণ, সে সম্বন্ধে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। আমার সঙ্গে চশমা ছিল না। হ্রস্ব-দৃষ্টি-নিবন্ধন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে গাড়ী আসিয়া পৌছিল। আমরা র—এর ভৃত্য "থাক" ও রসুয়ে ব্রাহ্মণ 'অনুকূল'কে সঙ্গে লইয়া খাবারের বাস্কেট ও টিফিন-ক্যারিয়ারটি তাহাদের হস্তে বুঝাইয়া দিয়া দলে পুষ্ট হইয়া পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। পথে দুগ্ধ-বিক্রেতারা দুগ্ধের ভার লইয়া পুরী

অভিমুখে যাইতেছিল ; তাহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, নিয়াখিয়া ("নাওয়া-খাওয়া") বলিয়া একটি লবণতোয়া নদী আছে, সেটী পার হইয়া কোনারক যাইতে হইবে ; নিয়াখিয়া হইতে কোনারক প্রায় ৮ মাইল পথ।

নিয়াখিয়া নদীতটে আমরা কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলাম। নদীর জল ঘোর লবণাক্ত ; শুনিলাম, সমুদ্রের খাঁড়ির সহিত সংযোগ আছে—রীতিমত জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে। ছোট মৎস্যের অভাব নাই। সারস জাতীয় দীর্ঘপদ একটি পক্ষী নদীর জলের উপর হাঁটিয়া হাঁটিয়া শিকার সন্ধানে ব্যস্ত আছে দেখিলাম। নদী সৈকতে—জলের কিনারার নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত—তাহাতে অসংখ্য কর্কট-শিশু আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কাঁকড়াগুলি এত ছোট যে, হঠাৎ দেখিলে বৃহদায়তন কীট বলিয়াই মনে হয়। রং প্রায় বালুকারই ন্যায় ; সুতরাং নিতান্ত নিকটে না গেলে মোটেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ভয় পাইলে পলাইবার সময় দাড়ায় দাড়ায় ঘর্ষণ বা বালুকা-কণার উপর দ্রুত-সঞ্চরণের জন্য একপ্রকার মৃদু শব্দ শ্রুত হয়। অধ্যাপক ক—পথে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; তাহাই জ্যাম্ (Jam) ও বিস্কুট সহযোগে পান করিলেন। অতঃপর আমরা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলাম। ভৃত্য ও পাচক-ব্রাহ্মণ 'মিঠা'জলের চেষ্টায় একটি কূপের অভিমুখে গমন করিল। মরুভূমির উপর কোনও রাস্তা নাই—কেবল মন্দিরের উপর লক্ষ্য রাখিয়া গাড়ীর চক্রচিহ্ন ধরিয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। মন্দিরের কৃষ্ণবর্ণ চূড়া দূর হইতে দেখা যাইতেছিল। বেলা যত বাড়িতে লাগিল, বালুকা ততই উত্তপ্ত হওয়ায় বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

চারিদিকে শুধু দিগন্ত-বিস্তৃত "বালুখণ্ড।" কোন ক্ষুদ্র জীব আসিলেও দূর হইতেই নজরে পড়ে। জন মানবের আর কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না দেখিয়া, আমরা পুনরায় চলিতে লাগিলাম। একপ্রকার লতা প্রায়ই আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। এগুলি এই বালুকা-ক্ষেত্র হইতেও রস-সঞ্চয় করিয়া সতেজে বর্দ্ধিত হইয়াছে। লতাগুলি স্থানে-স্থানে এরূপ ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, বৃন্তগুলি যেন জালের অনুকরণেই পরস্পরের সহিত এরূপ ওতপ্রোত ভাবে সম্মিলিত হইয়াছে। পরে শুনিয়াছিলাম, এগুলি Convolvulus শ্রেণীর লতা। বৎসরে অন্ততঃ ছয়মাস ইহাতে সুন্দর বেগুনী রঙের ফুল ফুটিয়া মরু-প্রকৃতির ভীষণ সৌন্দর্য্যে অপূর্ব্ব মাধুরী বিকাশ করিয়া থাকে। নিকটে একটি মৃগযূথ বিচরণ করিতেছিল। আমাদিগকে দেখিয়া কি সুন্দর ভঙ্গীতে লম্ফ প্রদান করিতে-করিতে তাহারা দূরে চলিয়া গেল। এ হরিণগুলি চিতাল জাতীয়। প্রত্যেক যূথের সহিত এক-একটি করিয়া পুংজাতীয় হরিণ থাকে ; সেটি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চাৎ দিকে কতকটা শাদা। অপর হরিণগুলি পাটল রঙ্গের, গায়ে শাদা-শাদা ছিটা-ফোটা দাগ। হরিণগুলির খেলা দেখিতে-দেখিতে আমাদের কতকটা ক্লান্তি দূর হইল ; কিন্তু পথ যেন আর ফুরায় না। যতই অগ্রসর হই, মন্দিরও যেন ততই পিছাইয়া যায়। এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি Sand-grouse জাতীয় পক্ষী বিচরণ করিতেছে। এগুলি সাধারণ গৃহপালিত কুক্কুট অপেক্ষা বড় বলিয়াই বোধ হইল। বুঝিলাম, কোনারকের কথা শুনিয়া কি জন্য বন্ধুবর—সেন মহাশয় বন্দুক লইয়া সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব মেঘান্তরে আত্মগোপন করিলেও উত্তাপ জনিত কষ্টের অবধি ছিল না। আবার কয়েকটি হরিণ দেখা গেল। এগুলিও সেই চিতাল শ্রেণীর। উদয়গিরির খোদিত গুহায় এই জাতীয় হরিণের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিয়াছি। কেবল প্রভেদ এই যে, উহার পৃষ্ঠদেশে দুইটি পক্ষ সংযোজন করা। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া কোনারকে পহুঁছিলাম। র—আমাদিগের খোঁজের জন্য স্থানীয় পূর্ত্তবিভাগের একজন চাপরাসী পাঠাইয়াছিলেন। সেই লোকটি আমাদিগকে বিশ্রামের স্থানে লইয়া গেল। বন্ধুবৎসল র—ইতোমধ্যেই আয়োজন বড় কম করেন নাই। দেখিলাম দুগ্ধ, জলে ভিজান ঠাণ্ডা ডাব এবং Lime juice cordial প্রভৃতি নানারূপ ক্লান্তিহর পানীয়ের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেগুলির সদ্ব্যবহার করিয়া স্নানান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরেই স্থানীয় একজন পাণ্ডা র—এর উপদেশ মত অন্ন লইয়া আসিল। দাইল, শাক, মোটা তণ্ডুলের অন্ন আর যথেষ্ট পরিমাণ গব্য ঘৃত। তাহাই যেন অমৃতোপম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে পাচক ও ভৃত্য আসিয়া পৌঁছিল। শুনিলাম জল তুলিতে গিয়া তাহাদের পাত্র কূপে পড়িয়া যায় ; তাই তাহাদের আসিতে এত অধিক বিলম্ব

হইয়াছে। বেলা ৪॥০ সময় মিত্র মহাশয়, শ্রীমান ভূ—ও মুন্সিজী আসিয়া পৌঁছিলেন,—তাঁহাদের জন্যও অন্ন প্রস্তুত ছিল। অপরাহ্নে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; আমাদের আর মন্দির দেখিতে যাওয়া হইল না। সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত। আহারাদির পর আর নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

পথের কথা এই স্থানেই শেষ হইল; কোনারকের আসল কথা এখনই আরম্ভ করিলে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার উপর বিষম অত্যাচার করা হইবে। অতএব আগামী সংখ্যার জন্য তাহা রাখিয়া দিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সাড়ে চৌদ্দ আনা

[শ্রীসুহাসিনী দত্ত]

(১)

রাত্রিতে রামসদয় বাবু আহার করিতে বসিয়াছেন। পত্নী কাদম্বিনী পরিবেশন করিতেছেন; কন্যা কমলা তাহার ছোট হাত দুটী দিয়া মাতাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। রামসদয় বাবু আহার করিতে বসিয়াই গম্ভীরভাবে নিজের কর্ত্তব্যে মনঃসংযোগ করিলেন।

পত্নী কাদম্বিনী স্বামীকে বলিলেন, "দেখ, আমার একটা কথা আছে,—খেয়ে উঠেই কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে প'ড় না,—বুঝলে?" কর্ত্তা মহাশয় মুখ না তুলিয়াই একটা "হুঁ" বলিয়া ক্ষান্ত রহিলেন। রামসদয় বাবুর ভোজন শেষ হইলে, মাতা ও কন্যা তাড়াতাড়ি "রান্নাঘরের" কায শেষ করিয়া শয়নঘরে গিয়া দেখিলেন যে, স্বামী অকাতরে নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। কাদম্বিনী যারপরনাই ক্ষুব্ধ হইলেন। ঘুম না ভাঙ্গিলে তাঁহার কথা বলা হয় না, সুতরাং ঘুম ভাঙ্গাইতেই হইবে। স্বামীর পায়ে হাত দিয়া একটু নাড়া দিতেই তিনি জাগিয়া উঠিলেন। "কি গিন্নি! খবর কি?" গিন্নী বলিলেন, "আর খবর! আমার কথা শোনে কে? বল্লুম একটু পরে ঘুমিও, তা আর তর সইলো না।" "তা' অত চটো কেন? আপিসে ত সাহেবের বকুনি খেতে-খেতে প্রাণ যায়-যায় হয়; আর যদি-বা রাত্তিরটা বাড়ী থাকি, তাতেও শান্তি নাই। গিন্নি! আফিসের কায যদি করতে তবে বুঝতে পারতে কি রকম খাটুনি!"

গিন্নী নথ দোলাইয়া বলিলেন, "বলি, আমরা কি আর খাটি না? পালঙ্কের উপর বসিয়ে রেখে খেতে দাও, না? এত শীতে, রাত ৫টার সময় উঠি, আবার রাত ১০।১১টার সময় ঘরে আসি। দুবেলা রান্না করতে হয়। এ-সব কায তোমরা এসে—" রামসদয় বাবু বলিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে, এখন একবার কাজের কথাটা পাড়ুন!" "বলি, মেয়ের কি বিয়ে-টিয়ে দেবে? বয়েস ত ১২।১৩ বছর হতে চল্‌লো, সেদিকে হিসেব আছে?" "ওঃ! এই কথা! তার আর কি! চেষ্টা চরিত্তির কর। আর মেয়ে ত এখনও ছোট। ও-পাড়ার শ্যাম বোসের মেয়ের বিয়ে হয়েছে ষোল বছরে; ক্ষেত্র মিত্তিরের ভাগিনীর বিয়ে হয়েছে ১৭।১৮ বছরের কম নয়।" "তা তুমিও কি কুড়ি বছর ক'রে দেবে না কি!" "দেখ, সত্য কথা বলতে কি, আমি যে চেষ্টা না করছি তা নয়; তবে কি জান—৫০৲ টাকা মাইনে পাই,—আর যা' পাই তোমার কাছেই এনে দিই; এই মাইনেতে সংসার খরচ চালানোই ভার, তার উপর দুটী মেয়ে, কি দিয়ে কি যে করি, তাই ঠিক করতে পারি না—অন্ততঃ মোটা-ভাত মোটা-কাপড় পায়, এমন ঘরে ত দিতে হবে। আজ-কাল ছেলের যে দর তা ত নিজের চক্ষেই দেখতে পাচ্ছ। একটা পাশ করা ছেলে আনতে গেলে কম পক্ষে দুটী হাজার টাকা চাই। তার উপর বিয়ের খরচ—আমার যে কি শক্তি আছে, তা' ভগবানই জানেন।" স্বামীর কথা শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন, "না, অত ভাবতে হবে না,—ভগবান যা করেন তাই হবে। আর আমার মেয়ে ত দেখতে কুৎসিত নয়। তা' আমি একটি ছেলের কথা বলতে পারি, তাঁদের তুমিও বেশ চেন।" "সত্যি না কি? কে বল ত শুনি।"

"এই আমাদের রাজেনের সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না? ছেলেটি বেশ ভাল। আর ওদের দুটীতেও বেশ মিল আছে।"

"কোন্ রাজেন ?" "যেন স্বর্গে থেকে পড়লেন, কিছুই জানেন না ! এই রাজেন চৌধুরী, যতীন চৌধুরীর ছোট ভাই, এম্-এ পাশ করেছে, এই মাঘ মাসে পরীক্ষা দিয়ে উকীল হবে ! এখন চিন্‌তে পার্‌লে !" "ও ! আমাদের রাজেন ? এতেই ত শাস্ত্রে বলে—স্ত্রীলোকের বুদ্ধি—" "বলি স্ত্রীলোকের বুদ্ধির দোষটা কি হ'ল ! নিজে ত কিছু কর্‌তে পাচ্ছ না ; তা' আমি একটা বল্‌লুম, তাও পছন্দ হয় না।" "পছন্দ হবে না কেন ? তারা কি আমার মত গরীবের সঙ্গে কুটুম্বিতা কর্‌বে ? আমাদের এমন সৌভাগ্য হবে কি ?"

"রাজেনের বড় ভাইয়ের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ পরিচয় আছে, তাঁকে গিয়ে ধরে পড় ; যার মেয়ে আছে, তার ঘরে বসে থাকলে চলে না। আর রাজেন যদি এ-কথা শুনতে পায়, তবে সে কখনও অমত করবে না। এই আমাদের বাড়ী এসে, নিজের মার মত আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে ; এত অল্প বয়সে সমস্ত পড়া পাশ করে ফেলেছে। যেমন দেখ্‌তে, তেমনি গুণে। সেদিন রাজেনের বৌদিদি বল্‌ছিল, 'কি রকম করে চুল ফিরুতে হয়, রাজেন তা' জানে না,—এমনি সাদাসিধে।' কম্‌লিকেও ভালবাসে বোধ হয়,—কলকেতা থেকে কত রকমের বই এনে কম্‌লিকে দেয়।" "আচ্ছা, তুমি যখন বল্‌ছ—চেষ্টা করে দেখ্‌ব। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, ছেলেটা sentimental,—কিছুতেই বিয়ে কর্‌তে চায় না।" "ও সমস্ত 'এন্টাল মেণ্টাল' বুঝি না, আমরা অত লেখাপড়া জানি না, সাদা কথায় বল।" "রাজেন বলে যে, বিয়ে করলে তার কোন স্বাধীনতা থাক্‌বে না,—সেবা সমিতির কাজ করতে পারবে না,—এই তার ধারণা।" "তুমি গিয়ে একটু চেষ্টা ক'রে দেখ না ? তার পর যা হ'বার হবে।"

(২)

রবিবার সকালবেলা রামসদয় বাবু যতীনবাবুর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মাঝে-মাঝে তাঁহার প্রাণে আশার আলো উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে, আবার পরক্ষণেই তিনি নিরাশার গভীর অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছেন। যতীন বাবু বাগানে পায়চারী করিতেছেন, এমন সময়ে রামসদয় বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতি-নমস্কারের পর যতীনবাবু রামসদয়ের এত সকালে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামসদয় বাবুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল। শেষে আত্মসংযম করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, মেয়ের বিয়ের জন্য বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়েছি ! এমন একটী বিবাহ সম্বন্ধ পাই না, যার জন্য একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি। তার পর ছেলের যে দর, তা ত আমার মত গরীব লোকের পক্ষে আকাশ কুসুম। কি যে কর্ব্ব, কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। পূর্ব্বে আমরা ৫।৭ ভরি সোনা, ২০।২৫ ভরি রৌপা পেয়ে বিবাহ করেছি ; আর এখন সেই হিসেবে আকাশ পাতাল প্রভেদ।"

যতীনবাবু উত্তরে বলিলেন, "তুমি যা' বল্লে, তা' সবই ঠিক, কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে। আজকাল একটী ছেলের মা বাপ কত কষ্ট সহ্য ক'রে, কত টাকা পয়সা খরচ ক'রে, এমন কি ঋণগ্রস্ত হ'য়ে তাদের ছেলেকে লেখা-পড়া শেখায়—তার পর মেয়ের বাপ যখন শোনে যে, সেই ছেলের বিয়ে হবে, তখন চারিদিক হতে শত শত খরিদদার এসে পড়ে। ভাল ছেলেকে সবাই পছন্দ করে, সবাই নিতে চায়। তোমরা মেয়ের বাপ ছেলের দর হাঁকতে আরম্ভ কর, আর তখন ছেলের বাপ যেখানে দুটো টাকা বেশী পায়, সেইখানেই যায়। তাদের ত রক্ত-মাংসের শরীর ; এত বড় লোভ সংবরণ করা তোমার আমার কার্য্য নয়। তোমরাই তাদের লোভ বাড়াও।" রামসদয়ের পূর্ব্বে যতটুকু আশা ছিল, যতীনবাবুর কথায় তাহার লেশমাত্র রহিল না। যতীনবাবুর কথায় বেশ বুঝা গেল, তাঁহার ভ্রাতার বিবাহে তিনি নিশ্চয়ই টাকা লইবেন। ভাবিলেন, তাঁহার নিজের কথা কিছু পাড়িবেন কি না,—বলিলেই বা লাভ কি ? আবার ভাবিলেন, একবার চেষ্টা করিতে দোষ কি ?

রামসদয় বলিলেন—"তবে ভাই আমরা যাই কোথা ? আমাদের মত গরীবের মেয়ের কি আর বিয়ে হবে না ? আমাদের এমন টাকা-পয়সা নাই যে দিয়ে-থুয়ে বিয়ে দিতে পারি। আমরা তা' হ'লে কি করব ?" "আমি তোমার বিষয় চিন্তা করেছি, কিন্তু কোনও সুবিধা করতে পারি নাই। কিছু টাকা পয়সা না খরচ ক'রে যে পার, এমন আমার বোধ হয় না। আর দেখ, সব দেশেরই আইনে আছে, মেয়েরা মাতা-পিতার সম্পত্তির কিছু অংশ পাবেই, এক আমাদের দেশে তা' নয়। আমাদের দেশে যা' বিয়ের সময় খরচ ; তার পর সব সম্পত্তি, টাকা-পয়সা ছেলে পাবে।

মেয়ে যেন কেউ নয়, যেন ভেসে এসেছে, ভেসে চলে যাবে। বেশী ভাগ ছেলেকে দেও, তাতে আপত্তি নাই,—কিন্তু মেয়েকে একেবারে বঞ্চিত করো না। এ বিষয় সকলেরই একবার ভাবা উচিত। অবশ্য যার টাকা-পয়সা আছে, তিনি তাঁর মেয়ের বিবাহে টাকা পয়সা খরচ করেন, কিন্তু তাঁর সম্পত্তির তুলনায় তা কিছু নয়।"

"আজ একটা কথা বল্‌বার জন্য তোমার কাছে এসেছি; যদি অভয় দেও, তবে বল্‌তে পারি।"

"আমার কাছে বলবে, তাতে ভয় আর অভয় কি! তুমি বলে ফেল।" "দেখ, আমার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা যে, তোমার ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিবাহ দিই। তা' তোমরা ত কমলিকে দেখেছ, দেখ্‌তে বোধ হয় মন্দ নয়।" যতীনবাবু "হো হো" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তুমি এর জন্যই এত সকালে এসেছ। কিন্তু কথা হচ্ছে—রাজেন বিয়েই কর্ত্তে চায় না, তার আমি কি করব, কিছুই বুঝ্‌তে পারি না; আমি এত বলেছি, তা' কিছুতেই স্বীকার পায় না, এমন একগুঁয়ে। তোমাকে ত রাজেনের কথা সেদিনও বলেছি, তোমরা সবাই জান। যাক্, এখন তোমার কথা। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে আমার কোনই আপত্তি নাই; আর তোমার মেয়ে বেশ লক্ষ্মী মেয়ে। তা যাক্, তুমি যখন বলছ, আমার স্ত্রীকে দিয়ে একবার শেষ চেষ্টা করব। রাজেন আমার স্ত্রীর বড় বাধ্য—সেই ওকে মানুষ করেছে, সেই ওর সব—তাও তোমরা জানই। দেখি, যদি মত করাতে পারি।" "কিন্তু ভাই, আমি টাকা পয়সা কিছুই দিতে পারব না, আমার অবস্থা ত তোমরা ভালই জান।" "তা' আর জানিনে! সেজন্যও তোমার বিশেষ চিন্তা করতে হবে না, আমি তোমার কাছে বেশী কিছু চাই না—যা অন্য লোকে দেবে বলেছে, তার থেকেও তুমি কিছু কম দিও। সে কথা থাক্, আগে রাজেনের মত করি, তার পর ও বিষয়ে কথাবার্ত্তা হবে।" রামসদয় পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিলেন যে এখানে কোন আশা নাই; এখন সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া নিজগৃহে গমন করিলেন।

(৩)

"রাজু! তোমাদের পরীক্ষে কবে থেকে হবে?" "এই ত এসে পড়েছে বৌদিদি,—১৭ই জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হবে।"

রাজেন্দ্রনাথ পড়িবার ঘরে বসিয়া আছেন,—তাঁহার বৌদিদি স্নেহময়ী আসিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্নেহময়ী রাজেনকে "রাজু, ঠাকুরপো, রাজেন" বলিয়া ডাকিতেন, আবার রাজেনও তাহাকে "বৌদিদি, বৌমা, মা" বলিতেন। "ঠাকুরপো! তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে; রেতে খাওয়া-দাওয়ার পর বলব। বুঝলে, মনে থাকে যেন।" "এখন বল না কেন বৌদিদি? কি কথা!" "না, এখন না" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পড়িয়া রাজেন আহার করিতে আসিয়াছে, বলিলেন, "কি বৌদি, কি বল্‌বে বলেছিলে, বল না।" "তুমি খেয়ে ওঠ, তার পর বলব।" আহারের পর রাজেন তাঁহার শয়নঘরে আসিলে, স্নেহময়ী পান লইয়া উপস্থিত হইলেন। "তুমি আগে খেয়ে এস না, তার পর তোমার কথা শুনব।" "আমি একটু পরে খাব। আজ তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করতে এসেছি।" "আমাকে? আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ? তা' বেশ বল।" "আমাদের সকলের ইচ্ছে যে তুমি এখন একটা বিয়ে কর।" রাজেন হঠাৎ এই কথা বৌদিদির মুখে শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। স্নেহময়ী বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বড়ই দুঃখ হইল।

"ছি, ঠাকুরপো! আমি একটা কথা প্রাণের সহিত বললাম, আর তুমি হেসে উড়িয়ে দিলে। তোমার একটু লজ্জা করে না? মনে ভেবেছিলুম, লেখাপড়া শিখেছ, বিদ্যাবুদ্ধি হয়েছে!" রাজেন বলিলেন—"তা' রাগ কেন কর বৌদিদি! তোমার কোন্ কথা আমি শুনি নাই বৌদিদি। দাদাও কয়েক দিন আমার কাছে এ বিষয় উত্থাপন করেছিলেন। তাঁকে আমি বলেছি যে, বি-এল পাশ না ক'রে আমি কিছু বল্‌তে পারি না,—আর এ বিষয়ে এখনও কিছু চিন্তা করি নাই।"

"তা' বেশ করেছ। আমরা মরলে পর চিন্তা করলেই চল্‌বে। তখন তুমি বিয়ে কর আর না কর, কেউ দেখ্‌তে আসবে না। এই সংসারে এগারো বছরের সময় এসেছিলুম, তার একবৎসর পরে তোমার মা তোমাকে আট মাসের ক'রে আমার হাতে দিয়ে স্বর্গে গেলেন। ব'লে গিয়েছিলেন, 'তোমাকে দিয়ে গেলুম, তুমি একে নিজের ছেলের মতন

মানুষ ক'রো। তখনও সংসার কাকে বলে বুঝতুম না, স্বামী কাকে বলে ভাল করে জানতুম না। তবু তোমাকে হাত পেতে নিয়েছিলুম। সেই থেকে ২৩ বছর পর্য্যন্ত মানুষ করেছি। আমার নিজের সন্তান নেই। নিজের ছেলেকে কেউ এর চেয়ে বেশী কিছু করতে পারে কি না, জানি না। বুকের রক্ত দিয়ে তোমাকে মানুষ করেছি। সে কথা তুমি বুঝবে না,—যার ছেলে মেয়ে হয়েছে, সে বুঝতে পারবে। আজ তুমি বড় হয়েছ, আজ তোমার যা' ইচ্ছে তাই করতে পার। তুমি এখন উড়তে শিখেছ; এখন আর আমাদের কথা শুনবে কেন? কিন্তু এমন এক দিন ছিল, যখন আমি না হ'লে এক মিনিট চলতো না, তখন আমি যে দিকে চালাতাম, সেই দিকে চলতে হতো। তখন খাবার সময় পেতুম না; তবু, তখন শুধু কাজ ছিল, শুধু চেষ্টা ছিল,—কি ক'রে তোমায় বাচাব। এখন তোমার উপর আমার কোন অধিকার নেই। কিন্তু একদিন ছিল। তোমার মা থাকলে কোন কথা বলিতে পারতে না; তখন বলতে পারতে না যে, 'আমি এখনও চিন্তা করি নি, অথবা বিয়ে করলে কোন কাজ করতে পারব না, স্বাধীনতা থাকবে না।' এখন আমি পর, আমার কথা শুনবে কেন? তুমি বলবে 'আমি বিয়ে করলে তোমার লাভ কি!' সে কথা তুমি বুঝবে না। যদি স্ত্রীলোক হতে, ছেলে মেয়ে হত, তবে বুঝতে পারতে। তা' কথায় বলা যায় না। আজ তাই জিজ্ঞেস্ করতে এসেছি,—যা' বলবার বলে ফেল, তার পর——" আর বলিতে পারিলেন না, টপ্ টপ্ চোখের জল পড়িতে লাগিল।

রাজেনও আর থাকিতে পারিলেন না, বিছানা থেকে নামিয়া বৌদিদিকে জড়াইয়া ধরিলেন—বলিলেন, "বৌদিদি! তুমি আমায় অভিশাপ দিচ্ছ। তুমি যা' বলবে, আমি তাই শুনবো।" এই বলিয়াই সে স্নেহময়ীর বুকে মুখ লুকাইল; আর কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। দুজনেই নীরব। কিছুক্ষণ পরে রাজেন বলিলেন, "বৌদিদি! তুমি শুতে যাও।" "যাচ্ছি; তা'হলে বিয়ে করবি বল্, আমায় ছুঁয়ে বল্।" "কিন্তু একটা কথা—টাকা-পয়সা কিছু নিতে পারবে না।" "সে ভার আমার উপর! এত লেখাপড়া শিখিয়েছি, তা' তারা কিছুই দেবে না! তবে আমরা কিছুই চাইব না। ও-বাড়ীর কমলীকে তোর পছন্দ হয়? বেশ মেয়েটা। তুইও ত ওকে দেখেছিস্। কালকে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল; আমি ঠাট্টা করে বললুম, 'কমলি, আমাদের রাজেনকে বিয়ে করবি?' কমলি বল্লে, 'তুমি যদি এ রকম কর, তা'হলে আর তোমাদের বাড়ী আসব না'। কমলাকে বিয়ে করবি, বাড়ীর কাছে আছে, আমি ঠিক ক'রে ফেলি।" "তা' আমি জানি না, তোমার যা' ইচ্ছা তাই করতে পার।" "তুমি এখন ঘুমোও, আমি মশারি ফেলে দিয়ে যাই।" তিনি মশারি ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

যতীন বাবু রামসদয় বাবুর বাড়ী যাইয়া বলিয়া আসিলেন যে, রাজেনের বিবাহ করিতে মত আছে। আগামী রবিবার এ বিষয় ঠিক করা যাইবে। রামসদয় বাবু বুঝিয়াছেন, এ সম্বন্ধ কিছুতেই হইবে না। কিন্তু ভদ্রলোককে যখন নিজে তাহার বাড়ী যাইয়া নিজের অবস্থা জানাইয়া আসিয়াছেন, তখন একবার যাইতেই হইবে। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ নিরাশ। রাজেনের মত ভাল ছেলেকে অনেকেই অনেক টাকা দিয়ে বিয়ে দেবে, আর যতীন বাবুও তাহার মেয়েকে লইয়া এতটা স্বার্থত্যাগ করিতে পারিবেন না।

রবিবার অপরাহ্নে যতীন বাবুর বৈঠকখানায় সভাধিবেশন হইল। যতীন বাবুর আহ্বানে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু সভা আলো করিয়া বসিয়াছেন। রামসদয় বাবু তাঁহার সর্ব্বভয়াপহারী বন্ধুবর্গসহ সভায় আসন গ্রহণ করিলেন। যতীন বাবুর বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন দেনা পাওনার কথা পাড়িলেন। বলিলেন, "কি জানেন মশাই, আপনার সঙ্গে যখন কুটুম্বিতা করিতে হইতেছে, তখন দেনা পাওনার কথা তোলাই বাহুল্য। তবে কি জানেন,—একটা প্রথা আছে, সেইজন্যই কথাটা পাড়া।"

রামসদয় বাবু বলিলেন, "অবশ্য, প্রথা যা' আছে, তা' মানিতে হইবে বই কি। কন্যাদান করিতে হইলেই গহনা-পণ, যৌতুক এ সকল দিতেই হয়, এ ত আর নূতন কথা নয়!" রামসদয়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত বক্তা বলিলেন, "আর মশাই, গহনা পণের কথা তুলিবেন না। কি সময়ই পড়েছে! এখন মেয়েছেলের বিবাহ দেওয়াই দায়। আমরাও ত বিবাহ করিয়াছি, আমাদের সময় এত হাঙ্গামা-হুজ্জুত ছিল না। আর এখন! কি বলেন মশাই? আর এখন মেয়ের বাপকে পথে বসাতে হয়। আটিশ

হাজার টাকা নগদ, চুড়ী সুট গয়না, বরের সোণার ঘড়ি-চেন, খাট-বিছানা, দান-সামগ্রী, আসবাবপত্র, দুচাকার গাড়ী, মোটর গাড়ী, এখনকার যা' যা' সব হয়েছে, সকল নামগুলাও আবার আমরা জানি না,—এ সকল দিতে না পারলে মেয়ের বিয়ে হয় না।"

রামসদয় বাবুর বন্ধুবর্গের মধ্যে একজন একটু স্পষ্ট-বক্তা ছিলেন। তিনি বলিলেন "এটাই কি যতীন বাবুর ফর্দ্দ না কি?" যতীনবাবুর বন্ধুটি বলিলেন, "আরে রাম! অমন কথা বলবেন না। আমাদের যতীন তেমন লোকই ন'ন। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁর অভাব কি? বিয়ের উপলক্ষ করে' এ রকম বুকে ছুরি দিয়ে আদায় করা কি ভদ্রলোকের কায! এটা ত চামারের কায। আমাদের যতীন ভায়ের বিয়ে দিয়ে বড়মানুষ হবেন, এমন দরিদ্র অবস্থা এঁর নয়। এঁর যা' আছে, তাই খায় কে।" রামসদয় বাবুর পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি বলিলেন, "তবে ফর্দ্দটা বাহির করুন না, যতীন বাবুর আঁচটা একবার দেখাই যাক্।" যতীনবাবু এইবার নিজে বলিলেন, "অবশ্য, যখন কথাবার্ত্তা স্থির করিতে হইবে, তখন ফর্দ্দ পাইবেন বই কি! তবে ফর্দ্দটা আমার হাতে নাই। আমি প্রস্তুত করি নাই। রাজেনের উপর আমার চেয়ে আমার স্ত্রীরই দাবী দাওয়া অনেক বেশী। সে-ই ওকে মানুষ করেছে। যা' যা' দিতে হবে, সে সব বাড়ীর মেয়েরা স্থির করে' দেবেন বলে' ফর্দ্দ প্রস্তুতের ভার তাঁরাই নিয়েছেন। আমি একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে ফর্দ্দ এনে দিচ্ছি।" এই বলিয়া যতীনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন।

অৰ্দ্ধঘণ্টা পরে যতীনবাবু বড় একটা 'বালির-কাগজে' ঠিকুজী কুষ্ঠির মত করিয়া পাকানো একখানি ফর্দ্দ আনিলেন। এই অৰ্দ্ধঘণ্টা কাল রামসদয়ের পক্ষে এক যুগ বলিয়া বোধ হইল। যতীনবাবুর হাতে ফর্দ্দ থাকিতেই রামসদয়ের আত্মাপুরুষ চমকিয়া উঠিল। তাঁহার মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্রনাথকে জামাতৃপদে বরণ করার আশাও জন্মের মত অন্তর্হিত হইল।

যতীন বাবু পাকানো ফর্দ্দখানি রামসদয় বাবুর হাতে দিলেন। রামসদয় কম্পিত হস্তে গ্রহণ করিলেন। বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। যেন কাগজটুকুতে তাঁহার জীবন মরণ আছে। একবার ইচ্ছা হইল খুলিয়া পড়েন, আবার ভাবিলেন—না, পড়িবার কোন দরকার নাই। যেখানে মোটর-গাড়ীর কথা, সেখানে ৫০৲ টাকা মাইনের কেরাণীর যাতায়াত নিষেধ। এখানে আসাই নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে। যাক্, যখন আসিয়াছি, তখন একবার পড়িয়া দেখি। একটু একটু করিয়া ফর্দ্দখানি খুলিতে আরম্ভ করিলেন; অবশেষে কাগজখানি একেবারে খুলিয়া ফেলিলেন। চক্ষে ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিলেন; একবার পড়িলেন—বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মনে ভাবিলেন—পড়িতে ভুল হইয়াছে। ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া আবার পড়িলেন—দেখিলেন—লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে একপাশে জিনিসের নাম, অন্য পাশে তাহাদের আনুমানিক মূল্য দেওয়া রহিয়াছে। তৃতীয় বার পড়িলেন, সেবার আর অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না,—বড় বড় বাঁকা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

জিনিসের নাম—			মূল্য —
রাঙা শাখা —			
(১ যোড়া)	...	...	।।০
(ভাল) চীনের সিন্দূর —			
(১ খান)	...	...	।০
হাতের নোয়া—			
(১ গাছা)	...	...	৶১০
			মোট—৸৶১০

রামসদয় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এও কি সম্ভব? যতীন বাবুকে বলিলেন, "এ কি যতীন! আমি ত কিছুই বুঝতে পারলুম না, আমাকে বুঝাইয়া দেও ভাই।" "রাজেনের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে হলে, সাড়ে চৌদ্দ আনা পয়সা খরচ করতেই হবে, এর কম হ'লে আমরা কিছুতেই পারব না, আর এর বেশী একটা পয়সা দিলেও নেব না। এখন তোমাদের মত কি বল।"

রামসদয় বাবু আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন "ভাই, তুমিই আমার জাত-মান রক্ষা করলে, তোমাকে কি বলে আশীর্ব্বাদ করব জানি না।"

তার পর,——তার পর আর কি? বিবাহ হইয়া গেল। যতীন বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই লইলেন—এক পয়সারও বেশী জিনিস নয়—সেই সাড়ে চৌদ্দ আনা।

"বৈষ্ণব কবিতা"-বিচার

[শ্রীধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ]

গত শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তীর "বৈষ্ণব কবিতার" সমালোচনা বাহির হইয়াছে। এমন অসংলগ্ন প্রবন্ধ বহুদিন বঙ্গ-সাহিত্যে পাঠ করি নাই। অজিত বাবুর রচনার তুলনা কেবল তাঁহারই রচনার সহিত করা যাইতে পারে। শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, তাহাতে গেটে, হায়েন, শ্লিগেল, শিলার হইতে কিপ্লিং, ব্রিজেস, মায় হুইটম্যান্ সকলই থাকে; থাকে না কেবল তিনি যাহা বলিবার জন্য ভূমিকা করেন, তাহা। যুক্তি-সিদ্ধান্তে চতুর্থ শ্রেণীর জ্যামিতির ছাত্রও তাঁহার নিকট পরাজিত হয়। পাঠক, একবার সামঞ্জস্যের বহরটা দেখুন। বৈষ্ণব কবিতার বাৎসল্য-রস প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—"এ রসে অবশ্য বাঙ্গালীর জিৎ, তাহা মানিতেই হইবে। খৃষ্টান দেশের আর্টে ম্যাডোনা ও বাল যিশুর ছবিতে, Vicarious Motherhoodএর সাধনায় বাৎসল্য রসের পরিচয় পাওয়া গেলেও, কোনও দেশেই বাৎসল্য-রসের এমন একান্ত প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই না।" কিন্তু এ জিৎ পরে তিনি নিজেই অস্বীকার করিতেছেন। "সামান্য কবি Coventry Pantmokএর Toys কবিতার মধ্যে, বা George Macdonaldএর The Baby কবিতার মধ্যে, বা Willam Blakeএর Songs of Innocenceএর মধ্যে, অথবা R. L. Stevensonএর A Child's Garden of Versesএর মধ্যে যে বাৎসল্য-রস পাওয়া যায়, তাহা সমস্ত পদাবলী ঘাঁটিলেও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।" এইরূপ উদাহরণ সর্ব্বত্র। আমরা স্থানান্তরে তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিব।

সমালোচক মহাশয়ের উদ্দেশ্য কি? তিনি কি বলিতে চান? বৈষ্ণব কবিতায় রস নাই? তিনি রস কাহাকে বলেন ও রস বলিতে কি বুঝেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন কি? আমাদের বোধ হয়, বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে, তাঁহার একবার ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিলে ভাল হইত, নিজের ভিতর রসজ্ঞতা সম্বন্ধে কোনও গলদ্ আছে কি না। আমরা বঙ্গের আপামর পাঠক-সাধারণকে তাঁহার রসগ্রাহিতার বিচারক হইবার জন্য আহ্বান করিতেছি।

William Blakeএর নাম বঙ্গের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ ত পরের কথা, ইংরাজী-শিক্ষার্থী বালক-সমাজেও অপরিচিত নহে। সকলেই জানেন, শিশু-প্রকৃতির সহিত একটা উদার সহানুভূতি তাঁহার কবিতার প্রধান লক্ষণ। নিম্নশ্রেণীর জীব-প্রকৃতির ভিতর যে একটা নিরীহ সরল শিশু ভাব আছে, তিনি তাহাই প্রীতির চক্ষে দেখিয়া আপনার কবিতার মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয়তার দিকও যে নাই, তাহা নহে। Blake আপনার কবিতার পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, একদিন তিনি এক সমতল ক্ষেত্রের উপর বসিয়া, মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে তাহারই রসে বিভোর হইয়া আছেন, এমন সময় মেঘের মধ্য হইতে এক শিশু আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিল,

"Pipe a song about a lamb!"
So I piped with merry cheer,
'Piper, pipe that song again:
So I piped: he wept to hear."

তাহার পর শিশু বলিল;—

"Piper, sit thee down and write
In a book that all may read,"

এবং এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিত হইল। সেই হইতে তিনি এমন সব গান লিখিয়া আসিতেছেন, যাহাতে

"Every child may joy to hear."

এই ত গেল Blakeএর কবিতা রচনার ইতিহাস; এবং আমরাও জানি তাঁহার সুমধুর "The lamb" "The Echoing Green" "The Black Boy" ইত্যাদি কবিতাগুলি শিশু-সমাজে অতি সমাদরের সহিত পঠিত হয়। অজিত বাবুর মতে এই সমস্ত কবিতা, বাৎসল্য-রসের কবিতা। তিনি বলেন Blakeএর (ও অন্য-অন্য ইংরাজ কবির—আমরা হাতের কাছে Blake পাইলাম বলিয়া

Blakeই লইলাম) কবিতার মধ্যে যে বাৎসল্য-রস আছে, তাহা বৈষ্ণব-কবিতার কোথাও পাওয়া যায় না। আমরা পাঠকগণের বোধ-সৌকর্য্যার্থে Blakeএর কবিতা হইতে তথা-কথিত বাৎসল্য-রসের কতকটা নমুনা না তুলিয়া দিয়া থাকিতে পারিলাম না। মাতা দ্বিপ্রহরে গাছের ছায়ায় তাঁহার শিশুটীকে কোলের উপর বসাইয়া আকাশের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিতেছেন :—

"Look on the rising sun ; there God doth live
And gives His light, and gives His heat away ইত্যাদি

এই কি বাৎসল্য-রস? অজিত বাবু যদি ইহাকে বাৎসল্য-রস বলেন, তাহা হইলে বলিব, তিনি বাৎসল্য-রসের কিছুই জানেন না, এবং এই নিগূঢ় রস-তত্ত্ব না জানিয়া বৈষ্ণব কবিতা সমালোচনা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছে। মাতাপুত্রের উল্লেখ বা শিশুর সম্পর্ক মাত্র থাকিলেই যদি বাৎসল্য রস হইত, তাহা হইলে মাতা বলিলেন—'বাছা বাজার হইতে আধ পয়সার চিংড়ি মাছ কিনিয়া লইয়া আইস'। এই বাক্যটী বা "Little bird, little bird, come to me," ইত্যাদি কবিতাটিকেও ত বাৎসল্য রসের উদাহরণ স্বরূপ ধরিতে পারা যাইত। কিন্তু অজিত বাবু নিশ্চয়ই এগুলিকে বাৎসল্য রস বলিবেন না।

বৈষ্ণব কবিতার সমালোচনা করা হইল, তাহার অপকর্ষতা নির্ণীত হইল, চূড়ান্ত বিচারে "ব্যস্, এই পর্য্যন্ত, তাহার বেশী নয়।" ইত্যাদি ভাষায় তাহার রায় প্রকাশ হইল. এক কথায় সাতকাণ্ড রামায়ণ সবই শেষ হইয়া গেল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত "সীতে কার ভাজ্‌জা ছিল?" তাহাই ঠিক হইল না। লেখক বৈষ্ণব-কবিতা সম্বন্ধে যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিয়া চুকাইয়া দিলেন, অথচ বৈষ্ণব-কবিতা যে কি এবং তাহার কতটুকু প্রসার, তাহাই বলিয়া দিলেন না। কিন্তু এই প্রশ্নটী নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে, কারণ একটা সাহিত্যের প্রসার কতটুকু, তাহা না জানিলে তাহার নামে কোনও নালিশই আসে না। কে বলিল, একটা সাহিত্যে যে-যে বিষয়ের অভাব আছে বলিয়া অনুযোগ করিতেছ, সেই-সেই গুণগুলি এমন কতকগুলি লেখকের মধ্যে নাই, যাহাদিগকে উক্ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ধর নাই? কিম্বা ইহাই কে বলিল যে, যে-যে গুণগুলির জন্য তুমি উক্ত সাহিত্যের প্রশংসা করিতেছ, তাহা এমন কতকগুলি লেখকের নয়, যাহাদিগের উহার সহিত কোনও সংস্রব নাই? আমরা অজিত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি বৈষ্ণব-কবিতা বলিতে কতটুকু বুঝিয়াছেন? বৈষ্ণব-কবিতা কি বৈষ্ণবের বা বিষ্ণুধর্ম্মাবলম্বীগণের কবিতা? তাহা হইলে ত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে বাদ দিতে হয় কারণ তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন না। অথচ এই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিকে বাদ দিলে বৈষ্ণব-কবিতার অৰ্দ্ধেক বাদ দেওয়া হয়। অথবা এই বৈষ্ণব-কবিতা বিষ্ণু (বা রাধা-কৃষ্ণ) বিষয়ক কবিতা? কিন্তু তাহা হইলেই বা আর সব কোথায় গেল? সকলেই জানেন, কীর্ত্তন, কবির গান, পাঁচালি ইত্যাদিতে রাধা কৃষ্ণলীলার অনেক নূতন রস প্রকটিত হইয়াছিল; গোবিন্দ অধিকারী, রসিক চক্রবর্ত্তী, নীলকণ্ঠ ইত্যাদি বিখ্যাত যাত্রাকারগণ, তাঁহাদের অক্রুর সংবাদ, উদ্ধব-সংবাদ, দূতী-সংবাদ ইত্যাদি পালায় রাগাত্মিকা কবিতা মন্দাকিনীতে অনেক নূতন-নূতন লহরী-লীলা সংযোগ করিয়াছিলেন; বিখ্যাত কৃষ্ণকমল গোস্বামীর "রাই উন্মাদিনী" "স্বপ্নবিলাস" "বিচিত্র বিলাস" পুস্তকগুলি বৈষ্ণব-সাহিত্যের এক একখানি অতি অমূল্য গ্রন্থ। অজিত বাবু এ গুলির নাম করেন নাই কেন? না, এ গুলির উল্লেখ না করিলে তাহার কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ছিল? যদি কৌশলে বৈষ্ণব-সাহিত্যের অংশবিশেষ চাপিয়া গিয়া বাকী অংশের উপর অযথা নিন্দা-বর্ষণই তাঁহার একপ করিবার গূঢ় অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সাধুতার প্রশংসা করিতে পারি না। কিম্বা ইহাও অসম্ভব নয় যে, তিনি উহাদের কথা জানেন না; কিন্তু অতটুকুও খবর না রাখিয়া কোনও গুরুতর ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে উপহাস করিতে বসিলে শ্রোতৃমণ্ডলে যে বক্তাকেই হাস্যাস্পদ হইতে হয়, এ খবরটুকুও কি তিনি রাখেন না?

অজিতবাবু হাতের কাছে আর কিছু না পাইয়া রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ "জন্ম-কথা" নামক কবিতা হইতে বাৎসল্য-রসের একটী উদাহরণ দিয়াছেন। অথচ কথা হইতেছে, এই "জন্ম-কথা" কবিতাটী বাৎসল্য-রসের কবিতা, কি সুপ্রজনন-বিদ্যা (eugenics) সম্বন্ধে একটা সুসম্বদ্ধ লেক্‌চার, তাহাতে এখনও অনেকের মনে সন্দেহ আছে। আমরা

পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত কবিতাটীর মর্ম্মার্থ এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শিশু মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমি কোথা হইতে আসিলাম?" মা বলিলেন, "বাবা, তুমি আমার জীবন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছ। আমার আজন্ম বালিকা বয়স হইতে তোমার অঙ্কুর আমার মধ্যেই সূচিত হইয়াছিল; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সেই সূচনাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমার শরীর, মন, প্রতি দিবসের চিন্তা, কর্ম্ম, ইত্যাদি হইতে তিল তিল করিয়া তুমি আপনার আকার সংগ্রহ করিয়াছ। যদিও তুমি যতদিন বিশ্ব আছে ততদিন হইতে আছ, এবং যদিও তুমি যুগে-যুগে অভিব্যক্ত হইয়াছ, কিন্তু এবারে তোমার অভিব্যক্তি নূতন করিয়া আমার ভিতর দিয়াই হইয়াছে।" ইত্যাদি। এই গুরুত্ব তত্ত্বটি সুললিত কবিত্ব-পরিপূর্ণ, অপূর্ব্ব ভাষায় ও ছন্দে "জন্ম-কথা" কবিতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আমরা স্বীকার করি, কবিতাটীর মধ্যে গভীর চিন্তাশীলতা, অপূর্ব্ব কবিত্বরস, অদ্ভুত কল্পনা-লীলা, সকলই আছে—নাই যাহা, তাহা কেবল বাৎসল্য-রস। বাৎসল্যরস হইতেছে, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার জ্ঞান ও কর্ম্ম নিরপেক্ষ হৃদয়াকর্ষণজনিত আনন্দের যে বাস্তব অনুভূতি, তাহাই। কবিতাটীর মধ্যে আর যাহাই থাকুক, এই জ্ঞান-নিরপেক্ষ অনুভূতির দিক্‌টাই নাই; সুতরাং এই কবিতাটী কিছুতেই বাৎসল্য রসের কবিতা হইতে পারে না। অজিত বাবু বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, দার্শনিক ভাবে জন্ম-তত্ত্বের আলোচনা না করিয়াও, নিতান্ত অদার্শনিক কোল্, ভীল্, মুণ্ডা, লেপ্‌চা পিতা-মাতাগণ তাহাদিগের শিশুগুলিকে বৎসলতার সহিত ভালবাসে, এবং তাহাদিগের সম্পর্কে এই স্নেহ-জনিত আনন্দ গভীর ভাবেই অনুভব করে। যদি তিনি উক্ত কবিতাটীকেই বাৎসল্য রস বলিয়া মানিয়া লন, তাহা হইলে এই বাস্তব অনুভূতিটীর কি নাম দিবেন? আর তা ছাড়া, উদ্ভব সম্বন্ধে গোটাকতক তত্ত্ব-কথাই যদি বাৎসল্য-রস হয়, তাহা হইলে সাঙ্খ্যের সৃষ্টি-তত্ত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বাৎসল্য-রসের আদর্শ জগতের কোনও সাহিত্যে মিলে না; কারণ, মাতা সেখানে স্বয়ং বিশ্ব-প্রকৃতি, এবং যে শিশুর জন্ম-রহস্য তথায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সে হইতেছে তাঁহা হইতেই উদ্ভূত ও তাঁহারই অন্তর্ভুক্ত জড় ও চেতন রাজ্যের সমস্ত বৈচিত্র্য। যাহা হউক, অজিত বাবু রবীন্দ্রনাথের সমালোচক হইলেও আমরা তাঁহাকে বলিব, তিনি রবীন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া বোঝেন নাই। সুবিখ্যাত "জন্ম কথা" কবিতাটীর গুণপনা বাৎসল্য রসের দিক দিয়া নহে, তাহার অন্য অসাধারণত্ব আছে।

সখ্য-রসের কথা বলিতে গিয়াও সমালোচক মহাশয় বড় কম বিভ্রাটে পড়েন নাই। তিনি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য খুঁজিয়া, বাছিয়া বাছিয়া, আপনার মনোমত আদর্শ উদ্ধার করিয়া, তাহারই সহায়তায় সখ্য-রস ও অন্য-অন্য রসের হীনতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া সমালোচক হিসাবে যে সত্যপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন, আমরা তাহার কথা আর বলিব না; কারণ সে কথা আমরা বৈষ্ণব কবিতার বিস্মৃতি নিরূপণের বেলাই একবার বলিয়া গিয়াছি; এবং সেখানে ইহাও দেখিয়াছি যে, খানিকটা চাপিয়া গেলে যদি আপনার বক্তব্য দ্বারা বোকা বুঝাইবার বেশ সুবিধা হয়, তবে তাহাতে তাঁহার আপত্তি নাই। এখানে আমরা যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা তাঁহার হাফেজের রসাস্বাদন লইয়া। অজিত বাবুর হাফেজ রসাস্বাদনের চেষ্টা half as much ও সার্থক হয় নাই! তাহা—তিনি হাফেজের কথা বলিতে গিয়া যে গণ্ডগোল পাকাইয়াছেন, তাহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা শিক্ষিত সাহিত্য সমজদারগণকে তাঁহার হাফেজীয় রসাস্বাদনের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি।

হাফেজের প্রসঙ্গে অজিত বাবু বলিয়াছেন,—"তাঁহার নিকট জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই সখার সম্বন্ধ,—(বৈষ্ণব কবিতার মত) পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ নয়।" এবং তাহার পরের লাইনে বলিতেছেন (অবশ্য প্রাসঙ্গিকই হউক আর অপ্রাসঙ্গিকই হউক) "জড় জগতের ও অধ্যাত্ম-জগতের সকল সম্বন্ধ সেই সখার মুখ জ্যোতিঃর ছটা।" কথাটা বড় সুন্দর লাগিল। অর্থাৎ কি না, জগতে যত থালা, ঘটি, গাড়ু, গামছা, কিম্বা যত গরু ছাগল, মহিষ, ভেড়া আছে, ও তাহাদের মধ্যে দেশ কাল-পাত্রগত যে এক-একটা সম্বন্ধ আছে, তাহার সমস্তই—জীবাত্মার কিম্বা তাহার নিরাকার বন্ধু পরমাত্মার (বিশেষ করিয়া কাহার, বুঝা গেল না) মুখে যে জ্যোতিঃ আছে, এবং তাহারই যে জ্যোতিঃ-নিরপেক্ষ একটা স্বতন্ত্র ছটা আছে, তাহা। কিন্তু কথা হইতেছে, আমার বন্ধু লাওয়েল-কোম্পানীর বড়বাবু শ্রীযুক্ত রামহরি

চট্টোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণীর দশনচ্ছটা থাকিলেও তাঁহার অমাকান্ত মুখচন্দ্রের কিরণের জ্যোতিঃর রশ্মিতে মোটেই কোনও ছটা নাই ; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে হাঁড়ি হেঁসেলের সম্বন্ধ ত নিতান্ত কম গভীর নহে। আমার বেহাই মহাশয়ের সঙ্গেও আমার যে টাঁকশালের সম্বন্ধ, সেটাও ঠিক জ্যোতিঃর ছটার সম্বন্ধ নহে। এ গুলির সম্বন্ধে অজিত বাবুর মত কি ? এ গুলি কি জড়-জগতের ও অধ্যাত্ম জগতের সকল সম্বন্ধ না হউক, অন্ততঃ গোটা-দুই সম্বন্ধও নয় ? আচ্ছা, জিনিসটাকে অন্য দিক্ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। অজিত বাবু বলিয়াছেন, হাফেজের জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ, "দুই সখার" সম্বন্ধ ; বৈষ্ণব-কবিদিগের মত পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ নয় বলিয়া, তাহা বৈষ্ণব কবিতায় বর্ণিত সম্বন্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। অজিত বাবু বৈষ্ণব কবিতার সখ্য-রসের সহিত হাফেজের সখ্য রসের তুলনা-মূলক সমালোচনা করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধের কথা কি প্রসঙ্গে আসিল ? আর পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ হইলে কি সখার সম্বন্ধ হইতে পারে না ? আমরা ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে সখ্যভাব ব্রাহ্মসমাজ ও ক্রিশ্চান-সমাজে আকছার দেখিতে পাই। বরং, অন্ধকারাচ্ছন্ন হিন্দু-সমাজই কুসংস্কার বশতঃ তাহা তত বেশী অনুমোদন করে না। অজিত বাবু কি বলিতে চান, এই সমস্ত সম্বন্ধ নীতি বিগর্হিত, অশ্লীল সম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই নহে ? আমরা নিম্নে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, রসের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, সখ্য রসের সম্বন্ধ পুরুষ ও নারীর ভিতর অধিক হওয়াই অধিক স্বভাবসিদ্ধ ; এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে যদি সখিত্ব হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহাদের এইরূপ একটা পুরুষ ও নারী ভাবের সম্বন্ধের মধ্যেই হইয়া থাকে।

সখ্য জিনিসটাও একটা রস—তাহার অনুভূতি চিত্তে ; তাহা চিত্তের অন্যান্য বৃত্তির (mental phenomena) মত একটা বাহ্যিক বিষয়ের (external object) অপেক্ষা করে। কিন্তু বিষয় হইতে হইলেই তাহার একটা আকার বা রূপ থাকা প্রয়োজন ; কারণ, রূপ ছাড়া বিষয় (object) হয় না। তবেই দেখা গেল, ব্রহ্ম বস্তু সখ্য-রসের বিষয় হইলে, তাহার একটা আকার থাকা প্রয়োজন ; পরমাত্মার মত একটা ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু হইয়া থাকিলে তাহার চলিবে না। আর ইহা ত অতি মোটা কথা যে, রস জিনিসটা যখন একটা ইন্দ্রিয়ের বস্তু, তখন তাহার ভোক্তা ইন্দ্রিয়বান্ না হইলে কি করিয়া চলিবে ? যদিই ইহা ধরা যায় যে, এখানে জীবাত্মাই (জীব ?) ভোক্তা, তাহা হইলেও ত পরমাত্মাকে কোনও একটা মূর্ত্তিতে তাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইতে হইবে ? এ কথা সকলেই জানেন,—যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহার রূপ চোখে দেখিয়া, তাহার গুণ কাণে শুনিয়া, তাহার স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া তবেই আমরা তাহাকে ভালবাসি। যাহাকে চোখে দেখি নাই, কাণে শুনি নাই, তাহাকে ভালবাসা আমাদের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং অজিতবাবু যে অতীন্দ্রিয় ভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সখ্য-সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন,—আমরা যতদূর দেখিলাম তাহা হইতে বুঝা গেল, রসের দিক দিয়া তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। জীবাত্মার সহিত সাক্ষাৎ পাওয়াইতে হইলে, পরমাত্মার আর অতীন্দ্রিয় হইয়া লুকাইয়া থাকিলে চলিবে না, তাঁহাকে আসিয়া মূর্ত্তিতে ধরা দিতে হইবে ; নতুবা নিরাকার পিতা, নিরাকার পত্নী, নিরাকার পুত্রবধূ- একটা কথার কথামাত্র। অজিতবাবুরও এই মূর্ত্তি স্বীকার করিতে আপত্তি নাই ; কারণ, তাঁহার উদ্ধৃত অংশে মুখের জ্যোতিঃ, কৃষ্ণ তিল ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য, মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা আছে, আকার নাই—তাহার মুখ আছে ও কৃষ্ণ তিল আছে—ইত্যাদি কল্পনা বহরমপুরের কোনও প্রাচীর বেষ্টিত স্থান বিশেষের মধ্যে সম্ভবপর হইলেও, নিশ্চয়ই কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি তাহা করেন না। সুতরাং দেখা গেল, তাঁহার উল্লিখিত হাফেজের ভগবানের সহিত যে সখার সম্বন্ধ, তাহা "জীবাত্মা ও পরমাত্মার সখার" সম্বন্ধের মত একটা অর্থহীন অক্ষম-কল্পনা-মাত্র সার গাঁজাখুরী সম্বন্ধ নহে। সে সম্বন্ধ রূপের সম্বন্ধ, রসের সম্বন্ধ, বুঝি বা ভোগের সম্বন্ধও বটে। যাক্, সে কথা আলোচনা করিয়া আর কি হইবে ? প্রেমিকবর হাফেজের সাহচর্য্যে আনন্দলোকে বিহার করিয়া শ্রীভগবানের সহিত শব্দে, স্পর্শে, রূপে-রসে-গন্ধে প্রেমের সম্বন্ধ সংস্থাপন করা ত আজ আমাদের ভাগ্যলিপি নহে। আজ আমাদের ভাগ্যলিপি যাহা, তাহা নিতান্তই নিম্ন জগতের মাসিক পত্রের প্রবন্ধ, সমালোচনা, ওকালতি, কচ্‌কচি ইত্যাদি

লইয়া। এখন যাহা বলিতেছিলাম তাহাই বলি। আমরা দেখিয়াছি ব্রহ্ম-বস্তুর সহিত রসের সম্বন্ধ পাতাইতে হইলে তাঁহার একটা মূর্ত্তি-কল্পনার প্রয়োজন। এখন, সে মূর্ত্তি কিরূপ হইবে, তাহাই প্রশ্ন। আমরা তাহার আর কিছুই জানি না, শুধু এইটুকু জানি—সে মূর্ত্তি গঠন-প্রণালীতে সখ্যরস অভিব্যক্ত করিবার পক্ষে উপযুক্ততম হইবে, সখা হিসাবে তাহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট মূর্ত্তি। Physiologyর সাক্ষ্য যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, চিন্তা, কর্ম্ম ও রস অভিব্যক্ত করিবার পক্ষে একমাত্র মানুষের মূর্ত্তিরই সেই উপযুক্ততা আছে। তাহা হইলে সখারূপে ব্রহ্মের যদি কোনও মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহার মানুষের মূর্ত্তি কল্পনা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত। তা'ছাড়া আমাদের আলোচ্য যে রস, তাহা মানুষের সহিত মানুষের সখ্য সম্বন্ধেরই রস; সে হিসাবেও ব্রহ্মের মানুষ ভিন্ন অন্য কোনও মূর্ত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে না। তাহার পর প্রশ্ন হইতেছে, সেই মূর্ত্তি কোন্ জাতীয় হইবে?—সখার সহিত সমজাতীয় হইবে, না বি-সমজাতীয় হইবে? অর্থাৎ সখাদ্বয় দুইই পুরুষ হইবেন, না—দুইই নারী হইবেন,—না—একজন পুরুষ একজন নারী হইবেন? নিশ্চয়ই বি-সমজাতীয় হইবে। কেন না, মনোঽভিনিবেশ, চিত্তাকর্ষণ ইত্যাদি বি-সম-জাতীয়ত্বের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে ও প্রগাঢ়তম রূপে হইয়া থাকে, ইহা মনোবিজ্ঞান ও শরীর বিজ্ঞানসম্মত তথ্য। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সখ্যভাবটা পুরুষ ও নারীর মধ্যেই সহজে হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক। আর বোধ হয় যৌন-প্রবৃত্তিটাও প্রকারান্তরে তাহাতে অনেকটা সহায়তা করে। এখন এইখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে,—"পুরুষে-পুরুষে বা নারীতে-নারীতে যে নিত্যকার ঘটনা—সখ্যরস, তাহা অস্বীকার করা কি পাগলামী নহে?" না, তাহা নহে। কে বলিল, পুরুষে-পুরুষে ও নারীতে-নারীতে যে সখিত্বের সম্বন্ধ, তাহা পুরুষ ও নারীর সখিত্বের সম্বন্ধ নহে? কে বলিল পুরুষ পুরুষে নারীর অংশ ও নারী নারীতে পুরুষের অংশ দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? পুরুষে অবিমিশ্র পৌরুষ ও নারীতে অবিমিশ্র নারীত্ব কোথায়? যদি আবেষ্টন মানব-প্রকৃতি গঠনের অন্যতম নিয়ামক হয়, তবে যে সামাজিক আবেষ্টনের মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতি ও নারী-প্রকৃতি—দুইটীই উপাদান স্বরূপ বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানবের শুধু পুরুষত্বের বা শুধু নারীত্বের অধিকারী হওয়া কি করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে? তাহা ছাড়া প্রতি মানবের জন্ম-কারণে কি পুরুষ ও নারী দুইই বিদ্যমান নাই? সুতরাং জগতে নিরবচ্ছিন্ন পুরুষ বা নিরবচ্ছিন্ন নারী মিলে না; এবং সেই জন্যই আমরা বলিতেছি, পুরুষে পুরুষে বা নারীতে নারীতে যে সখ্য, তাহারও পুরুষ ও নারীতে সখ্য হইতে কোনও আপত্তি নাই। জগতে প্রতিদিন একজাতীয় সখিত্বের উদাহরণ যে আমরা অজস্র দেখিতে পাই, তাহার অন্যতম কারণ—সমাজের বাধ্যতামূলক প্রতিষেধ বিধি নর ও নারীর মেলামেশার সর্ব্বদা সুবিধা নাই বলিয়া। আমরা আরও নানা দিক হইতে দেখাইতে পারিতাম—আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা সত্য; কিন্তু তাহার প্রয়োজনাভাব। তাহা হইলে দেখা গেল, বৈষ্ণব কবিগণ রসাস্বাদন প্রসঙ্গে যে জীব ও ব্রহ্মের পুরুষ ও নারীর রূপ কল্পনা করিয়াছেন, তাহার একটা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে এবং হাফেজের যে "জীবাত্মা ও পরমাত্মার সখ্যর সম্বন্ধ" তাহা যে পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ নয়, তাহার কোনও মানে নাই; বরং তাহাই হওয়া বেশী স্বাভাবিক। বৈষ্ণব সাহিত্যের রস বিভাগ যে রসের একটা ক্রম পরিণতির ইতিহাস, এবং মধুর রস যে সখ্য রসের উচ্চতর বৈবর্ত্ত মাত্র, ইহা মনে রাখিলে, পাঠকের আর এই তত্ত্বটি বুঝিতে কষ্ট হইবে না। বৈষ্ণব-সাহিত্যিকগণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একটা পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া যে আহাম্মুখী করেন নাই, এই মোটা কথাটা কি আবার বুঝাইয়া দিতে হয়? আমরা বৈষ্ণব-দর্শনের দিক দিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করিব না; কারণ, লজিক শাস্ত্র অনুসারে তাহা petitio principie দোষ হয়; কিন্তু, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, প্রকৃতিতত্ত্ব ইত্যাদি বড়-বড় কথা বাদ দিলেও নিতান্ত সাধারণ বুদ্ধিতেই ত ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, রসের দিক দিয়া ব্রহ্মকে প্রণয়ী, সখা, সন্তান ইত্যাদি সাংসারিক নানা সম্বন্ধের মধ্যে জড়াইয়া লইতে হইলে, অর্থাৎ তাঁহার এক-একটা মা, বাপ, ভাই, বোন খাড়া করিতে হইলে, তাঁহাকে মানুষ ভাবে দেখিতে হইবে না ত কি করিতে হইবে? আর মানুষের মধ্যে

তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিয়া নিলে, একটা নারীও ত চাই; কারণ জগতের সমস্ত রসের সম্বন্ধগুলা ত পুরুষদেরই একচেটিয়া নহে, তাহার মধ্যে নারীরও ত স্থান আছে। এই সোজা কথাটা যে বালকেও বুঝিতে পারে।

আর বৈষ্ণব সাহিত্যে যেন কেবল "পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধে"র (যদিও বুঝা গেল না সেটা কি,—তবুও আমরা মধুর রসের সম্বন্ধ অজিতবাবুর লক্ষ্য বলিয়াই ধরিয়া লইলাম) কথাই বর্ণিত হইয়াছে। অজিতবাবু বোধ হয় জানেন না, স্থূল ভাবে সখা-সখী বলিতে তাঁহারা যাহা বুঝেন, কতকটা তাহারই অনুরূপ অষ্টসখী ও দ্বাদশ গোপালের স্থানও তাহাতে আছে। তবে না কি মধুর রসই সেখানকার প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়, তাই সেই রসই ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সাহিত্যিক হিসাবে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু তাঁহাদের কথা বলিয়াই বৈষ্ণবকবিগণ ক্ষান্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া তত্ত্ব হিসাবে ইহার অন্য অর্থও আছে, অজিতবাবু তাহা বুঝিবেন না।

তা'ছাড়া হাফেজের সখ্য-রসের উদাহরণ প্রসঙ্গে অজিত বাবু যে কয়টি লাইন তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত রস সখ্য-রস কি মধুর-রস, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা পাঠকবর্গকে মধ্যস্থ মানিতেছি। সখাকে (কিম্বা যাহাকে হউক) লক্ষ্য করিয়া হাফেজ বলিতেছেন;—

"তাঁহার মদির আঁখির ইঙ্গিত প্রেমিকের প্রাণকে কখনও ভাবে উন্মত্ত করে, কখনও বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে, কখনও মধুর আহ্বানে আশ্বস্ত করে।"

"সখার প্রসন্নতা লাভ করিয়া যখন তিনি (তিনি কি রকম? অজিত বাবু কি নিজের কথা উদ্ধৃত করিতেছেন না কি?) সুখী, তখন তাঁর কাছে সমরকন্দ ও বোখারার সমগ্র সম্পদ সখার একটা কৃষ্ণতিলের সমান মূল্যবান্ নয়।"

"ওহে সুন্দর, সুন্দর চন্দ্রমার যে দীপ্তি তাহা তোমারি উজ্জ্বল মুখের দীপ্তি। জগতে যাহা কিছু সুন্দর—তোমার মুখ-শোভাই তাহার সৌন্দর্য্যের উৎস।" ইত্যাদি

এখন, এই "সুন্দর" ভদ্রলোকটী কে? হাফেজের সখা? অবশ্য অজিত বাবুর অথরিটি যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে তাহাই। কিন্তু তাহাই যদি হয়, তবে সখা সখাকে মদির আঁখি ঠারিয়া কি ইঙ্গিত করিতেছে? এটা ত রীতি নহে। আর সখার হৃদয়ই বা তাহাতে বিদ্ধ ও হত হয় কেন? ধরিলাম ইহা সখ্য-রস; কিন্তু তাহা হইলে "হাসির চাহনি দেখাল কামিনী পরাণ হারানু তঁহু।" ইত্যাদি রাধার মদির-আঁখির ইঙ্গিতে বিদ্ধ ও হত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি সখ্যরসের উদাহরণ হইতে কি অপরাধ করিয়াছে? কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের "উলটি-উলটি জনু পদ দুইচারি, কলসে-কলসে জনু অমিয় উগারি" ইত্যাদি রূপ-বিহ্বলতা যদি মধুর রস হয়, তবে হাফেজের "সখার (মুখের?) একটি কৃষ্ণতিলের কাছে বোখারার সমস্ত সম্পদ্ তুচ্ছ", ইত্যাদি রূপ-বিহ্বলতা মধুর রস হইবে না কেন? সেখানে শ্রীকৃষ্ণ না হয় রাধার একটা বিশেষ গতিভঙ্গীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, আর এখানে না হয় হাফেজ মুখের (বা যে কোনও স্থানের) একটা বিশেষ শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন; কিন্তু দুই-ই ত রূপ বিহ্বলতা? আর তা'ছাড়া, অজিত বাবুকে আর একটা কথা আমরা জিজ্ঞাসা করি। তিনি যদি রূপ বিহ্বলতা, ভাবে উন্মত্ততা, প্রাণ যায় যায় ভাব ইত্যাদি মধুর রসের সমস্ত লক্ষণগুলি সখ্য-রস বলিয়া চালান, তাহা হইলে মধুর রসের জন্য কি বাকী থাকে? শুধু যৌন সম্বন্ধ? আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তাঁহার উল্লিখিত হাফেজের ফ্রেণ্ড্ পরমাত্মা মহাশয়ের পুরুষ বা নারী হইতে কোনও আপত্তি নাই। যদিও না হয় ধরা যায়, তিনি পুরুষ হইলেও পূর্ণ পুরুষ বা নারী হইলেও পূর্ণা নারী,—তাহা হইলে কি গরীব শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা বেচারা নেহাতই ছাড়ুখোর খোট্টা আহীর-আহীরাণ বলিয়া তাঁহারা তাহা হইতে জানেন না? যদি বলেন, "ওহে সুন্দর" "সুন্দর চন্দ্রমা" ইত্যাদি বাক্যে হাফেজ যে তাঁহার প্রেমিককে কতকটা মানুষের মত হইলেও ঠিক মানুষের চক্ষে দেখিতেছেন না, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমরাও বলি, বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে যে মানুষের চক্ষে দেখিতেন, "রাই তুমি সে আমার গতি, তোমারি কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি।" কিম্বা "কিশোরীর দাস আমি পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যা'র, কোটীযুগ যদি আমারে ভজয়ে বিফলে জনম তার।" ইত্যাদি লাইন তাহার প্রমাণ না কি?

অজিতবাবু-শ্রেণীর সমালোচকগণের তামাসা হইতেছে যে, তাঁহারা হাফেজ ইত্যাদির "সুন্দর চন্দ্রমার দীপ্তি তোমারই মুখের দীপ্তি" ইত্যাদি লাইনকে বলিবেন—প্রেমিক

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখিয়া বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে তাহার প্রণয়ীর সৌন্দর্য্য বলিয়া অনুভব করিতেছে; অথচ বৈষ্ণব-কবিগণের "তরুণ অরুণ সিন্দুর বরণ নীল গগনে হেরি, তোহারি ভরমে তা সঞে রোখত মানিনী বদন ফেরি" ইত্যাদি লাইনেও যে সেরূপ একটি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন না; কারণ ঐ যে "ভরম" কথাটী আছে। কিন্তু কোন্ দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখিয়া রাধার এই ভ্রমটা হইতেছে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়,—তাহা হইলে আর তাহার উত্তর দিতে পারিবেন না। কিন্তু হয় ত হাফেজের পূর্ব্বোক্ত লাইন অপেক্ষা এই লাইনটী উৎকৃষ্টতর। লাইনটার মানে করিলে এইরূপ হয়—কা'ল বলিয়া শ্যাম মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন; সে কতকাল—বৃন্দাবনে রাধিকার দিন আর কাটে না। অভাগিনী বালিকা পথ চাহিয়া-চাহিয়া শেষে নৈরাশ্যে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। দিন যদি বা কথায়-বার্ত্তায় একরূপ বহিয়া যায়—রাত আর যায় না। একদিন স্মৃতির উৎপীড়নে সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটাইয়া ভোর হইতে-না হইতেই বিছানা হইতে পলাইয়া দরজা খুলিতেই দেখিল, নীল আকাশ উষার রক্তরাগে ভরিয়া গিয়াছে। আহ্লাদে তাহার প্রাণটা লাফাইয়া উঠিল—"এই যে আমার শ্যাম—রাত্রিতে কখন আসিয়া আমার বাহির হইবার অপেক্ষায় দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে—ভয়ে ডাকিতে পারে নাই।" অমনি অভিমানিনীর অভিমানের সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। "তুমি এখন আসিলে? আর আমি যদি মরিতাম? কত দীর্ঘ বরষ মাস দিন গণিয়া-গণিয়া কাটাইয়া দিয়াছি। আমার সোণার শরীর কালী হইয়া গিয়াছে। নিঠুর! তোমার কি একবার মনেও পড়ে নাই?" অভাগিনী অভিমানে মুখ ফিরাইল। কি, করুণ চিত্র, কি করুণ ভ্রম! এই ভ্রম যখন ভাঙ্গিবে, তখন প্রাণ-মাত্র-সারা কুসুম-সুকুমারী বালা তাহা সহ্য করিতে পারিবে কি? বেচারা যে সেইখানেই ঝরিয়া পড়িবে।' কিন্তু অজিত বাবু এই সকল লাইনের মধ্যেও সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পান নাই। হাফেজের বিশ্বের সৌন্দর্য্যে প্রেমিকের সত্তা অনুভব করা, আর রাধার নীল গগনের সিন্দুরচ্ছটায় শ্যামকে দেখিতে পাওয়ার মধ্যে তফাৎ, হইতেছে এই—সেখানে হাফেজ যাহা দেখিতেছেন, তাহা আগে দার্শনিক ভাবে চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন—যে জগতের যা কিছু সৌন্দর্য্য তাহার আদি কারণ বা উৎস স্বরূপ হইতেছেন, তাঁহার চিরসুন্দর প্রেমিক। এইরূপে তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির মূলে একটা দার্শনিকের বিচার-বুদ্ধি আছে (অবশ্য আমরা অজিত বাবুর উদ্ধৃত অংশ হইতে হাফেজকে বিচার করিতেছি,—ইহা আমাদের হাফেজের সমালোচনা নহে); আর রাধার যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, তাহা তাহার নিতান্তই সহজ দৃষ্টি। সে ভাবে নাই, চিন্তায় নাই, কিছুই করে নাই—শুধু যাহা চোখে দেখিতেছে তাহা। হাফেজের "ওহে সুন্দর" ইত্যাদি হইতে ইহার আর একটা শ্রেষ্ঠতা হইতেছে এই যে, এখানে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আরও গভীর। সে শ্যামকে এত সুস্পষ্ট দেখিতেছে যে, তাহার উপর তাহার অভিমান জাগিতেছে। তা ছাড়া, ইহার মধ্যে অধিকন্তু যে গভীর করুণরসটুকু আছে, হাফেজে তাহা নাই। তার পর প্রকাশের কৌশল। শুধু দুইটা "ভরম" ও "বদন ফেরি" কথা দিয়া এত সুন্দর, করুণ, গভীর অর্থপূর্ণ এতখানি ভাব প্রকাশ করা কি কম প্রতিভার পরিচয়? অথচ অজিত বাবু এই বৈষ্ণব-কবিদের মধ্যে এমন কোনও গুণপনাই খুঁজিয়া পান না, যাহাতে অন্ততঃ দরোয়ান্ হইয়াও ইহাঁরা হাফেজ হুইট্‌ম্যানের দেউড়ীতেও দাঁড়াইতে পারেন। বৈষ্ণব-কবিগণের দুর্ভাগ্য!

আর তা'ছাড়া, ইহাঁদের কোন্ কথাটা ধরিব? ইহাঁরা কি যে বলেন, তাহা নিজেরাই বোঝেন না। একবার বলিতেছেন, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমের কবিতা জগতের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার সহিত তুলিত হইতে পারে, যথা;—"তবে যুগলপ্রেম ইহার প্রধান বিষয় হইয়াছে বলিয়া, ইহা সময়-সময় ইহার স্থূল পুরাণগত রূপ ও বস্তুকে বহুদূরে ছাড়াইয়া যায়—ইহা চিরন্তন মানবের হৃদয়ের বাণী হইয়া উঠে। পৃথিবীর বড়-বড় প্রেমের কবির কাব্যের বাণীর সঙ্গে সেই-সেই বাণীর সারূপ্য আছে।" আবার বলিতেছেন "পৃথিবীর মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি, যেমন দান্তে বা শেলি বা ব্রাউনিং, তাঁদের কারো সঙ্গেই কোন বৈষ্ণব কবি কোন দিক দিয়াই তুলনীয় নন।" একবার বলিলেন, (চণ্ডীদাসের) "রচনার মধ্যেও ইন্দ্রিয়-লালসার গান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান;" আবার তখনই বলিলেন, "চণ্ডীদাসের এ প্রেম অন্যান্য বৈষ্ণব-কবিগণের মত কাম নয়—কামকে ধ্বংস করিয়া তবে তাহার প্রতিষ্ঠা।" নিজেরাই এক জায়গায়

বলিতেছেন "রাধা-কৃষ্ণের গোপন প্রণয়ের ঐ কাহিনীটা এমনি ঘোরতর যৌন সম্বন্ধের কাহিনী যে, তাহার বর্ণনায় কামশাস্ত্রের মাল-মসলা জোগানো ছাড়া উচ্চ মানব-প্রেমের বিশেষ কোন মাল-মসলা জোগানো যায় না।" আবার নিজেরাই আর এক জায়গায় বলিয়াছেন, "যুগল 'প্রেম' রূপ ও বস্তুকে ছাড়াইয়া যায়" "চিরন্তন মানবের হৃদয়ের বাণী হইয়া উঠে।" ইত্যাদি। এখন কোন্ কথাটা বিশ্বাস করিব? কথাটা আর কিছুই নয়;—না বিশ্ব-সাহিত্য, না বঙ্গ-সাহিত্য, না পাশ্চাত্য-দর্শন, না প্রাচ্য-দর্শন—কোনও কিছুরই সুস্পষ্ট ধারণা মনে না থাকিলে, অথচ, একটা কিছু বলাই চাই, এইরূপ স্থির করিলে, বিভ্রাটই বাধিয়া যায়।

কিন্তু এই অর্থহীন সমালোচনার ভিতর হইতেও সমালোচক মহাশয়ের কি বলিবার উদ্দেশ্য, আমরা তাহা ধরিয়াছি। প্রথমতঃ তিনি ভিন্ন-ভিন্ন মহাজন—পদকর্ত্তাদিগের রচনাকে ভিন্ন-ভিন্ন কবির রচনার ন্যায় আলাদা আলাদা বিচার করিতে চান। সব রচনাগুলিকে জড়াইয়া একটি রচনা করিয়া ফেলিতেই তাঁহার আপত্তি। দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন, বৈষ্ণব-কবিতার যে রস—সাহিত্য-হিসাবে তাহা নিতান্ত দৈনন্দিন জীবনেরই স্থূল রস। তোমরা যে বল 'আধ্যাত্মিক' 'আধ্যাত্মিক'—তাহাতে আধ্যাত্মিকতার কোনও আভাসমাত্র নাই। তৃতীয়তঃ, তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় যে, হাফেজ বা হুইট্‌মান্ ইত্যাদির রচনায় বরং বাস্তব জীবনের রস হইতে একটা অতীন্দ্রিয় রসে পৌঁছাইবার চেষ্টা আছে; বৈষ্ণব-কবিদিগের রচনায় তাহাও নাই। সেই হিসাবে তাঁহারা বৈষ্ণব-কবিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এবং চতুর্থতঃ, তাঁহার শেষ আপত্তি, এই যে, এই প্রেম-কাহিনীতে প্রেমের কোনও বিবর্ত্ত-বিলাস (evolution) পরিলক্ষিত হয় না; ইহার প্রেম আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার ভিতর দিয়া এক হইতে বহু রসে বিচিত্র হইয়া কাঁদিয়া, ঘুরিয়া, শেষে অনন্ত জীবনের ভিতর আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়া আপনাকে পরিসমাপ্ত করে না। আমরা একে-একে এই চারিটি আপত্তিরই উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। আমাদের প্রথম উত্তর:—অজিত বাবু যে বৈষ্ণব-কবিগণকে আলাদা-আলাদা করিয়া বিচার করিতে পারেন না, তাহা তিনি সমস্ত রচনাগুলিকে জড়াইয়া সমষ্টিভাবে যে এক "বৈষ্ণব কবিতা" আখ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণ শেলি, কীট্‌সের মত আলাদা-আলাদা কবি নন্—তাঁহারা একই রসের একই বিষয় একই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—পার্থক্যের মধ্যে প্রত্যেকে কেবল কতকগুলি নূতন-নূতন বৈচিত্র্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। সুতরাং তাঁহার—এ অশ্লীল, ও অশ্লীল নয়, এ আধ্যাত্মিক নয়, ও আধ্যাত্মিক, ইত্যাদি মতের কোনও অর্থসঙ্গতি হয় না।

আমাদের দ্বিতীয় উত্তর অজিতবাবুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দুইটি আপত্তি জড়াইয়া হইবে। সত্য বটে আপাতদৃষ্টিতে বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে একটা বস্তু-তান্ত্রিক স্থূল দিক দৃষ্টিগোচর হয়,—তাহা হইলেও, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার ইঙ্গিতের অভাব নাই। আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের উপর এইরূপ একটা স্থূল ভাব আরোপ করাই (objectification) বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিপ্রায়। বৈষ্ণব-পদাবলী বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে আলাদা নহে। অজিত বাবু যে বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে বাস্তব জীবনের রস হইতে অতীন্দ্রিয় রসে পৌঁছিবার চেষ্টা নাই বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন, তাহার কোনও মূল্য নাই। বৈষ্ণব-কবিগণের পদ্ধতি হইতেছে, অতীন্দ্রিয় রস হইতে বাস্তব জীবনের রসে ফিরিয়া আসা। অজিতবাবু যদি বৈষ্ণব-সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের ইতিহাস একটু আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন—আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য কি না। অধ্যাত্মতত্ত্বেই বৈষ্ণব-সাহিত্যের জন্ম। যখন বৈষ্ণব-কবিতা বা বৈষ্ণব-সাহিত্য অনাগতের তথ্য ছিল, তখনও ভারতবর্ষে বৈষ্ণবীয় অধ্যাত্ম-দর্শনের প্রচলন ছিল। সেই দুরূহ দার্শনিক তথ্য আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনের স্নেহ ও প্রেম-কাহিনী দিয়া রূপকচ্ছলে সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য করিবার জন্য সাহিত্যে সরস রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর আবির্ভাব। প্রথমে রাধাও ছিলেন না। ভগবান ও ব্যষ্টিভাবে জীব-জগতের প্রেমের সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য একক শ্রীকৃষ্ণ ও ষোড়শ সহস্র (অগণ্যতাসূচক) গোপিকা কল্পিতা হইয়াছিল। রাধা আসিলেন পরে, সমষ্টির প্রেম জ্ঞাপন করিবার জন্য। এই সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির প্রেমের সমস্ত রসগুলি মিশাইয়া আছে। সেইজন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে ললিতাদি সখিবৃন্দ ও শ্রীদামাদি সখাবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ-রাধার মিলনে সমস্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি

অনুভব করিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি সেই মিলন যশোদা-নন্দেরও অনভিপ্রেত নহে। জয়দেবের "ইত্থং নন্দ-নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং, রাধা-মাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥" ইত্যাদি তাহার প্রমাণ। বস্তুতঃ, নন্দ, যশোদা, শ্রীদাম, সুদাম, ললিতা, বিশখা, এমন কি যমুনা, গোবর্দ্ধন, কেলিকুঞ্জ - বৃন্দাবনের কাহারও বা কোনও কিছুরই রাধা ছাড়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পূর্ণ পুরুষের সহিত ব্যক্তিগত প্রেমের লীলায় জীব-প্রকৃতির অপূর্ণতার জন্য যে অসম্পূর্ণতা থাকিয়াই যায়, তাহারই পূর্ণ পরিণতি দেখাইবার জন্য সমষ্টি ভাবে রাধার কল্পনা। রাধা সমষ্টিভাবে সমগ্র বিশ্বের হইয়া বিশ্বেশ্বরের সহিত প্রণয়লীলা করিতেছেন। ব্যষ্টি অনিত্য, অসম্পূর্ণ, ও দেশ-কালে আবদ্ধ হইলেও, সমষ্টি নিত্য, সুসম্পূর্ণ, অসীম; তাই রাধা— প্রেমরূপা, মহাপ্রকৃতি;—নিত্য-বৃন্দাবনের অধীশ্বরী,— তাঁহাকে বাদ দিয়া প্রেমের লীলা হইবার জো নাই। চৈতন্যদেব আপনার জীবনে এই রাধা-ভাবের লীলাই প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন—ইহার রস সর্ব্বসাধারণের অনুভাব্য করিবার জন্য; এবং বৈষ্ণব-কবিগণ আপনাদের গানে ও কবিতায় এই অপূর্ব্ব অধ্যাত্ম রসের অমৃত-মদিরা আমাদের প্রাত্যহিক প্রেমরস আস্বাদনের স্মৃতির সহিত মিশাইয়া মিশাইয়া মুক্তহস্তে বিলাইয়া গিয়াছেন। এই কবিগণের কৃতিত্ব হইতেছে, যিনি যত এই তত্ত্বের রস ঠিক আমাদেরটির মতন করিয়া আমাদিগকে আস্বাদন করাইয়া যাইতে পারিবেন—তাহাতে। তাহা হইলেই দেখা গেল, বৈষ্ণব কবি ও সাহিত্যিকগণের উদ্দেশ্য, বস্তু-জগৎ হইতে যাত্রা করিয়া অধ্যাত্ম-জগতে পৌছান নহে; পরন্তু, জগতের মুক্তির জন্য অধ্যাত্ম-জগৎ হইতে অমৃতভাণ্ড চুরি করিয়া লইয়া বস্তু-জগতে ফিরিয়া আসা এবং তাহাই রক্ত-মাংসের আবরণে রক্ত-মাংসলোলুপ মানব-সমাজে বিতরণ করা। অজিত বাবু যাহাকে 'আদিরস' 'আদিরস' বলিয়া নাক সিঁটকাইয়াছেন, তাহা যে সুরুচি-মূলক ভাবার ক্ষীণ পরদার আবরণে লালসা-উদ্দীপক জঘন্য আধ্যাত্মিক প্রেম অপেক্ষা অনেক উচ্চদরের জিনিষ, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন।

বৈষ্ণব-কবিতার নামে চতুর্থ নালিশ যে, উহার প্রেম-কাহিনীতে প্রেমের বিবর্ত্তনমূলক কোনও ইতিহাস (evolution) পরিলক্ষিত হয় না। অজিত বাবুর ভাষায় উহা আমাদিগের প্রতি দিবসের সংসারটাতে জন্মগ্রহণ করিয়া "জীবনের ঋজু কুটিল পথে" শত সংশয়-দ্বন্দ্ব-পাপের মধ্য দিয়া অভিসার যাত্রা করিয়া "উত্থান-পতন, জয় পরাজয়ে"র ভিতর দিয়া অনন্ত প্রেমময়ে গিয়া পৌছে না। কিন্তু কথা হইতেছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেমে আদৌ এইরূপ সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া যাত্রা করিবার প্রয়োজন আছে কি না? এই প্রেম-সঙ্গীত যদি চিরন্তন পুরুষ প্রকৃতির প্রণয়লীলার সহস্র বিচিত্র কাহিনীর কয়েকটী মূর্চ্ছনা মাত্র হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব কবিগণ যে আনন্দলোকে দাঁড়াইয়া তাহা আলাপ করিয়াছেন, সেখানে আমাদের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ, সংশয়-দ্বন্দ্বের স্থান কোথায়? সেখানকার প্রেমে যদি কোনও বিবর্ত্ত-বিলাস থাকে, তাহা এই প্রেমেরই আনুসঙ্গিক মান অপমান, কলহ বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই হইবে; এবং বৈষ্ণব-কবিগণের মধ্যে তাহা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। আর এক কথা, —যদি কর্ম্মময় জীবনের ভিতর দিয়া প্রেমের ক্রম-পরিণতি দেখানই বৈষ্ণব সাহিত্যকারগণের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের ত তাহার যথেষ্ট অবসর ছিল; কারণ, যে বিচিত্র জীবন-কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া এই পরম গুহ্য প্রেম তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার মত অদ্ভুত কর্ম্মময় জীবন আর কোথায় দেখিতে পাওয়া যায়? কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, যেখানে তাহার কর্ম্মময় অংশের সূত্রপাত, ঠিক সেইখানেই তাহার প্রেমময় অংশ শেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ যে সংসার হইতে দূরে,—সমাজ-বন্ধন ও কর্ম্মময় জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের বাহিরে, একটী নিরালা আনন্দ-লোক সৃষ্টি করিয়া, সেইখানে দুইটী চিরন্তন নবীন হৃদয়ের স্বার্থ-কামনা-বিহীন মধুর মিলনের অপূর্ব্ব রসবিলাস বর্ণনা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহা বৃন্দাবন লীলার দেশকাল-পাত্র-সংস্থান সাহিত্যের দিক দিয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়। অজিত বাবু যে বৈষ্ণব-সাহিত্য নিতান্ত অনাধ্যাত্মিক ও স্থূল-রসের সাহিত্য বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে এইখানটী মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন, তাহার ভিতর প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিকতার কোনও ইঙ্গিত আছে কি না।

কাল—সেখানে অনির্দিষ্ট; সংসারের কোনও শক,

অব্দ, হিজিরায় তাহার নির্দ্দেশ করা যায় না। দেশ—সেখানে অলৌকিক; যদি আনন্দ-লোকের কোনও চিত্র মর্ত্ত্যে উপস্থাপিত করা সম্ভবপর হইত, তবে তাহা বুঝি এইরূপই হইত। সে একেবারে Perfect Arcadia! সেখানে গাছে-গাছে পাখী গান করে, শ্যামায় শিস্ দেয়, মেঘ-মেদুর আকাশের তলে তমাল-গাছের শীর্ষগুলি যখন শ্যামতর হইয়া আসে, তখন বনান্ত-সীমায় শিখী বর্হ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে। লোকালয়ের বাহিরে একটু দূরেই গোবর্দ্ধন গিরি; তাহার সমুন্নত শিখরপ্রদেশ হইতে একটা রজত-শুভ্র নির্ঝর-ধারা শ্যামাঙ্গিনী প্রকৃতির পীবর-বক্ষের উপর আধখানি মালার মত লুটাইয়া আছে। বেচারী মালাটী গাঁথিতে গাঁথিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পার্শ্বেই যমুনানদী; তাহার কালো জলের লহরী-লীলায় তরুণ-প্রণয়ের শত-বিচিত্র কাহিনী মর্ম্মরিয়া উঠে। এই যমুনারই অনপ প্রদেশে গোবর্দ্ধনগিরির উপকণ্ঠে গোচারণ-ক্ষেত্র ও বনভূমি—না জানি সে কতই বন—তালী বন, তমাল বন, ভাণ্ডীর বন—দিগন্তের সীমা চুম্বন করিয়া পত্রে-পুষ্পে সুসজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী না জানি কি উৎসব দেখিবার মানসে নীল আকাশের তলে কাতারে-কাতারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের বুকের ভিতরে-ভিতরে প্রেমিকের গুপ্ত কুঞ্জবন—সেখানে রজনীতে উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না-হাসি-তলে রূপ ও যৌবনের মেলা বসিয়া যায়; রাসরসে নৃত্যপরা যুবতীদের নূপুর-নিক্কনে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠে। এই দেবভূমিতে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের জীবনও দেবতাদেরই মত নিষ্কলঙ্ক ও শুভ্র। অতি নিরীহ গো-প্রতিপালন ও ক্ষেত্র-কর্ষণই তাঁহাদের জীবিকা। তাঁহাদের জীবনে দুঃখ-দৈন্য নাই; সংসার যাত্রায় স্বার্থ লইয়া বাদ বিসম্বাদ নাই; সমাজে বিধি-প্রতিষেধপূর্ণ সহস্র প্রকারের কৃত্রিম বন্ধন নাই—সকলে মিলিয়া-মিশিয়া এক-প্রাণ, এক-আত্মা হইয়া গলা-গলি করিয়া বাস করে। তাহাদের একজন রাজা আছে বটে, কিন্তু তাহা নাম মাত্র; বিশ্বপ্রকৃতির জড়-চেতন স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সমস্ত বস্তুর মত তাহারা অধীনতার মধ্যেও স্বাধীন। তাহাদের মধ্যে একটা ধর্ম্ম আছে বটে, তাহা নিতান্তই প্রকৃতি-পূজা—মেঘ-বর্ষা-বাদল ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার শক্তি মানিয়া লওয়া। শ্রীকৃষ্ণ পরে তাহাদিগকে শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে শিখাইয়াছিলেন। তাহাদের যে নীতিপরায়ণতা, তাহা তাহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেরই মত নিতান্ত সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার; এবং তাহাদের যে সখ্য, প্রেম, বাৎসল্য ইত্যাদি—তাহা একান্তই জ্ঞান-নিরপেক্ষ হৃদয়ের টান—তাহারা যেখানে ভালবাসে, সেখানে ভাল না বাসিয়া পারে না বলিয়াই বাসে। পরের ছেলে কৃষ্ণ—তাহাদের হাঁড়ি ভাঙ্গে, ননী চুরি করিয়া খায়, কতই না উপদ্রব করে—তবু তাহারা তাহাকে ভালবাসে (কাজের মধ্যে ঐ একটি কাজই তাহাদের জীবনে আছে); রাগ হইলে মারিতে যায়, আবার তাহার মুখ দেখিলেই সব ভুলিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের অবকাশ নাই;—কর্ম্ম যতটুকু জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজন, ততটুকু। কেবল যাহার অবকাশ আছে, তাহা হৃদয়ের। সে হৃদয়ও সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টি-ভাবে মিলনে একত্রীভূত; কেবল দুইটী হৃদয়ের উপর কেন্দ্রীভূত। এই প্রেমের ক্ষেত্র বৃন্দাবনের যিনি নায়ক—তিনি বয়সে কিশোর (অর্থাৎ তাঁহার এমন একটী বয়স, যখন বালকের পবিত্রতায় সহিত যুবকের রূপ-রস আনন্দ অনুভব করিবার শক্তি আসিয়া মিলে)—রূপে অতুলনীয়, গুণে অতুলনীয়, শক্তিতে অতুলনীয়; স্বয়ং রূপেশ্বরী রাধা "জনম অবধি" তাঁহার "রূপ দেখিতেছেন" তবু তাঁহার "আঁখি তৃপ্ত হইল না"—বুঝি কখনও হইবেও না। বৃন্দাবন তাঁহারই লীলাভূমি; সেখানে স্থাবর হইতে জঙ্গম পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বাঁচিয়া আছে; তিনি তাহার উন্মুক্ত প্রকৃতি-বক্ষে তাহারই প্রাণ স্বরূপ হইয়া পুলিনে, নিকুঞ্জে, গোচারণ-ক্ষেত্রে নাচিয়া-নাচিয়া, বাঁশী বাজাইয়া-বাজাইয়া বিহার করেন—বুঝি তাঁহার নৃত্যের ছন্দে-ছন্দে বৃন্দাবনের জীবন-স্রোতও তালে-তালে চলিতে থাকে। এ নৃত্য যে দিন থামিল, তাহার জীবনেরও সেইদিন অবসান হইয়া গেল। তাঁহার বাঁশীর তানে ময়ূর-ময়ূরী পুলকে পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্য করে, গাছে-গাছে শিহরণ জাগে, যমুনা প্রেমে উচ্ছল হইয়া উজান বহিতে থাকে। বৃন্দাবনের গো-মেষ-ছাগ-মহিষাদিও তাঁহাকে চিনে; তাহারা জানে—কোন্‌টী তাঁহার পদচিহ্ন, কোন্‌টী নয়। তিনি যখন বাঁশীর সুরে উদাস করিয়া ডাকিতে থাকেন, তখন রাধার মত তাহারাও ঘেঁসিয়া আসিয়া তাঁহার গায়ে গা রাখিয়া দাঁড়ায়। আর সেই "গোরোচনা গোরী, নবল কিশোরী শ্যাম সোহাগিনী, শ্যাম-তমালের বক্ষের স্বর্ণমাধবীলতা রাধা - যাঁহার শ্যাম

ছাড়া আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—যিনি "নীল সাড়ি"র সহিত শ্যামের "প্রাণটীও নিঙ্গড়াইয়া-নিঙ্গড়াইয়া" পথের উপর দিয়া চলিয়া যান্—শ্যাম তাঁহারই "আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রচনা" করা মূর্ত্তি, কেমন করিয়া "হিয়ার ভিতর হইতে বাহিরে" আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার মিলনই তাঁহার প্রাণ। তিনি এই মিলনের জন্যই "ঘরকে বাহির" করিয়াছেন, "বাহিরকে ঘর" করিয়াছেন, তবু আর মিলনের তৃষা মিটে না। শ্যামের "হিয়ার পরশ লাগি" তাঁহার "হিয়া কাঁদিয়া মরে," "প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গ" ব্যাকুল হয়—এতই মিলনের ক্ষুধা। আর সে মিলনও এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। যখন শ্যামের স্বর্ণাভ পীতধটীর সহিত রাধার স্বর্ণকান্তি ও রাধার নীলাম্বরীর সহিত শ্যামের নীল মণিময় বপু মিশিয়া নীল ও স্বর্ণরাগে একাকার হইয়া যায়, তখন মনে হয়, অসীম নভো-নীলিমা ব্যাপ্ত করিয়া যেন রূপের এক পরিপূর্ণ বিদ্যুদ্দীপ্তি এই মাত্র ঝলসিয়া উঠিল,—আলোর সহিত আঁধারের, রূপের সহিত অরূপের মিলন হইলে বুঝি সে এই রকমই হয়। তাঁহাদের প্রেম বিবাহিত দম্পতীর প্রেম নহে, কারণ, তাহাতেও সংসার হিসাবে একটা সুবিধা-অসুবিধার দিক আছে;—এ প্রেম স্বার্থ মাত্র বিরহিত। সত্য বটে ইহাতে একটা কলঙ্কও আছে—কিন্তু তাহা ছায়া মাত্র—বৈষ্ণব কবিগণ তাহার অবতারণা করিয়াছেন, শুধু কলঙ্কের কষ্টিপাথরে প্রেমের উজ্জ্বল স্বর্ণ খাঁটী কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। গৃহে একটা গুরু-গঞ্জনার ভয় আছে; কিন্তু তাহারও সার্থকতা শুধু প্রেম-বৈচিত্র্য প্রদর্শনে—শুধু সহজ মিলনের পথে একটা বাধা আনিয়া দেওয়ায়। এক কথায়, বৃন্দাবন-লীলায় যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সে সমস্তই কেবল এক সুসম্বদ্ধ, শাশ্বত, মাত্র হৃদয়-সম্পর্কিত মহাপ্রেমের বিচিত্র লীলা-রস প্রকটিত করিবার জন্য; কেবল রাধাকৃষ্ণের প্রেমের স্ফূর্ত্তি প্রদর্শনেই সাহিত্য হিসাবে তাহাদিগের উপযোগিতা। এই মহাপ্রেমের উপরেই বৈষ্ণব-কবিতার ভিত্তি; ইহাকে বাদ দিলে তাহার আর কোনও অবলম্বনই থাকে না—কাজেই কোনও মূল্যও থাকে না। এখন আমরা অজিত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তিনি বলুন দেখি,—বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিকতার কোনও ইঙ্গিত আছে কি না?

অজিত বাবু বৈষ্ণব-কবিতাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারেন; কিন্তু স্যর রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন না। তিনি বৈষ্ণব-কবিতারসে তাঁহার কবি-ভারতীর অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং এখনও তাঁহার ভানুসিংহের পদাবলী, "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন" কিম্বা "বাঁশরী বাজাতে চাহি" ইত্যাদি সঙ্গীত, "নিরাকুল ফুলভারে বকুল বাগান" ইত্যাদি পদের শব্দলালিত্য (নিরাকুল বকুল কলাপে—জয়দেব।) কিম্বা তাঁহার "চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি" ইত্যাদি প্রবন্ধ, "বৈষ্ণব কবিতা" ইত্যাদি কবিতা সেই কথারই সাক্ষ্য দিতেছে।

এখনও তাঁহার—

> "মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে
> আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে?"

কিম্বা—

> "আকাশ কাঁদে হতাশ সম নাই যে ঘুম নয়নে মম
> দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম চাই যে বারে বার।"

ইত্যাদি লাইনের যে ব্যাকুলতা, তাহা বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাগণের

> "গগনে বাবিদ ঝম্পিয়া
> * * *
> একলি মন্দিরে অনিদ লোচনে
> জাগি সগর রতিয়া।"

কিম্বা—

> "ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।"

ইত্যাদি লাইনে রাধার ব্যাকুলতারই প্রতিধ্বনি। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই যে, তিনি রাধার স্থানে আপনাকে কল্পনা করিয়া লইয়াছেন এবং বৈষ্ণব-কবিগণ যেখানে সখ্য, মধুর ইত্যাদি রসের লীলা বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য ভগবানকে একটি বিশিষ্ট, সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে দেখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, রসের প্রয়োজন না থাকায়, মোটামুটী বিরহ ও মিলনের উদ্দেশ্য অনুসারে তিনি সেইখানে তাঁহাকে একটু দূরে সরাইয়া দিয়া, একটু ব্যাপ্ত, একটু ছায়া-ছায়া করিয়া দেখেন মাত্র। নতুবা বৈষ্ণব-কবিদিগের বিরহ-মিলন-অভিসারে ও রবীন্দ্রনাথের বিরহ-মিলন-অভিসারে ধাতুগত বিশেষ কোনও বিভিন্নতা নাই। আপনার কবি-জীবনের উদ্বোধনে বৈষ্ণব-কবিদিগের নিকট সহায়তা পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ এবং এই বৈষ্ণব-কবিতারূপ অপূর্ব্ব অমৃতভাণ্ড কৃপণের ধনের মত বঙ্গ-

সাহিত্যের হৃদয়ে লুকানো আছে দেখিয়া, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সমগ্র মানবজাতির দিক হইতে জগৎ-সাহিত্যের জন্য তাহার দাবীও করিয়াছেন।

কিন্তু স্বয় রবীন্দ্রনাথ যেখানে পদার্পণ করিতে ভয় পান, অজিত বাবু সেখানে সবেগেই প্রবেশ করেন; কারণ, তাঁহার ভয় করিবার কিছুই নাই। কিন্তু তবু আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বৈষ্ণব কবিতাকে এরূপ অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়া লাভ কি? তাহাও তাঁহারই দেশের কবিতা। তাহার যদি কোনও গৌরব থাকে, ত সে গৌরব ত তাঁহারও। আর তা'ছাড়া, সব জিনিসকে কি সকল সময়ে বিদ্রূপ করা যায়? একটা গুরু-লঘু জ্ঞানও ত আছে। অজিত বাবু একটি কথা মনে রাখিলে আর কোনও বিভ্রাট ঘটে না—আকাশে থুথু ফেলিলে অনেক সময় তাহা নিজের গায়েই লাগে।*

* এই প্রতিবাদটী 'প্রবাসীতে' প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ না করিয়া ফেরত পাঠাইয়াছেন—লেখক।

নির্ম্মলী ও আকালী

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

মহাত্মা নানক-প্রবর্ত্তিত শিখ-ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে 'নির্ম্মলী' ও 'আকালী' সম্প্রদায়ের নাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই উভয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তির বিবরণ অনেকেই জ্ঞাত নহেন; 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণের অবগতির জন্য এই দুই সম্প্রদায়ের উৎপত্তির কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

নির্ম্মলী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি-বিবরণ অতি অদ্ভুত। এই বিবরণ একখানি চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু হইতে পারে। শিখ-সম্প্রদায়ের দশম-গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৬৯১ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে পঞ্জাবের অন্তর্গত আনন্দপুর নামক তাঁহার বাসগ্রামে দোল-পূর্ণিমা উপলক্ষে 'হোলি'-উৎসবে মত্ত হইয়াছিলেন। সেই বৎসর আনন্দপুরে হোলি-উৎসব দেখিবার জন্য পঞ্জাবের নানা স্থান হইতে বহু দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। এমন কি, অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের শুদ্ধান্তবাসিনী রমণীগণও এই আনন্দপূর্ণ উৎসব সন্দর্শনের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারেন নাই; পঞ্জাবী পুরুষ ও রমণীগণ দলে-দলে আসিয়া এই মধুর উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

উৎসবারম্ভের পর উৎসব-ক্ষেত্রে একদিন একটি মহিলার সমাগম হইল,—তাঁহার নাম অনুপ কোঁয়ার। অনুপ কোঁয়ার লাহোরবাসিনী; তিনি ক্ষত্রিয়াণী ছিলেন। এই সময় অনুপ কোঁয়ারের বয়স বিশ-বাইশ বৎসরের অধিক হয় নাই,—কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনায় এই বয়সেই তিনি বিধবা হইয়াছিলেন। অনুপ কোঁয়ার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন, তাহার উপর তাঁহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য সে সময় লাহোরের অধিবাসিগণের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। একে ত অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী—তাহার উপর অপরূপ রূপ! সংসারে তেমন সতর্ক অভিভাবকও কেহ ছিল না; সুতরাং এই যুবতী বিধবা বিলাস-স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র যে নির্ম্মল রাখিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ বোধ হয় না।

যাহা হউক অনুপ কোঁয়ার আনন্দপুরে উপস্থিত হইয়া উৎসব-মত্ত গুরু গোবিন্দকে দেখিতে পাইলেন। শত-শত লোক সেদিন আনন্দোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু অনুপ কোঁয়ারের সতৃষ্ণ দৃষ্টি গুরু গোবিন্দের প্রতিই সর্ব্বাগ্রে আকৃষ্ট হইল। গুরু গোবিন্দের বয়স তখন পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে। তাঁহার সুগৌর উন্নত দেহ, তাঁহার দেবোপম মুখ-কান্তি, তাঁহার ভাবোন্মত্ত প্রেম-গদগদ ভাব দেখিয়া যুবতী অনুপ কোঁয়ার মনের সংযম হারাইলেন; তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।—তিনি গুরু গোবিন্দকে প্রণয়-শৃঙ্খলে বন্দী করিবার চেষ্টায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—যদি তাঁহাকে কুল-ত্যাগিনী হইতে হয়, কলঙ্ক-পসরা মস্তকে বহন করিতে হয়, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি তিনি গোবিন্দ সিংহের চরণযুগলে তাঁর রূপ-যৌবন উপহার প্রদান করিবেন। কিন্তু কিরূপে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইতে পারে, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি দুই-একজন সহচরীর নিকট তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে আশা দিতে পারিল না। শিখ-গুরু গোবিন্দ সিংহ জীবনে যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, নারীর প্রেম তাহার তুলনায় তুচ্ছ। তিনি কি তাঁহার আজীবনের সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়া, চরিত্রের পবিত্রতা, ধর্ম্মের কঠোরতা, কর্ত্তব্য সাধনের একাগ্রতা সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া রূপসীর রূপের উপাসনায় আত্মনিয়োগ করিবেন? কে তাঁহাকে এমন অসঙ্গত অনুরোধ করিবে? অনুপ কৌয়ারের আশা মিটিল না, তাঁহার পিপাসা নিবৃত্ত হইল না; গোবিন্দ সিংহকে তিনি যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রজ্জলিত হুতাশনের ন্যায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল; প্রেমোন্মাদে তিনি পাগলিনীর মত হইলেন।—অবশেষে তিনি তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য এমন এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্র করিলেন, যাহা তাঁহারই দুঃসাহসের সম্পূর্ণ উপযোগী।

এই সময় ভারতের মোগল বাদসাহ ও তাঁহার মুসলমান কর্ম্মচারিগণ হিন্দুদিগের ধর্ম্মের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছিল; বিশেষতঃ শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি তখন কঠোর নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছিল। গোবিন্দ সিংহ এই অত্যাচারের প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হইলেন; কিন্তু মুষ্টিমেয় শিষ্য-দল লইয়া মহাপরাক্রান্ত মোগল বাদসাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কল্পনা বাতুলতা বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি বুঝিলেন, দৈববলে বলীয়ান হইতে না পারিলে তাঁহার চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিরূপে এই বল লাভ করা যাইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, গোবিন্দ সিংহ মহাকালীর মন্দিরের পুরোহিতগণের শরণাপন্ন হইলেন; পুরোহিতেরা তাঁহাকে আশা দিলেন, ষোড়শোপচারে পূজা দ্বারা মহামায়াকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে গোবিন্দ সিংহ তাঁহার কার্য্যফল লাভ করিতে পারেন। তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই—'পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনায়' তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার নহে। দেবীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিবার ব্যবস্থা করা হইল, নিত্য অজস্র অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহের কার্য্যফল লাভ হইল না, দেবী প্রসন্না হইলেন না।

তখন গোবিন্দ সিংহ বিষণ্ণ হৃদয়ে সাধু সন্ন্যাসিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন—কি উপায়ে দেবীর প্রসন্নতা লাভ করা যায়। গোবিন্দ সিংহের বিশ্বাস ছিল, সংসারত্যাগী জিতেন্দ্রিয়, সাধু-সন্ন্যাসিগণ, বিশেষতঃ তান্ত্রিক সাধুরা এমন যোগ-যাগ অনেক জানেন, যাহার সাহায্যে করালবদনা নৃমুণ্ডমালিনী মহাকালীকে প্রসন্না করিতে পারা যায়। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া গোবিন্দ সিংহ কোনও নূতন সাধু-সন্ন্যাসীর সেই অঞ্চলে আগমন-বার্ত্তা পাইলেই, তাঁহার চরণ-দর্শনে যাইতেন, এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও সাধু তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

অনুপ কৌয়ার তাঁহার গুপ্তচরের মুখে গোবিন্দ সিংহের এই 'বাতিকের' কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত পরিচিতা হইবার এক অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুপ কৌয়ার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ছিলেন; তিনি অর্থবলে কতকগুলি লোককে বশীভূত করিয়া তাঁহার গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সাহায্যে নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে আনন্দপুরের সন্নিহিত অরণ্যে যোগ-যাগ আরম্ভ করিলেন। অনুপ কৌয়ারের দলের লোকেরা চারিদিকে রটনা করিতে লাগিল—জঙ্গলে হঠাৎ কোথা হইতে এক সাধু আসিয়াছেন—তিনি বড় সিদ্ধ পুরুষ; তাঁহার শক্তি অসাধারণ। প্রতিদিন মধ্যরাত্রে তিনি কালী-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেখানে ভজন-সাধন করেন; মহাকালীর সহিত তাঁহার নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হয়—ইহাও অনেক লোক গোপনে থাকিয়া শুনিয়াছে। সন্ন্যাসী দিবাভাগে বৃক্ষতলে ধ্যানস্থ থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না, ইত্যাদি।

সাধুর ক্ষমতার কথা ক্রমে গোবিন্দ সিংহের কর্ণেও প্রবেশ করিল। তিনি মনে করিলেন, এতদিন পরে দেবী বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন;—এই সাধুর সাহায্যেই তিনি দেবীর প্রসন্নতা লাভে সমর্থ হইবেন। গোবিন্দ সিংহ সেই দিনই তাঁহার একজন বিশ্বস্ত শিষ্যকে নবাগত সাধুর নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার মনের কথা জানাইলেন, এবং কখন কিরূপে সেই মহাত্মার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন।

গোবিন্দ সিংহের শিষ্য ছদ্মবেশিনী অনুপ কোঁয়ারের নিকট উপস্থিত হইয়া নবীন সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। সে মনে-মনে বলিল, "হাঁ, আসল সাধুর মত চেহারা বটে,—ইনিই গুরুজীর মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিবেন।"—অনন্তর সে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সেই ভাক্ত সাধুর চরণ-বন্দনা করিয়া তাঁহাকে গোবিন্দ সিংহের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল। সাধু অচঞ্চল ভাবে গোবিন্দ-শিষ্যের প্রমুখাৎ সকল কথা শুনিয়া ধীর গম্ভীর বচনে বলিলেন, "অনেকেই আমার নিকট অনেক প্রার্থনা জানাইতে আসে; কেহ দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি-কামনায় আসে, কেহ অর্থলাভের কামনায় আসে,—এই সকল স্বার্থপর ভিক্ষুকদিগের সহিত আমি বাক্যালাপও করি না। কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া বুঝিতেছি, তোমার গুরু নিতান্ত সাধারণ লোক নহেন, এবং তিনি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াও আমার সাক্ষাৎ প্রার্থী নহেন; তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ বলিয়াই বোধ হইতেছে; সুতরাং আমি তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে অসম্মত নাই; কিন্তু তিনি যদি একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন, তাহা হইলেই আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারি।"

শিষ্য সবিনয় নিবেদন করিল, "অঙ্গীকারটি কি বলুন, আমার প্রভু নিশ্চয়ই সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইবেন। আপনার পাদপদ্ম দর্শনের জন্য তিনি সকলই করিতে প্রস্তুত আছেন।"

সাধু-বেশধারিণী অনুপ কোঁয়ার বলিলেন, "দিবসে তাহার সহিত আমার কোনও কথা হইবে না। গভীর নিশায় সমস্ত জগৎ সুষুপ্ত হইলে, তিনি একাকী আমার আশ্রমে আসিবেন, তাঁহার কোনও শিষ্য বা অনুচর তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারিবে না। আর তিনি যে শিখ-গুরুর ন্যায় আড়ম্বরপূর্ণ বেশে সজ্জিত হইয়া আসিবেন, তাহাও হইবে না; তাঁহাকে পীতবর্ণের আলখেল্লা পরিধান করিয়া যোগি-বেশে আমার আশ্রমে প্রবেশ করিতে হইবে। যদি এই সর্ত্তে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আজ মধ্যরাত্রে তাঁহাকে আসিতে বলিও।"

গোবিন্দ সিংহের শিষ্য সাধুর চরণ-বন্দনা করিয়া তাহার শিবিরে প্রত্যাগমন করিল, এবং সাধু যাহা-যাহা বলিয়াছিলেন—তাহা গোবিন্দ সিংহের গোচর করিল। সাধুর উক্তি শ্রবণ করিয়া সাধুর প্রতি গোবিন্দের ভক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। সাধুর ঐশী শক্তি না থাকিলে তিনি গোবিন্দকে এমন অঙ্গীকারে কেন বাধ্য করিবেন? গোবিন্দ সাধু-সন্দর্শনের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল, রাত্রি ক্রমে গভীরতর হইতে লাগিল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—চরাচর নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; উদ্ধাকাশে হীরকখণ্ডবৎ শুভ্র উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের দীপ্তি;—আর বনান্তরালে খদ্যোৎ-পুঞ্জের স্তিমিত জ্যোতিঃ। গোবিন্দ সিংহ সাহসে ভর করিয়া একাকী নগর-প্রান্তবর্ত্তী অরণ্যাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মৃদু নৈশ সমীরণ-প্রবাহে তাঁহার পীতাভ আলখেল্লা কম্পিত হইতে লাগিল, বৃক্ষচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন বনপথ দিয়া চলিতে দুইএকটি শুষ্ক বৃক্ষ পত্র স্খলিত হইয়া তাঁহার উষ্ণীষে নিপতিত হইতে লাগিল; কদাচিৎ তরুশাখাসীন দুই একটি নিশাচর পক্ষী গম্ভীরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবিন্দ সিংহ অকম্পিত হৃদয়ে সাধুর আশ্রম সন্নিহিত হইলেন।

তখন সাধু বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ধুনি জ্বালিয়া যোগ সাধনায় রত ছিলেন,—ধুনির আলোকে বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত হইতেছিল। সেই আলোকে গোবিন্দ সিংহ সাধুর সুকুমার মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। ভক্তি ভরে তাঁহার হৃদয় অবনত হইল। গোবিন্দ সাধুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সাধু সমাদর সহকারে শিখ গুরুর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর গোবিন্দ যে উদ্দেশ্যে তাঁহার দর্শন-প্রার্থী হইয়াছিলেন, তাহা নিবেদন করিলেন। কথায়-বার্ত্তায় অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সাধুর কথাবার্ত্তা শুনিয়া গোবিন্দ সিংহ চরিতার্থ হইলেন।

কিছুকাল কথাবার্ত্তার পর সাধু হঠাৎ উঠিলেন, গোবিন্দসিংহকে বলিলেন, "আপনি একটু বসুন, আমি আসিতেছি।" গোবিন্দসিংহ বসিয়া রহিলেন, সাধু হঠাৎ উঠিয়া কোথায় যাইতেছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না ও সে কথা জিজ্ঞাসা করাও তিনি অশিষ্টতার নিদর্শন মনে করিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সাধু গোবিন্দের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। গোবিন্দ সবিস্ময়ে সভয়ে দেখিলেন—এ কি, এ ত সাধু নহেন! এ যে অপ্সরা মূর্ত্তি! যুবতী বহুমূল্য পট্টবস্ত্রে

সুশোভিতা, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হীরকালঙ্কার ঝল্‌মল্ করিতেছিল; তাঁহার মুখে মৃদু-মৃদু হাসি, তাঁহার হৃদয়ে লালসার সুতীব্র হলাহল! অনুপ কোঁয়ার গোবিন্দ সিংহের সম্মুখে আসিয়াই তাঁহার বিস্ময়াপনোদনের অবসর না দিয়াই তাঁহার পদতলে জানু নত করিয়া বসিলেন, এবং উভয় হস্তে তাঁহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া উদ্বেলিত স্বরে প্রেম ভিক্ষা করিলেন; কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমি সাধু নহি, সন্ন্যাসী নহি, আমি লাহোরের অনুপ কোঁয়ার, তোমার রূপে মুগ্ধ; তোমাকে পাইবার জন্যই আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছি। আমার এই অপরূপ রূপ, আমার অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, আমার এই নব যৌবন, আমার অতুল ঐশ্বর্য্য—তোমার চরণে সমর্পণ করিতেছি; তুমি গ্রহণ কর, আমার জীবন-যৌবন ধন্য কর। তোমাকে না পাইলে আমার জীবন বৃথা!"

অনুপ কোঁয়ারের কথা শুনিয়া গোবিন্দ সিংহের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল!—তিনি বিদ্যুদ্বেগে কয়েক পদ সরিয়া গিয়া ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিলেন; "দুশ্চারিণি, তোর এত সাহস - গোবিন্দ সিংহের ব্রত ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিস্! আমার সহিত ছলনা? ধিক্ তোর রূপে, ধিক্ তোর যৌবনে; আর শতধিক্ তোর অর্থে!—কি বলিব, তুই স্ত্রীলোক,—নতুবা আমি তোর মুখে পদাঘাত করিতাম। দূর হ পিশাচি!"

এই তীব্র তিরস্কার শুনিয়া যৌবনোদ্ধতা নারী আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিল না। সে ক্রোধে কাঁপিতে-কাঁপিতে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "কি! তোমার এত সাহস! —তুমি আমায় অপমান করিলে? চোরের মত গোপনে এখানে আসিয়া আমার হৃদয়-ভরা প্রেম প্রত্যাখ্যান করিলে?—কে আছিস্, এই তস্করকে বন্দী কর।—চোর সাধুর বেশে আমার অলঙ্কার চুরি করিতে আসিয়াছে।"

অনুপ কোঁয়ারের অনুচরবৃন্দ অদূরে লুকাইয়া ছিল; তাহারা অনুপ কোঁয়ারের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া গোবিন্দ সিংহকে ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল। গোবিন্দ সিংহ এই যুবতীর শঠতা বুঝিতে পারিলেন; তিনি বুঝিলেন, —সেই স্থানে তিনি অনুপ কোঁয়ারের অনুচরবর্গ-কর্তৃক ধৃত হইলে, তাঁহার মান-সম্ভ্রম সমস্তই নষ্ট হইবে,—তাঁহার সদুদ্দেশ্যে সেখানে আগমনের কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না; এমন কি, তাঁহার অনেক বিশ্বস্ত শিষ্যও মনে করিবে—এই যুবতীর রূপজ্যোতিঃতে আকৃষ্ট হইয়াই প্রভু এই নিশীথকালে গোপনে তাহার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দ সিংহ মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে সেইস্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন,—ক্রোধে ও ক্ষোভে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে কাহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না; অনুপ কোঁয়ারের অনুচরবর্গকে তাঁহাকে ধরিবার জন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তিনি উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন, এবং তাঁহার অনুসরণকারিগণের ন্যায় তিনিও 'চোর', 'চোর' 'ধর' 'ধর' শব্দে চীৎকার করিতে-করিতে অন্ধকারপূর্ণ অরণ্য-পথ দিয়া তাঁহার বাসস্থানের অভিমুখে ধাবমান হইলেন; এবং অল্পকালের মধ্যেই নিরাপদ হইলেন। অনুপ কোঁয়ারের অনুচরেরা ব্যর্থমনোরথ হইয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল। গোবিন্দ সিংহ গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার সেই পীত পরিচ্ছদ তাঁহার ভক্ত শিষ্য পবিত্রচেতা বীর সিংহকে প্রদান পূর্ব্বক, এই ঘটনা স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য, একটি নূতন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সংগঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে বীর সিংহ 'নির্ম্মলী' অর্থাৎ 'পবিত্র' নামক একটি নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

গোবিন্দ সিংহ কেবল যে সাহসী, পবিত্রচেতা, ধার্ম্মিক বীরপুরুষ ছিলেন, এরূপ নহে; তিনি সুপণ্ডিত, সুরসিক ও কবি ছিলেন। অনুপ কোঁয়ার-কর্তৃক এই ভাবে প্রতারিত হইয়া, তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে দুঃশীলা রমণীগণের ছলনা ও চাতুর্য্য-জাল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, একশত চারিটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল উপাখ্যান পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, রমণী-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা কিরূপ অসাধারণ ছিল।

নির্ম্মলী সম্প্রদায়ভুক্ত শিখগণ সাধারণতঃ সুপণ্ডিত এবং সংস্কৃত সাহিত্যে পারদর্শী; তাঁহাদের অনেকেই বেদান্তের অনুরাগী। কথিত আছে, এই সম্প্রদায়ের পাঁচজন সাধু ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য বারাণসী ধামে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা শূদ্র বলিয়া কাশীর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া গুরু গোবিন্দ সিংহের সকাশে

প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করায়- গোবিন্দ সিংহ তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন যে, "বৎসগণ, তোমরা বারাণসী-ধামের পাণ্ডিত্যাভিমানী দাম্ভিক ব্রাহ্মণ-গণের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইও না; আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের মধ্যে এমন সকল পণ্ডিতের আবির্ভাব হইবে, যাহাদের পদতলে বসিয়া ব্রাহ্মণেরা শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইবে।"—গোবিন্দ সিংহের এই ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই।

'নির্ম্মলী'রা মস্তকে দীর্ঘ কেশ রাখেন এবং লোহিতাভ পীতবর্ণের পরিচ্ছদ ধারণ করেন।

আকালী সম্প্রদায়-ভুক্ত শিখ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার বিবরণও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। মোগল নরপতিগণের সৈন্য-সামন্তের অত্যাচারে চামকর হইতে গোবিন্দ সিংহের পলায়ন উপলক্ষেই এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা। চামকর শিখ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ স্থান।

চামকরে শিখদিগের একটি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল। লাহোরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা এই দুর্গ আক্রমণের জন্য বহুসংখ্যক মোগল সৈন্য প্রেরণ করেন। সেই সময়ে চামকর দুর্গে চল্লিশজন মাত্র শিখ বাস করিতেছিল। গুরু গোবিন্দ সিংহও তখন এই দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মোগল সম্রাটের অসংখ্য সৈন্য দুর্গ আক্রমণ-পূর্ব্বক মুষ্টিমেয় শিখ বীরগণকে বন্দী করিবার উপক্রম করিলে, গোবিন্দ সিংহ তাঁহার একজন শিষ্যকে তাঁহার পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া—গোবিন্দ সিংহ সাজাইয়া তাহার হস্তে দুর্গরক্ষার ভার প্রদান-পূর্ব্বক গুপ্তপথে স্থানান্তরে পলায়ন করেন। দুর্গরক্ষী শিখগণ আততায়ী মোগল-বাহিনীর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিল; কিন্তু তাহারা অশেষ বিক্রম প্রদর্শন করিয়াও দুর্গরক্ষায় সমর্থ হইল না। মোগলেরা দুর্গজয় করিয়া অধিকাংশ শিখ বীরকে বন্দী করিল। কিন্তু কয়েকজন শিখ বিজয়ী মোগল সৈন্য-মণ্ডলীর চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক নৈশ অন্ধকারে দুর্গ হইতে পলায়ন করিল। দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া তাহারা তাহাদের পূজনীয় গুরুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। বিস্তর অনুসন্ধানের পর তাহারা দেখিল, গুরু গোবিন্দ মাচিবারা নামক গ্রামের অদূরবর্ত্তী প্রান্তরে একটি কূপের সন্নিকটে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন; পথশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসায় তিনি এতই কাতর হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নড়িবার পর্য্যন্ত শক্তি ছিল না।

যাহা হউক, মাচিবারা গ্রামে গোবিন্দ সিংহের কয়েকজন বন্ধু বাস করিতেন,—তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। এই মুসলমান বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া গোবিন্দ সিংহ আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। মোগল সৈন্যেরা গোবিন্দ সিংহের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা তাঁহাকে ধরিতে পারিলে নিশ্চয়ই হত্যা করিবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার সেই মুসলমান মিত্রগণ তাঁহাকে মুসলমান ফকিরের ছদ্মবেশে সজ্জিত করিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হয়। মুলতানের সন্নিকটে উচ্ নামক একটি গ্রাম আছে; এই গ্রামে বহুসংখ্যক সৈয়দের বাস। এই গ্রামে একজন পীর ছিলেন, লোকে তাঁহাকে উচ্-কা-পীর বলিত। গোবিন্দ সিংহের দুইজন শিষ্য, এবং নবি খাঁ ও গণি খাঁ নামক তাঁহার দুইজন সৈয়দ বন্ধু তাঁহাকে একখানি খাটিয়ায় শয়ন করাইয়া, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া, উক্ত উচ্-কা পীর পরিচয়ে তাঁহাকে স্থানান্তরে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। গোবিন্দ সিংহের আর একজন শিষ্য একখানি পাখা লইয়া খাটিয়াশায়ী ছদ্মবেশী গোবিন্দকে ব্যজন করিতে-করিতে খাটিয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলেন।

খাটিয়া-বাহকেরা ছদ্মবেশী গোবিন্দ সিংহকে কিছুদূর বহন করিয়া লইয়া যাইতে-না-যাইতেই, মোগল সৈন্যগণ আল্লা হো আকবর শব্দে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতে-করিতে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তাঁহাদের উপর নিপতিত হইল! মুহূর্ত্ত মধ্যে জাল 'উচ্-কা-পীরের' প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল। মোগলেরা খাটিয়াখানি পরিবেষ্টিত করিয়া কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"খাটিয়ায় কে?"—বাহকগণ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "উচ্-কা-পীর!" পীরের খাটিয়া আক্রমণ করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য,—ইহা বুঝিলেও মোগল সৈন্যগণ খাটিয়া-বাহকগণের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিল না। মোগল সেনাপতি বলিলেন, "খাটিয়াতে যদি সত্যই পীর সাহেব থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অভ্যর্থনা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা খানার আয়োজন করিতেছি; পীর সাহেবকে বল, তিনি আমাদের সঙ্গে আসিয়া এক ফরাসে বসিয়া খানা খান।"

বলা বাহুল্য, গোবিন্দ সিংহ মুসলমান-স্পৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভোজন করিতেন না। মোগল সেনাপতির কথা শুনিয়া তিনি

প্রমাদ গণিলেন। মোগল সৈন্যগণের তরবারির আঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হয়, তাহাও স্বীকার—তিনি তাহাদের সঙ্গে বসিয়া আহার করিবেন না, সঙ্কল্প করিলেন; কিন্তু কোনও কথা বলিলেন না। পীর সাহেবকে নির্ব্বাক দেখিয়া একজন খাটিয়া-বাহক বলিল, "পীর সাহেব কি তোমার-আমার মত খানা খান? উনি দিবারাত্রি অনশনেই অতিবাহিত করেন; মাসান্তে একদিন এক রতি ছাতু মাত্র আহার করিয়া থাকেন।—তা' পীরজী তোমাদের সঙ্গে বসিয়া খানা না খান, তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা তোমাদের সঙ্গে বসিয়া খাইতেছি, তাহা হইলেই উঁহার আহার করা হইবে।"—অনন্তর গোবিন্দ সিংহের খাটিয়া বাহক চতুষ্টয় ও বাজনকারী শিখ—পাঁচজনেই মোগল সৈন্যগণের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিল। ইহাতে মোগল সেনানায়কের সন্দেহ বিদূরিত হইল; পীর সাহেবের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া তাহারা স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

পথিমধ্যে আর কোনও বিঘ্ন ঘটিল না। গোবিন্দ সিংহ এইরূপে নিরাপদে স্বীয় বাসগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্রয় ও সৈয়দ বন্ধুদ্বয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার পরিহিত নীলবর্ণ ছদ্মবেশের কিয়দংশ অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন, অবশিষ্টাংশ মানসিংহ নামক একজন সাহসী ও প্রীতিভাজন শিষ্যকে প্রদান-পূর্ব্বক এই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহাকে একটি নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে মানসিংহ 'নিহং' বা 'আকালী' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। 'নিহং' শব্দের অর্থ 'অহঙ্কার বর্জ্জিত' অর্থাৎ 'নিরহঙ্কার' আর 'আকালী' শব্দের অর্থ অনন্তকালস্থায়ী অর্থাৎ 'অবিনশ্বর।'

গোবিন্দ সিংহ উচ্-কা-পীরের ছদ্মবেশে পলায়নের সময় নীলবস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য 'আকালী' সম্প্রদায়ভুক্ত শিখগণ সর্ব্বদা নীল পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। পরিচ্ছদের সহিত নানাবিধ অস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে ধারণ করা ইহাদের সামাজিক প্রথা। নীল-পরিচ্ছদধারী, নানা অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত, দীর্ঘকায় আকালী বীরগণের আকার-প্রকার দেখিলে, তাহাদিগকে অতি ভীষণ-প্রকৃতি লোক বলিয়াই ধারণা হয়। ইহারা সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কষ্টসহ, এবং সমর-নিপুণ। পরবর্ত্তী কালে পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের যে সকল রণদুর্ম্মদ, অজেয়, খালসা-সৈন্য তাঁহার অধিকৃত বিশাল রাজ্যের গৌরবস্তম্ভ বলিয়া ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই এই নীল-পরিচ্ছদধারী আকালী। মহারাজ রণজিৎ সিংহের শিক্ষা-গুণেই আকালীরা মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধৃ জাতিতে পরিণত হইয়াছিল। ধর্ম্মান্ধতায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া শিখ ধর্ম্মের গৌরব সংরক্ষণের জন্য ইহারা যে ভাবে মোগল দমনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার বিবরণ পাঠ করিলে, মধ্যযুগের সমরবিশারদ, ধর্ম্মোন্মত্ত য়ুরোপীয় 'টেম্প্লার' (Templars) 'হস্পিটেলার' (Hospitallers) এবং 'টিউটনিক নাইট্' (Teutonic Knights) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল বলিয়াই মনে হয়।

বর্ত্তমান কালে আকালীদিগের সম্প্রদায়গত বিশেষত্ব-সূচক সেই ধর্ম্মোন্মাদ অনেকটা সংযত হইয়াছে, ইহা অবশ্য কালধর্ম্মেরই লক্ষণ। আকালীরা অতিথিকে আহার না করাইয়া স্বয়ং ভোজন করে না; ইহারা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, নিকটে কেহ অভুক্ত আছে কি না, সন্ধান লয়; এমন কি, যে সময়ে তাহাদের কেহ আহারে বসিবে, সেই সময়ে যদি কোনও ক্ষুধার্ত্ত অতিথি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিজের মুখের গ্রাস তাহাকে প্রদান করিয়া স্বয়ং অভুক্ত থাকে।

যে সকল আকালী গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদলে গৃহীত হয় নাই, তাহাদের অনেককেই ঘোড়া, উট সহ নানা প্রকার লট্-বহর লইয়া যাযাবর জাতির ন্যায় পঞ্জাবের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, এবং তাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সম্ভ্রান্ত লোকের সাহায্যপ্রার্থী হয়। কেহ-কেহ 'সাহেব লোকের' নিকট 'ভিজিটিং কার্ড' পাঠাইয়া ভিক্ষা চাহে! ইহারা 'বাহিরিয়া' অর্থাৎ গৃহহীন বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকে।

পঞ্জাবের অনেক শিখ ধর্ম্মশালায় দেখা যায়, নিরক্ষর নিষ্কর্ম্মা আকালীরা সায়ংকালে দলে-দলে একত্র সম্মিলিত হইয়া, সুবৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত 'খলে' কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্থূল 'দণ্ড' দ্বারা ভাঙ্গ ঘুটিতেছে! তাহাদের গল্প-গুজবে এবং উচ্চহাস্যে ধর্ম্মশালা গুলজার হইয়া উঠে। যখন ইহারা অশ্বে বা উষ্ট্রে আরোহণ-পূর্ব্বক ভিক্ষায় বাহির হয়, তখনও নীল-পরিচ্ছদ এবং অস্ত্র-শস্ত্র ত্যাগ করে না।

সাময়িকী

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় 'রামমোহন লাইব্রেরী' ভবনে 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে দিন উক্ত লাইব্রেরীতে এত জন-সমাগম হইয়াছিল যে, বহু লোক সভাস্থলে প্রবেশ করিতেও অসমর্থ হইয়াছিলেন। সেই জন্য কয়েক দিন পরে 'আলফ্রেড থিয়েটারে' কবিবর পুনরায় উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে বাধ্য হন। সে দিনও এত লোক হইয়াছিল যে, অনেককে বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বক্তৃতায় এমন কিছু ছিল, যাহা শুনিবার জন্য সকলেরই বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিবার জন্য সাধারণতঃ জন সমাগম হইয়াই থাকে; কিন্তু এই 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' শুনিবার জন্য লোকের অত্যধিক আগ্রহের যথেষ্ট কারণ আছে। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী কবি-সম্রাটের সুমধুর গীতধ্বনি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা অতৃপ্ত হৃদয়ে কাণ পাতিয়া শুনিয়াছিলেন—

> "জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
> স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
> দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
> দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
> ত্রাসাতঙ্ক চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা,
> কোটি-মৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে
> জাগ্রত ভগবান্ হে, জাগ্রত ভগবান্।"

আমরা শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথের 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' শুনিয়াছি, পরেও মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তাহার পর এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে নানা আলোচনা, আন্দোলনও শুনিতেছি, পড়িতেছি। কেহ প্রবন্ধটীর প্রশংসা করিতেছেন, কেহ নিন্দা করিতেছেন, কেহ বা নিন্দা প্রশংসা দুই-ই করিতেছেন; আবার এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা বিদ্রূপও করিতেছেন। প্রশংসার হেতু বুঝি, নিন্দারও কারণ বুঝি, নিন্দা-প্রশংসার উদ্দেশ্য ত ভাল করিয়াই বুঝি; কিন্তু বিদ্রূপের হেতু মোটেই অবধারণ করিতে পারি না। প্রবন্ধটী রাজনৈতিক শ্রেণীভুক্ত; আমরা রাজনীতির আলোচনা করি না, 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম'ই হউক, অথবা দশ জনের ইচ্ছাতেই কর্ম্ম হউক, কর্ম্ম ত হইতেছে—তা সেটা সু-কর্ম্মই হউক, আর কু-কর্ম্মই হউক। সেই কথা ভাবিয়াই আমরা শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথের এই 'কর্ম্মের' কথার আলোচনা করিব না, স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি, ঐ প্রবন্ধ লইয়া বেশ আন্দোলন হইতেছে; তাই আমরা বিশেষ কোন কথা না বলিয়া প্রবন্ধের স্থল-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া 'ভারতবর্ষের' পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবৃত্তি করিতেছি। 'হোম রুল' (বাঙ্গালা অনুবাদ কি? জানি না) কি 'কর্ত্তার রুল' ভাল, তাহার বিচার আমাদের 'সাময়িকী'র বিষয়ীভূত নহে;—আমরা আদালতের কনেষ্টবলের যে 'রুলের' সহিত পরিচিত, দূর হইতে তাঁহাদের সেলাম করিয়াই থাকি;—তা পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ যাহাই বলুন না কেন—"এমনি করিয়া দুঃখকে আমরা সন্দেহে মাখি এবং ভাঙ্গা পিপের আল্‌কাতরার মত সেটাকে দেশের চারিদিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।"

গ্রামের পাঠশালায় দাগা বুলাইয়া অক্ষর-লিখনের পর, তালপাতা-কলাপাতায় যলা-বানান শেষ করিয়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াই, লোহারামের ব্যাকরণ পড়িয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছি,—'কর্ত্তা' আর 'ক্রিয়া'; সঙ্গে-সঙ্গে শিখিয়াছি, 'কর্ত্তা' যদি কাজের লোক হন, তাহা হইলে 'ক্রিয়া' 'সকর্ম্মক', আর তিনি যদি আমাদের মত বচন-সর্ব্বস্ব অ-কর্ম্মা হন, তাহা হইলে ক্রিয়া 'অকর্ম্মক'। এ শিক্ষা আমাদের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছে; আমরা জানিয়া রাখিয়াছি 'কর্ত্তা' ছাড়া ক্রিয়াও হয় না, কর্ম্মও হয় না;—তা সে কর্ত্তা লাট-সাহেবই হউন, থানার দারোগাই হউন, বা মনু পরাশরই হউন, বা জ্যেঠা-মহাশয়ই হউন, অথবা বর্ত্তমান সময় অনুসারে সম্বন্ধী মহাশয়ই হউন বা তাঁহার সহোদরাই হউন। অতএব 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম'ই হইয়া থাকে; এখন যদি না হয়, তবে আমরা নাচার! শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বলিতেছেন—

"আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্ত্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনায় আমরা যে যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্ম্মে,—না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্ত্তাভজা, সেটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অন্ততঃ একটা ফাটল দিয়াও সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে এটাও শুভলক্ষণ।"

শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথের সার কথাটা পাঠক-পাঠিকাগণ বেশ বুঝিয়াছেন; তাঁহার 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' বক্তৃতার উদ্দেশ্যও সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন; এবং এ কথা লইয়া শিক্ষিত সমাজে মতভেদ নাই, কারণ এখন Home Ruleর আমল। কিন্তু মতভেদ হইয়াছে আসল কথার ডাল পালা লইয়া। যাঁহারা ক্রটী ধরিতেছেন, নিন্দা করিতেছেন, গালাগালি দিতেছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি আলোচনা করিতেছেন, তাহাই করুন; তাহার মধ্যে হিন্দু সমাজের কথা কেন? হিন্দু সমাজের উপর আক্রমণ কেন? রাজনীতিতে স্বধু শাসক-সম্প্রদায় ও জন সম্প্রদায় থাকিবে (Government and People); হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান কেন? আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, রবীন্দ্র বাবুর নিম্নলিখিত কথাগুলি ঠিক নহে। সার রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"কোথাও আমাদের কোন কর্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পুরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাচের টবের মধ্যে; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাচটা জল নয়। তার পরে সে বড় জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে জলটা কাচ নয়; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ঐ মাথা-ঠুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্ব্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁট-খুলিবার বিদ্যাটা নয়; তারপর জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে সুরু করিয়া চলাফেরাটা পর্য্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্য্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইসারাকে, গণ্ডীকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত, যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সাম্‌নে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনোমতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতী চষমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে একটুকু ভুল হয় এইজন্য যে দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের প্রতি অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড় কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন- "তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।"

আর যাই হোক, মনু পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সংস্কৃত সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্ব্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁৎ নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জ্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।"

উদ্ধৃত অংশের শেষ দিকটায় কেহ আপত্তি করেন না; তাঁহাদের আপত্তি, ক্ষোভ, ক্রোধ ঐ 'মানুষকে, পুঁথিকে, ইসারাকে, গণ্ডীকে—' ইত্যাদিতে; তাঁহাদের ক্ষোভ, ক্রোধ ঐ "নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে-" ইত্যাদিতে। কথাটা যে বেশ শক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; আমাদের এই সনাতন হিন্দু সমাজের মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন শক্ত কথা বলিলে হিন্দু সমাজ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ না হইয়া পারেন না। 'তন্ত্র মন্ত্র' 'বিধি নিষেধ' 'শ্লোক' 'আচার'কে এমন করিয়া আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইলে হিন্দু ত চটিবেন-ই; এই যে 'আষ্টে পিষ্টে বাঁধন' ইহাকে যে হিন্দু সোণার বাঁধন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন, এই 'আষ্টেপিষ্টে বাঁধন' এই বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্রই হিন্দু জাতিকে এত বিপ্লবের মধ্যেও মাথা তুলিয়া রাখিবার শক্তি, সামর্থ্য দিয়াছে; এ বাঁধন না থাকিলে হিন্দুত্ব থাকিত না, হিন্দুর কিছুই থাকিত না, হিন্দু কোল ভীল সাঁওতাল হইয়া যাইত। অতএব, সার রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-সমাজের উপর আক্রমণ করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন।

সে দিন একটা সাহিত্যিক মজ্‌লিসে আমরা উপস্থিত ছিলাম। মজ্‌লিসটী ছোট; কিন্তু সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা ছেলে-ছোকরা, নবীন যুবক নহেন; তাঁহারা প্রবীণ এবং আমাদের সাহিত্যিক ও সামাজিক-ক্ষেত্রেও শীর্ষস্থানীয়। আমরা সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, কর্ত্তারা সকলে মিলিয়া 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' লইয়া আলোচনা গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাহাতে যোগ দিতে হইল। তাঁহারা সার রবীন্দ্রনাথের উপরি উদ্ধৃত মতের সমর্থন করিলেন না; তাঁহারা বলিলেন, এই রাজনৈতিক কথার মধ্যে এমন করিয়া হিন্দুসমাজের উপর মন্তব্য প্রকাশের কোন আবশ্যকতা ছিলনা; কোন একজন বলিলেন, সার রবীন্দ্রনাথের উপরিউক্ত মন্তব্য যাতসহ নহে, হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম উহা নহে; যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহারা প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইতে পারেন যে, কথাগুলি ঠিক নহে। তাঁহাদের কথার মধ্যে আমরা একটী কথা বলিয়াছিলাম। তাহা এই; সার রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন হইতে যে মত প্রচার করিতেছেন, তাহার সার কথা ব্যক্তিত্ববাদ, ইংরাজীতে যাহাকে বলে individualism। তাঁহার গল্পে, কবিতায়, কথায়, বক্তৃতায় এই ব্যক্তিত্ববাদই পরিস্ফুট। তিনি তাঁহার এ মত কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না; সুতরাং উপরি-উদ্ধৃত কথাগুলিতে তিনি সেই individualismই প্রচার করিয়াছেন। তিনি স্থানান্তরে ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই মনুষ্যত্বের চরম কামনা।' এই যাহার মত, তিনি উপরি-উদ্ধৃত কথা না বলিয়াই পারেন না। সার রবীন্দ্রনাথের এই 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' তিনি সেই মতই দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়াছেন। এবং সেই individualism লইয়া আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিবেই। তবে তিনি তাঁহার হোমরুলের কথায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলেই পারিতেন; সোজাসুজি রাজা ও প্রজা লইয়া কথা বলিলে তাঁহার হোমরুলের বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকিত না। আমাদের মজ্‌লিস এ কথা স্বীকার করিলেন; কিন্তু সার রবীন্দ্রনাথকে এত সহজে অব্যাহতি দিতে তাঁহারা সম্মত নহেন। এ কথাটাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, সে মজ্‌লিসে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত, তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে কখনও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটী কথাও বলেন নাই এই প্রথম তাঁহারা সার রবীন্দ্রের কথায় আপত্তি করিলেন।

শ্রীযুক্ত সার রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা বলিলাম; এখন তাঁহার প্রবন্ধের কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিব। সার রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

মুখে কোনটাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু ঐ মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জ্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজাররকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলি বলে, কি জানি, কাজ কি! ভয় জিনিষটাই এইরকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজশাসনের কোন একটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্ম্মকেই ভুলিয়া যায়,—যে ধ্রুব নিভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায় রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেষ্টিজ রক্ষাকে তার চেয়ে বড় মনে করে,—এবং বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আসমানে পাঠাইতে পারিলেই লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইজেই ত বিশ্ববিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে—ছোটো ভয়, কি ছোটো লোভ, কিম্বা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোট চাতুরী! আমরাও অন্ধভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্ম্মটাকে বিসর্জ্জন দিতে রাজি। বাতিবাস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি! তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাশ করি—"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম"—এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলি ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা-না-একটা কর্ত্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে-দেশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায়-দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্ত্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে, ক'-হাত ঘেরের কুয়ার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্ম্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুচিরই বা কি গুণ, রুটিরই বা কি, ম্লেচ্ছের তৈরি মদেরই বা কি আর ম্লেচ্ছের ছোঁয়া জলেরই বা কি, কর্ত্তার ইচ্ছার উপর বরাৎ দিয়া সে-বিচার তারা চিরকালের মত সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানি-পাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বাল্‌তিতে লইয়া ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি-মিশ্রা

ফিল্‌টার হইতে যে জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব ওটা ত তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা ত কর্ত্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্ত্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিথিসৎকার নয়, অন্ত্যেষ্টিসৎকার পর্য্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর জবরদস্তি দ্বারা যাদের প্রতি সামান্য খাওয়া ছোঁয়ার অধিকার পর্য্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে, তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ বোধ করে না কেন?"

এখানেও পাঠক দেখিতেছেন, সেই পূর্ব্বের কথারই পুনরাবৃত্তি, সেই বিধি নিষেধ, খাওয়া-ছোঁয়া, আচার নিষ্ঠা!

তাহার পর আর এক স্থানে সার রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্ব্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এত বড় সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কি পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপ যে মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাৎ করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপোস হইয়া গেছে; বিষয়বিভাগের মত উভয়ের মহল বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্ম্মে কর্ম্মে আচারে বিচারে যত সঙ্কীর্ণতা, যত স্থূলতা, যত মূঢ়তাই থাক, উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, "যে মানুষ আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে," অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, "যে বেটা সর্ব্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবা নাপিত বন্ধ,"—আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল—"বাবা বাঁচিয়া থাক!" এইজন্যই এদেশে কর্ম্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্ম্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার!"

এইবার আর একটা কথা শুনুন। সার রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

মনে রাখা দরকার, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্ম্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লী করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধূধূ করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁৎ করিয়া না মানো ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম্ম বলে, সাগর গিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খৎ দিতে হইবে। ধর্ম্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্ম্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্ম্মতন্ত্র।

আরও শুনুন—

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এদেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেই ভাবেই দেখেন একজন আর্টিষ্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে,—তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না! স্নানযাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক। ষ্টীমারের ঘাটে ঘাটে, রেলোয়ের ষ্টেশনে ষ্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্য্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানব-সন্তানদের বেড়ার মধ্যে যে-সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অন্তরায়কে আকাশ-পরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই সুন্দর। কাণা বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ বিধাতা আমাদের সবচেয়ে বড় যে সম্পদ দিয়াছেন—ত্যাগস্বীকারের বীরত্ব—এই কষ্ট তারই বেহিসাবী বাজেখরচ। আজ তারই নিকাশ আমাদের চলিতেছে—ইহার ঋণের ফর্দ্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিতেছি হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই ত ঋণদায়ে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্ব্বনেশে। যে অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে জোটায়, সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্য্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চির জীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিদ্যা না আছে চারিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তি বিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর, কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্যতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক পা অগ্রসর করিয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, তবু ত সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিম্বা নিজের জন্য করিত। সে কথা ঠিক,—কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ না-করাটাকে কিম্বা নিজের জন্য খরচ করাটাকে সে ধর্ম্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না,—এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করাতে হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে; অনুগত দাসের মত সে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

ইহাই সার রবীন্দ্রনাথের এখনকার মত—principle; সুতরাং তাহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের বিরোধ না হইয়াই পারে না। এই বিরোধের মধ্য হইতে মিলনের পথ খুজিয়া বাহির করিতে হইবে,—তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য।

রাজনীতি সম্বন্ধে 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্মে' সার রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, রাজপুরুষ ও রাজনীতি-বিদ্‌গণ তাহার বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করিবেন। আমরা পাঠক-পাঠিকাগণের সম্মুখে এই প্রবন্ধের যে কয়েকটী কথা উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা শেষ করিয়াছি, তাঁহারা এখন কথাগুলির বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখুন। সর্ব্বশেষে আমরা সার রবীন্দ্রনাথের শেষ মহতী বাণী উদ্ধৃত করিব। আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, শত্রু হউন আর মিত্র হউন, সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, 'এমন বাণী পূর্ব্বে একদিন শুনিয়াছিলাম স্বামী বিবেকানন্দের মুখে, আর এতকাল পরে শুনিলাম সার রবীন্দ্রনাথের মুখে। এমন করিয়া এমন কথা এখন তিনি ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারেন না।' সার রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এক মানুষের পৃথিবী, মহৎ এক মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির রথে চড়িয়া তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় তিলকে তাঁর উচ্চললাট সমুজ্জ্বল, অনতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড় হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন! ওরে অকাল জরা-জর্জ্জরিত, আত্ম-অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মত কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহঙ্কার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহঙ্কার কেবল আপন গৃহকোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্দ্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদ-লাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্ত বিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জ্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে, আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতনযুগের প্রভাতসূর্য্যকে ম্লান করিল, নব-নব-অধ্যবসায়-শীল আমাদের যৌবনধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্ম্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে, তবেই নিত্যসম্মুখ-গামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চিরজাগরুক, চির সন্ধানরত,

যে বিশ্বকর্ম্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মত আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া! সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি,—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এস প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও! আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু—ডাক আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে! দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নির্ব্বাসন গ্রহণ করুক!

সর্ব্বশেষে আমরা রবীন্দ্রনাথের অমর সুরে, তাঁহারই কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—

"যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে,
বর্জ্জিল ভয় অর্জ্জিল জয় সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে,
ছায়াভয়চকিত মূঢ়, করহ পরিত্রাণ হে—
জাগ্রত ভগবান হে, জাগ্রত ভগবান।"

চুম্বক-তত্ত্ব

(৩)

[অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য, বি এস্‌সি]

অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক। বিজ্ঞানাগারে চুম্বক তত্ত্ব পরীক্ষার নিমিত্ত সাধারণতঃ তিনপ্রকার চুম্বক ব্যবহৃত হয়; যথা—
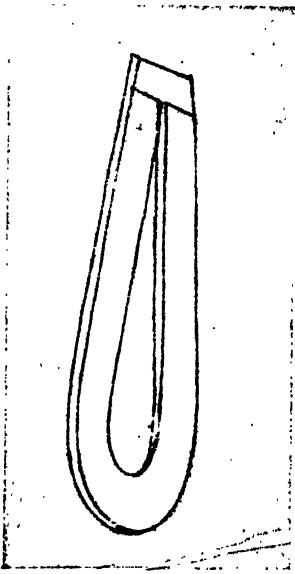
চিত্র—৫।

(১) চুম্বক-শলাকা; (২) চুম্বক-দণ্ড; (৩) অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি চুম্বক। চুম্বক-শলাকা ও চুম্বক-দণ্ড সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিশদরূপে বলা হইয়াছে। ইস্পাতখণ্ডকে প্রথমে অশ্বক্ষুরাকৃতি বিশিষ্ট করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন প্রণালীর কোন একটী দ্বারা চুম্বকে পরিণত করিলে, অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক (horse-shoe magnet) প্রস্তুত হয়। চিত্র ৫।

চপলা চুম্বক। একটী লৌহ দণ্ডের [চিত্র ৬] (সরল বা অশ্বক্ষুরাকৃতি) চারিদিকে সংাবৃত তাম তার কুণ্ডলী ভাবে জড়াইয়া তাহার মধ্যে তাড়িত শক্তি প্রবাহিত করিলে, লৌহ দণ্ডটী চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। যতক্ষণ তাম তাঁরে তাড়িত-শক্তি সঞ্চালিত হইতে থাকে, ততক্ষণ লৌহদণ্ডের চুম্বকাবস্থা বর্ত্তমান থাকে। [তাড়িত-প্রবাহ স্থগিত হইলে লৌহ দণ্ডে যে অতি সামান্য চুম্বকাবস্থা থাকে, তাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে (practically speaking) আমরা চুম্বকাবস্থা বলিয়া না ধরিলেও পারি।] যে মুহূর্ত্তে তাড়িত-প্রবাহ বন্ধ হইবে, সেই মুহূর্ত্তে লৌহ দণ্ডের চুম্বকাবস্থা দূর হইবে। এইরূপে লৌহ-দণ্ড যখন চুম্বকে পরিণত হয়, তখন তাহাকে চপলা-চুম্বক বা তাড়িত-চুম্বক (electro-magnet) কহে।

একমাত্র বিকর্ষণই চুম্বকের অস্তিত্বের ধ্রুব প্রমাণ। একটি ইস্পাত-শলাকা একগাছি রেসম অংশু দ্বারা দিক্‌জ্যা মার্গে (horizontal line) ঝুলাইয়া দাও। একটি চুম্বক-খণ্ডের

সুমেরু পর্য্যায়ক্রমে প্রলম্বিত ইস্পাত-শলাকার প্রত্যেক প্রান্তের নিকট লইয়া এস। দেখিবে, প্রত্যেক প্রান্তই চুম্বক দণ্ড দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। এখন সেই ইস্পাত-শলাকাকে পূর্ব্ব কথিত কোন প্রণালী দ্বারা চুম্বকে পরিণত করিয়া আবার সেই রেসম অংশু দ্বারা ঝুলাইয়া দাও। এখন চুম্বক দণ্ডের সুমেরু (north pole) একে-একে চুম্বকে পরিণত ইস্পাত শলাকার প্রত্যেক প্রান্তের নিকট পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিক হইতে (একটু দূর হইতে) ধীরে ধীরে

চিত্র—৬
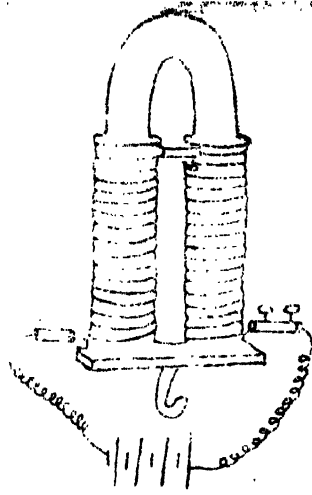
লইয়া আসিলে দেখিতে পাইবে যে, প্রলম্বিত চুম্বকের একটা প্রান্ত, চুম্বক দণ্ডের সুমেরু দ্বারা বিকৃষ্ট (repulsed) হইতেছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইল যে, কেবল আকর্ষণ দ্বারা চুম্বক অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না; কিন্তু বিকর্ষণই চুম্বক-অস্তিত্বের ধ্রুব প্রমাণ।

মধ্যমেরু। চুম্বক প্রস্তুত প্রণালী যদি দোষাবহ হয়, তাহা হইলে প্রান্ত মেরুদ্বয় ব্যতীত, ইস্পাত-দণ্ডের মধ্যে এক, দুই, তিন বা ততোধিক মেরুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই ইস্পাত দণ্ডের মধ্যস্থিত প্রত্যেক মেরুকে মধ্যমেরু (consequent pole) কহে। মধ্যমেরু-যুক্ত কোন একটি চুম্বক দণ্ড যদি লোহাচুরের মধ্যে ডুবাইয়া ধীরে-ধীরে তোলা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, লোহাচুরগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে প্রান্ত মেরুদ্বয়ে ও মধ্যমেরুতে লাগিয়া আছে। ইহা দ্বারা মধ্যমেরুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল। সহজে আর এক প্রকারে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

দিক্-শলাকা। এমন একটি ছোট কৌটা পাতলা পিতল-পাতের দ্বারা প্রস্তুত কর, যাহার উপর ও তলা কেবলমাত্র পাতলা কাচে আচ্ছাদিত। এই কৌটার ব্যাস এক সেণ্টিমিটার (এক ইঞ্চির আড়াই ভাগের এক ভাগ)। এই কৌটার তলদেশের কেন্দ্রস্থানে একটি ক্ষুদ্র আল্‌পিন উদ্ধমুখে তলার কাচের সহিত পরিপাটীরূপে আটকাইয়া দাও। এই * আল্‌পিনের আগায় একটি ক্ষুদ্র (৫ সেঃ মি লম্বা, ২ মিলিমিটার চওড়া) চুম্বক এরূপ ভাবে বসাও, যেন ইহা অবাধে দিক্সা-মার্গে ঘুরিতে-ফিরিতে পারে। ক্ষুদ্র চুম্বকের সুমেরু-জ্ঞাপনার্থে ইহার সুমেরুর নিকটে একটি অতি ক্ষুদ্র (২ মিলিমিটার) পিতল-তার আড়ভাবে বসান থাকে। ক্ষুদ্র চুম্বকের সম-দৈর্ঘ্য-পরিমাণ একটি সরু পিতল তার † চুম্বকের সহিত সমকোণ করিয়া
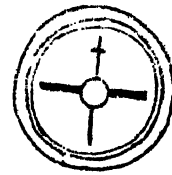
চিত্র—৭

তাহার মধ্যস্থলে অবিচলিত ভাবে সংলগ্ন থাকে। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের নাম 'দিক্-শলাকা' (compass-needle)। [চিত্র ৭] এই দিক্-শলাকা ধীরে-ধীরে মধ্যমেরুযুক্ত চুম্বক-খণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উপরিতলের ধারে দিয়া লইয়া যাও। এখন মনোনিবেশ-পূর্ব্বক দিক্-শলাকার সুমেরুর ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে, মধ্যমেরুর অস্তিত্ব বুঝা যাইবে। একটি ছাতার শিকের প্রথম-অর্দ্ধ প্রথমে

* এক সেণ্টিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগের নাম মিলিমিটার।

† ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে পরে বলিব (see Equi-potential line)।

'এক-চুম্বক-স্পর্শ-প্রণালী' (single touch) দ্বারা চুম্বকে পরিণত কর। তার পর অপরার্দ্ধ ঐ প্রণালী দ্বারা চুম্বকে পরিণত করিলে, শিকের ঠিক মধ্যস্থলে একটি মধ্যমেরুর উৎপত্তি হইবে।

চৌম্বক দ্রব্য। ইস্পাত ও লৌহ ব্যতীত, নিকেল ও কোবল্ট্ নামক ধাতুদ্বয় চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। চৌম্বক-ধর্ম্ম ইস্পাত বা লৌহদণ্ডে যেমন প্রকাশ পায়, নিকেল্ বা কোবল্টে সেরূপ হয় না।

লৌহ-মিশ্র পদার্থ (compounds of iron), কাগজ ও তরল অম্লজান (liquid oxygen) চুম্বক দ্বারা অল্পাধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইস্পাত ও লৌহে স্থায়ীরূপে (permanently) বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী চুম্বক মেরুদ্বয়ের উৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু নিকেল-কোবল্টে বা উপরোক্ত অন্যান্য পদার্থে সেটি সম্ভব নহে। শেষোক্ত পদার্থগুলিকে 'চৌম্বক-পদার্থ' (magnetic substance) কহে।

চৌম্বক পরিপূরণ। চুম্বকের প্রান্তভাগস্থিত চুম্বকত্বের পরিমাণকে সেই চুম্বকের মেরুবল (pole strength) কহে। পূর্ব্বে যে তিনপ্রকার চুম্বক-প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে 'চপলা-চুম্বক' (Electro magnet) দ্বারা এক-চুম্বক-স্পর্শ-প্রণালী উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। কারণ, চপলা-চুম্বকের মেরুবল অত্যন্ত অধিক। নকল চুম্বকের মেরুবল (১) চপলা-চুম্বকের মেরুবলের উপর, ও (২) ইস্পাত-দণ্ডের প্রকার-ভেদের (quality of steel) উপর নির্ভর করে। কিন্তু নকল চুম্বকের মেরুবলের একটা সীমা আছে। যতই কেন চুম্বককারী (magnetising) মেরুর বলবৃদ্ধি কর না, নকল চুম্বক কিন্তু নির্দ্দিষ্ট মেরুবলের সীমা অতিক্রম করে না। যখন কোন ইস্পাত দণ্ডকে তাহার মেরুবলের সীমা পর্য্যন্ত চুম্বক-শক্তিতে পরিপূর্ণ করা যায়, তখন তাহার চৌম্বকাবস্থাকে (magnetic state) চৌম্বক পরিপূরণ (magnetic saturation) কহে।

মিশ্র চুম্বক। মোটা ইস্পাত-দণ্ডের অভ্যন্তর চুম্বকে পরিণত করা বড় সহজ নহে। কাজেই ইহাকে চুম্বক-শক্তিতে পরিপূরণ করা (up to magnetic saturation) এক-প্রকার অসম্ভব। কিন্তু যদি ইস্পাত-দণ্ডকে খণ্ড-খণ্ড পাতলা চাদরে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক ইস্পাত-চাদর-খণ্ডকে তাহার নির্দ্দিষ্ট মেরুবলের সীমা পর্য্যন্ত চুম্বক শক্তিতে পরিপূর্ণ করিতে পারা যায়। এইরূপে চুম্বকে পরিণত ইস্পাত চাদর খণ্ডগুলিকে একত্র লোহার মেরুখণ্ড দ্বারা [১, ১ চিত্র ৮] (pole pieces)
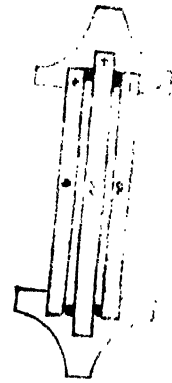
চিত্র ৮

এরূপভাবে বাঁধ যে সুমেরুগুলি একদিকে থাকে (কাজেই কুমেরুগুলি অপরদিকে থাকিবে। এইরূপে একত্রীভূত চুম্বকাবলীর নাম মিশ্র-চুম্বক (Compound magnet)।* [চিত্র ৮] এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি মধ্যস্থিত চুম্বকপাত (২, চিত্র ৮) উহার পার্শ্বস্থিত চুম্বক পাতদ্বয়, ৩, ৪, অপেক্ষা দীর্ঘতর হয়, তবে মিশ্র-চুম্বকের মেরুবল অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। ৮ম চিত্রে চুম্বকপাত (২,৩,৪) তিনটি লইয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু ৫, ৭ বা ততোধিক বিযুক্ত-সংখ্যক চুম্বকপাত লইয়াও মিশ্র-চুম্বক হইতে পারে।

অযত্নে চুম্বক শক্তির নাশ। চুম্বকদণ্ড অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়; নচেৎ চুম্বক-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। (১) চুম্বক দণ্ড বার-বার টেবিলের উপর পড়িয়া গেলে, ইহার শক্তির হ্রাস হয়। (২) চুম্বক-দণ্ডকে উত্তপ্ত করিলে চুম্বক শক্তির হ্রাস হয়। (৩) চুম্বকে পরিণত ইস্পাত-পাতকে বার-বার মোচড়াইলে চুম্বক-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

স্থায়ী ও অস্থায়ী চুম্বক। একটা লৌহ-দণ্ডকে কোন

চুম্বকের নিকটে আনিলে, উক্ত লৌহ-দণ্ড চুম্বকের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু চুম্বকটীকে দূরে সরাইয়া দিয়া লৌহ-দণ্ডকে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দিবার পর দেখা যায় যে, লৌহ-দণ্ডের আর চুম্বক-ধর্ম্ম থাকে না। এইরূপে চুম্বকে পরিণত লৌহ-দণ্ডকে অস্থায়ী চুম্বক (temporary magnet) বলে। ইস্পাত-দণ্ডকে একবার চুম্বকে পরিণত করিয়া চুম্বককারক শক্তিকে দূরে সরাইয়া অযত্নে ব্যবহারের পরও দেখিতে

চিত্র ৮ক

পাওয়া যায় যে, ইস্পাত-দণ্ডের চুম্বক-শক্তি একেবারে নষ্ট হয় না। এইরূপে চুম্বকে পরিণত ইস্পাত-দণ্ডকে স্থায়ী চুম্বক (permanent magnet) কহে।

ধারণ-ক্ষমতা (Retentivity) ও দমন-ক্ষমতা (Coercivity)। একটা নরম লৌহখণ্ড এবং সম-আয়তন ও আকৃতিবিশিষ্ট একটা ইস্পাত-দণ্ডকে একই চুম্বক-শক্তির অধীন রাখিয়া চুম্বকে পরিণত করিবার পর যদি চুম্বক-শক্তিকে ধীরে-ধীরে সরাইয়া ফেলা যায়, এবং যদি কোনরূপে তাহাদের স্থানচ্যুত বা অন্য কোন বিপরীত চুম্বক-শক্তির অধীন না করা হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লৌহ-দণ্ডের চুম্বক-শক্তির পরিমাণ ইস্পাত-খণ্ডের চুম্বক-শক্তির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক। এইরূপে চুম্বক-শক্তির ধারণ করিবার ক্ষমতার নাম Retenivity। আর যদি উক্ত চুম্বকদ্বয় অযত্নে ব্যবহৃত হয় বা বিপরীত চুম্বক-শক্তির অধীন হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইস্পাত-খণ্ডের চুম্বক-শক্তির পরিমাণ লৌহ-খণ্ডের চুম্বক-শক্তির পরিমাণ অপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার ঠিক বিপরীত—শেষোক্ত প্রকারে চুম্বক-শক্তির ধারণ করিবার ক্ষমতার নাম দমন-ক্ষমতা (Coercivity)।

বিশেষ তপ্তাবস্থা (Critical Temperature)। একখণ্ড লৌহ বা ইস্পাতকে যদি ক্রমান্বয়ে গরম করা যায়, তাহা হইলে লৌহ-খণ্ড এমন এক উত্তপ্ত অবস্থায় আসে, যখন ইহা আর চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হয় না। লৌহ-খণ্ডের এই তপ্তাবস্থার নাম বিশেষ তপ্তাবস্থা (Critical Temperature)। এই চরম তপ্তাবস্থা লৌহ বা ইস্পাতের উপাদানের উপর নির্ভর করে। বিশুদ্ধ লৌহের চরম তপ্তাবস্থা ৭৯০০ সেঃ (centigrade)। আবার এই চরম তপ্তাবস্থায় আর একটা আশ্চর্য্যজনক ঘটনা ঘটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহ-খণ্ডকে উজ্জ্বল লাল টক্‌টকে অবস্থা পর্য্যন্ত তপ্ত করিবার পর যদি ক্রমে-ক্রমে জুড়াইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যত তাপ লৌহ হইতে বাহির হইয়া যায়, ততই উহার উজ্জ্বল লাল অবস্থা আর থাকে না, ফেকাসে লাল (dull red) হইয়া যায়। এই সময়ে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, লৌহটা ঠাণ্ডা হইতে-হইতে হঠাৎ আবার উজ্জ্বল লাল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। লৌহের এই পুনঃ উজ্জ্বলাবস্থা (recallescence) আর চরম তপ্তাবস্থা একই। এই সময়ে বোধ হয় লৌহের পরমাণুর মধ্যে বিশেষ কোন একটা পরিবর্ত্তন ঘটে।

চুম্বক-ক্ষেত্র। চুম্বক-মেরুর চতুর্দ্দিকস্থ আকাশের (space) অবস্থা চুম্বক মেরুশূন্য আকাশের অবস্থা হইতে বিভিন্ন। এই চুম্বক-মেরুর উপস্থিতি হেতু নিকটস্থ পরিবর্ত্তিত অবস্থাপন্ন আকাশের নাম চুম্বক-ক্ষেত্র (magnetic field)। মোটামুটী বুঝিতে হইলে, একটী চুম্বক-মেরুর নিকটে একটী দিক্‌-শলাকা (compass needle) আনিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দিক্‌-শলাকার চুম্বক-শলাকাটী বিচলিত (affected) হয়। চুম্বক-মেরুকে কেন্দ্র করিয়া, যত দূর পর্য্যন্ত দিক্‌-শলাকাটী বিচলিত হয়, সেই দূরত্বকে ব্যাসার্দ্ধ ধরিয়া যদি একটী মণ্ডল (sphere)

অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী আকাশকে চুম্বকের ক্ষেত্র বলে।

চৌম্বক-শক্তি-রেখা। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই চুম্বক-ক্ষেত্রের মধ্যে অসংখ্য রেখা কল্পনা করিয়া থাকেন। রেখাগুলি সুমেরু হইতে বহির্গত হইয়া কুমেরুর মধ্যে প্রবেশ করে। যতগুলি রেখা সুমেরু হইতে বহির্গত হয়, ঠিক ততগুলি রেখা আবার কুমেরুর মধ্যে প্রবেশ করে। মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে রেখাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে; কিন্তু মেরুর দূরবর্ত্তী স্থানে রেখাগুলি ক্রমান্তরে অর্থাৎ ক্রমে-ক্রমে ফাঁক্-ফাঁক্ হইয়া অবস্থান করে। এই রেখাগুলিকে চৌম্বক-শক্তি-রেখা (magnetic lines of force) কহে। এই শক্তি-রেখাগুলির কয়েকটী ধর্ম্ম বা গুণ আছে। ক্ষেত্রের মধ্যে দুইটী শক্তি রেখা কখনও পরস্পর মিলিত হয় না। একমুখী রেখাপুঞ্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। বিপরীতগামী রেখাপুঞ্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

ক্ষেত্র-বল বা চৌম্বক-বল। চুম্বক-ক্ষেত্রের সকল স্থানে দিক-শলাকা (compass needle) সমানভাবে বিচলিত হয় না। মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে অপেক্ষাকৃত অল্প বিচলিত হয়। চুম্বকের চতুর্দ্দিকে দিক-শলাকার ব্যবহারে জানা যায় যে, চুম্বক-ক্ষেত্রের দিক শলাকাকে বিচলিত করিবার ক্ষমতা সকল স্থানে সমান নহে। চুম্বক ক্ষেত্রের দিক শলাকাকে বিচলিত করিবার ক্ষমতাকে স্থূলভাবে ক্ষেত্র-বল (strength of the field) কহে। মেরুর নিকটবর্ত্তী স্থানে ক্ষেত্র-বল বেশী, দূরবর্ত্তী স্থানে ক্ষেত্র-বল কম।

চৌম্বক-বল বা ক্ষেত্র-বল। একটী চুম্বক-ক্ষেত্রের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে যদি একটী একক পরিমিত সুমেরু* (north pole of unit strength) রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই একক সুমেরু ক্ষেত্রোৎপাদনকারী চুম্বক-মেরুর দিকে আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হয়। যে শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হয়, তাহার নাম সেই ক্ষেত্রের, সেই স্থানের, সেই বিন্দুর চৌম্বক-বল (magnetic intensity) বা ক্ষেত্র-বল (strength of the field)।

* $শ = \frac{৮ \times ৮}{দ^২}$

যদি সম-মেরুবল-বিশিষ্ট দুটী সুমেরু এক সেণ্টিমিটার ব্যবধান থাকিয়া পরস্পরকে এক ডাইন শক্তিতে বিকর্ষণ করে, তাহা হইলে উক্ত মেরুদ্বয়ের প্রত্যেককে একক পরিমিত সুমেরু কহে।

আণবিক-বাদ (Molecular Theory)। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সুমেরু হইতে শক্তি-রেখা বহির্গত হইয়া কুমেরুর মধ্যে প্রবেশ করে। এখন কথা হইতেছে যে, সুমেরু ও কুমেরু কি শক্তিরেখাগুলির জন্ম ও মরণ স্থান?—না, চুম্বক দেহে তাহাদের অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব আছে? পূর্ব্বমতে সুমেরু বা কুমেরু এক-একটী বিন্দুবিশেষ। শক্তি রেখাগুলি সুমেরু হইতে বহির্গত হইয়া কুমেরুর মধ্যে শেষ হইয়া যায়। তাহাদের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি স্থান যথাক্রমে সুমেরু ও কুমেরু। কুমেরু ভেদ করিয়া চুম্বক-দেহে ব্যাপৃত হইবার ক্ষমতা শক্তি-রেখাগুলির নাই। পরে ঈউইং (Ewing) সাহেব তাঁহার নবমত প্রচার করেন। তাঁহার মত সকলেই একবাক্যে গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং গ্রাহ্য করিবার যথেষ্ট কারণও আছে। তাঁহার মতই আজকাল প্রামাণ্য মত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চৌম্বক দ্রব্যের প্রত্যেক অণুকে (molecule) ঈউইং সাহেব এক-একটী চুম্বক অনুমান করিয়াছেন। সাধারণ অবস্থায় তাহারা এমন অনিয়মিত ভাবে (চিত্র ৯) থাকে

চিত্র ৯

যে, তাহাদের চুম্বক ধর্ম্ম বাহিরে প্রকাশ পায় না। তাহারা পরস্পরের উপর এরূপ ভাবে শক্তি চালনা করে যে, তাহাদের যৌগিক বাহ্যিক ফল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়—কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যখন চৌম্বক-দণ্ডকে চুম্বকে পরিণত করা হয়, তখন সেই অতি ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম আণবিক চুম্বকগুলি আর এলোমেলো ভাবে থাকে না। তখন তাহারা এক-একটী সমান্তর রেখা-ক্রমে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। আর সেই রেখাগুলি চুম্বক-দণ্ডের দৈর্ঘ্যের প্রায় সমান্তর। যদি আণবিক চুম্বকগুলি সম্পূর্ণরূপে চুম্বক-দণ্ডের দৈর্ঘ্যের সমান্তরত্ব (parallelism) প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে

দেখা যায়, চৌম্বক-দণ্ডটীতে চূড়ান্ত (maximum) চুম্বক-ধর্ম্ম প্রকটিত হইয়াছে। তখন তাহার মেরু-বলের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; অর্থাৎ আর বাড়াইতে পারা যায় না। আর যদি আণবিক চুম্বকগুলি সম্পূর্ণরূপে সমান্তরত্ব না পাইয়া আংশিকরূপে প্রাপ্ত হয় (চিত্র ১১), তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহাতে চুম্বকধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হয় নাই; তখন তাহার মেরু-বল শেষ সীমায় পৌঁছায় নাই; ইচ্ছা করিলে তাহার মেরু-বল
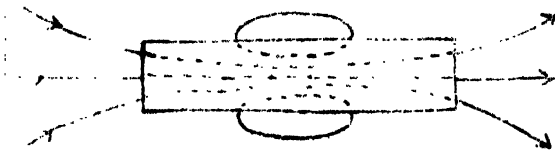
চিত্র ১১

বাড়াইতে পারা যায়। ১১শ চিত্রে চৌম্বক দ্রব্যের বাহিরে যে রেখাগুলি দেখান হইয়াছে, সেগুলি শক্তি-রেখা (lines of force); আর ঐ শক্তি রেখাগুলিকে যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে (continuously) চৌম্বক দ্রব্যের মধ্য দিয়া টানা যায়, তবে শক্তি রেখার যতটুকু অংশ চৌম্বক-দ্রব্যের মধ্যে থাকে, তাহাকে শক্তি-রেখা না বলিয়া চুম্বক রেখা (lines of magnetisation) বলা হয়। এই চুম্বক-রেখাগুলি বিন্দুপাতে দেখান হইয়াছে।

পৃথিবী একটি সুবৃহৎ চুম্বক। আমাদের পৃথিবী একটি প্রকাণ্ড চুম্বক। উহার উত্তর দিকে সুমেরু ও দক্ষিণ দিকে কুমেরু অবস্থিত। পৃথিবীর উত্তরদিকস্থিত মেরু চুম্বক-শলাকায় (magnetic needle) উত্তরমেরু হইতে বিভিন্ন ও ঠিক বিপরীত ধর্ম্মী। সেইজন্য অনেকে চুম্বক-শলাকায় সুমেরুকে সুমেরু বা উত্তর মেরু না বলিয়া উত্তরান্বেষী (north-seeking) মেরু কহে। সেইরূপ কুমেরুকে দক্ষিণান্বেষী (south-seeking) মেরু কহে। শক্তি রেখাগুলি পৃথিবীর কুমেরু হইতে বহির্গত হইয়া সুমেরু মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সুমেরু ও কুমেরুর মধ্যে দূরত্ব এত অধিক, যে পৃথিবীর শক্তিরেখাগুলিকে সরল সমান্তর বলিয়া ধরা হয়। বাস্তবিক কিন্তু তাহারা ঈষৎ বক্ররেখা।

পার্থিব চৌম্বক-বল বা শক্তিমাত্রা (magnetic intensity due to the earth's magnetism) সকল স্থানে সমান নহে; কোন স্থানে বেশী, কোন স্থানে কম। মেরুর নিকটবর্ত্তী দেশে অধিক, বিষুবরেখার সন্নিহিত দেশে অল্প। যে সকল স্থানের চৌম্বক-বল (magnetic intensity) সমান, সেই সকল স্থান একটা রেখাদ্বারা যোগ করিলে সেই রেখাটিকে সমচৌম্বক বলীয়ান্ রেখা Isodynamic lines) কহে।

চুম্বক মাপক যন্ত্র (magnetometer)। একটা ছোট চুম্বকের ঠিক মধ্যভাগে দৈর্ঘ্যের সমকোণে (at right angles to its length) একটী সরু এ্যালুমিনিয়াম্ তার সুদৃঢ়রূপে সংলগ্ন থাকে। তারটীর দৈর্ঘ্য চুম্বকের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেক বড় (প্রায় ১০।১২ গুণ)। একটা চতুষ্কোণ চেপ্টা কাঠের (কাচের ডালাবিশিষ্ট) বাক্সের মধ্যে পিত্তলের পিনের উপর বা পাকহীন একটা রেসম-অংশুর দ্বারা উপরি-উক্ত চুম্বকটী প্রলম্বিত থাকে। এ্যালুমিনিয়াম তারের অগ্রভাগদ্বয়
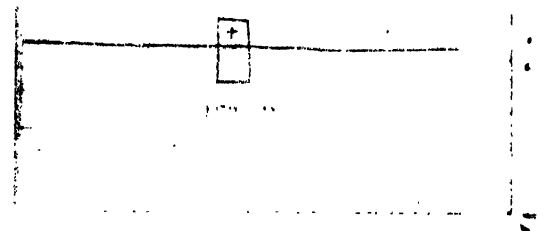
চিত্র ১২

একটি অংশ-জ্ঞাপক বৃত্তের উপর (on scale graduated in degrees) ঘুরিতে পারে। বৃত্তের কেন্দ্রের উপর চুম্বকটী প্রলম্বিত থাকে। বাক্সের বিপরীত প্রান্তদ্বয়ের সমকোণে, বৃত্তের প্রায় সমতলে, প্রায় ৫০ সেঃ মিঃ (centi-

metre) দীর্ঘ মিলিমিটার-জ্ঞাপক মাপকাটি আঁটা (ruler graduated in millimetre) এক-একটি সরু কাষ্ঠ-ফলক বাক্সের বিপরীত ধারের প্রত্যেকের সহিত লাগান থাকে। মাপকাটীদ্বয়ের অঙ্ক বৃত্তের কেন্দ্র হইতে দূরত্ব-জ্ঞাপক। এই মাপকাটীযুক্ত সরু কাষ্ঠফলকদ্বয়কে চুম্বক মাপক যন্ত্রের বাহু কহে। কোন কোন যন্ত্রে এই কাষ্ঠ ফলকের মধ্যভাগে দৈর্ঘ্যের সমান্তরে চুম্বক রাখিবার জন্য V আকারে কাটা থাকে। বাক্সটীর তলায় তিনটী সমতল
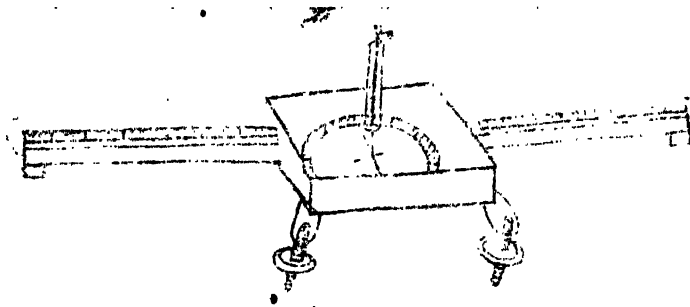
চিত্র- ১৩

কারক স্ক্রু (levelling screw) এরূপ ভাবে লাগান থাকে যে, যদি স্ক্রু লগ্ন বিন্দুত্রয় তিনটী সরল রেখা দ্বারা যোগ করা যায়, তবে ত্রিভুজটী সমবাহু হইবে। বাক্সের উদ্দেশ্য—বায়ুর গতি হইতে প্রলম্বিত চুম্বক শলাকাটিকে রক্ষা করা। কোন-কোন যন্ত্রে বাক্সের ভিতর তলায় প্রলম্বিত চুম্বকের নীচে প্যারাল্যাক্স্* (parallax) -জনিত ভ্রম সংশোধনার্থ একখানি সমতল আরসি বসান থাকে। প্যারাল্যাক্স্-জনিত ভ্রম কাহাকে বলে? মনে কর, কখ (চিত্র ১৪) অংশ-জ্ঞাপকবৃত্ত (circle graduated in degrees)। গ এ্যালুমিনিয়াম্ নির্ম্মিত প্রদর্শক-কাঁটা (index)। (অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা এ্যালুমিনিয়াম্ হাল্কা বলিয়া ইহা প্রদর্শক কাঁটা-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।) দর্শকের চক্ষু, চ, তিনটী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। যখন চক্ষু ১—চ চিহ্নিত স্থানে স্থাপিত তখন দর্শক অংশ-জ্ঞাপক বৃত্তে দুই চিহ্নিত অংশ দেখিবে। যখন চক্ষু ২—চ চিহ্নিত স্থানে আসিবে অর্থাৎ যখন ২—চ—গ রেখাটী বৃত্ততলের উপর লম্বভাবে (perpendicularly) পড়িবে, তখন দর্শক ০ চিহ্নিত অংশটা দেখিবে। আবার চক্ষু ৩—চ চিহ্নিত স্থানে থাকিবে, তখন দর্শক ৩৫৮ চিহ্নিত অংশটা দেখিবে। এখন কোন দৃষ্ট অঙ্কটী (reading) ঠিক? যখন চক্ষু ও প্রদর্শক কাঁটা-যুক্ত রেখাটী অংশজ্ঞাপক বৃত্ততলের উপর লম্বভাবে (perpendicularly) অবস্থিত, তখনকার দৃষ্ট অঙ্কটী (reading) ঠিক বা প্যারাল্যাক্স্ ভ্রমশূন্য। কিন্তু যখন উক্ত রেখাটী বক্রভাবে অবস্থিত, তখন দৃষ্ট অঙ্কটী (reading) প্যারাল্যাক্স্ দোষদুষ্ট। যথা চক্ষের প্রথম ও তৃতীয় স্থান (চিত্র ১৪)। এখন উক্ত রেখাটী বৃত্ততলের উপর লম্ব হইল কি না, জানা যাইবে কিরূপে? আরসীর ব্যবহারে। চক্ষু প্রদর্শক কাঁটার উপর এরূপ ভাবে রাখ, যেন কাঁটাটী তাহার আরসী মধ্যস্থ প্রতিবিম্বটীকে লুকাইয়া রাখে, চক্ষে দেখিতে পাওয়া না যায়; এইরূপ হইলে

চিত্র—১৪

জানিতে হইবে যে চক্ষু ও প্রদর্শক কাঁটাযুক্ত রেখাটী বৃত্ততলের উপর লম্ব (perpendicular) হইয়াছে।
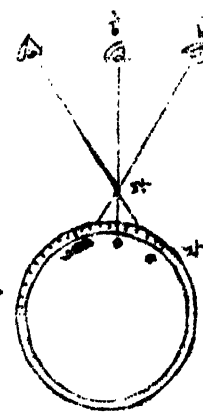
* দুই বস্তু একত্র না থাকায় তাহাদের মায়িক (apparent) ও বাস্তবিক (real) অবস্থিতির যে ভেদ-জ্ঞান হয়, সেই প্রভেদের নাম প্যারাল্যাক্স্ ভ্রম।

সদর্পণ চুম্বক-মাপক যন্ত্র (mirror magnetometer)। উপরি উক্ত চুম্বক-মাপক যন্ত্রের প্রদর্শক-কাঁটা (index) যত বড় হইবে, প্রলম্বিত চুম্বক-শলাকার ঘূর্ণন (deflection) তত সূক্ষ্মরূপে মাপা যাইতে পারে। কিন্তু প্রদর্শক কাঁটাটী ইচ্ছামত লম্বা করিতে পারা যায় না। কারণ (১) বাক্সটীও তাহা হইলে বড় করিতে হয়; এবং খুব বড় বাক্স হইলে যন্ত্রটীকে স্থানান্তরিত করিবার পক্ষে অসুবিধা ঘটে। (২) প্রদর্শক কাঁটাটী (index) খুব বড় হইলে চুম্বক-শলাকাটীর সূক্ষ্মতা (sensibility i.e., measurable deflection due to slight change in the magnetic intensity at that point) নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণার্থ সমতল দর্পণ খণ্ড (plane mirror) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটা পাতলা গোল এক

চিত্র ১৫
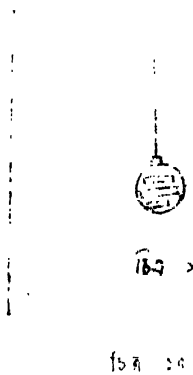
সেঃ মিঃ (centimetre) ব্যাসবিশিষ্ট দর্পণ খণ্ড। উহার পশ্চাদ্ভাগে পাতলা সরু ছোট ছোট দুই তিনটী চুম্বক গালাসংযোগে এরূপ ভাবে লাগাইয়া দাও, যেন চুম্বকগুলির সুমেরু একই দিকে ফিরান থাকে। এখন একগাছি পাক্‌হীন রেসম-অংশু দ্বারা এই দর্পণটীকে একটা ছোট বাক্সের মধ্যে ঝুলাইয়া দাও। এই বাক্সের সম্মুখভাগ কাঠের বদলে কাচে আবৃত। এই বাক্সের দুইধারে পূর্ব্ব-কথিত দুই বাহু চুম্বক রাখিবার জন্য সংলগ্ন থাকে। এখন একগোছা সমান্তর আলোক-রশ্মি যদি দর্পণে প্রায় লম্বা ভাবে পড়িয়া প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে সেই প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি চুম্বকের দৈর্ঘ্যের সহিত প্রায় সমকোণ করিয়া বহুদূর চলিয়া যায়। প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির পথে একটা সম ব্যবধান চিহ্নিত মাপকাটী (scale) রাখা হয়। তাহা হইলে দেখ প্রদর্শক-কাঁটার (index) কাজ প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি দ্বারা সুচারুরূপে হইতে পারে। এ্যালুমিনিয়াম্-নির্ম্মিত প্রদর্শক-কাঁটা তাহার ভার-হেতু (weight) চুম্বক-শলাকার ঘূর্ণনের পথে অন্তরায় উপস্থিত করে এবং সেই কাঁটাটী যত বড় হইবে, তত ভারি হইবে ও তত বেশী ঘূর্ণনের পথে বাধা দিবে। কিন্তু আলোক-রশ্মির ভার (weight) না থাকায় সে চুম্বক-সমষ্টির (system of magnets) ঘূর্ণনের পথে বাধা দেয় না, এবং তাহাকে যত ইচ্ছা

চিত্র—১৬
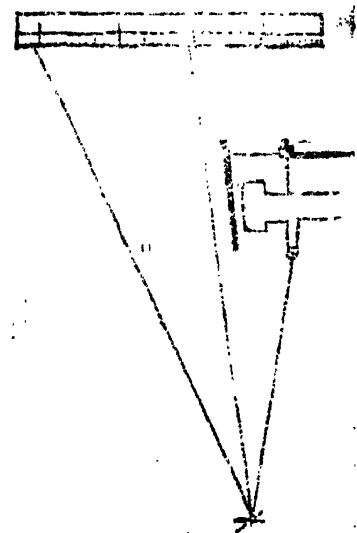
তত বড় করিতে পারা যায়,—মাপকাটিটী তত দূরে রাখিলেই হইল। অথচ চুম্বক-সমষ্টি যদি ক অংশ (degree) ঘোরে, তাহা হইলে আলোক-তত্ত্বের বিধি অনুসারে প্রতিফলিত রশ্মি দ্বিগুণ অর্থাৎ ২ক অংশ (degree) ঘুরিবে। সুতরাং চুম্বক-সমষ্টির অতি সামান্য ঘূর্ণনও অতি সূক্ষ্ম ভাবে নিরূপণ করা যাইতে পারে। প্রতিফলিত আলোক-রশ্মি একটী সম-ব্যবধান চিহ্নিত মাপকাটির (scale) উপর ফেলা হয়। এই মাপকাটির (scale) উপর প্রতিফলিত আলোক-রশ্মির গতি হইতে চুম্বক-সমষ্টির ঘূর্ণনের (defltion) পরিমাণ স্থির করিতে পারা যায়।

দুইখানি ইতিহাস

বেগম সমরু

[শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি-এল্]

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যে মহীয়সী মহিলা আপনার প্রতিভা ও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ভারতের রাজনৈতিক গগনে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় শোভিতা হইয়াছিলেন, তাঁহার কীর্ত্তি কাহিনী শুনিতে সকলেরই যে আগ্রহ জন্মিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই শক্তিশালিনী রমণীর নাম বেগম সমরু।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নব প্রকাশিত 'বেগম সমরু' গ্রন্থে এই মহিলার জীবন-কথা সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় বেগম সমরুর এরূপ বিস্তৃত ও সুন্দর জীবন-কাহিনী প্রকাশিত হয় নাই। আমরা একবার সমরুর বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়াছিলাম ও কোন কোন মাসিকপত্রে বেগম সমরুর বিষয়ও আলোচিত হইয়াছিল; কিন্তু বেগম সমরুর এরূপ ধারাবাহিক বিবরণ পূর্ব্বে আর কখনও বঙ্গভাষায় দেখা যায় নাই। 'বেগম সমরু' গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহা লিখিতে ব্রজেন্দ্রনাথ যে সকল প্রমাণ-পঞ্জী আলোচনা করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে হইলে এইরূপ ভাবে আলোচনারই প্রয়োজন। দুই একটা প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস লেখা নিরাপদ নহে; অসংখ্য প্রমাণ আলোচনা করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বেগম সমরুর জীবন-কাহিনী বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাও মধুর ও প্রাঞ্জল। সেই মনোজ্ঞ ভাষার সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বেগম সমরুর চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে বেগম সমরুর অমানুষী প্রতিভা, অসামান্য প্রভুত্ব ও অজস্র দানের পরিচয় সকলে অবগত হইতে পারিবেন; সঙ্গে-সঙ্গে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অন্ধকারময় ভারতেতিহাসের কতক পরিচয়ও পাইবেন। ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনার পৌর্ব্বাপর্য্যে, প্রমাণের বিচারে, গ্রন্থখানি বিশেষরূপ প্রশংসারই যোগ্য হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রনাথ 'বাঙ্গালার বেগম', 'নূরজহান' প্রভৃতি গ্রন্থ ও অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত হইয়াছেন, 'বেগম সমরু' তাঁহার সে গৌরব অক্ষুন্নই রাখিয়াছে, এমন কি তাহা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে বলা যাইতে পারে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় গ্রন্থখানিতে তাঁহার পরিচয় লিখিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আমরাও তাহার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স যে আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালা প্রকাশ করিয়া সুলভ সাহিত্য প্রচারে সচেষ্ট হইয়াছেন, 'বেগম সমরু' তাহারই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; আশা করি, 'বেগম সমরু' সকলেরই প্রীতি সম্পাদন করিবে। ব্রজেন্দ্রনাথ সাবধান লেখক; কিন্তু 'বেগম সমরু'র দুই একস্থানে সামান্য সামান্য ত্রুটি লক্ষিত হইল, যেমন মুর্শিদাবাদের সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র 'গিরিয়াকে' তিনি ইংরাজী গ্রন্থের অনুকরণে 'গিরিয়া' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'পলাশীকে' কেহ 'প্লাসী' লিখিলে যেমন শুনায়, 'গিরিয়াকে'ও 'গিরিয়া' লিখিলে আমাদের কাণে সেইরূপই লাগে। আর একটি স্থানের কথা উল্লেখ করিতেছি; সমরুর পুত্র জাফর ইয়াবের কন্যার পুত্র ডাইস সোম্বারকে তিনি 'সমরুর প্রপৌত্র' বলিয়াছেন। এইরূপ দুই একটি সামান্য ত্রুটি ব্যতীত গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

প্রতাপ সিংহ

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

'প্রতাপ সিংহ'—অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, বি এ প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ; মূল্য এক টাকা। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম এ মহাশয় এই গ্রন্থের একটি সারগর্ভ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। যাহারা রাজপুত জাতির উৎপত্তি বিষয়ে সংক্ষেপে তত্ত্ব অবগত হইতে চান, তাহারা যদুবাবুর ভূমিকা পাঠ করিলে পরিতৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি ছাত্রদের শিক্ষণীয় পুস্তক ছিল, গ্রন্থকার এবার পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত সংস্কার সাধন করিয়া, তাহাকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে পরিণত করিয়াছেন। অনেকগুলি হাফটোন চিত্র গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। রাজপুত গৌরব, স্বদেশ প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি রাণা প্রতাপের জীবন চরিত সতীশবাবু তাঁহার সুললিত ভাষায় রচনা করিয়াছেন, লিখিবার গুণে পুস্তকখানি উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রতাপ সিংহের এরূপ সুন্দর জীবন-কাহিনী আর কেহ ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এ জন্য গ্রন্থকার বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। আশা করি, বঙ্গীয় পাঠক সমাজে ইহা যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিবে।

চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে; 'প্রতাপ সিংহ' পাঠকালে কয়েকটা ভ্রম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; আশা করি, সতীশবাবু পরবর্ত্তী সংস্করণে এগুলির সম্যক্ আলোচনা করিয়া, সংশোধন করিয়া দিবেন :—

(১) ২৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, 'হুমায়ুন ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহ্ কর্ত্তৃক কনৌজের যুদ্ধে পরাজিত হন।' ইহা সত্য নহে; কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ের তারিখ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ, মে মাস। See *Akbarnama* (Eng. Trans B.b. Ind) i, 351.

(২) ২৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "হুমায়ুন অমরকোট হইতে 'স্ত্রী পুত্রাদি' লইয়া প্রথমে কাবুলে এবং তৎপরে পারস্যে পলায়ন করেন।" এইরূপ লিখিলে ভুল করা হয়। হুমায়ুন পুত্রকে শাল্ (কোয়েটা) নামক স্থানে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কন্দাহারের নিকটবর্ত্তী মাশ্তং নামক স্থানে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অস্কারী তাঁহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিলে হুমায়ুন পারস্যে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—তিনি মোটেই কাবুলে যান নাই। See *Akbarnama*, i, 390-95.

(৩) ৬৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন:—"মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের বিবরণীতে প্রতাপ সিংহকে 'রাণা কীকা' এই অপভ্রংশ নামে কীর্ত্তিত করা হইয়াছে। কেন এরূপ বলা হয়, তাহা জানা যায় নাই।" মেওয়ারে সাধারণতঃ ছেলেদের 'কীকা' বা 'কুকা' বলা হইয়া থাকে। মেওয়ারের মহারাণা-কুমারগণ, সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত 'কীকা' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই কারণে মহারাণা উদয় সিংহের জীবিতাবস্থায় প্রতাপ সিংহ 'কীকা' নামে পরিচিত ছিলেন। আকবর প্রতাপকে যে 'কীকা' বলিতেন, ইহাই খুব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, এবং এইরূপে প্রতাপ সিংহ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পরও মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক 'রাণা কীকা' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। See Noer's *Emperor Akbar*, Translator's Note, i, 245.

(৪) ১৫০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত গ্রন্থ-তালিকায় গ্রন্থকার তিনখানি জহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া নাম দিয়াছেন; গ্রন্থকার যখন Rogers & Beveridgeএর 'তুজুক-ই-জহাঙ্গীরী'র বিশুদ্ধ সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন অপর দুইখানির নাম দিবার কোনই সার্থকতা নাই; বিশেষতঃ Price সাহেবের *Memoirs of Jahangir* বর্ত্তমানে প্রক্ষিপ্ত (Spurious) বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রন্থকার Priceকে অবলম্বন করিয়া এক-স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; ১০২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—"জহাঙ্গীর ৯৭৮ হিজীরাতে বা ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।" এই তারিখটী ভুল; জহাঙ্গীরের জন্মের তারিখ ৯৭৭ হিজরা, ৩১এ আগষ্ট ১৫৬৯ See *Tuzuk-i Jahangiri* Rogers & Beveridge i, 2; Gladwin's *Jahangir*, Cal. 1788, p. i. ৩০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার কিন্তু জহাঙ্গীরের জন্মের তারিখ ১৫৬৯ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৫) ৮৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন:—'বুন্দীর রাজ-দপ্তরের কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, যখন মানসিংহ স্বীয় ভাগিনেয় খসরুকে দিল্লীশ্বর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন আক্‌বর তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নিধন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার জন্য বিষের লাড়ু প্রস্তুত করেন; কিন্তু ভুলক্রমে ভাল লাড়ু মানসিংহকে দিয়া স্বয়ং বিষের লাড়ু খাইয়া ফেলেন; তাহাতেই আক্‌বরের মৃত্যু হয় (১৬০৫)।" টড্ সাহের এই ব্যাপারের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছেন (*Rajasthan*, i, 372-73)। সুরাটের Dutch East India কোম্পানীর ডিরেক্টর van den Broeckeই সর্ব্বপ্রথম এই কাহিনীর সৃষ্টিকর্ত্তা। Broecke ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে ছিলেন; তাঁহার মতে আক্‌বর সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা জানী বেগের পুত্র মীর্জ্জা গাজীকে বিষ-লাড়ুর সাহায্যে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ভ্রমক্রমে সেই বিষ-লাড়ু তিনি নিজে খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন (See de Laet's *De Imperio Magni Mogolis sive India Vera*, etc., Leyden 1631, p. 204)। Sir Thomas Herbert ("*Some Years' Travels into divers parts of Africa and Asia the Great* etc." তিনি ১৬২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় ছিলেন)। Laet অবলম্বন করিয়া, এবং Talboys Wheeler (*Hist. India*, IV. 174, 188), Herbert অবলম্বন করিয়া এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন; Manucci (*Storia do Mogor*, IV. 149-50) আক্‌বরের বিষপানে মৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন, তবে কাহাকে আকবর বিষপ্রদান করিয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু টড্ ও Laetএর কাহিনীর মধ্যে একটু প্রভেদ পরি-লক্ষিত হয়। টডের মতে মানসিংহকে এবং Laetএর মতে মীর্জ্জা গাজীকে আক্‌বর বিষপ্রয়োগে মারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দুই বিবরণের মধ্যে Broeckeএর কথাই বোধ হয় সমধিক বিশ্বাসযোগ্য (Laet, Broeckeএর উপাদানই ব্যবহার করিয়াছিলেন); কারণ তিনি আক্‌বরের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই ভারতে ছিলেন এবং তাঁহার না কি এই সমস্ত ব্যাপারে বিশ্বাসযোগ্য উপাদান লাভের সুবিধা ছিল। দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত আজগুবি কাহিনীর উপর আমাদের কিছু-মাত্র আস্থা নাই—ইহা বাজার-গুজব মাত্র। Botelho (1660) ইহাকে বাজার-গুজব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (See Maclagan, *J. A. S. B.* 1896 p. 10). Du Jarric (iii, 132) এ বিষয়ে নীরব; তবে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছেন, লোকমুখে প্রচার—কুমার সেলিমই না কি পিতাকে বিষপ্রয়োগে ধরাধাম হইতে অপসৃত করিয়া-ছিলেন। 'তুজুক-ই-জহাঙ্গীরী'তে মীর্জ্জা গাজীর একটী বিস্তৃত বিবরণ আছে; কিন্তু তাহার কোন স্থলে গাজীর প্রতি আক্‌বরের অসন্তোষ প্রভৃতির উল্লেখ নাই। H. Beveridge, Vincent Smith প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ বিষযোগে আক্‌বরের মৃত্যুর কথায় আস্থা স্থাপন করেন নাই। ইহা বাজার-গুজব না হইলে প্রত্যেক লেখকই ভিন্ন-ভিন্ন রকমের কথা বলিতেন না। কাজেই সতীশবাবু ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিলেই ভাল করিতেন।

(৬) ৬০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গ্রন্থকার, চিতোর-ধ্বংসের পর পত্র-পৃষ্ঠে ৭৪॥০ এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিবার প্রথা-প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে যে প্রবাদ-বাক্যের আলোচনা করিয়াছেন, তাহার যে কোন ভিত্তি আছে, তাহা আমাদের মনে হয় না। Sir H. M. Elliot এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা এ বিষয়ে জানিতে ইচ্ছুক,

তাঁহারা Elliot—*Supplemental Glossary*, ed. Beames (1869), Vol. II, p. 68 n. পাঠ করিবেন।

(৭) ৫৯ পৃষ্ঠায় চিতোর-ধ্বংস অধ্যায়ে গ্রন্থকার লিখিতেছেন :—"পলায়নাদি দ্বারা তাহাদের কেহ আত্মরক্ষা করিয়াছিল, এমন কথা শত্রুপক্ষীয় লেখনীমুখেও প্রকাশ পায় নাই।" তবে 'আকবরনামা'-পাঠে জানা যায় (ii, 475 6 Eng. Trans.) যে রাজপুতপক্ষীয় এক হাজার বন্দুকধারী (Musketeers), স্ত্রীপুত্রসহ চাতুরী অবলম্বন করিয়া, মোগলের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল; ইহারা মোগলপক্ষের ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল; এই কারণে তাহাদের পলায়নে আকবর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

(৮) ৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন, "মলদেবের কন্যা যোধবাইর সহিত আকবরের বিবাহ হইল। এই মহিষীর গর্ভে আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম জন্মগ্রহণ করেন (১৫৬৯)।" গ্রন্থকার এই কথাগুলি কেবলমাত্র টড্ অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন। টডের প্রতি অতি বিশ্বাসের ফলে তিনি যোধবাইকে সেলিমের মাতা বলিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ইহা কতদূর সত্য। টডের রাজস্থান পাঠে জানা যায় (*Rajasthan*, ii, 34) যে ১৬২৫ সংবৎ অর্থাৎ ১৫৬৯* খৃষ্টাব্দে মালদেওর মৃত্যু হয়। মালদেওর মৃত্যুর পর তৎপুত্র উদয় সিংহ, ভগিনী যোধবাইর সহিত আকবরের বিবাহ দেন; কারণ টড্ স্পষ্টই লিখিতেছেন :—"Maldeo was at least spared the degradation of seeing a daughter of his blood bestowed upon the opponent of his faith" (p. ii 31)। যাহা হউক, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে মালদেওর মৃত্যু হইবার পর তাঁহার কন্যা আকবরের অন্তঃপুরচারিণী হইয়াছিলেন। এদিকে 'তুজুক-ই জহাঙ্গীরী' প্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে, ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দের ৩১এ আগষ্ট তারিখে (অর্থাৎ যে বৎসর মালদেওর মৃত্যু হয়) জহাঙ্গীরের জন্ম হয়। তাহা হইলে কেমন করিয়া, মালদেওর কন্যা যোধবাই জহাঙ্গীরের মাতা হইতে পারেন?

এখন জিজ্ঞাস্য, তবে জহাঙ্গীরের মাতা কে? এই বিষয় লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা এ বিষয়ে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা *J. A. S. B.* 1887 ও 1888 পাঠ করিবেন। সকল দিক বিবেচনা করিয়া এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাজা বিহারী মলের কন্যা ও রাজা ভগবান দাসের ভগিনীই জহাঙ্গীর জননী (See *Encyclopædia of Islam*—H. Beveridge on "Djehangir" i, 997). ব্লকমান সাহেবেরও সেই মত; তিনি "আইন্-ই আকবরী"র ৬১৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন :—"There is little doubt that Jahangir's mother (the Maryam-uzzamani) is the daughter of Rajah Bihari Mal and sister to Rajah Bhagwan Das."

* অপর একস্থলে (*Rajasthan*, ii, 32) টড লিখিয়াছেন যে, ১৬৭১ সংবৎ বা ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে মালদেওর মৃত্যু হয়। ইহা কখনই হইতে পারে না; কারণ ১৬৫২ সংবৎ বা ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে উদয় সিংহের মৃত্যু ঘটে, এবং ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়। ইহার পরে মালদেওর মৃত্যু কদাচ ঘটিতে পারে না; সুতরাং আমরা টডের প্রদত্ত মালদেওর মৃত্যুর অপর তারিখ '১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ' বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য, সতীশবাবু টডকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া গ্রন্থে আরও চৌচারিটি ভুল করিয়াছেন; বাহুল্য ভয়ে তাহা আর উল্লেখ করিলাম না। তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও স্থান বিশেষের নামের বানান সম্বন্ধে বড়ই ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন; যথা, 'ইকবালনামা' স্থলে 'ইকবলনামা'; কখন 'বাদশাহ' কখন 'বাদসাহ', 'রামশাহ' 'রামসাহ' প্রভৃতি। ইতিহাসে এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

অভিভাষণ :—

উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের বিগত দশম অধিবেশনে বগুড়ার নবাবজাদা মাননীয় সৈয়দ আলতাফ আলী সাহেবকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি; কারণ কোনও সাহিত্য-সম্মিলনের কোনও ক্ষেত্রেই ইতিপূর্ব্বে কোনও মুসলমান মনীষীকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে দেখি নাই।

শুধু প্রথম বলিয়াই যে এ ঘটনায় আমরা আনন্দিত, ঠিক তাহা বলি না। যদি এ ঘটনার সহিত দেশের কল্যাণ বা জাতির স্বার্থ জড়িত না থাকিত, তাহা হইলে কিছুই অবশ্য বলিতাম না। কিন্তু এ ব্যাপারে বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্য সেবীদের মধ্যে যেন একটু প্রীতির ভাব বাড়িল বলিয়া মনে হইতেছে।

বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান এক ভাষা-জননীর দুই সন্তান। দুই ভাই যদি মাতৃ-মন্দিরে আসিয়া, একত্র বসিয়া, পরস্পর পরস্পরের নিকট সুখ-দুঃখের কথা কহেন—ভাবের আদান-প্রদান করেন, তাহা হইলে মিলনের পথ প্রশস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সম্মিলনের তাহা প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও সচরাচর তাহা ঘটে না। অধিকাংশ

সম্মিলনই মিলনের সেতু না হইয়া মন ভাঙ্গাভাঙ্গির হেতু হইয়া দাঁড়ায়। এবার উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে তাহা হয় নাই বলিয়াই আমরা সুখী,—সেখানে প্রীতির সুর জমিয়াছিল ভাল।

বলা বাহুল্য, সৈয়দ আলতাফ আলী সাহেবই সে সুরের সূত্রধার হইয়াছিলেন। শুধু সূত্রধার নহেন, তাঁহার সুরই অন্য সকল সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি আবেগভরে বলিয়াছিলেন,—"আমি মুসলমান, কিন্তু আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালার মুসলমান। বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্য-ক্ষেত্রে মুসলমানের জন্য একটা বড় আসন পাতা আছে। বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিকল্পে হিন্দু যেমন মনীষার পরিচয় দিয়াছে, মুসলমানও তেমনি যোগ্যতা দেখাইয়াছে। কেবল বাঙ্গালা ভাষা কেন, হিন্দুস্থানে বাদশাহী আমলে হিন্দীভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে হিন্দু মুসলমান দুই ভাই সমভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই এক ক্ষেত্র, যেখানে আমরা দুই জাতি সরল ও উদার ভাবে সম্মিলিত হইয়া এক মনে কাজ করিতে পারি; পূর্ব্বে মুসলমান শাসনকালে একযোগেই কাজ করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধে আমাদের উভয় জাতির ঔদার্য্য বড় কম ছিল না। মুসলমান দরাফ খাঁর রচিত গঙ্গাস্তোত্র এখনও বাঙ্গালার হিন্দুগণ পাঠ করিয়া থাকেন; সুরদাস, শ্যামদাস রচিত কৃষ্ণলীলা বিষয়ক বড় বড় গান এখনও উত্তর পশ্চিমের বড় বড় নবাবী মজলিসে গীত হইয়া থাকে। আমরা তাহা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়া থাকি। পূর্ব্বে যাহা ছিল এখন তাহা হইবে না কেন? মায়ের অঞ্চল ধরিয়া মাতৃপ্রাঙ্গণে ছুটাছুটি করিয়া আমরা বাঙ্গালার উভয় শিশু যে ভাষা প্রথম শৈশবে শিখিয়াছি, তাহার উপর আমাদের উভয়ের সমান দাবী, সমান অধিকার। সে দাবী, সে অধিকার হইতে আমরা মুসলমান অবহেলায়, ঔদাসীন্যে কেন বঞ্চিত থাকিব? আসুন ভাই হিন্দু মুসলমান, মাতৃভাষার আঙ্গিনায় আমরা উভয়ে আবার সমবেত ও সম্মিলিত হই। আজ বগুড়ার এই বৈঠকে আমি বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে শুধু এই আহ্বানই করিতেছি। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির নিষ্কণ্টক মিলনের এমন আঙ্গিনা আর নাই।"—মুসলমানের বাঙ্গালা লেখায় এমন মিলনের আহ্বান আমরা অল্পই শুনিয়াছি। ইহার ছত্রে-ছত্রে আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তবে এই অভিভাষণের একটি কথা সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। সে কথাটি এই,—"বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বরচিত গ্রন্থে মুসলমান বিদ্বেষের পরিচয় দিয়া থাকেন।"—এ কথা সত্য হইলে নিতান্ত লজ্জার ও দুঃখের বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মুসলমান ভ্রাতারা উহা যতটা জোরের সহিত প্রচার করিয়া থাকেন, ততটা কি উহা সত্য? তাঁহারা বঙ্কিম, গিরিশ ও দ্বিজেন্দ্রলালকে ঐ অভিযোগের মধ্যে টানিয়া আনিয়া নিতাই গালি দিয়া থাকেন দেখিতে পাই; কিন্তু বাস্তবিকই কি তাঁহারা অপরাধী? জানি না, সভাপতি মহাশয়ের কটাক্ষের লক্ষ্যস্থল কাহারা!—তবে কথাটা যখন তিনি তুলিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে একটু বুঝাইয়া বলা এখানে দরকার মনে করিতেছি।

নাটক বা উপন্যাসের পাত্র পাত্রীর মুখের কথায় নাট্যকার বা উপন্যাসকারের মনের ভাব যে অনেক সময় ধরিতে পারা যায়, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য্য যে, গ্রন্থকারের মনের ভাব ধরিতে যাইয়া অনেক সময় আমরা ভুল করিয়াও বসি। আমাদের বিবেচনায় মুসলমান-ভ্রাতারাও সেই ভুল করিতেছেন। যেখানে দেখা যায় যে, লেখক একদিকে অনুরাগভরে হেলিয়া পড়িয়াছেন, আর অন্যদিকে বিরাগে বাঁকিয়া আছেন, সেখানে অবশ্য লেখকের মন বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যে সহানুভূতি চরিত্র-সৃষ্টির মূল, সেই সহানুভূতি যেখানে প্রবল, সেখানে কি সম্প্রদায়গত বা জাতিগত বিদ্বেষভাব প্রকাশ পায়? সেখানে আমরা দেখিতে পাই, শাক্ত বৈষ্ণবকে গালি দিতেছে, আবার বৈষ্ণবও শাক্তকে গালি দিতেছে। সেখানে মুসলমান হিন্দুকে গালি দিতেছে, আবার হিন্দুও মুসলমানকে গালি দিতেছে।—সেখানে গ্রন্থকারের জাতি বা ধর্ম্মের ওকালতী থাকে না। ইহার ব্যতিক্রম যে গিরিশ বা দ্বিজেন্দ্রলালে দেখিয়াছি, এমন ত মনে হয় না।

মনে পড়ে, গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' নাটক যখন প্রকাশিত হয়, তখন মুসলমান ভ্রাতারা উহাতে মুসলমান বিদ্বেষের গন্ধ আছে বলিয়া উহার অভিনয় বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাহাতে বিশেষ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি পুস্তকের 'ভূমিকা'য় লেখেন,—"এই নাটক, হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ববিষয়ক। সুতরাং পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেরূপ কটূক্তি হইত, তাহা এই নাটকে সন্নিবেশিত হইয়াছে; উহা ঐতিহাসিক রচনায় অপরিহার্য্য। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধীয় এবং রাণী এলিজাবেথ ও ক্যাথেরিনার দ্বন্দ্ব-সম্বন্ধীয় সার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস ইহার প্রমাণ। মুসলমান ভ্রাতাগণের মধ্যে যদি কেহ কৃপায় এই নাটক পাঠ করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন যে, মুসলমানের প্রতি রচয়িতার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং মুসলমান যে সমস্ত গুণগ্রামে ভূষিত, তাহা হিন্দুর আদর্শ হওয়া উচিত, এইরূপ নাটককারের ধারণা। যদি কোন স্থল কাহারও কর্কশ বোধ হয়, ভ্রাতৃজ্ঞানে সে দোষ মার্জ্জনা করিবেন। পুনর্ব্বার সার ওয়াল্টার স্কটকে উল্লেখ করিয়া বলি যে, যদিচ তাঁহার উপন্যাসে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের দ্বন্দ্ব বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডবাসী এক্ষণে একজাতি হইয়া আনন্দের সহিত তাহা পাঠ করে। হিন্দু মুসলমান এক্ষণে আমরা এক—হিন্দুস্থানবাসী—সুখ দুঃখের অংশী। অতএব পূর্ব্বকালে হিন্দু-মুসলমানে যে সকল দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে, তাহার উল্লেখে কোনও জাতির ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নহে। বরং ইতিহাস দৃষ্টে উভয় জাতির পূর্ব্ব ভ্রম সংশোধিত হইতে পারে।"—এই কথাই আমাদেরও কথা। এমন সুযুক্তিপূর্ণ উক্তিতেও কিন্তু আমাদের মুসললমান ভ্রাতারা সন্তুষ্ট নহেন। কাজেই বলিতেছিলাম, তাঁহারা হিন্দু লেখকগণের মুসলমান-বিদ্বেষ যতটা প্রচার করিতেছেন, ততটা উহা সত্য নহে। আমরা আশা করি, সভাপতি আলতাফ আলী সাহেব আমাদের এই মনের কথাটা বুঝিয়া তাঁহার নিজ সম্প্রদায়কে ইহা বুঝাইবার এবার চেষ্টা করিবেন। তিনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ—মুসলমান-

নেপোলিয়নের সেণ্ট বারনার্ড অতিক্রম
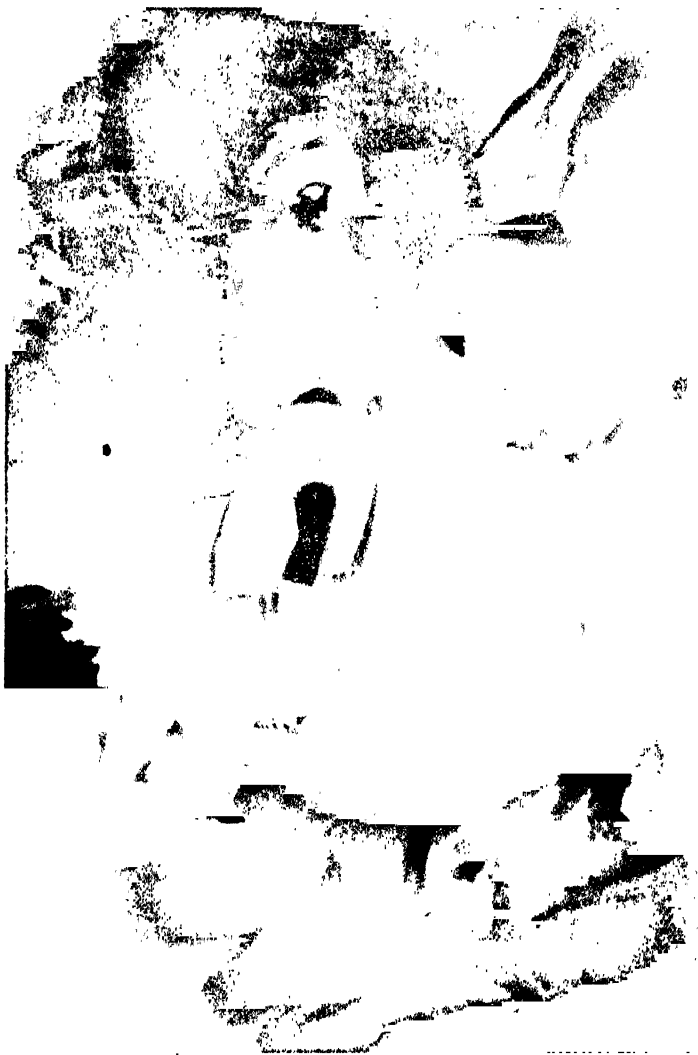
শিল্পী—পল ডেলারোচি

কুলের চূড়া ; তিনি একটু চেষ্টা করিলে আমাদের বিশ্বাস সুফল ফলিতে পারে।

সেকাল ও একালের বিবাহ :—

অনুচিকীর্ষার বশে যে সাহিত্য রচিত, তাহার কথা ধরি না ; কিন্তু যাহা খাঁটি সাহিত্য, তাহা যে দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব, একথা জোর করিয়াই বলিতে পারি।

এ কথা জানিবার জন্য পরের দুয়ারে ছুটিবারও প্রয়োজন নাই। আমাদের ঘরে যে সাহিত্য-ভাণ্ডার আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলেই উদাহরণ যথেষ্ট মিলিবে। আমাদের সেকেলে সাহিত্য যিনি একটু মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িবেন, তিনিই দেখিতে পাইবেন তাহাতে আমাদের দেশের অনেক চিত্রই প্রতিফলিত হইয়াছে।—অনেক সামাজিক রীতি নীতি—বাঙ্গালী ঘরের অনেক সুখ-দুঃখের কথা, তাহা হইতে জানিতে পারা যায়।

এই যে বঙ্গদেশে আজ যে বিবাহ-ব্যবসা খুব জোরের সহিত চলিতেছে, তাহা সেকালে ছিল কি না, জানিতে হইলে কে আমাদের সে কথা ঠিকমত জানাইয়া দিবে ?—না, সাহিত্য ! সাহিত্যই একমাত্র ইহার উত্তর দিতে পারে। কবি সত্যই বলিয়াছেন,—

"কে শুনিত রাম সীতা নাম সুধাময়,
না থাকিলে রামায়ণ ত্রেতার সম্বল !
সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, জগৎ নশ্বর !
কবিতা অমৃত আর কবিরা অমর।"

'কবিরা অমর', সন্দেহ নাই। তাই মুকুন্দরাম, ঘনরাম, কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতিকে সেকেলে বাঙ্গালী সমাজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে এখনও তাহার উত্তর শুনিতে পাই। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালীর বিবাহ-ব্যাপারে কিরূপ 'খাঁই' বা 'দেনা-পাওনা' ছিল, তাহা ঐ সকল কাব্যের কবিগণ বলিতে পারেন।

আবার একালের বর-বিক্রয়ের ছবিও যে একালের সাহিত্যে প্রতিফলিত না হইতেছে, এমন নহে। সে ছবি যাঁহাদের দেখিবার ইচ্ছা, তাঁহারা 'পাশকরা ছেলে' 'বিবাহ-বিভ্রাট' 'বলিদান' ও 'অরক্ষণীয়া' এই চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারেন। 'বরের দরে'র আর একটি ছবি কবিতায় আঁকিয়া গিয়াছেন—স্বর্গীয় কবি রজনীকান্ত সেন। বিবাহ-ব্যাপারে সেকালের সহিত একালের 'দেওয়া-থোয়া'র কতটা প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, তাহা একালের দুই-একখানি ছবির পার্শ্বে সেকালের দুই একখানি ছবি দাঁড় করাইলেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

আজকাল 'বরের দর' কিরূপ, তাহা কবি রজনীকান্ত বরের বাপের মুখ দিয়া বলাইতেছেন,—

"নগদে চাই তিনটি হাজার,
(আর), পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
সোনার চৈন ঘড়ি, আইভরি ছড়ি,
ডায়মণ্ড-কাটা সোনার বোতাম,
দিও এক সেট্, কতই বা দাম ?
বিলিতি বুট, ভাল শ্লিপার, বরের প্রয়োজন ;
ফুল এষ্টকিং, রেসমী রুমাল, দিও দু'ডজন।
ছাতি, বুরুস, আয়না, চিরুনি,
ফুলকাটা সার্ট, কোট, পেণ্টালুন,
দু' জোড়া শাল, সাজের চাদর, গরদ সুচিকন,
হ্যাদ্দ্যাখো ধরিনি 'চস্‌মা'—কেমন ভুলো মন !
ছেলে, টুসি পেলে খুসি, একটু খাটো দরশন।
খাট, চৌকী, মশারি, গদি, এর মধ্যে নেই 'পারি যদি',
তাকিয়া, তোষক, বালিশাদি, দস্তুর মতন ;
হবে দু' প্রস্থ, শয্যা প্রশস্ত,
(আর) টেবিল, চেয়ার, আলনা, ডেস্ক,
হাতীর দাঁতের হাত বাক্স,
ষ্টীল ট্রাঙ্ক খুব বড় ছোটো, যা' দেশের চলন ;
(আর) তারি সঙ্গে পুরো এক সেট্ রূপোরি বাসন।
গিন্নি বলেন, বাছাটি হচে, রূপ-লাবণ্য উঠে ফুটে,
এক'শ' ভরির হলেই হবে একটি সেট উত্তম ;
যেন অলঙ্কার দেখে, নিন্দে করে না লোকে,
দিও বারানসী বোম্বাই,—মন্দ কিছু হ'ল লম্বাই ;
হাঁ, তোমার মেয়ে, তোমার জামাই,
তোমার আকিঞ্চন ;
আমার কি ভাই ; আজ বাদে কা'ল মুদব দু'নয়ন।
(আর) দিও যাতায়াতের খরচ,
না হয় কিছু হবে করজ,
তা, মেয়ের বিয়ে, তোমার গরজ, তোমার প্রয়োজন ;
আবার আসবে কুলীন দল, তাদের চাই বিলাতি জল,
দুজন বিশেষ 'হুইস্কি' খেকো,
নইলে বড় প্রমাদ, দেখো !"

এই হইল আধুনিক বরের দর। বলা বাহুল্য, দর ক্রমে ক্রমে চড়িয়া ঐ দরে এখন দাঁড়াইয়াছে। হয় ত একটু আধটু এদিক ওদিক হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর বরের বাজার এখন ঐরূপ !

সেকালে কিন্তু ঐরূপ ছিল না। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ধনকুবের বণিকের বিবাহের যে ইতিবৃত্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ফর্দ্দাফর্দ্দির বিশেষ কিছু বাড়াবাড়ি দেখিতে পাই না। লক্ষপতি দুহিতার গাত্রে হরিদ্রার সজ্জা কেবল মাত্র—

'সুরঙ্গ পাটের শাড়ী, বিচিত্র রঙ্গের কড়ি,
বীজমালা স্বর্ণ বিজড়িত ॥'

আর—

'গোরোচনা নীলশঙ্খ, চামর চন্দন পঙ্ক,
ফুলমালা কজ্জল দর্পণ ॥'

এ দিকে বরপক্ষেও 'দেনা-পাওনা' লইয়া মারামারি ছিল না।

মেয়ের বাপের ইচ্ছার উপর বরের পাওনা-গণ্ডা তখন নির্ভর করিত। কিন্তু কন্যার পিতাও সটান ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেন না। তিনি—

'বসন কাঞ্চন হার, আদি নানা অলঙ্কার
দিয়া জামাতার কৈল মান।'

তখন জামাতাকেও—

'বসন নানারঙ্গে, বরণ করি যত্নে'
করিতে নিল স্ত্রী আচার।'

আসল কথা তখন বিবাহ—বিবাহই ছিল; ব্যবসা ছিল না। তখন পাশের রুচি দেখিয়া বর পছন্দ করা হইত না। তখন বর,—

"যেমন রূপ, তেমন গুণ উত্তম ব্যবহার।
দেব-দ্বিজ, গুরুভক্তি, শুদ্ধ সদাচার॥
দানে কর্ণ সমান উচ্চ অভিলাষ।
নাটক-নাটিকা কাব্য করেছে অভ্যাস॥"

এইরূপ হওয়া আবশ্যক ছিল। তখন কনে পছন্দও কলেজের মেয়ে দেখিয়া হইত না। তখন সেই মেয়েরই সুখ্যাতি হইত, যে মেয়ে—

'বার মাসে বার ব্রত, পুণ্য তিথি করে কত
দেবকার্য্য করে অবিশ্রাম।'

এখনকার কালে বোধ করি এ মেয়ে চলে না। এখনকার ছেলেরা অমন মেয়ে দেখিলে নিশ্চয়ই নাসিকা শিকায় তুলিবেন। আর গুণবতী Girlরাও যে অমন মেয়ে দেখিলে না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন, এমন মনে হয় না।

যাহা হোক, কনে-পছন্দের এখন প্রধান উপকরণ—পাওনা। সেকালে বরসজ্জা, বরাভরণ, যৌতুক, ফুলশয্যা প্রভৃতি যে ছিল না, এমন বলিতেছি না। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এ সমস্তই ছিল; কিন্তু ইহার উপর তখন মেয়ে-পছন্দ নির্ভর করিত না। তখন কন্যার বিবাহে কাহারও বাস্তুভিটা বিক্রয়ের সম্ভাবনা ছিল না।—বৈবাহিক বণিগ বৃত্তি তখন স্বপ্নের অগোচর ছিল।

বর বিক্রয়ের প্রথা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের প্রথার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত হইয়াছে, মনে হইতেছে। এই ব্যাপার লইয়া বঙ্গভাষায় যে পুস্তকখানি সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার নামকরণও হইয়াছিল—'পাশকরা ছেলে'। 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রণেতা স্বর্গীয় দুর্গাচরণ রায় ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে, এই ক্ষুদ্র নাটকখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তখন 'পাশকরা ছেলে' একটু উঁচু দরে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। সে দর কেমন ছিল, তাহা এই পুস্তকের মধ্যেই আছে। 'পাশকরা ছেলে'র বাপ বলিতেছেন,—"ছেলের বেতে কি কি নেবো শুনবে—বৌমার মাথায় সোনার আঁব কাঁঠালের বাগান, আর তাঁর চোখে কানে, বুকে পিঠে, কণ্ঠায় যত সোনা লাগবে এবং কোমর হ'তে পা পর্য্যন্ত রূপো দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। আমার গঙ্গারামের দশ আঙ্গুলে দশ আংটি, সোনার ঘড়ি, সোনার চেন, রূপোর দান-সামগ্রী, ভাল খাট মায় মসারি, পড়ার খরচ মাসিক চোদ্দ টাকা এবং দু হাজার টাকা আয়ের একখানি তালুক যে দেবে তাকে ছেলে দোব, তার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হবে।"—বর বিক্রয়ের প্রথমযুগে বরের বাপেদের এই রকম 'খাই' হইয়াছিল। পরে তাহা বাড়িতে বাড়িতে কোথায় গিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রথমেই আমরা দিয়াছি। তবে সরস্বতী আশুতোষের কৃপায় পাশের দর যেরূপ সুলভ হইয়াছে, তাহাতে আশা হয় পাশ করা ছেলে'র দরও ক্রমে কমিবে। তখন হয় ত গিরিশের 'বলিদানে'র পরিবর্ত্তে সাহিত্যে আমরা আবার সুখের ছবিও দেখিতে পাইব।— আমাদের সে আশা কি সফল হইবে না।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ বিদ্যুৎ-গতিতে সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল! বঙ্গ-দেশবাসী এই নিদারুণ বার্ত্তায় শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বহু কবি শোকগাথায় গভীর বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, ভুবনচন্দ্র-প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিগণ সুললিত কবিতায় করুণ সুরে শ্রীমধুসূদনের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের সে অপার্থিব শোক-সঙ্গীত ভুলিবার নয়। তাহা বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠস্থ হইয়া আছে।

"বাল্মীকি তোমর, সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী;
অকাল-কোকিল, মরুতল-তরু
অ-নীর দেশের বারি।"

কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী,—বঙ্গের যাবতীয় সম্পাদকবর্গ মধুসূদনের মৃত্যুবার্ত্তা গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কবির জন্য প্রকৃতই ব্যথিত হইয়াছিলেন। সেরূপ অকৃত্রিম সমবেদনা বর্ত্তমানকালে বিরল। সে সহৃদয়তা,

সে সহানুভূতি, সে আন্তরিকতা আর নাই। 'সমাজ-দর্পণ'-সম্পাদকের মর্ম্মস্তুদ লেখা সকলেই পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছেন; এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেবল রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'রহস্য-সন্দর্ভে' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রথম কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"হে ভারতভূমি! তুমি ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, জয়দেব প্রভৃতির বিরহ কথঞ্চিৎ প্রকারে বিস্মরণার্থ যে অমূল্য রত্নস্বরূপ মাইকেলকে ক্রোড়ে করিয়া সাহ্লাদিত চিত্তে তাঁহার মধুময় বাক্যাবলী শ্রবণ করিতেছিলে, সর্ব্বভুক কাল যে তাঁহাকে অকালে হরণ করিল, সে কেবল তোমার ভাগ্যদোষে। বহুকাল নিরশন ব্যক্তির পক্ষে পর্য্যাপ্তাহার ও চিরদুঃখীর পক্ষে বহু ধনলাভ যেরূপ সহনীয় হয় না, হতভাগিনী ভারতের প্রতি সেইরূপ মধুসূদনের মনঃপ্রসাদকর সুললিত সঙ্গীত সহ্য হইল না। পারিজাত কুসুম সদৃশ মধুরতা, বীরতা, বিজ্ঞতাদি সদ্গুণ সৌরভ বিস্তারকারী রঘু, কুরু, পাণ্ডু, যদুবংশীয় রাজগণ যখনি শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছেন, তখনি ভারতের দীনাবস্থার উদয় হইয়াছে। হায়, অনাথার নাথ প্রাপ্তি অতীব দুরূহ! মাতৃত্ববশতঃ আমাদিগের হৃদয় যখন এ দুর্ঘটনায় বিদীর্ণ হইতেছে, তখন, হে ভারতভূমি! তুমি জননী হইয়া এ শোক কিরূপে সম্বরণ করিবে?"

সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের লেখক ও সম্পাদকবর্গ এতাবৎকাল অবিরত উদ্ধৃত করিতেছেন; আমরা প্রথম প্যারাটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম ;—

"আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না; এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে! কেন না, বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।"

বঙ্গ সাহিত্য-সমাজ এই আকস্মিক বজ্রপাতে বিচূর্ণ হইয়া গেল! ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী মেডিকেল কলেজে আসিয়া ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য চিকিৎসকদিগকে মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। অনেকে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আলিপুর জেনেরল হাসপাতালাভিমুখে গমন করিলেন। মধুসূদন মধ্যে-মধ্যে মেডিকেল কলেজে আসিয়া ছাত্রদিগকে কাব্যসুধাদানে পরিতৃপ্ত করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রতি ছাত্রগণের আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। সেই কারণে অনেকে তাঁহার মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আলিপুরে গিয়াছিলেন। শুধু ছাত্রগণ নহে,—বীরভূম—সিউড়ী-নিবাসী জমীদার স্বর্গীয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ লেখককে বলিয়াছিলেন যে,—"মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতা নগরে বিঘোষিত হইলে কেবল বাঙ্গালী নহে, ভারতীয় নানাজাতীয় খ্রীষ্টান, মুসলমান, মান্দ্রাজী, ইংরাজ প্রভৃতি ভদ্রলোক আলিপুরের চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শবদেহ দর্শন করিয়া তাঁহার নিমিত্ত শোক-সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। মধুসূদনের ন্যায় বিরাট পুরুষের এরূপ অচিন্তনীয় - অশ্রুতপূর্ব্ব শোকাবহ পরিণামে কেহই অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারেন নাই।"

মধুসূদন রবিবার অপরাহ্নে মানবলীলা সম্বরণ করেন। অবিরাম জন-সমাগমে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের নানা মতভেদ ও বাদানুবাদে, বন্ধুগণের পরামর্শ প্রভৃতি নানা কারণে সেই দিন তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার মৃতদেহ পুষ্পাচ্ছন্ন করিয়া ২৪ ঘণ্টারও অধিককাল মৃতাগারে সুরক্ষিত হইয়াছিল। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বন্ধুগণ কবির শ্মশান-যাত্রার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পরদিন ৩০ জুন সোমবার (খ্রীঃ ১৮৭৩) অপরাহ্নে মধুসূদনের মৃতদেহ টমাস এণ্ড কোম্পানী (Thomas & Co.) লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করিবার জন্য লইয়া গেলেন। ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মধুসূদনের ব্যারিষ্টার বন্ধুগণ, তাঁহার কন্যা-পুত্র-জামাতা ও অন্যান্য কুটুম্বগণ, বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং তাঁহার স্বদেশবাসী প্রায় সহস্র ব্যক্তি ধীরে – নীরবে—সাশ্রুনয়নে তাঁহার শবাধারবাহী মন্থরগতি শকটের অনুগমন করিয়াছিলেন*। বঙ্গের মহাকবির মহাযাত্রায় কোনরূপ আড়ম্বর, বা বাহ্যদুঃখের অবতারণা ছিল না। কিন্তু শোক-জ্ঞাপক নিস্তব্ধ গম্ভীর দুঃখের মহাগাম্ভীর্য্যে মহাকবির মহাপ্রস্থানের মৌনমুগ্ধ নীরব সমারোহ পরিলক্ষিত

* এ সম্বন্ধে কলিকাতা Tract Book Societyর ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ কর্ম্মাধ্যক্ষ ডাক্তার জে, বিশ্বাস মহাশয় যে পত্রখানি আমাদিগকে লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল।

হইয়াছিল। স্তব্ধ মৌনবদন জনসঙ্ঘ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মহাকবির শবাধারের (Bier) অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

হায়! কোথায় পুণ্য-সলিলা জাহ্নবীতীরে জাহ্নবী-তনয়ের 'কুসুমদামসজ্জিত' অগুরু-চন্দন চর্চ্চিত বরবপু সর্জ্জরস-চন্দন-বাসিত বহ্নিমান চিতায় ভস্মসাৎ হইয়া জাহ্নবীর চির-পবিত্র জলে মিশাইয়া যাইবে, না, কোথায় বাঙ্গালার মধুসূদনের শবদেহ খ্রীষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে ধরণীগর্ভে গাঢ় অন্ধকারে প্রোথিত করিবার জন্য নীত হইতেছে—নিশ্চয়ই সহৃদয় হিন্দুসন্তানমাত্রেই তখন এ ব্যথা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন।

এ-স্থলে কেহ যেন মনে না করেন যে, মনুষ্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সমাজ-সঙ্কীর্ণতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া এরূপ কথা বলিতেছি; সকল সমাজের এবং সকল ধর্ম্মের শেষ ক্রিয়াই সেই-সেই সমাজের ধর্ম্মানুষ্ঠানসঙ্গত। হিন্দুকুল-জাত মধুসূদনের পার্থিব অবশেষ চিতানলে বিলীন হইলেই আমাদের কোন ক্ষোভ থাকিত না,—ইহাই বলা আমাদের

38, Upper Circular Road, Calcutta.

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সোম সমীপেষু!

মহাশয়!

আমি স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা অবগত আছি, তাহা লিখিতেছি।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহোদয়ের মৃত্যু সময়ে আমি শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যয়ন করিতাম। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শনের নিমিত্ত, আমি ও আমার অপর দুইজন বন্ধু, শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতায় আসি। কেবল শ্রীরামপুর হইতে নহে, হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ব্যক্তি এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-কার্য্যে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। প্রায় এক সহস্র লোক তাঁহার শবাধারের অনুগমন করিয়াছিলেন।

আমরা যখন লোয়ার সাকুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম, তখন মাইকেলের সমাধিকার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তখনও প্রায় তিন চারিশত লোক গোরস্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তৎকালে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার অন্তিম কার্য্যাদি সম্বন্ধে কোনও কারণে খৃষ্টীয় পাদরী ও মিশনরীদিগের মধ্যে মতভেদ, বাদানুবাদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে সকল অন্তরায়ের নিষ্পত্তি হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নিবেদক

(স্বাঃ) জে, বিশ্বাস,

উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি যখন খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তখন তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারে যথাবিহিত সুসম্পন্ন হওয়ায় সে সম্বন্ধে আর এক্ষণে কাহারও কিছুই বলিবার নাই। তাহা যথোচিত মর্য্যাদা ও গৌরবের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

যখন মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টির বিষয় লইয়া খ্রীষ্টান-সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল, যখন মতভেদ-নিবন্ধন পাদরীগণ লর্ড বিশপ মহোদয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য যুক্তি ও পরামর্শ করিতেছিলেন,—তৎপূর্ব্বেই সেণ্ট জেমস্ গির্জ্জার ধর্ম্মাচার্য্য (Chaplain) স্বাধীনচেতা, সৌম্যদর্শন, পণ্ডিত চূড়ামণি, মহামতি রেভারেণ্ড ডাক্তার পিটার জন জার্বো (Rev. Dr. Peter John Jarbo M. A., Ph. D., D. D.) স্ব-ইচ্ছায় মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি-নির্ব্বাহের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিলেন না। এমন কি, তিনি মধুসূদনের পারলৌকিক ক্রিয়ার নিমিত্ত লর্ড বিশপের অনুমতির অপেক্ষাও রাখেন নাই। মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি সমস্যার সময়, মহামতি জার্বো নির্ভীকচিত্তে মতবিরোধী পাদরীদিগকে বলিয়াছিলেন "যখন তিনি খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজ (Baptised) হইয়া মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন, তখন কেন আমরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিব না? তাঁহার যে খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস ছিল না, এ কথা কে বলিতে পারেন?" ধন্য বিধাতার কৌশল! মধুসূদন যেমন চিরদিন দোর্দ্দণ্ড স্বাধীন প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন, তদুপযুক্ত উন্নতমনা, সৎসাহসী নির্ভীকহৃদয় ধর্ম্মাচার্য্য তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ক্রমে আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়াসমন্বিত স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে জনসমূহ পরিবেষ্টিত শবাধারবাহী শকট (Hearse) সমাধিস্থানের দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে, শবাধার শববাহকগণের স্কন্ধারূঢ় হইয়া সমাধিক্ষেত্রে চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ড সম্প্রদায়ের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত ভূমিখণ্ডাভিমুখে চলিল;—অগ্রে-অগ্রে পুরোহিত-পরিচ্ছদভূষিত সৌম্যমূর্ত্তি ডাক্তার পি, জে, জার্বো মহোদয় ধীরে-ধীরে চলিয়াছেন;—ছত্রধর তাঁহার মস্তকোপরি প্রকাণ্ড ছত্রধারণ করিয়া পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চলিয়াছে—শ্রেণীবদ্ধ শোকক্লাতর জনমণ্ডলী নীরবে ধর্ম্মাচার্য্যের অনুগমন করিতেছেন। কবির শবাধার সমাধি-

কবরের উপরিভাগে সুরক্ষিত হইলে রেভারেণ্ড জারবো মহোদয় Anglican Church এর ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিধি অনুষ্ঠানানুযায়ী মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ডাক্তার জারবো এবং কবির আত্মীয়-স্বজন সকলে এক-এক মুষ্টি মৃত্তিকা শবাধারের উপর নিক্ষেপ করিলে, শেষক্রিয়া সমাধার পর বন্ধুবর্গ ও উপস্থিত জনমণ্ডলী শবাধার পুষ্পে পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে শববাহকেরা উন্মুক্ত [illegible] কবির সমাধিস্থ শবাধার ঢাকাইয়া দিল। তৎপরে মৃত্তিকারাশির দ্বারা সমাধি বিবর পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।

"Slowly and sadly we laid him down,
From the field of his fame, fresh
and gory;
We carved not a line, and we raised
not a stone,
But we left him alone in his glory!"

সেই দিন মধুসূদনের সমাধির পর প্রাবৃট প্রকৃতি মুক্ত ধারায় অশ্রুনীরে শোক-জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন; অমনি আকাশ হইতে যেন নিবিড় অন্ধকার নামিয়া আসিল! নিস্তব্ধ সমাধিভূমি আবার গভীর সুষুপ্তিতে সমাচ্ছন্ন হইল! শান্তির প্রশান্ত যবনিকা ধীরে ধীরে পতিত হইয়া সমগ্র জগৎ ঢাকিয়া ফেলিল! মহাকবি মধুসূদন চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন! শোকাতুর বন্ধুবর্গ, আত্মীয় স্বজন, উপস্থিত জনমণ্ডলী সাশ্রু নয়নে গৃহাভিমুখে চলিলেন!

‘কবরে কবিরে রাখি বঙ্গজন এবে
ফিরিলা গৃহের পানে! আজি অশ্রুনীরে
নিমজ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে!
বিয়োগে বিধুরা বঙ্গ কাঁদিলা বিষাদে!’

“কাঁদ, মা বঙ্গজননী, তোমার আকাশমার্গের কোটি নয়ন হইতে বর্ষার বারিধারা ছুটাইয়া কাঁদ মা বঙ্গজননী; তোমার নয়নজলে মধুসূদনের সমাধি শীতল হউক; কারণ জীবনে মধুসূদন ত কখনও শীতলতা উপভোগ করেন নাই! অভাবের তুষানলে তাঁহাকে মরণের দিন পর্যন্ত জ্বলিতে পুড়িতে হইয়াছিল। * * * কাঁদ মা উচ্চ আকাশের গগন-পট হইতে কাঁদ, তোমার নয়নের নির্মল সলিল-কণায় মধুসূদনের সমাধি শীতল হউক, আমরাও সেই জলের সহিত নয়নজল মিশাইতে থাকি। * * * বর্ষার আসার সম্পাতে তোমার নয়ননীরে এ সমাধিক্ষেত্র নিত্য সিক্ত হউক, হেমন্তের শিশিরবিন্দুতে এ সমাধি শীতল হউক! কপোতাক্ষ তীরের মধুকণ্ঠে আমাদের বড় সাধের মধুসূদন অতীতের কত বিস্মৃত কথা আমাদের শুনাইয়া গিয়াছেন; সেই কপোতাক্ষে এখন না হয় ডুবিতে এমনি ভাবে কাঁদিতে থাক।”

[illegible]

IN MEMORIAM.

MICHAEL M. S. DUTT.

BORN 1824. DIED 1873.

Mourn, poor Bengala, mourn thy
hapless state!
Thy swan, thy warbler's snatched by
ruthless fate!
Oh, snatched in prime of life, thy
darling child,—

Datta who sang in magic numbers wild,
Great Meghnad — Indra's haughty conqu'ring foe,
Hurled by brave Lakshman to the shades below !
— Hushed is the tuneful voice that thrilled the soul,
Silent the lyre whose swelling notes did roll
In streams of music sweet that did impart
A life — a soul ev'n to the dullest heart !
Ah, poor unhappy land ! how sad thy doom,
Thy noblest sons are lost in vigor's bloom !
Oh Death ! how stern — implacable thou art
To single them out for thy cruel dart !
Ye children of Bengala ! O'er his bier
Pour forth your sorrows, — shed the grateful tear

To wit and talents due, and genius rare,
Now lost beyond the reach of hope and care !
What though no pageant grand, no funeral show
Followed his hearse in sable garb of woe ?
What though no column high, no living bust
Should mark the spot where lies his honored dust ?
He needs not these, though prized by little men .—
His works his noblest monument remain !
Oh, crown your poet's grave with flowery wreaths,
The flesh is dead, th' immortal spirit breathes !

MOOKERJEE'S MAGAZINE, VOL. II, 1873.

বাঙালী পণ্ডিত

শ্রীমান প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার বন্ধু

প্রেরণ করিয়াছিলেন। হীমু, গোয়ালিয়রে আলী কুলী খাঁ, ও আগ্রায় সিকন্দর খাঁ উজ্‌বক্ প্রভৃতিকে পরাজিত করিলেন; পুরাতন দিল্লীর নিকট তিনি তর্দ্দী বেগকে পরাস্ত করিয়া, পাণিপথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন।

অভিষেকের অনতিকাল পরে, জলন্ধর নামক স্থানে অবস্থানকালে আকবর সংবাদ পাইলেন (৭ অক্টোবর, ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) যে হীমু, দিল্লীর শাসনকর্ত্তা তর্দ্দী বেগের

আকবর বাদশাহ

সম্রাট্ হুমায়ন

মাহম অনগের মাদ্রাসা

নিকট হইতে দিল্লী অধিকার করিয়া লইয়াছেন;—পরাজিত তর্দ্দী বেগ পলায়িত! রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনেকে পরামর্শ দিল যে, এ সময়ে আকবরের কাবুলে প্রত্যাবর্ত্তন করাই যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু বাবর ও হুমায়ুনের বিশ্বস্ত সহচর, নির্ভীক বয়রাম্ খাঁ এই ভীরুতার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না; তিনি শত্রুর সমুচিত

শান্তিবিধানের জন্য যুদ্ধের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। সিকন্দর স্থরের প্রতিকূলতাচরণ করিবার জন্য গুলবদনের স্বামী খিজর্ খাঁ নিযুক্ত হইলেন।

আক্‌বর ও বয়রাম্ খাঁ সসৈন্য দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সরহিন্দ্ নামক স্থানে দিল্লীর পরাজিত সেনানীরা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

আকবর সমীপে বয়রাম্ খাঁ

এই সময়ে বয়রাম্ খাঁ, কাপুরুষ চগ্‌তাই প্রধান তর্দী বেগকে বিনা কারণে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া পলায়নের অপরাধে হত্যা করাইলেন। তর্দী বেগ হুমায়ুনের শাসন কালে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন; এতদ্ব্যতীত 'আক্‌বর-নামা'-পাঠে জানা যায় যে, তাঁহার সহিত বয়রাম্ খাঁর পূর্ব্বশত্রুতাও ছিল। তর্দী বেগের হত্যাকাণ্ডে অন্যান্য চগ্‌তাই প্রধানেরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু ফিরিশ্‌তার (ii, 180) মতে তর্দী বেগের প্রাণদণ্ড ঠিকই হইয়াছিল। বয়রাম্ খাঁ এই কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া অবিনীত লোকদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, অন্যায় কার্য্য করিলে কেহই, তিনি যত বড়ই হউন না কেন, সহজে পরিত্রাণলাভ করিবেন না, অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ড বিহিত হইবে।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে এ পাণিপথে হুমায়ুনের একবার ভাগ্যপরীক্ষা হইয়াছিল, সেই পাণিপথে হীমর সহিত মোগল পক্ষের ভীষণ সংগ্রাম বাধিল (৫ই নভেম্বর ১৫৫৬)। সৈন্য-

সংখ্যায় হীম প্রবল হইলেও চক্রনেমীর পরিবর্ত্তনে তিনি পরাজিত ও বন্দী হইলেন। 'আকবরনামা' ও 'নফাইস্উল মাসির' পাঠে জানা যায় যে, যুদ্ধের সময় আকবর ও বয়রাম খাঁ উপস্থিত ছিলেন না; যুদ্ধশেষে ক্ষত বিক্ষত হীম যখন বন্দী, সেই সময়ে তাঁহারা যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হ'ন। এই সময়ে বয়রাম খাঁ হীমর রক্তে তরবারি রঞ্জিত করিয়া 'গাজী' বা বিধর্ম্মী-নিধনকারী হইবার জন্য সম্রাট্ আকবরকে অনুরোধ করেন। 'আক্‌বরনামা' ও বদায়ূনী পাঠে জানা যায় যে, সহৃদয় আকবর উত্তরে বয়রামকে বলিয়াছিলেন,—"হীম্ এক্ষণে মৃতবৎ; মৃতের উপর তরবারি চালনে আমি

কলানরে আকবরের সিংহাসন

অসম্মত। যদি তাহার জ্ঞান ও সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে আমি তাহার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতাম।” বয়রামই স্বহস্তে তাঁহাকে হত্যা করেন।

দিল্লী ও আগ্রা অধিকৃত হইল, কিন্তু সিকন্দর সূরকে দমন করা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। আকবর এই সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, সিকন্দর সিওয়ালিকের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নামিয়া পঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছেন। মোগল রাজপ্রতিনিধি খিজর্ খাজা তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুঃসংবাদে আক্‌বর ও বয়রাম্ খাঁ সসৈন্যে পঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া সিকন্দর সূর মানকোটের দুর্জ্জয় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আকবর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। ছয় মাস কাল অবরোধের পর সিকন্দর আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন (মে, ১৫৫৭); তিনি অধীনতা স্বীকার করিয়া পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ আকবরের নিকট পাঠাইয়া সম্রাটের সম্মতিক্রমে বাঙ্গালায় গমন করিয়াছিলেন; তথায় কয়েক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রকৃতপক্ষে আকবর এখন নিষ্কণ্টক। সূর বংশের আর কেহই এখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। মহম্মদ শাহ্ আদিল এখন মৃত (১৫৫৭ খ্রীঃ), হীমু নিহত; সিকন্দর শার হস্ত হইতে আকবর নিষ্কৃত; ইব্রাহিম খাঁ সূর উড়িষ্যায় পলাতক

বুলন্দ দরওয়াজা—ফতেপুর সিক্রী

পঞ্চমহল — ফতেপুর সিক্রী

ফতেপুর সিক্রীর দৃশ্য

অভিভাবক বয়রাম্ খাঁর উপরই ন্যস্ত ছিল। বয়রাম্ 'খাঁন্-খানান্' নামক সর্ব্বোচ্চ পদবী লাভ করিয়াছিলেন; অধিকন্তু সাধারণে তাঁহার অভিভাবকত্ব যাহাতে স্বীকার করে, তজ্জন্য তিনি 'খাঁন্ বাবা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আক্‌বর তাঁহার সহকারী ভাবে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিলেন।

রাজত্বের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে (১৫৫৮-৬০খ্রীষ্টাব্দ) ক্রমে-ক্রমে হিন্দুস্থানে আকবরের রাজ্য বিস্তৃত হইল। মধ্যভারতে অবস্থিত গোয়ালিয়রের দুর্ভেদ্য দুর্গ, এবং জৌনপুর প্রদেশ তাহার করতলগত হইল। রাজপুতানার রন্তাম্ভোরের দুর্গ জয় করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। মালব অধিকারের সূচনা হইয়াছিল; কিন্তু সেই সময় বয়রাম্ খাঁর সহিত আকবরের সজ্বর্ষ উপস্থিত হওয়ায় সে চেষ্টা আর অগ্রসর হইতে পাইল না।

বয়রাম্ খাঁর এই প্রকার প্রাধান্য অনেক আমীর-ওমরাহের চক্ষুশূল হইয়াছিল; সম্রাটের দরবারে তাঁহার বহু শত্রুর উদ্ভব হইয়াছিল। তন্মধ্যে আকবরের প্রধান ধাত্রী মাহম্ অনগ ও তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র আধম্ খাঁই সর্ব্বপ্রধান। তাঁহারা সম্রাটের নিকট যখন-তখন বয়রামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিতে লাগিলেন।

আকবরের উপর মাহম্ অনগের বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। অদৃষ্টের পরিহাসে সম্রাট্ হুমায়ূন যখন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অস্করীর বিশ্বাসঘাতকতায় পত্নীকে লইয়া পারস্যে পলায়ন করিয়াছিলেন, তখন তিনি শিশু আকবরকে কন্দাহারের নিকট ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হ'ন। এই সময়ে আকবরের পালিতা মাতা মাহম্ অনগ, জীজী অনগ এবং পালিত পিতা শাম্সুদ্দীন্ মুহম্মদ্ আট্কা খাঁ শিশু আকবরের তত্ত্বাবধান-ভার লইয়াছিলেন। তাহার পর আকবর যখন শৈশবে পিতৃবৈরী, পিতৃব্য অস্করী ও কামরানের হস্তে নিপতিত হ'ন, তখনও মাহম্ অনগ আকবরের নিকটে থাকিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে আকবর মাহম্কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। আবুল-ফজল সত্যই লিখিয়াছেন,—"She had been in Akbar's service from the cradle till his adornment of the throne." (ii, 86)। মাহম্ অনগ আকবরের স্তন্যদায়িনী ধাত্রী ছিলেন না। তাঁহার বংশ-পরিচয় বা স্বামীর নাম সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বেভারিজ্ মহোদয় কর্ণেল হানার নিকট রক্ষিত একখানি পুঁথিতে নাদিম্ কোকাকে মাহম্ অনগের স্বামীরূপে উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছেন (*J. R. A. S.*, 1899)।

রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবার দুর্দ্দমনীয় বাসনা মাহম্ অনগের মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল; কিন্তু তিনি বাসনা চরিতার্থ করিবার কোন সুযোগই এতকাল পান নাই। বয়রাম্ খাঁই তাহার প্রধান অন্তরায়। তর্দ্দী বেগের গুরুদণ্ড দেখিয়া তিনি মনে-মনে একটু ভীতা হইয়াছিলেন,—বুঝিয়াছিলেন, যে কেহ বয়রামের পথের কণ্টক হইবে, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আকবর, অভিভাবক বয়রাম্ খাঁর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু এই সঙ্ঘর্ষ বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল। আকবর এক্ষণে অষ্টাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন; তিনি এখন স্বয়ং স্বাধীনভাবে রাজকার্য্য চালাইবার উপযুক্ত হইয়াছেন, এরূপ মনে করিতে-ছেন; নামেমাত্র সম্রাট্ না থাকিয়া, তিনি এখন কার্য্যতঃ সম্রাট্ হইতে চাহেন। তাঁহার এই স্বাভাবিক ইচ্ছা, বয়রাম্ খাঁর বিরুদ্ধে মাহম্ অনগ প্রভৃতির চক্রান্তে, আরও বলবতী হইয়াছিল। রাজদরবারে বয়রামের শত্রুর অভাব ছিল না। বয়রাম্ শীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১৫৫৮-৫৯ খ্রীঃ) তিনি শেখ গদাই নামক একজন শীয়াকে 'সদর্-ই-সদর' (প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ) নামক উচ্চপদ প্রদান করিয়া দরবারের সমস্ত সুন্নীদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক বৈরীভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। সুন্নীরা প্রায়ই অনুযোগ করিত যে, বয়রাম্ স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেদের মধ্যে অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাহার পর তর্দ্দী বেগের হত্যাকাণ্ডে বহু চগ্তাই-প্রধান ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। বয়রামের কতকগুলি নিষ্ঠুর আচরণ * সম্রাট্ আকবরের অসন্তোষের অন্যতম কারণ। বয়রাম্ আকবরের একজন মাহুতকে (*A. N.* ii, 139-40) বিনা দোষে হত্যা করিয়াছিলেন। আকবর ক্ষমাভিক্ষার জন্য এই মাহুতকে বয়রামের নিকট পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু বয়রাম্ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। সত্য বটে বয়রাম্ একটু কোপনস্বভাব ও কঠোর-নীতির অনুসারী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পতন যে দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আকবর এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং শাসনকার্য্য পরিচালন

* 'আকবরনামা'র দ্বিতীয় খণ্ডে (P.161) একখানি সুদীর্ঘ ফর্ম্মানে আকবর, বয়রাম খাঁর দোষাবলীর কথা বিশদভাবে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ইহার ভাষার তীব্রতা দেখিয়া স্পষ্টই মনে হয় যে, ইহা বয়রামের কোন শত্রু কর্ত্তৃক লিখিত।

অপেক্ষা আমোদ-প্রমোদই বোধ হয় তখন তাঁহার পক্ষে অধিক প্রিয় ছিল। কোথায় রাজনীতিবিশারদ্ বয়রামের কঠোর রাজ্যশাসন, আর কোথায় স্বার্থান্ধ মাহম্ অনগ ও তাঁহার পুত্র পরিচালিত আক্‌বরের শাসন!

বয়রামের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য আক্‌বর শিকারে যাইবার ছলে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া, আলিগড় অভিমুখে গমন করিলেন (১৫৬০, মার্চ্চ); কিন্তু আমাদের মনে হয়, তখনও অভিভাবককে ত্যাগ করিবার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প হ'ন নাই।

শিহাবুদ্দীন্ অহমদ্ খাঁ তখন দিল্লীর শাসনকর্ত্তা। আক্‌বর-জননী হামীদা বানুও সেই সময় দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। মাহম্ অনগ স্থির করিলেন, আক্‌বরকে যদি দিল্লীতে লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ও শিহাবুদ্দীন্ উভয়ে মিলিয়া কোন্ পথ অবলম্বন করিলে বয়রামের পতন অবশ্যম্ভাবী, তাহা স্থির করিতে পারিবেন। আক্‌বর যখন দিল্লীর মধ্যপথে সিকান্দ্রা রাও নামক স্থানে পৌঁছিয়াছেন, সেই সময়ে চতুরা মাহম্ সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, সম্রাট্-জননী দিল্লীতে অসুস্থ; তিনি শাহান্‌শাহ্‌কে একবার দেখিতে ইচ্ছা করেন। এই সংবাদে আক্‌বর অবিলম্বে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

মাহম্ অনগ ও শিহাবুদ্দীন্ উভয়ে মিলিয়া সুবিধা পাইলেই বয়রামের সহিত আক্‌বরের অচিরাৎ সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া দিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই ষড়্‌যন্ত্র ব্যাপারে সম্রাট্-জননী হামীদা বানুও লিপ্ত ছিলেন। মাহম্ বুঝাইয়া দিলেন যে, বয়রামের যতদিন প্রাধান্য থাকিবে, ততদিন রাজ্য-শাসনকার্য্যের উপর সম্রাটের কোনই ক্ষমতা থাকিবে না; বয়রাম্‌ই সর্ব্বময় কর্ত্তা;—সম্রাট্ তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক। এই সময় মাহম্ অনগ সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, যখন খাঁন্ খানান অবগত হইবেন যে তিনিই সম্রাট্‌কে লইয়া দিল্লীতে আসিয়াছেন, তখন বয়রাম্ তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবেন। এই কারণে চতুরা মাহম্ ছল করিয়া সম্রাটের নিকট মক্কা যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

যদি মাহম্ অনগ এই ষড়্‌যন্ত্রে যোগ না দিতেন এবং বয়রামের কোপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য মক্কা চলিয়া যাইবার ভয় না দেখাইতেন, তাহা হইলে আক্‌বর বোধ হয় বয়রামের নিকট পুনরায় ফিরিয়া যাইতেন। এবার মাহমেরই জয় হইল; সম্রাটের হৃদয়ে মাহাম্ অনগ যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আক্‌বর মাহমের সাহচর্য্য ত্যাগ করিতে পারিলেন না; তিনি আগ্রায় বয়রামের কর্ম্মত্যাগ-পত্র পাঠাইলেন।

বয়রাম্ খাঁ আগ্রায় অবস্থান করিতেছিলেন; রাজ্য-শাসনভার ও সৈন্যাদি তাঁহার অধীনে ছিল; এই কারণে শিহাবুদ্দীন্ ভাবী বিপদাশঙ্কায় পূর্ব্বাহ্নেই দিল্লী সুরক্ষিত করিয়াছিলেন; অধিকন্তু লাহোর ও কাবুল নিরাপদ করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। বয়রামের সহিত সম্রাটের অকৌশলের কথা প্রচারিত হইবামাত্র একে-একে বহু সভাসদ্ আগ্রা ত্যাগ করিয়া সম্রাট্-পক্ষে যোগদান করিলেন।

বয়রাম্‌ও বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার সময়ও তাঁহার উপস্থিত। এই বিচ্ছেদ, আক্‌বর ও বয়রাম্ উভয়ের পক্ষেই যে বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শেখ গদাই ও বয়রামের অনুগত অনেকেই সম্রাট্ আক্‌বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে খাঁন্ খানান্‌কে উত্তেজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রভুভক্ত বয়রাম্ বৃদ্ধবয়সে বিদ্রোহের কলঙ্ক-পসরা মস্তকে লইতে একেবারে অস্বীকার করিলেন; তিনি স্থির করিলেন, এতদিন ত বিষয়-সেবা করিলেন, এখন শেষবয়সে পবিত্র তীর্থ মক্কা গমনই তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে নাগোরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাহম্ ও শিহাবুদ্দীন্ বয়রামের আগ্রা-ত্যাগের সংবাদ শুনিয়া সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, বয়রামের পঞ্জাব-আক্রমণের দুরভিসন্ধি আছে। ইহা শুনিয়া আক্‌বর পঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বয়রাম্ খাঁ পঞ্জাবে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শামসুদ্দীন্ মুহম্মদ্ আট্‌কা খাঁর নিকট পরাজিত হ'ন।

বয়রাম্ খাঁ অবশেষে সম্রাটের নিকট স্বীয় দুষ্কৃতির জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়াছিলেন। আক্‌বর রাজদ্রোহী বয়রাম্‌কে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিয়া মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আমাদের মনে হয়, বয়রাম্ খাঁর প্রথমে বিদ্রোহ করিবার অভিপ্রায় ছিল না;—তিনি বাধ্য হইয়া এ কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাধান্যকালে পীর মুহম্মদ্ নামে একজন

মুল্লা তাঁহার চেষ্টায় উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত পীর মুহম্মদ্ একবার তাঁহার পৃষ্ঠপোষক বয়রামের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায় বয়রাম্ তাঁহাকে পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। গুজরাটে অবস্থানকালে, পীর মুহম্মদ্ বয়রামের পতনের কথা শুনিয়া, তথা হইতে আসিয়া আকবরের কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। বয়রাম্ মক্কা গমন-উদ্দেশ্যে আগ্রা ত্যাগ করিলে, আকবর পীর মুহম্মদ্‌কে একদল সৈন্য দিয়া বয়রামের অনুসরণ করিতে পাঠাইয়াছিলেন;—যত শীঘ্র সম্ভব বয়রাম্‌কে মক্কা গমন করিতে বাধ্য করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। বয়রাম্ মধ্যপথে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ আকবরের নিকট রাজচিহ্ন (Insignia) ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু এক সময়ে যে পীর মুহম্মদ্ তাঁহার ভৃত্য ছিল, তাহার সাহায্যে তাঁহাকে ভারত হইতে ত্বরায় বিতাড়িত করিবার চেষ্টা দেখিয়া, বয়রাম্ খাঁ অপমান বোধ করিয়াছিলেন; তিনি পূর্ব্বসম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন।*

বয়রাম্ মক্কাগমন অভিলাষে সম্রাটের নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। মক্কা যাইবার পথে যখন তিনি গুজরাটে উপস্থিত হ'ন, সেই সময়ে মুবারক্ খাঁ লোহানী নামক একজন আফগান্ তাঁহাকে হত্যা করে (৩১এ জানুয়ারী, ১৫৬১ খ্রীঃ)। বয়রামের এই হত্যাকাণ্ডে আক্‌বর সংশ্লিষ্ট ছিলেন না; মচ্ছিওয়ারার যুদ্ধে বয়রাম্ মুবারকের পিতাকে নিহত করেন; তাহারই প্রতিশোধ-গ্রহণ মানসে মুবারক্ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিল।

সম্রাট্ আক্‌বর বয়রামের পরিবারবর্গের উপরও বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন; তিনি বয়রামের শিশুপুত্র আব্দুর রহীমের লালনপালনের ভার লইয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

* বয়রামের বিদ্রোহের কারণ, দরবেশ মুহম্মদ খাঁকে লিখিত বয়রামের একখানি পত্রে উল্লিখিত আছে; আটকা খাঁ সম্রাট্ আকবরকে যে আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে এই পত্রের কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট আছে (J. A. ii, 185)। বয়রাম্ দরবেশ মুহম্মদকে লিখিয়াছিলেন,—"আমি সম্রাটের অনুগত ভৃত্য; তাঁহার উপর আমার কোনরূপ ক্রোধ নাই; কিন্তু তাঁহার উকীলগণের উপর আমি প্রতিহিংসা সাধন করিব।"

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায়, বি-এ]

হিন্দী

১। **সরস্বতী**, জুলাই, ১৯১৭

"উত্তরাধ্যয়ন-প্রবন্ধ" (Continuation Schools)—লেখক শ্রীগোপালনারায়ণ সেন-সিংহ, বি-এ।

এ দেশের শিক্ষাপ্রচারের একটি বিচিত্র বিশেষত্ব এই যে, একদিকে যে সকল জাতির বিদ্যাশিক্ষায় অধিকার কখনও ছিল না, তাহারা শিক্ষালাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে; অন্যদিকে, শিক্ষা যাহাদের পেশা ছিল, তাহারা এখন অর্দ্ধশিক্ষিত থাকিয়া সামান্য বেতন-ভোগী "বাবু" হইতেছে। যেখানে পূর্ব্বে কোনও বিদ্যালয় ছিল না, সেখানে অনেক বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে ও হইতেছে। পাঠশালা খুলিবার যেরূপ উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, শীঘ্রই এমন দিন আসিবে, যখন—পাঠশালায় কখনো যায় নাই, এমন ছেলে আর পাওয়া যাইবে না। এখনই মধ্যশ্রেণীর মধ্যে এমন ছেলে বিরল, যে অন্ততঃ ছ'মাসও গুরুজীর শ্রীচরণ সেবা করে নাই।

কিন্তু এই সকল বালক পাঠশালা ছাড়িতে-না-ছাড়িতে যাহা কিছু শিখিয়াছিল, সকলই ভুলিয়া বসে। গ্রাম্য বালকগণ পাঠশালা ছাড়িবার পর আর শিক্ষার সংস্পর্শেও আসে না। কারণ, সকল গ্রামেই ত আর স্কুল নাই। নিশ্চেষ্ট থাকিলে শুধু জ্ঞান কেন, কোনও উপার্জ্জিত বস্তুই মানুষ রক্ষা করিতে পারে না। শুধু প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া কোনও লোক কোনও বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে না; সে জন্য আরও কিছু শিক্ষা করার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ছেলেই অর্থাভাবে অথবা পারিবারিক দায়িত্বের জন্য উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়। এ অবস্থায় যদি জীবিকা অর্জ্জনের সঙ্গে-সঙ্গেই তাহারা বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষার সুবিধা পায়, তাহা হইলে অনেক কষ্ট দূর হইতে পারে।

জার্ম্মাণিতে Erganzung Schulen নামক যে স্কুল সম্প্রদায় আছে, তাহাতে পাঠশালা ছাড়িবার পরও ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালকগণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হয়। যে সহর যে শিল্প বা পণ্যের জন্য বিখ্যাত, সেই সহরের মজুর শ্রেণীর বালকগণকে ঐ সকল স্কুলে উক্ত

শিল্প বা পণ্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। ইংলণ্ডেও অনেক নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে এই সকল নৈশ-বিদ্যালয়ে প্রত্যেক সহরের বিশেষ শিল্পশালা ও কারখানার আবশ্যকতা অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। ফলে, এই কারখানাগুলি শিক্ষিত মজুর পায়—নূতন লোককে কায শিখাইয়া লইতে হয় না। ইহারা যেন পাশ-করা মজুর। বালকগণকে কাযও শেখান হইল, পড়ানও হইল। ফলে, ছাত্রগণ কি কায করিবে ভাবিয়া অস্থির হয় না—যে কায শিখিয়াছে, সেই বিশেষ কাযের জন্য চাকরী সন্ধান করিয়া লইলেই হইল।

য়ুরোপের সকল বাণিজ্য-প্রধান দেশেই এই জাতীয় নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে নক্সা প্রস্তুত করা, চিত্র, ব্যবসায়, দপ্তরের কায (Book-keeping) ও নানাবিধ শ্রমশিল্প সম্বন্ধে বিজ্ঞান বিষয়ক কথা শেখান হয়।

দিনান্তে কর্ম্মের অবসরে ছুতার, কুমার, সেকরা, লোহার অথবা কলকারখানার মজুরগণ অন্য কোনও কলা বা শিল্প শিখিতে পারে। অনেকে নিজ-নিজ বিশেষ পেশা সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি শিখিয়া, তাহার প্রয়োগ ইত্যাদি জানিয়া লইয়া ব্যবসায়ে উন্নতির চেষ্টা করিতে পারে।

আমাদের দেশে এইরূপ একটা-কিছু করিবার সময় আসিয়াছে। বর্ত্তমান প্রণালীর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই দেশের শিক্ষার সমস্যাটির সমাধান হইল, এরূপ মনে করা ভুল। এ জন্য আমাদের নিজেদের চিন্তা করিতে হইবে, নিজেদের কাজে লাগিতে হইবে; পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিতে পারেন, উৎসাহ দিতে পারেন, সহানুভূতি দেখাইতে পারেন; কিন্তু এতবড় একটা অভিনব ব্যাপার গবর্ণমেন্ট নিজের স্কন্ধে লইবেন, দেশবাসী নিশ্চেষ্ট থাকিবে—এরূপ আশা করা মূঢ়তা। ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণী ছাড়া য়ুরোপের অন্যান্য দেশে সরকারের সাহায্য নামমাত্রই পাওয়া যায়। প্রায়ই বেসরকারী সমিতি প্রভৃতির উৎসাহে ও চেষ্টায় কায হয়।

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সুবিধা না পাইয়া যে সব ছেলে প্রায় নিরক্ষর থাকে, অথবা সামান্য সাক্ষর বিদ্যা লাভ করে, তাহাদের বিদ্যাভ্যাসের আয়োজন করা আমাদের কর্ত্তব্য। তাহাতে লাভ হইবে এই যে, এই সকল বালক এবং যুবক কাযে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে অর্থ পাঠশালায় দণ্ড দিয়াছিল, সেটা অপব্যয় বলিয়া মনে হইবে না, অথচ ইহাদের লাভ হইবে অনেক। প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি নির্দ্ধারণে এইটুকু দৃষ্টি রাখা উচিত যে, শ্রমশিল্পগুলির সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দেওয়ার আয়োজন যেন তাহার সঙ্গে থাকে। কারণ, আধুনিক বৈশ্যবৃত্তির যুগে শুধু নিরামিষ সাক্ষরতার প্রয়োজন কম; পরন্ত সাক্ষরতার সঙ্গে-সঙ্গে ব্যবহার-কুশলতার প্রয়োজনই অধিক। মার্চ্চ, ১৯১৭—Atkinson's Committeeর বিবরণীতে এই কথার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে—"More practical training is wanted. A large number of openings exist for the employment of technically trained Indians; but the training, if it is to lead to employment, must include a large proportion of practical manual works."

এখন আমাদের দেশের শিক্ষা—বিশেষতঃ জনসাধারণের শিক্ষা—প্রয়োগাত্মক করিতে হইবে; যাহাতে এ-দেশের শ্রমজীবিগণ উত্তরোত্তর দক্ষতা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের দেশের শ্রমজীবিগণ যদি এরূপে উন্নতি করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে একটি বিশেষ সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে। আমাদের সমাজনীতির এই যে কলঙ্ক যে once a labourer, always a labourer—আজ যে মজুর সে চিরকাল তাহাই থাকিবে, অন্য কিছু হইতে পারিবে না,—সমাজের উচ্চস্তরে কোথাও তার স্থান নাই, এই কলঙ্ক চিরকালের জন্য ঘুচিতে পারে। হিন্দুসমাজ যদি মজুরকে আত্মোন্নতির সুযোগ ও অবসর দেয়, এবং তাহার যে আত্মোন্নতি করিয়া সমাজের উচ্চ, মুখ্য ও কুলীনগণের সঙ্গে একাসনে বসিবার অধিকার আছে,—ইহা স্বীকার করে, তবে দেশের ভবিষ্যৎ এত অন্ধকার থাকিবে না।

"বিবিধ প্রসঙ্গ" সম্পাদক

মান্দ্রাজের "হিন্দু" পত্রে শিক্ষার ব্যয় সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক বলেন, এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করা হয় না বলিয়া যাঁহারা অভিযোগ করেন, বিপক্ষের নিকট হইতে তাঁহারা বেশ একটু মিঠাকড়া আস্বাদ লাভ করেন। যাঁহারা বলেন যে, অন্যান্য কার্য্যে যাহা ব্যয় করা হয়, তাহা অপেক্ষা শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় করা উচিত,—কারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অধিক, তাঁহাদের কথা গ্রাহ্য হইলেও হইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে রাজস্ব-সচিব শ্রীযুক্ত মেয়ার সাহেব যে বার্ষিক খরচের খসড়া কাউন্সিলে পেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, সরকার বাহাদুর প্রায় ৫½ কোটী টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন। গবর্ণমেন্টের বার্ষিক আয় প্রায় ১½ অর্ব্বুদ। তাহার মধ্যে শিক্ষার জন্য ৫½ কোটী ব্যয় শতকরা ৪ টাকারও কম। প্রাশিয়ার গবর্ণমেন্ট আয়ের অষ্টমাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে। ক্ষুদ্র সার্ভিয়া রাজ্য $\frac{1}{১৯}$ ভাগ খরচ করে। একমাত্র লণ্ডন নগরে শিক্ষার জন্য ৭½ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মত বৃহৎ দেশে শিক্ষার জন্য যাহা ব্যয় করা হয়, তাহার দেড়গুণ শুধু লণ্ডন্ সহরের জন্য ব্যয় করা হয়। যুদ্ধের জন্য যে এবার খরচ কমান হইয়াছে, তাহা নহে; কারণ যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহাপেক্ষাও কম খরচ করা হইত। এ অবস্থায় ভারতবর্ষে শিক্ষা-প্রচারের গতি যদি গজেন্দ্রপদবিক্ষেপের মত ধীর হয়, সেটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নিশ্চয়ই নয়। শিক্ষাপ্রচারের অনুযোগগুলি যাঁহারা অন্যায় প্রতিপন্ন করিতে চায়, তাহাদের ন্যায়পরায়ণতাকে বলিহারি!

২। মর্য্যাদা, জুলাই ১৯১৭—"স্বরাজ সংখ্যা"

"এশিয়া কি জাগৃতি"—লেখক বিশ্ববন্ধু মিঃ এচ্, এম্, হাইণ্ডম্যান।

গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এশিয়া ও য়ুরোপের সম্বন্ধের এমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং এই পরিবর্ত্তন এত শীঘ্র হইয়াছে যে,—ইহার ফল এখন যাহা দাঁড়াইয়াছে ও ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম যে কি হইবে, তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এই যুদ্ধের ফলে পূর্ব্ব মহাদ্বীপের উপর য়ুরোপের শক্তি-সঙ্ঘের প্রভাব কমিবেই; ফলে এশিয়ার শক্তি প্রবলতর হইবে। এবং সার্ব্বজনীন রাজনীতিতে এশিয়ার যে অধিকার থাকা উচিত ছিল, তাহাও সে পাইবে।

মনে হয়, ধীরে-ধীরে এমন অবস্থা আমরা দেখিব, যে অবস্থায় প্রাচীন পর্য্যটকগণ এশিয়াকে দেখিয়াছিলেন। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ সিউয়ার্ড বলিয়াছিলেন যে, চীন এমন একটি রাষ্ট্র দাঁড় করাইবে, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাষ্ট্রগণের অদৃষ্ট লিপির নিয়ামক হইবে। সার হেনরী মেনও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

য়ুরোপ যে চীনকে আফিমখোর, নির্জ্জীব বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিল, চীনকে মুমূর্ষু মনে করিয়া য়ুরোপীয়গণ চীনের মৃতদেহ ভাগাভাগি করিবার আয়োজন করিতেছিল—সেই চীন একদিন জগতকে স্তম্ভিত করিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল এবং য়ুরোপের নীতি উপেক্ষা করিয়া এশিয়ার গুপ্ত শক্তির পরিচয় দিয়া তাহাদেরই নীতি-বাক্যের সার্থকতা দেখাইয়া দিল—"Wake not a sleeping wolf."

তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে বিরাট রুষ রাক্ষসকে বিপর্য্যস্ত করিয়া এশিয়ার আর একটি ক্ষুদ্র, ঘৃণ্য প্রাণী পুরুকথাই সপ্রমাণ করিয়াছিল। জাপান যদি আজ য়ুরোপকে বলে—"দেখুন মশায়, দুই-এক শতাব্দী ধরিয়া আপনার দেশে আমি উৎকৃষ্ট শিল্পের নমুনা, নানাপ্রকার রেশমি বস্ত্র, জড়োয়া রাজঅলঙ্কার ও fine artএর অন্যান্য নিদর্শন পাঠাইতেই থাকিলাম তবু আপনারা আমাদের জংলী ও অসভ্য বলিতেই থাকিলেন। কিন্তু যেই আমি দেখাইয়া দিলাম যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিষ্ঠুর নীতি অনুসরণ করিতে আপনাদের চেয়ে কম নই, অমনি আপনারা আমাকে সভ্যজগতের কাউন্সিলে সাদরে ডাকিয়া লইলেন।"—তাহা হইলে আমাদের আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই।

পূর্ব্বে যে চীন ও জাপানের অধিবাসীবৃন্দ আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও অন্যান্য সভ্যদেশে সভ্য জাতির মত আদর পায় নাই, আজ তাহারা নিজের যোগ্যতা দেখাইয়া সেই অধিকার লইতেছে। য়ুরোপকে আজ ইহারা ভদ্র-ব্যবহার করিতে বাধ্য করিয়াছে।

আধুনিক যুগের রাজ্য-পিপাসা ও বাণিজ্য-নীতির স্বরূপ দেখিলে ভবিষ্যতে জাপান ও আমেরিকার সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

৩। **জৈনহিতৈষী**—জুন ও জুলাই, ১৯১৭।

"বর্ণ অওর জাতিবিচার"—লেখক শ্রীপুষ্যসভানুজী বকীল।

হিন্দু ও জৈন উভয় সমাজেই জাতিভেদ আছে। শুধু আহার বিহারে নয়,—স্পর্শদোষে নয়,—বিবাহে ও ধর্ম্মকর্ম্মেও জাতিভেদের উৎকট বৈষম্য আমাদের দেশের একতা ও রাষ্ট্রজীবনের মূল নিয়ত টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ফেলিতেছে।

এই ব্রাহ্মণ-শাসিত দেশে জাতিভেদ যে ছিল না, মানুষ যে মানুষের অধিকার পাইত—তাহা ত সকলেই জানে। জ্ঞান যার আছে, আত্মা যার উন্নত, আচারে ও ব্যবহারে যে শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তব্যবুদ্ধি যার অধিক, সমাজের কল্যাণ যে করে, সেই ধার্ম্মিক ও নরসমাজে বরেণ্য। সে অবস্থায় ধর্ম্মের সঙ্গে বর্ণভেদের সম্বন্ধ থাকিতেই পারে না।

ব্রাহ্মণের সন্তানই হও, বা নমঃশূদ্রের সন্তানই হও—শরীরের গঠন ত একই,—একই পদার্থে, অণুপরমাণু, রক্তমাংস দুজনের শরীরেই সমান। তবে এর মধ্যে যার মস্তিষ্ক আছে, জ্ঞান বেশী, বিদ্যা বেশী, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা আছে, যে ন্যায়-অন্যায় বিচারপরায়ণ, সমাজসেবী—তাহাকেই সম্মান করিতে হইবে। যে দুরাচারী ও লম্পট, মিথ্যাবাদী ও মূর্খ, সে যাহার সন্তানই হউক—অস্পৃশ্য।

"শ্রদ্ধা উঠ্ গই"—লেখক ব্রহ্মচারী ভগবানদীনজী।

দেশে একটা রব উঠিয়াছে যে, নূতন শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত যাহারা—তাহাদের পুরাতন ধর্ম্মে আর শ্রদ্ধা নাই, উঠিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিতেছেন,—তোমরা ধর্ম্মকে ডুবাইতে বসিয়াছ—বিধবা বিবাহ দিবে, জাতি মানিবে না তোমরা দূর হও।

অর্থাৎ ব্যাপার এই যে, বিচার-স্বাধীনতা ও ক্রিয়া স্বাধীনতার নাম ইঁহারা "নাস্তিকতা" রাখিয়াছেন। ইঁহারা ভালমন্দ বিচার করিবেন, উন্নতির আশা করিবেন। কবে—সেই কোন কালে—সময় ও অবস্থার ঘটনাচক্রে যে সকল নিয়ম একদিন মানুষ গড়িয়াছিল, সেগুলি এখন দরকারী কি না,—সেগুলি এখন উপকারী কি না,—সেগুলি এখন স্থাবর কি না সেগুলি জাতি ও ব্যক্তির বিকাশে সহায়ক কি না,—কিছুই বিচার করিব না—চক্ষু মুদিত করিয়া ডাক্তারের তিক্ত ঔষধের মত গিলিয়া গেলেই হইল। কবে যে ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন মনে নাই, তখন যে আমার এই অসুখ ছিল না তার বিচার নাই; কিন্তু সেই পুরাতন নথির মধ্যে প্রাপ্ত, পুরাতন রোগের পুরাতন ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী পুরাতন ও পর্য্যুষিত ঔষধই ভক্ষণ কর,—জীবন মরণ;—সে ত ভগবানের হাতে।

ইঁহারা চোখ খুলিবেন না। সেগুলি না হইলেও চলে সেগুলি ছাঁটিবেন না। সেগুলি না হইলে নয়, অথচ আমাদের নাই, সেগুলি গ্রহণ করিবার, খুঁজিয়া লইবার প্রয়াস করিবেন না। ফল কথা, সংস্কারের ইচ্ছা নাই, শক্তি নাই।

গৃহ-দাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"এ কি, সুরেশ যে! এস, এস, বাড়ীর ভেতরে এস। ভাল ত!" মহিমের স্বাগত সম্ভাষণ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সুরেশ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হাতের গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগটা নামাইয়া রাখিয়া কহিল, "হাঁ, ভাল। কিন্তু, কি রকম, একা দাঁড়িয়ে যে? অচলা বধূ-ঠাকুরাণী এক মুহূর্ত্তে সচল হয়ে গেলেন কি রূপে? তাঁর প্রবল বিশ্রম্ভালাপ মোড়ের ওপর থেকে যে আমাকে এ বাড়ীর পাত্তা দিলে!" বস্তুতঃ, অচলার শেষ কথাটা রাগের মাথায় একটু জোরে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক দ্বারের বাহিরেই তাহা সুরেশের কাণে গিয়াছিল। সুরেশ কহিল, "দেখ্‌লে মহিম, বিদুষী স্ত্রী-লাভের সুবিধে কত? ক'দিনই বা এসেছেন, কিন্তু এর মধ্যেই পাড়াগাঁয়ের প্রেমালাপের ধরণটা পর্য্যন্ত এম্‌নি আয়ত্ত করে নিয়েছেন যে, খুঁত বের করে দেয় পাড়া-গেঁয়ে মেয়ের তা সাধ্য নয়।" মহিম লজ্জায় আকর্ণ রাঙা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেশ ঘরের দিকে চাহিয়া অচলাকে উদ্দেশ করিয়া পুনরায় কহিল, "অত্যন্ত অসময়ে এসে রস-ভঙ্গ করে দিলুম বৌ'ঠান, মাপ কোরো। মহিম, দাঁড়িয়ে রইলে যে? বস্‌বার ঘরটর কিছু থাকে ত নিয়ে চল, একটু বসি। হাঁটতে হাঁটতে ত পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে গেছে—ভালা য়ায়গায় বাড়ী করেছিলে ভাই,—চল, চল, কল্‌কাতায় চল।" "চল" বলিয়া মহিম তাহাকে বাহিরের বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইল। সুরেশ কহিল, "বৌ'ঠান কি আমার সাম্‌নে বের হবেন না না কি?" পরদা-নসিন?" মহিম জবাব দিবার পূর্ব্বেই পাশের দরজা ঠেলিয়া অচলা প্রবেশ করিল। তাহার মুখে কলহের চিহ্নমাত্র নাই, নমস্কার করিয়া প্রসন্ন মুখে কহিল, "এ যে আশাতীত সৌভাগ্য! কিন্তু এমন অকস্মাৎ যে?" তাহার প্রফুল্ল হাসি-মুখে সুখ-সৌভাগ্যের প্রসন্ন বিকাশ কল্পনা করিয়া সুরেশের বুকের ভিতরটা ঈর্ষায় যেন জ্বলিয়া উঠিল; হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া বলিল, "এখন দেখছি বটে এমন অকস্মাৎ এসে পড়া উচিত হয়নি। কিন্তু কাণ্ডটা কি হচ্ছিল? 'Their first difference, না আসা পর্য্যন্তই এই ভাবের মত-ভেদ চল্‌চে? কোন্‌টা?" অচলা তেম্‌নি হাসি মুখে কহিল, "কোন্‌টা শুন্‌লে আপনি বেশি খুসি হ'ন, বলুন? শেষেরটা ত? তা'হলে আমার তাই বলা উচিত,—অতিথিকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে নেই।" সুরেশের মুখ গম্ভীর হইল; কহিল, "কে বল্‌লে নেই? বাড়ীর গৃহিণীর সেই ত হ'ল আসল কাজ—সেই ত তার পাকা পরিচয়!" অচলা হাসিতে-হাসিতে কহিল, "গৃহই নেই, তার আবার গৃহিণী! এই দুঃখীদের কুঁড়ের মধ্যে কি কোরে যে আজ আপনার রাত্রি কাট্‌বে, সেই হয়েচে আমার ভাবনা। কিন্তু, ধন্য আপনাকে জেনে শুনে এ দুঃখ সইতে এসেছেন।" স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা, নয়নবাবুকে ধরে চন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আজ রাতটার মত ওঁর শোবার ব্যবস্থা করা যায় না? তাঁদের পাকা বাড়ী—বসবার ঘরটরও আছে, ওঁর কষ্ট হোতো না।" সৌজন্যের আবরণে উভয়ের শ্লেষের এই সকল প্রচ্ছন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে মহিম মনে-মনে অধীর হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কি করিয়া থামাইবে ভাবিয়া পাইতেছিল না, এম্‌নি অবস্থায় সুরেশ নিজেই তাহার প্রতিকার করিল; সহসা হাত জোড় করিয়া বলিল, "আমার ঘাট হয়েচে বৌ'ঠান, বরং একটু চা'টা দাও, খেয়ে গায়ে জোর করে নিয়ে তার পরে নয়নবাবুকে বল, শ্রবণবাবুকে বল চন্দ্রবাবুর পাকা ঘরে শোবার জন্যে সুপারিশ ধর্‌তে রাজী আছি। কিন্তু যাই বল মহিম, এর ওপর এত টান্ সত্যি হলে খুসি হবার কথা বটে।" মহিমের হইয়া অচলাই তাহার উত্তর দিল; সহাস্যে কহিল, "খুসি হওয়া, না-হওয়া মানুষের নিজের হাতে; কিন্তু, এ আমার শ্বশুরের ভিটে, এর ওপর টান্ না জন্মে বড়লাটের রাজপ্রাসাদের ওপর টান্ পড়লে সেইটেই ত হোতো মিথ্যে। যাক্, আগে গায়ে জোর হোক্, তার পরে কথা হবে। আমি চায়ের জল চড়াতে বলে এসেচি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে এনে হাজির করে দিচ্চি—ততক্ষণ মুখ বুজে একটু বিশ্রাম করুন"—বলিয়া অচলা হাসিয়া প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া যাইতেই সুরেশের বুকের জ্বালাটা যেন বাড়িয়া উঠিল। নিজেকে সে চিরদিনই দুর্ব্বল এবং অস্থির-মতি বলিয়াই জানিত, এবং এজন্য তাহার লজ্জা বা ক্ষোভও ছিল না। ছেলেবেলায় বন্ধু-বান্ধবেরা যখন মহিমের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহাকে খেয়ালী প্রভৃতি বলিয়া অনুযোগ করিত, তখন সে মনে-মনে খুসি হইয়া বলিত, সে ঠিক যে তাহার সঙ্কল্পের জোর নাই, সে প্রবৃত্তির বাধ্য; কিন্তু হৃদয় তাহার প্রশস্ত,—সে কখনও হীন বা ছোট কাজ করে না। সে নিজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করিতে জানে না, পাত্রাপাত্র হিসাব করিয়া দান করিতে পারে না - মন কাঁদিয়া উঠিলে গায়ের বস্ত্রখানা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া চলিয়া আসিতে তাহার বাধে না,—তা' সে যাহাকে এবং যে কারণেই হৌক; কিন্তু এ কথা কাহারও বলিবার জো নাই যে, সুরেশ কাহাকেও দ্বেষ করিয়াছে, কিম্বা স্বার্থের জন্য এমন কোন কাজ করিয়াছে, যাহা তাহার করা উচিত ছিল না। সুতরাং আজন্মকাল হৃদয়ের ব্যাপারে যাহার একান্ত দুর্ব্বল বলিয়াই অখ্যাতি ছিল, এবং নিজেও যাহা সে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিত, সেই সুরেশ যখন অকস্মাৎ অচলার সম্পর্কে শেষ মুহূর্ত্তে আপনার এত বড় কঠোর সংযমের পরিচয় পাইল, তখন নিজের মধ্যে এই অজ্ঞাত শক্তির দেখা পাইয়া কেবল আত্ম-প্রসাদই লাভ করিল না, তাহার সমস্ত হৃদয় গর্ব্বে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অচলার বিবাহের পরে দুটো দিন সে আপনাকে নিরন্তর এই কথাই বলিতে লাগিল—সে শক্তিহীন, অক্ষম নয়,—সে প্রবৃত্তির দাস নয়; বরঞ্চ, আবশ্যক হইলে সমস্ত প্রবৃত্তিটাকেই সে বুকের ভিতর হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। বন্ধুত্ব যে কি, তাহার সুখের জন্য একজন যে কতখানি ত্যাগ করিতে পারে, এইবার বন্ধু ও বন্ধু-পত্নী বুঝুন গিয়া। কিন্তু কোন মিথ্যা দিয়াই দীর্ঘকাল একটা ফাঁক ভরাইয়া রাখা যায় না; আত্ম-সংযম তাহার সত্য বস্তু নয়, ইহা আত্ম-প্রতারণা। সুতরাং একটা সম্পূর্ণ সপ্তাহ না কাটিতেই মিথ্যা এই সংযমের, মোহ তাহার বিস্ফারিত হৃদয় হইতে ধীরে-ধীরে নিষ্কাসিত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনিতে লাগিল; মন তাহার বারম্বার বলিতে লাগিল, এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা সে পাইল কি? ইহা তাহাকে কি দিল? কোন্ অবলম্বন লইয়া সে আপনাকে এখন খাড়া রাখিবে? পিসিমা বলিলেন, "বাবা, এইবার তুই এমনি একটি বউ ঘরে আন্, আমি নিয়ে সংসার করি।"

একদিন সমাজের দোর-গোড়ায় কেদারবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি স্পষ্টই বলিলেন, কাজটা তাহার ভাল হয় নাই। মহিমের সহিত বিবাহ দিতে ত গোড়াগুড়িই তাঁহার ইচ্ছা ছিল না—শুধু সে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল বলিয়াই তিনি অবশেষে মত দিলেন। ঘরে আসিয়া তাহার মনের মধ্যে অভিশাপের মত জাগিতে লাগিল, এই বিবাহ দ্বারা তাহাদের কেহই যেন সুখী না হয়। নিজের অবস্থাকে অতিক্রম করার অপরাধ বন্ধুও অনুভব করুন, অচলাও যেন নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া মরে। কিন্তু তাই বলিয়া মন তাহার ছোট নয়। এই অকল্যাণ-কামনার জন্য নিজেকে সে অনেক রকম করিয়া শাসিত করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার পীড়িত, প্রতারিত হৃদয় কিছুতেই বশ মানিল না,—নিতান্ত একগুঁয়ে ছেলের মত নিরন্তর ঐ কথাই আবৃত্তি করিতে লাগিল। এমনি করিয়া মাসখানেক সে কোন মতে কাটাইয়া দিয়া, একদিন কৌতূহল আর দমন করিতে না পারিয়া, অবশেষে ব্যাগ হাতে মহিমের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "এখন দেখতে পাচ্চো মহিম, আমার কথাটা কতখানি সত্যি?" মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কথাটা?" সুরেশ বিজ্ঞের মত বলিল, "আমার পল্লীগ্রামে বাস নয় বটে, কিন্তু, এর সমস্তই আমি জানি। আমি তখনি কি সাবধান করে দিইনি যে, গ্রামের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে একটা ঘোরতর বিরোধ বাধবে?" মহিম সহজ ভাবে কহিল, "কৈ, তেমন বিরোধ ত কিছু হয়নি।" সুরেশ—"বিরোধ আর বল কাকে? তোমার বাড়ীতে কেউ খেলে কি? সেইটেই কি যথেষ্ট অশান্তি, অপমান নয়?" মহিম—"আমি খেতে কাউকে বলিনি।" সুরেশ—"বলনি? আচ্ছা, কৈ বউ-ভাতে আমাকে ত নেমতন্ন করনি মহিম?" মহিম—"ওটা হয়নি বলেই করিনি।" সুরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "বউ-ভাত হয় নি? ওঃ—তোমাদের যে আবার—কিন্তু এমন কোরে ক'টা উপদ্রব এড়ানো যাবে মহিম? আপদ-বিপদ আছে, ছেলে-মেয়ের কাজ-কর্ম্ম আছে,—

সংসার করতে গেলে নেই কি? আমি বলি—" যদুর হাতে চায়ের সরঞ্জাম এবং নিজে থালায় করিয়া মিষ্টান্ন লইয়া অচলা প্রবেশ করিল। সুরেশের শেষ কথাটা তাহার কাণে গিয়াছিল; কিন্তু তাহার মুখের ভাবে সুরেশ তাহা ধরিতে পারিল না। দুই বন্ধুর জলযোগ এবং চা-পান শেষ হইলে, মহিম কাঁধের উপর চাদরটা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ গ্রামের জমিদার মুসলমান, তাঁহার ছেলেটিকে মহিম ইংরাজি পড়াইত। জমিদার সাহেব নিজে লেখা-পড়া না জানিলেও তাঁহার মতের ঔদার্য্য ছিল, এবং মহিমের সহিত সদ্ভাবও যথেষ্ট ছিল। এই জন্যই গ্রামের লোক সমাজের দোহাই দিয়া আজও তাহার উপর উপদ্রব করিতে সাহস করে নাই। অচলা কহিল, "আজ পড়াতে না গেলেই কি হোতো না?" মহিম কহিল, "কেন?" অচলার মনের জোর ও অন্তরের নির্ম্মলতা যত বড়ই হৌক, সুরেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটা যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে তাহার আকস্মিক অভ্যাগমে কোন রমণীই সঙ্কোচ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না। সুরেশকে সে ভাল করিয়াই চিনিত; তাহার হৃদয় যত মহৎই হোক্, সেই মহত্বের ঝোঁকের উপর তাহার কোন আস্থা ছিল না,—এমন কি, ভয়ই করিত। এই সন্ধ্যায় তাহারই সহিত তাহাকে একাকী ফেলিয়া যাইবার প্রস্তাবে সে মনে-মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; কিন্তু বাহিরে তাহার লেশমাত্রও প্রকাশ না করিয়া হাসিয়া কহিল, "বাঃ, সে কি হয়? অতিথি কি একলা ফেলে—" মহিম কহিল, "তা'তে অতিথি-সৎকারের কোন ত্রুটি হবে না। তা' ছাড়া, তুমি ত রইলে—" অচলা ইতস্তত: করিয়া বলিল, "কিন্তু, আমি ত থাক্‌তে পারব না।" সুরেশের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আমাদের উড়ে বামুনটি এম্‌নি পাকা রাঁধুনি যে, তার সঙ্গে না থাক্‌লে কিছুই মুখে দেবার যো থাক্‌বে না। আমি বলি তুমি বরঞ্চ—" মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, তা' হয় না। ঘণ্টা দুই বই ত নয়—" বলিয়া ঘরের কোণ হইতে সে লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইল। একে ত মহিমের কাজের ধারা সহজে বিপর্য্যস্ত হয় না; তাহাতে এই একটা সামান্য কারণ লইয়া বারম্বার নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেও অচলার লজ্জা করিতে লাগিল, পাছে ভয়টা তাহার সুরেশের চোখে ধরা পড়িয়া লজ্জাটা শতগুণ হইয়া উঠে।

মহিম ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাহাকে শুনাইয়া সুরেশ অচলাকে হাসিয়া কহিল, "কেন নিজের মুখ হেঁট করা! চিরকাল জানি, ও সে পাত্রই নয় যে কারও কথা রাখবে। তুমি বরং যা'হোক এক-খানা বই আমাকে দিয়ে নিজের কাজে যাও,—আমার দিব্যি সময় কেটে যাবে।" কথাটা হঠাৎ অচলাকে বাজিল যে, বাস্তবিকই মহিম কোন দিন কোন অনুরোধই তাহার রক্ষা করে না। হউক না ইহা তাহার সুমহৎ গুণ; কিন্তু তবুও সুরেশের মুখ হইতে স্বামীর এই আজন্ম কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় তাহারই সম্মুখে আজ তাহাকে অপমানকর উপেক্ষার আকারে বিঁধিল। কোন কথা না কহিয়া, সে নিজের ঘরে গিয়া, যদুকে দিয়া একখানা বাঙ্‌লা বই পাঠাইয়া দিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশ কত দিন এখানে থাক্‌বে তোমাকে বল্‌লে?" এম্‌নি ত নানা কারণে আজ সারাদিনই স্বামীর উপর তাহার মন প্রসন্ন ছিল না; তাহাতে এই প্রশ্নের মধ্যে একটা কুৎসিত বিদ্রূপ নিহিত আছে কল্পনা করিয়া, সে চক্ষের নিমিষে জ্বলিয়া উঠিল; কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তার মানে?" মহিম অবাক হইয়া গেল। সে সোজা ভাবেই কথাটা জানিতে চাহিয়াছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছুই করে নাই। তাহাদের এতক্ষণের আলাপের মধ্যে এ প্রশ্নটা সে বন্ধুকে সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, এবং সুরেশও নিজে হইতে তাহা বলে নাই। কিন্তু তাহার আশা ছিল, সুরেশ নিশ্চয়ই অচলাকে তাহা বলিয়াছে। মহিমকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অচলা নিজেই বলিল, "এ কথার মানে এত সোজা যে, তোমাকে জিজ্ঞেসা করবারও দরকার নেই। তোমার বিশ্বাস যে, সুরেশবাবু কোন সঙ্কল্প নিয়েই এখানে এসেছেন, এবং তা' সফল হতে কত দেরি হবে সে আমি জানি। এই ত?" মহিম আরও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "আমার কোন বিশ্বাসই নেই। কিন্তু মৃণালের ব্যবহারে আজ তোমার মন ভাল নেই, তুমি কিছুই ধীর ভাবে বুঝ্‌তে পার্‌বে না। আজ শোও, কাল সে কথা হবে।" বলিয়া নিজেই বিছানায় শুইয়া পড়িয়া পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিল। অচলাও

শুইয়া পড়িল বটে, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। তাহার মনের মধ্যে সারাদিন যে বিরক্তি উত্তরোত্তর জমা হইয়া উঠিতেছিল, সামান্য একটা কলহের আকারে তাহা বাহির হইয়া যাইতে পারিলে হয় ত সে সুস্থ হইতে পারিত; কিন্তু, এমন করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় সে নিজের মধ্যেই শুধু পুড়িতে লাগিল। অথচ, যে প্রসঙ্গ বন্ধ হইয়া গেল, তাহাকে অশিক্ষিত সাধারণ স্ত্রীলোকের মত গায়ে পড়িয়া আন্দোলন করায় যে লজ্জা এবং ইতরতা আছে, তাহাও তাহার দ্বারা একান্ত অসম্ভব। সে শুধু কল্পনায় স্বামীকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাইয়া, জ্বালাময়ী প্রশ্নোত্তর-মালায় নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

একটু বেলায় ঘুম ভাঙিয়া অচলা ধড়মড় করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, যদু কেৎলি হাতে করিয়া রান্না-ঘরে চলিয়াছে। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কিছু বলে গেছেন যদু?" যদু কহিল, "এক পহর বেলার মধ্যেই ফিরে আস্‌বেন বলে গেছেন।" মহিম প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া নিজের ক্ষেত-খামার দেখিতে যাইত; ফিরিয়া আসিতে কোন দিন বা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত। অচলা প্রশ্ন করিল, "নতুন বাবু উঠেছেন?" যদু কহিল, "উঠেছেন বৈ কি। তিনিই ত চা তৈরি কর্‌তে বলে দিলেন।" অচলা তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, সুরেশ বহুক্ষণ পুর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়া ঘরের সমস্ত জানালা খুলিয়া দিয়া, খোলা দরজার সুমুখে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া কাল্‌কের সেই বইখানা পড়িতেছে। অচলার পদশব্দে সুরেশ বই হইতে মুখ তুলিয়া চাহিল। অচলার মুখের উপর রাত্রি-জাগরণের সমস্ত চিহ্ন দেদীপ্যমান। চোখের নীচে কালী পড়িয়াছে, গণ্ড পাংশু, ওষ্ঠ মলিন—সে যত দেখিতে লাগিল, ততই তাহার দুই চক্ষু ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই দৃষ্টি সে আর ফিরাইতে পারিল না। তাহার চাহনির ভঙ্গীতে অচলা বিস্মিত হইল, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিল না; কহিল, "কখন্ উঠ্‌লেন? আমার উঠ্‌তে আজ একটু দেরি হয়ে গেল।" "তাই ত দেখ্‌ছি" বলিয়া সুরেশ ধীরে-ধীরে মাথা নাড়িল। সুমুখের দেয়ালের গায়ে বহুদিনের পুরাতন একটা বড় আর্‌সি টাঙান ছিল; ঠিক সেই সময়েই অচলার দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ায়, সুরেশের চাহনির অর্থ এক মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; এবং নিজের শ্রীহীনতায় লজ্জায় যেন সে একেবারে মরিয়া গেল। এই মুখখানা কেমন করিয়া লুকাইবে, কোথায় লুকাইবে, সুরেশের মিথ্যা ধারণার কি করিয়া প্রতিবাদ করিবে,—কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল; বলিতে-বলিতে গেল,—"যাই, আপনার চা নিয়ে আসি গে।" সুরেশ কোন কথা বলিল না; শুধু একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শূন্য দৃষ্টিতে শূন্যের পানে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মিনিট দশেক পরে চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া অচলা পুনরায় যখন প্রবেশ করিল, তখন সুরেশ আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়াছিল। চা খাইতে-খাইতে সুরেশ কহিল, "কৈ, তুমি চা খেলে না?" অচলা হাসিয়া কহিল, "আমি আর খাইনে।" "কেন খাও না?" "আর ভাল লাগে না। তা ছাড়া, এ যায়গাটা গরম না কি, খেলে ঘুম হয় না। কাল ত প্রায় সারারাত ঘুমোতে পারিনি।" হাসিয়া বলিল, "একটা রাত ঘুম না হলে চোখ-মুখের কি যে শ্রী হয়—পোড়া মুখ যেন আর লোকের সাম্‌নে বার করা যায় না।" বলিয়া লজ্জিত মুখে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। সুরেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু, এ তোমার ছেলে-বেলার অভ্যাস, চা খেতে মহিম অনুরোধ করে না?" অচলা হাসিয়া বলিল, "অনুরোধ করলেই বা শুন্‌বে কে? তা' ছাড়া এ আর এমন কি জিনিস যে না খেলেই নয়?" এ হাসি যে শুষ্ক হাসি, সুরেশ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, "তুমি ত জানই, ভূমিকা করে কথা বলা আমার অভ্যাসও নয়, পারিও নে। কিন্তু, স্পষ্ট করে দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে কি তুমি রাগ করবে?" অচলা হাসি-মুখে কহিল, "শোন কথা। রাগ কোরব কেন?" সুরেশ কহিল, "বেশ। তা'হলে জিজ্ঞাসা করি, তুমি এখানে সুখে আছ কি?" অচলার হাসি-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; বলিল, "এ প্রশ্ন আপনার করাই উচিত নয়।" "কেন নয়?" অচলা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না। আমি সুখে নেই—এ কথা আপনার মনে হওয়াই অন্যায়।" সুরেশ একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "মনটা কি ন্যায়-অন্যায় ভেবে নিয়ে তবে মনে করে অচলা?

কেবল মাস-দুই পূর্ব্বে এ ভাবনা শুধু যে আমার উচিত ছিল তাই নয়, এ ভাবনায় অধিকার ছিল। আজ দু-মাস পরে সব অধিকার যদি ঘুচে থাকে ত থাক্, সে নালিশ করিনে, এখন শুধু সত্যি কথাটা জেনে যেতে চাই। এসে পর্য্যন্ত একবার মনে হচ্চে জিতেচ, একবার মনে হচ্চে হেরেচ। আমার মনটা ত তোমার অজানা নেই,—একবার সত্যি করে বল ত অচলা, কি?" দুর্নিবার অশ্রুর ঢেউ অচলার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল; কিন্তু প্রাণপণে তাহাদের শক্তি প্রতিহত করিয়া অচলা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি বেশ আছি।" সুরেশ ধীরে-ধীরে কহিল, "ভালই।" ইহার পরে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই যেন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুরেশ অকস্মাৎ যেন চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আর একটা কথা। তোমার জন্যে যে আমি কত সয়েছি সে কি তোমার কখনো—" অচলা দুই কাণে আঙুল দিয়া বলিয়া উঠিল, "এ সমস্ত আলোচনা আপনি মাপ করবেন।" সুরেশ খোলা দরজায় দুই হাত প্রসারিত করিয়া অচলার পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া বলিল, "না, মাপ আমি করতেই পারিনে, তোমাকে শুনতেই হবে। সুরেশের চোখে সেই দৃষ্টি—যাহা মনে পড়িলে আজও সে শিহরিয়া উঠে। একটুখানি পিছাইয়া গিয়া সভয়ে কহিল, "আচ্ছা, বলুন—" সুরেশ কহিল, "ভয় নেই, তোমার গায়ে আমি হাত দেব না—আমার এখনো সে জ্ঞান আছে।" বলিয়া পুনরায় চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "এই কথাটা তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে, আমি তোমার ওপর সমস্ত অধিকার হারালেও, আমার ওপর তোমার সেই অধিকারই বর্ত্তমান আছে—" অচলা বাধা দিয়া কহিল, "এ মনে রাখায় আমার লাভ?" কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কথাটা যেন সজোরে আঘাত করিয়া সুরেশকে পলকের জন্য বিবর্ণ করিয়া ফেলিল, এবং সেই মুহূর্ত্তেই নিজেও স্পষ্ট অনুভব করিল, অনুতাপের কশা তাহার নিজের পিঠের উপরেও সজোরে আসিয়া পড়িল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া এবার কোমল কণ্ঠে বলিল, "সুরেশ-বাবু, এ সব কথা আমারও শোনা পাপ, আপনারও বলা উচিত নয়। কেন আপনি এ-সব কথা তুলে আমাকে দুঃখ দিচ্চেন?" সুরেশ তাহার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "দুঃখ কি পাও অচলা?" অচলার মুখ দিয়া অকস্মাৎ বাহির হইয়া গেল, "আমি কি পাষাণ, সুরেশবাবু?" সুরেশ তাহার সেই দৃষ্টি অচলার মুখের উপর হইতে নামাইল না বটে, কিন্তু অচলার দুই চক্ষু নত হইয়া পড়িল। সুরেশ ধীরে-ধীরে বলিল, "বাস্, এই আমার চিরজীবনের সম্বল রইল অচলা, এর বেশি আর চাইনে। বলিয়া এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিল, "তুমি যখন পাষাণ নও, তখন, এই শেষ ভিক্ষে থেকে আর আমাকে কিছুতে বঞ্চিত করতে পারবে না। তোমার সুখের ভার যার ওপর ইচ্ছে থাকুক, কিন্তু তোমার হাত থেকে দুঃখই যখন শুধু পেয়ে এসেচি, তখন তোমারও সমস্ত দুঃখের বোঝা আজ থেকে আমার থাক্—এই বর আজ আমাকে তুমি ভিক্ষে দাও।" বলিতে বলিতেই অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। অচলার চোখ দিয়াও তাহার বিগত দিবারাত্রির সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এইবার গলিয়া ঝরঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। এম্নি সময় ঠিক দ্বারের বাহিরে জুতার শব্দ শোনা গেল; এবং পরক্ষণেই মহিম ঘরে ঢুকিতে-ঢুকিতে কহিল, "কিহে সুরেশ, চা-টা পেলে?" সুরেশ সহসা জবাব দিতে পারিল না। সে কোনমতে মুখ নীচু করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া ফেলিল, এবং অচলা আঁচলে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতবেগে মহিমের পাশ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মহিম চৌকাটের ভিতরে এক পা এবং বাহিরে এক পা দিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পুস্তক-পরিচয়

খাদ্য

রায় বাহাদুর শ্রীচুণীলাল বসু প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।

এই উৎকৃষ্ট পুস্তকখানির তৃতীয় সংস্করণ হইয়াছে মাত্র। ১৯১০ অব্দে প্রথম সংস্করণ, আর এই ১৯১৭ অব্দে তৃতীয় সংস্করণ। বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইলে এই সাত বৎসরে ইহার ত্রিশটী সংস্করণ হইত। এমন বই এখনও যে আমাদের দেশের প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে দিন-পঞ্জিকার মত থাকে নাই কেন, তাহাই আশ্চর্য্যের কথা। ইহাতে যে কথা আছে, সুস্থভাবে জীবন-ধারণ করিতে হইলে সে সব কথা জানা উচিত, মানা উচিত। স্বাস্থ্য-রক্ষার বিধি পালন না করাতে যে অনেক লোক রোগে কষ্ট পাইয়া থাকে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা বাঙ্গালীমাত্রকেই এই বইখানি কিনিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করি। বইখানি কিনিয়াই আগাগোড়া পড়িতে বলি, এবং তদনুসারে কাজ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করি। শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়ের বহুদর্শনের ও অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দেদীপ্যমান।

ব্রহ্মচর্য্য-সাধন

শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ ও শ্রীহেমচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস প্রণীত; মূল্য এক টাকা মাত্র।

পুস্তকের নাম শুনিয়াই কেহ বিচলিত হইবেন না; ইহা শাস্ত্র গ্রন্থ নহে—ইহা জীবন-রক্ষার জন্য কর্ত্তব্য-বিষয়ে অভিজ্ঞের উপদেশ। এই গ্রন্থে পাঁচটী পরিচ্ছেদ আছে—(১) সংজ্ঞা, (২) সাধনা, (৩) বিজ্ঞের বাণী, (৪) অনুশাসন, (৫) বৈরাগ্য। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবককে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে বলি। ইহাতে শরীর-রক্ষার কথা আছে; আরও যে-সে কথা আছে, তাহা যুবকগণ বইখানি পড়িলেই জানিতে পারিবেন। যে দুইজন বহুদর্শী চিকিৎসক এই বইখানি লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা প্রাণের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের যুবকগণের হস্তে এই বই দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। এই পুস্তক প্রণয়নে শ্রদ্ধেয় চিকিৎসকদ্বয় যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, যে অনুসন্ধিৎসা ও যে প্রকার যোগ্যতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়।

জাতক

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত, মূল্য তিন টাকা।

এই 'জাতক' বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য রত্ন, পরম সম্পদ। বৌদ্ধ 'জাতকে'র অনুবাদ এতদিন কেহই করেন নাই। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় মধ্যে মধ্যে মাসিকপত্রাদিতে দুই চারিটি জাতকের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তখন অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই যে, এই কার্য্যে শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয় কি পরিশ্রম করিয়াছেন। এখন তাঁহার এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় বেশ বুঝিতে পারা গেল যে, তিনি শুধু অনুবাদই করেন নাই; এই জাতক সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন,—এই পুস্তকের উপক্রমণিকা ও পরিশিষ্ট তাঁহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। শ্রীযুক্ত ঈশানবাবু আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, 'এই বৃহৎ গ্রন্থ ছয়খণ্ডে সমাপ্ত হইবার কথা; তবে ততদিন আমার অর্থে, সামর্থ্যে ও জীবনে কুলাইবে কি না সন্দেহ।" আমরা প্রার্থনা করি, ভগবান এই কার্য্য শেষ করাইবার জন্য তাঁহাকে অর্থ, সামর্থ্য ও দীর্ঘ জীবন দান করিবেন; এবং বাঙ্গালী জাতি তাঁহার এই গ্রন্থ পরম সমাদরে গ্রহণ করিবে।

স্বাস্থ্য ও শক্তি

শ্রীপ্রাণচন্দ্র রায় এম এ, বি এল্ প্রণীত; মূল্য এক টাকা।

'স্বাস্থ্য ও শক্তি' একখানি উপাদেয় ও উপকারী গ্রন্থ; নামেই গ্রন্থের পরিচয়। বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, স্বাস্থ্য না থাকিলে সবই বৃথা। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় এ কথা বেশ বুঝিয়াছেন; তাই তিনি এই বইখানি এমন যত্ন করিয়া লিখিয়াছেন, এবং এত অর্থব্যয় করিয়া ছাপাইয়াছেন। ইহাতে শরীররক্ষার প্রয়োজনীয়তা, শরীর-গঠন, আহার, পরিচ্ছদ, নিদ্রা ও ব্যায়াম সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা আছে; অবশেষে কতিপয় বলবান ব্যক্তির বিবরণ ও প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের দেশের বিদ্যার্থী যুবকগণ ক্রমেই যে প্রকার হীন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের শিক্ষার জন্য এই প্রকার পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা অভিভাবক মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের পুস্তকখানি যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে নিম্ন-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও উহা বেশ বুঝিতে পারিবেন। এ জন্য পুস্তকখানি আমাদের বঙ্গবিদ্যালয়-সমূহের পাঠ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

মন্দাকিনী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত; মূল্য ছয় আনা।

'মন্দাকিনী' কয়েকটী কবিতার সংগ্রহ-পুস্তক। রচয়িতা বলিতেছেন, এগুলির পনর আনা তাঁহার কিশোর বয়সের রচনা। কিশোর বয়সের রচনা হইলেও কবিতাগুলিতে কবিত্ব আছে, ভাবের খেলা আছে, শব্দের ঝঙ্কার আছে। এতদ্ব্যতীত আর একটী গুণ এই কবিতা-

গুলির আছে;—আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সবগুলি কবিতা বুঝিতে পারিয়াছি। কবির কিশোর জীবনের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই।

বিল্বদল

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার উনবিংশ গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর আর একখানি গ্রন্থ—'দূর্ব্বাদল' এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথমে 'দূর্ব্বাদল', তাহার পর 'বিল্বদল'—ঠিকই হইয়াছে। ইহাতে বিন্দু, লক্ষীর মোহর, আরতি, দীনু ও জীবনারতি, এই পাঁচটী ছোট গল্প আছে। এই পাঁচটী গল্পের মধ্যে প্রথম গল্প 'বিন্দু' আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর লাগিল; তাহার পরই 'দীনু'। যতীন্দ্র বাবুর 'দূর্ব্বাদল' যেমন পাঠকগণের পূজায় লাগিয়াছে, 'বিল্বদল'ও তাহাতে বঞ্চিত হইবে না, এ কথা আমরা বলিতে পারি।

কাশীনাথ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা।

এখানি উপন্যাস নহে, কয়েকটী গল্পের সংগ্রহ; 'কাশীনাথ' নামক গল্পটীকে লেখক প্রথমে স্থান দান করিয়া বইখানির নাম দিয়াছেন 'কাশীনাথ'। লেখক মহাশয় যদি আমাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার 'মন্দির' গল্পটীকে প্রথমে দিয়া বইখানির নাম দিতাম 'মন্দির'। এই 'মন্দির' গল্পের একটু ছোট ইতিহাস আছে; তাহা ব্যক্তিগত হইলেও এই স্থলে উল্লেখ করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। বহুদিন পূর্ব্বে একবার আমরা 'কুন্তলীন পুরস্কারের' পুরস্কার যোগ্য গল্প নির্ব্বাচন করিয়া দিবার ভার পাইয়াছিলাম। ১২৮টী ছোট গল্প আমাদের হস্তগত হয়; সেই বিপুল গল্প-সমুদ্র মন্থন করিয়া আমরা এই 'মন্দির' গল্পটীকে প্রথম স্থান দিয়াছিলাম। পরে শুনিয়াছি, এই 'মন্দির' গল্পটীতেই শরৎচন্দ্রের হাতে-খড়ি; সেই শরৎচন্দ্র এখন, বাঙ্গালার উপন্যাস-লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের সহিত এক আসনে উপবিষ্ট। আমাদের মনে হয়, কেবল ঐ মন্দির গল্পটী পড়িবার জন্যই দেড় টাকা খরচ করিয়া একখানি 'কাশীনাথ' কিনিতে পারা যায়, অন্য গল্পগুলি ফাউ।

নৃপেন্দ্র-স্মৃতি

শ্রীদীনদয়াল চৌধুরী প্রণীত; মূল্য রাজ-সংস্করণ ১॥০ টাকা, সাধারণ সংস্করণ বার আনা।

এখানি কুচবিহারাধিপতি স্বর্গীয় মহারাজা কর্ণেল স্যর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের বাল্য জীবনের একখানি চিত্র। লেখক বলিয়াছেন 'ক্ষুদ্র-চিত্র', আমরা কিন্তু দেখিতেছি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র, মনোহর চিত্র। আমরা দেখিতে পাই যে, অনেকেরই বাল্য জীবনের কথা বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না, কারণ কেহই শ্রীযুক্ত দীনদয়াল চৌধুরী মহাশয়ের ন্যায় এমন করিয়া বাল্য-বন্ধু ও সঙ্গীর সামান্য পত্রখানিও এমন সযত্নে রাখিয়া দেন না। স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুর নানা বিষয়ে সৌভাগ্যবান নরপতি; কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, তিনি দীনদয়াল বাবুর ন্যায় বন্ধু ও সখা পাইয়া যে সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, কুচবিহারের সিংহাসনও তাহার নিকট তুচ্ছ। বড় অদৃষ্ট করিয়া আসিলে এমন বন্ধু, এমন অকৃত্রিম সখা মিলে, আর অতি বড় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরই এমন বাল্যস্মৃতি-লেখক মিলে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুস্তকখানি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও অন্য হিসাবে খুব বড়।

ছেলেদের বত্রিশ সিংহাসন

শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।

আমরা ছেলেবেলায় কত আগ্রহের সহিত 'বত্রিশ সিংহাসন' পড়িতাম, তাহা বেশ মনে আছে; তাহার পর কেমন করিয়া যেন সে বত্রিশ সিংহাসন অদৃশ্য হইয়া গেল; আমাদের পরবর্ত্তী ছাত্রগণ আর সে পুস্তকের খবর রাখিলেন না। এত দিন পরে শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন বাবু সেই সিংহাসন আমাদের ছেলেদের সম্মুখে হাজির করিলেন; শুধু হাজির করা নহে, একেবারে নূতন সাজে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। আমরা—ছেলেদের অভিভাবকগণ, এ সিংহাসনের সম্মুখে অবনত-মস্তক হইতেছি; এবং আমাদের বিশ্বাস, এমন সুন্দর করিয়া লেখা বইখানি ছেলেরাও পরম আদরে গ্রহণ করিবে।

নবি-কাহিনী

কাজি ইম্‌দাদুল-হক্ প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

এই সুন্দর পুস্তকখানিতে দশজন নবির পবিত্র জীবন-কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কাজি সাহেব বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত হজরতগণের জীবন-কথা অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণ যে বাঙ্গালা ভাষায় এই সকল পবিত্র জীবন-কথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা অতি শুভ লক্ষণ বলিয়া আমরা মনে করি; তাই আমরা কাজি ইম্‌দাদুল-হক্ মহাশয়ের এই পুস্তকখানিকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছি। তিনি এই জীবন-কাহিনীগুলি লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠকগণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কর্ম্মের পথে

শ্রীহরিদাস হালদার প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা।

এখানি সামাজিক ও রাজনৈতিক উপন্যাস। 'স্বদেশী' উপলক্ষে যে

সমস্ত ব্যাপারের অভিনয় এই বাঙ্গালা দেশে হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছে। গোয়েন্দার কাহিনী, ছদ্মবেশী স্বদেশী নেতা, কর্ম্মী যুবক, আর অকর্ম্মা লোকের সুন্দর চিত্র এই পুস্তকখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার আর একদিকে লেখক মহাশয় হেমাঙ্গিনীকে কত বিপদ, কত প্রলোভনের মধ্য দিয়া অক্ষত শরীরে লইয়া গিয়াছেন। উপন্যাসখানি এমন সুকৌশলে লিখিত যে, ইহার মধ্যে ধরিবার-ছুঁইবার কিছু নাই, অথচ সেই ঘোর স্বদেশী আন্দোলন, সেই রাজনৈতিক খুন, সেই বোমা-ফাটার মধ্য দিয়াই গল্পটা অগ্রসর হইয়াছে। 'গোবর-গণেশের' লেখকের নিকট হইতে এই রকম মুন্সীয়ানাই আমরা আশা করি।

দিদির বর

[শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু]

আমাদের নিতাইবাবু লোকটী অতি শান্ত, অতি নিরীহ প্রকৃতির, আর তেমনি অমায়িক। পাছে ভদ্রতা-রক্ষার কোন ক্রটী ঘটে, কেহ মনঃক্ষুন্ন হয়, ভদ্রলোক সেজন্য সর্ব্বদাই শশব্যস্ত। একটী ছেলে, একটি মেয়ে। মেয়েটিই প্রথম সন্তান এবং বড়ও হইয়াছে। অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়; তবে, আজকাল্‌কার বরের বাপের খাঁই মিটাইতে পারেন, কেমন সঙ্গতি তাঁহার ছিল না। ঘটক ঘটকী নিত্য আনাগোনা করিতেছে, গত কয়েকমাস হইতে 'প্রজাপতি' কাগজেরও গ্রাহক হইয়াছেন; তথাচ কন্যার পাত্র জুটিতেছে না। মেয়েটি শ্যামা, কিন্তু অতি শ্রী-মতী,—দেখিলে, চক্ষু স্নিগ্ধ হয়; আর ইদানীং পিতামাতার দর্শনেন্দ্রিয় চারিটী উদ্বেগাকুল হইয়া উঠে। সম্প্রতি কোথা হইতে সম্বন্ধ আসিয়াছে। পাত্রপক্ষ শুনিয়াছেন, মেয়েটি কাল; তাই, বলিয়া পাঠাইয়াছেন, বরের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু একদিন এক সময় হঠাৎ আসিয়া নিরাভরণা কন্যাকে দেখিয়া যাইবেন,—পাত্রীপক্ষ তাহাতে যদি সম্মত থাকেন, দেনা-পাওনার কথা পরে স্থির হইবে। কথাটা শুনিয়া শীতল-স্বভাব নিতাইচরণও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু পাছে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে ভদ্রলোকদের অসম্মান করা হয়,—মাটীর মানুষ তৎক্ষণাৎ জল হইয়া গেলেন এবং সাগ্রহে সম্মতিদান করিলেন। লোকে বলে, নামের সহিত নামীর আকৃতির বা প্রকৃতির সম্বন্ধ বড়-একটা দেখা যায় না। অনেক গৌরবাবুকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়াছি। 'মধুবাবু'র বিষময় বাক্যবাণে ইচ্ছা হইয়াছে—আত্মহত্যা করি। দারুণ খুঁৎখুঁতে লোক 'সন্তোষকুমার' বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকে। আর কত শান্তমণির কলহের জ্বালায় শ্বশুর-শাশুড়ীকে দেশান্তরী হইতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের নিতাই কলসীকানা মারিলেও প্রেমদান করেন।

সম্মতি প্রদান করিয়া নিতাই-দাদা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একে ভদ্রলোক, তায় আবার পাত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু; তার উপর—কবে, কখন আসিবেন, তাহার ঠিক নাই। আজ নিতাই দাদার চায়ের আসরে এই সকল কথাই হইতেছিল। নিত্য প্রাতে, অর্থাৎ বেলা ৮৷৹টার পর নিতাই চরণের বাটীতে আমাদের চা পার্টি বসিত। 'পার্টি' কথাটা এ-স্থলে গৌরবে বহুবচন। চা পান করিতাম কেবল আমি। নিতাই কাছে বসিয়া ভদ্রতার খাতিরে মাঝে-মাঝে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন, আর তাঁহার কন্যা চা ঢালিয়া দিতেন। পাত্রীর সমক্ষে পাত্রপক্ষের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের উভয়ের মধ্যে একপ্রকার ঠারেঠোরে চলিতেছিল। নিতাই-দাদা বলিলেন,—"তাই ত! এখন কি করা যায় বলুন দিকি?" এক ঢোঁক চা গিলিয়া আমি বলিলাম,—"তাই ত! যদি হঠাৎ এসে পড়ে! আমার বোধ হয় অন্তরঙ্গ নয়, স্বয়ং।" কমলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে, বাবা?" নিতাই-দাদা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"কেউ না।" কমলা ঈষৎ হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে, কাকা?" আমিও আর এক ঢোঁক চা গিলিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম,—"তা ত জানিনি!" মেয়েটি বড় সুবোধ। বুঝিল, তাহার কাছে কোন কথা আমরা লুকাইতেছি। সে আর সে স্থান হইতে নড়িল না। সেই সময় দরজার সামনে একখানা গাড়ী থামিল। একটী ভদ্র যুবক ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চায়ের আসরে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু নিতাই-দাদা ততোধিক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,

"এই যে! বল্‌তে না বল্‌তেই!" ইতোমধ্যে আমাদের দু'জনে চোখে-চোখে একটা টেলিগ্রাফ্ হইয়া গেল। কমলা ছুটিয়া পলাইতেছিল; নিতাই-দাদা ডাকিলেন,—"কমলা!" কমলা ফিরিয়া আসিলে নিতাই-দাদা বলিলেন,—"ইনি আমাদের ঘরের লোক, অন্তরঙ্গ বন্ধু। এইখানে ব'স।" তার পর আগন্তুকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এইটাই আমার কন্যা—কমলা।"

আগন্তুক বলিলেন,—"ওঃ! ভাল আছেন ত?" প্রশ্নের উত্তরে কমলা কেবল একটা সলজ্জ নমস্কার করিল। আগন্তুক বা অন্তরঙ্গ বন্ধু তাহার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। নিতাই-দাদা বলিলেন,—"মা! এঁর জন্যে এক পেয়ালা চা' তৈরি ক'রে নিয়ে'স ত।" কমলা টী-পট্‌টা লইয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল। আগন্তুক বলিলেন,—"চলুন না, সব ঘুরে-ফিরে দেখা যাক!" নিতাই-দাদা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিলেন, এবং আগন্তুকের পশ্চাতে আসিবার জন্য আমাকেও ইঙ্গিত করিলেন। সমস্ত বাড়ীটা তন্ন তন্ন করিয়া আগন্তুককে দেখান হইল; অবশেষে একস্থানে আসিয়া নিতাই-দাদা বলিলেন,—"এইটে অন্দরে যাবার পথ।" আগন্তুক বলিলেন,—"ওঃ! তা হ'লে, হাঁ, এইটে দেখা—" আগন্তুকের কথা শেষ না হইতেই নিতাইচরণ বলিলেন,—"আজ্ঞে হাঁ! দেখ্‌তে ইচ্ছে করেন কি?" "নিশ্চয়" বলিয়া আগন্তুক নিতাই-দাদার অপেক্ষা মাত্র না করিয়া অগ্রগামী হইলেন। অপরিচিত ব্যক্তি অন্দরে প্রবেশ করিতেছে,—সংবাদ দিবার জন্য আমি অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু নিতাই-দাদা আমায় বাধা প্রদান করিলেন।

আগন্তুকের পশ্চাতে যখন আমরা অন্দরে প্রবেশ করিলাম, কমলার মা তখন দরদালানে বসিয়া কুটনো কুটিতেছিলেন। সহসা একজন অপরিচিতকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সামলাইতে গিয়া বঁটীতে তাঁহার আঙুল কাটিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। নিতাই দাদার বিধবা ভগ্নী কুটস্থ দুধের কড়া লইয়া আসিতেছিলেন, তাহা হস্ত-স্খলিত হইয়া পড়িল। আর এক প্রৌঢ়া সিক্ত বস্ত্র শুকাইতে দিতেছিল। সে কাপড়খানা ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইতে-পলাইতে, বোধ করি ভাবিতেছিল, মূর্খ শাস্ত্র বলে—বস্ত্রত্যাগ, দেহত্যাগ—এক কথা! শাস্ত্র জানে না—দেহত্যাগ আরও সহজ!

আমরা বহির্বাটীতে ফিরিয়া আসিবামাত্র কমলা চা আনিয়া দিল। নিতাইচরণ অভ্যাগতকে খাতির-যত্ন করিতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে, অতিথির কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই চায়ের পাত্র তাঁহার হস্ত স্খলিত হইয়া পড়িল; এবং এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় অন্তরঙ্গ বন্ধুটী পাছে সঙ্কুচিত হ'ন, সে জন্য তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন,—"ওর জন্যে আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না; এ রকম চা'র পেয়ালা আমার হাত থেকে রোজ প্রায় আট-দশটা পড়ে ভেঙে যায়! ভায়া জানেন! আপনার শুভাগমনে ত একটা বৈ ভাঙ্গল না! কেমন হে ভায়া?" ভায়া অগত্যা বলিল,—"ঢের! ঢের! আট্টা দশটা কি! ক্রমে একশো!" অন্তরঙ্গ বন্ধু বলিলেন, "ওঃ! তা হ'লে দেনা-পাওনার কথাটা হয়ে যাক! আমি, মশায়, শেষ কালে গোলমালে হওয়াটা পছন্দ করি না। আগে সব কথা চুকে যাক।"

নিতাই-দাদা অতি বিনয়-সহকারে বলিলেন,—'কি জানেন, আপনি যখন তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তখন আমাদেরও।' অন্তরঙ্গ বলিলেন,—"ওঃ। তা' বেশ ত! বেশ ত! বলুন না, কি হ'তে পারবেন।'

"আজ্ঞে হাজার চারেক টাকা আমি পারি।" অন্তরঙ্গ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"চার—হা—জা—র!" "আজ্ঞে আমি পারিব! এর উপর অনুরোধ করলে আমি রাখ্‌তে পারব না।" "রাখ্‌তে পারবেন না? চালাকি না কি? ভদ্রলোক মনে ক'রে আপনার এখানে এসেছি, মাখন বাবু! এই কি ভদ্র ব্যবহার?" একে ভদ্র-ব্যবহারের উপর দোষারোপ, তাহাতে 'মাখন বাবু' সম্বোধন! নিতাই দাদা একপ্রকার কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে আমি মাখন বাবু নই, ভায়া জানেন! কেমন হে ভায়া?" কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিতে-না-দিতে অন্তরঙ্গ বন্ধু পকেট হইতে একটুক্‌রা ছাপা কাগজ বাহির করিয়া বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে-করিতে বলিলেন, "আপনি মাখন হালদার ন'ন্? সে কথা বিশ্বাস করব কেন? এ কি জোচ্চুরি কাণ্ড-কারখানা!"

নিতাই-দাদা মাটীর মানুষ; আরও মাটী হইয়া গেলেন। মাটীর সঙ্গে মিশিয়া বলিলেন,—"আপনি ভদ্রলোক,

অন্তরঙ্গ বন্ধু—দয়া ক'রে আমার বাড়ীতে পদার্পণ করেছেন। আপনার খাতিরে সব করতে পারি, কিন্তু মাখম হালদার হ'তে পারি না। আমায় মাপ করবেন। আমি নিতাইচরণ নাগ।" আগন্তুক বলিলেন,—"সে কি! নাগ! এটা তবে কি গলি?" "আজ্ঞে, বৈষ্ণবচরণ বশাখের গলি।" "তাই বলুন! তবে এতক্ষণ চালাকী করছিলেন যে! এ বাড়ীর নম্বর কত?" আমি দেখিলাম, দাদা আর কথা কহিতে পারিতেছেন না। আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কত নম্বর আপনার দরকার?" আগন্তুক তৎক্ষণাৎ আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" "আমি এই পাড়ায় থাকি।" "কি করা হয়?' "থাকি, আর করব কি?" "আপনার নাম কি?" "বংশীবদন পাল।" "পাল কি?" 'পাল' কি? লোকটা কি ঠাউরেছে? পানাবোজের পাল? না, ভেড়া-গরুর পাল? জিজ্ঞাসা করিলাম, "পাল আবার কি জাত?" "তেলী না কায়েত?" "কায়েত।" "তাই বলুন।" আমি যেন ইহাকে এতক্ষণ ঠকাইতেছিলাম, তাই চেষ্টা করিয়া মনের মতন উত্তর পাইয়া বলিতেছে—'তাই বলুন'। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কত নম্বর চাই?" তিনি আমার হাতে সেই ছাপা কাগজের টুকরাটা দিয়া বলিলেন, "এই দেখুন মশাই, এ সব কি কাণ্ড কারখানা!"

দেখিলাম, সেই ছাপার কাগজ একখানি বিজ্ঞাপন। তাহাতে ঠিকানা লেখা ১৫নং মাখম হালদারের গলি, বৈষ্ণবচরণ বশাখের কারখানা। বুঝিলাম লোকটা নামের গোলমাল করিয়াছে। বৈষ্ণব চরণ বশাখের কারখানাকে বৈষ্ণবচরণ বশাখের গলি মনে করিয়াছে। আর মাখম হালদারের গলিকে মনে করিয়াছে, মাখম হালদারের কারখানা। তার পর পনের নম্বর বাটীর পরিবর্ত্তে একান্ন নম্বরে আসিয়াছে। বলিলাম,—"এ বাড়ীর নম্বর ত পনের নয়, একান্ন।" "একান্ন! তা কখন হ'তে পারে না ভজহরি বাবু।" ভজহরি! ওঃ, লোকটার দশাই এই! বলিলাম,—"আমার নাম ভজহরি নয়, বংশীবদন। বাপ-মা আমাকে এই নাম আদর ক'রে দিয়ে গেছেন। যত দিন বাচ্‌ব এই নাম আমি ভোগ-দখল করব। নাম পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগদখল করা যায় না। কিন্তু তাই ব'লে ভজহরি হবার ত কোন প্রয়োজন দেখি না।" 'নিতাই-দাদা সগর্ব্বে আমার মুখের পানে চাহিয়াছিলেন; ইচ্ছা—'ব্রাভো, এক্সেলেন্ট্, এন্‌কোর' প্রভৃতি বলিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন। কিন্তু পাছে অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্ষুণ্ণ হন, তাই নিঃশব্দে তাঁহার মাথাটা পানকৌড়ীর মত কেবল উঠিতে-ডুবিতে লাগিল। আমিও বিজয়-গর্ব্বে আগন্তুকের মুখের প্রতি চাহিলাম। দেখিলাম, সে মুখে লজ্জা বা অনুতাপের চিহ্নমাত্র নাই। আমি চাহিবামাত্র তিনি বলিলেন,—"দেখুন, প্যারারাম বাবু, আমি বড় বিপদে পড়েছি।" আবার 'প্যারারাম!' দূর হ'ক! একে প্রতিবাদ করা বাগানে মুক্তা ছড়ান! বলিলাম,—"আশ্চর্য্য কি! বিপদে পড়বারই ত কথা!" লোকটা সবিস্ময়ে আমার মুখপানে চাহিয়া বলিল, "কেন, হরেকৃষ্ণ বাবু?" বহুত আচ্ছা! ভাল রঙ্গে, দাদা! তারিফ! বলিলাম,—"কেন, তা পার বলা! এখন আপনার নামটা বলুন দিকি?" বাবুটী একখানি নামের কার্ড পকেট হইতে বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। লোকটা বুদ্ধিমান বটে! পাছে নিজের নাম ভুলিয়া যায়, তাই ছাপাইয়া রাখিয়াছে! একেবারে পাকা বন্দোবস্ত! পড়িলাম—নারায়ণচন্দ্র মিত্র। নারায়ণ ত কমলাপতি! চট্ করিয়া আমার মাথায় একটা মৎলব আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনার বিবাহ হয়েছে?" "আজ্ঞে না।" বলিয়া কমলার উপর করুণ কটাক্ষপাত! "ঠিক মনে আছে ত?" "কি বলছেন, হরিহর বাবু? আমার বিয়ে হয়েছে কি না আমার মনে নেই?" আবার কটাক্ষ! দেখিলাম, কমলারও মুখ প্রসন্ন, চক্ষে কৌতুকালোক! আগন্তুককে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার আর কে আছে, নারাণ বাবু?" "দাদা আছেন।" আমি বলিলাম,—"কখখন না। আপনার ভুল হয়েছে।" "সে কি, মশাই?" "আর সে কি, কি? দাদা থাকলে কখন আপনি বৈষ্ণব বশাখের কারখানায় না গিয়ে বৈষ্ণবচরণ বশাখের লেনে আসতেন? না, পনের নম্বরে না গিয়ে একান্ন নম্বর বাড়ীতে উঠতেন? আপনার দাদা কখন নেই।" "তিনি যে আমায় দেখেন না। বিষয়-আশয় সব ভাগ ক'রে নিয়েছেন।" "আপনার তা'হলে সব দেখেন-শোনেন কে?" "দাওয়ানজী আর চাকর লোকজন।" "বাড়ীতে স্ত্রীলোক নেই?" এবার সবিনয় নিবেদন সহ কাতর কটাক্ষ। কমলার মুখও

সমবেদনা-বিষণ্ণ। কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "স্ত্রীলোক? কেউ না।" সেই সময় খোকা ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"বাবা, গরম দুধ প'ড়ে পিসীমার পা পুড়ে গেছে—ভারি জ্বালা করছে। তুমি ডাক্তার ডেকে আন।" শুনিবামাত্র কমলা ছুটিয়া গেল। নিতাইচরণও ছুটিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। আমি আগন্তুককে বলিলাম,—"আপনি আজ খামকা এসে কি কাণ্ডটা বাঁধিয়েছেন, শুনলেন? খবর দেওয়া নেই, কিছু নেই—তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে পালাতে গিয়ে বাড়ীর গিন্নীর হাত কেটে রক্তারক্তি! এই এক অনাথা বিধবার পায়ে গরম দুধের কড়া প'ড়ে বিষম ব্যাপার!" "আপনারা আমায় বারণ করলেন না কেন, রামভজন বাবু।" "বারণ করব কি? আমরা জানি, আপনি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুর হয়ে মেয়ে দেখতে এসেছেন!" নারায়ণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ে দেখতে?" "তবে কি করতে?" "গাড়ি কিনতে! ঠিক কিনতে নয়, বদলাতে। তারা নতুন ধরণের গাড়ি এনেছে। আমার পুরন গাড়ি বদলে সেইখানা নেব মনে ক'রেছিলুম, যদি পছন্দ হ'ত।" "ভদ্দর লোকের বাড়ীতে এসেছেন গাড়ি বদলাতে!" "এখানে যে কেমন ক'রে এসে পড়লুম, আমি ত তা বুঝতে পারছি নি, দুঃখীরাম বাবু! দাওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করলুম, বষ্টুম বশাখের গলি কোথা? তিনি বললেন, জোড়া সাঁকোর কাছে।" "বষ্টুম বশাখের গলি ত নয়। বষ্টুম বশাখের কারখানা, মাখম হালদারের গলি। আপনি দাওয়ানজীকে সঙ্গে ক'রে আনেননি কেন?" "সে ভারি কৃপণ। আগে থাকতে জানলে কিনে দিত না।" "তার বেজায় অন্যায়। আপনার মতন বয়ঃপ্রাপ্ত নাবালককে যে পথে একলা ছেড়ে দেয়, সে আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। এই যে এখন দুর্ঘটনা সব ঘটল, তার খেসারত দেয় কে? নিতাইচরণ নাগকে মাখম হালদার ব'লে অপমান? লাইবেল্ (Libel) কয় জানেন?" নারায়ণ অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন,—"তার জন্যে আপনি আমায় যা' করতে বলবেন, আমি তাই করব!" "আর কি করবেন! অপমান যা করবার, তা ত করেছেন!" "তাই ত! আমি এখন কি করি বলুন দিকি মশাই?" বলিয়া নিতান্ত অসহায় শিশুর মত নারায়ণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন! দাঁড়াও ছোক্‌রা! আগে তোমার বাড়ী যাই, সব খবর নি, তুমি বংশীবদনকে ভজহরি বল কেন, তার সন্ধান করি, তার পর তোমায় কমলাকে দিয়ে বাঁধাব। কিন্তু এ সকল কথা নারায়ণকে বলিলাম না। তাহাকে কেবল বলিলাম,—"এখন আপনি যেখানে যাচ্ছিলেন, যান্। আপনি বিকেল-বেলায় বাড়ী থাকবেন। আমি যাব। গিয়ে আপনার সঙ্গে আর দেওয়ানজীর সঙ্গে পরামর্শ করব। এখন আপনি বষ্টুম বশাখের কারখানায় যান।" "সে কারখানা কোন্‌খানে?" "ভবানীপুরে।" নারায়ণ বিষণ্ণমুখে ধীরে ধীরে উঠিলেন। বলিলেন,—"তা'হ'লে আমি এখন খড়্‌দাতেই যাই, নসীবাবু! বিকেলে আপনি যাবেন।" বলিতে-বলিতে গাড়িতে উঠিয়া কোচ্‌ম্যান্‌কে হুকুম দিলেন,—"যাও বালীগঞ্জ্।" পরদিন চায়ের আসরে আমি নিতাই দাদাকে বলিতেছিলাম, নারায়ণের বিষয়-আশয় যথেষ্ট। লেখাপড়া বেশ শিখিয়াছে। তবে বিশেষ করিয়া মুখস্থ না করিলে, নামধাম মনে রাখিতে পারে না। তা'তেও সময়-সময় উল্ট-পাল্টা করিয়া ফেলে। কিশোর বয়সে একবার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছিল—টাইফয়েড্ (Typhoid)—সেই ইস্তক এইরূপ হইয়াছে। প্রধান ডাক্তারদের কারুর-কারুর মত যে, বিবাহাদি ক'রে সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে, এ স্মৃতি-বিপর্যায় রোগ সেরে যাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ত'বে নারায়ণকে ঐরূপ দেখে পাগল মনে ক'রে কেউ কন্যাদান করতে চায় না। ঠিক সেই সময় নারায়ণ পূর্ব্বের মত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"এই যে নফর বাবু, ফকির বাবু! আপনারা দুজনেই উপস্থিত! সে মেয়েটীর বে হ'য়ে গিয়েছে কি? না যদি হয়ে থাকে, আপনারা যা বলবেন, আমি তা'তেই রাজি!" কমলা তখন চায়ের আসরে উপস্থিত ছিল না। খোকা ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকা, এ কে?" আমি তাহার কাণে-কাণে বলিলাম,—"চুপ্! এর সঙ্গে তোর দিদির বিয়ে হ'বে।" সে বলিতে-বলিতে ছুটিল,—"মা, মা, দিদির বর এয়েছে!"

প্রতিধ্বনি

যুদ্ধের ফলে আমাদের যে সকল বিষয়ে অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বর্ত্তমানে বস্ত্রাভাবই প্রধান। দেশ এখন বস্ত্রের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের মুখাপেক্ষী। সেই ম্যাঞ্চেষ্টার অধুনা যুদ্ধের প্রয়োজনে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণে নিযুক্ত। বিশেষতঃ, জাহাজের অভাবে বস্ত্রের আমদানীর পক্ষে আরও একটা ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। এই দুইটী কারণেই ত দেশে বস্ত্রাভাব ঘটিবার কথা এবং তাহার ফলে বস্ত্রের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার উপর, শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, এই দুর্দ্দিনের সুযোগে বঙ্গের বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা বস্ত্রের বাজার একচেটিয়া করিয়া এবং মাল আটকাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে বস্ত্রের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বস্ত্রাভাবে যে দেশব্যাপী আর্ত্তনাদ উঠিবে তাহা অস্বাভাবিক নহে। বস্তুতঃ, মফস্বলের নানাস্থান হইতেই বস্ত্রাভাবের অভিযোগ উপস্থাপিত হইতেছে। পাবনার সহযোগী সুরাজ লিখিয়াছেন,—

বর্ত্তমান যুদ্ধে আমাদের বস্ত্র-সমস্যাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিত্য ব্যবহার্য্য এমন কতকগুলি দ্রব্যের জন্য আমাদিগকে পর-মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, যাহা না হইলে একদণ্ডও চলিতে পারে না। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্রের অভাব যে সর্ব্ব প্রধান তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। লোকে দু'দিন উপবাসে কাটাইতে পারে, কিন্তু উলঙ্গ হইয়া দু'দণ্ডও থাকিতে পারে না। পূর্ব্বকালে কাপড় চাদরেই লোকের যথেষ্ট হইত, এখন কিন্তু কাপড় চেয়ে চোপড়ের অভাবই বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের দু'এক প্রস্থ হইলেই চলিত; এখন প্রস্থে প্রস্থে কাপড় চোপড় রাখিয়াও সভ্যতা রক্ষা হয় না।

তাই দিনের পর যতই দিন যাইতেছে, লোকের বস্ত্র-সমস্যা ততই কঠিন হইয়া পড়িতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথে তুলে নে রে ভাই" গান গাহিয়া দেশ মাতাইয়াছিলাম বটে; কিন্তু তখন সেই স্বদেশী মোটা কাপড় পরিয়াছিলাম কয়জন? তখন যদি আমরা মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় সকলে এক প্রাণ হইয়া সত্য সত্যই ব্যবহার করিতাম, তাহা হইলে আজ আমরা এ সমস্যায় পতিত হইতাম না। আজ মোটা কাপড়ও মিলিতেছে না। কাপড়ের দর হু হু বাড়িয়া চলিতেছে। লজ্জা নিবারণের জন্য শক্তি অনুসারে লোকে মোটা হউক, পাট হউক, যাহা সামর্থ্যে কুলাইতেছে, তাহাই খরিদ করিতেছে। দিন দিন কাপড়ের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রাণ উড়িয়া যায়। বল দেখি ভাই ৪, ৪॥ টাকা জোড়ার কাপড় কয়-জন সংগ্রহ করিয়া পরিতে পারে? আমাদের ত সাহেবী নহে, বাপ, মা, খুড়া, জেঠি, বিধবা ভগ্নী, পুত্র, ইত্যাদি লইয়া একান্নবর্ত্তী পরিবার! দুই এক জোড়া বস্ত্রে সংসার চলে না। উপায়ক্ষম সংসারে প্রায়ই একটার অধিক নয়। তাও সামান্য বেতনের কেরাণীর দলভুক্তই বেশী। তাহা ভিন্ন পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, কৃষককুলের কথা ভাব দেখি? পেটেই দিবে, না পরণেই পরিবে!

এ বস্ত্রসমস্যার প্রতীকার কেমনে হইবে? যত দিন না সর্ব্ব-মঙ্গলা দেশে শান্তি স্থাপন করিতেছেন, যত দিন না পৃথিবীব্যাপী এই মহাযুদ্ধের অবসান হইতেছে, তত দিন আর এ সমস্যার প্রতী-কারের উপায় কি? জার্ম্মাণ জাতি এই সমরে যে সমস্ত পাপলীলার অভিনয় করিতেছে, তন্মধ্যে টর্পেডোরূপ মহা অস্ত্রের প্রভাবই আমাদের বস্ত্র সমস্যার প্রধান কারণ। তুলা বিলাতে জন্মে না। বিদেশ হইতেই আমদানী করিতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের সহিত বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাই তুলার অভাবে ম্যানচেষ্টারের কলগুলির কাজ সপ্তাহে চারি দিনের অধিক চলিতেছে না। যাহা কিছু বস্ত্র হইতেছে, তাহাও এ দেশে আসিবার পথে অনেক বাধাবিঘ্ন আছে।

দেশে এখন তাঁত নাই, সূতা নাই, তুলাও নাই। দেশবাসীর আয়োজন উদ্যোগও নাই। এক সময়ে কিন্তু ভারতের প্রস্তুত বস্ত্রে বিদেশের লজ্জা নিবারণ হইত। ঢাকার মসলিন, মুর্শিদাবাদের রেশমী বস্ত্র প্রভৃতির নাম লোকে এখনও বিস্মৃত হয় নাই। সেই দেশের জোলা তাঁতির আজ এ দুর্দ্দশা কেন? আজ তাহাদের ব্যবসাতে দিন কাটে না। তাই তাহারা ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা এই ব্যবসা চালাইতেছে তাহাদেরও তাঁত ও এণ্ডুটী না হইলে পেটের ভাত জুটিতেছে না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমরা যে দেশী বস্ত্র ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছিলাম, সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। লোকে চিরদিনই সস্তার দাস। তাই তখন বিলাতী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় আমাদিগের স্বদেশী মিলের ও তাঁতের কাপড় বাজারে ভাল বিকায় নাই। তার পর মিলের কাপড়গুলির অনেক দোষও ছিল—পাড় উঠিয়া যাইত—বুনা-নিতে অনেক 'হল' থাকিত—জমিনও ঠিক হইত না। মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর সখের প্রাণে অতটা সহ্য হইবে কেন? অনেকেই সভা-সমিতিতে যাইতে বা লোক দেখাইতে দুই একখানা স্বদেশী বস্ত্র রাখি-তেন; "ঘরে কিন্তু পরেন গিন্নী ম্যানচেষ্টারের সাড়ী" ইহাই ঠিক ছিল।

বস্ত্র-সমস্যার সমাধানকল্পে চট্টগ্রামের সহযোগী "জ্যোতিঃ"

যে সুপরামর্শ দিয়াছেন, তাহাও সকলের প্রণিধান-যোগ্য :—

এদেশের বস্ত্রাভাব সম্বন্ধে কেহ চিন্তা করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। অভাব ক্রমেই বাড়িতেছে, কিন্তু দেশের কাহারো তজ্জন্য সাড়াশব্দ নাই। এমন নির্জীবতা অন্য কোথাও কি দেখা যায়? বিলাতের কলওয়ালারা সুতা পাইতেছে না। এ দেশে যে সব সুতা জন্মে, তাহারও অনেকটা জাপানী ব্যবসায়ীরা লইয়া যাইতেছে। সুতরাং এ দেশে সুতার বিশেষ অভাব হইবে। এ দেশের কলওয়ালারা ও যে-সব তাঁতী জোলারা এখনো হাতে কাপড় তৈয়ারী করে তাহারাও বিলাতী সুতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বিলাতী সুতা না আসাতে তাহারাও কাপড় তৈয়ারী করিতে পারিতেছে না। স্থানীয় একজন বহুদর্শী তাঁতী আমাদের বলিয়াছে,—আবার যদি ঘরে ঘরে ভদ্র অভদ্র ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মেয়েরা সুতা কাটিতে আরম্ভ করেন তবে আমরা বস্ত্রাভাবের আশঙ্কা হইতে দূরে থাকিতে পারিব, নতুবা নহে। পূর্ব্বে যেমন বেতনের বা লাভের আশায় মেয়েরা সুতা কাটিতেন না, নিজের ও বাড়ীর অন্যান্য লোকের কাপড়ের জন্য সুতা কাটিয়া তাঁতি জোলাকে দিতেন, আবার সেই ভাবে যদি প্রত্যেক ঘরের মেয়েরা সুতা কাটিতে থাকেন, তবে দেশের তাঁতি জোলারাও স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের ফরমাইস্ মত কাপড় তৈয়ারি করিয়া দিতে পারিবে। এই কথাটি কি দেশের কেহ শুনিবেন, এবং নিজের বাড়ীর মেয়েদের প্ররোচিত করিবেন?

বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি হইবার যে কয়েকটি অনিবার্য্য কারণ ঘটিয়াছে, তাহার উপর, ব্যবসায়ীরা সুযোগ বুঝিয়া বস্ত্রের অযথা মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছেন বলিয়া যে কথাটা উঠিয়াছে, তাহা সত্য কি না, এবং সত্য হইলে তাহার প্রতিকারের উপায় কি?—এ সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতার কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতেছেন। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে প্রশ্নও হইয়াছিল। উত্তরে গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধের জন্য অন্যান্য জিনিসের যেমন মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, বস্ত্রের মূল্যও সেইরূপ বাড়িয়াছে; ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত লাভের আশায় ষড়যন্ত্র করিয়া বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ঘটে নাই। সে যাহা হউক, বস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি যে হইয়াছে, এবং তাহাতে দেশবাসীর যে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই। দেশবাসী সমবেত ভাবে অচিরে ইহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন না করিলে কষ্ট দিন-দিন বাড়িবে বই কমিবে না।

আমরা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলাম যে, আজকাল ছাত্রমহলে কিছু-কিছু দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে এবং দিন-দিন প্রসার লাভ করিতেছে। বস্তুতঃ, কেবল লিখিতে-পড়িতে শিখিলে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না। নীতিহীন শিক্ষা প্রাণহীনও বটে। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে না, চরিত্রগঠনে সহায়তা হয় না, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের সময় কতই না সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। পাছে পরীক্ষার পূর্ব্বে প্রশ্নপত্র ছাত্রদিগের হস্তগত হয়, এজন্য প্রশ্নপত্র বিলাত হইতে ছাপাইয়া আনিয়া সুরক্ষিত কক্ষে লোহার সিন্ধুকের ভিতর রাখিয়া দিতে হয়; পাছে ছেলেরা পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বন করে, এই আশঙ্কায় পরীক্ষা-মন্দিরে বহুসংখ্যক ভদ্রলোককে পারিশ্রমিক দিয়া প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়। যে দিন দেখিব, ছেলেদের জন্য এই সকল সতর্কতার প্রয়োজনাভাব উপস্থিত হইয়াছে, সেইদিন বুঝিব ছেলেদের যথার্থ শিক্ষা হইতেছে। মোট কথা, লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা দিবার প্রয়োজনীয়তা বিবেচক লোক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। দেখিয়া সুখী হইলাম, অল্পে-অল্পে ছেলেদের মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে সহযোগিনী "নোয়াখালি সম্মিলনী" লিখিয়াছেন,—

বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুর মক্তবসমূহের উন্নতিকল্পে এক হুকুম জারী করিয়াছেন যে, বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে কোরাণ ও উর্দ্দু পাঠ্য নিয়মিত পড়ান হইতেছে কি না তিনি জানিতে চাহিয়াছেন এবং মুসলমান ভিন্ন অন্য কর্ম্মচারী দ্বারা ঐ সকল বিষয়ের পরীক্ষা নিতে নিষেধ করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার এই হুকুমে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ বিষয়ে আমাদের সামান্য কিছু বলিবার আছে। এই জিলায় মক্তবের সংখ্যা সাধারণ প্রাইমারী স্কুলের সমান না হইলেও ন্যূন নহে। মক্তব-সমূহের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য জিলাবোর্ড মাত্র দুইজন ইন্স্পেক্টিং মৌলবী নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রাইমারী স্কুলসমূহ পরিদর্শনের জন্য ১০ জন সবইন্স্পেক্টর এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ৪ জন ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুর অনেক পূর্ব্বে ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিতগণের পদ এবালিশ করিয়া, ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিতগণকে স্থানান্তরে নিযুক্ত করিতে আদেশ দিয়াছেন। এ জিলায় ১৪।১৫ জন ইন্স্পেক্টিং পণ্ডিত ছিলেন, কালক্রমে কয়েকজনকে বোর্ডস্কুলে, কয়েকজনকে মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা গিয়াছে; মাত্র উপযুক্ত একজনকে ডেপুটি

ইন্‌স্পেক্টর আফিসের কেরাণী পদ দেওয়া গিয়াছে। সাধারণ প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শনের জন্য যখন ১০ জন সব ইন্‌স্পেক্টর আছেন এবং যখন সকল সব ইন্‌স্পেক্টরের অধীন ইন্‌স্পেক্‌টিং পণ্ডিত নাই, তখন আমাদের বিবেচনায় বর্ত্তমান যে ৪ জন ইন্‌স্পেক্‌টিং পণ্ডিত আছেন তাঁহাদের পদ এবালিশ করিয়া তৎস্থলে ইন্‌স্পেক্‌টিং মৌলবী নিযুক্ত করিলে মক্তবের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। এবালিশ করা ইন্‌স্পেক্‌টিং পণ্ডিতগণকে যে কোন স্কুলে নিযুক্ত করিলেই তাঁহাদের আপত্তি থাকিবে না, এবং এইরূপ আপত্তির কোন ন্যায় সঙ্গত দাবিও দেখা যায় না। বর্ত্তমান ২ জন এবং নূতন ৪ জন মোট ৬ জন ইন্‌স্পেক্‌টিং মৌলবী থাকিলে জিলার মক্তবসমূহের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। এই ৬ জন ইন্‌স্পেক্‌টিং মৌলবী মক্তব-সমূহের বিল করিবার ক্ষমতা পাইবেন। মক্তব-সমূহের সালতামামী সংগ্রহ করিয়া সবইং ও ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরগণের সাহায্য করিবেন। এই নূতন ইন্‌স্পেক্‌টিং মৌলবীগণকে বর্ত্তমানে ইন্‌স্পেক্‌টিং পণ্ডিতগণের বেতনে নিযুক্ত করিলেই চলিবে, এবং পরে বোর্ডের বিবেচনামত বেতন ও এলাউন্স বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। আমরা উপরি উক্ত বিষয়ে সুযোগ্য ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুর ও চট্টগ্রাম বিভাগের ইস্কুল ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের এবং জিলার সদাশয় ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি

ভারতবর্ষে যখন পাশ্চাত্য ধরণে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছিল। এক শ্রেণীর লোক স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং অপর শ্রেণী স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হইয়াছিলেন। এখন এই দুই শ্রেণীর লোকই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, তথাপি তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। এখন স্ত্রীলোকগণকে শিক্ষাদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে মতভেদ অন্তর্হিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শিক্ষাদানের প্রণালী লইয়া মতভেদ ঘটিতেছে। এই ভেদ ভাব দূর করিতে হইলে উভয় শ্রেণীর মতামতের আলোচনা এবং বিচার হওয়া আবশ্যক। অল্পদিন পূর্ব্বে মান্দ্রাজ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ কুমারী ডি লা হে নারীদিগের প্রতি যুবক সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা উপলক্ষে এতদ্দেশীয় নারীদিগের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা 'ভারত-মহিলা' হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

স্কুলে প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণের যে অসন্তোষ দেখা যায়, স্কুলের শিক্ষা গৃহের চালচলনের সঙ্গে খাপ খায় না বলিয়া যে অভিযোগ শোনা যায়, আমার মনে হয় তাহার প্রধান কারণ হিন্দু শিক্ষয়িত্রীর অভাব। তবেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে, নারীদিগকে কলেজের উচ্চশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক কি না? অনেকে বলেন, উচ্চশিক্ষা দ্বারা পুরুষ-ভাবাপন্ন, বিজাতীয় প্রকৃতিবিশিষ্টা, স্বাধীনচিত্তা, বুটপরা চসমাওয়ালা মেয়ের সৃষ্টি করা হইতেছে, তাহারা পুরুষের ব্যবসা অবলম্বন করে, পুরুষের সমকক্ষ হইতে চায় এবং গার্হস্থ্য জীবন ও গৃহকর্ম্মকে ঘৃণা করে। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক।

আমার ব্যক্তিগত মত এই,—যে সকল মেয়ে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিবে না, অথবা যাহাদের গভীর জ্ঞানলাভের জন্য অন্তরে একটা পিপাসা নাই, তাহাদের পক্ষে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নাই। যদি স্কুলে কোন মেয়ে লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগ না দেখায়, তবে তাহাকে কলেজে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। এইরূপ স্থলে মেয়েকে কলেজে পাঠান আমি নিষ্ঠুরতা মনে করি। কারণ ইহাতে সে শক্তির অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করিতে যাইয়া, শুধু তাহার শরীর নয়, মন ও হৃদয় বৃত্তিরও অনিষ্ট করে। সুতরাং দেখিতেছ, আমি সকল মেয়ের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী নই। কিন্তু শিক্ষিতা মেয়েদের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ সাধারণ ভাবে সত্য বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। অবশ্য এইরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় বটে, যে কোন কোন শিক্ষিতা মহিলা বিলাতি চালচলন অত্যধিক মাত্রায় অনুকরণ করেন এবং জাতীয় ভাব বর্জ্জন করিয়া ভারতনারীর মাধুর্য্য হারাইয়া ফেলেন; কিন্তু আমি দেখিয়াছি, অধিকাংশ শিক্ষিতা মহিলাই উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া যথেষ্ট মানসিক উন্নতি সাধন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের স্বাভাবিকতা বা জাতীয় ভাব কিছুমাত্র হারান নাই।

আমার এ কথা মনে হয় না, যে, উচ্চশিক্ষা ভারত-নারীকে ভারতীয় বিশেষত্ব হইতে বিচ্যুত করিবে। তোমরা কি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবে জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছ? যদি না দিয়া থাক, তবে পাশ্চাত্য শিক্ষা তোমাদের মেয়েদিগকে কেন জাতীয়ত্ব বর্জ্জিত করিবে? আমি তোমাদের নিকট সাক্ষ্য দিতে পারি, আমার ছাত্রীদের মধ্যে আমি ভারতবর্ষের প্রতি এবং জাতীয় ভাবের প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখিতে পাই।

"বুটজুতা" আর "চসমা"—এত ভয়ের জিনিষ নয়। অধ্যয়নে পুরুষের যেমন মেয়েদেরও তেমনি চক্ষুর দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়। বুটজুতা পরিবার প্রয়োজনীয়তাটা আমিও বুঝি না। জুতা জিনিসটা শুধু অস্বাভাবিক নয়, অস্বাস্থ্যকরও বটে। দেশের আবহাওয়ার জন্য বাধ্য না হইলে জুতা পরিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু মেয়েরা এ সম্বন্ধে কি বলে তোমরা জান? তাহারা বলে, "আচ্ছা, ছেলেরা যে আমাদের বড় নিন্দা করে, তাদের কথা কি? তাহারা যে বড় বুট পরে, কলার গলায় দেয়, সাহেবী পোষাক পরে তার কি? আমরা শকুন্তলা নই বলিয়া তারা যে বড় নিন্দা করে—তারা বুঝি দুষ্মন্ত!" আসল কথাটা এই, পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে নূতন জিনিস। এই শিক্ষা প্রভাবে মেয়েরা প্রথমে কতকটা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইলেও দু'দিন পরে আর তাহা থাকিবে না। এখনই জাতীয় ভাবের শ্রেষ্ঠতার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্যই এই যে নারীদিগকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করিবে, কিন্তু মেয়েরা চালচলনে, ধরণধারণে ও আকাঙ্ক্ষায় ভারতীয়ই থাকিবে।

বাঙ্গালীর ঋণ-দান

[শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ]

ইংরাজের বিজয়-পতাকা-নিম্নে সমবেত বঙ্গ-বীর এই প্রথমবার যুদ্ধ-যাত্রা করিল, না, বাঙ্গালার বীর-বাহু পূর্ব্বেও ইংরাজরাজের পতাকা বহন করিয়াছে—ইহা এখন পুনরালোচিত হইবার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই—বাঙ্গালার কিছুকালের ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস নানাস্থানে নানা ভাবে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। বীর বাঙ্গালীর শূরত্বের কাহিনী তাই এখন একান্ত অপরিচিত; শুধু অপরিচিত নহে—বঙ্গের একজন প্রধান রাজপুরুষের নিকট আমরা কিছুদিন পূর্ব্বেই কলিকাতা টাউনহলে শুনিয়াছি যে, অনেক বাঙ্গালী বিশ্বাস করেন,—বঙ্গভূমি সৈন্য-সংগ্রহের যোগ্য ভূমি নহে!

নব-গঠিত বঙ্গ-বাহিনী বাঙ্গালীর এই ভ্রম দূর করিয়াছে বলিয়া মনে হয়; মনে হয়—যে সকল বাঙ্গালী সৈনিক দ্বিতীয় বাহিনী গঠন করিবে, তাহারাও শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই অনাস্থা দূর করিতে পারিবে। বাঙ্গালী যে আজ যুদ্ধে গমন করিয়াছে—ইহা যেমন একটা আকস্মিক ঘটনা নহে, বাঙ্গালী যে ইংরাজ রাজের জন্য অকাতরে হৃদয়-শোণিত দান করিয়াছে,—বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের অভাবে এখন তাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়া নানা তর্ক বিতর্কের পর মীমাংসা করিতে হইলেও, তাহা নূতন ব্যাপার নহে।

ইংরাজিতে বেঙ্গল আর্ম্মির গঠন ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আছে। তাহাতে ভারতের নানা যোদ্ধৃ জাতির নাম ও কর্ম্ম-নৈপুণ্যের পরিচয় থাকিলেও বাঙ্গালীর নাম নাই! বাঙ্গালায় ইংরাজের প্রতিষ্ঠার যে কাহিনী সচরাচর বাঙ্গালার ইতিহাস রূপে পরিচিত ও প্রচারিত হয়, তাহাতেও বঙ্গসৈনিকের উল্লেখ নাই। এ সকল না থাকিলেও, অন্য প্রকার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজ-রাজের জন্য আত্ম-দান বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন নহে।

তখনও বাঙ্গালার নবাবই এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তখনও কোম্পানী বাহাদুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই—তখনও তাঁহারা কল্পনাও করেন নাই যে, ভারতের ত দূরের কথা—বাঙ্গালার মসনদও তাঁহাদের জন্য একদিন শূন্য হইবে; সেই সময়েও বাঙ্গালী কোম্পানী বাহাদুরের সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়া বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল।

অনেকের এইরূপ ধারণা আছে যে, কোম্পানী বাহাদুর এ দেশে প্রথমে যে সেনাদল গঠন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বেহারবাসী, এবং প্রধানতঃ সাহাবাদ জেলার অধিবাসী। অযোধ্যা এবং কাশীও তৎকালে কোম্পানীর বাহিনীকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। সেকালের ব্রিটিশ রাজত্বের বহির্দ্দেশ হইতে লোক আনিয়া বা লোক সংগ্রহ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর সেনাদল গঠন করিয়াছিলেন,—বাঙ্গালী সে দলে স্থান পায় নাই। কেন? কারণ, প্রসিদ্ধি আছে যে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাঙ্গালীকে কেহ কোন দিন যোদ্ধৃ জাতিতে পরিণত করিতে পারে নাই! এ কলঙ্ক-টীকা বাঙ্গালী যখন লাভ করে, তখন কোম্পানী বাহাদুর আর বাঙ্গালার বণিক নহে তখন বাঙ্গালা আর নবাবের 'মুলুক' নহে। তখন নানা কারণে বাঙ্গালার নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে; সুতরাং এই কলঙ্কের লাঞ্ছন ইংরাজ-বাহিনীতে বাঙ্গালীর প্রবেশ-পথ সে কালে রুদ্ধ করিতে পারে নাই।

তবে কিসে সে পথ রুদ্ধ করিয়াছিল? বাঙ্গালী কি তখন সত্যই যুদ্ধে অনভ্যস্ত ছিল? তাহা সম্ভব নহে। বাঙ্গালার মোগল ও পাঠান শাসন-কালের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালার নবাবগণ সর্ব্বদাই বাঙ্গালা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন—বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান বাঙ্গালার ও বেহারের রণক্ষেত্রে কখনও শত্রুরূপে এবং কখনও বা মিত্ররূপে বাঙ্গালীর জন্য শূরত্বের জয়মাল্য অর্জ্জন করিত। আলিবর্দ্দী যখন বাঙ্গালার নবাব, তখনও দেখিতে পাই, বাঙ্গালী তাঁহার সমর-সচিব, বাঙ্গালী তাঁহার রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্ত্তা,—বঙ্গ হইতেই তাঁহার সেনাদল পরিপুষ্ট।

গিরিয়ার ক্ষেত্রে যখন আলিবর্দ্দীর সহিত বাঙ্গালার নবাবের যুদ্ধ ঘটে, তখন দেখিতে পাই,—আলিবর্দ্দীর

অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া নন্দলাল বীর-বিক্রমে যুদ্ধে লিপ্ত—আলিবর্দ্দীর সেনাদল নবাব সুজাউদ্দীনের ও সরফরাজের বঙ্গ-সৈন্য দ্বারা পরিপুষ্ট। এই যোদ্ধৃ-পুরুষ সকলেই বাঙ্গালী ছিল কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ—সম্ভবতঃ অসম্ভব।

তাহার পর দেখিতে পাই, বঙ্গে মহারাষ্ট্র-অভিযান—আজিও যাহার স্মৃতি বঙ্গ-জননী সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। সেই দুর্দ্দিনে নবাব আলিবর্দ্দীর পঞ্চসহস্র সৈন্য যেরূপ অপূর্ব্ব দৃঢ়তা, সাহস ও বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর বীরের সভায় সসম্মানে আলোচিত হইবার যোগ্য বলিয়া একজন সমসাময়িক ইংরাজ কর্ত্তৃক বিঘোষিত হইয়াছে।(১) এই বীর সেনাদলের মধ্যে বাঙ্গালী ছিল কি না, ইহা তর্কের বিষয় হইলেও, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা করিলে, বাঙ্গালীর যে থাকা সম্ভব ছিল না, এরূপ অনুমান করা যায় না। এই ক্ষুধা-খিন্ন ক্লেশ-দীর্ণ সেনাদলে যে বাঙ্গালী ছিল, বাঙ্গালার কোন ঐতিহাসিক তাহার প্রমাণাবলী আবিষ্কার করিলে, বাঙ্গালীর কণ্ঠে একটী জয়মাল্য অর্পণ করা হইবে, সন্দেহ নাই।

আজ এতকাল পরে বহু অন্বেষণ করিয়া, নানা স্থান হইতে তিল-তিল করিয়া প্রমাণাদি সংগ্রহ-পূর্ব্বক আমাদিগকে সংশয়াকুল চিত্তে অগ্রসর হইতে হইতেছে বটে, কিন্তু সে-কালে কলিকাতার দুর্গে যে সকল ইংরাজ বাস করিতেন, বাঙ্গালীর এ কাহিনী তাঁহাদের নিকট নিত্য প্রত্যক্ষ বলিয়া সুপরিচিত ছিল। এমন সময়ে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী স্বর্গারোহণ করিলেন (এপ্রিল, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ)। ইহার চারি বর্ষ পূর্ব্বে (১৭৫২) 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস্' কোম্পানী বাহাদুরকে আদেশ দিয়াছিলেন—'মিলিসিয়া' গঠন করিতে বিলম্ব করিও না। (২) সে আদেশ তখন প্রতিপালিত হয় নাই; কারণ, সৈনিকের ধর্ম্ম অত্যন্ত কঠোর · তাহাতে বায়ু-সেবন-কালে ছয়-ঘোড়ার গাড়ী মিলে না, ভোজনের সময় ঐক্যতান বাদ্য বাজে না! (৩) সুতরাং মিলিসিয়া গঠিত হইল না। চারি বৎসর পর ডিরেক্টর-সভা রুষ্ট ভাষায় (in severe terms) ইহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন এবং অবিলম্বে মিলিসিয়া গঠন করিতে আদেশ দিলেন।

নবাব আলিবর্দ্দীর সহিত কোম্পানী বাহাদুরের কোন কলহ ছিল না;—যুবক নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন হইতেই কলহের সূত্রপাত হইল। কলহের প্রধান কারণ, প্রাচীন কলিকাতা-দুর্গের সংস্কার। সিরাজ তখন পূর্ণিয়ার নবাব শওকত জঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি রুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ২৪মে অপরাহ্ণে জমাদার ওমরবেগ তিনসহস্র সৈন্য লইয়া কাশীমবাজারের ইংরাজ কুঠি অবরোধ করিলেন। ১লা জুনের মধ্যেই দ্বাদশ সহস্র নবাবী সৈন্য সমবেত হইল। (৪) পাঁচদিন পরেই কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, কাশীমবাজার অবরুদ্ধ হইয়াছে। সে-দিনও সকলে মনে করিল, ইহা জনরবমাত্র। পরদিন প্রাতে (৭ই জুন) যখন কলেট সাহেবের পত্র আসিল, তখন কলিকাতাবাসী ভয়ার্ত্ত হৃদয়ে শুনিল যে, ৫০ সহস্র সৈন্য লইয়া নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিতে আসিতেছেন! গবর্ণর ড্রেক তখন কলিকাতা রক্ষার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ঢাকা, জগদীয়া, লক্ষ্মীপুর, বালেশ্বর, প্রভৃতি স্থানের কুঠিতে অবিলম্বে বিপদের সংবাদ প্রেরিত হইল—মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরেও সাহায্যার্থ পত্র গেল। (৫) সে-কালে পদব্রজে, অশ্বারোহণে বা নৌকা-যোগে ভিন্ন গমনাগমন বা সংবাদ প্রেরণের উপায়ান্তর ছিল না; সুতরাং বাহিরের সাহায্যের জন্য আর অপেক্ষা করিবারও অবকাশ ছিল না। কোম্পানী বাহাদুর অবিলম্বে ১৫০০ বন্দুকধারী হিন্দু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। (৬) যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই ১৬ই জুন বাগবাজারের সন্নিকটে বাঙ্গালার নবাবের কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল!

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, কাশীমবাজার অবরোধ হইতে আরম্ভ করিয়া নবাবের বাগবাজারে আগমন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৪ মে হইতে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত—এই

(১) Interesting Historical Events.—Holwell.

(২) Calcutta—Past and Present.—K. Blechynden.

(৩) Mill and Marshman.

(৪) H. Beveridge in Calcutta Review : 1893.

(৫) Holwell's Letters, para 16.

(৬) History of Bengal—Stewart.

কয়েকদিনের মধ্যেই গবর্ণর ড্রেককে মিলিসিয়া গঠন করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাশীমবাজার অবরোধের সংবাদ কলিকাতায় ৬ই জুন তারিখে পৌঁছিয়াছিল। তর্কস্থলে না হয় ধরাই গেল যে, সে সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই গবর্ণর ড্রেক মিলিসিয়া গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই "পূর্ব্বে" যে ১৬ই জুনের অধিক দিন পূর্ব্বে নহে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই (৭)। গবর্ণর ড্রেক যখন দেখিলেন দুর হইতে কোন সাহায্য লাভের সময় নাই, তখন তিনি চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কর্ত্তা ও চন্দননগরের ফরাসী কর্ত্তার নিকট বিপন্ন হইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ওলন্দাজ কর্ত্তা সাহায্য করিতে অসম্মত হইলেন—ফরাসী কর্ত্তা কহিলেন, আপনারা কলিকাতা ছাড়িয়া চন্দননগরে আসুন, আমরা আপনাদিগকে রক্ষা করিব! যখন সাহায্য, প্রাপ্তির সকল আশা ফুরাইল, তখন গবর্ণর ড্রেক কলিকাতার আর্ম্মাণী ও দেশজ পর্ত্তুগীজদিগকে অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত করিলেন এবং ১৫০০ শত হিন্দু বন্দুকধারী সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট এই সকল ঘটনার যে তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান হয় যে, এই সৈন্য সংগঠন ৯ই হইতে ১৫ই জুনের মধ্যে হইয়াছিল—অর্থাৎ এক সপ্তাহ মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল! এই সপ্তাহ কাল মধ্যে বাঙ্গালার বাহির হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা একালে আয়াসের সহিত সম্ভব হইলেও, সেকালে একান্তই অসম্ভব ছিল। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই এই ১৫০০ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল।

বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, সে সময়ে দিল্লীর সিংহাসন একান্ত শক্তিশূন্য ছিল; তখন নানা বিপ্লবে উত্তর ভারত হইতে বঙ্গের প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বদা বিপর্য্যস্ত হইত। যুদ্ধ-ব্যবসায়ী উত্তরাঞ্চলবাসিগণ দলে-দলে দক্ষিণ-ভারত ও বঙ্গদেশ পরিপ্লাবিত করিত। কোম্পানী বাহাদুর সেই সকল লোকের ভিতর হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। (৮)

উত্তর-ভারতের অবস্থা তখন শোচনীয় ছিল, সন্দেহ নাই। দিল্লীর বাদশাহ ক্রীড়া-কন্দুক রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বাদশাহের তখন নাম মাত্রই সম্বল ছিল; যে যেরূপে পারিত, সেই নামমাত্র সম্বল সম্রাটকে অবলম্বন করিয়া আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিত। মহারাষ্ট্র ও অযোধ্যার নবাবের কাহিনী সে পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু ইহাতে এরূপ সূচিত হয় না যে, উত্তরাঞ্চলবাসিগণ দলে-দলে বাঙ্গালায় আসিয়া বাস করিত, এবং আবশ্যকমত কোম্পানীর সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইত। পরবর্ত্তী কালে উত্তরাঞ্চলবাসীদিগের সংখ্যা বাঙ্গালায় যত অধিক হইয়াছিল, পলাশির যুদ্ধের প্রাক্কালে সেরূপ ছিল কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। মুসলমান শাসনকালে বাঙ্গালার ভূস্বামিগণ সৈন্য রক্ষা (৯) করিতেন। নিজেদের মান ও প্রতিষ্ঠার জন্য ইহার যেমন প্রয়োজন ছিল—বাঙ্গালার নবাবকে সাহায্য করিবার জন্যও তেমনি প্রয়োজন হইত; সুতরাং এরূপ অনুমান আদৌ সম্ভব নহে যে, তাঁহারা সকলেই উত্তরাঞ্চলবাসীদিগকেই সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিতেন। যুদ্ধের সহিত ও শূরত্বের সহিত বাঙ্গালী যে তখন সম্যক্ পরিচিত ছিল, তাহার পরিচয় মোহনলাল, মীরমদন, শ্যামসুন্দর, নন্দলাল প্রভৃতির ইতিহাসে পরিস্ফুট রহিয়াছে। নবাব আলিবর্দ্দী, সিরাজ উদ্দৌলা বা মীরকাশিমের ৪০।৫০ সহস্র সৈন্য ছিল (আলিবর্দ্দীর সৈন্য-সংখ্যা কিছু কম ছিল); বাঙ্গালীকে সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত না করিলে তাঁহারা কিছুতেই এইরূপ বিরাট বাহিনী গঠন করিতে সমর্থ হইতেন না। পলাশীর যুদ্ধের মাত্র তিন বৎসর পরেও বর্দ্ধমানাধিপতির ৫০০০ সৈন্য ছিল। সেই বর্ষেই তিনি আরও ১০।১৫ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ

(৭) In this dilemma, as no hopes of assistance could be expected in time from Madras, Mr. Drake applied to the Dutch at Chinsura, and to the French at Chandernagore, to help him : but the former positively refused ; and the latter added insult to the refusal, by desiring the English to abandon Calcutta and to repair to Chandernagore, where they would protect them. The English, finding that they had no other resource than in their own exertions, armed all the Europeans, native Portuguese, and Armenians, and took into their service 1500 Hindu matchlockmen ;—History of Bengal,—Stewart.

(৮) Imperial Gazetteer—Vol. IV, Chap. XI, p. 326 330.

(৯) Bengal M. S. Records—Vol. I, p. 56.

করিয়াছিলেন। (১০) এই সকল হইতেই দেখা যাইতেছে যে সেকালে দেশে বাঙ্গালী সৈন্যের অভাব ছিল না। সুতরাং কোম্পানী বাহাদুর যখন সপ্তাহ কাল মধ্যে কলিকাতা রক্ষার্থ মিলিসিয়া গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ১৫০০ হিন্দু বন্দুকধারী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তখন যে অধিকাংশই বাঙ্গালী সৈন্য লইতে হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব। বাঙ্গালীর সেকালের ইতিহাস মূক হইলেও এ বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণের একেবারে অভাব নাই। পলাশীর যুদ্ধের পর পঞ্চদশ বর্ষ মধ্যেই যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেই বাঙ্গালীর শূরত্বের বিবরণ সাধারণ ভাবে লিখিত রহিয়াছে। গ্রন্থকার Bolts কলিকাতায় কোম্পানীর অধীনেই কার্য্য করিতেন এবং সকল বিষয় নিজে দেখিবার ও জানিবার তাঁহার বিশেষ সুবিধা ছিল। সুতরাং তাঁহার উক্তিকে অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। (১১)

পরবর্ত্তী কালের প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, লর্ড ক্লাইভের লাল পল্টন বাঙ্গালী সৈনিকের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। (১২) বিরুদ্ধবাদীরা বলিয়া থাকেন, এ সকল উক্তির কোন মূল্য নাই, কারণ ইঁহারা কেহই "বেঙ্গল আর্ম্মির" ইতিহাস রচনা করেন নাই—বিষয়ান্তরের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া সাধারণ ভাবে বাঙ্গালী সম্বন্ধে একটা উক্তি করিয়াছেন মাত্র। নতুবা "বেঙ্গল আর্ম্মির" সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক Col. Broome কহিবেন কেন যে, লর্ড ক্লাইভের পল্টনের মধ্যে বাঙ্গালী ছিল না! (১৩)

বাঙ্গালী যে ব্রিটিশ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, Walter Hamilton, Bishop Heber, Kaye & Malleson ইহা কহিয়া থাকিলেও কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই, এ কথা সত্য। সুতরাং বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন যে,—ইঁহারা মনগড়া একটা কথা লিখিয়া গিয়াছেন, না, ইঁহাদিগের উক্তি নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? Broome এবং Malleson প্রভৃতি ঐতিহাসিক—সকলেই পলাশীর যুদ্ধের অনেক দিন পরে আপন-আপন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের কাহারো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল না।

Kaye and Malleson-এর সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস একখানি সুবিখ্যাত গ্রন্থ। তাহারই এক স্থানে বাঙ্গালী পল্টনের কথা লিখিত হইয়াছে। সেকালে "বেঙ্গল আর্ম্মি" বলিতে—পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং ব্রহ্মদেশের অধিবাসী দ্বারা গঠিত বাহিনী-কেই বুঝাইত (১৪)। এই 'বেঙ্গল আর্ম্মির' সেনাদিগের মধ্য হইতেই কতকগুলি সেনা বিদ্রোহী হইয়াছিল। তাহাদিগের ইতিহাসই সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস (১৫)। সুতরাং সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস রচনাকালে Kaye এবং Malleson-এর ন্যায় বিচক্ষণ ঐতিহাসিক যে "বেঙ্গল আর্ম্মি" বলিতে কি বুঝাইত তাহা দেখেন নাই, এরূপ অনুমান করা যায় না। ইঁহাদিগের গ্রন্থ রচিত হইবার পূর্ব্বে Broome তাঁহার 'বেঙ্গল আর্ম্মির' ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং Kaye এবং Malleson যে সে গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন, ইহাই সঙ্গত অনুমান।

ঐতিহাসিক Malleson লর্ড ক্লাইবের জীবনী রচনা করিয়াছেন। তাহার মুখবন্ধে কহিয়াছেন যে, Broome তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। Broome তাঁহার "বেঙ্গল আর্ম্মি" নামক গ্রন্থের জন্য যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, Malleson সে সমুদয়ই তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং Broome-এর ন্যায় ঐতিহাসিকের উক্তির বিরুদ্ধে Malleson যখন পরবর্ত্তী কালে সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, ক্লাইবের পল্টনে বাঙ্গালী সৈন্য ছিল—তখন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, Broome-এর উক্তিকে খণ্ডন করিবার জন্যই তিনি এরূপ লিখিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ঐতিহাসিক Bolts সাধারণ ভাবে যাহা লিখিয়াছেন, ঐতিহাসিক উপাদানের উপর নির্ভর করিয়া বিচক্ষণ Malleson বিশেষ ভাবে সেই কথারই উল্লেখ করিয়াছেন,—Walter

(১০) Bengal M. S. Records – p 239.

(১১) Bolts' Consideration in Indian Affairs – Preface.

(১২) Walter Hamilton, Bishop Heber, Kaye and Malleson.

(১৩) The natives of the Province (Bengal Proper) were never entertained as soldiers by any party.— Broome's "Bengal Army", Chap. II, p. 92-93.

(১৪) Provincial Gazetteer of India, Vol. 1, Bengal.

(১৫) Imperial Gazetteer of India: Chap. IV, Army.

Hamilton এবং Bishop Heberও ভিন্ন-ভিন্ন কালে স্বাধীন অনুসন্ধানের পর সেই একই তথ্য প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং Broomeএর সিদ্ধান্তকে ভুল না বলিয়া উপায় কি! পরবর্ত্তী কালেও আমরা দেখিতে পাই যে, মীরকাশেমের আমলে গিরিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বে কোম্পানীর সেনাপতি Adams কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন (১৬)। ইহারাও যে বাঙ্গালী ছিল, পূর্ব্ববর্ণিত কারণে তাহাই অনুমান হয়।

বিরুদ্ধবাদীদিগের আর একটী তর্কের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। ইহা এখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অবরোধ করিলে পর, গবর্ণর ড্রেক সর্ব্বাগ্রে এবং পরে আরও অনেকে দুর্গ-পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিলেন। যাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গবর্ণর ড্রেক, মিষ্টার ম্যাকেট, মিষ্টার মিন্‌চিন্ ও কাপ্তান গ্রান্ট প্রধান বলিয়া পরিচিত। হল্‌ওয়েল সাহেব পলায়ন করেন নাই, দুই দিন পর্য্যন্ত দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিয়া পরে বীরের ন্যায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন (১৭)। হলওয়েল যখন দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত হন, তখন বেতনভোগী সৈন্য ও সখের সৈন্য লইয়া মোট ১৯০ জন মাত্র দুর্গে অবস্থান করিতেছিল।

সিরাজের ৫০ সহস্র সৈন্য যখন কলিকাতা দুর্গ অবরোধ করে, তখন ঐতিহাসিক অর্মের মতে দুর্গ-রক্ষক সৈন্য-সংখ্যা ২৬৪ ছিল। ইহাদিগের মধ্যে সখের সৈনিক সহ য়ুরোপীয়ের সংখ্যা ১৭৪ জন ছিল। সেইজন্য ১৫০০ হিন্দু বন্দুকধারী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশীয় এবং য়ুরোপীয় সকলেই পলায়ন করিয়াছিল।

কিছুকাল পরে ক্লাইব যখন মান্দ্রাজ হইতে ১৫০০ সিপাহী ও ৯০০ গোরা সৈন্য লইয়া ফল্‌তায় আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন কলিকাতা উদ্ধার ও ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য সৈন্যদিগকে পুনরায় শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। কোন-কোন ঐতিহাসিক বলেন, এই সময়ে কলিকাতায় সংগৃহীত ১৫০০ বন্দুকধারী সৈন্যদিগকে ভীরুতার জন্য কার্য্যচ্যুত করা হইয়াছিল! ইহা বিশ্বাস্য নহে, কারণ ভীরুতাই যদি তাহাদিগকে দূর করিবার কারণ হয়, তাহা হইলে গোরা, আরমানী ও দেশজ পর্ত্তুগীজগণও তাহার পরিচয় দিয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধেও তাহারা ক্লাইবের পতাকা-নিম্নে সমবেত হইয়াছিল। সুতরাং একই কারণে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত কতক সৈন্য কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, আর কতক হয় নাই, এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই। সেই জন্য আমি ইহাই বলিতে চাহি যে, পূর্ব্বে গৃহীত বন্দুক-ধারী সেনাদলও ক্লাইবের মান্দ্রাজী সিপাহীদলের সহিত যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, পরবর্ত্তী কালে ব্রিটিশ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য হৃদয়-শোণিত দান করিয়াছিল - বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজী সৈন্য একক্ষেত্রে যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া ইংরাজের পতাকা বহন করিয়াছিল। এই অনুমানই ঐতিহাসিক Kaye এবং Mallesonএর নিম্নোদ্ধৃত উক্তির সহিত মিলিয়া যায় (১৮)।

বর্ত্তমান মহাসমরে একজন আহত স্বেচ্ছাসেবকের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া একজন ইংরাজ ডাক্তার তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালী আজ যে ঋণ দান করিল, তাহা বহু ফলপ্রসূ হইবে (১৯)। তিনি জানেন না যে, ভারতে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বাঙ্গালীর রুধির দ্বারা গ্রথিত হইয়াছে। ব্রিটীশ পতাকা-নিম্নে সমবেত হইয়া বীর বাঙ্গালী বহু যুদ্ধে হৃদয় শোণিত দান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বাঙ্গালীর শোণিত-ঋণ আজিকার নূতন নহে—উহা ১৬১ বর্ষের পুরাতন কাহিনী! রাজ-অনুগ্রহে বাঙ্গালী আবার সেই পুরাতন ঋণের কড়ি বাড়াইতে চলিয়াছে।

---

(১৬) Vansittart's Narratives.

(১৭) History of Hindustan : Orme. Cook's Evidence : First Report.

(১৮) "......a battalion of Bengali Sepahis fought at Plassey side by side with their comrades from Madras......that the Bengali Sepahi was an excellent soldier was freely declared by men who had seen the be t troops of the European Powers.—History of Sepoy Mutiny Vol. I, p. 149.

(১৯) Speech of Dr. S. K. Mallik in the Town Hall on 5th March 1917.

শোক-সংবাদ

এ মাসে আমাদিগকে দুর্ভাগ্যক্রমে চারিজন মনস্বী ব্যক্তির পরলোকগমন-সংবাদ পত্রস্থ করিতে হইতেছে ! তন্মধ্যে—

৺মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী

মহোদয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৯০৪ সংবতের ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তিথিতে কাশীর চারি ক্রোশ উত্তরে উন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা রাম
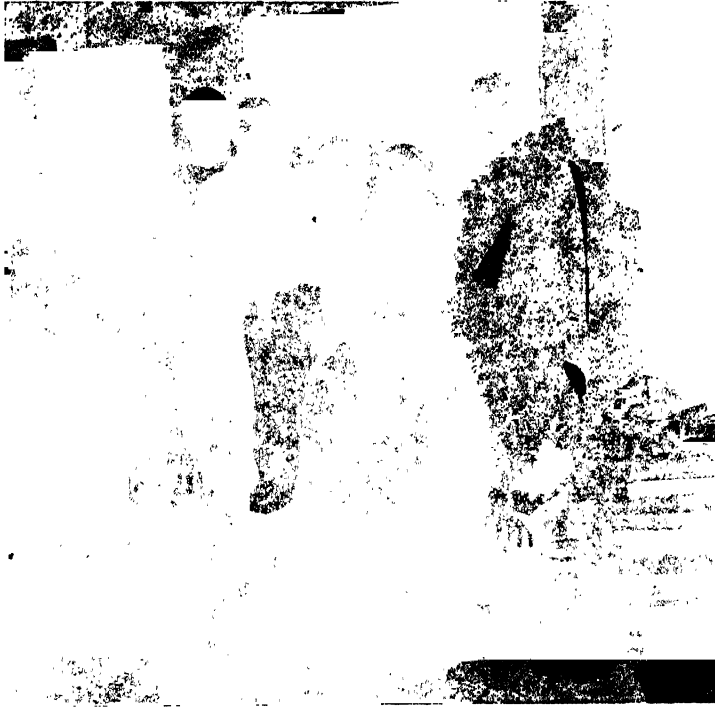
৺মহামহোপাধ্যায় শিবকুমার শাস্ত্রী

সেবক মিশ্র পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃব্য বেথিয়ায় কর্ম্ম করিতেন। পিতৃহীন বালক ১১ বৎসর বয়সে পিতৃব্য-ভবনে গিয়া বাস করেন। কিছুদিন পরে তিনি বিদ্যালাভার্থ কাশীধামে গমন করেন। কাশীতে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে তিনি বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। কিন্তু এক বৎসর পরেই কলেজের কার্য্য ত্যাগ করিয়া নিজ গৃহে ছাত্রগণের অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি দেশে-বিদেশে প্রচারিত হয় এবং তাঁহার পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু ছাত্র নানাস্থান হইতে বিদ্যালাভার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিতে থাকেন। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺সারদাচরণ মিত্র।

গত ১৯শে ভাদ্র, ১৩২৪, মঙ্গলবার রাত্রিকালে বাঙ্গলার অন্যতম মনস্বী, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র এম্-এ, বি-এল্ মহাশয় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ১৮৪৮ অব্দের ১৯শে ডিসেম্বর হুগলী জেলার অন্তর্গত পানিশেহালা গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ১৯০২ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সারদাচরণ প্রথমে অস্থায়ীভাবে, পরে স্থায়ীভাবে হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ অব্দের ১৮ই ডিসেম্বর তাঁহার ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় সরকারী নিয়মানুসারে বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও সেনেটের সদস্য এবং ঠাকুর আইন অধ্যাপক ছিলেন। বিচারকার্য্যে তিনি যথেষ্ট নির্ভীকতা এবং তেজস্বিতার পরিচয় দিতেন। অবসরকালে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। সমগ্র ভারতে এক-লিপি-বিস্তার শেষজীবনে তাঁহার মূলমন্ত্র হইয়াছিল। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ

রায় বদ্রীদাস বাহাদুর
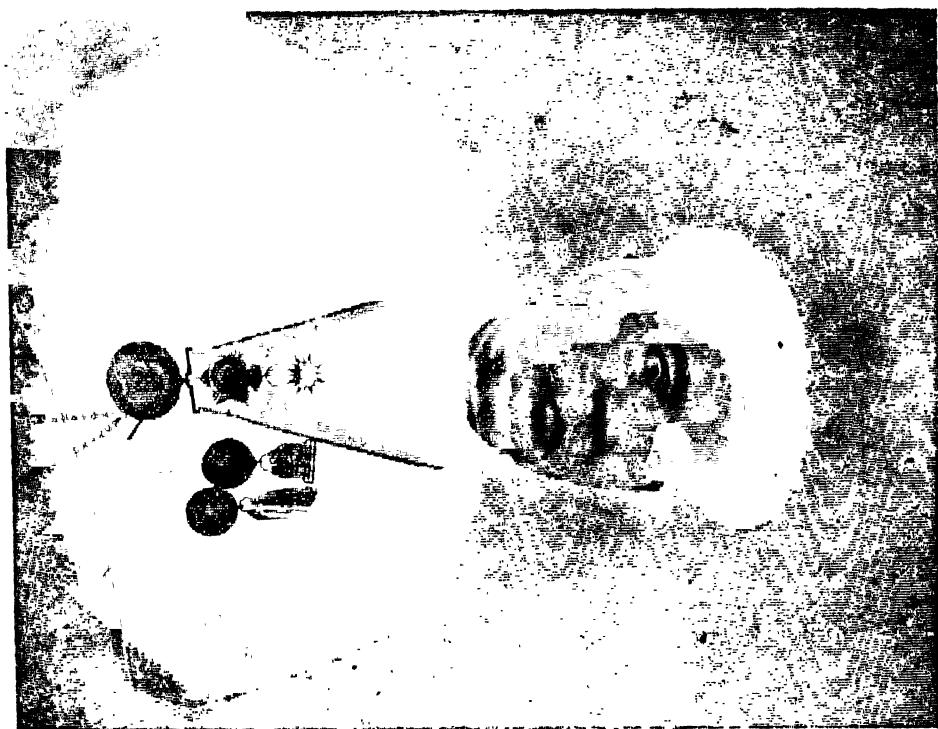
৺হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

করিয়া তিনি শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিবিধানে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার তিনটি উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান। প্রার্থনা করি, শ্রীভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

৺হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণনগরের স্বনামপ্রসিদ্ধ উকীল হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গগত হইয়াছেন। ১৮৬৬ অব্দের জানুয়ারী মাসে হুগলীতে মাতুলালয়ে হরিপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি তাঁহার পিতা কৃষ্ণনগরের গবর্ণমেণ্ট প্লীডার ৺যতুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দানশীলতা ও পরোপকার-প্রবৃত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তিলাভ করেন, কিন্তু তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী একটী বালক বৃত্তিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় তাহার শিক্ষাও বন্ধ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া হরিপ্রসাদ ঐ বালকটির সুবিধার জন্য বৃত্তি গ্রহণে অস্বীকার করেন। যে বালক এরূপ উচ্চ হৃদয়ের অধিকারী, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনও যে তদ্রূপ মহৎ হইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। গত ১৪ই জুলাই তারিখে ৫১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বিধবা পত্নী এবং পুত্রকন্যাগণ শোকে সান্ত্বনা লাভ করুন, ভগবানের নিকট ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রায় ৺বদরীদাস বাহাদুর।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর সোমবার অপরাহ্নকালে কলিকাতা, হ্যারিসন রোড, বড়বাজারনিবাসী অন্যতম জৈনপ্রধান রায় বদরীদাস বাহাদুর, মুকিম, পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য যেমন প্রচুর, তাঁহার বদান্যতাও সেইরূপ দেশবিশ্রুত ছিল। মাণিকতলা পার্শ্বনাথের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির এবং সোদপুরের পিঁজরাপোল তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মৃত্যুতে জৈনসম্প্রদায় একজন নেতা হারাইলেন। মৃত্যুকালে রায় বদরীদাসের বয়স ৮৫ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্র—রায়কুমার সিং ও রাজকুমার সিং—রায় বদরীদাস বাহাদুর এণ্ড সন্স নামক চৌরঙ্গীর সুবিখ্যাত জুয়েলারী দোকানের বর্ত্তমান অধিকারী।

সুবাদার কুমার অধিক্রম মজুমদার

কুমার অধিক্রম মজুমদার যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল রায় যতুনাথ মজুমদার বাহাদুর বেদান্তবাচস্পতি মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। ইনি ১৯১২ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ, এবং ১৯১৫ অব্দে বি-এল, পাশ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছিলেন। ১৯১৬ সালে যখন সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীকে সৈন্য-বিভাগে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন, তখন ইহার সৈন্য-বিভাগে যোগদান করিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তখন তিনি যশোহরে তাঁহার পিতার নিকট তাহার মনোভিলাষ জ্ঞাপন করেন। কুমার অধিক্রমের সৈন্য বিভাগে যোগদান করিবার একান্ত ইচ্ছা জানিতে পারিয়া রায় বাহাদুর যতুনাথ মজুমদার বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় (Dr. S. K. Mullick) ডাঃ এস, কে, মল্লিকের নিকট তাহা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে সৈন্য বিভাগের নিয়মাবলি সবিশেষ জানিয়া পুত্রকে সেনা-বিভাগে যোগদান করিতে সানন্দে অনুমতি প্রদান করেন। তদনুসারে কুমার অধিক্রম গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গালী ডবল্ কোম্পানীতে যোগদান করেন। তিনি গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গালী ডবল্ কোম্পানির দ্বিতীয় দলভুক্ত হইয়া নাউসেরা (Nowshera) যাত্রা করেন। সেখানে তিনি স্বীয় চেষ্টায়, যত্নে ও কার্য্যদক্ষতায় অল্প দিনের মধ্যেই পদোন্নতি লাভ করেন এবং ক্রমান্বয়ে (Lance Naik), ল্যান্সনায়ক, নায়ক (Naik) এবং তৎপরে হাবিল্দারের পদে উন্নীত হন। তাঁহারা তাহার পর নাউসেরা হইতে করাচী বন্দরে আসিয়া থাকেন। সেখানে কুমার অধিক্রম জমাদারের পদে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনি পুণায় যাইয়া Target-Shooting এ বিশেষজ্ঞ হইয়া পুনরায় করাচীতে আসেন। বর্ত্তমানে তিনি বাঙ্গালী পল্টনের সুবাদার হইয়া মেসোপোটেমিয়ায় অবস্থান করিতেছেন।

বাল্যকাল হইতেই কুমার অধিক্রম কিছু চঞ্চল-প্রকৃতির বালক ছিলেন। তিনি শিকারে খুব আসক্ত ছিলেন এবং বন্দুক ছুড়িতে ও অশ্বারোহণে খুব সুদক্ষ ছিলেন। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে কুমার অধিক্রমের মঙ্গল ও উন্নতি প্রার্থনা করি। তিনি রাজা এবং স্বদেশের কার্য্য করিয়া ও যশ, মান, প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসুন, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

কীর্ত্তন—একতালা।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন,
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম,
তোহারি চরণখানি॥

—"চণ্ডীদাস"

স্বরলিপি।

কথা—চণ্ডীদাস।] [স্বরলিপি—শ্রীরজনীকান্ত রায় দস্তিদার এম-এ,
এম্, আর, এস্, এ (লণ্ডন) ইত্যাদি।

২ ৩ ০ ১
না নর্সা I ধা না নর্সা | ধা পা পধা | মা পা পা | মপধপা মগা মা I
বঁ ধু০ তু মি সে০ আ মা র০ প্রা ০ ণ্ ০০০০ ০০ ০

২´ ২ ০ ১
I না নর্সা ধনা | ধা পা পধা | মা পা পা | -া -া -া I
তু মি০ সে০ আ মা র০ প্রা ০ ণ্ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ধর্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা | না র্সা না | না না নধপা I
দে০ হ ম ন আ দি০ তো হা রে স পে ছি০০

২´ ৩ ০ ১
I পা পধনা নধপা | পা পা পক্ষা | পা ধা -া | ধনা ধনর্সা না II
কু ল০০ শী০০ ল জা তি০ মা ০ ০ ০০ ০০০ ন্

২´ ৩ ০ ১
I সা রা রা | রা রা গা | মা পা পা | মধা পা মগা I
অ খি লে র না থ তু মি হে কা০ লি য়া০
পি রী তি র সে তে ঢা লি ত তু০ ম ন০
ক ল ঙ্কী ব লি য়া ডা কে স ব০ লো কে০
স তা বা অ স তী তো মা তে বি০ দি ত০

২ ৩ ০ ১
I মা পা পা | পা পধা পমা | পা ধা -া | ধনা ধনর্সা না I
যো গী র আ রা০ ধ্য০ ধ ০ ০ ন০ ০০০ ০
দি য়া ছি তো মা০ র০ পা ০ ০ ০০ ০০০ য়
তা হা তে না হি০ ক০ দু ০ ০ খ০ ০০০ ০
ভা ল ম ন্দ না০ হি০ জা ০ ০ নি০ ০০০ ০

২ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা | না র্সা না | না না নধপা I
গো প গো য়া লি নি০ হা ম অ তি হী না০০
তু মি মো র প তি০ তু মি মো র গ তি০০
তো মা র লা গি য়া০ ক ল ঙ্কে র হা র০০
ক হে চ ণ্ডী দা স০ পা প পু ণ্য স ম০০

২´ ৩ ০ ১
I পা পধসা নধপা | পা পা পক্ষা | পা ধা ধা | ধনা ধনর্সা না II
না জা০০ নি০০ ভ জ ন০ পূ ০ জ ন০ ০০০ ০
ম ন০০ না০০ হি আ ন০ ভা ০ ০ ০০ ০০০ য়
গ লা০০ য়০০ প রি তে০ সু ০ ০ খ০ ০০০ ০
তো হা০০ রি০০ চ র ণ০ খা ০ ০ নি০ ০০০ ০

গান ও স্বরলিপি

ভূপকল্যাণ—কাওয়ালী।

কথা ও সুর—স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়]　　　　[স্বরলিপি – শ্রীআশুতোষ ঘোষ

ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী,
গর্জ্জে সিন্ধু, চলিছে তরণী,
গম্ভীর রাত্রি গাহিছে যাত্রী,
ভেদি সে ঝঞ্ঝা উঠিছে স্বর,
"উঠ মা উঠ মা দেখ মা চাহি,
এইত এসেছি আর চিন্তা নাহি,
জননীহীনা কন্যা দীনা,
উঠ মা উঠ মা প্রদীপটি ধর"।
লঙ্ঘি বনানি পর্ব্বত রাজি
তোর কাছে আমি এইছি ত আজি,

কোথায় জননী, গভীর রজনী,
গর্জ্জে অশনি, বহিছে ঝড়।
একি, কুটীর যে মুক্তদ্বার,
নির্ব্বাণ দীপ, গৃহ অন্ধকার,
কোথায় জননী, কোথায় জননী,
শূন্য যে শয্যা, শূন্য যে ঘর।
সে ধ্বনি, উঠিয়া, আর্ত্ত নিনাদে
বিধাতৃ চরণে পড়িয়া কাঁদে,
চরণাঘাতে, বজ্র-নিপাতে,
মূর্চ্ছিয়া পড়িল সে অবনী পর।

"চন্দ্রগুপ্ত"।

\+ ৩ ০ ১
গ প গ — র র স স ন্ র স — ধ্ — প —
ঘ ন ত ম সা — বৃ ত অ — ম্ব র ধ র ণী —

\+ ৩ ০ ১
প্ ধ্ স স স — — — স র স রগ গ — — —
গ — র্জ্জে — সি — ন্ধু — চ লি ছে — ত র ণী —

\+ ৩ ০ ১
গ প — — — — — — গ প গ — — — — —
গ ভী — র রা — ত্রি — গা — হি ছে যা — ত্রী —

\+ ৩ ০ ১
র গ র র স — ধ — স র স রগ গ — — —
ভে — দি সে ঝ — ঞ্ঝা — উ ঠি ছে — স্ব — — র

\+ ৩ ০ ১
হ্মা — — — — — — — গ হ্মা ধ — প — — —
উ ঠ মা — উ ঠ মা — দে খ্ মা — চা — — হি

\+ ৩ ০ ১
হ্মা প ধ ধ — — — — প ধন প ধন ন — — —
এ ই ত এ সে ছি আ র চি ন্ তা — না — — হি

\+ ৩ ০ ১
ন র্ র্স — — — — — ন — — — ধ — — —
জ ন নী — হী — না — ক — ন্যা — দী — না —

\+ ৩ • ১
প — — — ম্ম — — — গ ম্ম পধ প প — — —
উ ঠ মা — উ ঠ মা — প্র দী প্ টি ধ — — র

\+ ৩ • ১
র্স — — — — — — — ন — ধ ধ ম্ম ধ প —
ল — ভি ব না — — নি প — র্ব ত য়া — জি —

\+ ৩ • ১
ম্ম পধ ধ ধ ধ — — — প ধ ন ন — — — —
তো র কা ছে এ ই আ মি এ ই ছি ত আ — জি —

\+ ৩ • ১
র্সা — — — — — — — ন — — — ধ — — —
কো থা — য় জ ন নী — গ ভী — র র জ নী —

\+ ৩ • ১
র গ ক্ষ — — — — — গ ক্ষ ধ — প — — —
গ — র্জে — অ শ নি — ব হি ছে — ঝ — — ড়

\+ ৩ • ১
স — — — — — — র গ — — — — — — —
এ — কি কু টী র যে মু — ক্ত — দ্বা — — র

\+ ৩ • ১
র গ ক্ষ — ক্ষ — — — গ ক্ষ প — — — — —
নি — র্বা ণ দী প গৃ হ অ — ন্ধ — কা — — র

\+ ৩ • ১
প — ধ — ধ — — — প ধ ন ন — — — —
কো থা — য় জ ন নী — কো থা — য় জ ন নী —

\+ ৩ • ১
ক্ষ প ধ ন ন — — — ক্ষ পধ নর্সা র্সা র্সা — — —
শূ — ন্য যে শ — য্যা — শূ — ন্য যে ঘ — — র

\+ ৩ • ১
স — — গ — — — — গ ক্ষ প — — — — —
সে — ধ্ব নি উ ঠি য়া — আ — র্ত্ত নি না — দে —

\+ ৩ • ১
প প ক্ষ পধ ধ — — — ক্ষ ধ ক্ষ ধন ন — — —
বি ধা — তৃ চ র ণে — প ড়ি য়া — কাঁ — দে —

\+ ৩ • ১
র্স — — — — — — — ন র্স ন ধ ক্ষ ধ প —
চ র ণা — ঘা — তে — ব — জ্র নি পা — তে —

\+ ৩ • ১
গ — — — র র স স স ন্ র স র্স — — —
— ছিঁ য়া প ড়ি ল সে অ ব নী — প — — র

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "পত্রপুষ্প" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কাশীনাথ" শীর্ষক গল্পের বই প্রকাশিত হইল। মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর "হালদার-বাড়ী" আট আনা সংস্করণের গ্রন্থমালার বিংশতিতম স্থান অধিকার করিল।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত "স্বেচ্ছাচারী" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত "সেখ-আন্দু" পুস্তকাকারে আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই বাহির হইবে। মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত নূতন নাটক "বঙ্গে রাঠোর" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীমতী অনিলাবালা দেবী প্রণীত "নূরলার ভুল" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচ সিকা।

শৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গল্পের বহি "মণিদীপ" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত "জননীর কর্ত্তব্য" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য দেড় টাকা।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত "শাস্তি কি শান্তি" ফুরাইয়া গিয়াছিল। বহুদিন পরে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মূল্য এক টাকা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'অভিনয়-শিক্ষা' ১০ই আশ্বিন প্রকাশিত হইবে; মূল্য দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "দরাফ-খাঁ"র সচিত্র জীবনী পূজার মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি-এল্ প্রণীত "কবিকথা" ২য় খণ্ড যন্ত্রস্থ; ইহাতে ভাস কবির গ্রন্থাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। নিখিলবাবুর "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" চতুর্থ সংস্করণও যন্ত্রস্থ; এই মাসেই বাহির হইবে।

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি-এ মহাশয়ের 'বিলাতী-হাওয়া' মূল্য দেড় টাকা ও 'ময়ূর-পুচ্ছ' মূল্য আট আনা, প্রকাশিত হইয়াছে।

চুঁচুড়া ফ্রেণ্ডস্ ডিবেটিং ক্লবের আগামী বৎসরের প্রবন্ধ-পুরস্কার নিম্নে লিখিত হইল। বিষয়—চুঁচুড়া, বর্ত্তমান ও অতীত (ইংরাজী) রায় মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের স্বর্ণপদক; বিষয় চুঁচুড়ার সাহিত্য-সমাজ (ইংরাজী) শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায়ের রৌপ্যপদক; বিষয়—হিন্দু গার্হস্থ্যের মূল ভিত্তি (বাঙ্গালা) বঙ্কুবিহারী রৌপ্যপদক; বিষয়—সীতার বনবাস রামের পক্ষে ন্যায়ানুমোদিত হইয়াছিল কি না? (বাঙ্গালা) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের রৌপ্যপদক। ৩১শে অক্টোবরের পূর্ব্বে উক্ত ক্লবের সম্পাদক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র আঢ্য চুঁচুড়া, এই ঠিকানায় প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কার্ত্তিক সংখ্যা "ভারতবর্ষ" ২০শে আশ্বিন তারিখে প্রকাশিত হইবে। ১৫ই আশ্বিনের মধ্যে ঠিকানা পরিবর্ত্তনের কথা জানাইতে হইবে।

কার্ত্তিক সংখ্যা "ভারতবর্ষে" কোনও নূতন বিজ্ঞাপন দিতে হইলে অথবা পুরাতন বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ৫ই আশ্বিনের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কাপি পাঠাইবেন।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Choudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.
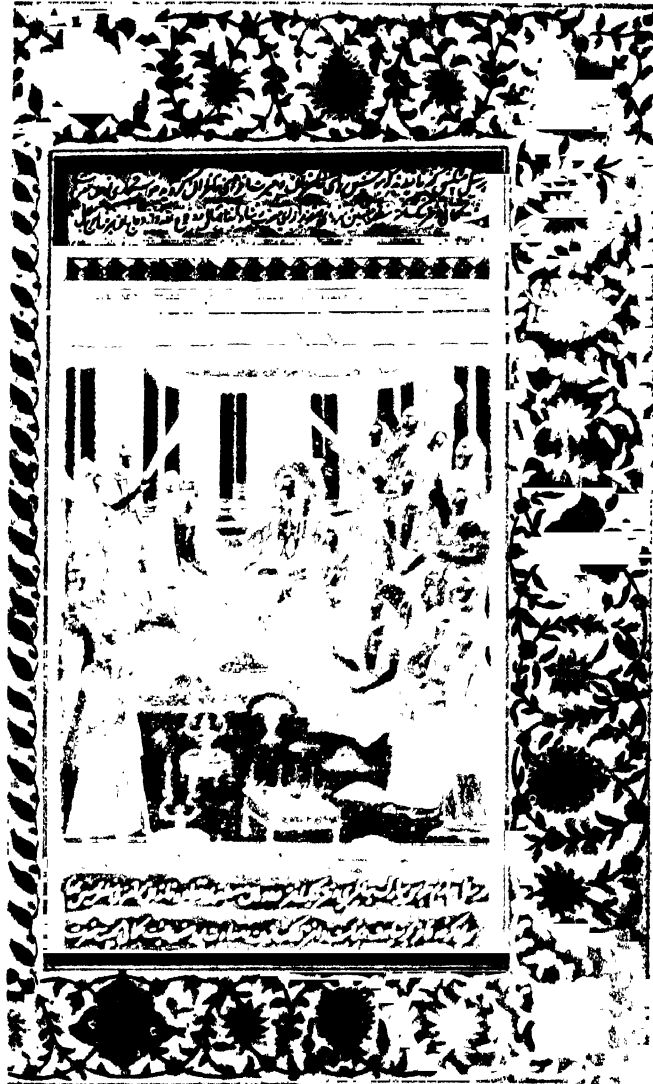
সম্রাট্ সাজাহানের সহিত বানুবেগমের বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববাগীশ মহাশয়ের সৌজন্যে

কার্ত্তিক, ১৩২৪

প্রথম খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [পঞ্চম সংখ্যা

জীব-জন্ম-তত্ত্ব

[শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু এম-এ, বি-এল]

গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে জীব-জন্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে :—

"মম যোনির্ম্মহৎব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥"

—১৪ অঃ ৩।৪।

এই শ্লোক অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা জীব-জন্ম-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কাল্পিক প্রলয়ান্তে জীব-সৃষ্টি

তৃতীয় শ্লোকে এই জগতের সৃষ্টি সময়ে সর্ব্বভূতের উৎপত্তিতত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, এবং চতুর্থ শ্লোকে জগতের স্থিতিকালে যে নিয়ত ভূতগণের জন্ম হইতেছে, তাহার তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। আমরা এই তত্ত্ব বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রলয়ান্তে জগতের সৃষ্টি হয়। বিশ্বের প্রলয় দুই রূপ—মহাপ্রলয় ও কাল্পিক প্রলয়। এই দুই রূপ প্রলয়ের কথা গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। তৃতীয় শ্লোকে যে ভূত-সৃষ্টির কথা আছে, তাহা প্রলয়ান্তে সৃষ্টি। কাল্পিক প্রলয়ান্তে যে রূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, তাহার তত্ত্ব উক্ত অষ্টম অধ্যায়ে, ১৮।১৯ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥"

এই কাল্পিক প্রলয়ে ভূতগণের একেবারে অত্যন্ত নাশ হয় না। তাহাদের ভূতত্ব বা জীবত্ব থাকে। তাহারা কেবল অবশ হইয়া, এই প্রলয় কালে অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়। বীজরূপে তাহারা অব্যক্তেই থাকিয়া যায়। আবার যখন কাল্পিক সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন সেই অব্যক্ত হইতেই আবার ভূতগণ ব্যক্ত হয়, তাহাদের প্রভব বা উৎপত্তি হয়।

এ কথা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়েও (২৮শ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে। যথা—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

উক্ত শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে যে, সূক্ষ্ম-শরীরী ভূতগণ স্থূল-শরীর গ্রহণ না করিলে অব্যক্ত ভাবে থাকে, স্থূল-শরীর গ্রহণ করিয়া তাহারা ব্যক্ত হয়; সুতরাং এই কাল্পিক প্রলয়ে ভূতগণের কোন স্থূল-শরীর থাকে না। কিন্তু তাহাদের পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ লিঙ্গ-শরীর বীজভাবে থাকে। প্রলয়ে ভূতগণ বা জীবগণ এই সূক্ষ্ম লিঙ্গ-শরীরযুক্ত থাকিয়া এই অব্যক্তে বিলীন হয়, এবং বীজভাবে সেই অব্যক্তে অবশ ভাবে রহিয়া যায়। তাহাতে এই লিঙ্গ-শরীরস্থ জীবাত্মার একেবারে বিনাশ হয় না। তাহাদের বিশেষত্ব বীজভাবে প্রকৃতিতে থাকিয়া যায়। সে বিশেষত্ব দূর হইলে জীবাত্মা লিঙ্গদেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, অবিশেষ ভাবে মিলাইয়া যাইত; এবং লিঙ্গ-শরীর তাহার কারণ মূল প্রকৃতিতে বা মায়াতে বিলীন হইত। কাল্পিক প্রলয়ে তাহা হয় না। সাগর-জলে জলবিন্দুর মিশ্রণরূপ লয় হয় না। যেমন অশ্বত্থবৃক্ষের বীজগুলি ক্ষেত্রে বপনের পূর্ব্বে বীজভাবে থাকে, জীব সেইরূপ এই কাল্পিক প্রলয়ে অব্যক্তে লীন থাকে। পরে যেমন অশ্বত্থবীজগুলি উপযুক্ত ভূমিতে উপ্ত হইলে, এবং জল-বায়ু-তাপাদির সহায়তা পাইলে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ কাল্পিক প্রলয়ের পরে অব্যক্ত হইতে স্থূল ভূতগণের বিকাশ হইলে, বা সমুদায় তত্ত্বের মূলরূপ অব্যক্ত হইতে আবার ভূ ভূর্ব স্বর্লোক সৃষ্ট হইলে, জীবাত্মা সেই অব্যক্ত হইতে উপযুক্ত স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া আবার ব্যক্ত হয়, বা শরীরী হয়। প্রলয়াবস্থায়ও প্রত্যেক জীব লিঙ্গদেহ-যুক্ত থাকিয়া যেমন বীজভাবে অব্যক্তে লীন থাকে, সেইরূপ তাহার সেই লিঙ্গ-দেহের সংস্কাররাশিবিশেষের সহিত সে জড়িত থাকে; সুতরাং কাল্পিক সৃষ্টিতে যখন অব্যক্ত হইতে তাহাদের পুনরুদ্ভব হয়, তখন সেই সংস্কার যেরূপ স্ফুটনোন্মুখ হয়, যে ভাবে প্রদ্যোতিত হয়, তাহার তদনুরূপ শরীর গ্রহণ করিয়া অব্যক্ত হইতে জন্ম বা উৎপত্তি হয়।

যোনিতে ভগবানের বীজ নিষেক করিতে হয় না। তবে অবশ্য সেই সৃষ্টির জন্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান আবশ্যক। কেন না, তাহার অধ্যক্ষতায় সেই কাল্পিক সৃষ্টিতেও প্রকৃতি স-চরাচর জগৎ প্রসব করে। ভগবানের অধিষ্ঠান ও অধ্যক্ষতা না থাকিলে, কোন সৃষ্টিই সম্ভব হয় না। (গীতা ৯।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ভগবান্ তাঁহার অধিষ্ঠান জন্যই, আপন কাল শক্তি দ্বারা প্রলয়ের পর স্ব-প্রকৃতিকে সৃষ্টি-কার্য্যে উন্মুখ করেন, এবং জীবগণের সংস্কারও স্ফুটনোন্মুখ করেন। এইরূপে কাল্পিক সৃষ্টি হয়। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা নিদ্রার পর জাগরিত হইয়া এই সৃষ্টি করেন। পরম পুরুষ পরমেশ্বর হিরণ্যগর্ভের দ্রষ্টৃরূপে অধিষ্ঠান করেন। হিরণ্যগর্ভ বা দ্বিতীয় পুরুষ হইতেই বিরাটের সৃষ্টি হয়। সেই বিরাট্ রূপ তৃতীয় পুরুষই এই বিশ্বরূপ। এই বিরাটই হিরণ্যগর্ভের জ্ঞেয় রূপ।

মহাপ্রলয়ান্তে ভূত-সৃষ্টি

অতএব বলিতে পারা যায় যে, এই শ্লোকে মহাপ্রলয়ান্তে যে সৃষ্টি হয়, তাহার কথাই উক্ত হইয়াছে। পুরাণে এই মহাপ্রলয়-তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে; শ্রুতিতে কোথাও তাহা স্পষ্টভাবে উক্ত হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। গীতাতেও পুরাণোক্ত দুই প্রকার প্রলয়ের কথা কোথাও উক্ত হয় নাই। একই প্রলয় বা কাল্পিক প্রলয়ের কথাই উক্ত হইয়াছে; ইহা আমরা উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি। সে যাহা হউক, কাল্পিক প্রলয়ের পর যখন ভূত-সৃষ্টি হয় না, তখন মহাপ্রলয়ের পর যে সৃষ্টি হয়, তাহাতেই ভূত-সৃষ্টি হয়। পুরাণ অনুসারে ইহা অবশ্য কল্পনা করিতে হয়। এই মহাসৃষ্টিতেই যেরূপে সর্ব্বভূতের সম্ভব বা উৎপত্তি হয়, তাহাই এ স্থলে উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মহাপ্রলয়ে ভূতগণের আর বীজভাবেও বিশেষ অস্তিত্ব থাকে না। তাহারা ভগবানের মায়াখ্য পরাশক্তিতে একেবারে অত্যন্ত বিলীন হইয়া যায়। অথবা তাহাদের ক্ষেত্রাংশ পরা ও অপরা প্রকৃতি এই মায়াতে বিলীন হয়। আর তাহাদের ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ভগবানের অংশ সেই এক ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বরে বিলীন হইয়া যায় এবং তাহাতেই নির্ব্বিশেষ ভাবে থাকে।

ভূত-যোনি প্রকৃতি

প্রলয়ের পরে যখন সৃষ্টি হয়, তখন এই মায়াখ্য পরাশক্তিতে জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়ার বিকাশ হয়। তাহা

কার্য্যোন্মুখ হইয়া প্রকৃতির বিকাশ হয়। সেই প্রকৃতি দুই রূপ—এক মায়াখ্য প্রকৃতি, ইহাই জীবত্বের মূল উপাদান; আর এক পঞ্চভূত, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনোরূপ অষ্টধা অপরা প্রকৃতি। এই দুই রূপ ভগবানের মায়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভগবানেরই প্রকৃতি। এই দুই প্রকৃতি মিলিত হইয়াই সমুদায় ভূতের যোনি হয়। ইহা গীতায় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয় ॥—(৭।৬)।

অতএব এ স্থলে যে ব্রহ্মকে ভূতগণের মহদ্‌যোনি বলা হইয়াছে, তাহা পরা ও অপরা প্রকৃতির মিলিত রূপ। এ স্থলে ব্রহ্মকেই এই প্রকৃতিরূপ সর্ব্বভূতের মহদ্‌যোনি বলা হইয়াছে। মহৎ অর্থে সকলের সর্ব্বব্যাপক কারণ। ইহা দেশ কাল নিমিত্ত দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। সাংখ্যদর্শনে আছে 'প্রকৃতের্ম্মহান্।' অর্থাৎ মূল ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাযুক্ত প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। সেই মহত্তত্ত্বই বুদ্ধিতত্ত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্ব হইতেই অন্য তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া জগতের বিকাশ হয়। অতএব প্রকৃতি এই মহত্তত্ত্বের কারণ বলিয়া তাহাকে মহৎ বলা যাইতে পারে। প্রাণও এই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই প্রাণকেও শ্রুতিতে মহৎ বলা হইয়াছে। প্রাণই এ সমুদায়, প্রাণই ব্রহ্ম,—ইহা শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই প্রাণ ও বুদ্ধিতত্ত্ব এই প্রকৃতির মূল রূপ। মায়াখ্য পরাশক্তির জ্ঞানক্রিয়া হইতে এই বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের প্রথম উৎপত্তি, এবং তাহার বলক্রিয়া হইতে নিঃসৃত ও কল্পিত হইয়া প্রাণের উৎপত্তি। ('প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ইতি কঠশ্রুতিঃ ৬।২)। অতএব প্রকৃতির —এই বুদ্ধি ও প্রাণরূপ মহৎ বলিয়া সর্ব্বভূত-যোনি উক্ত প্রকৃতিকে 'মহৎ' বলা হইয়াছে।

ভূত-যোনি প্রকৃতি ব্রহ্ম কেন ?

ব্যাখ্যাকারগণ ইহার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। শঙ্কর বলেন, এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়া স্ববিকার সকলের ভরণ হেতু ব্রহ্মশব্দ-বাচ্য। রামানুজ বলেন, শ্রুতিতে কোন-কোন স্থলে ইহা ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্বামী ও মধুসূদন বলেন, বৃংহণত্ব (বর্দ্ধনশীলত্ব) হেতু অথবা স্বকার্য্য সকলের বৃদ্ধি করেন বলিয়া, এই প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। বল্লভাচার্য্য-মতে স্বকার্য্য অপেক্ষা বর্দ্ধমান বলিয়া এই প্রকৃতি ব্রহ্ম। বলদেব বলেন, ইহা হইতে কোটী ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম। এই ব্যাখ্যাকারগণ কেহই এ ব্রহ্মের অর্থ যে উপনিষদ-প্রতিপাদিত ব্রহ্ম, তাহা বলেন না।

কিন্তু এ স্থলে এই বিশ্বের উৎপত্তি মহদ্‌যোনিকে ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম হইতেই এ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় হয়, তাহা বেদান্তদর্শনের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। যোনির এক অর্থ "আধার"। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"সবিত্রা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্মপূর্ব্বম্।

তত্র যোনিং কৃণ্বসে ন হি তে পূর্ত্তমক্ষিপৎ ॥—(২।৭)।

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, ব্রহ্মকে আশ্রয় পূর্ব্বক সাধনা করিলে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম আর বিক্ষেপকর হয় না। এ স্থলে যোনি অর্থে আশ্রয়; ব্রহ্মের জ্ঞেয় অব্যক্ত ভাবকে আশ্রয় করিয়া মায়া দ্বারা ভগবান্ কিরূপে বিশ্ব-সৃষ্টি করেন, স্বয়ং ব্রহ্মের জ্ঞাতৃরূপে কিরূপে নিমিত্ত কারণ হইয়া ব্রহ্মের জ্ঞেয় রূপকে উপাদান করিয়া বিশ্বসৃষ্টি করেন, তাহা সপ্তম অধ্যায়ের ব্যাখ্যা-শেষে বিবৃত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্ম জগৎকারণ হন। এজন্য ব্রহ্মকে যোনি বলা হয়।—

"তদ্‌বেদগুহ্যোপনিষৎসু গূঢ়ং

তদ্ ব্রহ্মা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্।" (শ্বেতাশ্বতর ৫।৬)

এ স্থলে যোনি অর্থে কারণ। ব্রহ্ম এ বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ, উপাদান-কারণ এবং অধিকরণ আধার। এইরূপে ব্রহ্ম এ বিশ্বের যোনি। পরম জ্ঞাতা মায়াশক্তিমান্ পরমেশ্বর, পরম জ্ঞেয় ব্রহ্মকে 'ভগ' কল্পনা করিয়া তাহাতে বহু কল্পনা-বীজ উপ্ত করিয়া, এ বিশ্বের সৃষ্টি-কারণ বলিয়া পরমেশ্বর 'ভগবান্'! তাই তাঁহাকে 'ভগেশ' বলে—

ধর্ম্মাবহং পাপনুদং ভগেশং, ইতি (শ্বেতাশ্বতর, ৬।৬)। যাহা হইতে উৎপত্তি হয়, তাহা যোনিস্বভাব। ভগবান্ "যোনিস্বভাবমধিতিষ্ঠত্যেকঃ।" (ঐ ৫।৪) ব্রহ্মই মূল যোনি বা কারণ।

উপনিষদ হইতে জানা যায় যে, যাহা সাংখ্যের প্রকৃতি, তাহা এই জগৎ-কারণ। পরব্রহ্মের অব্যক্ত প্রকৃতি-ভাবই এই জগৎ রূপে ব্যক্ত। এজন্য 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', এই শ্রুতিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, ব্রহ্মই এক, অদ্বিতীয়। তাঁহা হইতে কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নাই। এ জগতে যাহা কিছু আছে

তাহা ব্রহ্মেরই ভাব (Modes) মাত্র। এই প্রকৃতি যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই এই মহৎ প্রকৃতিকে ভগবান্ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। আমরাও এ তত্ত্ব পূর্ব্বে নানা স্থানে নানা রূপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে এই শ্লোকোক্ত তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আবার তাহার কতক উল্লেখ করিতে হইবে।

পরব্রহ্মের দুই ভাব,—নির্গুণ ভাব ও সগুণ ভাব। নির্গুণ ভাব আমাদের জ্ঞানের অতীত (unknowable)। সগুণ ভাব আমাদের জ্ঞানগম্য—এমন কি সগুণ ঈশ্বর ভাব সমগ্র রূপে আমাদের জ্ঞেয় হইতে পারে। এই সগুণ ব্রহ্ম হইতে, আমাদের নির্ম্মল জ্ঞানে আত্মস্বরূপে অবস্থান অবস্থায়, এই নির্গুণ ব্রহ্মও একরূপ জ্ঞেয় হন। চন্দ্র-মণ্ডলের যে দিক নিয়ত সূর্য্যাভিমুখে থাকে, তাহা আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। তাহার স্বরূপ আমরা কখন জানি না। তবে তাহার যে দিক্ আমাদের পৃথিবীর দিকে থাকে, তাহা আমরা জানিতে পারি, তাহার স্বরূপ আমাদের জ্ঞেয় হইতে পারে, এবং তাহা হইতে তাহার অপর সূর্য্যাভিমুখস্থ দিক্‌ও আমরা কতকটা অনুমান দ্বারা জানিতে পারি। এক অর্থে, এইরূপে সগুণ ব্রহ্ম হইতে নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞেয় হ'ন। অন্য ভাবেই সগুণ রূপ হইতে তাঁহার নির্গুণ রূপ আমরা জানিতে পারি; এ তত্ত্ব স্থানান্তরে বিবৃত হইয়াছে।

এই জ্ঞান মায়া-শক্তিহেতু বিকাশোন্মুখ হইলে, তাহা বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (অজ্ঞান) রূপে অভিব্যক্ত হয়। এ উভয়ই অক্ষর ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত।—

"দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বনন্তে
বিদ্যাবিদ্যে নিহিতে যত্র গূঢ়ে" (শ্বেতাশ্বতর, ৫।১)।

আমরা এইরূপে ধারণা করিতে পারি যে, পরব্রহ্ম নিত্য পরাশক্তিযুক্ত। আমরা যেমন তাঁহার নিত্য জ্ঞানরূপ ধারণা করি, সেইরূপ তাঁহার নিত্য শক্তিরূপও ধারণা করি। নির্গুণ ভাবে জ্ঞান অনন্ত পূর্ণ অবিশেষ ভাবে এক অর্থে বীজরূপে থাকে। সৃষ্টিপ্রসঙ্গে পরা শক্তিমান্ পরমজ্ঞাতা ব্রহ্ম ঈশ্বর রূপে এই বিদ্যা ও অবিদ্যার নিয়ন্তা হ'ন। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মশক্তি অনন্ত পূর্ণ অবিশেষ—নিষ্ক্রিয় অথবা এক অর্থে অব্যাকৃত বীজ ভাবে থাকে। সগুণ ব্রহ্মে যখন সেই জ্ঞান কার্য্যোন্মুখ হয়, ব্রহ্ম সেই জ্ঞানের ক্রিয়াহেতু জ্ঞান ও অজ্ঞান যুক্ত হইয়া 'বহু হইব' এইরূপ ঈক্ষণ বা সংকল্প করেন, সেইরূপ এই শক্তিও যখন কার্য্যোন্মুখ হয়, তখন ব্রহ্ম এই কার্য্যোন্মুখ শক্তিযুক্ত হইয়াই সগুণ ব্রহ্মের প্রকৃতি রূপ হ'ন। অতএব পরব্রহ্ম যেমন পরাশক্তি মায়া হেতু জ্ঞাতৃস্বরূপ, সেইরূপ মায়াখ্য জ্ঞেয় প্রকৃতি-স্বরূপ হ'ন। ব্রহ্ম এই পরমা মায়া হেতু পরম জ্ঞাতা ও পরম জ্ঞেয় উভয় রূপ হ'ন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। এজন্য এই মায়াকে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ী বলা যায়।

অতএব এই কার্য্যোন্মুখ মায়াময় ব্রহ্মই সগুণ। এই সগুণ রূপে পরব্রহ্ম যেন আপনাকে দ্বিধা করেন। এই দ্বিধা বিভক্তের ন্যায় সেই এক অবিভক্ত ব্রহ্মেরই এক রূপ পরমেশ্বর, আর এক রূপ জ্ঞান-বল-ক্রিয়ারূপ বিবিধ ভাবে বিকাশিত মায়া পরাশক্তির প্রকৃতি রূপ। পরমেশ্বর ভাবে তিনি পরম দ্রষ্টা, পরম জ্ঞাতা এক ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং পরা প্রকৃতি ভাবে তিনিই আপনার পরম দৃষ্ট, পরম জ্ঞেয় ক্ষেত্র হন।

পরম দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা-রূপে পরমেশ্বর, তাঁহারই স্বরূপ ও তাঁহারই দৃষ্ট ও জ্ঞেয় প্রকৃতিকে তাঁহারই স্বভূত জ্ঞান করেন। তাঁহার জ্ঞানে, এই পরম জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভিন্নরূপে থাকিয়াও স্বরূপতঃ অভিন্ন থাকে—আমি ও আমার এই দুই ভাবে ভিন্ন হইয়াও এক থাকে। এজন্য ভগবান্ এই প্রকৃতিকে আমার ও আমার যোনি বলিয়াছেন। (৮।২২ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

সর্ব্ব ভূতের মহদ্ ব্রহ্ম মাতা এবং ঈশ্বর পিতা

এস্থলে আমাদের আরও এক কথা বুঝিতে হইবে। পরম ব্রহ্ম এইরূপে পরমেশ্বর ভাবে পরম পিতা এবং পরা প্রকৃতি ভাবে তিনিই পরমা মাতা। পরমেশ্বর রূপে তিনি পুং-শক্তিযুক্ত, আর পরা প্রকৃতি রূপে তিনি স্ত্রী-শক্তিযুক্তা। পাণিনীয় দর্শনে আছে যে, পুং-শক্তি ত্যাগাত্মক, আর স্ত্রী-শক্তি গ্রহণাত্মক। পরমেশ্বর তাঁহারই মায়াখ্য প্রকৃতিতে তাঁহারই সংকল্পাত্মক বীজ ত্যাগ বা নিষেক করেন এবং সেই পরমা প্রকৃতি তাহা গ্রহণ করিয়া, স্বগর্ভমধ্যে তাঁহাকে পুষ্ট করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড এবং আরও কত কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন, সর্ব্বভূত প্রসব করেন; পুরাণে ইহা উক্ত হইয়াছে। এজন্য পরমেশ্বর পিতা ও এই মায়াখ্য পরাপ্রকৃতি মাতা। ভগবান্ জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াও তাঁহাকে পিতা বলা

যায়, এবং তাঁহার মায়া তাঁহারই পরাশক্তিস্বরূপ বলিয়া তাঁহাকে মাতা বলা যায়। সগুণ ব্রহ্মকে জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে—তিনি পিতা, আর শক্তির দিক দিয়া দেখিলে তিনি মাতা। পরমেশ্বর এই প্রকৃতিরূপ পরাশক্তিমান্ বলিয়া, এবং শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ বলিয়া, তিনিই এ জগতের পিতা, মাতা, ধাতা,--তিনিই জগতের প্রভাব ও প্রলয় স্থান (গীতা ৯।১৭-১৮)।

অতএব এই মায়াখ্য প্রকৃতিই যে পরব্রহ্মের একভাব, তাহা আমরা সংক্ষেপে বুঝিতে পারি। এই ভাবে পরব্রহ্মকে অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপা মায়াকে মাতৃরূপেও আমরা ধারণা ও উপাসনা করিতে পারি। সেই মাতৃভাব হইতে জগতে সর্ব্বত্র মাতৃভাবের বিকাশ হয়। ব্রহ্মই সর্ব্বভূতে পিতৃরূপে ও মাতৃরূপে অবস্থান করেন, পরমেশ্বর পরমেশ্বরী রূপে অবস্থান করেন। চণ্ডীতে আছে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

এই মাতৃভাবের প্রাধান্যে ভূতগণ স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হয় এবং পিতৃভাবের প্রাধান্যে পুংযোনি প্রাপ্ত হয়। আর এই পুংস্ত্রী-সংযোগেই সৃষ্টির অবস্থায় ভূতগণের জন্ম বা উৎপত্তি হয়। যাহা হউক, এ সকল গূঢ় তত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। চতুর্থ শ্লোক বুঝিবার সময় ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে।

সৃষ্টিকালে প্রকৃতিতে পরমেশ্বরের গর্ভনিষেক

মহাপ্রলয়ান্তে সৃষ্টির আরম্ভে পরব্রহ্মের এই পরাশক্তি মায়া কার্য্যোন্মুখ হইলেও ব্রহ্ম সগুণ ভাবে বা পরমেশ্বররূপে তাঁহার এই মায়ার কার্য্যোন্মুখ অবস্থা হেতু জ্ঞানে ঈক্ষণ করেন বা সংকল্প করেন। (ছান্দোগ্য ৬।২।৬)। অথবা 'কাম' যুক্ত হইয়া তপঃ করেন (তৈত্তিরীয়, ২।৬।১) যে আমি বহু হইয়া প্রকাশিত (manifest) হইব। এই বহু হইবার সংকল্পবশতঃ যেন পরমেশ্বরের 'কাম' বা ইচ্ছা দ্বারা যুক্ত হন, এবং সেই কামের সহিত স্বশক্তি মায়া প্রতি ঈক্ষণ করেন। এই ঈক্ষণই মায়াশক্তিরূপ ব্রহ্মে গর্ভাধান। ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই শ্রুত্যুক্ত 'ঈক্ষণ'ই যে এই গর্ভাধান, পরমাত্মা স্বপ্রকৃতিকে আপন যোনি কল্পনা করিয়া, তাহাতে গর্ভাধান করেন, ইহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।১৭) আছে:—"আত্মা এব ইদমগ্র আসীৎ এক এব, সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়।" ইতি।

হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি

এই ঈক্ষণ—বা স্বমায়াকে জায়ারূপে কামনা পূর্ব্বক ঈক্ষণ হইতেই পরমেশ্বরের এই পরাশক্তি রূপা প্রকৃতিতে, তাঁহার এই বহু হইবার এই "বহু স্যাং প্রজায়েয়" রূপ সংকল্প বীজ উপ্ত হয়। সেই বীজ পরমেশ্বরেরই স্বরূপ; তাঁহারই বহু হইবার ভাব। তাঁহারই আত্মা সেই বীজে অনুপ্রবিষ্ট। সেই বীজ হইতেই মহা প্রকৃতি গর্ভে প্রথমে হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি হয়। বলিয়াছি ত, এই হিরণ্যগর্ভই দ্বিতীয় পুরুষ। ইনিই জীবঘন (প্রশ্ন উপঃ ৫।৫)। তিনি ব্রহ্মের বহু হইবার বা বহু জীবরূপে ব্যাকৃত হইবার কল্পনার ঘন বিজ্ঞান রূপ। এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে—বা মায়াখ্য প্রকৃতির গর্ভে মহা জ্যোতির্ম্ময় বা হিরণ্য জ্যোতির্যুক্ত গর্ভে অবস্থান করিয়া পরমপুরুষের সেই বহু হইবার সংকল্পকে বহুরূপে বিকাশ করেন—অনন্ত প্রকার জীবজাতিকে বা জীববিশেষকে নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত করেন, এবং ব্যক্ত করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন। এই হিরণ্যগর্ভরূপ অক্ষর ব্রহ্ম এই প্রকার নাম-রূপময় উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া, বিভক্তের মত হইয়া, আত্মা স্বরূপে সেই কল্পিত নাম-রূপের মধ্যে প্রবেশ করেন। ইহাই জীব বীজ, হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মের মধ্যে স্থিত।

হিরণ্যগর্ভ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি

এই হিরণ্যগর্ভ সেই সর্ব্ব জীবের বীজ পরা ও অপরাপ্রকৃতিতে নিষেক করেন। ব্রহ্ম হইতে মায়ার পরিণামে আকাশাদি ক্রমে যে পঞ্চ মহাভূত এবং বুদ্ধি অহঙ্কার মনস্তত্ত্ব পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়া 'লিঙ্গ' উৎপন্ন হইয়াছিল (যাহা শিবময় ব্রহ্মেরই অষ্টরূপ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে) তাহার সহিত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত যে প্রাণরূপ পরা-প্রকৃতি তাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া বা এই অপরা ও পরা প্রকৃতি মিলিয়া যে সর্ব্বভূত যোনি উৎপন্ন

হইয়াছিল, সেই মহদ্ যোনিই এই সমুদায় নামরূপে ব্যাকৃত ও আত্ম দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট জীব-বীজ আপন গর্ভে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ব্রহ্মসত্তায় সত্তাযুক্ত ও ব্রহ্ম-শক্তিতে শক্তিযুক্ত করিয়া ও আপনারই উপাদান বা প্রকৃতির বিকৃতি—দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া, তাহাদের উক্ত অষ্টাদশ প্রকৃতি বিকৃতি ও বিকৃতিযুক্ত সূক্ষ্ম দেহের বিকাশ করেন এবং তাহার সহিত স্থূল ভূতের সংযোগ করিয়া দিয়া এবং এই রূপে তাহাদের ক্ষেত্রের রূপ শরীরের বিকাশ করিয়া দিয়া এই সর্ব্বভূতময় জগৎকে ভগবানের অধ্যক্ষে প্রসব করেন।

এই পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ সর্ব্বভূত-যোনি (৭।৫) যে ব্রহ্ম, তাহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে রামানুজ ও বলদেবের উদ্ধৃত শ্রুতি (মুণ্ডক ১।১।৯) উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্য শ্রুতি এই—

এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥"

(মুণ্ডক ২।১।৩)।

এই রূপে সেই হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের বহু হইবার সংকল্পাত্মক বীজ হইতে এই বিরাট বিশ্বরূপের সৃষ্টি হয়। বিরাট ব্রহ্মজ্ঞানের জাগ্রৎ রূপ, হিরণ্যগর্ভ সেই জ্ঞানের স্বপ্ন রূপ, আর পরমপুরুষ সেই জ্ঞান-স্বরূপের নিদ্রিত রূপ। নির্গুণ ব্রহ্ম সেই জ্ঞানস্বরূপ ও শক্তিস্বরূপ ব্রহ্মের তুরীয় রূপ।

অতএব পরম পুরুষের বহু হইবার সংকল্প বীজ প্রথমে তাঁহার পরাশক্তি মায়া-গর্ভে নিষিক্ত হইয়া হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষের উৎপত্তি হয়। পরে এই দ্বিতীয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বহু হইবার সংকল্প তাঁহার নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত করিয়া এবং তাহাতে আত্মারূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বহুজীব-বীজ বা জীবজাতির বীজ আপনাতে ধারণ করেন; সেই বীজ উক্ত পরা ও অপরারূপা প্রকৃতির গর্ভে নিষেক করেন। প্রকৃতিতে উপ্ত সেই গর্ভ হইতে বা এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগ হইতে সমুদায় সত্তার উৎপত্তি হয়। এইরূপে ব্যক্ত সর্ব্বভূতময় জগৎই বিরাট বা ভগবানের বিশ্বরূপ। তাহাই তৃতীয় পুরুষ বা সর্ব্বক্ষরপুরুষ। তাহা হিরণ্যগর্ভ রূপ ব্রহ্মের দৃষ্ট বা জ্ঞেয়। *

সৃষ্টির প্রারম্ভে গর্ভাধানের অর্থ

এই যে সৃষ্টির আরম্ভে মায়াখ্য, পরাশক্তিযুক্ত পরব্রহ্ম সগুণ ভাবে আপনাকে শক্তিমান্ ও শক্তিরূপে অথবা পরমেশ্বর ও পরাপ্রকৃতিরূপে দ্বিধা করেন, এবং পরমেশ্বর হইতে আপনার শক্তিরূপ প্রকৃতি নিজ গর্ভে জগৎ বীজ গ্রহণ করিয়া এই জড় জীবময় জগৎ প্রসব করেন, সৃষ্টি অবস্থায় প্রতি জীবের জন্মও তদনুরূপ। পিতা মাতৃ-গর্ভে রেতঃ সেক করিলে মাতৃ-শোণিত-যোগে মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া আমাদের জন্ম হয়। সর্ব্বত্র এই নিয়ম। সমষ্টির যে নিয়ম, ব্যষ্টিরও তাহাই। অতএব ব্যক্তি-বিশেষের স্থূল শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক মাতৃ গর্ভ হইতে জন্ম-তত্ত্ব বুঝিলে এই জগতের সর্ব্ব ভূতের আদি উৎপত্তি-তত্ত্ব আমরা-বুঝিতে পারিব। এ স্থলে তাহার বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। †

---

* প্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল তাঁহার Philosophy of Religion গ্রন্থে এইরূপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মোক্ত ত্রিত্ববাদের (Trinity) দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে—পরমেশ্বর পরমপুরুষ The Father। এই পরমপুরুষ যে প্রথম কল্পনা করিয়া, যেরূপে প্রকাশিত হন, তাহাই Logos—Idea, শব্দ-ব্রহ্ম; তাহাই The Son। খ্রীষ্ট তাঁহারই অবতারণ সেই Logos ই হিরণ্যগর্ভাখ্য দ্বিতীয় পুরুষ। আর তাহা হইতে যে বিরাটাখ্য তৃতীয় পুরুষের বিকাশ,—তাহা The Spirit বা Holy Ghost। এ জগৎ তাহারই বিকাশরূপ (Procession of the Spirit)। ইহা সেই দ্বিতীয় পুরুষের—The Logosএর বহুরূপে ব্যক্ত সংকল্পের the name বা Ideas সকলের রূপ (form) দ্বারা প্রকাশিত ভাব। প্রসিদ্ধ যুনানী দার্শনিক প্লেটোর মতেও "সত্যং শিবং সুন্দরং" বা সচ্চিদানন্দাত্মক (the good, the true and the beautiful) Idea জগতের মূল, তাহাই বহু হইয়া (বহু Idea হইয়া) জগতে অভিব্যক্ত হয়।

† পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যায় এই শ্লোক বুঝাইতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল:—

"দুই প্রকার ঘটনা দ্বারা সন্তানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহার একটিই এখানে দৃষ্টান্তের অবতারণা নিমিত্ত আবশ্যক হইয়াছে। অতএব সেই একটির প্রণালীই এখানে বলা যাইতেছে। অতীব সূক্ষ্ম—কেবল শক্তি মাত্র স্বরূপে অবস্থিত জীবসকল ঘটনাক্রমে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য অথবা নিশ্বাসবায়ুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহে প্রবেশ করে।

গর্ভবীজ

অতএব এই গর্ভ অর্থে শঙ্কর যে বলিয়াছেন,—হিরণ্য-গর্ভের জন্ম হেতু বীজ অথবা সর্ব্বভূতের জন্ম-কারণ স্বরূপ বীজ, তাহা সঙ্গত। মধুসূদন এই অর্থই বিবৃত করিয়াছেন। ইহাই এক অবিভক্ত ক্ষেত্রজ্ঞের বিভক্তের ন্যায় বিকাশিত বহু ক্ষেত্রজ্ঞ বীজ। ইহাই ক্ষর পুরুষ;. কিন্তু রামানুজ বলদেব প্রভৃতি এই 'বীজকে' জীবভূত পরা-প্রকৃতি বলিয়াছেন,—তাহা সঙ্গত নহে। এই পরা-প্রকৃতি যে প্রাণ-শক্তিমাত্র, তাহা ৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিবৃত হইয়াছে। শ্রুতিতে প্রত্যেক নাম-রূপাত্মক সংকল্প মধ্যে ব্রহ্মের আত্ম-স্বরূপে অনুপ্রবেশের কথা আছে, সেই জ্ঞানরূপ উপাধিযুক্ত আত্মাই বীজ, তাহা কেবল জড় প্রাণ শক্তিরূপ পরা প্রকৃতি নহে।

পরে তাহা এমত অভিন্ন ভাবে পিতার আত্মার সহিত মিশিয়া যায় যে, কোন প্রকারেও তাহাদের পার্থক্য অনুভব করা যায় না; যেন একেবারে একই হইয়া যায়। পরে যখন স্ত্রী আর পুরুষে যোগ হয়, তখন এই বিলীন শক্তিটুকু আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া পিতার দেহের অণুমাত্র ভৌতিক পদার্থ আশ্রয় পূর্ব্বক মাতৃ-জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া আবার মাতার দেহে একেবারে সমবেত হইয়া যায়; পরে মাতা হইতেই দেহের পুষ্টিসাধন পূর্ব্বক আবার মাতা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এক এক বার মহাপ্রলয়ের পর ব্রহ্ম আর প্রকৃতি হইতেও ঠিক এইরূপেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত যত প্রকার জন্য পদার্থ আছে, তৎসমস্তই মহাপ্রলয়কালে ত্রিগুণাত্মিকা বা ত্রিশক্তি স্বরূপা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়, তখন কোন প্রকার জন্য বস্তুই অস্তিত্ব থাকে না; একমাত্র প্রকৃতি ও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাবে মিশিয়া যায়। প্রত্যেক জীবের যে পৃথক-পৃথক জীবনীশক্তি আছে, তাহাও ঐ প্রকৃতিতেই বিলীন হইয়া যায়, কারণ উহাও প্রকৃতি-জন্য পদার্থ। ঐ দিকে প্রত্যেক জীবের অবলম্বন স্বরূপ বা আত্মা স্বরূপ যে পৃথক-পৃথক্ ও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র চৈতন্যের অনুভব হইতেছে, তৎসমস্তই সেই অপরিমিত চৈতন্য-সমুদ্রে এক হইয়া যায়, ইহাদের কিছুমাত্র পার্থক্যের অনুভব হয় না; তখন একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান থাকেন। পরে যখন মহাপ্রলয়ের অবসান হয়, তখন ঐ মায়া বা ত্রিগুণাত্মিক অথবা ত্রিগুণ শক্তিরূপা প্রকৃতির সহিত ঐ চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা বা পুরুষের পূর্ব্বোক্ত অধ্যাসস্বরূপ সংযোগ থাকাতে সেই পূর্ব্ব-বিলীন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র জীব চৈতন্য-গুলি সেই সুবৃহৎ চৈতন্য-স্বরূপ পিতা হইতে যেন পৃথক হইয়া পড়ে। তখন তাহারা সেই পূর্ব্ব-বিলীন আপন-আপন জীবনী-শক্তিও গ্রহণ করে, এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি স্বরূপা মাতার সহিত সমবেত হইয়া যায়। এই হইল প্রকৃতির গর্ভাধান ব্যাপার। পরে ঐ প্রকৃতি হইতেই জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং পোষণশক্তি সংমিশ্রিত বুদ্ধি, অভিমান ও মন ইন্দ্রিয়াদি শক্তি সংগ্রহ করিয়া অসংখ্য জীবের পৃথক-পৃথক্ কারণদেহ বা লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহ সংগঠিত হয়; তখনই জীবের পৃথক-পৃথক্ জন্ম হইল বলা যায়। তৎপর সেই জীব হইতেই প্রকৃতির অংশ সকল গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে ব্রহ্ম অবধি কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত প্রাণিদেহের বিকাশ হইয়াছে; অতএব ব্রহ্ম বা আত্মাই জগতের পিতা, এবং ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই এই জগতের মাতা।"

শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত সৃষ্টির আদিতে জীবসৃষ্টি তত্ত্ব

যাহা হউক, শ্রুতিতেও যে এইরূপে সর্ব্বভূত-সৃষ্টি-তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা বিবৃত হইলেও এ স্থলে তাহার শ্রুতি প্রমাণ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। যিনি সর্ব্ব দেবতার প্রভব ও উদ্ভবের কারণ, যিনি এই বিশ্বের অধিপ, তিনি—

"হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বম্।" (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৪)।

তিনি অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময় পুরুষ—

'য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ। (ছান্দোগ্য, ১।৬।৬)।

তিনিই প্রজাপতি—ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং প্রজাপতি হইতে দেবাদি ক্রমে সকল জীবের উৎপত্তি হইয়াছে—

'ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবান্ অসৃজৎ।' (বৃহদারণ্যক, ৫।৫।১)।

এই হিরণ্যগর্ভই অক্ষর ব্রহ্ম; তাঁহা হইতেই বিবিধ ভাবের উৎপত্তি হয়,—

"তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।"—(মুণ্ডক, ২।১।১)

এই অক্ষর পুরুষ বা হিরণ্যগর্ভ হইতে যিনি পর বা শ্রেষ্ঠ, সেই দিব্য (পরম) পুরুষই ব্রহ্ম—

"অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।"—(মুণ্ডক, ২।১।২)

এই হিরণ্যগর্ভ হইতে বহু হইবার সংকল্প অনন্তরূপ হইয়া, নামরূপ দ্বারা ব্যাকৃত হইয়া, সৃষ্টির অনন্তর ব্রহ্ম আত্মারূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, বীজরূপে হিরণ্যগর্ভ দ্বারা পরা ও অপরা রূপা প্রকৃতিতে উপ্ত হইয়া যে বিরাটের উৎপত্তি হয়, শ্রুতি অনুসারে সেই বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় স্থলে ব্যাপ্ত হয়।—

"যো * * * ব্রহ্মাণ্ডস্য অন্তর্বহির্ব্যাপ্নোতি—বিরাট্ * * *।" (রামোত্তর তাপনী, ৫।৩৮)।

সে যাহা হউক, হিরণ্যগর্ভাখ্য ব্রহ্ম হইতে কিরূপে প্রজা-

সৃষ্টি হয়, তাহার বিবরণ গূঢ়ভাবে বৃহদারণ্যকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল।—

"আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। সঃ অনুবীক্ষ্য নান্যৎ আত্মনোঽপশ্যৎ।" ১।৪।১

* * *

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ। সহৈতাবান্ আস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চ অভবতাম্। তস্মাদিদম্ অর্দ্ধ বৃগলমিব স্ব। ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাদয়মাকাশঃ। স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব তাং সমভবৎ। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত। ১।৪।৩

"সোহ ইয়ম ঈক্ষাঞ্চক্রে কথং নু মা আত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি, হন্ত তিরোঽসানি ইতি। সা গৌঃ অভবৎ, ঋষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ। ততো গাবঃ অজায়ন্ত বড়বা ইতরা অভবৎ, অশ্ব বৃষ ইতরঃ, গর্দ্দভী ইতরা, গর্দ্দভ ইতরঃ, তাং সমেবাভবৎ। তত্র একশফম্ অজায়ত। অজা ইতরা অভবৎ বস্ত ইতরঃ অবিঃ ইতরা মেষ ইতরঃ তাং সমেব অভবৎ। ততঃ অজা অবয়ঃ অজায়ন্ত। এবমেব যৎ ইদং কিঞ্চ মিথুনম্ আপিপীলিকাভ্যঃ তৎ সর্ব্বম্ অসৃজত॥" ১।৪।৪

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, "এই বিশ্ব অগ্রে আত্মাই ছিলেন। তিনি পুরুষাকার ছিলেন। তিনি ঈক্ষণ করিলেন, বা আলোচনা করিলেন, আত্মা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।"

"তিনি এইরূপে একাকী থাকিয়া রতি বা আনন্দ পাইলেন না। সেই হেতু একা কেহ আনন্দ পায় না। তিনি তাঁহার দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। তিনি এক আত্মা বা পুরুষ স্বরূপে যেন পুং স্ত্রী এই দুই ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনিই এইরূপ আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। তাহা হইতে পতি এবং পত্নী উৎপন্ন হইল। এই জন্য এই বিশ্ব স্বীয় আত্মারই যেন অর্দ্ধ বৃগল (বিকার) রূপ। সেই জন্য (আত্মা হইতে উদ্ভূত) আকাশ স্ত্রীরূপ দ্বারা পূর্ণ (পূরিত) হইয়াছিল। সেই স্ত্রীতে (শতরূপাখ্যা স্ত্রীতে) সেই পুরুষ উপগত হইয়াছিলেন। তাহা হইতেই এই মনুষ্যগণের উৎপত্তি।

"তখন সেই স্ত্রী (শতরূপা) ঈক্ষণ করিলেন, অর্থাৎ চিন্তা করিলেন, হায়! আত্মা আমাকে উৎপাদন করিয়া, কেন আমাতে উপগত হইতেছেন! আমি এখন তিরোহিত হই অর্থাৎ অন্য জাতিরূপে আপনাকে লুক্কাইত করি। সেই স্ত্রী তখন গো হইলেন। পুরুষও বৃষ হইয়া তাহাতে উপগত হইল। তাহাতে গো-জাতির উৎপত্তি হইল। সে স্ত্রী তখন ঘোটকী হইলে, পুরুষও ঘোটক হইয়া তাহাতে উপগত হইল। তাহাতে অশ্ব-জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী গর্দ্দভী হইলেন, পুরুষ গর্দ্দভ হইয়া তাহাতে উপগত হইল। তাহাতে এক-খুরযুক্ত গর্দ্দভ জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী তখন অজা হইলেন, পুরুষ অজ হইয়া তাহাতে উপগত হইল, ছাগ-জাতির উৎপত্তি হইল। স্ত্রী তখন অবী বা স্ত্রীমেষ হইল; পুরুষ পুংমেষ হইয়া তাহাতে উপগত হইল। এইরূপে মেষ জাতির সৃষ্টি হইল। এই-এই প্রকারে এই বিশ্বে ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে যে কোন জাতির মিথুন আছে (পুং স্ত্রী আছে) সে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (২।১৩।২) আছে—

"স য এবমেতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদ, মিথুনী ভবতি মিথুনাৎ মিথুনাৎ প্রজায়তে।" * * *

পুরাণে—বিশেষতঃ শ্রীভাগবতে, বিষ্ণুপুরাণে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই আদি সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ব্রহ্মা (হিরণ্যগর্ভ) হইতে চতুর্বিংশতি প্রকার ভূতগণের উৎপত্তি-তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে বিবৃত আছে। সঞ্চর (সৃষ্টি), প্রতিসঞ্চর (বিশেষ সৃষ্টি ও প্রলয়), মন্বন্তর প্রভৃতি বিস্তারিত বর্ণনই পুরাণের বিশেষত্ব। যাহা হউক পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব এ স্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার বহুরূপ হইবার সংকল্প বা মননই 'মনু'। এই মনুই প্রজাপতি। তাঁহার স্ত্রীই শতরূপা। এখানে শত অপরিমিত সংখ্যাবাচক। ইহাই প্রত্যেক জাতীয় জীবের কল্পনার (Ideas এর) তদনুযায়ী রূপ (form)। জীব-জাতি এক অর্থে অনন্ত রূপ, এজন্য ইহাকে (অনন্ত রূপা) শতরূপা বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, এস্থলে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এস্থলে মূল শ্লোকই উদ্ধৃত হইল—

"আসীদিদং তমোভূতম্ অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ অব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥

যোহসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্বভৌ॥
সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥

* * *

তস্মিন্ অণ্ডে স ভগবান্ উষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোৎ দ্বিধা॥

* * *

সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।

* * *

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহম্ অর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥"

(মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়, ৫—৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। ভগবান্ যে বলিয়াছেন—'ব্রহ্ম তাঁহার মহদ্ যোনি, তাহাতে তিনি গর্ভ নিষেক করেন বলিয়া সমুদায় ভূতের উদ্ভব হয়'— ইহার অর্থ আমরা শ্রুতি হইতেই জানিতে পারি। ইহার বিবরণ জানিতে হইলে, শ্রীভাগবৎ প্রভৃতি পুরাণের সাহায্য লইতে হইবে।

সর্ব্বযোনিতে সর্ব্বপ্রকার মূর্ত্তির উৎপত্তি

এক্ষণে কোন্ কোন্ যোনিতে কিরূপ মূর্ত্তি কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় আদি সৃষ্টিকালে কিরূপে সর্ব্বভূতের সমুদ্ভব হয়, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহার পর এ জগতের স্থিতিকালে আমরা দেখিতে পাই, ভূতগণ বার-বার জন্মগ্রহণ করিতেছে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। তাহারা বার-বার স্থূল শরীর সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে, অথবা মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে; আবার সে মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, সে শরীর হইতে বিযুক্ত হইয়া অন্তর্হিত হইতেছে। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, কাল্পিক সৃষ্টির স্থিতিকালে—

'ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।' (৮।১৯)

স্বামী বলিয়াছেন, কেবল যে সৃষ্টির উপক্রমেই আমার অধিষ্ঠান হেতু এই পুরুষ-প্রকৃতি-দ্বয় হইতে এইরূপে ভূতগণের উৎপত্তি হয়, তাহা নহে; সর্ব্বদাই এইরূপে মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া সর্ব্বভূতগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব এই জগতের স্থিতিকালে ভূতগণের কিরূপে এই উৎপত্তি হয়, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

মূর্ত্তির উৎপত্তি

সৃষ্টির প্রারম্ভে যে ভূতগণের উদ্ভব হয়, সে ভূতগণ লিঙ্গশরীর-যুক্ত অর্থাৎ তাহারা পরা ও অপরা প্রকৃতিযুক্ত। সমষ্টি পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ মহদ্‌যোনিতে যে পরিচ্ছিন্ন আত্মারূপ বীজ ব্রহ্ম পরমেশ্বররূপে নিষেক করেন, তাহা হইতে ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন পরা ও অপরা প্রকৃতিরূপ সূক্ষ্ম-শরীর যুক্ত হইয়া ভূতগণের বিভিন্নরূপে উৎপত্তি হয়, তাহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এই লিঙ্গশরীরী ভূতগণ অমূর্ত্ত। সংঘাত বা স্থূল শরীরের সহিত সংযুক্ত না হইলে তাহারা মূর্ত্ত হয় না, অর্থাৎ তাহারা ইন্দ্রিয়গোচর রূপ ও আকৃতিযুক্ত হয় না। সাংখ্য দর্শনে (৩।১৩ সূত্র) আছে, "মূর্ত্তত্বেঽপি ন সংঘাতযোগাৎ তরণিবৎ।" অর্থাৎ লিঙ্গ-শরীর মূর্ত্ত স্বীকার করিলেও সংঘাতরূপ আশ্রয় ব্যতীত তাহার মূর্ত্তত্ব বা মূর্ত্তরূপে প্রকাশ হয় না। সূর্য্য প্রকাশ-স্বরূপ হইলেও জড় আধার ব্যতীত যেমন তাহার প্রকাশ হয় না, লিঙ্গশরীরও সেইরূপ। এই সংঘাত বা স্থূল শরীর যোগে ভূতগণের মূর্ত্তি গ্রহণ কিরূপে হয়, তাহা এ স্থলে উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বযোনি

ব্যাখ্যাকারগণের মতে সর্ব্বযোনিতে যে সকল মূর্ত্তির উৎপত্তি হয়, সেই সব যোনি—দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ, মনুষ্য, পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপাদি, দেবাদি স্থাবরান্ত সমুদায় যোনিতে জরায়ুজ অণ্ডজ উদ্ভিজ্জাদি-ভেদে বিভিন্ন ও বিবিধ সংস্থানযুক্ত তনুর (বা মূর্ত্তি সকলের) উৎপত্তি হয়। এক্ষণে আমরা এই তত্ত্ব বুঝিব।

প্রথমেই বলিতে হইবে যে, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ প্রভৃতির মূর্ত্তি সূক্ষ্ম-ভৌতিক। তাহা আমাদের এই চর্ম্মচক্ষুর গোচর নহে। যোগদৃষ্টিতে বা শাস্ত্রদৃষ্টিতে তাহাদের দর্শন হইতে পারে। অর্জ্জুন ভগবৎ-প্রসাদে দিব্য-চক্ষু পাইয়া এ সব দেখিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের উৎপত্তি আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। শাস্ত্র হইতে আমরা

ইহার বিবরণ জানিতে পারি। মনুসংহিতায় প্রথমে সংক্ষেপে ইহা উক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণেও ইহা বিবৃত হইয়াছে। তাহাদের মূর্ত্তি যে যোনিজ এবং মহৎ ব্রহ্মরূপ যোনিতে তাহাদের বীজ-নিষেক হইতে ব্রহ্মাদি ক্রমে তাহাদের যে উৎপত্তি, ইহা আমরা কেবল শাস্ত্র হইতেই জানিতে পারি। তবে মর্ত্ত্য-লোকে মনুষ্যাদি ক্রমে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর যে উৎপত্তি হয়, তাহার তত্ত্ব আমরা বিজ্ঞান-সাহায্যে জানিতে পারি।* তাহাদের সম্বন্ধে গীতোক্ত এই তত্ত্ব কত দূর প্রযোজ্য, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আমরা পূর্ব্বে তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখিয়াছি যে, পুরুষ ও স্ত্রীর সংযোগ বা মিথুন হইতে সকল প্রকার জীব মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ পুরুষের রেতঃ স্ত্রীগর্ভে উপ্ত হইলে, সেই রেতোমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট লিঙ্গশরীরী জীব সূক্ষ্ম বীজভাবে অর্থাৎ স্থূল ভৌতিক দেহের বীজ সহ মাতার জরায়ুস্থ অণ্ডে (ovum) প্রবিষ্ট হইলে মাতৃযোনি-যোগে সেই স্থূল-শরীর বীজ হইতে সেই জীবের স্থূল-শরীর ভ্রূণ রূপে বিকাশ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে সেই ভ্রূণ উপযুক্ত বা আপনার কর্ম্মানুরূপ মাতা-পিতৃজ শরীর গ্রহণ ও পুষ্টিলাভ করিয়া গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব এই সর্ব্বযোনি অর্থে সর্ব্বজাতীয় জীবের স্ত্রী-যোনি।

যোনিজ জীব

শ্রুতিতে অনেক স্থলে 'যোনি' শব্দের উল্লেখ আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই যোনি অর্থে উৎপত্তি-স্থান। কোথাও বা যোনি অর্থে কারণও বুঝা যায়। এ স্থলেও যোনি অর্থে উৎপত্তি-স্থান। জীবের উৎপত্তি-স্থান স্ত্রী-যোনি। সকল জীবই যোনিজ। শাস্ত্র অনুসারে জীবগণকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়,—জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও স্বেদজ। (ঐতরেয় উপঃ, ৫।৩)। উক্ত চারি প্রকার জীবই যোনিজ ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

জরায়ুজ জীব

জরায়ুজ জীবমাত্রেই যে পুংস্ত্রী-সংযোগে স্ত্রী-যোনি হইতে উৎপন্ন, তাহা সকলেই জানেন। শাস্ত্র অনুসারে যে সকল জীব পুণ্যবলে উর্দ্ধলোকে গিয়া পরে কর্ম্ম-ক্ষয়ে আবার মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা জরায়ুজ। তাহারা প্রায়শঃ স্তন্যপায়ী। ইহঁাদের মধ্যে স্ত্রীজাতীয় জীবে মাতৃ-শক্তির বিশেষ বিকাশ হয়। সন্তান লালন-পালনেই সে শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়।

এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই জরায়ুজ জীবগণ মৃত্যুর পর লোকান্তরে গমন করিতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেবল মানুষই দেবযানে বা পিতৃযানে উর্দ্ধ-লোকে গমন করে। তাহারা পুনর্জ্জন্ম কালে সেই উর্দ্ধ-লোক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জন্মগ্রহণ করে। অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুর পর প্রেত-লোকে বা অন্তরীক্ষ-লোকে থাকে, তাহাদের উর্দ্ধগতি হয় না। নিম্ন জীব—বিশেষতঃ অণ্ডজাদি জীব এই পৃথিবীতেই থাকে, তাহাদের উর্দ্ধগতি হয় না। তাহাদের লোককে জায়স্ব ম্রিয়স্ব লোক বলে। মৃত্যুর পর যে জীব যে লোকে যাউক, পুনর্জ্জন্ম কালে তাহাদের কিরূপে জন্ম হয়, তাহা এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

অণ্ডজ জীব

অণ্ডজ জীবসকলও জরায়ুজ জীবের ন্যায় যোনিজ। পুরুষ ও স্ত্রী-সংযোগে স্ত্রীগর্ভে অণ্ডের উৎপত্তি হয়; স্ত্রীগর্ভেই সে অণ্ডের পুষ্টি হয়। স্ত্রী সেই অণ্ডই প্রসব করে। পরে তাপাদি সাহায্যে সেই অণ্ড পরিণত হইলে, তাহা হইতে সেই জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। কোথাও বা পুং-স্ত্রী-সংযোগের পূর্ব্বে স্ত্রীগর্ভে অণ্ডের উৎপত্তি হয়; পরে পুং-সংযোগ হইলে সে অণ্ড জীববীজ গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে জীবের উৎপত্তি হয়। পক্ষী প্রভৃতি এইরূপ অণ্ডজ। ইহাদের মধ্যেও স্ত্রীজাতীয় জীবে মাতৃশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সে অণ্ডে পুং বীজের যোগ না হয়, তবে সে অণ্ড (বাওয়া ডিম্) হইতে কোন জীবের উৎপত্তি হয় না।

স্বেদজ জীব

ইহারাও প্রকৃত পক্ষে অণ্ডজ। মক্ষিকা-মশকাদি স্বেদজ। তাহাদেরও পুং-স্ত্রী-সংযোগে স্ত্রীতে গর্ভের উৎপত্তি

---

* আধুনিক জীব বিজ্ঞানে এই তত্ত্ব বিবৃত আছে। এ সম্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে ডারুইন প্রণীত "Origin of the Species" ও হেকেল প্রণীত "Origin of Man' উল্লেখযোগ্য। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিতে পারেন।

আমরাও পূর্ব্বে এ তত্ত্ব আমাদের শাস্ত্র অনুসারে 'সমাজ ও তাহার আদর্শ" নামক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে মানুষের জন্ম বিবৃত করিতে গিয়া সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহা দ্রষ্টব্য।

হয় এবং স্ত্রীগর্ভে বহু ডিম্বের জন্ম হয়। ইহাদের মধ্যে মাতৃশক্তির বিকাশ এই পর্য্যন্ত। তাহার পর গর্ভে এই সকল ডিম্ব উপযুক্তরূপে পরিপুষ্ট হইলে, সেই গর্ভস্থ ডিম্ব সকল স্বেদ বা মলিন পূতিগন্ধযুক্ত জলে পয়ঃস্থানে বা জলসংপৃক্ত ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়। সেই স্বেদে বা আবিলজলে স্বাভাবিক উষ্মা দ্বারা সেই অণ্ড বর্দ্ধিত হইলে, পরে সেই ডিম্ব হইতে সেই জাতীয় জীবগণের উৎপত্তি হয়। দংশ, মশক, মক্ষিকা, কৃমি, কীটাদি সমুদায় স্বেদজ জীবের জন্ম এইরূপ।

মনুসংহিতায় আছে—

"পশবশ্চ মৃগাশ্চৈব ব্যালাশ্চোভয়তোদতঃ।
রক্ষাংসি চ পিশাচাশ্চ মনুষ্যাশ্চ জরায়ুজাঃ॥
অণ্ডজাঃ পক্ষিণঃ সর্পা নক্রা মৎস্যাশ্চ কচ্ছপাঃ।
যানি চৈবম্প্রকারাণি স্থলজানোদকানি চ॥
স্বেদজং দংশমশকং যুকা মক্ষিকমৎকুণম্।
উষ্মণশ্চোপজায়ন্তে যদ্‌বান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্॥

মনুসংহিতা, প্রথম অধ্যায় ৪৩—৪৫ শ্লোক।

এই জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ জীব জঙ্গম। অতি ক্ষুদ্রজাতীয় জঙ্গম জীবের জন্ম এইরূপ যোনিজ—পুংস্ত্রী-সংযোগে উৎপন্ন। আপাততঃ কোন-কোন স্বেদজ জীবাণুকে অযোনিজ মনে হয়। কিন্তু আধুনিক জীব-বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, কেহই অযোনিজ নহে। এই শ্রেণীর অনেক জাতীয় জীবের দেহে পুংস্ত্রী উভয় লিঙ্গই থাকে (ইহাদের নাম (hermaphrodites)। ইহাদের উৎপত্তিও এই পুংস্ত্রী-সংযোগেই হইয়া থাকে। অনেক ক্ষুদ্র জীবাণুতে এই পুংস্ত্রী ভাবের বিকাশ প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। কিন্তু তাহা না হইলেও ইহারা যে যোনিজ ও স্ত্রীপুংশক্তি-সংযোগ-জাত, তাহা বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছে (amæba. protozoa প্রভৃতি)। অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর (bacillus) জন্মেরও এই নিয়ম। অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর শরীরে (protoplasm) এই পুংশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি (cell, grem ও sperm) উভয়ই থাকে। এই সকল ক্ষুদ্র জীবাণু ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে,—পুংশক্তি-বীজ (protoplasm) এবং স্ত্রীশক্তি-বীজ (cell) উভয়ই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি জীবাণুর উৎপাদন করে, তাহারা প্রত্যেকে আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়। এইরূপে ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। এ স্থলেও সেই এক জীবাণু শরীরে পুংশক্তি স্ত্রীশক্তি উভয়ের যোগদ্বারা বাহ্যপ্রকৃতির সাহায্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তবে দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং দুইটি জীবাণুর উৎপাদন করে। অতএব এই স্থলেও যে এই সকল ক্ষুদ্র জীবাণু—পুংস্ত্রী-শক্তি-সংযোগে যোনিজ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে সমুদায় জঙ্গম জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়। জীব-বিজ্ঞানে এই সকল তত্ত্ব বিবৃত আছে।

স্থাবর উদ্ভিজ্জ জীব

স্থাবরের মধ্যে উদ্ভিদ্‌ও যে এইরূপ যোনিজ এবং পুংস্ত্রী-শক্তি যোগে উৎপন্ন, আধুনিক বিজ্ঞান তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উদ্ভিদ্ যে জীব, তাহা অধুনা জীব-বিজ্ঞান স্বীকার করেন। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, তাহাদের জন্ম বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ আছে। তাহাদের (inspiration, respiration, digestion, assimilation এবং circulation রূপ) বিভিন্ন প্রাণক্রিয়াও আছে। শাস্ত্রমতে তাহাদের অন্তঃসংজ্ঞা ও সুখ দুঃখানুভূতিও আছে। নানারূপে ইহাদের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রে আছে—

"উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ সর্ব্বে বীজকাণ্ডপ্ররোহিণঃ।
ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্পফলোপগাঃ॥
অপুষ্পাঃ ফলবন্তো যে তে বনস্পতয়ঃ স্মৃতাঃ।
পুষ্পিণঃ ফলিনশ্চৈব বৃক্ষাস্তূভয়তঃ স্মৃতাঃ॥
গুচ্ছগুল্মন্তু বিবিধং তথৈব তৃণজাতয়ঃ।
বীজকাণ্ডরুহাণ্যেব প্রতানা বল্ল্য এব চ॥
তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ"

মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায় ৪৬।৪৯ শ্লোক।

ইহা হইতে জানা যায় যে, স্থাবর উদ্ভিজ্জগণকে—বৃক্ষ, ওষধি, বনস্পতি, গুচ্ছ, গুল্ম, তৃণ, প্রতান ও বল্লী এইরূপ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করা যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বীজ হইতে জন্মে, এবং কতকগুলি রোপিত শাখা বা কাণ্ড হইতে, এমন কি, পত্র হইতেও উৎপন্ন হয়। অতএব উদ্ভিদের উৎপত্তি দুই প্রকার,—এক বীজ হইতে, আর এক শাখাদি হইতে। যাহারা বীজ হইতে উৎপন্ন, তাহারা যে পুংস্ত্রী-শক্তি সংযোগে স্ত্রীগর্ভ হইতে হয়, তাহা উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানে বিবৃত হইয়াছে। এ সকল উদ্ভিদের পুষ্প হয়। পুষ্প মধ্যে কতকগুলি পুংজাতীয়

—পরাগকেশরযুক্ত, কতকগুলি স্ত্রীজাতীয় - গর্ভকেশরযুক্ত; এবং কতকগুলি উভয়জাতীয়—অর্থাৎ একই পুষ্পে পরাগকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই থাকে। এই শেষ জাতীয় পুষ্পে সহজেই পুংস্ত্রী রেণুর সংযোগ হয়। বায়ু-সাহায্যে পুংরেণু স্ত্রীরেণু যুক্ত হয়। যে স্থলে একই বৃক্ষে বা লতাদিতে এক জাতীয় পুষ্প পরাগকেশরযুক্ত, আর এক জাতীয় গর্ভকেশর যুক্ত, সে স্থলেও পরাগকেশর বায়ু চালিত হইয়া অন্য পুষ্পস্থ গর্ভকেশরেযুক্ত হয়। কিন্তু যে স্থলে এক বৃক্ষ কেবল পুংজাতীয় পুষ্প ধারণ করে, এবং সেই জাতীয় বৃক্ষের অন্যটি কেবল স্ত্রীজাতীয় পুষ্প ধারণ করে, সে স্থলে কেবল বায়ুর চালনায় এইরূপ পুংজাতীয় পুষ্পরেণু স্ত্রীজাতীয় পুষ্পে সংযুক্ত হইতে পারে না। সে স্থলে ভগবানের বা প্রকৃতি দেবীর কৌশল আশ্চর্য্য। পুষ্প সকল সুন্দর মধুযুক্ত হয় এবং ভৃঙ্গ-মধুমক্ষিকা প্রভৃতি মধুসংগ্রহ জন্য কিংবা সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাতায়াত করে। তাহারাই এক পুষ্পের পরাগ কেশর বহিয়া অন্য পুষ্পের গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিয়া দেয়। এইরূপে এই সকল স্ত্রীজাতীয় পুষ্প, তাহার গর্ভকেশরে পুংজাতীয় রেণু গ্রহণ করিয়া গর্ভযুক্ত হয়। এই গর্ভই তাহার ফল। এই ফলের মধ্যেই সেই জাতীয় উদ্ভিদের বীজ ধৃত হয় এবং যথাসময়ে সেই বীজ ভূমিতে উপ্ত হইলে, সেই জাতীয় বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। এ স্থলে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগ ও স্ত্রী-গর্ভে বীজের পুষ্টিই ইহাদের উৎপত্তির কারণ।

যে স্থলে উদ্ভিদসকল রোপিত শাখা বা কাণ্ডাদি হইতে জন্মে, সে স্থলে সেই শাখা বা কাণ্ড দ্বারা সেই পূর্ব্ব বৃক্ষেরই অনুবৃত্তি হয় মাত্র; অর্থাৎ সেই শাখা বা কাণ্ডে সেই বৃক্ষের যে শক্তি নিহিত থাকে, তাহা দ্বারাই সে শাখাদি হইতে সেই বৃক্ষের বিকাশ হয়। সেই বৃক্ষাদির প্রতি শাখায় বা কাণ্ড মূলে, এবং কোন জাতীয় বৃক্ষের পত্রেও সেই বৃক্ষাদির সন্ধিস্থল থাকে, সেই সন্ধিতেই সেই জাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করিবার বীজ বা শক্তি থাকে। সেই সন্ধিস্থলে সেই বৃক্ষের স্ত্রীপুংশক্তির সংযোগ থাকে বলিয়াই তাহা সেই বৃক্ষের বীজ ধারণ করে। সে সন্ধি স্থলই সেই বৃক্ষের যোনি ও গর্ভ; সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। যে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ জাতীয় জীবাণুর অস্তিত্ব কেবল উপযুক্ত অণুবীক্ষণের সাহায্যেই জানিতে পারা যায়, তাহারাও এইরূপে অতি ক্ষুদ্র জঙ্গম-জাতীয় জীবাণুর ন্যায় স্ত্রী ও পুংশক্তি-সংযোগে স্ত্রীযোনি হইতে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান হইতে আমরা এ সকল তত্ত্ব জানিতে পারি।

অতএব সাধারণতঃ আমরা সমুদায় জঙ্গম ও উদ্ভিজ্জ-জাতীয় সত্তা, যাহাদের জীব বলি তাহারা, অবশ্য স্ত্রীপুংশক্তি-যোগে পুংবীজ হইতে স্ত্রীযোনিতে জন্মগ্রহণ করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কোন জীবেরই আকস্মিক সৃষ্টি হইতে পারে না। কাল, স্বভাব, যদৃচ্ছা নিয়তি ইহারা ভূতযোনি নহে। স্বগুণে নিগূঢ় দেবাত্ম শক্তিই উক্ত নিখিল কারণকে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সেই ব্রহ্মশক্তিই আমাদের জন্ম, জীবন এবং অভ্যুদয়ের কারণ। (শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ১।১-৩)। সেই সর্ব্বনিয়ন্তার পরাশক্তিতেই সমুদায় নিয়মিত। সেই নিয়ম-বশেই পুংস্ত্রী শক্তি যোগে স্ত্রীযোনি হইতে এই সকল জীবের উৎপত্তি হয়। কোনরূপ জড়সংঘাত হইতে হঠাৎ কোন জাতীয় জীবের বা জীবাণুর উৎপত্তি হয় না,—হইতেও পারে না। ইহা আধুনিক বিজ্ঞানেরও সিদ্ধান্ত। প্রাণ হইতেই প্রাণের উদ্ভব (Life from life only) ইহা এক্ষণে সর্ব্বত্র স্বীকৃত। জীব হইতেই জীবোৎপত্তি হয় (Biogenesis), জড় হইতে কখন জীবোৎপত্তি (Abiogenesis) হয় না এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই, ইহা পরীক্ষা দ্বারা আধুনিক জীব-তত্ত্ববিজ্ঞান (Biology) সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অন্য স্থাবর জীব

যাহা হউক জঙ্গম জীব ও স্থাবর উদ্ভিদ সম্বন্ধে সকলেরই যে যোনিতে উৎপত্তি, স্ত্রীপুংশক্তি যোগে যে তাহাদের জন্ম, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু অন্য স্থাবর সত্তা সম্বন্ধে যে এই নিয়ম, তাহা আমরা সহজে ধারণা করিতে পারি না। যে কোন সত্তা ভাববিকারযুক্ত অর্থাৎ তাহারই উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্ষয় বিনাশাদি ষড়ভাব বিকার আছে, এইরূপ যে সত্তা স্থূলমূর্ত্তিযুক্ত, সেই দেহেরই উৎপত্তি বৃদ্ধি ক্ষয় লয় আছে; এক কথায় যাহা কিছু মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়, এবং ক্রমপরিণতি-নিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া শেষে বিনষ্ট হয়, তাহাই যোনিজ এবং পুং-স্ত্রী-শক্তি-যোগে যোনিতে উৎপন্ন; এ কথা আমরা সহজে বুঝিতে

পারি না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত প্রাণ-শক্তিই পরা-প্রকৃতি। তাহা সর্ব্ব-ব্যাপ্ত। শ্রুতিতে আছে—'প্রাণই এ সমুদায়'—তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (৭।৪ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। যাহা কিছু আমরা দেখিতে পাই, সকলই এই প্রাণ-শক্তিযুক্ত, সকল সত্তাই এক অর্থে প্রাণী। তবে যাহাদের জীবনী-শক্তি অভিব্যক্ত, প্রাণ-ক্রিয়া প্রকটিত, তাহাদিগকেই আমরা সাধারণ ভাবে জীব বা প্রাণী বলি; এবং যাহাদের মধ্যে এই প্রাণ বা জীবনী-শক্তি অনভিব্যক্ত, যাহাদের জন্ম, স্থিতি, বিনাশ প্রভৃতি ষড়ভাব-বিকাশ আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর নহে, তাহাদিগকে আমরা জড় বলি। এই ব্যাবহারিক প্রভেদের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

পরমাণু ও অণু

আধুনিক জড়বিজ্ঞান (Chemistry) সমুদায় জড়কে অতি ক্ষুদ্র অণুরাশির সংঘাতে সংগঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। বিভিন্ন ভূতগ্রামের সংঘাতকে বিশ্লেষণ করিয়া, জড়-বিজ্ঞান অনেক প্রকার মূল পরমাণুর (Elements) আবিষ্কার করিয়াছেন। বৈশেষিক-দর্শনের পরমাণুবাদ বিজ্ঞান এক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সজাতীয় বা বিজাতীয় পরমাণুগণের (atoms) মিশ্রণে দ্ব্যণুক ত্রসরেণু প্রভৃতি ক্রমে অণুগণের (molecules) সৃষ্টি হয়, এবং এই সকল সজাতীয় ও বিজাতীয় নানারূপ অণুর সংযোগে অনন্ত-প্রকার জড়-সংঘাতের উৎপত্তি হয়। যে জড়-সত্তা বিভিন্ন অণুবিশেষের সংযোগে উৎপন্ন হয়, সেই সংঘাতের বিশ্লেষণ হইলে সে জড়-সত্তার নাশ প্রতীয়মান হয়। ইহাই আধুনিক জড়বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

স্ত্রী ও পুংজাতীয় পরমাণু ও তাহাদের যোগে জড় মূর্ত্তির উৎপত্তি।

বিজ্ঞান আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই পরমাণু ও অণুগণের মধ্যে কতকগুলি ত্যাগাত্মক (positive) ও কতকগুলি গ্রহণাত্মক (negative)। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাহারা ত্যাগাত্মক তাহাদিগকে পুং-শক্তিযুক্ত বলা যায়; এবং যেগুলি গ্রহণাত্মক, তাহাদিগকে স্ত্রী-শক্তিযুক্ত বলা যায়। পুং-শক্তিযুক্ত (positive) পরমাণু বা অণু স্ত্রী-শক্তিযুক্ত (negative) পরমাণুকে বা অণুকে আকর্ষণ করিয়া উভয়ে সংযুক্ত হয়। পরমাণু ও অণুর মধ্যে আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যান-রূপ দুই শক্তির ক্রিয়া হয়। এই আকর্ষণের মূলকে রাগ বলা যায়, এবং এই প্রত্যাখ্যানের মূলকে দ্বেষ বলা যায়। পুং-শক্তিযুক্ত পরমাণু অপর পুং-শক্তিযুক্ত পরমাণুকে এই বিরাগহেতু প্রত্যাখ্যান করে, এবং স্ত্রী-শক্তিযুক্ত পরমাণুকে রাগহেতু আকর্ষণ করে। এই রাগ ও বিরাগ উভয়ের সমবেত ক্রিয়ায় বা যোগেই বিভিন্ন সত্তার সৃষ্টি হয়। আমরা এই অর্থে সাংখ্য দর্শনের যে সূত্র "রাগ বিরাগয়োযোগঃ সৃষ্টিঃ"—ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি। কোন অণু-সংঘাতে পুং-শক্তিযুক্ত পরমাণু যদি প্রবল না হয়, তবে অপর কোন জড়-সংঘাতের পুং শক্তি প্রবলতর হইলে, তাহাকে আনুষঙ্গিক অবস্থার সাহায্যে পরাভূত করিয়া সেই সংঘাতের স্ত্রী-শক্তি-বিশিষ্ট অণুসমষ্টির সহিত যুক্ত হইয়া, এক জড়-সংঘাতকে বিশ্লেষণপূর্ব্বক অন্য জড় সংঘাতের সৃষ্টি করিতে পারে। এইরূপ বিভিন্ন সংযোগ বিয়োগরূপ ক্রিয়া হইতে নানারূপ জড় সংঘাতের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়।

অতএব এ স্থলেও স্ত্রী-পুং-শক্তি সংযোগে জড়-সংঘাতের বা নানারূপ স্থাবর সত্তার উৎপত্তি হয়—ইহা জড়বিজ্ঞান হইতেই অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে জড় পুং-শক্তি-যুক্ত অণু বা পরমাণু, যে স্ত্রী-শক্তিযুক্ত অণু বা পরমাণুতে মিলিত হইলে, সেই স্ত্রী জাতীয় অণু বা পরমাণুর জড়োৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতে যে জড়ের উৎপত্তি হয়, সে তত্ত্ব এখনও স্পষ্ট আবিষ্কৃত হয় নাই। জড়ের এই আকর্ষণ শক্তির নাম, আণবিক আকর্ষণ (chemical affinity)। ইহা ব্যতীত জড়ে যে বিভিন্ন জড়-শক্তি নিহিত, তন্মধ্যে বিদ্যুৎ (ilectricity) এবং চুম্বক (magnetism) এই দুই শক্তিও যে কার্য্যোৎপত্তির সময় ত্যাগাত্মক (পুং—positive) ও গ্রহণাত্মক (স্ত্রী negative) এই দুই রূপে দ্বিধা বিভক্ত হয়, বিজ্ঞান অধুনা তাহা আবিষ্কার করিয়াছে। উক্ত আণবিক আকর্ষণও যে এই বৈদ্যুতিক শক্তির রূপান্তর, এবং তাহাও এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত পুং-স্ত্রী-শক্তিরূপ, তাহাও অনেকে সিদ্ধান্ত করেন। এইরূপে আমরা সেই একই নিয়মের অভিব্যক্তি, এবং সর্ব্বত্র স্থাবর জড়বর্গের পুং-স্ত্রী-সংযোগ হইতে উৎপন্ন, তাহা বুঝিতে পারি, এবং তাহাদের যোনিজত্বও আমরা ধারণা করিতে পারি।

পুং-স্ত্রী-শক্তিযোগে পরমাণুর উৎপত্তি

এ সম্বন্ধে আরও এক কথা আমাদের বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞান যে পরমাণুগুলিকে মূল তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাও যে মূল তত্ত্ব নহে, অধুনা বিজ্ঞান তাহা একরূপ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন-জাতীয় পরমাণুও যে পুং-স্ত্রী-শক্তিযুক্ত দুইরূপ ক্ষুদ্রতর পরমাণু হইতে উৎপন্ন, তাহা অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের ইংরাজী নাম Ions অথবা Electrons। এক-একটি পরমাণু এইরূপ পুংজাতীয় (positively electrified) এবং স্ত্রীজাতীয় (negatively electrified) বহু ক্ষুদ্রতর পরমাণু (Ions) দ্বারা গঠিত। আমরা আরও বলিতে পরি যে, সর্ব্বব্যাপক এক অনন্ত শক্তির যে জড় তড়িৎ-শক্তিরূপ, তাহা যখন কোন স্থানে কোন কারণে পুং (positive) ও স্ত্রী (negative) শক্তিরূপে বিভক্ত হইয়া যায়, তখন কেবল সেই স্থানেই তাহাদের পুনঃসংযোগ চেষ্টায় ক্রিয়ার অভিব্যক্তি হয়। সেইখানেই এই বিভিন্ন electronsদের উৎপত্তি হয়। হয় ত এই জড় শক্তির আধার আকাশে (Ether এ) এইরূপে সে শক্তির অভিব্যক্তি হয়। এইরূপে যে Elcatron-দের সৃষ্টি হয়, তাহাদের কোনটি পুংজাতীয় ও কোনটি স্ত্রীজাতীয় হয়; এবং তাহাদেরই নানারূপ সংযোগ-বিয়োগাত্মক সংঘাত বা সংস্থান হইতে নানা জাতীয় পরমাণুর সৃষ্টি হইয়া থাকিবে এবং পরমাণুগণও স্ত্রীপুংভেদে বিভক্ত হইয়া দ্ব্যণুকাদি অণুর উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকিবে; এবং পরে সেই সংঘাতের বিশ্লেষে তাহাদের লয়ও হইতে পারে। কোন-কোন জাতীয় পরমাণুর (radium) সৃষ্টিনাশ ইহারই মধ্যে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহার যত ক্ষুদ্রতম পরমাণু-মূর্ত্তি থাকুক না কেন, তাহার মধ্যেও এই ত্যাগাত্মক পুং-শক্তি, এবং গ্রহণাত্মক স্ত্রীশক্তি নিহিত; এবং তাহাদের সংযোগ হইতে যে সেই সব মূর্ত্তির বিকাশ, ইহা আমরা ধারণা করিতে পারি।

যে কোন মূর্ত্তির (form) সম্ভব হয়, তাহা অবশ্য কোন আধার বা অধিকরণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহার অবশ্য উৎপত্তি-স্থান থাকে। সেই উৎপত্তি-স্থানকেই যোনি বলে। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যে কোন সত্তা মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া ব্যক্ত হয়, তাহা অবশ্য যোনিতেই উৎপন্ন হয়, এবং উৎপত্তির পরে সে যোনি হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। সকল সত্তাই এইরূপে পুং-স্ত্রী-শক্তিযোগে যোনিতে উৎপন্ন হয়। তাহাকে ভগবান্ এক অর্থে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ বলিয়াছেন। এ কথা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই সব মূর্ত্তির একই মহদ্ যোনি বা মহদ্ ব্রহ্ম এবং একই বীজপ্রদ পিতা—পরমেশ্বর ইহার অর্থ কি

আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বিভিন্ন যোনিতে যে সকল মূর্ত্তির উদ্ভব হয়, তাহার কারণ পুং-স্ত্রী-সংযোগ, এবং স্ত্রী-গর্ভে পুরুষকর্ত্তৃক বীজ-নিষেক। এ স্থলে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, নানারূপে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত সেই সর্ব্বভূত-যোনিকে এক অবিভক্ত মহদ্ ব্রহ্ম বলিয়াই বুঝিতে হইবে, এবং বিভিন্ন যোনিতে যে বিভিন্ন পিতা বীজ-নিষেক-পূর্ব্বক গর্ভোৎপাদন করেন, সেই সমস্ত বিভক্তের ন্যায় স্থিত পিতাকে এক অবিভক্ত পরমেশ্বর বলিয়াই ধারণা করিতে হইবে। পরাশক্তিযুক্ত সগুণব্রহ্ম আপনাকে যেন দ্বিধা বিভক্ত করেন, একেন এবং একার্দ্ধ পরমপুরুষরূপ পরম পিতা, অন্যার্দ্ধ পরাপ্রকৃতিরূপ পরমা মাতা হইয়া এ সৃষ্টিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহা আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। যিনি পরমপুরুষ পরমেশ্বর পরম পিতা, তিনিই সমগ্র জগতের এক অবিভক্ত পুং-শক্তি-যুক্ত; আর যিনি পরা-প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরমা মাতা, তিনিই সমগ্র জগতের এক অবিভক্ত স্ত্রী-শক্তিময়ী। সর্ব্বত্রই সেই এক পিতৃ-শক্তি ও মাতৃ-শক্তির বিকাশ। সেই এক পিতৃ-শক্তি ও মাতৃ-শক্তি অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় অনন্তভাবে অনন্তরূপে জগতে ব্যক্ত। প্রতি পুংজাতীয় জীব সেই পরমেশ্বর হইতেই পুংশক্তিযুক্ত, প্রত্যক স্ত্রীজাতীয় জীব সেই পরমেশ্বরী হইতেই সেই স্ত্রীশক্তিযুক্ত। আর তাঁহারাই পুংস্ত্রী-শক্তি-রূপে প্রতি জীবে অবস্থিত।

এ লোকে জীবজাতি অসংখ্য এবং প্রতিজাতীয় জীবের সংখ্যাও একরূপ অনন্ত। প্রতি মুহূর্ত্তে কত কোটী জীব জন্মিতেছে, কত কোটি মরিয়া যাইতেছে। এক মানুষের কথা ভাবিলেই জানা যায় যে, প্রতিদিন এ পৃথিবীতে লক্ষাধিক মানুষ জন্মিতেছে, এবং প্রায় এক লক্ষ লোক

মরিতেছে। এইরূপ নিত্য জন্মমৃত্যু-প্রবাহের মধ্য দিয়া এই সংসার কাল-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। স্রোতস্বিনী নদীর জল যেমন নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে; এ মুহূর্ত্তে নদীর কোন স্থানে যে জল দেখিতেছি, পর মুহূর্ত্তে তাহা অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে, অথচ তাহাতে নদীর রূপের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতেছে না, সেইরূপ এই জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ মধ্য দিয়া জীবগণ কালস্রোতে ভাসিয়া যাইলেও, এ সংসারের বড় কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। আজ মানুষ প্রভৃতি যে সকল জীব এ পৃথিবীতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান, শত বর্ষ পরে তাহাদের প্রায় কেহই থাকিবে না। তখন অন্য জীব মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান থাকিবে,—কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন বুঝা যাইবে না। এইরূপে এ সংসারে যে নিয়ত অসংখ্য জীব-মূর্ত্তির উৎপত্তি হইতেছে, ইহারা কোথা হইতে আসিতেছে? ইহারা ত সকলেই কোন বিশেষ ভাবে বিকাশিত যোনিতে বিশেষ পুং-স্ত্রীশক্তিযোগে পিতৃ বীজ হইতে মাতৃ-গর্ভে উৎপন্ন হইতেছে। সকলেরই মাতা পিতা ভিন্ন।

এই অনন্ত ভেদের মধ্যে আমরা কিরূপে একত্ব দর্শন করিব? কিরূপে বুঝিব যে, একই পরমপিতা সর্ব্বজীবের বীজপ্রদ পিতা, এবং একই মাতৃরূপিণী পরমাপ্রকৃতি সর্ব্বজীবের যোনি ও সকলের গর্ভধারিণী মাতা? এই একত্ব দর্শন ব্যতীত প্রকৃত দর্শন সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সে একত্ব দর্শন কিরূপে সম্ভব?

পরাশক্তিহেতু ব্রহ্মের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব

আমরা সামান্য ভাবে ইহা একরূপ বুঝিতে পারি। পরম পুরুষ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সমভাবে স্থিত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; এবং ব্রহ্মও যে অবিভক্ত হইয়াও বিভক্তের ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তরে বাহিরে স্থিত, ইহাও উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও পরাশক্তি-হেতু সগুণরূপে সেই শক্তিরই—জ্ঞান ও বল ক্রিয়া দ্বারা এই কার্য্যাত্মক জগৎ হইয়া ব্যক্ত। সেই শক্তি-স্বরূপ ব্রহ্ম অথবা সেই ব্রহ্মরূপা শক্তিই প্রকৃতিরূপে পরমা মাতা। তিনিই সর্ব্বভূতের ধারণ, পোষণ ও রক্ষণ-শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিতা। এইজন্য বলিতে পারা যায় যে, সর্ব্বভূতস্থ ঈশ্বরই সর্ব্বভূতে, সমভাবে অবস্থিত থাকিয়া, তাঁহারই পিতৃ-শক্তিদ্বারা সর্ব্বভূতকে পিতৃ-শক্তিযুক্ত করেন, এবং এইরূপে বীজপ্রদ পিতা হন। আর সেই সর্ব্বভূতস্থ পরমাপ্রকৃতিই সর্ব্বভূতের অন্তরে, এবং তাহার ক্ষেত্ররূপে থাকিয়া মাতৃ-শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে মাতৃ-শক্তিযুক্ত করেন, এবং এইরূপে সকলের গর্ভধারিণী মাতা হ'ন। এ তত্ত্ব পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

প্রত্যেক জাতীয় জীবের পুং-স্ত্রী-বিভাগ

সৃষ্টির প্রারম্ভে আত্মা বা ব্রহ্ম আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, এক ভাবে পুরুষরূপ ও অন্য ভাবে স্ত্রীরূপা হন, তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি সগুণ হইয়া পরমপুরুষ ও পরমা প্রকৃতি রূপ, বা পরমেশ্বর-পরমেশ্বরী রূপ হন। প্রথম সৃষ্টিতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা এই আদি পুরুষ ও স্ত্রী সংযোগে উৎপন্ন হয়, এবং যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাও এই পুরুষ স্ত্রী শক্তিযুক্ত হয়। প্রত্যেক উৎপন্ন জীবে ব্রহ্মই পুরুষ স্ত্রীরূপে অবস্থান করেন। প্রত্যেক ভূত-মধ্যে পরমেশ্বর পরমেশ্বরী অবস্থিত হ'ন। পরমেশ্বর পুং-শক্তিরূপে ও পরমেশ্বরী স্ত্রী-শক্তিরূপে থাকেন। পিতৃ-শক্তি মাতৃ শক্তি উভয়ে লীলারূপে 'রমণার্থ' মিলিত থাকেন। এই উভয়রূপা শক্তি পরস্পর মিলিত থাকিয়া একশক্তি আর এক শক্তিকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করেন। ইহারই ফলে কোন ক্ষেত্রে পুং-শক্তির আধিক্য থাকে, কোন ক্ষেত্রে বা স্ত্রী শক্তির আধিক্য থাকে। যাহাতে পুংভাবের আধিক্য থাকে তাহা পুংজাতীয়, এবং যাহাতে স্ত্রীভাবের আধিক্য থাকে তাহা স্ত্রীজাতীয়। জগতের স্থিতিজন্য, অথবা বৈষ্ণব দার্শনিকগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করেন, জগৎরূপে লীলাজন্য, ব্রহ্মই ভগবান-ভগবতীরূপে প্রতি জীবে অবস্থিত, এবং বিভক্ত হইয়া যেন বিভিন্ন জীবে কোথাও পুংভাবে ও কোথাও স্ত্রীভাবে অবস্থিত। তাঁহারা প্রত্যেক জাতীয় জীবকে দুইভাগে বিভক্ত করেন,—এক ভাগ স্ত্রীরূপ, এবং অন্যভাগ পুংরূপ হয়। এক ভাগ বীজপ্রদ পিতা হয়, আর এক ভাগ গর্ভধারিণী মাতা হয়। মহামায়া পরমেশ্বরী যে এইরূপে সর্ব্ব স্ত্রীজাতিতে বিভক্তের ন্যায় হইয়া বিশেষ ভাবে অবস্থিতা, তাহা চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে; যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"—তিনিই বিশেষভাবে সর্ব্বস্ত্রীজাতিতে আবির্ভূতা; সকল স্ত্রীই তাঁহার অংশ—

"স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।" (চণ্ডী)

সেইরূপ ভগবান্‌ও পুংশক্তিরূপে অবস্থিত, এবং বিশেষ ভাবে সর্ব্বপুংজাতীয় জীবে এই পুং-শক্তিরূপে অবস্থিত। স্ত্রীজাতীয় জীবে পুং-শক্তি অপেক্ষা স্ত্রী-শক্তিরই অধিক বিকাশ বলিয়া তাহারা স্ত্রী, আর পুংজাতীয় জীবে স্ত্রী-শক্তি অপেক্ষা পুং-শক্তির অধিক বিকাশ বলিয়া তাহারা পুংজাতীয়।

প্রত্যেক জাতীয় জীবের পুংস্ত্রী-সংযোগ

ভগবান্‌ই প্রজনন-শক্তিরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত। এই প্রজনন-শক্তি মধ্যে যাহা 'কন্দর্প' এবং 'কাম', তাহা ভগবানেরই বিভূতি। কামই প্রজনন-শক্তির বিশেষ বিকাশ। উন্নত জাতীয় জীবে এক অর্থে জরায়ুজ, অণ্ডজ, এমন কি স্বেদজ জীবেও এই প্রজনন-শক্তি জীবপ্রবাহ রক্ষার জন্য (preservation of the species) কাম রূপে বিকাশিত হয়। এই 'কাম' দ্বারা স্ত্রী পুরুষ পরস্পর আকৃষ্ট হয়। তাহার দ্বারাই প্রত্যেক জাতীয় জীবের পুরুষ-স্ত্রী সংসর্গ হয়। তাহা দ্বারাই পিতার দ্বারা মাতৃগর্ভে রেতঃসেক হয় ও স্ত্রীতে গর্ভ-সঞ্চার হয়; এবং সেই গর্ভ হইতে যে জাতীয় জীবের উৎপত্তি হয়, স্ত্রী-পুং-সংযোগকালে যে শক্তির আধিক্য থাকে, তদনুসারে সেই জাতীয় জীব স্ত্রীজাতীয় বা পুংজাতীয় হয়। ভগবান্‌ই এইরূপে সর্ব্বভূতের বীজদাতা বা বীজপ্রদ পিতা হ'ন। কোন জাতীয় জীবের উৎপত্তির জন্য সেই জাতীয় পুরুষের রেতঃমধ্যে বীজভাবে তাহার প্রবেশ প্রথম প্রয়োজন, এবং সেই রেতঃ সহ স্ত্রীর গর্ভে অণু প্রবেশ ও মাতৃ-গর্ভে পুষ্টির প্রয়োজন। এই জীব-বীজ স্বয়ং ভগবান্। তিনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন—

"যচ্চাপি সর্ব্বভূতানং বীজং তদহমর্জ্জুন।"

—(গীতা, ১০৩৮)।

উচ্চজাতীয় জীবের জন্ম সম্বন্ধে যে নিয়ম, বলিয়াছি ত নিম্নজাতীয় জীবের—অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার স্থাবরাদির জন্ম সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। তবে নিম্নজাতীয় জীব সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগের জন্য যে 'কাম' বা 'কন্দর্প' রূপ প্রজনন-শক্তি, তাহার বিকাশ দেখা যায় না। তবে সে শক্তি প্রচ্ছন্ন ও অবিকাশিত ভাবে থাকে, এবং কেবল জড় আকর্ষণ (affinity) রূপে আমাদের অনুমিত হয়; এবং সে স্থলে পুং-স্ত্রী-সংযোগের উপায়ও স্বতন্ত্র। পুষ্পবান বৃক্ষ-লতাদির পরাগরেণু ও গর্ভরেণুর সংযোগ সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য কৌশল, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। যাহা হউক এই সকল নিম্নজাতীয় স্থাবর ভূত সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যখন যে-কোন উপায়ে পুং-শক্তি ও স্ত্রী-শক্তির সন্নিকর্ষ হয়, তখন এই প্রচ্ছন্ন 'কাম' বা আকর্ষণ বলে তাহারা সংযুক্ত ও মিলিত হয়। তাহা হইতেই স্ত্রী-যোনিতে গর্ভ হয়, ও সে জাতীয় ভূতের উৎপত্তি হয়।

অতএব ব্রহ্ম পরাশক্তি-স্বরূপ— অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ, এবং ব্রহ্মই এ সমুদায়,—উপনিষদোক্ত এই মহাতত্ত্ব হইতে আমরা সর্ব্বভূতের বীজপ্রদ পিতা যে সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বর—সগুণ ব্রহ্ম, এবং সকলের যোনি ও গর্ভধারিণী মাতা যে পরমেশ্বরী সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্ম-মায়া, তাহা সামান্যভাবে আমরা বুঝিতে পারি।

শ্রুতি অনুসারে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মের পুরুষ-স্ত্রীরূপ দ্বিধা ভাগ ও জীবজাতির উৎপত্তি

উপনিষদ্ হইতে আমরা এ তত্ত্ব আরও বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব। মূল উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে মায়া বা প্রকৃতির উল্লেখ নাই। এক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ব্যতীত অন্য কোন মূল উপনিষদে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মশক্তি পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হয় নাই। এক আত্মা বা ব্রহ্মই যে আপনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ ও আর এক অংশে নারী হ'ন, তাহাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত এই তত্ত্ব আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, এই বিশ্ব পূর্ব্বে আত্মাই ছিলেন,—তিনি পুরুষরূপ। তিনি তাঁহার 'দ্বিতীয়' বা আনন্দ-সম্ভোগ জন্য সঙ্গী লাভ ইচ্ছা করিয়া, আপনার মধ্যে নিহিত পুরুষ ও স্ত্রী ভাবকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ ও অপরাংশে স্ত্রী হইলেন। অবশ্য এই স্ত্রীভাবই তাঁহার পরাশক্তি মায়া। ব্রহ্মের বহু হইবার সংকল্প-বীজ এই মায়াতে উপ্ত হইলে তিনিই তদনুসারে বহুরূপা হ'ন। এই বহুসংকল্প (ideas) অনুযায়ী বহুরূপ (forms) ধারণ করেন; এবং পুরুষ আত্মা স্বরূপে সেই বহু সংকল্প অনুযায়ী ভাবে হইয়া, তাহাতে উপগত হন। এইরূপে মায়ার শতরূপা ভাবে বিধৃত প্রতিরূপে, ব্রহ্ম তদনুরূপ হইয়া উপগত হইলে, সেইরূপে মায়া সেই আত্মার

বীজ (বা পরিচ্ছিন্ন রূপ) গর্ভে ধারণ করেন এবং তাহা হইতেই সেই-সেই কল্পিত রূপবিশিষ্ট জীবজাতির উৎপত্তি হয়। ইহাই ব্রহ্মের নামরূপে ব্যাকৃত হইয়া, তাহাতে অনুপ্রবেশ।

এইরূপে সৃষ্টির প্রারম্ভে বিভিন্নজাতীয় জীবগণের উৎপত্তি। এইরূপে জীবগণ উৎপন্ন হইয়া প্রথমে প্রকৃতি-গর্ভে লীন থাকে। পরে তাহারা উপযুক্ত স্থান, কাল ও অবস্থা-সমাবেশে স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া বা মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়।

সৃষ্টির স্থিতিকালে পরমেশ্বর পরমেশ্বরীরূপ বীজ হইতে জীবের জন্ম

সৃষ্টিতে এইরূপে জীবগণের জন্ম; ও আদি সৃষ্টিকালে জীবগণের জন্মের ন্যায় পুং-স্ত্রী-সংযোগে মিথুনোদ্ভূত। প্রতি জীবের অন্তরে আত্মা পুরুষ ও স্ত্রীরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন বলিয়া, জীবগণ মূর্ত্তিগ্রহণ কালে পুং-স্ত্রীশক্তি-সংযোগে যোনিতে উৎপন্ন হয়। পুরুষ রূপেই পরমেশ্বর—পরমেশ্বরী বিভিন্ন স্বরূপ যে স্ত্রীগণ তাহাতে রেতঃ-সেক পূর্ব্বক গর্ভ উৎপাদন করিয়া, আমাদের পিতা-মাতা হ'ন, বহু প্রজা-সৃষ্টির কারণ হন।—

"পুমান রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং।
বহ্বীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসূতাঃ॥"—(মুণ্ডক ২।১।৫)

এক পুরুষ যেমন এইরূপে বহু প্রজা সৃষ্টি করেন, সেইরূপ এক প্রকৃতি অজাও সেইরূপে বহু প্রজা গর্ভে ধারণ করিয়া তাহাদের প্রসবের কারণ হন।

অজাং একাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাং
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে"
—(শ্বেতাশ্বতর, ৭।৫)।

অতএব এই যে স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে বহু প্রজার উৎপত্তি হয়, সেই এক পুরুষ দ্বারা স্ত্রী-গর্ভে পুং-শক্তি-বলে রেতঃ-সেকই তাহার কারণ; এবং এক 'অজা' বা প্রকৃতি দ্বারা তাহাদের গর্ভে ধারণ ও পোষণ ও মূর্ত্তি-গ্রহণ তাহার কারণ। এই 'অজা' প্রকৃতিরূপা পরমা মায়া, আর এই যে পরম পুরুষ—তিনি মহেশ্বর, তিনি সেই মায়ায় মায়ী। তাঁহারই অবয়ব ভূত হইয়া এ জগৎ সমুদায় ব্যাপ্ত। তিনিই একা প্রতি যোনিতে অধিষ্ঠিত, তাঁহাতেই সমুদায় ভূতের জন্ম ও লয় হয়। তিনিই হিরণ্যগর্ভরূপে জায়মান, তিনিই দেবগণের প্রভব ও উদ্ভব স্থান। শ্রুতিতে এই তত্ত্ব স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, যথা—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরং।
তস্যাবয়ব ভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।১০)

সেই মহেশ্বরই
"যোনিং যোনিং অধিতিষ্ঠ ত্যেকো।"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।১১)

এবং তাহাতেই অর্থাৎ সেই মায়াময় মায়ীতেই—
"তস্মিন্নিদং সং চ বিচৈতি সর্ব্বম্।" (ঐ)

সেই ভগবান মহেশ্বরই—
"দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ, বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং।" (শ্বেতাশ্বতর, ৪।১২)

তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া উক্ত হইয়াছে—
"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।"
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।৩)

অতএব শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মরূপ সেই মায়াখ্য মহতী প্রকৃতিই সর্ব্বভূত যোনি, এবং তাহাতে মায়ী মহেশ্বররূপ ব্রহ্মই অধিষ্ঠান করেন, ও প্রতি যোনিতে বীজ প্রদান করিয়া সর্ব্বভূতের উৎপাদন করেন। সর্ব্বভূত তাঁহা হইতেই মূর্ত্তি গ্রহণ করে; এবং মৃত্যুর পর সে মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়। জীবগণ এইরূপে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হয়। মৃত্যুর পর জীবগণ সেই ব্রহ্মের মায়ারূপ শরীরে বীজ ভাবে অবস্থান করে; এবং পুনর্ব্বার জন্ম-গ্রহণ সময়ে ব্রহ্ম হইতেই সে বীজ মহাপ্রকৃতির বিশেষ যোনিরূপে উপ্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির স্থিতি অবস্থায় এইরূপে যে জীবগণ বার-বার মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া জন্মলাভ করে, তাহার তত্ত্ব আরও বিশেষভাবে আমাদের বুঝিতে হইবে।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যে বিভিন্ন জীব ব্রহ্ম-সংকল্প হইতে উৎপন্ন হয়, পরা ও অপরা রূপা প্রকৃতিতে বিভিন্নরূপে আত্মার পরিচ্ছিন্ন ভাবে অনুপ্রবেশই তাহার কারণ। এইরূপে বহু-জীব-বীজের সৃষ্টি হয়। তাহার পর ইহারা জন্ম-গ্রহণ করে, এবং নাশ প্রাপ্ত হয়।

শ্রুতি অনুসারে জীবের জন্ম-প্রণালী।

এইরূপে বার-বার জন্ম-মরণের মধ্য দিয়া জীবগণ অগ্রসর হয়। প্রতি জন্মে কর্ম্ম দ্বারা যে সংস্কার অর্জ্জন করে, জীব মৃত্যুকালে সূক্ষ্ম শরীরে সেই সংস্কারে আবৃত হইয়া প্রয়াণ করে; সেই সংস্কাররাশির মধ্যে যেগুলির বীজ কার্য্যোন্মুখ হয়, সে সকল সংস্কার প্রদ্যোতিত হয়; ও তদনুসারে তাহার পর-জন্ম লাভ হয়। এইরূপে বিভিন্ন জন্মের সংস্কার-রাশির দ্বারা জীব আবদ্ধ হয়। এইরূপে সেই সকল সংস্কারের ক্রম আপূরণে জীবের জাত্যন্তর পরিণাম হইতে থাকে। ক্রমে সে জীব মানব-জন্ম গ্রহণের উপযুক্ত হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভেও হয় ত অনেক জীব মানব-জন্ম গ্রহণের উপযুক্ত থাকায় প্রথমেই সে মানব-জন্ম গ্রহণ করে। আমরা এক্ষণে এই মানব-জন্ম গ্রহণের তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহা দ্বারাই অন্য নিম্নজাতীয় জীবের জন্ম-তত্ত্বও বুঝা যাইবে।

মানুষ মৃত্যু সময়ে যখন তাহার ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি প্রাণে সম্পিণ্ডিত হয়, তখন তাহার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের ও সে জন্মের সংস্কাররাশির মধ্যে কতকগুলি সংস্কার 'প্রদ্যোতিত' হয়, এবং সেই প্রদ্যোতিত সংস্কার অনুসারেই পর-জন্মে তাহার তদনুরূপ যোনি লাভ হয়। সংস্কার ভাল হইলে অপেক্ষাকৃত উন্নত মানব-যোনি সে পরজন্মে লাভ করে। সংস্কার মন্দ হইলে, সে নীচ-যোনি—এমন কি পশু-যোনি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে।

মৃত্যুর পর মানুষ কর্ম্মানুসারে স্বর্গাদি অবস্থা ভোগের পর, ভোগ দ্বারা সে কর্ম্ম ক্ষয় হইলে সে, সেই মৃত্যুকালীন প্রদ্যোতিত সংস্কার অনুসারে পুনর্ব্বার তদনুযায়ী যোনিতে জন্মলাভ করে; এবং সেই পরজন্মে, তাহার প্রদ্যোতিত সংস্কাররাশির বিকাশ জন্য, এবং তাহার আরও আপূরণ জন্য তদুপযোগী বা সেই সকল সংস্কারের বিকাশানুসারে পিতৃদেহে প্রবেশপূর্ব্বক, তদুপযোগী মাতৃ-গর্ভে পিতৃদেহ হইতে যাইতে হয়। সে যদি তাহার প্রদ্যোতিত সংস্কার বিকাশোপযোগী পিতা, মাতা, বংশ, কুল, সমাজ প্রভৃতি সহকারী কারণের আশ্রয় না পায়, তবে তাহার সে জন্ম বৃথা হয়।

জীবের জন্মে দেবগণের সহায়তা।

মানুষ এবং সাধারণতঃ সকল জীবই একা—নিরাশ্রয়। সে নিজে তাহার সেই সংস্কার-বিকাশের উপযোগী পিতা-মাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারে না। তবে কিরূপে তাহার জন্মের জন্য এই অনুকূল অবস্থা সকলের সংযোগ হয়? গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগভ্রষ্টের শ্রীমান ধনীর গৃহে বা জ্ঞানী যোগীর গৃহে পুনর্জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, যিনি সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা, সকলের নিয়ন্তা, তিনিই এই অনুকূল অবস্থা-সংযোগের কারণ। তিনি নানারূপে এই সংযোগের কর্ত্তা হ'ন। তিনি বীজপ্রদ পিতা হ'ন, তিনিই তাহার প্রকৃতিরূপ যোনিতে সে বীজ-নিষেকের কর্ত্তা হ'ন। সেই পরমাপ্রকৃতিই উপযুক্ত মাতৃরূপে সে গর্ভে ধারণ ও পোষণ করেন, এবং অধিদেবরূপে ভগবান্ সেই গর্ভ ধারণ, রক্ষণ ও পোষণ করেন।

পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা।

কিরূপে দেবগণ সেই মানুষের জন্ম-গ্রহণের কারণ হন, তাহা ইঙ্গিতে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাগ্নি-বিদ্যায় উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, মানুষের এবং সাধারণ ভাবে জীবগণের এই জন্মের জন্য দেবগণ যজ্ঞ করেন। স্বর্গভ্রষ্ট মানুষের জন্মগ্রহণ জন্য পাঁচবার পাঁচরূপ অগ্নিতে তাঁহারা সে যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞ-বিবরণ বৃহদারণ্যক উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে (এবং আংশিক ভাবে ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় হইতে অষ্টম ব্রাহ্মণে) উক্ত হইয়াছে। যথা,—

প্রথম যজ্ঞ।

এই লোক - অগ্নি। আদিত্য তাহার সমিদ্, রশ্মি সকল ধূম, অহঃ (দিবা)—অর্চ্চি, চন্দ্র অঙ্গার, আর নক্ষত্র বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধারূপ আহুতি দেন,—সেই অগ্নি হইতে সোম রাজার উৎপত্তি হয়।

দ্বিতীয় যজ্ঞ।

পর্জ্জন্য—অগ্নি। বায়ু, তাহার সমিদ, মেঘ—ধূম, বিদ্যুৎ—অর্চ্চি, অশনি—অঙ্গার, এবং গর্জ্জন (মেঘের)—বিস্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে আহুতি দেন,- সেই আহুতি হইতে বর্ষণ (বৃষ্টি) হয়।

তৃতীয় যজ্ঞ।

পৃথিবী—অগ্নি। সংবৎসর তাহার সমিদ, আকাশ—

ধূম, রাত্রি—অর্চ্চি, দিক সকল—অঙ্গার এবং অবান্তর দিক্ সকল বিস্ফুলিঙ্গ। সেই অগ্নিতে দেবগণ বর্ষণকে আহুতি দেন,—সেই আহুতি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ যজ্ঞ।

পুরুষ—অগ্নি। বাক্য তাহার সমিদ্, প্রাণ—ধূম, অর্চ্চি—জিহ্বা, অঙ্গার—চক্ষু, এবং বিস্ফুলিঙ্গ—শ্রোত্র। সেই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন আহুতি দেন,—সেই আহুতি হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়।

পঞ্চম যজ্ঞ।

স্ত্রী (যোষিৎ)—অগ্নি। উপস্থ তাহার সমিদ্, যাহা উপমন্ত্রিত হয়; (বৃহদারণ্যক উপনিষদ অনুসারে—লোম সকল) তাহা ধূম-যোনি—অর্চ্চি, যে গর্ভবীজ তাহাতে প্রবেশ করে (যৎ অন্তঃকরোতি) তাহা অঙ্গার, এবং যে আনন্দ হয় (অভিনন্দা)—তাহা বিস্ফুলিঙ্গ। এই স্ত্রীরূপ অগ্নিতে দেবগণ রেতঃ আহুতি দেন, সেই আহুতি হইতে গর্ভের উৎপত্তি হয়, (পুরুষের উৎপত্তি হয়—বৃহদারণ্যক উপনিষদ্)।

শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।৫) উক্ত হইয়াছে যে, মৃত্যুর পর যে সাধক দেবযান মার্গে প্রয়াণ করেন, তাঁহাদের অনেকের আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। যাঁহারা পিতৃযানে প্রয়াণ করেন, সেই সকল কর্ম্মীর আবার পুনরাবর্ত্তন হয়। গীতায়ও (৮।২৪ ২৬ শ্লোক) এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা পুনরাবর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উক্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা স্বর্গ হইতে কর্ম্মক্ষয়ে প্রচ্যুত হইয়া "আকাশ রূপে অভিনিস্পন্ন হ'ন, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা অন্ন হন। তাঁহারা তখন পুরুষাগ্নিতে আহুত হন, তাহা হইতে স্ত্রী-রূপ অগ্নিতে আহুত হন। এইরূপে স্ত্রীযোনি হইতে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বে ইহা বিবৃত হইয়াছে।

এই সকল শ্রুতি-মন্ত্রে যে তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। আমরা এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, মনুষ্যাদি জীবগণ যখন মৃত্যুর পরে স্বর্গাদি ভোগান্তে আবার মর্ত্ত্যে জন্ম গ্রহণ করে, তখন দেবগণ সে জন্ম-গ্রহণের সহায় হন। তাঁহারা যজ্ঞ করেন। এই লোকে (প্রধানতঃ স্বর্গে) তাঁহারা যে যজ্ঞ করেন, তাহাতে সোমের উৎপত্তি হয়, সেই জীবগণ সূক্ষ্ম-শরীরে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। তাঁহারা পর্জ্জন্য অগ্নিতে সেই সোম আহুতি দিলে বৃষ্টি হয়, জীব সেই বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পতিত হয়। দেবগণ সেই ভূমিতে বৃষ্টি আহুতি দিলে অন্নের উৎপত্তি হয়। সে জীবগণও সূক্ষ্ম শরীরে সেই অন্নমধ্যে প্রবেশ করে। দেবগণ সেই অন্ন পুরুষে আহুতি দিলে রেতঃ উৎপন্ন হয়, তাহাতে জন্ম-গ্রহণোন্মুখ জীব প্রবেশ করে। দেবগণ এই রেতঃ স্ত্রী-যোনিতে আহুতি দিলে, তবে সেই জীব মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারে।

ঐতরেয় শ্রুতি অনুসারে জীবের জন্ম

দেবগণের সাহায্যে যে এইরূপে মানুষাদির জন্ম হয়, তাহা ঐতরেয় উপনিষদেও দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে উক্ত হইয়াছে। তাহার ভাবার্থ এই :—

"জন্ম-গ্রহণের পূর্ব্বে জীব প্রথমে পুরুষে (অর্থাৎ পুরুষ-শরীরে) গর্ভ বা বীজভাবে থাকে। (অন্ন দ্বারা পুরুষে এই জীব বীজ প্রবিষ্ট হয়)। তাহার যে রেতঃ ইহা পুরুষের সমুদায় অঙ্গ হইতে সংগৃহীত (তেজঃ) তাহার মধ্যে এই জীব বীজ অনুপ্রবিষ্ট থাকে। পুরুষ যখন এই রেতঃ স্ত্রীতে সিঞ্চন করে, তখন তাহার প্রথম জন্ম হয়। সেই জীব-বীজ তখন স্ত্রীর আত্মভূত হইয়া যায়। স্ত্রী তাঁহার গর্ভ-প্রবিষ্ট জীবকে গর্ভে পোষণ করে। তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চারের পূর্ব্বে পিতাই সে জীবকে (কুমারকে) পোষণ করিয়াছিলেন। পিতাই যেন (আত্মজ) পুত্ররূপে স্ত্রী-গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা জীবের দ্বিতীয় জন্ম। পুত্র পিতার প্রতিনিধি হ'ন, এবং পুত্র-উৎপাদন দ্বারা বংশপরম্পরা রক্ষা করেন। তাহার পর সেই জীব যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করে। তাহার পর আবার তাহার জন্ম হয়। ইহা তাহার তৃতীয় জন্ম। এইরূপে বার-বার তাহার জন্ম হয়। সেই একই আত্মা এইরূপে বার-বার জন্মগ্রহণ করে।" তাহার জীবরূপে জন্ম-গ্রহণ জন্য আত্মরূপ দেবগণ তাহার সহায় হ'ন, ইহা পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্ত্র হইতে জানা যায়।

জীবের জন্মান্তর

এক্ষণে এ স্থলে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। বলিয়াছি ত যে জীবগণ জীর্ণদেহ হইলে বা আয়ু পূর্ণ হইলে সে দেহ ত্যাগ করে। পরে আবার জন্মগ্রহণপূর্ব্বক

নূতন শরীর ধারণ করে। তাহার মৃত্যুকালে প্রদ্যোতিত সংস্কার অনুসারে সেই নূতন শরীর লাভ হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৫।১১—১২ মন্ত্রে) আছে,—

"সঙ্কল্পন স্পর্শন দৃষ্টি মোহৈর্গ্রাসাম্বুবৃষ্ট্যাত্ম বিবৃদ্ধ জন্ম।
কর্ম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে॥
স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহুনি চৈব রূপাণী দেহো স্বগুণৈর্ব্বৃণোতি।
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগ হেতুরপরোঽপিদৃষ্টঃ॥"

অর্থাৎ 'দেহী সঙ্কল্পন স্পর্শন দৃষ্টি মোহের বশে অণুক্রমে বা পরম্পরাক্রমে নানাস্থানে (অর্থাৎ পূর্ব্বে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় উক্ত - সোমে—বৃষ্টিতে—অন্নে রেতঃতে ও গর্ভে) কর্ম্মানুযায়ী রূপ সকল গ্রহণ করিয়া অন্ন জল-বৃষ্টি দ্বারা নিজের ক্রমপুষ্টি লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। দেহী স্বগুণে বা প্রাক্তন জন্ম-সংস্কার দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম বহুরূপ দ্বারা আবৃত হয়। ক্রিয়াগুণ ও আত্মগুণ দ্বারা সেই-সেই দেহের সহিত সংযোগ কারণ দেহবদ্ধ 'অপর' (জীবাত্মারূপে) তিনি দৃষ্ট হ'ন, এবং দেহান্তর সংযুক্ত হ'ন।' কিন্তু সেই আত্মা কলিল মধ্যে বা এই দেহরূপ ভ্রূণ মধ্যে থাকিলেও তিনি পরমাত্মাই —

"অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারং অনেকরূপং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥"
(শ্বেতাশ্বতর উপঃ, ৫।১৩)।

আত্মাই বিভক্তের ন্যায় জীবরূপে জন্মেন এবং অবিভক্ত পরমাত্মারূপে সে জন্মের সহায় হন

এই জীবাত্মা ব্রহ্ম ; এজন্য ব্রহ্মই আপনাকে বহু জীবরূপে মূর্ত্তিযুক্ত করিবার জন্য নিজেই বীজপ্রদ পিতা হ'ন, নিজেই মহৎ যোনি হ'ন, এবং নিজেই বিভিন্ন দেবরূপে, সেই জীবের জন্মগ্রহণের সহায় হ'ন। তিনি পরিচ্ছিন্ন হ'ন, অবিদ্যাযুক্ত হ'ন, কর্ম্মে অভিমানযুক্ত হন, জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া জীবরূপে ব্রহ্ম স্ব মায়াশক্তি দ্বারা কর্ম্মানুসারে দেহী হইতে জন্মগ্রহণ করেন। বলিয়াছি ত, মৃত্যুকালে যে মানবের যে সকল সংস্কার যেরূপ প্রদ্যোতিত হয়, তদনুসারে সে সেই সংস্কাররাশি বিকাশের উপযোগী মাতা-পিতা প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ পূর্ব্বে যোগভ্রষ্ট সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ভারত।
(গীতা, ৬।৪১-৪২)

বলিয়াছি ত কোন জীব স্বীয় কর্ম্মানুগুণে যে জন্মগ্রহণের উপযুক্ত, সে জন্ম সে আপনি লাভ করিতে পারে না। ভগবান্ই সেই জন্মগ্রহণের সহায়, তিনিই একমাত্র কর্ম্মফলদাতা। তিনি স্বয়ং সহায়ে জীবের সেই জন্মগ্রহণের কারণ হ'ন।

ইহা হইতে আমরা আর একটি অতি গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে পারি। যদি আমরা কেহ উপযুক্ত সন্তান লাভ করিতে ইচ্ছা করি, তবে আমাদের—অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে, সেই সন্তান লাভের উপযুক্ত হইতে হইবে। আমরা যদি শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত হই, তবে আমরা শুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রকৃতিযুক্ত পুত্র লাভ করিতে পারি। শুদ্ধ সাত্ত্বিক হইয়া শুদ্ধাচারে ভগবানের যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া, তবে তাঁহার কৃপায় উপযুক্ত পুত্র লাভ করিতে পারি। তিনি আমাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র বুঝিলে, আমাদের নিকট তদুপযুক্ত সন্তান প্রেরণ করেন। আমরা শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান করিয়া ভগবৎ কৃপায় উপযুক্ত পুত্র লাভ করিতে পারি। তাহা হইলে আমার অন্তরস্থিত ব্রহ্ম বা ভগবান্ আমাদ্বারা আমার স্ত্রীতে উপযুক্ত জীব-বীজ নিষেক করাইয়া, গর্ভ ধারণ করান। এবং সেই স্ত্রী-রূপে—ব্রহ্মই মহৎযোনি ভাবে অবস্থিত থাকিয়া সে গর্ভ গ্রহণ করেন। এই কারণ শাস্ত্রে উপযুক্ত পুত্র লাভের জন্য গর্ভাধান-সংস্কার বিহিত হইয়াছে।

গর্ভাধান-তত্ত্ব

আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদ (ষষ্ঠ অধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণ) হইতে এই গর্ভাধান-তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তাহাতে আছে—

"যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, আমার পুত্র শুক্লবর্ণ, এক এ বেদাধ্যায়ী ও শতায়ু হউক, তবে তাহারা স্ত্রী-পুরুষে অবঘাতিক তণ্ডুল দ্বারা ক্ষীরোদন পাক করিয়া ও ঘৃতযুক্ত করিয়া (সেই চরু) ভক্ষণ করিবেন। কপিলবর্ণ, দ্বিবেদাধ্যায়ী পূর্ণায়ু পুত্র কামনা করিলে দধোদন পাক করিয়া ভক্ষণ করিবেন। শ্যামবর্ণ লোহিতাক্ষ ত্রিবেদাধ্যায়ী ও পূর্ণায়ু পুত্র কামনা করিলে, জলোদন পাক ও ঘৃতযুক্ত করিয়া ভক্ষণ করিবেন। যদি কেহ বিদুষী ও পূর্ণায়ু কন্যা কামনা করেন, তবে তাঁহারা তিলোদন পাক করিয়া ভক্ষণ করিবেন। প্রগলভ সুভাষী সর্ব্ববেদাধ্যায়ী পুত্র

কামনা করিলে, তাঁহারা মাংসযুক্ত অন্ন পাক করিয়া ভক্ষণ করিবেন।"

এক কথায়, প্রথমে আহার-শুদ্ধি করিতে হয়। যজ্ঞাবশিষ্ট-ভোজীরই আহার-শুদ্ধি হয়। আহারশুদ্ধি দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধি হয় (ছান্দোগ্য ৭।২, ৬।২)। সত্ত্ব বা দেহ শুদ্ধ হইলে, তবে তাহা উপযুক্ত পুত্র-বীজ, সেই অন্ন হইতে গৃহীত ও শরীরে ধৃত হয়। দেবগণ সত্ত্ব শুদ্ধ পুরুষের শরীরেই তদপযুক্ত পুত্র বীজযুক্ত রেতঃ উৎপাদন করেন। এইরূপে শরীর শুদ্ধ হইলে, তদনুরূপ সত্ত্বা শুদ্ধা স্ত্রীতে উপগত হইতে হয়। সেই সময় যে গর্ভাধান-মন্ত্র চিন্তা করিতে হয়, তাহা এই—

"বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিংশতু, আসিঞ্চতু প্রজাপতিঃ, গর্ভং দধাতু, তে গর্ভং ধেহি সিনীবালি, গর্ভং ধেহি পৃথুষ্টুকে, গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেববোধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।"

(বৃহদারণ্যক, ৬।৪।২১)

ইহার ভাবার্থ;—"বিষ্ণু যোনি কল্পনা করুন, প্রজাপতি রেতঃসেক করুন, ধাতা গর্ভধারণ করুন, ত্বষ্টা রূপ দান করুন, সিনীবালি, পৃথুষ্টুক ও অশ্বিদয় গর্ভ রক্ষা করুন ইত্যাদি।" ইহার অর্থ এই যে, স্বামী যখন সুপুত্র-কামনায় শুদ্ধ মনে, শুদ্ধাহার দ্বারা শরীর শুদ্ধ করিয়া স্ত্রীতে উপগত হইবেন, তিনি নিজে তাঁহার ব্যক্তিত্ব কৃতিত্ব ভুলিয়া গিয়া, ভগবানই বিষ্ণুরূপে বীজপ্রদ পিতা হইয়া এই স্ত্রী-যোনিতে প্রজাপতিরূপে রেতঃ-নিষেক করিতেছেন এবং দেবগণ সে গর্ভ ধারণ করিতেছে, এইরূপে একাগ্র ভাবনা করিবেন। এই শ্রুতিমন্ত্র হইতে গীতোক্ত এই গর্ভাধান ব্যাপারের তত্ত্ব কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

কিরূপে জীব স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী পিতা মাতা প্রাপ্ত হয়

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্ত্তে অসংখ্য জীবের জন্ম হইতেছে। কাহারও জন্ম আকস্মিক নহে। সকলেই এক নিয়মে আবদ্ধ। ভগবান্ কর্ম্মফল-দাতা। তিনিই প্রত্যেক জীবের স্বকর্ম্মানুগুণ দেহ-সংযোগ পূর্ব্বক জন্ম-গ্রহণ করাইবার কারণ; তিনিই প্রতি জীবের উপযুক্ত পিতা-মাতা প্রাপ্ত করাইবার কারণ; তিনিই প্রত্যেক জীবকে তাহার উপযুক্ত পিতৃ-শরীরে প্রবেশ করাইবার কারণ; তিনি প্রত্যেক জীবকে তাহার উপযুক্ত মাতৃগর্ভে সেই বীজকে পিতৃ রেতঃ হইতে প্রবেশ করাইয়া, তাহার অণ্ডের (cell) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া সে গর্ভ রক্ষা পূর্ব্বক তাহার জন্মগ্রহণ করাইবার কারণ; তিনি পিতামাতা হইয়া জীবের জন্মের কারণ; তিনি স্বয়ং জীব হইয়া সেই পিতা-মাতা হইতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিবার কারণ।

আমরা দেখিয়াছি বৃষ্টি, হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃ হইতে গর্ভ হয়। বৃষ্টিতে স্বর্গচ্যুত, জন্ম-গ্রহণোন্মুখ কত—অসংখ্য জীব-বীজ থাকে, সেই বৃষ্টি হইতে প্রতি পুং জীবে কত রেতঃ উৎপন্ন হয়। প্রতি রেতঃবিন্দুতে কত লক্ষ জীবাণু (spermatozoa) থাকে। স্ত্রীযোনিতে সেই রেতঃসেককালে কত লক্ষ জীবাণু স্ত্রী-গর্ভে (ovum মধ্যে) প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে একটিমাত্র জীবাণু স্ত্রীর শোণিতের (cell) মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। মাতা সেই একটিমাত্র জীবাণুকে (কখন বা একাধিক জীবাণুকে) গর্ভে ধারণ করিয়া তাহার পোষণ করেন। মানুষ এইরূপে মূর্ত্তিযুক্ত হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়। এইরূপে মানুষ তাহার কর্ম্মানুগুণ দেহ প্রাপ্ত হয়। এই জন্ম গ্রহণ যদি আকস্মিক হইত, তবে বুঝি তাহা অসম্ভব হইত। অথবা কত লক্ষ কোটীর মধ্যে কদাচিৎ একবার সেরূপ জন্মের সম্ভাবনা হইত। তাহার পক্ষে উপযুক্ত পিতা মাতা প্রাপ্তি সুতরাং ভগবানের কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত একরূপ অসম্ভব হইত। ভগবানই উপযুক্ত অবস্থাদি সংযোগ দ্বারা আমাদের জন্মের কারণ।

অতএব যদি পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিতে হয়, যদি আমাদের জন্ম আকস্মিক না হয়, তবে অবশ্য আমাদের এই জন্ম-ব্যাপারে ভগবানেরই কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তিনিই সর্ব্বজীবমধ্যে ভগবান্ ভগবতী রূপে অবস্থান করেন; তিনিই এ জগতে সর্ব্বত্র ভগবান্-ভগবতী রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনিই উপযুক্ত পিতার মধ্যে উপযুক্ত সন্তানের বীজ স্থাপন করেন; তিনিই সে পিতা হইতে সে বীজ স্ত্রী-যোনিতে প্রদান করেন; তিনিই সেই মাতাতে পরমেশ্বরী রূপে সে বীজ গ্রহণ করেন, এবং সে বীজ হইতে মূর্ত্তির উৎপত্তি ও পোষণ করেন। এইরূপে মনন ও বিচার করিয়া গীতোক্ত জীবসৃষ্টির গূঢ় তত্ত্ব আমাদের বুঝিতে হইবে।

বিসর্জ্জনে আবাহন

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

(১)

পদ্মাতীরে ক্ষুদ্র বাউসমারি গ্রাম। গ্রামখানি পদ্মার ভাঙ্গন হইতে কোন রকমে আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পূর্ব্বে পদ্মা বাউসমারির অন্ততঃ তিন ক্রোশ দূরে ছিলেন; কিন্তু এখন তিনি পশ্চিম-কূল ভাঙ্গিতে-ভাঙ্গিতে বাউসমারির প্রায় বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছেন! বাউসমারির নীচেই পদ্মার প্রকাণ্ড এক পাক; সেখানে কোন নৌকা যাইতে পারে না। আই, জি, এস্, এন্ কোম্পানীর যে সকল ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে রাজসাহী ঘুরিয়া পাটনা পর্য্যন্ত যায়—তাহারা এই পাকের কাছে ঘেঁসিতে সাহস করে না; অনেক ঘুরিয়া বাউসমারি ষ্টেসনে নোঙ্গর করে। ষ্টীমার-ষ্টেসনটিও নিতান্ত উঠবন্দী রকমের। একখানি ক্ষুদ্র চালাঘরে পনের টাকা বেতনের 'সব এজেণ্ট' বংশীধর মণ্ডল ষ্টেসন-মাষ্টারী করিতেন। তাঁহার 'বাৎতোন' পনের টাকা হইলে কি হইবে,—পাচশত টাকার মত তাঁহার ঝাঁঝ্ ছিল! বংশীধর প্রকৃতি দেবীর রুদ্রলীলা প্রতিনিয়ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বোধ হয় মানব-জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশ হইয়াছিলেন; এইজন্য চুরি-চামারী দ্বারা যেরূপে হউক দুই পয়সার সংস্থান করাই জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু দেনেওয়ালা ভগবান। তিনি না দিলে কখনও কাহারও অভাব দূর হয় না। বংশীধরেরও অভাব দূর হইত না। অতি কষ্টে তিনি সংসার প্রতিপালন করিতেন। সকালে ও বিকালে 'আপ্' ও 'ডাউন' ষ্টীমার চলিয়া গেলে, চাপরাসী বাদলরামের উপর ষ্টেসনের ভার দিয়া, বংশীধর পদ্মার ধার দিয়া বাড়ীর দিকে চলিতেন। বাউসমারীর দুইক্রোশ পশ্চিমে গোপালপুর গ্রামে তাঁহার বাড়ী। তিনি দেখিতেন, অপরাহ্নের সূর্য্যালোক পদ্মার জলে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় যেন হিঙ্গুলের স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে; তাহার উপর শুভ্র মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মহাজনী নৌকাগুলি শ্বেত, পীত, ধূসর বর্ণের পাল তুলিয়া দূর-দূরান্তরে ধাবিত হইতেছে। নদীর পাড়ের উপর প্রকাণ্ড একটা বটের ও একটা কাঁঠালের গাছ অতি কষ্টে মাটী আঁকড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের লাল শিকড়গুলি নদীর দিকে বাহির হইয়া রহিয়াছে। রাখালেরা দূর মাঠে গরু চরাইতে-চরাইতে এক-একবার ভাঙ্গনের ধারে আসিয়া গাছ-দুইটির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। বুনোপাড়ার বুনোদের মেয়েরা একটি কলসী মাথায় ও একটী কলসী 'কাঁকালে' লইয়া নদী হইতে জল ভরিয়া বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছে। ভাঙ্গনের ভয়ে পরিত্যক্ত জমীদারী-কাছারীর প্রাঙ্গণস্থিত ঝাউগাছ অপরাহ্নের বায়ু-প্রবাহে শন্‌শন্ শব্দে হা-হুতাশ করিতেছে। দেখিতে-দেখিতে শ্রান্ত তপন পশ্চিম-গগন-প্রান্তে অস্তমিত হইতেন।

বংশীধর গৃহে ফিরিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া, ধূমপান করিতে বসিতেন। তাঁহার কন্যা জয়দুর্গা তাঁহার জন্য একবাটী 'চালভাজা', কিঞ্চিৎ আখের গুড় ও এক গেলাস জল লইয়া আসিত। তাঁহার স্ত্রী ক্ষান্তমণি 'হেঁসেলে' রাঁধিতে চলিতেন। বড় ছেলে নবীন ঘরের মেঝেতে একখানি 'কাঁচকেঁচে'র পাটীর উপর বসিয়া, ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকে তাহার ছোট ভাই বিপিনের 'পড়া' বলিয়া দিত, এবং নিজেও পড়াশুনা করিত। বংশীধরের মনে হইত, আর কয়েক বৎসর পরে বড় ছেলেটি কোন রকমে মানুষ হইলেই তাঁহার দুঃখ ঘুচিবে। নবীন তখন গ্রাম্য মাইনর স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িত। পড়া-শুনায় তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল।

একদিন রাত্রিকালে ক্ষান্তমণি আহারাদির পর স্বামীর পথশ্রান্ত পদদ্বয়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "আর শুনেচো, নায়েব মশায়ের পরিবার নবুনের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিবার জন্যে 'একান্ত' হয়েছে। তা' আমার নবীন ছেলে ত অমন্দ নয়, 'নেকাপড়াতে'ও ভাল। তবে তেমন সাজন্ত হবে না, এই যা কথা। নবুনে ঘেটের কোলে

ষোলয় পড়েছে; এগার বছরের মেয়ে সঙ্গে কি মানাবে ?"

বংশীধরের মেজাজ সেদিন বড় ভাল ছিল না,—রাজসাহীর সদর আফিসের ছোটসাহেব সেইদিন ষ্টীমারে আসিয়া, কি একটা দোষের জন্য তাঁহার কর্ণমর্দ্দন করিয়া গিয়াছিল। তিনি কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিত বলিলেন, "না গো না, এখন বিয়ে-থাওয়ায় দরকার নেই। ছেলে আগে মানুষ হোক্, তার পর বিয়ে! শুনেছি না কি নায়েব মশায়ের মেয়েটা কাল্‌প্যাঁচা; আর কোন দিকে সুবিধে না হওয়ায় নবনের ঘাড়ে গড়াতে চাচ্ছেন। ওঁ সব হবে-টবে না। পাস্-টাস্ না কর্‌লে আমি নবনের বিয়ে দিচ্ছিনে।"

ক্ষান্তমণি স্বামীর এইপ্রকার উপেক্ষাসূচক কথা শুনিয়া একটু চটিয়া উঠিলেন,—পদসেবা ত্যাগ করিয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "কথার ছিরি গ্যাকো! অত বড় লোকের মেয়ে,—যার বলে মাসে পাঁচ-সাত-কুড়ি টাকা রোজগার,—তার মেয়েকে বল্‌চ কাল্‌প্যাঁচা! ঐ কাল্‌প্যাঁচাকেই আমার বেটার বৌ কর্‌ব, তা ব'লে দিচ্ছি। কাল্‌প্যাঁচা! ভদ্দর লোকের মেয়েকে কাল্‌প্যাঁচা বল্‌তে লজ্জা হলো না? তুমি এমন কি পরী বিয়ে করে এনেছিলে? আর ক'টা পাশ করেছিলে? পনের টাকা মাইনের ইষ্টাসিন্-মাষ্টরী করে এত জাঁক সাজে না। কথায় আছে—'কাচা কাপড়, যাচা মেয়ে, যে ছাড়ে সে অলপ্পেয়ে!' নায়েব মশায় যদি নবনের শ্বশুর হয়—তা'হ'লে ওর ভাবনাটা কি! কত বড় একটা সহায় হবে? কম বয়সে বিয়ে না কর্‌লেই যদি 'নেকাপড়া' হতো, তা'হ'লে কোন্ দিন তুমি পাঁচ-গণ্ডা পাশ করে ফেল্‌তে। তুমি ত ধেড়ে বয়সে আমাকে বিয়ে করেছিলে, মনে পড়ে না?"

পত্নীর তীব্র ঝঙ্কারে একটু নরম হইয়া বংশীধর মাথা চুল্‌কাইয়া বলিলেন, "আমি কি তাই বল্‌চি? আমাদের গন্ধবেণের ঘরে ভাল ছেলে মেলে না। নবনে শুনেছি পড়াশুনায় ভাল,—ও যদি দুট-একটা পাশ-ফাস্ কর্‌তে পারে, তা' হ'লে কল্‌কাতার কত বড়-বড় ঘরে ওর বিয়ে দিতে পার্‌বো! পরীর মত বৌ সোণার-মুকুট মাথায় দিয়ে এসে তোমার দাসীগিরি কর্‌বে! সে ভাল, না গ্রেগ্‌সন্ কোম্পানীর ডিহি গোপালপুরের নায়েব ত্রিভুবন দত্তের কালো মেয়ে ভাল?"

স্বামীর কথা শুনিয়া ক্ষান্তমণি চিবুকে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলিলেন, "ও আমার কপাল! কল্‌কাতার কত বড়-বড় ঘরের পরী সোণার মুকুট মাথায় দিয়ে আমার দাসীগিরি কর্‌তে আস্‌বে!—হ্যাঁগো, তুমি যে ছেঁড়াকাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপন দেখ্‌চো! না, আমার পরীতেও দরকার নেই, সোণার মুকুটও ধুয়ে খাব না। নায়েব মশায়ের ঐ কালো মেয়েই আমার ভাল; কেমন খাসা চোখ-মুখ, কেমন নরম স্বভাব; আর মুখে উঁচু কথাটি নেই। তবে রঙ্গটা একটু ময়লা বটে; তা বৌ ত আর হাটে বিক্রি কর্‌তে যাচ্ছি নে।"

বংশীধরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তুমি আবার সে মেয়ে কোথায় দেখ্‌লে? নায়েববাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করেছ বুঝি! কি সর্ব্বনাশ!—নাঃ, তোমাকে দিয়ে আমার আর মান-সম্ভ্রম কিচ্ছু থাকে না দেখ্‌চি। আমি ত তোমাকে একশ' দিন বলেচি—নায়েবের বৌ আগে তোমার বাড়ী আসে ত তুমি তার বাড়ী যেতে পার। মফস্বলে কোন ভদ্দ-লোক—তা সে ডেপুটী হোক, আর মুন্‌সেফ্ হোক্,—বদ্‌লী হয়ে এলে, আগে গাঁয়ের দশজন মান্যি-গণ্যি লোকের সঙ্গে দেখা করে;—তার পর তারা পাল্‌টে দেখা দিতে যায়—এই হচ্ছে নিয়ম! তবে যারা হ্যাংলা আর ক্যাংলা, তারা এ নিয়ম মানে না—হাকিম-টাকিমগুলো নূতন বদ্‌লি হয়ে আস্‌তে না আস্‌তে, তাদের দুয়োরে গিয়ে ধূলো চাটে! নায়েব মশায় কি স্বজাতি বলে কোন দিন আমার বাড়ী পায়ের ধূলো দিয়েছেন, যে আমরা আগে তাঁকে সেলাম দিতে যাব? তেমন বাপের ঔরসে 'জন্ম' নয়।"

ক্ষান্তমণি বলিলেন, "তুমি কি যে বল, আর কি যে কও, তার ঠিকানা নেই! নায়েব মশায়ের বাড়ী আমি কি কর্‌তে যাব? আমি কি নায়েবের মেয়ে দেখিনি মনে কর? ইঁচেখালিতে আমার পিসির বাড়ী, তা জান? আমার পিসে নবকুমার দত্ত নায়েবের বৌ'র বোনের ভাসুর। আমার পিসিমা আর নায়েবের বৌ'র বোন যে দুই জা!—সেখানে সে-বচ্ছর নায়েবের মেয়েটিকে দেখে এসেছিলাম। পিসিমাই বল্লেন, 'ক্ষ্যান্ত, তোর নবীনের সঙ্গে সহচরীর বিয়ে দিস্, খাসা মানাবে। বাপের ঐ একটি মেয়ে,—দেবেও দশ তোল্লা; নবীনেরও একটা সহায় হবে।'"

বংশীধর বলিলেন, "ওঃ—এতক্ষণে বুঝ্‌লাম, আমার

পিসেস্ এ বিয়ের ঘটক; 'বরের ঘরের পিসি, আর কনের ঘরের মাসী'—এ যে সেই রকম হোলো! তা' যাই বল, আমি এখন পাঁচ বচ্ছর নবুনের বিয়ে দিচ্ছিনে। তা' তোমরা চটো, ঘরের ভাত বেশী করে খেয়ো। আমি বংশীধর মণ্ডল এক কথার মানুষ।"

ক্ষান্তমণি সদর্পে বলিলেন, "আচ্ছা, দেখা যাবে, আমি যদি এ বিয়ে না দিই, ত, আমার নামও ক্ষ্যান্তি বেণেনী নয়। দেখি, তোমারই জিদ্ কেমন ক'রে বজায় থাকে!"

তুমুল প্রেম-কোন্দলে সে রাত্রি স্বামী-স্ত্রীর কেহ চোখের পাতা বুঁজিতে পারিল না। নবীন ও বিপিন অন্য ঘরে ক্যাচকেঁচের পাটীর উপর পড়িয়া অনেক পূর্ব্বেই নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল। মাটির প্রদীপটা জলিয়া-জলিয়া তেলের অভাবে নিভিয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কেবল অনেক রাত্রে একটা কেঁদো-বাঘ গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী তেঁতুল-তলায় বসিয়া 'ঘাঁড়্‌র-ঘাঁড়্‌র' শব্দে যেন অন্ধকারের মধ্যে করাত দিয়া কাঠ চিরিতেছিল, আর তাহার প্রায় ত্রিশ গজ দূরে একটা সতক 'ফেউ' মধ্যে-মধ্যে কম্পান্বিত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়া অদূরবর্ত্তী গোপপল্লীর গৃহস্থগণকে বৃহল্লাঙ্গুল মহাশয়ের শুভাগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছিল।

(২)

গ্রেগসন্ কোম্পানী প্রথমে নীলকররূপে নদীয়া ও মুরশিদাবাদ জেলায় কুঠী স্থাপন করেন। সুবিখ্যাত নীল-বিদ্রোহের পর নীলের ব্যবসায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইলে, তাঁহারা জমীদারী ক্রয় করিয়া জমীদার হইয়া বসেন। এখন তাঁহারা এই অঞ্চলের খুব বড় জমীদার। গোপালপুরের কাছারী তাঁহাদের বহুসংখ্যক কাছারীর অন্যতম। নিত্যানন্দপুরের ত্রিভুবন দত্ত এই কাছারীর নায়েব। তিনি বহুদিন হইতে এখানে নায়েবী করিতেছিলেন।

ত্রিভুবন দত্ত বহুদর্শী নায়েব। সামান্য গোমস্তাগিরি হইতে কার্য্যদক্ষতা-গুণে তিনি মনিব-সরকারের প্রিয়পাত্র হইয়া, ক্রমে আশি টাকা বেতনের নায়েবী পদ লাভ করিয়াছিলেন। গোপালপুরে তিনি স্ত্রী-কন্যা সহ বাস করিতেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ কৃষ্ণনগর কলেজের 'হষ্টেলে' থাকিয়া কলেজিয়েট্ স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। কন্যা সহচরী তাঁহার কাছে গোপালপুরেই থাকিত।

সহচরীর বিবাহের বয়স হইয়াছিল। যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি নবাবের গৃহে কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেন; কিন্তু মেয়েটিকে তিনি এতই ভালবাসিতেন যে, প্রাণাধিকা দুহিতার বিবাহ দিয়া তাহাকে পরের ঘরে পাঠাইতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কোন গরীব গৃহস্থের সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান ছেলের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া, মেয়েটিকে নিজের কাছে রাখিবেন, জামাইটীকে লেখা-পড়া শিখাইয়া মানুষ করিবেন। শেষে সে যখন উপার্জ্জনক্ষম হইবে, তখন মেয়েকে তাহার কার্য্যস্থলে পাঠাইবেন। এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না। তাঁহার স্ত্রী বাল্যকালে পতিগৃহে আসিয়া, বহুদিন পর্য্যন্ত শাশুড়ী ও ননদের নিকট লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিয়াছিলেন; সুতরাং সহচরীকে শ্বশুর-ঘর করিতে দিবেন না, এ বিষয়ে তিনিও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। নায়েব ত্রিভুবন সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন, নবীন ছেলেটি ভাল; লেখা-পড়া শিখাইতে পারিলে সে মানুষ হইবে। এই জন্য তিনি নবীনের সহিত সহচরীর বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টীমার-আফিসের পনের টাকা বেতনের 'সব-এজেণ্ট' তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এরূপ লোভনীয় প্রস্তাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, ইহা তিনি কোন দিন মনে করিতে পারেন নাই।

ত্রিভুবন দত্ত ক্রমে জানিতে পারিলেন, নবীনের মায়ের এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে; এজন্য তিনি একেবারে হাল ছাড়িলেন না। তিনি ভাবিলেন, 'মেয়ের বয়স এই ত সবে এগার; এত তাড়াতাড়ি কি! বিবাহ দিলেই ত মেয়ে পর হইয়া যাইবে।' তিনি কয়েক মাস উচ্চবাচ্য করিলেন না, অন্য কোন পাত্রেরও সন্ধান করিলেন না।

ইতোমধ্যে ত্রিভুবন গোপালপুর কাছারী হইতে মুরশিদাবাদের অন্তর্গত জঙ্গীপুরের কাছারীতে বদলী হইলেন। নবীনও মাইনর পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক চারি টাকা বৃত্তি পাইল।

এবার ছেলেকে এণ্ট্রান্স স্কুলে ভর্ত্তি করিতে হইবে। বংশীধর মণ্ডল সন্ধান লইয়া জানিলেন, মাসিক দশ-বার টাকা ব্যয় করিতে না পারিলে, কোন স্থানেই ছেলের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাঁহার স্ত্রী ক্ষান্তমণি তাঁহার দুশ্চিন্তার কারণ অবগত হইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "'সাধের কথা শোন নি কাণে, প্রাণ যাবে তোমার হ্যাচ্‌কা টানে!'

এখন মদ্দানী ফলাও! কল্‌কাতার পরী আর সোণার মুকুট এখন কোথায়? এখনও বল্‌চি, ভাল চা ত নায়েব মশায়ের মেয়ের সঙ্গে নবনের বিয়ে দাও,—ছোঁড়াটার একটা হিল্লে হোক।”

বংশীধর মুখ ভার করিয়া বলিলেন, “একবার বিয়ে দেব না বলেছি, এখন আর কোন্ মুখে বলি, বিয়ে দেব। আমার ত মেয়ে নয় যে, পা ধরে সাধ্‌তে যাব।”

ক্ষান্তমণি বলিলেন, “তোমাকে সাধ্‌তে হবে কেন? নায়েব মশায় তোমাকেই সাধ্‌বে,—আমি তার উপায় কর্‌চি।”

বংশীধর সবিস্ময়ে বলিলেন, “তুমি মেয়েমানুষ, বার হাত কাপড়ে তোমার কাছা নেই,—তুমি আবার কি উপায় কর্‌বে? আমাদের বাচপোত মশায় বল্‌তেন, ‘স্ত্রীবুদ্ধিং প্রলয়ঙ্করীং’; শেষে কি তাই হবে না কি? প্রেলয় কাণ্ড বাধাবে? এমন পাটোয়ারী বুদ্ধি কোথায় পেলে বল ত?”

তখন ক্ষান্তমণি একখানি পত্র বাহির করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। পত্রখানি তাঁহার পিসিমা ইচেথালি হইতে লিখিয়াছিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই যে, ক্ষান্তমণি সহচরীর সহিত নবীনের বিবাহ দিতে রাজী থাকিলে, ত্রিভুবন দত্ত তাহাকে লেখা-পড়া শিখাইবার ভার লইতে পারেন।

বংশীধর এবার আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। শুভ বৈশাখে নায়েব মহাশয় মহা সমারোহে নবীনের সহিত সহচরীর বিবাহ দিলেন; নবীন শ্বশুরের নিকট থাকিয়া, জঙ্গীপুরের এণ্ট্রেন্স স্কুলে লেখা-পড়া করিতে লাগিল।

(৩)

বিবাহের পর সহচরী কয়েক দিন শ্বশুরবাড়ী ছিল। মা-বাপের আদুরে মেয়ে, এই কয়দিন শ্বশুরবাড়ী থাকিতেই সে কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হইল। শাশুড়ীর আদর-যত্ন-সেবা তাহার মনে ধরিল না। সে জঙ্গীপুরে বাপের বাসায় ফিরিয়া গিয়া বলিল, “মা, আমি তোমার পাতা কুড়িয়ে খাব, সেও ভাল,—আমাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠিও না; সেখানে গেলে আমি আর বাঁচব না। তোমার ভাত কতজনে খাচ্ছে, আমাকে দু'টো দিতে পারবে না?”

মেয়ের কথা শুনিয়া মায়ের চোখে জল আসিল। তিনি বলিলেন, “না মা, আর তোকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবো না। শ্বশুরবাড়ী দেখে দিই নি, যাকে দেখে দিয়েছি, সে একশ' বছরের হ'য়ে বেঁচে থাক, তোর দুঃখ কি মা?”

সহচরীকে আর শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইল না। নবীন শ্বশুরগৃহে আদর-যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

গরীবের ছেলে বড়লোকের জামাই হইলে, তাহার চা'ল বিগড়াইতে বিলম্ব হয় না;—নবীনেরও চাল কিছুদিনের মধ্যে বিগড়াইয়া গেল। পিতৃ-গৃহের অসুবিধা, দারিদ্র্য, কষ্ট তাহার নিকট দুঃস্বপ্ন বলিয়াই প্রতীত হইত। শাশুড়ীর স্নেহে সে আবাল্যের মাতৃ-স্নেহ পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল! তাহার ধনবান্ শ্বশুরের তুলনায় তাহার পিতা কত সামান্য লোক,—ইহা স্মরণ হইলে, তাহার লজ্জার সীমা থাকিত না। নবীন শ্বশুরের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আর বাড়ী যাইতে চাহিত না। মায়ের স্নেহ-বিহ্বল হৃদয় বহুদূরবর্ত্তী পল্লীপ্রান্তে হাহাকার করিত; নবীনের ভাই বিপিন সর্ব্বদাই বলিত, “মা, দাদা কবে আস্‌বে? দাদাকে আস্‌তে লেখ, তার জন্যে আমার বড় মন কেমন করচে।” বিপিনের কথা শুনিয়া মায়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিত। বংশীধর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন, “হরি হে, ছেলেটাকে খাইয়ে-পরিয়ে, মানুষ করে, শেষে কি পরকে দিলাম!”—ক্ষান্তমণি বলিতেন, “তোমার যেমন কথা! পেটের ছেলে কি কখন পর হয়? লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত আছে, বাড়ী আস্‌তে সময় পায় না। নবীন আমার তেমন ছেলে নয়।” ক্ষান্তমণি মুখে এ কথা বলিতেন বটে, কিন্তু একটা বাষ্পভরা রুদ্ধশ্বাস তাঁহার বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠিত।

যাহা হউক, একবার পূজার ছুটীতে, শ্বশুরের অনুরোধে, নবীন নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তিন দিনের জন্য গোপালপুরে বেড়াইতে আসিল। সভ্য-ভব্য, নব্য নবীনকে দেখিয়া পল্লীবাসিগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল। নবীনের চোখে সোণার চসমা, মাথায় চেরা সিঁথি, সার্টের বোতামের গর্ত্তে গোলাপ ফুল গোঁজা!—গলায় আবার নেক্‌টাই! নবীন দুই হাত তুলিয়া সাহেবী কেতায় মা-বাপকে নমস্কার করিল। ঘরের মেঝেয় মায়ের প্রদত্ত জলখাবার দেখিয়া তাহার পিত্ত জ্বলিয়া গেল। মুড়ি আর নারকেলের নাড়ু, আর খানিকটা দুধের সর! সে কোন রকমে জলযোগ শেষ করিয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিবে, এমন সময় চৌকাটে ঢিপ্ করিয়া তাহার মাথা বাধিয়া গেল! নবীন মুখ বিকৃত করিয়া

বলিল, "কি বিড়ম্বনা, এ রকম ঘরে কি মানুষে বাস করতে পারে?" বিপিন দাদার কাছে ঘেঁসিতেই সাহস করিল না। নবীন অপরাহ্ণে পল্লী-ভ্রমণে বাহির হইয়া শৈশবের সঙ্গিগণকে দেখিয়া অত্যন্ত নিরাশ হইল। দেখিল, তাহার এক বন্ধু—হরিপদ নন্দী, একটা দোকানে বসিয়া, হাঁটুর উপর ময়লা কাপড় তুলিয়া, বিলাতী কাপড় বিক্রয় করিতেছে; ফটিক ঘোষ তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়া মাঠ হইতে গরু চরাইয়া আসিতেছে; পঞ্চা কৈবর্ত্ত খেজুর গাছে উঠিয়া রস-সঞ্চয়ের জন্ম গাছ 'কাটিতেছে', এবং তাহার পরম বন্ধু নিতাই নাপিত তেমাথা রাস্তায় দাঁড়াইয়া পায়রা উড়াইতেছে! নবীন কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিল না; তাহারাও তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আদর করিতে পারিল না। তাহারা বুঝিল, তাহাদের সে নবীন আর নাই, নবীন এখন 'সহুরে' হইয়াছে! নবীন তিন দিন পরে শ্বশুরবাড়ী পলাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

যথাসময়ে এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া নবীন বহরমপুর কলেজে এল্-এ পড়িতে গেল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নবীন দুইবার কি তিনবার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাড়ী আসিয়াছিল, তাহার পর সে আর বাড়ী আসিল না। ক্ষান্তমণি বধূমাতাকে গৃহে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বেয়াই বলিয়াছিলেন 'মেয়েটা যে তোমার বাড়ী যাবে, সেখানে গিয়ে খাবে কি? তোমার ছেলের চাক্‌রী-বাকরী হোক্, তখন নিয়ে যেও।'

বংশীধর তাহার পর আর কোন দিন পুত্রবধূকে স্বগৃহে আনিবার চেষ্টা করেন নাই। নবীনকে দুই-তিনখানি পত্র লিখিয়া কখন উত্তর পাইতেন, কখন কোন সংবাদই পাইতেন না। দারুণ মনঃক্ষোভে তিনি বুড়া না হইতেই বুড়া হইলেন,—মাথার সমস্ত চুল পাকিয়া গেল, দাঁতও অনেকগুলি পড়িল। তিনি চাক্‌রী ছাড়িয়া গোপালপুরে একখানি বেণে-মশলার দোকান খুলিয়া বসিলেন, এবং বিপিনকে আর বেশী লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা না করিয়া, সেই দোকানে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিপিন পাকা দোকানদার হইয়া উঠিল। বংশীধর আলমপুরের নীলমণি কুণ্ডুর কন্যার সহিত বিপিনের বিবাহ দিলেন; নীলমণি আলমপুর বাজারে মুদীখানার দোকান করিতেন। নবীনের সেবার এল-এ পরীক্ষা, এবং সহচরী অন্তঃস্বত্ত্বা,—সুতরাং তাহারা কেহই এ বিবাহে বাড়ী আসিতে পারিল না। বিবাহের কিছুদিন পরে বিপিনের স্ত্রী রাইকমল আসিয়া বৃদ্ধ শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর 'ভাত জল' যোগাইতে লাগিল।

(৪)

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসরে কত বালক যুবক, ও কত যুবক প্রৌঢ় হইয়াছে। সংসারের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। নায়েব ত্রিভুবন দত্ত গ্রেগ্‌সন কোম্পানীর নায়েবী ছাড়িয়া,—সকল জমীদারের যিনি মালিক—তাঁহার দরবারে নিকাশ দিতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় একটি সদাগরী আফিসে চাকরী করিতেছে। রুদ্রনারায়ণ একটি জমীদার-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে; তাহার একটি পুত্র। তাহার স্ত্রী ও পুত্র তাহার মাতার নিকট পল্লীগ্রামের পৈত্রিক বাড়ীতেই থাকিত। রুদ্রনারায়ণ অল্প বেতনের চাকরী করিত, স্ত্রী-পুত্র ও মাতাকে লইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকা তাহার সাধ্যাতীত। পল্লীগ্রামে অল্প খরচে সুখে-দুঃখে এক রকমে চলিয়া যাইত; দু' টাকা সঞ্চয়ও হইত। রুদ্রনারায়ণ দুই-চারি দিনের ছুটী পাইলেই বাড়ী আসিত; এবং মায়ের স্নেহে, পত্নীর প্রেমে, ছেলের ভালবাসায় প্রবাসের কষ্ট ও বেদনা ভুলিয়া গিয়া কয়েক দিনের জন্য শান্তি লাভ করিত।

নবীনও সংসারী হইয়াছে। সে পুনঃ-পুনঃ দুইবার চেষ্টা করিয়াও যখন এল-এ পাশ করিতে পারিল না, তখন তাহার শ্বশুর তাহার জন্য একটী ভাল চাক্‌রীর সন্ধানে নানা স্থানে চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে অনেক দিন হইতেই চাকরীর বাজারে আগুন লাগিয়াছে;—তিনি কোন দিকেই কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনিব—জমীদার-কোম্পানীর ম্যানেজার ম্যাক্‌ফার্সন সাহেব তাঁহাদের সদর আফিসে কুড়ি টাকা বেতনের একটি কেরাণীগিরি দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে উন্নতির কোন আশা নাই বুঝিয়া, তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। শেষে তাঁহার এক বন্ধুকে ধরিয়া সিরাজগঞ্জে রালি ব্রাদার্সের পাটের আফিসে নবীনের একটি চাকরী জুটাইয়া দেন। নবীন ত্রিশ টাকায় চাক্‌রী আরম্ভ করিয়াছিল,—কয়েক বৎসর পরে তাহার বেতন চল্লিশ টাকা হইল। সে তাহার স্ত্রী সহচরী, ও শিশু পুত্র 'ফ্যালা' (পঙ্কজকুমার)কে লইয়া

সিরাজগঞ্জেই বাস করিতে লাগিল। সে তাহার পিতামাতাকে কোন দিন অর্থ-সাহায্য করে নাই,—তাঁহারাও তাহার উপার্জ্জনের প্রত্যাশা করিতেন না। যে পুত্র মাসে কদাচিৎ একখানি পত্র লিখিয়াও পিতা-মাতার সংবাদ জিজ্ঞাসা না করে, তাহার নিকট পিতা-মাতার কি প্রত্যাশা থাকিতে পারে? বিপিনই দোকান-পাট করিয়া পিতা-মাতাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল।

কিন্তু নবীনের হৃদয়হীন ব্যবহারে বংশীধর নিরন্তর মনস্তাপ সহ্য করিতেন, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। একবার বর্ষাকালে বৃদ্ধ ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। পল্লীগ্রামে ডাক্তার-কবিরাজের বড় অভাব,—সুতরাং চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা হইল না। বিপিন তাঁহাকে কয়েক বোতল ডিঃ গুপ্ত, ও কয়েক কৌটা 'সর্ব্বজ্বর গজসিংহ' খাওয়াইল; কিন্তু কোন ফল হইল না। একদিন অপরাহ্নকালে ক্ষান্তমণি ও বিপিনকে কাঁদাইয়া তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার দীপ্তিহীন নয়নের সম্মুখে পৃথিবীর আলো যখন নিবিয়া আসিল, তখন তিনি শূন্যদৃষ্টিতে একবার উর্দ্ধে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "বাবা নবীন, একবার চোখের দেখাও দেখ্‌লি নে! ভগবান, নবীনকে সুখে রেখো।" দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার শুষ্ক, বিবর্ণ চিবুকের নীচে গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর সব শেষ! বিপিন তাঁহার তুষার-শীতল পদদ্বয় মাথায় তুলিয়া লইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল, "বাবা, দাদা তোমার শেষ আশাটাও পুরালেন না, এ দুঃখ যে যাবার নয়!"

যাহা হউক, নবীন পিতার অন্তিমকালে তাঁহাকে দেখিতে না আসিলেও, দুই দিনের ছুটী লইয়া সিরাজগঞ্জ হইতে বাড়ী আসিয়া, পিতৃ শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া গেল। সহচরী বলিয়াছিল, কতকগুলা খরচপত্র করিয়া বাড়ী না গিয়া, শ্রাদ্ধের সাহায্য বলিয়া বিপিনকে দশটি টাকা পাঠাইয়া দিলেই চলিবে। কথাটা নবীনের নিতান্ত অযৌক্তিক মনে হয় নাই; কিন্তু তাহার আফিসের বাবুরা তাহার পিতৃ-ভক্তির বহর দেখিয়া, এরূপ দুই চারিটি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, নবীনকে অনিচ্ছাতেও বাড়ী আসিতে হইয়াছিল, এবং অনর্থক তাহার ১৭৮/১০ টাকা খরচ হইয়াছিল। সুতরাং, বলা বাহুল্য, বিপিন স্বয়ং পিতৃ-শ্রাদ্ধের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর গোপালপুরের সহিত নবীনের সকল সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইল। অর্থাৎ পিতা জীবিত থাকিতে সে কদাচিৎ কখন একখানি পোষ্ট-কার্ড লিখিয়া তাঁহার সংবাদ লইত,—পিতার মৃত্যুর পর বিপিনকে চিঠিপত্র লেখাও সে বাহুল্য মনে করিতে লাগিল।

(৫)

এই ঘটনার অল্পদিন পরে সহচরীর মা নিত্যানন্দপুর হইতে সহচরীকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—এককড়া গরম দুধ উনান হইতে নামাইবার সময় হাত ফস্‌কাইয়া তাঁহার গায়ে পড়িয়াছে,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে,—সহচরী যেন নবীনের সঙ্গে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যায়। পত্র পাইয়াই সহচরী নিত্যানন্দপুরে যাত্রা করিবার আয়োজন আরম্ভ করিল। নবীন এক মাসের ছুটী লইয়া স্ত্রী-পুত্র সহ সিরাজগঞ্জ ত্যাগ করিল। আফিসের বাবুরা নবীনের শাশুড়ী-ভক্তির পরিচয় পাইয়া ধন্য-ধন্য করিতে লাগিল।

শ্বশুর মহাশয় যখন জীবিত ছিলেন, তখন নবীন দুই-একবার নিত্যানন্দপুরে আসিয়াছিল। নিত্যানন্দপুরের মধুর স্মৃতি তাহার হৃদয়ে উজ্জ্বল ছিল; কিন্তু দীর্ঘকাল পরে এবার আসিয়া দেখিল,—'সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই!' এখন শ্যালক-পত্নীই গৃহকর্ত্রী, তাহার শাশুড়ীকে তাঁহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে হয়। কোন বিষয়ে তাঁহার কর্তৃত্ব নাই। রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী বিজনবালা বড়লোকের মেয়ে; সংসারে অপোষ্যের মধ্যে একমাত্র শাশুড়ী,—তিনি একবেলা একমুটা খাইতেন মাত্র। কিন্তু হঠাৎ এ কি ঝঞ্ঝাট!—বলা-কওয়া নাই—হঠাৎ তিনটি প্রাণী ধূমকেতুর মত তাহার সংসারাকাশে উদিত হইয়া এ কি বিভ্রাট বাধাইল!—পূর্ব্বাপেক্ষা দুধ বেশী লাগিতেছে, দুই পয়সার মাছে আর কুলায় না, দশসের চাউল আনাইলে তিন দিনের মধ্যে ফুরাইয়া যায়; ইহার উপর, শাশুড়ীর স্নেহ যেন তাঁহার ননদের ছেলের উপরেই বেশী! পাঁচদিন যাইতে না যাইতে বিজনবালা স্বামীকে পত্র লিখিল, "মার গায়ে দুধ পড়িয়া কোথায় একটু ফোক্‌সা হইয়াছে, কি না, চিঠি লিখিয়া মেয়ে-জামাই-নাতি—একেবারে পঙ্গপাল আমদানী করিয়াছেন;

খাটিয়া-খাটিয়া আমার আর প্রাণ বাঁচে না, খরচেও আর কুলাইতে পারিতেছি না।—তুমি কলিকাতায় বাসা ঠিক করিয়া আমাকে লইয়া যাও, না হয় আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেও—মা মেয়ে-জামাই লইয়া ঘর করুন।"

রুদ্রনারায়ণ মায়ের অবিবেচনায় অত্যন্ত চটিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ কিছু করিয়া ফেলিতে পারিল না। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দান করিয়া পত্র লিখিল, "উহারা বড় জোর মাসখানেক থাকিবে বৈ ত নয়!—একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া থাক, লক্ষ্মী আমার! এখন যদি অসন্তোষ প্রকাশ কর, তাহা হইলে লোকে বড় নিন্দা করিবে।"

কিন্তু অসন্তোষ দিন-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্নে কি-একটা তুচ্ছ বিষয় লইয়া রুদ্রনারায়ণ ও সহচরীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়া গেল। রুদ্রনারায়ণের জননী পৌত্রকে বলিলেন, "দেখ মহীন্, ওরা দুদিনের জন্যে আমাকে দেখতে এসেচে, চিরকাল থাকবে না, তুই ফ্যালার সঙ্গে কেন ঝগড়া করিস্?"

এই কথায় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইল। বৌমা পুত্রকে ধরিয়া আচ্ছা রকম পিটাইয়া দিল,—তাহার পর সে-রাত্রি অনাহারে কাটাইল। শাশুড়ীর অনুনয়-বিনয়ে কোন ফল হইল না।

সহচরী বলিল, "বাবা আজ বেঁচে থাক্‌লে কি আমাকে পরের মেয়ের মুখনাড়া সইতে হোত? সকলই 'অদেষ্ট!' মাকে দু'দিন দেখ্‌তে এসেছি, এতেই এত?"

মা বলিলেন, "আমি আর এখন সংসারের কেউ নই মা! মরণটা হ'লেই বাঁচি!"

বৌ কথাটা শুনিতে পাইল,—শাশুড়ীকে শুনাইয়া বলিল, "আমার মরণ হ'লেই লোকে বাঁচে! বাপের বাড়ী যেতে চাইলেও যেতে দেবে না, আবার কল্‌কাতায় বাসাও করবে না। আমার হয়েছে উভয়-সঙ্কট!"

রাত্রিটা কোন রকমে কাটিয়া গেল।

পূজার ছুটীর আর অধিক বিলম্ব ছিল না। নবীন মনে করিয়াছিল, পূজার কয়দিন সে নিত্যানন্দপুরে শ্বশুরালয়েই কাটাইয়া যাইবে; কিন্তু তুচ্ছ বিষয় লইয়া প্রায় প্রত্যহ যেরূপ কলহ চলিতে লাগিল, তাহাতে সে জ্বালাতন হইয়া উঠিল; সে পলাইতে পারিলে বাঁচে। সহচরীও বলিল, "এখানে আর একদিনও থাক্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে না। তিন দিনের জন্যে বাপের বাড়ী এসে এত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা,—ছি, ছি! অদেষ্ট যদি ভাল হবে, ত, বাবাই বা অসময়ে মারা যাবেন কেন? সংসারে যার মাথা রাখ্‌বার ঠাঁই নেই, সেই যেন ভাইয়ের সংসারে এসে ভাজের লাথি-ঝাঁটা সহ্য করে।"

তখন ভাদ্র মাসের শেষ। সহচরী ভাদ্র মাসে স্বামীর সহিত পিতৃ-গৃহ ত্যাগের আয়োজন করিতেছে দেখিয়া, প্রতিবেশিনীরা তাহাকে আরও কয়েক দিন থাকিয়া আশ্বিনের প্রথমে স্বামীর কর্ম্মস্থানে যাইবার উপদেশ দিল। কিন্তু সে কাহারও অনুরোধে কর্ণপাত করিল না। নবীন দুইখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলিল।

বেলা দশটার সময়—আহারাদির পর রওনা হইবার কথা। প্রত্যূষে নবীনের ভেদ ও বমন আরম্ভ হইল। সে সময় নিত্যানন্দপুরে দুই-একজনের 'কলেরা' হইতেছিল। দুই-একবার ভেদ ও বমনের পর নিত্যানন্দপুরের বিচক্ষণ ডাক্তার নরহরি আচার্য্যকে ডাকিয়া আনা হইল।—ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কলেরা বটে, কিন্তু চিন্তা নাই; দুই এক ডোজ হোমিয়-প্যাথি ঔষধ পড়িলেই ভেদ-বমি বন্ধ হইবে।"

কিন্তু নরহরি ডাক্তারের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল না—রোগ ক্রমে কঠিন হইয়া উঠিল। রুদ্রনারায়ণের স্ত্রী বুঝিল—এই সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে অবিলম্বে স্থানান্তরে গমন করা আবশ্যক।—সে সেই দিনই তাহার দূর-সম্পর্কীয় দেবরকে দিয়া স্বামীর নিকট টেলিগ্রাম করিল, 'বাড়ীতে বড়ই বিভ্রাট, শীঘ্র আসিবে।"

রুদ্রনারায়ণ পরদিন প্রভাতে কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিয়া, নবীনের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল; তবে সুখের বিষয় তাহার বুদ্ধিমতী স্ত্রী নবীনের রোগশয্যার দিকে না আসিয়া নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে,—ছেলেকেও সে-দিকে যাইতে দেয় নাই। তাহার মা ও সহচরী প্রাণপণে রোগীর সেবা করিতেছে। রুদ্রনারায়ণ ডাক্তারকে নবীনের চিকিৎসার জন্য যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া, স্ত্রী-পুত্র-সহ সেই রাত্রেই শ্বশুরালয়ে পলায়ন করিল। দুই-একজন প্রতিবেশী তাহার সাধু সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভায়া হে, নবীন তোমার ভগিনীপতি, তাকে এ রকম সংশয়াপন্ন অবস্থায় ফেলে তোমার কি বাড়ী ছেড়ে যাওয়া উচিত?"—রুদ্রনারায়ণ বিলক্ষণ সপ্রতিভ ভাবে উত্তর

দিয়াছিল, "কি করি বলুন, গ্রামে যে রকম 'এপিডেমিক' আরম্ভ হয়েছে, তা দেখে কি একদণ্ডও এ গ্রামে থাকা উচিত? শাস্ত্রেই ত আছে—'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ"— হিন্দুর ছেলে হয়ে শাস্ত্র অমান্য করা যে মহাপাপ। পরমায়ু থাকে,—নবীন সেরে উঠবে।"

(৬)

রুদ্রনারায়ণ স্ত্রী-পুত্র লইয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিলে, দুইটী মাত্র রমণী মরণাহত নবীনের প্রাণরক্ষার জন্য সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি যমের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল; কিন্তু একজন পুরুষ অভিভাবক না থাকিলে ত চলে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া সহচরী এই দুর্দ্দিনে তাহার চির-উপেক্ষিত দেবরকে স্মরণ করিল। একদিন অতি প্রত্যূষে সে বিপিনের নিকট লোক পাঠাইল; বলিয়া দিল—যদি তাহার দাদাকে জন্মশোধ দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সে যেন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিত্যানন্দপুরে চলিয়া আসে।

সেইদিন অপরাহ্নকালে বিপিন দাদার সাংঘাতিক রোগের সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। দোকান বন্ধ করিয়া নিত্যানন্দপুরে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ক্ষান্তমণি কাঁদিয়া বলিলেন "ওরে বিপিন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল, বাছাকে একবার দেখে আসি। কতকাল যে তাকে দেখিনি! বাছার কেন এমন রোগ হলো? মা মঙ্গল-চণ্ডী, আমার নবীনের মঙ্গল কর,—ওমা ওলাবিবি, তোমার সিন্নি দেব—বাছা আমার সেরে উঠুক।"

গরুর গাড়ীতে সমস্ত রাত্রি চলিয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে মাতাপুত্রে যখন নিত্যানন্দপুরে উপস্থিত হইল, তখন নবীনের অন্তিমকাল সমুপস্থিত। তখন তাহার হাতে-পায়ে খিল লাগিতেছিল,—দাঁতে-দাঁতে বাধিয়া যাইতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, দেহ তুষার-শীতল, নিষ্প্রভ চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট; কিন্তু তখনও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় নাই। সহচরী নবীনের পদপ্রান্তে পড়িয়া মাটিতে মাথা কুটিতেছিল। তাহার চোখে তখন জল ছিল না, আসন্ন শোকের দারুণ উত্তাপে যেন অশ্রুর উৎস পর্য্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছিল। সে বিদীর্ণ কণ্ঠে বলিতেছিল, "ওগো, তুমি যে কখন একদিনও আমাকে ছেড়ে থাকো নি, তবে আমাকে কার কাছে ফেলে কোথায় যাচ্ছ? সংসারে আমার আর কে আছে? তোমার ফাঁলাকে কার হাতে দিয়ে যাচ্ছ!" তাহার বিদীর্ণ হৃদয়ের হাহাকার শুনিয়া নবীন চক্ষু মুদিত করিল,—বোধ হয় অবস্থাটা ঠিক বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

ঠিক সেই সময়ে ক্ষান্তমণি ঝড়ের ন্যায় বেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া নবীনের মাথার কাছে আছড়াইয়া পড়িলেন, এবং তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "নবীন, বাপ্ আমার! আজ কি তোর এই দশা দেখ্‌তে এলাম? আমি বড়ই অভাগী। কতদিন তোর মুখখানা দেখি নি। আমি যে বাবা এক লহমার জন্যেও তোকে ভুলতে পারিনি। তুই যে আমার সাত রাজার ধন সাগর-সেঁচা মাণিক। নবীন, বাপ্ নবীন রে!"

নবীন একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তাহার কোটরগত চক্ষুর পাশে দুইবিন্দু অশ্রু দেখা দিল; সে ক্ষীণস্বরে বলিল, "মা এসেছ? আঃ, তোমার জন্যেই বুঝি প্রাণটা এতক্ষণ ছিল। আমি তোমার কুপুত্র, তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও মা! আমি তোমার মনে বড় ব্যথা দিয়েছি, মা, ক্ষমা কর। বিপিন, ছোঁড়াটাকে দেখিস্ ভাই, আর ঐ হতভাগাকে একমুঠো ভাত দিস্, ওর আর কেউ নেই।"

বিপিন 'দাদা' 'দাদা', বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু সে আহ্বানে কেহ উত্তর দিল না।

* * *

সেদিন বিজয়া-দশমী। সন্ধ্যা অতীত প্রায়। মা দশভুজাকে পদ্মাবক্ষে বিসর্জ্জন দিয়া গোপালপুরের অধিবাসীরা তখন স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল। গ্রামের বহির্ভাগে নদীতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত প্রান্তর। সেই সুপ্রশস্ত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিতেছিল। শানাই কাঁদিয়া-কাঁদিয়া করুণ কণ্ঠে কি বেদনাভরা রাগিণীতে চরাচরের মর্ম্মভেদী শোক পরিব্যক্ত করিতেছিল; এবং শারদীয়া শুক্লা দশমীর শশধর সুধা-ধবল জ্যোৎস্নালোকে মুক্তপ্রকৃতি পরিপ্লাবিত করিতেছিল। এমন সময় ক্ষান্তমণি বিশুষ্কবদনা, সাশ্রুনয়না, মলিনবসনা, কম্পিতচরণা, নিরাভরণা সহচরীর হাত ধরিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। সহচরী সেই কুটীরের অনাবৃত মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া উভয় হস্তে তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুর প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিল। বিপিনের স্ত্রী রাইকমল সহচরীর ধরালুণ্ঠিত মস্তকটি সযত্নে

কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার রুক্ষ কেশের উপর নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

নবীন বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই ক্ষুদ্র কুটীরখানিরই মেঝেতে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একখানি 'ক্যাঁচ্‌কেঁচের পাটী'তে বসিয়া মৃৎপ্রদীপের ম্লা আলোকে বিপিনের পাঠ বলিয়া দিত; তাহার পর বিং বর্ষব্যাপী ব্যবধান!—আজ দুইটি শোকার্ত্তা নারীর উৎসারিত অশ্রুর প্রবাহে এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান বিলুপ্ত হইল।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

শুভঙ্কর

[শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস্‌সি]

(কাঠাকালি,—বিঘাকালি)

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুভঙ্করের জীবনী নহে। তিনি কোথায়, কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা তিনি যে সমস্ত জিনিস আমাদের দিয়া গিয়াছেন—সেই সকল তাঁহার নিজ মস্তিষ্ক-প্রসূত, অথবা সেই সকল জিনিস তিনি সঙ্কলন করিয়াছিলেন,—কিম্বা এইরূপ কিছু লিখিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা নহে। যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করেন, তাঁহাদের উপর শুভঙ্করের ঐতিহাসিক আলোচনার ভার দিয়া, যে বিষয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য তাহার অবতারণা করা যাউক।

(১) কুড়বো কুড়বো কুড়বো লিজ্জে।
কাঠা কুড়বো কাঠা লিজ্জে।
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ।
বিশ গণ্ডা হয় কাঠার জান।
গণ্ডা বাকী থাকে যদি কাঠা নিলে পর।
ষোল দিয়ে পুরে তারে সারা গণ্ডা ধর।

(২) ছটাক ধরিতে হবে ছটাক বিঘায়।
গণ্ডা ধরি ল'তে হবে ছটাক কাঠায়।
ছটাকে ছটাক হলে কাক ধরি লবে।
একুন করিলে পর কালী ঠিক পাবে।

ছেলেবেলায় যাঁহারা পাঠশালায় পড়িয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই উপরিউক্ত দুইটী শুভঙ্করের আর্য্যা মুখস্থ করিতে হইয়াছে. এবং ইহার সাহায্যে জমির কালি বাহির করিতে হইয়াছে। কিন্তু খুব কম ছেলেই—('কম ছেলেই' কেন আমার বোধ হয় কেহই নহে)—এই আর্য্যার তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে। পাঠশালায় শুভঙ্করের প্রায় সকল নিয়মই মোটামুটী শিক্ষা হইত—তবে আজকাল ইহা ক্রমে-ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। আজকাল শুভঙ্করের পাঁজাকালি, দধিকালি ইত্যাদির ত কথাই নাই,—সামান্য মণকষা, কড়িকষা, বৎসরমাহিনা, সুদকষা প্রভৃতির চলন উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবনে—আচার্য্য রামেন্দ্রবাবুর কথায় বলিতে গেলে—আমাদের কারবারের জীবনে কাজ-চালান হিসাবে শুভঙ্করের নিয়মই আমাদের বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত। জমির কালি, জিনিসের দাম, টাকার সুদ প্রভৃতি অনেক হিসাবই এই শুভঙ্করের হিসাবেই হইয়া থাকে। যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসকরা লোক, তাঁহাদেরও অনেকে হিসাব করিবার সময় শুভঙ্করের সাহায্য ল'ন। কিন্তু আমাদের সাধারণ লোক, যাঁহাদের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নাই, যাঁহাদের শিক্ষার শেষ গ্রাম্য পাঠশালায়,—তাঁহারা প্রায় সকলেই এই শুভঙ্করের সাহায্য লইয়া থাকেন।

শুভঙ্করের এই আর্য্যাগুলিতে তিনি কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক হিসাবের গোড়ার হিসাব—যে হিসাব সেই প্রকার অন্য সকল হিসাবে দরকার লাগে,—তিনি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। যেমন ১৲ এক টাকা করিয়া মণ হইলে ১ সেরের দাম কত জানিতে হইলে আমরা ১৲ এক টাকাকে ৪০ দিয়া ভাগ করিয়া ৮ আট গণ্ডা পাই। শুভঙ্কর আমাদের সুবিধার জন্য এই ভাগ করিয়া লিখিয়াছেন—'মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর, তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সের প্রতি ধর' প্রভৃতি লিখিয়াছেন। প্রত্যেক হিসাবের জন্য শুভঙ্কর যে সকল আর্য্যা লিখিয়াছেন, তাহার গোড়ায় যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করিয়া কতকগুলি মোটামুটী হিসাব করিয়া সেইগুলি পদ্যে লিখিয়া তিনি আর্য্যা লিখিয়াছেন। এই সকল আর্য্যার সাহায্যে আমরা কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট হিসাব শীঘ্র করিতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শুভঙ্কর আমাদের কারবারের জীবনের বড়ই প্রয়োজনীয়। শুভঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের জন্য লিখিয়াছেন। তিনি কিছু নূতন theory'র প্রবর্ত্তন করিতে যান নাই। ইংরাজী প্রথানুযায়ী যখন হিসাব করিতে হয়, তখন এক টাকাকে ৪০ দিয়া ভাগ করিয়া এক সেরের দাম বাহির করিতে হয়। কিন্তু এইরূপে হিসাব করিতে সময় অনেক লাগে এবং ভুল হইবারও সম্ভাবনা বেশী। এই জন্য যাঁহাদের বেশী হিসাবপত্র করিতে হয়, তাঁহারা হিসাবের একটা table করিয়া

রাখেন ; সেই table দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত হিসাবই করেন। শুভঙ্করের আর্য্যাগুলি এক-একটা table—তবে এইগুলি concise বা সংক্ষিপ্ত ; পদ্যে লেখা,—মুখস্থ করিবার বিশেষ সুবিধা। যাঁহারা table দেখিয়া হিসাব করেন, তাঁহাদের table হারাইয়া গেলেই চক্ষুস্থির ; শুভঙ্করে সে ভয় নাই। এ হিসাবে শুভঙ্করের সুবিধা অনেক।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছেলেবেলায় যখন এই সকল আর্য্যা মুখস্থ করা যায়, তখন কোন ছেলেই প্রায় এই সকলের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। তবে শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকল আর্য্যারই তাৎপর্য্য বুঝা যায়—কিন্তু কাঠাকালি, বিঘাকালি আর্য্যার ঠিক তাৎপর্য্য বুঝিতে অনেক দেরী লাগে। ইহার কারণ কি ? ইহার কারণ হইতেছে যে, কাঠা, ছটাক, বিঘা প্রভৃতি রাশির এমন একটা বিশিষ্টতা (property) আছে, যাহা মণ, সের, বা টাকা, আনা, পয়সা, প্রভৃতির নাই। সেই property যে কি, তাহা ক্রমে ক্রমে দেখান যাইতেছে।

আমাদের হিসাব দুই প্রকার সংখ্যা (number) দ্বারা হইয়া থাকে। একটাকে বলে abstract number, আর একটাকে বলে concrete number। বাঙ্গালাতে abstract numberকে কেবল সংখ্যা * বলা যাইতে পারে। এবং concrete numberকে রাশি * বলা যাইতে পারে। এক, পাঁচ, সাত, পনর, দুইশত, পাঁচশত, পাঁচলক্ষ, সাতশ' তিন প্রভৃতি abstract number ; পাঁচমণ, পনর জন মানুষ, তিন বিঘা জমি, তের ঘণ্টা প্রভৃতি concrete number। আমাদের হিসাবের মধ্যে এই দুই প্রকার numberই কেবল পাওয়া যায়। Abstract numberকে abstract number দিয়া যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করা যায় ; যথা ৫+৭=১২, ৭ – ৫=২, ৫×৭=৩৫, ২৫÷৫=৫। Concrete numberকে abstract number দ্বারা গুণ এবং ভাগ চলে, যোগ বিয়োগ চলে না। যেমন ৫ ঘণ্টা ×৫=২৫ ঘণ্টা, ১৫ হাত কাপড় ÷ ৩=৫ হাত কাপড়। এই দুই স্থলেই ফল concrete number। ২৫ ঘণ্টাও concrete number, এবং ৫ হাতও concrete number। কিন্তু পাঁচ মানুষ হইতে দুই বাদ দেওয়া যায় না এবং দুই যোগ করাও যায় না। Concrete number-এর সহিত concrete numberএর যোগ, বিয়োগ, ভাগ হয়, কেবল গুণ হয় না। যেমন ৫ জন মানুষ+৭ জন মানুষ=১২ জন মানুষ ; ৫ ঘণ্টা—৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট=১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট ; ১৫টা গরু ÷ ৫টা গরু=৩। এই স্থানে প্রথম ফল দুইটা concrete number এবং শেষ ফলটী abstract number। তা'ছাড়া, শেষোক্ত তিনটী নিয়মেই concrete number এক জাতীয়। ৫ জন মানুষের সহিত ৭ জন মানুষ যোগ করা হইয়াছে, মানুষের সহিত ঘণ্টার যোগ হয় নাই এবং ফল গরু হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, concrete numberএর সহিত একই জাতীয় concrete number এর কার্য্য চলে—পৃথক জাতীয় concrete number এর কারবার চলে না। এইবার দেখা যাউক, concrete numberকে concrete number দ্বারা গুণ করা চলে কি না। পাঁচ ঘণ্টাকে সাত ঘণ্টা দ্বারা গুণ করা চলে না ; পাঁচ জন মানুষকে তিন জন মানুষ দ্বারা গুণ করা চলে না ; আবার পাঁচ ঘণ্টাকে সাত টাকা দিয়াও গুণ করা চলে না। কিন্তু পাঁচ হাতকে সাত হাত দ্বারা গুণ করা চলে, কিন্তু পাঁচ হাতকে তিন ঘণ্টা দ্বারা গুণ করা চলে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে concrete numberকে concrete number দ্বারা গুণ করা চলে কেবল এক জায়গায়—যেমন, পাঁচ হাত × সাত হাত। এই যে পাঁচ হাতকে সাত হাত দ্বারা গুণ করা যায়, ইহার কারণ কি ? এইরূপ গুণ অন্য জায়গায় হয় না কেন ? ইহার উত্তর সহজ নহে ; তবে সাধ্যানুযায়ী বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ব্যাপ্তিজ্ঞাপক তিনটা দিক আছে ; ইংরাজীতে যাহাকে বলে dimension। আকাশের তিনটা dimension আছে।* আকাশের কোন এক স্থান হইতে অন্য এক স্থানে যাইতে হইলে, তিনদিকে যাইলেই চলিবে। তিনটা দূরত্ব দেওয়া থাকিলেই আকাশের যে কোন দুই স্থানের পরস্পর অবস্থিতি বুঝা যায়। সচরাচর আমরা এই তিনটাকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা বলিয়া থাকি। এই তিনটা কথা তিনটা dimensionএর পরিজ্ঞাপকরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ৫ হাত × ৭ হাত=৩৫ বর্গ হাত। এই রাশি একটি ক্ষেত্রকে বুঝাইতেছে, যাহা লম্বায় ৭ হাত এবং প্রস্থে ৫ হাত। কেবল ৩৫ হাত বলিলে আর একটা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস বুঝায়। কেবল ৩৫ হাত কোনও একটা দ্রব্যকে বুঝায়—যাহা একদিকে ৩৫ হাত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ৩৫ হাত আর ৩৫ বর্গ হাত—এই দুইটা concrete number। যদিও এক পর্য্যায়ের concrete number, তথাপি ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে—একটা আর একটা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আবার ৫ হাত × ৭ হাত × ২ হাত=৭০ ঘন হাত। ইহা একটী জায়গাকে বুঝায়, যাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাহার বা যে concrete numberএর দুই বা ততোধিক dimension আছে, তাহাদেরই পরস্পরকে পরস্পর দ্বারা গুণ করা চলে। আকাশকে (space) ইংরাজীতে ফুট, গজ, মাইল ইত্যাদি দ্বারা মাপা হইয়া থাকে। আমাদের বাঙ্গালায় বিঘা, কাঠা, ছটাক ইত্যাদি দ্বারা মাপা হয় ; সুতরাং বিঘা, কাঠা, ছটাক প্রভৃতির একটি দ্বারা আর একটিকে গুণ করা চলে। এখন দেখা যাউক, এই গুণ করা কিরূপে হয়,—অর্থাৎ বিঘাকালি, কাঠাকালিতে শুভঙ্কর এই গুণ কিরূপভাবে করিয়াছেন। ১ গজ × ১গজ=১ বর্গ গজ ; ইহাতে একটা জমিকে বুঝায়, যাহা লম্বায় ১ গজ এবং চওড়ায় এক গজ। সেইরূপ ১ ঘন গজ বলিলে একটা স্থানকে বুঝায়, যাহা তিন দিকেই এক-এক

* গণিতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতানুসারে।

* আজকালকার গণিতবিদ্‌দিগের মতে, আমরা যত ইচ্ছা তত dimensionএর কল্পনা করিতে পারি। সেটা কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের বাহিরে

গজ করিয়া। আবার এক বর্গগজ জমিতে ১ ফুট লম্বা ১ ফুট চওড়া এরূপ ৯ (নয়) টুকরা জমি হয় ; কারণ ৩ ফিটে এক গজ। সুতরাং যদি এক ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া জমিকে এক বর্গ ফুট বলা হয়, তবে ১ বর্গ গজে নয় বর্গ ফিট। সেইরূপ এক ঘন গজে ২৭ ঘন ফিট হয়। এই স্থলে বর্গ গজ, বর্গ ফুট, ঘন গজ, ঘন ফুট প্রভৃতির যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিতে কোনরূপ নূতন ধারণার প্রয়োজন হয় নাই। অর্থাৎ এক বর্গগজের সংজ্ঞা যেরূপে পাওয়া গিয়াছে, এক বর্গফুটের সংজ্ঞাও সেইরূপে পাওয়া গিয়াছে ; সেইরূপে ঘনগজ, ঘনফুটের সংজ্ঞাও পাওয়া গিয়াছে। বর্গইঞ্চি, ঘনইঞ্চি প্রভৃতি সংজ্ঞাও এইরূপে ঠিক করা হইয়াছে। এই সংজ্ঞাগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপোষক ; কোনটিই কাহারও বিরোধী নহে। এই হিসাবে ধরিলে, ১ বিঘাকে ১ বিঘা দিয়া গুণ করিলে এক বর্গ বিঘা হওয়া উচিত। এক বর্গ বিঘায় ২০ × ২০ = ৪০০ বর্গ কাঠা হওয়া উচিত। কার্য্যতঃ আমরা বিঘায়-বিঘায় গুণ করিয়া বিঘাই পাইয়া থাকি ; কারণ শুভঙ্করের আর্য্যায়—"কুড়বো কুড়বো কুড়বো লিজ্জ্যে" আছে। এক বিঘা × ১ কাঠা = ২০ কাঠা × ১ কাঠা = ২০ বর্গ কাঠা হওয়া দরকার ; কিন্তু শুভঙ্করের হিসাবে 'কাঠায় কুড়বো কাঠা লিজ্জ্যে' অর্থাৎ কাঠায় এবং বিঘায় গুণ করিলে কাঠা হয়। ১ কাঠা × ১ কাঠা = ১ বর্গ কাঠা ; কিন্তু 'কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ' ইত্যাদি। আবার ছটাকে-ছটাকে গুণ করিলে বর্গ ছটাক হওয়া দরকার ; কিন্তু 'ছটাকে ছটাকে হ'লে কাক্ ধরি ল'বে।' এইরূপ নিসদৃশ হইবার কারণ কি ? এটা ঠিক বিসদৃশ বলা ঠিক নহে ; কারণ এই সমস্ত অমিল সংজ্ঞার পার্থক্যের জন্যই হইয়াছে। শুভঙ্করের সংজ্ঞা ঠিক ইংরাজী সংজ্ঞার অনুরূপ নহে। ইংরাজী হিসাবে ৪০০ বর্গ কাঠায় এক বর্গ বিঘা হওয়া উচিত, ২৫৬ বর্গ ছটাকে এক বর্গ কাঠা হওয়া উচিত। শুভঙ্কর সেরূপ ধরেন নাই। তিনি ২০ কাঠায় বিঘা সর্ব্বত্রই ধরিয়াছেন, ১৬ ছটাকে কাঠা সর্ব্বত্র ধরিয়াছেন। এক বিঘা লম্বা এবং এক বিঘা চওড়া জমির কালি তিনি এক বিঘাই ধরিয়াছেন। এই এক বিঘা লম্বা এবং এক বিঘা চওড়া জমিতে যে এক কাঠা লম্বা এবং এক কাঠা চওড়া ৪০০ চারিশত টুকরা জমি হয়, তাহার প্রত্যেকটাকে এক কাঠা ধরা ইংরাজী হিসাবে হয় ; কিন্তু শুভঙ্কর এই এক বিঘা লম্বা এবং এক বিঘা চওড়া জমি (যাহার কালি তিনি এক বিঘা ধরিয়াছেন)—ইহাকে ২০ ভাগে ভাগ করিয়া এক কাঠা ধরিয়াছেন, এবং এই শেষোক্ত কাঠাকে ১৬ ভাগ করিয়া, এক একটাকে এক ছটাক ধরিয়াছেন ; সুতরাং শুভঙ্করের হিসাবে ২০ কাঠায় বিঘা এবং ১৬ ছটাকে কাঠা সর্ব্বস্থানেই খাটে,—এটা universal। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইংরাজী হিসাবে ৪০০ বর্গ কাঠায় ১ বিঘা হয়, শুভঙ্করের হিসাবে ২০ কাঠায় এক বিঘা, সুতরাং শুভঙ্করের এক কাঠা (কালি) ইংরাজী এক বর্গ কাঠার ২০ গুণ। এই হইতেই বিঘায় কাঠায় কেন কাঠা হয় বুঝা যায়। ১ বিঘা × ১ কাঠা = ২০ কাঠা × ১ কাঠা = ২০ বর্গ কাঠা ; কিন্তু ২০ বর্গ কাঠা = শুভঙ্করের ১ কাঠা (কালি)। অতএব বিঘায় কাঠায় কেন কাঠা হয়, বুঝা গে । ১ কাঠা × ১ কাঠা = ১ বর্গ কাঠা ; কিন্তু এক বর্গ কাঠা শুভঙ্করের এক কাঠার (কালি) ২০ ভাগের ভাগ ; অর্থাৎ এক বর্গ কাঠা· ; কাঠা (কালি)। শুভঙ্করের আর্য্যার সহিত ইহার মিল একটি উদাহরণ লইলেই বুঝা যাইবে। ৫ কাঠা দৈর্ঘ্য, ৫ কাঠা প্রস্থ,—শুভঙ্করের হিসাবে ইহার কালি ১ কাঠা ৪ ছটাক। আবার ৫ কাঠা × ৫ কাঠা = ২৫ বর্গ কাঠা। কিন্তু কুড়ি বর্গ কাঠায় ১ কাঠা (শুভঙ্করের কালি) ; সুতরাং ২৫ বর্গ কাঠা = $\frac{২৫}{২০}$ = ১$\frac{১}{৪}$ কাঠা (কালি) = ১ কাঠা ৪ ছটাক (কারণ ১৬ ছটাকে কাঠা)। শুভঙ্করের প্রথম আর্য্যাটির সমস্তটাই বুঝা গেল। এখন শুভঙ্করের দ্বিতীয় আর্য্যাটির সামঞ্জস্য দেখা যাউক। শুভঙ্কর ২০ কাঠায় বিঘা এবং ১৬ ছটাকে কাঠা ধরিয়াছেন ; সুতরাং ২০ × ১৬ = ৩২০ ছটাকে বিঘা হয়। অন্যদিকে ৪০০ বর্গ কাঠায় বিঘা এবং ২৫৬ বর্গ ছটাকে কাঠা ; অতএব ৪০০ × ২৫৬ বর্গ ছটাকে এক বিঘা হয়। শুভঙ্কর বলিয়াছেন, 'ছটাক ধরিতে হবে ছটাক বিঘায়'। আবার অন্যদিক হইতে ধরিলে ১ বিঘা × ১ ছটাক = ৩২০ ছটাক × ১ ছটাক = ৩২০ বর্গ ছটাক। কিন্তু ৪০০ × ২৫৬ বর্গ ছটাক = ৩২০ ছটাক (শুভঙ্কর) ; অতএব ৪০০ × ২৫৬ ÷ ৩২০ বর্গ ছটাকে এক ছটাক (শুভঙ্কর) হয়। সুতরাং ১ বিঘা × ১ ছটাক = ১ ছটাক (শুভঙ্কর), ১ কাঠা × ১ ছটাক = ১৬ ছটাক × ১ ছটাক = ১৬ বর্গ ছটাক। কিন্তু ৩২০ বর্গ ছটাকে ১ ছটাক হয় ; সুতরাং ১৬ বর্গ ছটাকে $\frac{১৬}{৩২০}$ = $\frac{১}{২০}$ ছটাক হয়। $\frac{১}{২০}$ ছটাক = ১ গণ্ডা, অতএব শুভঙ্করের 'গণ্ডা ধরি ল'তে হ'বে ছটাক কাঠায়' পাইলাম। 'ছটাকে ছটাক হ'লে কাক ধরি ল'বে' এইটি বুঝিতে পারিলেই আমাদের শুভঙ্করের দ্বিতীয় আর্য্যাটিও সমস্তটা বুঝা যাইবে। ১ ছটাক × ১ ছটাক = ১ বর্গ ছটাক = $\frac{১}{৩২০}$ ছটাক (শুভঙ্কর) ; কারণ, ৩২০ বর্গ ছটাকে ১ ছটাক (শুভঙ্কর) হয়। $\frac{১}{৩২০}$ ছটাক = ১ কাক। সুতরাং শুভঙ্করের দুইটি আর্য্যারই তাৎপর্য্য বুঝা গেল।

শুভঙ্করের কাঠা, ছটাক প্রভৃতির সংজ্ঞার বিশেষত্বের জন্যই শুভঙ্করের আর্য্যা প্রথম-প্রথম বুঝিতে কষ্ট হয়। শুভঙ্করের সংজ্ঞার বিশেষত্ব হইতেছে যে, তিনি ২০ কাঠায় বিঘা এবং ১৬ ছটাকে কাঠা রৈখিক (linear) মাপেও ধরিয়াছেন, এবং তল সম্বন্ধীয় (superficial) মাপেও ধরিয়াছেন।

শুভঙ্করের আর্য্যা দুইটি বর্গফলের সহিত তুলনা না করিয়াও কেবল শুভঙ্করের সংজ্ঞা হইতেই পাওয়া যাইতে পারে। তবে বর্গফলের সহিত তুলনায় সুবিধা হয় বলিয়াই সেইরূপে আর্য্যা দুইটি বাহির করিলাম"।

এক্ষণে শুভঙ্করের কাঠাকালি এবং বিঘাকালি এই আর্য্যা দুইটির একটি অসুবিধা এবং একটি সুবিধার কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। অসুবিধা হইতেছে যে, এই আর্য্যাতে ছটাক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর মাপের কালির কথা নাই। শুভঙ্করের সময় যখন ২০।২৫ বিঘা জমি লোকে কথায়-কথায় দান করিত (আমার এইরূপ ধারণা করা অন্যায় ; কারণ, আমি ইহার কোনও প্রমাণ দিই নাই, বা দিতে পারিতেছি না ; তবে আমার এ অনুমানটা বোধ হয় অন্যায় নয়), তখন ছটাক অপেক্ষা

ক্ষুদ্রতর অংশের কালির কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু এখন যখন গিনি দাঁড় করাইয়া জমির দাম ঠিক করা হয়, তখ ছটাক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশের কালির বিশেষ দরকার। এইবার সু ,ধার কথা বলিব। অসুবিধাটা যেমন practical lifeএ বড় বেশী অনুভব করা যায় (আজকাল কলিকাতার মত জায়গায়), সুবিধাটা সেইরূপ কেবল theoretically ; অর্থাৎ শুভঙ্করের এই আর্য্যা দুইটির একটু বিশেষ theoretical value আছে। কোন একটি স্থানের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা দেওয়া থাকিলে শুভঙ্করের এই দুইটি আর্য্যাতে তাহার ঘনফল বিঘা ছটাক এবং কাঠায় পাওয়া যাইবে। এমন কি যদি তিন অপেক্ষা অধিক যত ইচ্ছা dimension এর কল্পনা করি, তাহারও ফল এই শুভঙ্করের আর্য্যা দুইটি হইতে পাওয়া যাইবে। কেবল পরে-পরে একটির পর আর একটির দ্বারা গুণ (শুভঙ্করের আর্য্যানুযায়ী) করিলেই চলিবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ২০ কাঠায় বিঘা এবং ১৬ ছটাকে কাঠা সর্ব্বত্রই।

গোস্বামী-প্রসঙ্গ

[শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা]

(নানা কথা)

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত বৈষ্ণবকবি ভক্তবর ৺রসিকমল গোস্বামী মহাশয়ের জামাতা সোমড়ানিবাসী ভক্তিনিষ্ঠ ৺হরিনারায়ণ রায় মহাশয় গোস্বামী মহাশয়কে দেখিতে কলিকাতা হইতে ঢাকায় গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেখিতে গিয়াছিলেন, কেমন দেখিলেন ?" তিনি বলিলেন, "যেরূপ কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষাও উচ্চ দেখিলাম। তাঁহার প্রেম-ভক্তির কথা আমি আর কি বলিব,—একটি বাহিরের ঘটনা দেখিলাম, তাহাও আর কোথাও দেখি নাই।" আমি জিজ্ঞাসু হইয়া হরিনারায়ণ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে মধুবর্ষী আম্রবৃক্ষের মূলে গোস্বামী মহাশয় যথারীতি আপনার আসনে বসিয়া আছেন; স্বদেশী-বিদেশী অনেক লোক তাঁহার সম্মুখে একত্র হইয়াছেন। মধুলোভে মৌমাছির দল যেমন আমগাছটীকে ঘিরিয়াছে, ধর্ম্মপিপাসু বহুলোক সেইরূপ গোঁসাজীকে ঘিরিয়া আছেন। এমন সময় একটি ঘটনা উপস্থিত সকলকে বিচলিত করিল। গোস্বামী মহাশয়ের গর্ভধারিণী স্নেহ, দয়া, ও ভক্তির আধার ছিলেন; কিন্তু তিনি মাঝে-মাঝে পাগলিনীর ন্যায় হইতেন। সেই অবস্থায় তাঁহার লোকাপেক্ষা, লজ্জা, ভয় কিছুই থাকিত না। আজ তিনি সমাগত অপরিচিত লোকদিগের মধ্যে পুত্রের নিকট প্রায়-বিবসনারূপে উপস্থিত হইয়া নানা ভঙ্গিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয় যেমন ভাবে বসিয়া ছিলেন, তেমনি রহিলেন,—মাকে সরিয়া যাইতে বলিলেন না, থামিতে বলিলেন না, অথবা সরাইয়া লইয়া যাইতে কাহাকেও আদেশ করিলেন না। * * * এই ঘটনায় তাঁহার মুখশ্রী কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হইল না। তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, যেন কোন ঘটনাই ঘটে নাই; জননীর আসার পূর্ব্বেও সে স্থানটী যেমন ছিল, তখনও তেমনিই আছে।

গোস্বামী মহাশয়ের একপাশে একখানি মাটির রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি ছিল; কোনও ভক্ত উহা রাখিয়াছিলেন; মাতাঠাকুরাণী ঐ মূর্ত্তির মাথা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার পর আর একপালা নাচিয়া লইয়া, কতকটা তেল আনিয়া পুত্রের মাথায় মাখাইতে লাগিলেন। তখন গোস্বামী মহাশয়ের যদিও জটা হয় নাই, তবু বড়-বড় চুল ছিল। তেলটা বোধ হয় রেড়ির তেল,—মা যত্ন করিয়া মাখাইতেছেন, সুবোধ শিশুটি মাথা পাতিয়া দিয়াছেন। এত লোকের মধ্যে মা'য়ের এই পাগ্‌লামীতে পুত্রের বিন্দু-মাত্র চাঞ্চল্য নাই, লেশমাত্র সঙ্কোচ নাই। দীর্ঘকাল এই অভিনয় হইয়া গেল। মা যখন চলিয়া গেলেন, তখন গোস্বামী মহাশয় একজন শিষ্যকে সেই ভাঙ্গা দেবমূর্ত্তি নদীতে বিসর্জ্জন দিতে আদেশ করিলেন। মনে হইল, গোঁসাইজী যেন একখানি পাথরের শিব,—তাঁহাতে বাক্‌শক্তি আছে, কিন্তু চাঞ্চল্য নাই। সহস্র উপদেশ অপেক্ষা এই দৃশ্যটী দর্শকগণের মন-প্রাণ আকর্ষণ করিল। এইরূপ স্থির অবস্থা জগতে দুর্লভ।

২

ত্রিপুরা জেলার কালিকচ্ছ গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান ৺রামদুলাল মুন্সীর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ বসিয়াছে। রামদুলাল নন্দী আগরতলা রাজ্যের দেওয়ান ও সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন; তাঁহার রচিত অনেক শ্যামা-সঙ্গীত পূর্ব্ববাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। এমন লোকের বাড়ীতে ব্রাহ্ম-সমাজ;—বাড়ীর লোকেরা, পাড়ার লোকেরা বিদ্রোহী হইল। দেওয়ান মহাশয়ের পুত্র ৺আনন্দচন্দ্র নন্দী (শেষে "আনন্দস্বামী" ও "দয়াময়" নামে খ্যাত) গোস্বামী মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। যখন সকলে উপাসনা করিতে বসিয়াছেন, তখন বিপক্ষগণ সাকার লাঠি লইয়া নিরাকার উপাসনার দক্ষিণা দিতে উপস্থিত হইল। প্রায় সকল উপাসকই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। আনন্দ নন্দী মহাশয় এবং তাঁহার খুল্লতাত-ভ্রাতা কৈলাসচন্দ্র নন্দীর সহিত অত্যাচারকারীদিগের বাক্‌যুদ্ধ চলিতে লাগিল; সকলেই চঞ্চল ও ব্যতিব্যস্ত। এই সকলের মধ্যে একটি লোক উপাসনা আরম্ভের সময় যে চক্ষু বুজিয়াছেন, এত কাণ্ড-কারখানার মধ্যেও এখনও চক্ষু বুজিয়াই আছেন। "এ বেটা এখনও চোখ্‌ বুজিয়াই আছে" বলিয়া এক ব্যক্তি দুইহাতে শক্ত করিয়া সেই উপাসকের দুই কাণ মলিয়া দিল; কিন্তু যখন দেখিল যে এতবড় শক্ত কাণমলা খাইয়াও এ লোক চক্ষু মেলিল না, তখন কেহই আর তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহস করিল না।

সমুদ্রের যে ঢেউগুলি খুব জোরে আসে, সেগুলি গায়ে লাগিলে, অনেক সময় হাত কি কোমর ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু ঐ সময় ডুব দিয়া

থাকিলে মাথার উপর দিয়া ঢেউগুলি চলিয়া যায়, মোটেই গায়ে লাগে না। গোস্বামী মহাশয়ও সেইদিনকার অত্যাচারের ঢেউগুলি ডুব দিয়া কাটাইয়া দিলেন, উহা মোটেই তাঁর গায়ে লাগিল না। তাঁহার অনুদ্বেগ ও অচঞ্চল ভাব দেখিয়া বিপক্ষগণ বিস্মিত হইল এবং "এ ঘটে দেবত্ব আছে" মনে করিয়া আর অধিক অত্যাচার করিতে সাহস করিল না।

৩

কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটে ভক্ত জমিদার ৺রাখালচন্দ্র রায় মহাশয়ের বাড়ীতে থাকার তাঁহার সময় বয়স্কা কন্যা প্রেমসখী মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা। সেইটিই শেষ সন্তান। ডাক্তার নীলরতন সরকার, জগদ্বন্ধু বসু প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের চিকিৎসা শেষ হইয়াছে; আর মোটেই আশা নাই। আমি গোস্বামী মহাশয়ের নিকট যাইয়া বলিলাম, "একটু সুচিকাভরণ দিলে হয় না?" তিনি সে সময় যথারীতি গ্রন্থপাঠ করিতেছিলেন। এ সময়ে পাঠে বাধা দিতে কেহ সাহস করে না, কাহারও প্রবৃত্তিও হয় না; আমি বেশী ব্যস্ত হইয়াই পাঠের মধ্যে কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই একটু মৃদু হাস্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "এখন যার যা' ইচ্ছা তা' ক'রে দেখা উচিত।" এইটুকু বলিয়াই আবার পাঠ করিতে লাগিলেন। বুঝিলাম, তিনি আর আশা রাখেন না। মৃদু হাস্যের ইহাই তাৎপর্য্য।

কন্যা প্রেমসখী দেহত্যাগ করিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী শান্তিসুধা এবং দিদিমা ঠাকুরাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের করুণ রোদনে উপস্থিত নরনারী অনেকেই কাঁদিতে লাগিলেন। গোঁসাইজী যেখানে আসনে স্থির হইয়া বসিয়া পাঠ করিতেছেন, সেখান হইতে এই শোক কোলাহল সমস্তই সুস্পষ্ট শোনা যাইতেছে। এক পলকের জন্য পাঠ বন্ধ হইল না। তিনি উপস্থিত কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, অথচ কিছুই তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। অনেকক্ষণ পরে যখন নিয়মিত পাঠ সমাপ্ত হইল, তখন কমণ্ডলুটী হাতে করিয়া উঠিয়া শৌচাগারের দিকে চলিলেন। রাস্তায় সেই ঘর, যেখানে বৃন্তচ্যুত গোলাপের মতন মাতৃহীন কন্যারত্নের প্রাণহীন দেহ পড়িয়া আছে,—জ্যেষ্ঠা কন্যা, বৃদ্ধা খাশুড়ী কাঁদিয়া গলা ভাঙ্গিতেছেন; পুত্র, শিষ্যা ও শিষ্যগণ সকলেই শোকাকুল। একবার সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। একদৃষ্টে অল্পক্ষণ সমস্ত পরিবারের আদরের দুলালী সেই কন্যারত্নের মুখপানে তাকাইয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, "একটু কীর্ত্তন কর।" তখন কীর্ত্তন করার উপযুক্ত লোক কেহই কাছে ছিলেন না। আদেশ প্রাপ্তিমাত্র আজ্ঞাবহ-সেবক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয় গান ধরিয়া দিলেন। আর কখনও আমি তাঁহাকে গাইতে দেখি নাই। তিনি গায়কও নহেন; কাছে খোল নাই, করতাল নাই; বিধুভূষণ হাতে তালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে আর দু-চারিজন এইরূপই গায়ক যোগ দিলেন। কিন্তু ঠাকুর যখন বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন মনে হইল, যেন কি অপূর্ব্ব কীর্ত্তনই হইতেছে। সেই মনোহর নৃত্য, ভাবে গদগদ সেই অপূর্ব্ব কান্তি, দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া হরিনামের সেই হা হুঙ্কার, সেই স্বেদ-কম্প-অশ্রু-সমন্বিত সর্ব্বাঙ্গে পুলকের প্রকাশ, ক্ষণেকের মধ্যে সেই শোকগৃহকে আনন্দনিলয় করিয়া তুলিল। তখন কাহারও শোক নাই, দুঃখ নাই, ইহকাল-পরকাল সকলে ভুলিয়া গিয়াছে; মৃত্যু অমৃত হইয়াছে। সকলেই আকুল-নয়নে, ব্যাকুলপ্রাণে সেই মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া আছে, মৃতার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। নৃত্য করিতে-করিতে তিনি দক্ষিণ হস্তে এমন ভাবে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চারিদিকে আরতি করিতে লাগিলেন যে, আমার স্পষ্টই মনে হইল, যেন সেই গৃহাগত, আমাদের অদৃশ্য, দেবলোকবাসীদিগকে দেখিয়া আরতি করিতেছেন। তিনি যে কিছু প্রত্যক্ষ না করিয়া উদ্দেশে কাহারও আরতি করিতেছেন, কিছুতেই এমন কথা ভাবিতে পারিলাম না; তখনকার অবস্থা সেইরূপ ছিল না। আর একটি অবস্থা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম; দেখিলাম, নৃত্যকালে তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গ চক-চক্ করিয়া জ্বলিতেছে; নদীর ধারে বালির উপর রৌদ্র পড়িলে যেমনটা হয়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সেইরূপ চক-চক্ করিতেছে। নৃত্যের মধ্যে তাঁহার শরীরের অন্যান্য নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি, কিন্তু এমন উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রূপ আর কখনও দেখি নাই। আমি অবাক্ হইয়া সেই রূপের দিকে চাহিয়া রহিলাম; সে জ্যোতিঃতে চক্ষু ঝলসাইতেছে না, উহা বড়ই দীপ্ত অথচ বড়ই মধুর। আমি কখন মানুষে এইরূপ রূপের কল্পনা করি নাই। নৃত্য ও আরতি হইতে বিরত হইয়া কন্যার মৃতদেহের মস্তকে তাঁহার পিতা এবং শ্রীগুরুদেব, আপনার চরণকমল অর্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং যথারীতি দৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পরক্ষণ হইতেই যাহারা দেখিল, সকলেই বুঝিল, যেন কিছু ঘটনা ঘটে নাই।

আমি তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় শরীর দেখার কথা তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া বলিলাম। বালির উপর রৌদ্র পড়ার দৃষ্টান্তটাও দিয়াছিলাম। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন যে, দেবলোকবাসীরা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতেই বোধ হয় স্ফূর্ত্তির জন্য দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। আমি দেখিলাম, আমার অনুমানই সত্য;—তখন আরতি করার অর্থও বুঝিলাম।

(৪)

শ্রীবৃন্দাবনধামে অবস্থিতিকালে একদিন গোস্বামী মহাশয়, কর যোড়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমাদের মাতৃস্বরূপিণী, ৺যোগমায়াদেবীর স্তুতি করিতেছিলেন; পরম শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্যামাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাশের ঘরে বসিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, গোঁসাইজী গম্ভীরভাবে যোগমায়া দেবীকে করযোড়ে বলিলেন, "সখি, তুমি আমাকে কৃপা করিয়া রক্ষা করিয়াছ। তুমি সহায় না হইলে আমি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতাম না। তুমি সর্ব্বদাই আমার ধর্ম্মপথের সাহায্যকারিণী" ইত্যাদি। শব্দগুলি ঠিক-ঠিক না হইলেও কথাগুলির ভাব এইরূপই বটে। দেবী যোগমায়া বাল্যকাল হইতেই স্বামীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পতি-

দেবতা সমাজের অন্যান্য লোকের মতন গতানুগত ভাবে সংসার পাতিয়া চলেন নাই। স্বার্থের পথে চলিলে সংসারের অন্য দশজনার মতন অনায়াসে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন, দশের মন যোগাইয়া চলিলে দেশের মধ্যে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ হইত। কিন্তু সরলতা ও সৎসাহসের অনুবর্ত্তী হওয়ায় তাঁহার সংসার-পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শান্তিপুরের মতন স্থানে অদ্বৈত-পরিবারের কোন লোকের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অন্যান্য বিদ্বেষী অংশীদিগের সঙ্গে একবাড়ীতে পরিবার লইয়া বাস করা যে কিরূপ বিপদ ও অপমানজনক, অন্যের পক্ষে তাহা অনুভব করাও সহজ নয়। রাস্তায় বাহির হইলে যেখানে সেখানে গ্লানি ও কুৎসা, হাটে, ঘাটে, বাটে, মাঠে, যেখানে যান সেইখানেই তিরস্কার, যুবক, বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রীলোক অনেকে তাঁহাকে নিন্দা ও অপমান করা অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে ধরিয়া লইয়াছিল, তাহারা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য মনে করিত না। রাস্তা দিয়া চলিতে দুষ্টলোকেরা তাঁহার গায়ে গোবরগোলা ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না।

বাউল গাহিয়াছিলেন—

"নগরেতে চলে যেতে
পাড়ার লোকে কত কই না কয়,
আমি, পরের মন্দ—পুষ্পচন্দন,
অলঙ্কার পরেছি গায়।"

গোস্বামী মহাশয় তাঁহার নবানুরাগে, পরের মন্দ পুষ্পচন্দনের ন্যায়ই জ্ঞান করিতেন। অপমান-নির্য্যাতনের বিষয়ে তিনি কখন কাহাকেও একটি উচ্চ বাক্য বলেন নাই, কাহার প্রতি ক্রোধ করেন নাই; কিন্তু অত্যাচারকারীদিগের ভীতিপ্রদর্শনেও কখন ভীত হ'ন নাই।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কুতশ্চন্।

যিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন, তিনি কাহাকেও ভয় করিবেন কেন?

তাঁহার নিজের উপরে যে সকল অত্যাচাররূপ পুষ্পচন্দন বর্ষিত হইত, সে সকল অপেক্ষা অন্য একটি বিশেষ উদ্বেগকর ব্যাপার ছিল। অন্তঃপুরে অন্যান্য ঘরের "মা গোঁসাই"গণ, গোস্বামী মহাশয়ের পরিবারের সে বাড়ীতে বাস করা মোটেই পছন্দ করিতেন না। নানাভাবে যতটা বাক্যবাণ বর্ষণ করা যায়, তাঁহারা যোগমায়া দেবীকে লক্ষ্য করিয়া সে সকল নিক্ষেপ করিতেন; বিশেষতঃ তাঁহার কর্ণে স্বামীর নিন্দা অসহ্য, হৃদয়-বিদারক হইত। বলিতে গেলে, তখনও তিনি অল্পবয়স্কা বধূ মাত্র; এই সকল অসহ্য যাতনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। পতিব্রতা শুধু পতির মুখ চাহিয়া সকলই সহ্য করিয়াছেন। এই সময় সাংসারিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা একখানি পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলেই বুঝা যাইবে। তখনকার সুপ্রসিদ্ধ ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, গোস্বামী মহাশয়ের পরম বন্ধু, ঢাকা ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম ট্রাষ্টি, বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়কে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,—

১৭৮৮ শক ৫ই জ্যৈষ্ঠ
(১৮৬৬ খৃঃ অঃ) কলিকাতা।

"প্রীতিপূর্ণ অসংখ্য নমস্কার—

আলস্য ও পয়সার অনাটন বশতঃ আপনাকে পত্র লিখি নাই, তথাপি এবার ব্যারিং পত্র লিখিতে হইল। আমার স্ত্রীর শরীর অসুস্থ; রীতিমত ঔষধ-পথ্য দিলে শীঘ্র সুস্থ হইতে পারিতেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মঙ্গলের জন্য এরূপে শরীর নাশও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। কেবল আমার নহে, প্রত্যেক প্রচারক পরিবারেরই এইরূপ দুর্দ্দশা। মরুক সকলে শুষ্ক হইয়া অনাহারে রোগ-বিকারে; কেবল ঈশ্বরের জন্য প্রাণত্যাগ করুক, তথাপি যেন কেহ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতে বিরত না হয়, এই আমার আন্তরিক বাসনা।"

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

চরণ পূজা করিয়া যাহারা অর্থ প্রদান করিত, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; আদিব্রাহ্মসমাজে থাকিতে সংসার নির্ব্বাহের কথা ভাবিতে হইত না; শান্তিপুরে বিরোধীদের কারাগারে ম্যালেরিয়ার রঙ্গ-ভূমিতে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছেন; প্রাণাধিকা ও ছায়ার মতন অনুগামিনী সহধর্ম্মিণীর পীড়ায় ঔষধ-পথ্য চলিতেছে না; তথাপি ধর্ম্মেরই জয় ঘোষণা করিতেছেন। ধর্ম্মানুরাগের চমৎকার আদর্শ!

তিনি ত ধর্ম্মানুরাগে পাগল হইয়াছেন, ধর্ম্মলাভের আশা পাইলে তিনি "ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িতে পারেন", সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারেন, শরীরকে "কুটিকুটি করিয়া কাটিয়া দিতে পারেন,"—সবই পারেন; সুতরাং এত ক্লেশ, এত অপমান-নির্য্যাতন কেন সহিবেন না? কিন্তু যে আশ্রিতা লতাটি শুধু তাঁহাকেই বেড়িয়া রহিয়াছে, সে ত অন্য কিছুই জানে না; সে শুধু তাহার আশ্রয়-তরুকেই জানে। দেবী যোগমায়া শুধু পতিমুখ চাহিয়াই সমস্ত দুঃখ সহিয়াছেন। যখন স্বামী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি সে ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতেন না; পতিগতপ্রাণা শুধু পতির জন্যই সকল সহিলেন, কোন দুঃখেই বিরক্ত বা বিচলিত হইলেন না।

যে অসীম-সাহসিক কাণ্ডারী, তরঙ্গাকুল নদীবক্ষে পাড়ি ধরিতেই ভালবাসে, তাহার নৌকায় আরোহী হইয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকা অল্প নির্ভরের কথা নহে। যোগমায়া ঠাকুরাণী সেই নির্ভরের এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছেন।

এইজন্যই গোস্বামী মহাশয় তাঁহার স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন—"সখি, * * তুমি সহায় না হইলে আমি কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিতাম না।" গৃহস্থের স্ত্রী সহধর্ম্মিণী না হইলে গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মলাভ করা অসম্ভব, তিনি সহায় হইলে গৃহই তপোবন হয়।

দেবী যোগমায়া, গোস্বামী মহাশয়ের আবাল্য সহচরী, প্রাণপ্রিয়া, প্রিয়সখী, সহধর্ম্মিণী ও ধর্ম্মরক্ষিণী ছিলেন। সেই যোগমায়া যখন

শ্রীবৃন্দাবনধামে শেষ-শয্যায় শয়ানা, যখন ওলাউঠা ব্যাধি সারথি হইয়া তাঁহাকে স্বধামে লইতে আসিয়াছে, সেদিনেও গোস্বামী মহাশয়ের নিয়মিত কার্য্য রেখামাত্র অতিক্রম করিল না। যথারীতি পাঠ, পূজা, মন্দির-প্রদক্ষিণ ও সাধু দর্শন করিয়া তিনি যখন আশ্রমে ফিরিলেন, তখন দেবী যোগমায়া মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গৃহে আসিয়া এরূপ আচরণ করিলেন, যেন সংবাদটা তাঁহার নিকট মোটেই নূতন নহে; যাহা ঘটিবে জানিতেন, তাহাই ঘটিয়াছে; যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও তিনি জানিয়াছিলেন। পরক্ষণ হইতে পূর্ব্বকার মতন জীবনযাত্রা চলিতে লাগিল, অথচ তাঁহার স্থায় পত্নীবৎসল জগতে দুর্লভ।

এ ঘটনাটি সাধারণ লোকের নিকট একটু নিষ্ঠুরতা, অন্ততঃ উপেক্ষা বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু যিনি দয়ার সাগর, তাঁহাতে কি এইরূপ নিষ্ঠুরতা সম্ভবে? যিনি ধর্ম্ম-পত্নীর নিকট এত কৃতজ্ঞ, তিনি কি তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন? তবে এ সমস্যার মীমাংসা কি?

দেবী যোগমায়ার দেহত্যাগের কিছুদিন পরে শ্রীগুরুদেবের জননী ঠাকুরাণী সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে এইভাবে বলিলেন—"বৌ, তোমার ত আইবুড়ো মেয়ে আছে, আমার বিজয়ের সঙ্গে বে দাও না।" কনের মা বলিলেন, "আপনার ছেলে যদি আমার মেয়েকে বে করেন, তা'হ'তে আমার আর অধিক সৌভাগ্য কি আছে?" পাত্রীপক্ষের আশ্বাস পাইয়া পাগলী মা, পুত্রকে বলিলেন যে, "আমি তোর বে ঠিক করেছি। নগেন্দ্রবাবুর মেয়ে, দিব্বি মেয়েটি—তারা রাজি হয়েছে।" পুত্র বলিলেন, "মা, আমি কি করে বে কর্ব্বো? যোগজীবনের মা আছেন যে।" মা বলিলেন, "কোথায় আছে,—সে ত মরে গেছে।" পুত্র বলিলেন "না মা, আমি তাঁকে দেখতে পাই।" মা আর জেদ করিলেন না। তিনি ইহকাল-পরকাল সমানভাবে প্রত্যক্ষ করিতেন। তাই তাঁহার শোক ছিল না। দেবী যোগমায়া মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিলেও স্বামীর দৃষ্টি অতিক্রম করেন নাই।

শাস্ত্রের কথা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইবার উপায় না থাকায়, আমাদের শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বগুলির উপর লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। লোকেরা ভাবে, সেগুলি কথার কথা মাত্র। ভগবান্ মহাপুরুষের মধ্য দিয়া সেই সকল তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিয়া ঋষি-বাক্যের সার্থকতা সপ্রমাণ করেন।

গোস্বামী মহাশয়ের জীবনের বহু ঘটনার মধ্য হইতে উপরে যে কয়েকটি ঘটনা লিখিত হইল, ইহা দ্বারা শাস্ত্রের এই বাক্য প্রমাণিত হইল যে,—

"দুঃখেষনুদ্বিগ্ন মনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ স্থিতধী র্মুনিরুচ্যতে।"

পাঠ ও শাঠ

[রায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর]

সম্প্রতি কোনও প্রবন্ধ, কোনও বক্তৃতা, অথবা কোনও অভিভাষণ—যাহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় বলিয়া শিক্ষিত সাধারণের নিকট সমাদৃত হইতেছে, এবং সকলের চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ,—কি জানি কেন জানি না,—দল-বিশেষের নিকট তৎসমস্ত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-করাভিভূত কুটজ-গুচ্ছের স্থায় পর্য্যুষিত বলিয়া প্রতিপন্ন ও পুরাতন বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। এই দল ভাল কিছু পাইলেই বলিতেছেন, ইহা পুরাতন, বহু পুরাতন। অবশ্য ইহা কপিলানুমোদিত সম্বাদ। কপিল কার্য্যমাত্রকে সৎ অর্থাৎ চিরকাল আছে বলিয়া বলেন। স্বয়ং ভগবানও গীতায় বলিয়াছেন,—

"না সতো বিদ্যতে ভাবো, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ"

সুতরাং যাঁহারা সবকে পুরাতন করিতে চান, তাঁহারা সত্যবাদী সন্দেহ নাই। তবে তাঁহাদের এই সত্যনিষ্ঠা ধরিলে তাঁহাদের "পুরাতন" বলাটাও যে পুরাতন, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহারা বলিতে পারেন, এরূপ বলিতে গেলে "অনবস্থা" দোষ ঘটিতে পারে। তাহা হউক, তাহা বলিয়া কি কপিলের সম্বাদ খণ্ডনের জন্য বৈদান্তিক সাজিয়া মিথ্যাবাদী হইতে হইবে, না, নৈয়ায়িক সাজিয়া তর্কের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া ব্যাসদেবের—

"তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ"

এই সূত্রের ধাক্কা খাইয়া আবার সেই অনবস্থার খাদে পড়িতে হইবে? অগত্যা কপিলের সম্বাদ লওয়াই সঙ্গত। এক্ষণে আমরা সকলেই বলিব—

অসদ করণাদুপাদান গ্রহণাৎ সর্ব্ব সম্ভবাভাবাৎ
শক্তস্য শক্য করণাৎ কারণ ভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্।

ইহার স্থূলতঃ অর্থ এই যে, কার্য্যমাত্রই সৎ অর্থাৎ ছিল, রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয় মাত্র। তাহা ত হইল; এখন আধুনিক কবিদের অবস্থা কি হইবে? যাহা কিছু হইবে, সবই ত পুরাতন;—আবিষ্কর্ত্তার আবশ্যকতা কি? বৈষ্ণব-পদাবলী-রচয়িতাদের ত দুর্নাম রাখিবার ঠাঁই নাই। প্রায় আটশত বৎসর হইল গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেবের তিরোধান ঘটিয়াছে; তাঁহার তিরোধানের তিনশত বৎসর পরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদাবলী-কর্ত্তাদের আবির্ভাব হয়। ব্যবধান তিন শত বৎসর বটে, কিন্তু সেই কৃষ্ণলীলা, সেই রস, সেই মাধুরী, সেই বীণা, সেই ঝঙ্কার যেন মূর্ত্তিমান। তবেই ত মুস্কিল! চণ্ডীদাস, জয়দেবের ও বিদ্যাপতির ত আর কিছুই রাখিলেন না। চণ্ডীদাসের মত চোর ত জগতে নাই। "কানু ছাড়া গীত নাই" এই প্রবাদ ধরিলে জয়দেব হইতে আরম্ভ করিয়া জগদানন্দ, বাসুঘোষ এবং যবন কবি নাসীর মামুদ ও আলোওল—অধিক কি অধুনাতন নীলকণ্ঠ, রসিক চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত যেন সব ডাকাতের দল।

যাঁহারা বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়াছেন এবং কালিদাসের রঘুবংশ পড়িয়াছেন, তাঁহারা যদি এইরূপ ভাবে সম্বাদ ধরিয়া বসেন, তাহা হইলে

মদন ও রতি

শ্রীযুক্ত বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে

তাঁহাদের নিকটে কালিদাস পর্য্যন্ত মহাকবিশ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইবেন।

আর অগ্নিপুরাণ যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারা ত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজের নাম শুনিলে নাসা আকুঞ্চন করিবেন, সন্দেহ নাই। এরূপ কয়টি বলিব? এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, আর নূতন কবি নাই, বা কবিতা নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—এখন যে হাটে-মাঠে-ঘাটে—সর্ব্বত্র কবিত্বের ছড়াছড়ি, ইহা কি শশবিষাণের স্থায়, বন্ধ্যাপুত্রের স্থায়, আকাশকুসুমের স্থায় সর্ব্বৈব মিথ্যা? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এই বিষম সমস্যার সমাধান করিতে হইলে কেবল পাঠে চলিবে না, শাঠ্যও আবশ্যক। পাঠ সকলেই জানেন। শাঠটা কি, তাহা পিতামহীর গল্পের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

পুরাকালে একজন পণ্ডিতপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার একটি সভা ছিল; সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সে সভার সভ্য ছিলেন। কোন নূতন পণ্ডিত রাজসকাশে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সেই সভা আহূত হইত, এবং নবাগত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা হইত। ঘোষণা দেওয়া ছিল যে, যে কবি এই সভায় একটি মাত্র নূতন কবিতা উপস্থিত করিবেন, তিনি লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন; এবং যে জ্যোতিষী রাজার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়া রাজাকে নিরুত্তর করিবেন, তিনি পাঁচশত মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। এই আশায় বহু দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক কবি, পণ্ডিত, জ্যোতির্ব্বিদ সেই রাজার নিকটে গমন করিতেন। দুঃখের বিষয়, কোনও পণ্ডিত কোনও দিন নূতন কবিতা দিয়া লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার পাইলেন না। যিনি যে কবিতা স্বরচিত বলিয়া রাজসভায় আবৃত্তি করেন, সভাস্থ পণ্ডিতগণ সেই কবিতাটিকে বহু পুরাতন বলিয়া ঘোষণা করেন। নূতন পণ্ডিতের নূতন কবিতা পঠিত হইলেই পাঠের অব্যবহিত পরক্ষণে সভাসদ পণ্ডিতগণ একে একে এক-একটি পাদ উচ্চারণ করিয়া নবীন পণ্ডিতের নবীন কবিতাকে পুরাতন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। জ্যোতিষী পণ্ডিতের পরীক্ষাকালে স্বয়ং রাজা গ্রহনক্ষত্রগণের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া উপসংহারে জ্যোতিষ পণ্ডিতকে ঠকাইয়া ফেলিতেন।

একজন ব্যবহার-চতুর কবি এবং একজন ব্যবহার-চতুর জ্যোতির্ব্বিদ এই সভার আভ্যন্তরীণ চাতুরী জানিতে পারিয়া স্থির করিলেন যে, এ স্থলে কেবল পাঠের সাহায্যে কার্য্যোদ্ধার হইবে না, "শাঠের" আবশ্যকতা। রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া "শাঠের" সাহায্যে ইঁহারা যতদূর যাহা করিয়াছিলেন, একে-একে নিম্নে বিবৃত হইল।

(১) কবি সভার চাতুরী জানিতে পারিলেন যে, নবীন পণ্ডিতের নবীন কবিতার আবৃত্তিকালে সভাস্থ পণ্ডিতগণ এক-একজন এক-একটি পাদ লক্ষতার সহিত মনে রাখেন; এবং আবৃত্তির পর বলিয়া বসেন যে, ইহা আমরা জানি,—ইহা পুরাতন, বহু পুরাতন। এই বলিয়া এক-একজন এক-একটি পাদ আবৃত্তি করিয়া নবীন পণ্ডিতটিকে নাকাল করিতেন। এই তথ্য অবগত হইয়া সুচতুর নবীন পণ্ডিত মহাশয় শাঠের সাহায্যে এক উদ্ভট উদ্ভাবন করিলেন। তিনি কবিতা রচনা করিলেন—

> ত্বৎ পিত্রা মৎ পিতুর্নীতা লক্ষ মুদ্রা ধরাপতে।
> সর্ব্বে জানন্তি বিদ্বাংসো যে যে তব সভাসদঃ
> দেহি মে তাঃ প্রবন্ধোয়ং
> নূতনো বা পুরাতনঃ।

অর্থ—রাজন্! আপনার পিতা আমার পিতার নিকট হইতে লক্ষ মুদ্রা লইয়াছেন, তাহা আপনার সভার পণ্ডিতগণ সকলেই জানেন। আমার এই প্রবন্ধ নূতন বা পুরাতন হউক, আপনি সেই লক্ষ মুদ্রা আমাকে দিন।

এই কবিতা আবৃত্তির পর পণ্ডিত-সভা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নীরব, নিশ্চল, নির্ব্বাক্। যদি বলেন, ইহা পুরাতন,—আমাদের জানা আছে, তাহা হইলে রাজা পিতৃঋণ লক্ষ টাকার জন্য দায়ী হন। আর যদি বলেন যে, ইহা আমরা জানি না—নূতন শুনিতেছি, তাহা হইলেও রাজা যথোষিত লক্ষ টাকার জন্য দায়ী। "সাপের ছুঁচো ধরা" হইয়া পড়িল। 'হাঁ' বলিলেও লক্ষ মুদ্রা, 'না' বলিলেও লক্ষ মুদ্রা; শাঠের জয় হইল।

রাজা এই শাঠের কষাঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, কি লক্ষ মুদ্রা না দিয়া গায়ের জোরে অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—তাহা আমাদের জানা নাই। এই ত গেল কবি মহাশয়ের অবলম্বিত "শাঠ"। অতঃপর জ্যোতির্ব্বিদের কথা বলি।

(২) পূর্ব্বোক্ত কবির স্থায় জ্যোতির্ব্বিদও রাজার জ্যোতিষ প্রশ্ন-বিষয়ক চাতুরী জানিতে পারিয়া "শাঠের" সাহায্যে সেইরূপ প্রস্তুত হইয়া সন্ধ্যার পর রাজসকাশে উপস্থিত হইলেন। জ্যোতিষ পণ্ডিতের পরীক্ষা স্বয়ং রাজা সন্ধ্যার পরই করিতেন। তদনুসারে রাজা, জ্যোতিষ-পণ্ডিত মহাশয়কে লইয়া সৌধের ছাদে উঠিলেন। উন্মুক্ত আকাশ; অসংখ্য তারকারাজী ইঁহাদের পাঠ ও শাঠ দেখিবার জন্য যেন চাহিয়া আছে। রাজার প্রশ্ন আরম্ভ হইল। "মহাশয়, এটি কি নক্ষত্র?" পণ্ডিত মহাশয় উত্তর দিলেন, "ইহা অশ্বিনী।" আবার প্রশ্ন হইল, "এটি কি?" উত্তর হইল, "ভরণী।" আবার প্রশ্ন হইল, "এটি কি?" উত্তর হইল, "কৃত্তিকা।" এইরূপে একে-একে রাজার সাতাইশটি প্রশ্নের পর সাতাইশটি নক্ষত্রের নাম উচ্চারিত হইয়া গেল। অনন্ত আকাশে অসংখ্য তারকা, কিন্তু এই কয়েকটি ছাড়া অপরগুলির নাম ত আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে নাই। রাজা এই সাতাইশটি প্রশ্নের পর ইষ্ট সিদ্ধির অবসর বুঝিয়া, চিরাভ্যস্ত চাতুরী অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সাতাইশটি নক্ষত্র বাদ দিয়া, অপর নক্ষত্রগুলির নাম জিজ্ঞাসা করিতে সুরু করিলেন। নক্ষত্র অসংখ্য, নাম মোটে সাতাশটি; সুতরাং সব পণ্ডিতই এইখানেই পরাজয় স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এবারকার পণ্ডিত মহাশয় ত কেবল পাঠের সাহস লইয়া আসেন নাই,—ইঁহার প্রধান অবলম্বন "শাঠ"। তিনি এই শাঠের সাহায্যে

রাজার প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ করিলেন। সাতাইশটি নক্ষত্র বাদ দিয়া রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কি নক্ষত্র?"—অমনি উত্তর "ইহা অশ্বিনীর ভাই গো।" আবার প্রশ্ন, "এটি কি?" অমনি উত্তর "কৃত্তিকার জ্যেঠা।" আবার প্রশ্ন "এটি কি?" অমনি উত্তর "ভরণীর ভায়রাভাই।" ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাজা দেখিলেন, তাঁহার চাতুরী আর টিকে না; তিনি যে অসংখ্য নক্ষত্রের সাহায্যে জ্যোতিষীকে ঠকাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন,—নবীন জ্যোতির্বিদ "শাঠের" সাহায্যে যে অনন্ত সম্বন্ধের উদ্ভট উদ্ভাবন করিলেন,—তাহাতে সব ফাঁসিয়া গেল। কারণ, সংসারে সম্বন্ধেরও ত সীমা নাই। যেমনি প্রশ্ন, তেমনি উত্তর; রাজা আর কত জিজ্ঞাসা করিবেন,—শেষে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। "শাঠের" জয় হইল।

পাঠকগণ ইহা হইতেই বুঝিতে পারেন ত পাঠ ও শাঠের বিশ্লেষণ করিয়া লউন। হয় ত কেহ-কেহ বলিতে পারেন, আলঙ্কারিকগণের মতে "অনবীকৃততা" একটি দোষ; সুতরাং নূতন কিছু না করা সাহিত্য-ক্ষেত্রের আগাছা। তাহা হইলেও সে ত পর্য্যায় ছাড়া নহে। সাহিত্য-দর্পণকার লিখিয়াছেন, অনবীকৃততা যথা—

সদা চরতি খে ভানুঃ
সদা বহতি মারুতঃ।

এ স্থলে সদা শব্দটি বারংবার না বলিয়া 'সদা' পর্য্যায়বাচী "অনারত" "অবিরত" "অহরহ" "অজস্র" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা উচিত ছিল। তাহা করা হয় নাই, তাই অনবীকৃততা। বাঙ্গালা ভাষায় একটি উদাহরণ দিই—

"শস্ত লোভী বৃষে বাধা দিয়া রাখা যায় না।
পরস্ত্রী-রসিকে বাধা দিয়া রাখা যায় না।
জুয়া-ভক্তজনে বাধা দিয়া রাখা যায় না।
স্বাভাবিক দোষে বাধা দিয়া রাখা যায় না॥"

ইতি কাব্যদর্পণোক্ত বসন্তসেনা।

এখানে "বাধা দিয়া রাখা যায় না" বাক্যটি বারংবার ব্যক্ত হওয়ায় অনবীকৃততা দোষ হইয়াছে। কিন্তু এই-এই পদগুলির তত্তৎ পর্য্যায়-বাচী ভিন্ন পদের দ্বারা এই একই ভাব অভিব্যক্ত হইলেও দোষ হইত না। ফল কথা, পর্য্যায় ঠিক থাকিলে এ দোষের দোষত্ব থাকে না। কিন্তু এ ত তা নয়। ইহা একেবারে পর্য্যায় ছাড়া, রীতিনীতি ছাড়া, এমন কি সৃষ্টি ছাড়া এক অভিনব উদ্ভাবনা না করিলে নূতন কিছু করাই হয় না। করিতে ইচ্ছা করিলে, এ ক্ষেত্রে পাঠ নয় শাঠ আবশ্যক।

"বদরিকাকে" কচু ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন বলিয়াই ত দাশুরায়ের পাঁচালীতে—"বিভ্রান্তের সিদ্ধান্ত" স্থান পাইয়াছে। অলমিতি।

সেকালের কথা

[পরলোকগতা নিস্তারিণী দেবী]

[নিস্তারিণী দেবী গতপূর্ব্ব বৎসর দেহত্যাগ করিয়াছেন। 'ভারতবর্ষে'র প্রথম বৎসরে তিনি ধারাবাহিকরূপে 'সেকালের কথা' লিখিতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার অবশিষ্ট লেখার কিয়দংশ আমাদিগকে প্রেরণ করেন; আমরা 'ভারতবর্ষে'র তৃতীয় বৎসরের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যায় (পূজার মহিলা-সংখ্যায়) তাহা প্রকাশ করি। এক্ষণে সেই 'সেকালের কাহিনী'র আরও কিয়দংশ আমাদের হস্তগত হইয়াছে; তাহারই কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইল। নিস্তারিণী দেবী পরলোকগত মনীষী রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন; পরলোকগত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আরম্ভেই যে প্রাণধনের নাম আছে, তিনি নিস্তারিণী দেবীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারিণী বাবুর পুত্র। পাঠক-পাঠিকাগণ পূর্ব্বের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে, তৃতীয় বৎসরের 'ভারতবর্ষে'র পূজার মহিলা-সংখ্যা দেখিবেন।—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।]

তত্ত্বতাবাসে একচোকোপিনা

তত্ত্বতাবাস এলে আমি ভাল সন্দেশগুলি প্রাণধনের জন্যে তাগ্‌ড়ে রাখি। আমি একচোকো—এ কথা বল্‌তে ভাল বৌরা পর্য্যন্ত ছাড়ে নি। আমার নষ্টচন্দ্র দেখে এই রকম বদনাম হতো। আমি সবাইকে যত্ন কত্তে গিয়ে কারও মন পাইনি। তরকারি, দুধ সব ভাগে ভাগে রেখেও কুলিয়ে উঠতে না পেরে, অনেকের মনে কষ্ট দিয়েছি।

আমার নিউমোনিয়া

প্রাণধনের মায়াতে সকল কষ্ট সহ্য করে রইলুম। প্রাণধন আমার ছোট ভাই তারিণীর ছেলে। সে যখন জন্মায়, তখন তার মার বয়স ১৩।১৪ বছর। মা তো ছেলে নিতেই চায় না। আমিই তার সব হয়ে উঠলুম। ছেলেও মা-বাপের কাছে যায় না। আমার নিউমোনিয়া ব্যায়রাম হলো। মুখ চোক ফুলে উঠলো। ছেলেকে ওরা ভয় দেখায়, ঐ তোর পিসির কি মূর্ত্তি হয়েছে দেখ্। ছেলের দিদিমা বলে, "অ নিস্তার, মুখ যে বড় ফুলেছে" আর হাসে। ছেলেকে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে নিলে। ছেলেও শেষ বলতে শিখলে "আমাদের ঘরে ভাত খাচ্চে"। এই রকম তাচ্ছল্য সবাই করে। যে ছেলে বল্‌তো "পিসিমা, তুমি একলা ফেলে কোথা গেলে গো"—সে এখন ওদের বাধ্য হলো। বৌকে নিয়ে, ছেলে নিয়ে, তারিণী খাশুড়ীর কাছে গেলো।

গুণচট পেতে শুয়ে থাকতুম

আমি একলা রইলুম। খণ্ডরের পুরান চাকর কেদারে বাইরে শুয়ে থাকবে বল্লে; আমি তাতে রাজি হলুম না। চুঁচড়ায় তখন গোরাবারিক ছিল। গোরাদের লুটপাটের ভয়। বড় ভাইপোদের একজন বড়-বাজারের বাড়ী থেকে শুতে আস্‌তো; মা দুবেলা দেখে যেতেন।

ব্যায়রাম থেকে উঠে বড্ডই অক্ষম। কালী বরাবর খোরাকীর টাকা পাঠায়। অমন গুণের ভাই কারও হবে না। আমার মা আমায় চুঁচড়ার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইলেন। বড় ভাইয়ের বউ তাতে রাজি হলেন না। মা উনানে আগুন দিয়ে ভাত চড়িয়ে দিয়ে যেতেন। আমি গুণচট্ পেতে সেখানেই শুয়ে থাকতুম।

মেজ ভাইপো চিরকাল ভাবুকে

মেজ ভাইপো মার কাছে থাকতো; হাঁসের ডিম খেতে ভালোবাস্‌তো। সে একটু সৌখীন, সুখী, ভয়-তরাসে ছেলে। তখন ছোট ভাইয়ের মেজ ছেলে হয়েছে। সে কার্ত্তিকের মত ছেলে। তার কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, নাদুশ-নুদুশ চেহারা—তাকে নিয়েই তার বাপ মা উন্মত্ত। প্রাণধনের তখন ৫ বছর বয়স। সে কাঠ কাটাবে, দরজা গড়াবে বলে, মাথায় লোহা-লক্কড় নিয়ে ঘুরে বেড়াতো; কিন্তু মাকড়সা দেখলে, মাকুসী আরসুলি বলে ভয়ে পালিয়ে আস্‌তো।

গলায় হাঁড়ি পড়লো

ছোট ভাই একদিন এসে বল্লে, "পাইখানা বন্ধ করে দিয়ে যাচ্চি; দিদি, তুমি বনবাদাড়ে যেয়ো।" আমি সে কথায় কাণ না দিয়ে বল্লুম, "একবার প্রাণধনকে দেখিয়ে নিয়ে যাস্।" সে বল্লে, "প্রাণধন তোমার কাছে আর আস্‌তে চায় না।" আমি তখন মনে-মনে বেশ বুঝ্‌লুম, এক গাছের ডাল অন্য গাছে লাগে না। 'মা না বিয়োলো বিয়োলো মাসি' এ কথা ঠিক। আমি শেষ মায়া কাটিয়ে পার্ব্বতীর সঙ্গে গোপালের বাসায় কলিকাতায় গেলুম। রাঁধি-বাড়ি খাই-দাই। সে সময় ভবানীর পড়াশুনার কষ্ট হওয়ায় গোপালের কাছে এসে পড়্‌লো। মেজ বউ বড় কুঁড়ে, গতর নাড়তে চায় না; বলে, পেট গোঁ-গাঁ করছে। পার্ব্বতীরও কষ্ট হওয়ায় গোপালের বাড়ী এলো। আমার গলায় হাঁড়ি পড়লো।

শুয়ারের মত কাণ লিক্ লিক্ কচ্চে

এ দিকে তারিণী দেশের বাড়ীতে এলো। খরচ কম হবে বলে, মাকে নিয়ে একসঙ্গে রান্না করে খেতে লাগলো। তখন তারিণীর মেজো ছেলে ভোলা হয়েছিলো। খরচ বেড়েছে। দেশের বাড়ী বেচে ফেল্লে। কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করে থাকবে বলে গোপালের বাড়ী সকলে নাবলো। আমি দেখলুম, প্রাণধনের বাঁচবার আশা নাই। রোগা, কেবলি হাগছে,—শুয়ারের মত কাণ লিক্ লিক্ কচ্চে। প্রাণধনের দিদিমা আমাকে বল্লে, "নিস্তার, প্রাণধন তোমার জন্য হেদিয়েছে।" আমি পরের ছেলের ভার নিতে চাইলুম না। কিন্তু তারিণী বাড়ী ভাড়া নিয়ে ছেলেকে দিনকতক আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে লাগলো। ছেলে আমার কাছ থেকে যেতে চায় না।

আবার মায়ায় পড়ে গেলুম

ছেলে আমার কাছেই রইলো। ছেলের মাও বেঁচে গেলো! তাই থেকে প্রাণধন আমার কাছে রইলো। দুধ, জলখাবারের টাকা ছেলের বাপ বরাবর দিতো। কিন্তু গোপালের খরচে কুলাতো না। ভাইপোরা সব তার গলায় পড়লো। তার নিজের জামাই আসা আছে। আবার গোপালের ভাইঝি ক্ষীরো এলো। সে প্রাণধনের বড় হিংসা কত্তো।

পোড়া পাখীটাও প্রাণধন প্রাণধন করে

তার রাগ শুধু প্রাণধনের উপর নয়, পোড়া পোষা পাখীটাও প্রাণধন প্রাণধন করে। এ দিকে ভাইপোর বিয়ে হবে। দাদা এসে অনেক সাধ্যসাধনা করে আমায় চুঁচুড়ায় নিয়ে গেলেন। আবার বৌয়ের সঙ্গে না বনায়, আমার প্রাণধনের কষ্ট হবে, এই বলে আমায় আবার কলকাতায় রেখে গেলেন।

কল্‌কাতার বাসায় আলুর খোসা ভাজা

আমি কালীর কাছে, সকলের খরচ মিলিয়ে যে টাকা হয়, তাতে একটা কলকাতার বাড়ী ভাড়া করে থাকা যায় বলায়, কালী রাজি হলো। ভাইপোরা সকলে, আমি, প্রাণধন, বড় বউ,—ভাইঝি সবাই এক বাসায় ভাত, ডাল, আলুর খোসা ভাজা খেয়ে থাকি। আমি একবেলা, বড়বৌ একবেলা পালা করে রাঁধি। বড় ভাইপোটি অনেক চেষ্টার পর তবে ডাক্তারী পাস হলো। বড় ভাইপো রোজকার কত্তে লাগলো।

যা অভাব হবে তখন আপনি দেবেন

বড় ভাইপোর রোজকার বেশী হলে কালীকে বল্লে, আর আপনাকে সাহায্য কত্তে হবে না; যখন যেটি বড় অভাব হবে, আটকাবে,—আপনি দেবেন। মা আমি সকলেই একসঙ্গে থাকি। সকল ছেলেদের পড়ার খরচ কালী দেয়।

আমি সংসারের কর্ত্তা

মা থাকতে আমার একটু মান্য ছিলো; নইলে মা কালীকে বলে আমাকে আলাদা রেখে দেবে। আমি সংসারের কর্ত্তা হয়ে রইলুম। ঝি-চাকর সবাই আমাকে মানে। আমার মনের যে অসহ্য যন্ত্রণা ছিলো, এতদিনে সেটি দূর হলো। বড় বউ দাদার কাছে লাহোরে ছিলো। এজন্য আমাকে কেউ কিছু বল্‌বার ছিলো না। বড় ভাইঝির বিবাহ হলো। আমার প্রাণধনও বড় হয়েছিল। সে বড় পরিষ্কার ভালবাসতো। ইলিস্ মাছ, কাঁটালের গন্ধ যে বাটিতে থাকতো, তাতে খেতো না। আমার প্রাণধনের জন্যে ভাল জিনিস যা পাই তাই রাখি; সেটিতে সবাই ব্যাজার।

ভবানী ওরফে উপাধ্যায়

ভবানী ছেলেবেলা থেকে ডানপিটে। লেখাপড়ায় খুব ভাল। যে অঙ্ক কেউ পারবে না, ভবানী একদণ্ডে তা কসে দেয়। ফুটবল খেলায় ভবানীর বড় নাম। লেকচার হ'লে ভবানী আগে সেখানে যায়। কেশব সেনের দলের মধ্যে গিয়ে সে একজন তার প্রধান চেলা বনে গেল।

কেশব সেনের দলে

কেশব সেনের দলে যখন ভবানীর খুব খাতির হলো, তখন সে নিজেকে খুব বীর মনে কত্তো। সে পাইকোয়াড়ে যুদ্ধ শিখতে পালিয়ে

গেছলো; দাদা তাঁকে ধ'রে আনে। সে বরাবর আইবুড়ো ছিল। রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দু বেদান্তের মিল দেখে, ক্যাথলিক্ পাদরীদের দলে ভিড়েছিল। মেরীকে গণেশ-জননী বলে প্রচার করে, সিন্ধে এক কীর্ত্তি রেখে গেছলো। যত সিন্ধি ছেলেদের দল পাকিয়ে খৃষ্ট সংকীর্ত্তন করে বেড়িয়ে ছিল। এক কথায়, সে দেশ মাতাতে জানতো; চাঁড়াল জাগাবার মন্ত্র জানতো।

থপিস্ জামাই

বড় ভাইপোর জামাই বড় থপিস্ ছিলো। ভাইঝির বিয়েতে ভাইপোর দেনা হয়। সেই দেনার জ্বালায় সে জেরবার হয়ে শেষ আপনার লোকেদের কাছেও বড় অপ্রস্তুত হয়েছিলো। বড়লোকের ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়া যে কি কষ্ট, তা' হাড়ে হাড়ে বুঝে বড় ভাইপো অনেক কষ্টে রোগা মেয়ের সেবা কর্ত্ত। জামাইয়ের ইচ্ছে, প্রাণধন ভিতরে না শোয়। আমি একটি গলির মত ঘরে চৌকিতে বেঞ্চি জোড়া দিয়ে প্রাণধনকে বুকের কাছে নিয়ে শুই—কি করি! একদিন কষ্ট পেয়ে, দুঃখ পেয়ে, বড় ভাইঝি হঠাৎ শ্বশুরবাড়ী মারা গেল। বড় ভাইপোটির বুক ভেঙ্গে গেলো।

ভবানী আলাদা হলো

ভবানী যখন পাদরীদের দলে যাতায়াত করে, তখনই সে আলাইদা থাকতে লাগলো। তার ভগবানের উপর সত্যি-সত্যিই নির্ভর ছিলো। যাকে বলে অর্দ্ধেক রাতে অন্ন হওয়া, তাই তার হতো। ভাইকে দেনার জ্বালায় অস্থির হতে দেখে, এই ভবানী সিন্ধে এম-এ ক্লাসে ৩ মাস অবধি পড়িয়ে ভাইয়ের অর্দ্ধেক দেনা শোধ করে দিয়েছিলো। ময়লাপুরের পাদরী তাকে বিলাত পাঠায়।

প্রাণধনের বউ দেখে মা মারা গেলো

প্রাণধনের বউ দেখেই মা মারা গেলো। আমি তখন তারিণীর নতুন বাড়ী হুগলীতে প্রাণধনের বউভাতের যোগাড় কচ্চি। বিয়ের পরদিন মা বলেছিলো, সব শীঘ্র-শীঘ্র সেরে নাও। বউ দেখবার জন্যই মা বেঁচে ছিলো। প্রাণধনকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সে মাকে তুলসী-তলায় হরিনাম শুনালে। আমি ও তারিণী মাকে জ্যান্ত দেখতে পাইনি। তারিণী ঘাটে গিয়ে মুখাগ্নি কল্লে। কালীর চক্ষের জলে বুক ভেসে গেলো। মায়ের উপর টান কালীর বড় ছিলো।

মা বিয়ে দেখতে চায়, বাড়ীতে বিয়ে হবে

যখন কালীর বড় মেয়ের বিবাহ হয়, তখন মা বিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। কালী বলেছিলো, সে হতে পারে না মা, বিবাহ গীর্জ্জায় হবে; সেখানে তো তুমি যাবে না। মা বলেছিলেন, তোর বাইবেলে এ কথা কোথায় লেখা আছে—মেয়ের বিয়ে বাড়ীতে হলে দোষ হয়। পাদরী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে আয়,—মা বলছেন, বাড়ীতে বিয়ে হবে। কালীচরণ বাইবেলের কোথাও বাড়ীতে বিয়ে দোষের না দেখে, মায়ের কথাই ভগবানের কথা বলে মেনে নিয়ে, প্রথমে বাড়ীতে বিয়ে দিয়েছিলো।

স্বজাতে বর পেলে স্বজাতে বিয়ে হবে

যার ইচ্ছা, বামুন খৃষ্টান পেলে কায়স্থ কি অন্য শূদ্রকে মেয়ে দেওয়া হবে না। সে কথাটাও যতদূর সম্ভব কালীচরণ মেনে চলেছিলো। সে গুরু-পুরুত কাহাকেও কোন উৎসবে বঞ্চিত করে নাই। খৃষ্টান বলে পরিবারের কেহই তাকে অমান্য করে নাই; বরং প্রণাম করবার সময় সে কথা ভুলেই যেতো। খৃষ্টান হলে যে হিন্দু ভাইদের সঙ্গে তফাৎ হয়ে যায়, এ ভাবটি কালীচরণ এমন মেরে দিয়েছিলো যে, পরে পাদরীদের খৃষ্টান করার অনেক সুবিধা হয়েছিলো। সে ভাইফোটা নিতো, জামাই-ষষ্ঠী কত্তো। সরস্বতী পূজায় বই পূজা কত্তো। মাকে দেবতার মত দেখতো।

আমার আবার দুঃখের আরম্ভ

মা মলেন, আর আমার দুঃখের আরম্ভ হলো। মার শ্রাদ্ধে বড় ভাইপো গেলে বল্লুম, মা গেলো, এখন তোমরাই তো সব; শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে যাব। মনে জানি ও ভিন্ন আমার গতি নাই। কিন্তু ভাইপো বল্লে, আমার কাছে কাউকে থাকতে হবে না; আমার পরিবার সব চালিয়ে নেবে। আমি কারও ভার নিতে পারব না। তবু আমি শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে তারই কাছে গেলুম, বড়ই অশ্রদ্ধা হলো। প্রাণধন তখন বি-এ পড়ে। বড় দুঃখে নপাড়ায় আমার বাড়ী চলে গেলাম। সেখানে থাকতে না পেরে ৮।১০ দিনে ফিরে এসে দেখি—

প্রাণধন আমীরের চাকুরী নিয়ে কাবুল পালাল

প্রাণধন কাবুল পালিয়ে গেছে। বি-এ ফেল হয়ে মনের দুঃখে চাকুরী নিয়েছে। সেখানে সামান্য দোষে হাত কেটে ফেলে। হিসাবের ঠিকে ভুল হলে যার দোষে হয়েছে, তার ডান হাত কাটা যায়। অনেক কষ্টে প্রাণধন শেষ সেখান থেকে পালিয়ে এলো, আর দেশেই সামান্য মাইনের চাকুরীর চেষ্টা কত্তে লাগলো।

কর্পূরতলায় কাজ নিয়ে জামাই পালালো

যে সময়ে প্রাণধন কাবুল পালায়, সেই সময়—তারিণীর জামাই সাধুচরণ কপূরতলায় কাজ নিয়ে পালায়। ঘর থেকে পালান একটা ছেলেদের রোগ। শুনেছি মাথায় একরূপ পোকা বিজ বিজ করে, ছেলেদের ভূতের মত ঘাড়ে চড়ে। না তাড়িয়ে ছাড়ে না।

যাচাতে এসেছ

প্রাণধনের বাঁশবেড়েতে স্কুল মাষ্টারী চাকুরী হলে জ্যাঠামশাই —কালীচরণকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে গেল। চাকুরী করি কি ফের বি-এ পড়ি। কালী বল্লে আমাকে যাচাতে এসেছো, না আমার পরামর্শ মত কায কর্ব্বে। প্রাণধন বল্লে ঠিক করে এসেছি চাকুরী করি, কালী বল্লে যা' ইচ্ছা কর। ভাবে বেশ বুঝা গেলো। বিয়ে হলে আর বি-এ পড়া হয় না।

যদি না কথা রাখে বন্ধুবিচ্ছেদ হবে

কালীর বড় বড় লোকদের সঙ্গে ভাব ছিলো, কিন্তু কি নিজের ছেলে, কি ভাইপো—কারো জন্যে কখনও কারোকে উপরোধ করেনি। সে

এত মানী ছিলো যে, পাছে কথা না রক্ষা করে এই ভয়ে কখনও কারোও জন্যে উপরোধ কর্ত্তো না। তার মতে, যে যোগ্য, তার পথ কেউ রুখ্‌তে পার্ব্বে না। এই জন্যে এতবড় পরিবারের মধ্যে কারও বড় হবার আশা ছিল না।

নিজের ছেলেকে ফেল

অতি কম নম্বরের জন্যে নিজেই নিজের ছেলেকে ফেল কর্ত্তে কালীর আগে আর কারও নাম শুনিনি। বিচার-জ্ঞানটা তার এত প্রবল ছিল, সত্য কথা সে এত ভাল বাস্‌তো যে, মিথ্যাটাকে সে বড় ঘৃণা কর্ত্তো।

খোসামোদ ও খয়েরখাঁই

খোসামোদ করা, কি মনিবের খয়েরখাঁই হয়ে দরদি ভাব দেখান, এ দুটোই কালী মোটে পছন্দ কর্ত্তো না। এই জন্যে সে যাত্রা, থিয়েটার কি কোন নাচ-তামাসা আমোদে যোগ দিতো না। এক কথায় তার কোনই সখ ছিলো না।

হুগলী থেকে বাঁশবেড়েতে মাষ্টারী

প্রাণধন হুগলী থেকে বাঁশবেড়ে স্কুলে মাষ্টারী কর্ত্তে রোজ যায়। সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক গড়গুড়ী মশাই হেডমাষ্টারী কর্ত্তে চন্দননগর থেকে নিত্য উজান ঠেলে, বর্ষার ভাঙ্গন ডিঙ্গিয়ে কাজ বজায় করেন। ২১ দিনের ছেলেকে ২১ বছরের করেছিনু; সে ছেলে আমার না বলে বৌ নিয়ে হুগলীতে থেকে এই চৈত্র-বৈশাখ মাসে ভরা-গঙ্গায় পাড়ী দিয়ে রোজ মাষ্টারী করে;—মনে বড় কষ্ট হলো। আমার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো। প্রাণধনের চাকুরী গেল।

মেজ ভাইপো মুঙ্গেরে গিয়ে ভেন্ন হলো

এদিকে বড় ভাইপোর দেনার জ্বালা,—ওদিকে মেজ ভাইপোর লোকসান হাত লাগলো। মেজ ভাইপোকেও আমি মানুষ করি। মা-মরা ছেলে পাস ফিরে শুতে দিতো না। ২৫ বছরে সে পাস হলে তবে তাকে অনেক বুঝিয়ে বিয়ে দেওয়া গেল।

বিয়ের নামে ভয়ে কাঁটা

যাদের বাপের দুটা বিয়ে অথচ দু-সতিনে ভিন্ন ভাব ছিলো না এবং ছেলেকেও মানুষ কর্ত্তো, ওর ছেলেরা একে মা বলে ডাকতো,—যাদের ঠাকুরদাদার ৫৬টা বিয়ে, বুড়োদাদার ১০৮টা বিয়ে—তারা বিয়েকে ভয় পায় কেন বলা যায় না। বড় ভাইয়ের ছোট ছেলে ভবানী তো মোটে বিয়ে কল্লে না। ছোট ভাইয়ের মেজ ছেলে বিয়ের নাম শুনে ছাত থেকে লাফিয়ে পড়তে চায়। সে বিয়ে করেনি। ১০।১২ বছর বয়সে মাছ-মাংস ত্যাগ করেছে, এ সব ভেবে মনে হয়, যেটা ভালো যেটা সত্য, সেইটাই টেঁকে যায়; যেটা খারাপ, যেটা মিথ্যা, সেটা যে সমাজের মধ্যেই থাক, কখনও টেঁকে থাকবে না।

ইষ্টিগুরুর দিব্যি

মেজ ভাইপোর বউয়ের বাপেরা বড়লোক। বিয়ে হবার পর বাপের বাড়ীর কথাই পাঁচ কাহন। কখন ভুলে বাপের বাড়ীর খোঁটা দিলে, বলে ফেলেন, "যে আমার বাপের বাড়ীর কথা কহিবে, তার "ইষ্টিগুরুর দিব্যি"। আমার কথাটা বড় মনে লাগলো। গুরুজনের আশীর্ব্বাদও ফলে যেমন দুঃখের কারণ হলেও, তেমনি অসুখী হতে হয়। বউমার ছেলে হয়, আর পেটে পিলে যকৃৎ হয়ে মারা যায়। বড় ভাইপো দেনার জ্বালায় গোরক্ষপুরে শালার কাছে গেলেন। মেজ ভাইপো ছেলে সারাতে মুঙ্গেরে ওকালতি কর্ত্তে গেলেন। সেই থেকেই দুই ভাইয়ে ভেন্ন হলো।

রেলে টরেটক্কা

প্রাণধনের বাঁশবেড়ে স্কুলের ৪০৲ মাহিনের কায গেলে, সে বসে না থেকে ৯৲ মাহিনায় রেলে টরেটক্কা শিখ্‌তে লাগলো। শেষ তার শ্যামনগরের রেলে ১৫৲ মাহিনার চাকুরী হলো। বড় ভাইপো মাঝে-মাঝে প্রাণধন আমায় দেখতে এলে চাকর চাকরাণীদের দিয়ে বলায়, প্রাণধন তোমার পিসির বিলি কর। আমায়ও ঐ কথা বলে—"কই গো, কবে যাবে? প্রাণধন কবে নিয়ে যাবে?"

হালিসহরে বেড়ুঁস জ্বর

হালিসহরে প্রাণধন বদলি হ'লে। আমি চিঠি লিখলুম, আমায় নিয়ে যাও। প্রাণধন একদিন এসে আমায় নিয়ে হালিসহরের ষ্টেসনে থাক্‌বার ঘরে নিয়ে রাখ্‌লে। বউ তখন হুগলীতে। আমি রাঁধি, প্রাণধনকে খাওয়াই। একদিন প্রাণধনের বেড়ুঁস জ্বর হ'লো; একটু সাম্‌লে, হুগলী চ'লে গেলো। আমি একলা রইলুম্। সেখানেও শুনলুম, বেড়ুঁস জ্বর। আমি একলা বিজবনের মধ্যে। ষ্টেসন্ তখনও তৈয়ার হয় নাই। চারিদিকে সব মাতাল হররা কচ্চে। ভাল লোকেরা প্রাণধনকে চিঠি লিখ্‌লে। প্রাণধন তাদের আমাকে শ্যামনগরে মামার বাড়ী পৌঁছে দিতে চিঠি লিখ্‌লে।

শ্যামনগরে মামার বাড়ী

মামারা তিন ঘর—কেউই দোরও খোলে না, আমল দেয় না। ছোট মামী অমূল্যর মার কাছে রইলুম। যার সংসারে যাব, রাঁধবো। প্রাণধনের জন্য কষ্ট হ'লো। ভারি অসুখ শুনলুম্। লোক পাঠালুম, খবর পেলুম—একটু ভাল আছে। মামী বল্লেন, খবর তো পেলে; এখন উঠো, বাসন মাজ, রেঁধে নাও। সকলে যে যার আপনা আপনা থাকে। কেউ আর আমার খোঁজ নেয় না। পয়সাও হাতে নাই। ছোট মামীও খাওয়াতে চায় না। বলে অন্য মামাতো ভাইদের কাছে যাও। রামচরণ ১৲ করে দেবে বল্লে, ছোট মামিও ১৲ টাকা দিলে। ২৲ টাকায় তো খাওয়া একবেলাও হয় না, কি করি ১৲ টাকার চাল কিনে আনলাম।

ডালপালা কুড়িয়ে পাতার জ্বালে রেঁধে খাই

ডালপালার ধোঁয়া হলে তারা বিরক্ত হয়। সবাই বল্লে, আমাদের রান্না-খাওয়া হলে, তবে তোমার ডালপালার ধোঁয়া কর্ত্তে পাবে। এদিকে প্রাণধন রেলের কাজ ছেড়ে ছানার ব্যবসা কর্ত্তে লাগলো। বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছে, পেটে বুদ্ধি আছে—ডেলি-প্যাসেঞ্জার হয়ে ছানার

বাঁক গাড়ীতে চাপিয়ে বেচে আসে। হুগলীতে একটা মুদিখানার দোকান খুলে ফেলে।

মতিহারিতে ৫০৲ মাইনের কাজ

ভগবান দেখেন, দুঃখের শেষ আছে তো। যখন দিন চলে না, তখন ৫০৲ মাহিনায় মতিহারীতে রিলিফের কাজ পেয়ে প্রাণধন বিদেশে গেলো। আমি খরচ পর্য্যন্ত আর পেলুম না। সেখানে কে গরিব ব্রাহ্মণ প্রাণধনের কুষ্ঠি করেছিলো।

ছায়া মেপে কুষ্ঠি তৈয়ার

ছায়া মেপে কুষ্ঠি তৈয়ার করে বলে, ৩৯ বছরের যে ফাঁড়া আছে, সেটা কাটলে ৮০ বছর পর্য্যন্ত বাঁচবে। কুষ্ঠি আমি বিশ্বাস করি, তাই ভয় পেলুম।

চক্ষু-চিকিৎসা

[অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন, এম-এ]

প্রথমেই বলিয়া রাখি, ব্যাকরণ-বিভীষিকা-কার বলিয়া বর্ত্তমান লেখকের একটা সংনামই হউক আর বদ্‌নামই হউক রটিয়াছে, সুতরাং সাহিত্যের বাঁধা-সড়কে চলিতে হইলেই তাঁহাকে ব্যাকরণ বাঁচাইয়া পদবিন্যাস করিতে হয়। কেননা, সুযোগ পাইলেই অমনি শক্রপক্ষ বিদ্রূপের সুরে বলিয়া উঠিবেন,—'আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারি—" (শেষ অক্ষরটি চাপিয়া গেলাম, নতুবা লিঙ্গ-বিভ্রাট্ ঘটে)! কিন্তু তাঁহাদিগের টিট্‌কারীর ভয়ে 'সশঙ্কিত' হইয়াও প্রবন্ধের শিরোনামে 'চক্ষুশ্চিকিৎসা' লিখিতে পারিলাম না। ইহাতে যদি পূজ্যপাদ পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় স্বপ্রদত্ত 'বিদ্যারত্ন' উপাধি প্রত্যাহার করেন, তাহা হইলে নাচার। তবে এই ভরসা আছে যে, যাঁহার অষ্ট-অঙ্গে উপাধির আভরণ, তিনি কি কখন নিষ্ঠুর হইয়া আমার সবে-ধন বেঙ্গের আধুলিটি কাড়িয়া লইতে পারেন? অতএব এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

'শ্রবণাদ্ দর্শনাদ্ বাপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষো যোঽপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥'

ইত্যাকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া দর্পণকার খালাস। কিন্তু এই 'দর্পণ' যে পদ্মিনীর দর্পণের ন্যায় রূপোন্মাদ প্রেমোন্মাদ প্রভৃতির জন্য আমাদের সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, তাহা কি তিনি আঁচ করিতে পারিয়াছিলেন? বিশ্বনাথ কবিরাজের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া কল্পনাকুশল কবিকুল এই শ্রবণ-দর্শন-জনিত পূর্ব্বরাগের (অথবা চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, শ্রোত্রনেত্র-জাত হৃদ্‌রোগের!) বহু সরস কাহিনী কাব্যনাটকে প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য নিদান-নির্ণয়ের পূর্ব্বেও সংসারে রোগ ছিল। সুতরাং কবিরাজ মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্বসূরিগণ এই প্রেমজ্বরের ভূরি ভূরি বিচিত্র বৃত্তান্ত কাব্যনাটকে বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস-ভবভূতি, সুবন্ধু-বাণভট্ট প্রভৃতি এই রসে ওতপ্রোত। আর শুধু সংস্কৃত-সাহিত্য কেন, ইংরেজী বাঙ্গালা ফরাশী ফারশী প্রভৃতি সকল সাহিত্যেই চারি চক্ষুর চোরা চাহনির জোরে ও জেরে চিত্তচুরির চমৎকারী চমকপ্রদ বিবরণে ভরপূর।

সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখা যায়, তখনকার সমাজে স্বয়ংবরা হইবার প্রথা, গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, অনুলোম প্রণালীতে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের অসবর্ণ-বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত থাকাতে, নিরঙ্কুশাঃ শুধু কবয়ঃ কেন, নিরঙ্কুশাঃ যুবতয়ঃ—এখনকার হিন্দুসমাজের তুলনায়। পরিণয়ের দরজা অনেকটা দরাজ থাকাতে, প্রেমের পন্থাঃ ততটা পিচ্ছিল ছিল না, প্রণয়-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধন ততটা বিঘ্নবহুল বাধাসঙ্কুল ছিল না। যে টুকু বাধাবিঘ্ন ছিল, তাহা কেবল পূর্ব্বরাগের পরিপাকের জন্য (বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'প্রেমের পাক বিচ্ছেদে'); ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে (যেমন বিনা-লঙ্ঘনে জ্বরের পরিপাক হয় না)!

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে অভয় দিতেছেন,—

'গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন বহ্ব্যোঽথ মুনিকন্যকাঃ।
শ্রূয়ন্তে পরিণীতাস্তাঃ পিতৃভিশ্চানুমোদিতাঃ॥'

'মালতীমাধবে' কামন্দকী মালতীকে উৎসাহিত করিবার জন্য 'ইতরেতরানুরাগো হি দারকর্ম্মণি পরার্দ্ধং মঙ্গলম্' শুধু এই বুঝাইয়াই ক্ষান্ত নহেন, বাসবদত্তা পিতৃনির্ব্বাচিত বর

প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বাভিলষিত বরকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মালতীকে চৌরিকাবিবাহে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। (অবশ্য কামন্দকী এই কার্য্যটি মালতীর পিতার সহিত পরামর্শ করিয়াই করিতেছিলেন, কিন্তু মালতী ভিতরের কথা জানিত না)। তবে এখনকার তুলনায় তখনকার সমাজে যৌননির্ব্বাচন সম্বন্ধে অনেকটা উদারতা থাকিলেও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না। সুতরাং দুষ্মন্ত যদিও নিজেকে চান্‌কাইবার জন্য খুব জোর গলায় বলিয়াছেন,—

'অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা
যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥'

তথাপি ইহাতে তাঁহার খট্‌কা মিটে নাই, মন শুদ্ধ হয় নাই, শকুন্তলার যুগলসখীকে জেরা করিয়া যখন তিনি শকুন্তলার জন্ম-রহস্য জানিলেন, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন,—

'ভব হৃদয় সাভিলাষং সম্প্রতি সন্দেহনির্ণয়ো জাতঃ।'

অতএব কালিদাস যে দুষ্মন্তকে নিজের ও শকুন্তলার জাতি বাঁচাইয়া প্রেমের মহাজনীতে লাভবান্ করিয়াছেন, তজ্জন্য কালিদাসকে বাহবা (credit) দিতে হয়।

কিন্তু এখনকার হিন্দুসমাজে গান্ধর্ব্ব-বিবাহের স্থান নাই (বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠীবদল ইহার একমাত্র অনুকল্প!) তাই ভারতচন্দ্র ইহার ভুর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন,—

"গান্ধর্ব্ব-বিবাহ হৈল মনে আঁখিঠার॥"

বীর্য্যশুল্কা দ্রৌপদীর বেলায় বাঙ্গালী কবি কাশীরাম দাস ধৃষ্টদ্যুম্নের মুখ দিয়া হাঁকিয়া বলাইয়াছেন,—

'ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানাজাতি।
যে বিন্ধিবে লভে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥'

এ ক্ষেত্রেও ভারতচন্দ্র আধুনিক সমাজের তরফ হইতে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে ইহার ভেংচান গাহিয়াছেন,—

'পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা যায়,
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায়।
দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ দেখ পুরাণপ্রসঙ্গ
যথা যথা পণ তথা তথা,এই রঙ্গ।'

তবে ভারতচন্দ্রের সময়ে কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বীরের জননী রঙ্গভূমির ক্ষাত্র-যুগের অবসান হইয়াছে, তাই তাঁহার কাব্যের নায়িকা বীর্য্যশুল্কা নহেন, শস্ত্রবিদ্যার পরিবর্ত্তে শাস্ত্র-বিদ্যার পরীক্ষায় প্রাপণীয়া।

সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখা যায়, যুবতী কন্যা গান্ধর্ব্ববিধানে স্বেচ্ছানুরূপ বরের পরিণীতা হইলে অভিভাবক (অগত্যা?) সেটা মানিয়া লয়েন, এবং গান্ধর্ব্ববিবাহটাও এমন তড়িঘড়ি সম্পন্ন হইয়া যায় যে অভিভাবক বিবাহের পূর্ব্বে বাধা দিবার কোন সুযোগ পান না। তবে কন্যা সব সময়েই জাতিবিচার করিয়া প্রেমাস্পদ নির্ব্বাচন করেন, একথা স্বীকার করিতে হইবে। আবার অনেক সময়ে, কন্যার পূর্ব্বরাগের পাত্র অভিভাবকেরও অভিপ্রেত বর, এরূপও দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বিলাতী-সমাজে জাতিভেদের কড়াক্কড় নাই বলিয়া আমাদের সমাজ-সংস্কারকগণ তারস্বরে ঘোষণা করিলেও, বিলাতী সাহিত্যে অভিজাত্য-গর্ব্বিত অভিভাবকের প্রদত্ত প্রবল বাধায় নায়ক-নায়িকার প্রেমসাগরে তুফান উঠিয়া তাঁহাদিগের ভগ্নহৃদয়ের ভরাডুবি হয়, এবং কাব্যখানি নিদারুণ ট্রাজেডিতে পরিণত হয়, এরূপ দৃষ্টান্তের বাহুল্য দেখা যায়। শ্রেষ্ঠ ইংরেজকবি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন,—

Ay me! for aught that I could ever read,
Could ever hear by tale or history
The course of true love never did run smooth;
But either it was different in blood —'

যাহা হউক, বিলাতী সমাজ ও সাহিত্যের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই (যদিও অধুনা তাহার অনুকরণ ও অনুসরণের ভিড়িকে আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতেছে।) আবার সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তনের জন্য সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক দূর হইয়া পড়িয়াছে; কেননা শকুন্তলা-দুষ্মন্তের, উর্ব্বশী-পুরুরবার, সাগরিকা-উদয়নের, মালবিকা-অগ্নিমিত্রের, মালতী-মাধবের ঘটনা এখনকার হিন্দুসমাজের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না, ঠিক যোড় মেলে না। ইহার পুনরভিনয় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে সম্ভবনীয়ও নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। আর রাজা বা রাজমন্ত্রীর ঘরে যাহা ঘটিত, তাহা লইয়া আমাদের গৃহস্থঘরের, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মাথাব্যথাই বা কেন?

কিন্তু এখনকার রাঢ়ী বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য দাক্ষিণাত্য বৈদিক, সপ্তশতী মধ্যশ্রেণী সরযূপারী শাকল-দ্বীপীয় ত্রিস্রোতীয়

ভূমিহার প্রভৃতি রকমারি ব্রাহ্মণের ও উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ বারেন্দ্র এই চতুর্ব্বিধ কায়স্থের—(সাধারণতঃ এই দুইটি উচ্চজাতি হইতে নাটক-নভেলের নায়ক-নায়িকা সংগৃহীত হয়)—কুলশীল গাঁইগোত্র প্রবরমেল পর্য্যায়পটী গণবর্ণ প্রভৃতি চিড়ের বাইশ-ফের বজায় রাখিয়া প্রেমের আখ্যান রচনা করা সহজ ব্যাপার নহে। ঐতিহাসিক নাটক ও আখ্যায়িকায় প্রতাপাদিত্য সীতারাম প্রভৃতি বঙ্গীয় কায়স্থবীরের আবিষ্কারের পূর্ব্বে রাজপুতানা হইতে নায়ক-নায়িকা আমদানী করিতে হইত। সেক্ষেত্রেও যখন বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ী, তখন অবশ্য পানাহারের ন্যায় আদান-প্রদানেও যথেষ্ট বাছবিচার বর্ত্তমান। ইউরোপের মণ্টেগু-ক্যাপুলেটের বিরোধের ন্যায় রাজপুতদিগের মধ্যেও বংশে বংশে বিরোধের অভাব ছিল না। সুতরাং তাহার জন্যও স্বাধীন প্রেমের পথে বাধা পড়িত। অথচ সস্তা মুদ্রাযন্ত্রের এবং তদপেক্ষাও সস্তা কল্পনাবৃত্তির কল্যাণে আমাদের সাহিত্য-সরস্বতী অজস্র ছোট-বড়-মাঝারি গল্পগাছা উপন্যাস নবন্যাস রমন্যাস রহোন্যাস নাটক নভেল প্রহসন পঙ্করং প্রসব করিতেছেন। যে সকল হুঁসিয়ার লেখক-লেখিকা এ অবস্থায় নায়ক-নায়িকার জাতিকুল বাঁচাইয়া প্রেমের চাষ করিতেছেন, তাঁহাদিগের বাহাদুরী বলিতে হইবে, তাঁহাদিগের সতর্কতা, কৌশল, উদ্ভাবনী-শক্তি, অধ্যবসায় প্রভৃতির বহুৎ তারিফ করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, যেখানে ঐরূপ আটঘাট বাঁধিয়া ঘটক-কুলাচার্য্যের মত কুলশীল ঠিকঠাক মিলাইয়া না দেখিয়াই কবিকল্পনা লম্বা দৌড় দিতেছে, সেখানেই সমাজবিপ্লবের আশঙ্কা, অথবা নিদারুণ বিয়োগান্ত ব্যাপারের (tragedy) সম্ভাবনা। আর ভাবপ্রবণ গল্পলেখকও তখন উত্তেজিত উন্মত্ত হইয়া 'ওরে দুষ্ট দেশাচার' বা 'Cursed be the social lies' বলিয়া চীৎকার করিয়া গগন ফাটাইবেন এবং এই অজুহাতে সমাজ-সংস্কারের ধূয়া ধরিবেন।

এইত গেল এক সমস্যা। ইহার উপর আর এক সমস্যা আছে। 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ।' সংস্কৃত-সাহিত্যের অভ্যুদয়-কালের সহিত আধুনিক হিন্দুসমাজের তুলনা করিলে আর একটি প্রভেদ প্রকট হইয়া উঠে। সংস্কৃত-সাহিত্যে নায়িকা 'কন্যাত্বজাতোপযমা সলজ্জা নবযৌবনা'; কিন্তু স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের উদ্‌বাহতত্ত্ব-শাসিত বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যৌবনোদয়ের পূর্ব্বেই বিবাহ-সংস্কার সমাধা করিতে হয়; পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কুলীনের ঘরে যৌবনস্থা (বা বিগতযৌবনা) অনূঢ়া কন্যা পাওয়া যাইত; কিন্তু কুলীন-সম্প্রদায়ও এখন রঘুনন্দনের ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়া কন্যার বাল্যবিবাহে মনোযোগী হইতেছেন। সুতরাং আধুনিক হিন্দুসমাজে পূর্ব্বরাগের অবকাশ, রোম্যান্সের সুযোগ, নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নিতান্ত বালিকার হৃদয়ে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার করা ভিন্ন আর গল্প-লেখকদিগের উপায় নাই। তবে বরপণের চাপে 'কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িতেছে, ইহাতে গল্প-লেখকদিগের বেশ একটু সুবিধার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু ইহারও উপর আর এক সমস্যা আছে। আধুনিক হিন্দুসমাজে বিবাহ-সম্বন্ধ বরকন্যার অভিভাবকদিগের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, 'কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর'—এই সহজ ব্যবস্থা চলে না! পাল্টী ঘরের প্রতিবেশিকন্যার অর্থাৎ নিজের ও ভগিনীর খেলার সাথীর নিরন্তর সাহচর্য্যে অথবা ছুটির সময় বেড়াইতে গিয়া ঐরূপ করণীয় ঘরের সহপাঠীর ভগিনী, বৌদিদির ভগিনী, ভগিনীর ননদ, কাকীমা বা জ্যেঠাইমার ভাইঝী, পিসিমার ভাশুরঝী বা দেবরকন্যা, সজাতীয় পিতৃবন্ধুর কন্যা ইত্যাদির দৈবাদ্দর্শনে স্কুল-কলেজের পড়ুয়া যুবকের প্রণয়সঞ্চার ঘটাইতে পারিলে আধুনিক হিন্দুসমাজে রোম্যান্সের কিঞ্চিৎ চর্চ্চা হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, এই স্বল্প-পরিসরের মধ্যে সব দিক্ রক্ষা করিয়া যে সকল লেখক-লেখিকা প্রণয়কাহিনী রচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের বাহাদুরীর জন্য বাহবা না দিলে আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইবে।

কিন্তু কাব্য-নাটকের মারফত বাঙ্গালী-জীবনে রোম্যান্সের এইরূপ নবনব অবসর যোগাইতে কল্পনাকুশল লেখক লেখিকাগণ সমাজে যে এক বিষম অনর্থ উৎপাদন করিতেছেন, তাহার কথা কেহ ভাবিতেছেন কি? এই ঘোর অত্যাহিতের প্রতিবিধানের চেষ্টা বিজ্ঞ সামাজিকগণ করিবেন না কি? সাহিত্যে ও সঙ্গেসঙ্গে সমাজেও যেভাবে সর্ব্বত্র নভেলী প্রেমের ব্যাসিলি ছড়ান হইতেছে, তাহা বাস্তবিকই আশঙ্কাজনক নহে কি? ইহা যে জার্ম্মান বিমানযান হইতে ইংলণ্ডের পূর্ব্বউপকূলের উপর বোমাছোড়া অপেক্ষাও

সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে। অথচ এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ উদাসীন।

যাক্, আর ফাঁকা আওয়াজ না করিয়া গোটাকতক বাছা বাছা উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করি।

প্রথমেই সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের কথা তুলিতে হয়, কেননা তিনিই অনেকের মতে এই মামলার মূল আসামী, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে পরবর্ত্তিগণ বিচরণ করিতেছেন।

সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখিয়াছি, ('নাগানন্দে') জীমূতবাহন তপোবন-গৌরীগৃহে মলয়বতীকে দেখিলেন, প্রথম-দর্শনেই 'এ চাহে উহার পানে, চিতহারা দুইজনে।' 'দেবমন্দিরে মন্মথের দৌরাত্ম্য' তখন হইতেই আরম্ভ হইল, শৈলেশ্বর-মন্দিরে কুমার জগৎসিংহ ও তিলোত্তমাসুন্দরীর পরস্পর-দর্শনে 'নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম-বিক্রিয়া' তাহারই অনুবৃত্তি। যুবক-যুবতী পরস্পরের জাতি না জানিয়া পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রকটিত করিলেন, এ জন্য ৺রাম গতি ন্যায়রত্ন দুষ্যন্তের সহিত তুলনা করিয়া দুষিয়াছেন বটে; কিন্তু প্রেমিক-প্রেমিকা বা পাঠক-পাঠিকা জাতির খবর না জানিলেও অন্তর্য্যামী গ্রন্থকার জানিতেন, সুতরাং ঠিকে ভুল হয় নাই। কিন্তু রমেশচন্দ্র ইহার উপর আর এক কাঠি চড়াইয়া মহেশ্বর-মন্দিরে কায়স্থ ইন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মণকন্যা বিমলার নয়নপথবর্ত্তী করিয়া নায়িকার হৃদয়ে প্রণয়োদয় ঘটাইলেন। ভাগ্যি তখনও গ্রন্থকারের সমাজসংস্কারস্পৃহা প্রবল হয় নাই, তাই তিনি ঐ প্রণয় একতরফা রাখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন এবং পরে নায়িকাকে দিয়া সামলাইয়া লইয়াছেন। (বহু পরে লিখিত 'সমাজে' অতি-সাহসিকতা দেখাইয়া গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ-কায়স্থে বিবাহ দিয়া সমাজ-সংস্কারস্পৃহা চরিতার্থ করিয়াছেন।)

পুরাণে শুনিয়াছি, গুরুকন্যা দেবযানীর সহিত শিষ্য কচের প্রণয় ঘটিয়াছিল। প্রবাদ আছে, ফৈজী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অধ্যাপকের টোলে অধ্যয়নকালে গুরুকন্যার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। অভিরামস্বামীর শিষ্য বীরেন্দ্রসিংহের গুরুকন্যা বিমলার সহিত প্রণয় ইহারই অভিনব সংস্করণ। আবার 'আনন্দমঠে' জীবানন্দ-শান্তির প্রণয়ও ইহার জের।

আয়েষা, রেবেকার ন্যায়, রোগে সেবা করিতে করিতে রোগীর অনুরাগিণী হইলেন। যাহা হউক, আয়েষা মুসলমানী, সুতরাং হিন্দুর ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। জগৎসিংহের হৃদয় পূর্ণ ছিল, তাই তাঁহার কোন বিকার ঘটিল না। মনোরমাও হেমচন্দ্রকে শুশ্রূষা করিয়াছিল, কিন্তু উভয়েরই হৃদয় পূর্ণ ছিল, সুতরাং কোন অত্যাহিত ঘটিল না। ওসমান পিতৃব্যকন্যা আয়েষার অনুরাগী, ইহা মুসলমান-সমাজের প্রথার বিরোধী নহে, বিলাতী সমাজ ও সাহিত্যে ত ইহা নিত্য ঘটনা। এক্ষেত্রেও হিন্দুর ইহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। যাহা হউক, এই একখানি আখ্যায়িকার আলোচনায় বুঝিলাম, দেবমন্দির, অধ্যাপকের চতুষ্পাঠী, রোগশয্যা, সর্ব্বত্রই 'মন্মথের দৌরাত্ম্য'!

নবকুমার সাগরতীরে গোধূলিলগ্নে কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেন, অনুমানে বুঝি তাঁহার হৃদয়ে তদ্দণ্ডেই প্রথম-দর্শনজনিত প্রণয় জন্মিল। তাহার পর, নায়িকা দুই দুইবার নায়ককে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহাতে নায়কের প্রণয় আরও ঘনীভূত হইল। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়, বীরপুরুষ অবলা নারীকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন এবং তদুপলক্ষে উভয়ের প্রণয়সঞ্চার হয়। এক্ষেত্রে নারী উদ্ধারকর্ত্রী; বাঙ্গালী নির্বীর্য্য বলিয়া কি এই বিপরীত ব্যবস্থা, না ইহা গ্রীক-পুরাণের এরিয়াড্নি, মিডিয়া, প্রভৃতির ব্যাপারের অনুবৃত্তি? তবে এখানে প্রণয়টা একতরফা, সুতরাং গ্রীকপুরাণের সহিত মিলিয়াও মিলিল না। নবকুমার দস্যুকর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা মতিবিবিকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন, মতিবিবির হৃদয়ে প্রেমোদয় হইল, ইহা সংস্কৃত-সাহিত্যের অনুরূপ, তবে জাতিত্যাগিনী এই যা' দোষ। (স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী হইলে দোষ ছিল না!) যাহা হউক, মতি-বিবি ওরফে পদ্মাবতীর প্রকৃতপক্ষে পতিপ্রেম ঝালান, আর এক্ষেত্রেও প্রণয়টা একতরফা। নগেন্দ্র দত্ত কুন্দর বড় অদিনে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার ভাবান্তর হয়, পরে কুন্দর পূর্ণ-যৌবনে ইহা আরও প্রবল হইল। অমরনাথ দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে রজনীকে রক্ষা করিল, আবার আহত অমরনাথকে বোধ হয় রজনী শুশ্রূষাও করিল (?); রজনীর হৃদয় পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহার কোন বিকার ঘটিল না, কিন্তু অমরনাথ তখন 'লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভুলিয়া যাইতে'ছিলেন, তাই তাঁহার ভাবান্তর হইল। হরলালও দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে একদিন রোহিণীকে উদ্ধার করিয়াছিল;' তাহাতে অনুমান হয়, রোহিণীর মনে একটু ভাবান্তর হইয়াছিল; কিন্তু অনুকূল অবস্থার অভাবে তাহা বদ্ধমূল হইতে

পারে নাই, পরে হরলালের কদর্য্য ব্যবহারে এবং গোবিন্দলালের প্রতি প্রবল আসক্তির ঝোঁকে সে ভাব একেবারে মুছিয়া গেল। ভবানন্দ কল্যাণীকে যমের দুয়ার হইতে টানিয়া আনিতে গিয়া নিজে প্রেমের (?) দুয়ারে হাজির হইল! বিপদে পড়িয়া শ্রী সীতারামের শরণ লইল, সীতারামের পরিত্যক্তা পত্নীর প্রতি প্রেম উজ্জীবিত হইল (প্রফুল্ল-ব্রজেশ্বরের ঘটনাও কতকটা অনুরূপ); বিপদে পড়িয়া রমা গঙ্গারামের শরণ লইল, গঙ্গারামের অমনি চিত্তবিকার হইল। এই সকল উদাহরণ হইতে বুঝা গেল, বিপদুদ্ধারেও নূতন বিপদ্ আছে।

'কাদম্বরী'তে পুণ্ডরীক স্নানে যাইতে মহাশ্বেতাকে দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইলেন। পদাবলী সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার ঘাটে 'গোরোচনা-গোরী নবীনকিশোরী' বিনোদিনী রাধাকে স্নান করিতে দেখিয়া 'মনমথ-জ্বরে ভোর' হইলেন। রোহিণী-গোবিন্দলালের পূর্ব্বে বহুবার নির্দ্দোষ-ভাবে দেখা হইলেও দেখার মত দেখা বাপীতীরে। তাহার পর, নানাকারণে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত, পল্লবিত, পুষ্পিত, ফলিত হইল; সে অনেক কথা। লরেন্স ফষ্টারও কি শৈবলিনীকে প্রথমে ভীমা পুষ্করিণীতে দেখিয়াছিল? সে যাহাই হউক, বুঝা গেল স্নানের ঘাটেও 'মন্মথের দৌরাত্ম্য' আছে।

হেমচন্দ্র যমুনায় জলমগ্না কুমারী মৃণালিনীকে উদ্ধার করিলেন এবং এই ঘটনায় উভয়ের হৃদয়েই প্রেমসঞ্চার হইল। ('যমুনার জলে' নিধি মিলিল বলিয়াই বুঝি এত 'মথুরাবাসিনী'র গান?) ঠিক অনুরূপ ঘটনা সংস্কৃত-সাহিত্যে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে Otway's Venice Preserved দৃশ্যকাব্যে Jaffier ও Belviderar ব্যাপার অনেকটা এইরূপ। আখ্যায়িকা-কার থ্যাকারে তাঁহার 'পেণ্ডেনিসে' এইরূপ একটি ঘটনার আভাস দিয়াছেন ('her cousin who saved her life out of the lake', ৪০শ পরিচ্ছেদ)। রোহিণীকেও গোবিন্দলাল জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। 'চন্দ্রশেখরে' জলমজ্জন-ব্যাপারে একটি রহস্য দেখা যায়। চন্দ্রশেখর জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিলেন প্রতাপকে, প্রেমে পড়িলেন শৈবলিনীর! 'দশাননোঽহরৎ সীতাং বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ!' আহা! প্রতাপ যদি বালক না হইয়া বালিকা হইত।

জলে ডোবার জের ঐখানেই মিটে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূর্ণবাবুর 'মধুমতী'তে যুবক করালীপ্রসন্ন জলমগ্না যুবতী 'মধুমতী'কে অনেক চেষ্টায় অনেক শুশ্রূষায় বাঁচাইলেন। জলমজ্জনে যুবতীর স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছিল, সে যে সধবা তাহা সে বিস্মৃত হইয়াছিল, সুতরাং উদ্ধারকর্ত্তা ব্রাহ্ম-যুবকের সহিত প্রণয় ও পরিণয়ে বাধা ঘটিল না। কিছুদিন সুখে কাটিল, কিন্তু পরে সে সুখের অবসান হইল, যুবতীর স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, পূর্ব্বস্বামীর সহিত মিলন হইল, কিন্তু ভাঙ্গা-ঘর আর যোড়া লাগিল না, স্বামিস্ত্রীর একত্র-মৃত্যুতে পর্য্যবসান হইল। আবার সেদিন দেখিলাম, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অশ্রু'তেও এই জলে ডোবার জের চলিতেছে। এক্ষেত্রে দুই পক্ষই ব্রাহ্ম, সুতরাং আমাদের বিশেষ মাথা-ব্যথা নাই; এখানেও যুবতী পূর্ব্বে বিবাহিত, তবে যুবক তাহা জানিত না, যুবতী অনেকদিন কথাটা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু সময় বুঝিয়া প্রকাশ করিলেন।

যাহা হউক, বুঝা গেল্ জলপথেও দস্যু 'মন্মথের দৌরাত্ম্য' আছে। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' এই শ্রেণীর প্রেমকাব্যের ব্যঙ্গ করিয়া নভেলপড়া কমলার খেয়াল বর্ণনা করিয়াছেন; বিশ্বেশ্বর কমলাকে জলমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছিল বলিয়া কমলা তাহাকেই বিবাহ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কেননা, কমলা 'সেই ঘটনার পর হইতে এই তিন বৎসরে যত পুস্তক পড়িয়াছে, তাহাতে এরূপ স্থলে একই কথা লেখে!'

সংস্কৃত-নাটকে রাজাদিগের অন্তঃপুরিকার সহিত প্রেমের ব্যাপার আছে; তবে মালবিকা, রত্নাবলী প্রভৃতি সকলেই সৌভাগ্যক্রমে কুমারী। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সব সময়ে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই। নগেন্দ্র দত্তের হৃদয়ে পূর্ব্বেই কুন্দপ্রেমের অঙ্কুরোদ্গম হইলেও (তখন সে কুমারী) নিজের অন্তঃপুরবাসিনী পূর্ণযৌবনা বিধবা কুন্দনন্দিনীর সহিতই প্রেম ঘনীভূত হইল। পাষণ্ড ব্যোমকেশের অন্তঃপুরবাসিনী মৃণালিনীর উপর লুব্ধদৃষ্টি পড়িল। মনোরমা পশুপতির গৃহে যাতায়াত করিত, এই সুযোগে পশুপতির প্রেমোদয় হইয়াছিল (প্রকৃতপক্ষে মনোরমা তাহার পত্নী, কিন্তু সে নগেন্দ্রদত্তের ন্যায় জানিত মনোরমা কুন্দর ন্যায় বিধবা।) উপেন্দ্রবাবু ভদ্রলোকের অন্তঃপুরে সুন্দরী পাচিকাকে পরিবেষণ করিতে দেখিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন, ইন্দিরা ওরফে কুমুদিনীও যত্ন করিয়া

পাকসাক করিয়া পরিবেষণ করিতে গিয়া প্রেমের পাকে (বা বিপাকে) পড়িল; তবে প্রভেদের মধ্যে ইন্দিরা মতিবিবির ন্যায় স্বামীকে চিনিয়াছিল, উপেন্দ্র বাবুর সে সাফাই নাই। অন্ধ ফুলওয়ালী সুন্দরী যুবতী রজনীকে অন্দরে যাতায়াত করিতে দেখিয়া শচীন্দ্র তাহার প্রেমে পড়ে নাই, না হয় স্বীকার করিলাম; সবটাই দয়া, তাহাও স্বীকার করিলাম, 'Pity melts the mind to love' 'একই সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা', এই কবি-বাক্য এখানে সার্থক নহে, তাহাও স্বীকার করিলাম; কিন্তু রজনীর অবস্থা? অন্ধ যুবতী শ্রবণাৎ, দর্শনাৎ ছাড়া আর এক প্রকারের প্রত্যক্ষ দ্বারা—স্পর্শনাৎ—প্রণয়বতী হইয়া দর্পণকারের একটু—ত্রুটি ধরিয়া দিল। (সে শচীন্দ্রের অমৃতময় কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা ত দর্পণকারের 'শ্রবণাৎ'এর তাৎপর্য্য নহে।) সেই 'বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শে' রজনীর হৃদয়ে প্রেমোদয় হইল। গৃহস্থের অন্তঃপুরেও 'মন্মথের দৌরাত্ম্য' দেখা গেল।

ইউরোপে Eloisa-Abelard-এর আমল হইতে শিক্ষক ও ছাত্রীর প্রণয় সমাজে ও সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। ইংরেজ-কবি পোপের প্রসাদে এই করুণ কাহিনী প্রসার লাভ করিয়াছে; হেম বাবুর 'মদন-পারিজাতে'র কল্যাণে এই অপূর্ব্ব প্রেমফুল বাঙ্গালা-সাহিত্যের উদ্যানেও ফুটিয়াছে। সুইফ্‌ট্‌ নিজের জীবন হইতে মশলাসংগ্রহ করিয়া 'Cadenus & Vanessa' কবিতায় এই জাতীয় প্রেমের পুনঃপ্রচার করিয়াছেন। রুসো তাঁহার New Heloiseতে এই মামুলি ব্যাপারের জীর্ণসংস্কার করিয়াছেন, তবে প্রথমে বিস্তর ঢলাঢলি করিয়া শেষে আশ্চর্য্য-রকমে সামলাইয়া লইয়াছেন। এই মামুলী ব্যাপারের মোলায়েম সংস্করণ অমরনাথ-লবঙ্গলতায়,* তথা গোপাল দাদা ও স্বর্ণলতায় দেখা যায়। রবিবাবুর 'মেঘ ও রৌদ্রে' শশিভূষণ ও গিরিবালার ব্যাপারও কি এই জাতীয়? শিক্ষক ও ছাত্রীর পবিত্র সম্বন্ধের ভিতরও কি রন্ধ্রগত কন্দর্প রহিয়াছেন? সমাজ-পতি মহাশয় 'সাজি'তে 'প্রাইভেট টিউটর' গল্পে ইহা লইয়া একটু রঙ্গ করিয়াছেন। চতুর গৃহশিক্ষক ছাত্রীর সহিত প্রেমের ভান করিল, অভিভাবক ব্যাপার প্রকৃত ভাবিয়া তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য তাহার অন্যত্র মোটা মাহিয়ানার চাকরী করিয়া দিলেন। অহো 'নিধি-প্রাপ্তেরয়মুপায়ঃ!'

পুরন্দর-হিরণ্ময়ী বাল্যকাল হইতে পরস্পরের খেলায় সাথী; বাল্যপ্রণয় ক্রমে ঘনীভূত হইল। প্রতাপ-শৈবলিনীর বেলায়ও তাহাই। তবে শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা, এইখানে বিষম গোল। লরেন্স ফষ্টার মেরি ফষ্টারে প্রণয় ইংরেজ-সমাজের প্রথার প্রতিকূল নহে, পিতৃব্যকন্যা আয়েষার প্রতি ওসমানের প্রণয় মুসলমান-সমাজের প্রতিকূল নহে, ভদ্রার্জ্জুনের বেলায় ও যদুবংশের আরও অনেকস্থলে মাতুলীকন্যাবিবাহ তৎকালে হিন্দুসমাজের অনুমোদিত ছিল, কিন্তু জ্ঞাতিকন্যা অর্থাৎ সগোত্রার সহিত বিবাহ সকল যুগেই হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ। যাহা হউক, দেখা গেল বালকবালিকার ক্রীড়াক্ষেত্রেও 'মন্মথের দৌরাত্ম্য'; সপিণ্ড, সকুল্য, সগোত্র পর্য্যন্ত সে মানে না।

শ্রেষ্ঠ প্রেমকাব্য বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীরাধার প্রথমে শ্যামনাম-শ্রবণ, পরে শ্যামের বংশীধ্বনি-শ্রবণ, পরে চিত্রদর্শনে তথা স্বপ্নদর্শনে প্রেমের Concrete বনিয়াদ-পত্তন হইল, তাহার পর 'যমুনা যাইতে কদম্বতলাতে' সাক্ষাদ্দর্শনে প্রেম ঘনীভূত হইল। 'শ্রবণাদ্ দর্শনাৎ' এর ষোল আনা উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের চঞ্চলকুমারী পূর্ব্বে রাজসিংহের বীরত্ব-মহত্ত্বের কাহিনী-শ্রবণে তাঁহার প্রতি বদ্ধভাবা হইয়াছিলেন, চিত্রদর্শনে সেই ভাব আরও ঘনীভূত হইল। এই পর্য্যন্ত গেল রাধাভাব। তাহার পর, শিশুপালভীতা রুক্মিণীর ন্যায় আরংজেবভীতা চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের শরণ লইলেন। গাছতলায় দেখা হওয়ায় প্রেমঘটনের ব্যাপারটা সখী নির্ম্মলকুমারীর জন্য তোলা থাকিল; তবে সেটা কদমতলা কি বকুলতলা তাহা আদালতের কাগজপত্র হইতে জানা যায় না।

ভারতচন্দ্র রথতলায় নায়ক-নায়িকার প্রথমদর্শন ঘটাইয়াছেন, তবে 'শ্রবণাৎ' উভয়পক্ষেই কায অনেকটা আগাইয়া রাখিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রথতলায় না হইলেও রথের ভাঙ্গাহাটে রাধারাণী-রুক্মিণীকুমারকে *

* 'মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে "ক য়ে করাত, "খ য়ে খরা, শিখাইতাম।'

* রাধারাণীর সহিত অনুপ্রাস-সত্ত্বেও রুক্মিণীকুমার নামটিতে রসভঙ্গ হইয়াছে। রুক্মিণীনাথ রুক্মিণীকান্ত রুক্মিণীরমণ হইলে রাধারাণীর উপযুক্ত প্রেমিক হইতেন।

ইতি—ব্যাকরণ-বিভীষিকাকারের টীকা।

পরস্পরের সমীপস্থ করিয়াছেন, তবে রাত্রির অন্ধকারে ভালমত 'দর্শন' ঘটে নাই, তাই বুঝি মিলনে এত বিলম্ব ?

এইবার বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য-প্রশিষ্যাদিগের রচনার আলোচনা করিব।

৺রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হিরণ্ময়ী' ও 'কিরণময়ী'তে ধনী ব্রাহ্মণ জমিদার একটি ব্রাহ্মণ বালককে আশ্রয় দিলেন। যথাসময়ে নিরন্তর-সাহচর্য্যে আশ্রয়-দাতার উভয় কন্যাই তাহার প্রেমে পড়িল; সেও উভয়ের না হউক, একজনের প্রেমের প্রতিদান দিল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'প্রেম-মরীচিকা'র একটি গল্পে বিপিন নলিন দুই ভাইই (অট্‌ওয়ের Orphan নাটকের ন্যায়) আশ্রিতা কুমারী শেফালিকার প্রেমে পড়িল। কুমারীকে কনিষ্ঠের অনুরক্তা জানিয়া জ্যেষ্ঠ অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখাইলেন। (ইহা অট্‌ওয়ের নাটকের বৃত্তান্তের ও সুন্দ-উপসুন্দের পৌরাণিক আখ্যানের সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং মৌলিক ও সুন্দর।) শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'ছিন্নমুকুলে' সন্ন্যাসিকন্যা নীরজা বিপন্ন যুবকদ্বয় প্রমোদ ও যামিনীনাথকে আশ্রয় দিলেন, উভয় যুবকই তাহার প্রেমে পড়িল, যুবতীও একজনের পক্ষপাতিনী হইল। উক্ত লেখিকার 'যমুনা' গল্পে গৃহস্বামিনী অতিথিকে আশ্রয় দিলেন। গৃহস্বামিনীর কন্যা যমুনা আবার পীড়িত অতিথির শুশ্রূষা করিল; একেবারে সোণায় সোহাগা, উভয়েরই হৃদয়ে যথারীতি প্রেমোদয় হইল, অতিথি জাতি ভাঁড়াইয়া যমুনাকে বিবাহ করিল, পরে যমুনার হাল দাসীরও অধম হইল। রবি বাবুর 'অতিথি' গল্পে কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু নৌকাপথে যাইতে যাইতে বালক তারাপদকে আশ্রয় দিলেন, ফলে শুধু জমিদার-কন্যা চারুশশীর কেন, বোধ হয় বামুন ঠাকরুণের বালবিধবা কন্যা সোণামণিরও হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর হইল। ক্রমে সহপাঠিনী 'বালিকা চারুশশীর নিয়ত দৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য্য' অলক্ষিতভাবে তারাপদর হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল,' বেচারা পলায়নে আত্মরক্ষা করিল। কি ভাগ্যে উক্ত লেখকের 'আপদ' গল্পে অনাথ বালক নীলকান্তকে আশ্রয় দিয়া স্বামিসোহাগিনী কিরণের মাতৃভাব জাগিল, মাতৃহীন নীলকান্তও তাঁহাকে মাতৃজ্ঞান করিল। যাহা হউক, আশ্রয়দানে প্রেমের প্রশ্রয়-দানের আরও বহু উদাহরণ আছে, মিছামিছি পশরা ভারী করিব না।

(১) রোগশয্যা

দামোদর বাবুর 'মা ও মেয়ে'তে রামচরণ ডাক্তার সুলোচনার স্বামীকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া সুলোচনাকে যে চক্ষে দেখিল এবং সতী সাধ্বীর যে হাল করিল তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহি না। (ইহা অবশ্য পবিত্র প্রণয় নহে, একটা জঘন্য প্রবৃত্তি। তবে চোখের দোষ উভয়ত্রই বিদ্যমান।) আবার জমিদার-পুত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় (বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী'র নায়কের নামে নাম) সুলোচনার কন্যা শরৎকুমারীর চিকিৎসা করিতে আসিলে রোঝা (ওঝা) ও রোগিণীর অন্যোন্যানুরাগ জন্মিল। রামচরণ ডাক্তারের এলোপ্যাথি চিকিৎসা, তাই বীভৎস এলোমার্কণ্ডী কাণ্ড, আর জমিদার-কুমারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা, তাই মৃদু ও সুখকর! ইহাতেও কি আমাদের দেশের লোকের হোমিওপ্যাথির উপর শ্রদ্ধা বাড়িবে না?

রবি বাবুর 'নিশীথে' গল্পে আবার উল্টা উৎপত্তি। হারাণ ডাক্তার চিকিৎসা করিলেন দক্ষিণাচরণ বাবুর স্ত্রীর, দক্ষিণা বাবু প্রেমে পড়িলেন ভিষগ্‌দুহিতা মনোরমার! রকম সকম দেখিয়া চিররোগিণী পতিপ্রাণা আত্মঘাতিনী হইয়া সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'রাঙ্গা শাঁখা'র 'মুক্তি' গল্পে ডাক্তার রমেন্দ্র বিদেশে একটি প্লেগের রোগীকে চিকিৎসা করিতে গিয়া চিনিলেন, রোগীর যুবতী পত্নী তাঁহারই বাল্য-সহচরী ও বাগ্‌দত্তা সরলা। হেমবাবুর 'হতাশের আক্ষেপে'র 'এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো, দেখে বুক বিদরিল, কেন তারে দেখিলাম।' ইত্যাদির পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নাই, কেননা নভেলী জগতে পূর্ব্ব-পরিচয় না থাকিলেও এরূপ ক্ষেত্রে প্রেমোদয় অসম্ভব নহে। সুখের বিষয়, রোগীর মৃত্যু হইলে অবিবাহিত ডাক্তার সদ্যোবিধবাকে নিজ গৃহে আনিতে (অবশ্য ভগিনীজ্ঞানে) আগ্রহ প্রকাশ করিলে সাধ্বী স্বামীর স্মৃতির অবমাননা করিল না, এবং অবিলম্বে প্লেগ তাহাকে সকল জ্বালা ও সকল প্রলোভন হইতে 'মুক্তি' দিল।

এই ত গেল গৃহস্থঘরে রোগশয্যার রোম্যান্স। আবার

হাঁসপাতালে মুমূর্ষু যুবতীর আশপাশেও 'মন্মথের দৌরাত্ম্য' আছে। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'রাঙ্গা শাঁখা'য় 'কনে দেখা' গল্পে মেডিক্যাল কলেজের হাঁসপাতালে আনীতা বিষপানে আত্মঘাতিনী অনূঢ়া যুবতী চন্দ্রা বিবাহে পিতা বাধা দেওয়ায় প্রেমাস্পদ অখিলের নাম জপিতে জপিতে চক্ষুঃ মুদিলেন। মেডিকাল কলেজের একটি ছাত্র তখন ডিউটিতে ছিল, চন্দ্রাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়াও তাহার প্রেম উপজিল এবং সে আমরণ আইবড় রহিল। এই 'কনে দেখা'ই তাহার শেষ 'কনে দেখা'!

(২) মেসের ছাদ

মেসের ছাদ হইতে নায়িকাকে দেখিয়া নায়কের প্রেম-সঞ্চার ও নায়িকার প্রতিদান অনেকগুলি ছোট-গল্পে দেখিয়াছি। ইহারই রকমফের 'জানালার কাবা' হইতে জানা যায়, গবাক্ষপথেও কালিদাসের মেঘের ন্যায় মন্মথের যাতায়াত সহজ। রবিবাবুর 'ত্যাগ' গল্পে হেমন্তের 'ছাদে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইত না,' কুসুমও 'প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাদে উঠিত'; ফলে বালবিধবার ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিল। উক্ত লেখকের 'প্রতিবেশিনী' গল্পে বক্তা স্বয়ং একরার করিতেছেন, 'পাশের বাড়ীর বাতায়নে' প্রতিবেশিনী যুবতী বিধবাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া তিনি ভাবে বিভোর; যাহা হউক, তাঁহার বন্ধুই শেষটা জিতিলেন। উক্ত লেখকের 'বিচারক' গল্পে শ্রাদ্ধ আরও অনেকদূর গড়াইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও নায়িকা যুবতী বিধবা। টীকা অনাবশ্যক।

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবীর 'পুষ্পহারে' 'কল্যাণী' গল্পে মেসের ছাদ হইতে মাতাল স্বামীর অমানুষিক অত্যাচার দেখিয়া গৌরীর জন্য বিনোদের সরল প্রাণে যে করুণার সঞ্চার হইল, তাহাই ঘনীভূত হইয়া গভীর প্রণয়ে পরিণত হইল। বিনোদের দুই বৎসর চেষ্টায় গৌরীর মন টলিল, সে বিনোদের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী হইল। পরে নায়কের দারিদ্র্য, রোগ-যন্ত্রণা ও অকালমৃত্যুর কথা আছে (ইহা 'আত্মাপরাধ-বৃক্ষে'র ফল কি না জানিনা), কিন্তু এই গর্হিত কার্য্যের জন্য ব্যভিচারিণীর অনুতাপ বা শাস্তির কোন উল্লেখ নাই। অথচ সধবার ব্যভিচার বিধবার ব্যভিচার অপেক্ষাও অমার্জ্জনীয়।

আর এক কথা। বিনোদের মৃত্যুর পর গৌরী বিনোদের সনামা মিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিল ও তাহাকে পিতৃসম্বোধন করিল। বন্ধু কিন্তু ভগিনীর উদ্ধে উঠিতে পারিল না। এই ত রোগের মূল। তবে এ রোগ নূতন নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হইতেই ইহার প্রাদুর্ভাব দেখি। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বারুণী পুষ্করিণীর ঘাটে কাঁদিতে দেখিয়া করুণা-পরবশ হইয়া বলিয়াছিল—'এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি—তবে কেন করিব না।' কিন্তু যখন 'জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ' আরম্ভ হইল, তখন ব্যাপার অনেক দূর গেল।

যাক্, এই পর্য্যন্ত গেল অচল অবস্থায় প্রেমে পড়ার কাহিনী। এক্ষণে সচল অবস্থার কথা বলিব।

(৩) অশ্বপৃষ্ঠে

'অশ্বপৃষ্ঠে জগৎসিংহ'—বড় বড় অক্ষরে থিয়েটারের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি বটে, কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তবে জগৎসিংহ প্রেমে পড়িবার অবসর পাইয়াছিলেন। মাণিকলাল অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াই নির্ম্মলকুমারীকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু কোর্ট-শিপ্‌টা করিল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া। জানিনা, রাজপুত-যুবক অপেক্ষা বাঙ্গালী যুবকের অশ্ববিদ্যায় পারদর্শিতা অধিক কিনা এবং স্ত্রীভাগ্য সুপ্রসন্ন কিনা, তবে দেখিতে পাই যে শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবীর 'পুষ্পহারে' 'শিক্ষা' গল্পে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট উদ্ধত বাঙ্গালী যুবক সত্যেন্দ্রনাথ অশ্বপৃষ্ঠে সফরে বাহির হইয়া হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ অযোধ্যানাথের যুবতী কুমারী কন্যা লছমীকে দেখিলেন, (বিদ্যাপতির লছিমা নহে), এবং যথারীতি উভয়ের প্রেম হইল। শেষে হাকিম বাবু স্বপ্নে 'শিক্ষা' লাভ করিয়া তাহার পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন। ইহার পরেও বাঙ্গালীর সমাজ সংস্কারে স্বপ্নের প্রভাব কে অস্বীকার করিবে?

(৪) মৃগয়া

দুষ্মন্ত মৃগয়ায় গিয়া আশ্রম-মৃগ বধ করিলেন না বটে, কিন্তু হরিণীর ন্যায় নিরীহ-প্রকৃতি আশ্রম-পালিতা শকুন্তলাকে নয়নবাণবিদ্ধা করিলেন, নিজেও হরিণ-নয়নার নয়ন শরাঘাতে চঞ্চল হইলেন; স্কটের 'সরঃসুন্দরী'তে ('দি লেডি অভ্ দি লেকে') স্কটল্যাণ্ডের রাজা ছদ্মবেশে মৃগয়ায় গিয়া হাইল্যাণ্ড-

কুমারীর দর্শনে প্রেমবিহ্বল হইলেন। বাঙ্গালী মৃগয়াপটু নহে, কিন্তু শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে ইয়ং বেঙ্গল অমর বন্ধু দেবেন্দ্রের বাসগ্রামে বেড়াইতে গিয়া বন্দুক ঘাড়ে বন্ধুর সহিত শীকার করিয়া ফিরিবার পথে বালিকা চারুকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল। পরে আবার চারুর পীড়ায় উভয় বন্ধুতে চিকিৎসা করিল। এই আশ্চর্য্যফলপ্রদ সদৃশ-চিকিৎসার প্রভাবে অমর প্রণয়ের পথে আর এক পৈঠা অগ্রসর হইল। যাহা হউক, লেখিকা রীতিমত রোম্যান্স রচনা করেন নাই, তাই একেবারে সর্ব্বগ্রাসী প্রেমের আবির্ভাব হইল না। শনৈঃ পন্থাঃ।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ধনপতি সদাগর পায়রা উড়াইয়া দিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন, পায়রার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রাণপাখীও বালিকা খুল্লনার কাছে ধরা দিল। 'পারাবত লৈলে মোর প্রাণ কৈলে চুরি।' প্রভাত বাবুর জমিদার পুত্র নবগোপালের পাখী হারাইয়া খুঁজিতে গিয়া রমাসুন্দরীর হাতে ঠিক সেই দশা হইল। নায়ক রমাসুন্দরীর হাতে পাখীটিকে বন্দী দেখিলেন, আর নিজের প্রাণপাখীও রমাসুন্দরীর হাতে ধরা পড়িল। বীরবালা বন্দুক চালাইয়া যুবকের হৃদয় বিদ্ধ করিল! যুবক 'হন্নে' হইয়া রাউলপিণ্ডি, অমৃতসর, কাশ্মীর পর্য্যন্ত ছুটিলেন,—অবশ্য 'সস্ত্রীক শকটারোহণে!'

(৫) রেলপথ

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'উল্কা'য় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনূঢ়া নবযৌবনা শিষ্যকন্যা স্বর্ণলতা ওরফে লক্ষ্মীকে লইয়া ট্রেনে উঠিতে পারিতেছেন না; দুইটি কলেজের যুবক শৈলেন ও মনু (মন্মথ) পরম উৎসাহে ভিড়ের মধ্যে নিজেদের কামরায় তাহাদিগকে উঠাইয়া লইলেন,—অবশ্য পরোপকার-স্পৃহায়। পরে জানা যায়, মনুর পরম গোঁড়া 'মনু' অবিবাহিত, কঠোর-সংযমী, নিত্য গীতাপাঠরত; কিন্তু আবার যখন ঘটনাচক্রে তিনি সেই অনূঢ়া সুন্দরীর সামীপ্যলাভ করিলেন, তখন তাঁহার পেটে ক্ষুধা মুখে লজ্জা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে তিনি নিজের মন্মথ নাম সার্থক করিতে রাজী,

যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি
ক্ব জপঃ ক্ব তপঃ ক্ব সমাধিবিধিঃ।

বন্ধু শৈলেন ভালবাসা নানারকমের বলিয়া সাফাই দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারও ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয়, তড়িতার সহিত বিবাহিত না হইলে তিনিও বড় গররাজী ছিলেন না। যাহা হউক, তড়িতার শোচনীয় মৃত্যুর পর, ৺কাশী-ধামে সেবাব্রত-চিরকুমারী বিধবাবেশধারিণী লক্ষ্মীকে দেখিয়া চক্ষুঃ জুড়ায়।

রবিবাবুর 'অপরিচিতা' গল্পে পাশকরা নবকার্ত্তিক অনুপম একদিন ট্রেনে উঠিতে ভিড়ে কোথাও স্থান না পাইয়া 'এই গাড়ীতে জায়গা আছে' বামাকণ্ঠে এই কয়টি কথা শুনিয়াই অনুপম প্রেমরসে মসগুল, অপরিচিতাকে নিজের পূর্ব্বের স্থিরীকৃতা পাত্রী সুপরিচিতা করুণা বলিয়া চিনিয়া, শুধু গাড়ীতে কেন, হৃদয়েও স্থান পাইবার জন্য আকুল, কিন্তু সেই 'সোণার তরী' সুপ্রশস্ত হইলেও সেথা তাঁহার 'স্থান নাই, স্থান নাই!'

একটু আশ্বাসের কথা, একটি স্থলে রেলপথে প্রেমিকের ভুলভাঙ্গা ঘটিয়াছে। শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর 'রাঙ্গা-শাঁখা'য় 'ভুলভাঙ্গা' গল্পে মাসিক পত্রের সম্পাদক নব্যযুবক অজিত অপরিচিতা কবিতালেখিকা কনকপ্রভার নাম শুনিয়া ও কবিতা পড়িয়া সুন্দরী ও কুমারী-ভ্রমে ('তারে দেখি নাই, শুধু বাঁশী শুনেছি') তাহার প্রেমে পড়িয়াছিলেন। শেষে একদিন রেলপথে শিশুমুখে ('শুকমুখে' নহে) পরিচয় পাইলেন, শিশুর 'কুদর্শনা কালিন্দী' কর্কশকণ্ঠা 'স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া' মহিষমর্দ্দিনী পিতামহী কবিতালেখিকা কনকপ্রভা! শুনিয়া সম্পাদক-প্রবরের চক্ষুঃ স্থির হইল, ভুল ভাঙ্গিল!

এ পর্য্যন্ত স্থলপথের কথা বলিলাম, এইবার জলপথের কথা বলিব।

(৬) গঙ্গাস্নান

গঙ্গাস্নানে যোগের মেলায় ভিখারীর ভিড়ে নায়ক কান্তিচন্দ্র যুবতী দোপাটীকে এক প্রকার কুড়াইয়াই পাইলেন, পরে যথাসময়ে উভয়ের নগেন্দ্রদত্ত-কুন্দর দশা হইল। আর এক ক্ষেত্রে নায়ক রসময় যুবতী নায়িকা মালতীকে দেখিলেন (পূর্ব্বে অবশ্য পরিচয় ছিল না) আর অমনি উভয়েই আত্মহারা হইয়া একেবারে গাঁটছড়া বাঁধিয়া ডুব দিলেন এবং প্রেম-সাগরে তলাইয়া গেলেন, (শেষে ৺কাশীতে

দশহরার গঙ্গাস্নানে ইহার উপসংহার!) এইরূপ দুইটি গল্প— পাঁচকড়ি বাবুর 'রূপলহরী'তে পড়িয়াছি। সুখের বিষয়, এই পুস্তকে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য রূপোন্মাদে সমাজের কি সর্ব্বনাশ ঘটে তাহারই চিত্রাবলি-প্রদর্শন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, 'বাল্য-প্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।' এই নজীরে শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর 'গুচ্ছে' 'পথহারা' গল্পে মণিলাল ও সুরমার বাল্যাবধি সাহচর্য্যে প্রণয় হইল কিন্তু পরিণয় হইল না; সুরমার অন্যত্র বিবাহ হইল; সে যথাসময়ে বিধবা হইল। মণিলাল অবিবাহিত রহিল ও অধঃপাতে গেল। একদিন বিধবা সুরমা মণিলালকে অসৎসঙ্গে গঙ্গাস্নানে আসিতে দেখিয়া তাহাকে সৎপথে আনিবার জন্য নিজ গৃহে লইয়া গেল। কিন্তু মণিলাল তখনও তাহাকে ভুলিতে পারে নাই বুঝিয়া কলঙ্ক প্রলোভন প্রভৃতি এড়াইবার জন্য সুরমা আত্মহত্যা করিল।

(৭) নৌকাপথ

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'অদৃষ্ট চক্রে' যতীশ, অমূল্যচরণ প্রভৃতি ইয়ারবর্গ নৌকাবিহারে বাহির হইয়া ঘাটে দুইটি নারীকে দেখিলেন, একটি যুবতী, অপরটি বালিকা। যুবতীটিকে যে তাঁহারা ভাল চোখে দেখিলেন তাহা নহে, তবে বালিকাটির প্রতি যতীশের পক্ষপাত দেখিয়া একজন বন্ধু ঘটকালীর ভার লইলেন। যথাসময়ে বিয়ের ফুল ফুটিল। যাহা হউক, এক্ষেত্রে যুবকদিগের চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে গ্রন্থেই সুতীব্র মন্তব্য আছে, আমাদের তাহার উপর আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

ঠিক নৌকায় বসিয়া না হউক, নৌকা হইতে নামিয়া নবকুমার ও নগেন্দ্র-দত্তের কেমন বরস্ত্রীলাভ ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা জানি। রবিবাবুর 'সমাপ্তি' গল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশকরা যুবক অপূর্ব্বকৃষ্ণ স্বগ্রামে পৌছিয়া নৌকা হইতে নামিতে গিয়া পিছল পথে পড়িয়া গেল, প্রতিবেশীর কন্যা মৃন্ময়ী অমনি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, আর অপূর্ব্বকৃষ্ণও অপ্রস্তত হইয়া প্রেমের পিছল পথে পা দিল। যাহা হউক, গল্পটির সমাপ্তি বড় মধুর।

(৮) ষ্টীমার-যাত্রা

কলিতে হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা নিষেধ, সেইজন্যই বোধ হয় ষ্টীমার-যাত্রার বেশী উদাহরণ আমাদের আধুনিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে যাহা একটি পাইয়াছি, তাহা একাই এক লক্ষ। (শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' সাহস করিয়া সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিয়াছেন, দেখা যাউক তাঁহার ভাগ্যে 'টগর' ছাড়া আর কোন্ ফুল ফোটে; 'অভয়া' অভয় দিতেছেন, তবু ভরসা হয় না)। শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবীর 'গুচ্ছে' 'ভবিতব্য' গল্পে ষ্টীমার-ঘাটে যুবক (জাতি বাঁচাইবার জন্য বোধ হয় তিনি যাত্রী নহেন) জলমগ্না বালিকাকে উদ্ধার করিল; যুবক পীড়িত হইল, তখনই যদিও আয়েষা-জগৎসিংহ-ব্যাপারের পুনরভিনয় হইল না, কিন্তু পরে বালিকার যেভাবে 'মস্তিষ্কের জ্বর' (brain-fever) হইল এবং যুবকের পুনরাগমনের দিন হইতেই উপশমের লক্ষণ দেখা দিল, তাহাতে বালিকার হৃদয়ে প্রেমের প্রভাব সুস্পষ্ট। যাহা হউক, বালিকার পিতা কন্যার আরোগ্যের পর দুই হাত এক করিয়া দিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বালিকা মৃণালিনী, যুবক চন্দ্রশেখর; নাম ও ঘটনায় বুঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ও 'চন্দ্রশেখরে'র অপূর্ব্ব সমন্বয়!

উপসংহার

বোধ হয় এই পূজার বাজারে পাঠক-সমীপে পেশ-করা এই প্রেমের পশরার চাপে পাঠক-সমাজের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব এইখানেই নিবৃত্ত হওয়া সুবুদ্ধির কার্য্য।

'কতেক কহিব আর নারিনু রচিতে।
পুঁথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে॥'

তবে আমার শেষ কথাটা বলিয়া লই।

এই রাশি রাশি প্রেমের পশরায় দেখিতেছি, অন্তঃপুরে, রোগশয্যায়, হাঁসপাতালে, গৃহের ছাদে, স্নানঘাটে, রেলে, ষ্টীমারে, গঙ্গাস্নানের যোগে, কোথাও গৃহস্থকন্যা প্রেমিকের শ্যেনদৃষ্টি হইতে নিরাপদ্ নহে। ডাক্তার, মাষ্টার, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী বা পড়ুয়া ছাত্র, প্রেমের ব্যাসিলি হইতে কাহারও নিস্তার নাই। গুরুঠাকুর, পূজারী ব্রাহ্মণ হইতে মোটর-চালক ও সহিস পর্য্যন্ত এই রোগে জর্জ্জরিত, তাহারও প্রমাণ মাসিক-পত্রের ছোট-গল্পে ও ক্রমশঃ-প্রকাশ্য গল্পে পাইয়াছি। সুন্দরী মক্কেলের সমাবেশ-সত্ত্বেও উকিল-ব্যারিষ্টারদের আজও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় নাই। তবে

আইন-ব্যবসায়ী গল্প-লেখকের যখন অভাব নাই, 'তখন 'অপরং কিং ভবিষ্যতি' কে জানে? সেদিন যখন সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, দৌলতপুর কলেজের ছাত্রগণ নমঃশূদ্র-জাতীয়া যুবতীকে বন্যা হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, তখন বড় ভয় হইয়াছিল বুঝি কোন নভেলি ব্যাপার ঘটে। সুখের বিষয়, সেই খোলা ময়দানে, সেই পূত শান্ত তপোবনে আজও নভেলের বিষাক্ত বাতাস যায় নাই।

জানি ভবভূতি বলিয়া গিয়াছেন, 'ভ্রমতি ভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা, বিকারি চ যৌবনম্।' বাঙ্গালী কবি আরও খোলসা করিয়া বলিয়াছেন, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।' অজ্ঞাতনামা ইংরেজ কবিও গাহিয়াছেন,

> Over the mountains
> And over the waves,
> Under the fountains
> And under the graves;
> Under floods that are deepest
> Which Neptune obey;
> Over rocks that are steepest
> Love will find out the way.

কিন্তু তথাপি বলিব, যে সমাজে ইউরোপীয় সমাজের ন্যায় অথবা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ন্যায় গান্ধর্ব্ববিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, যৌবনবিবাহ, বর-নির্ব্বাচনে কন্যার স্বাধীনতা প্রভৃতি নাই, সে সমাজে এমন করিয়া সাহিত্যের মারফত প্রেমের ব্যাসিলি ছড়ান কি মঙ্গলজনক?

আজকাল rock-oilএর তীব্র আলোকে আমাদের বংশধরদিগের চোখ খারাপ হয় বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি। কিন্তু এই ভুঁইফোড় প্রেমের তীব্র জ্যোতিতে চক্ষুঃ ঝলসাইয়া, তাহাদিগের যে চোখের দোষ জন্মিতেছে, তাহার উপায় কি?

চক্ষুরোগ হইলে বাঙ্গালী খ্যাতনামা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাগ্‌চি মহাশয়ের শরণ লয়। শুনিয়াছি, তিনি শুধু সুচিকিৎসক নহেন, পরন্তু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। এ রোগের চিকিৎসার ভার তিনি লইবেন কি? গল্প আছে, খাদ্য-লোভী উদরাময়-গ্রস্ত রোগীর পেট ঠাণ্ডা না করিয়া ডাক্তার চোখে ঔষধ লাগাইবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, কেননা বেচারার সুখাদ্য-দর্শনে লোভ-সংবরণের অসমর্থতাই অনর্থের মূল। এ ক্ষেত্রেও সেই হিসাবে হৃদয় মনের পরিবর্ত্তে চক্ষু-চিকিৎসাই আবশ্যক নহে কি? না বিল্বমঙ্গলের মত আসুরিক চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে?*

* আশা করি, নভেল-নাটকের লেখক-লেখিকাগণ তথা পাঠক-পাঠিকাগণ এই প্রবন্ধ পাঠে কাব্যবিভীষিকাগ্রস্ত হইবেন না, উনপঞ্চাশদ্-বর্ষীয় উনপঞ্চাশদ্গ্রস্ত প্রবন্ধকারের উন্মত্ত-প্রলাপ কৃপা ও ক্ষমার চক্ষে দেখিবেন।

আমার যুদ্ধ-যাত্রা

[লেপ্টেনাণ্ট শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আই-এম-এস]

আমি ডাক্তার। বৈশাখ মাসে যেদিন আমার মালদহে বদলির খবর এল, সে দিন আত্মীয়-বন্ধুদের আর আনন্দ ধরে না; কারণ আর কিছুই নয়—আমের সময় আমের দেশে যাচ্ছি, তাঁ'রা কিছু প্রত্যাশা করেন। যথাকালে মালদহে গিয়া ডেরা-ডাণ্ডা পাতিলাম। শুন্‌লাম, এবার আমের ফসল খুবই ভাল; রপ্তানীর বাজার মন্দ,—ক্রেতার অভাব; সুতরাং টাকায় শ' গোপাল-ভোগ বিক্রি হ'তে পারে। আমের বাগান খুবই সস্তায় বিক্রি হ'চ্ছিল, ভাগে একখানা বাগানও কেনা গেল। ইচ্ছা—সকলকে সাধ মিটাইয়া আম খাওয়াব। দেখ্‌তে-দেখ্‌তে বোশেখ মাস চ'লে গেল। জ্যেষ্ঠ মাসের কাট-ফাটা রোদে আম পেকে উঠলো, কাঁটাল ফাটলো। আমিও দিবা-নিদ্রাবসানের পর সুপক্ব, রসাল ফলের রসাস্বাদন ক'রতে সবেমাত্র আরম্ভ ক'রেছি,—এমন সময় একদিন হঠাৎ উপরওয়ালার কাছ থেকে জরুরি 'তার' এল, "তোমায় যুদ্ধে যেতে হবে।" উপরওয়ালার ইচ্ছা অমান্য করা যায় না; আমারও 'কমিশন'রূপ দিল্লীর লাড্ডু খেয়ে দেখ্‌বার যে ইচ্ছে হ'ল না এমন নয়; সুতরাং যাইতে সম্মতি জ্ঞাপন

করিলুম; এবং "সই লো, সাজো সময়ে" ব'লে ঘর-সংসার উঠিয়ে দিলাম। আমের বাগান পড়ে রইল। আত্মীয়-বন্ধুদের জন্য কিছু আম সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের মাল-মসলা সংগ্রহের জন্য ক'লকাতায় এলাম। ক'লকাতায় এসে শুনলাম, ভবানীপুর পাগলা-গারদের ডাক্তার শ্রীমান মিথিলেশ ঘোষের উপরও যুদ্ধে যাবার জন্য পরোয়ানা এসেছে, এবং তাঁকে সম্প্রতি "আমেদনগর" যেতে হবে। আমায় "পুণা" গিয়ে রিপোর্ট করতে হ'বে; সুতরাং দু'জনে একত্র যাবার বন্দোবস্ত ক'রবার জন্য মিথিলেশ ভায়ার পাগলা-গারদে যাওয়া গেল। অনেক কষ্টে তাঁর নাগাল পেয়ে সব ঠিকঠাক করা গেল;—দুজনে একত্র যুদ্ধ-সাজ সংগ্রহ ক'রতে লাগ্‌লাম। ৯ই জুন শুক্রবার, সন্ধ্যায় বম্বে মেলে আমাদের যাবার কথা। বৈকাল ৫টার সময় ঘোষজা লিখে পাঠালেন যে, কোন কারণ বশতঃ তিনি সেদিন যেতে পারবেন না, পরদিন যাবেন; এবং আমাকেও যাত্রা স্থগিত রাখতে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। ঘোষজার হঠাৎ এই মত-পরিবর্ত্তনের কারণটা তখন বুঝতে পারি নি। পরে শুনেছিলাম যে, ৯ই দিনটা বড় ভাল ছিল না; সে জন্য তাঁহার গৃহিণী আস্‌তে দেন নি। হাজার হ'ক বাঙ্গালীর মেয়ে ত বটে। আমার সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে; অনেক বন্ধু-বান্ধব ষ্টেশনে দেখা করতে আস্‌বেন বোলেছেন; কাজেই যাত্রা স্থগিত রাখতে পারলাম না—যথাসময়ে পরিবারবর্গ, আত্মীয়-বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে দুর্গা বলিয়া পুণায় রওনা হ'লাম। ১১ই জুন তারিখে সন্ধ্যা-বেলা পুণায় পৌঁছিলাম। পরদিন সকালে A. D. M. S. এর (Asaistant Director of Medical Service) নিকট যথানিয়ম রিপোর্ট ক'রতে গেলাম। দেখলাম, ইনি আমার পরিচিত—মেডিকেল কলেজে আমাদের রসায়ন পড়াইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর ব'ল্লেন, "তোমায় এখানকার সামরিক হাঁসপাতালে কাজ ক'রতে হবে; অতএব সেখানকার বড় কর্ত্তার কাছে report কর।" সঙ্গে-সঙ্গে পরোয়ানা দিলেন। আমিও যথাকালে সামরিক হাঁসপাতালের S. M. O.র নিকট হাজির হ'লাম। দু'চারিটি কথার পর তিনি আমায় বল্লেন, "উপস্থিত কোন কাজ নাই; কাল এস, তখন তোমার কাজের বন্দোবস্ত হবে।" পরদিন ১৩ই জুন তারিখে Lord Kitchenerএর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গির্জ্জায় মহা সমারোহে প্রার্থনা হবে—সমস্ত অফিসারদের সেখানে উপস্থিত থাক্‌বার হুকুম হয়েছে। আমিও হাঁসপাতালের অন্যান্য ডাক্তারদের সঙ্গে গির্জ্জায় যাব বলে সকাল-সকাল হাঁসপাতালে এলাম। পৌঁছিবামাত্র একজন ইউরেসিয়ান কেরাণী আসিয়া বলিল, "আপনার বসরায় যাবার হুকুম এসেছে।" খবরটা শুনে বসে পড়লাম—একেবারে 'ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বে।' বাড়ী থেকে বেরুতে-না-বেরুতে একেবারে সমর-ক্ষেত্রে চালান! বিশেষতঃ, তখন 'বস্‌রার' নামে বড়-বড় যোদ্ধাদেরই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হ'ত—অন্যে পরে কা কথা। অন্ততঃ মাসখানেক ভারতবর্ষে থাক্‌তে পাব—এরূপ আশা করেছিলাম। যাক, ভাবলাম, যখন টোপ গিলেছি, তখন আর উপায় নাই। কিছুক্ষণ পরে S. M. O. এলেন; আমায় দেখে বোলে উঠলেন, "Oh! you are a damned lucky fellow. You have been ordered to proceed to Busrah immediately. Your order came soon after you left the hospital yesterday." (তোমার খুবই বরাত জোর; তোমায় এক্ষুণি বসরা যেতে হবে। কাল তুমি হাঁসপাতাল থেকে যেতে-না-যেতে তোমার হুকুম আসে।) বরাত-জোর যে কোথায়, তা ত বুঝতে পার্‌লাম না। শুনলাম, আমাদের হাঁসপাতালের একজন মেজর ও একজন লেফ্‌টেনাণ্টেরও বসরা যাবার হুকুম এসেছে। কিছুক্ষণ পরে তাঁরাও এসে হাজির হ'লেন। মেজরের মুখটা কিছু ম্লান দেখ্‌লাম। যথা-সময়ে আমরা লিখিত অর্ডার নিয়ে, অগ্রিম মাহিনা ইত্যাদি নেবার জন্য Divisional Disbursing Officeএ গেলাম। সেখানকার কাজ সারতে এবং টাকা-কড়ির বন্দোবস্ত করতে ৫টা বেজে গেল। তখন হোটেলে ফিরে এলাম। ১৫ই জুন, বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার সময় আমরা তিনজন Poona Expressএ বোম্বাই যাত্রা করলাম। গাড়ীতে নানা রকম জটলা আরম্ভ হ'ল। Mesopotamia কেমন দেশ—কোথায় বা আমাদের থাকতে হবে—Field Serviceএর জন্য কি-কি আবশ্যক জিনিস না নিলে নয়—ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় সময় কেটে গেল; সন্ধ্যা-বেলা আমরা বোম্বাই পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গী দু'জনের কাছে বিদায় নিয়ে আমি আমার হোটেলে গেলাম। পথ-

শ্রমে এবং নানারূপ ভাবনায় শরীরে কেমন একটা অবসাদ এসেছিল; তাই তাড়াতাড়ি আহার করে শুয়ে পড়্লাম—কিন্তু ঘুম আর আসে না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর অনেক রাত্রে নিদ্রাদেবী কৃপা কর্‌লেন। Alexandra Dockএ Embarkation Medical Officerএর নিকট report কর্‌বার জন্য আমাদের উপর আদেশ ছিল। পরদিন সকালে প্রাতরাশ সেরে E. M. Oর কাছে গেলাম। তিনি বল্লেন, "তোমার জাহাজ এখনও ঠিক হয়নি; কাল এসে খবর নিও।" আমিও যথারীতি সেলাম ঠুকে, অফিসারদের গমন-আগমনরূপ চিত্রগুপ্তের খাতায় নাম-সই করে বাজার কর্‌তে বেরুলাম। এজেন্ট ও বীমা-আফিসের সমস্ত কাজ চুকিয়ে, আসবাবপত্র কিন্‌তে একটি দোকানে ঢুকতে যাব, এমন সময় পাশের এক দোকানে uniform-পরা "বাঙ্গালীমুখো" একজন Officer দেখতে পেলাম। সঙ্গী লাভের আশায় সেই দোকানে গেলাম; এবং যথারীতি করমর্দ্দন, হাড়্‌চুড় করার পর পরিচয়ে জান্‌লাম যে, ইঁহার নাম সুকুমার নাগ—ইনিও বসরা-যাত্রী এবং মিরাট হ'তে এসেছেন। নূতন সঙ্গী পেয়ে, বিশেষতঃ স্বদেশী লোক পেয়ে, ভারী আনন্দ হ'ল দমা মনটায় বেশ স্ফূর্ত্তি এল; তখন দু'জনে একত্র বাজার কর্‌তে লাগ্‌লাম। বোম্বাই সহর তখন মস্‌গুল্ - সেপাই-সৈন্যে ও অফিসারে রাস্তা গিস্‌গিস্ কর্‌চে। সমস্ত দোকানেই খুবই ভীড়; কারণ, প্রতিদিন পালে-পালে নূতন নূতন অফিসার বসরা যাচ্ছেন। তাঁরা সবাই বাজার কর্‌তে বেরিয়েছেন। দোকানীদের মরশুম পড়েছে—তারা প্রত্যেক জিনিসের ন্যায্য দামের উপর ৩।৪গুণ দাম চাপিয়ে দিয়েছে। উপায়ান্তর নাই;—তারা বেশ্ জানে, এসব জিনিষ অফিসারদের নিতেই হবে। কাজেই তারা যা' তা' দাম হেঁকে গাঁট হ'য়ে বসে আছে। সুতরাং বাজার ক'রতে বেশই নাস্তানাবুদ হ'তে হ'ল;—বেশ বুঝতে পারলাম যে, গালে চড় মেরে ঠকিয়ে পয়সা নিচ্চে। ভাবলাম, হায়! আগে যদি জানতাম যে এত শীঘ্র বসরায় চালান দেবে, তা হ'লে ক'লকাতা থেকে সব জিনিসই আন্‌তে পারতাম—সেখানে ত দোকানীরা এমন দিনে-ডাকাতি করে না! অনুশোচনা বৃথা ভেবে, সুবোধ শিশুর মত, জিনিসের যে দাম চাইতে লাগল তাই দিয়ে, আবশ্যক মালপত্র কিনে হোটেলে ফির্‌লাম। সুকুমার অন্য এক হোটেলে ছিলেন,—তিনিও সন্ধ্যাবেলা মালপত্র নিয়ে আমার হোটেলে এলেন। শনিবারে সকালে দু'জনে আবার E. M. Oর আফিসে গেলাম। বড়কর্ত্তা বোল্লেন যে, সোমবার, ১৯শে জুন, Hired Transport Mathuraতে তোমরা দু'জনে বসরা যাবে; এবং সঙ্গে-সঙ্গে ছাড়পত্র দিলেন। সোমবার সকালে আমরা জিনিস-পত্তর নিয়ে যথাসময়ে ডকে এলাম, এবং জন্মভূমির নিকট বিদায় নিয়ে ভগবানের নাম করতে-করতে "মথুরা"য় চ'ড়লাম। একজন অফিসার এসে আমাদের কেবিন নির্দ্দিষ্ট করে দিলেন। আমাদের সহযাত্রী আরও তিনজন ডাক্তার এবং ৬।৭ জন যোদ্ধা অফিসার (Combatant Officer) ছিলেন। সুকুমারের ও আমার এক কেবিনে স্থান হ'ল না। সুকুমারের সঙ্গে একজন Anglo-Indian I. M. S. ডাক্তারের এবং আমার সঙ্গে এক পক্ককেশ Goanese I. M. S. ডাক্তারের কেবিনের বখরা হ'ল। এইখানে এই Goanese ডাক্তার সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলিয়া লই। যথারীতি আলাপ হবার পর জানলাম যে, পঠদ্দশায় এঁর I. M. S. হবার খুবই ইচ্ছা ছিল; সেজন্য বিলাত যান; কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। এই যুদ্ধ-বিগ্রহে যখন "সরকার" ডাক্তারদের Temporary Commission দিতে আরম্ভ করেন, তখন ইনি তাঁর বহু দিনের আশা মিটাইবার জন্য প্রাক্‌টিশ ছাড়িয়া দিয়া কমিশন্ নেন। ৫।৬ মাস Mesopotamiaয় ছিলেন,—শরীর অসুস্থ হওয়ায় ছুটি নিয়ে দেশে যান। বৃদ্ধ বসরার ফেরৎ,—অনেক খবর জানতে পারব ভেবে ভাল রকম আলাপ কর্‌লাম। কিন্তু দু'-একদিনের পর বৃদ্ধ যখন জানতে পারলে আমরা বাঙ্গালী—তখন থেকে আমাদের সঙ্গে বড় একটা মিশত না; বরং মাঝে-মাঝে বাঙ্গালীদের নিয়ে অল্প-বিস্তর ঠাট্টা বিদ্রূপ ক'র্‌ত। ঝগড়া করাটা নেহাৎ খারাপ দেখায় বলিয়া আমরা কোন প্রতিবাদ করি নাই, এবং বৃদ্ধের সঙ্গে আর বড়-একটা কথাও কইতাম না। বৃদ্ধের এই বাঙ্গালী-বিদ্বেষের কারণ তখন বুঝি নাই; বসরা পৌছিবার কয়েক মাস পরে জানিতে পারি যে, বৃদ্ধ বড়ই ঝগড়াটে এবং চাল্‌দার। আমারায় Bengel Ambulance Corpsএর ডাক্তারদের উপর কি চাল দিতে যান; কিন্তু "ফন্দী" ভায়ার মিষ্টি-মিষ্টি বুক্‌নীতে

বেশ অপদস্থ হ'ন। এ ছাড়া, আরও দু'-একজন বাঙ্গালী অফিসারের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া অনর্থক ঝগড়া করেন ও সেখানেই উত্তম-মধ্যম পান। তাঁর বাঙ্গালী-বিদ্বেষের মূল কারণ এই। অস্থায়ী কমিশনীতে যে কত প্রকার অদ্ভুত জীব এসেছে, তা' বলা যায় না। আমাদের জাহাজে ৭০০।৮০০ সাঁওতাল কুলী যাবে;—বেলা ৯৷৷০টার সময় তাদের special train জাহাজের পাশে এসে দাঁড়াল। তাদের ও তাদের মাল-পত্তর তুল্‌তে অনেক দেরী হয়ে গেল। সমুদ্রে তখন ভাঁটা পড়ে এসেছে; কাজেই আমাদের আর সেদিন যাওয়া হ'ল না। কাপ্তেন বল্লেন, কাল খুব সকালে জাহাজ ছাড়বে। আমরাও আর এক চক্কর সহর বেড়াতে গেলাম।

পরদিন সকালে জাহাজ ছাড়ল দেখ্‌তে দেখ্‌তে বোম্বাই সহর চোখের অন্তরালে গেল; এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আমরা গভীর সমুদ্রে এসে পড়লাম। তখন পূরাদস্তর monsoonএর সময়। আমাদের জাহাজখানিও খুবই ছোট; এবং মালপত্তর ভাল রকম সাজান না থাকাতে, খুবই মাথা-ভারি (top heavy) ছিল; কাজেই অসম্ভবরূপ হেল্‌তে-দুল্‌তে আরম্ভ করলে। যদিও আমি অনেকবার সমুদ্রযাত্রা ক'রেছি, তবুও আমি ভারি (bad sailor) আনাড়ী নাবিক;—সহজেই সমুদ্র-পীড়ায় কাতর হ'য়ে পড়ি। জাহাজের হেলা-দোলার সঙ্গে-সঙ্গে আমারও মাথা-গা হেল্‌তে-দুল্‌তে আরম্ভ হ'ল এবং শীঘ্রই শয্যাশায়ী হ'লাম। সমুদ্র-পীড়া যে কি ভীষণ ব্যাধি, তা' ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন; কিন্তু ইহাতে যদি কেবল নিজেকেই ভুগ্‌তে হয়, তা'হ'লে ইহা আরও ভীষণতর হ'য়ে ওঠে। যদিও এই ব্যাধি দমনের কোন উপায় নাই, তথাপি এটা হওয়া একটু লজ্জার কথা। যখন শুন্‌লাম যে, আমার সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই, এমন কি, একজন জাহাজের কর্ম্মচারীর পর্য্যন্ত আমারই মতন অবস্থা, তখন সেই ভীষণ কষ্টের মধ্যেও অনেকটা আরাম পেলাম। পাঁচ দিন এইরূপ কষ্টভোগ ক'রে ২৫শে জুন সকালে আমাদের জাহাজ পারস্য উপসাগরে পড়ল। এখানে সমুদ্র স্থির, ধীর ও নীরব। জল স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায়; তরঙ্গের চিহ্নমাত্র নাই। জাহাজের হেলা-দোলা বন্ধ হ'ল, আমরাও যে যার শয্যা হ'তে উঠলাম,—বোধ হ'ল, যেন নূতন জীবন পেলাম। দু'দিন পরে, ২৭শে জুন সন্ধ্যাবেলা "সাট-আল্-আরব" নদীর খাঁড়ীর মুখে এসে আমাদের জাহাজ নঙ্গর করল। শুন্‌লাম, পরদিন সকালে পাইলট (pilot) লইয়া জোয়ারের সময় জাহাজ নদীতে ঢুকবে। সন্ধ্যাবেলা মাঝে-মাঝে আগুনের হল্কার মত যে বাতাস আস্‌তে আরম্ভ হ'ল, তাতেই বসরার গরম যে কি রকম, তা বেশই মালুম করতে পার্‌লাম। যাক্, সমুদ্রপীড়ার চেয়ে এ আগুনে বাতাস ভাল। পরদিন ভোরেই জাহাজ নদীর ভিতর গেল এবং বেলা প্রায় ১টার সময় বস্‌রার বন্দরে উপস্থিত হয়ে নঙ্গর করল। সারাক্ষণ আমি জাহাজের উপর হ'তে প্রাকৃতিক শোভা দেখ্‌তে-দেখ্‌তে এলাম। সমস্ত পথ নদীটা সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে গেছে। মাঝে-মাঝে নদী হ'তে বড় বড় খাল বাহির হ'য়ে দুই পার্শ্বস্থিত খেজুর বাগানের ভিতর দিয়া ক্ষেত-খামারে জল সরবরাহ করচে। নদীর দুই পাড়ই ছোট ছোট উইলো (willow) গাছে আচ্ছাদিত; এবং এর পরই ঘন খেজুর বাগান। এই খেজুর বাগানের পরই আবার ধূ ধূ মরুভূমি। জাহাজের ডেকের উপর থেকে বোধ হয় যেন মরুভূমির মাঝে কে একখানি চওড়া সবুজপেড়ে নীল সাড়ী বিছিয়ে রেখেছে। আমরা ২৯শে জুন জাহাজ থেকে নাম্‌লাম। সাঁওতাল কুলিরা তাদের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে তাদের ক্যাম্পে চলে গেল। আমরা ডাক্তার-ক'জন A. D. M. S. আফিসে রিপোর্ট ক'রতে গেলাম। বড়কর্ত্তা তখন আফিসে ছিলেন না,—ছোটকর্ত্তা আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "তোমাদের মধ্যে মুখুর্জ্জে কার নাম? তাঁরই কাজের ঠিক আছে। বাকী তোমরা Re-inforcement Campএ গিয়ে থাক, যথাসময়ে তোমাদের কাজের হুকুম পাবে।" আমি সাম্‌নে গিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়াতে, আমায় বল্লেন, "তুমি এখানকার No. 9 India General Hospitalএ গিয়া Commanding Officerএর নিকট রিপোর্ট কর।" শুন্‌লাম, এই হাঁসপাতালের Officerদের থাকার জন্য বেশ দোতলা বাড়ী আছে। বসরা এসে বালী-গাদায়, খেজুরতলায় তাঁবুর ভেতর থাক্‌তে হবে, তাই ধারণা ছিল; কিন্তু এখন এই দারুণ গরমে দোতালা বাড়ীতে থাক্‌তে পাব জেনে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগলাম। আমার এই অভাবনীয় অবস্থা দেখে আমার অন্যান্য brother-officerদের যে একটু হিংসা হ'ল না, এমন নয়; তাঁরা ব'ল্‌তে লাগলেন,

"Oh, you are a damned lucky fellow." যাক্, তখন সকলের নিকট বিদায় নিয়ে আমার কর্ম্মস্থলে এলাম। সুকুমার আমার সঙ্গে আমার হাঁসপাতাল অবধি গিয়ে তার পর Re-inforcement Camp এ চ'লে গেলেন। মেসে আসিয়া ৩।৪টী ভারতবর্ষীয় যুবক দেখ্‌তে পেলাম। এঁরা Commission নিয়ে এসেছেন; সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত বেশ গুছিয়ে নিয়ে কাজ ক'রতে লাগলাম। এখানে আমার যুদ্ধ-যাত্রার বিবরণ শেষ ক'রে, এদেশ সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলি।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ভীষণ সমরাভিনয়ের এক অঙ্ক আজ এসিয়ার যে অংশে অভিনীত হচ্চে, সেই অংশের নাম মেসোপটেমিয়া। এই যুদ্ধের আগে মেসোপটেমিয়া জিনিসটা যে কি বা কোথায়, তাহা অনেকেই জানতেন না। সে দিন 'ষ্টেটস্‌ম্যান্' কাগজে দেখলাম যে, বাঙ্গালার কোন স্কুলে ভূগোলের পরীক্ষায় একটী প্রশ্ন ছিল যে, মেসোপটেমিয়া কি এবং কোথায়? উত্তরে নানা ছেলে হরেক রকম কথা লেখে। কেহ বলে, মেসোপটেমিয়া একটা মস্ত পাহাড়; কেহ বলে, আমেরিকার নদী; ইত্যাদি। 'ভারতবন্ধু' ষ্টেটস্‌ম্যানের এই সংবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য যে কি, তাহা ত বুঝ্‌লাম না! বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাদানের প্রতি বিদ্রূপ-কটাক্ষ কি? তবে এটা ঠিক্ বল্‌তে পারি যে, অনেক ছেলের বাবারাও আগে "মেসোপটেমিয়া" জিনিসটা কি, তা জানতেন না,—তা কি আমাদের দেশের, কি ষ্টেটস্‌ম্যান-সম্পাদকের দেশের। ব্লকম্যানের স্বনামখ্যাত ভূগোলে ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, Mesopotamia or Iraq-i-Arab; স্বপ্নেও তখন ভাবি নি যে এ দেশে আসতে হবে। মেসোপটেমিয়া শব্দটী ২টী গ্রীক শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এবং ইহার অর্থ দুই নদী-মধ্যস্থ দেশ। এই নদী দুটী বিখ্যাত "ইউফ্রেটিস্" ও "টাইগ্রিস্"; এবং ইহাদের মধ্যস্থিত ভূখণ্ডেরই নাম মেসোপটেমিয়া। সমগ্র মেসোপটেমিয়া আবার উপর ও নিম্ন মেসোপটেমিয়ায় (Upper and Lower Mesopotamia) বিভক্ত। প্রথমোক্তটির বা আল্ জারিরার (Al Jarirah) (দুই নদী-মধ্যস্থ দ্বীপ) সীমানা উপর হইতে বাগদাদের দক্ষিণ পর্য্যন্ত, এবং শেষোক্তটির বা "Iraq-i-Arabi"র সীমানা বাগদাদের দক্ষিণ হইতে পারস্য উপসাগর অবধি।

ইউফ্রেটিস্ নদীর পশ্চিম-তীরের ১০০ মাইল পর্য্যন্ত, এবং পূর্ব্বে পারস্য পর্ব্বত-শ্রেণী—এই দুই সীমানার মধ্যস্থিত জমি কোন স্থলেই সমুদ্রপৃষ্ঠ হ'তে ১০০ ফিট উচ্চ নয়। এই জন্য ভূতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, সমস্ত মেসোপটেমিয়া দেশটা এক সময় পারস্য উপসাগরের গর্ভে নিহিত ছিল; এবং হয় ত বা এক সময়ে এইখান দিয়া ভূমধ্য সাগরের সহিত পারস্য উপসাগরের সংযোগ ছিল। কালে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায়, এবং নদীর পলি-পড়া মাটী ও বায়ু-চালিত আরব দেশের মরুভূমির বালুকারাশির দ্বারা মেসোপটেমিয়ার সৃষ্টি হয়। বসরা হ'তে নসিরিয়া যাবার পথে মধ্যে-মধ্যে অনেক ছোট-ছোট বালিয়াড়ী (শুষ্ক খাদ) দেখ্‌তে পাওয়া যায়; এবং সেখানকার বালির ভিতর অনেক প্রকারের সামুদ্রিক ঝিনুকও পাওয়া যায়। এই সব চিহ্ন হ'তে বেশই বুঝ্‌তে পারা যায় যে, এই দেশটা অনেক আগে জলের নীচে ছিল। এই সব কারণে এখানকার মাটী এত উর্ব্বর যে, বাস্তবিকই এখানে সোণা ফলে। এই দেশই এক সময়ে "এসেরিয়া", "বেবিলন" এবং পারস্য দেশের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে প্রতিপালন ক'রেছিল। এক সময়ে এই দেশটাই পৃথিবীর শস্যের ভাণ্ডার (World's granery) বলে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু অরাজকতা, লোকের আলস্য, জলকষ্ট, জলপ্লাবন প্রভৃতি নানা কারণে এই সোণার দেশ এখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এখনও যেখানে সামান্য সামান্য চাষ হয়, সেখানে অন্য জায়গার তুলনায় প্রায় ২০০ গুণ ফসল ফলে। আশা করা যায় যে, ইংরাজের সুশাসনে এই দেশের পূর্ব্ব-গৌরব আবার ফিরে আস্‌বে; এবং এই মরু প্রদেশ পূর্ব্বের ন্যায় আবার শ্যামল-শস্যসম্পদে হেসে উঠবে, শুষ্ক তরু আবার মুঞ্জরিত হবে। এখানকার অনুর্ব্বরতার প্রধান কারণ—জলকষ্ট বা জলপ্লাবন। যদি মিশর এবং পাঞ্জাব প্রদেশের ন্যায় এখানকার নদীতে স্থান-বিশেষে বাঁধ দিয়া বা খাল কাটিয়া Lock-gate ইত্যাদি নির্ম্মাণ করা হয়, ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে জল-সেচনের ব্যবস্থা হয়, বা জলপ্লাবনের হাত হ'তে রক্ষার বন্দোবস্ত করা যায়, তাহ'লে অচিরেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে। প্রাচীন কলডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারগণ এই সব উপায়েই বেবিলন ক্ষেত্রকে (Babylonian Planes) ধনধান্যে,

যশে-খ্যাতিতে পৃথিবীর সেরা ক'রেছিলেন—সে আজ কত যুগের কথা! কিন্তু সেই বেবিলনের নাম ত আজও লুপ্ত হয় নি! এখনও বেবিলন-ক্ষেত্রে সেই প্রাচীন কলডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারগণের কীর্ত্তি-মাহাত্ম্য যথেষ্ট পরিমাণেই বিদ্যমান আছে। যাক্, তুর্কীরা যে এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন ছিল, এমনও বলা যায় না। তারাও এ দেশটাকে সজীব ক'র্‌তে আরম্ভ করেছিল। তাদের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে বিখ্যাত Irrigation Engineer Sir William Wilwiks অনেক রকম উপায়েই ইউফ্রেটিস্ নদীতীরস্থ অনেক ভূমির উদ্ধার সাধন ক'রেছেন। প্রাচীন বেবিলন সহরের ধ্বংসের সন্নিকটেই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি Hindiah Barrage অতি অল্পদিনই শেষ হ'য়েছে; এবং ইহাতে অনেক সহস্র বিঘা জমির উদ্ধার সাধন হয়েছে। এটা একটা বৃহৎ কার্য্যের (Scheme) আংশিক অনুষ্ঠান মাত্র। যুদ্ধ-বিগ্রহ না বাধলে এই কাজ রীতিমত চ'ল্‌ত, এবং ফলে ২,৮০০,০০০ একার ভূমি সজীব হ'ত। এই সংস্কার-কার্য্যের আনুমানিক ব্যয় ২১,০০০,০০০ পাউণ্ড ধার্য্য হয়; এবং সংস্কৃত জমির মূল্য প্রায় ৬০,০০০,০০০ পাউণ্ড হবে এরূপ অনুমিত হয়। এখানকার জমির উর্ব্বরতার একটু নমুনা দিই। বস্‌রার ৪৫ মাইল উপরে "কুরণা" নামে এক জায়গা আছে,—এখানকার বাসীন্দার সংখ্যা প্রায় ৫০০০। বাইবেল-উক্ত নন্দন-কানন বা Garden of Eden এইখানেই ছিল; এখানেই আদম ও ইভ রাজত্ব করতেন। যাক, সে সব কথা সময়ান্তরে বল্‌বার ইচ্ছা রইল। এখনও সময়ে-সময়ে "কুরণা" হ'তে বৎসরে ১৫০,০০০ বা ২০০,০০০ টন শস্য বিদেশে চালান হয়। পূর্ব্বে বলেছি যে, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস্ এদেশের প্রধান নদী এবং ইহাদের অনুগ্রহের উপরই এখানে কৃষিকার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে। এই নদী দুটী যমজ ভ্রাতার ন্যায় উত্তর আরমেনিয়ান পর্ব্বত হ'তে জন্মগ্রহণ করে' নানা গিরি-উপত্যকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে, বোগদাদ সহর অবধি আসে; তার পর যেন কোন কারণ বশতঃ এদের ভিতর ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়; এবং এই স্থান হ'তে পরস্পর পরস্পরের নিকট হ'তে ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ে। পরে অনুতাপে দগ্ধ হ'য়ে যেন দুই ভাই আবার পুরান দ্বন্দ্ব মিটিয়ে "গুরমত আলী" নামক স্থানে মিলিত হ'য়ে, একত্র সাগর-উদ্দেশে চ'লে যায়। পূর্ব্বে "কুরণা"য় দুই ভাইয়ের মিলন হয়; কিন্তু কালে ইউফ্রেটিস নদী সরিয়া আসিয়া গুরমত আলীতে টাইগ্রিসের সহিত মিলিয়া যায়। গুরমত আলী হ'তে পারস্য উপসাগর অবধি এই মিলিত নদীর নাম সাট-অল্-আরব (Shatt-al-Arab) বা আরব দেশের জল। বস্‌রার ২০ মাইল নীচে পারস্য দেশের "কারুণ" নদী ইহার সহিত মিশিতেছে। এই মিলনের পর নদীটা আয়তনে খুব বড় হ'য়ে ৩।৪টী বড়-বড় শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হ'য়ে পারস্য উপসাগরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

নদীর মোহানা হ'তে ৪।৫ মাইল উপরে এবং ইহার পশ্চিম-তীরে "ফাও" নামে একটি গণ্ডগ্রাম আছে। বস্‌রা যাবার পথে জাহাজ হ'তে এইটিই প্রথমে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখানকার জন-সংখ্যা প্রায় ৪০০। এখানে তুর্কিদের টেলিগ্রাফ-লাইন শেষ হয়; এবং Indo-European Co's cable আরম্ভ হয়। এখানে তুর্কিদের এক মাটির কেল্লা ছিল। Brigadier General Delamain ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই নবেম্বর তারিখে সৈন্য লইয়া এখানে আসেন এবং কেল্লা দখল করিয়া তুর্কীদের তাড়াইয়া দেন।

এখান হ'তে বস্‌রা অবধি নদীর দুই-তীর খুবই নীচু—পূর্ণ জোয়ারের জলে উভয় কুল ডুবিয়া যায়। কুল হ'তে উভয় তীরস্থ জমী খুবই উর্ব্বর এবং চিরশ্যামল খর্জ্জুর বৃক্ষে আচ্ছাদিত।

ফাওর অপর তীরে আবাদান দ্বীপ। এখানে Anglo-Persian Co's তেল শোধন করিবার প্রকাণ্ড কারখানা আছে। পারস্য দেশের উপকণ্ঠস্থিত তেলের খনি হ'তে প্রায় ৭০ ক্রোশ পথ পাইপ দিয়ে crude তেল এখানে আনিয়া বড়-বড় ট্যাঙ্কে জমা করা হয়। পরে এখানে শোধিত হ'য়ে দেশ-বিদেশে চালান যায়। এই তেলের কারবারে ইংলণ্ডের নৌবিভাগের বিস্তর অর্থ আছে; এমন কি, এক কথায় এটাকে নৌবিভাগের সম্পত্তি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ইংলণ্ডের সমস্ত রণতরীর তেল এখান হ'তে সরবরাহ হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্ব্বৃত্ত জার্ম্মাণ এই তেলের কারবার ধ্বংস করবার বিস্তর চেষ্টা করেছিল; এবং ইহাদের ষড়যন্ত্রে উত্তেজিত হয়ে তুর্কী ও আরবরা তেলের পাইপ কেটে দিবার ও সমস্ত কারবার নষ্ট করবার বিশেষ

চেষ্টা করেছিল; কিন্তু শেষে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। এখন এই কারবার বিশেষভাবে সুরক্ষিত আছে।

আবাদান দ্বীপের কিছু উপরে এবং বসরার ২০ মাইল দক্ষিণে "মহামারা" নগর। এটা পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও, এখানকার সেখ এক রকম স্বাধীন। ইনি পারস্যের শা-কে কর দেন মাত্র; কিন্তু নিজের দেশে ইঁহার সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন। দক্ষিণ আরবিস্থানে ইহার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ। ইঁহার নাম Shaik Khazal Khan K. C. I. E., K. C. S. I. (Sardar-i-Arfa)। ইনি ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতার মৃত্যুর পর মসনদে আরোহণ করেন। ইনি ইংরাজের পরম বন্ধু, এবং অনেক কার্য্যে সেই বন্ধুত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। বাদ্ধক্যে এখন অনেক বিষয়ে ইংরাজের পরামর্শের উপর নির্ভর করেন। মহামারার জনসংখ্যা প্রায় ২৩,০০০। এখানে ইট ও মাটীর তৈয়ারী ৮০০ বাড়ী আছে; আর সবই খড়ের ঘর। সেখের প্রাসাদ অতি সুন্দর; একটা খালের ধারে চারিদিকে গভীর গড়ের দ্বারা সুরক্ষিত। এই স্থানও অত্যন্ত উর্ব্বর; কিন্তু কৃষিকার্য্যোপযোগী লোকাভাবে অনেক স্থলেই চাষ হয় না। তথাপি এখান হ'তে প্রতি বৎসর আফিম, তামাক, খেজুর, গম ইত্যাদি বিস্তর রপ্তানী হয়। এখানে ইংরাজের একজন Consul থাকেন; তাঁদের একটী স্বতন্ত্র পোষ্ট আফিসও আছে। এ ছাড়া পারস্যের শা-র custom অফিস, পোর্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসও আছে।

মহামারা হ'তে বসরা পর্য্যন্ত নদীর উভয় তীরে ক্রোশ-ব্যাপী জমি ঘন খর্জ্জুর-বৃক্ষে আচ্ছাদিত; এবং তার মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট আরব পল্লী। নদী হ'তে খাল কাটিয়া জল লইয়া এই সব খেজুর-বাগানে জল দিবার বন্দোবস্ত আছে। এই খেজুর-বাগানের পর উভয় তীরেই ধূ-ধূ মরুভূমি।

মহামারার ২০ মাইল উপরে সাট-অল-আরব নদীর পশ্চিমতীরে বিখ্যাত বসরা সহর। বহুকাল হ'তে এই সহর বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। সমগ্র মেসোপটেমিয়া ও পূর্ব্ব-পারস্য দেশের সমস্ত জিনিসেরই আমদানী-রপ্তানী এখান হ'তেই হয়। নানা দিক হ'তে নানা উপায়ে দ্রব্য-সম্ভার এখানে আসিয়া জমা হয়; পরে সমুদ্রগামী জাহাজে দেশ-বিদেশে চালান যায়। ছেলেবেলায় আমরা যে সিন্ধবাদ নাবিকের উপাখ্যান শুনেছি, সেই সিন্ধবাদ নাবিক এই বসরা বন্দর হ'তে বাণিজ্য-যাত্রা ক'রতেন। কিন্তু সিন্ধবাদের বসরা নগর এখন আর নাই; তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে মাত্র এবং ইহার আধুনিক নাম জুবেয়ার। জুবেয়ার আধুনিক বসরার দক্ষিণ পশ্চিমে ৯ মাইল দূরে মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। পুরাকালে পারস্য উপসাগরের একটা শাখা এই নগর অবধি বিস্তৃত ছিল; এখন তাহার চিহ্নমাত্র আছে। এখানে পুরাণ বসরার অনেক ভগ্ন অট্টালিকা ইত্যাদি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এখনও সেই বহু পুরাকালে নির্ম্মিত এক ভগ্ন মস্‌জিদের একটা গম্বুজ সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন ক'রে এই সহরের পূর্ব্ব-গরিমা ঘোষণা করচে। এই ধ্বংসের অনতিদূরেই "তাল্লার" কবর স্থান এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ইনি ৬৫৬ খৃষ্টাব্দে Battle of Camelএ জুবেয়ারের সহিত নিহত হন। জুবেয়ারে বসরা সহরের অনেক ধনী লোকের বাগানবাড়ী আছে। Dry climate বলিয়া গরমের সময় ইঁহারা এখানে বাস করেন। এখানকার তরমুজ ও খরমুজ বিখ্যাত। জুবেয়ারের ৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সৈবা (Shaiba) গ্রাম মরুভূমিতে একটা Oasis মাত্র। এখানে আলির প্রধান শত্রু জুবেয়ারের কবর-স্থান এখনও বিদ্যমান আছে। সৈবার জনসংখ্যা প্রায় ৬০০০, এবং সকলেই সুন্নী ধর্ম্মাবলম্বী। এই সৈবাতেই ১৯১৫ খৃঃ ১২ই, ১৩ই, ১৪ই এপ্রিল তারিখে ইংরাজের সহিত তুর্কীর ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং তুর্কীরা হারিয়া যায়। এই পরাজয়ের পরেই তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষ সুলেমান আস্‌করি (Suleiman Askeri) আত্মহত্যা করেন।

আধুনিক বসরা সহর নদী হ'তে দু'মাইল দূরে Nahral Ashar নামক এক খালের ধারে অবস্থিত। খালের মুখ হ'তে সহর পর্য্যন্ত বেশ সুপ্রশস্ত সড়ক আছে। ইহাই এখানকার ট্রাণ্ড রোড। তবে রাস্তাটী মেটে; সেজন্য গরমে হাঁটু-ভোর ধূলা,— বর্ষায় হাঁটু-ভোর কাদা হয়। শীঘ্রই রাস্তাটী পাকা হবে ব'লে আশা করা যায়। ইংরাজের কৃপায় এখন সন্ধ্যাবেলা এই রাজপথ বৈদ্যুতিক আলোক-মালায় উদ্ভাসিত হয়। রাস্তার ধারে-ধারে ফুল-বাগানের কেয়ারিও আরম্ভ হয়েছে। নৌকা করে কিম্বা "আরাবানা" বা ফিটনের মত ছক্কড় গাড়ীতে সহরে যাওয়া যায়। এই গাড়ীতে চড়্‌লেই

কবিবরের "বিঘোরে বেহারে চড়িনু একা" মনে পড়ে; সুতরাং ইহা কেমন আরামদায়ক, বলাই বাহুল্য। বসরা সহরটী এক সময়ে মাটির প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল; এবং তাহার মধ্যে-মধ্যে দুর্গ ছিল। এখনও এই প্রাচীরের ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে এবং কয়েক স্থানে দু'-একটী পুরান কামানও দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

সহরের অধিকাংশ বাড়ী পাকা দোতাল্লা। গরিবদের মেটে ঘর, চাটাইএর ছাউনি এবং তারা সব সহরের আশ-পাশে থাকে। গরমের জন্য সমস্ত বাড়ীর ভিত ও দেওয়াল খুবই পুরু—কোন বাড়ীরই বাহির-সৌষ্ঠব নাই, সবই ইট-বার-করা। কিন্তু সব বাড়ীই চকমিলান; মধ্যে বেশ বড় উঠান; বড়লোকদের বাড়ী সদর-অন্দর মহলে ভাগ করা এবং উঠানের চারদিকে বারাণ্ডা দেওয়া। কারও বাড়ীর সামনে একইঞ্চি জায়গা নাই। সদর দরজা একেবারে রাস্তার উপর। বাড়ীগুলি এত ঘেঁষাঘেঁষি, এবং রাস্তাও এত সরু যে, ছাদের উপর দিয়া সমস্ত সহরটা বেড়ান যায়। এখনকার বাড়ীর গাঁথনি বড়ই অমজবুত; কারণ, মাল-মসলার সঙ্গে ইটের রাসায়নিক সংযোগ হয় না। সব বাড়ীই প্রায় কাদার গাঁথনি। এখানকার ইট দেখতে শাদা এবং রোদে শুকান। আগে ইট পোড়াবার রেওয়াজ বড়-একটা ছিল না। এখন Govt. পোড়ান ইট তৈয়ার করতে আরম্ভ কোরেছেন।

এদেশী ইটের দর ২৫।৩০ টাকা ক'রে হাজার; সুতরাং বাড়ী করাও খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। সমস্ত মালমসলাই বিদেশ থেকে আসে। আমাদের দেশে ৫০০০ টাকায় যে-রকম বাড়ী হয়, এখানে সে-রকম বাড়ী করিতে প্রায় ৩০,০০০ কি তার বেশীও খরচ পড়ে। মহামারার সেখের বসরাতে নদীর ধারে এক প্রাসাদ আছে—সেটী তোয়ের করতে ৫০,০০০ পাউণ্ড খরচ পড়ে; কিন্তু দেখ্‌লে কে বলবে যে এত টাকা লেগেছে।

এখানকার ছাদ তোয়ের করবার প্রণালীও অদ্ভুত! কড়ি-বরগার ব্যবহার নাই; মোটা-মোটা কাঠের রলা খুব কাছাকাছি ফেলিয়া, সেগুলি মোটা চাটাই দিয়া মুড়িয়া, তার উপর ৮।৯ ইঞ্চি মাটি ফেলিয়া, পিটিয়া সমান করা হয়। কোন-কোন বাড়ীর ছাদে চাটাইএর উপর এক সারি টালী পাতা আছে। এ হ'তেই, এখানকার বর্ষার প্রকোপ কতদূর, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। সারা বছরে ৫।৬ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। ছাদে উঠলে পায়ের ভরে ছাদ কাঁপতে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ছাদ নিতান্ত অমজবুত নয়। অবস্থাপন্ন আরব, এবং ইহুদি আৰ্ম্মেনিয়ান প্রভৃতিদের বাড়ী বেশ সাজান-গোচান। সমস্ত ঘরই কাঠের সিলিং এবং পেণ্টিং-করা; খুব বড় বড় আয়না-মোড়া এবং কৌচ, কেদারা, গালচে, পর্দ্দা ইত্যাদিতে ইংরাজি ধরণে সাজান। অধিকাংশ বাড়ীতেই রাস্তার দিকে কাঠের জাফরি দিয়ে ঘেরা সরু সরু ছোট-ছোট বারাণ্ডা আছে। এ সব বারাণ্ডা সন্ধ্যাকালে যখন পুরসুন্দরীদের মুখ-পদ্মে শোভিত হয়, তখন কালিদাসের সেই

তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈ
ব্যাপ্তান্তরা সান্দ্র কুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্র ভ্রমরৈর্গবাক্ষা
সহস্র পত্রাভরণামিবাসন॥

মনে পড়ে। বাস্তবিকই মনে হয়, যেন পদ্ম-ফুল ফুটিয়া আছে; তবে আসব-গন্ধ থাকে কি না, বল্‌তে পারলাম না। সহরের রাস্তাগুলি সঙ্কীর্ণ, অপরিসর, অসমান এবং অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা। পাকা রাস্তা নাই; সুতরাং অল্প বৃষ্টিতে যেমন কাদা, অল্প রোদে তেমনই ধূলা হয়। আগে ময়লার গন্ধে রাস্তায় চলা যেতো না; কিন্তু এখন কড়াকড় নিয়মে, ও মুন্সিপাল সৃষ্টি হওয়ায়, আগের অবস্থা বদলে গেছে। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবার হুকুম নাই। গরমের সময় এখন প্রধান-প্রধান রাস্তায় জল দেবার, রাতে আলো দেবার বন্দোবস্ত হ'য়েছে। বাজারের রাস্তার উপর ঢালু ছাদ দেওয়া, সেজন্য গরমের সময় রোদে পুড়ে, বা বর্ষায় জলে ভিজে বাজার করতে হয় না। সমস্ত জিনিসেরই দোকান ষ্টলের মত সাজান—খোলা জায়গায় মাটীতে জিনিস বিছিয়ে বিক্রি খুবই কম হয়। অনেক রাস্তার ধারে বা বাজারের ভিতর বিস্তর বড়-বড় কাফির দোকান আছে। এগুলি প্রায়ই নিষ্কর্ম্মা লোকদের আড্ডাস্থল;—সদাই লোকে ভর্ত্তি থাকে। বৈকালে কাজকর্ম্মের পর অনেক লোক এসে এসব দোকানে আড্ডা নেয়। সকাল থেকে রাত ৮।৯ পর্য্যন্ত কাফির দোকান খোলা থাকে। বড় বড় ঠেসান-দেওয়া বেঞ্চির উপর ব'সে, কেহ-বা চোখ বুজে মালা জপ করে, কেহ-বা আলবোলায় তামাক টানে—কেহ-বা গাল-গল্পে সময়

কাটায়। দোকানী মাঝে-মাঝে এসে সকলকে একটু-একটু কাফি খাইয়ে যায়—শেষে প্রাপ্য আদায় করে। কাফি খাওয়ার চলনটা এখানে খুবই আছে। এ সব আড্ডায় জুয়াখেলাও হয়ে থাকে।

এই সব দোকানে এদেশের প্রস্তুত কোন দ্রব্যই নাই। সব দোকানই বিদেশী মালে পরিপূর্ণ। আজকাল জাপানী মালও বিস্তর আস্‌তে আরম্ভ হয়েছে। এখানে তরি তরকারী বড় একটা মেলে না;—জন্মে না এমন নয়; কেবল লোকের চেষ্টা-যত্ন নাই। সামান্য মূলা, পালম শাক, ছালাড়, কুমড়া ও পিঁয়াজ জন্মে; আলু, ডাল, পিঁয়াজ প্রভৃতি জিনিস অপর দেশ হ'তে আসে। গরমের সময় এখানে তরমুজ, খরমুজ, আঙ্গুর, ডালিম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং দামও বেশ সস্তা। কতক ফল এখানে জন্মে, বেশীর ভাগই পারস্যদেশের উপকণ্ঠ ও অন্যান্য নিকটস্থ দেশ হ'তে আসে। মাছও নানা রকম পাওয়া যায়, এবং সস্তাও বেশ; তবে আজকাল লোকাধিক্য বশতঃ ক্রমশই দাম চড়্‌তে আরম্ভ হ'য়েচে। মাছের মধ্যে Tigris Salmon প্রধান। এ মাছ দেখ্‌তে অনেকটা রুই মাছের মত,—কেবল মাথাটা চেপ্টা, মুখটা খুবই সরু এবং ছোট-ছোট আঁষ। এই মাছ এক-একটা খুবই বড় হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন রাস্তায় এইরূপ বৃহৎ আকারের একটা মাছ দু'জন জোয়ান লোককে কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে দেখেছিলাম। এই মাছটী লম্বে ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি, ঘেরে ৩ ফিট ১০ ইঞ্চি, ওজনে ২১৫ পাউণ্ড ছিল। একজন আরব সড়কী দিয়া এই মাছটী মারে। সড়কী বা লাঠির আগায় লোহার মোটা-মোটা তার বাঁধিয়া তাহার দ্বারা মাছ মারা এদেশে খুবই চলন আছে। বোয়াল মাছ এখানে বিস্তর পাওয়া যায়। নি-আঁষ মাছ খাওয়া মুসলমান-শাস্ত্রে নিষিদ্ধ; সেজন্য আগে এদেশের লোকে বোয়ালমাছ ছুঁত না পর্য্যন্ত; কিন্তু ভারতের বিস্তর শকুন আসিয়া পড়ায়, আজকাল আরবরা বোয়াল মাছ বেচিয়া বেশ উপার্জ্জন কোরচে। সামন মাছ (Salmon) ছাড়া ভাঙ্গন, ইলিশ, বড়-বড় চাঁদামাছও বিস্তর পাওয়া যায়।

রাস্তার ধারে ফিরিওয়ালারা ভুট্টার খই, ডাল-বড়া, এলাচদানা, চিনির ছাঁচ, গোলাপছড়ি প্রভৃতি অনেক রকম জিনিসের দোকান খুলে বেশ বিক্রি করে। আবার রাঁধা-মাংস, রুটি, পোলাওয়ের দোকানও যে নাই, এমন নয়। অনেকেই দুপুরে বাজারের রুটি কিনে খেয়ে থাকে। গরমের সময় ফিরিওয়ালারা রাস্তায়-রাস্তায় নানা রংএর ঠাণ্ডাই সরবৎ, কুল্‌পি বরফ প্রভৃতি বিক্রি করে বেড়ায়। বস্‌রার মোট জন-সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০; তন্মধ্যে অধিকাংশই গৃহী আরব (Sedentary)। এ ছাড়া, কয়েক ঘর য়ুরোপবাসী, ভারতবাসী, ১০০০ আন্দাজ ইহুদী ও প্রায় ৩০০০ পারস্যদেশীয় লোক এখানে বসবাস করে।

আরবরা দেখ্‌তে অতি সুন্দর, সুশ্রী এবং সুপুরুষ। ইহাদের যেমন দীর্ঘ গঠন, তেমনই অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ (manly and handsome figure)। এক-একজনের এমন মোলায়েম চেহারা যে, যখন দাড়ি গোঁফ না থাকে, তখন দূর হতে স্ত্রীলোক বলে ভ্রম হয়।

আরব-রমণীদেরও গঠন বেশ সুগোল, সুঠাম এবং রংও বেশ ফর্সা—অনেককেই সুন্দরী বলা যেতে পারে। তবে ইহাদের চেয়েও সিরিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান, কলডিয়ান রমণীরা আরও সুন্দরী। এদের রূপ বর্ণনা করা কবির কাজ;—আমার মত অ কবির সে চেষ্টা করা বিড়ম্বনামাত্র। তবে এক কথায় বলতে পারি যে, এসব রূপসীদের মুখ একবার দেখ্‌লে আবার ফিরে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। ইহাদের গঠন লম্বা; বোধ হয় এই রকম গঠনকেই পুরাতন কবিরা তন্বী ব'লতেন। সরল নাসিকা; ডাগর, টানা, আবেশময় চোখ-দুটি সুর্ম্মা-রঞ্জিত হয়ে সর্ব্বদাই ভাবে ডগমগ হয়ে হাসতে থাকে। পুষ্প-ধনুর ন্যায় টানা যুগ্ম ভুরু, আঙ্গুরের মত কোমল নাতি-পুরু, নাতি-পাতলা প্রবাল ওষ্ঠ; এবং রংটীও দুধে-আলতা বা ইংরাজিতে যাহাকে milk and rose complexion বলে, সেই রকমের। এই সব রূপসী ছেড়ে আরব্য-উপন্যাসের বাদশা পুত্রদের চীনের রাজ-কুমারীর উপর ঝোঁক পড়ত কেন, তা'ত বুঝতে পারি না! বোধ হয় এ সখটা হরদম পোলাও খেয়ে বাবুর থাড়া-চচ্চড়ী খাবার সখেরই মত। তবে এদেশে যে কুৎসিৎ পুরুষ বা কুৎসিতা স্ত্রীলোক নাই, এমন নয়। "আবদালা"রও অভাব নাই এবং ততোধিক কুৎসিতা রমণীও যথেষ্ট আছে। ইহারা আফ্রিকার কাফ্রিদের বংশধর। পূর্ব্বে এদেশে দাস-ব্যবসায়ের খুবই চলন ছিল; আরবরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হ'তে কাফ্রিদের ধরে এনে দাস-দাসীরূপে বিক্রি কোরত। এ প্রথা এখন বন্ধ হয়েছে;

তবে পূর্ব্বের আমদানী কাফ্রি ক্রীত-দাস-দাসী এখনও অনেক বাড়ীতে আছে। কিন্তু ইহারা এখন অনেকটা স্বাধীন। আরবদের সঙ্গে এদের বিবাহ হয়ে এক বর্ণসঙ্কর শ্রেণী হয়েছে—এদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। হৈমবতীর ২০০ ডাইলিউসনে mother tinctureএর কণিকা থাকে কি না, জানি না; কিন্তু এদের মাথার চুলে ও ঠোঁটে এখনও mother-tinctureএর পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে এরাও দেখতে নিতান্ত মন্দ নয়। আমার মনে হয়, মিশ্রিত জাতিমাত্রেই দেখতে অল্প-বিস্তর সুন্দর। কচিৎ কখনও দরজার অন্তরালে এই রমণীদের দু'একখানি কাঁচামুখ চ'খে পড়লে, কবির "Sweet as the primrose peeps beneath the thorn" মনে পড়ে। আরবদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখতে পরিপাটি। পুরুষরা পায়জামার (ইলবাস্) উপর লম্বা আলখেল্লা (দিশদিশা) পরিয়া তার উপর অবস্থা ও সামর্থ্যানুযায়ী নানা রকম কাপড়ের কোট (সিত্রা) পরে এবং সর্ব্বোপরি চোগার মত ঢিলা আস্তিনশূন্য একটী জামা (মিস্উয়া) দোছোটের মত ব্যবহার করে। মাথায় বড়-বড় রুমাল (চিফিয়া) কোণাকুনি ভাঁজ করিয়া দিয়া তার উপর উটের চুলের বিড়া (আগল) পরে। স্ত্রীলোকেরাও পায়জামা ব্যবহার করে; এবং প্রথমে একটী পুরা-আস্তীন খাবরা (মাব্রা) পরিয়া তার উপর আস্তীনশূন্য খুব ঢীলা সেমিজ (জেবুন) পরে এবং সর্ব্বোপরি আপাদমস্তক ঢাকা এক কাল ঘেরাটোপ (মিস্টয়া)। অনেকেই একখানি কাল রুমাল বুকের উপর ঝুলাইয়া তার দুইখুঁট দুই গালের উপর দিয়া লইয়া মাথার উপর বাঁধিয়া রাখে। অনেক মেয়ে ঘরে বসিয়া কলে নিজেদের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈয়ের করে। Singerএর সেলাইর কল এখানেও ঘরে-ঘরে আছে। সিরিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান পুরুষরা সাহেবী পোষাক পরে; কিন্তু মাথায় সকলেই প্রায় ফেজ্ পরে থাকে; অতি অল্প লোকেই হ্যাট মাথায় দেয়। এই সাহেবী পোষাকের উপরও অনেককে মিস্উয়া ব্যবহার ক'রতে দেখেছি। ইহাদের স্ত্রীলোকদের পোষাক পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য দেশের পোষাকের সংমিশ্রণ (Mixture of Eastern and Western costume)—খুবই জমকাল রকমের এবং নয়ন-প্রীতিকর। এদেশের মেয়েরা খোপা বাঁধে না; আলুলায়িত বেণী দুটী-দুটী করে দুই স্কন্ধের উপর দিয়ে সাপের মত ঝুলতে থাকে এবং কবির

'বিলম্বিত দুই বেণী অতুল শোভায়
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।'

স্মরণ করাইয়া দেয়। বাস্তবিক সাপও এদেশে খুবই কম;—এই জন্যই কি? আরব-রমণীদের উল্কি পরার সখ খুবই আছে—উল্কির টিপ্, উল্কি দিয়া যুগ্ম ও টানা ভুরু আঁকা,—চিবুকে, হাতে, পায়ে নানা রকমের উল্কির ছাপ—সকল স্ত্রীলোকেই পরে থাকে; এবং এদের হাত ও পা সদাই মেহেদীপাতার রং-এ রঙ্গিয়া আছে। অনেকেই জুতা পায়ে দেয়। মেয়েদের ভিতর অবরোধ-প্রথা নাই; ঘেরাটোপ পরিয়া সকলেই হাটে, ঘাটে, মাঠে যায়।

এখানে মেয়েদের গহনা পরার বড় একটা রেওয়াজ নেই। কাঁসার বা রূপার চুড়ি-হিন্দুস্থানী মেয়েরা যেমন কাঁসার মল ব্যবহার করে সেই রকম কাঁসার মল—অল্প স্ত্রীলোকেই পরিয়া থাকে; এবং দুই-একজন নাকে নাক-ছাবিও দেয়। কেহ-কেহ টাকার শিকলি গেঁথে মাথায় পরে। সিরিয়ান, আর্ম্মেনিয়ান রমণীরা সোণার ও জড়োয়ার কাজ-করা ইংরাজী ধরণের অনেক রকম গহনা পরে থাকে; দু'একজনকে পায়ে সোণার পাঁইজোরও পরতে দেখেছি।

ইতর শ্রেণীর আরবরা অত্যন্ত অপরিষ্কার ও নোংরা; জলকষ্ট ইহার মূল কারণ বলে বোধ হয়। এখানে খেজুর গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছ নাই; জ্বালানি কাঠের খুবই অভাব। ভারতের বাবলা কাঠে আমাদের যুদ্ধের কাজ চলছে। এই ইন্ধনের অভাবের জন্য আরবদের রান্নার বাহুল্য নাই। বড়-বড় মোটা-মোটা রুটী ও খেজুরই এখানকার প্রধান খাদ্য; এবং এর সঙ্গে কাঁচা ছালাদ, মূলা ও শসার টাক্না চলে। মাছ-পোড়া, মাংসের ঝোলও যে চলে না, এমন নয়। বৈকালে অনেকেই ভাত-তরকারি খেয়ে থাকে। রুটী সেঁকিবার উননগুলি তুন্দরের মত;-নীচে বাতাস ও কাঠ যাবার জন্য ছোট একটা মুখ এবং উপরে রুটী যাবার মত বড় এক মুখ থাকে। খড়-কুটো, খেজুর-পাতা পোড়াইয়া উননটী গরম হ'লে, ইহার ভিতরের গায়ে রুটী বসাইয়া দেয়, এবং ৪।৫ মিনিটের ভিতর সুন্দর রুটী তৈয়ের হয়। মেয়েরা চাকী-বেলোন ব্যবহার করে না;

বড়-বড় ময়দার তাল হাতে ঘুরাইয়া সুন্দর গোল রুটী তোয়ের করে। অনেক ছোট-ছোট পল্লীতে ৩।৪ ঘরের এক-একটি সাধারণ উনান থাকে। বোধ হয় কাঠের খরচ সংক্ষেপ করবার জন্যই এরূপ ব্যবস্থা। সকলেই অল্প-বিস্তর খড়-কুটো এনে উনানটী গরম করিয়া নিজ-নিজ রুটী করিয়া লয়। পূর্ব্বেই বলেছি, এখানে খুবই জলকষ্ট। নদীর বা বড় বড় খালের ধারে মহাজনদের আড়ত বা দোকানবাড়ী ছাড়া বসতবাড়ী অতি অল্পই আছে। সুতরাং অধিকাংশ লোককেই ছোট-ছোট খালের জল ব্যবহার করতে হয়। বড় খাল ছাড়া, খেজুর-বাগানের ভিতর যে-সব Irrigation Canal আছে, সেগুলি জোয়ারের জলে ভরিয়া গেলে, সেখান হ'তে অনেকে জল নিয়ে যায়। ধনী লোকেরা বড়-বড় নৌকায় টিন পিপে বোঝাই করে নদী হ'তে জল আনান। এ ছাড়া ভিস্তিরাও বাড়ী-বাড়ী জল দিয়া যায়। তবে এ সবই ব্যয়-সাপেক্ষ। গরীবরা খালের ঘোলা জলই খেয়ে থাকে। অতি অল্প বাড়ীতেই কূয়া আছে; কিন্তু তার জল ব্যবহারের উপযুক্ত নয়—লবণাক্ত। যে-সব বাড়ীতে কূয়া আছে, আজকাল সে সব বাড়ীর দরজায় "W" লেখা থাকে,—সাধারণকে জানানোর জন্য এরূপ ব্যবস্থা হয়েছে।

সহরে ড্রেনের বন্দোবস্ত ছিল না—শীঘ্রই হবে, এরূপ আশা করা যায়। অনেকের বাড়ীতেই কূয়া পায়খানা ছিল; আজকাল সেগুলির ব্যবহার বন্ধ করে, কমোড ব্যবহার করাবার চেষ্টা হচ্ছে; এবং Municipality অনেককেই কমোড সরবরাহ করচেন। গরীবদের জন্য স্থানে স্থানে সাধারণ পায়খানা তোয়ের হ'য়েছে এবং রাস্তা * ঘাট পরিষ্কার রাখবার জন্য আজকাল অনেক মেথর খাটিয়া থাকে।

লেখাপড়ার চর্চ্চা যে এখানে খুব বেশী, এমনও বোধ হয় না; কিন্তু এই দেশই এক সময়ে ইতিহাস, সাহিত্য ইত্যাদির জন্য জগতে বিখ্যাত ছিল। গরীবদের জন্য মাত্র ২।১টী মক্তব আছে। বস্রায় ক্রিশ্চিয়ান ও অবস্থাপন্ন লোকেরা মেয়েদের জন্য একটী Convent. একটি স্কুল এবং ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্র একটি স্কুল আছে। এ ছাড়া "আসারে" একটী Catholic Boys' School এবং আমেরিকান মিশনের সর্ব্বসাধারণের জন্য এক স্কুল আছে।

এখানকার স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দ নয়। তবে আমাদের দেশের মত সময়-বিশেষে এখানেও প্লেগ, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ যথেষ্টই হয়ে থাকে। বহুদিন পূর্ব্বে এখানে একবার ভীষণ প্লেগ হ'য়ে অনেক লোক মরিয়া যায়। শীতের সময় এখানে যেমন পিশু, উকুন প্রভৃতির উপদ্রব, আবার গরমের সময় মশা, মাছি, Sand-fly-এর উপদ্রবও ততোধিক। ম্যালেরিয়াও বেশ আছে। এদেশের লোকেদের Trachoma বলিয়া এক রকম চক্ষু-রোগ অত্যন্ত হয়ে থাকে এবং ইহাতে অনেক লোকের অনেক সুন্দর-সুন্দর ছেলে-মেয়েদের চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এ রোগটী ছোঁয়াচে এবং ইহার কারণ নির্ণয় আজও পর্য্যন্ত হয় নাই। মিশরেও এ রোগ যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করবার জন্য সেখানে বহু পারিতোষিক ঘোষিত আছে।

পূর্ব্বে বলেছি যে "নর-উল-আসার" খাল দিয়া বস্রা যেতে হয়। এই খালের দু'ধারে সদাগরি আফিস, দোকান, Civil Post Office, 'তার' আফিস। খালের মুখে তুর্কিদের কাষ্টম হাউস ও ডক্ ছিল;—এ সব এখন আমরা ব্যবহার করছি। খালের পশ্চিম-তীরে "আসার" গ্রাম পূর্ব্বে খুবই ছোট ছিল; কিন্তু আজকাল দিন দিন জেঁকে উঠ্‌ছে। আধুনিক সমস্ত কারবারের স্থানই এইটী।

বস্রার খেজুর অতি চমৎকার, এবং ইহাই প্রধান ফসল। এখান হ'তে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে প্রচুর পরিমাণে খেজুর চালান হয়; এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন quality-র জিনিস যায়। আমেরিকায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেজুর চালান হয়। ১৯১৩ সালে বস্রা বন্দর হতে ৭৫,৩৬৮ টন খেজুর দেশ-বিদেশে চালান যায়; তাহার দাম প্রায় ৫৮২,০৭৪ পাউণ্ড। সুতরাং এই ব্যবসা যে কি রকম লাভজনক, তা' এ হ'তে বেশ বুঝতে পারা যায়। গড়ে এক-একটী খেজুর-গাছ হ'তে ফল-পাতায় বছরে ৫ টাকা আন্দাজ আয় হয়। আজকাল গাছ-প্রতি ॥০ আনা ট্যাক্স ধার্য্য হয়েছে। খেজুরের চাষে যে বিশেষ পরিশ্রম ক'রতে হয় এমন নয়; তবে ভাল ফসলের জন্য প্রচুর জলের

* ছোট ছোট পল্লীতে অনেকে রাস্তা-ঘাটে বা ছাদের উপর প্রাতঃকৃত্যাটা সারিয়া থাকে এবং যাঁহাদের মুন্সিপালের কাজ করে থাকেন।

আবশ্যক। সেজন্য প্রতি সারি গাছের ভিতর খাল কাটা আছে। এই সমস্ত ছোট-ছোট খাল বড়-বড় খালের দ্বারা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত আছে। প্রতিদিনই জোয়ারের সময় এগুলি জলে পুরিয়া যায় এবং তদ্দ্বারা গাছের পুষ্টিসাধন হয়। বন্যার সময় সমস্ত গাছের গোড়া প্রায় ৩।৪ হাত জলে ডুবিয়া থাকে। অনেক খেজুর-বাগানের ভিতর আঙ্গুর ও ডালিম গাছ আছে। গ্রীষ্মের সময় যখন এই সব দ্রাক্ষালতায় থোলো-থোলো সুরসাল, সুমিষ্ট আঙ্গুর এবং ডালিম গাছে বড়-বড় লাল ডালিম ফলিয়া থাকে, তখন বাগানের যে কি বাহার হয়, তা' বলা যায় না।

খেজুরের চাষের আর একটী বিশেষত্ব দেখলাম; সেটীতে একটু নূতনত্ব আছে বলিয়া বিশদ ভাবে লিখিতেছি। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, খেজুর-গাছ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের যে শ্রেণীভুক্ত, সেই শ্রেণীর ভিন্ন-ভিন্ন গাছে স্ত্রী ও পুরুষ ফুল হয়; এবং বায়ু বা কীট-পতঙ্গের দ্বারা পুং-ফুলের পরাগ স্ত্রী-ফুলের সহিত মিশিয়া ফলের উৎপত্তি হয়। অবশ্য এই সব প্রকৃতি-সহচরের (natural means of fertilisation) উপর নির্ভর করলে আশানুরূপ ফল না পাবারই বেশী সম্ভাবনা। এজন্য আরবরা অন্য উপায়ে ফল উৎপাদন করে থাকে। খেজুর-বাগানে স্ত্রী গাছই প্রায় সবই—দুই চারিটী মাত্র পুং-গাছ। বোধ হয় ছোট-বেলাতেই আরবরা স্ত্রী ও পুং-গাছ চিন্‌তে পারে এবং পুং-গাছ কাটিয়া ফেলে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে ফুল ফুটতে আরম্ভ হ'লে, আরবরা পুং-ফুলের ঝাড় কাটিয়া, তাহার অল্প-অল্প স্ত্রী-ফুলের ঝাড়ের ভিতর বসাইয়া দেয়। ইহাতে পুং-ফুলের পরাগ অতি সহজেই স্ত্রী-ফুলের গর্ভ-কোষের সহিত মিশিয়া যায়। যে সব ফুলের ঝাড়ে হাত যায় না, সেগুলিতে—লাঠীর আগায় পরাগের পুঁটুলি বাঁধিয়া —তদ্দ্বারা পরাগ ছিটাইয়া দেয়। এর পর ফল হ'তে প্রায় দুমাস সময় লাগে। জুন মাসের শেষে খেজুর বেশ বড়-বড় ও পুষ্ট হয়; এবং জুলাই মাসের শেষাশেষি সবুজ রং হতে হলদে রংএ পরিণত হয়। ক্রমশঃ ফল পাক্‌তে আরম্ভ হ'লে রং (Brown)-'গাঢ় পিঙ্গল' হয়; এবং সেপ্টেম্বর মাসে সমস্ত ফলই পাকিয়া যায়। পরে ভাল-ভাল খেজুর বাছিয়া বাক্স-বন্দী করিয়া এবং বাকী রেজা খেজুর চাটায়ে মুড়িয়া চালান দেওয়া হয়। এক-একটী খেজুর গাছে ১২।১৪।১৬ কাঁদি খেজুর হয়। "ইরাক" দেশ ছাড়া আরও অনেক দেশে খেজুরের চাষ আছে; এবং আজকাল আমেরিকায় ক্যালিফোরণিয়া প্রদেশে বিস্তর খেজুরের চাষ আরম্ভ হয়েছে; তবুও আবহমানকাল হ'তে ইরাক দেশের বা বস্‌রার খেজুরই জগদ্বিখ্যাত। মার্কো পোলো (Marco Polo) তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন, "There is also on the river (Tigris) as you go from Bandas (Bagdad) to Kisi (Kish) a great city called Bastra (Busreh, classically Basreh) surrounded by woods, in which grow the best dates in the world" (Yal's Ed. I, 50, London, 1871)। কিন্তু আধুনিক কয়েকজন খেজুর তত্ত্ববিশারদ আমেরিকান বাগ্‌দাদী খেজুরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলেন। শুনা যায় এদেশে ১১২ রকমের খেজুর জন্মে। তবে ব্যবসা হিসাবে লাভজনক বলিয়া পাঁচ সাত রকম ছাড়া অন্যান্য রকমের চাষ খুবই কম। বস্‌রায় "হালাউই" (Halawi) "খাদরাউই" (Khadrawi) এবং "সাইর" (Sayir)—এই তিন রকমের খেজুরের চাষই বেশী। এগুলি ফলেও বেশী এবং এতে লাভও খুব। বরাবর খাবার জন্য "খাদরাউই" খেজুরই ভাল—আমেরিকার লোকে দেখ্‌তে ভাল বলিয়া "হালাউই" বেশী পছন্দ করে। বসরার সেরা খেজুর হ'চ্ছে "আওয়াদি" (Awaydi); এবং "বারহি" (Barhi) খেজুরের চাষ খুবই কম; কারণ এ খেজুর ব্যবসা হিসাবে মোটেই লাভজনক নয়। আমাদের দেশে মেওয়ার দোকানে খুব বড় বড় একরকম শুক্‌না খেজুর দেখ্‌তে পাওয়া যায়—তার নাম হচ্ছে "যাহিদি" (Zahidi)। বাগ্‌দাদে এর চাষ বিস্তর। এই খেজুর খুব আগুড়ি জন্মায় এবং ফলেও বেশী। আরবরা শতমুখে এর গুণপনা ব্যাখ্যা করে থাকে। বেদিয়া আরবদের এই-ই প্রধান খাদ্য। "যাহিদি" ছাড়া বাগদাদে আর চার রকমের খেজুর হয়। এদের নাম যথাক্রমে গুণানুসারে "খুস্তাউই" (Khustawi), আশারাশি (Asharasi), "মাক্‌তুম" (Maktum) এবং "তাবিরজাল" (Tabirzal)। যে-সব খেজুর-গাছে আগুড়ি ফল ধরে, সে খেজুর জুলাই মাসেই পাক্‌তে আরম্ভ হয়। তবে প্রকৃত পক্ষে সেপ্‌টেম্বর মাসই খেজুরের প্রকৃত কাল। এর পর এক মাসের মধ্যেই সমস্ত ফল বাছাই ও বাক্সবন্দী হয়ে চালানের জন্য মজুত থাকে এবং প্রায়

৪০ দিনের মধ্যেই খেজুরের সময় শেষ হয়ে যায়। আগুড়ি খেজুরের নাম ইব্রাহিমি (Ibrahimi) "হালাউই" (Halawi), "মক্কাউই বালাবাল্ (Makkawi Balaban) "মক্কাই আস্কার" (Makkkwi ashquar) "বারবান" (Barban) "বাদিনজানী" (Badinjani) সুলতানী (Sultani)। নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে একরকম নাবী খেজুর হয়; এদের নাম "খাসাব" (Khasab), হিলালী (Hilali) সাট্উই (Shatwi) লুলুই (Lului).

আমোদ-প্রমোদের ভিতর বস্‌রা সহরে দুটি আরব থিয়েটার, দুটি বায়স্কোপ এবং "আসারে" ৩।৪টি আরব থিয়েটার আছে। গরমের সময় উন্মুক্ত ছাদের উপর, এবং শীতের সময় ঘরের ভিতর থিয়েটার হয়। ছাদের একদিকে একটি ছোট রঙ্গমঞ্চ এবং তার সামনে দর্শকদের বসবার জন্য চেয়ার, বেঞ্চি, কৌচ পাতা থাকে। টিকট কিনিয়া ঢুকতে হয় না, কিছুক্ষণ দেখার পর একজন লোক আসিয়া দর্শনী আদায় করে, নির্দ্দিষ্ট মূল্য নাই ।০, ॥০ হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত যার কাছে যেমন আদায় হয়। অভিনয়ের মধ্যে নর্ত্তকীদের নাচ-গানই প্রধান,—কোন নাটকের অভিনয় হয় না। ক্বচিৎ কখন কোন-কোন রঙ্গালয়ে ছোট-ছোট প্রহসন হয় এবং ইহার রসিকতা, ঠাট্টা, বিদ্রূপে দর্শকরা পর্য্যন্ত যোগ দেয়। রঙ্গমঞ্চের উপর নর্ত্তকী ও বাদকদের বসবার জন্য চেয়ার পাতা থাকে। ব্যাঞ্জো, করতাল, গেটার, মৃদঙ্গ ইত্যাদিতে গানের সঙ্গত হয় এবং নর্ত্তকীরা পালা করিয়া নাচিয়া-নাচিয়া গান করে। মাঝে-মাঝে বাদকেরাও গানে যোগ দেয়। এই নাচ দেখবার জিনিস, বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। ইহাতে যথেষ্ট কসরৎ আছে। গানের সুর অতি মিঠা ও কোমল; আমাদের কাণে বড়ই মধুর লাগে; কিন্তু ইংরাজরা মোটে পছন্দ করেন না। অধিকাংশ গানই প্রণয় ও বিবাহ সম্বন্ধীয়। আরবরা যখন নাচগান শুনিয়া মশগুল হয়, তখন টাকা-পয়সা ছুড়িয়া যথেষ্ট প্যালা দিয়া থাকে। থিয়েটারের ভিতর চা, কাফি, তামাক, সোডা, লেমনেড খাবার বেশ বন্দোবস্ত আছে। কোন-কোন থিয়েটারে গরমের সময় গোলাপ-পাসে করিয়া গোলাপজল দর্শকদের উপর ছিটাইয়া দিতে দেখা যায়। আজকাল বস্‌রার থিয়েটার ছাড়া অন্য কোন থিয়েটারে সেপাই কিম্বা আফিসারদের যাবার হুকুম নাই—এগুলি out of bounds :(সীমা-বহির্ভূত)। আজকাল এখানে অনেক চীনে মজুর আসাতে সরকার তাদের জন্য একটি চীনে থিয়েটারও আনিয়েছেন। নট-নটীদের মাহিনা এবং অন্যান্য খরচ সবই সরকার দেন। টিকিট বিক্রয়ের টাকাটা সরকারী তহবিলে জমা হয়। দর্শনীর মূল্য ২৲ ও ১৲ টাকা। ইচ্ছা থাকলেও উকুন, পিশুর ভয়ে এ থিয়েটার আজও দেখা হয়নি। এক কর্ণেল একদিন দেখতে যান,—কিন্তু মিনিট-পনেরোর মধ্যে উকুন-পিশুর কামড়ে অস্থির হয়ে বাড়ী ফিরে সারারাত উকুন মারেন!

বস্‌রায় অনেকগুলি বড়-বড় খাল (creek) আছে. তন্মধ্যে "কোরা" "আসার," "খণ্ডক", এবং "রোবার্ট" ক্রীক প্রধান। কোরায় রবিবারে ও ছুটীর দিন মেয়ে-পুরুষদের নৌকা করিয়া বেড়াবার আড্ডা। আজকাল এই খালের ধারে খুব বনভোজনের ধূম পড়ে গেছে। আসর খালের ধারে বড়-বড় আফিস, দোকান-পসারী ইত্যাদি। এই খাল দিয়া বস্‌রা সহরে যেতে হয়। খণ্ডক ক্রীকের ধারে বড়-বড় গোলাবাড়ী; এখানে সমস্ত শস্য—চাল, যব, গম ইত্যাদি এসে জমা হয়।

এখানকার নদীতে ৪।৫ রকমের নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ চলাফেরার জন্য লম্বা-লম্বা সরু-সরু পান্‌সীর মত একরকম নৌকা আছে - এগুলির নাম বালাম। দু'জন লোকে লগি ঠেলিয়া নিয়ে যায়। আরবরা দাঁড় টানিতে বড়ই নারাজ। ছোট-বড় সব নৌকাই লগি ঠেলিয়া চালায়। মালপত্তরের জন্য ছোট-বড় মহাজনী নৌকার মত নৌকা আছে। সেগুলির নাম আয়তন হিসাবে যথাক্রমে "বাঘেলা" ও "মহেলা"। সমুদ্রগামী নৌকার নাম "ধাও" (Dhow)। বাগ্দাদে এক রকম গোল-গোল ঝুড়ির মত নৌকা আছে—তার নাম গোফির (Gophir)। এগুলি উইলোর ডালের বা বেতের তোয়েরী এবং উপরে পিচ বা Asphalt ঢালা। গ্রীষ্মের ভাগটাই এদেশে বেশী। মাস-খানেকের জন্য মার্চ্চ মাসে বসন্ত এসে একবার দেখা দিয়ে যায় মাত্র। তার পর মে মাস হতে গরম পড়তে আরম্ভ হয়; সেটা September মাস অবধি চলে। গরমটা যে কি ভীষণ, তা আর বেশী বলতে হবে না; কারণ আজকাল অনেকেই সেটা জানতে পেরেচেন। সময়-সময় ১২০°।১২৫° ডিগ্রী গরম ওঠে। তবে এহেন গরমে সুখের বিষয় এই যে
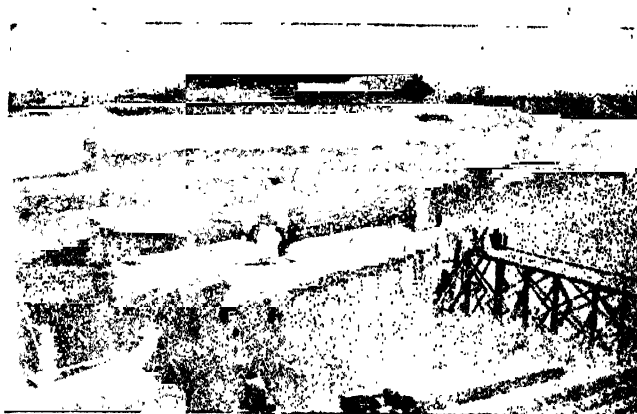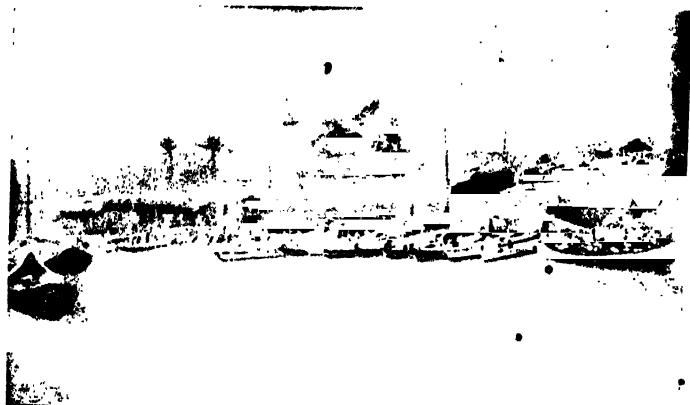
খন্দক ক্রীক

খেজুরের পুষ্পের ঝাড় হাতে আরব

সামার ক্রীক

আরব রমণীর "জলকে চল"

বসরা যাইবার পথে

'আমার রাজপথ'

বেদো বালিকা

দরিদ্র আরব-পল্লী

খেজুরের স্ত্রী-ফুলে পুং-ফুল বসাইয়া দিতে আরব গাছে উঠিতেছে

রবাট ক্রীক

আরব রমণী ও পুরুষ

আরব পুরুষ

রাতটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে এবং ঘুমও বেশ হয়। গরমকালে এদেশে সকলেই রাতে ছাদের উপর শুয়ে থাকে। খুব গরমের সময় এখানে একরকম পশ্চিমে হাওয়া দেয়; এর নাম "সামাল" (Shamal)। হাওয়াটা মরুভূমি থেকে আসে। গরমটা কিছু কমায় বটে, কিন্তু ধুলায় অস্থির ও কাণা করে দেয়। অক্টোবর নবেম্বর মাস দুটো নরমে গরমে—ঠাণ্ডা-গরমের সমাবেশে মন্দ কাটে না। এর পরই আবার হাড়-ভাঙা শীত পড়তে আরম্ভ হয়। এখানে বর্ষাটা আবার শীতকালে হয়। তাতেও আবার লোকের সমূহ কষ্ট হয়। তবে সারা বছরে বসরায় ৬ ইঞ্চির বেশী জল হয় না; গত বৎসর তাও হয় নি। অল্প জল হয়; কিন্তু তাতেই রাস্তাঘাটে এমন চটচটে আটার মত কাদা হয় যে, তাতে চলা ফেরা দায়। ফসলের মধ্যে এখানে যব, গম, ধানই প্রধান এবং খেজুরের

বাজারের ভিতরের দৃশ্য

পরই ভেড়ার লোমের চালানই এখান থেকে বেশী হয়। এ ছাড়া পারস্যদেশের আফিম, গঁদ, যষ্টিমধু, কার্পেট, শস্য ইত্যাদিও বসরার বন্দর দিয়ে নানাদেশে চালান যায়। বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপে আরবদের ভিতর হুলুধ্বনি দেওয়ার পদ্ধতি যথেষ্ট আছে। যখনই কোন পাড়া হইতে ঝাঁকে-ঝাঁকে হুলুধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তখনই বুঝতে হবে, সেখানে কোন-না-কোন আনন্দ-উৎসব হচ্ছে। এ দেশে মেয়েরা বরের বাড়ী বিয়ে করতে যায় এবং কনের বাপ বরের বাপের নিকট হ'তে পণ পায়। বিবাহের দিন কনে নানা বেশভূষায় সাজিয়া কন্যাযাত্রী বাপ এবং অন্যান্য নিকট পুরুষ-আত্মীয়ের সহিত নৌকা করিয়া বরের

বাড়ী যায়। কনের বাপ ঘর-সংসারের আবশ্যক অনেক জিনিষই মেয়ের সঙ্গে যৌতুক দিয়া থাকে। সকলেই সাধ্যানুযায়ী খাট, পালঙ্গ, লেপ, তোষক, গালচে, বালিস, গদী প্রভৃতি বরশয্যার জিনিষ এবং খাদ্যদ্রব্য দিয়া থাকে। কন্যাযাত্রীরা জলপথে হুলু দিতে দিতে এবং নানারকম গান-বাদ্যে আমোদ করতে করতে গিয়া থাকে। কখন কখন পুরুষেরা ২।৩ খানি নৌকা একসঙ্গে বাঁধিয়া তার উপর নাচের বন্দোবস্তও করে থাকে। অবশ্য এতে মেয়েরা যোগ দেয় না, পুরুষরাই নাচিয়া থাকে।

বসরা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। যদি পাঠকগণের ভাল লাগে, তা'হলে পরে "নন্দনকানন" প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের বিবরণ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম বি]

"গৃহিণী —

সহচরঃ---

সখী মিথ্যা——

প্রিয় শিষ্য।

মোসাহেব

মোসাহেব

"আগো আপ্নি হলেন— হাঁ হাঁ তা' বটে, আপ্নি হলেন ঈশ্বর-ই।
এই — আপ্নার কি —হে হে, কর্ত্তা কীর্ত্তি কভু বিস্মরি ?"
মোদের মুখের পরে নিতুই মিঠাবুলির ঝরে ফুলঝুরি,
জানি একঘেয়ে তা', তবুও করে দর্শকের দিল চুরি।
মোদের দাঁতের আগে হাস্য জাগে সম্পদে ও সঙ্কটে,
মোদের হাসির চোটে শুষ্ক ঠোঁটে তাম্বুলের রং চটে।
আবার সুযোগ পেলে হাস্য ছেড়ে অশ্রু ঢালি তিন ঘড়া,
আর রাজার কড়া মেজাজ বুঝে চট্‌তে পারি মনগড়া।
এই বিশাল ভব-সিন্ধু-নীরে গুগ্‌লি মোরা ঘর করি,
মোদের চামড়া বড় শক্ত, তাই তরঙ্গে না ডর করি।
মোদের দেহের মাপে মুখটি বড়, হাঁ-ও বড় মন্দ নয় ;
কেবল মৃত্যুতে বা মৃত্যুভয়ে মুখের ঢাকা বন্ধ হয়।
এই মুখের জোরে আট্‌কে ধরি তুচ্ছেস্থ বন্ধনে
কত স্রোতের টানে, ঝড় তুফানে নেপ্‌টে থাকি প্রাণপণে।

পোলিটিশিয়ান

এই　দেশের ধন্য সন্তান আমি,
　　দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে ;
এই　দেশের লাগিয়া পড়েছি জড়ায়ে
　　কুটিল রাজনীতির ফাঁদে।
তাই　ক্ষুদ্র ঘরের রুদ্ধ বাতাসে
　　রৈতে নারিনু কোণ ঘেঁসে ;
তাই　বক্তৃতা করি হাটে-মাঠে বাটে,
　　বক্তৃতা করি Congressএ।
আজ　অনাহারে মরে অগণ্য প্রজা
　　মহামারী আছে দেশ ব্যেপে,
এখন　একটা যা'হোক্ কর্তেই হবে,
　　কিছু না করে' যে যাই ক্ষেপে।
যদি　ইস্কুল কর, factory কর,
　　স্বাস্থ্যের কর চর্চ্চা বা ;
তাতে　ক্ষতি নাই, তবে ঝঞ্ঝাট বড় ;
　　তা' ছাড়া দেখ না খরচাটা।
তাই　আমি বেছে নিছি সহজ পন্থা,
　　চীৎকার করে দেশ ফাটাই,
শুধু　আবেদন আর নিবেদন করে
　　নির্ভাবনায় রাত কাটাই।
আমি　"দাও, দাও" বলি করুণ কণ্ঠে,
　　মৃদু হেসে বলি "দাও গো, দাও,"
আবার কখনও বা গুরু গর্জ্জিয়া বলি জলদ স্বরে—
　　"জলদি দাও।"
বলি,　"দাও গো চাকরী, ছোট-বড় সব
　　আমাদেরি হাতে দাও ফেলি ;
আর　Councilএর memberই দাও,
　　সৈন্য বিভাগে Colonelই।"
বলি,　"দেশের স্বাস্থ্য উন্নত কর, নইলে যে প্রতি বচ্ছরে,
কত　হাজার হাজার লোক মরে,
　　শুধু Malaria আর মচ্ছড়ে।
কর　নগরে-নগরে পানীয় জলের সুব্যবস্থা সঙ্গত ;
আর　দেশের শিল্প বিস্তার তরে উঠে পড়ে লাগ দিন কত।
আর　Arms Actটা তুলে দাও,
　　কর শিক্ষাটা Compulsory,
আর　Provincial Autonomy, তা' সে
　　দিয়ে ফেলা ভাল সত্বরই।
জানি, চাইলেই পাব ;　না পেলে যে ক্ষতি—
　　না পেলে যে আর রক্ষা নেই !
তাই　চাই প্রাণ খুলে, চাই কান ভুলে,
　　মুক্তি মোদের ভিক্ষাতেই।
শুধু,　কর্তৃপক্ষে শুনবার মত গলার জোরটা দরকারী ;
শুধু　কান্নাকাটিতে, ঠিক করে আছি, গলার
　　হৃদয় সরকারী।
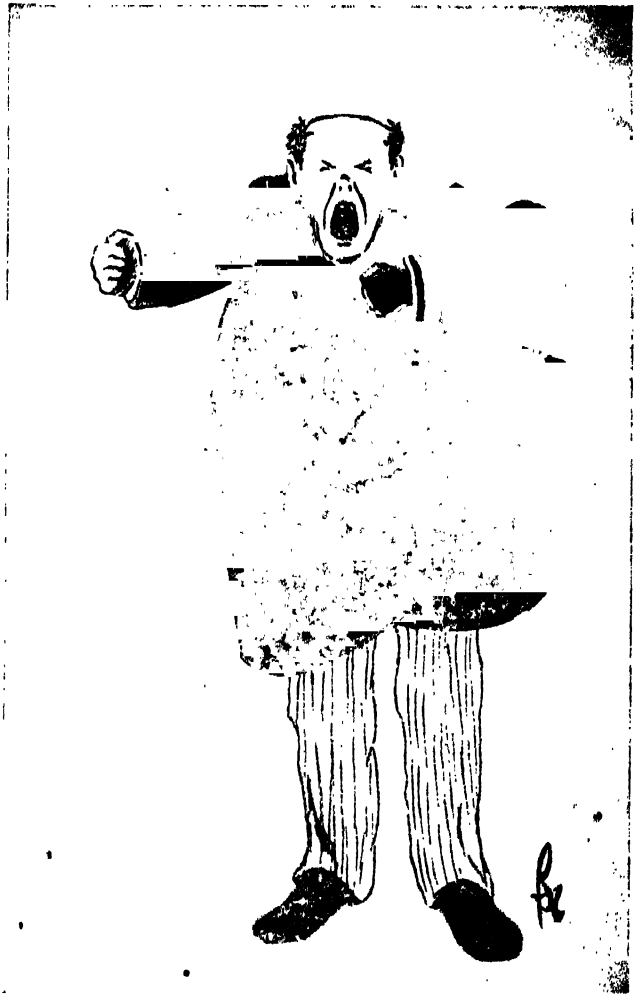
ব্যবসাদার

জীবনে বিষম ভ্রম হ'য়ে গেছে, এবে তার

নাই কোন চারা,

মিছামিছি ভেবে হই সারা।

নোকরী না করে কেন ব্যবসা করিতে গেনু ?

করে হেন কাজ(ও)!

তাই আমি ছোট লোক আজ(ও)!

বাঙালীর জীবনের চিরতর সাধনার লক্ষ্য সুমহান্

করিতে নারিনু সমাধান—

না পরিনু চুড়িদার, লেজ-কাটা খোলা কোট,

চক্‌চকে প্লেট,

রোল্ড গোল্ড বোতামের সেট ;

না পরিনু কোন কালে বিলাতের আমদানী

ফিন্‌ফিনে বুট

সুচিক্কণ বনাতের সুট।

বয়স কাটিল প'রে হাত কাটা বেনিয়ান

ছেঁড়া চটি জুতো,

বসনে বেজায় মোটা সূতো।—

বসিতে আসন পায় কোট-পরা

কেরাণী সে—গোলামীতে দড়,

কোঁচার বহর সে যে বড়।

আর আমি ছ'শ' টাকা বিল নিয়ে দাঁড়াইয়া থাকি

দ্বারদেশে

মোর সাথে বাবুরা না মেশে।

তাই ভাবি, দিই ছেড়ে লাভ-ক্ষতি ভয়ময় নীচ কারবার ;

ভদ্র হয়ে দেখি একবার।

আর কিছু নাহি হয়, শান্তিতে থাকা যাবে, বিনা ভাবনায়,

মাসটি ফুরালে বাঁধা আয়।

ব্যবসাদার

পেটে যদি নাই জুটে দুই মুঠা মোটা ভাত, আফিসেতে বসে'

পাখার বাতাস খাব কসে'।

হায়রে, সময় নেই, মজে আছি বিল আর ভাউচার নিয়ে—

বসে,—দেখি হিসেব মিলিয়ে!

মহামায়ার মায়া

[শ্রীজলধর সেন]

একটু বৃষ্টি হইলে প্রায় সব বাড়ীর আঙ্গিনায় জল দাঁড়ায়, পথে এক হাঁটু কাদা হয়,—গ্রামের নাম কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর। তা' এমন হয়,—কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন, তালপাতার সিপাহীর নাম নরসিংহ - অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠপুর সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা বলা চলে না। যিনি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি এ স্থানের শোভা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নামকরণ করেন নাই। তাঁহার নাম ছিল বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডল; তাই গ্রামের নাম বৈকুণ্ঠপুর। প্রত্নতাত্ত্বিকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এখনও গোপীনাথ মণ্ডলের বাড়ী হইতে পুরাতন দলিলপত্র বাহির করিয়া প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

দুইদশ ঘর সৌভাগ্যবান মানুষ ছাড়া প্রায়ই দেখা যায় যে, এক পুরুষ উপার্জ্জন করেন, সঞ্চয় করেন,—দ্বিতীয় পুরুষ পায়ের উপর পা দিয়া ভোগ করেন, দুইহাতে টাকা উড়ান; তৃতীয় পুরুষের দিন-অন্ন জুটে না। গোপীনাথ মণ্ডলেরও তাই হইয়াছে; তাহার পিতামহ বৈকুণ্ঠ মণ্ডল নীলকুঠীর দেওয়ানী করিয়া বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, জমাজমি বাড়ী-ঘর করিয়াছিলেন, নিজের নামে এই বৈকুণ্ঠপুর গ্রামখানি বসাইয়াছিলেন, সম্ভবমত খরচপত্র, দানধ্যানও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র হরেকৃষ্ণ মণ্ডল একেবারে নবাব হইয়া বসিলেন; বাবুগিরি, ধুমধাম দেখে কে? সৎকার্য্যে সামান্যই খরচ হইল, অসৎ কার্য্যে একেবারে জলের মত টাকা বাহির হইতে লাগিল। হরেকৃষ্ণের আমলের জমাখরচের ফর্দ্দ দাখিল করিয়া আর কাজ নাই। আর দশজন যেমন করিয়া উচ্ছন্ন যায়, হরেকৃষ্ণ সেই মহাজন-পন্থারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে হরেকৃষ্ণ-নন্দন গোপীনাথ পাইয়াছেন সামান্য একখানি জোত, কয়েকটী কোঠাঘর, এবং শূন্যগর্ভ পাঁচটী লোহার সিন্দুক; আর পাইয়াছেন, দেশজোড়া 'বড়মানুষ' নাম, পিতৃ-পিতামহ-কালাগত পালি-পার্ব্বণ, গৃহ-দেবতা নারায়ণ-শিলা, আর একপাল পোষ্য—তাহার মধ্যে কুপোষ্যই বেশী। মণ্ডলেরা জাতিতে সদ্গোপ। গোপীনাথের যখন বিবাহের বয়স হইল, অর্থাৎ যখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর, তখন হরেকৃষ্ণ খুব ঘটা করিয়া ছেলের বিবাহ দিলেন; অতি গরিবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিলেন, সুতরাং পুত্রবধূর সঙ্গে-সঙ্গে বৌমার বিধবা মাতা, বিধবা ভগিনী এবং নাবালক ভ্রাতাকেও গৃহে স্থান দিলেন। কলসীর জল তখনই প্রায় তিনভাগ কমিয়া গিয়াছিল। অনেক বড়-মানুষের ঘরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন তাঁহাদের অবস্থা মলিন হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাঁহারা সেই মলিনতা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ধুমধাম আরও বাড়াইয়া দেন; ভয়—পাছে কেহ দৈন্যের কথা টের পায়। হরেকৃষ্ণ শেষে তাহাই করিলেন। ছেলের বিবাহের পর তিনি যে বার বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন সমানেই চালাইয়াছিলেন; গোপীনাথও কিছু দেখেন নাই,—বড়মানুষের ছেলেরা যাহা করিয়া থাকেন, তাহাই করিয়া সময় কাটাইয়াছেন। তাহার পর একদিন হরেকৃষ্ণের ডাক পড়িল; তিনি চলিয়া গেলেন। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ এবং বড় আদরের আদরিণী একমাত্র পৌত্রী ইন্দিরা, একপাল আত্মীয়,—কেহই তাঁহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিল না।

দুইদিন যাইতে না যাইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল,—হরেকৃষ্ণ দেনায় ডুবিয়া গিয়া বহু আয়াসে বৈতরণী পার হইয়া গিয়াছেন। তা' বলিয়া ত আর এতবড় লোকটার শ্রাদ্ধ বালির পিণ্ডি দিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামের দশজন, কল্যাণকামী পুরোহিত মহাশয়, শুভানুধ্যায়ী শ্যালক নিধিরাম এবং অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই গোপীনাথকে সাহস দিলেন—যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন—যে ষাট হাজার সেই সত্তর হাজার! ষাট হাজার টাকা ঋণ যদি শোধ হয়, তাহা হইলে আর দশহাজারও শোধ হইবে—বাবা ত দ্বিতীয় বার মরিতে আসিবেন না! গোপীনাথ কি করিবেন; দশজনের পরামর্শই গ্রহণ করিলেন—দশহাজার টাকা ধার করিয়া মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করিলেন।

তাহার পর মহাজনেরা সব বেচিয়া-কিনিয়া লইল; যাহা থাকিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(২)

চৈত্রমাসে হরেকৃষ্ণ মণ্ডল মারা গেলেন, বৈশাখ মাসেই গোপীনাথ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মহাজনদিগের ঋণ শোধ করিলেন। অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল যে, খরচপত্র কমাইয়া ধীরে-ধীরে কিছু-কিছু করিয়া শোধ দেওয়া হউক,—গোপীনাথ কাহারও কথা শুনিলেন না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা ব্যতীত ঋণ-শোধের অন্য উপায় নাই। বিলম্ব করিলে ঋণের পরিমাণ বাড়িবে ব্যতীত কমিবে না। এই ঋণ শোধ করিতে গিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব গেল। তিনি দেখিলেন, ভদ্রাসনও রক্ষা করা যায় না। তখন বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের অর্থাৎ তাঁহার মাতার ও স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ভদ্রাসন এবং ছোট একখানি জোত রক্ষা করিলেন। জোতের আর আয় কত? খাজনা-ট্যাক্স্ বাদে বৎসরে সাত-আট শত টাকা তাঁহার ঘরে আসিতে পারে। এই সাত-আট শত টাকাতেই সংসার চালাইতে হইবে। আর ত উপায় নাই!

তাঁহার শ্যালক নিধিরাম, একটা কিছু কারবার করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিল। তিনি বলিলেন, "কারবার করিতে মূলধন চাই। টাকা কোথায় পাইব? আর কারবারের আমি কি জানি?" নিধিরাম কহিল, "দেখ গোপীবাবু, তুমি যাই বল—তোমার মায়ের হাতে, আর আমার দিদির হাতে নিশ্চয়ই কিছু টাকা আছে। তাঁরা এত দিন চাপিয়া রাখিয়াছেন। তোমার অবস্থার কথা ত তাঁরা বুঝ্ছেন। এখন যদি তুমি একটু কাঁদাকাটি ক'রে ধর, তা হ'লেই তাঁরা হাজার দু-হাজার টাকা নিশ্চয়ই বার ক'রে দেবেন।" গোপীনাথ কহিলেন, "না নিধি, তাঁদের হাতে একটী পয়সাও নেই। তাঁদের কাছে টাকা থাক্‌লে কি তাঁরা গয়নাগুলো এমন ক'রে বেচ্‌তে দিতেন?" নিধিরাম কহিল, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না; তাঁদের হাতে টাকা আছেই।" গোপীনাথ কহিল, "না নিধি, এটা তোমার ভুল। এত যে কষ্ট হচ্চে, তা চোখে দেখেও কি তাঁরা চুপ করে থাকতে পারতেন?" নিধি তখন কোন মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিবার পরামর্শ দিল। গোপীনাথ বলিলেন, "সপরিবারে অনাহারে মরিব, তাও স্বীকার; কিন্তু নিধি, আমি ধার করতে পারব না—কিছুতেই না।" নিধি কহিল, "তা হ'লে চলবে কি করে? এত বড় সংসার; তার পর মান-সম্ভ্রম আছে, বারমাসে তের পার্ব্বণ আছে; লোক-লৌকিকতা আছে; এসব হবে কি ক'রে?" গোপীনাথ বলিলেন, "হবে না! যখন ছিল, তখন হয়েছিল; এখন যার সংসার চলাই ভার, তার পক্ষে ও-সকল ত্যাগ করতেই হবে।" নিধিরাম বলিল, "তা'হ'লে আমাদেরও ত পথ দেখ্‌তে হয়। সত্য কথা বলিতে কি গোপীবাবু, তোমাদের আশ্রয়ে এসে আমিও যে তোমাদের মতই হ'য়ে গিয়েছি। লেখাপড়া তেমন শিখ্‌লাম না, কাজকর্ম্মও এতদিন কিছুই করি নাই। তুমিও যেমন কিছু ভাব নাই, আমিও ভাবি নাই। মনে করেছিলাম, সপরিবারে তোমাদের অন্ন ধ্বংস করেই জীবন কাটিয়ে দেব। এ যে তোমাদের বাড়ী, আমার বাড়ী নয়,—এ কথা তোমার বাবা ত একদিনও আমাকে বুঝতে দেন নাই। এখন আমাদেরই বা কি উপায় হবে? আমরাই যে পাঁচ-ছয়টা লোক। এ সময় কোথায় তোমার সাহায্য করব, তা' তোমার উপরই ব'সে খেতে হচ্চে। তার জন্যই ত বল্‌ছিলাম যে, কোন রকমে হাজার দুই তিন টাকা জোগাড় কর; দুই জনে খেটে-খুটে সংসার চালাই। চাই কি মা-লক্ষ্মী একদিন মুখ তুলেও চাইতে পারেন।"

গোপীনাথ বলিলেন, "ভাই, তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছি। সংসারের এই অবস্থা দেখে তুমি কাতর হয়েছ এবং এখানে থাক্‌তে তোমাদের কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্চে। কিন্তু নিধি, তোমরা যেতে পার্‌বে না; আমার আর কেহই নাই। এ সময় কি তুমি আমাকে ফেলে যাবে? সে হবে না ভাই! তোমার বয়স কম, তুমি লেখাপড়াও যা হয় কিছু শিখেছ; তুমি চেষ্টা করলেই কোন স্থানে একটা কাজকর্ম্ম জুঠিয়ে নিতে পার্‌বে; কিন্তু আমার ত আর উপায় নেই। তুমি ত জান, আমি অতি সামান্যই লেখাপড়া শিখেছিলাম; পয়সার ভাবনা ছিল না, আমোদ-আহ্লাদেই দিন কাটিয়েছি। এই আমার বয়স ২৭ বৎসর, এতদিনের মধ্যে মদ, গাঁজা দূরে থাক্, আমি তামাক, পান পর্য্যন্ত খাইনে। শিখ্‌বার মধ্যে শিখেছি গান-বাজনা;—আর ত কিছু জানিনে। যাত্রার দলে বেহালা বাজাবার কাজ ছাড়া আমি আর ত কিছুই কর্‌তে পারিনে। এতকাল পরে

দুটো অন্নের জন্য বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের নাতিকে কি যাত্রার দলে যেতে হবে ? শেষে কি আমার ”

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া নিধিরাম বলিল, “না গোপী-বাবু, সে হবে না ; তা’ তোমাকে কিছুতেই কর্‌তে দেব না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী থাক, আমি এই সংসারের ভার নিলাম। যে ক’রে হোক্ আমি তোমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কর্‌ব,—এ সময় তোমাদের ছেড়ে আমরা কোথায় যাব ? আমাদের ত আর দাঁড়াবার স্থান নেই। তুমি ভেব না। আমি দুই-এক দিনের মধ্যেই কল্‌কাতায় যাচ্ছি। সেখানে আমাদের কত পরিচিত লোক আছে। তাদের কাউকে ধ’রে নিশ্চয়ই একটা কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌ব।” গোপীনাথ বলিলেন, “ভাই, যখন সময় ভাল ছিল, তখন অনেক বন্ধু ছিল ; এখন কি আর কেউ সে কথা মনে কর্‌বে !” নিধি বলিল, “দেখাই যাক্ না। তা’ ব’লে ত ঘরে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। আমার কিন্তু বড় ইচ্ছা যে, একটা ব্যবসা করি। দেখি কি হয়।” গোপীনাথ বলিলেন, “দেখ ভাই নিধি, সব কাজ কোরো,—কিন্তু আমার অনুরোধ, ধার ক’রে কিছু কোরো না—ধারের মত শত্রু আর নেই।” এই কথোপকথনের দুই দিন পরেই নিধিরাম কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(৩)

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ গেল। গোপীনাথ কোন প্রকারে সংসার চালাইতে লাগিল। নিধিরাম কলিকাতায় কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছে, এখনও সফল-মনোরথ হইতে পারে নাই। ভাদ্র মাস পড়িল ; আশ্বিনের প্রথমেই এবার মহামায়ার পূজা। গোপীনাথ স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এবার পূজা করা হইবে না। মণ্ডল-বাড়ী দুর্গোৎসবে যে সমারোহ হইত, তাহা ত একেবারেই অসম্ভব,--কোন প্রকারে মায়ের পূজা করিতে গেলেও যে তিন-চারি শত টাকা লাগে ! এত টাকা তিনি কোথায় পাইবেন ? এ তিন-চারি শত টাকা থাকিলে যে তিনি সপরিবারে তিন চারি মাস খাইয়া বাঁচেন ! না—এবার আর মণ্ডল-বাড়ীতে মহামায়ার আগমন হইবে না।

এই সময় একদিন সন্ধ্যার পর গোপীনাথ বিষণ্ণ মনে বাহিরের বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মাতাঠাকুরাণী সেখানে আসিয়া বলিলেন, “গোপী, বাবা, অমন করে একেলা ব’সে আছ কেন ? ঘরে যে একটা আলোও কেউ দিয়ে যায় নাই,—সন্ধ্যাদীপও বুঝি দেখান হয় নাই !” গোপীনাথ বলিলেন, “না মা, আলোর দরকার নেই, আমি এই আঁধারেই বেশ আছি।”

কথাটা মায়ের বুকে বাজিল। তিনিও যে আজ কয়দিন হইতে আঁধার দেখিতেছেন ! সম্মুখে পূজা !—এতকাল মা আসিয়াছেন,--আর এ বৎসর তাঁহার কোনই আয়োজন হইতেছে না,—এই কথা ভাবিয়া তিনিও কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। আজ সেই কথাটা উত্থাপন করিবার জন্যই তিনি গোপীনাথের নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু গোপী-নাথের কথা শুনিয়া সে প্রসঙ্গ তুলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। গোপীনাথ বুঝিলেন, মাতা কোন বিশেষ কথার জন্য আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, “মা, এ সময় তুমি এ দিকে এলে যে ?” মা বলিলেন, “না, তুমি কি কর্‌ছ, তাই দেখ্‌তে এলাম।” গোপীনাথ বলিলেন, “মা, এবার পূজার কি হবে ? আমি অনেক ভেবে দেখ্‌লাম ; পূজা করা ত অসম্ভব !” মা বলিলেন, “বাবা, সেই কথা বল্‌তেই আমি এসেছিলাম ; কিন্তু এই আঁধারের মধ্যে তোমাকে চুপ করে বসে থাক্‌তে দেখে আমার আর সে কথা তুল্‌তে মন সরছিল না।” গোপীনাথ বলিলেন, “যে রকম অবস্থা হয়েছে মা, তা ত তুমি দেখ্‌তেই পাচ্ছ, বুঝ্‌তেই পাচ্ছ ; কেমন করে যে সংসার চল্‌বে, তাই প্রধান ভাবনা !” মা বলিলেন, “তা কি আর আমি বুঝ্‌ছিনে বাবা ! কিন্তু কি কর্‌বে ! অদৃষ্ট মন্দ, তাই এই ছেলে বয়সে তোমাকে এত কষ্ট পেতে হল, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছি।” গোপীনাথ বলিলেন, “তা হ’লে পূজা এবার বন্ধ থাকুক ; আবার যদি কখন সুদিন আসে, তখন দেখা যাবে। কি বল মা ?” মাতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “এত-কালের পূজা ! কর্ত্তার সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হ’য়ে যাবে ! আর উপায়ও ত দেখ্‌ছি নে। আমার কি বৌমার যদি দু’চারখানা অলঙ্কার থাক্‌ত, তা হ’লে না হয়, তাই দিতাম ; কোন রকমে এবার মাকে আনা যেত। তাও ত নেই। এক ধার-কর্জ্জ,—তা বাবা, তোমাকে করতে দিচ্ছিনে।” গোপীনাথ বলিলেন, “মা, কোন-রকমে পূজা সার্‌তে গেলেও তিন-চারশ’ টাকার দরকার। এত টাকা কোথায় পাব ?” মা বলিলেন, “মা দুর্গা, তোর মনে এই ছিল মা ! যাক্

গোপি, বাবা, তুমি আর ওসব কথা ভেবে মন খারাপ কোরো না। তুমি বেঁচে থাক, তোমার ভয় কি? এ বছর নাই হোলো পূজা, আস্‌ছে বছর হবে। তুমি কিছু ভেব না; জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি!" এই সময় ইন্দিরা "বাবা, বাবা" বলিয়া ডাকিতে-ডাকিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। "বাবা, তুমি এ অন্ধকারে বসে কি কর্‌ছ? আলো আন্‌ব?" গোপীনাথ বলিলেন, "না মা, আলো এনে কাজ নেই। এই আমি মায়ের সঙ্গে ছটো কথা বল্‌ছিলাম।" ইন্দিরা বলিল, "কৈ, দিদি কৈ? আমি যে আঁধারে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।" "এই যে দিদি, আমি এই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি।"

ইন্দিরা তখন ঠাকুরমার নিকটে যাইয়া বলিল, "আলোতে বুঝি তোমাদের কথা হয় না! আঁধারের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়েও ত থাক্‌তে পার! আচ্ছা বাবা, ওরা সবাই বল্‌ছিল, এবার আমাদের বাড়ী পূজো হবে না। কেন হবে না—খুব হবে। দাদামশাই নেই, দিদিমা ত আছে, বাবা ত আছে! পূজো হবে না বল্লেই অমনি হ'লো। বুঝলে বাবা, মা সেই কথা শুনে কাঁদছিল। আমি বল্লাম, 'যাই দেখি বাবার কাছে; পূজো আবার হবে না!' পূজো কর্‌তেই হবে দিদিমা! তুমি কারো কথা শুনো না—বাবা বল্লেও শুনো না। দিদিমা, তুমি যে কথা বল্‌চ না?" দিদিমা অতি ধীর স্বরে বলিলেন "দিদি, কি ক'রে পূজা হবে। আমাদের যে কিছু নেই!" ইন্দিরা বলিয়া উঠিল, "কিছু নেই কি, বাবা আছে, মা আছে, আমি আছি!"

ইন্দিরার কথা শুনিয়া গোপীনাথের যেন কি হইয়া গেল! তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কন্যাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন. "মা আমার, কিছু নেই কি? সব আছে। তুই যখন আছিস্, তখন আমার সব আছে। মা, এবার তোর পূজা! হাঁ, পূজা হবে বৈ কি! তুই যখন আছিস্, তুই যখন আমাকে ছেড়ে যাস্‌নি মা, তখন পূজা হবে বৈ কি! যাও মা, তোমার মায়ের চখের জল মুছিয়ে দেও গে! বোলো এবার পূজা হবে,—এবার আমার মা ইন্দিরার আদেশ, পূজা হবে।" মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "মা, ভেব না; যাঁর পূজা তিনি করবেন। শুন্‌লে না, মা-দুর্গা ইন্দিরার মুখ দিয়ে বল্‌লেন 'আমি আছি'! ও ত ইন্দিরার কথা নয়, মা মহামায়া আজ কন্যারূপে এসে বল্‌ছেন 'ওরে আমি আছি!'"

ঠিক সেই সময়ে এক দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ মুসলমান ফকির একটা বাতি হাতে করিয়া বৈঠকখানার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া জলদগম্ভীর স্বরে বলিল,—"ইয়া পীর মওলা মুস্কিল-আসান, যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান।"

(৪)

পরদিন বেলা এগারটার সময় গোপীনাথ যখন স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "বাবু, একখানি পত্র আছে।" গোপীনাথ বলিলেন, "তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ?" লোকটী বলিল, "কালকাতা থেকে,—সকালের গাড়ীতে এসেছি।" এই বলিয়া সে গোপীনাথের হাতে একখানি পত্র দিল। গোপীনাথ পত্রের শিরোনামা দেখিলেন—তাঁহার পিতার নাম লেখা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "এ চিঠি ত আমার বাবার নামে। তিনি ত চৈত্র মাসে স্বর্গে গিয়েছেন! আহা, তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ যে! ঐ বেঞ্চখানার উপর বোসো। তুমি বুঝি আর কখন বৈকুণ্ঠপুরে এস নি? আগে খবর দিলে ষ্টেসনে লোক পাঠিয়ে দিতাম।"

লোকটী সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে না, আর কখন আসি নি। তা' ইষ্টিসেন থেকে এ আর কতটুকু পথ,—কোশ-দেড়েক হবে; আর যাকে মণ্ডল বাড়ীর নাম বলেছি, সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছে। দু-কোশ পাঁচ-কোশ চল্‌তে আমাদের কষ্ট হলে কি বাবু চলে!" গোপীনাথ তখন বলিলেন, "কে চিঠি লিখেছেন?" লোকটী বলিল, "আমাদের বড় বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় মহাশয়; তিনি কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর রায় মহাশয়ের বড় ছেলে। বড়বাবু মুখে ব'লে দিয়েছেন যে, তিনি আর কর্ত্তা মহাশয় আজ দুইটার গাড়ীতে এখানে আস্‌বেন। আমাকে খবর দিতে পাঠিয়েছেন, আর সন্ধ্যার সময় ইষ্টিসেনে দুইখানি পাল্‌কী ঠিক করে রাখ্‌তে হুকুম দিয়েছেন। কর্ত্তা মহাশয় বৃদ্ধ হয়েছেন, বয়স প্রায় যাটের উপর, শরীরও ভাল নয়। তাই বড়বাবু আমাকে সব ঠিক কর্‌বার জন্য আগে পাঠিয়ে দিলেন।" গোপীনাথ মহা চিন্তায় পড়িলেন। সর্ব্বেশ্বর রায়, সিদ্ধেশ্বর রায়,—এ কোন নামই ত তাঁহার পরিচিত নহে! শুনিলেন

উভয়পার্শ্বে গৈরিকবসনমণ্ডিত যুবক যুবতী ধ্যানমগ্ন ও মধ্যস্থলে
উচ্চ শৃঙ্গোপরি দণ্ডী দণ্ডায়মান।

শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে

সর্ব্বেশ্বর রায় বৃদ্ধ ; তিনি কষ্ট করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এতদূরে তাঁহার বাড়ীতে কেন আসিতেছেন, তাহা গোপীনাথ মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। লোকটাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল। যিনি এত আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে মোটেই জানেন না, এ কথা প্রকাশ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। অথচ যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা কি প্রকার অবস্থার লোক, কেমন ভাবে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য, ইহা জানিতে না পারিলে হয় ত অনেক ক্রটী হইতে পারে। তখন তিনি মনে করিলেন, এই লোকটার নিকট হইতে কৌশলে সমস্ত কথা জানিয়া লইতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?" লোকটি বলিল, "আমার নাম শ্রীরজনীকান্ত দাস। আমি রায়-বাবুদের চাকর। যখন যেখানে চিঠিপত্র নিয়ে যেতে হয়, কি সঙ্গে যেতে হয়, তাই আমি করি। কর্ত্তা, বড়বাবু, ছোটবাবু সকলেই আমাকে কৃপা করেন।" "তুমি কত বেতন পাও ?" "আজ্ঞে সাত টাকা মাহিনা পাই, আর খেতে পাই। মফস্বলে চিঠিপত্র নিয়ে গেলে কিছু-কিছু পাই ; তার পর বিপদ-আপদে কর্ত্তাই আছেন। এই ত কর্ত্তা কাশীবাস করতে যাবেন ; তা আমাকে বলেছেন, 'রজনী, তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' কর্ত্তার ত কাশী যাওয়ার সব ঠিক ; এই দুচার দিনের মধ্যেই যাবেন ; বাঁধা-ছাঁদা সব হচ্চে। সেখানে বাড়ী পর্য্যন্ত ভাড়া করা হয়েছে। তার মধ্যে কি না, আজ খুব ভোরে উঠে বড় বাবু আমায় ডেকে বল্লেন, 'দেখ্ রজনী, তোকে এখনই বৈকুণ্ঠপুর যেতে হবে, —এই সাতটার গাড়ীতে।' তার পর পথ-ঘাটের কথা বলে দিলেন। কর্ত্তা বুড়া মানুষ, কোথাও যান না ; এই যে কাজ-কর্ম্ম, বিষয়-আশয়, এত বড় কল্‌কাতার আড়ত,—সব বড় বাবু দেখেন-শোনেন। কর্ত্তা একেবারে কাশীবাসী হ'তে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে আজ সকালে হুকুম হোলো, তাঁরা এখানে আপনার বাড়ীতে আস্‌বেন। বড়মানুষের মরজি—কখন কি হয় তা ত বলা যায় না। পত্রখানি পড়ে দেখুন, তাতে বোধ হয় সব কথা খোলসা লেখা আছে।" গোপীনাথ তখন পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন ; তাহাতে লেখা আছে—

শ্রীশ্রীহরি
সহায়।

সবিনয় নিবেদন,—

আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর রায় মহাশয় কোন বিশেষ কারণে অদ্য অপরাহ্নের গাড়ীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শরীরও তেমন ভাল নহে ; এই জন্য আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব। ষ্টেসন হইতে আপনার বাড়ীতে গমনের, এবং আগামী কল্য প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করিবার জন্য রজনী দাসকে এই পত্রসহ পাঠাইলাম। সবিশেষ সাক্ষাতে নিবেদন করিব। অত্র কুশল, মহাশয়ের পারিবারিক কুশল কামনা করি। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়
শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নাই ; অথচ যে বৃদ্ধ কাশী গমন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি হঠাৎ পুত্র সঙ্গে করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে কেন আসিতেছেন, তাহা গোপীনাথ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি রজনী দাসকে বলিলেন, "তা হ'লে দাসের পো, বেলা অনেক হয়েছে ; স্নান-আহার ক'রে বিশ্রাম কর। তাঁদের ষ্টেসন থেকে আন্‌বার সমস্ত ব্যবস্থা আমিই ঠিক করে রাখব ; তার জন্য তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।" এই বলিয়া তিনি রজনীকে চাকরের জিম্মা করিয়া দিয়া, নিজে স্নান-আহারে গমন করিলেন। আজ আর তাঁহার বিশ্রাম করিবার সময় নাই। পূর্ব্বের মত অবস্থা থাকিলে দু'দশজন বড়মানুষের অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইত না। কিন্তু এখন ত আর সে অবস্থা নাই ! সুতরাং সবই নিজেকে দেখিয়া-শুনিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর্থিক অবস্থা যাহাই হউক, পিতৃপিতামহের নাম ত এখনও লোপ পায় নাই। বিশেষতঃ, রজনীর নিকট যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারিলেন, যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক, কলিকাতার অধিবাসী ; তাঁহাদের পদমর্য্যাদার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তাই আহারান্তেই তিনি লোকজন ডাকাইয়া বৈঠকখানার আবর্জ্জনা দূর করিলেন ; ফরাস পাতাইলেন ;

বিক্রয়াবশিষ্ট যে কয়েকটী আলো ছিল, তাহা যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন। অবস্থা মলিন হইলেও, এখনও ডাকিলে দশজন লোক মণ্ডল-বাড়ীতে আসে, এবং কাজটা, কর্ম্মটা করিয়া দেয়। এই প্রকারের দুই-চারিজন অনুগত লোককে ডাকাইয়া বাড়ী-ঘর একটু পরিষ্কার করাইয়া লইলেন। পুকুর হইতে মাছ ধরাইবার ব্যবস্থা করিলেন; আহার্য্য দ্রব্যও যথাসাধ্য সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর ভাবিলেন, ভদ্রলোকেরা যখন পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিয়াছেন, তখন ষ্টেসনে কেবল পাল্‌কী ও লোক পাঠাইয়া দেওয়াই ভাল দেখায় না। অপরিচিত বড়লোক, কলিকাতার বাবু লোক,—হয় ত তাহা অভ্যর্থনার ত্রুটী বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাই তিনি তিনখানি পাল্‌কীর ব্যবস্থা করিলেন। নিজেদের যে কয়খানি পাল্‌কী ও যে দুইটা ঘোড়া ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন,—বিলাসিতার যাহা কিছু আসবাব, সে সমস্তই বিদায় করিয়াছিলেন। এই সকল ব্যবস্থা করিতে-করিতেই বেলা চারিটা বাজিয়া গেল; তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া পাল্‌কীতে চড়িয়া ষ্টেসনে গেলেন—অপর দুইখানি পাল্‌কী পূর্ব্বেই রজনী দাসকে সঙ্গে দিয়া ষ্টেসনে পাঠাইয়াছিলেন। যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেসনে আসিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী কক্ষ হইতে একটা বৃদ্ধ ও একটী যুবক অবতরণ করিলেন। গোপীনাথ সেই দিকে অগ্রসর হইলে রজনী দাস কর্ত্তাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়, বাবু আপনাদের নিতে নিজেই এসেছেন।" তখন গোপীনাথ তাঁহার সম্মুখে যাইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমার নাম শ্রীগোপীনাথ মণ্ডল; আমি স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র।" বৃদ্ধ সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "এস বাবা, বেঁচে থাক। তোমার বাবা বেঁচে নেই। আমি সে খবর জানিনে, তিনি আর আমি এক-বয়সী ছিলাম; আমিই হয় ত একটু বড় ছিলাম। হরেকৃষ্ণ আমাকে 'সর্ব্ব-দা' ব'লে ডাক্‌ত। সে কি আজকের কথা বাবা! এখন চল, তোমার বাড়ী যাই। আজ বড় আশা করে এসেছিলাম, হরেকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হবে; সে দেখ্‌ছি আগেই চলে গিয়েছে। তোমাদের বাড়ী এখান থেকে কত দূর বাবা?" "এই ক্রোশ দেড়েক; আমি পাল্‌কীর ব্যবস্থা করেছি।" সর্ব্বেশ্বর বাবু সিদ্ধেশ্বর বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "এইটী আমার বড়-ছেলে, সিদ্ধেশ্বর।" গোপীনাথ সিদ্ধেশ্বর বাবুকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর সকলে ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া পাল্‌কীতে চড়িলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে যে দুইজন চাকর ও একজন দ্বারবান আসিয়াছিল, তাহারা রজনী দাসের সঙ্গে পদব্রজে চলিল।

(৫)

বাড়ীতে পৌছিয়া বিশ্রামান্তে হাত-মুখ ধুইয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু যখন ফরাসে বসিতে যাইবেন, তখন গোপীনাথ বলিলেন "একটু জলযোগ কর্‌তে হবে। আমাদের এ পাড়াগাঁ, এখানে ত আপনার অভ্যর্থনার উপযুক্ত কিছুই মেলে না; তবে যখন দয়া করে পায়ের ধূলো—" গোপীনাথের কথায় বাধা দিয়া, তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "বাব', তুমি জান না, তোমাদের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ। তা জান্‌লে এমন কথা বল্‌তে না। যাক্‌ এখন চল, একটু জল খেয়েই আসি।" এই বলিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবু ও গোপীনাথকে সঙ্গে লইয়া তিনি অন্দরের একটা ঘরে গেলেন। সেখানে দেখেন, তাঁহাদের পিতাপুত্রের জন্য প্রচুর জলযোগের আয়োজন হইয়াছে। সর্ব্বেশ্বর বাবু তখন গোপীনাথকে বলিলেন, "বাবা গোপীনাথ, এ তুমি কি করেছ? আমাকে তোমরা কি মনে করেছ? তুমি তা' হলে কিছুই জান না। আমি যে এ বাড়ীর চাকর।" এই বলিয়া তিনি মৃত্তিকা-আসনে বসিয়া পড়িলেন। গোপীনাথ ও সিদ্ধেশ্বর বাবু অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছ না; সিদ্ধেশ্বর, তুমিও কিছু বুঝতে পারছ না। আমি সত্য-সত্যই এ বাড়ীর চাকর-সামান্য চাকর—এক টাকা বেতনের চাকর। আমার জন্য এ অভ্যর্থনার আয়োজন ক'রে গোপী, তোমার পিতামহের অপমান কোরো না। তোমরা বোসো, আমার কথা শোন।" গোপীনাথ বলিলেন, "আপনি ঐ আসনের উপর ব'সে যা বল্‌বার বলুন না।" সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "না, না,—আগে আমার কথা শোন। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ যে, তোমার পিতামহ স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ মণ্ডল মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার হাজিপুরের নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। তিনি যে বছর কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে আসেন,

তার দুই বছর আগে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন আমার কেউ ছিল না—আমি নিরাশ্রয় ছিলাম;—ভিক্ষা করে খেতে-খেতে হাজিপুরে যাই। তখন আমার বয়স বার কি তের বছর; তোমার বাবারও বয়স তখন দশ-এগার। মণ্ডল মহাশয় আমার দুরবস্থা দেখে দয়া করে আমাকে আশ্রয় দেন; আমি তাঁর চাকর হয়ে থাকি। তিনি আমাকে মাসে এক টাকা বেতন দিতেন, আর খেতে-পরতে দিতেন। আমি তখন অতি সামান্য লেখাপড়া জান্‌তাম। দুই বছর তাঁর কাছে থাকি। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাস্‌তেন। আমি তিলির ছেলে; তাই তিনি আমাকে দিয়ে সামান্য চাকরের কাজ করাতেন না; আমি হাটবাজার কর্‌তাম, তোমার বাবার সঙ্গে-সঙ্গে থাক্‌তাম। তার পর তিনি যখন কর্ম্ম ত্যাগ করে দেশে আসেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে এখানে আস্‌তে চেয়েছিলাম। তিনি তাতে সম্মত হন নাই। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখ সর্ব্ব, তোমার ভাল হবে, তোমার উন্নতি হবে, তোমার এ অবস্থা থাক্‌বে না!' তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি তিলির ছেলে, চাকরের কাজ আমার নয়। এই ব'লে তিনি আমাকে পঞ্চাশটী টাকা দিয়ে বলেছিলেন 'সর্ব্ব, এই টাকা কয়টী দিয়ে একখানা দোকান কোরো, আর কারো চাক্‌রী কোরো না। আমি তোমাকে এই মূলধন দিয়ে গেলাম। সৎপথে থেকে কাজ কোরো, তোমার উন্নতি হবে।' আমি সেই মহাপুরুষের উপদেশ গুরুবাক্য ব'লে গ্রহণ করেছিলাম। তারই থেকে আজ আমার এই অবস্থা। তাঁরই আশীর্ব্বাদে আজ আমার জমীদারী; তাঁরই আশীর্ব্বাদে আজ আমি সর্ব্বেশ্বর রায়;—তাঁরই মূলধনে আজ আমি ধনী। তিনি আজ স্বর্গে, তাঁর ছেলে হরেকৃষ্ণ আজ স্বর্গে; আমি কি তাঁর বাড়ীতে এসে আসনে বসে জলযোগ কর্‌তে পারি! অমন কথা বোলো না গোপীনাথ! আমি কত আশা করে এসেছিলাম—হরেকৃষ্ণ তাঁর ছেলেবেলার সঙ্গী সর্ব্ব-দাকে দেখে কত আনন্দ কর্‌বে। আর—যাক্, সে কথায় আর এখন কাজ নেই। বাবা গোপীনাথ, তুমি তোমার মাকে ডাক; তিনি এসে হাতে তুলে আমাকে কিছু দেন; আজ চল্লিশ বছর পরে আমার মনিব-বাড়ীর প্রসাদ পেয়ে আমরা বাপ-বেটায় কৃতার্থ হয়ে যাই। শোন গোপীনাথ, তুমিও শোন সিদ্ধেশ্বর, সেই ছেলেবেলায়,—সেই যখন আমরা হাজিপুরে ছিলাম, তখন হরেকৃষ্ণ আমাকে 'সর্ব্ব-দা' ব'লে ডাকৃত। তার পর আমি সে ডাক ভুলে গিয়েছিলাম। এই চল্লিশ বৎসর কেউ আমাকে 'সর্ব্ব-দা' বলে ডাকে নাই। আমি মহা অপরাধী; চল্লিশ বছর তোমাদের কথা ভুলে ছিলাম—একেবারে ভুলে ছিলাম। কাল রাত্রিতে একটা মেয়ে—স্বপনে নয় বাবা—আমি তখন বেশ জেগে ছিলাম—আমি সজ্ঞানে ছিলাম;—তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা কি আটটা—একটা ছোট মেয়ে, এই চল্লিশ বছর পরে আমার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে বল্‌লে, 'সর্ব্ব-দা, কাশী যাচ্ছ; বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের ধার কি শোধ করবে না,—তাদের যে বড় কষ্ট; তাদের বাড়ী এবার পূজো যে হয় না!' দেখ, আজ চল্লিশ বছর 'সর্ব্ব-দা' ব'লে কেউ ত আমায় ডাকে নাই। কাল কে সে মেয়ে, আমাকে সেই নাম ধ'রে ডাক্‌লে! স্বপ্ন নয় বাবা,—কিছুতেই স্বপ্ন নয়! আমার মত মহা অপরাধীকে অপরাধের কথা জানিয়ে দেবার জন্য কে আমাকে দয়া করেছিলেন? সেই জন্যই আজ চল্লিশ বছর পরে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। আমার সবই ত তোমাদের গোপীনাথ! তাই আমি তোমাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি;—বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের চাকর আজ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তোমার মাকে হুকুম করতে বল বাবা! আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হোক।" গোপীনাথ অশ্রুপূর্ণনয়নে বৃদ্ধ সর্ব্বেশ্বর বাবুর হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "আপনি না হয় ঠাকুরদাদার চাকর ছিলেন; কিন্তু আমার বাবার ত 'সর্ব্ব-দা'! আমার ত জ্যেঠামশাই! আমি যে আজ বাপ হারিয়ে জ্যেঠামশাইকে পেয়েছি! আপনি সেকালের চাকর হতে পারেন; আজ যে আপনি আমার জ্যেঠামশাই! এই সম্পর্কই আজ ধরুন। আমি বিপন্ন, আমার বিষয়-আশয় সব বেচে আমি বাবার ঋণ শোধ করেছি; তাই আজ আমি দরিদ্র, তাই আজ আমি আমার জ্যেঠামশাইকে—" গোপীনাথের কথায় বাধা দিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "তাই আজ জ্যেঠামশাই তাঁর ঋণের সামান্য অংশ শোধ দিতে এসেছে।" গোপীনাথ বলিলেন, "জ্যেঠামশাই, আমার কথা ত আপনি শুনবেন না; তা হ'লে যে আপনাকে 'সর্ব্ব-

দা' ব'লে ডেকে জোর ক'রে হাত ধ'রে নিয়ে বসাতে পারে, তাকেই ডাকি।" "সে কে বাবা গোপীনাথ!" "সে আমার মেয়ে ইন্দিরা" এই কথা বলিয়া গোপীনাথ ডাকিলেন, "মা ইন্দিরা, এদিকে এস মা! দেখে যাও তোমার আর এক দাদামশাই এসেছেন।" ইন্দিরা, তাহার মা, তাহার ঠাকুরমা এবং বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা সকলেই পাশের ঘর হইতে সমস্ত শুনিতেছিলেন। পিতার আহ্বান শুনিয়া ইন্দিরা ধীরে ধীরে আসিয়া গোপীনাথের পার্শ্বে দাঁড়াইল। সর্ব্বেশ্বরবাবু মুখ তুলিয়া চাহিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌ছ! এই তোমার মেয়ে ইন্দিরা!" তাহার পরই বৃদ্ধ দৌড়িয়া গিয়া ইন্দিরাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "দিদি! সর্ব্ব-দার অপরাধ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তুই-ই না কা'ল আমার কাছে গিয়েছিলি! গোপীনাথ! সিদ্ধেশ্বর! এই ইন্দিরাই কা'ল আমার কাছে গিয়েছিল! আমাকে 'সর্ব্ব-দা' বলে ডেকে আমার ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এসেছিল! মা মহামায়া! তুমি কা'ল আমার এই দিদির রূপ ধরে মণ্ডল বাড়ীর পূজা আদায় করতে গিয়েছিলে মা! বুড়া সর্ব্বেশ্বরের উপর তোমার এত করুণা—মা করুণাময়ী! আয় দিদি! আয় আমার মহামায়া! আয়—" বৃদ্ধ সর্ব্বেশ্বর রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন।

বাদশাহী কথা

(সমসাময়িক আলেখ্য হইতে)

(২)

[অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রত্নতত্ত্ববাগীশ বি-এ]

(বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে আমরা বৈদেশিকের বর্ণনা হইতে শাহান্ শাহ দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরোবার দরবারের এক চিত্র দিয়াছি। এবার আমরা, আব্দুল হামিদের পাদিশানামায় যেরূপ ভাবে শাহজাহান দৈনিক সময়াতিপাত করিতেন, তাহারই চিত্র প্রদান করিতেছি। এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের পুস্তকের উপর অধিকাংশই নির্ভর করা হইয়াছে। বারান্তরে আমরা আওরংজেবের দৈনন্দিন জীবন আলোচনা করিব।)

রাত্রি থাকিতে-থাকিতে শাহজাহান শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য সমাপন করিতেন। তৎপরে তিনি মক্কার দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা ও কুরাণের শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। অতি প্রত্যূষে তিনি প্রাসাদ-মসজেদে নিয়মানুযায়ী প্রার্থনা শেষ করিয়া রাজকার্য্যে ব্রতী হইতেন।

সর্ব্বপ্রথমে তিনি প্রজাবর্গকে সন্দর্শন দিতেন। আগ্রা-দুর্গের পূর্ব্বপ্রাচীরে গবাক্ষ সন্নিকটে উপবেশন করিলে লক্ষ লক্ষ প্রজা যমুনাকূলে সমবেত হইত। সূর্য্যোদয়ের দুই দণ্ডের পরে বাদশাহ এই স্থানে উপনীত হইলে সেই জনসঙ্ঘ নত মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলে বাদশাহ গবাক্ষ পরিত্যাগ করিতেন। এইস্থানে তিনি আবেদন-নিবেদনও শ্রবণ করিতেন। বাদশাহ এই স্থানে জনসাধারণের পক্ষে সহজগম্য ছিলেন এবং বিনা উৎকোচেই প্রজাবৃন্দ নিজ-নিজ অভিযোগ তাঁহার কর্ণগোচর করিতে পারিত। ঝরোকা হইতে একটী সূত্র লম্বমান থাকিত এবং সেই সহযোগে দরখাস্তসমূহ বাদশাহের সম্মুখে নীত হইত। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যতক্ষণ বাদশাহের সন্দর্শন লাভ না করিতেন, ততক্ষণ জলস্পর্শ করিতেন না, বা কোন কার্য্যেও ব্রতী হইতেন না।

তৎপরে হস্তিযুদ্ধ হইত। হস্তিযুদ্ধ বাদশাহ ব্যতীত অন্য কেহই আদেশ করিতে পারিতেন না। শাহজাহান এই হস্তিযুদ্ধ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ-উপভোগ করিতেন। অনেক সময় এই স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়াই বাদশাহ যুদ্ধাশ্ব পরিদর্শন এবং হস্তী ও অশ্বের লড়াই দেখিতেন।

তৎপরে বাদশাহ দেওয়ানী-আমে গমন করিতেন। ইহাই ছিল প্রকাশ্য দরবার। বাদশাহের দক্ষিণে ও বামে তাঁহার পুত্রগণ দণ্ডায়মান (এবং আদিষ্ট হইলে উপবেশন করিতেন) থাকিতেন। কক্ষে আমীর, ওমারাহ,

পদস্থ ব্যক্তিগণ সম্রাটের দিকে মুখ করিয়া দণ্ডায়মান থাকিতেন। তাঁহার শরীর-রক্ষিগণ তাঁহার উভয় পার্শ্বে থাকিতেন।

এবম্প্রকারে ২০১ ফীট দীর্ঘ ও ৬৭ ফীট প্রশস্ত কক্ষটী জনপূর্ণ হইত। কিন্তু সমবেত জন-সঙ্ঘের পক্ষে এই কক্ষ সুপ্রশস্ত ছিল না। তাই নিম্নপদস্থ ব্যক্তিগণ, এবং তীরন্দাজ ও বন্দুকধারী শরীর-রক্ষিগণ অঙ্গনে থাকিত। কক্ষের দ্বারে ও অঙ্গনের চতুষ্পার্শস্থ রেলিংয়ের ধারে বিশ্বাসী সোটাবর্দ্দার ও অস্ত্রধারী সিপাহী প্রহরীর কার্য্য করিত।

পশ্চাদ্দেশস্থ দ্বার-পথে ৭টা ৪০ মিনিটের সময় বাদশাহ দেওয়ানী-আমে প্রবেশ পূর্ব্বক গদীতে উপবিষ্ট হইলে রাজকার্য্য আরম্ভ হইত। এই স্থানে দরবারের কার্য্যাদি সম্পন্ন হইতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লাগিত।

মীরবক্‌সী সামরিক কর্ম্মচারী বা মন্‌সবদারগণের দরখাস্তসমূহ বাদশাহের নিকট পেশ্ করিলে বাদশাহ তৎক্ষণাৎ তৎসম্বন্ধে আদেশ দিতেন। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত কর্ম্মচারিবৃন্দ এই স্থানেই বাদশাহের দর্শন-লাভ করিতেন, নব-নিয়োজিত কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ-কর্ত্তৃক বাদশাহের সহিত পরিচিত হইতেন। এই সকল অধ্যক্ষ তাঁহাদের অধীন ব্যক্তিগণকে রাজকীয় অনুগ্রহ ও সম্মানের জন্য সুপারিশ করিতেন। অধিকাংশ স্থলেই উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ খিলাত বা অন্য কোন উপহার প্রাপ্ত হইতেন।

তৎপরে বাদশাহের খাস্ জনপদ বা তহবিলের কেরাণীগণ নিজ-নিজ বিভাগীয় অধ্যক্ষগণের প্রমুখাৎ বক্তব্য জ্ঞাপন ও তৎক্ষণাৎ হুকুম গ্রহণ করিতেন। তখন, বিশেষ প্রিয়পাত্র কর্ম্মচারিগণ, রাজপুত্র ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, ফৌজদার, দেওয়ান প্রভৃতির পত্র পেশ ও সঙ্গে-সঙ্গে প্রেরিত উপহার দাখিল করিতেন। রাজপুত্র ও প্রধান অমাত্যগণের পত্রগুলি বাদশাহ স্বয়ং পাঠ করিতেন, অথবা তাঁহাকে পড়িয়া শুনান হইত। তৎপরে মীরসদর অন্যান্য সদরগণের পত্র পাঠ এবং সৈয়দ, শেখ, ধার্ম্মিক ব্যক্তি ও ছাত্রগণের কথা নিবেদন করিলে, বাদশাহ এই সকল আবেদনকারীর অবস্থানুযায়ী দান করিতেন। অতঃপর, পূর্ব্ববর্ত্তী হুকুমসমূহ দ্বিতীয়বার অনুমোদিত হইত। এই সকল আর্জী পেশ করিবার জন্ত একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন।

তৎপরে, রাজকীয় মন্দুরার তত্ত্বাবধায়কগণ হস্তী ও অশ্বসমূহ ও তাহাদের নির্দ্ধারিত আহার্য্য বাদশাহের সম্মুখে প্রদর্শন করিতেন। যে সকল তত্ত্বাবধায়ক রাজকীয় অর্থের অপব্যবহার করিয়া ঐ সকল পশুর আহার্য্য চুরি করিত, তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্যই আকবর কর্ত্তৃক এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অশ্ব বা হস্তী দুর্ব্বল হইলে নিয়োজিত কর্ম্মচারী তিরস্কৃত হইতেন এবং তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট অর্থ বাজেয়াপ্ত হইত। ওমরাহদিগের নিয়োজিত সৈন্যগণের অশ্বাদিও এইরূপে পরীক্ষিত হইত।

দশ ঘটিকার কিছু পূর্ব্বে বাদশাহ দেওয়ানী খাসে গমন করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইতেন। এই স্থানে তিনি স্বহস্তে বিশেষ প্রয়োজনীয় দরখাস্তের উপর হুকুম লিখিতেন। রাজমন্ত্রিগণ সম্রাটের আদেশানুসারে অন্যান্য উত্তরের খসড়া প্রস্তুত করিতেন। এই সকল খসড়া পরে বাদশাহ কর্ত্তৃক সংশোধিত হইয়া অন্তঃপুরে মুমতাজমহালের নিকট মোহরের জন্য প্রেরিত হইত।

খাস্ ভুমি-সম্বন্ধীয় আবশ্যক সংবাদ সম্রাট্ এই স্থানেই শ্রবণ করিতেন। বিশেষ নিঃস্ব, দীন প্রভৃতির জন্য দানের হুকুমও এই স্থানে হইত। অতঃপর, তিনি সুচতুর শিল্পীর কার্য্য পরিদর্শন করিলে প্রাসাদাদির নক্‌সা তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত হইত এবং তিনি এই সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। সরকারী পূর্ত্ত বিভাগের অধ্যক্ষ ও বিশেষজ্ঞ স্থপতিগণ এই সময়ে বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইয়া আদেশ গ্রহণ করিতেন।

কোন কোন সময়ে বাদশাহ শিকারের চিতা, বাজপক্ষী প্রভৃতি পরিদর্শন করিতেন।

এই সকল কার্য্য সমাপনান্তে বাদশাহ 'শাহবুর্জ্জে' গমন করিয়া বিশেষ গোপনীয় কার্য্য সমাধা করিতেন। কেবল রাজপুত্র ও বিশ্বস্ত কয়েকজন কর্ম্মচারীর এই স্থানে প্রবেশাধিকার ছিল। ভৃত্যবর্গকে কক্ষের বহির্দ্দেশে থাকিতে হইত।

প্রায় দ্বিপ্রহরে বাদশাহ অন্তঃপুরে গমন করিয়া নমাজ করিতেন; তৎপরে আহার করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন। শাহজাহান সাধারণতঃ বিলাসপ্রিয় হইলেও অন্তঃপুরেও নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। দরিদ্র বিধবা, অনাথ ও অন্যান্য অনেক নিঃস্ব ব্যক্তির কন্যাদি বাদশাহের নিকট

ভিক্ষার্থ অন্তঃপুরে আগমন করিত। ইহাদের দরখাস্ত প্রথমে মুমতাজমহালের নিকট পেশ হইলে, তিনি বাদশাহকে নিবেদন করিতেন, এবং বাদশাহ প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী দান করিতেন। এবম্প্রকারে প্রত্যহ প্রচুর অর্থ বিতরিত হইত।

তিনটার পরে বাদশাহ পুনর্ব্বার নমাজ করিতেন; এবং কোন-কোন দিবস দেওয়ানী-আমে গমন করিয়া কিছু রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তৎপরে পুনর্ব্বার দেওয়ানী-খাসে আসিয়া সমবেত রাজকর্ম্মচারিগণের সহিত সান্ধ্য-নমাজে যোগদান করিতেন। নমাজান্তে দেওয়ানী-খাসে সহস্র-সহস্র বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত হইয়া সুগন্ধ বিকীর্ণ করিত। সম্রাট্ এই সময় প্রথমে রাজকার্য্য ও পরে আমোদে অতিবাহিত করিতেন। তিনি সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন এবং কদাচিৎ নিজেও কণ্ঠ-সঙ্গীতে যোগদান করিতেন। শাহজাহান স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

রাত্রি আট ঘটিকার নমাজ হইলে বাদশাহ পুনরায় শাবুজে গমন করিয়া গোপনে মন্ত্রণা করিতেন। সার্দ্ধ আট ঘটিকার সময় পুনর্ব্বার অন্তঃপুরে গমন করিতেন। তথায় দুই-তিন ঘণ্টা স্ত্রীকণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীত সুধা পান করিয়া তিনি নিদ্রায় মগ্ন হইতেন। ছয় ঘণ্টা তিনি নিদ্রায় অতিবাহিত করিতেন।

সপ্তাহে দুই দিন—শুক্রবার ও বুধবার ব্যতীত, অন্য কয়দিবসেই এইরূপে দৈনন্দিন ব্যাপার সমাধা হইত। শুক্রবার পবিত্র দিবস, সেদিন আর দরবার হইত না। বুধবার বিচারের জন্য নির্দ্ধারিত ছিল। এই দিন দেওয়ানী-আমে আর দরবার হইত না; কিন্তু বাদশাহ ঝারোকা হইতে দেওয়ানী-খাসে উপস্থিত হইতেন। রাজকীয় কর্ম্মচারিবৃন্দ ক্রমান্বয়ে এক-একটি বাদীকে বাদশাহের সম্মুখে আনয়ন করিলে তিনি ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আদেশ করিতেন। অতি দূর-দেশান্তর হইতে বিচার-প্রার্থী সমবেত হইত। এরূপ ক্ষেত্রে বাদশাহ শাসনকর্ত্তাদিগকে সত্যানুসন্ধানের জন্য আদেশ করিতেন এবং হয় ন্যায় বিচার করিতে, অথবা যথাযথ ঘটনার বিবরণ সহ প্রার্থীদিগকে রাজধানীতে প্রেরণের আদেশ করিতেন।

ইহা বাদশাহের নিত্য-নিয়মিত কার্য্য ছিল। তদ্ব্যতীত, নগরমধ্যে অশ্বারোহণে ভ্রমণ, রাজকীয় বজরায় যমুনায় বায়ু সেবন, শিকার, নানাপ্রদেশে ভ্রমণ—আবশ্যকমত বাদশাহ এগুলিও সম্পাদন করিতেন।

যাহা হউক, উল্লিখিত সকল বিবরণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাদশাহের অদৃষ্টে ভোগ অপেক্ষা ক্লেশই পরিমাণে অধিক ছিল। বাদশাহের জীবন ক্লেশকর হইলেও শাহজাহানের প্রজাবর্গ যে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি ভোগ করিত, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই; এবং বাদশাহের পরিশ্রমই যে প্রজাবর্গের সুখের মূলীভূত কারণ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

রমণী-হৃদয়

[শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ]

মুখবন্ধ।

সম্পাদক মহাশয় তাগিদ দিতেছেন—শারদীয়া পূজার সংখ্যায় একটা ছোট গল্প চাই-ই। কিন্তু প্লট কোথায় পাই? প্লট ত আর সম্পাদকীয় তাগাদায় মাথায় আসে না। আর রবীন্দ্রনাথ হইতে চুনা-পুঁটি সকলে মিলিয়া বাঙ্গালী-জীবনের প্রায় সকল দিকই নিঃশেষ করিয়া দেখাইয়া ফেলিয়াছেন। তা'ছাড়া বাঙ্গালীর শান্ত, বৈচিত্র্যহীন জীবনে প্রতিদিন নূতন গল্প লেখার মত আধানবস্তু পাওয়া শক্ত; তাই আমাদের দেশের ছোট গল্পগুলি ক্রমশঃ একঘেয়ে এবং নকলের নকল হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সমাজ, আমাদের জীবন, আমাদের কর্ম্ম-ক্ষেত্র এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের অবকাশ বড় কম। য়ুরোপের বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে গল্পের যে উপাদান আছে—তাহা অশেষ;—তাই য়ুরোপীয় লেখকদের ছোট গল্পগুলি বিচিত্রতায় পূর্ণ, একঘেয়ে হইবার সম্ভাবনা অল্প। তা'

বলিয়া আমি এমন কথা বলি না যে, বৈচিত্র্যই ছোট গল্পের প্রাণ এবং বর্ত্তমান য়ুরোপীয় লেখকদের ছোট গল্প-গুলিকেই আমাদের আদর্শ করিতে হইবে। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য, আমাদের মত ক্ষুদ্র লেখকদের একটা সাফাই দেখান মাত্র। আমি জানি যে, কৃতী শিল্পীর হাতে পড়িলে আমাদের এই শান্ত জীবনের কাহিনীই কাব্য হইয়া উঠে। কিন্তু সে সোণার 'কাঠি ত আর সকলের হাতে নাই। তা বলিয়া উপায় নাই—লিখিতেই হইবে।

সে দিন খুব মেঘ করিয়াছিল—সমস্ত দিন অফিসে কলম পিশিয়া সন্ধ্যার পর ইজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্রে আমি এই সব কথা ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ মনে পড়িল ভাদ্রমাস আরম্ভ হইয়াছে; সম্পাদক মহাশয় আমাকে যে সময় দিয়াছেন, তার ত আর দেরী নাই। এবার তাঁহাকে নিরাশ করিলে বন্ধু-বিচ্ছেদ হওয়া অসম্ভব নহে। গল্প লিখিতেই হইবে। দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া সোজা হইয়া বসিতে-না-বসিতেই বাহির হইতে আওয়াজ পড়িল—"বাবু সাহেব, মে অন্দর আ শক্তা হুঁ।"—তারপর ঘরে ঢুকিয়া আমার সামনে লেখার সরঞ্জাম দেখিয়া আগন্তুক বলিলেন—"বাবুজী, বে-অক্ত আনেকা মাফি মাঙ্গতা হুঁ।" বহুদিন পরে বন্ধুকে দেখিয়া মনটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; বিশেষতঃ ইনি সম্প্রতি লড়াই হইতে ফিরিয়াছেন;—তাঁর কাছে সেখানকার গল্প শুনিবার আগ্রহ দমন করা আমার পক্ষে শক্ত হইল। তখন জানিতাম না যে, তিনি আমার "মুস্কিল আসান" করিতেই আসিয়াছেন।

শারীরিক কুশল-প্রশ্নাদির পর বন্ধু বলিলেন—"যুদ্ধের গল্প নূতন আর কি আছে—সবই আপনারা কাগজে পড়িতেছেন। তবে একটা জিনিষ যা' আমাদের চোখে বেশী করিয়া ঠেকিয়াছে, সেটা বলি। এই যে য়ুরোপে আজ সভ্যতার সহিত জার্ম্মান স্বার্থপরতার ভীষণ সঙ্ঘাত চলিতেছে, তাহাতে যে কেবল সেখানকার পুরুষেরাই বীরত্ব দেখাইতেছে, তাহা নহে—এই সমরাগ্নিতে সেখানকার নারী-চরিত্র স্বদেশপ্রীতিতে, কর্ম্মে ও আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পটা পড়িবেন।" এই বলিয়া তিনি আমাকে একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা দিয়া একটা গল্প দেখাইয়া বলিলেন—"বাবুজী এ'টা কেবল মাত্র গল্প হিসাবে পড়িবেন না, আমার কথার উদাহরণ হিসাবে দেখিবেন। আর একটা কথা, এ কাল্পনিক ঘটনা হইতে বাস্তব আরো অনেক উচ্চ, এ কথা ভুলিবেন না।"

বন্ধু চলিয়া গেলে গল্পটা পড়িয়া ফেলিলাম এবং ইহাতে সম্পাদকীয় বিরাগ নিবারণের পন্থা দেখিতে পাইয়া আশান্বিত হইলাম।

(১)

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এক সপ্তাহের ছুটি পাইয়া টেরি-টোরিয়াল সৈন্যদলের কয়েকজন কর্ম্মচারী ইংলণ্ড যাইতেছিলেন। পথে রেলগাড়ীতে বন্ধুদের মধ্যে নানাবিধ গল্প চলিতেছিল। মেজর ডেরিক জ্যাক্‌সন বলিয়া উঠিল—"তোমরা কি সব বাজে কথা বলিতেছ—এবার একটি বালিকার যে ধৈর্য্য ও মনের জোরের কথা হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে শুনিলাম, তার কাছে আমার মনে হয় পুরুষের সহ্যশক্তি সব ছেলেখেলা।

তোমরা—নং পদাতিক সৈন্যদলের নূতন লেফ্‌টেনাণ্ট হেনরীকে ত' জানিতে। ছোকরা যেমন সুদর্শন, তেমনি সাহসী ও মিশুক ছিল। আমাদের পাশের গ্রামের এক পাদরীর ছেলে সে;—কলেজ ছাড়িয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতে তার এমন আগ্রহ যে, সে শিক্ষানবিশীর কয়েকটা মাস অতি কষ্টে কাটাইয়াছিল। তারপর যে দিন তার দলের সঙ্গে সে ফ্রান্সে রওনা হইল, তখন তার আনন্দ দেখে কে? সে আমাদের সকলেরই বড় প্রিয় ছিল;—তার সুন্দর চেহারা, সদা-প্রফুল্ল ভাব, তার অমিত সাহস এবং হাসিমুখে কষ্ট সহিবার ক্ষমতার জন্য সকলেই তাকে বড় ভাল বাসিত।

বয়সে হেনরী বালকমাত্র;—তার মনে যে কোন লুকান দুঃখ থাকিতে পারে, তা'ও আবার ব্যর্থ প্রেমের জন্য, এ কথা আমাদের মনেও আসিত না, যদি না সে নিজে আমার কাছে কথাটা প্রকাশ করিত। সেদিন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর আমাদের ও হেনরীর দলের সে রাত্রির মত বিশ্রামের ছুটি ছিল। হেনরী ধীরে-ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিল;—এমন বিমর্ষ, গম্ভীর ভাব হেনরীর কখনও দেখি নাই। আমি উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি?" হেনরী বলিল, "তুমি হয় ত শুনে হাসবে;

কিন্তু আমার মনে কেমন একটা দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধেই আমার জীবন শেষ হইবে। তাই আজ তোমার কাছে জীবনের লুকান পাপের কথা সব খুলিয়া বলিতে চাহি। য়্যানী আমার ছেলে-খেলার সাথী ছিল; শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে দু'জনে একত্র বড় হইয়াছি; আমাদের ভালবাসা ক্ষণিকের মোহ মাত্র ছিল না - তাহা আমাদের জীবনেরই এক অংশ ছিল। আমি মহাপাপী; একান্ত-নির্ভরশীলা সরলা য়্যানীর সর্ব্বনাশ করিয়াছি। সে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু আমার বিমাতার মত হইল না। আর আমিও পরাধীন। ক্ষোভে দুঃখে সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, কোন সন্ধান পাইলাম না। তারপর আমি কলেজ ছাড়িয়া দিয়া সৈন্যদলে যোগ দিলাম। আমি বেশ জানিতেছি যে, আমার দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিয়াছে;—এখন তার কাছে ক্ষমা না চাহিলে আমি মরণেও শান্তি পাইব না। তোমাকে সব কথা বলিলাম। যদি য়্যানীর দেখা পাও, বলিও যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তাকেই ভাল বাসিতাম; সে যেন আমার সেই প্রথম এবং শেষ অপরাধ মার্জ্জনা করে।" বলিয়া হেনরী চুপ করিল। আমি কি বলিব, ভাবিয়া না পাইয়া বসিয়া বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

(২)

ইহার পর পনের দিন হেনরীর কোন সংবাদ পাইলাম না,—তখন তাহাদের দল আরো অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। আমাদেরও ক'দিন সময় মাত্র ছিল না, দিনরাত্রি যুদ্ধ চলিতেছিল। সে যে কি ভীষণ ব্যাপার, তা' তোমরা সবাই জান—আমি আর কি বলিব। দুই সপ্তাহ পরে আমাদের ছুটি হইল,—এক নূতন দল আমাদের স্থান অধিকার করিল। সেই সময় খবর পাইলাম যে, হেনরী গুরুতর আহত হইয়াছিল—তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাদের দলের কাপ্তানের সঙ্গে দেখা হইল। হেনরীর বীরত্বের কথা বলিতে-বলিতে সেই কঠোর-হৃদয় বৃদ্ধ কাপ্তেনেরও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি শেষে বলিলেন, "হেনরীর এ যাত্রা রক্ষা নাই;—কিন্তু আমার যদি ছেলে থাকিত, তবে আমি তার হেনরীর মত বীরের মৃত্যুই কামনা করিতাম। সে তোমার বন্ধু ছিল;—যদি পার, একবার হাসপাতালে তার খবর নিও।"

ছুটিতে আসিবার সময় তাই আমি হাসপাতালে গিয়াছিলাম। সেখানে ডাক্তারের কাছে যা' শুনিয়াছিলাম, সেই গল্পই তোমাদের কাছে করিতেছি।

ডাক্তারকে হেনরীর কথা বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন "হেনরীকে যখন হাসপাতালে আনিল, তখন তাহার অবস্থা খুবই খারাপ। তার দু'টি চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রায় সর্ব্বাঙ্গেই আঘাত লাগিয়াছিল; তার ফলে, খুব জ্বর এবং প্রলাপ। প্রলাপের মধ্যে কেবল এক কথা—'য়্যানী, আমাকে ক্ষমা করো, য়্যানী আমাকে ক্ষমা করো।' যতক্ষণ একটুও জ্ঞান থাকিত, ততক্ষণ সে এই ক'টি কথাই বলিত। তার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হইত। একদিন ভাবিলাম যে, যদি কোন নার্সকে য়্যানী বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাহাকে ক্ষমা করার কথা বলাইয়া দেওয়া যায়, তবে হয় ত বেচারার শেষ দিন ক'টা শান্তিতে কাটিতে পারে। এ হাসপাতালের মধ্যে নার্স এড্‌না'র মত রোগীর সেবা করিতে কেহ পারে না। সে যে অক্লান্ত ভাবে সমস্ত হৃদয় দিয়া আহত সৈনিকের সেবা করে,—তাহা দেখিলে তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হয়। সে কাছে দাঁড়াইলে অতি বড় অসহিষ্ণু রোগীও মাতার ক্রোড়ে শিশুর মত শান্ত হইয়া থাকে। জানি না, কি কুক্ষণে আমি হেনরীর কথা তাহাকে বলিলাম এবং তাহার সেবার ভার লইতে অনুরোধ করিলাম। সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে গম্ভীর ভাবে নার্স এড্‌না হেনরীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে এবং নিজেকে য়্যানী বলিয়া পরিচয় দিতে স্বীকার করিল। আমি হেনরী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলাম, কেন না তার অবস্থা দেখিয়া আমার মনেও শান্তি ছিল না। তারপর সাতদিন হেনরী জীবিত ছিল। নার্স যে ভাবে তার সেবা করিত, তাহা বোধ হয় তাহার মাতা অথবা তাহার প্রণয়িনী য়্যানীও পারিত না। তার উপর সে য়্যানী সাজিয়া হেনরীর জ্বরতপ্ত হাত দু'খানি ধরিয়া সান্ত্বনা দিত যে, সে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়াছে। এ সাত দিনের মধ্যে আমি একবারও নার্স এড্‌নাকে হেনরীর কাছছাড়া হইতে দেখি নাই; সে যেন আহার-নিদ্রার উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিল। যদিও হাসপাতালের নিয়ম অনুসারে তার বিশ্রামের ছুটি ছিল, এবং সেই সময়ে রোগীর

পরিচর্য্যা করিবার জন্য অন্য নার্সও ছিল, এড্‌না কিন্তু আর কাহাকেও হেনরীর সেবা করিতে দিত না। অনেক সময় দেখিয়াছি, নার্স এড্‌না নিদ্রিত হেনরীর হাতখানি ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে,—তার চোখ দু'টি ছল্‌ছল্‌ করিতেছে। আমি আশ্চর্য্য হইতাম—কেন না আমি আর কখনও তাকে বিচলিত হইতে দেখি নাই; ভাবিতাম, করুণ-হৃদয়া এড্‌না বুঝি এ সুন্দর যুবকের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছে; অথবা সে হেনরীর প্রণয়িনীর ভূমিকা অভিনয় করিতেছে। আমি মনে মনে তার অভিনয়-দক্ষতার প্রশংসা করিতাম;—যে যদি নার্স না হইয়া অভিনেত্রী হইত, তবে সে খুব কৃতকার্য্য হইত সন্দেহ নাই। এমনি করিয়া সাত দিন সাত রাত্রি কাটিল। একদিন ভোরে প্রিয়তমা য্যানীর নিকট শেষ ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া, নার্স এড্‌নার বুকে মাথা রাখিয়া হেনরী পরলোকের পথে যাত্রা করিল। হেনরীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া হইয়া গেলে আমি নার্স এড্‌নার ঘরে গিয়া দেখিলাম, সে গম্ভীর ভাবে বসিয়া কাগজপত্র গুছাইতেছে। আমিও একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। নার্স এড্‌না কোন কথা কহিল না দেখিয়া আমি হেনরীর কথা পাড়িলাম; শেষে বলিলাম—"দেখ এড্‌না, তুমি যদি নার্স না হইয়া অভিনেত্রী হইতে, তাহা হইলে খুব নাম করিতে পারিতে। এ ক'দিন তুমি যে ভাবে হেনরীর কাছে তার প্রণয়িনী য্যানীর অভিনয় করিয়াছিলে, তাহাতে তোমার এ বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়াছি। সে ত অন্ধ হইয়াছিল—তোমার মুখ দেখিতে পায় নাই;—কিন্তু সে শান্তিতে মরিয়াছে।" মরণাহতা হরিণীর কৃষ্ণতার চক্ষুর মত তার বড়-বড় ঘন নীল চক্ষু দু'টি বিস্ফারিত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে এড্‌না বলিল—'অভিনয়! হা জগদীশ্বর! ডাক্তার, আমি অভিনয় করি নাই—আমিই য্যানী।' আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম।"

ডাক্তারের কাহিনী শুনিয়া আমার মনে যে কি হইতেছিল, তাহা ভগবানই জানেন। ভাবিলাম আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দশটা লোক মারিয়া বীর বলিয়া প্রশংসা লাভ করি; কিন্তু এই যুবতীর মনের বলের কাছে তাহা কি সামান্য! 'ভিক্টোরিয়া ক্রস'ও ইহার পূর্ণ সম্মান দিতে পারে না।

গল্প শেষ করিয়া মেজর ডেরিক চুপ করিয়া চুরুট টানিতে লাগিল। তার সঙ্গীরা বিস্মিত হইয়া দেখিল, তার চক্ষু দু'টিতে অশ্রু ভরিয়া উঠিয়াছে,—মেজর ডেরিককে সকলেই অত্যন্ত কড়া রকমের লোক বলিয়াই জানিত।

আগমনীর গান

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

পূজা আসিতেছে। শরতের প্রভাত।—প্রভাত-সূর্য্যের সোণালী কিরণে চারিদিক প্লাবিত—পুলকিত।—যেন আকাশ ও ধরার মধ্যে বিগলিত স্বর্ণধারা তরঙ্গায়িত হইতেছে;—এমন সময় ভিখারী আসিয়া ঘরের দুয়ারে গান ধরিল,—

'গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই বলে মানবো না॥'
—রামপ্রসাদ।

গান শুনিবামাত্র গৃহস্থের হৃদয়ে কেমন একটু কোমল-করুণ আঘাত হইল;—নিজ সংসারের ছোট-ছোট মেয়েদের মুখগুলি মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। গৃহস্থ আবার ভিখারীকে গাহিতে বলিলেন। ভিখারী আবার গান ধরিল,—

'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল।' ইত্যাদি—
—দাশরথি রায়।

প্রতিবৎসর এমনই সময়ে বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে যাইয়া এই সব গান গাইয়া ভিখারীরা ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। এদেশে বৈষ্ণব ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশী বটে; কিন্তু এ সময়টা

আগমনীর গান ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ের গান কোনও ভিখারীর মুখে বড়-একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী গৃহস্থও এ সময়ে সে গান শুনিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে। বর্ষে-বর্ষে তাহারা উহা শুনিয়া আসিতেছে,—তবু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা, শুনিবার আগ্রহ তাহাদের প্রতি বর্ষেই সমান দেখিতে পাই।—বাঙ্গালীর নিকট ইহার রস এতই গভীর!—এমনই অক্ষয়!

ইতিবৃত্তের কোন্ বৎসরে ইহার জন্ম হইয়াছিল, জানি না। কে ইহার আদি-রচয়িতা, তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তবে আগমনীর যত গান আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাহা হইতে অনুমান করিয়া এই বলা যায় যে, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদই এই গানের প্রথম পথ-প্রদর্শক। বহু গ্রাম্য-ছড়ার মধ্যেও আগমনীর কথা আছে, স্বীকার করি; কিন্তু সেগুলি গান নহে—ছড়া মাত্র। ভাঙ্গা ছন্দ, অপূর্ণ মিল ও অসংলগ্ন ভাবে তাহার আগাগোড়া পরিপূর্ণ। তা' ছাড়া, সে ছড়াগুলিও যে এদেশে কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা রামপ্রসাদের গানের পূর্ব্বে রচিত কি পরে রচিত, সে সম্বন্ধেও জোর করিয়া কিছু বলা চলে না।

রামপ্রসাদ এ ক্ষেত্রে শুধু প্রথম নহেন,—সর্ব্বপ্রধানও বটেন। বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে চণ্ডীদাসের যে আসন, শাক্ত কবিগণের মধ্যে রামপ্রসাদেরও সেই আসন। চণ্ডীদাসের গানের করুণ-মধুর রস অতুলনীয়; রামপ্রসাদের গানের করুণ-বাৎসল্য রস অতুলনীয়। সেকেলে ও একেলে যতগুলি কবি আগমনীর গান রচিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই এ ক্ষেত্রে রামপ্রসাদকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নহে; তাঁহাদের সকলের উপরেই রামপ্রসাদের পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া সেকালের ও একালের কত কবি যে আগমনীর গান রচিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। কবিও অসংখ্য, গানও অসংখ্য। সে অগণিত গানের মধ্যে আবর্জ্জনার অংশ যে অল্প, তাহাও নহে। রামপ্রসাদের উচ্চ-অঙ্গের আগমনীর ব্যর্থ অনুকরণ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, প্রণয়-সঙ্গীতে সিদ্ধহস্ত নিধুবাবুও এ ব্যর্থ অনুকরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। যে কয়টি আগমনীর গান তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার একটিও তেমন উচ্চদরের হয় নাই। শুধু নিধুবাবু বলিয়া নহে;—ব্রজরায় ও নীলকণ্ঠ প্রভৃতি অনেক কবিরই আগমনীর গানে অমন অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। সে সব গানের হা-হুতাশের অভাব নাই বটে, কিন্তু আন্তরিকতা ও রচনা-নৈপুণ্যের অভাবে তাহা অন্তঃকরণকে আঘাত করে না,—দুঃখের স্থলে তাহার দুঃখের আড়ম্বরটাই বেশী করিয়া চোখে পড়ে। কিন্তু তাই বলিয়া উৎকৃষ্ট আগমনী-সঙ্গীতের সংখ্যাও যে নিতান্ত অল্প, এমন কথা বলি না। সংখ্যায় তাহা স্বল্প নহে, গুণেও তাহা অল্প নহে। গুণের হিসাবে তাহার পাশে দাঁড়াইতে পারে, এমন বাৎসল্য রসের বাঙ্গালা গান বড়-একটা দেখিতে পাই না।

তবে বাঙ্গালার সঙ্গীত সাহিত্যে আগমনীর গানই যে প্রথম বাৎসল্যের গান, অবশ্য তাহা বলি না। এ রসটা এ দেশের বৈষ্ণব-সঙ্গীতেই প্রথম ফুটিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ও যশোদাকে উপলক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব-কবিগণ বহু সঙ্গীতই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর গানও যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু তুলনায় সমালোচনা করিলে, আমাদের মনে হয়, কবিত্বে, মাধুর্য্যে ও লালিত্যে আগমনীর গান ঐ সকল বৈষ্ণব গানের অপেক্ষা অনেক স্থলে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে।

আগমনীর গানের উমা আমাদেরই ঘরের কন্যা, মেনকা আমাদেরই ঘরের মাতা, এবং গিরিরাজ আমাদেরই ঘরের পিতা। বালিকা-কন্যার বিবাহের পর তাহাকে লইয়া হিন্দু-পরিবারে যে দুশ্চিন্তার আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাই মেনকা ও গিরিরাজের গানের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা বৈষ্ণব-সঙ্গীতে নাই, এবং থাকা সম্ভবপরও নহে। বৈষ্ণব-সঙ্গীতে শুধু আছে,—

"অরুণ অধর উরে নবনী লাগিয়াছে-রে
মরি মরি বাছনি কানাই,
হেরি যশোমতি প্রেমেতে পূরিত আঁখি
আয় কোলে বলিহারি যাই।"

অথবা

"কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে।

রাণী দিল পূরি কর,　　*　　পাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল রায়—" ইত্যাদি।

কিন্তু এই ছবির পাশে আর একটি ছবি রাখিতেছি,—পাঠক মিলাইয়া দেখুন—উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি অধিক মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী!—

"গৌরী এলো এলো শুনি, এলো-থেলো পাগলিনী,
এলোকেশী হ'য়ে রাণী, ধরা-শয়ন তাজি অমনি উঠিল।
কৈ কৈ কৈ গো মা! আমার সাধের উমা,
কন্যা হর মনোরমা,
আজি কি শিবের শুভদৃষ্টি ঘটিল॥
নয়ন জলে দৃষ্টিহারা, বলে—কোলে আয় মা তারা।
জুড়াই ছুটি নয়ন-তারা, মুখ দেখিলে দুঃখ খণ্ডে॥"...
—দাশরথি

এ মাতৃস্নেহের ছবির কাছে বৈষ্ণব-কবিগণের মাতৃস্নেহের ছবি কি দাঁড়াইতে পারে? কেবল বৈষ্ণব কবি কেন, অন্য কোনও কবিরই বাৎসল্য-রসের কোন গান বা কবিতা আগমনীর গানের মত বাঙ্গালীর মনকে ভিজাইতে পারে বলিয়া মনে করি না। বিশ্ব-সাহিত্যের ধ্বজাধারীরা অবশ্য এ কথা শুনিয়া চটিবেন, জানি। কিন্তু চটিলেও ইহা সত্য—ইহা স্বাভাবিক। যে সমাজ দূর ও নিকট-সম্পর্কীয় সকলকে লইয়া একসঙ্গে বাস করিতে চায়, এবং কেবল কন্যাকেই পরের ঘরে বিলাইয়া দিতে বাধ্য হয়, সেই সমাজের নিকট আগমনীর গানের রস অক্ষয়—অপূর্ব্ব!

আগমনীর গানের আরম্ভটিও বড় স্বাভাবিক—বড় সুন্দর! ইহার গোড়াতেই আছে, মেনকা-রাণী গিরিরাজকে বলিতেছেন—

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে॥
এই, এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল হে!
আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে॥
মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি, বিতরে অমৃত রাশি,
সুললিত বচনে। অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম
গিরি, হে! ধৈরয না ধরে মম জীবনে॥
আর শুন অসম্ভব, চারিদিকে শিবা রব; হে! তার মাঝে
আমার উমা, একাকিনী শ্মশানে। বল কি করিব আর,
কে আনিবে সমাচার হে! না জানি মোর গৌরী
আছে কেমনে?" ইত্যাদি।—　　　　কমলাকান্ত।

সাধক রামপ্রসাদের আগমনীর গানে এরূপ আরম্ভ নাই। সাধক কমলাকান্তই মনে হয় এ গানে ঐরূপ ভূমিকা প্রথম আমদানী করিয়াছেন। তাঁহার পর হইতে আমরা দাশরথি রায়, রসিক রায়, ব্রজ রায়, রামবসু, নীলকণ্ঠ ও গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি সকলের গানেই এই 'স্বপন' দেখার 'ধর্ত্তা' দেখিতে পাই। তবে সকলের স্বপ্ন যে সমান, তাহা নহে। কেহ 'কুস্বপন দেখেছি গিরি' বলিয়া গান আরম্ভ করিয়াছেন, আবার কেহ-বা 'সুস্বপন' বলিয়া গান ধরিয়াছেন। কমলাকান্তের গানে কুস্বপ্নেরই আভাষ আছে। তিনি এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হইলেও কবিওয়ালা রামবসু ঠিক তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ না করিয়া একটু স্বতন্ত্র দিকে গিয়াছেন। সুস্বপ্ন হইতে কথা আরম্ভ বোধ করি তাঁহার আগমনীর গানেই প্রথম আমদানী হইয়াছে। তাঁহার গানটি এই—

"গত নিশি-যোগে আমি হে, দেখেছি যে সুস্বপন—
এলো হে, সেই আমার তারাধন!
দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
বলে মা কই, মা-কই, মা-কই আমার,
দেও দেখা দুখিনীরে॥
অমনি দুবাহু পসারি, উমা কোলে করি,
— আনন্দেতে আমি, আমি নই॥"—রামবসু

এ গানটিও মর্ম্মস্পর্শী। বাৎসল্য-রস ইহাতেও বেশ ফুটিয়াছে। তবে আগমনী গানের সূচনা 'কুস্বপনে' হইলেই বোধ করি যে একটু বেশী স্বাভাবিক ও বেশী মর্ম্মস্পর্শী হয়। কারণ, সচরাচর স্বপ্ন চিন্তার অনুরূপই হইয়া থাকে। কন্যা-বিরহ-জনিত যে দুঃখ পুটপাকের ন্যায় মাতৃহৃদয়কে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা নিদ্রার সময়ও স্বপ্নে দেখা দিল,—ইহা বস্তুতন্ত্রতামূলক। বাঙ্গালী ঘরে ইহা নিত্য দৃষ্টি-গোচর হয়। তাই বোধ করি, অধিকাংশ কবিরই আগমনী গান কুস্বপ্নে সূচিত হইয়াছে।

মেনকা রাণী এতদিন কতকটা স্থির ছিলেন, কিন্তু স্বপ্ন দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন—

"বাহ্যজ্ঞানশূন্যা রাণী—কন্যার মায়ায়
'দেহ কন্যা' ব'লে রাণী ধরে গিরির পায়॥"
—দাশরথি।

মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহকে উদ্দীপিত করিতেছে—ইহাও স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণকে বুকে করিয়া বসুদেব যখন ভাবিতেছিলেন—কেমন করিয়া এ দুস্তার যমুনা পার হইব, তখন জননী-স্বরূপিণী শিবা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। এখানেও মাতৃস্নেহ পিতৃস্নেহকে জাগাইয়া তুলিল।

গিরিরাজ কন্যা আনিতে কৈলাসে গমন করিলেন। কিন্তু মেনকা আর কন্যার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তাঁহার অবস্থা তখন—

"মেনকার ঝুরিছে আঁখি, গিরির বিলম্ব দেখি,
অচল মোহিনী যেন চঞ্চলা হরিণী।"—দাশরথি

এমন সময় তাঁহার কাণে আসিয়া পৌঁছিল,—

"গা-তোল গা-তোল, বাঁধ মা! কুন্তল,
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।
ল'য়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ, মা কৈ ব'লে,
ডাক্‌ছে মা তোর শশধর-বদনী।" ইত্যাদি
—দাশরথি

এমন সময়—

"পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এলো ওই"—ঈশ্বর গুপ্ত

শুধু তাহাই নহে। স্বয়ং জয়া আসিয়া বলিল,—

"ওগো রাণি। নগরে কোলাহল, উঠ চল চল, নন্দিনী
নিকটে তোমার গো। চল, বরণ করিয়া, গৃহে আনি
গিয়া, এসো না সঙ্গে আমার গো।"—রামপ্রসাদ

এই সব কথা শুনিয়া—

"রাণী ভাসে প্রেম জলে, দ্রুতগতি চলে, খসিল কুন্তল-
ভার।
নিকটে দেখে যারে, সুধাইছে তারে, গৌরী কত দূরে
আর গো॥"
—রামপ্রসাদ।

এমন সময় গৌরীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া রাণী—

"গদ-গদ ভাব ভরে, ঝর ঝর আঁখি ঝরে,
পাছে করি গিরিবরে, অমনি কাঁদে গলা ধরে।"
—রামপ্রসাদ

আর কি বাধা মানে? অশ্রুর প্লাবন আসিল! যে অন্তর্বেদনা বৎসর খানেক ধরিয়া হৃদয়ের মধ্যে গুমরিয়া মরিতেছিল, তাহা আজ মিলন-সুখে অশ্রু আকারে চোখ ফাটিয়া বাহির হইল। কন্যাকে ঘরে আনিয়া মেনকারাণী কোলে করিয়া বসিলেন—মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

"সারা বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন-তারা।
এলি কি পাষাণী ওরে, দেখ্‌ব তোরে আঁখি ভোরে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।"
—রবীন্দ্রনাথ

কন্যা ঘরে আসিলেন—এইবার 'মায়-ঝিয়ে' মান-অভিমানের পালা আরম্ভ হইল। মেনকা গৌরীকে কোলে করিয়াছেন বলিয়া গৌরী বলিতেছেন,—

"আমাকে বসিলে কোলে করি,
আমার গণেশ দাঁড়িয়ে ধরাতলে।"—দাশরথি

মেনকা উত্তর দিবার ঐ সুযোগ ছাড়িলেন না। একটু খোঁটা দিয়া কন্যাকে তিনি কহিলেন,—

"মা! বলা অধিক, প্রাণাধিকের প্রাণাধিক
গণেশ আমার—তাত আমি জানি।
কি করিব মা! বুঝে না মন,
গণেশে মন তোমার যেমন,
তেমনি আমার গণেশ-জননী॥"—দাশরথি

কন্যাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য জননীর এই আঘাত অতি মিষ্ট! শ্বশুর-বাটীর সহিত দুই-চারি দিনের কড়ার করিয়া কন্যাকে যে পিতৃগৃহে আসিতে হইয়াছে, মাতৃ-স্নেহ তাহা বুঝিতে চাহে না। জননী কন্যাকে বলিতেছেন,—

"এসেছিস্ মা থাক্ না উমা দিন কত।
হয়েছিস্ ডাগর-ডোগর কিসের এখন ভয় এত॥
* * * * *
এখন বুঝি ঘর চিনেছিস্, তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস্, নিতে এলে হর,
সঁপে দিছি পরের হাতে
জোর আমার ত নাই তত॥"—গিরিশচন্দ্র।

কন্যার প্রতি অবুঝ মাতৃ-স্নেহের আবার আঘাত—

"বোঝাব মায়ের ব্যথা,
গণেশকে তোর আট্‌কে রেখে।
মায়ের প্রাণে বাজে কেমন,

জান্‌বি তখন আপনি ঠেকে ॥
তো বিনা কে আছে আমার,
গিরিপুরী ছিল আঁধার,
পাঠাব না তোরে তো আর,
নিতে এলে কৈলাস থেকে ॥"—গিরিশচন্দ্র

কিন্তু পাঠাইতেই হইল!—মাতার সমস্ত অভিমান - সমস্ত আঘাত ব্যর্থ হইয়া গেল! গৌরীকে লইয়া যাইবার জন্য শিব মেনকার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। জয়া আসিয়া মেনকাকে ধরিয়া বসিলেন,—

দিও না আজ উমায় যেতে
ওগো মা মেনকা রাণী!
আশুতোষে আশু তুষে
বিদায় করগো এখনি।
হাসি হাসি উমা এলো,
কেঁদে হলো এলোগেলো,
কেন আজি পোহাইল নবমী রজনী ॥
ভেবে চিন্তে উমাশশী, যেন রাহুগ্রস্ত শশী,
হানিল হৃদয়ে আসি, কি শূল ত্রিশূলপাণি ॥"
—রসিক রায়।

জয়ার কথা শুনিয়া, শিবকে দুয়ারে দেখিয়া, মেনকার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। সে বুক-ভাঙ্গা ক্রন্দন রামপ্রসাদের গানের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, দেখিতে পাই। মেনকা বলিতেছেন—

"ওহে প্রাণনাথ, গিরিবর হে, ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার।
কি শুনি দারুণ কথা, দিবসে আঁধার ॥
বিছায়ে বাঘের ছাল, দ্বারে বসে মহাকাল, বেরোও গণেশ-মাতা, ডাকে বার বার। তব দেহ হে পাষাণ, এ দেহে পাষাণ প্রাণ, এই হেতু এতক্ষণ না হ'লো বিদায়।" ইত্যাদি
—রামপ্রসাদ

সাধক কমলাকান্তেরও এ সময়ের গানটি অতি চমৎকার। —তাহার মধ্যেও মাতার বুক ফাটা ক্রন্দনধ্বনি শুনা যায়। সে গানটি এই;—

"কি হলো, নবমী নিশি হৈলো অবসান গো!
বিশাল ডমরু, ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে
প্রাণ গো ॥
কি কহিব মনোদুঃখ, গৌরী পানে চেয়ে দেখ, মায়ের
মলিন হয়েছে অতি ও বিধু বয়ান।
ভিখারী ত্রিশূলধারী যা চাহে তা দিতে পারি;
বরঞ্চ জীবন চাহে তাহা করি দান। কে জানে
কেমন মত, না শুনে গো হিতাহিত; আমি
ভাবিয়া ভবের রীত, হয়েছি পাষাণ গো ॥"—কমলাকান্ত

মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠানো - বাঙ্গালী হিন্দু ঘরের একটা বিষম ট্রাজিডি। এই ট্রাজিডি হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া শাক্ত কবিগণ তাহারই উপর তাঁহাদের বিজয়া-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তাই ইহার প্রত্যেক কথাটিই মর্ম্মস্থলকে কাঁপাইয়া তুলে। গৌরীর পিতৃগৃহে আগমন, পিতৃগৃহে অবস্থান এবং তাহার শ্বশুর বাড়ী যাত্রা এ তিনটি দৃশ্যেই বাঙ্গালার হিন্দুসংসার প্রতিফলিত হইয়াছে। বঙ্গজননীর মর্ম্মব্যথা ঐ তিনটি দৃশ্যের মধ্যেই নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা এই পূজার সময় মাতৃহৃদয়ের সেই অপূর্ব্ব ছবি পাঠকবর্গকে উপঢৌকন দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। এ অমৃতে সম্ভবতঃ কেহ অরুচি প্রকাশ করিবেন না।

"ডএ বিন্দু ড়"

[শ্রীচন্দ্রশেখর কর, বিদ্যাবিনোদ, বি-এ]

প্রবন্ধের শিরোনাম "ডএ বিন্দু ড়" পড়িয়া পাঠক ভড়্কাইবেন না। বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত জলধর সেন সম্পাদক মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে এবং তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারায় আমাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে পাঠকদিগকেও কিঞ্চিৎ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। 'ভারতবর্ষে'র পূজার সংখ্যার জন্য আমাকে রগড়ের কিছু লিখিতে হইতেছে; আমি "ডএ বিন্দু ড়"এর আশ্রয় লইয়াছি। কেবল "ড়" বলিলেই চলিত, কিন্তু তাহা হইলে শিরোনামটী বড় ছোট হইয়া পড়িত। বাঙ্গালার কোন-কোন স্থানে "ড়"এর উচ্চারণ "ডএ বিন্দু ড়।"

বাল্যকালে আমরা যখন পাড়াগায়ে পাঠশালায় ক, খ লিখিতে আরম্ভ করি, তখন ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ছিল চৌত্রিশটী। "ক্ষ" ছিল শেষ বর্ণ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথমভাগেই "ডএ বিন্দু ড়"এর সহিত আমাদের প্রথম পরিচয়। তিনি যুক্তাক্ষর বলিয়া "ক্ষ"কে ছাড়িয়া দিয়া ড় ঢ় য় ং ঃ ঁ এই কএকটাকে "হ"র পরে বসাইয়া দেন এবং ড়, ঢ়, য়-কে বর্ণ ধরিয়া ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৩৪টীর স্থলে ৩৬টী করেন।

বঙ্গসাহিত্যে "ড়" এর সম্মান অত্যন্ত অধিক, আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহাই যথাসাধ্য প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইব। যে "ড"এর নিম্নে বিন্দু যোগ করিয়া "ড়"এর উৎপত্তি, বর্ণমালার মধ্যে সেই "ড"এর স্থান অতি উচ্চ।

"ক" হইতে "ম" পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণ পাচ বর্গে বিভক্ত। "ড" তৃতীয় বর্গের তৃতীয় বর্ণ বলিয়া ইহাদের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার বামে বারটী এবং দক্ষিণে বারটী বর্গীয় বর্ণ। সুতরাং "ড" বর্গীয় বর্ণমধ্যে "দ্যুতিমান মধ্যমণি।" "ড়, ঢ়, য়" এর মধ্যে "ড়"ই সর্ব্বপ্রথম। এই মাননীয় "ড়" আমাদের ভাষায় কি প্রকার শব্দে আছেন, আমরা তাহার দুই চারিটী উদাহরণ দিতেছি।

সর্ব্বপ্রথমে মানুষের ভূমিষ্ঠ হইবার স্থান আতুড়্ ঘরে ড়। বিদ্যাশিক্ষার পূর্ব্বে হাতেখড়িতে ড়। লেখা-পড়ায় ড়। রান্না-ঘরের ভাতের হাঁড়িতে, হাতা-বেড়িতে, দুধের কড়ায় এবং জলের ঘড়ায় ড়। ভাঁড়ার-ঘরে ড়। নুনের ভাঁড়, তেলের ভাঁড়, চুণের ভাঁড় প্রভৃতি ভাঁড় মাত্রেই ড়। থোড়, খাড়া, কুমড়া-বড়িতে ড়। সিঙ্গেড়া, কচুড়ি, রাব্ড়ি, খিচুড়িতে ড়। গরীবের চিড়ে-মুড়্কিতে ড়। কড়্কড়ো ভাতে ড়। মনিবের রুই মাছের মুড়ো এবং চিতল মাছের সিংড়িতে ড়। চাকরের কুচো-চিংড়ি, পুঁইশাক-চচ্চড়িতে ড়। সব মিষ্টির গোড়া গুড়ে ড়, বিশেষতঃ জয়নগর অঞ্চলের পয়ড়া গুড়ে। গুড়ের পরবর্ত্তী, চিনির অপরিষ্কার কিন্তু বিশুদ্ধ মূর্ত্তি খাঁড়ে ড়। বড়লোকের বড়বাড়ী, শার্শী খড়খড়ি, যুড়ী কিংবা চৌঘুড়ী অথবা হাওয়া-গাড়ীতে ড়। টাকা-কড়িতে ড়। ঘোড়দৌড়ে পয়সার ছড়াছড়িতে ড়। গরীবের কুঁড়েয় ড়। ভিক্ষুকের কড়োয়ায় ড়। বড়লোকের বাঁকা তেড়ি, খাটো দাড়ি, হাতের ছড়ি এবং বুকের ঘড়িতে ড়। গরীবের মুখের বিড়িতে ড়। বড়লোকের তামাক খাইবার গড়্গড়ায় ড়। বাড়ীর ছাতের নীচে কড়িতে ড়। গরীবের ঘরের চালের উপর খড়ে ড়। খড় উড়াইবার ঝড়ে ড়। মেঘের গুড়গুড় গর্জ্জনে ড়। বৃষ্টির হুড়হুড় বর্ষণে ড়। ষাঁড়া-ষাঁড়ির কোটালে ড়। চোরের বেড়ি, ফাঁশীর দড়িতে ড়। বাঁশের ঝাড়ে, নৌকার দাঁড়ে, পাঁটার হাড়ে, ভাতের মাড়ে ড়। পুলিস ফাঁড়ি, ধর-পাকড় এবং হাতকড়ায় ড়। তাড়ির ভাঁড়ে, আবকারীর ছাড়ে, লেপ-তোষক বালিসের ওয়াড়ে ড়। বিবাহে বরের পিঁড়িতে ড়, কন্যার শাঁখা-সাড়ী এবং সিন্দুর-চুবড়ীতে ড়। কৌতুকক্রীড়ায় ড়, নারীর ব্রীড়ায় ড়; ব্যারাম-পীড়ায় ড়। প্রহার পর্ব্বে চড়, চাপড়, থাবড়ায় ড়। কোন-কোন স্থানে থাবড়াকে থাপ্লোড় বলা হয়। গালিপর্ব্বে মুখপোড়া, হতচ্ছাড়া প্রভৃতি অনেক দুর্ব্বাক্যে ড়। কেনাবেচায় জাঁকোড়ে ড়। কথাবার্ত্তায় এবং ব্যবহারে "ভাঙ্গোড়" ড়। কথার নড়চড়ে ড়, গাড়ী-চাপার মৃত্যুর পূর্ব্বে ধড়ফড়ে ড়।

দেন্‌দারের উপর কড়াকড়িতে ড়; পাওনাদারের নিকট ভাঁড়াভাঁড়িতে ড়। পুরুষের কাপড়চোপড় এবং পাগড়িতে ড়। স্ত্রীলোকের ঢাকাই পার্শী বেণারসী সাড়িতে এবং জড়োয়া গহনায় ড়। অন্তিমকালে বৈদ্যের বড়িতে ড়, কলসী-দড়িতে ড়, মড়া পোড়াইবার খড়িতে ড়। সর্ব্বোপরি জগদারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের পীতধড়ায় ড়, মোহন-চূড়ায় ড়। শ্রীগরির "উঠাপড়া, পাশমোড়ায়" ড়। প্রেমপুলকিত ভক্তের মাথানাড়ায় ড়, মাটীতে পড়ায় ড়, এবং গড়াগড়ি দেওয়ায় ড়। এইবার স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রদর্শিত রীতি অনুসারে ড়কে লইয়া দুই চারিটী নীতিবাক্য যোজনা করিব। ইহার সকলগুলিতেই নীতি কিংবা সুনীতি আছে, পাঠক ইহা স্বীকার নাও করিতে পারেন। কেহ-কেহ বা বলিবেন, ইহার দুই-একটী খাপছাড়া হইয়া গিয়াছে।

১। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া উচিত নহে।

২। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই, নলখাগড়ার মরণ।

৩। কোন স্থান হইতে পাততাড়ি বগলে করিয়া লম্বা পাড়ি দেওয়া কাপুরুষের কার্য্য।

৪। অনেক বুড়োবুড়ী গাড়ী চড়িয়া গড়ের মাঠে বেড়াইতে যান।

৫। তাড়াতাড়ি খাওয়া, দৌড়াদৌড়ি যাওয়া এবং হুড়াহুড়ি করিয়া ট্রামগাড়ী পাওয়া অনেক আপিসগামী বাঙ্গালীর নিত্যকর্ম্ম।

৬। কোন কোন ব্যবসায়ে ভিতরে কিছু না থাকিলেও বাহিরের ভড়ং ঠিক রাখিতে হয়।

৭। পৈতৃক ভিটাবাড়ী ছাড়িয়া দিয়া সহরের ভাড়াটীয়া বাড়ীতে বাস করিলে অনেকের হামবড় ভাবটী বাড়িয়া যায়।

৮। বড়বাজারে কাপড়ের দর যেরূপ চড়িয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে অনেক দরিদ্র ভদ্রলোককে এবার ন্যাকড়া পরিতে হইবে।

৯। প্রিয়বন্ধু স্বর্গীয় ডি, এল রায়ের মতে প্রিয়ার হাতের চুড়ীর টুনটুনি হইতে সম্মার্জ্জনী অর্থাৎ খ্যাংড়া কিংবা ঝাঁটার বাড়ি সবই মিঠে। আমাদের মনে হয় ইহাতে কবি মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন। (ভদ্রঘরের) বঙ্গরমণী এখনও এত বেয়াড়া হন নাই যে, স্বামীর পৃষ্ঠে খ্যাংড়া চালাইতে পারেন। আর তাঁহারা খ্যাংড়া ঝাড়ু ত অনেক দিনই ছাড়িয়াছেন। এখন কিছু চালাইতে হইলে ঘর ঝাড়িবার ব্রুস কিংবা গাড়ী হাঁকাইবার চাবুক চালাইবার কথা।

১০। সেকালের লোকেরা মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্যের নিকট পাওনাগণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া যাইতেন। এ কালে বাঁচিয়া থাকিতে-থাকিতেই অন্যের জিনিষ কাড়িয়া লওয়াই ব্যবস্থা। যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে সময় থাকিতে-থাকিতে যতদূর সম্ভব গাছের পাড়া এবং তলার কুড়ানর চেষ্টা দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

১১। পূর্ব্বে বাড়ীতে অসময়ে অতিথি আসিলে লোকে তাহাকে নিজের বাড়া ভাত ধরিয়া দিত, এখন সময়াগত অতিথিকেও মাথানাড়া কিংবা মুখঝাড়া দিয়া তাড়াইয়া দেওয়াই সভ্যতা।

১২। সেকালে অনেক বাড়ীতে সময়-মত যাইয়া পাতা পাড়িলেই দুটা অন্ন পাওয়া যাইত, একালে অতিথির শব্দ শুনিলে গৃহস্বামী সাড়াই দেন না।

১৩। সেকালের বড়লোকেরা বেতন দিয়া ভাঁড় রাখিতেন। একালে যাঁহাদের বাড়ীতে অবৈতনিক ভাঁড় অর্থাৎ কেঁড়েধরার গতিবিধি নাই, তাঁহারা বড়লোকই নহেন।

১৪। বাঙ্গালী ঝগড়ায় মজবুত, এ কথা অনেকেই বলেন। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা ঝগড়া করিতেন। নবেল পড়ার ক্ষতি হয় বলিয়া তাঁহারা উহা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং সংপ্রতি পুরুষেরা আড়েহাতে ঐ ব্যবসায়ে লাগিয়াছেন।

১৫। যোগাড়ের তুল্য মূল্যবান বস্তু আজকাল কিছুই নহে। যোগাড়ের জোরে অসাধ্যসাধন করা যায়, গাধাকে (না পিটিয়াই) ঘোড়া করা চলে। কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে যে ঐকান্তিক যত্ন এবং চেষ্টার প্রয়োজন, চলিত-ভাষায় তাহার নাম কাঠখড়। এখনী প্রায় সকল কাজেই যোগাড় এবং কাঠখড়ের দরকার।

১৬। তবে সর্ব্বোপরি পড়্‌তা। পড়্‌তা ভাল পড়িলে ধানছেঁড়া লোকও লাখপতি হইয়া উঠেন। আর পড়্‌তা খারাপ হইলে সুবিদ্বানও ভেড়াকান্ত হইয়া পড়েন।

ধন্য ডএ বিন্দু ড়! কি বলিয়া তোমার সুখ্যাতি করিব জানি না। তুমি যেমন পদস্থ, তেমনই বিনয়ী। তুমি কখনও কোন শব্দের ঘাড়ে চড়িতে যাও না, অর্থাৎ

প্রথমে থাক না, সর্ব্বদাই মধ্যে কিংবা শেষে। ইহাতেই তুমি আরও বড়। তুমি কত স্থানে কত ভাবে রহিয়াছ, আমি কেবল কএকটী মাত্র দেখাইলাম।

এইবার "ড়" সম্বন্ধে এমন কিছু লিখিব যাহা পড়িয়া

"গৌড়জন যাহে
উড়াইবে 'ডয়ে বিন্দু ড়' এর নিশান।"

অধুনা দেশের বহুস্থানে সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই এ বিষয়ে কোন গবেষণা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন কি, যে, বঙ্গদেশের ঊনবিংশ শতাব্দির এবং বর্ত্তমান কালের বহু কবি, বক্তা এবং লেখকের বাড়ী অথবা বাসস্থানে এই "ডএ বিন্দু ড়" বিদ্যমান; যথা; —

স্বর্গীয় দাশরথী রায় — বাঁধমুড়ো (বর্দ্ধমান)
৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত — কাঁচড়াপাড়া (২৪ পরগণা)
৺বিদ্যাসাগর মহাশয় — বাদুড়বাগান (কলিকাতা)
মাইকেল মধুসূদন দত্ত — সাগরদাঁড়ি (যশোহর)
স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র — চৌবেড়িয়া (নদীয়া)
স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — কাঁঠালপাড়া (২৪ পরগণা)
সোমপ্রকাশ সম্পাদক
স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ — চিংড়িপোতা (ঐ)
স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় — চুঁচুড়া (হুগলী)
শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার — চুঁচুড়া (হুগলী)
স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — উত্তরপাড়া
স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন — নওয়াপাড়া (চট্টগ্রাম)
স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ
বিদ্যাসাগর — ভরাকৈড় (ঢাকা)
কবি দীনেশচন্দ্র বসু — শ্রীবাড়ী (ঐ)
৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র — শুঁড়ো (২৪ পরগণা)
৺লালমোহন ঘোষ — বায়ড়াগাদি (ঢাকা) এবং গোয়াড়ী (কৃষ্ণনগর)
৺ডি এল্ রায় — গোয়াড়ী চাষাপাড়া (কৃষ্ণনগর)
৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় — গোয়াড়ী চাষাপাড়া (কৃষ্ণনগর)
রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর — গোয়াড়ী চাষাপাড়া (কৃষ্ণনগর)
গীতরচয়িতা গোবিন্দ রায় — সেরপুর বগুড়া
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — ঘোড়ামারা (রাজসাহী)
বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা
স্বর্গীয় যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু — বেড়্গ্রাম (বর্দ্ধমান)
পৃথ্বীরাজ-প্রণেতা কবিবর
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু — হ্যাংড়া (২৪ পরগণা)
প্রবাসী সম্পাদক
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় — বাঁকুড়া
ভক্তিযোগ-লেখক
শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত — বাটাজোড় (বরিশাল)
শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা — বানরীপাড়া (বরিশাল)
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী — হাবড়া
কবিসম্রাট বিশ্ববিখ্যাত
শ্রীযুক্ত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — যোড়াসাঁকো

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অজেয় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহ বঙ্গ-সাহিত্যের এক পীঠস্থান। সুকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুলেখিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী সকলেই এই বাড়ীর। প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা স্বর্গীয় বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় এবং বঙ্গভাষায় বিশুদ্ধ গদ্য-সাহিত্য-রচনার প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া যথাক্রমে গীত রচনা এবং 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদন করিয়াছিলেন। সাহিত্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বাল্যকালে বহুদিন মাতামহের আলয়ে বাদুড়বাগানে বাস করিয়াছেন এবং 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মাতুলালয় বক্জুড়ীতে ঐরূপ বাস করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আদি-বাড়ী আড়কান্দি (ফরিদপুর) এবং সাহিত্যপরিষদের সভাপতি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ভারতরত্ন শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আদি-বাড়ী রাড়িখাল (বিক্রমপুর)। অবশেষে বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবান্, বহু সাহিত্যিকের আশ্রয়স্থল, বহু সাহিত্য-সভা এবং সম্মিলনের সভাপতি বিদ্বৎকুলচূড়ামণি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের নাম করিব। ইহাঁর বাড়ী ভবানীপুর, চক্রবেড়ের মোড়ে। সম্মুখে (দক্ষিণে) অতি নিকটে চড়কডাঙ্গা, পার্শ্বে (দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে) জেলেপাড়া। পৈতৃক বাসস্থান জিরাট বলাগড়;

এবং শ্বশুরালয় গোয়াড়িতে। "ড়"এর কি অপূর্ব্ব সংযোগ!

আর বাড়াইবার প্রয়োজন কি? সর্ব্বজন-পরিচিত সুলেখক এবং সদ্বক্তা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং সুকবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় যথাক্রমে নিজ-নিজ নামে এবং উপাধিতে "ড়" রাখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় ইহাঁদের বাসস্থানে "ড়" নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বাঁড়ুয্যে হইয়া দাঁড়ান তখন ইহাতেও একটা ড় পাওয়া যায়। এ হিসাবে ইন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, অধ্যাপক ললিতকুমার, ইহাঁরা কেহই এ তালিকা হইতে বাদ পড়েন না। কিঞ্চিৎ দূর-সম্পর্ক ধরিলে বলিতে পারা যায় যে, পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী ভাটপাড়ার অতি নিকটে। আর আজীবন সাহিত্যসেবী প্রিয় সুহৃৎ 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয়কেই বা ছাড়ি কেন? তিনি অল্পকাল হইল কুমারখালির বাড়ী ছাড়িয়া গড়ই নদীর চড়ায় তেবাড়িয়ার নূতন বাড়ী করিয়াছেন!

পাঠক কি বলেন? ড়-এর মহিমা দেখাইবার জন্য ইহা কি যথেষ্ট নহে? যাহা লিখিলাম, ইহাতে এমন কিছু প্রমাণ হইল না যে, যাঁহাদের নামে কিংবা বাসস্থানে "ড়" নাই, তাঁহারা বঙ্গভাষার লেখক নহেন, অথবা ইহাও বলা হইল না যে, গড়পার, রাজখাড়া, সাঁড়ার পুল, তেলিনীপাড়া প্রভৃতি সকল স্থানেই লেখক থাকিবার কথা। কিন্তু যে বর্ণ এতগুলি মহারথীর বাসস্থান আশ্রয় করিয়া আছেন, তিনি যে সাহিত্যসেবী মাত্রেরই নমস্য, তাহাতে সন্দেহ আছে কি? হে মহামহিম 'ডএ বিন্দু ড়'! তুমি নিজগুণে বঙ্গসাহিত্য-সেবকগণের মহাজন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছ, সুতরাং তোমাকে মহামহিম আখ্যায় সম্বোধন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। তুমি আকারে বক্র হইলেও সরল ইক্ষুদণ্ড অপেক্ষা রসাল। তোমাকে নিংড়াইতে হয় না, সামান্য নাড়াচাড়া করিলেই তুমি প্রচুর রস প্রদান কর। আমি অতি ক্ষুদ্র সাহিত্যসেবক। তোমার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইলেও উহার সম্যক্ বর্ণনায় একান্ত অক্ষম। তুমি আমাকে অল্প-বর্ণনা দোষের জন্য ক্ষমা করিও। বঙ্গ-সাহিত্য তোমার নিকট যে প্রকার ঋণী, তাহাতে আশা করা অসঙ্গত নহে যে, দেশের সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির মাত্রেরই গাত্রে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা গণেশের শুণ্ডের ন্যায় তোমার এই চক্রমূর্ত্তি স্বর্ণবর্ণে খোদিত থাকিবে; আর সাহিত্য-সেবকেরা সর্ব্বাগ্রে তোমাকে নমস্কার করিয়া নিজ নিজ কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিবেন অর্থাৎ হাত বাড়াইবেন। শুনিতে পাই কেহ-কেহ তোমাকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন তোমাকে বর্ণ-মালা মধ্যে স্থান দিয়াছেন, তখন আর তাড়ায় কে? যিনি যতই মুখফোড় হউন না কেন, যাঁহার বিদ্যার দৌড় যতই অধিক হউক না কেন, পূর্ব্বোক্ত বড়-বড় কবি, বক্তা এবং লেখকের নাম পড়িয়া সকলেই ভয়ে জড়সড় হইবেন, সন্দেহ নাই, এবং তুমি বর্ণমালার মধ্যে আসিয়া যুড়িয়া বসিয়াছ বলিয়া কেহই তোমাকে লইয়া ছকড়া নকড়া করিতে সাহসী হইবে না। *

* সম্পাদকের টিপ্পনী।—প্রবন্ধ লেখক, 'অনাথ বালক'—রচয়িতা কর মহাশয় সাহিত্য-সমাজে কাহার অপরিচিত? যখন তিনি আমাদিগকে ছাড়েন নাই, তখন তাঁহাকেই বা ছাড়িব কেন? তিনি অনেকদিন হইল গোয়াড়িতে বাড়ী করিয়াছেন এবং এখন হাজরা রোডের ঠিক মোড়ে থাকেন।—ভারতবর্ষ সম্পাদক।

কীটের কাণ্ড

[শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল]

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানবিশেষে আসিয়া যখন আটকাইয়া গেলাম—কিছুতেই যখন বিশ্ববিদ্যালয় আর উত্তীর্ণ করিতে চাহিল না, তখন অগত্যা কৃষিকলেজে নাম লিখাইতে হইল।

আর্ট-কলেজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর হইতে কৃষি-কলেজকে মনোরম বলিয়া বোধ হইত! ছোট এতটুকু জমির মধ্যে ইহা আবদ্ধ নয়,—ইহা উদার, সুবিস্তৃত; আলো এবং বাতাস এখানে বাঁধা পড়ে নাই; এবং ইহার সম্মুখস্থিত খোলা মাঠে প্রচুর শস্য, প্রচুর আলো এবং প্রচুর স্ফূর্ত্তি যে পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কলেজে নাম লিখাইয়া, সত্য কথা বলি, একে-

বারে হতাশ হইয়া গেলাম। স্বাধীনতার নামে বাঁধন এখানে আরও কড়া, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিজের বলিতে এক ঘণ্টাও নাই। একটা মোটা বড় রেজেষ্টরি-খাতা ক্রমাগতই শাসন-দণ্ড উদ্যত করিয়া রহিয়াছে। কোথায় কি এতটুকু অনিয়ম হইয়া পড়িল, অমনি খাতায় মোটা অক্ষরে ঢেরা পড়িয়া গেল,—বাস্! সামলাও তাহার ঠেলা। হোষ্টেলে বসিয়া একটু জোরে যাই গল্প-গুজব হইয়াছে, অমনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কালো মেঘের মত অন্ধকার মুখ নয়ন-পথে আসিয়া উদয় হইল,—এবং তাহার পর প্রমাদ। এ যে ঘরে-বাহিরে বন্ধন! বাস্তবিক, মনে হয় যে, শিক্ষার দোহাই দিয়া মানুষের ভিতরকার সমস্ত রস-কস ছেঁচিয়া নিঃশেষে বাহির করিয়া, মানুষকে নীরস যন্ত্র-বিশেষে পরিণত করিবার বৃহৎ কল আমাদের এই আধুনিক শিক্ষা-মন্দিরগুলি! ঘরে বাহিরে যখন এইরূপে সমস্ত রস-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, তখনও আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেরৎ গুটি-পাচেক ছেলে, নারিকেল-গাছের আগায় নারিকেল-জলের উপর ষোলআনা ভরসা রাখিয়া কোনও রূপে দিন-যাপন করিতেছিলাম; অর্থাৎ কলেজের বিস্তৃত কম্পাউণ্ডের চারিপাশে যে নারিকেল গাছগুলি ছিল, তাহার ফলগুলিকে আমরা আমাদের প্রাপ্য বলিয়াই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, এবং আর্ট-কলেজ হইতে কৃষি-কলেজের এতটুকু পার্থক্যও পাওয়া যাইবে, ইহা মনে করিয়া কতকটা সান্ত্বনাও পাইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য সেই-দিনই পূরাপুরি ষোলআনা বলিয়া বোধ হইল, যে দিন কলেজের প্রিন্সিপাল সমস্ত নারিকেল-গাছগুলি বিশ্বনাথ দাসকে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

২

আমাদের দলের একটা সিক্রেট-মিটিং হইয়া গেল, এবং তাহাতে স্থির হইল যে, এ অত্যাচার কিছুতেই সহ্য করা যাইতে পারে না! কিন্তু কি যে করা যাইতে পারে, তাহার একটা ঠিক-ঠাক স্কীম উদ্ভাবন করার ভার আমার উপর পড়িল। নিজের কথা বলিতে গেলে আত্ম-প্রশংসার মত শোনায়; কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি আত্ম-প্রশংসা করিতেছি না, দশজন লোকের কথাই বলিতেছি। আমি শ্রীমনাথনাথ ঘোষ,—আমাকে দলের ছেলেরা চিরদিনই তাহাদের মুরুব্বি বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে; এবং বিপদের ছায়া যখন গভীর হইয়া আসিয়াছে, তখনই আমার শরণ লইয়াছে; এবং এই সুদীর্ঘ ছাত্র-জীবনে কোনও দিনই কাহাকেও হতাশ হইতে হয় নাই। এই সে-দিনকার কথা,—আমাদের গণিতের অধ্যাপক পাঁচদিন নিরাশ হওয়ার পর বলিলেন, কাল যদি বাড়ী থেকে অঙ্ক ক'সে না আনো, ত, তোমাদের ক্লাসের বার ক'রে দোবো; আর পাঁচ টাকা ক'রে জরিমানা করব।—অঙ্ক যাদের হয় না, তাদের উপর এ জুলুম—গণিতবিদ্যার না হইলেও,—ন্যায়-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ! কিন্তু উপায় কি! পরদিন শূন্য খাতায় কতকগুলো অঙ্কপূরণ ও a b c d লিখিয়া লইয়া নিরীহের মত বসিয়া রহিলাম; অধ্যাপক মহাশয় যাই ক্লাসে আসিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'কই, অঙ্ক দেখি', অমনি যেন অভ্যাসবশতঃ মুখে হাত দিতে-দিতে টপাটপ্ করিয়া ৪।৫ পৃষ্ঠা তাঁহার দেহের অতি সন্নিকটে উল্টাইয়া গেলাম, এবং আমার শিক্ষামত আমার দলও তন্মুহূর্ত্তে সেইরূপ করিল। প্রফেসারের পিতা ছিলেন তর্কতীর্থ এবং পিতামহ ন্যায়পঞ্চানন; এবং প্রফেসরও স্বয়ং পরম হিন্দু ছিলেন; সুতরাং ঈপ্সিত ফল ফলিল। তিনি দশহাত পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, 'হাঁ, হাঁ, কর কি, কর কি!' আমিও আবার তাঁহার দেহের খুব নিকটে গিয়া বলিলাম, 'এই দেখুন স্যার', বলিয়া দ্রুত পূর্ব্বানুবৃত্তি! তখন তিনি প্রমাদ গণিলেন; কহিলেন, 'বেশ ক'রেছ; এই রকমই ত পড়ায় মনোযোগ হওয়া উচিত। যাও ব'সোগে।' আমরা যে শুধু সে-দিন বাঁচিয়া গেলাম, তা নয়; সেই দিন হইতে আমাদের এই বেয়াড়া, অহিন্দু দলটিকে প্রফেসর মহাশয় হোম-টাস্ক হইতে রেহাই দিলেন! এই একটা দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিবেন আমাদের দলের বিশ্বাস আমার উপর কেন এত অটল ছিল।

৩

আমি কহিলাম, "উপায় স্থির ক'রেছি; কিন্তু খুব গোপনে রাখ্‌তে হবে।" আমাদের দল কহিল, "কি?" আমি কহিলাম, "কাঠের মই ত' আমাদের কতকগুলো আছে। সেইগুলো গাছে লাগিয়ে, কাঁটি দিয়ে নারিকেলের তলায় ও পাশে ছিদ্র ক'রে, তাইতে মুখ লাগিয়ে জল খেয়ে নিতে হবে!" দল কহিল, "বেশ উপায়।" গাছগুলো বেশীর ভাগ ছোট ছিল, সুতরাং ইহাতে কিছুই বাধা দেখা গেল না।

এক ভাবনার কথা ছিল, যদি কেহ দেখিয়া ফেলে। আমি কহিলাম,"সেই দিকে লক্ষ্য ক'রে এ কাজ করতে হবে। খুব সাবধান।" তাহার পর হইতে আরম্ভ হইল। মাঠে দিনের মধ্যে অনেক সময়েই আমাদের 'ডিউটি' থাকিত; সেই ডিউটিকে সরস করিতে লাগিল এই ডাবের জল! ক্রমশঃ আমাদের দল ছাড়াইয়া ইহা বাহিরেও সংক্রামিত হইল,—কলেজের অন্যান্য ছাত্ররাও এই অমৃত-আস্বাদন হইতে বঞ্চিত রহিল না। একজন করিয়া পাহারা থাকিত, এবং বিপদের সম্ভাবনা মাত্রে সে ইঙ্গিত করিয়া সাবধান করিয়া দিত! এমন করিয়া বিশ্বনাথ দাসের বন্দোবস্তি নারিকেল আমাদের প্রচুর আনন্দ দান করিতে লাগিল।

* * *

সেদিন দ্বিপ্রহরে প্রফেসর দত্তর ক্লাসে কীট-তত্ত্বের বক্তৃতা হইতেছিল। গ্রীষ্ম প্রচণ্ড ছিল, সুতরাং আমরা কয়েকজন নিদ্রা-তত্ত্বের চর্চ্চার উদ্যোগ করিতেছিলাম। এমন সময় একটা প্রকাণ্ড ঝুড়িতে গোটা-ত্রিশেক শূন্যাভ্যন্তর নারিকেল লইয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর বিশ্বনাথ দাস দত্ত সাহেবের সম্মুখে নামাইয়া হা হুতাশ করিয়া কহিল, "হুজুর, মারা গেলাম। একটা নারিকেলও ভাল নেই! খাজনা দিই কি ক'রে!" দত্ত বলিলেন "এখানে কেন?" বিশ্বনাথ কহিল, "প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম; তিনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" আমি ততক্ষণে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। দেখিলাম, এইবার বিপদ। কহিলাম, "কোন রকম পোকা হবে বোধ হয়।" প্রফেসর দত্ত একটা নারিকেল লইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; কহিলেন, "সম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য্য, এ কি পোকা?" বলিয়া পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর কহিলেন, "শঙ্খে পোকা হয়ে নষ্ট ক'রে দেয় বটে; কিন্তু নারিকেলের পোকার কথা ত' শুনিনি।" আমি কহিলাম, "কত নূতন-নূতন পোকার অস্তিত্বের কথা শোনা যাচ্ছে! এও একরকম পোকাই হবে।" প্রফেসার দত্ত বিশ্বনাথকে কহিলেন, "গোটাকতক নারিকেল রেখে যাও—পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ব।" সে হাত যোড় করিয়া কহিল, "হুজুর, সবগুলোই রইল; ও নিয়ে আমি আর কি করব! আমার মালগুজারির কথাটা!" দত্ত সাহেব কহিলেন, "আচ্ছা, পরীক্ষা ক'রে বড় সাহেবের সঙ্গে সে বিষয়ে কথা কইব। তুমি এখন যাও।" বিশ্বনাথ চলিয়া গেল।

* * *

তাহার পর এই বিষয় লইয়া দিনকতক খুব চর্চ্চা ও গবেষণা চলিল! দত্ত সাহেব প্রায় আমাদের পড়ান ছাড়িয়া দিলেন, দিবারাত্রি নারিকেলগুলি লইয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। শুনিলাম, তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই কীট কীটরাজ্যে একটা অদ্ভুত জিনিস, কীট-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মগুলি এই কীট একেবারেই মানিয়া চলে না! অবশেষে দত্ত সাহেব ও প্রিন্সিপ্যাল উভয়েই একমত হইলেন যে, ইহার রিপোর্ট বিলাতের Royal Agricultural Society ও আমেরিকার কৃষি-সমিতিতে পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের মতামত জানা প্রয়োজন।

কলেজ হইতে রিপোর্ট গেল। উত্তরে, উভয় Society লিখিলেন,—The research promises to be an extremely interesting one, as there is no known instance of a cocoanut-shell being bored in the way reported. Nothing, however, can be definitely done, without examining some of the cocoanuts in question, and we, therefore, request, that you will be good enough to send some specimens immediately.

তাহার পর বড়-বড় কাঠের বাক্সে বন্ধ হইয়া, অজ্ঞাত-কীট-দষ্ট বিশ্বনাথ দাসের এই শূন্যগর্ভ নারিকেলগুলি সযত্নে লণ্ডন ও আমেরিকার কৃষি-সমিতিতে প্রেরিত হইল।

* * *

(৪)

আমাদের দলের মধ্যে যামিনী আড়-বুঝো লোক ছিল, এবং তাহাকে লইয়াই আমাদের বিপদ হইল। সেই কথাই বলিতেছি।

সহজে যে বাঁকা বুঝিয়া চটিয়া উঠে, লোকের চেষ্টা হয় তাহাকে চটান। এটা পৃথিবীর ধর্ম্ম। যামিনী এই সহজে-ক্রুদ্ধ-হইবার স্বভাব লইয়া যে-দিন আমাদের দলে ভর্ত্তি হইল, সে-দিন হইতে আমাদের দলের একটা প্রাত্যহিক কাজ হইল তাহাকে চটান। কলেজে যাইবার যখন বিশেষ তাড়া, তখন ফস্ করিয়া একপাটি জুতা হারাইয়া যাওয়া,

বেড়াইতে যাইবার সময় চাদরের অন্তর্দ্ধান, খাইবার সময় হঠাৎ আলো নিভিয়া গিয়া খাইবার থালা তিরোহিত হওয়া —এ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন সময় বেচারার অপরাধ—সে বিবাহ করিল। আর কোথা যায়! সকলে মিলিয়া ধরিয়া বসিল, বউয়ের চিঠি দেখাতে হবে। এ এমন একটা শক্ত কথা নয়; কিন্তু বলিয়াছি ত' যামিনী একটু বাঁকা বুঝিত,—সে কহিল, "কিছুতেই দেখাইব না!"

তাহার ফল এই হইল যে, প্রায় মাস-খানেক ধরিয়া যামিনীর স্বাক্ষরে অমরনাথ এবং যামিনীর স্ত্রীর মধ্যে চিঠি-চলাচল হইতে লাগিল, এবং যামিনীর চিঠি-না-পাওয়ার তাগিদ-পত্রগুলি ড্রেণের মধ্যে শতখণ্ড হইয়া ইহলীলা অবসান করিতে লাগিল।

এই ব্যাপার যে-দিন ধরা পড়িল, সে দিন যামিনী পাগলের মত হইয়া গেল। সে কাহাকে কি বলিল—কোন ঠিকানা নাই। অবশেষে হোষ্টেলের সুপারিনটেন্‌ডেন্‌টের কাছে নালিশ করিয়া দিল; এবং ভয় দেখাইল যে, প্রিন্সিপ্যালকে বলিয়া দিবে। সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট একঘণ্টা ধরিয়া আমাদিগকে নৈতিক বক্তৃতা দেওয়ার পর, আরও একঘণ্টা বক্তৃতার ভয়ে আমাদের চোখে অনুশোচনার জল আসিল, এবং আমরা বলিলাম যে, আমরা আন্তরিক অনুতপ্ত হইয়াছি! শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি প্রভুর আশীর্ব্বাদ আহ্বান করিয়া আমাদিগকে মুক্তি দিলেন।

এ ঘটনা মোটে দিনদশেক হইয়া গিয়াছে। যামিনী নিশ্চিন্ত আছে যে, আর তাহার উপর জুলুম হইবে না। এমন সময় মাঠ হইতে ঘুরিয়া আসিয়া একদিন সে স্ত্রীর হাতের লেখা খাম খুলিয়া দেখিল, তাহার ভিতর স্ত্রীর চিঠি নাই; এবং তাহার পরিবর্ত্তে স্থূল-পুচ্ছ একটি নিরীহ গাধার ছবি, —যাহার মুখ অনেকটা তাহার সহিত মেলে।

দেখিয়া সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; এবং অন্তরালে আমরা যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিলাম। কিন্তু তাহার পর সে জল-ভরা মেঘের মত থমথমে হইয়া গেল; কাহারও সহিত কোনও আলাপ করিল না, এবং ভাত পর্য্যন্ত খাইল না।

দত্ত-সাহেবের ক্লাসে আমরা সকলে বসিয়াছি, লেকচার হইতেছে,—এমন সময়ে ঝড়ের মত ক্লাসের ভিতর গিয়া যামিনী ডাকিল "স্যর!" দত্ত-সাহেব বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন। সে কাহারও পানে লক্ষ্য না করিয়া কহিল, "ও সব নারিকেলগুলো অনাথরা খেয়েছে,—পোকা-টোকা মিথ্যা কথা।" দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ক'রে?" "সিঁড়ি লাগিয়ে কাঁটি দিয়ে ফুটো ক'রে।" শুনিয়া দত্ত সাহেবের মুখ একেবারে লাল হইয়া গেল। হাতের বই টেবিলের উপর সশব্দে পড়িয়া গেল। তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "অনাথ!" ভয়ে বুক কাঁপিয়া উঠিল; আমি আস্তে-আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দত্ত-সাহেব ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন, "যামিনী কি বলছে,—সত্যি সব?" আমি নিম্ন-স্বরে কহিলাম, "আজ্ঞে হাঁ।" "কেন এমন ক'রেছিলে?" "তেষ্টা পেয়েছিল স্যর!" বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তাঁহার মুখের কঠোর ভাব হঠাৎ অনেকটা নরম হইয়া আসিল, এবং কষ্টে ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিলেন। "এতগুলো কেন নষ্ট করেছো?" "সকলের তেষ্টা পেয়েছিল।"—তাহা শুনিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "গাধা ছেলেরা সব,—তোমাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! খেয়েছ—খেয়েছ; কিন্তু যখন সেগুলো বিলেতে আর আমেরিকায় পাঠান হ'ল, তখন বল্‌তে নেই? এ যে কেলেঙ্কারী!" আমি নিম্নস্বরে বলিলাম, "আপনি যখন ধর্‌তে পারেন নি স্যর, তখন তারাও পার্‌বে না।" শুনিয়া তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, "এমন দুষ্টামির কথা ত' কোথাও শুনিনি!" তাঁহার প্রসন্ন মুখ ও হাসি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের বিপদের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে; কারণ এই গভীর বিদ্যাশালী শিশুপ্রকৃতি আমাদের প্রফেসারটিকে যখনই হাসাইতে পারিয়াছি, তখনই জানিয়াছি—আমরা নির্ভয়। তখন ফিস্‌ফিস্ করিয়া ক্লাসের মধ্যে সকলে যামিনীকে কহিতে লাগিল, 'কৃতঘ্ন! নরাধম! বিশ্বাসঘাতক!'

(৫)

তাহার পর প্রায় বছর-খানেক কাটিয়া গিয়াছে; আমরা কৃষি কলেজ হইতে "আউট" হইয়া ভদ্রলোক শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছি। প্রফেসর দত্ত কিন্তু আমাদের ভুলেন নাই। সে-দিন তিনি আমাকে ও আরও গুটি-দুই-তিন তাঁহার বাছা-বাছা ভূতপূর্ব্ব ছাত্রকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমরা যাইতেই তিনি হাস্যমুখে

কহিলেন, "লণ্ডনের Royal Agricultural Societyর রিপোর্ট এসেছে" বলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন :—

"After corresponding with the Society of Agriculture of America on this subject, we are of opinion that the fungus theory or theory of microbes must be dismissed out of consideration as untenable. * * * We have examined the borings in the shell of the cocoanuts, and they appear to have been made by insects provided with strong and pointed weapons in their heads. The borings are deep, clear and straight, and as such the weapons must also be sharp and long. Of the three well-defined parts of an insect, namely the head, thorax and body, the weapon must go with the head. We however do not know yet of any insect provided with so strong and long a weapon, and as such, this particular specimen is extremely interesting. * * * As a means of protecting the cocoanuts we would suggest a close wire-netting and this we think would be sufficiently effective, as from the data before us, the insects do not seem to us to be very small, and to us it appears that they can even be caught if proper care and vigilance be exercised. * * * The research has been very interesting and the insect which is undoubtedly of a novel sort should prove to be a valuable addition to the science of Entomology."

অর্থাৎ, আমেরিকার কৃষি-সমিতির সহিত এ বিষয়ে পত্র-ব্যবহার করিয়া আমাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছে যে, ফাঙ্গাস অথবা মাইক্রোব থিওরি সম্ভব নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। নারিকেলের খোলার ছিদ্রগুলি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি ; এবং আমাদের মনে হয় যে, মাথায় তীক্ষ্ণ এবং কঠিন অস্ত্রধারী পোকার দ্বারা ঐ-গুলি করা হইয়াছে। ছিদ্রগুলি গভীর, পরিষ্কার এবং সরল, এবং তাহাতে বোঝা যায় যে অস্ত্রও তীক্ষ্ণ এবং দীর্ঘ হইবে। পোকার শরীরের তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট অংশ—মস্তক, বক্ষ এবং দেহের ভিতর, অস্ত্রটী মাথাতেই আছে। আমরা কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন পোকার কথা জানি না, যাহার এরূপ দীর্ঘ ও কঠিন অস্ত্র আছে। এবং সেইজন্যই ইহা বিশেষ কৌতূহল-প্রদ হইয়াছে। * * নারিকেলগুলি রক্ষা করার জন্য আমাদের মনে হয় ঘন জালের বেড়ায় বেশ কাজ হইবে ; কারণ পোকাগুলি বিশেষ ছোট বলিয়া বোধ হয় না। এমন কি সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে তাহাদের ধরাও যাইতে পারে। * * এই বিষয়ের আলোচনা খুবই কৌতূহল-প্রদ হইয়াছে, এবং নূতন ধরণের এই আলোচ্য কীট, কীট-বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান সঞ্চয় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

রিপোর্ট পাঠ করিয়া প্রফেসর দত্ত হাসিয়া আমার পিঠ ঠুকিয়া দিলেন, "মৌলিক বটে।"

চোরের চাতুরী

[শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী]

সে যে রে চতুর চোর !
নীরদ-কান্তি, মরাল-গমন,
খঞ্জন-মীন-হরিণ-লোচন,
চন্দ্র-বদন-মাধুরী মোহন হরিল বঁধুয়া মোর !
মধুর মধুর তাহার বদন-মাধুরীতে রবে মগন নয়ন,
সেই অবসরে চুরি করি মন লুকা'ন কিশোররাজ ;

কতদূরে আর করিবে গমন ?
কমলার আঁখি করিতে স্মরণ
অলস চরণ জড়ের মতন দাঁড়াবে কানন-মাঝ !
যদি দূরে যায়, ময়ূর-মুকুটে পড়িবে সে ধরা নয়নের পুটে,
কেমনে গোপন র'বে ?
আঁধিয়ার বনে অঙ্গ-কিরণে বঁধুরে চিনিবে সবে !

ত্রি-চিত্র

[মাননীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত স্যার বিজয়চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুর

কে-সি-এস-আই, কে-সি-আই-ই, আই-ও-এম]

প্রথম দৃশ্য—আদিরস। স্থান—নন্দন-কানন।

মদন ও রতি দণ্ডায়মান।

রতির উক্তি—

গীত।

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল কাওয়ালী।

নাথ হে জীবন-সার, পর পর ফুলহার।
ও গলে দুলিলে মালা জুড়াবে প্রাণ আমার॥
মধুরে মধুরে মিশে, হাসিবে ফুল পরশে,
মালা দিলে জ্বালা মম হবে' দেখে সুখ তার।
তবে হে পর'না তায়, হার হবে অন্তরায়,
মাঝে থেকে বুকে বুকে মিশিতে দিবে না আর।
রাখি হে দুটী হৃদয়ে, স্নেহ-পাশে জড়াইয়ে,
তা হ'লে থাকিবে ভাল, কাজ কি কোন ভূষার।
প্রণয়ের পরিমাণে, দিব কি তব চরণে,
দিতে বাকি আছে বা কি, দাসী যে নিজে তোমার।"

মদনের প্রত্যুত্তর—

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

তুমি মম ধ্রুবতারা, আমি তব কৃতদাস।
মোহিনী মোহনরূপে, তাই সদা অভিলাষ॥
হৃদয়-মন্দিরে কবি, দিল যে মানস-ছবি,
হ'য়ে তাহা প্রেমরবি, নাশিছে কামের ত্রাস।
যাবে ঘুচে মায়া মোহ, থাকিবে না কারো কেহ,
যবে এই ভালবাসা, করিবে গো পূর্ণগ্রাস।
পবিত্র এ প্রীতি যেন, রহে দোঁহে অনুক্ষণ
এ জীবনে আজীবন, এই মম সদা আশ।"

(পট-পরিবর্ত্তন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য—উন্মেষ। স্থান—প্রমোদ-উদ্যান।

যুবক ও যুবতী উপবিষ্ট।

যুবকের উক্তি—

গীত।

কীর্ত্তন—তাল একতালা।

মানস রঙ্গিনী, মানস-সঙ্গিনী,
মন-বিমোহিনী রে।
হৃদয়বাসিনী, হৃদয়-ভামিনী,
হৃদি-বিলাসিনী রে॥
প্রাণের কামনা, প্রাণের ললনা,
প্রাণ-বিলোকনা রে।
প্রেমের পুতলী, প্রেমের অঞ্জলি,
প্রেমময় কলি রে॥

(উভয়ে প্রেমালাপে মগ্ন, দূরে গৈরিক-বেশমণ্ডিত দণ্ডধারী দণ্ডী দণ্ডায়মান হইয়া নেপথ্যে গীত।)

রাগিণী বেহাগ খাম্বাজ—তাল একতালা।

"শৈশবে, যৌবনে, বিবিধ বিধানে,
লয়ে রামাস্তনে কাটায়েছ দিন।
খেয়েছ, ঘেঁটেছ, নেড়েছ-চেড়েছ,
দেখেছ, ভেবেছ, অলস-বিহীন॥

(যুবক ও যুবতী হস্তধারণ ও উত্থান এবং মুখে ক্রোধভাব)
(দণ্ডী সম্মুখে আসিয়া আবার গাহিলেন—)

রক্ত, ক্লেদ, বসা, এতে এত তৃষ্ণা,
এত ভালবাসা হয় কি কারণ।
শূকরে, পুরীষে, রিষকীট বিষে,
সতত হরষে নিরত যেমন॥

কোটী কোটী বার যে জনম-দ্বার
হইয়াছ পার, নরক-সমান ;
তা'তে কি ভাবিয়া, রয়েছ মজিয়া,
সকল ভুলিয়া, হ'য়ে হতজ্ঞান ॥
(যুবক ও যুবতীর মুখে লজ্জার ভাব)

(দণ্ডী পুনরায় গাহিলেন—)

নর হ'য়ে কি রে, পশুসম মোরা
করিব অভ্যাস-বশে ঘোরা-ফেরা ?
মন্দ ছিনু কবে, তাই হেয় ভাবে
চিরদিন কি রে জনম কাটিবে ?
চোখ বুজে এসে চোখ বুজে যা'ব,
কিসে কি ঘটিছে ভুলে না দেখিব ?
উচ্চ আবাহনে বধির হইয়া
ইন্দ্রিয়-সঙ্গীতে রহিব মজিয়া ?
অমৃত-বাসনা মিটাব গরলে
ভজিব মরণে, মুক্তি পায়ে ঠেলে ?
(যুবক ও যুবতীর মুখে চিন্তার ভাব)

(দণ্ডী শেষে গাহিলেন—)

আয় না দু'দিন দেখি সাধু সেজে
একবার ছেড়ে চিরাভ্যস্ত কাজে,
যদি সুস্থ হই, ঘোচে ভবজ্বালা,
তবে কেন মরি, করি এ কু-খেলা ?
শৈশব চেষ্টায় কাটে কি যৌবন ?
যৌবন-ব্যাপার তারুণ্যে তেমন।
পশুভাব ছেড়ে যত শীঘ্র পার,
'প্রাপ্য বর ল'য়ে দেবত্ব আহর'।
রাজপুত্র হ'য়ে শূকর-চারণে
কোন্ পাপে বল যাপিবে জীবনে ?
যে চাহিলে পায় অক্ষয় রতন,
কাচে পরিতোষ তা'র কি কারণ ॥"

(যুবক ও যুবতীর পরস্পর হাত-ছাড়াছাড়ি ও তাহাদের মুখে এক অনির্ব্বচনীয় 'উন্মেষের' ভাব)

(পটপরিবর্ত্তন)

তৃতীয় দৃশ্য— আনন্দ।

স্থান—গিরিগুহা।

(উভয় পার্শ্বে গৈরিক-বসনমণ্ডিত ঐ যুবক-যুবতী ধ্যানমগ্ন ও মধ্যস্থলে উচ্চ-শৃঙ্গোপরি উপবিষ্ট দণ্ডী।)

দণ্ডীর উক্তি—

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কবে এড়াইব করমের ফাঁস,
যাতে সদা আনে ভুবনে।
কবে ঘুচে যাবে কামনা জঞ্জাল,
করম জনমে যেথানে ॥
কিছু, কিছু নয়, সব মায়াময়,
জলধারা দেখে ভুজঙ্গম ভয়,
শূন্যে অভিমান মমতা উদয়,
জড় বোধ হয় চেতনে।
মায়া কেটে গেলে 'নিজ' বোধ যায়
'আমি' 'তুমি' ধ্বনি আকাশে মিশায়,
জ্ঞানরবি নাশে অবিদ্যা-নিশায়,
দেখিবারে পাই নয়নে।
মান, অপমান, সব সম স্থান,
ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য, অভিধান,
দুই তিরোধান, এক অধিষ্ঠান,
হয় দ্বৈতভাব নাশনে।
একত্ব বুঝিলে শোক, মোহ যায়,
ভ্রম-আবরণ কোথায় লুকায়,
ক্ষোভ-তম গত বিজ্ঞান-প্রভায়,
বিমল আনন্দ-কিরণে।
যথা সিন্ধু, উর্ম্মি, অভেদ গণন,
কবে ব্রহ্মে, নিজে, ভাবিব তেমন,
বিজয়ে চিনিতে ভুলিব যখন,
দেখিব কি কভু সে দিনে ॥

একাদশী বৈরাগী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

১

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া, অনার সমেত বি-এ পাশ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না। গ্রামের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ একটা হাই-স্কুল ছিল,—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যে ইহাতেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়িয়া দিয়া, দশআনা-ছ'আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু, কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্র্যাজুয়েট ছোকরার মাথার চুল সমান করিয়া কাটা; বিশেষ করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নধর টিকির সংস্থান দেখিয়া, শুধু ছোকরা কেন, বাবাদের পর্য্যন্ত বিস্ময়ে তাক্‌ লাগিয়া গেল। সহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব্ব সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্ত-কণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল, যে, এই হিন্দুধর্ম্মের মত এমন সনাতন ধর্ম্ম আর নাই; কারণ, ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞান-সম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহরক্ষা ব্যাপারে সন্ধ্যাহ্নিকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়া নির্ব্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল। এবং, তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকাল মধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, একাদশী, পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের ঘটায় বাড়ীর মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনায়, কল্পনায় যুবকমহলে একেবারে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। বুড়ারা বলিতে লাগিল, 'হাঁ, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেম্‌নি। না হইলে আজকালকার কালে এতগুলা ইংরাজি পাশ করিয়াও এই বয়সে এমন ধর্ম্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায়! সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব্ব একটা অপূর্ব্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী, ধূমপান-নিবারণী ও দুর্নীতি-দলনী—এই তিন-তিনটা সভার আস্ফালনে গ্রামের চাষাভুষার দল পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাঁচকড়ি তেওর তাড়ি খাইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া, অপূর্ব্ব সদলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনি শাসিত করিয়া দিল যে, পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ী পলাইয়া গেল। ভগা কাওড়া অনেক রাত্রে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে, গাঁজার ঝোঁকে নাকি বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল; ব্রাহ্মণ-পাড়ার অবিনাশের কাণে যাওয়ায়, সে তাহার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল। দুর্গা ডোমের ১৪।১৫ বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল; অপূর্ব্বর দলের ছোকরার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর সেই জ্বলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোস্কা তুলিয়া দিল। এম্‌নি করিয়া অপূর্ব্বর হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সদ্যসদ্যই ফুলে-ফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্ব্বর চোখে পড়িল যে, ইস্কুলের লাইব্রেরীতে শশিভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছু নাই। এই দীনতার জন্য সে হেডমাষ্টারকে অশেষরূপে লাঞ্ছিত করিয়া, অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিষ্ট তৈরি হইতে বিলম্ব হইল না। এতদিন ছেলেদের ধর্ম্ম-প্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল; কিন্তু, দুই-এক্ দিনের মধ্যেই তাহাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি

ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্ম্ম-প্রচার ও দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা হইল। ইস্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্ব্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একাদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্ব্বে উদ্বাস্ত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুর গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা না কি টাকার কুমীর; কিন্তু তাহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না, —হাঁড়ি-ফাটার ভয়ে বহুদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগী মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ। অপূর্ব্ব তাল ঠুকিয়া কহিল, "টাকার কুমীর! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্দ্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য! না হইলে সেখানের ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বারুই-পুরের জমিদার ত দিদির মামাশ্বশুর!" ছেলেরা নাচিয়া উঠিল, এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগীর নামের পিছনে একটা মস্ত অঙ্কপাত হইয়া গেল। একাদশীর কাছে টাকা আদায় করা হইবে, না হইলে অপূর্ব্ব তাহার দিদির মামাশ্বশুরকে বলিয়া বারুইপুরেও ধোপা-নাপিত বন্ধ করিবে, সংবাদ পাইয়া রসিক স্মৃতিরত্ন লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থে উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা টাকা না দিলে, মহাপাপী ব্যাটা কালীদহে বাস্ত কি করিয়া রক্ষা করে দেখিতে হইবে। কারণ, বাস না করিলেও এই বাস্ত-ভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্মৃতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যেহেতু বছর-দুই পূর্ব্বে এই জমিটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু ব্যক্তির ন্যায় কাণে আঙুল দিয়া বলিয়াছিল, "এমন অনুমতি করবেন না ঠাকুর মশাই, ঐ এক ফোঁটা জমির বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতে পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগবে, এ তো আমার সাত-পুরুষের ভাগ্যি।" স্মৃতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিত চিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি শ্রদ্ধার লক্ষকোটী সুখ্যাতি করিয়া অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করার পরে, একাদশী করজোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল—"কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট, ঠাকুর- মশাই, যে, সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতে হাতছাড়া করবার জো নেই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস বাবা, বাস্ত-ভিটে কখনো ছাড়িস্ নে!" ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আক্রোশ স্মৃতিরত্ন বিস্মৃত হন নাই।

দিন-পাঁচেক পরে একদিন সকালবেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীটি মাটির, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয় লক্ষ্মীশ্রী আছে। অপূর্ব্ব কিম্বা তাহার দলের আর কেহ একাদশীকে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই; সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ লোক টাকার কুমীরই হোক, হাঙ্গরই হোক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যে পুঁটি-মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা। দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে, কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তিও যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্যই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিংড়াইয়া বিসর্জ্জন দিয়া 'মহাজন' হইয়া বসিয়া আছে। তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব্ব মনে-মনে দমিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের উপর ঢালা বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাত-বাক্স, এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসাবের খাতাপত্র। একজন বৃদ্ধ-গোছের গমস্তা খালি-গায়ে পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া শ্লেটের উপর সুদের হিসাব করিতেছে; এবং সম্মুখে, পার্শ্বে, বারান্দায়, খুঁটির

আড়ালে নানা বয়সের নানা অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ ম্লান মুখে বসিয়া আছে। কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সুদ দিতে, কেহ-বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে;—কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য কেহ যে বসিয়া ছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া একাদশী বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিল। গমস্তা শ্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, "কোত্থেকে আসচেন?" অপূর্ব্ব কহিল, "কালীদহ থেকে।" "মশায় আপনারা?" "আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।" ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ঝুঁকাইয়া প্রণাম করিল; কহিল, "বোস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌।" সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গমস্তা প্রশ্ন করিল, "আপনাদের কি প্রয়োজন?" অপূর্ব্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর-একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোকেটিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, "তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা? সুদ ত হয়েছে কুল্‌লে সাত টাকা দু-আনা; তার দু-আনাই যদি ছাড়্‌ করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের কোরে মেরে ফেল না কেন?"

তাহার পরে উভয়েই এম্‌নি ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু করিয়া দিল—যেন এই দু'আনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর মাও যেমন স্থিরসঙ্কল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেরি হইতেছে দেখিয়া, অপূর্ব্ব উভয়ের বাদ্‌বিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, "আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা—" একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আজ্ঞে, এই যে শুনি;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবোতে চাস্‌ রে? সে দু'টাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার এক টাকা চাইতে এসেছিস্‌ কোন্‌ লজ্জায় শুনি? বলি সুদ্‌টুদ কিছু এনেচিস?" নফর ট্যাঁক খুলিয়া একআনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল, "তিন মাস হয়ে গেল না রে? আর দুটো পয়সা কই?" নফর হাত-জোড় করিয়া বলিল, "আর নেই কর্ত্তা; ধাড়ার-পোর কত হাতে-পায়ে পোড়ে পয়সা চারটি ধার কোরে আন্‌চি, বাকি দুটো পয়সা আসচে হাট-বারেই দিয়ে যাবো।"

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, "দেখি তোর ওদিকের ট্যাঁক্‌টা?" নফর বাঁ দিকের ট্যাঁক্‌টা দেখাইয়া অভিমান ভরে কহিল, "দুটো পয়সার জন্যে মিছে কথা কইচি কর্ত্তা? যে শালা পয়সা এনেও তোমারে ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক—এই বলে দিলুম।" একাদশী তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তুই চারটে পয়সা ধার কোরে আন্‌তে পারলি, আর দুটো অম্‌নি ধার করতে পারলিনে?" নফর রাগিয়া কহিল, "নাইরি দিলাশা করলুম না কত্তা? মুখে পোকা পড়ুক"—অপূর্ব্বর গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা লোক ত তুমি মশাই!" একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র,—কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগ্‌দী সুমুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল; একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া বলিল, "পরাণ, নফ্‌রার কাছাটা এক্‌বার খুলে দেখ্‌ ত রে, পয়সা দুটো বাঁধা আছে না কি?" পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাঁধা পয়সা দুটো খুলিয়া একাদশীর সুমুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। একাদশী এই বেয়াদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর মুখে পয়সা ছয়টা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া গমস্তাকে কহিল, "ঘোষাল মশাই, নফরার নামে সুদ আদায় জমা করে নেন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার কোরবি রে?" নফর কহিল, "আবশ্যক না হলেই কি এয়েচি মশাই?" একাদশী কহিল, "আট আনা নিয়ে যা না। গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় করে ফেল্‌বি রে!" তার-পরে অনেক কষা-মাজা করিয়া নফর মোড়ল বারো-আনা পয়সা কর্জ্জ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। অপূর্ব্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটা একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "যা দেবেন দিয়ে দিন মশাই, আমরা আর দেরি করতে পারিনে।"

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পোনর মিনিট ধরিয়া আগাগোড়া তন্নতন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া, শেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি বুড়ো মানুষ, আমার কাছে আবার চাঁদা কেন?" অপূর্ব্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, "বুড়ো মানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোট ছেলেতে টাকা দেবে? তারা পাবে কোথায়

শুনি?" বুড়া সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, "ইস্কুল ত হয়েচে ২০।২৫ বছর; কৈ, এতদিন ত কেউ লাইব্রেরীর কথা তোলে নি বাপু? তা, যাক্, এ তো আর মন্দ কাজ নয়,—আমাদের ছেলেপুলে বই পড়ুক আর না পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়বে ত! কি বল ঘোষাল মশাই?" ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল, বোঝা গেল না। একাদশী কহিল, "তা বেশ, চাঁদা দেব আমি,—একদিন এসে নিয়ে যাবেন চারআনা পয়সা। কি বল ঘোষাল, এর কমে আর ভাল দেখায় না! অতদূর থেকে ছেলেরা এসে ধরেচে—যা'হোক্ একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত? আরও ত লোক আছে, তাদের কাছে ত চাইতে যায় না,—কি বল হে?"

ক্রোধে অপূর্ব্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অনাথ কহিল, "এই চারআনার জন্যে আমরা এতদূরে এসেচি? তাও আবার আর-একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে?" একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "দেখ্‌লেন ত অবস্থা,—ছ'টা পয়সা হকের সুদ আদায় করতে ব্যাটাদের কাছে কি ছ্যাঁচড়াপানাই না করতে হয়? তাই, এই পাট-টা বিক্রী না হয়ে গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে"—অপূর্ব্বর রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; বলিল, "সুবিধে হবে এখানেও ধোপা-নাপিত বন্ধ হলে। ব্যাটা পিশাচ সর্ব্বাঙ্গে ছিটে-ফোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েছেন,—আচ্ছা!"

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটা আঙুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, "বারুইপুরের রাখালদাস বাবু আমাদের কুটুম—মনে থাকে যেন বৈরাগী!" বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব্ব বলিল, "গরীবদের রক্ত শুষে সুদ খাওয়া তোমার বার কোরব, তবে ছাড়্‌ব।" নফ্‌রা তখনও বসিয়া ছিল; তাহার কাছায়-বাঁধা পয়সা-দুটা আদায় করার রাগে মনে-মনে ফুলিতেছিল; সে কহিল, "যা কইলেন কর্ত্তা, তা ঠিক। বৈরিগী ত নয় পিচেশ! চোখে দেখ্‌লেন ত, কি কোরে মোর পয়সা-দুটা আদায় দিলে!" বুড়ার লাঞ্ছনায় উপস্থিত সকলেই মনে-মনে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা ত ভেতরের কথা জানো না;—কিন্তু, আমাদের গাঁয়ের লোক,—আমরা সব জানি। কি গো বুড়ো, আমাদের গাঁয় কেন তোমার ধোপা-নাপ্‌তে বন্ধ হয়েছিল বোল্‌ব?" খবরটা পুরাতন। সবাই জানিত, একাদশী সংগোপের ছেলে—জাত বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্র ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ-মরা এই বৈমাত্র ছোট বোন্‌টিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল; তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল; আবার অল্প বয়সে বিধবা হইয়া গেলে, দাদার ঘরেই সে আদরে যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে সেই ভগিনীর এতবড় পদস্খলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে-গ্রামে, সহরে-সহরে ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা, একান্ত অনুতপ্তা দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া, নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোবা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল। কথাটা সবাই জানিত; তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক-কাহিনীর মাধুর্য্যটা উপভোগ করিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু একাদশী লজ্জায়, ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার নিজের জন্য নয়, ছোট বোনটার জন্য। গৌরীর প্রথম যৌবনের অপরাধ তাহার আপনার বুকের মধ্যে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলার্দ্ধও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভাল রূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও তাহার কাণে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণ মুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

তাহার এই সকরুণ দৃষ্টির নীরব মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু, অপূর্ব্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

বিপিন বলিতে লাগিল, "আমরা কি ভিখিরি, যে, দুকোশ পথ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগণ্ডা পয়সা ভিক্ষে চাইতে এসেচি! তাও আবার আজ নয়,—কবে ওঁর কোন্ খাতকের পাট বিক্রী হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁটতে হবে। তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু, লোকের রক্ত শুষে সুদ খাও বুড়ো, মনে করেচ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাড়ির হাল করি, ত আমার নাম বিপিন ভটচায্যিই নয়! ছোট জাতের পয়সা হয়েচে বলে চোখে-কাণে আর দেখ্‌তেই পাও না? চল হে অপূর্ব্ব, আমরা যাই—তার পরে যা জানি করা যাবে।" বলিয়া সে অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া টান্ দিল।

বেলা এগারোটা বাজিয়া গিয়াছিল; বিশেষতঃ এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া অপূর্ব্বর অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্ব্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ-বিবাদে সে কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহারই তৃষ্ণার জল একহাতে এবং অন্যহাতে রেকাবিতে গুটি কয়েক বাতাসা লইয়া একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পাশের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল। গৌরীকে ছোট জাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। পরণে গরদের কাপড়; স্নানের পর বোধ করি সে এইমাত্র আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল,—ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে চাকরের কাছে শুনিয়া, সে আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, "আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে!" বিপিন কহিল, "পাটের শাড়ি পরে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল খাবো আমরা? অপূর্ব্ব, ইনিই সেই বিশ্বেশ্বরী হে!" চক্ষের নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবিটা ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কনুয়ের গুঁতো মারিয়া কহিল, "এ সব কি বাঁদরামি হচ্চে! কাণ্ডজ্ঞান নেই?" বিপিন পাড়াগাঁয়ের মানুষ—কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী-ভেদাভেদ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ। সে অপূর্ব্বর খোঁচা খাইয়া আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া হাঁকিয়া কহিল, "কেন, মিছে কথা বল্‌চি না কি? ওর এতবড় সাহস, যে, বামুনের ছেলের জন্যে জল আনে? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে পারি জানো?" অপূর্ব্ব বুঝিল, আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। কহিল, "আমিই আন্‌তে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া কোরো না; চল, আমরা এখন যাই।" গৌরী রেকাবিটি কুড়াইয়া লইয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে কহিল, "দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েচ?"

একাদশী এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিহ্বলের ন্যায় বসিয়া ছিল, ভগিনীর আহ্বানে চকিত হইয়া বলিল, "না; এই যে দিই দিদি।" অপূর্ব্বর প্রতি চাহিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, "বাবু মশাই, আমি গরীব মানুষ; চারআনাই আমার পক্ষে ঢের—দয়া কোরে নিন।" বিপিন পুনরায় কি-একটা কড়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, অপূর্ব্ব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল; কিন্তু, এত কাণ্ডর পরে সেই চারআনার প্রস্তাবে তাহার নিজেরও অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "থাক্ বৈরাগী, তোমার কিছু দিতে হবে না।" একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা; একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কলিকাল! বাগে পেলে কেউ কি কারও ঘাড় ভাঙ্‌তে ছাড়ে! দাও ঘোষাল মশাই, পাঁচগণ্ডা পয়সাই খাতায় খরচ লেখো। কি আর কোরবে বল!" বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্ব্বর এবার হাসি পাইল। এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চারআনা এবং পাঁচআনার মধ্যে কত বড় যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল; মৃদু হাসিয়া কহিল, "থাক্ বৈরাগী, তোমার দিতে হবে না। আমরা চার-পাঁচআনা পয়সা চাঁদা নিইনে। আমরা চল্লুম।"

কি জানি কেন, অপূর্ব্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচআনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে। তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল; কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব যথার্থই ক্ষোভের সহিত মনে-মনে কহিল, 'ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচআনা

পয়সার অধিক ইহাদের ধারণাই নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না, এমন কাজ সংসারে নাই।'

অপূর্ব্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই, একটি বছর-দশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটীর গলায় উত্তরীয়, বোধ করি পিতৃ-বিয়োগ কিম্বা এম্‌নি কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়া ছিল। অনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পুঁটে, তুই যে এখানে?" পুঁটে আঙুল দেখাইয়া কহিল, "আমার মা বসে আছেন। মা বল্‌লেন, 'আমাদের অনেক টাকা ওঁর কাছে জমা আছে'।" বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল। কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ইহার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায়, দেখিবার জন্য অপূর্ব্ব নিজের আকণ্ঠ পিপাসা সত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, "তোমার নামটি কি বাবা? বাড়ী কোথায়?" ছেলেটি কহিল, "আমার নাম শশধর; বাড়ী ওঁদের গাঁয়ে—কালীদহে।"

"তোমার বাবার নামটি কি?" ছেলেটির হইয়া এবার অনাথ জবাব দিল; কহিল, "এর বাপ অনেকদিন মারা গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়াছিলেন; সাত বৎসর পরে মাস খানেক হ'ল ফিরে এসেছিলেন। পরশু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবোতে গিয়ে বৃদ্ধ মারা পড়েচেন। আর কেউ নেই, এই নাতীটিই শ্রাদ্ধাধিকারী।" কাহিনী শুনিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে প্রশ্ন করিল, "টাকার হাতচিঠা আছে? যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এসো।" ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, "কাগজপত্র কিচ্ছু নেই—সব পুড়ে গেছে।" একাদশী প্রশ্ন করিল, "কত টাকা?" এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব দিল, "ঠাকুর মরবার আগে বলে গেছেন, পাঁচশ টাকা তিনি জমা রেখে তীর্থ-যাত্রা করেন। বাবা, আমরা বড় গরীব; সব টাকা-নাদাও, কিছু আমাদের ভিক্ষে দাও," বলিয়া বিধবা টিপিয়া-টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘোষাল মশাই এতক্ষণ খাতা-লেখা ছাড়িয়া একাগ্র চিত্তে শুনিতেছিলেন; তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "বলি, কেউ সাক্ষী-টাক্ষী আছে?" বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না। আমরাও জানতাম না। ঠাকুর গোপনে টাকা জমা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।" ঘোষাল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "শুধু কাঁদলেই ত হয় না বাপু; এ-সব মবলগ্ টাকাকড়ির কাণ্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিঠা নেই, তা'হলে কি রকম হবে বল দেখি?" বিধবা ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু কান্নার ফল যে কি হইবে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না। একাদশী এবার কথা কহিল; ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আমার মনে হচ্চে যেন, পাঁচশ টাকা কে জমা রেখে আর নেয় 'ন। তুমি একবার পুরোনা খাতাগুলো খুঁজে দেখ দিকি, কিছু লেখা-টেখা আছে না কি।" ঘোষাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "কে এত বেলায় ভূতের ব্যাগার খাট্‌তে যাবে বাবু? সাক্ষী নেই, রসিদ-পত্তর নেই—" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আসিল, "রসিদ পত্তর নেই বলে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা মারা যাবে না কি? পুরোনো খাতা দেখুন—আপনি না পারেন আমাকে দিন, দেখে দিচ্চি।" সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল; কিন্তু যে হুকুম দিল তাহাকে দেখা গেল না।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, "কত বচ্ছর হয়ে গেল মা! এতদিনের খাতা খুঁজে বার করা ত সোজা নয়! খাতা-পত্তরের আণ্ডিল! তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি! বিধবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "তুমি বাছা কেঁদো না,—হক্কের টাকা হয় ত, পাবে বৈ কি। আচ্ছা, কাল একবার আমাদের বাড়ী যেয়ো; সব কথা জিজ্ঞাসা করে খাতা দেখে বার কোরে দেব। আজ এত বেলায় ত আর হবে না!" বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, "আচ্ছা বাবা, কাল সকালেই আপনার ওখানে যাবো।" "যেয়ো" বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখের খোলা খাতা সেদিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়ীতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, "আট বছর আগের—তা'লে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার খুলে দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না!"

ঘোষাল কহিলেন, "এত তাড়াতাড়ি কিসের মা!" গৌরী কহিল, "আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের মেয়ে দু'কোশ হেঁটে এসেচেন—দু'কোশ এই রৌদ্রে হেঁটে যাবেন, আবার কাল আপনার কাছে আস্‌বেন;—এত হাঙ্গামায় কাজ কি ঘোষাল-কাকা?" একাদশী কহিল, "সত্যিই ত ঘোষাল মশাই। ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছিমিছি হাঁটানো কি ভালো? বাপ্ রে! দাও, দাও—চট্‌পট্ দেখে দাও।" ক্রুদ্ধ ঘোষাল তখন রুষ্ট মুখে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। মিনিট-দশেক পাতা উল্টাইয়া হঠাৎ ভয়ানক খুসি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! আমার গৌরী মায়ের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! ঠিক এক সালের খাতাতেই জমা পাওয়া গেল! এই যে রামলোচন চাটুযোর জমা পাঁচশ—" একাদশী কহিল, "দাও, চট্‌পট্ সুদটা কষে দাও, ঘোষাল মশাই।" ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, "আবার সুদ?" একাদশী কহিল, "বেশ, দিতে হবে না! টাকাটা এত দিন খেটেচে ত, বোসে ত থাকেনি। আট বছরের সুদ—এই ক'মাস শুধু বাদ পড়বে।" তখন সুদে-আসলে প্রায় সাড়ে সাত'শ টাকা হইল। একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বার কোরে আন্। হাঁ বাছা, সব টাকাটাই একসঙ্গে নিয়ে যাবে ত?" বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন; চোখ মুছিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "না বাবা, অত টাকায় আমার কাজ নেই; আমাকে পঞ্চাশটি টাকা এখন শুধু দাও।" "তাই নিয়ে যাও মা। ঘোষাল মশাই, খাতাটা একবার দাও, সই কোরে নিই; আর বাকি টাকার তুমি একটা চিঠি করে দাও।" ঘোষাল কহিল, "আমিই সই কোরে নিচ্চি। তুমি আবার—" একাদশী কহিল, "না—না, আমাকেই দাও না ঠাকুর,—নিজের চোখে দেখে দিই।" বলিয়া খাতা লইয়া অর্দ্ধ মিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, "ঘোষাল মশাই, এই যে একজোড়া আসল মুক্তো ব্রাহ্মণের নামে জমা রয়েচে। আমি জানি কি না—ঠাকুর মশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখ্‌তে পায় না" বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। এতগুলি লোকের সুমুখে মনিবের মুখের এই ব্যঙ্গোক্তিতে ঘোষালের মুখ কালি হইয়া গেল।

সে দিনের সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে, অপূর্ব্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তপ্ত পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলিতেছিল। ঘোষাল সঙ্গে ছিল; সে সবিনয় আহ্বান করিয়া কহিল, "আসুন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেয়ে যেতে হবে।" অপূর্ব্ব কোন কথা না কহিয়া নীরবে অনুসরণ করিল। ঘোষালের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল; সে একাদশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "দেখ্‌লেন, ছোটলোক ব্যাটার আস্পর্দ্ধা! আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানদের পায়ের ধূলো পড়েচে, হারামজাদার সোল-পুরুষের ভাগ্যি; ব্যাটা পিচেশ কি না, পাঁচগণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখিরি বিদেয় করতে চায়!" বিপিন কহিল, "দু'দিন সবুর করুন না; হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা-নাপ্‌তে বন্ধ করে পাঁচগণ্ডা পয়সা দেওয়া বার করে দিচ্চি। রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখবেন ঘোষাল মশাই।" ঘোষাল কহিল, "আমি ব্রাহ্মণ! দু'বেলা সন্ধ্যা আহ্নিক না কোরে জল-গ্রহণ করি নে,—দুটো মুক্তোর জন্যে কি রকম অপমানটা দুপুর বেলায় আমাকে করলে, চোখে দেখলেন ত। ব্যাটার ভাল হবে? মনেও কোরবেন না। সে বেটি—যারে ছুঁলে নাইতে হয়,—কি না বামুনের ছেলের তেষ্টার জল নিয়ে আসে! টাকার গুমরটা কি রকম হয়েচে একবার ভেবে দেখুন দেখি!" অপূর্ব্ব এতক্ষণ একটা কথায়ও কথা যোগ করে নাই; সে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "অনাথ, আমি ফিরে চললুম ভাই—আমার ভারি তেষ্টা পেয়েচে!" ঘোষাল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ী দেখা যাচ্চে।" অপূর্ব্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনি এদের নিয়ে যান,—আমি যাচ্চি ঐ একাদশীর বাড়ীতেই জল খেতে।" একাদশীর বাড়ীতে জল খেতে! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, "চল, চল,—দুপুর রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর ঢঙ্ করতে হবে না। তুমি সেই পাত্রই বটে! তুমি খাবে একাদশীর বোনের ছোঁয়া জল!" অপূর্ব্ব হাত টানিয়া লইয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, "সত্যিই আমি তাঁর দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্যে ফিরে যাচ্চি। তোমরা ঘোষাল মশায়ের ওখান থেকে খেয়ে এসো,—ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা কোরে থাক্‌ব।"

তাহার শান্ত স্থির কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, "এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, তা জানেন ?" অনাথ কহিল, "ক্ষেপে গেলে না কি ?" অপূর্ব্ব কহিল, "তা' জানি নে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ত সে তখন ধীরে-সুস্থে ভাবা যাবে। কিন্তু এখন ত পারলাম না—" বলিয়া সে বেগে একাদশীর বাড়ীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

জাতীয় কল্যাণ

[অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ]

মানব-সমাজ মানব-জীবনেরই মত গতিশীল। গতিশীলতাই সমাজের জীবনের স্পন্দন। সমাজ শুধু ব্যক্তির সমষ্টিমাত্র নহে। পিন-আধারে পিনের মত বা আঙ্গুরের থোলোর মত, যদি সমাজ কেবল মানুষের দেশ-গত নৈকট্য বুঝাইত, তবে সমাজ-জীবনের কোনও প্রসঙ্গই উঠিতে পারিত না। কিন্তু সমাজ বলিতে আমরা এইরূপ দেশ-কালঘটিত সংস্থান মাত্র বুঝি না। সমাজ একটি সংস্থান নহে,—প্রতিষ্ঠান। মানব-দেহের যেমন গতি আছে, স্পন্দন আছে, চৈতন্য আছে, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন আছে, সমাজেরও ঠিক তেমনই আছে। সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইয়াও আমরা সমাজের গতি সব সময়ে বুঝিতে পারি না বা লক্ষ্য করি না। পৃথিবীর ক্রোড়ে থাকিয়াও আমরা পৃথিবীর গতি যেমন বুঝিতে পারি না, সমাজের গতি, বৃদ্ধি, পরিবর্ত্তনও তেমনই আমাদের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়া থাকে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, কোটী-কোটী বৎসরে পৃথিবীর স্তর বদলায়, কোটী-কোটী বৎসরে পার্থিব দেহের উপাদান-সংস্থানে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। আবার কখনও কখনও ভূকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবে কোটী-কোটী বৎসরের ফল এক মুহূর্ত্তেও ফলিয়া থাকে। সমাজ-দেহের পরিবর্ত্তন হইতে কোটী-কোটী বৎসর না লাগিলেও দীর্ঘকাল লাগে। ছিদ্র কলসীর বারির ন্যায় ব্যক্তিগত জীবন যখন অল্পকালেই নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন সমাজ-জীবন-প্রবাহ পূর্ণমাত্রায় বহে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনাশে সমাজদেহের বিনাশ হয় না, কেন না নূতন নূতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুরাতনের স্থান অধিকার করিয়া, আবার সমাজদেহকে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলে। এইরূপ নব-কলেবর গ্রহণের চিরন্তনী রীতির ফলে দারুভূত মুরারির ন্যায় মানব-সমাজ চিরায়ু লাভ করে। আকস্মিক বিপ্লব বা একান্ত ক্ষয়শীলতার প্রভাব না ঘটিলে সমাজ-জীবন নানা আবর্ত্তন, পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। এই দীর্ঘ জীবনের ফলে ব্যক্তি-বিশেষের নহে, মানবজাতির দৃষ্টি শক্তি, অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা অনেক বাড়িয়া যায়। সীমাবদ্ধ, অচিরকালব্যাপী ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র শক্তি ও জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া সমাজের সমগ্র শক্তি ও জ্ঞান বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। এই স্বাভাবিক জ্ঞান-প্রসারের ইতিহাসই মানব-জাতির সভ্যতার ইতিহাস।

সমাজের এই জীবনী-শক্তি নানা দিকে নানা ভাবে স্ফুরিত হয়। ভাষার মধ্যে ইহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের ভাব বেদনা, জ্ঞান বিজ্ঞান, সাধনা ও সিদ্ধি, আশা ও আদর্শ, সংস্কার ও স্মৃতি—সমস্তই ভাষার ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ভাষায়। তাহার গৌরব, তাহার সমৃদ্ধি, তাহার অবনতি ও দৈন্য, এ সকলই ভাষা ও সাহিত্যের ফলকে চিরমুদ্রিত হইয়া থাকে। সমাজ বিলাস-পরায়ণ বা উচ্ছৃঙ্খল হইলে ভাষাও তদনুসারিণী হয়। বাণিজ্য ও শিল্প যখন সমাজে বিস্তৃতি লাভ করে, তখন ভাষার ছন্দও কর্ম্মোপযোগী এবং বাহুল্য-বর্জ্জিত হইয়া দাঁড়ায়। উর্দ্দু ভাষা আদব্-কায়দার ভাষা, কারণ মুসলমান বাদশাহগণের দরবারে আদব্-কায়দার কদর্ বেশী ছিল। সংস্কৃত ভাষা অলঙ্কার-ভারে মন্থর, কারণ প্রাচ্য-জাতির কোমলতা ভাষার অলস গতি ও ছন্দের ঝঙ্কারে ফুটিতে পাইয়াছিল। বর্ত্তমান বাণিজ্যের রাজা ইংরেজের ভাষা সাদাসিধে, অনাড়ম্বর, কাজে লাগাইবার ভাষা। ভাবুকতার কেন্দ্রস্থল জার্ম্মানীর ভাষা গুরুগম্ভীর ও শ্রুতিকঠোর। বিলাসপ্রিয় ফরাসী-

জাতির ভাষা কোমল, শ্রুতিমধুর ও লঘুগতি। এইরূপে সকল দেশে, সকল সময়ে ভাষা ও সাহিত্যে মানবের সামাজিক জীবন বহু পরিমাণে প্রতিফলিত হয়।

সমাজ-জীবনের আর একটি লক্ষণ এই যে, ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়া রাখে। সৃষ্টির কোন্ অখ্যাত প্রভাতে মানব সমাজ গঠন করিয়া লইয়াছিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আমরা মানুষকে সমাজের মধ্যেই দেখিতে পাই। অতীত কালের অন্ধকার কক্ষে কল্পনার বর্ত্তিসাহায্যে যতদূরই যাওয়া যাক্ না, সমাজ ছাড়া মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। বর্ত্তমান কালের অবস্থা চিন্তা করিলে মনে হয়, সমাজই মানুষকে গঠন করে। সমাজ তাহার নানাবিধ শাসন-যন্ত্রের দ্বারা মানুষের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি, চিন্তা ও বাক্য, চেষ্টা ও কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজ কখনও সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদিগকে "কান্তা সম্মিততয়োপদেশযুজে" পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়, কখনও নিন্দা, গ্লানি, অপযশের দ্বারা চোখ রাঙায়, কখনও আইন-আদালতের দ্বারা অপরাধীকে শোধন করিয়া লয়। সমাজ নানা ভাবে, নানা দিক দিয়া মানুষের জীবনে আপনার প্রভাব বিস্তার করে। যে সমাজ তাহা পারে না, তাহার সামাজিক আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। সমাজ-দেহ বিনষ্ট হইলেও ব্যক্তির জীবন চলিতে পারে, কিন্তু সে জীবন হয় অন্য সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যাইবে, না হয় ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

সুতরাং যতক্ষণ সমাজের জীবনী-শক্তি থাকে, ততক্ষণ সে শক্তি সমাজভুক্ত জীবের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। অনেক সময়ে মনে হইতে পারে, যে সমাজ ও ব্যক্তি, পরস্পর বিরুদ্ধ উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কেবল শত্রুতাচরণই করে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সংকোচ-সাধন করে বলিয়া সমাজকে অনেক সময় প্রতিকূল শক্তি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হইতে পারে না। ব্যক্তিগত খেয়ালের খর্ব্বতা করিয়া সমগ্রের প্রকৃত স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়—সমাজ। আমার খেয়াল প্রবল হইতে পারিত, যদি পৃথিবীতে একমাত্র মানব আমি হইতাম। কিন্তু একজনের খেয়াল যে আর একজনের খেয়ালের সহিত সংঘর্ষ উৎপাদন করিয়া অনর্থ ঘটায়! সমাজ তাই আইনের দ্বারা প্রত্যেকের যথাসম্ভব স্বাধীনতা ও দায়িত্বের সীমা-নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহাকে মানিয়া চলিতেই হইবে। না মানিলে সমাজ তাহার সমগ্র শক্তি দিয়া ব্যক্তিকে নিপীড়িত করিবে। কিন্তু নির্দ্ধারিত সীমার মধ্যে প্রত্যেকে যাহাতে তাহার প্রকৃতিদত্ত শক্তি-নিচয়ের পূর্ণ-পরিণতি সাধন করিতে পারে, সমাজ বিধিমত ভাবে তাহার সুবিধা করিয়া দেয়। তাহা না করিয়া রাক্ষসী জননীর মত, কোনও সমাজ যদি তাহার সন্তানকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তবে অপর সমাজের সহিত জীবন-সংগ্রামে হার মানিয়া সে সমাজকে বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইতে হইবে। কারণ, ইহা অতি সহজ সত্য যে, যে সমাজ তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিপুঞ্জকে সর্ব্বপ্রকারের সুযোগ দিয়া পরিপুষ্ট ও শক্তিশালী করে, সেই সমাজ নিশ্চয়ই প্রজাদ্রোহী সমাজ অপেক্ষা জীবন-ধারণের পক্ষে অধিকতর সমর্থ হয়।

এই যে সমাজসকলের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ইহা ভাবিবার বিষয়। আমরা সমাজের অংশ মাত্র; আমাদের জীবন লইয়া সমাজের জীবন, এ কথা সত্য। কিন্তু সমাজের ধারণা যখন আমাদের মনে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়, তখন ইহা কি মনে হয় না যে, আমাদের মঙ্গলামঙ্গলের কথাই চরিত্রনীতির শেষ কথা নহে। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিগত ভাল-মন্দের উপর সমাজের বৈশিষ্ট্য ও ভাল-মন্দ নির্ভর করে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে আর যে একটু কথা আছে, তাহা সব সময়ে আমাদের মনে আসে না। মনে করুন, ঠগ বা পিণ্ডারীদের মত একটি বিপুল দস্যু-সম্প্রদায় আছে। এই দস্যু-সম্প্রদায়ের অকরণীয় কিছুই নাই; লোকের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন, গৃহে অগ্নিদান, গৃহস্থের প্রাণনাশ, সকলই ইহাদের নিত্য-কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। মানব-সমাজে যত প্রকার পাপানুষ্ঠান আছে, তাহার আচরণ করিয়াও কি এই দস্যু-সমাজ টিঁকিয়া থাকে না? কেমন করিয়া এই অকার্য্যের অনুষ্ঠাতারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, বিচরণ করে, এবং রাজ-শক্তিকে অগ্রাহ্য করে, তাহা ভাবিবার বিষয়। আমার মনে হয়, ইহাদের দলবদ্ধতার মধ্যে একটা ঐক্য আছে, ইহাদের অধর্ম্মের মূলে ধর্ম্ম আছে, উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে শাসন আছে। তাই যদি থাকে, তবেই দস্যুদল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, নচেৎ পারে না। দস্যুরা অপরের দ্রব্যে লোভ করে, তাহা লুণ্ঠন করে, এবং লুণ্ঠন করিবার জন্য নরহত্যা পর্য্যন্ত অকাতরে করিতে

প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ইহারা পরস্পরের দ্রব্যে লোভ করে না, তাহা লুণ্ঠন করিতেও প্রবৃত্ত হয় না। ইহাদের পরস্পরের ব্যবহারে সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষা, আত্ম-সম্মান, দলপতির প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি ইহারা সদ্‌গুণ হিসাবে অর্জ্জন করে না। আবশ্যক হইলে ইহারা মিথ্যাও বলে, আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দেয়; প্রবঞ্চনা প্রতারণাকেও যে ঘৃণা করে, তাহা বোধ হয় না। অথচ পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে ইহাদের এই সকল গুণের আবির্ভাব কোথা হইতে হয়? যাহারা কোনও ধর্ম্মকেই মানে না, তাহারা সমাজ-ধর্ম্মকে মানে কেন? পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে ইহারা এমন উদারতা ও আত্ম-মর্য্যাদার পরিচয় দেয় কেন? সমগ্রের প্রতি টানই যে তাহাদের এইরূপ অসমঞ্জস ব্যবহারের হেতু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা বাহিরে যাহাই করুক না কেন, তাহারা জানে যে, বিরুদ্ধ শক্তিপুঞ্জ হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য দলকে রক্ষা করা। দলকে রক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে সন্দেহের ছায়া মাত্রও যাহাতে স্পর্শ না করে, সেইরূপ আচরণ করা। সেই জন্য সত্য কথা বলা, দলপতির বাক্য নির্বিচারে পালন করা, নির্ব্বিরোধে একই উদ্দেশ্যের অনু-বর্ত্তন করা, প্রভৃতি গুণের আদর দস্যুদিগের মধ্যেও বর্ত্তমান আছে। যদি কেহ কখনও সত্য কথা বলিয়া অপরকে ধরাইয়া দিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে দস্যু-সমাজেও সে ব্যক্তিকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ঘৃণা করে। তাহা হইলেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমগ্রের ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ধর্ম্মের উপরে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত চারিত্রোৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের যতটা দায়িত্ব, সমাজগত ধর্ম্মের পালন সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব তদপেক্ষা অনেক বেশী। চরিত্রনীতির কথা এই যে, আত্মোন্নতি, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে সমাজকে মানিয়া চলিতে হইবে; যে স্বার্থের দ্বারা সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হয়, সে স্বার্থকে বলিদান করিতে হইবে। তবেই সকলের পক্ষে আত্মোন্নতিসাধন সম্ভবপর হইবে। ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি এইরূপে সাধিত হইলে অবশ্য সমাজও উন্নতি লাভ করিবে। সমাজের উন্নতি এ স্থানে গৌণ; মুখ্য প্রয়োজন হইতেছে আত্মার উন্নতি। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে, দেশকালের উপাধি বিচ্যুত করিয়া আত্মার প্রকৃত সত্তাকে চিনিতে পারিলে, বিশ্বের সহিত মানবের বিরোধ থাকে না, সমাজের সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় না, এবং পরমাত্মার ও জীবাত্মার মধ্যে ব্যবধান চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়। ইহাই চরিত্র-নীতির সার সত্য।

কিন্তু আমরা যে দিক দিয়া এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা প্রণিধান করিয়া দেখিলে চরিত্র নীতির পরিপ্রেক্ষা (Perspective) বা দৃষ্টিরেখা (angle of vision) একটু বদলাইয়া যায় না কি? যাঁহারা এ পর্য্যন্ত আমার যুক্তিপরম্পরা অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, চরিত্র-নীতির ব্যক্তিধর্ম্ম অপেক্ষা আর একটি উচ্চতর ধর্ম্ম আছে, যাহাকে সমাজ-ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কথাটি যে নূতন, তাহা বলিতেছি না। আমাদের দেশে সেকালের "গ্রাম সম্প্রদায়" (Village community) এই সমাজধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রাম সম্প্রদায়ে যেমন ব্যক্তিবিশেষের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব স্বামিত্ব ছিল না, তেমনই সমগ্রের অতিরিক্ত কোনও কার্য্য ব্যক্তিবিশেষের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইতে পারিত না। সমাজ-দেহ যেন একটি কলের মত চলিত। সে দেহ হইতে বিচ্যুত হইলে শুধু যে অংশসকলের অস্তিত্ব নিরর্থক হইয়া যাইত, তাহা নহে; জীবন সংশয় হইয়া উঠিত। প্রাচীন স্পার্টার ব্যক্তিগত জীবন সমাজ-জীবনের একান্ত অঙ্গীভূত ছিল, তাহার স্বাতন্ত্র্য বিশেষ কিছু ছিল না। প্লেটোর রিপাব্লিক সমাজ-ধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠ সংহিতা। ব্যক্তিগত জীবনে ন্যায়ান্যায় কি, তাহা বিচার করিতে হইলে সমাজের কথাই আসিয়া পড়ে। সমাজের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, তাহাই ন্যায়। সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে, যাহাতে ন্যায়ের দণ্ড অব্যাহতভাবে পরিচালিত হইতে পারে। ব্যক্তিগত শিক্ষা, ব্যক্তিগত জীবন, ব্যক্তিগত ধর্ম্ম (Religion) সমস্তই সমাজের হিতসাধনকল্পে নূতন প্রণালীতে পরিচালিত ও উদ্ভাবিত হইবে, ইহাই প্লেটনিক চরিত্র-নীতির মূল সূত্র। আমার বোধ হয় ভগবদ্‌গীতার আত্ম-তত্ত্বটি সমাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সহিত জড়িত। গীতার উপদেশও আমাদের নিকট প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হইবে,—যদি আমরা এই সমগ্রের কথাটি মনে না রাখি। অর্জ্জুন যে সকল যুক্তি দেখাইয়া যুদ্ধে বিরত হইতে চাহিতেছিলেন,

ব্যক্তিগত চরিত্রের পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় কি? "আত্মীয় স্বজনের শবের উপর দিয়া যে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতে হয়, তাহা আমি চাহি না। আচার্য্য, পিতামহ, শ্বশুর, মাতুল ইঁহাদিগকে বধ করিতে যাইব কিসের জন্য? ভোগ কি এতই বড়? আমি যুদ্ধ করিব না; তা ত্রৈলোক্যের রাজ্য পাইলেও নহে। লোভের জন্য এত পাপ আমি কখনও করিতে পারিব না।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অন্য পথে অর্জ্জুনের মতিকে পরিচালিত করিয়া দিলেন; সে পথ আমার মনে হয় সমাজের পথ, বৃহত্তর আত্মার পথ। "তুমি ক্ষত্রিয়; তুমি একটি বৃহৎ সংঘের অন্তর্ভুক্ত; যুদ্ধ করাই সেই ক্ষত্রিয়-সংঘের ধর্ম্ম; যুদ্ধ না করিলে সে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না; ক্ষত্রিয়-সমাজে তোমার নিন্দা হইবে, নিন্দা সম্ভাবিত ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুর সমান; অতএব যুদ্ধ কর।" যুদ্ধ করা যে সমাজ-স্থিতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, ইহা গীতার উপদেষ্টা সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার উচ্চাঙ্গের জটিল দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসার মধ্যে যুদ্ধের আহ্বান ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রসাত্ত্বিকা, তত্ত্বজ্ঞানামৃতের কামধেনু স্বরূপ, গীতোপনিষদের শেষ কথা, "যাও, যুদ্ধ কর" তস্মাৎ যুধ্যস্ব, ভারত।

সমাজের সহিত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিলেও, আমরা প্রাচীন কালের এই সমাজ-প্রধান চরিত্রতত্ত্বকে মানিয়া লইতে পারি নাই, তাহার কারণ পূর্ব্বকালে সমাজকে মুখ্য স্থান দিয়া ব্যক্তিকে গৌণ স্থান দেওয়া হইত। ব্যক্তি সমাজের বাহকমাত্র রূপে পরিগণিত হইত। ফলতঃ ব্যক্তির প্রাধান্য এরূপভাবে ক্ষুণ্ণ করিলে সমাজ-জীবন ক্রমশঃ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। সমাজ-জীবনের গতি-প্রবণতা এইরূপ জড়তা এবং যন্ত্রবদ্ধতা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহার ফলে, সমাজের প্রকৃতি অন্য আকারে মানবের মনে দেখা দিল। সে নবীন রূপটি এই যে, সমাজ ব্যক্তিসকলের প্রভু নহে, সমাজের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিত্বকে ডুবাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই; সমাজ আমাদের উদ্দেশ্যের সাধন বা উপায় স্বরূপ। সমাজেই আমরা বাস করি, সমাজের দ্বারাই পুষ্ট হই, সমাজের ক্ষেত্রেই আমাদের কর্ম্মের বীজ বপন করি, এবং তাহা হইতে বিবিধ ফল লাভ করি; অতএব ব্যক্তিগত চরিত্র সমাজের অপেক্ষা করে, সমাজ ব্যক্তিগত চরিত্রের উপায়-স্বরূপ, অবলম্বন-স্বরূপ। আদর্শ—আমাদের আত্মোন্নতি, প্রত্যেকের নিজের চারিত্রোৎকর্ষ; কিন্তু সমাজ ও সমাজের কল্যাণকে উপায়সমূহের মধ্যে গণনা করা হয়।

বর্ত্তমান চরিত্র-নীতির মূলসূত্র অনুসারে সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ এইরূপ ভাবেই কল্পিত হইয়া থাকে, কিন্তু আর এক দিকে স্রোতের টান দেখা দিতেছে বলিয়া আমার মনে হয়। প্রাচীন কালের যন্ত্রবদ্ধ, খণ্ড সমাজের পরিবর্ত্তে আর একটি বৃহত্তর সমাজের কল্পনা আবির্ভূত হইয়া চরিত্র-নীতিকে ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা হইতে মুক্তি দান করিতেছে। পূর্ব্বে যাহা সমাজের কল্যাণকর, তাহাই ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী বলিয়া গণ্য হইত, এবং সমাজের পক্ষে যাহা অহিতকর, তাহাই, ব্যক্তির পক্ষে যতই উৎকর্ষ-বিধায়ক হউক না, অকর্ত্তব্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইত। পরে, আবার আমরা শুধু নিজের কথাই ভাবিতাম, নিজের যুক্তি ও তর্কে নিজের যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতাম, তাহাই করিবার জন্য ব্যগ্র হইতাম। এখন যেন সমগ্রের দিকে পুনরায় দৃষ্টি পতিত হইতেছে। অভিব্যক্তিবাদ মানুষের পরিণামকে নূতন মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে, মানবের ভবিষ্যৎগঠনের সম্বন্ধে আমাদের দায়িত্ব কঠোর সত্যের গুরুভার লইয়া আমাদিগের স্কন্ধে নামিতেছে: সুপ্রজনন-বিদ্যা (Eugenics) মানবের দৃষ্টি অতি দূরে প্রসারিত করিয়া দিতেছে; আর অতীতকালের সঞ্চিত সভ্যতা নব-নব জটিল সমস্যার মধ্য দিয়া আমাদিগের অসামঞ্জস্য, অনুপযোগিতা ফুটাইয়া তুলিতেছে। সমাজ-জীবনে এই যে নূতন হাওয়া বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহার প্রকৃতি, গতি ও দিক্ নির্ণয় করা ক্রমে চরিত্র-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। সমাজ-জীবনের গতির সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের এই ধারণা ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, মানুষ বৃহত্তর, পূর্ণতর জীবনের অধিকারী। এই দেশ-কালাতীত বৃহত্তর জীবনের ধারণা ব্যক্তিগত জীবনের ধারণা অপেক্ষা যে অনেক উপকারী ও মূল্যবান, সেই কথাটী সভ্য-জগতের নিকট ক্রমশঃ ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, বা পরস্পর-বিরোধী খণ্ডসমাজের কল্যাণ অপেক্ষা আরও মহত্তর, শ্রেষ্ঠতর উদ্দেশ্য মানবের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে—সেটি হইতেছে মানব-জাতির কল্যাণ। মানব-সভ্যতা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহা যদি

বর্ত্তমান কালের ঝটিকা-ঝঞ্ঝার মধ্যেও বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তবে সে উন্নতি আমাদিগকে এই অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করিয়াছে, বলিতে হইবে। আমরা এই তথ্যটুকু ভাল করিয়া যেন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। নিজের সুখের কল্পনা, বর্ত্তমান সমাজের উন্নতির জন্য খণ্ড-প্রয়াস, ইহা ত সামান্য কথা। ইহাতে সুখ কোথায়? গৌরব কোথায়? এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, যাহা ভবিষ্যৎ মানবের পক্ষে, উত্তরবংশীয়দের পক্ষে কল্যাণপ্রদ। হিন্দু-শাস্ত্রোপদেষ্টা যখন বলিলেন 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র পিণ্ডঃ প্রয়োজনং' তখনকার হিন্দুসমাজ সে কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। তখন অনার্য্যদের মধ্যে আর্য্যজাতির প্রতিষ্ঠা বংশবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিত। এখন বৃত্তি-সংকটের দিনে সে কথা মানিয়া চলা অনেক সময়ে কঠিন হইয়া পড়ে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যখন আমেরিকাবাসী মহিলা ও পুরুষগণের সমবেত-সভার সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে, অধিক সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করাই প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য, তখন তিনি শ্লীলতার অনুরোধে সত্যের অপলাপ করিতে পারেন নাই। যেখানে ভবিষ্যৎবংশীয়দের মঙ্গলামঙ্গলের কথা আছে, সেখানে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা উঠিতে পারে না। এই যে ইউরোপের মহাসমরে প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ প্রাণী নিহত হইতেছে, কত শত গ্রাম জনপদ শ্মশান হইয়া যাইতেছে, কত প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ বিলুপ্ত হইতেছে, ইহাতে ব্যক্তিগত ন্যায়ান্যায়ের কথা উঠিতেছে কি? এখানে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মের কথাও বিশেষ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। একটি কথা কেবল স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া মানবের মনে জাগিতেছে —মানবের ভাগ্য, সভ্যতার ভবিষ্যৎ। সেই মানবজাতির শুভাশুভের তুলাদণ্ড ধরিয়া আমরা এই মহারণের বিচার করিতে বসিয়াছি। ইহাকে ঠিক প্রাচীন চরিত্র-নীতির শাখা মাত্র বলিয়া মনে করিলে, এই নূতন যুগধর্ম্মকে আমরা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। আমি অবশ্য বলিতেছি না যে, এই নূতন ধর্ম্ম পুরাতন ব্যক্তির কল্যাণ-মূলক চরিত্র-নীতিকে উৎসাদিত করিয়াছে। বৃক্ষ যতই শাখা-প্রশাখা মেলিয়া বনচ্ছায়াকে ঘনীভূত করিয়া তুলুক না, মূলের তাহাতে উৎখাত হয় না। মূল সেই সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মূলের উচ্ছেদ-সাধন হইলে ত মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত চরিত্রে যে নবীন কল্পনা ক্রমশঃ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠিতেছে, অন্নের স্পন্দনে যে ভূমার বিকাশ ঘটাইতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বে, সমাজকে প্রাধান্য দিয়া ব্যক্তিকে তাহার পদানত করিয়া তুলাই সে সময়ের চরিত্র-নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। স্পেন্সারের মতে ইহা পরস্পর যুধ্যমান সমাজের নীতি। পরে ব্যবসায় প্রধান সমাজে ইহার বিপরীত ধারণা জন্ম-লাভ করিয়াছিল। যে সময়ে লোক শান্তিতে বাস করিয়া কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতে লাগিল এবং নিজ-নিজ পরিশ্রমের ফল অবিরোধে উপভোগ করিতে আরম্ভ করিল, তখন ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ হইতে কিঞ্চিৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইল; তখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিয়া সমাজকে মাত্র উপাদান স্বরূপে ব্যবহার করিতে লাগিল। সমাজ জীবনে এই যে নূতন কল্পনা দেখা দিল, ইহাকে বিদ্রোহিতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য না করিয়া, একান্ত স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়াই সভ্য-সমাজ স্বীকার করিয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বের সে সমাজ-প্রধান ধারণাকে পুনরায় প্রবর্ত্তন করিতে গেলে সমাজ তাহা সহ্য করিবে না। ইহাই সমাজের জীবনী-শক্তির পরিচয়। বর্ত্তমানে যে জাতীয় কল্যাণ-কামনা সভ্যসমাজে দেখা দিতেছে, তাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বলপূর্ব্বক সমাজের পদানত করে না, প্রকৃত স্বার্থের উচ্ছেদ করে না, সমাজ-সমূহের অকারণ বিরোধ ঘটায় না। মানবের ভাষায়, ভাবে—জাতীয় কল্যাণের যে ছায়াটি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, তাহা স্বাধীন, গতিশীল, অভিব্যক্তি-পরায়ণ সমাজের সু-চিন্তিত ও সুব্যক্ত পরিণতি। ইহা জ্ঞান-বিকাশের ফল, অন্তর্দৃষ্টি-বিস্তারের ফল। ইহাকে অঙ্গীকার করিয়া লইতে পারিলেই বিশ্ব-মানবসমাজ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে।

রাজরাণী

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত]

(১)

"রাম্ নাম্ সত্য হ্যায়—রাম্ নাম্ সত্য হ্যায়—রাম্ নাম্ সত্য হ্যায়—" সকালবেলায় কাশীর ভেলুপুরা অঞ্চলে বড় সড়ক্ ধরিয়া হিন্দুস্থানী শ্মশান-যাত্রীর দল শবদেহ বহিয়া গঙ্গাতীরে হরিশ্চন্দ্র শ্মশান-ঘাটের উদ্দেশে চলিয়াছে। শ্মশান-যাত্রীদের অগ্রে-অগ্রে কিছু দূরে হিন্দুস্থানী ফেরিওয়ালা 'রামদানাকা লাড়ুয়া' সুর করিয়া হাঁকিয়া চলিয়াছে।—"রামদানাকা লাড়ুয়া পয়সামে চার—পয়সামে চার—ভাইয়া পয়সামে চার—" ফেরিওয়ালা অগ্রে-অগ্রে, শ্মশান-যাত্রী পিছে-পিছে। ভেলুপুরা হাসপাতাল ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে, সড়কের ধারে একটা বটগাছ। সেই বটগাছের ছায়ায় রাস্তার উপর একখানি পুরানো ঢোলের জীর্ণ, দোতালা, ছোট পাথরের বাড়ী। সেই বাড়ীর ভিতর হইতে একটি বালিকা ডাকিল,—"ঐ রামদানা, এধার আও-মা, একটা পয়সা দাও, রামদানা কিন্‌ব।" পয়সা মুঠোর ভিতর করিয়া বালিকা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। ফেরিওয়ালা বলিল, "কেৎনা চাহি?" বালিকা কিছু দূরে শ্মশান-যাত্রীদের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। "কেৎনা?" "এক পয়সাকা।" ঠিক তখনই শ্মশান-যাত্রীদল 'রাম্ নাম্' ডাকিল।—'রাম্ নাম্ সত্য হ্যায়।' বালিকা ভয়ে দৌড়িয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ফেরিওয়ালা বক্-বক্ করিতে-করিতে তাড়াতাড়ি রামদানার ঝাঁকা মাথায় তুলিয়া লইল। পাছে শ্মশানের দল একেবারে তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, তাই মুহূর্ত্ত না দাঁড়াইয়া অগ্রসর হইল। ফেরিওয়ালা চলিয়া গেল। পশ্চাতে শ্মশান-যাত্রীর দলও বাড়ী ছাড়াইয়াই একবার শ্মশানের ডাক ডাকিয়া চলিয়া গেল। বালিকা দরজার ফাঁক দিয়া সব দেখিল। 'রামদানাকা লাড়ুয়া চলিয়া গিয়াছে, হাতের পয়সা হাতেই রহিল, কেনা আর হইল না। ঐ শশ্মাটার দলই সব গোলমাল করিয়া দিয়া গেল!

এই সময় পশ্চাৎ হইতে যুবক বল—কিশোর বল—বালক বল—যা খুসী বল—সে আসিয়া বালিকার পিঠের উপর এলায়িত খোলা চুলের একটি গুচ্ছ ধরিয়া বেশ একটু জোরেই টান দিল। বালিকা পিছন ফিরিয়া হাসিল; কিন্তু তখনই আবার আর একটা টান! "আঃ—আমার চুলে ব্যথা লাগে না বুঝি?" সে সে কথা না শুনিয়া বলিল, "কই, আমায় রামদানা দিলে না?" বালিকা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "রামদানা?—রামদানা 'রাম্ নাম্ সত্য হ্যায়'এর সঙ্গে চলে গেছে। এই দেখ পয়সা। কিনে রেখে দেব এখন, ইস্কুল থেকে এসে তখন পাবে।—আচ্ছা, বিমল-দা, হিন্দুস্থানীরা 'রাম্ নাম্ সত্য হ্যায়' বলে; বাঙ্গালীরা 'বল হরি, হরি বোল' —কেন বলে?—ওমা! শুন্‌লে ভয় হয়! আচ্ছা, বিমল-দা, তোমার ভয় করে না? এই মাত্র যাচ্ছিল, মনটা কেমন করে উঠ্‌ল!" বিমল-দা বালিকার গণ্ডে একটি মৃদু টোকা মারিয়া বলিল,—"এতটুকু মেয়ে—'মনটা কেমন করে উঠ্‌ল'!" বালিকা তাহাতে নিতান্ত আপত্তি করিয়া, সুন্দর মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "ইস্, আমি অতটুকু মেয়ে—আর উনি, তেরকেলে বুড়ো!—পণ্ডিত মশাই!" বলিয়াই খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। "দেখ্ মণি, তুই বড় বেআদব হয়েছিস্—জামা ছেড়ে দে—পকেটে কি আর আছে!—হাতী না ঘোড়া!—ছিঁড়ে যাবে, ছেড়ে দে বল্‌ছি! আঃ—" মণি এলোচুল দোলাইয়া, ছোট মুখখানি নাড়িয়া বলিল, "আঃ—ছেড়ে দেব না বল্‌ছি—কোথায় যাওয়া হচ্ছে, আগে শুনি?" "বাজারে যাচ্ছি, দেখ্‌ছিস্‌নে?" "আমিও যাব, তোমার সঙ্গে বাজারে—হাঁ, আমি যাব, আমায় নিয়ে চল।" "তুই কোথায় যাবি?—সে অনেক দূর, দশাশ্বমেধ ঘাট!" "হোক্ দূর, আমি যাব।" "দেখ্, বিরক্ত করিস্‌নে—মাসিমাকে ডাকব?" "ডাক না।"

মাসিমা, কি না, মণির মা, স্নানান্তে বাড়ীর মধ্যে ছোট-উঠানখানির এককোণে ছোট একটি মাটির টবে সযত্ন-রোপিত তুলসী-গাছটীর মূলে জল দিতেছিলেন। মুখে স্নেহ-বিগলিত মৃদু হাসি ;—মণি ও বিমলের ঝগড়া শুনিতে-ছিলেন। গাছে জল দিয়া, সম্মুখের ঠাকুর-ঘর হইতে মালাগাছটি আনিয়া জপ করিতে লাগিলেন। উভয়ের এই অভিনয় দেখিতে-দেখিতে মালা ফিরাইতে ভুলিয়া গেলেন। অনিমেষ স্নেহ-উদ্বেলিত নয়নে দুটিকে দেখিতে-ছিলেন। দেখিতে-দেখিতে বিধবার নয়ন হইতে অশ্রু গলিয়া ঝরিয়া পড়িল। ঐ পিতৃ-মাতৃহীন, আত্মীয়-বান্ধবহীন, সহায়-সম্পদহীন বালক সংসারের সার মাতৃ-ক্রোড় হইতে যে-দিন বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহার ক্রোড়ে আসিয়াছে, সেই দিনের করুণ দৃশ্য বিধবার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।—পার্শ্বের ঐ জীর্ণ বাড়ী; গভীর রাত্রি; মলিন শয্যা। মুমূর্ষুর শিয়রে তৈলহীন মিটিমিটি মাটির প্রদীপ। এই প্রবাসে, সেই নিস্তব্ধ, অন্ধকার, গভীর রাত্রিতে মুমূর্ষু বিধবা তাহার একমাত্র পুত্র ঐ বালকের ছোট হাত-খানি তাঁহার হাতে দিয়া করুণ অস্ফুটপ্রায় কণ্ঠে বলিয়াছিল,—আজ পাঁচ বৎসর পরে তিনি যেন স্পষ্ট শুনিতেছিলেন—"বোন, পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই তুমি আমার বোন ছিলে; নহিলে, এ জন্মে কোন সম্পর্ক নেই তবু কেন তুমি বোনের চেয়ে বেশী হলে! দুখিনী বিধবার ছেলে—দাও বোন, একটিবার, এই শেষবার আমার বুকে দাও!" সেই দিন হইতে ঐ মাতৃহারা বালকের তিনি মা হইয়াছেন,—তাঁহার সংসারই বালকের সংসার। তাঁহারও পুত্র-সন্তান নাই,—ঐ একমাত্র কন্যা। বিমল তাঁহার বুকের শূন্যস্থান পূর্ণ করিয়াছে। আজ অশ্রুজলে, দুঃখে, হর্ষে বিধবার মনে হইতেছিল—তাঁহার মণি ও বিমল তাঁহারই পেটের মেয়ে ও ছেলে। সঙ্গে-সঙ্গে আজ বিধবার আরও একটা সাধ প্রাণে জাগিল—উহাদের আপন স্নেহ-ক্রোড়েই রাখিবেন। এই নূতন চিন্তার উদয়ে মাতৃ-হৃদয় গভীর স্নেহে ভরিয়া উঠিল। নয়নে আনন্দাশ্রু বহিল; হাতের মালা ফিরাইতে ভুলিয়া গেলেন। অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বিধবা সম্মুখের পূজার ঘরে গেলেন। ঘরে তাঁহার গুরুদেবের ছবির সম্মুখে প্রণতা হইয়া আপন অভিলাষ নিবেদন করিলেন। শ্বেত অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বাহিরে আসিলেন। তার পর ধীরে-ধীরে স্নেহের প্রত্যক্ষ দেবতা দুটীর নিকট গিয়া, ছেলের মাথায় হাত দিয়া নীরবে আশীর্ব্বাদ করিলেন। "ও কি, মাসিমা!" "আমার মাথায় হাত দিলে না, মা?" বলিয়া বালিকা মার হাতখানি টানিয়া নিজের ছোট মাথার উপর স্থাপন করিল। তার পর কি ভাবিয়া খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিয়া মায়ের অঞ্চলের মধ্যে মুখ লুকাইল। "ও কি রে?" বলিয়া মা মেয়ের ছোট্ট মুখখানি ভরিয়া চুম্বন করিলেন।

(২)

কয়েক বৎসর পরের কথা। মণি আর সে ছোট্টটি নাই, বড় হইয়াছে। অনেকের মতে সে না কি আরও সুন্দর হইয়াছে! সুখে-দুঃখে বিধবার দিনগুলি কোন-রকমে অতিবাহিত হইয়া চলিয়াছে। স্বামী মৃত্যুকালে যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা কষ্টে-সৃষ্টে এত দিন সংসার চলিয়াছে। এই দশবৎসর বিধবার পক্ষে একটা দীর্ঘ জীবন! সহায় সম্পদ আত্মীয়-স্বজনহীন প্রবাস-জীবন এরূপ ক্ষেত্রে যে কতটা দুঃখের, যে সে জীবন যাপন করিয়াছে, কেবল সে-ই তাহা জানে। বিধবার শরীরও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখন একমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন; এবং আশা—মণি ও বিমলের বিবাহ দিয়া,—ওদের ভার ওরা নিজেরা বহন করিতে পারিতেছে,—দেখিয়া, বিশ্বনাথের চরণে শান্তিলাভ করা। সে দিন তাঁহার আসিয়াছে। বিমল এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

"মাসিমা, তুমি অত ভাব্‌চ কেন? আমি বলি কি, রেল-আফিসে এখন ঢুক্‌লে শেষে কিছুদিন পরেই বেশ উন্নতি করতে পারব। আট-নয় মাস কাজ শিখ্‌লেই ওরা রেলের একটা কাজ দেবে। আর এই আট-নয় মাসের খরচ রেল-কোম্পানীই দেবে। আমি সব ঠিক-ঠাক করে এসেছি,—এই আস্‌ছে মাস থেকেই শিখ্‌তে আরম্ভ করব।" "ঠিক করেছিস্?" "হাঁ মাসিমা, এখন 'না' বল্‌লে হবে না। কলেজে পড়ে সব কটা পাস করে বেরুতে সাত-আট বছরের কথা। আর কলেজে পড়লেই যে পাশ করতে পারব, কে জানে? চল্‌বেই বা কি করে?—মণি বড় হয়েছে। আজ-কালকার ছেলের দর,—এ দূর-দেশেও, যা-তা রকমের—সেও হাজার টাকার কমে নয়—" মা একটু

ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মণির বিয়ের হাজার টাকার যোগাড় করতে বুঝি তুমি সকাল-সকাল চাকরী করতে যাচ্ছ?" "তা কেন?" "তবে?" "তবে কি!—তুমি বুঝছ না।" "কি বুঝছি না রে!—আমরা গরীব, গরীবের ঘরে মণির বে দেব।" "না, মাসিমা।—কেন আমরা কম কিসে? তুমি গরীব-গরীব করো না; মণি শুনলে মুখ ভার করে বসে থাকবে। আমি সে দিন বলছিলুম, মণির বে বড়লোকের ঘরে হবে; অমনি মুখ ভার করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!—আচ্ছা, মাসিমা!"—"কি?" "মণির বিয়ে-টিয়ে দিয়ে কাজ নেই। এমন তো হচ্ছে আজ-কাল। বিয়ে হলেই তো চলে যাবে,—তুমি কি করে থাকবে?" মা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "থাকতেই হবে, কি আর করব!" "আর আমিও তো চাকরীতে অন্য যায়গায় থাকব!" "তা না হয়, মণির মত একটি মেয়ে ঘরে আনব।" "কি যে বল!" "কেন?" "আমি বিয়ে-টিয়ে করব না, মাসিমা।" বলিয়াই বিমল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মাসিমা স্নেহপূর্ণ নয়নে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া আবার হাতের কাজে নজর দিলেন। ভাবিতেছিলেন—"তাই তো, কি করা যায়? আর পড়া হবে না! যদিও আমি কিছু জানতে দিইনি, তবু বিমল বুঝছে,—আর পড়ার খরচ চলা ভার। তাই আমাকে না বলেই রেলওয়েতে যাবার বন্দোবস্ত করে এসেছে। কি আর করব!—ঠাকুরের যা ইচ্ছা। যদি পড়া নাই হল, তখন কাজে ঢুকলেই বিয়েটা হয়ে যাক্। মণির বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়েছে, বুঝতে শিখেছে। সে দিন বিমলের বিয়ের কথায় মণি মুখ লাল করে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। আগে হলে, 'বৌ টুকটুকে হবে, ছোট্টটি হবে,—আমরা দুজনে এক সঙ্গে খেলব'—এমনি কত কি বলত। ঠাকুর, বিধবার জীবনের শেষ সাধ!—কিন্তু দুঃখের জীবন, —ভয় হয়!"

(৩)

বৎসর অতীত হইয়াছে। বিমল রেল-আফিসে ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরী পাইয়াছে। এলাহাবাদ ষ্টেশন কর্ম্মস্থল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শীঘ্রই তাহাকে কার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। "এলাহাবাদে কোথায় থাকবি, কোথায় খাওয়া-দাওয়া করবি, কিছু ঠিক্-ঠাক্ করেছিস্ কি?" "হাঁ, মাসিমা, আমারি মত কয়েকজন রেলের কর্ম্মচারী মিলে একটা মেসের মত করেছে, আমি সেই রেলওয়ে অফিসারদের মেসে থাকব।" "সেখানে দেখবার-শোনবার তো কেউ নেই!" "তারাই দেখবে, মিলে-মিশে একসঙ্গে থাকা।" মণি, মা, বিমল তিন জনে মিলিয়া প্রবাসীর প্রবাসোপযোগী জিনিসপত্র গুছাইয়া ঠিক্ করিয়া রাখিলেন। আগামী কল্য সকালে যাইতে হইবে। বিমলের অনেক আপত্তি সত্ত্বেও মাসিমা ছোট-খাট,—একরূপ অনাবশ্যক বলিলেও চলে,—কয়েকটি জিনিসে বিমলের বাক্স ভরিয়া দিলেন। তার মধ্যে বিশ্বনাথের প্রসাদী নির্ম্মাল্য, প্রসাদী সন্দেশ, পাণ্ডাদের রুলি, ইত্যাদি। আরও কিছু উক্ত বাক্সে স্থান পাইল,—মণির হাতের সেলাই ছোট-খাট কয়েকটি সৌখিন জিনিস, যথা—কার্পেটের জুতা, রুমাল, ফুল-কাটা টেবিলের চাদর, ফুল-তোলা একখানি আসন। "দেখছ মাসিমা, মণি তার সব ভাণ্ডার উজাড় করে আমায় দিয়ে দিচ্ছে।" "বেশ, এ সব তো তোমার দরকার হবে। কেমন, না মা?" মণির প্রশ্নে মা মৃদু হাসিলেন; বলিলেন, "মেসের সকলে মণির গুণপনা দেখবে, প্রশংসা করবে—মনে-মনে সে সাধটাও আছে!" মণি সুন্দর গ্রীবা বাঁকাইয়া মার কথার প্রতিবাদ করিল, "হাঁ, তাই বুঝি!" তার পর অভিমান-ভরা স্বরে বলিল, "তবে থাক!" বিমল মণির মুখের দিকে বারেক চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, "তবে থাক।" মণি গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করিয়া বলিল, "বেশ তো, তুমি নিও না, কে দিচ্ছে তোমায়?" মা হাসিয়া মণিকে বুকের কাছে টানিয়া খোলা চুলের ভিতর হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "এত অভিমান! দেখি মুখখানি!" অভিমানের উপরে জননীর এই স্নেহপূর্ণ আদরে মণি মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা কন্যার অশ্রুসিক্ত, সরল, সুন্দর মুখখানি অঞ্চলে মুছাইয়া দিলেন; বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা—দে। ভারি তো দিয়েছিস্! তোর ঐ উল-সুতোর বোনা কুকুরটা দিলি:নি? বিমল যখন আফিসে যাবে সাহেবদের মত সঙ্গে করে নিয়ে যাবে!" কুকুরের কথায় মণি হাসিয়া ফেলিল। বিমল এবং মাতা হাসিলেন। মণি তাড়াতাড়ি তাকের উপর হইতে কুকুরটা টানিয়া আনিয়া বিমলের কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার কুকুর—আফিসের পেয়াদা!" আবার তিনজনে হাসিলেন। তখনও মণির

চক্ষে অশ্রুচিহ্ন রহিয়াছে। যেন শিশিরসিক্ত প্রভাত-কমল! এইরূপে প্রব্রাজ্যের আয়োজন সমাপ্ত হইল।

(৪)

পূর্ণিমা তিথি। চাঁদের আলোতে পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে। কোথায় দূরে নহবতে শানাই বাজিতেছে। মাসিমা পূজার ঘরের দ্বারে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। জ্যোৎস্না আসিয়া তাঁর পায়ের কাছে পড়িয়াছে। বিমল পূজার ঘরের পাশের ঘরে, তাহার নিজের ঘরে—তখনো চিঠিপত্রাদি না জানি কি লিখিতেছিল। মণি মায়ের তাড়নায় সকাল-সকাল উপরে শুইতে গিয়াছে। "বিমল!" "কি মাসিমা?" "কি কচ্ছ? রাত হয়েছে যে!" "হাঁ মাসিমা, এই চিঠিখানা লিখেই শোব।" "চিঠি লিখে একবার আসিস্—একটা কথা আছে।" "কি কথা, মাসিমা?" বিমল কলম রাখিয়া উঠিয়া আসিল; আসিয়া মাসিমার পায়ের কাছে জ্যোৎস্নার উপর বসিয়া পড়িল। "কি মাসিমা?" মাসিমা নীরবে, স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে বিমলের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। "কি মাসিমা, চুপ করে রইলে যে?" "হাঁ, একটা কথা তোকে আজ বলব। এতদিন বলি নি।" বিমলের বুক কাঁপিয়া উঠিল। হর্ষে, কি বিষাদে, কি কিসে, সে কথা সে নিজেই জানে না। তবে ঐ স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বিপদের বার্ত্তাও সম্পদের—হর্ষের। "কি কথা, মাসিমা?" "এই আসছে অগ্রহায়ণে তোদের বিয়ে দিতে চাই।" "তোদের! —আমারও না কি মাসিমা?" "হাঁ, মণির সঙ্গে।" বিমল কি বলিবে? চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাল্যের ক্রীড়া-সঙ্গিনী আজ ব্রীড়াময়ী জীবন-সঙ্গিনী হইয়া তাহার বুকে আসিয়া যেন মুখ লুকাইল।

(৫)

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। একটু বেলাও হইয়াছে। বিমল তখনও শয্যা-ত্যাগ করেনি। সারা রাত সে কত কি ভাবিয়াছে। সে ভাবনা কখনো সুখের, কখনো দুঃখের। সব ভাবনারই মূলে তার ভবিষ্যৎ জীবন; অর্থাৎ যে জীবন মাসিমার দুটি কথায়—"মণির সঙ্গে",—গঠিত হইবে। এই এক রাত্রির ভাবনা তাহাকে ধীর, স্থির, চিন্তাশীল করিয়া তুলিয়াছে। মণির বয়স যেন আরও পাঁচ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। সে কত ভাবনা, কত কথা—কখনো অশ্রুজলে, কখনো অভিমানে, কখনো ঢুলু-ঢুলু আবেশময় নয়নে, কখনো দুরু-দুরু বক্ষে, কখনো মুগ্ধ, প্রশান্ত, তৃপ্ত চিত্তে। কিছুদূরে, মন্দিরে, রাত্রিশেষে নহবত বাজিয়া উঠিলে, চিন্তা-স্রোতে বাধা পাইয়া বিমল ঘুমাইয়া পড়িল। মাসিমা গৃহ-কার্য্যে রত। মণি মার সঙ্গে-সঙ্গে ধোয়া-মোছায় সাহায্য করিতেছে। কলে জল আসিয়াছে। মণি চৌবাচ্ছায় বাসি জল ছাড়িয়া দিয়া মাকে বলিল, "মা, বিমল-দা এখনো ঘুমুচ্ছে।" "তুলিস্‌নে; রাত্রে বোধ হয় ভাল ঘুম হয়নি।" "সারারাত তোমার সঙ্গে বুঝি গল্প করেছে! তাই তো অনেক রাত্রে তুমি ঘুমুতে গেলে। আচ্ছা গল্প করার সুখটা ভেঙ্গে দিচ্ছি।" বলিয়াই মণি বিমলের ঘরে গেল। খোলা জানালা দিয়া ঝিকিমিকি আলো বিমলের সুপ্ত চোখে-মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। মণি বিমলের মাথার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। "মণি!" মা রান্নাঘর হইতে ডাকিলেন। হঠাৎ চমকিয়া মণি 'যাই' বলিয়া সুপ্ত বিমলকে ডাকিল "বিমল-দা! ওঠ—" মণি বিমলের হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে টানিল। বিমল "এঁ্যা" বলিয়া চোখ মেলিল। "বেশ,—এত বেলা হয়েছে—দেখ, রোদ উঠেছে —উঠ্‌বে না?" বিমল উঠিয়া বসিল। সঙ্গে-সঙ্গে গত রাত্রির সব কথা সূর্য্যোদয়ের মত তাহার মনে উদয় হইল। মণির সস্মিত মুখের দিকে চাহিয়াই মুখ নত করিল। কেমন একটা মধুর লজ্জা আসিয়া তাহার মুখ আরক্তিম করিয়া তুলিল। মণি হাসিয়া বলিল, "ও কি! আবার যে চোখ বুজ্‌লে?—ওঠ।" বলিয়াই মণি বিমলের হাতের দুটি আঙ্গুল ধরিয়া টানিল। বিমল মুখ না তুলিয়াই বলিল, "হাঁ, উঠ্‌ছি।" "ও কি, অমন মন-মরা হয়ে কথা কচ্ছ কেন? এখনো বুঝি ঘুমের ঘোর কাটে নি?—স্বপ্ন দেখ্‌ছ বুঝি?—এখনো বুঝি দেখ্‌ছ—আমাকে বুঝি চিন্‌তে পারনি? ভেবেছিলে, বুঝি সেই স্বপ্নের পরীর দেশের রাজকুমারী এসে তোমার হাত—"এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মণি হঠাৎ বিমলের হাত ছাড়িয়া দিল। মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। আপনার স্থানে সেই স্বপ্নের রাজকুমারীকে বসাইয়া যে অভিযোগটা সে হাজির করিতেছিল, হঠাৎ সে অভিযোগে সে নিজেই অভিযুক্ত হইয়া পড়িল। একটা অজ্ঞাত মধুর লজ্জা,—অর্জ্জিত অথচ সুখকর একটা অনুভূতি তাহার কিশোর হৃদয়ে বিকশিত হইয়া নব পরিচয়ের প্রথম কটাক্ষের মত তাহাকে বিদ্ধ করিল, চঞ্চল করিল, চমকিত করিল।

কিছুদিন ধরিয়া সে কেমন যেন বিমলের সঙ্গে আগেকার মত ছেলেমানুষী করিতে পারিতেছিল না। অবশ্য বিমলের কিছুদিন অন্যত্র অবস্থান একটা প্রধান কারণ বটে। এক-সঙ্গে বরাবর থাকিলে যাহা আরও কিছুদিন পরে আসিয়া হৃদয় অধিকার করিত, এই মাঝখানের অদর্শনে শীঘ্র-শীঘ্রই তাহা আসিয়া হাজির হইয়াছে। চিন্তা সময়ের পরিমাপক।

আজ বিমল চলিয়া যাইবে। কিছুদিন আগে হইলে মণি নিজের ঘুম-ভাঙ্গার সঙ্গে-সঙ্গেই বিমলের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিত। হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া একটা হৈচৈ ব্যাপার বাধাইয়া দিত। মনে-মনে সে ইচ্ছা যে না হইয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু—ঐ কিন্তুই মাকে বলিয়াছে—"মা, বিমল-দা এখনো ঘুমুচ্ছে!" কিন্তু আর বিলম্ব সহিল না। বিমল যে তাহার খেলার সঙ্গী, স্নেহের অংশীদার,—তার বিমল-দা!

"সেই স্বপ্নের পরীর দেশের রাজকুমারী এসে তোমার হাত—" বলিয়াই মণি বিমলের—অর্থাৎ যেন তেপান্তরের মাঠের ওপারের রাজকুমারের হাত ছাড়িয়া দিল। বিমল মুখ তুলিয়া মণির আরক্তিম নত মুখে চাহিতেই মা ডাকিলেন, "মণি!" মণি তাড়াতাড়ি "যাই মা!" বলিয়াই ঘরের বাহিরে আসিল।

(৬)

যাবার সময় হইয়াছে; এক্কা রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; বাক্স-বিছানা তোলা হইয়াছে। মার নয়নে অশ্রু দেখা দিল। মণিরও তাই। মা পূজার ঘরে আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্র আনিতে গিয়াছেন। মণি বাহিরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া। বিমল মণির অতি কাছে আসিয়া মণির দুটি হাত ধরিল। মণি বিমলের ছলছল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাঁহার দুটি চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। "মণি!" "কি?" বিমলের চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। মা ফিরিয়া আসিলেন। বিমল মার পদধূলি মাথায় গ্রহণ করিলে, মা বিমলের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্র মাথায় স্পর্শ করাইয়া চাদরের কোণে বাঁধিয়া দিলেন। মণিও তার বিমল-দাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। বিমল মণির মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিল।

(৭)

এলাহাবাদের বিশাল রেলওয়ে-ষ্টেশনের অনতিদূরেই রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের মেস্। অবশ্য এই মেস বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদেরই। মেসের মেম্বর-সংখ্যা কুড়ি-পঁচিশজনের অধিক হইবে না। প্রায় সকলেই যুবক,—সুতরাং মেম্বরদের পরস্পরের মধ্যে একটা খোলামেলা 'ভাই ভাই' ভাব বর্ত্তমান। সরল, স্নেহপরায়ণ, পরোপকারী, হৃদয়বান্, এই যুবকগণকে দেখিলে মনে হয়, ইঁহারা কখনই বাঙ্গালা দেশের যুবক ন'ন। ইঁহারা সকলেই প্রবাসী-বাঙ্গালী,—তাই এখনো তাঁহাদের জীবনে সরলতা, সবলতা, হৃদয়বত্ত্ব বর্ত্তমান। যাঁহারা বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালী এবং বঙ্গের ঘরের বাঙ্গালী—উভয় বাঙ্গালীই দেখিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়াছেন, আমার এ কথার যথার্থতা লইয়া তাঁহারা কখনই তর্ক করিবেন না। যদি কেহ করেন, তবে বুঝিতে হইবে, তিনি ঘরের বাঙ্গালী, এবং ঘরের খাইয়া বনের মোষ তাড়ানই তাঁর ব্যবসায়। প্রবাসী-বাঙ্গালী রেলওয়ে কর্ম্মচারী যুবকগণের মেস—এহেন সবার সেরা আমাদের এই বাংলা দেশ হইতে বহু দূরে; সুতরাং সব উল্টা। মেসে উঠিয়াই বিমলের মনে হইল, এঁরা যেন তার চিরপরিচিত বন্ধু। দ্বিতলে একটি ছোট ঘর বিমলের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিমল একাই সে ঘরে থাকিবে। মেসের মেম্বরগণের মধ্যে বিমলই সকলের ছোট,—তাই তাঁহারা বিমলকে 'বিমলবাবু' 'গুডমর্ণিং' ইত্যাদি না বলিয়া 'বিমল' 'এস, বস' বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিমলও তাঁহাদিগকে ললিত-দা, সতীশ-দা, নরেশ-দা, ক্ষিতীশ-দা, রাসবিহারী-দা বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। এই 'দা' ডাকাতে বিশেষ কোন গুরু-লঘু ভাব নাই—সকলেই সমান, সকলের চিন্তার সকলেই দোসর। গান-বাজনা, তাস-পাশা, থিয়েটারের একটিং, হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজব প্রভৃতি আমোদে সকলেই উৎসাহী। মাঝে-মাঝে রেলওয়ের উর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ-কেহ এই মেসে আসিয়া আমোদ-প্রমোদে যোগদান করিতেন। বিমল ছাড়া মেসের সকলেই বিবাহিত; কেহ-বা একেবারে নবীন, কেহ-বা একটু পুরানো। দ্বিপত্নীক বা বিপত্নীক কেহ নাই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বন্ধুস্থানীয়দের পরস্পরের মধ্যে একটু-আধটু ফষ্টিনষ্টি প্রভৃতি স্বাভাবিক আচরণও অনুষ্ঠিত হইত। বিমল বিবাহিত নয়—"এঃ

একেবারে নাবালক্!"—বলিয়া সকলেই একটু বিশেষ করিয়াই তাহাকে স্নেহ করিত। ঘটকালির জন্য কেহ-কেহ উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেল।

আজ একমাস হইল বিমল এলাহাবাদে আসিয়াছে; আসিয়াই তাহার পৌছান সংবাদ এবং শারীরিক কুশল মাসিমাকে লিখিয়াছে। সে চিঠির উত্তর আসিয়াছে। স্নেহময়ী জননীর মত সে উত্তর স্নেহ এবং মঙ্গলাশীষে রচিত। উত্তরের শেষ দুই ছত্রে লিখিয়াছেন—"মণির শরীর তত ভাল নেই; তুমি চলে গেলে পর কেমন এক-রকম মন-মরা হয়ে রয়েছে। তুমি মণিকে চিঠি লিখিও।"

মেসের সকলের বিবরণ, তাঁদের আদর, যত্ন, স্নেহ, খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্ম্মের বিষয়—সব কথা বিস্তারিত খুটিনাটিটি পর্য্যন্ত ক্রমে-ক্রমে বিমল মাসিমাকে চিঠির পর চিঠি লিখিয়া জ্ঞাপন করিয়াছে; কিন্তু মণিকে স্বতন্ত্র চিঠি লেখে নাই। মণি তাকে আগে চিঠি লিখ্বে—এমনি একটা মধুর অভিমান বিমলের মনে প্রথম হইতেই জাগিয়া জাঁকিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তার পর সেই 'আগে চিঠি না পাওয়ায়' উহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া নীরব অশ্রুজলে পরিণত হইয়াছে। সে অশ্রুজলের সঙ্গে কত কি বিচিত্র কল্পনা—মণি হয় তো মাসিমার কাছে সব কথা শুনেছে। তাই বুঝি চিঠি লিখ্‌তে লজ্জা হচ্ছে। মণি বড় দুষ্ট! ছিঃ আমাকেও লজ্জা! আচ্ছা মণি কি ভাব্‌ছে?—কত কি ভাব্‌ছে!—আচ্ছা মণি এখন কি কচ্ছে?—কল্পনা হৃদয়াবেগে তীব্রতর হইয়া কার্য্যকরী হইয়া থাকে। বিমল উঠিয়া আলো জ্বালিয়া মণিকে চিঠি লিখিতে বসিল—অভিমানের দর্প চূর্ণ হইল।

(৮)

একই ডাকে দুইখানি চিঠি—৩০নং ভেলুপুরা, বেনারস সিটি, ঠিকানায় হিন্দুস্থানী পিওন "চিঠ্‌ঠি হ্যায়" হাঁক দিয়া বিলি করিয়া গেল। মণি পিওনের হাঁক শুনিয়া তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া পিওনের হাত হইতে চিঠি লইল। চিঠি আসিবে—মনে-মনে জানিয়াই যেন সে উদ্‌গ্রীব হইয়া পিওনের "চিঠ্‌ঠি হ্যায়"—হাঁকের জন্য কাণ পাতিয়া উসখুস্ করিতেছিল। বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী পিওন মণির হাতে চিঠি দিয়া মণির সলজ্জ-আরক্তিম মুখমণ্ডলের দিকে যদি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিত, এবং যদি তাহার দেখিবার মত নজর থাকিত, তবে বুঝিত, তাহার এই পিওন-জীবন সার্থক হইয়াছে। আর সে যদি কবি কিংবা রসগ্রাহী হইত, তবে বুঝিত মেঘদূতের আষাঢ়ের প্রথম সজল নবীন মেঘের চেয়ে তাহার এই বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী পিওন-জীবন অনেক কবিত্বময় এবং অনেক সরস। কুমারী-হৃদয়ে উঁকি-ঝুঁকি মারিবার প্রলোভন সহজ প্রলোভন নহে, কেন না কৈশোরের হৃদয়-লীলা সকল লীলার সেরা। আমরাও বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী পিওনের দেখাদেখি সে দিকে নজর দিলুম না। এখনো অনেক চিঠি বিলি করিতে হইবে।

"মণি!" "মা!" "কে চিঠি লিখেছে রে?—বিমল বুঝি?—কি লিখেছে?" "এখনো পড়িনি।" "তোকে লিখেছে বুঝি?" মা এবং মেয়ে উভয়েই মনে-মনে মৃদু হাসিলেন; তবে সে হাসি বিভিন্ন রকমের; এবং উহা বুঝিবার,—বলিবার নয়। মণি মায়ের প্রশ্নের উত্তরে অমনি বুঝিবার মত একটা 'হাঁ' বলিয়াই বলিল, "আর একখানা চিঠি—এই দেখ—তোমার নামে।" মণি সে চিঠি পড়িল। চিঠির মর্ম্ম—গুরুদেব শীঘ্রই—দুই-তিন দিনের মধ্যে ৺কাশীধামে ৺বিশ্বেশ্বর দর্শনে আসিতে-ছেন। আসিয়া ভেলুপুরে তাঁহারা শিষ্যার গৃহে সেবা গ্রহণ করিবেন। গুরুদেবের আগমন সংবাদে বিধবার আনন্দের আর অবধি রহিল না। সময় যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন সকল দিক হইতে আনন্দের সংবাদ বহিয়া আসে। বিধবা ভক্তিপ্লুত প্রাণে গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

(৯)

গুরুদেব আসিয়াছেন। সঙ্গে দুইজন শিষ্য। গুরু সাক্ষাৎ দেবতা,—গুরুর কৃপা সংসারের সার বস্তু, গুরুর সন্তোষ শিষ্যের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। ভক্তিমতী, বিশ্বাসবতী বিধবা সে কথা প্রাণে-প্রাণে জানিয়াই আনন্দে এবং ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া গুরুদেবের সেবায় রত হইয়াছেন। জননীগতপ্রাণা কন্যাও সে সেবায় মাতার সহকারিণী। কাশীস্থ শিষ্যমণ্ডলী একে-একে সকলেই আসিয়া গুরুদেবের পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। যাঁহার যাহা শুনিবার, বলি-বার এবং উপদেশ লইবার—ভক্তিভরে শুনিতেছেন, মুক্তকণ্ঠে হৃদয়-মন খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং বেদবাক্য সম গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু বিধবার অবসর নাই; তিনি

সেবাতেই রত, সেবাতেই আত্মহারা। শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ বেশ সমৃদ্ধিশালী। গুরুদেবের সেবা না করিতে পাইয়া। তাঁহারা নিতান্তই দুঃখিত হইয়াছেন। অনেক অনুনয়, বিনয়, প্রার্থনা—কিছুতেই গুরুদেব বিধবার গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সেবা গ্রহণে সম্মত হইলেন না। বিধবার নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল,—তাঁহার গুরুভক্তি সার্থক হইয়াছে। বিধবার জীর্ণ, দরিদ্র গৃহ উৎসব-মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর শিষ্যগণ গুরুদেবকে ঘিরিয়া ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন, মনের সন্দেহ একে-একে নিরসন করিয়া লইতেছেন।

এই সময় শিষ্য বালকরাম আসিয়া পণ্ডিতজীর আগমন-সংবাদ নিবেদন করিল—"যোগাশ্রম হ'তে একজন পণ্ডিত গুরুদেবের দর্শনাভিলাষী হয়ে এসেছেন।" "হুঁঃ—পণ্ডিত! আচ্ছা, নিয়ে এস। পাণ্ডিত্যের অভিমান!—আমি মুখ্যু, পাণ্ডিত্যের কি জানি!" বলিয়াই গুরুদেব হাসিয়া ফেলিলেন। শিষ্যগণও সঙ্গে-সঙ্গে হাসিল। দীর্ঘ-শ্বেতশ্মশ্রু পণ্ডিতজী ঘরে ঢুকিলেই গুরুদেব অতি ব্যস্তভাবে উঠিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন। বলিলেন, "যোগাশ্রম আমি খুব জানি। আপনাদের কাজ অতি মহৎ। আমিও আপনাদেরই কাজ কচ্ছি—আপনাদের দাস বলেই আমায় জান্‌বেন। হা-হা-হা।" পণ্ডিতজী অতি সঙ্কুচিত হইয়া বিনয়-নম্র স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে, সে কি কথা, সে কি কথা! আপনি সাধুপুরুষ—ও-কথা বললে আমাদের অপরাধ হবে। আপনার নাম কে না জানে?" "নাম! হুঁ। আমি আপনাদেরই কাজ করছি—নাম অনাম কি জানি!" "দর্শন করবার সাধ অনেক দিন থেকে। এবার পূর্ণ হল। কবে কাশী এসেছেন?" "আমি! কবে এসেছি? কাশীতে? কই তাতো মনে নাই।" বালকরাম দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল; বলিল, "আজ্ঞে, আজ সকালে।" পণ্ডিতজী বিলক্ষণ থতমত খাইয়া গেলেন। 'মনে নাই'—তিনি ঠিক্ বুঝিতে পারিলেন না। শিষ্যগণ নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক। তুচ্ছ জাগতিক ব্যাপার, মনের উচ্চাবস্থায় সব সময় মনে থাকে না—বিচিত্র কি! পণ্ডিতজীর ইচ্ছা ছিল, কিছু শাস্ত্রালোচনা করেন, কিন্তু তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে। গুরুদেব পণ্ডিতজীর হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "আপনি শুনেছি মহা পণ্ডিত। একটু শাস্ত্রকথা বলুন না, শুনি।" পণ্ডিতজী বিনীতভাবে বলিলেন, "আজ্ঞে, আপনার কাছে শাস্ত্রের কথা কি আর বলব। আপনিই যে শাস্ত্র!" গুরুদেব হাসিয়া ফেলিলেন। শিষ্যগণ গভীর ভক্তিভরে নিস্তব্ধ।

(১০)

তীর্থস্থানে, বিশেষতঃ তীর্থের সেরা কাশীধামে ত্রিরাত্রির অধিক বাস করা তীর্থ-যাত্রীর অকল্যাণকর। গুরুদেব শিষ্যগণকে উহার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, অদ্য বেলা ১টার ট্রেনেই তিনি বঙ্গদেশে যাত্রা করিবেন। বিধবার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এক হস্তে চক্ষুজল মুছিতে-মুছিতে অপর হস্তে গুরুদেবের সেবার এবং খাবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। বেলা ৯টা বাজিয়াছে মাত্র। গুরুদেব ডাকিলেন, "হয়েছে? আসন কর।" শিষ্য বালকরাম বলিল, "সবে ৯টা, ট্রেন ১টায়।" গুরুদেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "গাড়ী নিয়ে এস। সিদ্ধেশ্বর, সব প্রস্তুত কর।" দ্বিতীয় শিষ্যটি সিদ্ধেশ্বর। সেবা হইয়া গিয়াছে। শিষ্যার মনে হইল, গুরুদেবের মোটেই খাওয়া হইল না। কিন্তু কি করিবেন! সব ঠিকঠাক। গুরুদেব তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন দিবস গুরুদেব তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। অন্যান্য শিষ্য কত উপদেশ, কত আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইল; কিন্তু বিধবার কোন কথাই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, ভাল করিয়া পদধূলি গ্রহণেরও অবসর হয় নাই। আর তো সময় নাই! হয় তো এমন দিন আর জীবনে না আসিতেও পারে। বিধবা সাশ্রু-নয়নে, গলবস্ত্র হইয়া, গুরুদেবের পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া, ভক্তিভরে পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। গুরুদেব 'ভক্তি লাভ হোক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মণি পাশের ঘরে ট্রেনে লইয়া যাইবার মত একবাটা পান পরিষ্কার একখণ্ড ভিজা ন্যাকড়ায় জড়াইতেছিল। মা ডাকিলেন, "মণি! আয় না মা, বাবার পদধূলি নিবি।" মণি একটু সলজ্জ, সরল, মধুর হাসিয়া আরক্তিম দুটি কোমল হাত দিয়া গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করিল এবং পদধূলি গ্রহণ করিল। মণি মুখ তুলিলে, গুরুদেব আলবোলার নল হইতে মুখ তুলিয়া, মণির মুখের দিকে চাহিয়া আবার যেমন নল টানিতেছিলেন, তেমনি একটি টান দিয়া বলিলেন, "হুঁ।" এই একটিমাত্র "হুঁ"তে গুরুদেব বিশেষ কিছু যেন প্রকাশ

করিলেন। বিধবা জিজ্ঞাসু মেয়ে করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন।" গুরুদেব পূর্ব্ববৎ বলিলেন, "হুঁ।" বিধবা আরও উৎসুক হইলেন। গুরুদেব হঠাৎ মুখ তুলিয়া তেজগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রাজরাণী হ'বে।" যেন দৈববাণী! বিধবা গুরুদেবের বাণী শ্রবণ করিয়া স্তব্ধ স্তম্ভিত এবং নির্ব্বাক হইয়া গুরুদেবের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। "রাজরাণী হবে!" আবার সেই বাণী! মণির বিবাহ যে ঠিক হইয়া গিয়াছে। তবে কি এ বিবাহ হবে না? বিধাতার এ কি নির্ব্বন্ধ! "বাবা!" "হুঁ—রাজরাণী।" "বাবা! মণির বিবাহ যে ঠিক্ করে ফেলেছি! কি হবে বাবা!" গুরুদেব গম্ভীরভাবে মাত্র বলিলেন, "হবে, হবে।" রাজরাণী হবে—শুভসংবাদ,—কিন্তু কি কঠোর! সত্য বুঝি চিরকালই এমনি কঠোর হয়! মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গেন। ভবিষ্যদ্দর্শী গুরুর বাক্য—সে বাক্য যে বিধাতারই বাক্য! গুরু এবং বিধাতা—দুই তো আলাহিদা নয়! বিধবা যেমন বসিয়া ছিলেন, তেমনই বসিয়া রহিলেন। মণি কখন সে ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে। গুরুদেব তাম্রকূট সেবনান্তে কখন বাহিরে আসিয়া সমাগত শিষ্যগণকে পদধূলি দিতেছিলেন, বিধবা কিছুই দেখিতে এবং বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কে, কোথায় আছেন, কেন আছেন,—কোন অনুভূতিই তখন তাঁহার ছিল না। শিষ্যদ্বয় যখন বিছানা এবং বাক্স ঘর হইতে বাহিরে লইয়া যাইতেছিল,—বিধবাকে দেখিয়া ভাবিল, গুরুদেব চলিয়া যাইতেছেন, তাই ইনি এমন নিস্তব্ধ, ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছেন। "মা, মা, মা—". "উঁ।" "গুরুদেব যাচ্ছেন, ওঠো!" "হুঁ—চল।" মা ও মেয়ে উঠিয়া গিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। বিদায় কালে গুরুদেব তাঁহাদিগকে একবার পদধূলি দান করিলেন; তার পর গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন; উঠিয়া গাড়োয়ানকে হাঁকিয়া বলিলেন, "ক্যান্টনমেণ্ট।" তখন বেলা দশটা।

(১১)

বর্ষা গিয়াছে, শরৎ আসিয়াছে। শরতেরও মাঝামাঝি, কিন্তু বর্ষণের বিরাম নাই। কিন্তু এ বর্ষণ প্রবাসে,—শরতের পীঠস্থান বাংলায় নয়। বাংলায় নব জীবনের সঞ্চার। প্রবাসী বাঙালীর প্রাণে সে জীবনের—সে আনন্দের ঢেউ একটু বিষাদের করুণ সুরেই ভাসিয়া-ভাসিয়া আসিয়া মিলাইয়া যায়। সারা বৎসরের মধ্যে এই শরতেই তাহার বিশেষ করিয়া মনে হয়, সে প্রবাসী-বাঙালী—বাংলার জন্ত তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, বাগানে-বাগানে শিউলি ঝরিয়া পড়িতেছে। মনে হয়, এই প্রভাতে গৃহে-গৃহে ভিখারী আগমনী গাহিয়া বেড়াইতেছে। মনে হয়, বোধনের মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইয়াছে, সপ্তমীর নহবৎ বাজিয়া উঠিয়াছে।

এই শরতেই আবার বাঙ্গালী বাংলা ছাড়িয়া ট্রেনে চাপিয়া প্রবাসে আসে। কিন্তু মেসের সকলেই প্রবাসী; সুতরাং তাহারা পূর্ব্বাহ্নেই স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিয়া আছে। এবার তাহারা এক মৎলব আঁটিল,—এই মেসেই দুর্গাপূজা করিবে; রীতিমত প্রতিমা গড়িয়া—জাঁক-জমকে। তজ্জন্য আয়োজনের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। বিমলের আনন্দ সব চেয়ে বেশী,—কেন না সে মেসের ভ্রাতাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং অবিবাহিত। সর্ব্বোপরি, সে মাতৃহারা। মার পূজায় তার যেমন আনন্দ, তেমনি অশ্রুজল। প্রতিমা গড়িবার প্রস্তাবের দিন তাহার মনে পড়িল,—তাহার মা নাই; কিন্তু কে যেন ছিল, যাঁহার স্নেহের অলক্ষ্য প্রভাব এখনও সে অনুভব করিতে পারে। আর এই মৃন্ময়ী মায়ের পূজা করিলে, যেন তাঁহারই পূজা করা হয়। মা নাই; কিন্তু মায়ের মত করুণারূপিণী মাসিমা আছেন। মনে হইল, পূজার সময় সে মাসিমাকে ছাড়িয়া কি করিয়া থাকিবে! আনন্দে বিষাদ,—সংসারে সুখ কোথায়? কিছুদিন ধরিয়া কাশীর কোন সংবাদও সে পায় নাই। সুতরাং দুঃখ চিন্তার সঙ্গে জড়িত হইয়া সহস্র ফণায় তাহার হৃদয়ে দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে।

সে দিন সমস্ত রাত্রি তাহার আর ঘুম হয় নাই। যখনই একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, তখনই সে নানা ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখিয়াছে। পরদিনই বিমল কাশীতে টেলিগ্রাম করিল—"আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন; কেমন আছ, জানাও।" দিন গেল। রাত্রিও গেল। কিন্তু উত্তর আসিল না। টেলিগ্রাম কি তবে পৌঁছায় নাই? "ক্ষিতীশ-দা আমি আজই কাশী যাব!" "আফিসের ডিউটি?" "ডিউটি-ফিউটি?—তুমি সাহেবকে বোলো।" "কেন, এত কি সঙ্গিন ব্যাপার, বিয়ে না হতেই এত দরদ?" "না, সব সময় ঠাট্টা ভাল লাগে না। সত্যিই আমার মন কেমন করছে ক্ষিতীশ-দা।" "ভায়া, ওরই নাম দরদ।" "টেলিগ্রাম! উত্তর এল না!" "সবে কাল করেছ। ধর, কালই যদি চিঠি লেখে, তবে আজ এখনো সে চিঠি আসতে পারে—সময় যায় নি। অত উতলা হয়ো না, ওঁরা ভালই আছেন।" "না ক্ষিতীশ-দা, তুমি জান না, মাসিমা তেমন নন। সপ্তাহে দুইখানা চিঠি লিখতেন,—আজ প্রায় বিশ দিন! তার পর টেলিগ্রাম করলুম, তাতেও উত্তর নেই!" "দেখ আজকের ডাকটা।"

(১২)

রাত্রি গভীর হইয়াছে। মেসে সেদিন একটু বিশেষ ভাবেই খাওয়া-দাওয়া ছিল। প্রায় একটায় খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে সকলে ঘুমাইতে গেল। কিন্তু বিমল ঘুমাইল না। সারাদিন সে মেসে অনুপস্থিত ছিল। খাওয়া-দাওয়ার সময় সে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু নামমাত্র বসিল। ক্ষিতীশদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তোর মুখ শুক্‌নো কেন? সারাদিন কোথায় ছিলি? খুঁজে খুঁজে হয়রাণ!" "হুঁ—বেরিয়েছিলুম।" বলিয়া বিমল আহারে মন দিল। মেসের ভোজনের সময়, বিশেষতঃ বিশেষ ভোজের দিনে, হাসি আনন্দ হৈ-চৈ যেরূপ হইয়া থাকে, চলিতে লাগিল। বিমল কোন কথা কহিতেছে না দেখিয়া ও হৈ-চৈ ব্যাপারে যোগ দিতেছে না দেখিয়া, ক্ষিতীশদা বলিলেন, "কিরে, অমন চুপচাপ্ মাংসের বাটীর দিকে চেয়ে আছিস্ যে? খাচ্ছিস্ নে কেন? শরীর ভাল নেই নাকি?" "হুঁ—এই খাচ্ছি!" বলিয়া বিমল মাংসের বাটীতে হাত দিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইল। শুইতে যাইবার সময় বিমল ডাকিল, "ক্ষিতীশদা।" "কি রে। ও কি, ডেকে চলে যাচ্ছিস্ যে।" "হাঁ।—একবার ডাকৃতে ইচ্ছে হল, তাই ডাকলুম।" "কবিত্ব!—হাঁ রে, চিঠি এসেছে জিজ্ঞেস্ করলুম, বল্‌লি—হাঁ। কেমন আছেন তোর মাসিমা? তোমার স্নেহের মণির বাঁকা-বাঁকা লেখা;—এবার কি লিখেছে রে?" "ক্ষিতীশ দা!" "ও কি!—এক্‌টিং করছিস্ যে—ক্ষিতীশদা!" "হুঁ—জগৎটাই একটা এক্‌টিং।—তোমার মা আছেন, ক্ষিতীশ দা?—তুমি মাকে ছেড়ে কি করে থাক?" বিমলের স্বরে ক্ষিতীশদা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু বিমলের জীবনের ইতিহাস ক্ষিতীশদা সব জানিত। স্নেহকোমল স্বরে বলিল, "কেন? তোমার মাসিমাই তোমার মা।—ও কি, কাঁদছিস্ নাকি?" "মার কাছে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে!" "মাসিমার উপর অভিমান হয়েছে বুঝি, এতদিন কেন চিঠি লেখেন নি! কি ছেলেমানুষ!—কেমন আছেন?" "ভালই আছেন!" "অমন করে বলছিস্ কেন?" "মাগো!" ক্ষিতীশদা বিমলের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কি ছেলেমানুষ! বল না, কি হয়েছে! মণি কেমন আছে?" "মণি—মণি—ভাল আছে।—হুঁ—" "ওঃ—বিরহ!—তাই বল!—চলুম—যা শোগে যা। কালই কাশী পাঠিয়ে দেব!—প্রতিজ্ঞা করছি! রাত হয়েছে—কবিত্ব কাল করিস্।—চলুম।" ক্ষিতীশদা নিজের ঘরে গেল।

ঘর অন্ধকার। বিমল সেই অন্ধকারে নিজের ঘরে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল। রাত্রি অন্ধকার, নিস্তব্ধ। কিছুদূরে রেলওয়ে ষ্টেশন; ষ্টেশনে গ্যাস জ্বলিতেছে। একখানা মালগাড়ী প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে। এখনই ছাড়িবে। বিমল অনেকক্ষণ জানালায় দাঁড়াইয়া ষ্টেশনের দিকে চাহিয়া রহিল। বাতি জ্বালিয়া পকেট হইতে চিঠি বাহির করিল। কাশীর চিঠি, মাসিমা লিখিয়াছেন,—অনেক লিখিয়াছেন। একবার, দুইবার, তিনবার বিমল চিঠি পড়িল। শেষবারে আর চিঠির অর্থবোধ হইল না। কেবল একটা লাইন তাহার মাথার ভিতর বিদ্যুতের রেখার মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া উলটি-পালটি খাইতে লাগিল—"বাবা, বিধাতার নির্ব্বন্ধ,—গুরুদেবের আজ্ঞা, মণির বিয়ে কোথায় হবে জানি না।" বুকের পকেট হইতে ঠিকানা-লেখা ডাক-টিকিট-লাগানো একখানি চিঠি বাহির করিয়া বালিসের নীচে রাখিয়া দিল, এবং একটা খাতা ছিঁড়িয়া এক টুকরা কাগজে লিখিল—"আমার কার্য্যের জন্য আমিই দোষী, অন্য কেহ দোষী নহে।" লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিল।

(১৩)

সাহেব ডাক্তার যখন আসিয়া পৌছিলেন, তখন বেলা ৮টা। অহিফেনের ক্রিয়া তখন পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইয়াছে। সকল চেষ্টা বৃথা হইল। বেলা দশটায় ডাক্তার মলিন মুখে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শবদেহের ব্যবস্থা করিয়া মেসের সকলে মেসে আসিল। বন্ধুর শেষ ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য ক্ষিতীশদা "কল্যাণীয়া শ্রীমতী মণিমালা দেবী"র চিঠিখানি ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল এবং পরদিন বিমলের জিনিস-পত্র লইয়া কাশী রওনা হইল।

* * *

ভেলুপুরের সড়কের উপর ৩০ নং বাড়ীর সম্মুখে বটগাছের তলায় যখন গাড়ী আসিয়া থামিল, ঠিক সেই সময়েই "বল হরি, হরিবোল" বলিয়া কয়েকজন শ্মশান-যাত্রী বাঙ্গালী খাটিয়ায় একটি বালিকার শবদেহ শোয়াইয়া সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বিমলের 'মণি' 'রাজরাণী' হইবার জন্য বিশ্বেশ্বরীর কোলে চলিয়া গেল। শ্মশান-যাত্রীর দল যতক্ষণ দেখা গেল, ক্ষিতীশদা গাছতলায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন। তারপর সেই জীর্ণ বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ছাতালের এক কোণে, তুলসী গাছের পাশে, এক মূর্চ্ছিতা বিধবার মস্তক ক্রোড়ে করিয়া একটি প্রৌঢ়া বাঙ্গালী বিধবা নিস্তব্ধ বসিয়া রহিয়াছে। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।

ভাবের অভিব্যক্তি

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

[শিল্পীর পরিচয়।—চিত্রগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাদের প্রত্যেকটাই চিত্র শিল্পী ও সুদক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নানাভাবের প্রতিমূর্ত্তি। পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া, অনেক সময়ে একই পরিচ্ছদে, কেবলমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানারূপ সঙ্কোচ ও বিকৃতির দ্বারা বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ করা হইয়াছে। এরূপ অভিনয় কার্য্যে ধীরেন্দ্র বাবু সুনিপুণ। তাঁহাকে অভিনয় করিতে দেখিলে নটগুরু ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। বিভিন্ন অবস্থায় মনে যে বিভিন্ন ভাবের উদয় হয়, মুখ মনের দর্পণ স্বরূপ বলিয়া, মুখেই সেই ভাবের ছায়া পড়ে। মুখে সেই ভাবটী ফুটাইয়া তোলাই প্রতিভা সাপেক্ষ। সুদক্ষ অভিনেতার এই খানেই বিশেষত্ব মানব-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের ও মনোবৃত্তি সমূহের সূক্ষ্মবিশ্লেষণের প্রকৃতিদত্ত শক্তি না থাকিলে, এ বিষয়ে দক্ষতা লাভ করা অসম্ভব। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এ বিদ্যার আদর নাই। তাই ধীরেন বাবুর অভিনয় চাতুর্য্য দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহাকে আমরা একজন সুনিপুণ চিত্রকর বলিয়াই জানিতাম, এখন দেখিতেছি অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ভাবাভিব্যক্তি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। ধীরেন বাবুর নানাবিষয়িণী প্রতিভার জন্য তাঁহাকে আমরা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।—ভারতবর্ষ সম্পাদক]।

সরল-প্রাণ বৃদ্ধ

ক্রূর-প্রকৃতি বৃদ্ধ

আতঙ্ক নির্ভীক

অসহ্য যন্ত্রণা

ঘৃণা ও বিরক্তি

আরাম

ছেলে সাজা

[কথা ও চিত্র—শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর

(নব-পর্য্যায়—সচিত্র ও বিচিত্র)

চন্দ্রশেখরের প্রতিজ্ঞা

"আমি বিবাহ করিব না"

"নাঃ। বিবাহ না করিলে আর চলে না। কিন্তু——"

যুবক ও যুবতী

শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজের অনুগ্রহে

চন্দ্রশেখরের ভরসা　　　　চন্দ্রশেখরের ভয়

"কুরূপা বিবাহ করিব; তাহা হইলে সেবা পাইব আর সিক্কা। অথচ, মন মুগ্ধ হইবার কোন কারণ ঘটিবে না।"

"সুন্দরী বিবাহ করিব না; সুন্দরীতে মন মুগ্ধ হইবার সম্ভাবনা।"

চন্দ্রশেখরের ব্রতভঙ্গ

"মরি! মরি! এমন রূপ ত কখনও দেখি নাই। তবে ঐ গৌরবর্ণাকেই বিবাহ করিব।"

চন্দ্রশেখরের ঘটকালি

"মোচার ঘণ্টে কতটা গুড় দিতে হয়, বল দিকি।"

চন্দ্রশেখরের সমস্যা

"সুন্দরী বিবাহ করিলাম ত' পুঁথি পড়িব কখন?"

চন্দ্রশেখরের মহত্ত্ব

"এই ক্লেশ-সঞ্চিত পুস্তকরাশি ছাড়ে ফেলিয়া দিয়া রমণী-মুখ-পদ্মই কি এ জীবনে সার করিব? ছি! ছি! তাহা পারিব না।"

প্রতাপের অনন্য নিষ্ঠা

তিনি রূপসীকে বিবাহ করিলেন বটে, কিন্তু শৈবলিনীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল।

প্রতাপের বীরত্ব

প্রতাপ বলিলেন, "আমি দেশের জন্য এবং নারীর মান-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিব। কারণ, যুদ্ধ করিলে নবাবের নিকট হইতে দুইটী পরগণা বখশিশ্ পাইতে পারি।"

প্রতাপের পরোপকার

শৈবলিনী বলিল, "তুমি কেন ডুবিবে, প্রতাপ? তোমার স্ত্রী আছে———"

প্রতাপ বলিলেন, "সই, রূপসীর জন্য ভাবিও না। তুমি এবং আমি জীবিত থাকিলে তাহার দুর্গতির অন্ত নাই।"

প্রতাপের ইন্দ্রিয়-জয়

তিনি গুরুপত্নীকে নিজ কক্ষে একা পাইয়াও দমকা প্রেমালাপ করিলেন না।

চন্দ্রশেখরের তত্ত্বজ্ঞান

"কি বলিলেন গুরুদেব,—দুঃখ বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই? এমন কথা ত কখনও শুনি নাই! কেবল পড়িয়াছি মাত্র কিন্তু পড়িলে কি এমন পুলক সঞ্চার হয়?"

চন্দ্রশেখরের ন্যায়পরতা

"ক্ষমা! তোমাকে ক্ষমা করিব!! শৈবলিনি, তুমি যদি শত্রু হইতে ত ক্ষমা করিতাম। কি তুমি শত্রু ন অতএব চতুর্দ্দশ বৎসর এই স্থানে পচিতে থাক।"

"প্রতাপ, যুদ্ধ করিয়া কি হইবে, ভাই? যাহার সহিত যুদ্ধ করিবে সে তোমার শত্রু ত? তবে ছাই ক্ষমা করিয়া ফেল।"
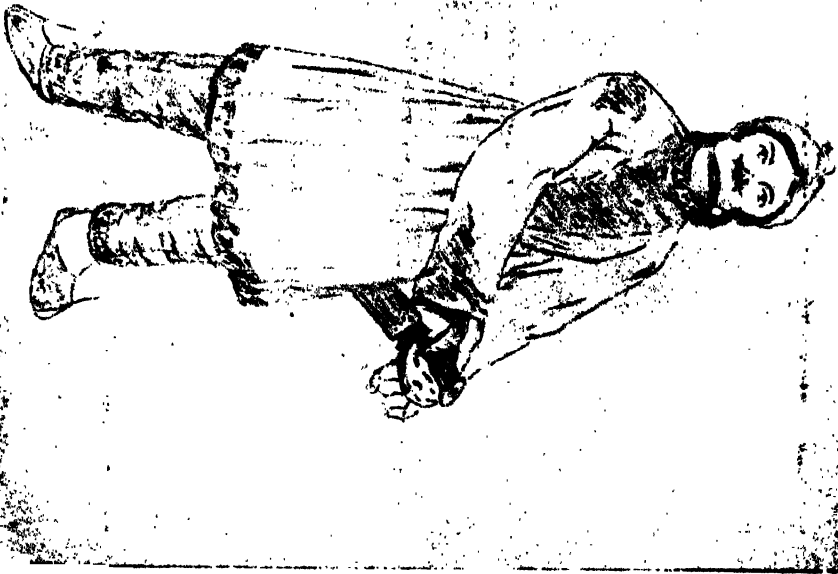
প্রতাপের মৃত্যু

রামানন্দ স্বামী বলিলেন, "প্রতাপ, তুমি ত মরিলে! কিন্তু পৃথিবীর ইন্দ্রিয়-জয়-শক্তিকে তোমার সহিত চিরলুপ্ত করিও না। আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন তোমার মত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারি।"

প্রতাপের স্বর্গভোগ

সুরাঙ্গনাগণ মাল্য-পুষ্পাদি লইয়া প্রতাপের অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু তিনি লাথি ও কিলের সাহায্যে তাঁহাদিগকে বিদায় করিলেন; কারণ, স্বর্গে না কি পায়ে ধরিলেও ভালবাসিতে হয় না।

দুইখানি চিত্র

[শ্রীমুকুলচন্দ্র দে]

সাঁওতাল যুবতী

বাউল
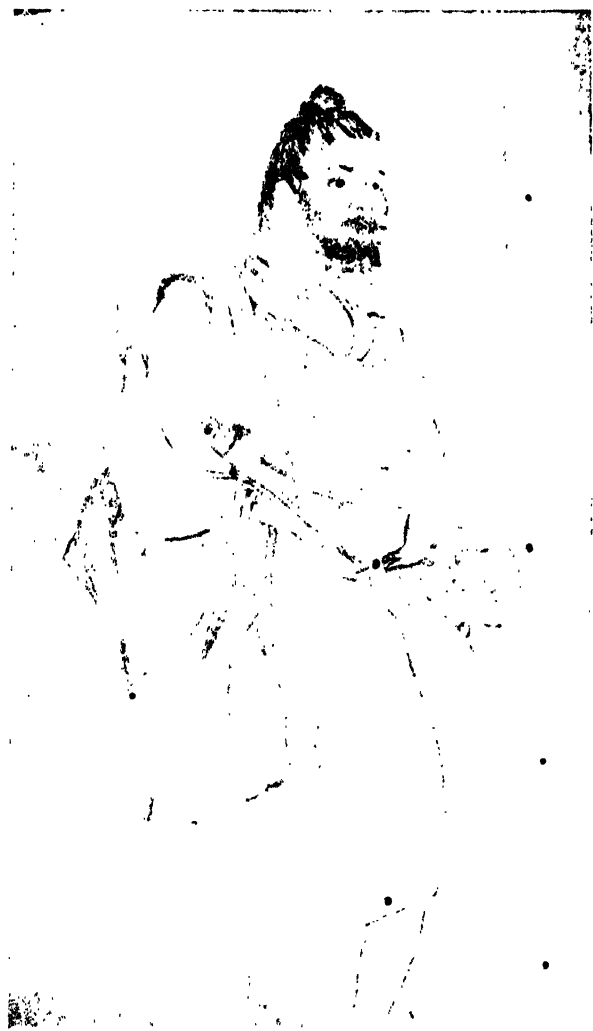
সমাজ চিত্র

[শ্রী————————]

"Idiot, তুমি স্বামী নামের অযোগ্য !"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির

সাহায্য-প্রার্থনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম এই বিংশ শতাব্দীতে জানিতে বোধ হয় ভারতবর্ষের কাহারও বাকি নাই। শুধু ভারতবর্ষ বলি কেন, সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকার সহস্র সহস্র অধিবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, এমন কি নিত্য পূজাও করিয়া থাকেন। ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম্মের সকল মতে নিজে সাধনা করিয়া যে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র দেশবাসীর সকল জাতির, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। সেই সর্ব্বজন পূজনীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহাস্থি কলিকাতার কাঁকুড়গাছি শ্রীযোগোদ্যানে সমাহিত হইয়াছে। আজি অষ্টাবিংশ বর্ষ হইল, শ্রীযোগোদ্যানে নিত্যপূজা ও মহোৎসবাদি সমাহিত হইয়া আসিতেছে। সেই সমাধিস্থলে যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সামান্য ও অতি ক্ষুদ্র গৃহমাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণের উদ্যোগে তাহার সম্মুখে যে নাটমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে সে সামান্য ভগ্নোম্মুখ গৃহ আদৌ শোভা পায় না। যে স্থানে তাঁহার দেহাস্থি রক্ষিত, সে স্থানে সুন্দররূপে একটি মন্দির নির্ম্মিত করাইবার চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা করা অস্বাভাবিক বলিয়া কেহই মনে করিবেন না, ইহাই আমাদিগের ধারণা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কোনও জাতি-বিশেষের, কোনও ধর্ম্মবিশেষের বা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের নহেন এবং ভারতবর্ষও চিরদিন কীর্ত্তিস্থাপনে পরাঙ্মুখ নহেন। তাই আজ আমরা ভারতবর্ষের দানবীর মহাত্মগণের নিকট, মহাপুরুষের কীর্ত্তিস্থাপনের সহায়তা-কারিগণের নিকট কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, এই মন্দির-নির্ম্মাণ-কল্পে তাঁহারা সকলে সহায়তা করুন। সঙ্কল্পিত মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইল। যিনি যাহা দান করিবেন, তাহা স্বামী যোগবিনোদ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সমাধি-মন্দির মঠ, যোগোদ্যান, কাঁকুড়গাছী, পোঃ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা পাঠাইবেন।
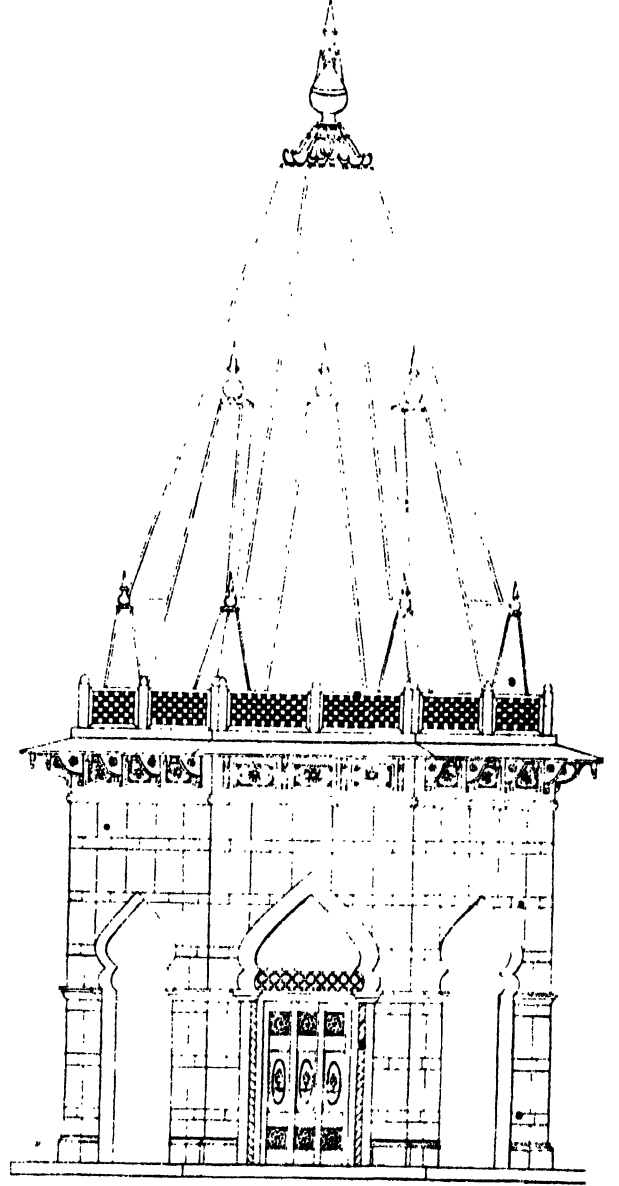
নূতন মন্দিরের নক্সা

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

তারকনাথের পত্র :-

যে বৎসর 'স্বর্ণলতা'র গ্রন্থকার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ইহলোক হইতে অপসারিত হন, ঠিক তাহার এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-বন্ধু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন,—

Buxar, July 2nd, 1890.

My dear Sir,

As there is no knowing of the fate of your Malancha, I am thinking of publishing as far as I have written of অদৃষ্ট under the name of অদৃষ্ট part first, so that I may have a notion of how the whole book is likely to be received by the public. I had not expected that হরিষে বিষাদ would fall so flat on the taste of public. I am convinced that no one ought to write books, novels in particular, in our country unless one has a name already in some respect or other. Have you read Romesh Chundra Dutt's সংসার? That book is extolled to the skies by the critics for no merit of the book, which every one who reads it may know, but for the name and position of the author; so Bankim Babu's books. What are they? Particularly the last 3 or 4? Though I am not the person, who should say so, yet I am of opinion that my হরিষে বিষাদ is better than his heap of rubbish and Romesh Chundra Dutt's choice performance, his সংসার! But fate (নসিব) is fate.

Will you be so kind as to get back the chapter which I gave you on the occasion of your coming here. I will also beg the favour of your procuring me a set of the already printed numbers of the মালঞ্চ so that I may send them to my printers. This you can easily do if you only try. We are pretty well and hoping to hear the best accounts of yourself and family I beg to remain.

Your's sincerely

Tarok Nath Ganguly.

এই পত্রখানির মধ্যে তারকনাথের মনের ছবি কতকটা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে মূল্যবান মনে করি। এবং সেই জন্যই সাদরে ইহা মুদ্রিতও করিলাম। যে উচ্চদরের প্রতিভার তিনি অধিকারী ছিলেন, তদুপযুক্ত প্রশংসা তাহার হয় নাই,—ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। সে ধারণাটা এই পত্রমধ্যে প্রতিফলিতও হইয়াছে। প্রতিভা পুরস্কৃত না হইলে, যশাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থাকিলে, মানুষের মন যে কেমন হয়, এ পত্রখানি তাহার পরিচায়ক।

কথাটা এক হিসাবে সত্য যে, বাঙ্গালী তাঁহাকে যথোপযুক্ত আদর করে নাই। তাঁহার 'স্বর্ণলতা' পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদৃত ও সমাদৃত হইলেও লেখক মহলে তিনি আদৌ আমোল পান নাই। তখনকার "নব্য বাঙ্গালীর নবোত্থিত সাহিত্যের শাসয়িতা সম্রাট" বঙ্কিমচন্দ্র কখনও ভুলিয়াও তাঁহার নাম মুখে আনেন নাই। রাজনারায়ণ বাবুর "বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়", রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" ও রমেশচন্দ্রের "The Literature of Bengal" নামক ইংরাজী গ্রন্থে তারকনাথের নাম দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তারপর অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রশেখর ও চন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যরথীগণও যে তাঁহার সম্বন্ধে কখনও কিছু লিখিয়াছেন, এমন শুনি নাই। অতএব, তাঁহার দুঃখ করাটা যে অন্যায় বা অসঙ্গত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

শুধু তাহাই নহে। সাহিত্য-সমাজে তিনি জীবিতকালে যেমন উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, এখনও প্রায় তেমনই উপেক্ষিত আছেন। বঙ্কিমবাবু জীবনে কখনও গিরিশচন্দ্র, বিহারীলাল ও শিবনাথ প্রভৃতির নাম গন্ধ না করিলেও তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বহু লেখকই উঁহাদের গুণগান করিয়াছেন। কিন্তু তারকনাথের কপালে সেটুকুও জুটে নাই! মাসিকের পৃষ্ঠায় এক 'কৃষ্ণকান্তের উইলের'ই কত সমালোচনা দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না; কিন্তু বাঙ্গালার প্রথম ও প্রধান সামাজিক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ বাহির হইতে কে কোথায় কয়টা দেখিয়াছে? এই ৬ই আশ্বিন তাঁহার মৃত্যুদিন গত হইল, কে তাঁহার নাম করিয়া সেদিন তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল? ঐশ্বর্য্য ও প্রশংসা যদি প্রতিভার পুরস্কার হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তারকনাথের মত দুর্ভাগা সচরাচর দেখা যায় না। এমন কি, থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলে ও প্লাকার্ডে পর্য্যন্ত তাঁহার নামটা বাহির হয় না, অথচ 'স্বর্ণলতা' কাহার দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে নামটুকুও তাহাতে মুদ্রিত হইয়া থাকে!—এমনই আমাদের কর্ত্তব্য-জ্ঞান! তারকনাথ যদি পরলোক হইতেও

এই সব দেখিতে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেখানেও তিনি তাঁহার বন্ধুকে নিশ্চয়ই বলিবেন - "Fate is fate."

তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, তিনি লেখক-সমাজ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহার 'স্বর্ণলতা'র পাঠক-সংখ্যা যত বেশী, এত বোধ করি আর কোনও বাঙ্গালা পুস্তকের নাই। সত্য যে নিজেকেই নিজে রক্ষা করে তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই 'স্বর্ণলতা'।

রবীন্দ্রনাথের পত্র :—

রবীন্দ্রবাবু ঠাকুরদাস বাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একখানির মধ্যে তাঁহার হাতের লেখা "শারদা" শীর্ষক একটি চতুর্দ্দশ-পদী কবিতা পাইয়াছি। কবিতাটি কোথাও মুদ্রিত হইয়াছে কি না, জানি না। সময়োপযোগী বোধে আমরা পত্রের সঙ্গে তাহা মুদ্রিত করিলাম।—

ওঁ জোড়াসাঁকো

সাদর নমস্কার নিবেদন—

আমি আগামী সোমবার রাত্রে বোলপুর "শান্তি-নিকেতন" উদ্যানে যাত্রা করিব। ইতিমধ্যে কখন আপনি আমার সহিত দেখা করিতে পারিবেন লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব। ইতি। শনিবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শারদা

ওই শুনি শূন্যপথে রথচক্র-ধ্বনি,
ও নহে শারদ-মেঘে লঘু গরজন।
কাহার আসার আশে নীরবে অবনী
আকুল শিশির-জলে ভাসায় নয়ন!
কার কণ্ঠহার হ'তে সোণার ছটায়
চারিদিকে ঝলমল শারদ-কিরণ!
প্রফুল্ল মালতী বনে প্রভাতে লুটায়
কাহার অমল শুভ্র অঞ্চল-বসন!
কাহার মঞ্জুল হাসি, সুগন্ধ নিঃশ্বাস
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তুলে শেফালি কামিনী।
ও কি রাজহংসরব, ওই কলভাষ?
নহে গো, বাজিছে অঙ্গে কঙ্কণ কিঙ্কিণী!
ছাড়িয়া অনন্তধাম সৌন্দর্য্য-কৈলাস,
আসিছেন এ-বঙ্গের আনন্দ-রূপিণী!

নবীনচন্দ্রের পত্র :—

নবীনচন্দ্রের কয়েকখানি মূল্যবান পত্র ইতিপূর্ব্বে একবার 'ভারতবর্ষে'র পাঠকবর্গকে আমরা উপহার দিয়াছি;—আজ আবার আর একখানি দিতেছি। কবিবরের জীবনের কথা ইহার মধ্যেও আছে।—বলা বাহুল্য, এ পত্রখানিও ঠাকুরদাস বাবুর উদ্দেশে লিখিত।

বেণী—

ভাই ঠাকুরদাস বাবু, ২৭।২।৯১

আপনার মত লোক একটি 'বাঙ্গাল'কে এত বাড়াইতে গেলে, তাহার মাথা ঠিক্ থাকিবে কেন? যাঁহার রৈবতকের সমালোচনা পড়িয়া আমি অক্ষয় বাবুর লেখা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম—যাঁহার বাঙ্গালা ভাষার উপর, ভাবের উপর অধিকার আমি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন মনে করি না, তাঁহার মুখের প্রশংসায় স্থির থাকিতে পারিব কেন? তাহার উপর আবার এতাদৃশ আত্ম-সুহৃত্তার কথা পাড়িলে আমার বড় হাসি পায়। যাহা হউক, নূতন কাব্য আমি বোধ করি আর ১০।১৫ দিনের মধ্যে পাঠাইতে পারিব।

শ্রীমান্ কেদারনাথ রায়কে আমি চিনি। তাঁহার সমালোচনা আমি পড়িয়াছি। কারণ আমি National Magazineএর একজন গ্রাহক। তাহাতে আপনি এত চটিয়া বড় অরসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। আর বাস্তবিক কুমারী কামিনীর বহিখানি বেশ। এমন 'সৃষ্টিরাস্তেব ধাতুঃ' যে বেথুন স্কুলের শিক্ষকতায় এই অতুল শ্রীসম্পন্না প্রতিভা ক্ষয় করিতেছেন, তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়। তিনি এবং * * রায় একদিন আমার খুব গোঁড়া ছিলেন। তখন তিনি বাঁকিপুরে মুন্সেফ ছিলেন, আমি বেহারে ছিলাম। আমাকে মহা অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াছিলেন। এখন যদি গালি দেন, তাহা আমি সৃষ্টির প্রকৃত চেলার মত গ্রহণ করিতে পারি। * * *

আপনার মত আরো বন্ধু Indian Mirrorএ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন শুনিয়াছি। কিন্তু শ্রীমান্ কেদারনাথ রায় S. C. S. (এখন P. C. S.) এখন শেয়ালদহের "জাইণ্ট বাবু"। Mirror কেমন করিয়া এরূপ প্রতিবাদ ছাপিবেন? আপনারাও যে কেন এ un-gallant কাযটা করিতে গিয়াছিলেন বুঝি না। 'আর্য্য-দর্শন' একদিন আমাকে বাঙ্গালার 'হোমার' বলিয়া—হায়! এ বয়সে কত কি হইলাম—যখন নির্জ্জলা গালি দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কেহ কেহ প্রতিবাদ করিতে অনুমতি চাহিলেন। আমি লিখিলাম এরূপ গালির একমাত্র প্রতিবাদ আছে * * * *। যদি তাহা কেহ পায়, কয়, না হয় চুপ করিয়া থাক।

Pioneer কি বলিয়াছেন দেখি নাই * * জানিতাম না যে এই বিবাহ-বিভ্রাট সম্বন্ধে শত্রু, মিত্র, মধ্যস্থ সকলেই আমার পত্র আংশিক উদ্ধৃত করিয়াছে। কিন্তু বলি কি, এই অপোগণ্ড বিলটা পাশ হইলে পৃথিবীটা থাকিবে ত? বাঙ্গালা Propertটা থাকিবে বলিয়া ত বোধ হয় না। যদি আইনটাকে reprospective effect দেওয়া হয়, ব্রাহ্মণী কিছু গোল বাধাইবেন না ত? আমি আগে ধরা পড়িব। একবার হরি হরি বল!

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

---

* এই সকল পত্র আমি ঠাকুরদাস বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। এজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।—অমর।

পূজার সওগাদ

আগমনী

[শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(ওগো) কেন আসে শরতেরি চাঁদ ?
সে না এলে উমা তরে না ঘটে প্রমাদ।
কেন সে শেফালি আসে, হেসে হেসে পড়ে খসে',
কেন কমল-বিকাশে, প্রাণে আনে অবসাদ ?
সুজলা সুফলা ধরা, প্রকৃতি মাধুরী ভরা,
অর্ঘ্য লয়ে বসুন্ধরা, কেন এত সাধে বাদ ?
নীলাকাশে শুভ্রবাসে, সুপ্রকাশে শরৎ হাসে,
বিমল রজতাভাসে, শুধু বরষে বিষাদ।
শিশির-শীতল শ্যামল আসন, মৃদু মধুর সমীর ব্যজন,
মুখর বিহঙ্গ কূজন, বধিতে পেতেছে ফাঁদ।
না-হয় বারণ কর মা সবে, না-হয় ত্বরা আয় মা শিবে,
(এরা) বিলম্বে প্রাণ বধিবে, হ'য়ে দুরন্ত নিষাদ।

অ-শেষ

['কাশীর কিঞ্চিৎ'-কার শ্রীনন্দিশর্ম্ম-রচিত]

সব কাজের শেষ আছে দেখি—
শুধু—বাজার করার নাইক শেষ!
নুন যদি রয়েছে ঘরে
ভাঁড়ে নাইক তেলের লেশ।
হুঁকোয় মাত্র দি'ছি হাত,
এই হয়েছে অপরাধ,
গিন্নী এসে অনটনের
লম্বা ফর্দ্দ করেন পেশ।
"তিন দিন আজ নাইক ডা'ল,
ভাঁড়ারে নাই একটা চা'ল,
ঘিয়ের কথা বলবো না আর,—
তেল অভাবে রুক্ষ কেশ।
কাঁচা লঙ্কাও এলো ছুটো,
তাতে-পোড়ার লাগে বেশ।
"এমন পোড়ারমুখো ধোপা,
হারিয়ে কাপড় করে চোপা,
কাপড় এলে বাজার থেকে—
ইস্কুলে যাবে নরেশ।"
সে দিন—হাট নেই তাই আছি খুসি,
দেখি—হাই তুলে হন হাজির পিসি,
শুনি—আফিঙ বিনে পেট ফুলেছে'
ভাংতেছে গা, বড়ই ক্লেশ।
ভাবছি বসে'—আজকে রেহাই
দেখি—খানিক পরেই হাজির বেহাই!
গামছা মাথায় দিয়ে ছুটি
বাজারে—আনতে সন্দেশ।
এ তো বারমেসে জ্বালা,
তা'র উপরে পূজোর পালা,—
ব্রাহ্মণীর বিশ ভরীর বালা,
আর শুধু চাই নেক্‌লেস্।
কারণ—'মানুষ আমরা নহি ত মেষ!'

বাঙ্গালীর দেহতত্ত্ব

('কাশীর কিঞ্চিৎ'-কার শ্রীনন্দিশর্ম্ম-প্রকটিত)

ঐ—সহস্রারে সুধাকরে ব'লে গেছেন মুনি,
আর—মূলাধারে কুণ্ডলিনী বসে' আছেন শুনি।
সাধিষ্ঠান অনাহত আর ঐ বিশুদ্ধাক্ষ—
এক এক শর্ম্মা আছেন সেথা, ঋষিদের বাক্য।
কোরাস্.................এই ত শুনি।

সুষুম্না পিঙ্গলা আছেন—আর ঐ নাড়ী ইড়া,
যা'—ব্যাখ্যা করেন চূড়ামণি, কথায় ভিজিয়ে চিঁড়া;
করেন শুনি পুঁথি খুলে' ষট্‌চক্র-ভেদ
আর—বাক্যের চোটে বিশ্ব উড়ান—নজির রেখে বেদ।
কোরাস্.................এই ত শুনি।

দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা বলেন, খাঁটি আধ্যাত্মিক,
কলের মত সোজা, আর জলের মত ঠিক।
শিরোমণি কহেন শুনি,—"সে ব্যাটা উজ্‌বক্
বোঝে না যে,—সাত পুরুষ তা'র করেনি কুম্ভক"
কোরাস্‌............এই ত শুনি।

ঠেকে শিখে দেহতত্ত্বটা বুঝেছি কিন্তু সার,—
মাথায় আছেন—অন্নচিন্তা, কন্যাদায় আঁর ;
কপালেতে দুঃখ-দৈন্য বেঁধে আছে বাসা,
চক্ষুঃ দেখে অনটন, আর অন্ধকার খাসা।
কোরাস্‌.........এই ত দেখি।

কর্ণ শোনেন—হা-হুতাশ আর হুহুঙ্কার যত,
নাসায় রাজেন—ড্রেনের গন্ধ, দীর্ঘশ্বাস শত ;
বদন ধরেন—বক্তৃতা আর পরের তরে নীতি,
পরনিন্দা-রটনাতে জিহ্বাটা পান প্রীতি।
কোরাস্‌............এই ত দেখি।

হস্তদ্বয় সদাই যুক্ত—কাজেই অর্থরিক্ত,
হৃদয়টাকে হতাশাই করে' রেখেছে তিক্ত ;
অন্নশূন্য উদরেতে—প্লীহা নেছেন স্থান,
পা-দুখানাই এ জীবনের একমাত্র যান।
কোরাস্‌............এই ত দেখি।

চর্ম্মের উপর ঘৃণা একাই করেছে শুধু বাস,
আলস্য আর ম্যালেরিয়ার দেহটা তালুক খাস
এই আমাদের দেহতত্ত্ব,—সহস্রার না সুধা ;
এই নিয়েই বেঁচে থাকা—অন্তে আঁখি মুদা।
কোরাস্‌............এই ত দেখি।

—

"রসগোল্লা"

(স্তব)

[শ্রীশশধর বর্ম্মণ]

(জয়) বদন কি নর্তন,
বাঁটা-[illegible]-মর্দন,
বর্ত্তুলাকারে বিহরণ জী।
বায়কোষ-মোহন,
তদুপরি আসন,
শৈশব-বাল্য-বয়সে জী।
রাধা-প্রেম-রসে,
বিহরতি হরষে,
কটাহ-বৃন্দাবনে জী।
টগবগ উত্তাপ,
বিরিঞ্চি-বৈভব,
উড়্‌কি বৃন্দাদূতি জী।
ভাসয়তি, ডুবয়তি,
উঠয়তি, পড়য়তি,
মোদক হস্তচালনে জী।
তব রূপ-কোকনদ,
সুভঙ্গিম মনোমদ,
রসে ডগমগ নিরেট জী।
(জয়) সরস অঙ্গিয়া,
মন-প্রাণ-রঞ্জিয়া,
রসভরা আধারে বিরাজ জী।
কি সুঠাম কলেবর,
বিমোহিত চরাচর,
দর্শন মাত্রেন লালায়তি জী।
আস্তিক-মোহন,
নাস্তিক-তোষণ,
দর্শন-বিজ্ঞান-বিজয়ী জী।
(জয়) তুমি হে উপাস্য,
তুমি যে নমস্য
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জী।
তুমি সার আগমের,
তুমি হৃদি নিগমের,
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ জী।
মোদক-গৃহশোভা,
মুনিজন মনোলোভা,
ব্রহ্মচারীর তুমি কাম্য জী।
গৃহীর তুমি হে গতি,
ভোগীর তুমি হে পতি,
অখিলের তুমি হৃদি-রঞ্জন জী

তুমি হে গায়ক,
তুমি হে বাদক,
তাণ্ডবের তুমি রাজা জী।
তুমি মধুমঙ্গল,
তুমি হৃদি-চঞ্চল,
অনাদি অক্ষয় অচ্যুত জী।
তব মোহমন্ত্রে,
বদনকি যন্ত্রে,
(কি) অপূর্ব্ব সঙ্গীত উত্থিত জী।
তুমি রসিক সাগর,
সুরসের নাগর,
কর্ম্মবাড়ীর তুমি মোহন জী।
তোমার প্রবেশে,
ভাসে সবে হরষে,
দীয়তাং দীয়তাং রবে জী।
তব হিয়ামাঝে,
ক্ষীর বুটী রাজে,
অর্পিত অতি যতনে জী।
তুমি হে সগৌরবে,
পাতোপরি নাচ যবে,
নয়নকি লাজ না রহে জী।
তুমি আদি মিত্র,
জঠর পবিত্র,
বরযাত্রের হর্ষ-বিধায়ক জী।
ভট্টাচার্য্য রাহু,
তুলিয়া দুই বাহু,
তোমার দর্শনে নাচে জী।
ভাটকি সম্পদ,
সুখদ শুভদ,
পরদিন অর্থকি সচ্ছল জী।
পিয়া-মুখচন্দ,
মানে যদি অন্ধ
দরশনে মানকি ভঞ্জন জী।
বাল-কল-হাস্ত,
হেয়ে হৃস্তিতাস্ত,
পলকে পুলক উপজাতি জী।

ত্বংহি বেদ-বিধি,
তুঁহি প্রেমনিধি
যুবনকি হর্ষ যুগাগত জী।
বৃদ্ধ কি সম্বল,
বাড়ে যদি অম্বল,
তুমি বিনা কেবা তার আছে জী।
কুহুরব-লাঞ্ছিত,
তুমি ওহে বাঞ্ছিত,
পড় যবে গামলার রসে জী।
তথ্য তাবাসে,
তুমি বিনা প্রবাসে,
কেবা আর যাইতে সক্ষম জী।
তব রূপ ধ্যানে,
তব গুণ গানে,
(যেন) চিত মগন সদা রহে জী।
অক্ষম লেখনী,
তব গুণ বাখানি,
হেন কিবা সাধ্য আছে জী।
তবে যদি কৃপা কর,
উর আসি হৃদিপর,
বঞ্চিত ক'র না অকিঞ্চনে জী।
সঞ্চিত করুণা,
কিঞ্চিত দেহ না,
তব পুত্রের গুণ গানে মাতি জী।

অনধিকারী

[শ্রীকপিঞ্জল—]

সুদর্শনের কোথা যে শক্তি, বুঝিবে কেমনে মালীর খন্তা,
কাদাখোঁচা বল চিনিবে কেমনে, মানস-সরের সহজ পন্থা।
শুণ্ড দুটী তার করিয়া উচ্চ বলিছে তুচ্ছ বনের বিচ্ছু,
হোমের গন্ধ অতীব মন্দ, নাহিক তাহাতে নাহিক কিছু।
গলা ফোলাইয়া কয় কোলাবেঙ্ ফুলের মধ্যে হেয় যে পদ্ম,
গোমুখীর নীরে কিবা কাজ তার, পীযূষ যাহার পচাই-মদ্য।
মোরগ যে মণি খুঁটে ফেলে দেয়, গোধুমের কণা পেলে সে তৃপ্ত,
কলু ভালবাসে ঘানি কচ্‌কচি, কালোয়াতে হাসি বলে যে ক্ষিপ্ত,
ঝুমরির দলে কাঁসি বাজাইয়া ঋষি-সঙ্গীত বলিছ ব্যর্থ
'বেদে' বট ব'লে গায়ের জোরে যে করিছ বেদের নূতন অর্থ
ভূমি-কীট তুমি, কাদা মাটী তুলি হিমাদ্রি পানে তুলিছ আস্ত,
কঙ্কর তুমি, শঙ্কর সাজি টানিয়া আনিছ ধরার হাস্ত।
কর চিরকাল আদার বেসাতি, অধরে হাস্ত নয়নে ভঙ্গী,
ভকতির কথা তুলিয়ো না তুমি সাধু-সমাজের নিয়ম লঙ্ঘি।
শিখণ্ডী রও বেণী-রচনায়, হয়ো না—হয়ো না সায়ক-হস্ত,
নালক ভাঙিয়া হবে না গোলক, সবর রোষ হে মোহগ্রস্ত।

আগমনী

আশাবরী—একতালা

হের গিরি-রাণি, তোমার নন্দিনী রাজরাণী সাজে আসিছে।
ভিখারী-ঘরণী কে বলে তোর মেয়ে
সিংহ 'পরে রাজরাজেশ্বরী সেজেছে ॥
চরণতল রকত উৎপল নখ-ছটায় কোটী চাঁদ চমকিছে,
সে চরণ 'পরে নূপুর শোভে রে, রুণু ঝুনু রুণু বাজন বাজিছে।
ক্ষীণ কটি হেরি বুঝি বা কেশরী
ও পদে আশ্রয় নিয়েছে।
ছিল যে দ্বিভুজা, হয়ে দশভুজা, তদুপরে বামা আসন করেছে ॥

[স্বরলিপি—শ্রীআনন্দলাল হাণ্ডে

০ ১ + ৩ ০ ০
II সা ঋা মা | মা পা পা I না দা দা | পা পা পা | সা পা দা | না সা র্সা I
হে র গি রি রা ণি তো মা র ন ন্দি নী রা জ রা ণী সা জে

+ ৩ ০ ১ + ১
না র্সা না | দা দা দা I র্জ্ঞ র্ঋা র্মা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্ঋা র্সা | না দা পা |
আ সি ০ ছে ০ ০ ভি খা রী ঘ র ণী কে ব লে তোর্ মে য়ে

০ ১ + ৩ ০ ১
পা না দা | পা মা পা | পা মা জ্ঞা | ঋা ঋা সা II মা পা পা | দা দা দা |
সিং হ প রে রাজ রা জে শ্ব রী সে জে ছে চ র ণ ত ০ ল

+ ৩ ০ ১ + ৩
না র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্মর্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা | র্ঋা র্সা র্সা I
র ক ত উৎ প ল ন খ ছ টা য় কোটী চাঁ দ চ ম কি ছে

র্সা র্সা র্সা | র্সা ঋর্া ঋর্া | র্সা না না | দা দা দা | র্সা র্সা না | না দা দা I
সে চ র ণ প রে নূ পু র শো ভে রে রু ণু ঝু ঝু রু ণু
\+ ৩ ০ ১ + ৩
পা পা পা | মা জ্ঞঋা সা II মা পা দা | দা না র্সা I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা |
বা জ ন বা জি ছে ক্ষী ণ ক টি হে রি বু ঝি বা কে শ রী
০ ১ + ৩ ০ ১
জ্ঞর্া জ্ঞর্া জ্ঞর্া | ঋর্া ঋর্া ঋর্া | র্সা না না | দা দা দা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
ও প দে আ শ্র য় নি য়ে ০ ০ ছে ০ ছি ল যে দ্বি ভু জা
\+ ৩ ০ ১ + ৩
না না দা | দা দা দা | পা গা পা | পা দা দা | পা মা মা | জ্ঞা ঋা সা II II
হ য়ে দ শ ভু জা ত দু প রে বা মা আ স ন ক রে ছে

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ ॥
চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির-অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি)—দূরে ছুটে যেতে, দুহাত পসারি',
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ ॥

"ও পথে যেওনা, ফিরে এস" ব'লে
কানে কানে কত ক'য়েছ ।
(আমি) তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ॥
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি মুখে তুমি ব'য়েছ ।
আমার নিজ-হাতে গড়া বিপদের মাঝে
বুকে ক'রে নিয়ে রয়েছ ॥

কথা ও সুর—৺রজনীকান্ত সেন ।] [স্বরলিপি—শ্রীমতী রমলা চন্দ্র ।

রে' গা' রে' সা' সা' সা' নি' সা' রে' সা' নি' ধা' পা' ধা' ।
(১) আ মি তো তো মা রে চা ০ হি নি জী ০ ব নে
সা' সা' রে' রে' রে' রে' গা' সা' রেগা' গা' গামা' গা' রে' ॥
(১) তু মি ০ অ ভা গা রে চে ০ ০ য়ে ছ ০ ০ ০
সা' সা' মা' মা' মা' মা' মা' মা' মা' মা' মা' পা' মা'
(১) আ মি ০ না ডা কি তে হৃ দ য় মা ঝা রে
গা' গা' গা' রে' সা' সা' রে' গা' রে' গা' মা' গা' রে' ॥ (আ)
(১) নি জে এ সে দে খা দি ০ ০ য়ে ছ ০ ০

গা১ গা১ গা১ রে১ সা১ রে১ রে১ রে১ গামা১ মা১ গা

(২) চি র আ দ রে র বি নি • • ম য়ে

গা১ গা১ মা১ গা১ মা১ পা১ পা১ ধা১ মা১ গা১ রে১ গা১ ।

(২) স খা চি র অ ব হে লা পে • য়ে ছ।

সা১ রে১ রে১ রে১ গামা১ মা১ মা১ মা১ মা১ মা১ মা১ মা১ মা১ পা১ মা১

(২) আ মি দূ রে • • ছু টে যে তে, দু হা ত প সা রি'

গা১ গা১ গা১ রে১ সা১ সা১ রে১ গা১ রে১ গা১ মা১ গা১ রে১ ।

(২) ধ' রে টে নে কো লে নি • • য়ে ছ • •॥

গা১ গা১ গা১ রে১ সা১ রে১ রে১ রে১ গামা১ মা১ গা১ গা১ গা১

(৩) ও প থে যে ও না ফি রে • • এ স ব লে

(৪) এই চির অ প রা ধী পা ত • • কী র বো ঝা

মা১ গা১ মা১ পা১ পা১ ধা১ মা১ গা১ রে১ গা১ ।

(৩) কা নে কা নে ক ত ক • য়ে ছ।

(৪) হা সি মু খে তু মি ব' • য়ে ছ।

সা১ রে১ রে১ রে১ গামা১ মা১ মা১ মা১ মা১ মা১ মা১ মা১

(৩) আ মি ত বু • • চ লে গে ছি ফি রা য়ে

(৪) আ মার নি জ • • হা তে গ ড়া বি প দে (র)

মা১ পা১ মা১ গা১ গা১ গা১ রে১ সা১ সা১ রে১ গা১ রে১গা১মা১ গা১ রে১ ॥

(৩) আ নি তে পা ছে পা ছে ছু টে গি • • য়ে ছ • •।

(৪) -র মা ঝে বু কে ক' রে নি য়ে র • • য়ে ছ • •।

হাম্বীর মিশ্র—তেওরা

[কথা ও স্বরলিপি—শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন]

\+ ১ ২

ধ র্সা র্সা । র্নি ধ, নি । ধ প । ম প ম । গ । ম ধ । প প ঋ ।

ক ত অ জা — না রে জা না ই লে তু মি ক ত য

গ ম । প ম গ । ঋ সা । সা । স ম ম । ম ম । মী । ম প প ।

রে দি লৈ ঠাঁ ই দূ র কে ক রি • লে নি ক ট •

পা | পা | র্সা র্সা | র্সা র্সা | নি | ধ নি ধ নি র্সা নি | ধ নি |
ব ন্ধু পর কে ক রি লে

ধ পা ‖ অন্তরা ‖ পা ধ পা | র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্ঋ র্ঋ | র্সা |
পু রা ণ আ বা স ছে ড়ে চ লি

র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | নি ধ | নি নি | নি র্সা র্সা | নি ধ নি | ধ পা |
য বে ম নে ভে বে ম রি কি জা নি কি হ বে

পা ধ পা | মা গা | ম পা | ম গা ম | ঋ | সা সা | সা ম ম |
নূ ত নে র মা ঝে তু মি পু রা ত ন সে ক থা

পা পা | পা | ধ নি ধ নি র্সা নি | ধ নি | ধ পা ‖ সঞ্চারী ‖
ভু লি য়া যা ই

সা সা সা | ম | ম ম | ম পা পা | পা | পা পা | ধ নি ধ | নি |
জী ব নে ম র ণে নি খি ল ভু ব নে য খ ন যে

সা সা | নি ধ | পা | পা ম | ম ম ম | ম | ধ পা | ম গা ম |
খা নে ল বে চি র জ ন মে র প রি চি

ঋ | সা সা | সা ম | পা পা | পা | পা ম পা ধ নি | ধ পা ‖ আভোগ ‖
ত ও হে তু মি চি না বে স বে

পা ধ পা | র্সা | র্সা র্সা | র্সা র্ঋ র্ঋ | র্সা | র্সা | ধ র্সা র্সা র্সা |
তো মা রে জা নি লে না হি কে হ পর না হি কো

নি ধ | নি নি | র্সা র্সা র্সা | নি ধ নি | ধ পা | পা ধ পা |
ন মা না না হি কে ন ভ য় স বা রে

সা | পা পা | ম গা ম | ঋ | সা সা |
জা গা রে তু মি জা গি তে ছ

সা ম ম | পা | পা পা | ধ নি ধ নি র্সা নি | ধ নি | ধ পা ‖
দে খা যে ন স দা পা হ

সাময়িকী

পূজা আসিয়াছে। যাঁহারা দুর্গোৎসব করেন, তাঁহারা পূজার আয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছেন; যাঁহারা পূজা করেন না, এমন হিন্দু-গৃহস্থও নিশ্চিন্ত নহেন। এই বস্ত্রের মহার্ঘ্যতায় সময়ও যাঁহার যেমন সাধ্য, পুত্র-কন্যাগণের জন্য বস্ত্রাদি ক্রয় করিতেছেন। যে দরিদ্র পিতা ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া সে-দিন কন্যা-বিবাহের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি এখন এই পূজার সময় জামাতৃগৃহে তত্ত্ব পাঠাইবার ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য বন্ধক দিবার মত আর কিছু নাই দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছেন; অল্প বেতনের কর্ম্মচারী বিদেশে কোন প্রকারে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া সারা বৎসর কাটাইয়াছেন; তিনি বৎসরান্তে এই সময় জন্মভূমিতে গমন করিয়া আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইবার অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নীরবে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছেন। আর যাঁহাদের সঙ্গতি আছে, যাঁহারা উচ্চবেতনভোগী, তাঁহাদের অনেকেই এই পূজার অবকাশে ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের গৃহে পিতৃ-পিতামহের আমল হইতে পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাঁহারা অগত্যা বাড়ীর গোমস্তার উপর পূজার ভার দিয়া মধুপুর, শিমুলতলা, কাশী প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছেন। পাড়াগাঁয়ের বাড়ীতে যাওয়া—বল কি! সেখানে যে ম্যালেরিয়া!

সেকালের সে পূজা আর নাই! সেই প্রাণভরা উল্লাস, আনন্দ, গালভরা হাসি, বুকভরা প্রীতি—সে সব কিছুই নাই! হিন্দুর প্রধান উৎসব এই দুর্গোৎসব এখন যেন একটা দায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—অনেকেই চক্ষু-লজ্জার খাতিরে পৈত্রিক ক্রিয়াটা কোন রকমে বজায় রাখিয়াছেন। পূজার জন্য একটা আন্তরিক আগ্রহ নাই, —করিতে হয় তাই পূজা করা! ইহার নাম ত পূজা নহে! ইহা অভিনয় মাত্র! তাই বড় দুঃখে কাঙ্গাল হরিনাথ গাহিয়াছিলেন—

"শক্তিপূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হ'ত, চিরদিন ভারত
শক্তি পূজে শক্তিহীন হ'ত না।
কেবল ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়
শক্তিপূজা হয় না;
এক মনঃ-বিল্বদল, ভক্তি-গঙ্গাজল,
শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন,
মা যে তাতে ভোলেন না;
কেবল জ্ঞান-দীপ জ্বেলে, একান্ত-ধূপ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা।
বনের মহিষ, অজা, মায়ের বাছা,
মা সে বলি লন না;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস-বাসনা।
কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাত-বিচারে
শক্তি-পূজা হয় না;
সকল বর্ণ এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।"

ইহারই নাম শক্তিপূজা,—ইহারই নাম দুর্গোৎসব! শক্তিপূজা করিতে হইলে স্বার্থ বলি দিতে হয়—বিলাস-বাসনা বলি দিতে হয়,—দর্প-অহঙ্কার বলি দিতে হয়। শক্তিপূজা করিতে হইলে উচ্চ-নীচ-ভেদ-জ্ঞান দূরে ফেলিয়া দিতে হয়—সকল বর্ণ এক হইয়া শক্তিময়ীকে ডাকিতে হয়,—তাঁহার পূজা করিতে হয়! বিনা সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় না; তাই এতকাল শক্তিপূজা করিয়াও আমরা এমন শক্তিহীন হইয়াছি। যাঁহারা মায়ের অসংখ্য সন্তানকে আপনার বলিয়া মনে করিবেন না, তাঁহারা মায়ের পূজার অধিকারী নহেন। এখন পূজাবাড়ীতে কি দেখিতে পাই? পূজার দালানে দীনপালিনী মায়ের পূজা হইতেছে, কিন্তু

পূজাবাড়ীর দ্বারদেশ হইতে দীনহীন কাঙ্গাল, মুষ্টিভিখারী দরিদ্র ব্যক্তি তাড়িত হইতেছে! অন্নপূর্ণা গৃহে আসিয়াছেন, কিন্তু একগ্রাস অন্নের প্রার্থী দ্বার হইতে বিমুখ হইয়া যাইতেছে! ইহার নাম ত পূজা নহে! আবার বলিতেছি, ইহা পূজার অভিনয় মাত্র!

এমনই দুর্গতি আমাদের হইয়াছে। আমরা এমনই আত্ম-সর্ব্বস্ব হইয়াছি, এমনই বিলাস-পরায়ণ হইয়াছি যে, আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিবারও অযোগ্য হইয়া পড়িতেছি। আমাদের শ্রদ্ধা-বুদ্ধি নাই, আমাদের ধর্ম্মে মতি নাই, আমরা ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছি। শুধু আমরা বলিয়া নহে, সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যেই একটা যেন ঔদাসীন্যের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে; সবই যেন উপর-উপর; ভিতরের টান ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে; প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ লোকের অভাব হইতেছে। আমাদের হৃদয় ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন, আমাদের মধ্যে সে নিষ্ঠা নাই, সে ভক্তি নাই, সে একাগ্রতা নাই, সে ধর্ম্ম-সাধন নাই। ইহা অপেক্ষা অকল্যাণের কথা আর কি হইতে পারে? আমাদের এই দুর্গোৎসবের সময় এই কথাই আমাদের মনে জাগিতেছে—আমরা কি মানুষ? আমাদের মনুষ্যত্ব কোথায়? তাই এই সময় কাঙ্গাল হরিনাথের কথা মনে হয়। তিনি বড় দুঃখে গায়িয়াছিলেন—

"মানুষ বড় কিসে, ভাবি তিন বেলা।
সে ত বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান পেয়ে
না বোঝে পরের জ্বালা।
গাছেতে ফল ধরে যত, নত হয়ে বিলায়, সে ত খায় না;
মানুষ ধন জ্ঞান বিদ্যা পেলে,
লাগায় তালার উপর তালা।
গাছের তলে বস্‌লে এসে,
সে ত ছায়া দেয় রে ভালবেসে, দেখ্‌ না;
কাট্‌তে গেলেও ছায়া দান করে সে,
গাছ না হয় রে উতলা।
ঝড় বৃষ্টি শিলা সয়ে,
আছে স্থিরভাবেতে দাঁড়াইয়ে, দেখ্‌ না;
যাচ্ছে এক উদ্দেশে ঊর্দ্ধদেশে,
তার শক্তি কি অচলা।
কাঙ্গাল বলে বড় যে জন,
সে ত ফকির হয় রে পরের কারণ, দেখ্‌ না;
ঘর ছেড়ে তাই যোগী ঋষি,
সার করে গাছের তলা।"

আমরা বাঙ্গালীরা যে কি হইয়াছি, তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমরা জাতীয় মহাসমিতি—ইংরাজীতে নাম National Congress—তাহারই কথা বলিতেছি। এই কন্‌গ্রেস উপলক্ষে আমাদের বাঙ্গালা দেশে যে কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গেল, তাহা সকলেই দেখিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে কেন, মানুষের সকল কার্য্যক্ষেত্রেই মতান্তর হইবেই; মতান্তর হইতে কথান্তরও হইয়া থাকে; কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা ঐ পর্য্যন্ত যাইয়াই নিরস্ত হই না; আমরা একেবারে মনান্তর, স্থানান্তরে পর্য্যন্ত যাইয়া উঠি! কন্‌গ্রেস ব্যাপারে আমরা বাঙ্গালা দেশে তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ দেখিলাম। যাঁহারা আমাদের দেশের অগ্রণী, যাঁহারা আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয়, যাঁহাদের আদর্শ অনুকরণ করিয়া আমাদের দেশের জনসাধারণ কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইবে, তাঁহারা এই কন্‌গ্রেস ব্যাপারে যে বিষ উদ্গীরণ করিলেন, যে পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহার ফল যে আমাদের পক্ষে শোচনীয় হইবে, তাহা কাহাকেও আর বলিয়া দিতে হইবে না। রাজনীতির অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে, সে কথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু এই উপলক্ষে আমাদের উচ্চশিক্ষিত, জ্ঞানগরিষ্ঠ, নেতৃস্থানীয় মহাশয়গণের বাক্যে অসংযম, কার্য্যে অসংযম, লেখায় অসংযম যে কি নিদারুণ ভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাই আমরা ভাবিতেছি। ইহারই নাম যদি সভ্যতা হয়, ইহাই যদি উচ্চ আদর্শ হয়, তাহা হইলে সে সভ্যতা, সে আদর্শকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিতেছি; এবং সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, "মা দুর্গে, এই আদর্শস্থানীয় নেতৃগণের হস্ত হইতে বাঙ্গালী জনসাধারণকে রক্ষা কর মা!"

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কাঙ্গাল হরিনাথের গানই

আমাদের মনে পড়ে। তিনি প্রাণের বেদনায় অধীর হইয়া একদিন গাহিয়াছিলেন—

"এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্যসন্তান ?
ও যার, তপোবলে, যোগবলে কাঁপিত দেবতার প্রাণ।
যার শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান,
করেছিল পৃথিবীর একদিন চক্ষুদান ;
যার বিদ্যাবলে আকাশতলে, চলে যেত পুষ্পযান।
কাঙ্গাল বলে বিদ্যাবল, দেহবল, কল-কৌশল,
ধর্ম্মবল বিনে রে ভাই ! সকলই বিফল ;
সেই ধর্ম্ম বিনে, দিনে দিনে, সকল হারায়ে শ্মশান। (ভারত)"

—–·–

এইবার অন্য একটী কথা বলিব। পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন গুড্‌ফ্রাইডের অবকাশ-সময়ে হইত ; মধ্যে বড়দিনের সময়ও অধিবেশন হইয়াছিল। এবারের অধিবেশন ঢাকায় হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে ; এবং ধাকিপুরে অধিবেশন হয়, তখন অনেকেই শুনিয়াছিলেন যে, ঢাকাতেও বড়দিনের সময়ই বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। কিন্তু যে প্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে বড়দিনে যে সম্মেলন হইবে না, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এখন পর্য্যন্ত সম্মেলন সম্বন্ধে কোন কথাই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। বড়দিনে না হইয়া ছোটদিনেই যদি সম্মেলন হয়, তাহা হইলেও এখন হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই কন্‌গ্রেসের গোলে সাহিত্য-সম্মেলনের কথা চাপা পড়িয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ প্রকার চাপা-পড়া ত কোন প্রকারেই বাঞ্ছনীয় নহে। পূর্ব্ব-বঙ্গের প্রধান নগর বা রাজধানী ঢাকায় সম্মেলন হইবে ; ঢাকা সহরে বা ঢাকা জেলায় একনিষ্ঠ কর্ম্মীর অভাব নাই ; আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে খ্যাতনামা অনেক মহাশয় পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিবাসী ; সাহিত্য পরিষদের বর্ত্তমান কর্ণধার আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের গৌরবস্থানীয় ; অক্লান্তকর্ম্মী সুকবি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী ; এই প্রকার আরও অনেকের নাম করিতে পারি। ঢাকার সকল সৎকার্য্যের অগ্রণী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয় এখনও সর্ব্বপ্রযত্নে সকল কার্য্যে যোগদান করিয়া থাকেন ; এতদ্ব্যতীত প্রথিত-যশাঃ সাহিত্যসেবীর অভাব ঢাকায় নাই। অথচ আগামী সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের কোন ব্যবস্থা, কোন আয়োজন এখন পর্য্যন্তও হইল না ; এমন কি, একটা অভ্যর্থনা-সমিতিও গঠিত হয় নাই,—সভাপতি নির্ব্বাচন ত দূরের কথা। আমাদের অনুরোধ, বড়দিনেই অধিবেশন হউক বা ছোটদিনেই হউক, এখন হইতেই তাহার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে হইবে ; এই পূজার ছুটীর মধ্যেই যাহাতে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয় এবং প্রধান সভাপতি ও শাখা সভাপতিগণের নির্ব্বাচন শেষ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

———

আমরা প্রতি-বৎসরই সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনের পূর্ব্বে প্রধান সভাপতি ও শাখা সভাপতিগণের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদের মত গৃহীত হউক বা না হউক, আমরা বিগত কয়েক বৎসর হইতেই আমাদের কথা বলিয়া আসিতেছি। এবারও আমরা আমাদের মত প্রকাশ করিতেছি। আমরা বলি কি, এবারে প্রধান সভাপতি ও সাহিত্য-শাখার সভাপতি পদে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে বরণ করা হউক ; তিনি অস্বীকার করিলে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে উক্ত আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হউক। ইতিহাস শাখায় শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়কে সভাপতি করা হউক ; তিনি অস্বীকার করিলে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি করা হউক। দর্শন-শাখায় শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার বেদান্ত-বাচস্পতি মহাশয়কে সভাপতি করা হউক। বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ত পূর্ব্বেই নির্ব্বাচিত হইয়া রহিয়াছেন। ভরসা করি, বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীরা আমাদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ]

হিন্দী

১। সরস্বতী, আগষ্ট ১৯১৭

"প্রাচীন ভারতবর্ষ মেঁ সিলে হুয়ে কপড়ে"—লেখক শ্রীহরিরামচন্দ্র দিবেকর। প্রশ্ন এই, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ সেলাই-করা বস্ত্র পরিধান করিতেন, না, শুধু ধুতি ও চাদর দ্বারাই শরীর আবৃত করিয়া রাখিতেন?

প্রশ্নটি অতি সহজ; কিন্তু এই প্রমাণ-যুগে ইহার উত্তর দেওয়া একটু কঠিন। কেহ-কেহ বলেন, মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে এখানে সেলাই-করা পোষাকের ব্যবহার ছিল না। অপর পক্ষ এ কথা না মানিলেও, ইহা স্বীকার করেন যে—"The art of sewing is of Semitic origin"—সীবন-শিল্প সেমিটিক জাতির মধ্যেই প্রথম সূচিত হয়। এ সম্বন্ধে দু এক কথা বলিতে চাই।

কালিদাস প্রভৃতি সংস্কৃত কবির গ্রন্থ হইতে কোনও প্রমাণ উদ্ধৃত করিব না; কারণ, এই সকল কবির সময় এখনও নিশ্চিতরূপে নিরূপিত হয় নাই। অনেক সংস্কৃত কবির সময় আবার মুসলমান-আগমনের পর নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এইজন্য স্মৃতি ও পুরাণ হইতে দু-একটি প্রমাণ উদাহরণ-স্বরূপ দিব। পুরাণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ সত্ত্বেও, সব পুরাণই যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের তাহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে "বেশ" শব্দ পোষাক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে যখন অক্রূর কংসের আদেশে গোপগণ সহিত শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া চলিয়াছেন, সেই সময় পথে এক রজকের নিকট হইতে শ্রীকৃষ্ণ রাজ-বস্ত্র কাড়িয়া লন। ভাগবত-কার বলেন, সেই সময় তথায় একজন "বায়ক" উপস্থিত হইল। সে কৃষ্ণ-বলরামের বেশ-কল্পনা করে—

ততস্তু বায়কঃ প্রীতস্তয়োর্বেষমকল্পয়ৎ।
বিচিত্রবর্ণৈঃ শৈলৈয়রাকল্পৈরনুরূপতঃ॥

এই শ্লোকে "বায়ক" শব্দের অর্থ দর্জ্জী ব্যতীত আর কি হইতে পারে? অতএব সে সময় লোকে সেলাই-করা বস্ত্র পরিধান করিত।

মহাভারতে দুর্য্যোধনের উক্তি ত প্রসিদ্ধ—

যাবদ্ধি সূচ্যাস্তীক্ষ্ণায়া বিধ্যেদগ্রেণ মারিষ।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবানপ্রতি॥

যদি সে সময় সীবন-শিল্প ছিল না, তবে সূচের প্রয়োজন হইত কেন? সুশ্রুতে পাওয়া যায়—"সীব্যেৎসূক্ষ্মেণ-সূত্রেণ।"

অন্য ভাবে দেখিলে মনে হয়, মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক ভারতে এই সীবন-শিল্পের প্রথম প্রবর্ত্তন হইতে পারে না। Necessity is the mother of invention যদি হয়, তবে শীতপ্রধান দেশের অধিবাসিগণই সেলাই-করা পোষাক প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। মক্কা ও মদিনার প্রান্তবাসী গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসীদের পূর্ব্বে হিমালয়বাসিগণের দ্বারাই সেলাই-বিদ্যার প্রবর্ত্তন হওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

পুরাণ হইতে প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থও দেখুন। মনুর চতুর্থ অধ্যায়ে বর্জ্যান্নপ্রকরণ আছে। তাহাতে, কোন্-কোন্ জাতির অন্ন অখাদ্য—লিখিতে গিয়া মনু বলেন—"শৈলূষতন্তুবায়ান্নং কৃতঘ্নস্যান্নমেবচ"। কুল্লুকভট্ট "তুন্নবায়ঃ সৌচিকঃ" লিখিয়াছেন। অর্থাৎ সূচীদ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করে যাহারা, তাহারা সৌচিক। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তিন প্রকার সূচের বর্ণনা আছে—

ত্রয়ঃ সূচ্যো ভবন্তি। অয়স্ময্যো রজতো হরিণ্যঃ।

জৈমিনীয়োপনিষদ্ ব্রাহ্মণে আছে যে, একটি ঋষির শরীরে শামূল অর্থাৎ পশমী-জামা ছিল। ঋগ্বেদের দ্বিতীয়াষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে আছে—

"সীব্যত্বপঃ সূচ্যা চ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থম্।" সায়নাচার্য্য ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"যথা বস্ত্রাদিক সূচ্যা স্যূতং চিরং তিষ্ঠতি এবমিদং কর্ম্মোতু।"

"খিলৌনে"—লেখক নারায়ণপ্রসাদ অরোড়া, বি-এ।

ভারতবর্ষে যত মেলা হয়, তাহার একটি প্রধান অঙ্গ হইতেছে, খেলনার দোকান। প্রত্যেক গ্রামে, অথবা কয়েকটা সম্মিলিত গ্রামে, প্রতি বৎসর একটি-না-একটি মেলা অথবা আড়ং হয়। তথায় নানারূপ লোক একত্র হয়। যে কাজ আজকাল প্রদর্শনী দ্বারা হয়, সেই কাজ পূর্ব্বে মেলা ও হাট দ্বারা সম্পাদিত হইত।

এই সকল মেলায় বিস্তর ক্রীড়নক বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। উহা প্রায়ই মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। কাঠ, লোহা ও পিতলের খেলনাও পাওয়া যায়। প্রায় খেলনাই বিশ্রী ও কদর্য্য হয়, শিল্প হিসাবে তাহার মূল্য কিছুই থাকে না। উত্তম কারিগরির খেলনা যাহা পাওয়া যায়, তাহার সৌন্দর্য্য হইতে মূল্য অধিক। সাধারণ লোকেই খেলনা প্রস্তুত করে। বিভিন্ন পেশার লোক অবসর সময়টাতে কিছু উপার্জ্জন করিবার জন্য খেলনা প্রস্তুত করে। আজকাল অবশ্য পাশ্চাত্যের দেখাদেখি অনেকে খেলনা প্রস্তুত করার পেশা গ্রহণ করিয়াছে। এখন অনেক স্থানে কলে খেলনা প্রস্তুত হয়। তবে এই ব্যাপারটা যে বৃহৎ বাণিজ্যের অংশ হইতে পারে, তাহা লোকে এখনও জানে না। আমাদের দেশের কোন কোনও স্থানে সুন্দর

খেলনা প্রস্তুত হয়। জয়পুরের প্রস্তরের সামগ্রী, কাশীর পিত্তলের খেলনা এবং চুনারের মৃত্তিকার খেলনা ও আবশ্যক জিনিস ভারতে প্রসিদ্ধ। বিদেশীয়েরা এই সকল জিনিস সাদরে ক্রয় করিয়া স্বদেশে লইয়া যান। এ সকল জিনিস ভারতবর্ষের বাহিরে যে বিশেষরূপে আদরণীয় হইতে পারে এবং ব্যবসায় হিসাবে খুব লাভের হইতে পারে, আমাদের দেশবাসীরা এখনও তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষে বিদেশী খেলনার আমদানী আরম্ভ হয়। তৎপুর্ব্বে চীন হইতে খেলনা আসিত। জার্ম্মাণী খেলনা প্রস্তুত করিতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অগ্রগামী। আমাদের দেশের মতই জার্ম্মাণীতে ও জাপানে খেলনা নির্ম্মাণ Cottage Industry (গ্রাম্য শিল্প) বলিয়া পরিচিত। জার্ম্মাণীতে প্রতি বৎসর সাড়ে সাত কোটী টাকার খেলনা প্রস্তুত হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্যও এ বিষয়ে খুব উন্নত। এই সব দেশে অন্যান্য শিল্পের ছাঁটা বকেয়া মালগুলি (by-products) খেলনা প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে খেলনা নির্ম্মাণের বেশ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র আছে। এই শিল্পটির উন্নতি করিতে পারিলে ভাল একটি ব্যবসায় সংগঠিত হইতে পারে। আর দেশের তৈয়ারী খেলনা ব্যবহার কালে আমাদের ছেলেরাও আত্মসম্মানের গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে।

১ চিত্রময় জগৎ, জুলাই ১৯১৭

"প্রজাত্ব"—লেখক শ্রীযুক্ত গোপাল নরসিং চৌধুরী

যদি কোনও জাতি উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করে, তবে তাহাদের মধ্যে প্রজাত্বের গৌরব উদ্বোধিত করিতে হইবে। প্রজাত্বের অভিমানহীন যে সকল জাতি এখন পৃথিবীতে আছে, ভারতের প্রজাপুঞ্জ তাহার মধ্যে অন্যতম। আফ্রিকার জঙ্গলের অধিবাসিগণ যদি প্রজাত্বের দাবী না করে, প্রজাত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট না হয়, তবে আমরা তাহাদের দোষ দিতে পারি না, বিদ্রূপ করিতে পারি না, ঘৃণাও করিতে পারি না। কারণ তাহারা স্ব কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞান।

কিন্তু প্রাচীনতম সভ্যতার উত্তরাধিকারী, আভিজাত্যের গৌরবকারী ভারতবাসী যখন প্রজাত্ব ভুলিয়া নিকৃষ্ট ইতরজনযোগ্য আচরণ করে, তখন শুধু আমরা কেন, বিদেশের মহানুভব ব্যক্তিগণও খেদ করেন —এ কি হইল?

এখানে আমরা "প্রজাত্ব" nationalityর অর্থে প্রয়োগ করিতেছি। একটি জাতির মধ্যে যতই কেন বিদ্যা ও জ্ঞানের অনুশীলন হউক না, বিজ্ঞানে সে জাতি যতই কেন উন্নত হউক না, নীতিতে সে জাতি যতই কেন শ্রেষ্ঠ হউক না,—প্রজাত্বের অনুভূতি যদি তাহাদের মধ্যে উন্মেষিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে জাতীয়তার দিক্ হইতে তাহার বিদ্যা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও নীতির কোনই সার্থকতা নাই। সে জাতির ভাগ্য—পরপদদলিত, পরান্নসেবী হইয়া থাকা ও সভ্যজাতির দ্বারা ঘৃণিত ও অপমানিত হওয়া।

পথে বাহির হইলে বাধা পাওয়াটাই হইতেছে স্বাভাবিক। কিন্তু বাধা পাইয়া নিজের অগ্রসর হওয়ার যোগ্যতায় সন্দিহান হইয়া থাকাটাই হইতেছে অস্বাভাবিক এবং মূঢ়তার পরিচায়ক। বাধা লোকে দিবে, পরিহাস লোকে করিবেই,—কিন্তু নিজের ক্ষমতায় ও অধিকারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চলিতে হইবে।

জাতীয়তার কর্ম্মক্ষেত্রে নিকৃষ্টতা ও উৎকৃষ্টতার প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কারণ সেখানে সকলেরই সমান অধিকার। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে হারিয়া যাইবে, তাহাকেই অপদস্থ হইতে হইবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার পুর্ব্বে কেহ বলিতে পারে না,—কে উৎকৃষ্ট, কে অপকৃষ্ট।

"রিয়াসত সোণ্ডুর মেঁ বাঘ কা তিসরা শীকার" সোণ্ডুরাজ্যের রাণী শ্রীযুক্তা তারারাজা ঘোরপড়ের অত্যন্ত শিকারের সখ আছে। শিকারকার্য্যে ইনি বিশেষ দক্ষতাও দেখাইয়াছেন।

১৯১৫ সালে তিনমাসের মধ্যে ইনি দুইটা ব্যাঘ্র শিকার করেন। এ বৎসরও সোণ্ডুর হইতে তিন মাইল দূরে তারন্মা জঙ্গলে একটি সাত ফিট ২ ইঞ্চি দীর্ঘ ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। জুলাই মাসে এই জঙ্গলে একটি ব্যাঘ্র অত্যন্ত উৎপাত করিতেছিল। একদিন ফরেষ্ট অফিসার পোল সাহেব খবর দিলেন যে, ব্যাঘটি একটি বলদ নিহত করিয়াছে। সংবাদ পাইবামাত্র দু-একজন লোক সঙ্গে লইয়া রাণী সাহেবা তথায় যাত্রা করেন। রাজা সাহেব তখন আফিসের কাজকর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন, তিনি খবরই পান নাই। অন্ধকার রাত্রিতে মাচানের উপর গিয়া রাণী সাহেবা শার্দ্দূল-প্রবরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেড় ঘণ্টা পরে নিহত বলদ ভক্ষণ করিবার জন্য ব্যাঘ্র তথায় উপস্থিত হইলে রাণীসাহেবার গুলিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। রাণীসাহেবা অক্কলকোটের স্বর্গীয় রাজা শহাজী ভোঁসলার তৃতীয়া কন্যা। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইঁহার জন্ম হয়। এখন ইঁহার বয়স মাত্র একুশ বৎসর।

ভারত-মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি—

পুণার মহিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত মহিলা পাঠশালায় (কলেজে) গত বৎসর হইতে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী খোলা হইয়াছে। বোম্বাই ইউনিভার্সিটির প্রিভিয়াস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দুইজন মহিলা কলেজে নিযুক্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে এখন ছয় জন বিদ্যার্থিনী আছেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে মহিলাবিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ আট জন মহিলা আছেন। তদ্ব্যতীত বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পাশ দুইজন ছাত্রী আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছেন।

মারাঠা ও কেশরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেলকরের কন্যা শ্রীমতী কমলাবাই দেশপাণ্ডে বোম্বাই হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এখানে ভর্ত্তি হইয়াছেন। ইনি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত লোকোপযোগী এবং গৃহোপযোগী পাঠ্যক্রম পুর্ণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া রাষ্ট্রীয় শিক্ষাসংস্থানকে নিজ আদর্শ দ্বারা সাহায্য করার এই ব্রত অনুকরণযোগ্য ও অভিনন্দনীয়, সন্দেহ নাই।

প্রাথমিক ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপিকা গঠন করাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য। অনাথা বালিকাশ্রম-মণ্ডলী এই উদ্দেশ্য পুর্ণ করিবার ব্যবস্থা এবার করিয়াছেন। ভারতমহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি ট্রেনিং স্কুল বা অধ্যাপিকা পাঠশালা

হিঙ্গণে খোলা হইয়াছে। এই বিভালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ১৩ জন মহিলা ভর্ত্তি হইয়াছেন। এই বিভালয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছেন শ্রীযুক্ত টিপণুনকর।

শ্রীযুক্ত কর্বে মহাশয় বৃদ্ধ বয়সে এই অনুষ্ঠানের জন্য অর্থ-সংগ্রহের ভার লইয়াছেন। নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া এ পর্য্যন্ত ৭০,০০০৲ টাকার অঙ্গীকার পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে ৩৮,০০০৲ টাকা নগদ আদায় হইয়াছে। গত বৎসর নয় হাজার টাকা বার্ষিক চাঁদা রূপে পাওয়া গিয়াছিল। পরিচালকগণ স্থির করিয়াছেন যে, আপাততঃ বার্ষিক চাঁদা দ্বারাই খরচ চালান হইবে। অন্য ভাবে যে টাকা আসিবে, তাহা দ্বারা একটি স্থায়ী ফণ্ড খুলিতে হইবে।

এরূপ একটি কল্যাণকর অনুষ্ঠানে সকলেরই সহানুভূতি থাকা উচিত। গত বৎসর প্রায় ১৩২৪ জনের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের লোকই ইহার মধ্যে ছিলেন। পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী এই সিণ্ডিকেটের একতম সদস্যা।

দেশের লোকের চেষ্টায়, দেশের লোকের টাকায় মেয়েদের শিক্ষা দিবার জন্য এইরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ভাষার প্রভেদানুযায়ী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় খোলা উচিত। মহারাষ্ট্র এ বিষয়ে পথ দেখাইয়াছেন; অন্যান্য প্রান্তের মহারাষ্ট্রের অনুসরণ করা উচিত। এই কার্য্যে যাহার যাহা সম্বল, তাহা দ্বারাই সাহায্য করা কর্ত্তব্য। ধনী অর্থ দিন, বিদ্বান জ্ঞান দিন ও সাধারণে সহানুভূতি দিন। এরূপ একটি বৃহৎ ও দেশের সত্য-কল্যাণকর কার্য্যে কাহারও কার্পণ্য করা উচিত নয়, নিশ্চেষ্ট থাকাও যুক্তিসঙ্গত নয়।

আর্টে দুর্গামূর্ত্তি

[শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি-এস্‌সি]

দুর্গাপূজা বহুকাল হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত পূজা। ধর্ম্মচর্চ্চা সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা পূজাপ্রচলনের কালনির্ণয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা নাই, ক্ষমতাও নাই। কিন্তু আর্ট হিসাবে একটা কথা মনে হয় এই যে, দুর্গামূর্ত্তি আমাদের বঙ্গদেশের কলাবিদ্যার একটা মনোরম দৃষ্টান্ত। মনোরমত্বটা বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশের এই জন্য যে, অপরাপর প্রদেশের দুর্গামূর্ত্তিতে লালিত্য বা শিল্পচাতুর্য্যের অভাবই পরিলক্ষিত হয়।

দুর্গামূর্ত্তিতে একটা রূপকের বিকাশ করা হইয়াছে; সেটি মানবের সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাবের সংগ্রাম। সংগ্রামের প্রবল বিপ্লব ও ঝঞ্ঝা, দেব ও অসুর ভাবের দ্বন্দ্বে প্রথমে তমসার ক্ষণিক জয় ও প্রভাব, পরিশেষে মানবের অন্তস্তল নিহিত দেবভাবের দ্বারা তাহার নিধন,—এ অতি সুন্দর চিত্র; সুকবির হস্তে সুরঞ্জিত হইয়া সুললিত কাব্যে পরিণত হইয়াছে; বাঙ্গলা ভাষাকে একখানি সুশোভন অলঙ্কার পরাইয়াছে। কিন্তু মূর্ত্তিগঠয়িতা শিল্পী সংগ্রাম বর্ণনা করেন নাই; প্রলয় হইতে এক ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ধরিয়া ফেলিয়া, একটী অপূর্ব্ব মাধুরীময়ী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। শিল্পী সংগ্রামের শেষমুহূর্ত্তই চিত্রিত করিয়াছেন; ইহাই "আর্টে"র অভাবনীয় শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত। চিত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা, ও তদনুযায়ী শিল্পে কখনও কবিতার ন্যায় ঘটনাপরম্পরার সংঘটন ব্যক্ত করা যায় না। কারণ কবিতা গমনশীল; পড়িবার সময় পাঠক সমস্ত ক্ষণই নূতন ভাষা, ভাব ও ছন্দের বলে গতিশীল বিষয়ের বর্ণনা বেশ স্পষ্টভাবেই দেখিতে পান; কিন্তু চিত্র বা ভাস্কর-বিদ্যা স্থায়ী; সমস্ত বর্ণনাটী এককালে দেখিতে হয়। সুতরাং স্থায়ীভাব বর্ণনাই এ সকল শিল্পের উপযুক্ত বিষয়; এবং যাহাতে এই চিরস্থায়ী ভাববিকাশটী কালক্রমে অভিনবত্বহীন, অতিপুরাতন, হেয় না হইয়া পড়ে, সে জন্য চিত্রটী পুরাপুরি সম্পূর্ণ না করিয়া দর্শকের কল্পনার জন্য একটা ফাঁক রাখিয়া যাইতে হয়। সেজন্য এই সকল শিল্পে সমস্ত ঘটনাকালের মধ্য হইতে এরূপ একটা মুহূর্ত্ত বাছিয়া লইতে হয়, যেটীতে সমুদয় ভাবের শ্রেষ্ঠ ভাবটীই ব্যক্ত হয়। এখানে, এই শেষ মুহূর্ত্তে মানবের শ্রেষ্ঠ জয়, তমসা দূর করিয়া সত্ত্বগুণের প্রভাব, তাহাই বিবৃত হইয়াছে; শিল্পী তাহাই গঠিত মূর্ত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অতি উচ্চ কলাবিদ্যার পরিচয় প্রদান করে।

আর্টে যাহাকে কুৎসিত বলে, সে জিনিসটী কখনই মনোরম হইতে পারে না, চক্ষুকে তৃপ্তিদান করে না,—সে বাস্তবেই হউক, চিত্রেই হউক, আর ভাস্কর্য্যেই হউক। বাস্তবে কুৎসিত অপ্রীতিকর; শিল্পে, কলায় ততোধিক। বাস্তবে অপরাপর বহুবিধ আনুষঙ্গিক গুণে কুৎসিতের

কুৎসিতত্ব তার হ্রাস পাইতে পারে, কিন্তু চিত্রে বা মূর্ত্তিতে তাহা হয় না। কারণ চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে বহু আনুষঙ্গিক ভাবের বা ঘটনার একত্র সমাবেশ অসম্ভব। ফলে কুৎসিতের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ দর্শনে ক্ষণিক বিস্ময় উৎপন্ন হয়, কিন্তু প্রীতি জন্মে না; সে বিস্ময়ও স্থায়ী নহে, নূতনত্ব চলিয়া গেলে, শুধু কুৎসিতই পড়িয়া থাকে, অপ্রীতিই থাকে। শিল্পী এই মূর্ত্তি-রচনায় একটি অপ্রীতিজনক ঘটনার সাহায্যে ভাবের বিকাশ করিয়াছেন; যে ঘটনাটিকে, আর্টের হিসাবে কুৎসিত বলা চলে। কিন্তু এই স্থলে, শিল্পীর এরূপ অসাধারণ কলাকৌশল, যে, ভাব সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তথাপি কুৎসিততা নাই। দেবীর সংহারমূর্ত্তি আছে, সংহারের ভাব বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু তীব্র ভ্রূকুঞ্চন বা রোষের মুখ-বিকৃতি নাই। তামসিক অসুর-মূর্ত্তি রহিয়াছে, কিন্তু সে মরণযাতনাক্লিষ্ট ভয়াবহ মূর্ত্তি নহে। মরণচ্ছায়ায় কাতর না হইয়া, জড়দেহবলে শেষ নিষ্ফল জয়চেষ্টা।

এই প্রসঙ্গ লইয়া রচিত কাব্যে সংহারমূর্ত্তি পূর্ণবর্ণনার সহিতই ব্যক্ত করা হইয়াছে। মরণ-যাতনারও বর্ণনা আছে। কিন্তু কাব্যে সে বর্ণনা প্রয়োজন, কারণ তাহা না হইলে ভাবের অভিব্যক্তি হয় না। কবিতার শব্দ দ্বারা চক্ষুর সম্মুখে এক সময়ে সম্পূর্ণ চিত্রটী উপস্থিত হয় না, কারণ একটির অধিক ভাব বর্ণনা একটি শব্দদ্বারা ঘটে না। সুতরাং সমস্ত কুৎসিতটা কবিতায় বহুশব্দে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং তাহার ফলে কুৎসিতটাও বহু পরিমাণে হ্রাস পায়; সুতরাং অপ্রীতি জন্মে না। দ্বিতীয়তঃ, কবিতায় কল্পনাকে শব্দ হইতে ছবিটী আঁকিয়া লইতে হয়। সুতরাং কল্পনার খানিকটা স্বাধীনতা থাকে ও প্রতিবারই মানসে নূতন প্রতিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেজন্যই কঠোর একটী ভাব-বিকাশের পরিবর্ত্তে স্বাভাবিক "আর্ট"-জ্ঞানী আমাদের শিল্পী দেবীমূর্ত্তির আননে ঈষৎ বিষাদ-রোষ-করুণা মাখাইয়াছেন। সে রোষে আমরা অন্যায়ের প্রতি ন্যায়ের বিরাগ দেখি, সে করুণায় অজ্ঞানতা দর্শনে জ্ঞানীর করুণা প্রকাশ হয়, সে বিষাদে আমরা সংসার মাত্রেই মানব-দেব-হৃদয়ের বেদনা বোধ করি। ভাবের এ মনোরম বিকাশ যে অজানা শিল্পী করিয়া গিয়াছেন, যাঁহার অনুকরণে রচিত মূর্ত্তিই এত সুন্দর, আর্টের জগতে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ।

মূর্ত্তির দেহগঠনে, শিল্পীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পরিমাণের পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে আপত্তি করা যাইতে পারে যে, শিল্পী অনবধানতা বশতঃ বা অন্ধের ন্যায় কাব্য-বর্ণিত উপমায় অনুকরণ করিয়া দেবীমূর্ত্তির চক্ষু দুইটি অতিশয় আয়ত করিয়াছেন; সেরূপ চক্ষু স্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাহাতে কি ভাববিকাশের ব্যাঘাত হইয়াছে? আমার বোধ হয় বরং এ আপাতঃ-দৃষ্ট দোষ শিল্পীর স্বেচ্ছাকৃত ও কলা-কৌশলেরই পরিচায়ক। দেবীমূর্ত্তির অক্ষিযুগল সাধারণ মানবের ন্যায় করিলে বিশেষত্ব থাকিত না, দেবভাবের বিভিন্নতা প্রকাশ হইত না; কিন্তু চক্ষু দুইটী একটু অধিক দীর্ঘ করায় মূর্ত্তি-দর্শনে আমাদের মনে একটা অমানুষিক ভাব জাগিয়া উঠে। কোনরূপ সৌন্দর্য্য নাশ হয় নাই, পরন্তু ভাব-প্রস্ফুটন অধিকতর রমণীয়ই হইয়াছে। এ কৌশলের উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখাইতে পারি, প্রসিদ্ধ গ্রীক্-শিল্পী, দেব ও মানবের বিশেষত্ব সাধনের নিমিত্ত বিখ্যাত এপলো (Apollo) দেবমূর্ত্তির (এক্ষণে রোমে আছে) পদদ্বয় ও জঙ্ঘাযুগল অমানুষভাবে দীর্ঘ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারই রচিত মানব এণ্টিনুসের (Antinous) মূর্ত্তির অবয়বাদির পরিমাণের পরস্পর সম্বন্ধ অতি সুরক্ষিত হইয়াছে। পরিশেষে শিল্পীর বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ আনা যাইতে পারে যে, তিনি কবির রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন; তিনি রূপক বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য সে কথা সত্য; এ দোষ শিল্পীর আছে। কিন্তু সে সমালোচনা এ ভাবুক শিল্পীর উপর ভাল করিয়া চলে না। যাঁহারা স্বজাত শিল্পী না হইয়াও, চিত্র ও ভাস্কর্য্যের ভাব-বিকাশ ক্ষমতা জানিয়াও বহুবিধ সাধারণ রূপক চিত্রিত করিয়া থাকেন, তাঁহারাই এ ভর্ৎসনার যোগ্য পাত্র। তাঁহাদের হস্তেই ভাবময়ী কলাবিদ্যা ভাবহীন না হউক স্বল্পভাব-প্রবণ বর্ণবিকাশ-চাতুর্য্যে পরিণত হইয়া থাকে।

শোক-সংবাদ

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার

'ভারতবর্ষে'র শেষ ফর্ম্মা যখন ছাপা আরম্ভ হইয়াছে, তখন সংবাদ পাইলাম, বাঙ্গালা-সাহিত্যের বৃদ্ধ সেবক, সাহিত্যরথী আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আর ইহজগতে নাই। এতদিনে সত্যসত্যই আমাদের একজন অকৃত্রিম অভিভাবক, একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবক চলিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের নিকট বাঙ্গালা-সাহিত্য চিরঋণী। সে কথা পরে বলিব, আজ শুধু তাঁহার পরলোকগমন সংবাদই আমরা সাশ্রুনয়নে দিতেছি। ভগবান শোকসন্তপ্ত পরিবারের গভীর শোকে সান্ত্বনা দান করুন।

সাহিত্য-সংবাদ

হরিসাধনবাবুর নবরচিত উপন্যাস "মরণের পরে" প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "মধুপর্ক" আট আনা সংস্করণ গ্রন্থাবলী ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত "সেখ আন্দু" প্রকাশিত হইল। মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "অভিনয়-শিক্ষা" প্রকাশিত হইল; মূল্য ২৲।

অধ্যাপক সমাদ্দারের "সমসাময়িক ভারতে"র একবিংশ খণ্ড মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত জ্ঞানগর্ভ ভূমিকাসহ প্রকাশিত হইল; মূল্য ৪৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত "নাবিক-বধূ" প্রকাশিত হইল; দর্শনী বার আনা।

শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী প্রণীত "ভক্ততীর্থ" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১॥০ টাকা।

নাটোরাধিপতি মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "নূরজাহান" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পথ নির্দ্দেশ" বাহির হইল; পাথেয় দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ নাগের "সতী" উপন্যাস বাহির হইয়াছে; মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত "দ্বিজেন্দ্রলাল" প্রকাশিত হইয়াছে; দক্ষিণা আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের "মাতৃমঙ্গল" ও "বিধির মিলন" প্রকাশিত হইয়াছে; প্রথমখানির মূল্য বার আনা ও দ্বিতীয়খানির পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পালের "বঙ্গবালা" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "ইন্দুমতী" প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত কুলদারঞ্জন রায়ের 'ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য আট আনা।

শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন প্রণীত "দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ও বিলাতী কাপড়ে বাঁধাই; মূল্য বার আনা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane, CALCUTTA.

অগ্রহায়ণ, ১৩২৪

প্রথম খণ্ড] পঞ্চম বর্ষ [ষষ্ঠ সংখ্যা

কালিদাস

[শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, এম এ, বি-এল]

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, "A poet is born, not made" অর্থাৎ যিনি প্রকৃত কবি, তিনি কবিত্ব প্রতিভা লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন ;—প্রকৃত কবিত্বশক্তি শুধু মানব-চেষ্টায় অর্জ্জিত হয় না, বা শত মানব চেষ্টায় তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে না। কবির প্রতিভা ভগবদ্দত্ত—আপনা হইতেই সেই প্রতিভার বিকাশ হয়, সেই প্রতিভা শত চেষ্টায় কেহ অর্জ্জন বা উৎপাদন করিতে পারে না। এক কথায় "গড়িয়া পিটিয়া" কবি করিয়া তোলা যায় না।

বড়-বড় কবির হৃদয় এই স্বতঃনিঃসৃত প্রতিভায় পরিপূর্ণ থাকে। এই স্বতঃ-প্রকাশিত প্রতিভা কবির হৃদয়কে আলোড়িত ও উদ্বেলিত করে ; এবং ইহার ফলে কবির মুখ বা লেখনী হইতে সঙ্গীতময় কবিত্বের ধারা নিঃসৃত হইতে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে, যিনি যত বড় প্রতিভান্বিত কবি, তাঁহার কবিতা বা কাব্য ততই এই অপার্থিব দৈব-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ। সেই সকল প্রতিভান্বিত কবির কবিতা বা কাব্য একটি অমৃতময়, চিরস্থায়ী, চিরব্যাপী সুর। পক্ষান্তরে, যাহাদের এই কবিত্ব-প্রতিভা নাই, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া ছন্দোবদ্ধ শব্দ সমষ্টি রচনা করিতে পারেন বটে, তাঁহারা নিপুণভাবে শব্দ প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় পাণ্ডিত্যের বিকাশ করিতে পারেন বটে, তাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্র ও শব্দ-শাস্ত্র মন্থন করতঃ ছন্দের ও অলঙ্কারের এবং শব্দাড়ম্বরের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কাব্যে বা কবিতায় সেই অমৃতময়, অপার্থিব, দৈব, চিরস্থায়ী, চিরব্যাপী সুর ও রাগের অভাব দৃষ্ট হয়। যে কবির কাব্যে বা কবিতায় ঐরূপ সুর রাগিণী সংযোগ দেখা যায়, সেইরূপ কবি যুগ-যুগান্তর প্রবর্ত্তক এবং সেইরূপ কবি যুগ-যুগান্তরের ও দেশ বিদেশের কবি। তাঁহার কাব্যের "ছাপ" চিরকাল বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এইরূপ কবি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রাদুর্ভূত হন না। পক্ষান্তরে, যে কবির কবিতায় বা কাব্যে ঐরূপ সুর রাগিণী সংযোগ দেখা যায় না,—যে কবির কবিতা বা কাব্য আয়াস-সাধ্য—সেইরূপ কবি যুগ-যুগান্তর-প্রবর্ত্তক কখনই হইতে পারেন না। এইরূপ শেষোক্ত কবি যখন-তখন প্রাদুর্ভূত হইতে পারেন, এবং স্বীয় লেখনী দ্বারা মাসিকপত্র বা সংবাদ-পত্র বা ছাপাখানা "ছাইয়া"

ফেলিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতা বা কাব্যের "ছাপ" বিদ্যমান থাকে না। তাঁহার কাব্য বা কবিতা জল-বুদ্বুদের ন্যায় দুইদিন পরে কোথায় বিলীন হইয়া যায়।

সত্য বটে, প্রকৃত কবিত্ব ঐশ্বরিক পদার্থ,—সত্য বটে, প্রকৃত কবি প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন,—সত্য বটে, শুধু চেষ্টা দ্বারা প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি অর্জন করা যায় না—সত্য বটে, শুধু অধ্যয়ন বা জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি লাভ করা যায় না—সত্য বটে, কবি-প্রতিভা সুর-রাগিণী-সম্বদ্ধ দৈব-সঙ্গীত—তথাপি, যাঁহার হৃদয়ে এই কবি-প্রতিভা আছে, যাঁহাকে ভগবান এই প্রতিভা দিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়ে এই দৈব—এই ঐশ্বরিক সুর-রাগিণী-সম্বদ্ধ সঙ্গীত ঝঙ্কার করিতেছে,—এক কথায়, যিনি এই কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—তিনি অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জ্জন, শিক্ষা, অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা দ্বারা হৃদয়ের এই স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি বর্দ্ধিত করিতে পারেন। প্রকৃত-কবি-হৃদয়ে যে স্বাভাবিক ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিহিত আছে, সাধনা দ্বারা সেই ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে ও বৰ্দ্ধিত হইতে পারে। যাহা কিছু মধুর ও মনোরম, যাহা কিছু সুন্দর ও মনোহর, যাহা কিছু কোমল ও কমনীয়, যাহা কিছু উন্নত ও মহান্, যাহা কিছু সুর-সমন্বিত পীযূষবৎ সঙ্গীতময়,—সে সকলই প্রকৃত কবির হৃদয়ে নিহিত থাকিলেও, সাধনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সেই নিহিত বৃত্তি-গুলির উত্তরোত্তর স্ফূরণ হয়, এবং সেই সকল বিষয় অনুভূতির ক্ষমতা ও তাহা প্রকাশের শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, ভার্জ্জিল, অভিদ, দান্তে, সেক্ষপীয়র, মিল্টন—সকলেই প্রতিভান্বিত কবি। সকলেই ঐশ্বরিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং যুগ-যুগান্তরের প্রবর্ত্তক হইয়া অনন্তকালের জন্য যশস্বী হইয়া গিয়াছেন;—সকলেই সাধনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বীয়-স্বীয় প্রতিভা-উৎপন্ন শক্তির ক্রমবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসও ঐ ঐশ্বরিক প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করতঃ অশেষ অধ্যয়ন, চেষ্টা, জ্ঞানার্জ্জন, সাধনা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা-শক্তির বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাস এত প্রতিভান্বিত ছিলেন যে, আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে লোকে সরস্বতীর "বরপুত্র" বলিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা প্রতিভার অধিক পরিচয় আর কি হইতে পারে?

কিরূপে কালিদাস তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রতিভা-শক্তির—তাঁহার ভগবদ্দত্ত কবিত্ব-শক্তির ক্রমবিকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার কোন্ কাব্য বা নাটকখানি অগ্রে লিখিত হইয়াছিল, এবং কোন্‌খানিই বা পরে রচিত হইয়াছিল—কোন্‌খানিই বা তাঁহার তরুণ বয়সের লেখা—কোন্‌খানিই বা তাঁহার পরিণত বয়সের master mind এর (শ্রেষ্ঠ মনের) রচনা—তাহারই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিষয়টী অতি দুরূহ, লেখকও সামান্য ও সাধারণ;—উপহাসাস্পদ হইবারই সম্ভাবনা। তবে মহাকবির কথায়—"তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ"—সেই মহাকবির গুণপনা স্মরণ করিয়া, নিজের অক্ষমতা সত্বেও আমি আজ "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্"। এই প্রবন্ধ সামান্য সফলতা লাভ করিলেও আমি কৃতার্থম্মন্য হইব।

"ঋতুসংহার" কাব্যখানি কালিদাসের বাল্যকালের রচনা বলিয়া মনে হয়; এবং এ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে ঐ কাব্যখানি তাঁহার বাল্য-রচনা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। "ঋতুসংহার" কাব্যখানিতে কালিদাস গ্রীষ্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ষড়ঋতুর বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যখানিতে স্থানে-স্থানে বর্ণনার সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ্য আছে। কাব্যখানি তরুণ বয়সের রচনা হইলেও, কালিদাসের লেখনী প্রসূত বলিয়া বেশ বুঝা যায়। এই কাব্যখানিই কবির কবিত্ব-প্রতিভার প্রথম অঙ্কুর। কাব্যখানিতে কবিত্বের খুব বিশেষত্ব না থাকিলেও, "অঙ্কুর" বলিয়া উহার নামোল্লেখ করিলাম।

ইহার পর কবি ক্রমে-ক্রমে প্রধানতঃ তিনখানি শ্রব্য কাব্য এবং তিনখানি দৃশ্য-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রব্য-কাব্য তিনখানির মধ্যে, আমার মনে হয়, "কুমার-সম্ভব" কাব্যই তাঁহার প্রথম বয়সের রচনা। অর্থাৎ, "ঋতুসংহার" কাব্য লিখিবার পরে, কিছুদিন সম্ভবতঃ বিশ্ব-কবি বিদ্যালয়ে "শিক্ষানবিশি" করিয়া, তৎকাল-প্রচলিত শাস্ত্রাদি পাঠ শেষ করতঃ, যৌবনের প্রারম্ভেই কালিদাস তাঁহার "কুমার-সম্ভব" মহাকাব্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। "মেঘদূত" খণ্ডকাব্যখানি তাহার পরে রচিত হয়। দৃশ্য

কাব্যগুলির মধ্যে প্রথমে "মালবিকাগ্নিমিত্র", তৎপরে "বিক্রমোর্ব্বশী" এবং সর্ব্বশেষে "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" নাটক খানি রচিত হয়।

এইরূপে, একখানি মহাকাব্য, একখানি খণ্ডকাব্য এবং তিনখানি দৃশ্যকাব্য রচনা করিবার পরে,—(এবং সম্ভবতঃ ইত্যবসরে মহাকবি আরও নানা অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, কালের কবল হইতে বোধ হয় সেগুলি রক্ষা পায় নাই)—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে নানা প্রকার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার পরে,- পরিণত বয়সে, হিমাদ্রি হইতে পূত জাহ্নবী-বারি নির্গত হইবার ন্যায়—মহাকবির লেখনী হইতে "রঘুবংশ" মহাকাব্যের অমিয়ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। "রঘুবংশ" মহাকাব্য প্রণয়ন কালে, আর কবির সে "শিক্ষানবিশি" ভাব ছিল না, আর সেই সৌন্দর্য্য বা শব্দাড়ম্বর সৃষ্টি করিবার বা রচনা-চাতুর্য্য দেখাইবার প্রয়াস ছিল না — আর কবির সে অর্জ্জিত জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা ছিল না। "রঘুবংশ" লিখিবার সময় মহাকবির লেখনী হইতে সহজ সরল ভাষায়, বিনা আয়াসে সকল সৌন্দর্য্য, সকল মনোরম ভাব—সকল উচ্চ মহান্ ভাব—সকল কবিত্ব—সকল জ্ঞানের সার আপনা হইতে সহস্র অমিয় ধারার ন্যায় নিঃসৃত হইয়াছিল। সমগ্র "রঘুবংশ" মহাকাব্যখানি কি এক দিব্য, মনোরম, স্বর্গীয়, চিরস্থায়ী, চিরব্যাপী, অমৃতময় সঙ্গীতের ঝঙ্কারে পরিপূর্ণ,—সে সুর —সে রাগিণী—সে তাল—সে লয়—যেন কাণে লাগিয়াই আছে। "রঘুবংশ" মহাকাব্যের সেই অপার্থিব সঙ্গীতের সম্মোহন সুরে পাঠকগণ যুগে-যুগে, দেশ বিদেশে মগ্ন ও বিভোর।

মহাকবি কালিদাসের শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্যগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে কি হেতু থাকিতে পারে, এক্ষণে তাহাই পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

কবির কোন্ রচনা কোন্ সময়ের, তাহা সাধারণতঃ কয়টি বিষয় হইতে জানা যায়। (১) কবি যদি তাঁহার কাব্যে তাঁহার কাব্য-রচনার সন-তারিখ দেন, বা তাঁহার রচনার অথবা গ্রন্থ কোনও স্থলে যদি ঐরূপ সময়-নির্দ্দেশক কোনও ইঙ্গিত থাকে,—তাহা হইতে গ্রন্থ-রচনার কাল জানা যায়। (২) যদি কবির কোনও আত্মীয় বা বন্ধু বা সমসাময়িক কোন ব্যক্তি ঐ বিষয়ে কোনরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহা হইতেও গ্রন্থ রচনার কাল নির্ণীত হইতে পারে। (৩) যদি কবির কোনও জীবন-চরিত-লেখক বা কোনও ঐতিহাসিক ঐ বিষয়ে কিছু লিখিয়া থাকেন, তাহা হইতেও উহা জানা যায়। (৪) যে দেশে বড় কবি প্রাদুর্ভূত হয়েন, সে দেশে তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত থাকে। উক্ত কিম্বদন্তী হইতে সময়ে-সময়ে কবির কাব্য-রচনার সময় নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। যদিচ কিম্বদন্তীমূলক সময় নির্দ্দেশের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না, তথাপি কিম্বদন্তী হইতে কবির কাব্যের সময় নির্দ্দেশক তথ্য সময়ে-সময়ে কিছু-কিছু জানা যাইতে পারে; অথবা কিম্বদন্তী সময়ে-সময়ে অন্ধকার পথে জোনাকির আলোর ন্যায় সামান্য অকিঞ্চিৎকর আলোক প্রদান করিয়া থাকে। (৫) আর, কবির লেখনী হইতে (যাহাকে ইংরাজীতে Internal evidence বলে, তাহা হইতে) অর্থাৎ কবির লিখিত ভিন্ন-ভিন্ন কাব্যের রচনা প্রণালী, ভাব-বিকাশ-প্রণালী প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্নিহিত প্রমাণাদি দ্বারা কবির কাব্যের সময় নির্দ্দেশ করা যায় ও পৌর্ব্বাপর্য্য স্থিরীকৃত হয়।

আমাদের এই ভারতবর্ষের কপালক্রমে এত বড় মহাকবি সম্বন্ধে প্রথম তিনটী প্রমাণের কোনটীই সুলভ নহে; প্রথম তিনটী প্রমাণের কোনটীই পাওয়া যায় না। সুতরাং চতুর্থ ও পঞ্চম প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে, মহাকবি কালিদাসের কোন্ কাব্যখানি প্রথমে, কোন্খানি বা পরে রচিত হইয়াছিল, তাহা দেখিতে হইবে।

প্রথমতঃ আমি কিম্বদন্তীমূলক প্রমাণের উল্লেখ করিব; এবং পরে, কিরূপে উক্ত কিম্বদন্তী মহাকবির রচিত কাব্যগুলির অন্তর্নিহিত প্রমাণাদি দ্বারা সমর্থিত বা বিনষ্ট হয়, তাহার আলোচনা করিব।

মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, তিনি কিছু লেখাপড়া জানিতেন না বলিয়া, তাঁহার নবোঢ়া বিদুষী পত্নী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করায়, তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিদ্যালাভ করতঃ রাত্রিযোগে পত্নীর আবাস-মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং পত্নীকে দ্বার খুলিতে বলেন। তাহাতে তাঁহার পত্নী রুদ্ধদ্বার কক্ষ মধ্য হইতে জিজ্ঞাসা করেন "কস্য";—কালিদাস বলেন,

"কালিদাসোঽহম্"। তদুত্তরে তাঁহার পত্নী "কিমর্থম্" জিজ্ঞাসা করিলে, কালিদাস বলেন, "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্ বিশেষঃ"। ইহা শুনিয়া তাঁহার পত্নী দ্বার খুলিয়া দেন এবং স্বামীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব উপলব্ধি করিয়া স্বামীকে "অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্ বিশেষঃ" এই তিনটী কথার এক-একটী আদিতে দিয়া তিনখানি কাব্য রচনা করিতে অনুরোধ করেন। কবি পত্নীর অনুরোধে প্রথমে "অস্তি" এই কথা লইয়া "অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা" ইত্যাদি দিয়া আরম্ভ করিয়া "কুমারসম্ভব," পরে "কশ্চিৎ কান্তাবিরহ গুরুণা" প্রভৃতি দিয়া আরম্ভ করিয়া "মেঘদূত" এবং সর্ব্বশেষে "বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ" ইত্যাদি দিয়া আরম্ভ করিয়া "রঘুবংশ" মহাকাব্য রচনা করেন। এই কিম্বদন্তী প্রথমে "কুমারসম্ভব," তৎপরে "মেঘদূত" এবং সর্ব্বশেষে "রঘুবংশ" প্রণীত হওয়ার কথা উল্লেখ করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা কিম্বদন্তীমাত্র, ইহার উপর নির্ভর করা চলে না। এই ত গেল কিম্বদন্তীমূলক প্রমাণ।

তার পর কবির নিজের লেখা কাব্যগুলি দেখা যাউক। ঐ সকল কাব্যের অন্তর্নিহিত প্রমাণ হইতে কাব্যের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে কি জানা যায়, তাহারই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে মহাকাব্যাদি প্রণয়নে আশীর্ব্বাদ বা নমস্ক্রিয়া বা বস্তুনির্দ্দেশাদি দ্বারা কাব্য আরম্ভ করিতে হয়। প্রথম বয়সে বিদ্যামন্দিরের যশোরাশি-বিভূষিত হইয়া সাধারণতঃ মানুষের প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতিই প্রথমতঃ দৃষ্টি পড়ে, এবং প্রথমেই প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া রচনা আরব্ধ হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে মানবের মন যত ভক্তিরসাপ্লুত হইতে থাকে, হৃদয়ে জ্ঞানের বিপাক হইয়া যত বিনয়ের সঞ্চার হয়,—শাস্ত্রাদির অনন্তত্ব এবং মানবের জ্ঞানের অল্পত্ব যত উপলব্ধি হইতে থাকে, মানবের হৃদয় হইতে বিদ্যামন্দিরের প্রথম পাণ্ডিত্যের ও সেই পাণ্ডিত্য-প্রদর্শনের ভাব যত তিরোহিত হইতে থাকে,—ততই গ্রন্থাদির আরম্ভে সাফল্যার্থ দেবতারাধনাদির প্রতি দৃষ্টি পড়ে। মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাদি পাঠে দেখা যায় যে "কুমারসম্ভব" কাব্যে প্রথমেই কবি প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিয়া হিমালয়ের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন। সেইরূপ "মেঘদূত" কাব্যেও কবি একেবারেই প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। "বিক্রমোর্ব্বশী," "মালবিকাগ্নিমিত্র" এবং "অভিজ্ঞান-শকুন্তল" এই তিনখানি নাটকেরই প্রারম্ভে কবি দেবদেব মহাদেবের আরাধনা করতঃ মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে কবি যখন তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য "রঘুবংশ" প্রণয়ন করেন, তখন কবি বাক্য ও অর্থের নিত্যসম্বন্ধ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন; এবং বাক্য ও অর্থের পরাকাষ্ঠা লাভ করা যে কি সুকঠিন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই "বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে"—বাক্য ও অর্থের প্রতিপত্তির জন্য, বাক্য ও অর্থের ন্যায় নিত্যসম্বন্ধ জগতের মাতাপিতা পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করিতেছেন। "রঘুবংশ" পরিণত বয়সের লেখা,—তাই "রঘুবংশে" কবি লিখিতে পারিয়াছেন, 'ক সূর্য্য প্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ। তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্!" তাই "রঘুবংশে" কবি লিখিতে পারিয়াছেন, "মন্দঃ কবিযশপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"—রঘুবংশ উচ্চ বংশ মহান্ বংশ, সন্দেহ নাই; অমর কবিও অনিপুণ হস্তে লেখনী ধারণ করেন নাই। কবিও যে সরস্বতীর বরপুত্র, আর "রঘুবংশ" লিখিবার সময় যে সে লেখনীর অবাধগতি যেন খরস্রোতা মন্দাকিনী! তবুও গ্রন্থের আরম্ভে কত বিনয়, কত নম্রভাব! সমুদায় শব্দার্ণশাস্ত্র মন্থন করিলে, সমুদায় জ্ঞানের ভাণ্ডার আয়ত্ত করিলে, সমুদায় রচনা কৌশল ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ক্ষমতা আপনা হইতে লেখনীর মুখে আসিয়া পড়িলে—বুঝি এত বিনয়, এত নম্র ভাব হৃদয়ে আসে! কৈ, দেবাদিদেব মহাদেবের পুত্র কুমারের জন্ম বিষয় ত অনুচ্চ নহে; যে উদ্দেশ্যে কুমারের উৎপত্তি, তাহাও ত অমহান্ নহে; তবে "কুমারসম্ভব" কাব্য রচনাকালে কবির লেখনীতে এত বিনয়, এত সৌজন্য, এত নম্র ভাব আসে নাই কেন? কবির "মালবিকাগ্নিমিত্র" ও "অভিজ্ঞান শকুন্তল" এই দুইখানি নাটকের পৌর্ব্বাপর্য্য আলোচনা-কালেও এইরূপ পার্থক্য দেখা যাইবে।

যে সব দেশের কবিদিগের কাব্য বা কবিতা—কোন্‌টী কোন্ সময়ে রচিত হইল, তাহার নিদর্শন থাকে—সেই সব দেশের কবিদিগের প্রথম বয়সের কাব্য বা কবিতার সহিত তাঁহাদের পরিণত বয়সের কাব্য বা কবিতার অনেক পার্থক্য

দেখা যায়। প্রথম বয়সের বা যৌবনের কাব্যে বা কবিতায় অতিশয়োক্তি ও শব্দাড়ম্বর থাকে, (চিন্তাশীলতা তত পরিস্ফুট হয় না); সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিবার প্রয়াস থাকে ও রচনার কৌশল দেখাইবার বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। ভাষাকে মনোরম ও হৃদয়গ্রাহিণী করিবার প্রয়াস প্রতি পদে দৃষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে লব্ধ বা পাঠ-সমুৎপন্ন পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান প্রকাশ করিবার আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখা যায়। পরিণত বয়সে যখন জ্ঞানের বিপাক হয়—যখন কবির অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি উভয়ই সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় যখন জ্ঞানের বিপাকের ফলে মনোমধ্যে চিন্তাশীলতার ও ভাবুকতার আবির্ভাব হয়, তখন কবির চিন্তাস্রোত আপনা হইতেই লেখনী-মুখে আসিয়া পড়ে, এবং ভাবের সমাবেশের সঙ্গে-সঙ্গে রচনা-চাতুর্য্য, ভাষার মনোহারিত্ব, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান সমুদায় সহজ ও সরল ভাবে আপনা হইতেই দেখা দেয়,—কবির আর ঐ সব দেখাইবার স্বতন্ত্র প্রয়াস পাইতে হয় না। কবির লেখনী হইতে তখন ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সহজ, প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী ভাষা আপনা হইতে নির্গত হইতে থাকে;—রচনা-কৌশল, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, জ্ঞানের বিকাশ, কাব্যের মনোহারিত্ব সমুদায় আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। কবির আর তখন অতিশয়োক্তির প্রয়োজন হয় না। ভাষা বা রচনাকে হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য আর অতিরিক্ত আয়াস পাইতে হয় না। তখন কেবল লেখনী ধরিলেই হইল—ভাব, ভাষা, জ্ঞান—সমুদায় ত্রিস্রোতার ন্যায় তাঁহার লেখনী-মুখে আবির্ভূত হইতে থাকে।

মহাকবি কালিদাসের "কুমারসম্ভব" কাব্যের ভাব ও ভাষার সহিত তাঁহার "রঘুবংশ" মহাকাব্যের ভাব ও ভাষার তুলনা করিলে প্রথমখানি যে তাঁহার যৌবনের এবং শেষখানি যে তাঁহার পরিণত বয়সের লেখা, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, কবি কোন্ গ্রন্থে কিরূপে রমণীর সৌন্দর্য্য-বর্ণনা করিয়াছেন। "কুমারসম্ভব" কাব্যের প্রথম সর্গেই উমার রূপ-বর্ণনা আছে। কালিদাসের উমার রূপবর্ণনা হইতে 'মসলা' সংগ্রহ করিয়া রায় গুণাকর কবি তাঁহার বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উমার রূপ-বর্ণনায় কি অতিশয়োক্তি (hyperbole)! "কুমারসম্ভব" কাব্যের প্রথম সর্গের ৩২ হইতে ৪৯ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য। উমার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে কি সচেষ্টতা, কি প্রয়াস! এইরূপ রূপ বর্ণনা, এইরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস কি পরিণত বয়সের লেখায় সম্ভব? নানা বস্তুর সহিত উমার রূপের তুলনা করিয়া যখন কিছুতেই কবির মন সন্তুষ্ট হইল না,—তখন কবি উমার অসাধারণ সৌন্দর্য্য পাঠকগণকে বুঝাইবার জন্য লিখিতেছেন—"সর্বোপমা দ্রব্য সমুচ্চয়েন, যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন। সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥" এক স্থানে পৃথিবীর সমুদায় সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছা করিয়াই যেন বিশ্বস্রষ্টা সমুদায় উপমাদ্রব্য একত্র করিয়া তাহা উমার শরীরের যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া অতিশয় যত্ন-সহকারে তাঁহাকে অর্থাৎ উমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

"মেঘদূত" কাব্যের উত্তরখণ্ডে যখন কবি বিরহী যক্ষের মুখে তাহার প্রিয়তমা পত্নীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন, তখন কবির অতিশয়োক্তির বেগ কিছু কমিয়াছে বটে—কবির বয়সটাও একটু বাড়িয়াছে ত! কিন্তু তখনও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াস একেবারে যায় নাই। কবি বর্ণনা করিতেছেন—"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ। শ্রোণিভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং যা তত্র স্যাদ্ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥"

আবার "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকে রাজার মুখে আমরা উর্ব্বশীর রূপ-বর্ণনা শুনিতে পাই—"অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রো নু কান্তিপ্রদঃ। শৃঙ্গারৈকরসঃ স্বয়ং নু মদনো মাসো নু পুষ্পাকরঃ। বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো, নির্মাতুং প্রভবেন্মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ॥" এখানেও অতিশয়োক্তি!

আবার "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটকে রাজা বিদূষকের নিকট শকুন্তলার রূপ-বর্ণনা করিতেছেন—"চিত্রে (কোথাও 'চিত্তে' পাঠ আছে) নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা, রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু। স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে, ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ॥" এখানে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াস অনেকটা কমিয়াছে;—যেটুকু আছে, সেটুকু বিরহী নায়কের মুখে নায়িকার রূপ-বর্ণনায় প্রযুক্ত হইয়া বড় মনোরম—বড় স্বাভাবিক হইয়াছে।

"রঘুবংশ" মহাকাব্যে রূপ-বর্ণনা করিবার অবসর অনেক স্থানে ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু কবি "রঘুবংশে" আর ঐরূপ রূপ-বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন নাই। যে দুই-এক স্থানে তিনি কোন রমণীর রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোনও প্রয়াস দৃষ্ট হয় না। কবি সহজ সরল ভাষায় নিজের বক্তব্য লিখিয়া গিয়াছেন;—আপনা হইতেই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে—আপনা হইতেই অগোচরে রূপ বর্ণনার কার্য্য হইয়াছে। দুটি একটি উদাহরণ দিই। "রঘুবংশের" তৃতীয় সর্গে সুদক্ষিণার গর্ভ-বর্ণনা-কালে কবি লিখিয়াছেন—"দিনেষু গচ্ছৎসু নিতান্ত পীবরঃ তদীয়মানীলমুখং স্তনদ্বয়ম্। তিরশ্চকার ভ্রমরাভিলীনয়োঃ সুজাতয়োঃ পঙ্কজ কোষয়োঃ শ্রিয়ম্।" কবি সুদক্ষিণার গর্ভ বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে "আনীলমুখং" (ঈষৎ নীল বর্ণ) এই শব্দটার দ্বারা সুদক্ষিণার গৌরবর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন—কি সহজ, সরল, সাধারণ ভাবে সুদক্ষিণার হেমবর্ণের পরিচয় দিতেছেন। তেমনই ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভায় সুনন্দা যখন ইন্দুমতীকে এক রাজার নিকট হইতে রাজান্তরের সমীপে লইয়া যাইতেছেন,—সেখানে স্থানে-স্থানে এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেইগুলি একত্র সমাবেশ করিলে একটি দিব্যাঙ্গনার সৃষ্টি হয়। "রঘুবংশ" মহাকাব্যে দাম্পত্য প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অজ ও ইন্দুমতী। এ হেন ইন্দুমতীর রূপ-বর্ণনায় প্রথম বয়সের রচনা হইলে কবি কত শ্লোকই প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু "রঘুবংশ" কবির পরিণত বয়সের লেখা—কবি স্বয়ম্বর-সভার ঘটনা সমুদায় বর্ণনা করিতেছেন—সঙ্গে-সঙ্গে আপনা হইতেই অগোচরে নায়িকার সৌন্দর্য্য-বর্ণনা হইয়া যাইতেছে;—পরমা সুন্দরী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর-সভায় কবির সহিত যাইয়া সমুদায় ঘটনা দেখিতেছি বটে, কিন্তু কবির নায়িকার রূপ বর্ণনার চেষ্টায় ক্লান্ত বা ক্লিষ্ট হইতেছি না।

"কুমারসম্ভব" কাব্যের প্রথমেই হিমালয়ের বর্ণনা আছে। ঐ বর্ণনাটি খুব সুন্দর ও স্বাভাবিক, মনোরম—মহাকবি কালিদাসেরই ত লেখা! কিন্তু বর্ণনীয় বিষয় এক-দেশব্যাপী—সমুদায় "কুমারসম্ভব" কাব্যে—তৃতীয় সর্গে মহাদেবের তপস্যাস্থান (ঐ বর্ণনাটিও খুব সুন্দর) ভিন্ন আর বর্ণনীয় বিষয় নাই বলিলেই হয়।

"মেঘদূত" কাব্যে কবি রামগিরি পর্ব্বত হইতে অলকা পর্য্যন্ত সমুদায় দেশের উপর দিয়া মেঘকে লইয়া গিয়াছেন; এবং সেই-সেই প্রদেশের বর্ণনা করিয়াছেন; পরিশেষে উত্তর মেঘে অলকার দিব্য বর্ণনা করিয়াছেন। রচনা-কৌশল ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বেশ মনোরম। কবির অভিজ্ঞতা বাড়িয়াছে এবং ভূয়োদর্শনের ফলে কবি ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের বর্ণনা করিয়াছেন - বর্ণনা আর একদেশব্যাপী নহে।

তার পর "রঘুবংশ" মহাকাব্যে কত না স্থানের কত না বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; -আর সেই সমুদায় বর্ণনা কি সুন্দর, মনোরম, আর কেমন সরল ও সহজ—যেন কবি লেখনী ধারণ করিয়াছেন, আর সেই লেখনীর মুখ হইতে স্বতঃই বর্ণনীয় বিষয় অনর্গল সুন্দর ও মনোরম হইয়া বাহির হইতেছে। প্রথম সর্গে সুদক্ষিণা ও দিলীপ উভয়ের রাজ্য হইতে বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন কালে পথিপার্শ্বস্থ সমুদায় বস্তুর বর্ণনা, ঐ প্রথম সর্গে নন্দিনী গাভীর বর্ণনা, দ্বিতীয় সর্গে দিলীপ ও গাভী যে পথ দিয়া প্রত্যহ গমনাগমন করিতেন, সেই পথের বর্ণনা, চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা এবং সেই প্রসঙ্গে নানা দেশ-বিদেশের ও সেই সেই দেশবাসীদের আচার-নীতি প্রভৃতির বর্ণনা এবং ত্রয়োদশ সর্গে সমুদ্র ও সমুদ্রোপান্ত প্রদেশসমূহের বর্ণনা - এই সকল বর্ণনাই অভিজ্ঞতার ফল—আর ঐ সকল বর্ণনা কি অনায়াস, সহজ, সরল, আর মনোরম।

"কুমারসম্ভব" কাব্যে কবি একটি উচ্চ মহান্ আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন—এবং ঐ কাব্যের তৃতীয় সর্গে তপস্যা-নিরত দেবাদিদেব মহাদেবের বর্ণনা এবং মদন কর্তৃক পঞ্চ-শরবিদ্ধ মহাদেবের বর্ণনা খুব উত্তম হইয়াছে সন্দেহ নাই। সেই বর্ণনার sublimity উচ্চ মহান্ ভাব আমি আমার "কালিদাস—তাঁহার ধর্ম্মমত" শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩২২, শাশ্বতী"—৩৩ পৃষ্ঠা বৈশাখ, দ্রষ্টব্য) দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বর্ণনাটি ত যে সে কবির নহে—মহাকবি কালিদাসের; আর আদর্শটিও তাঁহারই আরাধ্য দেবতার। ঐরূপ sublime (গম্ভীর ও মহান্) বর্ণনা সাহিত্য জগতে বিরল। কিন্তু "কুমারসম্ভব" কাব্যে ঐরূপ sublime situationএর খুব অল্পই। "রঘুবংশ" মহাকাব্যে ঐরূপ উচ্চ মহান ভাবের এবং ঐরূপ sublime situationএর অবতারণা অনেক স্থানে করা হইয়াছে; এবং সেগুলি খুব উচ্চ ধরণের হইয়াছে। সিংহের সেই দিলীপকে পরিহাসের বর্ণনা

(একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং, নবংবয়ঃ কান্ত মিদং বপুশ্চ। অল্পস্য হেতোর্বহুহাতুমিচ্ছন্, বিচারমূঢ়ঃ প্রতিভাসি মে ত্বম্” প্রভৃতি), আর নন্দিনীর প্রাণ-রক্ষার্থে দিলীপের দেহ নিজ দেহদানের সংকল্প, (ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ, ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়। রাজ্যেন কিং তদ্বিপরীতবৃত্তেঃ প্রাণৈরুপক্রোশমলীমসৈর্বা ॥” ইত্যাদি), ইন্দ্রের সহিত রঘুর যুদ্ধকালে রঘুর ওজস্বিতা, (“ন খলু রঘুমনির্জিতো কৃতী ভবান্” ইত্যাদি), দিগ্বিজয়ের পর বিশ্বজিৎ যজ্ঞে রঘুর সর্ব্বস্ব দান এবং দানান্তে মৃৎপাত্রাবশেষ রঘুর নিকট গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য বরতন্তু-শিষ্যের আগমন, যজ্ঞশেষে “নিঃশেষ বিশ্রাণিত কোষজাত” রঘুকে কৌৎস মুনির “স্থানে ভবানেক নরাধিপঃ সন্, অকিঞ্চনত্বং মখজং ব্যনক্তি। পর্য্যায় পীতস্য সুরৈর্হিমাংশোঃ কলাক্ষয়ঃ শ্লাঘ্যতরোহি বৃদ্ধেঃ” প্রভৃতি সম্ভাষণ, প্রিয়তমা পত্নী ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের বিলাপ ও ব্রহ্মচর্য্য, ত্রয়োদশ সর্গে সেই “দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বি তমালতালিবনরাজিনীলা” প্রভৃতির বর্ণনা, ভদ্রচরের নিকট প্রজাগণ কর্তৃক গুরুকলত্র নিন্দা শ্রবণে অভ্যাহত শ্রীরামচন্দ্রের “অপি স্বদেহাৎ কিমুতেন্দ্রিয়ার্থাৎ যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ॥” ইত্যাদি কর্ত্তব্যজ্ঞানে সীতাদেবীকে পরিহার—আর সর্ব্বশেষে নিশীথে শয়ন-মন্দিরে অদৃষ্টপূর্ব্ব “মৃণালিনী হৈম মিবোপরাগম্” সুন্দরী যুবতী দেখিয়া কুশের জিতেন্দ্রিয়ত্ব—এ সকলই “রঘুবংশ” মহাকাব্য পরিণত বয়সের রচনা বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করে।

“কুমারসম্ভব” কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ এবং “রঘুবংশ” কাব্যের দশম সর্গ একত্র আলোচনা করিলে “কুমারসম্ভব” যৌবনের রচনা এবং “রঘুবংশ” পরিণত বয়সের রচনা—ইহা বেশ উপলব্ধি হয়। তারকাসুর কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ প্রতীকারের জন্য ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য দেবগণ ব্রহ্মার স্তব আরম্ভ করিলেন। এই স্তবটি “কুমারসম্ভব” কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে। সেইরূপ রাবণ কর্তৃক নিষ্পীড়িত হইয়া দেবগণ প্রতিকারের আশায় ভগবান্ বিষ্ণুর সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন। এই শেষোক্ত স্তবটি “রঘুবংশ” কাব্যের দশম সর্গে আছে। এই দুইটি স্তব পাঠ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে কবি পাঠাগারের নিভৃতে বসিয়া নৈশ আলোকের সাহায্যে দর্শনাদি শাস্ত্র-পাঠজনিত বিদ্যা ও জ্ঞানের বিকাশ করিবার চেষ্টায় “কুমারসম্ভব” কাব্যে ব্রহ্মার স্তবটি রচনা করিয়াছিলেন;—আর পরিণত বয়সে যখন জ্ঞানের বিপাকের ফলে কবির হৃদয়ে সমুদায় দর্শন-শাস্ত্রের সমন্বয় হইয়াছিল,—যখন জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে কবির হৃদয় আলোকিত হইয়াছিল—যখন ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার সহিত মিলিত হইয়া পুস্তকস্থ বিদ্যা সর্ব্বপ্রসারিণী হইয়াছিল—এক কথায়, কবি যখন “শিক্ষানবিশি” অবস্থা ছাড়াইয়া শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন—তখনই কবির লেখনী হইতে “রঘুবংশ” মহাকাব্যে বিষ্ণুর স্তব নিঃসৃত হইয়াছিল।

“কুমারসম্ভব” কাব্যে ব্রহ্মার স্তবে গুরুগম্ভীর ভাব আনিবার জন্য কত আয়াস, কত চেষ্টা! “রঘুবংশ” কাব্যের বিষ্ণুর স্তবে সে আয়াস বা সে চেষ্টা নাই; অথচ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় কেমন সুন্দর মহান্ ভাবের অবতারণা করা হইয়াছে। “কুমারসম্ভব” কাব্যের স্তবে বিপরীতার্থ বাচক শব্দের প্রয়োগ দ্বারা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কি প্রয়াস, কি যত্ন! “রঘুবংশের” স্তবে ভক্তের প্রাণের সরল স্বাভাবিক ভাষায় আপনা হইতেই কি মনোরম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে! “কুমারসম্ভব” কাব্যের স্তবে দর্শন-শাস্ত্রের কি জটিলতা! “রঘুবংশ” কাব্যের স্তবে ভক্তের হৃদয়ে কি সরলতা, কি মধুরতা! “কুমারসম্ভব” কাব্যের স্তবে সাংখ্যাদি দর্শনের পাণ্ডিত্য ফুটিয়া উঠিতেছে,—আর “রঘুবংশ” কাব্যের স্তবে সকল দর্শনের সার দর্শন,—ভগবদ্ভক্তি ফুটিয়া উঠিতেছে। “বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ। ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া-ইবার্ণবে॥” আর আমার “কালিদাস—তাঁহার ধর্ম্মমত” শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩২২ সালের শাশ্বতী, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), আমি বিশেষরূপে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, “রঘুবংশ” মহাকাব্য রচনাকালে মহাকবির পরব্রহ্ম জ্ঞানলাভ হইয়াছিল; এবং সেই পরব্রহ্ম তত্ত্ব কবির হৃদয়কে উদ্ভাসিত করিয়াছিল; এবং কবি রসান্তরের মধ্য দিয়া সেই “একরস” ব্রহ্ম-তত্ত্ব পান করিতে পারিয়াছিলেন। তাই পরিণত বয়সের কবি তাঁহার “রঘুবংশ” মহাকাব্যে সমুদায় শাস্ত্রের সমন্বয় করতঃ উদার বিশ্বজনীন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, এমন উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন—যেখানে

কোন সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই—যেখানে পাঠাগারের গন্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট পৌছিতে পারে নাই।

তার পর "কুমারসম্ভব" কাব্যের চতুর্থ সর্গে বর্ণিত রতি-বিলাপ এবং "রঘুবংশ" মহাকাব্যের অষ্টম সর্গে বর্ণিত অজ-বিলাপ—এই উভয় বিলাপের তুলনা করিলে বেশ স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বেরটি যৌবন-সুলভ অদম্য চঞ্চল প্রেমের উচ্ছ্বাস—আর শেষোক্তটি পরিণত বয়সের গম্ভীর অথচ সরস, পরিণত-স্নেহসারের অভিব্যঞ্জনা। রতিবিলাপের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল অতৃপ্ত দেহজ ভোগ বাসনা-মূলক বিলাপে পরিপূর্ণ; অজবিলাপও করুণ রসে পরিপূর্ণ বটে;—অজ-বিলাপে কারুণ্যোত্থিত মোহ আছে বটে—কিন্তু তাহাতে অতৃপ্ত দেহজ ভোগ-বাসনা বিরল—তাহা ইন্দুমতীর গুণপনা স্মরণে অজের সকরুণ গীতি পূর্ণ! অজ-বিলাপের একটি শ্লোক পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, তাহা পরিণত বয়সের লেখা। "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। করুণা বিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥" এই শ্লোকটি কি কোন তরুণ লেখকের লেখনী হইতে বাহির হইতে পারিত? একটু বয়স না থাকিলে কি পত্নীকে "গৃহিণী সচিবঃ" বলা যায়? নিদারুণ যম ইন্দুমতীকে হরণ করিয়া যে শুধু অজের প্রেমিকা পত্নীকে কাড়িয়া লইয়াছেন, তাহা নহে,—অজের যে যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছেন—ইন্দুমতীকে হরণ করিয়া যে করাল কাল অজের গৃহিণীকে—অজের মন্ত্রীকে কাড়িয়া লইয়াছেন! যৌবনে পত্নী-বিয়োগে ত এত সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয় না—যৌবনের কবি ত এত সর্ব্বস্বান্তের ভাব বুঝিতে পারিতেন না—এত সর্ব্বস্বান্তের ভাব ফুটাইতে পারিতেন না! তাই বলিতেছিলাম যে, যেদিক দিয়াই দেখা যাউক, "রঘুবংশ" যে কবির পরিণত বয়সের লেখা এবং "কুমার-সম্ভব" কাব্য যে তাঁহার যৌবনের রচনা, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

"কুমারসম্ভব" "মেঘদূত" এবং "রঘুবংশ" এই তিনখানি কাব্যের ভাষা, শব্দযোজনা, ছন্দপ্রয়োগ, বর্ণনীয় বস্তুর অবতারণা, রচনা ও বর্ণনার কৌশল, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি, উপমা-প্রয়োগ, ভাবের সমাবেশ প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, "কুমারসম্ভব" কাব্য কবির প্রথম বয়সের লেখা; তৎপরে "মেঘদূত" রচিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বশেষে কবি "রঘুবংশ" মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

"মালবিকাগ্নিমিত্র," "বিক্রমোর্ব্বশী" এবং "অভিজ্ঞান শকুন্তল" এই তিনখানি নাটক পাঠ করিলে বেশ জানা যায় যে, প্রথমে "মালবিকাগ্নিমিত্র", পরে "বিক্রমোর্ব্বশী" এবং সর্ব্বশেষে কবির শ্রেষ্ঠ নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তল" রচিত হইয়াছিল।

এ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার একটু আভ্যন্তরীণ প্রমাণও (Internal evidence) আছে। "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে, "সূত্রধারঃ। অভিহিতোঽস্মি পরিষদা শ্রীকালিদাস গ্রথিত বস্তু মালবিকাগ্নিমিত্রম্ নাম নাটকমস্মিন্ বসন্তোৎসবে প্রয়োক্তব্যমিতি, তদারভ্যতাং সঙ্গীতকম্।' 'পারিপার্শ্বিকঃ। মা তাবৎ। প্রথিত যশসাং ধাবক সৌমিল্ল কবি রত্নাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমান কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ।" "সূত্রধারঃ। অয়ে! বিবেক বিশ্রান্তমভিহিতম্। পশ্য "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্। সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পর প্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ॥" উদ্ধৃত অংশ হইতে দেখা যাইতেছে যে, কবি স্বয়ং আপনাকে "বর্ত্তমান কবি" অর্থাৎ নূতন কবি বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, এবং নূতন কবি হইলেও যে তাঁহার দৃশ্যকাব্য সাদরে গৃহীত হইবে, এইরূপ স্পর্দ্ধা করিতেছেন। যখন কবি নাট্যশাস্ত্র-রচনায় অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন, যখন দৃশ্যকাব্য-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত হইলেন—তখন কবি দেখিলেন যে, লোকের মনোরঞ্জন করা কি শক্ত ব্যাপার! প্রথম রচনাকালে লোকপ্রিয়তা যত সহজ বিবেচিত হইয়াছিল, বাস্তবিক পক্ষে তাহা তত সহজ নহে; তাই কবি তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তলে" লিখিলেন, "আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্। বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ॥"

এই তিনখানি নাটকের মঙ্গলাচরণে দেব-দেব মহাদেবের যে স্তুতিবাচক কবিতা আছে, তাহা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, "মালবিকাগ্নিমিত্র" ও "বিক্রমোর্ব্বশী"র কবি তখনও পাঠাগারের পুস্তকসমূহের মধ্যে নিমগ্ন রহিয়াছেন। "অভিজ্ঞান-শকুন্তলের" কবি সে স্তর ছাড়াইয়া

আরও উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন। তার পর, নাটক তিনখানির শব্দ-যোজনা, ভাষা ও ভাবের সমাবেশ প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলে, ক্রমোন্নতির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আর সর্ব্বশেষ নাটকের যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ "চরিত্রাঙ্কন" (character-painting),—সেই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, "মালবিকাগ্নিমিত্রের" ও "বিক্রমোর্ব্বশীর" কবি সে বিষয়ে কেবল শিক্ষানবিশি" করিতেছেন। "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" কবির "চরিত্রাঙ্কন" সিদ্ধহস্তেরই—শিল্পকের পরিচায়ক। "মালবিকাগ্নিমিত্র" ও "বিক্রমোর্ব্বশী"তে কেবল মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের প্রেম এবং পুরুরবা ও উর্ব্বশীর প্রেম এবং সেই প্রসঙ্গোত্থিত ঈর্ষাদি বিষয়-ইহারই বর্ণনা—এবং নাটকের "চরিত্রগুলি" (characters) একরকম "একঘেয়ে"। "অভিজ্ঞান শকুন্তলে" কবি বিভিন্ন চরিত্রের (varied characters) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যেমন সংসারে নানাপ্রকার ব্যক্তির ব্যক্তিগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়, কবি "অভিজ্ঞান শকুন্তলে" সেইরূপ নানাপ্রকার "চরিত্রে"র সমাবেশ করিয়াছেন। রাজা দুষ্মন্ত অগ্নিমিত্র বা পুরুরবার ন্যায় কেবল প্রেমিক বলিয়া চিত্রিত হন নাই—দুষ্মন্তের ন্যায় রাজার যেরূপ চারিদিকে দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, কবির দুষ্মন্ত চরিত্রে আমরা সেইরূপই দেখিতে পাই। "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" বিদূষক অন্য দুই নাটকের বিদূষকের অপেক্ষা উচ্চ ধরণের। শকুন্তলার দুই সখীর চরিত্রগত পার্থক্য অন্য দুই নাটকের অপেক্ষা এই নাটকের পরিণতির ফল জ্ঞাপন করিয়া দেয়। আর সর্ব্বশেষে শকুন্তলার "চরিত্রের" সহিত মালবিকা ও উর্ব্বশীর চরিত্রের তুলনা করিলে বেশই বুঝিতে পারা যায় যে, অপর দুইখানি নাটক লিখিবার বহুকাল পরে কবি তাঁহার অমর শ্রেষ্ঠ নাটক "অভিজ্ঞান শকুন্তল" রচনা করিয়াছিলেন—যাহা পাঠ করিয়া স্বদেশীয়-বিদেশীয় সুধিগণ চমৎকৃত হইয়া কবিকে ধন্য-ধন্য করিয়াছেন! আবার "অভিজ্ঞান শকুন্তলে"র নৈতিক আদর্শ তাহাকে কবির পরিপক্ক বয়সের রচনা বলিয়া সপ্রমাণ করিয়া দেয়। বিশেষ "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" চতুর্থ অঙ্ক—যেখানে শকুন্তলা আশ্রমের ও আশ্রমস্থ সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন—এবং যেখানে মুনিবর কণ্ব পর্য্যন্ত তনয়া বিচ্ছেদদুঃখে কাতর হইয়া পড়িতেছেন সেই চতুর্থ অঙ্ক পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, এই নাটকখানি কবির পরিপক্ক বয়সের রচনা;—কবিও না জানি প্রিয়তমা দুহিতাকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইবার সময় এমনই কণ্বেরই মত কত না কাঁদিয়াছেন, কাঁদিতে কাঁদিতে কত না সদুপদেশ দিয়াছেন! এই অঙ্কটি সমুদায় নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও মনোহর। এটি করুণ রসে পরিপূর্ণ। এমন করুণ রসের অবতারণা কি অল্পবয়সে করা যায়? একটু বয়স না থাকিলে কি এমনই ক্রন্দনের মধ্যে সদুপদেশ দেওয়া যায়? একটু বয়স না হইলে যে এ করুণ রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না—এ করুণ রস ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায় না! এ ত প্রেমিক প্রেমিকার বিরহাশঙ্কাজাত করুণ রস নহে, এ ত উর্ব্বশীর বিরহে পুরুরবার শোকোচ্ছ্বাস নহে—সে ত যৌবনসুলভ চাপল্য-প্রণোদিত শোক,—কবি যৌবনের রচনায় বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্রম হইতে বিদায় দিবার সময়ে কণ্বের শোক এবং আশ্রমস্থ সকলের—এমন কি তরুলতাদির পর্য্যন্ত শোক—এ শোকের অনুভূতির জন্য একটু বয়স আবশ্যক; আর সে শোক ফুটাইয়া তুলিতে ত পরিণত বয়সের আরও প্রয়োজন। তাই বলিতেছিলাম যে, পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, কবির "মালবিকাগ্নিমিত্র" ও "বিক্রমোর্ব্বশী" অল্প বয়সের রচনা—আর "অভিজ্ঞান শকুন্তল" কবির পরিণত বয়সের পক্ক ফল—যে পক্কফলের আস্বাদ পাইয়া পণ্ডিতবর গেটে গাহিয়াছেন—

"Wouldst thou the young year's blossoms
And the fruits of its decline
And all by which the soul is charmed,
Enraptured, feasted, fed?
Wouldst thou the Earth and Heaven itself
In one sole name combine,
I name thee, O Sakuntala, and
All at once is said."

গ্রন্থ-সমালোচনা

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

[সমালোচনার মৌলিক অর্থ,—তাহার বিশিষ্ট বা আংশিক অর্থ; গ্রন্থাদির সমালোচনা; সমালোচক ও গ্রন্থকার; উভয়ের অধিকার ও পার্থক্য। গ্রন্থ বিভাগ, কাব্য-গ্রন্থ, তাহার লক্ষণ, কবি—জীবনের উচ্চ সমালোচক,—কবিতা প্রকৃতির উচ্চ সমালোচনা, প্রতিভা ও সমালোচনা;—একাধারে গ্রন্থকার ও সমালোচক, গ্রন্থকার ও গ্রন্থ সমালোচকের মধ্যে বিসংবাদ, তাহার অযৌক্তিকতা, ভাষা ও সাহিত্য-সংগঠন ও তাহাদের উন্নতিকল্পে গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়েরই অস্তিত্বের আবশ্যকতা; ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতির মূল অন্বেষণ।]

'সমালোচনা' শব্দ সচরাচর যে বিশিষ্ট ভাবার্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা অবশ্য স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র বা বিশেষ ভাবার্থে, একজন গ্রন্থকারকে, অর্থাৎ যিনি কোন মূলতত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া গ্রন্থ লিখেন, তাঁহাকে সমালোচক বলা যায় না। কিন্তু কথাটা একটু সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে গৃহীত হইলে, প্রতীত হইবে যে, একজন গ্রন্থকারও প্রকারান্তরে সমালোচক। তবে তিনি কোন গ্রন্থবিশেষের সমালোচক না হইতে পারেন;—প্রকৃতিই তাঁহার সমালোচ্য বিষয়। প্রকৃতির সমালোচনা করিয়া, গ্রন্থকার গ্রন্থ লিখেন; আর সচরাচর সঙ্কীর্ণ অর্থে যাহাকে সমালোচক বলা যায়, তিনি সেই গ্রন্থের সমালোচনা করেন। ফলতঃ, মূলে উভয়েরই কার্য্য—সমালোচনা।

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকৃতির সমালোচনা স্ফুট কি অস্ফুট হইল, প্রকৃত কি অপ্রকৃত হইল, উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট হইল,—সমালোচক তাহারই বিচার করেন, এবং গ্রন্থের যে-যে স্থল জটিল বা অস্ফুট থাকে, তাহার সরল ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণ বুদ্ধির অধিগম্য করেন। অবশ্য গ্রন্থকারের 'সমালোচনা' হইতে সমালোচকের সমালোচন-প্রণালী বিভিন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ গ্রন্থকার প্রকৃতির সমালোচনা করিতে যেরূপ পদ্ধতির অবলম্বন করেন, সমালোচককে গ্রন্থের সমালোচনা করিতে সে পদ্ধতির অবলম্বন করিতে না হইতে পারে, কিন্তু প্রণালী বা পদ্ধতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও 'সমালোচনা' একই পদার্থ।

প্রকৃতির সমালোচনা হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি; অতএব গ্রন্থেরও উৎপত্তি।* মনুষ্যাদির কার্য্য-সমালোচনা হইতেও গ্রন্থের উৎপত্তি। মনুষ্যাদির কার্য্য অবশ্য প্রকৃতির বহির্ভূত নহে; তবে প্রভেদ এই যে, মূল প্রকৃতির শৃঙ্খলা ভ্রমশূন্য ও পূর্ণ; মনুষ্যাদির কার্য্য ভ্রমসঙ্কুল ও অপূর্ণ। গ্রন্থ মনুষ্যকৃত, সুতরাং ভ্রমসঙ্কুল ও অপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। ভ্রমশূন্যত্ব ও পূর্ণত্বের সমালোচনা ভ্রমসঙ্কুলতা ও অপূর্ণতার সমালোচনা হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র-প্রকৃতিসম্পন্ন। সমালোচনার এই প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্যই গ্রন্থকার ও সমালোচকের পার্থক্যের কারণ। মূলতঃ উভয়েই সমালোচক। গ্রন্থকার প্রকৃতির ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সমালোচক ও গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া, তাহার গূঢ় মর্ম্ম বুঝাইয়া দেন। পার্থক্য এই যে, গ্রন্থের প্রকৃতির অক্ষরে-অক্ষরে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য, যে হেতু তাহা অনেকের নিকট দুর্বোধ্য; আর সমালোচককে গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ অংশ বা সন্ধিস্থলের ব্যাখ্যা করিতে হয়,—যাহা অপেক্ষাকৃত জটিল বা অস্ফুট ও সাধারণবুদ্ধির অনধিগম্য। সমালোচক একপক্ষে সাধারণ ব্যাখ্যা দ্বারা সমগ্র গ্রন্থের স্থূল মর্ম্ম ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন; আর পক্ষান্তরে গ্রন্থের যে-যে স্থলের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে অপেক্ষাকৃত অধিক বিচক্ষণতা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন, সেই সেই স্থলের বিশদ্ ও বিস্তৃত

---

* "জ্ঞান বিজ্ঞান—প্রকৃতি পর্য্যালোচনা;—শিল্প-সাহিত্য সেই পর্য্যালোচনার সংক্ষিপ্ত সার; গ্রন্থ অর্থে গ্রন্থি, চিত্র অর্থেও তাই। প্রকৃতি পর্য্যালোচনার ফল, অনুধাবন, অনুকরণ ও বহুদর্শনের ফল, শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষার ফল—গ্রন্থে "গেরো" দিয়া গেঁথে রাখা হয়—বর্ত্তমানের স্মরণার্থ, অতীতের গৌরবার্থ, ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থ,—সভ্যতার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত। পরন্তু জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যেরই ক্রম বিকাশের সাহায্যার্থে এবং ভিত্তিস্বরূপে। স্তরের উপর স্তর, তার উপর স্তর। এক স্তরের ফল আর এক স্তর, অথবা এক স্তরে বসিয়া আর এক স্তর নির্ম্মাণ করা হয়।"

মৎপ্রণীত "সুকুমার সাহিত্যের প্রকৃতি" নামধেয় প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।—গ্রন্থকার।

ব্যাখ্যা করেন। তদ্ভিন্ন সমালোচককে আরও কিছু করিতে হয়,—তাহা গ্রন্থের বিচার। গ্রন্থের দোষ, গুণ, উপযোগিতা, অনুপযোগিতা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ও সমালোচকের বিচার্য্য। গ্রন্থকার প্রকৃতির ব্যাখ্যা করেন; এই ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক পদার্থের স্বরূপ ও গুণের ব্যাখ্যা; ভ্রমসঙ্কুলতা বা অপূর্ণতার বিচার নহে। যখন পদার্থের সমগ্র স্বরূপ, উদ্দেশ্য ও উৎপত্তির কারণ সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করা মনুষ্য-বুদ্ধির অতীত, তখন তাহার অপূর্ণতা ও অনুপযোগিতা মনুষ্যজ্ঞানের বিচারাধীন হইতে পারে না। অতএব গ্রন্থকার প্রকৃতির স্বরূপনিচয়েরই ব্যাখ্যা করেন; প্রাকৃতিক কার্য্য কারণ সম্বন্ধেরই আলোচনা করেন; প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার ভ্রম-প্রমাদের বিচার করেন না,—যে হেতু তাহা অনায়ত্ত। ভ্রমসঙ্কুলতা বা অপূর্ণতা-ঘটিত যে কিছু বিচার গ্রন্থকারকে করিতে হয়, তাহা মনুষ্যের কার্য্যের এবং সঙ্কীর্ণ প্রকৃতির। এখন এতদ্দ্বারা, প্রকৃতির ব্যাখ্যা ও বিচারের সহিত কোন গ্রন্থবিশেষের বিচার ও ব্যাখ্যাগত যে পার্থক্য অথবা গ্রন্থকারের সহিত গ্রন্থ-সমালোচকের সমালোচনা-ঘটিত যে বিভিন্নতা, তাহা অংশতঃ বুঝা যাইতেছে।

গ্রন্থকার প্রকৃতির প্রথম সমালোচক; আর গ্রন্থ সমালোচক—দ্বিতীয়। প্রকৃতি-সমালোচনা হইতে যেমন গ্রন্থের উৎপত্তি, তেমনি সেই গ্রন্থ-সমালোচনা করিতেও প্রকৃতি-সমালোচনা আবশ্যক; নতুবা গ্রন্থের বিশদরূপ ব্যাখ্যা ও দোষ-গুণ বিচার অসম্ভব।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,—গ্রন্থমাত্রেই কি সমালোচনা-সম্ভূত, আর গ্রন্থকারমাত্রেই কি প্রকারান্তরে সমালোচক? গভীররূপে বিবেচনা করিলে, তাহাই প্রতীত হইবে। গ্রন্থকে বহুভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে একটা বিভাগ কাব্য-গ্রন্থ। অন্যান্য শ্রেণীর গ্রন্থ সম্বন্ধে এস্থলে কিছুই বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। কাব্য-গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিলেই হইবে। কাব্য কবি-কল্পনা-সম্ভূত,—অতএব, তাহার মধ্যে আবার সমালোচনা কোথায়? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে, 'কাব্য' কি—কথাটা স্থির হইলে ভাল হইত; কিন্তু সে বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা করিবার স্থান ইহা নহে। কাব্য ও কবিতার লক্ষণ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত সত্ত্বেও তাহার সৌন্দর্য্য-প্রবণতার প্রতি কাহারও সন্দেহ নাই। সহৃদয়তা-বিহীন যাহা কিছু, তাহা কবিতা নহে। কবিতা ফুল্ল প্রসূনবৎ মনুষ্যের হৃদয়বৃত্তি, চিন্তাশক্তি, ভাষা ও জ্ঞানের সার সৌরভ বহন করে। কবি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করেন, পক্ষান্তরে তেমনি অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেন। ফলতঃ, সৌন্দর্য্যের সমাবেশ ও চরমোৎকর্ষ-সৃষ্টিই কবির কার্য্য। এ কার্য্য সম্পাদনে কবির প্রতিভা অবশ্য তাঁহার প্রধান সহায়। প্রতিভা ভিন্ন কখনই এ কার্য্য সম্ভবে না; কিন্তু এ স্থলে প্রতিভার কথা হইতেছে না। প্রতিভা যদ্দ্বারা ও যাহা লইয়া কার্য্য করে, তাহারই কথা হইতেছে। কবি প্রতিভাশক্তিসম্পন্ন; তজ্জন্যই তিনি সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। কিন্তু বাহ্য ও অন্তঃ প্রকৃতির গভীর সমালোচনা ভিন্ন এই সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টি-ক্ষমতা অবশ্য কবির প্রতিভাজনিত; কিন্তু তাঁহার দ্বারা যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা অপ্রকৃত নহে। প্রকৃতিতে যাহা আছে, তিনি তাহারই বৈচিত্র্য দেখান; সুতরাং, তিনি প্রকৃতি সমালোচনা করিতে বাধ্য। কবিকল্পনা স্বতই প্রকৃতির অনুকারিণী। আলোচনা ভিন্ন অনুকরণ সম্ভবে না। মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে সেক্সপিয়রের অদ্বিতীয় অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা মনুষ্য প্রকৃতির গভীর সমালোচনারই ফল; যেহেতু সমালোচনা ভিন্ন জ্ঞানমাত্রেই অসম্ভব। সেক্সপিয়র এক দিকে মনুষ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে যেমন অভিজ্ঞ, পক্ষান্তরে তেমনিই অতুল প্রতিভাসম্পন্ন; তজ্জন্যই তিনি জগতের সুদুর্লভ কবি। এস্থলে সমালোচন শক্তিকে প্রতিভা হইতে আমরা পৃথক করিতেছি না; প্রত্যুত সেক্সপিয়রের সূক্ষ্ম সমালোচনা-শক্তি তাঁহার অদ্বিতীয় প্রতিভা সম্ভূত, ইহাই বলিতেছি। তবে সমালোচন শক্তিসম্পন্ন হইলেই যে কবিজনোচিত প্রতিভা থাকিবে, তাহা নহে। সমালোচন-শক্তি প্রতিভার অন্তর্গত হইতে পারে; কিন্তু কবিজনোচিত প্রতিভা সমালোচন-শক্তির অন্তর্ভূত হইতে কদাচিৎ দেখা যায়। এই স্থলেই কাব্য-লেখক ও কাব্য-সমালোচকে অবিচ্ছিন্ন পার্থক্য। কাব্য-সমালোচক কবিতার ব্যাখ্যা করেন; সৌন্দর্য্যের অস্ফুট অংশ ফুটাইয়া দেন, কবির ন্যায় তীক্ষ্ণরূপে কবিতা অনুভবও করিতে পারেন; হয় ত কবি সৌন্দর্য্যের যে গভীরতম অংশে নিজে প্রবেশ করেন নাই, তাহাতেও তিনি নিমগ্ন হইয়া, কবিতার অন্ত-

মূলনিহিত রসের আবিষ্কার করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কাব্যের দোষ ও অপূর্ণতা দেখাইয়া দেন; এবং যদ্দারা উহা অপেক্ষাকৃত পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারিত, বিচার করিয়া তাহাও নির্ণয় করিতে সমর্থ হ'ন। সমালোচক এ সমস্তই ন্যূনাধিকভাবে করিতে পারেন; কিন্তু কবি-জনসুলভ প্রতিভাশালী না হইলে, কবিতা সৃষ্টি করিতে পারেন না,—কবি হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে কবি হইলেই যে উৎকৃষ্টরূপে গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে সমর্থ হইবেন, তাহারও কিছু অর্থ নাই। কবি প্রকৃতিকে অবিচ্ছিন্ন ও মৌলিক অবস্থায় যেরূপে সমালোচনা করিতে সমর্থ, প্রকৃতির প্রতিকৃতির সমালোচনা করিতে তাদৃশ পারদর্শী না হইতে পারেন। কবি, প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া, কাব্য রচনা করিতে যেরূপ সমর্থ, নিজের বা অন্যের রচিত কাব্য সমালোচনা করিতে সেরূপ সমর্থ না হইতে পারেন। মূল পদার্থের সমালোচনা ও তাহার প্রতিকৃতির সমালোচনা, উভয়েই মূলতঃ সমালোচনা হইলেও, তাহার মধ্যে প্রণালী ও প্রক্রিয়াগত পারম্পরিক বিভিন্নতা আছে। এই বিভিন্নতার বিষয় আমরা ইতঃপূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। যেমন গ্রন্থ-সমালোচক কর্ত্তৃক গ্রন্থকারের কার্য্য সম্পাদিত না হইতে পারে, তেমনি গ্রন্থকারের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচকের কার্য্যও সুসম্পন্ন না হওয়া সম্ভব। তবে ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয় যে, গ্রন্থকার হইলেই গ্রন্থ সমালোচক হইতে একেবারে অপারগ হইবেন, বা সমালোচক হইলেই ভাল গ্রন্থকার হইতে পারিবেন না। গ্রন্থকার ও সমালোচক—একেবারে উভয়ের সমবায় হওয়াও অসম্ভব নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রেই এই সমবায়ের উত্তম দৃষ্টান্ত আছে।* যথা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এক্ষণে যে কথাগুলি বলা হইল, তদ্দ্বারা গ্রন্থকারের সহিত সমালোচকের সম্বন্ধ কি বুঝাইতে পারে। স্ব-স্ব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থে সময়ে-সময়ে গ্রন্থকারে ও সমালোচকে বিবাদ হইতে দেখা যায়। এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ কিছু কৌতুকজনক। সমালোচক কর্ত্তব্যানুরোধে সমালোচ্য গ্রন্থের প্রতি সময়ে-সময়ে একটু তীব্র কটাক্ষ করিতে বাধ্য হ'ন; অনেক গ্রন্থকারের উহা সহ্য হয় না। সমালোচনা ন্যায়সঙ্গত হউক আর অন্যায় হউক, গ্রন্থকার সমালোচকের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন; সমালোচকদিগের সহিত গ্রন্থকারদিগের মৌলিক সম্বন্ধঘটিত তর্কে প্রবৃত্ত হ'ন। গ্রন্থকার বলেন,—"সমালোচক! তুমি যে আজ গর্ব্বিতভাবে বিচারকের উচ্চমঞ্চে বসিয়াছ ও সাহিত্য-সংসারে স্বকীয় আধিপত্য সংস্থাপনার্থে অবিরত, শাসন-দণ্ড পরিচালন করিতেছ, ইহা যারপরনাই লজ্জাকর। তোমাকে ঐ শাসনদণ্ডটা কে দিল? বিচারের অধিকার তুমি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলে? গ্রন্থকারদিগের সহিত তোমার মূলতঃ কি সম্বন্ধ, তাহা কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি যে শব্দালঙ্কার, ব্যাকরণ, রূপ-রস-রুচি, ছন্দ ও ভাবানুভাবের অযুতকোটী নিয়ম সংগ্রহ করিয়া আপনাকে সর্ব্বেসর্ব্বা বিবেচনা করিতেছ, এই সকল নিয়মের উৎপত্তিস্থল কোথায়, তাহা কি তোমার আদৌ মনে নাই? তোমার যে-কিছু শিক্ষা, যে-কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি, যে-কিছু জ্ঞান-গরিমা, সমুদয়ই ঐ গ্রন্থকারদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত! তুমি গ্রন্থকারের মন্ত্র-শিষ্য মাত্র। গ্রন্থকার তোমার গুরু ও নিয়মদাতা। গ্রন্থকারের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, গ্রন্থকারের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, তুমি আজ গ্রন্থকারদিগকে উপেক্ষা করিতেছ, গ্রন্থকারদিগের উপর বিধি-ব্যবস্থা চালাইতে সাহসী হইতেছ, ইহা তোমার সামান্য স্পর্দ্ধা নহে! গ্রন্থকার সংসারে যাবতীয় বস্তুর বিচার করিবেন, আর তুমি সেই বিচারের ব্যাখ্যা ও শ্রেণী-নির্ব্বাচন করিবে, প্রথম হইতেই তোমার সহিত এই বন্দোবস্ত। কিন্তু, এখন দেখিতেছি, তুমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। নিজের প্রকৃত কর্ত্তব্যসাধনে আর তোমার মন নাই; গ্রন্থকারদিগের কুৎসা ও গ্লানি প্রচার করাই তোমার এক্ষণে একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারগণ তোমার কথায় ভ্রূক্ষেপও করেন না। তোমার অন্যায়, অসঙ্গত ও বিরক্তি-জনক নিয়মে তাঁহারা কখনই বাধ্য ছিলেন না,—এখনও বাধ্য নহেন। তুমি আত্মবশ্যতা স্থাপন করিবার জন্য যতই কেন চীৎকার কর না, গ্রন্থকার কোন নিয়মবিশেষের বশবর্ত্তী হইবেন না; কেবল মাত্র 'প্রকৃতি ও প্রতিভার'

* বলা বাহুল্য যে, অধুনা বাঙ্গালা সাহিত্যে যে প্রকৃতির সমালোচনা দেখা যায়, তাহা ইংরেজি সাহিত্যমূলক ও তাহারই অনুকরণ। ইংরেজি সমালোচনার সাময়িক পরিবর্ত্তের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা-প্রণালীও কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে গ্রন্থ রচনা করিবেন।"

গ্রন্থকারের এবংবিধ উক্তিতে সময়ে-সময়ে সমালোচকের আত্মাভিমান স্বভাবতঃই আঘাত প্রাপ্ত হয়। তিনি অধীর ও আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়েন; এবং হয় ত গ্রন্থকারের সহিত অযোগ্য দ্বন্দ্বেও প্রবৃত্ত হ'ন। সমালোচক বলেন;—"সাবধান গ্রন্থকার! সাহিত্যের যাহা কিছু গৌরব, সমস্তই সমালোচক-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে; অতএব সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহারাই যে প্রবল হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সাহিত্য তাঁহাদিগের দ্বারা উন্নীত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। সুতরাং চিরকালই তাঁহাদিগের দ্বারা শাসিত হইবে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহারা যে-কিছু বিধি ব্যবস্থা করিবেন, গ্রন্থকারদিগকে দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা পালন করিতে হইবে। কেহ অবাধ্য হইলে, তাহাকে অধঃপাতের অধস্তলে প্রেরণ করিব। আঃ! গ্রন্থকার! তোমার মত অনেককে সমালোচক দেখিয়াছে;—অনেককে ডুবাইয়াছে। সমালোচকের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদ আভার্থ তোমার ন্যায় অনেককে গৃহমার্জ্জনীর ন্যায় অশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়াও, অনবরত সাহিত্য-সংসারের গৃহ হইতে আঁস্তাকুড়ে, আঁস্তাকুড় হইতে গৃহে 'গতায়াত' করিতেছে। সমালোচক বলিলে তবে ত তুমি 'গ্রন্থকার'; নতুবা তোমার নামেরই অস্তিত্বাভাব। তুমি প্রতিভাবান্‌ই হও, আর স্বাধীন ভাবের দেখ, কখনই সমালোচকের ক্ষমতার অতীত নহ। অতএব অধিক বাক্যব্যয়ের আবশ্যকতা কি? তোমার সাধারণ নামটীও সমালোচকের হস্তে, ইহাই যেন স্মরণ থাকে।"

এই প্রকৃতির বিসংবাদ, নানা আকারে ও ভিন্ন-ভিন্ন পরিচ্ছদে একশ্রেণীর গ্রন্থকার ও সমালোচকের মধ্যে সময়ে-সময়ে দেখা যায়। কখন-কখনও গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সমালোচকের 'সঙ' বাহির করিয়া পরিহাস, রসিকতা ও ব্যঙ্গের ছলে, তাহার নানারূপ লাঞ্ছনা করেন। পক্ষান্তরে সমালোচকও গ্রন্থকারকে ছাড়েন না;—সময়ে-অসময়ে, সুযোগে ও দুর্য্যোগে, গ্রন্থকারের অভদ্রতা 'সুদে আসলে' প্রত্যর্পণ করেন। য়ুরোপীয় সাহিত্যে এরূপ অর্থশূন্য বিবাদের দৃষ্টান্ত আছে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যেও সময়ে-সময়ে গ্রন্থকার ও সমালোচকে সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। আমাদের আধুনাতন অনেক পুস্তক-প্রণেতা সংবাদপত্র ও সমসাময়িকপত্রকৃত "সংক্ষিপ্ত সমালোচনায়" বিশেষ বিরক্ত হইয়া থাকেন। অবশ্য বিরক্ত হইবার কারণও থাকে। কেহ-কেহ এই বিরক্তি মনে মনেই রাখেন, কেহ-বা সময়ে-সময়ে সমালোচকদিগকে বিদ্রূপ করিবার ছলে তাহা প্রকাশ করিয়া, মনের জ্বালা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করেন।* বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের,—অনেকের প্রতি অস্মদ্দেশীয় সংবাদ ও সাময়িক-পত্র সম্পাদকদিগের "অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের" কথা প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে!

* ৫০ বৎসর অতীত হইল "বান্ধব" নামধেয় মাসিকপত্রে এই সম্বন্ধে বড় একটী কৌতুককর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ-লেখক সমালোচকদিগকে নানারূপে বিদ্রূপ করিয়া রসিকতা ও বিদ্রূপের 'ছড়াছড়ি' করিয়াছিলেন। তাঁহার সরস শ্রেণী বিভাগ নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল।

১ম। মারিণ বা কাট ছেঁড়া সমালোচনা। এই সমালোচনায় প্রথমে গ্রন্থের আগা-গোড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লেখকের মর্মস্থলে আঘাত করিতে হয়; লেখকের অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতাকে ভর্ৎসনা করিতে পারিলে আরও ভাল হয়।

২য়। আইরিশ সমালোচনা। ইহাকে সামান্যতঃ "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি" বলে। সমালোচক অজ্ঞানবশতঃ গ্রন্থ না বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে গ্রন্থকারকে গালি দেন, কিন্তু আয়র্লণ্ডের বিষহীন সর্পের ন্যায় তাহাতে লেখকের অঙ্গে আঁচড়টীও লাগে না।

৩য়। কাকতালীয় সমালোচনা। ইহাতে গ্রন্থের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না; শিরস্থানে বা টীকায় গ্রন্থের নামমাত্র ধৃত হইয়া সমালোচনায় সমালোচকের যত কিছু বিদ্যা বুদ্ধি থাকে, সমুদায়ই খরচ করিতে হয়। এরূপ সমালোচনার অধিকাংশ [illegible] দেখিলে।

৪র্থ। স্থানবরণস্পর্শী বা "ঢাকন ঢাকা"। টাইটেল পেজ—বড় জোর বিজ্ঞাপনটী পাঠ করিয়া এরূপ সমালোচনা করা হয়।

৫ম। মাক্ষিক সমালোচনা। মক্ষিকাগণ যেরূপ ক্ষত স্থানেরই অন্বেষণ করে, এরূপ সমালোচনাতেও তদ্রূপ দোষের স্থান খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোষ প্রদর্শন। (টীকা) একপেশে সমালোচনা, ইহাতে স্বসম্পর্কীয় হইলে কেবল গুণ, অপরের পক্ষে কেবল দোষ দেখাইতে হয়।

৬ষ্ঠ। মুরুব্বিগিরি। সমালোচক পক্ষপাতশূন্য না হইয়া গ্রন্থকারকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করেন এবং ভবিষ্যতে গ্রন্থকার তাদৃশ দোষ না করেন, এজন্য তাঁহাকে উপদেশ দেন।

এই শ্রেণীবিভাগ, বিদ্রূপ-প্রিয়তা ও পরিহাস-রসিকতার [illegible] হইলেও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, উহা নিতান্ত ভিত্তিশূন্য নহে। প্রবন্ধ লেখক প্রত্যেক শ্রেণীর সমালোচনার এক একটা "নমুনা" দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠক

গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-সমালোচকের এইরূপ বিরোধ কখন-কখন সাধারণের কিয়ৎ পরিমাণে আমোদজনক হইলেও, তদ্দ্বারা অনেক সময়ে বিষম অনিষ্টোৎপন্ন হইতে পারে। পক্ষান্তরে, গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-সমালোচকে আবার আজকাল আমাদের এখানে এমনতর একটা কুৎসিত সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে, যাহা বড়ই লজ্জাকর ও সাহিত্যের পক্ষে একান্ত অমঙ্গলকর। কিছুদিন হইল, এ সম্বন্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ সম্পাদক আন্তরিক আক্ষেপ করিতেছিলেন।* ফলতঃ, অবস্থা শোচনীয় বটে।

গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-সমালোচকের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয় আমরা যাহা বিবৃত করিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়ের মধ্যে একের তুলনায় অপরের কার্য্যকারিতা ও আবশ্যকতা কোন অংশে ন্যূন নহে। স্ব-স্ব কার্য্যের গুরুত্বানুসারে উভয়েরই সমানরূপ

ইচ্ছা করিলে, উল্লিখিত ছয় প্রকার সমালোচনার দৃষ্টান্ত সংবাদ ও সাময়িক পত্রের "সংক্ষিপ্ত সমালোচনা" ও "সাহিত্য সংবাদ" স্তম্ভ হইতে নিজেই বাহির করিতে পারেন।

প্রবন্ধ-লেখকের কোন কোন কথার সহিত আমাদিগের কিয়ৎ পরিমাণে ঐকমত্য থাকিলেও, তাঁহার সকল কথা আমরা অনুমোদন করি না। বিশেষতঃ তিনি গ্রন্থকারের সহিত সমালোচকের সাধারণতঃ যেরূপ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আদৌ আমাদের সহানুভূতি নাই। তিনি গ্রন্থকারের পক্ষ সমর্থনকারী; সুতরাং কেবল গ্রন্থকারের পক্ষেই 'ওকালতী' করিয়াছেন ও গা-জোরী কথা দ্বারা সমালোচককে গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ অধীন প্রমাণিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন। ইঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে 'বান্ধব'-সম্পাদক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহার কিয়দংশ এই :—"গ্রন্থকারদিগের সহিত সমালোচকদিগের বিবাদ কিসে, আমরা বুঝিতে পারি না। গ্রন্থকারেরা জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের সীমা বিস্তার এবং সেই সঙ্গে ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব করিতে অভিলাষ করেন, সমালোচকদিগেরও ইহাই আন্তরিক অভিলাষ। আমরা প্রস্তাবলেখকের মতে সায় দিয়া গ্রন্থকার-দিগকে শিক্ষক ও সমালোচকদিগকে ছাত্র বলি না। সেইরূপ গ্রন্থকার এক্ষণ অল্পই জন্মে এবং তাদৃশ ব্যক্তি গ্রন্থ প্রকটন করিলে লোকে আপনা হইতেই "স্বাগতং" বলিয়া আদর করিয়া মাথায় তুলিয়া লয়। এইক্ষণ যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে একটা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে, আমাদিগের বিবেচনায়, গ্রন্থকারেরা গ্রামা-ব্যাপারী আর সমালোচকবৃন্দ আড়তদার। গ্রন্থকারেরা সাহিত্যের হাটে মাল পঁহুছান, সমালোচক দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিয়া মাল চালান করেন। গ্রন্থকারেরা তাহা আবার আনিবার সময় আপনা হইতেই বিশেষ সাবধান হইয়া থাকেন। অথবা গ্রন্থকারেরা কুলীন, সমালোচকেরা তাঁহাদিগের কুলাচার্য্য। কে কুলীন কে অকুলীন, কার কুল ভেঙ্গ, কার কুল বাড়িল, তাহা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন।

* সাহিত্য সমালোচনায় নানারূপ জঞ্জাল জড়িত হইয়াছে। উপরোধ, অনুরোধ, ক্রোধ, বিরোধ, সমালোচনায় অনুষঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশে সামান্য তৈলবটে সকল রূপ ব্যবস্থা মিলে, সে দেশে সমালোচনার জন্যও অতি সামান্য তৈলবট ক্রমে-ক্রমে ব্যবস্থিত হইতেছে। এক্ষণ সংবাদপত্রের পিয়নকে পার্ব্বনী দিয়া গ্রন্থকার মহাশয় মনোমত সমালোচনার আশা করেন—প্রিণ্টারের করমর্দ্দন করিয়া আশানুরূপ সমালোচনার ভরসা করেন—যে কোন সংবাদপত্রে গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দিয়া সেই সংবাদপত্রের কঠোর সমালোচনার দায় হইতে নিশ্চিন্ত হয়েন।

সাহিত্য সেবার সহিত অহঙ্কারের কলঙ্ক প্রায়ই একটু-আধটু থাকে; কেবল যে ভবভূতি বলিয়াছেন,—

"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা।"

কেবল যে এস্কাইলস বলিয়াছেন;—

"To time I dedicate"

কেবল যে শেক্সপিয়র বলিয়াছেন;—

"Criticise you may but first purchase"

কেবল যে গোস্বামী ঠাকুর বলিয়াছেন;—

"শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।"

কেবল যে বড় বড় কবি, মহাকবিরা অহঙ্কারী, এমন নহে; অধিকাংশ সাহিত্য সেবকেরই চরিত্রে অহঙ্কারের কলঙ্ক লক্ষিত হয়। এটি গেল সাধারণ কথা। তাহার উপর ইংরেজী শিক্ষায় দেশে একরূপ বিষম অহঙ্কারের স্রোত চালাইয়াছে। সকলেই হাড়ে-হাড়ে পাশ্চাত্য-সভ্যতার দাসানুদাস, অথচ সকলেই মনে করে, আমরা স্ব-স্ব-প্রধান এমন নির্ব্বোধের অহঙ্কার অন্য দেশে আছে কি না জানি না।

সাধারণতঃ সাহিত্য-সেবার সহজ দোষে, বিশেষতঃ এ দেশের শিক্ষার দোষে বঙ্গের প্রত্যেক গ্রন্থকারই মনে করেন 'আমি একজন'। এই সকল "এক-এক জনের" অতি আদরের ধন লইয়া সেই সকলের দোষ-গুণ-পরীক্ষা সমালোচককে করিতে হয়। বড় বাঞ্ছনীয় কাজ নহে, বড় বিষম কাজ। এ কাজে যে সুখ্যাতির প্রত্যাশা করে, সে নির্ব্বোধ। তুমি দেশের পশ্চাতে লাগিয়া আছ—আর তাহারা তোমার সুখ্যাতি গান করিবে,—এ ত নির্ব্বোধের প্রত্যাশা, এ কাযে যে অর্থের প্রত্যাশা করে, সে আরও নির্ব্বোধ। যাহারা দিবারাত্রি কেতাবের দোকানদারের দ্বারস্থ, তাহারা তোমাকে অর্থ সাহায্য করিবে—এ ত ঘোর মূর্খের আশা। * * *

উপরোধে, অনুরোধে, তোষামোদে, খোসামোদে সমালোচকগণের আত্মপ্রসাদরূপ একমাত্র সম্বলটুকু তোমরা নিয়ত নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছ—তবে আবার প্রকৃত সমালোচনার প্রত্যাশা কর কোন্ মুখে?

প্রাধান্য, উভয়ই সমানরূপ শ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের সৃষ্টি, বিকাশ ও উন্নতি, গ্রন্থকার সমালোচক, উভয়েরই কার্য্যের উপর নির্ভর করে। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়ের কেহই পরস্পরে ন্যূন নহেন। তবে যে, সময়ে-সময়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ঘটে, তাহার কারণ এই যে, ইদানীন্তন কালের গ্রন্থকার ও সমালোচক উভয়েই অনেক পরিমাণে অধঃপতিত, উভয়ের মধ্যেই পারস্পরিক বিদ্বেষবুদ্ধি ও আত্মগরিমার আধিক্য এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার অভাব।

তবে যদি সমালোচনা মানে সার্টিফিকেট বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে তাহার একটা দর-বাঁধাবাঁধি কর। বাঙ্গালার শারীরিক স্বাস্থ্যের-অস্বাস্থ্যের সার্টিফিকেটের যেমন হউক একটা দর স্থির হইয়াছে; নাটক নবেলের সার্টিফিকেটেরও একটা দর স্থির হউক না?

আসল কথা—যাঁহারা সমাজচালকরূপে আপনা-আপনি আপনার গৃহকোণে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সমাজের বল বড়ই প্রবল। সমাজ এ হেন যাত্রাকে কেবল বক্তৃতার আড়ম্বর করিয়াছে, এহেন কীর্ত্তনকে বাউলের গীত করিয়াছে, সংবাদপত্রকে বিজ্ঞাপনের রঙ্গস্থল করিয়াছে, আর গ্রন্থাদি সমালোচনা এই সমাজের গুণে আপন দলের সার্টিফিকেট ও বিপক্ষ-দলের কটূক্তি হইয়াছে। সমাজ! তুমি আবার উল্টাইয়া বল, প্রকৃত সমালোচনা দেখ না কেন?

দুই একটি ভাল জিনিস দেশে অঙ্কুরিত মাত্র হইতেছিল; স্বার্থপরতার ও কপটতার যত বৃদ্ধি হইতেছে, সেগুলি তত মুসড়িয়া যাইতেছে। নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা আর নাই বলিলেও চলে।"

নব্যবিভাকর সাধারণী।

মরীচিকা

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ]

(১)

তারও একদিন সুখের দিন গিয়াছে,—চিরদিন তার এমনই ছিল না। সৌভাগ্যের আত্মীয়-পরিজন, দেবোপম স্বামী, গার্হস্থ্য জীবনের সহজ সুখ-শান্তি সবই তার ছিল। আর ছিল,—প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ কালে দেবতার দান—এক শিশু পুত্র।

কালের ধর্ম্মে সংসারের সব জিনিস একে-একে যায়; তাঁরও গিয়াছে। তবে নিষ্ঠুর কাল তাহাকে প্রস্তুত হইবার বড়-একটা অবকাশ দেয় নাই,—নির্ম্মমভাবে এক দিনেই তাহাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছে। বড় দয়া তার,—তাই স্বামীর শেষ স্মৃতি-চিহ্নটুকুর প্রতি তার দৃষ্টি পড়ে নাই।

ভুবন বাঁড়ুয্যে অর্থবান্ না হইলেও বহুমানাস্পদ ছিলেন। দেশ ব্যাপিয়া তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম্মে প্রায়ই তাঁহাকে দেশান্তরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইত। উপঢৌকনাদি যাহা পাইতেন, তাহাতে বৎসরান্তে সমারোহের সহিত ৺শ্রীধর গোপীনাথের দোল করিতেন। সঞ্চয়ের কথা কেহ বলিলে উত্তর দিতেন—"পিতৃপুরুষের দেওয়া ৺শ্রীধরের যে কয় বিঘা জমি আছে, তাহাই যথেষ্ট। তাঁর প্রতি ভক্তি থাকলে, তাঁর কণিকা প্রসাদই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ব্রাহ্মণের পক্ষে সঞ্চয় নিষিদ্ধ।" সহসা একদিন বিদেশে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া পথে অসুস্থ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন। সেই শয্যাই তাঁর শেষ শয্যা হইল। অন্তিম কালে স্ত্রী-পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ৺শ্রীধরের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে-করিতে তিনি পরলোকে গমন করিলেন। তার পরে অশৌচান্ত হইতে-না-হইতে মুন্সেফ আদালতের পেয়াদা আসিয়া ভদ্রাসন-বাটী দখল করিয়া বসিল—কিছুদিন পূর্ব্বে কোন এক বিপন্ন আত্মীয়ের জন্য তিনি জামিন হইয়া আপন ভদ্রাসনখানি পণস্বরূপ রাখিয়াছিলেন,—সে গুণধর আত্মীয় ফেরার হওয়ায় এই বিপদ। শেষে গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগের চেষ্টায় অতি কষ্টে ভদ্রাসনখানির উদ্ধার হইল; কিন্তু নয়নতারা তখন একেবারে নিঃস্ব। একখানি মাত্র স্বর্ণালঙ্কার—তাও তখন গিয়াছে; শ্রাদ্ধ-ব্যয় নির্ব্বাহের কোন সঙ্গতিই রহিল না। অপরে তাঁহাকে সে দায় হইতে উদ্ধার করিল বটে, কিন্তু স্বামীর শেষ কার্য্যের জন্য যে অপরের করুণার উপরই নির্ভর করিতে হইল সেই ব্যথাই তাঁহার প্রাণে বড় বাজিল।

অতি কষ্টে দিন যায়। দেখিতে-দেখিতে দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। শিশু রাধারমণই এখন নয়নতারার একমাত্র অবলম্বন। আধ-আধ স্বরে "মা' 'মা' বলিয়া যখন সে কোলে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে, নয়নতারার কাছে তখন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইয়া সেই একমাত্র কচিমুখখানি ভাসিয়া উঠে,—বিশ্বের সকল আলো সেই কোমল চক্ষুদুটিতে ফুটিয়া উঠে,—সকল সাধ, আশা, সুখ সেই ক্ষুদ্র রক্তাধরপুটে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। আকুল আবেগে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে চাঁদমুখখানিতে ঘন-ঘন চুম্বন করেন, তার পর সহসা চমকিত হইয়া সে মুখখানিকে ভাল করিয়া দেখেন; দেখিতে-দেখিতে আর একখানি মুখের কথা তাঁর মনে পড়ে—চন্দন-চর্চ্চিত, শান্তশ্রীসমুজ্জ্বল, স্নেহ মমতা-কোমল এক দেবতার ছবি তাঁর চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে; তাঁর চক্ষু ছল-ছল করিয়া আসে। মার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া বালকও চঞ্চল হইয়া মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে "মা, কাঁদ্‌ছিস্ কেন? তোর চোখে জল কেন?" তখন আর নয়নতারার ধৈর্য্যের বাঁধ থাকে না,—পুত্রকে বুকে লুকাইয়া অবিরল অশ্রুধারে তার ক্ষুদ্র মস্তকখানি ভাসাইয়া দেন।

দিন যায়,—কোনরূপে মাতাপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন হয়; সম্বল সেই কয়েক বিঘা মাত্র জমি। তাহা হইতেই নয়নতারা স্বয়ং স্বল্পাহারিণী থাকিয়াও, বৎসরান্তে ৺শ্রীধরের দোল করিতেন। বৎসরান্তে সেই একদিন সংযতমনা ব্রতধারিণী নয়নতারা বুঝি জীবনের চরম শান্তি উপলব্ধি করিতেন। সংসারের দুঃখ-দৈন্য, কালের ভ্রূকুটি—সব উপেক্ষা করিয়া বৎসরে সেই একদিন গভীর রজনীতে বুঝি তিনি তাঁর চিরজীবনের, জন্মজন্মান্তরের লোকলোকান্তরের ধ্যেয় দেবতার সহিত যথার্থভাবে মিলিতেন, এবং সে রাত্রির পর সম্বৎসর ধরিয়া পুনরায় তেমন এক রাত্রির অপেক্ষায় থাকিতেন।

দিন যায়,—দেখিতে-দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। গ্রাসাচ্ছাদন ত কোনরূপে চলে; কিন্তু পুত্রের ভবিষ্যৎ? নয়নতারা সে সূচীভেদ্য অন্ধকারে ক্ষীণতম আলোকরেখাপাতও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে একদিন নারায়ণপুরের জমিদার নীলকান্ত গাঙ্গুলী কোন বিষয়কার্য্যোপলক্ষে সে গ্রামে পদার্পণ করিয়া, পরম্পরায় সকল কথা শুনিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাধারমণকে আপনার সহিত লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কথা রহিল, মধ্যে মধ্যে তাহাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। বিদায়ের দিন দরিদ্র জননী সঞ্চিত যৎসামান্য অর্থ হইতে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া পুত্রকে কোলে বসাইয়া আহার করাইলেন; তার পর কতক্ষণ ধরিয়া গৃহদেবতার চরণে প্রণত হইয়া পুত্রের কল্যাণ কামনা করিলেন; পুত্রের শিরে হাত দিয়া কতবার নামজপ করিতে-করিতে অঞ্চল-প্রান্তে চক্ষের জল মুছিলেন। তার পর তাহার বস্ত্রের একপ্রান্তে দুইটি মিষ্টান্ন ও অপর প্রান্তে আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্র বাঁধিয়া দিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"বাবা, তুমি ভাল ছেলে হবে, কেমন?" পুত্রও প্রতিচুম্বন করিয়া উত্তর দিল,—"বাবা ভাল ছেলে হবে।"

(২)

তার পর ছয় মাস অতীত হইয়াছে। নীলকান্ত তাঁর প্রতিশ্রুতিমত রাধারমণকে তার জননীর নিকট পাঠান নাই। নয়নতারার পত্রের উত্তরে জানাইয়াছেন, "আমি অপুত্রক। আমার এ বিস্তৃত জমিদারীর উপস্বত্ব ভোগ করিতে আমার কোন উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান নাই। রাধারমণের প্রতি আমার অপত্যস্নেহ জন্মিয়াছে; তাই মনে করিয়াছি, তাহাকে দত্তক গ্রহণ করিব। তবে, একটা কথা,—আপনি যদি তাহার উপর সমস্ত দাবী ত্যাগ করিয়া তাহাকে স্বেচ্ছায় যথারীতি আমাকে দান করেন, তবেই তাহাকে আমি গ্রহণ করিব; নচেৎ নহে। পুত্র আপনারই, তবে লৌকিকতঃ সে সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব থাকিবে,—এই আমার উদ্দেশ্য। ইহাতে আপনি সম্মত থাকেন, উত্তম; সে ক্ষেত্রে আপনার আজীবন একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিব। অন্যথা আমার লোক আপনার পুত্রকে আপনার কাছে দিয়া আসিবে; কিন্তু অতঃপর তাহার জন্য আমার আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না।"

নয়নতারা স্বামীর নিকট চলনসই লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পত্র পড়িয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন। একদিকে, তাঁর বৈধব্য-জীবনের একমাত্র অবলম্বন,—স্বামীর শেষ স্মৃতি-চিহ্নের প্রতি মমতা; অপর দিকে, পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এ মহাপরীক্ষার দিনে কে তাঁহাকে ভাল-মন্দ বুঝাইয়া দেয়? স্বামীর কথা কতক্ষণ ধরিয়া ভাবিলেন—সে মূর্ত্তি আজ স্পষ্টভাবে মানস-চক্ষে

ফুটিয়া উঠিল না; গৃহ-দেবতার চরণে কতক্ষণ ধরিয়া প্রণতা হইয়া রহিলেন, তবু চিত্তে শান্তি আসিল না। সকলেই যেন আজ দূরে দূরে! ব্যথার ব্যথী, জীবনের বন্ধু কেহ যেন আজ কাছে নাই। দুই দিন, দুই রাত্রি অতল চিন্তা সমুদ্রের মাঝে পড়িয়া তিনি কাটাইলেন. অবশেষে নিষ্কাম স্নেহেরই জয় হইল। নয়নতারা ভাবিয়া দেখিলেন,—দরিদ্রা তিনি, পুত্রের শিক্ষার জন্য তিনি কি করিতে পারিবেন? অজ্ঞান, মূর্খ হইয়া পুত্র যদি পিতৃপুরুষের নাম কলঙ্কিত করে, তাহা হইলে সে পুত্রের মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। স্বামীর পুণ্যবলে আজ যে সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিলে তাঁর স্বামীর স্মৃতিরই অবমাননা করা হইবে। পুত্র ত তাঁরই; সে যখন জ্ঞানী মানী হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তখন সে আত্মপ্রসাদ হইতে কেহ ত তাঁহাকে বঞ্চিতা করিতে পারিবে না! সে গৌরবে স্বামীরই গৌরব বৃদ্ধি হইবে। পরদিন নয়নতারা সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিলেন; এবং তাহার পক্ষান্ত পরেই যথারীতি দানপত্র হইয়া গেল।

(৩)

নয়নতারা প্রথমটা আপনাকে প্রত্যর্পিত-ন্যাস অন্তরাত্মা'র ন্যায় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে বুঝিলেন, সেটা কৃত্রিম ধৈর্য্য মাত্র। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার জীবনের শূন্যতা বাড়িতে লাগিল, ততই তাঁহার তৃষিত মাতৃ-হৃদয় কাতর হইয়া উঠিতে লাগিল। উদাস চিত্তে, শূন্য নয়নে অঙ্গিনার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সমস্ত দিনমান কাটাইয়া দিতেন; নিশীথে পুত্রের শূন্য শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অনিমেষ নয়নে কল্পনায় পুত্রের মুখচ্ছবিখানির প্রতি চাহিয়া থাকিতেন; মাঝে-মাঝে তন্ময়তার মাঝে পুত্রের সে কলকণ্ঠস্বর যেন কাণে আসিয়া পশিত, আর আত্মবিস্মৃতা হইয়া শূন্যকে আলিঙ্গন করিয়া আকুল উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিতেন 'এলি বাবা?' পরক্ষণেই বাস্তব জগতের কথা তাঁহার মনে পড়িত; আর দুই গণ্ড বহিয়া ঝর-ঝর অশ্রুধারা ছুটিত। কখনও বা বুঝি তার প্রত্যাবর্ত্তনের আশায়, সমস্ত দিন ধরিয়া আপন মনে কত আহার্য্য প্রস্তুত করিতেন; তার পর অপরাহ্নে প্রতিবেশিনীদের বাড়ী যাইয়া স্বহস্তে শিশুদের মধ্যে যে আহার্য্য বণ্টন করিয়া দিয়া আসিতেন। তবে তাহাতে প্রাণের শূন্যতা পূরিত না, বুভুক্ষু হৃদয়ের তৃষা মিটিত না।

শেষে, প্রায় বৎসরাধিক পরে, অধীর হইয়া পুত্রকে একবার পাঠাইবার জন্য নীলকান্ত গাঙ্গুলিকে পত্র দিলেন। উত্তরে নীলকান্ত বাবু কিছু বিরক্ত ভাবে জানাইলেন— "আপনার দানপত্র মত লৌকিকতঃ পুত্রের উপর আপনার এখন আর কোন দাবী-দাওয়া নাই। সে এখন আমার পরিবারেরই একজন। তাহার পূর্ব্ব অবস্থা তাহার এখন বিস্মৃত হওয়াই আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি; সেই হেতু আপনার কাছে তাহাকে পাঠান অসম্ভব। আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি এখানে আসিয়া পুত্রকে দেখিয়া যাইতে পারেন।"

পত্র পড়িয়া ক্ষোভে, ঘৃণায় নয়নতারার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িবার উপক্রম হইল। এত বড় সাহস তার যে সে তাঁহাকে অপমান করিতে চায়? হউক অপত্য-স্নেহ, তা বলিয়া নয়নতারা আত্ম-সম্মানে জলাঞ্জলি দিবেন না। পুত্রের প্রতি মায়া যতই বলবতী হউক, স্বামীর বংশমর্য্যাদার কাছে চিত্তের কোন বৃত্তিই ত আর বড় নয়! ৺ভুবন পণ্ডিতের সহধর্ম্মিণী হইয়া একমাত্র পুত্রকে দেখিতেও তিনি বিনা আদরে অপরের গৃহে পদার্পণ করিবেন না। পরদিনই নয়নতারা গাঙ্গুলির দেয় মাসিক বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করিয়া পত্র দিলেন। মনে ভাবিয়া রাখিলেন, পুত্র যেদিন সাবালক হইয়া স্বেচ্ছায় সে কুটীরে জননীর পদধূলি লইতে আসিবে, সেই দিন, যদি তিনি বাঁচিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সহিত পুত্রের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, নতুবা নহে।

সে প্রত্যাখ্যান পত্র পাইয়া নীলকান্ত মনে-মনে হাসিলেন; ভাবিলেন—"ভাল দেখা যাবে,— মায়া বড় কি তেজ বড়!"

৪

দরিদ্র শিশু রাধারমণ জমিদারের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় আসিয়া প্রথমটা কেমন হইয়া গেল। তাহার বিচিত্র চিত্রশোভিত সুবিস্তৃত হল-ঘর, মর্ম্মরমণ্ডিত কক্ষতল, সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী, কারুকার্য্যময় অন্দরমহল, লতাপুষ্প-সমন্বিত মর্ম্মর-মূর্ত্তি-পরিশোভিতা, সুচারু উদ্যান-বাটিকা, তাহাকে যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে আনিয়া উপনীত করিল। তাহার উপর অসংখ্য দাসদাসীর সাগ্রহ সেবা-যত্ন তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল। নূতনত্বের বৈচিত্র্যের

মাঝে পড়িয়া সমস্ত দিন তার বেশ কাটিল। কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার যত গাঢ়তর হইতে লাগিল, প্রাসাদের কক্ষে-কক্ষে শত দীপ প্রজ্জ্বলিত হইলেও তাহার মনের মধ্যে কি যেন অভাব ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। মাতার কোলে ছুটিয়া যাইবার জন্ম তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। স্তব্ধভাবে কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বালক ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ভুবনেশ্বরী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কত আদর সোহাগে তাহাকে ভুলাইতে লাগিলেন। তবু তার সেই এক কথা "আমার মা, আমি মার কাছে যাব।" অবশেষে কাঁদিতে-কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রথম কয়দিন এইরূপে কাটিল, তারপর ক্রমে সে ভুলিতে লাগিল, তবু সে সব ভুলিতে পারিত না। থাকিয়া-থাকিয়া সেই মৃণ্ময় প্রাচীর ঘেরা মৃৎকুটীরখানি, সেই 'বদা' 'মঙ্গলা' 'উমি', সেই 'মিনি' বেড়াল, 'সাবি' গাই, সেই ধূলাখেলা, মায়ের কোল, দুপুর বেলায় মায়ের পাতের ভাত,—সবই তার মনে পড়িত। আর মনে পড়িত—সন্ধ্যার সময় মায়ের সঙ্গে তুলসী তলায় প্রদীপ দিতে যাওয়া; তার পর, তার সন্ধ্যাহ্নিকের পর, ঘরের মেঝেয় আঁচলের উপর শুইয়া, কোলে মাথা দিয়া, কত রূপকথা, কত ঠাকুরদাদার গল্প শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়া! এ অসংখ্য দাসদাসী, এ ষোড়শ ব্যঞ্জন, এ নূতন আদর যত্ন কিছুতেই তখন তাহার মনকে বাঁধিতে পারিত না,—পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় সে তখন হাঁকাইয়া উঠিয়া কাঁদিতে বসিত।

ক্রমশঃ কালের ধর্ম্মে বালক আপনার নূতন জীবনে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। নয়নতারাকে যদিও সে ভুলিতে পারে নাই, তবু এখন সে 'মা' না'হলেও তার দিন চলিয়া যায়। এখন সে ভুবনেশ্বরীকে 'মা' বলিয়াই ডাকে, তাঁহার বেশ পরিপাট্য দেখিয়া আর বলে না—"তোমার গায়ে অত গয়না, তোমায় মা বল্‌ব কেন?"

নীলকান্তের যত্নে, গৃহিণীর আদরে, দাস-দাসীর সেবায়, রাধারমণ নধরকান্তি হইয়া ক্রমে-ক্রমে দশম বর্ষে পদার্পণ করিল। তখনও তাহার বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাতমাত্র হয় নাই। কেহ সে বিষয়ে অনুযোগ করিলে, নীলকান্ত বলিতেন,—"বাপু হে, জমিদারের বংশধর, তাকে ত আর বি-এ, এম্-এ, পাশ করে সরকারের ঘানিতে কাঁধ দিয়ে অন্নসংস্থান করতে হবে না; তবে এখন এত তাগাদা কেন? একটু বড় হোক্, মাথাটা জমাট বাঁধুক, তখন লেখাপড়া আরম্ভ করলেই চল্‌বে। মোটামুটি একটা জ্ঞান দরকার—এই ত? তার ঢের সময় পড়ে আছে।"

আরও দুই বৎসর কাটিলে, নীলকান্ত কলিকাতা হইতে একজন এম্-এ পাশ প্রাইভেট টিউটর আনাইয়া রাধারমণের শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। রাধারমণ মেধাবী,—পিতার স্ফুলিঙ্গ পুত্রেও বর্ত্তমান ছিল; তাই কয়েক বৎসরের মধ্যে সে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল—রাধারমণ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার জেলার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। নীলকান্ত বলিলেন—"ব্যস্, জমিদারের উত্তরাধিকারীর আর উপাধি-পরীক্ষায় কাজ নাই। একটা ত পাশ হল; এইবার বাড়ীতে বসে' যত ইচ্ছা পড়ুক, জ্ঞান উপার্জ্জন করুক, সঙ্গে-সঙ্গে জমিদারীর কাজকর্ম্মও শিখুক।"

গৃহিণীও সে কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "আর পড়া মানে ত কলকাতায়? সে যাদু-বিদেশে বাছাকে আমি পাঠাবো না।" কিন্তু রাধারমণ সে যুক্তির সহিত একমত হইতে পারিল না। পরীক্ষা দিতে যাইয়া, একপক্ষ-কাল কলিকাতায় কাটাইয়া আসিয়া, সেই মহানগরীর মাঝে গৃহশিক্ষক নরেন্দ্রনাথের সহিত মুক্তভাবে ঘুরিয়া, একটা নূতন চেতনায়, নূতনত্বের আস্বাদে তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাই সে নরেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিতে বসিল।

নরেন্দ্রনাথও তাই চায়। সে শুধু মাসিক পঞ্চাশ মুদ্রার লোভে সুদূর পল্লীগ্রামে গৃহ-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে নাই; অন্ততঃ, তাহার মনে অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকিলে, সে এতদিন ধরিয়া সে পদে ব্রতী থাকিত না। নীলকান্ত অচল, অটল। অবশেষে সকলের অনুরোধে-উপরোধে তিনি সম্মত হইলেন। ভুবনেশ্বরী কিন্তু বলিলেন,—"তুমি যাই বল, ও মাষ্টারকে আমার ভাল বলে মনে হয় না।" নীলকান্ত হাসিয়া বলিলেন,—"ঐ সব তোমার মেয়েলি কথা। মাষ্টার ত নিজে থেকে কোন দিন আমায় এ বিষয়ে কোন কথা বলে নি। আর, কলকাতায় যায়ই যদি, তা' হলেই কি ছেলে গোল্লায় যাবে? তা'হলে ত' দেশে একটাও

বড়লোক জন্মাত না। তারা সবই ত' প্রায় কলকাতার পোড়ো। সঙ্গে মাষ্টার থাকবে, কর্ম্মচারী থাক্‌বে,—ভয় কি?" কিন্তু ভুবনেশ্বরীর মন তবু বুঝিল না। কি জানি কি ভবিষ্যদাশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত চঞ্চল উঠিল।

কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ, জনৈক কর্ম্মচারী এবং দাসদাসী-সহ রাধারমণকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইল। রাধারমণ প্রেসিডেন্সিতে ভর্ত্তি হইল; বাসা হইল রামবাগানে।

(৫)

ফার্ষ্ট আর্টস্ এবং বি-এর চারি বৎসরে রাধারমণ পাঠ্য অপাঠ্য অনেক পুস্তক পড়িল; ত্যাজ্য গ্রহণীয় অনেক ভাব জীবনে বরণ করিয়া লইল; 'অন্ধকারে'র মধ্যে অনেক 'আলোকে'র সন্ধান পাইল। জীবন-ধর্ম্মে নিষ্ঠার শিক্ষা না হইতেই অনেক prejudice বর্জ্জন করিতে শিখিল; চিত্তের ভিত্তি দৃঢ় না করিয়াই সার্ব্বভৌমিকত্ব প্রচার করিতে বসিল; ধর্ম্মাধর্ম্মের, পাপপুণ্যের পার্থক্য অনুভব করিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি হারাইতে শিখিল। ফলে, কলেজের জ্ঞানার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নৈতিক জীবনের ভিত্তি ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল।

সে দিন শনিবার। বি-এ পরীক্ষার আর কয়েক মাস মাত্র বিলম্ব আছে। রাধারমণ দ্বিতলে আপনার কক্ষে বসিয়া তন্ময় চিত্তে 'মেঘদূত' পড়িতে পড়িতে কবি-কল্পনা-স্বপ্নে কখন্ মগ্ন হইয়া গিয়া, 'আধ স্বপনে, আধজাগরণে' বিরহিণী যক্ষ-বধূর ছবিখানি মানস চক্ষে দেখিতেছিল, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ আসিয়া ডাকিল—"রাধারমণ!"

রাধারমণ চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহার চক্ষে স্বপ্নের মাধুরী লেখা! নরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সেটুকু এড়াইল না; সে হাসিয়া বলিল,—"পড়ছিলে, না কি ভাবছিলে?" ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া রাধারমণ উত্তর করিল—"দুই ই। পড়তে-পড়তে আত্ম-বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম।" "এমনই কবির সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি! আর, কবির কবিত্বের পরিচয় এইখানেই। সর্ব্বদেশে, সর্ব্ব কালে, সকল জাতির মানবের চিত্ত যিনি অধিকার করতে পারেন, তাঁরই লেখনী সার্থক। তবে সে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অনুভূতির অধিকারী সকলে হয় না। বর্ষার জল ত' সম-ভাবেই সর্ব্বত্র ঝরে, তা'তে লতারই শ্যামলতা বাড়ে, প্রস্তর-খণ্ডের কি?" "ভাল বুঝ্‌লাম না। বর্ষার শুরু গাম্ভীর্য্যের মধ্যে যে একটা অপূর্ব্ব চেতনা আছে, তার সাড়া কি প্রস্তর-খণ্ডে গিয়া কখনও পৌঁছায় না?" "পৌঁছাইতে পারে, কিন্তু ফল বড় হয় না। এই ধর না আমারই কথা। আমিও ত একদিন ও-কাব্য পড়েছি; কিন্তু কাব্য হিসাবে তোমার মত তন্ময় হয়ে কি কোন দিন পড়বার ইচ্ছা গেছে?" "তা' যাক্ সে কথা; বলছিলাম কি—আজ পড়াশুনা থাক্, চল একটু থিয়েটার দেখে আসি।" "থিয়েটার?—কেন?"

"সে কি! থিয়েটারের নামে এত চঞ্চল হও কেন? prejudice তোমার এখনো গেল না? থিয়েটার যদি এতই মন্দ হবে, তা হলে কি আমি তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাই? তোমার শত শত কল্পনা সৃষ্টির চেয়ে একটা যথার্থ নাটকাভিনয়ের মূল্য কত, জান?" রাধারমণ কতক্ষণ কি ভাবিল; শেষে বলিল,—"আচ্ছা, চলুন।"

থিয়েটারে পৌঁছিতে তাহাদের কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। উভয়ে যখন আসিয়া ষ্টেজের দুখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল, তখন একটা অঙ্ক শেষ হইয়া গিয়াছে। রাধারমণের এই প্রথম অভিনয় দর্শন, অপেরাও বেশ 'জমাট' ধরণের ছিল। দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, সুকণ্ঠী যুবতী অভিনেত্রীর নৃত্য কলা চাতুর্য্য সবই অপূর্ব্ব। রাধারমণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সমস্ত ক্ষণ অভিনয় দর্শন করিল; শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িয়া যাইবার পর নরেন্দ্রনাথের আহ্বানে সে বহুচালিত পুত্তলিকাবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও তাহার চক্ষে একটি বেদনা-কাতর মুখ, দুইটি 'সজল কাজল আঁখি' জাগিতেছিল; আর থাকিয়া থাকিয়া মানস শ্রবণে সেই 'আঁধারে রাখিবে যদি কেন আলো দেখালে'র সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল। বাসায় ফিরিয়া রাধারমণ সে রাত্রে শুধু তাহাই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

পর সপ্তাহের শনিবারে রাধারমণ আপনা হইতেই থিয়েটারে যাইবার প্রস্তাব করিয়া বসিল। নরেন্দ্র বলিল—"বেশ, ত' চল। কি জান, মাঝে-মাঝে braintার একটু recreation দরকার,—একটু freshen করে নেওয়া ভাল।"

এইরূপে ৩|৪ সপ্তাহ চলিল। কর্ম্মচারীটি তখন কর্ত্তব্যবোধে, এবং কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া, নীলকান্তকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করিল। পত্র পাইয়াই নীলকান্ত রাধারমণের সহিত

নরেন্দ্রনাথকে বাড়ী ফিরিবার আদেশ করিলেন। উত্তরে নরেন্দ্রনাথ জানাইল—"পরীক্ষার সময় সন্নিকট। এখন রাধারমণের নির্জ্জন পাঠের বিশেষ প্রয়োজন। আমার মতে এখন তাহার দেশে যাওয়া সমীচীন হইবে না।" নীলকান্তের সন্দেহ গাঢ়তর হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি স্বয়ং কলিকাতায় রওনা হইলেন, এবং একমাসের মাহিনা পুরস্কার স্বরূপ দিয়া মাষ্টারকে বিদায় দিয়া, রাধারমণকে লইয়া দেশে ফিরিলেন; গৃহিণীকে বলিলেন—"ছেলের বিয়ে না দিয়ে আর তাকে পরীক্ষা দিতে সেখানে পাঠাব না।" ভুবনেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন—"কাঙ্গালের কথা, এখন বুঝেছ ত'?" পক্ষকাল পরে পাত্রী-নির্ব্বাচনও হইয়া গেল, কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধ অন্যরূপ। সহসা দশ দিনের জ্বরে নীলকান্ত স্বর্গারোহণ করিলেন, এবং তাহার অনতিকাল পরেই গৃহিণীও স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন। দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে, ঘটনার ফেরে, সুবিস্তৃত নারায়ণপুর পরগণার একমাত্র উত্তরাধিকারিত্ব রাধারমণে অর্শাইল। সেবার আর তাহার পরীক্ষা দেওয়া ঘটিল না।

(৬)

সংসারের অবলম্বন পালক-পিতা-মাতাকে অকস্মাৎ হারাইয়া রাধারমণের জীবনের মুক্ত-গতি সহসা বাধা প্রাপ্ত হইল। জমিদারীর কার্য্য সে কোন দিন শিক্ষা করে নাই; সে বিষয়ে কখনও তাহার আগ্রহও ছিল না। জমিদারীর মালগুজারী, আদায় তহশিল, সদর খাজনা, ইত্যাদি কিছুরই সম্যক পরিচয় সে এতদিন রাখে নাই; তাই এখন হইতে সে প্রত্যহ নিয়মিত রূপে কাছারীতে যাইয়া বসিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ রামশরণ চক্রবর্ত্তী দুই-পুরুষের সদর-নায়েব,—সংসারে তাঁর কোন বন্ধন ছিল না। মাসিক বিংশমুদ্রার বিনিময়ে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন সেই জমিদারীর কার্য্যে উৎসর্গিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষায় ও আগ্রহে রাধারমণ কিছুদিনের মধ্যে আপন জমিদারী সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া লইল। বৃদ্ধকে একদিন বলিল—"কুড়ি টাকায় আজীবন কাটালেন, এখন থেকে আপনি আরও কুড়িটাকা করে নেবেন।" "না, বাবা!" বৃদ্ধ রামশরণ শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন—"ঐ অপরাধটি কোরো না। কর্ত্তামশায় কতবার ও-কথা বলেছিলেন - অনেক করে তবে তাঁকে নিরস্ত করেছি। আমার একটা পেট—এতেই খুব চলে যায়। ছেলেপিলে, ধনদৌলত, গর্ব্ব-মান সবই আমার তোমাদের এই জমীদারী; আজন্ম-কাল ছেলের মত একে লালন-পালন করে এসেছি। একে বজায় রেখো, এর উন্নতি কোরো—সেই আমার পুরস্কার।" রাধারমণ নির্ব্বাক-বিস্ময়ে বৃদ্ধের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কয়েক বৎসর কলিকাতার চাকুরীজীবীদের সংসর্গে আসিয়া, চাকুরীকে 'দিনগত পাপক্ষয়' বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল; প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধকে সে শুধু বাহ্যিক আদান-প্রদান বলিয়াই জানিত; তাহা হইতে যে এমন একটা প্রাণের টান জন্মে, সে জ্ঞান পূর্ব্বে তাহার হয় নাই। আজ তাহার চক্ষু ফুটিল; কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ধীর স্বরে সে বলিল—"আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তাঁহাদের কীর্ত্তি-চিহ্ন বজায় রেখে যেতে পারি।" বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিলেন "বাবা, তুমি চিরজয়ী হও, লক্ষ্মী তোমার ঘরে অচলা হোন্‌।"

মাসকতক পরে কিন্তু রাধারমণের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সেই প্রতিদিনের 'একঘেয়ে' কাজ, সেই নালিশ-সালিশ, প্রজাবিলি, উচ্ছেদের মামলা, সেই বৈষয়িক কূটনীতি তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সে তখন কিছুদিনের মত একবার কলিকাতা ঘুরিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিল। রামশরণ কিছু শঙ্কিত হইলেন; তবে এখন মাষ্টার কাছে নাই, এই যা ভরসা!

জননী নয়নতারাকে রাধারমণ অনেকদিন পূর্ব্বেই ভুলিয়াছিল। বহুপূর্ব্বশ্রুত বাঁশরীর শেষ সুরের ন্যায়, অতীত স্বপ্নের ছায়ার ন্যায়, কখন-কখন তাহার মনে সে সব বাল্য স্মৃতি জাগিয়া উঠিত মাত্র। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবার, বা অন্য কাহারও তাহার কাছে সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার অধিকার ছিল না। নীলকান্ত সে বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ফলে, যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহাই ঘটিল। আজ বৃদ্ধ রামশরণ সে কথা তুলিতে অভিমানাহত স্বরে রাধারমণ উত্তর দিল—"আপন সন্তানকে যিনি বিলিয়ে দেন, তাঁর সঙ্গে সন্তানের আর কি সম্বন্ধ? আমি ত তাঁর কাছে মৃত হয়েই আছি। কই তিনি ত আমাকে দেখতে এলেন না - শ্রাদ্ধের কাজেও না।" "তিনি এখনও তীর্থে রয়েছেন। না থাকলেও, আমি তাঁর মন জানি, তুমি নিজে তাঁকে আনতে না গেলে, তিনি আসবেন না।" "কেন?" "আমি

যতদূর বুঝি—অভিমানে, বংশ-মর্য্যাদার জন্য।" "ভাল, তবে তাই নিয়েই তিনি থাকুন।" বলিয়া রাধারমণ উঠিয়া গেল।

কলিকাতায় আসিয়া রাধারমণ সৌভাগ্যক্রমে রামবাগানের সেই পুরাতন বাসা পাইল। দিনকতক নিশ্চিন্তভাবে ঘুরিয়া ভূতপূর্ব্ব বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া তাহার বেশ কাটিল; কিন্তু চিত্তের নিঃসঙ্গ ভাব তাহার গেল না। কয়দিন হইতে কি যেন-একটা অভাব, কি-যেন-একটা বেদনা তাহার প্রাণের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। শেষে একদিন সে ভাবিল—"দূর হোক ছাই, ভাল নাটক দেখে একদিন না হয় থিয়েটার দেখেই আসি, মনটা ত তাতে ভাল থাক্‌বে।"

সেদিন "শ্রীনাস" থিয়েটারে বড় ভিড়। একখানা নূতন নাটকের প্রথম অভিনয়-রজনী। ষ্টলের টিকিট একখানাও নাই, অর্কেষ্ট্রা ষ্টলে মাত্র ৫।৬ খানা চেয়ার তখনও খালি আছে। রাধারমণ তারই একখানা টানিয়া লইয়া বসিল। প্রথম অঙ্ক হইতেই অভিনয় বেশ জমাট বাঁধিয়া গেল। রাধারমণ মুগ্ধের ন্যায় বসিয়া জীবনের শূন্যতার মাঝে কোন্ এক স্বপ্নের কুহক, অপূর্ব্ব নন্দন-কানন রচনা করিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল—এই অভিনেত্রী কি বারনারী? এই বিনম্রা, ক্ষমাশীলা, অপূর্ব্ব ধৈর্য্যশালিনী মহিমময়ী রমণী—এ কি ধর্ম্ম-ভ্রষ্টা? এই সরলা, ভক্তিবিহ্বলা, স্বামিগতপ্রাণা সতী,—এ কি পতিতাদেরই একজন? না, না, তা বুঝি কখন নয়! এ ত ধূলিধূসরিতা, পঙ্কমলিনা নয়—এ যে নমস্যা!

কখন যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে, দর্শকবৃন্দ একে-একে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার লক্ষ্য নাই; এমন সময় সহসা পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল—"রাধারমণ!" সে কণ্ঠস্বর সুপরিচিত। রাধারমণ চকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল—নরেন্দ্রনাথ। "মাষ্টার মশাই?" বলিয়া অভিবাদন করিয়া রাধারমণ উঠিয়া দাঁড়াইল—"কেমন আছেন?" "মন্দ নয়। তার পর, তুমি কলকাতায় এলে কবে?" নরেন্দ্রনাথ কতক-কতক সংবাদ রাখিত। অবশিষ্ট যাহা কিছু জানিবার ছিল, ক্রমশঃ প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইল। কথা বলিতে-বলিতে উভয়ে রাজপথে আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইতেই আকাশে মেঘ জমিয়া ছিল, সহসা প্রবল বেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। নরেন্দ্রনাথ বলিল—"বৃষ্টিটা ধরুক; ততক্ষণ চল একটু থিয়েটারের ভিতর গিয়ে বসা যাক। ম্যানেজার অতি সজ্জন ব্যক্তি, আমার অনেক দিনের বন্ধু। আমার মুখে তোমার কথা শুনে সে দিন তোমাকে দেখবার জন্য বড় আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন।" রাধারমণ দু'একবার ইতস্ততঃ করিল। কিন্তু বৃষ্টির বেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল; সুতরাং আর উপায়ান্তর রহিল না—উভয়ে ছুটিয়া আসিয়া ম্যানেজারের কক্ষে প্রবেশ করিল। সেখানে তখন দু'একজন অভিনেতা এবং প্রধানা অভিনেত্রী বৃষ্টির জন্য যাইতে না পারিয়া, বসিয়া-বসিয়া গল্প করিতেছিল। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি আগন্তুকদ্বয়ের উপর নিবদ্ধ হইল। ম্যানেজার তাড়াতাড়ি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন—"নরেন্দ্র বাবু যে! আসুন, আসুন। বরুণদেবের তাড়া খেয়ে বুঝি? সঙ্গে ইনি—"

নরেন্দ্রের অপাঙ্গে একটা উদার ইঙ্গিত খেলিয়া গেল। সে বলিল—"ইনিই রাধারমণ বাবু, নারায়ণপুর পরগণার বর্ত্তমান জমীদার—আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র।"

"আসুন, আসুন, বড় সৌভাগ্য আমাদের—" বলিয়া ম্যানেজার রাধারমণের করমর্দ্দন করিয়া তাহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন। এ-কথা সে কথার পর কুমুদিনী সহসা প্রশ্ন করিল—"অভিনয় আপনার কেমন লাগল?"

রাধারমণ মুখ তুলিয়া চাহিল। সেই অভিনেত্রী, সেই প্রেমবিহ্বলা পতিপ্রাণা নায়িকা! বলিল—"অতি সুন্দর! বিশেষতঃ আপনার অভিনয়। আমি আজ জীবনে যা পেয়েছি, বুঝি লক্ষবার বইখানা শুধু পড়লে তা' পেতাম না।"

"সেটা আপনার অনুগ্রহ। তবে এটা ঠিক যে, যদি প্রতি রাত্রে আপনার মত একজন শ্রোতা পাই, তা' হলে অভিনয়ে একটা নূতন চেতনা আসে। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে আমি লক্ষ্য করেছি; আপনার তন্ময়তা দেখে অভিনয়টা আজ সার্থক বলে মনে হয়েছে।"

এই রমণীই পরনারী? মহাকবিরা বলেন,—'সৌন্দর্য্য পুণ্যেরই ছবি।' তা যদি, তবে এও কি নিষ্কলঙ্কা নয়? বাহ্যিক আচার ব্যবহারের অন্তরালে ইহার অন্তরতম, অন্তরখানি কি শুভ্র স্নিগ্ধ কুসুমের ন্যায় ফুটিয়া নাই? ইহার সংস্পর্শে জীবন কি উন্নত, উজ্জ্বল, ধন্য হইয়া উঠে না? জীবনের সকল অভাব, সকল দৈন্য কি এমনই ছুটি-

সুকোমল নয়ন-পল্লবের স্নিগ্ধ দৃষ্টির মাঝে ডুবিয়া যায় না? এমনই এক পূর্ণোন্নত বক্ষের মাঝে—'লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মদলের' মধ্যে—আপনাকে লুকাইয়া জীবনের সব অতৃপ্তি কি মিটে না?

রাধারমণ! ন হি, ন হি,—পিচ্ছিলঃ পন্থা!

বৃষ্টি থামিলে রাধারমণ উঠিল। কুমুদিনী বলিল—"আপনার সঙ্গে আলাপে সুখী হলাম। যখন সুবিধা হবে দয়া করে আসবেন।" ম্যানেজারও সে কথায় সায় দিল। রাধারমণ কুমুদিনীর প্রতি একবার চাহিল—কি গভীর অতৃপ্তিভরা সহানুভূতি-ভিক্ষু সে দৃষ্টি! সেই দৃষ্টিই যেন উত্তর দিল—"আসব।"

(৭)

জ্যোৎস্নাপ্লুত নিশীথ রাত্রি। থিয়েটারবাড়ীর ছাদের উপর রাধারমণ কুমুদিনীর সহিত একান্তে বসিয়া ছিল। তখনও অভিনয় চলিতেছিল, তবে শেষের নাটকে কুমুদিনী কোন ভূমিকা ছিল না। রাধারমণ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল—"দেখ কুমুদিনী, এ অবলম্বন ছেড়ে দাও। আবার নূতন করে শান্ত পবিত্রভাবে জীবন আরম্ভ কর। তোমার কি সে ইচ্ছা হয় না?"

"হয় বটে, খুবই হয়। কিন্তু বিচারের দোষে যে ডাল আপনার হাতে কেটেছি, সে ডাল ত আর গাছে জোড়া লাগে না।"

"সে ডাল ত একেবারে শুকায় নি; তাতে এখনও শ্যামলতা আছে, রস আছে। আপনার পায়ে আপনি দাঁড়িয়ে প্রাণের উৎস ধারায় তাকে বাঁচিয়ে রাখ, লালসার বহ্নিতে, কামনার তাপে তাকে নষ্ট কোরো না।"

কুমুদিনী একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল; বলিল—"রাধারমণ বাবু, আমাদের প্রাণেও নারীত্বের অভাব জাগে; কিন্তু তা বুঝে কয়জন? এই বিলাস-বিভ্রমের অন্তরালে যে এক তৃষিত হৃদয় যথার্থ সহানুভূতির বারিবিন্দুর আশায় লালায়িত হয়ে থাকে—সে অনুভব কার থাকে? আমরা ভ্রান্ত, কিন্তু সে ভ্রান্তির পথে প্রথমে আমাদের টানে কে? সে ভ্রান্তির মাঝে চিরদিন আমাদের ডুবিয়ে রাখে কে? জীবনের নরক-বহ্নিতে চিরদিন ইন্ধন যোগায় কে? সে আপনারা—পুরুষেরা।" রাধারমণ মুখ অবনত করিল। কুমুদিনী বলিতে লাগিল—"যে আসে সে বাহির নিয়েই চলে যায়, অন্তর চায় না। আমরা শুধু তাদের উপভোগের সামগ্রী, লালসা-বহ্নির আহুতি মাত্র! তাই যৌবন-কুহকের ছোট-ছোট শিকড়ে যতদিন রস টানে, ততদিনই এ গাছের জীবন। মহাজীবনের ফল্গুধারাস্রোত থেকে রস টানবার মূল শিকড় এর জন্মে না, থাকে না; সাধ থাকিলেও সাধনার অবকাশ সে পায় না।" হায় অভাগিনী নারী! এত শিক্ষা, এত আকুলতা লইয়াও তোমার মুক্তি হয় না? রাধারমণ তাই ভাবিতেছিল। সহসা কুমুদিনীর হাত দুখানি আপনার হাতের উপর তুলিয়া লইয়া সে বলিয়া উঠিল—"দেখ কুমুদিনী, আমি ভেবেছি, এভাবে আর তোমাকে থাকতে দেবো না। আমি তোমার কেহ নই বটে, তবু বন্ধুত্বের অধিকারের দাবী করেই এ কথা বলছি। আমার অর্থের অভাব নেই, তোমার যা খরচ-পত্র লাগে, আমি দেবো; সৎপথে থেকে তুমি আবার নূতন করে জীবন আরম্ভ কর। একজনারও মুক্তির যদি নিমিত্ত কারণ হতে পারি, তা হলে বুঝব—আমার জীবন সার্থক। আমার সে আত্ম-প্রসাদের তুলনা স্বর্গলাভেও হবে না। আমার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কোরো না।" কুমুদিনী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। তার পর সজল কৃষ্ণতার চক্ষু দুইটি রাধারমণের মুখের দিকে ফিরাইয়া কম্পিত স্বরে বলিল—"রাধারমণ বাবু, আপনার বড় দয়া। এভাবে একদিনও কেউ আমার কাছে আসে নি। আপনার কথায় আজ আমি জীবনে এক নূতন আলো দেখতে পাচ্ছি। আপনার উপদেশই শিরোধার্য। কিন্তু হঠাৎ কিছু করব না। আরও কিছুদিন আমাকে এর মধ্যে থাকতে হবে; মনটাকে ক্রমশঃ পোড় খাওয়াতে হবে, নইলে সে শক্ত হবে না।" "ভাল, আমি আবার এক সপ্তাহ পরে আসব।" বলিয়া রাধারমণ উঠিল। কুমুদিনী বলিল—"তবে একটা কথা। যদি তাই হয়, তা হলে নিজের জন্য আমি অন্যের উপর নির্ভর করতে চাই নে। আমার যে অর্থ আছে, তাতেই আমার একরকমে কেটে যাবে।" রাধারমণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। অভিমানাক্ত স্বরে বলিল—"আমি তা জানি। কিন্তু সে অর্থ নিজে না নিয়ে, ভবিষ্যতে কোন সৎকাজে সেটা খরচ কর, এই আমার ইচ্ছা। পর কি চিরদিনই পর থাকে, কখনও আপনার হয় না? আমারও যে অর্থ সে ত পরের—পরই আমাকে আপন করে

তার সমস্ত ঐশ্বর্য্য আমাকে দিয়ে গেছে। আমায় নীচ ভেবো না, এতে আমার কোন হীন স্বার্থ নেই। তোমার ভাল দেখে আমার সুখ, তুমি সৎপথে থাকলে আমার গর্ব্ব —তাই এ কথা বলি; নইলে, সত্যই ত, আমি তোমার কে?" একটা গভীর সুখ-বেদনার ধারা কুমুদিনীর চক্ষের উপর দিয়া তরঙ্গে-তরঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল; এক অপূর্ব্ব শান্ত-শ্রীর ছায়া তাহার মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া আসিল। মনে মনে সে ভাবিল—"জানি না তুমি আমার কে! কে তুমি দেবতার মত এ জীবনে এলে! বুঝি তুমি জন্মান্তরের কেউ!" রাধারমণ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে মুখের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল; তার পর সহসা চকিত হইয়া সোপানশ্রেণী দ্রুত অতিক্রম করিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রনাথ অলক্ষ্যে অপেক্ষা করিতেছিল। রাধারমণ চলিয়া গেলে কুমুদিনীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হ'ল? পারলে, না ফস্কে গেল?" কুমুদিনীর চক্ষে তখন এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন মাধুরীর ছায়া! সে বলিল "নরেন্দ্র বাবু, আমায় মাপ করবেন। আমায় দিয়ে তার কোন অনিষ্ট সাধন হবে না।" "কারণ?" বলিয়া নরেন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুমুদিনীর মুখের প্রতি চাহিল। "কারণ? কারণ—কৃতজ্ঞতা; কারণ মানবে দানবে পার্থক্য কিসে, তা আজ বুঝতে পেরেছি; কারণ—এ ক্ষেত্রে আমার সে প্রবৃত্তি নেই।" কুমুদিনী আর সেখানে দাঁড়াইল না। নরেন্দ্র কতকটা দমিয়া গেল। এতদিন ধরিয়া উর্ণনাভের ন্যায় যে তন্তুজাল সে রচনা করিয়া আসিতেছে, তাহা আজ একটা sentimental স্ত্রীলোকের দ্বারা ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তবু সে হতাশ হইল না। কুমুদিনীকে হাতে রাখিতেই হইবে।

সপ্তাহান্তে রাধারমণ কুমুদিনীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিল। কুমুদিনী বলিল—"আরও একমাস আমাকে সময় দিন। সঙ্কল্প আমি করেছি; কিন্তু রমণীর মন, তার গতি কোন্ দিকে, এখনও ভাল করে বুঝতে পারি নি।" "ভাল, তাই হোক্! এর মধ্যে আর আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না। কিন্তু প্রলোভনের মধ্যে থাকা কি ঠিক হচ্ছে বলে মনে কর?" কুমুদিনী সে কথার কোন উত্তর দিল না। সে রাধারমণকে পরীক্ষা করিতেছিল।' সে চক্রান্ত নরেন্দ্রনাথের; কিন্তু তার মনে সম্পূর্ণ পৃথক উদ্দেশ্য ছিল। মাসান্তে সাক্ষাতের সময় কুমুদিনী রাধারমণকে বলিল—"থিয়েটার কোম্পানীর সঙ্গে এখনও আমার এক মাসের চুক্তি আছে, তার আগে তারা আমায় ছাড়তে চায় না।" "ভাল, তারা যা ক্ষতিপূরণ চায় আমি দেবো।" নরেন্দ্রও তাই চাহিতেছিল। কিন্তু কুমুদিনী অন্য পথে গেল; বলিল "কিন্তু আমি কে যে, আমার জন্য অত ক্ষতি স্বীকার করবেন? সে টাকা ত অন্য অনেক সৎকাজে ব্যয় করতে পারেন।" রাধারমণ এ উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। এ বিদ্রূপে তাহার চিত্ত আহত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া সে বলিল—"সত্যই তুমি কেউ নও, তবু জানি না কেন আমার এ চেষ্টা!" "রাধারমণ বাবু, কয়লার সংস্পর্শে হাত কালোই হয়। আমার সংস্রবে থেকে কেন আপনি লোকের কাছে কলঙ্ক কিনবেন?" "এতে যদি কলঙ্ক হয়, সে কলঙ্ক আমি মাথায় করে নিতে স্বীকৃত আছি।" "কিন্তু সমাজ তাতে স্বীকৃত হবে না।" "সমাজ টাকার বশ।" "ভাল, বিবেক ত' তা' নয়!" "আমি বিবেকের বশেই বলছি।" "সে ভ্রান্ত বিবেক; কামনার টান মাত্র! সেইটাকেই আমরা সময় সময় বিবেক বলে দোহাই দিই।" "বুঝলাম না।" "তবে বুঝিয়ে বলি। এই যে আমার জন্য আপনার চেষ্টা, এটা কি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ? এর কোথাও কি কামনা বাসনার টান লেশমাত্র নেই? এটা কি শুধুই একটা স্বতঃ উৎসারিত করুণা, একটা গভীরতম নিঃস্বার্থ সহানুভূতির উচ্ছ্বাস মাত্র? সংসারের দুদিকই আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী দেখেছি, তাই ভয় হয়।" রাধারমণ স্তব্ধভাবে কতকক্ষণ বসিয়া রহিল। গভীর নিঃস্বার্থ সহানুভূতি—তাই কি? বিচারকের সূক্ষ্মতম দৃষ্টি লইয়া সে ত এতদিন আপনার চিত্তের ভাব পরীক্ষা করে নাই! এই যে করুণা, ইহাকে সে আখ্যা বুঝি সে দিতে পারে না। যে মহাপ্রাণতা, চিত্তের প্রশস্তি—বুদ্ধ-ঈশা-চৈতন্যের ছিল, তাহার তাহা কই? যাহার নিজের মুক্তি নাই, সে পরকে মুক্তি দিতে চায় কিসে? তাই ভাবের বশে যাহাকে সে উচ্চে তুলিতে চায়, সাধনার অভাবেই বুঝি তাহাকে অজ্ঞাতসারে ক্রমে আপনার জীবনের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনে, এবং তাহাতে বাধা পাইলেই সমস্ত জীবন তার এত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে! অবশেষে সে

উত্তর করিল—"তাই যদি হয়, তাতেই বা কি? আমার চিত্তে যদি কোন দৌর্ব্বল্য আসে, তুমি তা' দূর করে দিয়ো।"

এ কি বিশ্বাস! এ কি নির্ভরতার সম্বোধন—বারনারী সে, তাহাকে! কুমুদিনী শিহরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। ধীরে-ধীরে বলিল—"আমি দুর্ব্বলা রমণী, পতিতা; আমার চিত্তের উপর আমার সে প্রভুত্ব নেই, সে বিশ্বাস নেই। জীবনের পাপের ভার আর আমার বাড়াবার প্রবৃত্তি নেই। আমার সংস্রব আপনার পক্ষে মঙ্গলকর হবে না। আমার অদৃষ্টে যাই থাক, আর আপনি আমার কাছে আস্‌বেন না।" কুমুদিনীর প্রত্যেক কথা রাধারমণের অন্তর বিদ্ধ করিতেছিল। স্তব্ধভাবে ভূমি-সংলগ্ন-দৃষ্টি হইয়া কতক্ষণ সে বসিয়া রহিল। মাথা তুলিয়া যখন সে চাহিল, তখন কুমুদিনী সে স্থান ত্যাগ করিয়াছে।

* * *

নরেন্দ্রনাথ নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া কাছে বসিয়া বলিল—"রাধারমণ, অপাত্রে সহানুভূতি কেন? যে ডোববার তাকে ডুবতে দাও, তোমার-আমার কি?" "আমার কি? সত্যই ত, আমার কি!" বলিয়া রাধারমণ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। নরেন্দ্র এক গ্লাস পানীয় আনিয়া তাহার হাতে দিল। "কি এ?" "একটা টনিক জল। খাও, মাথা ঠাণ্ডা হবে।" রাধারমণ একবার মাষ্টারের মুখের দিকে একবার গ্লাসটার দিকে চাহিল; তার পর নিঃশব্দে সে পানীয় গলাধঃকরণ করিল। ইহার পর হইতে প্রায় প্রতিদিনই সে টনিক-বারি বোতল-উৎস হইতে নিঃসারিত হইয়া তাহার উদর-চর্ম্মস্থলীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। কিন্তু তবু উপেক্ষার স্মৃতি শেলসম তাহার বক্ষের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে! আপনার চিত্তের দৌর্ব্বল্য এখন সে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিল! তাই সে বুঝিল, একের উপেক্ষা অপরের প্রাণে কেন এত বাজে! মায়ায় এত মোহ, মোহে এত জ্বালা, আগে ত সে জানিত না। কুমুদিনী তবু অচল, অটল; তাহার একই কথা—"সকলের আগে চিত্ত জয় করুন।"

রাধারমণ আর থাকিতে পারিল না। "কিসের জন্য কুমুদ? তুমি আমার, আমারই। আমার এ সমস্ত জীবন আমি তোমারই অপেক্ষা করে আছি—তুমি আমার আরাধ্যা, আমার সর্ব্বস্ব।" বলিয়া সে অগ্রসর হইল। কুমুদিনীর সমস্ত দেহে একটা পুলক রোমাঞ্চ জাগিয়া উঠিতেছিল। রাধারমণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কিন্তু সে সচকিতে কয়েকপদ পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল—"রাধারমণবাবু, আমাকে অপরাধিনী করবেন না। ছিঃ, এত দুর্ব্বল আপনি?" "হাঁ, আমি দুর্ব্বল বটে; কিন্তু কার জন্য? আমার জীবন ব্যর্থ করে দিয়ো না। সমাজ, সংসার সব দূরে পড়ে থাক্‌, একটিবার বল তুমি আমার?" "প্রতিদানের অপেক্ষায় যে ভালবাসার পুষ্টি, সে ভালবাসা নাই বাস্‌লেন? দেহের জন্য এত লালায়িত কেন, রাধারমণ বাবু? এ দেহ ত অনেকে উপভোগ করেছে; অপরের উচ্ছিষ্টে কামনা কেন? যে চক্ষে আপনাকে প্রথম দেখেছি, তার মর্য্যাদা নষ্ট করবেন না। দেবতার আসন দানবের অধিকারে ছেড়ে দেবেন না।"

রাধারমণ কয়দিন ধরিয়া কথাটা ভাবিয়া দেখিল। অগ্নিগর্ভ পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইয়া নিম্নস্থ অধিত্যকা মরুভূমিতে যে এতদিন করুণাধারা বর্ষণ করিতে চাহিতেছিল, কামনার তাপে সে আগ্নেয়-গিরি যে একদিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া তাহাকেও সেই মরুভূমিতে অধঃপতিত করিতে পারে, সে কথা সে একদিনও ভাবিয়া দেখে নাই। আজ সে তাহা কতক বুঝিল বটে, কিন্তু যে কামনার বহ্নি আজ লেলিহ শিখা বিস্তার করিয়া ধাবমান হইয়াছে, সহজে সে প্রতিনিবৃত্ত হইতে চাহিল না। শেষে একদিন সে কুমুদিনীকে বলিল—"ভাল, তোমারই উপদেশে চল্‌ব। কিন্তু তার আগে সম্পূর্ণভাবে একদিন তুমি আমার মাঝে ধরা দাও; একদিন তুমি আমায় বুঝিয়ে বলে দাও, তুমি আমারই।" একটা গভীর বেদনার ছায়া কুমুদিনীর মুখে পরিব্যাপ্ত হইয়া আসিল। ছলছল চক্ষে সে বলিল—"এতই অপদার্থ আমি! আর আপনি আমার কাছে আস্‌বেন না!" ক্ষুব্ধ চিত্তে রাধারমণ বাসায় ফিরিল।

বৃদ্ধ রামশরণ দেশ হইতে আসিয়া কতক্ষণ হইতে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন; রাধারমণ ফিরিতেই তাহাকে বলিলেন "বাবা, তোমার বিষয় তোমাকে বুঝিয়ে দিতে এসেছি। আমি আর ক'দিন? একটা অজ্ঞাতকুলশীলকে দিয়ে এ শেষ বয়সে আমার ইজ্জত নষ্ট করিয়ো না। নিজের বিষয় নিজে দেখো।" রাধারমণের মেজাজটা ভাল ছিল না। রুক্ষভাবে সে উত্তর দিল—

"আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি অবসর নিতে পারেন। মাষ্টার মশাই আজ থেকে সব ভার নেবেন। তাঁর উপর কটাক্ষ কেন? বিষয় আমার,—আমার ইচ্ছামত, নিজ প্রয়োজনে, টাকা না পাওয়া আশ্চর্য্যের কথা বটে!" "কিন্তু চৈত্রের কিস্তির টাকা—" "কস্‌রিতে থায়! যাক্, আপনি এখন বিশ্রাম করুন।" বৃদ্ধ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই সেই রাধারমণ! হা ভগবান! বৃদ্ধ আর সেখানে দাঁড়াইলেন না; মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কাগজপত্র তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া, সেই রাত্রেই তিনি সে বাটী ত্যাগ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হইল। জমিদারীর সমস্ত ভার আপনার হাতে পাইয়া সে তখন ক্রমশঃ জাল গুটাইতে আরম্ভ করিল। রাধারমণ আর নিজে কিছু দেখে না। নরেন্দ্র জলের মত অর্থ ঢালিতে লাগিল, আর তার তরঙ্গরাজির মধ্যে ডুবিয়া-ডুবিয়া রাধারমণ কুমুদিনীকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে উপভোগে তাহার তৃষ্ণা মিটিল না। বিশাল অম্বুরাশির মধ্যে ডুবিয়া-ডুবিয়া লবণাক্ত বারি পান করিয়া তৃষ্ণার দাহে উত্তরোত্তর সে দগ্ধই হইতে লাগিল।

(৯)

নয়নতারা তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। সংসারের দুঃখ তাপের 'পোড়' খাইয়া মানুষের পরমায়ু বুঝি বৃদ্ধিই হইতে থাকে। শুভ্র সরস জিনিসই সকলে চায়। ফুল তুলিবার সময় আমরা বাছিয়া-বাছিয়া ভাল ফুলটিই তুলি; ফল পাড়িবার সময় ভাল ফলটির দিকেই আমাদের লক্ষ্য থাকে। যমরাজেরই বা তাহাতে ব্যতিক্রম ঘটিবে কেন? তাই আমরা দেখিতে পাই—অতাপ, অপাপ জীবনই আগে চলিয়া যায়; তাপক্লিষ্ট, বেদনাবিধুর প্রাণ আর দেহপিঞ্জর হইতে বাহির হইতে চায় না। তাই বিধবা নয়নতারা, সংসারের সব সম্পদ হইতে একে-একে বিচ্যুতা হইয়াও তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। নীলকান্তের জীবদ্দশায় স্বামীর বংশমর্য্যাদা, এবং এখন পুত্রের উপেক্ষায় দারুণ অভিমানই বুঝি তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। তবু তিনি উপযাচিকারূপে এক-দিনও পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। লোকে কিছু বলিলে উত্তর দিতেন,—"চিরকাল থাক্‌বার জন্য কেউ ত আসে না মা! একজনকে ভগবান ডেকে নিয়েছেন, একজনকে সংসারে নিয়েছে। দুই-ই আমার জন্মান্তরের কর্ম্মফল। এতে দুঃখ বা অভাব মনে করলে চল্‌বে কেন?" প্রতিবেশীরা তাঁহার যুক্তির সারবত্তা প্রণিধান করিতে না পারিয়া পরস্পর নানা আলোচনা করিত। কেহ বলিত—"এমন বোকা মাগী ত আমি বাপের জন্মে দেখিনি। অমন রাজার মা হলে আমি ত পায়ের ওপর পা দিয়ে দিনরাত হুকুম চালাতাম। বড় একগুঁয়ে, চিরকালই ঐ ধরণ!" অমনি কেহ বলিয়া উঠিত—"এ কি একগুঁয়েমি বাছা! ছেলের কাছে আবার মান অভিমান কি? সেখানে গেলেই ত রাজার হালে থাকিস্‌।" একেই বলে—কপালে নেই ক ঘি—" তাহারা চলিয়া গেলে, নির্জ্জনে নয়নতারার চক্ষের জল আর রোধ মানিত না। বিংশবর্ষ পূর্ব্বেকার সেই এক-খানি কচি মুখের স্মৃতি তাঁহাকে তখন আকুল করিয়া তুলিত।

অপরাহ্ণে নয়নতারা তুলসী মঞ্চের বেদীতে বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছিলেন, এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—"গিন্নি মা, বাড়ী আছেন?" "গিন্নী মা!" এ যে নূতন সম্বোধন! কে তাঁহাকে ডাকে? নয়নতারা পুস্তক বন্ধ করিয়া রাখিয়া, মাথার কাপড় ঈষৎ টানিয়া দিয়া, মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—"আছি! কে বাবা, ভিতরে এস।"

আগন্তুক—রামশরণ চক্রবর্ত্তী। বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গলবস্ত্রে নয়নতারাকে প্রণাম করিয়া নতমুখে বলিলেন—"মা, আমি আপনার দাস;—আপনার ছেলের চাকর। বড় দায়ে ঠেকে আজ আপনার কাছে এসেছি। আপনার ছেলের বিপদ; আপনি না গেলে তা থেকে তাঁকে আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। আমি কাশীবাস করবার সব ঠিক করেছি; তবে আজন্মকাল সে বাড়ীর নুন খেয়ে এসেছি, এ বিপদের দিনে তাকে না দেখলে আমায় ধর্ম্মে পতিত হতে হবে, তাই আজ আপনাকে নিতে এসেছি।" বিপদ! উদ্ধার! সে কি! নয়নতারার বুক কাঁপিয়া উঠিল। শুষ্কমুখে তিনি শুধু রামশরণের প্রতি চাহিয়া রহিলেন—কোন কথা কহিতে পারিলেন না। রামশরণ বলিলেন—"আজ মা, গর্ব্ব-অভিমানের দিন নয়। জান ত মা,—কু-পুত্র যদি বা হয়, কু-মাতা কখন নয়!" সহসা একটা দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভাব নয়নতারার মুখে প্রকট হইয়া উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"শারীরিক কোন অমঙ্গল নয় ত?" "কতকটা বটে, মন শরীর একই জিনিস।"

"বিষয়-সম্পত্তি ?" "এখনো আছে।" "তবে ?" "মা, তুমি তাঁর জননী! তাঁর ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য সবই তোমার দায়। আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।"

সেই রাত্রেই, বৃদ্ধকে আহার করাইয়া, 'গঙ্গাজল' ওরফে রায়-গৃহিণীর কাছে বাড়ীর চাবি দিয়া, নয়নতারা কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন। সমস্ত পথ নয়নতারা কতবার প্রশ্ন করিয়াছেন, কিন্তু রামশরণ আর কোন উত্তর দেন নাই। তাই নয়নতারা, 'তাঁর ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সবই তোমার দায়'—বৃদ্ধের সেই শেষ কথাই বারবার ভাবিতেছিলেন। তবে কি বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে পুত্র কোন গুরুতর অন্যায় কদর্য্য কার্য্যে হাত দিয়াছে?

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে উভয়ে কলিকাতায় রাধারমণের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারবান বলিল—"বাবু বাড়ী নেই, বাগানে গেছেন।" "সঙ্গে কে কে গেছে জান, লছমন?" "মাষ্টার বাবু। তবে তাঁদের সন্ধ্যার পরই ফেরবার কথা আছে। ততক্ষণ বসুন না! সঙ্গে উনি কে?" "উনি? ওঁর পরিচয় কি করে দিই? ভগবান দিন দেন, একদিন জান্‌বে।" লছমন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি চান ইনি?" "বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে।" "তবে কাল আস্‌তে বলে দেবেন। সকালে নয় দুপুর বেলায়। আজ আর তিনি ফিরবেন না।" এইবার নয়নতারা কথা কহিলেন। মাতৃহৃদয়োচ্ছ্বাসিত, উৎকণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিলেন—"তবে বলে দাও বাবা, কোথায় সে গেছে; আমি আজ রাত্রেই তার সঙ্গে দেখা করব।" "তা হয় না মায়ী। যাকে-তাকে সেখানে পাঠিয়ে দিলে বাবু রাগ করবেন।" রামশরণ বলিলেন—"লছমন, তোমার কোন ভয় নেই। দেখছ, আমি সঙ্গে যাচ্ছি। বল তিনি কোথায় গেছেন।" "তোমার ভরসা কি ঠাকুর। তুমি ত এখন ডাঙ্গার মাছ। শেষে মাষ্টারের হাতে আমারও তোমার মত দশা হবে।" "তবে এঁকেই বলে দাও।" "কে ইনি তাঁর?" নয়নতারার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। বলিলেন—"তা ত জানিনে বাবা। একদিন সে আমায় মা বলে ডাক্‌ত; তার ওপর এখন আমার সেই-টুকুই যা দাবী।" লছমন নীলকান্তের আমলের পুরাতন ভৃত্য। রাধারমণের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সে জানিত। নয়নতারার উত্তরে চকিত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল—"আপনিই বাবুর মা?" লজ্জায় নয়নতারা মাটীর সহিত মিশাইতে চাহিতেছিলেন। হায়, ভৃত্যের নিকট পরিচয় দিয়া তবে পুত্রের বাটীতে প্রবেশ করিতে হইবে? কিন্তু তাঁহার সে ক্ষোভ অধিকক্ষণ রহিল না। বৃদ্ধ লছমন সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল—"মা, আমি বুঝেছি। রাস্তায় কেন? বাড়ীর ভিতর আসুন।" বলিয়া সে অপর ভৃত্যদের ডাকিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। নয়নতারা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন—"না বাবা, তার সঙ্গে দেখা না হলে বাড়ী ঢুক্‌ব না।" "কিন্তু মা, মা হয়ে সেখানে—" সহসা রামশরণের তীব্র দৃষ্টিতে লছমন থামিয়া গেল। "কি বাবা, সেখানে?" "কিছু নয় মা, তবে এখন সেখানে না যাওয়াই ভাল।" বলিয়া রামশরণ অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। ফল বিপরীত হইল। কোন আসন্ন অনিষ্টপাতের আশঙ্কায় নয়নতারা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তৃষিত মাতৃহৃদয়ে আজ বন্যার প্রবাহ আসিয়াছিল,—রামশরণ সে প্রবাহের গতি-রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছুতেই যখন নয়নতারা বাধা মানিলেন না, তখন লছমন বলিল—"তবে গাড়ী জুড়তে বলে দিই? বাবু ফিটনে গেছেন, পাল্কী-গাড়ী ত রয়েছে।" অতি দুঃখেও নয়নতারার ওষ্ঠে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—"না, বাবা।" অগত্যা রামশরণ ঠিকানা জানিয়া লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে বরাহ-নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

(১০)

কুমুদিনী লিখিয়াছিল—

"রাধারমণ বাবু, কুক্ষণে আপনি আমাকে দেখিয়াছিলেন। কুক্ষণে এ অভাগিনীর প্রতি আপনার করুণার উদ্রেক হইয়াছিল। সে করুণা যে শেষে এমন মোহে রূপান্তরিত হইবে, একটা নিষ্কলঙ্ক জীবনকে এমনভাবে ব্যর্থ করিয়া দিবে, আমি তখন ভাবি নাই। আমি নিমিত্তমাত্র, এই আমার সান্ত্বনা; তবু আমি আপনার সম্মুখে একদিন না দাঁড়াইলে ত এ ঘটনা ঘটিত না। তাই ভাবিয়াছি—ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। আজ হইতে আমি এ দেশ ত্যাগ করিলাম। কোন তীর্থস্থানে যাইয়া বাস করিব। নিজের খরচের জন্য যৎসামান্য অর্থ সঙ্গে লইলাম—বাকী সমস্ত অর্থই আজ আপনার নামে রেজেষ্ট্রী করিয়া দিলাম,

কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করিবেন। আমার সন্ধান করিবেন না। যখন এ পত্র আপনার হাতে পৌছিবে, তখন আমি বহু দূরে। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—কেন আমি ধরা দিলাম না? তাহার কারণ—আজ বলিতে বাধা নাই—আপনাকে আমি ভালবাসি। এ ভালবাসা মৌখিক নয়, মন-রাখা কথা নয়; অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ইহার শিকড় যাইয়া পৌছিয়াছে। আপনি আমার দেবতা; আপনার অকৃত্রিম সহানুভূতিতে আমার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাই আপনার সর্ব্বনাশ সাধনে আমার প্রবৃত্তি যায় নাই। আপনাতে-আমাতে মিলন অসম্ভব। আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি। সমাজ-বিচ্যুতা আমি, সমাজে আর আমি স্থান পাইতে পারি না; সমাজের অংশ আপনি—আপনাকে সে কেন্দ্র হইতে চ্যুত করিবার অধিকার আমার নাই। আপনার উপর আমা হইতে সমাজের দাবী অনেক বেশী,—তাই আমি চলিলাম। আমি কাছে থাকিলে আপনার উত্তরোত্তর ক্ষতি, তাই আমি চলিলাম। আরও চলিলাম,—কারণ, অপবিত্র মন্দির অপেক্ষা শূন্য দেউল অনেক ভাল; কারণ, আশার অবসানই দুঃখের নয়, নিরাশার পরিহাসই বড় যন্ত্রণাময়; কারণ, দেবতার অদর্শন তত কষ্টের নয়, যত—সে দেবতাকে দানবে রূপান্তরিত হইতে দেখা। আমি চলিলাম—আমার আশা এবং ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা যে, আবার আপনি প্রকৃতিস্থ হইয়া দেবতার আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবেন। সে দিন যখন আসিবে, তখন এ জীবনে বা পরলোকে শুদ্ধ দেহ মনে যেন আপনার চরণসেবার অধিকারিণী হই। ইতি"

বাগানে আসিয়া পত্র পড়িয়া রাধারমণ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। বারনারী সে,—এত মনের বল তার! আর শিক্ষিত উন্নত সে, এত—! রাধারমণ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। অসহ্য গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশ মাত্র নাই! সহসা তীব্রকণ্ঠে সে হাঁকিল—"ভিখুয়া!" "হুজুর!" "হিঁয়া লে আও গিলাস।" সঙ্গে-সঙ্গে বোতল-বাহিনীর আবির্ভাব হইল। তাহার অর্দ্ধাংশ খালি করিয়া জড়িত স্বরে রাধারমণ ডাকিল—"মাষ্টার!" নরেন্দ্র কক্ষান্তরে ছিল; তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। "চৈত্র কিস্তির কথা কি বলছিলে?" "টাকা তহবিলে নেই।" "কবে চালান?" "পরশু" "কি উপায় স্থির করেছ?" "দেখছি ত নিরুপায়! এখন যা বল। যা অসম্ভব খরচ করছ, আমি আর কি করব?" রাধারমণ ঈষৎ হাসিল; বলিল—"কত তোমার হাতে মজুদ আছে?" "উপস্থিত মোটে হাজার খানেক। কাল বড় জোর আর হাজার তিনেক আসতে পারে।" "ভাল, যা আছে এখানে নিয়ে এস। আর, সেদিন তোমার কথার অর্থ বুঝিনি। সত্যই ত, কুমুদিনী আমার কে?" "সত্যই ত! যার অর্থ আছে, তার ভাবনা কিসের? বিষস্য বিষই ঔষধ; তোমায় বলি, তুমি ত শোন না!" "ভাল, আজ আর তোমার অবাধ্য হব না।" "আজই?" "আজই।" রাধারমণের চক্ষু দীপ্ত, কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্থির। তাহার বুদ্ধি, বিচার, বিবেক-জ্ঞান, কিছুরই তখন অস্তিত্ব ছিল না।

(১১)

যতই তাঁহারা বরাহনগরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই নয়নতারার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে-ই রাধারমণ! সেই নয়নের মণি, প্রাণপুত্তলি,—যাহাকে বিদায় দিতে হইবে বলিয়া একদিন তাঁহার চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিয়াছিল, বিদায়ের পূর্ব্বে যাহাকে শতবার বক্ষে চাপিয়াও প্রাণের তৃষ্ণা মেটে নাই—সেই কণ্ঠের ধ্বনির মালিক! তার পর বিশটি বর্ষ ঘুরিয়া-ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে—সে বুক-জুড়ান ধন ত বুকে ফেরে নাই! যতই তিনি সে কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে ক্রমশঃ অনুশোচনা জাগিতে লাগিল। পাষাণী সে,—ভ্রান্ত অভিমানের তীব্র তাপে স্নেহ-নির্ঝরের ধারা শুষ্ক করিয়া স্বেচ্ছায় আপন জীবনকে দগ্ধ মরুক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে! সেই রাধারমণ! সেই রমণীয় মুখ, সেই আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, সেই কুঞ্চিত কেশদাম, সেই তার জননী-সর্ব্বস্ব শিশু-হৃদয়, সেই আধ-আধ স্বরে 'মা' বলিয়া সম্বোধন—কেন সে স্বেচ্ছায় সে-সব হইতে বঞ্চিতা হইল? ভাবিতে ভাবিতে নয়নতারার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। এখন সে কত বড়টি হইয়াছে! দেখিতে বুঝি সেইরূপই আছে! পিতার রূপ, পিতার গুণ, পিতার দেবত্ব, সবই বুঝি সন্তানে আসিয়া ফুটিয়াছে! নয়নতারা আত্মহারা হইয়া মানস-চক্ষে সে কল্পনা-ছবি দেখিতে-দেখিতে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। "গিন্নী-মা!—" সে সম্বোধনে নয়নতারা সহসা চমকিতা হইলেন। ইতস্ততঃ চাহিয়া

বলিলেন—"কি বাবা, এ কোথায় এলাম ? আমার রাধারমণ কই ? এ কার বাগান ? ভিতরে ও কার বাড়ী ?" দারুণ অনুশোচনায় রামশরণ বাত্যাহত কদলীবৃক্ষবৎ কাঁপিতেছিলেন। সাক্ষাতের পরিণাম কি ঘটিবে, কে জানে ? সহসা তিনি নয়নতারার পা জড়াইয়া ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"মা, এখানেই তিনি আছেন; কিন্তু আর গিয়ে কাজ নেই; চলুন এখান থেকেই ফিরি।" "সে কি কথা ? বাছার আমার বিপদ,—আর আমি ফিরে চলে যাব ? কেন এ কথা বল্‌ছ ? বল, বল,—সে ত বেঁচে আছে ?" "হা ভগবান !" বলিয়া বৃদ্ধ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। নয়নতারা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না। শারীরিক মঙ্গল ত বটে, তবে কি বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত কোন বিপদ ? কুচক্রী লোকের কৌশল হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ এত কষ্ট করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে ? নয়নতারা মনে মনে হাসিলেন। বিষয়-সম্পত্তি ? যায় যাক্। বিষয়সম্পত্তিই ত তাঁর তৃষিত মাতৃবক্ষ হইতে এতদিন পুত্রকে অন্তর করিয়া রাখিয়াছে ! বিংশবর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ নিঃস্ব-ভাবে সে তাঁহার ক্রোড় হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, আজ সেই 'রিক্ত সম্বলহারা' অবস্থায় এতদিনের পরে পুত্র আবার তাঁহার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসুক। ভাবিতে-ভাবিতে নয়নতারা একাকিনী সম্মুখবর্ত্তী কক্ষের আলোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন।

* * * *

তখন মজলিস বেশ জমিয়া গিয়াছে। গ্লাসের ঠুং-ঠাং, নূপুরের শিঞ্জন, মাষ্টারের বুকনি—তালে বেতালে মিশিতেছিল। বামাকণ্ঠে গানও চলিতেছিল—

"বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ,
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।"

বারান্দা হইতে সে দৃশ্য নয়নতারার চক্ষে পড়িল। নয়নতারা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন, আর তাঁর পা উঠিল না। এ কি ! এ যে নরককুণ্ড ! এই রাধারমণের আবাস ? আর, ঐ অর্দ্ধশায়িত, বিস্রস্তবসন, তন্দ্রাবিষ্টনয়ন যুবকই কি তাঁর রাধারমণ ? না, না, তা বুঝি নয়—কিছুতেই নয় ! সে যে তাঁর পুত্র, তার পিতার পুত্র,—তার এ অধঃপতন ত ঘটিতে পারে না ! কিন্তু নিষ্ঠুর অদৃষ্ট তাঁহাকে সে ভ্রান্তিতে অধিকক্ষণ থাকিতে দিল না। সহসা মাষ্টার বলিয়া উঠিল—"রাধারমণ, হেসে নাও দু'দিন বই ত নয়। এক কুমী গেলেই কি বাবা প্রাণটা গড়ের মাঠ হয়ে থাক্‌বে ?" শেষ কথা কয়টা আর নয়নতারার কর্ণে পৌঁছিল না। তবে, ওই-ই ত রাধারমণ ! যাহার স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া, যাহাকে উন্নত, শিক্ষিত, পবিত্র ভাবিয়া এ দীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন, কল্পনায় যাহার গৌরব অনুভব করিয়া তাঁহার বক্ষ গর্ব্বস্ফীত হইয়া উঠিয়াছে—এই সেই রাধারমণ ! এতদিন পরে আজ যাহাকে বুকে ধরিয়া বিংশবর্ষের ক্ষোভ মিটাইবেন বলিয়া ভাবিতেছিলেন, যাহার উদ্দেশে উৎসারিত দীর্ঘরুদ্ধ স্নেহের বন্যায় সকল অভিমান, গর্ব্ব ভাসাইয়া দিয়া উন্মুক্ত বক্ষে আজ ছুটিয়া আসিতেছিলেন—এই সেই রাধারমণ ? সহসা একটা তীব্র বৈদ্যুতিক স্পন্দনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত, শিহরিত হইয়া উঠিল ! কঠোর তীব্র কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—"রাধারমণ !—" পরক্ষণেই নয়নতারার বেপথুদেহ সশব্দে ভূমিতলে পতিত হইল।

সহসা মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। টলিতে-টলিতে সকলে বাহিরে আসিয়া পড়িল। রামশরণ চকিতে বৃদ্ধার মস্তক আপন অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছিলেন। রাধারমণকে দেখিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন—"রাধারমণ, তুমি পশু অপেক্ষাও অধম ! পাপের চরম সীমায় না পৌঁছে ছাড়লে না। মাতৃ—" "মা !"—রাধারমণের চক্ষের সম্মুখে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিয়া উঠিল ! অবসন্নভাবে জননীর পদতলে বসিয়া পড়িয়া, বক্ষের মাঝে সে চরণ দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া, অনুতপ্ত, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল—"মা, মা আমার !—"

উদ্যান-সজ্জা

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

গৃহ-নির্ম্মাণ করিবার পর লোকে আবশ্যক-অনাবশ্যক নানাবিধ দ্রব্যে তাহা পূর্ণ করে। এই সকল আসবাবের মধ্যে মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ বড় অধিক নহে; অথচ প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয়। এই অতিরিক্ত দ্রব্যাদির কোন-কোনটি কালেভদ্রে আবশ্যক হইলেও হইতে পারে; কিন্তু অধিকাংশই কার্য্যক্ষেত্রে অনাবশ্যক। তবে কেন এই সকল দ্রব্য সংগৃহীত হয়? কারণ, সেই জিনিসগুলি সুবিন্যস্ত হইলে গৃহের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা মানব-হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত গুণ। ইতর-ভদ্র, সভ্য-অসভ্য নির্ব্বিশেষে মানবমাত্রেই সৌন্দর্য্য প্রিয়। এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাই শিল্পের প্রাণ। গৃহ-নির্ম্মাণ কালে সকলেই যেমন নিজ-নিজ সামর্থ্য অনুসারে গৃহের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে, গৃহ প্রাচীরে কত বিচিত্র চিত্র অঙ্কন করিয়া কলাকৌশলের পরিচয় দিয়া থাকে, বসতি-গৃহ সংলগ্ন উদ্যান-রচনার সময়েও সেইরূপ শিল্প সৌন্দর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। উদ্যানে কেবল ফলকর বৃক্ষ, প্রয়োজনীয় শাকসব্জি বা সুগন্ধি কুসুমের বৃক্ষ থাকে না, অনেক বৃক্ষলতা কেবল উদ্যানের সৌন্দর্য্য সম্পাদনের জন্য উপ্ত এবং রোপিত হয়। উদ্যানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে বলিয়া সেগুলিকে আবার উপযুক্তভাবে বিন্যাস করিতে হয়। উদ্যানের মধ্যে পথ ঘাট, তোরণ, কুঞ্জ, পুষ্প-বাটিকা প্রভৃতি রচিত হইয়া থাকে; এই সকল কারণে, উদ্যান-রচনাও একটি স্বতন্ত্র শিল্প বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। উদ্যান-সৌন্দর্য্যের পরিকল্পনা আজিকার জিনিস নহে, আমাদের হিন্দু পুরাণাদিতে নন্দন-কানন, খৃষ্টীয় পুরাণে ইডেন-উদ্যান, মহম্মদীয় পুরাণে বেহেস্ত প্রভৃতির কথা চিন্তা করিলে সুসজ্জিত উদ্যান-নির্ম্মাণের কল্পনা অতি প্রাচীন বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে উদ্যান-রচনার যে রীতি ছিল, তাঁহার কোন সাহিত্য আছে কি না, সে কথা বলিতে পারি না। তবে, অধুনা য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এতদ্দেশে উদ্যান-রচনার যে নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহারই সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

Agricultural Journal of India নামক সুপ্রসিদ্ধ কৃষি-বিষয়ক সরকারী সাময়িক পত্রের দ্বাদশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ইকনমিক বটানিষ্ট মিঃ ডবলিউ বার্ণস, বি এস্‌সি এবং বোম্বাই লাট প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানের তত্ত্বাবধারক মিঃ ই, ব্রিটন উদ্যানের সৌন্দর্য্যবিধান সম্বন্ধে একটি সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপাদান ও চিত্রগুলির জন্য উক্ত লেখক মহাশয়-গণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

অপর সকল বিষয়ের ন্যায় উদ্যান রচনা ও উদ্যান-সজ্জা সম্বন্ধেও যে ভারতীয় ও য়ুরোপীয় প্রথার পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিবে, তাহা বিচিত্র নহে। তবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে অন্ততঃ সরকারী উদ্যানসমূহে উদ্যান-রচনার প্রণালী যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের দেশে প্রাচীনকালের উদ্যান রচনার প্রণালী সম্বন্ধে কোন সাহিত্য থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া ইহা স্বচ্ছন্দে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ভারতবাসীরা বাহ্যসৌন্দর্য্যসম্পন্ন বৃক্ষলতাদি অপেক্ষা গুণসম্পন্ন বৃক্ষলতার সমধিক পক্ষপাতী। এইরূপে অনেক বৃক্ষলতা প্রাচীন কালের সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বর্ত্তমান কালের বাঙ্গলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু অধুনা সেই সকল বৃক্ষ উদ্যানে থাকুক আর নাই থাকুক, কেবল উদ্যানের শোভা-সম্পাদনের জন্য এমন অনেক নূতন গাছপালা উদ্যানে রোপণ করা হয়, পূর্ব্ব কালের সাহিত্যে যাহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। এইরূপ নূতন-নূতন বৃক্ষ রোপণের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের বিন্যাস সম্বন্ধেও বর্ত্তমান কালের উদ্যানে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হইতেছে। এখন উদ্যান-রচনা করিতে হইলে, প্রথমে, যে ভূমিতে উদ্যান রচিত হইবে, তাহা

পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়। তার পর সেই জমির পরিমাণ অনুসারে নক্সা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। জমির পরিমাণের উপর নক্সা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। এই নক্সা প্রস্তুত করিতেই উদ্যান-রচয়িতার যথেষ্ট গুণপনার প্রয়োজন হয়। নক্সা যেমন হইবে, উদ্যানও সেইরূপ হইবে। স্থানভেদে, আবহাওয়ার প্রকৃতিভেদে, উদ্যানে বৃক্ষমূলে সেচনের জন্য জলের প্রচুর বা অপ্রচুর সংস্থান-ভেদেও অবশ্য নক্সার কিছু-কিছু ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। নক্সা ভাল হইলে, উদ্যানটি দর্শকের চিত্ত-বিনোদন করিতে পারে; আর, নক্সা মন্দ হইলে উদ্যান দেখিতে ভাল হয় না। ফলতঃ উদ্যান-রচনাতেও চিত্রাঙ্কনের ন্যায় শিল্পীর চক্ষু ও শিল্পীর হস্ত আবশ্যক। অনেক বিষয়ে দেখা যায়, সুশৃঙ্খলা ও শ্রেণীবদ্ধভাবে কার্য্য হইলে কাযটি সুন্দর দেখায়। কিন্তু উদ্যানের নক্সার সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটে না। নক্সার কোনরূপ শৃঙ্খলা বা নিয়ম না থাকিলেও, মোটের উপর বাগানখানি সুন্দর দেখিতে হইলেই উদ্যান-রচনা সার্থক হইয়া থাকে। উদ্যানে পথগুলি সমান্তরালভাবে অবস্থিত বা সমান প্রশস্ত না হইলেও ক্ষতি নাই। বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ না করিয়াও উদ্যানের সৌন্দর্য্য সম্পাদনে কোন বিঘ্ন ঘটে না। উদ্যানের মধ্যে কোঠা সরোবর, ফোয়ারা প্রভৃতির সংখ্যা ও অবস্থানের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই,—যদি এই সকলের সমষ্টি দর্শকের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয়। মানুষের দেহে অনেকগুলি অঙ্গ যোড়া-যোড়া; যথা, হাত, পা, চোখ, কান প্রভৃতি। মহিলাগণ অলঙ্কার পরিধান করিবার সময় এই সকল অঙ্গে যোড়া-যোড়া অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু মাথার খোঁপায় চিরুনী, গলায় হার, কোমরে গোট যোড়া-যোড়া আবশ্যক হয় না। অথচ, মোটের উপর কতক যোড়া এবং কতক একটা অলঙ্কার পরিধান করায় তাঁহাদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। উদ্যান সম্বন্ধেও—কোন্‌খানে কোন্ জিনিসটি থাকিলে মানান সই হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া, সেইখানে সেই জিনিসটি বসাইলেই, মোটের উপর বাগানখানি সুন্দর হইল। নক্সা প্রস্তুত করিবার সময় এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

য়ুরোপীয় উদ্যান-রচনা-প্রণালীতে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি এদেশে আসিয়া উদ্যান-রচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই দুইটী অসুবিধায় পড়িয়া যান। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ এত বড় দেশ যে, তাহার সর্ব্বত্র এক সময়ে ঋতুর অবস্থা একরূপ থাকে না। একই সময়ে দেশের ভিন্ন-ভিন্ন অংশে ঋতুর অবস্থা ভিন্ন রূপ থাকে। দ্বিতীয়তঃ উদ্যানের অলঙ্কার সম্বন্ধে দুইজনের মত কখনও একরূপ হয় না। অর্থাৎ উদ্যানের সৌন্দর্য্য-সাধন সম্বন্ধে কোন বাঁধা নিয়ম না থাকায় প্রত্যেক লোকে নিজের রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন অংশে বাৎসরিক বৃষ্টির পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ কোথাও আদৌ বৃষ্টি হয় না, কোথাও বা বৎসরে ৩০০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টি পড়িয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় দেশের সর্ব্বত্র উদ্যান-রচনায় একই প্রণালী অনুসৃত হইতে পারে না; কারণ, তাহাতে কখনও একরূপ ফল উৎপন্ন হইবে না। কোন-কোন স্থানে উদ্যানে জল সেচনের জন্য বৃষ্টির উপর আদৌ নির্ভর করিতে হয় না। সেখানে নদী বা খাল হইতে জল তুলিয়া উদ্যানে সেচনের যথেষ্ট সুযোগ আছে। স্থলবিশেষে বা বহুদূরবর্ত্তী জলাশয় হইতে ভূগর্ভে প্রোথিত নলের সাহায্যে জল আনয়ন করিতে হয়। ইহা বহুব্যয়সাধ্য; কাজেই, এ সকল স্থানে উদ্যানের আয়তন ক্ষুদ্র না হইলে চলে না। বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অপর সকল সময়েই এই উপায়ে উদ্যানে জল সংগ্রহ করিতে হয়। বাগান করিতে হইলে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয় বলিয়া, আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে, বাগান করিতে হইলেই, বাগানের মধ্যে দুই-একটী পুষ্করিণী খনন না করাইলে বাগান করাই হয় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে "পাম্প" প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায়, বাগানে জলসংস্থান করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে।

উদ্যান-রচনায় ঋতুর প্রভাবও বড় অল্প নহে। প্রকাণ্ড দেশের সকল স্থলে একই সময়ে একই ঋতুর আবির্ভাব আশা করা যায় না। সুতরাং উদ্যান-রচনায় সর্ব্বত্র একই নিয়ম অনুসৃত হইতে পারে না। সেইজন্য ভিন্ন-ভিন্ন স্থলে বিভিন্ন রীতিতে উদ্যান বিরচিত হইয়া থাকে। আর একটী কারণে উদ্যান-নির্ম্মাণের সময় ঋতুর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। মৃত্তিকা ও বায়ু উত্তপ্ত ও আর্দ্র থাকিলে, গাছপালা এত শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, সে সময়ে আগাছা তুলিয়া না ফেলিলে, অন্যান্য গাছের অতিবৃদ্ধি নিবারণের

উপায় অবলম্বন না করিলে, বাগান জঙ্গলে ভরিয়া উঠে এবং দেখিতে বিশ্রী হইয়া যায়। আবার বায়ু ও মৃত্তিকা উত্তপ্ত থাকিলে, কিন্তু আর্দ্র না হইলে, কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই অনেক গাছপালা মরিয়া যায়। পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা অনুচিত পরিমাণে আর্দ্র থাকিলে অনেক ক্ষুদ্র গাছের প্রাণ-সংশয় হইয়া উঠে। সেইজন্য স্থানে-স্থানে আইল দিয়া জল ধরিয়া রাখিবার এবং স্থান বিশেষে অতিরিক্ত, অনাবশ্যক জল বাহির করিয়া দিবার জন্য পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

তার পর, পোকা লাগিয়া অনেক গাছ অকালে নষ্ট হইয়া যায়। বাগানের এই প্রবল শত্রুকে দমন করিবার জন্য ক্ষেত্রবিশেষে উৎকট ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া থাকে। অনেক পক্ষীও চারাগাছের বিস্তর অনিষ্ট করিয়া থাকে। চড়াই পাখী ছোট গাছের বিষম শত্রু। বাদুড় প্রভৃতি পক্ষী হইতে রসাল ফলের বিশেষ অপকার হয়। উদ্যানের সৌন্দর্য্য-সাধন শিক্ষাসাপেক্ষ। সাধারণ সৌন্দর্য্যানুভূতির সহিত সার্ভেয়িং এবং ড্রয়িং সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান থাকিলে অনেকটা সুবিধা হয়; কেবল মালির বিবেচনা ও মর্জ্জির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় না। মরসুমি ফুল, ফল, শাক-সব্জি, সার ও মৃত্তিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু-কিছু জানা থাকিলে ত সোনায় সোহাগা হয়। বাগান যে-সে যায়গায় ভাল হয় না। বাগানের জন্য উপযুক্ত জমি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সর্ব্বত্র নির্ব্বাচনের সুবিধা নাই। অনেক স্থলেই বাসগৃহ-সংলগ্ন ভূমি—তা' সে ভূমি যেমনই হউক, অর্থাৎ বাগান করিবার উপযুক্ত হউক আর না-ই হউক—যেমন ভাবে পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বাগান যে মনের মত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কেবল ভূমির গুণাগুণের উপরে বাগানের সৌন্দর্য্য নির্ভর করে না—পারিপার্শ্বিক অবস্থাও উদ্যানের সৌন্দর্য্য-সাধনের পক্ষে অনুকূল হওয়া আবশ্যক। যেখানে সৌভাগ্যক্রমে উদ্যানের উপযোগী স্থান-নির্ব্বাচনের সুবিধা আছে, সেখানে কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়; যথা, বাগানের জমি উর্ব্বরা হওয়া আবশ্যক। ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ দেড় হাত গভীর জমি স্বভাবতঃই সারবান হইলে ভাল হয়। নচেৎ জমি প্রস্তুত করিয়া লইতে প্রচুর অর্থব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, জল যেন সহজলভ্য হয়। তৃতীয়তঃ ঝড়ে গাছের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা না থাকে। যদি বাতাসের প্রবল বেগ রোধ করিবার স্বাভাবিক বন্দোবস্ত না থাকে, তবে যেদিক হইতে ঝড় বহে, প্রথমে সেইদিকে বড়-বড় গাছ জন্মাইয়া বায়ুর বেগ কমাইবার উপায় অবলম্বন করা উচিত। তার পর, ঋতুর অবস্থা, শ্রমের মূল্য, প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

উপযুক্ত জমি নির্ব্বাচিত হইলে, প্রথমে বাগানের সর্ব্বত্র সহজ গতিবিধির সুবিধার্থ রাস্তা ও সরু সরু পথ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তার পর, বিভিন্ন শ্রেণীর বৃক্ষের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। গাছগুলি যেমন যেমন বাড়িয়া উঠিবে, বাগানও তেমনি সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইবে এমনি ভাবে স্থান নির্দ্ধারণ করিতে হয়। অতঃপর মধ্যে-মধ্যে হরিত তৃণাবৃত খালি জমি; তাহার মাঝে মাঝে মরসুমি ফুলের গাছ রোপণ করিতে হয়। পথের ধারে-ধারে চিত্র বিচিত্র গুল্ম বসাইয়া পথের সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কোন কোন গাছ কেবল বেড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। সেগুলি সুপ্রযুক্ত হইলে বাগানের শোভা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মধ্যে-মধ্যে মাটীর ও চীনা মাটীর টবে দুই-চারিটী করিয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষ থাকিলে, উদ্যানের সৌন্দর্য্য-সাধনে বিলক্ষণ সাহায্য পাওয়া যায়। লতা সহজে সতেজে উঠিতে পারে, এমন তোরণ বা বড় বড় গাছ থাকিলে আরও ভাল হয়। বাগানের স্থানে স্থানে খোলা জমি থাকিলে কেবল যে দেখিতে সুন্দর হয়, তাহা নহে; তাহাতে সুবিধাও প্রচুর। অতঃপর উদ্যান-স্বামীর অবস্থা ও রুচি অনুসারে প্রস্তর বা দগ্ধ মৃত্তিকা-মূর্ত্তি, আলোক স্তম্ভ, বেদী, বেঞ্চি, ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড়ের গাত্রবাহিনী নির্ঝরিণী প্রভৃতির সমাবেশ করা যাইতে পারে। বাগানে পুষ্করিণী এমন স্থানে খনন করাইতে হয় যে, সমস্ত বাগানখানিতে সহজে জল লইয়া যাওয়া যায়। বড় বাগান হইলে ঝিল ও সেতু নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। বাগানের উপযুক্ত জমি নির্ব্বাচিত হইলেই, প্রথমে গো, মহিষ, ছাগাদির উপদ্রব হইতে গাছপালা রক্ষার জন্য বাগানের চারিদিকে একহাত কি দেড়হাত উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার উপর লোহার তীক্ষ্ণাগ্র রেলিং বসাইলে এবং রেলিংয়ের গায়ে

লতানে গাছ উঠাইয়া দিলে বাগানখানি নিরাপদ ত হয়ই, সুন্দরও কম হয় না। যেখানে প্রাচীর ও রেলিং নির্ম্মাণের সুবিধা নাই, অথবা উদ্যান-স্বামীর সামর্থ্যে কুলায় না, সেখানে অন্যরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। উদ্যান-সীমান্তে আট কি দশ হাত অন্তরে এক জোড়া করিয়া সচ্ছিদ্র লোহার খুঁটি পুঁতিয়া দিতে হয়। খুঁটি দুইটীর পরস্পরের ব্যবধান এক কি দেড় হাত হইলেই চলে। তার পর চার কি পাঁচ লাইন কাঁটাযুক্ত তার খুঁটির ছিদ্র মধ্যে পরাইয়া দিয়া সমস্ত বাগানখানি ঘিরিয়া ফেলিতে হয়। অতঃপর দুই সারি তারের মধ্যস্থিত অবকাশ স্থানটুকুতে খুব ঘন করিয়া মেহেন্দি বা ঐরূপ কোন বেড়ার গাছ বসাইয়া দিলে, গাছগুলি বড় হইয়া সুন্দর বেড়া রচিত হয়। তার পর ইচ্ছামত উচ্চ ছাটিয়া দিলে সমোচ্চ মেহেন্দির বেড়া দিব্য-শ্রী ধারণ করে। গরু ছাগলের ত কথাই নাই, মানুষেও সহজে এই বেড়া অতিক্রম করিতে পারে না। যেখানে ইহারও সুবিধা নাই, সেখানে অবশ্য বাখারির বেড়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা দেখিতেও তেমন সুন্দর হয় না, এবং বেশী মজবুত হয় না; অল্পদিনেই খারাপ হইয়া যায় এবং গোরু-বাছুরের দ্বারা বাগানের অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা জন্মে। আর তাহা মেরামত করিতে করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। বেড়া প্রস্তুত করিবার পর রাস্তা নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিতে হয়। সচরাচর বাগান তৈয়ার করিবার সময় আমাদের দেশে রাস্তা নির্ম্মাণে মনোযোগ দেওয়া হয় না। ওটা যেন অনাবশ্যক ব্যয় বা পরিশ্রমের অপব্যয় বলিয়া বিবেচনা করা হয়। রাস্তার অভাবে যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা আমরা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া থাকি। কেবল বাগান কেন, গ্রাম-নগরাদি গঠন-কালেও রাস্তা-নির্ম্মাণের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। যাতায়াতের উপযুক্ত পথ না রাখিয়াই এতদ্দেশে গ্রাম-নগরাদি গঠিত হইয়া উঠে। ইহা আমাদের শৃঙ্খলা-বুদ্ধির অভাববশতঃ ঘটিয়া থাকে, এবং ইহা কেবল ব্যক্তিগত নহে, আমাদের জাতিগত স্বভাব। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার সময়েও রাস্তার অভাবে মাঠের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে হয়। ইহাতে যে কত অসুবিধা, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। অতএব বাগানখানিকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে হইলে, বাগান-গঠনে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া উচিত। রাস্তা নির্ম্মিত হইলে পর তবে বৃক্ষলতা রোপণ করা কর্ত্তব্য। রাস্তা নির্ম্মিত হইলে কেবল যে যাতায়াতেরই সুবিধা হয়, তাহা নহে; বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ত হয়ই; অধিকন্তু বৃক্ষলতাদি রোপণেও স্বতঃই বেশ সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। প্রথমে রাস্তা তৈয়ার করিয়া না লইলে, গাছপালা জন্মাইবার পর রাস্তা তৈয়ার করিতে গেলে, অনেক গাছ নষ্ট হয়; আর, গাছ বাঁচাইতে গেলে রাস্তা ভাল কিম্বা সুবিধাজনক হয় না। বাগানের সকল স্থানে যাইবার সুবিধা বিবেচনা করিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বাড়ী হইতে ফটক, এবং বাগানের চারি প্রান্তে যাইবার জন্য, পুষ্করিণী ব্যবহারের জন্য, মালীর ঘর, চাকর-বাকরদের ঘরে যাইবার জন্য, গো বা অশ্বশালায় যাইবার জন্য, পথ থাকা আবশ্যক। বাগানের সীমার সহিত সমান্তরাল ভাবে বাগানের চারিদিকেই একটা প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া লইবার পর কয়েকটি প্রধান রাস্তার দ্বারা বাগানখানিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলে এবং মাঝে-মাঝে অপ্রশস্ত সংযোজক পথ নির্ম্মাণ করিলে চলিতে পারে।

রাস্তা বিবিধ প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে। সাধারণতঃ এক হাত মাটী খুঁড়িয়া, বেশ সমতল করিয়া, তাহার উপর এক কি দুই প্রস্থ ইট বিছাইয়া দিয়া, তাহার উপর প্রথমে খোয়া, তাহার পর কাঁকর এবং সর্ব্বোপরি সুরকি বিছাইয়া দিয়া রাস্তা তৈয়ার করা হইয়া থাকে। কেহ-কেহ বা তিন চারি ইঞ্চি পুরু পাথরের ইট (ট্রামরাস্তা নির্ম্মাণে যেরূপ প্রস্তর ব্যবহৃত হয় সেইরূপ) বিছাইয়া তাহার উপর দুই ইঞ্চি পুরু খোয়া বিছাইয়া লইবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। ইট বা পাথর যাহাই ব্যবহৃত হউক না কেন, খোয়া বিছাইবার পর তাহা 'রোড রোলার', অন্ততঃ দুর্ম্মুসের সাহায্যে শক্ত করিয়া পিটাইয়া লইতে হইবে। নচেৎ এদেশের বর্ষায় রাস্তা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যাইতে পারে। কন্‌ক্রিট নির্ম্মিত হইলে কাঁকর ও সুরকি বিছাইয়া রাস্তা নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ষাকালে সুরকি ধুইয়া বাহির হইয়া যায়, এবং অন্য ঋতুতে ভয়ানক ধূলা হয়। আমাদের বিবেচনায়,—যোগাড় করিতে পারিলে,—পাথরের কাঁকর (অর্থাৎ মটরের বা ছোট-ছোট টোপাকুলের আকৃতি

এবং তাহারা যাহাতে মৃত্তিকা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে ভূমি সরস রাখিবার জন্য, প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এবং সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের তাপ মন্দীভূত হইলে বৃক্ষমূলে জল সেচন করা কর্ত্তব্য। কেবল বর্ষাকালে জল-সেচনের প্রয়োজন হয় না। তবে উপর্য্যুপরি ৫।৭ দিন বৃষ্টি না হইলে, ভূমি শুষ্ক হইয়া গাছগুলি মলিন হইয়া গেলে, এক-আধ দিন জল-সেচনের প্রয়োজন হয়। এই কারণে উদ্যানে প্রচুর জলের সংস্থান করিয়া রাখা উচিত। পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, তড়াগ, বাপী, কেবল যে জল-সংস্থানের উপায়, তাহা নহে। ইহারা উদ্যানের অন্যতম শোভাসম্পদ এবং পল্লী-বধূর জল-সংগ্রহের সদুপায়। জামনগর-রাজ্যের উদ্যানে ফোয়ারার অনতিদূরে যে প্রকাণ্ড জলাশয়টি রহিয়াছে, উহা হইতেই জলাশয়ের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য সহজেই উপলব্ধ হইবে। আবার পুষ্করিণীতে মৎস্যের চাষ করিলে গৃহস্থের ধনাগমের একটা পন্থা বজায় থাকে। তদুপরি, কমল, কুমুদ কহ্লার, সালুক প্রভৃতি পুষ্পও পুষ্করিণীটিকে অল্প শোভিত করে না। বাঙ্গালা দেশে পদ্মপুকুর নানা স্থানেই আছে; তবে তাহা অযত্নে থাকায় তেমন শোভা বিস্তার করিতে পারে না। পুণা গবর্ণমেণ্ট-হাউসসংলগ্ন উদ্যানের চিত্রে পুষ্করিণীতে পদ্ম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহারও নাম পদ্মপুকুর (Lotus Tank)। ইহাতে মানুষের হাতের যথেষ্ট কারিকুরি আছে। পুষ্করিণীর চারি পাড়ে পান ও অন্যান্য বৃক্ষ রোপণ করা যাইতে পারে। উদ্যান আয়তনে সুবৃহৎ হইলে জল-সেচনের সুবিধার জন্য বিত্তশালী ব্যক্তিরা "পাম্প" স্থাপন করিতে পারেন। তাহাতে জল-সেচনের ব্যয়ের হ্রাস হইবে। এই পাম্পের সাহায্যে উদ্যানের মধ্যে-মধ্যে অর্থাৎ যে সকল স্থলে দর্শকেরা সচরাচর ভ্রমণ করেন, এমন স্থানে দুই-একটি কৃত্রিম নির্ঝর, প্রস্রবণ, ফোয়ারা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া দিলে, সে শোভার তুলনা হয় না। পর্ব্বত-গাত্রে যে প্রণালীতে বৃষ্টির জলের ধারা প্রবাহিত হইয়া স্রোতস্বিনীর সৃষ্টি হয়, তাহারই ক্ষুদ্রতম সংস্করণ স্বরূপ অনেক উদ্যানে কৃত্রিম পাহাড় নির্ম্মাণ করা হয়; পাম্পের সাহায্যে জল তুলিয়া ঐ পাহাড়ের পশ্চাদ্ভাগে লোক-লোচনের অন্তরালে চৌবাচ্চায় রক্ষা করিতে হয়; এবং নলের সাহায্যে অতি ক্ষীণ ধারায় সেই জল পর্ব্বত-গাত্র দিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। প্রস্রবণ গঠন করিতে হইলেও ঐরূপ কোন উচ্চ স্থানে জলের চৌবাচ্চা রাখিয়া তাহা হইতে নলের সাহায্যে জল প্রস্রবণের মুখে আনিয়া দিতে হয়। চৌবাচ্চাটি যত উচ্চে থাকিবে, ফোয়ারার মুখ হইতেও জল তত উর্দ্ধে উঠিবে। প্রস্রবণের চারিধারে পাকা গাথুনীর জলাধার থাকিলে, তাহাতে লাল, সোণালী, সাদা মৎস্য রক্ষা করা যায়।

পুণানগরে সার ডি, জে, টাটা মহাশয়ের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান এবং জামনগর রাজোদ্যান হইতে দুইটি ফোয়ারার চিত্র সংগৃহীত হইল। বাগানের ভিতর ফোয়ারা অনেক স্থানেই আছে এবং প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন। সুতরাং ভাষায় ইহাদের সৌন্দর্য্যের পরিচয় দিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না।

উদ্যানের আরও কতকগুলি সজ্জা আছে। সেগুলি সংগ্রহ করা ধনিগণের পক্ষেই সম্ভবপর। যথা, দগ্ধ-মৃত্তিকা-গঠিত পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি বা আধুনিক নরনারী মূর্ত্তি, পশুপক্ষীর মূর্ত্তি, আলোক-স্তম্ভ, পুরাতন কামান প্রভৃতি। জামনগরের রাজার উদ্যানে একটি পাকা গাথুনীর বেদীর উপর ধর্ম্মের ষাঁড়ের প্রস্তর-মূর্ত্তি দূর হইতে দেখা যাইতেছে। পুণার সার ডি, জে, টাটার বাসগৃহ—"গ্রাড-হাষ্ট"-সংলগ্ন উদ্যানে তিনটী শিশু কেমন পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। উৎসবের দিনে, গার্ডেন পার্টিতে বা বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব-দিবসে গাছের ডালে জাপানী ফানুস জ্বালিয়া ঝুলাইয়া দিলে কত বাহার হয় তাহা কল্পনাতীত। খাঁচার ভিতর বা দাঁড়ে কয়েক প্রকার পক্ষী, পোষা ময়ূর, দুই চারি প্রকার পশু দর্শকের নয়ন ও শ্রবণের বিনোদনে যথেষ্ট সাহায্য করে।

উদ্যান-সজ্জা প্রবন্ধের এইখানেই উপসংহার করিলাম। এই প্রবন্ধে উদ্যান-রচনার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণায় চেষ্টা লেখকের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা; অতএব সে প্রয়াস সর্ব্বথা পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গলার পল্লী অঞ্চলে অনেকেরই জমি আছে; কিন্তু বাগানের সখ অল্প লোকেরই আছে। একটু পরিশ্রম করিলে ব্যায়াম-চর্চ্চাও হয়, এবং সঙ্গে-সঙ্গে গৃহের শোভাও সম্পাদিত হয়। কেবল শোভার জন্য নয়, উদ্যান-রচনা স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যতম উপাদান। পক্ষান্তরে, এই জীবন-সংগ্রামের দিনে,

ইচ্ছা করিলে অনেকে আর্থিক লাভও পাইতে পারেন। অতএব এই প্রয়োজনীয় বিষয়টির প্রতি পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। এ বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি পড়িলে, এবং কেহ উদ্যান-রচনায় মনোনিবেশ করিলে প্রবন্ধ লেখা সার্থক হইবে।

বিধিলিপি

[শ্রীনিরুপমা দেবী]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে গ্রামখানি নিস্তব্ধ। বর্ষাকাল; কিন্তু বহুদিন বৃষ্টি না হওয়াতে, আকাশ একেবারে নির্মেঘ, রৌদ্রোজ্জ্বল, চক্ষুর দাহকারী। ধরণী নিস্পন্দা, বায়ু-সঞ্চরণের আভাষও তাহার অঙ্গের বসনকে ঈষৎমাত্রও চাঞ্চল্য দিতেছে না। জীবমাত্র নিস্তব্ধ। বনের স্পন্দন জানানো মাত্র যাহাদের কায,—গাছতলার, ঝোপঝাপের সেই পতঙ্গ ও বন্য মক্ষিকার দলও একেবারে গুঞ্জনহীন, মূক। কেবল কোন দূর-দিগন্ত হইতে একটা তীব্র শিষের মত তীক্ষ্ণস্বর মাঝে-মাঝে ভাসিয়া আসিয়া প্রকৃতির এই সম্পূর্ণ মূক ভাবকে এক-একবার দূর করিতেছে। সে স্বর যেন একেবারে প্রকৃতির মর্ম্মস্থলেই বিদ্ধ হইয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে "ফ-টি-ক্ জল্ ফটি-ই-ই-ক্ জল্।"

জ্যোতিরত্নের গৃহের একটি কক্ষ হইতেও মাঝে-মাঝে একটা গুঞ্জন-শব্দ সে গৃহের অঙ্গনের রৌদ্র-স্তম্ভিত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। কক্ষমধ্যে রমা ও কাত্যায়নী। কাত্যায়নী রমার অবশ্য-প্রতিপাল্য পশুপাখী হইতে 'দীন দীনাশ্রিত' ব্যক্তি কয়টির জনে-জনে খোঁজ লইতেছিল; এবং রমাও অত্যন্ত উৎসাহিত ভাবে তাহাদের বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছিল। অনেকের সুখ, দুঃখ, অভাবের ভাগ যাহারা নিজেদের বুকে বয়, তাহাদের নিজেদেরই শোকে দুঃখে ডুবাইয়া রাখিতে কাত্যায়নীর আর ভাল লাগিতেছিল না; তাই সে রমার নিজের কথাই তুলিয়াছিল। কাত্যায়নীকে অন্যদিকে মন দিতে দেখিয়া, রমাও খুসী হইয়া বকিয়া যাইতেছিল। কথাটা এই, রমার আর একটি পোষ্য বাড়িয়াছে। সেটি একটি খঞ্জ বালক। সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের মুখখানা দেখিলে যে কিরূপ মায়া হয়, তাহা কাত্যায়নীকে বুঝাইবার জন্য রমা বলিতেছে, "তাকে একদিন তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব;—তুমি একদিন তাকে দেখবে ভাই?" কাত্যায়নী ঈষৎ উদাসীন ভাবে বলিল, "তুমি দেখলেই তার কাজ হবে রমা, আমি দেখে কি করব?" রমা ক্ষুণ্ণ ও আঘাত প্রাপ্ত ভাবে বলিল, "কি কাজ হবে? দুটি খেতে পেলে, কি একটু পরতে পেলে—এই তো? এতকাল কি আমিই তাকে এটুকুও দিয়ে এসেছি? যিনি দেখলে মানুষের আসল কাজ হয়, তিনি মানুষকে কখন না দেখছেন? তবু কেন তিনি মানুষকে মানুষের কাছে পাঠান? তার দুঃখের একটু ভাগ দেবার জন্যই নয় কি? মানুষের এইটুকুমাত্র সাধ্য। দুঃখ দেখে একটু দুঃখ বোধ করা! আর বোধ হয় ভগবানও মানুষের জন্য মানুষের কাছ থেকে এইটুকুমাত্রই চান। সেটুকু দিতেও মানুষের এত কৃপণতা কেন ভাই?" কাত্যায়নী অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "তোমার রামের মা বুড়ী এখনো বেঁচে আছে তো?" "আছে, কিন্তু তাকে অত কষ্ট করে আসতে বারণ করে দিয়েছি। হারাণের পিসিকে এক-একদিন দেখতে পাঠাই—আহা কি যে তার যন্ত্রণা! কোন্‌দিন নিঃশব্দে মরে আছে শুনতে পাব। দাদা এবার বাড়ী এলে,—কিন্তু তাতেই বা তার কি হবে! মানুষে তার সে যন্ত্রণার কি করবে! যিনি পারেন, কেবল তাঁকেই বলি, 'ঠাকুর, তার যন্ত্রণা কমিয়ে দাও; আর তুমি যে তাকে সর্ব্বদাই দেখছ, এই বিশ্বাসটা আমার মনে একটু গভীর করে দিয়ে আমার এ মিথ্যা অস্থিরতাটাও থামিয়ে দাও!' মনে হয়, যদি তার কাছে এক-একবার যেতে পেতাম! তা যে আমি পাই না। গোবিন্দদেব কেন আমায় এমন অস্থির-মনা করেছেন, যাতে

কেবলই,—নিজে দেখ্‌তে পেলাম না—এই-ই আমার মনে আগে আসে; তিনি দেখ্‌ছেন তা কেন আগে মনে হয় না?” “রমা, তোমার গোবিন্দদেবের পাথরের চোখ্ তো বুঁজেই আছে; সে চোখে তো তিনি জগৎকে দেখ্‌ছেন না; তিনি তোমাদেরই এই রক্তমাংসের চোখ্ দিয়ে সে কাজ করেন; আর, ঐ-সব ছোট-ছোট হাত দিয়েই তাঁর হাতের চিহ্ন দেখা যায়। যেদিন তোমাদের চোখ্ পৃথিবীর ওপর থাক্‌বে না, সে দিন তিনিও দৃষ্টিহীন হয়ে যাবেন।” রমা একটু বিদ্ধ অন্তঃকরণে যেন বেগের সহিত বলিয়া উঠিল, “ও-কথা বলো না ভাই, তোমার পায়ে পড়ি! গোবিন্দদেবকে পাথর বলো না। তিনি ঐ চোখ্ দিয়েই সব দ্যাখেন, আর যারা তাঁর সে দৃষ্টিপাত বুঝ্‌তে পারে, তারা নিজের মনের মধ্যেই সে দৃষ্টিকে অনুভব করে থাকে।” মানুষের অন্তরের মধ্যে তাঁর সে দৃষ্টি যেমন ফুটে আছে তেমনি জগতের বুকেও আছে। তাই না জগৎ আছে; তাই না আমি আছি, তুমি আছ। সে দৃষ্টি না থাক্‌লে কি কেউ থাক্‌তেই পারত? আমি চোখ বুঁজে মনে-মনে শুন্‌তে পাই,—যেন দেখ্‌তেও পাই,—রামের মা বুড়ী তার অন্ধকার কুঁড়ের মধ্যে একলা রোগের যন্ত্রণায় কাঁদ্‌ছে, আর তাঁকেই ডাক্‌ছে, যাঁর চোখের দৃষ্টি তার সেই ছোট কুঁড়ে-ঘরের অন্ধকারে, আর মরণের গভীর অন্ধকারের মধ্যেও জ্বল-জ্বল্ করে জ্বল্‌ছে। তাই না সে দিবারাত্রি নির্ভয়ে মরণকে ডাক্‌তে পারে! তাঁর সে দৃষ্টি না দেখ্‌তে পেলে, মানুষ কি তা পার্‌ত? এত নির্ভয়ে মরণ কামনা করবার সাহস কি তার হ'ত?” কাত্যায়নী স্তব্ধ ভাবে মাথা হেঁট করিল। রমার কথার প্রতিবাদ করা যেন তাহার সাধ্যে কুলাইল না। রমাও একটু থামিয়া তাহার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, “এখন আর একদিনও ঠাকুর-বাড়ী যাও না কেন? আরতির সময় মাকে নিয়ে গেলে তো পার।” কাত্যায়নী সেইরূপ নতমস্তকেই বলিল, “ইচ্ছা হয় না।” “কেন ইচ্ছা হয় না? এ ইচ্ছা তোমার হতে হবে। আরতির আলোয় গোবিন্দদেবের সেই পাথরের চোখের পানে চেয়ে দেখে বুঝ্‌তে হবে যে, কি করে সেই বন্ধ চোখের দৃষ্টি মানুষের অন্তরে গিয়ে লাগে; তার পরে কি করে সেই দৃষ্টি ভুবন থেকে ভুবনে ছড়িয়ে পড়ে; আর তাতে মানুষে কি করে শোকে সান্ত্বনা পায়, দুঃখে শান্তি পায়, অশেষ যন্ত্রণায় মধ্যেও তাই থেকে পরম নির্ভরকে লাভ করে থাকে।”

কাত্যায়নী তেমনি নীরবেই রহিল; কেবল তাহার একটা দীর্ঘ নিশ্বাসে রমা বুঝিল, তাহার শোকগ্রস্ত মন এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসে নাই। নিজের আকস্মিক উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া রমা আবার বলিল, “মন্দিরে গিয়ে একটু অন্যমনা হ'তেও তো পারবে।” “অন্যমনা? কোথায় গিয়ে হব রমা? তুমি তো জান, সন্ধ্যাকালে ঐ মন্দিরের নীচের ঘাটে গিয়ে কে আহ্নিক করতেন? তুমি আমায় কতবার ডাক্‌তে পাঠাতে, কোন দিন তোমার কাছে যেতাম, কোন দিন যেতাম না। ঘাটে বসে-বসে দেখ্‌তাম, ওপারের আকাশের রাঙা আভা যেই মিলিয়ে আসছে, মন্দিরের চূড়ার উপর সেই সন্ধ্যার তারাটি জ্বলে উঠছে, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠ্‌ল, আর বাবাও অমনি উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে চেয়ে যোড়-হাতে জোরে-জোরে স্তব পড়তে আরম্ভ করতেন। তোমার মন্দিরের আরতি দেখার চেয়ে সেই আরতির ছবি যে আমার মনে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। সে আরতি তো আর দেখ্‌তে পাব না, সে স্তব আর শুন্‌তে পাব না; তবে কি জন্য যাব?” রমা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া পরে বেদনা-ভরা অশ্রু-আবিল চক্ষু দুইটা কাত্যায়নীর মুখের পানে তুলিয়া বলিল “আর কোনদিকে চেও না, খালি গোবিন্দদেবকেই দেখো।” “তোমার গোবিন্দদেবকে যে ভাই আমি চিনি না; আমার গোবিন্দ-দেবের স্থান যে ঘাটের পৈঠের উপরই ছিল। সেখানে গেলে চোখ্ কি সেই শূন্য স্থান ছাড়া আর কোন কিছু দেখ্‌বে?” রমা এইবারে কাত্যায়নীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহার বক্ষে মুখ লুকাইল; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “থাক্—তবে যেও না।” কাত্যায়নী ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল, “না,—যাব। মার যেতে ইচ্ছা হয়, আমার জন্যই যান না। গেলে তোমার সঙ্গেও রোজ দেখা হবে।”

“আমিও তাই বল্‌তে চাচ্ছিলাম,—সমস্ত দিন একেবারে একলা থাক।” “আমার তো তাতে কোন কষ্ট নেই রমা।” “হয় না? আমার কিন্তু হয়। সমস্ত দিনই তো আমার কতজন সঙ্গী রয়েছে। সংসারের যত কাজ, ততই বৈনী লোকের সঙ্গে মেলামেশা, কথাবার্ত্তা কওয়া,—তাতেও আমার সময়-সময় একলা-একলা বোধ হয়। যেন একজন

ঠিক সঙ্গী নেই। সে সময় যদি ঠাকুরবাড়ী যেতে পাই, কি গোবিন্দদেবের কাজ করতে পাই, তো বেশ থাকি; নয় ত তোমার কাছে আস্তে ইচ্ছে করে, তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তে ইচ্ছে হয়। তোমার কি এমন হয় না ভাই!" কাত্যায়নী একটু ভাবিয়া বলিল, "একেবারেই যে হয় না তা নয়—কিন্তু সে বোধ হয় সেই একজনেরই জন্য। তিনি থাক্‌তে কোন কিছুরই অভাব বোধ ত একদিনও করিনি। তুমি তো জান, তিনি আমায় তাঁর কাছেই যে সর্ব্বদা রাখ্‌তেন। যা পড়্‌তাম-শুন্‌তাম, জান্‌তাম, সবই তাঁর হাত থেকে। আজ তিনি নেই, তাই আমার কিছুই নেই। সব দিকেই সেই অভাব।" "ভগবানের কাযে মানুষের তো কোন হাত নেই ভাই। সে দুঃখের তো কোন প্রতিবিধান নেই—সে যে সইতেই হবে। কিন্তু মেয়ে-মানুষের আর একজন সঙ্গীও বাপ-মায়ে ঠিক্ করে দেন, যিনি বাপ, মা অবর্ত্তমানেও তার চিরসঙ্গী হ'তে পারেন। তুমি সে সঙ্গী নিতে কেন এত আপত্তি কর ভাই? এ রকম ভাবে কতদিন কাট্‌বে? আজ যেন মা আছেন, তার পরে?" "তোমার কি মা আছেন? তুমি যেমন করে আছ। ওঃ না—তোমার যে গোবিন্দদেব আছেন।" "গোবিন্দদেব কি তোমার নন?" "বলেছি তো সে কথা। তাই তো বল্‌ছি, তুমি যেমন আছ তেমনি আমিও থাক্‌ব।" "মানুষকে—বিশেষ মেয়েমানুষকে তোমার মতন এমন অসংগত ভাবে থাক্‌তে নেই। তাকে একটা বাঁধন পরতেই হয়। বাপ-মা—সমাজ—মানুষকে ধর্ম্মের সেই একটা বাঁধনে চিরজীবনের জন্যে বেঁধে দেয়, তাতেই সে বিধাতার হাত দেখ্‌তে পেয়ে শান্তভাবে নিজের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। নইলে নিজের সম্বন্ধে স্বাধীন শক্তি যতক্ষণ মানুষের হাতে থাকে, ততক্ষণ—কি করব, না করব—এটা করি, কিম্বা ওটা করি—এই দোলার মধ্যে দুল্‌তে-দুল্‌তে বড় অশান্তিতেই তার জীবন কাটে। সেই বাঁধন তুমি যতক্ষণ না পরবে, ততক্ষণ যে নিশ্চিন্ততার শান্তি তোমার আসবে না।" "তা আমার এসেছে, জেনো। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তই তো আছি।" "মিছে তর্ক ছাড়। তা যদি তুমি পেতে, তা'হলে শোকের মধ্যেও তোমার শান্তি আস্‌ত। তা তো আসেনি। তুমি তো সৃষ্টি ছাড়া নও। বল, বিয়েয় তোমার কিসের এত আপত্তি!" "শোন নি কি, আমার কোষ্ঠি ভাল নয়। রাশ-গণ খুব মন্দ।" "ভাল নয় কি! খুব উঁচুই যে শুনেছি? এত উঁচু, যে, সহজে উপযুক্ত পাত্র মেলাই দায়। তবু বাবা চেষ্টায় আছেন যখন, নিশ্চয়ই তেমন পাত্রও পাওয়া যাবে।" "তিনি কি এখনও সেই পণ্ডশ্রম করছেন রমা? এখনো থামেন্ নি?" "থাম্‌বেন কি? তিনি তো তোমার মত পাগল হ'তে পারেন না! তোমার বাবা তাঁর হাতেই তোমার ভার সমর্পণ করে গেছেন। সে ভার কি তিনি মনে রাখ্‌বেন না?" "মহেন্দ্র আমার ভাই—সে আছে, তোমরা আছ, তবু কি আমার এই মহাভার কেউ বইতে পারবেন না?" "আমরা আছি, কিন্তু তোমার কি করতে পারছি বল? এই তো তুমি পরের মত এতদূরে পড়ে থাক! কে তোমায় দ্যাখে, কে তোমার জন্য ভাবে? আজ যদি তোমার মা মারা যান, তোমায় অনাথা ভিন্ন অন্য কিছু কেউ বল্‌বে না।" "না বলুক, তাতে আমি অনাথা হব না। তোমরাই আমায় চিরদিন দেখ্‌বে।" "এই ভরসা কি চিরদিনই রাখ্‌তে পারবে, কিম্বা আমরাই কি রাখ্‌তে পারব?" "কেন পারবে না? বিয়ের কথা যদি বল, সেও তো পরের সঙ্গেই হয়। তার পরে সেই পরই তো আপন হয়। তাদের উপরেই চিরদিনের ভরসাও রাখ্‌তে হয়।" "সে যে ধর্ম্মের বন্ধন—সমাজের বন্ধন ভাই। শেষে তাতে প্রাণের বন্ধনও যে পড়ে।" "দয়ার বন্ধন কি বন্ধন নয়? এতেও কি প্রাণের বন্ধন পড়ে না? তা যদি না পড়্‌ত, তা'হলে আজ তুমি যে আমার সামনে মিথ্যে হয়ে যেতে রমা। সংসারের আর যেখানে লোক্ ও কথা খাটিতে পারে; কিন্তু তোমাদের কাছে—তোমার মুখে ও কথা যে মোটেই সাজে না।" "আমার হার হ'য়েছে ভাই,—আর তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কিন্তু তবু জেনো, বাবা তাঁর যতদূর সাধ্য, এখনো চেষ্টা করছেন।" কাত্যায়নীর মুখ ক্রমশঃ গম্ভীর হইয়া উঠিল; বলিল "রমা, তাঁকে বারণ করো—যেন এ মিছা চেষ্টা তিনি আর না করেন। আমার বাবা আমায় চিরকুমারী থাক্‌বার আদেশ দিয়ে গেছেন। তিনি যেন আমায় পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে মিথ্যা জেদ্ না করেন।" "তোমার এ ভুল সংস্কার কেন হয়েছে? সেটা অত্যন্ত শোকের সময়, তাই হয় ত তোমার মনে নেই—তোমার বাবা বলেছিলেন—তোমার বিয়ের একমাত্র উপায় আছে; তা না হয় ত তাঁর মেয়ে কুমারী

থাক্‌বে। সেই একমাত্র উপায় কথাটা কি তাঁর জ্যোতিষ মতের মিল দেখে যোগ্য পাত্রের ইঙ্গিতই নয়? বাবা তো তাই বলেছেন। বাবার কি ভুল হতে পারে? তোমার সে কথা মনে নেই বোধ হয়?" "বেশ মনে আছে। ভুলই বটে। কিন্তু রমা, তোমায় আমার শেষ অনুরোধ—শুধু অনুরোধ মাত্র নয়, তোমাদের কাছে আমি ভিক্ষা চাচ্চি,—ঐ অকর্ত্তব্য ব্যাপারের জন্য তোমরা মিছা চেষ্টা পেয়ে আমায় কেবল উত্তরোত্তর লজ্জা আর দুঃখ দিও না।" "বল কিসে এ অকর্ত্তব্য? আগে আমায় তার কারণ বুঝাও, তবে সে কথা।" "যদি আমায় একটুও ভালবাস, একটুও স্নেহ করে থাক, আমি হাত যোড় করে ভিক্ষা চাচ্চি রমা, এ কথা ছেড়ে দাও।"

কাত্যায়নীর কাতর স্বরে ব্যথিত হইয়া রমা নীরব হইল। একটু পরে বলিল, "থাক্‌, তবে আর বলব না। এ-সব যে তোমায় আমিই এত জোরের সঙ্গে নিজের ইচ্ছাতেই বল্‌ছি, তা নয়। বাবা একদিন আমায় তোমাকে এই কথাগুলো ভাল করে বুঝিয়ে বলে' তোমার এই ভুল বিশ্বাস ভাঙ্‌তে বলে দিয়েছিলেন। আজ বুঝ্‌লাম, আমার সে সাধ্য নেই। চিরকুমারী থাকাই বুঝি তোমার বিধিলিপি।" "হাঁ তাঁকেও এই কথা বুঝ্‌তে বলো।" "মনে কিছু কর না—একটা কথা বলি, তুমি যেন কিছু লুকুচ্চ। এ ছাড়াও যেন কি একটু তোমার মনে আছে, অথচ বল্‌ছ না। কিন্তু তা কি তুমি আমার কাছেও লুকুবে কাত্যায়নি? কেন তা লুকুচ্চ, বল আমায়।" কাত্যায়নী অধোমুখে ক্রমশঃ যেন নিস্পন্দ হইয়া যাইতে লাগিল। উত্তর পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া ক্ষণপরে রমা সনিশ্বাসে বলিল,—"না বল্‌লেই যদি ভাল বোঝ, তবে থাক্‌। আমি এইবার বাড়ী যাব, বেলা বেশী নেই আর।" কাত্যায়নী মুখ তুলিয়া রমার ক্ষুণ্ণ মুখের পানে চাহিল। তাহার নীরব দৃষ্টিতে এমন একটু কিছু ছিল, যাহা দেখিয়া উত্থানোন্মুখ রমা আবার বসিয়া পড়িল, এবং কাত্যায়নীর হাত ধরিয়া স্নেহ-মৃদু স্বরে বলিল, "মাপ কর ভাই, আমার দোষ হয়েছে। রাগ ক'র না।" কাত্যায়নী এবারে কথা কহিল; গাঢ়স্বরে বলিল, "রমা, সত্যই তোমার কাছেও আমি কিছু লুকুচ্ছি। কিন্তু জেনো, তা লুকানোই উচিত। তাতে তোমাদেরও মঙ্গল, আমারও মঙ্গল।" "আমাদের তা শুনলে অমঙ্গল হবে? কি এমন কথা ভাই,—তোমায় বল্‌তেই হবে।" কাত্যায়নী সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "অমঙ্গল নয়; আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, শুন্‌লে তোমরাও সুখী হবে না—বলে' আমিও হব না।" "তুমি যদি অসুখী হও তবে থাক্‌; কিন্তু—" "আর 'কিন্তু' নয় রমা, সত্যই বেলা গেছে। ঠাকুরের শীতল কখন গোছাব? বাড়ী যাও। আমিও আজ মাকে নিয়ে আরতি দেখ্‌তে যাব।"

অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন মুখে রমা উঠিল। উভয়ে উঠানে নামিয়া আসিয়া দেখিল, সত্যই বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। রৌদ্রোজ্জ্বলা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই শ্যাম ছায়া, কেবল নারিকেলের উচ্চ মস্তক স্বর্ণ পতাকার ন্যায় জ্বলিতেছে মাত্র। দাবদগ্ধা ধরণী হইতে এখনও উত্তাপ উঠিতেছিল। দগ্ধ দিগন্ত তখনো তাম্র ও কপিশ বর্ণ। রমা বলিল, "তাই ত, আজ কখন কি হবে। কই, হারাণের মাও ত এখনো আসেনি, কার সঙ্গে যাই?" এদিক-ওদিক্‌ চাহিতে চাহিতে আবার বলিল, "বাঃ! বেলা-গাছ-কটি যে কুঁড়িতে ভ'রে রয়েছে। খুব জল দাও বুঝি?" "কুয়োর ধারে বলেই সর্ব্বদা জল পায়। আগে আরও পেত। বাবা ঐখানে হাত-পা ধুতেন।" "রোজ তা'হ'লে অনেক ফুল ফোটে, না? সেগুলোয় কি কর?" "কিছুই না। ঐখানে ফুটে ঐখানেই ঝরে যায়।" "আজ গোবিন্দদেবের জন্য তুলে নিয়ে যেও। এ ফুলগুলোয় মালা গাঁথ্‌লে বেশ দেখায়।" কাত্যায়নী বলিল,—"ঐ যে ঝি এসেছে।" "এত দেরী করে এলি? আমিও যেমন গল্পে ভুলে রয়েছি, তুইও তাই ছিলি যে! চল—চল্‌, আজ কখন কি হবে।"

রমা দাসী সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলে, কাত্যায়নী মাতাকে ডাকিয়া বলিল, "আরতি দেখতে যাবে মা?" "অনেক দিন ত যাইনি, যদি আজ তোর মন হয়ে থাকে, চল্‌।" উভয়ে গৃহ-কার্য্য সারিয়া দেব-দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ধরণীর নাসারন্ধ্র হইতে তখন ধীরে-ধীরে মৃদু নিশ্বাস-বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। নির্ম্মেঘ নীলাকাশ ধূসর আভায় রঞ্জিত। দিগ্বধূর শোণিতাক্ত অঞ্চলে তখন যেন গ্রামে শান্তির স্নিগ্ধ আলোক ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহার ললাটে জ্বল-জ্বল করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডল সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠিল। কাত্যায়নীকে ফুলগুলি তুলিতে দেখিয়া

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফুল কি ঠাকুরের জন্য তুলছিস্?" "গঙ্গার জন্য।" মাতা অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "ঠাকুরকে দিলেও হ'ত।" "কাল থেকে তাই দিও। আজ এ-ক'টা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব আমি।"

রমা ব্যস্তভাবে বাটী গিয়া অঙ্গনে পা দিতেই দেখিল, সেই বৃহৎ উঠানের একটা কোণে কয়টি দীন বালক-বালিকা এবং একটা রমণী কুণ্ঠিত মলিন মুখে বসিয়া রহিয়াছে। জমিদার-গৃহের বিস্তৃত রোয়াকের উপর বড় বড় বঁটা পাতিয়া কয়জন আত্মীয়া তরকারী কুটিতে-কুটিতে বকিয়া যাইতেছেন,—"ছোটলোককে কি আস্কারা দিতে আছে? কুকুরকে নাই দিলে পাতে বসে খায়। ভিখিরি আছিস্ বাপু, বার্‌বাড়ী থেকে ভিক্ষে নিয়ে যা! এ যে ক্রমে-ক্রমে এরা অন্দরেও সেঁধুতে লাগ্‌ল। এমন ব্যাপার তো কখনো ছিল না! এর নাম যে আস্পর্দ্ধা দেওয়া!" জনৈকা বিধবা বর্ষিয়সী শুচিস্নাত ভাবে একদিকে একখানা আসনে বসিয়া হরিনামের ঝোলার মধ্যে হাত পুরিয়া সেটাকে ঘন-ঘন নাড়িতেছিলেন; এবং সেই চিত্র-বিচিত্র অশ্বমুখ ঝোলাটির রন্ধ্রপথে বহিস্কৃত তর্জ্জনীর দ্বারা তাহাদের উদ্দেশে তর্জ্জন করিয়া মনের ঝাল মিটাইতেছিলেন। তাঁহার অদূরে একজন পা ছড়াইয়া সলিতা পাকাইতে-পাকাইতে বর্ষিয়সীকে ইঙ্গিতে বুঝাইতেছিলেন যে, কর্ত্তার অসঙ্গত আদরেই এসব ব্যাপার ঘটিতে পাইতেছে। বর্ষিয়সী সবেগে একবার ঝোলাটা নাড়িয়া জপের মালাটা ফিরাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন; "হলোই বা আদরের মেয়ে; আমরাও যে অমনি অল্পবয়সে বিধবা হ'য়ে বাপ-মায়ের ওপর কত আব্‌দার করেছি—ব্রত করেছি, নিয়ম করেছি, তীর্থে গিয়েছি, ধর্ম্ম করেছি'; কিন্তু এমন বিদ্‌ঘুটে আব্‌দার তো বাপের জন্মে কাণেও শুনিনি।" তার পরে সহুঙ্কারে সেই কুণ্ঠিত, ম্লান-মুখ ব্যক্তি কয়টার পানে হস্ত নাড়িয়া বলিলেন "ভিক্ষে চাইতে এসেছিস্ তো অতিথশালার দিকে যা, বাড়ীর মধ্যে না এলে ওঁদের ভিক্ষে করা হয় না। যত সব ছেলে-মানুষের কাণ্ডও যেমন হয়েছে, ছোটলোকদের তেমনি আস্পর্দ্ধাও বেড়ে চলেছে। এই যে খোঁড়া ছোঁড়াটা, এঁর আস্পর্দ্ধাই সব চেয়ে বেশী। 'আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে।' যা বারবাড়ীতে যা। ওদের অন্দরে কি বলে' ঢুকতে দেয় তাও যে বুঝিনে। ঐ ছোঁড়াটাই আবার নতুন একদল সঙ্গী জুটিয়ে এনেছে দেখ্‌ছি। নিত্যিই নতুন-নতুন মূর্ত্তি দেখ্‌ছি, কামাই তো নেই।" উপবিষ্ট দীন বালক-বালিকাগণ থতমত খাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—কেন না তাহারা এ বাড়ীতে কখনো এভাবে আসে নাই এবং এমন ভাবে অভ্যর্থিতও হয় নাই। উক্ত শাসনকর্ত্রী বিজ্ঞা গৃহিণীর অভিহিত খঞ্জ বালকটিও অপ্রস্তুত ভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে মৃদুস্বরে সঙ্গীদের আহ্বান করিয়া পলাইবার উপক্রম করিতেছে, ইতিমধ্যে দ্বারের দিকে চাহিয়া তাহার মলিন মুখ মুহূর্ত্তে আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সঙ্গীদের দিকে অভয় আশ্বাসের দৃষ্টিতে চাহিয়া সানন্দ স্বরে সে ডাকিয়া উঠিল, "ঐ যে মা এসেছেন।" "কি রে কানাই, তুই যে এমন সময়ে?" কানাই উত্তর না দিয়া কুণ্ঠিত আনন্দে কেবল মাথা নোয়াইল। তাহার সঙ্গীদলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীটি তাহাদের নেতার সেই বালিকা মা-টিকে দেখিয়া বড় বেশী ভরসা পাইল না। প্রবীণাদের বিরুদ্ধভাব দেখিয়া তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিল। একটী বালিকাকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া অপ্রসন্ন স্বরে বলিল "চল্ না বাছা, আর এখানে বেলা ভোর করে কি হবে। এনাদের এখন কাযের সময়"—"তোমরা বুঝি অনেক ক্ষণ এসেছ বাছা?" ইতিমধ্যে সেখানকার হাওয়া একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। যিনি এতক্ষণ এই বিরক্তকারী ছোটলোক দলের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া এত বক্তৃতা দিতেছিলেন, তিনি সহসা যেন অন্য কোন জগৎ হইতে আমদানী হইয়া মধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "হ্যাঁ বাছা, ওরা অনেক ক্ষণ থেকেই এসে বসে আছে। বসে-বসে বেচারারা হায়রাণ হ'য়ে গিয়েছে। কেন এসেছে, কি বৃত্তান্ত, তাতো আমাদের বলে না; তাই বল্‌ছিলাম,—বলি, নূতন লোক এরা, আমরা তো চিনি না; বাইরের লোকে যদি চিন্‌তে পারে,—এদের কি দরকার বুঝতে পারে, তাই বল্‌ছিলাম যে বাছারা বাইরে যাও"—"বাইরে যেতে পারলে কি এরা তোমাদের কাছে আসত দিদিমা? এদের তো আমিও কখনো দেখিনি। বস বাছা; আহা তোমরা এতক্ষণ কষ্ট পাচ্ছ!" কানাই এবার অগ্রসর হইয়া কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া বলিল, "মা, এদের ঘরখানি পুড়ে গিয়েছে; তাই ছেলেপিলেগুলি নিয়ে ওনার বড় কষ্ট।" "ঘর পুড়ে গেছে? কবে? এদের বাড়ী কোথায় ছিল? এই গাঁয়েই কি?" "না

মা। এ গাঁয়ে হলে কি কর্ত্তাবাবুকে জানাতে পারলে এতদিন ঘর হতে বাকী থাকত! এদের বাড়ী মাঝের-গাঁ, এখান থেকে দু'তিন কোশ দূর। আজ তিনমাস এদের ঘর নেই। দুঃখ-ধান্দা করে দিন কাটে; কিন্তু ঘর না থাকায় পরের ঘরে থাক্‌তে হয়। এতদিন এই রকমে কেটেছে; এখন যাদের ঘর তারা আর জায়গা দিতে চায় না।" উপরোক্ত দিদিমাতা ঠাকুরাণী এতক্ষণ কোপ-কুটিল কটাক্ষ ছাড়া ইহাদের প্রতি একবারও অন্যভাবে চাহেন নাই; এইবার সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া বলিলেন, "তা' তোমাদের গাঁয়ের জমিদার কে? জমিদারই তো প্রজার দুঃখ দেখে থাকে।" "নগাঁয়ের জমীদাররা এদের জমীদার; তা তানারা"—সর্ব্বজ্ঞা ঠাকুরাণী বলিলেন, "ওঃ, তারাই? তাদের মতন নচ্ছার জমীদার আর আছে! আমাদের কামাখ্যানাথের মতন আর কে হবে! তা' রমা, ঠাকুরদের শেতলের যে সময় বয়ে যাচ্চে। এরা এখন যাক্। তুমি তো এখন ঠাকুর-বাড়ী যাবে?" "যাচ্চি দিদিমা! এদের সঙ্গে আর একটু কথা কই; এরা যে অনেকক্ষণ বসে আছে! তুমি নতুন দিদিকে বলে, যদি একটু ততক্ষণ গুছিয়ে রাখাতে পার্‌তে"—"তা আর পারি না? এই যে যাচ্চি। আহা, তোমার ভরসাতেই বসে আছে কখন থেকে; কথা কইবে বই কি দিদি, কও; এই যে আমি শেতল গোছাবার ব্যবস্থা করাচ্চি" বলিতে-বলিতে অপ্রসন্ন মুখখানা যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন করিয়া ঠাকুরাণী একমনে ঘন-ঘন মালা ফিরাইতে লাগিলেন। রমার কিংকর্ত্তব্যবিব্রত মুখের পানে চাহিয়া কানাই বলিল, "মা, আজ তবে আমরা আসি,—আর একদিন তখন এনাকে নিয়ে আসব না হয়—" "সেই দু'তিন ক্রোশ দূর থেকে আবার এই মানুষটিকে অন্য একদিন আনবি কানাই? তুইও তো এই খোঁড়া, আর মেয়েমানুষটিরও যে অস্থিচর্ম্মসার! এতটা পথ এই ছোট-ছোট বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কি করে হেঁটে এসেছো বাছা? আর এই তো সন্ধ্যে হয়ে আস্‌ছে; আজ আর সেখানে যাবেই বা কি করে? তুই-ই বা এদের কোথায় পেলি কানাই?" কানাই উৎসাহের সহিত বলিল, "আমার মামার বাড়ী যে সেই গাঁয়ে। আমি এখন অনেকটা করেই যে হাঁটুতে পারি মা। এদের ঘরের জন্য কষ্ট দেখে" বলিতে-বলিতে কানাইয়ের স্বর ক্রমে নীরব হইয়া আসিল। রমা তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলিল, "তা বেশ করেছিস্! তোমরা কি বাছা সেই গাঁয়েই আবার ঘর করতে চাও?" দীনা রমণীটি এতক্ষণ অর্দ্ধ-আশা অর্দ্ধ-নিরাশাচ্ছন্ন মুখে এই বালিকার মুখের পানে চাহিয়া ছিল। ইহার কমনীয় অমন তরুণ মুখখানিতে যেন মূর্ত্তিমতী করুণা পরিস্ফুট; কিন্তু ইহার বালিকা বয়স:—ইহার নিকটে কতটুকু দয়ার আশা রাখা উচিত! সংসার যে বড় কঠিন ঠাই! এই বালিকা কি তাহার এতখানি অভাব দূর করিতে পারে? তাই রমার এই প্রশ্নে সসঙ্কোচে বলিল, "চাইলেই কি তা পাব মা? আমার যে কিছুই নেই। এদের পেটের ভাতই জোটাতে পারি না, তা ঘর করা?" হারাণের পিসি অগ্রসর হইয়া বলিল, "দিদিমণি, আজ কি ঠাকুর-বাড়ী শেতল যাবে না?" "আজ আমি বড্ড দেরী করে ফেলেছি রে, কাত্যায়নীর কাছে গিয়ে। তুই নতুন দিদিকে একটু গুছিয়ে দিতে বল। আমি এই এদের একটু—" "শেতল গোছাবার ব্যবস্থা হয়েছে, সেজন্য নয়। তুমি আজ ঠাকুর-বাড়ী যাবে না?" "এই যে! তুই ততক্ষণ এই ছেলে-পিলে কটির জন্য চাট্টি-চাট্টি খাবার নিয়ে আয় দেখি।" বালক-বালিকাগুলির মাতা এইবার বাধা দিয়া বলিল, "তোমার সেবার দেরী পড়ছে মা, তুমি যাও। তোমার মত মেয়ে বুঝি আর কোথাও দেখিনি। মা, তোমার মুখের কথাতেই আমার প্রাণ ভরেছে। পারি তো আর একদিন আসব! যদি কেউ কিছু এই অনাথাদের দয়া করতে পারে, মা! তবে সে কেবল তুমিই বুঝি পারবে! তোমার মুখের একটা কথাতেও দুঃখীর অনেক দুঃখ জুড়িয়ে যায়। এই ছেলেটা তোমার কথা বলেই আমাদের এত দূরে এনেছিল। তা হোক্, আজ তুমি ব্যস্ত আছ—ঠাকুর-সেবা হচ্চে না; যাও মা, তুমি যাও।" "সে কি? এই সন্ধ্যায় তোমরা গেরস্তর বাড়ী থেকে এমনি করে চলে যাবে? বাচ্চা-কাচ্চাগুলির মুখ দেখেই যে বোঝা যাচ্চে, এদের কত খিদে পেয়েছে। এই দু'তিন ক্রোশ রাস্তা—এই রাত্রে এদের নিয়ে ফিরে যাবে! আর তোমারও তো এই দশা"! "আমাদের সবই সয়। জোচ্ছনা রাত্ আছে, বস্‌তে-বস্‌তে যাব।" হারাণের পিসি ইতিমধ্যে কতকগুলি খাদ্য আনিয়া বালক-বালিকাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়ায় তাহাদের মলিন মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। রমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না, সে হতেই পারে না, বাছা। আজকের

রাতটা এইখানে থেকে যেতেই হবে তোমাদের।” “না না, সেখানে বুড়ো মা আছে, সে আবার ভেবে মরবে। মা তোমার এই দয়াই চিরদিন আমার মনে থাকবে।” রমা তখন চিন্তিত মুখে হারাণের পিসির পানে চাহিয়া বলিল, “হাঁ রে, বাবা কোথায় জানিস? এতক্ষণ কি ঠাকুর-বাড়ী গেছেন ঠাকুর প্রণাম করতে?” “তোমার বাবা? তা বুঝি জান না? থাক্ বাপু, এখন সন্ধ্যেবেলায় আর সে কথায় কাজ নেই।” “সে কি, বল না কি হয়েছে? তিনি কি বাড়ী নেই?” হারাণের পিসি ইতস্ততঃ করিতেছিল; কিন্তু দিদিমাতা ঠাকুরাণীর আর দেরী সহিল না; তিনি মালাটি দ্রুত-হস্তে মাথায় ঠেকাইয়া জপে গ্রন্থি দিলেন, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তা বুঝি জান না! বাড়ুযোদের সেই ছেলেটির যে হ'য়ে এসেছে। ছেলেটা অচিকিচ্ছেয় মারা গেল। তোমার বাবা যে সহরের ডাক্তার আনতে লোক পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তারও এসেছে,—ছেলেটাকেও বার করবার জোগাড়। তোমার বাবা তাই শুনে দৌড়িয়েছেন। আহা, সেদিনও তার মা ছেলেটাকে নিয়ে অন্নপূন্নো ঠাকরুণের প্রসাদ খাওয়াতে এসেছিল। বৌটোর কি কপাল! অমন খাসা-খাসা ছেলেগুলো দপ্‌দপ্ করে মরে যাচ্ছে।” রমা স্তব্ধ কাঠের মত হইয়া দাঁড়াইল, এবং দেখিতে-দেখিতে তাহার চক্ষু হইতে টপ্‌টপ্ করিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দিদিমা হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে-দিতে “হরি হে তোমারি ইচ্ছে” বলিতে বলিতে মালার ঝোলা রাখিতে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হারাণের পিসি বিরক্ত হইয়া ঠাকুরাণীর উদ্দেশে গজ্‌গজ করিয়া বলিল, “একটু যদি দেরী সয়! দিলে এই ভরসন্ধ্যেয় বাছাকে কাঁদিয়ে। না গো অতদূর নয়, বের-টের করেনি দিদিমণি, ও উঁয়ার বাড়ানো কথা। আমি এই যাচ্চি, গিয়ে খবর নিয়ে আস্‌ছি বাবুর কাছ থেকে। তুমি আজ আর না হয় ঠাকুর-বাড়ী যেও না। নে কানাই এই ভরসন্ধ্যেয় তুই”— “এই যে আমি আমার ঘরে যাই মাসি। এনাদেরও আজ আমাদের ঘরে না হয় নিয়ে গিয়ে রাখি মা, তার পরে—” রমা অশ্রু-সজল চক্ষু মুছিতে-মুছিতে বলিল, “ভর্‌সন্ধ্যায় এরা না খেয়ে বাড়ী থেকে যাবে কানাই?” রমণীটি এইবার ধীর স্বরে বলিল, “তাতে যদি তোমার মনে লাগে, তবে থাকৃছি মা রাতটুকু! তোমার বাড়ীতে তো যায়গার অভাব নেই। প্রসাদ খেয়েই তবে কাল সকালে যাব।” “কাল বাবাকে তোমাদের ঘরের জন্য বলব। আজ—” “তা তো শুনলাম; আর তোমার চোখের জলও দেখ্‌ছি মা। আমাদের জন্য আজ আর তুমি ভেব না। মা, দুঃখীর দুঃখ তুমি এমন বোঝ! ভগবান্ তোমার মনের সন্তাপ দূর করুন। তিনি তোমার ভাল করুন মা,— তুমি দেবতা!” “এরা নূতন মানুষ;— কানাই, তুই তো কতদিন এ-বাড়ী থেকেছিস্; তুইও আজ এদের সঙ্গে থাক্।” “তা থাকৃছি মা, তার আর কি!” হারাণের পিসি অপ্রসন্ন মুখে বলিল, “নাও, এইবার হাত-পা ধোবে চল, ঘরে ওঠো।” “না,—না,—ওরে, আমি ঠাকুর বাড়ী যাব একবার।” “পূজোরীরা যে শেতল নিয়ে চলে গেছে; নতুন দিদিও হয় ত গেছেন। তুমি আর যেও না।” “না, আমি একটু যাবই,— নইলে আমি টিঁক্‌তে পারব না। কেউ আমার সঙ্গে চল্।” “আমিই যাই চল তবে, সেখানে আর যাব না।” “না,—না; তুই যা, জেনে আয় সত্যি কি এ-কথা? দিদিমা, আমার সঙ্গে এস। তোমরা ঐ দালানে উঠে বসগে বাছা! কানাই, নিয়ে যা এদের ঐ দিকে। ক্ষান্তকে বল্ এদের একটা মাদুর দিক, একটু জল-টল দিক্। তোমরা ব'স, আমি একবার আসি।” দীনা রমণীটিরও চোখে জল আসিয়াছিল; তাহা যে কিসের, তা' সে-ই জানে। সেটুকু সে মুছিয়া বলিল, “এস মা, এস।”

তখন আরতি আরম্ভ হইয়া গেছে। রমা আসে নাই দেখিয়া কাত্যায়নীর মাতা একটু ক্ষুণ্ণ-ভাবে মন্দিরের পাশের ঘরের এক কোণে বসিয়া ছিলেন, এবং জমিদার-বাড়ীর নতুন দিদি সাহঙ্কারে একখানা আসন লইয়া গম্ভীর মুখে দ্বারের মাঝ পথে বসিয়া নিজ প্রাধান্যের প্রমাণে ব্যস্ত ছিলেন। হাতে তাঁহার জপ ধরা এবং চক্ষু ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। সহসা একজন দাসী ও দিদিমা ঠাকুরাণীর সঙ্গে রমাকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার গাম্ভীর্য্যের জাঁক ভূমিসাৎ হইয়া গেল। আস্তে-ব্যস্তে উঠিয়া “এস দিদি, এস; এই যে আসবে না বলেছিলে, তাই তো বলি! তুমি কি না এসে থাকতে পার, না, এ না হলে ঠাকুরের সেবা হয়!” ইত্যাদি বলিতে-বলিতে একপাশে আসনখানা টানিয়া লইয়া বসিলেন। রমা কাহারো সহিত বাক্যালাপমাত্র করিল না; কেবল একদৃষ্টিতে আরত্রিক প্রদীপ-শিখায় উজ্জ্বলিতবিগ্রহের মুখের পানে চাহিয়া স্তব্ধ ভাবে দুয়ারে শরীরের ভার রাখিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। আরতি থামিয়া গেলে, সকলেই প্রণামের জন্য নত হইল; কেবল রমাই একভাবে তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা তাহার পৃষ্ঠে করস্পর্শ হইল; সঙ্গে-সঙ্গে কে ডাকিল, "রমা!" রমা চাহিয়া দেখিল, কাত্যায়নী। রমা সম্ভ্রস্ত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল, "তোমরা এসেছ? এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" "ঘাটে।" "ঘাটে কেন?" "এমনি! দেখতে গিয়েছিলাম সেই খালি ঘাটকে, আর দুটো ফুল ভাসাতে।" রমা সহসা হতাশ কণ্ঠে অন্য মনে যেন বলিল, "খালি? সত্যি কি সবই খালি? তবে সে ফুল কে নেয়?" কাত্যায়নীর মাতা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "যাঁর দৃষ্টিতে কারুর দুঃখই বাদ পড়ে না, সকলের সব যিনি নিয়ে থাকেন তুমি বলে থাক,— তোমার সেই কথা আজ মিলিয়ে দেখতে এলাম রমা, তোমার সেই ঠাকুরকে দেখলাম আজ।" রমার ব্যথিত অন্তর আজ তাঁহার এই সরল, স্নিগ্ধ বিশ্বাসে এতক্ষণে সহসা যেন আশ্রয়হারা অবস্থা হইতে আশ্রয় পাইল। মন্দিরের পানে ফিরিয়া এইবার প্রণাম করিতেই পূর্ণ নির্ভরতায় তাহার চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

আক্‌বর বাদশাহ্ সাক্ষর না নিরক্ষর ?

বিগত ১৩২৩ সালের ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' (৩৬৯-৩৭২ পৃ.) শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম এ, পি-আর এস্ মহাশয় লিখিত 'আক্‌বর বাদশাহ্ কি নিরক্ষর ছিলেন?' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গত ভাদ্র মাসের 'ভারতবর্ষে' (৪৫২-৪৬১ পৃঃ) শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, 'আক্‌বর বাদশাহ্ কি নিরক্ষর ছিলেন না?' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রবাবুর মতের প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদের দুইটি উত্তর আসিয়াছে; একটি হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন, বি-এল-লিখিত; অপরটার লেখক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল। এ সম্বন্ধে আরও দুই-দশজন ঐতিহাসিকের মতামত প্রাপ্তির আশায় আমরা এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলাম। এক্ষণে উপরিউক্ত মহাশয়দ্বয়ের প্রতিবাদ এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুর তদুত্তরে বক্তব্য একই সঙ্গে নিম্নে প্রকাশিত হইল। সত্য-নির্ণয়ই এই আলোচনার উদ্দেশ্য; এমন একটা বিষয় অমীমাংসিত থাকা প্রার্থনীয় নহে বলিয়াই আমরা এই বাদ-প্রতিবাদ সাদরে গ্রহণ করিয়াছি।

—ভাঃ সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন মহাশয়ের মন্তব্য।

(ক) বহুদিন হইতে, এইচ্ বিভারিজ প্রমুখ কয়েকটি ইউরোপীয় পণ্ডিত এই মতের পোষকতা করিয়া আসিতেছেন যে, আক্‌বর বাদশাহের অক্ষর কিংবা সংখ্যাক্ষর জ্ঞান ছিল না এবং তিনি সংখ্যা ও বর্ণমালা লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন না। এ, মন্‌সেরাট্ (A. Monserrat) ও জেরোম জেভিয়ার (Jerome Xavier) নামক দুই জন খৃষ্টীয় মিশনারির উক্তির উপর এই মতের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা স্বভাবতঃই স্বীয় মতের আনুকূল্য-বিধায়ক পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও সাক্ষ্য প্রমাণগুলি গ্রহণ, এবং যে সমস্ত ঘটনা বা উক্তি এই মতের বিরুদ্ধগামী সেগুলিকে অবিশ্বাসযোগ্য, প্রক্ষিপ্ত, বা মূল্যহীন জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়াছেন। নরেন্দ্রবাবু বলেন যে, এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। উক্ত মিশনারিদ্বয়ের উক্তি যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর স্থাপিত নহে, তদ্বিষয়ে তিনি কয়েকটি কারণও দর্শাইয়াছেন। আক্‌বরের জীবন-কাহিনী ও আবুল-ফজ্‌লের লিখিত আক্‌বরনামায় নিহিত প্রমাণই অধিকতর বলবৎ এবং এ সমস্ত প্রমাণকেই কেন্দ্র করিয়া অপরাপর ঘটনা ও উক্তির সত্যাসত্য বিচার করিতে হইবে। তাঁহার লিপিবদ্ধ যুক্তির মধ্য হইতে ব্রজেন্দ্রবাবু কয়েকটির দোষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই দোষগুলির বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি বক্তব্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

(১) ব্রজেন্দ্রবাবু বলেন প্রাচ্যের ইতিহাসে এমন অনেক বড় বড় শাসনকার্য্য-পরিচালকের নামোল্লেখ আছে যাঁহারা সুশৃঙ্খলার সহিত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, অথচ তাঁহারা লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না। উদাহরণস্বরূপ হায়দর আলী, মহারাষ্ট্রীয় শিবাজী প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। সেইহেতু আক্‌বর বাদশাহও যে নিরক্ষর হইয়াও অবাধে রাজকার্য্য চালাইবেন, তাহা বিশ্বাস করিতে বাধা নাই। কথাটি সত্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এস্থলে ইহাও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, পূর্ব্বোক্ত শাসনকর্ত্তৃগণের নিরক্ষরতার সহিত আক্‌বর বাদশাহের সংখ্যাক্ষর জ্ঞানের কোনও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নাই।

(২) প্রায় পঞ্চম বর্ষ বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া আট দশ বৎসর কাল আক্‌বরের জন্য কয়েকটী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আক্‌বরকে অক্ষর পর্য্যন্ত শিখাইতে সমর্থ হন নাই, এ কথা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আক্‌বর পায়রা উড়াইতেন, অলস ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিলেন, এবং তাঁহার একজন শিক্ষকও পায়রা উড়াইয়া কালক্ষেপ করিয়াছিলেন ইহা সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইলেও হুমায়ুন, বায়রাম এবং উপরিউক্ত একটী মাত্র শিক্ষক

ব্যতীত অপর শিক্ষকগণের চেষ্টা ও যত্ন যে আমূল ব্যর্থ হইয়াছিল, ইহা আমার বোধ হয় না। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রবাবুর অন্যান্য যুক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করা অনাবশ্যক। তবে এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, ব্রজেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে উক্ত যুক্তিগুলি আদৌ খণ্ডিত হয় নাই।

(৩). আবুলফজল্ "আইন ই-আকবরী" গ্রন্থে যে hindisah ba-qalam gauharbar naqsh kunand লিখিয়াছেন তন্মধ্যে hindisah naqsh kunand—এই শব্দ কয়টার অর্থ লইয়া মতভেদ হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর মতে hindisah শব্দের অর্থ জ্যামিতিক চিত্র (Geometric diagram) এবং তিনি এইরূপে ইহার অর্থ করিয়াছেন - "যেখানে পাঠক শেষ করিত, তথায় পঠিত পৃষ্ঠার সংখ্যা অনুযায়ী আকবর নিজ কলমের সাহায্যে একটী জ্যামিতিক চিত্র আঁকিতেন (naqsh kunand ছবি আঁকিতেন); আমরা বাঙ্গালায় যাহাকে ঢেড়া বলি, যেমন ×, △, × × প্রভৃতি চিহ্ন,—অক্ষর নহে।" Steingass সাহেবের Arabic-English Dictionaryতে hindisah শব্দের অর্থ geometrical figure দেওয়া হইয়াছে এবং ব্লকম্যান্ সাহেব আইন ই-আকবরী গ্রন্থের অনুবাদে এইরূপ লিখিয়াছেন যে—"His Majesty makes with his own pen a sign according to the number of the pages." ব্রজেন্দ্রবাবু এই দুইটী প্রমাণ অবলম্বন করিয়াই hindisahর অর্থ ঐরূপ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি A. N. Wollaston রচিত English-Persian Dictionary (1904) দেখিলে numeral শব্দের অর্থ hindisah পাইতেন। আমার মতে hindisahর এই অর্থই বর্ত্তমানস্থলে যুক্তিযুক্ত। এই hindisah শব্দটাকে আমরা সচরাচর arithmetic অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখি এবং এই অর্থ সম্ভবতঃ ইহার numeral অর্থ হইতে উদ্ভূত; জ্যামিতির জন্য "যুক্লাইদস্" কথা প্রযুক্ত হয়। তার পর ব্রজেন্দ্র বাবু যে Naqsh-kunand শব্দটাকে বিভক্ত করিয়াছেন (naqsh এবং kunand = আঁকিতেন), তাহা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। যদি এই কথাটীর দ্বারা "নক্সা আঁকিতেন" অর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত বচনটাতে hindisah শব্দের অস্তিত্ব বাহুল্য মাত্র। প্রকৃতপক্ষে Naqsh-kunand এই দুইটী শব্দ একত্ররূপে একটী ক্রিয়াপদ হইয়াছে। ক্রিয়াপদের এবম্বিধ প্রয়োগ বহুস্থানে দেখিতে পাই। যথা—Nashta-kunand, Ghosal-kunand, Syer-kunand (kunand = করিতেন) "লিখিতেন" এই সাদাসিধা শব্দটা ব্যবহার না করিয়া মহামান্য ভারত-সম্রাটের লেখা বলিয়া ইহাকে রঞ্জিত আকারে সম্মানসূচক ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। "hindisah" উক্ত ক্রিয়াপদের কর্ম্ম; কাজেই hindisah naqsh kunand এই সমস্ত পদটার অর্থ হইতেছে "সংখ্যালিপি লিখিতেন।" ব্লকম্যান্ সাহেবের অনুবাদে এই বচনটার মূলানুযায়ী অর্থ প্রতিফলিত হয় নাই। অধিকন্তু তিনি gauharbar কথাটিকে একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

(৪) "তুজক-ই-জাহাঙ্গীরী" গ্রন্থে আকবর সম্বন্ধে "উম্মি" কথা ব্যবহৃত হইয়াছে। "উম্মি" শব্দের একাধিক অর্থ আছে। "নিরক্ষর" যে ইহার একমাত্র অর্থ তাহা নহে। নরেন্দ্রবাবু "মহীতুল-মুহীৎ" গ্রন্থ অবলম্বনে ইহার অর্থ করিয়াছেন,—"taciturn" (অল্পভাষী) এবং তুজকস্থ যে বেষ্টনীর মধ্যে শব্দটী দেখিতে পাই, তাহার সহিত এই অর্থের সামঞ্জস্য আছে। "মহীতুল-মুহীৎ" একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ বিধায় ইহার এই অর্থ গ্রহণে কোন আপত্তি দেখি না। আরও বক্তব্য এই যে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের আত্মজীবনচরিত বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। ইহাদিগের মধ্যে "উম্মি" কথাটী সকল গ্রন্থে নাই। বিভারিজ সাহেব রিউ, (Rieu) সাহেবের মত অনুসরণ করিয়া বলেন যে, 'উম্মি'যুক্ত পাঠই ঠিক। যদি "আকবর নিরক্ষর ছিলেন" এই মত দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহারা বলেন এই পাঠই ঠিক, তবে অপর পক্ষ এ কথা বলিতে পারেন যে "উম্মি" শব্দ-বর্জ্জিত পাঠই ঠিক।

(৫) "আকবর-নামা", "ফেরেশ্‌তা" ইত্যাদি অবলম্বনে নরেন্দ্রবাবু বলেন যে, আকবর হাফিজ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিতেন, পদ্য রচনায় কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন, মনীষিগণের সহিত জটিল বিষয়ে তর্কালাপ করিতেন এবং ইতিহাসেও অভিজ্ঞ ছিলেন। এই সমস্ত বিষয়ে দখল থাকায় স্বভাবতঃই মনে হয় আকবর নিরক্ষর ছিলেন না, পরন্তু তাঁহার অক্ষরজ্ঞান ছিল। ["These as well as the learning they imply come as more natural corollaries to his knowledge of the alphabet than to his ignorance thereof" *Promotion of Learning by Muhammadans* (Addendum)] ব্রজেন্দ্রবাবু Bibliotheca Indica, সংস্করণের "আকবরনামা" গ্রন্থের যে অংশে উক্ত বিবিধ বিষয়ে আকবরের জ্ঞানের কথা নিহিত আছে, সে অংশটিকে "প্রক্ষিপ্ত" (spurious) বলিতে চাহেন, কারণ লক্ষ্ণৌ সংস্করণের আকবরনামায় উহা নাই। কেন যে লক্ষ্ণৌ সংস্করণে উহা নাই, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি যে, Bibliotheca Indica সংস্করণের প্রামাণিকতা অল্প নহে, বিশেষতঃ যখন ফেরেশতা লিখিয়াছেন—"Although Akbar was by no means an accomplished scholar, he sometimes wrote poetry and was well-read in history" এবং বদায়ুনীও বলেন, "আকবর মীর আবদুল লতীফের নিকট হাফেজের 'দেওয়ান' হইতে পাঠ লইতেন।" ব্রজেন্দ্রবাবু বদায়ুনীর উক্তিকে ব্লকম্যান্ সাহেবের "আইন-ই-আকবরীর" অনুবাদে নিহিত কয়েকটী পংক্তির দ্বারা খণ্ডিত করিতে চাহেন। এই পংক্তিগুলি ব্লকম্যান্ সাহেবের স্বকীয় বক্তব্য নহে, পরন্তু (Elliot) সাহেব কর্ত্তৃক অনূদিত Lubbut Tawarikh নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত (See Elliot, iv, 294)। Lubbut Tawarikhএ লিখিত আছে যে, "Mir Abdul Latif...arrived at Court with his family after Akbar had ascended the throne. By him he was received with great kindness and consideration

and was appointed in the second year of the reign as his (Akbar's) preceptor. *At that time the prince knew not how to read and write but shortly afterwards he was able to repeat some odes of Hafiz.*" শেষোক্ত কয়েকটী পংক্তি পাঠে বুঝা যায় যে, আবদুল লতীফের আগমনকালে আক্‌বর যদিও লিখিতে-পড়িতে জানিতেন না, তথাচ তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই কেবল লিখন-পঠন ত সামান্য কথা, হাফিজ্ হইতে আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন "আক্‌বরের নিরক্ষরতা বিষয়ে এত প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতেও নরেন্দ্রবাবু বৃথা লিখিয়াছেন যে, 'আক্‌বর বাদশাহ্ যে সংখ্যা ও বর্ণমালায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহা য়ুরোপে বিনা তর্কে গৃহীত হইয়াছে।' আমি যতদূর জানি তাহাতে নরেন্দ্রবাবু ইহা বৃথা লেখেন নাই, তিনি ঠিকই লিখিয়াছেন যে, ঐ বিষয়টী য়ুরোপে বিনা তর্কে (without discussion) গৃহীত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রবাবুই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উহা তর্ক বিতর্কের পর গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয়ের মন্তব্য

(১) **২রা জানুয়ারী ১৫৪৭ (৯ জিকাদ ৯৫৩ হিঃ)** অকবরের বিসমল্লা (বিদ্যারম্ভ) হয়। হুমায়ুঁ তখন কাবুলের অধিপতি। ভারতে আসিবার সময়ে অকবর বেশ চিত্র আঁকিতে পারিতেন ও মুল্লা পীর মহম্মদের কাছে হাফেজের কবিতা পাঠ করিতেন। পরে মীর অবদুল লতীফের কাছেও হাফেজ পাঠ করেন। তর্ক করিবার সময়ে হাফেজের কবিতা উদ্ধৃত করিতেন। অকবর যখন প্রেরিত পুরুষের (রসুল-অল্লার) অতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলী লইয়া তর্ক করিতেন, তখন মোল্লারা অরবী ধরিত। অকবর অরবী বুঝিতেন না, অতএব অবুল ফজলের পিতা শেখ মুবারকের কাছে "সর্ফ্ হবাই" নামক প্রাথমিক ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অল্প দিনেই সময়াভাবে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ইহার পর যখন মোল্লারা মথুরার এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডাকে হজরৎ মহম্মদের প্রতি অসম্মানসূচক বলার অপরাধে প্রাণদণ্ড করে, তখন একদিন মুবারকের কাছে মোল্লাদের অত্যাচার কাহিনী বলেন। মুবারক বলিলেন "ধর্ম্মতঃ রাজা যদি রাজনৈতিক কারণে ইচ্ছা করেন তবে মুল্লাদের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিতে পারেন।" এই কথা শুনিয়াই অকবর বলেন "হর গাহ্ শুমা ওস্তাদ মা বাশেদ, ব অবহক্ পেশ্ শুমা খোয়ান্দা বাশেম, চিরা মা রা অজ্ সিল্লমে ইঁ মুল্লায়ান খলাস নমি "সাজেদ" অর্থাৎ যখন তুমি আমার ওস্তাদ ছিলে ও আমি তোমার কাছে পাঠ পড়িয়াছি, তখন আমাকে এই মুল্লাদের কবল হইতে উদ্ধার কর না কেন?

(২) অকবরের নিরক্ষরতা সম্বন্ধে প্রমাণ জহাঙ্গীরের তোজক হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। জহাঙ্গীর লিখিয়াছেন :—"আমার পিতা বিদ্বানদের সহিত বড় বড় বিষয়ে তর্ক করিয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহার কথা শুনিয়া কেহ বুঝিতে পারিত না যে তিনি "উম্মী"।

"উম্মী" শব্দের আভিধানিক অর্থ "প্রাকৃতিক", "স্বাভাবিক" অর্থাৎ মাতৃগর্ভ হইতে যে অবস্থায় জন্ম হইয়াছে, তাহার উপর কৃত্রিমতা বা শিক্ষা পায় নাই। কিন্তু লেখকের লেখার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে অকবর যে সকল বিষয়ে তর্ক করিতেন তাহার অধিকারী ছিলেন না। একেবারে নিরক্ষর বোঝায় না।

(৩) অকবর প্রত্যহ পাঠের পর স্বহস্তে "হিন্দসা" লিখিয়া দিতেন। "হিন্দসা" শব্দের অর্থ ধরা হইয়াছে জ্যামিতির ক্ষেত্র অর্থাৎ তিনি ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ ইত্যাদি রেখা সহিত মত একটা চিহ্ন করিতেন; কিন্তু "হিন্দসা" অর্থে যে বিদ্যা হিন্দ (ভারতবর্ষ) হইতে আসিয়াছে। অরবেরা ক্ষেত্র বিদ্যা (Mensuration) কে "ইলম ই হিন্দসা" বলে। কিন্তু কেবল "হিন্দসা" অঙ্ককে (numerals) বলে; এখনও অরবী ও উর্দ্দু ভাষায় ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেবল "হিন্দসা" বলিলে জ্যামিতিক ক্ষেত্র কোন মতে বুঝিতে পারা যায় না। অবশ্য যদি "অশকাল ই হিন্দসা" থাকিত তাহা হইলে ক্ষেত্র Geometrical figures অর্থ করা যাইতে পারিত। এখানে Blochmann ভুল করিয়া Sign লিখিয়াছেন বলিয়া শব্দের অর্থ বিকৃত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই।

(৪) গোঁড়া মুল্লা অবদুলকাদির বদাউনি (অকবরের সময়ের ঐতিহাসিক) অকবরের একজন পেশ ইমাম পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিযুক্ত হইবার সময়ে (এপ্রেল ১৫৭৪) অকবরের গোঁড়া ছিলেন, কিন্তু পরে অকবরের উদার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিতে না পারিয়া আপন ইতিহাসে এত কটূক্তি করিয়াছেন যে, জহাঙ্গীর সব পুস্তক নষ্ট করিয়া ফেলেন ও বদাউনীর উত্তরাধিকারীদের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লয়েন যে এ পুস্তক কখন প্রচার করিবে না। এই পুস্তকে অকবরের অনেক দোষের কথা আছে, কিন্তু তিনিও "নিরক্ষর" বলেন নাই।

(৫) আবুল ফজল ৯৯৯ হিজরির বর্ণনায় লিখিয়াছেন জহাঙ্গীরের পুত্র খুসরুর বিদ্যারম্ভ হইল। অকবর স্বয়ং পৌত্রকে পাঠ দিতেন। দিন কয়েক পরে অবুল ফজলকে ভার দিলেন; অবুল ফজলও কয়েক দিবস পরে আপন কনিষ্ঠ অবুলখায়েরকে নিযুক্ত করিলেন।

এই সকল কারণে বোধ হয় অকবর নিরক্ষর ছিলেন না; তবে পিতা ও পিতামহের মত বিদ্বান ছিলেন না এইমাত্র।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য

(মৌলবী ওয়াজেদ হোসেনের বক্তব্য সম্বন্ধে)

আক্‌বরের নিরক্ষরতা প্রসঙ্গে পূর্ব্ব প্রতিবাদে অধিকাংশ কথাই বলিয়াছি; মৌলবী সাহেব ও শীল মহাশয়ের বক্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলিলেও চলিত, কিন্তু তাঁহারা স্ব স্ব বক্তব্যে অনেকগুলি ভুল করিয়াছেন; সেগুলির আলোচনা বিধেয় বলিয়া সংক্ষেপে আমার মন্তব্য প্রকাশ করিলাম।

(১) শ্রীযুক্ত ওয়াহেদ হোসেন মহাশয় নিরক্ষর শাসনকর্ত্তৃগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বোক্ত শাসনকর্ত্তৃগণের নিরক্ষরতার সহিত আকবর বাদশাহের সংখ্যাক্ষর জ্ঞানের কোনও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই।" সম্বন্ধ এই হিসাবে আছে, যাঁহারা মোগল-মণি, রাজনীতি-বিশারদ আকবর "নিরক্ষর" ছিলেন, একথা শুনিলে বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহাদের জানা উচিত যে, আলাউদ্দীন্ খিলজী, হায়দর আলী, মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজী, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ প্রভৃতি নিরক্ষর হইয়াও আকবরের ন্যায় সুশৃঙ্খলায় রাজ্যশাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন,—ইহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই; এমন কি হজরৎ মুহম্মদও নিরক্ষর ছিলেন।

(২) কয়েকটী শিক্ষক নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও আকবর যে অক্ষর পর্য্যন্ত লিখিতে শেখেন নাই, এ কথা মৌলভী সাহেব বিশ্বাস করেন না; কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁহার এই অনুমানের কোনই মূল্য নাই। লাহা মহাশয় ও মৌলভী সাহেব যাঁহার কথা অমূল্য প্রমাণরূপে মনে করেন, সেই আবুল ফজল্ নিম্নোদ্ধৃত অংশে প্রকারান্তরে আকবর যে নিরক্ষর, এবং তিনি যে কোন শিক্ষকেরই নিকট কিছু শেখেন নাই তাহা স্বীকার করিয়াছেন; তিনি লিখিতেছেন:—

"It is not hidden from the wise and acute, that the appointment of a teacher in a case like this, springs from use or wont, * * For him (Akbar) who is God's pupil, what occasion is there for teaching by creatures or for application to lessons? Accordingly his holy heart and his sacred soul *never turned towards external teaching.* And his possession of the excellent sciences together with his *disinclination for learning of letters* were a method of showing to mankind * * * that the lofty comprehension of this Lord of the Age *was not learnt or acquired,* but was *gift of God in which human effort had no part.*" (See *Akbarnama,* i, 589).

পরন্তু আকবর যদি সত্যই অক্ষর লিখিতে পারিতেন, তাহা হইলে আবুল-ফজল্ যে প্রভুর হস্তাক্ষরের এবং গ্রন্থপাঠের প্রশংসায় কয়েক-পৃষ্ঠা পূর্ণ করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; যিনিই আকবরনামার সহিত সুপরিচিত, তিনিই এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। যেমন আব্দুল হামিদ্ লাহোরী, সম্রাট্ শাহ্‌জহানের গান গাহিবার ক্ষমতার প্রশংসায় লিখিয়াছেন,—"বাদশাহ্‌র গান শুনিয়া অনেক সাধু ও পণ্ডিতের মূর্চ্ছা লাগিয়া যাইত! (*Abdul Hamid,* I. A. 153) যখন আবুল-ফজলের ন্যায় মজ্জাগত তোষামোদকারী লেখক এ বিষয়ে নীরব, তখন আকবরের নিরক্ষরতার বিষয়ে সন্দেহ করা এক প্রকার অসম্ভব।

* আকবরের বয়ঃক্রম যখন ১৪ বৎসর, সেই সময়ে আবদুল লতীফ তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হ'ন। লতীফের পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষকেরা যে আকবরকে কিছুতেই শিখাইতে পারেন নাই, ইতিহাসে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে:—"Mir Abdul Latif * * was appointed in the 2nd year of the reign as his (Akbar's) preceptor. *At that time the prince knew not how to read or write,* but shortly afterwards he was able to REPEAT some odes of Hafiz." (*Lubbut Tawarikh* in Elliot, IV, 294.)

পঞ্চম অংশের শেষে, মৌলভী সাহেব লিখিতেছেন, "শেষোক্ত (উপরিউদ্ধৃত ইংরেজী অংশের) কয়েকটী পংক্তি পাঠে বুঝা যায় যে, আবদুল্ লতীফের আগমনকালে আকবর যদিও লিখিতে-পড়িতে জানিতেন না, তত্রাচ তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই কেবল **লিখন-পঠন** ত সামান্য কথা হাফিজ হইতে আবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" এই কয়েকটী কথা পাঠ করিয়া আমাদের স্বতঃই মনে হইতেছে, তিনি জোর করিয়া আকবরকে 'লিখন পঠনে সমর্থ' করিতে চাহেন; কারণ উপরিউদ্ধৃত ইংরেজী অংশে কোথাও "**লিখন-পঠনের**" কথা নাই; repeat কথাটী আছে, ইহার অর্থ "আবৃত্তি করা বা মুখস্থ বলা।" কাজেই আবদুল্ লতীফের নিকটও আকবর যে **লিখিতে পড়িতে** শিখিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ নাই। শিক্ষক নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও যে ছাত্র লিখিতে-পড়িতে শেখে নাই, ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। উদাহরণস্বরূপ সম্রাট্ আওরংজীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সুলতানের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে; তিনি তুর্কী শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও তুর্কী-ভাষা শিখেন নাই—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। (*Adab-i-Alamgiri,* 184 *a*)

(৪) মৌলভী সাহেব "উম্মি" শব্দের অর্থে 'নিরক্ষর' গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য পূর্ব্ব প্রতিবাদেই লিখিয়াছি; সে সমস্ত কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এস্থলে মৌলভী সাহেবের অবগতির জন্য একটা কথা বলিব। মৌলভী আবদুল মুক্তাদীরের ন্যায় সুপণ্ডিত মুসলমানও "উম্মি" শব্দের অর্থ 'নিরক্ষর' গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই; সত্যের খাতিরে, তিনিও স্বীকার করিয়াছেন যে, আকবর নিরক্ষর। (See "Learning of the Mughal Emperors" *Journal of the Moslem Institute,* Jany. to March, 1907) শুধু ইহাই নহে; মুহম্মদ হুসেন সাহেব আজাদ-রচিত উর্দ্দু গ্রন্থ "**দরবার-আক্‌বরী**" একখানি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ; এই পুস্তকের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, সম্রাট্ আকবর লিখিতে বা পড়িতে অসমর্থ ছিলেন। Sir H. M. Elliot, H. Beveridge, I. C. S, W.H. Lowe প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গও "উম্মির" অর্থ 'নিরক্ষর' করিয়াছেন।' আমার অন্যতম প্রতিবাদকারী শীল মহাশয়ও "উম্মি" শব্দের যথার্থ আভিধানিক ব্যুৎপত্তি প্রদান করিয়াছেন।

মৌলভী সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে:—"জহাঙ্গীরের আত্মজীবন

নতি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রাজা রাজেশ্বর প্রসাদ বসু

চরিত বলিয়া যে কয়েকখানি পুঁথি আছে, তাহার কোন কোন-খানিতে এই "উম্মি"যুক্ত পাঠ নাই।" আমাদের যতটা জানা আছে, তাহাতে মনে হয়, একমাত্র Price সাহেব জহাঙ্গীরের আত্ম-কাহিনী *Wakiat-i-Jahangir*এর যে ইংরেজী অনুবাদ করেন, সেই অনুবাদে 'উম্মি'র উল্লেখ নাই (See p. 44-45),—মূল পুঁথিতে কি আছে বলিতে পারি না। Price সাহেবের অনুদিত জহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী যে 'উম্মি' শব্দ-বিবর্জ্জিত, সে কথা নরেনবাবু তাঁহার Promotion of Learning etc. পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন; মৌলভী সাহেব এস্থানে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু Price সাহেব-অনুদিত *Wakiat i-Jahangiri* বর্ত্তমানে 'প্রক্ষিপ্ত' (spurious) বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। এ বিষয়ে বেভারিজ সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্যটী উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিতেছেন :—"Mr. Law relies on the spurious Memoirs which were translated by Major Price. That these memoirs are spurious is the view of so great an authority as Dr. Rieu, and is also proved by the fact *that they contain statements which it is impossible that Jahangir can have written.*"

Price সাহেব-অনুদিত *Wakit-i-Jahangiri* সম্বন্ধে V. A. Smith লিখিয়াছেন :—"Many of the statements are absolutely incredible, and numbers have been exaggerated throughout. *The book should not be quoted for any purpose,* but should be ignored as being misleading. Prior to the publication of the version of the genuine memoirs by Rogers and Beveridge Price's translation was commonly quoted and is responsible for much false current 'history".—Smith's *Akbar*, p. 456.

ইহার পরও যাঁহারা এ বিষয়ে অধিক কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহারা Rogers and Beveridge-সম্পাদিত *Tuzuk-i-Jahangir*এর ভূমিকা পাঠ করিবেন। সার সৈয়দ অহমদের বিশুদ্ধ পাঠ অবলম্বন করিয়া, জহাঙ্গীরের আত্মজীবন-চরিতের বহু পুঁথি মিলাইয়া, Rogers & Beveridge *Tuzuk-i-Jahangiri*র যে বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের নিকট তাহার মূল্য অধিক; ইহাতে 'উম্মি'যুক্ত পাঠ আছে (i, 33); শুধু তাহাই নহে, Asiatic Society হইতে প্রকাশিত W. H. Lowe কর্ত্তৃক সম্পাদিত *Tuzuk-i-Jahangiri*তেও (আংশিক প্রকাশিত) 'উম্মির' প্রয়োগ আছে, (see p. 26)। ইহার পরেও কেহ যদি জোর করিয়া বলেন যে, Rogers & Beveridgeএর সংস্করণ ও Priceএর সংস্করণ সমান মূল্যবান্; Catrouর চুরিকরা, ভ্রমপূর্ণ প্রক্ষিপ্ত, মানুচীর (Manucci) বিবরণ ও Wm. Irvine-সম্পাদিত মানুচীর বিশুদ্ধ, সম্পূর্ণ বিবরণ, তুল্যমূল্য, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত তর্ক করা বিড়ম্বনা!

(৫) মৌলভী সাহেব লিখিতেছেন: "আকবরনামা, ফেরেশ্তা, ইত্যাদি অবলম্বনে নরেন্দ্রবাবু বলেন যে, আকবর হাফিজ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিতেন, পদ্য রচনায় কৃতিত্বলাভ করিয়াছিলেন, মনীষিগণের সহিত জটিল বিষয়ে তর্কালাপ করিতেন এবং ইতিহাসেও অভিজ্ঞ ছিলেন। এই সমস্ত জটিল বিষয়ে দখল থাকায়, স্বভাবতঃই মনে হয়, আকবর নিরক্ষর ছিলেন না, পরন্তু তাঁহার অক্ষর-জ্ঞান ছিল।" দুঃখের বিষয়, নরেনবাবু বা তাঁহার সমর্থনকারী, কাহারই আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস ভালরূপ স্মরণ নাই; তাহা হইলে তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন না। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি:—

আকবরের পদ্য রচনায় কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে অংশটী *Bibliotheca Indica*-সংস্করণ আকবরনামায় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যে 'প্রক্ষিপ্ত', তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রতিবাদেই দেখাইয়াছি। প্রতিবাদকারী মৌলভী সাহেব জবাবে বলিতেছেন:—"লক্ষ্ণৌ সংস্করণ 'আকবরনামায়' কেন যে উহা নাই, তাহা বলিতে পারি না; তবে ইহা বলিতে পারি যে Bibl. Ind. সংস্করণের প্রামাণিকতা অল্প নহে।" Bibliotheca Indica সংস্করণ 'আকবরনামার', মূল্য যে যথেষ্ট, তাহা আমিও অস্বীকার করি না; তবে যে অংশটা 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়াছি, তাহার কোনই মূল্য নাই;—এ কথা আকবরের 'সাক্ষরত্ব'-প্রমাণাভিলাষীরা স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু প্রত্যেক সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। দুঃখের বিষয়, নরেনবাবু বা তাঁহার সমর্থনকারী 'আকবরনামা' খানি ভাল করিয়া পাঠ করেন নাই; তাহা করিলে নরেনবাবুও একথা লিখিতেন না, এবং মৌলভী সাহেবকেও এ বৃথা তর্কের হাঙ্গামায় পড়িতে হইত না। 'আকবরনামার' প্রথম খণ্ডে, ৫২০ পৃষ্ঠার পাদটীকায়, বেভারিজ সাহেবের মন্তব্যটুকু এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিতেছেন:—"The passage about the Hindi and Persian poetry is omitted in the Lucknow Edition. Nor does it occur in British Museum Mss. No. 27, 247, 17, 926, 5610, and 6544. It is also absent from the India office Mss. Nos. 4 and 564, and is *undoubtedly spurious.*" মৌলভী মুকতাদীরও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্করণ 'আকবরনামায়' আলোচ্য প্রক্ষিপ্ত অংশটী দেখিতে পান নাই। (See *Journal of the Moslem Instt.*, Jany. to March, 1907)। সম্ভবতঃ ইহাতেই মৌলভী সাহেবের বিস্ময় অপনোদিত হইবে।

তাহার পর ফেরেশ্তার কথা। তিনি আকবর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তৎসমুদয় 'আকবরনামার' উপাদান অবলম্বনে; সুতরাং তাঁহার পক্ষে 'আকবরনামার' প্রক্ষিপ্ত অংশটী লওয়া খুব

সম্ভবপর, এ কথা পূর্ব্ব প্রতিবাদেই বলিয়াছি। অধিকন্তু Briggs সাহেব-অনূদিত ফেরেশ্‌তায় প্রচুর ভুল অনুবাদ আছে। উদাহরণ-স্বরূপ একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি; নরেনবাবু প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা Briggs সাহেবের ফেরেশ্‌তার অনুবাদ অবলম্বনে, আকবরের ন্যায় আলাউদ্দীন্ খিলুজীর নিরক্ষরতা কলঙ্ক মোচন করিয়াছিলেন; কিন্তু বেভারিজ সাহেব স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন যে, উহা Briggs সাহেবের অনুবাদের ভুল;—আলাউদ্দীন্ নিরক্ষর!

নরেনবাবু বা তাঁহার মত-সমর্থনকারী মৌলভী সাহেব ফেরেশ্‌তার দোহাই দিয়া আকবরের কবিতা-রচনার কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা Briggs কর্ত্তৃক ফেরেশ্‌তার অনুবাদে আছে (ii, 288)। সুখের বিষয়, আমরা ফেরেশ্‌তার মূল ফার্সী গ্রন্থ দেখিয়াছি; কিন্তু তাহাতে আকবরের কবিতা-রচনার কথা কিছুই লেখা নাই,—কেবল লেখা আছে "আক্‌বর সময় সময় পদ্য আবৃত্তি করিতেন। ইতিহাসে তাঁহার অত্যন্ত জ্ঞান ছিল; তিনি ভারতেতিহাস সুন্দররূপে জানিতেন।" (See *Ferishta*, Lucknow edition, Vol. I, P. 271 bottom) সুতরাং ইহা Briggs সাহেবের অনুবাদের ভুল।

তৎপরে আরও একটী কথা ভাবিবার আছে; ভারতবর্ষে নিরক্ষর কবির অসদ্ভাব নাই; ইহা কিছু নূতন কথা নহে; কাহারও কবিতা-রচনার শক্তি থাকিলেই যদি ধরিয়া লইতে হয় যে, তিনি লিখন-পঠনে সমর্থ, তাহা হইলে ত বিড়ম্বনা! এই "ভারতবর্ষ" পত্রেই ধারাবাহিক-ভাবে নিরক্ষর কবিদের সুন্দর কবিতাদি প্রকাশিত হইতেছে!

সম্রাট্ আক্‌বর বহু ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মতত্ত্বালোচনাকারীদের পুস্তকের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন; দর্শনশাস্ত্র তাঁহার প্রিয় বস্তু ছিল; নানা দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে তাঁহার আলোচনা করিবার শক্তি ছিল,—এ সমস্ত কথা সত্য, আমিও তাহা স্বীকার করি; কিন্তু ইহার সহিত আকবরের নিরক্ষরতার কোনই সম্বন্ধ নাই। শৈশবে আক্‌বর অলস ও ক্রীড়াপ্রিয় থাকায় লেখাপড়ার দিকে একেবারে দৃষ্টিপাত করেন নাই; কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তিনি বেতনভোগী পাঠক দ্বারা নিয়মিতরূপে নানাবিষয়ক পুস্তকের পাঠ শ্রবণ করিতেন। তিনি অসাধারণ স্মরণ-শক্তির অধিকারী ছিলেন বলিয়া পঠিত পুস্তক সমূহের সার মর্ম্ম স্মরণ রাখিতে পারিতেন। এই স্মরণশক্তির বলেই তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং নানা দুর্জ্ঞেয় বিষয়েও সুন্দররূপে তর্ক করিতে পারিতেন। পণ্ডিতপ্রবর Vincent Smith সত্যই লিখিয়াছেন:—"He (Akbar) simply preferred to learn the contents of books through the *ear* rather than the *eye*, and was able to trust his prodigious memory which was never enfeebled by the use of written memoranda. Anybody who heard him arguing with acuteness and lucidity on a subject of debate would have credited him with wide knowledge and profound erudition, and *never would have suspected him of illiteracy*." (Smith's *Akbar*, 338), এই অমূল্য কথাগুলি শুধু স্মিথই বলেন নাই, Father Monserrate'ও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন। (See *Commentarius*, 643).

(ক) ইহার পর মিশনরীগণের বিবরণ; আক্‌বর সম্বন্ধে কোন কিছু রচনা করিতে গেলে, এগুলি বাদ দিলে চলে না; কারণ "The Fathers were highly educated men, trained for accurate observation, and scholarly writing. They made excellent use of their opportunities at the Imperial court, *and any book which professes to treat of Akbar while ignoring the indispensible Jesuit testimony must necessarily be misleading.* The long-lost and recently recovered work by Father Monserrate is an authority of the highest credit and importance, practically new." (Smith's *Akbar*, 7) মন্‌সেরাট্, জেভিয়ার প্রমুখ মিশনরী একাধিক বর্ষ মোগল দরবারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন; আকবরের সহিত তাঁহাদের মিশিবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল; অধিকন্তু তাঁহারা মানুচীর (Manucci) ন্যায় 'Run-away lad' নহেন,—প্রাপ্তবয়স্ক ও সুশিক্ষিত ছিলেন। এই মন্‌সেরাট্ ও জেভিয়ার উভয়েই স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, আক্‌বর 'can neither read nor write' (See *J. A. S. B.* 1912, p, 194; and *J. A. S. B.* 1888, p 37)। দুঃখের বিষয়, নরেনবাবু বা তাঁহার সমর্থনকারী এই সমস্ত সমসাময়িক লোকের কথার উপর কোন আস্থা স্থাপন করিতে রাজী নহেন; তাঁহাদের যুক্তি যেহেতু *Monserrate*এর বিবরণে কয়েকটি ভুল আছে, অতএব আক্‌বরের নিরক্ষরতা বিষয়ে মন্‌সেরাট্ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ভুল, বা শুনা-কথা! কিন্তু নরেনবাবু জেভিয়ার সম্বন্ধে নীরব। বিংশ শতাব্দীর উন্নত প্রণালীতে ইতিহাস-রচনার যুগে, ইহাও যদি আবার যুক্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, আক্‌বরকে কোন বিষয়ে বাড়াইয়া বা ছোট করিয়া আমাদের কিছুমাত্র লাভ নাই—সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের নিকট উপযুক্ত প্রমাণাভাবে 'নূতন কিছু করিবার' লোভ সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়।

মৌলভী সাহেব আমাদের জানাইয়াছেন যে, বেভারিজ প্রমুখ কয়েকটী ইউরোপীয় পণ্ডিত মন্‌সেরাট্ ও জেভিয়ারের উক্তির উপর ভিত্তি করিয়া আক্‌বরকে 'নিরক্ষর' বলিয়াছেন এবং "এই মতের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা স্বভাবতঃই স্বীয় মতের আনুকূল্য বিধায়ক পারিপার্শ্বিক ঘটনা ও সাক্ষ্য প্রমাণগুলি গ্রহণ এবং যে সমস্ত ঘটনা বা উক্তি এই মতের বিরুদ্ধগামী সেগুলিকে অবিশ্বাসযোগ্য, প্রক্ষিপ্ত, বা মূল্যহীন জ্ঞানে বর্জ্জন করিয়াছেন।" মৌলভী সাহেব কথাগুলি একটু সংযতভাবে লিখিলে ভাল করিতেন; Beveridge, Smith প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ বলবৎ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই আক্‌বরকে 'নিরক্ষর' বলিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নরেনবাবু ও মৌলভী সাহেব

জানিতে পারিবেন যে, শুধু পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই আকবরকে নিরক্ষর বলেন নাই; পরন্তু সুপণ্ডিত মুসলমানেরাও এই কথা স্বীকার করেন। উদাহরণ স্বরূপ মৌলভী আবদুল মুক্তাদীর ও মুহম্মদ হসেন সাহেব আজাদের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে; মুক্তাদীর ১৯০৭ সালের *J. Mos. Instt.* পত্রে আকবরের নিরক্ষরতা প্রমাণ করিয়াছেন; হসেন সাহেব আজাদ তাঁহার মূল্যবান্ উর্দ্দূ গ্রন্থ "দরবার আকবরী" গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, আকবর লিখন-পঠনে অসমর্থ ছিলেন। এত প্রচুর প্রমাণের পর, সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি সত্যের দৃঢ় প্রস্তরের উপর সংস্থাপিত—আর নরেনবাবু ও মৌলভী সাহেবই জোর করিয়া আকবরকে 'সাক্ষর' করিবার অভিলাষী; তাহা না হইলে জহাঙ্গীরের যে আত্মজীবন-চরিতখানি জগতে 'প্রক্ষিপ্ত' প্রতিপন্ন হইয়াছে, বর্ত্তমান উদ্দেশ্যসিদ্ধিকল্পে, অন্য প্রমাণের অভাবে, এখন তাহারা সেই অব্যবহার্য্য পুস্তকখানির সাহায্যে, Rogers & Beveridge কর্ত্তৃক সম্পাদিত, 'উম্মি' পাঠযুক্ত, বিশুদ্ধ "তুজুক-ই-জহাঙ্গীরীর" মত খণ্ডন করিতে অগ্রসর;—ইহা বিচিত্র বটে! 'উম্মি' শব্দের যথার্থ আভিধানিক ব্যুৎপত্তি গ্রহণ না করিয়া, Steingass সাহেবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিধানে ও তাৎকালীন সাহিত্যে প্রচলিত 'উম্মি'র যথার্থ অর্থ না মানিয়া—তাঁহারা 'নিরক্ষরের স্থলে 'অল্পভাষী' অর্থ করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, এরূপ করিলে জহাঙ্গীরের উক্তিটীর কোনরূপ অর্থ আদৌ পরিস্ফুট হয় না। যথা:—

বেভারিজ সাহেবর অনুবাদ:—"My (Jahangir's) father used to hold discourses with learned men of all persuasions, particularly with Pandits and the intelligent persons of Hindustan. Though he was ILLITERATE yet from constantly conversing with learned and clever persons his language was so polished that no one could discover from his conversation that he was *entirely uneducated.*"

উপরিউক্ত অংশে "Illiterate" শব্দের পরিবর্ত্তে নরেনবাবু "অল্পভাষী" অর্থ করিতে চাহেন; কিন্তু তাহাতে অংশটীর কিরূপ অর্থ-সঙ্গতি হইবে, তাহার বিচারভার পাঠকগণের উপর। তবে এই স্থলে বলা বাহুল্য, আমার অন্যতম প্রতিবাদিকারী শীল মহাশয় নরেনবাবুর ন্যায় 'উম্মি'র 'অল্পভাষী' অর্থ করেন নাই।

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, তৎকালেও লেখা-পড়া শেখা খুব সহজ ছিল বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের এই ভ্রমাত্মক ধারণা, বেভারিজ সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্যটী পাঠ করিলে যে অপনোদিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি লিখিতেছেন:—

"Like Wordsworth's pedlar, Eastern Prophets and kings had small need of books. It should be borne in mind too that in the East in those days there were no printed books. The only reading he had was from Mss. which were often in *Shikast* handwriting, and wanting in vowels and diacriticial marks. Reading, therefore, was almost, if not quite, as difficult an attainment as that of writing and unless Alaud-din and Akbar could read shorthand, which is really what Persian transcript amounts to, a knowledge of the alphabet and of the meaning of the words would be of small help. The art of manuscript-reading is one of slow acquirement, and so we find that though Elphinstone could speak Persian, and admired Omar-Khayyam and other poets, he could not read Persian Mss. and had to rely on his munshi or on a translation."

(শীল মহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে)

(১) শীল মহাশয়ের বক্তব্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক মনে করি; তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঐতিহাসিক-ব্যাপারের প্রতিবাদ করিতে হইলে, নিজ যুক্তির সমর্থনকল্পে "নজীর" উদ্ধৃত করিতে হয়, নতুবা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কথা বা 'Mandate' ঐতিহাসিক-সত্যরূপে বিংশ শতাব্দীতে পরিগণিত হইতে পারে না। মনে করুন, তিনি লিখিতেছেন,—"২রা জানুয়ারী (৯ জিকদ, ৯৫৩ হিঃ) আকবরের বিদ্যারম্ভ হয়।" আকবরকে প্রথম বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া হয়— ৭ শওয়াল, ৯৫৪ হিজরায় ২০এ নভেম্বর, ১৫৪৭ (See *Akbarnama*, i, 519 and *note*)। তিনিও যে আকবরের বিষয়ে কথা বলিতে গিয়া 'আকবরনামা' খানিও একবার খুলেন নাই, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে!

(২) 'উম্মি' শব্দের যথার্থ আভিধানিক ব্যুৎপত্তি দিয়াও শীল মহাশয় লিখিতেছেন, "কিন্তু লেখকের লেখার তাৎপর্য্য বোধ হয় যে, আকবর যে সকল বিষয়ে তর্ক করিতেন, তাহার অধিকারী ছিলেন না। একেবারে 'নিরক্ষর' বোঝায় না।" 'উম্মির' অর্থ যে নিরক্ষর তাহা পরোক্ষভাবে স্বীকার করিতেছেন, অথচ তিনি 'বোধ হয়' বলিয়া "নিরক্ষর বোঝায় না" ইহাও বলিতেছেন; তাঁহার কথায় কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। তাহার পর তিনি লিখিতেছেন, "আকবর যে সকল বিষয়ে তর্ক করিতেন, তাহার অধিকারী ছিলেন না"—এই উক্তিটীর কোনই মূল্য নাই। আমি মৌলভী সাহেবের প্রতিবাদে দেখাইয়াছি যে, আকবর সুন্দরভাবে নানা বিষয়ে তর্ক করিতে পারিতেন—ইহা Vincent Smith এবং Father Monserrate স্পষ্ট লিখিয়াছেন; অধিকন্তু লাহা মহাশয়,—যাঁহার প্রবন্ধ লইয়া আমাদের এই আলোচনা, তিনিও বলেন যে, আকবর মনীষিগণের সহিত জটিল বিষয়ে তর্কালাপ করিতেন, "Akbar appreciated abstruse controversies;"

সুতরাং শীল মহাশয় বোধ হয় এখন স্বীকার করিবেন যে জহাঙ্গীর নিরক্ষর অর্থেই 'উম্মি' ব্যবহার করিয়াছেন।

(৪) তিনি লিখিতেছেন—"বদায়ুনীর পুস্তকে আকবরের অনেক দোষের কথা আছে; কিন্তু তিনিও 'নিরক্ষর' বলেন নাই।" বদায়ুনী গোঁড়া মুসলমান, এই কারণে তিনি আকবরের উদার ধর্ম্মমতের বিরোধী ছিলেন। আমাদের যতটা জানা আছে, তাহাতে মনে হয় বদায়ুনী যেখানে আকবরকে আক্রমণ করিয়াছেন, সে কেবল আকবরের ধর্ম্ম-মত লইয়া; "The aversion with which Badauni regarded the Emperor and his able ministers arose, as he himself frankly confesses, from his own bigoted attachment to the most bigoted of religions," (*Elliot*, v, 479) আকবরের অন্যান্য দোষের কথা বদায়ুনী যে বড় একটা লিখিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। তিনিও আবুল-ফজলের ন্যায় আকবরের বেতন ভোগী কর্ম্মচারী; কাজেই তাঁহার পক্ষে আকবরের নিরক্ষরতার কথা না লেখাও বিচিত্র নহে। কিন্তু তিনি প্রকারান্তরে আকবরকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা 'নিরক্ষর' অপেক্ষাও তীব্র; তিনি আকবরকে 'আমী মহজ্' (অর্থাৎ 'utterly ignorant—একেবারে মূর্খ') বলিয়াছেন। See *Badauni*, ii, Pers. Text, p. 255.

পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে, আমি পূর্ব্বলিখিত প্রতিবাদের কেবল সমর্থনকল্পেই এই মন্তব্য লিখি নাই। আকবর নিরক্ষর ছিলেন কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা ইতিহাস-পাঠকেরই কর্ত্তব্য। যাহাতে সত্য নির্ণীত হয়, তাহারই জন্য এতগুলি কথা বলিয়াছি। মোগল বাদশাহদিগের সকলেরই স্বাক্ষর (signature) বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু আকবরের কোনরূপ হস্তাক্ষর এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ইহাতেই মনে হয়, আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণগুলির এটাও সহায়ক। অবশ্য যদি আকবরের হস্তাক্ষর আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে একটা নূতন ঐতিহাসিক সত্য বাহির হইয়া পড়িবে। ঐতিহাসিকমাত্রেরই সত্যলিপ্সু হওয়া উচিত. এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই বর্ত্তমান আলোচনায় যোগদান করিয়াছি।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

সেকালের কথা

[পরলোকগতা নিস্তারিণী দেবী]

ভূমিকম্পে বাড়ী চৌচির

শ্যামনগরে পেটের ব্যারাম হলো। আমি মামার পড়ো বাড়ীতে থাকি। প্রাণধন মতিহারী থেকে কিছু-কিছু খরচ পাঠায়। হুগলী থেকে বউ অনেক চিঠি লেখে। যে ঘরে থাকতুম, ভূমিকম্পে সে ঘর চৌচির হ'য়ে গেলো। আমি নেত্যগোপালের বইটকখানায় রাত্রে শুয়ে থাকতুম। আবার প্রাণধনের কাজ ফুরিয়ে গেলো। সে বেকার, দিন আর যায় না।

মুদিখানার দোকান ও বাগান জমা

প্রাণধন একটা মুদিখানার দোকান কল্লে; একটা প্রকাণ্ড বাগান জমা নিলে। প্রাণধনের ছেলে হবে,—আমাকে তাদের দরকার হলো। এদিকে আমার ছোট ভাই মরণাপন্ন রোগে পড়িল। কালী তাহাকে দেখিয়া গেল ও ডুলি করিয়া কলিকাতায় চিকিৎসার জন্য লইয়া গেল। তারিণীর বৌ ও দুইটি ছোট ছেলে সঙ্গে গেল। বড় ভাইপোর বাসায় গেলে, সকল খরচ কালীচরণ দিতে লাগিল। তারিণীর দুই ছেলে—ভোলা, কৃষ্ণ, আমি, প্রাণধন, বৌ, প্রাণধনের ছেলে সব হুগলী রইনুম। দিন আর যায় না।

পেয়ারা-ভাতে ভাত

চাউলের পয়সা কোন রকমে হইলেও তরকারির পয়সা জুটিত না। আমরা পেয়ারা গাছ হইতে কাঁচা পেয়ারা পাড়িয়া, তাহারই ভাতে ভাত খাইতে লাগিলাম। তারিণী একটু ভাল হলে সকলে হুগলীতে আসিল। প্রাণধন যে বাগান জমা লইয়াছিল সেখানে আগলাইবার জন্য আমায় রাখিল।

ভুতুড়ে বাগানে ভুতুড়ে জ্বর

বাগানের সম্মুখের পচা পুকুরের ঠাণ্ডায় আমার জ্বর হইল। জ্বরের বিকারে খেয়াল দেখিতে লাগিলাম। বাগানের একটি বাড়ীতে যাহারা মরিয়াছে, তাহারা আমায় বাগান ছাড়িয়া দিতে বলিল। এই বাগান লওয়ায় প্রাণধনের ভয়ানক জ্বর হয়। এই বাগানে থাকায় আমারও জ্বর হইয়াছে। আমি বাগানে আর একদণ্ড থাকিব না বলায়, প্রাণধন আমায় চুঁচুড়ায় আমার বিমাতার ছেলে যদু গোপালের ছেলে নমুর বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে অনেক ঘর; লোকজন বেশী নাই; থাকিবার স্থান পাইলাম।

নমুর ধাড়ী খোয়ার

নমুর প্রকাণ্ড বাগান। সেখানে খরচ করিয়া খাই। বাগান থেকে যদি একটু কাট ভাঙ্গিয়া লই, তবে সকলে ব্যাজার হয়। নমুরও মুখ ভার; কি যে কিছু বুঝিতে পারি না। উঠরাতে পারে না, ফেলতেও পারে না। মাঝে মাঝে বলে, "পিসিমা,—তোমার কষ্ট

হবে।' কালীর ছেলের বিয়ে ;—চিঠি লিখলে। তারিণীর ছেলে ভোলা কলিকাতায় বড় ভাইপোর বাসায় লইয়া গেল। কালীর ছেলের বিয়ে আমি দেখবো, আর কালীকে কষ্টের কথা বলব।

রেলে কর্ম্ম—বাপ-বেটায় ভেন্ন

প্রাণধনের কলিকাতায় রেলে কর্ম্ম হলো। অল্প মাইনেতে কলকেতায় চলে না ; হুগলীতেও এক বাড়ীতে বৌয়ের ভাল লাগে না। প্রাণধন আলাহিদা হুগলীতেই বাসা করে থাকে। এই রকম বাপবেটায় যেখানে আলাদা হয়, আমার জ্ঞানে, সেখানে মিল হতে গেলে এক পক্ষে অকল্যাণ হবেই হবে। হয় বাপ-মার মধ্যে একজন, নয় ছেলে-বউয়ের মধ্যে একজন না মলে আর মিল হয় না। হলোও তাই।

কলেরায় তারিণীর বৌ মারা গেল

প্রাণধনের মার সবচেয়ে কলেরা রোগটাকে ভয় ছিল। যে যা ভয় করে, তাকেই সেইটা আগে ধরে—এ কথাটা—যেমন ভাবনা তেমনি সিদ্ধি—এই মত কথাটার প্রমাণ। দুদিনে প্রাণধনের মা মারা গেল। সবাই আবার এক হলো। কিন্তু তারিণীর বৌ লক্ষ্মী ছিল। তার সঙ্গে কারোর সঙ্গেই অবনিবন্ধ ছিল না। সে মাটির মানুষ ছিল। বৌয়ের শ্বশুরের সঙ্গে বনতো না। শ্বশুর একটু গোঁয়ার গোছের ছিল।

সেজ ছেলে বকে গেল—বৌয়ের বাত হলো

মা-খেকো ছেলের খারাপ হতে দেরী লাগে না। মা মারা গেলে, তারিণীর সেজ ছেলে বদ্‌সঙ্গে মিশলো। বৌয়ের বাত রোগে শরীর ভগ্ন হয়ে গেল। প্রাণধনও রোগীয়ে গেল। সেজ ও ছোট ছেলেরা এক্‌জামিনে ফেল হলো।

ছেলে কেউ আলাদা রেখ না

বাপ যদি ছেলেকে নিজের কাছে-কাছে ন্যাওটো করে না রাখে, তবে ছেলে বাপের সঙ্গে প্রায়ই থাকে না। এই পড়বার অছিলা করেই বোর্ডিংয়ে রাখা হউক, আর খাওয়া-পরার সুবিধার জন্যই হউক, আর দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারের তুষ্টির জন্যেই হউক, ছেলে আলাহিদা একাক্রম রেখে তাকে বাড়ীর সুখ থেকে বঞ্চিত করে রাখলে, সে বাড়ীতে থাকতে কখন চায় না। সাহেবদের মত সে ছেলে আর বাপ ভেন্ন হবেই হবে।

কলিকাতায় ভিন্ন বাসায়

কলিকাতায় রেলে চাকুরী হওয়ায়, বৌকে নিয়ে আমাকে নিয়ে প্রাণধন ভিন্ন বাসায় রইল। মাঝে-মাঝে বাপকে কিছু কিছু পাঠাত। ৩০।৪০১ টাকা মাইনেতে কলিকাতার বাসা-খরচ চালিয়ে, স্ত্রী-পুত্র-পিসীকে খাইয়ে বাঁচেই বা কি ?

বউ ছুতায়-নাতায় ঝগড়া করিতে লাগিল

বউ, প্রথম থেকেই আমাকে শাশুড়ীর মত যত্ন করিত। প্রাণধনের বিয়ে দেখবার ইচ্ছে মায়ের বড় বেশী ছিল। আমি একরকম জোর করেই প্রাণধনের বিয়ে বি-এ পাসের আগেই দিই। বি-এ পাসের আগে বিয়ে দিলে পাস আর হয় না—এ কথাটা আমার যখন মনে হতো, তখন ছেলের পড়াশুনার ব্যাঘাত যে বউ, তা মনে হয়ে আমার মন খারাপ হতো। এইজন্যে প্রাণধনকে আমি খালি এক্‌জামিনের পড়া পড়-পড় বলে জ্বালাতন করতুম। প্রাণধন সাতবার ওকালতি এক্‌জামিন ফেল হলো। বি-এ এক্‌জামিনও চাকুরী করতে-করতে ~~[illegible]~~ না। ছেলেও বড় হয়ে উঠেছে, তাকেও পড়ান চাই। আবার স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা এই নিয়ে এ সময় একটা হুজুগ উঠেছিল। বউয়ের সঙ্গে এক্‌জামিনের পড়ার কথা নিয়ে আমার ঝগড়া হতো।

বউকে পড়িয়ে ছেলেকে পড়াতে বলাই স্ত্রী-শিক্ষা

বউকে একটু পড়িয়ে দিয়ে, ছেলেকে পড়াতে বলে, সহজেই বউয়ের শিক্ষা হয়—এ সহজ কথাটা আমাদের দেশের লোকে বুঝে না বলেই, মেয়েদের বিয়ে না হতে শিক্ষা দিয়ে মাষ্টারণী তৈয়ার করে থাকে। ছেলে পাঁচ বছর বয়সের হলে তবে তাকে পড়ান দরকার। ছেলের মাকে তার নিজের ছেলেকে পড়াতে ভার দিলে, ছেলের মা আপনিই যা পড়াতে হবে সব শিখে নেয়—ছেলেকেও প্রাণপণে শেখায়। কিন্তু বউকে পড়াতে দিলে নিজের পড়ার ক্ষতি বলে অমত হয়। এইজন্যে পড়া শেষ করে বিয়ে করা চাই।

নাপাঙ্কিমানে স্কুলে পড়ান

প্রাণধনের ছেলেকে কোন স্কুলে পড়ায় নাই। কেমন পড়ান হলো একবার যাচিয়ে নেবার জন্য, না পাশেই চাকরির জন্য খাবার জন্য এক্‌জাম পাস করান চাই। বেশী পড়াতে চাও, কলেজে দাও। ছেলেকে ঘরে পড়াতে যে পারে না, সে হয় অকাট মূর্খ, নয় বড্ড গরিব।

আমার চখের ব্যারাম

আমি মনের দুঃখের কাঁদি। আমার চক্ষে জল পড়ে-পড়ে চখের ব্যারাম হলো। বড় ভাইপো ডাক্তার ; তাকে দেখালে সে বলে, আমি চখের ডাক্তার নই। ওদিকে ছেলে-বউ দুজনেরই বাত ; দুজনেরই কষ্ট।

হাতের চুড়ি ভেঙ্গে থান পরে মাছের টক দিয়ে ভাত খায়

বউ শিক্ষা পেয়েছে, ঘরের গিন্নি হয়েছে, আমাকে মানবে কেন। আমি 'হাতের নোয়া খুলতে নেই, অকল্যাণ হয়—থান পরতে নাই' এ সকল বলে এসেছি। এখন সে হাতের চুড়ি ভেঙ্গে কখনও বা চৌবাচ্চায় ফেলে দেয় ; আর আমাকে দেখায় আর হাসে। কখন বা থান পরে বসে টক দিয়ে ভাত খায়। আমার তো অসহ্য হলো।

মুখ চুন করে বসে থাকলেই খোসামোদ করে

না খেলে, মুখ চুন করে বসে থাকলে প্রাণধনই আমায় খোসামোদ করে। সে বলে, 'বউ কিছু বলেছে পিসিমা ?' সে বউয়ের ভয়ে আমায়

কোন দুর্ব্বাক্য বলে নি। বউয়ের মনে কোন দুঃখও সে কখনও দেয় নি। তার একদিকে স্ত্রী, একদিকে আমি মায়ের মত। কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট—সে কখনও ভেবে ঠিক কত্তে পারে নি। দুটার মধ্যে যেটাকে যখন ভেবেছে, বড় করে দেখেছে; দু'জনকে এক-সঙ্গে ভাবলে সমান মনে করেছে!

তারকনাথে হত্যা দিনু

চোখের রোগ ডাক্তারদের দেখালে বলে, বুড়ো হয়েছ, এ ভাল হবে না; ভাল দেখে-দেখে আর কষ্ট থাকবে না। কি করি, নবী ঝির কাছে ১০৲ ধার করে তাকে সঙ্গে নিয়ে তারকনাথে হত্যা দিতে গেনু। সেখানে ১০৮ বার নাক-খত দিয়ে বাবার পুকুরে নেয়ে শুয়ে পড়ে রইলুম। তিন দিন কিছু খাইনে। শেষের দিন তন্দ্রা হলো; কে যেন বল্লে, চুলো খুঁজগে যা। কিছুই পেলুম না। লোকে বল্লে, ও চুলো নয়, বাবার যে চুলোয় ভোগ হয় সেই চুলো। কিছুই হলো না, বাড়ী ফিরে এলুম।

ছোট-পিসির বিলি কর

বড়-ভাইপো দেনার জ্বালায় জেরবার হয়ে খরচ কমাবার জোগাড়ে থাকে। বাড়ীতে থাকলেই নানান্ জ্বালা। আমার কালী ৬৲ করে খোরাকী বড়-ভাইপোর কাছে থাকলে বরাবর দিয়েছে; তার অমতে কিছু কাজ করবার যো নেই। তার মত নিয়ে কাজ কল্লে সে সদাশিব। বড়-ভাইপো সপরিবারে গোরক্ষপুরে গেলো। প্রাণধনকে বলে গেল ছোট পিসির বিলি কর।

আরশোলাকে আর পাখী বানিও না

আমি বল্লুম, আরশোলাকে পাখী বানিও না। ও কি করবে। একা ভেকা হয়ে বাড়ীতে থাকি। সকলে ফিরে এসে আবার ডাক্তারখানায় ভাইপো একলা থাকবে। পরিবার ছেলেপুলে পাঠিয়ে দেবে ঠিক করে। নবী ঝিকে আমি নিরুপায় হয়ে ২৲ একটা সামান্য ঘর ভাড়া করে আসতে বল্লুম। আমি তখন খুব বুড়ো হয়ে গেছি। এক চোখে মোটে দেখতে পাইনি। প্রাণধন এলে নবী-ঝি বল্লে পিসিমাকে কেন কাশী দিয়ে রেখে এসোনা! প্রাণধন বল্লে, 'পিসিমা কাশী যাবে।' আমি বল্লুম, 'কার ভরসায় যাই, একটি চোখ গেছে। আমার তো পেটের ছেলে "নৃত্য-গোপাল" নাই।' 'প্রাণধন বল্লে, 'আমি যদি তোমার এক ছেলে নৃত্য গোপাল হতুম।'

যাকে দেখবার কেউ নেই, তাকে বিশ্বনাথ দেখবে

আমি সাত পাঁচ ভাবলুম। এতদিন পাঁচভূতের ব্যাপার খেটে মলুম; এখন এক চোখ গেছে। পকাশ উর্দ্ধে বনে যাওয়ার মত আমার কাশী যাওয়া। কালীর মত পেলুম না; তার ইচ্ছে আমি নিকটেই থাকি। সে বল্লে যে কে দেখবে। যাকে দেখবার কেউ নাই তাকে বিশ্বনাথ দেখবে; এ কথায় তার রাগ হলো। আমিও রেগে বল্লুম, 'দাদা; তুমি দেবে না, তাই বল। আমি কাশী যাবোই যাব। এত বিধবা-আশ্রম আছে, তুমি আমায় কেন লিখে দাও না।' দাদা চুপ্।

মেয়ে মণি

নগেন নামে অরুচি। কালীর মেয়ে মণির নগেন জামাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। সে ফুলের মত মেয়ে। জামাই খাপিস্। সে থাকবে কেন? যেখানকার ফুল সেখানে চলে গেল। এই মেয়ের শোকে কালীচরণের বুক ভেঙ্গে গেল। আর সারে নি। তারপর কালীর বউ, বড় মেয়ে একে একে গেল; কিন্তু এত শোক আয় হয় নি।

নগেন জামাই

নগেন জামাই আমাদের ঘরে তিন জন। কালীর জামাই নগেন, তারিণীর জামাই নগেন, বড়-ভাইপোর জামাই নগেন—এই তিন জনের মধ্যে কারও বড় একটা গুণ দেখা যায় না। বিবাহে সবাই মেয়েদের অসুখী করেছে। দেবীচরণের জামাই এখন মুন্সেফ। বড়র জামাই বিনোদ উকিল। সাধু জামাই ফরেসডাঙ্গায় থাকে। কালীর বড় জামাই প্রিয় এখনও বেঁচে আছে। এদেরই নাম শুনা যায়।

কিসের টাকা?

কালীর মেজ ছেলের কাছে গেলুম, সে ১৲ করে দিতে চাইলে; একমাস দিয়ে শেষ বৌরা আর দিতে চায় না; বলে, কিসের টাকা। বড় ছেলের কাছে গেলুম। সে বলে, একটা-একটা দোয়ানী রেখে দিলেই মাসে ৮টা দোয়ানী হবে। তোমার ভাবনা কি। সেও একমাস ৮টি দোয়ানী তুলে রেখে দিয়েছিলো। শেষে আর তুলে রাখতে ভুলে যায়—কি করি, আবার কালীর কাছে গেলুম। বল্লুম, এমন করে কতদিন থাকি। কালী চুপ!

কুরুপ্পর হবে কেন?

প্রাণধন কাশীতে নিয়ে গেল। মেজভাইপোর সঙ্গে মুঙ্গেরে দেখা করে গেলুম! তার তখন ইচ্ছা হলো, আমি তার কাছে থাকি, খাই-দাই। বউমা বল্লে, কেন কুরুপ্পর হয়ে থাকবে। কাশীতে গিয়ে দূর সম্পর্কে খুড়োর বাড়ী ভাড়া করলুম। রাঁধি বাড়ী খাই। প্রাণধন ৪৲ করে দেয়। মেজ-ভাইপো তিন মাস তিন টাকা করে দিয়ে বন্ধ করে দিলে।

প্রাণধনের মেয়ে মরা

প্রাণধন রেলের কাজে ছুটি নিয়ে লাহোরে বি-এ, পাশ হয়ে এসে এলাহাবাদে স্ত্রী পুত্র নিয়ে আইন পড়তে গেলো। প্লেগের চাকুরী কত্তো. আর আইন পড়তো। বসন্তরোগে তার মেয়ে মারা গেলো। অনাহারে তাদের কতদিন কেটে গেলো। সব আমি কাশী থেকে শুনি, আর কাঁদি।

হুগলীতে ও ছোট-আদালতে ওকালতী

প্রাণধন যখন হুগলীতে ওকালতি করে—তখন সে নতুন উকিল। কে মোকোদ্দমা দেবে? ছোট-আদালতে দালালের খোসামোদ করে যদিও যা কিছু পায়, তার কাজে মন খুব ছোট হয়ে যায়। এদিকে ম্যালেরিয়া ধল্লো। কলিকাতা থেকে বসন্তরায় একমাস যাতায়াত

কল্লে। শেষ লক্ষৌতে গুটিকতক টাকা হাতে করে কপাল ফেরাতে গেলো।

লক্ষৌতে পসার

লক্ষৌতে ৪।৫ বৎসরের মধ্যে তার নাম হলো, রোজকারও ৩।৪ শত টাকা হতে লাগলো। তার দিদিমা মারা গেলো। বাপ মারা গেল। সেখানে একটা যায়গা কিনে কাছারির কাছে বাড়ী কল্লে। আমায় ১০৲ মাসে দিতে লাগলো। আমি তখন অন্ধ। ভাড়াটেদের দয়ার উপর নির্ভর করে পড়ে থাকি।

অন্ধের হরিদ্বার তীর্থ

আমার তীর্থের মধ্যে হরিদ্বার বাকি ছিলো। প্রাণধনের ভাই ভোলা হরিদ্বার নিয়ে গেলো। আমায় লক্ষৌতে নিয়ে গিয়ে প্রাণধন সব বাড়ীর আসবাবপত্র দেখালে। আমার আর সংসারের সাধ নাই। প্রাণধনের বউ দেবতার মত আমায় যত্ন কল্লে। আসতে মন চায় না, বিশ্বনাথ টেনে আনলে।

কাশীতে বাড়ী-ভাড়া করে থাকি

প্রাণধন মাঝে-মাঝে দেখে যায়। যে কাশীতে আসে দেখে যায়—আমি মনের দুঃখে থাকি কেন বলিতে পারি না। দুই চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে বলে কেউ দুর্বাক্য বলতে না পাল্লেও, সবাই নিজের নিজের—কে কার খোঁজ নেয়। প্রাণধনের ইচ্ছা, আমায় নিজের কাছে রাখে। আমার মনে হয়—আর কেন? এখন মরে গিয়ে তাঁর কাছে যেতে পাল্লেই হয়।

আমার আমাশয়—ভোলানাথের সেবা

আমার আমাশয় হলো—যাই, যাই। লক্ষৌ থেকে ভাইপো ভোলা দেখতে এলো। ভোলা বিয়ে করেনি। দাদা ভাই—এক প্রাণ, এক আত্মা। সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে রোগ ভাল করে দিলে। বল্লে, 'পিসিমা' তুই ভক্ত; ভগবানকে পেতে হলে তাকে স্বপ্নে পেতে হয় প্রথম। স্বপ্নে যদি জানতে পারিস,—আমি স্বপ্ন দেখেছি—তবেই তোর মায়া কেটে যাবে। মরবার কষ্ট কিছু নাই; আমরা সবাই স্বপনের দেশে থাকবো। ভোলাকে সবাই এখানকার ভালবাসে। সে হাত গুণতে পারে। যাকে যা বলে, ঠিক ফলে। সে যাত্রা ভোলা আমায় বাঁচিয়ে গেলো।

কানীবুড়ীর ভাড়াটেদের তাচ্ছিল্য

কাশীতে দিনকতক থাকতেই আর একটি চোখও গেল। আমি অন্ধ হলুম। আটকালে রাঁধিবাড়ি। এখনও কারও হাতে খাবো না—পণ বজায় রেখেছি। আমার ৯০ বছর বয়েস হয়েছে। প্রাণধন মাস-মাস ১০৲ পাঠায়; তা শুনে অনেকের চোখ টাটায়। আজ কালী গেলো, কাল তারিণী গেল—এই রকমে কেবল মরা খবর শুনে-শুনে বুকটা কঠিন হয়ে গেছে। একে-একে ভাইদের খেলুম। ভাইদের বৌরাও ক্রমে-ক্রমে মরে গেলো। ভগবান আমায় হনুমানের মত অমর করে রেখেছেন। বিশ্বনাথ আমার প্রাণধনকে দিয়ে বজায় করে রেখেছেন বলে, আমি প্রাণধনের গরব করি।

অন্ধের নুড়ীর শেষ দেখা

আমার অন্ধের নড়ী প্রাণধন বাপমার গয়া করে আমাকে দেখে বাড়ী ফিরে গেলো। বেশ করে হাড়ে হাড়ে রেঁধে খাওয়ালুম। আগের দিন বল্লুম, 'তোর কি সখ আছে, বল।' আমার অন্ধের নড়ী খাবার সখ না বলে, বল্লে, হরিশ্চন্দ্র ঘাটে পোড়বার সখ, কাশীতে মরবার সখ হয়। আমি বল্লুম, 'বালাই' ও-কথা বলিস নে।' আবার যখন জিজ্ঞাসা কল্লুম, 'গয়াতে গদাধরের পাদপদ্মে কি ফল ত্যাগ কল্লি'—সে বল্লে—

'কর্ম্মফল ত্যাগ'

কর্ম্মের চেয়ে কি ফল আছে পিসিমা! আমি কর্ম্মফল ত্যাগ করে গদাধরের পাদপদ্মে বাপমার জন্ম বেঁধে নিলুম। আমি কি জানতুম আমার অন্ধের নড়ীকে আর দেখতে পাবো না।

এক্কা থেকে যেমন পড়া অমনি মরা

বাড়ী ফিরে দু'পা যেতে না যেতে কাশীর রাস্তায় আমার অন্ধের নড়ীর মনস্কামনা পূর্ণ হলো। এক্কা থেকে পড়ে গেলো। আর তখনি মরে গেলো। রাত্রে তবে আমি খবর পেলুম। আমার কান্না বেরুল না। আমার কান্না শুকনো হয়ে গেছে। সেই থেকে আমি কাঁদিনি। তার বউও শুনতে পাই কাঁদেনি। তোমরা আমায় আর কারোর দুঃখের কথা শুনিয়ে কাঁদাতে পার, আমি কালীচরণের বড় বোন। আমার খাবার লোক কেউ না নিলেও, আমার খাবার কষ্ট সওয়া আছে। কিন্তু আমায় কেউ তোমরা কাঁদিয়ে দিতে পাল্লেই আমি কৃতার্থ হই। আমার প্রাণধনের সঙ্গে আমি স্বপনে রোজ কথা কই। আমার কষ্ট কি? আমি কাঁদতে যাব কেন? আমি জেনেছি, মলে তার সঙ্গে স্বপ্নে কথা কব,—তবেই তাকে জাগতে পাব। শেষ, প্রাণধনকেই আমার বিশ্বেশ্বর বলে মেনে নিয়ে, বিশ্বেশ্বরকে ছেলের মত ভালবাসতে পাল্লেই, আমার সকল দুঃখের অবসান হবে।

নিমাই'র বারমাস

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত]

যাঁহারা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহাদের নিকটে "বারমাস" বা "বারমাস্যা" বিষয়টী অপরিজ্ঞাত নহে সন্তানকে হারাইয়া জননী, পতিকে হারাইয়া সতী, পিতামাতাকে হারাইয়া হত-ভাগ্য সন্তানেরা কি প্রকার মর্ম্ম-বেদনায় এক একটী মাস অতিবাহিত করেন, প্রাচীন পল্লী-কবিগণ "বারমাস" বা "বারমাস্যা'র মধ্যে তাহার করুণ চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ সকল গাথায়

ারমাসের কাহিনী বর্ণিত হয়, সুতরাং ইহার "বারমাস" বা "বারমাস্যা" ামের সার্থকতা আছে।

"বারমাস"গুলি সাধারণতঃ সুর-তাল-সংযোগে গীত হইয়া থাকে। সময়ে ইহা এত প্রাণস্পর্শী বোধ হয় যে, শ্রোতৃমণ্ডলীর অশ্রু-সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে এরূপ করুণ-রসাত্মক "বারমাস" বা "বারমাস্যা"র ন্ত নাই। কত অজ্ঞাত, অখ্যাতনামা পল্লী-কবি আপনাপন নিভৃত কেন্দ্রে বসিয়া এরূপ হৃদয়দ্রাবী করুণরসের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, াহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কাল তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের রিচয় ধরিয়া রাখিতে পারে নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের যে কমনীয় সুর-হরী যুগ-যুগান্তের করাল গ্রাস উপেক্ষা করিয়া আজ আমাদের নিকটে াসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার মূল্যও সামান্য নহে। হয় ত তাহার ধ্য কত পুত্রহারার, কত পতিহারার, কত পিতৃমাতৃহারার বাস্তব ার্তনাদ এখনও অলক্ষিতে ঝঙ্কৃত হইতেছে।

আজ এমনি একটী অশ্রুসিক্ত "বারমাস" আমাদের "ভারতবর্ষে"র দয় ও সহৃদয়া পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিতে আসিয়াছি। এ ারমাসটীর" নাম "নিমাইর বারমাস"। প্রেমের ঠাকুর নিমাইর পরিচয় বাসীকে দিতে হইবে না। তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ উপলক্ষে শচী-তার মর্ম্ম-ব্যথার করুণ চিত্র এ "বারমাসে" প্রদত্ত হইয়াছে; তৎসঙ্গে-প্রসঙ্গক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়ার কিছু কাহিনীও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পরাপর "বারমাস" হইতে ইহাই "নিমাইর বারমাসের" বিশেষত্ব।

এই "বারমাসটী"র আর এক বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে দুইটী পদী রচনা আছে। আমি এ পর্য্যন্ত যতগুলি "বারমাস" দেখিয়াছি, হার সমস্তগুলিই একমাত্র পয়ার কিম্বা ত্রিপদী ছন্দে রচিত। াতে এই উভয় ছন্দই অনুসৃত হইয়াছে।

পুস্তকখানির ভাব ও ভাষা বিষয়ানুযায়ী করুণ ও সুললিত। কবি ানে-স্থানে অতি অল্প কথায় গভীর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার ামাগুলিও সুন্দর। এ সম্বন্ধে যদি দুই-একটী উদাহরণ দিই, তবে াধ হয় অপ্রীতিকর বা অশোভন হইবে না।

নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার অভাবে শচীমাতার কি দুরবস্থা বে, তাঁহার উল্লেখ করিয়া জননী বলিতেছেন—

> "পক্ষী উড়িয়া গেলে শূন্য হয় বাসা।
> তোমার বিহনে মোর হইবে সেই দশা॥"

ানকে বক্ষে লইয়াই ত জননীর যত সুখ, শান্তি, আনন্দ, গৌরব ও শ্বর্য্য; তাহাকে হারাইলেই যে তিনি বিহঙ্গহীন কুলায়ের ন্যায় সকল সম্পদ-শ্রীহারা হন। সে বিষাদ-করুণ দৃশ্য কবি কেমন মৃদু তুলিকা-র্শ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন! অন্য একস্থলে শচীদেবী নিমাইকে লিতেছেন,—

> "কার সঙ্গে যাবে পুত্র কে করিবে দয়া।
> তোমার কোমল অঙ্গে কেবা দিবে ছায়া॥"

ঘরে বাহিরে সকল স্থলে সকল অবস্থায় স্নেহময়ী জননী কিরূপে আপনার অপরিসীম স্নেহের স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপতলে সন্তানকে ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন, উপরিউক্ত দুইটী ছত্রের মধ্যে কবি তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

হৃদয়বান্ সন্তানের সন্ন্যাস-গ্রহণের পক্ষে প্রধান অন্তরায় কি, স্নেহময়ী জননী তাহা উত্তমরূপে জানেন; তাই শচীমাতা নিমাইকে বলিতেছেন—

> "তোমার কারণ মোর সদা কাঁদে প্রাণ।
> কি মতে করিবে বাছা সন্ন্যাসে প্রস্থান॥"

মায়ের প্রাণের ক্রন্দনকে উপেক্ষা করিয়া মাতৃভক্ত সন্তান কেমন করিয়া গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইবে?

অপর এক স্থানে প্রত্যেক সতীরমণীর মর্ম্ম-কামনা কবি দুইটী পংক্তির মধ্যে কেমন পরিস্ফুট ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন! আশু-পতি-বিচ্ছেদ-শঙ্কা-বিধুরা বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইকে আত্ম-নিবেদন-ছলে বলিতেছেন—

> "স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী সে জীবন।
> স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের মঙ্গল মরণ।"

গভীর পতিনিষ্ঠার সঙ্গে কি গম্ভীর আবেগ-কাতরতা এই দুইটী পংক্তির ভিতরে লুকায়িত রহিয়াছে! এই দুইটী ছত্র প্রত্যেক বঙ্গনারীর অন্তরে বাহিরে "মটো" বা আদর্শবাণী করিয়া রাখা উচিত।

"নিমাই'র বারমাসে" এরূপ সুভাবপূর্ণ কবিত্বের অভাব নাই। এ পুস্তকখানি আমি চট্টগ্রামের অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে জনৈক পল্লী-গৃহস্থের বাড়ীতে পাইয়াছি। অবশ্য ইহা মূল পাণ্ডুলিপি নহে। কত প্রতিলিপির প্রতিলিপি তাহার স্থিরতা নাই। প্রতিলিপিকারগণ গ্রন্থকারের প্রাচীন ভাষার বিশিষ্টতা কিম্বা তাঁহার নাম-রক্ষার চেষ্টা করেন নাই। ফলে পুস্তকে রচয়িতার নাম এবং "নিমাইর বারমাসের" ভাষাও প্রায় স্থলে আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। এবার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র-নাথ সেন মহাশয় গ্রন্থখানির প্রতিলিপি করিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। নিম্নে সমগ্র "বারমাস" প্রদত্ত হইল।

নিমাইর বারমাস

> হা হা পুত্র নিমাইচাঁদ একি হলো মোর।
> আর কি দেখিব আমি চন্দ্রমুখ তোর॥
> কে হরিল নিমাইচাঁদ কে করিল চুরি।
> পলকে আঁধার করি নদীয়া নগরী॥
> সন্ন্যাসী না হইও বাছা বৈরাগী না হইও।
> অভাগিনী মা মরিলে যোগী হইয়া যাইও॥
>
> ১। মাঘ মাসে নিমাইচাঁদ ব্যাকুল হইল।
> কেশব ভারতী আসি কি মন্ত্রণা দিল॥
> হর-গৌরী আরাধিয়া পাইলাম তোরে।
> শক্তিশেল হানি যাবে অভাগিনী মারে॥
> আমার দুঃখের কথা শুন দিয়া মন।
> তোমারে পেয়েছি বাছা তপস্যার কারণ॥

২। ফাল্গুন মাসে গোবিন্দেরে দোলাইয়াছি দোলে।
৩। চৈত্র মাসে শিব পূজা মন কুতূহলে।
৪। বৈশাখ মাসে তুলসীরে দিয়াছি ঝাড়া।
৫। জৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজা সাক্ষী আছেন তারা॥
৬। আষাঢ় মাসে পদ্ম পুষ্প শিবের স্বস্ত্যয়ন।
৭। শ্রাবণ মাসে মনসারে করিয়াছি পূজন॥
৮। ভাদ্র মাসে ভদ্রকালী করিয়াছি পূজা।
৮। আশ্বিন মাসে পুজিয়াছি দেবী দশভুজা॥
১০। কার্ত্তিক মাসে গোবিন্দেরে দিয়াছি তুলসী।
১১। অগ্রহায়ণ মাসে সেবিয়াছি কতেক সন্ন্যাসী॥
১২। পৌষ মাসে পুজিয়াছি চন্দ্রহেন দেবা।
১। মাঘ মাসে সূর্য্যেরে দিয়াছি নানাজবা॥
সোনার শরীর নিমাই পেয়েছি তোমারে।
কোন দোশে বাছা নিমাই ছারিবা মায়েরে॥
কি যন্ত্রণা পেয়ে নিমাই হইলা উদাস।
কুলবধু বিষ্ণুপ্রিয়া না কর নৈরাশ॥
দেখ হে নদীয়ার লোক বাহির হইয়া।
গৌরহরি সন্ন্যাসে যায় জননী ছারিয়া॥
নদীয়ার সর্ব্ব লোক তব হিতকারি।
একতিল নাহি জীবে তুমি গেলে ছারি॥
২। ফাল্গুন মাসেতে নিমাই কাঞ্চন নগরী।
স্বর্ণ বেশ ভূষা ছারি হল দণ্ডধারী॥
মস্তক মুণ্ডন করি কমণ্ডলু হাতে।
দেখিয়া জননী প্রান ধরিবে কি মতে॥
মা বল মা বল নিমাই মা শুনিলাম কানে।
তুমি বাছা ছাড়া গেলে না জীব পরানে॥
৩। চৈত্র মাসেতে নিমাই বসন্তের শেষ।
মায়েরে ছারিয়া বাছা যাবে দূর দেশ॥
শোক সাগরে পুত্র ভাসাইয়া মারে।
উদাসীর বেশে বাছা? যাবে দেশান্তরে॥
একাকিনী প্রানবধু রাখিয়া গৃহেতে!
সন্ন্যাসে যাইবা বধু নারিবে সহিতে॥
কি বলিয়া সান্ত্বাইব বধু হেন ধনে।
তোমার বিরহ জ্বালা না সহিবে প্রানে॥
শিশু সতী বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষীর সমান।
মুখ হেরি বধুর মোর বিদরে পরান॥
বার বৎসরের শিশু যাইব কেমনে।
কেমনে ভ্রমিবে বাছা অঘোর কাননে
৪। বৈশাখে নিদাঘ বাছা বড়ই দুরন্ত।
প্রখর রবির তেজে প্রান করে অন্ত॥
সোনার বরন দেহ রোদ্রেতে মিলাবে।
তোমার রাতুল চরণ কিরূপে চলিবে॥
বিবাহ করেছে পুত্র সোনার প্রতিমা।
না যাইয়া সন্ন্যাসেতে চিত্তে দেয় ক্ষমা॥
তুমি যদি যাও পুত্র সন্ন্যাসীর বেশে।
সঙ্গে করি দিব বধু না রাখিব দেশে॥
রামচন্দ্র বনে যেতে সঙ্গে নিল সীতা।
সঙ্গে করি লয়ে যাও তোমার বনিতা॥
৫। জ্যেষ্টমাসে নিমাইচাঁদ রৌদ্রের জ্বালা বাড়ে।
দারুণ রৌদের তাপে অগ্নি হেন পোরে॥
ক্ষিধায় অন্ন তৃষ্ণায় জল কেবা দিবে তোরে।
কে তোরে করিবে দয়া গেলে দেসান্তরে॥
ক্ষিধা হইলে পুত্র তুমি মা ডাকিবা কারে।
মুখ পানে চাহি পুত্র কে সান্ত্বাবে তোরে।
পক্ষি উড়িয়া গেলে শূন্য হয় বাসা।
তোমার বিহনে মোর হইবে সেই দশা॥
৬। আষাঢ় মাসেতে নিমাই জলদ বরিষে।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধু ছারি যাবে পরবাসে॥
সত্যে পালিতাম তোরে যাইছ ছারিয়া!
অভাগিনী মায়েরহে পথ নিরখিয়া॥
ব্রহ্মসাপ পাইয়াছিল দশরথ রাজন।
বাসী মরা হইল রাজা তেই সে কারণ॥
বাসি মরা হয়ে রাজা রহে দশরথ।
অগ্নি কার্য্য দেশে আসি করিল ভরত॥
জননী ছাড়িয়া পুত্র সন্ন্যাসে চলিলা।
এত দুঃখ কেন বিধি কপালে লিখিলা।
৭। শ্রাবন মাসেতে নিমাই বরষার ধারা।
সন্ন্যাসে চলিলা পুত্র নয়নের তারা।
কাঁদিয়া ফিরিব আমি বিনে যাদুধন।
শোকের সাগরে মম ভাসিবে জীবন॥
পথে ঝর বৃষ্টি হৈলে রবে কার বাড়ি।
সন্ন্যাসে যাইতে চাহ প্রানবধু ছাড়ি॥
৮। ভাদ্র মাসেতে বাছাধন করিছি চিন্তন।
আমাকে ছাড়িবা বাছা অঞ্চলের ধন॥
মম সম অভ্যাগিনী ভবার্ণবে নাই।
আমাকে ছাড়িবা পুত্র প্রাণের নিমাই॥
ভাবিতে চিন্তিতে মম অন্তর বিকল।
অভাগিনী মারে নিমাই করিলা পাগল॥
হা হা রে কঠীন প্রান বরই নিষ্ঠুর।
শরীর ছারিয়া যাও দুঃখ হউক দুর॥
কার সঙ্গে যাবে পুত্র কে করিবে দয়া।
তোমার কোমল অঙ্গে কেবা দিবে ছায়া॥

তোমার কারণ মোর সদা কাঁদে প্রান।
কি মতে করিবা বাছা সন্ন্যাসে প্রস্থান ॥
অনুক্ষন মাগী পুত্র তোমার কল্যান।
তোমার বিহনে গৃহ কানন সমান ॥
নদীয়ার সর্ব্বলোক তব হিতকারি।
এক তিল না জীবেক তুমি গেলে ছারি ॥
আশ্বিন মাসে নিমাইচাঁদ শরৎ শীতল।
অন্তরে জ্বালিয়া দিলি শোকের অনল ॥
গোকুল ছারিয়া জাবে সন্ন্যাসে নিমাই।
সোনার সংসার মোর সাগরে ভাসাই ॥
সন্ন্যাসেতে যাবে পুত্র শুন্য করি ঘর।
সঙ্গে কিবা যাবে কেহ তোমার দোষর ॥
কার্ত্তিক মাসেতে নিমাই কাতর হইয়া।
কাঁদিয়া কহেন মায়ের চরনে পরিয়া ॥
বিদায় কর জননী গো সন্ন্যাসেতে যাই।
ভক্ত জনের মনোবাঞ্ছা পুরাইতে চাই ॥
এতেক শুনিয়া শচী করহে রোদন।
কোলে এস বাছা ধন জুরাক জীবন ॥
কাঁদি কাঁদি শচীদেবী নিমাই কোলে নিল।
পুনঃ পুনঃ পুত্রমুখ সাদরে চুম্বিল ॥
অশ্রুজলে ভাসি শচী বলিতে লাগিল।
পুত্র শোকে সাগরে আমারে ভাসাইল ॥
কার মুখ চাইয়া পুত্র রাখিব জীবন।
মা বলিয়া কে আমারে করিবে সান্তন ॥
শচী বলে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনহ বচন ;
ক্ষিধা হইয়াছে পুত্রের করহ রন্ধন।
শাশুরী আজ্ঞায় বধু সন্তোষ হইল।
নানা বেশ ধরি রামা সাজিতে লাগিল ॥

ত্রিপদী

আচুরি মাথার কেশ, করিয়াছে নানা বেশ
লোটন করেছে নানামত।
কি ঠাঠে বাঁধিছে খোঁপা, তাতে দিছে কনক চাঁপা,
দেখি ভ্রমর হইয়াছে উন্মত্ত ॥
চম্পক কলিকা, যেন অঙ্গুলী শোভিছে হেন,
অঙ্গুরী শোভিছে রত্নময়।
কি সুন্দর মাজাখান, কেশরী সরম পান ?
লজ্জায় কাননে যায় চলি।
কটীদেশে কাঞ্চি তার, মরি কিবা চমৎকার,
মন সুখে নিতম্ব দোলায়।
চলিতে নিতম্ব দোলে, হেরি মুনি মন টলে,
অপরূপ সাজে বিনোদিয়া।
পৃথিবী মোহিল সাজে, চরণে নুপুর বাজে,
সুমধুর সুন্দর সে ধ্বনি।
সাজন সম্পূর্ণ করি, উঠীল শ্রীদুর্গা স্মরী,
গজেন্দ্রগমনে চলে ধনি ॥
স্বর্গের পূর্ণ শশী, ভ্রমে কি উদিতে আসি,
কিবা উষারঞ্জিত ভুবনে।
আসিয়া মলয়ানিল, অঙ্গের সৌরভ নিল,
চতুর্দ্দিকে বহিল ভুবনে ॥
মকরন্দ লোভে আসি, ভ্রমরা হয়ে উল্লাসী,
মধু মাগে গুণ গুণ গান।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণশশী
রন্ধনশালাতে প্রবেশ হন্।
নানারূপ দ্রব্য আনি, রন্ধন করিল ধনী
মন বর প্রফুল্ল হইল।
শচীর চরণ ধরি, বকিল বিনয় করি
অন্ন ব্যঞ্জন হইয়াছে সকল ॥
ডাকি কহে শচীরাণী, এস এস যাদুমণি,
ভোজন করহ আসি সুখে।
আসে নিমাই মনসাধে, প্রণমিয়া মাতৃপদে,
ভোজনেতে বসিল কৌতুকে ॥
স্বর্ণ থালে অন্ন করি, কোটরা ব্যঞ্জন ভরি,
আনি দিল বিষ্ণুপ্রিয়া সতী।
দধি দুগ্ধ আদি করি, সন্তোষে উদর পুরি,
পান করে নদীয়ার পতি ॥
ভোজন করিয়া শেষ, আচমন অবশেষ,
করি করে শর্য্যায় গমন।
মনসুখে বিষ্ণুপ্রিয়া, আহ্লাদে মগন হইয়া,
গৃহকর্ম্ম কৈলা সমাপন ॥
সম্মুখে দর্পণ আনি, মুখ হেরী সুবদনী,
আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে প্রাণ।
সিন্দুর যে ভাল ছিল, বাল্য-সূর্য্য শোভে ছিল,
মলিন হইল কি কারণ ॥
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, জিব আশা পরি-হরি
পতি পাশে করিল গমন।
পতি-প্রেম সোহাগিনী, জোর করে যুগ পানী,
পতি পদে করিল বন্দন ॥

পয়ার

প্রেমের পুতলী নিমাই কোলে তুলি নিল।
বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ নিমাই সাদরে চুম্বিল॥
জিজ্ঞাসিল নিমাইচাঁদ উদাসীন মন।
কেন প্রিয়ে চিন্তাকুল তোমার আনন॥
অধিরা হওনা প্রিয়ে আমার কারণ।
ভক্ত-বাঞ্ছা পুর-হিতে সন্ন্যাসে গমন॥
চুম্বন করিল নিমাই প্রিয়ার বদন।
বলে বিষ্ণুপ্রিয়া-নারী সজল নয়ন॥
সত্যই কি প্রাণনাথ ছাড়িয়া আমারে।
নিশ্চয় যাইবে তুমি প্রভাস সুদূরে॥
আমি অভাগিনী নারী থাকিব কেমনে।
বিচ্ছেদ অনলে নাথ দহিব জীবনে॥
সঙ্গে করি নেও নাথ সঙ্গে যাব তব।
তুমি বিনে কে রাখিবে স্বতীত্ব বিভব॥
স্বামী ধ্যান স্বামী জ্ঞান স্বামী সে জীবন।
স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের মঙ্গল মরণ॥
স্বামী উপদেশ যেই না করে পালন।
সে রমণী লাজ স্বতী জানে ত্রিভুবন॥
অতএব বসি নাথ বিহনে তোমার।
সন্ন্যাসেতে যাবে তুমি—গতি কি আমার॥
এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে লাগিল।
নিমাইচাঁদ কোলে রামা শয়ন করিল॥
কাঁদিতে লাগিল নিমাই প্রিয়তমা কোলে।
অশ্রুজলে ভাসে নিমাই ধিরে ধিরে বলে॥
সাধে কিলো প্রিয়তমে ছাড়িব তোমারে।
সাধে কি চলেছি আমি-প্রভাস সুদূরে॥
ছাড় তবে প্রাণপ্রিয়ে না ভুল আমায়।
এ জনমে প্রিয়তমে না পাবে আমায়॥
রজনী প্রভাত প্রায় যাইব এখন।
শান্ত হও প্রাণ প্রিয়ে না কর রোদন॥
এত শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া উঠিয়া বসিল।
ভুজপাশে জোরে ধরি বলিতে লাগিল॥
এস তবে প্রাণ-সখা জীবনের জীবন।
ভুলনা দাসীরে তবে ভুল না কখন॥
এ দাসীর ধ্যান জ্ঞান জানিবে রে প্রাণ।
ঈশ্বর করুন তব মঙ্গল বিধান॥
এত বলি সতীর বুকে লুকায় বদন।
পতি সোহাগিনী নারী ভুলিল আপন॥
মোহীত * হইয়া পরে শয্যার উপরে।
বালিসে মস্তক নিমাই রাখে ধীরে ধীরে॥
নিকটে বসিয়া নিমাই কান্দিয়া কান্দিয়া।
কাতরে কহেন কিছু চাহি বিষ্ণুপ্রিয়া॥
প্রিয়তমে হলে তুমি ঘুমে অচেতন।
তোমাকে ছাড়িয়া যায় তব প্রাণধন॥
আমার হস্তেতে কৈলে এ জীবন দান।
তোমাকে ছাড়িয়া যেতে কাঁন্দিছে পরান॥
কি করিব প্রিয়তমে ললাটে লিখন।
লিখিয়াছে প্রজাপতি না যায় খণ্ডন॥
পৃথিবীর পাপ-ভার উদ্ধার করিতে।
ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে যাব সন্ন্যাসেতে॥
কেমনে সহিব আমি বিরহ বেদন।
কেমনে ভুলিব তব কোমল বদন॥
অভাগীণী জননীর আর কেহ নাই।
যত্নে সেবিও তাঁরে এই ভিক্ষা চাই॥
এ বলিয়া প্রিয়া মুখ সাদরে চুম্বিয়া।
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি কাঁন্দিয়া কাঁন্দিয়া॥
বেশ করি নিমাইচাঁদ বাহির হইল।
বিষ্ণুপ্রিয়া মুখশশী মনেতে পড়িল॥
পুনঃ ফিরি নিমাইচাঁদ করিল গমন।
বিষ্ণুপ্রিয়া মুখে মুখ করিল অর্পন॥
হৃদে উদাসীন ভাব জ্বলিয়া উঠিল।
সংসারের সুখ সব বিসর্জ্জন দিল॥
লিখি এক পত্র নিমাই শিয়রে রাখিয়া।
বাহির হইল নিমাই হাতে দণ্ড নিয়া॥
হরিনাম হৃদয়েতে করিল ধারণ।
পথে ভারতীর সঙ্গে হল দরশন॥
কেশব ভারতী পদে প্রণাম করিয়া।
করযোড়ে দাঁড়াইল সম্মুখে যাইয়া॥
ভারতী সাদরে ধরি নিমাইয়ের হাতে।
বিদায় কি নিয়াছ—বাছা সকল হইতে॥
বলিলেন নিমাইচাঁদ মুছি চক্ষুর জল।
বিদায় হইয়াছি আমি সম্ভাসি সকল॥
কেশবভারতী তবে ধ্যানেতে যাপিয়া।
সাদরে ভারতী কহে বিস্মিত হইয়া॥
কি করিলা নিমাইচাঁদ এই কি করিলা।
শচী না সম্ভাষী কেন সন্ন্যাসে চলিলা॥

শায়িত ?

যাও শীঘ্র নিমাইচাঁদ মায়ের গোচরে।
মাতা সম্ভাষিয়া আসিও সত্বরে ॥
তাহা শুনি নিমাইচাঁদ পুনঃ চলি যায়।
মায়ের গৃহেতে আসি দুয়ারে দাঁড়ায় ॥
অগ্রহায়ণ মাসে নিমাই উদাসীন বেশ।
ভাবিতে চিন্তিতে মায়ে না পায়ে উদ্দেশ ॥
মা, মা, বলি নিমাইচাঁদ ডাকিতে লাগিল।
ঘুমঘোরে শচী দেবী শুনতে না পাইল ॥
ধীরে ধীরে নিমাইচাঁদ গৃহে প্রবেশিয়া।
কাঁন্দিতে লাগিল মায়ের চরণে ধরিয়া ॥
উঠ উঠ জননীগো কর দরশন।
সন্ন্যাসেতে চলি তব অঞ্চলের ধন ॥
কেন মাতা হলে তুমি ঘুরে অচেতন।
দেখা না হবে আর থাকিতে জীবন ॥
যত দোষ করিয়াছি ক্ষমিও আমারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী সঙ্গে থাকিও সংসারে ॥
শোকে ব্যাকুলিত মন হইলে তোমার।
সোণার সংসার মোর হবে ছারখার ॥
তুমি না শান্তিলে তব বধূ প্রাণধন।
অভাগার বিরহেতে ত্যজীবে জীবন ॥
এত করি ডাকিলাম তুমি না শুনিলে।
কাঁদে তব প্রাণ নিমাই তুইলে নেও কোলে ॥
বিদায় হইলাম মাতা কর আশীর্ব্বাদ।
আমার কারণে যেন না ঘটে প্রমাদ ॥
পৌষ মাসেতে নিমাই ব্যাকুল হইল।
সন্ন্যাসে যাইতে গৌরের বাসনা হইল ॥
শুন শুন মা জননী বিদায় হইয়া যাই।
ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পুরাইতে চাই ॥
এ বলিয়া নিমাইচাঁদ করিল গমন।
মনহুখে বন্দে গিয়া ভারতী চরণ ॥
আগে আগে নিমাইচাঁদ ভরতী পশ্চাতে।
হরি হরি ধ্বনি করে যেতে পথে পথে ॥
নগরের সর্ব্বলোক সঙ্গে সঙ্গে ধায়।
কাহার সোণার শিশু সন্ন্যাসেতে যায় ॥
চলিলেন নিমাইচাঁদ ছাড়িয়া সংসার।
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া দোহে কাঁন্দে অনিবার ॥
চেতন পাইল তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ধনি।
চতুর্দ্দিকে নিরখিল নাহি গুণমণি ॥
উঠিয়া বসিল রামা পালঙ্গ উপরে।
দেখিলেক পত্রখানি রয়েছে শিয়রে ॥
পত্র পড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া হৃদে হানি কর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় করে ধরফর ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার রোদন

হায় রে দারুন বিধি, হয়ে মম প্রতিবাদী,
হরে নিলি প্রাণধন মোর।
কি করিব কোথায় যাব, আর কার মুখ চাব,
চতুর্দ্দিক হেরি অন্ধকার ॥
বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ বিষে, অভাগিনীর প্রাণ নাশে,
প্রাণনাথ করহ উদ্ধার।
আর কিবা সুখ আসে, থাকিব এ গৃহ বাসে,
কর নাথ সঙ্গিনী তোমার ॥
নদীয়ার পূর্ণ শশী, কোন রাহু গ্রাসে আসি,
প্রাণনাথ কে করিল চুরি।
শুনি শচী ঠাকুরাণী, শোকেতে ত্যজীব প্রাণী,
মাতৃবধ পাপে রবে বেড়ি ॥
আমার যৌবন কাল, হল নাথ যেন কাল,
প্রাণ যাবে বিরহ জ্বালায়।
ছিল আশা মনে মনে, দাসী হয়ে শ্রীচরণে,
ভক্তি ভরে সেবীব তোমায় ॥
সম্বরি বসন ধনি, হেলায়ে মোহন বেণী,
শচী গৃহে করিল গমন।
ডাকি কহে বিনোদিনী, উঠ উঠ ঠাকুরাণী,
কপালেতে লেগেছে আগুন ॥
আস্তে ব্যস্তে শচীরাণী, বধুর ক্রন্দন শুনি,
উঠি বসে পালঙ্গ উপরে।
ধিরে ধিরে বিষ্ণুপ্রিয়া শাশুরী নিকটে গিয়া,
কহে রামা তিতি অশ্রুনীরে ॥
ধর ধর ঠাকুরাণী, পড়ে দেখ পত্র খানি,
কপাল ভাঙ্গিল মো সবারে।
পত্র পড়ি শচীরাণী, হাহাকার করি ধ্বনি,
কর হানে ললাট উপরে ॥
বাছা মোর কোথা গেল, হৃদয়ে হানিয়া শেল,
দগধে পরাণী শোকানলে।
পুত্র পুত্র করি রাণী, হয়েছেন পাগলিনী,
মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ধরাতলে ॥
অচেতন শচীরাণী, স্বপনেতে যাদুমণী,
হেরিলেন মোহন মূরতি।
আহা মরি কি আকার, হেরি রূপ চমৎকার,
কিবা শম্ভু কিবা বসুপতী ॥

মায়েরে সম্বোধি বলে, অজিও না শোকানলে,
পুনঃ আমি আসিব ফিরিয়া।
বৎসরেক পরে আসি, তোমার কোলেতে বসি,
সান্ত্বনা করিব মা বলিয়া ॥
কিছুদিন এই ভবে, থাক মাতা শান্তভাবে,
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূর সংহতি।
এই বলিয়া নিমাই চাঁদ, হয়ে গেল অন্তর্দ্ধান,
মূর্চ্ছা ভঙ্গ হল শচী সতী।

পয়ার

মূর্চ্ছা ভঙ্গে শচী রাণী বসিয়া উঠীয়া।
বলিতে লাগিল রাণী বধূ সম্বোধিয়া ॥
স্বপনে হেরিনু আমি নিমাই যাদুমণি।
বৎসরের পরে বাছা আসিবেক পুনি ॥
রজনী প্রভাত হল ভানু প্রকাশিল।
দশ দিক আলো করি পৃথীবি সাজিল ॥
রজনীতে নিমাই চাঁদ সন্ন্যাসে চলিল।
নদীয়ার সর্ব্বলোক শুনিতে পাইল ॥
হাহাকার করি কাঁন্দে যত প্রজাগণ।
শিশু যুবা কিবা বৃদ্ধ যত পরিজন ॥
সুন্ন্যাসী হইয়া গেল রাজার নন্দন।
নৈদে রাজধানী আজি হইল কানন ॥
এইরূপে সর্ব্বলোক কাঁদিয়া বেড়ায়।
হেন সমে (২) গৌরহরি সন্ন্যাসেতে যায় ॥
মন্ত্রি হস্তে শচীরাণী দিয়ে রাজ্য ভার।
বধূ সহ চলে গেল কাটোয়া বাজার ॥
আশ্রয় লইল শচী সামান্য কুটীরে।
দিবস রজনী সদা পুত্র পুত্র করে ॥
এরূপে বর্ষাকাল গেলরে চলিয়া।
তবে কেন নিমাই চন্দ্র না এল ফিরিয়া ॥
একদিন শচীরাণী বসেছে দুয়ারে।
আসিল বৈরাগী এক দণ্ড হাতে করে ॥
বসিল বৈরাগী রাজ পাতীয়া আসন।
শচীরাণী করে তার মুখ নিরিক্ষন ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে মাতা কি কর বসিয়া।
এক বৎসর গেল, বয়ে এসেছে ফিরিয়া ॥
ইহা শুনি শচীদেবী উঠিয়া সত্বর।
নিমাইয়ে তুলিয়া নিল কোলের উপর ॥
লক্ষ লক্ষ চুম্ব নিমাইর মুখে দিল।
আনন্দে কাঁদিয়া সবে বলিতে লাগিল ॥
এতদিন কোথা ছিলি নিমাই বাছা ধন।
আমারে ছাড়িয়া কৈলে সন্ন্যাসে গমন ॥
নিমাই চাঁদ বলে মাতা না কান্দিও আর।
অঞ্চলের ধন আমি নিকটে তোমার ॥
শুন শুন মা জননী করি নিবেদন।
সন্ন্যাসীর বেশ সবে করহ ধারণ ॥
নদীয়ার রাজ্যে আছে যত প্রজাগণ।
সন্ন্যাসীর মন্ত্র সবে করিবে গ্রহণ ॥
এত শুনি শচীদেবী শন্তোষিত হয়ে।
নিমাইরে রাখিয়া গেল বাহিরে চলিয়ে ॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিধুমুখী আসি ধিরে ধিরে।
পতী পদে প্রণমিল ভক্তি সহকারে ॥
করে ধরি নিমাই চাঁদ বলিল বচন।
অপরাধ করিয়াছি করহ মার্জ্জন ॥
বৈরাগীনি বেশ ধর আমি যে বৈরাগী।
যেনো তুমি নিমাই চাঁদ তব অনুরাগী ॥
এত শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া হরষিত মন।
সন্তোষে চলিয়া গেল করিতে রন্ধন ॥
নিমাই আসিয়াছে শুনি যত প্রজাগণ।
আসি প্রণমিল সবে নিমাইর চরণ ॥
নিমাই বলে শুন মম যত প্রজাগন।
বৈরাগীর বেশ সবে করহ ধারণ ॥
নিমাইর চরণে সবে উপস্থিত হইল।
বৈরাগ্যের মন্ত্রে সবে দিক্ষিত হইল ॥
রাজ্য সহ সর্ব্বলোক বৈরাগী হইল।
বৈরাগ্যের রাজ্য বলে প্রকাশ হইল ॥
সে মধু নাপিত হল ভক্তের প্রধান।
যাত্রা কালে মুণ্ডন করিল যার স্থান ॥
শচী বিষ্ণুপ্রিয়া করে সুখে অবস্থান।
বৈরাগ্যের অধিশ্বর হল নিমাই চান (৩) ॥

চট্টগ্রামের একটী প্রাচীন মন্দির

[শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী]

সম্প্রতি চট্টগ্রাম সহরের সাত মাইল উত্তরপূর্ব্বে শিকারপুর গ্রামে একটা প্রাচীন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরটী চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ কায়স্থ-পরিবার মধুরাম চৌধুরীর পূর্ব্বপুরুষ তিলকচাঁদ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে দেখা যায়। মন্দিরের গঠন-

(২) সময়ে।

(৩) চাঁদ, চন্দ্র।

ালী অতীব প্রাচীন ; মন্দির-গাত্রে লতা-পাতা ও ফুল-ফলে চিত্রিত াচীন ইষ্টক শোভা পাইতেছে। ইহার গাঁথনি এতই সুদৃঢ় যে, কয়েকটি ছ ইহার দেওয়াল ভেদ করিয়া উঠিলেও দেওয়ালের কিছুমাত্র অনিষ্ট ধন করিতে পারে নাই। মন্দিরের উপরিভাগ নানাবিধ বৃক্ষ, তা ও গুল্মে আচ্ছাদিত। অন্যান্য হিন্দু মন্দিরের ন্যায় ইহার দ্বার ক্ষিণ দিকে নহে, একটামাত্র দ্বার উত্তর দিকে আছে। ইহার কোনরূপ নালা নাই। মন্দিরটী মাটীতে বসিয়া গিয়াছে ;—ভূমিকম্প কিম্বা অন্য ান বিশেষ কারণে ঐরূপ হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমিত হয়। মন্দিরের রের উচ্চতা বর্ত্তমানে আড়াই হাতের বেশী নাই। মন্দিরের ভিতরে বেশ করিতে কাহারো সাহস হইতেছে না। অনেকেরই বিশ্বাস ােতে বিষধর সর্প অবস্থান করিতেছে। মন্দিরের দ্বার হইতে কিছু র দাঁড়াইয়া মাথা নিচু করিয়া দৃষ্টিপাত করিলে মন্দিরের ভিতরে ্রদিকের দেওয়ালে সংলগ্ন একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বেদী দৃষ্ট হয়।

মধুরাম চৌধুরীর বংশের জনৈক কুলপুরোহিতের বাড়ীতে প্রাচীন থির মধ্যে একখণ্ড হরিতাল কাগজে অতি প্রাচীন হস্তাক্ষরে তিলক- ় চৌধুরীর এই প্রসিদ্ধ মন্দিরের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"আসীদ্বঙ্গেষু রাঢ়াখ্যে কায়স্থ কুলজঃ সুধী
ত্রিভিঃ প্রবরকৈর্যুক্তো মধুমান কাশ্যপান্বয়ে।
জাতোঽহং কৃচ্ছ্রমাপন্নে রাঢ়ে দক্ষিণ পূর্ব্বত
শ্চট্টলে কুলভূমৌচ প্রস্থিতোঽনুচরৈঃ সহ।
দৃষ্ট্বাহং শ্যাম কান্তারং রম্যং ব্যালৈর্নিষেবিতং
বাসার্থং সমভিলষণ্ সাঙ্গোপাঙ্গৈরনেকধা।
কৃতানুযত্ন সঞ্চারৈরিয়ং ভূর্বাস যোগ্যকা॥
গৌড়েশ্বরেণ মৃগায়াত্র কৃতানুপূর্ব্বং
তস্মাৎ শিকারপুর নাম কৃতং প্রসিদ্ধং।
তত্রস্থিতো ভগবতো ব্রতমত্রপুণ্যং
সম্পাদিতং ব্রতময়ো মধুনাম কৃচ্ছ্রম্।
শাকেঽগ্নি গ্রহ বেদেন্দু প্রমে বিষুব সংক্রমে।
কৃতে শ্রীমন্দিরে চাত্র স্থাপিতঃ স্বর্গসম্পদে
মাতুঃ শ্রীতিলকেনাস্ত রায়েন কূর্ম্মসংজ্ঞকঃ॥

১৪৯৩ শকাব্দা—বিষুব-সংক্রান্তি দিনে মাতৃদেবীর স্বর্গার্থে তিলক কর্তৃক নির্ম্মিত মন্দিরে কূর্ম্মচক্র স্থাপিত হইল।"

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় এই প্রাচীন হস্তলিপির ঠাদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।

এই প্রাচীন মন্দিরের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া চট্টগ্রামের হাসের এক পৃষ্ঠা খুলিয়া যাইতেছে, দেখা যায়। উপরিউক্ত সংস্কৃত ক নিবদ্ধ শিকারপুর, কুলভূমি এবং গৌড়েশ্বরের কথা চিন্তা করিলে সত্যই নানা তথ্যের আবিষ্কার হইয়া যাইবে আশা করা যায়। প্রসঙ্গে শিকারপুর সংলগ্ন খন্দকিয়া ও ফতেয়াবাদ গ্রামের বিষয়ও াপন করিতে হয়।

চট্টগ্রাম একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা কর্ণফুলী নদীর উপর অবস্থিত। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি পাঠে অনুমিত হয়, কর্ণফুলী নদী এক্ষণে যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, পূর্ব্বকালে তাহার গতি তদপেক্ষা উত্তর-পশ্চিমে ছিল। চট্টগ্রাম সহর সংলগ্ন ঠিক উত্তরাংশের কয়েকটী স্থানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও এই অনুমানের পোষকতা করিতেছে —যথা, চর চাকতাই, কাপাসগোলা, বোল সহর, সুলতবহর, চাঁদগাও, বাকলিয়াচর, বুড়িরচর ইত্যাদি। পাঠান-রাজত্বকালে সূর্য্যবংশীয় গৌড়াধিপতি মহারাজ নরেন্দ্র সিংহ দেববর্ম্মা মুসলমান কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া পরিজনসহ নবদ্বীপে আগমন করেন। তিনি তথায় জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। তৎপুত্র মহারাজ পুরুষোত্তম দেববর্ম্মা পুরোহিত, পরিজন ও সার্দ্ধ দ্বিশত বরকন্দাজ সৈন্য সহ তীর্থ-পর্য্যটন করিতে-করিতে কামরূপ হইয়া ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত খণ্ডলগ্রামে উপস্থিত হন। তিনি তথায় বহুদিন বাস করেন। তৎপুত্র গৌড়েশ্বর রায় চট্টগ্রামে আসিয়া কুলভূমিতে বাস করেন। তৎকালে চট্টগ্রাম ত্রিপুর-রাজের অধীন ছিল। এই চট্টগ্রাম লইয়া ত্রিপুর-রাজ ও আরাকান-রাজের মধ্যে যুদ্ধ হয়। গৌড়েশ্বর রায় ত্রিপুর-রাজের পক্ষে আরাকান-রাজের বিরুদ্ধে বহুদিন সংগ্রাম করেন। অতঃপর তৎপুত্র মুকুটরায় আরাকান-রাজ-কর্ত্তৃক চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কয়েক-বর্ষ পরে কোন কারণে মুকুটরায় মুসলমানের হস্তে চট্টগ্রামের শাসনভার দিয়া চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করেন। চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ হিন্দু পরিবারের বংশ-তালিকা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রায় সকলের পূর্ব্বপুরুষই গৌড় কিম্বা রাঢ় হইতে এদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন। তাঁহাদের অনেকেই সর্ব্বপ্রথমে এই কুলভূমি বা কুলগ্রাম অর্থাৎ কুলগাঁও নামক স্থানে অবস্থিতি করেন এবং ক্রমশঃ অন্য স্থানে ছড়াইয়া পড়েন। এই তিলকচাঁদ রায়ও চট্টগ্রামে আসিয়া প্রথমে কুলভূমিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি কুলভূমির সন্নিহিত জঙ্গলে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু শিকার করিতেন। পরে মুসলমান বাদশাহগণ কর্ত্তৃক ঐ জঙ্গলাকীর্ণ স্থান আবাদ হইলে শিকারপুর নামে অভিহিত হয়। এই রমণীয় স্থানকেই তিলকচাঁদ রায় বাসের উপযুক্ত ভূমি মনোনীত করিয়া লয়েন। তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর স্বর্গার্থ এই প্রাচীন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে কূর্ম্মচক্র নারায়ণের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং জিম্মে কূর্ম্মচক্র নামক ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেন। এক্ষণে সেই দেববিত্ত ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি হইয়াছে। তিলকচাঁদ রায় চৌধুরী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথম দুই পুত্র মধুরাম ও জনার্দ্দনের নামে "মধুজনার্দ্দন" তরফ সৃষ্টি করেন। মধুরাম চৌধুরী পিতার অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন—তাঁহারই নামে এই বংশের নাম মধুবংশ হয়। মধু ও জনার্দ্দনের পর এই বংশের কিছু অবনতি হয়। অতঃপর মহাদেব চৌধুরীর বিশেষ প্রতিপত্তি হয়। তিনি তাঁহার কন্যারত্নকে প্রসিদ্ধ লালা চাঁদ রায়ের বংশধর লালা প্রাণবল্লভের হস্তে সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে গৃহজামাতারূপে গ্রহণ করেন এবং জামাতার নামে প্রাণবল্লভ তরফের গঠন করেন। শিকারপুর গ্রামে মধুরাম চৌধুরীর বংশ ও লালা চাঁদ রায়ের বংশ বহুবর্ষ ব্যাপিয়া

বনবাস করিতেছে। কালের এমনি বিচিত্র গতি— যদিও লালাবংশ মধুবংশের গৃহজামাতা, তথাপি ঐ গ্রামে লালাবংশেরই বিশেষ প্রতিপত্তি ও উন্নতি হইয়াছিল, দেখা যায়। এই গ্রামে লালাবংশের অনেক বড়-বড় দীঘি এখনও তাহার অতীত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বর্ত্তমানে লালাবংশের শ্রীযুক্ত বরদাচরণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন চৌধুরীর অবস্থা পূর্ব্ববৎ নাই। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমিদার ৺অপর্ণাচরণ চৌধুরী এই বংশের প্রধান ব্যক্তি। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তদীয় একমাত্র নাবালক পুত্র শ্রীমান পাঁচকড়ি চৌধুরীর পক্ষে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র লাল চৌধুরী বিশেষ সুখ্যাতির সহিত ব্যবসা ও জমিদারির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। বর্ত্তমানে মধুবংশে স্বনাম-খ্যাত ব্যবসায়ী ও জমিদার ৺অভয়াচরণ চৌধুরীর পুত্রগণ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্তসুরেন্দ্র লাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল চৌধুরী বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যবসা ও জমিদারি পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রামকালী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত উমাচরণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রামকুমার চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ চৌধুরী এই বংশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

এই শিকারপুর গ্রামের একদিকে খন্দকিয়া গ্রাম; অপর দিকে ফতেয়াবাদ গ্রাম। খন্দকিয়া অর্থে খন্দক অর্থাৎ নিম্নভূমিকে বুঝাইতেছে। কর্ণফুলী নদীতে চরভরাট হইয়া এই নিম্নভূমির উৎপত্তি হইয়াছে, অনুমান করা যায়। ফতেয়াবাদ অর্থে ফতে—বিজয়, আবাদ—নগর; অর্থাৎ বিজয়নগরকে বুঝাইতেছে। শ্রীযুক্ত মৌঃ আবদুল করিম সাহেব সংগৃহীত কবি দৌলত উজিরের লায়লিমজনু নামক ৭১ বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে ফতেয়াবাদ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়—

"বঙ্গদেশ মনোহর, তার মধ্যে শোভাকর
নগর ফতেয়াবাদ নাম।
আল্লাওদ্দীন পীর, নির্ম্মল শরীর বীর
তথাতে বসতি অনুপাম।"
"নগর ফতেয়াবাদ, দেখিতে পুরয়ে সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোহর মনোরম, অমর নগর সম
খণ্ডে খণ্ডে অনেক নিবাস।
* * * * * কর্ণফুলী তট
শুভপুরী অতি বিদ্যমান।

৺তিলকচাঁদ চৌধুরীর মন্দির

চৌদিগে * * উচল বিস্তর সব
তাহে সদা বদর পয়ান।
আদেশিলা গৌড়েশ্বরে, উজির হামিদ খাঁরে
অধিকারী হৈল চাটিগ্রাম
আত্মরূপ দানধর্ম্ম, করিলা পুণ্যের কর্ম্ম
আনন্দে রহিলা সেই ধাম।"
"অনুক্রমে বংশ কত, গণিলেক সেইমত
গৌড়ের কুদিন হৈল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি, নানামত মহামতি
নৃপতি নেজাম সাহাদুর।"
"একশত ছত্রধারী, সভানের অধিকারী
ধবল অরুণ গৌড়েশ্বর।
রজনী সময় হৈলে, মাণিক্য প্রদীপ জ্বলে
অপরূপ পুরীর অন্তর।"

এই প্রাচীন পুঁথিতে ফতেয়াবাদ গ্রামের বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে গৌড়ে-

রর নায় দৃষ্ট হয়। খুব অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলে ফতেয়া-
া চট্টগ্রামের রাজধানী বলিয়া অনুমিত হয়। মুসলমান রাজত্ব-
লেও চট্টগ্রামে ফতেয়াবাদ প্রধান স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল।
তয়াবাদের নছরৎ বাদশাহের প্রকাণ্ড দীঘি এবং প্রাচীন মসজিদের
:সাবশেষ এখনও তাহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মণিবেগমের মৃত্যু-তারিখ

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বাঙ্গালার বেগমদিগের ইতিহাস-সঙ্কলন-কালে মীরজাফর-বনিতা
ণিবেগমের মৃত্যুর তারিখ লইয়া বিশেষ গোলযোগে পড়িতে হইয়াছিল;
ারণ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে এ বিষয়ে বহু মতদ্বৈধ আছে। সুখের
বয়, সম্প্রতি আমরা মণিবেগমের মৃত্যুর যথার্থ তারিখ জানিতে
ারিয়াছি। এক্ষণে এ বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মত আলোচনা
রা যাউক।

	মণিবেগমের মৃত্যুর তারিখ
) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, বি-এল মহাশয় রচিত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনীর' (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ২৬২) মতে	...খ্রীঃ ১৮০২
) Beale Keene এর "*Oriental Biographical Dictionary*"র মতে	...খ্রীঃ ১৭৯৮
) শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "*Musnud of Murshidabad*" (পৃঃ ১৩৩) পুস্তকের মতে	... এপ্রেল ১৮১২ খ্রীঃ
) পরলোকগত মুর্শিদাবাদের দেওয়ান বাহাদুর ফজল্ রব্বী খাঁ বাহাদুরের সহিত এ বিষয়ে আমাদের পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল; তাঁহার মতে	... এপ্রেল ১৮১২ খ্রীঃ

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, উপরি-উক্ত তারিখগুলির কোনটাই যে
ক নহে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। *Calcutta Gazette* পত্রে
ণিবেগমের মৃত্যুর যথার্থ তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে
য়; ইহাতে লিখিত আছে:—

Fort William, 14th January, 1813.

A dispatch from the Superintendent of Nizamut
ffairs at Moorshedabad has been received by the
Right Hon'ble the Governor General in Council,
nnouncing the melancholy event of the decease of
Her Highness the Munny Begum, widow of the la'e
Nabab Jaafer Alli Khaun, ancestor of the reigning
Nabob of Bengal on the morning of *the 10th instant.*

Her Highness' remains were interred with the
honors due to her exalted rank in the evening of the
same day at a mosque in the city of Moorshedabad.

In testimony of respect to the memory of her late
Highness the Munny Begum, the Right Hon'ble
the Governor General in Council has been pleased
to direct that minute guns to the number of ninety
answering to the years of the deceased, be fired from
the ramparts of Fort William at four o'clock *this
evening*, the flag be'ng hoisted half-mast high.

Published by command of the Right Hon'ble the
Gove nor General in Council.

G. Dowdeswell

Chief Secy. to Govt.

(*Selections from the Calcutta Gazettes* of the
years 1806-1815 inclusive.—H. D. Sandeman, Vol.
IV, pp. 120-1.).

Letters of Warren Hastings to his wife (S. C.
Grier, 1905) পুস্তকের ২২৯ পৃষ্ঠাতেও উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৮১৩
খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী মণিবেগমের মৃত্যু হয়; তাহা হইলে ইহাও
Calcutta Gazette পত্রে প্রদত্ত তারিখের সমর্থন করিতেছে।

আশা করি ইহার পর বোধ হয় ঐতিহাসিকেরা মণিবেগমের মৃত্যুর
তারিখ-নির্দ্ধারণে গোলে পড়িবেন না।

শুভঙ্কর

[শ্রীললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এস্‌সি]

(২)

(বামে-ভাঙ্গা হরণ—দোভাঙ্গা হরণ)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে শুভঙ্করের কাঠাকালি এবং বিঘাকালি সম্বন্ধে কিছু
বলিয়াছি। আজ শুভঙ্করের বিষয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা আছে।
শুভঙ্করের প্রবর্ত্তিত অঙ্ক কষিবার সকল নিয়মেরই একটু-একটু বিশেষত্ব
আছে। আজ যে বিষয়ে বলিব তাহার বিশেষত্ব অন্য প্রকারের।
আজ যাহা বলিব তাহা ছাড়া শুভঙ্করের আর সকল নিয়ম
এক পর্য্যায়ে ফেলা যায়। তাহার কথা পরে বলিবার ইচ্ছা আছে। আজ
আমি শুভঙ্করের 'দোভাঙ্গা হরণ' এবং 'বামে-ভাঙ্গা হরণ' বিষয়ে
বলিব।

'দোভাঙ্গা হরণ' এবং 'বামে-ভাঙ্গা হরণ' কাহাকে বলে এবং এইরূপ
নামকরণ কেন হইল, তাহা সর্ব্বপ্রথমে বলা প্রয়োজন মনে করি।
'হরণ' সাধারণতঃ 'ভাগ' করাকেই বলা হয়, তাহা সকলেই জানেন।

'দোভাঙ্গা হরণ' বলিলে এমন হরণকে বুঝায় যাহার দুইটাই—হার্য্য এবং হারক—আজকালকার কথায় ভাজ্য এবং ভাজক—ভাঙ্গারাশি, অর্থাৎ মিশ্ররাশি। যেমন ৩৩২৸৵০ কে ১৩৷৴০ দিয়া ভাগ করা। এইখানে হার্য্য—৩৩২৸৵০ এবং হারক—১৩৷৴০—দুইটাই ভাঙ্গা বা মিশ্ররাশি। এই হইল 'দোভাঙ্গা হরণ'। 'বামে-ভাঙ্গা হরণ' 'দোভাঙ্গা হরণ'এর নামান্তর মাত্র। এইরূপ নামান্তর করিবার কারণ এই যে 'দোভাঙ্গা হরণ' যেরূপ ভাবে করা হয়, 'বামে-ভাঙ্গা হরণ' সেরূপ ভাবে করা হয় না। ইহা করিবার প্রণালী (working method) পৃথক। 'বামে-ভাঙ্গা হরণ' প্রণালীতে অঙ্ক করিতে হইলে হার্য্যকে ক্রমে-ক্রমে 'বামে ভাঙ্গিতে হয়; এই 'বামে ভাঙ্গা' কিরূপ তাহা পরে দেখান যাইবে।

সর্ব্বপ্রথমেই 'দোভাঙ্গা হরণ' এবং 'বামে-ভাঙ্গা হরণ' এই দুইটী নিয়মের দুইটী অঙ্ক করা যাউক। ৩৩২৸৵০ কে ১৩৷৴০ দিয়া শুভঙ্কর নিম্নলিখিত রূপে ভাগ করেন।

(ক) ১৩৷৴০) ৩৩   ২৸৵০
২   ৫
৩৩   ২৸৵০
১৩৷৴০ × ২ = ২৬৷৵০   ৬৷৵ × ১০ = ৬৩৸০
৬৷৵০   ৬৬৷৴০
১৩৷৴০ × ৫ = ৬৬৷৴০

ভাগফল হইল ২৫।

এইখানে ৩৩২৸৵ ফাঁক-ফাঁক করিয়া রাখা হইয়াছে। ৩৩এর ভিতর ১৩৷৴০ যায় ২ বার; ৩৩ হইতে ১৩৷৴০ × ২ = ২৬৷৵০ বাদ দিলে ৬৷৵০ থাকে, ইহাকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২৸৵০ এর সহিত যোগ করাতে হইল ৬৬৷৴০। ইহার ভিতর ১৩৷৴০ যায় ৫ বার। বাকী কিছুই থাকে না। ভাগফল হইল ২৫। পাটীগণিতের নিয়মে ভাগ করিতে হইলে আমরা ভাজ্য এবং ভাজক দুইটাকেই আনায় আনিয়া ভাগ করিতাম। এ জায়গায় সে সব হাঙ্গামা কিছুই নাই। এইবার 'বামে-ভাঙ্গা হরণের' একটা উদাহরণ দিই। শুভঙ্কর 'দোভাঙ্গা হরণে'র পর এই আর্য্যাটী দিয়াছেন,—

হার্য্যরাশি যদি অতি উচ্চপদ হয়।
হারক যত্তপি অতি নীচপদে রয়॥
হার্য্যকে দশকে হরি বামেতে ভাঙ্গিবে।
শুভঙ্কর বলে ইথে সহজ হইবে॥

'দোভাঙ্গা হরণ'এর সচরাচর নিয়ম যেখানে খাটে না, সেইখানেই এই নিয়ম। এই আর্য্যাই 'বামে-ভাঙ্গা হরণে'র আর্য্যা। এই আর্য্যা অঙ্ক করিবার প্রণালী ঠিক বলিয়া দেয় না। একটী অঙ্ক করিলে আর্য্যাটী ঠিক বুঝা যাইবে। যেমন ১৪৸৶১২৷৷কে ৴১৷ দিয়া ভাগ কর। এইখানে হার্য্য এবং হারক দুইটী ভাঙ্গা রাশি—সুতরাং এই অঙ্কটা 'দোভাঙ্গা হরণ,' কিন্তু এই 'দোভাঙ্গা হরণ' করিবার প্রণালী অন্য প্রকারের বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বামে-ভাঙ্গা হরণ'। এইখানে হারক ৴১৷, গণ্ডায় এবং কড়ায় আছে। আর হার্য্য ১৪৸৶১২৷৷ আছে টাকা আনা গণ্ডা কড়ায়। সুতরাং হারকের তুলনায় হার্য্য অনেক 'উচ্চপদে' আছে এবং হার্য্যের তুলনায় হারক অনেক 'নীচপদে' আছে। অতএব এইখানে 'বামে-ভাঙ্গা' প্রণালীতে ভাগ করিতে হইবে। 'বামে-ভাঙ্গা' প্রণালীতে ভাগটী নিম্নলিখিতরূপে সম্পাদিত হয়।

১   ৪৸৶১২৷৷
৴৪৸   ৵৭৸   ১৷৶১৯   ০

(খ) ৴১৷) ৴৪৸ | ৩   ৴৷   ৴১৷৷   ৴২৷৷
৴৩৸   ৴১০   ৴২৷৷   ৴২৷৷
৴১   ৴১০৷ | ৮   ৴৪ | ৩   ৴৫ | ৪
৴১০   ৴৩৸   ৴৫
৴৷   ৴৷   ০০

ভাগফল হইল ৩৮৩৪। এইখানে ১৪৸৶১২৷৷কে ফাঁক-ফাঁক করিয়া রাখা হইয়াছে। ৪৸৶১২৷৷ কে ১০ দিয়া ভাগ করাতে ৷৶১৯ ভাগফল হয় এবং ৴২৷৷ কে নীচে রাখিয়া ৷৶১৯ ১এর সহিত যোগ করিয়া পাওয়া যায় ১৷৶১৯। ইহাকে ১০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল ৵৭৸ হয় এবং ৴১৷৷ ভাগশেষ থাকে। ৴১৷৷ কে নীচে রাখিয়া ৵৭৸ কে (যোগ করিবার কিছু না থাকায়) ১০ দিয়া ভাগ করা হইল। ভাগফল ৴৪৸ এবং ভাগশেষ ৴৷ হইল। ৴৷ কে নীচে রাখা হইল। সর্ব্বশেষ ভাগফল ৴৪৸ কেও নীচে রাখা হইল। ইহ'কেই শুভঙ্কর 'বামে-ভাঙ্গা' বলিয়াছেন। ১৪৸৶১২৷৷ কে বামে ভাঙ্গিয়া যে ফল হইয়াছে তাহা যথাক্রমে

৴৪৸   ৴৷   ৴১৷৷   ৴২৷৷

এইগুলিকে ইংরাজী হিসাবে Key numbers বলা যাইতে পারে, কারণ এইগুলিই হইতেছে ভাগ করিবার প্রয়োজনীয় রাশি। এইবার ভাগ কিরূপভাবে করা হয়, তাহা বলিতে হইবে। ৴৪৸ এর ভিতর ৴১৷ যায় ৩ বার, বাকী থাকে ৴১। এই ৴১ কে দশ দিয়া গুণ করিয়া ৴৷ এর সহিত যোগ করাতে হইল ৴১০৷, এই ৴১০৷ এর ভিতর ৴১৷ যায় ৮ বার, বাকী থাকে ৴৷। এই ৴৷ কে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ৴১৷৷ এর সহিত যোগ করাতে হইল ৴৪; এই ৴৪ এর ভিতর ৴১৷ যায় ৩ বার, বাকী থাকে ৴৷। এই ৴৷ কে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ৴২৷৷ এর সহিত যোগ করাতে হইল ৴৫; এই ৴৫ এর ভিতর ৴১৷ যায় ৪ বার, বাকী কিছুই থাকে না। ৩, ৮, ৩ এবং ৪কে পরে-পরে রাখিয়া ৩৮৩৪ হয়, ইহাই ভাগফল। শুভঙ্কর তাঁহার আর্য্যার শেষে বলিয়াছেন 'ইথে সহজ হইবে,' বাস্তবিক ভাগ করিবার এমন 'সহজ' এবং সুন্দর নিয়ম কেহ কোথাও পাইয়াছেন কি? এই নিয়মে ভাগ করিলে 'সহজ 'ত হয়ই; তা ছাড়া এই নিয়মটী যেমন সুন্দর, অঙ্ক করিতেও তেমনি সময় কম লাগে। তা ছাড়া ইহাতে অঙ্ক ভুল যাইবার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ এই নিয়মে ভাগ করিলে বেশী বড়-বড় রাশি লইয়া আমাদের ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না।

এইবার শুভঙ্কর যে এই 'দোভাঙ্গা হরণ' এবং 'বামে-ভাঙ্গা হরণ' কি নিয়মে করেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অর্থাৎ এই দুইটী

প্রণালী কেন যে ঠিক উত্তর দেয়, তাহা দেখা যাউক। প্রথমেই আমরা দোভাঙ্গা হরণ বিষয়ে বলিব। এইটী বুঝিতে হইলে আমরা সচরাচর যে ভাগ করিয়া থাকি, তাহার বিষয়ে দুই একটী কথা বলিব। ৪৩৪৭ কে ৯ দিয়া ভাগ করিলে কি হয় দেখা যাউক।

৯) ৪৩৪৭ (৪৮৩
৩৬
———
৭৪
৭২
———
২৭
২৭
———

এইখানে ৪ এর ভিতর ৯ যায় না; সেইজন্য ৪৩ লওয়া হইল। ৪৩ এর ভিতর ৯ যায় ৪ বার, বাকী থাকে ৭। তাহার পর ৪ নামান হইয়াছে। তাহাতে ৭৪ হয়। এইটাকে একটু ঘুরাইয়া বলিলে বলিতে পারা যায় যে, যাহা বাকী থাকে তাহাকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া যেটা নামান হয়, তাহা যোগ করিতে হয়। অর্থাৎ ৭ কে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ৪ যোগ করাতে হইল ৭৪। সেইরূপ ২ কে ১০ দিয়া গুণ ও ৭ যোগ করাতে পাইলাম ২ × ১০ + ৭ = ২৭। 'দোভাঙ্গা হরণ' করিবার প্রণালী ঠিক এইরূপ। যেমন

১৩।/০) ৩৩২৸/০ (২৫
২৬॥৵০
———
৬।৵০
১ ,
———
৬৩৸০
২৸/০
———
৬৬॥/০
৬৬॥/০
———

এইখানে ৩ এর ভিতর ১৩।/০ যায় না। সেইজন্য ৩৩ লওয়া হইল। ৩৩ এর ভিতর ১৩।/০ যায় ২ বার বাকী থাকে ৬।৵০; ইহাকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২৸/০ যোগ করাতে হইল ৬৬॥/০। ইহার ভিতর ১৩।/০ যায় ৫ বার। সুতরাং ভাগফল ২৫ হইল। শুভঙ্করের দোভাঙ্গা হরণে'র যাহা পাতর্ন ((ক) দ্রষ্টব্য) তাহা ঠিকই এই, তবে তাহা একটু পৃথকভাবে সাজান।

শুভঙ্করের প্রণালীতে 'দোভাঙ্গা হরণ' করিবার সময় একক স্থানীয় অঙ্কটা সর্ব্বদাই মিশ্ররাশির সহিত রাখিতে হইবে। যেমন ৩৩২৸/০ কে যখন ফাঁক-ফাঁক করিয়া রাখা হয়, তখন—

৩৩ ২ ৸/০

এইরূপ না রাখিয়া—

৩৩ ২৸/০

এইরূপ রাখা হইয়াছে, অর্থাৎ ২ কে ৸/০ এর সঙ্গে রাখা হইয়াছে। এইরূপ রাখিবার কারণ এই যে ৩৩২৸/০ এর মধ্যে প্রথম ৩ এর স্থানীয় মান শতক, দ্বিতীয় ৩ এর স্থানীয় মান দশম, এবং ২৸/০ এর স্থানীয় মান একক। যদি ৩৩২৸/০ কে

৩৩ ২ ৸/০

এইরূপ রখা হয় তবে ২ এর স্থানীয় মান দাঁড়ায় দশক কিন্তু ২ এর প্রকৃত স্থানীয় মান একক; এইজন্য ২ কে ৸/০ এর সহিত রাখা হইয়াছে।

শুভঙ্করের এই 'দোভাঙ্গা হরণ' প্রণালীতে আমরা কোনও একটী মিশ্রভাগ যত ইচ্ছা তত দশমিক বিন্দু পর্য্যন্ত করিতে পারি। যেমন বিঘা ২৩১॥৩।৴০ কে ৸১৴/০ দিয়া ভাগ ২ দশমিক বিন্দু পর্য্যন্ত করা যাউক। শুভঙ্করের হিসাবে করিলে ভাগফল নিম্নলিখিত রূপে বাহির হয়।

৸১৴/০)	২	৩	১॥৩।৴		
	২	৮	৬	২	৩
	২	৩	১॥৩।৴	১৸৩৻৻৵	২৸২॥
	১॥২।৵	৩৸১।	৩।২॥০	১॥২।৵	২।৩॥/০
	।২॥৵	৬৸১।	৫৻৻৸৴	।৻৸	।৩৸৴
		৬।৪॥	৪৸২৵		
		।১৸	/৩৸/		

ভাগফল হইল ২৮৬০২২।

'দোভাঙ্গা হরণ' যেরূপে বুঝা গেল, বামে-ভাঙ্গা হরণ ঠিক সেইরূপে বুঝা যায় না। ১০ দিয়া ভাগ করিয়া যে বামে-ভাঙ্গা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেই 'বামে-ভাঙ্গা হরণ' বুঝা যাইবে। প্রথমে আমাদের 'বামে-ভাঙ্গা'র প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে হইবে। শুভঙ্কর বলিয়াছেন হার্য্য যদি উচ্চপদ এবং হারক যদি নীচ পদ হয়, তবে বামে ভাঙ্গিতে হইবে। আমরা যে উদাহরণ দিয়াছি, তাহা হইতে ইহা বুঝিতে হইবে। ((খ) দ্রষ্টব্য)। ১ এর ভিতর ৻। ৯ অপেক্ষা অনেক অধিকবার যায়, এই জন্য ৻৲। এর 'পদ' ১৪৸৴/১২॥০ তুলনায় নীচ। এইজন্য ১৪৸৴/১২॥০ কে 'বামে ভাঙ্গিয়া' রাখা হইয়াছে। 'বামে ভাঙ্গিবার' উদ্দেশ্য হইতেছে যে ভাজক, ভাগ করিবার সময়, ভাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এককবার (৯ অথবা ৯ অপেক্ষা কমবার) যায়। আমরা বামে ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে ১৪৸৴/১২॥ কে তফাৎ-তফাৎ রাখিয়াছি অর্থাৎ ১৪৸৴/১২॥ কে ১০ + ৪৸৴/১২॥ এইরূপ রাখিয়াছি। তারপর ৪৸৴/১২॥ কে ১০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফল ।৴১৯ আর ভাগশেষ ৻২॥ পাইয়াছি। ।৴১৯ কে ১ এর সহিত যোগ করিয়াছি। পাইয়াছি ১।৴১৯। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বামে ভাঙ্গিবার সময় ১০ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাই ১৪৸৴/১২॥ কে ১০ দিয়া ভাগ করিয়াও পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১৪৸৴/১২॥ কে ১০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হয় ১।৴১৯ এবং ভাগ শেষ ৻২॥০। মোট কথা হইতেছে যে ১৪৸৴/১২॥ = ১।৴১৯ × ১০ + ৻২॥। তারপর ১।৴১৯ কে ১০ দিয়া ভাগ করাতে ভাগফল হয় ৴৭৸ আর ৻১। ভাগশেষ থাকে। সুতরাং ১৪৸৴/১২॥ = ৴৭৸ × ১০০ + ৻১। × ১০ + ৻২॥। সর্ব্বশেষে যখন ৴৭৸কে

১০ দিয়া ভাগ করাইলে তখন ভাগফল ৲৪৸ আর ভাগ শেষ ৲৷ পাওয়া যায়। অতএব ১৪৸৶/১২॥ = ৲৪৸ × ১০০০ + ৲৷ × ১০০ + ৲১॥ × ১০ + ৲২॥। এইটাকে ঘুরাইয়া বলিলে বলিতে পারা যায় যে ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ৲৪৸ আছে ১০০০ বার, ৲৷ আছে ১০০ বার ৲১॥ আছে ১০ বার আর ৲২॥ আছে ১ বার। স্থানীয় মানের কথা যদি বলি, তবে ৲৪৸ এর স্থানীয় মান সহস্র, ৲৷র স্থানীয় মান শত, ৲১॥ এর স্থানীয় মান দশ এবং ৲২॥ এর স্থানীয় মান একক। এখন ৲৪৸ এর ভিতর ৲১৷ আছে ৩ বার, বাকী থাকে ৲২৷ সুতরাং ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ৲১৷ আছে ৩০০০ বার। আর বাকী যে ৲১ আছে তাহা ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ১০০০ বার আছে। সুতরাং ৲১ কে ১০ দিয়া গুণ করাতে যে ১০ হইল তাহা ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর আছে ১০০ বার; আবার ৲৷ আছে ১৪৸৶/১২॥ ভিতর ১০০ বার সুতরাং ৲১০৷ আছে ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ১০০ বার। ৲১০৷ এর ভিতর ৲১৷ যায় ৯ বার বাকী থাকে ৲৷। সুতরাং ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ৲১৷ আছে ৮০০ বার। বাকী যে ৲৷ থাকে তাহা ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ১০০ বার আছে। অতএব ৲৷ কে ১০ দিয়া গুণ করাতে আমরা যে ৲২॥ পাই তাহা ১৪৸৶/১২॥ ভিতর ১০ বার আছে, এ ছাড়া ৲১॥ ও ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ১০ বার আছে; সুতরাং ৲২॥ + ৲১॥ = ৲৩ আছে ১৪৸৶/১২॥ ভিতর ১০ বার। আবার ৲৪ এর ভিতর ৲১৷ আছে তিনবার, সুতরাং ৲১৷, ৲১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর আছে ৩০ বার। বাকী ৲৷ তাহা ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ১০ বার আছে। সুতরাং ৲৷ × ১০ = ৲২॥ আছে ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ১ বার, আর তা ছাড়াও ৲২॥ আছে ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর একবার সুতরাং ৲২॥ + ৲২॥ = ৲৫ আছে ১৪৸৶/১২॥ ভিতর ১ বার। অন্যদিকে ৲১৷ যায় ৲৫ এর ভিতর ৪ বার। সুতরাং ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর যায় ৪ বার। সুতরাং ৲১৷ সর্ব্বশুদ্ধ ১৪৸৶/১২॥ এর ভিতর ৩০০০ + ৮০০ + ৩০ + ৪ = ৩৮৩৪ বার আছে।

আমরা এই সমস্ত কথা অন্য প্রকারে বুঝাইব। পূর্ব্বেই পাইয়াছি ১৪৸৶/১২॥ = ৲৪৸ × ১০০০ + ৲৷ × ১০০ + ৲১॥ × ১০ + ৲২॥। আবার ৲৪৸ = ৲৩৸ + ৲১। সুতরাং ৲৪৸ × ১০০০ = ৲৩৸ × ১০০০ + ৲১ × ১০০০ = ৲৩৸ × ১০০০ + ৲১০ × ১০০। অতএব আমরা ১৪৸৶/১২॥ = ৲৩৸ × ১০০০ + ৲১০ × ১০০ + ৲৷ × ১০০ + ৲১॥ × ১০ + ৲২॥ পাইতেছি।

অর্থাৎ ১৪৸৶/১২॥ = ৲৩৸ × ১০০০ + ৲১০৷ × ১০০ + ৲১॥ × ১০ + ৲২॥

আবার ৲১০৷ = ৲১০ + ৲৷। অতএব ৲১০৷ × ১০০ = ৲১০ × ১০০ + ৲৷ × ১০০ + ৲১০ × ১০ + ৲২॥ × ১০

সুতরাং ১৪৸৶/১২॥ = ৲৩৸ × ১০০০ + ৲১ × ১০০ + ৲২॥ × ১০ + ৲১॥ × ১০ + ৲২॥

= ৲৩৸ × ১০০০ + ৲১০ × ১০০ + ৲৪ × ১০ + ৲২॥ আবার ৲৪ = ৲৩৸ × ৲৷, সুতরাং ৲৪ × ১০ = ৲৩৸ × ১০ + ৲৷ × ১০ = ৲৩৸ × ১০ + ৲২॥।

সুতরাং ১৪৸৶/১২॥ = ৲৩৸ × ১০০০ + ৲১০ × ১০০ + ৲৩৸ × ১০ + ৲২॥ + ৲২॥,

= ৲৩৸ × ১০০০ + ৲১০ × ১০০০ + ৲৩৸ × ১০ + ৲৫ অতএব ১৪৸৶/১২॥ ÷ ৲১৷

$$\frac{= ৲৩৸ × ১০০০ = ৲১০ × ১০০০ + ৲৩৸ × ১০ + ৲৫}{৲১৷}$$

= ৩ × ১০০০ + ৮ × ১০০ + ৩ × ১০ + ৪

= ৩০০০ + ৮০০ = ৩০ + ৪

= ৩৮৩৪

সুতরাং ভাগফল কেন শুভঙ্করের নিয়মে পাওয়া যায়, তাহা বুঝা গেল।

এখন 'বামে-ভাঙ্গা'র বিষয়ে একটী কথা বলিবার আছে। কথাটা হইতেছে এই যে, আমরা 'বামে ভাঙ্গিয়া' ঠিক ৲৪৸ তেই থামিলাম কেন? ইহার কারণ এই যে ৲৪৸ এর ভিতর ৲১৷ এক কবার (৩ বার) যায়। ৲৪৸ কে ১০ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা হয় তাহার ভিতর ৲১৷ যায় না। আবার ৲৪৸ এর পূর্ব্বে যে ভাগফল পাওয়া গিয়াছিল তাহা ৶৭৸। ইহার ভিতর ৲১৷ একবারের অধিক যায়, কাজেকাজেই আমরা 'বামে ভাঙ্গা' ৶৭৸ তেও শেষ করিতে পারি নাই। মোট কথা হইতেছে যে 'বামেভাঙ্গা'র যে ফলগুলি আমরা পাইব—যেমন আমাদের উদাহরণে সেইগুলি যথাক্রমে ৲৪৸, ৲৷, ৲১॥ এবং ৲২॥—সেইগুলি ভাজকের (৲১৷এর) সহিত একই পর্য্যায়ের হওয়া দরকার, কারণ তাহা হইলে বিভিন্ন ভাগের সময় ভাগফল সমস্তই একক স্থানীয় হয়—যেমন-কথিত উদাহরণে সেইগুলি যথাক্রমে ৩, ৮, ৩ এবং ৪ হইয়াছে।

বামে ভাঙ্গিবার পর আমরা ভাগফলে কতগুলি অঙ্ক হইবে তাহা দেখিয়াই বলিতে পারি। যেমন—

১৪৸৶/১২॥ কে 'বামে ভাঙ্গিয়া' যথাক্রমে

৲৪৸,   ৲৷   ৲১॥   ৲২॥

পাইয়াছি, সুতরাং ভাগফলে ৪টী অঙ্ক হইবে, অর্থাৎ ভাগফল হাজার পর্য্যন্ত হইবে।

নির্ব্বন্ধ

[শ্রীসৌদামিনী দেবী]

(১)

একাদশবর্ষীয়া কন্যা রচনাকে ষোড়শবর্ষীয় কিশোরীলালের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার পিতা কন্যাদানের ফল লাভ করিয়াছিলেন কি না, ভগবান জানেন; কিন্তু সামান্য দেনা-পাওনার মীমাংসা করিতে গিয়া, উভয় পক্ষে এমন বচসা হইয়া গেল যে, কিশোরীর পিতা বাসি-বিবাহের দিবস শুভ-কার্য্যের অঙ্গহানি করিয়া বালিকা বধূমাতাকে পিত্রালয়ে ফেলিয়া রাখিয়া পুত্রকে লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। যে বিজাতীয় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এমন নিষ্ঠুর সমাজ-গর্হিত আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিফলও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। অর্থের বিনিময়ে সমাজ অবিচার করে, আবার সময়ে-সময়ে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অপরাধীকে শাস্তিও দেয়। কিশোরীর পিতা গ্রামে 'একঘরে' হইলেন। পল্লীগ্রামে 'একঘরে' জীবন যাপনের ক্লেশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য পুত্র পরিবার সঙ্গে লইয়া কিশোরীর পিতা সুদূর এলাহাবাদে চলিয়া গেলেন। তার পর দীর্ঘ ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সে দিনের সেই যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস,—শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মাঝে যে বিচ্ছুরিত শ্রীমুখচ্ছবির প্রথম আভাস,—অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত নয়নের লজ্জাভারাবনত চাহনির কোমল পরশ যে শুভদৃষ্টির শুভ অন্তরালে রহিয়া মিলন-দেবতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া দিয়াছিল, কৈশোরের প্রারম্ভ হইতে যৌবনের পূর্ণ-উত্তেজনার মধ্যেও সেই অনুভূতিটুকু সমানইভাবে কিশোরীর কম্পিত বক্ষে জাগিয়াছিল। প্রতীকারের উপায় নাই; অথচ স্মৃতির স্পন্দন চিরদিনই তীব্র। পিতা তাঁহার ভ্রমের নিমিত্ত অনুতপ্ত, ভ্রম-সংশোধনেও উৎসুক ছিলেন; কিন্তু উপযাচক হইয়া বৈবাহিকের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতে তিনি কুণ্ঠিত। তাই তাঁহাদের যে ব্যবধান কাটে নাই, তাহারই অভিসম্পাতের নিবিড় আঁধারে নিষ্পেষিত হইতে-ছিল দুইটী নির্দ্দোষ জীবন। তাহারা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও, সংসারের পঙ্কিল স্পর্শে মধ্যস্থলে দুরন্তের প্রাচীর তুলিয়া পরস্পরের নিকট অপরিচিত রহিয়া গেল। বি-এ পাশ করিয়া কিশোরী পিতৃ-আদেশে কলিকাতায় বি-এল পড়িবার জন্য আসিল। পিতার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে; কিশোরী একটা ছেলে পড়াইয়া নিজের পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াই কলিকাতায় আসিয়াছিল।

(২)

কলিকাতায় আসিয়া অনেক চেষ্টার পর মাসিক ত্রিশটী রজতমুদ্রা দক্ষিণায় গৃহ-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া কিশোরী শ্যামবাজারে তাহার নূতন আশ্রয়ে উপস্থিত হইল। সামান্য দ্রব্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সে ম্যানেজার বাবুর সহিত পরিচিত হইতে গেল। সাদর-সম্ভাষণ শেষ হইলে তিনি কহিলেন, "কর্ত্তা-মহাশয় ও গিন্নী-মা এখন মধুপুরে আছেন। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা ও আমরা ক'জন এখানে আছি।" হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন, 'রাম, ছোট-বাবুকে এখানে ডেকে নিয়ে আয় ত।' 'তার পর, মাষ্টারবাবু, আপনাকে এই ছেলেটাকে পড়াতে হবে। ও' এবার হেয়ার স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়্ছে।' গৃহকর্ত্তার পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে ও শঙ্কায় কিশোরীর বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। মরুভূমির উষ্ণ বক্ষে ভ্রমণশীল, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক অকস্মাৎ সুশীতল পানীয়ের সন্ধান পাইয়া যেমন উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া যায়, অথচ তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়াও বিপদসঙ্কুল, দুর্গম বালুকা-গর্ত্ত হইতে একবিন্দু বারিও বাহির করিতে না পারিয়া বিদ্রোহ-চঞ্চল হয়, কিশোরীর চিত্তও তেমনই যুগপৎ আশা ও নিরাশার সংঘর্ষণে আলোড়িত হইয়া উঠিল। বিষয়-কর্ম্মে ব্যস্ত ম্যানেজার-বাবু তাহার কোন ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "এই যে নলিন। নলি, এই তোমার মাষ্টার মশাই; যাও, এঁকে সঙ্গে করে তোমার পড়ার ঘরে নিয়ে যাও।" কম্পিত আগ্রহে বালকের পানে চাহিয়া কিশোরী শিহরিয়া উঠিল। সেই একদিনের দেখা মুখ,—একই ছাঁচে ঢালা। অদৃষ্টের তীব্র পরিহাসে এই গৃহে

তাহাকে শিক্ষকের অভিনয় করিতে হইবে! আপনার পরিচয় সত্য-মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া সে নলিনের সহিত উঠিয়া আসিল।

(৩)

"নলিন, তোমার দিদি কেমন আছেন?"—জিজ্ঞাসা করিয়াই ঔৎসুক্য সহকারে কিশোরী উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। "ভালই আছেন। আমায় এখন তিনি পড়তে আসতে বল্লেন।" "ডাক্তারবাবু কি বলে গ্যাছেন, জান?" "না, তবে বড়দা বল্লে, আর জ্বর না হলে শীগ্‌গির ভাত দেওয়া হবে।"

বাহিরে নলিনের দাদা পুলিন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল; কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বরাবর নলিনের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কথা হচ্চে রে নলে?"

ভ্রাতার কণ্ঠস্বরে ঈষৎ ভীত হইয়া সে কহিল—"মাষ্টার মশাই দিদির অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন, তাই বলছিলুম।" "কেন তোর পড়ার ব'য়ে তাই লেখা আছে না কি? হ্যাঁ রে, এমনি করে রোজ-রোজ বাড়ীর মেয়েদের খবর-নিয়ে, মাষ্টার বুঝি তোকে পড়ায়?" কিশোরী কি বলিতে যাইতেছিল; বাধা দিয়া পুলিন তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "হরিশবাবু, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, আপনার যা কাজ তাই করে যাবেন। বাড়ীর কে কেমন আছে, সে খবরে আপনার দরকার? আর কখনও এ সব শুনতে পেলে, আপনার এখানে থাকা হবে না, বলে দিয়ে যাচ্ছি।" পুলিন চলিয়া গেলে কিশোরীর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার ক্ষুন্নভাব লক্ষ্য করিয়া অপরাধীর ন্যায় নলিন কহিল—"না, মাষ্টার মশাই, আপনি বড়-দার কথায় কিছু মনে কর্বেন না; ওর অমনি মেজাজ। অকারণ লোককে যা-তা বলে। দিন-রাত শুধু-শুধু দিদির হিংসা করে ব'লে, মা বাবা কেউ ওঁকে দেখতে পারেন না। আপনি রাগ করবেন না মাষ্টার মশাই, আমি এক্ষুনি দিদিকে সব বলে দিচ্ছি।" কিশোরীর অভিমান গলিয়া জল হইয়া গেল। কোথা হইতে অশ্রু আসিয়া তাহার নয়ন-কোণ ভরিয়া দিল।

(৪)

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর নলিনের সন্ধান করিতে-করিতে রচনা একেবারে তাহার পড়িবার ঘরে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া নলিন কহিল, "বসো দিদি—মাষ্টার মশাই কলেজে গ্যাছেন—তিনটের আগে আর আসবেন না।" আসন গ্রহণ করিয়া রচনা কহিল—"আচ্ছা নলি, তুই না সে-দিন আমায় বল্‌ছিলি, পুলনেটা মাষ্টার মশাইকে অপমান করেছে? তা' তিনি অপমান সয়ে এখানে আছেন কেন, চলে গেলেই পারেন?" কাঁদ-কাঁদ স্বরে নলিন বলিল—"দিদি, এই বুঝি তুমি আমার নালিশের বিচার কর্‌লে? তিনি ত যাচ্ছিলেনই,—আমি কত করে বল্লুম বলে' এখনও আছেন। বড়-দা কি তাকে এমনি যা' মুখে আসে তাই বল্‌বে? মাষ্টার মশাই যদি চলে"—কথা কাড়িয়া লইয়া রচনা জিজ্ঞাসা করিল—"মাষ্টার মশাইর পুরো নামটা কি রে?" "হরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।" "ওঁর বাড়ী কোথায় জানিস?" "না; কেন দিদি?" "অমনি," বলিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উপর পানে চাহিতেই, একখানি ফটোতে তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। "ওখানা কার ছবি রে?" বলিয়া উঠিয়া আসিয়া বারম্বার সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া কহিল, "মাষ্টার মশাইর ছেলেবেলার ছবি, নয় রে?" "হ্যাঁ, দিদি। তুমি এমন কচ্ছ কেন দিদি?" "কৈ, না। বল্‌তে পারিস্, ওঁর চিঠি-পত্তর কোথায় থাকে?" "আচ্ছা দাঁড়াও, দেখ্‌ছি।" নলিন বহু অনুসন্ধানের পর একখানি এনভেলাপ বাহির করিতেই, কিশোরীর আগমনের আভাষ পাইয়া আত্ম-প্রকাশের ভয়ে রচনা দ্রুত অন্তর্হিত হইল। নলিনও পত্রখানি বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিল। সদ্য-ক্রীত কাব্যখানির উপহারের পৃষ্ঠায় সযত্নে 'শ্রীমতী রচনা দেবী' লিখিয়া দেরাজ খুলিতেই কিশোরী অবাক্ হইয়া গেল। নলিন নিবিষ্টচিত্তে অঙ্ক কষিতেছিল,—অন্ততঃ কিশোরীর সেইরূপ ধারণা হইল। সরিয়া আসিয়া সে নলিনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"নলি, তুমি দুপুর হতেই এখানে আছ?" "আজ্ঞে, হ্যাঁ।" "তবে আমার দেরাজ এমনি করে ওল্টালে কে? আমি একখানা চিঠি রেখে গিয়েছিলুম, বড্ড দরকারি—পাচ্চি না ত।" "কি হবে তা হ'লে! দিদি ছাড়া ত' এখানে আর কেউ আসেন নি?" মিথ্যা কথা বলিয়া নলিন ঘন-ঘন বাহিরের দিকে তাকাইতেছিল। "তোমার দিদি এসেছিলেন? পুলিন বাবু আসেন নি ত?" "না। আমি যাই মাষ্টার মশাই, দিদি আমায় ডাকছিল, শুনে এক্ষুনি আসব।" "আচ্ছা, যাও।"

(৫)

"বসুন, মাষ্টার মশাই।" ম্যানেজার-বাবুর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া কিশোরী তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। "একটা কথার দরকার আছে। আপনার জন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা কচ্ছিলুম।" ঈষৎ উৎকণ্ঠাভরে কিশোরী ম্যানেজারবাবুর মুখের পানে চাহিল। "তবে কি না একটা অপ্রিয়-প্রসঙ্গ। এ রকম ত ভাব্‌তে পারি নাই। যাক্, যা' হবার, তা' হয়ে গেছে। আপনাকে কিন্তু মাষ্টার মশাই, অন্যত্র চেষ্টা দেখ্‌তে হচ্চে। এখানে আপনার থাকা হতেই পারে না।" অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া কিশোরী কহিল—"কেন মশাই; কি অন্যায়টা হয়েছে শুনতে পারি কি?" "যথেষ্ট। দেখুন ত এই বইখানি কার?" আশঙ্কার একটা গুরুভার দূর হইয়া গেলে সে সহজ কণ্ঠে উত্তর দিল—"এ ত আমি আজকেই কিনে এনেছি। তা' আপনার কাছে কেন?" "আসবার কারণ আছে। কর্ত্তার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর সব দিকেই আমায় নজর রাখতে হয় কি না। আচ্ছা, এই নামটাও কি আপনার লেখা?" "আজ্ঞে হাঁ।" "কি রকম ছোক্‌রা হে তুমি? বাঘের মুখে হাত দিতে এস্, বড্ড আস্পর্দ্ধা দেখছি তোমার?" "ও কি মশাই। অনর্থক কটু কথা বলছেন কেন? কোন অপরাধ করে থাকি, না হয় নাই রাখবেন। আমায় অপমান কর্ব্বার আপনাদের কোন অধিকার নাই!" "অধিকার খুব আছে। কিন্তু অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা করে নিজেদের সম্মান নষ্ট করতে চাই নে। দেখ, আর দেরী না করে তুমি অমনি এ স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও। তোমার মাইনে সব চুকিয়ে দিচ্ছি। কেউ যদি কারণ জিজ্ঞাসা করে, বলো, সুবিধা—হল না, তাই ছেড়ে চলে এসেছি। বুঝ্‌লে?" "বেশ মশাই, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। চিরদিন এখানে থাক্‌তে আসি নি। দু'দিন পরে আপনিই যেতাম। কিন্তু যাবার সময় একটা কলঙ্কের ছাপ নিয়ে যেতে হচ্ছে, এই যা ক্ষোভ। কিন্তু আপনি ত প্রাচীন,—সংসারের এত দেখে আস্‌ছেন; অথচ এই সামান্য ব্যাপারটা বুঝ্‌তে মস্ত ভুল করে বসলেন! বাইরের কথা শুনে আপনার তীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি লুপ্ত হয়ে গেছে। একটা নাম লিখেছি বটে, কিন্তু আমারও একটা বাড়ী আছে; আর সেখানে আমারও আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। তাঁদের কারো জন্য কি বইখানা কেনা হতে পারে না? আর বিশ্বজগতে একটা নাম আপনাদের এত একচেটিয়া নয় যে, অপর কাহারও কল্পনায় অবিকল সেই নামটিই না জাগতে পারে! আর বা বল্‌বার আছে, তা' না হয় নাই বল্লুম্। যাক্, আমি আর এক মুহূর্ত্তও আপনাদের এই বাড়ীতে অপেক্ষা কর্ব্ব না। তবে শেষ কথা বলে যাচ্ছি, অন্য কোন ব্যক্তি আজ যদি আমার শিরে এমন কলঙ্কের পসরা চাপিয়ে দিত, তা'কে সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে এ স্থান আমি কথনো ত্যাগ করতুম না।" ম্যানেজার-বাবুর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই কিশোরী সে স্থান ত্যাগ করিল।

(৬)

বহুবার পাঠ করিয়াও রচনার তৃপ্তিবোধ হইতেছিল না। পত্রখানি নলিনের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিভৃতে তিন-চারিবার পাঠ করিয়াছে। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আপনার নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া, প্রদীপালোকে সংগোপনে রক্ষিত পত্রখানির অক্ষরগুলি পুনরায় তন্ন-তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া রচনা কি যেন কাম্য-বস্তুর সন্ধান করিতেছিল। তাহাতে লেখা ছিল, "বাবা, এতদূর গড়াবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নাই। বিবাহের সময় গোল হয়, কিন্তু সবই আবার মিটে যায়। শুধু আমার বরাত-দোষে এতটা কাণ্ড হয়ে গেছে। বৌমার বাপও আর কিছু লেখেন নাই, কর্ত্তাও চুপ করে আছেন। তোমার শ্বশুর মশাই দেশ ছেড়ে যে কলকাতায় বাড়ী করেছেন, তা আমরা জানতুম না। যাক্, ভগবান যা' করেন, তা' মঙ্গলের নিমিত্তই করেন। তাঁর শুভ ইচ্ছায়ই আজ তুমি এখানে রয়েছ। ওঁরা মধুপুর হতে ফিরে এলে, তোমার শ্বশ্রূমাতাকে তোমার পরিচয় দিয়ে, যাতে আমার লক্ষ্মী মাকে ছুটির সময়ে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরতে পার, তার চেষ্টা করবে। কর্ত্তা মহাশয়েরও এতে সম্পূর্ণ মত আছে। তিনি শুনেই চিঠি লিখতে চেয়েছিলেন; আমি মানা করে দিয়েছি। তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার উপরই আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করছি। প্রয়োজন হয় এই চিঠিখানি দেখাইও। তোমরা আমাদের আশীর্ব্বাদ—ইত্যাদি।"

আশীর্ব্বাদিকা তোমার মাতা।

রচনা আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল, এমন সময়ে তাড়াতাড়ি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া নলিন কহিল—"দিদি, ও দিদি, মাষ্টার মশাই চলে যাচ্ছেন যে! আমি সব জিনিস-

পত্তর গোছাতে দেখে এলুম।" হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া রচনা তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কি বল্লি, তিনি চলে যাচ্ছেন! না তাঁর ককৃখনো যাওয়া হবে না—যা'ত রে নলে, এই চিঠিখানি কাকাবাবুকে দিয়ে এলে আয়, এখানা মাষ্টার মশাইর চিঠি, তাঁর মা লিখেছেন—আপনাকে দিদি পড়তে বলেছেন।" "তোমার চিঠি এখন রেখে দাও দিদি। তিনি বুঝি চলে গেলেন; না, আমি আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। আমার আর এমন মাষ্টার হবে না।"—এই বলিয়া নলিন প্রস্থানের উদ্যোগ করিল। তাহাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রচনা কঠোর স্বরে কহিল— "না, তা যাবেন না; সে ভার আমি নিচ্ছি—যা, তুই চিঠিখানি শীগ্গীর কাকাবাবুকে দিয়ে আয়।"

প্রস্তুত হইয়া, নলিনকে আহ্বান করিয়া বাহিরে আসিতেই, সম্মুখে রচনাকে দেখিয়া কিশোরী থমকিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার প্রতি চাহিয়াই সঙ্কোচে তাহার দৃষ্টিশক্তি জড়িত হইয়া আসিল। অসীম উন্মাদনা দমন করিবার পূর্ব্বেই রচনা তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, "ওগো' এসেছ যদি, আর, কেন যাবে? আর যদি যেতেই হয়, আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও। কি দোষে আমায় বিসর্জ্জন দিয়ে যাচ্ছ?" কিশোরী তাহাকে সস্নেহে তুলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে কাকাবাবুর হস্ত ধারণ করিয়া 'চাটুয্যে মশাই' 'চাটুয্যে মশাই' আহ্বান করিতে-করিতে নলিন সোল্লাসে ছুটিয়া আসিল।

মধু-স্মৃতি

[শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম]

(২১)

দেখিতে-দেখিতে প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। মধুসূদন আর ইহজগতে নাই—কিন্তু তাঁহার মধুময়ী স্মৃতি মধুর সৌরভে ভুবন ভরিয়া রাখিয়াছে। মধুর সমাধি প্রকৃতি-দেবী শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বদেশবাসী একজনও তদুপরি একখণ্ড ইষ্টকও রাখিয়া দেন নাই; তাহা স্মরণীয় করিতে তখন পর্য্যন্ত কাহারও অনুরাগ লক্ষিত হয় নাই। সেই পূত-পবিত্র ভূমিখণ্ড তেমনই অনাবৃত রহিয়াছে—নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্র সেই ভূমি তৃণহীন করিতেছে; তাহাকে ছায়াদান করিতে কোন পত্রপল্লব-প্রসারিত তরু রোপিত হয় নাই; ঘনঘোর প্রাবৃটের অবিশ্রান্ত ধারায় সেই তীর্থসদৃশ পুণ্যভূমি সলিলসিক্ত হইতেছে—তদুপরি কোন ছত্রবৎ চন্দ্রাতপ রচিত হয় নাই। শরতের পূর্ণচন্দ্র শারদ-কৌমুদিপ্রপাতে সেই ভূমি প্লাবিত করিতেছে—হেমন্তের নৈশ শিশির-আসারে—শীতের প্রখর হিমবর্ষণে, সেই ভূমি স্নিগ্ধ হইতেছে—উজ্জ্বল বসন্তের রক্তিম উষায় সেই ভূমি সুরঞ্জিত হইতেছে—কিন্তু কোন মানবহস্ত তখন পর্য্যন্ত সেই ভূমির উপর কোন স্মৃতিমঠ নির্ম্মাণ করিয়া কবি-প্রতিভার উপযুক্ত পূজার ব্যবস্থা করে নাই। কবির মহানিদ্রার সঙ্গে-সঙ্গে যেন তাঁহার দেশবাসীরাও মহানিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন! মধুসূদন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া যে কথা বলিয়াছিলেন,—হায়, তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ সম্বন্ধে সে কথা যে তাঁহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে!—

> "নাহি কি হে কেহ তব বান্ধবের দলে,
> তব চিতা-ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
> স্নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?"

যিনি কীর্ত্তিমঠে চির অমর হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার ক্ষণভঙ্গুর পার্থিব সমাধি-স্তম্ভের প্রয়োজন কি? মধুসূদন ভিক্টর হুগোকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাঁহাকেও এ ক্ষেত্রে সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি;—

> "হে কবীন্দ্র, জয়ী তুমি এই মর-কুলে!
> আসে যবে যম, তুমি হাসো হে সাহসে।
> অক্ষয় বৃক্ষের রূপে তব নাম রবে
> তব জন্ম-দেশ-বনে, কহিনু তোমারে;

প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে !"

সে যাহাই হউক, তাঁহার দেশবাসীরও ত তাঁহার প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে! তিনি কীর্ত্তিবলে অমর হইলেও, তাঁহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ত তাঁহার অবশ্য-প্রাপ্য! বিধাতার বিধানে তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, তাঁহারা জাগ্রত হইয়া শুভ্র-মর্ম্মরে মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, মহাকবির সম্মান রক্ষা করিয়া, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির স্রক্‌চন্দনে তাঁহার চরণতলে প্রতিবৎসর পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে কৃতার্থ হইতেছেন। মধুসূদনের সমাধি-স্তম্ভের ইতিহাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইংরেজী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এক বৈশাখী অপরাহ্নে একটি সপ্তদশ বর্ষীয় বঙ্গীয় যুবক, লোয়ার সার্কুলার রোড সমাধি-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া, মাইকেলের সমাধিস্তম্ভ (Tomb) অন্বেষণ করিতে লাগিল। যুবক কিছুদিন পূর্ব্বে 'কাব্য-সিন্ধু' নামক একখানি ক্ষুদ্র-কলেবর কবিতা-গ্রন্থে "৺কবিবর মাইকেলের কবর দর্শনে" শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিল; কবিতাটির প্রথমাংশ এইরূপ ছিল; –

৺কবিবর মাইকেলের কবর দর্শনে

"দাঁড়াও ক্ষণেক তরে, হেরি একবার,
মিলি আঁখি দুটি ওই কবরের পানে!
কোন্ মহাজন হেথা বিরামের তরে
লভিছেন চিরনিদ্রা অনন্ত শয়নে
এই নিরজনে। দেখি, কি কথা বলিছে
খোদিত প্রস্তর ওই? ডাকি পান্থগণে
'দাঁড়াও'—সকলে বলি;—ইত্যাদি

উপরিউক্ত কবিতাটি পাঠ করিয়াই তাহার হৃদয়ে কবির সমাধি-দর্শনের স্পৃহা বলবতী হয়। কিন্তু কোন্ সমাধিক্ষেত্রে মাইকেলের অস্থি-কঙ্কাল নিহিত আছে, কবিতায় তাহার কোন উল্লেখ ছিল না। কবিতাটি যে লেখকের কল্পনামাত্র, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। কলিকাতার কয়েকটি সমাধিক্ষেত্রে অনুসন্ধানের পর, সেই যুবক লোয়ার সার্কুলার রোডের বিশাল-বিস্তৃত সমাধি-ভূমিতে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে মাইকেলের সমাধি খুঁজিতে লাগিল! কত শত সুন্দর-সুন্দর সমাধি-স্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রস্তরফলক চিরবিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকার হইতে কতশত অজ্ঞাতনামা চিরবিস্মৃত নরনারীর মুহূর্ত্তস্থায়ী ক্ষীণ পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল; কিন্তু, হায়! মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় স্মৃতি-রশ্মি-সমুজ্জ্বল কবি মধুসূদনের পরিচয় কোন জীর্ণ ভগ্ন, বার্দ্ধক্য-কম্পিত, পতনোন্মুখ সমাধিও প্রদান করিল না। যুবক নিরাশ হৃদয়ে সমাধিক্ষেত্রের দ্বারে ফিরিয়া আসিয়া একটি পার্সী কোট ও পেণ্টালুন পরিহিত খর্ব্বাকৃতি ভদ্রলোককে* দেখিয়া সংশয়াকুল-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়! মাইকেলের সমাধি কোথায়? আপনি জানেন কি?' যুবকের এই কথায় ভদ্রলোকটি ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে বিস্মিতনেত্রে তাকাইয়া বলিলেন, 'মাইকেল এই সমাধিক্ষেত্রেই সমাধিস্থ আছেন'—তাঁহার কথা শেষ না হইতেই চঞ্চল যুবক বাধা দিয়া বলিল, 'কোন্‌খানে মহাশয়? আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিন।' ভদ্রলোকটি ঈষৎ হাস্য করিয়া একটু ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেন, 'কি দেখিবে? তাঁহার সমাধির উপর ত কোন চিহ্নই নাই? বহুদিন পূর্ব্বে তথায় একটি মৃত্তিকা-স্তূপের উপর একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রুশ ছিল—এক্ষণে তাহাও নাই; কালের গতিতে স্তূপ ও ক্রুশ অন্তর্হিত হইয়া সেইস্থান সমভূমি হইয়া রহিয়াছে! তুমি দেখিবে কি?' তাঁহার উত্তরে যুবকটি ক্ষুণ্ণমনে বলিল, 'মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই স্থানটিই আমাকে দেখাইয়া দিন, তাহা হইলেই আমার এ স্থানে আগমন সার্থক হইবে।' যুবকের নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া ভদ্রলোকটি তখন একজন কর্ম্মচারীকে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের Burial Register নামাইতে বলিলেন। পুরাতন র‍্যাকের উচ্চ স্তর হইতে ধূলিমাখা প্রকাণ্ড Register বহি নামান হইলে, তিনি গোরস্থানের চাপরাশীকে ধূলা ঝাড়িতে বলিলেন। ধূলা ঝাড়া হইলে, তিনি পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে মাইকেল সমাধিক্ষেত্রের কোন্ স্থানে সমাহিত আছেন, তাহা বাহির করিলেন। রেজিষ্টারী বহিতে সমাধির স্থান-নির্দ্দেশ এইরূপে লিখিত আছে,—

"*30th June, 1873* Michael Madhoosoodun Datta, aged 40 years, Barrister-at-Law,

---

* ইহার নাম শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী সাহা। ইনি সমাধিক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া বিশ্রাম ভোগ করিতেছেন।

buried by Thomas & Co. in a cutcha grave 39 feet south of Mrs. L. J. McCarthy's Headstone, 5th range of graves, 6th walk, south from the 1st Gate, South East Quarters C. R. B. G."

মাইকেলের পত্নীর সমাধির স্থান-নির্দ্দেশ উক্ত রেজিষ্টারী বহিতে এইরূপ আছে ;—

"*26th June* 1873—Emelia Henrietta Sophia Datta, aged 27 years. Wife of Michael, buried by J. Lewis & Co. in a cutcha grave 23 feet south of Mrs. L. J. McCarthy's Headstone, 5th range of graves, 6th walk, south from the 1st Gate, South East Quarters. C. R. B. G."

যুবকটি উহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, কবি ও তাঁহার পত্নীর বয়ঃক্রম লিখিতে অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। আরও বুঝিলেন যে, তাঁহারা উভয়ে পাশাপাশি সমাহিত আছেন।

তত্ত্বাবধারক মহাশয়, রেজিষ্টার হইতে উক্ত লেখা একটু-কাগজে লিখিয়া লইয়া, মাপের ফিতা লইয়া, উক্ত যুবক এবং চাপরাসীর সঙ্গে মাইকেলের সমাধিভূমির নিকট গমন করিয়া, রীতিমত মাপ-জোপ করিয়া একটি অনাবৃত ভূমিখণ্ড দেখাইয়া বলিলেন, 'দেখ, এইস্থানেই মাইকেল মধুসূদন ও তৎপার্শ্বে তাঁহার পত্নী সমাহিত রহিয়াছেন। যিনি তাঁহার স্বদেশকে, তাঁহার জাতিকে সমগ্র জগতের সম্মুখে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সমাধির এই দশা!' তত্ত্বাবধারক মহাশয় একজন বিশিষ্ট কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডিরোজিও সাহেবের কবিতাবলী সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বঙ্গদেশবাসীর কৃতঘ্নতা ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'ইংলণ্ড হইলে যাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ গগন স্পর্শ করিত, তাঁহার সমাধির উপর একখণ্ড ইষ্টকও নাই,' এ পরিচয় কি কোন শিক্ষিত জাতি অপর কোন সুসভ্য জাতির সম্মুখে প্রদান করিতে পারে?' তাঁহার কথায় যুবকটি মরমে মরিয়া গেল, লজ্জায় কোন উত্তর করিতে পারিল না। তত্ত্বাবধারক মহাশয় আবার বলিতে লাগিলেন, 'গত চতুর্দ্দশ বৎসর ধরিয়া মাইকেলের সমাধি অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাঁহার স্বদেশবাসীরা নির্ব্বিকার মনে বসিয়া আছেন, ইহা যে কতদূর দুঃখের বিষয় বলিতে পারি না।' যুবকটি তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বিধাতার বিধানে সেই বৎসরেই এক অভাবনীয় ব্যাপার সংঘটিত হইল।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার একেশ্বরবাদী পাদ্রী ডল সাহেবের (Rev. C. H. A. Dall) মৃত্যু হইলে তাঁহার সমাধি উপলক্ষে উমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভদ্র ব্যক্তিগণ সমাধি-ক্ষেত্রে সমবেত হন। সেই সময়ে তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, মাইকেলের সমাধি স্থানের উপর কোন স্মৃতি-চিহ্ন নাই; তদুপরি কোন স্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তদনুসারে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দেই স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ কয়েকটি সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমাধি-নির্ম্মাণ ফণ্ড' নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী, ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সেরপুরের হরচন্দ্র চৌধুরী, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ধনকুবের রাজা-মহারাজা এবং পল্লীনিবাসী সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত মধুসূদনের সমাধি নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়া কবির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সময়ে মনস্বী রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, নরেন্দ্র বাবুকে যে পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

"Camp Jamalpore,
Mymensingh, 15th December, 1887.

My dear Narendra Babu,

I hasten to send my humble contribution towards the erection of a tombstone or monument over the grave of the greatest man that Bengal has produced within this century. I am sure all Bengali gentlemen, who appreciate our national literature, still young, will respond to your call and that you will quickly realize a much larger amount than what you have asked for. A suitable

ıonument can thus be raised to the memory f Madhu Sudan Datta, and future generaons of our countrymen will visit the tomb s European tourists visit Stratford on Avon r Dryburgh Abbey.

Yours Sincerely

(sd.) R. C. Dutta

To Babu Narendra Nath Sen."

এইস্থানে সমাধিস্তম্ভ-নির্ম্মাণ-কমিটি সম্বন্ধে দুই চারিটি থা বলা আবশ্যক। মধ্যবঙ্গ সম্মিলনীর (Central Bengal Union) সভ্যগণ প্রথমে কমিটি গঠন করিয়া র্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে তাঁহাদের অবৈতনিক ম্পাদক এবং ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কন্তু মধুসূদন যশোহরের অধিবাসী বলিয়া যশোহর-খুলনা-ম্মিলনী তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার জন্য াকৃত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সম্মিলনী পরমাহ্লাদে তাঁহাদের সহিত কত্রীভূত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেশের পামর-সাধারণ এ কার্য্যে সোৎসাহে অর্থ প্রদান করিয়া াহাদের সঙ্কল্প-সিদ্ধির উপায় করিয়া দিলেন। তাঁহাদের ষ্টায় অল্পকাল মধ্যেই আশাতিরিক্ত অর্থ সংগৃহীত হইল। তিমধ্যে তাঁহারা পরামর্শ করিয়া মধুসূদনের দেহাবশেষ বর্ণমেণ্ট সমাধিক্ষেত্র হইতে উত্তোলিত করিয়া নগরীর ধ্যভাগে হেদুয়া কিম্বা গোলদীঘির সরোবর-কূলে প্রোথিত রিয়া তদুপরি সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করেন। সে ন্য তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের নিকট াবেদনও করিয়াছিলেন। কিন্তু কি জন্য তাঁহারা সে ঙ্কল্প ত্যাগ করেন, তাহা বলিতে পারি না। টাউনসভার ার্য্যবিবরণী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"*Proceedings of the 38th Meeting of the Town Council held at the Municipal Office, on Saturday, the 24th March, 1888, at 3 p. m.*

PROPOSED REMOVAL OF HUMAN REMAINS. The application from e Secretary, 'Central Bengal Union," for ermission to remove the remains of the te Michael Madhu Sudan Datta from the Government Cemetery in Lower Circular Road and to inter them in either of the two Squares—"College" or "Cornwallis," was not further considered as no further proposal had been received from the applicants."

অচিরেই উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হইলে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভাস্কর ও স্তম্ভনির্ম্মাণকারী **Messrs. LLEWELYN and Co.** কবির সমাধিস্থলে সুন্দর মর্ম্মর নির্ম্মিত সমাধিস্তম্ভ সংস্থাপিত করিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাসমারোহে সাধারণের সম্মুখে স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেন। বঙ্গদেশের সেই একটি স্মরণীয় দিন। সেই দিনের উৎসব-বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমরা মধুময় মধু-স্মৃতি সমাপ্ত করিলাম।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ন বেলা সাড়ে তিনটার সময় বঙ্গের বহু শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সাধারণ জনমণ্ডলী, বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রের দ্বারদেশে মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা-দর্শনের নিমিত্ত সমবেত হন।

সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশদ্বার হইতে ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সেই বিপুল জনসঙ্ঘ ধীরে-ধীরে সমাধি-অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ক্রমে সমাধির নিকট উপস্থিত হইলে জনমণ্ডলী সমাধিস্তম্ভের চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সমাধির সম্মুখে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত মহিলা, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, চন্দ্রনাথ বসু, প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সমাধির নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন। মধুসূদনের গৃহে-শ্মশানে চিরবন্ধু বৃদ্ধ গৌরদাস বসাক মহাশয় সমাধির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নতশিরে নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। মধুসূদনের পুত্র আলবার্ট দত্ত নতমস্তকে অধোবদনে লোকান্তরিত পিতৃদেবের সমাধিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

প্রথমে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হইলে, নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কমিটির কার্য্য-বিবরণী পাঠ করিলেন।

তৎপরে তিনি ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে কবির স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা ও সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন; আমরা আমাদের পাঠক-পাঠিকার অবগতির নিমিত্ত তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।

মনোমোহন ঘোষ বলিলেন—"বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এবং মধুসূদন দত্ত স্মৃতিসভার সভ্য মহোদয়গণ! আমি আপনাদের নিমন্ত্রণে অদ্যকার সভার কার্য্যের গুরুভার অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছি। সেই সঙ্গে ইহাও বলিতে চাহি যে, যে বিশ্ববিখ্যাত কবি ও পণ্ডিতবরের স্মৃতিপূজার জন্য আমরা অদ্য সমবেত হইয়াছি, সে কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত না হইয়া কোন যোগ্যতর সাহিত্যিকের হস্তে ন্যস্ত হইলে আমার অপেক্ষা এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। যে কারণে এই উৎসব আমার দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে আপনারা প্রণোদিত হইয়াছেন—তাহা এই যে, স্বর্গীয় দত্ত মহোদয়ের শেষজীবনে আমি তাঁহার একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম। আমি স্বীকার করিতেছি যে, যদি এই কারণেই আপনারা আমার উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের মনোনয়ন উপযুক্তই হইয়াছে; কারণ ইহা আমার পক্ষে অতি সৌভাগ্য ও সুযোগের কথা বলিতে হইবে যে, আমি দত্তজ মহোদয়ের সহিত তাঁহার জীবনের শেষ এগার বৎসর য়ুরোপে এবং ভারতবর্ষে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলাম। যখন আমার পরলোকগত বন্ধুর পার্থিব-অবশেষ এই স্থানে নিহিত হয়, তখন কোন অনিবার্য্য ও অপ্রত্যাশিত বিঘ্নে এখানে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহাকে যে অর্ঘ্য, যে সম্মান, যে বন্ধুত্বের প্রীতি-নিদর্শন প্রদানে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, অদ্য সেই সুযোগ পুনরাগত হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তাঁহার মৃত্যুর চারিদিন পূর্ব্বে যখন আমি ঠিক এইস্থানে দাঁড়াইয়া, তাঁহার জীবনের বহুবৎসরের সঙ্গিনী, সুখ-দুঃখ-ভাগিনী মহিয়সী রমণীর মৃত্যুর জন্য শোকাশ্রুবর্ষণ করিতেছিলাম, তখন আমি কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই যে, সেই সমাধি-বিবর সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কবিবর তাঁহার পত্নীর পার্শ্বশায়ী হইবেন। ভদ্র-মহোদয়গণ, অদ্য আমরা পঞ্চদশ বৎসর পরে, প্রকাশ্য সভায় বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভাকে যে পূজার্ঘ্য প্রদানের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি, তাহা বহুকাল পূর্ব্বেই তাঁহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য ছিল। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশের ইতিহাস-বিশ্রুত ভরসেলস্ নগরীতে দত্তজ মহাশয় যখন কবিগুরু-দান্তের সম্বন্ধে তাঁহার সুপরিচিত চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, (যাহা সম্ভবতঃ আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন) তখন তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হয়, তাহা অদ্যকার এই স্মৃতি-উৎসবে আমার সুস্পষ্টরূপে স্মরণ ও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি জগৎ-প্রসিদ্ধ ইতালীয় কবির (দান্তের) ত্রিশত-বাৎসরিক সম্মান-উৎসব উপলক্ষে রচিত হইতেছিল। সেই সময় দত্তজ মহোদয় আমার নিকট যে দুইটি মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা এই স্থলে পুনরুল্লেখ করিব। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে, সকল দেশেই কবিগণ তাঁহাদের মৃত্যুর পর বহুবৎসর অনাদৃত হইয়া থাকেন; আর দ্বিতীয়তঃ, তিনি যখন উপরিউক্ত কবিতাটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত করিতেছিলেন, তখন বলেন যে, যে কেহ বিদেশীয় ভাষায় যতই উৎকৃষ্ট অধিকার লাভ করুক না কেন, নিজের মাতৃভাষা ভিন্ন অন্যভাষায় যেন কবিতা রচনার চেষ্টা না করে। তাঁহার মন্তব্য স্মরণে আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে যে, যিনি আপনার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধি-শালিনী করিতে এতদূর করিয়া গিয়াছেন, এবং যে ভূমিতে তাঁহার দেহাবশেষ নিহিত রহিয়াছে, সেই চিরপুণ্য ভূমির কোন উদ্দেশ না লইয়া আমরা পঞ্চদশ বৎসর কালস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি। এতদ্ভিন্ন আমি বিবেচনা করি, এ কথা বলিলে অসঙ্গত ও অন্যায় হইবে যে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবি-প্রতিভা তাঁহার সমকালবর্ত্তী সমাজ ও বংশাবলীর দ্বারা সমাদৃত হয় নাই।

তাঁহার দ্বিতীয় মন্তব্যের যাথার্থ্য তাঁহার নিজের সম্বন্ধেই চিত্রবৎ প্রকটিত ও যথাযথ প্রযুজ্য হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত তাঁহার সমকালবর্ত্তী বিদ্বজ্জনের মধ্যে ত কেহ ছিলেনই না; এমন কি বর্ত্তমানকালে তাঁহার স্বদেশীয়গণের মধ্যে এমন ব্যক্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যিনি প্রাচীন ও নব্য য়ুরোপীয় সাহিত্যের সুগভীর জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যদি তিনি তাঁহার মাতৃভাষায় কবিতা-রচনা না করিতেন,

াহা হইলে তিনি কখনই অত বড় কবি হইতে ারিতেন না।

দত্তজ মহোদয় যে সকল কাব্যগ্রন্থের দ্বারা চিরস্মরণীয় ইয়াছেন, তৎসমূহের গুণকীর্ত্তন এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। ামি অতি সংক্ষেপে আমার অন্যান্য মন্তব্য ব্যক্ত করিব। ামরা এই কমিটিকে সমাধি নির্ম্মাণের আয়াসের জন্য ান্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি। তাঁহারা এই আয়াস-স্বীকার া করিলে যে স্থান পরিবেষ্টিত করিয়া অদ্য আমরা একত্র ইয়াছি, অতি অল্পদিনেই তাহার সমস্ত চিহ্ন তিরোহিত ইত। আপনারা সকলেই জানেন, যে সমাধিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা আমি এখনই করিব, তাহা সাধারণের অর্থসাহায্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমাধিস্তম্ভের আড়ম্বরশূন্য সরল ঠন দেখিয়া অনেকে মনে করিবেন যে, বঙ্গদেশবাসী াঙ্গালা-সাহিত্যে মধুসূদনের কার্য্য, যেরূপ উচ্চ প্রশংসার হিত করিয়া থাকেন, সেই উচ্চ-প্রশংসার উপযোগী সমাধি-স্তম্ভ রচিত হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, এই আড়ম্বর-বিরহিত স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে, কত বিয়োগ-বিধুর পতি, কত শোক-কাতর জনক-জননী, তাঁহাদের লোকান্তরিত প্রিয়জনের নিমিত্ত কত দৃষ্টিরম্য সুন্দর সমাধি নির্ম্মাণ করিয়া-ছেন। কিন্তু ইহা অবশ্য মনে রাখিবেন যে, পরলোকগত কবির স্মৃতি চিরস্মরণীয় করা অপেক্ষা, এই স্থানটিকে কোন চিহ্নদ্বারা নির্দ্দেশ করাই কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। মাইকেল মধুসূদন নিজেই যে স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার ভক্ত স্বদেশবাসী তাহাদের ঐশ্বর্য্যরাশি ও শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা আহরণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাঁহার গ্রন্থাবলী ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা বিস্ময়ের সহিত পাঠ করিবে, এবং যত দিন বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্তও "শ্রীমধুসূদন" নাম বিলুপ্ত হইবে না।

আমি যখন এই স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিব, তখন আপনারা দেখিবেন যে, ইহার একপার্শ্বে কবির মৃত্যুর ছবর্ষ পূর্ব্বে, অননুকরণীয় অমিত্রছন্দে তাঁহার স্বরচিত করুণ সমাধি-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। অতুল্য সারল্য-ময় সমাধিলিপি এবং সমাধিস্তম্ভের নিরলঙ্কৃত কমনীয় গঠন সত্ত্বেও, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আপনারা সকলেই মুক্তবাক্যে আমার কথার অনুমোদন করিবেন যে, দত্তজ মহোদয়ের নিজের প্রিয়কবি মিল্টন, অপর এক বিশ্ববিখ্যাত মহাকবির কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার (মাইকেল মধুসূদনের) নিজের প্রতিও অতি বিচিত্র রূপে আরোপিত ও প্রযুজ্য হইয়াছে :—

"And so sepulchured in such pomp dost lie.

That kings for such a tomb would wish to die."

এইবার সমাধি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেই আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়; কিন্তু তৎপূর্ব্বে অদ্যকার কার্য্যা-বলির বিধিবদ্ধ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম করিবার অধিকার গ্রহণ করিয়া আমি এমন একটি প্রস্তাব করিব, যাহা নিশ্চয়ই আপনারা সকলে স্বাভাবিক সহৃদয়তাবশে অকুণ্ঠিত চিত্তে অনুমোদন করিবেন। আমি মনে করি যে, আমাদের জাতীয় ধর্ম্মবুদ্ধি ও প্রচলিত রীত্যনুসারে, এই শুভ্র স্মৃতি-স্তম্ভোপরি আমার মাল্যদাম প্রদানের পূর্ব্বে, যে তরুণ যুবক আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, প্রথম পুষ্পোপহার তাঁহারই প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি অত্যধিক-শৈশবতা-নিবন্ধন পরলোকগত পিতামাতার মৃত্যুকালে তাঁহাদের প্রতি স্নেহ ও সম্মানের অর্ঘ্য প্রদানে বঞ্চিত ছিলেন, এবং, যে স্নেহবান পিতামাতাকে তিনি অতি শৈশবেই হারাইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সমাধির উপর ভক্তি ও স্নেহের অর্ঘ্য প্রদানের জন্য তিনি অধীর হইয়াছেন।"

এই বলিয়া ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়, সমাধি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করিলেন। মধুসূদনের একমাত্র পুত্র আলবার্ট দত্ত অগ্রসর হইয়া স্বর্গীয় পিতার সমাধির উপরে পুষ্পস্তবক প্রদান করিলেন।

তৎপরে মনোমোহন ঘোষ মহাশয়, সমাধিস্তম্ভ পুষ্পদামে বিমণ্ডিত ও সুশোভিত করিয়া বলিলেন, "In the name and on behalf of the people of Bengal I place this wreath round the tomb of Michael Madhu Sudan Datta."

তৎপরে রেভারেণ্ড ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন,—"শ্রীমধুসূদনের বন্ধু ও স্বদেশবাসীগণ! আমি আপনাদিগকে বঙ্গভাষায় দু' একটী কথা বলিতে চাই; কারণ যাঁহার স্মৃতিচর্চ্চার জন্য আমরা সকলে সমবেত হইয়াছি, যাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্যের গুণেই আমরা এখানে

আকৃষ্ট হইয়াছি, তিনি বাঙ্গালী ছিলেন এবং তাঁহার কাব্য-সমূহ বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। যখন কোন দেশে বিপুল পরিবর্ত্তনের যুগ উপস্থিত হয়, তখন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাও নিজেদের যোগ্যতা সম্যক পরিস্ফুট করিতে পারেন না। যখন পূর্ব্বতন মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং নূতন মত সেই স্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না, যখন দেশের সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে অথবা যাইতেছে, যখন সভ্যতা এবং আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছে, সে সময়ে, এমন কি, প্রবল মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও তাঁহাদের বক্তব্য জনসাধারণের কর্ণগোচর করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। এই প্রকার বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্যের সময় যিনি জাতীয় সাহিত্যের নেতৃস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি সত্যসত্যই একজন মহাপুরুষ। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত এই মহাপুরুষ ছিলেন। শ্রীমধুসূদন তাঁহার স্বজাতীয় মহান্ ব্যক্তিগণের ন্যায় বিশেষ প্রতিভা-সম্পন্ন ছিলেন। অনাদৃত বাঙ্গালীজাতির মহান্ আদর্শ আছে, অন্যজাতির ভাব ও চিন্তা অধিগত করিবার বিপুল ক্ষমতা আছে, এবং তাঁহারা যাহা অনুভব করেন, সে কথা, সে চিন্তা, সে কল্পনা আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ করিবার অতুল ক্ষমতার তাঁহারা অধিকারী। এই সমস্ত শক্তি শ্রীমধুসূদনে অলৌকিক রূপে ও বিপুল পরিমাণে পুঞ্জীকৃত ছিল। এই অতুল শক্তি, এই অদম্য মনীষা শ্রীমাইকেলের স্বজাতীয় আমাদের মধ্যে কেন এমন সুপ্ত ভাবে থাকে? আমাদের পল্লী হ্যামডেনেরা কেন আত্মপ্রকাশ করেন না? কেন আমাদের মৌন মিল্টনগণ মৌনভঙ্গ করেন না? যে অসাধারণ মনস্বীর সমাধিস্তম্ভ পবিত্রীকৃত করিবার জন্য আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, তাঁহার মধ্যে এমন কি শক্তি নিহিত ছিল, যাহাতে তাঁহাকে এমন শীর্ষস্থানে অধিরূঢ় করিয়াছিল? শ্রীমধুসূদনের মধ্যে শক্তি ও সামর্থ্যের সহিত অপূর্ব্ব শিক্ষা ও সাধনার সমবায় হইয়াছিল। তিনি মানসিক ধী-শক্তিতে যেমন তাঁহার স্বদেশবাসী মহাপুরুষগণের প্রতি-নিধিস্বরূপ ছিলেন, তেমনি তিনি শিক্ষায়, দীক্ষায় তাঁহার স্বদেশীয়গণকে অতিক্রম করিয়া, অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই দুই ভাষাই তাঁহার মাতৃভাষা হইয়া পড়িয়াছিল। এবং তিনি হিন্দু ও যুরোপীয় দেবভাষায় (Classics) অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং সেই সুগভীর পাণ্ডিত্যের সহিত তিনি ফরাসী, জর্ম্মণ, এবং ইতালীয় নব্যভাষা সমূহের অতুল্য জ্ঞানসমষ্টির সংযোগ করিয়াছিলেন। যিনি এত ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় যে উন্নত হইবে, ইহা ত স্বাভাবিক; কিন্তু তিনি নিজের মানসিক ঔৎকর্ষ্যেই পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব প্রতিভা, ও অদম্য স্বদেশানুরাগের ফল তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসীর মনকে উন্নত করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এখানে, এই সমাধিস্তম্ভের চতুষ্পার্শে যে সকল যুবককে আমি উপস্থিত দেখিতেছি, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আমি বলিতেছি যে, তাঁহারা 'মেঘনাদ' ও 'তিলোত্তমা'র কবির বিরাট সাহিত্য-সাধনার অনুকরণ করুন, এবং অসাম্প্রদায়িক ভাবে পৃথিবীর ভিন্ন-ভিন্ন মধুচক্র হইতে মধু সংগ্রহ করুন। ইহাই একমাত্র কথা নহে। আমাদের মহাকবি অতুল্য মাধুর্য্যের অধিকারী ছিলেন এবং অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে তাঁহার কবিতারাজ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-ভাবের কি সুন্দর সামঞ্জস্য-বিধান করিয়াছিলেন! ভারতের ভবিষ্যৎ সাহিত্য সম্পূর্ণ সংস্কৃতি-মূলক হইবে না, এবং তাহা সম্পূর্ণ প্রতীচ্যও হইবে না। ভারতের ভাবরাজ্যে, ভারতের বিধিব্যবস্থায়, ভারতের ভাষায় ভবিষ্যতে য়ুরোপের আদর্শ, য়ুরোপের সভ্যতা, য়ুরোপের তেজ ও য়ুরোপের সামর্থ্য অনুপ্রবিষ্ট হইবেই। এই বিশাল সাহিত্য-সৌধের অপূর্ব্ব-নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের প্রথম শিলাবিন্যাস করিয়াছেন শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত;—তাঁহার অপূর্ব্ব মহাকাব্যই সেই প্রথম শিলা। আমি জানি, তাঁহার দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিগণের ন্যায় তাঁহারও ত্রুটি ছিল, তাঁহারও চপলতা ছিল। কিন্তু তিনি এখন যে দেবলোকে বিরাজ করিতেছেন, সেই কবিদিগের বৈকুণ্ঠে মহাকবিগণের সিংহাসনের মধ্যে— যেখানে কবিকুলরাজ হোমার, দান্তে, মিল্টন এবং আমাদেরই কালিদাস ও ভবভূতি সগৌরবে আসীন রহিয়াছেন,— সেখানে আমাদের গৌরবরবি প্রিয়তম কবি শ্রীমধুসূদনও উন্নত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। সেইখানেই তিনি বিরামলাভ করুন। আর যাঁহার মাতৃভাষায় আমরা কথোপকথন করি, যাঁহার প্রতিভা আমরা সগৌরবে মহিমা-মণ্ডিত করি,

যেখানে তাঁহার পার্থিব-অবশেষ আমরা মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া সগৌরবে রক্ষা করিয়াছি, তাহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহারই স্বদেশবাসী, স্বভাষা-ভাষী আমরা সেই পুণ্যভূমি পবিত্রীকৃত করিয়া একমাত্র সান্ত্বনা অনুভব করি। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম বঙ্গে—কেবল বঙ্গে নহে, সমগ্র ভারতে অমর হইয়া থাকুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

প্রতাপ বাবুর বক্তৃতার পর আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—"মাইকেল মধুসূদনের ন্যায় মহৎ ব্যক্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহার পর আমার কিছু বলার বিশেষ প্রয়োজনই দেখিতেছি না। তাঁহার সমাধির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ধর্ম্ম-বিষয়ে যাহার সহিত মতভেদ থাকুক না কেন, আমরা যেন যুগাবতারদিগের প্রতিভার পূজা করিতে বিরত না হই—ইহাই মাইকেলের ন্যায় প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে জাগরুক করিয়া দিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গলা-সাহিত্যকে যে অমূল্য রত্ন দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই চিরকাল তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু আমাদের জাতির ন্যায়পরতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার প্রতিভা যে আমাদিগকে এখানে সমবেত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে, তাহা তাঁহার কবি-কীর্ত্তি হইতে অধিক না হইলেও তুল্য-মূল্য বলিয়া আমি মনে করি।"

তৎপরে সমাধি-স্তম্ভের এবং উপস্থিত জনমণ্ডলীর ছায়া-চিত্র গৃহীত হইলে, একটি স্তোত্র-গীতির পর সভার কার্য্য শেষ হইলে, উপস্থিত নরনারীগণ সমাধিস্তম্ভে উৎকীর্ণ কবির স্বরচিত সমাধি-লিপি (Epitaph) পাঠ করিতে লাগিলেন। কবি নিবিড় তমসাচ্ছন্ন সমাধির অলক্ষ্যে থাকিয়া বাঙ্গালার পথিককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ;—

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!"
মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

সমাধি স্তম্ভের অপর পার্শ্বে (পশ্চিমমুখে) ইংরেজি ভাষায় নিম্নলিখিত সমাধি-লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে :—

IN MEMORY OF
MICHAEL MADHU SUDAN DATTA
ONE OF THE GREATEST POETS
OF BENGAL,
ESPECIALLY DISTINGUISHED
AS AN EPIC POET
AND AS THE FIRST BENGALI WRITER
OF BLANK VERSE,
BORN AT SA'GARDARI' IN THE
DISTRICT OF JESSORE,
IN 1824 A. D.
DIED ON THE 29th JUNE,
1873, A. D.
THIS TOMB IS ERECTED
IN THE YEAR 1888
BY HIS GRATEFUL AND ADMIRING
COUNTRYMEN.

—o—

LLEWELYN & CO.

সমাধি-লিপি পাঠান্তে দর্শক-বৃন্দ সমাধিস্তম্ভের উপরে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সেই পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে একটি মনোমুগ্ধকর পরম রমণীয় স্মৃতি-উৎসব সমাপ্ত হইল।

সেই বৎসর হইতেই প্রতি বৎসর ২৯শে জুন, কবির সমাধি-ক্ষেত্রে স্মৃতি-উৎসব হইয়া থাকে। দেশের ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় মনস্বীবর্গ কবি-শ্মশানে সম্মিলিত হইয়া মধুসূদনের স্মৃতি-পূজা করিয়া থাকেন। উদীয়মান যুবক কবিগণ মহাকবির উদ্দেশে কবিতার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্ঘ্য দান করেন। যত দিন যাইতেছে, ততই বঙ্গবাসীরা মধুসূদনের গুণানুরক্ত হইতেছেন—এমন কি অনেকের ইচ্ছা

যে, তাঁহার দেহাস্থি—সমাধিস্তম্ভ উত্তোলিত করিয়া আমাদের পল্লীমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। জনৈক দেশবিখ্যাত মনস্বী সম্পাদক তদুপলক্ষে সম্প্রতি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"মধুসূদন সত্যই বাঙ্গালার মধুসূদন। নামে খৃষ্টান্, কিন্তু তাঁহার কোন মহাকাব্যে, কোন খণ্ড কবিতায় বিদেশীয় বিজাতীয় ভাব, খৃষ্টান্ ধর্ম্মের ইঙ্গিত কণামাত্রও প্রকট হয় নাই। মেঘনাদ ও ব্রজাঙ্গনা পড়িলে মনে হয় না যে, উহা খৃষ্টান কবির লেখা। উপাদেয় ভাষা, ভাব, অলঙ্কার শব্দবিন্যাস সবই আমাদের দেশের ও সমাজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের সম্মত। মেঘনাদের দুই এক স্থানে ইউরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় একটু-আধটু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে কেবল ভাবের ছায়া মাত্র; ভাষা ও শব্দবিন্যাস সম্পূর্ণ বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর। সীতা ও সরমার উক্তি পড়িলে মনে হয় না যে উহা খৃষ্টান কবি লিখিয়াছেন। মনে হয় কোন ভক্ত ভাবুক হৃদয়ভরা ভক্তি ঢালিয়া সীতার মাতৃমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, মাইকেলেরও দুর্ভাগ্য যে এমন কবি, এমন মহাপ্রাণ খৃষ্টান হইয়াছিলেন—দেশের নামাবলি ছাড়িয়া হ্যাটকোট পরিয়াছিলেন। এমন দুর্ভাগ্য ত অনেকই সহিতেছি,—বিশ্বনাথের মন্দিরের পার্শ্বে মসজিদও রাখিয়াছি,—মাইকেলের খৃষ্টানীও সহিব না কেন? কেবল সহ্য নহে, সেই খৃষ্টান পদ্ধতি যথাসম্ভব অবলম্বন করিয়া তাঁহার আত্মার কল্যাণকামনা করিয়া সকল জাতির ও সকল ধর্ম্মের অধীশ্বর জগদীশের উপাসনা করিব।

* * * *

"বড় লজ্জার কথা, আজও মধুকে পর করিয়া ঘরের বাহিরে রাখিয়াছি। তাঁহার সমাধি আমাদের আয়তনের মধ্যে থাকিবে, নিত্য পুষ্পপত্র দিয়া তাঁহাকে সাজাইব, নিত আসিয়া তাঁহার সমাধির সম্মুখে নতজানু হইয়া কাঁদিব, প্রার্থনা করিব। মেঘনাদ ও ব্রজাঙ্গনার কবি ত আমা পর নহে।

* * * *

"মধুসূদনের সমাধি তুলিয়া লইয়া আমাদের অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সে পক্ষে চেষ্টা রীতিমত করিতে হইবে।"

ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্টন ইংলণ্ডের অন্যতম মহাকবি সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন,—আমরাও মাইকেল সম্বন্ধে সেই কথার পুনরুক্তি করিয়া "মধু-স্মৃতি"র উপসংহার করিলাম।

What needs our Madhusudan for his
honoured bones,
The labour of an age in piled stones?
Or that his hallowed reliques should be hid
Under a star-y-pointing pyramid?
Dear son of Memory, great heir of Fame,
What need'st thou such weak witness
of thy name?
Thou in our wonder and astonishment
Hast built thyself a livelong monument.

* * * *

And so sepulchered in such pomp dost lie,
That kings, for such a tomb, would
wish to die.

কবি রজনীকান্ত

[শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়]

লর্ড কার্জ্জনের প্রচণ্ড দণ্ডাঘাতে অখণ্ড বঙ্গভূমি দ্বিখণ্ডিতা হইলে, সমগ্র বঙ্গদেশ আলোড়িত করিয়া যে আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল, 'স্বদেশী যুগের' প্রবর্ত্তক বলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সেই সময়ে বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে দেশাত্ম-বোধের যে সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, বাঙ্গালীর অসাড় হৃদয়ে যে প্রাণ-স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল, তাহার ফল আমাদের জড়বৎ নিস্পন্দ সমাজদেহে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া-

ল। স্বদেশী আন্দোলনের সেই প্রথম যুগে যে সকল দেশ-বৎসল ভাবুক কবি 'স্বদেশী'-সঙ্গীতে বাঙ্গলার নর-নারী-হৃদয়ে দেশাত্মবোধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভক্ত কবি রজনীকান্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদিন পরে—আজও মনে পড়িতেছে, বঙ্গভঙ্গের দেশের প্রতিবাদ-সভায় কলিকাতা টাউন-হলে রবীন্দ্রনাথের অমর সঙ্গীত—'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি'—শত কণ্ঠে গীত হইয়া কি অপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছিল! তাহার পর সেই গীত-তরঙ্গকে ডুবাইয়া স্বদেশী-ব্রতের একনিষ্ঠ সাধক, মাতৃ-মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ' এই উদ্দীপনাপূর্ণ হৃদয়োন্মাদক দেশ-স্তোত্রে বাঙ্গলার গগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন;—সেই সময়ে কলনাদিনী পদ্মার অপর পারে বরেন্দ্রভূমির গৌরব রাজসাহীতে বসিয়া স্বদেশী-মন্ত্রের আর একজন অজ্ঞাতনামা অখ্যাত সাধক 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই; দীন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।'—এই করুণ-মধুর-সরল সঙ্গীতে বঙ্গ-দেহের যাহারা মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে কর্ত্তব্য-পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোকই জানিত না, পূর্ব্ববঙ্গের উদীয়মান কবি প্রতিভাবান রজনীকান্ত এই সঙ্গীতের রচয়িতা। কারণ রজনীকান্ত তখন পর্য্যন্ত সাহিত্য-সমাজে তেমন পরিচিত হন নাই।

বস্তুতঃ রজনীকান্ত চাপরাস্ আঁটিয়া কোনদিনই বঙ্গসাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ন্যায় বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্ ও একনিষ্ঠ সেবক শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে অধিক দেখা যায় না। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি রজনীকান্তকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল একত্র বাস করিয়াছিলাম; সুতরাং তাঁহার ভিতর ও বাহির দেখিবার আমার যেরূপ সুযোগ হইয়াছিল, তাঁহার পরিবারের বাহিরে দুই-একজন ভিন্ন আর কাহারও ততখানি সুযোগ হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এই দুই-একজনের মধ্যে তাঁহার সহোদরোপম সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবিনাশবাবু রাজসাহীতে রজনীকান্তের প্রতিবেশী ছিলেন; আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি—রজনীবাবু তখন রাজসাহী জজ আদালতের উকীল, এবং অবিনাশবাবু জেলা জজের পেস্কার ছিলেন। রজনীবাবুর মৃত্যুর পর অবিনাশবাবু নদীয়ার জজের নাজীর হইয়াছেন; কিন্তু রজনীবাবুর অকাল-বিয়োগে তিনি হৃদয়ে এতই আঘাত পাইয়াছিলেন যে, আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ রজনীকান্ত-বিহীন রাজসাহীতে গিয়া দুই দিনও বাস করিতে পারিতেন না। রজনীকান্তের চরিত্রের এই একটি প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি যাহাকে ভালবাসিতেন, তাহাকে একেবারে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। সে সময় রাজসাহীতে নানারকম দলাদলি ছিল; কিন্তু রজনীকান্ত কোন দিন কোন দলে যোগদান করেন নাই। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন; রাজসাহীতে রজনীকান্ত অজাতশত্রু ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আমি কার্য্যোপলক্ষে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী যাই। সে সময় রাজসাহীর সেসন-আদালতে নাটোরের বড় তরফ ও ছোট তরফের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ফৌজদারী মামলা চলিতেছিল। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রকুমার শীল তখন রাজসাহীর ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ। নাটোরের মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্বর্গীয় তারকনাথ পালিত উপস্থিত ছিলেন। রজনীবাবু তখন জজ আদালতের 'জুনিয়ার' উকিল। রাজসাহী কাশিমপুরের খ্যাতনামা জমীদার স্বর্গীয় রায় কেদারপ্রসন্ন লাহিড়ী বাহাদুর পরে যে বাড়ীটি কিনিয়া লইয়া তাঁহার বৈঠকখানা করেন, সেই বাড়ীতে সে সময় রাজসাহীর 'পাবলিক লাইব্রেরী' ছিল। একদিন সায়ংকালে সেই লাইব্রেরী-ভবনে ব্যারিষ্টার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হইয়াছিল; সেই মজলিসে রাজসাহীর ছোট-বড় অনেক উকীল উপস্থিত ছিলেন; রজনীকান্তও সেখানে গমন করিয়াছিলেন। সেই মজলিসে অবিনাশবাবু রজনীকান্তের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। আমি তখন 'ভারতী'তে নিয়মিত রূপে লিখিতাম; অবিনাশবাবু আমাকে 'ভারতী'র লেখক রূপেই তাঁহার সহিত পরিচিত করেন। সেই একদিনের পরিচয়েই মনে হইল, রজনীকান্ত যেন আমার কত দিনের বন্ধু! তিনি এমন খোলা প্রাণে আমার সহিত মিশিলেন, নানা সুখ-দুঃখের

এত কথা বলিলেন যে, আমি মুগ্ধ হইলাম, তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। তাহার পর যে কয়েক বৎসর রাজসাহীতে ছিলাম, তাঁহার সস্নেহ ব্যবহার, তাঁহার আদর যত্নে প্রবাসের কষ্ট কোনদিন বুঝিতে পারি নাই।

রাজসাহীতে অবস্থান কালে আমি কিছুদিন মেসে ছিলাম, —কিছুদিন রজনীকান্তের বাসায় ছিলাম; তাহার পর বরোদারাজ্যে যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজসাহীর জমীদার স্বর্গীয় হরকুমার সরকার মহাশয়ের বাসাবাটীতে ছিলাম। স্বর্গীয় হরকুমারবাবু সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের পিতৃব্য ছিলেন। হরকুমারবাবু যেন এ যুগের মানুষ ছিলেন না। তাঁহার মহানুভবতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, শিক্ষানুরাগ প্রভৃতির পরিচয় পাইয়া দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা মনে পড়িত। হরকুমার বাবুর গৃহে অবস্থান কালে আমি প্রত্যহ দু'বেলা রজনীকান্তের বাসায় যাইতাম। যখন মেসে থাকিতাম, তখন রজনীবাবুর বাসাতেই আমাদের আড্ডা ছিল। আমাদের মালোপাড়ার মেস ও বড়কুঠির মেস, উভয়ই রজনীকান্তের বাসার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। আমাদের মেসে স্কুল-কলেজের ছাত্রই বেশী থাকিত; দুই-তিনজন আদালতের আমলাও থাকিতেন। কিন্তু মেসে আহারাদির কোন সুব্যবস্থা ছিল না; আজ ঠাকুর নাই, কাল ঝি পলাইয়াছে, ইত্যাদি অভিযোগ লাগিয়াই থাকিত। অবশেষে, একবার গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে স্কুল-কলেজের ছেলেরা মেস ছাড়িয়া বাড়ী চলিয়া যাইবার পর, আমার আহারাদির অত্যন্ত অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া, রজনীকান্ত আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া যান, এবং আমার বাসের জন্য একটি ঘর ছাড়িয়া দেন। সেই সময় হইতে কাছারীর সময় ভিন্ন দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় রজনীকান্তের সহবাসে যাপন করিতাম। সেই সময়টিই আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রবাসের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা আমি একদিনের জন্যও বুঝিতে পারি নাই। দীর্ঘকাল রজনীকান্তের সহিত একত্র বাস করিয়াছি, কিন্তু কোন দিন কোন বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আমার মনান্তর হয় নাই। তেমন সদানন্দ, হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ-লোভশূন্য, নির্লিপ্ত পুরুষ আমি জীবনে দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। রজনীকান্তের বাসায় অবস্থান কালে একবার আমার 'জল বসন্ত' হইয়াছিল। এই সংক্রামক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া 'পরের বাসায়' আমি কিছু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলাম, এবং তাঁহার আশ্রয়-ত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। কিন্তু আমাকে যাইতে দেওয়া দূরের কথা, রজনীকান্ত এরূপ যত্নে আমার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন যে, নিজের সহোদরও ততখানি পারে কি না সন্দেহ।

রাজসাহীর 'বড়কুঠি'তে রজনীকান্তের বাসা ছিল। বাসার ভিতরে তিন-চারিখানি ঘর; তন্মধ্যে একখানি ঘর না-ভিতরে, না-বাহিরে। তাহার এক অংশ ভিতরের দিকে, অন্য অংশ বাহিরের দিকে; সেই ঘরখানি তিনি আমার বাসের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাহিরের দক্ষিণ-দ্বারী ঘরখানি বৈঠকখানা। প্রভাতে ও রাত্রিতে সেই ঘরেই আমাদের আড্ডা জমিত। তবে যখন তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার পৈত্রিক ভবন ভাঙ্গাবাড়ীতে থাকিতেন, তখন তাঁহার শয়ন-মন্দিরই দিবারাত্রি বন্ধুগণের কলহাস্যে প্রতিধ্বনিত হইত। মক্কেলাদি আসিলে তিনি কদাচিৎ বাহিরে আসিয়া মামলার কাগজপত্র দেখিতেন। রজনীকান্তের বাসায় তখন অট্টালিকা ছিল না। রাজসাহীতে মাটীর প্রাচীর-বিশিষ্ট খড়োঘর বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার ঘরগুলি টিন দিয়া ছাওয়া, কিন্তু চারিদিকে প্রাচীরের পরিবর্ত্তে বেড়া দেওয়া। বাড়ীর ভিতর তাঁহার জননীর একখানি স্বতন্ত্র রন্ধনশালা ছিল; মাতৃভক্ত রজনীকান্ত সেই গৃহখানিকে দেব-মন্দিরের মত দেখিতেন।

রজনীকান্ত আদৌ বিলাসী ছিলেন না। তাঁহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর কোন দিনই ছিল না। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা পোষাকে কোর্টে যাইতেন। কোন সম্ভ্রান্ত মজলিসে নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইতে হইলেও, তিনি কোন রকম সাজ-পোষাক করিতে ভালবাসিতেন না। আয়না, চিরুণী, ব্রস লইয়া তাঁহাকে কখন কেশের পারিপাট্য সাধন করিতে দেখি নাই। আজকালকার মত সেকালে মফস্বলের শিক্ষিত-সমাজে চায়ের এত প্রচলন হয় নাই; তিনিও চায়ের অনুরক্ত ছিলেন না। তবে তিনি কিঞ্চিৎ ভোজনবিলাসী ছিলেন। মা যখন রাজসাহীতে থাকিতেন, তখন তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য 'নিরামিষ' হেঁসেলে, নানাপ্রকার রসনা-তৃপ্তিকর ব্যঞ্জন রাঁধিতেন। আর, রজনীবাবুর পতিগতপ্রাণা সাধ্বী পত্নীর কথা আর কি বলিব? রন্ধন-বিদ্যায় তিনি যেন

সাক্ষাৎ দ্রৌপদী!—বাসায় যেদিন আহারাদির একটু বিশেষ আয়োজন হইত, রজনী সেদিন বন্ধুগণকে না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না; সকলের সহিত একত্র বসিয়া মহানন্দে আহার করিতেন। তাঁহার ওকালতির আয় তেমন অধিক ছিল না, তাহাতে বাসা-খরচ কুলাইত কি না সন্দেহ; তবে দেশে পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, সুতরাং অর্থাভাবে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইত না।

রজনীকান্ত সুবক্তা ও আইনজ্ঞ উকীল ছিলেন। বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পিতৃব্য রাজসাহীর সর্ব্বপ্রধান উকীল ছিলেন। রজনীকান্ত পিতৃব্যের পসার পাইলে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাতের মৃত্যু হওয়ায় সে পসার তাঁহার হাতছাড়া হইয়াছিল। বোধ হয় ভালই হইয়াছিল। সেই অখণ্ড পসার থাকিলে, আমরা রজনীকান্তকে একজন বহু-অর্থ-উপার্জ্জন-ক্ষম মাতব্বর উকীল রূপেই দেখিতে পাইতাম; জননী বীণাপাণির সেবক—'বাণী' ও 'কল্যাণী'র রচয়িতা কবি রজনীকান্তকে পাইতাম কি না সন্দেহ। রজনীকান্তের বাসায় পরিবার-সংখ্যা বড় অধিক ছিল না; তাঁহার মাতা, স্ত্রী, কয়েকটি শিশুপুত্র, একটি ভাগিনেয়, তাঁহার মুহুরী শশী ভাদ্রা, (ভায়াটি পদবী) এবং 'ভাদুড়ী' নামধারী একটি ভৃত্য ছিল। কিন্তু এমন দিন ছিল না—যে দিন অভ্যাগত দুই-একটি আত্মীয় বা অনাহূত অতিথি তাঁহার গৃহে আহার না করিত। অন্নদানে তিনি কোনদিন কৃপণতা করিতেন না। আহারের সময় তাঁহার শিশু পুত্রেরা তাঁহার সঙ্গে বসিয়া খাইত। বড়টির বয়স তখন নয়-দশ বৎসরের অধিক নহে। না জানি এখন তাহারা কত বড় হইয়াছে! বহুদিন তাহাদিগকে দেখি নাই, তাহাদের কোন সংবাদও পাই না। সেদিনের কথা এখনও স্বপ্ন মনে হইতেছে।

রজনীকান্ত পান ও তামাকের বড় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার গড়গড়ার আগুন প্রায়ই নিবিত না। তাস-দাবা খেলিতে, ও গান করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তিনি সদা-প্রফুল্ল ছিলেন, কোনদিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখি নাই। তিনি গল্পের জাহাজ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার গল্প করিবার চমৎকার ভঙ্গি ছিল। তাঁহার গল্প শুনিতে বসিয়া উঠিয়া যায়, এরূপ সাধ্য কাহারও ছিল না। এক-একদিন তিনি রাত্রি দুই-তিনটা পর্য্যন্ত গল্প করিয়াও ক্লান্ত হইতেন না। তিনি হাসির গল্প এত জানিতেন যে, তাহার সংখ্যা হয় না। কিন্তু তাঁহার গল্প বলিবার একটা বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার গল্প শুনিয়া শ্রোতারা হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত, হাসিতে হাসিতে পেটে খিল লাগিত; কিন্তু তিনি একটুও হাসিতেন না। অথচ তাঁহার চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখিয়া অতি গম্ভীর-প্রকৃতি লোকেরও হাস্য-সংবরণ করা দুরূহ হইত। তাঁহার গল্পের কি মোহিনী শক্তি ছিল—তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব। পূজার ছুটির পর একবার তিনি বাড়ী হইতে রাজসাহীতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন; আমিও ছুটীর শেষে রাজসাহীতে যাইতেছিলাম। দামুকদিয়া ঘাট হইতে প্রত্যুষে ষ্টীমার ছাড়িয়া অপরাহ্নকালে রাজসাহী পৌঁছিত। আই, জি, এস্, এন্ কোম্পানীর ষ্টীমার। আমি চুয়াডাঙ্গা ষ্টেশনে ট্রেণে চাপিয়া দামুকদিয়া গিয়া ষ্টীমারে চাপিতাম; কিন্তু সেবার সোজা গরুর গাড়ীতে পদ্মাতীরবর্ত্তী আলাইপুর ষ্টীমার-ষ্টেশনে গিয়া ষ্টীমার ধরি। ষ্টীমারে উঠিয়া দেখি, ষ্টীমারের ডেকের উপর একখানি সতরঞ্চি বিছাইয়া রজনীকান্ত আড্ডা জমাইয়া লইয়াছেন,—তাঁহার গল্প আরম্ভ হইয়াছে। বহু যাত্রী তাঁহার চারিপাশে বসিয়া মুখব্যাদান করিয়া গল্প গিলিতেছিল; আর, মধ্যে-মধ্যে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। এমন কি, ষ্টীমারের সারেঙ্গ, সুখানি, ডাক্তার পর্য্যন্ত তাঁহাকে কাতার দিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।—জাহাজ পদ্মার প্রতিকূল স্রোতে চলিতে লাগিল। ক্রমে তাহা আলাইপুর ছাড়াইয়া—চারঘাট, সরদহ প্রভৃতি ষ্টীমার-ষ্টেশনগুলি অতিক্রম করিল। কত মাল নামিল, উঠিল; কত বিদেশের যাত্রী জাহাজে উঠিল, জাহাজ হইতে নামিয়া গেল; কিন্তু রজনীকান্তের গল্প শেষ হইল না।—অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় ষ্টীমার রাজসাহীর ঘাটে নঙ্গর করিল—তখনও গল্প শেষ হয় নাই। সারেঙ্গ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "বাবু, আপনার কেচ্ছা বড় সরেস. এরকম কেচ্ছা আর কখন শুনি নাই, বড়ই আপশোস যে শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। যদি জানিতাম, উহা শেষ করিতে দেরী হইবে,—তাহা হইলে আমি জাহাজ খুব ঢিমে চালাইতাম।" রজনীকান্ত বলিলেন, "আর এক যাত্রায় তোমাকে ইহার শেষটুকু শুনাইব। আজ ত আর সময় নাই।"—জানি না, তিনি

মহাপ্রস্থানের পূর্ব্বে সারেঙ্গের আশা অন্য কোন যাত্রায় পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না।

রজনীকান্ত ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। ইংরেজী ভাষায় ভাল ডিটেক্‌টিভ নভেল এমন একখানিও নাই, যাহা রজনীকান্ত পাঠ করেন নাই। প্রধানতঃ গাবেরিও ও বাইগবির নভেলের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন; এবং সেই সকল নভেলের গল্পই বন্ধুগণকে শুনাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার গদ্য-রচনার অভ্যাস ছিল না; এইজন্য তিনি আমাকে একটি প্লট দিয়া উহা অবলম্বনপূর্ব্বক একখানি ডিটেকটিভ নভেল লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, উহার কার্য্যক্ষেত্র, নায়ক-নায়িকা—সমস্তই এদেশী হওয়া চাই, বিলাতীর গন্ধও যেন না থাকে। তাঁহার এই উপদেশানুসারে আমি 'অজয় সিংহের কুঠি' লিখিতে আরম্ভ করি। প্রথমে উহার কয়েক পরিচ্ছেদ 'দাসী' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার নায়ক-নায়িকা প্রভৃতির চরিতাঙ্কনে যে সকল ত্রুটি ছিল, রজনীকান্ত সযত্নে তাহা সংশোধন করিয়াছিলেন, এবং সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা ডিটেকটিভ নভেলসমূহের মধ্যে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে—এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।" রজনীকান্তের এই দৈববাণী সফল হইয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু এই উপন্যাসের তিনটি সংস্করণ অতি অল্প কালেই নিঃশেষিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ আটমাসে ফুরাইয়াছে শুনিয়া, রজনীকান্ত আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেমন? আমার কথা ঠিক কি না!"

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রাজসাহী সাহিত্যিকগণের একটি কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।—সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা তখন 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইতেছিল। এই 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিবার জন্য অক্ষয়বাবুকে তখন কিরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতে হইত, আমি তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। নকলনবিশী ও তর্জ্জমা দ্বারা এরূপ গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না। রাজসাহীর অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রাজসাহী কলেজের প্রবীণ দ্বিতীয়-শিক্ষক লোকনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় 'চন্দ্রশেখরে'র সমালোচনা শেষ করিয়া লেখনীকে বিরাম দান করিলেও, দেবী বীণাপাণির সেবায় প্রতিনিবৃত্ত হন নাই। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তখন মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সত্যের আলোক-পাতের জন্য কঠোর সাধনায় রত ছিলেন। শ্রদ্ধাভাজন কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় বঙ্গবাণীর সেবায় রত থাকিলেও, সে সময়ে সে কথা সাধারণে জানিতে পারে নাই। খ্যাতনামা লেখক নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের লেখনী হইতে তখন অমৃত-নিস্যন্দিনী ভাষার আবির্ভাব না হইলেও, তিনি দেবী সরস্বতীর প্রসন্নতা লাভের আশায় নীরব সাধনায় কালাতিপাত করিতেছিলেন—এ কথা অনুমান করা কঠিন নহে। অল্পদিন পরে, পরলোকগত সুরেশচন্দ্র সাহার উৎসাহে ও অক্ষয়বাবু প্রভৃতি সাহিত্য-রথীগণের উপদেশে 'উৎসাহ' নামক একখানি ক্ষুদ্রকায় মাসিকপত্র রাজসাহী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। রজনীকান্ত এই কার্য্যে সুরেশচন্দ্রকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন। বোধ হয়—তাঁহার কোন-কোন গানও উৎসাহে প্রকাশিত হইয়াছিল।—তৎপূর্ব্বে রজনীকান্তের কোন রচনা ছাপার অক্ষরে বাহির হয় নাই। 'বাণীপ্রেস' নামক একটি নূতন মুদ্রাযন্ত্র হইতে 'উৎসাহ' প্রকাশিত হইত। রাজসাহীর অনেক নূতন লেখক তাহাতে হাত পাকাইয়াছিলেন।

রাজসাহী ধর্ম্মসভার মুখপত্র 'হিন্দুরঞ্জিকা' তমোঘ্ন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত; 'হিন্দুরঞ্জিকা' রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র। রজনীবাবু কোন দিন গোঁড়ামীর পক্ষপাতী ছিলেন না, এজন্য হিন্দুরঞ্জিকা কোনদিন তাঁহার বা অক্ষয় বাবুর সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই। রজনীকান্ত বাল্যকাল হইতেই হাস্যরসের অবতার ছিলেন। নীচের ক্লাশে পড়িবার সময় রাজসাহী কলেজের সেই সময়কার শিক্ষকদের লক্ষ্য করিয়া তিনি সংস্কৃতে এক ছড়া লিখিয়াছিলেন, শ্বেতাঙ্গ প্রিন্সিপালও তাহাতে বাদ পড়েন নাই। সেই হাস্যরসপূর্ণ ছড়াটি রজনীকান্তের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি; এখন তাহা মনে নাই। রজনীকান্ত ভণ্ডামী দেখিতে পারিতেন না। রাজসাহীর একজন প্রবীণ উকীল বৃদ্ধ বয়সে 'দ্বিতীয় সংসার' করেন। এই বিবাহের পর বৃদ্ধ দ্বিতীয় সংসারের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রজনীকান্ত বৃদ্ধের

দুরবস্থার কথা শুনিয়া একদিন এক গান রচনা করিলেন; রজনীকান্তর প্রণীত 'কল্যাণী'তে সেই গানটি পরে প্রকাশিত হয়। গানটী তিনি আমাদের সম্মুখে বসিয়া হারমোনিয়ম বাজাইতে-বাজাইতে রচনা করিয়া আমাদের শুনাইলেন। গানটি এই :—

বাজার হুদ্দা কিনা আইন্যা, ঢাইলা দিচি পায়;
তোমার লগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌ছে দায়!
আরসি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি ত্থাওন যায়?
বেলোয়ারী চুরি দিচি, পাছা-পাইর্যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি, মজা কৈর্যা দিব্যার লাগ্‌চস্ গায়।
উলের হুতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগ্যা মনড়া পাইন্যা?
ওজন কৈইর্যা ব্যাবাক্ দিচি, পরাণ দিচি ফায়!
বুরা বুরা কইয়া ক্যাবল, থ্যাপাইয়া ক্যান্ কোর্‌চ পাগল?
যহন বিয়া কোর্‌চ ফেল্‌বা ক্যাম্‌তে?
কৈয়্যা দ্যাও আমায়।"

সে সময়ে গানটীর দুই-একটি শব্দের রূপান্তর ছিল। 'কাহই' পরে বসিয়াছিল, – তখন ছিল 'চিরণ'; –পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, রজনীকান্তের কেবল এই গানে নহে, 'বাঙ্গাল্লে'-ভাষার যতগুলি হাসির গান 'বাণী ও কল্যাণী'তে স্থান পাইয়াছে, প্রত্যেক গানে বাঙ্গালে ভাষা যথাযথ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি দক্ষিণবঙ্গের অধিবাসী হইলে এ বিষয়ে এরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। এ বিষয়ে হাস্যরসের অবতার দীনবন্ধু ভিন্ন বঙ্গসাহিত্যের সেবকগণের মধ্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দী নাই।

একদিন সায়ংকালে একটি পূর্ব্ব বঙ্গবাসী 'সাধু' তাঁহার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। লোকটি ভিক্ষুক, কিন্তু কালী-ভক্ত। রজনীবাবুর অনুরোধে সে দুই-একটি কালী-বিষয়ক গানও করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সুর ও গাহিবার ভঙ্গিতে ভক্তির উদ্রেক না হইয়া হাস্যেরই উদ্রেক হয়। দুই-একদিন পরে রজনীবাবু হারমোনিয়ম-সহযোগে সেই সাধুর কণ্ঠস্বরের অনুকরণে এই গানটি রচনা করিয়া গায়িয়াছিলেন,—

"তারা নাম কোর্‌তে কোর্‌তে, জিব্বাডা আমার,
অ্যাকেকালে গ্যাছে আরাইয়া;
গুরু যে কি আথা কৈয়া দিল কাণে,
ফেল্‌চি জন্মের মত হারাইয়া।
বৈস্যা বৈস্যা ক্যাবোল করচি তারা নাম,
কি দোষ পাইয়্যা তারা হৈয়্যা বস্‌চস্ বাম?
শোন কের্‌পাময় আমি যাইমু কৈ,
নিবি যদি পাও ছারাইয়্যা।
তারা বৈলা যারা পাও ধইর্যা থাকে,
তারা তারা কইর্যা চক্ষু মুইদ্যা ডাকে,
টিকি ধইর্যা তার সাত সুমুদ্দুর পার
ত্থাও ত্থাশে থনে, তারাইয়্যা।"— ইত্যাদি।

পরে এ গানটিও 'কল্যাণী'তে প্রকাশিত হইয়াছে।

রজনীকান্ত ডুগি-তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের ধার ধারিতেন না; একটি হারমোনিয়ম তাঁহার সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন ছিল। হারমোনিয়মে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তিনি যে-কোন গান হারমোনিয়ম সহযোগে গায়িতে পারিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর খুব মিষ্ট ছিল না বটে, কিন্তু তিনি গান গায়িতে গায়িতে এরূপ ভাববিহ্বল হইতেন যে, তাহাতে তাঁহার কণ্ঠস্বরের দৈন্য ঢাকিয়া যাইত। তিনি অশ্রান্ত গায়ক ছিলেন, এমন কি, আট-দশ ঘণ্টা কাল ক্রমাগত গান করিয়াও পরিশ্রান্ত হইতেন না। তাঁহাকে কখনও 'আর পারি না' বলিতে শুনি নাই। এখনও মনে পড়ে—কি বসন্তে, কি শরতে তিনি তাঁহার বাসার ভিতর-আঙ্গিনায় একখানি সতরঞ্চ বিছাইয়া, তাহার উপর বসিয়া সন্ধ্যা হইতে রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নালোকে গান গায়িতেন, তাঁহার বন্ধুগণ চারিপাশে বসিয়া তাঁহার রচিত মধুর সঙ্গীতগুলি উপভোগ করিতেন। কোন-কোন উচ্চ ভাব পূর্ণ গান গায়িতে-গায়িতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতে দেখিয়াছি। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ও শিশু-হৃদয়ের ন্যায় সরল ছিল।

রজনীকান্তের ন্যায় মাতৃভক্ত সন্তান একালে বড় বিরল। তাঁহার মায়ের মত মা সকলের ভাগ্যে জোটে না। মা যখন তাঁহার কাছে না থাকিতেন, তখন তাঁহার গুণের কথা বলিতে-বলিতে রজনীকান্তের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত। একবার তাঁহার মা বাসা হইতে বাড়ী চলিয়া যাইবার পর রজনীকান্ত তাঁহার স্নেহময়ী জননীর উদ্দেশে একটি গান রচনা করিয়া আবেগভরে আমাদিগকে শুনাইলেন। গানটি 'বাণী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটা এইরূপ :—

স্নেহ বিহ্বল, করুণা ছল ছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখি রে !
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী-সুধা
এনেছে অশরণ লাগি রে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনসনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি, যাতনা তাপ ভুলি'
বদন-পানে চেয়ে থাকি রে !
ইত্যাদি।

এরূপ মধুর, নির্ম্মল, নির্ভরতাপূর্ণ মাতৃস্তোত্র বঙ্গ-সাহিত্যে একান্ত বিরল।

রজনীকান্ত স্বদেশভক্ত ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি স্বদেশ প্রেমের সঙ্গীত স্বদেশী আন্দোলনের সময় রচিত হইয়াছিল। সে সময় আমি রাজসাহীতে ছিলাম না। রজনীকান্ত মধ্যে-মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের বাসায় বসিয়া তাঁহার নূতন-নূতন গান শুনাইতেন। একদিন প্রায় সমস্ত রাত্রি তিনি গান করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্বে তিনি স্বদেশ-প্রেমের অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন। স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম গান;—

"(মরি) শ্যামল শস্য-ভরা !
(চির) শান্তি বিরাজিত পুণ্যময়ী ;
ফল ফুল পূরিত, নিত্য সুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত।
ধূর্জ্জটি-বাঞ্ছিত, হিমাদ্রি-মণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত-সরসিজ-রঞ্জিত।
রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জ্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত,
বীর প্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।
সামগান-রত আর্য্য তপোধন
শান্তি সুধান্বিত কোটী তপোবন,
রোগ-শোক-দুখ-পাপ বিমোচন।
ওই সুদূরে সে নীরনিধি—
যার তীরে হের দুখ-দিগ্ধ-হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি !" (বাণী।)

এই সুন্দর গানটি যখন রচিত হয়, তখন শেষ দুই ছত্র এইরূপ ছিল ;—

"যার তীরে বসি শোক-বিদ্ধ হৃদি
কাঁদে ভারত, হায় বিধি !"

এই গানটি সর্ব্বপ্রথম রজনীকান্তের প্রিয় সুহৃদ অবিনাশ-বাবু গায়িয়া আমাদের শুনাইয়াছিলেন। সে সময়ে রাজসাহীতে অবিনাশবাবুর মত সুকণ্ঠ গায়ক অতি অল্পই ছিলেন। গান শুনিয়া আমি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, রজনীবাবুকে বলিয়া উহা 'ভারতী'তে প্রকাশিত করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম। তখন 'ভারতী'তে অনেক গান ও তাহার স্বরলিপি প্রকাশিত হইত। রজনীবাবু বলিলেন, 'হাঁ, ভারতীর মত বিখ্যাত কাগজে আমার এ গান আবার ছাপা হবে! তুমিও যেমন।"—তথাপি আমি উহা শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী সরলা দেবীর নিকট পাঠাইয়াছিলাম ; কিন্তু সরলা দেবী এই গানটি ভারতীতে প্রকাশের যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। তিনি তাহার কি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, এত দিন পরে তাহা মনে নাই। তবে রজনীকান্ত তখনও কবিযশঃ লাভ করিতে পারেন নাই। গান ছাপা হইল না দেখিয়া রজনীকান্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ্‌লে ? আমি জানি ঠাকুর-বাড়ীর কাগজে আমার ও-গান ছাপা হবে না।"—আমি নিরুত্তর।

সে সময়েও রজনীকান্ত দুই-চারিটি হাসির গান রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হাসির গান রচনায় তাঁহার তেমন আগ্রহ দেখি নাই। অবশেষে, একবার কবিবর স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রাজসাহীর আবগারী বিভাগের পরিদর্শনকার্য্যে রাজসাহীতে গমন করেন। সেই সময়ে রজনী-কান্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। গুণগ্রাহী দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্তের দুই-একটি হাসির গান শুনিয়া এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিলে, ক্রমে রজনীকান্ত অনেকগুলি হাসির গান রচনা করেন। আমি একদিন তাঁহাকে বলি, 'অভ্যাস রাখিলে, আপনি হাসির গান রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ হইতে পারিবেন।'—এ কথা শুনিয়া তিনি উত্তর

হস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া আমাকে বলিলেন, "কি যে বল তুমি! এ বিষয়ে তিনি আমার গুরু, আমি তাঁহার পদস্পর্শেরও যোগ্য নহি।" বিনয়ে রজনীকান্তকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিত না।

ইহার অল্পদিন পরে রজনীকান্ত কলিকাতায় আসিয়া কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু রজনীকান্তকে কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন ও সঙ্গীত-চর্চ্চায় কিরূপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, রজনীকান্ত রাজসাহীতে ফিরিয়া গিয়া মহানন্দে আমাদের কাছে সে কথা প্রকাশ করেন। তাহার পর হইতে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সখ্য-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রমে রজনীকান্ত 'পূর্ব্ববঙ্গের হাসির গানের কবি' বলিয়া পরিচিত হন।

রজনীকান্ত রাজসাহীতে ওকালতি করিতে-করিতে জজ সাহেবের আদেশে একবার নওগাঁয়ে ও একবার নাটোরে দুই-এক-মাসের জন্য মুন্সেফীর 'একটিনি' করিতে যান। সে সময় জেলা-জজেরা অল্প সময়ের জন্য তাঁহাদের অধীন চৌকীতে নিজের কোর্টের উকীলদের মুন্সেফ নিযুক্ত করিতে পারিতেন। হাকিমী করিয়া রজনীকান্ত রাজসাহীতে ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাকিমীটা কেমন লাগল?"—রজনীকান্ত বলিলেন, "অত বাঁধাবাঁধি কি আমাদের ভাল লাগে?—তবে শোন, নাটোরে হাকিমী করিতে-করিতে একটা গান বাঁধা গিয়াছে":—

"দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর,
আমরা মোটা মাইনের মজুর,
তোমরা দেখে নাও সবে আপন চক্ষে
নাম শুনেছিলে 'জুজুর'।
একটু peevish মোদের স্বভাব,
বড়, খাইনে কোর্ম্মা কাবাব,
প্রায় cent per cent খুঁজে দেখ,
নেই diabetesএর অভাব।
আমাদের মানা কারো সনে মিশ্‌তে,
আমরা দক্ষ কলম পিশ্‌তে,
ঐ এগারটা থেকে ছ'টা, বসে লিখি
কাগজ দিস্তে দিস্তে।
আমাদের, আজ দিলে রংপুরে,
কাল্‌কে রাঁচিতে ফেলে ছুঁড়ে,
দেখ, বদ্‌লীপ্রসাদে হয়ে আছি মোরা
একদম ভবঘুরে।"
ইত্যাদি (কল্যাণী)

এই গান শুনিয়া তাঁহার প্রিয় বন্ধু অবিনাশচন্দ্র বলিলেন, "দাদা, মুন্সেফ হাকিমদের ত গুণ-বর্ণনা হলো, আপনারা উকীল মশায়রা কি চীজ্—তার একটু বর্ণনা হবে না? আপনাদেরও যে অসংখ্য গুণ!"

রজনীকান্ত প্রিয় বন্ধুর এ অনুরোধ উপেক্ষা করেন নাই; একটি সুদীর্ঘ সঙ্গীতে উকিলেরও গুণ-বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রথমাংশ এইরূপ:—

"দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত, Public Movementএ leader.
আর Conscience to us is a marketable thing.
(Which) We sell to the highest bidder.
দেখ, annually swelling in number
আমরা করেছি bar encumber;
আর শামলা চাপকানে চেন চশমা দাড়িতে,
We look so grave and sombre!
আমরা বাদীকেও বলি 'হ্যালো,
তোমার মামলা তো অতি ভাল!'
আবার প্রতিবাদী এলে বলি 'জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো।'
ছুটো খেয়েই কাছারী ছুটি,
আর যা' পাই থলেসে পুঁটি,
ঐ, জলে কাদাভেজে, যার যার মত,
কাড়াকাড়ি করে লুটি।"
ইত্যাদি—(কল্যাণী।)

শেষে তিনি ডেপুটী হাকিমদেরও বাদ দেন নাই। সেই সুদীর্ঘ গানটির শেষ অংশ বড়ই মধুর, এবং কতদূর সত্য তাহা ভুক্তভোগীদেরই ভাল জানা আছে। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—

"আর ঐ কর্ত্তাটি ভালবেসে,
যদি কাণ মলে দেন ক'সে,

ঐ কর-কমলের কোমলতা, করি
অনুভব, হেসে।
এই নাসায় বিলিতি শুঁতো,
আর এই পৃষ্ঠে বিলিতি জু'তো,—
একটু দৃষ্টিকটুতা-দুষ্ট হ'লেও
তুষ্টিময় বস্তুতঃ।" (কল্যাণী)

শুনিয়াছি, এই গান শুনিয়া হাস্যরসের অবতার দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্তকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়াছিলেন।

রজনীকান্ত প্রায় সমস্ত মাসিকপত্রই পাঠ করিতেন, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রসঙ্গ তিনি পড়িতেন না; প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। এমন কি, পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণকে বিদ্রূপ করিবার জন্য তিনি একটি গান রচনা করিয়াছিলেন; তাহার প্রথমাংশ এই:—

"রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের কটা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের কটা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।
আকবর সাহা কাছা দিত কি না,
নূরজাহানের কটা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন, ক্ষীণা কিংবা পীনা
এ সব করিয়া বাহির, বিদ্যে করেছি জাহির।"
ইত্যাদি—(কল্যাণী)

রজনীকান্ত ভণ্ডামীকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, তাঁহার রচিত 'হজমীগুলি' 'জাতীয় উন্নতি' 'তিনকড়ি শর্ম্মা' প্রভৃতি গানগুলি তাহার প্রমাণ।—তাঁহার এই সকল গান সমাজের উচ্চ-নীচ সকল স্তরেই সমান আদর লাভ করিয়াছে; নতুবা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র সাত আটটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইত না। সমাজে পণপ্রথার বিরুদ্ধে বহুদিন হইতেই আন্দোলন চলিতেছে; অনেক বক্তার মুখে এ সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা শুনিতে-শুনিতে কর্ণ বধিরপ্রায় হইয়াছে; কিন্তু 'বরের দর' নামক সঙ্গীতে রজনীকান্ত পুত্র-বিক্রয়-সমুৎসুক 'বরের বাপদের' পৃষ্ঠে যে কশাঘাত করিয়াছেন,—সহস্র বক্তৃতাও তাহার সমতুল্য নহে। রজনীকান্তের কোন আত্মীয়-কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বরের পিতা যে লম্বা ফর্দ্দ দিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া রজনীকান্ত ঐ গানটি রচনা করিয়াছিলেন। 'বেহায়া বেয়াই' নামক গানটিও এই বর্ব্বর সামাজিক প্রথার প্রতি তীক্ষ্ণ কশাঘাত। এই গান শুনিয়া অনেক 'বেহায়া বেহাই' লজ্জায় অধোবদন হইয়াছে; কিন্তু অনুতপ্ত হইয়াছে কি না কে বলিবে? আজ রজনীকান্ত জীবিত থাকিলে কেরোসিনে বালিকাদের আত্মহত্যা সম্বন্ধে দুই-চারিটি সকরুণ সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম; কিন্তু কে তাঁহার অভাব পূর্ণ করিবে? তিনি সমাজ-সংস্কারক রূপে পরিচিত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা কোন দিন হৃদয়ে পোষণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার রচিত বহুসংখ্যক সামাজিক গান রঙ্গরসের অন্তরালে যে অশ্রুর উৎস প্রবাহিত করিয়াছে,—তাহা কিরূপ মর্ম্মভেদী,—ইহা যাহার হৃদয় আছে, সে-ই বুঝিতে পারিবে।

শ্লেষে ও বিদ্রূপে রজনীকান্তের অনন্যসাধারণ শক্তি ছিল। কিন্তু তাঁহার বিদ্রূপে হুল ছিল না,—ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। যাহাদিগকে তিনি লক্ষ্য করিয়া গালি দিতেন, তাহারাও হাসিমুখে সে গালি পরিপাক করিত। তাঁহার রসিকতার পরিচয় তাঁহার রচনাতেই পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায়,আলাপ-আপ্যায়নে,সামাজিক শিষ্টাচারেও তাঁহার রসিকতা ফুটিয়া উঠিত। একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিই। রজনীবাবুর বৈঠকখানায় একখানি আয়না, চিরুণী ও ক্রস প্রায়ই পড়িয়া থাকিত। রাজসাহীতে বিশেষতঃ নাটোরাঞ্চলে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয় গোঁড়া মুসলমানের বাস। এইরূপ একটি বনিয়াদী ঘরের প্রাচীন মুসলমান মক্কেল রজনীকান্তকে মামলা বুঝাইতে আসিয়া, আয়না ক্রস্‌খানি সম্মুখে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। দর্পনে মুখ দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল; আয়নাখানি তুলিয়া লইয়া মুখ দেখিতে-দেখিতে তিনি লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার সুদীর্ঘ দাড়ীগুলি বড়ই এলোথেলো হইয়া ঝুলিতেছে। তখন তিনি ক্রস্‌খানি তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা দাড়ী আঁচড়াইতে লাগিলেন। রজনীকান্ত তাঁহার মামলার কাগজপত্র দেখিতে-দেখিতে মুখ তুলিয়া মিঞা সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিলেন। মক্কেল মহাশয় ইহা দেখিয়া রজনীকান্তকে তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রজনীকান্ত বলিলেন, "আপনি যে বুরুষ দিয়া দাড়ি আঁচড়াইতেছেন, উহা কোন্ জানোয়ারের রোঁয়ায় তৈয়েরী, জানেন কি?"

বৃদ্ধ মুসলমান মক্কেল তাঁহার দাড়ী আন্দোলিত করিয়া

বলিলেন, "না। এ কোন্ জানোয়ারের লোম?"—রজনীকান্ত বলিলেন, "যার নাম শুন্‌লে আপনারা কাণে আঙ্গুল দেন—শুয়োর!"

মুসলমান ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ বুরুষখানি দূরে নিক্ষেপ করিয়া 'তোবা, তোবা' শব্দে চীৎকার করিয়া উভয় হস্তে পাকা দাড়ী ছিঁড়িতে লাগিলেন! সকলের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইল; কিন্তু রজনীকান্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে কাগজ দেখিতে লাগিলেন।

রজনীকান্ত বলিতেন, তিনি তাঁহার কবিত্ব-শক্তি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়াছেন। ইহার প্রমাণ স্বরূপ একখানি পুরাতন খাতা হইতে তিনি আমাদিগকে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক কতকগুলি সুন্দর কবিতা শুনাইয়াছিলেন। অধিকাংশ কবিতাই বিদ্যাপতির অনুসরণে রচিত, কিন্তু তাহাতে মৌলিকতার অভাব ছিল না। এই সকল কবিতা তাঁহার পিতার রচিত। সেই কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না জানি না।

যে বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস হয়—সেইবার রজনীকান্ত 'বাণী'র কাপি লইয়া কলিকাতায় ছাপিতে আসিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণের বাণীর ছাপা কাগজ ভাল ছিল না, আকারও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল। বাণী ও কল্যাণীর বর্ত্তমান প্রকাশক বাঙ্গালীর এই জাতীয় কবির চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্বরূপ পুস্তক দুইখানি যেরূপ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে ইহার বহিঃ-সৌন্দর্য্য ভিতরের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ হইয়াছে সন্দেহ নাই। রজনীকান্ত বড় যন্ত্রণায় অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু কোন দিন যন্ত্রণায় তিনি অধীর হন নাই। কথা কহিবার শক্তি ছিল না, লিখিয়া তাঁহাকে মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইত, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটিতে প্রাণের ভাষা ফুটিয়া উঠিত; যেন তিনি নীরব ভাষায় বলিতেন,—

"ওই, বধির যবনিকা তুলিয়া মোরে, প্রভু,
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।
ওপারে সবই ভাল, কেবল সুখ-আলো,
এপারে সবই ব্যথা আঁধার শোক।" (বাণী।)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজসাহীতে রজনীকান্তের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু, সখা, বয়স্য ছিলেন—আমাদের প্রিয়দর্শন সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায়।—অবিনাশবাবু রজনীকান্তের সম্বন্ধে অনেক কথা জানেন বলিয়া তাঁহাকে কিছু লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম; অবিনাশবাবু অধিক কিছু লেখেন নাই, কিন্তু যে কয়েক ছত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই রজনীকান্তের মধুর চরিত্রের এক অংশ উজ্জ্বল হইয়াছে। আমরা তাঁহার পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"রজনীদাদার সহিত ১৮৭৯ সাল হইতে আমার পরিচয়। সে আজ আটত্রিশ বৎসরের কথা। তখন আমি বালক। তিনি আমার বড় ছিলেন। কোন্ সালে তাঁহার জন্ম তাহা জানি না। তাঁহার চরিত্র কিরূপ মধুর ছিল, তাহার পরিচয় আপনাকে বিশেষ করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর, মিষ্টভাষী সদাশয় লোক আর দেখিয়াছি কি না স্মরণ হয় না। একবার তিনি আমাকে তাঁহার নিজ-বাড়ী পাবনা জেলার ভাঙ্গাবাড়ীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি বাড়ী যাইবার সময় গ্রামস্থ গরীব-দুঃখীদের জন্য রাজসাহী হইতে ৩০।৩২ খানি কাপড় লইয়া গিয়াছিলেন। তাহা তিনি স্ব-গ্রামের গরীব-দুঃখীদের বিতরণ করিয়া কি আনন্দ পাইয়াছিলেন, তাহা আমার প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। তিনি তখন জুনিয়ার উকীলমাত্র, তেমন অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না; তথাপি দীনদুঃখীর সাহায্যে বিরত থাকিতেন না। তিনি কোন প্রার্থীকে রিক্ত-হস্তে ফিরাইতে পারিতেন না। তিনি পারিশ্রমিক না লইয়া কত গরীবের মামলা করিয়া দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। তিনি আমাকে নিজ সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন,—কাহাকেই বা ভাল না বাসিতেন? যাহারা ভদ্রসমাজের উপহাসাস্পদ, ভদ্র সমাজে বসিবার অযোগ্য—তাহাদিগকেও তিনি ডাকিয়া আদর করিয়া কাছে বসাইতেন; কোন মানুষকে ঘৃণা করিতেন না। সমাজের দুর্নীতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, কিন্তু তাঁহার সেই রোদন হাসির আকারে আত্মপ্রকাশ করিত। 'কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ বিলক্ষণ!' প্রভৃতি বিদ্রূপপূর্ণ গানগুলির কথা স্মরণ করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

রজনীদাদা উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়াছিলেন। তিনিও সকলকে এক ভাবে দেখিতেন—তাঁহার নিকট ছোট-বড় ছিল না। আমি বাল্যকাল হইতে যৌবনের শেষ সীমা

পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়াছি, যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বলিতে পারি, রজনীদাদার মতন লোক সংসারে বিরল। দেখিয়াছি, গান রচনা করিতে-করিতে অনেক সময়ে তিনি ভাবের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিতেন। আমি তাঁহার বাসায় যাইতে বিলম্ব করিলে, তিনি আমাদের বাড়ী আসিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া গান গায়িতে বলিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিকট দিন-রাত্রির বাছবিচার ছিল না। তাঁহার গানগুলি আমি গায়িয়া তাঁহাকে না শুনাইলে তিনি তৃপ্তিলাভ করিতেন না। রজনীদাদার মৃত্যুর পর হইতে আমি গান গাওয়া একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি। আপনি ত জানেন, আমি তাঁহার নিকট সর্ব্বদাই গান গায়িতাম। এখনও রজনীদাদার কথা মনে হইলে আমি না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার জন্য অনেকেই কাঁদে। যাহারা তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছিল, তাঁহার বন্ধুত্বে মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহারা চিরজীবন তাঁহার জন্য দী[ir্ঘ] নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। আমি লিখিতে জানি না, স[ব] কথা গুছাইয়া বলিবার শক্তি নাই; আপনি রজনীদা[র] সঙ্গে অনেক দিন একত্র বাস করিয়াছেন, আপনি তাঁ[হার] সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিতে পারিবেন, অন্য কেহ ত[া] পারিবে না।"

কিন্তু রজনীকান্তের গুণের কথা বলিয়া ফুরায় ন[া।] তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই—এ দু[ঃখ] জীবনে ভুলিবার নহে। তিনি অকালে ইহলোক ত্য[াগ] করিয়াছেন - কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রতিভা অমর হই[য়া] থাকিবে। যতদিন তাঁহার 'বাণী' ও 'কল্যাণী' বর্ত্তম[ান] থাকিবে—ততদিন পূর্ব্ববঙ্গের 'কান্ত কবি'কে তাঁহ[ার] স্বদেশবাসী বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

শ্রীকান্তর ভ্রমণ-কাহিনী

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(৪)

কেরেন্টিন্ কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য,—ভদ্রলোকের জন্য নয়; এবং যে-কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশি দেয় নাই, সেই কুলি। চা-বাগানের আইনে কি বলে জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে। এবং, কর্ত্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কি জানেন তা তাঁরাই জানেন; কিন্তু অফিসিয়েলি তাঁহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সকলেই কুলি ছিলাম। সাহেবরা ইহাও জানেন যে, কুলির জীবন-যাত্রার সাজ-সরঞ্জাম এমন কিছু হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়, যাহা সে নিজে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং, ঘাট হইতে কেরেন্টিন্ যাত্রীদের জিনিসপত্র বহন করাইবার যে কোন ব্যবস্থাই নাই, তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবারও কিছু নাই। এ সকলই সত্য; তথাপি আমরা তিনটি প্রাণী যে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য, এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকা-রাশির উপরে, এক অপরিচিত নদীকূলে, এক রাশ মোট-ঘাট সুমুখে ল[ইয়া] কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে পরস্পরের মুখোমুখি চাহিয়া দাঁড়া[ইয়া] রহিলাম, সে শুধু আমাদের দুরদৃষ্ট। সহযাত্রীদের পরি[চয়] ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি। তাঁহারা যে-যাহার লোটা-কম্বল পি[ঠে] ফেলিয়া, এবং অপেক্ষাকৃত ভারি বোঝাগুলি তাঁহা[দের] গৃহলক্ষ্মীদের মাথায় উপরে তুলিয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে গ[ন্তব্য] স্থানে চলিয়া গেলেন। দেখিতে-দেখিতে 'রোহিণীদা[দা'] একটা বিছানার পুঁটুলিতে ভর দিয়া কাঁপিতে-কাঁপি[তে] বসিয়া পড়িলেন। জ্বর, পেটের অসুখ এবং চরম শ্রান্তি, এইগুলি এক করিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ, যে, চলা ত [দূ]রের কথা, বসাও অসম্ভব,—শুইয়া পড়িতে পারি[লে] তিনি বাঁচেন। অভয়া স্ত্রীলোক। রহিলাম শুধু আ[মি] এবং নিজের ও পরের নানা আকারের ছোট-বড় বোঁচ[কা-] বুঁচ্‌কিগুলি! অবস্থাটা আমার একবার ভাবিয়া দেখি[বার] মত বটে! অকারণে চলিয়াছি ত এক অজ্ঞাত, অপ্রীতি

ানে; এক স্কন্ধে ভর দিয়াছেন এক নিঃসম্পর্কীয়া নিরুপায়া ারী, অপর স্কন্ধে ঝুলিতেছেন তেম্‌নি অপরিচিত এক ্যাধিগ্রস্ত পুরুষ! মোট-ঘাটগুলা ত সব ফাউ! এই কলের মধ্যে ভীষণ রৌদ্রে আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া এক অজানা যায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। চিত্রটি ল্পনা করিয়া, পাঠক-হিসাবে লোকের প্রচুর আমোদ বোধ ইতে পারে; হয় ত বা, কোন সহৃদয় পাঠক এই নিঃস্বার্থ রোপকার-বৃত্তির প্রশংসা করিতেও পারেন; কিন্তু বলিতে জ্জা নাই, এই হতভাগ্যের তৎকালে সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে সহস্র ধিক্কার য়া মনে' হইয়াছিল, এত বড় গাধা ত্রিসংসারে কি ার কেউ আছে! কিন্তু পরমাশ্চর্য্য এই যে, এ পরিচয় আমার গায়ে লিখা ছিল না; তবে, এক-জাহাজ লোকের ধ্যে একদণ্ডেই অভয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল কি রিয়া? কিন্তু, আমার চমক ভাঙিল তাহার হাসিতে। মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল। এই হাসির চেহারা খিয়া শুধু আমার চমক্ নয়, তাহার ভয়ানক কষ্টটাও ইবার চোখে পড়িয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য ইয়া গেলাম—এই পল্লীবাসিনী মেয়েটির কথায়। কোথায় জ্জায়, কৃতজ্ঞতায় মাটির সহিত মিশিয়া গিয়া করুণা ভিক্ষা াহিবে, না হাসিয়া কহিল, "খুব ঠকেচেন—মনে করবেন না ান্। অনায়াসে যেতে পেরেও যে যান নি, তার নাম দান। তবড় দান করবার সুযোগ জীবনে হয় ত খুব কমই পাবেন, া' বলে রাখ্‌চি। কিন্তু সে কথা যাক্। জিনিস-পত্তর খানেই পড়ে থাক্, চলুন, এঁকে যদি কোথাও ছাওয়ায় কটু পৌঁছাতে পারা যায়।" বোঁচ্‌কা-বুঁচ্‌কির মমতা াপাততঃ ত্যাগ করিয়াই আমি 'রোহিণীদাদা'কে পিঠে রিয়া কেরেন্টিনের উদ্দেশে রওনা হইলাম। অভয়া ছোট কটি হাত-বাক্স মাত্র হাতে লইয়া আমার অনুসরণ করিল; ন্যান্য জিনিসপত্র সেইখানেই পড়িয়া রহিল। অবশ্য সে কল আমাদের খোয়া যায় নাই, ঘণ্টা দুই পরে তাহাদের ানাইয়া লইবার উপায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ কাল্পনিক পদের চেয়ে ঢের সুসহ। প্রথম হইতে ইহা স্মরণ থাকিলে, নেক দুশ্চিন্তার হাত এড়ানো যায়। সুতরাং কিছু-কিছু শ ও অসুবিধা যদিও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কেরেন্টিনের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের দিনগুলি আমাদের একপ্রকার ভালই কাটিল। তা' ছাড়া, পয়সা খরচ করিতে পারিলে যমের বাটীতেও যখন বড়-কুটম্বের আদর পাওয়া যায়, তখন এ তো মোটে কেরেন্টিন্! জাহাজের ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ forward; কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই স্ত্রীলোকটি যে কিরূপ 'বেশ forward' হইতে পারে, তাহা বোধ করি তিনি কল্পনাও করেন নাই। রোহিণীবাবুকে যখন পিঠ হইতে নামাইয়া দিলাম, তখন অভয়া কহিল, "হয়েছে, আর আপনাকে কিছু করতে হবে না শ্রীকান্তবাবু, এবার আপনি বিশ্রাম করুন, যা' করবার আমি করচি।" বিশ্রামের আমার যথার্থই আবশ্যক হইয়াছিল—পা'-দুটা শ্রান্তিতে ভাঙিয়া পড়িতেছিল; তথাপি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "আপনি কি করবেন?" অভয়া জবাব দিল, "কাজ কি কম রয়েচে? জিনিসগুলো আনাতে হবে, একটা ভাল ঘর জোগাড় করে আপনাদের দু'জনের বিছানা তৈরি করে দিতে হবে, রান্না করে যা হোক দুটো দুজনকে খাইয়ে দিয়ে তবে ত আমার ছুটি হবে তবে ত একটু বস্‌তে পাবো? না না, মাথা খান্ উঠবেন না; আমি এক্ষুণি সমস্ত ঠিকঠাক্ করে দিচ্চি।" একটু হাসিয়া কহিল, "ভাব্‌চেন, মেয়েমানুষ হয়ে একা এ-সব জোগাড় কোরবো কি কোরে, না?—তা' বৈ কি! আপনাদের জোগাড় করেছিল কে? সে আমি, না আর কেউ?" বলিয়া সে ছোট বাক্সটি খুলিয়া গুটিকয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া কেরেন্টিনের অফিস-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। সে পারুক আর না পারুক, আমি ত আপাততঃ বসিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই একজন চাপরাশি আমাদের ডাকিতে আসিল। রোহিণীকে লইয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরটি ভালই বটে। মেমসাহেব ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া লোক দিয়া সমস্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করাইতেছেন, জিনিসপত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে, দু'খানি খাটিয়ার উপর দুজনের বিছানা পর্য্যন্ত তৈরি হইয়া গিয়াছে। এক ধারে নূতন হাঁড়ি, চাল, ডাল, আলু, ঘি, ময়দা, কাঠ সমস্তই মজুদ। মাদ্রাজি ডাক্তারের সহিত অভয়া ভাঙা হিন্দিতে কথাবার্ত্তা চালাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই কহিল, "ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়ুন গে, আমি মাথায় দু ঘটি জল ঢেলে নিয়ে

এ-বেলার মত চারিটি চালে-ডালে খিচুড়ি রেঁধে নিই। ও-বেলা তখন দেখা যাবে।" বলিয়া গামছা এবং কাপড় লইয়া মেমসাহেবকে সেলাম করিয়া একজন খালাসিকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। অতএব ইঁহারই অভিভাবকতায় এখানের দিনগুলি যে আমাদের ভালই কাটিয়াছিল, তাহা বলায় নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় নাই।

এই অভ্যাসে আমি দুটা জিনিস শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় নিঃসম্পর্কীয় নর-নারীর ঘনিষ্ঠতা স্বতঃই দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায়; কিন্তু, ইহা সে কোন দিন ঘটিবার সুযোগ দেয় নাই। ইহার ব্যবহারের মধ্যে কি যে একটা ছিল, যাহা প্রতিক্ষণেই স্মরণ করাইয়া দিত, আমরা এক-যায়গার যাত্রীমাত্র। কাহারও সহিত কাহারও সত্যকার সম্বন্ধ নাই;—দুদিন পরে হয় ত সারা-জীবনের মধ্যেও আর কখনও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না। আর, এমন আনন্দের পরিশ্রমও কখনও দেখি নাই। সারাদিন আমাদের সেবার জন্যেই ব্যস্ত, সমস্ত কাজ নিজেই করিতে চায়। সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলেই হাসিয়া বলিত, "এ তো সমস্তই আমার নিজের কাজ। নইলে, রোহিণীদাদার-ই বা' এ কষ্টের কি আবশ্যক ছিল, আপনারই বা কি মাথা-ব্যথা পড়েছিল এই জেলখানায় আসতে। আমার জন্যেই ত আপনাদের এত দুঃখ।"

হয় ত, খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু গল্প হইতেছে, অফিসের ঘণ্টায় দুটা বাজিতেই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যাই আপনার চা তৈরি কোরে আনি—দুটো বাজল।"

মনে-মনে বলিতাম, 'তোমার স্বামী যত পাপিষ্ঠই হোন্, পুরুষ-মানুষ ত! যদি কখনো তাঁকে পাও, তোমার মূল্য তিনি বুঝিবেনই।' তার পরে একদিন মিয়াদ ফুরাইল। দাদাও ভাল হইলেন, আমরাও সরকারি ছাড়পত্র পাইয়া আর একবার পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া রেঙ্গুন যাত্রা করিলাম। কথা ছিল, সহরের মোসাফিরখানায় দুই-একদিনের জন্য আশ্রয় লইয়া একটা বাসা তাঁহাদের ঠিক করিয়া দিয়া তবে আমি নিজের জায়গায় যাইব; এবং যেখানেই থাকি, তাঁহার স্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহাকে একটা সংবাদ পাঠাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

সহরে যে দিন পদার্পণ করিলাম, সে দিনটি ব্রহ্মবাসীদে কি একটা পর্ব্বদিন। আর পর্ব্ব ত তাহাদের লাগিয় আছে। দলে-দলে ব্রহ্ম নর-নারী রেশমের পোষাক পরি তাহাদের মন্দিরে চলিয়াছে। রমণী-স্বাধীনতার দেশ, সুতর আনন্দ-উৎসবে তাঁহাদের সংখ্যাই অধিক। বৃদ্ধা, যুবতী বালিকা - সকল বয়সের স্ত্রীলোকই অপূর্ব্ব পোষাক-পরিচ্ছ সজ্জিত হইয়া হাসিয়া, গল্প করিয়া, গান গাহিয়া সমস্ত পথ মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের রঙ্ অধিকাংশই ফর্সা; মেঘের মত চুলের বোঝা ত শতকরা নব্বুই জ রমণীর হাঁটুর নীচে পড়ে। খোঁপায় ফুল, কাণে ফুল, গলা ফুলের মালা,—ঘোম্‌টার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটি পলাইবার আগ্রহাতিশয্যে হোঁচট্ খাইয়া উপুড় হইয়া প নাই,—দ্বিধা-সঙ্কোচলেশহীন—যেন, ঝরণার মুক্ত প্রবাহে মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নিজেদের দেশের তুলন মনে-মনে তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, 'এই চাই! এ নইলে আবার জীবন!' তাহাদের সৌভাগ্য সহসা যেন ঈর্ষার মত বুকে বাজিল। কহিলাম, 'এই ইহারা চতুর্দ্দিকে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সে কি অবহেলার জিনিস? রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই তাহাদের অষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করি দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! আমাদের মেয়েরাও য এম্‌নি একদিন—' হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া পিছ ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আজও আমার তেমনি স্প মনে আছে। বচসা বাধিয়াছে, ঘোড়ার গাড়ীর ভা লইয়া। গাড়োয়ান আমাদেরই হিন্দুস্থানী মুসলমান। কহিতেছে, চুক্তি হইয়াছিল আট আনা; আর তিনজন ভ ঘরের ব্রহ্মরমণী গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িয়া সমস্বরে চীৎক করিয়া বলিতেছেন, না, পাঁচ-আনা। মিনিট দুই-তি তর্কাতর্কির পরেই, বলং বলং বাহুবলং! পথের ধারে এক লোক মোটা-মোটা ইক্ষুদণ্ড খাদি করিয়া বিক্রী করিতেছি অকস্মাৎ তিনজনেই ছুটিয়া গিয়া তিনগাছা হাতে তুলি হতভাগ্য গাড়োয়ানকে একযোগে আক্রমণ করিলেন সে কি এলোপাথাড়ি মার! বেচারা স্ত্রীলোকের গা হাত দিতেও পারে না—শুধু আত্মরক্ষা করিতে এ

াটকায় ত ওর বাড়ী মাথায় পড়ে, ওকে আটকায় ত তার াড়ী মাথায় পড়ে। চারিদিকে লোক জমিয়া গেল,—কিন্তু া শুধু তামাসা দেখিতে। সে দুর্ভাগার কোথায় গেল পি-পাগ্‌ড়ি, কোথায় গেল হাতের ছপ্‌টি—আর সহ্য করিতে া পারিয়া সে রণে ভঙ্গ দিয়া 'পুলিশ! পুলিশ! পিয়াদা! পয়াদা!' চীৎকার করিতে-করিতে ছুটিয়া পলাইল। সবে াঙ্‌লা দেশ হইতে আসিতেছি, তাও আবার পাড়াগাঁ ইতে! কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—কাণে শুনিয়াছি, াথে দেখি নাই। কিন্তু, স্বাধীনতা পাইলে ভদ্র-ঘরের 'অবলা'রাও যে একটা জোয়ান-মদ্দ পুরুষ-মানুষকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর আক্রমণ করিয়া, লাঠি-পেটা করিতে পারে, —ক্রমশঃ এতখানি 'সবলা' হইয়া উঠার সম্ভাবনা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিলাম। মনে-মনে কহিতে লাগিলাম, 'স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল কিম্বা মন্দ, সমাজে আনন্দের মাত্রা ইহাতে বাড়ে কিম্বা কমে—এ বিচার আর একদিন করিব; কিন্তু, আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল।'

মহারাজা স্বামিদাসের তাম্রশাসন

[অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-আর-এস্]

লিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ম্মাইকেল অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় এই তাম্রশাসনখানি াঠ করিবার নিমিত্ত আমাকে দিয়াছেন। ইন্দোর রাজ্যের ক ব্রাহ্মণের নিকট তিনি ইহা প্রাপ্ত হন। ইহা সম্ভবতঃ ধ্যভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এই তাম্র- াসনখানির আবিষ্কার সম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ জানা য় না।

তাম্রশাসনখানির পরিমাণ ৪১⁄১৬"×৭৮"। ইহার এক ার্শ্বে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। লিপিখানির পংক্তি-সংখ্যা এবং প্রত্যেক অক্ষরই বেশ স্পষ্ট। অক্ষরের পরিমাণ " হইতে ১⁄৬"

লিপিখানি গদ্যে লিখিত। ইহার ভাষা সংস্কৃত। নেক স্থানে ব্যাকরণের দোষ আছে; যথা—দ্বিতীয় পংক্তিতে ঃ' স্থানে 'ব'; তৃতীয় পংক্তিতে "সমনুজানীয়াস্মি" স্থানে জানীয়োস্মি"; পঞ্চম পংক্তিতে "পুত্র পৌত্রান্বয়" স্থানে পৌত্র স্বয়" "অন্যাস্মাভিঃ কৃতঃ" স্থানে "অন্যস্মাভি তঃ" এবং "ইদানীং" স্থানে "ইদানিং"; ষষ্ঠ পংক্তিতে ভুক্তঃ" স্থানে "ভুক্ত" এবং সপ্তম পংক্তিতে "কৃষাপয়তশ্চ" ানে "০ পয়তশ্চঃ" ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় পংক্তিতে াকৃত "সত্তক" শব্দের প্রয়োগ আছে।

'বানান' সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য:—(১) 'র' এর সহিত সংযুক্ত ধ স্থানে দ্ধ (পাদানুদ্ধ্যাতো—১ম পংক্তি); (২) 'র'এর সহিত সংযুক্ত 'ব' ও 'য'এর দ্বিত্ব (৭ম পংক্তি)— "সর্ব্বৈরেব" ৪র্থ পংক্তি আর্য্য=কিন্তু ৪—৫ পংক্তির "চন্দ্রার্ক" শব্দে 'ক'এর দ্বিত্ব হয় নাই; (৩) বিসর্গের পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তী ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব। (৫ম পংক্তিতে অস্মাভিকৃতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ কিন্তু সপ্তম পংক্তির "০তুল্যাদিভিস্‌সমনুমন্তব্যং শুদ্ধ পদ) (৪) মূর্দ্ধণ্য 'ণ'এর পরি- বর্ত্তে দন্ত্য 'ন' (৩য় পংক্তি ব্রাহ্মনস্য চতুর্থ পংক্তি 'বানিজক') এই লিপির অক্ষরগুলি দাক্ষিণাত্যের অক্ষর শ্রেণীভুক্ত গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাঁচিলিপির (১) অক্ষরের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই দুই লিপির অক্ষরগুলি তুলনা করিলে দেখা যায় যে ত, থ, প, ম, ল এবং ঈকার ভিন্ন, উভয়ের অন্যান্য অক্ষরগুলি ঠিক এক প্রকারের। সাঁচি লিপিতে দুই প্রকারের 'ত' দেখা যায়। একটি সরল রেখার নিম্নে দুইটি কোণাকুণি রেখা টানিয়া এক প্রকার 'ত' লিখিত হইয়াছে (যেমন প্রথম পংক্তির 'ভাবিতেন্দ্রিয়ায়' এই শব্দে) এবং একটি কোণাকুণি রেখার মধ্যস্থল হইতে নিম্নমুখী আর একটি কোণাকুণি রেখা টানিয়া আর একপ্রকার 'ত' লিখিত হইয়াছে (যেমন

(১) "Fleet—Gupta Inscriptions—"—৫ সংখ্যক লিপি

তৃতীয় পংক্তির ([illegible] ‘আপ্যায়িত’ এই দুই শব্দে এবং চতুর্থ পংক্তির ‘পতাক’ এই শব্দে)। আলোচ্য লিপিখানিতে কেবলমাত্র এই শেষোক্ত প্রকারের ‘ত’ পরিলক্ষিত হয়। ইহা বলভী লিপিসমূহ ও রাজা দ্রহ্রসেনের পার্দি লিপিতে ব্যবহৃত ‘ত’এর অনুরূপ।

আলোচ্য লিপির ‘থ’-ও সাঁচি-লিপির ‘থ’এর ন্যায় ঠিক গোলাকার নহে। ইহার ‘প’ ও ‘ল’ সাঁচি-লিপির ‘প’ ও ‘ল’এর অনুরূপ হইলেও তাহা অপেক্ষা প্রাচীন। সাঁচি লিপিতে ‘ই’কার জ্ঞাপক বৃত্তের মধ্যে, ছোট একটি ‘কমা’র চিহ্নের ন্যায় চিহ্ন দিয়া ঈকার বুঝান হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য

‘মহারাজ’ এবং ‘পরমভট্টারকপাদানুধ্যাতঃ” এই দুই উপাধি হইতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, স্বামিদাস একজন সামন্ত রাজা মাত্র ছিলেন। লিপিখানির তারিখ ‘৬৭ বর্ষ’; কোন অব্দের উল্লেখ নাই। ইহা মহারাজ স্বামিদাসের রাজ্য-সংবৎ, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে; কারণ, লিপির শেষ ভাগে কেবলমাত্র ‘বর্ষ’ কথার দ্বারা রাজ্য-সংবৎ সূচিত করা হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, প্রত্নলিপিতত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে লিপিখানি সাঁচি-লিপির সমসাময়িক অথবা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। সাঁচি লিপির তারিখ ৯৩ গোপ্তাব্দ; সুতরাং আলোচ্য লিপির

মহারাজ স্বামিদাসের তাম্রশাসন

লিপিতে ‘ই’কার জ্ঞাপক ‘বৃত্তে’র শেষ অংশে আর একটি অর্দ্ধবৃত্ত গঠিত করিয়া ঈকার চিহ্ন বুঝান হইয়াছে।

প্রাচীনতম বলভী লিপির (২) সহিত আলোচ্য লিপিখানির তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার ‘ল’ ‘ম’ ‘জ’ ‘ব’ ‘ব’ ‘ছ’ ‘চ’ ‘দ’ এবং ‘রফলা’ নিঃসন্দেহে পূর্ব্বোক্ত লিপির উল্লিখিত অক্ষরগুলি অপেক্ষা প্রাচীন। অতএব প্রত্নলিপি-তত্ত্বের প্রমাণ অনুসারে আলোচ্য লিপিখানিকে সাঁচি-লিপির সমসাময়িক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

লিপিখানি মহারাজ স্বামিদাসের রাজ্যকালে লিখিত। তারিখ ‘৬৭ গোপ্তাব্দ’—ইহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই অনুমান সত্য হইলে, আলোচ্য তাম্রশাসনখানিই আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীনতম তাম্রশাসন।

আলোচ্য লিপিখানি দ্বারা মহারাজ স্বামিদাস জনৈক ব্রাহ্মণের ‘ব্রহ্মদেয়’ অনুমোদন করিয়াছেন। ‘ব্রহ্মদেয়’ জিনিষটি কি, তাহা জয় বর্ম্মণের কোণ্ডমুদি শাসন (৩) হইতে জানা যায়। ইহা একপ্রকার ভূমি দান; কিন্তু সাধারণ দান অপেক্ষা ইহাতে কয়েকটি বিশিষ্ট সুবিধা ও অধিকার লাভ হয়।

আলোচ্য লিপিখানির প্রথম শব্দটি ‘বলখা’; ইহার

(২) Ep. Ind. XI—১০৬ পৃঃ

(৩) Ep. Ind. VI. পৃঃ ৩১৬

কোন বিশদ অর্থ নিরূপণ করিতে পারি নাই। অনুমান হয়, 'ইহা স্থানবিশেষের নাম, এবং এই স্থান হইতেই মহারাজ এই তাম্র-শাসনখানি দান করিয়াছেন। এই শব্দের পর একটি 'ৎ' যোগ করিয়া 'বল্থাৎ পরম-ভট্টারক' ০' এইরূপ পাঠ করিলেই উল্লিখিত অর্থ সুস্পষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় পংক্তির 'সন্তক' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাকৃত শব্দ। রাজা দহ্রসেনের পার্দিলিপি এবং বাকাটক রাজগণের লিপিতে (৪) এই 'সন্তক' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দিব্যাবদানে এবং জাতকে এই শব্দটির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রথ ও বোট্‌লিং (৫) ইহাকে 'অস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়াছেন, এবং ইহার 'সম্বন্ধ' ও অধিকার-সূচক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পংক্তির 'যুক্তক' শব্দটিও সংস্কৃত অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন কালের, বিশেষতঃ রাষ্ট্রকূট রাজগণের তাম্রশাসনে ইহার বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তৃতীয় ইন্দ্ররাজের বাগমুরা শাসন (৬) এবং 'চতুর্থ গোবিন্দের ক্যাম্বে শাসন (৭)' এর উল্লেখ করা যাইতে পারে।—এই দুইখানি লিপির সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর 'যুক্তক' শব্দের 'রাজ-কর্ম্মচারী' অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অশোক-লিপিতে ব্যবহৃত 'যুত' শব্দ এই 'যুক্তক' হইতে নিষ্পন্ন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও যুক্তক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

লিপিখানির ষষ্ঠ পংক্তির কোন অর্থই হয় না। আর ইহা যে ভ্রমপূর্ণ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ এই পংক্তি যে ভাবে আছে, তাহাতে 'কৃতঃ' স্থানে 'কৃতং' হইবে এবং 'ন কস্তোচিত' এই পদে 'ক'এর পূর্ব্বে জিহ্বামূলীয়ের কোন আবশ্যকতা নাই। আমার নিকট আর একখানি তাম্রশাসন আছে তাহার পদগুলিও এই লিপির পদের অনুরূপ। ইহাতে আলোচ্য স্থানে 'কৃতামুজ্ঞস্তো' এই পদ আছে। এই লিপির 'কৃতঃ ন কস্তো' পদের পরিবর্ত্তে 'কৃতামুজ্ঞস্তো' পাঠ করিলে পরিষ্কার অর্থ হয়; এবং আমার মনে হয়, ইহাই প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ পাঠ। এইরূপ, আলোচ্য লিপির সপ্তম পংক্তির "সর্ব্বৈরেবাস্ম পক্ষতক্কুল্যাদিভিঃ" এই পদের কোন অর্থ হয় না; কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত অন্য তাম্রশাসনখানিতে আছে সর্ব্বৈরেবাস্মৎ-পক্ষীয়ৈঃ"—ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, উক্ত পদটি "সর্ব্বৈরেবাস্মৎপক্ষ তত্কুল্যাদিভিঃ" এইরূপ পরিবর্ত্তিত আকারে পাঠ করিতে হইবে।

এই লিপিতে দুইটি স্থানের উল্লেখ আছে, যথা "নগরিকা পথকে দক্ষিণ বল্মিক তল্লবাটকে"।—মহারাজ সংক্ষোভের বেতুল শাসনে (৮ প্রস্তরবাটক গ্রামের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত হীরালাল এই লিপি সম্পাদন কালে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালে যে গ্রামের নামের শেষে 'বারা' বা 'ওয়ারা' দেখিতে পাওয়া যায় (যেমন গুলওয়ারা, মুরওয়ারা, কৈলওয়ারা প্রভৃতি) তাহা এই 'বাটক' হইতে নিষ্পন্ন। সুতরাং আলোচ্য লিপির 'দক্ষিণ বল্মিক তল্লবাটক' একটি গ্রামের নাম বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

'পথক' শব্দটি সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায় না—কিন্তু পরমার রাজ-ভোজদেবের উজ্জয়িনী-শাসনে, (৯) এবং দ্বিতীয় জয়বর্ম্মণের মান্ধাতা-শাসনে (১০) ইহা বর্ত্তমান 'জিলার' ন্যায় প্রদেশের একটি বিভাগরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই লিপির 'নগরিকা পথকে' এই পদের 'নগরিকা জিলার অন্তর্গত' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

পরিশেষে দ্রষ্টব্য যে, এই লিপিতে দানপত্রের যেরূপ মুসাবিদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রাষ্ট্রকূট রাজগণের দানপত্রের অনুরূপ। আলোচ্য লিপির দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম পংক্তির সহিত তৃতীয় ইন্দ্ররাজের বাগমুরা শাসনের (১১) ৫৬ ও ৫৭ সংখ্যক পংক্তির তুলনা করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে।

(৪) Fleet's Gupta Inscriptions ৫৫ ও ৫৬ সংখ্যক লিপিদ্বয়।

(৫) St. Petersburgh Dictionary.

(৬) Ep. Ind. IX ২৪ পৃঃ।

(৭) Ep. Ind. VII—৩৯ পৃঃ।

(৮) Ep. Ind. VIII—পৃঃ ২৮৫—২৮৭।

(৯) Ind. Ant. VI—৫৩ পৃঃ।

(১০) Ep. Ind. IX. ১২১ পৃঃ।

(১১) Ep. Ind. IX. ৩৬—৩৭ পৃঃ।

পূর্ব্বলিপির পাঠ (১২)

১। বল্‌খা (১৩) পরম ভট্টারক পাদানুদ্ধ্যাতো
মহারাজ শ্রী স্বামিদাসঃ সমাজ্ঞা

২। পয়তি সর্ব্বা (১৩ক) নেবাস্মৎসন্তকানাযুক্ত-
কাদ্বিজ্ঞাতমস্তব (১৪) সমনুজ্ঞা-

৩। নীয়োস্মি (১৫) শাণ্ডিল্য সগোত্র মুণ্ড
ব্রাহ্মণস্য (১৬) নগরিকা পথকে দক্ষিণ

৪। বল্মিকতল্লবাটকে আর্য্যবানিজক (১৭)
প্রত্যয়ক্ষেত্রপদং ব্রহ্মদেয়মাচন্দ্রা

৫। র্কতারক কালীয়ং পুত্রপৌত্রন্বয় (১৮) ভোজ্যং
ভোগায়ৈবমিদানিমস্যস্মা (১৯)

৬। ভিক্কৃতঃ (২০) ন হকস্তোচিতয়া ব্রহ্মদেয়
ভুক্ত্যা ভুঞ্জত (২১) কৃষতঃ কৃষা

৭। পয়তশ্চঃ (২২) সর্ব্বৈরেবাস্মপক্ষ (২৩)
তক্তুল্যাদিভিস্সমনুমন্তব্যং (২৪)

৮। নন্নভট্টি দূতকঃ বর্ষে ৬০, ৭ জ্যেষ্ঠ শু ৫

(১২) নিম্নে লিপিখানি অবিকল উদ্ধৃত হইল। যে যে স্থলে ভুল আছে, পাদটীকায় তাহা সংশোধন করা গেল।

(১৩) 'বল্‌খাৎপরম॰' (১৪) বঃ (১৫) '॰নীয়াস্মি' (১৬) 'ব্রাহ্মণস্য' (১৭) 'বাণিজক' (১৮) 'পৌত্রান্বয়' (১৯) 'ইদানীমস্যা॰' (২০) '॰কৃতা-নুজ্ঞস্তো॰' (২১) ভুঞ্জতঃ (২২) 'শ্চ' (২৩) '॰স্মৎপক্ষ' (২৪) 'তত্তুল্যা-দিভি॰'।

(৯) (তাম্রশাসনের একপার্শ্বে উল্লিখিত পংক্তিগুলির সমকোণে) মহারাজ শ্রীস্বামিদাসস্য—

অনুবাদ

বল্‌খা নগরী হইতে পরম ভট্টারক পাদানুধ্যাত মহারাজ শ্রীস্বামিদাস যুক্তক প্রভৃতি সমুদায় অমাত্যগণকে আদেশ করিতেছেন তোমাদিগকে এতদ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে নাগরিকা জিলার অন্তর্গত, দক্ষিণবল্মিক তল্লবাটক গ্রামস্থিত আর্য্য নামধারী বণিকের অধীনস্থ (২৫) একখণ্ড ভূমি যে শাণ্ডিল্য গোত্রসম্ভূত মুণ্ড ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মদেয় রূপে দান করা হইয়াছে আমি তাহার অনুমোদন করিতেছি। উক্ত ব্রাহ্মণ, পুত্র পৌত্রাদিক্রমে যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর এই ভূমিখণ্ড উপভোগ করিবেন। তিনি আমাদের অনুমতি-ক্রমে এবং ব্রহ্মদেয়ের নিয়ম অনুসারে এই ভূমিখণ্ড উপভোগ করিবেন, কর্ষণ করিবেন অথবা কর্ষণ করাইবেন, ইহা আমাদের পক্ষীয় অথবা তত্তুল্য অপর কেহ (অর্থাৎ যাহারা ভবিষ্যতে রাজ অমাত্য হইবেন) সকলেই অনুমোদন করিবেন দূতক নন্নভট্টি বর্ষ ৬৭ জ্যৈষ্ঠমাস শুক্লপক্ষ ৫ম দিন। (পার্শ্বে) মহারাজ শ্রীস্বামিদাসের

(২৫) 'প্রত্যয়' অর্থ অধীনস্থ জমি। Fleet—Gupta Inscriptions.

(১৩ক) অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় অনুমান করেন যে, এই স্থলে "অস্মৎ সন্তকানাযুক্তকান-বিজ্ঞাপিতমস্তু" এইরূপ পাঠ ধরিতে হইবে।

কোনারক

[শ্রীগুরুদাস সরকার এম্-এ]

প্রাতঃকালে অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমরা উহা গ্রাহ্য না করিয়া, সকলে মিলিয়া মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। মিত্র মহাশয় ক্যামেরা ও ফিতা লইয়া বেদীর নক্সা ও মন্দিরের আলোক-চিত্র গ্রহণে ব্যস্ত রহিলেন। মন্দিরের উপরিভাগ পিরামিডাকৃতি। মরুর সহিত পিরামিড বা তৎসদৃশ আয়তনবিশিষ্ট দেব-মন্দির বা সমাধি-সৌধের কি সম্বন্ধ আছে, জানি না; তবে ভাবুক হয় ত বলিবেন যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে বাস্তু-শিল্পের ইহাই স্বাভাবিক স্ফুরণ। যাঁহারা মরুমধ্যস্থ গীজে (Gizeh) পিরামিডের চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন, মরুমধ্য হইতে মন্দির-চূড়ার সৌন্দর্য্য তাঁহারা নিশ্চয়ই ভালরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। এ স্থলে law of association কতদূর কার্য্যকরী হইয়া থাকে, তাহা মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণই বলিতে পারেন। পথের অসুবিধা ও দূরত্বের কথা স্মরণ করিয়া কাহার-কাহারও মনে হইল,—সুদৃশ্য মন্দিরই যদি নির্ম্মাণ করা উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে একটু কাছে সুবিধা-জনক স্থান দেখিয়া নির্ম্মাণ করিলে কি'ই বা ক্ষতি হইত? আমাদিগের ন্যায় "গোলা" লোকের মনে এরূপ ভাবের উদয়

হইতে পারে ; কিন্তু যিনি ললিত-কলায় পারদর্শী, এবং সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা ও উপাসক, তিনি কখনই ইহার প্রশ্রয় দিবেন না। কবীন্দ্র সার রবীন্দ্র তাঁহার আমেরিকার বক্তৃতায় ললিত-কলা সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি কোনটি সাগর-সরিৎ-সঙ্গমে, কোনটি গিরি-শিখরস্থ চিরন্তন তুষার-মধ্যে, কোনটি বা জনশূন্য সমুদ্রকূলে অবস্থিত। এই সকল স্থানে অনন্তের ছায়া স্বতঃই প্রতীয়মান হয়, এবং মানব-হৃদয়ও ইহা বিশেষ-রূপে অনুভব করিতে পারে ; তাই মানব তথায় তাহার নিজ-কৃত প্রতিমূর্ত্তি, মন্দির ও সুন্দর খোদিত প্রস্তরফলক সমূহে যেন লিখিয়া রাখিয়াছে,—'আমার কথা শ্রবণ কর ;—আমি অমৃত পুরুষের সন্ধান পাইয়াছি।' মানবের ব্যক্তিত্বের যতই বিকাশ হয়, ততই সেই আলোক অধিক দূরে ছড়াইয়া পড়ে। যতই লুক্কায়িত কোণগুলি সে আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শিল্পরাজ্যও ততই তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া অজ্ঞাত দেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে। তাই শিল্প সৌন্দর্য্যের নিদর্শন দ্বারা তাহার জগৎ-জয়ের বারতা জ্ঞাপন করিতেছে ; তাই যে সকল স্থানে কোন শব্দ শ্রুত হয় না, কোনও বর্ণই নয়ন-গোচর হয় না সেখানেও এই নিদর্শন-গুলি বিরাজমান রহিয়াছে।

"মরু-অধিষ্ঠাতৃ শক্তিও মানবের সহিত আত্মীয়তা অস্বীকার করিতে পারে নাই ; তাই জনহীন পিরামিডগুলি মানব-প্রকৃতির নিস্তব্ধতার সহিত জড়-প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মিলন যেন স্পষ্টই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। গুহা-নিহিত অন্ধকারও তাই মানবাত্মাকে শান্তিসুখ দান করিয়াছে, ও তদ্বিনিময়ে শিল্পের মোহন মালায় নিজ শির অলঙ্কৃত করিয়াছে। (Tagore's Personality—What is Art ; p. 28-29 & 32)।

"এ ত গেল দর্শন, কাব্য ও ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাপার। কিন্তু এত কষ্ট করিয়া গন্তব্য স্থানে পঁহুছিয়া শুধু এ আলোচনায় কাল কাটাইলে ত চলিবে না ; কারণ, ফিরিবার সময় পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত হইয়া গেছে। তাই চটপট বন্ধুজন সঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া গম্বুজের প্রথম স্তর পর্য্যন্ত আরোহণ করিলাম। সেখান হইতেই সমুদ্রের শ্বেত-ফেন-শীর্ষ তরঙ্গমালা স্পষ্টই দেখা যাইতে লাগিল। অপর দুইটি উচ্চ স্তরে উঠিবার উপায় নাই ; তাই উপরিস্থ মূর্ত্তিগুলি দেখিতে-দেখিতে স্তরটি প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নে অবতরণ করিলাম।

এখন যাহা কোনারকের মন্দির বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত, তাহা দেব-মন্দিরের জগমোহন নামক অংশমাত্র। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের জগমোহনের সহিত কোনার্ক মন্দিরের জগমোহনের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে ; কেবল তফাৎ এই যে, উপরিভাগে, গম্বুজ অংশে, দুইটির বদলে তিনটি থাক্। প্রথম দুইটি থাকে ছয়টি করিয়া কার্ণিশ এবং তৃতীয় থাকটিতে পাঁচটি মাত্র কার্ণিশ। নিম্নের শেষ কার্ণিশ দুইটি যে কি সুন্দর ভাবে খোদিত, তাহা আর বলিবার নহে। ফার্গুসন (Ferguson) কোণগুলির গঠনপ্রণালী ও ছেদ-ভেদাদি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, সুষ্ঠুতা ও সুবিবেচনায় কোনও যবন (য়ুনানী) শিল্পীও ইহা অপেক্ষা অধিক কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইত না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, কার্ণিসের ফাঁকে ও জোড়ের মুখে প্রায়ই সীসক দৃষ্ট হইয়া থাকে। মন্দিরের যে অংশে সূর্য্য-মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই ভূপতিত হইয়াছে। সূর্য্য-মূর্ত্তিও অন্তর্হিত,—মাত্র বেদীটি যথাস্থানে অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে। ক্লোরাইট পাথরের এই বেদীটি, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের মতে, কলিঙ্গ তক্ষণ-শিল্পের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৭' ফিট, প্রস্থে ৯ ফিট। বেদীর গাত্রে সূর্য্যদেব-সম্মুখীন ব্যাধি-নির্ম্মুক্ত শাম্বের একটি সুন্দর চিত্র আছে। প্রবাদ এই যে, কৃষ্ণকুমার শাম্ব যে সূর্য্য-মূর্ত্তি পূজা করিয়া কুষ্ঠ-ব্যাধি-মুক্ত হইয়াছিলেন, কোনারকে সেই সূর্য্য-মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বন্ধুবর হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর উপরকার মাপ প্রভৃতি লইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (Vide Modern World, July, 1913) যে, এই গর্ভগৃহের সূর্য্য-মূর্ত্তিই পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে ; এবং ইহার সহিত অপর যে মূর্ত্তিটি রক্ষিত হইয়াছে, তাহা ইন্দ্রদেবের নহে,—চন্দ্রের মূর্ত্তি। যেহেতু নবগ্রহ প্রস্তরে অঙ্কিত সোম (চন্দ্র)-মূর্ত্তির সহিত ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে ; এবং উপবীত-ধারণ-ভঙ্গীও ঠিক একই প্রকারের। মূর্ত্তিটির হাত নাই ; নতুবা, ধ্যানমন্ত্র হইতে চিনিয়া লওয়ার সুবিধা হইত। প্রবাদ আছে, কোনার্ক মন্দিরে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রদেবও পূজিত হইতেন। কেহ-কেহ বলেন, কোনারকের ভোগ-মন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্য-

মূর্ত্তিটিরই পূজা হইত। এ মূর্ত্তিটির কিন্তু চক্ষুদান সমাপ্ত হয় নাই; সুতরাং শাস্ত্রমতে এরূপ মূর্ত্তি পূজিত হওয়া সম্ভব নহে—আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন কোনারকে গমন করেন, সে সময়ে মন্দিরের নিম্নদেশে খোদিত রথচক্রগুলি বালুকায় প্রোথিত ছিল; এখন সরকারী পূর্ত্ত-বিভাগের যত্নে বালুকা অপসারিত হইয়াছে, মন্দিরের কিয়দংশ মেরামত করা হইয়াছে; এবং যাহাতে গম্বুজটি না পড়িয়া যায়, সেই জন্য মন্দিরের দ্বার-কয়টি সম্পূর্ণরূপে গাঁথিয়া দিয়া ভিতরকার অংশ বালুকা ও প্রস্তর-খণ্ডে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। মন্দিরের গাত্রে যে বিচিত্র কারুকার্য্য দেখিলাম, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, কোনারকের মন্দির কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দিরেরই অনুরূপ। আইন-ই-আক্‌বরীর গ্রন্থকার বোধ হয় আত্মক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন; কারণ, মার্ত্তণ্ড-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের যে চিত্র দেখা যায়, তাহার সহিত কোনারক মন্দিরের বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না (Vide engraving on p. 260, Ferguson's History of India & Eastern Architecture)। সুপ্রসিদ্ধ স্থপতি-বিদ্যাবিৎ ফার্গুসন (Ferguson) সাহেব বলিয়াছেন যে, অন্ততঃ, আয়তনের হিসাবে এরূপ বহিঃ-কারুকার্য্য-খচিত মন্দির জগতে আর একটি নয়ন-গোচর হয় না।

কোনারকের মন্দির বিন্যাস-সামঞ্জস্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ভিন্সেন্ট স্মিথ প্রভৃতির মতে ইহাই মধ্যযুগের ওড্র শিল্পকলার শেষ অভিব্যক্তি। কোনারকের সৌন্দর্য্যের তুলনায় পুরী-মন্দিরের অপকৃষ্টতর শিল্প-নিদর্শনে অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকেন। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেরূপ একবার শেষ মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, উৎকল-দেশীয় ললিত-কলাও সেইরূপ এই সূর্য্য-মন্দিরে উজ্জ্বলে-মধুরে মিশিয়া চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। মন্দিরের চারি পার্শ্বে তিন থাক করিয়া বারটি কার্ণিশ আছে। তাহার ধারে-ধারে শিকার, শোভাযাত্রা প্রভৃতি সংসারের দৈনন্দিন কার্য্য ও আমোদ-প্রমোদের কতই যে ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। কার্ণিশের এই আলসেগুলি ১ ফুট হইতে ১৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চওড়া, এবং লম্বায় প্রায় ৩০০০ ফিট হইবে। ফার্গুসন অনুমান করিয়াছেন, যে মন্দিরের শুধু এই সামান্য অংশে অন্যূন ৬০০০ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দির বা জগমোহনটি উচ্চে প্রায় ১৪০ ফিট। কৃষ্ণদেউল নামে অভিহিত হইলেও, ইহা কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত নহে; Sandstone বা বালিয়া পাথরই ইহার প্রধান উপকরণ; তবে কারুকার্য্য-সমন্বিত দরজার চৌকাঠ ও মন্দিরগাত্রস্থ চিত্রাদির মধ্যে কতকগুলি মুগি বা কাল ক্লোরাইট এবং granitiferous gneiss পাথরে খোদিত। দূর হইতে মন্দিরাগ্রভাগ কাল দেখায় বলিয়া, কিম্বা এই সকল কারুকার্য্য-সমন্বিত কৃষ্ণ-প্রস্তরখণ্ডগুলির সমাবেশের জন্য দেউলের Black pagoda নামকরণ হইয়া থাকিবে; বোধ হয় বিভিন্নতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই য়ুরোপীয় নাবিকগণ পুরীর জগন্নাথের মন্দিরকে শ্বেত-দেউল বা white pagoda নামে অভিহিত করিয়া থাকে। দুইটি মন্দিরই সমুদ্রগামী পোত হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অর্ক-মন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ প্রধান প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি গজারূঢ় সিংহমূর্ত্তি এবং উত্তর ও দক্ষিণদিকস্থ অপর দুই দ্বারের পার্শ্বে শুণ্ড দ্বারা নরদেহ উত্তোলনকারী গজ এবং যোদ্ধৃ-মূর্ত্তিসহ সজ্জিত সুন্দর অশ্বাদি সংস্থাপিত ছিল; স্থানচ্যুত হওয়ায় এক্ষণে তাহাদের কতকাংশ মন্দিরপ্রাঙ্গণে রক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে দ্বাররক্ষক প্রস্তর-বিনির্ম্মিত জীবমূর্ত্তিগুলি যেরূপ ইতস্ততঃ স্থানান্তরিত,—সিংহদ্বার, হস্তীদ্বার ও অশ্বদ্বার নামে অভিহিত এই দ্বার-তিনটিও সেইরূপ চিরকালের নিমিত্ত রুদ্ধ হইয়াছে। উপরে যে সিংহমূর্ত্তি ছিল, তাহা পূর্ব্বদিকের সোপানপার্শ্বে স্থান পাইয়াছে। মন্দিরটি সূর্য্যদেবের রথের আকারে পরিকল্পিত। সর্ব্বসমেত আটটি চক্র; প্রত্যেকটির ব্যাস ৯ ফিট ৮ ইঞ্চি। এই রথচক্রগুলির ভিতরও যে বহু খোদাই কাজ রহিয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। কত ধৈর্য্যের সহিত ও কত অক্লান্ত পরিশ্রমে এগুলি তক্ষিত হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। শুনা যায়, পুরী ও ভুবনেশ্বর তীর্থের ন্যায় কোনারকেও রথযাত্রা প্রচলিত ছিল। সেইজন্য কেহ-কেহ এটিও কোনও প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া অনুমান করেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি সুধিগণের মতে পুরীর রথযাত্রা প্রাচীন বৌদ্ধ রথযাত্রা উৎসবেরই অনুকরণমাত্র।

দেখিলাম, মন্দিরের নিম্নতম অংশে একসারি হস্তীর চিত্র। এই সুদীর্ঘ আলম্বনগুলি কেবল "একঘেয়ে" ভঙ্গীরই পুনরাবর্ত্তন নহে; প্রত্যেক চিত্রেরই যেন বেশ জীবন্ত ভাব। গজশ্রেণীর লীলাঙ্কিত গতি শিল্পীর পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচায়ক। আমরা উচ্চে যে স্তর পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলাম, সেখানে কয়েকটি ব্রহ্মামূর্ত্তি এবং বীণা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদন-নিরতা রমণীমূর্ত্তি সন্নিবিষ্ট আছে। মন্দির-গাত্রে কারুকার্য্যের অন্ত নাই। নৃত্যশীলা রমণীমূর্ত্তি-গুলির ভঙ্গী বড়ই মনোহর। অনেক অভিজ্ঞ ইংরেজ সমালোচক ইহাদিগের delicious pose বা সুঠাম ভঙ্গীর প্রশংসা করিয়াছেন। এক-একটি মূর্ত্তি হস্তপদাদির স্বাভাবিক বিন্যাসে স্বভাবতঃই গ্রীক্ শিল্পীগণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কাল পাথরে খোদাই-করা মন্দিরের দুই দ্বারে সুন্দর Scroll-work বা লতাদির আবর্ত্তন। তাহার মধ্যে-মধ্যে অনেকগুলি cupid বা cherub-এর ন্যায় ক্রীড়ারতা শিশুমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই চিত্রের সৌন্দর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দিরেও এইরূপ একটি আবর্ত্তিত লতার ভিতর কতকগুলি দেবশিশু অঙ্কিত দেখিয়াছি। পুরীর মন্দিরের জগমোহনের গাত্রে আর একটি সুন্দর বল্লরীর খোদিত চিত্র দেখিয়া-ছিলাম; কিন্তু উহাতে সুন্দর শিশুমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কতকগুলি বানরের ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই চিত্রটিও সুন্দর। নিপুণ শিল্পী বানরমূর্ত্তি অঙ্কনে যথেষ্ট শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

এক স্থানে মন্দিরসংলগ্ন দুইটী কৌতূহলজনক চিত্র দেখিলাম। প্রথমটি বোধ হয় শিকারের চিত্র। বৃক্ষতলে গজারূঢ় ধনুকধারী মূর্ত্তি। পশ্চাতে পরিচারক মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। মাহুতটিকে স্ত্রী বলিয়া সন্দেহ হয়; তবে ধম্মিল্লধারী তরুণ-বয়স্ক পুরুষ হওয়াও সম্ভব বটে। সম্মুখে কতকগুলি ব্যক্তি যেন সন্ত্রস্ত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চিত্রের lower panel বা নিম্ন-ফলকে অসিচর্ম্মধারী কয়েকজন লোক ও দুইটী হস্তী অঙ্কিত দেখা গেল। অপর চিত্রটীতে বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান যুগল স্ত্রী-পুরুষ। স্ত্রী-মূর্ত্তিটী পুরুষ-মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পুরুষ মূর্ত্তিটার মুখাবয়ব ও গঠন-প্রণালী প্রভৃতি হঠাৎ লক্ষ্য করিলে, জৈন বা বৌদ্ধ-মূর্ত্তির সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। নিম্নস্থ ফলকে জনৈক পরিচারক একটী সজ্জিত অশ্বের বল্গা ধারণ করিয়া আছে। সঙ্গে কয়েকজন অসি-চর্ম্মধারী পুরুষ। শেষোক্ত চিত্রটীর তাৎপর্য্য আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আরও দুই-একটি সুন্দর খোদিত ছবি নর-মিথুনের জুগুপ্সিত চিত্রাবলীর মধ্যে সহজেই অনুসন্ধিৎসু দর্শককে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। এটী একটি শিকারের চিত্র। মৃগয়াশীল ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া হরিণ ও ব্যাঘ্র-শিকারে নিরত রহিয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রটির একটু বিশেষত্ব আছে। রাজা হস্তি-পৃষ্ঠে সমারূঢ়। কয়েকজন দীর্ঘ-পরিচ্ছদধারী বিদেশী ব্যক্তি একটি সশৃঙ্গ (giraffe-like) জীরাফের ন্যায় জন্তু যেন উপহার দিবার জন্যই তৎসন্নিধানে আনয়ন করিয়াছে। জীরাফ মাত্র আফ্রিকা দেশেই পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, এ জীবের মস্তকে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শৃঙ্গবৎ অস্থি উদ্গত হয় বটে, তবে সে শৃঙ্গ কখনও বড় হয় না। বাইবেল গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদিগের রাজা সলোমনের নিকট শাখামৃগ, ময়ূর প্রভৃতি উপঢৌকন প্রেরিত হইত। এই জাতীয় পশুপক্ষী সাধারণতঃ ভারতেই পাওয়া গিয়া থাকে; সুতরাং সলোমন-সংক্রান্ত এই বিবরণটি যে ভারতবর্ষের সহিত ইহুদী-রাজ্যের বাণিজ্য বা রাজনৈতিক সম্পর্ক জ্ঞাপন করিতেছে, অধুনা অনেকেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। জন্তুটি আফ্রিকার জিরাফ বলিয়া বিবেচিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত নজীর অনুসারে, এ চিত্রটির দ্বারা ভারতের সহিত আফ্রিকা মহাদেশের দৌত্যাদি সূত্রে কোনও প্রকার সম্পর্ক জ্ঞাপন করা সম্ভব কি না, তাহা বিশেষজ্ঞগণের প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। আর একটি চিত্রে শিবলিঙ্গ, জগন্নাথ ও দুর্গা মূর্ত্তি একই বেদীর উপর সংস্থাপিত। দেবী মহিষাসুর-বধে নিযুক্তা। জনৈক রাজা হস্তী ও পরিচারক প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যেন বিগ্রহগুলির পূজা করিবার উদ্দেশ্যেই আগমন করিয়াছেন। মন্দিরের ভগ্নাবশেষমধ্যে এইরূপ আরও খোদিত প্রস্তর পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার সহিত পূর্ব্ববর্ণিত চিত্রখানির সামান্য একটু পার্থক্য আছে। শেষোক্ত চিত্রে দুইটি বেদী। একটি বেদীর উপর শিবলিঙ্গ ও

জগন্নাথ, এবং অপরটিতে দুর্গা। অনেকেই এই অপূর্ব্ব চিত্রখানিকে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সমন্বয়-জ্ঞাপক বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গগত ডাক্তার ব্লক (Block) সাহেব চিত্রখানি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যখন কোনারক মন্দির নির্ম্মিত হয়, সে সময় বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তির উদ্ভব হয় নাই। জগন্নাথের সহিত শিব ও দুর্গা তখন একত্রই পূজিত হইতেন। কেহ-কেহ এ ধারণা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করেন না। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ সমগ্র ছবিখানির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা শ্রীরাম কর্ত্তৃক রামেশ্বর তীর্থে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার চিত্র। স্কন্দ-পুরাণ মতে মহিষাসুর রামেশ্বরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং দেবীও তথায় দুর্গামূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া অবতীর্ণা হইয়াছিলেন; সুতরাং শিবপ্রতিষ্ঠার সহিত দুর্গা ও মহিষাসুরও যে চিত্রিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অসুরটি যে মহিষাসুরই বটে, ইহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু নিম্নভাগে একটি খণ্ডিত ক্ষুদ্র মহিষ-মস্তক অঙ্কিত রহিয়াছে। ব্লক সাহেবের মতে, ইহা নবগ্রহ-সমন্বিত সূর্য্যমূর্ত্তিমাত্র। চিত্রে খোদিত রাজার অনুচরগণের মধ্যে একটী সশ্মশ্রু ব্যক্তির চিত্র আছে। নবগ্রহ প্রস্তরের শ্মশ্রুযুক্ত বৃহস্পতির সহিত তাহার কোনও প্রকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া বোধ হয় ডাঃ ব্লক এই সিদ্ধান্ত করিয়া থাকিবেন। কিন্তু অর্থ-সামঞ্জস্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয়ের ব্যাখ্যাটিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। চিত্রটি সেই জন্য "রামেশ্বর-দৃশ্য" নামেই অভিহিত হইয়াছে। অপর একটি কারণেও এ চিত্রটি বিশেষ মূল্যবান; যেহেতু, ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কোনারকের মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আর একটি মূর্ত্তি লইয়াও মতদ্বৈধের কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। ডাক্তার ব্লক কোনারক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খনন কালে প্রাপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, তাহা সূর্য্য ও শিবের সম্মিলিত মূর্ত্তি। মূর্ত্তির চারিটি হস্ত। উপরের দুই হস্তে সূর্য্যদেবের চিহ্ন স্বরূপ দুইটি পদ্ম; নিম্নের এক হস্তে ত্রিশূল; অপর হস্তটি বরদ-কমল মুদ্রায় বিন্যস্ত। ধৃতকমলদ্বয় উপরিভাগে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ব্লক সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে, কোনারকের সূর্য্যদেব যে ভুবনেশ্বরের মহাদেব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—ইহাতে তাহাই সূচিত হইতেছে এই উক্তিটী আচার্য্য ব্লকের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া সন্দে[illegible] হয়। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় (1318 B. S. [illegible] 196) চুঁচুড়ায় সূর্য্যমূর্ত্তি-পরিচয় প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যামহা[illegible] শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকর্ম্মা শিল্প হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতী[illegible] হইবে যে, সূর্য্যমূর্ত্তি (চতুর্ব্বাহুর্দ্বিহস্তো-বা) দ্বিভুজ বা চতুর্ভু[illegible] —দুই প্রকারেরই হইতে পারে। শ্রীযুক্ত টি, গোপিনা[illegible] রাও (T. Gopinath Row) তাঁহার (Indian Iconography) "ইণ্ডিয়ান আইকনোগ্রাফী" বা ভারতী[illegible] মূর্ত্তিতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্গত মিত্র নাম[illegible] যে আদিত্য-মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার সহিত ব্ল[illegible] সাহেব কথিত 'সূর্য্য-শিবের' বেশ সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। এ মূর্ত্তিও চতুর্ভুজ শিব-মূর্ত্তির ন্যায় ত্রি-নেত্রবিশিষ্ট উপরের দুই হস্তে পদ্মপুষ্প, ও নিম্নের একটি হস্তে শূ[illegible] থাকার কথা লিখিত আছে। ত্রিশূল শূলেরই প্রকার ভেদ। ত্রিশূলধারী মহাদেবও সাধারণতঃ শূলী নামে[illegible] পরিচিত। ত্রিশূল হস্তে থাকিলেই যে কোনও মূর্ত্তি শৈব অংশবিশিষ্ট হইবে, এ কথা যুক্তি-যুক্ত বলিয়া মনে হয় না ব্লক সাহেবের রিপোর্টেই প্রকাশ যে, গৌড়েও এইরূপ এক[illegible] বিমিশ্র (composite) শৈব-সৌরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল কোনারক ও ভুবনেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূচক এরূপ একটি অভিনব মূর্ত্তি গৌড়মণ্ডলে আমদানী হওয়ার বিশেষ কোন[illegible] আবশ্যকতা ছিল বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং এটিও [illegible] মিত্র-আদিত্যের মূর্ত্তি এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

কোনারকে জগমোহনের উপরিভাগে কার্ণিশে সন্নিবিষ্ট যে ছয়টি চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি আছে, সেগুলি সাধারণতঃ ব্রহ্মা বলিয়াই পরিচিত; এবং পণ্ডিত বিষণস্বরূপও এই মত[illegible] গ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শ্রীযুক্ত এইচ লংহার্ষ্ট সাহেবের মতে এগুলি সমস্তই মহেশ্বর-মূর্ত্তি (Vide Archæological Survey Report. E. Circle 1906)। তাঁহার মতে ত্রিনেত্র, জটাজুট, সর্প, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি চিহ্ন যখন সমস্তই মিলিয়া গিয়াছে, তখন আর শি[illegible] বলিয়া প্রকাশ করিতে আপত্তি কি? একটি সূর্য্যমূর্ত্তিতে[illegible] তিনি এইরূপ শিবত্ব আরোপ করিয়াছেন। বরাহমিহি[illegible] হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সূর্য্যদেবের পরিচ্ছদ উত্ত[illegible]

দেশীয়। তাঁহার মস্তকাবরণ বহিঃ-দৃশ্যে অনেকটা জটা-ভারের মত বোধ হয় বটে, কিন্তু ত্রিনেত্র হইলেই যে "শিব" এ কথা মূর্ত্তিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কোনারক মন্দিরে শৈব-প্রভাব সম্বন্ধে বোধ হয় লংহার্ষ্ট সাহেবের দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল। ভোগ-মন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্যমূর্ত্তির বেদীটি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, এটি অনেকাংশে যোনিমুদ্রার অনুরূপ; সুতরাং এ মূর্ত্তিটিও যে শিবমূর্ত্তিরই অন্যতম সংস্করণ, এ প্রকার ইঙ্গিতও তিনি করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহার রিপোর্ট পাঠ করিলেই দৃষ্ট হইবে যে, অন্য একটি খোদিত চিত্রেও এইরূপ শৈব-প্রাধান্য তৎকর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছে। এ চিত্রটিতে সম্মানের স্থান না কি সদাশিব কর্ত্তৃকই অধিকৃত। দক্ষিণের দুইটী মূর্ত্তি তাঁহার মতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র, এবং বামের দুইটি বিষ্ণু ও সূর্য্য। বুদ্ধবৎ যে একটি ধ্যানমগ্ন ঋষি-মূর্ত্তি আছে, তাহার কপালেও আবার ত্রিপুণ্ড্র-রেখা; সুতরাং দুর্জ্জয় শৈব-প্রভাবের আর বাকী রহিল কি! কোন্ লক্ষণের দ্বারা কোন্ মূর্ত্তিটির পরিচয় নির্ণীত হইল, তাহার কোন বিচার করা হয় নাই। ঋষি-মূর্ত্তিটির ললাটের কুঞ্চন-চিহ্ন স্বাভাবিক, কি ত্রিপুণ্ড্র-লাঞ্ছনের প্রতিনিধিস্বরূপ, তাহাও সহজে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। মন্দিরের উপরের অংশে অশ্লীল চিত্র না থাকার কারণ নির্দ্দেশ কালে লংহার্ষ্ট সাহেব বলিয়াছেন, উপরিস্থ শিবলোকে পৌছিতে হইলে রিপুর উত্তেজনা ও ঐহিক কামনা পদ-দলিত করা আবশ্যক। ডাক্তার ব্লক যেরূপ একটী মূর্ত্তি দেখিয়া শৈব ধর্ম্মের উপর সৌর প্রাধান্য অনুমান করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত লংহার্ষ্ট সেই পদ্ধতিতেই উল্টামতের প্রচার ও সমর্থন করিয়াছেন। দশ-বারো বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সেরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিত হয় নাই, এবং দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টিও এদিকে যথোচিত পরিমাণে আকৃষ্ট হয় নাই। Foucher (ফুসে) প্রমুখ বৈদেশিক পণ্ডিতগণই এ বিষয়ে আমাদিগের পথ-প্রদর্শক। দেব-মূর্ত্তি-পরিচয় ব্যাপারে ভ্রম হওয়া বড় অস্বাভাবিক নহে। Sir W. W. Hunter-এর ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিও নবগ্রহ-প্রস্তর অন্তর্গত শুক্র-মূর্ত্তিটিকে য়ুনানী "ভেনাস" ধারণা করিয়া Plump female বা হৃষ্টপুষ্ট স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেকালের শিল্পীগণ সকলেই কিছু শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত উপদেশাদি যথাযথ পালন করিতেন না; এবং শাস্ত্রগ্রন্থেও দেব-মূর্ত্তির পরস্পর বিরুদ্ধ বর্ণনার অভাব দেখা যায় না। এই সকল কারণে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যেও মূর্ত্তি-পরিচয় সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়; সুতরাং কোনও একটি সামান্য ত্রুটির জন্য পণ্ডিতগণের অন্যান্য মতবাদের প্রতি আস্থাহীন হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এখানেও মন্দির-গাত্রে নানাবিধ Frieze বা আলম্বন দেখিলাম। তন্মধ্যে সশস্ত্র মনুষ্যশ্রেণীর বেশ একটু নূতনত্ব আছে। আলিঙ্গনবদ্ধ নাগনাগিনীগণের যুগল মূর্ত্তি বড়ই সুন্দর। দেহের নিম্নার্দ্ধ ভাগের অহিবৎ পুচ্ছগুলির লীলায়িত আবর্ত্তনে শিল্পীর সৌন্দর্য্য-জ্ঞান বিশিষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কোনারকে যে নিতান্ত অশ্লীল চিত্রাদিরও অভাব নাই, এ কথা অনেকেই অবগত আছেন। এ সকল চিত্রের অর্থ বা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবিবর রবীন্দ্রনাথ, যশস্বী আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি অনেকেই আপন-আপন মত প্রকাশ করিয়াছেন। উত্তরাপথের মন্দিরগুলিতে এরূপ নরনারীর কামলীলার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। উৎকল ও মধ্য-প্রদেশের মন্দিরগুলিই অনেকস্থলে শিল্পীর সৌন্দর্য্যপ্রকাশ-চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া প্রায়শঃ এই সকল চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া আছে। ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার ভারতীয় ললিত-কলার ইতিহাসের একস্থানে লিখিয়াছেন, দুষ্ট প্রেতযোনি প্রভৃতি যাহাতে দেউল সন্নিধানে না আসিতে পারে, সেই জন্যই এই সকল চিত্রাদি তক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। তিনি এই প্রসঙ্গে যেন কতকটা ব্যঙ্গচ্ছলে বিদ্যুতাপসারক ধাতব-দণ্ডের সহিত এই চিত্রগুলির তুলনা করিয়াছেন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার 'গ' বলেন, Sex is the foundation of religion। তাঁহার ন্যায় শুধু শারীরতত্ত্বের দিক দিয়া না দেখিলেও, মোটের উপরে বুঝা যায় যে, বামমার্গাবলম্বী শৈবমতের সহিত এই জাতীয় শিল্পের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। পুরী, কোনার্ক ও ভুবনেশ্বর, এই তিন স্থানেই লক্ষ্য করিলাম যে, সম্ভোগের চিত্র জগমোহন ও ভোগমন্দিরের গাত্রেই অধিক পরিমাণে স্থান পাইয়াছে। মন্দিরের প্রধান অংশে বা রত্নবেদীর সান্নিধ্যে ইহার কোনও নাম-গন্ধ নাই। কোনা-রকের নাটমন্দির এখন ছাদবিহীন; কেবল দেওয়ালগুলি খাড়া রহিয়াছে। নাটমন্দিরের সোপানের দুই পার্শ্বে দুইটি
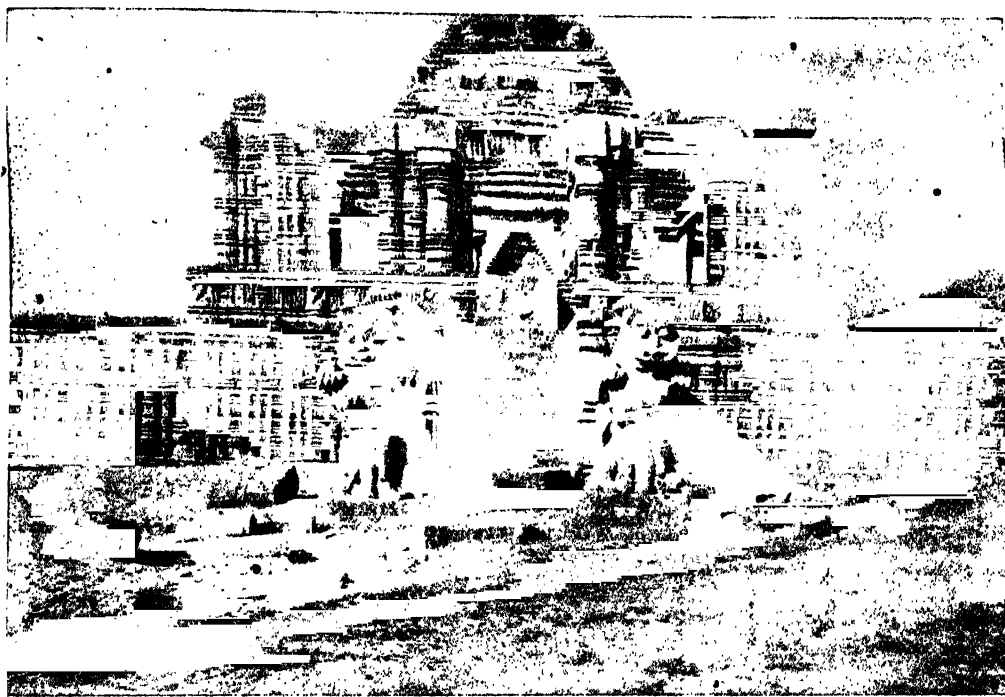
সমুদ্র হইতে কোনারকের সম্মুখের দৃশ্য
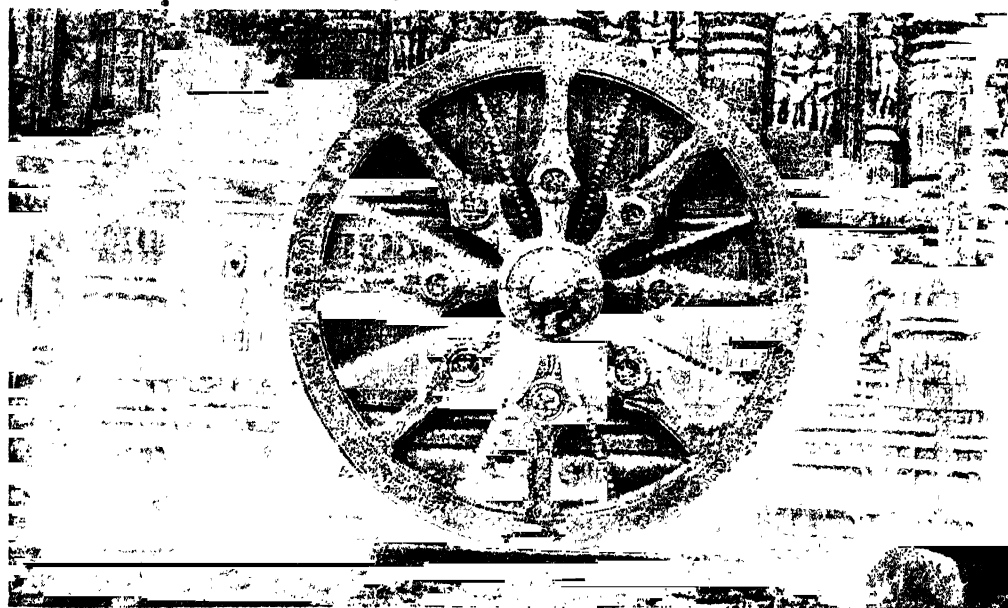
কোনারকের মন্দির-গাত্রে খোদিত শিল্প

গজসিংহ-মূর্ত্তি রক্ষিত। সোপানাবলীর নিম্নে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিলেই সম্মুখে জগমোহনের প্রধান প্রবেশদ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের এ অংশটি জগমোহন হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত,—পুরীর মন্দিরের ন্যায় একত্র সংশ্লিষ্ট নহে। এখানে নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্র-হস্তা, বাদন-রতা, নৃত্যপরা মূর্ত্তি বহু পরিমাণে অঙ্কিত দেখিলাম; অশ্লীল মূর্ত্তি নাই বলিলেও হয়। জগমোহনের পশ্চাৎ ভাগে মায়াদেবী বা মহামায়ার মন্দির। কেহ-কেহ ইহাকে অব্দের Archæological Report বা পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে এ বিষয়টি আলোচিত হইয়াছে। অপরটি অতি স্বাভাবিক ভাবে নির্ম্মিত; যেন একটি কুম্ভীর সদ্যোধৃত মৎস্য মুখে করিয়া রহিয়াছে।

কোনারকে আরও অনেকগুলি ছোটখাট মন্দির ছিল শুনা যায়; কিন্তু সেগুলির সংস্থান সন্তোষজনক ভাবে নির্ণীত হয় নাই। খননকালে অনেক বহিঃগৃহ ও চাতাল প্রভৃতি বাহির হইয়াছিল, সরকারি
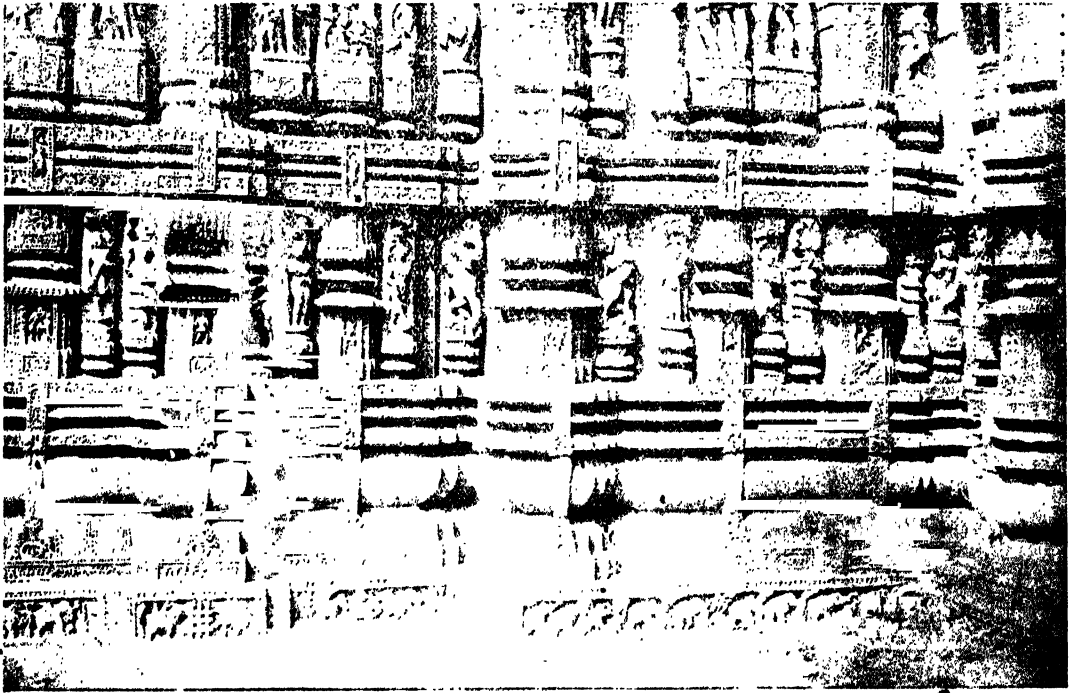
কোনারকের শিল্প-চাতুর্য্য

রামচণ্ডীর মন্দিরও বলিয়া থাকেন। এখানেও কয়েকটি সূর্য্য-মূর্ত্তি আছে; তাহার মধ্যে একটি মূর্ত্তি অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। মন্দির হইতে চরণামৃত প্রভৃতি নির্গমনের জন্য কারুকার্য্যসমন্বিত কৃষ্ণপ্রস্তরের দুইটি সুন্দর জলনালী রহিয়াছে দেখিলাম। একটির মুখ মকরের ন্যায়। মকর-মূর্ত্তির পরিকল্পনা বৌদ্ধ-যুগেও দেখা যায়। Symbolটি যে অত্যন্ত প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে মকর-মুখ শুধু জল-নির্গমন-নালী রূপে নহে,—তোরণ-অলঙ্কার রূপেও ব্যবহৃত হইত। হিন্দু স্থপতিগণ মকর-তোরণের কথা অদ্যাবধি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ১৯০৩-৪ রিপোর্টে এইরূপ প্রকাশ। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কোনার্কে ২৮টি ক্ষুদ্রতর মন্দির ছিল; তন্মধ্যে ২২টি মন্দির-প্রাঙ্গণে এবং ৬টি উত্তরদ্বারের সম্মুখভাগে। নাটমন্দিরের সম্মুখভাগে মহামান্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক একটি সংগ্রহাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় নাটমন্দিরে প্রাপ্ত সূর্য্য-মূর্ত্তি ও জগমোহনের ধ্বংসোন্মুখ অংশ হইতে বিচ্যুত অনেকগুলি বিভিন্ন প্রকার মূর্ত্তি সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার মধ্যে "সীতার বিবাহ", "শর-সন্ধানে"র চিত্র (কেহ-কেহ ইহাকে পরশুরামের পর্ব্বত-ভেদের চিত্রও বলিয়া থাকেন), পূর্ব্ববর্ণিত "রামেশ্বর" চিত্র এবং গুরুমহাশয় ও

কোনারকের হিন্দু-শিল্প
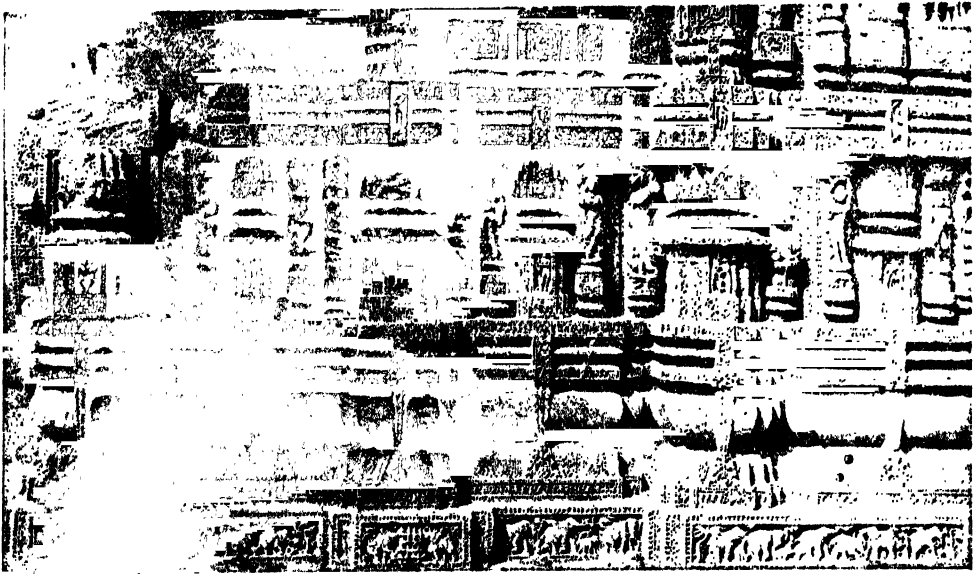
কোনারক—স্থাপত্য-নিদর্শন

পড়ুয়াদিগের চিত্র বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে গঙ্গামূর্ত্তি ও মেষারূঢ় বৃহস্পতি বা 'অজ-রথ' অগ্নি-মূর্ত্তিও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। কিছুদিন পূর্ব্বে Pioneer পত্রে একজন এই গঙ্গা-মূর্ত্তিটির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে,কোনারকে উহা ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অতএব মূর্ত্তিটি যাদুঘরে স্থানান্তরিত করা উচিত। আমরা কিন্তু গঙ্গামূর্ত্তির কোনও স্থানেই কিছু ধ্বংসের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয় সংগ্রহশালায় আনীত হইবার পূর্ব্বে উপরের লোহার কড়ি ধুইয়া বৃষ্টির জল আসিয়া লাগায় Oxide of Iron (কিট বা লোহমল)-জনিত কয়েকটি

লাল দাগ হইয়াছে মাত্র। এই ঘরটিতে মন্দিরচ্যুত নবগ্রহের সুন্দর প্রস্তরখানি রক্ষিত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে এবং পুরীর গুণ্ডিচা-বাড়ীতেও দেখিয়াছিলাম, মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগেই এইরূপ নবগ্রহের প্রস্তর সংলগ্ন আছে। কোনারকের প্রস্তরখানি বিশেষ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। অধুনা ইহার পূজা হইয়া থাকে। নবগ্রহের নিকট মানত করিয়া কাহার না কি দুরারোগ্য পীড়া সারিয়া গিয়াছিল; সেই অবধি নিকটস্থ গ্রামবাসিগণের নিকট এ প্রস্তরটি "জাগ্রত" রূপে পরিগণিত রুচির মান রক্ষা করিতে হইলে, সমগ্র মন্দিরের কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। কিন্তু ললিতকলার সহিত ধর্ম্মান্ধতা বা রুচি-বায়ু-গ্রস্ততার কোন সম্পর্ক নাই—তাই আধুনিক য়ুরোপীয়গণও এই "কাল দেউলের" যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। আবুল ফজলও তাই লিখিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা সমালোচনা-তৎপর এবং সহজে সন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন, তাঁহারাও এই মন্দির দেখিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে দণ্ডায়মান থাকেন। সংগ্রহশালায় আর একটি মূর্ত্তি আছে,—যাহা অনেকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন।
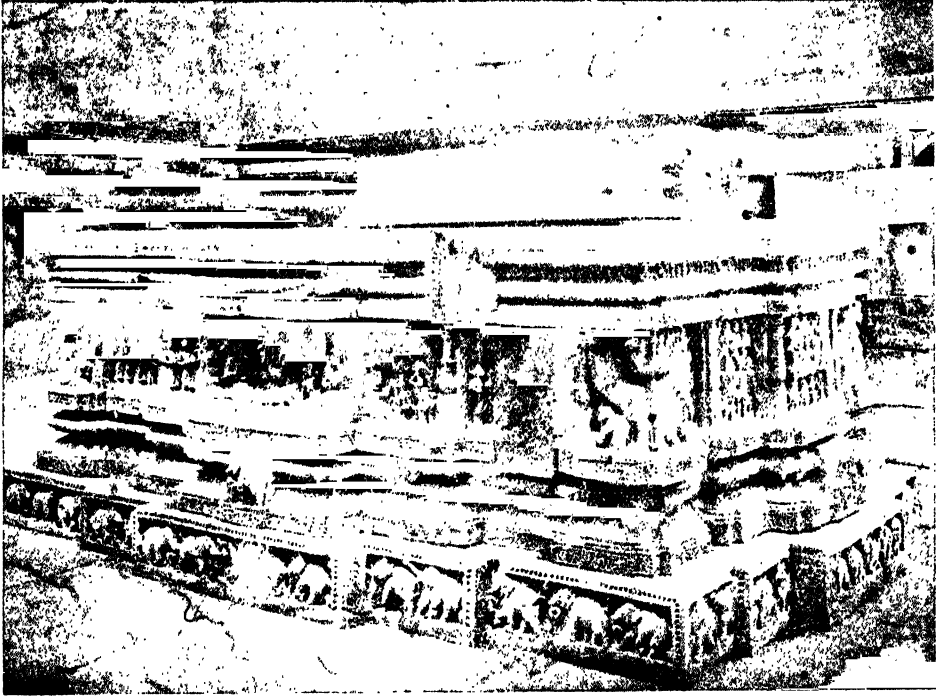
কোনারক—মন্দিরমধ্যস্থ বেদ

হইয়াছে। এই কারণেই প্রাচীন শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ এই নবগ্রহ প্রস্তরখানিকে কলিকাতার মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করিবার কল্পনা সরকার বাহাদুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সংগ্রহশালায় ব্রীড়াজনক ভগ্ন-মূর্ত্তিরও অভাব নাই। শুনিয়াছি, কোনও ইতালীয় যাদুঘরে যে অংশে পম্পি নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর প্রাচীন দ্রব্যাদি রক্ষিত আছে, সেখানে বালক-বালিকা ও মহিলাগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু কোনারকে এরূপ নিষেধ সম্ভবপর নহে। আধুনিক

মূর্ত্তিটির উপরে বিততফণ সর্প। দুই পাশে দুই নারীমূর্ত্তি; একটির হস্তে স্থালী বা অন্নপাত্র। পণ্ডিত বিষণস্বরূপ মহাশয় বলেন যে, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে শাক্যসিংহ যখন অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন, তখন শ্রেষ্ঠী-পত্নী সুজাতা তাঁহার দাসী পুন্নাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার জন্য পায়স ও পানীয় আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মূর্ত্তির উপরিস্থ সর্প-চিহ্নটি সর্পরাজ মুচলিন্দের প্রতিকৃতি। যাহাতে বুদ্ধদেব ঝড়-বৃষ্টি-রৌদ্র এবং সরীসৃপ ও মশকাদি কীট-পতঙ্গ হইতে কষ্ট না পান, সেইজন্য মুচলিন্দ ছত্রের

ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া তথায় সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। আর একটি এইরূপ তথাকথিত বৌদ্ধচিত্র গর্ভ-গৃহস্থ বেদীর গাত্রে খোদিত আছে। একটি বালক হস্তীকে আহার দিতেছে। কোন-কোনও পণ্ডিতের মতে, এ চিত্রের ঘটনাটি জাতক-কাহিনী হইতে গৃহীত। বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে একবার হস্তিপকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি যে রাজার অধীনে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি কাশীরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। কাশীরাজ্য আক্রমণ কালে, ভবিষ্যৎ বুদ্ধদেব যে হস্তীটি চালনা করিতেন, সেটি শত্রুপক্ষীয় হস্তীর লৌহ-কণ্টকাকীর্ণ বর্ম্মের ভয়ে অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। তাই বুদ্ধদেব তাহাকে উৎসাহ দিয়া দুর্গ-প্রাচীর প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে নিযুক্ত করেন। এই বেদীর গাত্রেও হস্তীশ্রেণী আলম্বনের ন্যায় চারিপার্শ্বে উৎকীর্ণ রহিয়াছে, দেখিয়াছি। যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদূরিত করিবার জন্য কেশরী-রাজগণ এরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি জন্য বৌদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ বা বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর চিত্র খোদিত করাইলেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। প্রত্নতত্ত্ববিশারদ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে কোনারকে বৌদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও মূর্ত্তি এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে যখন মতভেদ আছে, তখন
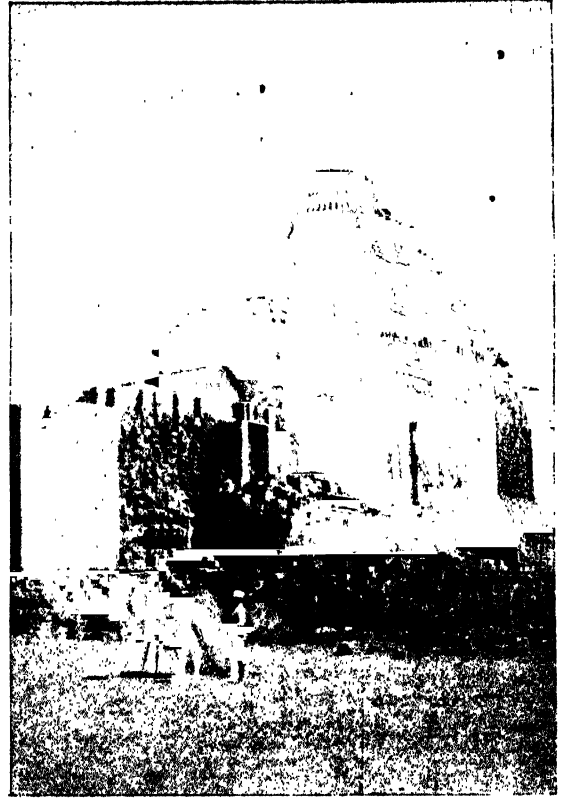
জগমোহন—উত্তর পার্শ্বের দৃশ্য
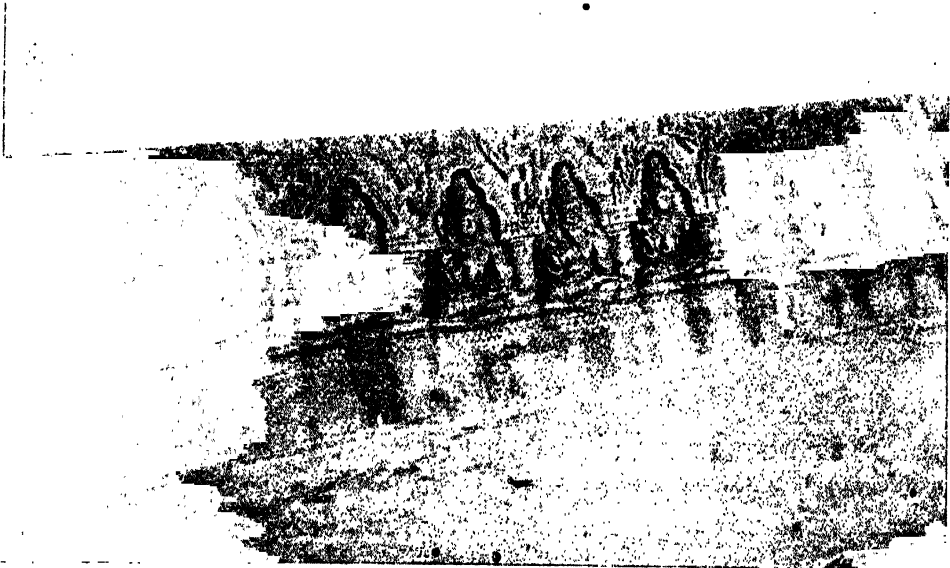
নবগ্রহ—কোনারকের মন্দির

সাধারণ লোকের মত প্রকাশ না করাই ভাল। ১৯০৩ অব্দে যাদুঘরের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশীয় তক্ষণ-শিল্পের নমুনার মধ্যে একটি স-মুচলিন্দ বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয় (No 6290)। এ চিত্রে বুদ্ধদেব সর্পরাজের শিরোদেশে উপবিষ্ট;—দণ্ডায়মান অবস্থায় সর্প-কর দ্বারা রক্ষিত নহেন। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যে কেবল অনন্তশয্যায় শায়িত মূর্ত্তিরই শিরোদেশে সর্পফণা দেখা যায়। এ উক্তিটি ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে হয়। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত চিত্র আছে। এটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। মাথার উপর শেষ নাগ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে পদ্মপুষ্প হস্তে শ্রীদেবী। বামে নীলোৎপলধারিণী ভূদেবী। জৈন মহাবীর-মূর্ত্তির শিরোভাগেও সর্পচিহ্ন দেখা যায়। সুতরাং মনে হয় যে, কেবল এই প্রকার চিহ্নের উপর নির্ভর করিয়া, কোনও মূর্ত্তি বৌদ্ধ কি জৈন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সহজ নহে। মার্শাল সাহেব মহোদয়ের অনুজ্ঞা ক্রমে পুরাতত্ত্ব-বিভাগ-কর্ত্তৃক যে অনুসন্ধান হয়, তাহার ফলে একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তি ও একটি বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উভয় মূর্ত্তিই
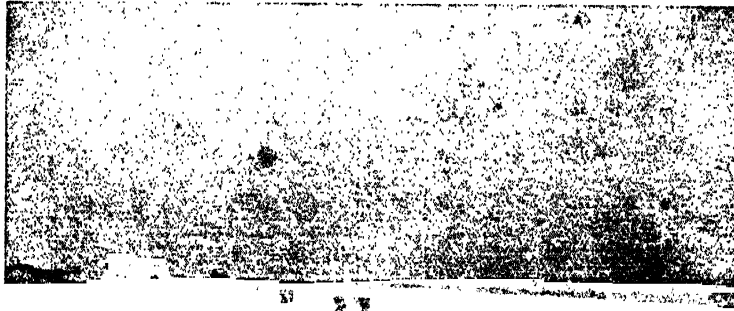
কোনারকের পথে—বেলাভূমিতে গরুর গাড়ী

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী প্রণীত দাক্ষিণাত্যের মূর্ত্তি-পরিচয় (South Indian Images) নামক গ্রন্থে 'বৈকুণ্ঠ-নারায়ণ' মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। এ মূর্ত্তিটিতে বিষ্ণু সর্প-সিংহাসনে উপবিষ্ট; শিরোভাগে সর্পফটা। বামপদ নিম্নে প্রসারিত; দক্ষিণ পদ আকুঞ্চিত। পার্শ্বদেশে দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি—লক্ষ্মী ও পৃথ্বী। উক্ত গ্রন্থে "যোগেশ্বর" নামক যে অপর একটি বিষ্ণু-মূর্ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, সেটিও পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিরই অনুরূপ। বিষ্ণু সিংহাসনে উপবিষ্ট; মস্তকোপরি সর্পরাজ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে—উভয় পার্শ্বে কলসহস্তে স্ত্রী মূর্ত্তি। টি, গোপীনাথ রাও প্রণীত হিন্দু-মূর্ত্তি বিষয়ক (Hindu Iconography) গ্রন্থে "মধ্যম ভোগস্থানক" শ্রেণীর একটি ধাতব বিষ্ণু-মূর্ত্তির কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। শেষোক্ত মূর্ত্তিটি দোলায় উপবিষ্ট। মুখাবয়ব দেখিতে সুশ্রী নহে। নিম্নে নতজানু পাঁচজন উপাসিকা; পার্শ্বেও একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। বড় নিপুণতার সহিত পাথর কাটিয়া দোলনা-সংযুক্ত শৃঙ্খল কয়টী দেখান হইয়াছে। ইহাতেই শিল্পীর যা-কিছু কৃতিত্ব। বিষ্ণু-মূর্ত্তিটী সুন্দর। নিম্নে খোদাই করা ফুলের কাজের ভিতর কয়েকটী উপাসিকার চিত্র; এবং উপরে উড্ডীয়মান দেবযক্ষ, অপ্সরা বা বিদ্যাধর প্রভৃতি। বিষ্ণুর চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। দক্ষিণে ব্রহ্মা ও বামে মহেশ্বর। গদা প্রভৃতির সংস্থান দেখিয়া মূর্ত্তিটীকে 'জনার্দন' বিষ্ণু-মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়।

মন্দিরের ভগ্ন প্রস্তর প্রভৃতি সাজাইয়া চারিদিকে অনুচ্চ

মায়াদেবী বা মহামায়ার মন্দির - কোনারক

মন্দিরের ফটকে হস্তীদ্বয়

বেষ্টনীর ন্যায় একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। যাহাতে পুনরায় লোক চক্ষু হইতে অন্তর্হিত না হয়, সেইজন্য বেষ্টনীর মরুভূমির বায়ু-চালিত বালুকারাশির দ্বারা মন্দির-ভিত্তি চারিপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ পুন্নাগ, ও একপ্রকার ঝাউগাছ

(Casuarina) রোপণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দির-প্রাঙ্গণটি বড় ক্ষুদ্র নহে। দৈর্ঘ্যে ৮৮৫ ফিট এবং প্রস্থে ৫৩৫ ফিট হইবে।

কোনার্ক দেউল-নির্ম্মাতা প্রথম নরসিংহ বা লাঙ্গুলিয়া নরসিংহ দেব যে সময়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, গঙ্গারাজবংশের তাহাই উজ্জ্বলতম যুগ। তখন উড়িষ্যা-রাজ্যের এক সীমায় বিজয়নগর, অপর সীমায় লক্ষ্মণাবতী। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল নিজগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যারাজ্য এক সময়ে হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী ঘাট হইতে গোদাবরী তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাম্র-লিপিতে বর্ণিত আছে যে রাজা নৃসিংহদেব—

রাঢ়া বরেন্দ্র যবনী নয়নাং জনাশ্রুপূরেণ
দূরবিনিবেশিত কালিম শ্রীঃ।
তদ্বিপ্রলম্ভ করণাদ্ভুত নিস্তরঙ্গা
গঙ্গাপিনূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ॥

* * *

রাঢ় ও বরেন্দ্রের যবনীগণের কজ্জল-বিধৌতকারী অশ্রুধারা গঙ্গাজলে মিশ্রিত করাইয়া নিস্তরঙ্গ কৃষ্ণবর্ণা গঙ্গা নদীকে তৎকালে যেন যমুনা-ধারায় পরিণত করিয়াছিলেন (দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রলিপি, J. A. S. B. 1896)।

জগমোহন—কোনারক

মাদলা-পঞ্জীর মতে নরসিংহদেব স্বীয় রাজ্যের অষ্টাদশ বর্ষে কোনার্ক মন্দির নির্ম্মাণ করেন। নরসিংহদেব ১২৩৮ হইতে ১২৬৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে ১৯০৩ সালের J. A. S. B. পত্রিকার— ম খণ্ডে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ দেখিতে অনুরোধ করি।

Date of Knoarak Erection—শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ (Vincent Smith) দেউলটির নির্ম্মাণ-কাল ১২৪০ হইতে ১২৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন। গঙ্গা-বংশীয় রাজগণের তাম্রলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা প্রথম নরসিংহ দেবই কোনারকে মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মাদলা পঞ্জীতেও এ কথা স্বীকৃত হইয়াছে। আবুল ফজলও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ-প্রসঙ্গে রাজা নরসিংহের নামোল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং মন্দিরটি যে ১২৪০ হইতে ১২৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ১৯০৬—৭ অব্দের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগীয় পূর্ব্বকেন্দ্রের রিপোর্টে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের জনৈক উদ্ভাবনক্ষম কর্ম্মচারী কোনারক মন্দির নির্ম্মাণের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে একটি বিচিত্র সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাহার আলোচনা করিব।
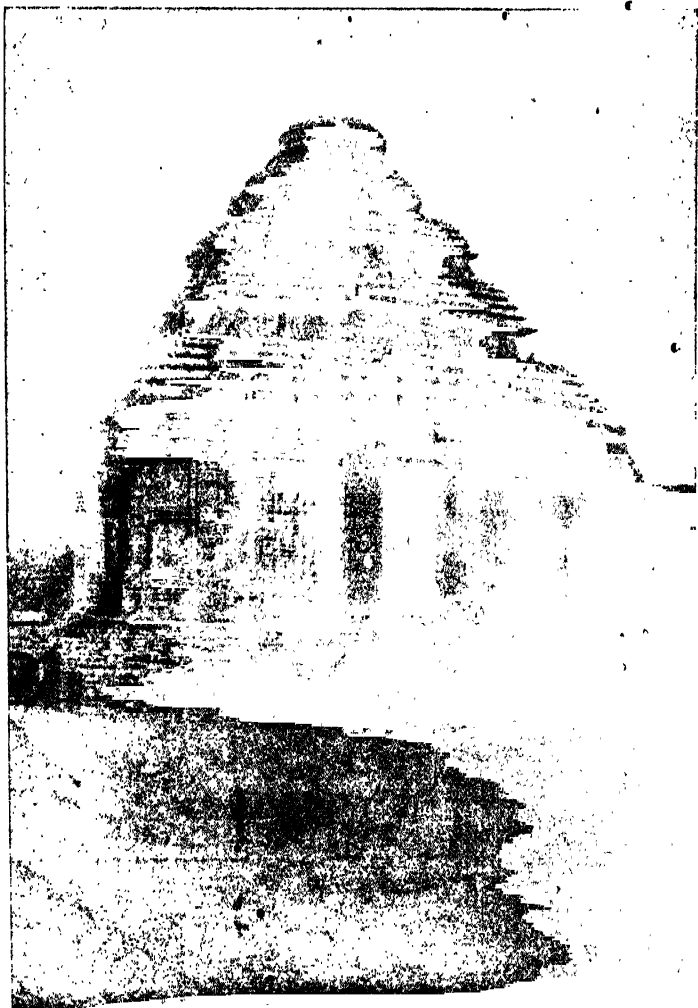
প্রতিধ্বনি

মাছের কথা

মাছ-ভাতখেকো বাঙ্গালীর অন্যতম প্রধান খাদ্য মাছের কথার এখন বিশেষভাবে আলোচনা চলিতেছে। দেশে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে মৎস্যের মূল্য দিন-দিন বৃদ্ধি ত পাইতেছেই ; অধিকন্তু মৎস্যের প্রায় দুর্ভিক্ষই উপস্থিত হইয়াছে। দেশবাসীর প্রধানতম খাদ্যদ্রব্যের এরূপ দুর্দ্দশা বিষম চিন্তার বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের লোক এ বিষয়ে একরূপ উদাসীন বলিলেই চলে। আমাদের দেশের সাধারণ, চিরন্তন নিয়মানুসারে অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও অপরে আমাদের মৎস্যের সংস্থান করিয়া দিবে, এই আশায় আমরা উর্দ্ধনেত্রে হাঁ করিয়া বসিয়া আছি ; এবং নিতান্ত নিরর্থকও নহে ; কারণ, ইউরোপীয় বণিকেরা এবং মহামান্য গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের জন্য এবং আমাদের হইয়া চেষ্টা করিতেছেন। আমরা জানি, ২৫ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় বণিক-কোম্পানী জাহাজে করিয়া বঙ্গোপসাগর হইতে মাছ ধরিয়া আনিয়া কলিকাতায় বিক্রয় করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার পর গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় "গোল্ডেন ক্রাউন" নামক ট্রলার জাহাজ বঙ্গোপসাগর হইতে মাছ ধরিয়া আনিয়া কলিকাতায় চালান দিতে থাকে। গবর্ণমেণ্ট এইরূপে পথ প্রদর্শন করিয়া আশা করিয়াছিলেন, বেসরকারী লোকে এই ব্যবসায় অবলম্বন করিবে। কিন্তু সে পক্ষে এখনও বিশেষ কোন উদ্যোগ আয়োজন দেখা যাইতেছে না। গবর্ণমেণ্ট সাগরের মৎস্যের ব্যবসায়ের পথ দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। দেশের আভ্যন্তরীণ জলকরের উন্নতি সাধন করিয়া মৎস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, মূল্য হ্রাস, চালানের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি উপায়ে মৎস্যাভাব দূরীকরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। ইহার ফল কি হইতেছে, মৎস্যের সুলভতা ও সুপ্রাপ্যতার পক্ষে প্রধান প্রধান অন্তরায় কি কি, তাহা পাঠকেরা আমাদের সহযোগী "বাঙ্গালী"র মুখেই শ্রবণ করুন :—

"দুধ-ভাতের মত মাছ-ভাতও বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য। কিন্তু এখন সেদিন আর নাই। ভাত এখনও বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য আছে বটে, কিন্তু দুধ আর মাছ সকল বাঙ্গালী পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। কারণ আজকাল এই দুইটা জিনিষই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ দুধ ও মাছ এদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবল সরবরাহের গলদে এবং দুধ ও মাছ-ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে আমরা এই দুইটা জিনিষ খাইতে পাই না।

"বাঙ্গালা দেশ নদী মাতৃক। কেবল নদী-মাতৃক বলিলে ঠিক হইবে না—এদেশ জলাশয়ে পরিপূর্ণ। সকল জলাশয়েই মাছ আছে। তাহার উপর এদেশ বঙ্গোপসাগরের সান্নিধ্যে অবস্থিত বলিয়া মাছের অভাব এদেশে এখনও হইতে পারে না। কিন্তু মাছ এত উৎপন্ন হইলেও উহার সরবরাহের ব্যাপারে এমন প্যাঁচ আছে যে, আমাদিগকে অত্যন্ত বেশী দামে মাছ খরিদ করিতে হয়। মাছের সের তিন আনা চারি আনা হইলেই যথেষ্ট মনে হয়। সেই স্থলে আমাদিগকে দশ আনা হইতে এক টাকা সের দরে মাছ খরিদ করিতে হয়।

"কেন এমন হয়, তাহা বলিতেছি। তরিতরকারির দর যেমন বাজারের ফড়িয়াদের কারচুপিতে বাড়িয়া থাকে, মাছের দরও তেমনই জেলিয়া মহাজনদের পাক চক্রে অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পদ্মার বিস্তর মাছ ধরা হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল জেলিয়া সেখানে মাছ ধরে, কলিকাতার জেলিয়া-মহাজনেরা তাহাদিগকে দাদন দিয়া থাকে। এই দাদনের টাকা তাহারা ধৃত মৎস্যের দ্বারা শোধ দেয়। দাদন-দাতাদের প্রতিনিধিরা যেরূপ দর দেয়, মাছ-ধরা জেলেদিগকে সেইদরে মাছ সরবরাহ করিতে হয়। এই দর এত সামান্য যে, মাছধরা জেলেরা লাভ বিশেষ কিছু করিতে পারে না। পনের আনা লাভ করে দাদন-দাতা জেলিয়া-মহাজনেরা। ইহারা যে দরে মাছ খরিদ করে, তাহার প্রায় আট গুণ দরে সহরে মাছ বিক্রয় করে। ফলে ছয় পয়সা সেরে তাহারা যে মাছ কিনিয়া থাকে, তাহা বার আনায় তাহারা বিক্রয় করে। এই অতিরিক্ত পয়সা আমাদিগকেই দিতে হয়।

"এই দুরবস্থা দূর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক দিন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছেন। সরকারী মৎস্য-বিভাগের প্রতিষ্ঠাও কতকটা এই জন্য। দেশের লোকে যাহাতে সুলভে প্রচুর মাছ খাইতে পায়, মাছের জোগান যাহাতে বাড়ে, বাঙ্গালা-সরকার অনেক দিন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। স্যর এনড্রু ফ্রেজারের মাছধরা জাহাজও এই উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্য করিয়াছিল। বঙ্গসাগরে মাছ ধরিয়া এই জাহাজ কলিকাতার বাজারে উহা সরবরাহের ব্যবস্থাও করিয়াছিল। কিন্তু জেলিয়া মহাজনদের চক্রান্ত ভেদ করিয়া উহা উদ্দেশ্য-সাধনে সফল হয় নাই।

রাজমহলে গঙ্গার মাছের 'ভেরি' আছে। এখানে জেলিয়ারা বিস্তর মাছ ধরে। অথচ ইহাদের দুর্দ্দশা ঘুচে না ; ভাত-কাপড়ের অভাব যায় না। গবর্ণমেণ্টের মৎস্য-বিভাগ ইহাদের দুর্দ্দশা ঘুচাইবার

জন্য এক সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে জেলিয়া-মহাজনেরা ইহাদের নিকট যে মাছ ৬৷১৬ টাকা মণ দরে ক্রয় করিয়া অন্যত্র চালান দিত ও সেই মাছ সরাসরি চালান দেওয়াতে এখানকার জেলিয়ারা প্রতি মণে ১৪৷১০৬ টাকা পাইয়াছিল। কিন্তু এত লাভ সত্ত্বেও সেখানকার জেলিয়ারা এভাবে মাছের সরাসরি চালান বেশী দিন দিতে পারিল না। এখন আবার তাহাদিগকে জেলিয়া-মহাজনদের হাতে আসিতে হইয়াছে।

কলিকাতার বাজারে ইহাদের এমন একচেটিয়া প্রভুত্ব আছে যে, ইহাদের সাহায্য বিনা কেহ মাছের চালান আনিয়াও তাহা বিক্রয় করিতে পারে না। কয়েকবার বাহিরের দুই চারজন ব্যবসায়ী কলিকাতায় প্রচুর মাছ চালান দিয়াছিল। কিন্তু এখানকার জেলিয়া-মহাজনদের লোকেরা একজোট হইয়া তাহাদের মাছ লয় নাই। ফলে উঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আর মাছেরও চালান দেয় নাই।

"ইহাদের এই একচেটিয়া ক্ষমতা ভাঙ্গিতে না পারিলে মাছ সুলভে সহরে সরবরাহ হওয়া অসম্ভব। যত দিন ইহা না হইতেছে, তত দিন সস্তায় মাছ পাওয়া আমাদের ভাগ্যে হইবে না। সুতরাং মাছ ভাতে বাঙ্গালীর দেহ-পুষ্টির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত মনে হইতেছে।"

পঞ্জিকা সংস্কার

হিন্দুর সমস্ত কর্ম্মই উপযুক্ত দিনক্ষণের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। হিন্দুকে এক পা বাড়াইতে হইলেই শুভ-দিন ও শুভক্ষণ নির্দ্ধারণ করিয়া যাত্রা করিতে হয়। সুতরাং পঞ্জিকা যে হিন্দুর পক্ষে কতখানি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। দিনক্ষণ না বাছিয়া যখন হিন্দুর কোন শুভকার্য্যই হইতে পারে না, তখন উপযুক্ত ক্ষণ নির্ব্বাচিত না হইলে তাঁহাদের সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানই যে পণ্ড হইয়া যাইবে, তাহা বিচিত্র নহে। পঞ্জিকা এই শুভ দিনক্ষণের নিয়ামক। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে যতগুলি standard পঞ্জিকা প্রচলিত আছে, তাহাদের কোন দুইখানিতেই প্রায় ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানের সময় নির্দ্দেশে সামঞ্জস্য দেখা যায় না। সুতরাং হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম যে ঠিক নিয়ম মত হইতেছে, এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা চলে না। সুখের বিষয়, পঞ্জিকা-বিভ্রাটের প্রতিকারের চেষ্টা কিছুদিন ধরিয়া চলিতেছে। কিন্তু সে চেষ্টা সামান্য এবং সঙ্কীর্ণ। এ সম্বন্ধে বহরমপুরের সহযোগী 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন :—

"অনেক দিন হইতে কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজা স্যার মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই, বাহাদুর চেষ্টা করিতেছেন, এজন্য তিনি প্রতি বৎসর ব্যয়েরও ত্রুটী করিতেছেন না। "বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" মহারাজের ব্যয়ে প্রকাশ হইয়া থাকে। গত সপ্তাহে ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতাধ্যাপক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেন ও মেট্রোপলিটান ইনিষ্টিটিউসনের অধ্যাপক জ্যোতির্ব্বিৎ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয়দ্বয় বহরমপুরে আসিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণসভার উদ্যোগে দুই দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পঞ্জিকা সংশোধন হওয়া যে নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতে কাহারই দ্বিমত নাই। কিন্তু এই সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যেক প্রদেশের বিশিষ্ট অধ্যাপকগণকে কিছুদিনের জন্য নিয়োজিত রাখিয়া কার্য্য করাইতে হইবে; নতুবা দুই চারি মাসের সিদ্ধান্তে এত বড় কার্য্য কিছুতেই হইতে পারে না, কারণ, ইহা বহু ব্যয়সাপেক্ষ। দেশের হিন্দু ধনীগণ মনোযোগী হইলেই কার্য্য হইবে।"

কবির স্মৃতি-রক্ষা

পরলোকগত আত্মার,—জাতীয় কবির স্মৃতির সার্থক তর্পণ কি করিয়া করিতে হয় এবং তৎসহ কিরূপে আত্মোন্নতি সাধন করিতে হয়, খুলনা—সেনহাটী গ্রামের যুবকেরা তাহা সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সহযোগী "খুলনা" তাঁহাদের এই সাধু চেষ্টার নিম্নোদ্ধৃত বিবরণটুকু প্রকাশিত করিয়াছেন।—

কৃষ্ণচন্দ্র লাইব্রেরী, সেনহাটী :—বঙ্গের হাফিজ, পাগল কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বহু বর্ষ অমরধামে গমন করিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গবাসী এখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারে নাই; বাঙ্গালা ভাষা যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন পারিবে বলিয়াও প্রতীতি হয় না। একমাত্র "সদ্ভাবশতকের" সরোবর ও শতদল শোভাই তাঁহার স্মৃতিকে অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে। কবির প্রতি আমাদের নিজেদের একটা কর্ত্তব্য আছে। তাঁহার প্রতি বঙ্গভাষা-ভাষী চির কৃতজ্ঞ; সেই অসীম কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কবির একটা সুযোগ্য স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করা সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শুভ উদ্দেশ্যে চারি বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-গৃহে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। পরিষদের পক্ষ হইতে এই কার্য্যের জন্য বিশেষ ভাবে কয়েক জনের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহাদিগের যত্ন ও চেষ্টা কোনই ফল প্রসব করে নাই। 'দাদার কাণ্ডের' প্রতিথযশা লেখক—বঙ্গদর্শন সম্পাদক ৺শৈলেশচন্দ্র মজুমদার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কবিবরের একখানি তৈলচিত্র পরিষদ-গৃহে রাখিবার জন্য দান

করিয়াছিলেন। অবগত আছি, উক্ত সভায় ইহা সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, কবির স্বগ্রামে একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হইবে; কিন্তু অদ্যাবধি উহারও কোন সূচনা না দেখিতে পাইয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। সেনহাটী গ্রামের ভদ্রমণ্ডলীকৃত একটী ইষ্টক স্তূপ কবির নিজ ভূমে স্থানীয় ডাকঘর ও হাসপাতালের সম্মুখে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া শ্রুত আছি; কিন্তু সম্ভবতঃ আর্থিক অনটনই ইহার সমাপ্তির প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, তথাকার যুবকবৃন্দের উদ্যোগে আজ তিন বৎসর হইল কবির স্মৃতি-রক্ষণার্থ কৃষ্ণচন্দ্র লাইব্রেরী সংস্থাপিত হইয়াছে। সেনহাটীর আবালবৃদ্ধবনিতা এই কার্য্যে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিলাম। লাইব্রেরীতে বর্ত্তমানে সন্দসমেত প্রায় সহস্রাধিক পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

"শুধু লাইব্রেরী স্থাপিত করিয়াই উৎসাহী যুবকবৃন্দ ক্ষান্ত হয়েন নাই। নানাবিধ আলোচনা ও ব্যায়াম ইত্যাদি কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা তাহারা নিজেদের মধ্যে নৈতিক ও শারীরিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। রোগীর শুশ্রূষায় ও দীনের দারিদ্র্য মোচনে আমরা তাহাদের স্নেহশীল চরিত্রের ও উদার হৃদয়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছি। নীরবকর্ম্মী ৺ত্রিগুণাচরণ সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দাতব্য-ভাণ্ডার ইঁহাদের দ্বারাই পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে ইঁহারা এ বৎসর যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। যুবকবৃন্দ শীঘ্রই কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃতিস্তম্ভ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাদের সৎকার্য্যাবলীর অনুমোদন করি। লাইব্রেরীর সুযোগ্য সম্পাদক স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সেন বি এ মহাশয় কর্ণধাররূপে যেরূপ কার্য্যদক্ষতা ও যোগ্যতার সহিত লাইব্রেরী ও দলবলকে পরিচালন করিতেছেন, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসনীয়।"

সাময়িকী

দুর্গোৎসব শেষ হইয়া গেল। আমরা 'ভারতবর্ষে'র পাঠক, লেখক ও অনুগ্রাহকগণকে বিজয়ার যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও অভিবাদন করিতেছি। মায়ের আশীর্ব্বাদ-ধারা সকলের মস্তকে বর্ষিত হউক; আগামী বৎসর এই বিজয়া উপলক্ষে আবার সকলকে প্রফুল্ল দর্শন করিয়া আমরা যেন পরিতৃপ্ত ও কৃতার্থ হই।

বিগত ১৪ই অক্টোবর কলিকাতা 'মীর্জাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরী'র বার্ষিক অধিবেশনে 'সবুজপত্রের' সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 'বঙ্গভাষা শিক্ষা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চৌধুরী মহাশয়ের বক্তৃতা পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছিল। সে মন্তব্য পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। সভায় উপস্থিত কোন সভ্য সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার যে চুম্বক লিখিয়া লইয়াছেন, আমরা তাহাই প্রকাশ করিলাম।

শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী আজকের সভায় যে প্রবন্ধ পাঠ করলেন, সে সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, যে প্রবন্ধ তিনি দু'দিনে রচনা করেছেন, সে প্রবন্ধ আমি দু'সপ্তাহেও রচনা করতে পারতুম না, এবং তার পরও, সে প্রবন্ধ এত সুন্দর হত না।

"কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালীর নিকট বাঙ্গলাভাষার আদর যে কত কম ছিল, তার প্রমাণ স্বরূপ চৌধুরী মহাশয় বলেছেন, সেকালে বিলেত-ফেরৎ সম্প্রদায় বাঙ্গলাভাষায় কথাবার্ত্তা কওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিতেন না। এ বিষয়ে আমি আপনাদের নিকট একটি গল্প বলি। আজ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন উক্ত সম্প্রদায়ের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যাই, তখন তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা আরম্ভ করেন। আমি তাতে বাঙ্গলায় এই কথা বলি যে, 'আমরা দুইজনেই যখন বাঙ্গালী, তখন মাতৃভাষাতেই আলাপ করা যাক্। ইংরাজের সহিত দেখেছি ইংরেজিতে কথাবার্ত্তা একরকম কওয়া যায়; কিন্তু বাঙ্গালীর সঙ্গে ইংরেজি বলতে আমার জিভ জড়িয়ে আসে।' এ কথায় তিনি হেসে উত্তর দেন যে, 'তুমি যা বলছ, তা ঠিক। তবে বাঙ্গলা ভাষার কোনও মান নাই, তাতেই আমরা ইংরেজি বলতে বাধ্য হই।' তার পর থেকে তিনি

বরাবরই আমার সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষাতেই আলাপ করিতেন; এবং আপনারা শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, তাঁর মত সুন্দর বাঙ্গলা আমি অল্প লোককেই বলতে শুনেছি।

"চৌধুরী মহাশয় আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মাতৃভাষার উপর এরূপ অবজ্ঞাটা যে শুধু বাঙ্গলাদেশেই দেখা গিয়াছে, তা নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ রকম ব্যাপার একযুগে না একযুগে ঘটেছে। চৌধুরী মহাশয় বলেছেন এই যে, Bacon তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Novum Organum ইংরেজিতে রচনা না করে ল্যাটিনে রচনা করেছিলেন। কিন্তু এর চাইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, Bacon তাঁর Essays প্রথমে ইংরেজিতে রচনা করে, পরে তার ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন এই উদ্দেশ্যে যে, তা'হলে সেগুলি শিক্ষিত লোকে পড়বে। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজি খালি অশিক্ষিত চাষাভুষায় পড়ে। যে ভাষায় Chaucer, Shakespeare, Spencer প্রভৃতি তাঁদের অমর গ্রন্থ সকল রচনা করেছিলেন, সেই ভাষা Baconএর মতে চাষাভুষার ভাষা বলেই গণ্য ছিল। অথচ Bacon যে-সে লোক ছিলেন না; তিনি যে একটি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এ কথা ত পৃথিবী শুদ্ধ লোক স্বীকার করে। অতএব ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলাভাষা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অশ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল বলে, তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হবার কোনই কারণ নাই।"

"শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরীর প্রধান বক্তব্য কথা এই যে, বাঙ্গলাভাষা যতদিন না বিদ্যার ভাষা এবং বিদ্যালয়ের ভাষা হয়ে উঠে, ততদিন বাঙ্গালা সাহিত্য তার যথার্থ মর্য্যাদা লাভ করবে না। এ কথা আমি মানি। তবে বাঙ্গলাকে বিদ্যাশিক্ষার ভাষা করে তোলবার পক্ষে যে সকল অন্তরায় আছে, সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা অনাবশ্যক; কেন না, আপনারা সকলেই তা অবগত আছেন। ইংরেজি শেখা যে আমাদের পক্ষে একান্ত দরকার, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংরেজি আমাদের শিখতে হবে, শুধু পড়তে নয়—সেই সঙ্গে বলতে এবং লিখতে; এবং সে ভাষা সম্যকরূপে আয়ত্ত করা যে কি কঠিন, তার প্রমাণ—আমরা আজীবন ঐ ভাষার চর্চ্চা করে যখন সে ভাষা লিখি, তখন ইংরেজরা বলেন যে, তা ইংরেজি নয়—'বাবু ইংলিস'; এবং সে ভাষায় যখন আমরা কথা কই, সে কথা শুনেও ইংরেজরা মুচকে হাসেন, তার উচ্চারণ শুনে। পূর্ব্বোক্ত কারণেই আমাদের বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা একাধিপত্য লাভ করেছে। কিন্তু আজকাল দেশের হাওয়া ফিরেছে। স্বদেশের প্রতি, স্বদেশীভাষার প্রতি সকলেরই প্রীতি ও শ্রদ্ধা জন্মেছে। সুতরাং আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর বাঙ্গলাভাষাকে তার যথাযোগ্য স্থান দিতে হবে।

"আমি প্রস্তাব করি যে, প্রথমে আমাদের স্কুলে বাঙ্গলা ভাষার প্রচলন করা হোক। আমার মতে, এক ইংরেজি সাহিত্য ব্যতীত প্রবেশিকা পরীক্ষার সকল বিষয়ের পরীক্ষা বাঙ্গলাতেই হওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলে ইংরেজি কেবল ভাষা হিসাবেই শেখান কর্ত্তব্য; অর্থাৎ ইংরেজি সে স্থানে প্রথম না হয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করবে। যাতে করে আমার এ মত কার্য্যে পরিণত হতে পারে, সে বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

"তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার স্থান কি হবে, সে বিষয়ে কিছু নিশ্চিত করে বলা কঠিন। ইংরেজি শিক্ষার আমাদের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। কেবল তা রাজভাষা বলে নয়;—উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা লাভ করতে আজকের দিনে ইংরেজির আশ্রয় নেওয়া ব্যতীত বাঙ্গালীর উপায়ান্তর নেই। সুতরাং বর্ত্তমানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষাকেই শিক্ষার ভাষা হিসাবে রাখতে হবে। তবে আমি এ কথা স্বীকার করি যে আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার চর্চ্চা অতি ক্ষীণ ভাবে চলছে, এবং অদূর-ভবিষ্যতে তাকে তীব্র ভাবে চালাতে হবে। সে বিষয়ে আমি যত্নের ত্রুটী করব না। বাঙ্গলাভাষা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সে সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলাভাষার প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত করতে আমাকে যথেষ্ট কষ্ট পেতে হয়েছিল। যে দিন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা ঢোকাবার প্রথম প্রস্তাব করি, সে দিন ইউনিভার্সিটির সত্তর জন সদস্য আমার বিরুদ্ধে ভোট দেন; আমার সপক্ষে ছিলেন কেবল তিনটি ব্যক্তি—স্যার গুরুদাস, ৺সারদাচরণ মিত্র এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। সর্ব্বশেষে প্রবন্ধ পাঠকের নিকট আমার এই অনুরোধ যে, তাঁর এ প্রবন্ধ হাতের লেখায় থাকলে চলবে না। এটিকে

গোধূলি

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রিত করে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, যাতে করে বাঙ্গলার সমগ্র শিক্ষিত সমাজ প্রবন্ধটী পাঠ করার সুযোগ পান।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবার কত ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে উত্তীর্ণ হইয়াছে ১১২৭০ জন। তাহার মধ্যে ৫৮৭৯ জন প্রথম বিভাগে, ৪৭৪৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ৬৪৮ জন তৃতীয় বিভাগে। এই প্রকার পাশের সংখ্যাধিক্য দেখিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই-চারিজন বিদেশী সদস্য বিশেষ বিচলিত হইয়া এই অত্যধিক পাশের কারণ অনুসন্ধানের জন্য কমিটি বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা-আন্দোলনও হইয়াছিল। আমাদের 'ভারতবর্ষে' অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ মহাশয় এই পাশের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরাও এ সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিয়াছি। এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রকাণ্ড এক কমিসন গঠিত হইয়াছে; বিলাতের খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ এবং আমাদের দেশেরও কয়েকজন সেই কমিসনের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। বিলাতী সদস্যগণ ও সভাপতি শ্রীযুক্ত স্যাড্‌লার মহোদয় এ দেশে আগমন করিয়াছেন; শীঘ্রই অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ হইবে। আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ও এই কমিসনের অন্যতম সদস্য। বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহারই হাতে-গড়া জিনিস;—প্রায় এক যুগ তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যত সংবাদ দিতে পারিবেন, এ দেশের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে যত কথা বলিতে পারিবেন, যত তথ্য প্রদান করিতে পারিবেন, আর কেহই তেমন পারিবেন না। এই কমিসনের মন্তব্য অবগত হইবার জন্য সকলেই আগ্রহান্বিত হইবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত এই সওয়া এগার হাজার ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার প্রদান করিলেন; কিন্তু তাহারা প্রবেশ করে কোথায়? পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার পর তিন-চারিদিন যাইতে-না-যাইতেই কলিকাতার বড়-বড় কলেজের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল; কলেজের কর্ত্তারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,

> "স্থান নাই, স্থান নাই, ছোট এ তরী,"
> আমারই ছেলের পালে গিয়াছে ভরি।"

ছোট-খাট যে দুই-চারিটা কলেজ আছে, তাহাতেও দশ-দিনের মধ্যেই স্থানাভাব হইল; মফস্বলের কলেজগুলির অবস্থাও প্রায় তথৈবচ। যে সমস্ত ছাত্র তৃতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছে, তাহারা অনেকেই কলেজের গেট হইতেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার উপায় কি? আমাদের মাননীয় শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর একটা উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন, কলিকাতার এবং বড়-বড় সহরের কলেজগুলিতে যখন পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের স্থান হইতেছে না, তখন মফস্বলের বড়-বড় উচ্চ ইংরাজী স্কুলে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী খুলিয়া ছাত্রগণের অন্ততঃ ইণ্টারমিডিয়েট পাঠের ব্যবস্থা করা হউক। এ প্রস্তাব যে অতি উত্তম তাহাতে সন্দেহ নাই; আর এ প্রস্তাব ব্যতীত আর কোন কথা ত কাহারও মনেও আসে না। বর্ত্তমান বৎসরে তাহার ব্যবস্থা করিলেই বেশ হইত; বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিসনের মুখের দিকে চাহিয়াই এ ব্যবস্থা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি, এবার যে সকল ছাত্র কলেজে প্রবেশ করিতে পারিল না, তাহাদের কি উপায় হইবে?

এই উপলক্ষে একটী রহস্যের কথা বলি। আমাদের এক পল্লীবাসী বন্ধুর একটী পুত্র এবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। বন্ধুটী নিতান্তই বাঙ্গালা-নবীশ; সহরের, বিশেষতঃ কলিকাতার, ধার তিনি বড় ধারেন না; পল্লীতে থাকেন, জোতজমা আছে, তাহাতেই বেশ ভাল ভাবে সংসার চলে। তিনি তাঁহার পুত্রটীকে কলিকাতার কোন ভাল কলেজে প্রবেশ করাইবার জন্য স্বয়ং পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বড়-বড় দুই-তিনটী কলেজে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে

পারেন নাই। এই সময় তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। আমরা তাঁহার পুত্রকে অপর কোন একটী কলেজে প্রবেশ করাইয়া দিবার ভার গ্রহণ করিলাম। তাহার পর ছেলেটীর অবস্থানের কথা উঠিল; আমরা তাঁহাকে কলিকাতার কোন এক প্রসিদ্ধ ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলাম। ছাত্রাবাস দেখিয়াই ত বন্ধুবরের চক্ষুস্থির! তিনি বলিলেন, "এমন সুন্দর অট্টালিকায় আমার মত গরিবের ছেলে থাকিবে!" তাহার পর ছাত্রাবাসের আহারাদির ব্যবস্থার কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "দেখুন মশাই, নিজের ছেলেটী ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল ভাবে থাকে, ইহা সকলেই চায়; কিন্তু এখানে যে ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থার মধ্যে থাকিলে আমার ছেলে যে বাড়ী যাইয়া আমার সেই খড়ো ঘরে থাকিতে চাহিবে না; আমার গৃহিনীর প্রদত্ত মুড়ি-গুড় জল খাইলে যে তাঁহার পেটের অসুখ হইবে; আমার আউশ ধানের চাউলের মোটা রাঙ্গা-রাঙ্গা ভাত আর মটরের দাইল যে তাহার মুখে উঠিবে না! না মশাই, আমার ছেলেকে আমি কলিকাতায় পড়াইব না; আমাদের জেলার উপর যে ছোট কলেজ আছে সেখানেই পড়াইব। সেখানে এ সব ব্যবস্থা নাই, আমাদের গৃহস্থ ঘরের মতই সেখানে ব্যবস্থা। এখানে থাকিয়া বাবাজির চাল অন্য রকম হইয়া গেলে আমার মত গরিব চাষী গৃহস্থ মারা যাইবে।" বন্ধু তাঁহার পুত্রটিকে লইয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার জেলার কলেজেই ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছেন। বন্ধুর কথাটা কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার মত কথা।

পুস্তক-পরিচয়

মধুপর্ক

[শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।]

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার একবিংশ গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় একজন উৎকৃষ্ট গল্পলেখক; এই সংগ্রহ-পুস্তকে যে কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিতেই তাঁহার অভ্যস্ত লিপি-কুশলতা বিদ্যমান। তিনি বিনয় প্রকাশ করিয়াই বইখানির নাম 'মধুপর্ক' রাখিয়াছেন; অবশ্য মধুপর্কের ছোট পাত্রে যে মধু সঞ্চিত হয়, তাহা ইহাতে আছে, কিন্তু আমাদের চিরাগত মধুপর্কের পাত্র যে প্রকার ক্ষুদ্রকায় এবং তাহাতে যে হোমিওপ্যাথি ডোজের মধু সঞ্চিত থাকে, ইহাতে ত তাহা নাই; এ মধুপর্কের পাত্রে যথেষ্ট মধু রহিয়াছে। অতএব সকলেই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন এ পাত্রের মধু কত বেশী, কত মিষ্ট।

দ্বিজেন্দ্রলাল

[শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা।]

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের পর এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার দুইখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত প্রকাশিত হইল। আমরা পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-চরিতের কথা বলিয়াছি; এক্ষণে দ্বিজেন্দ্রলালের পরম সুহৃদ, সুকবি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত দ্বিজেন্দ্রলালের পরিচয় পাঠকগণকে দিতেছি। দেবকুমার বাবু এই জীবন-চরিত প্রণয়নে যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন; দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয় বন্ধুগণের যিনি যাহা জানেন, সমস্তই তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন; দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত কথাই এই পুস্তকে আছে। দেবকুমার বাবু বলিয়াছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থ সমালোচনা তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে করিবেন; তাঁহার সেই দ্বিতীয় খণ্ড দেখিবার জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া আছি। তাঁহার ন্যায় সুকবির লিখিত গ্রন্থ-সমালোচনা যে সুন্দর ও যথাযথ হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান পুস্তকখানি অতি তাড়াতাড়ি ছাপা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল, নতুবা দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মস্থান গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর না হইয়া খানাকুল কৃষ্ণনগর হইত না। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ সমস্তই ভাল, ছবিও অনেকগুলি আছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিলে আনন্দিত হইব।

অভিনয়-শিক্ষা

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুইটাকা।]

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ একজন নাট্যকার, তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া থাকে এবং নাট্যামোদিবৃন্দ নাটকগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই সার্টিফিকেটের বলেই ভূপেন্দ্রনাথ অভিনয়-শিক্ষা লেখেন নাই; তিনি একজন বিখ্যাত

অভিনেতা, সখের, নাটকের দলে অনেকদিন অনেক ভূমিকা গ্রহণ করিয়া তিনি অভিনয় করিয়াছেন; সুতরাং অভিনয়-শিক্ষা সম্বন্ধে দশ কথা বলিবার তাঁহার অধিকার আছে। এখন আমাদের দেশে অনেক স্থানেই শিক্ষিত যুবকগণ নাটক অভিনয় করিয়া থাকেন; তাঁহাদের শিক্ষার জন্যই এই পুস্তকখানি লিখিত; কিন্তু আমরা বলিতে পারি, যাঁহারা পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারাও এই পুস্তকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় পাইবেন। ভূপেন্দ্রনাথ রাখিয়া-ঢাকিয়া কোন কথা বলেন নাই, একেবারে খোলাখুলি ভাবে সব কথা বলিয়াছেন। সখের দলে এমন সব অভিনেতা দেখিয়াছি, যাঁহারা বড় বড় নামওয়ালা অভিনেতা অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহেন; চেষ্টা করিলে ও সাধনা করিলে আরও অনেকে ভাল অভিনেতা হইতে পারেন। তাঁহাদেরই শিক্ষার জন্য এই বইখানি লিখিত হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক অভিনয়-শিক্ষার্থীকে এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি। বইখানির মূল্য দুই টাকার একটু কম করিলে ভাল হইত।

বাঙ্গালার বেগম

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য বার আনা।]

বাঙ্গালার বেগমের দ্বিতীয় সংস্করণ হইল দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বইখানি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বলিলেও হয়,—এখানি সম্পূর্ণ নূতন বাঙ্গালার বেগম। শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথের প্রধান গুণ এই যে, তিনি সত্যনিষ্ঠ; তিনি যখন যাহা লেখেন, তাহাই বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, পড়িয়া শুনিয়া লেখেন; পরে যদি কোন প্রকারে জানিতে পারেন যে, তাঁহার লেখার কোন অংশ ঠিক হয় নাই, তাহা হইলে পূর্ব্বের লেখা নির্দ্দয় ভাবে পরিত্যাগ করেন; সেই জন্যই বাঙ্গালার বেগমের এই দ্বিতীয় সংস্করণ একেবারে নূতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা প্রথম সংস্করণের পুস্তক কিনিয়াছেন, তাঁহাদের এই দ্বিতীয় সংস্করণের বইখানিও কিনিতেই হইবে। বিশেষতঃ এবার বইখানির অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সুন্দর হইয়াছে; ছাপা, কাগজ, ছবি, বাঁধাই সবই ভাল। লেখা যে কেমন হইয়াছে, তাহা এই পুস্তকের ভূমিকায় ঐতিহাসিকপ্রবর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ই বলিয়াছেন।

নাগকেশর

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত, মূল্য এক টাকা।]

যাঁহারা বাঙ্গালা কবিতার সামান্য খোঁজও রাখেন, তাঁহারাই সুকবি শ্রীমান যতীন্দ্রমোহনের নাম জানেন। সেই যতীন্দ্রমোহন তাঁহার কতকগুলি কবিতা 'নাগকেশর' নাম দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই নাগকেশরগুলি এমন করিয়া পুষ্পপাত্রে সংগ্রহ না করিলে কবি যতীন্দ্রমোহন প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেন। তাঁহার কবিতা যখন যেখানে প্রকাশিত হয়, আমরা পড়ি, বিশেষ আগ্রহের সহিতই পড়ি এবং পাঠ শেষ করিয়া কবির দীর্ঘজীবন কামনা করি। নাগকেশরের প্রত্যেক কবিতাটি সুন্দর, মনোহর; আরও যে কি, তাহা কেবল উপভোগ্য।

ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি

[শ্রীকুলদারঞ্জন রায় প্রণীত, মূল্য আট আনা।]

খুব বাহাদুর এই কুলদারঞ্জন বাবু! তিনি যে কাজে হাত দেন, তাহাই সুন্দর হয়। ক্রিকেটে সিদ্ধহস্ত কুলদারঞ্জন সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়া প্রথমেই আমাদিগকে বত্রিশ সিংহাসনে চড়াইয়াছেন; তাহার পর এই বেতাল-পঞ্চবিংশতি। এই অমূল্য রত্নগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি এতদিন পড়ে নাই; কুলদারঞ্জন ছেলেদের উপলক্ষ করিয়া আমাদের এই ত্রুটী ধরাইয়া দিলেন। পঞ্চবিংশতির ভাষা বেশ সুন্দর হইয়াছে; ছেলেরা খুব আগ্রহের সহিত এই বই পড়িবে; আমরা, ছেলেদের অভিভাবকেরাই কি কম আগ্রহে বইখানি পড়িয়াছি!

চিত্রপট

[শ্রীসরলাবালা দাসী প্রণীত, মূল্য এক টাকা।]

এখানি ছোট গল্পের সমষ্টি; বারটী গল্প ইহাতে আছে। বইখানির নাম 'চিত্রপট' দিয়া লেখিকা মহাশয়া ঠিক কাজই করিয়াছেন, ইহা চিত্রপটই বটে; এমন সুন্দর, এমন প্রাণস্পর্শী চিত্রপট অনেকদিন দেখি নাই, গল্পগুলি পড়িয়া অশ্রু সংবরণ করা যায় না। শ্রীমতী সরলাবালা এখন আর লেখেন না, এই যা দুঃখ! কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার 'নিবেদিতা' পড়িয়াছিলাম, আর এখন তাঁহার বহুপূর্ব্বে লিখিত ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত এই গল্পগুলি পড়িলাম। তাঁহার নিকট যে আমরা অনেক বেশী আশা করি!

ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার

[শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।]

এখানি ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারের দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে মুসলমান রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কুমার শৌরীন্দ্র-

কিশোর ময়মনসিংহের বরণীয় রামগোপালপুরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ মহৎ কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়া বংশের তথা দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সুসঙ্গ রাজবংশের ইতিহাস বাঙ্গালী মাত্রেরই জানা উচিত। এই ইতিহাসে উক্ত রাজবংশের সমস্ত কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই ইতিহাসখানি পড়িতে পড়িতে বারবারই পরলোকগত মহারাজ কুমুদচন্দ্রের নাম আমাদের মনে পড়িয়াছে। কি মহামহিম, দেবোপমচরিত মহারাজাই আমরা অকালে হারাইয়াছি। শ্রীযুক্ত কুমার শৌরীন্দ্রকিশোর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদারগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করুন; শুধু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার কেন, তিনি ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালার জমিদারগণের ইতিহাসই লিখিতে পারেন; সে শক্তি, সে গুণপনা তাঁহার আছে বলিয়াই আমরা এ দাবী করিতেছি।

মাতৃ-মঙ্গল

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত, মূল্য বার আনা।]

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর-বধ, শুম্ভ নিশুম্ভ-বধ, সতী ও উমা, এই কয়টি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবু সুলেখক; তাঁহার সুলিখিত পুস্তকাবলির সহিত সকলেই পরিচিত; এই পুস্তকখানিও—তাঁহার সেই সুযশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ছবিগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়াছি।

হালদার বাড়ী

[শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত, মূল্য আট আনা]

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার বিংশ পুস্তক। শ্রীমান্ মুনীন্দ্রপ্রসাদ শুধু কবি নহেন, তিনি গার্হস্থ্য চিত্র অঙ্কনেও বিশেষ পারদর্শী; এই হালদার বাড়ী পুস্তকে তাহার যথেষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। শ্রীমান্ মুনীন্দ্রপ্রসাদ এই হালদার বাড়ীর যে ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জিত নহে, এ দৃশ্য আমাদের দেশের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে।

সেখ আন্দু

[শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা।]

এই উপন্যাসখানি যখন ধারাবাহিক ভাবে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন আমরা পড়িয়াছিলাম। সে সময়ে এই উপন্যাসখানি সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন সমগ্র গল্পটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল, এ সময় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মত প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, এই উপন্যাসখানির আখ্যানভাগ লইয়া মতভেদ হইবেই; তবে লেখিকা যে অতি সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া গল্পটী লিখিয়াছেন এবং আন্দুর চরিত্র যে সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। লেখিকার ভাষা বেশ, লিখিবার ভাবটীও সুন্দর, বইখানির ছাপা ও বাঁধাইও বেশ হইয়াছে।

রঙ্গ-চিত্র

[শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায় এম-বি]

ওস্তাগর

ওস্তাগর।—"আজ্ঞে,—হাতা আপনার বেমানান হয় নি। আবার একটু shrink করবে ত। তা ছাড়া, ভেতরে shirt থাকবে। বুকে কসা?—আচ্ছা, আপনি ঠিক হ'য়ে একবার দাঁড়ান। কৈ? কোথা কসা? এই দেখুন কত কাপড় রয়েছে। নতুন সেলাই হয়েছে বলে একটু কুঁচকে রয়েছে। একবার ইস্ত্রী হলেই ঠিক হয়ে যাবে। কোমরে?—আজ্ঞে, একটু ঢিলে ত থাকবেই। আপনিই বলেছেন loose fit করতে। আর, যথার্থই—বেশী আঁট হ'লে বেমক্কা হবে। মনে করুন এ ত আর গেঞ্জি নয়। আজ্ঞে ঝুল? এর চেয়ে বেশী হলে কি মানাবে? গলা বড়? আজ্ঞে যা' ফ্যাশান তাই করেছি। আপনি বলেন, ছোট করে' দোবো আমাদের কি? কিন্তু শেষে আপনারই দম বন্ধ হয়ে আসবে—তখন আবার বাড়িয়ে দিতে বলবেন। এর চেয়ে ছোট গলা হয় মশাই? আপনি মিছে খুঁত ধরচেন—তা' আর কি বলি বলুন।"

সভাপতির অভিজ্ঞতা

"Hear, Hear." "Can't hear." "ORDER !!"

বস্ত্রাগার

মামলাবাজ

বদহজম

মামলাবাজ

রামের জমির চৌহদ্দিতে শ্যামেরে দেওয়াই ডিক্রী।
শ্যামেরে করাই খরচা বাবদে হালের বলদ বিক্রী।
দেলবার আলি জেরবার! খালি মুলতুবি রাখি মামলা,
দোস্তমামুদে নাস্তানাবুদ করি বিরচিয়া হাম্‌লা।
গোকুলের নাম নকল করিতে নকুলে করাই মকৃশ,
খাড়া করে দিই কেদারের ধনে সরীক দেদারবক্স।
আবুর দলিলে ওয়ারীশ খাটি গিরীশ ভট্টাচার্য্যি,
ইহারি নজীর দাখিলিয়া করি হাকিমেতে পেশ আর্জি।
"অছি," "আদালত," "ওকালতনামা" "জোতজমা" "দরখাস্ত,"
"সওয়াল জবাব" ইত্যাদি নিয়ে নিত্যই মহা ব্যস্ত।
রাত্রি-দিবস নাইক বিরাম, চিন্তার নেই অন্ত।
ধাই নথি-হাতে, শুই নথি-মাথে—আমি যে বুদ্ধিমন্ত!
বুদ্ধি-বারুদ ভিতরে থাকিলে কেউ বা কাঁপায় বিশ্ব;
কেউ আপনারে ফাঁকা আওয়াজেই নিমেষেতে করে নিঃস্ব।
পট্‌কার মত কেউ ফাটে, কেউ ঘুরে মরে যেন চর্‌কা,
আলোর ফোয়ারা ছুটায়, কেহ বা ছিটায় ফুলের বর্ষা।
কেউ উঠে যায় নিমেষ ফেলিতে অবাধে অসীম উচ্চে,
কেহ বা নিজেরে ফুটাইয়া তোলে রঙীন তারকাগুচ্ছে।
আমি ইহাদের কোনটাই নই; নাই মোর ছলামাত্র,—
ফাটিও না নিজে, ফুটাই না ফুল, কাটাই না গিরিগাত্র।
মানব-সমাজে আমি ছুঁচোবাজী, অনিয়ন্ত্রিত কর্ম্ম,
কোন্ পথে, কবে, কোথা যাব, কেহ নাহি জানে তার মর্ম্ম।
কখনো গড়াই পায়ের গোড়ায়, ধরাই কখনো মট্‌কা,
ছুটি গোয়ালেতে, উঠি গোলাঘরে, দেখে-শুনে লাগে খট্‌কা।
ছুঁচোবাজী আমি! ভুল হবে যদি বল মোরে "ছুঁচো হদ্দ।"
ভুল করে' ছুঁচো বল, ত, করিব আইনেতে সোপরদ্দ।

ভাবের অভিব্যক্তি

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

নম্র প্রকৃতি

রুক্ষ প্রকৃতি

মাতাল

উন্মাদ

সমাজ-চিত্র

পাঠাভ্যাস

শোক-সংবাদ

৺সারদাচরণ মিত্র

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার

পূর্ব্ববঙ্গের প্রিয় কবি
৺কুলচন্দ্র দে

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের জন্ম-মৃত্যু তারিখে'র যে তালিকা বাহির হইয়া থাকে, আশা করি তাহার ভিতর এবার ১৩২৪ সালের ১৬ই আশ্বিন তারিখটিও ছাপা হইয়াছে দেখিতে পাইব। কারণ এই দিনই সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রকে আমরা হারাইয়াছি।

তাঁহার বয়স ৭১ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। অতএব এ মৃত্যুকে অসময়ে মৃত্যু বলিয়া দুঃখ করিবার যে কিছু নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। সাহিত্য-সেবাও ইদানীং তিনি এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বিয়োগে সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইল বোধ করিবারও হেতু দেখি না। কিন্তু তবু তাঁহার অভাবে আজ আমরা ব্যথিত।—'তিনি নাই' এ কথা মনে করিলে চিত্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল হইয়া উঠে।

বাস্তবিক, যাহা আমরা হারাইলাম, ঠিক তেমনটি এদেশে আর দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহার অপেক্ষা পণ্ডিত—তাঁহার অপেক্ষা শক্তিশালী লেখক থাকিতে পারেন, এবং তাহা আছেনও মনে করি; কিন্তু বাঙ্গালায় দ্বিতীয় অক্ষয়চন্দ্র নাই। তেমন অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগ, মাতৃভাষার প্রতি তেমন অবিচল নিষ্ঠা আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। চুঁচুড়ার সাহিত্য-সম্মিলনে অভিভাষণ পাঠের সময় তাঁহার সে স্নিগ্ধ গম্ভীর স্বর—তাঁহার গণ্ডযুগল বাহিয়া সে অশ্রুর প্লাবন যে দেখিয়াছে, সে তাঁহাকে চিনিয়াছে—বুঝিয়াছে। সে তাঁহাকে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না।

তিনি যখন সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, সাহিত্যের তখন কিশোর অবস্থা। সে সময়ে সাহিত্যালোচনার নেশা জন্মাইয়া দিবার মতন জিনিস সাহিত্যে বিশেষ কিছু ছিল না। এমন কি, সাহিত্য-সেবা করিয়া যশ-লাভ বা অর্থ-লাভ যে কিছু হইবে, সে সম্ভাবনাও তখন ছিল না। তখন ইংরাজী ভাষায় লিখিতে ও বলিতে পারিলেই দেশের লোকের নিকট আদর হইত। সেইটাই তখনকার দিনে বিশেষ রকম সম্মান ও গৌরবের বিষয় ছিল। অক্ষয়চন্দ্র কিন্তু ইংরাজী-ভাষায় পরম পণ্ডিত হইয়াও সে সম্মান ও গৌরবের আশাকে উপেক্ষা করিয়া দীনা মাতৃ-ভাষারই সেবক হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে সকলেই অবসর-মত সাহিত্য-সেবা করিতেন, কিন্তু তিনিই একমাত্র সাহিত্য-সেবাকে জীবনের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। গুণবতী মাতার প্রতি সন্তানের যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা ভক্তি তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি পূর্ণ-মাত্রায় ছিল।

বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাহার জন্য যে একটী বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল, সেই বিজ্ঞাপনে লেখকগণের নামের তালিকা এই ভাবে মুদ্রিত ছিল;—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।
" " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" " জগদীশনাথ রায়।
" " তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
" " কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
" " রামদাস সেন।
এবং " অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

—এই তালিকামধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের নাম সর্ব্বশেষে মুদ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনিই 'বঙ্গদর্শনে'র সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে'র অনেক সমালোচনা, যাহা বঙ্কিমের লেখা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা অক্ষয়চন্দ্রেরই লেখনী-প্রসূত। তাঁহার 'শিক্ষানবিশের পদ্য' সমালোচনা কালে তৃতীয় বর্ষের 'বঙ্গদর্শনে' স্বয়ং বঙ্কিমই লিখিয়াছিলেন,—"শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার—এই নামযুক্ত গ্রন্থ এই প্রথম প্রচারিত হইল। অতএব এমন অনেক পাঠক থাকিতে পারেন, যে অক্ষয়বাবুর বিশেষ পরিচয় জানেন না। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব যে বঙ্গদর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। তাঁহার প্রণীত সেই সকল প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্য লেখক, অল্পই বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।" বাস্তবিক 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার 'উদ্দীপনা', 'তুলনায় সমালোচনা' প্রভৃতি রচনা পাঠে তখনকার পাঠকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 'তখনকার' বলি কেন, এখনকার দিনেও তাহা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ ও উপকৃত হই। তেমন সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সুস্পষ্ট প্রবন্ধ এখনকার দিনে একান্ত বিরল। নবপর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিয়াছেন বটে,—"অক্ষয়চন্দ্র সাহিত্যে কোনও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন নাই। তাঁর অলোক-সামান্য কবি-প্রতিভার কিম্বা অসমসাধারণ চিন্তাশীলতার যে কোনও দাবী

আছে, এমনও বলা অসঙ্গত।"—কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। তিনি যে সাহিত্যে কোনও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন নাই, এ কথা স্বীকার্য্য। তাঁহার যে অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার কোনও দাবী নাই, তাহাও সত্য। কিন্তু 'অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতার যে কোনও দাবী' তিনি করিতে পারেন না, এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহার 'হেমচন্দ্র', 'সনাতনী' ও 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' প্রভৃতি লেখা যিনি পড়িয়াছেন, তিনি বিপিনচন্দ্রের মতে সায় দিতে পারিবেন, এমন বিশ্বাসও হয় না। এ সব রচনা তাঁহার অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্মদর্শিতারই পরিচায়ক। তিনিই বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রথম শুনাইয়াছেন যে, 'পূর্ব্বতন-কালে এদেশে বহু বহু কবি ছিল, কিন্তু একজনও উদ্দীপক ছিল না। আমাদের এই একটি ভাল জিনিষ ছিল না,—উদ্দীপনা শক্তি ছিল না।' তার পর ঈশ্বর গুপ্তকে যখন একদল লেখক উপেক্ষার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল, সে সময়ে তিনিই বাঙ্গালীকে ঈশ্বর গুপ্তের কৃতিত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় যখন 'ইংরাজী-পন্থী, ইংরাজী-ছন্দী, তাহার উল ইংরাজী, তাহার ফুল ইংরাজী, একরূপ পরস্ব পণ্য কেবল আসর জাঁকাইয়া পসার' করিতে আরম্ভ করে, তখন তিনিই সাহস করিয়া প্রথম বলেন,—"বলিতে একটু দুঃখ হয়, একটু সঙ্কোচও হয়, কিন্তু কথাটা ঠিক যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার শেষ কবি। মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্টন, হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র—বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ—শেলি,—বেশ কথা, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার কি? ঈশ্বর গুপ্ত—বাঙ্গালার ঈশ্বর গুপ্ত। ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের নিন্দা, ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা। তাঁহার কবিত্ব বাঙ্গালীর নিজস্ব; সেটুকু দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রা হইলেও, তাহার নিজস্ব। আর নিজস্ব বলিয়াই বড় আদরের সামগ্রী।"—এই ভাবের কথা পরে বঙ্কিমের লেখাতেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে ক্ষুদ্র নহে। ঠিক এ ধরণের পুস্তক বঙ্গভাষায় আর একখানি আছে বলিয়াও মনে হয় না। এত অল্প পরিসরের মধ্যে এত বিভিন্ন রকমের কথা এতটা গুছাইয়া বলিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। এ বহি পড়িলে যে কেবল কবি হেমচন্দ্রকে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের দোষ-গুণ, উন্নতি-অবনতি সমস্তই একপ্রকার বুঝা যায়। কাল সাগরের ঢেউ খাইয়া কবি হেমচন্দ্র যদি বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানিও অমরত্বের তরণীতে স্থান পাইবে, আমাদের বিশ্বাস। ইহা ভক্তি গদগদ অত্যুক্তি নহে। উচ্ছ্বাসের মুখে ইহা বেতালা স্তব নহে। বাস্তবিকই কবি হেমচন্দ্রের এমন সুন্দর পরিচয় আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

অক্ষয়চন্দ্রকে কেহ-কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সে ধারণা ঠিক নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যের পাঠশালায় হাতেখড়ি দিয়াছিলেন। আর অক্ষয়চন্দ্র নিজের কথা নিজ মুখেই বলিয়াছেন যে, "দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীত-বক্ষে গণেশ-মূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপ ভারত-চন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূর-চূড়া, টেরিকাটা কার্ত্তিক স্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহাপ্রতিমার উপাসক।"—অতএব, অক্ষয়চন্দ্রকে বঙ্কিমের শিষ্য না বলিয়া 'গুরুভাই' বলিলেই বোধ করি অধিকতর সঙ্গত হয়। তবে বঙ্কিমের প্রভাব যে অক্ষয়চন্দ্রের উপর কিছু পড়ে নাই, তাহা বলি না। প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়াই বঙ্কিমের পতাকাতলে তিনি স্বেচ্ছায়—সাগ্রহে সমবেত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন যুগ-প্রবর্ত্তক লেখক। তাঁহার প্রজ্বলিত প্রতিভাগ্নির দ্বারা সাহিত্য-ক্ষেত্রের অনেক আবর্জ্জনাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এ কার্য্যে বঙ্কিম একমাত্র অক্ষয়চন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও তেমন সহায়তা পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাঁহারই অনুকরণে অক্ষয়চন্দ্রও মেকী সাহিত্যের উপর করুণ-কঠোর কশাঘাত করিতেন। বলা বাহুল্য, সে অনুকরণ ব্যর্থ হয় নাই। ব্যর্থ যে হয় নাই, তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এই যে, বঙ্গ-দর্শনের প্রাপ্ত-গ্রন্থের অনেক সমালোচনাই তাঁহার লিখিত হইলেও বঙ্কিমের লেখা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।

এই সঙ্গে আর একটি কথা না বলিলে অন্যায় হইবে। কথাটি এই যে, বঙ্কিমের প্রতিভার নিকট যেমন অক্ষয়চন্দ্র ঋণী ছিলেন, তেমনই অক্ষয়চন্দ্রের শক্তি সাধন-সম্পত্তির দ্বারা বঙ্কিম-প্রতিভাও যৎকিঞ্চিৎ পুষ্ট হইয়াছিল। প্রমাণ হাতে-হাতেই আছে। বিষবৃক্ষের ভাষা-ভঙ্গী যে দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ভাষা হইতে একটু অন্য রকমের হইয়াছিল, তাহা অক্ষয়চন্দ্রেরই প্ররোচনায়। অক্ষয়চন্দ্র এ কথা একরূপ নিজেই বলিয়াছেন। তাঁহার "পিতা-পুত্র" নামক রচনায় তিনি লিখিয়াছেন,—"তাঁহার ভাষার "লম্ফত্যাগ" "নিদ্রাগমন" প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থকুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে বিদ্রূপাত্মিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন। আর কায়স্থকুলাধম আমি, ভাষার একান্ত সংস্কৃতানুসারিণী ভঙ্গি লইয়া বঙ্কিমবাবুর সহিত বিচার বিতর্ক করিয়াছি।......সাধারণ বর্ণনায়, সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয়, সংস্কৃতানুসারিণী হইলে তেমন হয় না। এইরূপ কথার বিচার বিতর্ক অনেকদিন চলিল। বঙ্কিম বিষবৃক্ষে 'গরু ঠেঙ্গাইতে' লাগিলেন। বিষবৃক্ষে উভয়রূপ ভাষার সমাবেশ হইল।"

বঙ্গভাষায় রীতিমত রাজনীতির আলোচনাও অক্ষয়চন্দ্র হইতে হইয়াছে। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সোম প্রকাশে" রাজনীতির আলোচনা করিতেন জানি; কিন্তু সে আলোচনা লিখন-ভঙ্গীর জন্য পাঠক সংগ্রহ করিতে পারে নাই। অক্ষয়চন্দ্রই রাজনীতির নীরস কথা সকল 'সাধারণী'র মারফতে সরস করিয়া প্রথম প্রচার করেন। সেই অবধি উহার চর্চ্চা দেশীয় কাগজে বাড়িয়া চলিয়াছে। রাজনীতির আলোচনার উদ্দেশ্যেই 'সাধারণী'র জন্ম। বঙ্গদর্শন প্রকাশের প্রায় দেড় বৎসর পরে এই 'সাধারণী' প্রকাশিত হয়। সাধারণীর পরিচয় প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রই বলিয়া গিয়াছেন,—"সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে সমান সেবা করিবার নিমিত্ত

জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, করিতও তাহাই! সাধারণী বলিত, ক্রন্দন ভিন্ন পলিটিক্স নাই; সুতরাং সরল বালিকার মতন কাঁদিত, ছোট ছোট আবদার করিত। রাজপুরুষেরা অতি ছোট আবদারে কর্ণপাত করিতেন। বড় আবদার করিলে এখন মুখ বাঁকান, ভর্ৎসনা করেন, তখন বালিকার কথা বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সাধারণীর ক্ষুদ্র কথায় রাজা কর্ণপাত করিতেন বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল। আর সাহিত্য-সেবাপরায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গালার কৃতবিদ্যের কাছে। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালী বাবু সক্ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন। আর রাজনীতি-জড়িত সাহিত্যের সক্ মিটাইবার জন্য —সাধারণীর জন্ম।"—'সাধারণী'র সাধনা যে সফল হইয়াছিল, তাহা এই লেখাটুকুর মধ্যেই সুপ্রকাশ। এ ক্ষেত্রে তিনি শুধু দূরদর্শিতা নহে, নির্ভীকতা ও স্বাধীনচিত্ততারও বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিলেন। বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া পরে বঙ্গবাসী পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই সেকালে বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাদের সংস্রবে থাকিয়াও কখনও সে ভাবের ভাবুক হন নাই।—তিনি বরাবরই কংগ্রেস প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তিনি রাজনীতি ও সাহিত্য-নীতির চর্চ্চা করিয়া শেষ জীবনটায় পল্লীর ও দেশের স্বাস্থ্যের কথায় মন দিয়াছিলেন। এই দুইটা জিনিষের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালীকে নানা কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। ইদানীং তাঁহার প্রধান কথাই ছিল এই যে,—"আমরা অস্বাস্থ্য-তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি, হাবুডুবু খাইতেছি।—অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর, তাহার পর আমাদিগকে অন্য উপদেশ দিও।" তাঁহার ধারণা ছিল, বাঙ্গালীর বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব নাই; দেহে বল ও সাহস আসিলেই এ জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে গণ্য হইতে পারিবে। এই জন্য তাঁহার সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণে এই 'স্বাস্থ্যের কথাটাই বেশী করিয়া শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা বলিতেন, তাহাতেই আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিত।

মাতৃ-সর্ব্বস্ব, সাহিত্যগত-প্রাণ অক্ষয়চন্দ্র এ দেশে যে ভাব বিলাইয়া গেলেন, তাহা অমর হউক। আমরা সেই বরেণ্য ভাবের আধার হইতে পারিলে, দেশ স্বর্গে পরিণত হইবে।—তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হউক। তাঁহার 'আদর্শ' বাঙ্গালায় দেদীপ্যমান হইয়া থাকুক।

ভ্রম-সংশোধন –

গত মাসে স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছিলাম—"রাজনারায়ণ বাবুর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়' রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' ও রমেশচন্দ্রের 'The Literature of Bengal' নামক ইংরাজী গ্রন্থে তারকনাথের নাম দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। রামগতি ও রমেশচন্দ্রের লেখা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক বটে; কিন্তু রাজনারায়ণের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা'য় তারকনাথ সম্বন্ধে এইটুকু লেখা আছে,—"উপন্যাস-রচয়িতা বলিয়া 'স্বর্ণলতা'-প্রণেতা অল্প-খ্যাতি লাভ করেন নাই। তাঁহার রচিত উপন্যাসের একটি প্রধান গুণ এই যে, তাহার কোনস্থানে জাতীয় ভাবের ব্যত্যয় হয় নাই।"

গৃহদাহ

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

আপনাকে সংবরণ করিয়া মহিম ঘরে ঢুকিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

মানব-চিত্ত যে অবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা অসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে মিথ্যা উদ্ভাবন করিতে পারে, সুরেশের তখন সেই অবস্থা। সে চট্ করিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া, সলজ্জ হাস্যে, অত্যন্ত উদারভাবে স্বীকার করিল, যে, সে বাস্তবিকই ভারি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু, মহিম সে জন্য কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিল না, এমন কি, তাহার হেতু পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিল না।

সুরেশ তখন নিজেই নিজের কৈফিয়ৎ দিতে লাগিল। কহিল, "যিনি যাই বলুন, মহিম, এ আমি জোর করে বল্‌তে পারি যে, এদের চোখে জল দেখ্‌লে কোথা থেকে যেন নিজেদের চোখেও জল এসে পড়ে,—কিছুতে সাম্‌লানো যায় না। আমি না গিয়ে পড়্‌লে কেদারবাবু ত এ-যাত্রা কিছুতেই বাঁচতেন না;—কিন্তু বুড়ো আচ্ছা বদমেজাজী লোক হে, মহিম, একটিমাত্র মেয়ে, তবুও তাকে খবর দিতে দিলে না। বিয়ের দিন থেকে সেই যে ভদ্রলোক চোটে আছে, সে চটা আর

জোড়া লাগ্‌ল না। বল্লুম, যা হবার সে তো হয়েই গেছে—"

মহিম জিজ্ঞাসা করিল, "চা' পেয়েচ ত হে?"

সুরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ, পেয়েচি। কিন্তু, বাপের কাছে এ রকম ব্যবহার পেলে কা'র চোখে না জল আসে বল? পুরুষ মানুষই সব সময়ে সইতে পারে না, এ তো স্ত্রীলোক!"

মহিম বলিল, "তা বটে। রাত্রে তোমার শোবার কোনো ব্যাঘাত হয়নি, সুরেশ, বেশ ঘুমোতে পেরেছিলে? নূতন যায়গায়—"

সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "না, নতুন যায়গায় আমার ঘুমের ত্রুটি হয়নি—একপাশেই রাত কেটে গেছে। আচ্ছা, মহিম, কেদারবাবু তাঁর অসুখের খবর তোমাদের একেবারেই দিলেন না, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ভেবে দেখ দেখি!"

মহিম একান্ত সহজভাবে কহিল, "আশ্চর্য্য বই কি।" বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, "হাত মুখ ধুয়ে একটু বেড়াতে বার হবে না কি? যাও ত একটু চট্‌পট্‌ সেরে নাও ভাই, আমাকে আবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বেরুতে হবে। এখনও আমার সকালের কাজকর্ম্মই সারা হয়নি।"

সুরেশ তাহার পুস্তকের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া কহিল, "গল্পটা বেশ লাগ্‌চে—এটা শেষ করে ফেলি।"

"তাই কর। আমি ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই ফিরে আস্‌চি" বলিয়া মহিম উঠিয়া চলিয়া গেল।

সে পিছন ফিরিবামাত্রই সুরেশ চোখ তুলিয়া চাহিল। মনে হইল কোন্ অদৃশ্য হস্ত এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার আগাগোড়া মুখখানার উপরে যেন এক পোঁছ লজ্জার কালী মাখাইয়া দিয়াছে।

যে দ্বার দিয়া মহিম বাহির হইয়া গেল, সেই খোলা দরজার প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া সুরেশ কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার অযাচিত জবাব-দিহির সমস্ত নিষ্ফলতা ক্রুদ্ধ অভিমানে তাহার সর্ব্বাঙ্গে হুল ফুটাইয়া দংশন করিতে লাগিল।

দুই বন্ধুর কথোপকথন দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া অচলা কান পাতিয়া শুনিতেছিল; মহিম কাপড় ছাড়িবার জন্য নিজের ঘরে ঢুকিবার অব্যবহিত পরেই সে কবাট ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

মহিম মুখ তুলিয়া চাহিতেই অচলা স্বাভাবিক মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার বাবা কি তোমার কাছে এমন কিছু গুরুতর অপরাধ করেছেন?"

অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া মহিম জিজ্ঞাসু মুখে নীরবে চাহিয়া রহিল।

অচলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথাটা বুঝি বুঝ্‌তে পারলে না?"

মহিম কহিল, "না। কথাগুলো প্রিয় না হ'লেও প্রাঞ্জল বটে; কিন্তু তার অর্থ বোঝা বেশ কঠিন। অন্ততঃ আমার পক্ষে বটে।"

অচলা অন্তরের ক্রোধ যথাশক্তি দমন করিয়া জবাব দিল, "এ দুটোর কোনটাই তোমার কাছে কঠিন নয়, কিন্তু কঠিন হচ্ছে স্বীকার করা। সুরেশ বাবুকে যে কথা তুমি স্বচ্ছন্দে জানিয়ে এলে, সেই কথাটাই আমাকে জানাবার বোধ করি তোমার সাহস হচ্ছে না। কিন্তু, আজ আমি তোমাকে স্পষ্ট করেই জিজ্ঞেসা করতে চাই, আমার বাবা কি তোমার কাছে এত তুচ্ছ হয়ে গেছেন যে, তাঁর সাংঘাতিক অসুখের খবরটাতেও তুমি কান দেওয়া আবশ্যক মনে কর না?"

মহিম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "খুবই করি। কিন্তু যেখানে সে আবশ্যক নেই, সেখানে আমাকে কি করতে বল?"

অচলা কহিল, "কোন্‌খানে আবশ্যক নেই শুনি।"

মহিম ক্ষণকাল স্ত্রীর মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া সহসা কঠোর কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, "যেমন এইমাত্র সুরেশের ছিল না। আর যেমন এ নিয়ে তোমারও এতখানি রাগারাগি কোরে আমার মুখ থেকে কড়া কথা টেনে বার করবার প্রয়োজন ছিল না। যাক্, আর না। যার তলায় পাঁক আছে, তার জল ঘুলিয়ে তোলা আমি বুদ্ধির কাজ মনে করিনে।" বলিয়া মহিম বাহির হইয়া যাইতেছিল, অচলা দ্রুতপদে সম্মুখে আসিয়া পথ আট্‌কাইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল সে দাঁত দিয়া সজোরে অধর চাপিয়া রহিল, ঠিক যেন একটা আকস্মিক দুঃসহ আঘাতের মর্ম্মান্তিক চীৎকার সে প্রাণপণে রুদ্ধ করিতেছে মনে হইল। তারপরে কহিল, "তোমার বাইরে কি বিশেষ জরুরি কোন কাজ আছে? দু-মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে না?"

মহিম বলিল, তা' পারব।"

অচলা কহিল, "তা'হলে কথাটা স্পষ্ট হয়েই যাক্। জল যখন সরে আ'সে, তখনই পাঁকের খবর পাওয়া যায়, এই না?"

মহিম ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হাঁ।"

অচলা বলিল, "নিরর্থক জল ঘুলিয়ে তোলার আমিও পক্ষপাতী নই, কিন্তু, সেই ভয়ে পঙ্কোদ্ধারটাও বন্ধ রাখা কি ভালো? একদিন যদি ঘোলায় ত ঘোলাক্ না, যদি বরাবরের জন্যে পাঁকের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায়! কি বল?"

মহিম কঠিনভাবে কহিল, "আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী দরকারি কাজ আমার পড়ে রয়েছে-- এখন সময় হবে না।"

অচলা ঠিক তেমনি কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল,—"তোমার এই ঢের বেশি দরকারি কাজ সারা হয়ে গেলে ফুরসৎ হবে ত? ভালো, ততক্ষণ আমি না হয় অপেক্ষা করেই রইলুম।" বলিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মহিম ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পরে কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে স্নান করিবার প্রসঙ্গ লইয়া বাহিরে সুরেশের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখের শান্ত শোকাচ্ছন্ন চেহারা সুরেশ চোখ তুলিবামাত্র অনুভব করিল। মহিমের সঙ্গে ইতিমধ্যে নিশ্চয় কিছু একটা ঘটিয়া গিয়াছে, নিশ্চয় অনুমান করিয়া সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সাহস করিয়া প্রশ্ন করিতে পারিল না।

অচলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি হচ্চে?"

সুরেশ ব্যাগের মধ্যে তাহার কল্যকার ব্যবহৃত জামা-কাপড়গুলি গুছাইয়া তুলিতেছিল, কহিল, "একটার মধ্যেই ত ট্রেণ, একটু আগেই ঠিক করে নিচ্চি।"

অচলা একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি কি আজই যাবেন না কি?"

সুরেশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, "হাঁ।"

অচলা কহিল, "কেন বলুন ত?"

সুরেশ তেম্‌নি অধোমুখে থাকিয়াই বলিল, "আর থেকে কি হবে। তোমাদের একবার দেখ্‌তে এসেছিলুম, দেখে গেলুম।"

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, "তবে উঠে আসুন। এ সব কাজ আপনাদের নয়, মেয়েমানুষের; আমি গুছিয়ে সমস্ত ঠিক করে দিচ্চি"—বলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতেই সুরেশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না না, তোমাকে কিছুই করতে হবে না,—এ কিছুই নয়—এ অতি—"

কিন্তু তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই অচলা ব্যাগটা তাহার সুমুখ হইতে টানিয়া লইয়া সমস্ত জিনিস-পত্র উপুড় করিয়া ফেলিয়া ভাঁজ-করা কাপড় আর একবার ভাঁজ করিয়া ধীরে-ধীরে ব্যাগের মধ্যে তুলিতে লাগিল। সুরেশ অদূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল—"এর কিছুই আবশ্যক ছিল না- সে যদি—আমি নিজেই"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

অচলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথারই প্রত্যুত্তর করিল না, ধীরে-ধীরে কাজ করিতে করিতে কহিল, "আপনার ভগিনী কিংবা স্ত্রী থাক্‌লে ত তাঁরাই করতেন, আপনাকে করতে দিতেন না;—কিন্তু আপনার ভয়, যদি বন্ধুটি ফিরে এসে দেখ্‌তে পান্‌,—এই না? কিন্তু, তাতেই বা কি, এ তো মেয়েমানুষের কাজ। কি বলেন?"

সুরেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এইমাত্র মহিমের সহিত তাহার যাহা হইয়া গেছে, অচলা তাহা নিশ্চয়ই জানে না; তাই কথাটা পাড়িয়া তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিতেও তাহার সাহস হইল না, অথচ ভয় করিতেও লাগিল, পাছে সে আসিয়া পড়িয়া আবার স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া ফেলে।

ব্যাগটি পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া দিয়া অচলা আস্তে-আস্তে বলিল, "বাবার অসুখের কথাটা না তুল্‌লেই ছিল ভাল;—এতে তাঁর অপমানই শুধু সার হোলো—উনি ত গ্রাহ্যই করলেন না।"

সুরেশ চকিত হইয়া কহিল, "কি বল্লে তোমাকে মহিম?"

অচলা তাহার ঠিক জবাব না দিয়া পাশের দরজাটা

চোখ দিয়া দেখাইয়া কহিল, "ঐখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজেই সমস্ত শুনেচি।"

সুরেশ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "সে জন্যে আমি তোমার কাছে মাপ চাচ্চি অচলা!"

অচলা মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, "কেন?"

সুরেশ অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "কারণ ত তুমি নিজেই বল্‌লে। আমার নিজের দোষে তাঁকে তোমাকে দুজনকেই আজ আমি অপমান করেচি; সেই জন্যেই তোমার কাছে বিশেষ করে ক্ষমা প্রার্থনা করচি অচলা!"

অচলা মুখ তুলিয়া চাহিল। সহসা তাহার সমস্ত চোখ-মুখ যেন ভিতরের আবেগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, "যাই কেন না আপনি কোরে থাকেন সুরেশ বাবু, সে তো আমার জন্যেই করেছেন? আমাকে লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যই ত আজ আপনার এই লজ্জা। তবুও আমারই কাছে আপনাকে মাপ চাইতে হবে, এত বড় অমানুষ আমি নই। কিসের জন্যে আপনি লজ্জিত হচ্চেন? যা করেছেন, বেশ করেছেন।"

সুরেশের বিস্মিত ও হতবুদ্ধিপ্রায় মুখের পানে চাহিয়া অচলা বুঝিল, সে তাহার কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। তাই এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া কহিল, "আজই আপনি যাবেন না, সুরেশ বাবু! এখানে লজ্জা যদি কিছু পেয়ে থাকেন, সে তো আমারই লজ্জা ঢাক্‌বার জন্যে; নইলে নিজের জন্যে আপনার ত কোন দরকারই ছিল না। আর বাড়ী আপনার বন্ধুর একার নয়, এর ওপর আমারও ত কিছু অধিকার আছে। সেই জোরে আজ আমি নিমন্ত্রণ করচি, আমার অতিথি হয়ে অন্ততঃ আর কিছুদিন থাকুন।"

তাহার সাহস দেখিয়া সুরেশ অভিভূত হইয়া গেল। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয়ে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই দেখিতে পাইল, মহিম তাহার বাহিরের কাজ সারিয়া বাড়ী ঢুকিতেছে।

অচলা তখন পর্য্যন্ত ব্যাগটা সম্মুখে লইয়া মেজের উপর বসিয়া এই দিকে পিছন ফিরিয়া ছিল; পাছে মহিমের আগমন জানিতে না পারিয়া আরও কিছু বলিয়া ফেলে, এই ভয়ে সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া বলিয়া উঠিল—"এই যে মহিম, কাজ সারা হ'ল তোমার?"

"হাঁ, হো'লো" বলিয়া মহিম ঘরে পা দিয়াই অচলাকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "ও কি হচ্ছে?"

অচলা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া সুরেশকেই লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ব প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া কহিল, "আপনি আমারও ত বন্ধু,—শুধু বন্ধুই বা কেন, আমাদের যা' করেছেন, তাতে আপনি আমার পরমাত্মীয়। এমন কোরে চলে গেলে আমার লজ্জার, ক্ষোভের সীমা থাকবে না। আজ আপনাকে ত আমি কোনমতেই ছেড়ে দিতে পারব না।"

সুরেশ শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, "শোন কথা মহিম! তোমাদের দেখ্‌তে এসেছিলুম, দেখে গেলুম, ব্যস। কিন্তু এ জঙ্গলের মধ্যে আমাকে অনর্থক বেশি দিন ধরে রেখে তোমাদেরই বা লাভ কি, আর আমারই বা কষ্ট সহ্য কোরে ফল কি বল?"

মহিম ধীরভাবে জবাব দিল, "বোধ করি রাগ করে চলে যাচ্ছিলে; কিন্তু সেটা উনি পছন্দ করেন না।"

অচলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "তুমি পছন্দ কর না কি?"

মহিম জবাব দিল, "আমার কথা ত হচ্ছে না।"

সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; তাই এই অপ্রিয় আলোচনা কোনমতে থামাইয়া দিবার জন্য প্রফুল্লতার ভান করিয়া সহাস্যে কহিল, "এ কি মিথ্যে অপবাদ দেওয়া! রাগ কোরব কেন হে, আচ্ছা লোক ত তোমরা! বেশ, খুসিই যদি হও, আরও দু' এক দিন না হয় থেকেই যাবো। বো'ঠান্‌, কাপড়গুলো আর তুলে কাজ নেই, বের করেই ফেলো। মহিম, চল হে, তোমাদের পুকুর থেকে আজ স্নান করেই আসা যাক্‌; তারপরে বাড়ী গিয়ে না হয় একশিশি কুইনিনই গেলা যাবে।"

"চল" বলিয়া মহিম জামা-কাপড় ছাড়িবার জন্য ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বীণার তান

[শ্রীসুধীন্দ্রলাল রায় বি-এ]

হিন্দী

১। **মর্য্যাদা**, আগষ্ট ১৯১৭।

"উদ্যোগ ধন্দে! দেশোন্নতি সে উনকা সম্বন্ধ!" লেখক শ্রীগোপীনাথ কুঞ্জরু B. A., LL. B. ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি ও আর্থিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে তর্ক প্রারম্ভ হইয়াছে। জাতীয় জীবনের জন্য আর্থিক স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য হইতে কোনও অংশেই হীন নহে। স্বাধীন রাষ্ট্র আর্থিক অবস্থায় পরাধীন হইতে পারে বটে—যেমন চীন। কিন্তু যে দেশের আর্থিক স্বাধীনতা আছে, তাহাকে কখনই অধিককাল পরতন্ত্রতার দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। * পরতন্ত্রতা দ্বারা বুঝা যায় যে, হয় দেশে বাণিজ্যদ্রব্যের অভাব আছে, অথবা দেশের কাঁচা মাল অন্য সভ্য দেশে চলিয়া যায় এবং সেখান হইতে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া অধিকতর মূল্যে বিক্রয় হয়। এইরূপে দেশের বস্তু অন্য দেশে চলিয়া যায় এবং রাষ্ট্রের দারিদ্র্য প্রতিদিন বাড়িতে থাকে। জীবনের আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য দেশে অর্থ থাকে না এবং শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য অর্থের অভাব হয়। এরূপ দেশের লোক কখন উন্নত হইতে পারে না এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রের কবলে পতিত হয়।

লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন যে, এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য গবর্ণমেন্টের সাহায্য কি একান্ত আবশ্যক? লেখকের মতে গবর্ণমেন্টের উচিত এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি দেওয়া। বিশেষতঃ আমাদের দেশে যখন নৈতিক ও সামাজিক কোনও আন্দোলনই সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকে হয় না, তখন আর্থিক ও শিল্পের উন্নতিতেও সরকারের সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের উন্নতি চরম লক্ষ্যের দিকে নজর রাখিয়াই করা হয়। Gold Exchange Standard অর্থাৎ স্বর্ণকোষের সম্বন্ধ আমদানি বস্তুর সঙ্গেই মাত্র। রপ্তানী ব্যবসা বা অন্তর্বাণিজ্যের সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধই নাই। Rate-payer বা শুল্কদাতাগণ, যে সকল ব্যাপারী মাল আমদানি করে, তাহাদিগকেই মাশুল দেয়। অর্থশাস্ত্রের একটি বিচিত্র নিয়ম এই যে, কারেন্সির মূল্য কমাইয়া দিলে আমদানী মালের মূল্য বাড়িয়া যায় এবং রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায়। এইরূপ হইয়াছিল বলিয়াই Chamberlain কমিশন বসিয়াছিল। ইংলণ্ডে ক্যাশ ব্যালেন্স, Paper currency Reserve এবং Gold Standard Reserve দ্বারা ভারতের এক্সচেকারের বায়ে ব্রিটিশ বণিক অল্প সুদে টাকা ধার লইয়া ব্যবসা করে। ভারতের ইনভেষ্টমেন্ট ইংলণ্ড অপেক্ষা কম সুরক্ষিত নহে, এবং ভারতগবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে ক্যাশ ব্যালেন্সে সুদের উপর ঋণদান করিয়া ভারতের ব্যবসায়ের সহায়তা করিতে পারেন।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির একটি প্রধান উপায়। ব্যাঙ্কের সাহায্য করা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য। ভারত গবর্ণমেন্ট এরূপ করিয়াও থাকেন। গবর্ণমেন্ট বিনা সুদে তিন কোটি টাকা দিয়া এদেশের প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করেন। এতদ্ব্যতিরেকে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ককেও গবর্ণমেন্ট সাহায্য করেন। ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় বটে যে, যখন শিক্ষাদ্বারা জর্ম্মণী ও জাপান শিল্পের উন্নতি করিতে পারিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ভারতবর্ষ এ বিষয়ে হীন রহিয়াছে কেন? এদেশে সাধারণ শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ শিক্ষা দ্বারা শ্রমজীবিদের বুদ্ধির বিকাশ হইবে, যোগ্যতা বাড়িবে এবং কার্য্যে ঔৎসুক্য বর্দ্ধিত হইবে। শিক্ষিত শ্রমজীবী দ্বারা শীঘ্র ভাল কাজ পাওয়া যায়; অশিক্ষিত লোককে বহুবার যাহা শিখাইতে হয়, শিক্ষিত লোককে তাহা একবার বলিলেই চলে। শিক্ষিত মনুষ্য অধিক কার্য্য করিতে পারে। শিক্ষিত মানুষ্যের মধ্যে অধিকতর যোগ্যতা ও কার্য্যদক্ষতা ব্যতীত আত্মোন্নতির প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে; তাহাতে সে উত্তমরূপে কার্য্য করে।

শুধু ব্যাঙ্ক ও শিক্ষা দ্বারা নহে অন্য ভাবেও গবর্ণমেন্টের উচিত দেশের সাহায্য করা। উদারতার সঙ্গে আবশ্যক মত সাহায্য করা, অন্য জাতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে রক্ষা করা এবং স্থল ও জলপথে সুবিধা করিয়া দেওয়াও উচিত।

২। **চিত্রময় জগৎ**, আগষ্ট ১৯১৭।

"জলানে কিলকড়ি সে নিকালনেবালে পদার্থ।"—বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পরিণাম অন্য দেশে যেরূপেই হউক, ভারতবর্ষের পক্ষে যে লাভদায়ক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানকার শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্ট যে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাহা একটি সুলক্ষণ। যদি আমরা কিছুই লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের মত হতভাগ্য দেশ আর নাই।

কাঠকয়লা হইতে জর্ম্মণীই প্রথম রং বাহির করিতে সমর্থ হয়, এবং এই কার্য্যে জর্ম্মণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। কাঠকয়লা হইতে নির্গত রং দ্বারা কাপড় রঙাইয়া সেই রং কাপড়ে স্থায়ী করিতে হইলে acetic acidএর প্রয়োজন হয়। জ্বালানি কাঠ হইতে এই acid পাওয়া

* "After all, industrial and political freedom go together. Hobhouse.

যায়। কোল্লাপুরের রাজ এষ্টেট্ এইজন্য একটি কারখানা খুলিয়াছেন। ১৮ গাড়ী কাঠ লইয়া একটি পরীক্ষা হইয়াছিল; তাহাতে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়—

১২০০ পাউণ্ড উড্ স্পিরিট wood spirit or crude-acetic acic.

৬৫ পাউণ্ড আলকাতরা Stockholm Tar.

১৪০০০ পাউণ্ড কয়লা charcoal.

ইহার মধ্যে ১৪০০০ পাউণ্ড কয়লার মূল্য টাকায় ৭০ পাউণ্ড হিসাবে ২০০৲ টাকা; ৬৫ পাউণ্ড আলকাতরার মূল্য প্রতি গ্যালন ৩৲ হিসাবে ১৩৲ টাকা; wood spiritএর মূল্য এখনও অনিশ্চিত। প্রতি একশত পাউণ্ড দশ শিলিঙ বলিয়া ধরা হয়।

এখন খরচের হিসাব দেখুন—

১৮ গাড়ী কাঠের দাম—১৮৲

কুলীর খরচ —৫৷৵৹

২৩৷৵৹

প্রতি বৎসর লক্ষ টাকার acetic acid বিদেশ হইতে আসে এবং সূতা রং করিবার জন্য প্রয়োজন হয়। জ্বালানী কাঠ হইতে ইহা নির্গত করিতে পারিলে একটি নূতন ব্যবসায় খুলিয়া যাইবে; wood Tarএর কাজ আমাদের দেশে Japan Black দ্বারা করা হয়। কিন্তু ঐ জিনিস এখানে উৎপন্ন হইলে কত উপকার হয়।

৩। চিত্রময় জগৎ, ভাদ্র, ১৯১৭।

"মহাত্মা গান্ধী কা ব্যাখ্যান।"—দ্বাদশ বিহারী ছাত্রসম্মেলনে গান্ধী মহোদয় এই বক্তৃতাটি করেন—

"ছাত্রবৃন্দ এবং বন্ধুগণ! আজ আমাকে সভাপতির আসন দান করিয়া আপনারা আমায় ধন্য করিয়াছেন। আপনারা যে এই সভার কার্য্য হিন্দীতে নিষ্পন্ন করিবার মনস্থ করিয়াছেন, তাহা আপনাদের স্বদেশপ্রীতিরই পরিচায়ক। এই প্রদেশের ভাষা যে ভারতের রাষ্ট্র-ভাষা হইতে পারে, আপনাদের এই বিশ্বাস আপনাদের দূরদর্শিতার পরিচায়ক। আমরা মাতৃভাষার অনাদর করিয়া আসিয়াছি। এই সভায় উপস্থিত যাঁহারা আছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ঘর হইতে ও ঘরের লোক হইতে কতটা পৃথক, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। আমরা স্কুল কলেজে যাহা পড়ি, তাহা আমরা নিজ নিজ বাড়ীতে প্রচার করিতে পারি না। কারণ যে ভাষায় আমরা জ্ঞান শিক্ষা করি, সে ভাষা আমাদের মেয়েরা বোঝে না, ছেলেরা বোঝে না। আমরাও তাহাকে আবার নিজ ভাষায় সব সময়ে বুঝাইতে পারি না। বিলাতে বা অন্যান্য দেশে বালকগণ যাহা বিদ্যালয়ে শিখিয়া আইসে, তাহা বাড়ীতে আসিয়া ছোট ছোট ভাই বোনদের মুখে মুখে ক্রীড়াচ্ছলে জানাইয়া দেয়—বাড়ীর অন্যান্য অনভিজ্ঞগণও জানিয়া লয়। আমরা যাহা বিদ্যালয়ে শিখি, তাহা সেইখানেই রাখিয়া আসি। যদি আমরা মাতৃভাষা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উচ্চ এবং গভীর চিন্তা এবং মনের কথা ব্যক্ত করিতে না পারি, তবে আমরা চিরকালের জন্যই হীন হইয়া থাকিব। উন্নতির সম্ভাবনা আশা করিতেই পারিব না। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রগুলি বুঝাইতে না পারিব, ততদিন আমরা সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের আশা কল্পনাও করিতে পারি না। সাধারণে কখনই ইংরাজী বুঝিতে পারে না। সকলের ইংরাজী শিখিবার সময়ও হয় না। অথচ তাহাদের জ্ঞানের ও শিক্ষার প্রয়োজন; এবং সে জ্ঞান ও সে শিক্ষা তাহাদিগকে মাতৃভাষাতেই দিতে হইবে। সব দেশেই তাহাই করা হয়।

যখন এক ভারতবাসী অন্য একজন ভারতবাসীর নিকট ইংরাজীতে চিঠি লেখেন, তখন আমার বড় দুঃখ হয়। আমি তো লক্ষ ইংরাজকে কথাবার্ত্তা বলিতে শুনিয়াছি; পরস্পরের মধ্যে তাহারা কখনই ইংরাজী ছাড়া অন্য ভাষা ব্যবহার করে না,—অন্য ভাষা জানা সত্ত্বেও। যদি পরস্পরের মধ্যে দৈনন্দিন ব্যবহারে আমরা মাতৃভাষার চর্চ্চা করি, তাহা হইলেও দেশের ও ভাষার অনেক উপকার হয়।

আমি দেখিয়াছি, আমাদের দেশের ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রাণহীন নিরুৎসাহের ভাব মাঝে-মাঝে আসিয়া পড়ে। অনেকেই বুঝিতে পারে না, তারা ভবিষ্যতে কি করিবে। ভবিষ্যতের চিন্তায় ও উপার্জ্জনের চিন্তায় তাহারা অস্থির হইয়া পড়ে; শিক্ষাও তাহাদের সেইজন্য সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের ছাত্রদের প্রথমে বুঝা উচিত, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি। শিক্ষা যে চারিত্র্যের বিকাশের জন্য, এ কথা অনেকেই ভুলিয়া যান। চারিত্র্যের ত্রুটি দূর করা ছেলেদের নিজের হাতে; তাঁহারা আপনি সে বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন।

বিদ্যার্থী যাঁহারা, তাঁহারা নির্দ্দোষ হইবেন। যেখানে নির্দ্দোষ বুদ্ধি আছে, সেখানেই শুদ্ধ আনন্দ আছে। তাহার সব সময় এই কথা মনে রাখা উচিত যে, জগতের শ্রেষ্ঠ স্থান তাহাকে অধিকার করিতে হইবে। দার্শনিকের মতে এ জগৎ ক্ষণিক হইতে পারে; কিন্তু শিক্ষার্থীর পক্ষে এ জগৎ মহান অখণ্ড সত্য; কারণ এখানে তাহাকে পুরুষার্থ অর্জ্জন করিতে হইবে। জগতের রহস্য না বুঝিয়া জগৎকে মিথ্যা বলিয়া যে সমাজ পরিত্যাগ করে, সে আপনাকে সন্ন্যাসী বলিতে পারে, কিন্তু সে মিথ্যা জ্ঞানী।

একটি বড় প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহা এই যে, বিদ্যার্থীর পক্ষে রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করা উচিত কি না। আমি কারণ দেখাইয়াই আমার অভিমত ব্যক্ত করিব। রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটি বিভাগ আছে। এক বিভাগ শুধু শাস্ত্রের বিভাগ। অন্যটিতে সেই শাস্ত্রের ব্যবহার বা প্রয়োগ কার্য্য চলে। শাস্ত্র সে পড়িতে পারে, কিন্তু কাজে সে শাস্ত্রের উপর তাহার কোনও অধিকার নাই। রাজনীতি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রগণ রাজসভা ও কংগ্রেসে যাইতে পারেন। এই সব সম্মেলন তাঁহাদের পক্ষে পদার্থবিদ্যার মত।

তুমি যাহা শিখিয়াছ, তাহার মূল্য তোমার কার্য্য দ্বারা ধার্য্য করা হইবে। তুমি হাজার টাকার পুস্তক পাঠ করিতে পার, কিন্তু যতক্ষণ সেই জ্ঞান কার্য্যে না পরিণত কর, ততক্ষণ তোমার মস্তিষ্কের মূল্য নাই। আমার অনুরোধ এবং আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, তোমরা যাহা শিখিবে, তাহাকে কাজে লাগাইবে, যেরূপ শিখিবে সেইরূপ কাজ করিবে। ইহাতেই উন্নতি হইবে।

দীক্ষা

[শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ঘোষ]

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

নৈহাটীর রামজীবন চট্টোপাধ্যায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, বেদাধ্যয়ন-রত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তবে তাঁহার জীবিকা ব্যবসা-বাণিজ্য, কারণ তাঁহাদের যাজনক্রিয়া কোনকালেই ছিল না এবং এখনও নাই। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া পৈতৃক সামান্য বহির দোকান অবলম্বন করিয়া নিজের বিশেষ চেষ্টায় একখানি দোকান করিয়া আজকাল তিনি মানুষের মত মানুষ হইয়াছেন। পৈতৃক একতলা ভগ্ন অট্টালিকার পরিবর্ত্তে সুরম্য দ্বিতল অট্টালিকা হইয়াছে; তদুপরি একখানি বাগানবাটীও খরিদ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনের বিষণ্ণতা ঘুচে নাই, কেন না তিনি অধিক বয়স পর্য্যন্ত পুত্রমুখ নিরীক্ষণে বঞ্চিত ছিলেন। ৺কালীঘাটের মহামায়ার প্রসাদী ফুলের প্রসাদে তাঁহার স্ত্রী সরমাসুন্দরী ৩৫ বৎসর বয়সে গর্ভবতী হইলেন। সাধ, পঞ্চামৃত, প্রভৃতি যাহা করণীয়, তাহাতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ত্রুটি করেন নাই। যথাকালে সরমাসুন্দরী প্রসববেদনার নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে সুন্দর সুকোমল শিশু প্রসব করিয়া যন্ত্রণার অসীম কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। নবজাত শিশুর ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি যথাসময়ে সম্পন্ন হইল। দিনে-দিনে পুত্র বাড়িতে লাগিল। অন্নাশনের সময় তাহার শ্যামদাস নামকরণ হইল। পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ মাত্রেই তাহার হাতে-খড়ি দেওয়া হইল; দশমবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত পাঠশালে পড়ার পরে সে স্থানীয় ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইল।

শ্যামদাস শৈশবকাল হইতে সাহেবীয়ানায় পোষাকে একটু বিশেষ প্রীতি দেখাইতেন; পিতামাতার একমাত্র পুত্র বলিয়া তাহার সমস্ত আবদারই সংকুলান হইত। বিদ্যালয়ে থাকাকালে জগবন্ধু নামক একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানের সহিত তাঁহার সখ্যতা হয়। বিজাতীয় পরিচ্ছদ এবং আহারের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহার পরদুঃখকাতরতা ছিল; তিনি সুবিধামত গরীব দুঃখীকে যথাসম্ভব দান করিতেন।

শ্যামদাস প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন কলেজে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার সহিত জগবন্ধুর ছাড়াছাড়ি হইল; তবে উভয়ের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিত। রামজীবন পরম্পর শ্রুত হইলেন, তাঁহার পুত্র ক্রমে বিগ্‌ড়াইতেছেন; তিনি পুত্রের কোষ্ঠির ফল জানিতেন এবং তাহা অকাট্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্যামদাসের কোষ্ঠির ফল ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে করিতে প্রাণবিয়োগ এবং তাহাতে সদ্‌গতি। কাজেই তিনি অপরের কথা গ্রাহ্য করিতেন না। তবুও পুত্রকে একদিন নিকটে আহ্বান করিয়া বাহ্যিক পরিচ্ছদের অসারতা বুঝাইয়া দিলেন। পুত্রও তদবধি বিশেষ ঘটনা ব্যতীত সাহেবীয়ানা করিতেন না। যে বৎসর শ্যামদাস এফ্-এ, পাশ করিলেন, সেই বৎসর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল। শ্যামদাস মহাসমারোহে যথারীতি পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন।

(২)

শ্যামদাস বি-এ, পড়িতে লাগিলেন। অবশেষে বি-এ পাশ করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংএ চাকরি গ্রহণ করিলেন। এই সময় তাঁহার জননী তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর শ্যামদাসের আবার পুরা সাহেবী-ধরণ চাগিয়া উঠিল; এবার পিতার ভয় ছিল না, মাও স্নেহবশতঃ কিছুই বলিতেন না। প্রায়ই শ্যামদাস হোটেলে নৈশ-ভোজন শেষ করিয়া আসিতেন।

একদিন আপিস হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে পথে জগবন্ধুকে দেখিয়া সোৎসুকে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "Hallo! Jagabandhu! জগবন্ধু সাহেবী পোষাক পরিহিত ভদ্রলোকের মুখ হইতে ইংরাজী-সম্বোধন শুনিয়া প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইল, পরে ভদ্রলোকের সাম্‌নে গিয়ে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শ্যামদাস সেই একই ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "What have you got to laugh at?" জগবন্ধু বলিলেন, "ওহে সাহেব! বাংলায় বল, মাতৃভাষা ভুলে গেলে

চল্‌বে কেন? তুমি যে ব্রাহ্মণ, তাতে আবার কুলীন ব্রাহ্মণ! তোমার চিরকালটাই সমানভাবে গেল হে? এখন বয়স হয়েছে, এক আধবার জপ-তপ কর? সাহেবী ঢংটা এখনও আছে দেখ্‌ছি।"

শ্যাম। তারপর জগবন্ধু বাবু! কেমন আছ, কি কোরছ?

জগ। আর ভাই, কি আর কোরব! কেরাণিগিরি করছি আ'র কি! তুমি কি কোরছ?

শ্যাম। আমিও তাই, তবে কি না আমার ভবিষ্যৎ একটা আশা আছে, পেন্সন পাবো।

জগ। আর ভাই! ওটা আমাদের আছে বটে; তবে সেটা অন্য রকমে, আমাদের প্রভিডেন্ট ফণ্ড আছে। শেষে টাকাটা একসঙ্গে পাওয়া যায়।

শ্যাম। তা বেশ ভালই, হাতে ওটা কি?

জগ। তুমি যে সাহেব, ওটার কথা শুন্‌লে হয় ত চটে যাবে!

শ্যাম। চটে যাব না, চট্‌বো কেন?

জগ। ভাই, কোন্নগরে আমরা একটি ধর্ম্মসভা স্থাপন করেছি; প্রতি শনি ও রবিবারে তথায় শাস্ত্রচর্চ্চা, গীতাপাঠ এবং গরীব দুঃখীর দুঃখ-মোচন সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

শ্যাম। তোমাদের আলোচনার বিষয়গুলির মধ্যে আমি দুঃখীর সম্বন্ধে আলোচনাটাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে রাজী। এটা কাজটা ভাল। আচ্ছা, ওই উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের সভায় কিছু টাকা দিতে রাজী আছি। কাল আপিসে যেও, দিয়ে দিব।

জগ। তোমার কেমন একটা ঝোঁক, যেটা ভাল না লাগে, তার ভিতরে কিছু আছে কি না তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা কর না। যা'ক, আজকাল একটু ধর্ম্মকর্ম্ম কর ত, না সাহেব সেজেই আছ?

শ্যাম। ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্যরূপ, আমি ওর পক্ষপাতী নই, জপ-তপ কেবল ভণ্ডামি। দীক্ষা না ঐ রকম কি তোমাদের আছে, সেটা নিয়েছ বোধ হয়?

জগ। হাঁ ভাই, তা নইলে দেহশুদ্ধ হয় না; আমার গুরুদেবের আলৌকিক ক্ষমতা; তুমি যদি যাও, তবে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পারি।

শ্যাম। তোমার গুরুদেব কোথায় থাকেন?

জগ। কাশীতে বাঙ্গালীটোলায়।

শ্যাম। আচ্ছা, আমি একবার তাঁর শিক্ষা, জপ, তপ ও প্রাণায়াম পরীক্ষা কোরব, ভণ্ডামিগুলো আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি বুঝি, খাও দাও, স্ফূর্ত্তি কর, আর মাঝে-মাঝে গরীবদুঃখীদের কিছু কিছু দেও, ব্যস।

কথোপকথন করিতে-করিতে দুইজনে হাবড়ায় আসিলেন, তারপর বিদায় গ্রহণ করিয়া উভয়ে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন।

(৩)

রামজীবনের মৃত্যুর পর প্রায় তিনবৎসর অতীত হইয়াছে। দোকানপাট এখন গোমস্তা সনাতনই চালাইতেছে। শ্যামদাস দোকানের কথা জিজ্ঞাসাও করেন না। তিনি সনাতনকে লাভের দুই আনা দিতে স্বীকৃত হইয়া কাজ চালাইতেছেন। কাজ ভাল ভাবেই চলিতেছে। পিতার অবর্ত্তমানে তিনি এখন যথেচ্ছ আহার-বিহার করিতেছেন। হঠাৎ একদিন মিউনিসিপাল বাজারে জগবন্ধুকে দেখিতে পাইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, এবং চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওয়েল চক্রবর্ত্তী, এখানে যে!" জগবন্ধু হাসিয়া বলিল, "তাই! কি করি, রোগীর পথ্যের জন্য সব জায়গায়ই যেতে হয়, আমার এক বন্ধুর ব্যামো হয়েছে, তাই ডাক্তারে প্রেসক্রিপসন করেছে, কোপির তরকারী খেতে হবে। তাই কিন্‌তে এয়েছি।" শ্যামদাস সোৎসাহে বলিলেন, "তবেই ত সাহেবের বাজারে গোঁড়া হিন্দুরও আস্‌তে হয়।" জগবন্ধু বলিল, "কেন সাহেবের বাজারে কি হিন্দুর ব্যবহার্য্য জিনিষ নাই?" শ্যামদাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন বাজার হোল? চল বাড়ী যাই।" "চল" বলিয়া জগবন্ধু তাঁহার পশ্চাদগামী হইল। দুই বন্ধুতে একখানি গাড়ীতে চড়িয়া বলিল "চালাও হাবড়া ষ্টেসন।"

গাড়ী তীরবেগে ছুটিল! জগবন্ধু জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, শ্যাম, তোমার কি চিরদিনই সমানে যাবে? বামুনের ছেলে, ভজন-সাধন কবে কোরবে? জীবন ত ফুরিয়ে এল!"

শ্যাম। আমার ও-সব ভাল লাগে না; যার যাতে ইচ্ছা হয় না, তা সে কোরবে কি করে! আমার ও সব ভণ্ডামি মনে হয়।

জগ। আমি সেদিন তোমায় বলেছি, একজন মহাত্মা

কাশীতে আছেন; চল সেখানে যাই;—তাঁকে দেখে এবং তাঁর কার্য্যে যদি তোমার ভক্তি হয়, তবে তাঁর কাছে দীক্ষা নেবে ত? ভক্তি না হয়, তোমায় আমি আর অনুরোধ কোরবো না।

শ্যামা। আচ্ছা, দেখা যাবে। তোমাদের সভার কতদূর হে? এক বছর আগে ত আমার কাছে থেকে টাকা নিয়েছিলে; আর আসনি যে?

জগ। ভাই! চল্‌ছে এক রকম; দশজনে সাহায্য করে, অভাব হয় না; তাই তোমার কাছে চাইনি। আমি ত জানি তোমার কাছে যখন চাইলেই পাবো, তখন ওটা রিজার্ভ থাক্।

শ্যাম। আচ্ছা, এবার গরীব-দুঃখীর জন্য আমি তোমাদের ফণ্ডে আরও কিছু টাকা দেব। তুমি কালই নিয়ো, আমি হয় ত আগামী পরশ্ব পশ্চিম যাবো।

জগ। আচ্ছা, তবে এখন বিদায় হই।

(৪)

শ্যামদাস সারারাত্রি জগবন্ধুর কথা আলোচনা করিলেন। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন, "একবার দেখ্‌তে হবে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে কি আছে; বাস্তবিক গুরু ব্যাটাদের ভণ্ডামি, না উহাতে কিছু পদার্থ আছে। কালই যেতে হবে। ছুটি দেয় ভালই, নচেৎ চাকরীতে ইস্তফা দিয়েই যাবো।" পরদিন শ্যামদাস মামাতো ভাই গোবর্দ্ধনকে গাড়ী রিজার্ভ করার জন্য টাকা দিয়া বলিয়া গেল, "আমি আপিসে যাচ্ছি, এসেই কাশী যাবো। বাড়ীতে ব'লে দিস্, আমাকে যেন কেউ চিঠিপত্র না দেয়; তোর কাছে চিঠি পত্র দেবো, তুই মাকে সংবাদ দিস্।" আপিসে যাইয়া ছুটির দরখাস্ত করিতেই সাহেব ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেবের কাছে যেতেই সাহেব হেসে বোল্লেন, "কি শ্যাম বাবু! তুমি পাগল আছ, এখন কাজের সময় কি ছুটী দেওয়া যায়!" শ্যামদাস বলিলেন, "আমার শরীর খারাপ হোয়েছে সাহেব; আমি আজই রাত্রের মেলে পশ্চিম যাবো; গাড়ী রিজার্ভ করা হোয়েছে।" সাহেব তখন তাঁহার পনর দিনের ছুটী মঞ্জুর করিলেন। বাড়ী আসিয়া সেই রাত্রেই শ্যামদাস ৺কাশীধাম রওনা হইলেন। মোগলসরাইতে প্রাতরাশের সময় জগবন্ধুর সহিত প্লাটফরমে দেখা হইল। জগবন্ধুও কাশী যাইতেছিল।

যথাসময়ে গাড়ী কাশী ষ্টেশনে পৌছিল। শ্যামদাস গাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়াই ঘোড়াগাড়ী ভাড়া করিয়া, জগবন্ধুর অপেক্ষা না করিয়াই, জগবন্ধু তাহার গুরুদেবের বাসায় যে ঠিকানা বলিয়া দিয়াছিল, সেই ঠিকানায় গাড়ী চালাইতে আদেশ করিলেন। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যেই গাড়ী গন্তব্য স্থানে পৌছিল। শ্যামদাস গাড়ী হইতে নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কিশোরী ভট্টাচার্য্যের এই বাড়ী?" একজন শিষ্য সেখানে ছিল; সে বলিল, "আজ্ঞে, হাঁ! আপনি কাকে চান?"

শ্যাম। আমি তাঁকেই চাই।

শিষ্য। তাঁকে এখন দেখতে পাবেন না! তিনি জপে বসেছেন। বেলা ৩টার সময় আস্‌বেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

শ্যাম। তিনি এতক্ষণ জপ করেন না কি? আমি ও সব শুনতে চাই না, ডাক তোমাদের ঠাকুরকে?

শিষ্য। আপনি কি রকম ভদ্রলোক মশাই?

সেই সময় জগবন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল "কি করছো রামদয়াল! ভদ্রলোকের সহিত ঝগড়া কর কেন? এস হে শ্যাম, আমার সঙ্গে এস!" শ্যাম আস্তে আস্তে বাল্যবন্ধুর সহিত একটী গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর জগবন্ধু বলিল, "চল হে, গঙ্গা নেয়ে আসি।" গঙ্গাস্নানান্তে শ্যামদাস বলিল, "চল যাই বিশ্বেশ্বরের মাথায় একটু জল দিয়ে আসি; গঙ্গাস্নান কোরে কাশীতে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণাকে না কি দর্শন করতে হয়, শুনেছি।" জগবন্ধু মনে মনে হাসিল মাত্র। বিশ্বেশ্বর দর্শন ও মন্দিরাদি প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহারা যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন বেলা ৩টা। গুরুদেব কিশোরীমোহন ভটাচার্য্য সেই সময় বাহিরে আসিয়া একজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁগো, হুগলী থেকে একটী বাবু এসেছেন কি?" শিষ্য উত্তর করিল "হাঁ, জগবন্ধু দাদা এসেছেন।" গুরুদেব বলিলেন, "জগবন্ধু নয়, শ্যামদাস নামে কোন ভদ্রলোক?" শিষ্য "তা ত জানি না" বলিয়া উত্তর করিল। তারপর একজন বলিল, "একজন সাহেবী বেশধারী এসেছেন, তিনি জগবন্ধু দাদার ঘরে আছেন।" গুরুদেব বলিলেন, "বেশ বেশ! মা অন্নপূর্ণা আমার কাতর আহ্বান শুনেছেন।" গুরুদেব

তখনই জগবন্ধুর ঘরে উপস্থিত হইলেন। জগবন্ধু গুরুচরণে প্রণত হইলেন, শ্যামদাস একটা ছোট নমস্কার করিলেন। গুরুদেব শ্যামদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা, এসেছ; আমি আজ তোমারই আগমন প্রতীক্ষা কোরছিলাম।" শ্যামদাস প্রথমে বিস্মিত হইলেন; পরে একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "কি রকম? আমায় আপনি জানেন?" গুরুদেব সহাস্যে বলিলেন, "হাঁ, বাবা! তোমায় চিনি, তোমার বাবাকে চিনি, তোমার পিতামহকেও চিনি; আমি যে তোমাদের কুলগুরু। তোমাদের না চিন্‌লে আমার চলবে কি ক'রে! আমি যে তোমাদের ঐহিক পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য দায়ী বাবা! তোমাকে কা'ল দীক্ষা নিতে হবে, তাই তোমায় এত প্রয়োজন।" শ্যামদাস বলিলেন, "আপনি যদি আমার কুলগুরু, তবে এতদিন খোঁজ নেননি কেন?" গুরুদেব বলিলেন, "সময় হয় নাই ব'লে খোঁজ নিই নেই। সময় ও ক্ষণ উপস্থিত না হোলে ত আর দীক্ষা হয় না? কাল তোমার দীক্ষা নেওয়ার বিধি-নির্দ্ধারিত দিন, তাই আমিও তোমায় স্মরণ করেছিলুম।" শ্যামদাস গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আচ্ছা, তাই দেখা যাক্। কাল যদি আমার দীক্ষা হয়, তবেই জানবো, সাধনা, দীক্ষা, মন্ত্র, এসব সত্য এবং আপনি আমার কুলগুরু, নচেৎ আমার বিশ্বাস—আমাতেই থাকবে।" গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "বাবা! এখনও চন্দ্র-সূর্য্য গগনে উদিত হচ্ছে, এখনও সতীর সতীত্ব-প্রভাব বিদ্যমান আছে; বেদ যদি সত্য হয়, শাস্ত্র যদি সত্য হয়, আর আমি যদি প্রকৃত তোমার কুলগুরু হই, তবে কাল তোমার দীক্ষা হবেই। যে হিন্দুধর্ম্ম এতদিনও বিলুপ্ত হয় নাই, তার অবশ্য একটা মাহাত্ম্য আছে; তুমি তাহার জলন্ত প্রমাণ পাবে। তোমার অবিশ্বাস মহামায়া নিজেই দূর করবেন বোলে তোমায় এখানে এনেছেন। এস, বৎস, আহারাদি কোরে একটু বিশ্রাম করবে।" সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন।

৫

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া ফিট্‌ফাট্ বাবু সাজিয়া শ্যামদাস সহরে বাহির হইয়া প্রথমেই ইংরেজ হোটেলের খোঁজ নিয়ে উপস্থিত হলেন; তথায় মদ্য মাংস পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া বেশ্যাপল্লীতে প্রবেশ করিলেন। একটা বাটীতে যাইয়া বলিলেন, "দেখো! আজ যদি তোমরা আমায় খুসী করতে পার, তাহলে, ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দেবো।" বেশ্যারা আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে তাঁহাকে মজলিসে বসাইল এবং নিজেরা ৭।৮ জন তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া গীতবাদ্য আরম্ভ করিয়া দিল। মদ্য মাংস তৎসঙ্গে চলিতে লাগিল। এত আমোদের মধ্যেও তাঁর চিন্তা "কাল দীক্ষা নিতে হবে, দেখি কি হয়," পরক্ষণেই যেন তাঁর মনে হইল গুরুদেব তাঁর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পরক্ষণেই দেখিলেন, কোথাও কেহ নাই। পুনরায় মদ্যপান আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আজ যেন কিছুতেই নেশা জম্‌ছে না। যাই হোক, সারারাত্রি এইরূপে কাটিল; পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত সেই একই ভাবে চলিল। বেশ্যারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এমন লোক তাহারা কখনও দেখে নাই; কিন্তু মুখে কিছু বলিতেছে না, কারণ পঞ্চাশ টাকার লোভ ত সোজা নয়। ১টার সময় বাবুর খেয়াল হইল 'গঙ্গা নাইতে যাবো'। সকলেই ঘেরা-ঘেরি করিয়া তাঁহাকে গঙ্গায় লইয়া গেল। স্নানান্তে পুনরায় সকলে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্যামদাস তাহাদের নিকট হইতে একখানি পট্টবস্ত্র চাহিয়া লইয়া পরিধান করিলেন, তারপর একখানি আসন চাহিয়া লইলেন। আসনে উপবেশনান্তে আপনাআপনি তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইল এবং আপনাআপনিই তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল বীজমন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল। বেশ্যারা দেখিয়া অবাক হইল; তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। সমস্ত দিনই সেইরূপে সেই আসনে বসিয়া কাটিল, তবুও শ্যামদাসের চৈতন্য হইল না; রাত্রি আসিল, তথাপিও তাঁহার জ্ঞানসঞ্চার হইল না দেখিয়া বেশ্যারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে ধূপধুনা পোড়াইতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস হইল, এ কোন শাপভ্রষ্ট সন্ন্যাসী নিজের যোগ-সাধনের জন্য আজ বেশ্যালয়ে অধিষ্ঠান হইয়াছেন।

পরদিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল এবং তিনি বিস্মিতের ন্যায় চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। তাঁহার হাবভাব দেখিয়া একজন বৃদ্ধা বেশ্যা করযোড়ে বলিল, "বাবা! তুমি কেন আমাদের ছলনা করছ? আমরা পাপিনী; আমাদের উদ্ধারের উপায় কি হবে না?" শ্যামদাসের এতক্ষণে

কলাকার কথা মনে হইল, তিনি উচ্চৈঃস্বরে "গুরুদেব! গুরুদেব! আমায় রক্ষা করুন।" বলিতে বলিতে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। বেশ্যার ঘরের বাহিরে আসিতেই দেখেন তাঁহার ইষ্টদেব যেন তাঁহারই অপেক্ষায় তথায় দাঁড়াইয়া আছেন। গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ট হইয়া গুরুদেবের পদতলে পতিত হইলেন। গুরুদেব তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া বলিলেন, "কি বাবা! দীক্ষা হোয়েছে?" শ্যামদাস নিজেকে গুরুদেবের আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব! লজ্জা দেবেন না, আমি পাপী, তাই আমার অমন মতি হোয়েছিল।" গুরুদেব বলিলেন। "বৎস! তোমার প্রাক্তন অনুযায়ী কার্য্য করিতে তুমি বাধ্য। বেশ্যালয়ে তোমার দীক্ষা হবে, ইহাই তোমার প্রাক্তন। বৎস দুঃখিত হোয়ো না; তোমার দীক্ষা-কার্য্য শেষ হয়েছে, চল যাই

একখানি ইতিহাস *

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের নাম বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত; তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইতিহাসের ১ম খণ্ড প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী-মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন; সম্প্রতি তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই খণ্ডে তিনি বাঙ্গালার মুসলমান-অধিকারকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই সময়কার ইতিহাস জানিতে হইলে Stewart সাহেবের History of Bengal গ্রন্থই একমাত্র অবলম্বন ছিল; কিন্তু এক্ষণে মুসলমান যুগের এত প্রভূত উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এখন আর আমরা শুধু Stewart লইয়া থাকিতে পারি না। রাখালবাবু আমাদের সে অভাব মোচন করিলেন; তাঁহার প্রভূত পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গালার ইতিহাস, (দ্বিতীয় খণ্ড) একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বাঙ্গালার ইতিহাস বাঙ্গালীর শ্লাঘার বস্তু।

পুস্তকখানি পাঠকালে দু'একটী অসঙ্গতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে; আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম; আশা করি রাখালবাবু পরবর্ত্তী সংস্করণে এগুলির সম্যক্ আলোচনা করিবেন;—

(১) ৩৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন;—"তবকাৎ-ই-নাসিরী ও তাজ-উল্-মাসিরে বখ্তিয়ারের সহিত মহম্মদ বিন্সাম অথবা কুতবুদ্দীন্ ইবকের প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ-সূচক কোন কথা নাই।" রাখালবাবু এ স্থলে তাজ-উল্-মাসিরের নামোল্লেখ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন,—বোধ হয় অনবধানতাবশতঃ তিনি দেখিতে পান নাই যে, এই গ্রন্থে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে—বখ্তিয়ার কুতবুদ্দীনের Lieutenant ছিলেন। See Elliot II, 222-3 বখ্তিয়ার কোনদিন কুতবুদ্দীনের ভৃত্য ছিলেন না, এ কথা আমিও স্বীকার করি; কারণ তাজ-উল্-মাসির অপেক্ষা তবকাৎ-ই-নাসিরী অধিক বিশ্বাসযোগ্য।

* বাঙ্গালার ইতিহাস, (দ্বিতীয় ভাগ) শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত, মূল্য তিন টাকা।

(২) ৩৫৮ পৃষ্ঠায় রাখালবাবু লিখিয়াছেন :—"১৫ই রবী-উল্‌-আউয়ল, ৯৬৩ হিজরা=২৮শে জানুয়ারী ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে হুমায়ুন বাদশাহের মৃত্যু হয়।" হুমায়ুনের মৃত্যু-তারিখ লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। বড়ই দুঃখের বিষয়, রাখালবাবুর ন্যায় একজন সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিক, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে, হুমায়ুনের মৃত্যু তারিখটী একখানি আধুনিক গ্রন্থ Burgess, Chronology of India (p. 35) হইতে গ্রহণ করিয়াছেন;—তিনি আবুলফজল, অথবা সীদী আলি রাইস-প্রমুখ সমসাময়িক লেখকদের প্রদত্ত তারিখ গ্রহণ করেন নাই। বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী কোনদিন সমসাময়িক সাক্ষ্য বর্জ্জন করিয়া বিংশ-শতাব্দীর একখানা পুস্তক অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিতে বলে না।

রাখাল বাবুর প্রদত্ত ২৮শে জানুয়ারী তারিখটী ভুল;—ইহা ২৭এ জানুয়ারী হইবে। হুমায়ুনের শেরমণ্ডল হইতে দুর্ঘটনা ২৪এ জানুয়ারী সংঘটিত হয়; ইহার তিন দিন পরে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়। পণ্ডিতপ্রবর বেভারিজ (H. Bəveridge) এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন; রাখালবাবু বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করেন নাই। See *Akbarnama*, i, 654-5 n., Gulbadan's Humayun-nama, Mrs. Beveridge's Introduction, p. 54-55.

(৩) রাখালবাবু ভ্রমক্রমে হুমায়ুনের ভ্রাতা 'অস্করীকে' 'আস্করি,' 'ফতেপুর সীক্‌রী' স্থলে 'ফতেপুর শিক্রী' এবং 'রাজশাহী' স্থলে 'রাজসাহী' লিখিয়াছেন। তিনি গ্রন্থে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও স্থানের নামের উচ্চারণগত বানান প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন, এইজন্য আমরা ইহার উল্লেখ করিলাম।

(৪) গ্রন্থকার—Talbot's Mems. of Babar নামক পুস্তকখানিকে 'প্রামাণ্য' বোধে ব্যবহার করিয়াছেন। বাবরের আত্মজীবন-চরিত তুর্কী ভাষায় রচিত; আকবরের রাজত্বকালে আবদুল-রহিম কর্ত্তৃক ইহা ফার্সীতে অনূদিত হয়। তাহাই অবলম্বন করিয়া Leyden and Erskine বাবরের আত্মজীবন-চরিতের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। রাখালবাবু চেষ্টা করিলেই, অল্প পরিশ্রমে Imperial Library বা Asiatic Societyতে ইহা দেখিতে পারিতেন; তাহা না করিয়া তিনি বাবরের একখানা ছেলে-ভুলান সচিত্র, সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি কি জানেন না যে, সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের নিকট ইহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়;—এরূপ স্থলে সাধারণতঃ 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া থাকে।

(৫) রাখালবাবু ৩৫০ পৃষ্ঠায় সুর-বংশের বংশ-লতিকায় এবং ৩৫৬ পৃষ্ঠার সিকন্দর শাহ সুরকে (আহ্‌মদ খাঁ) শের্‌শাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সিকন্দর শেরশাহের কনিষ্ঠভ্রাতা, কি nephew, তাহা লইয়া মতভেদ আছে; তিনি ভিন্ন-ভিন্ন মত আলোচনা করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে আমাদের কিছু বলিবার ছিল না। বদায়ুনী ও 'খুলাসাৎ-তওয়ারিকে আমরা সিকন্দর সুরকে শেরশাহের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে উল্লিখিত হইতে দেখি। রাখালবাবু বোধ হয় এই কারণে ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন। এরূপ স্থলে আমার মনে হয়, আবুল-ফজল, নিজামুদ্দীন, অহমদ, 'তারিখ-ই-সলাতীন-ই আফাঘনা' প্রভৃতির উক্তি গ্রহণ না করিবার কারণ উল্লেখ করা উচিত।

আজকালকার ইতিহাস পড়িয়া স্বতঃই একটা কথা মনে হয়;—শুষ্ক গবেষণাই কি ইতিহাসের চরম উদ্দেশ্য? কেবল তারিখের পশরা, রাজ্য-পরিবর্ত্তন, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি লইয়াই কি ইতিহাস? ইহা ব্যতীত ইতিহাসের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই? না,—তাহা নহে। ঐতিহাসিকের দুইটি কার্য্য; প্রথম সাক্ষী-বিচার,—ইংরেজীতে যাহাকে বলে Historical Criticism; দ্বিতীয়—ঐতিহাসিক দর্শন,—Philosophy of History। এই ঐতিহাসিক দর্শনের পরিচয় বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে এক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, এম-এ মহাশয়ের *Aurangzib* গ্রন্থের মধ্যে পাইয়া থাকি, বলিয়া মনে হয়। এমন কি রাখাল-বাবুর ন্যায় পাকা ঐতিহাসিকের গ্রন্থেও ইহার একান্ত অসদ্ভাব। ইতিহাসের সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ—ঐতিহাসিক দর্শন, অর্থাৎ "বর্ণিত ঘটনাবলী হইতে মানব-চরিত্র বা জাতীয় জীবন সম্বন্ধে গভীর উপদেশ লওয়া।" এই প্রণালীতে ইতিহাস লিখিতে হইলে, সময়-সময় 'Synthetic imagination' দিবারও প্রয়োজন হয়। George সাহেব সত্যই

লিখিয়াছেন ;—"The second stage requires no longer the judicial faculty only, but insight, even imagination, to suggest the reason why things happened, the motive that swayed the chief actors in events the influences that caused this or that drift of opinion or of feeling. In order to interest readers in men of the past, for admiration or the reverse, for example or for warning, he must strive to depict their character, as he infers it from their actions or words."

রাখালবাবুর গ্রন্থে আরও একটা অভাব পরিলক্ষিত হইল। তিনি পুস্তকখানি আদৌ মনোজ্ঞ করিয়া লিখিতে পারেন নাই। ভাষার প্রসাদগুণে দুর্ব্বোধ্য বিষয়কেও যে সুখপাঠ্য করা যাইতে পারে, এ কথাটা আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই।

তাহার পর, কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে হইলে, সামাজিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থা, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ের বিস্তৃতভাবে আলোচনা প্রয়োজন। রাখালবাবুর গ্রন্থে ইহারও অভাব বর্ত্তমান।

রাখালবাবুর গ্রন্থের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় :—'হিন্দুজাতির পুনরুত্থান—গণেশ ও দনুজমর্দ্দনের বংশ' ; এই অধ্যায়ে রাখালবাবুর বিচার-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যদেবের কথা যে অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা পড়িয়া আমরা হতাশ হইয়াছি। কয়েকখানি ত্রিবর্ণ চিত্র ও অনেকগুলি একবর্ণের চিত্র গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

উপরে যে দু'একটী ত্রুটির কথার উল্লেখ করিলাম, তাহা পুস্তকের গুণের তুলনায় কিছুই নহে। 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বাঙ্গালীর গর্ব্বের সামগ্রী হইয়াছে ; সাধারণ্যে ইহার যথাযোগ্য সমাদর দেখিলে আমরা সুখী হইব। এরূপ একখানি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তিন টাকায় পাওয়া সৌভাগ্যের কথা নহে কি ?

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক প্রণীত নূতন উপন্যাস 'জোহরা' প্রকাশিত হইয়াছে ; মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী ধর প্রণীত 'বউ মা' প্রকাশিত হইয়াছে, দেড় টাকা দিয়া বৌমার মুখ দেখিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'উদ্‌যাপন' প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পালের 'বিধির বিধি' প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য পাঁচ সিকা।

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষের 'কাল বৌ' প্রকাশিত হইয়াছে। কাল বৌ, তাই দর্শনী আট আনা।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যালের 'বিল্বদল' প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত মতিলাল ভট্টাচার্য্য প্রকাশিত 'নক্ষত্র গ্রহ বর্ণনা' প্রকাশিত হইল, মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'অপরাধিনী' প্রকাশিত হইল। পাঠকের জরিমানা দেড় টাকা।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী প্রণীত 'কিণ্ডার গার্টেন ছড়া' মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত 'মলিনা' নাটক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীকথা' প্রকাশিত হইল। মূল্য বার আনা।

রিজিয়া প্রণেতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় প্রণীত আট আনা সংস্করণের ২২ সংখ্যক বহি "লীলার স্বপ্ন" প্রকাশিত হইল।

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ রায় প্রণীত নূতন পঞ্চাঙ্ক নাটক 'পাণিপথ' প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲ এক টাকা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৌলিকের 'স্বাতিয়া' গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য পাঁচ আনা।

শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত প্রণীত কাব্য 'মানসপ্রতিমা' হইয়াছে, মূল্য আট আনা।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'চরিত্রহীন' মহাশয়ের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে মূল্য ৩৷৹ ও

শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর 'প্রবাসীর প্রত্যাগমন' হইয়াছে মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত করালপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'তত্ত্বজ্ঞানামৃত' প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ণ মূল্য ছয় টাকা।

শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্ব্বকথা' প্রকাশিত মূল্য ॥৹ আনা।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Beharilal Nath,
The Emerald Printing Works,
9, Nanda K. Chaudhuri's 2nd Lane.